শতবর্ষের সেরা প্রেমের উপন্যাস

১

শতবর্ষের সেরা

প্রেমের উপন্যাস

১

সম্পাদনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
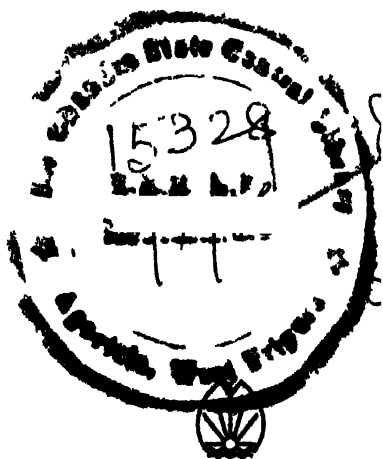
পত্র ভারতী
৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

SHATABARSHER SERA PREMER UPANYAS 1

Edited by

Sunil Gangapadhyay

পরিশিষ্ট

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ

সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

অলংকরণ

বিজন কর্মকার

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

'পত্র ভারতী'র পক্ষে ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত ও হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস,
১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

"ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে।
আমারে কার কথা সে যায় শুনিয়ে।..."

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

বাংলা উপন্যাসের যে-কোনও আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম অবশ্যই সর্বাগ্রগণ্য। শুধুমাত্র পথিকৃৎ হিসেবেই তিনি অনেক সম্মান পেতে পারতেন, কিন্তু তাঁর ভূমিকা তার চেয়েও অনেক বেশি। আমাদের অতি সৌভাগ্য এই যে বঙ্কিমের মতন এক মহৎ প্রতিভাধর লেখক বাংলা ভাষায় শুধু যে উপন্যাস রচনা শুরু করলেন তা নয়, প্রথম থেকেই এই রচনার মান অনেক উচ্চ তারে বেঁধে দিলেন। অর্থাৎ পরবর্তী লেখকদেরও সেই মানে পৌঁছোবার চেষ্টা করে যেতে হল।

বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই প্রায় সারা ভারতে সাড়া পড়ে যায়। অন্য কোনও ভারতীয় ভাষাতেই তখনও ঠিক উপন্যাসের আঙ্গিকে কিছু লেখা শুরু হয়নি। অন্যান্য ভাষার লেখকরা বঙ্কিমকে দেখে উদ্বুদ্ধ হন। গোড়ার দিকে বেশ কয়েকজন লেখক সরাসরি বঙ্কিমকেই অনুসরণ করেছেন। সুতরাং শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যেও বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় শীর্ষ স্থানে আছেন।

এই প্রেমের উপন্যাস সংকলনে বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ' কিংবা 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কোন্‌টি গ্রহণ করা হবে, তা নিয়ে দ্বিধা থাকতে পারে। বঙ্কিমের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলিতেও প্রেমের স্থান যথেষ্টই, কিন্তু সেগুলি রোমান্স-ধর্মী, তাঁর এই দুটি উপন্যাসই সমসাময়িক বাস্তবতা ভিত্তিক, দুটিই খুব জোরালো। তবে, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বঙ্কিমের নিজের জীবনের কিঞ্চিৎ ছায়া আছে, সেই কারণেই বেশি মর্মস্পর্শী মনে হয়।

উপন্যাসের বিষয়বস্তু বহু বিচিত্র বিষয়ের হতে পারে। একেবারে নরনারীর প্রেম বর্জিত উপন্যাসও হতে পারে, কিন্তু বিশ্বের অধিকাংশ, যেগুলি স্মরণীয় হয়ে আছে, সেগুলিতে অবশ্যই প্রেম অন্তর্লীন। এবং আশ্চর্যের বিষয়, এই সব প্রণয় কাহিনিতে মিলনের সার্থকতার চেয়ে অতৃপ্তি এবং মিলনের জন্য গোপন হাহাকারই প্রধান হয়ে থাকে।

রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা'-তেও রয়েছে সেই অচরিতার্থ প্রেম এবং বিচ্ছেদ বেদনার প্রবল সুর। রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি উপন্যাসও এই নিরিখে সার্থক, কিন্তু 'শেষের কবিতা' এই সংকলনে গ্রহণের কারণ, এ উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ যেন তাঁর পূর্বতন লেখক সত্তা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আবার নবীন হয়ে উঠেছেন। কল্লোল যুগের নবীন লেখকরা যখন রবীন্দ্রনাথকে প্রাচীন পন্থী বলে নিজেদেরই আধুনিকতার পরাকাষ্ঠা বলে দাবি করছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ শেষের কবিতায় সকলকে বিস্ময়াপন্ন করে দিয়ে হয়ে উঠলেন আধুনিকদের চেয়েও বেশি আধুনিক। এই তথ্য ছাড়াও, 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটি বড়ই বিষাদ-মধুর।

শরৎচন্দ্রের প্রায় সবকটি রচনাই প্রেম-কেন্দ্রিক। এমনকী 'পথের দাবি'-কেও তা বলা যায়। সুতরাং এমন সংকলনে তাঁর একটি রচনা নির্বাচন করা বেশ শক্ত। এবং তাঁর প্রায় সবকটি লেখাই চলচ্চিত্রায়িত হয়েছে বলে একালের যে-সমস্ত পাঠক তাঁর লেখা পড়েননি, তাঁদের কাছেও সব কাহিনিই পরিচিত। সেই জন্যই 'পরিণীতা' বেছে নেওয়ার কারণ, ভাষার দিক থেকে এই উপন্যাসোপম বড় গল্পটি খুবই সুলিখিত, কাহিনির থেকেও সাহিত্যের স্বাদ এখানে মুখ্য।

রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের যুগের পর বাংলা উপন্যাসে দীর্ঘদিন শীর্ষস্থানে সৃষ্টিশীল থেকেছেন তিন বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা মনুষ্য হৃদয়ের গভীরে যেমন অনুসন্ধান চালিয়েছেন, তেমনি উপন্যাসের পটভূমিকা ও পরিধিও বাড়িয়েছেন অনেকখানি। সেইজন্যই এঁদের তিনজনের তিনরকম রসের কাহিনি স্থান পেয়েছে এই সংকলনে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' এক অসাধারণ গ্রন্থ। এক হিসেবে গ্রন্থটি প্রকৃতি-প্রেমের কাহিনি মনে হলেও, সেই অরণ্যে বিচরণশীল নারী-পুরুষগুলিও অপ্রধান নয়। এসেছে চকিত প্রেমের মুহূর্ত।

এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ই নিম্নবর্গীয়, দরিদ্র কিংবা অতি সাধারণ মানুষকে মহত্ত্বে উন্নীত করেছেন। বিভূতিভূষণ যেমন 'আরণ্যকে' এনেছেন আদিবাসী রমণীর কথা, তেমনি তারাশঙ্কর তাঁর 'কবি'-তে এক কবিত্ব প্রতিভাসম্পন্ন অভাজন, রেল স্টেশনের কুলিকে নায়কের মর্যাদা দিয়ে রচনা করেছেন এক ক্লাসিক উপন্যাস।

নিম্নবর্গীয় মানুষদের নিয়েই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন তাঁর অধিকাংশ উপন্যাস ও ছোটগল্প। তাঁর ছোট উপন্যাস 'চতুষ্কোণ' সেদিক থেকে ব্যতিক্রমী। এবং অল্প পরিচিত। তাঁর প্রথম জীবনের এই রচনাটিতে আছে মনস্তত্ত্বের জটিলতা এবং সেইসঙ্গে শরীরের ভাষাতেও প্রেমকে খোঁজা।

কল্লোল যুগের লেখকরা প্রেমের সঙ্গে শরীরের সম্পর্কের কথা নিয়ে এলেন সরাসরি-ভাবে। তার আগে সব প্রেম কাহিনিতেই শরীরকে উহ্য রাখার একটা প্রবণতা ছিল। অবশ্য একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে নায়িকার বক্ষ-আবরণী ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ শরীরসঙ্গী ভালোবাসার কথা লিখে দারুণ আলোড়ন তুলেছিলেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রও ছিলেন এই দলে। তবে তিনি যত মন দিয়ে ছোটগল্প লিখেছেন, তেমন মন দেননি উপন্যাস রচনায়।

কল্লোল গোষ্ঠীর বাইরেও কিছু-কিছু শক্তিশালী লেখক ছিলেন, যেমন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, সুবোধ ঘোষ, সৈয়দ মুজতবা আলী প্রমুখ। গোয়েন্দা গল্প ও ভূতের গল্পের জন্য বিখ্যাত হলেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসগুলিই ভাষার গুণে ও কল্পনার মাধুর্যে স্মরণীয়। বনফুল বহু রকমের কাহিনি লিখেছেন, চাঁছা-ছোলা প্রেমের কাহিনিও অপরূপ করে তুলেছেন। সুবোধ ঘোষের রচনাগুলিকে বলা উচিত নির্মাণ। বিষয় বৈচিত্র্য তো আছেই, শব্দ দিয়ে গেঁথে-গেঁথে তিনি চরিত্রগুলিকে ছবি ঠিক নয়, ভাস্কর্য করে তোলেন। সৈয়দ মুজতবা আলী লেখা শুরু করেছেন বেশি বয়েসে এবং শুরু থেকেই শীর্ষে অবস্থান করছেন। তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় 'শবনম' উপন্যাসটি একেবারে অন্যরকম।

যেমন বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে সবাই কৌতুক রসের লেখক বলেই জানত। হঠাৎ তিনি 'নীলাঙ্গুরীয়'র মতন এক নরম, স্নিগ্ধ রসের উপন্যাস লিখে ফেললেন, যা আজ ক্লাসিকের পর্যায়ে পড়ে।

এক হিসেবে জীবনানন্দ দাশের তুলনা বিশ্ব সাহিত্যে নেই। কবি হিসেবে তিনি অতুলনীয় তো বটেই, তাঁর বিপুল গদ্য-সম্ভার জীবৎকালে গোপন করে গেছেন। অন্তত ১৭টি উপন্যাস, প্রায় পঞ্চাশটি ছোট গল্পের সন্ধান পাওয়া গেছে, যার একটিও তিনি প্রকাশ করেননি। তাঁর পাণ্ডুলিপির খাতায় এরকম আরও রচনা উদ্ধার করার কাজ চলছে। কোন প্রেরণায় একজন লেখক ১৭টি উপন্যাস রচনা করেন কিন্তু প্রকাশ করেন না? যথা সময়ে প্রকাশিত হলে তিনি কবি ও কথা-সাহিত্যিক হিসেবেও গণ্য হতেন।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রায় সমস্ত রচনাতেই কাহিনির অংশ অকিঞ্চিৎকর, তাঁর সন্ধানী চোখ সবসময় বিচরণ করেছে চরিত্রগুলির মনোজগতে। অন্ধকারের মধ্যে ফেলেছেন আলো। অসুন্দরের মধ্যেও খুঁজেছেন রূপ।

সতীনাথ ভাদুড়ীর উপন্যাসটি আগে স্থান পেলেও এর আলোচনা আমি সব শেষে রেখেছি একটি বিশেষ কারণে। প্রেম বিষয়ক আলোচনায় প্রেমের নানা বর্ণের কথাই আমাদের মনে পড়ে। সে বর্ণগুলিও আমাদের জানা হয়ে গেছে। তার মধ্যে নতুন কোনও বর্ণ যোগ করা নিশ্চিত বিস্ময়কর ব্যাপার। সতীনাথ ভাদুড়ী তাঁর 'অচিন রাগিনী' উপন্যাসে সেই কাজই করেছেন। ভালোবাসার এই রাগিনীটির রেখাচিত্র সর্বাংশে নতুন।

নতুন প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকারা সাধারণত সমসাময়িক কালের সাহিত্য রচনাই পাঠ করে। ক্লাসিকের কিছু-কিছু নমুনা থাকে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকে। কেউ কেউ হয়তো স্ব-শিক্ষিত হওয়ার জন্য বঙ্কিম-রবীন্দ্র সাহিত্য অনেকখানি পড়ে নেন। কিন্তু আমাদের বাংলা ভাষায় এমন বেশ কিছু উপন্যাস রচিত হয়েছে, যা বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তুলনীয়। সেই সব রচনা বিস্মৃত হওয়া খুবই দুঃখজনক। বরং পারিবারিক সম্পদের মতন বারবার দেখার মতন। সব বিখ্যাত বইগুলিও অবশ্য সবসময় সহজলভ্য নয়। সেখানেই এই ধরনের সংকলনের সার্থকতা। নির্বাচনের জন্যও পাঠককে সাহিত্যের ইতিহাস হাতড়াতে হবে না। এ-বই একটানা পড়বার মতনও নয়, শিয়রের কাছে রেখে দিতে হবে, পড়তে হবে যখন রসগ্রহণের জন্য পাঠকের মন থাকবে প্রস্তুত।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশকের কৈফিয়ত

বহুদিন ধরেই ভাবনা সযত্নে লালিত হচ্ছিল আমাদের মনে। বাংলাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার উপন্যাসগুলিকে বাছাই করে গ্রন্থাকারে পাঠকের হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা। এই পথ ধরেই প্রকাশিত হয়েছে 'শতবর্ষের সেরা রহস্য উপন্যাস'। তারপরেই মনে হল, বাংলাসাহিত্যের যা চিরকালীন সম্পদ, সেই 'প্রেমের উপন্যাস'-এর প্রামাণ্য ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ নির্মাণের, যা থেকে যে-কোনও পাঠক আস্বাদ করতে পারবেন এই ধারার ক্রমবিবর্তনও।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এলেন। তালিকা তৈরি থেকে ক্রমপর্যায় অনুযায়ী সাজানো সবই বরেণ্য কথাশিল্পীর। কিন্তু প্রকাশের সময়ে দেখা গেল সম্পাদকের নির্বাচিত প্রথম খণ্ডের উপন্যাসগুলি আয়তনে অনেক বৃহৎ হওয়ায় প্রথম খণ্ডে একত্রে কিছুতেই সঙ্কুলান হচ্ছে না। অতএব সেই উপন্যাসগুলিকেই সময়সারণি অটুট রেখে বিভক্ত করা হয়েছে দুটি খণ্ডে। কিছুদিনের মধ্যে বেরুচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ডটিও।

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিষবৃক্ষ

বঙ্কিম্‌চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নগেন্দ্রের নৌকাযাত্রা

নগেন্দ্র দত্ত নৌকারোহণে যাইতেছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাস, তুফানের সময়; ভার্য্যা সূর্য্যমুখী মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন, দেখিও নৌকা সাবধানে লইয়া যাইও, তুফান দেখিলে লাগাইও। ঝড়ের সময় কখন নৌকায় থাকিও না। নগেন্দ্র স্বীকৃত হইয়া নৌকারোহণ করিয়াছিলেন। নহিলে সূর্য্যমুখী ছাড়িয়া দেন না। কলিকাতায় না গেলেও নহে, অনেক কাজ ছিল।

নগেন্দ্রনাথ মহাধনবান্ ব্যক্তি, জমিদার। তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণন করিব। নগেন্দ্র বাবু যুবা পুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র। নগেন্দ্রনাথ আপনার বজরায় যাইতেছিলেন। প্রথম দুই এক দিন নির্ব্বিঘ্নে গেল। নগেন্দ্র দেখিতে দেখিতে গেলেন, নদীর জল অবিরল চল্ চল্ চলিতেছে—ছুটিতেছে—বাতাসে নাচিতেছে—রৌদ্রে হাসিতেছে—আবর্ত্তে ডাকিতেছে। জল অশ্রান্ত—অনন্ত—ক্রীড়াময়। জলের ধারে তীরে তীরে মাঠে মাঠে রাখালেরা গোরু চরাইতেছে, কেহ বা বৃক্ষের তলায় বসিয়া গান করিতেছে, কেহ বা তামাকু খাইতেছে, কেহ বা মারামারি করিতেছে, কেহ কেহ ভুজা খাইতেছে। কৃষকে লাঙ্গল চষিতেছে, গোরু ঠেঙ্গাইতেছে, গোরুকে মানুষের অধিক করিয়া গালি দিতেছে, কৃষাণকেও কিছু কিছু ভাগ দিতেছে। ঘাটে ঘাটে কৃষকের মহিষীরাও কলসী, ছেঁড়া কাঁথা, পচা মাদুর, রূপার তাবিজ, নাকছাবি, পিতলের পৈঁচে, দুই মাসের ময়লা পরিধেয় বস্ত্র, মসীনিন্দিত গায়ের বর্ণ, রুক্ষ কেশ লইয়া বিরাজ কবিতেছেন। তাহার মধ্যে কোন সুন্দরী মাথায় কাদা মাখিয়া মাথা ঘসিতেছেন। কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছেন, কেহ কোন অনুদ্দিষ্টা, অব্যক্তনাম্নী, প্রতিবাসিনীর সঙ্গে উদ্দেশে কোন্দল করিতেছেন, কেহ কাষ্ঠে কাপড় আছড়াইতেছেন। কোন কোন ভদ্রগ্রামের ঘাটে কুলকামিনীরা ঘাট আলো করিতেছেন। প্রাচীনারা বক্তৃতা করিতেছেন—মধ্যবয়স্কারা শিবপূজা করিতেছেন—যুবতীরা ঘোমটা দিয়া ডুব দিতেছেন—আর বালক বালিকারা চেঁচাইতেছে, কাদা মাখিতেছে, পূজাব ফুল কুড়াইতেছে, সাঁতার দিতেছে, সকলের গায়ে জল দিতেছে, কখন কখন ধ্যানে মগ্না মুদ্রিতনয়না কোন গৃহিণীর সম্মুখস্থ কাদার শিব লইযা পলাইতেছে। ব্রাহ্মণ ঠাকুরেরা নিরীহ ভালমানুষের মত আপন মনে গঙ্গাস্তব পড়িতেছেন, পূজা করিতেছেন, এক একবার আকণ্ঠনিমজ্জিতা কোন যুবতীর প্রতি অলক্ষ্যে চাহিয়া লইতেছেন। আকাশে শাদা মেঘ রৌদ্রতপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, তাহার নীচে কৃষ্ণবিন্দুবৎ পাখী উড়িতেছে, নারিকেল গাছে চিল বসিয়া, রাজমন্ত্রীর মত চারি দিক্ দেখিতেছে, কাহার কিসে ছোঁ মারিবে। বক ছোট লোক, কাদা ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। ডাহুক রসিক লোক, ডুব মারিতেছে। আর আর পাখী হাল্কা লোক, কেবল উড়িয়া বেড়াইতেছে। হাটুরিয়া নৌকা হটর হটর করিয়া যাইতেছে—আপনার প্রয়োজনে। খেয়া নৌকা গজেন্দ্রগমনে যাইতেছে,—পরের প্রয়োজনে। বোঝাই নৌকা যাইতেছে না,—তাহাদের প্রভুর প্রয়োজন মাত্র।

নগেন্দ্র প্রথম দুই এক দিন দেখিতে দেখিতে গেলেন। পরে এক দিন আকাশে মেঘ উঠিল, মেঘ আকাশ ঢাকিল, নদীর জল কালো হইল, গাছের মাথা কটা হইল, মেঘের কোলে বক উড়িল, নদী নিস্পন্দ হইল। নগেন্দ্র নাবিকদিগকে আজ্ঞা করিলেন, "নৌকাটা কিনারায় বাঁধিও।" রহমত মোল্লা মাঝি তখন নেমাজ করিতেছিল, কথার উত্তর দিল না। রহমত আর কখন মাঝিগিরি করে নাই—তাহার নানার খালা মাঝির মেয়ে ছিল, তিনি সেই গর্ব্বে মাঝিগিরির উমেদার হইয়াছিলেন, কপালক্রমে সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। রহমত হাঁকে ডাকে খাটো নন, নেমাজ সমাপ্ত হইলে বাবুর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "ভয় কি, হজুর! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।" রহমত মোল্লার এত সাহসের কারণ এই যে, কিনারা অতি নিকট, অবিলম্বেই কিনারায় নৌকা লাগিল। তখন নাবিকেরা নামিয়া নৌকা কাছি করিল।

বোধ হয়, রহমত মোল্লার সঙ্গে দেবতার কিছু বিবাদ ছিল, ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল। ঝড় আগে আসিল। ঝড় ক্ষণেক কাল গাছপালার সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিয়া সহোদর বৃষ্টিকে ডাকিয়া আনিল।

তখন দুই ভাই বড় মাতামাতি আরম্ভ করিল। ভাই বৃষ্টি, ভাই ঝড়ের কাঁধে চড়িয়া উড়িতে লাগিল। দুই ভাই গাছের মাথা ধরিয়া নোয়ায়, ডাল ভাঙ্গে, লতা ছেঁড়ে, ফুল লোপে, নদীর জল উড়ায়, নানা উৎপাত করে। এক ভাই রহমত মোল্লার টুপি উড়াইয়া লইয়া গেল। আর এক ভাই তাহার দাড়িতে প্রস্রবণের সৃজন করিল। দাঁড়ীরা পাল মুড়ি দিয়া বসিল। বাবু সব সাসী ফেলিয়া দিলেন। ভৃত্যেরা নৌকাসজ্জা সকল রক্ষা করিতে লাগিল।

নগেন্দ্র বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। নৌকা হইতে ঝড়ের ভয়ে নামিলে নাবিকেরা কাপুরুষ মনে করিবে—না নামিলে সূর্য্যমুখীর কাছে মিথ্যাবাদী হইতে হয়। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, "তাহাতে বা ক্ষতি কি?" আমরা জানি না, কিন্তু নগেন্দ্র ক্ষতি বিবেচনা করিতেছিলেন। এমত সময়ে রহমত মোল্লা স্বয়ং বলিল যে, "হুজুর, পুরাতন কাছি, কি জানি কি হয়, ঝড় বড় বাড়িল, নৌকা হইতে নামিলে ভাল হইত।" সুতরাং নগেন্দ্র নামিলেন।

নিরাশ্রয়ে, নদীতীরে ঝড় বৃষ্টিতে দাঁড়ান কাহারও সুসাধ্য নহে। বিশেষ সন্ধ্যা হইল, ঝড় থামিল না, সুতরাং আশ্রয়ানুসন্ধানে যাওয়া কর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া নগেন্দ্র গ্রামাভিমুখে চলিলেন। নদীতীর হইতে গ্রাম কিছু দূরবর্ত্তী; নগেন্দ্র পদব্রজে কর্দ্দমময় পথে চলিলেন। বৃষ্টি থামিল, ঝড়ও অল্পমাত্র রহিল, কিন্তু আকাশ মেঘপরিপূর্ণ; সুতরাং রাত্রে আবার ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা। নগেন্দ্র চলিলেন, ফিরিলেন না।

আকাশে মেঘাড়ম্বরকারণ রাত্রি প্রদোষকালেই ঘনান্ধতমোময়ী হইল। গ্রাম, গৃহ, প্রান্তর, পথ, নদী কিছুই লক্ষ্য হয় না। কেবল বনবিটপী সকল, সহস্র সহস্র খদ্যোতমালাপরিমণ্ডিত হইয়া হীরকখচিত কৃত্রিম বৃক্ষের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। কেবলমাত্র গর্জ্জনবিরত শ্বেতকৃষ্ণাভ মেঘমালার মধ্যে হ্রস্বদীপ্তি সৌদামিনী মধ্যে মধ্যে চমকিতেছিল—স্ত্রীলোকের ক্রোধ একেবারে হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। কেবলমাত্র নববারিসমাগমপ্রফুল্ল ভেকেরা উৎসব করিতেছিল। ঝিল্লীরব মনোযোগপূর্ব্বক লক্ষ্য করিলে শুনা যায়, রাবণের চিতার ন্যায় অশ্রান্ত রব করিতেছে, কিন্তু বিশেষ মনোযোগ না করিলে লক্ষ্য হয় না। শব্দের মধ্যে বৃক্ষাগ্র হইতে বৃক্ষপত্রের উপর বর্ষাবিশিষ্ট বারিবিন্দুর পতনশব্দ, বৃক্ষতলস্থ বর্ষাজলে পত্রচ্যুত জলবিন্দুপতনশব্দ, পথিস্থ অনিঃসৃত জলে শৃগালের পদসঞ্চারণশব্দ, কদাচিৎ বৃক্ষারূঢ় পক্ষীর আর্দ্র পক্ষের জল মোচনার্থ পক্ষবিধূননশব্দ। মধ্যে মধ্যে শমিতপ্রায় বায়ুর ক্ষণিক গর্জ্জন, তৎসঙ্গে বৃক্ষপত্রচ্যুত বারিবিন্দু সকলের এককালীন পতনশব্দ। ক্রমে নগেন্দ্র দূরে একটা আলো দেখিতে পাইলেন। জলপ্লাবিত ভূমি অতিক্রম করিয়া, বৃক্ষচ্যুত বারি কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া, বৃক্ষতলস্থ শৃগালের ভীতি বিধান করিয়া, নগেন্দ্র সেই আলোকাভিমুখে চলিলেন। বহু কষ্টে আলোকসন্নিধি উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এক ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীন বাসগৃহ হইতে আলো নির্গত হইতেছে। গৃহের দ্বার মুক্ত। নগেন্দ্র ভৃত্যকে বাহিরে রাখিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, গৃহের অবস্থা ভয়ানক।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : দীপনির্ব্বাণ

গৃহটি নিতান্ত সামান্য নহে। কিন্তু এখন তাহাতে সম্পদ্‌লক্ষণ কিছুই নাই। প্রকোষ্ঠ সকল ভগ্ন, মলিন, মনুষ্য-সমাগম-চিহ্ন-বিরহিত। কেবলমাত্র পেচক, মূষিক ও নানাবিধ কীটপতঙ্গাদি-সমাকীর্ণ। একটিমাত্র কক্ষে আলো জ্বলিতেছিল। সেই কক্ষমধ্যে নগেন্দ্র প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন কক্ষমধ্যে মনুষ্য-জীবনোপযোগী দুই একটা সামগ্রী আছে মাত্র, কিন্তু সে সকল সামগ্রী দারিদ্র্যব্যঞ্জক। দুই একটা হাঁড়ি—একটা ভাঙ্গা উনান—তিনি চারিখান তৈজস—ইহাই গৃহালঙ্কার। দেওয়ালে কালি, কোণে ঝুলি; চারিদিকে আরসুলা, মাকড়সা, টিকটিকি, ইন্দুর বেড়াইতেছে। এক ছিন্ন শয্যায় এক জন প্রাচীন শয়ন করিয়া আছেন। দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। চক্ষু ম্লান, নিশ্বাস প্রখর, ওষ্ঠ কম্পিত।

শয্যাপার্শ্বে গৃহচ্যুত ইষ্টকখণ্ডের উপর একটি মৃন্ময় প্রদীপ, তাহাতে তৈলাভাব; শয্যোপরিস্থ জীবন-প্রদীপেও তাহাই। আর শয্যাপার্শ্বেও আর এক প্রদীপ ছিল,—এক অনিন্দিতগৌরকান্তি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়রূপিনী বালিকা।

তৈলহীন প্রদীপের জ্যোতিঃ অপ্রখর বলিয়াই হউক, অথবা গৃহবাসী দুই জন আশু ভাবী বিরহের চিন্তায় প্রগাঢ়তর বিমনা থাকার কারণেই হউক, নগেন্দ্রের প্রবেশকালে কেহই তাঁহাকে দেখিল না। তখন নগেন্দ্র দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া সেই প্রাচীনের মুখনির্গত চরমকালিক দুঃখের কথা সকল শুনিতে লাগিলেন। এই দুই জন, প্রাচীন এবং বালিকা, এই বহুলোকপূর্ণ লোকালয়ে নিঃসহায়। এক দিন ইহাদিগের সম্পদ্ ছিল, লোক জন, দাস দাসী, সহায় সৌষ্ঠব সব ছিল। কিন্তু চঞ্চলা কমলার কৃপার সঙ্গে সঙ্গে একে একে সকলই গিয়াছিল। সদ্যঃসমাগত দারিদ্র্যের পীড়নে পুত্রকন্যার মুখমণ্ডল, হিমনিষিক্ত পদ্মবৎ দিন দিন ম্লান দেখিয়া, অগ্রেই গৃহিণী নদী-সৈকতশয্যায় শয়ন করিলেন। আর সকল তারাগুলিও সেই চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে নিবিল। এক বংশধর পুত্র, মাতার চক্ষের মণি, পিতার বার্দ্ধক্যের ভরসা, সেও পিতৃসমক্ষে চিতারোহণ করিল। কেহ রহিল না, কেবল প্রাচীন আর এই লোকমনোমোহিনী বালিকা, সেই বিজনবনবেষ্টিত ভগ্ন গৃহে বাস করিতে লাগিল। পরস্পরে পরস্পরের একমাত্র উপায়। কুন্দনন্দিনী বিবাহের বয়স অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু কুন্দ পিতার অন্ধের যষ্টি, এই সংসারবন্ধনের এখন একমাত্র গ্রন্থি; বৃদ্ধ প্রাণ ধরিয়া তাহাকে পরহস্তে সমর্পণ করিতে পারিলেন না। "আর কিছু দিন যাক্—কুন্দকে বিলাইয়া দিয়া কোথায় থাকিব? কি লইয়া থাকিব?" বিবাহের কথা মনে হইলে, বৃদ্ধ এইরূপ ভাবিতেন। এ কথা তাঁহার মনে হইত না যে, যে দিন তাঁহার ডাক পড়িবে, সে দিন কুন্দকে কোথায় রাখিয়া যাইবেন। আজি অকস্মাৎ যমদূত আসিয়া শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইল। তিনি ত চলিলেন। কুন্দনন্দিনী কালি কোথায় দাঁড়াইবে?

এই গভীর অনিবার্য্য যন্ত্রণা মুমূর্ষুর প্রতি নিশ্বাসে ব্যক্ত হইতেছিল। অবিরল মুদ্রিতোন্মুখনেত্রে বারিধারা পড়িতেছিল। আর শিরোদেশে প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির ন্যায় সেই ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা স্থিরদৃষ্টে মৃত্যুমেঘাচ্ছন্ন পিতৃমুখপ্রতি চাহিয়াছিল। আপনা ভুলিয়া, কালি কোথা যাইবে তাহা ভুলিয়া, কেবল গমনোন্মুখের মুখপ্রতি চাহিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধের বাক্যস্ফূর্ত্তি অস্পষ্টতর হইতে লাগিল। নিশ্বাস কণ্ঠাগত হইল, চক্ষু নিস্তেজ হইল; ব্যথিতপ্রাণ ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইল। সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জ্জন করিতেছিল, ভগ্ন গৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্ব্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারি বার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ছায়া পূর্ব্বগামিনী

নিশীথ সময়। ভগ্ন গৃহমধ্যে কুন্দনন্দিনী ও তাহার পিতার শব। কুন্দ ডাকিল, "বাবা।" কেহ উত্তর দিল না। কুন্দ একবার মনে করিল, পিতা ঘুমাইলেন, আবার মনে করিল, বুঝি মৃত্যু—কুন্দ সে কথা স্পষ্ট মুখে আনিতে পারিল না। শেষে, কুন্দ আর ডাকিতেও পারিল না, ভাবিতেও পারিল না। অন্ধকারে ব্যজনহস্তে যেখানে তাহার পিতা জীবিতাবস্থায় শয়ান ছিলেন, এক্ষণে যেখানে তাঁহার শব পড়িয়াছিল, সেইখানেই বায়ুসঞ্চালন করিতে লাগিল। নিদ্রাই শেষে স্থির করিল, কেন না, মরিলে কুন্দের দশা কি হইবে? দিবারাত্রি জাগরণে এবং এক্ষণকার ক্লেশে বালিকার তন্দ্রা আসিল। কুন্দনন্দিনী

রাত্রি দিবা জাগিয়া পিতৃসেবা করিয়াছিল। নিদ্রাকর্ষণ হইলে কুন্দনন্দিনী তালবৃন্তহস্তে সেই অনাবৃত কঠিন শীতল হর্ম্ম্যতলে আপন মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা গেল।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বপ্ন দেখিল। দেখিল, যেন রাত্রি অতি পরিষ্কার জ্যোৎস্নাময়ী। আকাশ উজ্জ্বল নীল, সেই প্রভাময় নীল আকাশমণ্ডলে যেন বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডলের বিকাশ হইয়াছে। এত বড় চন্দ্রমণ্ডল কুন্দ কখন দেখে নাই। তাহার দীপ্তিও অতিশয় ভাস্বর, অথচ নয়নস্নিগ্ধকর। কিন্তু সেই রমণীয় প্রকাণ্ড চন্দ্রমণ্ডলমধ্যে চন্দ্র নাই; তৎপরিবর্ত্তে কুন্দ মণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী এক অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী দৈবী মূর্ত্তি দেখিল। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিসনাথ চন্দ্রমণ্ডল যেন উচ্চ গগন পরিত্যাগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নীচে নামিতেছিল। ক্রমে সেই চন্দ্রমণ্ডল, সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল। তখন কুন্দ দেখিল যে, সেই মণ্ডলমধ্যশোভিনী, আলোকময়ী, কিরীট-কুণ্ডলাদি-ভূষণালঙ্কৃতা মূর্ত্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা। রমণীয় কারুণ্যপরিপূর্ণ মুখমণ্ডল, স্নেহপরিপূর্ণ হাস্য অধরে স্ফুরিত হইতেছে। তখন কুন্দ সভয়ে সানন্দে চিনিল যে, সেই করুণময়ী তাহার বহুকাল-মৃতা প্রসূতির অবয়ব ধারণ করিয়াছে। আলোকময়ী সস্নেহাননে কুন্দকে ভূতল হইতে উত্থিতা করিয়া ক্রোড়ে লইলেন। এবং মাতৃহীনা কুন্দ বহুকাল পরে 'মা' কথা মুখে আনিয়া যেন চরিতার্থ হইল। পরে জ্যোতির্ম্মণ্ডলমধ্যস্থা কুন্দের মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন, "বাছা! তুই বিস্তর দুঃখ পাইয়াছিস্। আমি জানিতেছি যে, বিস্তর দুঃখ পাইবি। তোর এই বালিকা বয়ঃ, এই কুসুম-কোমল শরীর, তোর শরীরে সে দুঃখ সহিবে না। অতএব তুই আর এখানে থাকিস না। পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়।" কুন্দ যে ইহাতে উত্তর করিল যে, "কোথায় যাইব?" তখন কুন্দের জননী ঊর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা উজ্জ্বল প্রজ্বলিত নক্ষত্রলোক দেখাইয়া দিয়া বলিলেন যে, "ঐ দেশ।" কুন্দ তখন যেন বহুদূরবর্ত্তী বেলাবিহীন অনন্তসাগরপারস্থবৎ অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, "আমি অত দূর যাইতে পারিব না; আমার বল নই।" তখন ইহা শুনিয়া জননীর কারুণ্য-প্রফুল্ল অথচ গম্ভীর মুখমণ্ডলে ঈষৎ অনাহ্লাদ-জনিতবৎ ভ্রূকুটি বিকাশ হইল, এবং তিনি মৃদুগম্ভীর স্বরে কহিলেন, "বাছা, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোকপ্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া, আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও। এখন তুমি আমার অঙ্গুলিসঙ্কেতনীতনয়নে আকাশপ্রান্তে চাহিয়া দেখ। আমি তোমাকে দুইটি মনুষ্যমূর্ত্তি দেখাইতেছি। এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও। তাহারা যে পথে যাইবে, সে পথে যাইও না।"

তখন জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলিসঙ্কেতদ্বারা গগনোপান্ত দেখাইলেন। কুন্দ তৎসঙ্কেতানুসারে দেখিল, নীল গগনপটে এক দেবনিন্দিত পুরুষমূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। তাঁহার উন্নত, প্রশস্ত, প্রশান্ত ললাট; সরল, সকরুণ কটাক্ষ; তাঁহার মরালবৎ দীর্ঘ ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবা এবং অন্যান্য মহাপুরুষলক্ষণ দেখিয়া, কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না যে, ইহা হইতে আশঙ্কা সম্ভবে। তখন ক্রমে ক্রমে সে প্রতিমূর্ত্তি জলবুদ্বুদবৎ গগনপটে বিলীন হইলে, জননী কুন্দকে কহিলেন, "ইহার দেবকান্ত রূপ দেখিয়া ভুলিও না। ইনি মহদাশয় হইলেও, তোমার অমঙ্গলের কারণ। অতএব বিষধরবোধে ইহাকে ত্যাগ করিও।" পরে আলোকময়ী পুনশ্চ "*ঐ দেখ*" বলিয়া গগনপ্রান্তে নির্দ্দেশ করিলে, কন্দু দ্বিতীয় মূর্ত্তি আকাশের নীলপটে চিত্রিত দেখিল। কিন্তু এবার পুরুষমূর্ত্তি নহে। কুন্দ তথায় এক উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী দেখিল। তাহাকে দেখিয়াও কুন্দ ভীতা হইল না। জননী কহিলেন, "এই শ্যামাঙ্গী নারীবেশে রাক্ষসী। ইহাকে দেখিলে পলায়ন করিও।"

ইহা বলিতে বলিতে সহসা আকাশ অন্ধকারময় হইল, বৃহচ্চন্দ্রমণ্ডল আকাশে অন্তর্হিত হইল এরং তৎসহিত তন্মধ্যসংবর্ত্তিনী তেজোময়ীও অন্তর্হিতা হইলেন। তখন কুন্দের নিদ্রাভঙ্গ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ এই সেই

নগেন্দ্র গ্রামমধ্যে গমন করিলেন। শুনিলেন, গ্রামের নাম ঝুমঝুমপুর। তাঁহার অনুরোধে এবং আনুকূল্যে গ্রামস্থ কেহ কেহ আসিয়া মৃতেব সৎকারের আয়োজন করিতে লাগিল। একজন প্রতিবেশিনী কুন্দনন্দিনীর নিকটে রহিল। কুন্দ যখন দেখিল যে, তাহার পিতাকে সৎকারের জন্য লইয়া গেল, তখন তাঁহার মৃত্যুসম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া, অবিরত রোদন করিতে লাগিল।

প্রভাতে প্রতিবেশিনী আপন গৃহকার্য্যে গেল। কুন্দনন্দিনী সান্ত্বনার্থ আপন কন্যা চাঁপাকে পাঠাইয়া দিল। চাঁপা কুন্দের সমবয়স্কা এবং সঙ্গিনী। চাঁপা আসিয়া কুন্দের সঙ্গে নানাবিধ কথা কহিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল যে, কুন্দ কোন কথাই শুনিতেছে না, রোদন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রত্যাশাপন্নবৎ আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছে। চাঁপা কৌতূহলপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা করিল, "এক শ বার আকাশপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ?" কুন্দ তখন কহিল, "আকাশ থেকে কাল মা আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে ডাকিলেন, 'আমার সঙ্গে আয়।' আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, আমি ভয় পাইলাম, মাব সঙ্গে গেলাম না। এখন ভাবিতেছি, কেন গেলাম না। এখন আর যদি তিনি আসেন, আমি যাই। তাই ঘন ঘন আকাশপানে চাহিয়া দেখিতেছি।"

চাঁপা কহিল, "হাঁ! মরা মানুষ নাকি আবার আসিয়া থাকে?"

তখন কুন্দ স্বপ্নবৃত্তান্ত সকল বলিল। শুনিয়া চাঁপা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সেই আকাশের গায়ে যে পুরুষ আর মেয়ে মানুষ দেখিয়াছিলে, তাহাদের চেন?"

কুন্দ। না; তাহাদের আর কখন দেখি নাই। সেই পুরুষের মত সুন্দর পুরুষ যেন কোথাও নাই। এমন রূপ কখনও দেখি নাই।

এদিকে নগেন্দ্র প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া গ্রামস্থ সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই মৃত ব্যক্তির কন্যাব কি হইবে? সে কোথায় থাকিবে? তাহার কে আছে?" ইহাতে সকলেই উত্তর করিল যে, "উহার থাকিবার স্থান নাই, উহার কেহ নাই।" তখন নগেন্দ্র কহিলেন, "তবে তোমরা কেহ উহাকে গ্রহণ কর। উহার বিবাহ দিও। তাহার ব্যয় আমি দিব। আর যতদিন সে তোমাদিগের বাটীতে থাকিবে, ততদিন আমি তাহাব ভরণপোষণের ব্যয়ের জন্য মাসিক কিছু টাকা দিব।"

নগেন্দ্র যদি নগদ টাকা ফেলিয়া দিতেন, তাহা হইলে অনেকে তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইতে পারিত। পরে নগেন্দ্র চলিয়া গেলে কুন্দকে বিদায় করিয়া দিত, অথবা দাসীবৃত্তিতে নিযুক্ত করিত। কিন্তু নগেন্দ্র সেরূপ মূঢ়তার কার্য্য করিলেন না। সুতরাং নগদ টাকা না দেখিয়া কেহই তাঁহার কথায় বিশ্বাস কবিল না।

তখন নগেন্দ্রকে নিরুপায় দেখিয়া একজন বলিল, "শ্যামবাজারে ইহার এক মাসীর বাড়ী আছে। বিনোদ ঘোষ ইহার মেসো। আপনি কলকাতায় যাইতেছেন, যদি ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া সেইখানে রাখিয়া আসেন, তবেই এই কায়স্থকন্যার উপায় হয়, এবং আপনারও স্বজাতির কাজ করা হয়।"

অগত্যা নগেন্দ্র এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। এবং কুন্দকে এই কথা বলিবার জন্য তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। চাঁপা কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিল।

আসিতে আসিতে দূর হইতে নগেন্দ্রকে দেখিয়া কুন্দ অকস্মাৎ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইল। তাহার পর আর পা সরিল না। সে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে বিমূঢ়ার ন্যায় নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

চাঁপা কহিল, "ও কি, দাঁড়ালি যে?"

কুন্দ অঙ্গুলিনির্দ্দেশের দ্বারা দেখাইয়া কহিল, "এই সেই।"

চাঁপা কহিল, "এই কে?" কুন্দ কহিল, "যাহাকে মা কাল রাত্রে আকাশের গায়ে দেখাইয়াছিলেন।"

তখন চাঁপাও বিস্মিতা ও শঙ্কিতা হইয়া দাঁড়াইল। বালিকারা অগ্রসর হইতে হইতে সঙ্কুচিতা হইল দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাদিগের নিকট আসিলেন এবং কুন্দকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলেন। কুন্দ কোন উত্তর করিতে পারিল না; কেবল বিস্ময়বিস্ফারিতলোচনে নগেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অনেক প্রকারের কথা

অগত্যা নগেন্দ্রনাথ কুন্দকে কলিকাতায় আত্মসমভিব্যাহারে লইয়া আসিলেন। প্রথমে তাহার মেসো বিনোদ ঘোষের অনেক সন্ধান করিলেন। শ্যামবাজারে বিনোদ ঘোষ নামে কাহাকেও পাওয়া গেল না। এক বিনোদ দাস পাওয়া গেল—সে সম্বন্ধ অস্বীকার করিল। সুতরাং কুন্দ নগেন্দ্রের গলায় পড়িল।

নগেন্দ্রের এক সহোদরা ভগিনী ছিলেন। তিনি নগেন্দ্রের অনুজা। তাঁহার নাম কমলমণি। তাঁহার শ্বশুরালয় কলিকাতায়। শ্রীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার স্বামী। শ্রীশ বাবু প্লন্ডর ফেয়ারলির বাড়ীর মুৎসুদ্দি। হৌস বড় ভারি—শ্রীশচন্দ্র বড় ধনবান্। নগেন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সম্প্রীতি। কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র সেইখানে লইয়া গেলেন। কমলকে ডাকিয়া কুন্দের সবিশেষ পরিচয় দিলেন।

কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর। মুখাবয়ব নগেন্দ্রের ন্যায়। ভ্রাতা ভগিনী উভয়েই পরম সুন্দর। কিন্তু কমলের সৌন্দর্য্যগৌরবেব সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার খ্যাতিও ছিল। নগেন্দ্রের পিতা মিস্ টেম্পল্ নাম্নী একজন শিক্ষাদাত্রী নিযুক্ত করিয়া কমলমণিকে এবং সূর্য্যমুখীকে বিশেষ যত্নে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। কমলের শ্বশ্রূ বর্ত্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন। কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।

নগেন্দ্র কুন্দের পরিচয় দিয়া কহিলেন, "এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ী যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।"

কমল বড় দুষ্ট। নগেন্দ্র এই কথা বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিলেই কমল কুন্দকে কোলে তুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। একটা টবে কতকটা অনতিতপ্ত জল ছিল, অকস্মাৎ কুন্দকে তাহার ভিতরে ফেলিলেন। কুন্দ মহাভীতা হইল। কমল তখন হাসিতে হাসিতে স্নিগ্ধ সৌরভযুক্ত সোপ্ হস্তে লইয়া স্বয়ং তাহার গাত্র ধৌত করিতে আরম্ভ করিলেন। একজন পরিচারিকা, স্বয়ং কমলকে এরূপ কাজে ব্যাপৃতা দেখিযা, তাড়াতাড়ি "আমি দিতেছি, আমি দিতেছি" বলিয়া দৌড়িয়া আসিতেছিল—কমল সেই তপ্ত জল ছিটাইয়া পরিচারিকার গায়ে দিলেন, পরিচারিকা পলাইল।

কমল স্বহস্তে কুন্দকে মার্জ্জিত এবং স্নাত করাইলে—কুন্দ শিশিরধৌত পদ্মবৎ শোভা পাইতে লাগিল। তখন কমল তাহাকে শ্বেত চারু বস্ত্র পরাইয়া, গন্ধতৈল সহিত তাহার কেশবচনা করিয়া দিলেন, এবং কতকগুলি অলঙ্কার পরাইয়া দিয়া বলিলেন, "যা, এখন দাদাবাবুকে প্রণাম করিয়া আয়! আর দেখিস্—যেন এ বাড়ীর বাবুকে প্রণাম করে ফেলিস্ না—এ বাড়ীর বাবু দেখিলেই বিয়ে করে ফেলিবে।"

নগেন্দ্রনাথ, কুন্দেব সকল কথা সূর্য্যমুখীকে লিখিলেন। হরদেব ঘোষাল নামে তাঁহার এক প্রিয় সুহৃৎ দূরদেশে বাস করিতেন—নগেন্দ্র তাঁহাকেও পত্র লেখার কালে কুন্দনন্দিনীর কথা বলিলেন, যথা—

"বল দেখি, কোন বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্য্যের সময়। প্রথম যৌবনসঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বেই যেরূপ মাধুর্য্য এবং সরলতা থাকে, পরে তত থাকে না। এই কুন্দের সরলতা চমৎকার; সে কিছুই বোঝে না। আজিও রাস্তার বালকদিগের সহিত খেলা করিতে ছুটে; আবার বারণ করিলেই ভীতা হইয়া প্রতিনিবৃত্তা হয়। কমল তাহাকে লেখাপড়া শিখাইতেছে। কমল বলে, লেখাপড়ায় তাহার দিব্য বুদ্ধি।

কিন্তু অন্য কোন কথাই বুঝে না। বলিলে বৃহৎ নীল দুইটি চক্ষু—চক্ষু দুইটি শরতের মত সর্ব্বদাই স্বচ্ছ জলে ভাসিতেছে—সেই দুইটি চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া চাহিয়া থাকে; কিছু বলে না—আমি সে চক্ষু দেখিতে দেখিতে অন্যমনস্ক হই, আর বুঝাইতে পারি না। তুমি আমার মতিস্থৈর্য্যের এই পরিচয় শুনিয়া হাসিবে, বিশেষ তুমি বাতিকের গুণে গাছ কয় চুল পাকাইয়া ব্যঙ্গ করিবার পরওয়ানা হাসিল করিয়াছ; কিন্তু যদি তোমাকে সেই দুইটি চক্ষুর সম্মুখে দাঁড় করাইতে পারি, তবে তোমারও মতিস্থৈর্য্যের পরিচয় পাই। চক্ষু দুইটি যে কিরূপ, তাহা আমি এ পর্য্যন্ত স্থির করিতে পারিলাম না। তাহা দুইবার এক রকম দেখিলাম না; আমার বোধ হয়, যেন এ পৃথিবীর সে চোখ নয়; এ পৃথিবীর সামগ্রী যেন ভাল করিয়া দেখে না; অন্তরীক্ষে যেন কি দেখিয়া তাহাতে নিযুক্ত আছে। কুন্দ যে নির্দ্দোষ সুন্দরী, তাহা নহে। অনেকের সঙ্গে তুলনায় তাহার মুখাবয়ব অপেক্ষাকৃত অপ্রশংসনীয় বোধ হয়, অথচ আমার বোধ হয়, এমন সুন্দরী কখনও দেখি নাই। বোধ হয় যেন কুন্দনন্দিনীতে পৃথিবী ছাড়া কিছু আছে, রক্ত মাংসের যেন গঠন নয়; যেন চন্দ্রকর কি পুষ্পসৌরভকে শরীরী করিয়া তাহাকে গড়িয়াছে। তাহার সঙ্গে তুলনা করিবার সামগ্রী হঠাৎ মনে হয় না। অতুল্য পদার্থটি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীণ শান্তভাবব্যক্তি—যদি, স্বচ্ছ সরোবরে শরচ্চন্দ্রের কিরণসম্পাতে যে ভাবব্যক্তি, তাহা বিশেষ করিয়া দেখ, তবে ইহার সাদৃশ্য কতক অনুভূত করিতে পারিবে। তুলনার অন্য সামগ্রী পাইলাম না।"

নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, কিছু দিন পরে তাহার উত্তর আসিল। উত্তর এইরূপ—

"দাসী শ্রীচরণে কি অপরাধ করিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। কলিকাতায় যদি তোমার এত দিন থাকিতে হইবে, তবে আমি কেনই বা নিকটে গিয়া পদসেবা না করি? এ বিষয়ে আমার বিশেষ মিনতি; হুকুম পাইলেই ছুটিব।

"একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?

"তামাসা যাউক, তুমি কি মেয়েটিকে একেবারে স্বত্ব ত্যাগ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছ? নহিলে আমি সেটি তোমার কাছে ভিক্ষা করিয়া লইতাম। মেয়েটিতে আমার কাজ আছে। তুমি কোন সামগ্রী পাইলে তাহাতে আমার অধিকার হওয়াই উচিত, কিন্তু আজি কালি দেখিতেছি, তোমার ভগিনীরই পূরা অধিকার।

"মেয়েটিতে কি কাজ? আমি তারাচরণের সঙ্গে বিবাহ দিব। তারাচরণের জন্য একটি ভাল মেয়ে আমি কত খুঁজিতেছি তা ত জান। যদি একটি ভাল মেয়ে বিধাতা মিলাইয়াছেন, তবে আমাকে নিরাশ করিও না। কমল যদি ছাড়িয়া দেয়, তবে কুন্দনন্দিনীকে আসিবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিও। আমি কমলকেও অনুরোধ করিয়া লিখিলাম। আমি গহনা গড়াইতে ও বিবাহের আর আর উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কলিকাতায় বিলম্ব করিও না, কলিকাতায় না কি ছয় মাস থাকিলে মনুষ্য ভেড়া হয়। আর যদি কুন্দকে স্বয়ং বিবাহ করিবার অভিপ্রায় করিয়া থাক, তবে বল, আমি বরণডালা সাজাইতে বসি।"

তারাচরণ কে, তাহা পরে [illegible] সে যেই হউক, সূর্য্যমুখীর প্রস্তাবে নগেন্দ্র এবং কমলমণি উভয়ে সম্মত হইলেন। সুতরাং স্থির হইল যে, নগেন্দ্র যখন বাড়ী যাইবেন, তখন কুন্দকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন। সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক সম্মত হইয়াছিলেন, কমলও কুন্দের জন্য কিছু গহনা গড়াইতে দিলেন। কিন্তু [illegible] অন্ধ। কয় বৎসর পরে এমত এক দিন আইল, যখন কমলমণি ও নগেন্দ্র ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া কপালে করাঘাত করিয়া ভাবিলেন যে, কি কুক্ষণে কুন্দনন্দিনীকে পাইয়াছিলাম! কি কুক্ষণে সূর্য্যমুখীর পত্রে সম্মত হইয়াছিলাম।
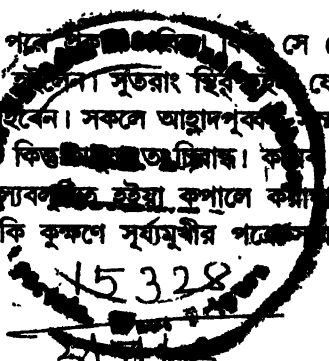
এখন কমলমণি, সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্র, তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।

এখন বজরা সাজাইয়া, নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।

কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকালে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিল না যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : তারাচরণ

কবি কালিদাসের এক মালিনী ছিল, ফুল যোগাইত। কালিদাস দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ফুলের দাম দিতে পারিতেন না—তৎপরিবর্ত্তে স্বরচিত কাব্যগুলিন মালিনীকে পড়িয়া শুনাইতেন। একদিন মালিনীর পুকুরে একটি অপূর্ব্ব পদ্ম ফুটিয়াছিল, মালিনী তাহা আনিয়া কালিদাসকে উপহার দিল। কবি তাহার পুরস্কারস্বরূপ মেঘদূত পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। মেঘদূত কাব্য রসের সাগর, কিন্তু সকলেই জানেন যে, তাহার প্রথম কবিতা কয়টি কিছু নীরস। মালিনীর ভাল লাগিল না—সে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া চলিল। কবি জিজ্ঞাসা করিলেন, "মালিনী সখি! চলিলে যে!"

মালিনী বলিল, "তোমার কবিতায় রস কই?"

কবি। মালিনী! তুমি কখন স্বর্গে যাইতে পারিবে না।

মালিনী। কেন?

কবি। স্বর্গের সিঁড়ি আছে। লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া স্বর্গে উঠিতে হয়। আমার এই মেঘদূতকাব্য-স্বর্গেরও সিঁড়ি আছে—এই নীরস কবিতাগুলিন সেই সিঁড়ি। তুমি এই সামান্য সিঁড়ি ভাঙ্গিতে পারিলে না—তবে লক্ষযোজন সিঁড়ি ভাঙ্গিবে কি প্রকারে?

মালিনী তখন ব্রহ্মশাপে স্বর্গ হারাইবার ভয়ে ভীতা হইয়া, অদ্যোপান্ত মেঘদূত শ্রবণ করিল। শ্রবণান্তে প্রীতা হইয়া, পরদিন মদনমোহিনী নামে বিচিত্রা মালা গাঁথিয়া আনিয়া কবিশিরে পরাইয়া গেল।

আমার এই সামান্য কাব্য স্বর্গও নয়—ইহার লক্ষযোজন সিঁড়িও নাই। রসও অল্প, সিঁড়িও ছোট। এই নীরস পরিচ্ছেদ কয়টি সেই সিঁড়ি। যদি পাঠকশ্রেণীমধ্যে কেহ মালিনীচরিত্র থাকেন, তবে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিই যে, তিনি এ সিঁড়ি না ভাঙ্গিলে সে রসমধ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিবেন না।

সূর্য্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা এক জন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতায় কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্য্যমুখীকে লালনপালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্য্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্য্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্য্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, তাহা কেহ বিশেষ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতী আর ফিরিয়া আসিল না।

শ্রীমতী, তারাচরণকে ফেলিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্য্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল। সূর্য্যমুখীর পিতা অতি দয়ালুচিত্ত ছিলেন। তিনি ঐ অনাথ বালককে আত্মসন্তানবৎ প্রতিপালন করিলেন, এবং

তাহাকে দাসত্বাদি কোন হীনবৃত্তিতে প্রবর্ত্তিত না করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষায় নিযুক্ত করিলেন। তারাচরণ এক অবৈতনিক মিশনরি স্কুলে ইংরেজী শিখিতে লাগিল।

পরে সূর্য্যমুখীর বিবাহ হইল। তাহার কয়েক বৎসর পরে তাঁহার পিতার পরলোক হইল। তখন তারাচরণ এক প্রকার মোটামুটি ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু কোন কর্ম্মকার্য্যে সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সূর্য্যমুখীর পিতৃপরলোকের পর নিরাশ্রয় হইয়া, তিনি সূর্য্যমুখীর কাছে গেলেন। সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রকে প্রবৃত্তি দিয়া গ্রামে একটি স্কুল সংস্থাপিত করাইলেন। তারাচরণ তাহাতে মাষ্টার নিযুক্ত হইলেন। এক্ষণে গ্রান্ট ইন্ এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা, টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাষ্টার বাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর "মাষ্টার বাবু" দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি Citizen of the World এবং Spectator পড়িয়াছিলেন, এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এই সকল গুণে তিনি দেবীপুরনিবাসী জমীদার দেবেন্দ্র বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন, এবং বাবুর পারিষদমধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং "হে পরমকারুণিক পরমশ্বের!" এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। তাহার কোনটা বা তত্ত্ববোধিনী হইতে নকল করিয়া লইতেন কোনটা বা স্কুলের পণ্ডিতের দ্বারা লেখাইয়া লইতেন। মুখে সর্ব্বদা বলিতেন, "তোমরা ইট পাটখেলের পূজা ছাড়, খুড়ী জ্যেঠাইয়ের বিবাহ দাও, মেয়েদের লেখাপড়া শিখাও, তাহাদের পিঁজরায় পুরিয়া রাখ কেন? মেয়েদের বাহির কর।" স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এতটা লিবরালিটির একটি বিশেষ কারণ ছিল, তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য। এ পর্য্যন্ত তাঁহার বিবাহ হয় নাই; সূর্য্যমুখী তাঁহার বিবাহের জন্য অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতার কুলত্যাগের কথা গোবিন্দপুরে প্রচার হওয়ায় কোন ভদ্র কায়স্থ তাঁহাকে কন্যা দিতে সম্মত হয় নাই। অনেক ইতর কায়স্থের কালো কুৎসিত কন্যা পাওয়া গেল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তারাচরণকে ভ্রাতৃবৎ ভাবিতেন, কি প্রকারে ইতর লোকের কন্যাকে ভাইজ বলিবেন, এই ভাবিয়া তাহাতে সম্মত হন নাই। কোন ভদ্র কায়স্থের সুরূপা কন্যার সন্ধানে ছিলেন, এমত কালে নগেন্দ্রের পত্রে কুন্দনন্দিনীর রূপগুণের কথা জানিয়া তাহারই সঙ্গে তারাচরণের বিবাহ দিবেন, স্থির করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ পদ্মপলাশলোচনে! তুমি কে?

কুন্দ, নগেন্দ্র দত্তের সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিল। কুন্দ, নগেন্দ্রের বাড়ী দেখিয়া অবাক্ হইল। এত বড় বাড়ী সে কখনও দেখে নাই। তাহার বাহিরে তিন মহল, ভিতরে তিন মহল। এক একটি মহল, এক একটি বৃহৎ পুরী। প্রথমে, যে সদর মহল, তাহাতে এক লোহার ফটক দিয়া প্রবেশ করিতে হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বে বিচিত্র উচ্চ লোহার রেইল। ফটক দিয়া তৃণশূণ্য, প্রশস্ত, রক্তবর্ণ, সুনির্ম্মিত পথে যাইতে হয়। পথের দুই পার্শ্বে গোগণের মনোরঞ্জন, কোমল নবতৃণবিশিষ্ট দুই খণ্ড ভূমি। তাহাতে মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে রোপিত, সুকুসুম পুষ্পবৃক্ষ সকল বিচিত্র পুষ্পপল্লবে শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বড় উচ্চ দেড়তলা বৈঠকখানা। অতি প্রশস্ত সোপানারোহণ করিয়া তাহাতে উঠিতে হয়। তাহার বারেন্ডায় বড় বড় মোটা ফ্লুটেড্ থাম; হর্ম্ম্যতল মর্ম্মরপ্রস্তরাবৃত। আলিশার উপরে, মধ্যস্থলে এক মৃন্ময় বিশাল সিংহ জটা লম্বিত করিয়া, লোল জিহ্বা বাহির করিয়াছে। এইটি নগেন্দ্রের বৈঠকখানা। তৃণপুষ্পময় ভূমিখণ্ডদ্বয়ের দুই পার্শ্বে, অর্থাৎ বামে ও দক্ষিণে দুই সারি একতালা কোঠা। এক সারিতে দপ্তরখানা ও কাছারি। আর এক সারিতে তোষাখানা এবং ভৃত্যবর্গের বাসস্থান। ফটকের দুই পার্শ্বে দ্বাররক্ষকদিগের থাকিবার ঘর। এই প্রথম মহলের নাম "কাছারি

বাড়ী"। উহার পার্শ্বে "পূজার বাড়ী"। পূজার বাড়ীতে রীতিমত বড় পূজার দালান; আর তিন পার্শ্বে প্রথামত দোতালা চক বা চত্বর। মধ্যে বড় উঠান। এ মহলে কেহ বাস করে না। দুর্গোৎসবের সময়ে বড় ধূমধাম হয়, কিন্তু এখন উঠানে টালির পাশ দিয়া ঘাস গজাইতেছে। দালান, দরদালান, পায়রায় পূরিয়া পড়িয়াছে, কুঠারি সকল আসবাবে ভরা,—চাবি বন্ধ। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ী। সেখানে বিচিত্র দেবমন্দির, সুন্দর প্রস্তরবিশিষ্ট "নাটমন্দির", তিন পাশে দেবতাদিগের পাকশালা, পূজারীদিগের থাকিবার ঘর এবং অতিথিশালা। সে মহলে লোকের অভাব নাই। গলায় মালা চন্দনতিলকবিশিষ্ট পূজারীর দল, পাচকের দল; কেহ ফুলের সাজি লইয়া আসিতেছে, কেহ ঠাকুর স্নান করাইতেছে, কেহ ঘণ্টা নাড়িতেছে, কেহ বকাবকি করিতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ পাক করিতেছে। দাসদাসীরা কেহ জলের ভার আনিতেছে, কেহ ঘর ধুইতেছে, কেহ চাল ধুইয়া আনিতেছে, কেহ ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে কলহ করিতেছে। অতিথিশালায় কোথাও ভস্মমাখা সন্ন্যাসী ঠাকুর জটা এলাইয়া, চিত হইয়া শুইয়া আছেন। কোথাও ঊর্দ্ধবাহু এক হাত উচ্চ করিয়া, দত্তবাড়ীর দাসীমহলে ঔষধ বিতরণ করিতেছেন। কোথাও শ্বেতশ্মশ্রুবিশিষ্ট গৈরিকবসনধারী ব্রহ্মচারী রুদ্রাক্ষমালা দোলাইয়া, নাগরী অক্ষরে হাতে লেখা ভগবদ্গীতা পাঠ করিতেছেন। কোথাও, কোন উদরপরায়ণ "সাধু" ঘি ময়দার পরিমাণ লইয়া গণ্ডগোল বাধাইতেছে। কোথাও বৈরাগীর দল শুষ্ক কণ্ঠে তুলসীর মালা আঁটিয়া, কপাল জুড়িয়া, তিলক করিয়া মৃদঙ্গ বাজাইতেছে, মাথায় আর্কফলা নড়িতেছে, এবং নাসিকা দোলাইয়া "কথা কইতে যে পেলেম না—দাদা বলাই সঙ্গে ছিল—কথা কইতে যে" বলিয়া কীর্ত্তন করিতেছে। কোথাও বৈষ্ণবীরা বৈরাগিরঞ্জন রসকলি কাটিয়া, খঞ্জনীর তালে "মধো কানের" কি "গোবিন্দ অধিকারীর" গীত গায়িতেছে। কোথাও কিশোরবয়স্কা নবীনা বৈষ্ণবী প্রাচীনার সঙ্গে গায়িতেছে, কোথাও অর্দ্ধবয়সী বুড়া বৈরাগীর সঙ্গে গলা মিলাইতেছে। নাটমন্দিরের মাঝখানে পাড়ার নিষ্কর্ম্মা ছেলেরা লড়াই, ঝগড়া, মারামারি করিতেছে এবং পরস্পর মাতাপিতার উদ্দেশে নানা প্রকার সুসভ্য গালাগালি করিতেছে।

এই তিন মহল সদর। এই তিন মহলের পশ্চাতে তিন মহল অন্দর। কাছারি বাড়ীর পশ্চাতে যে অন্দর মহল, তাহা নগেন্দ্রের নিজ ব্যবহার্য্য। তন্মধ্যে কেবল তিনি, তাঁহার ভার্য্যা ও তাঁহাদের নিজ পরিচর্য্যায় নিযুক্ত দাসীরা থাকিত। এবং তাঁহাদের নিজ ব্যবহার্য্য দ্রব্যসামগ্রী থাকিত। এই মহল নূতন, নগেন্দ্রের নিজের প্রস্তুত; এবং তাহার নির্ম্মাণ অতি পরিপাটি। তাহার পাশে পূজার বাড়ীর পশ্চাতে সাবেক অন্দর। তাহা পুরাতন, কুনির্ম্মিত; ঘর সকল অনুচ্চ, ক্ষুদ্র ও অপরিষ্কৃত। এই পুরী বহুসংখ্যক আত্মীয়কুটুম্ব-কন্যা, মাসী, মাসীত ভগিনী, পিসী, পিসীত ভগিনী, বিধবা মাসী, সধবা ভাগিনেয়ী, পিসীত ভাইয়ের স্ত্রী, মাসীত ভাইয়ের মেয়ে, ইত্যাদি নানাবিধ কুটুম্বিনীতে কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়, রাত্রি দিবা কল কল করিত। এবং অনুক্ষণ নানা প্রকার চীৎকার, হাস্য পরিহাস, কলহ, কুতর্ক, গল্প, পরনিন্দা, বালকের হুড়াহুড়ি, বালিকার রোদন, "জল আন" "কাপড় দে" "ভাত রাঁধলে না" "ছেলে খায় নাই" "দুধ কই" ইত্যাদি শব্দে সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ শব্দিত হইত। তাহার পাশে ঠাকুরবাড়ীর পশ্চাতে রন্ধনশালা। সেখানে আরো জাঁক। কোথাও কোন পাচিকা ভাতের হাঁড়িতে জ্বাল দিয়া পা গোট করিয়া, প্রতিবাসীনীর সঙ্গে তাঁহার ছেলের বিবাহের ঘটার গল্প করিতেছেন। কোন পাচিকা বা কাঁচা কাঠে ফুঁ দিতে দিতে ধুঁয়ায় বিগলিতাশ্রুলোচনা হইয়া, বাড়ীর গোমস্তার নিন্দা করিতেছেন, এবং সে যে টাকা চুরি করিবার মানসেই ভিজা কাঠ কাটাইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহুবিধ প্রমাণ প্রয়োগ করিতেছেন। কোন সুন্দরী তপ্ত তৈলে মাছ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, দশনাবলী বিকট করিয়া, মুখভঙ্গি করিয়া আছেন, কেন না, তপ্ত তৈল ছিটকাইয়া তাহার গায়ে লাগিয়াছে, কেহ বা স্নানকালে বহুতৈলাক্ত, অসংযমিত কেশরাশি চূড়ার আকারে সীমন্তদেশে বাঁধিয়া ডালে কাটি দিতেছেন—যেন রাখাল, পাঁচনীহস্তে গোরু ঠেঙ্গাইতেছে। কোথাও বা বড় বঁটি পাতিয়া বামী, ক্ষেমী, গোপালের মা, নেপালের মা, লাউ, কুমড়া, বার্ত্তাকু, পটল, শাক কুটিতেছে;

তাতে ঘস্ ঘস্ কচ্ কচ্ শব্দ হইতেছে, মুখে পাড়ার নিন্দা, মুনিবের নিন্দা, পরস্পরকে গালাগালি করিতেছে। এবং গোলাপী অল্প বয়সে বিধবা হইল, চাঁদির স্বামী বড় মাতাল, কৈলাসীর জামাইয়ের বড় চাকরি হইয়াছে—সে দারোগার মুহুরী; গোপালে উড়ের যাত্রার মত পৃথিবীতে এমন আর কিছুই নাই, পার্ব্বতীর ছেলের মত দুষ্ট ছেলে আর বিশ্ববাঙ্গালায় নাই, ইংরেজেরা না কি রাবণের বংশ, ভগীরথ গঙ্গা এনেছেন, ভট্‌চায্যিদের মেয়ের উপপতি শ্যাম বিশ্বাস, এইরূপ নানা বিষয়ের সমালোচনা হইতেছে। কোন কৃষ্ণবর্ণা স্থূলাঙ্গী, প্রাঙ্গণে এক মহাস্ত্ররূপী বঁটি, ছাইয়ের উপর সংস্থাপিত করিয়া মৎস্যজাতির সদ্যঃপ্রাণসংহার করিতেছেন, চিলেরা বিপুলাঙ্গীর শরীরগৌরব এবং হস্তলাঘব দেখিয়া ভয়ে আগু হইতেছে না, কিন্তু দুই একবার ছোঁ মারিতেও ছাড়িতেছে না। কোন পক্ককেশা জল আনিতেছে, কোন ভীমদশনা বাটনা বাটিতেছে। কোথাও বা ভাণ্ডারমধ্যে, দাসী, পাচিকা এবং ভাণ্ডারের রক্ষাকারিণী এই তিন জনে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত। ভাণ্ডারকর্ত্রী তর্ক করিতেছেন যে, যে ঘৃত দিয়াছি, তাহাই ন্যায্য খরচ—পাচিকা তর্ক করিতেছে যে, নায্য খরচে কুলাইবে কি প্রকারে? দাসী তর্ক করিতেছে যে, যদি ভাণ্ডারের চাবি খোলা থাকে, তাহা হইলে আমরা কোনরূপে কুলাইয়া দিতে পারি। ভাতের উমেদারীতে অনেকগুলি ছেলে মেয়ে, কাঙ্গালী, কুক্কুর বসিয়া আছে। বিড়ালেরা উমেদারী করে না—তাহার অবকাশমতে "দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ" করত বিনা অনুমতিতেই খাদ্য লইয়া যাইতেছে। কোথাও অনধিকারপ্রবিষ্টা কোন গাভী লাউয়ের খোলা, বেগুনের ও পটলের বোঁটা এবং কলার পাত অমৃতবোধে চক্ষু বুজিয়া চর্ব্বণ করিতেছে।

এই তিন মহল অন্দরমহলের পর, পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যান পরে, নীলমেঘখণ্ডতুল্য প্রশস্ত দীর্ঘিকা। দীর্ঘিকা প্রাচীরবেষ্টিত। ভিতর বাটীর তিন মহল ও পুষ্পোদ্যানের মধ্যে খিড়কীর পথ। তাহার দুই মুখে দুই দ্বার। সেই দুই খিড়কী। এই পথ দিয়া অন্দরের তিন মহলেই প্রবেশ করা যায়।

বাড়ীর বাহিরে আস্তাবল, হাতিশালা, কুকুরের ঘর, গোশালা, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি স্থান ছিল।

কুন্দনন্দিনী, বিস্মিতনেত্রে নগেন্দ্রেব অপরিমিত ঐশ্বর্য্য দেখিতে দেখিতে শিবিকারোহণে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। সে সূর্য্যমুখীর নিকটে আনীত হইয়া, তাঁহাকে প্রণাম কবিল। সূর্য্যমুখী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

নগেন্দ্রসঙ্গে, স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষরূপের সাদৃশ্য অনুভূত করিয়া; কুন্দনন্দিনীব মনে মনে এমত সন্দেহ জন্মিয়াছিল যে, তাঁহাব পত্নী অবশ্য তৎপরদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তির সদৃশরূপা হইবেন; কিন্তু সূর্যমুখীকে দেখিয়া সে সন্দেহ দূর হইল। কুন্দ দেখিল যে, সূর্য্যমুখী আকাশপটে দৃষ্টা নারীর ন্যায় শ্যামাঙ্গী নহে। সূর্য্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্য তপ্তকাঞ্চনবর্ণা। তাঁহার চক্ষু সুন্দর বটে, কিন্তু কুন্দ যে প্রকৃতির চক্ষু স্বপ্নে দেখিয়াছিল, এ সে চক্ষু নহে। সূর্য্যমুখীর চক্ষু সুদীর্ঘ, অলকস্পর্শী ভ্রূযুগসমাশ্রিত, কমনীয় বঙ্কিমপল্লবরেখার মধ্যস্থ, স্থূলকৃষ্ণতারাসনাথ, মণ্ডলাংশের আকারে ঈষৎ স্ফীত, উজ্জ্বল অথচ মন্দগতিবিশিষ্ট। স্বপ্নদৃষ্টা শ্যামাঙ্গীর চক্ষুর এরূপ অলৌকিক মনোহারিত্ব ছিল না। সূর্য্যমুখীব অবয়বও সেরূপ নহে। স্বপ্নদৃষ্টা খর্ব্বাকৃতি, সূর্য্যমুখীর আকার কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, বাতান্দোলিত লতায় ন্যায় সৌন্দর্যভরে দুলিতেছে। স্বপ্নদৃষ্টা স্ত্রীমূর্ত্তি সুন্দরী, কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহার অপেক্ষা শতগুণে সুন্দরী। আর স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই—সূর্য্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়্‌বিংশতি। সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সেই মূর্ত্তির কোন সাদৃশ্য নাই দেখিয়া, কুন্দ স্বচ্ছন্দচিত্ত হইল।

সূর্য্যমুখী কুন্দকে সাদরসম্ভাষণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যার্থ দাসীদিগকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন। এবং তন্মধ্যে যে প্রধানা, তাহাকে কহিলেন যে, "এই কুন্দের সঙ্গে আমি তারাচরণের বিবাহ দিব। অতএব ইহাকে তুমি আমার ভাইজের মত যত্ন করিবে।"

দাসী স্বীকৃতা হইল। কুন্দকে সে সঙ্গে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া চলিল। কুন্দ এতক্ষণে তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিল। দেখিয়া, কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্ত্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দ্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী!

কুন্দ ভীতিবিহ্বলা হইয়া, মৃদুনিক্ষিপ্ত শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কে গা?"
দাসী কহিল, "আমার নাম হীরা।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ : পাঠক মহাশয়ের বড় রাগের কারণ

এইখানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকাগ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দনন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্ব্বগুণে ভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে, এবং নায়িকার প্রণয়ে ঢল ঢল করিবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই—সৌন্দর্য্যের মধ্যে তামাটে বর্ণ, আর খাঁদা নাক—বীর্য্য কেবল স্কুলের ছেলেমহলে প্রকাশ—আর প্রণয়ের বিষয়টা কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে তাঁহার কত দূর ছিল, বলিতে পারি না, কিন্তু একটা পোষা বানরীর সঙ্গে একটু একটু ছিল।

সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল। তারাচরণ সুন্দরী স্ত্রী ঘরে লইয়া গেলেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী লইয়া, তিনি এক বিপদে পড়িলেন। পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিবে যে, তারাচরণের স্ত্রীশিক্ষা ও জেনানা ভাঙ্গার প্রবন্ধসকল প্রায় দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানাতেই পড়া হইত। তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্ককালে মাষ্টার সর্ব্বদাই দম্ভ করিয়া বলিতেন যে, "কখন যদি আমায় সময় হয়, তবে এ বিষয়ে প্রথম রিফরম্ করার দৃষ্টান্ত দেখাইব। আমার বিবাহ হইলে স্ত্রীকে সকলের সম্মুখে বাহির করিব।" এখন ত বিবাহ হইল—কুন্দনন্দিনীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি ইয়ার মহলে প্রচারিত হইল। সকলে প্রাচীন গীত কোট করিয়া বলিল, "কোথা রহিল সে পণ?" দেবেন্দ্র বলিলেন, "কই হে, তুমিও কি ওল্ড্ ফুল্‌দের দলে? স্ত্রীর সহিত আমাদের আলাপ করিয়া দাও না কেন?" তারাচরণ বড় লজ্জিত হইলেন। দেবেন্দ্র বাবুর অনুরোধ ও বাক্যযন্ত্রণা এড়াইতে পারিলেন না। দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর সাক্ষাৎ করাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভয় পাছে সূর্য্যমুখী শুনিয়া রাগ করে। এইমত টালমাটাল করিয়া বৎসরাবধি গেল। তাহার পর আর টালমাটালে চলে না দেখিয়া, বাড়ী মেরামতের ওজর করিয়া কুন্দকে নগেন্দ্রের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। বাড়ী মেরামত হইল। আবার আনিতে হইল। তখন দেবেন্দ্র এক দিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিল? ক্ষণকাল ঘোম্‌টা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নবযৌবনসঞ্চারের অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।

ইহার কিছু দিন পরে দেবেন্দ্রের বাটীতে কোন ক্রিয়া উপস্থিত। তাঁহার বাটী হইতে একটি বালিকা কুন্দকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিল। কিন্তু সূর্য্যমুখী তাহা শুনিতে পাইয়া নিমন্ত্রণে যাওয়া নিষেধ করিলেন। সুতরাং যাওয়া হইল না।

ইহার পর আর একবার দেবেন্দ্র, তারাচরণের গৃহে আসিয়া, কুন্দের সঙ্গে পুনরালাপ করিয়া গেলেন। লোকমুখে, সূর্য্যমুখী তাহাও শুনিলেন। শুনিয়া তারাচরণকে এমত ভর্ৎসনা করিলেন যে, সেই পর্য্যন্ত কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেবেন্দ্রর আলাপ বন্ধ হইল।

বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাল কাটিল। তাহার পর—কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জ্বরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্য্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়ীতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।

নবম পরিচ্ছেদ ঃ হরিদাসী বৈষ্ণবী

বিধবা কুন্দনন্দিনী নগেন্দ্রের গৃহে কিছু দিন কালাতিপাত করিল। একদিন মধ্যাহ্নের পর পৌরস্ত্রীরা সকলে মিলিত হইয়া পুরাতন অন্তঃপুরে বসিয়াছিল। ঈশ্বরকৃপায় তাহারা অনেকগুলি, সকলে স্ব স্ব মনোমত গ্রাম্যস্ত্রীসুলভ কার্য্যে ব্যাপৃতা ছিল। তাহাদের মধ্যে অনতীতবাল্যা কুমারী হইতে পলিতকেশা বর্ষীয়সী পর্য্যন্ত সকলেই ছিল। কেহ চুল বাঁধাইতেছিল, কেহ চুল বাঁধিয়া দিতেছিল, কেহ মাথা দেখাইতেছিল, কেহ মাথা দেখিতেছিল, এবং "উঁ উঁ করিয়া উকুন মারিতেছিল, কেহ পাকা চুল তুলাইতেছিল, কেহ ধান্যহস্তে তাহা তুলিতেছিল। কোন সুন্দরী স্বীয় বালকের জন্য বিচিত্র কাঁথা শিয়াইতেছিলেন; কেহ বালককে স্তন্যপান করাইতেছিলেন। কোন সুন্দরী চুলের দড়ি বিনাইতেছিলেন, কেহ ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিলেন, ছেলে মুখব্যাদান করিয়া তিনগ্রামে সপ্তসুরে রোদন করিতেছিল। কোন রূপসী কার্পেট বুনিতেছিলেন; কেহ থাবা পাতিয়া তাহা দেখিতেছিলেন। কোন চিত্রকুশলা কাহারও বিবাহের কথা মনে করিয়া পিঁড়িতে আলেপনা দিতেছিলেন, কোন সদ্গ্রন্থরসগ্রাহিণী বিদ্যাবতী দাশু রায়ের পাঁচালী পড়িতেছিলেন। কোন বর্ষীয়সী পুত্রের নিন্দা করিয়া শ্রোত্রীবর্গের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেছিলেন, কোন রসিকা যুবতী অর্দ্ধস্ফুটস্বরে স্বামীর রসিকতার বিবরণ সখীদের কাণে কাণে বলিয়া বিরহিণীর মনোবেদনা বাড়াইতেছিলেন। কেহ গৃহিণীর নিন্দা, কেহ কর্ত্তার নিন্দা, কেহ প্রতিবাসীদিগের নিন্দা করিতেছিলেন; অনেকেই আত্মপ্রশংসা করিতেছিলেন। যিনি সূর্য্যমুখী কর্ত্তৃক প্রাতে নিজবুদ্ধিহীনতার জন্য মৃদুভর্ৎসিতা হইয়াছিলেন, তিনি আপনার বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্য্যের অনেক উদাহরণ প্রয়োগ করিতেছিলেন; যাঁহার রন্ধনে প্রায় লবণ সমান হয় না, তিনি আপনার পাকনৈপুণ্যসম্বন্ধে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতেছিলেন। যাঁহার স্বামী গ্রামের মধ্যে গণ্ডমূর্খ, তিনি সেই স্বামীর অলৌকিক পাণ্ডিত্য কীর্ত্তন করিয়া সঙ্গিনীকে বিস্মিতা করিতেছিলেন। যাঁহার পুত্রকন্যাগুলি এক একটি কৃষ্ণবর্ণ মাংসপিণ্ড, তিনি রত্নগর্ভা বলিয়া আস্ফালন করিতেছিলেন। সূর্য্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্ব্বিত; এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না এবং তিনি থাকিলে অন্য সকলের আমোদের বিঘ্ন হইত। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত; তাঁহার নিকট মন খুলিয়া সকল কথা চলিত না। কিন্তু কুন্দনন্দিনী এক্ষণে এই সম্প্রদায়েই থাকিত; এখনও ছিল। সে একটি বালককে তাহার মাতার অনুরোধে ক, খ, শিখাইতেছিল। কুন্দ বলিয়া দিতেছিল, তাহার ছাত্র অন্য বালকের করস্থ সন্দেশের প্রতি হাঁ করিয়া চাহিয়াছিল; সুতরাং তাহার বিশেষ বিদ্যালাভ হইতেছিল।

এমত সময়ে সেই নারীসভামণ্ডলে "জয় রাধে!" বলিয়া এক বৈষ্ণবী আসিয়া দাঁড়াইল।

নগেন্দ্রের ঠাকুরবাড়ীতে নিত্য অতিথিসেবা হইত, এবং তদ্ব্যতীত সেইখানেই প্রতি রবিবারে তণ্ডুলাদি বিতরণ হইত, ইহা ভিন্ন ভিক্ষার্থ বৈষ্ণবী কি কেহ অন্তঃপুরে আসিতে পাইত না। এই জন্য অন্তঃপুরমধ্যে "জয় রাধে" শুনিয়া এক জন পুরবাসিনী বলিতেছিল, "কে রে মাগী বাড়ীর ভিতর? ঠাকুরবাড়ী যা।" কিন্তু এই কথা বলিতে বলিতে সে মুখ ফিরাইয়া বৈষ্ণবীকে দেখিয়া কথা আর সমাপ্ত করিল না। তৎপরিবর্ত্তে বলিল, "ও মা! এ আবার কোন্ বৈষ্ণবী গো!"

সকলেই বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বৈষ্ণবী যুবতী, তাহার শরীরে আর রূপ ধরে না। সেই বহুসুন্দরীশোভিত রমণীমণ্ডলেও, কুন্দনন্দিনী ব্যতীত তাহা হইতে সমধিক রূপবতী কেহই নহে। তাহার স্ফুরিত বিম্বাধর, সুগঠিত নাসা, বিস্ফারিত ফুল্লেন্দীবরতুল্য চক্ষু, চিত্ররেখাবৎ ভ্রূযুগ, নিটোল ললাট, বাহুযুগলের মৃণালবৎ গঠন এবং চম্পকদামবৎ বর্ণ, রমণীকুলদুর্ল্লভ। কিন্তু সেখানে যদি কেহ সৌন্দর্য্যের চারক থাকিত, তবে সে বলিত যে, বৈষ্ণবীর গঠনে কিছু লালিত্যের অভাব। চলন ফেরন এ লও পৌরুষ।

বৈষ্ণবীর নাকে রসকলি, মাথায় টেড়ি কাটা, পরণে কালাপেড়ে সিমলার ধুতি, হাতে একটি খঞ্জনী। হাতে পিত্তলের বালা, এবং তাহার উপরে জলতরঙ্গ চুড়ি।

স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে এক জন বয়োজ্যেষ্ঠা কহিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কে গা?"

বৈষ্ণবী কহিল, "আমার নাম হরিদাসী বৈষ্ণবী। মা ঠাকুরাণীরা গান শুন্‌বে?"

তখন "শুন্‌বো গো শুন্‌বো! এই ধ্বনি চারিদিকে আবালবৃদ্ধার কণ্ঠ হইতে বাহির হইতে লাগিল। তখন খঞ্জনী হাতে বৈষ্ণবী উঠিয়া গিয়া ঠাকুরাণীদিগের কাছে বসিল। সে যেখানে বসিল, সেইখানে কুন্দ ছেলে পড়াইতেছিল। কুন্দ অত্যন্ত গীতপ্রিয়, বৈষ্ণবী গান করিবে শুনিয়া, সে তাহার আর একটু সন্নিকটে আসিল। তাহার ছাত্র সেই অবকাশে উঠিয়া গিয়া সন্দেশভোজী বালকের হাত হইতে সন্দেশ কাড়িয়া লইয়া আপনি ভক্ষণ করিল।

বৈষ্ণবী জিজ্ঞাসা করিল, "কি গায়িব?" তখন শ্রোত্রীগণ নানাবিধ ফরমায়েস আরম্ভ করিলেন; কেহ চাহিলেন "গোবিন্দ অধিকারী"—কেহ "গোপালে উড়ে।" যিনি দাশরথির পাঁচালী পড়িতেছিলেন, তিনি তাহাই কামনা করিলেন। দুই একজন প্রাচীনা কৃষ্ণবিষয় হুকুম করিলেন। তাহারই টীকা করিতে গিয়া মধ্যবয়সীরা "সখীসংবাদ" এবং "বিরহ" বলিয়া মতভেদ প্রচার করিলেন। কেহ চাহিলেন, "গোষ্ঠ"—কোন লজ্জাহীনা যুবতী বলিল, "নিধুর টপ্পা গাইতে হয় ত গাও—নহিলে শুনিব না।" একটি অস্ফুটবাচা বালিকা বৈষ্ণবীকে শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে গাইয়া দিল, "তোলা দাস্‌নে দাস্‌নে দাস্‌নে দূতি।"

বৈষ্ণবী সকলের হুকুম শুনিয়া কুন্দের প্রতি বিদ্যুদ্দামতুল্য এক কটাক্ষ করিয়া কহিল, "হ্যাঁ গা—তুমি কিছু ফরমাস করিলে না?" কুন্দ তখন লজ্জাবনতমুখী হইয়া অল্প একটু হাসিল, কিছু উত্তর করিল না। কিন্তু তখনই একজন বয়স্যার কাণে কাণে কহিল, "কীর্ত্তন গাইতে বল না?"

বয়স্যা তখন কহিল, "ওগো কুন্দ কীর্ত্তন করিতে বলিতেছে গো!" তাহা শুনিয়া বৈষ্ণবী কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিল। সকলের কথা টালিয়া বৈষ্ণবী তাহার কথা রাখিল দেখিয়া কুন্দ বড় লজ্জিতা হইল।

হরিদাসী বৈষ্ণবী প্রথমে খঞ্জনীতে দুই একবার মৃদু মৃদু যেন ক্রীড়াচ্ছলে অঙ্গুলি প্রহার করিল। পরে আপন কণ্ঠমধ্যে অতি মৃদু মৃদু নববসন্তপ্রেরিতা এক ভ্রমরীর গুঞ্জনবৎ সুরের আলাপ করিতে লাগিল—যেন লজ্জাশীলা বালিকা স্বামীর নিকট প্রথম প্রেমব্যক্তি জন্য মুখ ফুটাইতেছে। পরে অকস্মাৎ সেই ক্ষুদ্রপ্রাণ খঞ্জনী হইতে বাদ্যবিদ্যাবিশারদের অঙ্গুলিজনিত শব্দের ন্যায় মেঘগম্ভীর শব্দ বাহির হইল, এবং তৎসঙ্গে শ্রোত্রীদিগের শরীর কণ্টকিত করিয়া, অপ্সরোনিন্দিত কণ্ঠগীতিধ্বনি সমুত্থিত হইল। তখন রমণীমণ্ডল বিস্মিত, বিমোহিতচিত্তে শুনিল যে, সেই বৈষ্ণবীর অতুলিত কণ্ঠ, অট্টালিকা পরিপূর্ণ করিয়া আকাশমার্গে উঠিল। মূঢ়া পৌরস্ত্রীগণ সেই গানের পরিপাট্য কি বুঝিবে? বোদ্ধা থাকিলে বুঝিত যে, এই সর্ব্বাঙ্গীণতাললয়স্বরপরিশুদ্ধ গান, কেবল সুকণ্ঠের কার্য্য নহে। বৈষ্ণবী যেই হউক, সে সঙ্গীতবিদ্যায় অসাধারণ সুশিক্ষিত এবং অল্পবয়সে তাহার পারদর্শী।

বৈষ্ণবী গীত সমাপন করিলে, পৌরস্ত্রীগণ তাহাকে গায়িবার জন্য পুনশ্চ অনুরোধ করিল। তখন হরিদাসী সতৃষ্ণবিলোলনেত্রে কুন্দনন্দিনীর মুখপানে চাহিয়া পুনশ্চ কীর্ত্তন আরম্ভ করিল,

শ্রীমুখপঙ্কজ—দেখ্‌বো বলে হে,
তাই এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মানের দায়ে তুই মানিনী,
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখ্‌বো তোমায় নয়ন ভরে,
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে।

যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী,
তখন নয়নজলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনাতীরে,
ভাঙ্গবো বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙ্গুক মান।
ব্রজের সুখ রাই দিয়ে জলে,
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণনূপুর বেঁধে গলে,
পশিব যমুনা-জলে।

গীত সমাপ্ত হইলে বৈষ্ণবী কুন্দনন্দিনীর মুখপ্রতি চাহিয়া বলিল, "গীত গাইয়া আমার মুখ শুকাইতেছে। আমায় একটু জল দাও।"

কুন্দ পাত্রে করিয়া জল আনিল। বৈষ্ণবী কহিল, "তোমাদিগের পাত্র আমি ছুঁইব না। আসিয়া আমার হাতে ঢালিয়া দাও, আমি জাতি বৈষ্ণবী নহি।"

ইহাতে বুঝাইল, বৈষ্ণবী পূর্ব্বে কোন অপবিত্রজাতীয়া ছিল, এক্ষণে বৈষ্ণবী হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া কুন্দ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ জল ফেলিবার যে স্থান, সেইখানে গেল। যেখানে অন্য স্ত্রীলোকেরা বসিয়া রহিল, সেখান হইতে ঐ স্থান এরূপ ব্যবধান যে, তথায় মৃদু মৃদু কথা কহিলে কেহ শুনিতে পায় না। সেই স্থানে গিয়া কুন্দ বৈষ্ণবীর হাতে জল ঢালিয়া দিতে লাগিল। বৈষ্ণবী হাত মুখ ধুইতে লাগিল। ধুইতে ধুইতে অন্যের অশ্রুতস্বরে বৈষ্ণবী মৃদু মৃদু বলিতে লাগিল, "তুমি নাকি গা কুন্দ?"

কুন্দ বিস্মিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন গা?"

বৈ। তোমার শাশুড়ীকে কখন দেখিয়াছ?

কু। না।

কুন্দ শুনিয়াছিল যে, তাহার শাশুড়ী ভ্রষ্টা হইয়া দেশত্যাগিনী হইয়াছিল।

বৈ। তোমার শাশুড়ী এখানে আসিয়াছেন। তিনি আমার বাড়ীতে আছেন, তোমাকে একবার দেখ্‌বার জন্য বড়ই কাঁদিতেছেন—আহা! হাজার হোক্ শাশুড়ী। সে ত আর এখানে আসিয়া তোমাদের গিন্নীর কাছে সে পোড়ার মুখ দেখাতে পারবে না—তা তুমি একবার কেন আমার সঙ্গে গিয়ে তাকে দেখা দিয়ে এস না?

কুন্দ সরলা হইলেও, বুঝিল যে, সে শাশুড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করাই অকর্ত্তব্য। অতএব বৈষ্ণবীর কথায় কেবল ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

কিন্তু বৈষ্ণবী ছাড়ে না—পুনঃপুনঃ উত্তেজনা করিতে লাগিল। তখন কুন্দ কহিল, "আমি গিন্নীকে না বলিয়া যাইতে পারিব না।"

হরিদাসী মানা করিল। বলিল, "গিন্নীকে বলিও না। যাইতে দিবে না। হয়ত তোমার শাশুড়ীকে আনিতে পাঠাইবে। তাহা হইলে তোমার শাশুড়ী দেশছাড়া হইয়া পালাইবে।"

বৈষ্ণবী যতই দার্ঢ্য প্রকাশ করুক, কুন্দ কিছুতেই সূর্য্যমুখীর অনুমতি ব্যতীত যাইতে সম্মত হইল না। তখন অগত্যা হরিদাসী বলিল, "আচ্ছা তবে তুমি গিন্নীকে ভাল করিয়া বলিয়া রেখ। আমি আর একদিন আসিয়া লইয়া যাইব; কিন্তু দেখো, ভাল করিয়া বলো; আর একটু কাঁদাকাটা করিও, নহিলে হইবে না।"

কুন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু বৈষ্ণবীকে হাঁ কি না, কিছু বলিল না। তখন হরিদাসী হস্তমুখপ্রক্ষালন সমাপ্ত করিয়া অন্য সকলের কাছে ফিরিয়া আসিয়া পুরস্কার চাহিল। এমত সময়ে

সেইখানে সূর্য্যমুখী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন বাজে কথা একেবারে বন্ধ হইল, অল্পবয়স্কারা সকলেই একটা একটা কাজ লইয়া বসিল।

সূর্য্যমুখী হরিদাসীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "তুমি কে গা?" তখন নগেন্দ্রের এক মামী কহিলেন, "ও একজন বৈষ্ণবী, গান করিতে এসেছে। গান যে সুন্দর গায়! এমন গান কখন শুনিনে মা। তুমি একটি শুনিবে? গা ত গা হরিদাসি! একটি ঠাক্‌রুণ বিষয় গা।"

হরিদাসী এক অপূর্ব্ব শ্যামাবিষয় গাইলে সূর্য্যমুখী তাহাতে মোহিতা ও প্রীতা হইয়া বৈষ্ণবীকে পুরস্কারপূর্বক বিদায় করিলেন।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিয়া এবং কুন্দের প্রতি আর একবার দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বিদায় লইল। সূর্য্যমুখী চক্ষের আড়ালে গেলেই সে খঞ্জনীতে মৃদু মৃদু খেমটা বাজাইয়া মৃদু মৃদু গাইতে গাইতে গেল,

"আয় রে চাঁদের কণা।
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোণা।
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্ব্বা করে,
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে,
দিব পানের দোনা।"

বৈষ্ণবী গেলে স্ত্রীলোকেরা অনেকক্ষণ কেবল বৈষ্ণবীর প্রসঙ্গ লইয়াই রহিল। প্রথমে তাহার বড় সুখ্যাতি আরম্ভ হইল। পরে ক্রমে একটু খুঁত বাহির করিতে লাগিল। বিরাজ বলিল, "তা হৌক, কিন্তু নাকটা একটু চাপা।" তখন বামা বলিল, "রঙ্গটা বাপু বড় ফেঁকাসে।" তখন চন্দ্রমুখী বলিল, "চুলগুলো যেন শণেব দড়ি।" তখন চাঁপা বলিল, "কপালটা একটু উঁচু।" কমলা বলিল, "ঠোঁট দুখানা পুরু।" হারাণী বলিল, "গড়নটা বড় কাট কাট।" প্রমদা বলিল, "মাগীর বুকের কাছটা যেন যাত্রার সখীদের মত; দেখে ঘৃণা করে।" এইরূপে সুন্দরী বৈষ্ণবী শীঘ্রই অদ্বিতীয় কুৎসিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। তখন ললিতা বলিল, "তা দেখিতে যেমন হউক, মাগী গায় ভাল।" তাহাতেও নিস্তার নাই। চন্দ্রমুখী বলিল, "তাই বা কি, মাগীর গলা মোটা।" মুক্তকেশী বলিল, ঠিক বলেছ—মাগী যেন ষাঁড় ডাকে।" অনঙ্গ বলিল, "মাগী গান জানে না, একটাও দাশুরায়ের গান গায়িতে পারিল না।" কনক বলিল, "মাগীব তালবোধ নাই।" ক্রমে প্রতিপন্ন হইল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী কেবল যে যাব পর নাই কুৎসিতা, এমত নহে—তাহাব গানও যার পব নাই মন্দ।

দশম পরিচ্ছেদ : বাবু

হরিদাসী বৈষ্ণবী দত্তদিগের গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেবীপুরের দিকে গেল। দেবীপুরে বিচিত্র লৌহরেইলপরিবেষ্টিত এক পুষ্পোদ্যান আছে। তন্মধ্যে নানাবিধ ফল পুষ্পের বৃক্ষ, মধ্যে পুষ্করিণী, তাহার উপরে বৈঠকখানা। হরিদাসী সেই পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিল। এবং বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া এক নিভৃত কক্ষে গিয়া বেশ পরিত্যাগে প্রবৃত্ত হইল। অকস্মাৎ সেই নিবিড় কেশদামরচিত করবী মস্তকচ্যুত হইয়া পড়িল, সে ত পরচুলা মাত্র। বক্ষঃ হইতে স্তনযুগল খসিল—তাহা বস্ত্রনির্ম্মিত। বৈষ্ণবী পিত্তলের বালা ও জলতরঙ্গ চুড়ি খুলিয়া ফেলিল—রসকলি ধুইল। তখন উপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধানানন্তর, বৈষ্ণবীর স্ত্রীবেশ ঘুচিয়া, এক অপূর্ব্ব সুন্দর যুবাপুরুষ দাঁড়াইল। যুবার বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না। মুখ এবং গঠন কিশোরবয়স্কের ন্যায়। কান্তি পরম সুন্দর। এই যুবাপুরুষ দেবেন্দ্র বাবু। পূর্ব্বেই তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

দেবেন্দ্র এবং নগেন্দ্র উভয়েই এক বংশসম্ভূত; কিন্তু বংশের উভয় শাখার মধ্যে পুরুষানুক্রমে বিবাদ চলিতেছে। এমন কি, দেবীপুরের বাবুদিগের সঙ্গে গোবিন্দপুরের বাবুদিগের মুখের আলাপ পর্য্যন্ত ছিল না। পুরুষানুক্রমে দুই শাখায় মোকদ্দমা চলিতেছে। শেষে এক বড় মোকদ্দমায় নগেন্দ্রের পিতামহ দেবেন্দ্রের পিতামহকে পরাজিত করায় দেবীপুরের বাবুরা একেবারে হীনবল হইয়া পড়িলেন। ডিক্রীজারিতে তাঁহাদের সর্ব্বস্ব গেল—গোবিন্দপুরের বাবুরা তাঁহাদের তালুক সকল কিনিয়া লইলেন। সেই অবধি দেবীপুর হ্রস্বতেজা, গোবিন্দপুর বর্দ্ধিতশ্রী হইতে লাগিল। উভয় বংশে আর কখনও মিল হইল না। দেবেন্দ্রের পিতা ক্ষুণ্ণধনগৌরব পুনর্বর্দ্ধিত করিবার জন্য এক উপায় করিলেন। গণেশ বাবু নামে আর একজন জমিদার হরিপুর জেলার মধ্যে বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র অপত্য হৈমবতী। দেবেন্দ্রের সঙ্গে হৈমবতীর বিবাহ দিলেন। হৈমবতীর অনেক গুণ—সে কুরূপা, মুখরা, অপ্রিয়বাদিনী, আত্মপরায়ণা। যখন দেবেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হইল, তখন পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রের চরিত্র নিষ্কলঙ্ক। লেখাপড়ায় তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল, এবং প্রকৃতিও সুধীর ও সত্যনিষ্ঠ ছিল। কিন্তু সেই পরিণয় তাঁহার কাল হইল। যখন দেবেন্দ্র উপযুক্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন তখন দেখিলেন যে, ভার্য্যার গুণে গৃহে তাঁহার কোনও সুখেরই আশা নাই। বয়োগুণে তাঁহার রূপতৃষ্ণা জন্মিল, কিন্তু আত্মগৃহে তাহা ত নিবারণ হইল না। বয়োগুণে দম্পতিপ্রণয়াকাঙ্ক্ষাও জন্মিল—কিন্তু অপ্রিয়বাদিনী হৈমবতীকে দেখিবামাত্র সে আকাঙ্ক্ষা দূর হইত। সুখ দূরে থাকুক—দেবেন্দ্র দেখিলেন যে, হৈমবতীর রসনাবর্ষিত বিষের জ্বালায় গৃহে তিষ্ঠানও ভার। এক দিন হৈমবতী দেবেন্দ্রকে কদর্য্য কটুবাক্য কহিল; দেবেন্দ্র অনেক সহিয়াছিলেন—আর সহিলেন না। হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। এবং সেই দিন হইতে গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানমধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন। ইতিপূর্ব্বেই দেবেন্দ্রের পিতার পরলোকগমন হইয়াছিল। সুতরাং দেবেন্দ্র এক্ষণে স্বাধীন। কলিকাতায় পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া দেবেন্দ্র অতৃপ্তবিলাসতৃষ্ণা নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন। তজ্জনিত যে কিছু স্বচিত্তের অপ্রসাদ জন্মিত, তাহা ভূরি ভূরি সুরাভিসিঞ্চনে ধৌত করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে তাহার আর আবশ্যকতা রহিল না—পাপেই চিত্তের প্রসাদ জন্মিতে লাগিল। কিছু কাল পরে বাবুগিরিতে বিলক্ষণ সুশিক্ষিত হইয়া দেবেন্দ্র দেশে ফিরিয়া আসিলেন, এবং তথায় নূতন উপবনগৃহে আপন আবাস সংস্থাপন করিয়া বাবুগিরিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কলিকাতা হইতে দেবেন্দ্র অনেক প্রকার ঢং শিখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফর্মর্ বলিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম যুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশী করিতে পারিলেন না। বিধবাবিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্র বাবু বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।

দেবেন্দ্র গোবিন্দপুর হইতে প্রত্যাগমনের পর, বৈষ্ণবীবেশ ত্যাগ করিয়া নিজমূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক পাশের কামরায় আসিয়া বসিলেন। একজন ভৃত্য শ্রমহারী তামাকু প্রস্তুত করিয়া আলবলা আনিয়া সম্মুখে দিল; দেবেন্দ্র কিছু কাল সেই সর্ব্বশ্রমসংহারিণী তামাকুদেবীর সেবা করিলেন। যে এই মহাদেবীর প্রসাদসুখভোগ না করিয়াছে, সে মনুষ্যই নহে। হে সর্ব্বালোকচিত্তরঞ্জিনি বিশ্ববিমোহিনি! তোমাতে যেন আমাদের ভক্তি অচলা থাকে। তোমার বাহন আলবলা, হুঁকা, গুড়গুড়ি প্রভৃতি দেবকন্যারা সর্ব্বদাই যেন আমাদের নয়নপথে বিরাজ করেন, দৃষ্টিমাত্রেই মোক্ষলাভ করিব। হে হুঁকে! হে আলবলে! হে কুণ্ডলাকৃতধূমরাশিসমুদ্গারিণী! হে ফণিনীনিন্দিতদীর্ঘনলসংসর্পিণি! হে

রজতকিরীটমণ্ডিতশিরোদেশসুশোভিনি! কিবা তোমার কিরীটবিস্রস্ত ঝালর ঝলমলায়মান! কিবা শৃঙ্খলাঙ্গুরীয় সম্ভূষিতবক্কাগ্রভাগ মুখনলের শোভা! কিবা তোমার গর্ভস্থ শীতলাম্বুরাশির গভীর নিনাদ! হে বিশ্বরমে! তুমি বিশ্বজনশ্রমহারিণী, অলসজনপ্রতিপালিনী, ভার্য্যাভর্ৎসিতজনচিত্তবিকারবিনাশিনী, প্রভুভীতজনসাহসপ্রদায়িনী! মূঢ়ে তোমার মহিমা কি জানিবে? তুমি শোকপ্রাপ্ত জনকে প্রবোধ দাও, ভয়প্রাপ্ত জনকে ভরসা দাও, বুদ্ধিভ্রষ্ট জনকে বুদ্ধি দাও, কোপযুক্ত জনকে শান্তি প্রদান কর। হে বরদে! হে সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী! তুমি যেন আমার ঘরে অক্ষয় হইয়া বিরাজ কর। তোমার সুগন্ধ দিনে দিনে বাড়ুক। তোমার গর্ভস্থ জলকল্লোল মেঘগর্জ্জনবৎ ধ্বনিত হইতে থাকুক! তোমার মুখনলের সহিত আমার অধরৌষ্ঠের যেন তিলেক বিচ্ছেদ না হয়।

ভোগাসক্ত দেবেন্দ্র যথেচ্ছা এই মহাদেবীর প্রসাদভোগ করিলেন—কিন্তু তাহাতে পরিতৃপ্তি জন্মিল না। পরে অন্যা মহাশক্তির অর্চ্চনার উদ্যোগ হইল। তখন ভৃত্যহস্তে, তৃণপটাবৃতা বোতলবাহিনীর আবির্ভাব হইল। তখন সেই অমল শ্বেত সুবিস্তৃত শয্যার উপরে, রজতানুকৃতাসনে সান্ধ্যগগনশোভিরক্তাম্বুদতুল্যবর্ণবিশিষ্টা, দ্রবময়ী মহাদেবী, ডেকান্টর নামে আসুরিক ঘটে সংস্থাপিতা হইলেন। কট গ্লাসের কোষা পড়িল; প্লেটেড জগ্ তাম্রকুণ্ড হইল; এবং পাকশালা হইতে এক কৃষ্ণকূর্চ্চ পুরোহিত হট্ওয়াটার-প্লেট নামক দিব্য পুষ্পপাত্রে রোষ্ট্ মটন্ এবং কট্লেট্ নামক সুগন্ধ কুসুমরাশি রাখিয়া গেল। তখন দেবেন্দ্র দত্ত, যথাশাস্ত্র ভক্তিভাবে, দেবীর পূজা করিতে বসিলেন।

পরে তানপুরা, তবলা, সেতার প্রভৃতি সমেত গায়ক বাদক দল আসিল। তাহারা পূজার প্রয়োজনীয় সঙ্গীতোৎসব সম্পন্ন করিয়া গেল।

সর্ব্বশেষে দেবেন্দ্রের সমবয়স্ক, সুশীতলকান্তি এক যুবাপুরুষ আসিয়া বসিলেন। ইনি দেবেন্দ্রের মাতুলপুত্র সুরেন্দ্র; গুণে সর্ব্বাংশে দেবেন্দ্রের বিপরীত। ইঁহার স্বভাবগুণে দেবেন্দ্রও ইঁহাকে ভালবাসিতেন। দেবেন্দ্র, ইঁহার ভিন্ন, সংসারে আর কাহারও কথার বাধ্য নহেন। সুরেন্দ্র প্রত্যহ রাত্রে একবার দেবেন্দ্রের সংবাদ লইতে আসিতেন। কিন্তু মদ্যাদির ভয়ে অধিকক্ষণ বসিতেন না। সকলে উঠিয়া গেলে, সুরেন্দ্র দেবেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তোমার শরীর কিরূপ আছে?"

দে। "শরীরং ব্যাধিমন্দিরং।"

সু। বিশেষ তোমার। আজি জ্বর জানিতে পারিযাছিলে?

দে। না

সু। আব যকৃতের সেই ব্যথাটা?

দে। পূর্ব্বমত আছে।

সু। তবে এখন এ সব স্থগিত রাখিলে ভাল হয় না?

দে। কি—মদ খাওয়া? কত দিন বলিবে? ও আমার সাথের সাথী।

সু। সাথের সাথী কেন? সঙ্গে আসে নাই—সঙ্গেও যাইবে না। অনেকে ত্যাগ করিয়াছে—তুমিও ত্যাগ করিবে না কেন?

দে। আমি কি সুখের জন্য ত্যাগ করিব? যাহারা ত্যাগ করে, তাহাদের অন্য সুখ আছে—সেই ভরসায় ত্যাগ করে। আমার আর কোন সুখই নাই।

সু। তবু, বাঁচিবার আশায়, প্রাণের আকাঙ্ক্ষায় ত্যাগ কর।

দে। যাহাদের বাঁচিয়া সুখ, তাহারা বাঁচিবার আশায় মদ ছাড়ুক। আমার বাঁচিয়া কি লাভ?

সুরেন্দ্রের চক্ষু বাষ্পাকুল হইল। তখন বন্ধুস্নেহে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, "তবে আমাদের অনুরোধে ত্যাগ কর।"

দেবেন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। দেবেন্দ্র বলিল, "আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব। আর"—

সু। আর কি?

দে। আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।

সুরেন্দ্র সজলনয়নে, মনোমধ্যে হৈমবতীকে শত শত গালাগালি দিতে দিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য্যমুখীর পত্র

"প্রাণাধিকা শ্রীমতী কমলমণি দাসী চিরায়ুষ্মতীষু।

আর তোমাকে আশীর্ব্বাদ পাঠ লিখিতে লজ্জা করে। এখন তুমিও একজন হইয়া উঠিয়াছ—এক ঘরের গৃহিণী। তা যাহাই হউক, আমি তোমাকে আমার কনিষ্ঠা ভগিনী ভিন্ন আর কিছু বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। তোমাকে মানুষ করিয়াছি। প্রথম "ক খ" লিখাই, কিন্তু তোমার হাতের অক্ষর দেখিয়া, আমার এ হিজিবিজি তোমার কাছে পাঠাইতে লজ্জা করে। তা লজ্জা করিয়া কি করিব? আমাদিগের দিনকাল গিয়াছে। দিনকাল থাকিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?

কি দশা? এ কথা কাহাকে বলিবার নহে,—বলিতে দুঃখও হয়, লজ্জাও করে। কিন্তু অন্তঃকরণের ভিতর যে কষ্ট, তাহা কাহাকে না বলিলেও সহ্য হয় না। আর কাহাকে বলিব? তুমি আমার প্রাণের ভগিনী—তুমি ভিন্ন আর আমাকে কেহ ভালবাসে না। আর তোমার ভাইয়ের কথা তোমা ভিন্ন পরের কাছেও বলিতে পারি না।

আমি আপনার চিতা আপনি সাজাইয়াছি। কুন্দনন্দিনী যদি না খাইয়া মরিত, তাহাতে আমার কি ক্ষতি ছিল? পরমেশ্বর এত লোকের উপায় করিতেছেন, তাহার কি উপায় করিতেন না? আমি কেন আপনা খাইয়া তাহাকে ঘরে আনিলাম?

তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭/১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্য্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী; পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী; সেই স্বামী, কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্ম্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই, তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। যে দিকে কুন্দনন্দিনী থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সে দিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখ আনেন না। এমন কি তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।

তবে কেন আমি এত হাবড়হাটি লিখিয়া মরি? পুরুষে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ, এতক্ষণে বুঝিয়াছ। যদি কুন্দনন্দিনী অন্য স্ত্রীলোকের মত তাঁহার চক্ষে সামান্যা হইত, তবে তিনি কেন তাহার প্রতি না চাহিবার জন্য ব্যস্ত হইবেন. তাহার নাম মুখে না আনিবার জন্য এত যত্নশীল হইবেন? কুন্দনন্দিনীর জন্য তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী হইয়াছেন। এ জন্য কখন কখন তাহার প্রতি অকারণ ভর্ৎসনা করেন। সে রাগ তাহার উপর নহে—আপনার উপর। সে ভর্ৎসনা তাহাকে নহে, আপনাকে। আমি ইহা বুঝিতে পারি। আমি এতকাল পর্য্যন্ত অনন্যব্রত হইয়া, অন্তরে বাহিরে কেবল তাঁহাকেই দেখিলাম—তাঁহার ছায়া দেখিলে তাঁহার মনের কথা বলিতে পারি—তিনি আমাকে কি লুকাইবেন? কখন কখন অন্যমনে তাঁহার চক্ষু এদিক্

ওদিক্ চাহে কাহার সন্ধানে, তাহা কি আমি বুঝিতে পারি না? দেখিলে আবার ব্যস্ত হইয়া চক্ষু ফিরাইয়া লয়েন কেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? কাহার কণ্ঠের শব্দ শুনিবার জন্য, আহারের সময়, গ্রাস হাতে করিয়াও কাণ তুলিয়া থাকেন, তাহা কি বুঝিতে পারি না? হাতের ভাত হাতে থাকে, কি মুখে দিতে কি মুখে দেন, তবু কাণ তুলিয়া থাকেন—কেন? আবার কুন্দের স্বর কাণে গেলেই তখনই বড় জোরে হাপুস হাপুস করিয়া ভাত খাইতে আরম্ভ করেন কেন, তা কি বুঝিতে পারি না? আমার প্রাণাধিক সর্ব্বদা প্রসন্নবদন—এখন এত অন্যমনাঃ কেন? কথা বলিলে কথা কাণে না তুলিয়া, অন্যমনে উত্তর দেন, 'হুঁ';—আমি যদি রাগ করিয়া বলি, "আমি শীঘ্র মরি," তিনি না শুনিয়া বলেন "হুঁ"। এত অন্যমনাঃ কেন? জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মোকদ্দমার জ্বালায়।" আমি জানি মোকদ্দমার কথা তাঁহার মনে স্থান পায় না। যখন মোকদ্দমার কথা বলেন, তখন হাসিয়া হাসিয়া কথা বলেন। আর এক কথা—এক দিন পাড়ার প্রাচীনার দল কুন্দের কথা কহিতেছিল, তাহার বাল্যবৈধব্য অনাথিনীত্ব এই সকল লইয়া তাহার জন্য দুঃখ করিতেছিল। তোমার সহোদর সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি অন্তরাল হইতে দেখিলাম, তাঁর চক্ষু জলে পুরিয়া গেল—তিনি সহসা দ্রুতবেগে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

এখন একজন নূতন দাসী রাখিয়াছি। তাঁহার নাম কুমুদ। বাবু তাহাকে কুমুদ বলিয়া ডাকেন। কখন কখন কুমুদ বলিয়া ডাকিতে কুন্দ বলিয়া ফেলেন। আর কত অপ্রতিভ হন! অপ্রতিভ কেন?

এ কথা বলিতে পারিব না যে, তিনি আমাকে অযত্ন বা অনাদর করেন। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক যত্ন, অধিক আদর করেন। ইহার কারণ বুঝিতে পারি। তিনি আপনার মনে আমার নিকট অপরাধী। কিন্তু ইহাও বুঝিতে পারি যে, আমি তাঁহার মনে স্থান পাই না। যত্ন এক, ভালবাসা আর, ইহার মধ্যে প্রভেদ কি—আমরা স্ত্রীলোক সহজেই বুঝিতে পারি।

আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক বিতর্ক হয়। সে দিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর, মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র, বিধবাবিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্ব্বভৌম ঠাকুর বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোণার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।

আপনার দুঃখের কথা লইয়া তোমাকে অনেকক্ষণ জ্বালাতন করিয়াছি। তুমি না জানি কত বিরক্ত হইবে? কিন্তু কি করি ভাই—তোমাকে মনের দুঃখ না বলিয়া কাহাকে বলিব? আমার কথা এখনও ফুরায় নাই—কিন্তু তোমার মুখ চেয়ে আজ ক্ষান্ত হইলাম। এ সকল কথা কাহাকেও বলিও না। আমার মাথার দিব্য, জামাই বাবুকেও এ পত্র দেখাইও না।

তুমি কি আমাদিগকে দেখিতে আসিবে না? এই সময় একবার আসিও, তোমাকে পাইলে অনেক ক্লেশ নিবারণ হইবে।

তোমার ছেলের সংবাদ ও জামাইবাবুর সংবাদ শীঘ্র লিখিবে। ইতি।

সূর্য্যমুখী।

পুনশ্চ। আর এক কথা—পাপ বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচি। কোথায় বিদায় করি? তুমি নিতে পার? না ভয় করে?"

কমল প্রত্যুত্তরে লিখিলেন—

"তুমি পাগল হইয়াছ। নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয়প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না রাখিতে পার—তবে দীঘির জলে ডুবিয়া

মর। আমি কমলমণি তর্কসিদ্ধান্ত ব্যবস্থা দিতেছি, তুমি বড় কলসী লইয়া জলে ডুবিয়া মরিতে পার। স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না—তাহার মরাই মঙ্গল।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ অঙ্কুর

দিন কয় মধ্যে, ক্রমে ক্রমে নগেন্দ্রের সকল চরিত্র পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। নির্ম্মল আকাশে মেঘ দেখা দিল—নিদাঘকালের প্রদোষাকাশের মত, অকস্মাৎ সে চরিত্র মেঘাবৃত হইতে লাগিল। দেখিয়া সূর্য্যমুখী গোপনে আপনার অঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

সূর্য্যমুখী ভাবিলেন, "আমি কমলের কথা শুনিব। স্বামীর চিত্তপ্রতি কেন অবিশ্বাসিনী হইব? তাঁহার চিত্ত অচলপর্ব্বত—আমিই ভ্রান্ত বোধ হয়। তাঁহার কোন ব্যামোহ হইয়া থাকিবে।" সূর্য্যমুখী বালির বাঁধ বাঁধিল।

বাড়ীতে একটি ছোট রকম ডাক্তার ছিল। সূর্যমুখী গৃহিণী। অন্তরালে থাকিয়া সকলের সঙ্গেই কথা কহিতেন। বারেন্ডার পাশে এক চিক থাকিত; চিকের পশ্চাতে সূর্য্যমুখী থাকিতেন। বারেন্ডায় সম্বোধিত ব্যক্তি থাকিত; মধ্যে এক দাসী থাকিত; তাহার মুখে সূর্য্যমুখী কথা কহিতেন। এইরূপে সূর্য্যমুখী ডাক্তারের সঙ্গে কথা কহিতেন। সূর্য্যমুখী তাহাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবুর অসুখ হইয়াছে, ঔষধ দাও না কেন?"

ডাক্তার। কি অসুখ, তাহা ত আমি জানি না। আমি ত অসুখের কোন কথা শুনি নাই।

সূ। বাবু কিছু বলেন নাই?

ডা। না—কি অসুখ?

সূ। কি অসুখ, তাহা তুমি ডাক্তার, তুমি জান না—আমি জানি?

ডাক্তার সুতরাং অপ্রতিভ হইল। "আমি গিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি," এই বলিয়া ডাক্তার প্রস্থানের উদ্যোগ করিতেছিল, সূর্য্যমুখী তাহাকে ফিরাইলেন, বলিলেন, "বাবুকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না—ঔষধ দাও।"

ডাক্তার ভাবিল, মন্দ চিকিৎসা নহে। "যে আজ্ঞা, ঔষধের ভাবনা কি," বলিয়া পলায়ন করিল। পরে ডিস্পেন্সরিতে গিয়া একটু সোডা, একটু পোর্ট ওয়াইন, একটু সিরপফেরিমিউরেটিস, একটু মাথা মুণ্ড মিশাইয়া, শিশি পুরিয়া টিকিট মারিয়া প্রত্যহ দুই বার সেবনের ব্যবস্থা লিখিয়া দিল। সূর্য্যমুখী ঔষধ খাওয়াইতে গেলেন; নগেন্দ্র শিশি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুঁড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঔষধ না খাও—তোমার কি অসুখ, আমাকে বল।"

নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি অসুখ?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমার শরীর দেখ দেখি কি হইয়াছে?" এই বলিয়া সূর্য্যমুখী একখানি দর্পণ আনিয়া নিকটে ধরিলেন। নগেন্দ্র তাঁহার হাত হইতে দর্পণ লইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। দর্পণ চূর্ণ হইয়া গেল।

সূর্য্যমুখীর চক্ষু দিয়া জল পড়িল। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া উঠিয়া গেলেন। বহির্ব্বাটী গিয়া একজন ভৃত্যকে বিনাপরাধে প্রহার করিলেন। সে প্রহার সূর্য্যমুখীর অঙ্গে বাজিল।

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র অত্যন্ত শীতলস্বভাব ছিলেন। এখন কথায় কথায় রাগ।

শুধু রাগ নয়। একদিন রাত্রে আহারের সময় অতীত হইয়া গেল, তথাপি নগেন্দ্র অন্তঃপুরে আসিলেন না। সূর্য্যমুখী প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। অনেক রাত্রি হইল। অনেক রাত্রে নগেন্দ্র আসিলেন; সূর্য্যমুখী দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। নগেন্দ্রের মুখ আরক্ত, চক্ষু আরক্ত, নগেন্দ্র মদ্যপান

করিয়াছেন। নগেন্দ্র কখন মদ্যপান করিতেন না। দেখিয়া সূর্য্যমুখী বিস্মিত হইলেন।

সেই অবধি প্রত্যহ এইরূপ হইতে লাগিল। একদিন সূর্য্যমুখী, নগেন্দ্রের দুইটি চরণে হাত দিয়া, গলদশ্রু কোনরূপে রুদ্ধ করিয়া, অনেক অনুনয় করিলেন; বলিলেন, "কেবল আমার অনুরোধে ইহা ত্যাগ কর।" নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি দোষ?"

জিজ্ঞাসার ভাবেই উত্তর নিবারণ হইল। তথাপি সূর্য্যমুখী উত্তর করিলেন, "দোষ কি তাহা ত আমি জানি না। তুমি যাহা জান না, তাহা আমিও জানি না। কেবল আমার অনুরোধ।"

নগেন্দ্র প্রত্যুত্তর করিলেন, "সূর্য্যমুখী, আমি মাতাল, মাতালকে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে শ্রদ্ধা করিও। নচেৎ আবশ্যক করে না।"

সূর্য্যমুখী ঘরের বাহিরে গেলেন। ভৃত্যের প্রহার পর্য্যন্ত নগেন্দ্রের সমমুখে আর চক্ষের জল ফেলিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।

দেওয়ানজী বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "মা ঠাকুরাণীকে বলিও—বিষয় গেল, আর থাকে না।"

"কেন?"

"বাবু কিছু দেখেন না। সদর মফস্বলের আমলারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতেছে। কর্ত্তার অমনোযাগে আমাকে কেহ মানে না।" শুনিয়া সূর্য্যমুখী বলিলেন, "যাঁহার বিষয়, তিনি রাখেন, থাকিবে। না হয়, গেল গেলই।"

ইতিপূর্ব্বে নগেন্দ্র সকলই স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন।

একদিন তিন চারি হাজার প্রজা নগেন্দ্রের কাছারির দরওয়াজায় জোড়হাত করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। "দোহাই হুজুর—নাএব গোমস্তার দৌরাত্ম্যে আর বাঁচি না। সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। আপনি না রাখিলে কে রাখে?"

নগেন্দ্র হুকুম দিলেন, "সব হাঁকায় দাও।"

ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একজন গোমস্তা একজন প্রজাকে মারিয়া একটি টাকা লইয়াছিল। নগেন্দ্র গোমস্তার বেতন হইতে দশটি টাকা লইয়া প্রজাকে দিয়াছিলেন।

হরদেব ঘোষাল নগেন্দ্রকে লিখিলেন, "তোমার কি হইয়াছে? তুমি কি করিতেছ? আমি কিছু ভাবিয়া পাই না। তোমার পত্র ত পাইই না। যদি পাই, ত সে ছত্র দুই, তাহার মানে মাথা মুণ্ড, কিছুই নাই। তাতে কোন কথাই থাকে না। তুমি কি আমার উপর রাগ করিয়াছ? তা বল না কেন, শারীরিক ভাল আছ কি না বল।"

নগেন্দ্র উত্তর লিখিলেন, "আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।"

হরদেব বড় বিজ্ঞ। পত্র পড়িয়া মনে করিলেন, "কি এ? অর্থচিন্তা? বন্ধুবিচ্ছেদ? দেবেন্দ্র দত্ত? না, এ প্রেম?"

কমলমণি সূর্য্যমুখীর আর একখানি পত্র পাইলেন। তাহার শেষ এই "একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আমার সুহৃদ্ কেহ নাই। একবার এসো!"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : মহাসমর

কমলমণির আসন টলিল। আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। কমলমণি রমণীরত্ন। অমনি স্বামীর কাছে গেলেন।

শ্রীশচন্দ্র অন্তঃপুরে বসিয়া, আপিসের আয়ব্যয়ের হিসাব কিতাব দেখিতেছিলেন। তাঁহার পাশে, বিছানায় বসিয়া, এক বৎসরের পুত্র সতীশচন্দ্র ইংরেজি সংবাদপত্রখানি অধিকার করিয়াছিলেন। সতীশচন্দ্র সংবাদপত্রখানি প্রথমে ভোজনের চেষ্টা দেখিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া

এক্ষণে পাতিয়া বসিয়াছিল।

কমলমণি স্বামীর নিকটে গিয়া গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া, ভূমিষ্ঠা হইয়া প্রণাম করিলেন। এবং করযোড় করিয়া কহিলেন, "সেলাম পৌঁছে মহারাজ!"

(ইতিপূর্ব্বে বাড়ীতে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইয়া গিয়াছিল।)

শ্রীশচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন, "আবার শশা চুরি নাকি?"

ক। শশা কাঁকুড় নয়। এবার বড় ভারি জিনিস চুরি গিয়াছে।

শ্রী। কোথায় কি চুরি হলো?

ক। গোবিন্দপুরে চুরি হয়েছে। দাদাবাবুর একটি সোণার কৌটায় এক কড়া কাণা কড়ি ছিল, তাই কে নিয়া গিয়াছে।

শ্রীশ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, "তোমার দাদাবাবুর সোণার কৌটা ত সূর্য্যমুখী—কাণা কড়িটি কি?"

ক। সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিখানি।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "তাই লোকে বলে যে, যে খেলে, সে কাণা কড়িতে খেলে। সূর্য্যমুখী ঐ কাণা কড়িতেই তোমার ভাইকে কিনে রেখেছে—আর তোমার এতটা বুদ্ধি থাকিতেও ভাই—" কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখ টিপিয়া ধরিলেন। ছাড়িয়া দিলে শ্রীশ বলিলেন, "তা কাণা কড়িটি চুরি করলে কে?"

ক। তা ত জানি না—কিন্তু তার পত্র পড়িয়া বুঝিলাম যে, সে কাণা কড়িটি খোওয়া গিয়াছে—নহিলে মাগী এমন পত্র লিখিবে কেন?

শ্রী। পত্রখানি দেখিতে পাই?

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের হাতে সূর্য্যমুখীর পত্র দিয়া কহিলেন, "এই পড়। সূর্য্যমুখী তোমাকে এ সকল কথা বলিতে মানা করিয়াছে—কিন্তু যতক্ষণ তোমাকে সব না বলিতেছি, ততক্ষণ আমার প্রাণ খাবি খেতেছে। তোমাকে পত্র না পড়াইলে আহার নিদ্রা হইবে না—ঘুরণী রোগই বা উপস্থিত হয়।"

শ্রীশচন্দ্র পত্র হস্তে লইয়া চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যখন তোমাকে নিষেধ করিয়াছে, তখন আমি এ পত্র দেখিব না। কথাটা কি, তা শুনিতেও চাহিব না। এখন কী করিতে হইবে কি, তাই বল।"

ক। করতে হবে এই—সূর্য্যমুখীর বুদ্ধিটুকু গিয়াছে, তার একটু বুদ্ধি চাই। বুদ্ধি দেয়, এমন লোক আর কে আছে—বুদ্ধি যা কিছু আছে তা সতীশ বাবুর। তাই সতীশ বাবুকে একবার গোবিন্দপুর যেতে তার মামী লিখে পাঠিয়েছে।

সতীশ বাবু ততক্ষণ একটা ফুলদানি ফুলসমেত উল্টাইয়া ফেলিয়াছিলেন, এবং তৎপরে দোয়াতের উপর নজর করিতেছিলেন। দেখিয়া শ্রীশচন্দ্র কহিলেন, "উপযুক্ত বুদ্ধিদাতা বটে। তা যাহা হোক, এতক্ষণে বুঝিলাম—ভাজের বাড়ী মশায়ের নিমন্ত্রণ। সতীশকে যেতে হলেই সুতরাং কমলমণিও যাবে। তা সূর্য্যমুখীর কাণা কড়িটি না হারালে এমন কথা লিখিবে কেন?"

ক। শুধু কি তাই। সতীশের নিমন্ত্রণ; আমার নিমন্ত্রণ আর তোমার নিমন্ত্রণ।

শ্রী। আমার নিমন্ত্রণ কেন?

ক। আমি বুঝি একা যাব? আমাদের সঙ্গে গাড়ু গামছা নিয়ে যায় কে?

শ্রী। এ সূর্য্যমুখীর বড় অন্যায়। শুধু গাড়ু গামছা বহিবার জন্য যদি ঠাকুরজামাইকে দরকার হয়, তবে আমি দু দিনের জন্য একটা ঠাকুরজামাই দেখিয়ে দিতে পারি।

কমলমণির বড় রাগ হইল। সে ভ্রূকুটি করিল, শ্রীশকে ভেঙ্গাইল, এবং শ্রীশচন্দ্র যে কাগজখানায় লিখিতেছিল, তাই ছিঁড়িয়া ফেলিল। শ্রীশ হাসিয়া বলিল, "তা লাগতে এসো কেন?"

কমলমণি কৃত্রিম কোপসহকারে কহিল, "আমার খুসি, লাগবো।"

শ্রীশচন্দ্রও কৃত্রিম কোপসহকারে কহিলেন, "আমার খুসি, বলবো।"

তখন কোপযুক্তা কমলমণি শ্রীশকে একটি কিল দেখাইল। কুন্দদন্তে অধর টিপিয়া ছোট হাতে একটি ছোট্ট কিল দেখাইল।

কিল দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র কমলমণির খোঁপা খুলিয়া দিলেন। এখন বর্দ্ধিতরোষা কমলমণি, শ্রীশচন্দ্রের দোয়াতের কালি পিকদানিতে ঢালিয়া ফেলিয়া দিল।

রাগে শ্রীশচন্দ্র দ্রুতগতিতে ধাবমান হইয়া কমলমণির মুখচুম্বন করিলেন। রাগে কমলমণিও অধীরা হইয়া শ্রীশচন্দ্রের মুখচুম্বন করিল। দেখিয়া সতীশচন্দ্রের বড় প্রীতি জন্মিল। তিনি জানিতেন যে, মুখচুম্বন তাঁহার ইজারা মহল। অতএব তাহার ছড়াছড়ি দেখিয়া রাজভাগ আদায়ের অভিলাষে মার জানু ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; এবং উভয়েরই মুখপানে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিব লহর তুলিলেন। সে হাসি কমলমণির কর্ণে কি মধুর বাজিল! কমলমণি তখন সতীশকে ক্রোড়ে উঠাইয়া ভূরি ভূরি মুখ চুম্বন করিল। পরে শ্রীশচন্দ্র কমলের ক্রোড় হইতে তাহাকে লইলেন এবং ভূরি ভূরি মুখ চুম্বন করিলেন। সতীশ বাবু এইরূপে রাজভাগ আদায় করিয়া যথাকালে অবতরণ করিলেন, এবং পিতার সুবর্ণময় পেন্‌সিল্‌টি দেখিতে পাইয়া অপহরণমানসে ধাবমান হইলেন। পরে হস্তগত করিয়া উপাদেয় ভোজ্য বিবেচনায় পেন্‌সিল্‌টি মুখে দিয়া লেহন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকালে ভগদত্ত এবং অর্জ্জুনে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ভগদত্ত অর্জ্জুন প্রতি অনিবার্য্য বৈষ্ণবাস্ত্র নিক্ষেপ করেন; অর্জ্জুনকে তন্নিবারণে অক্ষম জানিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বযং বক্ষঃ পাতিয়া সেই অস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার শমতা করেন। সেইরূপ, কমলমণি ও শ্রীশচন্দ্রের এই বিষম যুদ্ধে, সতীশচন্দ্র মহাস্ত্র সকল আপন বদনমণ্ডলে গ্রহণ করায় যুদ্ধের শমতা হইল। কিন্তু ইহাদের এইরূপ সন্ধিবিগ্রহ বাদলের বৃষ্টির মত—দণ্ডে দণ্ডে হইত, দণ্ডে দণ্ডে যাইত।

শ্রীশচন্দ্র তখন কহিলেন, "তা সত্য সত্যই কি তোমার গোবিন্দপুরে যেতে হবে? আমি একা থাকিব কি প্রকারে?"

ক। তোমায় যেন আমি একা থাকিতে সাধতেছি। আমিও যাব, তুমিও যাবে! তা যাও, সকাল সকাল আপিস সারিয়া আইস, আর দেরি কর ত, সতীশে আমাতে দু-দিকে দুই জনে কাঁদিতে বসবো।

শ্রী। আমি যাই কি প্রকারে? আমাদের এই তিসি কিনিবার সময়। তুমি তবে একা যাও।

ক। আয়, সতীশ! আয়, আমরা দু-জনে দুই দিকে কাঁদতে বসি।

মার আদরের ডাক সতীশের কাণে গেল—সতীশ অমনি পেন্‌সিল্‌ভোজন ত্যাগ করিয়া লহর তুলিয়া আহ্লাদের হাসি হাসিল, সুতরাং কমলের এবার কাঁদা হলো না। তৎপরিবর্ত্তে সতীশের মুখচুম্বন করিলেন,—দেখাদেখি শ্রীশও তাহাই করিলেন। সতীশ আপনার বাহাদুরি দেখাইয়া আর এক লহর তুলিয়া হাসিল। এই সকল বৃহৎ ব্যাপার সমাধা হইলে কমল আবার কহিলেন, "এখন কি হুকুম হয়?"

শ্রী। তুমি যাও, মানা করি না, কিন্তু তিসির মরসুমটায় আমি কি প্রকারে যাই?

শুনিয়া কমলমণি মুখ ফিরাইয়া মানে বসিলেন। আর কথা কহেন না।

শ্রীশচন্দ্রের কলমে একটু কালি ছিল। শ্রীশ সেই কলম লইয়া পশ্চাৎ হইতে গিয়া কমলের কপালে একটি টিপ কাটিয়া দিলেন।

তখন কমল হাসিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমি তোমায় কত ভালবাসি।" এই বলিয়া কমল শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধ বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন, সুতরাং টিপের কালি, সমুদায়টাই শ্রীশের গালে লাগিয়া রহিল।

এইরূপে এবারকার যুদ্ধে জয় হইলে পর, কমল বলিলেন, "যদি তুমি একান্তই যাইবে না, তবে আমার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দাও।"

শ্রী। ফিরিবে কবে?

ক। জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তুমি যদি গেলে না, তবে আমি কয় দিন থাকিতে পারিব?

শ্রীশচন্দ্র কমলমণিকে গোবিন্দপুরে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু আমরা নিশ্চিত সংবাদ রাখি যে, সেবার শ্রীশচন্দ্রের সাহেবেরা তিসির কাজে বড় লাভ করিতে পারেন নাই। হৌসের কর্ম্মচারীরা আমাদিগের নিকট গোপনে বলিয়াছে যে, সে শ্রীশ বাবুরই দোষ। তিনি ঐ সময়টা কাজকর্ম্মে বড় মন দেন নাই। কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গুণিতেন। এ কথা শ্রীশচন্দ্র একদিন শুনিয়া বলিলেন, "হবেই ত! আমি তখন লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছিলাম।" শ্রোতারা শুনিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ছি! বড় স্ত্রৈণ!" কথাটা শ্রীশের কাণে গেল। তিনি শুনিয়া হৃষ্টমনে ভৃত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে, ভাল করিয়া আহারের উদ্যোগ কর। বাবুরা আজ এখানে আহার করিবেন।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ ঃ ধরা পড়িল

গোবিন্দপুরে দত্তদিগের বাড়ীতে যেন অন্ধকারে একটি ফুল ফুটিল। কমলমণির হাসিমুখ দেখিয়া সূর্য্যমুখীরও চক্ষের জল শুকাইল। কমলমণি বাড়িতে পা দিয়াই সূর্য্যমুখীর চুলের গোছা লইয়া বসিয়া গেলেন। অনেক দিন সূর্য্যমুখী কেশরচনা করেন নাই। কমলমণি বলিলেন, "দুটো ফুল গুঁজিয়া দিব?" সূর্য্যমুখী তাঁহার গাল টিপিয়া ধরিলেন। "না! না!" বলিয়া কমলমণি লুকাইয়া দুইটা ফুল দিয়া দিলেন। লোক আসিলে বলিলেন, "দেখেছ, মাগী বুড়া বয়সে মাথায় ফুল পরে।"

আলোকময়ীর আলো নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলের মেঘেও ঢাকা পড়িল না। নগেন্দ্রকে দেখিয়াই কমলমণি টিপ করিয়া প্রণাম করিল। নগেন্দ্র বলিলেন, "কমল কোথা থেকে?" কমল মুখ নত করিয়া, নিরীহ ভাল মানুষের মত বলিলেন, "আজ্ঞে, খোকা ধরিয়া আনিল।" নগেন্দ্র বলিলেন, "বটে! মার পাজিকে!" এই বলিয়া খোকাকে কোলে লইয়া দণ্ডস্বরূপ তাহার মুখচুম্বন করিলেন। খোকা কৃতজ্ঞ হইয়া তাঁহার গায়ে লাল দিল, আর গোঁপ ধরিয়া টানিল।

কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে কমলমণির ঐরূপ আলাপ হইল,—"ওলো কুঁদী—কুঁদী মুদী দুঁদী—ভাল আছিস্ ত কুঁদী?"

কুঁদী অবাক্ হইয়া রহিল। কিছুকাল ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "আছি।"

"আছি দিদি—আমায় দিদি বলবি—না বলিস্ ত ঘুমাইয়া থাকিবি আর তোর চুলে আগুন ধরিয়ে দিব। আর নহিলে গায়ে আরসুলো ছাড়িয়া দিব।"

কুন্দ দিদি বলিতে আরম্ভ করিল। যখন কলিকাতায় কুন্দ কমলের কাছে থাকিত, তখন কমলকে কিছু বলিত না। বড় কথাও কহিত না। কিন্তু কমলের যে প্রকৃতি চিরপ্রেমময়ী, তাহাতে সে তখন হইতেই তাঁহাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মধ্যে কয় বৎসর অদর্শনে কতক কতক ভুলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে কমলের স্বভাবগুণে, কুন্দেরও স্বভাবগুণে, সেই ভালবাসা নূতন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

প্রণয় গাঢ় হইল। এদিকে কমলমণি স্বামীর গৃহে যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন; সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না ভাই! আর দু-দিন থাক! তুমি গেলে আমি আর বাঁচিব না। তোমার কাছে সকল কথা বলাও সোয়াস্তি।" কমল বলিলেন, "তোমার কাজ না করিয়া যাইব না।" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার কি কাজ করিবে?" কমলমণি মুখে বলিলেন, "তোমার শ্রাদ্ধ," মনে বলিলেন, "তোমার কণ্টকোদ্ধার।"

কুন্দনন্দিনী কমলের যাওয়ার কথা শুনিয়া আপনার ঘরে গিয়া লুকাইয়া কাঁদিল, কমলমণি লুকাইয়া লুকাইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল। কুন্দনন্দিনী বালিশে মাথা দিয়া কাঁদিতেছে, কমলমণি তাহার

চুল বাঁধিতে বসিল। চুল বাঁধা কমলের একটা রোগ।

চুল বাঁধা সমাপ্ত হইলে, কুন্দের মাথা তুলিয়া, কমল তাহার মস্তক আপনার কোলে রাখিলেন। অঞ্চল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। এই সব কাজ শেষ করিয়া শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কুঁদি, কাঁদিতেছিলি কেন?"

কুন্দ বলিল, "তুমি যাবে কেন?"

কমলমণি একটু হাসিলেন। কিন্তু ফোঁটা দুই চক্ষের জল সে হাসি মানিল না—না বলিয়া কহিয়া তাহারা কমলমণির গণ্ড বহিয়া হাসির উপর আসিয়া পড়িল। রৌদ্রের উপর বৃষ্টি হইল।

কমলমণি বলিলেন, "তাতে কাঁদিস্ কেন?"

কুন্দ। তুমিই আমায় ভালবাস।

কম। কেন—আর কেহ ভালবাসে না?

কুন্দ চুপ করিয়া রহিল।

কম। কে ভালবাসে না? গিন্নী ভালবাসে না—না? আমার লুকুস্ নে।

কুন্দ নীরব।

কমল। দাদাবাবু ভালবাসে না?

কুন্দ নীরব।

কমল বলিলেন, "যদি আমি তোমায় ভালবাসি—আর তুমি আমায ভালবাস, তবে কেন আমার সঙ্গে চল না?"

কুন্দ তথাপি কিছু বলিল না। কমল বলিলেন, "যাবে?" কুন্দ ঘাড় নাড়িল। "যাব না।"

কমলের প্রফুল্ল মুখ গম্ভীর হইল।

তখন কমলমণি সস্নেহে কুন্দনন্দিনীর মস্তক বক্ষে তুলিয়া লইযা ধারণ করিলেন, এবং সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ গ্রহণ করিযা কহিলেন, "কুন্দ, সত্য বলিবি?"

কুন্দ বলিল "কি"?

কমল বলিলেন, "যা জিজ্ঞাসা করিব? আমি তোর দিদি—আমার কাছে লুকুস্ নে—আমি কাহারও কাছে বলিব না।" কমল মনে মনে রাখিলেন, "যদি বলি ত রাজমন্ত্রী শ্রীশবাবুকে। আর খোকার কাণে কাণে।"

কুন্দ বলিলেন, "কি বল?"

ক। তুই দাদাবাবুকে বড় ভালবাসিস্।—না?

কুন্দ উত্তর দিল না। কমলমণিব হৃদযমধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কমল বলিলেন, "বুঝছি—মরিয়াছ। মর তাতে ক্ষতি নাই—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মরে যে?"

কুন্দনন্দিনী মস্তক উত্তোলন করিয়া কমলের মুখপ্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া রহিল। কমলমণি প্রশ্ন বুঝিলেন। বলিলেন, "পোড়ারমুখী চোখের মাথা খেয়েছ? দেখিতে পাও না যে—মুখের কথা মুখে রহিল—তখন ঘুরিয়া কুন্দের উন্নত মস্তক আবার কমলমণির বক্ষের উপর পড়িল। কুন্দনন্দিনীর অশ্রুজলে কমলমণির হৃদয় প্লাবিত হইল। কুন্দনন্দিনী অনেকক্ষণ নীরবে কাঁদিল—বালিকার ন্যায় বিবশা হইয়া কাঁদিল। সে কাঁদিল, আবার পরের চক্ষের জলে তাহার চুল ভিজিয়া গেল।

ভালবাসা কাহাকে বলে, সোণার কমল তাহা জানিত। অন্তঃকরণের অন্তঃকরণ মধ্যে কুন্দনন্দিনীর দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইল। কুন্দনন্দিনীর চক্ষু মুছাইয়া কহিল, "কুন্দ!"

কুন্দ আবার মাথা তুলিয়া চাহিল।

কম। আমার সঙ্গে চল।

কুন্দের চক্ষে আবার জল পড়িতে লাগিল। কমল বলিল, "নহিলে নয়।—সোণার সংসার

ছারখার গেল।”

কুন্দ কাঁদিতে লাগিল। কমল বলিলেন, “যাবি? মনে করিয়া দেখ্‌?—”

কুন্দ অনেকক্ষণ পরে চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, “যাব।”

অনেকক্ষণ পরে কেন? তাহা কমল বুঝিল। বুঝিল যে, কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গলমন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্য্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল। সেই জন্য অনেকক্ষণ লাগিল। আপনার মঙ্গল? কমল বুঝিয়াছিলেন যে কুন্দনন্দিনী আপনার মঙ্গল বুঝিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ঃ হীরা

এমত সময়ে হরিদাসী বৈষ্ণবী আসিয়া গান করিল।

“কাঁটা বনে তুল্‌তে গেলাম কলঙ্কের ফুল,
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পর্‌লেম মালা গেঁথে, কাণে পর্‌লেম দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।”

এ দিন সূর্য্যমুখী উপস্থিত। তিনি কমলকে গান শুনিতে ডাকিতে পাঠাইলেন। কমল কুন্দকে সঙ্গে করিয়া গান শুনিতে আসিলেন। বৈষ্ণবী গায়িতে লাগিল।

“মরি মরব্‌ কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে,
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে,
নবীন মুকুল।”

কমলমণি ভ্রূভঙ্গী করিয়া বলিলেন, “বৈষ্ণবী দিদি—তোমার মুখে ছাই পড়ুক—আর তুমি মর। আর কি গান জান না?”

হরিদাসী বলিল, “কেন?” কমলের আরও রাগ বাড়িল; বলিলেন “ কেন?” একটা বাবলার ডাল আন ত রে—কাঁটাফোটা কত সুখ মাগীকে দেখিয়ে দিই।”

সূর্য্যমুখী মৃদুভাবে হরিদাসীকে বলিলেন, “ও সব গান আমাদের ভাল লাগে না।—গৃহস্থবাড়ী ভাল গান গাও।”

হরিদাসী বলিল, “আচ্ছা।” বলিয়া গায়িতে আরম্ভ করিল,

“স্মৃতিশাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্য্যের পায়ে ধোরে।
ধর্ম্মাধর্ম্ম শিখে নিব, কোন্‌ বেটী বা নিন্দে করে ॥”

কমল ভ্রূকুটি করিয়া বলিলেন, “গিন্নী মশাই—তোমার প্রবৃত্তি হয়, তোমার বৈষ্ণবীর গান তুমিই শোন, আমি চলিলাম।” এই বলিয়া কমল চলিয়া গেলেন—সূর্য্যমুখীও মুখ অপ্রসন্ন করিয়া উঠিয়া গেলেন। আর আর স্ত্রীলোকেরা আপন আপন প্রবৃত্তি মতে কেহ উঠিয়া গেল, কেহ রহিল; কুন্দনন্দিনী রহিল। তাহার কারণ, কুন্দনন্দিনী গানের মর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে নাই—বড় শুনেও নাই—অন্যমনে ছিল, এই জন্য যেখানকার সেইখানে রহিল। হরিদাসী তখন গান করিল না। এদিক্‌ সেদিক্‌ বাজে কথা আরম্ভ করিল। গান আর হইল না দেখিয়া আর সকলে উঠিয়া গেল। কুন্দ কেবল উঠিল না—চরণে তাহার গতিশক্তি ছিল কি না সন্দেহ। তখন কুন্দকে বিরলে পাইয়া হরিদাসী তাহাকে অনেক কথা বলিল। কুন্দ কতক বা শুনিল, কতক বা শুনিল না।

সূর্য্যমুখী ইহা সকলই দূর হইতে দেখিতেছিলেন। যখন উভয়ে গাঢ় মনঃসংযোগের সহিত

কথাবার্ত্তা হওয়ার চিহ্ন দেখিলেন, তখন সূর্য্যমুখী কমলকে ডাকিয়া দেখাইলেন। কমল বলিল, "কি তা? কথা কহিতেছে কহুক না। মেয়ে বই ত আর পুরুষ না।"

সূর্য্য। মেয়ে কি পুরুষ তার ঠিক কি?

কমল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি?"

সূর্য্য। আমার বোধ হয় কোন ছদ্মবেশী পুরুষ। তাহা এখনই জানিব—কিন্তু কুন্দ কি পাপিষ্ঠা।

"রসো। আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটো দেখাই।"

এই বলিয়া কমল বাবলার ডালের সন্ধানে গেলেন। পথে সতীশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল—সতীশ মামীর সিন্দূরকৌটা অধিকার করিয়া বসিয়া ছিলেন—এবং সিন্দূর লইয়া আপনার গালে, নাকে, দাড়িতে, বুকে, পেটে বিলক্ষণ করিয়া অঙ্গরাগ করিতেছিলেন—দেখিয়া কমল, বৈষ্ণবী, বাবলার ডাল, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতি সব ভুলিয়া গেলেন।

তখন সূর্য্যমুখী হীরা দাসীকে ডাকাইলেন।

হীরার নাম একবার উল্লেখ হইয়াছে। তাহার কিছু বিশেষ পবিচয় আবশ্যক।

নগেন্দ্র এবং তাঁহার পিতার বিশেষ যত্ন ছিল যে, গৃহের পরিচারিকারা বিশেষ সৎস্বভাববিশিষ্টা হয়। এই অভিপ্রায়ে উভয়েই পর্য্যাপ্ত বেতনদান স্বীকার করিয়া, একটু ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকগণকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। তাঁহাদিগের গৃহে পবিচারিকা সুখে ও সম্মানে থাকিত, সুতরাং অনেক দারিদ্র্যগ্রস্ত ভদ্রলোকের কন্যারা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি স্বীকার করিত। এই প্রকার যাহারা ছিল, তাহাদের মধ্যে হীরা প্রধানা। অনেকগুলি পরিচারিকা কায়স্থকন্যা—হীরাও কায়স্থ—নগেন্দ্রের পিতা হীরার মাতামহীকে গ্রামান্তর হইতে আনয়ন করেন। প্রথমে তাহার মতামহীই পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিল—হীরা তখন বালিকা, মাতামহীর সঙ্গে আসিয়াছিল। পরে হীরা সমর্থা হইলে প্রাচীনা দাসীবৃত্তি ত্যাগ করিয়া আপন সঞ্চিত ধনে একটি সামান্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিল—হীরা দত্তগৃহে চাকরি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এক্ষণে হীরার বয়স বিংশতি বৎসর। বয়সে সে প্রায় অন্যান্য দাসীগণ অপেক্ষা কনিষ্ঠা। তাহার বুদ্ধির প্রভাবে এবং চরিত্রগুণে সে দাসীমধ্যে শ্রেষ্ঠা বলিয়া গণিত হইয়াছিল।

হীরা বাল্যবিধবা বলিয়া গোবিন্দপুরে পরিচিতা। কেহ কখন তাহার স্বামীর কোন প্রসঙ্গ শুনে নাই। কিন্তু হীরার চবিত্রেও কেহ কোন কলঙ্ক শুনে নাই। তবে হীরা অত্যন্ত মুখরা, সধবার ন্যায় বেশবিন্যাস করিত, এবং বেশবিন্যাসে বিশেষ প্রীতা ছিল।

হীরা আবার সুন্দরী—উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশলোচনা। দেখিতে খর্ব্বাকৃতা; মুখখানি যেন মেঘঢাকা চাঁদা; চুলগুলি যেন সাপ ফণা ধরিয়া ঝুলিয়া বহিয়াছে। হীরা আড়ালে ব'সে গান করে; দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বাধাইয়া তামাসা দেখে; পাচিকাকে অন্ধকারে ভয় দেখায়; ছেলেদের বিবাহের আবদার করিতে শিখাইয়া দেয়; কাহাকে নিদ্রিত দেখিলে চুণ কালি দিয়া সং সাজায়।

কিন্তু হীরার অনেক দোষ। তাহা ক্রমে জানা যাইবে। আপাততঃ বলিয়া রাখি, হীরা আতর গোলাপ দেখিলেই চুরি করে।

সূর্য্যমুখী হীরাকে ডাকিয়া কহিলেন, "ঐ বৈষ্ণবীকে চিনিস্?"

হীরা। না। আমি কখন পাড়ায় বাহির হই না।—আমি বৈষ্ণবী ভিখীরী কিসে চিনিব? ঠাকুরবাড়ীর মাগীদের ডেকে জিজ্ঞাসা কর না। করুণা কি শীতলা জানিতে পারে।

সূর্য্য। এ ঠাকুরবাড়ীর বৈষ্ণবী নয়। এ বৈষ্ণবী কে, তোকে জানতে হবে। এ বৈষ্ণবীই বা কে, আর বাড়ীই বা কোথায়? আর কুন্দের সঙ্গে এত ভাবই বা কেন? এই সকল কথা যদি ঠিক জেনে এসে বলতে পারিস্, তবে তোকে নূতন বারাণসী পরাইয়া সং দেখিতে পাঠাইয়া দিব।

নূতন বারাণসীর কথা শুনিয়া হীরার পাঁচ হাত বুক হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কখন জানিতে যেতে হবে?"

সূ। তোর যখন খুসি। কিন্তু এখনও ওর পাছু পাছু না গেলে ঠিকানা পাবি না।

হীরা। আচ্ছা।

সূ। কিন্তু দেখিস্ যেন বৈষ্ণবী কিছু বুঝিতে না পারে। আর কেহ কিছু বুঝিতে না পারে।

এমত সময়ে কমল ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যমুখী তাঁহাকে পরামর্শের কথা সব বলিলেন। শুনিয়া কমল খুসি হইলেন। হীরাকে বলিলেন, "আর পারিস্ ত মাগীকে দুটো বাবলার কাঁটা ফুটিয়ে দিয়ে আসিস্।"

হীরা বলিল, "সব পারিব, কিন্তু শুধু বারাণসী নিব না।"

সূ। কি নিবি?

কমল বলিল, "ও একটি বর চায়। ওর একটি বিয়ে দাও।"

সূ। আচ্ছা তাই হবে—জামাই বাবুকে মনে ধরে? বল তা হলে কমল সম্বন্ধ করে।

হী। তবে দেখবো। কিন্তু আমার মনের মত ঘরে একটি বর আছে।

সূ। কে লো?

হী। যম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ ঃ "না"

সেই দিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী। এই দীর্ঘিকা অতি সুবিস্তৃতা; তাহার জল অতি পরিষ্কার এবং সর্ব্বদা নীলপ্রভ। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই পুষ্করিণীর পশ্চাতে পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানমধ্যে এক শ্বেতপ্রস্তররচিত লতামণ্ডপ ছিল। সেই লতামণ্ডপের সম্মুখেই পুষ্করিণীতে অবতরণ করিবার সোপান। সোপান প্রস্তরবৎ ইষ্টকে নির্ম্মিত, অতি প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। তাহার দুই ধারে, দুইটি বহুকালের বড় বকুল গাছ। সেই বকুলের তলায়, সোপানের উপরে কুন্দনন্দিনী, অন্ধকার প্রদোষে একাকিনী বসিয়া স্বচ্ছ সরোবরহৃদয়ে প্রতিফলিত নক্ষত্রাদিসহিত আকাশপ্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। কোথাও কতকগুলি লাল ফুল অন্ধকারে অস্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছিল। দীর্ঘিকার অপর তিন পার্শ্বে, আম্র, কাঁটাল, জাম, লেবু, লিচু, নারিকেল, কুল, বেল, প্রভৃতি ফলবান্ ফলের গাছ, ঘনশ্রেণীবদ্ধ হইয়া অন্ধকারে অসমশীর্ষ প্রাচীরবৎ দৃষ্ট হইতেছিল। কদাচিৎ তাহার শাখায় বসিয়া মাচাড় পাখী বিকট রব করিয়া নিঃশব্দ সরোবরকে শব্দিত করিতেছিল। শীতল বায়ু, সরোবর পার হইয়া ইন্দীবরকোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া, আকাশচিত্রকে স্বল্পমাত্র কম্পিত করিয়া কুন্দনন্দিনীর শিরঃস্থ বকুলপত্রমালায় মর্ম্মর শব্দ করিতেছিল এবং নিদাঘপ্রস্ফুটিত বকুল পুষ্পের গন্ধ চারি দিকে বিকীর্ণ করিতেছিল। বকুল পুষ্প সকল নিঃশব্দে কুন্দনন্দিনীর অঙ্গে এবং চারি দিকে ঝরিয়া পড়িতেছিল। পশ্চাৎ হইতে অসংখ্য মল্লিকা, যূথিকা এবং কামিনীর সুগন্ধ আসিতেছিল। চারিদিকে, অন্ধকারে, খদ্যোতমালা স্বচ্ছ বারির উপর উঠিতেছিল, পড়িতেছিল, ফুটিতেছিল, নিবিতেছিল। দুই একটা বাদুড় ডাকিতেছে—দুই একটা শৃগাল অন্য পশু তাড়াইবার তাহাদিগের যে শব্দ, সেই শব্দ করিতেছে—দুই একখানা মেঘ আকাশে পথ হারাইয়া বেড়াইতেছে—দুই একটা তারা মনের দুঃখে খসিয়া পড়িতেছে। কুন্দনন্দিনী মনের দুঃখে ভাবিতেছেন। কি ভাবনা ভাবিতেছেন? এইরূপ;—"ভাল, সবাই আগে মলো—মা মলো, দাদা মলো, বাবা মলো, আমি মলেম না কেন? যদি না মলেম ত এখানে এলাম কেন? ভাল, মানুষ কি মরিয়া নক্ষত্র হয়।" পিতার পরলোকযাত্রার রাত্রে কুন্দ যে স্বপ্ন দেখিয়াছিল, কুন্দের আর তাহা কিছুই মনে ছিল না; কখনও মনে হইত না, এখনও তাহা মনে হইল না। কেবল আভাস-মাত্র মনে আসিল। এইমাত্র মনে হইল, যেন সে কবে মাতাকে স্বপ্নে দেখিয়াছিল, তাহার মা যেন, তাহাকে নক্ষত্র হইতে বলিয়াছেন। কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "ভাল, মানুষ মরিলে কি

নক্ষত্র হয়. তা হলে ত বাবা, মা, সবাই নক্ষত্র হইয়াছেন? তবে তাঁরা কোন্ নক্ষত্রগুলি? ঐটি? না ঐটি? কোন্‌টি কে? কেমন করিয়া জানিব? তা যেটিই যিনি হউন, আমায় ত দেখতে পেতেছেন? আমি যে এত কাঁদি—তা দূর হউক, ও আর ভাবি না—বড় কান্না পায়। কেঁদে কি হবে? আমার ত কপালে কান্নাই আছে—নহিলে মা—আবার ঐ কথা! দূর হউক—ভাল, মরিলে হয় না? কেমন করিয়া? জলে ডুবিয়া?—বেশ ত! মরিলে নক্ষত্র হব—তা হলে হব ত? দেখিতে পাব—রোজ রোজ দেখিতে পাব—কাকে? কাকে, মুখে বলিতে পারি নে কি? আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি নে কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পাবে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন-নগ-নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র, নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, আমার নগেন্দ্র! আলো! আমার নগেন্দ্র! আমি কে? সূর্য্যমুখীর নগেন্দ্র। কতই নাম করিতেছি—হলেম কি? আচ্ছা—সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক—ডুবেই মরি। আচ্ছা, যেন এখন ডুবিলাম—কাল ভেসে উঠবো—তবে সবাই শুনবে, শুনে নগেন্দ্র—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র! আবার বলি—নগেন্দ্র নগেন্দ্র নগেন্দ্র!—নগেন্দ্র শুনে কি বলিবেন? ডুবে মরা হবে না—ফুলে পড়িয়া থাকিব—দেখিতে রাক্ষসীর মত হব। যদি তিনি দেখেন? বিষ খেয়ে ত মরিতে পারি? কি বিষ খাব? বিষ কোথা পাব—কে আমায় এনে দিবে? দিলে যেন—মরিতে পারিব কি? পারি—কিন্তু আজি না—একবার আকাঙ্ক্ষা ভরিয়া মনে করি—তিনি আমায় ভালবাসেন। কমল কি কথাটি বলতে বলতে বলিল না? সে ঐ কথাই। আচ্ছা, সে কথা কি সত্য?—কিন্তু কমল জানিবে কিসে? আমি পোড়ারমুখী জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। ভালবাসেন? কিসে ভালবাসেন? কি দেখে ভালবাসেন, রূপ না গুণ? রূপ—দেখি? (এই কহিয়া কালামুখী স্বচ্ছ সরোবরে আপনার প্রতিবিম্ব দেখিতে গেল, কিন্তু কিছুই দেখিতে না পাইয়া আবাব পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বলিল) "দূর হউক, যা নয় তা ভাবি কেন? আমার চেয়ে সূর্য্যমুখী সুন্দর; আমার চেয়ে হরমণি সুন্দর; বিশু সুন্দর; মুক্ত সুন্দর; চন্দ্র সুন্দর; প্রসন্ন সুন্দর; বামা সুন্দর; প্রমদা সুন্দর; আমার চেয়ে হীরা দাসীও সুন্দরী। হীরাও আমার চেয়ে সুন্দর? হাঁ; শ্যামবর্ণ হলে কি হয়—মুখ আমার চেয়ে সুন্দর। তা রূপ ত গোল্লাই গেল—গুণ কি? আচ্ছা দেখি দেখি ভেবে!—কই, মনে ত হয় না। কে জানে! কিন্তু মরা হবে না, ঐ কথা ভাবি। মিছে কথা! তা মিছে কথাই ভাবি। মিছে কথাকে সত্য বলিয়া ভাবিব। কিন্তু কলিকাতায় যেতে হবে যে, তা ত যেতে পারিব না। দেখিতে পাব না যে। আমি যেতে পারব না—পারব না—পারব না। তা না গিয়াই বা কি করি? যদি কমলের কথা সত্য হয়, তবে ত যারা আমার জন্য এত করেছে, তাহাদের ত সর্ব্বনাশ করিতেছি। সূর্য্যমুখীর মনে কিছু হয়েছে বুঝিতে পারি। সত্যই হউক, মিথ্যাই হউক, কাজে কাজেই আমায় যেতে হবে। তা পারিব না। তাই ডুবে মরি। মবিবই মরিব। বাবা গো! তুমি কি আমাকে ডুবিয়া মারিবার জন্য রাখিয়া গিয়াছিলে;—

কুন্দ তখন দুই চক্ষে হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। সহসা অন্ধকার গৃহে প্রদীপ জ্বালার ন্যায়, কুন্দের সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত সুস্পষ্ট মনে পড়িল। কুন্দ তখন বিদ্যুৎস্পৃষ্টার ন্যায় গাত্রোত্থান করিল। 'আমি সকল ভুলিয়া গিয়াছি—আমি কেন ভুলিলাম? মা আমাকে দেখা দিয়াছিলেন—মা আমার কপালের লিখন জানিতে পারিয়া আমায় ঐ নক্ষত্রলোকে যাইতে বলিয়াছিলেন—আমি কেন তাঁর কথা শুনলেম না—আমি কেন গেলাম না!—আমি কেন মলেম না! আমি এখনও বিলম্ব করিতেছি কেন? আমি এখনও মরিতেছি না কেন? আমি এখনই মরিব।" এই ভাবিয়া কুন্দ ধীরে ধীরে সেই সরোবরসোপান অবতরণ আরম্ভ করিল। কুন্দ নিতান্ত অবলা—নিতান্ত ভীরুস্বভাবসম্পন্না—প্রতি পদার্পণে ভয় পাইতেছিল—প্রতি পদার্পণে তাহার অঙ্গ শিহরিতেছিল। তথাপি অস্খলিতসঙ্কল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলিস্পর্শ করিল। বলিল, "কুন্দ!" কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র। কুন্দের সে দিন আর মরা হলো না।

আর নগেন্দ্র! এই কি তোমরা এত কালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা? এই কি সূর্য্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল! ছি ছি! দেখ, তুমি চোর! চোরের অপেক্ষাও হীন। চোর সূর্য্যমুখীর কি করিত? তাহার গহনা চুরি করিত, অর্থহানি করিত, কিন্তু তুমি তাহার প্রাণহানি করিতে আসিয়াছ। চোরকে সূর্য্যমুখী কখন কিছু দেয় নাই; তবু সে চুরি করিলে চোর হয়। আর সূর্য্যমুখী তোমাকে সর্ব্বস্ব দিয়াছে—তবু তুমি চোরের অধিক চুরি করিতে আসিয়াছ! নগেন্দ্র, তুমি মরিলেই ভাল হয়। যদি সাহস থাকে, তবে তুমি গিয়া ডুবিয়া মর।

আর ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি! তুমি চোরের স্পর্শে কাঁপিলে কেন? ছি! ছি! কুন্দনন্দিনি!—চোরের কথা শুনিয়া তোমার গায়ে কাঁটা দিল কেন? কুন্দনন্দিনি!—দেখ, পুষ্পরিণীর জল পরিষ্কার, সুশীতল, সুবাসিত—বায়ুর হিল্লোলে তাহার নীচে তারা কাঁপিতেছে। ডুবিবে? ডুবিয়া মর না? কুন্দনন্দিনি মরিতে চাহে না।

চোর বলিল, "কুন্দ! কলকাতায় যাইবে?"

কুন্দ কথা কহিল না—চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

চোর বলিল "কুন্দ! ইচ্ছাপূর্বক যাইতেছ?"

ইচ্ছাপূর্বক! হরি! হরি! কুন্দ আবার চক্ষু মুছিল—কথা কহিল না।

"কুন্দ—কাঁদিতেছ কেন?" কুন্দ এবার কাঁদিয়া ফেলিল। তখন নগেন্দ্র বলিতে লাগিলেন "শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না। কি কষ্টে যে বাঁচিয়া আছি, তাহা বলিতে পারি না। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষত বিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবাবিবাহ চলিত হইতেছে—আমি তোমাকে বিবাহ করিব। তুমি বলিলেই বিবাহ করি।"

কুন্দ এবার কথা কহিল। বলিল, "না।"

আবার নগেন্দ্র বলিলেন, "কেন, কুন্দ! বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?" কুন্দ আবার বলিল, "না।"

নগেন্দ্র বলিল, "তবে না কেন? বল বল—বল—আমার গৃহিণী হইবে কি না? আমায় ভালবাসিবে কি না?"

কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র যেন সহস্রমুখে, অপরিমিত প্রেমপরিপূর্ণ মর্ম্মভেদী কত কথা বলিলেন। কুন্দ বলিল, "না।"

তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, পুষ্করিণী নির্ম্মল, সুশীতল—কুসুম-বাস-সুবাসিত—পবনহিল্লোলে তন্মধ্যে তাঁরা কাঁপিতেছে,—ভাবিলেন, "উহার মধ্যে শয়ন কেমন?"

অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল, "না।" বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন। স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নীচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ ঃ যোগ্যং যোগ্যেন যোজয়েৎ

হরিদাসী বৈষ্ণবী উপবনগৃহে আসিয়া হঠাৎ দেবেন্দ্রবাবু হইয়া বসিল। পাশে এক দিকে আলবোলা। বিচিত্র রৌপ্যশৃঙ্খলদলমালাময়ী, কলকল-কল্লোলনিনাদিনী, আলবোলা সুন্দরী দীর্ঘ ওষ্ঠ চুম্বনার্থ বাড়াইয়া দিলেন—মাথার উপর সোহাগের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। আর একদিকে স্ফটিকপাত্রে, হেমাঙ্গী এক্‌শাকুমারী টল টল করিতে লাগিলেন। সম্মুখে, ভোক্তার ভোজনপাত্রের নিকট উপবিষ্ট গৃহমার্জ্জারের

মত, একজন চাটুকার প্রসাদাকাঙ্ক্ষায় নাক বাড়াইয়া বসিলেন, হুঁকা বলিতেছে, "দেখ! দেখ! মুখ বাড়াইয়া আছি! ছি! ছি! মুখ বাড়াইয়া আছি"। এক্‌শাকুমারী বলিতেছে, "আগে আমায় আদর কর! দেখ, আমি কেমন রাঙ্গা! ছি! ছি! আগে আমায় খাও!" প্রসাদাকাঙ্ক্ষীর নাক বলিতেছে, "আমি যার, তাকে একটু দিও।"

দেবেন্দ্র সকলের মন রাখিলেন। আলবোলার মুখচুম্বন করিলেন—তাহার প্রেম ধুঁয়াইয়া উঠিতে লাগিল। এক্‌শানন্দিনীকে উদরস্থ করিলেন, সে ক্রমে মাথায় উঠিতে লাগিল। গৃহমার্জ্জার মহাশয়ের নাককে পরিতুষ্ট করিলেন—নাক দুই চারি গেলাসের পর ডাকিতে আরম্ভ করিল। ভৃত্যেরা নাসিকাধিকারীকে "গুরুমহাশয় গুরুমহাশয়" করিয়া স্থানান্তরে রাখিয়া আসিল।

তখন সুরেন্দ্র আসিয়া দেবেন্দ্রের কাছে বসিলেন এবং তাঁহার শারীরিক কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর বলিলেন, "আবার আজি তুমি কোথায় গিয়াছিলে?

দে। ইহারই মধ্যে তোমার কাণে গিয়াছে?

সু। এই তোমার আর একটি ভ্রম। তুমি মনে কর, সব তুমি লুকিয়ে কব—কেহ জানিতে পারে না, কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ঢাক বাজে।

দে। দোহাই ধর্ম্ম! আমি কাহাকেও লুকাইতে চাহি না—কোন্ শালাকে লুকাইব?

সু। সেও একটা বাহাদুরী মনে করিও না। তোমার যদি একটু লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে আমাদেরও একটু ভরসা থাকিত। লজ্জা থাকিলে আর তুমি বৈষ্ণবী সেজে গ্রামে গ্রামে ঢলাতে যাও?

দে। কিন্তু কেমন রসের বৈষ্ণবী, দাদা? রসকলিটি দেখে, ঘুরে পড় নি ত?

সু। আমি সে পোড়ারমুখ দেখি নাই, দেখিলে দুই চাবুকে বৈষ্ণবীর বৈষ্ণবী যাত্রা ঘুচিয়ে দিতাম।

পরে দেবেন্দ্রেব হস্ত হইতে মদ্যপাত্র কাড়িয়া লইয়া সুরেন্দ্র বলিতে লাগিলেন, "এখন একটু বন্ধ কবিয়া, জ্ঞান থাকিতে থাকিতে দুটো কথা শুন। তার পর গিলো।"

দে। বল, দাদা! আজ যে বড় চটাচটা দেখি—হৈমবতীর বাতাস গায়ে লেগেছে নাকি?

সুরেন্দ্র দুর্ম্মুখেব কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "বৈষ্ণবী সেজেছিলে কার সর্ব্বনাশ করার জন্য?

দে। তা কি জান না? মনে নাই, তাবা মাষ্টারের বিয়ে হয়েছিল এক দেবকন্যার সঙ্গে? সেই দেবকন্যা এখন বিধবা হয়ে ও গাঁয়ের দত্তবাড়ী রেঁধে খায। তাই তাকে দেখতে গিয়াছিলাম।

সু। কেন, এত দুর্বৃত্তিতেও তৃপ্তি জন্মাল না যে, সে অনাথা বালিকাকে অধঃপাতে দিতে হবে! দেখ দেবেন্দ্র, তুমি এত বড় পাপিষ্ঠ, এত বড় নৃশংস, এমন অত্যাচারী যে, বোধ হয়, আর আমরা তোমার সহবাস করিতে পারি না।

সুরেন্দ্র এরূপ দার্ঢ্য সহকারে এই কথা বলিলেন যে, দেবেন্দ্র নিস্তব্ধ হইলেন। পরে দেবেন্দ্র গাম্ভীর্য্যসহকারে কহিলেন, "তুমি আমার উপর রাগ করিও না। আমার চিত্ত আমার বশে নহে' আমি সকল ত্যাগ কবিতে পাবি, এই স্ত্রীলোকের আশা ত্যাগ করিতে পারি না। যে দিন প্রথম তাহাকে তারাচরণেব গৃহে দেখিয়াছি, সেই দিন অবধি আমি তাহার সৌন্দর্য্যে অভিভূত হইয়া আছি। আমার চক্ষে এত সৌন্দর্য্য আর কোথাও নাই। জ্বরে যেমন তৃষ্ণা রোগীকে দগ্ধ করে, সেই অবধি উহার জন্য লালসা আমাকে সেইরূপ দগ্ধ করিতেছে। সেই অবধি আমি উহাকে দেখিবার জন্য কত কৌশল করিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। এ পর্য্যন্ত পারি নাই—শেষে এই বৈষ্ণবী-সজ্জা ধরিয়াছি। তোমার কোন আশঙ্কা নাই—সে স্ত্রীলোক অত্যন্ত সাধ্বী!"

সু। তবে যাও কেন?

দে। কেবল তাহাকে দেখিবার জন্য। তাহাকে দেখিয়া, তাহার সঙ্গে কথা কহিয়া, তাহাকে গান শুনাইয়া আমার যে কি পর্য্যন্ত তৃপ্তি হয়, তাহা বলিতে পারি না।

সু। তোমাকে আমি সত্য বলিতেছি—উপহাস করিতেছি না। তুমি যদি এই দুষ্প্রবৃত্তি ত্যাগ না করিবে—তুমি যদি সে পথে আর যাইবে—তবে তোমার সঙ্গে আমার আলাপ এই পর্য্যন্ত বন্ধ। আমিও তোমার শত্রু হইব।

দে। তুমি আমার একমাত্র সুহৃদ্। আমি অর্দ্ধেক বিষয় ছাড়তে পারি, তবু তোমাকে ছাড়িতে পারি না। কিন্তু তোমাকে যদি ছাড়িতে হয়, সেও স্বীকার, তবু আমি কুন্দনন্দিনীকে দেখিবার আশা ছাড়িতে পারিব না।

সু। তবে তাহাই হউক। তোমার সঙ্গে আমার এই পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ।

এই বলিয়া সুরেন্দ্র দুঃখিত চিত্তে উঠিয়া গেলেন। দেবেন্দ্র একমাত্র বন্ধুবিচ্ছেদে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া কিয়ৎকাল বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিলেন। শেষ, ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "দূর হউক। এ সংসারে কে কার। আমিই আমার!" এই বলিয়া পাত্র পূর্ণ করিয়া ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তাহার বশে আশু চিত্তপ্রফুল্লতা জন্মিল। তখন দেবেন্দ্র, শুইয়া পড়িয়া, চক্ষু মুদিয়া গান ধরিলেন,

"আমার নাম হীরা মালিনী।
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কুব্জা আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি,
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচক মেরে কৃষ্ণ,
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী!"

তখন পারিষদেরা সকলে উঠিয়া গিয়াছিল, দেবেন্দ্র নৌকাশূন্য নদীবক্ষঃস্থিত ভেলার ন্যায় একা বসিয়া রসের তরঙ্গে হাবুডুবু খাইতেছিলেন। রোগরূপ তিমি মকরাদি এখন জলের ভিতর লুকাইয়াছিল—এখন কেবল মন্দ পবন আর চাঁদের আলো! এমন সময়ে জানালার দিকে কি একটা খড় খড় শব্দ হইল—কে যেন খড়খড়ি তুলিয়া দেখিতেছিল—হঠাৎ ফেলিয়া দিল। দেবেন্দ্র বোধ হয়, মনে মনে কাহারও প্রতীক্ষা করিতেছিলেন—বলিলেন, "কে খড়খড়ি চুরি করে?" কোন উত্তর না পাইয়া জানেলা দিয়া দেখিলেন—দেখিতে পাইলেন, এক জন স্ত্রীলোক পলায়। স্ত্রীলোক পলায় দেখিয়া দেবেন্দ্র জানেলা খুলিয়া লাফাইয়া পড়িয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ টলিতে টলিতে ছুটিলেন।

স্ত্রীলোক অনায়াসে পলাইলে পলাইতে পারিত, কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক পলাইল না, কি অন্ধকারে ফুলবাগানের মাঝে পথ হারাইল, তাহা বলা যায় না। দেবেন্দ্র তাহাকে ধরিয়া অন্ধকারে তাহার মুখপানে চাহিয়া চিনিতে পারিলেন না। চুপি চুপি মদের ঝোঁকে বলিলেন, "বাবা! কোন্ গাছ থেকে?" পরে তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া একবার এক দিকে আবার আর এক দিকে আলো ধরিয়া দেখিয়া, সেইরূপ স্বরে বলিলেন, "তুমি কাদের পেত্নী গা?" শেষে কিছু স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন, "পারলেম না বাপ! আজ ফিরে যাও, অমাবস্যায় লুচি পাঁঠা দিয়ে পূজো দেব—আজ একটু কেবল ব্রাণ্ডি খেয়ে যাও," এই বলিয়া মদ্যপ স্ত্রীলোকটিকে বৈঠকখানায় বসাইয়া, মদের গেলাস তাহার হাতে দিল।

স্ত্রীলোকটি তাহা গ্রহণ না করিয়া নামাইয়া রাখিল।

তখন মাতাল আলোটা স্ত্রীলোকের মুখের কাছে লইয়া গেল। এদিক্ ওদিক্ চারিদিক্ আলোটা ফিরাইয়া ফিরাইয়া গম্ভীরভাবে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া, শেষ হঠাৎ আলোটা ফেলিয়া দিয়া গান ধরিল—"তুমি কে বট হে, তোমায় চেন চেন করি—কোথাও দেখেছি হে।"

তখন সে স্ত্রীলোকটি ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া বলিল, "আমি হীরা।"

"Hurrah! Three Cheers for হীরা!" বলিয়া মাতাল লাফাইয়া উঠিল। তখন আবার ভূমিষ্ঠ হইয়া হীরাকে প্রণাম করিয়া গ্লাস-হস্তে স্তব করিতে আরম্ভ করিল;—

"নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী বটবৃক্ষেষু ছায়ারূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তসৈ নমো নমঃ।
যা দেবী দত্তগৃহেষু হীরারূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী পুকুরঘাটেষু চুপড়িহস্তেন সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী ঘরদ্বারেষু ঝাঁটাহস্তেন সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।
যা দেবী মম গৃহেষু পেত্নীরূপেণ সংস্থিতা ॥
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

তার পর—মালিনী মাসি—কি মনে ক'রে?"

হীরা ইতিপূর্ব্বে বৈষ্ণবীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া দিনমানে জানিয়া গিয়াছিল যে, হরিদাসী বৈষ্ণবী ও দেবেন্দ্র বাবু একই ব্যক্তি। কিন্তু কেন দেবেন্দ্র বৈষ্ণবী-বেশে দত্তগৃহে যাতায়াত করিতেছে? এ কথা জানা সহজ নহে। হীরা মনে মনে অত্যন্ত দুঃসাহসিক সঙ্কল্প করিয়া, এই সময়ে স্বয়ং দেবেন্দ্রের গৃহে আসিল। সে গোপনে উদ্যানমধ্যে প্রবেশ করিয়া জানেলার কাছে দাঁড়াইয়া দেবেন্দ্রের কথাবার্ত্তা শুনিয়াছিল। সুরেন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রের কথোপকথন অন্তরাল হইতে শুনিয়া হীরা সিদ্ধমনস্কাম হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময় অসাবধানে খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়াছিল—ইহাতেই গোল বাধিল।

এখন হীরা পলাইবার জন্য ব্যস্ত। দেবেন্দ্র তাহার হাতে আবার মদের গেলাস দিল। হীরা বলিল, "আপনি খান।" বলিবামাত্র দেবেন্দ্র তাহা গলাধঃকরণ করিলেন। সেই গেলাস দেবেন্দ্রের পূর্ণ মাত্রা হইল—দুই একবার ঢুলিয়া—দেবেন্দ্র শুইয়া পড়িলেন। হীরা তখন উঠিয়া পলাইল। দেবেন্দ্র তখন ঝিম্‌কিনি মাবিয়া গাইতে লাগিল;—

"বয়স তাহাব বছর ষোল,
দেখতে শুনতে কালো কালো,
পিলে অগ্রমাসে মোলো,
আমি তখন খানায় পোড়ে।"

সে বাত্রে হীরা আর দত্তবাড়ীতে গেল না, আপন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পরদিন প্রাতে গিয়া সূর্য্যমুখীর নিকট দেবেন্দ্রের সংবাদ বলিল। দেবেন্দ্র কুন্দের জন্য বৈষ্ণবী সাজিয়া যাতায়াত করে। কুন্দ যে নির্দ্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না, সূর্য্যমুখীও বুঝিলেন না। হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন। সূর্য্যমুখী দেখিয়াছিলেন, কুন্দ বৈষ্ণবীর সঙ্গে চুপি চুপি কথা কহিতেছে—সুতরাং সূর্য্যমুখী তাহাকে দোষী মনে করিলেন। হীরার কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখীর নীলোৎপললোচন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। তাঁহার কপালে শিরা স্থূলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকটিত হইল। কমলও সকল শুনিলেন। কুন্দকে সূর্য্যমুখী ডাকাইলেন। সে আসিলে পরে বলিলেন, "কুন্দ। হরিদাসী বৈষ্ণবী কে, আমরা চিনিয়াছি। আমরা জানিয়াছি যে, সে তোর কে। তুই যা তা জানিলাম! আমরা এমন স্ত্রীলোককে বাড়ীতে স্থান দিই না। তুই বাড়ী হইতে এখনই দূর হ। নহিলে হীরা তোকে ঝাঁটা মারিয়া তাড়াইবে।"

কুন্দের গা কাঁপিতে লাগিল। কমল দেখিলেন যে, সে পড়িয়া যায়। কমল তাহাকে ধরিয়া শয়নগৃহে লইয়া গেলেন। শয়নগৃহে থাকিয়া আদর করিয়া সান্ত্বনা করিলেন এবং বলিলেন, "ও মাগী যাহা বলে বলুক; আমি উহার একটা কথাও বিশ্বাস করি না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : অনাথিনী

গভীর রাত্রে গৃহস্থ সকলে নিদ্রিত হইলে কুন্দনন্দিনী শয়নাগারের দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। এক বসনে সূর্য্যমুখীর গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সেই গভীর রাত্রে এক বসনে সপ্তদশবর্ষীয়া, অনাথিনী সংসারসমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার। অল্প অল্প মেঘ করিয়াছে, কোথায় পথ?

কে বলিয়া দেবে, কোথায় পথ? কুন্দনন্দিনী কখন দত্তদিগের বাটীর বাহির হয় নাই। কোন্ দিকে কোথায় যাইবার পথ, তাহা জানে না। আর কোথাই বা যাইবে।

অট্টালিকার বৃহৎ অন্ধকারময় কায়া, আকাশের গায়ে লাগিয়া রহিয়াছে—সেই অন্ধকার বেষ্টন করিয়া কুন্দনন্দিনী বেড়াইতে লাগিল। মানস, একবার নগেন্দ্রনাথের শয়নকক্ষের বাতায়নপথে আলো দেখিয়া যায়। একবার সেই আলো দেখিয়া চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে।

তাঁহার শয়নাগার চিনিত—ফিরিতে ফিরিতে তাহা দেখিতে পাইল—বাতায়নপথে আলো দেখা যাইতেছে। কবাট খোলা—সাসী বন্ধ—অন্ধকারমধ্যে তিনটি জানেলা জ্বলিতেছে। তাহার উপর পতঙ্গ জাতি উড়িয়া উড়িয়া পড়িতেছে। আলো দেখিয়া উড়িয়া পড়িতেছে, কিন্তু রুদ্ধপথে প্রবেশ করিতে না পারিয়া কাচে ঠেকিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। কুন্দনন্দিনী এই ক্ষুদ্র পতঙ্গদিগের জন্য হৃদয়মধ্যে পীড়িতা হইল।

কুন্দনন্দিনী মুগ্ধলোচনে সেই গবাক্ষপথ-প্রেরিত আলোক দেখিতে লাগিল—সে আলো ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। শয়নাগারের সম্মুখে কতকগুলি ঝাউগাছ ছিল—কুন্দনন্দিনী তাহার তলায় গবাক্ষ প্রতি সম্মুখ করিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার, চার দিক্ অন্ধকার, গাছে গাছে খদ্যোতের চাক্‌চিক্য সহস্রে সহস্রে ফুটিতেছে, মুদিতেছে; মুদিতেছে, ফুটিতেছে। আকাশে কালো মেঘের পশ্চাতে কালো মেঘ ছুটিতেছে—তাহার পশ্চাতে আরও কালো মেঘ ছুটিতেছে—তৎপশ্চাতের আরও কালো। আকাশে দুই একটি নক্ষত্র মাত্র, কখনও মেঘে ডুবিতেছে, কখনও ভাসিতেছে। বাড়ীর চারি দিকে ঝাউগাছের শ্রেণী, সেই মেঘময় আকাশে মাথা তুলিয়া নিশাচর পিশাচের মত দাঁড়াইয়া আছে। বায়ুর স্পর্শে সেই করালবদনা নিশীথিনী-অঙ্কে থাকিয়া, তাহারা আপন আপন পৈশাচী ভাষায় কুন্দনন্দিনীর মাথার উপর কথা কহিতেছে। পিশাচেরাও করাল রাত্রির ভয়ে, অল্প শব্দে কথা কহিতেছে। কদাচিৎ বায়ুর সঞ্চালনে গবাক্ষের মুক্ত কবাট প্রাচীরে বারেক মাত্র আঘাত করিয়া শব্দ করিতেছে। কালপেঁচা সৌধোপরি বসিয়া ডাকিতেছে। কদাচিৎ একটা কুক্কুর অন্য পশু দেখিয়া সম্মুখ দিয়া অতি দ্রুতবেগে ছুটিতেছে। কদাচিৎ ঝাউয়ের পল্লব অথবা ফল খসিয়া পড়িতেছে। দূরে নারিকেল বৃক্ষের অন্ধকার শিরোভাগ অন্ধকারে মন্দ মন্দ হেলিতেছে; দূর হইতে তালবৃক্ষের পত্রের তর তর মর্ম্মর শব্দ কর্ণে আসিতেছে; সর্ব্বোপরি সেই বাতায়ণশ্রেণীর উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে—আর পতঙ্গদল ফিরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। কুন্দনন্দিনী সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

ধীরে ধীরে একটি গবাক্ষের সাসী খুলিল। এক মনুষ্যমূর্ত্তি আলোকপটে চিত্রিত হইল। হরি! হরি! নগেন্দ্রের মূর্ত্তি। নগেন্দ্র—নগেন্দ্র! যদি ঐ ঝাউতলার অন্ধকারের মধ্যে ক্ষুদ্র কুন্দ কুসুমটি দেখিতে পাইতে! যদি তোমাকে গবাক্ষপথে দেখিয়া তাহার হৃদয়াঘাতের শব্দ—দুপ! দুপ! শব্দ—যদি সে শব্দ শুনিতে পাইতে! যদি জানিতে পারিতে যে, তুমি আবার এখনই সরিয়া অদৃশ্য হইবে, এই ভয়ে তাহার দেখার সুখ হইতেছে না! নগেন্দ্র! দীপের দিকে পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইয়াছ—একবার দীপ সম্মুখে করিয়া দাঁড়াও! তুমি দাঁড়াও, সরিও না—কুন্দ বড় দুঃখিনী। দাঁড়াও—তাহা হইলে, সেই পুষ্করিণীর স্বচ্ছ শীতল বারি—তাহার তলে নক্ষত্রচ্ছায়া—তাহার আর মনে পড়িবে না।

ঐ শুন! কালপেঁচা ডাকিল। তুমি সরিয়া যাইবে, আর কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। দেখিলে বিদ্যুৎ! তুমি সরিও না—কুন্দনন্দিনীর ভয় করিবে। ঐ দেখ, আবার কালো মেঘ পবনে চাপিয়া যে যুদ্ধে ছুটিতেছে। ঝড় বৃষ্টি হইবে। কুন্দকে কে আশ্রয় দিবে?

দেখ, তুমি গবাক্ষ মুক্ত করিয়াছ, ঝাঁকে ঝাঁকে পতঙ্গ আসিয়া তোমার শয্যাগৃহে প্রবেশ করিতেছে। কুন্দ মনে করিতেছে, কি পুণ্য করিলে পতঙ্গজন্ম হয়। কুন্দ! পতঙ্গ যে পুড়িয়া মরে! কুন্দ তাই চায। মনে কবিতেছে, "আমি পুড়িলাম—মবিলাম না কেন?

নগেন্দ্র সাসী বন্ধ কবিযা সবিযা গেলেন। নির্দ্দয়! ইহাতে কি ক্ষতি! না, তোমাব বাত্রি জাগিযা কাজ নাই—নিদ্রা যাও—শবীব অসুস্থ হইবে। কুন্দনন্দিনী মবে, মরুক। তোমাব মাথা না ধবে, কুন্দনন্দিনীব কামনা এই।

এখন আলোকময গবাক্ষ যেন অন্ধকাব হইল। চাহিযা, চাহিযা, চাহিযা চক্ষেব জল মুছিযা, কুন্দনন্দিনী উঠিল। সম্মুখে যে পথ পাইল— সেই পথে চলিল। কোথায চলিল? নিশাচব পিশাচ ঝাউগাছেবা সব সব্ শব্দ কবিযা জিজ্ঞাসা কবিল, "কোথায যাও? তালগাছেবা তর তব্ শব্দ কবিযা বলিল, "কোথায যাও?" পেচক গম্ভীব নাদে বলিল, "কোথায যাও?" উজ্জ্বল গবাক্ষশ্রেণী বলিতে লাগিল, "যায যাউক—আমবা আব নগেন্দ্র দেখাইব না।" তবু কুন্দনন্দিনী—নির্ব্বোধ কুন্দনন্দিনী ফিবিযা ফিবিযা সেই দিকে চাহিতে লাগিল।

কুন্দ চলিল—কেবল চলিল। আকাশে আবও মেঘ ছুটিতে লাগিল—মেঘ সকল একত্র হইযা আকাশেও বাত্রি কবিল—বিদ্যুৎ হাসিল—আবাব হাসিল আবাব! বাযু গর্জ্জিল, মেঘ গর্জ্জিল—বাযুতে মেঘেতে একত্র হইযা গর্জ্জিল। আকাশ আব বাত্রি একত্র হইযা গর্জ্জিল। কুন্দ! কোথায যাইবে?

ঝড উঠিল। প্রথমে শব্দ, পবে ধূলি উঠিল, পবে গাছে পাতা ছিঁডিযা লইযা বাযু স্বযং আসিল, শেষে পিট্ পিট্!—পট্ পট্! —হু হু! বৃষ্টি আসিল। কুন্দ কোথায যাইবে?

বিদ্যুতেব আলোকে পথপার্শ্বে কুন্দ একটা সামান্য গৃহ দেখিল। গৃহেব চতুষ্পার্শ্বে মৃৎপ্রাচীব, মৃৎপ্রাচীবেব ছোট চাল। কুন্দনন্দিনী আসিযা তাহাব আশ্রযে, দ্বাবেব নিকটে বসিল। দ্বাবে পিঠ বাখিযা বসিল! দ্বাব পিঠেব স্পর্শে শব্দিত হইল। গৃহস্থ সজাগ, দ্বাবেব শব্দ তাহাব কাণে গেল। গৃহস্থ মনে কবিল, ঝড কিন্তু তাহাব দ্বাবে একটা কুক্কুব শযন কবিযা থাকে—সেটা ডাকিতে লাগিল। গৃহস্থ তখন ভয পাইল। আশঙ্কায দ্বাব খুলিযা দেখিতে আইল। দেখিল, আশ্রযহীনা স্ত্রীলোকমাত্র। জিজ্ঞাসা কবিল "কে গা তুমি?"

কুন্দ কথা কহিল না।

'কে বে মাগী?'

কুন্দ বলিল, 'বৃষ্টিব জন্য দাডাইযাছি।'

গৃহস্থ ব্যগ্রভাবে বলিল, কি? কি? কি? আবাব বল ত?

কুন্দ বলিল, 'বৃষ্টিব জন্য দাঁডাইযাছি।"

গৃহস্থ বলিল, ও গলা যে চিনি। বটে? ঘবেব ভিতব এস ত।

গৃহস্থ কুন্দকে ঘবেব ভিতব লইযা গেল। আগুন কবিযা আলো জ্বালিল। কুন্দ তখন দেখিল—হীবা।

হীবা বলিল 'বুঝিযাছি, তিবস্কাবে পলাইযাছ। ভয নাই। আমি কাহাবও সাক্ষাতে বলিব না। আমাব এইখানে দুই দিন থাক।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ হীরার রাগ

হীবাব বাডী প্রাচীব আঁটা। দুইটি ঝব্‌ঝোবে মেটে ঘব। তাহাতে আলেপনা—পদ্ম আঁকা—পাখী আঁকা—ঠাকুব আঁকা। উঠান নিকান—এক পাশে রাঙ্গা শাক, তাব কাছে দোপাটি, মল্লিকা, গোলাপ ফুল। বাবুব বাডীব মালী আপনি আসিযা চাবা আনিযা ফুলগাছ পুতিযা দিযা গিয়াছিল—হীরা চাহিলে,

চাই কি বাগান শুদ্ধই উহার বাড়ী তুলিয়া দিয়া যায়। মালীর লাভের মধ্যে এই, হীরা আপন হাতে তামাকু সাজিয়া দেয়। হীরা, কালো-চুড়ি পরা হাতখানিতে হুঁকা ধরিয়া মালীর হাতে দেয়, মালী বাড়ী গিয়া রাত্রে তাই ভাবে।

হীরার বাড়ী হীরার আয়ী থাকে, আরা হীরা। এক ঘরে আয়ী, এক ঘরে হীরা শোয়। হীরা কুন্দকে আপনার কাছে বিছানা করিয়া রাত্রে শুয়াইল। কুন্দ শুইল—ঘুমাইল না। পরদিন তাহাকে সেইখানে রাখিল। বলিল, "আজি কালি দুই দিন থাক; দেখ, রাগ না পড়ে, পরে যেখানে ইচ্ছা, সেইখানে যাইও।" কুন্দ রহিল। কুন্দের ইচ্ছানুসারে তাহাকে লুকাইয়া রাখিল। ঘরে চাবি দিল, আয়ী না দেখে। পরে বাবুর বাড়ীতে কাজে গেল। দুই প্রহর বেলায় আয়ী যখন স্নানে যায়, হীরা তখন আসিয়া কুন্দকে স্নানাহার করাইল। আবার চাবি দিয়া চলিয়া গেল। রাত্রে আসিয়া চাবি খুলিয়া উভয়ে শয্যা রচনা করিল।

"টিট্—কিট্—খিট্—খিটি—খাট্" বাহির দুয়ারের শিকল সাবধানে নাড়িল। হীরা বিস্মিত হইল। একজনমাত্র কখনও কখনও রাত্রে শেকল নাড়ে। সে বাবুর বাড়ীর দ্বারবান্, রাত ভিত ডাকিতে আসিয়া শিকল নাড়ে। কিন্তু তাহার হাতে শিকল অমন মধুর বলে না, তাহার হাতে শিকল নাড়িলে, বলে, "কট কট কটাঃ, তোর মাথা মুণ্ড উঠা! কড় কড় কড়াং! খিল খোল নয় ভাঙ্গি ঠ্যাং।" তা ত শিকল বলিল না। এ শিকল বলিতেছে, "কিট্ কিট্ কিটি! দেখি কেমন আমার হীরেটি! খিট্ খাট্ ছন্! উঠিলো আমার হীরামন্! ঠিট্ ঠিট্ ঠিঠি ঠিনক্—আয় রে আমার হীরা মাণিক।" হীরা উঠিয়া দেখিতে গেল; বাহির দুয়ার খুলিয়া দেখিল, স্ত্রীলোক। প্রথমে চিনিতে পারিল না, পরেই চিনিল—"কে ও গঙ্গাজল! এ কি ভাগ্য!" হীরার গঙ্গাজল মালতী গোয়ালিনী। মালতী গোয়ালিনীর বাড়ী দেবীপুর—দেবেন্দ্র বাবুর বাড়ীর কাছে—বড় রসিকা স্ত্রীলোক। বয়স বৎসর ত্রিশ বত্রিশ, সাড়ী পরা, হাতে রুলি, মুখে পানের রাগ। মালতী গোয়ালিনী প্রায় গৌরাঙ্গী—একটু রৌদ্র পোড়া—মুখে রাঙ্গা রাঙ্গা দাগ, নাক খাঁদা—কপালে উল্কি। কসে তামাকুপোড়া টেপা আছে। মালতী গোয়ালিনী দেবেন্দ্র বাবুর দাসী নহে—আশ্রিতাও নহে—অথচ তাঁহার বড় অনুগত—অনেক ফরমায়েস্—যাহা অন্যের অসাধ্য তাহা মালতী সিদ্ধ করে। মালতীকে দেখিয়া চতুরা হীরা বলিল, "ওহে গঙ্গাজল! অন্তিম কালে যেমন তোমায় পাই! কিন্তু এখন কেন?"

গঙ্গাজল চুপি চুপি বলিল, "তোকে দেবেন্দ্র বাবু ডেকেছে।"

হীরা কাদা মাখে, হাসিয়া বলিল, "তুই কিছু পাবি নাকি?"

মালতী দুই অঙ্গুলের দ্বারা হীরাকে মারিল, বলিল, "মরণ আর কি! তোর মনের কথা তুই জানিস্! এখন চ।"

হীরা ইহাই চায়। কুন্দকে বলিল, "আমার বাবুর বাড়ী যেতে হলো—ডাকিতে এসেছে; কে জানে কেন?" বলিয়া প্রদীপ নিবাইল এবং অন্ধকারে কৌশলে বেশভূষা করিয়া মালতীর সঙ্গে যাত্রা করিল। দুই জনে অন্ধকারে গলা মিলাইয়া—

"মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়;"

ইতি গীত গায়িতে গায়িতে চলিল।

দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় হীরা একা গেল। দেবেন্দ্র দেবীর আরাধনা করিতেছিলেন, কিন্তু আজ সরু কাটিতেছিলেন। জ্ঞান টন্‌টনে। হীরার সঙ্গে আজ অন্য প্রকার সম্ভাষণ করিলেন। স্তবস্তুতি কিছুই নাই। বলিলেন, "হীরা, সে দিন আমি অধিক মদ খাইয়া তোমার কথার মর্ম্ম কিছুই গ্রহণ করিতে পারি নাই। কেন আসিয়াছিলে? সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।"

হী। কেবল আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলাম।

দেবেন্দ্র হাসিলেন। বলিলেন, "তুমি বড় বুদ্ধিমতী। ভাগ্যক্রমে নগেন্দ্র বাবু তোমার মত দাসী

পেয়েছেন। বুঝিলাম তুমি হরিদাসী বৈষ্ণবীর তত্ত্বে এসেছিলে। আমার মনের কথা জানিতে এসেছিলে। কেন আমি বৈষ্ণবী সাজি, কেন দত্তবাড়ী যাই, এই কথা জানিতে আসিয়াছিলে। তাহা একপ্রকার জানিয়াও গিয়াছ। আমিও তোমার কাছে সে কথা লুকাইব না। তুমি প্রভুর কাজ করিয়া প্রভুর কাছে পুরস্কার পাইয়াছ, সন্দেহ নাই। এখন আমার একটি কাজ কর। আমিও পুরস্কার করিব।"

মহাপাপে নিমগ্ন যাহাদিগের চরিত্র, তাহাদিগের সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লেখা বড় কষ্টকর। দেবেন্দ্র, হীরাকে বহুল অর্থের লোভ প্রদর্শন করিয়া, কুন্দকে বিক্রয় করিতে বলিলেন। শুনিয়া ক্রোধে হীরার পদ্মপলাশ চক্ষু রক্তময় হইল—কর্ণবন্ধ্রে অগ্নিবৃষ্টি হইল। হীরা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, "মহাশয়! আমি দাসী বলিয়া এইরূপ কথা বলিলেন। ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।"

এই বলিয়া হীরা বেগে প্রস্থান করিল। দেবেন্দ্র ক্ষণেক কাল অপ্রতিভ এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া নীরব হইয়াছিলেন। পরে প্রাণ ভরিয়া দুই গ্লাস ব্রাণ্ডি পান করিলেন। তখন প্রকৃতিস্থ হইয়া মৃদু মৃদু গান গায়িলেন,

"এসেছিল বক্না গোরু পর-গোয়ালে জাব্না খেতে—"

বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ হীরার দ্বেষ

প্রাতে উঠিয়া হীরা কাজে গেল। দত্তের বাড়ীতে দুই দিন পর্য্যন্ত বড় গোল, কুন্দকে পাওয়া যায় না। বাড়ীর সকলেই জানিল যে, সে বাগ করিয়া গিয়াছে, পাড়াপ্রতিবাসীরা কেহ জানিল, কেহ জানিল না। নগেন্দ্র শুনিলেন যে, কুন্দ গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছে—কেন গিয়াছে, কেহ তাহা শুনাইল না। নগেন্দ্র ভাবিলেন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিযা, কুন্দ আমার গৃহে আর থাকা অনুচিত বলিয়া চলিয়া গিয়াছে। যদি তাই, তবে কমলের সঙ্গে গেল না কেন? নগেন্দ্রের মুখ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কেহ তাঁহার নিকটে আসিতে সাহস করিল না। সূর্য্যমুখীর কি দোষ, তাহা কিছু জানিলেন না, কিন্তু সূর্য্যমুখীর সঙ্গে আলাপ বন্ধ করিলেন। গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায কুন্দনন্দিনীর সন্ধানার্থ স্ত্রীলোক চর পাঠাইলেন।

সূর্য্যমুখী রাগে বা ঈর্ষ্যায় বশীভূত হইয়া, যাহাই বলুন, কুন্দের পলায়ন শুনিয়া অতিশয় কাতর হইলেন। বিশেষ কমলমণি বুঝাইয়া দিলেন যে, দেবেন্দ্র যাহা বলিয়াছিল, তাহা কদাচ বিশ্বাসযোগ্য নহে। কেন না, দেবেন্দ্রের সহিত গুপ্ত প্রণয় থাকিলে, কখন অপ্রচার থাকিত না। আর কুন্দের যেরূপ স্বভাব, তাহাতে কদাচ ইহা সম্ভব বোধ হয় না। দেবেন্দ্র মাতাল, মদের মুখে মিথ্যা বড়াই করিয়াছে। সূর্য্যমুখী এ সকল কথা বুঝিলেন, এজন্য অনুতাপ কিছু গুরুতর হইল। তাহাতে আবার স্বামীর বিরাগে আরও মর্ম্মব্যথা পাইলেন। শত বার কুন্দকে গালি দিতে লাগিলেন, সহস্র বার আপনাকে গালি দিলেন। তিনিও কুন্দের সন্ধানে লোক পাঠাইলেন।

কমল কলিকাতায় যাওয়া স্থগিত করিলেন। কমল কাহাকেও গালি দিলেন না—সূর্য্যমুখীকেও অণুমাত্র তিরস্কার করিলেন না। কমল গলা হইতে কণ্ঠহার খুলিয়া গৃহস্থ সকলকে দেখাইয়া বলিলেন, "যে কুন্দকে আনিয়া দিবে, তাহাকে এই হার দিব।"

পাপ হীরা এই সব দেখে শুনে, কিন্তু কিছু বলে না। কমলের হার দেখিয়া এক একবার লোভ হইয়াছিল—কিন্তু সে লোভ সম্বরণ করিল। দ্বিতীয় দিন কাজ করিয়া দুই প্রহরের সময়ে, আয়ীর স্নানের সময় বুঝিয়া, কুন্দকে খাওয়াইল। পরে রাত্রে আসিয়া উভয়ে শয্যারচনা করিয়া শয়ন করিল। কুন্দ বা হীরা কেহই নিদ্রা গেল না—কুন্দ আপনার মনের দুঃখে জাগিয়া রহিল। হীরা আপন মনের সুখ-দুঃখে জাগিয়া রহিল। সেও কুন্দের ন্যায় বিছানায় শুইয়া চিন্তা করিতেছিল। যাহা চিন্তা করিতেছিল,

কৌশল্যা আর সহ্য করিতে পারিল না। তখন কৌশল্যাও আরম্ভ করিল, "তুমি দুটি চক্ষের মাথা খাও! নিপাত যাও! তোমায় যেন যম না ভোলে! পোড়ারমুখি! আবাগি! শতেক খোয়ারি! কোন্দল-বিদ্যায় হীরার অপেক্ষা কৌশল্যা পটুতরা। সুতরাং হীরা পাটকেলটি খাইল।

হীরা তখন প্রভুপত্নীর নিকট নালিশ করিতে চলিল। যাইবার সময়ে যদি হীরার মুখ কেহ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত, তবে দেখিতে পাইত যে, হীরার ক্রোধলক্ষণ কিছুই নাই, বরং অপরপ্রান্তে একটু হাসি আছে। হীরা সূর্য্যমুখীর নিকট যখন গিয়া উপস্থিত হইল, তখন বিলক্ষণ ক্রোধলক্ষণ— এবং সে প্রথমেই স্ত্রীলোকের ঈশ্বরদত্ত অস্ত্র ছাড়িয়া অর্থাৎ কাঁদিয়া দেশ ভাসাইল।

সূর্য্যমুখী নালিশী আর্‌জি মোলাহেজা করিয়া, বিহিত বিচার করিলেন। দেখিলেন, হীরারই দোষ। তথাপি হীরার অনুরোধে কৌশল্যাকে যৎকিঞ্চিৎ অনুযোগ করিলেন। হীরা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিল, "ও মাগীকে ছাড়াইয়া দাও, নহিলে আমি থাকিব না।"

তখন সূর্য্যমুখী হীরার উপর বিরক্ত হইলেন। বলিলেন, "হীরে, তোর বড় আদর বাড়িয়াছে! তুই আগে দিলি গাল—দোষ সব তোর—আবার তোর কথায় ওকে ছাড়াইব? আমি এমন অন্যায় করিতে পারিব না—তোর যাইতে ইচ্ছা হয় যা, আমি থাকিতে বলি না।"

হীরা ইহাই চায়। তখন "আচ্ছা চল্লেম" বলিয়া হীরা চক্ষের জলে মুখ ভাসাইতে ভাসাইতে বহির্ব্বাটীতে বাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু বৈঠকখানায় একা ছিলেন—এখন একাই থাকিতেন। হীরা কাঁদিতেছে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "হীরে, কাঁদিতেছিস্ কেন?

হীরা। আমার মাহিনা পত্র হিসাব করিয়া দিতে হুকুম করুন।

ন। (সবিস্ময়ে) সে কি? কি হয়েছে?

হী। আমার জবাব হয়েছে। মা ঠাকুরাণী আমাকে জবাব দিয়াছেন।

ন। কি করেছিস্ তুই?

হী। কুশি আমাকে গালি দিয়াছিল—আমি নালিশ করিয়াছিলাম। তিনি তার কথায় বিশ্বাস করিয়া আমাকে জবাব দিলেন।

নগেন্দ্র মাথা নাড়িয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কাজের কথা নয়, হীরে, আসল কথা কি বল্।"

হীরা তখন ঋজু হইয়া বলিল, "আসল কথা, আমি থাকিব না।"

ন। কেন?

হী। মা ঠাকুরাণীর মুখ বড় এলো মেলো হয়েছে—কারে কি বলেন, ঠিক নাই।

নগেন্দ্র ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিলে, "সে কি?"

হীরা যাহা বলিতে আসিয়াছিল, তাহা এইবার বলিল, সেদিন কুন্দঠাকুরাণীকে কি না বলিয়াছিলেন। শুনিয়া কুন্দঠাকুরাণী দেশত্যাগী হয়েছেন। আমাদের ভয়, পাছে আমাদের সেইরূপ কোন্ দিন কি বলেন,—আমরা তা হলে বাঁচিব না। তাই আগে হইতে সরিতেছি।"

ন। সে কি কথা?

হী। আপনার সাক্ষাতে লজ্জায় তা আমি বলিতে পারি না।

শুনিয়া, নগেন্দ্রের ললাট অন্ধকার হইল। তিনি হীরাকে বলিলেন, আজ বাড়ী যা। কাল ডাকাব।"

হীরার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। সে এই জন্য কৌশল্যার সঙ্গে বচসা সৃজন করিয়াছিল।

নগেন্দ্র উঠিয়া সূর্য্যমুখীর নিকটে গেলেন। হীরা পা টিপিয়া টিপিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

সূর্য্যমুখীকে নিভৃতে লইয়া গিয়া নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি হীরাকে বিদায় দিয়াছ?" সূর্য্যমুখী বলিলেন, "দিয়াছি।" অনন্তর হীরা ও কৌশল্যার বৃত্তান্ত সবিশেষ বিবৃত করিলেন। শুনিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "মরুক। তুমি কুন্দনন্দিনীকে কি বলিয়াছিলে?"

নগেন্দ্র দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর মুখ শুকাইল। সূর্য্যমুখী অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "কি বলিয়াছিলাম?"

ন। কোন দুর্ব্বাক্য?

সূর্য্যমুখী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে যাহা বলা উচিৎ, তাহাই বলিলেন, বলিলেন, "তুমি আমার সর্ব্বস্ব। তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল। তোমার কাছে কেন আমি লুকাইব? আমি কুন্দকে কুকথা বলিয়াছিলাম। পাছে তুমি রাগ কর বলিয়া তোমার কাছে ভরসা করিয়া বলি নাই। অপরাধ মার্জ্জনা করিও। আমি সকল বলিতেছি।"

তখন সূর্য্যমুখী হরিদাসী বৈষ্ণবীর পরিচয় হইতে কুন্দনন্দিনীর তিরস্কার পর্য্যন্ত অকপটে সকল বিবৃত করিলেন। বলিয়া, শেষে কহিলেন "আমি কুন্দনন্দিনীকে তাড়াইয়া আপনার মরমে আপনি মরিয়া আছি। দেশে দেশে তাহার তত্ত্বে লোক পাঠাইয়াছি। যদি সন্ধান পাইতাম, ফিরাইয়া আনিতাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র তখন বলিলেন, "তোমার বিশেষ অপরাধ নাই, তুমি যেরূপ কুন্দের কলঙ্ক শুনিয়াছিলে, তাহাতে কোন্ ভদ্রলোকের স্ত্রী তাকে মিষ্ট কথা বলিবে, কি ঘরে স্থান দিবে? কিন্তু একবার ভাবিলে ভাল হইত যে, কথাটা সত্য কি না?"

সূর্য্য। তখন সে কথা ভাবি নাই। এখন ভাবিতেছি।

ন। ভাবিলে না কেন?

সূর্য্য। আমার মনের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। বলিতে বলিতে সূর্য্যমুখী—পতিপ্রাণা—সাধ্বী—নগেন্দ্রের চরণপ্রান্তে ভূতলে উপবেশন করিলেন, এবং নগেন্দ্রের উভয় চরণ দুই হস্তে গ্রহণ করিয়া নয়নজলে সিক্ত করিলেন। তখন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "প্রাণাধিক তুমি। কোন কথা এ পাপ মনের ভিতর থাকিতে তোমার কাছে লুকাইব না। আমার অপরাধ লইবে না?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "তোমায় বলিতে হইবে না। আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।"

সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের যুগল চরণে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আবার সেই শিশির সিক্ত-কমলতুল্য ক্লিষ্ট মুখমণ্ডল উন্নত করিয়া, সর্ব্বদুঃখাপহারী স্বামীমুখপ্রতি চাহিয়া বলিলেন, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমনি মরা নহে; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম। আমার অপরাধ লইও না।"

নগেন্দ্র অনেকক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া, শেষ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, "সূর্য্যমুখী! অপরাধ সকলই আমার। তোমার অপরাধ কিছুই নাই! আমি যথার্থ তোমার নিকট বিশ্বাসহন্তা। যথার্থই আমি তোমাকে ভুলিয়া কুন্দনন্দিনীতে—কি বলিব? আমি যে যন্ত্রণা পাইয়াছি, যে যন্ত্রণা পাইতেছি, তাহা তোমাকে কি বলিব? তুমি মনে করিয়াছ, আমি চিত্ত দমনের চেষ্টা করি নাই; এমত ভাবিও না। আমি যত আমাকে তিরস্কার করিয়াছি, তুমি কখনও তত তিরস্কার করিবে না। আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না।"

সূর্য্যমুখী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, যোড়হাত করিয়া কাতরস্বরে বলিলেন, "যাহা তোমার মনে থাকে, থাক্—আমার কাছে আর বলিও না। তোমার প্রতি কথায় আমার বুকে শেল বিঁধিতেছে।—আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা ঘটিয়াছে—আর শুনিতে চাহি না। এ সকল আমার অশ্রাব্য।"

"না, তা নয়, সূর্য্যমুখী! আরও শুনিতে হইবে। যদি কথা পাড়িলে, তবে মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলি—কেন না, অনেক দিন হইতে বলি বলি করিতেছি। আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। মরিব না—কিন্তু দেশান্তরে যাইব। বাড়ী ঘর সংসারে আর সুখ নাই। তোমাতে আমার সুখ নাই। আমি তোমার অযোগ্য স্বামী। আমি আর কাছে থাকিয়া তোমাকে ক্লেশ দিব না। কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান

করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব; তুমি এ গৃহে গৃহিণী থাক। মনে মনে ভাবিও তুমি বিধবা—যাহার স্বামী এরূপ পামর, সে বিধবা নয় ত কি? কিন্তু আমি পামর হই, আর যাই হই, তোমাকে প্রবঞ্চনা করিব না। আমি অন্যাগতপ্রাণ হইয়াছি—সে কথা তোমাকে স্পষ্ট বলিব; এখন আমি দেশত্যাগ করিয়া চলিলাম। যদি কুন্দনন্দিনীকে ভুলিতে পারি, তবে আবার আসিব! নচেৎ তোমার সঙ্গে এই সাক্ষাৎ।

এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্য্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত্ত প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া সূর্য্যমুখী—কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র, সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। মনে মনে বলিতেছিলেন, "সেই ত মরিতে হইবে—তার আজ কাল কি? জগদীশ্বরের ইচ্ছা,—আমি কি করিব? আমি কি মনে করিলে ইহার প্রতিকার করিতে পারি? আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে?"

না; নগেন্দ্র! তুমি মরিলে সূর্য্যমুখী বাঁচিবে না, কিন্তু তোমার মরাই ভাল ছিল।

দণ্ডেক পরে সূর্য্যমুখী উঠিয়া বসিলেন। আবার স্বামীর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, "এক ভিক্ষা।"

ন। কি।

সূ। আর এক মাস গৃহে থাক। ইতিমধ্যে যদি কুন্দনন্দিনীকে না পাওয়া যায়, তবে তুমি দেশত্যাগ করিও। আমি মানা করিব না।

নগেন্দ্র মৌনভাবে বাহির হইয়া গেলেন। মনে মনে আর এক মাস থাকিতে স্বীকার করিলেন। সূর্য্যমুখীও তাহা বুঝিলেন। তিনি গমনশীল নগেন্দ্রের মূর্ত্তিপ্রতি চাহিয়াছিলেন। সূর্য্যমুখী মনে মনে বলিতেছিলেন, "আমার সর্ব্বস্ব ধন! তোমার পায়ের কাঁটাটি তুলিবার জন্য প্রাণ দিতে পারি। তুমি পাপ সূর্য্যমুখীর জন্য দেশত্যাগী হইবে? তুমি বড়, না আমি বড়?"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : চোরের উপর বাটপাড়ি

হীরা দাসীর চাকরী গেল, কিন্তু দত্তবাড়ীর সঙ্গে সম্বন্ধ ঘুচিল না। সে বাড়ীর সংবাদের জন্য হীরা সর্ব্বদা ব্যস্ত। সেখানকার লোক পাইলে ধরিয়া বসাইয়া গল্প ফাঁদে, কথার ছলে সূর্য্যমুখীর প্রতি নগেন্দ্রের কি ভাব, তাহা জানিয়া লয়। যে দিন কাহারও সাক্ষাৎ না পায়, সেদিন ছল করিয়া বাবুদের বাড়ীতেই আসিয়া বসে। দাসীমহলে পাঁচ রকম কথা পাড়িয়া, অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া চলিয়া যায়।

এইরূপে কিছু দিন গেল। কিন্তু এক দিন একটি গোলযোগ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল।—

দেবেন্দ্রের নিকট হীরার পরিচয়াবধি, হীরার বাড়ী মালতি গোয়ালিনীর কিছু ঘন ঘন যাতায়াত হইতে লাগিল। মালতী দেখিল, তাহাতে হীরা বড় সন্তুষ্টা নহে। আরও দেখিল, একটি ঘর প্রায় বন্ধ থাকে সে ঘরে, হীরার বুদ্ধির প্রাখর্য্য হেতু, বাহির হইতে শিকল এবং তাহাতে তালা চাবি আঁটা থাকিত, কিন্তু এক দিন অকস্মাৎ মালতী আসিয়া দেখিল, তালা চাবি দেওয়া নাই। মালতী হঠাৎ শিকল খুলিয়া দুয়ার ঠেলিয়া দেখিল। দেখিল, ঘর ভিতর হইতে বন্ধ। তখন সে বুঝিল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে।

মালতী হীরাকে কিছু বলিল না, কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিল—মানুষটা কে? প্রথমে ভাবিল, পুরুষ মানুষ। কিন্তু কে কার কে, মালতী সকলই ত জানিত—এ কথা সে বড় মনে স্থান দিল না। শেষে তাহার মনে মনে সন্দেহ হইল—কুন্দই বা এখানে আছে। কুন্দের নিরুদ্দেশ হওয়ার কথা মালতী সকলই শুনিয়াছিল। এখন সন্দেহভঞ্জনার্থ শীঘ্র সদুপায় করিল। হীরা বাবুদিগের বাড়ী

হইতে একটি হরিণশিশু আনিয়াছিল। সেটি বড় চঞ্চল বলিয়া বাঁধাই থাকিত। এক দিন মালতী তাহাকে আহার করাইতেছিল। আহার করাইতে করাইতে হীরার অলক্ষ্যে তাহার বন্ধন খুলিয়া দিল। হরিণশিশু মুক্ত হইবামাত্র বেগে পলায়ন করিল। দেখিল, হীরা ধরিবার জন্য তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গেল।

হীরা যখন ছুটিয়া যায়, মালতী তখন ব্যগ্রস্বরে ডাকিতে লাগিল, "হীরে! ও হীরে! ও গঙ্গাজল!" হীরা দূরে গেলে মালতী আছড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও মা! আমার গঙ্গাজল এমন হলো কেন?" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কুন্দের দ্বারে ঘা মারিয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল, "কুন্দ ঠাক্‌রুণ! কুন্দ! শীঘ্র বাহির হও! গঙ্গাজল কেমন হয়েছে।" সুতরাং কুন্দ ব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিল। মালতী তাহাকে দেখিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া পলাইল।

কুন্দ দ্বার রুদ্ধ করিল। পাছে হীরা তিরস্কার করে বলিয়া হীরাকে কিছু বলিল না।

মালতী গিয়া দেবেন্দ্রকে সন্ধান বলিল। দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এস্‌পার কি ওস্‌পার, যা হয় একটা করিয়া আসিবেন। কিন্তু সে দিন একটা "পার্টি" ছিল—সুতরাং জুটিতে পারিলেন না। পর দিন যাইবেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ পিঞ্জরের পাখী

কুন্দ এখন পিঞ্জরের পাখী—"সতত চঞ্চল"। দুইটি ভিন্নদিগভিমুখগামিনী স্রোতস্বতী পরস্পরে প্রতিহত হইলে স্রোতোবেগে বাড়িয়াই উঠে। কুন্দের হৃদয়ে তাহাই হইল। এদিকে মহালজ্জা—অপমান—তিরস্কার—মুখ দেখাইবার উপায় নাই—সূর্য্যমুখী ত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু সে লজ্জাস্রোতের উপর প্রণয়স্রোত আসিয়া পড়িল। পরস্পর প্রতিঘাতে প্রণয়প্রবাহই বাড়িয়া উঠিল। বড় নদীতে ছোট নদী ডুবিয়া গেল। সূর্য্যমুখীকৃত অপমান ক্রমে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্যমুখী আর মনে স্থান পাইলেন না—নগেন্দ্রই সর্ব্বত্র। ক্রমে কুন্দ ভাবিতে লাগিল, "আমি কেন সে গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিলাম? দুটো কথায় আমার কি ক্ষতি হইয়াছিল? আমি ত নগেন্দ্রকে দেখিতাম। এখন যে একবারও দেখিতে পাই না। তা আমি কি আবার ফিরে সে বাড়ীতে যাব? তা যদি আমাকে তাড়াইয়া না দেয়, তবে আমি যাই। কিন্তু পাছে আবার তাড়াইয়া দেয়? কুন্দনন্দিনী দিবানিশি মনোমধ্যে এই চিন্তা করিত। দত্তগৃহে প্রত্যাগমন কর্ত্তব্য কি না, এ বিচার আর বড় করিত না—সেটা দুই চারি দিনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল যে, যাওয়াই কর্ত্তব্য—নহিলে প্রাণ যায়। তবে গেলে সূর্য্যমুখী পুনশ্চ দূরীকৃত করিবে কি না, ইহাই বিবেচ্য হইল। শেষে কুন্দের এমনই দুর্দ্দশা হইল যে, সে সিদ্ধান্ত করিল, সূর্য্যমুখী দূরীকৃতই করুক আর যাই করুক, যাওয়াই স্থির।

কিন্তু কি বলিয়া কুন্দ আবার গিয়া সে গৃহ প্রাঙ্গণে দাড়াইবে? একা ত যাইতে বড় লজ্জা করে—তবে হীরা যদি সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, তা হলে যাওয়া হয়। কিন্তু হীরাকে মুখ ফুটিয়া বলিতে বড় লজ্জা করিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারিল না।

হৃদয়ও আর প্রাণাধিকের অদর্শন সহ্য করিতে পারে না। এক দিন দুই চারি দণ্ড রাত্রি থাকিতে কুন্দ শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল। হীরা তখন নিদ্রিত। নিঃশব্দে কুন্দ দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাটীর বাহির হইল। কৃষ্ণপক্ষাবশেষে ক্ষীণচন্দ্র আকাশপ্রান্তে সাগরে নিক্ষিপ্তা বালিকা সুন্দরীর ন্যায় ভাসিতেছিল। বৃক্ষান্তরাল মধ্যে রাশি রাশি অন্ধকার লুকাইয়াছিল। অতি মন্দ শীতল বায়ুতে পথিপার্শ্বস্থ সরোবরের পদ্মপত্রশৈবালাদিসমাচ্ছন্ন জলের বীচিবিক্ষেপ হইতেছিল না। অস্পষ্টলক্ষ্য বৃক্ষাগ্রভাগ সকলের উপর নিবিড় নীল আকাশ শোভা পাইতেছিল। কুক্কুরেরা পথিপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রকৃতি স্নিগ্ধগাম্ভীর্য্যময়ী হইয়া শোভা পাইতেছিল। কুন্দ পথ অনুমান করিয়া দত্তগৃহাভিমুখে সন্দেহমন্দপদে চলিল। যাইবার আর কিছুই অভিপ্রায় নহে—যদি কোন সুযোগে একবার নগেন্দ্রকে দেখিতে পায়। দত্তগৃহে ফিরিয়া

যাওয়া ত ঘটিতেছে না—যবে ঘটিবে, তবে ঘটিবে—ইতিমধ্যে এক দিন লুকাইয়া দেখিয়া আসিলে ক্ষতি কি? কিন্তু লুকাইয়া দেখিব কখন? কি প্রকারে? কুন্দ ভাবিয়া ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছিল যে, রাত্রি থাকিতে দত্তদিগের গৃহসন্নিধানে গিয়া চারি দিকে বেড়াইব—কোন সুযোগে নগেন্দ্রকে বাতায়নে, কি প্রাসাদে, কি উদ্যানে, কি পথে দেখিতে পাইব। নগেন্দ্র প্রভাতে উঠিয়া থাকেন, কুন্দ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেও পাইতে পারে। দেখিয়াই অমনি কুন্দ ফিরিয়া আসিবে।

মনে মনে এইরূপ কল্পনা করিয়া কুন্দ শেষরাত্রে নগেন্দ্রের গৃহাভিমুখে চলিল। অট্টালিকা-সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তখন রাত্রি প্রভাত হইতে কিছু বিলম্ব আছে। কুন্দ পথপানে চাহিয়া দেখিল—নগেন্দ্র কোথাও নাই—ছাদপানে চাহিল, সেখানেও নগেন্দ্র নাই—বাতায়নেও নগেন্দ্র নাই। কুন্দ ভাবিল, এখনও তিনি বুঝি উঠেন নাই—উঠিবার সময় হয় নাই। প্রভাত হউক—আমি ঝাউতলায় বসি। কুন্দ ঝাউতলায় বসিল। ঝাউতলা বড় অন্ধকার। দুই একটি ঝাউয়ের ফল কি পল্লব মুট মুট করিয়া নীরমধ্যে খসিয়া পড়িতেছিল। মাথার উপর বৃক্ষস্থ পক্ষীরা পাখা ঝাড়া দিতেছিল। অট্টালিকারক্ষক দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা দ্বারোদ্ঘাটনের ও অবরোধের শব্দ মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছিল। শেষ উষাসমাগমসূচক শীতল বায়ু বহিল।

তখন পাপিয়া স্বরলহরীতে আকাশ ভাসাইয়া মাথার উপর দিয়া ডাকিয়া গেল। কিছু পরে ঝাউগাছে কোকিল ডাকিল। শেষে সকল পক্ষী মিলিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। তখন কুন্দের ভরসা নিবিতে লাগিল—আর ত ঝাউতলায় বসিয়া থাকিতে পারে না, প্রভাত হইল—কেহ দেখিতে পাইবে। তখন প্রত্যাবর্ত্তনার্থে কুন্দ গাত্রোত্থান করিল। এক আশা মনে বড় প্রবলা হইল। অন্তঃপুরসংলগ্ন যে পুষ্পোদ্যান আছে—নগেন্দ্র প্রাতে উঠিয়া কোন কোন দিন সেইখানে বায়ুসেবন করিয়া থাকেন। হয়ত নগেন্দ্র এতক্ষণ সেইখানে পদচারণ করিতেছেন। একবার সে স্থান না দেখিয়া কুন্দ ফিরিতে পারিল না। কিন্তু সে উদ্যান প্রাচীরবেষ্টিত। খিড়কীর দ্বার মুক্ত না হইলে তাহার মধ্যে প্রবেশের পথ নাই। বাহির হইতেও তাহা দেখা যায় না। খিড়কীর দ্বার মুক্ত কি রুদ্ধ, ইহা দেখিবার জন্য কুন্দ সেই দিকে গেল।

দেখিল, দ্বার মুক্ত। কুন্দ সাহসে ভর করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল এবং উদ্যানপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া এক বকুলবৃক্ষের অন্তরালে দাঁড়াইল।

উদ্যানটি ঘন বৃক্ষলতাগুল্মরাজিপরিবৃত। বৃক্ষশ্রেণীমধ্যে প্রস্তররচিত সুন্দর পথ, স্থানে স্থানে শ্বেত, রক্ত, নীল, পীতবর্ণ বহু কুসুমরাশিতে বৃক্ষাদি মণ্ডিত হইয়া রহিয়াছে—তদুপরি প্রভাতমধুলুব্ধ মক্ষিকাসকল দলে দলে ভ্রমিতেছে, বসিতেছে, উড়িতেছে—গুন্‌ গুন্‌ শব্দ করিতেছে। এবং মনুষ্যের চরিত্রের অনুকরণ করিয়া একটা একটা বিশেষ মধুযুক্ত ফুলের উপর পালে পালে ঝুঁকিতেছে। বিচিত্রবর্ণ অতি ক্ষুদ্র পক্ষিগণ প্রস্ফুটিত পুষ্পগুচ্ছোপরি বৃক্ষফলবৎ আরোহণ করিয়া পুষ্পরসপান করিতেছে, কাহারও কণ্ঠ হইতে সপ্তস্বর-সংমিলিত ধ্বনি নির্গত হইতেছে। প্রভাতবায়ুর মন্দ হিল্লোলে পুষ্পভারাবনত ক্ষুদ্র শাখা দুলিতেছে—পুষ্পহীন শাখাসকল দুলিতেছে না; কেন না, তাহারা নম্র নহে। কোকিল মহাশয় বকুলের ঝোপের মধ্যে কালবর্ণ লুকাইয়া গলা-বাজিতে সকলকে জিতিতেছেন।

উদ্যানমধ্যস্থলে, একটি শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত লতামণ্ডপ। তাহা অবলম্বন করিয়া নানাবিধ লতা পুষ্পধারণ করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার ধারে মৃত্তিকাধারে রোপিত সপুষ্প গুল্ম সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

কুন্দনন্দিনী বকুলান্তরাল হইতে উদ্যানমধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রের দীর্ঘায়ত দেবমূর্ত্তি দেখিতে পাইল না। লতামণ্ডপ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহার প্রস্তরনির্ম্মিত স্নিগ্ধ হর্ম্ম্যোপরি কেহ শয়ন করিয়া রহিয়াছে, কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, সেই নগেন্দ্র। ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সে ধীরে ধীরে বৃক্ষের অন্তরালে থাকিয়া অগ্রবর্ত্তিনী হইতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময়ে লতামণ্ডপস্থ ব্যক্তি গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইল। হতভাগিনী কুন্দ দেখিল যে, সে নগেন্দ্র নহে, সূর্য্যমুখী।

কুন্দ তখন ভীতা হইয়া এক প্রস্ফুটিতা কামিনীর অন্তরালে দাঁড়াইল। ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিল না—পশ্চাদপসৃতও হইতে পারিল না। দেখিতে লাগিল, সূর্য্যমুখী উদ্যানমধ্যে পুষ্প চয়ন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেখান কুন্দ লুকাইয়া আছে, সূর্য্যমুখী ক্রমে সেই দিকে আসিতে লাগিলেন। কুন্দ দেখিল যে, ধরা পড়িলাম। শেষে সূর্য্যমুখী কুন্দকে দেখিতে পাইলেন। দূর হইতে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কে গা?"

কুন্দ ভয়ে নীরব হইয়া রহিল—পা সরিল না। সূর্য্যমুখী তখন নিকটে আসিলেন—দেখিলেন—চিনিলেন যে, কুন্দ। বিস্মিতা হইয়া কহিলেন, "কে, কুন্দ না কি?"

কুন্দ তখনও উত্তর করিতে পারিল না। সূর্য্যমুখী কুন্দের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "কুন্দ!" এসো—দিদি এসো! আর আমি তোমায় কিছু বলিব না।"

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী হস্ত ধরিয়া কুন্দনন্দিনীকে অন্তঃপুর মধ্যে লইয়া গেলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ অবতরণ

সেই দিন রাত্রে দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে, সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়িতে দর্শন দিলেন। এ ঘর ও ঘর খুঁজিয়া দেখিলেন, কুন্দ নাই। হীরা মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। দেবেন্দ্র রুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাসিস্ কেন?"

হীরা বলিল, "তোমার দুঃখ দেখে। পিঁজরার পাখী পলাইয়াছে—আমার খানাতল্লাসী করিলে পাইবে না।"

তখন দেবেন্দ্রের প্রশ্নে হীরা যাহা যাহা জানিত, আদ্যোপান্ত কহিল। শেষে কহিল, "প্রভাতে তাহাকে না দেখিয়া অনেক খুঁজিলাম, খুঁজিতে খুঁজিতে বাবুদের বাড়ীতে দেখিলাম—এবার বড় আদর।"

দেবেন্দ্র হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু মনের সন্দেহ মিটিল না। ইচ্ছা আর একটু বসিয়া ভাবগতিক বুঝিয়া যান। আকাশে একটু কাণা মেঘ ছিল, দেখিয়া বলিলেন, "বুঝি বৃষ্টি এলো।" অনন্তর ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। হীরার ইচ্ছা, দেবেন্দ্র একটু বসেন—কিন্তু সে স্ত্রীলোক—একাকিনী থাকে—তাহাতে রাত্রি—বসিতে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে অধঃপাতের সোপানে আর এক পদ নামিতে হয়, তাহাও তাহার কপালে ছিল। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার ঘরে ছাতি আছে?"

হীরার ঘরে ছাতি ছিল না। দেবেন্দ্র বলিলেন, "তোমার এখানে একটু বসিয়া জলটা দেখিয়া গেলে কেহ কিছু মনে করিবে?"

হীরা বলিল, "মনে করিবে না কেন? কিন্তু যাহা দোষ, আপনি রাত্রে আমার বাড়ী আসতেই তাহা ঘটিয়াছে।"

দে। তবে বসিতে পারি।

হীরা উত্তর কবিল না। দেবেন্দ্র বসিলেন।

তখন হীরা তক্তপোষের উপর অতি পরিষ্কার শয্যা রচনা করিয়া দেবেন্দ্রকে বসাইল। এবং সিন্দুক হইতে একটি ক্ষুদ্র রূপাবাঁধা হুঁকা বাহির করিল। স্বহস্তে তাহাতে শীতল জল পুরিয়া মিঠাকড়া তামাকু সাজিয়া, পাতাব নল করিয়া দিল।

দেবেন্দ্র পকেট হইতে একটি ব্রাণ্ডি ফ্লাস্ক বাহির করিয়া, বিনা জলে পান করিলেন এবং রাগযুক্ত হইলে দেখিলেন, হীরার চক্ষু বড় সুন্দর। বস্তুতঃ সে চক্ষু সুন্দর। চক্ষু বৃহৎ, নিবিড় কৃষ্ণতার, প্রদীপ্ত এবং বিলোলকটাক্ষ।

দেবেন্দ্র হীরাকে বলিলেন, "তোমার দিব্য চক্ষু!" হীরা মৃদু হাসিল। দেবেন্দ্র দেখিলেন, এক কোণে একখানা ভাঙ্গা বেহালা পড়িয়া আছে। দেবেন্দ্র গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতে করিতে সেই

বেহালা আনিয়া তাহাতে ছড়ি দিলেন। বেহালা ঘাঁকর ঘোঁকর করিতে লাগিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ বেহালা কোথায় পাইলে?"

হীরা কহিল, "একজন ভিখারীর কাছে কিনিয়াছিলাম।" দেবেন্দ্র বেহালা হস্তে লইয়া একপ্রকার চলনসই করিয়া লইলেন এবং তাহার সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া, মধুর স্বরে মধুর ভাবযুক্ত মধুর পদ মধুরভাবে গায়িলেন। হীরার চক্ষু আরও জ্বলিতে লাগিল। ক্ষণকালজন্য হীরার সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি জন্মিল। সে যে হীরা, এই যে দেবেন্দ্র, তাহা ভুলিয়া গেল। মনে করিতেছিল, ইনি স্বামী—আমি পত্নী। মনে করিতেছিল, বিধাতা দুই জনকে পরস্পরের জন্য সৃজন করিয়া, বহুকাল হইতে মিলিত করিয়াছেন, বহুকাল হইতে যেন উভয়ের প্রণয়সুখে উভয়ে সুখী। এই মোহে অভিভূত হীরার মনের কথা মুখে ব্যক্ত হইল। দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্দ্ধব্যক্তস্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।

কথা ব্যক্ত হইবার পর হীরার চৈতন্য হইল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। তখন সে উন্মত্তের ন্যায় আকুল হইয়া দেবেন্দ্রকে কহিল, "আপনি শীঘ্র আমার ঘর হইতে যান।"

দেবেন্দ্র বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, হীরা?"

হীরা। আপনি শীঘ্র যান—নহিলে আমি চলিলাম।

দে। সে কি, তাড়াইয়া দিতেছ কেন?

হী। আপনি যান—নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?

হীরা তখন উন্মাদিনীর ন্যায় বিবশা।

দে। একেই বলে স্ত্রীচরিত্র।

হীরা রাগিল—বলিল, স্ত্রীচরিত্র? স্ত্রীচরিত্র মন্দ নহে। তোমাদিগের ন্যায় পুরুষের চরিত্রই অতি মন্দ। তোমাদের ধর্ম্মজ্ঞান নাই—পরের ভাল মন্দ বোধ নাই—কেবল আপনার সুখ খুঁজিয়া বেড়াও—কেবল কিসে কোন স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিবে, সেই চেষ্টায় ফের। নহিলে কেন তুমি আমার বাড়ী বসিলে? আমার সর্ব্বনাশ করিবে, তোমার কি এ অভিপ্রায় ছিল না? তুমি আমাকে কুলটা ভাবিয়াছিলে, নহিলে কোন্ সাহসে বসিবে? কিন্তু আমি কুলটা নহি। আমরা দুঃখী লোক, গতর খাটাইয়া খাই—কুলটা হইবার আমাদের অবকাশ নাই—বড়মানুষের বউ হইলে কি হইতাম, বলিতে পারি না।" দেবেন্দ্র ভ্রূভঙ্গি করিলেন। দেখিয়া হীরা প্রীতা হইল। পরে উন্নমিতাননে দেবেন্দ্রের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া কোমলতর স্বরে কহিতে লাগিল, "প্রভু, আমি আপনার রূপগুণ দেখিয়া পাগল হইয়াছি। কিন্তু আমাকে কুলটা বিবেচনা করিবেন না। আমি আপনাকে দেখিলেই সুখী হই। এজন্য আপনি আমার ঘরে বসিতে চাহিলে বারণ করিতে পারি নাই—কিন্তু অবলা স্ত্রীজাতি—আমি বারণ করিতে পারি নাই বলিয়া কি আপনার বসা উচিত হইয়াছে? আপনি মহাপাপিষ্ঠ এই ছলে ঘরে প্রবেশ করিয়া আমার সর্ব্বনাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন এখন আপনি এখান হইতে যান।"

দেবেন্দ্র আর এক ঢোক পান করিয়া বলিলেন, "ভাল, ভাল। হীরে তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে এক দিন বক্তৃতা দিবে?"

হীরা এই উপহাসে মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, রোষকাতরস্বরে কহিল, "আমি আপনার উপহাসের যোগ্য নই—আপনাকে অতি অধম লোকে ভালবাসিলেও, তাহার ভালবাসা লইয়া তামাসা করা ভাল নয়। আমি ধার্ম্মিক নহি, ধর্ম্ম বুঝি না—ধর্ম্মে আমার মন নাই। তবে যে আমি কুলটা নই বলিয়া স্পর্দ্ধা করিলাম, তাহার কারণ এই, আমার মনে মনে প্রতিজ্ঞা আছে, আপনার ভালবাসার লোভে পড়িয়া কলঙ্ক কিনিব না। যদি আপনি আমাকে একটুকুও ভালবাসিতেন, তাহা হইলে আমি এ প্রতিজ্ঞা করিতাম না—আমার ধর্ম্মজ্ঞান নাই, ধর্ম্মে ভক্তি নাই—আমি আপনার ভালবাসার তুলনায় কলঙ্ককে তৃণজ্ঞান করি। কিন্তু আপনি ভালবাসেন না—সেখানে কি সুখের জন্য কলঙ্ক কিনিব? কিসের লোভে

আমার গৌরব ছাড়িব? আপনি যুবতী স্ত্রী হাতে পাইলে কখন ছাড়েন না, এজন্য আমার পূজা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, কিন্তু কালে আমাকে হয়ত ভুলিয়া যাইবেন, নয়ত যদি মনে রাখেন, তবে আমার কথা লইয়া দলবলের কাছে উপহাস করিবেন—এমন স্থানে কেন আমি আপনার বাঁদী হইব? কিন্তু যে দিন আপনি আমাকে ভালবাসিবেন, সেই দিন আপনার দাসী হইয়া চরণসেবা করিব।"

দেবেন্দ্র হীরার মুখে এই তিন প্রকার কথা শুনিলেন। তাহার চিত্তের অবস্থা বুঝিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "আমি তোমাকে চিনিলাম, এখন কলে নাচাইতে পারিব। যেদিন মনে করিব, সেই দিন তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধার করিব।" এই ভাবিয়া চলিয়া গেলেন।

দেবেন্দ্র হীরার সম্পূর্ণ পরিচয় পান নাই।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ ঃ খোস্ খবর

বেলা দুই প্রহর। শ্রীশ বাবু আপিসে বাহির হইয়াছেন। বাটীর লোক জন সব আহারান্তে নিদ্রা যাইতেছেন। বৈঠকখানার চাবি বন্ধ। একটা দোআঁসলা গোছ টেরিয়র বৈঠকখানার বাহিরে, পাপোসের উপর, পায়ের ভিতর মাথা রাখিয়া ঘুমাইতেছে। অবকাশ পাইয়া কোন প্রেমময়ী চাকরাণী কোন রসিক চাকরের নিকট বসিয়া গোপনে তামাকু খাইতেছে, আর ফিস্ ফিস্ করিয়া বকিতেছে। কমলমণি শয্যাগৃহে বসিয়া পা ছড়াইয়া সূচী-হস্তে কার্পেট তুলিতেছেন—কেশ বেশ একটু একটু আলু থালু--কোথায় কেহ নাই, কেবল কাছে সতীশ বাবু বসিয়া মুখে অনেক প্রকার শব্দ করিতেছেন, এবং বুকে লাল ফেলিতেছেন। সতীশ বাবু প্রথমে মাতার নিকট হইতে উলগুলি অপহরণ করিবার যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু পাহারা বড় কড়াকড় দেখিয়া, একটা মৃন্ময় ব্যাঘ্রের মুণ্ডলেহনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দূরে একটা বিড়াল, থাবা পাতিয়া বসিয়া, উভয়কে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাহার ভাব অতি গম্ভীর, মুখে বিশেষ বিজ্ঞতার লক্ষণ; এবং চিত্ত চাঞ্চল্যশূন্য। বোধ হয় বিড়াল ভাবিতেছিল, "মানুষের দশা অতি ভয়ানক, সর্ব্বদা কার্পেট তোলা, পুতুল-খেলা প্রভৃতি তুচ্ছ কাজে ইহাদের মন নিবিষ্ট, ধর্ম্মে-কর্ম্মে মতি নাই, বিড়ালজাতির আহার যোগাইবার মন নাই, অতএব ইহাদের পরকালে কি হইবে?" অন্যত্র একটা টিক্‌টিকি প্রাচীরাবলম্বন করিয়া ঊর্দ্ধমুখে একটি মক্ষিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল। সেও মক্ষিকাজাতির দুশ্চরিত্রের কথা মনে মনে আন্দোলন করিতেছিল, সন্দেহ নাই। একটি প্রজাপতি উড়িয়া বেড়াইতেছিল, সতীশ বাবু যেখানে বসিয়া সন্দেশ ভোজন করিয়াছিলেন, ঝাঁকে ঝাঁকে সেখানে মাছি বসিতেছিল—পিপীলিকারাও সার দিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে, টিকটিকি মক্ষিকাকে হস্তগত করিতে না পারিয়া অন্য দিকে সরিয়া গেল। বিড়ালও মনুষ্যচরিত্র পরিবর্ত্তনের কোন লক্ষণ সম্প্রতি উপস্থিত না দেখিয়া, হাই তুলিয়া, ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেল। প্রজাপতি উড়িয়া বাহির হইয়া গেল। কমলমণিও বিরক্ত হইয়া কার্পেট রাখিলেন এবং সতু বাবুর সঙ্গে আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলমণি বলিলেন, "অ, সতু বাবু, মানুষে আপিসে যায় কেন বলিতে পার?" সতু বাবু বলিলেন, "ইলি—লি—ল্লি।"

ক। সতু বাবু, কখনও আপিসে যেও না।"

সতু বলিল, "হাম্!"

কমলমণি বলিলেন, "তোমার হাম্ করার ভাবনা কি? তোমার হাম করার জন্য আপিসে যেতে হবে না। আপিসে যেও না—আপিসে গেলে বৌ দুপুরবেলা বসে বসে কাঁদবে।"

সতু বাবু বৌ কথাটা বুঝিলেন; কেন না, কমলমণি সর্ব্বদা তাঁহাকে ভয় দেখাইতেন যে বৌ আসিয়া মারিবে। সতু বাবু এবার উত্তর করিলেন, "বৌ মাবে।"

কমল বলিলেন, "মনে থাকে যেন। আপিসে গেলে বৌ মারিবে।"

এইরূপ কথোপকথন কতক্ষণ চলিতে পারিত, তাহা বলা যায় না; কেন না, এই সময়ে একজন দাসী ঘুমে চোখ মুছিতে মুছিতে আসিয়া একখানি পত্র আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর পত্র। খুলিয়া পড়িলেন। পড়িয়া আবার পড়িলেন। আবার পড়িয়া বিষণ্ণ মনে মৌনী হইয়া বসিলেন। পত্র এইরূপ;—

"প্রিয়তমে! তুমি কলিকাতায় গিয়া পর্য্যন্ত আমাদের ভুলিয়া গিয়াছ—নহিলে একখানি পত্র লিখিলে না কেন? তোমার সংবাদের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকি, জান না?

"তুমি কুন্দনন্দিনীর কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। তাহাকে পাওয়া গিয়াছে—শুনিয়া সুখী হইবে—ষষ্ঠীদেবতার পূজা দিও। তাহা ছাড়া আরও একটা খোস্ খবর আছে—কুন্দের সঙ্গে আমার স্বামীর বিবাহ হইবে। এ বিবাহে আমিই ঘটক। বিধবাবিবাহ শাস্ত্রে আছে—তবে দোষ কি? দুই এক দিনের মধ্যে বিবাহ হইবে। তুমি আসিয়া জুটিতে পারিবে না—নচেৎ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিতাম। পার যদি, তবে ফুলশয্যার সময়ে আসিও। কেন না, তোমাকে দেখিতে বড় সাধ হইয়াছে।"

কমলমণি পত্রের কিছুই অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিয়া চিন্তিয়া সতীশ বাবুকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সতীশ ততক্ষণ সম্মুখে একখানা বাঙ্গালা কেতাব পাইয়া তাহার কোণ খাইতেছিল, কমলমণি তাহাকে পত্রখানি পড়িয়া শুনাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, "এর মানে কি, বল দেখি? সতু বাবু?" সতু বাবু রস বুঝিলেন, মাতার হাতের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া কমলমণির নাসিকা-ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং কমলমণি সূর্য্যমুখীকে ভুলিয়া গেলেন। সতু বাবুর নাসিকা-ভোজন সমাপ্ত হইলে, কমলমণি আবার সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "এ সতু বাবুর কর্ম্ম নয়, এ আমার সেই মন্ত্রীটি নহিলে হইবে না। মন্ত্রীর আপিস কি ফুরায় না? সতু বাবু আজ এস আমরা রাগ করিয়া থাকি।"

যথাসময়ে মন্ত্রিবর শ্রীশচন্দ্র আপিস হইতে আসিয়া ধড়া চূড়া ছাড়িলেন। কমলমণি তাঁহাকে জল খাওয়াইয়া, শেষে সতীশকে লইয়া রাগ করিয়া খাটের উপর শুইলেন। শ্রীশচন্দ্র রাগ দেখিয়া হাসিতে হাসিতে হুঁকা লইয়া দূরে কৌচের উপর গিয়া বসিলেন। হুঁকাকে সাক্ষী করিয়া বলিলেন, "হে হুঁক্কে! তুমি পেটে ধর গঙ্গাজল, মাথায় ধর আগুন! তুমি সাক্ষী, যারা আমার উপর রাগ করেছে, তারা এখনি আমার সঙ্গে কথা কবে—কবে—কবে! নহিলে আমি তোমার মাথায় আগুন দিয়া এইখানে বসিয়া দশ ছিলিম তামাক পোড়াব!" শুনিয়া, কমলমণি উঠিয়া বসিয়া, মধুর কোপে, নীলোৎপলতুল্য চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "আর দশ ছিলিম তামাক মানে না! এক ছিলিমের টানের জ্বালায় আমি একটি কথা কইতে পাই না—আবার দশ ছিলিম তামাক খায়—আমি আর কি ভেসে এয়েছি!" এই বলিয়া শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং হুঁকা হইতে ছিলিম তুলিয়া লইয়া সাগ্নিক তামাক-ঠাকুরকে বিসর্জ্জন দিলেন।

এইরূপে কমলমণির দুর্জ্জয় মান ভঞ্জন হইলে, তিনি মানের কারণের পরিচয় দিয়া সূর্য্যমুখীর পত্র পড়িতে দিলেন এবং বলিলেন, 'ইহার অর্থ করিয়া দাও, তা নহিলে আজ মন্ত্রিবরের মাহিয়ানা কাটিব।"

শ্রীশ। বরং আগাম মাহিয়ানা দাও—অর্থ করিব।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রের মুখের কাছে মুখ আনিলেন, শ্রীশচন্দ্র মাহিয়ানা আদায় করিলেন। তখন পত্র পড়িয়া বলিলেন, "এটা তামাসা।"

কম। কোন্‌টা তামাসা? তোমার কথাটা, না পত্রখানা?

শ্রীশ। পত্রখানা।

কম। আজ মন্ত্রিমশাইকে ডিশ্চার্জ করিব। ঘটে এ বুদ্ধিটুকুও নাই? মেয়েমানুষ কি এমন তামাসা মুখে অনিতে পারে?

শ্রীশ। তবে যা তামাসা কোরে পারে না, তা সত্য সত্য পারে?

কম। প্রাণের দায়ে পারে। আমার বোধ হয়, এ সত্য।

শ্রীশ। সে কি? সত্য, সত্য?

কম। মিথ্যা বলি ত কমলমণির মাথা খাই।

শ্রীশচন্দ্র কমলের গাল টিপিয়া দিলেন। কমল বলিলেন, "আচ্ছা, মিথ্যা বলি ত কমলমণির সতীনের মাথা খাই।"

শ্রীশ। তা হলে কেবল উপবাস করিতে হইবে।

কম। ভাল, কারু মাথা নাই খেলেম—এমন বিধাতা বুঝি সূর্য্যমুখীর মাথা খায়। দাদা বুঝি জোর করে বিয়ে কর্‌তেছে?

শ্রীশচন্দ্র বিমনা হইলেন। বলিলেন, "আমি কিছু বুঝিতে পারিতেছি না। নগেন্দ্রকে পত্র লিখিব? কি বল?"

কমলমণি তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশচন্দ্র ব্যঙ্গ করিয়া পত্র লিখিলেন। নগেন্দ্র প্রত্যুত্তরে যাহা লিখিলেন, তাহা এই;—

"ভাই, আমাকে ঘৃণা করিও না—অথবা সে ভিক্ষাতেই বা কাজ কি? ঘৃণাস্পদকে অবশ্য ঘৃণা করিবে। আমি এ বিবাহ করিব। যদি পৃথিবীর সকলে আমাকে ত্যাগ করে, তথাপি আমি বিবাহ করিব। নচেৎ আমি উন্মাদগ্রস্ত হইব—তাহার বড় বাকীও নাই।

"এ কথা বলার পর আমার বোধ হয় কিছু বলিবার আবশ্যক করে না। তোমরাও বোধ হয় ইহার পর আমাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য কোন কথা বলিবে না। যদি বল, তবে আমিও তর্ক করিতে প্রস্তুত আছি।

"যদি কেহ বলে যে, বিধবাবিবাহ হিন্দুধর্ম্মবিরুদ্ধ, তাহাকে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রবন্ধ পড়িতে দিই। যেখানে তাদৃশ শাস্ত্রবিশারদ মহামহোপাধ্যায় বলেন যে, বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত, তখন কে ইহা অশাস্ত্র বলিবে? আর যদি বল, শাস্ত্রসম্মত হইলেও ইহা সমাজসম্মত নহে, আমি এ বিবাহ করিলে সমাজচ্যুত হইব; তাহার উত্তর, এ গোবিন্দপুরে আমাকে সমাজচ্যুত করে কার সাধ্য। যেখানে আমিই সমাজ, সেখানে আমার আবার সমাজচ্যুতি কি? তথাপি আমি তোমাদিগের মনোরক্ষার্থে এ বিবাহ গোপনে রাখিব—আপাততঃ কেহ জানিবে না।

"তুমি এ সকল আপত্তি করিবে না। তুমি বলিবে, দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ কাজ। ভাই, কিসে জানিলে ইহা নীতি-বিরুদ্ধে কাজ? তুমি এ কথা ইংরেজের কাছে শিখিয়াছ, নচেৎ ভারতবর্ষে এ কথা ছিল না। কিন্তু ইংরেজেরা কি অভ্রান্ত? যিহুদার বিধি আছে বলিয়া ইংরেজদিগের এ সংস্কার—কিন্তু তুমি আমি যিহুদী বিধি ঈশ্বরবাক্য বলিয়া মানি না। তবে কি হেতুতে এক পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বলিব?

"তুমি বলিবে, যদি এক পুরুষের দুই স্ত্রী হইতে পারে, তবে এক স্ত্রীর দুই স্বামী না হয় কেন? উত্তর—এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে অনেক অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা; এক পুরুষের দুই বিবাহে তাহার সম্ভাবনা নাই। এক স্ত্রীর দুই স্বামী হইলে সন্তানের পিতৃনিরূপণ হয় না—পিতাই সন্তানের পালনকর্ত্তা—তাহার অনিশ্চয়ে সামাজিক উচ্ছৃঙ্খলতা জন্মিতে পারে। কিন্তু পুরুষের দুই বিবাহে সন্তানের মাতার অনিশ্চয়তা জন্মে না। ইত্যাদি আরও অনেক কথা বলা যাইতে পারে।

"যাহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকারক, তাহাই নীতি-বিরুদ্ধ। তুমি যদি পুরুষের দুই বিবাহ নীতি-বিরুদ্ধ বিবেচনা কর, তবে দেখাও যে, ইহা অধিকাংশ লোকের অনিষ্টকর।

"গৃহে কলহাদির কথা বলিয়া আমাকে যুক্তি দিবে। আমি একটা যুক্তির কথা বলিব। আমি নিঃসন্তান। আমি মরিয়া গেলে আমার পিতৃকুলের নাম লুপ্ত হইবে। আমি এ বিবাহ করিলে সন্তান হইবার সম্ভাবনা—ইহা কি অযুক্তি?

"শেষ আপত্তি—সূর্য্যমুখী। স্নেহময়ী পত্নীর সপত্নীকণ্টক করি কেন? উত্তর—সূর্য্যমুখী এ বিবাহে দুঃখিতা নহেন। তিনি বিবাহের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে আমাকে প্রবৃত্ত করিয়াছেন—তিনিই ইহাতে উদ্যোগী। তবে আর কাহার আপত্তি?

"তবে কোন্ কারণে আমার এই বিবাহ নিন্দনীয়?"

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ ঃ কাহার আপত্তি

কমলমণি পত্র পড়িয়া বলিলেন, "কোন্ কারণে নিন্দনীয়? জগদীশ্বর জানেন। কিন্তু কি ভ্রম! পুরুষে বুঝি কিছুই বোঝে না। যা হৌক, মন্ত্রিবর আপনি সজ্জা করুন। আমাদিগের গোবিন্দপুরে যাইতে হইবে।"

শ্রীশ। তুমি কি বিবাহ বন্ধ করিতে পারিবে?

কমল। না পারি, দাদার সম্মুখে মরিব।

শ্রীশ। তা পারিবে না। তবে নূতন ভাইজের নাক কাটিয়া আনিতে পারিবে। চল, সেই উদ্দেশ্যে যাই।

তখন উভয়ে গোবিন্দপুর যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। পরদিন প্রাতে তাঁহারা নৌকারোহণে গোবিন্দপুর যাত্রা করিলেন। যথাকালে তথায় উপস্থিত হইলেন।

বাটীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বের দাসীদিগের এবং পল্লীস্থ স্ত্রীলোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইল, অনেকেই কমলমনিকে নৌকা হইতে লইতে আসিল। বিবাহ হইয়া গিয়াছে কি না, জানিবার জন্য তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর নিতান্ত ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, কিন্তু দুই জনের কেহই এ কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন না—এ লজ্জার কথা কি প্রকারে অপর লোককে মুখ ফুটিয়া জিজ্ঞাসা করেন?

অতি ব্যস্তে কমলমণি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন; এবার সতীশ যে পশ্চাতে পড়িয়া রহিল, তাহা ভুলিয়া গেলেন। বাটার ভিতর প্রবেশ করিয়া, স্পষ্ট স্বরে, সাহসশূন্য হইয়া দাসীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "সূর্য্যমুখী কোথায়?" মনে ভয়, পাছে কেহ বলিয়া ফেলে যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পাছে কেহ বলিয়া ফেলে সূর্য্যমুখী মরিয়াছে।

দাসীরা বলিয়া দিল, সূর্য্যমুখী শয়নগৃহে আছেন। কমলমণি ছুটিয়া শয়নগৃহে গেলেন।

প্রবেশ করিয়া প্রথমে কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তকাল ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিলেন। শেষে দেখিতে পাইলেন, ঘরের কোণে, এক রুদ্ধ গবাক্ষসন্নিধানে, অধোবদনে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। কমলমণি তাহার মুখ দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু চিনিলেন যে সূর্য্যমুখী। পরে সূর্য্যমুখী তাহার পদধ্বনি পাইয়া উঠিযা কাছে আসিলেন। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া কমলমণি, বিবাহ হইযাছে কি না, ইহা জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না—সূর্য্যমুখীর কাঁধের হাড় উঠিয়া পড়িয়াছে—নবদেবদারুতুল্য সূর্য্যমুখীর দেহতরু ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, সূর্য্যমুখীর প্রফুল্ল পদ্মপলাশ চক্ষু কোটরে পড়িয়াছে—সূর্য্যমুখীর পদ্মমুখ দীর্ঘাকৃত হইয়াছে। কমলমণি বুঝিলেন যে, বিবাহ হইয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কবে হলো?" সূর্য্যমুখী সেইরূপ মৃদুস্বরে বলিলেন, "কাল।"

তখন দুই জনে সেইখানে বসিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন—কেহ কিছু বলিলেন না। সূর্য্যমুখী কমলের কোলে মাথা লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—কমলমণির চক্ষের জল তাঁহার বক্ষে ও কেশের উপর পড়িতে লাগিল।

তখন নগেন্দ্র বৈঠকখানায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন? ভাবিতেছিলেন, "কুন্দনন্দিনী! কুন্দ আমার! কুন্দ আমার স্ত্রী! কুন্দ! কুন্দ! কুন্দ! সে আমার!" কাছে শ্রীশচন্দ্র আসিয়া বসিয়াছিলেন—ভাল করিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে পারিতেছিলেন না। এক একবার মনে পড়িতেছিল, "সূর্য্যমুখী উদ্যোগী হইয়া বিবাহ দিয়াছে—তবে আমার এ সুখে আর কাহার আপত্তি!"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ : সূর্য্যমুখী ও কমলমণি

যখন প্রদোষে, উভয়ে উভয়ের নিকট স্পষ্ট করিয়া কথা কহিতে সমর্থ হইলেন, তখন সূর্যমুখী কমলমণির কাছে নগেন্দ্র ও কুন্দনন্দিনীর বিবাহবৃত্তান্তের আমূল পরিচয় দিলেন। শুনিয়া কমলমণি বিস্মিতা হইয়া বলিলেন, "এ বিবাহ তোমার যত্নেই হইয়াছে—কেন তুমি আপনার মৃত্যুর উদ্যোগ আপনি করিলে?"

সূর্য্যমুখী হাসিয়া বলিলেন, "আমি কে?"—মৃদু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৃষ্টির পর আকাশপ্রান্তে ছিন্ন মেঘে যেমন বিদ্যুৎ হয়, সেইরূপ হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন, "আমি কে? একবার তোমার ভাইকে দেখিয়া আইস—সে মুখভরা আহ্লাদ দেখিয়া আইস,—তখন জানিবে, তিনি আজ কত সুখে সুখী। তাঁহার এত সুখ যদি আমি চক্ষে দেখিলাম, তবে কি আমার জীবন সার্থক হইল না? কোন্ সুখের আশায় তাঁকে অসুখী রাখিব? যাঁহার এক দণ্ডের অসুখ দেখিলে মরিতে ইচ্ছা করে, দেখিলাম দিবারাত্র তাঁর মর্ম্মান্তিক অসুখ—তিনি সকল সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগী হইবার উদ্যোগ কবিলেন—তবে আমার সুখ কি বহিল? বলিলাম, 'প্রভু! তোমাব সুখই আমার সুখ—তুমি কুন্দকে বিবাহ কর—আমি সুখী হইব,—তাই বিবাহ করিয়াছেন।"

কমল। আর, তুমি সুখী হইয়াছ?

সূর্য্য। আবার আমাব কথা কেন জিজ্ঞাসা কর, আমি কে? যদি কখনও স্বামীর পায়ে কাঁকর ফুটিয়াছে দেখিয়াছি, তখনই মনে হইযাছে যে, আমি ঐখানে বুক পাতিয়া দিই নাই কেন, স্বামী আমার বুকের উপর পা বাখিযা যাইতেন।

বলিয়া সূর্য্যমুখী ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন—তাঁহার চক্ষের জলে বসন ভিজিয়া গেল—পরে সহসা মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কমল কোন্ দেশে মেয়ে হলে মেবে ফেলে?"

কমল মনের ভাব বুঝিযা বলিলেন, "মেয়ে হলেই কি হয? যার যেমন কপাল, তার তেমনি ঘটে।"

সূ। আমাব কপালেব চেয়ে কাব কপাল ভাল? কে এমন ভাগ্যবতী? কে এমন স্বামী পেয়েছে? রূপ, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ্—সে সকলও তুচ্ছ কথা—এত গুণ কার স্বামীব? আমাব কপাল, জোর কপাল—তবে কেন এমন হইল?

কমল। এও কপাল।

সূ। তবে এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন?

কমল। তুমি স্বামীব আজিকার আহ্লাদপূর্ণ মুখ দেখিযা সুখী—তথাপি বলিতেছ, এ জ্বালায় মন পোড়ে কেন? দুই কথাই কি সত্য?

সূ। দুই কথাই সত্য। আমি তাঁর সুখে সুখী—কিন্তু আমায় যে তিনি পায়ে ঠেলিলেন, আমায় পায়ে ঠেলিয়াছেন বলিয়াই তাঁর এত আহ্লাদ!—

সূর্যমুখী আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল—চক্ষু ভাসিয়া গেল, কিন্তু সূর্য্যমুখীর অসমাপ্ত কথার মর্ম্ম কমলমণি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছিলেন। বলিলেন, "তোমায় পায়ে ঠেলেছেন বলে তোমার অন্তর্দ্দাহ হতেছে। তবে কেন বল, 'আমি কে?' তোমার অন্তঃকরণের আধখানা আজও আমিতে ভরা; নহিলে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াও অনুতাপ করিবে কেন?"

সূ। অনুতাপ করি না। ভালই করিয়াছি, ইহাতে আমার কোন সংশয় নাই। কিন্তু মরণে ত যন্ত্রণা আছেই। আমার মরণই ভাল বলিয়া, আপনার হাতে আপনি মরিলাম। কিন্তু তাই বলিয়া মরণের সময়ে কি তোমার কাছে কাঁদিব না?

সূর্য্যমুখী কাঁদিলেন। কমল তাঁহার মাথা আপন হৃদয়ে আনিয়া হাত দিয়া ধরিয়া রাখিলেন। কথায় সকল ব্যক্ত হইতেছিল না—কিন্তু অন্তরে অন্তরে কথোপকথন হইতেছিল। অন্তরে অন্তরে

কমলমণি বুঝিতেছিলেন যে, সূর্য্যমুখী কত দুঃখী। অন্তরে অন্তরে সূর্য্যমুখী বুঝিয়াছিলেন যে, কমলমণি তাঁহার দুঃখ বুঝিতেছেন।

উভয়ে রোদন সম্বরণ করিয়া চক্ষু মুছিলেন। সূর্য্যমুখী তখন আপনার কথা ত্যাগ করিয়া অন্যান্য কথা পাড়িলেন। সতীশচন্দ্রকে আনাইয়া আদর করিলেন, এবং তাহার সঙ্গে কথোপকথন করিলেন। কমলের সঙ্গে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত সতীশ শ্রীশচন্দ্রের কথা কহিলেন। সতীশচন্দ্রের বিদ্যাশিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদি, বিষয়ে অনেক সুখের কথার আলোচনা হইল। এইরূপ গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত উভয়ে কথোপকথন করিয়া সূর্য্যমুখী কমলকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিলেন এবং সতীশচন্দ্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিলেন। উভয়কে বিদায় দিবার কালে সূর্য্যমুখীর চক্ষের জল আবার অসম্বরণীয় হইল। রোদন করিতে করিতে তিনি সতীশকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "বাবা! আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমার মামার মত অক্ষয় গুণে গুণবান্ হও। ইহার বাড়া আশীর্ব্বাদ আমি আর জানি না।"

সূর্য্যমুখী স্বাভাবিক মৃদুস্বরে কথা কহিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার কণ্ঠস্বরের ভঙ্গীতে কমলমণি চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "বউ! তোমার মনে কি হইতেছে—কি? বল না?"

সূ। কিছু না।

কম। আমার কাছে লুকাইও না।

সূ। তোমার কাছে লুকাইবার আমার কোন কথাই নাই।

কমল তখন স্বচ্ছন্দচিত্তে শয়নমন্দিরে গেলেন। কিন্তু সূর্য্যমুখীর একটি লুকাইবার কথা ছিল। তাহা কমল প্রাতে জানিতে পারিলেন। প্রাতে সূর্য্যমুখীর সন্ধানে তাঁহার শয্যাগৃহে গিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখী তথায় নাই, কিন্তু অভুক্ত শয্যার উপরে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। পত্র দেখিয়াই কমলমণির মাথা ঘুরিয়া গেল—পত্র পড়িতে হইল না—না পড়িয়াই সকল বুঝিলেন। বুঝিলেন, সূর্য্যমুখী পলায়ন করিয়াছেন। পত্র খুলিয়া পড়িতে ইচ্ছা হইল না—তাহা করতলে বিমর্দ্দিত করিলেন। কপালে করাঘাত করিয়া শয্যায় বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "আমি পাগল। নচেৎ কাল ঘরে যাইবার সময়ে বুঝিয়াও বুঝিলাম না কেন?" সতীশ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মার কপালে করাঘাত ও রোদন দেখিয়া সেও কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ : আশীর্ব্বাদ-পত্র

শোকের প্রথম বেগ সম্বরণ হইলে, কমলমণি পত্র খুলিয়া পড়িলেন। পত্রখানির শিরোনামায় তাঁহারই নাম। পত্র এইরূপ;—

"যে দিন স্বামীর মুখে শুনিলাম যে, আমাতে আর তাঁর কিছুমাত্র সুখ নাই, তিনি কুন্দনন্দিনীর জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইবেন, অথবা প্রাণত্যাগ করিবেন, সেই দিনেই মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম, যদি কুন্দনন্দিনীকে আবার কখনও পাই, তবে তাহার হাতে স্বামীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিব। কুন্দনন্দিনীকে স্বামী দান করিয়া আপন গৃহত্যাগ করিয়া যাইব; কেন না, আমার স্বামী কুন্দনন্দিনীর হইলেন, ইহা চক্ষে দেখিতে পারিব না। এখন কুন্দনন্দিনীকে পুনর্ব্বার পাইয়া তাহাকে স্বামী দান করিলাম। আপনিও গৃহত্যাগ করিয়া চলিলাম।"

"কালি বিবাহ হইবার পরেই আমি রাত্রে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতাম। কিন্তু স্বামীর যে সুখের কামনায় আপনার প্রাণ আপনি বধ করিলাম, সে সুখ দুই এক দিন চক্ষে দেখিয়া যাইবার সাধ ছিল। আর তোমাকে আর একবার দেখিয়া যাইব সাধ ছিল। তোমাকে আসিতে লিখিয়াছিলাম—তুমি অবশ্য আসিবে, জানিতাম। এখন উভয় সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছে। আমার যিনি প্রাণাধিক, তিনি সুখী হইয়াছেন ইহা দেখিয়াছি। তোমার নিকট বিদায় লইয়াছি। আমি এখন চলিলাম।"

"তুমি যখন এই পত্র পাইবে, তখন আমি অনেক দূর যাইব। তোমাকে যে বলিয়া আসিলাম না, তাহার কারণ এই যে, তা হইলে তুমি আসিতে দিতে না। এখন তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তোমরা আমার সন্ধান করিও না।"

"আর যে তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এমত ভরসা নাই। কুন্দনন্দিনী থাকিতে আমি আর এ দেশে আসিব না—এবং আমার সন্ধানও পাইবে না। আমি এখন পথের কাঙ্গালিনী হইলাম—ভিখারিণীবেশে দেশে দেশে ফিরিব—ভিক্ষা করিয়া দিনপাত করিব—আমাকে কে চিনিবে? আমি টাকা কড়ি সঙ্গে লইলে লইতে পারিতাম, কিন্তু প্রবৃত্তি হইল না। আমার স্বামী আমি ত্যাগ করিয়া চলিলাম—সোণা রূপা সঙ্গে লইয়া যাইব?"

"তুমি আমার একটি কাজ করিও। আমার স্বামীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও। আমি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া যাইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু পারিলাম না। চক্ষের জলে অক্ষর দেখিতে পাইলাম না—কাগজ ভিজিয়া নষ্ট হইল। কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিলাম—আবার ছিঁড়িলাম—আবার ছিঁড়িলাম—কিন্তু আমার বলিবার যে কথা আছে, তাহা কোন পত্রেই বলিতে পারিলাম না। কথা বলিতে পারিলাম না বলিয়া, তাঁহাকে পত্র লেখা হইল না। তুমি যেমন করিয়া ভাল বিবেচনা কর, তেমন করিয়া আমার এ সংবাদ তাঁহাকে দিও। তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিও যে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া আমি দেশান্তরে চলিলাম না। তাঁহার উপর আমার রাগ নাই; কখনও তাঁহার উপর রাগ করি নাই, কখনও করিব না। যাঁহাকে মনে হইলেই আহ্লাদ হয়, তাঁহার উপর কি রাগ হয়? তাঁহার উপর যে অচলা ভক্তি, তাহাই রহিল, যত দিন না মাটিতে এ মাটি মেশে, তত দিন থাকিবে। কেন না, তাঁহার সহস্র গুণ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এত গুণ কাহারও নাই। এত গুণ কাহারও নাই বলিয়াই আমি তাঁহার দাসী। এক দোষে যদি তাঁহার সহস্র গুণ ভুলিতে পারিতাম, তবে আমি তাঁহার দাসী হইবার যোগ্য নহি। তাঁহার নিকট আমি জন্মের মত বিদায় লইলাম। জন্মের মত স্বামীর কাছে বিদায় লইলাম, ইহাতেই জানিতে পারিবে যে, আমি কত দুঃখে সর্ব্বত্যাগিনী হইতেছি।"

"তোমার কাছে জন্মের মত বিদায় হইলাম, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার স্বামী পুত্র দীর্ঘজীবী হউক, তুমি চিরসুখী হও। আরও আশীর্ব্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিত হইবে, সেই দিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্ব্বাদ কেহ করে নাই।"

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ বিষবৃক্ষ কি?

যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা, কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী; একবার ইহার পুষ্টি হইলে, আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর; দূর হইতে ইহার বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময়; যে খায়, সেই মরে।

ক্ষেত্রভেদে, বিষবৃক্ষে নানা ফল ফলে। পাত্রবিশেষে, বিষবৃক্ষে রোগশোকাদি নানাবিধ ফল। চিত্তসংযমপক্ষে প্রথমতঃ চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি, দ্বিতীয়তঃ চিত্তসংযমের শক্তি আবশ্যক। ইহার মধ্যে শক্তি

প্রকৃতিজন্যা; প্রবৃত্তি শিক্ষাজন্যা। প্রকৃতিও শিক্ষার উপর নির্ভর করে। সুতরাং চিত্তসংযমপক্ষে শিক্ষাই মূল। কিন্তু গুরুপদেশকে কেবল শিক্ষা বলিতেছি না, অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।

নগেন্দ্রের এ শিক্ষা কখনও হয় নাই। জগদীশ্বর তাঁহাকে সকল সুখের অধিপতি করিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন। কান্ত রূপ; অতুল ঐশ্বর্য্য; নীরোগ শরীর; সর্ব্বব্যাপিনী বিদ্যা, সুশীল চরিত্র, স্নেহময়ী সাধ্বী স্ত্রী; এ সকল এক জনের ভাগ্যে প্রায় ঘটে না। নগেন্দ্রের এ সকলই ঘটিয়াছিল। প্রধানপক্ষে, নগেন্দ্র নিজ চরিত্রগুণেই চিরকাল সুখী; তিনি সত্যবাদী, অথচ প্রিয়ংবদ; পরোপকারী, অথচ ন্যায়নিষ্ঠ; দাতা, অথচ মিতব্যয়ী; স্নেহশীল, অথচ কর্ত্তব্যকর্ম্মে স্থিরসঙ্কল্প। পিতা, মাতা বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাদিগের নিতান্ত ভক্ত এবং প্রিয়কারী ছিলেন; ভার্য্যার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন; বন্ধুর হিতকারী; ভৃত্যের প্রতি কৃপাবান; অনুগতের প্রতিপালক, শত্রুর প্রতি বিবাদশূন্য। তিনি পরামর্শে বিজ্ঞ, কার্য্যে সরল; আলাপে নম্র; রহস্যে বাঙ্ময়। এরূপ চরিত্রের পুরস্কারই অবিচ্ছিন্ন সুখ;—নগেন্দ্রের আশৈশব তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার দেশে সম্মান, বিদেশে যশঃ, অনুগত ভৃত্য; প্রজাগণের সন্নিধানে ভক্তি; সূর্য্যমুখীর নিকট অবিচলিত, অপরিমিত, অকলুষিত স্নেহরাশি। যদি তাঁহার কপালে এত সুখ না ঘটিত, তবে তিনি কখনও এত দুঃখী হইতেন না।

দুঃখী না হইলে লোভে পড়িতে হয় না। যাহাতে যাহাতে অভাব, তাহার তাহাতেই লোভ। কুন্দনন্দিনীকে লুব্ধলোচনে দেখিবার পূর্ব্বে নগেন্দ্র কখনও লোভে পড়েন নাই; কেন না, কখনও কিছুরই অভাব জানিতে পারেন নাই। সুতরাং লোভ সম্বরণ করিবার জন্য যে মানসিক অভ্যাস বা শিক্ষা আবশ্যক, তাহা তাঁহার হয় নাই। এই জন্যই তিনি চিত্তসংযমে প্রবৃত্ত হইয়াও সক্ষম হইলেন না। অবিচ্ছিন্ন সুখ, দুঃখের মূল; পূর্ব্বগামী দুঃখ ব্যতীত স্থায়ী সুখ জন্মে না।

নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ ঃ অন্বেষণ

বলা বাহুল্য যে, যখন সূর্য্যমুখীর পলায়নের সংবাদ গৃহমধ্যে রাষ্ট্র হইল, তখন তাঁহার অন্বেষণে লোক পাঠাইবার বড় তাড়াতাড়ি পড়িয়া গেল। নগেন্দ্র চারি দিকে লোক পাঠাইলেন, শ্রীশচন্দ্র লোক পাঠাইলেন, কমলমণি চার দিকে লোক পাঠাইলেন। বড় বড় দাসীরা জলের কলসী ফেলিয়া ছুটিল; হিন্দুস্থানী দ্বারবানেরা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া, তূলভরা ফরাশীর ছিটের মেরজাই গায়ে দিয়া, মস্‌মস্‌ করিয়া নাগরা জুতার শব্দ করিয়া চলিল—খান্‌সামারা গামছা কাঁধে, গোট কাঁকালে, মাঠাকুরাণীকে ফিরাতে চলিল। কতকগুলি আত্মীয় লোক গাড়ি লইয়া বড় রাস্তায় গেল। গ্রামস্থ লোক মাঠে ঘাটে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিল; কোথাও বা গাছতলায় কমিটি করিয়া তামাকু পোড়াইতে লাগিল। ভদ্রলোকেরাও বারোইয়ারির আটচালায়, শিবের মন্দিরের রকে, ন্যায়কচ্‌কচি ঠাকুরের টোলে এবং অন্যান্য তথাবিধ স্থানে বসিয়া ঘোঁট করিতে লাগিলেন। মাগী ছাগী স্নানের ঘাটগুলাকে ছোট আদালত করিয়া তুলিল। বালকমহলে ঘোর পর্ব্বাহ বাধিয়া গেল; অনেক ছেলে ভরসা করিতে লাগিল, পাঠশালার ছুটি হইবে।

প্রথমে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্র এবং কমলকে ভরসা দিতে লাগিলেন, "তিনি কখনও পথ হাঁটেন নাই—কত দূর যাইবেন? এক পোওয়া আধ ক্রোশ পথ গিয়া কোথাও বসিয়া আছেন, এখনই সন্ধান পাইব।" কিন্তু যখন দুই তিন ঘণ্টা অতীত হইল, অথচ সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, তখন নগেন্দ্র স্বয়ং তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ রৌদ্রে পুড়িয়া মনে করিলেন, "আমি খুঁজিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু হয়ত সূর্য্যমুখীকে এতক্ষণ বাড়ী আনিয়াছে।" এই বলিয়া ফিরিলেন। বাড়ী

আসিয়া দেখিলেন, সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ নাই। আবার বাহির হইলেন। আবার ফিরিয়া বাড়ী আসিলেন। এরূপ দিনমান গেল।

বস্তুতঃ শ্রীশচন্দ্র যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। সূর্য্যমুখী কখনও পদব্রজে বাটীর বাহির হয়েন নাই। কতদূর যাইবেন? বাটী হইতে অর্দ্ধক্রোশ দূরে একটা পুষ্করিণীর ধারে আম্রবাগানে শয়ন করিয়াছিলেন। একজন খানাসামা, যে অন্তঃপুরে যাতায়াত করিত, সেই সন্ধান করিতে করিতে সেইখানে আসিয়া তাঁহাকে দেখিল। চিনিয়া বলিল, "আজ্ঞে, আসুন!"

সূর্য্যমুখী কোন উত্তর করিলেন না। সে আবার বলিল, "আজ্ঞে আসুন! বাড়ীতে সকলে বড় ব্যস্ত হইয়াছেন।" সূর্য্যমুখী তখন ক্রোধভরে কহিলেন, "আমাকে ফিরাইবার তুই কে?" খানসামা ভীত হইল। তথাপি সে দাঁড়াইয়া রহিল। সূর্য্যমুখী তাহাকে কহিলেন, "তুই যদি এখানে দাঁড়াইবি, তবে এই পুষ্করিণীর জলে আমি ডুবিয়া মরিব।"

খানসামা কিছু করিতে না পারিয়া দ্রুত গিয়া নগেন্দ্রকে সংবাদ দিল। নগেন্দ্র শিবিকা লইয়া স্বয়ং সেইখানে আসিলেন। কিন্তু তখন আর সূর্য্যমুখীকে সেখানে পাইলেন না। নিকটে অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই হইল না।

সূর্য্যমুখী সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া এক বনে বসিয়াছিলেন। সেখানে এক বুড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। বুড়ী কাঠ কুড়াইতে আসিয়াছিল—কিন্তু সূর্য্যমুখীর সন্ধান দিতে পারিলে ইনাম পাওয়া যাইতে পারে, অতএব সেও সন্ধানে ছিল। সূর্য্যমুখীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কি আমাদের মা ঠাকুরাণী গা?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "না বাছা!"

বুড়ী বলিল, "হাঁ, তুমি আমাদের মা ঠাকুরাণী।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "তোমাদের মা ঠাকুরাণী কে গা?"

বুড়ী বলিল, "বাবুদের বাড়ীর বউ গা।"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "আমার গায়ে কি সোণা দানা আছে যে, আমি বাবুদের বাড়ীর বউ?"

বুড়ি ভাবিল, "তাও ত বটে?"

সে তখন কাঠ কুড়াইতে কুড়াইতে অন্য বনে গেল।

দিনমান এইরূপে বৃথায় গেল। রাত্রেও কোন ফললাভ হইল না। তৎপরদিন ও তৎপরদিনও কার্য্যসিদ্ধি হইল না—অথচ অনুসন্ধানেরও ত্রুটি হইল না। পুরুষ অনুসন্ধানকারীরা প্রায় কেহই সূর্য্যমুখীকে চিনিত না—তাহারা অনেক কাঙ্গাল গরীব ধরিয়া আনিয়া নগেন্দ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিল। শেষে ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের একা পথে ঘাটে স্নান করিতে যাওয়া দায় ঘটিল। একা দেখিলেই নগেন্দ্রের নেমকহালাল হিন্দুস্থানীরা "মা ঠাকুরাণী" বলিয়া পাছু লাগিত, এবং স্নান বন্ধ করিয়া অকস্মাৎ পাল্কী, বেহারা আনিয়া উপস্থিত করিত। অনেকে কখন পাল্কী চড়ে নাই, সুবিধা পাইয়া বিনা ব্যয়ে পাল্কী চড়িয়া লইল।

শ্রীশচন্দ্র আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। কলিকাতায় গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন। কমলমণি, গোবিন্দপুরে থাকিয়া অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সকল সুখেরই সীমা আছে

কুন্দনন্দিনী যে সুখের আশা করিতে কখন ভরসা করেন নাই, তাঁহার সে সুখ হইয়াছিল। তিনি নগেন্দ্রের স্ত্রী হইয়াছিলেন। যে দিন বিবাহ হইল, কুন্দনন্দিনী মনে করিলেন, এ সুখের সীমা নাই, পরিসীমা নাই। তাহার পর সূর্য্যমুখী পলায়ন করিলেন। তখন মনে পরিতাপ হইল—মনে করিলেন, "সূর্য্যমুখী

আমাকে অসময়ে রক্ষা করিয়াছিল—নহিলে আমি কোথায় যাইতাম—কিন্তু আজি সে আমার জন্য গৃহত্যাগী হইল। আমি সুখী না হইয়া মরিলে ভাল ছিল।" দেখিলেন সুখের সীমা আছে।

প্রদোষে নগেন্দ্র শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন—কুন্দনন্দিনী শিয়রে বসিয়া ব্যজন করিতেছেন। উভয়ে নীরবে আছেন। এটি সুলক্ষণ নহে; আর কেহ নাই—অথচ দুই জনেই নীরব—সম্পূর্ণ সুখ থাকিলে এরূপ ঘটে না।

কিন্তু সূর্য্যমুখীর পলায়ন অবধি ইঁহাদের সম্পূর্ণ সুখ কোথায়? কুন্দনন্দিনী সর্ব্বদা মনে ভাবিতেন, "কি করিলে আবার যেমন ছিল, তেমনি হয়।" আজিকার দিন, এই সময়, কুন্দনন্দিনী মুখ ফুটিয়া এ কথাটি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করিলে যেমন ছিল তেমনি হয়?"

নগেন্দ্র বিরক্তির সহিত বলিলেন, "যেমন ছিল, তেমনি হয়? তোমাকে বিবাহ করিয়াছি বলিয়া কি তোমার অনুতাপ হইয়াছে?"

কুন্দনন্দিনী ব্যথা পাইলেন। বলিলেন, "তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে?"

নগেন্দ্র বলিলেন, "ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্য্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দ্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।"

ইহা কুন্দনন্দিনী জানিতেন—কিন্তু নগেন্দ্রের ইহা বলাতে কুন্দনন্দিনী ব্যথিত হইলেন। ভাবিলেন, "এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্য্যমুখীই তে এ বিবাহ দিয়াছে?" কুন্দ আর কোন কথা না কহিয়া ব্যজনে রত হইলেন। কুন্দনন্দিনীকে অনেকক্ষণ নীরবে দেখিয়া নগেন্দ্র বলিলেন, "কথা কহিতেছ না কেন? রাগ করিয়াছ?" কুন্দ কহিলেন "না।"

ন। কেবল একটি ছোট্টো "না" বলিয়া চুপ করিলেন। তুমি কি আমায় আর ভালবাস না?'

কু। বাসি বই কি?

ন। "বাসি বই কি?" এ যে বালক-ভুলান কথা। কুন্দ, বোধ হয়, তুমি আমায় কখন ভালবাসিতে না।

কু। ববাবর বাসি।

নগেন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, এ সূর্য্যমুখী নয়। সূর্য্যমুখীর ভালবাসা যে কুন্দনন্দিনীতে ছিল না—তাহা নহে—কিন্তু কুন্দ কথা জানিতেন না। তিনি বালিকা, ভীরুস্বভাব, কথা জানেন না, কি বলিবেন? কিন্তু নগেন্দ্র তাহা বুঝিলেন না, বলিলেন, "আমাকে সূর্য্যমুখী বরাবর ভালবাসিত। বানরের গলায় মুক্তার হাব সহিবে কেন? লোহার শিকলই ভাল।"

এবার কুন্দনন্দিনী রোদন সংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহিরে গেলেন। এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার কাছে রোদন করেন। কমলমণি আসা পর্য্যন্ত কুন্দ তাঁহার কাছে যান নাই—কুন্দনন্দিনী, আপনাকে এ বিবাহের প্রধান অপরাধিনী বোধ করিয়া লজ্জায় তাঁহার কাছে মুখ দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু আজিকার মর্ম্মপীড়া, সহৃদয়া স্নেহময়ী কমলমণির সাক্ষাতে বলিতে ইচ্ছা করিলেন। সে দিন, প্রণয়ের নৈরাশ্যের সময় কমলমণি তাঁহার দুঃখে দুঃখী হইয়া তাঁহাকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়াছিলেন—সেই দিন মনে করিয়া তাঁহার কাছে কাঁদিতে গেলেন। কমলমণি কুন্দনন্দিনীকে দেখিয়া অপ্রসন্ন হইলেন—কুন্দকে কাছে আসিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিছু বলিলেন না। কুন্দ তাঁহার কাছে আসিয়া বসিয়া, কাঁদিতে লাগিলেন। কমলমণি কিছু বলিলেন না; জিজ্ঞাসাও করিলেন না, কি হইয়াছে। সুতরাং কুন্দনন্দিনী আপনা আপনি চুপ করিলেন। কমল তখন বলিলেন, "আমার কাজ আছে।" অনন্তর উঠিয়া গেলেন।

কুন্দনন্দিনী দেখিলেন, সকল সুখেরই সীমা আছে।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : বিষবৃক্ষের ফল

(হরদেব ঘোষালের প্রতি নগেন্দ্র দত্তের পত্র)

তুমি লিখিয়াছ যে, আমি এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্ব্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। আমি এই কাজ করিয়া সূর্য্যমুখীকে হারাইলাম। সূর্য্যমুখীকে পত্নীভাবে পাওয়া বড় জোর কপালের কাজ। সকলেই মাটি খোঁড়ে, কোহিনুর এক জনের কপালেই উঠে। সূর্য্যমুখী সেই কোহিনুর। কুন্দনন্দিনী কোন্ গুণে তাঁহার স্থান পূর্ণ করিবে?

তবে কুন্দনন্দিনীকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলাম কেন? ভ্রান্তি, ভ্রান্তি! এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য। আমারও মরিবার জন্য এ মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে। এখন সূর্য্যমুখীকে কোথায় পাইব?

আমি কেন কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করিয়াছিলাম? আমি কি তাহাকে ভালবাসিতাম? ভালবাসিতাম বই কি—তাহার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হইতে বসিয়াছিলাম—প্রাণ বাহির হইতেছিল। কিন্তু এখন বুঝিতেছি, সে কেবল চোখের ভালবাসা। নহিলে আজি পনের দিবসমাত্র বিবাহ করিয়াছি—এখনই বলিব কেন, "আমি তাহাকে ভালবাসিতাম?" ভালবাসিতাম কেন? এখনও ভালবাসি—কিন্তু আমার সূর্য্যমুখী কোথায় গেল? অনেক কথা লিখিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু আজ আর পারিলাম না। বড় কষ্ট হইতেছে। ইতি

(হরদেব ঘোষালের উত্তর)

আমি তোমার মন বুঝিয়াছি। কুন্দনন্দিনীকে ভালবাসিতে না, এমত নহে—এখনও ভালবাস; কিন্তু সে যে কেবল চোখের ভালবাসা, ইহা যথার্থ বলিয়াছ। সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার গাঢ় স্নেহ—কেবল দুই দিনের জন্য কুন্দনন্দিনীর ছায়ায় তাহা আবৃত হইয়াছিল। এখন সূর্য্যমুখীকে হারাইয়া তাহা বুঝিয়াছ। যতক্ষণ সূর্য্যদেব অনাচ্ছন্ন থাকেন, ততক্ষণ তাঁহার কিরণে সন্তাপিত হই, মেঘ ভাল লাগে। কিন্তু সূর্য্য অস্ত গেলে বুঝিতে পারি, সূর্য্যদেবই সংসারের চক্ষু। সূর্য্য বিনা সংসার আঁধার।

তুমি আপনার হৃদয় না বুঝিতে পারিয়া এমন গুরুতর ভ্রান্তিমূলক কাজ করিয়াছ—ইহার জন্য তিরস্কার করিব না—কেন না, তুমি যে ভ্রমে পড়িয়াছিলে, আপনা হইতে তাহার অপনোদন বড় কঠিন। মনের অনেকগুলি ভাব আছে, তাহার সকলকেই লোকে ভালবাসা বলে। কিন্তু চিত্তের যে অবস্থায়, অন্যের সুখের জন্য আমরা আত্মসুখ বিসর্জ্জন করিতে স্বতঃ প্রস্তুত হই, তাহাকে প্রকৃত ভালবাসা বলা যায়। "স্বতঃ প্রস্তুত হই," অর্থাৎ ধর্ম্মজ্ঞান বা পুণ্যাকাঙ্ক্ষায় নহে। সুতরাং রূপবতীর রূপভোগলালসা, ভালবাসা নহে। যেমন ক্ষুধাতুরের ক্ষুধাকে অন্নের প্রতি প্রণয় বলিতে পারি না, তেমনি কামাতুরের চিত্তচাঞ্চল্যকে রূপবতীর প্রতি ভালবাসা বলিতে পারি না। সেই চিত্তচাঞ্চল্যকেই আর্য্যকবিরা মদনশরজ বলিয়া বর্ণনা কবিয়াছেন। যে বৃত্তির কল্পিত অবতার বসন্তসহায় হইয়া, মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে গিয়াছিলেন, যাঁহার প্রসাদে কবির বর্ণনায় মৃগেরা মৃগীদিগের গাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করিতেছে, করিগণ করিণীদিগকে পদ্মমৃণাল ভাঙ্গিয়া দিতেছে, সে এই রূপজ মোহমাত্র। এ বৃত্তিও জগদীশ্বরপ্রেরিতা; ইহা দ্বারাও সংসারের ইষ্টসাধন হইয়া থাকে, এবং ইহা সর্ব্বজীবমুগ্ধকরী। কালিদাস, বাইরণ, জয়দেব ইহার কবি,—বিদ্যাসুন্দর ইহার ভেঙ্গান। কিন্তু ইহা প্রণয় নহে; প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণ সকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীতা হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা, এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা, এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জ্জন। এই যথার্থ প্রণয়;

সেক্ষপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি। ইহা রূপে জন্মে না। প্রথমে বুদ্ধিদ্বারা গুণগ্রহণ, গুণগ্রহণের পর আসঙ্গলিপ্সা; আসঙ্গলিপ্সা সফল হইলে সংসর্গ, সংসর্গফলে প্রণয়, প্রণয়ে আত্মবিসর্জ্জন। আমি ইহাকেই ভালবাসা বলি। নিতান্ত পক্ষে স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, আমার বিবেচনায় এইরূপ। আমার বোধ হয়, অন্য ভালবাসারও মূল এইরূপ; তবে স্নেহ এক কারণে উপস্থিত হয় না। কিন্তু সকল কারণই বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। নিতান্ত পক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কারণজাত স্নেহ ভিন্ন স্থায়ী হয় না। রূপজ মোহ তাহা নহে। রূপদর্শনজনিত যে সকল চিত্তবিকৃতি, তাহার তীক্ষ্ণতা পৌনঃপুন্যে হ্রস্ব হয়। অর্থাৎ পৌনঃপুন্যে পরিতৃপ্তি জন্মে। গুণজনিতের পরিতৃপ্তি নাই। কেন না, রূপ এক—প্রত্যহই তাহার এক প্রকারই বিকাশ, গুণ নিত্য নূতন নূতন ক্রিয়ায় নূতন নূতন হইয়া প্রকাশ পায়। রূপেও প্রণয় জন্মে, গুণেও প্রণয় জন্মে—কেন না, উভয়ের দ্বারা আসঙ্গলিপ্সা জন্মে। যদি উভয় একত্রিত হয়, তবে প্রণয় শীঘ্র জন্মে; কিন্তু একবার প্রণয়সংসর্গ ফল বদ্ধমূল হইলে, রূপ থাকা না থাকা সমান। রূপবান্ ও কুৎসিতেব প্রতি স্নেহ ইহার নিত্য উদাহরণস্থল।

গুণজনিত প্রণয় চিরস্থায়ী বটে—কিন্তু গুণ চিনিতে দিন লাগে। এই জন্য সে প্রণয় একেবারে হঠাৎ বলবান্ হয় না—ক্রমে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু রূপজ মোহ এককালীন সম্পূর্ণ বলবান্ হইবে। তাহার প্রথম বল এমন দুর্দ্দমনীয় হয় যে, অন্য সকল বৃত্তি তদ্দ্বারা উচ্ছিন্ন হয়। এই মোহ কি—এই স্থায়ী প্রণয় কি না—ইহা জানিবার শক্তি থাকে না। অনন্তকালস্থায়ী প্রণয় বলিয়া তাহাকে বিবেচনা হয়। তোমার তাহাই বিবেচনা হইয়াছিল—এই মোহের প্রথম বলে সূর্য্যমুখীর প্রতি তোমার যে স্থায়ী প্রেম, তাহা তোমার চক্ষে অদৃশ্য হইয়াছিল। এই তোমার ভ্রান্তি। এ ভ্রান্তি মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব তোমাকে তিরস্কার করিব না। বরং পরামর্শ দিই, ইহাতেই সুখী হইবার চেষ্টা কর।

তুমি নিরাশ হইও না। সূর্য্যমুখী অবশ্য পুনবাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কত কাল থাকিবেন? যত দিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে, কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্য্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে। বিশেষ কনিষ্ঠা তোমাকে ভালবাসেন। ভালবাসায় কখন অযত্ন করিবে না; কেন না, ভালবাসাতেই মানুষের একমাত্র নির্ম্মল এবং অবিনশ্বর সুখ। ভালবাসাই মনুষ্যজাতির উন্নতির শেষ উপায়—মনুষ্যমাত্রে পরস্পরে ভালবাসিলে আর মনুষ্যকৃত অনিষ্ট পৃথিবীতে থাকিবে না।

(নগেন্দ্রনাথের প্রত্যুত্তর)

তোমার পত্র পাইয়া, মানসিক ক্লেশের কারণ এ পর্য্যন্ত উত্তর দিই নাই। তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহা সকলই বুঝিয়াছি এবং তোমার পরামর্শই যে সৎপরামর্শ তাহাও জানি। কিন্তু গৃহে মনঃস্থির করিতে পারি না। এক মাস হইল, আমার সূর্য্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। তিনি যে পথে গিয়াছেন, আমিও সেই পথে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমিও গৃহত্যাগ করিব। দেশে দেশে তাঁহার সন্ধান করিয়া বেড়াইব। তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারি না। সে চক্ষুঃশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই—কিন্তু আমি তাঁহার মুখদর্শন আর সহ্য করিতে পারি না। আগে কিছু বলিতাম না—এখন নিত্য ভর্ৎসনা করি—সে কাঁদে,—আমি কি করিব? আমি চলিলাম, শীঘ্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অন্যত্র যাইব। ইতি

নগেন্দ্রনাথ যেরূপ লিখিয়াছিলেন, সেইরূপই করিলেন। বিষয়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দেওয়ানের উপরই ন্যস্ত করিয়া অচিরাৎ গৃহত্যাগ করিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন। কমলমণি অগ্রেই

কলিকাতায় গিয়াছিলেন। সুতরাং এ আখ্যায়িকার লিখিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কুন্দনন্দিনী একাই দত্তদিগের অন্তঃপুরে রহিলেন, আর হীরা দাসী পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রহিল।

দত্তদিগের সেই সুবিস্তৃতা পুরী অন্ধকার হইল। যেমন বহুদীপসমুজ্জ্বল, বহুলোকসমাকীর্ণ, গীতধ্বনিপূর্ণ নাট্যশালা নাট্যরঙ্গ সমাপন হইলে পর অন্ধকার, জনশূন্য, নীরব হয়; এই মহাপুরী সূর্য্যমুখীনগেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সেইরূপ আঁধার হইল। যেমন বালক, চিত্রিত পুত্তলি লইয়া একদিন ক্রীড়া করিয়া, পুতুল ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেয়, পুতুল মাটিতে পড়িয়া থাকে, তাহার উপর মাটি পড়ে, তৃণাদি জন্মিতে থাকে; তেমনি কুন্দনন্দিনী, ভগ্ন পুতুলের ন্যায় নগেন্দ্র কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একাকিনী সেই বিস্তৃতা পুরীমধ্যে অযত্নে পড়িয়া রহিলেন। যেমন দাবানলে বনদাহকালীন শাবকসহিত পক্ষিনীড় দগ্ধ হইলে, পক্ষিণী আহার লইয়া আসিয়া দেখ, বৃক্ষ নাই, বাসা নাই, শাবক নাই; তখন বিহঙ্গী নীড়ান্বেষণে উচ্চ কাতরোক্তি করিতে করিতে সেই দগ্ধ বনের উপরে মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া বেড়ায়, নগেন্দ্র সেইরূপ সূর্য্যমুখীর সন্ধানে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যেমন অনন্তসাগরে অতলজলে মণিখণ্ড ডুবিলে আর দেখা যায় না, সূর্য্যমুখী তেমনি দুষ্প্রাপণীয়া হইলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ

কার্পাসবস্ত্রমধ্যস্থ তপ্ত অঙ্গারের ন্যায়, দেবেন্দ্রের নিরুপম মূর্ত্তি হীরার অন্তঃকরণকে স্তরে স্তরে দগ্ধ করিতেছিল। অনেকবার হীরার ধর্ম্মভীতি এবং লোকলজ্জা, প্রণয়বেগে ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইল; কিন্তু দেবেন্দ্রের স্নেহহীন ইন্দ্রিয়পর চরিত্র মনে পড়াতে আবার তাহা বদ্ধমূল হইল। হীরা চিত্তসংযমে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালিনী এবং সেই ক্ষমতা ছিল বলিয়াই, সে বিশেষ ধর্ম্মভীতা না হইয়াও এ পর্য্যন্ত সতীত্বধর্ম্ম সহজেই রক্ষা করিয়াছিল। সেই ক্ষমতাপ্রভাবেই, সে দেবেন্দ্রের প্রতি প্রবলানুরাগ অপাত্রন্যস্ত জানিয়া সহজেই শমিত করিয়া রাখিতে পারিল। বরং চিত্তসংযমের সদুপায়স্বরূপ হীরা স্থির করিল যে, পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি অবলম্বন করিবে। পরগৃহের গৃহকর্ম্মাদিতে অনুদিন নিরত থাকিলে, সে অন্য মনে এই বিফলানুরাগের বৃশ্চিকদংশনস্বরূপ জ্বালা ভুলিতে পারিবে। নগেন্দ্র যখন কুন্দনন্দিনীকে গোবিন্দপুরে রাখিয়া পর্য্যটনে যাত্রা করিলেন, তখন হীরা ভূতপূর্ব আনুগত্যের বলে দাসীত্ব ভিক্ষা করিল। কুন্দের অভিপ্রায় জানিয়া নগেন্দ্র হীরাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্য্যায় নিযুক্ত রাখিয়া গেলেন।

হীরার পুনর্ব্বার দাসীবৃত্তি স্বীকার করার আরও একটি কারণ ছিল। হীরা পূর্ব্বে অর্থাদি কামনায়, কুন্দকে নগেন্দ্রের ভবিষ্যৎ প্রিয়তমা মনে করিয়া স্বীয় বশীভূত করিবার জন্য যত্ন পাইয়াছিল। ভাবিয়াছিল, নগেন্দ্রের অর্থ কুন্দের হস্তগত হইবে, কুন্দের হস্তগত অর্থ হীরার হইবে। এক্ষণে সেই কুন্দ নগেন্দ্রের গৃহিণী হইল। অর্থসম্বন্ধে কুন্দের কোন বিশেষ আধিপত্য জন্মিল না, কিন্তু এখন সে কথা হীরারও মনে স্থান পাইল না। হীরার অর্থে আর মন ছিল না, মন থাকিলেও কুন্দ হইতে লব্ধ অর্থ বিষতুল্য বোধ হইত।

হীরা, আপন নিষ্ফল প্রণয়যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর প্রতি দেবেন্দ্রের অনুরাগ সহ্য করিতে পারিল না। যখন হীরা শুনিল যে, নগেন্দ্র বিদেশ পরিভ্রমণে যাত্রা করিবেন, কুন্দনন্দিনী গৃহে গৃহিণী হইয়া থাকিবেন, তখন হরিদাসী বৈষ্ণবীকে স্মরণে হীরার মহাভয়সঞ্চার হইল। হীরা, হরিদাসী বৈষ্ণবীর যাতায়াতের পথে কাঁটা দিবার জন্য প্রহরী হইয়া আসিল।

হীরা কুন্দনন্দিনীর মঙ্গলকামনা করিয়া এরূপ অভিসন্ধি করে নাই। হীরা ঈর্ষ্যাবশতঃ কুন্দের উপরে এরূপ জাতক্রোধ হইয়াছিল যে, তাহার মঙ্গলচিন্তা দূরে থাকুক, কুন্দের নিপাত দৃষ্টি করিলে পরমাহ্লাদিত হইত। পাছে কুন্দের সঙ্গে দেবেন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়, এইরূপ ঈর্ষ্যাজাত ভয়েই হীরা নগেন্দ্রের পত্নীকে প্রহরাতে রাখিল।

হীরা দাসী, কুন্দের এক যন্ত্রণার মূল হইয়া উঠিল। কুন্দ দেখিল, হীরার সে যত্ন, মমতা বা প্রিয়বাদিনীত্ব নাই। দেখিল যে, হীরা দাসী হইয়া তাহার প্রতি সর্ব্বদা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং তিরস্কৃত ও অপমানিত করে। কুন্দ নিতান্ত শান্তস্বভাব; হীরার আচরণে নিতান্ত পীড়িতা হইয়াও কখনও তাহাকে কিছু বলিত না। কুন্দ শীতলপ্রকৃতি, হীরা উগ্রপ্রকৃতি। এজন্য কুন্দ প্রভুপত্নী হইয়াও দাসীর নিকট দাসীর মত থাকিতে লাগিল, হীরা দাসী হইয়াও প্রভুপত্নীর প্রভু হইয়া বসিল। পুরবাসিনীরা কখনও কখনও কুন্দের যন্ত্রণা দেখিয়া হীরাকে তিরস্কার করিত, কিন্তু বাক্যময়ী হীরার নিকট তাল ফাঁদিতে পারিত না। দেওয়ানজী, এ সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া হীরাকে বলিলেন, "তুমি দূর হও। তোমাকে জবাব দিলাম।" শুনিয়া হীরা রোষবিস্ফারিতলোচনে দেওয়ানজীকে কহিল, "তুমি জবাব দিবার কে? আমাকে মুনিব রাখিয়া গিয়াছেন। মুনিবের কথা নহিলে আমি যাইব না। আমাকে জবাব দিবার তোমার যে ক্ষমতা, তোমাকে জবাব দিবার আমারও সে ক্ষমতা।" শুনিয়া দেওয়ানজী অপমানভয়ে দ্বিতীয় বাক্যব্যয় করিতে পারিলেন না। হীরা আপন জোরেই রহিল। সূর্য্যমুখী নহিলে কেহ হীরাকে শাসিত করিতে পারিত না।

এক দিন নগেন্দ্র বিদেশ যাত্রা করিলে পর, হীরা একাকিনী অন্তঃপুরসন্নিহিত পুষ্পোদ্যানে লতামণ্ডপে শয়ন করিয়াছিল। নগেন্দ্র ও সূর্য্যমুখী পরিত্যাগ করা অবধি সে সকল লতামণ্ডপ হীরারই অধিকারগত হইয়াছিল। তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। আকাশে প্রায় পূর্ণচন্দ্র শোভা করিতেছে। উদ্যানের ভাস্বর বৃক্ষপত্রে তৎকিরণমালা প্রতিফলিত হইতেছে। লতাপল্লবরন্ধ্রমধ্য হইতে অপসৃত হইয়া চন্দ্রকিরণ শ্বেতপ্রস্তরময় হর্ম্ম্যতলে পতিত হইয়াছে এবং সমীপস্থ দীর্ঘিকার প্রদোষবায়ুসন্তাড়িত স্বচ্ছ জলের উপর নাচিতেছে। উদ্যানপুষ্পের সৌরভে আকাশ উন্মাদকর হইয়াছিল। এমত সময় হীরা অকস্মাৎ লতামণ্ডপমধ্যে পুরুষমূর্ত্তি দেখিতে পাইল। চাহিয়া দেখিল যে, সে দেবেন্দ্র। অদ্য দেবেন্দ্র ছদ্মবেশী নহেন, নিজবেশেই আসিয়াছেন।

হীরা বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আপনার এ অতি দুঃসাহস। কেহ দেখিতে পাইলে আপনি মারা পড়িবেন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "যেখানে হীরা আছে, সেখানে আমার ভয় কি?" এই বলিয়া দেবেন্দ্র হীরার পার্শ্বে বসিলেন। হীরা চরিতার্থ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিল, "কেন এখানে এসেছেন? যার আশায় এসেছেন, তার দেখা পাইবেন না।"

"তা ত পাইয়াছি। আমি তোমারই আশায় এসেছি।"

হীরা লুব্ধ চাটুকারের কপটালাপে প্রতারিত না হইয়া হাসিল এবং কহিল; "আমার কপাল যে এত প্রসন্ন হইয়াছে, তা ত জানি না। যাহা হউক, যদি আমার ভাগ্যই ফিরিয়াছে, তবে যেখানে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আপনাকে দেখিয়া মনের তৃপ্তি হইবে, এমন স্থানে যাই চলুন। এখানে অনেক বিঘ্ন।"

দেবেন্দ্র বলিলেন, "কোথায় যাইব?"

হীরা বলিল, "যেখানে কোন ভয় নাই। আমার সেই নিকুঞ্জ বনে চলুন।"

দে। তুমি আমার জন্য কোন ভয় করিও না।

হী। যদি আপনার জন্য ভয় না থাকে, আমার জন্য ভয় করিতে হয়। আমাকে আপনার কাছে কেহ দেখিলে, আমার দশা কি হইবে?

দেবেন্দ্র সঙ্কুচিত হইয়া কহিলেন, "তবে চল। তোমাদের নূতন গৃহিণীর সঙ্গে আলাপটা একবার ঝালিয়ে গেলে হয় না?"

হীরা এই কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রের প্রতি যে ঈর্ষ্যানলজ্বলিত কটাক্ষ করিল, দেবেন্দ্র অস্পষ্টালোকে ভাল দেখিতে পাইলেন না। হীরা কহিল, "তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবেন কি প্রকারে?"

দেবেন্দ্র বিনীতভাবে কহিলেন, "তুমি কৃপা করিলে সকলই হয়।"

হীরা কহিল, "তবে এইখানে আপনি সতর্ক হইয়া বসিয়া থাকুন, আমি তাঁহাকে ডাকিয়া

আনিতেছি।"

এই বলিয়া হীরা লতামণ্ডপ হইতে বাহির হইল। কিয়দ্দূর আসিয়া এক বৃক্ষান্তরালে বসিল এবং তখন তাহার কণ্ঠসংরুদ্ধ নয়নবারি দরবিগলিত হইয়া বহিতে লাগিল। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, কিন্তু কুন্দনন্দিনীর কাছে গেল না। বাহিরে গিয়া দ্বাররক্ষকদিগকে কহিল, "তোমরা শীঘ্র আইস, ফুলবাগানে চোর আসিয়াছে।"

তখন দোবে, চোবে, পাঁড়ে এবং তেওয়ারি পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া অন্তঃপুরমধ্য দিয়া ফুলবাগানের দিকে ছুটিল। দেবেন্দ্র দূর হইতে তাহাদের নাগরা জুতার শব্দ শুনিয়া দূর হইতে কালো গালপাট্টা দেখিতে পাইয়া, লতামণ্ডপ হইতে লাফ দিয়া বেগে পলায়ন করিল। তেওয়ারি গোষ্ঠী কিছু দূর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। তাহারা দেবেন্দ্রকে ধরিতে পারিয়াও ধরিল না। কিন্তু দেবেন্দ্র কিঞ্চিৎ পুরস্কৃত না হইয়া গেলেন না। পাকা বাঁশের লাঠির আস্বাদ তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, আমার নিশ্চিত জানি না, কিন্তু দ্বারবান্ কর্তৃক "শ্বশুরা", "শালা" প্রভৃতি প্রিয়সম্বন্ধসূচক নানা মিষ্ট সম্বোধনের দ্বারা অভিহিত হইয়াছিলেন, এমত আমরা শুনিয়াছি। এবং তাঁহার ভৃত্য এক দিন তাঁহার প্রসাদী ব্রাণ্ডি খাইয়া পরদিবস আপন উপপত্নীর নিকট গল্প করিয়াছিল যে, "আজ বাবুকে তেল মাখাইবার সময় দেখি যে, তাঁহার পিঠে একটা কালশিরা দাগ।"

দেবেন্দ্র গৃহে গিয়া দুই বিষয়ে স্থিরকল্প হইলেন। প্রথম, হীরা থাকিতে তিনি আর দত্তবাড়ী যাইবেন না। দ্বিতীয়, হীরাকে ইহার প্রতিফল দিবেন। পরিণামে তিনি হীরাকে গুরুতর প্রতিফল প্রদান করিলেন। হীরার লঘুপাপে গুরুদণ্ড হইল। হীরা এমত গুরুতর শাস্তি প্রাপ্ত হইল যে, তাহা দেখিয়া শেষে দেবেন্দ্রেরও পাষাণহৃদয় বিদীর্ণ হইয়াছিল। তাহা বিস্তারে বর্ণনীয় নহে, পরে সংক্ষেপে বলিব।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ পথিপার্শ্বে

বর্ষাকাল। বড় দুর্দ্দিন। সমস্ত দিন বৃষ্টি হইয়াছে। একবারও সূর্য্যোদয় হয় নাই। আকাশ মেঘে ঢাকা। কাশী যাইবার পাকা রাস্তার ঘুটিঙ্গের উপর একটু একটু পিছল হইয়াছে। পথে প্রায় লোক নাই—ভিজিয়া ভিজিয়া কে পথ চলে? একজন মাত্র পথিক পথ চলিতেছিল। পথিকের ব্রহ্মচারীর বেশ। গৈরিকবর্ণ বস্ত্র পরা—গলায় রুদ্রাক্ষ—কপালে চন্দনরেখা—জটার আড়ম্বর কিছু নাই, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশ কতক কতক শ্বেতবর্ণ। এক হাতে গোলপাতার ছাতা, অপর হাতে তৈজস—ব্রহ্মচারী ভিজিতে ভিজিতে চলিয়াছেন। একে ত দিনেই অন্ধকার, তাহাতে আবার পথে রাত্রি হইল—অমনি পৃথিবী মসীময়ী হইল—পথিক কোথায় পথ, কোথায় অপথ, কিছু অনুভব করিতে পারিলেন না। তথাপি পথিক পথ অতিবাহিত করিয়া চলিলেন—কেন না, তিনি সংসারত্যাগী, ব্রহ্মচারী। যে সংসারত্যাগী, তাহার অন্ধকার, আলো, কুপথ, সুপথ সব সমান।

রাত্রি অনেক হইল। ধরণী মসীময়ী—আকাশের মুখে কৃষ্ণাবগুণ্ঠন। বৃক্ষগণের শিরোমালা কেবল গাঢ়তর অন্ধকারের স্তূপস্বরূপ লক্ষিত হইতেছে। সেই বৃক্ষশিরোমালার বিচ্ছেদে মাত্র পথের রেখা অনুভূত হইতেছে। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছে। এক একবার বিদ্যুৎ হইতেছে—সে আলোর অপেক্ষা আঁধার ভাল। অন্ধকারে ক্ষণিক বিদ্যুদালোকে সৃষ্টি যেমন ভীষণ দেখায়, অন্ধকারে তত নয়।

"মা গো!"

অন্ধকারে যাইতে যাইতে ব্রহ্মচারী অকস্মাৎ পথিমধ্যে এই শব্দসূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস শুনিতে পাইলেন। শব্দ অলৌকিক—কিন্তু তথাপি মনুষ্যকণ্ঠনিঃসৃত বলিয়া নিশ্চিত বোধ হইল। শব্দ অতি মৃদু, অথচ অতিশয় ব্যথাব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। ব্রহ্মচারী পথে স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। কতক্ষণে আবার বিদ্যুৎ হইবে—সেই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঘন ঘন বিদ্যুৎ হইতেছিল। বিদ্যুৎ হইলে

পথিক দেখিলেন পথিপার্শ্বে কি একটা পড়িয়া আছে। এটা কি মনুষ্য? পথিক তাহাই বিবেচনা করিলেন। কিন্তু আর একবার বিদ্যুতের অপেক্ষা করিলেন। দ্বিতীয় বার বিদ্যুতে স্থির করিলেন, মনুষ্য বটে। তখন পথিক ডাকিয়া বলিলেন, "কে তুমি পথে পড়িয়া আছ?"

কেহ কোন উত্তর দিলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার অস্ফুট কাতরোক্তি আবার মুহূর্ত্তজন্য কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন ব্রহ্মচারী ছত্র, তৈজস ভূতলে রাখিয়া, সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ হস্তপ্রসারণ করিতে লাগিলেন। অচিরাৎ কোমল মনুষ্যদেহে করস্পর্শ হইল। "কে গা তুমি?" শিরোদেশে হাত দিয়া কবরী স্পর্শ করিলেন, "দুর্গে! এ যে স্ত্রীলোক!"

তখন ব্রহ্মচারী উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া মুমূর্ষু অথবা অচেতন ঐ স্ত্রীলোকটিকে, দুই হস্ত দ্বারা কোলে তুলিলেন। ছত্র তৈজস পথে পড়িয়া রহিল। ব্রহ্মচারী পথ ত্যাগ করিয়া সেই অন্ধকারে মাঠ ভাঙ্গিয়া গ্রামাভিমুখে চলিলেন। ব্রহ্মচারী এ প্রদেশের পথ ঘাট গ্রাম বিলক্ষণ জানিতেন। শরীর বলিষ্ঠ নহে, তথাপি শিশুসন্তানবৎ সেই মরণোন্মুখীকে কোলে করিয়া এই দুর্গম পথ ভাঙ্গিয়া চলিলেন। যাহারা পরোপকারী, পরপ্রেমে বলবান্, তাহারা কখনও শারীরিক বলের অভাব জানিতে পারে না।

গ্রামের প্রান্তভাগে ব্রহ্মচারী এক পর্ণকুটীর প্রাপ্ত হইলেন। নিঃসঙ্গ স্ত্রীলোককে ক্রোড়ে লইয়া সেই কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। ডাকিলেন, "বাছা হর, ঘরে আছ গা?" কুটীরমধ্য হইতে একজন স্ত্রীলোক কহিল, "এ যে ঠাকুরের গলা শুনিতে পাই। ঠাকুর কবে এলেন?"

ব্রহ্মচারী। এই আসছি। শীঘ্র দ্বার খোল—আমি বড় বিপদ্গ্রস্ত।

হরমণি কুটীরের দ্বার মোচন করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাকে প্রদীপ জ্বালিতে বলিয়া দিয়া, আস্তে আস্তে স্ত্রীলোকটিকে গৃহমধ্যে মাটির উপর শোয়াইলেন। হর দীপ জ্বালিত করিল, তাহা মুমূর্ষুর মুখের কাছে আনিয়া উভয়ে তাঁহাকে বিশেষ করিয়া দেখিলেন।

দেখিলেন, স্ত্রীলোকটি প্রাচীনা নহে। কিন্তু এখন তাহার শরীরের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে তাহার বয়স অনুভব করা যায় না। তাহার শরীর অত্যন্ত শীর্ণ—সাংঘাতিক পীড়ার লক্ষণযুক্ত। সময়বিশেষে তাহার সৌন্দর্য্য ছিল—এমত হইলেও হইতে পারে; কিন্তু এখন সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নাই। আর্দ্র বস্ত্র অত্যন্ত মলিন;—এবং শত স্থানে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন। আলুলায়িত আর্দ্র কেশ চিররুক্ষ। চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট। এখন সে চক্ষু নিমীলিত। নিশ্বাস বহিতেছে—কিন্তু সংজ্ঞা নাই। বোধ হইল যেন মৃত্যু নিকট।

হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "একে কোথায় পেলেন?"

ব্রহ্মচারী সবিশেষ পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ইহার মৃত্যু নিকট দেখিতেছি। কিন্তু তাপ সেক করিলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে। আমি যেমন বলি, তাই করিয়া দেখ।"

তখন হরমণি ব্রহ্মচারীর আদেশমত, তাহাকে আর্দ্র বস্ত্রের পরিবর্ত্তে আপনার একখানি শুষ্ক বস্ত্র কৌশলে পরাইল। শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা তাহার অঙ্গের এবং কেশের জল মুছাইল। পরে অগ্নি প্রস্তুত করিয়া তাপ দিতে লাগিল। ব্রহ্মচারী বলিলেন, "বোধ হয়, অনেকক্ষণ অবধি অনাহারে আছে। যদি ঘরে দুধ থাকে, তবে একটু একটু করে দুধ খাওয়াইবার চেষ্টা দেখ।"

হরমণির গোরু ছিল—ঘরে দুধও ছিল। দুধ তপ্ত করিয়া অল্প অল্প করিয়া স্ত্রীলোকটিকে পান করাইতে লাগিল। স্ত্রীলোক তাহা পান করিল। উদরে দুগ্ধ প্রবেশ করিলে সে চক্ষু উন্মীলিত করিল। দেখিয়া হরমণি জিজ্ঞাসা করিল, "মা, তুমি কোথা থেকে আসিতেছিলে গা?"

সংজ্ঞালব্ধ স্ত্রীলোক কহিল, "আমি কোথা?"

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "তোমাকে পথে মুমূর্ষু অবস্থায় দেখিয়া এখানে আনিয়াছি। তুমি কোথা যাইবে?"

স্ত্রীলোক বলিল, "অনেক দূর।"

হরমণি। তোমার হাতে রুলি রয়েছে। তুমি সধবা?

পীড়িত ভ্রূভঙ্গী করিল। হরমণি অপ্রতিভ হইল।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাছা, তোমায় কি বলিয়া ডাকিব? তোমার নাম কি?"
অনাথিনী কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "আমার নাম সূর্য্যমুখী।"

পঞ্চত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ আশাপথে

সূর্য্যমুখীর বাঁচিবার আশা ছিল না। ব্রহ্মচারী তাঁহার পীড়ার লক্ষণ বুঝিতে না পারিয়া পরদিন প্রাতে গ্রামস্থ বৈদ্যকে ডাকাইলেন।

রামকৃষ্ণ রায় বড় বিজ্ঞ। বৈদ্যশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত। চিকিৎসাতে গ্রামে তাঁহার বিশেষ যশঃ ছিল। তিনি পীড়ার লক্ষণ দেখিয়া বলিলেন, "ইঁহার কাস রোগ। তাহার উপর জ্বর হইতেছে। পীড়া সাঙ্ঘাতিক বটে। তবে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারেন।"

এ সকল কথা সূর্য্যমুখীর অসাক্ষাতে হইল। বৈদ্য ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—অনাথিনী দেখিয়া পারিতোষিকের কথাটি রামকৃষ্ণ রায় উত্থাপন করিলেন না। রামকৃষ্ণ রায় অর্থপিপাসু ছিলেন না। বৈদ্য বিদায় হইলে, ব্রহ্মচারী হরমণিকে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিয়া, বিশেষ কথোপকথনের জন্য সূর্য্যমুখীর নিকট বসিলেন। সূর্য্যমুখী বলিলেন, "ঠাকুর! আপনি আমার জন্য এত যত্ন করিতেছেন কেন? আমার জন্য ক্লেশেব প্রয়োজন নাই।"

ব্রহ্ম। আমার ক্লেশ কি? এই আমার কার্য্য। আমার কেহ নাই। আমি ব্রহ্মচারী। পরোপকার আমার ধর্ম্ম। আজ যদি তোমার কাজে নিযুক্ত না থাকিতাম; তবে তোমাব মত অন্য কাহারও কাজে থাকিতাম।

সূর্য্য। তবে, আমাকে রাখিয়া, আপনি অন্য কাহারও উপকারে নিযুক্ত হউন। আপনি অন্যের উপকার করিতে পারিবেন—আমার আপনি উপকার করিতে পারিবেন না।

ব্রহ্ম। কেন?

সূর্য্য। বাঁচিলে আমার উপকার নাই। মরাই আমার মঙ্গল। কাল রাত্রে যখন পথে পড়িয়াছিলাম—তখন নিতান্ত আশা করিয়াছিলাম যে, মরিব। আপনি কেন আমাকে বাঁচাইলেন?

ব্রহ্ম। তোমার এত কি দুঃখ, তাহা আমি জানি না—কিন্তু দুঃখ যতই হউক না কেন, আত্মহত্যা মহাপাপ। কদাচ আত্মহত্যা করিও না। আত্মহত্যা পরহত্যাতুল্য পাপ।

সূর্য্য। আমি আত্মহত্যা করিবাব চেষ্টা করি নাই। আমার মৃত্যু আপনি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল—এই জন্য ভরসা করিতেছিলাম। কিন্তু মরণেও আমার আনন্দ নাই।

"মরণে আনন্দ নাই" এই কথা বলিতে সূর্য্যমুখীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল। চক্ষু দিয়া জল পড়িল।

ব্রহ্মচারী কহিলেন, "যত বার মরিবার কথা হইল, তত বার তোমার চক্ষে জল পড়িল, দেখিলাম। অথচ তুমি মরিতে চাহ। মা, আমি তোমার সন্তান সদৃশ। আমাকে পুত্র বিবেচনা করিয়া মনের বাসনা ব্যক্ত করিয়া বল। যদি তোমার দুঃখনিবারণের কোন উপায় থাকে, আমি তাহা করিব। এই কথা বলিয়াই, হরমণিকে বিদায় দিয়া, নির্জ্জনে তোমার কাছে আসিয়া বসিয়াছি। কথাবার্ত্তায় বুঝিতেছি, তুমি বিশেষ ভদ্রঘরের কন্যা হইবে। তোমার যে উৎকট মনঃপীড়া আছে, তাহাও বুঝিতেছি। কেন তাহা আমার সাক্ষাতে বলিবে না? আমাকে সন্তান মনে করিয়া বল।"

সূর্য্যমুখী সজললোচনে কহিলেন, "এখন মরিতে বসিয়াছি—লজ্জাই বা এ সময়ে কেন করি? আর আমার মনোদুঃখ কিছুই নয়—কেবল মরিবার সময় যে স্বামীর মুখ দেখিতে পাইলাম না, এই দুঃখ। মরণেই আমার সুখ—কিন্তু যদি তাঁহাকে না দেখিয়া মরিলাম, তবে মরণেও দুঃখ। যদি এ সময়ে একবার দেখিতে পাই, তবে মরণেই আমার সুখ।"

ব্রহ্মচারীও চক্ষু মুছিলেন। বলিলেন, "তোমার স্বামী কোথায়?" এখন তোমাকে তাঁহার কাছে

লইয়া যাইবার উপায় নাই। কিন্তু তিনি যদি, সংবাদ দিলে, এখানে আসিতে পারেন, তবে আমি তাঁহাকে পত্রের দ্বারা সংবাদ দিই।"

সূর্য্যমুখীর রোগক্লিষ্ট মুখে হর্ষবিকাশ হইল। তখন আবার ভগ্নোৎসাহ হইয়া কহিলেন, "তিনি আসিলে আসিতে পারেন, কিন্তু আসিবেন কি না, জানি না। আমি তাঁহার কাছে গুরুতর অপরাধে অপরাধী—তবে তিনি আমার পক্ষে দয়াময়—ক্ষমা করিলেও করিতে পারেন। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আছেন—আমি তত দিন বাঁচিব কি?"

ব্র। কত দূরে সে।

সূ। হরিপুর জেলা

ব্র। বাঁচিবে।

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কাগজ কলম লইয়া আসিলেন, এবং সূর্য্যমুখীর কথামত নিম্নলিখিত মত পত্র লিখিলেন—

"আমি মহাশয়ের নিকট পরিচিত নহি। আমি ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে আছি। আপনি কে তাহাও আমি জানি না। কেবল এইমাত্র জানি যে, শ্রীমতী সূর্য্যমুখী দাসী আপনার ভার্য্যা। তিনি এই মধুপুর গ্রামে সঙ্কটাপন্ন রোগগ্রস্ত হইয়া হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ীতে আছেন। তাঁহার চিকিৎসা হইতেছে—কিন্তু বাঁচিবার আকার নহে। এই সংবাদ দিবার জন্য আপনাকে এ পত্র লিখিলাম। তাঁহার মানস, মৃত্যুকালে একবার আপনার দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। যদি তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিতে পারেন, তবে একবার এই স্থানে আসিবেন। আমি ইঁহাকে মাতৃ সম্বোধন করি। পুত্রস্বরূপ তাঁহার অনুমতিক্রমে এই পত্র লিখিলাম। তাঁহার নিজের লিখিবার শক্তি নাই।

"যদি আসা মত হয়, তবে রাণীগঞ্জের পথে আসিবেন। রাণীগঞ্জে অনুসন্ধান করিয়া শ্রীমান্ মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। তাঁহাকে আমার নাম করিয়া বলিলে তিনি সঙ্গে লোক দিবেন। তাহা হইলে মধুপুরে খুঁজিয়া বেড়াইতে হইবে না।

"আসিতে হয় ত, শীঘ্র আসিবেন, আসিতে বিলম্ব হইলে, অভীষ্টসিদ্ধি হইবে না। ইতি শ্রীশিবপ্রসাদ শর্ম্মা।"

পত্র লিখিয়া ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাহার নামে শিরোনামা দিব?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "হরমণি আসিলে বলিব।"

হরমণি আসিলে নগেন্দ্রনাথ দত্তের নাম শিরোনামা দিয়া ব্রহ্মচারী পত্রখানি নিকটস্থ ডাকঘরে দিতে গেলেন।

ব্রহ্মচারী যখন পত্র হাতে লইয়া ডাকে দিতে গেলেন, তখন সূর্যমুখী সজলনয়নে, যুক্তকরে, উর্দ্ধমুখে, জগদীশ্বরের নিকট কায়মনোবাক্যে ভিক্ষা করিলেন, "হে পরমেশ্বর! যদি তুমি সত্য হও, আমার যদি পতিভক্তি থাকে, তবে যেন এই পত্রখানি সফল হয়। আমি চিরকাল স্বামীর চরণ ভিন্ন কিছুই জানি না—ইহাতে যদি পুণ্য থাকে, তবে সে পুণ্যের ফলে আমি স্বর্গ চাহি না। কেবল এই চাই, যেন মৃত্যুকালে স্বামীর মুখ দেখিয়া মরি।"

কিন্তু পত্র ত নগেন্দ্রের নিকট পৌঁছিল না। পত্র যখন গোবিন্দপুরে পৌঁছিল, তাহার অনেক পূর্ব্বে নগেন্দ্র দেশপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিলেন। হরকরা পত্র বাড়ীর দেওয়ানের কাছে দিয়া গেল।

দেওয়ানের প্রতি নগেন্দ্রের আদেশ ছিল যে, আমি যেখানে পৌঁছিব, তখন সেইখান হইতে পত্র লিখিব। আমার আজ্ঞা পাইলে সেইখানে আমার নামের পত্রগুলি পাঠাইয়া দিবে। ইতিপূর্ব্বেই নগেন্দ্র প্যাটনা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, "আমি নৌকাপথে কাশীযাত্রা করিলাম। কাশী পৌঁছিলে পত্র লিখিব। আমার পত্র পাইলে, সেখানে আমার পত্রাদি পাঠাইবে।" দেওয়ান সেই সংবাদের প্রতীক্ষায় ব্রহ্মচারীর পত্র বাক্সমধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলেন।

যথাসময়ে নগেন্দ্র কাশীধামে আসিলেন। আসিয়া দেওয়ানকে সংবাদ দিলেন, তখন দেওয়ান অন্যান্য পত্রের সঙ্গে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর পত্র পাঠাইলেন। নগেন্দ্র পত্র পাইয়া মর্ম্মাবগত হইয়া,

অঙ্গুলিদ্বারা কপাল টিপিয়া ধরিয়া কাতরে কহিলেন, "জগদীশ্বর! মুহূর্ত্তজন্য আমার চেতনা রাখ।" জগদীশ্বরের চরণে সে বাক্য পৌঁছিল; মুহূর্ত্তজন্য নগেন্দ্রের চেতনা রহিল; কর্ম্মাধ্যক্ষকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, আজ রাত্রেই আমি রাণীগঞ্জ যাত্রা করিব—সর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও তুমি তাহার বন্দোবস্ত কর।"

কর্ম্মাধ্যক্ষ বন্দোবস্ত করিতে গেল। নগেন্দ্র তখন ভূতলে ধূলির উপর শয়ন করিয়া অচেতন হইলেন।

সেই রাত্রে নগেন্দ্র কাশী পশ্চাতে করিলেন। ভুবনসুন্দরী বারাণসি, কোন্ সুখী জন এমন শারদ রাত্রে তৃপ্তলোচনে তোমাকে পশ্চাৎ করিয়া আসিতে পারে? নিশা চন্দ্রহীনা; আকাশে সহস্র সহস্র নক্ষত্র জ্বলিতেছে—গঙ্গাহৃদয়ে তরণীর উপর দাঁড়াইয়া যে দিকে চাও, সেই দিকে আকাশে নক্ষত্র!—অনন্ত তেজে অনন্তকাল হইতে জ্বলিতেছে—অবিরত জ্বলিতেছে, বিরাম নাই। ভূতলে দ্বিতীয় আকাশ!—নীলাম্বরবৎ স্থিরনীল তরঙ্গিণীহৃদয়; তীরে সোপানে এবং অনন্ত পর্ব্বতশ্রেণীবৎ অট্টালিকায়, সহস্র আলোক জ্বলিতেছে। প্রাসাদ পরে প্রাসাদ, তৎপরে প্রাসাদ, এইরূপ আলোকরাজিশোভিত অনন্ত প্রাসাদশ্রেণী। আবার সমুদয় সেই স্বচ্ছ নদীনীরে প্রতিবিম্বিত—আকাশ, নগর, নদী,—সকলই জ্যোতির্ব্বিন্দুময়। দেখিয়া নগেন্দ্র চক্ষু মুছিলেন। পৃথিবীর সৌন্দর্য্য তাঁহাব আজি সহ্য হইল না। নগেন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, শিবপ্রসাদের পত্র অনেক দিনের পর পৌঁছিয়াছে—এখন সূর্য্যমুখী কোথায়?

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ হীরার বিষবৃক্ষ মুকুলিত

যে দিন পাঁড়ে গোষ্ঠী পাকা বাঁশের লাঠি হাতে করিয়া দেবেন্দ্রকে তাড়াইয়া দিয়াছিল সে দিন হীরা মনে মনে বড় হাসিয়াছিল। কিন্তু তাহার পরে তাহাকে অনেক পশ্চাত্তাপ করিতে হইল। হীরা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি তাঁহাকে অপমানিত করিয়া ভাল করি নাই। তিনি না জানি মনে মনে আমার উপর কত রাগ করিযাছেন। একে ত আমি তাঁহাব মনের মধ্যে স্থান পাই নাই; এখন আমার সকল ভরসা দূর হইল।"

দেবেন্দ্রও আপন খলতাজনিত হীরার দণ্ডবিধানের মনস্কামসিদ্ধির অভিলাষ সম্পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মালতী দ্বারা হীরাকে ডাকাইলেন। হীরা, দুই এক দিন ইতস্ততঃ করিয়া শেষে আসিল। দেবেন্দ্র কিছুমাত্র রোষ প্রকাশ করিলেন না—ভূতপূর্ব্ব ঘটনার কোন উল্লেখ করিতে দিলেন না। সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত মিষ্টালাপে প্রবৃত্ত হইলেন। যেমন ঊর্ণনাভ মক্ষিকার জন্য জাল পাতে, হীরার জন্য তেমনি দেবেন্দ্র জাল পাতিতে লাগিলেন। লুব্ধাশয়া হীরা-মক্ষিকা সহজেই সেই জালে পড়িল। সে দেবেন্দ্রের মধুরালাপে মুগ্ধ এবং তাহার কৈতববাদে প্রতারিত হইল। মনে করিল, ইহাই প্রণয়; দেবেন্দ্র তাহার প্রণয়ী। হীরা চতুরা, কিন্তু এখানে তাহার বুদ্ধি ফলোপধায়িনী হইল না। প্রাচীন কবিগণ যে শক্তিতে জিতেন্দ্রিয় মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধিভঙ্গে ক্ষমতাশালিনী বলিয়া কীর্ত্তিত করিয়াছেন, সেই শক্তির প্রভাবে হীরার বুদ্ধি লোপ হইল।

দেবেন্দ্র সে সকল কথা ত্যাগ করিয়া তানপুরা লইলেন এবং সুরাপানসমুৎসাহিত হইয়া গীতারম্ভ করিলেন। তখন দৈবকণ্ঠ কৃতবিদ্য দেবেন্দ্র এরূপ সুধাময় সঙ্গীতলহরী সৃজন করিলেন যে, হীরা শ্রুতিমাত্রাত্মক হইয়া একেবারে বিমোহিতা হইল। তখন তাহার হৃদয় চঞ্চল, মন দেবেন্দ্রপ্রেমবিদ্রাবিত হইল। তখন তাহার চক্ষে দেবেন্দ্র সর্ব্বসংসারসুন্দর, সর্ব্বার্থসার, রমণীর সর্ব্বাদরণীয় বলিয়া বোধ হইল। হীরার চক্ষে প্রেমবিমুক্ত অশ্রুধারা বহিল।

দেবেন্দ্র তানপুরা রাখিয়া, সযত্নে আপন বসনাগ্রভাগে হীরার অশ্রুবারি মুছাইয়া দিলেন। হীরার শরীর পুলককন্টকিত হইল। তখন দেবেন্দ্র, সুরাপানোদ্দীপ্ত হইয়া, এরূপ হাস্যপরিহাসসংযুক্ত সরল

সম্ভাষণ আরম্ভ করিলেন, কখনও বা এরূপ প্রণয়ীর অনুরূপ স্নেহসিক্ত, অস্পষ্টালঙ্কারবচনে আলাপ করিতে লাগিলেন যে, জ্ঞানহীনা, অপরিমার্জ্জিতবাগ্‌বুদ্ধি হীরা মনে করিল, এই স্বর্গ-সুখ। হীরা ত কখনও এমন কথা শুনে নাই। হীরা যদি বিমলচিত্ত হইত, এবং তাহার বুদ্ধি সৎসংসর্গপরিমার্জ্জিত হইত, তবে সে মনে করিত, এই নরক। পরে প্রেমের কথা পড়িল—প্রেম কাহাকে বলে, দেবেন্দ্র তাহা কিছুই কখন হৃদয়ঙ্গত করেন নাই—বরং হীরা জানিয়াছিল—কিন্তু দেবেন্দ্র তদ্বিষয়ে প্রাচীন কবিদিগের চর্ব্বিতচর্ব্বণে বিলক্ষণ পটু। দেবেন্দ্রের মুখে প্রেমের অনির্ব্বচনীয় মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া হীরা দেবেন্দ্রকে অমানুষিকচিত্তসম্পন্ন মনে করিল—স্বয়ং আপাদকবরী প্রেমরসার্দ্রা হইল। তখন আবার দেবেন্দ্র প্রথমবসন্তপ্রেরিত একমাত্র ভ্রমরঝঙ্কারবৎ গুন্ গুন্ স্বরে, সঙ্গীতোদ্যম করিলেন। হীরা দুর্দ্দমনীয় প্রণয়স্ফূর্ত্তিপ্রযুক্ত সেই সুরের সঙ্গে আপনার কামিনীসুলভ কলকণ্ঠধ্বনি মিলাইতে লাগিল। দেবেন্দ্র হীরাক গায়িতে অনুরোধ করিলেন। তখন হীরা প্রেমার্দ্রচিত্তে, সুষ্মারাগরঞ্জিত কমলনেত্র বিস্ফারিত করিয়া, চিত্রিতবৎ ভ্রূযুগবিলাসে মুখমণ্ডল প্রফুল্ল করিয়া প্রস্ফুটস্বরে সঙ্গীতারম্ভ করিল। চিত্তস্ফূর্তিবশতঃ তাহার কণ্ঠে উচ্চ স্বর উঠিল। হীরা যাহা গায়িল, তাহা প্রেমবাক্য—প্রেমভিক্ষায় পরিপূর্ণ।

তখন সেই পাপমণ্ডপে বসিয়া পাপান্তঃকরণ দুই জনে, পাপাভিলাষবশীভূত হইয়া চিরপাপরূপ চিরপ্রেম পরস্পরের নিকট প্রতিশ্রুত হইল। হীরা চিত্ত সংযম করিতে জানিত, কিন্তু তাহাতে তাহার প্রবৃত্তি ছিল না বলিয়া, সহজে পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্রকে অপ্রণয়ী জানিয়া চিত্তসংযমে প্রবৃত্তি হইয়াছিল, তাহাও অল্পদূরমাত্র; কিন্তু যত দূর অভিলাষ করিয়াছিল, তত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিল। দেবেন্দ্রকে অঙ্কাগত প্রাপ্ত হইয়া, হাসিতে হাসিতে তাহার কাছে প্রেম স্বীকার করিয়াও, অবলীলাক্রমে তাহাকে বিমুখ করিয়াছিল। আবার সেই পুষ্পগত কীটানুরূপ হৃদয়বেধকারী অনুরাগকে কেবল পরগৃহে কার্য্য উপলক্ষ করিয়া শমিত করিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহার বিবেচনা হইল যে, দেবেন্দ্র প্রণয়শালী, তখন আর তাহার চিত্তদমনে প্রবৃত্তি রহিল না। এই অপ্রবৃত্তি হেতু বিষবৃক্ষে তাহার ভোগ্য ফল ফলিল।

লোকে বলে, ইহলোকে পাপের দণ্ড দেখা যায় না। ইহা সত্য হউক বা না হউক—তুমি দেখিবে না যে, চিত্তসংযমে অপ্রবৃত্ত অব্যক্তি ইহলোকে বিষবৃক্ষের ফলভোগ করিল না।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ সূর্য্যমুখীর সংবাদ

বর্ষা গেল। শরৎকাল আসিল। শরৎকালও যায়। মাঠের জল শুকাইল। ধান সকল ফুলিয়া উঠিতেছে। পুষ্করিণীর পদ্ম ফুরাইয়া আসিল। প্রাতঃকালে বৃক্ষপল্লব হইতে শিশির ঝরিতে থাকে। সন্ধ্যাকালে মাঠে মাঠে ধূমাকার হয়। এমত কালে কার্ত্তিক মাসের এক দিন প্রাতঃকালে মধুপুরের রাস্তার উপরে একখানি পাল্কী আসিল। পল্লীগ্রামে পাল্কী দেখিয়া দেশের ছেলে, খেলা ফেলে পাল্কীর ধারে কাতার দিয়া দাঁড়াইল। গ্রামের ঝি বউ মাগী ছাগী জলের কলসী কাঁকে নিয়া একটু তফাৎ দাঁড়াইল—কাঁকের কলসী কাঁকেই রহিল—অবাক্ হইয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। বউগুলি ঘোমটার ভিতর হইতে চোখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল—আর আর স্ত্রীলোকেরা ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল। চাষারা কার্ত্তিক মাসে ধান কাটিতেছিল—ধান ফেলিয়া, হাতে কাস্তে, মাথায় পাগড়ী, হাঁ করিয়া পাল্কী দেখিতে লাগিল। গ্রামের মণ্ডল মাতব্বরলোকে অমনি কমিটিতে বসিয়া গেল। পাল্কীর ভিতর হইতে একটা বুটওয়ালা পা বাহির হইয়াছিল। সকলেই সিদ্ধান্ত করিল, সাহেব আসিয়াছে—ছেলেরা ধ্রুব জানিত, বৌ আসিয়াছে।

পাল্কীর ভিতর হইতে নগেন্দ্রনাথ বাহির হইলেন। অমনি তাঁহাকে পাঁচ সাত জনে সেলাম করিল—কেন না, তাঁহার পেন্টলুন পরা, টুপি মাথায় ছিল। কেহ ভাবিল, দারোগা; কেহ ভাবিল, বরকন্দাজ সাহেব আসিয়াছেন।

দর্শকদিগের মধ্যে প্রাচীন এক ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া নগেন্দ্রনাথ শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত, এখনই কোন খুনি মামলার সুরতহাল হইবে—অতএব সত্য উত্তর দেওয়া ভাল নয়। সে বলিল, "আজ্ঞে, আমি মশাই ছেলে মানুষ, আমি অত জানি না।" নগেন্দ্র দেখিলেন, একজন ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ না পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে না। গ্রামে অনেক ভদ্রলোকের বসতিও ছিল। নগেন্দ্রনাথ তখন একজন বিশিষ্টলোকের বাড়ীতে গেলেন। সে গৃহের স্বামী রামকৃষ্ণ রায় কবিরাজ। রামকৃষ্ণ রায়, একজন বাবু আসিয়াছেন দেখিয়া, যত্ন করিয়া একখানি চেয়ারের উপর নগেন্দ্রকে বসাইলেন। নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর সংবাদ তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন। রামকৃষ্ণ রায় বলিলেন, "ব্রহ্মচারী ঠাকুর এখানে নাই।" নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কোথায় গিয়াছেন?"

উত্তর। তাহা বলিয়া যান নাই। কোথায় গিয়াছেন, তাহা আমরা জানি না। বিশেষ তিনি এক স্থানে স্থায়ী নহেন; সর্ব্বদা নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র। কবে আসিবেন, তাহা কেহ জানে?

রামকৃষ্ণ। তাহার কাছে আমার নিজেরও কিছু আবশ্যক আছে। এজন্য আমি সে কথারও তদন্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি যে কবে আসিবেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

নগেন্দ্র বড় বিষণ্ণ হইলেন। পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কত দিন এখান হইতে গিয়াছেন?"

রামকৃষ্ণ। তিনি শ্রাবণ মাসে এখানে আসিয়াছিলেন। ভাদ্র মাসে গিয়াছেন।

নগেন্দ্র। ভাল, এ গ্রামে হরমণি বৈষ্ণবীর বাড়ী কোথায় আমাকে কেহ দেখাইয়া দিতে পারেন?

রামকৃষ্ণ। হরমণিব ঘব পথের ধারেই ছিল। কিন্তু এখন আর সে ঘর নাই। সে ঘর আগুন লাগিয়া পুড়িয়া গিয়াছে।

নগেন্দ্র আপনাব কপাল টিপিয়া ধরিলেন। ক্ষীণতর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হরমণি কোথায় আছে?"

রামকৃষ্ণ। তাহাও কেহ বলিতে পারে না। যে রাত্রে তাহাব ঘরে আগুন লাগে, সেই অবধি সে কোথায় পলাইযা গিয়াছে। কেহ কেহ এমনও বলে যে, সে আপনাব ঘরে আপনি আগুন দিয়া পলাইয়াছে।

নগেন্দ্র ভগ্নহৃদ হইযা কহিলেন, "তাহার ঘরে কোন স্ত্রীলোক থাকিত?"

রামকৃষ্ণ বায় কহিলেন, "না, কেবল শ্রাবণ মাস হইতে একটি বিদেশী স্ত্রীলোক পীড়িতা হইয়া আসিয়া তাহার বাড়ীতে ছিল। সেটিকে ব্রহ্মচারী কোথা হইতে আনিয়া তাহার বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। শুনিযাছিলাম, তাহার নাম সূর্য্যমুখী। স্ত্রীলোকটি কাসরোগগ্রস্ত ছিল—আমিই তাহার চিকিৎসা করি। প্রায় আরোগ্য করিয়া তুলিযাছিলাম—এমন সময়ে—"

নগেন্দ্র হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন সময়ে কি—?"

রামকৃষ্ণ বলিলেন, "এমন সময়ে হরবৈষ্ণবীর গৃহদাহে ঐ স্ত্রীলোকটি পুড়িয়া মরিল।"

নগেন্দ্রনাথ চৌকি হইতে পড়িয়া গেলেন। মস্তকে দারুণ আঘাত পাইলেন। সেই আঘাতে মূর্চ্ছিত হইলেন। কবিরাজ তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন।

বাঁচিতে কে চাহে? এ সংসার বিষময়। বিষবৃক্ষ সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে। কে ভালবাসিতে চাহে?

অষ্টত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ : এত দিনে সব ফুরাইল!

এত দিনে সব ফুরাইল। সন্ধ্যাকালে যখন নগেন্দ্র দত্ত মধুপুর হইতে পাল্কীতে উঠিলেন, তখন এই কথা মনে মনে বলিলেন, "আমার এত দিনে সব ফুরাইল।"

কি ফুরাইল? সুখ? তা ত যে দিন সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিনই ফুরাইয়াছিল। তবে এখন ফুরাইল কি? আশা। যত দিন মানুষের আশা থাকে, তত দিন কিছুই ফুরায় না, আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল!

নগেন্দ্রের আজ সব ফুরাইল। সেই জন্য তিনি গোবিন্দপুর চলিলেন। গোবিন্দপুরে গৃহে বাস করিতে চলিলেন না; গৃহধর্ম্মের নিকট জন্মের শোধ বিদায় লইতে চলিলেন। সে অনেক কাজ। বিষয়-আশয়ের বিলি ব্যবস্থা করিতে হইবে। জমীদারী ভদ্রাসনবাড়ী এবং অপরাপর স্বোপার্জ্জিত স্থাবর সম্পত্তি ভাগিনেয় সতীশচন্দ্রকে দানপত্রের দ্বারা লিখিয়া দিবেন—সে লেখা পড়া উকীলের বাড়ী নহিলে হইবে না। অস্থাবর সম্পত্তি সকল কমলমণিকে দান করিবেন—সে সকল গুছাইয়া কলিকাতায় তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিতে হইবে। কিছুমাত্র কাগজ আপনার সঙ্গে রাখিবেন—যে কয় বৎসর জীবিত থাকেন, সেই কয় বৎসর তাহাতেই তাঁহার নিজব্যয় নির্ব্বাহ হইবে। কুন্দনন্দিনীকে কমলমণির নিকট পাঠাইবেন। বিষয়-আশয়ের আয়ব্যয়ের কাগজপত্রসকল শ্রীশচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। আর সূর্য্যমুখী যে খাটে শুইতেন, সেই খাটে শুইয়া একবার কাঁদিবেন। সূর্য্যমুখীর অলঙ্কারগুলি লইয়া আসিবেন। সেগুলি কমলমণিকে দিবেন না—আপনার সঙ্গে রাখিবেন। যেখানে যাবেন, সঙ্গে লইয়া যাবেন। পরে যখন সময় উপস্থিত হইবে, তখন সেইগুলি দেখিতে দেখিতে মরিবেন। এই সকল আবশ্যক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া, নগেন্দ্র জন্মের শোধ ভদ্রাসন ত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেশপর্য্যটন করিবেন। আর যত দিন বাঁচিবেন, পৃথিবীর কোথাও এক কোণে লুকাইয়া থাকিয়া দিনযাপন করিবেন।

শিবিকারোহণে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নগেন্দ্র চলিলেন। শিবিকাদ্বার মুক্ত, রাত্রি কার্ত্তিকী জ্যোৎস্নাময়ী; আকাশে তারা; বাতাসে রাজপথিপার্শ্বস্থ টেলিগ্রাফের তার ধ্বনিত হইতেছিল। সে রাত্রে নগেন্দ্রের চক্ষে একটি তারাও সুন্দর বোধ হইল না। জ্যোৎস্না অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইতে লাগিল। দৃষ্ট পদার্থমাত্রই চক্ষুঃশূল বলিয়া বোধ হইল। পৃথিবী অত্যন্ত নৃশংস। সুখের দিনে যে শোভা ধারণ করিয়া মনোহরণ করিয়াছিল, আজি সেই শোভা বিকাশ করে কেন? যে দীর্ঘতৃণে চন্দ্রকিরণ প্রতিবিম্বিত হইলে হৃদয় স্নিগ্ধ হইত, আজ সে দীর্ঘতৃণ তেমনি সমুজ্জ্বল কেন? আজিও আকাশ তেমনি নীল, মেঘ তেমনি শ্বেত, নক্ষত্র তেমনি উজ্জ্বল, বায়ু তেমনি ক্রীড়াশীল! পশুগণ তেমনি বিচরণ করিতেছে; মনুষ্য তেমনি হাস্য পরিহাসে রত; পৃথিবী তেমনি অনন্তগামিনী; সংসারস্রোতঃ তেমনি অপ্রতিহত। জগতের দয়াশূন্যতা আর সহ্য হয় না। কেন পৃথিবী বিদীর্ণা হইয়া নগেন্দ্রকে শিবিকাসমেত গ্রাস করিল না?

নগেন্দ্র ভাবিয়া দেখিলেন, সব তাঁরই দোষ। তাঁহার তেত্রিশ বৎসবমাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছে। ইহারই মধ্যে তাঁহার সব ফুরাইল। অথচ জগদীশ্বর তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলেন, তাহার কিছুই ফুরাইবার নহে। যাহাতে যাহাতে মনুষ্য সুখী, সে সব তাঁহাকে ঈশ্বর যে পরিমাণে দিয়াছিলেন, সে পরিমাণে প্রায় কাহাকেও দেন না। ধন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, মান এ সকল ভূমিষ্ঠ হইয়াই অসাধারণ পরিমাণে পাইয়াছিলেন। বুদ্ধি নহিলে এ সকলে সুখ হয় না—তাহাতে বিধাতা কার্পণ্য করেন নাই। শিক্ষায় পিতা মাতা ত্রুটি করেন নাই—তাঁহার তুল্য সুশিক্ষিত কে? রূপ, বল, স্বাস্থ্য, প্রণয়শীলতা, তাহাও ত প্রকৃতি তাঁহাকে অমিতহস্তে দিয়াছেন; ইহার অপেক্ষাও যে ধন দুর্লভ—যে একমাত্র সামগ্রী এ সংসারে অমূল্য—বিশেষ প্রণয়শালিনী সাধ্বী ভার্য্যা—ইহাও তাঁহার প্রসন্ন কপালে ঘটিয়াছিল। সুখের সামগ্রী পৃথিবীতে এত আর কাহার ছিল? আজি এত অসুখী পৃথিবীতে কে? আজি যদি তাঁহার সর্ব্বস্ব দিলে—ধন, সম্পদ, মান, রূপ, যৌবন, বিদ্যা, বুদ্ধি, সব দিলে, তিনি আপন শিবিকার একজন বাহকের সঙ্গে অবস্থাপরিবর্ত্তন করিতে পারিতেন, তাহা হইলে স্বর্গসুখ মনে করিতেন। বাহক কি? ভাবিলেন, "এই দেশের রাজকারাগারে এমন কে নরঘ্ন পাপী আছে যে, আমার অপেক্ষা সুখী নয়? আমা হতে পবিত্র নয়? তারা ত অপরকে হত করিয়াছে, আমি সূর্য্যমুখীকে বধ করিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়দমন করিলে, সূর্য্যমুখী বিদেশে আসিয়া কুটীরদাহে মরিবে কেন? আমি সূর্য্যমুখীর বধকারী—কে এমন পিতৃঘ্ন, মাতৃঘ্ন, পুত্রঘ্ন আছে যে, আমার অপেক্ষা গুরুতর পাপী? সূর্যমুখী কি কেবল আমার—স্ত্রী?

সূর্য্যমুখী আমার—সব। সম্বন্ধে স্ত্রী, সৌহার্দ্দে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী। আমার সূর্য্যমুখী—কাহার এমন ছিল? সংসারে সহায়, গৃহে লক্ষ্মী, হৃদয়ে ধর্ম্ম, কণ্ঠে অলঙ্কার! আমার নয়নের তারা, হৃদয়ের শোণিত, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব! আমার প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি, চিন্তায় বুদ্ধি, কার্য্যে উৎসাহ! আর এমন সংসারে কি আছে? আমার দর্শনে আলোক, শ্রবণে সঙ্গীত, নিশ্বাসে বায়ু, স্পর্শে জগৎ। আমার বর্ত্তমানের সুখ, অতীতের স্মৃতি, ভবিষ্যতের আশা, পরলোকের পুণ্য! আমি শূকর, রত্ন চিনিব কেন?

হঠাৎ তাঁহার স্মরণ হইল যে, তিনি সুখে শিবিকারোহণে যাইতেছেন, সূর্য্যমুখী পথ হাঁটিয়া হাঁটিয়া পীড়িতা হইয়াছিলেন। অমনি নগেন্দ্র শিবিকা হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে চলিলেন। বাহকেরা শূন্য শিবিকা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আনিতে লাগিল। প্রাতে যে বাজারে আসিলেন, সেখানে শিবিকা ত্যাগ করিয়া বাহকদিগকে বিদায় দিলেন। অবশিষ্ট পথ পদব্রজে অতিবাহিত করিবেন।

তখন মনে করিলেন, "এ জীবন এই সূর্য্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব। কি প্রায়শ্চিত্ত? সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া যে সকল সুখে বঞ্চিতা হইয়াছিলেন—আমি সে সকল সুখভোগ ত্যাগ করিব। ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, দাসদাসী, বন্ধুবান্ধবের আর কোন সংস্রব রাখিব না। সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অবধি যে সকল ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, আমি সেই সকল ক্লেশ ভোগ করিব। যে দিন গোবিন্দপুর হইতে যাত্রা করিব, সেই দিন হইতে আমার গমন পদব্রজে, ভোজন কদন্ন, শয়ন বৃক্ষতলে বা পর্ণকুটীরে। আর কি প্রায়শ্চিত্ত? যেখানে যেখানে অনাথ স্ত্রীলোক দেখিব, সেইখানে প্রাণ দিয়া উপকার করিব। যে অর্থ নিজব্যয়ার্থ রাখিলাম, সেই অর্থে আপনার প্রাণধারণ মাত্র করিয়া অবশিষ্ট সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগেব সেবার্থে ব্যয় করিব। যে সম্পত্তি স্বত্ব ত্যাগ করিয়া সতীশকে দিব, তাহারও অর্দ্ধাংশ আমার যাবজ্জীবন সতীশ সহায়হীনা স্ত্রীলোকদিগের সাহায্যার্থ ব্যয় করিবে, ইহাও দানপত্রে লিখিয়া দিব। প্রায়শ্চিত্ত! পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন?" তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করিয়া জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিলেন।

ঊনচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : সব ফুরাইল, যন্ত্রণা ফুরায় না।

রাত্রি প্রহরেকের সময়ে শ্রীশচন্দ্র একাকী বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন এমত সময়—পদব্রজে নগেন্দ্র সেইখানে উপস্থিত হইয়া, স্বহস্তবাহিত কান্‌বাস ব্যাগ দূরে নিক্ষিপ্ত করিলেন। ব্যাগ রাখিয়া নীরবে একখানা চেযারের উপর বসিলেন।

শ্রীশচন্দ্র তাঁহার ক্লিষ্ট, মলিন, মুখকান্তি দেখিয়া ভীত হইলেন; কি জিজ্ঞাসা কবিবেন, কিছু বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, কাশীতে নগেন্দ্র ব্রহ্মচারীর পত্র পাইয়াছিলেন এবং পত্র পাইয়া মধুপুর যাত্রা করিয়াছিলেন। এ একল কথা শ্রীশচন্দ্রকে লিখিয়া নগেন্দ্র কাশী হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এখন নগেন্দ্র আপনা হইতে কোন কথা বলিবেন না দেখিয়া, শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের নিকট গিয়া বসিলেন এবং তাঁহা। হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, "ভাই নগেন্দ্র, তোমাকে নীরব দেখিয়া আমি বড় ব্যস্ত হইয়াছি। তুমি মধুপুর যাও নাই?"

নগেন্দ্র এই মাত্র বলিলেন, "গিয়াছিলাম।"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্রহ্মচারীর সাক্ষাৎ পাও নাই?"

নগেন্দ্র। না।

শ্রীশ। সূর্য্যমুখীর কোন সংবাদ পাইলে? কোথায় তিনি?

নগেন্দ্র উর্দ্ধে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "স্বর্গে।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইলেন। নগেন্দ্রও নীরব হইয়া মুখাবনত করিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে মুখ তুলিয়া বলিলেন, "তুমি স্বর্গ মান না—আমি মানি।"

শ্রীশচন্দ্র জানিতেন, পূর্ব্বে নগেন্দ্র স্বর্গ মানিতেন না; বুঝিলেন যে, এখন মানেন। বুঝিলেন যে, এ স্বর্গ প্রেম ও বাসনার সৃষ্টি। "সূর্যমুখী কোথাও নাই" এ কথা সহ্য হয় না—"সূর্য্যমুখী স্বর্গে আছেন"—এ চিন্তায় অনেক সুখ।

উভয়ে নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। শ্রীশচন্দ্র জানিতেন যে, সান্ত্বনার কথার সময় এ নয়। তখন পরের কথা বিষবোধ হইবে। পরের সংসর্গও বিষ। এই বুঝিয়া, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রের শয্যাদি করাইবার উদ্যোগে উঠিলেন। আহারের কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস হইল না; মনে মনে করিলেন, সে ভার কমলকে দিবেন।

কমল শুনিলেন, সূর্য্যমুখী নাই। তখন আর তিনি কোন ভারই লইলেন না। সতীশকে একা ফেলিয়া, কমলমণি সে রাত্রের মত অদৃশ্য হইলেন।

কমলমণি ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া, আলুলায়িত কুন্তলে কাঁদিতেছেন দেখিয়া, দাসী সেইখানে সতীশচন্দ্রকে ছাড়িয়া দিয়া, সরিয়া আসিল। সতীশচন্দ্র মাতাকে ধূলিধূসরা, নীরবে রোদনপরায়ণা দেখিয়া প্রথম নীরবে, নিকটে বসিয়া রহিল। পরে মাতার চিবুকে ক্ষুদ্র কুসুমনিন্দিত অঙ্গুলি দিয়া, মুখ তুলিয়া দেখিতে যত্ন করিল। কমলমণি মুখ তুলিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না। সতীশ তখন মাতার প্রসন্নতার আকাঙ্ক্ষায়, তাঁহার মুখচুম্বন করিল। কমলমণি, সতীশের অঙ্গে হস্তপ্রদান করিয়া আদর করিলেন, কিন্তু মুখচুম্বন করিলেন না, কথাও কহিলেন না। তখন সতীশ মাতার কণ্ঠে হস্ত দিয়া, মাতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া রোদন করিল। সে বালক-হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া, বিধাতা ভিন্ন কে সে বালক-রোদনের কারণ নির্ণয় করিবে?

শ্রীশচন্দ্র অগত্যা আপন বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া, কিঞ্চিৎ খাদ্য লইয়া আপনি নগেন্দ্রের সম্মুখে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "উহার আবশ্যক নাই—কিন্তু তুমি বসো। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে—তাহা বলিতেই এখানে আসিয়াছি।"

তখন নগেন্দ্র, রামকৃষ্ণ রায়ের কাছে যাহা শুনিয়াছিলেন, সকল শ্রীশচন্দ্রের নিকট বিবৃত করিলেন। তাহার পর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যাহা যাহা কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা সকল বলিলেন।

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "ব্রহ্মচারীর সঙ্গে পথে তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই, ইহা আশ্চর্য্য। কেন না, গতকল্য কলিকাতা হইতে তোমার সন্ধানে তিনি মধুপুর যাত্রা করিয়াছেন।"

নগেন্দ্র। সে কি? তুমি ব্রহ্মচারীর সন্ধান কি প্রকারে পাইলে?

শ্রীশ। তিনি অতি মহৎ ব্যক্তি। তোমার পত্রের উত্তর না পাইয়া, তিনি তোমার সন্ধানে স্বয়ং গোবিন্দপুরে আসিয়াছিলেন। গোবিন্দপুরেও তোমায় পাইলেন না, কিন্তু শুনিলেন যে, তাঁহার পত্র কাশীতে প্রেরিত হইবে। সেখানে তুমি পত্র পাইবে। অতএব আর ব্যস্ত না হইয়া এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি পুরুষোত্তম যাত্রা করেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তোমার সন্ধানে পুনশ্চ গোবিন্দপুরে গিয়াছিলেন। সেখানে তোমার কোন সংবাদ পাইলেন না—শুনিলেন, আমার কাছে তোমার সংবাদ পাইবেন। আমার কাছে আসিলেন। পরশ্ব দিন আমার কাছে আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে তোমার পত্র দেখাইলাম। তিনি তখন মধুপুরে তোমার সাক্ষাৎ পাইবার ভরসায় কালি গিয়াছেন। কালি রাত্রে রাণীগঞ্জে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল।

নগেন্দ্র। আমি কালি রাণিগঞ্জে ছিলাম না। সূর্য্যমুখীর কথা তিনি তোমাকে কিছু বলিয়াছিলেন।

শ্রীশ। সে সকল কালি বলিব।

নগেন্দ্র। তুমি মনে করিতেছ, শুনিয়া আমার ক্লেশবৃদ্ধি হইবে। এ ক্লেশের আর বৃদ্ধি নাই। তুমি বল।

তখন শ্রীশচন্দ্র ব্রহ্মচারীর নিকট শ্রুত তাঁহার সহিত সূর্য্যমুখীর সঙ্গে পথে সাক্ষাতের কথা,

পীড়ার কথা এবং চিকিৎসা ও অপেক্ষাকৃত আরোগ্য লাভের কথা বলিলেন। অনেক বাদ দিয়া বলিলেন—সূর্য্যমুখী কত দুঃখ পাইয়াছিলেন, সে কথা বলিলেন না।

শুনিয়া, নগেন্দ্র গৃহ হইতে নির্গত হইলেন। শ্রীশ সঙ্গে যাইতেছিলেন, কিন্তু নগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া নিষেধ করিলেন। পথে পথে নগেন্দ্র রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পাগলের মত বেড়াইলেন। ইচ্ছা, জনস্রোতোমধ্যে আত্মবিস্মৃতি লাভ করেন। কিন্তু জনস্রোত তখন মন্দীভূত হইয়াছিল—আর আত্মবিস্মৃতি কে লাভ করিতে পারে? তখন পুনর্ব্বার শ্রীশচন্দ্রের গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। শ্রীশচন্দ্র আবার নিকটে বসিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "আরও কথা আছে। তিনি কোথায় গিয়াছিলেন, কি করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মচারী অবশ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া থাকিবেন। ব্রহ্মচারী তোমাকে বলিয়াছেন কি?"

শ্রীশ। আজি আর সে সকল কথায় কাজ কি? আজ শ্রান্ত আছ, বিশ্রাম কর।

নগেন্দ্র। ভ্রূকুটী করিয়া মহাপুরুষ কণ্ঠে বলিলেন, "বল।" শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিলেন, নগেন্দ্র পাগলের মত হইয়াছেন, "বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের মত তাঁহার মুখ কালিময় হইয়াছে। ভীত হইয়া শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "বলিতেছি।" নগেন্দ্রের মুখ প্রসন্ন হইল; শ্রীশচন্দ্র সংক্ষেপে বলিলেন, "গোবিন্দপুর হইতে সূর্য্যমুখী স্থলপথে অল্প অল্প করিয়া প্রথমে পদব্রজে এই দিকে আসিয়াছিলেন।"

নগেন্দ্র। প্রত্যহ কত পথ চলিতেন?

শ্রীশ। এক ক্রোশ দেড় ক্রোশ।

নগেন্দ্র। তিনি ত একটি পয়সাও লইয়া বাড়ী হইতে যান নাই—দিনপাত হইত কিসে?

শ্রীশ। কোন দিন উপবাস—কোন দিন ভিক্ষা—তুমি পাগল!!

এই বলিয়া শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রকে তাড়না করিলেন। কেন না, নগেন্দ্র আপনার হস্তদ্বারা আপনার কণ্ঠরোধ করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন। বলিলেন, "মরিলে কি সূর্য্যমুখীকে পাইবে?" এই বলিয়া নগেন্দ্রের হস্ত লইয়া আপনার হস্তমধ্যে রাখিলেন। নগেন্দ্র বলিলেন, "বল।"

শ্রীশ। তুমি স্থির হইয়া না শুনিলে আমি আর বলিব না।

কিন্তু শ্রীশচন্দ্রের কথা আর নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল না। তাঁহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগেন্দ্র মুদ্রিতনয়নে স্বর্গারূঢ়া সূর্য্যমুখীর রূপ ধ্যান করিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, তিনি রত্নসিংহাসনে রাজরাণী হইয়া বসিয়া আছেন; চার দিক্ হইতে শীতল সুগন্ধময় পবন তাঁহার অলকদাম দুলাইতেছে; চারি দিকে পুষ্পনির্ম্মিত বিহঙ্গগণ উড়িয়া বীণারবে গান করিতেছে। দেখিলেন, তাঁহার পদতলে শত শত কোকনদ ফুটিয়া রহিয়াছে; তাঁহার সিংহাসনচন্দ্রাতপে শত চন্দ্র জ্বলিতেছে; চারি পার্শ্বে শত শত নক্ষত্র জ্বলিতেছে। দেখিলেন, নগেন্দ্র স্বয়ং এক অন্ধকারপূর্ণ স্থানে পড়িয়া আছেন; তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বেদনা; অসুরে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতেছে; সূর্য্যমুখী অঙ্গুলিসঙ্কেতে তাহাদিগকে নিষেধ করিতেছেন।

অনেক যত্নে শ্রীশচন্দ্র নগেন্দ্রের চেতনাবিধান করিলেন। চেতনাপ্রাপ্ত হইয়া নগেন্দ্র উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, "সূর্য্যমুখী! প্রাণাধিকে! কোথায় তুমি?" চীৎকার শুনিয়া শ্রীশচন্দ্র স্তম্ভিত এবং ভীত হইয়া নীরবে বসিলেন। ক্রমে নগেন্দ্র স্বভাবে পুনঃস্থাপিত হইয়া বলিলেন, "বল!"

শ্রীশচন্দ্র ভীত হইয়া বলিলেন, "আর কি বলিব?"

নগেন্দ্র। বল, নহিলে আমি এখনই প্রাণত্যাগ করিব।

ভীত শ্রীশচন্দ্র পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন, "সূর্য্যমুখী অধিক দিন এরূপ কষ্ট পান নাই। একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ সপরিবারে কাশী যাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকাপথে আসিতেছিলেন, একদিন নদীকূলে সূর্য্যমুখী বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণেরা সেইখানে পাক করিতে উঠিয়াছিলেন। গৃহিণীর সহিত সূর্য্যমুখীর আলাপ হয়। সূর্য্যমুখীর অবস্থা দেখিয়া এবং চরিত্রে প্রীতা হইয়া ব্রাহ্মণগৃহিণী তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া লইলেন। সূর্য্যমুখী তাঁহার সাক্ষাতে বলিয়াছিলেন যে, তিনিও কাশী যাইবেন।"

নগেন্দ্র। সে ব্রাহ্মণের নাম কি? বাটী কোথায়?

নগেন্দ্র মনে মনে কি প্রতিজ্ঞা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহার পর?"

শ্রীশ। ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁহার পরিবারস্থার ন্যায় সূর্য্যমুখী বর্হি পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কলিকাতা পর্য্যন্ত নৌকায়, কলিকাতা হইতে রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলে, রাণীগঞ্জ হইতে বুলক্‌ট্রেণে গিয়াছিলেন; এ পর্যন্ত হাঁটিয়া ক্লেশ পান নাই।

নগেন্দ্র। তার পর কি ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিদায় দিল?

শ্রীশ। না; সূর্য্যমুখী আপনি বিদায় লইলেন। তিনি আর কাশী গেলেন না। কত দিন তোমাকে না দেখিয়া থাকিবেন? তোমাকে দেখিবার মানসে বর্হি হইতে পদব্রজে ফিরিলেন।

কথা বলিতে শ্রীশচন্দ্রের চক্ষে জল আসিল। তিনি নগেন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। শ্রীশচন্দ্রের চক্ষের জলে নগেন্দ্রের বিশেষ উপকার হইল। তিনি শ্রীশচন্দ্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাঁহার কাঁধে মাথা রাখিয়া রোদন করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের বাটী অসিয়া এ পর্য্যন্ত নগেন্দ্র রোদন করেন নাই— তাঁহার শোক রোদনের অতীত। এখন রুদ্ধ শোকপ্রবাহ বেগে বহিল। নগেন্দ্র শ্রীশচন্দ্রের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া বালকের মত বহুক্ষণ রোদন করিলেন। উহাতে যন্ত্রণার অনেক উপশম হইল। যে শোকে রোদন নাই, সে যমের দূত।

নগেন্দ্র কিছু শান্ত হইলে শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসব কথায় আজ আর আবশ্যক নাই।"

নগেন্দ্র বলিলেন, "আর বলিবেই বা কি? অবশিষ্ট যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা ত চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। বর্হি হইতে তিনি একাকিনী পদব্রজে মধুপুরে আসিয়াছিলেন। পথ হাঁটার পরিশ্রমে, অনাহারে, রৌদ্র বৃষ্টিতে, নিরাশ্রয় আর মনের ক্লেশে সূর্য্যমুখী রোগগ্রস্ত হইয়া মরিবার জন্য পথে পড়িয়াছিলেন।"

শ্রীশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাই, বৃথা কেন আর সে কথা ভাব? তোমার দোষ কিছুই নাই। তুমি তাঁর অমতে বা অবাধ্য হইয়া কিছুই কর নাই। যাহা আত্মদোষে ঘটে নাই, তার জন্য অনুতাপ বুদ্ধিমানে করে না।"

নগেন্দ্রনাথ বুঝিলেন না। তিনি জানিতেন, তাঁরই সকল দোষ, তিনি কেন বিষবৃক্ষের বীজ হৃদয় হইতে উচ্ছিন্ন করেন নাই।

চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ হীরা বিষবৃক্ষের ফল

হীরা মহারত্ন কপর্দ্দকের বিনিময়ে বিক্রয় করিল। ধর্ম্ম চিরকষ্টে রক্ষিত হয়, কিন্তু এক দিনের অসাবধানতায় বিনষ্ট হয়। হীরার তাহাই হইল। যে ধনের লোভে হীরা এই মহারত্ন বিক্রয় করিল, সে এক কড়া কাণা কড়ি। কেন না, দেবেন্দ্রের প্রেম বন্যার জলের মত; যেমন পঙ্কিল, তেমনি ক্ষণিক। তিন দিনে বন্যার জল সরিয়া গেল, হীরাকে কাদায় বসাইয়া রাখিয়া গেল। যেমন কোন কোন কৃপণ অথচ যশোলিপ্সু ব্যক্তি বহুকালাবধি প্রাণপণে সঞ্চিতার্থ রক্ষা করিয়া, পুত্রোদ্বাহ বা অন্য উৎসব উপলক্ষে এক দিনের সুখের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলে, হীরা তেমনি এত দিন যত্নে ধর্ম্মরক্ষা করিয়া, এক দিনের সুখের জন্য তাহা নষ্ট করিয়া উৎসৃষ্টার্থ কৃপণের ন্যায় চিরানুশোচনার পথে দণ্ডায়মান হইল। ক্রীড়াশীল বালক কর্ত্তৃক অল্পোপভুক্ত অপক্ব চূতফলের ন্যায়, হীরা দেবেন্দ্রকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, প্রথমে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু কেবল পরিত্যক্ত নহে— সে দেবেন্দ্রের দ্বারা যেরূপ অপমানিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল, তাহা স্ত্রীলোকমধ্যে অতি অধমারও অসহ্য।

যখন, দেখা সাক্ষাতের শেষ দিনে হীরা দেবেন্দ্রের চরণাবলুণ্ঠিত হইয়া বলিয়াছিল যে, "দাসীরে পরিত্যাগ করিও না," তখন দেবেন্দ্র তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, "আমি কেবল কুন্দনন্দিনীর লোভে তোমাকে এত দূর সম্মানিত করিয়াছিলাম—যদি কুন্দের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ করাইতে পার, তবেই

তোমার সঙ্গে আমার আলাপ থাকিবে—নচেৎ এই পর্য্যন্ত। তুমি যেমন গর্ব্বিতা, তেমনি আমি তোমাকে প্রতিফল দিলাম; এখন তুমি এই কলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া গৃহে যাও।"

হীরা ক্রোধে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। যখন তাহার মস্তক স্থির হইল, তখন সে দেবেন্দ্রের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, ভ্রুকুটী কুটিল করিয়া, চক্ষু আরক্ত করিয়া, যেন শতমুখে দেবেন্দ্রকে তিরস্কার করিল। মুখরা, পাপিষ্ঠা স্ত্রীলোকেই যেরূপ তিরস্কার করিতে জানে, সেইরূপ তিরস্কার করিল। তাহাতে দেবেন্দ্রের ধৈর্য্যচ্যুতি হইল। তিনি হীরাকে পদাঘাত করিয়া প্রমোদোদ্যান হইতে বিদায় করিলেন। হীরা পাপিষ্ঠা—দেবেন্দ্র পাপিষ্ঠ এবং পশু। এইরূপ উভয়ের চিরপ্রেমের প্রতিশ্রুতি সফল হইয়া পরিণত হইল।

হীরা পদাহত হইয়া গৃহে গেল না। গোবিন্দপুরে এক জন চাণ্ডাল চিকিৎসা ব্যবসায় করিত। সে কেবল চাণ্ডালাদি ইতর জাতির চিকিৎসা করিত। চিকিৎসা বা ঔষধ কিছুই জানিত না—কেবল বিষবড়ির সাহায্যে লোকের প্রাণসংহার করিত। হীরা জানিত যে, সে বিষবড়ি প্রস্তুত করার জন্য উদ্ভিজ্জ বিষ, খনিজ বিষ, সর্পবিষাদি নানা প্রকার সদ্যঃপ্রাণাপহারী বিষ সংগ্রহ করিয়া রাখিত। হীরা সেই রাত্রে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে ডাকিয়া গোপনে বলিল যে, "একটা শিয়ালে রোজ আমার হাঁড়ি খাইয়া যায়। আমি সেই শিয়ালটাকে না মারিলে তিষ্ঠিতে পারি না। মনে করিয়াছি, ভাতের সঙ্গে বিষ মিশাইয়া রাখিব—সে আজি হাঁড়ি খাইতে আসিলে বিষ খাইয়া মরিবে। তোমার কাছে অনেক বিষ আছে; সদ্যঃ প্রাণ নষ্ট হয়, এমন বিষ আমাকে বিক্রয় করিতে পার?"

চাণ্ডাল শিয়ালের গল্পে বিশ্বাস করিল না। বলিল, "আমার কাছে যাহা চাহ, তাহা আছে, কিন্তু আমি তাহা বিক্রয় করিতে পারি না। আমি বিষ বিক্রয় করিয়াছি, জানিলে আমাকে পুলিসে ধরিবে।"

হীরা কহিল, "তোমার কোন চিন্তা নাই। তুমি যে বিক্রয় করিয়াছ, ইহা কেহ জানিবে না—আমি ইষ্টদেবতা আর গঙ্গার দিব্য করিয়া বলিতেছি। দুইটা শিয়াল মরে, এতটা বিষ আমাকে দাও, আমি তোমাকে পঞ্চাশ টাকা দিব।"

চাণ্ডাল নিশ্চিত মনে বুঝিল যে, এ কাহার প্রাণবিনাশ করিবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকার লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বিষবিক্রয়ে স্বীকৃত হইল। হীরা গৃহ হইতে টাকা আনিয়া চাণ্ডালকে দিল। চাণ্ডাল তীব্র মানুষঘাতী হলাহল কাগজে মুড়িয়া হীরাকে দিল। হীরা গমনকালে কহিল, "দেখিও, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না—তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই অমঙ্গল।"

চাণ্ডাল কহিল, "মা! আমি তোমাকে চিনিও না।" হীরা তখন নিঃশঙ্ক হইয়া গৃহে গমন করিল।

গৃহে গিয়া, বিষের মোড়ক হস্তে করিয়া অনেকে রোদন করিল। পরে চক্ষু মুছিয়া মনে মনে কহিল, "আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব?" যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।"

একচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : হীরার আয়ি

"হীরার আয়ি বুড়ী।
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি।
দাঁতে ভাঙ্গে নুড়ি।
কাঁঠাল খায় দেড় বুড়ি।"

হীরার আয়ি লাঠি ধরিয়া গুড়ি গুড়ি যাইতেছিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ বালকের পাল, এই কবিতাটি পাঠ করিতে করিতে করতালি দিতে দিতে এবং নাচিতে নাচিতে চলিয়াছিল।

এই কবিতাতে কোন বিশেষ নিন্দার কথা ছিল কি না, সন্দেহ—কিন্তু হীরার আয়ি বিলক্ষণ কোপাবিষ্ট হইয়াছিল। সে বালকদিগকে যমের বাড়ী যাইতে অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছিল—এবং তাহাদিগের পিতৃপুরুষের আহারাদির বড় অন্যায় ব্যবস্থা করিতেছিল। এইরূপ প্রায় প্রত্যহই হইত।

নগেন্দ্রের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া হীরার আয়ি বালকদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল। দ্বারবান্‌দিগের ভ্রমরকৃষ্ণ শ্মশ্রুরাজি দেখিয়া তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। পলায়নকালে বালক বলিল;—

"রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যাবেলা শোবে.
চোর এলে কোথায় পালাবে?"

কেহ বলিল—

"রাম দীন পাঁড়ে,
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে,
চোর দেখ্‌লে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।"

কেহ বলিল,—

"লালচাঁদ সিং,
নাচে তিড়িং মিড়িং
ডালরুটির যম, কিন্তু বাজে ঘোড়ার ডিম।"

বালকেরা দ্বারবান্‌দিগের দ্বারা নানাবিধ অভিধান ছাড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।

হীরার আয়ি লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া নগেন্দ্রের বাড়ীর ডাক্তারখানায় উপস্থিত হইল। ডাক্তারকে দেখিয়া চিনিয়া বুড়ী কহিল, "হাঁ বাবা—ডাক্তার বাবা কোথায গা?" ডাক্তার কহিলেন, "আমিই ত ডাক্তার।" বুড়ি কহিল, "আর বাবা, চোকে দেখতে পাই নে—বয়স হ'ল পাঁচ সতা গণ্ডা, কি এক পোনই হয়—আমার দুঃখের কথা বলিব কি—একটা বেটা ছিল, তা যমকে দিলাম—এখন একটি নাতিনী ছিল, তাবও—" বলিয়া বুড়ী—হাঁউ মাউ—খাঁউ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।

ডাক্তাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে তোর?"

বুড়ী সে কথাব উত্তর না দিয়া আপনার জীবনচরিত আখ্যাত করিয়া আরম্ভ করিল এবং অনেক কাঁদাকাটার পর তাহা সমাপ্ত করিলে, ডাক্তারকে আবাব জিজ্ঞাসা কবিতে হইল, "এখন তুই চাহিস্ কি? তোর কি হইয়াছে?"

বুড়ী তখন পুনর্ব্বার আপন জীবনচরিতের অপূর্ব্ব কাহিনী আরম্ভ করিতেছিল, কিন্তু ডাক্তার বড় বিরক্ত হওয়ায় তাহা পরিত্যাগ করিয়া হীরার ও হীরার মাতার ও হীরার পিতার ও হীরার স্বামীর জীবনচরিত আখ্যান আরম্ভ করিল। ডাক্তার বহু কষ্টে তাহার মর্ম্মার্থ বুঝিলেন—কেন না, তাহাতে আত্মপরিচয় ও রোদনের বিশেষ বাহুল্য।

মর্ম্মার্থ এই যে, বুড়ী হীরার জন্য একটু ঔষধ চাহে। রোগ, বাতিক। হীরা গর্ভে থাকা কালে তাহার মাতা উন্মাদগ্রস্ত হইয়াছিল। সে সেই অবস্থায় কিছু কাল থাকিয়া সেই অবস্থাতেই মরে। হীরা বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী—তাহাতে কখনও মাতৃব্যাধির কোন লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই, কিন্তু আজিকালি বুড়ীর কিছু সন্দেহ হইয়াছে। হীরা এখন কখনও কখনও একা হাসে—একা কাঁদে, কখনও বা ঘরে দ্বার দিয়া নাচে। কখনও চীৎকার করে। কখনও মূর্চ্ছা যায়। বুড়ী ডাক্তারের কাছে ইহার ঔষধ চাহিল।

ডাক্তার চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তোর নাতিনীর হিষ্টীরিয়া হইয়াছে।"

বুড়ী জিজ্ঞাসা করিল, "তা বাবা! ইষ্টিরসের ঔষধ নাই?"

ডাক্তার বলিলেন, "ঔষধ আছে বই কি। উহাকে খুব গরম রাখিস্ আর এই কাষ্টর-অয়েলটুকু লইয়া যা কাল প্রাতে খাওয়াইস্। পরে অন্য ঔষধ দিব।" ডাক্তার বাবুর বিদ্যাটা ঐ রকম।

বুড়ী কাষ্টর-অয়েলের শিশি হাতে, লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া চলিল। পথে এক জন প্রতিবাসিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি গো হীরের আয়ি, তোমার হাতে ও কি?"

হীবার আয়ি কহিল যে, "হীরের ইষ্টিরস হয়েছে, তাই ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম, সে একটু কেষ্টরস দিয়াছে। তা হাঁ গা, কেষ্টরসে কি ইষ্টিরস ভাল হয়?"

প্রতিবাসিনী অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিল, "তা হবেও বা। কেষ্টই ত সকলের ইষ্টি। ত তাঁর অনুগ্রহে ইষ্টিরস ভাল হইতে পাবে। আচ্ছা, হীরাব আয়ি, তোর নাতির্নীর এত রস হয়েছে কোথা থেকে?" হীরার আয়ি অনেক ভাবিয়া বলিল, "বয়সদোষে অমন হয়।"

প্রতিবাসিনী কহিল, "একটু কৈলে বাচুরের চোনা খাইতে দিও। শুনিয়াছি, তাহাতে বড় রস পবিপাক পায়।"

বুড়ী বাড়ী গেলে, তাঁহার মনে পড়িল যে, ডাক্তার গরমে রাখার কথা বলিয়াছে। বুড়ী হীবাব সম্মুখে এক কড়া আগুন আনিয়া উপস্থিত করিল। হীরা বলিল, "মর! আগুন কেন?"

বুড়ী বলিল,—ডাক্তার তোকে গরম করতে বলেছে।"

দ্বিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : অন্ধকার পুরী—অন্ধকার জীবন

গোবিন্দপুবে দত্তদিগের বৃহৎ অট্টালিকা, ছয় মহল বাড়ী—নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী বিনা সব অন্ধকার। কাছারি বাড়ীতে আমলাবা বসে, অন্তঃপুরে কেবল কুন্দনন্দিনী, নিত্য প্রতিপাল্য কুটুম্বিনীদিগের সহিত বাস করে। কিন্তু চন্দ্র বিনা রোহিণীতে আকাশের কি অন্ধকার যায়? কোণে কোণে মাকড়সার জাল—ঘরে ঘরে ধূলার রাশি, কার্ণিসে কার্ণিসে পায়রার বাসা, কড়িতে কড়িতে চড়ুই। বাগানে শুক্না পাতার রাশি, পুকুরেতে পানা। উঠানেতে শিয়ালা, ফুল-বাগানে জঙ্গল, ভাণ্ডার ঘরে ইন্দুর। জিনিসপত্র ঘেরাটোপে ঢাকা। অনেকেতেই ছাতা ধরেছে। অনেক ইন্দুরে কেটেছে। ছুঁচা, বিছা, বাদুড়, চামচিকে অন্ধকাবে দিবাবাত্র বেড়াইতেছে। সূর্য্যমুখীর পোষা পাখীগুলাকে প্রায় বিড়ালে ভক্ষণ করিয়াছে। কোথাও কোথাও ভোজনাবশিষ্ট পাখাগুলি পড়িয়া আছে। হাঁসগুলা শৃগালে মারিয়াছে। ময়ূরগুলা বুনো হইয়া গিয়াছে। গোরুগুলাব হাড় উঠিয়াছে—আর দুধ দেয় না। নগেন্দ্রের কুক্কুরগুলার স্ফূর্ত্তি নাই—খেলা নাই, ডাক নাই—বাঁধাই থাকে। কোনটা মরিয়া গিয়াছে—কোনটা ক্ষেপিয়া গিয়াছে, কোনটা পলাইয়া গিয়াছে। ঘোড়াগুলার নানা রোগ—অথবা নীরোগেই রোগ। আস্তাবলে যেখানে সেখানে খড় কুটা, শুক্না পাতা, ঘাস, ধূলা আর পায়রার পালক। ঘোড়া সকল ঘাস দানা কখনও পায় কখনও পায় না। সহিসেরা প্রায় আস্তাবলমুখ হয় না; সহিস্নীমহলেই থাকে। অট্টালিকার কোথাও আলিশা ভাঙ্গিয়াছে, কোথাও জমাট খসিয়াছে; কোথাও সাসী, কোথাও খড়খড়ি, কোথাও রেলিং টুটিয়াছে। মেটিঙ্গের উপর বৃষ্টির জল, দেয়ালের পেন্টের উপর বসুধারা, বুককেশের উপর কুমীরপোকার বাসা, ঝাড়ের ফানুসের উপর চড়ুইয়ের বাসার খড় কুটা। গৃহে লক্ষ্মী নাই। লক্ষ্মী বিনা বৈকুণ্ঠও লক্ষ্মীছাড়া হয়।

যে উদ্যানে মালী নাই, ঘাসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে, সেখানে যেমন কখনও একটি গোলাপ কি একটি স্থলপদ্ম ফুটে, এই গৃহমধ্যে তেমনি একা কুন্দনন্দিনী বাস করিতেছিল। যেমন আর পাঁচজনে খাইত পরিত। কুন্দও তাই। যদি কেহ তাকে গৃহিণী ভাবিয়া কোন কথা কহিত, কুন্দ ভাবিত আমায় তামাসা করিতেছে। দেওয়ানজি যদি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইতেন, ভয়ে কুন্দের বুক দুড়্

দুড় করিত। বাস্তবিক কুন্দ দেওয়ানজিকে বড় ভয় করিত। ইহার একটি কারণও ছিল। নগেন্দ্র কুন্দকে পত্র লিখিতেন না; সুতরাং নগেন্দ্র দেওয়ানজিকে যে পত্রগুলি লিখিতেন, কুন্দ তাহাই চাহিয়া আনিয়া পড়িত। পড়িয়া, আর ফিরাইয়া দিত না। সেইগুলি পাঠ তাহার সন্ধ্যাগায়ত্রী হইয়াছিল। সর্ব্বদা ভয়, পাছে দেওয়ান পত্রগুলি ফিরাইয়া চায়। এই ভয়ে দেওয়ানের নাম শুনিলেই কুন্দের মুখ শুকাইত। দেওয়ান হীরার কাছে এ কথা জানিয়াছিলেন। পত্রগুলি আর চাহিতেন না। আপনি তাহার নকল রাখিয়া কুন্দকে পড়িতে দিতেন।

বাস্তবিক সূর্য্যমুখী যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন—কুন্দ কি পাইতেছে না? সূর্য্যমুখী স্বামীকে ভালবাসিতেন—কুন্দ কি বাসে না? সেই ক্ষুদ্র হৃদয়খানির মধ্যে অপরিমিত প্রেম! প্রকাশের শক্তি নাই বলিয়া, তাহা বিরুদ্ধ বায়ুর ন্যায় সতত কুন্দের সে হৃদয়ে আঘাত করিত। বিবাহের অগ্রে, বাল্যকালাবধি কুন্দ নগেন্দ্রকে ভালবাসিয়াছিল—কাহাকে বলে নাই, কেহ জানিতে পারে নাই। নগেন্দ্রকে পাইবার কোন বাসনা করে নাই—আশাও করে নাই, আপনার নৈরাশ্য আপনি সহ্য করিত। তাকে আকাশের চাঁদ ধরিয়া হাতে দিল। তার পর—এখন কোথায় সে চাঁদ? কি দোষে তাকে নগেন্দ্র পায়ে ঠেলিয়াছেন? কুন্দ এই কথা রাত্রিদিন ভাবে, রাত্রিদিন কাঁদে। ভাল, নগেন্দ্র নাই ভালবাসুন—তাকে ভালবাসিবেন, কুন্দের এমন কি ভাগ্য—একবার কুন্দ তাঁকে দেখিতে পায় না কেন? শুধু তাই কি? তিনি ভাবেন, কুন্দই এই বিপত্তির মূল, সকলেই ভাবে, কুন্দই অনর্থের মূল. কুন্দ ভাবে, কি দোষে আমি সকল অনর্থের মূল?

কুক্ষণে নগেন্দ্র কুন্দকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যেমন উপাস বৃক্ষের তলায় যে বসে, সেই মরে, তেমনি এই বিবাহের ছায়া যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, সেই মরিয়াছে।

আবার কুন্দ ভাবিত, "সূর্য্যমুখীর এই দশা আমা হতে হইল। সূর্য্যমুখী আমাকে রক্ষা করিয়াছিল—আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিত—তাহাকে পথের কাঙ্গালী করিলাম; আমার মত অভাগিনী কি আর আছে? আমি মরিলাম না কেন? এখন মরি না কেন।" আবার ভাবিত, "এখন মরিব না। তিনি আসুন—তাঁকে আর একবার দেখি—তিনি কি আর আসিবেন না?" কুন্দ সূর্য্যমুখীর মৃত্যুসংবাদ পায় নাই। তাই মনে মনে বলিত, "এখন শুধু শুধু মরিয়া কি হইবে? যদি সূর্য্যমুখী ফিরিয়া আসে, তবে মরিব। আর তার সুখের পথে কাঁটা হব না।"

ত্রিচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ প্রত্যাগমন

কলিকাতার আবশ্যকীয় কার্য্য সমাপ্ত হইল। দানপত্র লিখিত হইল। তাহাতে ব্রহ্মচারীর এবং অজ্ঞাতনাম ব্রাহ্মণের পুরস্কারের বিশেষ বিধি রহিল। তাহা হরিপুরে রেজেষ্ট্রী হইবে, এই কারণে দানপত্র সঙ্গে করিয়া নগেন্দ্র গোবিন্দপুরে গেলেন। শ্রীশচন্দ্রকে যথোচিত যানে অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়া গেলেন। শ্রীশচন্দ্র তাঁহাকে দানপত্রাদির ব্যবস্থা, এবং পদব্রজে গমন ইত্যাদি কার্য্য হইতে বিরত করিবার জন্য অনেক যত্ন করিলেন, কিন্তু সে যত্ন নিষ্ফল হইল। অগত্যা তিনি নদীপন্থায় তাঁহার অনুগামী হইলেন। মন্ত্রীছাড়া হইলে কমলমণির চলে না, সুতরাং তিনিও বিনা জিজ্ঞাসাবাদে সতীশকে লইয়া শ্রীশচন্দ্রের নৌকায় গিয়া উঠিলেন।

কমলমণি আগে গোবিন্দপুরে আসিলেন, দেখিয়া কুন্দনন্দিনীর বোধ হইল, আবার আকাশে একটি তারা উঠিল। যে অবধি সূর্য্যমুখী গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, সেই অবধি কুন্দনন্দিনীর উপর কমলমণির দুর্জ্জয় ক্রোধ। মুখ দেখিতেন না। কিন্তু এবার আসিয়া কুন্দনন্দিনীর শুষ্ক মূর্ত্তি দেখিয়া কমলমণির রাগ দূর হইল—দুঃখ হইল। তিনি কুন্দনন্দিনীকে প্রফুল্লিত করিবার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন, নগেন্দ্র আসিতেছেন, সংবাদ দিয়া কুন্দের মুখে হাসি দেখিলেন। সূর্য্যমুখীর

মৃত্যুসংবাদ দিতে কাজে কাজেই হইল। শুনিয়া কুন্দ কাঁদিল। এ কথা শুনিয়া, এ গ্রন্থের অনেক সুন্দরী পাঠকারিণী মনে মনে হাসিবেন; আর বলিবেন, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে।" কিন্তু কুন্দ বড় নির্ব্বোধ। সতিন মরিলে যে হাসিতে হয়, সেটা তার মোটা বুদ্ধিতে আসে নাই। বোকা মেয়ে, সতিনের জন্যও একটু কাঁদিল। আর তুমি ঠাকুরাণি! তুমি যে হেসে হেসে বলতেছ, "মাছ মরেছে, বেরাল কাঁদে"—তোমার সতিন মরিলে তুমি যদি একটু কাঁদ, তা হইলে আমি বড় তোমার উপর খুসী হব।

কমলমণি কুন্দকে শান্ত করিলেন। কমলমণি নিজে শান্ত হইয়াছিলেন। প্রথম প্রথম কমল অনেক কাঁদিয়াছিলেন—তার পরে ভাবিলেন, "কাঁদিয়া কি করিব? আমি কাঁদিলে শ্রীশচন্দ্র অসুখী হন—আমি কাঁদিলে সতীশ কাঁদে—কাঁদিলে ত সূর্য্যমুখী ফিরিবে না; তবে কেন এঁদের কাঁদাই? আমি কখন সূর্যমুখীকে ভুলিব না; কিন্তু আমি হাসিলে যদি সতীশ হাসে, তবে কেন হাসব না?" এই ভাবিয়া কমলমণি রোদন ত্যাগ করিয়া আবার সেই কমলমণি হইলেন।

কমলমণি শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, "এ বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী ত বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তাই বোলে দাদা বাবু বৈকুণ্ঠে এসে কি বটপত্রে শোবেন?"

শ্রীশচন্দ্র বলিলেন, "এসো, আমরা সব পরিষ্কার করি।"

অমনি শ্রীশচন্দ্র, রাজ, মজুর, ফরাস, মালী, যেখানে যাহার প্রয়োজন, সেখানে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এদিকে কমলমণির দৌরাত্ম্যে ছুঁচা, বাদুড়, চামচিকে মহলে বড় কিচি মিচি পড়িয়া গেল; পায়রাগুলা "বকম বকম" করিয়া এ কার্ণিশ ও কার্ণিশ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, চড়ুইগুলা পলাইতে ব্যাকুল—যেখানে সাসী বন্ধ, সেখানে দ্বার খোলা মনে করিয়া, ঠোঁটে কাচ লাগিয়া ঘুরিয়া পড়িতে লাগিল; পরিচারিকারা ঝাঁটা হাতে জনে জনে দিকে দিকে দিগ্বিজয়ে ছুটিল। অচিরাৎ অট্টালিকা আবার প্রসন্ন হইয়া হাসিতে লাগিল।

পরিশেষে নগেন্দ্র আসিয়া পঁহুছিলেন। তখন সন্ধ্যাকাল। যেমন নদী, প্রথম জলোচ্ছ্বাসকালে অত্যন্ত বেগবতী, কিন্তু জোয়ার পূরিলে গভীর জল শান্তভাব ধারণ করে, তেমনি নগেন্দ্রের সম্পূর্ণ-শোক-প্রবাহ এক্ষণে গম্ভীর শান্তিরূপে পরিণত হইয়াছিল। যে দুঃখ, তাহা কিছুই কমে নাই; কিন্তু অধৈর্য্যের হ্রাস হইয়া আসিয়াছিল। তিনি স্থিরভাবে পৌরবর্গের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলেন, সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কাহারও সাক্ষাতে তিনি সূর্য্যমুখীর প্রসঙ্গ করিলেন না—কিন্তু তাঁহার ধীরভাব দেখিয়া সকলেই তাঁহার দুঃখে দুঃখিত হইল। প্রাচীন ভৃত্যেরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গিয়া আপনা আপনি রোদন করিল। নগেন্দ্র কেবল একজনকে মনঃপীড়া দিলেন। চিরদুঃখিনী কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ স্তিমিত প্রদীপে

নগেন্দ্রনাথেব আদেশমত পরিচারিকারা সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে তাঁহার শয্যা প্রস্তুত করিয়াছিল। শুনিয়া কমলমণি ঘাড় নাড়িলেন।

নিশীথকালে পৌরজন সকলে সুষুপ্ত হইলে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহে শয়ন করিতে গেলেন। শয়ন করিতে না—রোদন করিতে। সূর্য্যমুখীর শয্যাগৃহ অতি প্রশস্ত এবং মনোহর; উহা নগেন্দ্রের সকল সুখের মন্দির, এই জন্য তাহা যত্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ঘরটি প্রশস্ত এবং উচ্চ, হর্ম্ম্যতল শ্বেতকৃষ্ণ মর্ম্মর-প্রস্তরে রচিত। কক্ষপ্রাচীরে নীল পিঙ্গল লোহিত লতা-পল্লব-ফল-পুষ্পাদি চিত্রিত; তদুপরি বসিয়া ন্যানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহঙ্গমসকল ফল ভক্ষণ করিতেছে, লেখা আছে। একপাশে বহমূল্য দারুনির্ম্মিত হস্তিদন্তখচিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট পর্য্যঙ্ক, আর এক পাশে বিচিত্র

বস্ত্রমণ্ডিত নানাবিধ কাষ্ঠাসন এবং বৃহদ্দর্পণ প্রভৃতি গৃহসজ্জার বস্তু বিস্তর ছিল। কয়খানি চিত্র কক্ষপ্রাচীর হইতে বিলম্বিত ছিল। চিত্রগুলি বিলাতী নহে। সূর্য্যমুখী নগেন্দ্র উভয়ে মিলিত হইয়া চিত্রের বিষয় মনোনীত করিয়া এক দেশী চিত্রকরের দ্বারা চিত্রিত করাইয়াছিলেন। দেশী চিত্রকর এক জন ইংরেজের শিষ্য; লিখিয়াছিল ভাল। নগেন্দ্র তাহা মহামূল্য ফ্রেম দিয়া শয্যাগৃহে রাখিয়াছিলেন। একখানি চিত্র কুমারসম্ভব হইতে নীত। মহাদেব পর্ব্বতশিখবে বেদির উপর বসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন। লতাগৃহদ্বারে নন্দী, বামপ্রকোষ্ঠার্পিতহেমবেত্র—মুখে এক অঙ্গুলি দিয়া কাননশব্দ নিবারণ করিতেছেন। কানন স্থির—ভ্রমরেরা পাতার ভিতর লুকাইয়াছে—মৃগেরা শয়ন করিয়া আছে। সেই কালে হরধ্যানভঙ্গের জন্য মদনের অধিষ্ঠান। সঙ্গে সঙ্গে বসন্তের উদয়। অগ্রে বসন্তপুষ্পাভরণময়ী পার্ব্বতী, মহাদেবকে প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। উমা যখন শম্ভুসম্মুখে প্রণামজন্য নত হইতেছেন, এক জানু ভূমিস্পৃষ্ট করিয়াছেন, আর এক জানু ভূমিস্পর্শ করিতেছে, স্কন্ধসহিত মস্তক নমিত হইয়াছে, সেই অবস্থা চিত্রে চিত্রিতা। মস্তক নমিত হওয়াতে অলকবন্ধ হইতে দুই একটি কর্ণবিলম্বী কুরুবক কুসুম খসিয়া পড়িতেছে, বক্ষ হইতে বসন ঈষৎ স্রস্ত হইতেছে, দূর হইতে মন্মথ সেই সময়ে, বসন্তপ্রফুল্লবনমধ্যে অর্দ্ধলুক্কায়িত হইয়া এক জানু ভূমিতে রাখিয়া, চারু ধনু চক্রাকার করিয়া, পুষ্পধনুতে পুষ্পশর সংযোজিত করিতেছেন। আর এক চিত্রে শ্রীরাম জানকী লইয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন; উভয়ে এক রত্নমণ্ডিত বিমানে বসিয়া, শূন্যমার্গে চলিতেছেন। শ্রীরাম জানকীর স্কন্ধে এক হস্ত রাখিয়া, আর এক হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা নিম্নে পৃথিবীর শোভা দেখাইতেছেন। বিমানচতুষ্পার্শে নানাবর্ণের মেঘ,—নীল, লোহিত, শ্বেত,—ধমূতরঙ্গোৎক্ষেপ করিয়া বেড়াইতেছে। নিম্নে আবার বিশাল নীল সমুদ্রে তরঙ্গভঙ্গ হইতেছে—সূর্য্যকরে তরঙ্গসকল হীরকরাশির মত জ্বলিতেছে। এক পারে অতিদূরে "সৌধকিরীটিনী লঙ্কা—" তাহার প্রাসাদাবলীর স্বর্ণমণ্ডিত চূড়া সকল সূর্য্যকরে জ্বলিতেছে। অপর পারে শ্যামশোভাময়ী "তমালতালীবনরাজিনীলা" সমুদ্রবেলা। মধ্যে শূন্যে হংসশ্রেণী সকল উড়িয়া যাইতেছে। আর এক চিত্রে, অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া রথে তুলিয়াছেন। রথ শূন্যপথে মেঘমধ্যে পথ করিয়া চলিয়াছে, পশ্চাৎ অগণিত যাদবী সেনা ধাবিত হইতেছে, দূরে তাহাদিগের পতাকাশ্রেণী এবং রজোজনিত মেঘ দেখা যাইতেছে। সুভদ্রা স্বয়ং সারথি হইয়া রথ চালাইতেছেন। অশ্বেরা মুখামুখি করিয়া, পদক্ষেপে মেঘ সকল চূর্ণ করিতেছে, সুভদ্রা আপন সারথ্যনৈপুণ্যে প্রীতা হইয়া মুখ ফিরাইয়া অর্জ্জুনের প্রতি বক্রদৃষ্টি করিতেছেন; কুন্দদন্তে আপন অধর দংশন করিয়া টিপি টিপি হাসিতেছেন; রথবেগজনিত পবনে তাঁহার অলক সকল উড়িতেছে—দুই এক গুচ্ছ কেশ স্বেদবিজড়িত হইয়া কপালে চক্রাকারে লিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, সাগরিকাবেশে রত্নাবলী, পরিষ্কার নক্ষত্রালোকে বালতমালতলে, উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছেন। তমালশাখা হইতে একটি উজ্জ্বল পুষ্পময়ী লতা বিলম্বিত হইয়াছে, রত্নাবলী এক হস্তে সেই লতার অগ্রভাগ লইয়া গলদেশে পরাইতেছেন, আর এক হস্তে চক্ষের জল মুছিতেছেন, লতাপুষ্প সকল তাঁহার কেশদামের উপর অপূর্ব্ব শোভা করিয়া রহিয়াছে। আর একখানি চিত্রে, শকুন্তলা দুষ্মন্তকে দেখিবার জন্য চরণ হইতে কাল্পনিক কুশাঙ্কুর মুক্ত করিতেছেন—অনুসূয়া, প্রিয়ম্বদা হাসিতেছে—শকুন্তলা ক্রোধে ও লজ্জায় মুখ তুলিতেছেন না—দুষ্মন্তের দিকে চাহিতেও পারিতেছেন না—যাইতেও পারিতেছেন না। আর এক চিত্রে, রণসজ্জিত হইয়া সিংহশাবকতুল্য প্রতাপশালী কুমার অভিমন্যু উত্তরার নিকট যুদ্ধযাত্রার জন্য বিদায় লইতেছেন—উত্তরা যুদ্ধে যাইতে দিবেন না বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আপনি দ্বারে দাঁড়াইয়াছেন। অভিমন্যু তাঁহার ভয় দেখিয়া হাসিতেছেন, আর কেমন করিয়া অবলীলাক্রমে ব্যূহভেদ করিবেন, তাহা মাটিতে তরবারির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্কিত করিয়া দেখাইতেছেন। উত্তরা তাহা কিছুই দেখিতেছেন না। চক্ষে দুই হস্ত দিয়া কাঁদিতেছেন। আর একখানি চিত্রে সত্যভামার তুলাব্রত চিত্রিত হইয়াছে। বিস্তৃত প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাঙ্গণ, তাহার পাশে উচ্চ সৌধপরিশোভিত রাজপুরী স্বর্ণচূড়ার সহিত দীপ্তি পাইতেছে। প্রাঙ্গণমধ্যে এক অত্যুচ্চ রজতনির্ম্মিত

তুলাযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে ভর করিয়া, বিদ্যুদ্দীপ্ত নীরদখণ্ডবৎ নানালঙ্কারভূষিত প্রৌঢ়বয়স্ক দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ বসিয়াছেন। তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ ভূমিস্পর্শ করিতেছে; আর এক দিকে নানারত্নাদিসহিত সুবর্ণরাশি স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে, তথাপি তুলাযন্ত্রের সেই ভাগ উদ্ধোত্থিত হইতেছে না। তুলাপাশে সত্যভামা; সত্যভামা প্রৌঢ়বয়স্কা, সুন্দরী, উন্নতদেহবিশিষ্টা, পুষ্টকান্তিমতী, নানাভরণভূষিতা, পঙ্কজলোচনা; কিন্তু তুলাযন্ত্রের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মুখ শুকাইয়াছে। তিনি অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া তুলায় ফেলিতেছেন; হস্তের চম্পকোপম অঙ্গুলির দ্বারা কর্ণবিলম্বী রত্নভূষা খুলিতেছেন, লজ্জায় কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে, দুঃখে চক্ষে জল আসিয়াছে, ক্রোধে নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত হইতেছে, অধর দংশন করিতেছেন; এই অবস্থায় চিত্রকর তাঁহাকে লিখিয়াছেন। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, স্বর্ণপ্রতিমারূপিণী রুক্মিণী দেখিতেছেন। তাঁহারও মুখ বিমর্ষ। তিনিও আপনার অঙ্গের অলঙ্কার খুলিয়া সত্যভামাকে দিতেছেন। কিন্তু তাঁহার চক্ষু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; তিনি স্বামীপ্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া, ঈষন্মাত্র অধরপ্রান্তে হাসি হাসিতেছেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সেই হাসিতে সপত্নীর আনন্দ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের মুখ গম্ভীর, স্থির, যেন কিছুই জানেন না; কিন্তু তিনি অপাঙ্গে রুক্মিণীর প্রতি দৃষ্টি করিতেছেন, সে কটাক্ষেও একটু হাসি আছে। মধ্যে শুভ্রবসন শুভ্রকান্তি দেবর্ষি নারদ; তিনি বড় আনন্দিতের ন্যায় সকল দেখিতেছেন, বাতাসে তাঁহার উত্তরীয় এবং শ্মশ্রু উড়িতেছে। চারি দিকে বহুসংখ্যক পৌরবর্গ নানাপ্রকার বেশভূষা ধারণ করিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। কত কত পুররক্ষিগণ গোল থামাইতেছে। এই চিত্রের নীচে সূর্য্যমুখী স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। স্বামীর সঙ্গে, সোণা রূপার তুলা?"

নগেন্দ্র যখন কক্ষমধ্যে একাকী প্রবেশ করিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছিল। রাত্রি অতি ভয়ানক। সন্ধ্যার পর হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল এবং বাতাস উঠিয়াছিল। এক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে বৃষ্টি হইতেছিল, বায়ু প্রচণ্ড বেগ ধারণ করিয়াছিল। গৃহের কবাট যেখানে যেখানে মুক্ত ছিল, সেইখানে সেইখানে বজ্রতুল্যশব্দে তাহার প্রতিঘাত হইতেছিল। সাসী সকল ঝনঝন শব্দে শব্দিত হইতেছিল। নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। তখন বাত্যানিনাদ মন্দীভূত হইল। খাটের পার্শ্বে আর একটি দ্বার খোলা ছিল—সে দ্বার দিয়া বাতাস আসিতেছিল না, সে দ্বার মুক্ত রহিল।

নগেন্দ্র শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন। নগেন্দ্র তাহাতে বসিয়া কত যে কাঁদিলেন, তাহা কেহ জানিল না। কত বার সূর্য্যমুখীর সঙ্গে মুখামুখি করিয়া সেই সোফার উপর বসিয়া কত সুখের কথা বলিয়াছিলেন।

নগেন্দ্র ভূয়োভূয়ঃ সেই অচেতন আসনকে চুম্বনালিঙ্গন করিলেন। আবার মুখ তুলিয়া সূর্য্যমুখীর প্রিয় চিত্রগুলির প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। গৃহে উজ্জ্বল দীপ জ্বলিতেছিল—তাহার চঞ্চল রশ্মিতে সেই সকল চিত্রপুত্তলি সজীব দেখাইতেছিল। প্রতি চিত্রে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে পড়িল যে, উমার কুসুমসজ্জা দেখিয়া সূর্য্যমুখী এক দিন আপনি ফুল পরিতে সাধ করিয়াছিলেন। তাহাতে নগেন্দ্র আপনি উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আনিয়া স্বহস্তে সূর্য্যমুখীকে কুসুমময়ী সাজাইয়াছিলেন। তাহাতে সূর্য্যমুখী যে কত সুখী হইয়াছিলেন—কোন্ রমণী রত্নময়ী সাজিয়া তত সুখী হয়? আর এক দিন সুভদ্রার সারথ্য দেখিয়া সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের গাড়ি হাঁকাইবার সাধ করিয়াছিলেন। পত্নীবৎসল নগেন্দ্র তখনই একখানি ক্ষুদ্র যানে দুইটি ছোট ছোট বর্ম্মা জুড়িয়া অন্তঃপুরের উদ্যানমধ্যে সূর্য্যমুখীর সারথ্যজন্য আনিলেন। উভয়ে তাহাতে আরোহণ করিলেন। সূর্য্যমুখী বল্গা ধরিলেন। অশ্বেরা আপনি চলিল। দেখিয়া, সূর্য্যমুখী সুভদ্রার মত নগেন্দ্রের দিকে মুখ ফিরাইয়া দংশিতাধরে টিপি টিপি হাসিতে লাগিলেন। এই অবকাশে অশ্বেরা ফটক নিকটে দেখিয়া একেবারে গাড়ি লইয়া বাহির হইয়া সদর রাস্তায় গেল। তখন সূর্য্যমুখী লোকলজ্জায় ম্রিয়মাণা

হইয়া ঘোমটা টানিতে লাগিলেন। তাঁহার দুর্দ্দশা দেখিয়া নগেন্দ্র নিজ হস্তে বল্‌গা ধারণ করিয়া গাড়ি অন্তঃপুরে ফিরাইয়া আনিলেন। এবং উভয়ে অবতরণ করিয়া কত হাসি হাসিলেন। শয্যাগৃহে আসিয়া সূর্য্যমুখী সুভদ্রার চিত্রকে একটি কিল দেখাইয়া বলিলেন, "তুই সর্ব্বনাশীই ত যত আপদের গোড়া।" নগেন্দ্র ইহা মনে করিয়া কত কাঁদিলেন। আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গাত্রোত্থান করিয়া পদচারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু যে দিকে চাহেন—সেই দিকেই সূর্য্যমুখীর চিহ্ন। দেয়ালে চিত্রকর যে লতা লিখিয়াছিল—সূর্য্যমুখী তাহার অনুকরণমানসে একটি লতা লিখিয়াছিলেন। তাহা তেমনি বিদ্যমান রহিয়াছে। এক দিন দোলে, সূর্য্যমুখী স্বামীকে কুঙ্কুম ফেলিয়া মারিয়াছিলেন—কুঙ্কুম নগেন্দ্রকে না লাগিয়া দেয়ালে লাগিয়াছিল। আজিও আবীরের চিহ্ন রহিয়াছে। গৃহ প্রস্তুত হইলে সূর্য্যমুখী এক স্থানে স্বহস্তে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

'১৯১০ সম্বৎসরে
ইষ্টদেবতা
স্বামীর স্থাপনা জন্য
এই মন্দির
তাঁহার দাসী সূর্য্যমুখী
কর্ত্তৃক
প্রতিষ্ঠিত হইল।'

নগেন্দ্র ইহা পড়িলেন। নগেন্দ্র কতবার পড়িলেন—পড়িয়া আকাঙ্ক্ষা পূরে না—চক্ষের জলে দৃষ্টি পুনঃপুনঃ লোপ হইতে লাগিল—চক্ষু মুছিয়া মুছিয়া পড়িতে লাগিলেন। পড়িতে পড়িতে দেখিলেন, ক্রমে আলোক ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। ফিরিয়া দেখিলেন, দীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। তখন নগেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন। শয্যায় উপবেশন করিবামাত্র অকস্মাৎ প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইয়া ঝটিকা ধাবিত হইল; চারি দিকে কবাটতাড়নের শব্দ হইতে লাগিল। সেই সময়ে, শূন্যতৈল দীপ প্রায় নির্ব্বাণ হইল—অল্পমাত্র খদ্যোতের ন্যায় আলো রহিল। সেই অন্ধকারতুল্য আলোতে এক অদ্ভুত ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে আসিল। ঝঞ্ঝাবাতের শব্দে চমকিত হইয়া, খাটের পাশে যে দ্বার মুক্ত ছিল, সেই দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। সেই মুক্তদ্বারপথে, ক্ষীণালোকে, এক ছায়াতুল্য মূর্ত্তি দেখিলেন। ছায়া স্ত্রীরূপিণী, কিন্তু আরও যাহা দেখিলেন, তাহাতে নগেন্দ্রের শরীর কণ্টকিত এবং হস্তপদাদি কম্পিত হইল। স্ত্রীরূপিণী মূর্ত্তি সূর্য্যমুখীর অবয়ববিশিষ্টা। নগেন্দ্র যেমন চিনিলেন যে, এ সূর্য্যমুখীর ছায়া—অমনি পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে পড়িয়া ছায়াপ্রতি ধাবমান হইতে গেলেন। ছায়া অদৃশ্য হইল। সেই সময়ে আলো নিবিল। তখন নগেন্দ্র চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : ছায়া

যখন নগেন্দ্রের চৈতন্যপ্রাপ্তি হইল তখন শয্যাগৃহে নিবিড়ান্ধকার। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সংজ্ঞা পুনঃসঞ্চিত হইতে লাগিল। যখন মূর্চ্ছার কথা সকল স্মরণ হইল, তখন বিস্ময়ের উপর আরও বিস্ময় জন্মিল। তিনি ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তবে তাঁহার শিরোদেশে উপাধান কোথা হইতে আসিল? আবার এক সন্দেহ—এ কি বালিশ? বালিশ স্পর্শ করিয়া দেখিলেন—এ ত বালিশ নহে। কোন

মনুষ্যের উরুদেশ। কোমলতায় বোধ হইল, স্ত্রীলোকের উরুদেশ। কে আসিয়া মূর্চ্ছিত অবস্থায় তাঁহার মাথা তুলিয়া উরুতে রাখিয়াছে? এ কি কুন্দনন্দিনী? সন্দেহ ভঞ্জনার্থে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" তখন শিরোরক্ষাকারিণী কোন উত্তর দিল না—কেবল দুই তিন বিন্দু উষ্ণ বারি নগেন্দ্রের কপোলদেশে পড়িল। নগেন্দ্র বুঝিলেন, যেই হউক, সে কাঁদিতেছে। উত্তর না পাইয়া নগেন্দ্র তাহার অঙ্গস্পর্শ করিলেন। তখন অকস্মাৎ নগেন্দ্র বুদ্ধিভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহার শরীর রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নিশ্চেষ্ট জড়ের মত ক্ষণকাল পড়িয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে রূদ্ধনিশ্বাসে রমণীর উরুদেশ হইতে মাথা তুলিয়া বসিলেন।

এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। আকাশে আর মেঘ ছিল না—পূর্ব্ব দিকে প্রভাতোদয় হইতেছিল। বাহিরে বিলক্ষণ আলোক প্রকাশ পাইয়াছিল—গৃহমধ্যেও আলোকরন্ধ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক আসিতেছিল। নগেন্দ্র উঠিয়া বসিয়া দেখিলেন যে, রমণী গাত্রোত্থান করিল—ধীরে ধীরে দ্বারোদ্দেশে চলিল। নগেন্দ্র তখন অনুভব করিলেন এ ত কুন্দনন্দিনী নহে। তখন এমন আলো নাই যে, মানুষ চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আকার ও ভঙ্গী কতক কতক উপলব্ধ হইল। আকার ও ভঙ্গী নগেন্দ্র মুহূর্ত্তকাল বিলক্ষণ করিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, সেই দণ্ডায়মান স্ত্রীমূর্ত্তির পদতলে পতিত হইলেন, কাতরস্বরে অশ্রুপরিপূর্ণ লোচনে বলিলেন, "দেবীই হও, আর মানুষই হও, তোমার পায়ে পড়িতেছি, আমার সঙ্গে একবার কথা কও। নচেৎ আমি মরিব।"

রমণী কি বলিল, কপালদোষে নগেন্দ্র তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু কথার শব্দ যেমন নগেন্দ্রের কর্ণে প্রবেশ করিল, অমনি তিনি তীরবৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এবং দণ্ডায়মান স্ত্রীলোককে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। কিন্তু তখন মন, শরীর দুই মোহে আচ্ছন্ন হইয়াছে—পুনর্ব্বার বৃক্ষচ্যুত বল্লীবৎ সেই মোহিনীর পদপ্রান্তে পড়িয়া গেলেন। আর কথা কহিলেন না।

রমণী আবার উরুদেশে মস্তক তুলিয়া লইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন নগেন্দ্র মোহ বা নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন, তখন দিনোদয় হইয়াছে। গৃহমধ্যে আলো। গৃহপার্শ্বে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষিগণ কলরব করিতেছে। শিরঃস্থ আলোকপন্থা হইতে বালসূর্য্যের কিরণ গৃহমধ্যে পতিত হইতেছে। তখনও নগেন্দ্র দেখিলেন, কাহার উরুদেশে তাঁহার মস্তক রহিয়াছে। চক্ষু না চাহিয়া বলিলেন, "কুন্দ, তুমি কখন আসিলে? আমি আজ সমস্ত রাত্রি সূর্য্যমুখীকে স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, সূর্য্যমুখীর কোলে মাথা দিয়া আছি। তুমি যদি সূর্য্যমুখী হইতে পারিতে, তবে কি সুখ হইত!" রমণী বলিল, "সেই পোড়ারমুখীকে দেখিলে যদি তুমি সুখী হও, তবে আমি সেই পোড়ারমুখীই হইলাম।"

নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন। চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন। চক্ষু মুছিলেন। আবার চাহিলেন। মাথা ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। আবার চক্ষু মুছিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তখন পুনশ্চ মুখাবনত করিয়া, মৃদু মৃদু আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "আমি কি পাগল হইলাম—না, সূর্যমুখী বাঁচিয়া আছেন? শেষে এই কি কপালে ছিল? আমি পাগল হইলাম!" এই বলিয়া নগেন্দ্র ধরাশায়ী হইয়া বাহুমধ্যে চক্ষু লুকাইয়া আবার কাঁদিতে লাগিলেন।

এবার রমণী তাঁহার পদযুগল ধরিলেন। তাঁহার পদযুগলে মুখাবৃত করিয়া, তাহা অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিলেন। বলিলেন "উঠ, উঠ! আমার জীবনসর্ব্বস্ব! মাটি ছাড়িয়া উঠিয়া বসো। আমি যে এত দুঃখ সহিয়াছি, আজ আমার সকল দুঃখের শেষ হইল। উঠ, উঠ! আমি মরি নাই। আবার তোমার পদসেবা করিতে আসিয়াছি।"

আর কি ভ্রম থাকে? তখন নগেন্দ্র সূর্য্যমুখীকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। এবং তাঁহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া, বিনা বাক্যে অবিশ্রান্ত রোদন করিতে লাগিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের স্কন্ধে মস্তক ন্যস্ত করিয়া কত রোদন করিলেন। কেহ কোন কথা বলিলেন না—কত রোদন করিলেন। রোদনে কি সুখ!

ষট্‌চত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ পূর্ব্ববৃত্তান্ত

যথাসময়ে সূর্য্যমুখী নগেন্দ্রের কৌতূহল নিবারণ করিলেন। বলিলেন, "আমি মরি নাই—কবিরাজ যে আমার মরার কথা বলিয়াছেন—সে মিথ্যা কথা। কবিরাজ জানেন না। আমি তাঁহার চিকিৎসায় সবল হইলে, তোমাকে দেখিবার জন্য গোবিন্দপুরে আসিবার কারণ নিতান্ত কাতর হইলাম। ব্রহ্মচারীকে ব্যতিব্যস্ত করিলাম। শেষে তিনি আমাকে গোবিন্দপুরে লইয়া আসিতে সম্মত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া তাঁহার সঙ্গে গোবিন্দপুরে আসিবার জন্য যাত্রা করিলাম। এখানে আসিয়া শুনিলাম তুমি দেশে নাই। ব্রহ্মচারী আমাকে এখান হইতে তিন ক্রোশ দূরে, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আপন কন্যা পরিচয়ে রাখিয়া, তোমার উদ্দেশ্যে গেলেন। তিনি প্রথমে কলিকাতায় গিয়া শ্রীশচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। শ্রীশচন্দ্রের নিকট শুনিলেন, তুমি মধুপুরে আসিতেছ। ইহা শুনিয়া তিনি আবার মধুপুরে গেলেন। মধুপুরে জানিলেন যে, যে দিন আমরা হরমণির বাটী হইতে আসি, সেই দিনেই তাহার গৃহদাহ হইয়াছিল। হরমণি গৃহমধ্যে পুড়িয়া মরিয়াছিল। প্রাতে লোকে দগ্ধ দেহ দেখিয়া চিনিতে পারে নাই। তাহারা সিদ্ধান্ত করিল যে, এ গৃহে দুইটি স্ত্রীলোক থাকিত; তাহার একটি মরিয়া গিয়াছে—আর একটি নাই। তবে বোধ হয়, একটি পলাইয়া বাঁচিয়াছে—আর একটি পুড়িয়া মরিয়াছে। যে পলাইয়াছে, সেই সবল ছিল, যে রুগ্ন, সে পলাইতে পারে নাই। এইরূপে তাহার সিদ্ধান্ত করিল যে, হরমণি পলাইয়াছে, আমি মরিয়াছি। যাহা প্রথমে অনুমান মাত্র ছিল, তাহা জনরবে ক্রমে নিশ্চিত বলিয়া প্রচার হইল। রামকৃষ্ণ সেই কথা শুনিয়া তোমাকে বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী এই সকল অবগত হইয়া আরও শুনিলেন যে, তুমি মধুপুরে গিয়াছিলে এবং আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া, এই দিকে আসিয়াছ। তিনি অমনি ব্যস্ত হইয়া তোমার সন্ধানে ফিরিলেন। কালি বৈকালে তিনি প্রতাপপুরে পৌঁছিয়াছেন, আমিও শুনিয়াছিলাম যে, তুমি দুই এক দিন মধ্যে বাটী আসিবে। সেই প্রত্যাশায় আমি পরশ্ব এখানে আসিয়াছিলাম। এখন আর তিন ক্রোশ পথ হাঁটিতে ক্লেশ হয় না—পথ হাঁটিতে শিখিয়াছি। পরশ্ব তোমার আসা হয় নাই, শুনিয়া ফিরিয়া গেলাম, আবার কাল ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর গোবিন্দপুরে আসিলাম। যখন এখানে পৌঁছিলাম, তখন এক প্রহর রাত্রি। দেখিলাম, তখনও খিড়কি দুয়ার খোলা। গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলাম—কেহ আমাকে দেখিল না। সিঁড়ির নীচে লুকাইয়া রহিলাম। পরে সকলে শুইলে সিঁড়িতে উঠিলাম। মনে ভাবিলাম, তুমি অবশ্য এই ঘরে শয়ন করিয়া আছ। দেখিলাম, এই দুয়ার খোলা। দুয়ারে উঁকি মারিয়া দেখিলাম—তুমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া আছ। বড় সাধ হইল, তোমার পায়ে লুটাইয়া পড়ি—কিন্তু আবার কত ভয় হইল—তোমার কাছে যে অপরাধ করিয়াছি—তুমি যদি ক্ষমা না কর? আমি ত তোমাকে কেবল দেখিয়াই তৃপ্ত। কপাটের আড়াল হইতে দেখিলাম; ভাবিলাম, এই সময়ে দেখা দিই। দেখা দিবার জন্য আসিতেছিলাম—কিন্তু দুয়ারে আমাকে দেখিয়াই, তুমি অচেতন হইলে। সেই অবধি কোলে লইয়া বসিয়া আছি। এ সুখ যে আমার কপালে হইবে, তাহা জানিতাম না। কিন্তু ছি! তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি আমার গায়ে হাত দিয়াও আমাকে চিনিতে পার নাই—আমি তোমার গায়ের বাতাস পাইলেই চিনিতে পারি।"

সপ্তচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ সরলা এবং সর্পী

যখন শয়ানাগারে সুখসাগরে ভাসিতে ভাসিতে নগেন্দ্র সূর্য্যমুখী এই প্রাণস্নিগ্ধকর কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন সেই গৃহের অংশান্তরে এক প্রাণসংহারক কথোপকথন হইতেছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে, পূর্ব্বরাত্রের কথা বলা আবশ্যক।

বাটী আসিয়া নগেন্দ্র কুন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন না। কুন্দ আপন শয়নাগারে উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া সমস্ত রাত্রি রোদন করিল। কেবল বালিকাসুলভ রোদন নহে—মর্ম্মান্তিক পীড়িত হইয়া রোদন করিল। যদি কেহ কাহাকে বাল্যকালে অকপটে আত্মসমর্পণ করিয়া, যেখানে অমূল্য হৃদয় দিয়াছিল, সেখানে তাহার বিনিময়ে কেবল তাচ্ছল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তবে সেই এই রোদনের মর্ম্মচ্ছেদকতা অনুভব করিবে। তখন কুন্দ পরিতাপ করিতে লাগিল যে, "কেন আমি স্বামিদর্শনলালসায় প্রাণ রাখিয়াছিলাম।" আরও ভাবিল যে, "এখন আর কোন্ সুখের আশায় প্রাণ রাখি?"

সমস্ত রাত্রি জাগরণ এবং রোদনের পর প্রভাতকালে কুন্দের তন্দ্রা আসিল। কুন্দ তন্দ্রাভিভূত হইয়া দ্বিতীয় বার লোমহর্ষণ স্বপ্ন দেখিল।

দেখিল, চারি বৎসর পূর্ব্বে পিতৃভবনে পিতার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে শয়নকালে, যে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি তাহার মাতার রূপ ধারণ করিয়া, স্বপ্নাবির্ভূতা হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেই আলোকময়ী প্রশান্তমূর্ত্তি আবার কুন্দের মস্তকোপরি অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু এবার তিনি বিশুদ্ধ শুভ্র চন্দ্রমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী নহেন। এক অতি নিবিড় বর্ষণোন্মুখ নীল নীরদমধ্যে আরোহণ করিয়া অবতরণ করিতেছেন। তাঁহার চতুষ্পার্শে অন্ধকারময় কৃষ্ণবাষ্পের তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই অন্ধকার মধ্যে এক মনুষ্যমূর্ত্তি অল্প অল্প হাসিতেছে। তন্মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে সৌদামিনী প্রভাসিত হইতেছে। কুন্দ সভয়ে দেখিল যে, ঐ হাস্যনিরত বদনমণ্ডল হীরার মুখানুরূপ। আরও দেখিল. মাতার করুণাময়ী কান্তি এক্ষণে গম্ভীরভাবাপন্ন। মাতা কহিলেন, "কুন্দ, তখন আমার কথা শুনিলে না, আমার সঙ্গে আসিলে না—এখন দুঃখ দেখিলে ত?"

কুন্দ রোদন করিল।

তখন মাতা পুনরপি কহিলেন, "বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।"

তখন কুন্দ কাঁদিয়া কহিল, "মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহি না।"

ইহা শুনিয়া মাতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন, "তবে আইস।" এই বলিয়া তেজোময়ী অন্তর্হিতা হইলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, কুন্দ স্বপ্ন স্মরণ করিয়া দেবতার নিকট ভিক্ষা চাহিল যে, "এবার আমার স্বপ্ন সফল হউক।"

প্রাতঃকালে হীরা কুন্দের পরিচর্য্যার্থে সেই গৃহে প্রবেশ করিল। দেখিল, কুন্দ কাঁদিতেছে।

কমলমণির আসা অবধি হীরা কুন্দের নিকট বিনীতভাব ধারণ করিয়াছিল। নগেন্দ্র আসিতেছেন, এই সংবাদই ইহার কারণ। পূর্ব্বপুরুষব্যবহারের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ বরং হীরা, পূর্ব্বাপেক্ষাও কুন্দের প্রিয়বাদিনী ও আজ্ঞাকারিণী হইয়াছিল। অন্য কেহ এই কাপট্য সহজেই বুঝিতে পারিত—কিন্তু কুন্দ অসামান্যা সরলা এবং আশুসন্তুষ্টা—সুতরাং হীরার এই নূতন প্রিয়কারিতায় প্রীতা ব্যতীত সন্দেহবিশিষ্টা হয় নাই। অতএব, এখন কুন্দ হীরাকে পূর্ব্বমত বিশ্বাসভাগিনী বিবেচনা করিত। কোন কালেই রূক্ষভাষিণী ভিন্ন অবিশ্বাসভাগিনী মনে করে নাই।

হীরা জিজ্ঞাসা করিল, "মা ঠাকুরাণি, কাঁদিতেছে কেন?"

কুন্দ কথা কহিল না। হীরার মুখপ্রতি চাহিয়া দেখিল। হীরা দেখিল, কুন্দের চক্ষু ফুলিয়াছে, বালিশ ভিজিয়াছে। হীরা কহিল, "এ কি? সমস্ত রাত্রিই কেঁদেছ না কি? কেন, বাবু কিছু বলেছেন?"

কুন্দ বলিল, "কিছু না।"

এই বলিয়া আবার সংবর্দ্ধিতবেগে রোদন করিতে লাগিল। হীরা দেখিল, কোন বিশেষ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কুন্দের ক্লেশ দেখিয়া আনন্দে তাহার হৃদয় ভাসিয়া গেল। মুখ ম্লান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু বাড়ী আসিয়া তোমার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কহিলেন? আমরা দাসী, আমাদের কাছে তা বলিতে হয়।"

কুন্দ কহিল, "কোন কথাবার্ত্তাই বলেন নাই।"

হীরা বিস্মিতা হইয়া কহিল, "সে কি মা! এত দিনের পর দেখা হলো! কোন কথাই বলিলেন না?"

কুন্দ কহিল, "আমার সঙ্গে দেখা হয় নাই।"

এই কথা বলিতে কুন্দের রোদন অসংবরণীয় হইল।

হীরা মনে বড় প্রীতা হইল। হাসিয়া বলিল, "ছি মা, এতে কি কাঁদতে হয়? কত লোকের কত বড় বড় দুঃখ মাথার উপর দিয়া গেল—আর তুমি একটু দেখা করার বিলম্বজন্য কাঁদিতেছ?"

"বড় বড় দুঃখ?" আবার কি প্রকার, কুন্দ তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। হীরা তখন বলিতে লাগিল, "আমার মত যদি তোমাকে সহিতে হইত—তবে এত দিনে তুমি আত্মহত্যা করিতে।"

"আত্মহত্যা," এই মহা অমঙ্গলজনক শব্দ কুন্দনন্দিনীর কাণে দারুণ বাজিল। সে শিহরিয়া উঠিয়া বসিল। রাত্রিকালে অনেক বার সে আত্মহত্যার কথা ভাবিয়াছিল। হীরার মুখে সেই কথা শুনিয়া নরাঙ্কিতের ন্যায় বোধ হইল।

হীরা বলিতে লাগিল, "তবে আমার দুঃখের কথা বলি শুন। আমিও একজনকে আপনার প্রাণ অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমার স্বামী নহে—কিন্তু যে পাপ করিয়াছি, তাহা মুনিবের কাছে লুকাইলে বা কি হইবে—স্পষ্ট স্বীকার করাই ভাল।"

এই লজ্জাহীন কথা কুন্দের কর্ণে প্রবেশও করিল না। তাহার কাণে সেই "আত্মহত্যা" শব্দ বাজিতেছিল। যেন ভূতে তাহার কাণে কাণে বলিতেছিল, "তুমি আত্মঘাতিনী হইতে পারিবে; এই যন্ত্রণা সহা ভাল, না মরা ভাল?"

হীরা বলিতে লাগিল, "সে আমার স্বামী নহে; কিন্তু আমি তাহাকে লক্ষ স্বামীর অপেক্ষা ভালবাসিতাম। সে আমাকে ভালবাসিত না; আমি জানিতাম যে, সে আমাকে ভালবাসিত না। এবং আমার অপেক্ষা শতগুণে নির্গুণ আর এক পাপিষ্ঠাকে ভালবাসিত।" ইহা বলিয়া হীরা নতনয়না কুন্দের প্রতি একবার অতি তীব্র কোপকটাক্ষ করিল, পরে বলিতে লাগিল, "আমি ইহা জানিয়া তাহার দিকে ঘেঁসিলাম না, কিন্তু একদিন আমাদের উভয়েরই দুর্বুদ্ধি হইল।" এইরূপে আরম্ভ করিয়া, হীরা সংক্ষেপে কুন্দের নিকট আপনার দারুণ ব্যথার পরিচয় দিল। কাহারও নাম ব্যক্ত করিল না; দেবেন্দ্রের নাম, কুন্দের নাম উভয়ই অব্যক্ত রহিল। এমত কোন কথা বলিল না যে, তদ্দারা, কে হীরার প্রণয়ী, কে বা সেই প্রণয়ীর প্রণয়িনী, তাহা অনুভূত হইতে পারে। আর সকল কথা সংক্ষেপে প্রকাশ করিয়া বলিল। শেষে পদাঘাতের কথা বলিয়া কহিল, "বল দেখি, তাহাতে আমি কি করিলাম?"

কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, "কি করিলে?" হীরা হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আমি তখন চাঁড়াল কবিরাজের বাড়ীতে গেলাম। তাহার নিকট এমন সব বিষ আছে যে, খাইবামাত্র মানুষ মরিয়া যায়।"

কুন্দ ধীরতার সহিত, মৃদুতার সহিত, কহিল, "তার পর?"

হীরা কহিল, "আমি বিষ খাইয়া মরিব বলিয়া বিষ কিনিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ভাবিলাম যে, পরের জন্য আমি মরিব কেন? ইহা ভাবিয়া বিষ কৌটায় পূরিয়া বাক্সতে তুলিয়া রাখিয়াছি।"

এই বলিয়া হীরা কক্ষান্তর হইতে তাহার বাক্স আনিল। সে বাক্সটি হীরা মুনিববাড়ীর প্রসাদ, পুরস্কার ও অপহরণের দ্রব্য লুকাইবার জন্য সেইখানে রাখিত।

হীরা সেই বাক্সতে নিজক্রীত বিষের মোড়ক রাখিয়াছিল। বাক্স খুলিয়া হীরা কৌটার মধ্যে বিষের মোড়ক কুন্দকে দেখাইল। আমিষলোলুপ মার্জ্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল। হীরা তখন যেন অন্যমনবশতঃ বাক্স বন্ধ করিতে ভুলিয়া গিয়া, কুন্দকে প্রবোধ দিতে লাগিল। এমত সময় অকস্মাৎ সেই প্রাতঃকালে নগেন্দ্রের পুরীমধ্যে মঙ্গলজনক শঙ্খ এবং হুলুধ্বনি উঠিল। বিস্মিত হইয়া হীরা ছুটিয়া দেখিতে গেল। মন্দভাগিনী কুন্দনন্দিনী সেই অবকাশে কৌটা হইতে বিষের মোড়ক চুরি করিল।

অষ্টচত্বারিংশত্তম পরিচ্ছেদ : কুন্দের কার্য্যতৎপরতা

হীরা আসিয়া শঙ্খধ্বনির যে কারণ দেখিল, প্রথম তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না। দেখিল, একটি বৃহৎ ঘরের ভিতর গৃহস্থ যাবতীয় স্ত্রীলোক, বালক এবং বালিকা সকলে মিলিয়া কাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া মহাকলরব করিতেছে। যাহাকে বেড়িয়া তাহারা কোলাহল করিতেছে—সে স্ত্রীলোক—হীরা কেবল তাহার কেশরাশি দেখিতে পাইল। হীরা দেখিল, সেই কেশরাশি কৌশল্যাদি পরিচারিকাগণ সুস্নিগ্ধ তৈলনিষিক্ত করিয়া, কেশরঞ্জিনীর দ্বারা রঞ্জিত করিতেছে। যাহারা তাহাকে মণ্ডলাকারে বেড়িয়া আছে, তাহারা কেহ হাসিতেছে, কেহ কাঁদিতেছে, কেহ বকিতেছে, কেহ আশীর্ব্বচন কহিতেছে। বালক বালিকারা নাচিতেছে, গায়িতেছে এবং করতালি দিতেছে। সকলকে বেড়িয়া বেড়িয়া কমলমণি শাঁক বাজাইতেছেন ও হুলু দিতেছেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাসিতেছেন—এবং কখন কখন এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া, এক একবার নৃত্য করিতেছেন।

দেখিয়া হীরা বিস্মিত হইল। হীরা মণ্ডলমধ্যে গলা বাড়াইয়া উঁকি মারিয়া দেখিল। দেখিয়া বিস্ময়বিহ্বলা হইল। দেখিল যে, সূর্য্যমুখী হর্ম্ম্যতলে বসিয়া, সুধাময় সস্নেহ হাসি হাসিতেছেন। কৌশল্যাদি তাঁহার রুক্ষ কেশভার কুসুম-সুবাসিত তৈলসিক্ত করিতেছে। কেহ বা তাহা রঞ্জিত করিতেছে; কেহ বা আর্দ্র গাত্রমার্জ্জনীর দ্বারা তাঁহার গাত্র পরিমার্জ্জিত করিতেছে। কেহ বা তাঁহার পূর্ব্বপরিত্যক্ত অলঙ্কার সকল পরাইতেছে। সূর্য্যমুখী সকলের সঙ্গে মধুর কথা কহিতেছেন—কিন্তু লজ্জিতা, একটু একটু অপরাধিনী হইয়া মধুর হাসি হাসিতেছেন। তাঁহার গণ্ডে স্নেহযুক্ত অশ্রু পড়িতেছে।

সূর্য্যমুখী মরিয়াছিলেন, তিনি আসিয়া আবার গৃহমধ্যে বিরাজ করিতেছেন, মধুর হাসি হাসিতেছেন, ইহা দেখিয়াও হীরার হঠাৎ বিশ্বাস হইল না। হীরা অস্ফুটস্বরে একজন পৌরস্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, কে গা?"

কথা কৌশল্যার কাণে গেল। কৌশল্যা কহিল, "চেন না, নেকি? আমাদের ঘরের লক্ষ্মী আর তোমার যম।" কৌশল্যা এত দিন হীরার ভয়ে চোরের মত ছিল, আজি দিন পাইয়া ভালমতে চোখ ঘুরাইয়া লইল।

কেশবিন্যাস সমাপ্ত হইলে এবং সকলের সঙ্গে আলাপ কুশল শেষ হইলে, সূর্য্যমুখী কমলের কাণে কাণে বলিলেন, "তোমায় আমায় একবাব কুন্দকে দেখিয়া আসি। সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।"

কেবল কমল ও সূর্য্যমুখী কুন্দেন সম্ভাষণে গেলেন।

অনেকক্ষণ তাঁহাদের বিলম্ব হইল। শেষে কমলমণি ভয়নিক্লিষ্টবদনে কুন্দের ঘর হইতে বাহির হইলেন। এবং অতিব্যস্তে নগেন্দ্রকে ডাকিতে পাঠাইলেন। নগেন্দ্র আসিলে, বধূরা ডাকিতেছে বলিয়া তাঁহাকে কুন্দের ঘর দেখাইয়া দিলেন। নগেন্দ্র তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দ্বারে সূর্য্যমুখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সূর্য্যমুখী বোদন করিতেছিলেন। নগেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী বলিলেন, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে। আমি এত দিনে জানিলাম, আমার কপালে একদিনেরও সুখ নাই--নতুবা আমি আবার সুখী হইবামাত্রই এমন সর্ব্বনাশ হইবে কেন?"

নগেন্দ্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে?"

সূর্য্যমুখী পুনরপি রোদন করিয়া কহিলেন, "কুন্দকে আমি বালিকাবয়স হইতেই মানুষ করিয়াছি; এখন সে আমার ছোট ভগিনী, বহিনের ন্যায় তাহাকে আদর করিব সাধ করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার সে সাধে ছাই পড়িল। কুন্দ বিষপান করিয়াছে।"

নগেন্দ্র। সে কি?

সূ। তুমি তাহার কাছে থাক—আমি ডাক্তার বৈদ্য আনিতেছি।

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নগেন্দ্র একাকী কুন্দনন্দিনীর নিকট গেলেন।

নগেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কুন্দনন্দিনীর মুখে কালিমা ব্যাপ্ত হইয়াছে। চক্ষু তেজোহীন হইয়াছে, শরীর অবসন্ন হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

উনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ ঃ এত দিনে মুখ ফুটিল

কুন্দনন্দিনী খাটের বাজুতে মাথা রাখিয়া, ভূতলে বসিয়াছিল—নগেন্দ্রকে নিকটে আসিতে দেখিয়া তাহার চক্ষুর জল আপনি উছলিয়া উঠিল। নগেন্দ্র নিকটে দাঁড়াইলে, কুন্দ ছিন্ন বল্লীবৎ তাঁহার পদপ্রান্তে মাথা লুটাইয়া পড়িল। নগেন্দ্র গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "এ কি এ কুন্দ! তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?"

কুন্দ কখন স্বামীর কথার উত্তর করিত না—আজি সে অন্তিমকালে মুক্তকণ্ঠে স্বামীর সঙ্গে কথা কহিল—বলিল, "তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ?"

নগেন্দ্র তখন নিরুত্তর হইয়া, অধোবদনে কুন্দনন্দিনীর নিকটে বসিলেন। কুন্দ তখন আবার কহিল,"কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে—কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না। আমি অল্পদিন মাত্র তোমাকে পাইয়াছি—তোমাকে দেখিয়া আমার আজিও তৃপ্তি হয় নাই। আমি মরিতাম না।"

এই প্রীতিপূর্ণ শেলসম কথা শুনিয়া নগেন্দ্র জানুর উপর ললাট রক্ষা করিয়া, নীরবে রহিলেন।

তখন কুন্দ আবার কহিল,—কুন্দ আজি বড় মুখরা, সে আর ত স্বামীর সঙ্গে কথা কহিবার দিন পাইবে না—কুন্দ কহিল, "ছিঃ! তুমি অমন করিয়া নীরব হইয়া থাকিও না। আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।"

সূর্য্যমুখীও এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন; অন্তকালে সবাই সমান।

নগেন্দ্র তখন মর্ম্মপীড়িত হইয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "কেন তুমি এমন কাজ করিলে?" তুমি আমায় একবার কেন ডাকিলে না?"

কুন্দ, বিলয়ভূয়িষ্ঠ জলদান্তর্ব্বর্ত্তিনী বিদ্যুতের ন্যায় মৃদুমধুর দিব্য হাসি হাসিয়া কহিল, "তাহা ভাবিও না। যাহা বলিলাম, তাহা কেবল মনের আবেগে বলিয়াছি। তোমার আসিবার আগেই আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, তোমাকে দেখিয়া মরিব। মনে মনে স্থির করিয়াছিলাম যে, দিদি যদি কখনও ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার কাছে তোমাকে রাখিয়া আমি মরিব—আর তাঁহার সুখের পথে কাঁটা হইয়া থাকিব না। আমি মরিব বলিয়াই স্থির করিয়াছিলাম—তবে তোমাকে দেখিলে আমার মরিতে ইচ্ছা করে না।"

নগেন্দ্র কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। আজ তিনি বালিকা অবাক্‌পটু কুন্দনন্দিনীর নিকট নিরুত্তর হইলেন।

কুন্দ ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল। তাহার কথা কহিবার শক্তি অপনীত হইতেছিল। মৃত্যু তাহাকে অধিকৃত করিতেছিল।

নগেন্দ্র তখন, সেই মৃত্যুচ্ছায়ান্ধকারম্লান মুখমণ্ডলের স্নেহপ্রফুল্লতা দেখিতেছিলেন। তাহার সেই আধিক্লিষ্ট মুখ মন্দবিদ্যুন্নিন্দিত যে হাসি তখন দেখিয়াছিলেন, নগেন্দ্রের প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত তাহা হৃদয়ে অঙ্কিত ছিল।

কুন্দ আবার কিছুকাল বিশ্রামলাভ করিয়া, অপরিতৃপ্তের ন্যায় পুনরপি ক্লিষ্টনিশ্বাসসহকারে কহিতে লাগিল, "আমার কথা কহিবার তৃষ্ণা নিবারণ হইল না—আমি তোমাকে দেবতা বলিয়া জানিতাম—সাহস করিয়া কখনও মুখ ফুটিয়া কথা কহি নাই। আমার সাধ মিটিল না—আমার শরীর

অবসন্ন হইয়া আসিতেছে—আমার মুখ শুকাইতেছে—জিব টানিতেছে—আমার আর বিলম্ব নাই।” এই বলিয়া কুন্দ, পর্য্যঙ্কাবলম্বন ত্যাগ করিয়া, ভূমে শয়ন করিয়া, নগেন্দ্রের অঙ্গে মাথা রাখিল এবং নয়ন মুদ্রিত করিয়া নীরব হইল।

ডাক্তার আসিল। দেখিয়া শুনিয়া ঔষধ দিল না—আর ভরসা নাই দেখিয়া ম্লানমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

পরে সময় আসন্ন বুঝিয়া, কুন্দ সূর্য্যমুখী ও কমলমণিকে দেখিতে চাহিল। তাঁহারা উভয়ে আসিলে, কুন্দ তাঁহাদের পদধূলি গ্রহণ করিল। তাঁহার উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিলেন।

তখন কুন্দনন্দিনী স্বামীর পদযুগলমধ্যে মুখ লুকাইল। তাহাকে নীরব দেখিয়া দুই জনে আবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। কিন্তু কুন্দ আর কথা কহিল না। ক্রমে ক্রমে চৈতন্যভ্রষ্টা হইয়া স্বামীর চরণমধ্যে মুখ রাখিয়া, নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করিল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাইল।

প্রথম রোদন সংবরণ করিয়া সূর্য্যমুখী মৃতা সপত্নী প্রতি চাহিয়া বলিলেন, “ভাগ্যবতি! তোমার মত প্রসন্ন অদৃষ্ট আমার হউক। আমি যেন এইরূপে স্বামীর চরণে মাথা রাখিয়া প্রাণত্যাগ করি।”

এই বলিয়া সূর্য্যমুখী রোরুদ্যমান স্বামীর হস্তধারণ করিয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলেন। পরে নগেন্দ্র ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক কুন্দকে নদীতীরে লইয়া যথাবিধি সৎকারের সহিত, সেই অতুল স্বর্ণপ্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আসিলেন।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ : সমাপ্তি

কুন্দনন্দিনীর বিয়োগের পর সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল যে, কুন্দনন্দিনী বিষ কোথায় পাইল। তখন সকলেই সন্দেহ করিল যে, হীরার এ কাজ।

তখন হীরাকে না দেখিয়া, নগেন্দ্র তাহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। হীরার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকাল হইতে হীরা অদৃশ্যা হইয়াছিল।

সেই অবধি আর কেহ সে দেশে হীরাকে দেখিতে পাইল না। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লোপ হইল। এক বার মাত্র বৎসরেক পরে, সে দেবেন্দ্রকে দেখা দিয়াছিল।

তখন দেবেন্দ্রের রোপিত বিষবৃক্ষের ফল ফলিয়াছিল। সে অতি কদর্য্য রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তদুপরি, মদ্যসেবার বিরতি না হওয়ায় রোগ দুর্নিবার্য্য হইল। দেবেন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিল। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুর পরে বৎসরেক মধ্যে দেবেন্দ্রেরও মৃত্যুকাল উপস্থিত হইল। মরিবার দুই চারি দিন পূর্ব্বে সে গৃহমধ্যে রুগ্নশয্যায় উত্থানশক্তিরহিত হইয়া শয়ন করিয়া আছে—এমত সময় তাহার গৃহদ্বারে বড় গোল উঠিল। দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, “কি?” ভৃত্যেরা কহিল যে, “একজন পাগলী আপনাকে দেখিতে চাহিতেছে। বারণ মানে না।” দেবেন্দ্র অনুমতি করিল, “আসুক।”

উন্মাদিনী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। দেবেন্দ্র দেখিল যে, সে একজন অতি দীনভাবাপন্ন স্ত্রীলোক। তাহার উন্মাদের লক্ষণ বিশেষ কিছু বুঝিতে পারিল না—কিন্তু অতি দীনা ভিখারিণী বলিয়া বোধ করিল। তাহার বয়স অল্প এবং পূর্ব্বলাবণ্যের চিহ্নসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার অত্যন্ত দুর্দ্দশা। তাহার বসন অতি মলিন, শতধা ছিন্ন, শতগ্রন্থিবিশিষ্ট এবং এত অল্পায়ত যে, তাহা জানুর নীচে পড়ে নাই, এবং তদ্দারা পৃষ্ঠ ও মস্তক আবৃত হয় নাই। তাহার কেশ রুক্ষ, অবেণীবদ্ধ, ধূলিধূসরিত—কদাচিৎ বা জটাযুক্ত। তাহার তৈলবিহীন অঙ্গে খড়ি উঠিতেছিল এবং কাদা পড়িয়াছিল।

ভিখারিণী দেবেন্দ্রের নিকট আসিয়া এরূপ তীব্রদৃষ্টি করিতে লাগিল যে, তখন দেবেন্দ্র বুঝিল, ভৃত্যদিগের কথাই সত্য—এ কোন উন্মাদিনী।

উন্মাদিনী অনেক ক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া কহিল, “আমায় চিনিতে পারিলে না? আমি হীরা।”

দেবেন্দ্র তখন চিনিল যে, হীরা। চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন দশা কে করিল?"

হীরা রোষদীপ্ত কটাক্ষে অধর দংশন করিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দেবেন্দ্রকে মারিতে আসিল। পরে স্থির হইয়া কহিল, "তুমি আবার জিজ্ঞাসা কর—আমার এমন দশা কে করিল? আমার এ দশা তুমিই করিয়াছ। এখন চিনিতেছ না—কিন্তু এক দিন আমার খোসামোদ করিয়াছিলে। এখন তোমার মনে পড়ে না, কিন্তু এক দিন এই ঘরে বসিয়া আমার এই পা ধরিয়া (এই বলিয়া হীরা খাটের উপর পা রাখিল) গাহিয়াছিলে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

এইরূপ কত কথা মনে করাইয়া দিয়া, উন্মাদিনী বলিতে লাগিল, "যে দিন তুমি আমাকে উৎসৃষ্ট করিয়া নাথি মারিয়া তাড়াইলে, সেই দিন হইতেই আমি পাগল হইয়াছি। আমি আপনি বিষ খাইতে গিয়াছিলাম—একটা আহ্লাদের কথা মনে পড়িল—সে বিষ আপনি না খাইয়া তোমাকে কি তোমার কুন্দকে খাওয়াইব। সেই ভরসায় কয় দিন কোন মতে আমার পীড়া লুকাইয়া রাখিলাম—আমার এ রোগ কখন আসে, কখন যায়। যখন আমি উন্মত্ত হইতাম, তখন ঘরে পড়িয়া থাকিতাম; যখন ভাল থাকিতাম, তখন কাজকর্ম্ম করিতাম। শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াইয়া মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল। আর লুকাইতে পারিব না—দেখিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেলাম। আর আমার অন্ন হইল না—পাগলকে কে অন্ন দিবে? সেই অবধি ভিক্ষা করি—যখন ভাল থাকি, ভিক্ষা করি; যখন রোগ চাপে, তখন গাছতলায় পড়িয়া থাকি। এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করি, নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।"

এই বলিয়া উন্মাদিনী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল। দেবেন্দ্র ভীত হইয়া শয্যার অপর পার্শ্বে গেল। হীরা তখন নাচিতে নাচিতে ঘরের বাহির হইয়া গায়িতে লাগিল,

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

সেই অবধি দেবেন্দ্রের মৃত্যুশয্যা কণ্টকময় হইল। মৃত্যুর অল্প পূর্ব্বেই জ্বরকালীন প্রলাপে দেবেন্দ্র কেবল বলিয়াছিলেন, "পদপল্লবমুদারং" পদপল্লবমুদারং"।

দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পর, কত দিন তাহার উদ্যানমধ্যে নিশীথ সময়ে রক্ষকে ভীতচিত্তে শুনিয়াছে যে, স্ত্রীলোক গায়িতেছে—

"স্মরগরলখণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহি পদপল্লবমুদারং।"

আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।

শেষের কবিতা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

অমিত-চরিত

অমিত রায় ব্যারিস্টার। ইংরেজি ছাঁদে রায় পদবী 'রয়' ও 'রে' রূপান্তর যখন ধারণ করলে তখন তার শ্রী গেল ঘুচে, কিন্তু সংখ্যা হল বৃদ্ধি। এই কারণে নামের অসামান্যতা কামনা করে অমিত এমন একটি বানান বানালে যাতে ইংরেজ বন্ধু ও বন্ধুনীদের মুখে তার উচ্চারণ দাঁড়িয়ে গেল—অমিট্ রায়ে।

অমিতর বাপ ছিলেন দিগ্‌বিজয়ী ব্যারিস্টার। যে পরিমাণ টাকা তিনি জমিয়ে গেছেন সেটা অধস্তন তিন পুরুষকে অধঃপাতে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তির সাংঘাতিক সংঘাতেও অমিত বিনা বিপত্তিতে এ যাত্রা টিকে গেল।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বি.এ.-র কোঠায় পা দেবার পূর্বেই অমিত অক্‌স্‌ফোর্ডে ভর্তি হয়; সেখানে পরীক্ষা দিতে দিতে এবং না দিতে দিতে ওর সাত বছর গেল কেটে। বুদ্ধি বেশি থাকাতে পড়াশুনো বেশি করে নি, অথচ বিদ্যেতে কমতি আছে বলে ঠাহর হয় না। ওর বাপ ওর কাছ থেকে অসাধারণ কিছু প্রত্যাশা করেন নি। তাঁর ইচ্ছে ছিল, তাঁর একমাত্র ছেলের মনে অক্‌স্‌ফোর্ডের রঙ এমন পাকা ক'রে ধরে যাতে দেশে এসেও ধোপ সয়।

অমিতকে আমি পছন্দ করি। খাসা ছেলে। আমি নবীন লেখক, সংখ্যায় আমার পাঠক স্বল্প, যোগ্যতায় তাদের সকলের সেরা অমিত। আমার লেখার ঠাট-ঠমকটা ওর চোখে খুব লেগেছে। ওর বিশ্বাস, আমাদের দেশের সাহিত্যবাজারে যাদের নাম আছে তাদের স্টাইল নেই। জীবসৃষ্টিতে উট জন্তুটা যেমন, এই লেখকদের রচনাও তেমনি, ঘাড়ে-গর্দানে সামনে-পিছনে পিঠে-পেটে বেখাপ; চালটা ঢিলে, নড়বড়ে; বাংলা সাহিত্যের মতো ন্যাড়া ফ্যাকাশে মরুভূমিতেই তার চলন। সমালোচকদের কাছে সময় থাকতে বলে রাখা ভালো, মতটা আমার নয়।

অমিত বলে ফ্যাশানটা হল মুখোশ, স্টাইলটা হল মুখশ্রী। ওর মতে, যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যাবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা বিষবৃক্ষে, বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন ঃ বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা মনোমোহনের মোহনবাগানে, নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে। বারোয়ারি তাঁবুর কানাতের নীচে ব্যাবসাদার নাচওয়ালীর দর্শন মেলে, কিন্তু শুভদৃষ্টিকালে বধূর মুখ দেখবার বেলায় বেনারসি ওড়নার ঘোমটা চাই। কানাত হল ফ্যাশানের, বেনারসি হল স্টাইলের—বিশেষের মুখ বিশেষ রঙের ছায়ায় দেখবার জন্যে। অমিত বলে, হাটের লোকের পায়ে-চলা রাস্তার বাইরে আমাদের পা সরতে ভরসা পায় না বলেই আমাদের দেশে স্টাইলের এত অনাদর। দক্ষযজ্ঞের গল্পে এই কথাটির পৌরাণিক ব্যাখ্যা মেলে। ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ একেবারে স্বর্গের ফ্যাশানদুরস্ত দেবতা, যাজ্ঞিক মহলে তাঁদের নিমন্ত্রণও জুটত। শিবের ছিল স্টাইল, এত ওরিজিন্যাল যে মন্ত্র-পড়া যজমানেরা তাঁকে হব্যকব্য দেওয়াটা বে-দস্তুর বলে জানত। অক্‌স্‌ফোর্ডের বি.এ.-র মুখে এ-সব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে। কেননা আমার বিশ্বাস, আমার লেখার স্টাইল আছে—সেইজন্যেই আমার সকল বইয়েরই এক সংস্করণেই কৈবল্যপ্রাপ্তি, তারা 'ন পুনরাবর্তন্তে'।

আমার শ্যালক নবকৃষ্ণ অমিতর এ-সব কথা একেবারে সইতে পারত না; বলত, 'রেখে দাও তোমার অক্‌স্‌ফোর্ডের পাস।' সে ছিল ইংরেজি সাহিত্যে রোমহর্ষক এম. এ.; তাকে পড়তে হয়েছে বিস্তর, বুঝতে হয়েছে অল্প। সেদিন সে আমাকে বললে, 'অমিত কেবলই ছোটো লেখককে বড়ো করে বড়ো লেখককে খাটো করবার জন্যেই। অবজ্ঞার ঢাক পিটোবার কাজে তার শখ, তোমাকে সে করেছে তার ঢাকের কাঠি।' দুঃখের বিষয় এই আলোচনা-স্থলে উপস্থিত ছিলেন আমার স্ত্রী, স্বয়ং ওর সহোদরা। কিন্তু পরম সন্তোষের বিষয় এই যে, আমার শ্যালকের কথা তাঁর একটুও ভালো

লাগে নি। দেখলুম, অমিতর সঙ্গেই তাঁর রুচির মিল, অথচ পড়াশুনো বেশি করেন নি। স্ত্রীলোকের আশ্চর্য স্বাভাবিক বুদ্ধি।

অনেক সময় আমার মনেও খটকা লাগে যখন দেখি কত কত নামজাদা ইংরেজ লেখকদেরও নগণ্য করতে অমিতর বুক দমে না। তারা হল যাদের বলা যেতে পারে 'বহুবাজারে চলতি লেখক, বড়োবাজারের ছাপ-মারা'—প্রশংসা করবার জন্যে যাদের লেখা পড়ে দেখবার দরকারই হয় না, চোখ বুজে গুণগান করলেই পাসমার্ক পাওয়া যায়। অমিতর পক্ষেও এদের লেখা পড়ে দেখা অনাবশ্যক, চোখ বুজে নিন্দে করতে ওর বাধে না। আসলে যারা নামজাদা তারা ওর কাছে বড়ো বেশি সরকারি, বর্ধমানের ওয়েটিং-রুমের মতো; আর যাদেরকে ও নিজে আবিষ্কার করেছে তাদের উপর ওর খাস-দখল যেন স্পেশাল ট্রেনের সেলুন কামরা।

অমিতর নেশাই হল স্টাইলে। কেবল সাহিত্য-বাছাই কাজে নয়, বেশে ভূষায় ব্যবহারে। ওর চেহারাতেই একটা বিশেষ ছাঁদ আছে—পাঁচজনের মধ্যে ও যে-কোনো একজন মাত্র নয়, ও হল একেবারে পঞ্চম; অন্যকে বাদ দিয়ে চোখে পড়ে। দাড়িগোঁফ-কামানো চাঁচা-মাজা চিকন শ্যামবর্ণ পরিপুষ্ট মুখ, স্ফূর্তি-ভরা ভাবটা, চোখ চঞ্চল, হাসি চঞ্চল, নড়াচড়া চলাফেরা চঞ্চল, কথার জবাব দিতে একটুও দেরি হয় না ; মনটা এমন এক রকমের চক্‌মকি যে ঠুন করে একটু ঠুকলেই স্ফুলিঙ্গ ছিটকে পড়ে। দেশী কাপড় প্রায়ই পরে, কেননা ওর দলের লোক সেটা পরে না। ধুতি সাদা থানের, যত্নে কোঁচানো, কেননা ওর বয়সে এরকম ধুতি চলতি নয়। পাঞ্জাবি পরে, তার বাঁ কাঁধ থেকে বোতাম ডান দিকের কোমর অবধি, আস্তিনের সামনের দিকটা কনুই পর্যন্ত দু ভাগ করা; কোমরে ধুতিটাকে ঘিরে একটা জরি-দেওয়া চওড়া খয়েরি রঙের ফিতে, তারই বাঁ দিকে ঝুলছে বৃন্দাবনি ছিটের এক ছোটো থলি, তার মধ্যে ওর ট্যাঁক-ঘড়ি, পায়ে সাদা চামড়ার উপর লাল চামড়ার কাজ-করা কট্‌কি জুতো। বাইরে যখন যায়, একটা পাট-করা পাড়-ওয়ালা মাদ্রাজি চাদর বাঁ কাঁধ থেকে হাঁটু অবধি ঝুলতে থাকে; বন্ধুমহলে যখন নিমন্ত্রণ থাকে মাথায় চড়ায় এক মুসলমানি লক্ষ্ণৌ টুপি, সাদার উপর সাদা-কাজ-করা। একে ঠিক সাজ বলব না, এ হচ্ছে ওর এক রকমের উচ্চ হাসি। ওর বিলিতি সাজের মর্ম আমি বুঝি নে; যারা বোঝে তারা বলে কিছু আলুথালু গোছের বটে, কিন্তু ইংরেজিতে যাকে বলে ডিস্‌টিঙ্গুইশ্‌ড্‌। নিজেকে অপরূপ করার শখ ওর নেই, কিন্তু ফ্যাশানকে বিদ্রূপ করবার কৌতুক ওর অপর্যাপ্ত। কোনোমতে বয়স মিলিয়ে যারা কুষ্ঠির প্রমাণে যুবক তাদের দর্শন মেলে পথে ঘাটে; অমিতর দুর্লভ যুবকত্ব নির্জলা যৌবনের জোরেই একেবারে বেহিসেবি, উড়নচণ্ডী, বান ডেকে ছুটে চলেছে বাইরের দিকে—সমস্ত নিয়ে চলেছে ভাসিয়ে, হাতে কিছুই রাখে না।

এ দিকে ওর দুই বোন, যাদের ডাক-নাম সিসি এবং লিসি, যেন নতুন বাজারে অত্যন্ত হালের আমদানি, ফ্যাশানের-পসরায় আপাদমস্তক যত্নে মোড়ক-করা পয়লা নম্বরের প্যাকেট-বিশেষ। উঁচু-খুর-ওয়ালা জুতো, লেসওয়ালা বুক-কাটা জ্যাকেটের ফাঁকে প্রবালে অ্যাম্বারে মেশানো মালা, শাড়িটা গায়ে তির্যগ্‌ভঙ্গিতে আঁট করে ল্যাপ্‌টানো। এরা খুট খুট করে দ্রুত লয়ে চলে; উচ্চৈঃস্বরে বলে; স্তরে স্তরে তোলে সূক্ষ্মাগ্র হাসি; মুখ ঈষৎ বেঁকিয়ে স্মিতহাস্যে উঁচু কটাক্ষে চায়, জানে কাকে বলে ভাবগর্ভ চাউনি। গোলাপি রেশমের পাখা ক্ষণে ক্ষণে গালের কাছে ফুর ফুর ক'রে সঞ্চালন করে, এবং পুরুষ বন্ধুর চৌকির হাতার উপরে বসে সেই পাখার আঘাতে তাদের কৃত্রিম স্পর্ধার প্রতি কৃত্রিম তর্জন প্রকাশ করে থাকে।

আপন দলের মেয়েদের সঙ্গে অমিতর ব্যবহার দেখে তার দলের পুরুষদের মনে ঈর্ষার উদয় হয়। নির্বিশেষভাবে মেয়েদের প্রতি অমিতর ঔদাসীন্য নেই, বিশেষভাবে কারো প্রতি আসক্তিও দেখা যায় না, অথচ সাধারণভাবে কোনোখানে মধুর রসেরও অভাব ঘটে না। এক কথায় বলতে গেলে, মেয়েদের সম্বন্ধে ওর আগ্রহ নেই, উৎসাহ আছে। অমিত পার্টিতেও যায়, তাসও খেলে, ইচ্ছে করেই

বাজিতে হারে, যে রমণীর গলা বেসুরো তাকে দ্বিতীয়বার গাইতে পীড়াপীড়ি করে, কাউকে বদ রঙের কাপড় পরতে দেখলে জিজ্ঞাসা করে কাপড়টা কোন্ দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যে-কোনো আলাপিতার সঙ্গেই কথা ব'লে বিশেষ পক্ষপাতের সুর লাগায়; অথচ সবাই জানে ওর পক্ষপাতটা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। যে মানুষ অনেক দেবতার পূজারি, আড়ালে সব দেবতাকেই সে সব দেবতার চেয়ে বড়ো ব'লে স্তব করে; দেবতাদের বুঝতে বাকি থাকে না, অথচ খুশিও হন। কন্যার মাতাদের আশা কিছুতেই কমে না, কিন্তু কন্যারা বুঝে নিয়েছে অমিত সোনার রঙের দিগন্তরেখা—ধরা দিয়েই আছে, তবু কিছুতেই ধরা দেবে না। মেয়েদের সম্বন্ধে ওর মন তর্কই করে, মীমাংসায় আসে না। সেইজন্যেই গম্যবিহীন আলাপের পথে ওর এত দুঃসাহস। তাই অতি সহজেই সকলের সঙ্গে ও ভাব করতে পারে—নিকটে দাহ্যবস্তু থাকলেও ওর তরফে আগ্নেয়তা নিরাপদে সুরক্ষিত।

সেদিন পিক্‌নিকে গঙ্গার ধারে যখন ওপারের ঘন কালো পুঞ্জীভূত স্তব্ধতার উপরে চাঁদ উঠল, ওর পাশে ছিল লিলি গাঙ্গুলি। তাকে ও মৃদুস্বরে বললে, 'গঙ্গার ওপারে ঐ নতুন চাঁদ, আর এপারে তুমি আর আমি, এমন সমাবেশটি অনন্ত কালের মধ্যে কোনোদিনই আর হবে না।'

প্রথমটা লিলি গাঙ্গুলির মন এক মুহূর্তে ছল্‌ছলিয়ে উঠেছিল, কিন্তু সে জানত এ কথাটায় যতখানি সত্য সে কেবল ঐ বলার কায়দাটুকুর মধ্যেই। তার বেশি দাবি করতে গেলে বুদ্‌বুদের উপরকার বর্ণচ্ছটাকে দাবি করা হয়। তাই নিজেকে ক্ষণকালের ঘোর-লাগা থেকে ঠেলা দিয়ে লিলি হেসে উঠল; বললে, 'অমিট্‌, তুমি যা বললে সেটা এত বেশি সত্য যে না বললেও চলত। এইমাত্র যে ব্যাঙটা টপ করে জলে লাফিয়ে পড়ল এটাও তো অনন্ত কালের মধ্যে আর কোনোদিন ঘটবে না।'

অমিত হেসে উঠে বললে, 'তফাত আছে লিলি, একেবারে অসীম তফাত। আজকের সন্ধ্যাবেলায় ঐ ব্যাঙের লাফানোটা একটা খাপছাড়া ছেঁড়া জিনিস। কিন্তু তোমাতে আমাতে চাঁদেতে, গঙ্গার ধারায়, আকাশের তারায়, একটা সম্পূর্ণ ঐকতানিক সৃষ্টি—বেটোফেনের চন্দ্রালোকগীতিকা। আমার মনে হয়, যেন বিশ্বকর্মার কারখানায় একটা পাগলা স্বর্গীয় স্যাকরা আছে, সে যেমনি একটি নিখুঁত সুগোল সোনার চক্রে নীলার সঙ্গে হীরে এবং হীরের সঙ্গে পান্না লাগিয়ে এক প্রহরের আংটি সম্পূর্ণ করলে অমনি দিলে সেটা সমুদ্রের জলে ফেলে—আর তাকে খুঁজে পাবে না কেউ।'

'ভালোই হল, তোমার ভাবনা রইল না অমিট্‌, বিশ্বকর্মার স্যাকরার বিল তোমাকে শুধতে হবে না।'

'কিন্তু লিলি, কোটি কোটি যুগের পর যদি দৈবাৎ তোমাতে আমাতে মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যের ছায়ায় তার কোনো-একটা হাজার-ক্রোশী খালের ধারে মুখোমুখি দেখা হয়, আর যদি শকুন্তলার সেই জেলেটা বোয়াল মাছের পেট চিরে আজকের এই অপরূপ সোনার মুহূর্তটিকে আমাদের সামনে এনে ধরে, চমকে উঠে মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করব, তার পরে কী হবে ভেবে দেখো।'

লিলি অমিতকে পাখার বাড়ি তাড়না করে বললে, 'তার পরে সোনার মুহূর্তটি অন্যমনে খসে পড়বে সমুদ্রের জলে। আর তাকে পাওয়া যাবে না। পাগলা স্যাকরার গড়া এমন তোমার কত মুহূর্ত খসে পড়ে গেছে ; ভুলে গেছ বলে তার হিসেব নেই।'

এই বলে লিলি তাড়াতাড়ি উঠে তার সখীদের সঙ্গে গিয়ে যোগ দিলে। অনেক ঘটনার মধ্যে এই একটা ঘটনার নমুনা দেওয়া গেল।

অমিতর বোন সিসি-লিসিরা ওকে বলে, 'অমি, তুমি বিয়ে কর না কেন?'

অমিত বলে, 'বিয়ে ব্যাপারটায় সকলের চেয়ে জরুরি হচ্ছে পাত্রী, তার নীচেই পাত্র।'

সিসি বলে, 'অবাক করলে, মেয়ে এত আছে!'

অমিত বলে, 'মেয়ে বিয়ে করত সেই পুরাকালে, লক্ষণ মিলিয়ে। আমি চাই পাত্রী, আপন পরিচয়েই যার পরিচয়, জগতে যে অদ্বিতীয়।'

সিসি বলে, 'তোমার ঘরে এলেই তুমি হবে প্রথম, সে হবে দ্বিতীয়, তোমার পরিচয়েই হবে তার পরিচয়।'

অমিত বলে, 'আমি মনে মনে যে মেয়ের ব্যর্থ প্রত্যাশায় ঘটকালি করি সে গরঠিকানা মেয়ে। প্রায়ই সে ঘর পর্যন্ত এসে পৌঁছয় না। সে আকাশ থেকে পড়ন্ত তারা, হৃদয়ের বায়ুমণ্ডল ছুঁতে-না-ছুঁতেই জ্বলে ওঠে, বাতাসে যায় মিলিয়ে, বাস্তুঘরের মাটি পর্যন্ত আসা ঘটেই ওঠে না।'

সিসি বলে, 'অর্থাৎ, সে তোমার বোনেদের মতো একটুও না।'

অমিত বলে, 'অর্থাৎ, সে ঘরে এসে কেবল ঘরের লোকেরই সংখ্যা বৃদ্ধি করে না।'

লিসি বলে, 'আচ্ছা ভাই সিসি, বিমি বোস তো অমির জন্যে পথ চেয়ে তাকিয়ে আছে, ইশারা করলেই ছুটে এসে পড়ে—তাকে ওর পছন্দ নয় কেন? বলে, ওর কালচার নেই। কেন ভাই, সে তো এম. এ.-তে বটানিতে ফার্‌স্ট্‌। বিদ্যেকেই তো বলে কাল্‌চার।'

অমিত বলে, 'কমল-হীরের পাথরটাকেই বলে বিদ্যে, আর ওর থেকে যে আলো ঠিকরে পড়ে তাকেই বলে কাল্‌চার। পাথরের ভার আছে, আলোর আছে দীপ্তি।'

লিসি রেগে উঠে বলে, 'ইস, বিমি বোসের আদর নেই ওঁর কাছে! উনি নিজেই নাকি তার যোগ্য? অমি যদি বিমি বোসকে বিয়ে করতে পাগল হয়েও ওঠে আমি তাকে সাবধান করে দেব, যেন ওর দিকে ফিরেও না তাকায়।'

অমিত বললে, 'পাগল না হলে বিমি বোসকে বিয়ে করতে চাইবই বা কেন? সে সময়ে আমার বিয়ের কথা না ভেবে উপযুক্ত চিকিৎসার কথা ভেবো।'

আত্মীয়স্বজন অমিতর বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। তারা ঠিক করেছে, বিয়ের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা ওর নেই, তাই ও কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে আর উলটো কথা ব'লে মানুষকে চমক লাগিয়ে বেড়ায়। ওর মনটা আলেয়ার আলো, মাঠে বাটে ধাঁধা লাগাতেই আছে, ঘরের মধ্যে তাকে ধরে আনবার জো' নেই।

ইতিমধ্যে অমিত যেখানে সেখানে হো হো করে বেড়াচ্ছে—ফিরপোর দোকানে যাকে তাকে চা খাওয়াচ্ছে, যখন তখন মোটরে চড়িয়ে বন্ধুদের অনাবশ্যক ঘুরিয়ে নিয়ে আসছে; এখান ওখান থেকে যা তা কিনছে আর একে ওকে বিলিয়ে দিচ্ছে; ইংরেজি বই সদ্য কিনে এ বাড়িতে ও বাড়িতে ফেলে আসছে, আর ফিরিয়ে আনছে না।

ওর বোনেরা ওর যে অভ্যাসটা নিয়ে ভারি বিরক্ত সে হচ্ছে ওর উলটো কথা বলা। সজ্জনসভায় যা-কিছু সর্বজনের অনুমোদিত ও তার বিপরীত কিছু-একটা বলে বসবেই।

একদা কোন্‌-একজন রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ডিমোক্রাসির গুণ বর্ণনা করছিল; ও বলে উঠল, 'বিষ্ণু যখন সতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করলেন তখন দেশ জুড়ে যেখানে সেখানে তাঁর একশোর অধিক পীঠস্থান তৈরি হয়ে গেল। ডিমোক্রাসি আজ যেখানে সেখানে যত টুকরো অ্যারিস্টক্রেসির পুজো বসিয়েছে—খুদে খুদে অ্যারিস্টক্র্যাটে পৃথিবী ছেয়ে গেল, কেউ পলিটিক্সে, কেউ সাহিত্যে, কেউ সমাজে। তাদের কারো গাম্ভীর্য নেই, কেননা তাদের নিজের 'পরে বিশ্বাস নেই।'

একদা মেয়েদের 'পরে পুরুষের আধিপত্যের অত্যাচার নিয়ে কোনো সমাজহিতৈষী অবলাবান্ধব নিন্দা করছিল পুরুষদের। অমিত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে ফস্‌ করে বললে, 'পুরুষ আধিপত্য ছেড়ে দিলেই মেয়ে আধিপত্য শুরু করবে। দুর্বলের আধিপত্য অতি ভয়ংকর।

সভাস্থ অবলা ও অবলাবান্ধবেরা চটে উঠে বললে, 'মানে কী হল?'

অমিত বললে, 'যে পক্ষের দখলে শিকল আছে সে শিকল দিয়েই পাখিকে বাঁধে, অর্থাৎ জোর দিয়ে। শিকল নেই যার সে বাঁধে আফিম খাইয়ে, অর্থাৎ মায়া দিয়ে। শিকলওয়ালা বাঁধে বটে কিন্তু ভোলায় না, আফিমওয়ালী বাঁধেও বটে ভোলায়ও। মেয়েদের কৌটো আফিমে ভরা, প্রকৃতি-শয়তানী তার জোগান দেয়।'

একদিন ওদের বালিগঞ্জের এক সাহিত্যসভায় রবি ঠাকুরের কবিতা ছিল আলোচনার বিষয়। অমিতর জীবনে এই সে প্রথম সভাপতি হতে রাজি হয়েছিল; গিয়েছিল মনে মনে যুদ্ধসাজ প'রে। একজন সেকেলে গোছের অতি ভালোমানুষ ছিল বক্তা। রবি ঠাকুরের কবিতা যে কবিতাই এইটে প্রমাণ করাই তার উদ্দেশ্য। দুই-একজন কলেজের অধ্যাপক ছাড়া অধিকাংশ সভ্যই স্বীকার করলে, প্রমাণটা একরকম সন্তোষজনক।

সভাপতি উঠে বললে, 'কবিমাত্রের উচিত পাঁচ বছর মেয়াদে কবিত্ব করা; পঁচিশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত। এ কথা বলব না যে পরবর্তীদের কাছ থেকে আরো ভালো কিছু চাই, বলব অন্য কিছু চাই। ফজলি আম ফুরোলে বলব না, আনো ফজলিতর আম; বলব, নতুন বাজার থেকে বড়ো দেখে আতা নিয়ে এসো তো হে। ডাব-নারকেলের মেয়াদ অল্প, সে রসের মেয়াদ; ঝুনো নারকেলের মেয়াদ বেশি, সে শাঁসের মেয়াদ। কবিরা হল ক্ষণজীবী, ফিলজফরের বয়সের গাছপাথর নেই।...রবি ঠাকুরের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো নালিশ এই যে, বুড়ো ওয়ার্ড্‌স্বার্থের নকল করে ভদ্রলোক অতি অন্যায়রকম বেঁচে আছে। যম বাতি নিবিয়ে দেবার জন্যে থেকে থেকে ফরাশ পাঠায়, তবু লোকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও চৌকির হাতা আঁকড়িয়ে থাকে। ও যদি মানে মানে নিজেই সরে না পড়ে, আমাদের কর্তব্য ওর সভা ছেড়ে দল বেঁধে উঠে আসা। পরবর্তী যিনি আসবেন তিনিও তাল ঠুকেই গর্জাতে গর্জাতে আসবেন যে, তাঁর রাজত্বের অবসান নেই, অমরাবতী বাঁধা থাকবে মর্তে তাঁরই দরজায়। কিছুকাল ভক্তরা দেবে মাল্যচন্দন, খাওয়াবে পেট ভরিয়ে, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করবে, তার পরে আসবে তাঁকে বলি দেবার পুণ্যদিন—ভক্তিবন্ধন থেকে ভক্তদের পরিত্রাণের শুভলগ্ন। আফ্রিকায় চতুষ্পদ দেবতার পুজোর প্রণালী এইরকমই। দ্বিপদী ত্রিপদী চতুষ্পদী চতুর্দশপদী দেবতাদের পুজোও এই নিয়মে। পূজা জিনিসটাকে একঘেয়ে করে তোলার মতো অপবিত্র অধার্মিকতা আর-কিছু হতে পারে না।...ভালো-লাগার এভোল্যুশন আছে। পাঁচ বছর পূর্বেকার ভালো-লাগা পাঁচ বছর পরেও যদি একই জায়গায় খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে তা হলে বুঝতে হবে, বেচারা জানতে পারে নি যে সে মরে গেছে। একটু ঠেলা মারলেই তার নিজের কাছে প্রমাণ হবে যে, সেন্টিমেন্টাল আত্মীয়েরা তার অন্ত্যেষ্টি-সৎকার করতে বিলম্ব কবেছিল, বোধ করি উপযুক্ত উত্তরাধিকারীকে চিরকাল ফাঁকি দেবার মতলবে। রবি ঠাকুরের দলের এই অবৈধ ষড়্‌যন্ত্র আমি পাবলিকের কাছে প্রকাশ করব বলে প্রতিজ্ঞা করেছি।'

আমাদেব মণিভূষণ চশমার ঝলক লাগিয়ে প্রশ্ন করলে, 'সাহিত্য থেকে লয়াল্‌টি উঠিয়ে দিতে চান?'

'একেবারেই। এখন থেকে কবি-প্রেসিডেন্টের দ্রুতনিঃশেষিত যুগ। রবি ঠাকুর সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, তাঁর রচনারেখা তাঁরই হাতের অক্ষরের মতো—গোল বা তরঙ্গরেখা, গোলাপ বা নারীর মুখ বা চাঁদের ধরনে। ওটা প্রিমিটিভ; প্রকৃতির হাতের অক্ষরের মক্‌শো-করা। নতুন প্রেসিডেন্টের কাছে চাই কড়া লাইনের, খাড়া লাইনের রচনা—তীরের মতো, বর্শার ফলার মতো, কাঁটার মতো; ফুলের মতো নয়; বিদ্যুতের রেখার মতো, ন্যুরাল্‌জিয়ার ব্যথার মতো—খোঁচাওয়ালা, কোণওয়ালা, গথিক গির্জের ছাঁদে; মন্দিরের মণ্ডপের ছাঁদে নয়; এমন-কি, যদি চটকল পাটকল অথবা সেক্রেটারিয়েট-বিল্‌ডিঙের আদলে হয়, ক্ষতি নেই।...এখন থেকে ফেলে দাও মন ভোলাবার ছলাকলা ছন্দোবন্ধ, মন কেড়ে নিতে হবে যেমন করে রাবণ সীতাকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছিল। মন যদি কাঁদতে কাঁদতে আপত্তি করতে করতে যায় তবুও তাকে যেতেই হবে—অতিবৃদ্ধ জটায়ুটা বারণ করতে আসবে,

তাই করতে গিয়েই তার হবে মরণ। তার পরে কিছুদিন যেতেই কিষ্কিন্ধ্যা জেগে উঠবে, কোন্ হনুমান হঠাৎ লাফিয়ে প'ড়ে লঙ্কায় আগুন লাগিয়ে মনটাকে পূর্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে আসবার ব্যবস্থা করবে। তখন আবার হবে টেনিসনের সঙ্গে পুনর্মিলন, বায়রনের গলা জড়িয়ে করব অশ্রুবর্ষণ, ডিকেন্স্‌কে বলব, মাপ করো, মোহ থেকে আরোগ্যলাভের জন্যে তোমাকে গাল দিয়েছি।...মোগল বাদশাদের কাল থেকে আজ পর্যন্ত দেশের যত মুগ্ধ মিস্ত্রি মিলে যদি যেখানে সেখানে ভারত জুড়ে কেবলই গম্বুজওয়ালা পাথরের বুদ্‌বুদ্ বানিয়ে চলত তা হলে ভদ্রলোক মাত্রই যেদিন বিশ বছর বয়স পেরোত সেইদিনই বানপ্রস্থ নিতে দেরি করত না। তাজমহলকে ভালো লাগাবার জন্যেই তাজমহলের নেশা ছুটিয়ে দেওয়া দরকার।'

(এইখানে বলে রাখা দরকার, কথার তোড় সামলাতে না পেরে সভার রিপোর্টারের মাথা ঘুরে গিয়েছিল, সে যা রিপোর্ট লিখেছিল সেটা অমিতর বক্তৃতার চেয়েও অবোধ্য হয়ে উঠেছিল। তারই থেকে যে-কটা টুকরো উদ্ধার করতে পারলুম তাই আমরা উপরে সাজিয়ে দিয়েছি।)

তাজমহলের পুনরাবৃত্তির প্রসঙ্গে রবি ঠাকুরের ভক্ত আরক্তমুখে বলে উঠল, 'ভালো জিনিস যত বেশি হয় ততই ভালো।'

অমিত বললে, 'ঠিক তার উলটো। বিধাতার রাজ্যে ভালো জিনিস অল্প হয় বলেই তা ভালো, নইলে সে নিজেরই ভিড়ের ঠেলায় হয়ে যেত মাঝারি।...যে-সব কবি ষাট-সত্তর পর্যন্ত বাঁচতে একটুও লজ্জা করে না তারা নিজেকে শাস্তি দেয় নিজেকে সস্তা করে দিয়ে। শেষকালটায় অনুকরণের দল চারি দিকে ব্যূহ বেঁধে তাদেরকে মুখ ভেঙচাতে থাকে। তাদের লেখার চরিত্র বিগড়ে যায়, পূর্বের লেখা থেকে চুরি শুরু ক'রে হয়ে পড়ে পূর্বের লেখার রিসিভর্‌স্ অফ স্টোল্‌ন্ প্রপার্টি। সে স্থলে লোকহিতের খাতিরে পাঠকদের কর্তব্য হচ্ছে, কিছুতেই এই-সব অতিপ্রবীণ কবিদের বাঁচতে না দেওয়া—শারীরিক বাঁচার কথা বলছি নে, কাব্যিক বাঁচা। এদের পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাক্ প্রবীণ অধ্যাপক, প্রবীণ পোলিটিশন, প্রবীণ সমালোচক।'

সেদিনকার বক্তা বলে উঠল, 'জানতে পারি কি, কাকে আপনি প্রেসিডেন্ট করতে চান? তার নাম করুন।'

অমিত ফস্ করে বললে, 'নিবারণ চক্রবর্তী।'

সভার নানা চৌকি থেকে বিস্মিত রব উঠল, 'নিবারণ চক্রবর্তী! সে লোকটা কে?'

'আজকের দিনে এই-যে প্রশ্নের অঙ্কুর মাত্র, আগামী দিনে এর থেকে উত্তরের বনস্পতি জেগে উঠবে।'

'ইতিমধ্যে আমরা একটা নমুনা চাই।'

'তবে শুনুন।'

ব'লে পকেট থেকে একটা সরু লম্বা ক্যাম্বিসে-বাঁধা খাতা বের করে তার থেকে পড়ে গেল—

আনিলাম
অপরিচিতের নাম
ধরণীতে,
পরিচিত জনতার সরণীতে।
আমি আগন্তুক,
আমি জনগণেশের প্রচণ্ড কৌতুক।
খোলো দ্বার,
বার্তা আনিয়াছি বিধাতার।
মহাকালেশ্বর
পাঠায়েছে দুর্লক্ষ্য অক্ষর,

বল্ দুঃসাহসী কে কে
মৃত্যু পণ রেখে
দিবি তার দুরূহ উত্তর।

শুনিবে না।
মূঢ়তার সেনা
করে পথরোধ।
ব্যর্থ ক্রোধ
হুংকারিয়া পড়ে বুকে —
তরঙ্গের নিষ্ফলতা
নিত্য যথা
মরে মাথা ঠুকে
শৈলতট-'পরে
আত্মঘাতী দম্ভভরে।

পুষ্পমাল্য নাহি মোর, রিক্ত বক্ষতল,
নাহি বর্ম অঙ্গদ কুণ্ডল।
শূন্য এ ললাটপট্টে লিখা
গূঢ় জয়টিকা।
ছিন্নকন্থা দরিদ্রের বেশ।
করিব নিঃশেষ।
তোমার ভাণ্ডার।
খোলো খোলো দ্বার।
অকস্মাৎ
বাড়ায়েছি হাত,
যা দিবার দাও অচিরাৎ!
বক্ষ তব কেঁপে ওঠে, কম্পিত অর্গল,
পৃথ্বী টলমল।
ভয়ে আর্ত উঠিছে চীৎকারি
দিগন্ত বিদারি—
'ফিরে যা এখনি,
রে দুর্দান্ত দুরন্ত ভিখারি,
তোর কণ্ঠধ্বনি
ঘুরি ঘুরি
নিশীথনিদ্রার বক্ষে হানে তীব্র ছুরি।'
অস্ত্র আনো।
ঝঞ্ঝনিয়া আমার পঞ্জরে হানো।
মৃত্যুরে মারুক মৃত্যু, অক্ষয় এ প্রাণ

করি যাব দান।
শৃঙ্খল জড়াও তবে,
বাঁধো মোরে, খণ্ড খণ্ড হবে
মুহূর্তে চকিতে —
মুক্তি তব আমারি মুক্তিতে।

শাস্ত্র আনো।
হানো মোরে, হানো।
পণ্ডিতে পণ্ডিতে
ঊর্ধ্বস্বরে চাহিবে খণ্ডিতে
দিব্য বাণী।
জানি জানি,
তর্কবাণ
হয়ে যাবে খান-খান।
মুক্ত হবে জীর্ণ বাক্যে আচ্ছন্ন দু চোখ,
হেরিবে আলোক।

অগ্নি জ্বালো।
আজিকার যাহা ভালো
কল্য যদি হয় তাহা কালো
যদি তাহা ভস্ম হয়
বিশ্বময়,
ভস্ম হোক।
দূর করো শোক।
মোর অগ্নিপরীক্ষায়
ধন্য হোক বিশ্বলোক অপূর্ব দীক্ষায়।

আমার দুর্বোধ বাণী
বিরুদ্ধ বুদ্ধিব 'পরে মুষ্টি হানি
করিবে তাহারে উচ্চকিত,
আতঙ্কিত।
উন্মাদ আমার ছন্দ
দিবে ধন্দ
শান্তিলুব্ধ মুমুক্ষুরে,
ভিক্ষাজীর্ণ বুভুক্ষুরে।
শিরে হস্ত হেনে
একে একে নিবে মেনে

ক্রোধে ক্ষোভে ভয়ে
লোকালয়ে
অপরিচিতের জয়,
অপরিচিতের পরিচয়—
যে অপরিচিত
বৈশাখের রুদ্র ঝড়ে বসুন্ধরা করে আন্দোলিত,
হানি বজ্রমুঠি
মেঘের কার্পণ্য টুটি
সংগোপন বর্ষণসঞ্চয়
ছিন্ন করে, মুক্ত করে সর্বজগন্ময়।।

রবি ঠাকুরের দল সেদিন চুপ করে গেল। শাসিয়ে গেল, লিখে জবাব দেবে।

সভাটাকে হতবুদ্ধি করে দিয়ে মোটরে করে অমিত যখন বাড়ি আসছিল সিসি তাকে বললে, 'একখানা আস্ত নিবারণ চক্রবর্তী তুমি নিশ্চয় আগে থাকতে গড়ে তুলে পকেটে করে নিয়ে এসেছ, কেবলমাত্র ভালোমানুষদের বোকা বানাবার জন্যে।'

অমিত বললে, 'অনাগতকে যে মানুষ এগিয়ে নিয়ে আসে তাকেই বলে অনাগতবিধাতা। আমি তাই। নিবারণ চক্রবর্তী আজ মর্তে এসে পড়ল, কেউ তাকে আর ঠেকাতে পারবে না।'

সিসি অমিতকে নিয়ে মনে মনে খুব একটা গর্ব বোধ করে।

সে বললে, 'আচ্ছা অমিত, তুমি কি সকালবেলা উঠেই সেদিনকার মতো তোমার যত শানিয়ে-বলা কথা বানিয়ে রেখে দাও?'

অমিত বললে, 'সম্ভবপরের জন্যে সব সময়ে প্রস্তুত থাকাই সভ্যতা; বর্বরতা পৃথিবীতে সকল বিষয়েই অপ্রস্তুত। এ কথাটাও আমার নোট্‌বইয়ে লেখা আছে।'

'কিন্তু তোমার নিজের মত বলে কোনো পদার্থই নেই ; যখন যেটা বেশ ভালো শোনায় সেইটেই তুমি বলে বস।'

'আমার মনটা আয়না, নিজের বাঁধা মতগুলো দিয়েই চিরদিনের মতো যদি তাকে আগাগোড়া লেপে রেখে দিতুম তা হলে তার উপরে প্রত্যেক চলতি মুহূর্তের প্রতিবিম্ব পড়ত না।'

সিসি বললে, 'অমি, প্রতিবিম্ব নিয়েই তোমার জীবন কাটবে।'

২
সংঘাত

অমিত বেছে বেছে শিলঙ পাহাড়ে গেল। তার কারণ, সেখানে ওর দলের লোক কেউ যায় না। আরো একটা কারণ, ওখানে কন্যাদায়ের বন্যা তেমন প্রবল নয়। অমিতর হৃদয়টার 'পরে যে দেবতা সর্বদা শরসন্ধান করে ফেরেন তাঁর আনাগোনা ফ্যাশানেব্‌ল্‌ পাড়ায়। দেশের পাহাড়-পর্বতে যত বিলাসী বসতি আছে তার মধ্যে শিলঙে এদের মহলে তাঁর টার্গেট-প্র্যাক্‌টিসের জায়গা সব চেয়ে সংকীর্ণ। বোনেরা মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বললে, 'যেতে হয় একলা যাও আমরা যাচ্ছি নে।'

বাঁ হাতে হাল কায়দার বেঁটে ছাতা, ডান হাতে টেনিস ব্যাট, গায়ে নকল পারসিক শালের ক্লোক প'রে বোনরা গেল চলে দার্জিলিঙে। বিমি বোস আগেভাগেই সেখানে গিয়েছে। যখন ভাইকে

বাদ দিয়ে বোনদের সমাগম হল তখন সে চার দিকে চেয়ে আবিষ্কার করলে, দার্জিলিঙে জনতা আছে, মানুষ নেই।

অমিত সবাইকে বলে গিয়েছিল সে শিলঙে যাচ্ছে নির্জনতা ভোগের জন্যে; দুদিন না যেতেই বুঝলে জনতা না থাকলে নির্জনতার স্বাদ মরে যায়। ক্যামেরা হাতে দৃশ্য দেখে বেড়াবার শখ অমিতর নেই। সে বলে, 'আমি টুরিস্ট্ না; মন দিয়ে চেখে খাবার ধাত আমার, চোখ দিয়ে গিলে খাবার ধাত একেবারেই নয়।'

কিছুদিন ওর কাটল পাহাড়ের ঢালুতে দেওদার গাছের ছায়ায় বই প'ড়ে প'ড়ে। গল্পের বই ছুঁলে না, কেননা, ছুটিতে গল্পের বই পড়া সাধারণের দস্তুর। ও পড়তে লাগল সুনীতি চাটুজ্জের 'বাংলা ভাষার শব্দতত্ত্ব', লেখকের সঙ্গে মতান্তর ঘটবে এই একান্ত আশা মনে নিয়ে। এখানকার পাহাড় পর্বত অরণ্য ওর শব্দতত্ত্ব এবং আলস্যজড়তার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ সুন্দর ঠেকে, কিন্তু সেটা মনের মধ্যে পুরোপুরি ঘনিয়ে ওঠে না; যেন কোনো রাগিণীর একঘেয়ে আলাপের মতো—ধুয়ো নেই, তাল নেই, সম নেই। অর্থাৎ, ওর মধ্যে বিস্তর আছে, কিন্তু এক নেই—তাই এলানো জিনিস ছড়িয়ে পড়ে, জমা হয় না। অমিতর আপন নিখিলের মাঝখানে একের অভাব ও যে কেবলই চঞ্চলভাবে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে সে দুঃখ ওর এখানেও যেমন শহরেও তেমনি। কিন্তু শহরে সেই চাঞ্চল্যটাকে সে নানাপ্রকারে ক্ষয় করে ফেলে, এখানে চাঞ্চল্যটাই স্থির হয়ে জমে জমে ওঠে—ঝর্না বাধা পেয়ে যেমন সরোবর হয়ে দাঁড়ায়। তাই ও যখন ভাবছে 'পালাই, পাহাড় বেয়ে নেমে গিয়ে পায়ে হেঁটে সিলেট-শিলচরের ভিতর দিয়ে যেখানে খুশি' এমন সময়ে আষাঢ় এল পাহাড়ে পাহাড়ে বনে বনে তার সজল ঘনচ্ছায়ার চাদর লুটিয়ে। খবর পাওয়া গেল চেরাপুঞ্জির গিরিশৃঙ্গ নববর্ষার মেঘদলের পুঞ্জিত আক্রমণ আপন বুক দিয়ে ঠেকিয়েছে ; এইবার ঘন বর্ষণে গিরিনির্ঝরিণীগুলোকে ক্ষেপিয়ে কূলছাড়া করবে। স্থির করলে এই সময়টাতে কিছুদিনের জন্যে চেরাপুঞ্জির ডাকবাংলায় এমন মেঘদূত জমিয়ে তুলবে যার অলক্ষ্য অলকার নায়িকা অশরীরী বিদ্যুতের মতো, চিত্ত-আকাশে ক্ষণে ক্ষণে চমক দেয়, নাম লেখে না, ঠিকানা রেখে যায় না।

সেদিন সে পবল হাইলাণ্ডারি মোটা কম্বলের মোজা, পুরু সুকতলাওয়ালা মজবুত চামড়ার জুতো, খাকি নর্‌ফোক কোর্তা হাঁটু পর্যন্ত হ্রস্ব অধোবাস, মাথায় সোলা-টুপি। অবনী ঠাকুরের আঁকা যক্ষের মতো দেখতে হল না, মনে হতে পারত রাস্তা তদারক করতে বেরিয়েছে ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ এঞ্জিনিয়ার। কিন্তু পকেটে ছিল গোটা পাঁচ-সাত পাতলা এডিশনের নানা ভাষার কাব্যের বই।

আঁকাবাঁকা সরু রাস্তা, ডান দিকে জঙ্গলে-ঢাকা খদ। এ রাস্তার শেষ লক্ষ্য অমিতর বাসা। সেখানে যাত্রী-সম্ভাবনা নেই, তাই সে আওয়াজ না করে অসতর্কভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। ঠিক সেই সময়টা ভাবছিল আধুনিক কালে দূরবর্তিনী প্রেয়সীর জন্যে মোটর-দূতটাই প্রশস্ত—তার মধ্যে ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুতাং সন্নিপাতঃ বেশ ঠিক পরিমাণেই আছে, আর চালকের হাতে একখানি চিঠি দিলে কিছুই অস্পষ্ট থাকে না। ও ঠিক করে নিলে, আগামী বৎসরে আষাঢ়ের প্রথম দিনেই মেঘদূতবর্ণিত রাস্তা দিয়েই মোটরে করে যাত্রা করবে, হয়তো বা অদৃষ্ট ওর পথ চেয়ে দেহলীদত্তপুষ্পা যে পথিকবধূকে এতকাল বসিয়ে রেখেছে সেই অবন্তিকা হোক বা মালবিকাই হোক, বা হিমালয়ের কোনো দেবদারুবনচারিণীই হোক, ওকে হয়তো কোনো একটা অভাবনীয় উপলক্ষে দেখা দিতেও পারে। এমন সময়ে হঠাৎ একটা বাঁকের মুখে এসেই দেখলে, আর-একটা গাড়ি উপরে উঠে আসছে। পাশ কাটাবার জায়গা নেই। ব্রেক কষতে কষতে গিয়ে পড়ল তার উপরে—পরস্পর আঘাত লাগল, কিন্তু অপঘাত ঘটল না। অন্য গাড়িটা খানিকটা গড়িয়ে পাহাড়ের গায়ে আটকে থেমে গেল।

একটি মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। সদ্য-মৃত্যু-আশঙ্কার কালো পটখানা তার পিছনে,

তারই উপরে সে যেন ফুটে উঠল একটি বিদ্যুৎরেখায় আঁকা সুস্পষ্ট ছবি—চারি দিকের সমস্ত হতে স্বতন্ত্র। মন্দর-পর্বতের-নাড়া-খাওয়া ফেনিয়ে-ওঠা সমুদ্র থেকে এইমাত্র উঠে এলেন লক্ষ্মী সমস্ত আন্দোলনের উপরে—মহাসাগরের বুক তখনো ফুলে ফুলে কেঁপে উঠছে। দুর্লভ অবসরে অমিত তাকে দেখলে। ড্রয়িংরুমে এ মেয়ে অন্য পাঁচজনের মাঝখানে পরিপূর্ণ আত্মস্বরূপে দেখা দিত না। পৃথিবীতে হয়তো দেখবার যোগ্য লোক পাওয়া যায়, তাকে দেখবার যোগ্য জায়গাটি পাওয়া যায় না।

মেয়েটির পরনে সরু-পাড়-দেওয়া সাদা আলোয়ানের শাড়ি, সেই আলোয়ানেরই জ্যাকেট, পায়ে সাদা চামড়ার দিশি ছাঁদের জুতো। তনু দীর্ঘ দেহটি, বর্ণ চিকন শ্যাম, টানা চোখ ঘন পক্ষ্মচ্ছায়ায় নিবিড় স্নিগ্ধ, প্রশস্ত ললাট অবারিত করে পিছু হটিয়ে চুল আঁট করে বাঁধা, চিবুক ঘিরে সুকুমার মুখের ডৌলটি একটি অনতিপক্ক ফলের মতো রমণীয়। জ্যাকেটের হাত কব্জি পর্যন্ত, দু হাতে দুটি সরু প্লেন বালা। ব্রোচের-বন্ধন-হীন কাঁধের কাপড় মাথায় উঠেছে, কটকি-কাজ করা রুপোর কাঁটা দিয়ে খোঁপার সঙ্গে বদ্ধ।

অমিত গাড়িতে টুপিটা খুলে রেখে তার সামনে চুপ করে এসে দাঁড়াল। যেন একটা পাওনা শাস্তির অপেক্ষায়। তাই দেখে মেয়েটির বুঝি দয়া হল, একটু কৌতুকও বোধ করলে। অমিত মৃদুস্বরে বললে, 'অপরাধ করেছি।'

মেয়েটি হেসে বললে, 'অপরাধ নয়, ভুল। সেই ভুলের শুরু আমার থেকেই।'

উৎসজলের যে উচ্ছলতা ফুলে ওঠে মেয়েটির কণ্ঠস্বর তারই মতো নিটোল। অল্প বয়সের বালকের গলার মতো মসৃণ এবং প্রশস্ত। সেদিন ঘরে ফিরে এসে অমিত অনেকক্ষণ ভেবেছিল এর গলার সুরে যে একটি স্বাদ আছে, স্পর্শ আছে, তাকে বর্ণনা করা যায় কী করে। নোট্‌বইখানা খুলে লিখলে, 'এ যেন অম্বুরি তামাকের হালকা ধোঁওয়া, জলের ভিতর দিয়ে পাক খেয়ে আসছে—নিকোটিনের ঝাঁঝ নেই, আছে গোলাপজলের স্নিগ্ধ গন্ধ।'

মেয়েটি নিজের ত্রুটি ব্যাখ্যা করে বললে, 'একজন বন্ধু আসার খবর পেয়ে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। এই রাস্তায় খানিকটা উঠতেই শোফার বলেছিল, এ রাস্তা হতে পারে না। তখন শেষ পর্যন্ত না গিয়ে ফেরবার উপায় ছিল না, তাই উপরে চলেছিলেম। এমন সময় উপরওয়ালার ধাক্কা খেতে হল।'

অমিত বললে, 'উপরওয়ালার উপরেও উপরওয়ালা আছে —একটা অতি কুশ্রী কুটিল গ্রহ, এ তারই কু-কীর্তি।'

অপর পক্ষের ড্রাইভার জানালে, 'লোকসান বেশি হয় নি, কিন্তু গাড়ি সেরে নিতে দেরি হবে।'

অমিত বললে, 'আমার অপরাধী গাড়িটাকে যদি ক্ষমা করেন তবে আপনি যেখানে অনুমতি করবেন সেইখানেই পৌঁছিয়ে দিতে পারি।'

'দরকার হবে না, পাহাড়ে হেঁটে চলা আমার অভ্যেস।'

'দরকার আমারই, মাপ করলেন তার প্রমাণ।'

মেয়েটি ঈষৎ দ্বিধায় নীরব রইল। অমিত বললে, 'আমার তরফে আরো একটু কথা আছে। গাড়ি হাঁকাই—বিশেষ একটা মহৎ কর্ম নয়, এ গাড়ি চালিয়ে পস্টারিটি পর্যন্ত পৌঁছবার পথ নেই। তবু আরম্ভে এই একটিমাত্র পরিচয়ই পেয়েছেন। অথচ এমনি কপাল যেটুকুর মধ্যেও গলদ। উপসংহারে এটুকু দেখাতে দিন যে জগতে অন্তত আপনার শোফারের চেয়ে আমি অযোগ্য নই।'

অপরিচিতের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে অজানা বিপদের আশঙ্কায় মেয়েরা সংকোচ সরাতে চায় না। কিন্তু বিপদের এক ধাক্কায় উপক্রমণিকার অনেকখানি বিস্তৃত বেড়া এক দমে গেল ভেঙে। কোন্ দৈব নির্জন পাহাড়ের পথে হঠাৎ মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দুজনের মনে দেখাদেখির গাঁঠ বেঁধে দিলে। সবুর করলে না। আকস্মিকের বিদ্যুৎ-আলোতে এমন করে যা চোখে পড়ল, প্রায় মাঝে মাঝে এ-যে রাত্রে জেগে উঠে অন্ধকারের পটে দেখা যাবে। চৈতন্যের মাঝখানটাতে তার গভীর ছাপ পড়ে গেল, নীল আকাশের উপরে সৃষ্টির কোন্-এক প্রচণ্ড ধাক্কায় যেমন সূর্য-নক্ষত্রের আগুন-জ্বলা ছাপ।

মুখে কথা না বলে মেয়েটি গাড়িতে উঠে বসল। তার নির্দেশমত গাড়ি পৌঁছল যথাস্থানে। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে বললে, 'কাল যদি আপনার সময় থাকে একবার এখানে আসবেন, আমাদের কর্তামার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেব।'

অমিতর ইচ্ছে হল বলে, 'আমার সময়ের অভাব নেই, এখনি আসতে পারি।' সংকোচে বলতে পারলে না।

বাড়ি ফিরে এসে ওর নোটবই নিয়ে লিখতে লাগল, 'পথ আজ হঠাৎ এ কী পাগলামি করলে! দুজনকে দু জায়গা থেকে ছিঁড়ে এনে আজ থেকে হয়তো এক রাস্তায় চালান করে দিলে। অ্যাস্ট্রনমার ভুল বলেছে। অজানা আকাশ থেকে চাঁদ এসে পড়েছিল পৃথিবীর কক্ষপথে—লাগল তাদের মোটরে মোটরে ধাক্কা, সেই মরণের তাড়নার পর থেকে যুগে যুগে দুজনে একসঙ্গেই চলেছে। এর আলো ওর মুখে পড়ে, ওর আলো এর মুখে। চলার বাঁধন আর ছেঁড়ে না। মনের ভিতরটা বলছে, আমাদের শুরু হল যুগল-চলন, আমরা চলার সূত্রে গাঁথব ক্ষণে-ক্ষণে-কুড়িয়ে-পাওয়া উজ্জ্বল নিমেষগুলির মালা। বাঁধা মাইনেয় বাঁধা খোরাকিতে ভাগ্যের দ্বারে প'ড়ে থাকবার জো রইল না; আমাদের দেনাপাওনা সবই হবে হঠাৎ।'

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দায় ঘন ঘন পায়চারি করতে করতে অমিত মনে মনে বলে উঠল, 'কোথায় আছ নিবারণ চক্রবর্তী! এইবার ভর করো আমার 'পরে—বাণী দাও, বাণী দাও।'

বেরোল লম্বা সরু খাতাটা, নিবারণ চক্রবর্তী বলে গেল—

পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি
আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী।
রঙিন নিমেষ ধুলার দুলাল
পরানে ছড়ায় আবীর গুলাল,
ওড়না ওড়ায় বর্ষার মেঘে
দিগঙ্গনার নৃত্য,
হঠাৎ-আলোর ঝলকানি লেগে
ঝলমল করে চিত্ত।

নাই আমাদের কনকচাঁপার কুঞ্জ,
বনবীথিকায় কীর্ণ বকুলপুঞ্জ।
হঠাৎ কখন সন্ধেবেলায়
নামহারা ফুল গন্ধ এলায়,
প্রভাতবেলায় হেলাভরে করে
অরুণ মেঘেরে তুচ্ছ,
উদ্ধত যত শাখার শিখরে
রডোডেনড্রনগুচ্ছ।

নাই আমাদের সঞ্চিত ধনরত্ন,
নাই রে ঘরের লালনললিত যত্ন।
পথপাশে পাখি পুচ্ছ নাচায়,
বন্ধন তারে করি না খাঁচায়,
ডানা-মেলে-দেওয়া মুক্তিপ্রিয়ের
কূজনে দুজনে তৃপ্ত।
আমরা চকিত অভাবনীয়ের
ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত।

এইখানে একবার পিছন ফেরা চাই। পশ্চাতের কথাটা সেরে নিতে পারলে গল্পটার সামনে এগোবার বাধা হবে না।

৩
পূর্ব ভূমিকা

বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রথম পর্যায়ে চণ্ডীমণ্ডপের হাওয়ার সঙ্গে স্কুল-কলেজের হাওয়ার তাপের বৈষম্য ঘটাতে সমাজবিদ্রোহের যে ঝড় উঠেছিল সেই ঝড়ের চাঞ্চল্যে ধরা দিয়েছিলেন জ্ঞানদাশংকর। তিনি সেকালের লোক, কিন্তু তাঁর তারিখটা হঠাৎ পিছলিয়ে সরে এসেছিল অনেকখানি একালে। তিনি আগাম জন্মেছিলেন। বুদ্ধিতে বাক্যে ব্যবহারে তিনি ছিলেন তাঁর বয়সের লোকদের অসমসাময়িক। সমুদ্রের-ঢেউ-বিলাসী পাখির মতো লোকনিন্দার ঝাপট বুক পেতে নিতেই তাঁর আনন্দ ছিল।

এমন-সকল পিতামহের নাতিরা যখন এইরকম তারিখের বিপর্যয় সংশোধন করতে চেষ্টা করে তখন তারা এক দৌড়ে পৌঁছয় পঞ্জিকার একেবারে উলটো দিকের টার্মিনসে। এ ক্ষেত্রেও তাই ঘটল। জ্ঞানদাশংকরের নাতি বরদাশংকর বাপের মৃত্যুর পর যুগ-হিসাবে বাপ-পিতামহের প্রায় আদিম পূর্বপুরুষ হয়ে উঠলেন। মনসাকেও হাতজোড় করেন, শীতলাকেও 'মা' বলে ঠাণ্ডা করতে চান। মাদুলি ধুয়ে জল খাওয়া শুরু হল ; সহস্র দুর্গানাম লিখতে লিখতে দিনের পূর্বাহ্ন যায় কেটে ; তাঁর এলেকায় যে বৈশ্যদল নিজেদের দ্বিজত্ব প্রমাণ করতে মাথা ঝাঁকা দিয়ে উঠেছিল অন্তরে বাহিরে সকল দিক থেকেই তাদের বিচলিত করা হল ; হিন্দুত্বরক্ষার উপায়গুলিকে বিজ্ঞানের স্পর্শদোষ থেকে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে ভাটপাড়ার সাহায্যে অসংখ্য প্যাম্ফলেট ছাপিয়ে আধুনিক বুদ্ধির কপালে বিনা মূল্যে ঋষি-বাক্য-বর্ষণ করতে কার্পণ্য করলেন না। অতি অল্পকালের মধ্যেই ক্রিয়াকর্মে, জপে তপে, আসনে আচমনে, ধ্যানে স্নানে, ধূপে ধুনোয়, গোব্রাহ্মণ-সেবায় শুদ্ধাচারের অচল দুর্গ নিশ্ছিদ্র করে বানালেন। অবশেষে গোদান, স্বর্ণদান, ভূমিদান, কন্যাদায়-পিতৃদায়-মাতৃদায়-হরণ প্রভৃতির পরিবর্তে অসংখ্য ব্রাহ্মণের অজস্র আশীর্বাদ বহন করে তিনি লোকান্তরে যখন গেলেন তখন তাঁর সাতাশ বছর বয়স।

এঁরই পিতার পরম বন্ধু, তাঁরই সঙ্গে এক-কলেজে-পড়া একই-হোটেলে-চপ-কাটলেট-খাওয়া রামলোচন বাঁড়ুজ্জের কন্যা যোগমায়ার সঙ্গে বরদার বিবাহ হয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে যোগমায়ার পিতৃকুলের সঙ্গে পতিকুলে ব্যবহারগত বর্ণভেদ ছিল না। এঁর বাপের ঘরে মেয়েরা পড়াশুনো করেন, বাইরে বেরোন, এমন-কি, তাঁদের কেউ কেউ মাসিকপত্রে সচিত্র ভ্রমণ-বৃত্তান্তও লিখেছেন। সেই বাড়ির মেয়ের শুচি সংস্করণে যাতে অনুস্বার-বিসর্গের ভুলচুক না থাকে সেই চেষ্টায় লাগলেন তাঁর স্বামী। সনাতন সীমান্তরক্ষানীতির অটল শাসনে যোগমায়ার গতিবিধি বিবিধ পাসপোর্টপ্রণালীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

হল। চোখের উপরে তাঁর ঘোমটা নামল, মনের উপরেও। দেবী সরস্বতী যখন কোনো অবকাশে এঁদের অন্তঃপুরে প্রবেশ করতেন তখন পাহারায় তাঁকেও কাপড়-ঝাড়া দিয়ে আসতে হত। তাঁর হাতের ইংরেজি বইগুলো বাইরেই হত বাজেয়াপ্ত—প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী রচনা ধরা পড়লে চৌকাঠ পার হতে পেত না। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণের উৎকৃষ্ট বাঁধাই বাংলা অনুবাদ যোগমায়ার শেল্ফে অনেক কাল থেকে অপেক্ষা করে আছে। অবসরবিনোদন উপলক্ষে সেটা তিনি আলোচনা করবেন, এমন একটা আগ্রহ এ বাড়ির কর্তৃপক্ষের মনে অন্তিমকাল পর্যন্তই ছিল। এই পৌরাণিক লোহার সিন্দুকের মধ্যে নিজেকে সেফ ডিপজিটের মতো ভাঁজ করে রাখা যোগমায়ার পক্ষে সহজ ছিল না, তবু বিদ্রোহী মনকে শাসনে রেখেছিলেন। এই মানসিক অবরোধের মধ্যে তাঁর একমাত্র আশ্রয় ছিলেন দীনশরণ বেদান্তরত্ন, এঁদের সভাপণ্ডিত। যোগমায়ার স্বাভাবিক স্বচ্ছ বুদ্ধি তাঁকে অত্যন্ত ভালো লেগেছিল। তিনি স্পষ্টই বলতেন, 'মা, এ-সমস্ত ক্রিয়াকর্মের জঞ্জাল তোমার জন্যে নয়। যারা মূঢ় তারা কেবল যে নিজেদেরকে নিজেরাই ঠকায় তা নয়, পৃথিবীসুদ্ধ সমস্ত-কিছুই তাদের ঠকাতে থাকে। তুমি কি মনে কর, আমরা এ-সমস্ত বিশ্বাস করি? দেখ নি কি, বিধান দেবার বেলায় আমরা প্রয়োজন বুঝে শাস্ত্রকে ব্যাকরণের প্যাঁচে উলট-পালট করতে দুঃখ বোধ করি না—তার মানে, মনের মধ্যে আমরা বাঁধন মানি নে, বাইরে আমাদের মূঢ় সাজতে হয় মূঢ়দের খাতিরে। তুমি নিজে যখন ভুলতে চাও না তখন তোমাকে ভোলাবার কাজ আমার দ্বারা হবে না। যখন ইচ্ছা করবে, মা, আমাকে ডেকে পাঠিয়ো, আমি যা সত্য বলে জানি তাই তোমাকে শাস্ত্র থেকে শুনিয়ে যাব।'

এক-একদিন তিনি এসে যোগমায়াকে কখনো গীতা কখনো ব্রহ্মভাষ্য থেকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে যেতেন। যোগমায়া তাঁকে এমন বুদ্ধিপূর্বক প্রশ্ন করতেন যে, বেদান্তরত্নমশায় পুলকিত হয়ে উঠতেন, এঁর কাছে আলোচনায় তাঁর উৎসাহের অন্ত থাকত না। বরদাশংকর তাঁর চারি দিকে ছোটো বড়ো যে-সব গুরু ও গুরুতরদের জুটিয়েছিলেন তাদের প্রতি বেদান্তরত্নমশায়ের বিপুল অবজ্ঞা ছিল ; তিনি যোগমায়াকে বলতেন, 'মা, সমস্ত শহরে একমাত্র এই তোমার ঘরে কথা কয়ে আমি সুখ পাই। তুমি আমাকে আত্মধিক্কার থেকে বাঁচিয়েছ।'

এমনি করে কিছুকাল নিরবকাশ ব্রত-উপবাসের মধ্যে পঞ্জিকার শিকলি-বাঁধা দিনগুলো কোনোমতে কেটে গেল। জীবনটা আগাগোড়াই হয়ে উঠল আজকালকার খবরের-কাগজি কিম্ভূত ভাষায় যাকে বলে 'বাধ্যতামূলক'।

স্বামীর মৃত্যুর পরেই তার ছেলে যতিশংকর ও মেয়ে সুরমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শীতের সময় থাকেন কলকাতায়, গরমের সময়ে কোনো-একটা পাহাড়ে। যতিশংকর এখন পড়ছে কলেজে ; কিন্তু সুরমাকে পড়াবার মতো কোনো মেয়ে-বিদ্যালয় তাঁর পছন্দ না হওয়াতে বহু সন্ধানে তার শিক্ষার জন্যে লাবণ্যলতাকে পেয়েছেন। তারই সঙ্গে আজ সকালে আচমকা অমিতর দেখা।

৪
লাবণ্য-পুরাবৃত্ত

লাবণ্যর বাপ অবনীশ দত্ত এক পশ্চিমি কালেজের অধ্যক্ষ। মাতৃহীন মেয়েকে এমন করে মানুষ করেছেন যে, বহু পরীক্ষা-পাসের ঘষাঘষিতেও তার বিদ্যাবুদ্ধিতে লোকসান ঘটাতে পারে নি। এমন-কি, এখনো তার পাঠানুরাগ রয়েছে প্রবল।

বাপের একমাত্র শখ ছিল বিদ্যায়। মেয়েটির মধ্যে তাঁর সেই শখটির সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি হয়েছিল। নিজের লাইব্রেরির চেয়েও তাকে ভালোবাসতেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানের চর্চায় যার মনটা নিরেট হয়ে ওঠে, সেখানে উড়ো ভাবনার গ্যাস নীচে থেকে ঠেলে ওঠবার মতো সমস্ত ফাটল মরে যায়,

সে মানুষের পক্ষে বিয়ে করবার দরকার হয় না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাঁর মেয়ের মনে স্বামীসেবা-আবাদের যোগ্য যে নরম জমিটুকু বাকি থাকতে পারত সেটা গণিতে ইতিহাসে সিমেন্ট করে গাঁথা হয়েছে—খুব মজবুত পাকা মন যাকে বলা যেতে পারে—বাইরে থেকে আঁচড় লাগলে দাগ পড়ে না। তিনি এত দূর পর্যন্ত ভেবে রেখেছিলেন যে, লাবণ্যর নাই-বা হল বিয়ে, পাণ্ডিত্যের সঙ্গেই চিরদিন নয় গাঁঠ-বাঁধা হয়ে থাকল।

তাঁর আর-একটি স্নেহের পাত্র ছিল। তার নাম শোভনলাল। অল্প বয়সে পড়ার প্রতি এত মনোযোগ আর-কারো দেখা যায় না। প্রশস্ত কপালে, চোখের ভাবের স্বচ্ছতায়, ঠোঁটের ভাবের সৌজন্যে, হাসির ভাবের সরলতায়, মুখের ভাবের সৌকুমার্যে তার চেহারাটি দেখবামাত্র মনকে টানে। মানুষটি নেহাত মুখচোরা, তার প্রতি একটু মনোযোগ দিলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

গরিবের ছেলে, ছাত্রবৃত্তির সোপানে সোপানে দুর্গম পরীক্ষার শিখরে শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে চলেছে। ভবিষ্যতে শোভন যে নাম করতে পারবে, আর সেই খ্যাতি গড়ে তোলবার প্রধান কারিগরদের ফর্দে অবনীশের নামটা সকলের উপরে থাকবে, এই গর্ব অধ্যাপকের মনে ছিল। শোভন আসত তাঁর বাড়িতে পড়া নিতে, তাঁর লাইব্রেরিতে ছিল তার অবাধ সঞ্চরণ। লাবণ্যকে দেখলে সে সংকোচে নত হয়ে যেত। এই সংকোচের অতিদূরত্ববশত শোভনলালের চেয়ে নিজের মাপটাকে বড়ো করে দেখতে লাবণ্যর বাধা ছিল না। দ্বিধা করে নিজেকে যে পুরুষ যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ না করায় মেয়েরা তাকে যথেষ্ট স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষ করে না।

এমন সময় একদিন শোভনলালের বাপ ননীগোপাল অবনীশের বাড়িতে চড়াও হয়ে তাঁকে খুব একচোট গাল পেড়ে গেল। নালিশ এই যে, অবনীশ নিজের ঘরে অধ্যাপনার ছুতোয় বিবাহের ছেলে-ধরা ফাঁদ পেতেছেন, বৈদ্যর ছেলে শোভনলালের জাত মেরে সমাজ-সংস্কারের শখ মেটাতে চান। এই অভিযোগের প্রমাণস্বরূপে পেন্সিলে-আঁকা লাবণ্যলতার এক ছবি দাখিল করলে। ছবিটা আবিষ্কৃত হয়েছে শোভনলালের টিনের প্যাঁটরার ভিতর থেকে, গোলাপ-ফুলের পাপড়ি দিয়ে আচ্ছন্ন। ননীগোপালের সন্দেহ ছিল না, এই ছবিটা লাবণ্যেরই প্রণয়ের দান। পাত্র হিসাবে শোভনলালের বাজার-দর যে কত বেশি এবং আর কিছুদিন সবুর করে থাকলে সে দাম যে কত বেড়ে যাবে, ননীগোপালের হিসাবি বুদ্ধিতে সেটা কড়ায়-গণ্ডায় মেলানো ছিল। এমন মূল্যবান জিনিসকে অবনীশ বিনা মূল্যে দখল করাবার ফন্দি করছেন, এটাকে সিঁধ কেটে চুরি ছাড়া আর কী নাম দেওয়া যেতে পারে! টাকা চুরির থেকে এর লেশমাত্র তফাত কোথায়!

এতদিন লাবণ্য জানতেই পারে নি, কোনো প্রচ্ছন্ন বেদীতে শ্রদ্ধাহীন লোকচক্ষুর অগোচরে তার মূর্তিপূজা প্রচলিত হয়েছে। অবনীশের লাইব্রেরির এক কোণে নানাবিধ প্যাম্ফ্লেট ম্যাগাজিন প্রভৃতি আবর্জনার মধ্যে লাবণ্যর একটি অযত্নম্লান ফোটোগ্রাফ দৈবাৎ শোভনের হাতে পড়েছিল, সেইটে নিয়ে ওর কোনো আর্টিস্ট্ বন্ধুকে দিয়ে ছবি করিয়ে ফোটোগ্রাফটি আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে রেখেছে। গোলাপ-ফুলগুলিও ওর তরুণ মনের সলজ্জ গোপন ভালোবাসারই মতো সহজে ফুটেছিল একটি বন্ধুর বাগানে, তার মধ্যে কোনো অনধিকার ঔদ্ধত্যের ইতিহাস নেই। অথচ শাস্তি পেতে হল। লাজুক ছেলেটি মাথা হেঁট ক'রে, মুখ লাল ক'রে, গোপনে চোখের জল মুছে এই বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে গেল। দূর থেকে শোভনলাল তার আত্মনিবেদনের একটি শেষ পরিচয় দিলে, সেই বিবরণটা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ জানত না। বি. এ. পরীক্ষায় সে যখন পেয়েছিল প্রথম স্থান লাবণ্য পেয়েছিল তৃতীয়। সেটাতে লাবণ্যকে বড়ো বেশি আত্মশ্লাঘবদুঃখ দিয়েছিল। তার দুটো কারণ ছিল, এক হচ্ছে শোভনের বুদ্ধির 'পরে অবনীশের অত্যন্ত শ্রদ্ধা নিয়ে লাবণ্যকে অনেক দিন আঘাত করেছে। এই শ্রদ্ধার সঙ্গে অবনীশের বিশেষ স্নেহ মিশে থাকাতে পীড়াটা আরো হয়েছিল বেশি। শোভনকে পরীক্ষার ফলে ছাড়িয়ে যাবার জন্যে সে চেষ্টা করেছিল খুব প্রাণপণেই। তবুও শোভন যখন তাকে ছাড়িয়ে গেল তখন এই স্পর্ধার জন্যে তাকে ক্ষমা করাই শক্ত হয়ে উঠল। তার মনে

কেমন একটা সন্দেহ লেগে রইল যে, বাবা তাকে বিশেষভাবে সাহায্য করাতেই উভয় পরীক্ষিতের মধ্যে ফলবৈষম্য ঘটল, অথচ পরীক্ষার পড়া-সম্বন্ধে শোভনলাল কোনোদিন অবনীশের কাছে এগোয় নি। কিছুদিন পর্যন্ত শোভনলালকে দেখলেই লাবণ্য মুখ ফিরিয়ে চলে যেত। এম. এ. পরীক্ষাতেও শোভনের প্রতিযোগিতায় লাবণ্যর জেতবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তবু হল জিত। স্বয়ং অবনীশ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শোভনলাল যদি কবি হত তা হলে হয়তো সে খাতা ভরে কবিতা লিখত—তার বদলে আপন পরীক্ষাপাসের অনেকগুলো মোটা মার্কা লাবণ্যর উদ্দেশে উৎসর্গ করে দিলে।

তার পরে এদের ছাত্রদশা গেল কেটে। এমন সময় অবনীশ হঠাৎ প্রচণ্ড পীড়ায় নিজের মধ্যেই প্রমাণ পেলেন যে, জ্ঞানের চর্চায় মনটা ঠাস-বোঝাই থাকলেও মনসিজ তার মধ্যেই কোথা থেকে বাধা ঠেলে উঠে পড়েন, একটুও স্থানাভাব হয় না। তখন অবনীশ সাতচল্লিশ—সেই নিরতিশয় দুর্বল নিরুপায় বয়সে একটি বিধবা তাঁর হৃদয়ে প্রবেশ করলে, একেবারে তাঁর লাইব্রেরির গ্রন্থব্যূহ ভেদ ক'রে তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রাকার ডিঙিয়ে। বিবাহে আর কোনো বাধা ছিল না, একমাত্র বাধা লাবণ্যের প্রতি অবনীশের স্নেহ। ইচ্ছার সঙ্গে বিষম লড়াই বাধল। পড়াশুনো করতে যান খুবই জোরের সঙ্গে, কিন্তু তার চেয়ে জোর আছে এমন-কোনো একটা চমৎকারা চিন্তা পড়াশুনোর কাঁধে চেপে বসে। সমালোচনার জন্যে মডার্ন রিভিয়ু থেকে তাঁকে লোভনীয় বই পাঠানো হয় বৌদ্ধধ্বংসাবশেষের পুরাবৃত্ত নিয়ে ; অনুদ্‌ঘাটিত বইয়ের সামনে স্থির হয়ে বসে থাকেন এক ভাঙা বৌদ্ধস্তূপেরই মতো, যার উপরে চেপে আছে বহুশত বৎসরের মৌন। সম্পাদক ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কিন্তু জ্ঞানীর স্তূপাকার জ্ঞান যখন একবার টলে তখন তার দশা এইরকমই হয়ে থাকে। হাতি যখন চোরাবালিতে পা দেয় তখন তার বাঁচবার উপায় কী।

এতদিন পরে অবনীশের মনে একটা পরিতাপ ব্যথা দিতে লাগল। তাঁর মনে হল, তিনি হয়তো পুঁথির পাতা থেকে চোখ তুলে দেখবার অবকাশ না পাওয়াতে দেখেন নি যে শোভনলালকে তাঁর মেয়ে ভালোবেসেছে; কারণ, শোভনের মতো ছেলেকে না ভালোবাসতে পারাটাই অস্বাভাবিক। সাধারণভাবে বাপ-জাতটার 'পরেই রাগ ধরল—নিজের উপরে, ননীগোপালের 'পরে।

এমন সময় শোভনের কাছ থেকে এক চিঠি এল। প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তির জন্যে গুপ্তরাজবংশের ইতিহাস আশ্রয় করে পরীক্ষার প্রবন্ধ লিখবে বলে সে তাঁর লাইব্রেরি থেকে গুটিকতক বই ধার চায়। তখনি তিনি তাকে বিশেষ আদর করে চিঠি লিখলেন; বললেন, 'পূর্বের মতোই আমার লাইব্রেরিতে বসেই তুমি কাজ করবে, কিছুমাত্র সংকোচ করবে না।'

শোভনলালের মনটা চঞ্চল হয়ে উঠল। সে ধরে নিলে এমন উৎসাহপূর্ণ চিঠির পিছনে হয়তো লাবণ্যর সম্মতি প্রচ্ছন্ন আছে। সে লাইব্রেরিতে আসতে আরম্ভ করলে। ঘরের মধ্যে যাওয়া-আসার পথে দৈবাৎ কখনো ক্ষণকালের জন্যে লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হয়। তখন শোভন গতিটাকে একটু মন্দ করে আনে। ওর একান্ত ইচ্ছে, লাবণ্য তাকে একটা-কোনো কথা বলে, জিজ্ঞাসা করে 'কেমন আছ', যে প্রবন্ধ নিয়ে ও ব্যাপৃত সে সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করে। যদি করত তবে খাতা খুলে এক সময় লাবণ্যর সঙ্গে আলোচনা করতে পারলে ও বেঁচে যেত। ওর কতকগুলি নিজের উদ্‌ভাবিত বিশেষ মত সম্বন্ধে লাবণ্যর মত কী, জানবার জন্যে ওর অত্যন্ত ঔৎসুক্য। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো কথাই হল না, গায়ে পড়ে কিছু বলতে পারে এমন সাহসও ওর নেই।

এমন কয়েক দিন যায়। সেদিন রবিবার। শোভনলাল তার খাতাপত্র টেবিলের উপর সাজিয়ে একখানা বই নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে, মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছে। তখন দুপুরবেলা, ঘরে কেউ নেই। ছুটির দিনের সুযোগ নিয়ে অবনীশ কোন্-এক বাড়িতে যাচ্ছেন তার নাম করলেন না—বলে গেলেন,

আজ আর চা খেতে আসবেন না।

হঠাৎ এক সময় ভেজানো দরজা জোরে খুলে গেল। শোভনলালের বুকটা ধড়াস করে উঠল কেঁপে। লাবণ্য ঘরে ঢুকল। শোভন শশব্যস্ত হয়ে উঠে কী করবে ভেবে পেল না। লাবণ্য অগ্নিমূর্তি ধরে বললে, 'আপনি কেন এ বাড়িতে আসেন?'

শোভনলাল চমকে উঠল, মুখে কোনো উত্তর এল না।

'আপনি জানেন, এখানে আসা নিয়ে আপনার বাবা কী বলেছেন? আমার অপমান ঘটাতে আপনার সংকোচ নেই?'

শোভনলাল চোখ নিচু করে বললে, 'আমাকে মাপ করবেন, আমি এখনি যাচ্ছি।'

এমন উত্তর পর্যন্ত দিলে না যে, লাবণ্যর পিতা তাকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করে এনেছেন। সে তার খাতাপত্র সমস্ত সংগ্রহ করে নিলে। হাত থর্ থর্ করে কাঁপছে; বোবা একটা ব্যথা বুকের পাঁজরগুলোকে ঠেলা দিয়ে উঠতে চায়, রাস্তা পায় না। মাথা হেঁট করে বাড়ি থেকে সে চলে গেল।

যাকে খুবই ভালোবাসা যেতে পারত তাকে ভালোবাসবার অবসর যদি কোনো একটা বাধায় ঠেকে ফসকে যায়, তখন সেটা না-ভালোবাসায় দাঁড়ায় না, সেটা দাঁড়ায় একটা অন্ধ বিদ্বেষে, ভালোবাসারই উলটো পিঠে। একদিন শোভনলালকে বরদান করবে বলেই বুঝি লাবণ্য নিজের অগোচরেই অপেক্ষা করে বসে ছিল। শোভনলাল তেমন করে ডাক দিলে না। তার পরে যা-কিছু হল সবই গেল তার বিরুদ্ধে। সকলের চেয়ে বেশি আঘাত দিলে এই শেষকালটায়। লাবণ্য মনের ক্ষোভে বাপের প্রতি নিতান্ত অন্যায় বিচার করলে। তার মনে হল, নিজে নিষ্কৃতি পাবেন ইচ্ছে করেই শোভনলালকে তিনি আবার নিজে থেকে ডেকে এনেছেন, ওদের দুজনের মিলন ঘটাবার কামনায়। তাই এমন দারুণ ক্রোধ হল সেই নিরপরাধের উপরে।

তার পর থেকে লাবণ্য ক্রমাগতই জেদ করে করে অবনীশের বিবাহ ঘটাল। অবনীশ তাঁর সঞ্চিত টাকার প্রায় অর্ধাংশ তাঁর মেয়ের জন্যে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন। তাঁর বিবাহের পরে লাবণ্য বলে বসল, সে তার পৈতৃক সম্পত্তি কিছুই নেবে না, স্বাধীন উপার্জন করে চালাবে। অবনীশ মর্মাহত হয়ে বললেন, 'আমি তো বিয়ে করতে চাই নি লাবণ্য, তুমিই তো জেদ করে বিয়ে দিইয়েছ। তবে কেন আজ আমাকে তুমি এমন করে ত্যাগ করছ!'

লাবণ্য বললে, 'আমাদের সম্বন্ধ কোনোকালে যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেইজন্যেই আমি এই সংকল্প করেছি। তুমি কিছু ভেবো না বাবা। যে পথে আমি যথার্থ সুখী হব সেই পথে তোমার আশীর্বাদ চিরদিন রেখো।'

কাজ তার জুটে গেল। সুরমাকে পড়াবার সম্পূর্ণ ভার তার উপরে। যতিকেও অনায়াসে পড়াতে পারত, কিন্তু মেয়েশিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়বার অপমান স্বীকার করতে যতি কিছুতেই রাজি হল না।

প্রতিদিনের বাঁধা কাজে জীবন একরকম চলে যাচ্ছিল। উদ্‌বৃত্ত সময়টা ঠাসা ছিল ইংরেজি সাহিত্যে, প্রাচীন কাল থেকে আরম্ভ করে হালের বার্নার্ড্ শ'র আমল পর্যন্ত এবং বিশেষভাবে গ্রীক ও রোমান যুগের ইতিহাসে—গ্রোট, গিবন ও গিলবার্ট্ মারের রচনায়। কোনো কোনো অবকাশে একটা চঞ্চল হাওয়া এসে মনের ভিতরটা যে একটু এলোমেলো করে যেত না তা বলতে পারি নে, কিন্তু হাওয়ার চেয়ে স্থূল ব্যাঘাত হঠাৎ ঢুকে পড়তে পারে ওর জীবনযাত্রার মধ্যে এমন প্রশস্ত ফাঁক ছিল না। এমন সময় ব্যাঘাত এসে পড়ল মোটরগাড়িতে চড়ে, পথের মাঝখানে, কোনো আওয়াজমাত্র না করে। হঠাৎ গ্রীস রোমের বিরাট ইতিহাসটা হালকা হয়ে গেল, আর সমস্ত-কিছুকে সরিয়ে দিয়ে অত্যন্ত নিকটের একটা নিবিড় বর্তমান ওকে নাড়া দিয়ে বললে 'জাগো'। লাবণ্য এক মুহূর্তে জেগে উঠে এতদিন পরে আপনাকে বাস্তবরূপে দেখতে পেলে—জ্ঞানের মধ্যে নয়, বেদনার মধ্যে।

৫
আলাপের আরম্ভ

অতীতের ভগ্নাবশেষ থেকে এবার ফিরে আসা যাক বর্তমানের নতুন সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

লাবণ্য পড়বার ঘরে অমিতকে বসিয়ে রেখে যোগমায়াকে খবর দিতে গেল। সে ঘরে অমিত বসল যেন পদ্মের মাঝখানটাতে ভ্রমরের মতো। চারি দিকে চায়, সকল জিনিস থেকেই কিসের ছোঁওয়া লাগে, ওর মনটাকে দেয় উদাস করে। শেলফে, পড়বার টেবিলে, ইংরেজি সাহিত্যের বই দেখলে; সে বইগুলো যেন বেঁচে উঠেছে। সব লাবণ্যর পড়া বই, তার আঙুলে-পাতা-ওলটানো, তার দিনরাত্রির-ভাবনা-লাগা, তার উৎসুক-দৃষ্টির-পথ-চলা, তার অন্যমনস্ক দিনে কোলের উপর পড়ে-থাকা বই। চমকে উঠল যখন টেবিলে দেখতে পেলে ইংরেজ কবি ডন-এর কাব্যসংগ্রহ। অক্‌স্‌ফোর্ডে থাকতে ডন এবং তাঁর সময়কার কবিদের গীতিকাব্য ছিল অমিতর প্রধান আলোচ্য, এইখানে এই কাব্যের উপর দৈবাৎ দুজনের মন এক জায়গায় এসে পরস্পরকে স্পর্শ করল।

এতদিনকার নিরুৎসুক দিনরাত্রির দাগ লেগে অমিতর জীবনটা ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল, যেন মাস্টারের হাতে ইস্কুলের প্রতি-বছরে-পড়ানো একটা ঢিলে মলাটের টেক্‌স্‌ট্‌ বুক। আগামী দিনটার জন্য কোনো কৌতূহল ছিল না, আর বর্তমান দিনটাকে পুরো মন দিয়ে অভ্যর্থনা করা ওর পক্ষে ছিল অনাবশ্যক। এখন সে এইমাত্র এসে পৌঁছল একটা নতুন গ্রহে; এখানে বস্তুর ভার কম; পা মাটি ছাড়িয়ে যেন উপর দিয়ে চলে; প্রতি মুহূর্ত ব্যগ্র হয়ে অভাবনীয়ের দিকে এগোতে থাকে; গায়ে হাওয়া লাগে, আর সমস্ত শরীরটা যেন বাঁশি হয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, আকাশের আলো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে, আর ওর অন্তরে অন্তরে যে উত্তেজনার সঞ্চার হয় সেটা গাছের সর্বাঙ্গপ্রবাহিত রসের মধ্যে ফুল ফোটাবার উত্তেজনার মতো। মনের উপর থেকে কত দিনের ধুলো-পড়া পর্দা উঠে গেল, সামান্য জিনিসের থেকে ফুটে উঠছে অসামান্যতা। তাই যোগমায়া যখন ধীরে ধীরে ঘরে এসে প্রবেশ করলেন সেই অতি সহজ ব্যাপারেও আজ অমিতকে বিস্ময় লাগল। সে মনে মনে বললে, 'আহা, এ তো আগমন নয়, এ যে আবির্ভাব!'

চল্লিশের কাছাকাছি তাঁর বয়স, কিন্তু বয়সে তাঁকে শিথিল করে নি, কেবল তাঁকে গম্ভীর শুভ্রতা দিয়েছে। গৌরবর্ণ মুখ টসটস করছে। বৈধব্যরীতিতে চুল ছাঁটা; মাতৃভাবে পূর্ণ প্রসন্ন চোখ; হাসিটি স্নিগ্ধ। মোটা থান চাদরে মাথা বেষ্টন করে সমস্ত দেহ সম্বৃত। পায়ে জুতো নেই, দুটি পা নির্মল সুন্দর। অমিত তাঁর পায়ে হাত দিয়ে যখন প্রমাণ করলে ওর শিরে শিরে যেন দেবীর প্রসাদের ধারা বয়ে গেল।

প্রথম পরিচয়ের পরে যোগমায়া বললেন, 'তোমার কাকা অমরেশ ছিলেন আমাদের জেলার সব চেয়ে বড়ো উকিল। একবার এক সর্বনেশে মকদ্দমায় আমরা ফতুর হতে বসেছিলুম, তিনি আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। আমাকে ডাকতেন বউদিদি বলে।'

অমিত বললে, 'আমি তাঁর অযোগ্য ভাইপো। কাকা লোকসান বাঁচিয়েছেন, আমি লোকসান ঘটিয়েছি। আপনি ছিলেন তাঁর লাভের বউদিদি, আমার হবেন লোকসানের মাসিমা।'

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার মা আছেন?'

অমিত বললে, 'ছিলেন। মাসি থাকাও খুব উচিত ছিল।'

'মাসির জন্যে খেদ কেন বাবা?'

'ভেবে দেখুন-না, আজ যদি ভাঙতুম মায়ের গাড়ি বকুনির অন্ত থাকত না, বলতেন—এটা বাঁদরামি; গাড়িটা যদি মাসির হয় তিনি আমার অপটুতা দেখে হাসেন, মনে মনে বলেন—ছেলেমানুষি।'

যোগমায়া হেসে বললেন, 'তা হলে নাহয় গাড়িখানা মাসিরই হল।'

অমিত লাফিয়ে উঠে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'এইজন্যেই তো পূর্বজন্মের

কর্মফল মানতে হয়। মায়ের কোলে জন্মেছি, মাসির জন্যে কোনো তপস্যাই করি নি—গাড়ি-ভাঙাটাকে সৎকর্ম বলা চলে না, অথচ এক নিমেষে দেবতার বরের মতো মাসি জীবনে অবতীর্ণ হলেন—এর পিছনে কত যুগের সূচনা আছে ভেবে দেখুন।'

যোগমায়া হেসে বললেন, 'কর্মফল কার বাবা? তোমার না আমার, না যারা মোটর-মেরামতের ব্যাবসা করে তাদের?'

ঘন চুলের ভিতর দিয়ে পিছন দিকে আঙুল চালিয়ে অমিত বললে, 'শক্ত প্রশ্ন। কর্ম একার নয়, সমস্ত বিশ্বের, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রে তারই সম্মিলিত ধারা যুগে যুগে চলে এসে শুক্রবার ঠিক বেলা নটা বেজে আটচল্লিশ মিনিটের সময় লাগালে এক ধাক্কা। তার পরে?'

যোগমায়া লাবণ্যের দিকে আড়চোখে চেয়ে একটু হাসলেন। অমিতর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ হতে না হতেই তিনি ঠিক করে বসে আছেন, এদের দুজনের বিয়ে হওয়া চাই। সেইটের প্রতি লক্ষ করেই বললেন, 'বাবা, তোমরা দুজনে ততক্ষণ আলাপ করো, আমি এখানে তোমার খাওয়ার বন্দোবস্ত করে আসি গে।'

দ্রুত তালে আলাপ জমাবার ক্ষমতা অমিতর। সে একেবারে শুরু করে দিলে, 'মাসিমা আমাদের আলাপ করবার আদেশ করেছেন। আলাপের আদিতে হল নাম। প্রথমেই সেটা পাকা করে নেওয়া উচিত। আপনি আমার নাম জানেন তো? —ইংরেজি ব্যাকরণে যাকে বলে প্রপার নেম।'

লাবণ্য বললে, 'আমি তো জানি আপনার নাম অমিতবাবু।'

'ওটা সব ক্ষেত্রে চলে না।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'ক্ষেত্র অনেক থাকতে পারে, কিন্তু অধিকারীর নাম তো একই হওয়া চাই।'

'আপনি যে কথাটা বলছেন ওটা একালের নয়। দেশে কালে পাত্রে ভেদ আছে অথচ নামে ভেদ নেই, ওটা অবৈজ্ঞানিক। Relativity of Names প্রচার করে আমি · ৰজাদা হব স্থির করেছি। তার গোড়াতেই জানাতে চাই, আপনার মুখে আমার নাম অমিতবাবু নয়।'

'আপনি সাহেবি কায়দা ভালোবাসেন? মিস্টার রয়?'

'একেবারে সমুদ্রের ও পারের ওটা দূরের নাম। নামের দূরত্ব ঠিক করতে গেলে মেপে দেখতে হয় শব্দটা কানের সদর থেকে মনের অন্দরে পৌঁছতে কতক্ষণ লাগে।'

'দ্রুতগামী নামটা কী শুনি।'

'বেগ দ্রুত করতে গেলে বস্তু কমাতে হবে। অমিতবাবুর বাবুটা বাদ দিন।'

লাবণ্য বললে, 'সহজ নয়, সময় লাগবে।'

'সময়টা সকলের সমান লাগা উচিত নয়। একঘড়ি বলে কোনো পদার্থ ত্রিভুবনে নেই, ট্যাকঘড়ি আছে, ট্যাক অনুসারে তার চাল। আইন্‌স্টাইনের এই মত।'

লাবণ্য উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আপনার কিন্তু স্নানের জল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।'

'ঠাণ্ডা জল শিরোধার্য করে নেব, যদি আলাপটাকে আরো একটু সময় দেন।'

'সময় আর নেই, কাজ আছে।' বলেই লাবণ্য চলে গেল।

অমিত তখনই স্নান করতে গেল না। স্মিতহাস্যমিশ্রিত প্রত্যেক কথাটি লাবণ্যর ঠোঁটদুটির উপর কিরকম একটি চেহারা ধরে উঠছিল, বসে বসে সেইটি ও মনে করতে লাগল।

অমিত অনেক সুন্দরী মেয়ে দেখেছে, তাদের সৌন্দর্য পূর্ণিমারাত্রির মতো, উজ্জ্বল অথচ আচ্ছন্ন; লাবণ্যর সৌন্দর্য সকালবেলার মতো, তাতে অস্পষ্টতার মোহ নেই, তার সমস্তটা বুদ্ধিতে পরিব্যাপ্ত। তাকে

মেয়ে করে গড়বার সময় বিধাতা তার মধ্যে পুরুষের একটা ভাগ মিশিয়ে দিয়েছেন; তাকে দেখলেই বোঝা যায়, তার মধ্যে কেবল বেদনার শক্তি নয়, সেইসঙ্গে আছে মননের শক্তি। এইটেতেই অমিতকে এত করে আকর্ষণ করেছে। অমিতর নিজের মধ্যে বুদ্ধি আছে, ক্ষমা নেই; বিচার আছে, ধৈর্য নেই; ও অনেক জেনেছে, শিখেছে, কিন্তু শান্তি পায় নি—লাবণ্যর মুখে ও এমন একটি শান্তির রূপ দেখেছিল যে শান্তি হৃদয়ের তৃপ্তি থেকে নয়, যা ওর বিবেচনাশক্তির গভীরতায়, অচঞ্চল।

৬
নূতন পরিচয়

অমিত মিশুক মানুষ। প্রকৃতির সৌন্দর্য নিয়ে তার বেশিক্ষণ চলে না। সর্বদাই নিজে বকাঝকা করা অভ্যাস; গাছপালা পাহাড়পর্বতের সঙ্গে হাসিতামাশা চলে না, তাদের সঙ্গে কোনোরকম উলটো ব্যবহার করতে গেলেই ঘা খেয়ে মরতে হয়—তারাও চলে নিয়মে, অন্যের ব্যবহারেও তারা নিয়ম প্রত্যাশা করে—এককথায়, তারা অরসিক, সেইজন্যে শহরের বাইরে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ কী হল, শিলঙ পাহাড়টা চার দিক থেকে অমিতকে নিজের মধ্যে যেন রসিয়ে নিচ্ছে। আজ সে উঠেছে সূর্য ওঠবার আগেই; এটা ওর স্বধর্মবিরুদ্ধ। জানলা দিয়ে দেখলে, দেবদারু গাছের ঝালরগুলো কাঁপছে, আর তার পিছনে পাতলা মেঘের উপর পাহাড়ের ও পার থেকে সূর্য তার তুলির লম্বা লম্বা সোনালি টান লাগিয়েছে—আগুনে-জ্বলা যে-সব রঙের আভা ফুটে উঠছে তার সম্বন্ধে চুপ করে থাকা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই।

তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা খেয়ে অমিত বেরিয়ে পড়ল। রাস্তা তখন নির্জন। একটা শেওলা-ধরা অতি প্রাচীন পাইন গাছের তলায় স্তরে স্তরে ঝরা পাতার সুগন্ধঘন আস্তরণের উপর পা ছড়িয়ে বসল। সিগারেট জ্বালিয়ে দুই আঙুলে অনেকক্ষণ চেপে রেখে দিলে, টান দিতে গেল ভুলে।

যোগমায়ার বাড়ির পথে এই বন। ভোজে বসবার পূর্বে রান্নাঘরটা থেকে যেমন আগাম গন্ধ পাওয়া যায়, এই জায়গা থেকে যোগমায়ার বাড়ির সৌরভটা অমিত সেইরকম ভোগ করে। সময়টা ঘড়ির ভদ্র দাগটাতে এসে পৌঁছলেই সেখানে গিয়ে এক পেয়ালা চা দাবি করবে। প্রথমে সেখানে ওর যাবার সময় নির্দিষ্ট ছিল সন্ধেবেলায়। অমিত সাহিত্যরসিক এই খ্যাতিটার সুযোগে আলাপ-আলোচনার জন্যে ও পেয়েছিল বাঁধা নিমন্ত্রণ। প্রথম দুই-চারি দিন যোগমায়া এই আলোচনায় উৎসাহ প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু যোগমায়ার কাছে ধরা পড়ল যে, তাতে করেই এ পক্ষের উৎসাহটাকে কিছু যেন কুণ্ঠিত করলে। বোঝা শক্ত নয় যে তার কারণ, দ্বিবচনের জায়গায় বহুবচন-প্রয়োগ। তার পর থেকে যোগমায়ার অনুপস্থিত থাকবার উপলক্ষ ঘন ঘন ঘটত। একটু বিশ্লেষণ করতেই বোঝা গেল, সেগুলি অনিবার্য নয়, দৈবকৃত নয়, তাঁর ইচ্ছাকৃত। প্রমাণ হল, কর্তামা এই দুইটি আলোচনাপরায়ণের যে অনুরাগ লক্ষ করেছেন সেটা সাহিত্যানুরাগের চেয়ে বিশেষ একটু গাঢ়তর। অমিত বুঝে নিল যে, মাসির বয়স হয়েছে বটে, কিন্তু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, অথচ মনটি আছে কোমল। এতে করেই আলোচনার উৎসাহ তার আরো প্রবল হল। নির্দিষ্ট কালটাকে প্রশস্ততর করবার অভিপ্রায়ে যতিশংকরের সঙ্গে আপসে ব্যবস্থা করলে, তাকে সকালে এক ঘণ্টা এবং বিকেলে দু ঘণ্টা ইংরেজি সাহিত্য পড়ায় সাহায্য করবে। শুরু করলে সাহায্য—এত বাহুল্যপরিমাণে যে, প্রায়ই সকাল গড়াত দুপুরে, সাহায্য গড়াত বাজে কথায়, অবশেষে যোগমায়ার এবং ভদ্রতার অনুরোধে মধ্যাহ্নভোজনটা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়ত। এমনি করে দেখা গেল, অবশ্যকর্তব্যতার পরিধি প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলে।

যতিশংকরের অধ্যাপনায় ওর যোগ দেবার কথা সকাল আটটায়। ওর প্রকৃতিস্থ অবস্থায় সেটা

ছিল অসময়। ও বলত, যে জীবের গর্ভবাসের মেয়াদ দশ মাস তার ঘুমের মেয়াদ পশুপক্ষীদের মাপে সংগত হয় না। এতদিন অমিতর রাত্রিবেলাটা তার সকালবেলাকার অনেকগুলো ঘন্টাকে পিল্‌পেগাড়ি করে নিয়েছিল। ও বলত, এই চোরাই সময়টা অবৈধ বলেই ঘুমের পক্ষে সব চেয়ে অনুকূল।

কিন্তু আজকাল ওর ঘুমটা আর অবিমিশ্র নয়। সকাল-সকাল জাগবার একটা আগ্রহ তার অন্তর্নিহিত। প্রয়োজনের আগেই ঘুম ভাঙে; তার পরে পাশ ফিরে শুতে সাহস হয় না, পাছে বেলা হয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিয়েছে; কিন্তু সময়-চুরির অপরাধ ধরা পড়বার ভয়ে সেটা বার বার করা সম্ভব হত না। আজ একবার ঘড়ির দিকে চাইলে, দেখলে বেলা এখনো সাতটার এ পারেই। মনে হল, ঘড়ি নিশ্চয় বন্ধ। কানের কাছে নিয়ে শুনলে টিক্ টিক্ শব্দ।

এমন সময় চমকে উঠে দেখে, ডান হাতে ছাতা দোলাতে দোলাতে উপরের রাস্তা দিয়ে আসছে লাবণ্য। সাদা শাড়ি, পিঠে কালো রঙের তিন-কোনা শাল, তাতে কালো ঝালর। অমিতর বুঝতে বাকি নেই যে, লাবণ্যর অর্ধেক দৃষ্টিতে সে গোচর হয়েছে কিন্তু পূর্ণদৃষ্টিতে সেটাকে মোকাবিলায় কবুল করতে লাবণ্য নারাজ। বাঁধের মুখ পর্যন্ত লাবণ্য যেই গেছে অমিত আর থাকতে পারলে না, দৌড়োতে দৌড়োতে তার পাশে উপস্থিত।

বললে, 'জানতেন এড়াতে পারবেন না, তবু দৌড় করিয়ে নিলেন। জানেন না কি দূরে চলে গেলে কতটা অসুবিধা হয়?'

'কিসের অসুবিধা?'

অমিত বললে, 'যে হতভাগা পিছনে পড়ে থাকে তার প্রাণটা উর্ধ্বস্বরে ডাকতে চায়। কিন্তু, ডাকি কী বলে? দেব-দেবীদের নিয়ে সুবিধে এই যে, নাম ধরে ডাকলেই তাঁরা খুশি। দুর্গা দুর্গা বলে গর্জন করতে থাকলেও ভগবতী দশভুজা অসন্তুষ্ট হন না। আপনাদের নিয়ে যে মুশকিল।'

'না ডাকলেই চুকে যায়।'

'বিনা সম্বোধনেই চালাই যখন কাছে থাকেন। তাই তো বলি, দূরে যাবেন না। ডাকতে চাই অথচ ডাকতে পারি নে, এর চেয়ে দুঃখ আর নেই।'

'কেন, বিলিতি কায়দা তো আপনার অভ্যাস আছে।'

'মিস ডাট্? স্টো চায়ের টেবিলে। দেখুন-না, আজ এই আকাশের সঙ্গে পৃথিবী যখন সকালের আলোয় মিলল সেই মিলনের লগ্নটি সার্থক করবার জন্যে উভয়ে মিলে একটি রূপ সৃষ্টি করলে, তারই মধ্যে রয়ে গেল স্বর্গমর্তের ডাকনাম। মনে হচ্ছে না কি, একটা নাম ধরে ডাকা উপর থেকে নীচে আসছে, নীচে থেকে উপরে উঠে চলেছে? মানুষের জীবনেও কি ঐরকমের নাম সৃষ্টি করবার সময় উপস্থিত হয় না? কল্পনা করুননা, যেন এখনই প্রাণ খুলে গলা ছেড়ে আপনাকে ডাক দিয়েছি— নামের ডাক বনে বনে ধ্বনিত হল, আকাশের ঐ রঙিন মেঘের কাছ পর্যন্ত পৌঁছল, সামনের ঐ পাহাড়টা তাই শুনে মাথায় মেঘ মুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগল; মনে ভাবতেও কি পারেন সেই ডাকটা মিস ডাট্?'

লাবণ্য কথাটাকে এড়িয়ে বললে, 'নামকরণে সময় লাগে, আপাতত বেড়িয়ে আসি গে।'

অমিত তার সঙ্গ নিয়ে বললে, 'চলতে শিখতেই মানুষের দেরি হয়, আমার হল উলটো; এতদিন পরে এখানে এসে তবে বসতে শিখেছি। ইংরেজিতে বলে, গড়ানে পাথরের কপালে শেওলা জোটে না; সেই ভেবেই অন্ধকার থাকতে কখন থেকে পথের ধারে বসে আছি। তাই তো ভোরের আলো দেখলুম।'

লাবণ্য কথাটাকে তাড়াতাড়ি চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঐ সবুজ-ডানাওয়ালা পাখিটার নাম জানেন?'

অমিত বললে, 'জীবজগতে পাখি আছে সেটা এতদিন সাধারণভাবেই জানতুম, বিশেষভাবে জানবার সময় পাই নি। এখানে এসে আশ্চর্য এই যে, স্পষ্ট জানতে পেরেছি পাখি আছে, এমন-কি, তারা গানও গায়।'

লাবণ্য হেসে উঠে বললে, 'আশ্চর্য!'

অমিত বললে, 'হাসছেন। আমার গভীর কথাতেও গাম্ভীর্য রাখতে পারি নে। ওটা মুদ্রাদোষ। আমার জন্মলগ্নে আছে চাঁদ, ঐ গ্রহটি কৃষ্ণচতুর্দশীর সর্বনাশা রাত্রেও একটুখানি মুচকে না হেসে মরতেও জানে না।'

লাবণ্য বললে, 'আমাকে দোষ দেবেন না। বোধ হয় পাখিও যদি আপনার কথা শুনত হেসে উঠত।'

অমিত বললে, 'দেখুন, আমার কথা লোকে হঠাৎ বুঝতে পারে না বলেই হাসে, বুঝতে পারলে চুপ করে বসে ভাবত। আজ পাখিকে নতুন করে জানছি, এ কথায় লোকে হাসছে। কিন্তু এর ভিতরের কথাটা হচ্ছে এই যে, আজ সমস্তই নতুন করে জানছি, নিজেকেও। এর উপরে তো হাসি চলে না। ঐ দেখুন-না, কথাটা একই, অথচ এইবার আপনি একেবারেই চুপ।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি তো বেশিদিনের মানুষ না, খুবই নতুন, আরো-নতুনের ঝোঁক আপনার মধ্যে আসে কোথা থেকে?'

'এর জবাবে খুব একটা গম্ভীর কথাই বলতে হল যা চায়ের টেবিলে বলা চলে না। আমার মধ্যে নতুন যেটা এসেছে সেটাই অনাদি কালের পুরোনো—ভোরবেলাকার আলোর মতোই সে পুরোনো, নতুন-ফোটা ভুঁইচাঁপা ফুলেরই মতো, চিরকালের জিনিস, নতুন করে আবিষ্কার।'

কিছু না বলে লাবণ্য হাসলে।

অমিত বললে, 'আপনার এবারকার এই হাসিটি পাহারাওয়ালার চোর-ধরা গোল লণ্ঠনের হাসি। বুঝেছি, আপনি যে কবির ভক্ত তার বই থেকে আমার মুখের এ কথাটা আগেই পড়ে নিয়েছেন। দোহাই আপনার, আমাকে দাগি চোর ঠাওরাবেন না—এক-এক সময় এমন অবস্থা আসে, মনের ভিতরটা শংকরাচার্য হয়ে ওঠে; বলতে থাকে, আমিই লিখেছি কি আর-কেউ লিখেছে এই ভেদজ্ঞানটা মায়া। এই দেখুন-না, আজ সকালে বসে হঠাৎ খেয়াল গেল, আমার জানা সাহিত্যের ভিতর থেকে এমন একটা লাইন বের করি যেটা মনে হবে—এইমাত্র স্বয়ং আমি লিখলুম, আর কোনো কবির লেখবার সাধ্যই ছিল না!'

লাবণ্য থাকতে পারলে না, প্রশ্ন করলে, 'বের করতে পেরেছেন?'

'হাঁ, পেরেছি।'

লাবণ্যর কৌতূহল আর বাধা মানল না, জিজ্ঞাসা করে ফেললে, লাইনটা কী বলুন-না।'

অমিত খুব আস্তে আস্তে কানে কানে বলার মতো করে বললে—

'For God's sake, hold your tongue
and let me love!'

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল।

অনেকক্ষণ পরে অমিত জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি নিশ্চয় জানেন লাইনটা কার?'

লাবণ্য একটু মাথা বেঁকিয়ে ইশারায় জানিয়ে দিলে, 'হাঁ।'

অমিত বললে, 'সেদিন আপনার টেবিলে ইংরেজ কবি ডন-এর বই আবিষ্কার করলুম, নইলে এ লাইন আমার মাথায় আসত না।'

'আবিষ্কার করলেন?'

'আবিষ্কার নয় তো কী? বইয়ের দোকানে বই চোখে পড়ে, আপনার টেবিলে বই প্রকাশ পায়। পাবলিক লাইব্রেরির টেবিল দেখেছি, সেটা তো বইগুলোকে বহন করে; আপনার টেবিল

দেখলুম, সে যে বইগুলিকে বাসা দিয়েছে। সেদিন ডন-এর কবিতাকে প্রাণ দিয়ে দেখতে পেয়েছি। মনে হল, অন্য কবির দরজায় ঠেলাঠেলি ভিড়—বড়োলোকের শ্রাদ্ধে কাঙালি বিদায়ের মতো। ডন-এর কাব্যমহল নির্জন, ওখানে দুটি মানুষ পাশাপাশি বসবার জায়গাটুকু আছে। তাই অমন স্পষ্ট করে শুনতে পেলুম আমার সকালবেলাকার মনের কথাটি—

দোহাই তোদের, একটুকু চুপ কর্।
ভালোবাসিবারে দে আমারে অবসর।'

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'আপনি বাংলা কবিতা লেখেন নাকি?'

'ভয় হচ্ছে, আজ থেকে লিখতে শুরু করব বা। নতুন অমিত রায় কী যে কাণ্ড করে বসবে পুরোনো অমিত রায়ের তা কিছু জানা নেই। হয়তো-বা সে এখনি লড়াই করতে বেরোবে।'

'লড়াই। কার সঙ্গে?'

'সেইটে ঠিক করতে পারছি নে। কেবলই মনে হচ্ছে, খুব মস্ত কিছু একটার জন্যে এক্‌খুনি চোখ বুজে প্রাণ দিয়ে ফেলা উচিত, তার পরে অনুতাপ করতে হয় র'য়ে ব'সে করা যাবে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'প্রাণ যদি দিতেই হয় তো সাবধানে দেবেন।'

'সে কথা আমাকে বলা অনাবশ্যক। কম্যুন্যাল রায়টের মধ্যে আমি যেতে নারাজ। মুসলমান বাঁচিয়ে, ইংরেজ বাঁচিয়ে চলব। যদি দেখি বুড়োসুড়ো গোছের মানুষ, অহিংস্র মেজাজের ধার্মিক চেহারা, শিঙে বাজিয়ে মোটর হাঁকিয়ে চলেছে, তার সামনে দাঁড়িয়ে পথ আটকিয়ে বলব, যুদ্ধং দেহি—ঐ যে লোক অজীর্ণ রোগ সারবার জন্যে হাঁসপাতালে না গিয়ে এমন পাহাড়ে আসে, খিদে বাড়াবার জন্যে নির্লজ্জ হয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'লোকটা তবু যদি অমান্য করে চলে যায়?'

'তখন আমি পিছন থেকে দু হাত আকাশে তুলে বলব—এবারকার মতো ক্ষমা করলুম, তুমি আমার ভ্রাতা, আমরা এক ভারতমাতার সন্তান। বুঝতে পারছেন, মন যখন খুব বড়ো হয়ে ওঠে তখন মানুষ যুদ্ধও করে, ক্ষমাও করে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আপনি যখন যুদ্ধের প্রস্তাব করেছিলেন মনে ভয় হয়েছিল, কিন্তু ক্ষমার কথা যেরকম বোঝালেন তাতে আশ্বস্ত হলুম যে ভাবনা নেই।'

অমিত বললে, 'আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

'কী, বলুন।'

'আজ খিদে বাড়াবার জন্যে আর বেশি বেড়াবেন না।'

'আচ্ছা বেশ, তার পরে?'

'ঐ নীচে গাছতলায় যেখানে নানা রঙের ছ্যাৎলা-পড়া পাথরটার নীচে দিয়ে একটুখানি জল ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে ঐখানে বসবেন আসুন।'

লাবণ্য হাতে-বাঁধা ঘড়িটার দিকে চেয়ে বললে, 'কিন্তু সময় যে অল্প।'

'জীবনে সেইটেই তো শোচনীয় সমস্যা লাবণ্যদেবী, সময় অল্প। মরুপথের সঙ্গে আছে আধ-মশক মাত্র জল, যাতে সেটা উছলে উছলে শুকনো ধুলোয় মারা না যায় সেটা নিতান্তই করা চাই। সময় যাদের বিস্তর তাদেরই পাঙ্কচুয়াল হওয়া শোভা পায়। দেবতার হাতে সময় অসীম; তাই ঠিক সময়টিতে সূর্য ওঠে, ঠিক সময়ে অস্ত যায়। আমাদের মেয়াদ অল্প, পাঙ্কচুয়াল হতে গিয়ে সময় নষ্ট করা আমাদের পক্ষে অমিতব্যয়িতা। অমরাবতীর কেউ যদি প্রশ্ন করে 'ভবে এসে করলে কী' তখন কোন্ লজ্জায় বলব 'ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে কাজ করতে করতে জীবনের যা-কিছু সকল-সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তোলবার সময় পাই নি'? তাই তো বলতে বাধ্য হলুম, চলুন ঐ জায়গাটাতে।'

ওর যেটাতে আপত্তি নেই সেটাতে আর-কারো যে আপত্তি থাকতে পারে, অমিত সেই আশঙ্কাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে কথাবার্তা কয়। সেইজন্যে তার প্রস্তাবে আপত্তি করা শক্ত। লাবণ্য

বললে, 'চলুন।'

ঘন বনের ছায়া। সরু পথ নেমেছে নীচে একটা খাসিয়া গ্রামের দিকে। অর্ধপথে আর-এক পাশ দিয়ে ক্ষীণ ঝর্নার ধারা এক জায়গায় লোকালয়ের পথটাকে অস্বীকার করে তার উপর দিয়ে নিজের অধিকারচিহ্নস্বরূপ নুড়ি বিছিয়ে স্বতন্ত্র পথ চালিয়ে গেছে। সেইখানে পাথরের উপরে দুজনে বসল। ঠিক সেই জায়গায় খদটা গভীর হয়ে খানিকটা জল জমে আছে, যেন সবুজ পর্দার ছায়ায় একটি পর্দানশীন মেয়ে, বাইরে পা বাড়াতে তার ভয়। এখানকার নির্জনতার আবরণটাই লাবণ্যকে নিরাবরণের মতো লজ্জা দিতে লাগল। সামান্য যা-তা একটা-কিছু বলে এইটেকে ঢাকা দিতে ইচ্ছে করছে, কিছুতেই কোনো কথা মনে আসছে না—স্বপ্নে যেরকম কণ্ঠরোধ হয় সেই দশা।

অমিত বুঝতে পারলে, একটা-কিছু বলাই চাই। বললে, 'দেখুন আর্যা, আমাদের দেশে দুটো ভাষা, একটা সাধু, আর একটা চলতি। কিন্তু এ ছাড়া আরো একটা ভাষা থাকা উচিত ছিল, সমাজের ভাষা নয়, ব্যবসায়ের ভাষা নয়, আড়ালের ভাষা—এইরকম জায়গার জন্যে। পাখির গানের মতো, কবির কাব্যের মতো, সেই ভাষা অনায়াসেই কণ্ঠ দিয়ে বেরোনো উচিত ছিল, যেমন করে কান্না বেরোয়। সেজন্যে মানুষকে বইয়ের দোকানে ছুটতে হয়, সেটা বড়ো লজ্জা। প্রত্যেকবার হাসির জন্যে যদি ডেন্টিস্টের দোকানে দৌড়াদৌড়ি করতে হত তা হলে কী হত ভেবে দেখুন। সত্যি বলুন লাবণ্যদেবী, এখনি আপনার সুর করে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না?'

লাবণ্য মাথা হেঁট করে চুপ করে বসে রইল।

অমিত বললে, 'চায়ের টেবিলের ভাষায় কোন্‌টা ভদ্র কোন্‌টা অভদ্র তার হিসেব মিটতে চায় না। কিন্তু এ জায়গায় ভদ্রও নেই অভদ্রও নেই। তা হলে কী উপায় বলুন। মনটাকে সহজ করবার জন্যে একটা কবিতা না আওড়ালে তো চলছে না। গদ্যে অনেক সময় নেয়, অত সময় তো হাতে নেই। যদি অনুমতি করেন তো আরম্ভ করি।'

দিতে হল অনুমতি, নইলে লজ্জা করতে গেলেই লজ্জা।

অমিত ভূমিকায় বললে, 'রবি ঠাকুরের কবিতা বোধ হয় আপনার ভালো লাগে?'

'হাঁ, লাগে।'

'আমার লাগে না। অতএব আমাকে মাপ করবেন। আমার একজন বিশেষ কবি আছে, তার লেখা এত ভালো যে খুব অল্প লোকেই পড়ে। এমন-কি, তাকে কেউ গাল দেবার উপযুক্ত সম্মানও দেয় না। ইচ্ছে করছি, আমি তার থেকে আবৃত্তি করি।'

'আপনি এত ভয় করছেন কেন?'

'এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা শোকাবহ। কবিবরকে নিন্দে করলে আপনারা জাতে ঠেলেন, তাকে নিঃশব্দে পাশ কাটিয়ে বাদ দিয়ে চললে তাতে করেও কঠোর ভাষাব সৃষ্টি হয়। যা আমার ভালো লাগে তাই আর-একজনের ভালো লাগে না, এই নিয়েই পৃথিবীতে যত রক্তপাত।'

'আমার কাছ থেকে রক্তপাতের ভয় করবেন না। আপন রুচির জন্যে আমি পরের রুচির সমর্থন ভিক্ষে করি নে।'

'এটা বেশ বলেছেন, তা হলে নির্ভয়ে শুরু করা যাক—

রে অচেনা' মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে
যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?

'বিষয়টা দেখছেন? না-চেনার বন্ধন। সব চেয়ে কড়া বন্ধন। না-চেনা জগতে বন্দী হয়েছি, চিনে নিয়ে তবে খালাস পাব, একেই বলে মুক্তিতত্ত্ব। —

কোন্‌ অন্ধক্ষণে
বিজড়িত তন্দ্রা-জাগরণে
রাত্রি যবে সবে হয় ভোর,
' মুখ দেখিলাম তোর।

চক্ষু-'পরে চক্ষু রাখি শুধালেম, কোথা সংগোপনে
আছ আত্মবিস্মৃতির কোণে?

'নিজেকেই ভুলে-থাকার মতো কোনো এমন ঝাপসা কোণ আর নেই। সংসারে কত যে দেখবার ধন দেখা হল না, তারা আত্মবিস্মৃতির কোণে মিলিয়ে আছে। তাই বলে তো হাল ছেড়ে দিলে চলে না।—

তোর সাথে চেনা
সহজে হবে না,
কানে কানে মৃদুকণ্ঠে নয়।
করে নেব জয়
সংশয়কুণ্ঠিত তোর বাণী;
দৃপ্ত বলে লব টানি
শঙ্কা হতে, লজ্জা হতে, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব হতে
নির্দয় আলোতে।

'একেবারে নাছোড়বান্দা। কত বড়ো জোর! দেখেছেন রচনার পৌরুষ?—

জাগিয়া উঠিবি অশ্রুধারে,
মুহূর্তে চিনিবি আপনারে,
ছিন্ন হবে ডোর—
তোরে মুক্তি দিয়ে তবে মুক্তি হবে মোর।

'ঠিক এই তানটি আপনার নামজাদা লেখকের মধ্যে পাবেন না; সূর্যমণ্ডলে এ যেন আগুনের ঝড়। এ শুধু লিরিক নয়, এ নিষ্ঠুর জীবনতত্ত্ব।'

লাবণ্যর মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে বললে—

'হে অচেনা,
দিন যায়, সন্ধ্যা হয়, সময় রবে না—
তীব্র আকস্মিক
বাধা বন্ধ ছিন্ন করি দিক;
তোমারে চেনার অগ্নি দীপ্তশিখা উঠুক উজ্জ্বলি,
দিব তাহে জীবন অঞ্জলি।'

আবৃত্তি শেষ হতে না হতেই অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরলে। লাবণ্য হাত ছাড়িয়ে নিলে না। অমিতর মুখের দিকে চাইলে, কিছু বললে না।

এর পরে কোনো কথা বলবার কোনো দরকার হল না। লাবণ্য ঘড়ির দিকে চাইতেও ভুলে গেল।

৭
ঘটকালি

অমিত যোগমায়ার কাছে এসে বললে, 'মাসিমা, ঘটকালি করতে এলেম। বিদায়ের বেলা কৃপণতা করবেন না।'

'পছন্দ হলে তবে তো? আগে নাম ধাম বিবরণটা বলো।'

অমিত বললে, 'নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়।'

'তা হলে ঘটক-বিদায়ের হিসাব থেকে কিছু বাদ পড়বে দেখছি।'

'অন্যায় কথা বললেন। নাম যার বড়ো তার সংসারটা ঘরে অল্প, বাইরেই বেশি। ঘরের মন-রক্ষার চেয়ে বাইরে মানরক্ষাতেই তার যত সময় যায়। মানুষটার অতি অল্প অংশই পড়ে স্ত্রীর ভাগে, পুরো বিবাহের পক্ষে সেটুকু যথেষ্ট নয়। নামজাদা মানুষের বিবাহ স্বল্পবিবাহ, বহুবিবাহের মতোই গর্হিত।'

'আচ্ছা, নামটা নাহয় খাটো হল, রূপটা?'

'বলতে ইচ্ছে করি নে, পাছে অত্যুক্তি করে বসি।'

'অত্যুক্তির জোরেই বুঝি বাজারে চালাতে হবে?'

'পাত্র-বাছাইয়ের বেলায় দুটি জিনিস লক্ষ্য করা চাই—নামের দ্বারা বর যেন ঘরকে ছাড়িয়ে না যায়, আর রূপের দ্বারা কনেকে।'

'আচ্ছা, নামরূপ থাক্, বাকিটা?

'বাকি যেটা রইল সব জড়িয়ে সেটাকে বলে পদার্থ। তা, লোকটা অপদার্থ নয়।'

'বুদ্ধি?'

'লোকে যাতে ওকে বুদ্ধিমান ব'লে হঠাৎ ভ্রম করে সেটুকু বুদ্ধি ওর আছে।'

'বিদ্যে?'

'স্বয়ং নিউটনের মতো। ও জানে যে, জ্ঞানসমুদ্রের কূলে সে নুড়ি কুড়িয়েছে মাত্র। তাঁর মতো সাহস করে বলতে পারে না, পাছে লোকে ফস করে বিশ্বাস করে বসে।'

'পাত্রের যোগ্যতার ফর্দটা তো দেখছি কিছু খাটো গোছের।'

'অন্নপূর্ণার পূর্ণতা প্রকাশ কবতে হবে ব'লেই শিব নিজেকে ভিখারি কবুল করেন, একটুও লজ্জা নেই।'

'তা হলে পরিচয়টা আরো একটু স্পষ্ট করো।'

'জানা ঘর। পাত্রটির নাম অমিতকুমার রায়। হাসছেন কেন মাসিমা? ভাবছেন কথাটা ঠাট্টা?'

'সে ভয় মনে আছে বাবা, পাছে শেষ পর্যন্ত ঠাট্টাই হয়ে ওঠে।'

'এ সন্দেহটা পাত্রের 'পরে দোষারোপ।'

'বাবা, সংসারটাকে হেসে হালকা করে রাখা কম ক্ষমতা নয়।'

'মাসি, দেবতাদের সেই ক্ষমতা আছে, তাই দেবতারা বিবাহের অযোগ্য; দময়ন্তী সে কথা বুঝেছিলেন।'

'আমার লাবণ্যকে সত্যি কি তোমার পছন্দ হয়েছে?'

'কিরকম পরীক্ষা চান বলুন।'

'একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে, লাবণ্য যে তোমার হাতেই আছে, এইটি তোমার নিশ্চিত জানা।'

'কথাটাকে আর-একটু ব্যাখ্যা করুন।'

'যে রত্নকে সস্তায় পাওয়া গেল তারও আসল মূল্য যে বোঝে সেই জানব জহুরি।'

'মাসিমা, কথাটাকে বড়ো বেশি সূক্ষ্ম করে তুলছেন। মনে হচ্ছে, যেন একটা ছোটো গল্পের সাইকোলজিতে শান লাগিয়েছেন। কিন্তু কথাটা আসলে মোটা, জাগতিক নিয়মে এক ভদ্রলোক এক ভদ্রমণীকে বিয়ে করবার জন্যে খেপেছে। দোষে গুণে ছেলেটি চলনসই, মেয়েটির কথা বলা বাহুল্য। এমন অবস্থায় সাধারণ মাসিমার দল স্বভাবের নিয়মেই খুশি হয়ে তখনি ঢেঁকিতে আনন্দনাড়ু কুটতে শুরু করেন।'

'ভয় নেই বাবা, ঢেঁকিতে পা পড়েছে। ধরেই নাও লাবণ্যকে তুমি পেয়েইছ। তার পরেও, হাতে পেয়েও যদি তোমার পাবার ইচ্ছে প্রবল থেকেই যায় তবেই বুঝব, লাবণ্যর মতো মেয়েকে বিয়ে করবার তুমি যোগ্য।'

'আমি যে এ-হেন আধুনিক, আমাকে সুদ্ধ তাক লাগিয়ে দিলেন।'

'আধুনিকের লক্ষণটা কী দেখলে?'

'দেখছি, বিংশ শতাব্দীর মাসিমারা বিয়ে দিতেও ভয় পান।'

'তার কারণ, আগেকার শতাব্দীর মাসিমারা যাদের বিয়ে দিতেন তারা ছিল খেলার পুতুল। এখন যারা বিয়ের উমেদার, মাসিমাদের খেলার শখ মেটাবার দিকে তাদের মন নেই।'

'ভয় নেই আপনার। পেয়ে পাওয়া ফুরোয় না, বরঞ্চ চাওয়া বেড়েই ওঠে, লাবণ্যকে বিয়ে করে এই তত্ত্ব প্রমাণ করবে বলেই অমিত রায় মর্তে অবতীর্ণ। নইলে, আমার মোটরগাড়িটা অচেতন পদার্থ হয়েও অস্থানে অসময়ে এমন অদ্ভুত অঘটন ঘটিয়ে বসবে কেন?'

'বাবা, বিবাহযোগ্য বয়সের সুর এখনো তোমার কথাবার্তায় লাগছে না, শেষে সমস্তটা বাল্যবিবাহ হয়ে না দাঁড়ায়।'

'মাসিমা, আমার মনের স্বকীয় একটা স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি আছে, তারই গুণে আমার হৃদয়ের ভারী কথাগুলোও মুখে খুব হালকা হয়ে ভেসে ওঠে, তাই বলে তার ওজন কমে না।'

যোগমায়া গেলেন ভোজের ব্যবস্থা করতে। অমিত এ ঘরে ও ঘরে ঘুরে বেড়ালে, দর্শনীয় কাউকে দেখতে পেলে না। দেখা হল যতিশংকরের সঙ্গে। মনে পড়ল আজ তাকে 'অ্যান্টনি ক্লিয়োপ্যাট্রা' পড়াবার কথা। অমিতর মুখের ভাব দেখেই যতি বুঝেছিল, জীবের প্রতি দয়া করেই আজ তার ছুটি নেওয়া আশু কর্তব্য। সে বললে, 'অমিতদা, কিছু যদি মনে না কর আজ আমি ছুটি চাই, আপার শিলঙে বেড়াতে যাব।'

অমিত পুলকিত হয়ে বললে, 'পড়ার সময় যারা ছুটি নিতে জানে না তারা পড়ে, পড়া হজম করে না। তুমি ছুটি চাইলে আমি কিছু মনে করব এমন অসম্ভব ভয় করছ কেন?'

'কাল রবিবার ছুটি তো আছেই, পাছে তুমি তাই ভাব।'

'ইস্কুল-মাস্টারি বুদ্ধি আমার নয় ভাই, বরাদ্দ ছুটিকে ছুটি বলিই নে। যে ছুটি নিয়মিত, তাকে ভোগ করা আর বাঁধা পশুকে শিকার করা একই কথা। ওতে ছুটির রস ফিকে হয়ে যায়।'

হঠাৎ যে উৎসাহে অমিতকুমার ছুটিতত্ত্ব-ব্যাখ্যায় মেতে উঠল তার মূল কারণটা অনুমান করে যতির খুব মজা লাগল। সে বললে, 'কয়দিন থেকে ছুটিতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমার মাথায় নতুন নতুন ভাব উঠছে। সেদিনও আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে। এমন আর কিছুদিন চললেই ছুটি নিতে আমার হাত পেকে যাবে।'

'সেদিন কী উপদেশ দিয়েছিলুম?'

'বলেছিলে, অকর্তব্যবুদ্ধি মানুষের একটা মহদ্‌গুণ, তার ডাক পড়লেই একটুও বিলম্ব করা উচিত হয় না। বলেই বই বন্ধ করে তখনি বাইরে দিলে ছুট। বাইরে হয়তো একটা অকর্তব্যের কোথাও আবির্ভাব হয়েছিল, লক্ষ্য করি নি।'

যতির বয়স বিশের কোঠায়। অমিতর মনে যে চাঞ্চল্য উঠেছে ওর নিজের মনেও তার আন্দোলনটা এসে লাগছে। ও লাবণ্যকে এতদিন শিক্ষকজাতীয় বলেই ঠাউরেছিল, আজ অমিতর অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝতে পেরেছে, সে নারীজাতীয়।

অমিত হেসে বললে, 'কাজ উপস্থিত হলেই প্রস্তুত হওয়া চাই, এই উপদেশের বাজার-দর বেশি, আকব্বরি মোহরের মতো; কিন্তু ওর উলটো পিঠে খোদাই থাকা উচিত —অকাজ উপস্থিত হলেই সেটাকে বীরের মতো মেনে নেওয়া চাই।'

'তোমার বীরত্বের পরিচয় আজকাল প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছে।'

যতির পিঠ চাপড়িয়ে অমিত বললে, 'জরুরি কাজটাকে এক কোপে বলি দেবার পবিত্র অষ্টমী

তিথি তোমার জীবন-পঞ্জিকায় একদিন যখন আসবে দেবীপূজায় বিলম্ব কোরো না ভাই—তার পরে বিজয়াদশমী আসতে দেরি হয় না।'

যতি গেল চলে, অকর্তব্যবুদ্ধিও সজাগ, যাকে আশ্রয় করে অকাজ দেখা দেয় তারও দেখা নেই। অমিত ঘর ছেড়ে গেল বাইরে।

ফুলে আচ্ছন্ন গোলাপের লতা; এক ধারে সূর্যমুখীর ভিড়, আর-এক ধারে চৌকো কাঠের টবে চন্দ্রমল্লিকা। ঢালু ঘাসের খেতের উত্তর-প্রান্তে এক মস্ত য়ুক্যালিপ্‌টস্‌ গাছ। তারই গুঁড়িতে হেলান দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে লাবণ্য। ছাই রঙের আলোয়ান গায়ে, পায়ের উপর পড়েছে সকালবেলাকার রোদ্দুর। কোলে রুমালের উপর কিছু রুটির টুকরো, কিছু ভাঙা আখরোট। আজ সকালটা জীবসেবায় কাটাবে ঠাউরেছিল, তাও গেছে ভুলে। অমিত কাছে এসে দাঁড়াল, লাবণ্য মাথা তুলে তার মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে রইল, মৃদু হাসিতে মুখ গেল ছেয়ে। অমিত সামনাসামনি বসে বললে, 'সুখবর আছে। মাসিমার মত পেয়েছি।'

লাবণ্য তার কোনো উত্তর না করে অদূরে একটা নিষ্ফলা পিচগাছের দিকে একটা ভাঙা আখরোট ফেলে দিলে। দেখতে দেখতে তার গুঁড়ি বেয়ে একটা কাঠবিড়ালি নেমে এল। এই জীবটি লাবণ্যর মুষ্টিভিখারি-দলের একজন।

অমিত বললে, 'যদি আপত্তি না কর, তোমার নামটা একটু ছেঁটে দেব।'

'তা দাও।'

'তোমাকে ডাকব বন্য বলে।'

'বন্য!'

'না না, এ নামটাতে হয়তো বা তোমার বদনাম হল। এরকম নাম আমাকেই সাজে। তোমাকে ডাকব—বন্যা। কী বল?'

'তাই ডেকো, কিন্তু তোমার মাসিমার কাছে নয়।'

'কিছুতেই নয়। এ-সব নাম বীজমন্ত্রের মতো, কারো কাছে ফাঁস করতে নেই। এই রইল আমার মুখে আর তোমার কানে!'

'আচ্ছা বেশ।'

'আমারও ঐ-রকমের একটা বেসরকারি নাম চাই তো। ভাবছি, ব্রহ্মপুত্র কেমন হয়! বন্যা হঠাৎ এল তারই কূল ভাসিয়ে দিয়ে।

'নামটা সর্বদা ডাকবার পক্ষে ওজনে ভারী।'

'ঠিক বলেছ। কুলি ডাকতে হবে ডাকবার জন্যে। তুমিই তা হলে নামটা দাও। সেটা হবে তোমারই সৃষ্টি।'

'আচ্ছা, আমি দেব তোমার নাম ছেঁটে। তোমাকে বলব—মিতা।'

'চমৎকার! পদাবলীতে ওরই একটি দোসর আছে—বঁধু। বন্যা, মনে ভাবছি, ঐ নামে নাহয় আমাকে সবার সামনেই ডাকলে, তাতে দোষ কী?'

'ভয় হয়, এক কানের ধন পাঁচ কানে পাছে সস্তা হয়ে যায়।'

'সে কথা মিছে নয়। দুইয়ের কানে যেটা এক, পাঁচের কানে সেটা ভগ্নাংশ। বন্যা!'

'কী মিতা?'

'তোমার নামে যদি কবিতা লিখি তো কোন্‌ মিলটা লাগাব জান?—অনন্যা।'

'তাতে কী বোঝাবে?'

বোঝাবে তুমি যা তুমি তাই, তুমি আর-কিছুই নও।'

'সেটা বিশেষ আশ্চর্যের কথা নয়।'

'বল কী, খুবই আশ্চর্যের কথা। দৈবাৎ এক-একজন মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় যাকে দেখেই চমকে বলে উঠি, এ মানুষটি একেবারে নিজের মতো; পাঁচজনের মতো নয়। সেই কথাটি আমি কবিতায় বলব—

হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা,
আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা।'

'তুমি কবিতা লিখবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই লিখব। কার সাধ্য রোধে তার গতি?'

'এমন মরিয়া হয়ে উঠলে কেন?'

'কারণ বলি। কাল রাত্তির আড়াইটা পর্যন্ত, ঘুম না হলে য়েমন এ-পাশ ও-পাশ করতে হয় তেমনি করেই কেবলই অক্স্ফোর্ড বুক অফ ভর্সেস-এর এ-পাত ও-পাত উলটেছি। ভালোবাসার কবিতা খুঁজেই পেলুম না, আগে সেগুলো পায়ে পায়ে ঠেকত। স্পষ্টই বুঝতে পারছি, আমি লিখব বলেই সমস্ত পৃথিবী আজ অপেক্ষা করে আছে।'

এই বলেই লাবণ্যর বাঁ হাত নিজের দুই হাতের মধ্যে চেপে ধরে বললে, 'হাত জোড়া পড়ল, কলম ধরব কী দিয়ে? সব চেয়ে ভালো মিল হাতে হাতে মিল। এই-যে তোমার আঙুলগুলি আমার আঙুলে আঙুলে কথা কইছে, কোনো কবিই এমন সহজ করে কিছু লিখতে পারলে না।'

'কিছুই তোমার সহজে পছন্দ হয় না, সেইজন্যে তোমাকে এত ভয় করি মিতা।'

'কিন্তু আমার কথাটা বুঝে দেখো। রামচন্দ্র সীতার সত্য যাচাই করতে চেয়েছিলেন বাইরের আগুনে, তাতেই সীতাকে হারালেন। কবিতার সত্য যাচাই হয় অগ্নিপরীক্ষায়, সে আগুন অন্তরের। যার মনে নেই সেই আগুন সে যাচাই করবে কী দিয়ে? তাকে পাঁচজনের মুখে কথা মেনে নিতে হয়, অনেক সময়েই সেটা দুর্মুখের কথা। আমার মনের আজ আগুন জ্বলেছে, সেই আগুনের ভিতর দিয়ে আমার পুরোনো সব পড়া আবার পড়ে নিচ্ছি ; কত অল্পই টিকল। সব হু হু শব্দে ছাই হয়ে যাচ্ছে। কবিদের হট্টগোলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আজ আমাকে বলতে হয়, তোমরা অত চেঁচিয়ে কথা কোয়ো না, ঠিক কথাটি আস্তে বলো—

For God's sake, hold your tongue
and let me love!'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইল। তার পরে এক সময়ে লাবণ্যর হাতখানি তুলে ধরে অমিত নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলে। বললে, 'ভেবে দেখো বন্যা, আজ এই সকালে ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত পৃথিবীতে কত অসংখ্য লোকই চাচ্ছে, আর কত অল্প লোকই পেলে। আমি সেই অতি অল্প লোকের মধ্যে একজন। সমস্ত পৃথিবীতে একমাত্র তুমিই সেই সৌভাগ্যবান লোককে দেখতে পেলে শিলঙ পাহাড়ের কোণে এই য়ুক্যালিপ্টস্ গাছের তলায়। পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য ব্যাপারগুলিই পরম নম্র, চোখে পড়তে চায় না। অথচ তোমাদের ঐ তারিণী তলাপাত্র কলকাতার গোলদিঘি থেকে আরম্ভ করে নোয়াখালি চাটগাঁ পর্যন্ত চীৎকার-শব্দে শূন্যের দিকে ঘুষি উঁচিয়ে বাঁকা পলিটিক্সের ফাঁকা আওয়াজ ছড়িয়ে এল, সেই দুর্দান্ত বাজে খবরটা বাংলাদেশের সর্বপ্রধান খবর হয়ে উঠল। কে জানে হয়তো এইটেই ভালো।'

'কোন্‌টা ভালো?'

'ভালো এই যে, সংসারের আসল জিনিসগুলো হাটেবাটেই চলাফেরা করে বেড়ায়, অথচ বাজে লোকের চোখের ঠোকর খেয়ে খেয়ে মরে না। তার গভীর জানাজানি বিশ্ব-জগতের অন্তরের নাড়ীতে নাড়ীতে—আচ্ছা বন্যা, আমি তো বকেই চলেছি, তুমি চুপ করে বসে কী ভাবছ বলো তো।'

লাবণ্য চোখ নিচু করে বসে রইল, জবাব করলে না।

অমিত বললে, 'তোমার এই চুপ করে থাকা যেন মাইনে না দিয়ে আমার সব কথাকে বরখাস্ত করে দেওয়ার মতো।'

লাবণ্য চোখ নিচু করেই বললে, 'তোমার কথা শুনে আমার ভয় হয় মিতা।'

'ভয় কিসের!'

'তুমি আমার কাছে কী যে চাও, আর আমি তোমাকে কতটুকুই বা দিতে পারি, ভেবে পাই নে।'

'কিছু না ভেবেই তুমি দিতে পার, এইটেতেই তো তোমার দানের দাম।'

'তুমি যখন বললে কর্তামা সম্মতি দিয়েছেন, আমার মনটা কেমন করে উঠল। মনে হল, এইবার আমার ধরা পড়বাব দিন আসছে।'

'ধরাই তো পড়তে হবে।'

'মিতা, তোমার রুচি, তোমার বুদ্ধি আমার অনেক উপরে। তোমার সঙ্গে একত্রে পথ চলতে গিয়ে একদিন তোমার থেকে বহু দূরে পিছিয়ে পড়ব, তখন আর তুমি আমাকে ফিরে ডাকবে না। সেদিন আমি তোমাকে একটুও দোষ দেব না—না না, কিছু বোলো না, আমার কথাটা আগে শোনো। মিনতি করে বলছি, আমাকে বিয়ে করতে চেয়ো না। বিয়ে করে তখন গ্রন্থি খুলতে গেলে তাতে আরো জট পড়ে যাবে। তোমার কাছ থেকে আমি যা পেয়েছি সে আমার পক্ষে যথেষ্ট, জীবনের শেষ পর্যন্ত চলবে। তুমি কিন্তু নিজেকে ভুলিয়ো না।'

'বন্যা, তুমি আজকের দিনের ঔদার্যেব মধ্যে কালকের দিনের কার্পণ্যের আশঙ্কা কেন তুলছ?'

'মিতা, তুমিই আমাকে সত্য বলবার জোর দিয়েছ। আজ তোমাকে যা বলছি তুমি নিজেও তা ভিতরে ভিতরে জান। মানতে চাও না, পাছে যে রস এখন ভোগ করছ তাতে একটুও খটকা বাধে। তুমি তো সংসার ফাঁদবার মানুষ নও, তুমি রুচির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে ফের; সাহিত্যে সাহিত্যে তাই তোমার বিহার, আমার কাছেও সেইজন্যেই তুমি এসেছ। বলব ঠিক কথাটা? বিয়েটাকে তুমি মনে মনে জান, যাকে তুমি সর্বদাই বল ভাল্‌গার। ওটা বড়ো রেস্‌পেক্টেবল্‌; ওটা শাস্ত্রের দোহাই-পাড়া সেই-সব বিষয়ী লোকের পোষা জিনিস যারা সম্পত্তির সঙ্গে সহধর্মিনীকে মিলিয়ে নিয়ে খুব মোটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে।'

'বন্যা, তুমি আশ্চর্য নরম সুরে আশ্চর্য কঠিন কথা বলতে পার।'

'মিতা, ভালোবাসার জোরে চিরদিন যেন কঠিন থাকতেই পারি, তোমাকে ভোলাতে গিয়ে একটুও ফাঁকি যেন না দিই। তুমি যা আছ ঠিক তাই থাকো, তোমার রুচিতে আমাকে যতটুকু ভালো লাগে ততটুকুই লাগুক, কিন্তু একটুও তুমি দায়িত্ব নিয়ো না—তাতেই আমি খুশি থাকব।'

'বন্যা, এবাব তবে আমার কথাটা বলতে দাও। কী আশ্চর্য করেই তুমি আমার চরিত্রেব ব্যাখ্যা করেছ। তা নিয়ে কথা-কাটাকাটি করব না। কিন্তু একটা জায়গায় তোমার ভুল আছে। মানুষের চরিত্র জিনিসটাও চলে। ঘর-পোষা অবস্থায় তার একরকম শিকলি-বাঁধা স্থাবর পরিচয়। তাব পরে একদিন ভাগ্যের হঠাৎ এক ঘায়ে তার শিকলি কাটে, সে ছুট দেয় অরণ্যে, তখন তার আর-এক মূর্তি।'

'আজ তুমি তার কোনটা?'

'যেটা আমার বরাবরেব সঙ্গে মেলে না সেইটে। এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধা ঘাটে, রুচির ঢাকা-লণ্ঠন জ্বালিয়ে। তাতে দেখাশোনা হয়, চেনাশোনা হয় না। তুমি নিজেই বলো বন্যা, তোমার সঙ্গেও কি আমার সেই আলাপ?'

লাবণ্য চুপ করে রইল।

অমিত বললে, 'বাইরে বাইরে দুই নক্ষত্র পরস্পরকে সেলাম করতে করতে প্রদক্ষিণ করে

চলে, কায়দাটা বেশ শোভন, নিরাপদ—সেটাতে যেন তাদের রুচির টান, মর্মের মিল নয়। হঠাৎ যদি মরণের ধাক্কা লাগে, নিবে যায় দুই তারার লণ্ঠন, দোঁহে এক হয়ে ওঠবার আগুন ওঠে জ্বলে। সে আগুন জ্বলেছে, অমিত রায় বদলে গেল। মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক, কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে; যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে। তুমি আমার তাল বদলিয়ে দিয়েছ বন্যা—সেই তালেই তো তোমার সুরে আমার সুরে গাঁথা পড়ল।'

লাবণ্যর চোখের পাতা ভিজে এল। তবু এ কথা মনে না করে থাকতে পারলে না যে, 'অমিতর মনের গড়নটা সাহিত্যিক, প্রত্যেক অভিজ্ঞতায় ওর মুখে কথার উচ্ছ্বাস তোলে। সেইটে ওর জীবনের ফসল, তাতেই ও পায় আনন্দ। আমাকে ওর প্রয়োজন সেইজন্যেই। যে-সব কথা ওর মনে বরফ হয়ে জমে আছে, ও নিজে যার ভার বোধ করে কিন্তু আওয়াজ পায় না, আমার উত্তাপ লাগিয়ে তাকে গলিয়ে ঝরিয়ে দিতে হবে।'

দুজনে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে লাবণ্য হঠাৎ এক সময়ে প্রশ্ন করলে, 'আচ্ছা মিতা, তুমি কি মনে কর না যেদিন তাজমহল তৈরি শেষ হল সেদিন মমতাজের মৃত্যুর জন্যে শাজাহান খুশি হয়েছিলেন? তাঁর স্বপ্নকে অমর করবার জন্যে এই মৃত্যুর দরকার ছিল। এই মৃত্যুই মমতাজের সব চেয়ে বড়ো প্রেমের দান। তাজমহলে শাজাহানের শোক প্রকাশ পায় নি, তাঁর আনন্দ রূপ ধরেছে।'

অমিত বললে, 'তোমার কথায় তুমি ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমক লাগিয়ে দিচ্ছ। তুমি নিশ্চয়ই কবি।'

'আমি চাই নে কবি হতে।'

'কেন চাও না?'

'জীবনের উত্তাপে কেবল কথার প্রদীপ জ্বালাতে আমার মন যায় না। জগতে যারা উৎসবসভা সাজাবার হুকুম পেয়েছে কথা তাদের পক্ষেই ভালো। আমার জীবনের তাপ জীবনের কাজের জন্যেই।'

'বন্যা, তুমি কথাকে অস্বীকার করছ? জান না, তোমার কথা আমাকে কেমন করে জাগিয়ে দেয়। তুমি কী করে জানবে তুমি কী বল, আর সে বলার অর্থ। আবার দেখছি নিবারণ চক্রবর্তীকে ডাকতে হল। ওর নাম শুনে শুনে তুমি বিরক্ত হয়ে গেছ। কিন্তু কী করব বলো, ঐ লোকটা আমার মনের কথার ভাণ্ডারী। নিবারণ এখনো নিজের কাছে নিজে পুরোনো হয়ে যায় নি—ও প্রত্যেক বারেই যে কবিতা লেখে সে ওর প্রথম কবিতা। সেদিন ওর খাতা ঘাঁটতে ঘাঁটতে অল্পদিন আগেকার একটা লেখা পাওয়া গেল। ঝর্নার উপরে কবিতা—কী করে খবর পেয়েছে, শিলঙ পাহাড়ে এসে আমার ঝর্ণা আমি খুঁজে পেয়েছি। ও লিখছে—

ঝর্না, তোমার স্ফটিক জলের
স্বচ্ছ ধারা,
তাহারি মাঝারে দেখে আপনারে
সূর্য তারা।

'আমি নিজে যদি লিখতুম, এর চেয়ে স্পষ্টতর করে তোমার বর্ণনা করতে পারতুম না। তোমার মনের মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে যে, আকাশের সমস্ত আলো সহজেই প্রতিবিম্বিত হয়। তোমার সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে-পড়া সেই আলো আমি দেখতে পাই। তোমার মুখে, তোমার হাসিতে, তোমার কথায়, তোমার স্থির হয়ে বসে থাকায়, তোমার রাস্তা দিয়ে চলায়।

আজি মাঝে মাঝে আমার ছায়ারে
দুলায়ে খেলায়ো তারি এক ধারে,
সে ছায়ারি সাথে হাসিয়া মিলায়ো
কলধ্বনি—

দিয়ো তারে বাণী যে বাণী তোমার
চিরন্তনী।

'তুমি ঝর্না, জীবনস্রোতে তুমি যে কেবল চলছ তা নয়, তোমার চলার সঙ্গে সঙ্গেই তোমার বলা। সংসারের যে-সব কঠিন অচল পাথরগুলোর উপর দিয়ে চল তারাও তোমার সংঘাতে সুরে বেজে ওঠে।

আমার ছায়াতে তোমার হাসিতে
মিলিত ছবি,
তাই নিয়ে আজি পরানে আমার
মেতেছে কবি।
পদে পদে তবে আলোর ঝলকে
ভাষা আনে প্রাণে পলকে পলকে,
মোর বাণীরূপ দেখিলাম আজি,
নির্ঝরিণী—
তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়,
নিজেরে চিনি।'

লাবণ্য একটু ম্লান হাসি হেসে বললে, 'যতই আমার আলো থাক্ আর ধ্বনি থাক্, তোমার ছায়া তবু ছায়াই, সে ছায়াকে আমি ধরে রাখতে পারব না।'

অমিত বললে, 'কিন্তু একদিন হয়তো দেখবে, আর-কিছু যদি না থাকে আমার বাণীরূপ রয়েছে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'কোথায়? নিবারণ চক্রবর্তীর খাতায়?'

'আশ্চর্য কিছুই নেই। আমার মনের নীচের স্তরে যে ধারা বয়, নিবারণের ফোয়াবায় কেমন করে সেটা বেরিয়ে আসে।'

'তা হলে কোনো একদিন হয়তো কেবল নিবারণ চক্রবর্তীর ফোয়ারার মধ্যেই তোমার মনটিকে পাব, আর কোথাও নয়।'

এমন সময় বাসা থেকে লোক এল ডাকতে —খাবার তৈরি।

অমিত চলতে চলতে ভাবতে লাগল যে, 'লাবণ্য বুদ্ধির আলোতে সমস্তই স্পষ্ট করে জানতে চায়। মানুষ স্বভাবত যেখানে আপনাকে ভোলাতে ইচ্ছা করে ও সেখানেও নিজেকে ভোলাতে পারে না। লাবণ্য যে কথাটা বললে সেটার তো প্রতিবাদ করতে পারছি নে। অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি বাইরে প্রকাশ করতেই হয়, কেউ-বা করে জীবনে, কেউ-বা করে রচনায়—জীবনকে ছুঁতে ছুঁতে অথচ তার থেকে সরতে সরতে, নদী যেমন কেবলই তীর থেকে সরতে সরতে চলে তেমনি। আমি কি কেবলই রচনার স্রোত নিয়েই জীবন থেকে সরে সরে যাব! এইখানেই কি মেয়ে-পুরুষের ভেদ? পুরুষ তার সমস্ত শক্তিকে সার্থক করে সৃষ্টি করতে, সেই সৃষ্টি আপনাকে এগিয়ে দেবার জন্যেই আপনাকে পদে পদে ভোলে। মেয়ে তার সমস্ত শক্তিকে খাটায় রক্ষা করতে, পুরোনোকে রক্ষা করবার জন্যেই নতুন সৃষ্টিকে সে বাধা দেয়। রক্ষার প্রতি সৃষ্টি নিষ্ঠুর, সৃষ্টির প্রতি রক্ষা বিঘ্ন। এমন কেন হল? এক জায়গায় এরা পরস্পরকে আঘাত করবেই। যেখানে খুব করে মিল সেইখানেই মস্ত বিরুদ্ধতা। তাই ভাবছি, আমাদের সকলের চেয়ে বড়ো যে পাওনা সে মিলন নয়, সে মুক্তি।'

এ কথাটা ভাবতে অমিতকে পীড়া দিলে, কিন্তু ওর মন এটাকে অস্বীকার করতে পারলে না।

৮
লাবণ্য-তর্ক

যোগমায়া বললেন, 'মা লাবণ্য, তুমি ঠিক বুঝেছ?'

'ঠিক বুঝেছি মা।'

'অমিত ভারি চঞ্চল, সে কথা মানি। সেইজন্যেই ওকে এত স্নেহ করি। দেখো-না, ও কেমনতরো এলোমেলো। হাত থেকে সবই যেন পড়ে পড়ে যায়।'

লাবণ্য একটু হেসে বললে, 'ওঁকে সবই যদি ধরে রাখতেই হত, হাত থেকে সবই যদি খসে খসে না পড়ত, তা হলেই ওঁর ঘটত বিপদ। ওঁর নিয়ম হচ্ছে, হয় উনি পেয়েও পাবেন না, নয় উনি পেয়েই হারাবেন। যেটা পাবেন সেটা যে আবার রাখতে হবে, এটা ওঁর ধাতের সঙ্গে মেলে না।'

'সত্যি করে বলি বাছা, ওর ছেলেমানুষি আমার ভারি ভালো লাগে।'

'সেটা হল মায়ের ধর্ম। ছেলেমানুষিতে দায় যত-কিছু সব মায়ের, আর ছেলের দিকে যত-কিছু সব খেলা। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, দায় নিতে যে পারে না তার উপরে দায় চাপাতে?'

'দেখছ-না লাবণ্য, ওর অমন দুরন্ত মন আজকাল অনেকখানি যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দেখে আমার বড়ো মায়া করে। যাই বল, ও তোমাকে ভালোবাসে।'

'তা বাসেন।'

'তবে আর ভাবনা কিসের?'

'কর্তামা, ওঁর যেটা স্বভাব তার উপর আমি একটুও অত্যাচার করতে চাই নে।'

'আমি তো এই জানি লাবণ্য, ভালোবাসা খানিকটা অত্যাচার চায়, অত্যাচার করেও।'

'কর্তামা, সে অত্যাচারের ক্ষেত্র আছে; কিন্তু স্বভাবের উপর পীড়ন সয় না। সাহিত্যে ভালোবাসার বই যতই পড়লেম ততই এই কথাটা বার বার আমার মনে হয়েছে, ভালোবাসার ট্র্যাজেডি ঘটে সেইখানেই যেখানে পরস্পরকে স্বতন্ত্র জেনে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারে নি—নিজের ইচ্ছেবে অন্যের ইচ্ছে করবার জন্যে যেখানে জুলুম—যেখানে মনে করি, আপন মনের মতো করে বদলিয়ে অন্যকে সৃষ্টি করব।'

'তা মা, দুজনকে নিয়ে সংসার পাততে গেলে পরস্পর পরস্পরকে খানিকটা সৃষ্টি না করে নিলে চলেই না। ভালোবাসা যেখানে আছে সেখানে সেই সৃষ্টি সহজ ; যেখানে নেই সেখানে হাতুড়ি পিটোতে গিয়ে তুমি যাকে ট্র্যাজেডি বল তাই ঘটে।'

'সংসার পাতবার জন্যেই যে মানুষ তৈরি তার কথা ছেড়ে দাও। সে তো মাটির মানুষ, সংসারের প্রতিদিনের চাপেই তার গড়ন-পিটোন আপনিই ঘটতে থাকে। কিন্তু যে মানুষ মাটির মানুষ একেবারেই নয় সে আপনার স্বাতন্ত্র্য কিছুতেই ছাড়তে পারে না। যে মেয়ে তা না-বোঝে সে যতই দাবি করে ততই হয় বঞ্চিত, যে পুরুষ তা না বোঝে সে যতই টানা-হেঁচড়া করে ততই আসল মানুষটাকে হারায়। আমার বিশ্বাস, অধিকাংশ স্থলেই আমরা যাকে পাওয়া বলি সে আর কিছু নয়, হাতকড়া হাতকে যেরকম পায় সেই আর-কি।'

'তুমি কী করতে চাও লাবণ?'

'বিয়ে করে দুঃখ দিতে চাই নে। বিয়ে সকলের জন্যে নয়। জান কর্তামা, খুঁতখুঁতে মন যাদের তারা মানুষকে খানিক খানিক বাদ দিয়ে বেছে বেছে নেয়। কিন্তু বিয়ের ফাঁদে জড়িয়ে প'ড়ে স্ত্রী-পুরুষ যে বড়ো বেশি কাছাকাছি এসে পড়ে, মাঝে ফাঁক থাকে না; তখন একেবারে গোটা মানুষকে নিয়েই কারবার করতে হয় নিতান্ত নিকটে থেকে। কোনো একটা অংশ ঢাকা রাখবার জো থাকে না।'

'লাবণ্য, তুমি নিজেকে জান না। তোমাকে নিতে গেলে কিছুই বাদ দিয়ে নেবার দরকার হবে না।'

'কিন্তু উনি তো আমাকে চান না। যে আমি সাধারণ মানুষ, ঘরের মেয়ে, তাকে উনি দেখতে পেয়েছেন বলে মনেই করি নে। আমি যেই ওঁর মনকে স্পর্শ করেছি অমনি ওঁর মন অবিরাম ও অজস্র কথা কয়ে উঠেছে। সেই কথা দিয়ে উনি কেবলই আমাকে গড়ে তুলেছেন। ওঁর মন যদি ক্লান্ত হয়, কথা যদি ফুরোয়, তবে সেই নিঃশব্দের ভিতরে ধরা পড়বে এই নিতান্ত সাধারণ মেয়ে, যে মেয়ে ওঁর নিজের সৃষ্টি নয়। বিয়ে করলে মানুষকে মেনে নিতে হয়, তখন আর গড়ে নেবার ফাঁক পাওয়া যায় না।'

'তোমার মন হয়, অমিত তোমার মতো মেয়েকেও সম্পূর্ণ মেনে নিতে পারবে না?'

'স্বভাব যদি বদলায় তবে পারবেন। কিন্তু বদলাবেই বা কেন? আমি তো তা চাই নে।'

'তুমি কী চাও?'

'যতদিন পারি নাহয় ওঁর কথার সঙ্গে, ওঁর মনের খেলার সঙ্গে মিশিয়ে স্বপ্ন হয়েই থাকব। আর, স্বপ্নই বা তাকে বলব কেন? সে আমার একটা বিশেষ জন্ম, একটা বিশেষ রূপ, একটা বিশেষ জগতে সে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। নাহয় সে গুটি থেকে বের হয়ে আসা দু-চার দিনের একটা রঙিন প্রজাপতিই হল, তাতে দোষ কী? জগতে প্রজাপতি আব কিছুব চেয়ে যে কম সত্য তা তো নয়। নাহয় সে সূর্যোদয়েব আলোতে দেখা দিল আর সূর্যাস্তের আলোতে মবেই গেল, তাতেই বা কী? কেবল এইটুকুই দেখা চাই যে, সেটুকু সময যেন ব্যর্থ হয়ে না যায়।'

'সে যেন বুঝলুম, তুমি অমিতর কাছে নাহয় ক্ষণকালের মায়া রূপেই থাকবে। আর নিজে? তুমিও কি বিয়ে করতে চাও না? তোমার কাছে অমিতও কি মায়া?'

লাবণ্য চুপ করে বসে রইল, কোনো জবাব করলে না।

যোগমায়া বললেন, 'তুমি যখন তর্ক কর তখন বুঝতে পারি তুমি অনেক-বই-পড়া মেয়ে। তোমার মতো করে ভাবতেও পারি নে, কথা কইতেও পারি নে ; শুধু তাই নয়, হয়তো কাজের বেলাতেও এত শক্ত হতে পারি নে। কিন্তু তর্কের ফাঁকের মধ্যে দিয়েও যে তোমাকে দেখেছি মা। সেদিন রাত তখন বাবোটা হবে— দেখলুম, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরে গিয়ে দেখি, তোমার টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে দুই হাতের মধ্যে মুখ রেখে তুমি কাঁদছ। এ তো ফিলজফি-পড়া মেয়ে নয়। একবার ভাবলুম, সান্ত্বনা দিয়ে আসি ; তার পরে ভাবলুম, সব মেয়েকেই কাঁদবার দিনে কেঁদে নিতে হবে, চাপা দিতে যাওয়া কিছু নয়। এ কথা খুবই জানি, তুমি সৃষ্টি করতে চাও না, ভালোবাসতে চাও। মন প্রাণ দিয়ে সেবা না করতে পারলে তুমি বাঁচবে কী করে। তাই তো বলি, ওকে কাছে না পেলে তোমাব চলবে না। 'বিযে করব না' বলে হঠাৎ পণ করে বোসো না। একবার তোমার মনে একটা জেদ চাপলে আর তোমাকে সোজা করা যায় না, তাই ভয করি।'

লাবণ্য কিছু বললে না, নতমুখে কোলের উপর শাড়ির আঁচলটা চেপে চেপে অনাবশ্যক ভাঁজ করতে লাগল।

যোগমায়া বললেন, 'তোমাকে দেখে আমার অনেকবার মনে হয়েছে, অনেক প'ড়ে, অনেক ভেবে তোমাদেব মন বেশি সূক্ষ্ম হয়ে গেছে; তোমরা ভিতরে ভিতরে যে সব ভাব গড়ে তুলছ আমাদের সংসারটা তার উপযুক্ত নয়। আমাদের সময়ে মনের যে-সব আলো অদৃশ্য ছিল, তোমরা আজ যেন সেগুলোকেও ছাড়ান দিতে চাও না। তারা দেহের মোটা আবরণটাকে ভেদ করে দেহটাকে যেন অগোচর করে দিচ্ছে। আমাদের আমলে মনের মোটা মোটা ভাবগুলো নিয়ে সংসারে সুখদুঃখ যথেষ্ট ছিল, সমস্যা কিছু কম ছিল না। আজ তোমরা এতই বাড়িয়ে তুলছ, কিছুই আর সহজ রাখলে না।'

লাবণ্য একটুখানি হাসলে। এই সেদিন অমিত অদৃশ্য আলোর কথা যোগমায়াকে বোঝাচ্ছিল,

তার থেকে এই যুক্তি তাঁর মাথায় এসেছে—এও তো সূক্ষ্ম; যোগমায়ার মা-ঠাকরুন এ কথা এমন করে বুঝতেন না। বললে, 'কর্তামা, কালের গতিকে মানুষের মন যতই স্পষ্ট করে সব কথা বুঝতে পারবে ততই শক্ত করে তার ধাক্কা সইতেও পারবে। অন্ধকারের ভয়, অন্ধকারের দুঃখ অসহ্য, কেননা সেটা অস্পষ্ট।'

যোগমায়া বললেন, 'আজ আমার বোধ হচ্ছে, কোনো কালে তোমাদের দুজনের দেখা না হলেই ভালো হত।'

'না না, তা বোলো না। যা হয়েছে এ ছাড়া আর-কিছু যে হতে পারত, এ আমি মনেও করতে পারি নে—এক সময়ে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, আমি নিতান্তই শুকনো—কেবল বই পড়ব আর পাস করব, এমনি করেই আমার জীবন কাটবে। আজ হঠাৎ দেখলুম, আমিও ভালোবাসতে পারি। আমার জীবনে এমন অসম্ভব যে সম্ভব হল, এই আমার ঢের হয়েছে। মনে হয় এত দিন ছায়া ছিলুম, এখন সত্য হয়েছি। এর চেয়ে আর কী চাই! আমাকে বিয়ে করতে বোলো না কর্তামা।'

ব'লে চৌকি থেকে মেঝেতে নেমে যোগমায়ার কোলে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

৯
বাসা-বদল

গোড়ায় সবাই ঠিক করে রেখেছিল, অমিত দিন-পনেরোর মধ্যে কোলকাতায় ফিরবে। নরেন মিত্তির খুব মোটা বাজি রেখেছিল যে, সাত দিন পেরোবে না। এক মাস যায়, দু মাস যায়, ফেরবার নামও নেই। শিলঙের বাসার মেয়াদ ফুরিয়েছে, রংপুরের কোন্ জমিদার এসে সেটা দখল করে বসল। অনেক খোঁজ করে যোয়মায়াদের কাছাকাছি একটা বাসা পাওয়া গেছে। এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তার পরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। সে কেরানিও গেছে মরে, তারই বিধবা এটা ভাড়া দেয়। জানলা-দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে।

ঘরের অবস্থা দেখে যোগমায়া একদিন চমকে উঠলেন বললেন, 'বাবা, নিজেকে নিয়ে এ কী পরীক্ষা চলেছে?'

অমিত উত্তর করলে, 'উমার ছিল নিরাহারের তপস্যা, শেষকালে পাতা পর্যন্ত খাওয়া ছেড়েছিলেন। আমার হল নিরাস্‌বাবের তপস্যা, খাট পালঙ টেবিল কেদারা ছাড়তে ছাড়তে প্রায় এসে ঠেকেছে শূন্য দেয়ালে। সেটা ঘটেছিল হিমালয় পর্বতে, এটা ঘটল শিলঙ পাহাড়ে। সেটাতে কন্যা চেয়েছিলেন বর, এটাতে বর চাচ্ছেন কন্যা। সেখানে নারদ ছিলেন ঘটক, এখানে স্বয়ং আছেন মাসিমা। এখন শেষ পর্যন্ত যদি কোনো কারণে কালিদাস এসে না পৌঁছতে পারেন, অগত্যা আমাকেই তাঁর কাজটাও যথাসম্ভব সারতে হবে।'

অমিত হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে, কিন্তু যোগমায়াকে ব্যথা দেয়। তিনি প্রায় বলতে গিয়েছিলেন, আমাদের বাড়িতেই এসে থাকো—থেমে গেলেন। ভাবলেন, বিধাতা একটা কাণ্ড ঘটিয়ে তুলছেন, তার মধ্যে আমাদের হাত পড়লে অসাধ্য জট পাকিয়ে উঠতে পারে। নিজের বাসা থেকে অল্প কিছু জিনিসপত্র পাঠিয়ে দিলেন, আর সেইসঙ্গে এই লক্ষ্মীছাড়াটার 'পরে তাঁর করুণা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। লাবণ্যকে বার বার বললেন, 'মা লাবণ্য, মনটাকে পাষাণ কোরো না।'

একদিন বিষম এক বর্ষণের অন্তে অমিত কেমন আছে খবর নিতে গিয়ে যোগমায়া দেখলেন, নড়বড়ে একটা চারপেয়ে টেবিলের নীচে কম্বল পেতে অমিত একলা বসে একখানা ইংরেজি বই পড়ছে। ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে বৃষ্টি বিন্দুর অসংগত আবির্ভাব দেখে টেবিল দিয়ে একটা গুহা বানিয়ে তার নীচে অমিত পা ছড়িয়ে বসে গেল। প্রথমে নিজে নিজেই হেসে নিলে এক চোট, তার পরে চলল কাব্যালোচনা। মনটা ছুটেছিল যোগমায়ার বাড়ির দিকে। কিন্তু শরীরটা দিলে বাধা। কারণ, যেখানে কোনো প্রয়োজন হয় না সেই কোলকাতায় অমিত কিনেছিল এক অনেক দামের বর্ষাতি, যেখানে সর্বদাই প্রয়োজন সেখানে আসবার সময় সেটা আনবার কথা মনে হয় নি। একটা ছাতা সঙ্গে ছিল, সেটা খুব সম্ভব কোনো একদিন সংকল্পিত গম্যস্থানেই ফেলে এসেছে, আর তা যদি না হয় তবে সেই বুড়ো দেওদারের তলে সেটা আছে পড়ে।

যোগমায়া ঘরে ঢুকে বললেন, 'একি কাণ্ড অমিত!'

অমিত তাড়াতাড়ি টেবিলের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে বললে, 'আমার ঘরটা আজ অসম্বদ্ধ প্রলাপে মেতেছে, দশা আমার চেয়ে ভালো নয়।'

'অসম্বদ্ধ প্রলাপ!'

'অর্থাৎ বাড়ির চালটা প্রায় ভারতবর্ষ বললেই হয়। অংশগুলোর মধ্যে সম্বন্ধটা আলগা। এইজন্যে উপর থেকে উৎপাত ঘটলেই চারি দিকে এলোমেলো অশ্রুবর্ষণ হতে থাকে, আর বাইরের দিক থেকে যদি ঝড়ের দাপট লাগে, তবে সোঁ সোঁ করে উঠতে থাকে দীর্ঘশ্বাস। আমি তো প্রটেস্ট্-স্বরূপে মাথার উপরে এক মঞ্চ খাড়া করেছি—ঘরের মিসগর্ভনমেন্টের মাঝখানেই নিরুপদ্রব হোমরুলের দৃষ্টান্ত। পলিটিক্সের একটা মূলনীতি এখানে প্রত্যক্ষ।'

'মূলনীতিটা কী শুনি।'

'সেটা হচ্ছে এই যে, যে ঘরওয়ালা ঘরে বাস করে না সে যত বড়ো ক্ষমতাশালীই হোক, তার শাসনের চেয়ে যে দরিদ্র বাসাড়ে ঘরে থাকে তার যেমন-তেমন ব্যবস্থাও ভালো।'

আজ লাবণ্যর 'পরে যোগমায়ার খুব রাগ হল। অমিতকে তিনি যতই গভীর ক'রে স্নেহ করছেন ততই মনে মনে তার মূর্তিটা খুব উঁচু করেই গড়ে তুলছেন। —'এত বিদ্যে, এত বুদ্ধি, এত পাস, অথচ এমন সাদা মন। গুছিয়ে কথা বলবার কী অসামান্য শক্তি! আর, যদি চেহারার কথা বল, আমার চোখে তো লাবণ্যব চেয়ে ওকে অনেক বেশি সুন্দর ঠেকে। লাবণ্যর কপাল ভালো, অমিত কোন্ গ্রহের চক্রান্তে ওকে এমন মুগ্ধ চোখে দেখেছে! সেই সোনার চাঁদ ছেলেকে লাবণ্য এত করে দুঃখ দিচ্ছে! খামকা বলে বসলেন কিনা বিয়ে করবেন না। যেন কোন্ রাজরাজেশ্বরী! ধনুক-ভাঙা পণ! এত অহংকার সইবে কেন! পোড়ারমুখীকে যে কেঁদে কেঁদে মরতে হবে।'

একবার যোগমায়া ভাবলেন, অমিতকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে যাবেন তাঁদের বাড়িতে। তার পরে কী ভেবে বললেন, 'একটু বোসো বাবা, আমি এখনই আসছি।'

বাড়ি গিয়েই চোখে পড়ল লাবণ্য তার ঘবের সোফায় হেলান দিয়ে পায়ের উপর শাল মেলে গোর্কির 'মা' বলে গল্পের বই পড়ছে। ওর এই আরামটা দেখে ওঁর মনে মনে রাগ আরো বেড়ে উঠল।

বললেন, 'চলো, একটু বেড়িয়ে আসবে।'

সে বললে, 'কর্তামা, আজ বেরোতে ইচ্ছে করছে না।'

যোগমায়া ঠিক বুঝলেন না যে, লাবণ্য নিজের কাছ থেকে ছুটে গিয়ে এই গল্পের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। সমস্ত দুপুরবেলা খাওয়ার পর থেকেই, তার মনের মধ্যে একটা অস্থির অপেক্ষা ছিল কখন আসবে অমিত। কেবলই মন বলেছে, এল বুঝি। বাইরে দমকা হাওয়ার দৌরাত্ম্যে পাইন গাছগুলো থেকে থেকে ছট্‌ফট্ করে। আর, দুর্দান্ত বৃষ্টিতে সদ্যোজাত ঝর্নাগুলো এমনি ব্যতিব্যস্ত

যেন তাদের মেয়াদের সময়টার সঙ্গে ঊর্ধ্বশ্বাসে তাদের পাল্লা চলেছে। লাবণ্যর মধ্যে একটা ইচ্ছে আজ অশান্ত হয়ে উঠল—যাক সব বাধা ভেঙে, সব দ্বিধা উড়ে, অমিতর দুই হাত আজ চেপে ধরে বলে উঠি, জন্মে-জন্মান্তরে আমি তোমার। আজ বলা সহজ। আজ সমস্ত আকাশ যে মরিয়া হয়ে উঠল, হু হু করে কী যে হেঁকে উঠছে তার ঠিক নেই, তারই ভাষায় আজ বন-বনান্তর ভাষা পেয়েছে, বৃষ্টিধারায়-আবিষ্ট গিরিশৃঙ্গগুলো আকাশে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইল। অমনি করেই কেউ শুনতে আসুক লাবণ্যর কথা—অমনি মস্ত করে, স্তব্ধ হয়ে, অমি উদার মনোযোগে। কিন্তু প্রহরের পর প্রহর যায়, কেউ আসে না। ঠিক মনের কথাটি বলার লগ্ন যে উত্তীর্ণ হয়ে গেল। এর পরে যখন কেউ আসবে তখন কথা জুটবে না, তখন সংশয় আসবে মনে, তখন তাণ্ডবনৃত্যোন্মত্ত দেবতার মাভৈঃ রব আকাশে মিলিয়ে যাবে। বৎসরের পর বৎসর নীরবে চলে যায়, তার মধ্যে বাণী একদিন বিশেষ প্রহরে হঠাৎ মানুষের দ্বারে এসে আঘাত করে। সেই সময়ে দ্বার খোলবার চাবিটি যদি না পাওয়া গেল তবে কোনোদিনই ঠিক কথাটি অকুণ্ঠিত স্বরে বলবার দৈবশক্তি আর জোটে না। যেদিন সেই বাণী আসে সেদিন সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে খবর দিতে ইচ্ছে করে, শোনো তোমরা, আমি ভালোবাসি। 'আমি ভালোবাসি' এই কথাটি অপরিচিত সিন্ধুপারগামী পাখির মতো, কত দিন থেকে, কত দূর থেকে আসছে—সেই কথাটির জন্যেই আমার প্রাণে আমার ইষ্টদেবতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। স্পর্শ করল আজ সেই কথাটি —আমার সমস্ত জীবন, আমার সমস্ত জগৎ সত্য হয়ে উঠল। বালিশের মধ্যে মুখ লুকিয়ে লাবণ্য আজ কাকে এমন করে বলতে লাগল 'সত্য সত্য, এত সত্য আর কিছু নেই'!

সময় চলে গেল, অতিথি এল না। অপেক্ষার গুরুভারে বুকের ভিতরটা টন টন করতে লাগল, বারান্দায় বেরিয়ে গিয়ে লাবণ্য খানিকটা ভিজে এল জলের ঝাপটা লাগিয়ে। তার পরে একটা গভীর অবসাদে তার মনটাকে ঢেকে ফেললে নিবিড় একটা নৈরাশ্যে ; মন হল ওর জীবনে যা জ্বলবার তা একবার মাত্র দপ্ ক'রে জ্বলে তার পরে গেল নিবে, সামনে কিছুই নেই। অমিতকে নিজের ভিতরকার সত্যের দোহাই দিয়ে সম্পূর্ণ করে স্বীকার করে নিতে ওর সাহস চলে গেল। এই কিছু আগেই ওর প্রবল যে একটা ভরসা জেগেছিল সেটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ চুপ করে পড়ে থেকে অবশেষে টেবিল থেকে বইটা টেনে নিলে। কিছু সময় গেল মন দিতে; তার পরে গল্পের ধারার মধ্যে প্রবেশ করে কখন নিজেকে ভুলে গেল তা জানতে পারে নি।

এমন সময় যোগমায়া ডাকলেন বেড়াতে যেতে। ওর উৎসাহ হল না।

যোগমায়া একটা চৌকি টেনে লাবণ্যর সামনে বসলেন, দীপ্ত চোখ তার মুখে রেখে বললেন, 'সত্যি করে বলো দেখি লাবণ্য, তুমি কি অমিতকে ভালোবাস?'

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে বসে বললে, 'এমন কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা?'

'যদি না ভালোবাস ওকে স্পষ্ট করেই বলো-না কেন। নিষ্ঠুর তুমি, ওকে যদি না চাও তবে ওকে ধরে রেখো না।'

লাবণ্যর বুকের ভিতরটা ফুলে ফুলে উঠল, মুখ দিয়ে কথা বেরোল না।

'এইমাত্র যে দশা ওর দেখে এলুম, বুক ফেটে যায়। এমন ভিক্ষুকের মতো কার জন্যে এখানে ও পড়ে আছে! ওর মতো ছেলে যাকে চায় সে যে কত বড়ো ভাগ্যবতী তা কি একটুও বুঝতে পার না?'

চেষ্টা করে রুদ্ধ কণ্ঠের বাধা কাটিয়ে লাবণ্য বলে উঠল, 'আমার ভালোবাসার কথা জিজ্ঞাসা করছ কর্তামা? আমি তো ভেবে পাই নে, আমার চেয়ে ভালোবাসতে পারে পৃথিবীতে এমন কেউ আছে। ভালোবাসায় আমি যে মরতে পারি। এতদিন যা ছিলুম সব যে আমার লুপ্ত হয়ে গেছে। এখন থেকে আমার আর-এক আরম্ভ, এ আরম্ভের শেষ নেই। আমার মধ্যে এ যে কত আশ্চর্য সে আমি কাউকে কেমন করে জানাব? আর কেউ কি এমন করে জেনেছে?'

যোগমায়া অবাক হয়ে গেলেন। চিরদিন দেখে এসেছেন লাবণ্যর মধ্যে গভীর শান্তি, এত

বড়ো দুঃসহ আবেগ কোথায় এতদিন লুকিয়ে ছিল! তাকে আস্তে আস্তে বললেন, 'মা লাবণ্য, নিজেকে চাপা দিয়ে রেখো না। অমিত অন্ধকারে তোমাকে খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে; সম্পূর্ণ করে তার কাছে তুমি আপনাকে জানাও—একটুও ভয় কোরো না। যে আলো তোমার মধ্যে জ্বলেছে সে আলো যদি তার কাছেও প্রকাশ পেত তা হলে তার কোনো অভাব থাকত না। চলো মা, এখনই চলো আমার সঙ্গে।'

দুজনে গেলেন অমিতর বাসায়।

১০
দ্বিতীয় সাধনা

তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে একতাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। টেবিলে এক দিস্তে ফুলস্ক্যাপ কাগজ নিয়ে তার চলছে লেখা। সেই সময়েই সে তার বিখ্যাত আত্মজীবনী শুরু করেছিল। কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলে, সেই সময়েই তার জীবনটা অকস্মাৎ তার নিজের কাছে দেখা দিয়েছিল নানা রঙে, বাদলের পরদিনকার সকালবেলায় শিলঙ পাহাড়ের মতো ; সেদিন নিজের অস্তিত্বের একটা মূল্য সে পেয়েছিল, সে কথাটা প্রকাশ না করে সে থাকবে কী করে? অমিত বলে, মানুষের মৃত্যুর পরে তার জীবনী লেখা হয় তার কারণ, এক দিকে সংসারে সে মরে, আর-এক দিকে মানুষের মনে সে নিবিড় করে বেঁচে ওঠে। অমিতর ভাবখানা এই যে, শিলঙে সে যখন ছিল তখন এক দিকে সে মরেছিল, তার অতীতটা গিয়েছিল মরীচিকার মতো মিলিয়ে, তেমনি আর-এক দিকে সে উঠেছিল তীব্র করে বেঁচে; পিছনের অন্ধকারের উপরে উজ্জ্বল আলোর ছবি প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রকাশের খবরটা রেখে যাওয়া চাই। কেননা, পৃথিবীতে খুব অল্প লোকের ভাগ্যে এটা ঘটতে পারে, তারা জন্ম থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত একটা প্রদোষচ্ছায়ার মধ্যেই কাটিয়ে যায়, যে বাদুড় গুহার মধ্যে বাসা করেছে তারই মতো।

তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।

অমিত চৌকি ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'এ কী অন্যায় মাসিমা!'

'কেন বাবা, কী করেছি?'

'আমি যে একেবারে অপ্রস্তুত। শ্রীমতী লাবণ্য কী ভাববেন!'

'শ্রীমতী লাবণ্যকে একটু ভাবতে দেওয়াই তো দরকার। যা জানবার সবটাই যে জানা ভালো। এতে শ্রীযুক্ত অমিতের এত আশঙ্কা কেন?'

'শ্রীযুক্তের যা ঐশ্বর্য সেইটেই শ্রীমতীর কাছে জানাবার। আর, শ্রীহীনের যা দৈন্য সেইটে জানাবার জন্যেই আছ তুমি, আমার মাসিমা।'

'এমন ভেদবুদ্ধি কেন বাছা?'

'নিজের গরজেই। ঐশ্বর্য দিয়েই ঐশ্বর্য দাবি করতে হয়, আর অভাব দিয়ে চাই আশীর্বাদ। মানবসভ্যতায় লাবণ্যদেবীরা জাগিয়েছেন ঐশ্বর্য, আর মাসিমারা এনেছেন আশীর্বাদ।'

'দেবীকে আর মাসিমাকে একাধারেই পাওয়া যেতে পারে অমিত; অভাব ঢাকবার দরকার হয় না।'

'এর জবাব কবির ভাষায় দিতে হয়। গদ্যে যা বলি সেটা স্পষ্ট বোঝাবার জন্যে ছন্দের ভাষ্য দরকার হয়ে পড়ে। ম্যাথু আর্নল্ড কাব্যকে বলেছেন ক্রিটিসিজ্‌ম অফ লাইফ, আমি কথাটাকে সংশোধন করে বলতে চাই লাইফ্‌স্ কমেন্টারি ইন্ ভার্স্। অতিথিবিশেষকে আগে থাকতে জানিয়ে রাখি, যেটা পড়তে যাচ্ছি সে লেখাটা কোনো কবিসম্রাটের নয়। —

পূর্ণপ্রাণে চাবার যাহা
রিক্ত হাতে চাস নে তারে,
সিক্ত চোখে যাস নে দ্বারে।

ভেবে দেখবেন, ভালোবাসাই হচ্ছে পূর্ণতা, তার যা আকাঙ্ক্ষা সে তো দরিদ্রের কাঙালপনা নয়। দেবতা যখন তাঁর ভক্তকে ভালোবাসেন তখনই আসেন ভক্তের দ্বারে ভিক্ষা চাইতে। —

রত্নমালা আনবি যবে
মাল্য-বদল তখন হবে,
পাতবি কি তোর দেবীর আসন
শূন্য ধুলায় পথের ধারে?

সেইজন্যেই তো সম্প্রতি দেবীকে একটু হিসেব করে ঘরে ঢুকতে বলেছিলুম। পাতবার কিছুই নেই তো পাতব কী? এই ভিজে খবরের কাগজগুলো? আজকাল সম্পাদকি কালির দাগকে সব চেয়ে ভয় করি। কবি বলছেন, ডাকবার মানুষকে ডাকি যখন জীবনের পেয়ালা উছলে পড়ে, তাকে তৃষ্ণার শরিক হতে ডাকি নে।—

পুষ্প-উদার চৈত্রবনে
বক্ষে ধরিস নিত্য-ধনে
লক্ষ শিখায় জ্বলবে যখন
দীপ্ত প্রদীপ অন্ধকারে।

মাসিদের কোলে জীবনের আরম্ভেই মানুষের প্রথম তপস্যা দারিদ্র্যের, নগ্ন সন্ন্যাসীর স্নেহসাধনা। এই কুটিরে তারই কঠোর আয়োজন। আমি তো ঠিক করে রেখেছি, এই কুটিরের নাম দেব মাসতুতো বাংলো।'

'বাবা, জীবনের দ্বিতীয় তপস্যা ঐশ্বর্যের, দেবীকে বাঁ পাশে নিয়ে প্রেমসাধনা। এ কুটিরেও তোমার সে সাধনা ভিজে কাগজে চাপা পড়বে না। 'বর পাই নি' বলে নিজেকে ভোলাচ্ছ? মনে মনে নিশ্চয় জান, পেয়েছ।'

এই বলে লাবণ্যকে অমিতর পাশে দাঁড় করিয়ে তার ডান হাত অমিতর ডান হাতের উপর রাখলেন। লাবণ্যর গলা থেকে সোনার হারগাছি খুলে তাই দিয়ে দুজনের হাত বেঁধে বললেন, 'তোমাদের মিলন অক্ষয় হোক।'

অমিত লাবণ্য দুজনে মিলে যোগমায়ার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করলে। তিনি বললেন, 'তোমরা একটু বোসো, আমি বাগান থেকে কিছু ফুল নিয়ে আসি গে।'

ব'লে গাড়ি করে ফুল আনতে গেলেন। অনেকক্ষণ দুজনে খাটিয়াটার উপরে পাশাপাশি চুপ করে বসে রইল। এক সময়ে অমিতর মুখের দিকে মুখ তুলে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'আজ তুমি সমস্ত দিন গেলে না কেন?'

অমিত উত্তর দিলে, 'কারণটা এত বেশি তুচ্ছ যে আজকের দিনে সে কথাটা মুখে আনতে সাহসের দরকার। ইতিহাসে কোনোখানে লেখে না যে, হাতের কাছে বর্ষাতি ছিল না ব'লে বাদলের দিনে প্রেমিক তার প্রিয়ার কাছে যাওয়া মুলতবি রেখেছে ; বরঞ্চ লেখা আছে সাঁতার দিয়ে অগাধ জল পার হওয়ার কথা। কিন্তু সেটা অন্তরের ইতিহাস, সেখানকার সমুদ্রে আমিও কি সাঁতার কাটছি নে ভাবছ? সে অকূল কোনোকালে কি পার হব?—

For we are bound where
mariner has not yet dared to go,

And we will risk the ship,
ourselves and all.
আমরা যাব যেখানে কোনো
যায় নি নেয়ে সাহস করি।
ডুবি যদি তো ডুবি-না কেন।
ডুবুক সবি, ডুবুক তরী।

বন্যা, আমার জন্যে আজ তুমি অপেক্ষা করে ছিলে?'

'হাঁ মিতা, বৃষ্টির শব্দে সমস্ত দিন যেন তোমার পায়ের শব্দ শুনেছি। মনে হয়েছে, কত অসম্ভব দূর থেকে যে আসছ তার ঠিক নেই। শেষকালে তো এসে পৌঁছলে আমার জীবনে।'

'বন্যা, আমার জীবনের মাঝখানটিতে ছিল এতকাল তোমাকে-না-জানার একটা প্রকাণ্ড কালো গর্ত। ঐখানটা ছিল সব চেয়ে কুশ্রী। আজ সেটা কানা ছাপিয়ে ভরে উঠল—তারই উপরে আলো ঝল্‌মল্‌ করে, সমস্ত আকাশের ছায়া পড়ে, আজ সেইখানটাই হয়েছে সব চেয়ে সুন্দর। এই যে আমি ক্রমাগতই কথা কয়ে যাচ্ছি, এ হচ্ছে ঐ পরিপূর্ণ প্রাণসরোবরের তরঙ্গধ্বনি ; একে থামায় কে?'

'মিতা, তুমি আজ সমস্ত দিন কী করছিলে?'

'মনের মাঝখানটাতে তুমি ছিলে, একেবারে নিস্তব্ধ। তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছিলুম, কোথায় সেই কথা? আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ছে আর আমি কেবলই বলেছি, কথা দাও, কথা দাও। —

O what is this?
Mysterious and uncapturable bliss
That I have known, yet seems to be
Simple as breath and easy as a smile,
And older than the earth.
একি রহস্য, একি আনন্দরাশি!
জেনেছি তাহারে, পাই নি তবুও পেয়ে।
তবু সে সহজে প্রাণে উঠে নিশ্বাসি,
তবু সে সরল যেন রে সরল হাসি—
পুরানো সে যেন এই ধরণীর চেয়ে।

বসে বসে ঐ করি। পরের কথাকে নিজের কথা করে তুলি। সুর দিতে পারতুম যদি তবে সুর লাগিয়ে বিদ্যাপতিব বর্ষার গানটাবে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতুম—

বিদ্যাপতি কহে, কৈসে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া!

যাকে না হলে চলে না তাকে না পেয়ে কী করে দিনের পর দিন কাটবে, ঠিক এই কথাটার সুর পাই কোথায়? উপরে চেয়ে কখনো বলি 'কথা দাও' কখনো বলি 'সুর দাও'। কথা নিয়ে সুর নিয়ে দেবতা নেমেও আসেন, কিন্তু পথের মধ্যে মানুষ ভুল করেন, খামকা আর-কাউকে দিয়ে বসেন—হয়তো-বা তোমাদের ঐ রবি ঠাকুরকে।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'রবি ঠাকুরকে যারা ভালোবাসে তারাও তোমার মতো এত বার বার করে তাঁকে স্মরণ করে না।'

'বন্যা, আজ আমি বড়ো বেশি বকছি, না? আমার মধ্যে বকুনির মন্‌সুন নেমেছে। ওয়েদার-রিপোর্ট যদি রাখ তো দেখবে এক-এক দিনে কত ইঞ্চি পাগলামি তার ঠিকানা নেই। কোলকাতায় যদি থাকতুম তোমাকে নিয়ে টায়ার ফাটাতে ফাটাতে মোটরে করে একেবারে মোরাদাবাদে দিতুম দৌড়। যদি জিজ্ঞাসা করতে মোরাদাবাদে কেন, তার কোনোই কারণ দেখাতে পারতুম না। বান যখন আসে তখন সে বকে, ছোটে, সময়টাকে হাসতে হাসতে ফেনার মতো ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এমন সময় ডালিতে ভরে যোগমায়া সূর্যমুখী ফুল আনলেন। বললেন, 'মা লাবণ্য, এই ফুল দিয়ে আজ তুমি ওকে প্রণাম করো।'

এটা আর কিছু নয়, একটা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রাণের ভিতরকার জিনিসকে বাইরে শরীর দেবার মেয়েলি চেষ্টা। দেহকে বানিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা ওদের রক্তে মাংসে।

আজ কোনো-এক সময়ে অমিত লাবণ্যকে কানে কানে বললে, 'বন্যা. একটি আংটি তোমাকে পরাতে চাই।'

লাবণ্য বললে, 'কী দরকার মিতা!'

'তুমি যে আমাকে তোমার এই হাতখানি দিয়েছ সে কতখানি দেওয়া তা ভেবে শেষ করতে পারি নে। কবিরা প্রিয়ার মুখ নিয়েই যত কথা কয়েছে। কিন্তু হাতের মধ্যে প্রাণের কত ইশারা ; ভালোবাসার যত-কিছু আদর, যত-কিছু সেবা, হৃদয়ের যত দরদ, যত অনির্বচনীয় ভাষা, সব যে ঐ হাতে। আংটি তোমার আঙুলটিকে জড়িয়ে থাকবে আমার মুখের ছোটো একটি কথার মতো ; সে কথাটি শুধু এই 'পেয়েছি'। আমার এই কথাটি সোনার ভাষায়, মানিকের ভাষায় তোমার হাতে থেকে যাক-না।'

লাবণ্য বললে, 'আচ্ছা, তাই থাক্।'

'কোলকাতা থেকে আনতে দেব, বলো কোন্ পাথর তুমি ভালোবাস।'

'আমি কোনো পাথর চাই নে, একটি মাত্র মুক্তো থাকলেই হবে।'

'আচ্ছা. সেই ভালো। আমিও মুক্তো ভালোবাসি।'

১১
মিলনতত্ত্ব

ঠিক হয়ে গেল আগামী অঘ্রান মাসে এদের বিয়ে। যোগমায়া কোলকাতায় গিয়ে সমস্ত আয়োজন করবেন।

লাবণ্য অমিতকে বললে, 'তোমার কোলকাতায় ফেরবার দিন অনেক কাল হল পেরিয়ে গেছে। অনিশ্চিতের মধ্যে বাঁধা পড়ে তোমার দিন কেটে যাচ্ছিল। এখন ছুটি। নিঃসংশয়ে চলে যাও। বিয়ের আগে আমাদের আর দেখা হবে না।'

'এমন কড়া শাসন কেন?'

'সেদিন যে সহজ আনন্দের কথা বলেছিলে তাকে সহজ রাখবার জন্যে।'

'এটা একেবারে গভীর জ্ঞানের কথা। সেদিন তোমাকে কবি বলে সন্দেহ করেছিলুম, আজ সন্দেহ করছি ফিলজফার বলে। চমৎকার বলেছ। সহজকে সহজ রাখতে হলে শক্ত হতে হয়। ছন্দকে সহজ করতে চাও তো যতিকে ঠিক জায়গায় কষে আঁটতে হবে। লোভ বেশি, তাই জীবনের কাব্যে কোথাও যতি দিতে মন সরে না, ছন্দ ভেঙে গিয়ে জীবনটা হয় গীতহীন বন্ধন। আচ্ছা, কালই চলে [illegible] একেবারে হঠাৎ এই ভরা দিনগুলোর মাঝখানে। মনে হবে, যেন মেঘনাদবধ-কাব্যের সেই চমকে- [illegible]—

চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে!

[illegible] নাহয় চললুম, কিন্তু পাঁজি থেকে অঘ্রান মাস তো ফস করে পালাবে না। [illegible] কী করব জান?'

'কী করবে।'

'মাসিমা যতক্ষণ করবেন বিয়ের দিনের ব্যবস্থা ততক্ষণ আমাকে করতে হবে তার পরের দিনগুলোর আয়োজন। লোকে ভুলে যায় দাম্পত্যটা একটা আর্ট, প্রতিদিন ওকে নূতন করে সৃষ্টি করা চাই। মনে আছে বন্যা, রঘুবংশে অজ-মহারাজা ইন্দুমতীর কী বর্ণনা করেছিলেন?'

লাবণ্য বললে, 'প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।'

অমিত বললে, 'সেই ললিতকলাবিধিটা দাম্পত্যেরই। অধিকাংশ বর্বর বিয়েটাকেই মনে করে মিলন, সেইজন্যে তার পর থেকে মিলনটাকে এত অবহেলা।'

'মিলনের আর্ট তোমার মনে কিরকম আছে বুঝিয়ে দাও। যদি আমাকে শিষ্যা করতে চাও আজই তার প্রথম পাঠ শুরু হোক।'

'আচ্ছা, তবে শোনো। ইচ্ছাকৃত বাধা দিয়েই কবি ছন্দের সৃষ্টি করে। মিলনকেও সুন্দর করতে হয় ইচ্ছাকৃত বাধায়। চাইলেই পাওয়া যায়, দামি জিনিসকে এত সস্তা করা নিজেকেই ঠকানো। কেননা, শক্ত করে দাম দেওয়ার আনন্দটা বড়ো কম নয়।'

'দামের হিসাবটা শুনি।'

'রোসো, তার আগে আমার মনে যে ছবিটা আছে বলি। গঙ্গার ধার, বাগানটা ডায়মণ্ডহারবারের ঐদিকটাতে। ছোটো একটি স্টীম লঞ্চ ক'রে ঘণ্টা-দুয়েকের মধ্যে কোলকাতায় যাতায়াত করা যায়।'

'আবার কোলকাতায় কী দরকার পড়ল?'

'এখন কোনো দরকার নেই সে কথা জান। যাই বটে বার-লাইব্রেরিতে— ব্যাবসা করি নে, দাবা খেলি। অ্যাটর্নিরা বুঝে নিয়েছে, কাজে গরজ নেই, তাই মন নেই. কোনো আপসের মকদ্দমা হলে তার ব্রীফ আমাকে দেয়, তার বেশি আর কিছুই দেয় না। কিন্তু বিয়ের পরেই দেখিয়ে দেব কাজ কাকে বলে—জীবিকার দরকারে নয়, জীবনের দরকারে। আমের মাঝখানটাতে থাকে আঁঠি, সেটা মিষ্টিও নয়, নরমও নয়, খাদ্যও নয় ; কিন্তু ঐ শক্তটাই সমস্ত আমের আশ্রয়, ঐটেতেই সে আকার পায়। কোলকাতার পাথুরে আঁঠিটাকে কিসের জন্য দরকার বুঝেছ তো? মধুরের মাঝখানে একটা কঠিনকে রাখবার জন্যে।'

'বুঝেছি। তা হলে দরকার তো আমারও আছে। আমাকেও কোলকাতায় যেতে হবে—দশটা-পাঁচটা।'

'দোষ কী? কিন্তু পাড়া-বেড়াতে নয়, কাজ করতে।'

'কিসের কাজ বলো। বিনা মাইনেয়?'

'না না, বিনা মাইনের কাজ কাজও নয় ছুটিও নয়, বারো আনা ফাঁকি। ইচ্ছে করলেই তুমি মেয়ে-কলেজে প্রোফেসারি নিতে পারবে।'

'আচ্ছা, ইচ্ছে করব। তার পর?'

'স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, গঙ্গার ধার , পাড়ির নীচে-তলা থেকে উঠেছে ঝুরি-নামা অতি পুরোনো বটগাছ। ধনপতি যখন গঙ্গা বেয়ে সিংহলে যাচ্ছিল, তখন হয়তো এই বটগাছে নৌকো বেঁধে গাছতলায় রান্না চড়িয়েছিল। ওরই দক্ষিণ ধারে ছ্যাৎলা-পড়া বাঁধানো ঘাট, অনেকখানি ফাটল-ধরা, কিছু কিছু ধসে-যাওয়া। সেই ঘাটে সবুজে-সাদায়-রঙ-করা আমাদের ছিপ্ছিপে নৌকোখানি। তারই নীল নিশানে সাদা অক্ষরে নাম লেখা। কী নাম বলে দাও তুমি।'

'বলব? মিতালি।'

'ঠিক নামটি হয়েছে, মিতালি। আমি ভেবেছিলুম সাগরী, মনে একটু গর্বও হয়েছিল ; কিন্তু তোমার কাছে হার মানতে হল। বাগানের মাঝখান দিয়ে সরু একটি খাড়ি চলে গেছে, গঙ্গার হৃৎস্পন্দন বয়ে। তার ও পারে তোমার বাড়ি, এ পারে আমার।'

'রোজই কি সাঁতার দিয়ে পার হবে, আর জানলায় আমার আলো জ্বালিয়ে রাখব?'

'দেব সাঁতার মনে মনে, একটা কাঠের সাঁকোর উপর দিয়ে। তোমার বাড়িটির নাম মানসী, আমার বাড়ির একটা নাম তোমাকে দিতে হবে।'

'দীপক।'

'ঠিক নামটি হয়েছে। নামের উপযুক্ত একটি দীপ আমার বাড়ির চুড়োয় বসিয়ে দেব, মিলনের সন্ধেবেলায় তাতে জ্বলবে লাল আলো, আর বিচ্ছেদের রাতে নীল। কোলকাতা থেকে ফিরে এসে রোজ তোমার কাছ থেকে একটি চিঠি আশা করব। এমন হওয়া চাই, সে চিঠি পেতেও পারি, না পেতেও পারি। সন্ধে আটটার মধ্যে যদি না পাই তবে হতবিধিকে অভিসম্পাত দিয়ে বারট্রাণ্ড রাসেলের লজিক পড়বার চেষ্টা করব। আমাদের নিয়ম হচ্ছে, অনাহূত তোমার বাড়িতে কোনোমতেই যেতে পারব না।'

'আর তোমার বাড়িতে আমি?'

'ঠিক এক নিয়ম হলেই ভালো হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে নিয়মের ব্যতিক্রম হলে সেটা অসহ্য হবে না।'

'নিয়মের ব্যতিক্রমটাই যদি নিয়ম না হয়ে ওঠে তা হলে তোমার বাড়িটার দশা কী হবে ভেবে দেখে বরঞ্চ আমি বুরকা পরে যাব।'

'তা হোক, কিন্তু আমার নিমন্ত্রণ-চিঠি চাই। সে চিঠিতে আর-কিছু থাকবার দরকার নেই, কেবল কোনো-একটা কবিতা থেকে দুটি-চারটি লাইন মাত্র।'

'আর আমার নিমন্ত্রণ বুঝি বন্ধ? আমি একঘরে?'

'তোমার নিমন্ত্রণ মাসে একদিন, পূর্ণিমার রাতে ; চোদ্দটা তিথির খণ্ডতা সেদিন চরম পূর্ণ হয়ে উঠবে।'

'এইবার তোমার প্রিয়শিষ্যাকে একটি চিঠির নমুনা দাও।'

'আচ্ছা বেশ।' পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে তার পাতা ছিঁড়ে লিখলে—

Blow gently over my garden
Wind of the southern sea,
In the hour my love cometh
And calleth me.
চুমিয়া যেয়ো তুমি
আমার বনভূমি,
দখিন-সাগরের সমীরণ,
যে শুভখনে মম
আসিবে প্রিয়তম—
ডাকিবে নাম ধ'রে অকারণ।

লাবণ্য কাগজখানা ফিরিয়ে দিলে না।

অমিত বলল, 'এবারে তোমার চিঠির নমুনা দাও, দেখি তোমার শিক্ষা কত দূর এগোল!'

লাবণ্য একটা টুকরো কাগজে লিখতে যাচ্ছিল। অমিত বললে, 'না, আমার এই নোটবইয়ে লেখো।'

লাবণ্য লিখে দিলে—

মিতা, ত্বমসি মম জীবনং, ত্বমসি মম ভূষণং,
ত্বমসি মম ভবজলধিরত্নম্।

অমিত বইটাকে পকেটে পুরে বললে, 'আশ্চর্য এই, আমি লিখেছি মেয়ের মুখের কথা, তুমি লিখেছ পুরুষের। কিছুই অসংগত হয় নি। শিমুলকাঠই হোক আর বকুলকাঠই হোক, যখন জ্বলে তখন আগুনের চেহারাটা একই।'

লাবণ্য বললে, 'নিমন্ত্রণ তো করা গেল, তার পরে?'

অমিত বললে, 'সন্ধ্যাতারা উঠেছে, জোয়ার এসেছে গঙ্গায়, হাওয়া উঠল ঝির্ ঝির্ করে ঝাউগাছগুলোর সার বেয়ে, বুড়ো বটগাছটার শিকড়ে শিকড়ে উঠল স্রোতের ছল্‌ছলানি। তোমার বাড়ির পিছনে পদ্মদিঘি, সেইখানে খিড়কির নির্জন ঘাটে গা ধুয়ে চুল বেঁধেছ। তোমার এক-একদিন এক-এক রঙের কাপড়, ভাবতে ভাবতে যাব আজকে সন্ধেবেলার রঙটা কী। মিলনের জায়গারও ঠিক নেই, কোনোদিন শান-বাঁধানো চাঁপাতলায়, কোনোদিন বাড়ির ছাতে, কোনোদিন গঙ্গার ধারের চাতালে। আমি গঙ্গায় স্নান সেরে সাদা মখমলের ধুতি আর চাদর পরব, পায়ে থাকবে হাতির দাঁতে কাজ করা খড়ম। গিয়ে দেখব, গালচে বিছিয়ে বসেছ, সামনে রুপোর রেকাবিতে মোটা গোড়ে মালা, চন্দনের বাটিতে চন্দন, এক কোণে জ্বলছে ধূপ।...পুজোর সময় অন্তত দু মাসের জন্যে দুজনে বেড়াতে বেরোব। কিন্তু দুজনে দু জায়গায়। তুমি যদি যাও পর্বতে আমি যাব সমুদ্রে।—এই তো আমার দাম্পত্য-দ্বৈরাজ্যের নিয়মাবলী তোমার কাছে দাখিল করা গেল! এখন তোমার কী মত?'

'মেনে নিতে রাজি আছি।'

'মেনে নেওয়া, আর মনে নেওয়া, এই দুইয়ের যে তফাত আছে বন্যা।'

'তোমার যাতে প্রয়োজন আমার তাতে প্রয়োজন না'ও যদি থাকে, তবু আপত্তি করব না।'

'প্রয়োজন নেই তোমার?'

'না, নেই। তুমি আমার যতই কাছে থাক তবু আমার থেকে তুমি অনেক দূরে। কোনো নিয়ম দিয়ে সেই দূরত্বটুকু বজায় রাখা আমার পক্ষে বাহুল্য। কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে এমন কিছুই নেই যা তোমার কাছের দৃষ্টিকে বিনা লজ্জায় সইতে পারবে, সেইজন্যে দাম্পত্যে দুই পারে দুই মহল করে দেওয়া আমার পক্ষে নিরাপদ।'

অমিত চৌকি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'তোমার কাছে আমি হার মানতে পারব না বন্যা, যাক গে আমার বাগানটা। কোলকাতার বাইরে এক পা নড়ব না। নিরঞ্জনদের আপিসের উপরের তলায় পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একটা ঘর ভাড়া নেব। সেইখানে থাকবে তুমি, আব থাকব আমি। চিদাকাশে কাছেদূরে ভেদ নেই। সাড়ে তিন হাত চওড়া বিছানায় বাঁ পাশে তোমার মহল মানসী, ডান পাশে আমার মহল দীপক। ঘরেব পুব দেওয়ালে একখানা আয়নাওয়ালা দেরাজ, তাতেই তোমারও মুখ দেখা আব আমারও। পশ্চি॰ দিকে থাকবে বইয়ের আলমাবি, পিঠ দিয়ে সেটা রোদ্‌দুর ঠেকাবে আর সামনের দিকে সেটাতে থাকবে দুটি পাঠকের একটিমাত্র সারক্যুলেটিং লাইব্রেরি। ঘরের উত্তর দিকটাতে একখানি সোফা, তারই বাঁ পাশে একটু জায়গা খালি রেখে আমি বসব এক প্রান্তে, তোমার কাপড়ের আলনার আড়ালে তুমি দাঁড়াবে—দু হাত তফাতে। নিমন্ত্রণের চিঠিখানা উপরের দিকে তুলে ধরব কম্পিত হস্তে, তাতে লেখা থাকবে—

ছাদের উপরে বহিয়ো নীরবে
ওগো দক্ষিণ হাওয়া,
প্রেয়সীর সাথে যে নিমেষে হবে
চারি চক্ষুতে চাওয়া।

এটা কি খারাপ শোনাচ্ছে বন্যা?'

'কিছু না মিতা। কিন্তু, এটা সংগ্রহ হল কোথা থেকে?'

'আমার বন্ধু নীলমাধবের খাতা থেকে। তার ভাবী বধূ তখন অনিশ্চিত ছিল। তাকে উদ্দেশ করে ঐ ইংরেজি কবিতাটাকে কোলকাতাই ছাঁচে ঢালাই করেছিল, আমিও সঙ্গে যোগ দিয়েছিলুম। ইকনমিক্‌সে এম. এ. পাস করে পনেরো হাজার টাকা নগদ পণ আর আশি ভরি গয়না-সমেত নববধূকে লোকটা ঘরে আনলে, চার চক্ষে চাওয়াও হল, দক্ষিনে বাতাসও বয়, কিন্তু ঐ কবিতাটাকে আর ব্যবহার করতে পারলে না। এখন তার অপর শরিককে কাব্যটির সর্বস্বত্ব সমর্পণ করতে বাধবে না।'

সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া
এনেছ অশ্রুজল।
এনেছ তোমার বক্ষে ধরিয়া
দুঃসহ হোমানল।
দুঃখ যে তায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে,
মুগ্ধ প্রাণের আবেশবন্ধ টুটে,
এ তাপে শ্বসিয়া উঠে বিকশিয়া
বিচ্ছেদশতদল।'

অমিত লাবণ্যর হাত চেপে ধরে বললে, 'বন্যা, সে ছেলেটা আজ আমাদের মাঝখানে কেন এসে পড়ল? ঈর্ষা করতে আমি ঘৃণা করি, এ আমার ঈর্ষা নয়, কিন্তু কেমন একটা ভয় আসছে মনে। বলো, তার দেওয়া ঐ কবিতাগুলো আজই কেন তোমার এমন করে মনে পড়ে গেল?'

'একদিন সে যখন আমাদের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল তার পরে যেখানে বসে সে লিখত সেই ডেস্কে এই কবিতাদুটি পেয়েছি। এর সঙ্গে রবি ঠাকুরের আরো অনেক অপ্রকাশিত কবিতা, প্রায় এক খাতা ভরা। আজ তোমার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি, হয়তো সেইজন্যেই বিদায়ের কবিতা মনে এল।'

'সে বিদায় আর এ বিদায় কি একই?'

'কেমন করে বলব? কিন্তু, এ তর্কের তো কোনো দরকার নেই। যে কবিতা আমার ভালো লেগেছে তাই তোমাকে শুনিয়েছি, হয়তো এ ছাড়া আর কোনো কারণ এর মধ্যে নেই।'

'বন্যা, রবি ঠাকুরের লেখা যতক্ষণ না লোকে একেবারে ভুলে যাবে ততক্ষণ ওর ভালো লেখা সত্য করে ফুটে উঠবে না। সেইজন্যে ওর কবিতা আমি ব্যবহারই করি নে। দলের লোকের ভালো-লাগাটা কুয়াশার মতো, যা আকাশের উপর ভিজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে তার আলোটাকে ময়লা করে ফেলে।'

'দেখো মিতা, মেয়েদের ভালো-লাগা তার আদরের জিনিসকে আপন অন্দর-মহলে একলা নিজেরই করে রাখে, ভিড়ের লোকের কোনো খবরই রাখে না। সে যত দাম দিতে পারে সব দিয়ে ফেলে, অন্য পাঁচজনের সঙ্গে মিলিয়ে বাজার যাচাই করতে তার মন নেই।'

'তা হলে আমারও আশা আছে বন্যা। আমার বাজার-দরের ছোট্ট একটা ছাপ লুকিয়ে ফেলে তোমার আপন দরের মস্ত একটা মার্কা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াব।'

'আমাদের বাড়ি কাছে এসে পড়ল মিতা। এবার তোমার মুখে তোমার পথশেষের কবিতাটা শুনে নিই।'

'রাগ কোরো না বন্যা, আমি কিন্তু রবি ঠাকুরের কবিতা আওড়াতে পারব না।'

'রাগ করব কেন?'

'আমি একটি লেখককে আবিষ্কার করেছি, তার স্টাইল—'

'তার কথা তোমার কাছে বরাবরই শুনতে পাই। কোলকাতায় লিখে দিয়েছি তার বই পাঠিয়ে দেবার জন্যে।'

'সর্বনাশ। তার বই! সে লোকটার অন্য অনেক দোষ আছে, কিন্তু কখনো বই ছাপতে দেয় না। তার পরিচয় আমার কাছ থেকেই তোমাকে ক্রমে ক্রমে পেতে হবে। নইলে হয়তো—'

'ভয় কোরো না মিতা, তুমি তাকে যে ভাবে বোঝ আমিও তাকে সেই ভাবেই বুঝে নেব এমন ভরসা আমার আছে। আমারই জিত থাকবে।'

'কেন?'

'আমার ভালো-লাগায় যা পাই সেও আমার, আর তোমার ভালো-লাগায় যা পাব সেও

আমার হবে। আমার নেবার অঞ্জলি হবে দুজনের মনকে মিলিয়ে। কোলকাতায় তোমার ছোটো ঘরের বইয়ের আলমারিতে এক শেলফেই দুই কবির কবিতা ধরাতে পারব। এখন তোমার কবিতাটি বলো।'

'আর বলতে ইচ্ছে করছে না। মাঝখানে বড়ো কতকগুলো তর্কবিতর্ক হয়ে হাওয়াটা খারাপ হয়ে গেল।'

'কিচ্ছু খারাপ হয় নি, হাওয়া ঠিক আছে।'

অমিত তার কপালের চুলগুলো কপালের থেকে উপরের দিকে ঠেলে দিয়ে খুব দরদের সুর লাগিয়ে পড়ে গেল—

'সুন্দরী তুমি শুকতারা
সুদূর শৈলশিখরান্তে,
শর্বরী যবে হবে সারা
দর্শন দিয়ো দিক্‌ভ্রান্তে।

বুঝেছ বন্যা? চাঁদ ডাক দিয়েছে শুকতারাকে, সে আপনার রাত পোহাবার সঙ্গিনীকে চায়। নিজের রাতটার 'পরে ওর বিতৃষ্ণা হয়ে গেছে।—

ধরা যেথা অম্বরে মেশে
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র,
আঁধারের বক্ষের 'পরে
আধেক আলোকরেখা-রন্ধ্র।

ওর এই আধখানা জাগা, ঐ অল্প একটুখানি আলো, আঁধারটাকে সামান্য খানিকটা আঁচড়ে দিয়েছে। এই হল ওর খেদ। এই স্বল্পতার জালে ওকে জড়িয়ে ফেলেছে, সেইটে ছিঁড়ে ফেলবার জন্যে ও যেন সমস্ত রাত্রি ঘুমোতে ঘুমোতে গুমরে উঠছে। কী আইডিয়া' গ্র্যাণ্ড্!

আমার আসন রাখে পেতে
নিদ্রাগহন মহাশূন্য।
তন্ত্রী বাজাই স্বপনেতে,
তন্দ্রা ঈষৎ করি ক্ষুণ্ণ।

কিন্তু, এমন হালকা করে বাঁচাব বোঝাটা যে বড়ো বেশি ; যে নদীর জল মরেছে তার মন্থর স্রোতের ক্লান্তিতে জঞ্জাল জমে, যে স্বল্প সে নিজেকে বইতে গিয়ে ক্লিষ্ট হয়। তাই ও বলছে—

মন্দচরণে চলি পারে,
যাত্রা হয়েছে মোর সাঙ্গ।
সুর থেমে আসে বারে বারে,
ক্লান্তিতে আমি অবশাঙ্গ।

কিন্তু, এই ক্লান্তিতেই কি ওর শেষ? ওর ঢিলে তারের বীণাকে নতুন করে বাঁধবার আশা ও পেয়েছে, দিগন্তের ওপারে কার পায়ের শব্দ ও যেন শুনল—

সুন্দরী ওগো শুকতারা,
রাত্রি না যেতে এসো তূর্ণ।
স্বপ্নে যে বাণী হল হারা
জাগরণে করো তারে পূর্ণ।

উদ্ধারের আশা আছে, কানে আসছে জাগ্রত বিশ্বের বিপুল কলরব, সেই মহাপথের দূতী তার প্রদীপ হাতে করে এল ব'লে।—

নিশীথের তল হতে তুলি
লহো তারে প্রভাতের জন্য।

'তোমারও ছাদে দক্ষিনে বাতাস বইবে, কিন্তু তোমার নববধূ কি চিরদিনই নববধূ থাকবে?'
টেবিলে প্রবল চাপড় দিতে দিতে উচ্চৈঃস্বরে অমিত বললে, 'থাকবে, থাকবে, থাকবে।'

যোগমায়া পাশের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী থাকবে অমিত? আমার টেবিলটা বোধ হচ্ছে থাকবে না।'

'জগতে যা-কিছু টেকসই সবই থাকবে। সংসারে নববধূ দুর্লভ কিন্তু লাখের মধ্যে একটি যদি দৈবাৎ পাওয়া যায় সে চিরদিনই থাকবে নববধূ।'

'একটা দৃষ্টান্ত দেখাও দেখি।'

'একদিন সময় আসবে, দেখাব।'

'বোধ হচ্ছে তার কিছু দেরি আছে, ততক্ষণ খেতে চলো।'

১২
শেষ সন্ধ্যা

আহার শেষ হলে অমিত বললে, 'কাল কোলকাতায় যাচ্ছি মাসিমা। আমার আত্মীয়স্বজন সবাই সন্দেহ করছে আমি খাসিয়া হয়ে গেছি।'

'আত্মীয়স্বজনরা কি জানে কথায় কথায় তোমার এত বদল সম্ভব?'

'খুব জানে, নইলে আত্মীয়স্বজন কিসের? তাই ব'লে কথায় কথায় নয়, আর খাসিয়া হওয়া নয়; যে বদল আজ আমার হল এ কি জাত-বদল, এ যে যুগ-বদল, তার মাঝখানে একটা কল্পান্ত। প্রজাপতি জেগে উঠেছেন আমার মধ্যে এক নূতন সৃষ্টিতে। মাসিমা, অনুমতি দাও, লাবণ্যকে নিয়ে আজ একবার বেড়িয়ে আসি। যাবার আগে শিলঙ পাহাড়কে আমাদের যুগল প্রণাম জানিয়ে যেতে চাই।'

যোগমায়া সম্মতি দিলেন। কিছু দূরে যেতে যেতে দুজনের হাত মিলে গেল, ওরা কাছে কাছে এল ঘেঁষে। নির্জন পথের ধারে নীচের দিকে চলেছে ঘন বন। সেই বনের একটা জায়গায় পড়েছে ফাঁক, আকাশ সেখানে পাহাড়ের নজরবন্দি থেকে একটুখানি ছুটি পেয়েছে; তার অঞ্জলি ভরিয়ে নিয়েছে অস্তসূর্যের শেষ আভায়। সেইখানে পশ্চিমের দিকে মুখ করে দুজনে দাঁড়াল। অমিত লাবণ্যর মাথা বুকে টেনে নিয়ে তার মুখটি উপরে তুলে ধরলে। লাবণ্যর চোখ অর্ধেক বোজা, কোণ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। আকাশে সোনার রঙের উপর চুনি-গলানো পান্না-গলানো আলোর আভাসগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে; মাঝে মাঝে পাতলা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে সুগভীর নির্মল নীল, মনে হয় তার ভিতর দিয়ে যেখানে দেহ নেই শুধু আনন্দ আছে সেই অমর্তজগতের অব্যক্তধ্বনি আসছে। ধীরে ধীরে অন্ধকার হল ঘন। সেই খোলা আকাশটুকু, রাত্রিবেলায় ফুলের মতো, নানা রঙের পাপড়িগুলি বন্ধ করে দিলে।

অমিতর বুকের কাছ থেকে লাবণ্য মৃদুস্বরে বললে, 'চলো এবার।'

কেমন তার মনে হল, এইখানে শেষ করা ভালো।

অমিত সেটা বুঝলে, কিছু বললে না। লাবণ্যর মুখ বুকের উপর একবার চেপে ধরে ফেরবার পথে খুব ধীরে ধীরে চলল। বললে, 'কাল সকালেই আমাকে ছাড়তে হবে, তার আগে আর দেখা করতে আসব না।'

'কেন আসবে না?'

'আজ ঠিক জায়গায় আমাদের শিলঙ পাহাড়ের অধ্যায়টি এসে থামল—ইতি প্রথমঃ সর্গঃ, আমাদের সয়ে বয়ে স্বর্গ।'

লাবণ্য কিছু বললে না, অমিতর হাত ধরে চলল। বুকের ভিতর আনন্দ, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একটা কান্না স্তব্ধ হয়ে আছে। মনে হল, জীবনে কোনোদিন এমন নিবিড় করে অভাবনীয়কে এত কাছে পাওয়া যাবে না। পরমক্ষণে শুভদৃষ্টি হল, এর পরে আর কি বাসরঘর আছে? রইল কেবল মিলন আর বিদায় একত্র মিশিয়ে একটি শেষ প্রণাম। ভারি ইচ্ছে করতে লাগল অমিতকে এখনই সেই প্রণামটি করে বলে, 'তুমি আমাকে ধন্য করেছ।' কিন্তু সে আর হল না।

বাসার কাছাকাছি আসতেই অমিত বললে, 'বন্যা, আজ তোমার শেষ কথাটি একটি কবিতায় বলো, তা হলে সেটা মনে করে নিয়ে যাওয়া সহজ হবে। তোমার নিজের যা মনে আছে এমন একটা-কিছু আমাকে শুনিয়ে দাও।'

লাবণ্য একটুখানি ভেবে আবৃত্তি করলে—

'তোমারে দিই নি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য গেনু রাখি
রজনীর শুভ্র অবসানে। কিছু আর নাই বাকি,
নাইকো প্রার্থনা, নাই প্রতি মুহূর্তের দৈন্যরাশি,
নাই অভিমান, নাই দীন কান্না, নাই গর্বহাসি,
নাই পিছু-ফিরে দেখা। শুধু সে মুক্তির ডালাখানি
ভরিয়া দিলাম আজি আমার মহৎ মৃত্যু আনি।'

'বন্যা, বড়ো অন্যায় করলে। আজকের দিনে তোমার মুখে বলবার কথা এ নয়, কিছুতেই নয়। কেন এটা তোমার মনে এল? তোমার এ কবিতা এখনই ফিরিয়ে নাও।'

'ভয় কিসের মিতা? এই আগুনে-পোড়া প্রেম এ সুখের দাবি করে না, এ নিজে মুক্ত ব'লেই মুক্তি দেয়, এর পিছনে ক্লান্তি আসে না, ম্লানতা আসে না; এর চেয়ে আর কিছু কি দেবার আছে?'

'কিন্তু আমি জানতে চাই, এ কবিতা তুমি পেলে কোথায়?'

'রবি ঠাকুরের।'

'তার তো কোনো বইয়ে এটা দেখি নি।'

'বইয়ে বেরোয় নি।'

'তবে পেলে কী করে?'

'একটি ছেলে ছিল, সে আমার বাবাকে গুরু ব'লে ভক্তি করত, বাবা দিয়েছিলেন তাকে তার জ্ঞানের খাদ্য। এ দিকে তার হৃদয়টিও ছিল তাপস। সময় পেলেই সে যেত রবি ঠাকুরের কাছে, তাঁর খাতা থেকে মুষ্টি ভিক্ষা করে আনত।'

'আর নিয়ে এসে তোমার পায়ে দিত।'

'সে সাহস তার ছিল না। কোথাও রেখে দিত, যদি আমার দৃষ্টিতে পড়ে, যদি আমি তুলে নিই।'

'তাকে দয়া করেছ?'

'করবার অবকাশ হল না; মনে মনে প্রার্থনা করি—ঈশ্বর যেন তাকে দয়া করেন।'

'যে কবিতাটি আজ তুমি পড়লে, বেশ বুঝতে পারছি এটা সেই হতভাগারই মনের কথা।'

'হাঁ, তারই কথা বৈকি।'

'তবে তোমার কেন আজ ওটা মনে পড়ল?'

'কেমন করে বলব? ঐ কবিতাটির সঙ্গে আর-এক টুকরো কবিতা ছিল, সেটাও আজ আমার কেন মনে পড়ছে ঠিক বলতে পারি নে—

আঁধারে নিজেরে ছিল ভুলি,
আলোকে তাহারে করো ধন্য।
যেখানে সুপ্তি হল লীনা,
যেথা বিশ্বের মহামন্দ্র,
অর্পিনু সেথা মোর বীণা
আমি আধো-জাগ্রত চন্দ্র।

এই হতভাগা চাঁদটা তো আমি। কাল সকালবেলা চলে যাব। কিন্তু, চলে যাওয়াকে তো শূন্য রাখতে চাই নে। তার উপরে আবির্ভাব হবে সুন্দরী শুকতারার, জাগরণের গান নিয়ে। অন্ধকার জীবনের স্বপ্নে এতদিন যা অস্পষ্ট ছিল, সুন্দরী শুকতারা তাকে প্রভাতের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেবে। এর মধ্যে একটা আশার জোর আছে, ভাবী প্রত্যুষের একটা উজ্জ্বল গৌরব আছে। তোমার ঐ রবি ঠাকুরের কবিতার মতো মিইয়ে-পড়া হাল-ছাড়া বিলাপ নয়।'

'রাগ করো কেন মিতা? রবি ঠাকুর যা পারে তার বেশি সে পারে না, এ কথা বার বার বলে লাভ কী?'

'তোমরা সবাই মিলে তাকে নিয়ে বড়ো বেশি—'

'ও কথা বোলো না মিতা। আমার ভালো-লাগা আমারই —তাতে যদি আর-কারো সঙ্গে আমার মিল হয়, বা তোমার সঙ্গে মিল না হয়, সেটাতে কি আমার দোষ? নাহয় কথা রইল, তোমার সে পঁচাত্তর টাকার বাসায় একদিন আমার যদি জায়গা হয় তা হলে তোমার কবির লেখা আমাকে শুনিয়ো, আমার কবির লেখা তোমাকে শোনাব না।'

'কথাটা অন্যায় হল যে। পরস্পর পরস্পরের জুলুম ঘাড় পেতে বহন করবে, এইজন্যেই তো বিবাহ।'

'রুচির জুলুম তোমার কিছুতেই সইবে না। রুচির ভোজে তোমরা নিমন্ত্রিত ছাড়া কাউকে ঘরে ঢুকতে দাও না, আমি অতিথিকেও আদর করে বসাই।'

'ভালো করলুম না তর্ক তুলে। আমাদের এখানকার এই শেষ সন্ধেবেলার সুর বিগড়ে গেল।'

'একটুও না। যা-কিছু বলবার আছে সব স্পষ্ট করে বলেও যে সুরটা খাঁটি থাকে সেই আমাদের সুর। তার মধ্যে ক্ষমার অন্ত নেই।'

'আজ আমার মুখের বিস্বাদ ঘোচাতেই হবে। কিন্তু বাংলা কাব্যে হবে না। ইংরেজি কাব্যে আমার বিচারবুদ্ধি অনেকটা ঠাণ্ডা থাকে। প্রথম দেশে ফিরে এসে আমিও কিছুদিন প্রোফেসারি করেছিলুম।'

লাবণ্য হেসে বললে, 'আমাদের বিচারবুদ্ধি ইংরেজ-বাড়ির বুলডগের মতো—ধুতির কোঁচাটা দুলছে দেখলেই ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। ধুতির মহলে কোন্‌টা ভদ্র ও তার হিসেব পায় না। বরঞ্চ খানসামার তকমা দেখলে লেজ নাড়ে।'

'তা মানতেই হবে। পক্ষপাত জিনিসটা স্বাভাবিক জিনিস নয়। অধিকাংশ স্থলেই ওটা ফরমাশে তৈরি। ইংরেজি সাহিত্যে পক্ষপাত কানমলা খেয়ে খেয়ে ছেলেবেলা থেকে অভ্যেস হয়ে গেছে। এই অভ্যাসের জোরেই এক পক্ষকে মন্দ বলতে যেমন সাহস হয় না অন্য পক্ষকে ভালো বলতেও তেমনি সাহসের অভাব ঘটে। থাক্ গে, আজ নিবারণ চক্রবর্তীও না, আজ একেবারে নিছক ইংরেজি কবিতা—বিনা তর্জমায়।'

'না না মিতা, তোমার ইংরেজি থাক্, সেটা বাড়ি গিয়ে টেবিলে বসে হবে। আজ আমাদের এই সন্ধেবেলাকার শেষ কবিতাটি নিবারণ চক্রবর্তীর হওয়াই চাই। আর-কারো নয়।'

অমিত উৎফুল্ল হয়ে বললে, 'জয় নিবারণ চক্রবর্তীর। এতদিনে সে হল অমর। বন্যা, তাকে আমি তোমার সভাকবি করে দেব। তুমি ছাড়া আর-কারো দ্বারে সে প্রসাদ নেবে না।'

'তাতে কি সে বরাবর সন্তুষ্ট থাকবে?'
'না থাকে তো তাকে কান মলে বিদায় করে দেব।'
'আচ্ছা, কান মলার কথা পরে স্থির করব, এখন শুনিয়ে দাও।'
অমিত আবৃত্তি করতে লাগল—

'কত ধৈর্য ধরি
ছিলে কাছে দিবসশর্বরী।
তব পদ-অঙ্কনগুলিরে
কতবার দিয়ে গেছ মোর ভাগ্য-পথের ধূলিরে।
আজ যবে
দূরে যেতে হবে
তোমারে করিয়া যাব দান
তব জয়গান।

কতবার ব্যর্থ আয়োজনে
এ জীবনে
হোমাগ্নি উঠে নি জ্বলি,
শূন্যে গেছে চলি
হতাশ্বাস ধূমেব কুণ্ডলী!
কতবাব ক্ষণিকেব শিখা
আঁকিযাছে ক্ষীণ টিকা
নিশ্চেতন নিশীথের ভালে।
লুপ্ত হযে গেছে তাহা চিহ্নহীন কালে।

এবার তোমাব আগমন
হোমহুতাশন
জ্বেলেছে গৌরবে।
যজ্ঞ মোব ধন্য হবে।
আমার আহুতি দিনশেষে
কবিলাম সমর্পণ তোমার উদ্দেশে।

লহো ে প্রণাম
জীবনের পূর্ণ পরিণাম।
এ প্রণতি-'পরে
স্পর্শ রাখো স্নেহভরে।
তোমার ঐশ্বর্য-মাঝে
সিংহাসন যেথায় বিরাজে
করিয়ো আহ্বান,
সেথা এ প্রণতি মোব পায় যেন স্থান।'

১৩
আশঙ্কা

সকালবেলায় কাজে মন দেওয়া আজ লাবণ্যর পক্ষে কঠিন। সে বেড়াতেও যায় নি। অমিত বলেছিল, শিলঙ থেকে যাবার আগে আজ সকালবেলায় সে ওদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না। সেই পণটাকে রক্ষা করবার ভার দুজনেরই উপর। কেননা, যে রাস্তায় ও বেড়াতে যায় সেই রাস্তা দিয়েই অমিতকে যেতে হবে। মনে তাই লোভ ছিল যথেষ্ট। সেটাকে কষে দমন করতে হল। যোগমায়া খুব সকালেই স্নান সেরে তাঁর আহ্নিকের জন্যে কিছু ফুল তোলেন। তিনি বেরোবার আগেই লাবণ্য সে জায়গাটা থেকে চলে এল য়ুক্যালিপ্‌টাস্‌-তলায়। হাতে দুই-একটা বই ছিল, বোধ হয় নিজেকে এবং অন্যদেরকে ভোলাবার জন্যে। তার পাতা খোলা, কিন্তু বেলা যায়, পাতা ওলটানো হয় না। মনের মধ্যে কেবলই বলছে—জীবনের মহোৎসবের দিন কাল শেষ হয়ে গেল। আজ সকালে এক-একবার মেঘরৌদ্রের মধ্যে দিয়ে ভাঙনের দূত আকাশ ঝেঁটিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে অমিত চিরপলাতক, একবার সে সরে গেলে আর তার ঠিকানা পাওয়া যায় না। রাস্তায় চলতে চলতে কখন সে গল্প শুরু করে, তার পর রাত্রি আসে, পরদিন সকালে দেখা যায় গল্পের গাঁথন ছিন্ন—পথিক গেছে চলে। লাবণ্য তাই ভাবছিল, ওর গল্পটা এখন থেকে চিরদিনের মতো রইল বাকি। আজ সেই অসমাপ্তির ম্লানতা সকালের আলোয় ; অকাল-অবসানের অবসাদ আর্দ্র হাওয়ার মধ্যে।

এমন সময়, বেলা তখন নটা, অমিত দুম্‌দাম্‌-শব্দে ঘরে ঢুকেই 'মাসিমা মাসিমা' করে ডাক দিলে। যোগমায়া প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে ভাঁড়ারের কাজে প্রবৃত্ত। আজ তাঁরও মনটা পীড়িত। অমিত তার কথায় হাসিতে চাঞ্চল্যে এতদিন তাঁর স্নেহাসক্ত মনকে, তাঁর ঘরকে ভরে রেখেছিল। সে চলে গেছে এই ব্যথার বোঝা নিয়ে তাঁর সকালবেলাটা যেন বৃষ্টিবিন্দুর ভারে সদ্যঃপাতী ফুলের মতো নুয়ে পড়ছে। তাঁর বিচ্ছেদকাতর ঘরকন্নার কাজে আজ তিনি লাবণ্যকে ডাকেন নি ; বুঝেছিলেন আজ তার দরকার ছিল একলা থাকার, লোকের চোখের আড়ালে।

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল, কোলের থেকে বই গেল পড়ে, জানতেও পারলে না। এ দিকে যোগমায়া ভাঁড়ার-ঘর থেকে দ্রুতপদে বেরিয়ে এসে বললেন, 'কী বাবা অমিত, ভূমিকম্প নাকি?'

'ভূমিকম্পই তো। জিনিসপত্র রওনা করে দিয়েছি ; গাড়ি ঠিক ; ডাকঘরে গেলুম দেখতে চিঠিপত্র কিছু আছে কি না। সেখানে এক টেলিগ্রাম।'

অমিতর মুখের ভাব দেখে যোগমায়া উদ্‌বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'খবর সব ভালো তো?'

লাবণ্যও ঘরে এসে জুটল। অমিত ব্যাকুল মুখে বললে, 'আজই সন্ধ্যাবেলায় আসছে সিসি, আমার বোন, তার বন্ধু কেটি মিত্তির, আর তার দাদা নরেন।'

'তা, ভাবনা কিসের বাছা? শুনেছি, ঘোড়দৌড়ের মাঠের কাছে একটা বাড়ি খালি আছে। যদি নিতান্ত না পাওয়া যায় আমার এখানে কি একরকম করে জায়গা হবে না?'

'সেজন্যে ভাবনা নেই মাসি। তারা নিজেরাই টেলিগ্রাফ করে হোটেলে জায়গা ঠিক করেছে।'

'আর যাই হোক বাবা, তোমার বোনেরা এসে যে দেখবে তুমি ঐ লক্ষ্মীছাড়া বাড়িটাতে আছ সে কিছুতেই হবে না। তারা আপন লোকের খ্যাপামির জন্যে দায়িক করবে আমাদেরকেই।'

'না মাসি, আমার প্যারাডাইস লস্ট্‌। ঐ নগ্ন আসবাবের স্বর্গ থেকে আমার বিদায়। সেই দড়ির খাটিয়ার নীড় থেকে আমার সুখস্বপ্নগুলো উড়ে পালাবে। আমাকেও জায়গা নিতে হবে সেই অতিপরিচ্ছন্ন হোটেলের এক অতিসভ্য কামরায়।'

কথাটা বিশেষ কিছু নয়, তবু লাবণ্যর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এতদিন একটা কথা ওর মনেও আসে নি যে, অমিতর যে সমাজ সে ওদের সমাজ থেকে সহস্র যোজন দূরে। এক মুহূর্তেই সেটা

বুঝতে পারলে। অমিত যে আজ কোলকাতায় চলে যাচ্ছিল তার মধ্যে বিচ্ছেদের কঠোর মূর্তি ছিল না। কিন্তু এই-যে আজ ও হোটেলে যেতে বাধ্য হল এইটেতেই লাবণ্য বুঝলে, যে বাসা এতদিন ওরা দুজনে নানা অদৃশ্য উপকরণে গড়ে তুলছিল সেটা কোনোদিন বুঝি আর দৃশ্য হবে না।

লাবণ্যর দিকে একটু চেয়ে অমিত যোগমায়াকে বললে, 'আমি হোটেলেই যাই আর জাহান্নমেই যাই, কিন্তু এইখানেই আমার আসল বাসা।'

অমিত বুঝেছে, শহর থেকে আসছে একটা অশুভ দৃষ্টি। মনে মনে নানা প্ল্যান করছে যাতে সিসির দল এখানে না আসতে পারে। কিন্তু, ইদানীং ওর চিঠিপত্র আসছিল যোগমায়ার বাড়ির ঠিকানায়। তখন ভাবে নি, কোনো সময়ে তাতে বিপদ ঘটতে পারে। অমিতর মনের ভাবগুলো চাপা থাকতে চায় না, এমন-কি, প্রকাশ পায় কিছু আতিশয্যের সঙ্গে। ওর বোনের আগা সম্বন্ধে অমিতর এত বেশি উদ্‌বেগ যোগমায়ার কাছে অসংগত ঠেকছিল ; লাবণ্যও ভাবলে অমিত ওকে নিয়ে বোনেদের কাছে লজ্জিত। ব্যাপারটা লাবণ্যর কাছে বিস্বাদ ও অসম্মানজনক হয়ে দাঁড়াল।

অমিত লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কি সময় আছে? বেড়াতে যাবে?'

লাবণ্য একটু যেন কঠিন করে বললে, 'না, সময় নেই।'

যোগমায়া ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'যাও-না মা, বেড়িয়ে এসো গে।'

লাবণ্য বললে, 'কর্তামা, কিছুকাল থেকে সুরমাকে পড়ানোর বড়ো অবহেলা হয়েছে। খুবই অন্যায় করেছি। কাল রাত্রেই ঠিক করেছিলুম আজ থেকে কিছুতেই আর ঢিলেমি করা হবে না।' ব'লে লাবণ্য ঠোঁট চেপে মুখ শক্ত করে রইল।

লাবণ্যর এই জেদের মেজাজটা যোগমায়ার পরিচিত। পীড়াপীড়ি কবতে সাহস করলেন না।

অমিতও নীরস কণ্ঠে বললে, 'আমিও চললুম কর্তব্য করতে, ওদের জন্যে সব ঠিক করে রাখা চাই।'

এই ব'লে চলে যাবাব আগে বারান্দায় একবার স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। বললে, 'বন্যা, ঐ চেয়ে দেখো। গাছের আড়াল থেকে আমার বাড়ির চালাটা অল্প একটু দেখা যাচ্ছে। একটা কথা তোমাদের বলা হয় নি, ঐ বাড়িটা কিনে নিয়েছি। বাড়ির মালেক অবাক, নিশ্চয় ভেবেছে ওখানে সোনার গোপন খনি আবিষ্কার করে থাকব। দাম বেশ একটু চড়িয়ে নিয়েছে। ওখানে সোনার খনির সন্ধান তো পেয়েছিলুম, সে সন্ধান একমাত্র আমিই জানি। আমার জীর্ণ কুটিরের ঐশ্বর্য সবার চোখ থেকে লুকোনো থাকবে।'

লাবণ্যর মুখে গভীর একটি বিষাদের ছায়া পড়ল। বললে, 'আর-কারো কথা অত করে তুমি ভাব কেন? নাহয় আর সবাই জানতে পারলে। ঠিকমত জানতে পারাই তো চাই, তা হলে কেউ অমর্যাদা করতে সাহস কবে না।'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে অমিত বললে, 'বন্যা, ঠিক করে রেখেছি বিয়ের পরে ঐ বাড়িতেই আমরা কিছুদিন এসে থাকব। আমার সেই গঙ্গার ধারে বাগান, সেই ঘাট, সেই বটগাছ সব মিলিয়ে গেছে ঐ বাড়িটার মধ্যে। তোমার দেওয়া মিতালি নাম ওকেই সাজে।'

'ও বাড়ি থেকে আজ তুমি বেরিয়ে এসেছ মিতা। আবার একদিন যদি ঢুকতে চাও, দেখবে ওখানে তোমাকে কুলোবে না। পৃথিবীতে আজকের দিনের বাসায় কালকের দিনের জায়গা হয় না। সেদিন তুমি বলেছিলে, জীবনে মানুষের প্রথম সাধনা দারিদ্র্যের, দ্বিতীয় সাধনা ঐশ্বর্যের। তার পরে শেষ সাধনার কথা বল নি, সেটা হচ্ছে ত্যাগের।'

'বন্যা, ওটা তোমাদের রবি ঠাকুরের কথা; সে লিখেছে, শাহাজান আজ তার তাজমহলকেও ছাড়িয়ে গেল। একটা কথা তোমার কবির মাথায় আসে নি যে, আমরা তৈরি করি তৈরি জিনিসকে ছাড়িয়ে যাবার জন্যেই। বিশ্বসৃষ্টিতে ঐটেকেই বলে এভোল্যুশন। একটা অনাসৃষ্টি-ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে, বলে 'সৃষ্টি করো'; সৃষ্টি করলেই ভূত নামে, তখন সৃষ্টিটাকেও আর দরকার থাকে না। কিন্তু

তাই ব'লে ঐ ছেড়ে যাওয়াটাই চরম কথা নয়। জগতে শাহাজান-মমতাজের অক্ষয় ধারা বয়ে চলেছেই—ওরা কি একজন মাত্র? সেই জন্যেই তো তাজমহল কোনোদিন শূন্য হতেই পারল না। নিবারণ চক্রবর্তী বাসরঘরের উপর একটা কবিতা লিখেছে। সেটা তোমাদের কবিবরের তাজমহলের সংক্ষিপ্ত উত্তর, পোস্টকার্ডে লেখা—

তোমারে ছাড়িয়ে যেতে হবে
রাত্রি যবে
উঠিবে উম্মনা হয়ে প্রভাতের রথচক্ররবে।
হায় রে বাসরঘর,
বিরাট বাহির সে যে বিচ্ছেদের দস্যু ভয়ংকর।
তবু সে যতই ভাঙেচোরে,
মালাবদলের হার যত দেয় ছিন্ন ছিন্ন ক'রে,
তুমি আছ ক্ষয়হীন
অনুদিন;
তোমার উৎসব
বিচ্ছিন্ন না হয় কভু, না হয় নীরব।
কে বলে, তোমারে ছেড়ে গিয়েছে যুগল
শূন্য করি তব শয্যাতল?
যায় নাই, যায় নাই—
নব নব যাত্রী-মাঝে ফিরে ফিরে আসিছে তারাই
তোমার আহ্বানে
উদার তোমার দ্বার-পানে।
হে বাসরঘর।
বিশ্বে প্রেম মৃত্যুহীন, তুমিও অমর।

রবি ঠাকুর কেবল চলে যাবার কথাই বলে, রয়ে যাবার গান গাইতে জানে না। বন্যা, কবি কি বলে যে আমরাও দুজন যেদিন ঐ দরজায় ঘা দেব দরজা খুলবে না?'

'মিনতি রাখো, মিতা, আজ সকালে কবির লড়াই তুলো না। তুমি কি ভাবছ প্রথম দিন থেকেই আমি জানতে পারি নি যে তুমিই নিবারণ চক্রবর্তী? কিন্তু, তোমার ঐ কবিতার মধ্যে এখনই আমাদের ভালোবাসার সমাধি তৈরি করতে শুরু কোরো না, অন্তত তার মরার জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

অমিত আজ নানা বাজে কথা বলে ভিতরের কোন্-একটা উদ্‌বেগকে চাপা দিতে চায়, লাবণ্য তা বুঝেছিল।

অমিতও বুঝতে পেরেছে, কাব্যের দ্বন্দ্ব কাল সন্ধেবেলায় বেখাপ হয় নি, আজ সকালবেলায় তার সুর কেটে যাচ্ছে। কিন্তু, সেইটে যে লাবণ্যর কাছে সুস্পষ্ট সেও ওর ভালো লাগল না। একটু নীরসভাবে বললে, 'তা হলে যাই, বিশ্বজগতে আমারও কাজ আছে, আপাতত সে হচ্ছে হোটেল-পরিদর্শন। ও দিকে লক্ষ্মীছাড়া নিবারণ চক্রবর্তীর ছুটির মেয়াদ এবার ফুরোল বুঝি।'

তখন লাবণ্য অমিতর হাত ধরে বললে, 'দেখো মিতা, আমাকে চিরদিন যেন ক্ষমা করতে পারো। যদি একদিন চলে যাবার সময় আসে তবে, তোমার পায়ে পড়ি, যেন রাগ করে চলে যেয়ো না।'

এই বলে চোখের জল ঢাকবার জন্যে দ্রুত অন্য ঘরে গেল। অমিত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পরে আস্তে আস্তে যেন অন্যমনে গেল য়ুক্যালিপ্‌টাস্‌-তলায়। দেখলে, সেখানে আখরোটের গোটাকতক ভাঙা খোলা ছড়ানো। দেখেই ওর মনটার ভিতর কেমন একটা ব্যথা চেপে ধরলে।

জীবনের ধারা চলতে চলতে তার যে-সব চিহ্ন বিছিয়ে যায় সেগুলোর তুচ্ছতাই সব চেয়ে সকরুণ। তার পরে দেখলে ঘাসের উপরে একটা বই, সেটা রবি ঠাকুরের 'বলাকা'। তার নীচের পাতাটা ভিজে গেছে। একবার ভাবলে, ফিরিয়ে দিয়ে আসি গে; কিন্তু ফিরিয়ে দিলে না, সেটা নিল পকেটে। হোটেলে যাব-যাব করলে, তাও গেল না; বসে পড়ল গাছতলাটাতে। রাত্রের ভিজে মেঘে আকাশটাকে খুব করে মেজে দিয়েছে। ধুলো ধোওয়া বাতাসে অত্যন্ত স্পষ্ট করে প্রকাশ পাচ্ছে চার দিকের ছবিটা; পাহাড়ের আর গাছপালার সীমান্তগুলি যেন ঘন নীল আকাশে খুদে দেওয়া, জগৎটা যেন কাছে এগিয়ে একেবারে মনের উপরে এসে ঠেকল। আস্তে আস্তে বেলা চলে যাচ্ছে, তার ভিতরটাতে ভৈরবীর সুর।

এখনই খুব কষে কাজে লাগবে বলে লাবণ্যর পণ ছিল, তবু যখন দূর থেকে দেখলে অমিত গাছতলায় ব'সে, আর থাকতে পারলে না, বুকের ভিতরটা হাঁপিয়ে উঠল, চোখ এল জলে ছল্‌ছলিয়ে।

কাছে এসে বলল, 'মিতা, তুমি কী ভাবছ?'

'এতদিন যা ভাবছিলুম একেবারে তার উলটো।'

'মাঝে মাঝে মনটাকে উল্‌টিয়ে না দেখলে তুমি ভালো থাক না। তোমার উলটো ভাবনাটা কিরকম শুনি।'

'তোমাকে মনের মধ্যে নিয়ে এতদিন কেবল ঘর বানাচ্ছিলুম—কখনো গঙ্গার ধারে, কখনো পাহাড়ের উপরে। আজ মনের মধ্যে জাগছে সকালবেলাকার আলোয় উদাস-করা একটা পথের ছবি—অরণ্যের ছায়ায় ছায়ায় ঐ পাহাড়গুলোর উপর দিয়ে। হাতে আছে লোহার-ফলা-ওয়ালা লম্বা লাঠি, পিঠে আছে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধা একটা চৌকো থলি। তুমি চলবে সঙ্গে। তোমার নাম সার্থক হোক বন্যা, তুমি আমাকে বদ্ধ ঘর থেকে বের ক'রে পথে ভাসিয়ে নিয়ে চললে বুঝি। ঘরের মধ্যে নানান লোক, পথ কেবল দুজনের।'

'ডায়মণ্ডহার্‌বারের বাগানটা তো গেছেই, তার পরে সেই পঁচাত্তর টাকার ঘর-বেচারাও গেল। তা, যাগ গে। কিন্তু চলবার পথে বিচ্ছেদের ব্যবস্থাটা কিরকম করবে? দিনান্তে তুমি এক পান্থশালায় ঢুকবে আর আমি আর-একটাতে?'

'তার দরকার হয় না বন্যা। চলাতেই নতুন রাখে, পায়ে পায়ে নতুন, পুরোনো হবার সময় পাওয়া যায় না। বসে থাকাটাই বুড়োমি।'

'হঠাৎ এ খেয়ালটা তোমার কেন মনে হল মিতা?'

'তবে বলি। হঠাৎ শোভনলালের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছি। তার নাম শুনেছ বোধ হয়, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদওয়ালা? ভারত-ইতিহাসের সাবেক পথগুলো সন্ধান করবে বলে কিছুকাল থেকে সে বেরিয়ে পড়েছে। সে অতীতের লুপ্ত পথ উদ্ধার করতে চায়; আমার ইচ্ছে ভবিষ্যতের পথ সৃষ্টি করা।'

লাবণ্যর বুকের ভিতরে হঠাৎ খুব একটা ধাক্কা দিলে। কথাটাকে বাধা দিয়ে অমিতকে বললে, 'শোভনলালের সঙ্গে একই বৎসর আমি এম. এ. দিয়েছি। তার সব খবরটা শুনতে ইচ্ছে করে।'

'এক সময়ে সে খেপেছিল, আফগানিস্থানের প্রাচীন শহর কাপিশের ভিতর দিয়ে একদিন যে পুরোনো রাস্তা চলেছিল সেইটেকে আয়ত্ত করবে। ঐ রাস্তা দিয়েই ভারতবর্ষে হিউয়েনসাঙের তীর্থযাত্রা, ঐ রাস্তা দিয়েই তারও পূর্বে আলেকজাণ্ডারের রণযাত্রা। খুব কষে পুশতু পড়লে, পাঠানি কায়দাকানুন অভ্যেস করলে। সুন্দর চেহারা, ঢিলে কাপড়ে ঠিক পাঠানের মতো দেখতে হয় না, দেখায় যেন পারসিকের মতো। আমাকে এসে ধরলে, সেখানে ফরাসি পণ্ডিতরা এই কাজে লেগেছেন, তাঁদের কাছে পরিচয়পত্র দিতে—ফ্রান্সে থাকতে তাঁদের কারো কারো কাছে আমি পড়েছি। দিলেম পত্র, কিন্তু ভারতসরকারের ছাড়চিঠি জুটল না। তার পর থেকে দুর্গম হিমালয়ের মধ্যে কেবলই পথ খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে—কখনো কাশ্মীরে, কখনো কুমায়ুনে। এবার ইচ্ছা হয়েছে হিমালয়ের

পূর্বপ্রান্তটাতেও সন্ধান করবে। বৌদ্ধধর্মপ্রচারের রাস্তা এ দিক দিয়ে কোথায় কোথায় গেছে সেইটে দেখতে চায়। ঐ পথ-খেপাটার কথা মনে করে আমারো মন উদাস হয়ে যায়। পুঁথির মধ্যে আমরা কেবল কথার রাস্তা খুঁজে খুঁজে চোখ খোওয়াই, ঐ পাগল বেরিয়েছে পথের পুঁথি পড়তে, মানববিধাতার নিজের হাতে লেখা।—আমার কী মনে হয় জান?'

'কী, বলো।'

'প্রথম যৌবনে একদিন শোভনলাল কোন্ কাঁকন-পরা হাতের ধাক্কা খেয়েছিল, তাই ঘরের থেকে পথের মধ্যে ছিটকিয়ে পড়েছে। ওর সমস্ত কাহিনীটা স্পষ্ট জানি নে, কিন্তু একদিন ওতে-আমাতে একলা ছিলুম, নানা কথায় হল প্রায় রাত-দুপুর, জানালার বাইরে হঠাৎ চাঁদ দেখা দিল একটা ফুলন্ত জারুল গাছের আড়ালে—ঠিক সেই সময়টাতে কোনো-একজনের কথা বলতে গেল, নাম করলে না, বিবরণ কিছুই বললে না, অল্প একটু আভাস দিতেই গলা ভার হয়ে এল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে চলে গেল। বুঝতে পারলুম ওর জীবনের মধ্যে কোন্‌খানে অত্যন্ত একটা নিষ্ঠুর কথা বিঁধে আছে। সেই কথাটাকেই বুঝি পথ চলতে চলতে ও পায়ে পায়ে খইয়ে দিতে চায়।'

লাবণ্যর হঠাৎ উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের ঝোঁক এল, নুয়ে পড়ে দেখতে লাগল ঘাসের মধ্যে সাদায়-হলদেয়-মেলানো একটা বুনো ফুল। একান্ত মনোযোগে তার পাপড়িগুলো গুনে দেখার জরুরি দরকার পড়ল।

অমিত বললে, 'জান, বন্যা, আমাকে তুমি আজ পথের দিকে ঠেলে দিয়েছ।'

'কেমন করে?'

'আমি ঘর বানিয়েছিলুম। আজ সকালে তোমার কথায় মনে হল তুমি তার মধ্যে পা দিতে কুণ্ঠিত। আজ দু মাস ধরে মনে মনে ঘর সাজালুম। তোমাকে ডেকে বললুম, এসো বধূ, ঘরে এসো। তুমি আজ বধূসজ্জা খসিয়ে ফেললে; বললে এখানে জায়গা হবে না বন্ধু, চিরদিন ধরে আমাদের সপ্তপদী গমন হবে।'

বনফুলের বটানি আর চলল না। লাবণ্য হঠাৎ উঠে পড়ে ক্লিষ্ট স্বরে বললে, 'মিতা, আর নয়, সময় নেই।'

১৪
ধূমকেতু

এতদিন পরে অমিত একটা কথা আবিষ্কার করেছে যে, লাবণ্যর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা শিলঙসুদ্ধ বাঙালি জানে। গভর্মেন্ট্ আফিসের কেরানিদের প্রধান আলোচ্য বিষয় তাদের জীবিকা-ভাগ্যগগনে 'কোন্ গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর'। এমন সময় তাদের চোখে পড়ল মানবজীবনের জ্যোতির্মণ্ডলে এক যুগ্মতারার আবর্তন, একেবারে ফার্স্ট্ ম্যাগ্নিচ্যুডের আলো। পর্যবেক্ষকদের প্রকৃতি-অনুসারে এই দুটি নবদীপ্যমান জ্যোতিষ্কের আগ্নেয় নাট্যের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা চলছে।

পাহাড়ে হাওয়া খেতে এসে এই ব্যাখ্যার মধ্যে পড়েছিল কুমার মুখুজ্জে—অ্যাটর্নি। সংক্ষেপে কেউ তাকে বলে কুমার মুখো, কেউ বলে মার মুখো। সিসিদের মিত্রগোষ্ঠীর অন্তশ্চর নয় সে, কিন্তু জ্ঞাতি, অর্থাৎ জানাশোনার দলে। অমিত তাকে ধূমকেতু মুখো নাম দিয়েছিল। তার একটা কারণ, সে এদের দলের বাইরে, তবু সে মাঝে মাঝে এদের কক্ষপথে পুচ্ছ বুলিয়ে যায়। সকলেই আন্দাজ করে, যে গ্রহটি তাকে বিশেষ করে টান মারছে তার নাম লিসি। এই নিয়ে সকলেই কৌতুক অনুভব করে, কিন্তু, লিসি স্বয়ং এতে ক্রুদ্ধ ও লজ্জিত। তাই লিসি প্রায়ই প্রবলবেগে এর পুচ্ছমর্দন করে চলে যায়, কিন্তু দেখতে পাই, তাতে ধূমকেতুর লেজার বা মুড়োর কোনোই লোকসান হয় না।

অমিত শিলঙের রাস্তায় ঘাটে মাঝে মাঝে কুমার মুখোকে দূর থেকে দেখেছে। তাকে না দেখতে পাওয়া শক্ত। বিলেতে আজো যায় নি বলে তার বিলিতি কায়দা খুব উৎকটভাবে প্রকাশমান। তার মুখে নিরবচ্ছিন্ন একটা দীর্ঘ মোটা চুরুট থাকে, এইটেই তার ধূমকেতু মুখো নামের প্রধান কারণ। অমিত তাকে দূর থেকেই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছে, এবং নিজেকে ভুলিয়েছে যে ধূমকেতু বুঝি সেটা বুঝতে পারে নি। কিন্তু দেখেও দেখতে না পাওয়াটা একটা বড়ো-বিদ্যের অন্তর্গত। চুরিবিদ্যের মতোই, তার সার্থকতার প্রমাণ হয় যদি না পড়ে ধরা। তাতে প্রত্যক্ষ দৃশ্যটাকে সম্পূর্ণ পার করে দেখবার পারদর্শিতা চাই।

কুমার মুখো শিলঙের বাঙালি সমাজ থেকে এমন অনেক কথা সংগ্রহ করেছে যাকে মোটা অক্ষরে শিরোনামা দেওয়া যেতে পারে 'অমিত রায়ের অমিতাচার'। মুখে সব চেয়ে নিন্দে করেছে যারা, মনে সব চেয়ে রসভোগ করেছে তারাই। যকৃতের বিকৃতিশোধনের জন্য কুমার কিছুদিন এখানে থাকবে বলেই স্থির ছিল, কিন্তু জনশ্রুতিবিস্তারের উগ্র উৎসাহে তাকে পাঁচ দিনের মধ্যে কোলকাতায় ফেরালে। সেখানে গিয়ে অমিত সম্বন্ধে তার চুরুট-ধূমাকৃত অত্যুক্তি-উদ্‌গারে সিসি-লিসি-মহলে কৌতুকে কৌতূহলে জড়িত বিভীষিকা উৎপাদন করলে।

অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এতক্ষণে অনুমান করে থাকবেন যে, সিসি-দেবতার বাহন হচ্ছে কেটি মিত্তিরের দাদা নরেন। তার অনেক দিনের একনিষ্ঠ বাহন-দশা এবার বৈবাহনের দশম দশায় উত্তীর্ণ হবে, এমন কথা উঠেছে। সিসি মনে মনে রাজি। কিন্তু যেন রাজি নয় ভাব দেখিয়ে একটা প্রদোষান্ধকার ঘনিয়ে রেখেছে। অমিতর সম্মতিসহায়ে নরেন এই সংশয়টুকু পার হতে পারবে বলে ঠিক করেছিল কিন্তু অমিত হাম্বাগ্‌টা না ফেরে কোলকাতায়, না দেয় চিঠির জবাব। ইংরেজি যতগুলো গর্হিত শব্দভেদী বাক্য তার জানা ছিল সবগুলিই প্রকাশ্যে ও স্বগত উক্তিতে নিরুদ্দেশ অমিতর প্রতি নিক্ষেপ করেছে। এমন-কি, তারযোগে অত্যন্ত বেতার বাক্য শিলঙে পাঠাতে ছাড়ে নি, কিন্তু উদাসীন নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে উদ্ধত হাউইয়ের মতো কোথাও তার দাহরেখা রইল না। অবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হল, অবস্থাটাব সবেজমিন তদন্ত হওয়া দরকার। সর্বনাশের স্রোতে অমিতর ঝুঁটির ডগাটাও যদি কোথাও একটু দেখা যায়, টেনে ডাঙায় তোলা আশু দবকার। এ সম্বন্ধে তার আপন বোন সিসির চেয়ে পরের বোন কেটিব উৎসাহ অনেক বেশি। ভারতের ধন বিদেশে লুপ্ত হচ্ছে বলে আমাদের পলিটিক্সের যে আক্ষেপ কেটি মিটারেব ভাবখানা সেই জাতের।

নরেন মিটার দীর্ঘকাল য়ুরোপে ছিল। জমিদারের ছেলে, আয়ের জন্য ভাবনা নেই, ব্যয়ের জন্যেও ; বিদ্যার্জনের ভাবনাও সেই পরিমাণেই লঘু। বিদেশে ব্যয়ের প্রতি অধিক মনোযোগ করেছিল—অর্থ এবং সময় দুই থেকে। নিজেকে আর্টিস্ট্ বলে পরিচয় দিতে পারলে একই কালে দায়মুক্ত স্বাধীনতা ও অহৈতুক আত্মসম্মান লাভ করা যায়। এইজন্যে আর্ট্-সরস্বতীর অনুসরণে য়ুরোপের অনেক বড়ো বড়ো শহরের বোহিমীয় পাড়ায় সে বাস করেছে। কিছুদিন চেষ্টার পর স্পষ্টবক্তা হিতৈষীদের কঠোর অনুরোধে ছবি আঁকা ছেড়ে দিতে হল, এখন সে ছবির সমজদারিতে পরিপক্ক বলেই নিজের প্রমাণনিরপেক্ষ পরিচয় দেয়। চিত্রকলা সে ফলাতে পারে না, কিন্তু দুই হাতে সেটাকে চটকাতে পারে। ফরাসি ছাঁচে সে তার গোঁফের দুই প্রত্যন্তদেশকে সযত্নে কণ্টকিত করেছে, এ দিকে মাথায় ঝাঁকড়া চুলের প্রতি তার সযত্ন অবহেলা। চেহারাখানা তার ভালোই, কিন্তু আরো ভালো করবার মহার্ঘ সাধনায় তার আয়নার টেবিল প্যারিসীয় বিলাসবৈচিত্র্যে ভারাক্রান্ত। তার মুখ-ধোবার টেবিলের উপকরণ দশাননের পক্ষেও বাহুল্য হত। দামি হাভানা দু-চার টান টেনেই অনায়াসেই সেটাকে অবজ্ঞা করা এবং মাসে মাসে গাত্রবস্ত্র পার্সেল পোস্টে ফরাসি ধোবার বাড়িতে ধুইয়ে আনানো, এ-সব দেখে ওর আভিজাত্য সম্বন্ধে দ্বিরুক্তি করতে সাহস হয় না। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ দর্জিশালার রেজেস্ট্রি বহিতে ওর গায়ের মাপ ও নম্বর লেখা এমন-সব কোঠায় যেখানে খুঁজলে পাতিয়ালা-কর্পূরতলার নাম পাওয়া যেতে পারে। ওর স্ল্যাঙবিকীর্ণ ইংরেজি ভাষার উচ্চারণটা বিজড়িত, বিলম্বিত, আমীলিত

চক্ষুর-অলস-কটাক্ষ-সহযোগে অনতিব্যক্ত ; যারা অভিজ্ঞ তাদের কাছে শোনা যায়, ইংলণ্ডের অনেক নীলরক্তবান্ আমীরদের কণ্ঠস্বরে এইরকম গদ্‌গদ জড়িমা। এর উপরে ঘোড়দৌড়ীয় অপভাষা এবং বিলিতি শপথের দুর্বাক্যসম্পদে সে তার দলের লোকের আদর্শ পুরুষ।

কেটি মিটারের আসল নাম কেতকী। চালচলন ওর দাদারই কায়দা-কারখানার বকযন্ত্রপরম্পরায় শোধিত তৃতীয় ক্রমের চোলাই-করা, বিলিতি কৌলীন্যের ঝাঁঝালো এসেন্‌স্। সাধারণ বাঙালি মেয়ের দীর্ঘকেশগৌরবের গর্বের প্রতি গর্বসহকারেই কেটি দিয়েছে কাঁচি চালিয়ে, খোঁপাটা ব্যাঙাচির লেজের মতো বিলুপ্ত হয়ে অনুকরণের উল্লম্ফশীল পরিণত অবস্থা প্রতিপন্ন করছে। মুখের স্বাভাবিক গৌরিমা বর্ণপ্রলেপের দ্বারা এনামেল-করা। জীবনের আদ্যলীলায় কেটির কালো চোখের ভাবটি ছিল স্নিগ্ধ, এখন মনে হয় সে যেন যাকে-তাকে দেখতেই পায় না। যদি-বা দেখে তো লক্ষ্যই করে না, যদি-বা লক্ষ্য করে তাতে যেন আধ-খোলা একটা ছুরির ঝলক থাকে। প্রথম বয়সে ঠোঁটদুটিতে সরল মাধুর্য ছিল, এখন বার বার বেঁকে বেঁকে তার মধ্যে বাঁকা অঙ্কুশের মতো ভাব স্থায়ী হয়ে গেছে। মেয়েদের বেশের বর্ণনায় আমি আনাড়ি, তার পরিভাষা জানি নে। মোটের উপর চোখে পড়ে, উপরে একটা পাতলা সাপের খোলসের মতো ফুর্‌ফুরে আবরণ, অন্দরের কাপড় থেকে অন্য একটা রঙের আভাস আসছে। বুকের অনেকখানিই অনাবৃত ; আর অনাবৃত বাহুদুটিকে কখনো কখনো টেবিলে, কখনো চৌকির হাতায়, কখনো পরস্পরকে জড়িত করে যত্নের ভঙ্গিতে আলগোছে রাখবার সাধনা সুসম্পূর্ণ। আর, যখন সুমার্জিতনখররমণীয় দুই আঙুলে চেপে সিগারেট খায় সেটা যতটা অলংকরণের অঙ্গ-রূপে ততটা ধূমপানের উদ্দেশে নয়। সব চেয়ে যেটা মনে দুশ্চিন্তা উদ্রেক করে সেটা ওর সমুচ্চ-খুর-ওয়ালা জুতোজোড়ার কুটিল ভঙ্গিমায়; যেন ছাগলজাতীয় জীবের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে মানুষের পায়ের গড়ন দেবার বেলায় সৃষ্টিকর্তা ভুল করেছিলেন, যেন মুচির দত্ত পদোন্নতির কিম্ভূত বক্রতায় ধরণীকে পীড়ন করে চলার দ্বারা এভোল্যুশনের ত্রুটি সংশোধন করা হয়।

সিসি এখনো আছে মাঝামাঝি জায়গায়। শেষের ডিগ্রি এখনো পায় নি, কিন্তু ডবল প্রোমোশন পেয়ে চলেছে। উচ্চ হাসিতে, অজস্র খুশিতে, অনর্গল আলাপে ওর মধ্যে সর্বদা একটা চলন-বলন টগবগ্ করছে—উপাসকমণ্ডলীর কাছে সেটার খুব আদর। রাধিকার বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় দেখতে পাওয়া যায় কোথাও তার ভাবখানা পাকা, কোথাও কাঁচা; এরও তাই। খুরওয়ালা জুতোয় যুগান্তরের জয়তোরণ, কিন্তু অনবচ্ছিন্ন খোঁপাটাতে রয়ে গেছে অতীত যুগ; পায়ের দিকে শাড়ির বহর ইঞ্চি দুই-তিন খাটো, কিন্তু উত্তরচ্ছদে অসম্‌বৃতির সীমানা এখনো আলজ্জতার অভিমুখে ; অকারণ দস্তানা পরা অভ্যস্ত, অথচ এখনো এক হাতের পরিবর্তে দুই হাতেই বালা; সিগারেট টানতে আর মাথা ঘোরে না, কিন্তু পান খাবার আসক্তি এখনো প্রবল। বিস্কুটের টিনে ঢেকে আচার-আমসত্ত্ব পাঠিয়ে দিলে সে আপত্তি করে না; ক্রিস্ট্‌মাসের প্লাম্ পুডিং এবং পৌষপার্বণের পিঠে এবং দুইয়ের মধ্যে শেষটার প্রতিই তার লোলুপতা কিছু বেশি। ফিরিঙ্গি নাচওয়ালীর কাছে সে নাচ শিখেছে, কিন্তু নাচের সভায় জুড়ি মিলিয়ে ঘূর্ণিনাচ নাচতে সামান্য একটু সংকোচ বোধ করে।

অমিত সম্বন্ধে জনরব শুনে এরা বিশেষ উদ্‌বিগ্ন হয়ে চলে এসেছে। বিশেষত, এদের পরিভাষাগত শ্রেণীবিভাগে লাবণ্য গভর্নেস। ওদের শ্রেণীর পুরুষের জাত মারবার জন্যেই তার 'স্পেশাল ক্রিয়েশন'। মনে সন্দেহ নেই, টাকার লোভে মানের লোভেই সে অমিতকে কষে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়াতে গেলে সেই কাজটাতে মেয়েদেরই সম্মার্জনপটু হস্তক্ষেপ করতে হবে। চতুর্মুখ তাঁর চার জোড়া চক্ষে মেয়েদের দিকে কটাক্ষপাত ও পক্ষপাত একসঙ্গেই করে থাকবেন, সেইজন্যে মেয়েদের সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধিতে পুরুষদের গড়েছেন নিরেট নির্বোধ ক'রে। তাই, স্বজাতিমোহমুক্ত আত্মীয় মেয়েদের সাহায্য না পেলে অনাত্মীয় মেয়েদের মোহজাল থেকে পুরুষদের উদ্ধার পাওয়া এত দুঃসাধ্য।

আপাতত এই উদ্ধারের প্রণালীটা কিরকম হওয়া চাই তাই নিয়ে দুই নারী নিজেদের মধ্যে একটা পরামর্শ ঠিক করেছে। এটা নিশ্চিত, গোড়ায় অমিতকে কিছুই জানতে দেওয়া হবে না। তার আগেই শত্রুপক্ষকে আর রণক্ষেত্রটাকে দেখে আসা চাই। তার পর দেখা যাবে মায়াবিনীর কত শক্তি।

প্রথমে এসেই চোখে পড়ল অমিতর উপর ঘন এক পোঁচ গ্রাম্য রঙ। এর আগেও ওর দলের সঙ্গে অমিতর ভাবের মিল ছিল না। তবু সে তখন ছিল প্রখর নাগরিক—চাঁচা, মাজা, ঝক্‌ঝকে। এখন কেবল যে খোলা হাওয়ায় রঙটা কিছু ময়লা হয়েছে তা নয়, সবসুদ্ধ ওর উপর যেন গাছপালার আমেজ দিয়েছে। ও যেন কাঁচা হয়ে গেছে এবং ওদের মতে কিছু যেন বোকা। ব্যবহারটা প্রায় যেন সাধারণ মানুষের মতো। আগে জীবনের সমস্ত বিষয়কে হাসির অস্ত্র নিয়ে তাড়া করে বেড়াত, এখন ওর সে শখ নেই বললেই হয়; এইটেকেই ওরা মনে করেছে নিদেন কালের লক্ষণ।

সিসি একদিন ওকে স্পষ্টই বললে, 'দূর থেকে আমরা মনে করেছিলুম তুমি বুঝি খাসিয়া হবার দিকে নামছ। এখন দেখছি তুমি হয়ে উঠছ যাকে বলে গ্রীন, এখানকার পাইনগাছের মতো, হয়তো আগেকার চেয়ে স্বাস্থ্যকর, কিন্তু আগেকার মতো ইন্‌টারেস্‌টিঙ নয়।'

অমিত ওঅর্ড্‌স্‌ওঅর্থের কবিতা থেকে নজির পেড়ে বললে, 'প্রকৃতির সংসর্গে থাকতে থাকতে নির্বাক্‌ নিশ্চেতন পদার্থের ছাপ লেগে যায় মনে প্রাণে, যাকে কবি বলেছেন 'mute insensate things'।'

শুনে সিসি ভাবলে, নির্বাক্‌ নিশ্চেতন পদার্থকে নিয়ে আমাদের কোনো নালিশ নেই; যারা অত্যন্ত বেশি সচেতন আর যারা কথা কইবার মধুর প্রগল্‌ভতায় সুপটু তাদের নিয়েই আমাদের ভাবনা।

ওরা আশা করেছিল, লাবণ্য সম্বন্ধে অমিত নিজেই কথা তুলবে। একদিন দুদিন তিনদিন যায়, সে একেবারে চুপ। কেবল একটা কথা আন্দাজে বোঝা গেল, অমিতর সাধের তরণী সম্প্রতি কিছু বেশিরকম ঢেউ খাচ্ছে। ওরা বিছানা থেকে উঠে তৈরি হবার আগেই অমিত কোথা থেকে ঘুরে আসে; তার পর মুখ দেখে মনে হয়, ঝোড়ো হাওয়ায় যে কলাগাছের পাতাগুলো ফালি ফালি হয়ে ঝুলছে তারই মতো শতদীর্ণ ভাবখানা। আরো ভাবনার কথাটা এই যে, ববি ঠাকুরের বই কেউ কেউ ওর বিছানায় দেখেছে। ভিতরের পাতায় লাবণ্যর নাম থেকে গোড়ার অক্ষরটা লাল কালি দিয়ে কাটা। বোধ হয় নামের পরশপাথরেই জিনিসটার দাম বাড়িয়েছে।

অমিত ক্ষণে ক্ষণে বেরিয়ে যায়। বলে, 'খিদে সংগ্রহ করতে চলেছি।' খিদের জোগানটা কোথায়, আর খিদেটা খুবই যে প্রবল, তা অন্যদের অগোচর ছিল না। কিন্তু তারা এমনি অবুঝের মতো ভাব করত যেন হাওয়ায় ক্ষুধাকরতা ছাড়া শিলঙে আর-কিছু আছে এ কথা কেউ ভাবতে পারে না। সিসি মনে মনে হাসে, কেটি মনে মনে জ্বলে। নিজের সমস্যাটাই অমিতর কাছে এত একান্ত যে, বাইরের কোনো চাঞ্চল্য লক্ষ্য করার শক্তিই তার নেই। তাই সে নিঃসংকোচে সখীযুগলের কাছে বলে, 'চলেছি এক জল-প্রপাতের সন্ধানে।' কিন্তু প্রপাতটা কোন্‌ শ্রেণীর, আর তার গতিটা কোন্‌ অভিমুখী তা নিয়ে অন্যদের মনে যে কিছু ধোঁকা আছে তা সে বুঝতেই পারে না। আজ বলে গেল, এক জায়গায় কমলালেবুর মধু সওদা করতে চলেছে। মেয়েদুটি নিতান্ত নিরীহভাবে সরল ভাষায় বললে, এই অপূর্ব মধু সম্বন্ধে তাদের দুর্দমনীয় কৌতূহল, তারাও সঙ্গে যেতে চায়। অমিত বললে পথ দুর্গম, যানবাহনের আয়ত্তাতীত। বলেই আলোচনাটাকে প্রথম অংশে ছেদন করেই দৌড় দিলে। এই মধুকরের ডানার চাঞ্চল্য দেখে দুই বন্ধু স্থির করলে, আর দেরি নয়, আজই কমলালেবুর বাগানে অভিযান করা চাই। এ দিকে নরেন গেছে ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সিসিকে নিয়ে যাবার জন্যে খুব আগ্রহ ছিল, সিসি গেল না। এই নিবৃত্তিতে তার কতখানি শমদমের দরকার হয়েছিল তা দরদী ছাড়া অন্যে কে বুঝবে?

১৫
ব্যাঘাত

দুই সখী যোগমায়ার বাগানে বাইরের দরজা পার হয়ে চাকরদের কাউকে দেখতে পেলে না। গাড়িবারাণ্ডায় এসে চোখে পড়ল বাড়ির রোয়াকে একটি ছোটো টেবিল পেতে একজন শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীতে মিলে পড়া চলছে। বুঝতে বাকি রইল না, এরই মধ্যে বড়োটি লাবণ্য।

কেটি টক্ টক্ করে উপরে উঠে ইংরেজিতে বললে, 'দুঃখিত।'

লাবণ্য চৌকি ছেড়ে উঠে বললে, 'কাকে চান আপনারা?'

কেটি এক মুহূর্তে লাবণ্যর আপাদমস্তকে দৃষ্টিটাকে প্রখর ঝাঁটার মতো দ্রুত বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'মিস্টার অমিট্রায়ে এখানে এসেছেন কি না খবর নিতে এলুম।'

লাবণ্য হঠাৎ বুঝতেই পারলে না 'অমিট্রায়ে' কোন্ জাতের জীব। বললে, 'তাঁকে তো আমরা চিনি নে।'

অমনি দুই সখীতে একটা বিদ্যুচ্চকিত চোখ-ঠারাঠারি হয়ে গেল, মুখে পড়ল একটা আড়হাসির রেখা। কেটি ঝাঁজিয়ে উঠে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, 'আমরা তো জানি এ বাড়িতে তাঁর যাওয়া-আসা আছে oftener than is good for him।'

ভাব দেখে লাবণ্য চমকে উঠল, বুঝলে এরা কে আর ও কী ভুলটাই করেছে। অপ্রস্তুত হয়ে বললে, 'কর্তামাকে ডেকে দিই, তাঁর কাছে খবর পাবেন।'

লাবণ্য চলে গেলেই সুরমাকে কেটি সংক্ষেপে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার টিচার?'

'হাঁ।'

'নাম বুঝি লাবণ্য?'

'হাঁ।'

'গট্ ম্যাচেস্?'

হঠাৎ দেশালাইয়ের প্রয়োজন আন্দাজ করতে না পেরে সুরমা কথাটার মানেই বুঝল না। মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটি বললে, 'দেশালাই।'

সুরমা দেশালাইয়ের বাক্স নিয়ে এল। কেটি সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে সুরমাকে জিজ্ঞাসা করলে, 'ইংরেজি পড়?' সুরমা স্বীকৃতিসূচক মাথা নেড়েই ঘরের দিকে দ্রুত চলে গেল। কেটি বললে, 'গবর্নেসের কাছে মেয়েটা আর যাই শিখুক ম্যানার্স্ শেখে নি।'

তার পরে দুই সখীতে টিপ্পনী চলল। 'ফেমাস্ লাবণ্য। ডিলীশস্। শিলঙ পাহাড়টাকে ভল্ক্যানো বানিয়ে তুলেছে, ভূমিকম্পে অমিটের হৃদয়ডাঙায় ফাটল ধরিয়ে দিলে, এ ধার থেকে ও ধার। সিলি! মেন আর ফানি!'

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। এই হাসিতে ঔদার্য ছিল। কেননা, পুরুষমানুষ নির্বোধ বলে সিসির পক্ষে আক্ষেপের কারণ ঘটে নি। সে তো পাথুরে জমিতেও ভূমিকম্প ঘটিয়েছে, দিয়েছে একেবারে চৌচির করে। কিন্তু এ কী সৃষ্টিছাড়া ব্যাপার! এক দিকে কেটির মতো মেয়ে, আর অন্য দিকে ঐ অদ্ভুত-ধরনে-কাপড়-পরা গবর্নেস! মুখে মাখন দিলে গলে না, যেন একতাল ভিজে ন্যাকড়া; কাছে বসলে মনটাতে বাদলার বিস্কুটের মতো ছাতা পড়ে যায়। কী করে অমিট ওকে এক মোমেন্ট্ও সহ্য করে।

'সিসি, তোমার দাদার মনটা চিরদিন উপরে পা ক'রে হাঁটে। কোন্ এক সৃষ্টিছাড়া উলটো বুদ্ধিতে এই মেয়েটাকে হঠাৎ মনে হয়েছে এঞ্জেল।' এই বলে টেবিলে অ্যাল্জেব্রার বইয়ের গায়ে সিগারেটটা ঠেকিয়ে রেখে কেটি ওর রুপোর-শিকল-ওয়ালা প্রসাধনের থলি বের করে মুখে একটুখানি পাউডার লাগালে, অঞ্জনের পেন্সিল নিয়ে ভুরুর রেখাটা একটু ফুটিয়ে তুললে।

দাদার কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় সিসির যথেষ্ট রাগ হয় না, এমন-কি, ভিতরে ভিতরে একটু যেন স্নেহই হয়। সমস্ত রাগটা পড়ে পুরুষদের মুগ্ধনয়নবিহারিণী মেকি এঞ্জেলদের 'পরে। দাদা সম্বন্ধে সিসির এই সকৌতুক ঔদাসীন্যে কেটির ধৈর্যভঙ্গ হয়। খুব করে ঝাঁকানি দিয়ে নিতে ইচ্ছে করে।

এমন সময়ে সাদা গরদের শাড়ি প'রে যোগমায়া বেরিয়ে এলেন। লাবণ্য এল না। কেটির সঙ্গে এসেছিল ঝাঁকড়া-চুলে-দুইচোখ-আচ্ছন্নপ্রায় ক্ষুদ্রকায়া ট্যাবি-নামধারী কুকুর। সে একবার ঘ্রাণের দ্বারা লাবণ্য ও সুরমার পরিচয় গ্রহণ করেছে। যোগমায়াকে দেখে হঠাৎ কুকুরটার মনে কিছু উৎসাহ জন্মালো। তাড়াতাড়ি গিয়ে সামনের দুটো পা দিয়ে যোগমায়ার নির্মল শাড়ির উপর পঙ্কিল স্বাক্ষর অঙ্কিত করে দিয়ে কৃত্রিম প্রীতি জ্ঞাপন করলে। সিসি ঘাড় ধরে টেনে আনলে কেটির কাছে, কেটি তার নাকের উপর তর্জনী তাড়ন করে বললে, 'নটি ডগ!'

কেটি চৌকি থেকে উঠলই না। সিগারেট টানতে টানতে অত্যন্ত নির্লিপ্ত আড়ভাবে একটু ঘাড় বাঁকিয়ে যোগমায়াকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। যোগমায়ার 'পরে তার আক্রোশ বোধ করি লাবণ্যর চেয়েও বেশি। ওর ধারণা লাবণ্যর ইতিহাসে একটা খুঁত আছে। যোগমায়াই মাসি সেজে অমিতর হাতে তাকে গতিয়ে দেবার কৌশল করছে। পুরুষমানুষকে ঠকাতে অধিক বুদ্ধির দরকার করে না, বিধাতার স্বহস্তে-তৈরি ঠুলি তাদের দুই চোখে পরানো।

সিসি সামনে এসে যোগমায়াকে নমস্কারের একটু আভাস দিয়ে বললে, 'আমি সিসি, অমির বোন।'

যোগমায়া একটু হেসে বললেন, 'অমি আমাকে মাসি বলে, সেই সম্পর্কে আমি তোমারও মাসি হই মা!'

কেটির রকম দেখে যোগমায়া তাকে লক্ষ্যই করলেন না। সিসিকে বললেন, 'এসো মা, ঘরে বসবে এসো।'

সিসি বললে, 'সময় নেই, কেবল খবর নিতে এসেছি অমি এসেছে কিনা।'

যোগমায়া বললেন, 'এখনো আসে নি।'

'কখন আস্‌বেন জানেন?'

'ঠিক বলতে পারি নে। আচ্ছা, আমি জিজ্ঞাসা করে আসি গে।'

কেটি তার স্বস্থানে বসেই তীব্রস্বরে বলে উঠল, 'যে মাস্টারনী এখানে বসে পড়াচ্ছিল সে তো ভান করলে অমিট্‌কে সে কোনোকালে জানেই না।'

যোগমায়ার ধাঁধা লেগে গেল। বুঝলেন কোথাও একটা গোল আছে। এও বুঝলেন এদের কাছে মান রাখা শক্ত হবে। এক মুহূর্তে মাসিত্ব পরিহার করে বললেন, 'শুনেছি অমিতবাবু আপনাদের হোটেলেই থাকেন, তাঁর খবর আপনাদেরই জানা আছে।'

কেটি বেশ একটু স্পষ্ট করেই হাসলে। তাকে ভাষায় বললে বোঝায়, লুকোতে পারো, ফাঁকি দিতে পারবে না।

আসল কথা, গোড়াতেই লাবণ্যকে দেখে এবং অমিকে সে চেনে না শুনে কেটি মনে মনে আগুন হয়ে আছে। কিন্তু সিসির মনে আশঙ্কা আছে মাত্র, জ্বালা নেই; যোগমায়ার সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য তার মনকে টেনেছিল। তাই, যখন দেখলে কেটি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা দেখিয়ে চৌকি ছাড়লে না, তার মনে কেমন সংকোচ লাগল। অথচ কোনো বিষয়ে কেটির বিরুদ্ধে যেতে সাহস হয় না, কেননা, কেটি সিডিশন দমন করতে ক্ষিপ্রহস্ত—একটু সে বিরোধ সয় না। কর্কশ ব্যবহারে তার কোনো সংকোচ নেই। অধিকাংশ মানুষই ভীরু, অকুণ্ঠিত দুর্ব্যবহারের কাছে তারা হার মানে। নিজের অজস্র কঠোরতায় কেটির একটা গর্ব আছে; যাকে সে মিষ্টিমুখো ভালোমানুষি বলে, বন্ধুদের মধ্যে

তার কোনো লক্ষণ দেখলে তাকে সে অস্থির করে তোলে। রূঢ়তাকে সে অকপটতা বলে বড়াই করে, এই রূঢ়তার আঘাতে যারা সংকুচিত তারা কোনোমতে কেটিকে প্রসন্ন রাখতে পারলে আরাম পায়। সিসি সেই দলের—সে কেটিকে মনে মনে যতই ভয় করে ততই তার নকল করে; দেখাতে যায় সে দুর্বল নয়। সব সময় পেরে ওঠে না। কেটি আজ বুঝেছিল যে, তার ব্যবহারের বিরুদ্ধে সিসির মনের কোণে একটা মুখচোরা আপত্তি লুকিয়ে ছিল। তাই সে ঠিক করেছিল, যোগমায়ার সামনে সিসির এই সংকোচ কড়া করে ভাঙতে হবে। চৌকি থেকে উঠল, একটা সিগারেট নিয়ে সিসির মুখে বসিয়ে দিলে, নিজের ধরানো সিগারেট মুখে করেই সিসির সিগারেট ধরাবার জন্যে মুখ এগিয়ে নিয়ে এল। প্রত্যাখ্যান করতে সিসি সাহস করলে না। কানের ডগাটা একটুখানি লাল হয়ে উঠল। তবু জোর করে এমনি একটা ভাব দেখালে যেন তাদের হাল পাশ্চাত্যিকতায় যাদের ভ্রূ এতটুকু কুঞ্চিত হবে তাদের মুখের উপর ও তুড়ি মারতে প্রস্তুত—that much for it!

ঠিক সেই সময়টাতে অমিত এসে উপস্থিত। মেয়েরা তো অবাক। হোটেল থেকে যখন সে বেরিয়ে এল মাথায় ছিল ফেল্ট্ হ্যাট, গায়ে ছিল বিলিতি কোর্তা। এখানে দেখা যাচ্ছে, পরনে তার ধুতি আর শাল। এই বেশান্তরের আড্ডা ছিল তার সেই কুটিরে। সেখানে আছে একটি বইয়ের শেল্ফ্, একটি কাপড়ের তোরঙ্গ, আর যোগমায়ার দেওয়া একটি আরামকেদারা। হোটেল থেকে মধ্যাহ্নভোজন সেরে এইখানে সে আশ্রয় নেয়। আজকাল লাবণ্যর শাসন কড়া, সুরমাকে পড়ানোর সময়ের মাঝখানটাতে জলপ্রপাত বা কমলালেবুর সন্ধানে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। সেইজন্য বিকেলে সাড়ে চারটে বেলায় চা-পান-সভার পূর্বে এ বাড়িতে দৈহিক মানসিক কোনোপ্রকার তৃষ্ণা-নিবারণের সৌজন্যসম্মত সুযোগ অমিতর ছিল না। এই সময়টা কোনোমতে কাটিয়ে কাপড় ছেড়ে যথানির্দিষ্ট সময়ে এখানে সে আসত।

আজ হোটেল থেকে বেরোবার আগেই কোলকাতা থেকে এসেছে তার আংটি। কেমন করে সে সেই আংটি লাবণ্যকে পরাবে তার সমস্ত অনুষ্ঠানটা সে বসে বসে কল্পনা করেছে। আজ হল ওর একটা বিশেষ দিন। এ দিনকে দেউড়িতে বসিয়ে রাখা চলবে না। আজ সব কাজ বন্ধ করা চাই। মনে মনে ঠিক করে রেখেছে লাবণ্য যেখানে পড়াচ্ছে সেইখানে গিয়ে বলবে, 'একদিন হাতিতে চড়ে বাদশা এসেছিল, কিন্তু তোরণ ছোটো, পাছে মাথা হেঁট করতে হয় তাই সে ফিরে গেছে, নতুন-তৈরি প্রাসাদে প্রবেশ করে নি। আজ এসেছে আমাদের একটি মহাদিন, কিন্তু তোমার অবকাশের তোরণটা তুমি খাটো করে রেখেছ—সেটাকে ভাঙো, রাজা মাথা তুলেই তোমার ঘরে প্রবেশ করুন।'

অমিত এ কথাও মনে করে এসেছিল যে ওকে বলবে, 'ঠিক সময়টাতে আসাকেই বলে পাঙ্কচুয়ালিটি ; কিন্তু ঘড়ির সময় ঠিক সময় নয় ; ঘড়ি সময়ের নম্বর জানে, তার মূল্য জানবে কী করে?'

অমিত বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলে, মেঘে আকাশটা ম্লান, আলোর চেহারাটা বেলা পাঁচটা-ছটার মতো। অমিত ঘড়ি দেখলে না, পাছে ঘড়িটা তার অভদ্র ইশারায় আকাশের প্রতিবাদ করে—যেমন বহুদিনের জ্বোরো রোগীর মা ছেলের গা একটু ঠাণ্ডা দেখে আর থার্মোমিটার মিলিয়ে দেখতে সাহস করে না। আজ অমিত এসেছিল নির্দিষ্ট সময়ের যথেষ্ট আগে। কারণ, দুরাশা নির্লজ্জ।

বারাণ্ডার যে কোণটায় বসে লাবণ্য তার ছাত্রীকে পড়ায়, রাস্তা দিয়ে আসতে সেটা চোখে পড়ে। আজ দেখলে সে জায়গাটা খালি। মন আনন্দে লাফিয়ে উঠল। এতক্ষণ পরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলে। এখনো তিনটে বেজে বিশ মিনিট। সেদিন ও লাবণ্যকে বলেছিল, 'নিয়মপালনটা মানুষের, অনিয়মটা দেবতার ; মর্তে আমরা নিয়মের সাধনা করি স্বর্গে অনিয়ম-অমৃতে অধিকার পাব বলেই। সেই স্বর্গ মাঝে মাঝে মর্তেই দেখা দেয়, তখন নিয়ম ভেঙে তাকে সেলাম করে নিতে হয়।' আশা হল, লাবণ্য নিয়ম-ভাঙার গৌরব বুঝেছে বা; লাবণ্যর মনের মধ্যে হঠাৎ আজ বুঝি কেমন করে বিশেষ দিনের স্পর্শ লেগেছে, সাধারণ দিনের বেড়া গেছে ভেঙে।

নিকটে এসে দেখে, যোগমায়া তাঁর ঘরের বাইরে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে, আর সিসি তার মুখের সিগারেট কেটির মুখের সিগারেট থেকে জ্বালিয়ে নিচ্ছে। অসম্মান যে ইচ্ছাকৃত তা বুঝতে বাকি রইল না। ট্যাবি-কুকুরটা তার প্রথম মৈত্রীর উচ্ছ্বাসে বাধা পেয়ে কেটির পায়ের কাছে শুয়ে একটু নিদ্রার চেষ্টা করছিল। অমিতর আগমনে তাকে সম্বর্ধনা করবার জন্যে আবার অসংযত হয়ে উঠল। সিসি আবার তাকে শাসনের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে এই সদ্‌ভাব-প্রকাশের প্রণালীটা এখানে সমাদৃত হবে না।

দুই সখীর প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে 'মাসি' বলে দূর থেকে ডেকেই অমিত যোগমায়ার পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিলে। এ সময়ে এমন করে প্রণাম করা তার প্রথার মধ্যে ছিল না। জিজ্ঞাসা করলে, 'মাসিমা, লাবণ্য কোথায়?'

'কী জানি বাছা, ঘরের মধ্যে কোথায় আছে।'

'এখনো তো তার পড়াবার সময় শেষ হয় নি।'

'বোধ হয় এঁরা আসাতে ছুটি নিয়ে ঘরে গেছে।'

'চলো, একবার দেখে আসি সে কী করছে।'

যোগমায়াকে নিয়ে অমিত ঘরে গেল। সম্মুখে যে আর কোনো সজীব পদার্থ আছে সেটা সম্পূর্ণই অস্বীকার কবলে।

সিসি একটু চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'অপমান! চলো কেটি, ঘরে যাই।'

কেটিও কম জ্বলে নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না দেখে সে যেতে চায় না।

সিসি বললে, 'কোনো ফল হবে না।'

কেটির বড়ো বড়ো চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল ; বললে, 'হতেই হবে ফল।'

আরো খানিকটা সময় গেল। সিসি আবার বললে, 'চলো ভাই, আর একটুও থাকতে ইচ্ছে করছে না।'

কেটি বারাণ্ডায় ধন্না দিয়ে বসে রইল। বললে, 'এইখান দিয়ে তাকে বেরোতেই তো হবে।'

অবশেষে বেরিয়ে এল অমিত, সঙ্গে নিয়ে এল লাবণ্যকে। লাবণ্যর মুখে একটি নির্লিপ্ত শান্তি। তাতে একটুও রাগ নেই, স্পর্ধা নেই, অভিমান নেই। যোগমায়া পিছনের ঘরেই ছিলেন, তাঁর বেরোবার ইচ্ছা ছিল না। অমিত তাঁকে ধরে নিয়ে এল। এক মুহূর্তের মধ্যেই কেটির চোখে পড়ল, লাবণ্যর হাতে আংটি। মাথায় রক্ত চন্‌ করে উঠল, লাল হয়ে উঠল দুই চোখ, পৃথিবীটাকে লাথি মারতে ইচ্ছে করল।

অমিত বললে, 'মাসি, এই আমার বোন শমিতা, বাবা বোধ হয় আমার নামের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নাম রেখেছিলেন কিন্তু রয়ে গেল অমিত্রাক্ষর। ইনি কেতকী, আমার বোনের বন্ধু।'

ইতিমধ্যে আর-এক উপদ্রব। সুরমার এক পোষা বিড়াল ঘর থেকে বেরিয়ে আসাতেই ট্যাবির কুক্কুরীয় নীতিতে সে এই স্পর্ধাটাকে যুদ্ধঘোষণার বৈধ কারণ বলেই গণ্য করলে। একবার অগ্রসর হয়ে তাকে ভর্ৎসনা করে, আবার বিড়ালের উদ্যত নখর ও ফোঁস্‌ফোঁসানিতে যুদ্ধের আশু ফল সম্বন্ধে সংশয়াপন্ন হয়ে ফিরে আসে; এমন অবস্থায় কিঞ্চিৎ দূর হতেই অহিংস্র গর্জননীতিই নিরাপদ বীরত্ব-প্রকাশের উপায় মনে করে অপরিমিত চীৎকার শুরু করে দিলে। বিড়ালটা তার কোনো প্রতিবাদ-না করে পিঠ ফুলিয়ে চলে গেল। এইবার কেটি সহ্য করতে পারলে না। প্রবল আক্রোশে কুকুরটাকে কান-মলা দিতে লাগল। এই কান-মলার অনেকটা অংশই নিজের ভাগ্যের উদ্দেশে। কুকুরটা কেঁই কেঁই স্বরে অসদ্‌ব্যবহার সম্বন্ধে তীব্র অভিমত জানালে। ভাগ্য নিঃশব্দে হাসল।

এই গোলমালটা একটু থামলে পর অমিত সিসিকে লক্ষ্য করে বললে, 'সিসি, এঁরই নাম

লাবণ্য। আমার কাছ থেকে এঁর নাম কখনো শোন নি, কিন্তু বোধ হচ্ছে আর-দশজনের কাছ থেকে শুনেছ। এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, কলকাতায়, অঘ্রান মাসে।'

কেটি মুখে হাসি টেনে আনতে দেরি করলে না। বললে, 'আই কন্‌গ্র্যাচুলেট। কমলালেবুর মধু পেতে বিশেষ বাধা হয় নি বলেই ঠেকছে; রাস্তা কঠিন নয়, মধু লাফ দিয়ে আপনি এগিয়ে এসেছে মুখের কাছে।'

সিসি তার স্বাভাবিক অভ্যাসমত হী হী করে হেসে উঠল।

লাবণ্য বুঝলে, কথাটায় খোঁচা আছে, কিন্তু মানেটা সম্পূর্ণ বুঝলে না।

অমিত তাকে বললে, 'আজ বেরোবার সময় এরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কোথায় যাচ্ছ'। আমি বলেছিলুম 'বন্য মধুর সন্ধানে'। তাই এরা হাসছে। ওটা আমারই দোষ; আমার কোন্ কথাটা যে হাসির নয় লোকে সেটা ঠাওরাতে পারে না।'

কেটি শান্ত স্বরেই বললে, 'কমলালেবুর মধু নিয়ে তোমার তো জিত হল, এবার আমারও যাতে হার না হয় সেটা করো।'

'কী করতে হবে বলো।'

'নরেনের সঙ্গে আমার একটা বাজি আছে। সে বলেছিল, জেন্টল্‌ম্যান্‌রা যেখানে যায় কেউ সেখানে তোমাকে নিয়ে যেতে পারে না, কিছুতেই তুমি রেস দেখতে যাবে না। আমি আমার এই হীরের আংটি বাজি রেখে বলেছিলুম, তোমাকে রেসে নিয়ে যাবই। এ দেশে যত ঝর্না, যত মধুর দোকান আছে, সব সন্ধান করে শেষকালে এখানে এসে তোমার দেখা পেলুম। বলো-না ভাই সিসি, কত ফিরতে হয়েছে বুনো হাঁস শিকারের চেষ্টায়, ইংরেজিতে যাকে বলে wild goose।'

সিসি কোনো কথা না বলে হাসতে লাগল। কেটি বললে, 'মনে পড়ছে সেই গল্পটা, একদিন তোমার কাছেই শুনেছি অমিট। কোন্ পার্সিয়ান ফিলজফার তার পাগড়িচোরের সন্ধান না পেয়ে শেষে গোরস্থানে এসে বসেছিল। বলেছিল পালাবে কোথায়? মিস্ লাবণ্য যখন বলেছিলেন ওকে চেনেন না, আমাকে ধোঁকা লাগিয়ে দিয়েছিল ; কিন্তু আমার মন বললে ঘুরে ফিরে ওকে ওর এই গোরস্থানে আসতেই হবে।'

সিসি উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

কেটি লাবণ্যকে বললে, 'অমিট আপনার নাম মুখে আনলে না, মধুর ভাষাতে ঘুরিয়ে বললে কমলালেবুর মধু ; আপনার বুদ্ধি খুবই বেশি সরল, ঘুরিয়ে বলবার কৌশল মুখে জোগায় না, ফস করে বলে ফেললেন অমিটকে জানেনই না। তবু সান্‌ডে-স্কুলের বিধানমত ফল ফলল না, দণ্ডদাতা আপনাদের কোনো দণ্ডই দিলেন না, শক্ত পথের মধুও একজন এক চুমুকেই খেয়ে নিলেন, আর অজানাকেও একজন এক দৃষ্টিতে জানলেন—এখন কেবল আমার ভাগ্যেই হার হবে? দেখো তো সিসি, কী অন্যায়!'

সিসির আবার সেই উচ্চহাসি। ট্যাবি-কুকুরটাও এই উচ্ছ্বাসে যোগ দেওয়া তার সামাজিক কর্তব্য মনে করে বিচলিত হবার লক্ষণ দেখালে। তৃতীয়বার তাকে দমন করা হল।

কেটি বললে, 'অমিট, তুমি জান, এই হীরের আংটি যদি হারি জগতে আমার সান্ত্বনা থাকবে না। এ আংটি একদিন তুমিই দিয়েছিলে। এই মুহূর্তে হাত থেকে খুলি নি, এ আমার দেহের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শেষকালে আজ এই শিলঙ পাহাড়ে কি একে বাজিতে খোওয়াতে হবে?'

সিসি বললে, 'বাজি রাখতে গেলে কেন ভাই!'

'মনে মনে নিজের উপর অহংকার ছিল, আর মানুষের উপর ছিল বিশ্বাস। অহংকার ভাঙল, এবারকার মতো আমার রেস ফুরোল, আমারই হার। মনে হচ্ছে অমিটকে আর রাজি করতে পারব না। তা, এমন অদ্ভুত করেই যদি হারাবে সেদিন এত আদরে আংটি দিয়েছিলে কেন? সে দেওয়ার মধ্যে কি কোনো বাঁধন ছিল না? এই দেওয়ার মধ্যে কি কথা ছিল না যে, আমার অপমান কোনোদিন তুমি ঘটতে দেবে না?'

বলতে বলতে কেটির গলা ভার হয়ে এল, অনেক কষ্টে চোখের জল সামলে নিলে।

আজ সাত বৎসর হয়ে গেল, কেটির বয়স তখন আঠারো। সেদিন এই আংটি অমিত নিজের আঙুল থেকে খুলে ওকে পরিয়ে দিয়েছিল। তখন ওরা দুজনেই ছিল ইংলণ্ডে। অক্স্‌ফোর্ডে একজন পাঞ্জাবি যুবক ছিল কেটির প্রণয়মুগ্ধ। সেদিন আপসে অমিত সেই পাঞ্জাবির সঙ্গে নদীতে বাচ খেলেছিল। অমিতরই হল জিত। জুন মাসের জ্যোৎস্নায় সমস্ত আকাশ যেন কথা বলে উঠেছিল, মাঠে মাঠে ফুলের প্রচুর বৈচিত্র্যে ধরণী তার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। সেই ক্ষণে অমিত কেটির হাতে আংটি পরিয়ে দিলে ; তার মধ্যে অনেক কথাই উহ্য ছিল, কিন্তু কোনো কথাই গোপন ছিল না। সেদিন কেটির মুখে প্রসাধনের প্রলেপ লাগে নি, তার হাসিটি সহজ ছিল, ভাবের আবেগে তার মুখ রক্তিম হতে বাধা পেত না। আংটি হাতে পরা হলে অমিত তার কানে কানে বলেছিল—

Tender is the night
And haply the queen moon
is on her throne.

কেটি তখন বেশি কথা বলতে শেখে নি। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কেবল যেন মনে মনে বলেছিল 'মন্‌আমী', ফরাসি ভাষায়, যার মানে হচ্ছে 'বঁধু'।

আজ অমিতর মুখেও জবাব বেধে গেল। ভেবে পেলে না কী বলবে।

কেটি বললে, 'বাজিতে যদিই হাবলুম তবে আমার এই চিরদিনের হারের চিহ্ন তোমার কাছেই থাক্ অমিট। আমার হাতে রেখে একে আমি মিথ্যে কথা বলতে দেব না।'

ব'লে আংটি খুলে টেবিলটার উপর রেখেই দ্রুতবেগে চ'লে গেল। এনামেল-করা মুখের উপর দিয়ে দর দর করে চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৬
মুক্তি

একটি ছোটো চিঠি এল লাবণ্যর হাতে, শোভনলালের লেখা—

শিলঙে কাল রাত্রে এসেছি। যদি দেখা করতে অনুমতি দাও তবে দেখতে যাব। না যদি দাও কালই ফিরব। তোমার কাছে শাস্তি পেয়েছি, কিন্তু কবে কী অপরাধ করেছি আজ পর্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝতে পারি নি। আজ এসেছি তোমার কাছে সেই কথাটি শোনবার জন্যে, নইলে মনে শান্তি পাই নে। ভয় কোরো না। আমার আর-কোনো প্রার্থনা নেই।

লাবণ্যর চোখ জলে ভরে এল। মুছে ফেললে ; চুপ করে বসে ফিরে তাকিয়ে রইল নিজের অতীতের দিকে। যে অঙ্কুরটা বড়ো হয়ে উঠতে পারত, অথচ যেটাকে চেপে দিয়েছে, বাড়তে দেয় নি, তার সেই কচিবেলাকার করুণ ভীরুতা ওর মনে এল। এতদিনে সে ওর সমস্ত জীবনকে অধিকার করে তাকে সফল করতে পারত। কিন্তু সেদিন ওর ছিল জ্ঞানের গর্ব, বিদ্যার একনিষ্ঠ সাধনা, উদ্ধত স্বাতন্ত্র্যবোধ। সেদিন আপন বাপের মুগ্ধতা দেখে ভালোবাসাকে দুর্বলতা বলে মনে মনে ধিক্‌কার দিয়েছে। ভালোবাসা আজ তার শোধ নিলে, অভিমান হল ধূলিসাৎ। সেদিন যা সহজে হতে পারত নিশ্বাসের মতো, সরল হাসির মতো, আজ তা কঠিন হয়ে উঠল ; সেদিনকার জীবনের সেই অতিথিকে

দু হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে আজ বাধা পড়ে, তাকে ত্যাগ করতে বুক ফেটে যায়। মনে পড়ল অপমানিত শোভনলালের সেই কুণ্ঠিত ব্যথিত মূর্তি। তার পরে কতদিন গেছে, যুবকের সেই প্রত্যাখ্যাত ভালোবাসা এতদিন কোন্ অমৃতে বেঁচে রইল? আপনারই আন্তরিক মাহাত্ম্যে।

লাবণ্য চিঠিতে লিখলে—

তুমি আমার সকলের বড়ো বন্ধু। এ বন্ধুত্বের পুরো দাম দিতে পারি এমন ধন আজ আমার হাতে নেই। তুমি কোনোদিন দাম চাও নি ; আজও তোমার যা দেবার জিনিস তাই দিতে এসেছ কিছুই দাবি না ক'রে! চাই নে বলে ফিরিয়ে দিতে পারি এমন শক্তি নেই আমার, এমন অহংকারও নেই।

চিঠিটা লিখে পাঠিয়ে দিয়েছে এমন সময় অমিত এসে বললে, 'বন্যা, চলো আজ দুজনে একবার বেড়িয়ে আসি গে।'

অমিত ভয়ে-ভয়েই বলেছিল ; ভেবেছিল লাবণ্য আজ হয়তো যেতে রাজি হবে না।

লাবণ্য সহজেই বললে, 'চলো।'

দুজনে বেরোল। অমিত কিছু দ্বিধার সঙ্গেই লাবণ্যর হাতটিকে হাতের মধ্যে নেবার চেষ্টা করলে। লাবণ্য একটুও বাধা না দিয়ে হাত ধরতে দিলে। অমিত হাতটি একটু জোরে চেপে ধরলে, তাতেই মনের কথা যেটুকু ব্যক্ত হয় তার বেশি কিছু মুখে এল না। চলতে চলতে সেদিনকার সেই জায়গাতে এল যেখানে বনের মধ্যে হঠাৎ একটুখানি ফাঁক। একটি তরুশূন্য পাহাড়ের শিখরের উপর সূর্য আপনার শেষ স্পর্শ ঠেকিয়ে নেমে গেল। অতি সুকুমার সবুজের আভা আস্তে আস্তে সুকোমল নীলে গেল মিলিয়ে। দুজনে থেমে সে দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল।

লাবণ্য আস্তে আস্তে বললে, 'একদিন একজনকে যে আংটি পরিয়েছিল, আমাকে দিয়ে আজ সে আংটি খোলালে কেন?'

অমিত ব্যথিত হয়ে বললে, 'তোমাকে সব কথা বোঝাব কেমন করে বন্যা? সেদিন যাকে আংটি পরিয়েছিলুম আর যে আজ সেটা খুলে দিলে তারা দুজনে কি একই মানুষ?'

লাবণ্য বললে, 'তাদের মধ্যে একজন সৃষ্টিকর্তার আদরে তৈরি, আর-একজন তোমার অনাদরে গড়া।'

অমিত বললে, 'কথাটা সম্পূর্ণ ঠিক নয়। যে আঘাতে আজকের কেটি তৈরি, তার দায়িত্ব কেবল আমার একলার নয়।'

'কিন্তু মিতা, নিজেকে যে একদিন সম্পূর্ণ তোমার হাতে উৎসর্গ করেছিল তাকে তুমি আপনার করে রাখলে না কেন? যে কারণেই হোক, আগে তোমার মুঠো আলগা হয়েছে, তার পরে দশের মুঠোর চাপ পড়েছে ওর উপরে, ওর মূর্তি গেছে বদলে। তোমার মন একদিন হারিয়েছে বলেই দশের মনের মতো করে নিজেকে সাজাতে বসল। আজ তো দেখি ও বিলিতি দোকানের পুতুলের মতো ; সেটা সম্ভব হত না যদি ওর হৃদয় বেঁচে থাকত। থাক্ গে ও-সব কথা। তোমার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে। রাখতে হবে।'

'বলো, নিশ্চয় রাখব।'

'অন্তত হপ্তাখানেকের জন্যে তোমার দলকে নিয়ে তুমি চেরাপুঞ্জিতে বেড়িয়ে এসো। ওকে আনন্দ দিতে নাও যদি পারো, ওকে আমোদ দিতে পারবে।'

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'আচ্ছা।'

তার পরে লাবণ্য অমিতর বুকে মাথা রেখে বললে, 'একটা কথা তোমাকে বলি মিতা, আর কোনোদিন বলব না। তোমার সঙ্গে আমার যে অন্তরের সম্বন্ধ তা নিয়ে তোমার লেশমাত্র দায় নেই। আমি রাগ করে বলছি নে, আমার সমস্ত ভালোবাসা দিয়েই বলছি, আমাকে তুমি আংটি

দিয়ো না, কোনো চিহ্ন রাখবার কিছু দরকার নেই। আমার প্রেম থাক্ নিরঞ্জন—বাইরের রেখা, বাইরের ছায়া তাতে পড়বে না।'

এই বলে নিজের আঙুলের থেকে আংটি খুলে অমিতর আঙুলে আস্তে আস্তে পরিয়ে দিলে। অমিত তাতে কোনো বাধা দিলে না।

সায়াহ্নের এই পৃথিবী যেমন অন্তরশ্মি-উদ্‌ভাসিত আকাশের দিকে নিঃশব্দে আপন মুখ তুলে ধরেছে, তেমন নীরবে, তেমনি শান্ত দীপ্তিতে লাবণ্য আপন মুখ তুলে ধরলে, অমিতর নত মুখের দিকে।

সাত দিন যেতেই অমিত ফিরে যোগমায়ার সেই বাসায় গেল। ঘর বন্ধ, সবাই চলে গেছে। কোথায় গেছে তার কোনো ঠিকানা রেখে যায় নি।

সেই য়ুক্যালিপ্‌টাস্ গাছের তলায় অমিত এসে দাঁড়াল, খনিকক্ষণ ধরে শূন্যমনে সেইখানে ঘুরে বেড়ালে। পরিচিত মালী এসে সেলাম করে জিজ্ঞাসা করলে, 'ঘর খুলে দেব কি? ভিতরে বসবেন?'

অমিত একটু দ্বিধা করে বললে, 'হাঁ।'

ভিতরে গিয়ে লাবণ্যর বসবার ঘরে গেল। চৌকি টেবিল শেল্‌ফ্ আছে, সেই বইগুলি নেই। মেজের উপর দুই-একটা ছেঁড়া শূন্য লেফাফা, তার উপরে অজানা হাতের অক্ষরে লাবণ্যর নাম ও ঠিকানা লেখা ; দু-চারটে ব্যবহার-করা পরিত্যক্ত নিব এবং ক্ষয়প্রাপ্ত একটি অতি ছোটো পেন্‌সিল টেবিলের উপরে। পেন্‌সিলটি পকেটে নিলে। এর পাশেই শোবার ঘর। লোহার খাটে কেবল একটা গদি, আর আয়নার টেবিলে একটা শূন্য তেলের শিশি। দুই হাতে মাথা রেখে অমিত সেই গদির উপরে শুয়ে পড়ল, লোহার খাটটা শব্দ করে উঠল। সেই ঘরটার মধ্যে বোবা একটা শূন্যতা। তাকে প্রশ্ন করলে কোনো কথাই বলতে পারে না। সে একটা মূর্ছা, যে মূর্ছা কোনোদিনই আর ভাঙবে না।

তার পরে শরীর-মনের উপর একটা নিরুদ্যমের বোঝা বহন করে অমিত গেল নিজের কুটিরে। যা যেমন রেখে গিয়েছিল তেমনিই সব আছে। এমন-কি, যোগমায়া তাঁর কেদারাটিও ফিরিয়ে নিয়ে যান নি। বুঝলে, তিনি স্নেহ ক'রেই এই চৌকিটি তাকে দিয়ে গেছেন; মনে হল যেন শুনতে পেলে শান্ত মধুর স্বরে তাঁর সেই আহ্বান—'বাছা।' সেই চৌকির সামনে মাথা লুটিয়ে অমিত প্রণাম করলে।

সমস্ত শিলঙ পাহাড়ের শ্রী আজ চলে গেছে। অমিত কোথাও আর সান্ত্বনা পেল না।

১৭
শেষের কবিতা

কোলকাতার কলেজে পড়ে যতিশংকর। থাকে কলুটোলা প্রেসিডেন্‌সি কলেজের মেসে। অমিত তাকে প্রায় বাড়িতে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, তার সঙ্গে নানা বই পড়ে, নানা অদ্ভুত কথায় তার মনটাকে চমকিয়ে দেয়, মোটরে ক'রে তাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসে।

তার পর কিছুকাল যতিশংকর অমিতর কোনো নিশ্চিত খবর পায় না। কখনো শোনে সে নৈনিতালে, কখনো উটকামণ্ডে। একদিন শুনলে, অমিতর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বলছে, সে আজকাল কেটি মিত্তিরের বাইরেকার রঙটা ঘোচাতে উঠেপড়ে লেগেছে। কাজ পেয়েছে মনের মতো, বর্ণান্তর করা। এতদিন অমিত মূর্তি গড়বার শখ মেটাত কথা দিয়ে, আজ পেয়েছে সজীব মানুষ। সে মানুষটিও একে একে আপন উপরকার রঙিন পাপড়িগুলো খসাতে রাজি, চরমে ফল ধরবে আশা করে। অমিতর

বোন লিসি নাকি বলছে যে, কেটিকে একেবারে চেনাই যায় না, অর্থাৎ তাকে নাকি বড্ডো বেশি স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। বন্ধুদের সে বলে দিয়েছে তাকে কেতকী বলে ডাকতে। এটা তার পক্ষে নির্লজ্জতা, যে মেয়ে একদা ফিন্‌ফিনে শান্তিপুরে শাড়ি পরত সেই লজ্জাবতীর পক্ষে জামা-শেমিজ পরারই মতো। অমিত তাকে নাকি নিভৃতে ডাকে কেয়া ব'লে। এ কথাও লোকে কানাকানি করছে যে, নৈনিতালের সরোবরে নৌকো ভাসিয়ে কেটি তার হাল ধরেছে, আর অমিত তাকে পড়ে শোনাচ্ছে রবি ঠাকুরের 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'। কিন্তু, লোকে কী না বলে? যতিশংকর বুঝে নিলে, অমিতর মনটা পাল তুলে চলে গেছে ছুটিতত্ত্বের মাঝদরিয়ায়।

অবশেষে অমিত ফিরে এল। শহরে রাষ্ট্র, কেতকীর সঙ্গে তার বিয়ে। অথচ অমিতর নিজ মুখে একদিনও যতি এ প্রসঙ্গ শোনে নি। অমিতর ব্যবহারেও অনেকখানি বদল ঘটেছে। পূর্বের মতোই যতিকে অমিত ইংরেজি বই কিনে উপহার দেয়, কিন্তু তাকে নিয়ে সন্ধেবেলায় সে-সব বইয়ের আলোচনা করে না ; যতি বুঝতে পারে, আলোচনার ধারাটা এখন বইছে এক নতুন খাদে। আজকাল মোটরে বেড়াতে সে যতিকে ডাক পাড়ে না। যতির বয়সে এ কথা বোঝা কঠিন নয় যে, অমিতর 'নিরুদ্দেশ-যাত্রা'র পার্টিতে তৃতীয় ব্যক্তির জায়গা হওয়া অসম্ভব।

যতি আর থাকতে পারলে না। অমিতকে নিজেই গায়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'অমিতদা, শুনলুম মিস্ কেতকী মিত্রের সঙ্গে তোমার বিয়ে!'

অমিত একটুখানি চুপ করে থেকে বললে, 'লাবণ্য কি এ খবর জেনেছে?'

'না, আমি তাকে লিখি নি। তোমার মুখে পাকা খবর পাই নি বলে চুপ করে আছি।'

'খবরটা সত্যি, কিন্তু লাবণ্য হয়তো-বা ভুল বুঝবে।'

যতি হেসে বললে, 'এর মধ্যে ভুল বোঝবার জায়গা কোথায়? বিয়ে কর যদি তো বিয়েই করবে, সোজা কথা!'

'দেখো যতি, মানুষের কোনো কথাটাই সোজা নয়। আমরা ডিক্‌শনারিতে যে কথার এক মানে বেঁধে দিই, মানব-জীবনের মধ্যে মানেটা সাতখানা হয়ে যায় সমুদ্রের কাছে এসে গঙ্গার মতো।'

যতি বললে, 'অর্থাৎ, তুমি বলছ বিবাহ মানে বিবাহ নয়?'

'আমি বলছি বিবাহের হাজারখানা মানে। মানুষের সঙ্গে মিশে তার মানে হয়, মানুষকে বাদ দিয়ে তার মানে বের করতে গেলেই ধাঁধা লাগে।'

'তোমার বিশেষ মানেটাই বলো-না।'

'সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায় না, জীবন দিয়ে বলতে হয়। যদি বলি ওর মূল মানেটা ভালোবাসা তা হলেও আর-একটা কথায় গিয়ে পড়ব ; ভালোবাসা কথাটা বিবাহ কথার চেয়ে আরো বেশি জ্যান্ত।'

'তা হলে, অমিতদা, কথা বন্ধ করতে হয় যে। কথা কাঁধে নিয়ে মানের পিছন পিছন ছুটব, আর মানেটা বাঁয়ে তাড়া করলে ডাইনে আর ডাইনে তাড়া করলে বাঁয়ে মারবে দৌড়, এমন হলে তো কাজ চলে না।'

'ভায়া, মন্দ বল নি। আমার সঙ্গে থেকে তোমার মুখ ফুটেছে। সংসারে কোনোমতে কাজ চালাতেই হবে, তাই কথার নেহাত দরকার। যে-সব সত্যকে কথার মধ্যে কুলোয় না, ব্যবহারের হাটে তাদেরই ছাঁটি, কথাটাকেই জাহির করি। উপায় কী? তাতে বোঝাপড়াটা ঠিক না হোক, চোখ বুজে কাজ চালিয়ে নেওয়া যায়।'

'তবে কি আজকের কথাটাকে একেবারে খতম করতে হবে?'

'এই আলোচনাটা যদি নিতান্তই জ্ঞানের গরজে হয়, প্রাণের গরজে না হয়, তা হলে খতম করতে দোষ নেই।'

'ধরে নাও-না প্রাণের গরজেই।'

'শাবাশ, তবে শোনো।'

এইখানে একটু পাদটীকা লাগালে দোষ নেই। অমিতর ছোটো বোন লিসির স্বহস্তে ঢালা চা যতি আজকাল মাঝে মাঝে প্রায়ই পান করে আসছে। অনুমান করা যেতে পারে যে, সেই কারণেই ওর মনে কিছুমাত্র ক্ষোভ নেই যে, অমিত ওর সঙ্গে অপরাহ্নে সাহিত্যালোচনা এবং সায়াহ্নে মোটরে করে বেড়ানো বন্ধ করেছে। অমিতকে ও সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছে।

অমিত বললে, 'অক্সিজেন এক ভাবে বয় হাওয়ায় অদৃশ্য থেকে, সে না হলে প্রাণ বাঁচে না; আবার অক্সিজেন আর-এক ভাবে কয়লার সঙ্গে যোগে জ্বলতে থাকে, সেই আগুন জীবনের নানা কাজে দরকার—দুটোর কোনোটাকেই বাদ দেওয়া চলে না। এখন বুঝতে পেরেছ?'

'সম্পূর্ণ না, তবে কিনা বোঝবার ইচ্ছে আছে।'

'যে ভালোবাসা ব্যাপ্তভাবে আকাশে মুক্ত থাকে অন্তরের মধ্যে সে দেয় সঙ্গ ; যে ভালোবাসা বিশেষভাবে প্রতিদিনের সব-কিছুতে যুক্ত হয়ে থাকে সংসারে সে দেয় আসঙ্গ। দুটোই আমি চাই।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝছি কি না সেইটেই বুঝতে পারি নে। আর-একটু স্পষ্ট করে বলো অমিতদা।'

অমিত বললে, 'একদিন আমার সমস্ত ডানা মেলে পেয়েছিলুম আমার ওড়ার আকাশ; আজ আমি পেয়েছি আমার ছোট্টো বাসা, ডানা গুটিয়ে বসেছি। কিন্তু আমার আকাশও রইল।'

'কিন্তু বিবাহে তোমার ঐ সঙ্গ-আসঙ্গ কি একত্রেই মিলতে পারে না?'

'জীবনে অনেক সুযোগ ঘটতে পারে, কিন্তু ঘটে না। যে মানুষ অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা একসঙ্গেই মিলিয়ে পায় তার ভাগ্য ভালো; যে তা না পায়, দৈবক্রমে তার যদি ডান দিক থেকে মেলে রাজত্ব আর বাঁ দিক থেকে মেলে রাজকন্যা, সেও বড়ো কম সৌভাগ্য নয়।'

'কিন্তু তুমি যাকে মনে কর রোম্যান্‌স্‌ সেইটেতে কমতি পড়ে! একটুও না। গল্পের বই থেকেই রোম্যান্‌সের বাঁধা বরাদ্দ ছাঁচে ঢালাই করে জোগাতে হবে নাকি? কিছুতেই না। আমার রোম্যান্‌স্‌ আমিই সৃষ্টি করব। আমার স্বর্গেও রয়ে গেল রোম্যান্‌স্‌, আমার মর্তেও ঘটাব রোম্যান্‌স্‌। যারা ওর একটাকে বাঁচাতে গিয়ে আব-একটাকে দেউলে করে দেয় তাদেরই তুমি বল রোম্যান্টিক! তারা হয় মাছের মতো জলে সাঁতার দেয়, নয় বেড়ালের মতো ডাঙায় বেড়ায়, নয় বাদুড়ের মতো আকাশে ফেরে। আমি রোম্যান্‌সের পরমহংস। ভালোবাসার সত্যকে আমি একই শক্তিতে জলে-স্থলেও উপলব্ধি করব, আবাব আকাশেও। নদীর চরে রইল আমার পাকা দখল. আবার মানসের দিকে যখন যাত্রা করব সেটা হবে আকাশের ফাঁকা রাস্তায়। জয় হোক আমার লাবণ্যর, জয় হোক আমার কেতকীর, আর সব দিক থেকেই ধন্য হোক অমিত রায়।'

যতি স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, বোধ করি কথাটা তার ঠিক লাগল না। অমিত তার মুখ দেখে ঈষৎ হেসে বললে, 'দেখো ভাই, সব কথা সকলের নয়। আমি যা বলছি হয়তো সেটা আমারই কথা। সেটাকে তোমার কথা বলে বুঝতে গেলেই ভুল বুঝবে, আমাকে গাল দিয়ে বসবে। একের কথার উপর আরেক মানে চাপিয়েই পৃথিবীতে মারামারি খুনোখুনি হয়। এবার আমার নিজের কথাটা স্পষ্ট করেই নাহয় তোমাকে বলি। রূপক দিয়েই বলতে হবে, নইলে এ-সব কথার রূপ চলে যায়, কথাগুলো লজ্জিত হয়ে ওঠে। কেতকীর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ ভালোবাসারই; কিন্তু সে যেন ঘড়ায়-তোলা জল, প্রতিদিন তুলব, প্রতিদিন ব্যবহার করব। আর লাবণ্যর সঙ্গে আমার যে ভালোবাসা সে রইল দিঘি; সে ঘরে আনবার নয়, আমার মন তাতে সাঁতার দেবে।'

যতি একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'কিন্তু অমিতদা, দুটোর মধ্যে একটাকেই কি বেছে নিতে হয় না?'

'যার হয় তারই হয়, আমার হয় না।'

'কিন্তু, শ্রীমতী কেতকী যদি—'

'তিনি সব জানেন। সম্পূর্ণ বোঝেন কি না বলতে পারি নে। কিন্তু সমস্ত জীবন দিয়ে এইটেই তাঁকে বোঝাব যে, তাঁকে কোথাও ফাঁকি দিচ্ছি নে। এও তাঁকে বুঝতে হবে যে লাবণ্যর কাছে তিনি ঋণী।'

'তা হোক, শ্রীমতী লাবণ্যকে তো তোমার বিয়ের খবর জানাতে হবে।'

'নিশ্চয় জানাব। কিন্তু তার আগে একটি চিঠি দিতে চাই, সেটি তুমি পৌঁছিয়ে দেবে?'

'দেব?'

অমিতর এই চিঠি—

সেদিন সন্ধেবেলায় রাস্তার শেষে এসে যখন দাঁড়ালুম, কবিতা দিয়ে যাত্রা শেষ করেছি। আজও এসে থামলুম একটা রাস্তার শেষে। এই মুহূর্তটির উপর একটি কবিতা রেখে যেতে চাই। আর-কোনো কথার ভার সইবে না। হতভাগা নিবারণ চক্রবর্তীটা যেদিন ধরা পড়েছে সেদিন মরেছে, অতি শৌখিন জলচর মাছের মতো। তাই উপায় না দেখে তোমারই কবির উপর ভার দিলুম আমার শেষ কথাটা তোমাকে জানাবার জন্যে—

তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন,
অন্তরে অলক্ষ্যলোকে তোমার অন্তিম আগমন।
লভিয়াছি চিরস্পর্শমণি,
আমার শূন্যতা তুমি পূর্ণ করি গিয়েছ আপনি।
জীবন আঁধার হল সেইক্ষণে পাইনু সন্ধান
সন্ধ্যার দেউলদীপ চিত্তের মন্দিরে তব দান।
বিচ্ছেদের হোমবহ্নি হতে
পূজামূর্তি ধরি প্রেম দেখা দিল দুঃখের আলোতে।

মিতা

তার পরেও আরো কিছুকাল গেল। সেদিন কেতকী গেছে তার বোনের মেয়ের অন্নপ্রাশনে। অমিত গেল না। আরামকেদারায় বসে সামনে চৌকিতে পা-দুটো তুলে দিয়ে বিলিয়ম জেম্‌সের পত্রাবলী পড়ছে। এমন সময় যতিশংকর লাবণ্যর লেখা এক চিঠি তার হাতে দিলে। চিঠির এক পাতে শোভলালের সঙ্গে লাবণ্যর বিবাহের খবর। বিবাহ হবে ছ মাস পরে, জ্যৈষ্ঠ মাসে, রামগড়পর্বতের শিখরে। অপর পাতে—

কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃদয়স্পন্দন—
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষ-ফাটা তারার ক্রন্দন।
ওগো বন্ধু,
সেই ধাবমান কাল
জড়ায়ে ধরিল মোরে ফেলি তার জাল—
তুলি নিল দ্রুতরথে

দুঃসাহসী ভ্রমণের পথে
তোমা হতে বহু দূরে।
মনে হয় অজস্র মৃত্যুরে
পার হয়ে আসিলাম
আজি নবপ্রভাতের শিখরচূড়ায়;
রথের চঞ্চল বেগ হাওয়ায় উড়ায়
আমার পুরানো নাম।
ফিরিবার পথ নাহি;
দূর হতে যদি দেখ চাহি
পারিবে না চিনিতে আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

কোনোদিন কর্মহীন পূর্ণ অবকাশে
বসন্তবাতাসে
অতীতের তীর হতে যে রাত্রে বহিবে দীর্ঘশ্বাস,
ঝরা বকুলের কান্না ব্যথিবে আকাশ,
সেইক্ষণে খুঁজে দেখো, কিছু মোর পিছে রহিল সে
তোমার প্রাণের প্রান্তে; বিস্মৃতিপ্রদোষে
হয়তো দিবে সে জ্যোতি,
হয়তো ধরিবে কভু নামহারা স্বপ্নের মুরতি।
তবু সে তো স্বপ্ন নয়,
সব চেয়ে সত্য মোর, সেই মৃত্যুঞ্জয়—
সে আমার প্রেম।
তারে আমি রাখিয়া এলেম
অপরিবর্তন অর্ঘ্য তোমার উদ্দেশে।
পরিবর্তনের স্রোতে আমি যাই ভেসে
কালের যাত্রায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

তোমার হয় নি কোনো ক্ষতি।
মর্তের মৃত্তিকা মোর, তাই দিয়ে অমৃতমুরতি
যদি সৃষ্টি ক'রে থাক, তাহারি আরতি
হোক তব সন্ধ্যাবেলা—
পূজার সে খেলা
ব্যাঘাত পাবে না মোর প্রত্যহের ম্লানস্পর্শ লেগে;
তৃষার্ত আবেগবেগে
ভ্রষ্ট নাহি হবে তার কোনো ফুল নৈবেদ্যের থালে।
তোমার মানস ভোজে সযত্নে সাজালে

যে ভাবরসের পাত্র বাণীর তৃষায়
তার সাথে দিব না মিশায়ে
যা মোর ধূলির ধন, যা মোর চক্ষের জলে ভিজে।
আজও তুমি নিজে
হয়তো-বা করিবে রচন
মোর স্মৃতিটুকু দিয়ে স্বপ্নাবিষ্ট তোমার বচন।
ভার তার না রহিবে, না রহিবে দায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

মোর লাগি করিয়ো না শোক—
আমার রয়েছে কর্ম, আমার রয়েছে বিশ্বলোক।
মোর পাত্র রিক্ত হয় নাই,
শূন্যেরে করিব পূর্ণ, এই ব্রত বহিব সদাই।
উৎকণ্ঠ আমার লাগি কেহ যদি প্রতীক্ষিয়া থাকে
সেই ধন্য করিবে আমাকে।
শুক্লপক্ষ হতে আনি
রজনীগন্ধার বৃন্তখানি
যে পারে সাজাতে
অর্ঘ্যথালা কৃষ্ণপক্ষ রাতে,
যে আমারে দেখিবারে পায়
অসীম ক্ষমায়
ভালোমন্দ মিলায়ে সকলি,
এবার পূজায় তারি আপনারে দিতে চাই বলি।
তোমারে যা দিয়েছিনু তার
পেয়েছ নিঃশেষ অধিকার।
হেথা মোর তিলে তিলে দান,
করুণ মুহূর্তগুলি গণ্ডূষ ভরিয়া করে পান
হৃদয়-অঞ্জলি হতে মম।
ওগো তুমি নিরুপম,
হে ঐশ্বর্যবান,
তোমারে যা দিয়েছিনু সে তোমারি দান;
গ্রহণ করেছ যত ঋণী তত করেছ আমায়।
হে বন্ধু, বিদায়।

বন্যা

২৫ জুন ১৯২৮
ব্যাঙ্গালোর। বাঙ্গালোর

পরিণীতা

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

শক্তিশেল বুকে পড়িবার সময় লক্ষ্মণের মুখের ভাব নিশ্চয় খুব খারাপ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গুরুচরণের চেহারাটা বোধ করি তার চেয়েও মন্দ দেখাইল—যখন প্রত্যুষেই অন্তঃপুর হইতে সংবাদ পৌঁছিল, গৃহিণী এইমাত্র নির্বিঘ্নে পঞ্চম কন্যার জন্মদান করিয়াছেন।

গুরুচরণ ষাট টাকা বেতনের ব্যাঙ্কের কেরানী। সুতরাং দেহটিও যেমন ঠিকাগাড়ির ঘোড়ার মত শুষ্ক শীর্ণ, চোখেমুখেও তেমনি তাহাদেরি মত একটা নিষ্কাম নির্বিকার নির্লিপ্ত ভাব। তথাপি এই ভয়ঙ্কর শুভ-সংবাদে আজ তাঁহার হাতের হুঁকাটা হাতেই রহিল, তিনি জীর্ণ পৈতৃক তাকিয়াটা ঠেস দিয়া বসিলেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিবারও আর তাঁহার জোর রহিল না।

শুভ সংবাদ বহিয়া আনিয়াছিল তাঁহার তৃতীয় কন্যা দশমবর্ষীয়া আন্নাকালী। সে বলিল, বাবা, চল না দেখবে।

গুরুচরণ মেয়ের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, মা, এক গেলাস জল আন ত খাই।

মেয়ে জল আনিতে গেল। সে চলিয়া গেলে, গুরুচরণের সর্বাগ্রে মনে পড়িল সূতিকাগৃহের রকমারি খরচের কথা। তার পরে, ভিড়ের দিনে স্টেশনে গাড়ি আসিলে দোর খোলা পাইলে থার্ড ক্লাসের যাত্রীরা পোঁটলা-পোঁটলি লইয়া পাগলের মত যেভাবে লোকজনকে দলিত পিষ্ট করিয়া ঝাঁপাইয়া আসিতে থাকে, তেমনি মার-মার শব্দ করিয়া তাঁহার মগজের মধ্যে দুশ্চিন্তারাশি হুহু করিয়া ঢুকিতে লাগিল। মনে পড়িল, গত বৎসর তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যার শুভ-বিবাহে বৌবাজারের এই দ্বিতল ভদ্রাসনটুকু বাঁধা পড়িয়াছে এবং তাহারও ছয় মাসের সুদ বাকী। দুর্গাপূজার আর মাসখানেক মাত্র বিলম্ব আছে—মেজমেয়ের ওখানে তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। অফিসে কাল রাত্রি আটটা পর্যন্ত ডেবিট ক্রেডিট মিলে নাই, আজ বেলা বারোটার মধ্যে বিলাতে হিসাব পাঠাইতে হইবে। কাল বড়সাহেব হুকুম জারি করিয়াছেন, ময়লা বস্ত্র পরিয়া কেহ অফিসে ঢুকিতে পারিবে না, ফাইন হইবে, অথচ গত সপ্তাহ হইতে রজকের সন্ধান মিলিতেছে না, সংসারের অর্ধেক কাপড়-চোপড় লইয়া সে বোধ করি নিরুদ্দেশ। গুরুচরণ আর ঠেস দিয়া থাকিতেও পারিলেন না, হুঁকাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া এলাইয়া পড়িলেন। মনে মনে বলিলেন, ভগবান, এই কলিকাতা শহরে প্রতিদিন কত লোক গাড়ি-ঘোড়া চাপা পড়িয়া অপঘাতে মরে, তারা কি আমার চেয়েও তোমার পায়ে বেশী অপরাধী! দয়াময়! তোমার দয়ায় একটা ভারী মোটরগাড়ি যদি বুকের উপর দিয়া চলিয়া যায়!

আন্নাকালী জল আনিয়া বলিল, বাবা ওঠ, জল এনেছি।

গুরুচরণ উঠিয়া সমস্তটুকু এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, আঃ, যা মা, গেলাসটা নিয়ে যা।

সে চলিয়া গেলে গুরুচরণ আবার শুইয়া পড়িলেন।

ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মামা, চা এনেচি ওঠ।

চায়ের নামে গুরুচরণ আর একবার উঠিয়া বসিলেন। ললিতার মুখের পানে চাহিয়া তাঁহার অর্ধেক জ্বালা যেন নিবিয়া গেল, বলিলেন, সারারাত জেগে আছিস মা, আয় আমার কাছে এসে একবার বোস।

ললিতা সলজ্জহাস্যে কাছে বসিয়া বলিল, আমি রাত্তিরে জাগিনি মামা।

এই জীর্ণ শীর্ণ গুরুভারগ্রস্ত অকালবৃদ্ধ মাতুলের হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন সুগভীর ব্যথাটা তার চেয়ে বেশী এ সংসারে আর কেহ অনুভব করিত না।

গুরুচরণ বলিলেন, তা হোক, আয়, আমার কাছে আয়।

ললিতা কাছে আসিয়া বসিতেই গুরুচরণ তাহার মাথায় হাত দিয়া সহসা বলিয়া উঠিলেন, আমার এই মা'টিকে যদি রাজার ঘরে দিতে পারতুম, তবেই জানতুম একটা কাজ কল্লুম।

ললিতা মাথা হেঁট করিয়া চা ঢালিতে লাগিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, হাঁ মা, তোর দুঃখী মামার ঘরে এসে দিনরাত্রি খাটতে হয়, না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, দিবারাত্রি খাটতে হবে কেন মামা? সবাই কাজ করে, আমিও করি।

এইবার গুরুচরণ হাসিলেন। চা খাইতে খাইতে বলিলেন, হাঁ ললিতা, আজ তবে রান্নাবান্নার কি হবে মা?

ললিতা মুখ তুলিয়া বলিল, কেন মামা, আমি রাঁধব যে।

গুরুচরণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই রাঁধবি কি মা, রাঁধতে কি তুই জানিস?

জানি মামা। আমি মামীমার কাছে সব শিখে নিয়েছি।

গুরুচরণ চায়ের বাটিটা নামাইয়া ধরিয়া বলিলেন, সত্যি?

সত্যি! মামীমা দেখিয়ে দেন,—আমি কতদিন রাঁধি যে। বলিয়াই মুখ নীচু করিল।

তাহার আনত মাথার উপর হাত রাখিয়া গুরুচরণ আশীর্বাদ করিলেন। তাঁহার একটা গুরুতর দুর্ভাবনা দূর হইল।

এই ঘরটি গলির উপরেই। চা পান করিতে করিতে জানালার বাহিরে দৃষ্টি পড়ায় গুরুচরণ চেঁচাইয়া ডাকিয়া উঠিলেন, শেখর নাকি? শোন, শোন।

একজন দীর্ঘায়তন বলিষ্ঠ সুন্দর যুবা ঘরে প্রবেশ করিল।

গুরুচরণ বলিলেন, বসো, আজ সকালে তোমার খুড়ীমার কাণ্ডটা শুনেচ বোধ হয়।

শেখর মৃদু হাসিয়া বলিল, কাণ্ড আর কি, মেয়ে হয়েছে তাই?

গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, তুমি ত বলবে তাই, কিন্তু তাই যে কি সে শুধু আমিই জানি যে।

শেখর কহিল, ও-রকম বলবেন না কাকা, খুড়ীমা শুনলে বড় কষ্ট পাবেন। তা ছাড়া ভগবান যাকে পাঠিয়েছেন তাকে আদর-আহ্লাদ করে ডেকে নেওয়া উচিত।

গুরুচরণ মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, আদর-আহ্লাদ করা উচিত, সে আমিও জানি! কিন্তু বাবা, ভগবানও ত সুবিচার করেন না। আমি গরীব, আমার ঘরে এত কেন? এই বাড়িটুকু পর্যন্ত তোমার বাপের কাছে বাঁধা পড়েচে, তা পড়ুক, সে জন্যে দুঃখ করিনে শেখর, কিন্তু এই হাতে-হাতেই দেখ না বাবা, এই যে আমার ললিতা, মাবাপ-মরা সোনার পুতুল, একে শুধু রাজার ঘরেই মানায়। কি করে একে প্রাণ ধরে যার-তার হাতে তুলে দিই বল ত? রাজার মুকুটে যে কোহিনুর জ্বলে, তেমনি কোহিনুর রাশীকৃত করে আমার এই মা'টিকে ওজন করলেও দাম হয় না। কিন্তু কে তা বুঝবে! পয়সার অভাবে এমন রত্নকেও আমাকে বিলিয়ে দিতে হবে। বল দেখি বাবা, সে-সময়ে কি রকম শেল বুকে বাজবে! তেরো বছর বয়েস হ'লো, কিন্তু হাতে আমার এমন তেরোটা পয়সা নেই যে, একটা সম্বন্ধ পর্যন্ত স্থির করি।

গুরুচরণ দুই চোখ অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। শেখর চুপ করিয়া রহিল।

গুরুচরণ পুনরায় কহিলেন, শেখরনাথ, দেখো ত বাবা, তোমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে যদি এই মেয়েটার কোন গতি করে দিতে পার। আজকাল অনেক ছেলে শুনেচি টাকাকড়ির দিকে চেয়ে দেখে না, শুধু মেয়ে দেখেই পছন্দ করে। তেমন যদি দৈবাৎ একটা মিলে যায় শেখর, তা হলে বলচি আমি, আমার আশীর্বাদে তুমি রাজা হবে। আর কি বলব বাবা, এ পাড়ায় তোমাদের আশ্রয়ে আমি আছি, তোমার বাবা আমাকে ছোট ভায়ের মতই দেখেন।

শেখর মাথা নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা তা দেখব।

গুরুচরণ বলিলেন, ভুলো না বাবা, দেখো। ললিতা ত আট বছর বয়স থেকে তোমাদের কাছে লেখাপড়া শিখে মানুষ হচ্ছে, তুমি ত দেখতে পাচ্ছ ও কেমন বুদ্ধিমতী, কেমন শিষ্ট শান্ত।

একফোঁটা মেয়ে, আজ থেকে ও-ই আমাদের রাঁধাবাড়া করবে, দেবে-থোবে, সমস্তই এখন ওর মাথায়।

এই সময়ে ললিতা একটিবার চোখ তুলিয়াই নামাইয়া ফেলিল। তাহার ওষ্ঠাধরের উভয় প্রান্ত ঈষৎ প্রসারিত হইল মাত্র। গুরুচরণ একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ওর বাপই কি কিছু কম রোজগার করেচে, কিন্তু সমস্তই এমন করে দান করে গেল যে, এই একটা মেয়ের জন্যেও কিছু রেখে গেল না।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। গুরুচরণ নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন, আর রেখে গেল না-ই বা বলি কি ক'রে? সে যত লোকের যত দুঃখ ঘুচিয়েছে, তার সমস্ত ফলটুকুই আমার এই মা'টিকে দিয়ে গেছে, তা নইলে কি এতটুকু মেয়ে এমন অন্নপূর্ণা হতে পারে। তুমিই বল না শেখর, সত্য কি না?

শেখর হাসিতে লাগিল। জবাব দিল না।

সে উঠিবার উপক্রম করিতেই গুরুচরণ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, এমন সকালেই কোথা যাচ্চ?

শেখর বলিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি—একটা কেস আছে। বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গুরুচরণ আর একবার স্মরণ করাইয়া বলিলেন, কথাটা একটু মনে রাখো বাবা। ও একটু শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু চোখমুখ, এমন হাসি, এত দয়ামায়া পৃথিবী খুঁজে বেড়ালেও কেউ পাবে না।

শেখর মাথা নাড়িয়া হাসিমুখে বাহির হইয়া গেল। এই ছেলেটির বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ। এম. এ. পাশ করিয়া এতদিন শিক্ষানবিশি করিতেছিল, গত বৎসর হইতে এটর্নি হইয়াছে। তাহার পিতা নবীন রায় গুড়ের কারবারে লক্ষপতি হইয়া কয়েক বৎসর হইতে ব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া ঘরে বসিয়া তেজারতি করিতেছিলেন, বড় ছেলে অবিনাশ উকিল,—ছোট ছেলে এই শেখরনাথ। তাঁহার প্রকান্ড তেতলা বাড়ি পাড়ার মাথায় উঠিয়াছিল এবং ইহার একটা খোলা ছাদের সহিত গুরুচরণের ছাদটা মিশিয়া থাকায় উভয় পরিবারে অত্যন্ত আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। বাড়ির মেয়েরা এই পথেই যাতায়াত করিত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্যামবাজারের এক বড়লোকের ঘরে বহুদিন হইতেই শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছিল। সেদিন তাঁহারা দেখিতে আসিয়া আগামী মাঘের কোন একটা শুভদিন স্থির করিয়া যাইতে চাহিলেন। কিন্তু শেখরের জননী স্বীকার করিলেন না। ঝিকে দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, ছেলে নিজে দেখিয়া পছন্দ করিলে তবে বিবাহ দিব।

নবীন রায়ের চোখ ছিল শুধু টাকার দিকে, তিনি গৃহিনীর এই গোলমেলে কথায় অপ্রসন্ন হইয়া বলিলেন, এ আবার কি কথা। মেয়ে ত দেখাই আছে। কথাবার্তা পাকা হয়ে যাক, তার পরে আশীর্বাদ করার দিন ভাল করে দেখলেই হবে।

তথাপি গৃহিনী সম্মত হইলেন না, পাকা কথা কহিতে দিলেন না। নবীন রায় সেদিন রাগ করিয়া অনেক বেলায় আহার করিলেন এবং দিবানিদ্রাটা বাহিরের ঘরেই দিলেন।

শেখরনাথ লোকটা কিছু শৌখিন। সে তেতলায় যে ঘরটিতে থাকে, সেটি অতিশয় সুসজ্জিত। দিন পাঁচ-ছয় পরে একদিন অপরাহ্নবেলায় সে সেই ঘরের বড় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মেয়ে

দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ললিতা ঘরে ঢুকিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বৌ দেখতে যাবে, না?

শেখর ফিরিয়া চাহিয়া বলিল, এই যে। কৈ বেশ করে সাজিয়ে দাও দেখি বৌ যাতে পছন্দ করে।

ললিতা হাসিল। বলিল, এখন ত আমার সময় নেই শেখরদা—আমি টাকা নিতে এসেচি, বলিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া একটা দেরাজ খুলিয়া গণিয়া গণিয়া গুটি-কয়েক টাকা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া যেন কতকটা নিজের মনেই বলিল, টাকা ত দরকার হলেই নিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু এ শোধ হবে কি করে?

শেখর চুলের একপাশ বুরুশ দিয়া সযত্নে উপরের দিকে তুলিয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, শোধ হবে, না হচ্ছে।

ললিতা বুঝিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

শেখর বলিল, চেয়ে রইলে, বুঝতে পারলে না?

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, না।

আরও একটু বড় হও, তখন বুঝতে পারবে, বলিয়া শেখর জুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাত্রে শেখর একটা কোচের উপর চুপ করিয়া শুইয়া ছিল, মা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। মা একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া বলিলেন, মেয়ে কি রকম দেখে এলি রে?

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল, বেশ।

শেখরের মায়ের নাম ভুবনেশ্বরী। বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু এমনি সুন্দর তাঁহার দেহের বাঁধন যে দেখিলে পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের অধিক মনে হইত না। আবার এই সুন্দর আবরণের মধ্যে যে মাতৃহৃদয়টি ছিল, তাহা আরও নবীন আরও কোমল। তিনি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে; পাড়াগাঁয়ে জন্মিয়া সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শহরের মধ্যে তাঁহাকে একদিনের জন্য বেমানান দেখায় নাই। শহরের চাঞ্চল্যসজীবতা এবং আচার-ব্যবহারও যেমন তিনি স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, জন্মভূমির নিবিড় নিস্তব্ধতা ও মাধুর্যও তেমনি হারাইয়া ফেলেন নাই। এই মা'টি যে শেখরের কত বড় গর্বের বস্তু ছিল, সে-কথা তাহার মা-ও জানিতেন না। জগদীশ্বর শেখরকে অনেক বস্তু দিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ স্বাস্থ্য, রূপ, ঐশ্বর্য, বুদ্ধি—কিন্তু এই জননীর সন্তান হইতে পারার ভাগ্যটাকেই সে কায়মনে ভগবানের সবচেয়ে বড় দান বলিয়া মনে করিত।

মা বলিলেন, 'বেশ' বলে চুপ করে রইলি যে রে!

শেখর আবার হাসিয়া মুখ নীচু করিয়া বলিল, যা জিজ্ঞেস করলে তাই ত বললুম।

মা-ও হাসিলেন। বলিলেন, কৈ বললি? রঙ কেমন, ফরসা? কার মত হবে? আমাদের ললিতার মত?

শেখর মুখ তুলিয়া বলিল, ললিতা ত কালো মা, ওর চেয়ে ফরসা।

মুখচোখ কেমন?

তাও মন্দ নয়।

তবে কর্তাকে বলি?

এবার শেখর চুপ করিয়া রহিল।

মা ক্ষণকাল পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিলেন, হাঁ রে, মেয়েটি লেখাপড়া শিখেচে কেমন?

শেখর বলিল, সে ত জিজ্ঞাসা করিনি মা!

অতিশয় আশ্চর্য হইয়া মা বলিলেন, জিজ্ঞেস করিস নি কি রে! যেটা আজকাল তোদের সবচেয়ে দরকারী জিনিস, সেইটেই জেনে আসিস নি?

শেখর হাসিয়া বলিল, না মা, ওকথা আমার মনেই ছিল না।

ছেলের কথা শুনিয়া এবার তিনি অতিশয় বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তবে তুই ওখানে বিয়ে করবি নে দেখচি!

শেখর কি একটা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু এই সময় ললিতাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া চুপ করিয়া গেল। ললিতা ধীরে ধীরে ভুবনেশ্বরীর পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি বাঁ হাত দিয়া তাহাকে সমুখের দিকে টানিয়া আনিয়া বলিলেন, কি মা?

ললিতা চুপি চুপি বলিল, কিচ্ছু না মা।

ললিতা পূর্বে ইঁহাকে মাসীমা বলিত, কিন্তু তিনি নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তোর আমি ত মাসী হইনে ললিতে, মা হই। তখন হইতে সে মা বলিয়া ডাকিত। ভুবনেশ্বরী তাহাকে বুকের আরো কাছে টানিয়া লইয়া আদর করিয়া বলিলেন, কিচ্ছু না? তবে বুঝি আমাকে শুধু একবার দেখতে এসেছিস?

ললিতা চুপ করিয়া রহিল।

শেখর কহিল, দেখতে এসেচে, রাঁধবে কখন?

মা বলিলেন, রাঁধবে কেন?

শেখর আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কে তবে ওদের রাঁধবে মা? ওর মামাও ত সেদিন বললেন, ললিতাই রাঁধাবাড়া সব কাজ করবে।

মা হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ওর মামার কি, যা হোক একটা বললেই হ'ল। ওর বিয়ে হয়নি, ওর হাতে খাবে কে? আমাদের বামুনঠাকরুনকে পাঠিয়ে দিয়েচি, তিনি রাঁধবেন। বড়বৌমা আমাদের রান্নাবান্না করচেন—আমি দুপুরবেলা ওদের বাড়িতেই আজকাল খাই।

শেখর বুঝিল, মা এই দুঃখী পরিবারের গুরুভার হাতে তুলিয়া লইয়াছেন। সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিল।

মাস-খানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর শেখর নিজের ঘরে কোচের উপর কাত হইয়া একখানি ইংরাজী নভেল পড়িতেছিল। বেশ মন লাগিয়া গিয়াছিল, এমন সময় ললিতা ঘরে ঢুকিয়া বালিশের তলা হইতে চাবি লইয়া শব্দ-সাড়া করিয়া দেরাজ খুলিতে লাগিল। শেখর বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, কি?

ললিতা বলল, টাকা নিচ্চি।

হুঁ, বলিয়া শেখর পড়িতে লাগিল। ললিতা আঁচলে টাকা বাঁধিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। আজ সে সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়াছিল, তাহার ইচ্ছা শেখর চাহিয়া দেখে। কহিল, দশ টাকা নিলুম শেখরদা।

শেখর 'আচ্ছা' বলিল, কিন্তু চাহিয়া দেখিল না। অগত্যা সে এটা-ওটা নাড়িতে লাগিল, মিছামিছি দেরি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই কোন ফল হইল না, তখন ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু গেলেই ত চলে না, আবার তাহাকে ফিরিয়া আসিয়া দোরগোড়ায় দাঁড়াইতে হইল। আজ তাহারা থিয়েটার দেখিতে যাইবে।

শেখরের বিনা হুকুমে সে যে কোথাও যাইতে পারে না, ইহা সে জানিত। কেহই তাহাকে ইহা বলিয়া দেয় নাই, কিংবা কেন, কি জন্য, এ-সব তর্কও কোনদিন মনে উঠে নাই। কিন্তু জীবমাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক সহজবুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধিই তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছিল; অপরে যাহা ইচ্ছা করিতে পারে যেখানে খুশি যাইতে পারে, কিন্তু সে পারে না। সে স্বাধীনও নয় এবং মামা-মামীর অনুমতিই তাহার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সে দ্বারের অন্তরালে দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে বলিল, আমরা যে থিয়েটার দেখতে যাচ্ছি।

তাহার মৃদুকণ্ঠ শেখরের কানে গেল না—সে জবাব দিল না।

ললিতা তখন আরো একটু গলা চড়াইয়া বলিল, সবাই আমার জন্য দাঁড়িয়ে রয়েচে যে।

এবার শেখর শুনিতে পাইল, বইখানা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

ললিতা একটুখানি রুষ্টভাবে বলিল, এতক্ষণে বুঝি কানে গেল। আমরা থিয়েটারে যাচ্ছি যে।

শেখর বলিল, আমরা কারা?

আমি, আন্নাকালী, চারুবালা, তার মামা।

মামাটি কে?

ললিতা বলিল, তাঁর নাম গিরীনবাবু। পাঁচ-ছদিন হ'লো মুঙ্গেরের বাড়ি থেকে এসেচেন, এখানে বি. এ. পড়বেন—বেশ লোক সে—

বাঃ—নাম, ধাম, পেশা—এ যে দিব্যি আলাপ হয়ে গেছে দেখচি। তাতেই চার-পাঁচ দিন মাথার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পাইনি—তাস খেলা হচ্ছিল বোধ করি?

হঠাৎ শেখরের কথা বলার ধরন দেখিয়া ললিতা ভয় পাইয়া গেল। সে মনেও করে নাই, এরূপ একটা প্রশ্নও উঠিতে পারে। সে চুপ করিয়া রহিল।

শেখর বলিল, এ ক'দিন খুব তাস চলছিল, না?

ললিতা ঢোক গিলিয়া মৃদুস্বরে কহিল, চারু বললে যে।

চারু বললে? কি বললে? বলিয়া শেখর মাথা তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিয়া কহিল, একেবারে কাপড় পরে তৈরি হয়ে আসা হয়েছে,—আচ্ছা যাও।

ললিতা গেল না, সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পাশের বাড়ির চারুবালা তাহার সমবয়সী এবং সই। তাহারা ব্রাহ্ম। শেখর ঐ গিরীনকে ছাড়া তাহাদের সকলকেই চিনিত। গিরীন পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বে কিছুদিনের জন্য একবার এদিকে আসিয়াছিল। এতদিন বাঁকিপুরে পড়িত, কলিকাতায় আসিবার প্রয়োজনও হয় নাই, আসেও নাই। তাই শেখর তাহাকে চিনিত না। ললিতা তথাপি দাঁড়াইয়া আছে দেখিয়া বলিল, মিছে দাঁড়িয়ে রইলে কেন, যাও। বলিয়া মুখের সমুখেই বই তুলিয়া লইল।

মিনিট-পাঁচেক চুপ করিয়া থাকার পরে ললিতা আবার আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, যাব?

যেতেই ত বললুম, ললিতা।

শেখরের ভাব দেখিয়া ললিতার থিয়েটার দেখিবার সাধ লোপ পাইল, কিন্তু তাহার না গেলেও যে নয়।

কথা হইয়াছিল, সে অর্ধেক খরচ দিবে এবং চারুর মামা অর্ধেক দিবে।

চারুদের ওখানে সকলেই তাহার জন্য অধীর হইয়া অপেক্ষা করিতেছে এবং যত বিলম্ব হইতেছে তাহাদের অধৈর্যও তত বাড়িতেছে, ইহা সে চোখের উপর দেখিতে লাগিল, কিন্তু উপায়ও খুঁজিয়া পাইল না। অনুমতি না পাইয়া যাইবে এত সাহস তাহার ছিল না। আবার মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, শুধু আজকের দিনটি—যাব?

শেখর বইটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া ধমকাইয়া উঠিল, বিরক্ত করো না ললিতা, যেতে ইচ্ছে হয় যাও, ভালমন্দ বোঝবার তোমার যথেষ্ট বয়েস হয়েচে।

ললিতা চমকিয়া উঠিল। শেখরের কাছে বকুনি খাওয়া তাহার নূতন নহে; অভ্যাস ছিল বটে, কিন্তু দু-তিন বৎসরের মধ্যে এরকম শুনে নাই। ওদিকে বন্ধুরা অপেক্ষা করিয়া আছে, সেও কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছে, ইতিমধ্যে টাকা আনিতে আসিয়া এই বিপত্তি ঘটিয়াছে। এখন তাহাদের কাছেই বা সে কি বলিবে?

কোথাও যাওয়া-আসা সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত তাহার শেখরের তরফ হইতে অবাধ স্বাধীনতা ছিল, সেই জোরেই সে একেবারে কাপড় পরিয়া সাজিয়া আসিয়াছিল, এখন শুধু যে সেই স্বাধীনতাই এমন রূঢ়ভাবে খর্ব হইয়া গেল তাহা নহে, যেজন্য হইল সে কারণটা যে কতবড় লজ্জার, তাহাই আজ তাহার তের বছর বয়সে প্রথম উপলব্ধি করিয়া সে মরমে মরিয়া যাইতে লাগিল। অভিমানে চোখ অশ্রুপূর্ণ করিয়া সে আরো মিনিট-পাঁচেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে গিয়া ঝিকে দিয়া আন্নাকালীকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহার হাতে দশটা টাকা দিয়া কহিল, তোরা আজ যা কালী, আমার বড় অসুখ কচ্চে, সইকে বল গে আমি যেতে পারব না।

কালী জিজ্ঞেস করিল, কি অসুখ সেজদি?

মাথা ধরেচে, গা বমি-বমি কচ্চে—ভারী অসুখ কচ্চে, বলিয়া সে বিছানায় পাশ ফিরিয়া শুইল। তারপর চারু আসিয়া সাধাসাধি করিল, পীড়াপীড়ি করিল, মামীকে দিয়া সুপারিশ করাইল, কিন্তু কিছুতেই তাহাকে রাজী করিতে পারিল না। আন্নাকালী হাতে দশটা টাকা পাইয়া যাইবার জন্য ছটফট করিতেছিল। পাছে এই সব হাঙ্গামায় পড়িয়া যাওয়া না ঘটে, এই ভয়ে সে চারুকে আড়ালে ডাকিয়া টাকা দেখাইয়া বলিল, সেজদির অসুখ কচ্চে—সে নাই গেল চারুদি! আমাকে টাকা দিয়েছে, এই দ্যাখো—আমরা যাই চল। চারু বুঝিল, আন্নাকালী বয়সে ছোট হইলেও বুদ্ধিতে কাহারো খাটো নয়। সে সম্মত হইয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

চারুবালার মা মনোরমার তাস খেলার চেয়ে প্রিয় বস্তু সংসারে আর কিছুই ছিল না। কিন্তু খেলার ঝোঁক যতটা ছিল দক্ষতা ততটা ছিল না। তাঁহার এই ত্রুটি শুধরাইয়া যাইত ললিতাকে পাইলে। সে খুব ভাল খেলিতে পারিত। মনোরমার মামাত ভাই গিরীন্দ্র আসা পর্যন্ত এ-কয়দিন সমস্ত দুপুরবেলা তাঁহার ঘরে তাদের বিরাট আড্ডা বসিতেছিল। গিরীন পুরুষমানুষ, খেলে ভাল, সুতরাং তার বিপক্ষে বসিতে গেলে মনোরমার ললিতাকে চাই-ই।

থিয়েটার দেখার পরের দিন যথাসময়ে ললিতা উপস্থিত হইল না দেখিয়া মনোরমা ঝিকে পাঠাইয়া দিলেন। ললিতা তখন একটি মোটা খাতায় একখানা ইংরাজি বই হইতে বাংলা তর্জমা করিতেছিল, গেল না।

তাহার সই আসিয়াও কিছু করিতে পারিল না, তখন মনোরমা নিজে আসিয়া তাহার খাতাপত্র একদিকে টান মারিয়া সরাইয়া দিয়া বলিলেন, নে, ওঠ। বড় হয়ে তোকে জজিয়তি করতে হবে না, বরং তাস খেলতেই হবে—চল।

ললিতা মনে মনে অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইয়া, কাঁদ-কাঁদ হইয়া জানাইল, আজ তাহার কিছুতেই যাবার জো নাই, বরং কাল যাইবে। মনোরমা কিছুতেই শুনিলেন না, অবশেষে মামীকে জানাইয়া তুলিয়া লইয়া গেলেন; সুতরাং তাহাকে আজও গিয়া গিরীনের বিপক্ষে বসিয়া তাস খেলিতে হইল।

কিন্তু, খেলা জমিল না। এদিকে এ এতটুকু মন দিতে পারিল না। সমস্ত সময়টা আড় হইয়া রহিল এবং বেলা না পড়িতেই উঠিয়া পড়িল। যাইবার সময় গিরীন বলিল, রাত্রে আপনি টাকা পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু গেলেন না, কাল আবার যাই চলুন।

ললিতা মাথা নাড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, না, আমার বড় অসুখ করেছিল।

গিরীন হাসিয়া বলিল, এখন ত অসুখ সেরেচে, চলুন কাল যেতে হবে।

না, না, কাল আমার সময় হবে না, বলিয়া ললিতা দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। আজ শুধু যে শেখরের ভয়ে তাহার খেলায় মন লাগে নাই তাহা নয়, তাহার নিজেরও ভারী লজ্জা করিতেছিল।

শেখরের বাটীর মত, এই বাটীতেও সে ছেলেবেলা হইতে আসা-যাওয়া করিয়াছে এবং ঘরের লোকের মতই সকলের সুমুখে বাহির হইয়াছে। তাই চারুর মামার সুমুখেও বাহির হইতে, কথা বলিতে, প্রথম হইতেই তাহার কোনও দ্বিধা হয় নাই। কিন্তু আজ গিরীনের সুমুখে বসিয়া সমস্ত খেলার সময়টা কেমন করিয়া যেন তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, এই কয়েকদিনের পরিচয়েই গিরীন্দ্র তাহাকে একটু বিশেষ প্রীতির চোখে দেখিতেছে। পুরুষের প্রীতির চক্ষু যে এতবড় লজ্জার বস্তু তাহা সে ইতিপূর্বে কল্পনাও করে নাই।

বাড়িতে একবার দেখা দিয়াই সে তাড়াতাড়ি ও-বাড়িতে শেখরের ঘরে গিয়া ঢুকিল, এবং একেবারে কাজে লাগিয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে এ ঘরের ছোটখাটো কাজগুলি তাহাকেই করিতে হইত। বই প্রভৃতি গুছাইয়া তুলিয়া রাখা, টেবিল সাজাইয়া দেওয়া, দোয়াত-কলম ঝাড়িয়া মুছিয়া ঠিক করিয়া রাখা, এ-সমস্ত সে না করিলে আর কেহ করিত না। ছয়-সাত দিনের অবহেলায় অনেক কাজ জমিয়া গিয়াছিল, সেই সমস্ত ত্রুটি শেখরের ফিরিয়া আসিবার পূর্বেই নিঃশেষ করিয়া ফেলিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেল।

ললিতা সময় পাইলেই কাছে কাছে থাকিত এবং সে নিজে কাহাকেও পর মনে করিত না বলিয়া এ-বাড়িতে তাহাকেও কেহ পর করিত না। আট বছর বয়সে মা-বাপ হারাইয়া মামার বাড়িতে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন হইতে সে ছোটবোনটির মত শেখরের আশেপাশে ঘুরিয়া তাহার কাছে লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইতেছে।

সে যে শেখরের বিশেষ স্নেহের পাত্রী তাহা সবাই জানিত, শুধু সেই স্নেহ যে এখন কোথায় উঠিয়াছে তাহাই কেহ জানিত না, ললিতাও না। শিশুকাল হইতে শেখরের কাছে তাহাকে একইভাবে এত অপর্যাপ্ত আদর পাইতে সবাই দেখিয়া আসিয়াছে যে, আজ পর্যন্ত তাহার কোন আদরই কাহারই চোখে বিসদৃশ বোধ হয় না, কিংবা কোন ব্যবহারই কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। করে না বলিয়াই সে যে কোনও দিন বধূরূপে এই গৃহে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, সে সম্ভাবনাও কাহারও মনে উদয় হয় নাই। ললিতাদের বাড়িতেও হয় নাই: ভুবনেশ্বরীর মনেও হয় নাই।

ললিতা ভাবিয়া রাখিয়াছিল, কাজ শেষ করিয়া শেখর আসিবার পূর্বেই চলিয়া যাইবে; কিন্তু অন্যমনস্ক ছিল বলিয়া ঘড়ির দিকে নজর করে নাই। হঠাৎ দ্বারের বাহিরে জুতার মসমস শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল।

শেখর ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, এঃ যে! কাল তা হলে ফিরতে কত রাত হ'ল?

ললিতা জবাব দিল না।

শেখর একটা গদিআঁটা আরাম-চৌকির উপর হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ফেরা হ'ল কখন? দুটো? তিনটে? মুখে কথা নেই কেন?

ললিতা তেমনি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর বিরক্ত হইয়া বলিল, নীচে যাও, মা ডাকছেন।

ভুবনেশ্বরী ভাঁড়ারের সুমুখে বসিয়া জলখাবার সাজাইতেছিলেন, ললিতা কাছে আসিয়া বলিল,

ডাকছিলে মা? কৈ ডাকিনি ত, বলিয়া মুখ তুলিয়া মুখের পানে চাহিয়াই বলিলেন, মুখখানি এমন শুকনো কেন ললিতে? কিছু খাসনি বুঝি এখনো?

ললিতা ঘাড় নাড়িল।

ভুবনেশ্বরী বলিলেন, আচ্ছা, যা তোর দাদাকে খাবার দিয়ে আমার কাছে আয়।

ললিতা খাবার হাতে করিয়া খানিক পরে, উপরে আসিয়া দেখিল, তখনো শেখর তেমনিভাবে চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, অফিসের পোশাকও ছাড়ে নাই, হাতমুখও ধোয় নাই। আস্তে আসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, খাবার এনেচি।

শেখর চাহিয়া দেখিল না। বলিল, কোথাও রেখে দিয়ে যাও।

ললিতা রাখিয়া দিল না, হাতে করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শেখর না চাহিয়াও বুঝিতেছিল, ললিতা যায় নাই—দাঁড়াইয়া আছে। মিনিট দুই-তিন নিঃশব্দে থাকিয়া বলিল, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ললিতা আমার দেরি আছে, রেখে নীচে যাও।

ললিতা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া মনে মনে রাগিতেছিল, মৃদুস্বরে বলিল, থাক দেরি, আমারো নীচে কোন কাজ নেই।

শেখর চোখ চাহিয়া হাসিয়া বলিল, এই যে কথা বেরিয়েছে। নীচে কাজ না থাকে ও-বাড়িতে আছে ত? তাও না থাকে, তার পরের বাড়িতেও আছে ত? বাড়ি ত তোমার একটি নয় ললিতে?

নয়ই ত? বলিয়া রাগ করিয়া ললিতা খাবারের থালাটা দুম করিয়া টেবিলে রাখিয়া দিয়া হনহন করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, সন্ধ্যের পরে একবার এসো।

একশ-বার আমি ওপর-নীচে করতে পারিনে, বলিয়া ললিতা চলিয়া গেল।

নীচে আসিবামাত্রই মা বলিলেন, দাদাকে তোর খাবার দিয়ে এলি, পান দিয়ে এলিনে রে!

আমার ক্ষিদে পেয়েচে মা, আমি আর পারিনে, আর কেউ দিয়ে আসুক, বলিয়া ললিতা বসিয়া পড়িল।

মা তাহার রুষ্ট মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তুই খেতে ব'স, ঝিকে পাঠিয়ে দিচ্চি।

ললিতা প্রত্যুত্তর না করিয়া খাইতে বসিয়া গেল।

সে থিয়েটার দেখিতে যায় নাই—তবুও শেখর তাহাকে বকিয়াছিল, এই রাগে সে চার-পাঁচ দিন শেখরকে দেখা দেয় নাই, অথচ সে অফিসে চলিয়া গেলে দুপুরবেলা গিয়া ঘরের কাজ করিয়া দিত। শেখর নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাহাকে দু'দিন ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, তথাপি সে যায় নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এ পাড়ার একজন অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে আসিত, তাহার উপর ললিতার বড় দয়া ছিল, আসিলেই তাহাকে একটি করিয়া টাকা দিত। টাকাটি হাতে পাইয়া সে যে-সমস্ত অপূর্ব এবং অসম্ভব আশীর্বাদ উচ্চারণ করিতে থাকিত, সেইগুলি শুনিতে সে অতিশয় ভালবাসিত। সে বলিত, ললিতা পূর্বজন্মে তাহার আপনার মা ছিল, এবং ইহা সে ললিতাকে দেখিবামাত্রই কেমন করিয়া চিনিতে পারিয়াছিল। সেই বুড়া ছেলেটি তাহার আজ সকালেই দ্বারে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, আমার মা-জননী কোথায় গো?

সন্তানের আহ্বানে আজ ললিতা কিছু বিব্রত হইয়া পড়িল। এখন শেখর ঘরে আছে, সে টাকা আনিতে যায় কিরূপে? এদিক-ওদিক চাহিয়া মামীর কাছে গেল। মামী এইমাত্র ঝির সহিত বকাবকি করিয়া বিরক্ত-মুখে রাঁধিতে বসিয়াছিলেন, তাঁহাকে কিছু না বলিতে পারিয়া সে ফিরিয়া আসিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, ভিক্ষুক দোরগোড়ায় লাঠিটি ঠেস দিয়া রাখিয়া বেশ চাপিয়া বসিয়াছে। ইতিপূর্বে ললিতা কখনও তাহাকে নিরাশ করে নাই, আজ শুধুহাতে ফিরাইয়া দিতে তাহার মন সরিল না।

ভিক্ষুক আবার ডাক দিল।

আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, সেজদি, তোমার সেই ছেলে এসেচে।

ললিতা বলিল, কালী, একটা কাজ কর না ভাই। আমার হাতজোড়া, তুই একটিবার ছুটে গিয়ে শেখরদার কাছ থেকে একটি টাকা নিয়ে আয়।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল, খানিক পরে তেমনি ছুটিয়া আসিয়া ললিতার হাতে একটা টাকা দিয়া বলিল, এই নাও।

ললিতা জিজ্ঞাসা করিল, শেখরদা কি বললে রে?

কিছু না। আমাকে বললে চাপকানের পকেট থেকে টাকা নিতে, আর নিয়ে এলুম।

আর কিছু বললে না?

না, আর কিচ্ছু না, বলিয়া আন্নাকালী ঘাড় নাড়িয়া খেলা করিতে চলিয়া গেল।

ললিতা ভিক্ষুক বিদায় করিল; কিন্তু অন্যদিনের মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া তাহার বাক্যচ্ছটা শুনিতে পারিল না—ভালই লাগিল না।

এ কয়দিন তাহাদের আড্ডা পূর্ণ তেজে চলিতেছিল। আজ দুপুরবেলা ললিতা গেল না, মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া রহিল। আজ সত্য সত্যই তাহার ভারী মন খারাপ হইয়া গিয়াছিল। বিকালবেলা কালীকে কাছে ডাকিয়া বলিল, কালী, তুই পড়া বলে নিতে শেখরদার ঘরে আর যাসনে?

কালী মাথা নাড়িয়া বলিল, হাঁ যাই ত।

আমার কথা শেখরদা জিজ্ঞেস করে না?

না। হাঁ, হাঁ, পরশু করেছিল—তুমি দুপুরবেলা তাস খেল কিনা?

ললিতা উদ্বিগ্ন হইয়া প্রশ্ন করিল, তুই কি বললি?

কালী বলিল, তুমি দুপুরবেলা চারুদিদিদের বাড়ি তাস খেলতে যাও, তাই বললুম। শেখরদা বললে, কে কে খেলে? আমি বললুম, তুমি আর সই-মা, চারুদিদি আর তার মামা। আচ্ছা, তুমি ভাল খেলো, না চারুদিদির মামা ভাল খেলে সেজদি? সই-মা বলে তুমি ভালো খেলো, না?

ললিতা সে কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল, তুই অত কথা বলতে গেলি কেন? সব কথায় তোর কথা কওয়া চাই, আর কোনদিন তোকে আমি কিচ্ছু দেব না, বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

কালী অবাক হইয়া গেল। তাহার এই আকস্মিক ভাবপরিবর্তনের হেতু সে কিছুই বুঝিল না।

মনোরমার তাস খেলা দু'দিন বন্ধ হইয়াছে—ললিতা আসে না। তাহাকে দেখিয়া অবধি গিরীন্দ্র যে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা প্রথম হইতেই মনোরমা সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই সন্দেহ আজ সুদৃঢ় হইল।

এই দুইদিন গিরীন কি একরকম উৎসুক ও অন্যমনস্ক হইয়াছিল। অপরাহ্নে বেড়াইতে যাইত না, যখন তখন বাড়ির ভিতরে আসিয়া এঘর-ওঘর করিত, আজ দুপুরবেলা আসিয়া বলিল, দিদি, আজও খেলা হবে না?

মনোরমা বলিলেন, কি করে হবে গিরিন, লোক কৈ? না হয়, আয় আমরা তিনজনেই খেলি।

গিরীন নিরুৎসাহভাবে বলিল, তিনজনে কি খেলা হয় দিদি? ও-বাড়ির ললিতাকে একবার ডাকতে পাঠাও না।

সে আসবে না।

গিরীন বিমর্ষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন আসবে না, ওদের বাড়িতে মানা ক'রে দিয়েচে বোধ হয়, না?

মনোরমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, ওর মামা-মামী সে-রকম মানুষ নয়—সে নিজেই আসে না।

গিরীন হঠাৎ খুশী হইয়া বলিল, তা হলে তুমি নিজে আজ একবার গেলেই আসবেন,—কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে নিজের মনেই ভারী অপ্রতিভ হইয়া গেল।

মনোরমা হাসিয়া ফেলিলেন,—আচ্ছা, তাই যাই, বলিয়া চলিয়া গেলেন এবং খানিক পরে ললিতাকে ধরিয়া আনিয়া তাস পাড়িয়া বসিলেন।

দু'দিন খেলা হয় নাই, আজ অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ জমিয়া গেল। ললিতারা জিতিতেছিল।

ঘণ্টা-দুই পরে সহসা কালী আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, সেজদি, শেখরদা ডাকচেন—জলদি!

ললিতার মুখ পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাস-দেওয়া বন্ধ করিয়া বলিল, শেখরদা অফিসে যাননি?

কি জানি, চলে এসেচেন, বলিয়া সে ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল।

ললিতা তাস রাখিয়া দিয়া মনোরমার মুখপানে চাহিয়া কুণ্ঠিতভাবে বলিল, যাই সই-মা।

মনোরমা তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন, সে কি রে, আর দু-হাত দেখে যা।

ললিতা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, না সই-মা, ইনি তা হলে বড় রাগ করবেন, বলিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

গিরীন প্রশ্ন করিল, শেখরদাদা আবার কে দিদি?

মনোরমা বলিলেন, ঐ যে সুমুখের ফটকওয়ালা বড় বাড়িটা।

গিরীন ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ও—ওই বাড়ি। নবীনবাবু ওঁদের আত্মীয় বুঝি?

মনোরমা মেয়ের মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আত্মীয় কেমন! ললিতাদের ঐ ভিটেটুকু পর্যন্ত বুড়ো আত্মসাৎ করবার ফিকিরে আছেন!

গিরীন আশ্চর্য হইয়া চাহিয়া রহিল।

মনোরমা তখন গল্প করিতে লাগিলেন, কেমন করিয়া গত বৎসর টাকার অভাবে গুরুচরণবাবুর মেজমেয়ের বিবাহ হইতেছিল না, পরে অসম্ভব সুদে নবীন রায় টাকা ধার দিয়া বাড়িখানি বাঁধা রাখিয়াছেন। এ টাকা কোনদিন শোধ হইবে না এবং অবশেষে বাড়িটা নবীন রায়ই গ্রহণ করিবেন।

মনোরমা সমস্ত কথা বলিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, বুড়ার আন্তরিক ইচ্ছা গুরুচরণবাবুর ভাঙ্গা বাড়িটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐখানে ছোট ছেলে শেখরের জন্যে একটি বড় রকমের বাড়ি তৈরি করেন—দুই ছেলের দুই আলাদা বাড়ি—মতলব মন্দ নয়।

ইতিহাস শুনিয়া গিরীনের ক্লেশ বোধ হইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা দিদি, গুরুচরণবাবুর আরও ত মেয়ে আছে, তাদেরি বা বিয়ে কি করে দেবেন?

মনোরমা বলিলেন, নিজের ত আছেই, তা ছাড়া ললিতা। ওর বাপ-মা নেই, সমস্ত ভার ঐ গরীবের ওপর। বড় হয়ে উঠেচে, এই বছরের মধ্যে বিয়ে না দিলেই নয়। ওদের সমাজে সাহায্য করতে কেউ নেই, জাত নিতে সবাই আছে—আমরা বেশ আছি গিরীন।

গিরীন চুপ করিয়া রহিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, সেদিন ললিতার কথা নিয়েই ওর মামী আমার কাছে কেঁদে ফেললে—কি করে যে কি হবে তার কিছুই স্থির নেই—ওর ভাবনা ভেবেই

গুরুচরণবাবুর পেটে অন্ন-জল যায় না,—হাঁ গিরীন, মুঙ্গেরে তোদের কোন বন্ধুবান্ধব এমন নেই যে, শুধু মেয়ে দেখে বিয়ে করে? অমন মেয়ে কিন্তু পাওয়া শক্ত।

গিরীন বিষণ্ণভাবে মৃদু হাসিয়া বলিল, বন্ধুবান্ধব আর পাবো কোথায় দিদি, তবে টাকা দিয়ে আমি সাহায্য করতে পারি।

গিরীনের পিতা ডাক্তারি করিয়া অনেক টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, সে-সমস্তরই এখন সে মালিক।

মনোরমা বলিলেন, টাকা তুই ধার দিবি?

ধার আর কি দেব দিদি—ইচ্ছে হয়, উনি শোধ দেবেন, না হয় নাই দেবেন।

মনোরমা বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, তোর টাকা দিয়ে লাভ? ওরা আমাদের আত্মীয়ও নয়, সমাজের লোকও নয়—এমনি কে কাকে টাকা দেয়?

গিরীন তাহার বোনের মুখের পানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, তার পরে কহিল, সমাজের লোক নাই হলেন, বাঙ্গালী ত? ওঁর একান্ত অভাব, আর আমার বিস্তর রয়েচে,—তুমি একবার বলে দেখো না দিদি, উনি যদি নিতে রাজী হন, আমি দিতে পারি। ললিতা তাঁদেরও কেউ নয়, আমাদেরও কেউ নয়—তার বিয়ের সমস্ত খরচ না হয় আমিই দেব।

তাহার কথা শুনিয়া মনোরমা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন না। ইহাতে তাঁহার নিজের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই নাই বটে, তথাপি এত টাকা একজন আর একজনকে দিতেছে দেখিলে অনেক স্ত্রীলোকই প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করিতে পারে না।

চারু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে মহা খুশী হইয়া লাফাইয়া উঠিল, বলিল, তাই দাও মামা, আমি সই-মাকে বলে আসচি।

তাহার মা ধমক দিয়া বলিলেন, তুই থাম চারু, ছেলেমানুষ—এ-সব কথায় থাকিস নে। বলতে হয় আমিই বলব।

গিরীন কহিল, তাই বলো দিদি। পরশু রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে গুরুচরণবাবুর সঙ্গে একটুখানি আলাপ হয়েছিল, কথায়বার্তায় মনে হল—বেশ সরল লোক; তুমি কি বল?

মনোরমা বলিলেন, আমিও তাই বলি, সবাই তাই বলে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বড় সাদাসিধে মানুষ। সেইজন্যেই ত দুঃখ হয় গিরীন, অমন লোকটিকে হয়ত বাড়িঘর ছেড়ে নিরাশ্রয় হতে হবে। তার সাক্ষী দেখলি নে গিরীন শেখববাবু ডাকচেন বলতেই ললিতা কি-রকম তাড়াতাড়ি উঠে পালালো, বাড়িসুদ্ধ লোক ওদের কাছে যেন বিক্রি হয়ে আছে। কিন্তু, যত খোশামোদই করুক না কেন, নবীন রায়ের হাতে গিয়ে একবার যখন পড়েচে, রেহাই পাবে, এ ভরসা কেউ করে না।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, তা হলে বলবে ত দিদি?

আচ্ছা, জিজ্ঞেস করব। দিয়ে যদি তুই উপকার করতে পারিস, ভালই ত। বলিয়াই একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোরই বা এত চাড় কেন গিরীন?

চাড় আর কি দিদি, দুঃখ-কষ্টে পরস্পরের সাহায্য করতেই হয়, বলিয়া সে ঈষৎ সলজ্জ-মুখে প্রস্থান করিল। দ্বারের বাহিরে গিয়াই আবার ফিরিয়া আসিয়া বসিল।

তাহার দিদি বলিলেন, আবার বসলি যে?

গিরীন হাসিমুখে বলিল, অত যে কাঁদুনি গাইলে দিদি, হয়ত সব সত্যি নয়।

মনোরমা বিস্মিত হইয়া বলিলেন, কেন?

গিরীন বলিতে লাগিল, ওদের ললিতা যেরকম টাকা খরচ করে সে ত দুঃখীর মত মোটেই নয় দিদি। সেদিন আমরা থিয়েটার দেখতে গেলুম, ও নিজে গেল না, তবু দশ টাকা ওর বোনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলে। চারুকে জিজ্ঞেস কর না, কিরকম খরচ করে? মাসে কুড়ি-পঁচিশ টাকার কম ওর নিজের খরচই চলে না যে।

মনোরমা বিশ্বাস করিলেন না।

চারু বলিল, সত্যি মা। ও-সব শেখরবাবুর টাকা, শুধু এখন নয়, ছেলেবেলা থেকে ওই শেখরদার আলমারি খুলে টাকা নিয়ে আসে—কেউ কিছু বলে না।

মনোরমা মেয়ের দিকে চাহিয়া সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা আনে শেখরবাবু জানেন?

চারু মাথা নাড়িয়া বলিল, জানেন, সুমুখেই চাবি খুলে নিয়ে আসে। গেল মাসে আন্নাকালীর পুতুলের বিয়েতে অত টাকা কে দিলে? সবই ত সই দিলে।

মনোরমা ভাবিয়া বলিলেন, কি জানি। কিন্তু এ-কথাও ঠিক বটে, বুড়োর মত ছেলেরা অমন চামার নয়—ওরা সব মায়ের ধাত পেয়েচে—তাই দয়াধর্ম আছে। তা ছাড়া, ললিতা মেয়েটি নাকি খুব ভাল, ছেলেবেলা থেকে কাছে কাছে থাকে, দাদা বলে ডাকে, তাই ওকে মায়া-মমতাও সবাই করে। হাঁ চারু, তুই ত যাওয়া-আসা করিস, ওদের শেখরের এই মাঘ মাসে নাকি বিয়ে হবে? শুনেচি, বুড়ো অনেক টাকা পাবে।

চারু বলিল, হাঁ মা, এই মাঘ মাসেই হবে—সব ঠিক হয়ে গেছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গুরুচরণ লোকটি সেই ধাতের মানুষ—যাহার সহিত যে-কোনও বয়সের লোক অসঙ্কোচে আলাপ করিতে পারে। দুই-চারিদিনের আলাপে গিরীনের সহিত তাঁহার একটা স্থায়ী সখ্যতা জন্মিয়া গিয়াছিল। গুরুচরণের চিত্তের বা মনের কিছুমাত্র দৃঢ়তা ছিল না বলিয়া তর্ক করিতেও তিনি যেমন ভালবাসিতেন, তর্কে পরাজিত হইলেও তেমনি কিছুমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না।

সন্ধ্যার পর চা খাইবার নিমন্ত্রণ তিনি গিরীনকে করিয়া রাখিয়াছিলেন। অফিস হইতে ফিরিতেই তাঁহার দিবা অবসান হইয়া যাইত। হাত-মুখ ধুইয়া বলিতেন, ললিতে, চা তৈরি হ'লো মা? কালী, যা যা, তোর গিরীনমামাকে এইবার ডেকে আন। তারপর উভয়ে চা-খাওয়া এবং তর্ক চলিতে থাকিত।

ললিতা কোন কোন দিন মামার আড়ালে বসিয়া চুপ করিয়া শুনিত। সেদিন গিরীনের যুক্তিতর্ক শতমুখে উৎসারিত হইতে থাকিত। তর্কটা প্রায়ই আধুনিক সমাজের বিরুদ্ধেই হইত। সমাজের হৃদয়হীনতা, অসঙ্গত উপদ্রব এবং অত্যাচার—এ-সমস্তই সত্য কথা।

একে ত সমর্থন করিবার বাস্তবিক কিছু নাই, তাহাতে গুরুচরণের উৎপীড়িত অশান্ত হৃদয়ের সহিত গিরীনের কথাগুলা বড়ই খাপ খাইত। তিনি শেষকালে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন, ঠিক কথা গিরীন। কার ইচ্ছে আর না করে নিজের মেয়েদের যথাসময়ে ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে, কিন্তু দিই কি করে? সমাজ বলচেন দাও বিয়ে—মেয়ের বয়স হয়েচে, কিন্তু দেবার বন্দোবস্ত করে ত দিতে পারেন না। যা বলেচ গিরীন, এই আমাকে দিয়েই দ্যাখ না কেন, বাড়িটুকু পর্যন্ত বন্ধক পড়েচে, দুদিন পরে ছেলেমেয়ের হাত ধরে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে—সমাজ তখন ত বলবেন না, এসো, আমার বাড়িতে আশ্রয় নাও। কি বল হে?

গিরীন হয়ত চুপ করিয়া থাকিত, গুরুচরণ নিজেই বলিতেন, খুব সত্য কথা। এমন সমাজ থেকে জাত যাওয়াই মঙ্গল। খাই না খাই, শান্তিতে থাকা যায়। যে সমাজ দুঃখীর দুঃখ বোঝে না, বিপদে সাহস দেয় না, শুধু চোখ রাঙ্গায় আর গলা চেপে ধরে সে সমাজ আমার নয়, আমার মত গরীবেরও নয়—এ সমাজ বড়লোকের জন্যে। ভাল, তারাই থাক, আমাদের কাজ নাই। বলিয়া গুরুচরণ সহসা চুপ করিতেন।

যুক্তিতর্কগুলি ললিতা শুধুই মন দিয়া শুনিত না, রাত্রে বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ ঘুম না আসিত

নিজের মনে বিচার করিয়া দেখিত। প্রতি কথাটি তাহার মনের উপর গভীরভাবে মুদ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। সে মনে মনে বলিত, যথার্থই গিরীনবাবুর কথাগুলি অতিশয় ন্যায়সঙ্গত।

মামাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, সেই মামার স্বপক্ষে টানিয়া গিরীন যাহাই কিছু বলিত, সমস্তই তাহার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে হইত। তাহার মামা, বিশেষ করিয়া তাহারি জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, অন্ন-জল পরিত্যাগ করিতেছে—তাহার নির্বিরোধী দুঃখী মামা তাহাকে আশ্রয় দিয়াই—এত ক্লেশ পাইতেছে! কিন্তু কেন? কেন মামার জাত যাবে? আজ আমার বিয়ে দিয়ে, কাল যদি বিধবা হয়ে ঘরে ফিরে আসি, তাহলে ত জাত যাবে না। অথচ তফাৎ কিসের? গিরীনের এই সমস্ত কথার প্রতিধ্বনি সে তাহার ভারাতুরা হৃদয় হইতে বাহির করিয়া আর একবার তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িত।

তাহার মামার হইয়া, মামার দুঃখ বুঝিয়া, যে-কেহ কহিত, তাহাকে শ্রদ্ধা না করিয়া, তাহার মতের সহিত মত না মিলাইয়া ললিতার অন্য পথ ছিল না। সে গিরীনকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতে লাগিল। ক্রমশঃ গুরুচরণের মত সেও সন্ধ্যার চা-পানের সময়টির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে গিরীন ললিতাকে 'আপনি' বলিযা ডাকিত। গুরুচরণ নিষেধ করিযা বলিয়াছিলেন, ওকে আবার 'আপনি' কেন গিরীন, 'তুমি' বলে ডেকো। তখন হইতে সে 'তুমি' বলিয়া ডাকিতে শুরু করিয়াছিল।

একদিন গিরীন জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, তুমি চা খাও না ললিতা?

ললিতা মুখ নীচু করিয়া ঘাড় নাড়িলে. গুরুচরণ বলিয়াছিলেন, ওর শেখরদার বারণ আছে। মেয়েমানুষের চা খাওয়া সে ভালবাসে না।

হেতু শুনিয়া যে গিরীন সুখী হইতে পারে নাই, ললিতা সেটুকু বুঝিতে পারিয়াছিল।

আজ শনিবার। অন্যদিনের অপেক্ষা এই দিনটির সভা ভাঙ্গিতে অধিক বিলম্ব হইল।

চা-খাওয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, গুরুচরণ আজ আলোচনায় তেমন উৎসাহের সহিত যোগ দিতে পারিতেছিলেন না, মাঝে মাঝে কি-একরকম অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছিলেন।

গিরীন সহজেই তাহা লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিল, আজ আপনার দেহটা বোধ করি তেমন ভাল নাই?

গুরুচরণ হুঁকাটা মুখ হইতে সরাইয়া লইয়া বলিলেন,—কেন? দেহ ত বেশ ভালই আছে।

গিরীন সঙ্কোচের সহিত বলিল, তাহলে অফিসে কি কিছু—

না, তাও ত কিছু নয়, বলিয়া গুরুচরণ একটু বিস্ময়ের সহিত গিরীনের মুখের দিকে চাহিলেন। তাহার ভিতরের উদ্বেগ যে বাহিরে প্রকাশ পাইতেছিল তাহা এই নিতান্ত সরল প্রকৃতির মানুষটি বুঝিতেই পারেন নাই।

ললিতা পূর্বে একেবারেই চুপ করিয়া থাকিত. কিন্তু আজকাল দু-একটা কথায় মাঝে মাঝে যোগ দিতেছিল। সে বলিল, হাঁ মামা, আজ তোমার হয়ত মন ভাল নেই।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ও সেই কথা? হাঁ মা, ঠিক ধরেছিস বটে, আজ আমার সত্যিই মন ভাল নেই।

ললিতা ও গিরীন উভয়েই তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

গুরুচরণ বলিলেন, নবীনদা সমস্ত জেনেশুনে গোটা-কতক শক্ত কথা পথে দাঁড়িয়েই শুনিয়ে দিলেন। আর তাঁরই বা দোষ কি, ছ'মাস হয়ে গেল, একটা পয়সা সুদ দিতে পারলুম না, তা আসল দূরে থাক।

ব্যাপারটা ললিতা বুঝিয়াই চাপা দিযা ফেলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীন মামা পাছে ঘরের লজ্জাকর কথাগুলা পরের কাছে ব্যক্ত করিয়া ফেলে এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, তুমি ভেবো না মামা, সে-সব পরে হবে।

কিন্তু গুরুচরণ সেদিক দিয়াও গেলেন না। বরং বিষণ্ণভাবে হাসিয়া বলিলেন, পরে আর কি হবে মা? তা নয় গিরীন, আমার এই মা'টি চায় তার বুড়ো ছেলেটি যেন কিছু ভাবনা-চিন্তা না করে। কিন্তু বাইরের লোকে যে তোর দুঃখী মামার দুঃখটা চেয়ে দেখতেই চায় না, ললিতে।

গিরীন জিজ্ঞাসা করিল, নবীনবাবু আজ কি বললেন?

গিরীন যে সমস্ত কথাই জানে ললিতা তাহা জানিত না, তাই তাহার প্রশ্নটাকে অসঙ্গত কৌতূহল মনে করিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

গুরুচরণ খুলিয়া বলিলেন। নবীন রায়ের স্ত্রী বহুদিন হইতে অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছিলেন, সম্প্রতি রোগ কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকেরা বায়ু-পরিবর্তনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। অর্থের প্রয়োজন, অতএব এই সময়ে গুরুচরণের সমস্ত সুদ এবং কিছু আসল দিতে হইবে।

গিরীন ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, একটা কথা আপনাকে বলি বলি করেও বলতে পারিনি, যদি কিছু না মনে করেন আজ তা হলে বলি।

গুরুচরণ হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, আমাকে কোন কথা বলতে কেউ কখন ত সঙ্কোচ করে না গিরীন,—কি কথা?

গিরীন বলিল, দিদির কাছে শুনেচি, নবীনবাবুর খুব বেশী সুদ। তাই বলি, আমার অনেক টাকাই ত অমনি পড়ে রয়েছে, কোনও কাজেই আসে না, আর তাঁরও দরকার, নাহয় এই ঋণটা শোধ করেই দিন না?

ললিতা ও গুরুচরণ উভয়েই আশ্চর্য হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। গিরীন অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত বলিতে লাগিল, আমার এখন ত টাকার বিশেষ কোন আবশ্যক নাই, তাই যখন আপনার সুবিধা হবে, ফিরিয়ে দিলেই চলবে, ওঁদের আবশ্যক, সেইজন্যে বলছিলাম যদি—

গুরুচরণ ধীরে ধীরে বলিলেন, সমস্ত টাকাটা তুমি দেবে?

গিরীন মুখ নীচু করিয়া বলিল, বেশ ত, তাঁদের উপকার হয়—

গুরুচরণ প্রত্যুত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, ঠিক এই সময়ে আন্নাকালী ছুটিয়া আসিয়া পড়িল। সেজদি, জলদি—শেখরদা কাপড় পরে নিতে বললেন—থিয়েটার দেখতে যেতে হবে,—বলিয়াই যেমন করিয়া আসিয়াছিল তেমনি করিয়া চলিয়া গেল। তাহার ব্যগ্রতা দেখিয়া গুরুচরণ হাসিলেন। ললিতা স্থির হইয়া রহিল।

আন্নাকালী মুহূর্ত পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিল, কৈ, উঠলে না সেজদি, আমরা সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছি যে!

তথাপি ললিতা উঠিবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। সে শেষ পর্যন্ত শুনিয়া যাইতে চায়, কিন্তু গুরুচরণ কালীর মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া ললিতার মাথায় একটা হাত দিয়া বলিলেন, তাহলে যা মা, দেরি করিস নে—তোর জন্যে বুঝি সবাই অপেক্ষা করে আছে।

অগত্যা ললিতাকে উঠিতে হইল। কিন্তু, যাইবার পূর্বে গিরীনের মুখের পানে সে যে গভীর কৃতজ্ঞদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল, গিরীন্দ্র তাহা দেখিতে পাইল।

মিনিট-দশেক পরে কাপড় পরিয়া প্রস্তুত হইয়া সে পান দিবার ছুতা করিয়া আর একবার বাহিরের ঘরে নিঃশব্দ-পদক্ষেপে আসিয়া প্রবেশ করিল।

গিরীন চলিয়া গিয়াছে। একাকী গুরুচরণ মোটা বালিশটা মাথায় দিয়া চোখ বুজিয়া শুইয়া আছেন, তাঁহার মুদিত চক্ষুর দুই পাশ বাহিয়া জল ঝরিতেছে। এ যে আনন্দাশ্রু, ললিতা তাহা বুঝিল। বুঝিল বলিয়াই তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া দিল না, যেমন নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দে

বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে সে যখন শেখরের ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন তাহার নিজের চোখ দুটিও অশ্রুভারে ছলছল করিতেছিল। কালী ছিল না, সে সকলের আগে গাড়িতে গিয়া বসিয়াছিল, একাকী শেখর তাহার ঘরের মাঝখানে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বোধ করি ললিতার অপেক্ষাতেই ছিল, মুখ তুলিয়া জলভারাক্রান্ত চোখ দুটি লক্ষ্য করিল।

সে আট-দশ দিন ললিতাকে দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অতিশয় বিরক্ত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সে তাহা ভুলিয়া উদ্বিগ্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, ও কি, কাঁদচ নাকি?

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া প্রবলবেগে মাথা নাড়িল।

এই কয়দিনের একান্ত অদর্শনে শেখরের মনের মধ্যে একটা পরিবর্তন ঘটিতেছিল, তাই সে কাছে সরিযা আসিয়া দুই হাত দিয়া সহসা ললিতার মুখ তুলিযা ধরিয়া বলিল, সত্যিই কাঁদচ যে। হ'লো কি?

ললিতা এবার নিজেকে আর সামলাইয়া রাখিতে পারিল না, সেইখানে বসিয়া পড়িয়া আঁচলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

নবীন বায় সমস্ত সুদ আসল কড়াক্রান্তি গণিয়া লইয়া বন্ধকী কাগজখানা ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, বলি, টাকাটা দিলে কে হে?

গুরুচরণ নম্রভাবে কহিলেন, সেটা জিজ্ঞেস করবেন না দাদা, বলতে নিষেধ আছে।

টাকাটা ফেবত পাইয়া নবীন কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হয় নাই, এটা আশাও করেন নাই, ইচ্ছাও করেন নাই। বরং বাড়িটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া কিরূপ নূতন অট্টালিকা প্রস্তুত করিবেন, তাহাই ভাবিয়া রাখিয়াছিলেন। শ্লেষ করিয়া বল্লিলেন, তা এখন নিষেধ ত হবেই। ভায়া, দোষ তোমার নয়, দোষ আমার। দোষ, টাকাটা ফিরে চাওয়ার, নইলে কলিকাল বলেচে কেন।

গুরুচরণ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলি লন, সে কি কথা দাদা! আপনার টাকার ঋণটাই শোধ করেচি, কিন্তু আপনার দয়ার ঋণ ত শো৲ করতে পারিনি।

নবীন হাসিলেন। তিনি পাকা লোক, এ-সকল কথা বিশ্বাস করিলে গুড় বেচিয়া এত টাকা করিতে পারিতেন না। বলিলেন, সে যদি সত্যিই ভাবতে ভায়া, তা হলে এমন করে শোধ করে দিতে না। না হয় একবার টাকাটাই চেয়েছিলাম, সেও তোমারই বৌঠানের অসুখের জন্যে, আমার নিজের জন্যে কিছু নয়,—বলি কত সুদে বন্ধক রাখলে বাড়িটা?

গুরুচবণ ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন,—বন্ধক রাখিনি—সুদের কথাও কিছু হয়নি।

নবীন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, বল কি, শুধু-হাতে?

হাঁ দাদা, একরকম তাই বটে। ছেলেটি বড় সৎ, বড় দয়ার শরীর।

ছেলেটি? ছেলেটি কে?

গুরুচরণ এ প্রশ্নের জবাব দিলেন না, মৌন হইয়া রহিলেন। যতটা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন এতটাও তাঁহার বলা উচিত ছিল না।

নবীন তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, যখন নিষেধ আছে তখন কাজ নেই, কিন্তু সংসারের অনেক জিনিসই দেখেচি বলে এইটুকু সাবধান করে দিই ভায়া, তিনি যেই হোন, এত ভাল করতে গিয়ে শেষকালে যেন ফ্যাসাদে না ফেলেন।

গুরুচরণ সে-কথায় আর জবাব না দিয়া নমস্কার করিয়া কাগজখানি হাতে করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন।

প্রায় প্রতি বৎসরই ভুবনেশ্বরী এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য পশ্চিমে ঘুরিয়া আসিতেন। তাঁহার অজীর্ণ রোগ ছিল, ইহাতে উপকার হইত। রোগ বেশী নয়। নবীন গুরুচরণের কাছে সেদিন কার্যোদ্ধারের জন্যই বাড়াইয়া বলিয়াছিলেন। যাই হোক, যাত্রার আয়োজন হইতেছিল।

সেদিন সকালবেলা একটা চামড়ার তোরঙ্গে শেখর তাহার আবশ্যকীয় শৌখিন জিনিসপত্র গুছাইয়া লইতেছিল।

আন্নাকালী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, শেখরদা, তোমরা কাল যাবে, না?

শেখর তোরঙ্গ হতে মুখ তুলিয়া বলিল, কালী, তোর সেজদিকে ডেকে দে, কি সঙ্গে নেবে-টেবে, এই সময়ে দিয়ে যাক। ললিতা প্রতি বৎসর মায়ের সঙ্গে যাইত, এবারেও যাইবে তাহাই শেখর জানিত।

কালী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, এবার সেজদি ত যাবে না।

কেন যাবে না?

কালী কহিল, বাঃ, কি করে যাবে! মাঘ-ফাল্গুন মাসে ওর বিয়ে হবে, বাবা বর খুঁজে বেড়াচ্ছেন যে।

শেখর নির্নিমেষ চোখে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

কালী বাড়ির ভিতরে যাহা শুনিয়াছিল উৎসাহের সহিত ফিসফিস করিয়া বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু বলেচেন যত টাকা লাগে ভাল পাত্তর চাই। বাবা আজও অফিসে যাবেন না, খেয়েদেয়ে কোথায় ছেলে দেখতে যাবেন; গিরীনবাবুও সঙ্গে যাবেন।

শেখর স্থির হইয়া শুনিতে লাগিল এবং কেন যে ললিতা আর আসিতে চাহে না তাহারও যেন কতকটা কারণ বুঝিতে পারিল।

কালী বলিতে লাগিল, গিরীনবাবু খুব ভালমানুষ শেখরদা। মেজদির বিয়ের সময় আমাদের বাড়ি জ্যোঠামশায়ের কাছে বাঁধা ছিল ত, বাবা বলেছিলেন, আর দু'মাস-তিনমাস পরেই আমাদের সবাইকে পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হ'ত, তাই গিরীনবাবু টাকা দিলেন। কাল সব টাকা জ্যাঠামশায়কে বাবা ফিরিয়ে দিয়েচেন। সেজদি বলছিল, আর আমাদের কোনও ভয় নেই, সত্যি না শেখরদা?

প্রত্যুত্তরে শেখর কিছুই বলিতে পারিল না, তেমনিই চাহিয়া রহিল।

কালী জিজ্ঞাসা করিল, কি ভাবচ শেখরদা?

এইবার শেখরের চমক ভাঙ্গিল, তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, কিছু না রে। কালী, তোর সেজদিকে একবার শিগগির ডেকে দে, বল আমি ডাকচি, যা ছুটে যা।

কালী ছুটিয়া চলিয়া গেল।

শেখর খোলা তোরঙ্গের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল। কোন্ দ্রব্যে তাহার প্রয়োজন, কোন্ দ্রব্যে প্রয়োজন নাই, সমস্তই এখন তাহার চোখের সম্মুখে একাকার হইয়া গেল।

ডাক শুনিয়া ললিতা উপরে আসিয়া প্রথমে জানালার ফাঁক দিয়া দেখিল, তাহার শেখরদা মেঝের উপর একদৃষ্টে মাটির দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। তাহার এ-রকম মুখের ভাব সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। ললিতা আশ্চর্য হইল, ভয় পাইল। ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে শেখর 'এসো' বলিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ললিতা আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমাকে ডাকছিলে?

হ্যাঁ, বলিয়া শেখর ক্ষণকাল স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল, কাল সকালের গাড়িতেই আমি মাকে নিয়ে পশ্চিমে যাচ্ছি, এবার ফিরতে হয়ত দেরি হবে। এই চাবি নাও, তোমার খরচের টাকাকড়ি ও-দেরাজের মধ্যেই রইল।

প্রতিবার ললিতাও সঙ্গে যায়। গতবারে এই উপলক্ষ্যে সে কি আনন্দে জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়াছিল, এবার সে কাজটা শেখরদা একা করিতেছে, খোলা তোরঙ্গের দিকে চাহিবামাত্রই ললিতার তাহা মনে পড়িল।

শেখর তাহার দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া একবার কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া বলিল, সাবধানে থেকো—আর যদি কোন কিছুর বিশেষ আবশ্যক হয়, দাদার কাছে ঠিকানা জেনে নিয়ে আমাকে চিঠি লিখো। অতঃপর দুইজনেই চুপ করিয়া রহিল। এবার ললিতা সঙ্গে যাইবে না, শেখর তাহা জানিতে পারিয়াছে এবং তাহার কারণটাও হয়ত শুনিয়াছে মনে করিয়া ললিতা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

হঠাৎ শেখর কহিল, আচ্ছা যাও এখন, আমাকে আবার এইগুলো গুছিয়ে নিতে হবে। বেলা হ'ল, আজ একবার অফিসেও যেতে হবে।

ললিতা খোলা তোরঙ্গের সমুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া বলিল, তুমি স্নান কব গে, আমি গুছিয়ে দিচ্চি।

তাহলে ত ভালই হয়, বলিয়া শেখর চাবির গোছাটা ললিতার কাছে ফেলিয়া দিয়া ঘরেব বাহিবে আসিয়া সহসা, থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমার কি কি দরকার হয়, তা ভুলে যাওনি ত?

ললিতা মাথা ঝুঁকাইয়া তোরঙ্গের জিনিসপত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল, সে-কথার কোন জবাব দিল না।

শেখর নীচে গিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কালীর সমস্ত সংবাদই সত্য। গুরুচরণ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, সে কথাও সত্য। ললিতার পাত্র স্থির করিবার বিশেষ চেষ্টা হইতেছে তাহাও সত্য। সে আব কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা-দুই পরে স্নানাহার শেষ কবিয়া অফিসের পোশাক পরিতে নিজের ঘরে ঢুকিয়া সে সত্যই অবাক হইয়া গেল।

এই দুই ঘণ্টাকাল ললিতা কিছুই করে নাই, তোরঙ্গের একটা পাটির উপর মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। শেখরের পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ তুলিয়াই ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। তাহাব দুই চোখ জবাফুলের মত রক্তবর্ণ হইয়াছে।

কিন্তু, শেখর তাহা দেখিয়াও দেখিল না, অফিসের পোশাক পরিতে পরিতে সহজভাবে বলিল, এখন পারবে না ললিতা, দুপুরবেলা এসে গুছিয়ে রেখো। বলিয়া প্রস্তুত হইয়া অফিসে চলিয়া গেল। সে ললিতার রাঙ্গা চোখের হেতু ঠিক বুঝিয়াছিল, কিন্তু সব দিক বেশ করিয়া চিন্তা না করা পর্যন্ত আর কোন কথা বলিতে সাহস করিল না।

সেদিন অপরাহ্নে মামাদের চা দিতে আসিয়া ললিতা সহসা জড়সড় হইয়া পড়িল। আজ শেখর বসিয়া ছিল। সে গুরুচরণবাবুর কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছিল।

ললিতা ঘাড় হেঁট করিয়া দু বাটি চা প্রস্তুত করিয়া গিরীন ও তাহার মামার সম্মুখে দিতেই গিরীন কহিল, শেখরবাবুকে চা দিলে না ললিতা?

ললিতা মুখ না তুলিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, শেখরদা চা খান না।

গিরীন আর কিছু বলিল না, ললিতার নিজের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল। শেখর নিজে এটা খায় না, অপরে খায় তাহাও ইচ্ছা করে না।

চায়ের বাটি হাতে তুলিয়া লইয়া গুরুচরণ পাত্রের কথা পাড়িলেন। ছেলেটি বি. এ. পড়িতেছে,

ইত্যাদি বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া শেষে বলিলেন, অথচ আমাদের গিরীনের পছন্দ হয়নি। অবশ্য ছেলেটি দেখিতে তেমন সুশ্রী নয় বটে, কিন্তু পুরুষমানুষের রূপ আর কোন্ কাজে লাগে, গুণ থাকলেই যথেষ্ট।

কোনমতে বিবাহটা হইয়া গেলেই গুরুচরণ নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচেন।

শেখরের সহিত গিরীনের এইমাত্র সামান্য পরিচয় হইয়াছিল। শেখর তাহার দিকে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, গিরীনবাবুর পছন্দ হলো না কেন? ছেলেটি লেখাপড়া করছে, অবস্থাও ভাল,—এই ত সুপাত্র।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল বটে, কিন্তু সে ঠিক বুঝিয়াছিল কেন ইহার পছন্দ হয় নাই এবং কেন ভবিষ্যতেও হইবে না। কিন্তু, গিরীন সহসা এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না, তাহার মুখ ঈষৎ রক্তাভ হইল, শেখর তাহাও লক্ষ্য করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, কাকা, কাল মাকে নিয়ে পশ্চিমে চললুম, ঠিক সময়ে খবর দিতে যেন ভুলে যাবেন না।

গুরুচরণ বলিলেন, সে কি বাবা, তোমরাই যে আমার সব। তাছাড়া, ললিতার মা উপস্থিত না থাকলে ত কোনও কাজই হতে পারবে না। কি বলিস মা ললিতা? বলিয়া হাসিমুখে ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, সে উঠে গেল কখন?

শেখর কহিল, কথা উঠতেই পালিয়েচে।

গুরুচরণ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, পালাবে বৈ কি,— হাজার হোক জ্ঞানবুদ্ধি হয়েচে ত। বলিয়া সহসা একটা ক্ষুদ্র নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, মা আমার একাধারে যেন লক্ষ্মী-সরস্বতী। এমন মেয়ে বহু ভাগ্যে মেলে শেখরনাথ! কথাটা উচ্চারণ করিতেই তাঁর শীর্ণ কৃশ মুখের উপর গভীর স্নেহের এমন একটা স্নিগ্ধ-মধুর ছায়াপাত হইল যে, গিরীন ও শেখর উভয়েই আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে মনে মনে নমস্কার না করিয়া থাকিতে পারিল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

চায়ের মজলিস হইতে নিঃশব্দে পলাইয়া আসিয়া ললিতা শেখরের ঘরে ঢুকিয়া উজ্জ্বল গ্যাসের নীচে একটা তোরঙ্গ আনিয়া শেখরের গরম বস্ত্রগুলি পাট করিয়া গুছাইয়া রাখিতেছিল, শেখরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া মুখ তুলিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া সে ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া রহিল।

মকদ্দমায় সর্বস্ব হারিয়া মানুষ যে-রকম মুখ করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আইসে, এ-বেলার মানুষকে যেন ও-বেলায় সহসা আর চিনিতে পারা যায় না, এই একঘণ্টার মধ্যে তেমনি শেখরকে ললিতা যেন ঠিক চিনিতে পারিল না। তাহার মুখের উপর সর্বস্ব হারানোর সমস্ত চিহ্ন যেন কে চিহ্নিত করিয়া দিয়াছে।

শেখর শুষ্ককণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হচ্চে ললিতা?

ললিতা সে প্রশ্নের জবাব না দিয়া কাছে সরিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহার একটা হাত লইয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, কি হয়েচে শেখরদা?

কৈ, কিছুই হয়নি ত, বলিয়া শেখর জোর করিয়া একটু হাসিল। ললিতার করস্পর্শে তাহার মুখে কতকটা সজীবতা ফিরিয়া আসিল। সে নিকটস্থ একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া সেই প্রশ্নই করিল, তোমার হচ্চে কি?

ললিতা কহিল, মোটা ওভারকোটটা সঙ্গে দিতে ভুলেছিলুম, সেইটাই দিতে এসেচি।

শেখর শুনিতে লাগিল। ললিতা এতক্ষণে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া বলিতে লাগিল, গতবারে

গাড়িতে তোমার বড় কষ্ট হয়েছিল, বড় কোট ত অনেকগুলোই ছিল, কিন্তু খুব মোটাসোটা একটাও ছিল না। তাই আমি ফিরে এসেই দোকানে মাপ দিয়ে এইটে তৈরি করিয়েছিলুম, বলিয়া সে খুব ভারী একটা ওভারকোট তুলিয়া আনিয়া শেখরের কাছে রাখিল।

শেখর হাত দিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল, কৈ, আমাকে বলনি ত?

ললিতা হাসিয়া বলিল, তুমি 'বাবু'মানুষ, তোমাকে বললে কি এত মোটা কোট তৈরি করতে দিতে? তাই বলিনি, তৈরি করিয়ে তুলে রেখেছিলুম।—বলিয়া সেটা যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া বলিল, ঠিক উপরেই রইল, তোরঙ্গ খুললেই পাবে—শীত করলে গায়ে দিতে ভুলো না যেন।

আচ্ছা, বলিয়া শেখর নির্নিমেষ চোখে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিল, না, এমন হতেই পারে না।

কি হতে পারে না? গায়ে দেবে না?

শেখর তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, না, সে-কথা নয়—ও অন্য কথা। আচ্ছা ললিতা, মার জিনিসপত্র গোছান হয়েচে কি না জানো।

ললিতা কহিল, জানি, দুপুরবেলা আমিই সে-সমস্ত গুছিয়ে দিয়েছি, বলিয়া সে আর একবার সমস্ত দ্রব্য ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া চাবি বন্ধ করিতে লাগিল।

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ ললিতা, আসচে বছর আমার উপায় কি হবে বলতে পার?

ললিতা চোখ তুলিয়া বলিল, কেন?

কেন সে আমিই টের পাচ্চি ভাই, বলিয়া ফেলিয়াই নিজের কথাটা চাপা দিবার জন্য শুষ্কমুখে প্রফুল্লতা টানিয়া আনিয়া বলিল, কিন্তু পরের ঘরে যাবার আগে কোথায় কি আছে না আছে আমাকে দেখিয়া দিয়ে যেয়ো—নইলে দরকারের সময় কিছুই খুঁজে পাব না।

ললিতা রাগিয়া বলিল, যাও—

শেখর এতক্ষণে হাসিল, বলিল, যাও ত জানি, কিন্তু সত্যই উপায় হবে কি? আমার শখ ত আছে ষোল আনা, কিন্তু এক কড়ার শক্তি নেই। এ-সব কাজ চাকর দিয়েও হয় না—এখন থেকে দেখচি, তোমার মামার মত হতে হবে—এক কাপড় এক চাদর সম্বল করে—যা হয় তাই হবে।

ললিতা চাবির গোছাটা মেঝের উপর ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কাল সকালে একবার এসো।

ললিতা শুনিয়াও শুনিল না, দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় নামিয়া গেল। বাড়ি গিয়া দেখিল, ছাদের এক কোণে চাঁদের আলোয় বসিয়া আন্নাকালী একরাশ গাঁদাফুল লইয়া মালা গাঁথিতেছে। ললিতা তাহার কাছে গিয়া বসিয়া কহিল, হিমে বসে কি করছিস কালী?

কালী মুখ না তুলিয়াই বলিল, মালা গাঁথছি—আজ রাত্তিরে আমার মেয়ের বিয়ে।

কৈ, আমাকে বলিস নি ত?

ঠিক ছিল না সেজদি। এখন বাবা পাঁজি দেখে বললেন, আজ রাত্তির ছাড়া আর এ-মাসে দিন নেই। মেয়ে বড় হয়েচে, আর রাখতে পারিনে, যেমন-তেমন করে বিদেয় করছি। সেজদি, দুটো টাকা দাও না, জলখাবার আনাই।

ললিতা হাসিয়া বলিল, টাকার বেলায় সেজদি। যা, আমার বালিশের নীচে কাছে, নিগে যা। হাঁ রে কালী, গাঁদাফুলে কি বিয়ে হয়?

কালী গম্ভীরভাবে বলিল, হয়। অন্য ফুল না পেলে হয়। আমি কতগুলো মেয়ে পার করলুম সেজদি; আমি সব জানি,—বলিয়া খাবার আনাইবার জন্য নীচে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে বসিয়া মালা গাঁথিতে লাগিল।

খানিক পরে কালী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আর সকলকেই বলা হয়েচে শুধু শেখরদাকে বলা হয়নি—যাই, বলে আসি, নইলে তিনি দুঃখ করবেন, বলিয়া ও-বাড়ি চলিয়া গেল।

কালী পাকা গৃহিণী, সমস্ত কাজকর্মই সে সুশৃঙ্খলায় করে। শেখরদাদাকে সংবাদ দিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, তিনি একছড়া মালা চাইলেন। যাও না সেজদি, শিগগির করে দিয়ে এসো না। আমি ততক্ষণ এদিকে বন্দোবস্ত করি—লগ্ন শুরু হয়ে গেছে, আর সময় নেই।

ললিতা মাথা নাড়িয়া বলিল, আমি পারব না কালী, তুই দিয়ে আয়।

আচ্ছা যাচ্চি। ওই বড় ছড়াটা দাও, বলিয়া সে হাত বাড়াইল।

ললিতা হাতে তুলিয়া দিতে গিয়া কি ভাবিয়া বলিল, আচ্ছা, আমিই দিয়ে আসচি।

কালী গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যাও সেজদি, আমার অনেক কাজ—মরবার ফুরসত নেই।

তার মুখের ভাব ও কথার ভঙ্গী দেখিয়া ললিতা হাসিয়া ফেলিল। একবারে পাকা বুড়ী, বলিয়া হাসিয়া মালা লইয়া চলিয়া গেল। কবাটের কাছে আসিয়া দেখিল, শেখর একমনে চিঠি লিখিতেছে। দোর খুলিয়া পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাতেও শেখর টের পাইল না। তখন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহাকে চমকিত করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে সে মালাছড়াটা সাবধানে শেখরের মাথা গলাইয়া গলায় ফেলিয়া দিয়াই চৌকির পিছনে বসিয়া পড়িল।

শেখর প্রথমটা চমকিয়া উঠিয়া বলিল, এই কালী। পরক্ষণেই ঘাড় ফিরাইয়া দেখিয়া ভয়ানক গম্ভীর হইয়া বলিল, ও কি করলে ললিতা।

ললিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শেখরের মুখের ভাবে ঈষৎ শঙ্কিত হইয়া বলিল, কেন, কি?

শেখর পূর্ণমাত্রায় গাম্ভীর্য বজায় রাখিয়া বলিল, জান না কি? কালীকে জিজ্ঞেস করে এসো, আজকের রাত্তিরে গলায় মালা পরিয়ে দিলে কি হয়।

এখন ললিতা বুঝিল। চক্ষের নিমেষে তাহার সমস্ত মুখ ভীষণ লজ্জায় রাঙ্গা হইয়া উঠিল, সে না, কক্ষনো না,—কক্ষনো না, বলিতে বলিতে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেখর ডাকিয়া বলিল, যেয়ো না ললিতা, শুনে যাও—বিশেষ কাজ আছে—

শেখরের ডাক তাহার কানে গেল বটে, কিন্তু শুনিবে কে? কোথাও সে থামিতে পারিল না, দৌড়িয়া আসিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া একেবারে চোখ বুজিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

এই পাঁচ-ছয় বৎসর ধরিয়া সে শেখরের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও দিন এমন কথা শোনে নাই। একে ত গম্ভীরপ্রকৃতি শেখর কখনই তাহাকে পরিহাস করিত না, করিলেও এতবড় লজ্জাকর পরিহাস যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে, ইহা সে ত কল্পনা করিতেও পারিত না। লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া মিনিট-কুড়ি পড়িয়া থাকিয়া সে উঠিয়া বসিল। অথচ, শেখরকে সে মনে মনে ভয় করিত, তিনি বিশেষ কাজ আছে বলিয়া ডাকিয়াছিলেন, তাই যাইবে কি না ইহাই ললিতা উঠিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। ও-বাড়ির ঝির গলা শোনা গেল, ললিতাদি কোথায় গো, ছোটবাবু একবার ডাকচেন—

ললিতা বাহিরে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, যাচ্ছি, যাও। উপরে আসিয়া কবাট ফাঁক করিয়া দেখিল শেখর তখনও চিঠি লিখিতেছে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিল, কেন?

শেখর লিখিতে লিখিতে বলিল, কাছে এসো বলছি।

না, ঐখান থেকে বল।

শেখর মনে মনে হাসিয়া বলিল, হঠাৎ কি একটা কাজ ক'রে ফেললে বল ত?

ললিতা রুষ্টভাবে বলিল, যাও—আবার।

শেখর শুধু ফিরাইয়া বলিল, আমার দোষ কি। তুমিই ত করে গেলে—

কিছু করিনি—তুমি ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর কহিল, সেইজন্যই ত ডেকে পাঠিয়েছি ললিতা। কাছে এসো, ফিরিয়ে দিচ্চি। তুমি অর্ধেকটা করে গেছ, সরে এসো, আমি সেটা সম্পূর্ণ করে দি।

ললিতা দ্বারের অন্তরালে ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া বলিল, সত্যি বলছি তোমাকে, ও-রকম ঠাট্টা করলে আর কোনদিন তোমার সামনে আসবো না—বলচি, ওটা ফিরিয়ে দাও।

শেখর টেবিলের দিকে মুখ ফিরাইয়া মালাটা তুলিয়া লইয়া বলিল, নিয়ে যাও।

তুমি ঐখান থেকে ছুঁড়ে দাও।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, কাছে না এলে পাবে না।

তবে আমার কাজ নেই, বলিয়া ললিতা রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

শেখর চেঁচাইয়া বলিল, কিন্তু অর্ধেকটা হয়ে থাকলো—

থাকে থাক, বলিয়া ললিতা যথার্থই রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সে চলিয়া গেল বটে, কিন্তু নীচে গেল না। পূর্বদিকে খোলা ছাদের একান্তে গিয়া রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইল। তখন সম্মুখের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল এবং শীতের পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া যাইতেছিল। উপরে স্বচ্ছ নির্মল নীলাকাশ। সে একবার শেখরের ঘরের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল। এইবার তাহার চোখ জ্বালা করিয়া লজ্জায় অভিমানে দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। সে এত ছোট নহে যে, এ-সব কথার তাৎপর্য সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, তবে কেন তাহাকে এমন মর্মান্তিক উপহাস করা! সে যে কত তুচ্ছ, কত নীচ, এ-কথা বুঝিবার তাহার যথেষ্ট বয়স হইয়াছে। সে ঠিক জানে, সে অনাথ এবং নিরুপায় বলিয়া তাহাকে সবাই আদব ও যত্ন করে—শেখরও করে, তাহার জননীও করেন। তাহার আপনার বলিতে কেহ নাই, সত্যকার দায়িত্ব তাহার কাহারও উপর নির্ভর করে না বলিয়াই গিরীন্দ্র সম্পূর্ণ পর হইয়াও তাহাকে উদ্ধার করিয়া দিবার কথা তুলিতে পারিয়াছেন।

ললিতা চোখ মুদিয়া মনে মনে বলিল, এই কলিকাতার সমাজে তাহার মামার অবস্থা ত শেখরদের কত নীচে, সে আবার সেই মামার আশ্রিত গলগ্রহ। ওদিকে সমান ঘরে শেখরের বিবাহের কথাবার্তা চলিতেছে, দু'দিন আগেই হউক, পাছেই হউক, সেই ঘরেই একদিন হইবে। এই বিবাহ উপলক্ষে নবীন রায় কত টাকা আদায় কবিবেন, সে-সব আলোচনাও সে শেখরের জননীর কাছে শুনিয়াছে।

তবে কেন, তাহাকে হঠাৎ আজ এমন করিয়া শেখরদা অপমান করিয়া বসিল এই সব কথা ললিতা সুমুখের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া নিজের মনে মগ্ন হইয়া আলোচনা করিতেছিল, সহসা চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, শেখর নিঃশব্দে হাসিতেছে। ইতিপূর্বে যে উপায়ে মালাটা সে শেখরের গলায় পরাইয়া দিয়াছিল, ঠিক সেই উপায়ে সেই গাঁদা ফুলের মালাটা তাহার নিজের গলায় ফিরিয়া আসিয়াছে। কান্নায তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, তবু সে জোর করিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, কেন এমন করলে?

তুমি করেছিলে কেন?

আমি কিছু করিনি, বলিয়াই সে মালাটা টান মারিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিবার জন্য হাত দিয়াই হঠাৎ শেখরের চোখের দিকে চাহিয়া থামিয়া গেল। আর ছিঁড়িয়া ফেলিতে সাহস করিল না, কিন্তু কাঁদিয়া বলিল, আমার কেউ নেই বলেই ত তুমি এমন করে আমাকে অপমান করচ।

শেখর এতক্ষণ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, ললিতার কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল। এ ত ছেলেমানুষের কথা নয়। কহিল, আমি অপমান করছি, না, তুমি আমাকে অপমান করছ?

ললিতা চোখ মুছিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, আমি কৈ অপমান করলুম?

শেখর ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া সহজভাবে বলিল, এখন একটু ভেবে দেখলেই টের পাবে।

আজকাল বড় বাড়াবাড়ি কচ্ছিলে ললিতা, আমি বিদেশ যাবার আগে সেইটেই তোমায় বন্ধ করে দিলাম।—বলিয়া চুপ করিল।

ললিতা আর প্রত্যুত্তর করিল না, মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নাতলে দু'জনে স্তব্ধ হইয়া রহিল। শুধু নীচ হইতে কালীর মেয়ের বিয়ের শাঁখের শব্দ ঘন ঘন শোনা যাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ মৌন থাকিয়া শেখর কহিল, আর হিমে দাঁড়িয়ে থেক না, নীচে যাও।

যাচ্চি, বলিয়া ললিতা এতক্ষণ পরে তাহার পায়ের নীচে গড় হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, আমি কি করব বলে দিয়ে যাও।

শেখর হাসিল। একবার একটু দ্বিধা করিল, তারপর দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে বুকের উপরে টানিয়া আনিয়া নত হইয়া তাহার অধরে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া বলিল, কিছুই বলে দিতে হবে না ললিতা, আজ থেকে আপনিই বুঝতে পারবে।

ললিতার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

সে সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আমি হঠাৎ তোমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়ে ফেলেচি বলেই কি তুমি এ-রকম করলে?

শেখর হাসিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, না। আমি অনেকদিন থেকেই ভাবচি, কিন্তু স্থির করে উঠতে পারিনি। আজ স্থির করেছি, কেন না, আজই ঠিক বুঝতে পেরেচি, তোমাকে ছেড়ে থাকতে পারব না।

ললিতা বলিল, কিন্তু তোমার বাবা শুনলে ভয়ানক রাগ করবেন, মা শুনলে দুঃখ করবেন—এ হবে না শে—

বাবা শুনলে রাগ করবেন সত্যি, কিন্তু মা খুব খুশী হবেন। সে যাই হোক, যা হবার হয়ে গেছে—এখন তুমিও ফেরাতে পার না, আমিও পারিনে। যাও, নীচে গিয়ে মাকে প্রণাম কর গে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মাস-তিনেক পরে একদিন গুরুচরণ ম্লানমুখে নবীন রায়ের ঘরে ঢুকিয়া ফরাসের উপর বসিবার উপক্রম করিতেই, তিনি চীৎকার করিয়া নিষেধ করিলেন, না না না, এখানে নয়—ঐ চৌকির উপর ব'সো গিয়ে। আমি অসময়ে আবার স্নান করতে পারব না—বলি, জাত দিয়েচ না কি হে?

গুরুচরণ দূরে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

দিন-চারেক পূর্বে সে যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিল, আজ সেই সংবাদটা নানা বর্ণে বিচিত্র হইয়া গোঁড়া হিন্দু নবীনের শ্রুতিগোচর হইয়াছে। নবীনের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, কিন্তু গুরুচরণ তেমনি মৌন নতমুখে বসিয়া রহিল। সে কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া কাজটা করিয়া অবধি বাড়িতে কান্নাকাটি এবং অশান্তির পরিসীমা ছিল না।

নবীন পুনরায় তর্জন করিয়া উঠিলেন, বল না হে, সত্যি কি না?

গুরুচরণ জলভারাক্রান্ত দুই চক্ষু তুলিয়া বলিল, আজ্ঞে, সত্যি।

কেন এমন কাজ করলে? তোমার মাইনে ত মোটে ষাটটি টাকা, তুমি—ক্রোধে নবীন রায়ের মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না।

গুরুচরণ চোখ মুছিয়া, রুদ্ধকণ্ঠ পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, জ্ঞান ছিল না দাদা। দুঃখের জ্বালায় গলাতেই দড়ি দেবো, কি ব্রহ্মজ্ঞানীই হ'বো, কিছুই ঠাওরাতে পাচ্ছিলুম না। শেষে ভাবলুম, আত্মঘাতী না হয়ে ব্রহ্মজ্ঞানীই হই, তাই ব্রহ্মজ্ঞানীই হয়ে গেলুম।

গুরুচরণ চোখ মুছিতে মুছিতে বাহির হইয়া গেল।

নবীন চীৎকার করিয়া বলিলেন, বেশ করেচ, নিজের গলায় দড়ি না দিতে পেরে জাতের গলায় দড়ি টাঙ্গিয়ে দিয়েছ—আচ্ছা যাও, আর আমাদের সামনে কালামুখ বা'র করো না, এখন যাঁরা-সব মন্ত্রী হয়েচেন, তাঁদের সঙ্গেই থাক গে—মেয়েদের হাড়ি-মুচির ঘরে দেও গে যাও, বলিয়া বিদায় করিয়া দিয়া তিনি মুখ ফিরাইয়া বসিলেন।

নবীন রাগে অভিমানে কি যে করিবেন প্রথমটা কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। গুরুচরণ হাতের ভিতর হইতে সম্পূর্ণ বাহির হইয়া গিয়াছে, আর শীঘ্র মুঠার মধ্যে আসিবে, এ সম্ভাবনাও নাই—তাই নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করিয়া আপাতত জব্দ করিবার আর কোন ফন্দি খুঁজিয়া না পাইয়া, সেইদিনই মিস্ত্রী ডাকিয়া ছাদের যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া একটা মস্ত প্রাচীর তুলিয়া দিলেন।

এই সংবাদ বহুদূর-প্রবাসে বসিয়া ভুবনেশ্বরী শেখরের মুখে শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন,—শেখর, এ মতি-বুদ্ধি কে দিলে তাকে?

মতি-বুদ্ধি কে দিয়েছিল শেখর তাহা নিশ্চয় অনুমান করিয়াছিল। সে উল্লেখ না করিয়া বলিল, কিন্তু মা, দু'দিন পরে তোমরাই ত তাঁকে একঘ'রে করে রাখতে। এতগুলি মেয়ের বিয়ে তিনি কি করে দিতেন, আমি ত ভেবে পাইনে।

ভুবনেশ্বরী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, কিছুই আটকে থাকে না শেখর। আর সেজন্য আগে থেকে জাত দিতে হলে অনেককেই দিতে হয়। ভগবান যাদের সংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই তাদের ভার নিতেন।

শেখর চুপ করিয়া রহিল। ভুবনেশ্বরী চোখ মুছিয়া বলিলেন, আমার ললিতা মেয়েটাকে যদি সঙ্গে আনতুম, তা হলে যা হয় একটা উপায় আমাকেই করে দিতে হতো—দিতামও। আমি ত জানিনে গুরুচরণ এই সব মতলব করেই পাঠিয়ে দিলে না। আমি মনে করেছিলুম বুঝি সত্যিই তার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্চে।

শেখর মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া একটুখানি লজ্জিতভাবে বলিল, বেশ ত মা, এখন বাড়ি গিয়ে তাই কর না কেন? সে ত আর ব্রাহ্ম হয়নি—তার মামাই হয়েচে—আর তিনিও কিছু তার যথার্থ আপনার কেউ ন'ন। ললিতার কেউ নেই বলেই তাঁর ঘরে মানুষ হচ্চে।

ভুবনেশ্বরী ভাবিয়া বলিলেন, তা বটে, কিন্তু কর্তা এক রকমের মানুষ, তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। হয়ত তাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ পর্যন্ত করতে দেবেন না।

শেখরের নিজের মনেও এই আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল, সে তার কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পরে আর একমিনিটও তাহার বিদেশে থাকিতে ইচ্ছা রহিল না। দু-তিনদিন চিন্তিত অপ্রসন্ন-মুখে এদিকে-ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া একদিন সন্ধ্যার সময় আসিয়া বলিল, আর ভাল লাগচে না মা, চল বাড়ি যাই।

ভুবনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া বলিলেন, তাই চল শেখর, আমারও কিছু ভাল লাগছে না।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া মাতাপুত্র উভয়েই দেখিলেন, ছাদের সেই যাতায়াতের পথটা বন্ধ করিয়া প্রাচীর উঠিয়াছে। গুরুচরণের সহিত আর কোনও সম্পর্ক রাখা, এমন কি, মুখের আলাপ রাখাও যে কর্তার অভিপ্রেত নয়, তাহা কাহাকেও না জিজ্ঞাসা করিয়াই উভয়ে বুঝিলেন।

রাত্রে শেখরের আহারের সময় মা উপস্থিত ছিলেন, দুই-একটা কথার পরে বলিলেন, ওদের গিরীনবাবুর সঙ্গেই ললিতার বিয়ে দেবার কথাবার্তা হচ্ছে। আমি তা আগেই বুঝেছিলাম।

শেখর মুখ না তুলিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, কে বললে?

ওর মামী। দুপুরবেলা কর্তা ঘুমোলে আমি নিজেই গিয়ে দেখা করে এসেচি। সেই অবধি,

কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ ফুলিয়া ফেললে। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া তিনি নিজের চোখ দুটি আঁচলে মুছিয়া ফেলিয়া বলিলেন, কপাল, শেখর, কপাল। এই কপালের লেখা কেউ খণ্ডাতে পারে না—কার আর দোষ দিই বল! যাই হোক, গিরীন ছেলেটি ভাল, সঙ্গতিও আছে, ললিতার কষ্ট হবে না,—বলিয়া চুপ করিলেন।

প্রত্যুত্তরে শেখর কোন কথাই বলিল না,—মুখ নীচু করিয়া খাবারগুলা হাত দিয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সেও উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

পরদিন সন্ধ্যার পর একটুখানি ঘুরিয়া আসিবার জন্য সে পথে বাহির হইয়াছিল। তখন গুরুচরণের বাহিরের ঘরে প্রাত্যহিক চা-পানের সভা বসিয়াছিল এবং যথেষ্ট উৎসাহের সহিত হাসি এবং কথাবার্তা চলিতেছিল। তথাকার কোলাহল শেখরের কানে যাইবামাত্র সে একবার স্থির হইয়া কি ভাবিয়া লইল, তারপর ধীরে ধীরে বাড়ি ঢুকিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া গুরুচরণের বাহিরের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল। তৎক্ষণাৎ কলরব থামিল এবং তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সকলেরই মুখের ভাব পরিবর্তিত হইয়া গেল।

শেখর ফিরিয়া আসিয়াছিল এ সংবাদ ললিতা ছাড়া আর কেহ জানিত না। আজ গিরীন্দ্র এবং আরও একজন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, তিনি বিস্মিত-মুখে শেখরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, এবং গিরীন মুখ অত্যন্ত গম্ভীর করিয়া দেওয়ালের দিকে তাকাইয়া রহিল। সর্বাপেক্ষা অধিক চেঁচাইতেছিলেন গুরুচরণ নিজে, তাঁহার মুখ একেবারে পাণ্ডুর হইয়া গেল। তাঁহার হাতের কাছে বসিয়া ললিতা তখনও চা তৈরি করিতেছিল, একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া মাথা হেঁট করিল।

শেখর সরিয়া আসিয়া তক্তপোশের উপর মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল এবং একধারে বসিয়া পড়িয়া হাসিয়া বলিল, এ কি, একেবারে সমস্ত নিবে গেল যে!

গুরুচরণ মৃদুকণ্ঠে বোধ করি আশীর্বাদ করিলেন, কিন্তু কি বলিলেন বোঝা গেল না।

তাঁহার মনের ভাব শেখর বুঝিল, তাই সময় দিবার জন্য নিজেই কথা পাড়িল। কাল সকালের গাড়িতে ফিরিয়া আসিবার কথা, জননীর রোগ উপশম হইবার কথা, পশ্চিমের কথা, আরও কত কি সংবাদ অনর্গল বকিয়া গিয়া শেষে সেই অপরিচিত যুবকটির মুখের দিকে চাহিল।

গুরুচরণ এতক্ষণে নিজেকে কতকটা সামলাইয়া লইয়াছিলেন, ছেলেটির পরিচয় দিয়া বলিলেন, ইনি আমাদের গিরীনের বন্ধু। এক জায়গায় বাড়ি, একত্রে লেখাপড়া শেখা, অতি সৎ ছেলে—শ্যামবাজারে থাকেন, তবুও আমার সঙ্গে আলাপ হওয়া পর্যন্ত প্রায়ই এসে দেখা-সাক্ষাৎ করে যান।

শেখর ঘাড় নাড়িয়া মনে মনে বলিল, হাঁ, খুব ভাল ছেলে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, কাকা, আর সব খবর ভাল ত?

গুরুচরণ জবাব দিলেন না, মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। শেখর উঠিবার উপক্রম করিতেই হঠাৎ কাঁদ-কাঁদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, মাঝে মাঝে এসো বাবা, একেবারে যেন ত্যাগ করো না। সব কথা শুনেচ ত?

শুনেচি বৈ কি, বলিয়া শেখর অন্দরের দিকে চলিয়া গেল।

তার পরেই ভিতরে গৃহিনীর কান্নার শব্দ উঠিল, বাহিরে বসিয়া গুরুচরণ হেঁট মুখে কোঁচার খুঁট দিয়া নিজের চোখের জল মুছিতে লাগিলেন এবং গিরীন অপরাধীর মত মুখ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। ললিতা পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে শেখর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া বারান্দা পার হইয়া উঠানে নামিতে

গিয়া দেখিল, অন্ধকার কবাটের আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া আছে। সে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং দাঁড়াইয়া উঠিয়া বুকের একান্ত সন্নিকটে সরিয়া আসিয়া মুখ তুলিয়া মুহূর্তকাল নিঃশব্দে কি যেন আশা করিয়া রহিল, তার পর পিছাইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, আমার চিঠির জবাব দিলে না কেন?

কৈ, আমি ত চিঠি পাইনি—কি লিখেছিলে?

ললিতা বলিল, অনেক কথা। সে যাক। সব শুনেচ ত, এখন তোমার কি হুকুম, তাই বল।

শেখর বিস্ময়ের স্বরে কহিল, আমার হুকুম! আমার হুকুমে কি হবে?

ললিতা শঙ্কিত হইয়া মুখপানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন?

তা বৈ কি ললিতা। আমি কার ওপর হুকুম দেব?

আমার ওপর, আর কার ওপর দিতে পারো?

তোমার ওপরেই বা দেব কেন? আর দিলেই বা তুমি শুনবে কেন? শেখরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, ঈষৎ করুণ।

এবার ললিতা মনে মনে অত্যন্ত ভয় পাইয়া, আর একবার কাছে সরিয়া আসিয়া কাঁদ-কাঁদ গলায় বলিল, যাও—এখন আমার তামাশা ভাল লাগছে না। পায়ে পড়ি, কি হবে বল? ভয়ে রাত্তিরে আমার ঘুম হয় না।

ভয় কিসের?

বেশ যা হোক। ভয় হবে না, তুমি কাছে নেই, মা কাছে নেই, মাঝে থেকে মামা কি-সব কাণ্ড করে বসলেন—এখন মা যদি আমাকে ঘরে নিতে না চান?

শেখর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, সে সত্যি, মা নিতে চাইবেন না। তোমার মামা অপরের কাছে অনেক টাকা নিয়েচেন, সে-কথা তিনি শুনেচেন। তা ছাড়া, এখন তোমরা ব্রাহ্ম, আমরা হিন্দু।

আন্নাকালী এইসময়ে রান্নাঘর হইতে ডাক দিল, সেজদি, মা ডাকচেন।

ললিতা চেঁচাইয়া বলিল, যাচ্ছি, তার পর গলা খাট করিয়া বলিল, মামা যাই হোন, তুমি যা, আমিও তাই। মা তোমাকে যদি ফেলতে না পারেন, আমাকেও ফেলবেন না। আর গিরীনবাবুর কাছে টাকা নেবার কথা বলচ—তা সে আমি ফিরিয়ে দেব। আর ঋণের টাকা, দু'দিন আগেই হোক, পিছনেই হোক, দিতেই তো হবে।

শেখর প্রশ্ন করিল, অত টাকা পাবে কোথায়?

ললিতা শেখরের মুখের পানে একটিবার চোখ তুলিয়া মুহূর্তকাল মৌন থাকিয়া বলিল, জান না, মেয়েমানুষে কোথায় টাকা পায়? আমিও সেইখানে পাব।

এতক্ষণ শেখর সংযত হইয়া কথা কহিতে থাকিলেও ভিতরে পুড়িতেছিল, এবার বিদ্রূপ করিয়া বলিল, কিন্তু তোমার মামা তোমাকে বিক্রি করে ফেলেছেন যে।

ললিতা অন্ধকারে শেখরের মুখের ভাব দেখিতে পাইল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন টের পাইল। সে দৃঢ়স্বরে জবাব দিল, ও-সব মিছে কথা। আমার মামার মত মানুষ সংসারে নেই—তাঁকে তুমি ঠাট্টা ক'রো না। তাঁর দুঃখ-কষ্ট তুমি না জানতে পার, কিন্তু পৃথিবীসুদ্ধ লোক জানে, বলিয়া একবার ঢোক গিলিয়া, একবার ইতস্ততঃ করিয়া শেষে বলিল, তা ছাড়া তিনি টাকা নিয়েচেন, আমার বিয়ে হবার পরে, সুতরাং আমাকে বিক্রি করবার অধিকার তাঁর নেই, বিক্রিও করেন নি। এ অধিকার আছে শুধু তোমারি, তুমি ইচ্ছে করলে টাকা দেবার ভয়ে আমাকে বিক্রি করে ফেলতে পার বটে!—বলিয়া উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

সে রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত শেখর বিহ্বলের মত পথে পথে ঘুরিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতেছিল, সেদিনকার একফোঁটা ললিতা এত কথা শিখিল কিরূপে? এমন নির্লজ্জ মুখরার মত তাহার মুখের উপর কথা কহিল কি করিয়া?

আজ সে ললিতার ব্যবহারে সত্যই অত্যন্ত বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু, এই ক্রোধের যথার্থ হেতুটা কি, এ যদি শান্ত হইয়া ভাবিয়া দেখিত, দেখিতে পাইত রাগ ললিতার উপরে নহে, তাহা সম্পূর্ণ নিজের উপরেই।

ললিতাকে ছাড়িয়া এই কয়টা মাসের প্রবাস-বাসকালে সে নিজের কল্পনায় নিজেকে আবদ্ধ করিয়া শুধু কাল্পনিক সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতিই খতাইয়া দেখিত। কিন্তু ললিতা আজ যে তাহার জীবনের কতখানি, ভবিষ্যতের সহিত কিরূপ অচ্ছেদ্য-বন্ধনে গ্রথিত, তাহার অবর্তমানে বাঁচিয়া থাকা কত কঠিন, কত দুঃখকর, বিছানায় শুইয়া এই কথাই সে বার বার আলোচনা করিতে লাগিল। ললিতা শিশুকাল হইতে নিজেদের সংসারে মিশিয়াছিল বলিয়াই তাহাকে বিশেষ করিয়া আর সে সংসারের ভিতরে, বাপ-মা ভাই-বোনের মাঝখানে নামাইয়া আনিয়া দেখে নাই, দেখিবার কথাও মনে করে নাই। ললিতাকে হয়ত পাওয়া যাইবে না, পিতা-মাতা এ-বিবাহে সম্মতি দিবেন না, হয়ত সে অপর কাহারও হইবে,—দুশ্চিন্তা তাহার বারবার এই ধার বহিয়াই চলিয়াছিল তাই বিদেশে যাইবার পূর্বের রাত্রে জোর করিয়া গলায় মালা পরাইয়া দিয়া সে এইদিকের ভাঙ্গনটার মুখেই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিল।

প্রবাসে থাকিয়া গুরুচরণের ধর্মমত পরিবর্তনের সংবাদ পাইয়া, শুনিয়া সে ব্যাকুল হইয়া অহর্নিশি এই চিন্তাই করিয়াছিল, পাছে ললিতাকে হারাইতে হয়। সুখের হোক, দুঃখের হোক, ভাবনার এই দিকটাই তাহার পরিচিত ছিল, আজ ললিতার স্পষ্ট কথা এইদিকটা সজোরে বন্ধ করিয়া দিয়া ভাবনার ধারা একেবারে উলটা স্রোতে বহাইয়া দিয়া গেল। তখন চিন্তা ছিল, পাছে না পাওয়া যায়, এখন ভাবনা হইল, পাছে না ছাড়া যায়।

শ্যামবাজারের সম্বন্ধটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তাঁহারাও অত টাকা দিতে শেষ পর্যন্ত পিছাইয়া দাঁড়াইলেন। শেখরের জননীরও মেয়েটি মনঃপূত হইল না। সুতরাং এই দায় হইতে শেখর আপাততঃ অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু নবীন রায় দশ-বিশ হাজারের কথা বিস্মৃত হন নাই এবং সেপক্ষে নিশ্চেষ্ট হইয়াও ছিলেন না।

শেখর ভাবিতেছিল, কি করা যায়। সে-রাত্রির সেই কাজটা যে এতবড় গুরুতর হইয়া উঠিবে, ললিতা যে এমন অসংশয়ে বিশ্বাস করিয়া লইবে, তাহার সত্যই বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং ধর্মতঃ কোন কারণেই ইহার আর অন্যথা হইতে পারে না, সেদিন এত কথা শেখর ভাবিয়া দেখে নাই। যদিও নিজের মুখেই উচ্চারণ করিয়াছিল, যা হইবার হইয়াছে, এখন তুমিও ফিরাইতে পার না, আমিও না, কিন্তু তখন, আজ যেমন করিয়া সে সমস্তটা ভাবিয়া দেখিতেছে, তেমন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার শক্তিও ছিল না, বোধ করি অবসরও ছিল না।

তখন মাথার উপর চাঁদ উঠিয়াছিল, জ্যোৎস্নায় চারিদিক ভাসিয়া গিয়াছিল, গলায় মালা দুলিয়াছিল, প্রিয়তমার বক্ষস্পন্দন নিজের বুক পাতিয়া প্রথম অনুভবের মোহ ছিল, এবং প্রণয়ীরা যাহাকে অধরসুধা বলিয়াছেন, তাহাই পান করার অতি তীব্র নেশা ছিল। তখন স্বার্থ এবং ।ংসারিক ভালমন্দ মনে পড়ে নাই, অর্থলোলুপ পিতার রুদ্রমূর্তি চোখের উপর জাগিয়া উঠে নাই। ভাবিয়াছিল, মা ত ললিতাকে স্নেহ করেন, তখন তাঁহাকে সম্মত করানো কঠিন হইবে না, এবং দাদাকে দিয়া পিতাকে কোনমতে কোমল করিয়া আনিতে পারিলে, শেষ পর্যন্ত হয়ত

কাজটা হইয়াই যাইবে। তা ছাড়া, গুরুচরণ এইভাবে তখন নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের আশার পথটা পাথর দিয়া এমনভাবে আঁটিয়া বন্ধ করেন নাই। এখন যে বিধাতাপুরুষ নিজে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছেন।

বস্তুত শেখরের চিন্তা করিবার বিষয় বিশেষ কিছু ছিল না। সে নিশ্চয় বুঝিতেছিল, পিতাকে সম্মত করানো ত ঢের দূরের কথা, জননীকে সম্মত করানোও সম্ভব নহে। এ-কথা যে আর মুখে আনিবারও পথ নাই।

শেখর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আর একবার অস্ফুটে আবৃত্তি করিল, কি করা যায়। সে ললিতাকে বেশ চিনিত, তাহাকে নিজের হাতে মানুষ করিয়াছে—একবার যাহা সে নিজের ধর্ম বলিয়া বুঝিয়াছে, কোনমতেই তাহাকে ত্যাগ করিবে না। সে জানিয়াছে, সে শেখরের ধর্মপত্নী, তাই আজ সন্ধ্যার অন্ধকারে অসঙ্কোচে বুকের কাছে সরিয়া আসিয়া মুখের কাছে মুখ তুলিয়া অমন করিয়া দাঁড়াইতে পরিয়াছিল।

গিরীনের সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা শুরু হইয়াছে—কিন্তু কেহই তাহাকে ত সম্মত করাইতে পারিবে না। আর ত সে কোনমতেই চুপ করিয়া থাকিবে না। এখন সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিবে। শেখরের চোখমুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সত্যই ত। সে ত শুধু মালা-বদল করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহাকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়াছিল। ললিতা বাধা দেয় নাই—দোষ নাই বলিয়াই দেয় নাই—ইহাতে তাহার অধিকার আছে বলিয়াই দেয় নাই, এখন এই ব্যবহারের জবাব সে কার কাছে কি দিবে?

পিতামাতার অমতে ললিতাব সহিত বিবাহ হইতে পারে না, তাহা নিশ্চয়, কিন্তু গিরীনের সহিত ললিতার বিবাহ না হইবার হেতু প্রকাশ পাইবাব পর ঘরে-বাহিরে সে মুখ দেখাইবে কি কবিয়া?

দশম পরিচ্ছেদ

অসম্ভব বলিয়া শেখর ললিতার আশা একেবারেই ত্যাগ করিয়াছিল। প্রথম ক'টা দিন সে মনে মনে অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে থাকিত, পাছে হঠাৎ সে আসিয়া উপস্থিত হয়, পাছে সব কথা প্রকাশ করিয়া দেয়, পাছে সেই সব লইয়া লোকের কাছে জবাবদিহি করিতে হয়। কিন্তু কেহই তাহার কৈফিয়ত চাহিল না, কোন কথা প্রকাশ পাইয়াছে কিনা তাহাও বুঝা গেল না, কিংবা সে-বাড়ি হইতে এ-বাড়িতে কেহ আসা-যাওয়া পর্যন্ত করিল না। শেখরের ঘরের সুমুখে যে খোলা ছাদটা ছিল, তাহার উপরে দাঁড়াইলে ললিতাদের ছাদের সবটুকু দেখা যাইত; পাছে দেখা হয়, এই ভয়ে সে এই ছাদটায় পর্যন্ত দাঁড়াইত না। কিন্তু যখন নির্বিঘ্নে একমাস কাটিয়া গেল, তখন সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে বলিল, হাজার হোক মেয়েমানুষের লজ্জাশরম আছে, এ-সকল ব্যাপার সে প্রকাশ করিতেই পারে না। সে শুনিয়াছিল, ইহাদের বুক ফাটিয়া গেলেও মুখ ফুটিতে চাহে না, এ-কথা সে বিশ্বাস করিল এবং সৃষ্টিকর্তা তাহাদের দেহে এই দুর্বলতা দিয়াছেন বলিয়া সে মনে মনে তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করিল। অথচ শান্তি পাওয়া যায় না কেন? যখন হইতে সে বুঝিল আর ভয় নাই, তখন হইতেই এক অভূতপূর্ব ব্যথায় সমস্ত বুক ভরিয়া উঠিতেছে কেন? রহিয়া রহিয়া হৃদয়ের অন্তরতম স্থল পর্যন্ত এমন করিয়া নিরাশায়, বেদনায়, আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠে কেন? তবে ত ললিতা কোন কথাই বলিবে না—আর একজনের হাতে সঁপিয়া দিবার সময় পর্যন্ত মৌন হইয়া থাকিবে। তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে স্বামীর ঘর করিতে চলিয়া গিয়াছে মনে হইলেও অন্তরে-বাহিরে তাহার এমন করিয়া আগুন জ্বলিয়া উঠে কেন?

পূর্বে সে সন্ধ্যার সময় বেড়াইতে বাহির না হইয়া সুমুখের খোলা ছাদটার উপর পদচারণা করিত, আজও তাহাই করিতে লাগিল, কিন্তু একটি দিনও ও-বাড়ির কাহাকেও ছাদে দেখিতে পাইল না। শুধু একদিন আন্নাকালী কি করিতে আসিয়াছিল, কিন্তু তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চোখ নামাইয়া ফেলিল এবং শেখর তাহাকে ডাকিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই অদৃশ্য হইয়া গেল। শেখর মনে মনে বুঝিল, তাহারা যে পথ বন্ধ করিয়া প্রাচীর তুলিয়া দিয়াছে, ইহার অর্থ ঐ একফোঁটা কালী পর্যন্ত জানিয়াছে।

আরও একমাস গত হইল।

একদিন ভুবনেশ্বরী কথায় কথায় বলিলেন, এর মধ্যে তুই ললিতাটাকে দেখেচিস শেখর?

শেখর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, না, কেন?

মা বলিলেন, প্রায় দু'মাস পরে কাল তাকে ছাদে পেয়ে ডাকলুম—মেয়েটা আমার যেন আর-এক রকমের হয়ে গেছে। রোগা, মুখখানি শুকনো, যেন কত বয়স হয়েচে। এমনি গম্ভীর, কার সাধ্যি দেখে বলে চোদ্দ বছরের মেয়ে—তাঁহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। হাত দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া ভারী গলায় বলিলেন, পরনের কাপড়খানি ময়লা, আঁচলের কাছে খানিকটা সেলাই-করা। জিজ্ঞেস করলুম, তোর কাপড় নেই মা? বললে ত আছে, কিন্তু, বিশ্বাস হয় না। কোনদিনই সে ওর মামার দেওয়া কাপড় পরে না, আমিই দিই, আমিও ত ছ-সাত মাস কিছু দিইনি। তিনি আর বলিতে পারিলেন না, আঁচল দিয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন—ললিতাকে যথার্থই তিনি নিজের মেয়ের মত ভালবাসিতেন।

শেখর আর-এক দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে তিনি পুনরায় বলিলেন, আমি ছাড়া কোনদিন সে কারো কাছে কিছু চাইতেও পারে না। অসময়ে ক্ষিদে পেলেও বাড়িতে মুখ ফুটে বলতেও পারে না,—সেও আমি—ঐ আমার কাছে কাছে ঘুরে বেড়াতো—আমি তার মুখ দেখলেই টের পেতুম। আমার সেই কথাই মনে হয় শেখর, হয়ত মুখ শুকিয়ে শুকিয়ে বেড়ায়, কেউ তাকে বোঝেও না, জিজ্ঞেসও করে না। আমাকে ত শুধু সে মা বলেই ডাকে না, মায়ের মত ভালও বাসে যে।

শেখর সাহস করিয়া মায়ের মুখের দিকে চোখ ফিরাইতে পারিল না। যেদিকে চাহিয়াছিল, সেইদিকেই চাহিয়া থাকিয়াই কহিল, বেশ ত মা, কি তার দরকার ডেকে জিজ্ঞেস করে দাও না কেন?

নেবে কেন? উনি যাওয়া-আসার পথটা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। আমিই বা দিতে যাবো কোন মুখে? ঠাকুরপো দুঃখের জ্বালায় না বুঝে যেন একটা অন্যায় করেচেন, আমরা আপনার লোকের মত কোথায় একটা প্রায়শ্চিত্ত -ট্রায়শ্চিত্ত করিয়ে ঢেকে দেব, তা নয়, একেবারে পর করে দিলুম। আর তাও বলি, এঁর পীড়াপীড়িতেই সে জাত দিয়ে ফেলেছে। কেবল তাগাদা, কেবল তাগাদা—মনের ঘেন্নায় মানুষ সব করতে পারে। বরং আমি ত বলি, ঠাকুরপো ভালই করেছেন। ঐ গিরীন ছেলেটি আমাদের চেয়ে তাঁর ঢের বেশী আপনার, তার সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েটা সুখে থাকবে তা আমি বলচি। শুনচি, আসচে মাসেই হবে।

হঠাৎ শেখর মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল, আসচে মাসেই হবে নাকি?

তাই ত শুনি?

শেখর আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, ললিতার মুখে শুনলাম, ওর মামার দেহটাও নাকি আজকাল ভাল নেই। না থাকবারই কথা। একে তার নিজের মনের সুখ নেই, তাতে বাড়িতে নিত্য কান্নাকাটি—এক মিনিটের তরেও ও-বাড়িতে স্বস্তি নেই।

শেখর চুপ করিয়া শুনিতেছিল, চুপ করিয়াই রহিল।

খানিক পরে মা উঠিয়া গেলে সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল—সে ললিতার কথা ভাবিতে লাগিল।

এই গলিটায় দুখানা গাড়ির স্বচ্ছন্দে যাতায়াতের স্থান হয় না। একখানা গাড়ি খুব একপাশে ঘেঁষিয়া না দাঁড়াইলে আর একটা যাইতে পারে না। দিন-দশেক পরে শেখরের অফিস-গাড়ি গুরুচরণের বাটীর সুমুখে বাধা পাইয়া স্থির হইল। শেখর অফিস হইতে ফিরিতেছিল, নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল ডাক্তার আসিয়াছেন।

সে কিছুদিন পূর্বে মায়ের কাছে শুনিয়াছিল গুরুচরণের শরীর ভাল নাই। তাই মনে করিয়া আর বাড়ি গেল না, সোজা গুরুচরণের শোবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাই বটে। গুরুচরণ নির্জীবের মত বিছানায় পড়িয়া আছেন, একপাশে ললিতা এবং গিরীন শুষ্কমুখে বসিয়া আছে, সুমুখে চৌকির উপর বসিয়া ডাক্তার রোগ পরীক্ষা করিতেছেন।

গুরুচরণ অস্ফুট-স্বরে বসিতে বলিলেন, ললিতা মাথায় আঁচলটা আরো একটু টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া বসিল।

ডাক্তার পাড়ার লোক, শেখরকে চিনিতেন। রোগ পরীক্ষা করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাহিরে আসিযা বসিলেন। গিরীন পিছনে আসিয়া টাকা দিয়া ডাক্তার বিদায় করিবার সময়, তিনি বিশেষ করিয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, রোগ এখনও অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই, এই সময়ে বায়ু-পরিবর্তনের নিতান্ত আবশ্যক।

ডাক্তার চলিয়া গেলে উভয়েই আর একবার গুরুচরণের ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

ললিতা ইশারা করিয়া গিরীনকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি চুপি কথা কহিতে লাগিল, শেখব সুমুখের চৌকিতে বসিয়া স্তব্ধ হইয়া গুরুচরণের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনি ইতিপূর্বে ওদিকে মুখ ফিরাইয়া শুইয়াছিলেন, শেখরের পুনরাগমন জানিতে পারিলেন না।

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া শেখর উঠিয়া গেল, তখনও ললিতা ও গিরীন তেমনি চুপি চুপি কথাবার্তা কহিতেছিল. তাহাকে কেহ বসিতে বলিল না, আসিতে বলিল না, একটা কথা পর্যন্ত কেহ ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল না

আজ সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিল, ললিতা তাহাকে তাহার কঠিন দায় হইতে চিরদিনের মত মুক্তি দিয়াছে—এখন সে নির্ভয়ে হাঁফ ফেলিয়া বাঁচুক—তার শঙ্কা নাই, আর ললিতা তাহাকে জড়াইবে না! ঘরে আসিয়া কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে সহস্রবার মনে পড়িল, আজ সে নিজের চোখে দেখিয়া আসিয়াছে গিরীনই ও-বাড়ির পরম বন্ধু, সকলের আশা-ভরসা এবং ললিতার ভবিষ্যতের আশ্রয়। সে কেহ নয়, এমন বিপদের দিনেও ললিতা তাহার একটি মুখের পরামর্শেরও আর প্রত্যাশী নহে।

সে সহসা 'উঃ'—বলিয়া একটা গদীআঁটা আরাম-চৌকির উপর ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া পড়িল। ললিতা তাহাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিয়া মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল যেন সম্পূর্ণ পর—একেবারে অপরিচিত। আবার তাহারই চোখের সুমুখে গিরীনকে আড়ালে ডাকিয়া কত-না পরমর্শ। অথচ এই লোকটিরই অভিভাবকতায় একদিন তাকেই থিয়েটার দেখিতে পর্যন্ত যাইতে দেয় নাই।

এখনও একবার ভাবিবার চেষ্টা করিল, হয়ত সে তাহাদের গোপন সম্বন্ধের কথা স্মরণ করিয়াই লজ্জায় ওরূপ ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু তাই বা কি করিয়া সম্ভব? তাহা হইলে এত কাণ্ড ঘটিয়াছে,

অথচ একটি কথাও কি সে একদিনের মধ্যে কোন কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার চেষ্টা করিত না।

হঠাৎ ঘরের বাহিরে মায়ের কণ্ঠস্বর শোনা গেল—তিনি ডাকিয়া বলিতেছেন, কৈ রে, এখনও হাতমুখ ধুসনি—সন্ধ্যা হয় যে?

শেখর ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল এবং তাহার মুখের উপর মায়ের দৃষ্টি না পড়ে, এইভাবে ঘাড় ফিরাইয়া রাখিয়া তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেল।

এই কয়টা দিন অনেক কথাই অনেক রকমের রূপ ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ আনাগোনা করিয়াছে, শুধু একটা কথা সে ভাবিয়া দেখিত না, বস্তুত দোষ কোনদিকে। একটি আশার কথা সে আজ পর্যন্ত তাহাকে বলে নাই, কিংবা তাহাকে বলিবারও সুযোগ দেয় নাই। বরঞ্চ, পাছে প্রকাশ পায়, সে কোনরূপ দাবী করিয়া বসে, এই ভয়ে কাঠ হইয়া ছিল। তথাপি, সর্বপ্রকারের অপরাধ একা ললিতার মাথায় তুলিয়া দিয়াই সে তাহার বিচার করিতেছিল এবং নিজের হিংসায়, ক্রোধে, অভিমানে, অপমানে পুড়িয়া মরিতেছিল। বোধ করি, এমনি করিয়াই সংসারের সকল পুরুষ বিচার করে এবং এমনি করিয়াই দগ্ধ হয়।

পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সাত দিন কাটিয়াছে, আজও সন্ধ্যার পর নিস্তব্ধ ঘরের মধ্যে সেই আগুন জ্বালিয়া দিয়াই বসিয়াছিল, হঠাৎ দ্বারের কাছে শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়াই তাহার হৃৎপিণ্ড লাফাইয়া উঠিল। কালীর হাত ধরিয়া ললিতা ঘরে ঢুকিয়া নীচে কার্পেটের উপর স্থির হইয়া বসিল। কালী বলিল, শেখরদা, আমরা দুজনে তোমাকে প্রণাম করতে এসেচি—কাল আমরা চলে যাব।

শেখর কথা কহিতে পারিল না, চাহিয়া রহিল।

কালী বলিল, অনেক দোষ-অপরাধ তোমার পায়ে আমরা করেচি শেখরদা, সে-সব ভুলে যেয়ো।

শেখর বুঝিল, ইহার একটি কথাও কালীর নিজের নহে, সে শেখানো কথা বলিতেছে মাত্র। জিজ্ঞাসা করিল, কাল কোথায় যাবে তোমরা?

পশ্চিমে। বাবাকে নিয়ে আমরা সবাই মুঙ্গের যাব—সেখানে গিরীনবাবুর বাড়ি আছে। তিনি ভাল হলেও আর আমাদের আসা হবে না, ডাক্তার বলেছেন, এ-দেশ বাবার সহ্য হবে না।

শেখর জিজ্ঞাসা করিল, এখন তিনি কেমন আছেন?

একটু ভাল, বলিয়া কালী আঁচলের ভিতর হইতে কয়েক জোড়া কাপড় বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিল, জ্যাঠাইমা আমাদের কিনে দিয়েচেন।

ললিতা এতক্ষণ চুপ করিয়া ছিল, উঠিয়া গিয়া টেবিলের উপর একটি চাবি রাখিয়া দিয়া বলিল, আলমারির এই চাবিটা এতদিন আমার কাছেই ছিল, একটুখানি হাসিয়া বলিল, কিন্তু টাকাকড়ি ওতে আর নেই, সমস্ত খরচ হয়ে গেছে।

শেখর চুপ করিয়া রহিল।

কালী বলিল, চল সেজদি, রাত্তির হচ্ছে।

ললিতা কিছু বলিবার পূর্বেই এবার শেখর হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, কালী, নীচে থেকে আমার জন্যে দুটো পান নিয়ে এস ত ভাই।

ললিতা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, তুই বোস কালী, আমি এনে দিচ্ছি, বলিয়া দ্রুতপদে নামিয়া গেল। খানিক পরের পান আনিয়া কালীর হাতে দিল, সে শেখরকে দিয়া আসিল।

পান হাতে লইয়া শেখর নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

চললুম শেখরদা, বলিয়া কালী পায়ের কাছে আসিয়া গড় হইয়া প্রণাম করিল। ললিতা

যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, সেইখানেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উভয়েই ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

'শেখর তাহার ভালমন্দ ও আত্মমর্যাদা লইয়া বিবর্ণ পাণ্ডুরমুখে বিহ্বল হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। সে আসিল, যাহা বলিবার ছিল বলিয়া চিরদিনের মত বিদায় লইয়া গেল, কিন্তু শেখরের কিছুই বলা হইল না। যেন, বলিবার কথা তাহার ছিল না, এইভাবে সমস্ত সময়টুকু কাটিয়া গেল। ললিতা কালীকে ইচ্ছা করিয়াই সঙ্গে আনিয়াছিল; কারণ, সে চাহে না কোন কথা ওঠে, ইহাও সে মনে মনে বুঝিল। তাহার পরে, তাহার সর্বশরীর ঝিমঝিম করিতে লাগিল, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে উঠিয়া গিয়া বিছানায় চোখ বুজিয়া শুইয়া পড়িল।

একাদশ পরিচ্ছেদ

গুরুচবণের ভাঙ্গা দেহ মুঙ্গেরের জলহাওয়াতেও আর জোড়া লাগিল না। বৎসর-খানেক পরেই তিনি দুঃখের বোঝা নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন। গিরীন যথার্থই তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিয়াছিল এবং শেষ দিন পর্যন্ত তাহার যথাসাধ্য করিয়াছিল।

মৃত্যুর পূর্বে তিনি সজল-কণ্ঠে তাহার হাত ধরিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন, সে যেন কোনদিন পর না হইয়া যায় এবং এই গভীর বন্ধুত্ব যেন নিকট আত্মীয়তায় পরিণত হয়। তিনি ইহা চোখে দেখিয়া যাইতে পারিলেন না, অসুখ-বিসুখে সময় হইল না, কিন্তু পরলোকে বসিয়া যেন দেখিতে পান। গিরীন তখন সানন্দে এবং সর্বান্তঃকরণে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।

গুরুচরণের কলিকাতার বাটীতে যে ভাড়াটিয়া ছিল, তাহার মুখে ভুবনেশ্বরী মধ্যে মধ্যে সংবাদ পাইতেন, গুরুচরণের মৃত্যুসংবাদ তাহারাই দিয়াছিল।

তাহাব পব এ-বাড়িতে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল। নবীন রায় হঠাৎ মারা গেলেন।

ভুবনেশ্বরী শোকে-দুঃখে পাগলেব মত হইয়া বড়বধূর হাতে সংসার সঁপিয়া দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। বলিয়া গেলেন, আগামী বৎসর শেখরের বিয়ের সমস্ত ঠিক হইয়া গেলে তিনি আসিয়া বিবাহ দিয়া যাইবেন।

বিবাহের সম্বন্ধ নবীন বায় নিজেই স্থির করিয়াছিলেন। এবং পূর্বেই হইয়া যাইত, শুধু তাঁহার মৃত্যু হওয়াতেই এক বৎসরর স্থগিত ছিল। কন্যাপক্ষের আর বিলম্ব করা চলে না, তাই তাহারা কাল আসিয়া আশীর্বাদ করিয়া গিয়াছিল। এই মাসেই বিবাহ। আজ শেখর জননীকে আনিতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। আলমারি হইতে জিনিসপত্র নামাইয়া তোরঙ্গ সাজাইতে গিয়া অনেকদিন পরে তাহার ললিতার কথা মনে পড়িল—সব সে-ই করিত।

তিন বৎসরের অধিক হইল তাহারা চলিয়া গিয়াছে, ইহার মধ্যে তাহাদের কোন সংবাদই সে জানে না। জানিবাব চেষ্টাও করে নাই, বোধ করি, ইচ্ছাও ছিল না। ললিতার উপরে ক্রমশঃ তাহার একটা ঘৃণার ভাব আসিয়াছিল। কিন্তু আজ সহসা ইচ্ছা করিল, যদি কোনমতে একটা খবর পাওয়া যায়—কে কেমন আছে। অবশ্য ভাল থাকিবারই কথা, কারণ গিরীনের সঙ্গতি আছে, তাহা সে জানিত, তথাপি সে শুনিতে ইচ্ছা করে, কবে বিবাহ হইয়াছে, তাহার কাছে কেমন আছে—এই সব।

ও-বাড়ির ভাড়াটিয়ারাও আর নাই, মাস-দুই হইল বাড়ি খালি করিয়া চলিয়া গিয়াছে। শেখর একবার ভাবিল, চারুর বাপকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, কারণ তাঁহারা গিরীনের সংবাদ নিশ্চয় রাখেন।

ক্ষণকালের জন্য তোরঙ্গ গুছানো স্থগিত রাখিয়া সে শূন্যদৃষ্টিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া এই সব ভাবিতে লাগিল, এমন সময়ে দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া পুরাতন দাসী কহিল, ছোটবাবু, কালীর মা একবার আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

শেখর মুখ ফিরাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, কোন্ কালীর মা?

দাসী হাত দিয়া গুরুচরণের বাড়িটা দেখাইয়া বলিল, আমাদের কালীর মা ছোটবাবু, তাঁরা কাল রাত্তিরে ফিরে এসচেন যে।

চল যাচ্চি, বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ নামিয়া গেল।

তখন বেলা পড়িয়া আসিতেছিল, সে বাড়িতে পা দিতেই বুকভাঙ্গা কান্নার রোল উঠিল। বিধবা-বেশধারিণী গুরুচরণের স্ত্রীর কাছে গিয়া সে মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং কোঁচার খুঁট দিয়া নিঃশব্দে চোখ মুছিতে লাগিল। শুধু গুরুচরণের জন্য নহে, সে নিজের পিতার শোকেও আর একবার অভিভূত হইয়া পড়িল।

সন্ধ্যা হইলে ললিতা আলো জ্বালিয়া দিয়া গেল। দূর হইতে গলায় আঁচল দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, এবং ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। শেখর সপ্তদশবর্ষীয়া পরস্ত্রীর পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে বা ডাকিয়া কথা কহিতে পারিল না। তথাপি আড়চোখে যতটা সে দেখিতে পাইয়াছিল, মনে হইল, ললিতা যেন আরও বড় হইয়াছে এবং অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

অনেক কান্নাকাটির পরে গুরুচরণের বিধবা যাহা বলিলেন, তাহার মর্ম এই যে, এই বাড়িটা তিনি বিক্রয় করিয়া মুঙ্গেরে জামাইয়ের আশ্রয়ে থাকিবেন, এই তাঁর ইচ্ছা। বাড়িটা বহুদিন হইতে শেখরের পিতার ক্রয় করিবার ইচ্ছা ছিল, এখন উপযুক্ত মূল্যে তাঁহারাই ক্রয় করিলে ইহা একরকম নিজেদেরই থাকিবে, তাহার নিজেরও কোনরূপ ক্লেশ বোধ হইবে না এবং ভবিষ্যতে কখন তিনি এদেশে আসিলে, দুই-একদিন বাস করিয়া যাইতেও পারিবেন—এই-সব। শেখর, মাকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার যথাসাধ্য করিবে বলায় তিনি চোখ মুছিয়া বলিলেন, দিদি কি এর মধ্যে আসবেন না শেখর?

শেখর জানাইল, আজ রাত্রেই তাঁকে সে আনিতে যাইবে। অতঃপর তিনি একটি একটি করিয়া অন্যান্য সংবাদ জানিয়া লইলেন—শেখরের কবে বিবাহ, কোথায়, কত হাজার, কত অলঙ্কার, নবীন রায় কি করিয়া মারা গেলেন, দিদি কি করিলেন ইত্যাদি অনেক কথা বলিলেন এবং শুনিলেন।

শেখর যখন ছুটি পাইল, তখন জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। এই সময় গিরীন্দ্র উপর হইতে নামিয়া বোধ করি তাহার দিদির বাটীতে গেল। গুরুচরণের বিধবা দেখিতে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই শেখরনাথ? এমন ছেলে সংসারে আর হয় না।

শেখরের তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, তাহা সে জানাইল এবং আলাপ আছে বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু বাহিরের বসিবার ঘরের সুমুখে আসিয়া তাহাকে সহসা থামিতে হইল।

অন্ধকার দরজার আড়ালে ললিতা দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, শোনো, মাকে কি আজই আনতে যাবে?

শেখর বলিল, হাঁ।

তিনি কি বড় বেশী কাতর হয়ে পড়েচেন?

হাঁ, প্রায় পাগলের মত হয়ে ছিলেন।

তোমার শরীর কেমন আছে?

ভাল আছে, বলিয়া শেখর তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

রাস্তায় আসিয়া তাহার আপাদমস্তক লজ্জায় ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। ললিতার কাছাকাছি

দাঁড়াইতে হইয়াছিল বলিয়া তাহার নিজের দেহটাও যেন অপবিত্র হইয়া গিয়াছে, এমনি মনে হইতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সে যেমন-তেমন করিয়া তোরঙ্গ বন্ধ করিয়া ফেলিল এবং তখনও গাড়ির বিলম্ব আছে জানিয়া, আর একবার শয্যাশ্রয় করিয়া ললিতার বিষাক্ত স্মৃতিটাকে পোড়াইয়া নিঃশেষ করিয়া দিবে শপথ করিয়া সে হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঘৃণার দাবানল জ্বালিয়া দিল। দাহনের যাতনায় সে তাহাকে মনে মনে অকথ্য ভাষায় তিরস্কার করিল, এমন কি, কুলটা পর্যন্ত বলিতে সঙ্কোচ করিল না। তখন কথায় কথায় গুরুচরণের স্ত্রী বলিয়াছিলেন, এ ত সুখের বিয়ে নয়, তাই শেষ পর্যন্ত কারো মনে ছিল না, নইলে ললিতা তখন তোমাদের সকলকেই সংবাদ দিতে বলেছিল। ললিতার এই স্পর্ধাটা যেন সমস্ত আগুনের উপরেও শিখা বিস্তার করিয়া প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

শেখর মাকে লইয়া যখন ফিরিয়া আসিল, তখনও তাহার বিবাহের দশ-বারো দিন বিলম্ব ছিল।

দিন-তিনেক পরে, একদিন সকালে ললিতা শেখরের মায়ের কাছে বসিয়া একটা ডালায় কি কতকগুলা তুলিতেছিল। শেখর জানিত না, তাই কি একটা কাজে 'মা' বলিয়া ঘরে ঢুকিয়াই হঠাৎ থতমত খাইয়া দাঁড়াইল। ললিতা মুখ নীচু করিয়া কাজ করিতে লাগিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন, কি রে?

সে যে জন্য আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গিয়া, না, এখন থাক, বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। ললিতার মুখ দেখিতে পায় নাই, কিন্তু তাহার হাত দুইটির উপর তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল। তাহা সম্পূর্ণ নিরাভরণ না হইলেও দু'গাছি করিয়া কাঁচের চুড়ি ছাড়া আর কিছু ছিল না। শেখর মনে মনে ক্রুর হাসি হাসিয়া বলিল, এ আর এক রকমের ভড়ং। গিরীন সঙ্গতিপন্ন তাহা সে জানিত, তাহার পত্নীর হাত এরূপ অলঙ্কারশূন্য হইবার কোন সঙ্গত হেতু সে খুঁজিয়া পাইল না।

সেইদিনই সন্ধ্যার সময় সে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতেছিল, ললিতাও সেই সিঁড়িতে উপরে উঠিতেছিল, একপাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু শেখর নিকটে আসিতেই অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত মৃদুকণ্ঠে বলিল, তোমাকে একটা কথা বলবার আছে।

শেখর একমুহূর্ত স্থির হইয়া বিস্ময়ের স্বরে বলিল, কাকে? আমাকে?

ললিতা তেমনি মৃদুস্বরে বলিল, হাঁ তোমাকে।

আমার সঙ্গে আবার কি কথা! বলিয়া শেখর পূর্বাপেক্ষা দ্রুতপদে নামিয়া গেল।

ললিতা সেইখানে কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অতি ক্ষুদ্র একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

পরদিন সকালে শেখর তাহার বাহিরের ঘরে বসিয়া সেই দিনের সংবাদপত্র পড়িতেছিল, নিরতিশয় বিস্ময়ের সহিত চোখ তুলিয়া দেখিল, গিরীন প্রবেশ করিতেছে। গিরীন নমস্কার করিয়া নিকটে চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। শেখর প্রতি-নমস্কার করিয়া সংবাদপত্রটা একপাশে রাখিয়া দিয়া জিজ্ঞাসুমুখে চাহিয়া রহিল। উভয়ের চোখের পরিচয় ছিল বটে, কিন্তু, আলাপ ছিল না এবং সে-পক্ষে আজ পর্যন্ত দু'জনের কেহই কিছুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।

গিরীন একেবারেই কাজের কথা পাড়িল। বলিল, বিশেষ প্রয়োজনে আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এসেচি। আমার শাশুড়ীঠাকরুনের অভিপ্রায় আপনি শুনেচেন—বাড়িটা তিনি আপনাদের কাছে

বিক্রি করে ফেলতে চান। আজ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, শীঘ্র যা হোক একটা বন্দোবস্ত হয়ে গেলেই তাঁরা এই মাসেই মুঙ্গেরে ফিরে যেতে পারেন।

গিরীনকে দেখিবামাত্রই শেখরের বুকের মধ্যে ঝড় উঠিয়াছিল, কথাগুলা তাহার কিছুমাত্র ভাল লাগিল না, অপ্রসন্ন-মুখে বলিল, সে ত ঠিক কথা, কিন্তু বাবার অবর্তমানে দাদাই এখন মালিক, তাঁকে বলা আবশ্যক।

গিরীন মৃদু হাসিয়া বলিল, সে আমরাও জানি। কিন্তু তাঁকে আপনি বললেই ত ভাল হয়।

শেখর তেমনিভাবেই জবাব দিল, আপনি বললেও হতে পারে। ও-পক্ষের অভিভাবক এখন আপনিই।

গিরীন কহিল, আমার বলবার আবশ্যক হলে বলতে পারি; কিন্তু কাল সেজদি বলছিলেন, আপনি একটু মনোযোগ করলে অতি সহজেই হতে পারে।

শেখর মোটা তাকিয়াটায় হেলান দিয়া বসিয়া এতক্ষণ কথা কহিতেছিল, সোজা হইয়া উঠিয়া বসিয়া বলিল, কে বললেন?

গিরীন বলিল,—সেজদি—ললিতাদিদি বলছিলেন—

শেখর বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। তার পরে গিরীন কি যে বলিয়া গেল, তাহার একবিন্দুও তাহার কানে গেল না। খানিকক্ষণ বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, আমাকে মাপ করবেন গিরীনবাবু, কিন্তু ললিতার সঙ্গে কি আপনার বিবাহ হয়নি?

গিরীন জিব কাটিয়া বলিল, আজ্ঞে, না—ওদের সকলকেই আপনি জানেন—কালীর সঙ্গে আমার—

কিন্তু, সে-রকম ত কথা ছিল না।

গিরীন ললিতার মুখে সব কথাই শুনিয়াছিল, কহিল, না, কথা ছিল না, সে-কথা সত্য। গুরুচরণবাবু মৃত্যুকালে আমাকে অনুরোধ করে গিয়েছিলেন আমি আর কোথাও যেন বিবাহ না করি। আমিও প্রতিশ্রুত হই। তাঁর মৃত্যুর পরে সেজদিদি আমাকে বুঝিয়ে বলেন, অবশ্য, এ-সব কথা আর কেউ জানে না যে, ইতিপূর্বেই তাঁর বিবাহ হয়ে গেছে এবং স্বামী জীবিত আছেন। এ-কথা আর কেউ হয়ত বিশ্বাস করত না, কিন্তু আমি তাঁর একটি কথাও অবিশ্বাস করিনি। তা ছাড়া, স্ত্রীলোকের একবারের অধিক বিবাহ হতে পারে না—ও কি?

শেখরের দুই চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, এখন এই বাষ্প অশ্রুধারায় চোখের কোণ বহিয়া গিরীনের সম্মুখেই ঝরঝর করিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সেদিকে তাহার চৈতন্য ছিল না, তাহার মনেও পড়িল না, পুরুষের সম্মুখেই পুরুষের এই দুর্বলতা প্রকাশ পাওয়া অত্যন্ত লজ্জাকর।

গিরীন নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। তাহার মনে মনে সন্দেহ ছিলই—আজ সে ললিতার স্বামীকে নিশ্চয় চিনিতে পারিল। শেখর চোখ মুছিয়া ভারী গলায় বলিল, কিন্তু আপনি ত ললিতাকে স্নেহ করেন।

গিরীনের মুখের উপরে প্রচ্ছন্ন বেদনার গাঢ় ছায়া পড়িল, কিন্তু পরক্ষণেই সে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। আস্তে আস্তে বলিল, সে কথার জবাব দেওয়া অনাবশ্যক। তা ছাড়া, স্নেহ যত বড়ই হোক, জেনে-শুনে কেউ পরের বিবাহিত স্ত্রীকে বিবাহ করে না—যাক, গুরুজনের সম্বন্ধে ও-সব আলোচনা আমি করতে চাইনে, বলিয়া সে আর একবার হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আজ যাই, আবার অন্য সময় দেখা হবে, বলিয়া নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

গিরীনকে শেখর চিরদিনই মনে মনে বিদ্বেষ করিয়াছে, এইবারে সেই বিদ্বেষ নিবিড় ঘৃণায় পর্যবসিত হইয়াছিল, কিন্তু আজ সে চলিয়া যাইবামাত্র শেখর উঠিয়া আসিয়া ভূমিতলে বারংবার মাথা ঠেকাইয়া এই অপরিচিত ব্রাহ্ম-যুবকটির উদ্দেশে প্রণাম করিতে লাগিল। মানুষ নিঃশব্দে যে

কতবড় স্বার্থত্যাগ করিতে পারে, হাসিমুখে কি কঠোর প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারে তাহা আজ সে প্রথম দেখিল।

অপরাহ্নবেলায় ভুবনেশ্বরী নিজের ঘরে মেঝেয় বসিয়া ললিতার সাহায্যে নূতন বস্ত্রের রাশি থাক দিয়া সাজাইয়া রাখিতেছিলেন, শেখর ঘরে ঢুকিয়া মায়ের শয্যার উপর গিয়া বসিল। আজ সে ললিতাকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পালাইল না। মা চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, কিঁ রে!

শেখর জবাব দিল না, চুপ করিয়া থাক দেওয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে বলিল, ও কি হচ্ছে মা?

মা বলিলেন, নূতন কাপড় কাকে-কি-রকম দিতে হবে, হিসেব করে দেখচি—বোধ করি, আরও কিছু কিনতে হবে, না, মা?

ললিতা ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

শেখর হাসি-মুখে কহিল, আর যদি বিয়ে না করি মা?

ভুবনেশ্বরী হাসিলেন। বলিলেন, তা তুমি পারো, তোমার গুণে ঘাট নেই।

শেখরও হাসিয়া বলিল, তাই বোধ করি হয়ে দাঁড়ায় মা।

মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, ও কি কথা! অমন অলক্ষণে কথা মুখে আনিস নে।

শেখর বলিল, এতদিন মুখে ত আনিনি মা, কিন্তু আর না আনলে নয়—আর চুপ করে থাকলে মহাপাতক হবে মা।

ভুবনেশ্বরী বুঝিতে না পারিয়া শঙ্কিত-মুখে চাহিয়া রহিলেন।

শেখর বলিল, তোমার এই ছেলেটির অনেক অপরাধই তুমি ক্ষমা করে এসেচ, এটাও ক্ষমা কব মা, আমি সত্যই এ বিয়ে করতে পারব না।

পুত্রের কথা ও মুখের ভাব দেখিয়া ভুবনেশ্বরী সত্যই উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু সে ভাব চাপা দিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তাই হবে। এখন যা তুই এখান থেকে, আমাকে জ্বালাতন করিস নে শেখর—আমার অনেক কাজ।

শেখর আর একবার হাসিবার ব্যর্থ প্রয়াস কবিয়া শুষ্কস্বরে বলিল, না মা, সত্যিই বলচি তোমাকে, এ বিয়ে হতে পারবে না।

কেন, এ কি ছেলেখেলা?

ছেলেখেলা নয় বলেই ত বলছি মা।

ভুবনেশ্বরী এবার রীতিমত ভীত হইয়া সরোষে বলিলেন, কি হয়েচে, আমাকে বুঝিয়ে বল শেখর। ও-সব গোলমেলে কথা আমার ভাল লাগে না।

শেখব মৃদুকণ্ঠে বলিল, আর একদিন শুনো মা, আর একদিন বলবো।

আর একদিন বলবি! তিনি কাপড়ের গোছা একধারে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, তবে আজই আমাকে কাশী পাঠিয়ে দে, এমন সংসারে আমি একটা রাতও কাটাতে চাইনে।

শেখর অধোমুখে বসিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী অধিকতর অস্থির হইয়া বলিলেন, ললিতাও আমার সঙ্গে কাশী যেতে চায়, দেখি তার যদি একটা কিছু বন্দোবস্ত করতে পারি।

এবার শেখর মুখ তুলিয়া হাসিল, তুমি নিয়ে যাবে, তার আবার বন্দোবস্ত কার সঙ্গে করবে মা? তোমার হুকুমের বড় ওর আবার কি আছে!

ছেলের হাসিমুখ দেখিয়া তিনি মনে মনে একটু যেন আশান্বিতা হইলেন, ললিতার পানে

একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, শুনলি মা ওর কথা! ও মনে করে, আমি ইচ্ছা করলেই যেন যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারি। ওর মামীর মত নিতে হবে না?

ললিতা জবাব দিল না। শেখরের কথাবার্তার ধরনে সে মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছিল।

শেখর বলিয়া ফেলিল, তাঁকে জানাতে চাও, জানাও গে, সে তোমার ইচ্ছে। কিন্তু, তুমি যা বলবে তাই হবে মা, এ আমিও মনে করি, যাকে নিয়ে যেতে চাচ্চ, সেও মনে করে, ও তোমার পুত্রবধূ। বলিয়া ফেলিয়াই শেখর ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল।

ভুবনেশ্বরী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। জননীর সম্মুখে সন্তানের মুখে এ কি পরিহাস। একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি বললি? ও আমার কি?

শেখর মুখ তুলিতে পারিল না, কিন্তু জবাব দিল। আস্তে আস্তে বলিল, ঐ ত বললুম মা। আজ নয়, চার বৎসরের বেশী হ'লো, তুমি সত্যই ওর মা। আমি আর বলতে পারিনে মা, ওকে জিজ্ঞাসা কর ও-ই বলবে,—বলিয়াই দেখিল ললিতা গলায় আঁচল দিয়া মাকে প্রণাম করিবার উদ্যোগ করিতেছে। সেও উঠিয়া আসিয়া তাহার পাশে দাঁড়াইল, এবং উভয়ে একত্রে মায়ের পদপ্রান্তে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া শেখর নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

ভুবনেশ্বরীর দুই চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ললিতাকে সত্যই অত্যন্ত ভালবাসিতেন। সিন্দুক খুলিয়া নিজের সমস্ত অলঙ্কার বাহির করিয়া তাহাতে পরাইতে পরাইতে একটু একটু করিয়া সব কথা জানিয়া লইলেন। সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তাই বুঝি গিরীনের কালীর সঙ্গে বিয়ে হয়েচে?

ললিতা বলিল, হ্যাঁ মা, তাই। গিরীনবাবুর মত মানুষ সংসারে আর আছে কিনা জানি না। আমি তাঁকে বুঝিয়ে বলতেই, তিনি বিশ্বাস করলেন যে সত্যিই আমার বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী আমাকে গ্রহণ করুন, না করুন, সে তাঁর ইচ্ছে, কিন্তু তিনি আছেন।

ভুবনেশ্বরী তাহার মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, আছে বৈ কি মা! আশীর্বাদ করি, জন্ম জন্ম দীর্ঘজীবী হয়ে থাকুক, একটু বোস মা, আমি অবিনাশকে জানিয়ে আসি যে, বিয়ের কনে বদল হয়ে গেছে, বলিয়া হাসিয়া বড়ছেলের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন।

আরণ্যক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

পনের-ষোল বছর আগেকার কথা। বি.এ. পাস করিয়া কলিকাতায় বসিয়া আছি। বহু জায়গায় ঘুরিয়াও চাকুরি মিলিল না।

সরস্বতী-পূজার দিন। মেসে অনেকদিন ধরিয়া আছি তাই নিতান্ত তাড়াইয়া দেয় না, কিন্তু তাগাদার উপর তাগাদা দিয়া মেসের ম্যানেজার অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। মেসে প্রতিমা গড়াইয়া পূজা হইতেছে—ধুমধামও মন্দ নয়, সকালে উঠিয়া ভাবিতেছি আজ সব বন্ধ, দু-একটা জায়গায় একটু আশা দিয়াছিল, তা আজ আর কোথাও যাওয়া কোন কাজের হইবে না, বরং তার চেয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঠাকুর দেখিয়া বেড়াই।

মেসের চাকর জগন্নাথ এমন সময় একটুকরা কাগজ হাতে দিয়া গেল। পড়িয়া দেখিলাম ম্যানেজারের লেখা তাগাদার চিঠি। আজ মেসে পূজা-উপলক্ষে ভাল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে, আমার কাছে দু-মাসের টাকা বাকী, আমি যেন চাকরের হাতে অন্তত দশটি টাকা দিই। অন্যথা কাল হইতে খাওয়ার জন্য আমাকে অন্যত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে।

কথা খুব ন্যায্য বটে, কিন্তু আমার সম্বল মোটে দুটি টাকা আর কয়েক আনা পয়সা। কোন জবাব না দিয়াই মেস হইতে বাহির হইলাম। পাড়ার নানা স্থানে পূজার বাজনা বাজিতেছে, ছেলেমেয়েরা গলির মোড়ে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে, অভয় ময়রার খাবারের দোকানে অনেক রকম নতুন খাবার থালায় সাজানো—বড়রাস্তার ওপারে কলেজ হোস্টেলের ফটকে নহবৎ বসিয়াছে। বাজার হইতে দলে দলে লোক ফুলের মালা ও পূজার উপকরণ কিনিয়া ফিরিতেছে।

ভাবিলাম কোথায় যাওয়া যায়। আজ এক বছরের উপর হইল জোড়াসাঁকো স্কুলের চাকুরি ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া আছি—অথবা বসিয়া ঠিক নাই, চাকুরির খোঁজে হেন মার্চেন্ট আপিস নাই, হেন স্কুল নাই, হেন খবরের কাগজের আপিস নাই, হেন বড়লোকের বাড়ী নাই—যেখানে অন্তত দশ বার না হাঁটাহাঁটি করিয়াছি, সকলেরই এক কথা, চাকুরি খালি নাই।

হঠাৎ পথে সতীশের সঙ্গে দেখা। সতীশের সঙ্গে হিন্দু হোস্টেলে একসঙ্গে থাকিতাম। বর্তমানে সে আলীপুরের উকীল, বিশেষ কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না, বালিগঞ্জের ওদিকে কোথায় একটা টিউশনি আছে, সেটাই সংসারসমুদ্রে বর্তমানে তাহার পক্ষে ভেলার কাজ করিতেছে। আমার ভেলা তো দূরের কথা, একখানা মাস্তুল-ভাঙা কাঠও নাই, যতদূর হাবুডুবু খাইবার তাহা খাইতেছি—সতীশকে দেখিয়া সে কথা আপাতত ভুলিয়া গেলাম। ভুলিয়া গেলাম তাহার আর একটা কারণ, সতীশ বলিল—এই যে, কোথায় চলেছ সত্যচরণ? চল হিন্দু হোস্টেলের ঠাকুর দেখে আসি—আমাদের পুরনো জায়গাটা। আর ওবেলা বড় জল্‌সা হবে—এসো। ওয়ার্ড সিক্সের সেই অবিনাশকে মনে আছে, সেই যে ময়মনসিংহের কোন্ জমিদারের ছেলে, সে যে আজকাল বড় গায়ক। সে গান গাইবে, আমায় আবার একখানা কার্ড দিয়েছে—তাদের এস্টেটের দু-একটা কাজকর্ম মাঝে মাঝে করি কিনা। এসো, তোমায় দেখলে সে খুশী হবে।

কলেজে পড়িবার সময়, আজ পাঁচ-ছয় বছর আগে, আমোদ পাইলে আর কিছু চাহিতাম না—এখনও সে মনের ভাব কাটে নাই দেখিলাম। হিন্দু হোস্টেলে ঠাকুর দেখিতে গিয়া সেখানে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ পাইলাম। কারণ আমাদের দেশের অনেক পরিচিত ছেলে এখানে থাকে, তাহারা কিছুতেই আসিতে দিতে চাহিল না। বলিলাম—বিকেলে জল্‌সা হবে, তা এখন কি। মেস থেকে খেয়ে আসব এখন।

তাহারা সে কথায় কর্ণপাত করিল না।

কর্ণপাত করিলে আমাকে সরস্বতী-পূজার দিনটা উপবাসে কাটাইতে হইত। ম্যানেজারের অমন

কড়া চিঠির পরে আমি গিয়া মেসের লুচি পায়েসের ভোজ খাইতে পারিতাম না—যখন একটা টাকাও দিই নাই। এ বেশ হইল—পেট ভরিয়া নিমন্ত্রণ খাইয়া বৈকালে জল্‌সার আসরে গিয়া বসিলাম। আবার তিন বৎসর পূর্বের ছাত্র-জীবনের উল্লাস ফিরিয়া আসিল—কে মনে রাখে যে চাকুরি পাইলাম কি না-পাইলাম, মেসের ম্যানেজার মুখ হাঁড়ি করিয়া বসিয়া আছে কি না-আছে, ঠুংরি ও কীর্তনের সমুদ্রে তলাইয়া গিয়া ভুলিয়া গেলাম যে দেনা মিটাইতে না পারিলে কাল সকাল হইতে বায়ু-ভক্ষণের ব্যবস্থা হইবে। জল্‌সা যখন ভাঙ্গিল তখন রাত এগারটা। অবিনাশের সঙ্গে আলাপ হইল, হিন্দু হোস্টেলে থাকিবার সময় সে আর আমি ডিবেটিং ক্লাবের চাঁই ছিলাম—একবার স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমরা সভাপতি করিয়াছিলাম। বিষয় ছিল, "স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা প্রবর্তন করা উচিত"। অবিনাশ প্রস্তাবকর্তা আমি প্রতিবাদী-পক্ষের নায়ক। উভয় পক্ষের তুমুল তর্কের পরে সভাপতি আমাদের পক্ষে মত দিলেন। সেই হইতে অবিনাশের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হইয়া যায়—যদিও কলেজ হইতে বাহির হইয়া এই প্রথম আবার তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ।

অবিনাশ বলিল—চল, আমার গাড়ী রয়েছে—তোমাকে পৌঁছে দিই। কোথায় থাক?

মেসের দরজায় নামাইয়া বলিল—শোন, কাল হ্যারিংটন স্ট্রীটে আমার বাড়ীতে চা খাবে বিকেল চারটের সময়। ভুলো না যেন। তেত্রিশের দুই। লিখে রাখো তো নোট-বইয়ে।

পরদিন খুঁজিয়া হ্যারিংটন স্ট্রীট বাহির করিলাম, বন্ধুর বাড়ীও বাহির করিলাম। বাড়ী খুব বড় নয়, তবে সামনে পিছনে বাগান। গেটে উইস্টারিয়া লতা, নেপালী দারোয়ান, ও পিতলের প্লেট। লাল সুরকীর বাঁকা রাস্তা—রাস্তার এক ধারে সবুজ ঘাসেব লন, অন্য ধারে বড় বড় মুচুকুন্দ চাঁপা ও আমগাছ। গাড়ীবারান্দায় বড় একখানা মোটর গাড়ী। বড়লোকের বাড়ী নয় বলিয়া ভুল করিবার কোন দিক হইতে কোন উপায় নাই। সিঁড়ি দিয়া ওপরে উঠিয়াই বসিবার ঘর। অবিনাশ আসিয়া আদব করিয়া ঘরে বসাইল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পুরাতন দিনের কথাবার্তায় আমরা দুজনেই মশগুল হইয়া গেলাম। অবিনাশের বাবা ময়মনসিংহের একজন বড় জমিদার, কিন্তু সম্প্রতি কলিকাতার বাড়ীতে তাঁহারা কেহই নাই। অবিনাশের এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে গত অগ্রহায়ণ মাসে দেশে গিয়াছিলেন—এখনও কেহই আসেন নাই।

এ-কথা ও-কথার পর অবিনাশ বলিল—এখন কি করছ সত্য?

বলিলাম—জোড়াসাঁকো স্কুলে মাস্টারী করতুম, সম্প্রতি বসেই আছি একরকম। ভাবছি আর মাস্টারী করব না। দেখছি অন্য কোন দিকে যদি—দু-এক জায়গায় আশাও পেয়েছি।

আশা পাওয়ার কথা সত্য নয়, কিন্তু অবিনাশ বড়লোকের ছেলে, মস্তবড় এস্টেট ওদের। তাহার কাছে চাকুরির উমেদারী করিতেছি এটা না দেখায়, তাই কথাটা বলিলাম।

অবিনাশ একটুখানি ভাবিয়া বলিল—তোমার মত একজন উপযুক্ত লোকের চাকুরি পেতে দেরী হবে না অবিশ্যি। আমার একটা কথা আছে, তুমি তো আইনও পড়েছিলে—না?

বলিলাম—পাসও করেছি, কিন্তু ওকালতি করবার মতিগতি নেই।

অবিনাশ বলিল—আমাদের একটা জঙ্গল-মহাল আছে পূর্ণিয়া জেলায়। প্রায় বিশ-ত্রিশ হাজার বিঘে জমি। আমাদের সেখানে নায়েব আছে কিন্তু তার ওপর বিশ্বাস করে অত জমি বন্দোবস্তের ভার দেওয়া চলে না আমরা একজন উপযুক্ত লোক খুঁজছি। তুমি যাবে?

কান অনেক সময় মানুষকে প্রবঞ্চনা করে জানিতাম। অবিনাশ বলে কি! যে চাকুরির খোঁজে আজ একটি বছর কলিকাতার রাস্তাঘাট চষিয়া বেড়াইতেছি, চায়ের নিমন্ত্রণে সম্পূর্ণ অযাচিতভাবে সেই চাকুরিব প্রস্তাব আপনা হইতে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল?

তবুও মান বজায় রাখিতে হইবে। অত্যন্ত সংযমের সহিত মনের ভাব চাপিয়া উদাসীনের মত বলিলাম—ও। আচ্ছা ভেবে বলব। কাল আছো তো?

অবিনাশ খুব খোলাখুলি ও দিলদরিয়া মেজাজের মানুষ। বলিল—ভাবাভাবি রেখে দাও।

আমি বাবাকে আজই পত্র লিখতে বসছি। আমরা একজন বিশ্বাসী লোক খুঁজছি। জমিদারীর ঘুণ কর্মচারী আমরা চাই নে—কারণ তারা প্রায়ই চোর। তোমার মত শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান লোকের সেখানে দরকার। জঙ্গল-মহাল আমরা নূতন প্রজার সঙ্গে বন্দোবস্ত করব। ত্রিশ হাজার বিঘের জঙ্গল। অত দায়িত্বপূর্ণ কাজ কি যার-তার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। তোমার সঙ্গে আজ আলাপ নয়, তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমি জানি। তুমি রাজী হয়ে যাও—আমি এখুনি বাবাকে লিখে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আনিয়ে দিচ্ছি।

২

কি করিয়া চাকুরি পাইলাম তাহা বেশী বলিবার আবশ্যক নাই। কারণ এ গল্পের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সংক্ষেপে বলিয়া রাখি—অবিনাশের বাড়ীর চায়ের নিমন্ত্রণ খাইবার দুই সপ্তাহ পরে আমি একদিন নিজের জিনিসপত্র লইয়া বি এন্ ডব্লিউ রেলওয়ের একটা ছোট স্টেশনে নামিলাম।

শীতের বৈকাল। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঘন ছায়া নামিয়াছে, দূরে বনশ্রেণীর মাথায় মাথায় অল্প অল্প কুয়াশা জমিয়াছে। রেল-লাইনের দু-ধারে মটর-ক্ষেত, শীতল সান্ধ্য-বাতাসে তাজা মটরশাকের স্নিগ্ধ সুগন্ধে কেমন মনে হইল যে-জীবন আরম্ভ করিতে যাইতেছি তাহা বড় নির্জন হইবে, এই শীতের সন্ধ্যা যেমন নির্জন, যেমন নির্জন এই উদার প্রান্তর আর ওই দূরের নীলবর্ণ বনশ্রেণী, তেমনি।

গরুর গাড়ীতে প্রায় পনের-ষোল ক্রোশ চলিলাম সারারাত্রি ধরিয়া—ছইয়ের মধ্যে কলকাতা হইতে আনীত কম্বল র‍্যাগ ইত্যাদি শীতে জল হইয়া গেল—কে জানিত এ-সব অঞ্চলে ভয়ানক শীত! সকালে রৌদ্র যখন উঠিয়াছে, তখনও পথ চলিতেছি। দেখিলাম, জমির প্রকৃতি বদলাইয়া গিয়াছে—প্রাকৃতিক দৃশ্যও অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছে—ক্ষেতখামার নাই, বস্তি লোকালয়ও বড়-একটা দেখা যায় না—কেবল ছোটবড় বন, কোথাও ঘন, কোথাও পাতলা, মাঝে মাঝে মুক্ত প্রান্তর, কিন্তু তাহাতে ফসলের আবাদ নাই।

কাছারিতে পৌঁছিলাম বেলা দশটার সময়। জঙ্গলের মধ্যে প্রায় দশ-পনের বিঘা জমি পরিষ্কার করিয়া কতকগুলি খড়ের ঘর, জঙ্গলেরই কাঠ, বাঁশ ও খড় দিয়া তৈরী—ঘরে শুক্‌নো ঘাস ও বন-ঝাউয়ের সরু গুঁড়ির বেড়া, তাহার উপর মাটি দিয়া লেপা।

ঘরগুলি নতুন তৈরী, ঘরের মধ্যে ঢুকিয়াই টাটকা-কাটা খড়, আধকাঁচা ঘাস ও বাঁশের গন্ধ পাওয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, আগে জঙ্গলের ওদিকে কোথায় কাছারি ছিল, কিন্তু শীতকালে সেখানে জলাভাব হওয়ায় এই ঘর নতুন বাঁধা হইয়াছে, কারণ পাশেই একটা ঝরণা থাকায় এখানে জলের কষ্ট নাই।

৩

জীবনের বেশীর ভাগ সময় কলিকাতায় কাটাইয়াছি। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে, লাইব্রেরী, থিয়েটার, সিনেমা, গানের আড্ডা—এসব ভিন্ন জীবন কল্পনা করিতে পারি না—এ অবস্থায় চাকুরির কয়েকটি টাকার খাতিরে যেখানে আসিয়া পড়িলাম, এত নির্জন স্থানের কল্পনাও কোনদিন করি নাই। দিনের পর দিন যায়, পূর্বাকাশে সূর্যের উদয় দেখি দূরের পাহাড় ও জঙ্গলের মাথায়, আবার সন্ধ্যায় সমগ্র বনঝাউ ও দীর্ঘ ঘাসের বনশীর্ষ সিঁদুরে রঙে রাঙাইয়া সূর্যকে ডুবিয়া যাইতে দেখি—ইহার মধ্যে শীতকালের

যে এগার-ঘণ্টা ব্যাপী দিন, তা যেন খাঁ-খাঁ করে শূন্য, কি করিয়া তাহা পুরাইব, প্রথম প্রথম সেইটা আমার পক্ষে হইল মহাসমস্যা। কাজকর্ম করিলে অনেক করা যায় বটে, কিন্তু আমি নিতান্ত নব আগন্তুক, এখনও ভাল করিয়া এখানকার লোকের ভাষা বুঝিতে পারি না, কাজের কোন বিলিব্যবস্থাও করিতে পারি না, নিজের ঘরে বসিয়া বসিয়া, যে কয়খানি বই সঙ্গে আনিয়াছিলাম তাহা পড়িয়াই কোন রকমে দিন কাটাই। কাছারিতে লোকজন যারা আছে তারা নিতান্ত বর্বর, না বোঝে তাহারা আমার কথা, না আমি ভাল বুঝি তাহাদের কথা। প্রথম দিন-দশেক কি কষ্টে যে কাটিল! কতবার মনে হইল চাকুরিতে দরকার নাই, এখানে হাঁপাইয়া মরার চেয়ে আধপেটা খাইয়া কলিকাতায় থাকা ভাল। অবিনাশের অনুরোধে কি ভুলই করিয়াছি এই জনহীন জঙ্গলে আসিয়া, এ-জীবন আমার জন্য নয়।

রাত্রিতে নিজের ঘরে বসিয়া এই সবই ভাবিতেছি, এমন সময় ঘরের দরজা ঠেলিয়া কাছারির বৃদ্ধ মুহুরী গোষ্ঠ চক্রবর্তী প্রবেশ করিলেন। এই একমাত্র লোক যাহার সহিত বাংলা কথা বলিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচি। গোষ্ঠবাবু এখানে আছেন অন্তত সতের-আঠার বছর। বর্ধমান জেলায় বনপাশ স্টেশনের কাছে কোন্ গ্রামে বাড়ী। বলিলাম বসুন গোষ্ঠবাবু—

গোষ্ঠবাবু অন্য একখানা চেয়ারে বসিলেন। বলিলেন—আপনাকে একটা কথা বলতে এলাম নিরিবিলি, এখানকাব কোনও মানুষকে বিশ্বাস করবেন না। এ বাংলা দেশ নয়। লোকজন সব বড় খাবাপ—

—বাংলা দেশের মানুষও সবাই যে খুব ভাল, এমন নয় গোষ্ঠবাবু—

—সে আর আমার জানতে বাকী নেই, ম্যানেজারবাবু। সেই দুঃখে আর ম্যালেরিয়ার তাড়নায় প্রথম এখানে আসি। প্রথম এসে বড় কষ্ট হত, এ জঙ্গলে মন হাঁপিয়ে উঠত—আজকাল এমন হয়েছে, দেশ তো দূরের কথা, পূর্ণিয়া কি পাটনাতে কাজে গিয়ে দু-দিনের বেশী থাকতে পারি নে।

গোষ্ঠবাবুর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিলাম—বলে কি!

জিজ্ঞাসা করিলাম—থাকতে পারেন না কেন? জঙ্গলের জন্য মন হাঁপায় নাকি?

গোষ্ঠবাবু আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বলিলেন, ঠিক তাই, ম্যানেজারবাবু। আপনিও বুঝবেন। নতুন এসেছেন কলকাতা থেকে, কলকাতার জন্যে মন উড়ুউড়ু করছে, বয়সও আপনার কম। কিছুদিন এখানে থাকুন। তারপর দেখবেন।

—কি দেখব?

—জঙ্গল আপনাকে পেয়ে বসবে। কোন গোলমাল কি লোকের ভিড় ক্রমশ আর ভাল লাগবে না। আমার তাই হয়েছে মশাই। এই গত মাসে মুঙ্গের গিয়েছিলাম মোকদ্দমার কাজে—কেবল মনে হয় কবে এখান থেকে বেরুব।

মনে মনে ভাবিলাম, ভগবান সে দুরবস্থার হাত থেকে আমায় উদ্ধার করুন। তার আগে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কোন্‌কালে কোলকাতায় ফিরিয়া গিয়াছি।

গোষ্ঠবাবু বলিলেন, বন্দুকটা রাত-বেরাত শিয়রে শিয়রে রেখে শোবেন, জায়গা ভাল নয়। এর আগে একবার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। তবে আজকাল এখানে আর টাকাকড়ি থাকে না, এই যা কথা।

কৌতূহলের সহিত বলিলাম, বলেন কি। কতকাল আগে ডাকাতি হয়েছিল?

—বেশী না। এই বছর আট-নয় আগে। কিছুদিন থাকুন, তখন সব কথা জানতে পারবেন। এ অঞ্চল বড় খারাপ। তা ছাড়া, এই ভয়ানক জঙ্গলে ডাকাতি করে মেরে দিলে দেখবেই বা কে?

গোষ্ঠবাবু চলিয়া গেলে একবার ঘরের জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দূরে জঙ্গলের মাথায় চাঁদ উঠিতেছে—আর সেই উদীয়মান চন্দ্রের পটভূমিকায় আঁকাবাঁকা একটা বনঝাউয়ের ডাল, ঠিক যেন জাপানী চিত্রকর হাকুসাই-অঙ্কিত একখানি ছবি।

চাকুরি করিবার আর জায়গা খুঁজিয়া পাই নাই! এ-সব বিপজ্জনক স্থান, আগে জানিলে কখনই অবিনাশকে কথা দিতাম না।

দুর্ভাবনা সত্ত্বেও উদীয়মান চন্দ্রের সৌন্দর্য আমাকে বড় মুগ্ধ করিল।

৪

কাছারির অনতিদূরে একটা ছোট পাথরের টিলা, তার উপর প্রাচীন সুবৃহৎ একটা বটগাছ। এই বটগাছের নাম গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ। কেন এই নাম হইল, তখন অনুসন্ধান করিয়াও কিছু জানিতে পারি নাই। একদিন নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে বেড়াইতে বেড়াইতে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যাস্তের শোভা দেখিতে টিলার উপরে উঠিলাম।

টিলার উপরকার বটতলায় আসন্ন সন্ধ্যার ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত দূর পর্যন্ত এক চমকে দেখিতে পাইলাম—কলুটোলার মেস, কপালীটোলার সেই ব্রিজের আড্ডাটি, গোলদীঘিতে আমার প্রিয় বেঞ্চখানা—প্রতিদিন এমন সময়ে যাহাতে গিয়া বসিয়া কলেজ স্ট্রীটের বিরামহীন জনস্রোত ও বাস্‌ মোটরের ভিড় দেখিতাম। হঠাৎ যেন কতদূরে পড়িয়া রহিয়াছে মনে হইল তাহারা। মন হু-হু করিয়া উঠিল—কোথায় আছি! কোথাকার জনহীন অরণ্যে-প্রান্তরে খড়ের চালায় বাস করিতেছি চাকুরির খাতিরে! মানুষ এখানে থাকে? লোক নাই, জন নাই, সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ—একটা কথা কহিবার মানুষ পর্যন্ত নাই। এদেশের এই সব মূর্খ, বর্বর মানুষ, এরা একটা ভাল কথা বলিলে বুঝিতে পারে না—এদেরই সাহচর্যে দিনের পর দিন কাটাইতে হইবে? সেই দূরবিসর্পী দিগন্তব্যাপী জনহীন সন্ধ্যার মধ্যে দাঁড়াইয়া মন উদাস হইয়া গেল, কেমন ভয়ও হইল। তখন সঙ্কল্প করিলাম, এ মাসের আর সামান্য দিনই বাকী, সামনের মাসটা কোনরূপে চোখ বুজিয়া কাটাইব, তারপর অবিনাশকে একখানা লম্বা পত্র লিখিয়া চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া গিয়া সভ্য বন্ধুবান্ধবদের অভ্যর্থনা পাইয়া, সভ্য খাদ্য খাইয়া, সভ্য সুরের সঙ্গীত শুনিয়া, মানুষের ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া, বহু মানবের আনন্দ-উল্লাসভরা কণ্ঠস্বর শুনিয়া বাঁচিব।

পূর্বে কি জানিতাম মানুষের মধ্যে থাকিতে এত ভালবাসি। মানুষকে এত ভালবাসি। তাহাদের প্রতি আমার যে কর্তব্য হয়ত সব সময় তাহা করিয়া উঠিতে পারি না,—কিন্তু ভালবাসি তাহাদের নিশ্চয়ই। নতুবা এত কষ্ট পাইব কেন তাহাদের ছাড়িয়া আসিয়া?

প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙে বই বিক্রী করে সেই যে বৃদ্ধ মুসলমানটি, কতদিন তাহার দোকানে দাঁড়াইয়া পুরনো বই ও মাসিক পত্রিকার পাতা উলটাইয়াছি—কেনা উচিত ছিল হয়ত, কিন্তু কেনা হয় নাই—সেও যেন পরম আত্মীয় বলিয়া মনে হইল—তাহাকে আজ কতদিন দেখি নাই।

কাছারিতে ফিরিয়া নিজের ঘরে ঢুকিয়া টেবিলে আলো জ্বালিয়া একখানা বই লইয়া বসিয়াছি, সিপাহী মুনেশ্বর সিং আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম—কি মুনেশ্বর?

ইতিমধ্যে দেহাতি হিন্দী কিছু কিছু বলিতে শিখিয়াছিলাম।

মুনেশ্বর বলিল—হুজুর, আমায় একখানা লোহার কড়া কিনে দেবার হুকুম যদি দেন মুহুরী বাবুকে।

—কি হবে লোহার কড়া?

মুনেশ্বরের মুখ প্রাপ্তির আশায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে বিনীত সুরে বলিল—একখানা লোহার কড়া থাকলে কত সুবিধে হুজুর। যেখানে সেখানে সঙ্গে নিয়ে গেলাম, ভাত রাঁধা যায়, জিনিসপত্র রাখা যায়, ওতে করে ভাত খাওয়া যায়, ভাঙবে না। আমার একখানাও কড়া নেই। কতদিন থেকে

ভাবছি একখানা কড়ার কথা—কিন্তু হুজুর, বড় গরীব, একখানা কড়ার দাম ছ-আনা, অত দাম দিয়ে কড়া কিনি কেমন করে? তাই হুজুরের কাছে আসা, অনেক দিনের সাধ একখানা কড়া আমার হয়, হুজুর যদি মঞ্জুর করেন, হুজুর মালিক।

একখানা লোহার কড়াই যে এত গুণের, তাহার জন্য যে এখানে লোক রাত্রে স্বপ্ন দেখে, এ ধরনের কথা এই আমি প্রথম শুনিলাম। এত গরীব লোক পৃথিবীতে আছে যে ছ-আনা দামের একখানা লোহার কড়াই জুটিলে স্বর্গ হাতে পায়। শুনিয়াছিলাম এদেশের লোক বড় গরীব। এত গরীব তাহা জানিতাম না। বড় মায়া হইল।

পরদিন আমার সই করা চিরকুটের জোরে মুনেশ্বর সিং নউগচ্ছিয়ার বাজার হইতে একখানা পাঁচ নম্বরের কড়াই কিনিয়া আনিয়া আমার ঘরের মেঝেতে নামাইয়া আমায় সেলাম দিয়া দাঁড়াইল।

—হো গৈল, হুজুরকী কৃপা-সে—কড়াইয়া হো গৈল। তাহার হর্ষোৎফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া আমার এই একমাসের মধ্যে সর্বপ্রথম আজ মনে হইল—বেশ লোকগুলো!

বড় কষ্ট তো এদের!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

কিছুতেই কিন্তু এখানকার এই জীবনের সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাওয়াইতে পারিতেছি না। বাংলা দেশ হইতে সদ্য আসিয়াছি, চিবকাল কলিকাতায় কাটাইয়াছি, এই অবণ্যভূমির নির্জনতা যেন পাথরের মত বুকে চাপিয়া আছে বলিয়া মনে হয়।

এক-একদিন বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া অনেক দূর পর্যন্ত যাই। কাছারির কাছে তবুও লোকজনের গলা শুনিতে পাওয়া যায়, রশি দুই-তিন গেলেই কাছারিঘরগুলো যখন দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশ জঙ্গলেব আড়ালে পড়ে, তখন মনে হয় সমস্ত পৃথিবীতে আমি একাকী। তার পর যতদূর যাওয়া যায়, চওড়া মাঠের দু-ধারে ঘন বনের সারি বহুদূর পর্যন্ত চলিয়াছে, শুধু বন আর ঝোপ, গজারি গাছ, বাবলা, বন্য কাঁটা-বাঁশ, বেত ঝোপ। গাছের ও ঝোপের মাথায় মাথায় অস্তোন্মুখ সূর্য সিঁদুর ছড়াইয়া দিয়াছে—সন্ধ্যার বাতাসে বন্যপুষ্প ও তৃণগুল্মেব সুঘ্রাণ, প্রতি ঝোপ পাখীর কাকলীতে মুখর, তার মধ্যে হিমালয়ের বনটিয়াও আছে। মুক্ত দূরপ্রসারী তৃণাবৃত প্রান্তর ও শ্যামল বনভূমির মেলা।

এই সময় মাঝে মাঝে মনে হইত যে, এখানে প্রকৃতির যে রূপ দেখিতেছি, এমনটি আর কোথাও দেখি নাই। যতদূর চোখ যায়, এ সব যেন আমার, আমি এখানে একমাত্র মানুষ, আমার নির্জনতা ভঙ্গ করিতে আসিবে না কেউ—মুক্ত আকাশতলে নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় দূর দিগন্তের সীমারেখা পর্যন্ত মনকে ও কল্পনাকে প্রসারিত করিয়া দিই।

কাছাবি হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটা নাবাল জায়গা আছে, সেখানে ক্ষুদ্র কয়েকটি পাহাড়ী ঝরণা ঝির ঝির করিয়া বহিয়া যাইতেছে, তাহার দু-পারে জলজ লিলির বন, কলিকাতার বাগানে যাহাকে বলে স্পাইডার লিলি। বন্য স্পাইডার-লিলি কখনও দেখি নাই, জানিতামও না যে, এমন নিভৃত ঝরণার উপল-বিছানো তীরে ফুটন্ত লিলি ফুলের এত শোভা হয় বা বাতাসে তাহারা এত মৃদু কোমল সুবাস বিস্তার করে। কতবার গিয়া এখানটিতে চুপ করিয়া বসিয়া আকাশ, সন্ধ্যা ও নির্জনতা উপভোগ করিয়াছি।

মাঝে মাঝে ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াই। প্রথম প্রথম ভাল চড়িতে পারিতাম না, ক্রমে ভালোই শিখিলাম। শিখিয়াই বুঝিলাম জীবনে এত আনন্দ আর কিছুতেই নাই। যে কখনও এমন নির্জন

আকাশতলে দিগন্তব্যাপী বনপ্রান্তরে ইচ্ছামত ঘোড়া ছুটাইয়া না বেড়াইয়াছে, তাহাকে বোঝানো যাইবে না সে কি আনন্দ। কাছারি হইতে দশ পনের মাইল দূরবর্তী স্থানে সার্ভে পার্টি কাজ করিতেছে, প্রায়ই আজকাল সকালে এক পেয়ালা চা খাইয়া ঘোড়ার পিঠে জিন কষিয়া সেই যে ঘোড়ায় উঠি, কোনদিন ফিরি বৈকালে, কোনদিন বা ফিরিবার পথে জঙ্গলের মাথার উপর নক্ষত্র উঠে, বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ করে; বনপুষ্পের সুবাস জ্যোৎস্নার সহিত মেশে, শৃগালের রব প্রহর-ঘোষণা করে, জঙ্গলের ঝিঁঝিঁ পোকা দল বাঁধিয়া ডাকিতে থাকে।

২

যে কাজে এখানে আসা তার জন্য অনেক চেষ্টা করা যাইতেছে। এত হাজার বিঘা জমি, হঠাৎ বন্দোবস্ত হওয়াও সোজা কথা নয় অবশ্য। আর একটা ব্যাপার এখানে আসিয়া জানিয়াছি, এই জমি আজ ত্রিশ বছর পূর্বে নদীগর্ভে সিকস্তি হইয়া গিয়াছিল—বিশ বছর হইল বাহির হইয়াছে—কিন্তু যাহারা পিতৃপিতামহের জমি গঙ্গায় ভাঙিয়া যাওয়ার পরে অন্যত্র উঠিয়া গিয়া বাস করিয়াছিল, সেই পুরাতন প্রজাদিগকে জমিদার এইসব জমিতে দখল দিতে চাহিতেছেন না। মোটা সেলামী ও বর্ধিত হারে খাজনার লোভে নূতন প্রজাদের সঙ্গেই বন্দোবস্ত করিতে চান। অথচ যে-সব গৃহহীন, আশ্রয়হীন অতিদরিদ্র পুরাতন প্রজাকে তাহাদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে তাহারা বার বার অনুরোধ-উপরোধ কান্নাকাটি করিয়াও জমি পাইতেছে না।

আমার কাছেও অনেকে আসিয়াছিল। তাহাদের অবস্থা দেখিলে কষ্ট হয়, কিন্তু জমিদারের হুকুম, কোনও পুরাতন প্রজাকে জমি দেওয়া হইবে না। কারণ একবার চাপিয়া বসিলে তাহাদের পুরাতন স্বত্ব তাহারা আইনত দাবী করিতে পারে। জমিদারের লাঠির জোর বেশী, প্রজারা আজ বিশ বৎসর ভূমিহীন ও গৃহহীন অবস্থায় দেশে দেশে মজুরী করিয়া খায়, কেহ সামান্য চাষবাস করে, অনেকে মরিয়া গিয়াছে, তাহাদের ছেলেপিলেরা নাবালক বা অসহায়—প্রবল জমিদারের বিরুদ্ধে স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া যাইবে।

এদিকে নূতন প্রজা সংগ্রহ করা যায় কোথা হইতে? মুঙ্গের, পূর্ণিয়া, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি নিকটবর্তী জেলা হইতে লোক যাহারা আসে, দর শুনিয়া পিছাইয়া যায়। দু-পাঁচজন কিছু কিছু লইতেছেও। এইরূপ মৃদু গতিতে অগ্রসর হইলে দশ হাজার বিঘা জঙ্গলী জমি প্রজাবিলি হইতে বিশ-পঁচিশ বৎসর লাগিয়া যাইবে।

আমাদের এক ডিহি কাছারি আছে—সেও ঘোর জঙ্গলময় মহাল—এখান থেকে উনিশ মাইল দূরে। জায়গাটার নাম লবটুলিয়া, কিন্তু এখানেও যেমন জঙ্গল, সেখানেও তেমনি, কেবল সেখানে কাছারি রাখার উদ্দেশ্য এই যে, সেই জঙ্গলটা প্রতি বছর গোয়ালাদের গরু-মহিষ চরাইবার জন্য খাজনা করিয়া দেওয়া হয়। এ বাদে সেখানে প্রায় দু'তিনশ' বিঘা জমিতে বন্যকুলের জঙ্গল আছে, লাক্ষা-কীট পুষিবার জন্য লোকে এই কুল-বন জমা লইয়া থাকে। এই টাকাটা আদায় করিবার জন্য সেখানে দশ টাকা মাহিনার একজন পাটোয়ারী ও তাহার একটা ছোট কাছারি আছে।

কুল-বন ইজারা দিবার সময় আসিতেছে, একদিন ঘোড়া করিয়া লবটুলিয়াতে রওনা হইলাম। আমার কাছারি ও লবটুলিয়ার মাঝখানে একটু উঁচু রাঙামাটির ডাঙা প্রায় সাত-আট মাইল লম্বা, এর নাম 'ফুলকিয়া বইহার'—কত ধরনের গাছপালা ও ঝোপ-জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জায়গায় জায়গায় বন এত ঘন যে, ঘোড়ার গায়ে ডালপালা ঠেকে। ফুলকিয়া বইহার যেখানে নামিয়া গিয়া সমতল ভূমির সহিত মিশিল, চানন্ বলিয়া একটি পাহাড়ী নদী যেখানে উপলখণ্ডের উপর ঝির্‌ঝির্ করিয়া বহিতেছে, বর্ষাকালে সেখানে জল খুব গভীর—শীতকালে তত জল নাই।

লবটুলিয়ায় এই প্রথম আসিলাম। অতি ক্ষুদ্র এক খড়ের ঘর, তার মেজে জমির সঙ্গে সমতল, ঘরের বেড়া পর্যন্ত শুক্‌নো কাশের, বনঝাউয়ের ডালের পাতা দিয়া বাঁধা। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেখানে পৌঁছিলাম—এত শীত যেখানে থাকি সেখানে নাই, শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম হইলাম বেলা না পড়িতেই।

সিপাহীরা বনের ডালপালা জ্বালাইয়া আগুন করিল, সেই আগুনের ধারে ক্যাম্পচেয়ারে বসিলাম, অন্য সবাই গোল হইয়া আগুনের চারিধারে বসিল।

কোথা হইতে সের পাঁচেক একটা রুই মাছ পাটোয়ারী আনিয়াছিল, এখন কথা উঠিল, রান্না করিবে কে? আমি সঙ্গে পাচক আনি নাই। নিজেও রান্না করিতে জানি না। আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সাত-আটজন লোক লবটুলিয়াতে অপেক্ষা করিতেছিল—তাহাদের মধ্যে কন্টুমিশ্র নামে এক মৈথিল ব্রাহ্মণকে পাটোয়ারী রান্নার জন্য নিযুক্ত করিল।

পাটোয়ারীকে বলিলাম—এ-সব লোকেই কি ইজারা ডাকবে?

পাটোয়ারী বলিল—না হুজুর। ওরা খাবার লোভে এসেছে। আপনার আসবার নাম শুনে আজ দু-দিন ধরে কাছারিতে এসে বসে আছে। এদেশের লোকের ওই রকম অভ্যেস। আরও অনেকে বোধ হয় কাল আসবে।

এমন কথা কখনও শুনি নাই। বলিলাম—সে কি! আমি তো নিমন্ত্রণ করি নি এদের?

—হুজুর, এরা বড় গরীব; ভাত জিনিসটা খেতে পায় না। কলাইয়ের ছাতু, মকাইয়ের ছাতু, এই এরা বারোমাস খায়। ভাত খেতে পাওয়াটা এরা ভোজের সমান বিবেচনা করে। আপনি আসছেন, ভাত খেতে পাবে এখানে, সেই লোভে সব এসেছে। দেখুন না আরও কত আসে।

বাংলা দেশের লোকে বড় বেশী সভ্য হইয়া গিয়াছে ইহাদের তুলনায়, মনে হইল। কেন জানি না, এই অন্নভোজনলোলুপ সরল ব্যক্তিগুলিকে আমার সে-রাত্রে এত ভাল লাগিল! আগুনের চারিধারে বসিয়া তাহারা নিজেদেব মধ্যে গল্প করিতেছিল, আমি শুনিতেছিলাম। প্রথমে তাহারা আমার আগুনে বসিতে চাহে নাই আমার প্রতি সম্মানসূচক দূরত্ব বজায় রাখিবার জন্য—আমি তাহাদের ডাকিয়া আনিলাম। কন্টুমিশ্র কাছে বসিয়াই আসানকাঠের ডালপালা জ্বালাইয়া মাছ রাঁধিতেছে—ধুনা পুড়াইবার মত সুগন্ধ বাহির হইতেছে ধোঁয়া হইতে—আগুনের কুণ্ডের বাহিরে গেলে মনে হয়, যেন আকাশ হইতে বরফ পড়িতেছে—এত শীত।

খাওয়া-দাওয়া হইতে রাত হইয়া গেল অনেক; কাছারিতে যত লোক ছিল, সকলেই খাইল। তারপর আবার আগুনের ধারে গোল হইয়া বসা গেল। শীতে মনে হইতেছে শরীরের রক্ত পর্যন্ত জমিয়া যাইবে। ফাঁকা বলিয়াই শীত বোধ হয় এত বেশী, কিংবা বোধ হয় হিমালয় বেশী দূর নয় বলিয়া।

আগুনের ধারে আমরা সাত-আটজন লোক, সামনে ছোট ছোট দুখানি খড়ের ঘর। একখানিতে থাকিব আমি, আর একখানিতে বাকী এতগুলি লোক। আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া অন্ধকার বন ও প্রান্তর, মাথার উপরে নক্ষত্র-ছড়ানো দূরপ্রসারী অন্ধকার আকাশ। আমার বড় অদ্ভুত লাগিল, যেন চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে নির্বাসিত হইয়া মহাশূন্যে এক গ্রহে অন্য এক অজ্ঞাত রহস্যময় জীবনধারার সহিত জড়িত হইয়া পড়িয়াছি।

একজন ত্রিশ-বত্রিশ বছরের লোক এ-দলের মধ্যে আমার মনোযোগকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। লোকটির নাম গনোরী তেওয়ারী, শ্যামবর্ণ; দোহারা চেহারা, মাথায় বড় চুল, কপালে দুটি লম্বা ফোঁটা কাটা, এই শীতে গায়ে একখানা মোটা চাদর ছাড়া আর কিছু নাই, এ-দেশের রীতি অনুযায়ী গায়ে একটা মেরজাই থাকা উচিত ছিল, তা পর্যন্ত নাই। অনেকক্ষণ হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছিলাম, সে সকলের দিকে কেমন কুণ্ঠিতভাবে চাহিতেছিল, কারও কথায় কোনও প্রতিবাদ করিতেছিল না, অথচ কথা যে সে কম বলিতেছিল তা নয়।

আমার প্রতি কথার উত্তরে কেবল সে বলে—হুজুর।

এদেশের লোকে যখন কোন মান্য ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কথা মানিয়া লয়, তখন কেবল মাথা সামনের দিকে অল্প ঝাঁকাইয়া সসম্ভ্রমে বলে—হুজুর।

গনোরীকে বলিলাম—তুমি থাকো কোথায়, তেওয়ারীজি?

আমি যে তাহাকে সরাসরি প্রশ্ন করিব, এতটা সম্মান যেন তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, এভাবে সে আমার দিকে চাহিল। বলিল—ভীমদাসটোলা, হুজুর।

তারপর সে তাহার জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করিয়া গেল, একটানা নয়, আমার প্রশ্নের উত্তরে টুক্‌রা টুক্‌রা ভাবে।

গনোরী তেওয়ারীর বয়স যখন বারো বছর, তার বাপ তখন মারা যায়। এক বৃদ্ধা পিসিমা তাহাকে মানুষ করে, সে পিসিমাও বাপের মৃত্যুর বছর-পাঁচ পরে যখন মারা গেলেন, গনোরী তখন জগতে ভাগ্য অন্বেষণে বাহির হইল। কিন্তু তাহার জগৎ পূর্বে পূর্ণিয়া শহর, পশ্চিমে ভাগলপুর জেলার সীমানা, দক্ষিণে এই নির্জন অরণ্যময় ফুলকিয়া বইহার, উত্তরে কুশী নদী—ইহারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইহারই মধ্যে গ্রামে গ্রামে গৃহস্থের দুয়ারে ফিরিয়া কখনও ঠাকুরপূজা করিয়া, কখনও গ্রাম্য পাঠশালায় পণ্ডিতি করিয়া কায়ক্লেশে নিজের আহারের জন্য কলাইয়ের ছাতু ও চীনা ঘাসের দানার রুটির সংস্থান করিয়া আসিয়াছে। সম্প্রতি মাস দুই চাকুরি নাই, পর্বতা গ্রামের পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, ফুলকিয়া বইহারের দশ হাজার বিঘা অরণ্যময় অঞ্চলে লোকের বসতি নাই—এখানে যে মহিষ-পালকের দল মহিষ চরাইতে আনে জঙ্গলে, তাহাদের বাথানে বাথানে ঘুরিয়া খাদ্যভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছিল—আজ আমার আসিবার খবর পাইয়া অনেকের সঙ্গে এখানে আসিয়াছে।

আসিয়াছে কেন, সে কথা আরও চমৎকার।

—এখানে এত লোক এসেছে কেন তেওয়ারীজি?

—হুজুর, সবাই বললে ফুলকিয়ার কাছারিতে ম্যানেজার এসেছেন, সেখানে গেলে ভাত খেতে পাওয়া যাবে, তাই ওরা এল, ওদের সঙ্গে আমিও এলাম।

—ভাত এখানকার লোকে কি খেতে পায় না?

—কোথায় পাবে হুজুর। নউগচ্ছিয়ায় মাড়োয়ারীরা রোজ ভাত খায়, আমি নিজে আজ ভাত খেলাম বোধ হয় তিন মাস পরে। গত ভাদ্রমাসের সংক্রান্তিতে রাসবিহারী সিং রাজপুতের বাড়ী নেমন্তন্ন ছিল, সে বড়লোক, ভাত খাইয়েছিল। তার পর আর খাই নি।

যতগুলি লোক আসিয়াছিল, এই ভয়ানক শীতে কাহারও গাত্রবস্ত্র নাই, রাত্রে আগুন পোহাইয়া রাত কাটায়। শেষ-রাত্রে শীত যখন বেশী পড়ে, আর ঘুম হয় না শীতের চোটে—আগুনের খুব কাছে ঘেঁষিয়া বসিয়া থাকে ভোর পর্যন্ত।

কেন জানি না, ইহাদের হঠাৎ এত ভাল লাগিল। ইহাদের দারিদ্র্য, ইহাদের সারল্য, কঠোর জীবন-সংগ্রামে ইহাদের যুঝিবার ক্ষমতা—এই অন্ধকার আরণ্যভূমি ও হিমবর্ষী মুক্ত আকাশ বিলাসিতার কোমল পুষ্পাস্তৃত পথে ইহাদের যাইতে দেয় নাই, কিন্তু ইহাদিগকে সত্যকার পুরুষমানুষ করিয়া গড়িয়াছে। দুটি ভাত খাইতে পাওয়ার আনন্দে যারা ভীমদাসটোলা ও পর্বতা হইতে ন'মাইল পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে বিনা নিমন্ত্রণে—তাহাদের মনের আনন্দ গ্রহণ করিবার শক্তি কত সতেজ ভাবিয়া বিস্মিত হইলাম।

অনেক রাত্রে কিসের শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল—শীতে মুখ বাহির করাও যেন কষ্টকর, এমন যে শীত এখানে তা না-জানার দরুন উপযুক্ত গরম কাপড় ও লেপ—তোশক আনি নাই। কলিকাতায় যে-কম্বল গায়ে দিতাম সেখানাই আনিয়াছিলাম—শেষরাত্রের শীতে সে যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যায় প্রতিদিন। যে-পাশে শুইয়া থাকি, শরীরের গরমে সে-দিকটা তবুও থাকে এক রকম, অন্য কাতে পাশ ফিরিতে গিয়া দেখি বিছানা কন্‌কন্‌ করিতেছে সে-পাশে—মনে হয় যেন ঠাণ্ডা পুকুরের জলে

পৌষ মাসের রাত্রে ডুব দিলাম। পাশেই জঙ্গলের মধ্যে কিসের যেন সম্মিলিত পদশব্দ—কাহারা যেন দৌড়িতেছে—গাছপালা, শুকনো বনঝাউয়ের গাছ মট্ মট্ শব্দে ভাঙিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িতেছে।

কি ব্যাপারখানা, কিছু বুঝিতে না পারিয়া সিপাহী বিষ্ণুরাম পাঁড়ে ও স্কুলমাস্টার গনোরী তেওয়ারীকে ডাক দিলাম। তাহারা নিদ্রাজড়িত চোখে উঠিয়া বসিল—কাছারির মেঝেতে যে-আগুন জ্বালা হইয়াছিল, তাহারই শেষ দীপ্তিটুকুতে ওদের মুখে আলস্য, সম্ভ্রম ও নিদ্রালুতার ভাব ফুটিয়া উঠিল। গনোরী তেওয়ারী কান পাতিয়া একটু শুনিয়াই বলিল—কিছু না হুজুর, নীলগাইয়ের জেরা দৌড়চ্ছে জঙ্গলে—

কথা শেষ করিয়াই সে নিশ্চিন্ত মনে পাশ ফিরিয়া শুইতে যাইতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম—নীলগাইয়ের দলের হঠাৎ এত রাত্রে এমন দৌড়ুবার কারণ কি?

বিষ্ণুরাম পাঁড়ে আশ্বাস দিবার সুরে বলিল—হয়তো কোনও জানোয়ারে তাড়া করে থাকবে হুজুর—এ ছাড়া আর কি।

—কি জানোয়ার?

—কি আর জানোয়ার হুজুর, জঙ্গলের জানোয়ার। শের হতে পারে—নয় তো ভালু—

—যে ঘরে শুইয়া আছি, নিজের অজ্ঞাতসারে তাহার কাশডাঁটায় বাঁধা আগড়ের দিকে নজর পড়িল। সে আগড়ও এত হালকা যে, বাহির হইতে একটি কুকুরে ঠেলা মারিলেও তাহা ঘরের মধ্যে উলটাইয়া পড়ে—এমন অবস্থায় ঘরের সামনেই জঙ্গলে নিস্তব্ধ নিশীথরাত্রে বাঘ বা ভালুকে বন্য নীলগাইয়ের দল তাড়া করিয়া লইয়া চলিয়াছে—এ সংবাদটিতে যে বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম না, তাহা বলাই বাহুল্য।

একটু পরেই ভোর হইয়া গেল।

৩

দিন যতই যাইতে লাগিল, জঙ্গলের মোহ ততই আমাকে ক্রমে পাইয়া বসিল। এর নির্জনতা ও অপরাহ্নের সিঁদুর-ছড়ানো বনঝাউয়ের জঙ্গলের কি আকর্ষণ আছে বলিতে পারি না—আজকাল ক্রমশ মনে হয় এই দিগন্তব্যাপী বিশাল বনপ্রান্তর ছাড়িয়া, ইহার রোদপড়া মাটির তাজা সুগন্ধ, এই স্বাধীনতা, এই মুক্তি ছাড়িয়া কলিকাতার গোলমালের মধ্যে আর ফিরিতে পারিব না।

এ মনের ভাব একদিনে হয় নাই। কত রূপে কত সাজেই যে বন্যপ্রকৃতি আমার মুগ্ধ অনভ্যস্ত দৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া আমায় ভুলাইল।—কত সন্ধ্যা আসিল অপূর্ব রক্তমেঘের মুকুট মাথায়, দুপুরের খরতর রৌদ্র আসিল উন্মাদিনী ভৈরবীর বেশে, গভীর নিশীথে জ্যোৎস্নাবরণী সুরসুন্দরীর সাজে হিমস্নিগ্ধ বনকুসুমের সুবাস মাখিয়া, আকাশভরা তারার মালা গলায়—অন্ধকার রজনীতে কাল-পুরুষের আগুনের খড়্গা হাতে দিগ্বিদিক ব্যাপিয়া বিরাট কালীমূর্তিতে।

৪

একদিনের কথা জীবনে কখনও ভুলিব না। মনে আছে সেদিন দোল-পূর্ণিমা। কাছারির সিপাহীরা ছুটি চাহিয়া লইয়া সারাদিন ঢোল বাজাইয়া হোলি খেলিয়াছে। সন্ধ্যার সময়েও নাচগানের বিরাম নাই দেখিয়া আমি নিজের ঘরে টেবিলে আলো জ্বালাইয়া অনেক রাত পর্যন্ত হেড আপিসের জন্য চিঠিপত্র লিখিলাম। কাজ শেষ হইতেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখি, রাত প্রায় একটা বাজে। শীতে

সে সময় এক মাস এ অঞ্চলের যত গরীব লোক গুড়মী ফল খেয়ে কাটিয়ে দেয়। দলে দলে ছেলেমেয়ে আসবে জঙ্গলের গুড়মী তুলতে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—রোজ রোজ খেড়ীর দানা সিদ্ধ আর বাথুয়া শাক ভাল লাগে?

—কি করব হুজুর, আমরা গরীব লোক, বাঙালী বাবুদের মত ভাত খেতে পাব কোথায়? ভাত এ অঞ্চলের মধ্যে কেবল রাসবিহারী সিং আর নন্দলাল পাঁড়ে খায় দুবেলা। সারাদিন মহিষের পেছনে ভূতের মত খাটি হুজুর; সন্ধ্যের সময় ফিরি যখন, তখন এত ক্ষিদে পায় যে, যা পাই খেতে তাই ভাল লাগে।

গনুকে বলিলাম—কলকাতা শহর দেখেছ গনু?

—না হুজুর। কানে শুনেছি। ভাগলপুর শহরে একবার গিয়েছি, বড় ভারী শহর। ওখানে হাওয়ার গাড়ী দেখেছি, বড় তাজ্জব চিজ হুজুর। ঘোড়া নেই, কিছু নেই, আপনাআপনি রাস্তা দিয়ে চলছে।

এই বয়সে উহার স্বাস্থ্য দেখিয়া অবাক হইলাম। সাহসও যে আছে, ইহা মনে মনে স্বীকার করিতে হইল।

গনুর জীবিকানির্বাহের একমাত্র অবলম্বন মহিষ কয়টি। তাদের দুধ অবশ্য এ-জঙ্গলে কে কিনিবে, দুধ হইতে মাখন তুলিয়া ঘি করে ও দু'তিন মাসের ঘি একত্রে জমাইয়া ন-মাইল দূরবর্তী ধরমপুরের বাজারে মাড়োয়ারীদের নিকট বিক্রয় করিয়া আসে। আর থাকিবার মধ্যে ওই দু-বিঘা খেড়ী অর্থাৎ শ্যামাঘাসের ক্ষেত, যার দানা সিদ্ধ এ-অঞ্চলের প্রায় সকল গরীব লোকেরই একটা প্রধান খাদ্য। গনু সে-রাত্রে আমাকে কাছারিতে পৌঁছাইয়া দিল, কিন্তু গনুকে আমার এত ভাল লাগিল যে, কত বার শান্ত বৈকালে তাহার খুপরির সামনে আগুন পোহাইতে পোহাইতে গল্প করিয়া কাটাইয়াছি। ওদেশের নানারূপ তথ্য গনুর কাছে যেরূপ শুনিয়াছিলাম, অত কেউ দিতে পারে নাই।

গনুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম। উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আঁতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা, ইত্যাদি। ওই নির্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গনুর সে-সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত—আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে-সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য। যেখানে-সেখানে যে-কোন গল্প শোনা চলে না, গল্প শুনিবার পটভূমি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর উহার মাধুর্য যে কতখানি নির্ভর করে, তাহা গল্পপ্রিয় ব্যক্তি মাত্রেই জানেন। গনুর সকল অভিজ্ঞতার মধ্যে আমার আশ্চর্য বলিয়া মনে হইয়াছিল বন্যমহিষের দেবতা টাঁড়বারোর কথা।

কিন্তু, যেহেতু এই গল্পের একটি অদ্ভুত উপসংহার আছে—সেজন্য সে-কথা এখন না বলিয়া যথাস্থানে বলিব। এখানে বলিয়া রাখি, গনু আমাকে যে-সব গল্প বলিত—তাহা রূপকথা নহে, তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়। গনু জীবনকে দেখিয়াছে তবে অন্যভাবে। অরণ্য-প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আজীবন কাটাইয়া সে অরণ্য-প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন রীতিমত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তাহার কথা হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মিথ্যা বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তিও গনুর আছে বলিয়া আমার মনে হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

১

গ্রীষ্মকাল পড়িতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের মাথায় পীরপৈঁতি পাহাড়ের দিক হইতে একদল বক উড়িয়া আসিয়া বসিল, দূর হইতে মনে হয় যেন বটগাছের মাথা সাদা থোকা থোকা ফুলে ভরিয়া গিয়াছে।

একদিন অর্ধশুষ্ক কাশের বনের ধারে টেবিল-চেয়ার পাতিয়া কাজ করিতেছি, মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।

একটু পরে প্রায় পঞ্চাশ বছরের একটি বৃদ্ধ ব্যক্তি আমার সামনে আসিয়া সেলাম করিল ও আমার নির্দেশমত একটা টুলের উপর বসিল। বসিয়াই সে একটি পশমের থলি বাহির করিল। তাহার পর থলেটির ভিতর হইতে খুব ছোট একখানি জাঁতি ও দুইটি সুপারি বাহির করিয়া সুপারি কাটিতে আরম্ভ করিল। পরে কাটা সুপারি হাতে রাখিয়া দুই হাত একত্র করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিয়া সসম্ভ্রমে বলিল—সুপারি লিজিয়ে হুজুর।

সুপারি ও-ভাবে খাওয়া অভ্যাস না থাকিলেও ভদ্রতার খাতিরে লইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথা হতে আসা হচ্ছে, কি কাজ?

তাহার উত্তরে লোকটি বলিল, তাহার নাম নন্দলাল ওঝা, মৈথিল ব্রাহ্মণ। জঙ্গলের উত্তর-পূর্ব কোণে কাছারি হইতে প্রায় এগার মাইল দূরে সুংঠিয়াদিয়াবাতে তাহার বাড়ী। বাড়ীতে চাষবাস আছে, কিন্তু সুদের কারবারও আছে—সে আসিয়াছে তার বাড়ীতে আগামী পূর্ণিমার দিন আমায় নিমন্ত্রণ করিতে—আমি কি তাহার বাড়ীতে দয়া করিয়া পদধূলি দিতে রাজী আছি? এ সৌভাগ্য কি তাহার হইবে?

এগার মাইল দূরে এই রৌদ্রে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইবার লোভ আমার ছিল না—কিন্তু নন্দলাল ওঝা নিতান্ত পীড়াপীড়ি করাতে অগত্যা রাজী হইলাম—তা ছাড়া এদেশের গৃহস্থ-সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিবার লোভও সংবরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ণিমার দিন দুপুরের পরে দীর্ঘ কাশের জঙ্গলের মধ্য দিয়া কাহাদের একটি হাতী আসিতেছে দেখা গেল। হাতী কাছারিতে আসিলে মাহুতের মুখে শুনিলাম হাতীটি নন্দলাল ওঝার নিজের—আমাকে লইয়া যাইতে পাঠাইয়া দিয়াছে। হাতী পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না—কারণ আমার নিজের ঘোড়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে পৌঁছিতে পারিতাম।

যাহাই হউক, হাতীতে চড়িয়াই নন্দলালের বাড়ীতে রওনা হইলাম। সবুজ বনশীর্ষ আমার পায়ের তলায়, আকাশ যেন আমার মাথায় ঠেকিয়াছে—দূর, দূর-দিগন্তের নীল শৈলমালার রেখা বনভূমিকে ঘিরিয়া যেন মায়ালোক রচনা করিয়াছে—আমি সে-মায়ালোকের অধিবাসী—বা দূর স্বর্গের দেবতা। কত মেঘের তলায় তলায় পৃথিবীর কত শ্যামল বনভূমির উপরকার নীল বায়ুমণ্ডল ভেদ করিয়া যেন আমার অদৃশ্য যাতায়াত।

পথে চাম্‌টার বিল পড়িল, শীতের শেষেও সিল্লী আর লাল হাঁসের ঝাঁকে ভর্তি। আর একটু গরম পড়িলেই উড়িয়া পলাইবে। মাঝে মাঝে নিতান্ত দরিদ্র পল্লী। ফণী-মনসা-ঘেরা তামাকের ক্ষেত ও খোলায় ছাওয়া দীন-কুটীর।

সুংঠিয়া গ্রামে হাতী ঢুকিলে দেখা গেল পথের দু-ধারে সারবন্দী লোক দাঁড়াইয়া আছে আমার অভ্যর্থনা করিবার জন্য। গ্রামে ঢুকিয়া অল্পদূর পরেই নন্দলালের বাড়ী।

খোলায় ছাওয়া মাটির ঘর আট-দশখানা—সবই পৃথক পৃথক, প্রকাণ্ড উঠানের মধ্যে ইতস্তত ছড়ানো। আমি বাড়ীতে ঢুকিতেই দুই বার হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ হইল। চমকাইয়া গিয়াছি—এমন সময়ে সহাস্যমুখে নন্দলাল ওঝা আসিয়া আমায় অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে লইয়া গিয়া একটা বড় ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসাইল। চেয়ারখানি এদেশের শিশুকাঠের তৈয়ারী এবং এদেশের গ্রাম্য মিস্ত্রীর হাতেই গড়া। তাহার পর দশ-এগার বছরের একটি ছোট মেয়ে আসিয়া আমার সামনে একখানা থালা ধরিল—থালায় গোটাকতক আস্ত পান, আস্ত সুপারি, একটা মধুপর্কের মত ছোট বাটিতে সামান্য একটু আতর, কয়েকটি শুষ্ক খেজুর; ইহা লইয়া কি করিতে হয় আমার জানা নাই—আমি আনাড়ির মত হাসিলাম ও বাটী হইতে আঙুলের আগায় একটু আতর তুলিয়া লইলাম মাত্র। মেয়েটিকেও

দু'একটি ভদ্রতাসূচক মিষ্টি কথাও বলিলাম। মেয়েটি থালা আমার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

তার পর খাওয়ানোর ব্যবস্থা। নন্দলাল যে ঘটা করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, তাহা আমার ধারণা ছিল না। প্রকাণ্ড কাঠের পিঁড়ির আসন পাতা—সম্মুখে এমন আকারের একখানি পিতলের থালা আসিল, যাহাতে করিয়া আমাদের দেশে দুর্গাপূজার বড় নৈবেদ্য সাজায়। থালায় হাতীর কানের মত পুরী, বাথুয়া শাক ভাজা, পাকা শশার রায়তা, কাঁচা তেঁতুলের ঝোল, মহিষের দুধের দই, পেঁড়া। খাবার জিনিসের এমন অদ্ভুত যোগাযোগ কখনও দেখি নাই। আমায় দেখিবার জন্য উঠানে লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে ও আমার দিকে এমনভাবে চাহিতেছে যে, আমি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব জীব। শুনিলাম ইহারা সকলেই নন্দলালের প্রজা।

সন্ধ্যার পূর্বে উঠিয়া আসিবার সময় নন্দলাল একটি ছোট থলি আমার হাতে দিয়া বলিল—হুজুরের নজর। আশ্চর্য হইয়া গেলাম। থলিতে অনেক টাকা, পঞ্চাশের কম নয়। এত টাকা কেহ কাহাকেও নজর দেয় না, তা ছাড়া নন্দলাল আমার প্রজাও নয়। নজর প্রত্যাখ্যান করাও গৃহস্থের পক্ষে নাকি অপমানজনক—সুতরাং আমি থলি খুলিয়া একটা টাকা লইয়া থলিটা তাহার হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম—তোমার ছেলেপুলেদের পেঁড়া খাইতে দিও।

নন্দলাল কিছুতেই ছাড়িবে না—আমি সে-কথায় কান না দিয়াই বাহিরে আসিয়া হাতীর পিঠে চড়িলাম।

পরদিনই নন্দলাল ওঝা আমার কাছারিতে গেল, সঙ্গে তাহার বড় ছেলে। আমি তাহাদিগকে সমাদব করিলাম—কিন্তু খাইবার প্রস্তাবে তাহারা রাজী হইল না। শুনিলাম মৈথিল ব্রাহ্মণ অন্য ব্রাহ্মণের হস্তের প্রস্তুত কোন খাবারই খাইবে না। অনেক বাজে কথার পরে নন্দলাল একান্তে আমার নিকট কথা পাড়িল, তাহার বড় ছেলে ফুলকিয়া বইহারের তহশীলদারীর জন্য উমেদার—তাহাকে আমায় বাহাল করিতে হইবে। আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—কিন্তু ফুলকিয়ার তহশীলদার তো আছে—সে পোস্ট তো খালি নেই। তাহার উত্তরে নন্দলাল আমাকে চোখ ঠারিয়া ইশারা করিয়া বলিল, হুজুর, মালিক তো আপনি। আপনি মনে করলে কি না হয়?

আমি আরও অবাক্ হইয়া গেলাম। সে কি রকম কথা। ফুলকিয়ার তহশীলদার ভালই কাজ করিতেছে—তাহাকে ছাড়াইয়া দিব কোন্ অপরাধে?

নন্দলাল বলিল—কত রুপেয়া হুজুরকে পান খেতে দিতে হবে বলুন, আমি আজ সাঁঝেই হুজুরকে পৌঁছে দেব। কিন্তু আমার ছেলেকে তহশীলদারী দিতে হবেই হুজুরের। বলুন কত, হুজুর। পাঁচ-শ'?... এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিলাম, নন্দলাল যে আমাকে কাল নিমন্ত্রণ করিয়াছিল তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি। এদেশের লোক যে এমন ধড়িবাজ, তাহা জানিলে কখনো ওখানে যাই? আচ্ছা বিপদে পড়িয়াছি বটে!

নন্দলালকে স্পষ্ট কথা বলিয়াই বিদায় করিলাম। বুঝিলাম নন্দলাল আশা ছাড়িল না।

আর একদিন দেখি, ঘন বনের ধারে নন্দলাল আমার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে।

কি কুক্ষণেই উহার বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম—দুখানা পুরী খাওয়াইয়া সে যে আমার জীবন এমন অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবে—তাহা আগে জানিলে কি উহার ছায়া মাড়াই?

নন্দলাল আমাকে দেখিয়া মিষ্টি মোলায়েম হাসিয়া বলিল—নোমোস্কার হুজুর।

—হুঁ। তার পর এখানে কি মনে করে?

—হুজুর সবই জানেন। আমি আপনাকে বারো-শ' টাকা নগদ দেব। আমার ছেলেকে কাজে লাগিয়ে দিন।

—তুমি পাগল নন্দলাল? আমি বাহাল করবার মালিক নই। যাদের জমিদারী, তাদের কাছে দরখাস্ত করতে পারো। তা ছাড়া বর্তমানে যে রয়েছে—তাকে ছাড়াব কোন্ অপরাধে?

বলিয়াই বেশী কথা না বাড়াইয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ক্রমে আমার কড়া ব্যবহারে নন্দলালকে আমি আমার ও স্টেটের মহাশত্রু করিয়া তুলিলাম। তখনও বুঝি নাই, নন্দলাল কিরূপ ভয়ানক প্রকৃতির মানুষ। ইহার ফল আমাকে ভাল করিয়াই ভুগিতে হইয়াছিল।

২

উনিশ মাইল দূরবর্তী ডাকঘর হইতে ডাক আনা এখানকার এক অতি আবশ্যক ঘটনা। অতদূরে প্রতিদিন লোক পাঠানো চলে না বলিয়া সপ্তাহে দুবার মাত্র ডাকঘরে লোক যাইত। মধ্য-এশিয়ার জনহীন, দুস্তর ও ভীষণ টাক্‌লামাকান মরুভূমিতে তাঁবুতে বসিয়া বিখ্যাত পর্যটক সোয়েন হেডিনও বোধ হয় এমনি আগ্রহে ডাকের প্রতীক্ষা করিতেন। আজ আট-নয় মাস এখানে আসিবার ফলে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এই জনহীন বন-প্রান্তরে সূর্যাস্ত, নক্ষত্ররাজি, চাঁদের উদয়, জ্যোৎস্না ও বনের মধ্যে নীলগাইয়ের দৌড় দেখিতে দেখিতে যে-বহির্জগতের সঙ্গে সকল যোগ হারাইয়া ফেলিয়াছি—ডাকের চিঠি কয়খানির মধ্য দিয়া আবার তাহার সহিত একটা সংযোগ স্থাপিত হইত।

নির্দিষ্ট দিনে জওয়াহিরলাল সিং ডাক আনিতে গিয়াছে। আজ দুপুরে সে আসিবে। আমি ও বাঙালী মহুরী বাবুটি ঘন ঘন জঙ্গলের দিকে চাহিতেছি। কাছারি হইতে মাইল দেড় দূরে একটা উঁচু টিবির উপর দিয়া পথ। ওখানে আসিলে জওয়াহিরলাল সিংকে বেশ স্পষ্ট দেখা যায়।

বেলা দুপুর হইয়া গেল। জওয়াহিরলালের দেখা নাই। আমি ঘন ঘন ঘর-বাহির করিতেছি। এখানে আপিসের কাজের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বিভিন্ন আমিনের রিপোর্ট দেখা, দৈনিক ক্যাশবই সই করা, সদরের চিঠি-পত্রের উত্তর লেখা, পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের আদায়ের হিসাব-পরীক্ষা, নানাবিধ দরখাস্তের ডিক্রী ডিস্‌মিস্ করা, পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি স্থানে নানা আদালতে নানাপ্রকার মামলা ঝুলিতেছে—ঐ সকল স্থানের উকীল ও মামলা-তদ্বিরকারকদের রিপোর্ট পাঠ ও তার উত্তর দেওয়া—আরও নানা প্রকার বড় ও খুচরা কাজ প্রতিদিন নিয়ম মত না করিলে দু-তিনদিন এত জমিয়া যায় যে, তখন কাজ শেষ করিতে প্রাণান্ত হইয়া উঠে। ডাক আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আবার একরাশি কাজ আসিযা পড়ে। শহরের নানা ধরনের চিঠি, নানা ধরনের আদেশ, অমুক জায়গায় যাও, অমুকের সঙ্গে অমুক মহালের বন্দোবস্ত কর, ইত্যাদি।

বেলা তিনটার সময় জওয়াহিরলালের সাদা পাগড়ী রৌদ্রে চক্‌চক্ করিতেছে দেখা গেল। বাঙালী মুহুরীবাবু হাঁকিলেন—ম্যানেজারবাবু, আসুন, ডাকপেয়াদা আসছে—ঐ যে—

আপিসের বাহিরে আসিলাম। ইতিমধ্যে জওয়াহিরলাল আবার টিবি হইতে নামিয়া জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। আমি অপেরাগ্লাস আনাইয়া দেখিলাম, দূরে জঙ্গলের মধ্যে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাসের ও বনঝাউয়ের মধ্যে সে আসিতেছে বটে। আর আপিসের কাজে মন বসিল না। সে কি আকুল প্রতীক্ষা! যে জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য, মানুষের মনের কাছে তাহার মূল্য তত বেশী। এ কথা খুবই সত্য যে, এই মূল্য মানুষের মন-গড়া একটি কৃত্রিম মূল্য, প্রার্থিত জিনিসের সত্যকার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের সঙ্গে এর কোনও সম্বন্ধ নাই। কিন্তু জগতের অধিকাংশ জিনিসের উপরই একটা কৃত্রিম মূল্য আরোপ করিয়াই তো আমরা তাকে বড় বা ছোট করি।

জওয়াহিরলালকে কাছারিব সামনে একটা অপরিসর বালুময় নাবাল জমির ও-পারে দেখা গেল। আমি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলাম। মুহুরীবাবু আগাইয়া গেলেন। জওয়াহিরলাল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল এবং পকেট হইতে চিঠিব তাড়া বাহির করিয়া মুহুরী বাবুর হাতে দিল।

আমারও খান-দুই পত্র আছে—অতি পরিচিত হাতের লেখা। চিঠি পড়িতে পড়িতে চারপাশের জঙ্গলের দিকে চাহিয়া নিজেই অবাক্ হইয়া গেলাম। কোথায় আছি, কখনও ভাবি নাই আমি এখানে

কোনদিন থাকিব, কলিকাতার আড্ডা ছাড়িয়া এমন জায়গায় দিনের পর দিন কাটাইব। একখানা বিলাতী ম্যাগাজিনের গ্রাহক হইয়াছি, আজ সেখানা আসিয়াছে। মোড়কের উপরে লেখা "উড়ো জাহাজের ডাকে"। জনাকীর্ণ কলিকাতা শহরের বুকে বসিয়া বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সুখ কি বুঝা যাইবে? এখানে—এই নির্জন বন-প্রদেশে—সকল বিষয়েই ভাবিবার ও অবাক হইবার অবকাশ আছে—এখানকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সে-অনুভূতি আনয়ন করে।

যদি সত্য কথা বলিতে হয়, জীবনে ভাবিয়া দেখিবার শিক্ষা এইখানে আসিয়াই পাইয়াছি। কত কথা মনে জাগে, কত পুরনো কথা মনে হয়—নিজের মনকে এমন করিয়া কখনও উপভোগ করি নাই। এখানে সহস্র প্রকার অসুবিধার মধ্যেও সেই আনন্দ আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিতেছে দিন দিন।

অথচ সত্যিই আমি প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কোনও জনহীন দ্বীপে একা পরিত্যক্ত হই নাই। বোধ হয় ত্রিশ-বত্রিশ মাইলের মধ্যে রেল স্টেশন। সেখানে ট্রেনে চড়িয়া এক ঘণ্টার মধ্যে পূর্ণিয়া যাইতে পারি—তিন ঘণ্টার মধ্যে মুঙ্গের যাইতে পারি। কিন্তু প্রথম তো রেল-স্টেশনে যাইতেই বেজায় কষ্ট—সে কষ্ট স্বীকার করিতে পারি, যদি পূর্ণিয়া বা মুঙ্গের শহরে গিয়া কিছু লাভ থাকে। এমনি দেখিতেছি কোনও লাভই নাই, না আমাকে সেখানে কেউ চেনে, না আমি কাউকে চিনি। কি হইবে গিয়া?

কলিকাতা হইতে আসিয়া বই আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে গল্প ও আলোচনার অভাব এত বেশী অনুভব করি যে কতবার ভাবিয়াছি এ জীবন আমার পক্ষে অসহ্য। কলিকাতাতেই আমার সব, পূর্ণিয়া বা মুঙ্গেরে কে আছে যে সেখানে যাইব? কিন্তু সদর-আপিসের বিনা অনুমতিতে কলিকাতায় যাইতে পারি না—তা ছাড়া অর্থব্যয়ও এত বেশী যে দু-পাঁচ দিনের জন্য যাওয়া পোষায় না।

৩

কয়েক মাস সুখে-দুঃখে কাটিবার পর চৈত্র মাসের শেষ হইতে এমন একটা কাণ্ডের সূত্রপাত হইল, যাহা আমার অভিজ্ঞতার মধ্যে কখনও ছিল না। পৌষ মাসে কিছু কিছু বৃষ্টি পড়িয়াছিল, তার পর হইতেই ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। মাঘ মাসে বৃষ্টি নাই, ফাল্গুনে না, চৈত্রে না, বৈশাখে না। সঙ্গে সঙ্গে যেমন অসহ্য গ্রীষ্ম, তেমনি নিদারুণ জলকষ্ট।

সাদা কথায় গ্রীষ্ম বা জলকষ্ট বলিলে এ বিভীষিকাময় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের স্বরূপ কিছুই বোঝানো যাইবে না। উত্তরে আজমাবাদ হইতে দক্ষিণে কিষণপুর—পূর্বে ফুলকিয়া বইহার ও লবটুলিয়া হইতে পশ্চিমে মুঙ্গের জেলার সীমানা পর্যন্ত সারা জঙ্গল-মহালের মধ্যে যেখানে যত খাল, ডোবা, কুণ্ডী অর্থাৎ বড় জলাশয় ছিল—সব গেল শুকাইয়া। কুয়া খুঁড়িলে জল পাওয়া যায় না—যদিবা বালির উনুই হইতে কিছু কিছু জল ওঠে, ছোট এক বালতি জল কুয়ায় জমিতে এক ঘণ্টার উপর সময় লাগে। চারিধারে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে একমাত্র কুশী নদী ভরসা—সে আমাদের মহালের পূর্বতম প্রান্ত হইতে সাত আট মাইল দূরে বিখ্যাত মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের ওপারে। আমাদের জমিদারী ও মোহনপুরা অরণ্যের মধ্যে একটা ছোট পাহাড়ী নদী নেপালের তরাই অঞ্চল হইতে বহিয়া আসিতেছে—কিন্তু বর্তমানে শুধু শুষ্ক বালুময় খাতে তাহার উপলঢাকা চরণচিহ্ন বিদ্যমান। বালি খুঁড়িলে যে জলটুকু পাওয়া যায়, তাহারই লোভে কত দূরের গ্রাম হইতে মেয়েরা কলসী লইয়া আসে ও সারা দুপুর বালি-কাদা ছানিয়া আধ-কলসীটাক ঘোলা জল লইয়া বাড়ী ফিরে।

কিন্তু পাহাড়ী নদী—স্থানীয় নাম মিছি নদী—আমাদের কোনও কাজে আসে না—কারণ আমাদের মহাল হইতে বহু দূরে। কাছারিতেও কোন বড় ইঁদারা নাই—ছোট যে বালির পাতকুয়াটি আছে, তাহা হইতে পানীয় জলের সংস্থান হওয়াই বিষম সমস্যার কথা দাঁড়াইল। তিন বালতি জল সংগ্রহ করিতে দুপুর ঘুরিয়া যায়।

দুপুরে বাহিরে দাঁড়াইয়া তাম্রাভ অগ্নিবর্ষী আকাশ ও অর্ধশুষ্ক বনঝাউ ও লম্বা ঘাসের বন দেখিতে ভয় করে—চারিধার যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছে, মাঝে মাঝে আগুনের হল্‌কার মত তপ্ত বাতাস সর্বাঙ্গ ঝল্‌সাইয়া বহিতেছে—সূর্যের এ রূপ, দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের এ ভয়ানক রুদ্র রূপ কখনও দেখি নাই, কল্পনাও করি নাই। এক এক দিন পশ্চিম দিক হইতে বালির ঝড় বয়—এ সব দেশে চৈত্র-বৈশাখ মাস পশ্চিমে বাতাসের সময়—কাছারি হইতে এক-শ' গজ দূরের জিনিস ঘন বালি ও ধূলিরাশির আবালে ঢাকিয়া যায়।

অর্ধেক দিন রামধনিয়া টহলদার আসিয়া জানায়—কুঁয়ামে পানি নেই হে, হুজুর। কোন-কোন দিন ঘণ্টাখানেক ধরিয়া ছানিয়া ছানিয়া বালির ভিতর হইতে আধ বাল্‌তি তরল কর্দম স্নানের জন্য আমার সামনে আনিয়া ধরে। সে ভয়ানক গ্রীষ্মে তাহাই তখন অমূল্য।

একদিন দুপুরের পরে কাছারির পিছনে একটা হরীতকী গাছের তলায় স্বল্প ছায়ায় দাঁড়াইয়া আছি—হঠাৎ চারিধারে চাহিয়া মনে হইল দুপুরের এমন চেহারা কখনও দেখি তো নাই-ই এ জায়গা হইতে চলিয়া গেলে আর কোথাও দেখিবও না। আজন্ম বাংলা দেশের দুপুর দেখিয়াছি—জ্যৈষ্ঠ মাসের খররৌদ্রভরা দুপুর দেখিয়াছি—কিন্তু এ রুদ্রমূর্তি তাহার নাই। ভীম-ভৈরব রূপ আমাকে মুগ্ধ করিল। সূর্যের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, একটা বিরাট অগ্নিকুণ্ড—ক্যালসিয়াম পুড়িতেছে, হাইড্রোজেন পুড়িতেছে, লোহা পুড়িতেছে, নিকেল পুড়িতেছে, কোবাল্ট পুড়িতেছে—জানা অজানা শত শত রকমের গ্যাস ও ধাতু কোটি যোজন ব্যাসযুক্ত দীপ্ত ফার্নেসে একসঙ্গে পুড়িতেছে—তারই ধু-ধু আগুনের ঢেউ অসীম শূন্যের ঈথারের স্তর ভেদ করিয়া ফুলকিয়া বইহার ও লোধাইটোলার তৃণভূমিতে বিস্তীর্ণ অরণ্যে আসিয়া লাগিয়া, প্রতি তৃণপত্রের শিরা উপশিরার সব রসটুকু শুকাইয়া ঝামা করিয়া, দিগ্‌দিগন্ত ঝল্‌সাইয়া পুড়াইয়া শুরু করিয়াছে ধ্বংসের এক তাণ্ডব-লীলা। চাহিয়া দেখিলাম দূরে দূরে প্রান্তরের সর্বত্র কম্পমান তাপ-তরঙ্গ ও তাহার ওধারে তাপজনিত একটি অস্পষ্ট কুয়াশা। গ্রীষ্ম-দুপুরে কখনও এখানে আকাশ নীল দেখিলাম না—তাম্রাভ, কটা—শূন্য, একটি চিল-শকুনিও নাই—পাখির দল দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে। কি অদ্ভুত সৌন্দর্য ফুটিয়াছে এই দুপুরের। খর উত্তাপকে অগ্রাহ্য করিয়া সেই হরীতকীতলায় দাঁড়াইয়া রহিলাম কতক্ষণ। সাহারা দেখি নাই, সোয়েন হেডিনের বিখ্যাত টাক্‌লামাকান্ মরুভূমি দেখি নাই, গোবি দেখি নাই—কিন্তু এখানে মধ্যাহ্নের এই রুদ্রভৈরব রূপের মধ্যে সে-সব স্থানের অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়া উঠিল।

কাছারি হইতে তিন মাইল দূরে একটি বনে-ঘেরা ক্ষুদ্র কুণ্ডীতে সামান্য একটু জল ছিল, কুণ্ডীটাতে গত বর্ষার জলে খুব মাছ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলাম—খুব গভীর বলিয়া এই অনাবৃষ্টিতেও তাহার জল একেবারে শুকাইয়া যায় নাই। কিন্তু সে জলে কাহারও কোন কাজ হয় নাই—প্রথমত, তার কাছাকাছি অনেক দূর লইয়া কোন মানুষের বসতি নাই—দ্বিতীয়ত, জল ও তীরভূমির মধ্যে কাদা এত গভীর যে, কোমর পর্যন্ত বসিয়া যায়—কলসীতে জল পুরিয়া পুনরায় তীরে উত্তীর্ণ হইবার আশা বড়ই কম। আর একটি কারণ এই যে, জলটা খুব ভাল নয়—স্নান বা পানের আদৌ উপযুক্ত নয়, জলের সঙ্গে কি জিনিস মিশানো আছে জানি না—কিন্তু কেমন একটা অপ্রীতিকর ধাতব গন্ধ।

একদিন সন্ধ্যায় পশ্চিমে বাতাস ও উত্তাপ কম পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় বাহির হইয়া ঐ কুণ্ডীটার পাশের উঁচু বালিয়াড়ি ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গলের পথে উপস্থিত হইয়াছি। পিছনে গ্রান্ট সাহেবের সেই বড় বটগাছের আড়ালে সূর্য অস্ত যাইতেছিল। কাছারির খানিকটা জল বাঁচাইবার জন্য ভাবিলাম, এখানে ঘোড়াটাকে একবার জল খাওয়াইয়া লই। যত কাদা হোক, ঘোড়া ঠিক উঠিতে পারিবে। জঙ্গল পার হইয়া কুণ্ডীর ধারে গিয়া এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়িল। কুণ্ডীর চারিধারে কাদার উপর আট-দশটা ছোট বড় সাপ, অন্য দিকে তিনটা প্রকাণ্ড মহিষ একসঙ্গে জল খাইতেছে। সাপগুলি প্রত্যেকটা বিষাক্ত, করাত ও শঙ্খচিতি শ্রেণীর, যাহা এদেশে সাধারণত দেখা যায়।

মহিষ দেখিয়া মনে হইল, এ ধরনের মহিষ আমি আর কখনও দেখি নাই। প্রকাণ্ড এক জোড়া শিং, গায়ে লম্বা লম্বা লোম—বিপুল শরীর। কাছেও কোনো লোকালয় বা মহিষের বাথান নাই—তবে এ মহিষ কোথা হইতে আসিল বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ভাবিলাম, চরির খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে কেহ লুকাইয়া হয়ত জঙ্গলের মধ্যে কোথাও বা বাথান করিয়া থাকিবে। কাছারির কাছাকাছি আসিয়াছি, মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদারের সহিত দেখা। তাহাকে কথাটা বলিতেই সে চমকিয়া উঠিল—আরে সর্বনাশ! বলেন কি হুজুর! হনুমানজি খুব বাঁচিয়ে দিয়েছেন আজ! ও পোষা ভঁইস্ নয়, ও হ'ল আড়ন, বুনো ভঁইস্ হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গল থেকে এসেছে জল খেতে। ও অঞ্চলে কোথাও জল নেই তো? জলকষ্টে পড়ে এসেছে।

কাছারিতে কথাটা তখনই রাষ্ট্র হইয়া গেল। সকলেই এক বাক্যে বলিল—উঃ, হুজুর খুব বেঁচে গিয়েছেন। বাঘের হাতে পড়লে বরং রক্ষা পাওয়া যেতে পারে, বুনো মহিষের হাতে পড়লে নিস্তার নেই। আর এই সন্ধ্যাবেলা ওই নির্জন জায়গায় যদি একবার আপনাকে ওরা তাড়া করত, ঘোড়া ছুটিয়ে বাঁচতে পারতেন না হুজুর।

তারপর হইতে জঙ্গলে-ঘেরা ওই ছোট কুণ্ডীটা বন্য জানোয়ারের জলপানের একটা প্রধান আড্ডা হইয়া দাঁড়াইল। অনাবৃষ্টি যত হইতে লাগিল, রৌদ্রের ক্রমবর্ধমান প্রখরতায় দিক্‌দিগন্তে দাবদাহ যত প্রচণ্ড হইয়া উঠিতে লাগিল,—খবর আসিতে লাগিল সেই জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীতে লোকে বাঘকে জল খাইতে দেখিয়াছে, বন-মহিষকে জল খাইতে দেখিয়াছে, হরিণের পালকে জল খাইতে দেখিয়াছে, নীল গাই ও বুনো শুয়োর তো আছেই—কারণ শেষের দুই প্রকার জানোয়ার এ জঙ্গলে অত্যন্ত বেশী। আমি নিজে আর একদিন জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় করিয়া কুণ্ডীতে যাই শিকারের উদ্দেশ্যে—সঙ্গে তিন-চারজন সিপাহী ছিল—দু-তিনটি বন্দুকও ছিল। সে যা দৃশ্য দেখিলাম সে রাত্রে, জীবনে ভুলিবার নয়। তাহা বুঝিতে হইলে কল্পনায় দৃষ্টি আঁকিয়া লইতে হইবে এক জনহীন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি ও বিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের। আরও কল্পনা করিয়া লইতে হইবে সারা বনভূমি ব্যাপিয়া এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার, অভিজ্ঞতা না থাকিলে যদিও সে নিস্তব্ধতা কল্পনা করা অসম্ভব।

উষ্ণ বাতাস অর্ধশুষ্ক কাশ-ডাঁটার গন্ধে নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। লোকালয় হইতে বহুদূরে আসিয়াছি, দিগ্‌-বিদিকের জ্ঞান হারাইয়া ফেলিয়াছি।

কুণ্ডীতে প্রায় নিঃশব্দে জল খাইতেছে একদিকে দুটি নীল গাই, অন্য দিকে দুটি হায়েনা, নীল গাই দুটি একবার হায়েনাদের দিকে চাহিতেছে, হায়েনারা একবার নীল গাই দুটির দিকে চাহিতেছে—আর দু-দলের মাঝখানে দু-তিন মাস বয়সের এক ছোট নীল গাইয়ের বাচ্চা। অমন করুণ দৃশ্য কখনও দেখি না—দেখিয়া পিপাসার্ত বন্য জন্তুদের নিরীহ শরীরে অতর্কিতে গুলি মারিবার প্রবৃত্তি হইল না।

এদিকে বৈশাখও কাটিয়া গেল। কোথাও একফোঁটা জল নাই। আরো এক বিপদ দেখা দিল। এই সুবিস্তীর্ণ বনপ্রান্তরের মাঝে মাঝে লোকে দিক হারাইয়া আগেও পথ ভুলিয়া যাইত—এখন এই সব পথহারা পথিকদের জলাভাবে প্রাণ হারাইবার সমূহ আশঙ্কা দাঁড়াইল, কারণ ফুলকিয়া বইহার হইতে গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছ পর্যন্ত বিশাল তৃণভূমির মধ্যে কোথাও একবিন্দু জল নাই। এক-আধটা শুষ্কপ্রায় কুণ্ডী যেখানে আছে, অনভিজ্ঞ দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকদের পক্ষে সে সব খুঁজিয়া পাওয়া সহজ নয়। একদিনের ঘটনা বলি।

৪

সেদিন বেলা চারটের সময় অত্যন্ত গরমে কাজে মন বসাইতে না পারিয়া একখানা কি বই পড়িতেছি, এমন সময় রামবিরিজ সিং আসিয়া এত্তেলা করিল, কাছারির পশ্চিমদিকে উঁচু ডাঙার উপরে একজন

কে অদ্ভুত ধরনের পাগলা লোক দেখা যাইতেছে—সে হাত-পা নাড়িয়া দূর হইতে কি যেন বলিতেছে। বাহিরে গিয়া দেখিলাম সত্যিই দূরের ডাঙাটার উপরে কে একজন দাঁড়াইয়া—মনে হইল মাতালের মত টলিতে টলিতে এদিকেই আসিতেছে। কাছারিসুদ্ধ লোক জড় হইয়া সেদিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া আছে দেখিয়া আমি দুজন সিপাহী পাঠাইয়া দিলাম লোকটাকে এখানে আনিতে।

লোকটাকে যখন আনা হইল, দেখিলাম তাহার গায়ে কোন জামা নাই—পরনে মাত্র একখানা ফর্সা ধুতি, চেহারা ভাল, রং গৌরবর্ণ। কিন্তু তাহার মুখের আকৃতি অতি ভীষণ, গালের দুই কশ বাহিয়া ফেনা বাহির হইতেছে, চোখদুটি জবাফুলের মত লাল, চোখে উন্মাদের মত দৃষ্টি। আমার ঘরের দাওয়ায় একটা বালতিতে জল ছিল—তাই দেখিয়া সে পাগলের মত ছুটিয়া বালতির দিকে গেল। মুনেশ্বর সিং চাক্‌লাদার ব্যাপারটা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি বালতি সরাইয়া লইল। তাহার পর তাহাকে বসাইয়া হাঁ করাইয়া দেখা গেল জিভ ফুলিয়া বীভৎস ব্যাপার হইয়াছে। অতি কষ্টে জিভটা মুখের একপাশে সরাইয়া একটু একটু করিয়া তার মুখে জল দিতে দিতে আধ ঘণ্টা পরে লোকটা কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল। কাছারিতে লেবু ছিল, লেবুর রস ও গরম জল এক গ্লাস তাহাকে খাইতে দিলাম। ক্রমে ঘণ্টাখানেক পরে সে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিল। শুনিলাম তার বাড়ী পাটনা। গালার চাষ করিবার উদ্দেশ্যে সে এ-অঞ্চলে কুলের জঙ্গলের অনুসন্ধান করিতে পূর্ণিয়া হইতে রওনা হইয়াছে আজ দুই দিন পূর্বে। তার পর দুপুরের সময় আমাদের মহালে ঢুকিয়াছে, এবং একটু পরে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এ রকম একঘেয়ে একই ধরনের গাছে-ভরা জঙ্গলে দিক্ ভুল করা খুব সোজা, বিশেষত বিদেশী লোকের পক্ষে। কালকার ভীষণ উত্তাপে ও গরম পশ্চিমে বাতাসের দমকার মধ্যে সারা বৈকাল ঘুরিয়াছে। কোথাও একফোঁটা জল পায় নাই, একটা মানুষের সঙ্গে দেখা হয় নাই—রাত্রে অবসন্ন অবস্থায় এক গাছের তলায় শুইয়া ছিল—আজ সকাল হইতে আবার ঘোরা শুরু করিয়াছে—মাথা ঠাণ্ডা রাখিলে সূর্য দেখিয়া দিক্ নির্ণয় করা হয়তো তার পক্ষে খুব কঠিন হইত না—অন্তত পূর্ণিয়ায়ও ফিরিয়া যাইতে পারিত—কিন্তু ভয়ে দিশাহারা হইয়া একবার এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিয়াছে আজ সারা দুপুর, তাহার উপর খুব চীৎকার করিয়া লোক ডাকিবার চেষ্টা করিয়াছে—কোথায় লোক? ফুলকিয়া বইহারের কুলের জঙ্গল যেদিকে, সেদিক হইতে লবটুলিয়া পর্যন্ত দশ-বারো বর্গমাইল-ব্যাপী বনপ্রান্তর সম্পূর্ণ জনমানবশূন্য, সুতরাং আশ্চর্যের বিষয় নয় যে, তাহার চীৎকার কেহ শোনে নাই। আরও তাহার আতঙ্ক হইবার কারণ, সে ভাবিয়াছিল তাহাকে জঙ্গলের মধ্যে জিনপরীতে পাইয়াছে—মারিয়া না ফেলিয়া ছাড়িবে না। তাহার গায়ে একটা জামা ছিল, কিন্তু আজ অসহ্য পিপাসায় দুপুরের পরে এমন গা-জ্বলুনি শুরু হইয়াছিল যে জামাটা খুলিয়া কোথায় ফেলিয়া দিয়াছে। এ অবস্থায় দৈবক্রমে আমাদের কাছারির হনুমানের ধ্বজার লাল নিশানটা দূর হইতে তাহার চোখে না পড়িলে লোকটা আজ বেঘোরে মারা পড়িত।

একদিন এই ঘোর উত্তাপ ও জলকষ্টের দিনে ঠিক দুপুর বেলা সংবাদ পাইলাম, নৈঋত কোণে মাইল-খানেক দূরের জঙ্গলে ভয়ানক আগুন লাগিয়াছে এবং আগুন কাছারির দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সবাই মিলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া দেখিলাম প্রচুর ধূমের সঙ্গে রাঙা অগ্নিশিখা লক্‌লক্ করিয়া বহুদূর আকাশে উঠিতেছে। সেদিন আবার দারুণ পশ্চিমে বাতাস, লম্বা লম্বা ঘাস ও বন-ঝাউয়ের জঙ্গল সূর্যতাপে অর্ধশুষ্ক হইয়া বারুদের মত হইয়া আছে, এক-এক স্ফুলিঙ্গ পড়িবামাত্র গোটা ঝাড় জ্বলিয়া উঠিতেছে—সেদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, ঘন নীলবর্ণ ধূমরাশি ও অগ্নিশিখা—আর চটপট শব্দ। ঝড়ের মুখে পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে বাঁকা আগুনের শিখা ঠিক যেন ডাক-গাড়ীর বেগে ছুটিয়া আসিতেছে আমাদের কয়খানা খড়ের বাংলোর দিকেই। সকলেরই মুখ শুকাইয়া গেল, এখানে থাকিলে আপাতত তো বেড়া-আগুনে ঝলসাইয়া মরিতে হয়—দাবানল তো আসিয়া পড়িল!

ভাবিবার সময় নাই। কাছারির দরকারী কাগজপত্র, তহবিলের টাকা, সরকারী দলিল ম্যাপ, সর্বস্ব মজুত—এ বাদে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত জিনিস যার যার তো আছেই। এ সব তো যায়! সিপাহীরা শুষ্কমুখে ভীতকণ্ঠে বলিল—আগ তো আ গৈল, হুজুর! বলিলাম—সব জিনিস বার কর। সরকারী তহবিল ও কাগজপত্র আগে।

জনকতক লোক লাগিয়া গেল আগুন ও কাছারির মধ্যে যে জঙ্গল পড়ে তাহারই যতটা পারা যায় কাটিয়া পরিষ্কার করিতে। জঙ্গলের মধ্যে বাথান হইতে আগুন দেখিয়া বাথানওয়ালা চরির প্রজা দু-দশ জন ছুটিয়া আসিল কাছারি রক্ষা করিতে, কারণ পশ্চিমা বাতাসের বেগ দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছে কাছারি ঘোর বিপন্ন।

কি অদ্ভুত দৃশ্য! জঙ্গল ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া ছুটিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে নীলগাইয়ের দল প্রাণভয়ে দৌড়িতেছে, শিয়াল দৌড়িতেছে, কান উঁচু করিয়া খরগোস দৌড়িতেছে, একদল বন্যশূকর তো ছানাপোনা লইয়া কাছারির উঠান দিয়াই দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ছুটিয়া গেল—ও অঞ্চলের বাথান হইতে পোষা মহিষের দল ছাড়া পাইয়া প্রাণপণে ছুটিতেছে, একঝাঁক বনটিয়া মাথার উপর দিয়া সোঁ করিয়া উড়িয়া পালাইল, পিছনে পিছনে একটা বড় ঝাঁক লাল হাঁস। আবার এক ঝাঁক বনটিয়া, গোটাকতক সিল্লি। রামবিরিজ সিং চাকলাদার অবাক হইয়া বলিল—পানি কাঁহা নেই ছে.. আরে এ লাল হাঁসকা জেরা কাঁহাসে আয়া, ভাই রামলগন? গোষ্ঠ মুহুরী বিরক্ত হইয়া বলিল—আঃ বাপু রাখ্! এখন প্রাণ নিয়ে টানাটানি, লাল হাঁস কোথা থেকে এল তার কৈফিয়তে কি দরকার?

আগুন বিশ মিনিটের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তার পরে দশ-পনের জন লোক মিলিয়া প্রায় ঘণ্টাখানেক আগুনের সঙ্গে সে কি যুদ্ধ! জল কোথাও নাই—আধকাঁচা গাছের ডাল ও বালি এইমাত্র অস্ত্র। সকলের মুখচোখ আগুনের ও রৌদ্রের তাপে দৈত্যের মত বিভীষণ হইয়া উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ছাই ও কালি, হাতের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, অনেকেরই গায়ে হাতে ফোস্কা—এদিকে কাছারির সব জিনিসপত্র, বাক্স, খাট, দেরাজ, আলমারি তখনও টানাটানি করিয়া বাহির করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠানে ফেলা হইতেছে। কোথাকার জিনিস যে কোথায় গেল, কে তার ঠিকানা রাখে! মুহুরীবাবুকে বলিলাম—ক্যাশ আপনার জিম্মায় রাখুন, আর দলিলের বাক্সটা।

কাছারির উঠান ও পরিষ্কৃত স্থানে বাধা পাইয়া আগুনের স্রোত উত্তর ও দক্ষিণ বাহিয়া নিমেষের মধ্যে পূর্বমুখে ছুটিল—কাছারিটা কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া গেল এযাত্রা। জিনিসপত্র আবার ঘরে তোলা হইল, কিন্তু বহুদূরে পূর্বাকাশ লাল করিয়া লোলজিহ্বা প্রলয়ঙ্করী অগ্নিশিখা সারারাত্রি ধরিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে সকালের দিকে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমানায় গিয়া পৌঁছিল।

দু-তিন দিন পরে খবর পাওয়া গেল কারো ও কুশী নদীর তীরবর্তী কর্দমে আট-দশটা বন্য মহিষ, দুটি চিতা বাঘ, কয়েকটি নীলগাই হাবড়ে পড়িয়া পুঁতিয়া রহিয়াছে। ইহারা আগুন দেখিয়া মোহনপুরা জঙ্গল হইতে প্রাণভয়ে নদীর ধার দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাবড়ে পড়িয়া গিয়াছে—যদিও রিজার্ভ ফরেস্ট হইতে কুশী ও কারো নদী প্রায় আট-ন' মাইল দূরে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ কাটিয়া গিয়া আষাঢ় পড়িল। আষাঢ় মাসে প্রথমেই কাছারির পুণ্যাহ উৎসব। এ জায়গায় মানুষের মুখ বড় একটা দেখিতে পাই না বলিয়া আমার একটা শখ ছিল কাছারির পুণ্যাহের দিনে অনেক লোক নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইব। নিকটে কোন গ্রাম না থাকায় আমরা গনোরী তেওয়ারীকে

পাঠাইয়া দূরে-দূরের বস্তির লোকদের নিমন্ত্রণ করিলাম। পুণ্যাহের পূর্বদিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া টিপ টিপ বৃষ্টি পড়িতে শুরু করিয়াছিল, পুণ্যাহের দিন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এদিকে দুপুর হইতে না হইতে দলে দলে লোক নিমন্ত্রণ খাওয়ার লোভে ধারাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া কাছারিতে পৌঁছিতে লাগিল, এমন মুস্কিল যে, তাহাদের বসিবার জায়গা দিতে পারা যায় না। দলের মধ্যে অনেক মেয়ে ছেলেপুলে লইয়া খাইতে আসিয়াছে, কাছারির দপ্তরখানায় তাহাদের বসিবার ব্যবস্থা করিলাম, পুরুষেরা যে যেখানে পারে আশ্রয় লইল।

এ-দেশের খাওয়ানোর কোন হাঙ্গামা নেই, এত গরীব দেশ যে থাকিতে পারে তাহা আমার জানা ছিল না। বাংলা দেশ যতই গরীব হোক্, এদের দেশের সাধারণ লোকদের তুলনায় বাংলা দেশের গরীব লোকে ও অনেক বেশী অবস্থাপন্ন। ইহারা এই মুষলধারে বৃষ্টি মাথায় করিয়া খাইতে আসিয়াছে চীনা ঘাসের দানা, টক দই, ভেলি গুড় ও লাড্ডু। কারণ ইহাই এখানে সাধারণ ভোজের খাদ্য।

দশ-বারো বছরের একটি অচেনা ছোকরা সকাল হইতেই খুব খাটিতেছিল, গরীব লোকের ছেলে, নাম বিশুয়া, দূরের কোন বস্তি হইতে আসিয়া থাকিবে। বেলা দশটার সময় সে কিছু জলখাবার চাহিল। ভাঁড়ারের ভার ছিল লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর উপর, সে এক খুঁচি চীনার দানা ও একটু নুন তাহাকে আনিয়া দিল।

আমি পাশেই দাঁড়াইয়া ছিলাম। ছেলেটি কালো কুচকুচে, সুশ্রী মুখটা, যেন পাথরের কৃষ্ণঠাকুর। সে যখন ব্যস্তসমস্ত হইয়া মলিন মোটা মার্কিনী আট-হাতি থান কাপড়ের খুঁট পাতিয়া সেই তুচ্ছ জলখাবার লইল তখন তাহার মুখে সে কি খুশীর হাসি! আমি বলিতে পারি অতি গরীব অবস্থারও কোনও বাঙালী ছেলে চীনার দানা কখনও খাইবেই না, খুশী হওয়া তো দূরের কথা। কারণ একবার শখ করিয়া চীনার দানা খাইয়া যে স্বাদ পাইয়াছি, তাহাতে মুখরোচক সুখাদ্যের হিসাবে তাহাকে উল্লেখ কখনই করিতে পারিব না।

বৃষ্টির মধ্যে কোনও রকমে তো ব্রাহ্মণভোজন একরকম চুকিয়া গেল। বৈকালের দিকে দেখি ঘোর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে তিনটি স্ত্রীলোক উঠোনে পাতা পাতিয়া বসিয়া ভিজিয়া ঝুপসি হইতেছে—সঙ্গে দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়েও। তাহাদের পাতে চীনার দানা আছে, কিন্তু দই বা ভেলি গুড় কেহ দিয়া যায় নাই, তাহারা হাঁ করিয়া কাছারি ঘরের দিকে চাহিয়া আছে। পাটোয়ারীকে ডাকিয়া বলিলাম—এদের কে দিচ্ছে? এরা বসে আছে কেন? আর এদের এই বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে বসিয়েছেই বা কে?

পাটোয়ারী বলিল—হজুর, ওরা জাতে দোষাদ। ওদের ঘরের দাওয়ায় তুললে ঘরের সব জিনিসপত্র ফেলা যাবে, কোনও ব্রাহ্মণ, ছত্রী কি গাঙ্গোতা সে জিনিস খাবে না। আর জায়গাই বা কোথায় আছে বলুন?

ওই গরীব দোষাদদের মেয়ে কয়টির সাম্‌নে আমি গিয়া নিজে বৃষ্টিতে ভিজিয়া দাঁড়াইতে লোকজনেরা ব্যস্ত হইয়া তাহাদের পরিবেশন করিতে লাগিল। সামান্য চীনার দানা, গুড় ও জলো টক দই এক একজন যে পরিমাণে খাইল, চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস করিবার কথা নহে। এই ভোজ খাইবার জন্য এত আগ্রহ দেখিয়া ঠিক করিলাম, দোষাদদের এই মেয়েদের নিমন্ত্রণ করিয়া একদিন খুব ভাল করিয়া সত্যকার সভ্য খাদ্য খাওয়াইব। সপ্তাহখানেক পরেই পাটোয়ারীকে দিয়া দোষাদপাড়ার মেয়ে কয়টি ও তাহাদের ছেলেমেয়েদের নিমন্ত্রণ করিলাম, সেদিন তাহারা যাহা খাইল—লুচি, মাছ, মাংস, ক্ষীর, দই, পায়েস, চাটনি—জীবনে কোনও দিন সেরকম ভোজ খাওয়ার কল্পনা করে নাই। তাদের বিস্মিত ও আনন্দিত চোখ-মুখের সে হাসি কতদিন আমার মনে ছিল। সেই ভবঘুরে গাঙ্গোতা ছোকরা বিশুয়াও সে দলে ছিল।

২

সার্ভে-ক্যাম্প থেকে একদিন ঘোড়া করিয়া ফিরিতেছি, বনের মধ্যে একটা লোক কাশঘাসের ঝোপের পাশে বসিয়া কলাইয়ের ছাতু মাখিয়া খাইতেছে। পাত্রের অভাবে ময়লা থান কাপড়ের প্রান্তেই ছাতুটা মাখিতেছে—এত বড় একটা তাল যে, একজন লোকে—হলই বা হিন্দুস্থানী, মানুষ তো বটে—কি করিয়া অত ছাতু খাইতে পারে এ আমার বুদ্ধির অগোচর। আমায় দেখিয়া লোকটা সসম্ভ্রমে খাওয়া ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম ঠুকিয়া বলিল—ম্যানেজার সাহেব। থোড়া জলখাই করতে হেঁ হুজুর, মাফ কিজিয়ে।

একজন ব্যক্তি নির্জনে বসিয়া, শান্ত ভাবে জলখাবার খাইতেছে, ইহার মধ্যে মাপ করিবার কি আছে খুঁজিয়া পাইলাম না। বলিলাম—খাও, খাও, তোমায় উঠতে হবে না। নাম কি তোমার?

লোকটা তখনও বসে নাই, দণ্ডায়মান অবস্থাতেই সসম্ভ্রমে বলিল—গরীব কা নাম ধাওতাল সাহু, হুজুর।

চাহিয়া দেখিয়া মনে হইল লোকটার বয়স ষাটের উপর হইবে। রোগা লম্বা চেহারা, গায়ের রং কালো, পরনে অতি মলিন থান ও মেরজাই, পা খালি।

ধাওতাল সাহুর সঙ্গে এই আমার প্রথম আলাপ।

কাছারিতে আসিয়া রামজোত পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ধাওতাল সাহুকে চেন?

রামজোত বলিল—জী হুজুর। ধাওতাল সাহুকে এ অঞ্চলে কে না জানে? সে মস্ত বড় মহাজন, লক্ষপতি লোক, এদিকে সবাই তার খাতক। নওগছিয়ায় তার ঘর। পাটোয়ারীর কথা শুনিয়া খুব আশ্চর্য হইয়া গেলাম। লক্ষপতি লোক বনের মধ্যে বসিয়া ময়লা উড়ানির প্রান্তে এক তাল নিরুপকরণ কলাইয়ের ছাতু খাইতেছে—এ দৃশ্য কোন বাঙালী লক্ষপতির সম্বন্ধে অন্তত কল্পনা করা অতীব কঠিন। ভাবিলাম পাটোয়ারী বাড়াইয়া বলিতেছে, কিন্তু কাছারিতে যাহাকে জিজ্ঞাসা কবি, সে-ই ঐ কথা বলে, ধাওতাল সাহু? তার টাকার লেখা-জোখা নাই।

ইহার পরে নিজের কাজে ধাওতাল সাহু অনেকবাব কাছারিতে আমার সহিত দেখা করিযাছে, প্রতিবার একটু একটু করিয়া তাহার সহিত আলাপ জমিয়া উঠিলে বুঝিলাম, একটি অতি অদ্ভুত লোকোত্তর চরিত্রের মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়াছে। বিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের লোক যে আছে, না দোখলে বিশ্বাস করা যায় না।

ধাওতালের বযস যাহা আন্দাজ করিয়াছিলাম, প্রায় তেষট্টি-চৌষট্টি। কাছারির পূর্ব-দক্ষিণ দিকের জঙ্গলের প্রান্ত হইতে বারো-তেরো মাইল দূরে নওগছিয়া নামে গ্রামে তাহার বাড়ী। এ অঞ্চলে প্রজা, জোতদার, জমিদার, ব্যবসাদার প্রায় সকলেই ধাওতাল সাহুর খাতক। কিন্তু তাহার মজা এই যে, টাকা ধার দিয়া সে জোর করিয়া কখনও তাগাদা করিতে পারে না। কত লোকে যে কত টাকা তাহার ফাঁকি দিয়াছে! তাহার মত নিরীহ, ভালমানুষ লোকের মহাজন হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু লোকের উপরোধ সে এড়াইতে পারে না। বিশেষত সে বলে, যখন সকলেই মোটা সুদ লিখিয়া দিয়াছে, তখন ব্যবসা হিসাবেও তো টাকা দেওয়া উচিত। একদিন ধাওতাল আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, উড়ানিতে বাঁধা এক বাণ্ডিল পুরনো দলিলপত্র। বলিল—হুজুর, মেহেরবানি করে একটু দেখবেন দলিলগুলো?

পরীক্ষা করিয়া দেখি প্রায় আট-দশ হাজার টাকার দলিল ঠিক সময়ে নালিশ না-করার দরুণ তামাদি হইয়া গিয়াছে।

উড়ানির আর এক মুড়ো খুলিয়া সে আরও কতকগুলি জরাজীর্ণ কাগজ বাহির করিয়া বলিল—এগুলো দেখুন দেখি হুজুর। ভাবি একবার জেলায় গিয়ে উকীলদের দেখাই, তা মামলা কখনো করিনি, করা পোষায় না। তাগাদা করি, দিচ্ছি দেব করে টাকা দেয় না অনেকে।

দেখিলাম, সবগুলিই তামাদি দলিল। সবসুদ্ধ জড়াইয়া সেও চার-পাঁচ হাজার টাকা। ভালোমানুষকে সবাই ঠকায়। বলিলাম—সাহুজী, মহাজনী করা তোমার কাজ নয়। এ-অঞ্চলে মহাজনী করতে পারবে রাসবিহারী সিং রাজপুতের মত দুঁদে লোকেরা, যাদের সাত-আটটা লাঠিয়াল আছে, খাতকের ক্ষেতে নিজে ঘোড়া করে গিয়ে লাঠিয়াল মোতায়েন করে আসে, ফসল ক্রোক করে টাকা আর সুদ আদায় করে। তোমার মত ভালমানুষ লোকের টাকা শোধ করবে না কেউ। দিও না কাউকে আর।

ধাওতালকে বুঝাইতে পারিলাম না, সে বলিল—সবাই ফাঁকি দেয় না হুজুর। এখনও চন্দ্র-সূর্য উঠছে, মাথার উপর দীন-দুনিয়ার মালিক এখনও আছেন। টাকা কি বসিয়ে রাখলে চলে, সুদে না বাড়ালে চলে না হুজুর। এই আমাদের ব্যবসা।

তাহার এ-যুক্তি আমি বুঝতে পারিলাম না, সুদের লোভে আসল টাকা নষ্ট হইতে দেওয়া কেমনতর ব্যবসা জানি না। ধাওতাল সাহু আমার সামনেই অম্লান বদনে পনের-যোল হাজার টাকার তামাদি দলিল ছিঁড়িয়া ফেলিল—এমন ভাবে ছিঁড়িল যেন সেগুলো বাজে কাগজ—অবশ্য বাজে কাগজের পর্যায়েই তাহারা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে বটে। তাহার হাত কাঁপিল না, গলার সুর কাঁপিল না।

বলিল—রাঁইচি আর রেড়ির বীজ বিক্রী করে টাকা করেছিলাম হুজুর, নয়তো আমার পৈতৃক আমলের একটা ঘষা পয়সাও ছিল না। আমি করেছি, আবার আমিই লোকসান দিচ্ছি। ব্যবসা করতে গেলে লাভ-লোকসান আছেই হুজুর।

তা আছে স্বীকার করি, কিন্তু কয়জন লোক এত বড় ক্ষতি এমন শান্তমুখে উদাসীনভাবে সহ্য করিতে পারে, সেই কথাই ভাবিতেছিলাম। তাহার বড়মানুষী গর্ব দেখিলাম মাত্র একটি ব্যাপারে; একটা লাল কাপড়ের বটুয়া হইতে সে মাঝে মাঝে ছোট্ট একখানা জাঁতি ও সুপারি বাহির করিয়া কাটিয়া মুখে ফেলিয়া দেয়। আমার দিকে চাহিয়া হাসিমুখে একবার বলিয়াছিল—রোজ এক কনোয়া করে সুপুরি খাই বাবুজী। সুপুরির বড় খরচ আমার। বিত্তে নিস্পৃহতা ও বৃহৎ ক্ষতিকে তাচ্ছিল্য করিবার ক্ষমতা যদি দার্শনিকতা হয়, তবে ধাওতাল সাহুর মত দার্শনিক আমি তো অন্তত দেখি নাই।

৩

ফুলকিয়ার ভিতর দিয়া যাইবার সময় আমি প্রতিবারই জয়পাল কুমারের মকাইয়ের পাতা ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার সামনে দিয়া যাইতাম। কুমার অর্থে কুম্ভকার নয়, ভুঁইহার বামুন।

খুব বড় একটা প্রাচীন পাকুড় গাছের নীচেই জয়পালের ঘর। সংসারে সে সম্পূর্ণ একা, বয়সেও প্রাচীন, লম্বা রোগা চেহারা, মাথায় লম্বা সাদা চুল। যখনই যাইতাম, তখনই দেখিতাম কুঁড়েঘরের দোরের গোড়ায় সে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। জয়পাল তামাক খাইত না, কখনও তাকে কোন কাজ করিতে দেখিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না, গান গাহিতে শুনি নাই—সম্পূর্ণ কর্মশূন্য অবস্থার মানুষ, কি ভাবে যে এমন ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে, জানি না। জয়পালকে দেখিয়া বড় বিস্ময় ও কৌতূহল বোধ করিতাম। প্রতিবারই উহার ঘরের সামনে ঘোড়া থামাইয়া উহার সহিত দুটা কথা না বলিয়া যাইতে পারিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—জয়পাল, কি কর বসে?

—এই, বসে আছি হুজুর।

—বয়েস কত হল?

—তা হিসেব রাখিনি, তবে যেবার কুশীনদীর পুল হয়, তখন আমি মহিষ চরাতে পারি।

—বিয়ে করেছিলে? ছেলেপুলে ছিল?

—পরিবার মরে গিয়েছে আজ বিশ-পঁচিশ বছর। দুটো মেয়ে ছিল, তারাও মারা গেল। সেও তের-চৌদ্দ বছর আগে। এখন একাই আছি।

—আচ্ছা, এই যে একা এখানে থাক, কারো সঙ্গে কথা বলো না, কোথাও যাও না, কিছু করও না—এ ভাল লাগে? একঘেয়ে লাগে না?

জয়পাল অবাক হইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিত—কেন খারাপ লাগবে হুজুর? বেশ থাকি। কিছু খারাপ লাগে না।

জয়পালের এই কথাটা আমি কিছুতে বুঝিতে পারিতাম না। আমি কলকাতার কলেজে পড়িয়া মানুষ হইয়াছি, হয় কোন কাজ, নয়তো বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা, নয় বই, নয় সিনেমা, নয় বেড়ানো—এ ছাড়া মানুষ কি করিয়া থাকে বুঝি না। ভাবিয়া দেখিতাম, দুনিয়ার কত কি পরিবর্তন হইয়া গেল, গত বিশ বৎসর জয়পাল কুমার ওর ঘরের দোরটাতে ঠায় চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া তার কতটুকু খবর রাখে? আমি যখন ছেলেবেলায় স্কুলের নীচের ক্লাসে পড়িতাম, তখন জয়পাল এমনি বসিয়া থাকিত, বি.এ. যখন পাস করিলাম তখনও জয়পাল এমনি করিয়া বসিয়া থাকে। আমার জীবনেরই নানা ছোট বড় ঘটনা যা আমার কাছে পরম বিস্ময়কর বস্তু, তারই সঙ্গে মিলাইয়া জয়পালের এই বৈচিত্র্যহীন নির্জন জীবনের অতীত দিনগুলির কথা ভাবিতাম।

জয়পালের ঘরখানা গ্রামের একেবারে মাঝখানে হইলেও, কাছে অনেকটা পতিত জমি ও মকাই-খেত, কাজেই আশে-পাশে কোন বসতি নাই। ফুলকিয়া নিতান্ত ক্ষুদ্র গ্রাম, দশ-পনের ঘর লোকের বাস, সকলেই চতুর্দিকব্যাপী জঙ্গল-মহলে মহিষ চরাইয়া দিন গুজরান করে। সারাদিন ভূতের মত খাটে আর সন্ধ্যার সময় কলাইয়ের ভূষির আগুন জ্বালাইয়া তার চারিপাশে পাড়াসুদ্ধ বসিয়া গল্পগুজব করে, খৈনি খায় কিংবা শালপাতার পিকার ধূমপান করে। হুঁকায় তামাক খাওয়ার চলন এদেশে খুবই কম। কিন্তু কখনও কোন লোককে জয়পালের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখি নাই।

প্রাচীন পাকুড় গাছটার মগডালে বকেরা দল বাঁধিয়া বাস করে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয়, গাছের মাথায় থোকা থোকা সাদা ফুল ফুটিয়াছে। স্থানটা ঘন ছায়াভরা, নির্জন, আর সেখানটাতে দাঁড়াইয়া যে দিকেই চোখ পড়ে, সেদিকেই নীল নীল পাহাড় দূরদিগন্তে হাত ধরাধরি করিয়া ছোট ছেলেমেয়েদের মত মণ্ডলাকারে দাঁড়াইয়া। আমি পাকুড় গাছের ঘন ছায়ায় দাঁড়াইয়া যখন জয়পালের সঙ্গে কথা বলিতাম, তখন আমার মনে এই সুবৃহৎ বৃক্ষতলের নিবিড় শান্তি ও গৃহস্বামীর অনুদ্বিগ্ন, নিস্পৃহ, ধীর জীবনযাত্রা ধীরে ধীরে কেমন একটা প্রভাব বিস্তার করিত। ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়া লাভ কি? কি সুন্দর ছায়া এই শ্যাম বংশী-বটের, কেমন মন্থর যমুনাজল, অতীতের শত শতাব্দী পায়ে পায়ে পার হইয়া সময়ের উজানে চলিয়া যাওয়া কি আরামের।

কিছু জয়পালের জীবনযাত্রার প্রভাব ও কিছু চারিধারের বাধা-বন্ধনশূন্য প্রকৃতি আমাকেও ক্রমে ক্রমে যেন ঐ জয়পাল কুমারের মত নির্বিকার, উদাসীন ও নিস্পৃহ করিয়া তুলিতেছে। শুধু তাই নয়, আমার যে চোখ কখনও এর আগে ফুটে নাই সে চোখ যেন ফুটিয়াছে, যে-সব কথা কখনও ভাবি নাই তাহাই ভাবাইতেছে। ফলে এই মুক্ত প্রান্তর ও ঘনশ্যামা অরণ্য-প্রকৃতিকে এত ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি যে, একদিন পূর্ণিয়া কি মুঙ্গের শহরে কার্য উপলক্ষে গেলে মন উড়ু উড়ু করে, মন টিকিতে চায় না। মনে হয়, কতক্ষণে জঙ্গলের মধ্যে ফিরিয়া যাইব, কতক্ষণে আবার সেই ঘন নির্জনতার মধ্যে, অপূর্ব জ্যোৎস্নার মধ্যে, সূর্যাস্তের মধ্যে, দিগন্তব্যাপী কালবৈশাখীর মেঘের মধ্যে, তারাভরা নিদাঘ-নিশীথের মধ্যে ডুব দিব।

ফিরিবার সময় সভ্য লোকালয়কে বহুদূর পিছনে ফেলিয়া, মুকুন্দি চাক্‌লাদারের হাতের বাবলাকাঠের খুঁটির পাশ কাটাইয়া যখন নিজের জঙ্গলের সীমানায় ঢুকি, তখন সুদূরবিসর্পী নিবিড়শ্যাম

বনানী, প্রান্তর, শিলাস্তূপ, বনটিয়ার ঝাঁক, নীল গাইয়ের জেরা, সূর্যালোক, ধরণীর মুক্ত প্রসার আমায় একেবারে একমুহূর্তে অভিভূত করিয়া দেয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

খুব জ্যোৎস্না, তেমনি হাড়কাঁপানো শীত। পোষ মাসের শেষ। সদর কাছারি হইতে লবটুলিয়ার ডিহি কাছারিতে তদারক করিতে গিয়াছি। লবটুলিয়ার কাছারিতে রাত্রে রান্না শেষ হইয়া সকলের আহারাদি হইতে রাত এগারটা বাজিয়া যাইত। একদিন খাওয়া শেষ করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখি, তত রাত্রে আর সেই কন্‌কনে হিমবর্ষ আকাশের তলায় কে একটি মেয়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় কাছারির কম্পাউণ্ডের সীমানায় দাঁড়াইয়া আছে। পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

পাটোয়ারী বলিল—ও কুন্তা। আপনার আসবার কথা শুনে আমায় কাল বলছিল—ম্যানেজারবাবু আসবেন, তাঁর পাতের ভাত আমি গিয়ে নিয়ে আসবো। আমার ছেলেপুলের বড় কষ্ট। তাই বলেছিলাম—যাস্।

কথা বলিতেছি, এমন সময় কাছারির টহলদার বলোয়া আমার পাতের ডালমাখা ভাত, ভাঙা মাছের টুকরো, পাতের গোড়ায় ফেলা তরকারি ও ভাত, দুধের বাটির ভুক্তাবশিষ্ট দুধ-ভাত—সব লইয়া গিয়া মেয়েটির আনীত একটা পেতলের থালায় ঢালিয়া দিল। মেয়েটি চলিয়া গেল।

আট-দশ দিন সেবার লবটুলিয়া কাছারিতে ছিলাম, প্রতি রাত্রে দেখিতাম ইঁদারার পাড়ে সেই মেয়েটি আমার পাতের ভাতের জন্য সেই গভীর রাত্রে আর সেই ভয়ানক শীতের মধ্যে বাহিরে শুধু আঁচল গায়ে দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে একদিন কৌতূহলবশে পাটোয়ারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা—যে রোজ ভাত নিয়ে যায়, ও কে, আর জঙ্গলে থাকেই বা কোথায়? দিনে তো কখনও দেখিনে ওকে?

পাটোয়ারী বলিল—বলছি হুজুর।

ঘরের মধ্যে সন্ধ্যা হইতে কাঠের গুঁড়ি জ্বালাইয়া গন্‌গনে আগুন করা হইয়াছে—তারই ধারে চেয়ার পাতিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া বসিয়া কিস্তির আদায়ী হিসাব মিলাইতেছিলাম। আহারাদি শেষ করিয়া আসিয়া মনে হইল একদিনের পক্ষে কাজ যথেষ্টই করিয়াছি। কাগজপত্র গুটাইয়া পাটোয়ারীর গল্প শুনিতে প্রস্তুত হইলাম।

—শুনুন হুজুর। বছর দশেক আগে এ অঞ্চলে দেবী সিং রাজপুতের বড় রবরবা ছিল। তার ভয়ে যত গাঙ্গোতা আর চাষী ও চরির প্রজা জুজু হয়ে থাকত। দেবী সিং-এর ব্যবসা ছিল খুব চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া এই সব লোককে—আর তার পর লাঠিবাজি করে সুদ ও আসল টাকা আদায় করা। তার তাঁবে আট-ন' জন লাঠিয়াল পাইকই ছিল। এখন যেমন রাসবিহারী সিং রাজপুত এ অঞ্চলের মহাজন, তখন ছিল দেবী সিং।

দেবী সিং জৌনপুর জেলা থেকে এসে পূর্ণিয়ায় বাস করে। তার পর টাকা ধার দিয়ে জোর-জবরদস্তি করে এ দেশের যত ভীতু গাঙ্গোতা প্রজাদের হাতের মুঠোয় পুরে ফেললে। এখানে আসবার বছর কয়েক পরে সে কাশী যায় এবং সেখানে এক বাইজীর বাড়ী গান শুনতে গিয়ে তার চৌদ্দ-পনের বছরের মেয়ের সঙ্গে দেবী সিং-এর খুব ভাব হয়। তার পর তাকে নিয়ে দেবী সিং পালিয়ে এখানে আসে। দেবী সিং-এর বয়স সাতাশ-আটাশ হবে। এখানে এসে দেবী সিং তাকে বিয়ে করে। কিন্তু বাইজীর মেয়ে বলে সবাই যখন জেনে ফেললে, তখন দেবী সিং-এর নিজের জাতভাই, রাজপুতরা

ওর সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে ওকে একঘরে করলে। পয়সার জোরে দেবী সিং সে সব গ্রাহ্য করত না। তার পর বাবুগিরি আর অযথা ব্যয় করে এবং এই রাসবিহারী সিং-এর সঙ্গে মকদ্দমা করতে গিয়ে দেবী সিং সর্বস্বান্ত হয়ে গেল। আজ বছর চারেক হল সে মারা গিয়েছে।

ঐ কুন্তাই দেবী সিং রাজপুতের সেই বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে ও লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর-দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কলবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত—আজ ওর এই দুর্দশা! আরও মুশকিল এই যে, বাইজীর মেয়ে সবাই জানে বলে ওর এখানে জাত নেই, তা কি ওর স্বামীর আত্মীয়বন্ধু রাজপুতদের মধ্যে, কি দেশওয়ালী গাঙ্গোতাদের মধ্যে। ক্ষেত থেকে গম কাটা হয়ে গেলে যে গমের গুঁড়ো শীষ পড়ে থাকে, তাই টুকরি করে ক্ষেতে ক্ষেতে বেড়িয়ে কুড়িয়ে এনে বছরে দু-এক মাস ও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের আধপেটা খাইয়ে রাখে। কিন্তু কখনও হাত পেতে ভিক্ষে করতে ওকে দেখি নি হুজুর। আপনি এসেছেন জমিদারের ম্যানেজার, রাজার সমান, আপনার এখানে প্রসাদ পেলে ওর তাতে অপমান নেই।

বলিলাম—ওর মা, সেই বাইজী, ওর খোঁজ করে নি তারপর কখনও?

পাটোয়ারী বলিল—দেখি নি তো কখনও হুজুর। কুন্তাও কখনও মায়ের খোঁজ করে নি। ও-ই দুঃখ-ধান্দা করে ছেলেপুলেকে খাওয়াচ্ছে। এখন ওকে কি দেখছেন, ওর এক সময় যা রূপ ছিল এ অঞ্চলে সে রকম কখনও কেউ দেখে নি। এখন বয়েসও হয়েছে, আর বিধবা হওয়ার পরে দুঃখে-কষ্টে সে চেহারার কিছু নেই। বড় ভাল আর শান্ত মেয়ে কুন্তা। কিন্তু এদেশে ওকে কেউ দেখতে পারে না, সবাই নাক সিঁটকে থাকে, নীচু চোখে দেখে, বোধ হয় বাইজীর মেয়ে বলে।

বলিলাম—তা বুঝলাম, কিন্তু এই রাত বারোটার সময় এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে ও একা লবটুলিয়া বস্তিতে যাবে—সে তো এখান থেকে প্রায় তিন পোয়া পথ?

—ওর কি ভয় করলে চলে হুজুর? এই জঙ্গলে হরবখত্‌ ওকে একলা ফিরতে হয়। নইলে কে আছে ওর, যে চালাবে?

তখন ছিল পৌষ মাস, পৌষ-কিস্তির তাগাদা শেষ করিয়াই চলিয়া আসিলাম। মাঘ মাসের মাঝামাঝি আর একবার একটা ক্ষুদ্র চরি মহাল ইজারা দিবার উদ্দেশ্যে লবটুলিয়া যাওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল।

তখন শীত কিছুমাত্র কমে নাই, তার উপরে পশ্চিমা বাতাস বহিবার ফলে প্রত্যহ সন্ধ্যার পরে শীত দ্বিগুণ বাড়িতে লাগিল। একদিন মহালের উত্তর সীমানায় বেড়াইতে বেড়াইতে কাছারি হইতে অনেক দূরে গিয়া পড়িয়াছি—সেদিকটাতে বহুদূর পর্যন্ত শুধু কুলগাছের জঙ্গল। এই সব জঙ্গল জমা লইয়া ছাপরা ও মজঃফরপুর জেলার কালোয়ার-জাতীয় লোকে লাক্ষার চাষ করিয়া বিস্তর পয়সা উপার্জন করে। কুলের জঙ্গলের মধ্যে প্রায় পথ ভুলিবার উপক্রম করিয়াছি এমন সময় হঠাৎ একটা নারীকণ্ঠে আর্তক্রন্দনের শব্দ. বালক-বালিকার গলায় চীৎকার ও কান্না এবং কর্কশ পুরুষ-কণ্ঠে গালিগালাজ শুনিতে পাইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখি, একটি মেয়েকে লাক্ষার ইজারাদারের চাকরেরা চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া লইয়া আসিতেছে। মেয়েটির পরনে ছিল মলিন বস্ত্র, সঙ্গে দু'তিনটি ছোট ছোট রোরুদ্যমান বালক-বালিকা, দুজন ছত্রি চাকরের মধ্যে একজনের হাতে একটা ছোট ঝুড়িতে আধঝুড়ি পাকা কুল। আমাকে দেখিয়া ছত্রি দুজন উৎসাহ পাইয়া যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, তাহাদের ইজারা করা জঙ্গলে এই গাঙ্গোতীন চুরি করিয়া কুল পাড়িতেছিল বলিয়া তাহাকে কাছারিতে পাটোয়ারীর বিচারার্থ ধরিয়া লইয়া যাইতেছে, হুজুর আসিয়া পড়িয়াছেন, ভালই হইয়াছে।

প্রথমেই ধমক দিয়া মেয়েটিকে তাহাদের হাত হইতে ছাড়াইলাম। মেয়েটি তখন ভয়ে লজ্জায় জড়সড় হইয়া একটি কুলঝোপের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহার দুর্দশা দেখিয়া এত কষ্ট হইল।

ইজারাদারের লোকেরা কি সহজে ছাড়িতে চায়! তাহাদের বুঝাইলাম—বাপু, গরীব মেয়েমানুষ যদি ওর ছেলেপুলেকে খাওয়াইবার জন্য আধঝুড়ি টক কুল পাড়িয়াই থাকে, তাহাতে তোমাদের

লাক্ষাচাষের বিশেষ কি ক্ষতিটা হইয়াছে। উহাকে বাড়ী যাইতে দাও।

একজন বলিল—জানেন না হুজুর, ওর নাম কুন্তা, এই লবটুলিয়াতে ওর বাড়ী, ওর অভ্যেস চুরি করে কুল পাড়া। আরও একবার আর-বছর হাতে হাতে ধরেছিলাম—ওকে এবার শিক্ষা না দিয়ে দিলে—

প্রায় চমকিয়া উঠিলাম। কুন্তা। তাহাকে তো চিনি নাই? তাহার একটা কারণ, দিনের আলোতে কুন্তাকে তো দেখি নাই, যাহা দেখিয়াছি রাত্রে। ইজারাদারের লোকজনকে তৎক্ষণাৎ শাসাইয়া কুন্তাকে মুক্ত করিলাম। সে লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশিয়া ছেলেপুলেদের লইয়া বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় কুলের ধামাটি ও আঁকশিগাছটা সেখানেই ফেলিয়া গেল। বোধ হয় ভয়ে ও সঙ্কোচে আমি উপস্থিত লোকগুলির মধ্যে একজনকে সেগুলি কাছারিতে লইয়া যাইতে বলাতে তাহারা খুব খুশী হইয়া ভাবিল ধামা ও আঁকশি সরকারে নিশ্চয়ই বাজেয়াপ্ত হইবে। কাছারিতে আসিয়া পাটোয়ারীকে বলিলাম—তোমাদের দেশের লোক এত নিষ্ঠুর কেন বনোয়ারীলাল? বনোয়ারী পাটোয়ারী খুব দুঃখিত হইল। বনোয়ারী লোকটা ভাল, এদেশের তুলনায় সত্যিই তার হৃদয়ে দয়ামায়া আছে। কুন্তার ধামা ও আঁকশি সে তখনই পাইক দিয়া লবটুলিয়াতে কুন্তার বাড়ী পাঠাইয়া দিল।

সেই রাত্রি হইতে কুন্তা বোধ হয় লজ্জায় আর কাছারিতেও ভাত লইতে আসে নাই।

২

শীত শেষ হইয়া বসন্ত পড়িয়াছে।

আমাদের এ জঙ্গল-মহালের পূর্ব-দক্ষিণ সীমানা হইতে সাত-আট ক্রোশ দূরে অর্থাৎ সদর কাছারি হইতে প্রায় চোদ্দ-পনের ক্রোশ দূরে ফাল্গুন মাসে হোলির সময় একটা প্রসিদ্ধ গ্রামীণ মেলা বসে, এবার সেখানে যাইব বলিয়া ঠিক করিয়াছিলাম। বহু লোকের সমাগম অনেকদিন দেখি নাই, এদেশের মেলা কি রকম জানিবার একটা কৌতূহলও ছিল। কিন্তু কাছারির লোকেরা পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিল, পথ দুর্গম ও পাহাড়-জঙ্গল ভর্তি, উপরন্তু গোটা পথটার প্রায় সর্বত্রই বাঘের ও বন্যমহিষের ভয়, মাঝে মাঝে বস্তি আছে বটে, কিন্তু সে বড় দূরে দূরে, বিপদে পড়িলে তাহারা বিশেষ কোন উপকারে আসিবে না, ইত্যাদি।

জীবনে কখনও এতটুকু সাহসের কাজ করিবার অবকাশ পাই নাই, এই সময়ে এই সব জায়গায় যতদিন আছি যাহা করিয়া লইতে পারি, বাংলা দেশে ও কলিকাতায় ফিরিয়া গেলে কোথায় পাইব জঙ্গল, কোথায় পাইব বাঘ ও বন্য মহিষ? ভবিষ্যতের দিনে আমার মুখে গল্পশ্রবণনিরত পৌত্র-পৌত্রীদের মুখ ও উৎসুক তরুণ দৃষ্টি কল্পনা করিয়া মুনেশ্বর মাহাতো, পাটোয়ারী ও নবীনবাবু মুহুরীর সকল আপত্তি উড়াইয়া দিয়া মেলার দিন খুব সকালে ঘোড়া করিয়া রওনা হইলাম। আমাদের মহালের সীমানা ছাড়াইতেই ঘণ্টা-দুই লাগিয়া গেল, কারণ পূর্ব-দক্ষিণ সীমানাতেই আমাদের মহালের জঙ্গল বেশী, পথ নাই বলিলেও চলে, ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন যান-বাহন সে পথে চলা অসম্ভব, যেখানে সেখানে ছোট-বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো, শাল-জঙ্গল, দীর্ঘ কাশ ও বন-ঝাউ-এর বন, সমস্ত পথটা উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে উঁচু বালিয়াড়ি, রাঙা মাটির ডাঙা, ছোট পাহাড়, পাহাড়ের উপর ঘন কাঁটা-গাছের জঙ্গল। আমি যদৃচ্ছাক্রমে কখনও দ্রুত, কখনও ধীরে অশ্বচালনা করিতেছি, ঘোড়াকে কদম চালে ঠিক চালানো সম্ভব হইতেছে না—খারাপ রাস্তা ও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের দরুণ কিছুদূর অন্তর অন্তর ঘোড়ার চাল ভাঙিয়া যাইতেছে, কখনও গ্যালপ, কখনও দুলকি, কখনও বা পায়চারি করিবার মত মৃদু গতিতে শুধু হাঁটিয়া যাইতেছে।

আমি কিন্তু কাছারি ছাড়িয়া পর্যন্তই আনন্দে মগ্ন হইয়া আছি, এখানে চাকুরি লইয়া আসার

দিনটি হইতে এদেশের এই ধু-ধু মুক্ত প্রান্তর ও বনভূমি আমাকে ক্রমশ দেশ ভুলাইয়া দিতেছে, সভ্য জগতের শত প্রকারের আরামের উপকরণ ও অভ্যাসকে ভুলাইয়া দিতেছে, বন্ধু-বান্ধব পর্যন্ত ভুলাইবার যোগাড় করিয়া তুলিয়াছে। যাক্ না ঘোড়া আস্তে বা জোরে, শৈলসানুতে যতক্ষণ প্রথম বসন্তে প্রস্ফুটিত রাঙা পলাশ ফুলের মেলা বসিয়াছে, পাহাড়ের নীচে, উপরে, মাঠের সর্বত্র ঝুপ্‌সি গাছের ডাল ঝাড় ঝাড় ধাতুপফুলের ভারে অবনত, গোলগোলি ফুলের নিষ্পত্র দুগ্ধশুভ্র কাণ্ডে হলুদ রঙের বড় বড় সূর্যমুখী ফুলের মত ফুল মধ্যাহ্নের রৌদ্রকে মৃদু সুগন্ধে অলস করিয়া তুলিয়াছে—তখন কতটা পথ চলিল, কে রাখে তাহার হিসাব?

কিন্তু হিসাব খানিকটা যে রাখিতেই হইবে, নতুবা দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথভ্রান্ত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, আমাদের জঙ্গলের সীমানা অতিক্রম করিবার পূর্বেই এ সত্যটি ভাল করিয়া বুঝিলাম। কিছুদূর তখন অন্যমনস্ক ভাবে গিয়াছি, হঠাৎ দেখি সম্মুখে বহুদূরে একটা খুব বড় অরণ্যানীর ধূম্রনীল শীর্ষদেশ রেখাকারে দিগ্‌বলয়ের সে-অংশে এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। কোথা হইতে আসিল এত বড় বন এখানে? কাছারিতে কেহ তো একথা বলে নাই যে, মৈষণ্ডির মেলার কাছাকাছি কোথাও অমন বিশাল অরণ্য বর্তমান? পরক্ষণেই ঠাহর করিয়া বুঝিলাম, পথ হারাইয়াছি, সম্মুখের বনরেখা মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট না হইয়া যায় না—যাহা আমাদের কাছারি হইতে খাড়া উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এসব দিকে চলতি বাঁধা-পথ বলিয়া কোন জিনিস নাই, লোকজনও কেহ বড় একটা হাঁটে না। তাহার উপর চারদিক দেখিতে ঠিক একই রকম, সেই এক ধরনের ডাঙা, এক ধরনের পাহাড়, এক ধরনের গোলগোলি ও ধাতুপ ফুলের বন, সঙ্গে সঙ্গে আছে কড়া রৌদ্রের কম্পমান তাপ-তরঙ্গ। দিক্‌ভুল হইতে বেশীক্ষণ লাগে না আনাড়ি লোকের পক্ষে।

ঘোড়ার মুখ আবার ফিরাইলাম। হুঁশিয়ার হইয়া গন্তব্যস্থানের অবস্থান নির্ণয় করিয়া একটা দিক্‌চিহ্ন দূর হইতে আন্দাজ করিয়া বাছিয়া লইলাম। অকূল সমুদ্রে জাহাজ ঠিক পথে চালনা, অনন্ত আকাশে এরোপ্লেনের পাইলটের কাজ করা আর এই সব অজানা সুবিশাল পথহীন বনপ্রান্তরে অশ্বচালনা করিয়া তাহাকে গন্তব্যস্থানে লইয়া যাওয়া প্রায় একই শ্রেণীর ব্যাপার। অভিজ্ঞতা যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের এ কথার সত্যতা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

আবার রৌদ্রদগ্ধ নিষ্পত্র গুল্মরাজি, আবার বনকুসুমের মৃদুমধুর গন্ধ, আবার অনাবৃত শিলাস্তূপসদৃশ প্রতীয়মান গণ্ডশৈলমালা, আবার রক্তপলাশের শোভা। বেলা বেশ চড়িল; জল খাইতে পাইলে ভাল হইত, ইহার মধ্যেই মনে হইল, কারো নদী ছাড়া এ পথে কোথাও জল নাই জানি, এখনও আমাদের জঙ্গলেরই সীমা কতক্ষণে ছাড়াব ঠিক নাই, কারো নদী তো বহুদূর—এ চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তৃষ্ণা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

মুকুন্দি চাক্‌লাদারকে বলিয়া দিয়াছিলাম আমাদের মহালের সীমানায় সীমানাজ্ঞাপক বাবলা কাঠের খুঁটি বা মহাবীরের ধ্বজার অনুরূপ যাহা হয় কিছু পুঁতিয়া রাখে। এ সীমানায় কখনও আসি নাই, দেখিয়া বুঝিলাম চাক্‌লাদার সে আদেশ পালন করে নাই; ভাবিয়াছে, এই জঙ্গল ঠেলিয়া কলিকাতার ম্যানেজারবাবু আর সীমানা পরিদর্শনে আসিয়াছেন, তুমিও যেমন। কে খাটিয়া মরে? যেমন আছে তেমনি থাকুক।

পথের কিছুদূরে আমাদের সীমানা ছাড়াইয়া এক জায়গায় ধোঁয়া উঠিতেছে দেখিয়া সেখানে গেলাম। জঙ্গলের মধ্যে একদল লোক কাঠ পুড়াইয়া কয়লা করিতেছে—এই কয়লা তাহারা গ্রামে গ্রামে শীতকালে বেচিবে। এদেশের শীতে গরীব লোকে মালসায় কয়লার আগুন করিয়া শীত নিবারণ করে; কাঠকয়লা চার সের পয়সায় বিক্রি হয়, তাও কিনিবার পয়সা অনেকের জোটে না, আর এত পরিশ্রম করিয়া কাঠকয়লা পুড়াইয়া পয়সায় চার সের দরে বেচিয়া কয়লাওয়ালাদের মজুরিই বা কি ভাবে পোষায়, তাও বুঝি না। এদেশে পয়সা জিনিসটা বাংলা দেশের মত সস্তা নয়, এখানে আসিয়া পর্যন্ত তা দেখিতেছি।

শুক্‌নো কাশ ও সাবাই ঘাসের ছোট্ট একটা ছাউনি কেঁদ ও আমলকীর বনে, সেখানে বড় একটা মাটির হাঁড়িতে মকাই সিদ্ধ করিয়া কাঁচা শালপাতায় সকলে একত্রে খাইতে বসিয়াছে, আমি যখন গেলাম। লবণ ছাড়া অন্য কোন উপকরণই নাই। নিকটে বড় বড় গর্তের মধ্যে ডালপালা পুড়িতেছে, একটা ছোকরা সেখানে বসিয়া কাঁচাশালের লম্বা ডাল দিয়া আগুনে ডালপালা উলটাইয়া দিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ও গর্তের মধ্যে, কি পুড়ছে?

তাহারা খাওয়া ছাড়িয়া সকলে একযোগে দাঁড়াইয়া উঠিয়া ভীতনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া থতমত খাইয়া বলিল—লক্‌ড়ি কয়লা হুজুর।

আমার ঘোড়ায় চড়া মূর্তি দেখিয়া লোকগুলা ভয় পাইয়াছে, বুঝিলাম আমাকে বন-বিভাগের লোক ভাবিয়াছে। এসব অঞ্চলের বন গভর্ণমেন্টের খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত, বিনা অনুমতিতে বন কাটা কি কয়লা পোড়ানো বে-আইনী।

তাহাদের আশ্বস্ত করিলাম। আমি বন-বিভাগের কর্মচারী নই, কোন ভয় নাই তাদের, যত ইচ্ছা কয়লা করুক। একটু জল পাওয়া যায় এখানে? খাওয়া ফেলিয়া একজন ছুটিয়া গিয়া মাজা ঝকঝকে জামবাটিতে পরিষ্কার জল আনিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, কাছেই বনের মধ্যে ঝরণা আছে, তার জল।

ঝরণা?—আমাব কৌতূহল হইল। ঝরণা কোথায়? শুনি নাই তো এখানে ঝরণা আছে।

উহারা বলিল—ঝরণা নাই হুজুব! উনুই। পাথরের গর্তে একটু একটু করে জল জমে, এক ঘণ্টায় আধ সের জল হয়, খুব সাফা পানি, ঠাণ্ডাও বহুৎ!

জায়গাটা দেখিতে গেলাম। কি সুন্দর ঠাণ্ডা বনবীথি! পরীরা বোধ হয় এই নির্জন অরণ্যে শিলাতলে শরৎ বসন্তের দিনে, কি গভীর নিশীথ রাত্রে জলকেলি করিতে নামে। বনের খুব ঘন অংশে বড় বড় পিয়াল ও কেঁদের ডালপালা দিয়া ঘেরা একটা নাবাল জায়গা, তলাটা কালো পাথরের, একখানা খুব বড় প্রস্তর-বেদী যেন কালে ক্ষয় পাইয়া ঢেঁকির গড়ের মত হইয়া গিয়াছে। যেন খুব একটা বড় প্রকৃতিক পাথরের খোরা। তার উপর সপুষ্প পিয়াল শাখা ঝুপসি হইয়া পড়িয়া ঘন ছায়ার সৃষ্টি করিয়াছে। পিয়াল ও শাল মঞ্জরীর সুগন্ধ বনের ছায়ায় ভুরভুর করিতেছে। পাথরের খোলে বিন্দু বিন্দু জল জমিতেছে, এইমাত্র জল তুলিয়া লইয়া গিয়াছে, এখনও আধ ছটাক জলও জমে নাই।

উহারা বলিল—এ ঝরণার কথা অনেকে জানে না হুজুর, আমরা বনে জঙ্গলে হরবখত্ বেড়াই, আমরা জানি।

আরও মাইল-পাঁচেক গিয়া কারো নদী পড়িল, খুব উঁচু বালির পাড় দু-ধারে, অনেকটা খাড়া নীচে নামিয়া গেলে তবে নদীর খাত, বর্তমানে খুব সামান্যই জল আছে, দু-পারে অনেক দুর পর্যন্ত বালুকাময় তীর ধু-ধু করিতেছে। যেন পাহাড় হইতে নামিতেছি মনে হইল; ঘোড়ায় জল পার হইয়া যাইতে যাইতে এক জায়গায় ঘোড়ার জিন পর্যন্ত আসিয়া ঠেকিল, রেকাবদলসুদ্ধ পা মুড়িয়া অতি সন্তর্পণে পার হইলাম। ওপারে ফুটন্ত রক্তপলাশের বন, উঁচু-নীচু রাঙা-রাঙা শিলাখণ্ড; আর শুধুই পলাশ আর পলাশ, সর্বত্র পলাশ ফুলের মালা। একবার দুরে একটা বুনো মহিষকে ধাতুপফুলের বন হইতে বাহির হইতে দেখিলাম—সেটা পাথরের উপর দাঁড়াইয়া পায়ের খুর দিয়া মাটি খুঁড়িতে লাগিল। ঘোড়ার মুখের লাগাম কষিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম; ত্রিসীমানায় কোথাও জন-মানব নাই, যদি শিং পাতিয়া তাড়া করিয়া আসে? কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সেটা আবার পথের পাশের বনের মধ্যে ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল।

নদী ছাড়াইয়া আরও কিছুদূর গিয়া পথের দৃশ্য কি চমৎকার। তবুও তো ঠিক-দুপুর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে; অপরাহ্নের ছায়া নাই, রাত্রির জ্যোৎস্নালোক নাই—কিন্তু সেই নিস্তব্ধ [illegible]

বাঁ-দিকে বনাবৃত দীর্ঘ শৈলমালা, দক্ষিণে লৌহপ্রস্তর ও পাইয়োরাইট ছড়ানো উঁচু-নীচু জমিতে শুধুই শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ ও রাঙা ধাতুপফুলের জঙ্গল। সেই জায়গাটা সত্যিই একেবারে অদ্ভুত; অমন রুক্ষ অথচ সুন্দর, পুষ্পাকীর্ণ অথচ উদ্দাম ও অতিমাত্রায় বন্য ভূমিশ্রী দেখিই নাই কখনও জীবনে। আর তার উপর ঠিক দুপুরের খাঁ-খাঁ রৌদ্র। মাথায় উপরের আকাশ কি ঘন নীল। আকাশে কোথাও একটা পাখী নাই, শূন্য—মাটিতে বন্য-প্রকৃতির বুকে কোথাও একটা মানুষ বা জীবজন্তু নাই—নিঃশব্দ, ভয়ানক নিরালা। চারিদিকে চাহিয়া প্রকৃতির এই বিজন রূপলীলার মধ্যে ডুবিয়া গেলাম—ভারতবর্ষে এমন জায়গা আছে জানিতাম না তো। এ যেন ফিল্‌মে দেখা দক্ষিণ-আমেরিকার আরিজোনা বা নাভাজো মরুভূমি কিংবা হড্‌সনের পুস্তকে বর্ণিত গিলা নদীর অববাহিকা-অঞ্চল।

মেলায় পৌঁছিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। প্রকাণ্ড মেলা, যে দীর্ঘ শৈলশ্রেণী পথের বাঁ-ধারে আমার সঙ্গে সঙ্গে ক্রোশ-তিনেক ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল, তারই সর্বদক্ষিণ প্রান্তে ছোট্ট একটা গ্রামের মাঠে, পাহাড়ের ঢালুতে চারিদিকে শাল পলাশের বনের মধ্যে এই মেলা বসিয়াছে। মহিষারডি, কড়ারী, তিনটাঙা, লছমনিয়াটোলা, ভীমদাসটোলা, মহালিখারূপ প্রভৃতি দূরের নিকটের নানা স্থান হইতে লোকজন, প্রধানত মেয়েরা আসিয়াছে। তরুণী বন্য মেয়েরা আসিয়াছে চুলে পিয়াল ফুল কি রাঙা ধাতুপফুল গুঁজিয়া; কারো কারো মাথায় বাঁকা খোঁপায় কাঠের চিরুনি আটকানো, বেশ সুঠাম, সুললিত, লাবণ্যভরা দেহের গঠন প্রায় অনেক মেয়েরই—তারা আমোদ করিয়া খেলো পুঁতির দানার মালা, সস্তা জাপানী কি জার্মানীর সাবানের বাক্স, বাঁশি, আয়না, অতি বাজে এসেন্স কিনিতেছে, পুরুষেরা এক পয়সায় দশটা কালী সিগারেট কিনিতেছে, ছেলেমেয়েরা তিলুয়া, রেউড়ি, রামদানার লাড্ডু ও তেলে-ভাজা খাজা কিনিয়া খাইতেছে।

হঠাৎ মেয়েমানুষের গলায় আর্ত কান্নার স্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলাম। একটু উঁচু পাহাড়ী ডাঙ্গায় যুবক-যুবতীরা ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া হাসি-খুশী গল্পগুজব আদর-আপ্যায়নে মত্ত ছিল—কান্নাটি উঠিল সেখান হইতেই। ব্যাপার কি? কেহ কি হঠাৎ পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইল? একজন লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তা নয়, কোনও একটি বধূর সহিত তার পিত্রালয়ের গ্রামের কোনও মেয়ের সাক্ষাৎ হইয়াছে—এদেশের রীতিই নাকি এইরূপ, গ্রামের মেয়ে বা কোনও প্রবাসিনী সখী, কুটুম্বিনী বা আত্মীয়ার সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হইলেই উভয়ে উভয়ের গলা জড়াইয়া মড়াকান্না জুড়িয়া দিবে। অনভিজ্ঞ লোকে ভাবিতে পারে উহাদের কেহ মরিয়া গিয়াছে, আসলে ইহা আদব-আপ্যায়নের একটা অঙ্গ। না কাঁদিলে নিন্দা হইবে। মেয়েরা বাপের বাড়ীর মানুষ দেখিয়া কাঁদে না—অর্থাৎ তাহা হইলে প্রমাণ হয় যে, স্বামীগৃহে বড় সুখেই আছে—মেয়েমানুষের পক্ষে ইহা নাকি বড়ই লজ্জার কথা।

এক জায়গায় বইয়ের দোকানে চটের থলের উপর বই সাজাইয়া বসিয়াছে—হিন্দী গোলেবকাউলী, লয়লা-মজনু, বেতাল পঁচিশী, প্রেমসাগর ইত্যাদি। প্রবীণ লোকে কেহ কেহ বই উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিতেছে—বুঝিলাম বুকস্টলে দণ্ডায়মান পাঠকের অবস্থা আনাতোঁল ফ্রাঁসের প্যারিসেও যেমন, এই বন্য দেশে কড়ারী তিনটাঙায় হোলির মেলাতেও তাহাই। বিনা পয়সায় দাঁড়াইয়া পড়িয়া লইতে পারিলে কেহ বড়-একটা বই কেনে না। দোকানীর ব্যবসাবুদ্ধি কিন্তু বেশ প্রখর, সে জনৈক তন্ময়চিত্ত পাঠককে জিজ্ঞাসা করিল—কেতাব কিনবে কি? না হয় তো রেখে দিয়ে অন্য কাজ দেখ। মেলার স্থান হইতে কিছুদূরে একটা শালবনের ছায়ায় অনেক লোক রাঁধিয়া খাইতেছে—ইহাদের জন্য মেলার এক অংশে তরিতরকারীর বাজার বসিয়াছে, কাঁচা শালপাতার ঠোঙায় শুঁটকি কুচো চিংড়ী ও নালসে পিঁপড়ের ডিম বিক্রয় হইতেছে। লাল পিঁপড়ের ডিম এখানকার একটি প্রিয় সুখাদ্য। তা ছাড়া আছে কাঁচা পেঁপে, শুকনো কুল, কেঁদ-ফল, পেয়ারা ও বুনো শিম।

হঠাৎ কাহার ডাক কানে গেল—ম্যানেজারবাবু,—

চাহিয়া দেখি ভিড় ঠেলিয়া লবটুলিয়ার পাটোয়ারীর ভাই ব্রহ্মা মাহাতো আগাইয়া আসিতেছে।—হুজুর, আপনি কখন এলেন? সঙ্গে কে?

বলিলাম—ব্রহ্মা, এখানে কি মেলা দেখতে?

—না হুজুর, আমি মেলার ইজারাদার। আসুন, আসুন, আমার তাঁবুতে চলুন, একটু পায়ের ধুলো দেবেন।

মেলার একপাশে ইজারাদারের তাঁবু, সেখানে ব্রহ্মা খুব খাতির করিয়া আমায় লইয়া গিয়া একখানা পুরনো বেন্টউড চেয়ারে বসাইল। সেখানে একজন লোক দেখিলাম, অমন লোক বোধ হয় পৃথিবীতে আর দেখিব না। লোকটি কে জানি না, ব্রহ্মা মাহাতোর কোন কর্মচারী হইবে। বয়স পঞ্চাশ-ষাট বছর, গা খালি, রং কালো, মাথার চুল কাঁচাপাকায় মেশানো। তাহার হাতে একটা বড় থলিতে এক থলি পয়সা, বগলে একখানা খাতা, সম্ভবত মেলার খাজনা আদায় করিয়া বেড়াইতেছে, ব্রহ্মা মাহাতোকে হিসাব বুঝাইয়া দিবে।

মুগ্ধ হইলাম তাহার চোখের দৃষ্টির ও মুখের অসাধারণ দীন নম্র-ভাব দেখিয়া। যেন কিছু ভয়ের ভাবও মেশানো ছিল সে দৃষ্টিতে। ব্রহ্মা মাহাতো রাজা নয়, ম্যাজিস্ট্রেট নয়, কাহারও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নয়, গভর্ণমেন্টের খাসমহলের জনৈক বাৰ্দ্ধিষ্ণু প্রজা মাত্র—লইয়াছেই না হয় মেলার ইজারা,-- এত দীন ভাব কেন ও লোকটার তার কাছে? তারও পরে আমি যখন তাঁবুতে গেলাম, স্বয়ং ব্রহ্মা মাহাতো আমাকে অত খাতির করিতেছে দেখিয়া লোকটা আমার দিকে অতিবিক্ত সম্ভ্রম ও দীনতার দৃষ্টিতে ভয়ে ভয়ে এক-আধ বারের বেশী চাহিতে ভরসা পাইল না। ভাবিলাম লোকটার অত দীনহীন দৃষ্টি কেন? খুব কি গরীব? লোকটার মুখে কি যেন ছিল, বার বার আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, Blessed are the meek for theirs is the Kingdom of Heaven এমন ধারা সত্যিকার দীন-বিনম্র মুখ কখনও দেখি নাই।

ব্রহ্মা মাহাতোকে লোকটার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম তার বাড়ী কড়ারী তিনটাঙা, যে গ্রামে ব্রহ্মা মাহাতোর বাড়ী; নাম গিরিধারীলাল, জাতি গাঙ্গোতা। উহার এক ছোট ছেলে ছাড়া আর সংসারে কেহই নাই। অবস্থা যাহা অনুমান করিয়াছিলাম—অতি গরীব। সম্প্রতি ব্রহ্মা তাহাকে মেলায় দোকানের আদায়কারী কর্মচারী বহাল করিয়াছে—দৈনিক চার আনা বেতন ও খাইতে দিবে।

গিরিধারীলালেব সঙ্গে আমার আরও দেখা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সঙ্গে শেষবারের সাক্ষাতের সময়কার অবস্থা বড় করুণ, পবে সে-সব কথা বলিব। অনেক ধরনের মানুষ দেখিয়াছি, কিন্তু গিরিধাবীলালের মত সাচ্চা মানুষ কখনও দেখি নাই। কত কাল হইয়া গেল, কত লোককে ভুলিয়া গিয়াছি, কিন্তু যাহাদের কথা চিরকাল মনে আঁকা আছে ও থাকিবে, সেই অতি অল্প কয়েকজন লোকের মধ্যে গিরিধারীলাল একজন।

৩

বেলা পড়িয়া আসিতেছে। এখনই রওনা হওয়া দরকার, ব্রহ্মা মাহাতোকে সে কথা বলিয়া বিদায় চাহিলাম। ব্রহ্মা মাহাতো তো একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, তাঁবুতে যাহারা উপস্থিত ছিল তাহারা হাঁ করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল। অসম্ভব। এই ত্রিশ মাইল রাস্তা অবেলায় ফেরা! হুজুর কলিকাতার মানুষ, এ অঞ্চলের পথের খবর জানা নাই তাই একথা বলিতেছেন। দশ মাইল যাইতে সূর্য যাইবে ডুবিয়া, না হয় জ্যোৎস্নারাত্রিই হইল, ঘন পাহাড়-জঙ্গলের পথ, মানুষ-জন কোথাও নাই, বাঘ বাহির হইতে পারে, বুনো মহিষ আছে, বিশেষত পাকা কুলের সময়, এখন ভালুক তো নিশ্চয়ই বাহির হইবে, কারো নদীর ওপারে মহালিখারূপের জঙ্গলে এই তো সেদিনও এক গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানকে বাঘে লইয়াছে, বেচারী জঙ্গলের পথে একা গাড়ী চালাইয়া আসিতেছিল। অসম্ভব, হুজুর। রাত্রে এখানে থাকুন, খাওয়া-দাওয়া করুন, যখন দয়া করিয়া আসিয়াছেন গরীবের ডেরায়। কাল সকালে তখন ধীর-সুস্থে গেলেই হইবে।

এ বাসন্তী পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নারাত্রে জনহীন পাহাড় জঙ্গলের পথে একা ঘোড়ায় চড়িয়া যাওয়ার প্রলোভন আমার কাছে দুর্দমনীয় হইয়া উঠিল। জীবনে আর কখনও হইবে না, এই হয়ত শেষ, আর যে অপূর্ব বন-পাহাড়ের দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি পথে। জ্যোৎস্নারাত্রে—বিশেষত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নায় তাহাদের রূপ একবার দেখিব না যদি, তবে এতটা কষ্ট করিয়া আসিবার কি অর্থ হয়?

সকলের সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইয়া রওনা হইলাম। ব্রহ্মা মাহাতো ঠিকই বলিয়াছিল, কারো নদীতে পৌঁছিবার কিছু পূর্বেই টক্‌টকে লাল সুবৃহৎ সূর্যটা পশ্চিম দিক্‌চক্রবালে একটা অনুচ্চ শৈলমালার পিছনে অস্ত গেল। কারো নদীর তীরের বালিয়াড়ির উপর যখন ঘোড়াসুদ্ধ উঠিয়াছি, এইবার এখান হইতে ঢালু বালির পথে নদীগর্ভে নামিব—হঠাৎ সেই সূর্যাস্তের দৃশ্য এবং ঠিক পূর্বে বহু দূরে কৃষ্ণ রেখার মত পরিদৃশ্যমান মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মাথায় নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের দৃশ্য—যুগপৎ এই অস্ত ও উদয়ের দৃশ্যে থম্‌কিয়া ঘোড়াকে লাগাম কষিয়া দাঁড় করাইলাম। সেই নির্জন অপরিচিত নদীতীরে সমস্তই যেন একটা অবাস্তব ব্যাপারের মত দেখাইতেছে—

পথে সর্বত্র পাহাড়ের ঢালুতে ও ডাঙায় ছাড়া-ছাড়া জঙ্গল, মাঝে মাঝে সরু পথটাকে যেন দুই দিক হইতে চাপিয়া ধরিতেছে, আবার কোথাও কিছুদূরে সরিয়া যাইতেছে। কি ভয়ঙ্কর নির্জন চারিদিক, দিনমানে যা-হয় একরূপ ছিল, জ্যোৎস্না উঠিবার পর মনে হইতেছে যেন অজানা ও অদ্ভুত সৌন্দর্যময় পরীরাজ্যের মধ্য দিয়া চলিয়াছি। সঙ্গে সঙ্গে বাঘের ভয়ও হইল, মনে পড়িল মেলায় ব্রহ্মা মাহাতো এবং কাছারিতে প্রায় সকলেই রাত্রে এপথে একা আসিতে বার বার নিষেধ করিয়াছিল, মনে পড়িল নন্দকিশোর গোঁসাই নামে আমাদের একজন বাথানদার প্রজা আজ মাস দুই-তিন আগে কাছারিতে বসিয়া গল্প করিয়াছিল এই মহালিখারূপের জঙ্গলে সেই সময় কাহাকে বাঘে খাওয়ার ব্যাপার। জঙ্গলের এখানে-ওখানে বড় বড় কুলগাছে কুল পাকিয়া ডাল নত হইয়া আছে—তলায় বিস্তর শুকনো ও পাকা কুল ছড়ানো—সুতরাং ভালুক বাহির হইবারও সম্ভাবনা খুবই। বুনো মহিষ এ বনে না থাকিলেও মোহনপুরা জঙ্গল হইতে ওবেলার মত এক-আধটা ছিটকাইয়া আসিতে কতক্ষণ! সম্মুখে এখনও পনের মাইল নির্জন বনপ্রান্তরের উপর দিয়া পথ।

ভয়ের অনুভূতি চারি পাশের সৌন্দর্যকে যেন আরও বাড়াইয়া তুলিল। এক এক স্থানে পথ দক্ষিণ হইতে খাড়া উত্তরে ও উত্তর হইতে পূর্বে ঘুরিয়া গিয়াছে, পথের খুব কাছে বাম দিকে সর্বত্রই একটানা অনুচ্চ শৈলমালা, তাদের ঢালুতে গোলগোলি ও পলাশের জঙ্গল, উপরের দিকে শাল ও বড় বড় ঘাস। জ্যোৎস্না এবার ফুটফুট করিতেছে, গাছের ছায়া হ্রস্বতম হইয়া উঠিয়াছে, কি একটা বন্য-ফুলের সুবাসে জ্যোৎস্নাশুভ্র প্রান্তর ভরপুর, অনেক দূরে পাহাড়ে সাঁওতালেরা জুম চাষের জন্য আগুন দিয়াছে, সে কি অভিনব দৃশ্য, মনে হইতেছে পাহাড়ে পাহাড়ে আলোর মালা কে যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে!

কখনও যদি এসব দিকে না আসিতাম, কেহ বলিলেও বিশ্বাস করিতাম না যে, বাংলা দেশের এত নিকটেই এরূপ সম্পূর্ণ জনহীন অরণ্যপ্রান্তর ও শৈলমালা আছে, যাহা সৌন্দর্যে আরিজোনার পাথুরে মরুদেশ বা রোডেসিয়ার বুশভেল্ডের অপেক্ষা কম নয় কোন অংশে—বিপদের দিক দিয়া দেখিতে গেলেও এসব অঞ্চল নিতান্ত পুতুপুতু বলা চলে না, সন্ধ্যার পরেই যেখানে বাঘ-ভালুকের ভয়ে লোকে পথ হাঁটে না।

এই মুক্ত জ্যোৎস্নাশুভ্র বনপ্রান্তরের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে ভাবিতেছিলাম, এ এক আলাদা জীবন, যারা ঘরের দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে ভালবাসে না, সংসার করা যাদের রক্তে নাই, সেই সব বারমুখো, খাপছাড়া প্রকৃতির মানুষের পক্ষে এমন জীবনই তো কাম্য। কলিকাতা হইতে প্রথম প্রথম আসিয়া এখানকার এই ভীষণ নির্জনতা ও সম্পূর্ণ বন্য জীবনযাত্রা কি অসহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এখন আমার মনে হয় এই ভাল, এই বর্বর রুক্ষ বন্য প্রকৃতি আমাকে তার স্বাধীনতা ও মুক্তির মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছে, শহরের খাঁচার মধ্যে আর দাঁড়ে বসিয়া থাকিতে পারিব কি? এই পথহীন

প্রান্তরের শিলাখণ্ড ও শালপলাশের বনের মধ্য দিয়া এই রকম মুক্ত আকাশতলে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় হু-হু ঘোড়া ছুটাইয়া চলার আনন্দের সহিত আমি দুনিয়ার কোন সম্পদ বিনিময় করিতে চাহি না।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে, নক্ষত্রদল জ্যোৎস্নালোকে প্রায় অদৃশ্য, চারিধারে চাহিয়া মনে হয় এ সে পৃথিবী নয় এতদিন যাহাকে জানিতাম, এ স্বপ্নভূমি, এই দিগন্তব্যাপী জ্যোৎস্নায় অপার্থিব জীবেরা এখানে নামে গভীর রাত্রে, তারা তপস্যার বস্তু, কল্পনা ও স্বপ্নের বস্তু, বনের ফুল যারা ভালবাসে না, সুন্দরকে চেনে না, দিগ্বলয়রেখা যাদের কখনও হাতছানি দিয়া ডাকে নাই, তাদের কাছে এ পৃথিবী ধরা দেয় না কোন কালেই।

মহালিখারূপের জঙ্গল শেষ হইতেই মাইল চার গিয়া আমাদের সীমানা শুরু হইল। রাত প্রায় নটার সময়ে কাছারি পৌঁছিলাম।

৪

কাছারিতে ঢোলের শব্দ শুনিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি একদল লোক কাছারির কম্পাউণ্ডে কোথা হইতে আসিয়া ঢোল বাজাইতেছে। ঢোলের শব্দে কাছারির সিপাহী কর্মচারীরা আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কাহাকেও ডাকিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, এমন সময় জমাদার মুক্তিনাথ সিং দরজার কাছে আসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—একবার বাইরে আসবেন মেহেরবানি করে?

—কি জমাদার, কি ব্যাপার?

—হুজুর, দক্ষিণ দেশে এবার ধান মরে যাওয়াতে অজন্মা হয়েছে, লোকে চালাতে না পেরে দেশে দেশে নাচের দল নিয়ে বেরিয়েছে। ওরা কাছারিতে হুজুরের সামনে নাচবে বলে এসেছে, যদি হুকুম হয় তবে নাচ দেখায়।

নাচের দল আমার অপিস-ঘরের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

মুক্তিনাথ সিং জিজ্ঞাসা করিল, কোন্ নাচ তাহারা দেখাইতে পারে। দলের মধ্যে একজন ষাট-বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ সেলাম করিয়া বিনীতভাবে বলিল—হুজুর, হো হো নাচ আর ছক্কর-বাজি নাচ।

দলটি দেখিয়া মনে হইল নাচের কিছু জানুক না জানুক, পেটে দুটি খাইবার আশায় সব ধরনের, সব বয়সের লোক ইহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহারা নাচিল ও গান গাহিল। বেলা পড়িবার সময় তাহারা আসিয়াছিল, ক্রমে আকাশে জ্যোৎস্না ফুটিল, তখনও তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাত ধরিয়া নাচিতেছে ও গান গাহিতেছে। অদ্ভুত ধরনের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে, এই দিগন্তপরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্নালোকে এই নাচ-গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ ঃ—

শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তার মাথায় কেঁদ-বন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকা ফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলের মালা।

দিন খুব সুখেই কাট্‌ত, ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতাম না।

পাঁচ-নহরী ঝরণার ধারে সেদিন কররা পাখী মারতে গিয়েছি।

হাতে আমার বাঁশের নল ও আঠা-কাঠি।

তুমি কুসুম-রঙে ছোপানো শাড়ী পরে এসেছিলে জল ভরতে।

দেখে বললে—ছিঃ, পুরুষমানুষে কি সাত-নলি দিয়ে বনের পাখী মারে!

আমি লজ্জায় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আঠা-কাঠির তাড়া।

বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্তু আমার মন-পাখী তোমার প্রেমের ফাঁদে চিরদিনের মত যে ধরা পড়ে গেল!

আমায় সাত-নলি চেলে পাখী মারতে বারণ করে এ-কি করলে তুমি আমার! কাজটা কি ভাল হল, সখি?

ওদের ভাষা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না। গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। এই পাহাড় ও পিয়ালবনের সুরে বাঁধা এদের গান, এখানেই ভাল লাগিবে।

ইহাদের দক্ষিণা মাত্র চার আনা পয়সা। কাছারির আমলারা একবাক্যে বলিল—হুজুর, তাই অনেক জায়গায় পায় না, বেশী দিয়ে ওদের লোভ বাড়াবেন না, তাছাড়া, বাজার নষ্ট হবে। যা রেট্ তার বেশী দিলে গরীব গেরস্তরা নিজেদের বাড়ীতে নাচ করাতে পারবে না হুজুর।

অবাক হইলাম—দু-তিন ঘণ্টা প্রাণপণে খাটিয়াছে, কস্‌মে কম সতর-আঠারজন লোক—চার আনায় ইহাদের জন-পিছু একটা করিয়া পয়সাও তো পড়িবে না। আমাদের কাছারিতে নাচ দেখাইতে এই জনহীন প্রান্তর ও বন পার হইয়া এতদূর আসিয়াছে। সমস্ত দিনের মধ্যে ইহাই রোজগার। কাছে আর কোনও গ্রাম নাই যেখানে আজ রাত্রে নাচ দেখাইবে।

রাত্রে কাছারিতে তাহাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করিযা দিলাম। সকালে তাহাদের দলের সর্দারকে ডাকাইয়া দুইটি টাকা দিতে লোকটা অবাক হইয়া আমার মুখেব দিকে চাহিয়া রহিল। নাচ দেখিয়া খাইতে কেহই দেয় না, তাহার উপর আবার দু-টাকা দক্ষিণা!

তাহাদের দলে বারো-তেরো বছরের একটি ছেলে আছে, ছেলেটির চেহারা যাত্রাদলের কৃষ্ণঠাকুরের মত। এক-মাথা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, ভারী শান্ত, সুন্দর চোখ-মুখ, কুচকুচে কালো গায়ের রং। দলের সামনে দাঁড়াইয়া সে-ই প্রথম সুর ধরে ও পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া নাচে যখন—ঠোঁটের কোণে হাসি মিলাইয়া থাকে। সুন্দর ভঙ্গিতে হাত দুলাইয়া মিষ্ট সুরে গায়—

রাজা লিজিয়ে সেলাম ম্যায় পরদেশিঁয়া।

শুধু দুটি খাইবার জন্য ছেলেটি দলের সঙ্গে ঘুরিতেছে। পয়সার ভাগ সে বড় একটা পায় না। তাও সে খাওয়া কি! চীনা ঘাসের দানা, আর নুন। বড় জোর তার সঙ্গে একটু তরকারি—আলুপটল নয়, জংলী গুড়মি ফল ভাজা, নয়ত বাথুয়া শাক সিদ্ধ, কিংবা ধুঁধুল ভাজা। এই খাইয়াই মুখে হাসি তার সর্বদা লাগিয়া আছে। দিব্যি স্বাস্থ্য, অপূর্ব লাবণ্য সাবা অঙ্গে।

দলের অধিকাবীকে বলিলাম, ধাতুরিয়াকে রেখে যাও এখানে। কাছারিতে কাজ করবে, আর থাকবে খাবে।

অধিকারী সেই দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ লোকটি, সে-ও এক অদ্ভুত ধরনের লোক। এই বাষট্টি বছরেও সে একেবারে বালকের মত।

বলিল—ও থাকতে পারবে না হুজুর। গাঁয়ের সব লোকের সঙ্গে একসঙ্গে আছে, তাই ও আছে ভাল। একলা থাকলে মন কেমন করবে, ছেলেমানুষ কি থাকতে পারে? আবার আপনার সামনে ওকে নিয়ে আসব হুজুর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১

জঙ্গলের বিভিন্ন অংশ সার্ভে হইতেছিল। কাছারি হইতে তিন ক্রোশ দূরে বোমাইবুরুর জঙ্গলে আমাদের এক আমীন রামচন্দ্র সিং এই উপলক্ষে কিছুদিন ধরিয়া আছে। সকালে খবর পাওয়া গেল রামচন্দ্র সিং হঠাৎ আজ দিন দুই-তিন হইল পাগল হইয়া গিয়াছে।

শুনিয়া তখনই লোকজন লইয়া সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। বোমাইবুরুর জঙ্গল খুব নিবিড় নয়, খুব ফাঁকা উঁচু-নীচু প্রান্তরে মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবদ্ধ বনঝোপ। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, ডাল হইতে সরু দড়ির মত লতা ঝুলিতেছে, যেন জাহাজের উঁচু মাস্তুলের সঙ্গে দড়াদড়ি বাঁধা। বোমাইবুরুর জঙ্গল সম্পূর্ণরূপে লোকবসতি-শূন্য।

গাছপালার নিবিড়তা হইতে দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাশে-ছাওয়া ছোট্ট দুখানা কুঁড়ে। একখানা একটু বড়, এখানাতে রামচন্দ্র আমীন থাকে, পাশের ছোটখানায় তার পেয়াদা আসরফি টিণ্ডেল থাকে। রামচন্দ্র নিজের কাঠের মাচার উপর চোখ বুজিয়া শুইয়াছিল। আমাদের দেখিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে রামচন্দ্র? কেমন আছ?

রামচন্দ্র হাতজোড় করিয়া নমস্কার করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কিন্তু আসরফি টিণ্ডেল সে-কথার উত্তর দিল। বলিল—বাবু, একটা বড় আশ্চর্য কথা। আপনি শুনলে বিশ্বাস করবেন না। আমি নিজেই কাছারিতে গিয়ে খবর দিতাম, কিন্তু আমীনবাবুকে ফেলে যাই বা কি করে? ব্যাপারটা এই, আজ ক'দিন থেকে আমীনবাবু বলছেন একটা কুকুর এসে রাত্রে ওঁকে বড় বিরক্ত করে। আমি শুই এই ছোট ঘরে, আমীনবাবু শুয়ে থাকেন এখানে। দু-তিনদিন এই রকম গেল। রোজই উনি বলেন—আরে কোত্থেকে একটা সাদা কুকুর আসে রাত্রে। মাচার উপর বিছানা পেতে শুই, কুকুরটা এসে মাচার নীচে কেঁউ কেঁউ করে। গায়ে ঘেঁষ দিতে আসে। শুনি, বড়-একটা গা করি নে। আজ চারদিন আগে উনি অনেক রাত্রে বললেন—আসরফি, শীগগির এসো বেরিয়ে, কুকুরটা এসেছে। আমি তার লেজ চেপে ধরে রেখেছি। লাঠি নিয়ে এস।

আমি ঘুম ভেঙে উঠে লাঠি আলো নিয়ে ছুটে যেতে যেতে দেখি—বললে বিশ্বাস করবেন না হুজুর, কিন্তু হুজুরের সামনে মিথ্যে বলব এমন সাহস আমার নেই—একটি মেয়ে ঘরের ভিতর থেকে বার হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি প্রথমটা থতমত খেয়ে গেলাম। তারপরে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি আমীনবাবু বিছানা হাতড়ে দেশলাই খুঁজছেন। উনি বললেন—কুকুরটা দেখলে?

আমি বললাম—কুকুর কই বাবু, একটা কে মেয়ে তো বার হয়ে গেল।

উনি বললেন—উল্লুক, আমার সঙ্গে বেয়াদবী? মেয়েমানুষ কে আসবে এই জঙ্গলে দুপুর রাতে? আমি কুকুরটার লেজ চেপে ধরেছিলাম, এমন কি তার লম্বা কান আমার গায়ে ঠেকেছে। মাচার নীচে ঢুকে কেঁউ কেঁউ করছিল। নেশা করতে শুরু করেছ বুঝি? রিপোর্ট করে দেবো সদরে।

পরদিন রাত্রে আমি সজাগ হয়ে ছিলাম অনেক রাত পর্যন্ত। যেই একটু ঘুমিয়েছি অমনি আমীনবাবু ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে বেরিয়ে আমার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়েছি, এমন সময় দেখি একটি মেয়ে ওঁর ঘরের উত্তর দিকের বেড়ার গা বেয়ে জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। তখনি হুজুর আমি নিজে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। অতটুকু সময়ের মধ্যে লুকোবে কোথায়, যাবেই বা কত দূর? বিশেষ করে আমরা জঙ্গল জরীপ করি, অন্ধিসন্ধি সব আমাদের জানা। কত খুঁজলাম বাবু, কোথাও তার চিহ্নটি পাওয়া গেল না। শেষে আমার কেমন সন্দেহ হল, মাটিতে আলো ধরে দেখি কোথাও পায়ের দাগ নেই, আমার নাগরা জুতোর দাগ ছাড়া।

আমীনবাবুকে আমি একথা বললাম না আর সেদিন। একা দুটি প্রাণী থাকি এই ভীষণ জঙ্গলের মধ্যে হুজুর। ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আর বোমাইবুরু জঙ্গলের একটু দুর্নামও শোনা ছিল। ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, বোমাইবুরু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দূরে—একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় ক'রে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন—ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত-ধরাধরি করে জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে ওদের 'ডামাবাণু'—এক ধরনের জীনপরী, নির্জন জঙ্গলের মধ্যে থাকে। মানুষকে বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।

হুজুর, পরদিন রাত্রে আমি নিজে আমীনবাবুর তাঁবুতে শুয়ে জেগে রইলাম সারারাত। সারারাত

জেগে জরীপের থাকবন্দীর হিসেব কষতে লাগলাম। বোধ হয় শেষ রাতের দিকে একটু তুন্দ্রা এসে থাকবে—হঠাৎ কাছেই একটা কিসের শব্দ শুনে মুখ তুলে চাইলাম—দেখি আমীন সাহেব ঘুমুচ্ছেন ওঁর খাটে, আর খাটের নীচে কী একটা ঢুকেছে। মাথা নীচু করে খাটের নীচে দেখতে গিয়েই চমকে উঠলাম। আধ-আলো আধ-অন্ধকারে প্রথমটা মনে হল, একটি মেয়ে যেন গুটি-সুটি মেরে খাটের তলায় বসে আমার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছে—স্পষ্ট দেখলাম হুজুর, আপনার পায়ে হাত দিয়ে বলতে পারি। এমন কি, তার মাথায় বেশ কালো চুলের গোছা পর্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি। লণ্ঠনটা ছিল, যেখানটাতে বসে হিসেব কষছিলাম সেখানে—হাত ছ'সাত দূরে। আরও ভাল করে দেখব বলে লণ্ঠনটা যেমন আনতে গিয়েছি, কি একটা প্রাণী ছুটে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে পালাতে গেল—দোরের কাছে লণ্ঠনের আলোটা বাঁকা ভাবে পড়েছিল, সেই আলোতে দেখলাম একটা বড় কুকুর, কিন্তু তার আগাগোড়া সাদা, হুজুর, কালোর চিহ্ন কোথাও নেই তার গায়ে।

আমীন সাহেব জেগে বললেন—কি, কি? বললাম—ও কিছু নয়, একটা শেয়াল কি কুকুর ঘরে ঢুকেছিল। আমীন সাহেব বললেন—কুকুর? কি রকম কুকুর? বললাম—সাদা কুকুর। আমীন সাহেব যেন একটা নিরাশার সুরে বললেন—সাদা ঠিক দেখেছ? না কালো? বললাম—না, সাদাই হুজুর।

আমি একটু বিস্মিত যে না হয়েছিলাম এমন নয়—সাদা না হয়ে কালো হলেই বা আমীনবাবুর কি সুবিধা হবে তাতে বুঝলাম না। উনি ঘুমিয়ে পড়লেন—কিন্তু আমার যে কেমন একটা ভয় ও অস্বস্তি বোধ হল কিছুতেই চোখের পাতা বোজাতে পারলাম না। খুব সকালে উঠে খাটের নীচেটা একবার কি মনে করে ভাল করে খুঁজতে গিয়ে সেখানে একগাছা কালো চুল পেলাম। এই সে চুলও রেখেছি, হুজুর। মেয়েমানুষের মাথার চুল। কোথা থেকে এল এ চুল? দিব্যি কালো কুচকুচে নরম চুল। কুকুর—বিশেষতঃ সাদা কুকুরের গায়ে এত বড়, নরম কালো চুল হয় না। এ হল গত রবিবার অর্থাৎ আজ তিন দিনের কথা। এই তিন দিন থেকে আমীন সাহেব তো এক রকম উন্মাদ হয়েই উঠেছেন। আমার ভয় করছে হুজুর—এবার আমার পালা কিনা তাই ভাবছি।

গল্পটা বেশ আষাঢ়ে-গোছের বটে। সে চুলগাছি হাতে করিয়া দেখিয়াও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। মেয়েমানুষের মাথার চুল, সে-বিষয়ে আমারও কোনো সন্দেহ রহিল না। আসরফি টিণ্ডেল ছোকরা মানুষ, সে যে নেশা-ভাঙ করে না, একথা সকলেই একবাক্যে বলিল।

জনমানবশূন্য প্রান্তর ও বনঝোপের মধ্যে একমাত্র তাঁবু এই আমীনের। নিকটতম লোকালয় হইতেছে লবটুলিয়া—ছয় মাইল দূরে। মেয়েমানুষই বা কোথা হইতে আসিতে পারে অত গভীর রাত্রে—বিশেষ যখন এই সব নির্জন বনপ্রান্তরে বাঘ ও বুনোশুয়োরের ভয়ে সন্ধ্যার পরে আর লোকে পথ চলে না?

যদি আসরফি টিণ্ডেলের কথা সত্যি বলিয়া ধরিয়া লই, তবে ব্যাপারটা খুব রহস্যময়। অথবা এই পাণ্ডববর্জিত দেশে, এই জনহীন বনজঙ্গল ও ধূ-ধূ প্রান্তরের মধ্যে বিংশ শতাব্দী তো প্রবেশের পথ খুঁজিয়া পায়ই নাই—উনবিংশ শতাব্দীও পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অতীত যুগের রহস্যময় অন্ধকারে এখনও এসব অঞ্চল আচ্ছন্ন—এখানেই সবই সম্ভব।

সেখানকার তাঁবু উঠাইয়া রামচন্দ্র আমীন ও আসরফি টিণ্ডেলকে সদর কাছারিতে লইয়া আসিলাম। রামচন্দ্রের অবস্থা দিন দিন খারাপ হইতে লাগিল, ক্রমশ সে ঘোর উন্মাদ হইয়া উঠিল। সারারাত্রি চীৎকার করে, বকে, গান গায়। ডাক্তার আনিয়া দেখাইলাম, কিছুতেই কিছু হইল না, অবশেষে তাহার এক দাদা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল।

এই ঘটনার একটা উপসংহার আছে, যদিও তাহা ঘটিয়াছিল বর্তমান ঘটনার সাত-আট মাস পরে, তবুও এখানেই তাহা বলিয়া রাখি।

এ ঘটনার ছ-মাস পরে চৈত্র মাসের দিকে দুটি লোক কাছারিতে আমার সঙ্গে দেখা করিল।

একজন বৃদ্ধ, বয়স ষাট-পঁয়ষট্টির কম নয়, অন্যটি তার ছেলে, বয়স কুড়ি-বাইশ। তাদের বাড়ী বালিয়া জেলায়, আমাদের এখানে আসিয়াছে চরি-মহাল ইজারা লইতে, অর্থাৎ আমাদের জঙ্গলে খাজনা দিয়া তাহারা গরু-মহিষ চরাইবে।

অন্য সব চরি-মহাল তখন বিলি হইয়া গিয়াছে, বোমাইবুরুর জঙ্গলটা তখনও খালি পড়িয়া ছিল, সেইটাই বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। বৃদ্ধ ছেলেকে সঙ্গে লইয়া একদিন মহাল দেখিয়াও আসিল। খুব খুশী, বলিল, খুব বড় বড় ঘাস হুজুর, বহুৎ আচ্ছা জঙ্গল। হুজুরের মেহেরবানি না হলে অমন জঙ্গল মিলত না।

রামচন্দ্র ও আসরফি টিণ্ডেলের কথা তখন আমার মনে ছিল না, থাকিলেও বৃদ্ধের নিকট তাহা হয়ত বলিতাম না। কারণ, ভয় পাইয়া সে ভাগিয়া গেলে জমিদারের লোকসান। স্থানীয় লোকেরা কেহই ও জঙ্গল ইজারা লইতে ঘেঁষে না, রামচন্দ্র আমীনের সেই ব্যাপারের পরে।

মাসখানেক পরে বৈশাখের গোড়ায় একদিন বৃদ্ধ লোকটি কাছারিতে আসিয়া হাজির, মহা রাগত ভাব, তার পিছনে সেই ছেলেটি কাঁচুমাচু ভাবে দাঁড়াইয়া।

বলিলাম—কি ব্যাপার?

বৃদ্ধ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল—এই বাঁদরটাকে নিয়ে এলাম হুজুরের কাছে দরবার করতে। ওকে আপনি পা থেকে খুলে পঁচিস জুতো মারুন, ও জব্দ হয়ে যাক্।

—কি হয়েছে কি?

—হুজুরের কাছে বলতে লজ্জা করে। এই বাঁদর, এখানে এসে পর্যন্ত বিগড়ে যাচ্ছে। আমি সাত-আট দিন আজ প্রায়ই লক্ষ্য করছি—লজ্জা করে বলতে হুজুর—প্রায়ই মেয়েমানুষ ঘর থেকে বার হয়ে যায়। একটা মাত্র খুপরি হাত-আষ্টেক লম্বা, ঘাসে ছাওয়া, ও আর আমি দু-জনে শুই। আমার চোখে ধুলো দিতে পারাও সোজা কথা নয়। দু-দিন যখন দেখলাম, তখন ওকে জিগ্যেস করলাম, ও একেবারে গাছ থেকে পড়ল হুজুর। বলে—কই, আমি তো কিছুই জানি নে! আরও দু-দিন যখন দেখলাম, তখন একদিন দিলাম আচ্ছা করে ওকে মার। চোখের সামনে বিগড়ে যাবে ছেলে? কিন্তু তার পরেও যখন দেখলাম, এই পরশু রাত্রেই হুজুর—তখন ওকে আমি হুজুরের দরবারে নিয়ে এসেছি, হুজুর শাসন করে দিন।

হঠাৎ রামচন্দ্র আমীনের ব্যাপারটা মনে পড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলাম—কত রাত্রে দেখেছ?

—প্রায়ই শেষরাত্রের দিকে হুজুর। এই রাতের দু-এক ঘড়ি বাকি থাকতে।

—ঠিক দেখেছ, মেয়েমানুষ?

—হুজুর, আমার চোখের তেজ এখনও তত কম হয়নি। হুজুর মেয়েমানুষ, বয়সেও কম, কোনদিন পরনে সাদা ধোয়া শাড়ী, কোনদিন বা লাল, কোনদিন কালো। একদিন মেয়েমানুষটা বেরিয়ে যেতেই আমি পেছনে পেছনে গেলাম। কাশের জঙ্গলের মধ্যে কোথায় পালিয়ে গেল, টের পেলুম না। ফিরে এসে দেখি, ছেলে আমার যেন খুব ঘুমের ভান করে পড়ে রয়েছে, ডাকতেই ধড়মড় করে ঠেলে উঠল, যেন সদ্য ঘুম ভেঙে উঠল এ রোগের ওষুধ কাছারি ভিন্ন হবে না বুঝলুম, তাই হুজুরের কাছে—

ছেলেটিকে আড়ালে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—এসব কি শুনছি তোমার নামে?

ছেলেটি আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—আমার কথা বিশ্বাস করুন হুজুর। আমি এর বিন্দু বিসর্গ জানি না। সমস্ত দিন জঙ্গলে মহিষ চরিয়ে বেড়াই—রাতে মড়ার মত ঘুমুই, ভোর হলে তবে ঘুম ভাঙে। ঘরে আগুন লাগলেও আমার হুঁশ থাকে না।

বলিলাম—তুমি কোনদিন কিছু ঘরে ঢুকতে দেখনি?

—না হুজুর। আমার ঘুমুলে হুঁশ থাকে না।

এ-বিষয়ে আর কোনো কথা হইল না। বৃদ্ধ খুব খুশী হইল, ভাবিল আমি আড়ালে লইয়া

গিয়া ছেলেকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছি। দিন-পনের পরে একদিন ছেলেটি আমার কাছে আসিল। বলিল—হুজুর, একটা কথা আছে। সেবার যখন আমি বাবার সঙ্গে কাছারিতে এসেছিলাম, তখন আপনি ও-কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন কেন যে আমি কোনও কিছু ঘরে ঢুকতে দেখেছি কিনা?

—কেন বল তো?

—হুজুর, আমার ঘুম আজকাল খুব সজাগ হয়েছে—বাবা ওই রকম করেন বলে আমার মনে কেমন একটা ভয়ের দরুণই হোক বা যার দরুণই হোক। তাই আজ ক-দিন থেকে দেখছি, রাত্রে একটা সাদা কুকুর কোথা থেকে আসে—অনেক রাত্রে আসে, ঘুম ভেঙে এক-একদিন দেখি সেটা বিছানার কাছেই কোথায় ছিল—আমি জেগে শব্দ করতেই পালিয়ে যায়—কোনও দিন জেগে উঠলেই পালায়। সে কেমন বুঝতে পারে যে, এইবার আমি জেগেছি। এরকম তো ক-দিন দেখলাম—কিন্তু কাল রাতে হুজুর, একটা ব্যাপার ঘটেছে। বাপজী জানে না—আপনাকে চুপি চুপি বলতে এলাম। কাল অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখি, কুকুরটা ঘরে কখন ঢুকেছিল দেখিনি—আস্তে আস্তে ঘর থেকে বার হয়ে যাচ্ছে। সেদিকের কাশের বেড়ায় জানালার মাপে কাটা ফাঁক। কুকুর বেরিয়ে যাওয়ার পরে—বোধ হয় পলক ফেলতে যতটা দেরি হয়, তার পরেই আমার সামনের জানালা দিয়ে দেখি একটি মেয়েমানুষ জানালার পাশ দিয়ে ঘরের পিছনের জঙ্গলের দিকে চলে গেল। আমি তখুনি বাইরে ছুটে গেলাম—কোথাও কিছু না। বাবাকেও জানাইনি, বুড়োমানুষ ঘুমুচ্ছে। ব্যাপারটা কি হুজুর বুঝতে পারছিনে।

আমি তাহাকে আশ্বাস দিলাম—ও কিছু নয়, চোখের ভুল। বলিলাম, যদি তাহাদের ওখানে থাকিতে ভয় করে, তাহারা কাছারিতে আসিয়া শুইতে পারে। ছেলেটি নিজের সাহস-হীনতায় বোধ করি কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু আমার অস্বস্তি দূর হইল না, ভাবিলাম এইবার কিছু শুনিলে কাছারি হইতে দুইজন সিপাহী পাঠাইব রাত্রে ওদের কাছে শুইবার জন্য।

তখন বুঝিতে পারি নাই জিনিসটা কত সঙ্গীন। দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল অতি অকস্মাৎ এবং অতি অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিন-তিনেক পরে।

সকালে সবে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়াছি, খবর পাইলাম কাল রাত্রে বোমাইবুরু জঙ্গলে বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা গিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা তখনই রওনা হইলাম। গিয়া দেখি তাহারা যে ঘরটাতে থাকিত তাহারই পিছনে কাশ ও বনঝাউ জঙ্গলে ছেলেটির মৃতদেহ তখনও পড়িয়া আছে। মুখে তাহার ভীষণ ভয় ও আতঙ্কের চিহ্ন—কি একটা বিভীষিকা দেখিয়া আঁৎকাইয়া যেন মারা গিয়াছে। বৃদ্ধের মুখে শুনিলাম, শেষ রাত্রির দিকে উঠিয়া ছেলেকে সে বিছানায় না দেখিয়া তখনি লণ্ঠন ধরিয়া খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করে—কিন্তু ভোরের পূর্বে তাহার মৃতদেহ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মনে হয়, সে হঠাৎ বিছানা থেকে উঠিয়া কোনো-কিছুর অনুসরণ করিয়া বনের মধ্যে ঢোকে—কারণ, মৃতদেহের কাছে একটা মোটা লাঠি ও লণ্ঠন পড়িয়া ছিল, কিসের অনুসরণ করিয়া সে বনের মধ্যে রাত্রে একা আসিয়াছিল তাহা বলা শক্ত। কারণ নরম বালিমাটির উপরে ছেলেটির পায়ের দাগ ছাড়া অন্য কোনও পায়ের দাগ নাই—না মানুষ, না জানোয়ারের। মৃতদেহেও কোনরূপ আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বোমাইবুরু জঙ্গলের এই রহস্যময় ব্যাপারের কোনো মীমাংসাই হয় নাই। পুলিশ আসিয়া কিছু করিতে না পারিয়া ফিরিয়া গেল, লোকজনের মনে এমন একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করিল ঘটনাটি যে, সন্ধ্যার বহু পূর্ব হইতে ও অঞ্চলে আর কেহ যায় না। দিনকতক তো এমন হইল যে, কাছারিতে একলা নিজের ঘরটিতে শুইয়া বাহিরের ধপধপে সাদা, ছায়াহীন, উদাস, নির্জন জ্যোৎস্নারাত্রির দিকে চাহিয়া কেমন একটা অজানা আতঙ্কে প্রাণ কাঁপিয়া উঠিত, মনে হইত কলকাতায় পালাই, এ-সব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ-প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রাণীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে। যেন এ-সব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু

ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।

২

প্রথম রাজু পাঁড়ের সঙ্গে যেদিন আলাপ হইল, সেদিনটা আমার বেশ মনে হয় আজও। কাছারিতে বসিয়া কাজ করিতেছি, একটি গৌরবর্ণ সুপুরুষ ব্রাহ্মণ আমাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। তাহার বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন হইবে, কিন্তু তাহাকে বৃদ্ধ বলিলে ভুল করা হয়, কারণ তাহার মত সুগঠিত দেহ বাংলা দেশে অনেক যুবকেরও নাই। কপালে তিলক, গায়ে একখানি সাদা চাদর, হাতে একটা ছোট পুঁটুলি।

আমার প্রশ্নের উত্তরে লোকটি বলিল, সে বহুদূর হইতে আসিতেছে, এখানে কিছু জমি বন্দোবস্ত লইয়া চাষ করিতে চায়। অতি গরীব, জমির সেলামী দিবার ক্ষমতা তাহার নাই, আমি সামান্য কিছু জমি স্টেটের সঙ্গে আধা বখরায় বন্দোবস্ত দিতে পারি কিনা?

এক ধরনের মানুষ আছে, নিজের সম্বন্ধে বেশি কথা বলিতে জানে না, কিন্তু তাহাদের মুখের ভাব দেখিলেই মনে হয় যে, সত্যই বড় দুঃখী। রাজু পাঁড়েকে দেখিয়া আমার মনে হইল এ অনেক আশা করিয়া ধরমপুর পরগণা হইতে এতদূর আসিয়াছে জমির লোভে, জমি না পাইলে কিছু না বলিয়াই ফিরিয়া যাইবে বটে, কিন্তু বড়ই আশাভঙ্গ ও ভরসাহারা হইয়া ফিরিবে।

রাজুকে দু-বিঘা জমি লবটুলিয়া বইহারের উত্তরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে বন্দোবস্ত দিলাম, একরকম বিনামূল্যেই। বলিয়া দিলাম, জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া সে আবাদ করুক, প্রথমে দু বৎসর কিছু লাগিবে না, তৃতীয় বৎসর হইতে চার আনা বিঘাপিছু খাজনা দিতে হইবে। তখনও বুঝি নাই কি অদ্ভুত ধরনের মানুষকে জমিদারীতে বসাইলাম!

রাজু আসিল ভাদ্র কি আশ্বিন মাসে, জমি পাইয়া চলিয়াও গেল, তাহার কথা বহু কাজের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গেলাম। পর বৎসর শীতেব শেষে হঠাৎ একদিন লবটুলিয়া কাছারি হইতে ফিরিতেছি, দেখি একটি গাছতলায় কে বসিয়া কি একখানা বই পড়িতেছে। আমাকে দেখিয়া লোকটি বই মুড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। আমি চিনিলাম, সেই রাজু পাঁড়ে। কিন্তু আর-বছর জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার পর লোকটা একবারও কাছারিমুখো হইল না, এর মানে কি? বলিলাম—কি রাজু পাঁড়ে, তুমি আছ এখানে? আমি ভেবেছি তুমি জমি ছেড়ে-ছুড়ে চলে গিয়েছ বোধ হয়। চাষ কর নি?

দেখিলাম, ভয়ে রাজুর মুখ শুকাইয়া গিযাছে। আমতা আমতা করিয়া বলিল—হ্যাঁ, হুজুর, চাষ কিছু—এবার হুজুর—

আমার কেমন রাগ হইয়া গেল। এই সব লোকের মুখ বেশ মিষ্টি, লোক ঠকাইয়া গায়ে হাত বুলাইয়া কাজ আদায় করিতে বেশ পটু। বলিলাম—দেড় বছর তোমার চুলের টিকি তো দেখা যায় নি। দিব্যি স্টেট্‌কে ঠকিয়ে ফসল ঘরে তুলছ—কাছারির ভাগ দেওয়ার যে কথা ছিল. তা বোধ হয় তোমার মনে নেই?

রাজু এবার বিস্ময়পূর্ণ বড় বড় চোখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বসিল—ফসল হুজুর? কিন্তু সে তো ভাগ দেবার কথা আমার মনেই ওঠে নি—সে চীনা ঘাসের দানা—

কথাটা বিশ্বাস হইল না। বলিলাম—চীনার দানা খাচ্ছ এই ছ-মাস? অন্য ফসল নেই? কেন, মকাই কর নি?

—না হুজুর, বড্ড গজার জঙ্গল। একা মানুষ, ভরসা করে উঠতে পারি নি। পনের কাঠা জমি অতিকষ্টে তৈরি করেছি। আসুন না হুজুর, একবার দয়া করে পায়ের ধুলো দিয়ে যান।

রাজুর পিছনে পিছনে গেলাম। এত ঘন জঙ্গল মাঝে মাঝে যে, ঘোড়ার ঢুকিতে কষ্ট হইতেছিল। খানিক দূরে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে গোলাকার পরিষ্কার জায়গা প্রায় বিঘাখানেক, মাঝখানে জংলী ঘাসেরই তৈরী ছোট নীচু দুখানা খুপরি। একখানাতে রাজু থাকে, আর একখানায় তার ক্ষেতের ফসল জমা আছে। থলে কি বস্তা নাই, মাটির নীচু মেঝেতে রাশীকৃত চীনা ঘাসের দানা স্তূপীকৃত করা। বলিলাম—রাজু, তুমি এত আল্‌সে কুঁড়ে লোক তা তো জানতুম না, দেড় বছরের মধ্যে দু-বিঘের জঙ্গল কাটতে পারলে না?

রাজু ভয়ে ভয়ে বলিল—সময় হুজুর বড় কম যে।

—কেন, কি কর সারাদিন?

রাজু লাজুক মুখে চুপ করিয়া রহিল। রাজুর বাসস্থান খুপরির মধ্যে জিনিসপত্রের বাহুল্য আদৌ নাই। একটা লোটা ছাড়া অন্য তৈজস চোখে পড়িল না। লোটাটা বড়গোছের, তাতেই ভাত রান্না হয়। ভাত নয়, চীনা ঘাসের বীজ। কাঁচা শালপাতায় ঢালিয়া সিদ্ধ চীনার বীজ খাইলে তৈজসপাত্রের কি দরকার? জলের জন্য নিকটেই কুণ্ডী অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয় আছে। আর কি চাই?

কিন্তু খুপরির একধারে সিঁদুরমাখানো ছোট কালো পাথরের রাধাকৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া বুঝিলাম, রাজু ভক্তমানুষ। ক্ষুদ্র পাথরের বেদী বনের ফুলে সাজাইয়া রাখিয়াছে, বেদীর এক পাশে দু-একখানা পুঁথি ও বই। অর্থাৎ, তাহার সময় নাই মানে সে সারাদিন পূজাআচ্চা লইয়াই বোধ হয় ব্যস্ত থাকে। চাষ করে কখন?

এই রাজুকে প্রথম বুঝিলাম।

রাজু পাঁড়ে হিন্দি লেখাপড়া ভাল জানে, সংস্কৃতও সামান্য জানে। তাও সে সর্বদা পড়ে না, মাঝে মাঝে অবসর সময়ে গাছতলায় কি একখানা হিন্দী বই খুলিয়া একটু বসে—অধিকাংশ সময় দূরের আকাশ ও পাহাড়ের দিকে চাহিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকে। একদিন দেখি একটা ছোট খাতায় খাগের কলমে, বসিয়া কি লিখিতেছে। ব্যাপার কি? পাঁড়ে কবিতাও লেখে নাকি? কিন্তু সে এতই লাজুক, নীরব চাপা মানুষটি, তাহার নিকট হইতে কোন কথা বাহির করিয়া লওয়া বড় কঠিন। নিজের সম্বন্ধে সে কিছুই বলিতে চায় না।

একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—পাঁড়েজী, তোমার বাড়ীতে আর কে আছে?

—সবাই আছে হুজুর, আমার তিন ছেলে, দুই লেড়কী, বিধবা বহিন।

—তাদের চলে কিসে?

রাজু আকাশের দিকে হাত তুলিয়া বলিল—ভগবান চালাচ্ছেন। তাদের দু'মুঠো খাওয়ানোর ব্যবস্থা করব বলেই তো হুজুরের আশ্রয়ে এসে জমি নিয়েছি। জমিটা তৈরি করে ফেলতে পারলে—

—কিন্তু দু-বিঘে জমির ফসলে অত বড় একটা সংসার চলবে? আর তাই বা তুমি উঠে-পড়ে চেষ্টা করছ কই?

রাজু কথার জবাব প্রথমটা দিল না। তার পর বলিল—জীবনের সময়টাই বড় কম হুজুর। জঙ্গল কাটতে গিয়ে কত কথা মনে পড়ে, বসে বসে ভাবি। এই যে বন-জঙ্গল দেখছেন, বড় ভাল জায়গা। ফুলের দল কত কাল থেকে ফুটছে আর পাখী ডাকছে, বাতাসের সঙ্গে মিলে দেবতারা পৃথিবীর মাটিতে পা দেন এখানে। টাকার লোভ, পাওনা-দেনার কাজ যেখানে চলে, সেখানকার বাতাস বিবিয়ে ওঠে। সেখানে ওঁরা থাকেন না। কাজেই এখানে, দা-কুড়ুল হাতে করলেই দেবতারা এসে হাত থেকে কেড়ে নেন—কানে চুপি চুপি এমন কথা বলেন, যাতে বিষয়-সম্পত্তি থেকে মন অনেক দূরে চলে যায়।

দেখিলাম রাজু কবি বটে দার্শনিকও বটে।

বলিলাম—কিন্তু রাজু, দেবতারা এমন কথা বলেন না যে, বাড়ীতে খরচ পাঠিও না, ছেলেপুলে উপোস করুক। ওসব কথাই নয় রাজু, কাজে লাগো। নইলে জমি কেড়ে নেব।

আরও কয়েক মাস গেল। রাজুর ওখানে মাঝে মাঝে যাই। ওকে কি ভালোই লাগে। সেই গভীর নির্জন লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলে একা ছোট একটা ঘাসের খুপরিতে সে কেমন করিয়া দিনের পর দিন বাস করে, এ আমি ভাবিয়া উঠতে পারি না।

সত্যকার সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক রাজু। অন্য কোন ফসল জন্মাইতে পারে নাই, চীনা ঘাসের দানা ছাড়া। সাত-আট মাস হাসিমুখে তাই খাইয়াই চালাইতেছে। কারও সঙ্গে দেখা হয় না, গল্পগুজবের লোক নাই, কিন্তু তাহাতে ওর কিছুই অসুবিধা হয় না, বেশ আছে। দুপুরে যখনই রাজুর জমির উপর দিয়া গিয়াছি, তখনই দুপুর রোদে ওকে জমিতে কাজ করিতে দেখিয়াছি। সন্ধ্যার দিকে ওকে প্রায়ই চুপ করিয়া হরীতকী গাছটার তলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছি—কোনদিন হাতে খাতা থাকে, কোনদিন থাকে না।

একদিন বলিলাম—রাজু, আরও কিছু জমি তোমায় দিচ্ছি, বেশী করে চাষ কর, তোমার বাড়ীর লোক না খেয়ে মরবে যে। রাজু অতি শান্ত প্রকৃতির লোক, তাহাকে কোন কিছু বুঝাইতে বেশী বেগ পাইতে হয় না। জমি সে লইল বটে, কিন্তু পরবর্তী পাঁচ-ছ' মাসের মধ্যে জমি পরিষ্কার করিয়া উঠিতে পারিল না। সকালে উঠিয়া তাহার পূজা ও গীতাপাঠ করিতে বেলা দশটা বাজে, তার পর কাজে বার হয়। ঘণ্টা-দুই কাজ করিবার পরে রান্না-খাওয়া করে, সারা দুপুরটা খাটে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। তার পরই আপন মনে গাছতলায় চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবে। সন্ধ্যার পরে আবার পূজাপাঠ আছে।

সে-বছর রাজু কিছু মকাই করিল, নিজে না খাইয়া সেগুলি সব দেশে পাঠাইয়া দিল, বড় ছেলে আসিয়া লইয়া গেল। কাছারিতে ছেলেটা দেখা করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম—বুড়ো বাপকে এই জঙ্গলে একা ফেলে রেখে বাড়ীতে বসে দিব্যি ফুর্তি করছ, লজ্জা করে না? নিজেরা রোজগারের চেষ্টা কর না কেন?

৩

সেবার শুয়োরমারি বস্তিতে ভয়ানক কলেরা আরম্ভ হইল, কাছারিতে বসিয়া খবর পাইলাম। শুয়োরমারি আমাদের এলাকার মধ্যে নয়, এখান থেকে আট-দশ ক্রোশ দূরে, কুশী ও কলবলিয়া নদীর ধারে। প্রতিদিন এত লোক মরিতে লাগিল যে, কুশী নদীর জলে সর্বদা মড়া ভাসিয়া যাইতেছে, দাহ করিবার ব্যবস্থা নাই। একদিন শুনিলাম, রাজু পাঁড়ে সেখানে চিকিৎসা করিতে বাহির হইয়াছে। রাজু পাঁড়ে যে চিকিৎসক তাহা জানিতাম না। তবে আমি কিছুদিন হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাড়াচাড়া করিয়াছিলাম বটে, ভাবিলাম এই সব ডাক্তার-কবিরাজশূন্য স্থানে দেখি যদি কিছু উপকার করিতে পারি। কাছারি হইতে আমার সঙ্গে আরও অনেকে গেল। গ্রামে পৌঁছিয়া রাজু পাঁড়ের সঙ্গে দেখা হইল। সে একটা বাটুয়াতে শিকড়বাকড় জড়ি-বুটি লইয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী রোগী দেখিয়া বেড়াইতেছে। আমায় নমস্কার করিয়া বলিল—হুজুর, আপনার বড্ড দয়া, আপনি এসেছেন, এবার লোকগুলো যদি বাঁচে। এমন ভাবটা দেখাইল যেন আমি জেলার সিবিল সার্জন কিংবা ডাক্তার গুডিভ চক্রবর্তী। সে-ই আমাকে সঙ্গে করিয়া গ্রামে রোগীদের বাড়ী বাড়ী ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইল।

রাজু ওষুধ দেয়, সবই দেখিলাম ধারে। সারিয়া উঠিলে দাম দিবে এই নাকি কড়ার হইয়াছে।

কি ভয়ানক দারিদ্রের মূর্তি কুটীরে কুটীরে। সবই খোলার কিংবা খড়ের বাড়ী, ছোট্ট ছোট্ট ঘর, জানালা নাই, আলো-বাতাস ঢোকে না কোনো ঘরে। প্রায় সব ঘরেই দু-একটি রোগী, ঘরের মেঝেতে ময়লা বিছানায় শুইয়া। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, পথ্য নাই। অবশ্য রাজু সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে, না ডাকিলেও সব রোগীর কাছে গিয়া তাহার জড়ি-বুটির ওষুধ খাওয়াইয়াছে, একটা ছোট ছেলের রোগশয্যার পাশে বসিয়া কাল নাকি সারা রাত সেবাও করিয়াছে। কিন্তু মড়কের তাহাতে কিছুমাত্র উপশম দেখা যাইতেছে না, বরং বাড়িয়াই চলিয়াছে।

রাজু আমায় ডাকিয়া একটা বাড়ীতে লইয়া গেল। একখানা মাত্র খড়ের ঘর, মেঝেতে রোগী তালপাতার চেটাইয়ে শুইয়া, বয়েস পঞ্চাশের কম নয়। সতের-আঠারো বছরের একটি মেয়ে দোরের গোড়ায় বসিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিতেছে। রাজু তাহাকে ভরসা দিয়া বলিল—কাঁদিস নে বেটি, হুজুর এসেছেন, আর ভয় নেই, রোগ সেরে যাবে।

বড়ই লজ্জিত হইলাম নিজের অক্ষমতার কথা স্মরণ করিয়া। জিজ্ঞাসা করিলাম—মেয়েটি বুঝি রোগীর মেয়ে?

রাজু বলিল—না হুজুর, ওর বৌ। কেউ নেই সংসারে মেয়েটার, বিধবা মা ছিল, বিয়ে দিয়ে মারা গিয়েছে। একে বাঁচান হুজুর, নইলে মেয়েটা পথে বসবে।

রাজুর কথার উত্তরে কি বলিতে যাইতেছি এমন সময় হঠাৎ চোখ পড়িল রোগীর শিয়রের দিকে দেওয়ালে মেঝে থেকে হাত তিনেক উঁচুতে একটা কাঠের তাকের প্রতি। দেখি তাকের উপর একটা আঢাকা পাথরের খোরায় দুটি পান্তা ভাত। ভাতের উপর দু-দশটা মাছি বসিয়া আছে। কি সর্বনাশ! ভীষণ এশিয়াটিক কলেরাব রোগী ঘরে, আর রোগীর নিকট হইতে তিন হাতের মধ্যে ঢাকাবিহীন খোরায় ভাত!

সারাদিন রোগীর সেবা করার পরে দরিদ্র ক্ষুধার্ত বালিকা হয়তো পাথরের খোরাটি পাড়িয়া পান্তা ভাত দুটি নুন লঙ্কা দিয়া আগ্রহের সহিত খাইতে বসিবে। বিষাক্ত অন্ন, য়ার প্রতি গ্রাসে নিষ্ঠুর মৃত্যুর বীজ। বালিকার সরল অশ্রুভরা চোখ দুটির দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। রাজুকে বলিলাম—এ ভাত ফেলে দিতে বল ওকে। এ-ঘরে খাবার রাখে!

মেয়েটি ভাত ফেলিয়া দিবার প্রস্তাবে বিস্মিত হইয়া আমাদের মুখের দিকে চাহিল। ভাত ফেলিয়া দিবে কেন? তবে সে খাইবে কি? ওঝাজীদের বাড়ী থেকে কাল রাত্রে ঐ ভাত দুটি তাহাকে খাইতে দিয়া গিয়াছিল।

আমার মনে পড়িল ভাত এ-দেশে সুখাদ্য বলিয়া গণ্য, আমাদের দেশে যেমন লুচি কি পোলাও। কিন্তু একটু কড়া সুরেই বলিলাম—উঠে এখুনি ভাত ফেলে দাও আগে।

মেয়েটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া খোরার ভাত ফেলিয়া দিল।

তাহার স্বামীকে কিছুতেই বাঁচানো গেল না। সন্ধ্যার পরেই বৃদ্ধ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। মেয়েটির কি কান্না! রাজুও সেই সঙ্গে কাঁদিয়া আকুল।

আর একটি বাড়ীতে রাজু আমায় লইয়া গেল। সেটা রাজুর এক দূরসম্পর্কীয় শালার বাড়ী। এখানে প্রথম আসিয়া এই বাড়ীতেই রাজু উঠিয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া এখানেই করিত। এখানে মা ও ছেলের একসঙ্গে কলেরা, পাশাপাশি ঘরে দুই রোগী থাকে, এ উহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল, ও ইহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল। সাত-আট বছরের ছোট ছেলে।

ছেলে প্রথমে মারা গেল। মাকে জানিতে দেওয়া হইল না। আমার হোমিওপ্যাথি ঔষধে মায়ের অবস্থা ভাল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল ক্রমশ। মা কেবলই ছেলের খবর নেয়, ও-ঘরে ছেলের সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না কেন? কেমন আছে সে?

আমরা বলি—তাকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে—ঘুমোচ্ছে।

চুপি চুপি ছেলের মৃতদেহ ঘর হইতে বাহির করা হইল।

গ্রামের লোক স্বাস্থ্যের নিয়ম একেবারে জানে না। একটি মাত্র পুকুর, সেই পুকুরেই কাপড় কাচে, সেখানেই স্নান করে। স্নান করা আর জল পান করা যে একই কথা নয়, ইহা কিছুতেই তাহাদের বুঝাইতে পারিলাম না। কত লোক কত লোককে ফেলিয়া পলাইয়া গিয়াছে। একটা ঘরের মধ্যে একটা রোগী দেখিলাম, সে বাড়ীতে আর লোক নাই। রোগগ্রস্ত লোকটি ঐ বাড়ীর ঘর-জামাই, স্ত্রী আর-বছর মারা গিয়াছে। তত্রাচ লোকটার অবস্থা খারাপ বলিয়াই হউক বা যে কারণেই হউক, শ্বশুরবাড়ীর লোকে তাহাকে ফেলিয়া পলাইয়াছে। রাজু তাহাকে দিনরাত সেবা করিতে লাগিল। আমি ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম। লোকটা শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়া গেল। বুঝিলাম, শ্বশুরবাড়ীর অন্নদাস হিসাবে তাহার অদৃষ্টে এখনও অনেক দুঃখ আছে।

রাজুকে থলি বাহির করিয়া চিকিৎসার মোট উপার্জন গণনা করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কত হল, রাজু?

রাজু গুনিয়া-গাঁথিয়া বলিল—এক টাকা তিন আনা।

ইহাতেই সে বেশ খুশী হইয়াছে। এদেশের লোক একটা পয়সার মুখ সহজে দেখিতে পায় না, এক টাকা তিন আনা উপার্জন এখানে কম নহে। রাজুকে আজ পনের-ষোল দিন, ডাক্তারকে ডাক্তার, নার্সকে নার্স, কি খাটুনিটাই খাটিতে হইয়াছে।

অনেক রাত্রে গ্রামের মধ্যে কান্নাকাটির রব শোনা গেল। আবার একজন মরিল। রাত্রে ঘুম হইল না। গ্রামের অনেকেই ঘুমায় নাই, ঘরের সামনে বড় বড় কাঠ জ্বালাইয়া আগুন করিয়া গন্ধক পোড়াইতেছে ও আগুনের চারিপাশে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প-গুজব করিতেছে। রোগের গল্প, মৃত্যুর খবর ছাড়া ইহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই—সকলেরই মুখে একটা ভয়, আতঙ্কের চিহ্ন পরিস্ফুট। কাহার পালা আসে।

দুপুর রাত্রে সংবাদ পাইলাম, ওবেলার সেই সদ্য-বিধবা বালিকাটির কলেরা হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, তাহার স্বামীগৃহের পাশে এক বাড়ীর গোয়ালে সে শুইয়া আছে। ভয়ে নিজের ঘরে আসিয়া শুইতে পারে নাই, অথচ তাহাকে কেহ স্থান দেয় নাই সে কলেরার রোগী ছুঁইয়াছিল বলিয়া। গোয়ালের এক পাশে কয়েক আটি খড়ের বিচালির উপর পুরানো চট পাতা, তাতেই বালিকা শুইয়া ছটফট করিতেছে। আমি ও রাজু বহু চেষ্টা করিলাম হতভাগিনীকে বাঁচাইবার। একটি লণ্ঠন, একটু জল কোথাও পাওয়া যায় না। উঁকি মারিয়া কেহ দেখিতে পর্যন্ত আসিল না। আজকাল এমন আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে যে, কলেরা কাহারও হইলে তাহার ত্রিসীমানায় লোক ঘেঁষে না।

রাত ফরসা হইল।

রাজুর খুব নাড়ীজ্ঞান, হাত দেখিয়া বলিল—এ হুজুর সুবিধে নয় গতিক।

আমি আর কি করিব, নিজে ডাক্তার নয়, স্যালাইন দিতে পারিলে হইত, এ অঞ্চলে তেমন ডাক্তার কোথাও নাই।

সকাল ন'টায় বালিকা মারা গেল।

আমরা না থাকিলে তাহার মৃতদেহ কেহ বাহির করিতে আসিত কিনা সন্দেহ, আমাদের অনেক তদ্বির ও অনুরোধে জন-দুই আহীর চাষী বাঁশ লইয়া আসিয়া মৃতদেহ বাঁশের সাহায্যে ঠেলিতে ঠেলিতে নদীর দিকে লইয়া গেল।

রাজু বলিল—বেঁচে গেল হুজুর। বিধবা বেওয়া অবস্থায়, তাতে ছেলেমানুষ, কি খেত, কে ওকে দেখত।

বলিলাম—তোমাদের দেশ বড় নিষ্ঠুর, রাজু।

আমার মনে কষ্ট রহিয়া গেল যে, আমি তাহাকে তাহার মুখের অত সাধের ভাত দুটি খাইতে দিই নাই।

৪

নিস্তব্ধ দুপুরে দূরে মহালিখারূপের পাহাড় ও জঙ্গল অপূর্ব রহস্যময় দেখাইত। কতবার ভাবিয়াছি একবার গিয়া পাহাড়টা ঘুরিয়া দেখিয়া আসিব, কিন্তু সময় হইয়া উঠে নাই। শুনিতাম মহালিখারূপের পাহাড় দুর্গম বনাকীর্ণ, শঙ্খচূড় সাপের আড্ডা, বনমোরগ, দুষ্প্রাপ্য বন্য চন্দ্রমল্লিকা, বড় বড় ভাল্লুকঝোড়ে ভর্তি। পাহাড়ের উপরে জল নাই বলিয়া, বিশেষত ভীষণ শঙ্খচূড় সাপের ভয়ে, এ অঞ্চলের কাঠুরিয়ারাও কখনও ওখানে যায় না।

দিকচক্রবালে দীর্ঘ নীলরেখার মত পরিদৃশ্যমান এই পাহাড় ও বন দুপুরে, বিকালে, সন্ধ্যায় কত স্বপ্ন আনে মনে। একে তো এদিকের সারা অঞ্চলটাই আজকাল আমার কাছে পরীর দেশ বলিয়া মনে হয়, এর জ্যোৎস্না, এর বন-বনানী, এর নির্জনতা, এর নীরব রহস্য, এর সৌন্দর্য, এর মানুষজন, পাখীর ডাক, বন্য ফুলশোভা—সবই মনে হয় অদ্ভুত, মনে এমন এক গভীর শান্তি ও আনন্দ আনিয়া দেয়, জীবনে যাহা কোথাও কখনও পাই নাই। তার উপরে বেশী করিয়া অদ্ভুত লাগে ওই মহালিখারূপের শৈলমালা ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা। কি রূপলোক যে ইহারা ফুটাইয়া তোলে দুপুরে, বৈকালে, জ্যোৎস্নারাত্রে—কি উদাস চিন্তার সৃষ্টি করে মনে!

একদিন পাহাড় দেখিব বলিয়া বাহির হইলাম। ন'মাইল ঘোড়ায় গিয়া দুই দিকের দুই শৈল-শ্রেণীর মাঝের পথ ধরিয়া চলি। দুই দিকের শৈলসানু বনে ভরা, পথের ধাবে দুই দিকের বিচিত্র ঘন বন-ঝোপের মধ্য দিয়া সুঁড়িপথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও উঁচু-নীচু, মাঝে মাঝে ছোট ছোট পার্বত্য ঝরণা উপলাস্তৃত পথে বহিয়া চলিয়াছে, বন্য চন্দ্রমল্লিকা ফুটিতে দেখি নাই, কারণ তখন শরৎকাল, চন্দ্রমল্লিকা ফুটিবার সময়ও নয়, কিন্তু কি অজস্র বন্য শেফালিবৃক্ষ বনের সর্বত্র, ফুলের খই ছড়াইয়া রাখিয়াছে বৃক্ষতলে, শিলাখণ্ডে, ঝরণার উপলাকীর্ণ তীরে। আরও কত কি বিচিত্র বন্যপুষ্প ফুটিয়াছে বর্ষাশেষে, পুষ্পিত সপ্তপর্ণের বন, অর্জুন ও পিয়াল, নানাজাতীয় লতা ও অর্কিডের ফুল—বহুপ্রকার পুষ্পের সুগন্ধ একত্র মিলিত হইয়া মৌমাছিদের মত মানুষকেও নেশায় মাতাল করিয়া তুলিতেছে।

এতদিন এখানে আছি, এ সৌন্দর্যভূমি আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল। মহালিখারূপের জঙ্গল ও পাহাড়কে দূর হইতে ভয় করিয়া আসিয়াছি, বাঘ আছে, সাপ আছে, ভালুকের নাকি লেখাজোখা নাই—এ পর্যন্ত তো একটা ভালুকঝোড় কোথাও দেখিলাম না। লোকে যতটা বাড়াইয়া বলে, ততটা নয়।

ক্রমে পথটার দু-ধারে বন ঘনাইয়া পথটাকে যেন দু-দিক হইতে চাপিয়া ধরিল। বড় বড় গাছের ডালপালা পথের উপর চন্দ্রাতপের সৃষ্টি করিল। ঘনসন্নিবিষ্ট কালো কালো গাছের গুঁড়ি, তাদের তলায় কেবলই নানাজাতীয় ফার্ণ, কোথাও বড় গাছেরই চারা। সামনে চাহিয়া দেখিলাম পথটা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে, বন আরও কৃষ্ণায়মান, সামনে একটা উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া, তাহার অনাবৃত শিখরদেশের অল্প নীচেই যে-সব বন্য-পাদপ, এত নীচু হইতে সেগুলি দেখাইতেছে যেন ছোট ছোট শেওড়া গাছের ঝোপ। অপূর্ব, গম্ভীর শোভা এই জায়গাটায়। পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপরে অনেক দূর উঠিলাম, আবার পথটা নামিয়া গড়াইয়া গিয়াছে, কিছুদূর নামিয়া আসিয়া একটা পিয়ালতলায় ঘোড়া বাঁধিয়া শিলাখণ্ডে বসিলাম—উদ্দেশ্য, শ্রান্ত অশ্বকে কিছুক্ষণ বিশ্রামের অবকাশ দেওয়া।

সেই উত্তুঙ্গ শৈলচূড়া হঠাৎ কখন বামদিকে গিয়া পড়িয়াছে; পার্বত্য অঞ্চলের এই মজার ব্যাপার কতবার লক্ষ্য করিয়াছি, কোথা দিয়া কোনটা ঘুরিয়া গিয়া আধ রশি পথের ব্যবধানে দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্যের সৃষ্টি করে, এই যাহাকে ভাবিতেছি খাড়া উত্তরে অবস্থিত, হঠাৎ দু-কদম যাইতে-না যাইতে সেটা কখন দেখি পশ্চিমে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

চুপ করিয়া কতক্ষণ বসিয়া রহিলাম। কাছেই বনের মধ্যে কোথায় একটা ঝরণার কলমর্মর সেই শৈলমালাবেষ্টিত বনানীর গভীর নিস্তব্ধতাকে আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। আমার চারিধারেই উঁচু উঁচু শৈলচূড়া, তাদের মাথায় শরতের নীল আকাশ। কতকাল হইতে এই বন পাহাড় এই এক রকমই আছে। সুদূর অতীতের আর্যেরা খাইবার গিরিবর্ত্ম পার হইয়া প্রথম যেদিন পঞ্চনদে প্রবেশ করিয়াছিলেন, এই বন তখনও এই রকমই ছিল, বুদ্ধদেব নববিবাহিতা তরুণী পত্নীকে ছাড়িয়া যে-রাত্রে গোপনে গৃহত্যাগ করেন, সেই অতীত রাত্রিতে এই গিরিচূড়া গভীর রাত্রির চন্দ্রালোকে আজকালের মতই হাসিত, তমসাতীরের পর্ণকুটীরে কবি বাল্মীকি একমনে রামায়ণ লিখিতে লিখিতে কবে চমকিয়া উঠিয়া দেখিয়াছিলেন সূর্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী, তমসার কালো জলে রক্তমেঘস্তূপের ছায়া পড়িয়া আসিয়াছে, আশ্রমমৃগ আশ্রমে ফিরিয়াছে, সেদিনটিতেও পশ্চিম দিগন্তের শেষ রাঙা আলোয় মহালিখারূপের শৈলচূড়া ঠিক এমনি অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, আজ আমার চোখের সামনে ধীর ধীরে যেমন হইয়া আসিতেছে। সেই কতকাল আগে যেদিন চন্দ্রগুপ্ত প্রথম সিংহাসনে আরাহণ করেন, গ্রীক্‌রাজ হেলিওডোরাস্ গরুড়ধ্বজ-স্তম্ভ নির্মাণ করেন; রাজকন্যা সংযুক্তা যেদিন স্বয়ংম্বর-সভায় পৃথ্বীরাজের মূর্তির গলায় মাল্যদান করেন; সামুগড়ের যুদ্ধে হারিয়া হতভাগ্য দারা যে-রাত্রে আগ্রা হইতে গোপনে দিল্লী পলাইলেন; চৈতন্যদেব যেদিন শ্রীবাসের ঘরে সংকীর্তন করেন; যেদিনটিতে পলাশীর যুদ্ধ হইল—মহালিখারূপের ঐ শৈলচূড়া, এই বনানী ঠিক এমনি ছিল। তখন কাহারা বাস করিত এই সব জঙ্গলে? জঙ্গলের অনতিদূরে একটা গ্রামে দেখিয়া আসিয়াছিলাম কয়েকখানি মাত্র খড়ের ঘর আছে, মহুয়াবীজ ভাঙিয়া তৈল বাহির করিবার জন্য দু-খণ্ড কাঠের তৈরী একটা ঢেঁকির মত কি আছে, আর এক বুড়িকে দেখিয়াছিলাম, তাহার বয়স আশী-নব্বুই হইবে, শনের-নুড়ি চুল, গায়ে খড়ি উড়িতেছে, রৌদ্রে বসিয়া বোধ করি মাথার উকুন বাছিতেছিল—ভারতচন্দ্রের জরতীবেশধারিণী অন্নপূর্ণার মত। এখানে বসিয়া সেই বুড়িটার কথা মনে পড়িল—এ অঞ্চলের বন্য সভ্যতার প্রতীক ওই প্রাচীন বৃদ্ধা—পূর্বপুরুষের এই বনজঙ্গলে বহু সহস্র বছর ধরিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। যীশুখ্রীষ্ট যেদিন ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেদিনও উহারা মহুয়াবীজ ভাঙিয়া যেরূপ তৈল বাহির করিত, আজ সকালেও সেইরূপ করিয়াছে। হাজার হাজার বছর ধরিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে অতীতের ঘন কুজ্ঝটিকায়, উহারা আজও সাতনলি ও আঠাকাঠি দিয়া সেইরূপই পাখী শিকার করিতেছে—ঈশ্বর সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে উহাদের চিন্তাধারা বিন্দুমাত্র অগ্রসর হয় নাই। ঐ বুড়ির দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি, জানিবার জন্য আমি আমার এক বছরের উপার্জন দিতে প্রস্তুত আছি।

বুঝি না কেন এক-এক জাতির মধ্যে সভ্যতার কী বীজ লুক্কায়িত থাকে, তাহারা যত দিন যায় তত উন্নতি করে—আবার অন্য জাতি হাজার বছর ধরিয়াও সেই একস্থানে স্থাণুবৎ নিশ্চল হইয়া থাকে কেন? বর্বর আর্যজাতি চার-পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, কাব্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, চরক-সুশ্রুত লিখিল, দেশ জয় করিল, সাম্রাজ্য পত্তন করিল, ভেনাস দ্য মিলোর মূর্তি, পার্থেনন, তাজমহল, কোলো ক্যাথিড্রাল গড়িল, দরবারী কানাড়া ও ফিফ্‌থ্ সিম্‌ফোনির সৃষ্টি করিল—এরোপ্লেন, জাহাজ, রেলগাড়ী, বেতার, বিদ্যুৎ আবিষ্কার করিল—অথচ পাপুয়া, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা আমাদের দেশের ওই মুণ্ডা, কোল, নাগা, কুকিগণ যেখানে সেখানেই কেন রহিয়াছে এই পাঁচ হাজার বছর?

অতীত কোন দিনে, এই যেখানে বসিয়া আছি, এখানে ছিল মহাসমুদ্র—প্রাচীন সেই মহাসমুদ্রের ঢেউ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িত ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের এই বালুময় তীরে—এখন যাহা বিরাট পর্বতে পরিণত হইয়াছে। এই ঘন অরণ্যানীর মধ্যে বসিয়া অতীত যুগের সেই, নীল সমুদ্রের স্বপ্ন দেখিলাম।

পুরা যতঃ স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্।

এই বালু-প্রস্তরের শৈলচূড়ায় সেই বিস্মৃত অতীতের মহাসমুদ্র বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে—অতি স্পষ্ট সে চিহ্ন—ভূতত্ত্ববিদের চোখে ধরা পড়ে। মানুষ তখন ছিল না, এ ধরনের

গাছপালাও ছিল না, যে ধরনের গাছপালা জীবজন্তু ছিল, পাথুরের বুকে তারা তাদের ছাঁচ রাখিয়া গিয়াছে, যে-কোনো মিউজিয়ামে গেলে দেখা যায়।

বৈকালের রোদ রাঙা হইয়া আসিয়াছে মহালিখারূপ পাহাড়ের মাথায়। শেফালিবনের গন্ধভরা বাতাসে হেমন্তের হিমের ঈষৎ আমেজ, আর এখানে বিলম্ব করা উচিত হইবে না, সম্মুখে কৃষ্ণ-একাদশীর অন্ধকার রাত্রি, বনমধ্যে কোথায় একদল শেয়াল ডাকিয়া উঠিল। ভালুক বা বাঘ পথ না আটকায়।

ফিরিবার পথে এইদিন প্রথম বন্য ময়ূর দেখিলাম বনান্তস্থলীতে শিলাখণ্ডের উপর। একজোড়া ছিল, আমার ঘোড়া দেখিয়া ভয় পাইয়া ময়ূরটা উড়িয়া গেল, তাহার সঙ্গিনী কিন্তু নড়িল না। বাঘের ভয়ে আমার তখন দেখিবার অবকাশ ছিল না, তবু একবার সেটার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইলাম। বন্য ময়ূর কখনও দেখি নাই, লোকে বলিত এ অঞ্চলে ময়ূর আছে, আমি বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু বেশীক্ষণ বিলম্ব করিতে ভরসা হইল না, কি জানি মহালিখারূপের বাঘের গুজবটা যদি এ রকম সত্য হইয়া যায়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ

১

দেশের জন্য মন কেমন করা একটি অতি চমৎকার অনুভূতি। যারা চিরকাল এক জায়গায় কাটায়, স্বগ্রাম ও তাহার নিকটবর্তী স্থান ছাড়িয়া নড়ে না—তাহারা জানে না ইহার বৈচিত্র্য। দূরপ্রবাসে আত্মীয়-স্বজনশূন্য স্থানে দীর্ঘদিন যে বাস করিয়াছে, সে জানে বাংলা দেশের জন্য, বাঙালীর জন্য, নিজের গ্রামের জন্য, দেশের প্রিয় আত্মীয়স্বজনের জন্য মন কি রকম হু-হু করে, অতি তুচ্ছ পুরাতন ঘটনাও তখন অপূর্ব বলিয়া মনে হয়—মনে হয় যাহা হইয়া গিয়াছে, জীবনে আর তাহা হইবার নহে—পৃথিবী উদাস হইয়া যায়, বাংলা দেশের প্রত্যেক জিনিসটা অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।

এখানে বছরের পর বছর কাটাইয়া আমারও ঠিক সেই অবস্থা ঘটিয়াছে। কতবার সদরে ছুটির জন্য চিঠি লিখিব ভাবিয়াছি, কিন্তু কাজ এত বেশী সব সময়েই হাতে আছে যে, ছুটি চাহিতে সঙ্কোচ বোধ হয়। অথচ এই জনশূন্য পাহাড়-জঙ্গলে, বাঘ ভালুক নীলগাইয়ের দেশে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একা কাটানো যে কি কষ্ট! প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে এক-এক সময়, বাংলা দেশ ভুলিয়া গিয়াছি, কত কাল দুর্গোৎসব দেখি নাই, চড়কের ঢাক শুনি নাই, দেবালয়ের ধুনাগুগ্‌গুলের সৌরভ পাই নাই, বৈশাখী প্রভাতে পাখীর কলকূজন উপভোগ করি নাই—বাংলার গৃহস্থালির সে শান্ত পূত ঘরকন্না, জলচৌকিতে পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র, পিঁড়িতে আলপনা, কুলুঙ্গীতে লক্ষ্মীর কড়ির চুপড়ি—সে সব যেন বিস্মৃত অতীত এক জীবন-স্বপ্ন!

শীত গিয়া যখন বসন্ত পড়িয়াছে তখন আমার এই ভাবটা অত্যন্ত বেশী বাড়িল।

সেই অবস্থায় ঘোড়ায় চড়িয়া সরস্বতী কুণ্ডীর ওদিকে বেড়াইতে গেলাম। একটা নীচু উপত্যকায় ঘোড়া হইতে নামিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার চারিদিক ঘিরিয়া উঁচু মাটির পাড়, তাহার উপর দীর্ঘ দীর্ঘ কাশ ও বনঝাউয়ের ঘন জঙ্গল। ঠিক আমার মাথার উপরে খানিকটা নীল আকাশ। একা কণ্টকময় গাছে বেগুনী রঙের ঝাড় ঝাড় ফুল ফুটিয়াছে, বিলাতী কর্ণফ্লাওয়ার ফুলের মত দেখিতে। একটা ফুলের বিশেষ কোনো শোভা নাই, অজস্র ফুল একত্র দলবদ্ধ হইয়া অনেকখানি জায়গা জুড়িয়া দেখাইতেছে ঠিক বেগুনী রঙের একখানি শাড়ীর মত। বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন অর্ধশুষ্ক কাশ-জঙ্গলের তলায় ইহারা খানিকটা স্থানে বসন্তোৎসবে মাতিয়াছে—ইহাদের উপরে প্রবীণ, বিরাট বনঝাউয়ের স্তব্ধ রুক্ষ অরণ্য এদের ছেলেমানুষিকে নিতান্ত অবজ্ঞা ও উপেক্ষার

চোখে দেখিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া প্রবীণতার ধৈর্যে তাহা সহ্য করিতেছে। সেই বেগুনী রঙের জংলী ফুলগুলিই আমার কানে শুনাইয়া দিল বসন্তের আগমন-বাণী। বাতাবী লেবুর ফুল নয়, ঘেঁটুফুল নয়, আম্রমুকুল নয়, কামিনীফুল নয়, রক্তপলাশ বা শিমুল নয়, কি একটা নামগোত্রহীন রূপহীন নগণ্য জংলী কাঁটাগাছের ফুল। আমার কাছে কিন্তু তাহাই কাননভরা বনভরা বসন্তের কুসুমরাজির প্রতীক হইয়া দেখা দিল। কতক্ষণ সেখানে একমনে দাঁড়াইয়া রহিলাম, বাংলা দেশের ছেলে আমি, কতকগুলি জংলী কাঁটার ফুল যে ডালি সাজাইয়া বসন্তের মান রাখিয়াছে এ দৃশ্য আমার কাছে নূতন। কিন্তু কি গম্ভীর শোভা উঁচু ডাঙার উপরকার অরণ্যের! কি ধ্যানস্তিমিত, উদাসীন, বিলাসহীন, সন্ন্যাসীর মত রুক্ষ বেশ তার, অথচ কি বিরাট! সেই অর্ধশুষ্ক, পুষ্পপত্রহীন বনের নিস্পৃহ আত্মার সহিত ও নিম্নের এই বন্য, বর্বর, তরুণদের বসন্তোৎসবের সকল নিরাড়ম্বর প্রচেষ্টার উচ্ছ্বসিত আনন্দের সহিত আমার মন এক হইয়া গেল।

সে আমার জীবনের এক পরম বিচিত্র মুহূর্ত। কতক্ষণ দাঁড়াইয়া আছি, দু-একটা নক্ষত্র উঠিল মাথার উপরকার সেই নীল আকাশের ফালিটুকুতে, এমন সময় ঘোড়ার পায়ের শব্দে চমকাইয়া উঠিয়া দেখি, আমীন পূরণচাঁদ নাঢ়া বইহারের পশ্চিম সীমানায় জরীপের কাজ শেষ করিয়া কাছারি ফিরিতেছে। আমায় দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া বলিল—হুজুর এখানে? তাহাকে বলিলাম, বেড়াইতে আসিয়াছি।

সে বলিল—একা এখানে থাকবেন না সন্ধ্যাবেলা, চলুন কাছারিতে। জায়গাটা ভাল নয়, আমার টিণ্ডেল স্বচক্ষে দেখেছে হুজুর। খুব বড় বাঘ, ওধারের ওই কাশের জঙ্গলে—আসুন, হুজুর।

পিছনে অনেক দূরে পূরণচাঁদের টিণ্ডেল গান ধরিয়াছে ঃ—

দয়া হোই জী—

সেই দিন হইতে ঐ কাঁটার ফুল দেখিলেই আমার মন হু-হু করিয়া উঠিত বাংলা দেশের জন্য। আর ঠিক কি পূরণচাঁদের টিণ্ডেল ছট্টুলাল প্রতি সন্ধ্যায় নিজের ঘরে রুটি সেঁকিতে সেঁকিতে ঐ গানই গাহিবে—

দয়া হোই জী—

ভাবিতাম, আসন্ন ফাল্গুন বলায় আম্রবউলের গন্ধভরা ছায়ায় শিমূলফুলফোটা নদীচরের এপারে দাঁড়াইয়া কোকিলের কূজন শুনিবার সুযোগ এ জীবনে বুঝি আর মিলিবে না, এই বনেই বেঘোরে বাঘ বা বন্যমহিষের হাতে কোন্‌দিন প্রাণ হারাইতে হইবে।

বনঝাউ-বন তেমনই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত, দূর বনলীন দিগ্বলয় তেমনই ধূসর, উদাসীন দেখাইত।

এমনি এক দেশের-জন্য-মন কেমন-করা দিনে রাসবিহারী সিং-এর বাড়ী হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইলাম। রাসবিহারী সিং এ অঞ্চলের দুর্দান্ত মহাজন, জাতিতে রাজপুত, কারো নদীর তীরবর্তী গবর্ণমেন্ট খাসমহালের প্রজা। তাহার গ্রাম কাছারি হইতে বারো-চৌদ্দ মাইল উত্তরপূর্ব কোণে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের গায়ে।

নিমন্ত্রণ না রাখিলেও ভাল দেখায় না, কিন্তু রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে যাইতে আমার নিতান্ত অনিচ্ছা। এ-অঞ্চলের যত গরীব গাঙ্গোতা জাতীয় প্রজার মহাজন হইল সে। গরীবকে মারিয়া তাদের রক্ত চুষিয়া নিজে বড়লোক হইয়াছে। তাহার কড়া শাসন ও অত্যাচারে কাহারও টুঁ-শব্দটি করিবার যো নাই। বেতন বা জমিভোগী লাঠিয়াল পাইকের দল লাঠিহাতে সর্বদা ঘুরিতেছে, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আসিয়া হাজির করিবে। যদি কোন রকমে রাসবিহারীর মনে হইল অমুক বিষয়ে অমুক তাহাকে যথেষ্ট মর্যাদা দেয় নাই বা তাহার প্রাপ্য সম্মান ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, তাহা হইলে সে হতভাগ্যের আর রক্ষা নাই। রাসবিহারী সিং ছলে-বলে-কৌশলে তাহাকে জব্দ করিয়া রীতিমত শিক্ষা দিয়া ছাড়িবেই।

আমি আসিয়া দেখি রাসবিহারী সিং-ই এদেশের রাজা। তাহার কথায় গরীব গৃহস্থ প্রজা থরহরি কাঁপে, অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন লোকেও কিছু বলিতে সাহস করে না, কেননা রাসবিহারীর লাঠিয়াল-দল বিশেষ দুর্দান্ত, মারধর দাঙ্গা-হাঙ্গামায় তাহারা বিশেষ পটু। পুলিসও নাকি রাসবিহারীর হাতে আছে। খাসমহালের সার্কেল অফিসার বা ম্যানেজার আসিয়া রাসবিহারী সিং-এর বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এ অবস্থায় কাহাকে গ্রাহ্য করিবে এ জঙ্গলের মধ্যে?

আমার প্রজার উপর রাসবিহারী সিং প্রভুত্ব জাহির করিবার চেষ্টা করে—তাহাতে আমি বাধা দিই। আমি স্পষ্ট জানাইয়া দিই, তোমাদের নিজেদের এলাকার মধ্যে যা হয় করিও, কিন্তু আমার মহালের কোনও প্রজার কেশাগ্র স্পর্শ করিলে আমি তাহা সহ্য করিব না। গত বৎসর এই ব্যাপার লইয়া রাসবিহারী সিং-এর লাঠিয়াল-দলের সঙ্গে আমার কাছারির মুকুন্দি চাকলাদার ও গণপৎ তহশীলদারের সিপাহীদের একটা ক্ষুদ্র রকমের মারামারি হইয়া যায়। গত শ্রাবণ মাসেও আবার একটা গোলমাল বাধিয়াছিল। তাহাতে ব্যাপার পুলিস পর্যন্ত গড়ায়। পুলিসের দারোগা আসিয়া সেটা মিটাইয়া দেয়। তাহার পর কয়েক মাস যাবৎ রাসবিহারী সিং আমার মহালের প্রজাদের কিছু বলে না।

সেই রাসবিহারী সিং-এর নিকট হইতে হোলির নিমন্ত্রণ পাইয়া বিস্মিত হইলাম।

গণপৎ তহশীলদারকে ডাকিয়া পরামর্শ করিতে বসি। গণপৎ বলিল—কি জানি হুজুর, ও লোকটাকে বিশ্বাস নেই। ও সব পারে, কি মতলবে আপনাকে নিয়ে যেতে চায় কে জানে? আমার মতে না যাওয়াই ভাল।

আমার কিন্তু এ-মত মনঃপূত হইল না। হোলির নিমন্ত্রণে না গেলে রাসবিহারী অত্যন্ত অপমান বোধ করিবে। কারণ হোলির উৎসব রাজপুতদের একটা প্রধান উৎসব। হয়ত ভাবিতে পারে যে, ভয়ে আমি গেলাম না। তা যদি ভাবে, সে আমার পক্ষে ঘোর অপমানের বিষয়। না, যাইতেই হইবে, যা থাকে অদৃষ্টে।

কাছারির প্রায় সকলেই আমায় নানা-মতে বুঝাইল। বৃদ্ধ মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আপনি এ-সব দেশের গতিক জানেন না। এখানে হট্ বলতে খুন করে বসে। জাহিল আদমির দেশ, লেখাপড়া-জানা লোক তো নেই। তা ছাড়া রাসবিহারী অতি ভয়ানক মানুষ। কত খুন করেছে জীবনে, তার লেখাজোখা আছে হুজুর? ওর অসাধ্য কাজ নেই—খুন, ঘর-জ্বালানি, মিথ্যে মোকদ্দমা খাড়া করা, ও সবতাতেই মজবুত।

ও-সব কথা কানে না তুলিয়াই খাসমহালে রাসবিহারীর বাড়ী গিয়া পৌঁছিলাম। খোলায় ছাওয়া ইটের দেওয়ালওয়ালা ঘর, যেমন এ-দেশে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ী হইয়া থাকে। বাড়ীর সামনে বারান্দা, তাতে কাঠের খুঁটি আলকাতরা-মাখানো। দুখানা দড়ির চারপাই, তাতে জনদুই লোক বসিয়া ফর্সিতে তামাক খাইতেছে।

আমার ঘোড়া উঠানের মাঝখানে গিয়া দাঁড়াইতেই কোথা হইতে গুড়ুম গুড়ুম করিয়া দুটি বন্দুকের আওয়াজ হইল। রাসবিহারী সিং-এর লোক আমায় চেনে, তাহারা স্থানীয় রীতি অনুসারে বন্দুকের আওয়াজ দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করিল, ইহা বুঝিলাম। কিন্তু গৃহস্বামী কোথায়? গৃহস্বামী না আসিয়া দাঁড়াইলে ঘোড়া হইতে নামিবার প্রথা নাই।

একটু পরে রাসবিহারী সিং-এর বড় ভাই রাসউল্লাস সিং আসিয়া বিনীত সুরে দুই হাত সামনে তুলিয়া বলিল—আইয়ে জনাব, গরীবখানামে তস্‌রিফ লেতে আইয়ে—। আমার মনের অস্বস্তি ঘুচিয়া গেল। রাজপুত জাতি অতিথি বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার অনিষ্ট করে না। কেহ আসিয়া অভ্যর্থনা না করিলে ঘোড়া হইতে না নামিয়া ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া দিতাম কাছারির দিকে।

উঠানে বহু লোক। ইহারা অধিকাংশই গাঙ্গোতা প্রজা। পরনের মলিন ছেঁড়া কাপড় আবীর ও রঙে ছোপানো, নিমন্ত্রণে বা বিনা-নিমন্ত্রণে মহাজনের বাড়ী হোলি খেলিতে আসিয়াছে।

আধ-ঘণ্টা পরে রাসবিহারী সিং আসিল এবং আমায় দেখিয়া যেন অবাক হইয়া গেল। অর্থাৎ

আমি যে তাহার বাড়ী নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইব, ইহা যেন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই। যাহা হউক, রাসবিহারী আমায় যথেষ্ট খাতির-যত্ন করিল।

পাশের যে ঘরে আমায় লইয়া গেল, সেটায় থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই-তিন সিসম কাঠের দেশী ছুতারের হাতে তৈরী খুব মোটা মোটা পায়া ও হাতলওয়ালা চেয়ার এবং একখানা কাঠের বেঞ্চি। দেওয়ালে সিন্দুর-চন্দন-লিপ্ত একটি গণেশমূর্তি।

একটু পরে একটি বালক একখানা বড় থালা লইয়া আমার সামনে ধরিল। তাহাতে কিছু আবীর, কিছু ফুল, কয়েকটি টাকা, গোটাকতক চিনির এলাচদানা ও মিছরিখণ্ড, একছড়া ফুলের মালা। রাসবিহারী সিং আমার কপালে কিছু আবীর মাখাইয়া দিল, আমিও তাহার কপালে আবীর দিলাম, ফুলের মালাগাছি তুলিয়া লইলাম। আর কি করিতে হইবে না বুঝিতে পারিয়া আনাড়ি ভাবে থালার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া রাসবিহারী সিং বলিল—আপনার নজর, হুজুর। ও আপনাকে নিতে হবে। আমি পকেট হইতে আর কিছু টাকা বাহির করিয়া থালার টাকার সঙ্গে মিশাইয়া বলিলাম—সকলকে মিষ্টিমুখ করাও এই দিয়ে।

রাসবিহারী সিং তাব পর আমাকে তাহার ঐশ্বর্য দেখাইয়া লইয়া বেড়াইল। গোয়ালে প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি গরু। সাত-আটটি ঘোড়া আস্তাবলে—দুটি ঘোড়া নাকি অতি সুন্দর নাচিতে পারে, একদিন নাচ আমায় সে দেখাইবে। হাতী নাই কিন্তু শীঘ্র কিনিবার ইচ্ছা আছে। এ-দেশে হাতী না থাকিলে সে সম্ভ্রান্ত লোক হয় না। আট-শ মণ গম চাষে উৎপন্ন হয়, দু-বেলায় আশী-পঁচাশীজন লোক খায়, সে নিজে সকালে নাকি দেড় সের দুধ ও এক সের বিকানীর মিছরি স্নানান্তে জলযোগ করে। বাজারের সাধারণ মিছরি সে কখনও খায় না, বিকানীর মিছরি ছাড়া। মিছরি খাইয়া জলযোগ যে করে, সে এ-দেশে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়—বড়লোকের উহা আর একটি লক্ষণ।

তাব পর রাসবিহারী একটা ঘরে আমায় লইয়া গেল, সে ঘরের হইতে দু-হাজার আড়াই-হাজার ছড়া ভুট্টা ঝুলিতেছে। এগুলি ভুট্টার বীজ, আগামী বৎসরের চাষের জন্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। একখানা লোহার কড়া আমায় দেখাইল, লোহার চাদর গুল্-বসানো পেরেক দিয়া জুড়িয়া কড়াখানা তৈরি, তাতে দেড় মণ দুধ একসঙ্গে জ্বাল দেওয়া হয় প্রত্যহ। তাহার সংসারে প্রত্যহই ঐ পরিমাণ দুধ খরচ হয়। একটা ছোট ঘরে লাঠি, ঢাল, সড়কি, বর্শা, টাঙ্গি, তলোয়ার এত অগুন্তি যে সেটাকে রীতিমত অস্ত্রাগার বলিলেও চলে।

রাসবিহারী সিং-এর ছয়জন ছেলে—জ্যেষ্ঠ পুত্রটির বয়স ত্রিশের কম নয়। প্রথম চারটি ছেলে বাপের মতই দীর্ঘকায়, জোয়ান, গোঁফ ও গালপাট্টার বহর এরই মধ্যে বেশ। তাহার ছেলেদের ও তাহার অস্ত্রাগার দেখিয়া মনে হইল দরিদ্র, অনাহারজীর্ণ গাঙ্গোতা প্রজাগণ যে ইহাদের ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া থাকবে ইহা আর বেশী কথা কি!

রাসবিহারী অত্যন্ত দাম্ভিক ও রাশভারী লোক। তাহার মানের জ্ঞানও বিলক্ষণ সজাগ। পান হইতে চুন খসিলেই রাসবিহারী সিং-এর মান যায়, সুতরাং তাহার সহিত ব্যবহার করিতে গেলে সর্বদা সতর্ক ও সন্ত্রস্ত থাকিতে হয়। গাঙ্গোতা প্রজাগণ তো সর্বদা তটস্থ অবস্থায় আছে, কি জানি কখন মনিবের মানের ত্রুটি ঘটে।

বর্বর প্রাচুর্য বলিতে যা বুঝায়, তাহার জাজ্বল্যমান চিত্র দেখিলাম রাসবিহারীর সংসারে। যথেষ্ট দুধ, যথেষ্ট গম, যথেষ্ট ভুট্টা, যথেষ্ট বিকানীর মিছরী, যথেষ্ট মান, যথেষ্ট লাঠিসোঁটা। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে? ঘরে একখানা ভাল ছবি নাই, ভাল বই নাই, ভাল কৌচ-কেদারা দূরের কথা, ভাল তাকিয়া-বালিস-সাজানো বিছানাও নাই। দেওয়ালে চুনের দাগ, পানের দাগ, বাড়ীর পিছনের নর্দমা অতি কদর্য নোংরা জল ও আবর্জনায় বোজানো, গৃহ-স্থাপত্য অতি কুশ্রী। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে না, নিজেদের পরিচ্ছদ ও জুতা অত্যন্ত মোটা ও আধময়লা। গত বৎসর বসন্ত রোগে বাড়ীর তিন-চারটি ছেলেমেয়ে এক মাসের মধ্যে মারা গিয়াছে। এ বর্বর প্রাচুর্য তবে কোন্ কাজে লাগে? নিরীহ গাঙ্গোতা প্রজা

ঠেঙাইয়া এ প্রাচুর্য অর্জন করার ফলে কাহার কি সুবিধা হইতেছে? অবশ্য রাসবিহারী সিং-এর মান বাড়িতেছে।

ভোজ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য দেখিয়া কিন্তু তাক্ লাগিল। এত কি একজনে খাইতে পারে? হাতীর কানের মত বৃহদাকার পুরী খান-পনের, খুরিতে নানা রকম তরকারি, দই, লাড্ডু, মালপোয়া, চাটনি, পাঁপর। আমার তো এ চার বেলার খোরাক। রাসবিহারী সিং নাকি একা এর দ্বিগুণ আহার্য উদরস্থ করিয়া থাকে একবারে।

আহার শেষ করিয়া যখন বাহিরে আসিলাম, তখন বেলা আর নাই। গাঙ্গোতা প্রজার দল উঠানে পাতা পাতিয়া দই ও চীনা ঘাসের ভাজা দানা মহাআনন্দে খাইতে বসিয়াছে। সকলের কাপড় লাল রঙে রঞ্জিত, সকলেব মুখে হাসি। রাসবিহারীর ভাই গাঙ্গোতাদেব খাওয়ানোর তদারক করিয়া বেড়াইতেছে। ভোজনের উপকবণ অতি সামান্য, তাতেই ওদের খুশি ধরে না।

অনেক দিন পবে এখানে সেই বালক-নর্তক ধাতুরিয়ার নাচ দেখিলাম। ধাতুরিয়া আর একটু বড় হইয়াছে, নাচেও আগের চেয়ে অনেক ভাল। হোলি-উৎসবে এখানে নাচিবার জন্য তাহাকে বায়না করিয়া আনা হইয়াছে।

ধাতুরিয়াকে কাছে ডাকিয়া বলিলাম—চিনতে পার ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাসিয়া সেলাম করিয়া বলিল—জী হুজুর। আপনি ম্যানেজারবাবু। ভাল আছেন হুজুর?

ভারী সুন্দর হাসি ওর মুখে। আর ওকে দেখিলেই মনে কেমন একটা অনুকম্পা ও করুণার উদ্রেক হয়। সংসারে আপন বলিতে কেহ নাই, এই বয়সে নাচিয়া গাইয়া পরের মন যোগাইয়া পয়সা রোজগাব করিতে হয়, তাও রাসবিহারী সিং-এর মত ধনগর্বিত অরসিকদের গৃহ-প্রাঙ্গণে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে তো অর্ধেক রাত পর্যন্ত নাচতে গাইতে হবে, মজুরী কি পাবে?

ধাতুরিয়া বলিল—চার আনা পয়সা হুজুর, আর খেতে দেবে পেট ভরে।

—কি খেতে দেবে?

—মাঢা, দই, চিনি। লাড্ডু দেবে বোধ হয়, আর-বছর তো দিয়েছিল।

আসন্ন ভোজ খাইবার লোভে ধাতুরিয়া খুব প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। বলিলাম—সব জায়গায় কি এই মজুরী?

ধাতুরিয়া বলিল—না হুজুর, রাসবিহারী সিং বড়মানুষ, তাই চার আনা দেবে আর খেতেও দেবে। গাঙ্গোতাদেব বাড়ী নাচলে দেয় দু আনা, খেতে দেয় না, তবে আধ সের মকাইয়ের ছাতু দেয়।

—এতে চলে?

—বাবু, নাচে কিছু হয় না, আগে হত। এখন লোকের কষ্ট, নাচ দেখবে কে? যখন নাচের বায়না না থাকে, ক্ষেতে-খামারে কাজ করি। আর-বছর গম কেটেছিলাম। কি করি হুজুর, খেতে তো হবে। এতে শখ করে ছক্করবাজি নাচ শিখেছিলাম গয়া থেকে—কেউ দেখতে চায় না, ছক্করবাজি নাচের মজুরী বেশী।

ধাতুরিয়াকে আমি কাছারিতে নাচ দেখাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম। ধাতুরিয়া শিল্পী লোক—সত্যিকার শিল্পীর নিস্পৃহতা ওর মধ্যে আছে।

পূর্ণিমার জ্যোৎস্না খুব ফুটিলে রাসবিহারী সিং-এর নিকট বিদায় লইলাম। রাসবিহারী সিং পুনরায় দুটি বন্দুকের আওয়াজ করিল, আমার ঘোড়া উহাদের উঠান পার হইবার সঙ্গে সঙ্গে, আমার সম্মানের জন্য।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রি। উদার, মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে সাদা বালির রাস্তা জ্যোৎস্না-সম্পাতে চিক্‌চিক্

করিতেছে। দূরে একটা সিল্লী পাখী জ্যোৎস্নারাতে কোথায় ডাকিতেছে—যেন এই বিশাল, জনহীন প্রান্তরের মধ্যে পথহারা কোনো বিপন্ন নৈশ-পথিকের আকুল কণ্ঠস্বর!

পিছন হইতে কে ডাকিল—হুজুর, ম্যানেজারবাবু—

চাহিয়া দেখি ধাতুরিয়া আমার ঘোড়ার পিছু পিছু ছুটিতেছে।

ঘোড়া থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া হাঁপাইতেছিল। একটুখানি দাঁড়াইয়া দম লইয়া, একটু ইতস্তত করিয়া পরিশেষে লাজুক মুখে বলিল—একটা কথা বলছিলাম, হুজুর—

তাহাকে সাহস দিবার সুরে বলিলাম—কি, বল না?

—হুজুরের দেশে কলকাতায় আমায় একবার নিয়ে যাবেন?

—কি করবে সেখানে গিয়ে?

—কখনও কলকাতায় যাই নি, শুনেছি সেখানে গাওনা-বাজনা-নাচের বড় আদর। ভাল ভাল নাচ শিখেছিলাম, কিন্তু এখানে দেখবার লোক নেই, তাতে বড় দুঃখ হয়। ছক্করবাজি নাচটা না নেচে ভুলে যেতে বসেছি। উঃ, কি করেই ওই নাচটা শিখি! সে কথা শোনার জিনিস।

গ্রামটা ছাড়াইয়াছিলাম। ধূ-ধূ জ্যোৎস্নালোকিত মাঠ। ভাবে বোধ হইল ধাতুরিয়া লুকাইয়া আমার সহিত দেখা করিতে চায়, রাসবিহারী সিং টের পাইলে শাসন করিবে এই ভয়ে। নিকটেই মাঠের মধ্যে একটা ফুলে-ভর্তি শিমুল চারা। ধাতুরিয়ার কথা শুনিয়া শিমুল গাছটার তলায় ঘোড়া হইতে নামিয়া একখণ্ড পাথরের উপর বসিলাম। বলিলাম—বল তোমার গল্প।

—সবাই বলত গয়া জেলায় এক গ্রামে ভিটলদাস বলে একজন গুণীলোক আছে, সে ছক্করবাজি নাচের মস্ত ওস্তাদ। আমার ঝোঁক ছিল ছক্করবাজি যে করে হোক শিখবই। গয়া জেলাতে চলে গেলাম, গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরি আর ভিটলদাসের খোঁজ করি। কেউ বলতে পারে না। শেষকালে একদিন সন্ধ্যার সময় একটা আহীরদের মহিষের বাথানে আশ্রয় নিয়েছি, সেখানে শুনলাম ছক্করবাজি নাচ নিয়ে তাদের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছে। অনেক রাত তখন, শীতও খুব। আমি বিচালি পেতে বাথানের এক কোণে শুয়ে ছিলাম, যেমন ছক্করবাজির কথা কানে যাওয়া অমনি লাফিয়ে উঠেছি। ওদের কাছে এসে বসি। কি খুশীই যে হলাম হুজুর সে আর কি বলব! যেন একটা কি তালুক পেয়ে গিয়েছি। ওদের কাছে ভিটলদাসের সন্ধান পেলাম। ওখান থেকে সতের ক্রোশ রাস্তা তিনটাঙা বলে গ্রামে তাঁর বাড়ী।

বেশ লাগিতেছিল একজন তরুণ শিল্পীর শিল্পশিক্ষার আকুল আগ্রহের গল্প। বলিলাম, তার পর?

—হেঁটে সেখানে গেলাম। ভিটলদাস দেখি বুড়ো মানুষ। একমুখ সাদা দাড়ি। আমায় দেখে বললেন—কি চাই? আমি বলিলাম—আমি ছক্করবাজি নাচ শিখতে এসেছি। তিনি যেন অবাক হয়ে গেলেন। বললেন—আজকালকার ছেলেরা এ পছন্দ করে? এ তো লোকে ভুলেই গিয়েছে। আমি তাঁর পায়ে হাত দিয়ে বললাম—আমায় শেখাতে হবে, বহুদূর থেকে আসছি আপনার নাম শুনে। তাঁর চোখ দিয়ে জল এল। বললেন—আমার বংশে সাতপুরুষ ধরে এই নাচের চর্চা। কিন্তু আমার ছেলে নেই, বাইরের কেউ এসে শিখতেও চায় নি আমার এত বয়স হয়েছে, এর মধ্যে। আজ তুমি প্রথম এলে। আচ্ছা, তোমায় শেখাব।—তা বুঝলেন হুজুর, এত কষ্ট করে শেখা জিনিস। এখানে গাঙ্গোতাদের দেখিয়ে কি করব? কলকাতায় গুণের আদর আছে। সেখানে নিয়ে যাবেন, হুজুর?

বলিলাম—আমার কাছারিতে একদিন এসো ধাতুরিয়া, এ-সম্বন্ধে কথা বলব।

ধাতুরিয়া আশস্ত হইয়া চলিয়া গেল।

আমার মনে হইল উহার এত কষ্ট করিয়া শেখা গ্রাম্য নাচ কলিকাতায় কে-ই বা দেখিবে, আর ও বেচারী একা সেখানে কি-ই বা করিবে?

অষ্টম পরিচ্ছেদ

১

প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন, তা অতি অমূল্য দান। অনেক দিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না। আর কি ঈর্ষার স্বভাব প্রকৃতিরাণীর—প্রকৃতিকে যখন চাহিব, তখন প্রকৃতিকে লইয়াই থাকিতে হইবে, অন্য কোনো দিকে মন দিয়াছি যদি, অভিমানিনী কিছুতেই তাঁর অবগুণ্ঠন খুলিবেন না।

কিন্তু অনন্যমনা হইয়া প্রকৃতিকে লইয়া ডুবিয়া থাকো, তাঁর সর্ববিধ আনন্দের বর, সৌন্দর্যের বর, অপূর্ব শান্তির বর তোমার উপর অজস্রধারে এত বর্ষিত হইবে, তুমিং দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিবে, দিনরাত মোহিনী প্রকৃতিরাণী তোমাকে শতরূপে মুগ্ধ করিবেন, নূতন দৃষ্টি জাগ্রত করিয়া তুলিবেন, মনের আয়ু বাড়াইয়া দিবেন, অমরলোকের আভাসে অমরত্বের প্রান্তে উপনীত করাইবেন।

কয়েক বারের কথা বলি। সে অমূল্য অনুভূতিরাজির কথা বলিতে গেলে লিখিয়া পাতার পর পাতা ফুরাইয়া যায়, কিন্তু তবু বলা শেষ হয় না, যা বলিতে চাহিতেছি তাহার অনেকখানিই বাকি থাকিয়া যায়। এসব শুনিবার লোকও সংখ্যায় অত্যন্ত কম, ক'জন মনে-প্রাণে প্রকৃতিকে ভালবাসে?

অরণ্য-প্রান্তরে লটুলিয়ার মাঠে মাঠে দুধলি ঘাসের ফুল ফুটাইয়া জানাইয়া দেয় যে বসন্ত পড়িয়াছে। সে ফুলও বড় সুন্দর, দেখিতে নক্ষত্রের মত আকৃতি, রং হলদে, লম্বা লম্বা সরু লতার মত ঘাসের ডাঁটাটা অনেকখানি জমি জুড়িয়া মাটি আঁকড়াইয়া থাকে, নক্ষত্রাকৃতি হলদে ফুল ধরে তার গাঁটে গাঁটে। ভোরে মাঠ, পথের ধার সর্বত্র আলো করিয়া ফুটিয়া থাকিত—কিন্তু সূর্যের তেজ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে সব ফুল কুঁক্‌ড়িয়া পুনরায় কুঁড়ির আকার ধারণ করিত—পরদিন সকালে আবার সেই কুঁড়িগুলিই দেখিতাম ফুটিয়া আছে।

রক্তপলাশের বাহার আছে মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে ও আমাদের সীমানার বাহিরের জঙ্গলে কিংবা মহালিখারূপের শৈলসানুপ্রদেশে। আমাদের মহাল হইতে সে-সব স্থান অনেক দূরে, ঘোড়ায় তিন-চার ঘণ্টা লাগে। সে-সব জায়গায় চৈত্রে শালমঞ্জুরীব সুবাসে বাতাস মাতাইয়া রাখে, শিমুল বনে দিগন্তরেখা রাঙাইয়া দেয়, কিন্তু কোকিল, দোয়েল, বৌ-কথা-কও প্রভৃতি গায়ক পাখীরা ডাকে না, এ-সব জনহীন অরণ্য-প্রান্তরের যে ছন্ন-ছাড়া রূপ, বোধহয় তাহারা তাহা পছন্দ করে না।

এক-এক দিন বাংলা দেশে ফিরিবার জন্য মন হাঁপাইয়া উঠিত, বাংলা দেশের পল্লীর সে সুমধুর বসন্ত কল্পনায় দেখিতাম, মনে পড়িত বাঁধানো পুকুরঘাটে স্নানান্তে আর্দ্রবস্ত্রে গমনরতা কোন তরুণী বধূর ছবি, মাঠের ধারে ফুলফোটা ঘেঁটুবন, বাতাবীলেবু ফুলের সুগন্ধে মোহময় ঘন-ছায়া-ভরা অপরাহ্ণ। দেশকে কী ভাল করিয়াই চিনিলাম বিদেশে গিয়া! দেশের জন্য এই মনোবেদনা দেশে থাকিতে কখনও অনুভব করি নাই, জীবনে এ একটা বড় অনুভূতি, যে ইহার আস্বাদ না পাইল, সে হতভাগ্য একটা শ্রেষ্ঠ অনুভূতির সহিত অপরিচিত রহিয়া গেল।

কিন্তু যে-কথাটা বার-বার নানা ভাবে বলিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু কোনো বারই ঠিকমত বুঝাইতে পারতেছি না, সেটা হইতেছে এই প্রকৃতির একটা রহস্যময় অসীমতার, দুরধিগম্যতার, বিরাটত্বের ও ভয়াল গা-ছম-ছম-করানো সৌন্দর্যের দিকটা। না দেখিলে কি করিয়া বুঝাইব সে কী জিনিস!

জনশূন্য বিশাল লবটুলিয়া বইহারের দিগন্তব্যাপী দীর্ঘ বনঝাউ ও কাশের বনের নিস্তব্ধ অপরাহ্ণে একা ঘোড়ার উপর বসিয়া এখানকার প্রকৃতির এই রূপ আমার সারা মনকে অসীম রহস্যানুভূতিতে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে, কখনও তাহা আসিয়াছে ভয়ের রূপে, কখনও আসিয়াছে একটা নিস্পৃহ,

উদাস, গম্ভীর মনোভাবের রূপে, কখনও আসিয়াছে কত মধুময় স্বপ্ন, দেশ-বিদেশের নর-নারীর বেদনার রূপে। সে যেন খুব উচ্চদরের নীরব সঙ্গীত—নক্ষত্রের ক্ষীণ আলোর তালে, জ্যোৎস্নারাত্রের অবাস্তবতায়, ঝিল্লীর তানে, ধাবমান উল্কার অগ্নিপুচ্ছের জ্যোতিতে তার লয়-সঙ্গতি।

সে-রূপ তাহার না দেখাই ভাল, যাহাকে ঘরদুয়ার বাঁধিয়া সংসার করিতে হইবে। প্রকৃতির সে মোহিনীরূপের মায়া মানুষকে ঘরছাড়া করে, উদাসীন ছন্নছাড়া ভবঘুরে হ্যারি জন্‌স্টন্, মার্কো পোলো, হাডসন, শ্যাকল্‌টন করিয়া তোলে—গৃহস্থ সাজিয়া ঘরকন্না করিতে দেয় না—অসম্ভব তাহার পক্ষে ঘরকন্না করা একবার সে-ডাক যে শুনিয়াছে, সে অনবগুণ্ঠিতা মোহিনীকে একবার যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

গভীর রাত্রে ঘরের বাহিরে একা আসিয়া দাঁড়াইয়া দেখিয়াছি, অন্ধকার প্রান্তরের অথবা ছায়াহীন ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রির রূপ। তাব সৌন্দর্যে পাগল হইতে হয়—একটুও বাড়াইয়া বলিতেছি না—আমার মনে হয় দুর্বলচিত্ত মানুষ যাহারা, তাহাদের পক্ষে সে-রূপ না দেখাই ভাল, সর্বনাশী রূপ সে, সকলের পক্ষে তার টাল সামলানো বড় কঠিন।

তবে একথাও ঠিক, প্রকৃতিকে সে-রূপে দেখাও ভাগ্যের ব্যাপার। এমন বিজন বিশাল উন্মুক্ত অরণ্য-প্রান্তর, শৈলমালা, বনঝাউ আর কাশের বন কোথায় যেখানে-সেখানে? তার সঙ্গে যোগ চাই গভীর নিশীথিনীর নীরবতার ও তার অন্ধকার বা জ্যোৎস্নার—এত যোগাযোগ সুলভ হইলে পৃথিবীতে কবি আর পাগলে দেশ ছাইয়া যাইত না?

একদিন প্রকৃতির সে-রূপ কিভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, সে-ঘটনা বলি।

পূর্ণিয়া হইতে উকিলের 'তার' পাইলাম পরদিন সকাল দশটার মধ্যে আমায় সেখানে হাজির হইতে হইবে। অন্যথায় স্টেটের একটা বড় মোকদ্দমায় আমাদের হার সুনিশ্চিত।

আমাদের মহাল হইতে পূর্ণিয়া পঞ্চান্ন মাইল দূরে। রাত্রের ট্রেন মাত্র একখানি, যখন 'তার' হস্তগত হইল তখন সতের মাইল দূরবর্তী কাটারিয়া স্টেশনে গিয়া সে-ট্রেন ধরা অসম্ভব।

ঠিক হইল এখনই ঘোড়ায় রওনা হইতে হইবে।

কিন্তু পথ সুদীর্ঘ বটে, বিপদসঙ্কুলও বটে, বিশেষ করিয়া এই রাত্রিকালে, এই আরণ্য-অঞ্চলে। সুতরাং তহশীলদার সুজন সিং আমার সঙ্গে যাইবে ইহাও ঠিক হইল।

সন্ধ্যায় দুজনে ঘোড়া ছাড়িলাম। কাছারি ছাড়িয়া জঙ্গল পড়িতেই কিছু পরে কৃষ্ণা তৃতীয়ার চাঁদ উঠিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় বন-প্রান্তর আরও অদ্ভুত দেখাইতেছে। পাশাপাশি দু'জনে চলিয়াছি—আমি আর সুজন সিং। পথ কখনও উঁচু, কখনও নীচু, সাদা বালির উপর জ্যোৎস্না পড়িয়া চক্‌চক্ করিতেছে। ঝোপঝাপ মাঝে মাঝে, আর শুধু কাশ আর ঝাউবন চলিয়াছে, সুজন সিং গল্প করিতেছে। জ্যোৎস্না ক্রমেই ফুটিতেছে—বনজঙ্গল, বালুচর ক্রমশ স্পষ্টতর হইতেছে। বহুদূর পর্যন্ত নীচু জঙ্গলের শীর্ষদেশে একটানা সরল রেখায় চলিয়া গিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি যায় ধূ-ধূ প্রান্তর একদিকে, অন্য দিকে জঙ্গল। বাঁ দিকে দূরে অনুচ্চ শৈলমালা। নির্জন, নীরব, মানুষের বসতি কুত্রাপি নাই, সাড়া নাই, শব্দ নাই, যেন অন্য কোন অজানা গ্রহের মধ্যে নির্জন বনপথে দুটি মাত্র প্রাণী আমরা।

এক জায়গায় সুজন সিং ঘোড়া থামাইল। ব্যাপার কী? পাশের জঙ্গল হইতে একটি ধাড়ী বন্যশূকর একদল ছানাপোনা লইয়া আমাদের পথ পার হইয়া বাঁ দিকের জঙ্গলে ঢুকিতেছে। সুজন সিং বলিল—তবুও ভাল হুজুর, ভেবেছিলাম বুনো মহিষ। মোহনপুরা জঙ্গলের কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, বুনো মহিষের ভয় এখানে খুব। সেদিনও একজন লোক মারিয়াছে মহিষে।

আরও কিছুদূর গিয়া জ্যোৎস্নায় দূর হইতে কালোমত সত্যিই কি একটা দেখা গেল।

সুজন বলিল—ঘোড়া ভয় পাবে হুজুর, ঘোড়া রুখুন।

শেষে দেখা গেল সেটা নড়েও না চড়েও না। একটু একটু করিয়া কাছে গিয়া দেখা গেল, সেটা একটা কাশের খুপরি। আবার ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম। মাঠ-ঘাট-বন, ধূ-ধূ জ্যোৎস্না-ভরা বিশ্ব—

কি একটা সঙ্গীহারা পাখী আকাশেব গায়ে কি বনের মধ্যে কোথায় ডাকিতেছে টি-টি-টি-টি— ঘোড়ার খুরে বড় বালি উঠিতেছে, ঘোড়া এক মুহূর্ত থামাইবার উপায় নাই—উড়াও, উড়াও—

অনেকক্ষণ একভাবে বসিয়া পিঠ টন টন করিতেছে, জিনের বসিবার জায়গাটা গরম হইয়া উঠিয়াছে, ঘোড়া ছাড়তোক ভাঙিয়া দুলকি চাল ধরিয়াছে, আমার ঘোড়াটা আবার বড্ড ভয় পায়, এজন্য সতর্কতার সঙ্গে সামনের পথে অনেক দূর পর্যন্ত নজর রাখিয়া চলিয়াছি—হঠাৎ থমকিয়া ঘোড়া দাঁড়াইয়া গেলে ঘোড়া হইতে ছিটকাইয়া পড়া অনিবার্য।

কাশের মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, রাস্তা বলিয়া কিছু নাই, এই কাশের ঝুঁটি দেখিয়া এই গভীর জঙ্গলে পথ ঠিক করিয়া লইতে হয়। একবার সুজন সিং বলিল—হুজুর, এ-পথটা যেন নয়, পথ ভুলেছি আমরা।

আমি সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখিয়া ধ্রুবতারা ঠিক করিলাম—পূর্ণিয়া আমাদের মহাল হইতে খাড়া উত্তরে, তবে ঠিকই আছি, সুজনকে বুঝাইয়া বলিলাম।

সুজন বলিল—না হুজুর, কুশীনদীর খেয়া পেরুতে হবে যে, খেয়া পার হয়ে তবে সোজা উত্তরে যেতে হবে। এখন উত্তর-পূর্ব কোণ কেটে বেরুতে হবে।

অবশেষে পথ মিলিল।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিয়াছে—সে কি জ্যোৎস্না! কি রূপ রাত্রির! নির্জন বালুর চরে, দীর্ঘ বনঝাউয়ের জঙ্গলের পাশের পথে জ্যোৎস্না যাহারা কখনও দেখে নাই, তাহারা বুঝিবে না এ জ্যোৎস্নার কি চেহারা! এমন উন্মুক্ত আকাশ-তলে ছায়াহীন উদাস গভীর জ্যোৎস্নাভবা রাত্রিতে, বন-পাহাড়-প্রান্তরের পথের জ্যোৎস্না, বালুচরের জ্যোৎস্না—ক'জন দেখিয়াছে? উঃ, সে কি ছুট! পাশাপাশি চলিতে চলিতে দুই ঘোড়াই হাঁপাইতেছে, শীতেও ঘাম দেখা দিয়াছে আমাদের গায়ে।

এক জায়গায় বনের মধ্যে একটা শিমুলগাছের তলায় আমরা ঘোড়া থামাইয়া একটু বিশ্রাম করি, সামান্য মিনিট-দশেক। একটা ছোট নদী বহিয়া গিয়া অদূরে কুশীনদীব সঙ্গে মিশিয়াছে, শিমুলগাছটাতে ফুল ফুটিয়াছে, বনটা সেখানে চারিধার হইতে আসিয়া আমাদেব এমন ঘিরিয়াছে যে, পথের চিহ্নমাত্র নাই, অথচ খাটো খাটো গাছপালার বন—শিমুলগাছটাই সেখানে খুব উঁচু—বনের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুজনেরই জল-পিপাসা পাইয়াছে দারুণ।

জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসে। অন্ধকার বনপথ, পশ্চিম দিগন্তের দূর শৈলমালার পিছনে শেষরাত্রির চন্দ্র ঢলিয়া পড়িয়াছে। ছায়া দীর্ঘ হইয়া আসিল, পাখী-পাখালির শব্দ নাই কোন দিকে, শুধু ছায়া-ছায়া, অন্ধকার মাঠ, অন্ধকার বন। শেষরাত্রির বাতাস বেশ ঠাণ্ডা হইয়া উঠিল। ঘড়িতে রাত প্রায় চারটা। ভয় হয় শেষরাত্রের অন্ধকারে বুনো হাতীর দল সামনে না আসে! মধুবনীর জঙ্গলে এক পাল বুনো হাতীও আছে।

এবাব আশে-পাশে ছোট ছোট পাহাড়, তার মধ্য দিয়া পথ, পাহাড়ের মাথায় নিষ্পত্র শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি ফুলের গাছ, কোথাও রক্তপলাশের বন। শেষরাত্রের চাঁদ-ডোবা অন্ধকারে বন-পাহাড় অদ্ভুত দেখায়। পূর্ব দিকে ফর্সা হইয়া আসিল—ভোরের হাওয়া বহিতেছে, পাখীর ডাক কানে গেল। ঘোড়ার সর্বাঙ্গ দিয়া দর-দর-ধারে ঘাম ছুটিতেছে, ছুট্ ছুট্, খুব ভাল ঘোড়া তাই এই পথে সমানে এত ছুটিতে পারে। সন্ধ্যায় কাছারি ছাড়িয়াছি—আর ভোর হইয়া গেল। সম্মুখে এখনও যেন পথের শেষ নাই, সেই একঘেয়ে বন, পাহাড়।

সামনের পাহাড়ের পিছন থেকে টকটকে লাল সিঁদুরের গোলার মত সূর্য উঠিতেছে। পথের ধারে এক গ্রামে ঘোড়া থামাইয়া কিছু দুধ কিনিয়া দুজনে খাইলাম। পরে আরো ঘণ্টা-দুই চলিয়াই পূর্ণিয়া শহর।

পূর্ণিয়ায় স্টেটের কাজ তো শেষ করিলাম, সে যেন নিতান্ত অন্যমনস্কতার সহিত, মন পড়িয়া রহিল পথের দিকে। আমার সঙ্গীর ইচ্ছা, সে কাজ শেষ করিয়াই বাহির হইয়া পড়ে—আমি তাহাকে

বাধা দিলাম, জ্যোৎস্না-রাত্রে এতটা পথ অশ্বারোহণে যাইবার বিচিত্র সৌন্দর্যের পুনরাস্বাদনের লোভে।

গেলামও তাই। পরদিন চাঁদ একটু দেরিতে উঠিলেও ভোর পর্যন্ত জ্যোৎস্না পাওয়া গেল। আর কি সে জ্যোৎস্না! কৃষ্ণপক্ষের স্তিমিতালোক চন্দ্রের জ্যোৎস্না বনে-পাহাড়ে যেন এক শান্ত, স্নিগ্ধ, অথচ এক আশ্চর্য রূপে অপরিচিত স্বপ্নজগতের রচনা করিয়াছে—সেই খাটো খাটো কাশ-জঙ্গল, সেই পাহাড়ের সানুদেশে পীতবর্ণ গোলগোলি ফুল, সেই উঁচু-নীচু পথ—সব মিলিয়া যেন কোন্ বহুদূরের নক্ষত্রলোক—মৃত্যুর পরে অজানা কোন্ অদৃশ্য লোকে অশরীরী হইয়া উড়িয়া চলিয়াছি—ভগবান বুদ্ধের সেই নির্বাণলোকে, যেখানে চন্দ্রের উদয় হয় না, অথচ অন্ধকারও নাই।

অনেক দিন পরে যখন এই মুক্ত জীবন ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করি, তখন কলিকাতা শহরের ক্ষুদ্র গলির বাসাবাড়ীতে বসিয়া স্ত্রীর সেলাইয়ের কল চালনার শব্দ শুনিতে শুনিতে অবসর-দিনের দুপুরে কতবার এই রাত্রির কথা, এই অপূর্ব আনন্দের কথা, এই জ্যোৎস্নামাখা রহস্যময় বনশ্রীর কথা, শেষরাত্রের চাঁদডোবা অন্ধকারে পাহাড়ের উপর শুভ্রকাণ্ড গোলগোলি গাছের কথা, শুক্‌নো কাশ-জঙ্গলের সোঁদা সোঁদা তাজা গন্ধের কথা ভাবিয়াছি—কতবার কল্পনায় আবার ঘোড়ায় চড়িয়া জ্যোৎস্নারাত্রে পূর্ণিয়া গিয়াছি।

২

চৈত্রমাসের মাঝামাঝি একদিন খবর পাইলাম সীতাপুর গ্রামে রাখালবাবু নামে একজন বাঙালী ডাক্তার ছিলেন, তিনি কাল রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছেন।

ইঁহার নাম পূর্বে কখনও শুনি নাই। তিনি যে ওখানে ছিলেন, তাহা জানিতাম না। শুনিলাম আজ বিশ-বাইশ বৎসর তিনি সেখানে ছিলেন। ও-অঞ্চলে তাঁহার পসার ছিল, ঘর-বাড়ীও নাকি করিয়াছিলেন ঐ গ্রামেই। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র সেখানেই থাকে।

এই অবাঙালীর দেশে একজন বাঙালী ভদ্রলোক মারা গিয়াছেন হঠাৎ, তাঁহার স্ত্রী-পুত্রের কি দশা হইতেছে, কে তাহাদের দেখাশুনা করিতেছে, তাঁহার সৎকার বা শ্রাদ্ধশান্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে, এসব জানিবার জন্য মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। ভাবিলাম আমার প্রথম কর্তব্য হইতেছে সেখানে গিয়া সেই শোকসন্তপ্ত পরিবারের খোঁজখবব লওয়া।

খবর লইয়া জানিলাম গ্রামটি এখানে হইতে মাইল-কুড়ি দূরে, কড়ারী খাস-মহালের সীমানায়। বৈকালের দিকে সেখানে গিয়া পৌঁছিলাম। লোকজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া রাখালবাবুর বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিলাম। দুখানা বড় বড় খোলার ঘর, খান-তিনেক ছোট ছোট ঘর। বাহিরে এ-দেশের ধরনে একখানা বসিবার ঘর, তাঁর তিন দিকে দেওয়াল নাই। বাঙালীর বাড়ী বলিয়া চিনিবার কোনও উপায় নাই, বসিবার ঘরে দড়ির চারপাই হইতে উঠানের হনুমান-ধ্বজাটি পর্যন্ত সব এদেশী।

আমাব ডাকে একটি বারো-তেরো বছরের ছেলে বাহির হইয়া আসিল। আমায় ঠেট্ হিন্দীতে জিজ্ঞাসা করিল—কাকে খুঁজছেন?

তাহার চেহারা দেখিয়া মনে হয় না যে সে বাঙালীর ছেলে। মাথায় লম্বা টিকি, গলায় অবশ্য বর্তমানে কাচা—সবই বুঝিলাম, কিন্তু মুখের ভাব পর্যন্ত হিন্দুস্থানী বালকের মত কি করিয়া হয়?

আমার পরিচয় দিয়া বলিলাম—তোমাদের বাড়ীতে এখন বড় লোক কে আছেন, তাঁকে ডাক।

ছেলেটি বলিল, সে-ই বড় ছেলে। তার আর দুটি ছোট ছোট ভাই আছে। বাড়ীতে আর কোন অভিভাবক নাই।

বলিলাম—তোমার মায়ের সঙ্গে আমি একবার কথা কইতে চাই। জিজ্ঞেস করে এস।

খানিকটা পরে ছেলেটি আসিয়া আমায় বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। রাখালবাবু স্ত্রীকে দেখিয়া মনে হইল বয়স অল্প, ত্রিশের মধ্যে, সদ্য-বিধবার বেশ, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ফুলিয়াছে। ঘরের আসবাবপত্র নিতান্ত দরিদ্রের গৃহস্থালির মত। এক দিকে একটা ছোট গোলা, ঘরের দাওয়ায় খান-দুই চারপাই, ছেঁড়া লেপ-কাঁথা, এদেশী পিতলের ঘয়লা, একটা গুড়িগুড়ি, পুরনো টিনের তোরঙ্গ। বলিলাম—আমি বাঙালী, আপনার প্রতিবেশী। আমার কানে গেল রাখালবাবুর কথা, তাই এলাম। আমার এখানে একটা কর্তব্য আছে বলে মনে করি। আমার কোনো সাহায্য যদি দরকার হয়, নিঃসঙ্কোচে বলুন। রাখালবাবুর স্ত্রী কপাটের আড়ালে দাঁড়াইয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন। আমি বুঝাইয়া শান্ত করিয়া পুনরায় আমার আসিবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী এবার আমার সামনে বাহির হইলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—আপনি আমার দাদার মত, আমাদের এই ঘোর বিপদের সময় ভগবান আপনাকে পাঠিয়েছেন।

ক্রমে কথায় কথায় জানা গেল, এই বাঙালী পরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও অসহায় এই ঘোর বিদেশে। রাখালবাবু গত এক বৎসরের উপর শয্যাগত ছিলেন। তাঁর চিকিৎসা ও সংসার-খরচে সঞ্চিত অর্থ সব নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে—এখন এমন উপায় নাই যে তাঁর শ্রাদ্ধের যোগাড় হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—আচ্ছা রাখালবাবু তো অনেকদিন ধরে এ অঞ্চলে আছেন, কিছু করতে পারেন নি?

রাখালবাবুর স্ত্রীর সঙ্কোচ ও লজ্জা অনেকটা দূর হইয়াছিল। তিনি যেন এই প্রবাসে, এই দুর্দিনে একজন বাঙালীর মুখ দেখিয়া অকূলে কূল পাইয়াছেন, মুখের ভাবে মনে হইল।

বলিলেন—আগে কি রোজগার করতেন জানি নে। আমার বিয়ে হয়েছে এই পনের বছর—আমার সতীন মারা যেতে আমায বিয়ে করেন। আমি এসে পর্যন্ত দেখছি কোন রকমে সংসার চলে। এখানে ভিজিটের টাকা বড় একটা কেউ দেয় না, গম দেয়, মকাই দেয়। গত বছর মাঘ মাসে উনি অসুখে পড়লেন, সেই থেকে আর একটি পয়সা ছিল না। তবে এদেশের লোক খারাপ নয়, যার কাছে যা পাওনা ছিল, বাড়ী বয়ে সে-সব গম মকাই কলাই দিয়ে গিয়েছে। তাই চলেছে, নয়ত না খেয়ে মরত সবাই।

—আপনার বাপের বাড়ী কোথায়? সেখানে খবর দেওয়া হয়েছে?

রাখালবাবুর স্ত্রী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—খবর দেবার কিছু নেই। আমার বাপের বাড়ী কখনও দেখি নি। শুনেছিলুম ছিল মুর্শিদাবাদ জেলায়। ছেলেবেলা থেকে আমি সাহেবগঞ্জে ভগ্নীপতির বাড়ীতে মানুষ। মা-বাবা কেউ ছিলেন না। আমার সে-দিদি আমার বিয়ের পর মারা যান। ভগ্নীপতি আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

—রাখালবাবুর কোন আত্মীয়স্বজন কোথাও নেই?

—দেশে জ্ঞাতি ভাইয়েরা আছে শুনতাম বটে, কিন্তু তারা কখনও সংবাদ নেয় নি, উনিও দেশে যাতায়াত করতেন না। তাদের সঙ্গে সদ্ভাবও নেই, তাদের খবর দেওয়া-না-দেওয়া সমান। এক মামাশ্বশুর আছে আমার শুনতাম, কাশীতে। তা-ও তাঁর ঠিকানা জানিনে।

ভয়ানক অসহায় অবস্থা। আপনার জন কেহ নাই, এই বন্ধুহীন বিদেশে দুই-তিনটি নাবালক ছেলে লইয়া সহায়সম্পদশূন্য বিধবা মহিলাটির দশা ভাবিয়া মন রীতিমত দমিয়া গেল। তখনকার মত যাহা করা উচিত করিয়া আমি কাছারিতে ফিরিয়া আসিলাম, সদরে লিখিয়া স্টেট্ হইতে আপাতত এক শত টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখালবাবুর শ্রাদ্ধও কোন রকমে শেষ করিয়া দিলাম।

ইহার পর আরও বারকয়েক রাখালবাবুর বাড়ীতে গিয়াছি। স্টেট্ হইতে মাসে দশটি টাকা সাহায্য মঞ্জুর করাইয়া লইয়া প্রথম বারের টাকাটা নিজেই দিতে গিয়াছিলাম। দিদি খুব যত্ন করিতেন,

অনেক স্নেহ-আত্মীয়তার কথা বলিতেন। সেই বিদেশে তাঁর স্নেহ-যত্ন আমার বড় ভাল লাগিত। তারই লোভে অবসর পাইলেই সেখানে যাইতাম।

৩

লবটুলিয়ার উত্তর প্রান্ত খুব বড় একটা হ্রদের মত। এরকম জলাশয়কে এদেশে বলে কুণ্ডী। এই হ্রদটার নাম সরস্বতী কুণ্ডী।

সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের তিনদিকে নিবিড় বন। এ ধরনের বন আমাদের মহালে বা লবটুলিয়াতে নাই। এ বনে বড় বড় বনস্পতিদের নিবিড় সমাবেশ—জলের সান্নিধ্য-বশতই হোক বা যে-জন্যই হোক, বনের তলদেশে নানা বিচিত্র লতাপাতা, বন্যপুষ্পের ভিড়। এই বন বিশাল সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জলকে তিনদিকে অর্ধচন্দ্রাকারে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, একদিকে ফাঁকা—সেখান হইতে পূর্বদিকে সুদূর-প্রসারিত নীল আকাশ ও দূরের শৈলমালা চোখে পড়ে। সুতরাং পূর্ব-পশ্চিম কোণের তীরের কোন এক জায়গায় বসিয়া দক্ষিণ ও বাম দিকে চাহিয়া দেখিলে সরস্বতী কুণ্ডীর সৌন্দর্যের অপূর্বতা ঠিক বোঝা যায়। বামে চাহিলে গভীর হইতে গভীরতর বনের মধ্যে দৃষ্টি চলিয়া গিয়া ঘন নিবিড় শ্যামলতার মধ্যে নিজেকে নিজে হারাইয়া ফেলে, দক্ষিণে চাহিলে স্বচ্ছ নীল জলের ওপারে সুদূরবিসর্পী আকাশ ও অস্পষ্ট শৈলমালার ছবি মনকে বেলুনের মত ফুলাইয়া পৃথিবীর মাটি হইতে উড়াইয়া লইয়া চলে।

এখানে একখানা শিলাখণ্ডের উপর কতদিন গিয়া একা বসিয়া থাকিতাম। কখনও বনের মধ্যে দুপুরবেলা আপন মনে বেড়াইতাম। কত বড় বড় গাছের ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতাম। মাঝে মাঝে গাছপালা, বন্যলতার ফুল সংগ্রহ করিতাম। এখানে যত রকমের পাখীর ডাক শোনা যায়, আমাদের মহালে অত পাখী নাই। নানা রকমের বন্য ফল খাইতে পায় বলিয়া এবং সম্ভবত উচ্চ বনস্পতিশিরে বাসা বাঁধিবার সুযোগ ঘটে বলিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর তীরের বনে পাখীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। বনে ফুলও অনেক রকমের ফোটে।

হ্রদের তীবের নিবিড় বন প্রায় তিন মাইলের উপর লম্বা, গভীরতায় প্রায় দেড় মাইল। জলের ধার দিয়া বনের মধ্যে গাছপালার ছায়ায় ছায়ায় একটি সুঁড়ি পথ বনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত আসিয়াছে—এই পথ ধরিয়া বেড়াইতাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মাঝে সরস্বতীর নীল জল, তার উপর উপুড়-হইয়া-পড়া দূরের আকাশটা এবং দিগন্তলীন শৈলশ্রেণী চোখে পড়িত। ঝির্‌ঝির্ করিয়া স্নিগ্ধ হাওয়া বহিত, পাখী গান গাহিত, বন্য ফুলের সুগন্ধ পাওয়া যাইত।

একদিন একটা গাছের ডালে উঠিয়া বসিলাম। সে-আনন্দের তুলনা হয় না। আমার মাথার উপরে বিশাল বনস্পতিদলের ঘন সবুজ পাতার রাশি, তার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশের টুক্‌রা, প্রকাণ্ড একটা লতায় থোকা থোকা ফুল দুলিতেছে। পায়ের দিকে অনেক নীচে ভিজা মাটিতে বড় বড় ব্যাঙের ছাতা গজাইয়াছে। এখানে আসিয়া বসিয়া শুধু ভাবিতে ইচ্ছা হয়। কত ধরনের কত নব অনুভূতি মনে আসিয়া জোটে। এক প্রকার অতল-সমাহিত অতিমানস চেতনা ধীরে ধীরে গভীর অন্তস্তল হইতে বাহিরের মনে ফুটিয়া উঠিতে থাকে। এ আসে গভীর আনন্দের মূর্তি ধরিয়া। প্রত্যেক বৃক্ষলতার হৃৎস্পন্দন যেন নিজের বুকের রক্তের শান্ত স্পন্দনের মধ্যে অনুভব করা যায়।

আমাদের যেখানে মহাল, সেখানে পাখীর এত বৈচিত্র্য নাই। সেখানটা যেন অন্য জগৎ। তার গাছপালা জীবজন্তু অন্য ধরনের। পরিচিত জগতে বসন্ত যখন দেখা দিয়াছে, লবটুলিয়ায় তখন একটা কোকিলের ডাক নাই, একটা পরিচিত বসন্তের ফুল নাই। সে যেন রুক্ষ কর্কশ ভৈরবী মূর্তি; সৌম্য, সুন্দর বটে, কিন্তু মাধুর্যহীন—মনকে অভিভূত করে ইহার বিশালতায়, রুক্ষতায়। কোমল বর্জিত

খাড়ব সুর, মালকোষ কিংবা চৌতালের ধ্রুপদ, মিষ্টত্বের কোন পর্দার ধার মাড়াইয়া চলে না—সুরের গম্ভীর উদাত্ত রূপে মনকে অন্য এক স্তরে লইয়া পৌঁছাইয়া দেয়।

সরস্বতী কুণ্ডী সেখানে ঠুংরী, সুমিষ্ট সুরের মধুর ও কোমল বিলাসিতায় মনকে আর্দ্র ও স্বপ্নময় করিয়া তোলে। স্তব্ধ দুপুরে ফাল্গুন-চৈত্র মাসে এখানে তীর-তরুর ছায়ায় বসিয়া পাখীর কূজন শুনিতে শুনিতে মন কত দূরে কোথায় চলিয়া যাইত, বন্য নিমগাছের সুগন্ধ নিমফুলের সুবাস ছড়াইত বাতাসে, জলে জলজ লিলির দল ফুটিত। কতক্ষণ বসিয়া থাকিয়া সন্ধ্যার পর সেখান হইতে উঠিয়া আসিতাম।

নাঢ়া বইহার জরীপ হইতেছে প্রজাদের মধ্যে বিলির জন্য, আমীনদের কাজ দেখাইবার জন্য প্রায়ই সেখানে যাইতে হয়। ফিরিবার পথে মাইল দুই পূর্ব-দক্ষিণ দিকে একটু ঘুরিয়া যাই, শুধু সরস্বতী কুণ্ডীর এই বনভূমিতে ঢুকিয়া বনের ছায়ায় খানিকটা বেড়াইবার লোভে।

সেদিন ফিরিতেছিলাম বেলা তিনটার সময়। খর রৌদ্রে বিস্তীর্ণ রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর পার হইয়া ঘর্মাক্ত কলেবরে বনের মধ্যে ঢুকিয়া ঘন ছায়ায় ছায়ায় জলের ধার পর্যন্ত গেলাম—প্রান্তরসীমা হইতে জলের কিনারা প্রায় দেড় মাইলের কম নয়, কোন কোন স্থানে আরও বেশী। একটা গাছের ডালে ঘোড়া বাঁধিয়া নিবিড় ঝোপের তলায় একখানা অয়েলক্লথ পাতিয়া একেবারে শুইয়া পড়িলাম। ঘন ঝোপের ডালপালা চারিধার হইতে এমন ভাবে আমায় ঢাকিয়াছে যে বাহির হইতে আমায় কেউ দেখিতে পাইবে না। হাত দুই উপরেই গাছপালা, মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত গুঁড়িওয়ালা কি একপ্রকার বন্যলতা জড়াজড়ি করিয়া ছাদ রচনা করিয়াছে—একটা কি গাছ হইতে হাতখানেক লম্বা বড় বড় বনসিমের মত সবুজ সবুজ ফল আমার প্রায় বুকের উপর দুলিতেছে। আর একটা কি গাছ, তার ডালপালা প্রায় অর্ধেক ঝোপটা জুড়িয়া, তাহাতে কুচো কুচো ফুল ধরিয়াছে, ফুলগুলি এত ছোট যে কাছে না গেলে চোখে পড়ে না—কিন্তু কি ঘন নিবিড় সুবাস সে-ফুলের! ঝোপের নিভৃত তল ভারাক্রান্ত সেই অজানা বনপুষ্পের সুবাসে।

পূর্বেই বলিয়াছি সরস্বতী কুণ্ডীর বন পাখীর আড্ডা। এত পাখীও আছে এখানকার বনে! কত ধরনের কত রং-বেরঙের পাখী—শ্যামা, শালিক, হরটিট্. বনটিয়া, ফেজান্টক্রো, চড়াই, ছাতারে, ঘুঘু, হরিয়াল। উঁচু গাছের মাথায় বাজবৌরী, চিল, কুল্লো—সরস্বতীর নীল জলে বক, সিল্লী, রাঙা হাঁস, মাণিকপাখী, কাঁক প্রভৃতি জলচর পাখী—পাখীর কাকলীতে মুখর হইয়া উঠিয়াছে ঝোপের উপরটা, কি বিরক্তই করে তারা, তাদের উল্লাস-ভরা অবাক কূজনে কান পাতা দায়। অনেক সময় মানুষকে গ্রাহ্যই করে না, আমি শুইয়া আছি দেখিতেছে, আমার চারি পাশে হাত-দেড়-দুই দূরে তারা ঝুলন্ত ডালপালায় লতায় বসিয়া কিচ্ কিচ্ করিতেছে—আমার প্রতি ভ্রূক্ষেপও নাই।

পাখীদের এই অসঙ্কোচ সঞ্চরণ আমার বড় ভাল লাগিত। উঠিয়া বসিয়াও দেখিয়াছি তাহারা ভয় পায় না, একটু উড়িয়া গেল, কিন্তু একেবারে দেশছাড়া হইয়া পালায় না। খানিক পরে নাচিতে নাচিতে বকিতে বকিতে আবার অত্যন্ত কাছে আসিয়া পড়ে।

এখানেই এদিন প্রথম বন্য হরিণ দেখিলাম। জানিতাম বন্য হরিণ আমাদের মহালের জঙ্গলে আছে, কিন্তু এর আগে কখনও চোখে পড়ে নাই। শুইয়া আছি—হঠাৎ কিসের পায়ের শব্দে উঠিয়া বসিয়া শিয়রের দিকে চাহিয়া দেখি ঝোপের নিভৃততর দুর্গমতর অঞ্চলে নিবিড় লতাপাতার জড়াজড়ির মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে একটা হরিণ। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, বড় হরিণ নয়, হরিণশাবক। সে আমায় দেখিতে পাইয়া অবোধ-বিস্ময়ে বড় বড় চোখে আমার দিকে চাহিয়া আছে—ভাবিতেছে, এ আবার কোন্ অদ্ভুত জীব।

খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল, দুজনেই নির্বাক, নিস্পন্দ।

আধ মিনিট পরে হরিণ-শিশুটা যেন ভাল করিয়া দেখিবার জন্য আবার একটু আগাইয়া আসিল। তার চোখে ঠিক যেন মনুষ্যশিশুর মত সাগ্রহ কৌতূহলের দৃষ্টি। আরও কাছে আসিত কিনা

জানি না, আমার ঘোড়াটা সে-সময় হঠাৎ পা নাড়িয়া গা-ঝাড়া দিয়া ওঠাতে হরিণশিশু চকিত ও সন্ত্রস্ত ভাবে ঝোপের মধ্য দিয়া দৌড়াইয়া তাহার মায়ের কাছে সংবাদটা দিতে গেল।

তার পর কতক্ষণ ঝোপের তলায় বসিয়া রহিলাম। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে চোখে পড়ে সরস্বতী কুণ্ডীর নীল জল অর্ধচন্দ্রাকারে দূর শৈলমালার পাদদেশ পর্যন্ত প্রসারিত, আকাশ নীল, মেঘের লেশ নাই কোন দিকে—কুণ্ডীর জলচর পাখীর দল ঝগড়া, কলরব, তুমুল দাঙ্গা শুরু করিয়াছে—একটা গম্ভীর ও প্রবীণ মানিক-পাখী তীরবর্তী এক উচ্চ বনস্পতির শীর্ষে বসিয়া থাকিয়া থাকিয়া তাহার বিরক্তি জ্ঞাপন করিতেছে। জলের ধারে ধারে বড় বড় গাছের মাথায় বকের দল এমন ঝাঁক বাঁধিয়া আছে, দূর হইতে মনে হয় যেন সাদা সাদা থোকা থোকা ফুল ফুটিয়াছে।

রোদ ক্রমশঃ রাঙা হইয়া আসিল।

ওপারে শৈলচূড়ায় যেন তামার রং ধরিয়াছে। বকের দল ডানা মেলিয়া উড়িতে আরম্ভ করিল। গাছপালার মগডালে রোদ উঠিয়া গেল।

পাখীর কূজন বাড়িল, আর বাড়িল অজানা বনকুসুমের সেই সুঘ্রাণটা। অপরাহ্নের ছায়ায় গন্ধটা যেন আরও ঘন, আরও সুমিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটি বেঁজি খানিকদূর হইতে মাথা উঁচু করিয়া আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছে।

কি নিভৃত শান্তি! কি অদ্ভুত নির্জনতা! এতক্ষণ তো এখানে আছি, সাড়ে তিন ঘণ্টার কম নয়—বন্য পাখীর কাকলী ছাড়া অন্য কোন শব্দ শুনি নাই, আর পাখীদের পায়ে পায়ে ডালপাতার মচ্‌মচানি, শুষ্কপত্র বা লতার টুকরা পতনের শব্দ। মানুষের চিহ্ন নাই কোন দিকে।

নানা বিচিত্র ও বিভিন্ন গড়ন বনস্পতিদের শীর্ষদেশের। এই সন্ধ্যার সময় রাঙা রোদ পড়িয়া তাদের শোভা হইয়াছে অদ্ভুত। তাদের কত গাছের মগডালে জড়াইয়া লতা উঠিয়াছে, এক ধরনের লতাকে এদেশে বলে ভিঁয়োরা লতা—আমি তাহার নাম দিয়াছি ভোম্‌রা লতা—সে লতা যে গাছের মাথায় উঠিবে, আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া ধরিয়া থাকে। এই সময় ভোম্‌রা লতায় ফুল ফোটে—ছোট ছোট বনজুঁইয়ের মত সাদা সাদা ফুলে কত বড় বড় গাছের মাথা আলো করিয়া রাখিয়াছে—অতি চমৎকার সুঘ্রাণ, অনেকটা যেন প্রস্ফুটিত সর্ষে ফুলের মত—তবে অতটা উগ্র নয়।

সরস্বতী কুণ্ডীব বনে কত বন্য শিউলি গাছ—শিউলি গাছের প্রাচুর্য এক এক জায়গায় এত বেশী, যেন মনে হয় শিউলির বন। বড় বড় শিলাখণ্ডের উপর শরতের প্রথমে সকালবেলা রাশি রাশি শিউলি ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছিল—দীর্ঘ এক বকম কর্কশ ঘাস সেই সব পাথরের আশে-পাশে—বড় বড় ময়না-কাঁটাব গাছ তার সঙ্গে জড়াইয়াছে—কাঁটা, ঘাস, শিলাখণ্ড সব-তাতেই রাশি রাশি শিউলি ফুল—আর্দ্র ছায়াগহন স্থান, তাই সকালের ফুল এখনও শুকাইয়া যায় নাই।

সরস্বতী হ্রদকে কত রূপেই দেখিলাম! লোকে বলে সরস্বতী কুণ্ডীর জঙ্গলে বাঘ আছে, জ্যোৎস্না-রাত্রে সরস্বতীর বিস্তৃত জলরাশির কৌমুদীস্নাত শোভা দেখিবার লোভে রাসপূর্ণিমার দিন তহশীলদার বনোয়ারীলালের চোখে ধূলা দিয়া আজমাবাদের সদর কাছারি আসিবার ছুতায় লবটুলিয়া ডিহি কাছারি হইতে লুকাইয়া একা ঘোড়ায় এখানে আসিয়াছি।

বাঘ দেখি নাই বটে, কিন্তু সেদিন আমার সত্যই মনে হইয়াছিল এখানে মায়াবিনী বনদেবীরা গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নাস্নাত হ্রদের জলে জলকেলি করিতে নামে। চারিধার নীরব নিস্তব্ধ—পূর্ব তীরের ঘন বনে কেবল শৃগালের ডাক শোনা যাইতেছিল—দূরের শৈলমালা ও বনশীর্ষ অস্পষ্ট দেখাইতেছে—জ্যোৎস্নার হিম বাতাসে গাছপালা ও ভোমরা লতার নৈশ-পুষ্পের মৃদু সুবাস...আমার সামনে বন ও পাহাড় বেষ্টিত নিস্তরঙ্গ বিস্তীর্ণ হ্রদের বুকে হৈমন্তী পূর্ণিমার থৈ থৈ জ্যোৎস্না...পরিপূর্ণ, ছায়াহীন, জলের উপর পড়া, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালায় প্রতিফলিত হওয়া অপার্থিব দেবলোকের জ্যোৎস্না...ভোমরা লতার সাদা-ফুলে-ছাওয়া বড় বড় বনস্পতিশীর্ষে জ্যোৎস্না পড়িয়া মনে হইতেছে গাছে গাছে পরীদের শুভ্র বস্ত্র উড়িতেছে...

আর এক ধরনের পোকা একঘেয়ে ডাকিতেছিল—ঝিঁঝি পোকার মতই। দু-একটা পত্র পতনের শব্দ বা খস্ খস্ করিয়া শুষ্ক পত্ররাশির উপর দিয়া বন্য জন্তুর পলায়নের শব্দ...

বনদেবীরা আমরা থাকিতে তো আর আসে না। কত গভীর রাত্রে আসে কে জানে। আমি বেশী রাত পর্য্যন্ত হিম সহ্য করিতে পারি নাই। ঘণ্টাখানেক থাকিয়াই ফিরি।

সরস্বতী কুণ্ডীর এই পরীদের প্রবাদ এখানেই শুনিয়াছিলাম।

শ্রাবণ মাসে একদিন আমাকে উত্তর সীমানার জরীপের ক্যাম্পে রাত্রি যাপন করিতে হয়। আমার সঙ্গে ছিল আমীন রঘুবর প্রসাদ। সে আগে গবর্ণমেণ্টের চাকুরি করিয়াছে, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট ও এ-অঞ্চলের বনের সঙ্গে তার পঁচিশ-ত্রিশ বছরের পরিচয়।

তাহার কাছে সরস্বতী কুণ্ডীর কথা তুলিতেই সে বলিল—হুজুর, ও মায়ার কুণ্ডী, ওখানে রাত্রে হুরী-পরীরা নামে; জ্যোৎস্নারাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙায় ঐ সব পাথরের উপর, রেখে জলে নামে। সে-সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে। আমি দেখি নি কখনও, হেড সার্ভেয়ার ফতে সিং একদিন দেখেছিলেন। একদিন তারপর তিনি গভীর রাত্রে একা ওই হ্রদের ধারে বনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন। সার্ভে-তাঁবুতে—পরদিন সকালে তাঁর লাস কুণ্ডীর জলে ভাসতে দেখা যায়। বড় মাছে তার একটা কান খেয়ে ফেলেছিল। হুজুর, ওখানে আপনি ও-রকম যাবেন না।

এই সরস্বতী কুণ্ডীব ধারে একদিন দুপুরে এক অদ্ভুত লোকের সন্ধান পাইলাম।

সার্ভে-ক্যাম্প হইতে ফিরিবার পথে একদিন হ্রদের তীরের বনপথ দিয়া আস্তে আস্তে আসিতেছি, বনের মধ্যে দেখি একটি লোক মাটি খুঁড়িয়া কি যেন করিতেছে। প্রথমে ভাবিলাম লোকটা ভুঁই-কুমড়া তুলিতে আসিয়াছে। ভুঁই-কুমড়া লতাজাতীয় উদ্ভিদ, মাটির মধ্যে লতার নীচে চালকুমড়ার আকারের প্রকাণ্ড কন্দ জন্মায—উপর হইতে বোঝা যায় না। কবিরাজী ঔষধে লাগে বলিয়া বেশ দামে বিক্রয় হয়। কৌতূহলবশতঃ ঘোড়া হইতে নামিয়া কাছে গেলাম, দেখি ভুঁই-কুমড়া নয়, কিছু নয়, লোকটা কিসের যেন বীজ পুঁতিয়া দিতেছে।

আমায় দেখিয়া সে থতমত খাইয়া অপ্রতিভ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিল। বয়স হইযাছে, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। সঙ্গে একটা চটের থলে, তার ভিতর হইতে ছোট একখানা কোদালের আগাটুকু দেখা যাইতেছে, একটা শাবল পাশে পড়িয়া, ইতস্তত কতকগুলি কাগজের মোড়ক ছড়ানো।

বলিলাম—তুমি কে? এখানে কি করছ?

সে বলিল—হুজুব কি ম্যানেজারবাবু?

—হ্যাঁ। তুমি কে?

—নমস্কার। আমার নাম যুগলপ্রসাদ। আমি আপনাদের লবটুলিয়ার পাটোয়ারী বনোয়ারীলালের চাচাতো ভাই।

তখন আমার মনে পড়িল, বনোয়ারী পাটোয়ারী একবার কথায় কথায় তাহার চাচাতো ভাইয়ের কথা তুলিয়াছিল। উঠাইবার কারণ, আজমাবাদের সদর কাছারিতে—অর্থাৎ আমি যেখানে থাকি—সেখানে একজন মুহুরীর পদ খালি ছিল। বলিয়াছিলাম একটা ভাল লোক দেখিয়া দিতে। বনোয়ারী দুঃখ করিয়া বলিয়াছিল, লোক তো তাহার সাক্ষাৎ চাচাতো ভাই-ই ছিল, কিন্তু লোকটা অদ্ভুত মেজাজের, এক রকম খামখেয়ালী উদাসীন ধরনের। নইলে কায়েথী হিন্দীতে অমন হস্তাক্ষর, অমন পড়ালেখার এলেম্ এ-অঞ্চলের বেশী লোকের নাই।

জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেন, সে কি করে?

বনোয়ারী বলিয়াছিল—তার নানা বাতিক হুজুর, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ানো এক বাতিক।

কিছু করে না, বিয়ে-সাদি করেছে, সংসার দেখে না, বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায়, অথচ সাধু-সন্নিসিও নয়, ঐ এক ধরনের মানুষ।

এই তাহা হইলে বনোয়ারীলালের সেই চাচাতো ভাই?

কৌতূহল বাড়িল, বলিলাম—ও কি পুঁতছ ওখানে?

লোকটা বোধ হয় গোপনে কাজটা করিতেছিল, যেন ধরা পড়িয়া লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে এমন সুরে বলিল—কিছু না, ওই—একটা গাছের বীজ—

আমি আশ্চর্য হইলাম। কি গাছের বীজ? ওর নিজের জমি নয়, এই ঘোর জঙ্গল, ইহার মাটিতে কি গাছের বীজ ছড়াইতেছে—তাহার সার্থকতাই বা কি? কথাটা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বলিল—অনেক রকম বীজ আছে হুজুর, পূর্ণিয়ায় দেখেছিলাম একটা সাহেবের বাগানে ভারী চমৎকাব বিলিতি লতা—বেশ বাঙা রাঙা ফুল। তারই বীজ, আরও অনেক রকম বনের ফুলের বীজ আছে, দূর দূর থেকে সংগ্রহ করে এনেছি, এখানকার জঙ্গলে ও-সব লতা-ফুল নেই তাই পুঁতে দিচ্ছি, গাছ হয়ে দু-বছরের মধ্যে ঝাড় বেঁধে যাবে, বেশ দেখাবে।

লোকটার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহার উপর আমার শ্রদ্ধা হইল। লোকটা সম্পূর্ণ বিনাস্বার্থে একটা বিস্তৃত বন্যভূমির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিবার জন্য নিজের পয়সা ও সময় ব্যয় করিতেছে, যে বনে তাহার নিজের ভূস্বত্ব কিছুই নাই—কি অদ্ভুত লোকটা!

যুগলপ্রসাদকে ডাকিয়া এক গাছের তলায় দুজনে বসিলাম। সে বলিল—আমি এর আগেও এ কাজ করেছি হুজুর, লবটুলিয়াতে যত বনের ফুল দেখেন, ফুলের লতা দেখেন, ও-সব আমি আজ দশ-বারো বছর আগে কতক পূর্ণিয়ার বন থেকে, কতক দক্ষিণ ভাগলপুরের লছমীপুর স্টেটের পাহাড়ী জঙ্গল থেকে এনে লাগিয়েছিলাম। এখন একেবারে ও-সব ফুলের জঙ্গল বেঁধে গিয়েছে।

—তোমার কি এ কাজ খুব ভাল লাগে?

—লবটুলিয়া বইহারের জঙ্গলটা ভারী চমৎকার জায়গা—ওই সব ছোটখাটো পাহাড়ের গায়ে কি এখানকার বনে ঝোপে নতুন নতুন ফুল ফোটাব, এ আমার বহুদিনের শখ।

—কি ফুল নিয়ে আসতে?

—কি করে আমার এদিকে মন গেল, তা একটু আগে হুজুরকে বলি। আমার বাড়ী ধরমপুর অঞ্চলে। আমাদের দেশে বুনো ভাণ্ডীর ফুল একেবারেই ছিল না। আমি মহিষ চরিয়ে বেড়াতাম ছেলেবেলায় কুশীনদীর ধারে ধারে, আমার গাঁ থেকে দশ-পনেরো ক্রোশ দূরে। সেখানে দেখতাম বনে-জঙ্গলে, মাঠে বুনো ভাণ্ডীর ফুলের বড় শোভা। সেখান থেকে বীজ নিয়ে গিয়ে দেশে লাগাই, এখন আমাদের অঞ্চলের পথের ধারে বনঝোপে কি লোকের বাড়ীর পেছনে পোড়ো জমিতে ভাণ্ডী ফুলের একেবারে জঙ্গল; সেই থেকে আমার এই দিকে মাথা গেল। যেখানে যে ফুল নেই, সেখানে সেই ফুল, গাছ, লতা নিয়ে পুঁতব, এই আমার শখ। সারাজীবন ওই করে ঘুরেছি। এখন আমি ও-কাজে ঘুণ হয়ে গেছি।

যুগলপ্রসাদ দেখিলাম এদেশের বহু বনের ফুল ও সুদৃশ্য বৃক্ষলতার খবর রাখে। এ বিষয়ে সে যে একজন বিশেষজ্ঞ, তাহাতে আমার কোন সন্দেহ রহিল না। বলিলাম—তুমি এরিস্টলোকিয়া লতা চেন?

তাহাকে ফুলের গড়ন বলিতেই সে বলিল, হংস-লতা? হাঁসের-মত-চেহারার ফুল হয় তো? ও তো এদেশের গাছ নয়। পাটনায় দেখেছি বাবুদের বাগানে।

তাহার জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। নিছক সৌন্দর্যের এমন পূজারীই বা ক'টা দেখিয়াছি? বনে বনে ভাল ফুল ও লতার বীজ ছড়াইয়া তাহার কোন স্বার্থ নাই, এক পয়সা আয় নাই, নিজে সে নিতান্তই গরীব, অথচ শুধু বনের সৌন্দর্য-সম্পদ বাড়াইবার চেষ্টায় তার এ অক্লান্ত পরিশ্রম ও উদ্বেগ।

আমায় বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর মত চমৎকার বন এ অঞ্চলে কোথাও নেই বাবুজী। কত গাছপালা যে আছে, আর কি দেখেছেন জলের শোভা! আচ্ছা, আপনি কি বিবেচনা করেন এতে পদ্ম হবে পুঁতে দিলে? ধরমপুরের পাড়াগাঁ অঞ্চলে পদ্ম আছে অনেক পুকুরে। ভাবছিলাম গেঁড় এনে পুঁতে দেব।

আমি তাহাকে সাহায্য করিতে মনে মনে সঙ্কল্প করিলাম। দুজনে মিলিয়া এ বনকে নানা নতুন বনের ফুলে, লতায়, গাছে সাজাইব, সেদিন হইতে ইহা আমাকে যেন একটা নেশার মত পাইয়া বসিল। যুগলপ্রসাদ খাইতে পায় না, সংসারে বড় কষ্ট, ইহা আমি জানিতাম। সদরে লিখিয়া তাহাকে দশ টাকা বেতনে একটা মুহুরীর চাকুরি দিলাম আজমাবাদ কাছারিতে।

সেই বছরে আমি কলিকাতা হইতে সাটনের বিদেশী বন্য পুষ্পের বীজ আনিয়া ও ডুয়ার্সের পাহাড় হইতে বন্য জুঁইয়ের লতার কাটিং আনিয়া যথেষ্ট পরিমাণে রোপণ করিলাম সরস্বতী হ্রদের বনভূমিতে। কি আহ্লাদ ও উৎসাহ যুগলপ্রসাদের! আমি তাহাকে শিখাইয়া দিলাম এ উৎসাহ আনন্দ যেন সে কাছারির লোকের কাছে প্রকাশ না করে। তাহাকে তো লোকে পাগল ভাবিবেই, সেই সঙ্গে আমাকেও বাদ দিবে না। পর বৎসর বর্ষার জলে আমাদের রোপিত গাছ ও লতার ঝাড় অদ্ভুতভাবে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। হ্রদের তীরের জমি অত্যন্ত উর্বর, গাছপালাগুলিও যাহা পুঁতিয়াছিলাম, এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। কেবল সাটনের বীজের প্যাকেট লইয়া গেলমাল বাধিয়াছিল। প্রত্যেক প্যাকেটের উপর তাহারা ফুলের নাম ও কোন কোন স্থলে এক লাইনে ফুলের সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়াছিল। ভাল রং ও চেহারা বাছিয়া বাছিয়া যে বীজগুলি লাগাইলাম, তাহার মধ্যে 'হোয়াইট বিম' ও 'রেড ক্যাম্পিয়ন্' এবং 'স্টিচওয়াট' অসাধারণ উন্নতি দেখাইল। 'ফক্সগ্লাভ' ও 'উড অ্যানিমোন্' মন্দ হইল না। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও 'ডগ রোজ' বা 'হনিসাক্‌ল'-এর চারা বাঁচাইতে পারা গেল না।

হলদে ধুতুরা-জাতীয় এক প্রকার গাছ হ্রদের ধারে ধারে পুঁতিয়াছিলাম। খুব শীঘ্রই তাহার ফুল ফুটিল। যুগলপ্রসাদ পূর্ণিয়ার জঙ্গল হইতে বন্য বয়ড়া লতার বীজ আনিয়াছিল, চারা বাহির হইবার সাত মাসের মধ্যেই দেখি কাছাকাছি অনেক ঝোপেব মাথা বয়ড়া লতায় ছাইয়া যাইতেছে। বয়ড়া লতাব ফুল যেমন সুদৃশ্য, তেমনি তাহাব মৃদু সুবাস।

হেমন্তের প্রথমে একদিন দেখিলাম বয়ড়া লতায় অজস্র কুঁড়ি ধরিয়াছে।

যুগলপ্রসাদকে খবরটা দিতেই সে কলম ফেলিয়া আজমাবাদ কাছারি হইতে সাত মাইল দুরবর্তী সরস্বতী হ্রদের তীরে প্রায় দৌড়িতে দৌড়িতেই আসিল।

আমায় বলিল—লোকে বলেছিল হুজুর, বয়ড়া লতা জন্মাবে, বাড়বেও বটে, কিন্তু ওর ফুল ধরবে না। সব লতায় নাকি ফুল ধরে না। দেখুন কেমন কুঁড়ি এসেছে!

হ্রদের জলে 'ওয়াটার ক্রোফট্' বলিয়া এক প্রকার জলজ ফুলের গেঁড় পুতিয়াছিলাম। সে গাছ হু হু করিয়া এত বাড়িতে লাগিল যে, যুগলপ্রসাদের ভয় হইল জলে পদ্মের স্থান বুঝি ইহারা বেদখল করিয়া ফেলে!

বোগেনভিলিয়া লতা লাগাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শহরের শৌখীন পার্ক বা উদ্যানের সঙ্গে এতই ওর সম্পর্কটা জড়ানো যে আমার ভয় হইল সরস্বতী কুণ্ডীর বনে ফুলেভরা বোগেনভিলিয়ার ঝোপ ইহার বন্য আকৃতি নষ্ট করিয়া ফেলিবে। যুগলপ্রসাদেরও এসব বিষয়ে মত আমার ধরনের। সেও বারণ করিল।

অর্থব্যয়ও কম করি নাই। একদিন গনোরী তেওয়ারীর মুখে শুনিলাম, কারো নদীর ওপারে জয়ন্তী পাহাড়ের জঙ্গলে এক প্রকার অদ্ভুত ধরনের বন্যপুষ্প হয়—ওদেশে তার নাম দুধিয়া ফুল। হলুদ গাছের মত পাতা, অত বড়ই গাছ—খুব লম্বা একটা ডাঁটা ঠেলিয়া উঁচুদিকে তিন-চার হাত ওঠে। একটা গাছে চার-পাঁচটা ডাঁটা হয়, প্রত্যেক ডাঁটায় চারটি করিয়া হলদে রঙের ফুল ধরে—

দেখিতে খুব ভাল তো বটেই, ভারি সুন্দর তার সুবাস। রাত্রে অনেক দূর পর্যন্ত সুগন্ধ ছড়ায়। সে ফুলের একটা গাছ যেখানে একবার জন্মায়, দেখিতে দেখিতে এত হু-হু বংশবৃদ্ধি হয় যে, দু-তিন বছরে রীতিমত জঙ্গল বাঁধিয়া যায়।

শুনিয়া পর্যন্ত আমার মনের শান্তি নষ্ট হইল। ঐ ফুল আনিতেই হইবে। গনোরী বলিল, বর্ষাকাল ভিন্ন হইবে না; গাছের গেঁড় আনিয়া পুঁতিতে হয়—জল না পাইলে মরিয়া যাইবে।

পয়সা-কড়ি দিয়া যুগলপ্রসাদকে পাঠাইলাম। সে বহু অনুসন্ধানে জয়ন্তী পাহাড়ের দুর্গম জঙ্গল হইতে দশ-বারো গণ্ডা গেঁড় যোগাড় করিয়া আনিল।

নবম পরিচ্ছেদ

১

প্রায় তিন বছর কাটিয়া গিয়াছে।

এই তিন বছরে আমার অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। লবটুলিয়া ও আজমাবাদের বন্য প্রকৃতি কি মায়া-কাজল লাগাইয়া দিয়াছে আমার চোখে—শহরকে একরকম ভুলিয়া গিয়াছি। নির্জনতার মোহ, নক্ষত্রভরা উদার আকাশের মোহ আমাকে এমনি পাইয়া বসিয়াছে যে, মধ্যে একবার কয়েকদিনের জন্য পাটনায় গিয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম কবে পিচ-ঢালা বাঁধা-ধরা রাস্তার গণ্ডি এড়াইয়া চলিয়া যাইব লবটুলিয়া বইহারে—পেয়লার মত উপুড়করা নীল আকাশের তলে মাঠের পর মাঠ, অরণ্যের পর অরণ্য, যেখানে তৈবী রাজপথ নাই, ইটের ঘরবাড়ী নাই, মোটর-হর্ণের আওয়াজ নাই, ঘন ঘুমের ফাঁকে যেখানে কেবল দূর অন্ধকার বনে শেয়ালের দলের প্রহর-ঘোষণা শোনা যায়, নয়তো ধাবমান নীলগাইয়েব দলের সম্মিলিত পদধ্বনি, নয়তো বন্য মহিষের গম্ভীর আওয়াজ।

আমার উপরওয়ালারা ক্রমাগত আমাকে চিঠি লিখিয়া তাগাদা করিতে লাগিলেন, কেন আমি এখানকার জমি প্রজাবিলি করিতেছি না। আমি জানি আমার তাহাই একটি প্রধান কাজ বটে, কিন্তু এখানে প্রজা বসাইয়া প্রকৃতির এমন নিভৃত কুঞ্জবনকে নষ্ট করিতে মন সরে না। যাহারা জমি ইজারা লইবে, তাহারা তো জমিতে গাছপালা বনঝোপ সাজাইয়া রাখিবার জন্য কিনিবে না—কিনিয়াই তাহারা জমি সাফ করিয়া ফেলিবে, ফসল রোপণ করিবে, ঘর-বাড়ী বাঁধিয়া বসবাস শুরু করিবে—এই নির্জন শোভাময় বন্য প্রান্তর, অরণ্য, কুণ্ডী, শৈলমালা জনপদে পরিণত হইবে, লোকের ভিড়ে ভয় পাইয়া বনলক্ষ্মীরা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইবেন—মানুষ ঢুকিযা মায়াকাননের মায়াও দূর করিবে, সৌন্দর্যও ঘুচাইয়া দিবে।

সে জনপদ আমি মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

পাটনা, পূর্ণিয়া কি মুঙ্গেব যাইতে তেমন জনপদ এদেশের সর্বত্র। গায়ে গায়ে কুশ্রী, বেঢপ খোলার একতলা কি দোতলা মাঠকোঠা, চালে চালে বসতি, ফণিমনসার ঝাড়, গোবরস্তূপের আবর্জনার মাঝখানে গরু-মহিষের গোয়াল—ইঁদারা হইতে রহট্ দ্বারা জল উঠানো হইতেছে, ময়লা কাপড়-পরা নর-নারীর ভিড়, হনুমানজীর মন্দিরে ধ্বজা উড়িতেছে, রূপার হাঁসুলি গলায় উলঙ্গ বালক-বালিকার দল ধূলা মাখিয়া রাস্তার উপর খেলা করিতেছে।

কিসের বদলে কি পাওয়া যাইবে!

এমন বিশাল ছেদহীন, বাধাবন্ধনহীন, উদ্দাম সৌন্দর্যময়ী আরণ্যভূমি দেশের একটা বড় সম্পদ—অন্য কোন দেশ হইলে আইন করিয়া এখানে ন্যাশনাল্ পার্ক করিয়া রাখিত। কর্মক্লান্ত শহরের মানুষ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া প্রকৃতির সাহচর্যে নিজেদের অবসন্ন মনকে তাজা করিয়া লইয়া ফিরিত। তাহা হইবার জো নাই, যাহার জমি সে প্রজাবিলি না করিয়া জমি ফেলিয়া রাখিবে কেন?

আমি প্রজা বসাইবার ভার লইয়া এখানে আসিয়াছিলাম—সেই আরণ্য-প্রকৃতিকে ধ্বংস করিতে আসিয়া এই অপূর্ব বনা নায়িকার প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি। এখন আমি ক্রমশ সে-দিন পিছাইয়া দিতেছি—যখন ঘোড়ায় চড়িয়া ছায়াগহন বৈকাল কিংবা মুক্তাশুভ্র জ্যোৎস্নারাত্রে একা বাহির হই, তখন চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে ভাবি, আমার হাতেই ইহা নষ্ট হইবে? জ্যোৎস্নালোকে উদাস আত্মহারা, শিলাস্তৃত ধূ-ধূ নির্জন বন্য প্রান্তর! কি করিয়াই আমার মন ভুলাইয়াছে চতুরা সুন্দরী!

কিন্তু কাজ যখন করিতে আসিয়াছি, করিতেই হইবে। মাঘ মাসের শেষে পাটনা হইতে ছটু সিং নামে এক রাজপুত আসিযা হাজার বিঘা জমি বন্দোবস্ত লইতে চাহিয়া দরখাস্ত দিতেই আমি বিষম চিন্তায় পড়িলাম—হাজার বিঘা জমি দিলে তো অনেকটা জায়গাই নষ্ট হুইয়া যাইবে—কত সুন্দর বনঝোপ, লতাবিতান নির্মমভাবে কাটা পড়িবে যে!

ছটু সিং ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল—আমি তাহার দরখাস্ত সদরে পাঠাইয়া দিয়া ধ্বংসলীলাকে কিছু বিলম্বিত কবিবার চেষ্টা করিলাম।

২

একদিন লবটুলিয়া জঙ্গলের উত্তরে নাঢ়া বইহারের মুক্ত প্রান্তরের মধ্য দিয়া দুপুরের পরে আসিতেছি—দেখিলাম, একখানা পাথরের উপর কে বসিয়া আছে পথের ধারে।

তাহার কাছে আসিয়া ঘোড়া থামাইলাম। লোকটির বয়স ষাটের কম নয়, পরনে ময়লা কাপড়, একটা ছেঁড়া চাদর গায়ে।

এ জনশূন্য প্রান্তরে লোকটা কি করিতেছে একা বসিয়া?

সে বলিল—আপনি কে বাবু?

বলিলাম—আমি এখানকার কাছারির কর্মচারী।

—আপনি কি ম্যানেজারবাবু?

—কেন বল তো? তোমার কোন দরকার আছে? হ্যাঁ, আমিই ম্যানেজার।

লোকটা উঠিয়া আমার দিকে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে হাত তুলিল। বলিল—হুজুর, আমার নাম মটুকনাথ পাঁড়ে, ব্রাহ্মণ। আপনার কাছেই যাচ্ছি।

—কেন?

—হুজুর, আমি বড় গরীব। অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি হুজুরের নাম শুনে। তিন দিন থেকে হাঁটছি পথে পথে। যদি আপনার কাছে চলাচলতির কোন একটা উপায় হয়—

আমার কৌতূহল হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—এ ক'দিন জঙ্গলের পথে তুমি কি খেয়ে আছ?

মটুকনাথ তাহার মলিন চাদরের একপ্রান্তে বাঁধা পোয়াটাক কলাইয়ের ছাতু দেখাইয়া বলিল—সেরখানেক ছাতু ছিল এতে বাঁধা, এই নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিলাম। তাই ক'দিন খাচ্ছি। রোজগারের চেষ্টায় বেড়াচ্ছি, হুজুর—আজ ছাতু ফুরিয়ে এসেছে, ভগবান জুটিয়ে দেবেন আবার।

আজমাবাদ ও নাঢ়া বইহারের এই জনশূন্য বনপ্রান্তরে উড়ানির খুঁটে ছাতু বাঁধিয়া লোকটা কি রোজগারের প্রত্যাশায় আসিয়াছে বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—বড় বড় শহর ভাগলপুর, পূর্ণিয়া, পাটনা, মুঙ্গের ছেড়ে এ জঙ্গলের মধ্যে এলে কেন পাঁড়েজী? এখানে কি হবে? লোক কোথায় এখানে? তোমাকে দেবে কে?

মটুকনাথ আমার মুখের দিকে নৈরাশ্যপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—এখানে কিছু রোজগার হবে না বাবু? তবে আমি কোথায় যাব? ও-সব বড় শহরে আমি কাউকে চিনি নে, রাস্তাঘাট চিনি নে, আমার ভয় করে। তাই এখানে যাচ্ছিলাম—

লোকটাকে বড় অসহায়, দুঃখী ও ভালমানুষ বলিয়া মনে হইল। সঙ্গে করিয়া কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

কয়েকদিন চলিয়া গেল। মটুকনাথকে কোন কাজ করিয়া দিতে পারিলাম না—দেখিলাম, সে কোন কাজ জানে না—কিছু সংস্কৃত পড়িয়াছে, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কাজ করিতে পারে। টোলে ছাত্র পড়াইত, আমার কাছে বসিয়া সময়ে অসময়ে উদ্ভট শ্লোক আবৃত্তি করিয়া বোধ হয় আমার অবসর-বিনোদনের চেষ্টা করে।

একদিন আমায় বলিল—আমায় কাছারির পাশে একটু জমি দিয়ে একটা টোল খুলিয়ে দিন হুজুর।

বলিলাম—কে পড়বে টোলে পণ্ডিতজী, বুনো মহিষ ও নীলগাইয়েব দল কি ভট্টি বা রঘুবংশ বুঝবে?

মটুকনাথ নিপাট ভালমানুষ—বোধ হয় কিছু না ভাবিয়া দেখিয়াই টোল খুলিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। ভাবিলাম, বুঝিবা এবাব সে নিরস্ত হইবে। কিন্তু দিন-কতক চুপ কবিয়া থাকিয়া আবাব সে কথাটা পাড়িল।

বলিল—দিন দয়া ক'রে একটা টোল আমায় খুলে। দেখি না চেষ্টা ক'রে কি হয়। নয়ত আর যাব কোথায় হুজুব?

ভাল বিপদে পড়িয়াছি, লোকটা কি পাগল। ওব মুখের দিকে চাহিলেও দয়া হয়, সংসারের ঘোরপেঁচ বোঝে না, নিতান্ত সরল, নির্বোধ ধরনের মানুষ—অথচ একরাশ নির্ভব ও ভরসা লইয়া আসিযাছে—কাহাব উপর কে জানে?

তাহাকে কত বুঝাইলাম, আমি জমি দিতে রাজী আছি, সে চাষবাস করুক, যেমন রাজু পাঁড়ে করিতেছে। মটুকনাথ মিনতি করিয়া বলিল, তাহারা বংশানুক্রমে শাস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, চাষকাজের সে কিছুই জানে ন, জমি লইয়া কি করিবে?

তাহাকে বলিতে পারিতাম, শাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত-মানুষ এখানে মরিতে আসিয়াছে কেন, কিন্তু কোন কঠিন কথা বলিতে মন সরিল না। লোকটাকে বড় ভাল লাগিয়াছিল। অবশেষে তাহার নির্বন্ধাতিশয্যে একটা ঘব বাঁধিয়া দিয়া বলিলাম, এই তোমার টোল, এখন ছাত্র যোগাড় হয় কি না দেখ।

মটুকনাথ পূজার্চনা করিয়া দু-তিনটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া টোল প্রতিষ্ঠা করিল। এ জঙ্গলে কিছুই মেলে না, সে নিজের হাতে মকাইয়ের আটার মোটা মোটা পুরী ভাজিল এবং জংলী ধুঁধুলের তরকারী। বাথান হইতে মহিষের দুধ আনাইয়া দই পাতিয়া রাখিয়াছিল। নিমন্ত্রিত দলে অবশ্য আমিও ছিলাম।

টোল খুলিয়া কিছুদিন মটুকনাথ বড় মজা করিতে লাগিল।

পৃথিবীতে এমন মানুষও সব থাকে!

সকালে স্নানাহ্নিক সারিয়া সে টোলঘরে একখানা বন্য খেজুরপাতায় বোনা আসনের উপর গিয়া বসে এবং সম্মুখে মুগ্ধবোধ খুলিয়া সূত্র আবৃত্তি করে, ঠিক যেন কাহাকে পড়াইতেছে। এমন চেঁচাইয়া পড়ে যে, আমি আমার আপিসঘরে বসিয়া কাজ করিতে করিতে শুনিতে পাই।

তহশীলদার সজ্জন সিং বলে—পণ্ডিতজী লোকটা বদ্ধ পাগল! কি করছে দেখুন হুজুর।

মাস-দুই এইভাবে কাটে। শূন্য ঘরে মটুকনাথ সমান উৎসাহে টোল করিয়া চলিয়াছে। একবার সকালে, একবার বৈকালে। ইতিমধ্যে সরস্বতী পূজা আসিল। কাছারিতে দোয়াত-পূজার দ্বারা বাগ্দেবীর

অর্চনা নিষ্পন্ন করা হয় প্রতি বৎসর, এ জঙ্গলে প্রতিমা কোথায় গড়ানো হইবে? মটুকনাথ তার টোলে শুনিলাম আলাদা পূজা করিবে, নিজের হাতে নাকি প্রতিমা গড়িবে।

ষাট বছরের বৃদ্ধের কি ভরসা, কি উৎসাহ!

নিজের হাতে ছোট প্রতিমা গড়িল মটুকনাথ। টোলে আলাদা পূজা হইল।

বৃদ্ধ হাসিমুখে বলিল—বাবুজী, এ আমাদের পৈতৃক পুজো। আমার বাবা চিরকাল তাঁর টোলে প্রতিমা গড়িয়ে পুজো করে এসেছেন, ছেলেবেলায় দেখেছি। এখন আবার আমার টোলে—

কিন্তু টোল কই?

মটুকনাথকে একথা বলি নাই অবশ্য।

৩

সরস্বতী পূজার দিন-দশ-বারো পরে মটুকনাথ পণ্ডিত আমাকে আসিয়া জানাইল, তাহার টোলে একজন ছাত্র আসিয়া ভর্তি হইয়াছে। আজই সে নাকি কোথা হইতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

মটুকনাথ ছাত্রটিকে আমার সামনে হাজির করাইল। চৌদ্দ-পনেরো বছরের কালো, শীর্ণকায় বালক, মৈথিলী ব্রাহ্মণ, নিতান্ত গরীব, পরনের কাপড়খানি ছাড়া দ্বিতীয় বস্ত্র পর্যন্ত নাই।

মটুকনাথের উৎসাহ দেখে কে! নিজে খাইতে পায় না, সেই মুহূর্তে সে ছাত্রটির ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিয়া বসিল। ইহাই তাহার কুলপ্রথা, টোলের ছাত্রের সকল প্রকার অভাব-অনটন এতদিন তাহাদের টোল হইতে নির্বাহ হইয়া আসিয়াছে, বিদ্যা শিখিবার আশায় যে আসিয়াছে, তাহাকে সে ফিরাইতে পারিবে না।

মাস দুইয়ের মধ্যে দেখিলাম, আরও দু-তিনটি ছাত্র জুটিল টোলে। ইহারা এক বেলা খায়, এক বেলা খায় না। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া মকায়ের ছাতু, আটা, চীনার দানা দেয়, কাছারি হইতে আমিও কিছু সাহায্য করি। জঙ্গল হইতে বাথুয়া শাক তুলিয়া আনে ছাত্ররা। তাহাই সিদ্ধ করিয়া খাইয়া হয়ত একবেলা কাটাইয়া দেয়। মটুকনাথেরও সেই অবস্থা।

রাত দশটা এগারোটা পর্যন্ত মটুকনাথ শুনি ছাত্র পড়াইতেছে টোলঘরের সামনে একটা হরীতকী গাছের তলায়। অন্ধকারেই অথবা জ্যোৎস্নালোকে—কারণ আলো জ্বালাইবার তেল জোটে না।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য হইয়াছি। মটুকনাথ টোলঘরের জন্য জমি ও ঘর বাঁধিয়া দেওয়ার প্রার্থনা ছাড়া আমার কাছে কোন দিন কোন আর্থিক সাহায্য চায় নাই। কোন দিন বলে নাই, আমার চলে না, একটা উপায় করুন। কাহাকেও সে কিছু জানায় না সিপাহীরা নিজের ইচ্ছায় যা দেয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে মটুকনাথের টোলের ছাত্রসংখ্যা বেশ বাড়িল। দশ-বারোটি বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো গরীব বালক বিনা পয়সায় অল্প আয়াসে খাইতে পাইবার লোভে নানা জায়গা হইতে আসিয়া জুটিয়াছে। কারণ এ-সব দেশে কাকের মুখে একথা ছড়ায়। ছাত্রগুলিকে দেখিয়া মনে হইল ইহারা পূর্বে মহিষ চরাইত; কারও মধ্যে এতটুকু বুদ্ধির উজ্জ্বলতা নাই—ইহারা পড়িবে কাব্য-ব্যাকরণ? মটুকনাথকে নিরীহ মানুষ পাইয়া পড়িবার ছুতায় ঘাড়ে বসিয়া খাইতে আসিয়াছে। কিন্তু মটুকনাথের এসব দিকে খেয়াল নাই, সে ছাত্র পাইয়া মহা খুশী।

একদিন শুনিলাম, টোলের ছাত্রগণ কিছু খাইতে না পাইয়া উপবাস করিয়া আছে। সেই সঙ্গে মটুকনাথও।

মটুকনাথকে ডাকাইয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম।

কথাটা ঠিকই। সিপাহীরা চাঁদা করিয়া যে আটা ও ছাতু দিয়াছিল, তাহা ফুরাইয়াছে, কয়েক

দিন রাত্রে শুধু বাথুয়া শাক সিদ্ধ আহার করিয়া চলিতেছিল, আজ তাহাও পাওয়া যায় নাই। তাহা ছাড়া উহা খাইয়া অনেকের অসুখ হওয়াতে কেহ খাইতে চাহিতেছেন না।

—তা এখন কি করবে পণ্ডিতজী?

—কিছু তো ভেবে পাচ্ছিনে হুজুর। ছোট ছোট ছেলেগুলো না খেয়ে থাকবে—

আমি উহাদের সকলের জন্য সিধা বাহির করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। দু-তিন দিনের উপযুক্ত চাল, ডাল, ঘি, আটা। বলিলাম—টোল কি ক'রে চালাবে, পণ্ডিতজী? ও উঠিয়ে দাও। খাবে কি, খাওয়াবে কি?

দেখিলাম, আমার কথায় সে আঘাত পাইয়াছে। বলিল—তাও কি হয় হুজুর? তৈরি টোল কি ছাড়তে পারি? ঐ আমার পৈতৃক ব্যবসায়।

মটুকনাথ সদানন্দ লোক। তাহাকে এ-সব বুঝাইয়া ফল নাই। সে ছাত্র কয়টি লইয়া বেশ মনের সুখেই আছে দেখিলাম।

আমার এই বনভূমির একপ্রান্ত যেন সেকালের ঋষিদের আশ্রম হইয়া উঠিয়াছে মটুকনাথের কৃপায়। টোলের ছাত্ররা কলরব করিয়া পড়াশুনা করে, মুগ্ধবোধের সূত্র আওড়ায়, কাছারির লাউ-কুমড়ার মাচা হইতে ফল চুরি করে, ফুলগাছের ডাল পাতা ভাঙ্গিয়া ফুল লইয়া যায়, এমন কি মাঝে মাঝে কাছারির লোকজনের জিনিসপত্রও চুরি যাইতে লাগিল—সিপাহীরা বলাবলি করিতে লাগিল, টোলের ছাত্রদের কাজ।

একদিন নায়েবের ক্যাশবাক্স খোলা অবস্থায় তাহার ঘরে পড়িয়া ছিল। কে তাহারা মধ্য হইতে কয়েকটি টাকা ও নায়েবের একটি ঘষা মরা-সোনার আংটি চুরি করিল। তাহা লইয়া খুব হৈ হৈ করিল সিপাহীরা। মটুকনাথের এক ছাত্রের কাছে কয়েকদিন পরে আংটিটা পাওয়া গেল। সে কোমরের ঘুনসিতে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কে দেখিতে পাইয়া কাছারিতে আসিয়া বলিয়া দিল। ছাত্র বামাল-সুদ্ধ ধরা পড়িল।

আমি মটুকনাথকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে সত্যই নিরীহ লোক. তাহার ভালমানুষির সুযোগ গ্রহণ করিযা দুর্দান্ত ছাত্রেরা যাহা খুশি করিতেছে। টোল ভাঙিবার দরকার নাই, অন্তত কয়েকজন ছাত্রকে তাড়াইতেই হইবে। বাকি যাহারা থাকিতে চায়, আমি জমি দিতেছি, উহারা নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জমিতে কিছু কিছু মকাই, চীনাঘাস, ও তরকারির চাষ করুক। খাদ্য শস্য যাহা উৎপন্ন হইবে, তাহাতেই উহাদের চলিবে।

মটুকনাথ এ-প্রস্তাব ছাত্রদের কাছে করিল। বারোজন ছাত্রের মধ্যে আটজন শুনিবামাত্র পালাইল। চারজন রহিয়া গেল, তাও আমার মনে হয় বিদ্যানুরাগের জন্য নয়, নিতান্ত কোথাও উপায় নাই বলিয়া। পূর্বে মহিষ চরাইত, এখন না-হয় চাষ করিবে। সেই হইতে মটুকনাথের টোল চলিতেছে মন্দ নয়।

৪

ছট্টু সিং ও অন্যান্য প্রজাদের জমি বিলি হইয়া গিয়াছে। সর্বসুদ্ধ প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি। নাঢ়া বইহারের জমি অত্যন্ত উর্বব বলিয়া ঐ অংশেই দেড় হাজার বিঘা জমি একসঙ্গে উহাদের দিতে হইয়াছে। সেখানকার প্রান্তরসীমার বনানী অতি শোভাময়ী, কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘোড়ায় আসিবার সময় সে বন দেখিয়া মনে হইয়াছে, জগতের মধ্যে নাঢ়া বইহারের এই বন একটা বিউটি স্পট—গেল সে বিউটি স্পট!

দূর হইতে দেখিতাম বনে আগুন দিয়াছে, খানিকটা পোড়াইয়া না ফেলিলে ঘন দুর্ভেদ্য জঙ্গল কাটা যায় না। কিন্তু সব জায়গায় তো বন নাই, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ধারে ধারে নিবিড় বন, হয়ত প্রান্তরের মাঝে মাঝে বনঝোপ, কত কি লতা, কত কি বনকুসুম।...

চট্ চট্ শব্দ করিয়া বন পুড়িতেছে, দূর হইতে শুনি—কত শোভাময় লতাবিতান ধ্বংস হইয়া গেল, বসিয়া বসিয়া ভাবি। কেমন একটা কষ্ট হয় বলিয়া ওদিকে যাই না। দেশের একটা এত বড় সম্পদ, মানুষের মনে যাহা চিরদিন শান্তি ও আনন্দ পরিবেশন করিতে পারিত—একমুষ্টি গমের বিনিময়ে তাহা বিসর্জন দিতে হইল।

কার্তিক মাসের প্রথমে একদিন জায়গাটা দেখিতে গেলাম। সমস্ত মাঠটাতে সরিষা বপন করা হইয়াছে—মাঝে মাঝে লোকজনেরা ঘর বাঁধিয়া বাস করিতেছে, ইহার মধ্যেই গরু-মহিষ, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া গ্রাম বসাইয়া ফেলিয়াছে।

শীতকালের মাঝামাঝি যখন সর্ষেক্ষেত হলুদ ফুলে আলো করিয়াছে, তখন যে দৃশ্য চোখের সম্মুখে উন্মুক্ত হইল, তাহার তুলনা নাই। দেড় হাজার বিঘা ব্যাপী একটা বিরাট প্রান্তব দূর দিগ্বলয়সীমা পর্যন্ত হলুদ রঙের গালিচায় ঢাকা—এর মধ্যে ছেদ নাই, বিরাম নাই—উপরে নীল আকাশ, ইন্দ্রনীলমণির মত নীল—তার তলায় হলুদ—হলুদ রঙের ধরণী, যতদূব দৃষ্টি যায়। ভাবিলাম, এও একরকম মন্দ নয়।

একদিন নূতন গ্রামগুলি পরিদর্শন করিতে গেলাম। ছট্টু সিং বাদে সকলেই গরীব প্রজা। তাহাদের জন্য একটা নৈশ স্কুল করিয়া দিব ভাবিলাম—অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে সর্ষেক্ষেতের ধারে ধারে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতে দেখিয়া আমার নৈশ স্কুলের কথা আগে মনে পড়িল।

কিন্তু শীঘ্রই নূতন প্রজারা ভয়ানক গোলমাল বাধাইল। দেখিলাম ইহারা মোটেই শান্তিপ্রিয় নয়। একদিন কাছারিতে বসিয়া আছি, খবর আসিল নাঢ়া বইহারের প্রজারা নিজেদের মধ্যে ভয়ানক দাঙ্গা শুরু করিয়াছে। জমির আল নির্দিষ্ট কিছু না থাকাতেই এই গোলমাল বাধিয়াছে, যাহার পাঁচ-বিঘা জমি সে দশ-বিঘা জমির ফসল দখল করিতে বসিয়াছে। আরও শুনিলাম, সর্ষে পাকিবার কিছুদিন আগে ছট্টু সিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আসল উদ্দেশ্য এখন বোঝা যাইতেছে। নিজের তিন-চার-শ বিঘা আবাদী জমির ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বইহারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করিতে চায়।

কাছারির আমলারা বলিল—এ-দেশের এই নিয়ম হুজুর। লাঠি যার ফসল তার।

যাহাদের লাঠির জোর নাই, তাহারা কাছারিতে আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল।

তাহারা নিরীহ গরীব গাঙ্গোতা প্রজা—সামান্য দু-দশ বিঘা জমি জঙ্গল কাটিয়া চাষ করিযাছিল, স্ত্রী-পুত্র আনিয়া জমির ধাবেই ঘর-বাড়ী করিয়া বাস করিতেছিল—এখন সারা বছরের পরিশ্রমের ও আশার সামগ্রী প্রবলের অত্যাচারে যাইতে বসিয়াছে!

কাছারির দুইজন সিপাহীকে ঘটনাস্থলে পাঠাইয়াছিলাম ব্যাপার কি দেখিতে। তাহারা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া জানাইল—ভীমদাস টোলার উত্তর সীমায় ভয়ানক দাঙ্গা বাধিয়াছে।

তখনই তহশীলদার সজ্জন সিং ও কাছারির সমস্ত সিপাহীদের লইয়া ঘোড়ায় করিয়া ঘটনাস্থলে রওনা হইলাম। দূব হইতেই একটা হৈ-হৈ গোলমাল কানে আসিল। নাঢ়া বইহারের মাঝখান দিয়া একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য নদী বহিয়া গিয়াছে—গোলমালটা যেন সেদিকেই বেশী।

নদীর ধারে গিয়া দেখি নদীর দুই পারেই লোক জড় হইয়াছে—প্রায় ষাট-সত্তর জন এপারে, ওপারে ত্রিশ-চল্লিশ জন ছট্টু সিং-এর রাজপুত লাঠিয়াল। ওপারের লোক এপারে আসিতে চায়, এপারের লোকেরা বাধা দিতে দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যেই জন-দুই লোক জখমও হইয়াছে—তাহারা এপারের দলের। জখম হইয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল, সেই সময় ছট্টু সিং-এর লোকেরা টাঙি দিয়া

একজনের মাথা কাটিতে চেষ্টা করে—এ-পক্ষ ছিনাইয়া নদী হইতে উঠাইয়া আনিয়াছে। নদীতে অবশ্য পা ডোবে না এমনি জল, পাহাড়ী নদী তার উপর শীতের শেষ।

কাছারির লোকজন দেখিয়া উভয় পক্ষ দাঙ্গা থামাইয়া আমার কাছে আসিল। প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের যুধিষ্ঠির এবং অপর পক্ষকে দুর্যোধন বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল। সে হৈ-হৈ কলরবের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। উভয় পক্ষকে কাছারিতে আসিতে বলিলাম। আহত লোক দুটির সামান্য লাঠির চোট লাগিয়াছিল, এমন গুরুতর জখম কিছু নয়। তাহাদেরও কাছারিতে লইয়া আসিলাম।

ছটু সিং-এর লোকেরা বলিল, দুপুরের পরে তাহারা কাছারিতে আসিয়া দেখা করিবে। ভাবিলাম, সব মিটিয়া গেল। কিন্তু তখনও আমি এদেশের লোক চিনি নাই। দুপুরের অল্প পরেই আবার খবর আসিল নাঢ়া বইহারে ঘোর দাঙ্গা বাধিয়াছে। আমি পুনরায় লোকজন লইয়া ছুটিলাম। একজন ঘোড়সওয়ার পনের মাইল দূরবর্তী নওগাছিয়া থানায় রওনা করিয়া দিলাম। গিয়া দেখি ঠিক ও-বেলার মতই ব্যাপার। ছটু সিং এবেলা আরও অনেক লোক জড় করিয়া আনিয়াছে। শুনিলাম রাসবিহারী সিং রাজপুত ও নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা ছটু সিংকে সাহায্য করিতেছে। ছটু সিং ঘটনাস্থলে ছিল না, তাহার ভাই গজাধর সিং ঘোড়ায় চাপিয়া কিছুদূরে দাঁড়াইয়াছিল—আমায় আসিতে দেখিয়া সরিয়া পড়িল। এবার দেখিলাম রাজপুতদলের দুজনের হাতে বন্দুক রহিয়াছে।

ওপার হইতে রাজপুতেরা হাঁকিয়া বলিল—হুজুর, সরে যান আপনি, আমরা একবার এই বাঁদীর বাচ্চা গাঙ্গোতাদের দেখে নিই।

আমার দলবল গিয়া আমার হুকুমে উভয় দলের মাঝখানে দাঁড়াইল। আমি তাহাদিগকে জানাইলাম নওগাছিয়া থানায় খবর গিয়াছে, এতক্ষণ পুলিস অর্ধেক রাস্তা আসিয়া পড়িল। ওসব বন্দুক কার নামে। বন্দুকের আওয়াজ করিলে তার জেল অনিবার্য। আইন ভয়ানক কড়া।

বন্দুকধারী লোক দুজন একটু পিছাইয়া পড়িল।

আমি এপারের গাঙ্গোতা প্রজাদের ডাকিয়া বলিলাম—তাহাদের দাঙ্গা করিবার কোনো দরকার নাই। তাহারা যে যার জায়গায় চলিয়া যাক। আমি এখানে আছি। আমার সমস্ত আমলা ও সিপাহীরা আছে। ফসল লুঠ হয় আমি দায়ী।

গাঙ্গোতা-দলের সর্দার আমার উপর নির্ভর করিয়া নিজের লোকজন হটাইয়া কিছুদূরে একটা বকাইন গাছের তলায় দাঁড়াইল। আমি বলিলাম—ওখানেও না। একেবারে সোজা বাড়ী গিয়ে ওঠো। পুলিস আসছে।

রাজপুতেরা অত সহজে দমিবার পাত্রই নয়। তাহারা ওপারে দাঁড়াইয়া নিজেদের মধ্যে কি পরামর্শ করিতে লাগিল। তহশীলদারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কি ব্যাপার সজ্জন সিং? আমাদের উপর চড়াও হবে নাকি?

তহশীলদার বলিল, হুজুর, ওই যে নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালা জুটেছে, ওকেই ভয় হয়। ও বদ্‌মাসটা আস্ত ডাকাত।

—তাহলে তৈরী হয়ে থাকো। নদী পার কাউকে হতে দেবে না। ঘণ্টা দুই সামলে রাখো, তার পরই পুলিস এসে পড়বে।

রাজপুতেরা পরামর্শ করিয়া কি ঠিক করিল জানি না, একদল আগাইয়া আসিয়া বলিল—হুজুর, আমরা ওপারে যাব।

বলিলাম, কেন?

—আমাদের কি ওপারে জমি নেই?

—পুলিসের সামনে সে কথা বোলো। পুলিস তো এসে পড়ল। আমি তোমাদের এপারে আসতে দিতে পারিনে।

—কাছারিতে একরাশ টাকা সেলামী দিয়ে জমি বন্দোবস্ত নিয়েছি কি ফসল লোকসান করবার জন্যে? এ আপনার অন্যায় জুলুম।

—সে কথাও পুলিসের সামনে বোলো।

—আমাদের ওপারে যেতে দেবেন না?

—না, পুলিস আসবার আগে নয়। আমার মহালে আমি দাঙ্গা হ'তে দেবো না।

ইতিমধ্যে কাছারির আরও লোকজন আসিয়া পড়িল। ইহারা আসিয়া রব উঠাইয়া দিল, পুলিস আসিতেছে। ছট্টু সিং-এর দল ক্রমশ দু-একজন করিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। তখনকার মত দাঙ্গা বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মারপিট, পুলিস-হাঙ্গামা, খুনজখমের সেই যে সূত্রপাত হইল, দিন দিন তাহা বাড়িয়া চলিতে লাগিল বই কমিল না। আমি দেখিলাম ছট্টু সিং-এর মত দুর্দান্ত রাজপুতকে একসঙ্গে অতটা জমি বিলি করিবার ফলেই যত গোলমালের সৃষ্টি। ছট্টু সিংকে একদিন ডাকাইলাম। সে বলিল, এসবের বিন্দুবিসর্গ সে জানে না। সে অধিকাংশ সময় ছাপরায় থাকে। তার লোকেরা কি করে না-করে তার জন্য সে কি করিয়া দায়ী?

বুঝিলাম লোকটা পাকা ঘুঘু। সোজা কথায় এখানে কাজ হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইহাকে জব্দ করিতে হইলে অন্য পথ দেখিতে হইবে।

সেই হইতে আমি গাঙ্গোতা প্রজা ভিন্ন অন্য কোন লোককে জমি দেওয়া একেবারে বন্ধ করিয়া দিলাম। কিন্তু যে-ভুল আগেই হইয়া গিয়াছে, তাহাব কোন প্রতিকার আর হইল না। নাঢ়া বইহারের শান্তি চিবদিনেব জন্য ঘুচিয়া গেল।

৫

আমাদের বারো মাইল দীর্ঘ জংলী-মহালের উত্তর অংশে প্রায় পাঁচ-ছ'শ একর জমিতে প্রজা বসিয়া গিয়াছে। পৌষ মাসের শেযে একদিন সেদিকে যাইবার দরকার হইয়াছিল—গিযা দেখি এরা এ-অঞ্চলের চেহারা বদলাইয়া দিযাছে।

ফুলকিযাব জঙ্গল হইতে হঠাৎ বাহির হইয়া চোখে পডিল সামনে দিগন্তবিস্তীর্ণ ফুল-ফোটা সর্ষেখেত—যতদূব চোখ যায়, ডাইনে, বাঁয়ে, সামনে, একটানা হলুদে-ফুল-তোলা একখানা সুবিশাল গালিচা কে যেন পাতিয়া গিয়াছে—এর কোথাও বাধা নাই, ছেদ নাই, জঙ্গলের সীমা হইতে একেবারে বহু, বহু দূরের চক্রবাল-রেখার নীল শৈলমালার কোলে মিশিয়াছে। মাথার উপরে শীতকালের নির্মেঘ নীল আকাশ। এই অপরূপ শস্যক্ষেত্রের মাঝে মাঝে প্রজাদের কাশের খুপরি। স্ত্রী-পুত্র লইয়া এই দুরন্ত শীতে কি কবিয়া তাহারা যে এই কাশ-ডাঁটার বেড়া-ঘেরা কুটিরে এই উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে বাস করে!

ফসল পাকিবাব সময়ের আর বেশী দেরি নাই। ইহাব মধ্যে কাটুনী মজুরের দল নানাদিক হইতে আসিতে শুরু করিয়াছে। ইহাদের জীবন বড় অদ্ভুত—পূর্ণিয়া, তরাই ও জয়ন্তীর পাহাড়-অঞ্চল ও উত্তর ভাগলপুর হইতে স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল পাকিবার সময় ইহারা আসিয়া ছোট ছোট কুঁড়েঘর নির্মাণ করিয়া বাস করে ও জমির ফসল কাটে—ফসলের একটা অংশ মজুরিস্বরূপ পায়। আবার ফসল কাটা শেষ হইয়া গেলে কুঁড়েঘর ফেলিয়া রাখিয়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া চলিয়া যায়। আবার আর বছর আসিবে। ইহাদের মধ্যে নানা জাতি আছে—বেশীর ভাগই গাঙ্গোতা কিন্তু ছত্রী, ভূমিহার ব্রাহ্মণ, মৈথিল ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আছে।

এ-অঞ্চলের নিয়ম, ফসল কাটিবার সময়ে ক্ষেতে বসিয়া খাজনা আদায় করিতে হয়।—নয়ত এক গরীব প্রজা, ফসল ক্ষেত হইতে উঠিয়া গেলে আর খাজনা দিতে পারে না। খাজনা আদায়

তদারক করিবার জন্য দিনকতক আমাকে ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তবিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের মধ্যে থাকিবার দরকার হইল।

তহশীলদার বলিল—ওখানে তাহলে ছোট তাঁবুটা খাঁটিয়ে দেব?

—একদিনের মধ্যেই ছোট একটি কাশের খুপরি করে দাও না।

—এই শীতে তাতে কি থাকতে পারবেন হুজুর?

—খুব। তুমি তাই কর।

তাহাই হইল। পাশাপাশি তিন-চারটা ছোট ছোট কাশের কুটির, একটা আমার শয়নঘর, একটা রান্নাঘর, একটাতে দুজন সিপাহী ও পাটোয়ারী থাকিবে। এ-ধরনের ঘরকে এদেশে বলে 'খুপরি'—দরজা-জানালার বদলে কাশের বেড়ার খানিকটা করিয়া কাটা—বন্ধ করিবার উপায় নাই—হু-হু হিম আসে রাত্রে। এত নীচু যে হামাগুড়ি দিয়া ভিতরে ঢুকিতে হয়। মেঝেতে খুব পুরু করিয়া শুক্‌নো কাশ ও বন-ঝাউয়ের সুঁটি বিছানো—তাহার উপর শতরঞ্জি, তাহার উপর তোশক-চাদর পাতিয়া ফরাস করা। আমার খুপরিটি দৈর্ঘ্যে সাত হাত প্রস্থে তিন হাত। সোজা হইয়া দাঁড়ানো অসম্ভব ঘরের মধ্যে, কারণ উচ্চতায় মাত্র তিন হাত।

কিন্তু বেশ লাগে এই খুপরি। এত আরাম ও আনন্দ কলিকাতায় তিন-চাবতলা বাড়ীতে থাকিয়াও পাই নাই। তবে বোধ হয় আমি দীর্ঘদিন এখানে থাকিবার ফলে বন্য হইয়া যাইতেছিলাম, আমার রুচি, দৃষ্টিভঙ্গি, ভাল-মন্দ লাগা সবেরই উপর এই মুক্ত অরণ্য-প্রকৃতির অল্প-বিস্তর প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছিল, তাই এমন হইতেছে কিনা কে জানে?

খুপরিতে ঢুকিয়া প্রথমেই আমার ভাল লাগিল সদ্য-কাশ-ডাঁটাব তাজা সুগন্ধটা, যাহা দিয়া খুপরির বেড়া বাঁধা। তাহার পব ভাল লাগিল আমার মাথার কাছে এক বর্গহাত পরিমিত ঘুলঘুলিপথে দৃশ্যমান, অর্ধশায়িত অবস্থায় আমাব দুটি চোখের দৃষ্টিব প্রায় সমতলে অবস্থিত ধূ-ধূ বিস্তীর্ণ সর্ষেক্ষেতের হল্‌দে ফুলরাশি। এ-দৃশ্যটা একেবারে অভিনব, আমি যেন একটা পৃথিবীজোড়া হল্‌দে কার্পেটের উপরে শুইয়া আছি। হু-হু হাওয়ায় তীব্র ঝাঁঝালো সর্ষেফুলের গন্ধ।

শীতও যা পড়িতে হয় পড়িয়াছিল। পশ্চিমে হাওয়াব একদিনও কামাই ছিল না, অমন কড়া রৌদ্র যেন ঠাণ্ডা জল হইয়া যাইত কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়ার প্রাবল্যে। বইহাবের বিস্তৃত কুল-জঙ্গলের পাশ দিয়া ঘোড়ায় কবিয়া ফিবিবার সময় দেখিতাম দূবে তিরাশী-চৌকার অনুচ্চ নীল পাহাড়-শ্রেণীর ওপারে শীতের সূর্যাস্ত। সারা পশ্চিম আকাশ অগ্নিকোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্যন্ত রাঙা হইয়া যায়, তরল আগুনের সমুদ্র হু-হু করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিগোলকের মত বড় সূর্যটা নামিয়া পড়ে—মনে হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতি যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি, বিশাল ভূপৃষ্ঠ যেন পশ্চিম দিক হইতে পূর্বে ঘুরিয়া আসিতেছে, অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত হইত, সত্যই মনে হইত যেন পশ্চিম দিক্‌চক্রবাল-প্রান্তের ভূপৃষ্ঠ আমার অবস্থিতি-বিন্দুর দিকে ঘুরিয়া আসিতেছে।

রোদটুকু মিলাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেজায় শীত পড়িত, আমরাও সারাদিনের গুরুতর পরিশ্রম ও ঘোড়ায় ইতস্তত ছুটাছুটির পরে সন্ধ্যাবেলা প্রতিদিন আমার খুপরির সামনে আগুন জ্বালিয়া বসিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারাবৃত বনপ্রান্তরের ঊর্ধ্বাকাশে অগণ্য নক্ষত্রালোক কত দূরের বিশ্বরাজির জ্যোতির দূতরূপে পৃথিবীর মানুষের চক্ষুর সম্মুখে দেখা দিত। আকাশে নক্ষত্ররাজি জ্বলিত যেন জ্বলজ্বলে বৈদ্যুতিক বাতির মত—বাংলা দেশে অমন কৃত্তিকা, অমন সপ্তর্ষিমণ্ডল কখনও দেখি নাই। দেখিয়া দেখিয়া তাহাদের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। নীচে ঘন অন্ধকার বনানী, নির্জনতা, রহস্যময়ী রাত্রি, মাথার উপরে নিত্যসঙ্গী অগণ্য জ্যোতির্লোক। এক-একদিন এক ফালি অবাস্তব চাঁদ অন্ধকারের সমুদ্রে সুদূর বাতিঘরের আলোর মত দেখাইত। আর সেই ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারকে আগুনের তীক্ষ্ণ তীর দিয়া সোজা কাটিয়া এদিকে ওদিকে উল্কা খসিয়া পড়িতেছে। দক্ষিণে, উত্তরে, ঈশানে,

নৈঋতে, পূর্বে, পশ্চিমে, সবদিকে। এই একটা, ওই একটা, ওই দুটো, এই আবার একটা—মিনিটে মিনিটে, সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে।

এক-একদিন গনোরী তেওয়ারী ও আরও অনেকে তাঁবুতে আসিয়া জোটে। নানা রকম গল্প হয়। এইখানেই একদিন একটা অদ্ভুত গল্প শুনিলাম। কথায় কথায় সেদিন শিকারের গল্প হইতেছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের বন্য-মহিষের কথা উঠিল। দশরথ সিং ঝাণ্ডাওয়ালা নামে এক রাজপুত সেদিন লবটুলিয়া কাছারিতে চরের ইজারা ডাকিতে উপস্থিত ছিল। লোকটা এক সময়ে খুব বনে জঙ্গলে ঘুরিয়াছে, দুঁদে শিকারী বলিয়া তার নাম আছে। দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালা বলিল—হুজুর, ওই মোহনপুরা জঙ্গলে বুনো মহিষ শিকার করতে আমি একবার টাঁড়বারো দেখি।

মনে পড়িল গনু মাহাতো একবার এই টাঁড়বারোর কথা বলিয়াছিল বটে। বলিলাম—ব্যাপারটা কি?

—হুজুর, সে অনেক দিনের কথা। কুশী নদীর পুল তখনও তৈরী হয় নি। কাটারিয়ায় জোড়া খেয়া ছিল, গাড়ীর প্যাসেঞ্জার খেয়ায় মালসুদ্ধ পারাপার হত। আমরা তখন ঘোড়ার নাচ নিয়ে খুব উন্মত্ত, আমি আর ছাপ্‌রার ছট্টু সিং। ছট্টু সিং হরিহরছত্র মেলা থেকে ঘোড়া নিয়ে আসত, আমরা দুজন সেই সব ঘোড়াকে নাচ শেখাতাম, তার পর বেশী দামে বিক্রী করতাম। ঘোড়ার নাচ দু-রকম, জমৈতি আর ফনৈতি। জমৈতিতে যে-সব ঘোড়ার তালিম বেশী, তারা বেশী দামে বিক্রী হয়। ছট্টু সিং ছিল জমৈতি নাচ শেখাবার ওস্তাদ। দুজনে তিন-চার বছরে অনেক টাকা করেছিলাম।

একবার ছট্টু সিং পরামর্শ দিলে ঢোলবাজ্যা জঙ্গলে লাইসেন্স নিয়ে বুনো মহিষ ধরে ব্যবসা করতে। সব ঠিকঠাক হল, ঢোলবাজ্যা দ্বারভাঙ্গা মহারাজের রিজার্ভ ফরেস্ট। আমরা কিছু টাকা খাইয়ে বনের আমলাদের কাছ থেকে পোরমিট্ আনালাম। তারপর ক'দিন ধরে ঘন জঙ্গলের মহিষের দেখা যদি কোন দিন মেলে! শেষে এক বুনো সাঁওতাল লাগালাম। সে একটা বাঁশবনের তলা দেখিয়ে বললে, গভীর রাত্রে এই পথ দিয়ে বুনো মহিষের জেরা (দল) জল খেতে যাবে। সেই পথের মধ্যে গভীর খানা কেটে তার ওপর বাঁশ ও মাটি বিছিয়ে ফাঁদ তৈরী করলাম। রাত্রে মহিষের জেরা যেতে গিয়ে গর্তের মধ্যে পড়বে।

সাঁওতালটা দেখে-শুনে বললে—কিন্তু সব করছিস বটে তোরা, একটা কথা আছে। ঢোলবাজ্যা জঙ্গলেব বুনো মহিষ তোরা মাবতে পারবি নে। এখানে টাঁড়বারো আছে।

আমরা তো অবাক্। টাঁড়বারো কি?

সাঁওতাল বুড়ো বলে—টাঁড়বারো হ'ল বুনো মহিষের দলের দেবতা। সে একটাও বুনো মহিষের ক্ষতি করতে দেবে না।

ছট্টু সিং বললে—ওসব ঝুট্ কথা। আমরা মানি নে। আমরা রাজপুত, সাঁওতাল নই।

তার পর কি হ'ল শুনলে অবাক হয়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি, বুনো মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম, তারা এদিকে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল, গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের ধারে, গর্তের দশ হাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা সে-মূর্তি, যেন মনে হল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে। বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক ওদিক পালাল, ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এল না, একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।

তারপর আরও দু-একজন শিকারীকে কথাটা জিজ্ঞেস করছি, তারা আমাদের বললে, ও-জঙ্গলে বুনো মহিষ ধরবার আশা ছাড়। টাঁড়বারো একটা মহিষও মারতে ধরতে দেবে না। আমাদের টাকা দিয়ে পোরমিট্ আনানো সার হ'ল, একটা বুনো মহিষও সেবার ফাঁদে পড়ল না।

দশরথ ঝাণ্ডাওয়ালার গল্প শেষ হইলে লবটুলিয়ার পাটোয়ারীও বলিল—আমরাও ছেলেবেলা

থেকে টাঁড়বারোর গল্প শুনে আসছি। টাঁড়বারো বুনো মহিষের দেবতা—বুনো মহিষের দল বেঘোরে প'ড়ে প্রাণ না হারায়, সে দিকে তাঁর সর্বদা দৃষ্টি।

গল্প সত্য কি মিথ্যা আমার সে-সব দেখিবার আবশ্যক ছিল না, আমি গল্প শুনিতে শুনিতে অন্ধকার আকাশে জ্যোতির্ময় খড়্‌গধারী কালপুরুষের দিকে চাহিতাম, নিস্তব্ধ ঘন বনানীর উপর অন্ধকার আকাশ উপুড় হইয়া পড়িয়াছে, দূরে কোথায় বনের মধ্যে বন্য কুক্কুট ডাকিয়া উঠিল, অন্ধকার ও নিঃশব্দ আকাশ, অন্ধকার ও নিঃশব্দ পৃথিবী শীতের রাত্রে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়া কি যেন কানাকানি করিতেছে—অনেক দূরে মোহনপুরা অরণ্যের কালো সীমারেখার দিকে চাহিয়া এই অশ্রুতপূর্ব বনদেবতার কথা মনে হইয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত। এই সব গল্প শুনিতে ভাল লাগে, এই রকম নির্জন অরণ্যের মাঝখানে ঘন শীতের রাত্রে এই রকম আগুনের ধারেই বসিয়া।

দশম পরিচ্ছেদ

১

পনেব দিন এখানে একেবারে বন্য-জীবন যাপন কবিলাম যেমন থাকে গাঙ্গোতারা কি গবীব ভূঁইহার বামুনরা। ইচ্ছা করিয়া নয়, অনেকটা বাধ্য হইয়াই থাকিতে হইল এ ভাবে। এ জঙ্গলে কোথা হইতে কি আনাইব? খাই ভাত ও বন-ধুঁধুলেব তরকারি, বনের কাঁকবোল কি মিষ্টি আলু তুলিয়া আনে সিপাহীরা, তাই ভাজা বা সিদ্ধ। মাছ দুধ ঘি—কিছু নাই।

অবশ্য বনে সিল্লি ও ময়ূরের অভাব ছিল না, কিন্তু পাখী মারিতে তেমন যেন মন সরে না বলিয়া বন্দুক থাকা সত্ত্বেও নিরামিষ খাইতে হইত।

ফুলকিয়া বইহারে বাঘের ভয় আছে। একদিনের ঘটনা বলি।

হাড়ভাঙা শীত সেদিন। বাত দশটার পরে কাজকর্ম মিটাইয়া সকাল সকাল শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, হঠাৎ কত রাত্রে জানি না, লোকজনের চীৎকাবে ঘুম ভাঙিল। জঙ্গলেব ধারের কোন্ জায়গায অনেকগুলি লোক জড় হইযা চীৎকাব করিতেছে। উঠিয়া তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিলাম। আমার সিপাহীরা পাশের খুপরি হইতে বাহির হইয়া আসিল। সবাই মিলিযা ভাবিতেছি ব্যাপারটা কি, এমন সময়ে একজন লোক ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—ম্যানেজারবাবু বন্দুকটা নিয়ে শিগগির চলুন—বাঘে একটা ছোট ছেলে নিয়ে গিয়েছে খুপরি থেকে।

জঙ্গলের ধার হইতে মাত্র দু-শ' হাত দূরে ফসলের ক্ষেতের মধ্যে ডোমন বলিয়া একজন গাঙ্গোতা প্রজার একখানা খুপবি। তাহার স্ত্রী ছ-মাসের শিশু লইযা খুপরির মধ্যে শুইয়াছিল—অসম্ভব শীতের দরুন খুপরির মধ্যেই আগুন জ্বালানো ছিল, এবং ধোঁয়া বাহির করিয়া দিবার জন্য ঝাঁপটা একটু ফাঁক ছিল। সেই পথে বাঘ ঢুকিয়া ছেলেটিকে লইয়া পলাইয়াছে।

কি করিয়া জানা গেল বাঘ? শিয়ালও তো হইতে পারে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আর কোন সন্দেহ রহিল না, ফসলের নরম মাটিতে স্পষ্ট বাঘের থাবার দাগ।

আমার পাটোয়ারী ও সিপাহীরা মহালের অপবাদ রটিতে দিতে চায় না, তাহারা জোর গলায় বলিতে লাগিল—এ আমাদেব বাঘ নয় হুজুর, এ মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টেব বাঘ। দেখুন না কত বড় থাবা!

যাহাদেরই বাঘ হউক, তাহাতে বড় কিছু আসে যায় না। বলিলাম, সব লোক জড় কর, মশাল তৈরী কর—চল জঙ্গলের মধ্যে দেখি। সেই রাত্রে অত বড় বাঘের পায়ের সদ্য থাবা দেখিয়া ততক্ষণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে শুরু করিয়াছে—জঙ্গলের মধ্যে কেহই যাইতে রাজী নয়। ধমক ও

গালমন্দ দিয়া জন-দশেক লোক জুটাইয়া মশালহাতে টিন পিটাইতে পিটাইতে সবাই মিলিয়া জঙ্গলের নানা স্থানে বৃথা অনুসন্ধান করা গেল।

পরদিন বেলা দশটার সময় মাইল-দুই দূরে দক্ষিণপূর্ব কোণের ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটা বড় আসান-গাছের তলায় শিশুটির রক্তাক্ত দেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইল।

কৃষ্ণপক্ষের কি ভীষণ অন্ধকার রাত্রিগুলিই নামিল তাহার পরে!

সদর কাছারি হইতে বাঁকে সিং জমাদারকে আনাইলাম। বাঁকে সিং শিকারী, বাঘের গতিবিধির অভ্যাস তার ভালই জানা। সে বলিল, হুজুর, মানুষখেকো বাঘ বড় ধূর্ত হয়। আর ক'টা লোক মরবে। সাবধান হয়ে থাকতে হবে।

ঠিক তিনদিন পরেই বনের ধারে সন্ধ্যার সময় একটা রাখালকে বাঘে লইয়া গেল। ইহার পর লোকে ঘুম বন্ধ করিয়া দিল। রাত্রে এক অপরূপ ব্যাপার! বিস্তীর্ণ বইহারের বিভিন্ন খুপরি হইতে সারা রাত টিনের ক্যানেস্ত্রা পিটাইতেছে, মাঝে মাঝে কাশের ডাঁটায় আঁটি জ্বালাইয়া আগুন করিয়াছে, আমি ও বাঁকে সিং প্রহরে প্রহরে বন্দুকের দ্যাওড় করিতেছি। আর শুধুই কি বাঘ? ইহার মধ্যে একদিন মোহনপুরা ফরেস্ট হইতে বন্যমহিষের দল বাহির হইয়া অনেকখানি ক্ষেতের ফসল তচনচ করিয়া দিল।

আমার কাশের খুপরির দরজার কাছেই সিপাহীরা খুব আগুন করিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে উঠিয়া তাহাতে কাঠ ফেলিয়া দিই। পাশের খুপরিতে সিপাহীরা কথাবার্তা বলিতেছে—খুপরির মেঝেতেই শুইয়া আছি, মাথার কাছের ঘুলঘুলি দিয়া দেখা যাইতেছে ঘন অন্ধকার-ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে ক্ষীণ তারার আলোয় পরিদৃশ্যমান জঙ্গলের আবছায়া সীমারেখা। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া মনে হইল, যেন মৃত নক্ষত্রলোক হইতে তুষারবর্ষী হিমবাতাস তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া আসিতেছে পৃথিবীর দিকে—লেপ-তোশক হিমে ঠাণ্ডা জল হইয়া গিয়াছে, আগুন নিবিয়া আসিতেছে, কি দুরন্ত শীত! আর সেই সঙ্গে উন্মুক্ত প্রান্তরের অবাধ হু-হু তুষারশীতল নৈশ হাওয়া!

কিন্তু কি করিয়া থাকে এখানকার লোকেরা এই শীতে, এই আকাশের তলায় সামান্য কাশের খুপরির ঠাণ্ডা মেঝের উপর কি করিয়া রাত্রি কাটায়? তাহার উপর ফসল চৌকি দিবার এই কষ্ট, বন্য-মহিষের উপদ্রব, বন্য-শূকরের উপদ্রব কম নয়—বাঘও আছে। আমাদের বাংলা দেশের চাষীরা কি এত কষ্ট করিতে পারে? অত উর্বর জমিতে, অত নিরুপদ্রব গ্রাম্য পরিবেশের মধ্যে ফসল করিয়াও তাহাদের দুঃখ ঘোচে না।

আমার ঘরের দু-তিন-শ' হাত দূরে দক্ষিণ-ভাগলপুর হইতে আগত জনকতক কাটুনি মজুর স্ত্রী-পুত্র লইয়া ফসল কাটিতে আসিয়াছে। একদিন সন্ধ্যায় তাহাদের খুপরির কাছ দিয়া আসিবার সময় দেখি কুঁড়ের সামনে বসিয়া সবাই আগুন পোহাইতেছে।

এদের জগৎ আমার কাছে অনাবিষ্কৃত, অজ্ঞাত। ভাবিলাম, সেটা দেখি না কেমন!

গিয়া বলিলাম—বাবাজী, কি করা হচ্ছে?

একজন বৃদ্ধ ছিল দলে, তাহাকেই এই সম্বোধন। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমাকে সেলাম করিল, বসিয়া আগুন পোহাইতে অনুরোধ করিল। ইহা এদেশের প্রথা। শীতকালে আগুন পোহাইতে আহ্বান করা ভদ্রতার পরিচয়।

গিয়া বসিলাম। খুপরির মধ্যে উঁকি দিয়া দেখি বিছানা বা আসবাবপত্র বলিতে ইহাদেব কিছু নাই। কুঁড়েঘরের মেঝেতে মাত্র কিছু শুক্‌নো ঘাস বিছানো। বাসনকোসনের মধ্যে খুব বড় একটা কাঁসার জামবাটি আর একটা লোটা। কাপড় যার যা পরনে আছে—আর এক টুকরা বস্ত্রও বাড়তি নাই। কিন্তু তাহা তো হইল, এই নিদারুণ শীতে ইহাদের লেপ-কাঁথা কই? রাত্রে গায়ে দেয় কি?

কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

বৃদ্ধের নাম নক্‌ছেদী ভকত। জাতি গাঙ্গোতা। সে বলিল—কেন, খুপরির কোণে ঐ যে

কলাইয়ের ভূষি দেখছেন না রয়েছে টাল করা?

বুঝিতে পারিলাম না। কলাইয়ের ভূষির আগুন করা হয় রাত্রে?

নক্‌ছেদি আমার অজ্ঞতা দেখিয়া হাসিল।

—তা নয় বাবুজী। কলাইয়ের ভূষির মধ্যে ঢুকে ছেলেপিলেরা শুয়ে থাকে, আমরাও কলাইয়ের ভূষি গায়ে চাপা দিয়ে শুই। দেখছেন না, অন্তত পাঁচ মণ ভূষি মজুত রয়েছে। ভারী ওম্ কলাইয়ের ভূষিতে। দুখানা কম্বল গায়ে দিলেও অমন ওম্ হয় না। আর আমরা পাবই বা কোথায় কম্বল বলুন না?

বলিতে বলিতে একটা ছোট ছেলেকে ঘুম পাড়াইয়া তাহার মা খুপরির কোণের ভূষির গাদার মধ্যে তাহার পা হইতে গলা পর্যন্ত ঢুকাইয়া কেবলমাত্র মুখখানা বাহির করিয়া শোওয়াইয়া রাখিয়া আসিল। মনে মনে ভাবিলাম, মানুষে মানুষের খোঁজ রাখে কতটুকু? কখনও কি জানিতাম এসব কথা? আজ যেন সত্যিকারের ভারতবর্ষকে চিনিতেছি।

অগ্নিকুণ্ডের অপর পার্শ্বে বসিয়া একটি মেয়ে কি রাঁধিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ও কি রান্না হচ্ছে?

নক্‌ছেদী বলিল—ঘাটো।

—ঘাটো কি জিনিস?

এবার বোধ হয় রন্ধনরতা মেয়েটি ভাবিল, এ বাংগালী বাবু সন্ধ্যাবেলা কোথা হইতে আসিয়া জুটিল। এ দেখিতেছি নিতান্ত বাতুল। কিছুই খোঁজ রাখে না দুনিয়ার। সে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—ঘাটো জানো না বাবুজী? মকাই-সেদ্ধ। যেমন চাল সেদ্ধ হ'লে বলে ভাত, মকাই সেদ্ধ করলে বলে ঘাটো।

মেয়েটি আমার অজ্ঞতার প্রতি কৃপাবশতঃ কাঠের খুন্তির আগায় উক্ত দ্রব্য একটুখানি হাঁড়ি হইতে তুলিয়া দেখাইল।

—কি দিয়ে খায়?

এবার হইতে যত কথাবার্তা মেয়েটিই বলিল। হাসি-হাসি মুখে বলিল—নুন দিয়ে, শাক দিয়ে—আবার কি দিয়ে খাবে বল না।

—শাক রান্না হয়েছে?

—ঘাটো নামিয়ে শাক চড়াব; মটরশাক তুলে এনেছি।

মেয়েটি খুবই সপ্রতিভ। জিজ্ঞাসা করিল—কলকাতায় থাক বাবুজী?

—হ্যাঁ।

—কি রকম জায়গা? আচ্ছা, কলকাতায় নাকি গাছ নাই? ওখানকার সব গাছপালা কেটে ফেলেছে?

—কে বললে তোমায়?

—একজন ওখানে কাজ করে আমাদের দেশের। সে একবার বলেছিল। কি রকম জায়গা দেখতে বাবুজী?

এই সরলা বন্য মেয়েটিকে যতদূর সম্ভব বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম আধুনিক যুগের একটা বড় শহরের ব্যাপারখানা কি। কতদূর বুঝিল জানি না, বলিল—কলকাত্তা শহর দেখতে ইচ্ছে হয়—কে দেখাবে?

তাহার পর আরও অনেক কথা বলিলাম তাহার সঙ্গে। রাত বাড়িয়া গিয়াছে, অন্ধকার ঘন হইয়া আসিল। উহাদের রান্না শেষ হইয়া গেল। খুপরির ভিতর হইতে সেই বড় জামবাটিটা আনিয়া তাহাতে ফেন-ভাতের মত জিনিসটা ঢালিল। উপর-উপর একটু নুন ছড়াইয়া বাটিটা মাঝখানে রাখিয়া ছেলেমেয়েরা সবাই মিলিয়া চারিদিকে গোল হইয়া বসিয়া খাইতে আরম্ভ করিল।

আমি বলিলাম—তোমরা এখান থেকে বুঝি দেশে ফিরবে?

নক্‌ছেদী বলিল—দেশে এখন ফিরতে অনেক দেরি। এখান থেকে ধরমপুর অঞ্চলে ধান কাটতে যাব—ধান তো এদেশে হয় না—ওখানে হয়। ধান কাটার কাজ শেষ হ'লে আবার যাব গম কাটতে মুঙ্গের জেলায়। গমের কাজ শেষ হ'তে জ্যৈষ্ঠ মাস এসে পড়বে; তখন আবার খেড়ী কাটা শুরু হবে আপনাদেরই এখানে। তার পর কিছুদিন ছুটি। শ্রাবণ-ভাদ্রে আবার মকাই ফসলের সময় আসবে। মকাই শেষ হলেই কলাই এবং ধরমপুর, পূর্ণিয়া অঞ্চলে কার্তিকশাল ধান। আমরা সারা বছর এই রকম দেশে দেশেই ঘুরে বেড়াই। যেখানে যে সময়ে যে ফসল, সেখানে যাই। নইলে খাব কি?

—বাড়ী-ঘর বলে তোমাদের কিছু নেই?

এবার মেয়েটি কথা বলিল। মেয়েটির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ, খুব স্বাস্থ্যবতী, বার্ণিশকরা কালো রং, নিটোল গড়ন। কথাবার্তা বেশ বলিতে পারে, আর গলার সুরটা দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী হিন্দীতে বড় চমৎকার শোনায়।

বলিল—কেন থাকবে না বাবুজী? সবই আছে। কিন্তু সেখানে থাকলে আমাদের তো চলে না। সেখানে যাব গরমকালের শেষে, শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত থাকব। তার পর আবার বেরুতে হবে বিদেশে—বিদেশেই যখন আমাদের চাকরি। তা ছাড়া বিদেশে কত কি মজা দেখা যায়—এই দেখবেন ফসল কাটা হয়ে গেলে আপনাদের এখানেই কত দেশ থেকে কত লোক আসবে। কত বাজিয়ে, গাইয়ে, নাচনেওয়ালী, কত বহুরূপী সং—আপনি বোধ হয় দেখেন নি এসব? কি ক'রে দেখবেন, আপনাদের এ অঞ্চলে তো ঘোর জঙ্গল হয়ে প'ড়ে ছিল—সবে এইবার চাষ হয়েছে। এই দেখুন না আসে আব পনের দিনের মধ্যেই। এই তো সবারই রোজগারের সময় আসছে।

চারিদিক নির্জন। দূরের বস্তিতে কারা টিন পিটাইতেছে অন্ধকারের মধ্যে। মনে ভাবিলাম, এই অর্গলহীন কাশডাঁটার বেড়ার আগড়-দেওয়া কুঁড়েতে ইহারা রাত কাটাইবে এই শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যের ধারে, ছেলেপুলে লইয়া—সাহসও আছে বলিতে হইবে। এই তো মাত্র দিন-কয়েক আগে এদেরই মত আর একটা খুপরি হইতে বাঘে ছেলে লইয়া গিয়াছে মায়ের কোল হইতে—এদেরই বা ভরসা কিসেব? অথচ একটা ব্যাপাব দেখিলাম, ইহারা যেন ব্যাপারটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিতেছে না। তত সন্ত্রস্ত ভাবও নাই। এই তো এত রাত পর্যন্ত উন্মুক্ত আকাশের তলায় বসিয়া গল্পগুজব রান্নাবান্না করিল। বলিলাম—তোমরা একটু সাবধানে থাকবে। মানুষ-খেকো বাঘ বেরিয়েছে, জান তো? মানুষ-খেকো বাঘ বড় ভয়ানক জানোয়ার, আর বড় ধূর্ত। আগুন রাখো খুপরির সামনে, আর ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়। এই তো কাছেই বন, রাত-বেরাতের ব্যাপার—

মেয়েটি বলিল—বাবুজী, ও আমাদের সয়ে গিয়েছে। পূর্ণিয়া জেলায় যেখানে ফি-বছর ধান কাটতে যাই, সেখানে পাহাড় থেকে বুনো হাতী নামে। সে জঙ্গল আরও ভয়ানক। ধানের সময় বিশেষ ক'রে বুনো হাতীব দল এসে উপদ্রব করে।

মেয়েটি আগুনের মধ্যে আর কিছু শুক্‌নো বনঝাউয়ের ডাল ফেলিয়া দিয়া সামনের দিকে সরিয়া আসিয়া বসিল।

বলিল—সেবার আমরা অখিলকুচা পাহাড়ের নীচে ছিলাম। একদিন রাত্রে এক খুপরিব বাইরে রান্না করছি, চেয়ে দেখি পঞ্চাশ হাত দূরে চার-পাঁচটা বুনো হাতী—কালো কালো পাহাড়ের মত দেখাচ্ছে অন্ধকারে—যেন আমাদের খুপরির দিকেই আসছে। আমি ছোট ছেলেটাকে বুকে নিয়ে বড় মেয়েটাকে হাত ধরে রান্না ফেলে খুপরির মধ্যে তাদের রেখে এলাম। কাছে আর কোনো লোকজন নেই, বাইরে এসে দেখি তখন হাতী ক'টা একটু থমকে দাঁড়িয়েছে। ভয়ে আমার গলা কাঠ হয়ে গিয়েছে। হাতীতে খুব দেখতে পায় না তাই রক্ষে—ওরা বাতাসে গন্ধ পেয়ে দূরের মানুষ বুঝতে পারে। তখন বোধ হয় বাতাস অন্য দিকে বইছিল, যাই হোক, তারা অন্য দিকে চলে গেল। ওঃ,

সেখানেও এমনি বাবুজী সারারাত টিন পেটায়, আর আলো জ্বালিয়ে রাখে হাতীর ভয়ে। এখানে বুনো মহিষ, সেখানে বুনো হাতী। ওসব গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে।

রাত বেশী হওয়াতে নিজের বাসায় ফিরিলাম।

দিন পনেরোর মধ্যে ফুলকিয়া বইহারের চেহারা বদলাইয়া গেল। সরিষার গাছ শুকাইয়া মাড়িয়া বীজ বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে দলেদলে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিতে লাগিল। পূর্ণিয়া, মুঙ্গের, ছাপরা প্রভৃতি স্থান হইতে মারোয়াড়ী ব্যবসায়ীরা দাঁড়িপাল্লা ও বস্তা লইয়া আসিল মাল কিনিতে। তাদের সঙ্গে কুলির ও গাড়োয়ানের কাজ করিতে আসিল এক দল লোক। হালুইকররা আসিয়া অস্থায়ী কাশের ঘর তুলিয়া মিঠাইয়ের দোকান খুলিয়া সতেজে পুরী, কচৌরী, লাড্ডু, কালাকন্দ্ বিক্রয় করিতে লাগিল। ফিরিওয়ালারা নানা রকম সস্তা ও খেলো মনোহারী জিনিস, কাচের বাসন, পুতুল, সিগারেট, ছিটের কাপড়, সাবান ইত্যাদি লইয়া আসিল।

এ বাদে আসিল রং-তামাশা দেখাইয়া পয়সা রোজগার করিতে কত ধরনের লোক। নাচ, দেখাইতে, রামসীতা সাজিয়া ভক্তের পূজা পাইতে, হনুমানজীর সিঁদুরমাখা মূর্তি হাতে পাণ্ডাঠাকুর আসিল প্রণামী কুড়াইতে। এ সময় সকলেরই দু-পয়সা রোজগারের সময় এসব অঞ্চলে।

আর বছরও যে জনশূন্য ফুলকিয়া বইহারের প্রান্তর ও জঙ্গল দিয়া, বেলা পড়িয়া গেলে ঘোড়ায় যাইতেও ভয় করিত—এ বছর তাহার আনন্দোৎফুল্ল মূর্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইতে হয়। চারিদিকে বালক-বালিকার হাস্যধ্বনি, কলরব, সস্তা টিনের ভেঁপুর পিঁপিঁ বাজনা, ঝুমঝুমির আওয়াজ, নাচিয়েদের ঘুঙুরের ধ্বনি—সমস্ত ফুলকিয়ার বিরাট প্রান্তর জুড়িয়া যেন একটা বিশাল মেলা বসিয়া গিয়াছে।

লোকসংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে অত্যন্ত বেশী। কত নূতন খুপরি, কাশের লম্বা চালাঘর চারিদিকে রাতারাতি উঠিয়া গেল। ঘর তুলিতে এখানে কোন খরচ নাই, জঙ্গলে আছে কাশ ও বনঝাউ কি কেঁদ-গাছের গুঁড়ি ও ডাল। শুকনো কাশের ডাঁটার খোলা পাকাইয়া এদেশে একরকম ভারি শক্ত রশি তৈরী করে, আর আছে ওদের নিজেদের শারীরিক পরিশ্রম।

ফুলকিয়ার তহশীলদার আসিয়া জানাইল, এই সব বাহিরের লোক, যাহারা এখানে পয়সা রোজগার করিতে আসিয়াছে, ইহাদের কাছে জমিদারের খাজনা আদায় করিতে হইবে।

বলিল—আপনি রীতিমত কাছারি করুন হুজুর, আমি সব লোক একে একে আপনার কাছে হাজির করাই—আপনি ওদের মাথাপিছু একটা খাজনা ধার্য ক'রে দিন।

কত রকমের লোক দেখিবার সুযোগ পাইলাম এই ব্যাপারে!

সকাল হইতে দশটা পর্যন্ত কাছারি করিতাম, বৈকালে আবার তিনটার পর হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত।

তহশীলদার বলিল—এরা বেশী দিন এখানে থাকবে না, ফসল মাড়া ও বেচাকেনা শেষ হয়ে গেলেই সব পালাবে। এর আগে এদের পাওনা আদায় ক'রে নিতে হবে।

একদিন দেখিলাম একটি খামারে মারোয়াড়ী মহাজনেরা মাল মাপিতেছে। আমার মনে হইল ইহারা ওজনে নিরীহ প্রজাদের ঠকাইতেছে। আমার পাটোয়ারী ও তহশীলদারদের বলিলাম সমস্ত ব্যবসায়ীর কাঁটা ও দাঁড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে। দু-চারজন মহাজনকে ধরিয়া মাঝে মাঝে আমার সামনে আনিতে লাগিল—তাহারা ওজনে ঠকাইয়াছে, কাহারও দাঁড়ির মধ্যে জুয়াচুরি আছে। সে-সব লোককে মহাল হইতে বাহির করিয়া দিলাম। প্রজাদের এতকষ্টের ফসল আমার মহালে অন্তত কেহ ফাঁকি দিয়া লইতে পারিবে না।

দেখিলাম শুধু মহাজনে নয়, নানা শ্রেণীর লোকে ইহাদের অর্থের ভার লাঘব করিবার চেষ্টায় ওৎ পাতিয়া রহিয়াছে।

এখানে নগদ পয়সার কারবার খুব বেশী নাই। ফিরিওয়ালাদের কাছে কোন জিনিস কিনিলে ইহারা পয়সার বদলে সরিষা দেয়, জিনিসের দামের অনুপাতে দামের অনেক বেশী সরিষা দিয়া দেয়—বিশেষত মেয়েরা। তাহাবা নিতান্ত নিরীহ ও সরল, যা-তা বুঝাইয়া তাহাদের নিকট হইতে ন্যায্যমূল্যের চতুর্গুণ ফসল আদায় করা খুবই সহজ।

পুরুষেরাও বিশেষ বৈষয়িক নয়।

তাহারা বিলাতী সিগারেট কেনে, জুতা-জামা কেনে। ফসলের টাকা ঘরে আসিলে ইহাদের ও বাড়ীর মেয়েদের মাথা ঘুরিয়া যায়—মেয়েরা ফরমাস করে রঙীন কাপড়ের, কাচের ও এনামেলের বাসনের, হালুইকরের দোকান হইতে ঠোঙা ঠোঙা লাড্ডু-কচৌরী আসে, নাচ দেখিয়া, গান শুনিয়াই কত পয়সা উড়াইয়া দেয়। ইহার উপর রামজী, হনুমানজীর প্রণামী ও পূজা তো আছেই। তাহার উপরেও আছে জমিদার ও মহাজনের পাইক-পেয়াদারা। দুর্দান্ত শীতে রাত জাগিয়া বন্য-শূকর ও বন্য-মহিষের উপদ্রব হইতে কত কষ্টে ফসল বাঁচাইয়া, বাঘের মুখে, সাপের মুখে নিজেদের ফেলিতে দ্বিধা না করিয়া সারা বছরের ইহাদের যাহা উপার্জন,—এই পনের দিনের মধ্যে খুশীর সহিত তাহা উড়াইয়া দিতে ইহাদের বাধে না দেখিলাম।

কেবল একটা ভালর দিক দেখা গেল, ইহারা কেহ মদ বা তাড়ি খায় না। গাঙ্গোতা বা ভুঁইহার ব্রাহ্মণদের মধ্যে এ-সব নেশার রেওয়াজ নাই—সিদ্ধিটা অনেকে খায়, তাও কিনিতে হয় না, বনসিদ্ধির জঙ্গল হইয়া আছে লবটুলিয়া ও ফুলকিয়ার প্রান্তরে, পাতা ছিঁড়িয়া আনিলেই হইল—কে দেখিতেছে?

একদিন মুনেশ্বর সিং আসিয়া জানাইল, একজন লোক জমিদারের খাজনা ফাঁকি দিবার উদ্দেশ্যে উর্ধ্বশ্বাসে পলাইতেছে—হুকুম হয় তো ধরিয়া আনে।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম—পালাচ্ছে কি রকম? দৌড়ে পালাচ্ছে?

—ঘোড়ার মত দৌড়ুচ্ছে হুজুর, এতক্ষণ বড় কুণ্ডী পার হয়ে জঙ্গলের ধারে গিয়ে পৌঁছল। দুর্বৃত্তকে ধরিয়া আনিবার হুকুম দিলাম।

এক ঘণ্টার মধ্যে চার-পাঁচজন সিপাহী পলাতক আসামীকে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

লোকটাকে দেখিয়া আমার মুখে কথা সবিল না। তাহার বয়স ষাটেব কম কোনমতেই হইবে বলিয়া আমার তো মনে হইল না—মাথার চুল সাদা, গালের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় সে কতকাল বুভুক্ষু ছিল, এইবার ফুলকিয়া বইহারের খামারে আসিয়া পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছে।

শুনিলাম সে নাকি 'ননীচোর নাটুয়া' সাজিয়া আজ কয়দিনে বিস্তর পয়সা রোজগার করিয়াছে, গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের তলায় একটা খুপরিতে থাকিত, আজ কয়দিন ধরিয়া সিপাহীরা তাহার কাছে খাজনার তাগাদা করিতেছে, কারণ এদিকে ফসলের সময়ও ফুরাইয়া আসিল। আজ তাহার খাজনা মিটাইবার কথা ছিল। হঠাৎ দুপুরের পরে সিপাহীরা খবর পায় সে লোকটা তল্পিতল্পা বাধিয়া রওনা হইয়াছে। মুনেশ্বর সিং ব্যাপার কি জানিতে গিয়া দেখে যে আসামী বইহার ছাড়িয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে পূর্ণিয়া অভিমুখে—মুনেশ্বরের হাঁক শুনিয়া সে নাকি দৌড়িতে আরম্ভ করিল। তাহার পরই এই অবস্থা।

সিপাহীদের কথার সত্যতা সম্বন্ধে কিন্তু আমার সন্দেহ জন্মিল। প্রথমত 'ননীচোর নাটুয়া' মানে যদি বালক শ্রীকৃষ্ণ হয়, তবে ইহার সে সাজিবার বয়স আর আছে কি? দ্বিতীয়ত, এ লোকটা উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইতেছিল, এ কথাই বা কি করিয়া সম্ভব।

কিন্তু উপস্থিত সকলেই হলফ করিয়া বলিল--উভয় কথাই সত্য।

তাহাকে কড়া সুরে বলিলাম—তোমার এ দুর্বুদ্ধি কেন হ'ল, জমিদারের খাজনা দিতে হয় জান না? তোমার নাম কি?

লোকটা ভয়ে বাতাসের মুখে তালপাতার মত কাঁপিতেছিল। আমার সিপাহীরা একে চায় তো আরে পায়, ধরিয়া আনিতে বলিলে বাঁধিয়া আনে। তাহারা যে এই বৃদ্ধ নটের প্রতি খুব সদয় ও মোলায়েম ব্যবহার করে নাই ইহার অবস্থা দেখিয়া তাহা বুঝিতে দেরি হইল না।

লোকটা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, তাহার নাম দশরথ।

—কি জাত? বাড়ী কোথায়?

—আমরা ভুঁইহার বাভন হুজুর। বাড়ী মুঙ্গের জেলা—সাহেবপুর কামাল।

—পালাচ্ছিলে কেন?

—কই না, পালাব কেন, হুজুর?

—বেশ, খাজনা দাও।

—কিছুই পাই নি, খাজনা দেব কোথা থেকে? নাচ দেখিয়ে সর্ষে পেয়েছিলাম, তা বেচে ক'দিন পেটে খেয়েছি। হনুমানজীর কিরিয়া।

সিপাহীরা বলিল—সব মিথ্যে কথা। শুনবেন না হুজুর। ও অনেক টাকা রোজগার করেছে। ওর কাছেই আছে। হুকুম করেন তো ওর কাপড়চোপড় সন্ধান করি।

লোকটা ভয়ে হাতজোড় করিয়া বলিল—হুজুর, আমি বলছি আমার কাছে কত আছে।

পরে কোমর হইতে একটা গেঁজে বাহির করিয়া উপুড় করিয়া ঢালিয়া বলিল—এই দেখুন হুজুর, তের আনা পয়সা আছে। আমার কেউ নেই, এই বুড়ো বয়সে কে-ই বা আমায় দেবে? আমি নাচ দেখিয়ে এই ফসলের সময় খামারে খামারে বেড়িয়ে যা রোজগার করি। আবার সেই গমের সময় পর্যন্ত এতেই চালাব; তার এখনও তিন মাস দেরি। যা পাই পেটে দুটো খাই, এই পর্যন্ত। সিপাহীরা বলছে, আমায় নাকি আট আনা খাজনা দিতে হবে—তা হলে আমার আর হইল পাঁচ আনা। পাঁচ আনায় তিন মাস কি খাব?

বলিলাম—তোমার হাতে ও পোঁটলাতে কি আছে? বার কর।

লোকটা পোঁটলা খুলিয়া দেখাইল তাহাতে আছে ছোট্ট একখানা টিনমোড়া আর্সি, একটা রাংতার মুকুট—ময়ুরপাখা সমেত, গালে মাখিবার রং, গলায় পরিবার পুঁতির মালা ইত্যাদি—কৃষ্ণঠাকুর সাজিবার উপকরণ।

বলিল—দেখুন তবুও বাঁশী নেই হুজুর। একটা টিনের বড় বাঁশী আট আনার কম হবে না। এখানে নলখাগড়ার বাঁশীতে কাজ চালিয়েছি। এরা গাঙ্গোতা জাত, এদের ভুলানো সহজ। কিন্তু আমাদের মুঙ্গের জেলার লোক সব বড় এলেমদার বাঁশী না হ'লে হাসবে। কেউ পয়সা দেবে না।

আমি বলিলাম—বেশ, তুমি খাজনা দিতে না পার, নাচ দেখিয়ে যাও, খাজনার বদলে।

বৃদ্ধ হাতে যেন স্বর্গ পাইয়াছে এমন ভাব দেখাইল। তাহার পর গালেমুখে রং মাখিয়া ময়ুরপাখা মাথায় ঐ বয়সে সে যখন বারো বছরের বালকের ভঙ্গিতে হেলিয়া দুলিয়া হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গান ধরিল—তখন হাসিব কি কাঁদিব স্থির করিতে পারিলাম না।

আমার সিপাহীরা তো মুখে কাপড় দিয়া বিদ্রুপের হাসি চাপিতে প্রাণপণ করিতেছে। তাহাদের চক্ষে 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ এক মারাত্মক ব্যাপারে পরিণত হইল। বেচারীরা ম্যানেজারবাবুর সামনে না পারে প্রাণ খুলিয়া হাসিতে, না পারে দুর্দমনীয় হাসির বেগ সামলাইতে।

সে-রকম অদ্ভুত নাচ কখনও দেখি নাই, ষাট বছরের বৃদ্ধ কখনও বালকের মত অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া কাল্পনিক জননী যশোদার নিকট হইতে দূরে চলিয়া আসিতেছে, কখনও একগাল হাসিয়া সঙ্গী রাখাল বালকগণের মধ্যে চোরা-ননী বিতরণ করিতেছে, যশোদা হাত বাঁধিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া কখনও জোড়-হাতে চোখের জল মুছিয়া খুঁৎ খুঁৎ করিয়া বালকের সুরে কাঁদিতেছে। সমস্ত জিনিস দেখিলে হাসিতে হাসিতে পেটের নাড়ী ছিঁড়িয়া যায়। দেখিবার মত বটে।

নাচ শেষ হইল। আমি হাততালি দিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিলাম।

বলিলাম—এমন নাচ কখনও দেখি নি, দশরথ। বড় চমৎকার নাচো। আচ্ছা তোমার খাজনা মাপ করে দিলাম—আর আমার নিজ থেকে এই দু টাকা বখশিশ দিলাম খুশি হয়ে। ভারি চমৎকার নাচ।

আর দিন-দশ-বারোর মধ্যে ফসল কেনাবেচা শেষ হইয়া গেলে বাড়তি লোক সব যে যার দেশে চলিয়া গেল। রহিল মাত্র যাহারা এখানে জমি চষিয়া বাস করিতেছে তাহারাই। দোকান-পসার উঠিয়া গেল, নাচওয়ালা, ফিরিওয়ালারা অন্যত্রর রোজগারের চেষ্টায় গেল। কাটুনি জনমজুরের দল এখনও পর্যন্ত ছিল শুধু এই সময়ের আমোদ তামাশা দেখিবার জন্য—এইবার তাহারও বাসা উঠাইবার যোগাড় করিতে লাগিল।

২

একদিন বেড়াইয়া ফিরিবার সময় আমি আমার পরিচিত সেই নক্‌ছেদী ভকতের খুপরিতে দেখা করিতে গেলাম।

সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, দিগন্তব্যাপী ফুলকিয়া বইহারের পশ্চিম প্রান্তে একেবারে সবুজ বনরেখার মধ্যে ডুবিয়া টক্‌টকে রাঙা প্রকাণ্ড বড় সূর্যটা অস্ত যাইতেছে। এখানকার এই সূর্যাস্তগুলি—বিশেষতঃ এই শীতকালে—এত অদ্ভুত সুন্দর যে এই সময়ে মাঝে মাঝে আমি মহালিখারূপের পাহাড়ে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বে উঠিয়া বিস্ময়জনক দৃশ্যের প্রতীক্ষা করি।

নক্‌ছেদী তাড়াতাড়ি উঠিয়া কপালে হাত দিয়া আমায় সেলাম করিল। বলিল—ও মঞ্চী, বাবুজীকে বসবার একটা কিছু পেতে দে।

নক্‌ছেদীর খুপরিতে একজন প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আছে, সে যে নক্‌ছেদীর স্ত্রী তাহা অনুমান করা কিছু শক্ত নয়। কিন্তু সে প্রায়ই বাহিরের কাজকর্ম অর্থাৎ কাঠ ভাঙা, কাঠ কাটা, দূরবর্তী ভীমদাসটোলার পাতকুয়া হইতে জল আনা ইত্যাদি লইয়া থাকে। মঞ্চী সেই মেয়েটি, যে আমাকে বুনো হাতীর গল্প বলিয়াছিল। সে আসিয়া শুষ্ক কাশের ডাঁটায় বোনা একখানা চেটাই পাতিয়া দিল।

তার সেই দক্ষিণ-বিহারের দেহাতী 'ছিকাছিকি' বুলির সুন্দর টানের সঙ্গে মাথা দুলাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—কেমন দেখলেন বাবুজী বইহারের মেলা? বলেছিলাম না, কত নাচ-তামাশা-আমোদ হবে, কত জিনিস আসবে, দেখলেন তো? অনেক দিন আসেন নি বাবুজী, বসুন। আমরা যে শীগগির চলে যাচ্ছি।

ওদের খুপরির দোরের কাছে লম্বা আধশুকনো ঘাসের ওপর চেটাই পাতিয়া বসিলাম, যাহাতে সূর্যাস্তটা ঠিক সামনাসামনি দেখিতে পাই। চারিদিকের জঙ্গলের গায়ে একটা মৃদু-রাঙা আভা পড়িয়াছে, একটা অবর্ণনীয় শান্তি ও নীরবতা বিশাল বইহার জুড়িয়া।

মঞ্চীর কথার উত্তর দিতে বোধ হয় একটু দেরি হইল। সে আবার কি একটা প্রশ্ন করিল, কিন্তু ওর 'ছিকাছিকি' বুলি আমি খুব ভাল বুঝি না, কি বলিল না বুঝিতে পারিয়া অন্য একটা প্রশ্ন দ্বারা সেটা চাপা দিবার জন্য বলিলাম—তোমরা কালই যাবে?

—হ্যাঁ, বাবুজী।

—কোথায় যাবে?

—পূর্ণিয়া কিষণগঞ্জ অঞ্চলে যাব।

পরে বলিল—নাচ-তামাশা কেমন দেখলেন বাবু? বেশ ভাল ভাল লোক গাইয়ে এবার এসেছিল। একদিন ঝল্লুটোলায় বড় বকাইন গাছের তলায় একটা লোক মুখে ঢোলক বাজিয়েছিল, শুনেছিলেন? কি চমৎকার বাবুজী! দেখিলাম মঞ্চী নিতান্ত বালিকার মতই নাচ-তামাশায় আমোদ

পায়। এবার কত রকম কি দেখিয়াছে, মহা উৎসাহ ও খুশির সুরে তাহারই বর্ণনা করিতে বসিয়া গেল।

নক্‌ছেদী বলিল—নে নে, বাবুজী কলকাতায় থাকেন, তোর চেয়ে অনেক কিছু দেখেছেন। ও এ-সব বড় ভালবাসে বাবুজী, ওরই জন্যে আমরা এতদিন এখানে রয়ে গেলাম। ও বল্লে—না, দাঁড়াও, খামারের নাচ-তামাশা, লোকজন দেখে তবে যাব। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও!

মঞ্চী যে নক্‌ছেদীর কে হয় তাহা এতদিন জিজ্ঞাসা করি নাই, যদিও ভাবিতাম বৃদ্ধের মেয়েই হইবে। আজ ওর কথায় আমার আর কোনো সন্দেহ রহিল না।

বলিলাম—তোমার মেয়ের বিয়ে দিয়েছ কোথায়?

নক্‌ছেদী আশ্চর্য হইয়া বলিল—আমার মেয়ে! কোথায় আমার মেয়ে হুজুর?

—কেন এই মঞ্চী তোমার মেয়ে নয়?

আমাব কথায় সকলেব আগে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল মঞ্চী। নক্‌ছেদীব প্রৌঢ়া স্ত্রীও মুখে আঁচল চাপা দিয়া খুপরির ভিতর ঢুকিল।

নক্‌ছেদী অপমানিত হওয়ার সুরে বলিল—মেয়ে কি হুজুব! ও যে আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী!

বলিলাম—ও!

অতঃপর খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমি তো এমন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম যে, কথা খুঁজিয়া পাই না।

মঞ্চী বলিল—আগুন ক'রে দিই, বড্ড শীত।

শীত সত্যই বড় বেশী। সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন হিমালয় পাহাড নামিয়া আসে। পূর্ব-আকাশের নীচেব দিকটা সূর্যাস্তের আভায় রাঙা, উপরটা কৃষ্ণাভ নীল।

খুপরি হইতে কিছু দূরে একটা শুক্‌নো কাশ-ঝাড়ে আগুন লাগাইয়া দিতে দশ-বারো ফুট দীর্ঘ ঘাস দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। আমবা জ্বলন্ত কাশঝোপের কাছে গিয়া বসিলাম।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী এখনও ও ছেলেমানুষ আছে, ওর জিনিসপত্র কেনার দিকে বেজায় ঝোঁক। ধরুন এবার প্রায় আট-দশ মণ সর্ষে মজুরী পাওয়া গিয়েছিল—তার মধ্যে তিন মণ ও খরচ করে ফেলেছে সখের জিনিসপত্র কেনবার জন্যে। আমি বললাম, গতর-খাটানো মজুরীর মাল দিয়ে তুই ওসব কেন কিনিস্? তা ছেলেমানষ শোনে না। কাঁদে, চোখের জল ফেলে। বলি, তবে কেন্!

মনে ভাবিলাম, তরুণী স্ত্রীর বৃদ্ধ স্বামী, না বলিযাই বা আর কি উপায় ছিল?

মঞ্চী বলিল—কেন, তোমায় তো বলেছি, গম কাটানোর সময় যখন মেলা হবে, তখন আর কিছু কিনব না। ভালো জিনিসগুলো সস্তায় পাওয়া গেল—

নক্‌ছেদী রাগিয়া বলিল- সস্তা! বোকা মেয়েমানুষ পেয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে কেঁয়ে দোকানদার আর ফিবিওয়ালা—সস্তা? পাঁচ সের সর্ষে নিয়ে একখানা চিরুনি দিয়েছে, বাবুজী। আর-বছর তিরাশী রতনগঞ্জের গমের খামারে—

মঞ্চী বলিল—আচ্ছা বাবুজী, নিয়ে আসছি জিনিসগুলো, আপনিই বিচাব ক'রে বলুন সস্তা কি না—

কথা শেষ না করিয়াই মঞ্চী খুপরির দিকে ছুটিল এবং কাশডাঁটায়-বোনা ডালা-আঁটা একটা ঝাঁপি হাতে করিয়া ফিরিল। তারপর সে ডালা তুলিয়া ঝাঁপির ভিতর হইতে জিনিসগুলি একে একে বাহির করিযা আমার সামনে সাজাইয়া রাখিতে লাগিল।

—এই দেখুন কত বড় কাঁকই, পাঁচ সের সর্ষের কমে এমনিতরো কাঁকই হয়? দেখেছেন কেমন চমৎকার রং! শৌখীন জিনিস না? আর এই দেখুন একখানা সাবান, দেখুন কেমন গন্ধ, এও নিয়েছে পাঁচ সের সর্ষে। সস্তা কি না বলুন বাবুজী?

সস্তা মনে করিতে পারিলাম কই? এমন একখানা বাজে সাবানের দাম কলিকাতার বাজারে

এক আনার বেশী নয়, পাঁচ সের সর্ষের দাম নয়ালির মুখেও অন্তত সাড়ে-সাত আনা। এই সরলা বন্য মেয়েরা জিনিসপত্রের দাম জানে না, খুবই সহজ এদের ঠকানো।

মঞ্চী আরও অনেক জিনিস দেখাইল। আহ্লাদের সহিত একবার এটা দেখায়, একবার ওটা দেখায়। মাথার কাঁটা, ঝুটো পাথরের আংটি, চীনামাটির পুতুল, এনামেলের ছোট ডিশ, খানিকটা চওড়া লাল ফিতে—এই সব জিনিস। দেখিলাম মেয়েদের প্রিয় জিনিসের তালিকা সব দেশেই সব সমাজেই অনেকটা এক। বন্য মেয়ে মঞ্চী ও তাহার শিক্ষিতা ভগ্নীর মধ্যে বেশী তফাৎ নাই। জিনিসপত্র সংগ্রহ ও অধিকার করার প্রবৃত্তি উভয়েরই প্রকৃতিদত্ত। বুড়ো নক্ছেদী রাগিলে কি হইবে!

কিন্তু সব চেয়ে ভাল জিনিসটি মঞ্চী সর্বশেষে দেখাইবে বলিয়া চাপিয়া রাখিয়া দিয়াছে তাহা কি তখন জানি!

এইবার সে গর্বমিশ্রিত আনন্দের ও আগ্রহের সহিত সেটা বাহির করিয়া আমার সামনে মেলিয়া ধরিল।

একছড়া নীল ও হলদে হিংলাজের মালা।

সত্যি, কি খুশী ও গর্বের হাসি দেখিলাম ওর মুখে! ওর সভ্য বোনেদের মত ও মনের ভাব গোপন করিতে তো শেখে নাই, একটি অনাবিল নির্ভেজাল নারী-আত্মা ওর এই সব সামান্য জিনিসের অধিকারের উচ্ছ্বসিত আনন্দের ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। নারী-মনের এমন স্বচ্ছ প্রকাশ দেখিবার সুযোগ আমাদের সভ্য-সমাজে বড়-একটা ঘটে না।

—বলুন দিকি কেমন জিনিস?

—চমৎকার।

—কত দাম হতে পারে এর বাবুজী? কলকাতায় আপনারা পরেন তো?

কলিকাতায় আমি হিংলাজের মালা পরি না, আমরা কেহই পরি না, তবুও আমার মনে হইল ইহার দাম খুব বেশী হইলেও ছ-আনার বেশী নয়। বলিলাম—কত নিয়েছে বল না?

—সতের সের সর্ষে নিয়েছে। জিতি নি?

বলিয়া লাভ কি যে, সে ভীষণ ঠকিয়াছে। এ-সব জায়গায় এ রকম হইবেই। কেন মিথ্যা আমি নক্ছেদীর কাছে বকুনি খাওয়াইয়া ওর মনের এ অপূর্ব আহ্লাদ নষ্ট করিতে যাইব?

আমারই অনভিজ্ঞতার ফলে এ রকম এমন হইতে পারিয়াছে। আমার উচিত ছিল ফিরিওয়ালাদের জিনিসপত্রের দরের উপরে কড়া নজর রাখা। কিন্তু আমি নতুন লোক এখানে, কি করিয়া জানিব এদেশের ব্যাপার? ফসল মাড়িবার সময় মেলা হয় তাহাই তো জানিতাম না। আগামী বৎসর যাহাতে এমনধারা না ঘটে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পরদিন সকালে নক্ছেদী তাহার দুই-স্ত্রী ও পুত্র-কন্যা লইয়া এখান হইতে চলিয়া গেল। যাইবার পূর্বে আমার খুপরিতে নক্ছেদী খাজনা দিতে আসিল, সঙ্গে আসিল মঞ্চী। দেখি মঞ্চী গলায় সেই হিংলাজের মালাছড়াটি পরিয়া আসিয়াছে। হাসিমুখে বলিল—আবার আসব ভাদ্র মাসে মকাই কাটতে। তখন থাকবেন তো বাবুজী? আমরা জংলী হর্তুকীর আচার করি শ্রাবণ মাসে—আপনার জন্যে আনব।

মঞ্চীকে বড় ভাল লাগিয়াছিল, চলিয়া গেলে দুঃখিত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ

১

এবার আমার একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হইল।

মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের দক্ষিণে মাইল পনের-কুড়ি দূরে একটা বিস্তৃত শাল ও বিড়ির পাতার জঙ্গল সেবার কালেক্টরীর নীলামে ডাক হইবে খবর পাওয়া গেল। আমাদের হেড আপিসে

তাড়াতাড়ি একটা খবর দিতে তারযোগে আদেশ পাইলাম, বিড়ির পাতার জঙ্গল যেন আমি ডাকিয়া লই।

কিন্তু তাহার পূর্বে জঙ্গলটা একবার আমার নিজের চোখে দেখা আবশ্যক। কি আছে না-আছে না জানিয়া নীলাম ডাকিতে আমি প্রস্তুত নই। এদিকে নীলামের দিনও নিকটবর্তী, 'তার' পাওয়ার পরদিনই সকালে রওনা হইলাম।

আমার সঙ্গের লোকজন খুব ভোরে বাক্স-বিছানা ও জিনিসপত্র মাথায় রওনা হইয়াছিল, মোহনপুরা ফরেস্টের সীমানায় কারো নদী পার হইবার সময়ে তাহাদের সহিত দেখা হইল। সঙ্গে ছিল আমাদের পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল।

কারো ক্ষীণকায়া পার্বত্য স্রোতস্বিনী—হাঁটুখানেক জল ঝির্‌ঝির্‌ করিয়া উপলরাশির মধ্য দিয়া প্রবাহিত। আমরা দুজনে ঘোড়া হইতে নামিলাম, নয়ত পিছল পাথরের নুড়িতে ঘোড়া পা হড়কাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে। দু-পারে কটা বালির চড়া। সেখানেও ঘোড়ায় চাপা যায় না, হাঁটু পর্যন্ত বালিতে এমনিই ডুবিয়া যায়। অপর পারের কড়ারী জমিতে যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা এগারটা। বনোয়ারী পাটোয়ারী বলিল—এখানে রান্নাবান্না করে নিলে হয় হুজুর, এর পরে জল পাওয়া যায় কি না ঠিক নেই।

নদীর দু-পারেই জনহীন আরণ্যভূমি, তবে বড় জঙ্গল নয়, ছোটখাটো কেঁদ পলাশ ও শালের জঙ্গল—খুব ঘন ও প্রস্তরাকীর্ণ, লোকজনের চিহ্ন কোন দিকে নাই।

আহারাদির কাজ খুব সংক্ষেপে সারিলেও সেখান হইতে রওনা হইতে একটা বাজিয়া গেল।

বেলা যখন যায়-যায়, তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশী দূর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল। অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কুলপাল, একটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে, সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না, তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।

বিশেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে জঙ্গল বড় ঘন হইয়া আসিল। আগে ছিল ফাঁকা জঙ্গল, এখন যেন ক্রমেই চারিদিক হইতে বড় বড় বনস্পতির দল ভিড় করিয়া সরু সুঁড়িপথটা চাপিয়া ধরিতেছে—এখন যেখানে দাঁড়াইয়া আছি, সেখানটাতে তো চারদিকেই বড় বড় গাছ, আকাশ দেখা যায় না, নৈশ অন্ধকার ইতিমধ্যেই ঘনাইয়া আসিয়াছে।

এক এক জায়গায় ফাঁকা জঙ্গলের দিকে বনের কি অনুপম শোভা! কি এক ধরনের থোকা থোকা সাদা ফুল সারা বনের মাথা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে ছায়াগহন অপরাহ্নের নীল আকাশের তলে। মানুষের চোখের আড়ালে সভ্য জগতের সীমা হইতে বহু দূরে এত সৌন্দর্য কার জন্য যে সাজানো! বনোয়ারী বলিল —ও বুনো তেউড়ির ফুল, এই সময় জঙ্গলে ফোটে, হুজুর। এক রকমের লতা।

যেদিকে চোখ যায়, সেদিকেই গাছের মাথা, ঝোপের মাথা, ঈষৎ নীলাভ শুভ্র বুনো তেউড়ির ফুল ফুটিয়া আলো করিয়া রহিয়াছে—ঠিক যেন রাশি রাশি পেঁজা নীলাভ কাপাস তুলা কে ছড়াইয়া রাখিয়াছে বনের গাছের মাথায় সর্বত্র। ঘোড়া থামাইয়া মাঝে মাঝে কতক্ষণ ধরিয়া দাঁড়াইয়াছি—এক এক জায়গার শোভা এমনই অদ্ভুত যে সেদিকে চাহিয়া যেন একটা ছন্নছাড়া মনের ভাব হইয়া যায়—যেন মনে হয়, কত দূরে কোথায় আছি, সভ্য জগৎ হইতে বহু দূরে এক জনহীন অজ্ঞাত জগতের উদাস, অপরূপ বন্য সৌন্দর্যের মধ্যে—যে জগতের সঙ্গে মানুষের কোনও সম্পর্ক নাই, প্রবেশের অধিকারও নাই, শুধু বন্য জীবজন্তু, বৃক্ষলতার জগৎ।

বোধ হয় আরও দেরি হইয়া গিয়াছিল আমার এই বার বার জঙ্গলের দৃশ্য হাঁ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবার ফলে। বেচারী বনোয়ারী পাটোয়ারী আমার তাঁবে কাজ করে, সে জোর করিয়া

আমায় কিছু বলিতে না পারিলেও মনে মনে নিশ্চয়ই ভাবিতেছে—এ বাঙালী বাবুটির মাথায় নিশ্চয় দোষ আছে! এঁকে দিয়া জমিদারীর কাজ আর কত দিন চলিবে? একটি বড় আসান-গাছের তলায় সবাই মিলিয়া আশ্রয় লওয়া গেল। আমরা আছি সবসুদ্ধ আট-দশজন লোক।

বনোয়ারী বলিল—বড় একটা আগুন কর আর সবাই কাছাকাছি ঘেঁষে থাকো। ছড়িয়ে থেকো না, নানা রকম বিপদ এ জঙ্গলে রাত্রিকালে।

গাছের নীচে ক্যাম্প-চেয়ার পাতিয়া বসিয়াছি, মাথার উপর অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা আকাশ, এখনও অন্ধকার নামে নাই, দূরে নিকটে জঙ্গলের মাথায় বুনো তেউড়ির সাদা ফুল ফুটিয়া আছে রাশি রাশি, অজস্র। আমার ক্যাম্প-চেয়ারের পাশেই দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস আধ শুক্‌নো, সোনালী রঙের। রোদ-পোড়া মাটির সোঁদা গন্ধ, শুক্‌নো ঘাসের গন্ধ, কি একটা বন-ফুলের গন্ধ, যেন দুর্গা-প্রতিমার রাঙতার ডাকের সাজের গন্ধের মত। মনের মধ্যে এই উন্মুক্ত, বন্য জীবন আনিয়া দিয়াছে একটা মুক্তি ও আনন্দের অনুভূতি—যাহা কোথাও কখনও আসে না, এই রকম বিরাট নির্জন প্রান্তর ও জনহীন অঞ্চল ছাড়া। অভিজ্ঞতা না থাকিলে বলিয়া বোঝানো বড়ই কঠিন সে মুক্ত-জীবনের উল্লাস।

এমন সময় আমাদের এক কুলি আসিয়া পাটোয়ারীর কাছে বলিল, একটু দূরে জঙ্গলের শুষ্ক ডালপালা কুড়াইতে গিয়া সে একটা কি জিনিস দেখিয়াছে। জায়গাটা ভাল নয়, ভূত বা পরীর আড্ডা, এখানে না তাঁবু ফেলিলেই হইত।

পাটোয়ারী বলিল—চলুন হুজুর, দেখে আসি কি জিনিসটা।

কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে একটা জায়গা দেখাইয়া কুলিটা বলিল—ঐখানে নিকটে গিয়ে দেখুন হুজুর। আর কাছে যাব না।

বনের মধ্যে কাঁটা-লতা ঝোপ হইতে মাথা উঁচু স্তম্ভের মাথায় একটা বিকট মুখ খোদাই-করা। সন্ধ্যাবেলা দেখিলে ভয় পাইবার কথা বটে।

মানুষের হাতের তৈরি এ-বিষয়ে ভুল নাই, কিন্তু এ জনহীন জঙ্গলের মধ্যে এ স্তম্ভ কোথা হইতে আসিল বুঝিতে পারিলাম না। জিনিসটা কত দিনের প্রাচীন তাহাও বুঝিতে পাবিলাম না।

সে বাত্রি কাটিয়া গেল। সকালে উঠিয়া বেলা ন'টার মধ্যে আমরা গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেখানে পৌঁছিয়া জঙ্গলেব বর্তমান মালিকের জনৈক কর্মচারীর সঙ্গে দেখা হইল। সে আমায় জঙ্গল দেখাইয়া বেড়াইতেছে—হঠাৎ জঙ্গলের মধ্যে একটা শুষ্ক নালার ওপারে ঘন বনের মধ্যে দেখি একটা প্রস্তরস্তম্ভের শীর্ষ জাগিয়া আছে—ঠিক কাল সন্ধ্যাবেলার সেই স্তম্ভটার মত। সেই রকমের বিকট মুখ খোদাই করা।

আমার সঙ্গে বনোয়ারী পাটোয়ারী ছিল, তাহাকেও দেখাইলাম। মালিকের কর্মচারী স্থানীয় লোক, সে বলিল—ও আরও তিন-চারটা আছে এ-অঞ্চলে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে। এ-দেশে আগে অসভ্য বুনো জাতির রাজ্য ছিল, ও তাদেরই হাতের তৈরি। ওগুলো সীমানার নিশানদিহি থাম্বা।

বলিলাম—থাম্বা কি ক'রে জানলে?

সে বলিল—চিবকাল শুনে আসছি বাবুজী, তা ছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্তমান।

বড় কৌতূহল হইল।

—কোথায়?

লোকটা আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই জঙ্গলের উত্তর সীমানায় একটা ছোট বস্তি আছে—সেখানে থাকেন। এ-অঞ্চলে তাঁর বড় খাতির। আমরা শুনেছি উত্তরে হিমালয় পাহাড় আর দক্ষিণে ছোটনাগপুরের সীমানা, পূর্বে কুশী নদী, পশ্চিমে মুঙ্গের—এই সীমানার মধ্যে সমস্ত পাহাড়-জঙ্গলের রাজা ছিল ওঁর পূর্বপুরুষ।

মনে পড়িল, পূর্বেও আমার কাছারিতে একবার গনোরী তেওয়ারী স্কুলমাস্টার গল্প করিয়াছিল বটে যে, এ অঞ্চলের আদিম-জাতীয় রাজা, তাদের বংশধর এখনও আছে। এদিকের যত পাহাড়ী

জাতি—তাহাকে এখনও রাজা বলিয়া মানে। এখন সে কথা মনে পড়িল। জঙ্গলের মালিকের সেই কর্মচারীর নাম বুদ্ধু সিং, বেশ বুদ্ধিমান, এখানে অনেককাল চাকুরি করিতেছে, এই সব বন-পাহাড় অঞ্চলের অনেক ইতিহাস সে জানে দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—মুঘল বাদ্‌শাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছুই নেই। যা কিছু বাকি ছিল, ১৮৬২ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহের পরে সব যায়। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা এখনও বেঁচে আছেন। তিনি বর্তমান রাজা। নাম দোবরু পান্না বীরবর্দী। খুব বৃদ্ধ আর খুব গরীব। কিন্তু এ দেশের সকল আদিম জাতি এখনও তাঁকে রাজার সম্মান দেয়। রাজ্য না থাকলেও রাজা বলেই মানে।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল।

রাজসন্দর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজর লইয়া যাওয়া উচিত। যার যা প্রাপ্য সম্মান, তাকে তা না দিলে কর্তব্যের হানি ঘটে।

কিছু ফলমূল, গোটা দুই বড় মুরগী—বেলা একটার মধ্যে নিকটবর্তী বস্তী হইতে কিনিয়া আনিলাম। এ-দিকের কাজ শেষ করিয়া বেলা দুইটার পরে বুদ্ধু সিংকে বলিলাম—চল, রাজার সঙ্গে দেখা করে আসি।

বুদ্ধু সিং তেমন উৎসাহ দেখাইল না। বলিল—আপনি সেখানে কি যাবেন! আপনাদের সঙ্গে দেখা করবার উপযুক্ত নয়। পাহাড়ী অসভ্য জাতদের রাজা, তাই ব'লে কি আর আপনাদের সমান সমান কথা বলবার যোগ্য বাবুজী? সে তেমন কিছু নয়।

তাহার কথা না শুনিয়াই আমি ও বনোয়ারীলাল রাজধানীর দিকে গেলাম। তাহাকেও সঙ্গে লইলাম।

রাজধানীটা খুব ছোট, কুড়ি-পঁচিশ ঘর লোকের বাস।

ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপরার চাল—বেশ পরিষ্কার করিয়া লেপাপোঁছা দেওয়ালের গায়ে মাটির সাপ, পদ্ম, লতা প্রভৃতি গড়া। ছোট ছোট ছেলেরা খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম করিতেছে। কিশোরী ও যুবতী মেয়েদের সুঠাম গড়ন ও নিটোল স্বাস্থ্য, মুখে কেমন সুন্দর একটা লাবণ্য প্রত্যেকেরই। সকলেই আমাদের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে?

স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই। তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

২

আমরা গ্রামে যেখানে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এইবার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। রাজবাড়ীতে ছেলেমেয়ে অনেকগুলি—কতকগুলি খুব ছোট। তাদের গলায় পুঁতির মালা ও নীল ফলের বীজের মালা। দু-একটি ছেলে-মেয়ে দেখিতে বেশ সুশ্রী। ষোল-সতের বছরের একটি মেয়ে বুদ্ধু সিং-এর ডাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিয়াই আমাদের দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, তাহার চোখের চাহনি দেখিয়া মনে হইল কিছু ভয়ও পাইয়াছে।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজা কোথায়?

—মেয়েটি কে? বুদ্ধু সিংকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—রাজার নাতির মেয়ে।

রাজা বহুদিন জীবিত থাকিয়া নিশ্চয়ই বহু যুবক ও প্রৌঢ়কে রাজসিংহাসনে বসিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

মেয়েটি বলিল—আমার সঙ্গে এস। জ্যাঠামশায় পাহাড়ের নীচে পাথরে বসে আছেন।

মানি বা নাই মানি, মনে মনে ভাবিলাম যে-মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে, সে সত্যই রাজকন্যা—তাহার পূর্বপুরুষেরা এই আবণ্য-ভূভাগ বহুদিন ধরিয়া শাসন করিয়াছিল—সেই বংশের সে মেয়ে।

বলিলাম—মেয়েটিব নাম কি জিজ্ঞেস কর।

বুদ্ধু সিং বলিল—ওর নাম ভান্‌মতী।

বাঃ, বেশ সুন্দর—ভানুমতী! রাজকন্যা ভানুমতী!

ভানুমতী নিটোল স্বাস্থ্যবতী, সুঠাম মেয়ে। লাবণ্যমাখা মুখশ্রী—তবে পরনের কাপড় সভ্যসমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির দানা। দূর হইতে একটা বড় বকাইন্ গাছ দেখাইয়া দিয়া ভানুমতি বলিল—তোমরা যাও, জ্যাঠামশায় ওই গাছতলায় ব'সে গরু চরাচ্ছেন।

গরু চরাইতেছেন কি রকম! প্রায় চমকিয়া উঠিয়াছিলাম বোধ হয়। এই সমগ্র অঞ্চলের রাজা সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা দোবরু পান্না বীরবর্দী গরু চরাইতেছেন!

কিছু জিজ্ঞাসা কবিবার পূর্বেই মেয়েটি চলিয়া গেল এবং আমরা আর কিছু অগ্রসর হইয়া বকাইন্ গাছের তলায় এক বৃদ্ধকে কাঁচা শালপাতায় তামাক জড়াইয়া ধূমপানবত দেখিলাম।

বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম, রাজাসাহেব।

বাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে খুব ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না।

বলিল—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে?

বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনাব সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে।

আমি নিজে গিয়া বৃদ্ধের সামনে মুরগী ও জিনিস কয়টি নামাইয়া রাখিলাম।

বলিলাম—আপনি দেশের রাজা, আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বহুৎ দূর থেকে এসেছি।

বৃদ্ধের দীর্ঘাযত চেহারার দিকে চাহিযা আমার মনে হইল যৌবনে রাজা দোবরু পান্না খুব সুপুরুষ ছিলেন সন্দেহ নাই। মুখশ্রীতে বুদ্ধির ছাপ সুস্পষ্ট। বৃদ্ধ খুব খুশী হইলেন। আমার দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ, অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেচি কল্‌কাতা।

—আপনি কখনও যান নি?

—না, আমরা কি শহরে যেতে পারি? এই জঙ্গলেই আমরা থাকি ভাল। বোসো। ভান্‌মতী কোথায় গেল, ও ভান্‌মতী?

মেয়েটি ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল—কি জ্যাঠামশায়?

—এই বাঙালী বাবু ও তাঁর সঙ্গের লোকজন আজ আমার এখানে থাকবেন ও খাওয়া-দাওয়া করবেন।

আমি প্রতিবাদ কবিয়া বলিলাম—না, না, সে কি! আমরা এখুনি চলে যাব, আপনার সঙ্গে দেখা ক'রেই—আমাদের থাকার বিষয়ে—

কিন্তু দোবরু পান্না বলিলেন—না, তা হতে পারে না। ভান্‌মতী, এই জিনিসগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বহিয়া অদূরবর্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল, ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সাঁওতাল-বিদ্রোহের নেতা, প্রাচীন অভিজাত-বংশীয় বীর দোবরু পান্না (হইলই বা বন্য আদিম জাতি) আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছেন—এ অনুরোধ আদেশেরই সামিল।

রাজা দোবরু পান্না অত্যন্ত দরিদ্র, দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তাঁহাকে গরু চরাইতে দেখিয়া প্রথমটা আশ্চর্য হইয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরে মনে ভাবিয়া দেখিলাম ভারতবর্ষের ইতিহাসে রাজা দোবরু পান্নার অপেক্ষা অনেক বড় রাজা অবস্থাবৈগুণ্যে গোচারণ অপেক্ষাও হীনতর বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

রাজা নিজের হাতে শালপাতার একটা চুরুট গড়িয়া আমার হাতে দিলেন। দেশলাই নাই—গাছের তলায় আগুন করাই আছে—তাহা হইতে একটা পাতা জ্বালাইয়া সম্মুখে ধরিলেন।

বলিলাম—আপনারা এ-দেশের প্রাচীন রাজবংশ, আপনাদের দর্শনে পুণ্য আছে।

দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে! আমাদের বংশ সূর্যবংশ। এই পাহাড়-জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীব সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়েস অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তারপর আর কিছু নেই।

এই আরণ্য ভূভাগের বহিঃস্থিত অন্য কোনও পৃথিবীর খবর দোবরু পান্না রাখেন বলিয়া মনে হইল না। তাঁহার কথার উত্তরে কি একটা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় একজন যুবক আসিয়া সেখানে দাঁড়াইল।

রাজা দোবরু বলিলেন—আমার ছোট নাতি, জগরু পান্না। ওব বাবা এখানে নেই, লছমীপুরের রাণী-সাহেবরে সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ওরে জগরু, বাবুজীর জন্যে খাওয়ার যোগাড় কর।

যুবক যেন নবীন শালতরু, পেশীবহুল সবল নধর দেহ। সে বলিল—বাবুজী, সজারুর মাংস খান?

পরে তাহার পিতামহের দিকে চাহিয়া বলিল—পাহাড়ের ওপারের বনে ফাঁদ পেতে রেখেছিলাম, কাল রাত্রে দুটো সজারু পড়েছে।

শুনিলাম রাজার তিনটি ছেলে, তাহাদের আট-দশটি ছেলেমেয়ে। এই বৃহৎ রাজপরিবারেব সকলেই এই গ্রামে একত্র থাকে। শিকার ও গোচারণ প্রধান উপজীবিকা। এ বাদে বনের পাহাড়ী জাতিদের বিবাদ-বিসংবাদে রাজার কাছে বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিলে কিছু কিছু ভেট্ ও নজরানা দিতে হয়—দুধ, মুরগী, ছাগল, পাখীর মাংস বা ফলমূল।

বলিলাম—আপনার চাষবাস আছে?

দোবরু পান্না গর্বের সুরে বলিলেন—ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সব চেয়ে গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে, আমি কখনও ছুঁই নি। বর্শা ধ'রে শিকার আসল শিকার।

ভানুমতি আবার আসিয়া একটা পাথরের ভাঁড় আমাদের কাছে রাখিয়া গেল।

রাজা বলিলেন—তেল মাখুন। কাছেই চমৎকার ঝরণা—স্নান ক'রে আসুন সকলে।

আমরা স্নান করিয়া আসিলে রাজা আমাদের রাজবাড়ীর একটা ঘরে লইয়া যাইতে বলিলেন।

ভানুমতী একটা ধামায় চাল ও মেটে আলু আনিয়া দিল। জগরু সজারু ছাড়াইয়া মাংস আনিয়া রাখিল কাঁচা শালপাতার পাত্রে।

ভানুমতী আর একবার গিয়া দুধ ও মধু আনিল। আমার সঙ্গে ঠাকুর ছিল না, বনোয়ারী মেটে আলু ছাড়াইতে বসিল, আমি রাঁধিবার চেষ্টায় উনুন ধরাইতে গেলাম। কিন্তু শুধু বড় বড় কাঠের সাহায্যে উনুন ধরানো কষ্টকর। দু-একবার চেষ্টা করিয়া পারিলাম না, তখন ভানুমতী তাড়াতাড়ি একটা পাখীর শুক্‌নো বাসা আনিয়া উনুনের মধ্যে পুরিয়া দিতে আগুন বেশ জ্বলিয়া উঠিল। দিয়াই দুরে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতি রাজকন্যা বটে, কিন্তু বেশ অমায়িক স্বভাবের রাজকন্যা। অথচ দিব্য সহজ, সরল মর্যাদাজ্ঞান।

রাজা দোবরু পান্না সব সময় রান্নাঘরের দুয়ারটির কাছে বসিয়া রহিলেন। আতিথ্যের এতটুকু ত্রুটি না ঘটে। আহারাদির পর বলিলেন—আমার তেমন বেশী ঘরদোরও নেই, আপনাদের বড় কষ্ট হল। এই বনের মধ্যে পাহাড়ের উপরে আমার বংশের রাজাদের প্রকাণ্ড বাড়ীর চিহ্ন এখনও আছে। আমি বাপ-ঠাকুর্দার কাছে শুনেছি বহু প্রাচীনকালে ওখানে আমার পূর্বপুরুষেরা বাস করতেন। সে দিন কি আর এখন আছে! আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেবতা এখনও সেখানে আছেন।

আমার বড় কৌতূহল হইল, বলিলাম—যদি আমরা একবার দেখতে যাই তাতে কি কোনও আপত্তি আছে, রাজাসাহেব?

—এর আবার আপত্তি কি! তবে দেখবার এখন বিশেষ কিছু নেই। আচ্ছা চলুন, আমি যাব। জগরু আমাদের সঙ্গে এস।

আমি আপত্তি করিলাম—বিবানব্বই বছরের বৃদ্ধকে আর পাহাড়ে উঠাইবার কষ্ট দিতে মন সরিল না। সে আপত্তি টিকিল না, রাজাসাহেব হাসিয়া বলিলেন—ও পাহাড়ে আমায় তো প্রায়ই উঠতে হয়, ওর গায়েই আমার বংশের সমাধিস্থান। প্রত্যেক পূর্ণিমায় আমায় সেখানে যেতে হয়। চলুন সে-জায়গাও দেখাব।

উত্তর-পূর্ব কোণ হইতে অনুচ্চ শৈলমালা (স্থানীয় নাম ধন্‌ঝরি) এক স্থানে আসিয়া যেন হঠাৎ ঘুরিয়া পূর্বমুখী হওয়ার দরুণ একটা খাঁজের সৃষ্টি করিয়াছে, এই খাঁজের নীচে একটা উপত্যকা, শৈলসানুর অরণ্য সারা উপত্যকা ব্যাপিয়া যেন সবুজের ঢেউয়ের মত নামিয়া আসিয়াছে, যেমন ঝরণা নামে পাহাড়ের গা বাহিয়া। অরণ্য এখানে ঘন নয়, ফাঁকা ফাঁকা—বনের গাছেব মাথায় মাথায় সুদুর চক্রবালরেখায় নীল শৈলমালা, বোধ হয় গয়া কি রামগড়ের দিকের—যতদূর দৃষ্টি চলে শুধুই বনের শীর্ষ, কোথাও উঁচু, বড় বড় বনস্পতিসঙ্কুল, কোথাও নীচু, চারা শাল ও চারা পলাশ। জঙ্গলের মধ্যে সরু পথ বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিলাম।

এক জায়গায় খুব বড় পাথরের চাঁই আড়ভাবে পোঁতা, ঠিক যেন একখানা পাথরের কড়ি বা ঢেঁকির আকারেব। তার নীচে কুম্ভকারদের হাঁড়ি-কলসী পোড়ানো পণ-এর গর্তের মত কিংবা মাঠের মধ্যে খেঁকশিয়ালী যেমন গর্ত কাটে—ওই ধরনের প্রকাণ্ড একটা গর্তের মুখ। গর্তের মুখে চারা শালের বন।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই গর্তের মধ্যে ঢুকতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। কোনো ভয় নেই। জগরু আগে যাও।

প্রাণ হাতে কবিয়া গর্তের মধ্যে ঢুকিলাম। বাঘ-ভালুক তো থাকিতেই পারে, না থাকে সাপ তো আছেই।

গর্তের মধ্যে হামাগুড়ি দিয়া খানিকদূর গিয়া তবে সোজা হইয়া দাঁড়ানো যায়। ভয়ানক অন্ধকার ভিতরে প্রথমটা মনে হয়, কিন্তু চোখ অন্ধকারে কিছুক্ষণ অভ্যস্ত হইয়া গেলে আর তত অসুবিধা হয় না; জায়গাটা প্রকাণ্ড একটা গুহা, কুড়ি-বাইশ হাত লম্বা, হাত পনের চওড়া—উত্তর দিকের দেওয়ালের গায়ে আবার একটা খেঁকশিয়ালীর মত গর্ত দিয়া খানিক দূর গেলে দেওয়ালের ওপারে ঠিক এই রকম নাকি আর একটা গুহা আছে—কিন্তু সেটাতে আমার ঢুকিবার আগ্রহ দেখাইলাম না। গুহার ছাদ বেশী উঁচু নয়, একটা মানুষ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত উঁচু করিলে ছাদ ছুঁইতে

পারে। চাম্‌সে ধরনের গন্ধ গুহার মধ্যে—বাদুড়ের আড্ডা—এ ছাড়া ভাম, শৃগাল, বনবিড়াল প্রভৃতি থাকে শোনা গেল। বনোয়ারী পাটোয়ারী চুপি চুপি বলিল—হুজুর, চলুন বাইরে, এখানে আর বেশী দেরি করবেন না।

ইহাই নাকি দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের দুর্গ-প্রাসাদ।

আসলে ইহা একটি বড় প্রাকৃতিক গুহা—প্রাচীনকালে পাহাড়ের উপর দিকে মুখওয়ালা এ গুহায় আশ্রয় লইলে শত্রুর আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করা যাইত।

রাজা বলিলেন—এর আর একটা গুপ্ত মুখ আছে—সে কাউকে বলা নিয়ম নয়। সে কেবল আমার বংশের লোক ছাড়া কেউ জানে না। যদিও এখন এখানে কেউ বাস করে না, তবুও এই নিয়ম চলে আসছে বংশে।

গুহাটা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ধড়ে প্রাণ আসিল।

তারপর আরও খানিকটা উঠিয়া এক জায়গায় প্রায় এক বিঘা জমি জুড়িয়া বড় বড় সরু মোটা ঝুরি নামাইয়া, পাহাড়ের মাথার অনেকখানি ব্যাপিয়া এক বিশাল বটগাছ।

রাজা দোবরু পান্না বলিলেন—জুতো খুলে চলুন মেহেববানি করে।

বটগাছতলায় যেন চারিধারে বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের আকারের পাথর ছড়ানো।

রাজা বলিলেন—ইহাই তাঁহার বংশের সমাধিস্থান। এক-একখানা পাথরের তলায় এক-একটা রাজবংশীয় লোকের সমাধি। বিশাল বটতলার সমস্ত স্থান জুড়িয়া সেই রকম বড় বড় শিলাখণ্ড ছড়ানো—কোনো কোনো সমাধি খুবই প্রাচীন, দু'দিক হইতে ঝুরি নামিয়া যেন সেগুলিকে সাঁড়াশির মত আটকাইয়া ধরিয়াছে, সে সব ঝুরি আবার গাছের গুঁড়ির মতো মোটা হইয়া গিয়াছে—কোনো কোনো শিলাখণ্ড ঝুরির তলায় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে সেগুলির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়।

রাজা দোবরু বলিলেন—এই বটগাছ আগে এখানে ছিল না। অন্য অন্য গাছের বন ছিল। একটি ছোট বটচারা ক্রমে বেড়ে অন্য গাছ মেরে ফেলে দিয়েছে। এই বটগাছটাই এত প্রাচীন যে, এর আসল গুঁড়ি নেই। ঝুরি নেমে যে গুঁড়ি হয়েছে, তারাই এখন রয়েছে। গুঁড়ি কেটে উপড়ে ফেললে দেখবেন ওর তলায় কত পাথর চাপা পড়ে আছে। এইবার বুঝুন কত প্রাচীন সমাধিস্থান এটা।

সত্যই বটগাছতলাটায় দাঁড়াইয়া আমার মনে এমন একটা ভাব হইল, যাহা এতক্ষণ কোথাও হয় নাই, রাজাকে দেখিয়াও না (রাজাকে তো মনে হইয়াছে জনৈক বৃদ্ধ সাঁওতাল কুলীর মত), রাজকন্যাকে দেখিয়াও নয় (একজন স্বাস্থ্যবতী হো কিংবা মুণ্ডা তরুণীর সহিত রাজকন্যার কোনো প্রভেদ দেখি নাই), রাজপ্রাসাদ দেখিয়া তো নয়ই (সেটাকে একটা সাপখোপের ও ভূতের আড্ডা বলিয়া মনে হইয়াছে)। কিন্তু পাহাড়ের উপরে এই সুবিশাল, প্রাচীন বটতকতলে কতকালের এই সমাধিস্থল আমার মনে এই অননুভূত, অপরূপ অনুভূতি জাগাইল।

স্থানটির গাম্ভীর্য, রহস্য ও প্রাচীনত্বের ভাব অবর্ণনীয়। তখন বেলা প্রায় হেলিয়া পাড়িয়াছে, হলদে রোদ পত্ররাশির গায়ে, ডাল ও ঝুরির অ.ণ্যে ধন্‌ঝরির অন্য চূড়ায়, দূর বনের মাথায়। অপরাহ্ণের সেই ঘনায়মান ছায়া এই সুপ্রাচীন রাজ-সমাধিকে যেন আরও গম্ভীর, রহস্যময় সৌন্দর্য দান করিল।

মিশরের প্রাচীন সম্রাটদের সমাধিস্থল থিব্‌স নগরের অদূরবর্তী 'ভ্যালি অব্ দি কিংস' আজ পৃথিবীর টুরিস্টদের লীলাভূমি, পাবলিসিটি ও ঢাক পিটানোর অনুগ্রহে সেখানকার বড় বড় হোটেলগুলি মরশুমের সময় লোকে গিজগিজ করে—'ভ্যালি অব্ দি কিংস' অতীত কালের কুয়াশায় যত না অন্ধকার হইয়াছিল, তার অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া যায় দামী সিগারেট ও চুরুটের ধোঁয়ায়—কিন্তু তার চেয়ে কোনো অংশে রহস্যে ও স্বপ্রতিষ্ঠিত মহিমায় কম নয় সুদূর অতীতের এই অনার্য

নৃপতিদের সমাধিস্থল, ঘন অরণ্যভূমির ছায়ায় শৈলশ্রেণীর অন্তরালে যা চিরকাল আত্মগোপন করিয়া আছে ও থাকিবে। এদের সমাধিস্থলে আড়ম্বর নাই, পালিশ নাই, ঐশ্বর্য নাই মিশরীয় ধনী ফ্যারাওদের কীর্তির মত—কারণ এরা ছিল দরিদ্র, এদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল মানুষের আদিম যুগের অশিক্ষিতপটু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, নিতান্ত শিশু-মানবের মন লইয়া ইহারা রচনা করিয়াছে ইহাদের গুহানিহিত রাজপ্রাসাদ, রাজসমাধি, সীমানাজ্ঞাপক খুঁটি। সেই অপরাহ্নের ছায়ায় পাহাড়ের উপরে সে বিশাল তরুতলে দাঁড়াইয়া যেন সর্বব্যাপী শাশ্বত কালের পিছন দিকে বহুদূরে অন্য এক অভিজ্ঞতার জগৎ দেখিতে পাইলাম—পৌরাণিক ও বৈদিক যুগও যার তুলনায় বর্তমানের পর্যায়ে পড়িয়া যায়।

দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মত অনার্য আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন...ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস—এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এই সব গুপ্ত গিরিগুহায়, অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থি কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে বিজয়ী আর্যজাতি কখনও ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতাদর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি, বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্বে উন্নতনাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাতবংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি, রাজকন্যা ভানুমতীকে মুণ্ডা কুলী-রমণী ভাবিতেছি—তাদের কত আগ্রহের ও গর্বের সহিত প্রদর্শিত রাজপ্রাসাদকে অনার্যসুলভ আলো-বাতাসহীন গুহাবাস, সাপ ও ভূতের আড্ডা বলিয়া ভাবিতেছি। ইতিহাসের এই বিরাট ট্রাজেডি যেন আমার চোখের সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল—সে নাটকের কুশীলবগণ এক দিকে বিজিত উপেক্ষিত দরিদ্র অনার্য নৃপতি দোবরু পান্না, তরুণী অনার্য রাজকন্যা ভানুমতী, তরুণ রাজপুত্র জগরু পান্না—এক দিকে আমি, আমার পাটোয়ারী বনোয়ারীলাল ও আমার পথপ্রদর্শক বুদ্ধু সিং।

ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজসমাধি ও বটতরুতল আবৃত হইবাব পূর্বেই আমরা সেদিন পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম।

নামিবার পথে একস্থানে জঙ্গলের মধ্যে একখানা খাড়া সিঁদুরমাখা পাথর। আশেপাশে মানুষের হস্তরোপিত গাঁদাফুলের ও সন্ধ্যামণি-ফুলের গাছ। সামনে আব একখানা বড় পাথব, তাতেও সিঁদুর মাখা। বহুকাল হইতে নাকি এই দেবস্থান এখানে প্রতিষ্ঠিত, রাজবংশের ইনি কুলদেবতা। পূর্বে এখানে নরবলি হইত—সম্মুখের বড় পাথরখানিই যূপ-রূপে ব্যবহৃত হইত। এখন পায়রা ও মুরগী বলি প্রদত্ত হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি ঠাকুর ইনি?

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো, বুনো মহিষের দেবতা।

মনে পড়িল গত শীতকালে গনু মাহাতোর মুখে শোনা সেই গল্প।

রাজা দোবরু বলিলেন—টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে।

এই অরণ্যচারী আদিম সমাজের দেবতাকে সভ্য জগতে কেউই মানে না, জানেও না—কিন্তু ইহা যে কল্পনা নয়, এবং এই দেবতা সে সত্যই আছেন—তাহা স্বতঃই মনে উদয় হইয়াছিল সেই বিজন বন্যজন্তু-অধ্যুষিত অরণ্য ও পর্বত অঞ্চলের নিবিড় সৌন্দর্য ও রহস্যের মধ্যে বসিয়া।

অনেক দিন পরে কলিকাতায় ফিরিয়া একবার দেখিয়াছিলাম বড়বাজারে, জ্যৈষ্ঠ মাসের ভীষণ গরমের দিনে এক পশ্চিমা গাড়োয়ান বিপুল বোঝাই গাড়ীর মহিষ দুটাকে প্রাণপণে চামড়ার পাঁচন দিয়া নির্মমভাবে মারিতেছে—সেই দিন মনে হইয়াছিল, হায় দেব টাঁড়বারো, এ তো ছোটনাগপুর কি মধ্যপ্রদেশের আরণ্যভূমি নয়, এখানে তোমার দয়ালু হস্ত এই নির্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে? এ বিংশ শতাব্দীর আর্য সভ্যতাদৃপ্ত কলিকাতা। এখানে বিজিত আদিম রাজা দোবরু পান্নার মতই তুমি অসহায়।

আমি নওয়াদা হইতে মোটর বাস ধরিয়া গয়ায় আসিব বলিয়া সন্ধ্যার পরেই রওনা হইলাম। বনোয়ারী আমাদের ঘোড়া লইয়া তাঁবুতে ফিরিল। আসিবার সময় আর একবার রাজকুমারী ভানুমতীর সহিত দেখা হইয়াছিল। সে এক বাটি মহিষের দুধ লইয়া আমাদেব জন্য দাঁড়াইয়া ছিল রাজবাড়ীর দ্বারে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

১

একদিন রাজু পাঁড়ে কাছারিতে খবর পাঠাইল যে বুনো শূওরের দল তাহার চীনা ফসলের ক্ষেতে প্রতি রাত্রে উপদ্রব করিতেছে, তাদের মধ্যে কয়েকটি দাঁতওয়ালা ধাড়ী শূকরের ভয়ে সে ক্যানেস্ত্রা পিটানো ছাড়া অন্য কিছু করিতে পারে না—কাছাবি হইতে ইহার প্রতিকার না করিলে তাহাব সমুদয় ফসল নষ্ট হইতে বসিয়াছে।

শুনিয়া নিজেই বৈকালের দিকে বন্দুক লইয়া গেলাম। রাজুর কুটীর ও জমি নাড়া-বইহারের ঘন জঙ্গলের মধ্যে। সেদিকে এখনও লোকের বসবাস হয় নাই, ফসলের ক্ষেতের পত্তনও খুব কম হইয়াছে, কাজেই বন্য জন্তুর উপদ্রব বেশী।

দেখি রাজুর নিজের ক্ষেতে বসিযা কাজ করিতেছে। আমায় দেখিয়া কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। আমাব হাত হইতে ঘোড়ার লাগাম লইয়া নিকটের একটা হরীতকী গাছে ঘোড়া বাঁধিল।

বলিলাম—কই রাজু, তোমায় যে আর দেখি নে, কাছারির দিকে যাও না কেন?

রাজুর খুপরিব চারিদিকে দীর্ঘ কাশের জঙ্গল, মাঝে মাঝে কেঁদ ও হরীতকী গাছ। কি করিয়া যে এই জনশূন্য বনে সে একা থাকে! এ জঙ্গলে কাহারও সহিত দিনান্তে একটি কথা বলিবার উপায় নাই—অদ্ভুত লোক বটে।

রাজু বলিল—সময় পাই কই যে কোথাও যাব হুজুর, ক্ষেতের ফসল চৌকি দিতেই প্রাণ বেরিয়ে গেল। তার ওপর মহিষ আছে।

তিনটি মহিষ চরাইতে ও দেড়-বিঘা জমির চাষ করিতে এত কি ব্যস্ত থাকে যে সে লোকালয়ে যাইবার সময় পায় না, একথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম—কিন্তু রাজু আপনা হইতেই তাহার দৈনন্দিন কার্যের যে তালিকা দিল, তাহাতে দেখিলাম তাহার নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ না থাকার কথা। ক্ষেতখামারের কাজ, মহিষ চরানো, দুধ দোয়া. মাখন-তোলা, পূজা-অর্চনা, রামায়ণ পাঠ, রান্না-খাওয়া—শুনিয়া যেন আমারই হাঁপ লাগিল। কাজের লোক বটে রাজু! ইহার উপর নাকি সারারাত জাগিয়া ক্যানেস্ত্রা পিটাইতে হয়।

বলিলাম—শূকর কখন বেরোয়?

—তার তো কিছু ঠিক নেই হুজুর। তবে রাত হ'লেই বেরোয় বটে। একটু বসুন, দেখবেন কত আসে।

কিন্তু আমার কাছে সর্বাপেক্ষা কৌতূহলের বিষয়—রাজু একা এই জনশূন্য স্থানে কি করিয়া

বাস ক'রে। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।

রাজু বলিল—অভ্যেস হয়ে গিয়েছে, বাবুজী। বহুদিন এমনি ভাবেই আছি—কষ্ট তো হয়ই না, বরং আপন মনে বেশ আনন্দে থাকি। সারাদিন খাটি, সন্ধ্যাবেলা ভজন গাই, ভগবানের নাম নিই, বেশ দিন কেটে যায়।

রাজু, কি গনু মাহাতো, কি জয়পাল—এ ধরনের মানুষ আরও অনেক আছে জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে—ইহাদের মধ্যে একটি নূতন জগৎ দেখিতাম, যে জগৎ আমার পরিচিত নয়।

আমি জানি রাজুর একটি সাংসারিক বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি আছে, সে চা খাইতে অত্যন্ত ভালবাসে। অথচ এই জঙ্গলের মধ্যে চায়ের উপকরণ সে কোথায় পায়, এই ভাবিয়া আমি নিজে চা ও চিনি লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—রাজু, একটু চা করো তো। আমার কাছে সব আছে।

রাজু মহা আনন্দে একটি তিন-সেরী লোটাতে জল চড়াইয়া দিল। চা প্রস্তুত হইল, কিন্তু একটি মাত্র ছোট কাঁসার বাটি ব্যতীত অন্য পাত্র নাই। তাহাতেই আমায় চা দিয়া সে নিজে বড় লোটাটি লইয়া চা খাইতে বসিল।

রাজু হিন্দী লেখাপড়া জানে বটে, কিন্তু বহির্জগৎ সম্বন্ধে তাহার কোনো জ্ঞান নাই। কলিকাতা নামটা শুনিয়াছে, কোন্ দিকে জানে না। বোম্বাই বা দিল্লীর বিষয়ে তার ধারণা চন্দ্রলোকের ধারণার মত সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কুয়াশাচ্ছন্ন। শহরের মধ্যে সে দেখিয়াছে পূর্ণিয়া, তাও অনেক বছর আগে এবং মাত্র কয়েক দিনের জন্য সেখানে গিয়াছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—মোটরগাড়ী দেখেছ রাজু?

—না হুজুর, শুনেছি বিনা গরুতে বা ঘোড়ায় চলে, ধোঁয়া বেরোয়, আজকাল পূর্ণিয়া শহরে অনেক নাকি এসেছে। আমার তো সেখানে অনেক কাল যাওয়া নেই, আমরা গরীব লোক, শহরে গেলেই তো পয়সা চাই।

রাজুকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কলিকাতা যাইতে চায় কিনা। যদি চায়, আমি তাহাকে একবার ঘুরাইয়া আনিব, পয়সা লাগিবে না।

রাজু বলিল—শহর বড় খারাপ জায়গা, চোর গুণ্ডা জুয়াচোরের আড্ডা শুনেছি। সেখানে গেলে শুনেছি যে জাত থাকে না। সব লোক সেখানকার বদ্‌মাইশ। আমার এ দেশের একজন লোক কোন্ শহরের হাসপাতালে গিয়েছিল, তা পায়ে কি হয়েছিল সেই জন্যে। ডাক্তার ছুরি দিয়ে পা কাটে আর বলে, তুমি আমাকে কত টাকা দেবে? সে বললে—দশ টাকা দেব, তখন ডাক্তার আরও কাটে। আবার বললে—এখনও বল কত টাকা দেবে? সে বললে—আরও পাঁচ টাকা দেব, ডাক্তারসাহেব, আর কেটো না। ডাক্তার বললে—ওতে হবে না—ব'লে আবার পা কাটতে লাগল। সে গরীব লোক, যত কাঁদে, ডাক্তার ততই ছুরি দিয়ে কাটে—কাটতে কাটতে গোটা পা-খানাই কেটে ফেললে। উঃ, কি কাণ্ড ভাবুন তো হুজুর!

রাজুর কথা শুনিয়া হাস্য সংবরণ করা দায় হইয়া উঠিল। মনে পড়িল এই রাজুই একবার আকাশে রামধনু উঠিতে দেখিয়া আমাকে বলিয়াছিল—রামধনু যে দেখছেন বাবুজী, ও ওঠে উইয়ের ঢিবি থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি।

রাজুর খুপরির সামনের উঠানে একটি বড় খুব উঁচু আসান গাছ আছে, তারই তলায় বসিয়া আমরা চা খাইতেছিলাম—যেদিকে চাই সেদিকেই ঘন বন—কেঁদে, আমলকি, পুষ্পিত বহেড়া লতার ঝোপ, বহেড়া ফুলের একটি মৃদু সুগন্ধ সান্ধ্য বাতাসকে মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। আমার মনে হইল এসব স্থানে বসিয়া এমনভাবে চা খাওয়া জীবনের একটা সৌন্দর্যময় অভিজ্ঞতা। কোথায় এমন অরণ্যপ্রান্তর, কোথায় এমন জঙ্গলে-ঘেরা কাশের কুটীর, রাজুর মত মানুষই বা কোথায়? এ অভিজ্ঞতা যেমন বিচিত্র, তেমনই দুষ্প্রাপ্য।

বলিলাম—আচ্ছা রাজু, তোমার স্ত্রীকে নিয়ে এস না কেন? তোমার আর তা হ'লে কষ্ট

করে রেঁধে খেতে হয় না।

রাজু বলিল—সে বেঁচে নেই হুজুর। আজ সতের-আঠারো বছর মারা গিয়েছে, তারপর থেকে বাড়ীতে মন বসাতে পারি নে আর।

রাজুর জীবনে রোমান্স ঘটিয়াছিল, এ ভাবিতে পারাও কঠিন বটে, কিন্তু অতঃপর রাজু যে গল্প করিল, তাহাকে ও-ছাড়া অন্য নামে অভিহিত করা চলে না।

রাজুর স্ত্রীর নাম ছিল সর্জু (অর্থাৎ সরযূ), রাজুর বয়স যখন আঠারো ও সরযূর চোদ্দ—তখন উত্তর-ধরমপুর, শ্যামলালটোলাতে সরযূর বাপের টোলে রাজু দিনকতক ব্যাকরণ পড়িতে যায়।

রাজুকে বলিলাম—কতদিন পড়েছিলে?

—কিছু না বাবুজী, বছরখানেক ছিলাম, কিন্তু পরীক্ষা দিই নি। সেখানে আমাদের প্রথম দেখাশুনো এবং ক্রমে ক্রমে—

আমাকে সমীহ করিয়া রাজু অল্প কাশিয়া চুপ করিল।

আমি উৎসাহ দিবার সুরে বলিলাম—তার পর ব'লে যাও—

—কিন্তু হুজুর, ওর বাবা আমার অধ্যাপক। আমি কি করে তাঁকে এ-কথা বলি? একদিন কার্তিক মাসে ছট্ পরবের দিন সরযূ ছোপানো হল্‌দে শাড়ী পরে কুশী নদীতে একদল মেয়ের সঙ্গে নাইতে যাচ্ছে, আমি—

রাজু কাশিয়া আবার চুপ করিল।

পুনরায় উৎসাহ দিয়া বলিলাম—বল, বল, তাতে কি?

—ওকে দেখবার জন্যে আমি একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলাম। এর কারণ এই যে, ইদানীং ওর সঙ্গে আমার আর তত দেখাশুনো হ'ত না—এক জায়গায় ওর বিয়ের কথাবার্তাও চলছিল। যখন দলটি গাইতে গাইতে—আপনি তো জানেন ছট্ পরবের সময় মেয়েরা গান করতে করতে নদীতে ছট্ ভাসাতে যায়!—তারপর যখন ওরা গাইতে গাইতে আমার সামনে এল, ও আমায় দেখতে পেয়েছে গাছের আড়ালে। ও-ও হাসলে, আমিও হাসলাম। আমি হাত নেড়ে ইশারা করলাম, একটু পেছিয়ে পড়—ও হাত নেড়ে বললে, এখন নয়, ফেরবার সময়ে।

রাজুর বাহান্ন বছর বয়েসের মুখমণ্ডলে বিংশবর্ষীয় তরুণ প্রেমিকের লাজুকতা ও চোখে একটি স্বপ্ন ভরা সুদূর দৃষ্টি ফুটিল এ-কথা বলিবার সময়—যেন জীবনের বহু পিছনে প্রথম যৌবনের পুণ্য দিনগুলিতে যে কল্যাণী তরুণী ছিল চতুর্দশ বর্ষদেশে—তাহাকেই খুঁজিতে বাহির হইয়াছে ওর সঙ্গীহারা প্রৌঢ় প্রাণ। এই ঘন জঙ্গলে একা বাস করিয়া সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন যাহার কথা ভাবিতে তাহার ভাল লাগে, যাহার সাহচর্যের জন্য তার মন উন্মুখ—সে হইল বহু কালের সেই বালিকা সরযূ, পৃথিবীতে যে কোথাও আজ আর নাই।

বেশ লাগিতেছিল ওর গল্প। আগ্রহের সঙ্গে বলিলাম, তার পর?

—তার পর ফেরবার পথে দেখা হ'ল। ও একটু পিছিয়ে পড়ল দলের থেকে। আমি বললাম—সরযূ, আমি বড় কষ্ট পাচ্ছি, তোমার সঙ্গে দেখাশোনাও বন্ধ, আমার লেখাপড়া হবে না জানি, কেন মিছে কষ্ট পাই, ভাবছি টোল ছেড়ে চলে যাব এ মাসের শেষেই। সরযূ কেঁদে ফেললে। বললে—বাবাকে বলো না কেন? সরযূর কান্না দেখে আমি মরীয়া হয়ে উঠলাম। এমনি হয়ত যে কথা কখনও আমার অধ্যাপককে বলতে পারতাম না, তাই ব'লে ফেললাম একদিন।

বিয়ে হওয়ার কোনো বাধা ছিল না, স্বজাতি, স্বঘর। বিয়ে হয়েও গেল।

খুব সহজ ও সাধারণ রোমান্স হয়ত শহরের কোলাহলে বসিয়া শুনিলে এটাকে নিতান্ত ঘরোয়া গ্রাম্য বৈবাহিক ব্যাপার, সামান্য একটা পুতুপুতু ধরনের পূর্বরাগ বলিয়া উড়াইয়া দিতাম। ওখানে ইহার অভিনবত্ব ও সৌন্দর্যে মন মুগ্ধ হইল। দুইটি নরনারী কি করিয়া পরস্পরকে লাভ করিয়াছিল তাহাদের জীবনে, এ-ইতিহাস যে কতখানি রহস্যময়, তাহা বুঝিয়াছিলাম সেদিন।

চা-পান শেষ করিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আকাশে পাতলা জ্যোৎস্না ফুটিল। ষষ্ঠী কী সপ্তমী তিথি।

আমি বন্দুক লইয়া বলিলাম—চল রাজু, দেখি তোমার ক্ষেতে কোথায় শূওর।

একটা বড় তুঁতগাছ ক্ষেতের একপাশে। রাজু বলিল—ওই গাছের ওপর উঠতে হবে হুজুর। আজ সকালে একটা মাচা বেঁধেছি ওর একটা দো-ডালায়।

আমি দেখিলাম, বিষম মুশকিল। গাছে ওঠা অনেক দিন অভ্যাস নাই। তার উপর এই রাত্রিকালে। কিন্তু রাজু উৎসাহ দিয়া বলিল—কোনো কষ্ট নেই হুজুর। বাঁশ দেওয়া আছে, নীচের ডালপালা, খুব সহজ ওঠা।

রাজুর হাতে বন্দুক দিয়া ডালে উঠিয়া মাচায় বসিলাম। রাজু অবলীলাক্রমে আমার পিছু পিছু উঠিল। দুজনে জমির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মাচার উপর বসিয়া রহিলাম পাশাপাশি।

জ্যোৎস্না আরও ফুটিল। তুঁতগাছের দো-ডালা হইতে জ্যোৎস্নালোকে কিছু স্পষ্ট, কিছু অস্পষ্ট জঙ্গলের শীর্ষদেশ ভারি অদ্ভুত ভাব মনে আনিতেছিল। ইহাও জীবনের এক নূতন অভিজ্ঞতা বটে।

একটু পরে চারিপাশের জঙ্গলে শিয়ালের পাল ডাকিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা কালোমত কি জানোয়ার দক্ষিণ দিকের ঘন জঙ্গলের ভিতর হইতে বাহির হইয়া রাজুর ক্ষেতে ঢুকিল।

রাজু বলিল—ঐ দেখুন হুজুর—

আমি বন্দুক বাগাইয়া ধরিলাম, কিন্তু আরও কাছে আসিলে জ্যোৎস্নালোকে দেখা গেল সেটা শূকর নয়, একটা নীলগাই।

নীলগাই মারিবার প্রবৃত্তি হইল না, রাজু মুখে 'দূর দূর' বলিতে সেটা ক্ষিপ্রপদে জঙ্গলের দিকে চলিয়া গেল। আমি একটা ফাঁকা আওয়াজ করিলাম।

ঘণ্টা দুই কাটিয়া গেল। দক্ষিণ দিকের সে জঙ্গলটার মধ্যে বনমোরগ ডাকিয়া উঠিল। ভাবিয়াছিলাম দাঁতওয়ালা ধাড়ী শূওরটা মারিব, কিন্তু একটা ক্ষুদ্র শূকর-শাবকেরও টিকি দেখা গেল না। নীলগাইয়ের পিছনে ফাঁকা আওয়াজ করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে।

রাজু বলিল—নেমে চলুন হুজুর, আপনার আবার ভোজনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি বলিলাম—কিসের ভোজন? আমি কাছারিতে যাব—রাত এখনও দশটা বাজে নি—থাকবার জো নেই। কাল সকালে সার্ভে ক্যাম্পে কাজ দেখতে বেরুতে হবে।

—খেয়ে যান হুজুর।

—এর পর আর নাঢ়া-বইহারের জঙ্গল দিয়ে একা যাওয়া ঠিক হবে না। এখনই যাই। তুমি কিছু মনে করো না।

ঘোড়ায় উঠিবার সময় বলিলাম—মাঝে মাঝে তোমার এখানে চা খেতে যদি আসি বিরক্ত হবে না তো?

রাজু বলিল—কি যে বলেন! এই জঙ্গলে একা থাকি, গরীব মানুষ, আমায় ভালবাসেন তাই চা-চিনি এনে তৈরি করিয়ে একসঙ্গে খান। ও কথা বলে আমায় লজ্জা দেবেন না, বাবুজী।

সে সময়ে রাজুকে দেখিয়া মনে হইল রাজু এই বয়সেই বেশ দেখিতে, যৌবনে যে খুবই সুপুরুষ ছিল, অধ্যাপক-কন্যা সরযূ পিতার তরুণ, সুন্দর ছাত্রটির প্রতি আকৃষ্ট হইয়া নিজের সুরুচিরই পরিচয় দিয়াছিল।

রাত্রি গভীর। একা প্রান্তর বহিয়া আসিতেছি। জ্যোৎস্না অস্ত গিয়াছে। কোনো দিকে আলো দেখা যায় না, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা—এ যেন পৃথিবী হইতে জনহীন কোনো অজানা গ্রহলোকে নির্বাসিত হইয়াছি—দিগন্তরেখায় জ্বলজ্বলে বৃশ্চিকরাশি উদিত হইতেছে, মাথার উপরে অন্ধকার আকাশে অগণিত দ্যুতিলোক, নিম্নে লবটুলিয়া বইহারের নিস্তব্ধ অরণ্য, ক্ষীণ নক্ষত্রলোকে পাতলা অন্ধকারে বনঝাউয়ের শীর্ষ দেখা যাইতেছে—দূরে কোথায় শিয়ালের দল প্রহর ঘোষণা করিল—আরও দূরে মোহনপুরা

রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা অন্ধকারে দীর্ঘ কালো পাহাড়ের মত দেখাইতেছে—অন্য কোন শব্দ নাই কেবল এক ধরনের পতঙ্গেব একঘেয়ে একটানা কি-র্-র্-র্ শব্দ ছাড়া; কান পাতিয়া ভাল করিয়া শুনিলে ঐ শব্দের সঙ্গে মিশানো আরও দু-তিনিটি পতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাইবে। কি অদ্ভুত রোমান্স এই মুক্ত জীবনে, প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ নিবিড় পরিচয়ের সে কি আনন্দ। সকলের উপর কি একটা অনির্দেশ্য, অব্যক্ত রহস্য মাখানো—কি সে রহস্য জানি না—কিন্তু বেশ জানি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার পরে আর কখনও কোথাও সে রহস্যের ভাব মনে আসে নাই।

যেন এই নিস্তব্ধ, নির্জন রাত্রে দেবতারা নক্ষত্ররাজির মধ্যে সৃষ্টির কল্পনায় বিভোর, যে কল্পনায় দূর ভবিষ্যতে নব নব বিশ্বের আবির্ভাব, নব নব সৌন্দর্যের জন্ম, নানা নব প্রাণের বিকাশ বীজরূপে নিহিত। শুধু যে আত্মা নিরলস অবকাশ যাপন করে জ্ঞানের আকুল পিপাসায়, যার প্রাণ বিশ্বের বিবাটত্ব ও ক্ষুদ্রত্বের সম্বন্ধে সচেতন আনন্দে উল্লসিত—জন্মজন্মান্তরের পথ বাহিয়া দূর যাত্রার আশায় যার ক্ষুদ্র. তুচ্ছ বর্তমানের দুঃখ, শোক বিন্দুবৎ মিলাইয়া গিযাছে—সে-ই তাঁদের সে রহস্যরূপ দেখিতে পায়। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ...

এভারেস্ট শিখরে উঠিয়া যাহারা তুষারপ্রবাহে ও ঝঞ্ঝায় প্রাণ দিযাছিল, তাহারা বিশ্বদেবতার এই বিবাট রূপকে প্রত্যক্ষ করিযাছে...কিংবা কলম্বাস্ যখন আজোরেস্ দ্বীপের উপকূলে দিনের পর দিন সমুদ্রবাহিত কাষ্ঠখণ্ডে মহাসমুদ্রপারের অজানা মহাদেশের বার্তা জানিতে চাহিয়াছিল—তখন বিশ্বের এই লীলাশক্তি তাঁর কাছে ধরা দিয়াছিল—ঘরে বসিয়া তামাক টানিয়া প্রতিবেশীর কন্যার বিবাহ ও ধোপা নাপিত বন্ধ কবিয়া যাহাবা আসিতেছে—তাহাদের কর্ম নয় ইহার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা।

২

মিছি নদীর উত্তর পাড়ে জঙ্গলেব ও পাহাড়ের মধ্যে সার্ভে হইতেছিল; এখানে আজ আট-দশ দিন তাঁবু ফেলিয়া আছি। এখনও দশ-বারো দিন হযত থাকিতে হইবে।

স্থানটা আমাদের মহাল হইতে অনেক দূরে, রাজা দোবরু পান্নার বাজত্বের কাছাকাছি। রাজত্ব বলিলাম বটে, কিন্তু রাজা দোবরু তো রাজ্যহীন রাজা—তাহার আবাসস্থলেব খানিকটা নিকটে পর্যন্ত বলা যায়।

বড় চমৎকাব জায়গা। একটা উপত্যকা, মুখেব দিকটা বিস্তৃত পিছনের দিক সংকীর্ণ—পূর্বে পশ্চিমে পাহাড়শ্রেণী—মধ্যে এই অশ্বক্ষুবাকৃতি উপত্যকা—বন্ধুর ও জঙ্গলাকীর্ণ, ছোট বড় পাথর ছড়ানো সর্বত্র, কাঁটা-বাঁশেব বন, আবও নানা গাছপালার জঙ্গল। অনেকগুলি পাহাড়ী ঝরনা উত্তর দিক হইতে নামিয়া উপত্যকাব মুক্ত প্রান্ত দিয়া বাহিবেব দিকে চলিয়াছে। এই সব ঝরনার দু-ধারে বন বড় বেশী ঘন এবং এত দিনেব বসবাসের অভিজ্ঞতা হইতে জানি এই সব জায়গাতেই বাঘের ভয়। হরিণ আছে, বন্য মোরগ ডাকিতে শুনিয়াছি দ্বিতীয় প্রহব রাত্রে। ফেউয়েব ডাক শুনিয়াছি বটে, তবে বাঘ দেখি নাই বা আওয়াজও পাই নাই।

পূর্বদিকের পাহাড়ের গায়ে একটা প্রকাণ্ড গুহা। গুহার মুখে প্রাচীন ঝাঁপালো বটগাছ—দিনরাত শন্শন্ করে। দুপুর রোদে নীল আকাশের তলায় এই জনহীন বন্য উপত্যকা ও গুহা বহু প্রাচীন যুগের ছবি মনে আনে, যে-যুগে আদিম জাতির রাজাদের হয়ত রাজপ্রাসাদ ছিল এই গুহাটা, যেমন রাজা দোবরু পান্নার পূর্বপুরুষদের আবাস-গুহা। গুহার দেওয়ালে একস্থানে কতকগুলো কি খোদাই করা ছিল, সম্ভবত কোনো ছবি—এখন বড়ই অস্পষ্ট, ভালো বোঝা যায় না। কত বন্য আদিম নরনারীর হাস্য-কলধ্বনি, কত সুখদুঃখ—বর্বর সমাজেব অত্যাচারের কত নয়নজলের অলিখিত ইতিহাস এই

গুহার মাটিতে, বাতাসে, পাষাণপ্রাচীরের মধ্যে লেখা আছে—ভাবিতে বেশ লাগে।

গুহামুখ হইতে রশি-দুই দূরে ঝরনার ধারে বনের মধ্যে ফাঁকা জায়গায় একটি গোঁড়-পরিবার বাস করে। দুখানা খুপরি, একখানা ছোট, একখানা একটু বড়, বনের ডালপালার বেড়া, পাতার ছাউনি। শিলাখণ্ড কুড়াইয়া তাহা দিয়া উনুন তৈয়ারী করিয়াছে আবরণহীন ফাঁকা জায়গায় খুপরির সামনে। বড় একটা বুনো বাদামগাছের ছায়ায় এদের কুটীর। বাদামের পাকা পাতা ঝরিয়া পড়িয়া উঠান প্রায় ছাইয়া রাখিয়াছে।

গোঁড়-পরিবারের দুটি মেয়ে আছে, তাদের একটি ষোল-সতের বছর বয়স, অন্যটির বছর চোদ্দ। রং কালো কুচকুচে বটে, কিন্তু মুখশ্রীতে বেশ একটা সরল সৌন্দর্য মাখানো—নিটোল স্বাস্থ্য। মেয়ে দুটি রোজ সকালে দেখি দু-তিনটি মহিষ লইয়া পাহাড়ে চরাইতে যায়—আবার সন্ধ্যার পূর্বে ফিরিয়া আসে। আমি তাঁবুতে ফিরিয়া যখন চা খাই, তখন দেখি মেয়ে দুটি আমার তাঁবুর সামনে দিয়া মহিষ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছে।

একদিন বড় মেয়েটি রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া তার ছোট বোনকে আমার তাঁবুতে পাঠাইয়া দিল। সে আসিয়া বলিল—বাবুজী, সেলাম। বিড়ি আছে? দিদি চাইছে।

—তোমরা বিড়ি খাও?

—আমি খাই নে, দিদি খায়। দাও না বাবুজী, একটা আছে?

—আমার কাছে বিড়ি নেই। চুরুট আছে—কিন্তু সে তোমাদের দেব না। বড় কড়া, খেতে পারবে না।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

আমি একটু পরে ওদের বাড়ী গেলাম। আমাকে দেখিয়া গৃহকর্তা খুব বিস্মিত হইল—খাতির করিয়া বসাইল। মেয়ে দুটি শালপাতায় 'ঘাটো' অর্থাৎ মকাই-সিদ্ধ ঢালিযা নুন দিয়া খাইতে বসিয়াছে। সম্পূর্ণরূপে নিরূপকরণ মকাইসিদ্ধ। তাদের মা কি একটা জ্বাল দিতেছে উনুনে। দুটি ছোট ছোট বালক-বালিকা খেলা করিতেছে।

গৃহকর্তার বয়স পঞ্চাশের উপর। সুস্থ, সবল চেহারা। আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—তাদের বাড়ী সিউনি জেলাতে। এখানে এই পাহাড়ে মহিষ চরাইবার ঘাস ও পানীয় জল প্রচুর আছে বলিয়া আজ বছর-খানেক হইতে এখানে আছে। তা ছাড়া এখানকার জঙ্গলের কাঁটা-বাঁশে ধামা চুপড়ি ও মাথায় দিবার টোকা তৈরি করিবার খুব সুবিধা। শিবরাত্রির সময় অখিলকুচার মেলায় বিক্রি করিয়া দু'পয়সা হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—এখানে কতদিন থাকবে?

—যতদিন মন যায়, বাবুজী। তবে এ-জায়গাটা বড় ভাল লেগেছে, নইলে এক বছর আমরা কোথাও বড় একটানা থাকি না। এখানে একটা বড় সুবিধা আছে, পাহাড়ের ওপর জঙ্গলে এত আতা ফলে—দু-ঝুড়ি ক'রে গাছ-পাকা আতা আশ্বিন মাসে আমার মেয়েরা মহিষ চরাতে গিয়ে পেড়ে আনতো—শুধু আতা খেয়ে আমরা মাস-দুই কাটিয়েছি। আতার লোভেই এখানে থাকা। জিজ্ঞেস করুন না ওদের।

বড় মেয়েটি খাইতে খাইতে উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ, একটা জায়গা আছে, ওই পূর্বদিকের পাহাড়ের কোণের দিকে, কত যে বুনো আতা গাছ, ফল পেকে ফেটে কত মাটিতে পড়ে থাকে, কেউ খায় না। আমরা ঝুড়ি ঝুড়ি তুলে আনতাম।

এমন সময়ে কে একজন ঘন-বনের দিক হইতে আসিয়া খুপরির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—সীতারাম, সীতারাম, জয় সীতারাম—একটু আগুন দিতে পার?

গৃহকর্তা বলিল—আসুন বাবাজী, বসুন।

দেখিলাম জটাজুটধারী একজন বৃদ্ধ সাধু। সাধু ইতিমধ্যে আমায় দেখিতে পাইয়া একটু বিস্ময়ের

ও বোধ হয় কথঞ্চিৎ ভয়ের সঙ্গেও, একটু সঙ্কুচিত হইয়া একপাশে দাঁড়াইয়া ছিল।

আমি বলিলাম—প্রণাম, সাধু বাবাজী—

সাধু আশীর্বাদ করিল বটে, কিন্তু তখনও যেন তাহার ভয় যায় নাই।

তাহাকে সাহস দিবার জন্য বলিলাম—কোথায় থাকা হয় বাবাজীর?

আমার কথার উত্তর দিল গৃহস্বামী। বলিল—বড্ড গজার জঙ্গলের মধ্যে উনি থাকেন, ওই দুই পাহাড় যেখানে মিশেছে, ওই কোণে। অনেক দিন আছেন এখানে।

বৃদ্ধ সাধু ইতিমধ্যে বসিয়া পড়িয়াছে। আমি সাধুর দিকে চাহিয়া বলিলাম—কতদিন এখানে আছেন?

এবার সাধুর ভয় ভাঙিয়াছে, বলিল—আজ পনেরো-ষোল বছর, বাবুসাহেব।

—একা থাকা হয় তো? বাঘ শুনেছি এখানে, ভয় করে না?

—আর কে থাকবে বাবুসাহেব? পরমাত্মার নাম নিই—ভয়ডর করলে চলবে কেন? আমার বয়স কত বল তো বাবুসাহেব?

ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া বলিলাম—সত্তর হবে।

সাধু হাসিয়া বলিল—না বাবুসাহেব, নব্বুইয়ের ওপরে হয়েছে। গয়ার কাছে এক জঙ্গলে ছিলাম দশ বছর। তার পর ইজারাদার জঙ্গলের গাছ কাটতে লাগল, ক্রমে সেখানে লোকের বাস হয়ে পড়ল। সেখান থেকে পালিয়ে এলাম। লোকালয়ে থাকতে পারি নে।

—সাধু বাবাজী, এখানে একটা গুহা আছে, তুমি সেখানে থাক না কেন?

—একটা কেন বাবুসাহেব, কত গুহা আছে এ-পাহাড়ে। আমি ওদিকে যেখানে থাকি সেটাও ঠিক গুহা না হ'লেও গুহার মত বটে। মানে তার মাথায় ছাদ ও দু-দিকে দেয়াল আছে—সামনেটা কেবল খোলা।

—কি খাও? ভিক্ষা কর?

—কোথাও বেরুই নে বাবুসাহেব। পরমাত্মা আহার জুটিয়ে দেন। বাঁশের কোঁড় সেদ্ধ খাই, বনে এক রকম কন্দ হয় তা ভারি মিষ্টি, লাল আলুর মত খেতে, তা খাই। পাকা আমলকী ও আতা এ-জঙ্গলে খুব পাওয়া যায়। আমলকী খুব খাই, রোজ আমলকী খেলে মানুষ হঠাৎ বুড়ো হয় না, যৌবন ধরে রাখা যায় বহু দিন। গাঁয়ের লোকে মাঝে মাঝে দর্শন করতে এসে দুধ, ছাতু, ভুরা দিয়ে যায়। চলে যাচ্ছে এই সবে এক রকম ক'রে।

—বাঘ-ভালুকের সামনে পড়েছ কখনও?

—কখনও না। তবে ভয়ানক এক জাতের অজগর সাপ দেখেছি এই জঙ্গলে—এক জায়গায় অসাড় হয়ে পড়েছিল—তালগাছের মত মোটা, মিশ্ কালো, সবুজ আর রাঙা আঁজি কাটা গায়ে। চোখ আগুনের ভাঁটার মত জ্বলছে। এখনও সেটা এই জঙ্গলেই আছে। তখন সেটা জলের ধারে পড়ে ছিল বোধ হয় হরিণ ধরবার লোভে। এখন কোনও গুহাগহ্বরে লুকিয়ে আছে। আচ্ছা যাই বাবুসাহেব, রাত হয়ে গেল।

সাধু আগুন লইয়া চলিয়া গেল। শুনিলাম মাঝে মাঝে সাধুটি এদের এখানে আগুন লইতে আসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিয়া যায়।

অন্ধকার পূর্বেই হইয়াছিল, এখন একটু মেটে মেটে জ্যোৎস্না উঠিয়াছে। উপত্যকার বনানী অদ্ভুত নীরবতায় ভরিয়া গিয়াছে। কেবল পার্শ্বস্থ পাহাড়ী ঝরনার কুলু কুলু স্রোতের ধ্বনি ও ক্বচিৎ দু-একটা বন্য মোরগের ডাক ছাড়া কোনো শব্দ কানে আসে না।

তাঁবুতে ফিরিলাম। পথে বড় একটা শিমুলগাছে ঝাঁক ঝাঁক জোনাকী জ্বলিতেছে, ঘুরিয়া ঘুরিয়া চক্রাকারে, উপর হইতে নীচু দিকে, নীচু হইতে উপরের দিকে—নানারূপ জ্যামিতির ক্ষেত্র অঙ্কিত করিয়া আলো-আঁধারের পটভূমিতে।

৩

এখানে একদিন আসিল কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। লম্বা, রোগা চেহারা, কালো সার্জের কোট গায়ে, আধময়লা ধুতি পরনে, মাথার চুল রুক্ষ ও এলোমেলো, বয়স চল্লিশ ছাড়াইয়াছে।

ভাবিলাম চাকুরির উমেদার। বলিলাম—কি চাই?

সে বলিল—বাবুজীর (হুজুর বলিয়া সম্বোধন করিল না) দর্শনপ্রার্থী হয়ে এসেছি। আমার নাম বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ। বাড়ী বিহার শরীফ, পাটনা জিলা। এখানে চক্‌মকিটোলায় থাকি, তিন মাইল দূর এখান থেকে।

—ও, তা এখানে কি জন্যে?

—বাবুজী যদি দয়া করে অনুমতি করেন, তবে বলি। আপনার সময় নষ্ট করছি নে?

তখন আমি ভাবিতেছি লোকটা চাকুরির জন্যই আসিয়াছে। কিন্তু 'হুজুর' না বলাতে সে আমার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বলিলাম—বসুন, অনেক দূর থেকে হেঁটে এসেছেন এই গরমে।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম—লোকটির হিন্দী খুব মার্জিত। সেরকম হিন্দীতে আমি কথা বলিতে পারি না। সিপাহী পিয়াদা ও গ্রাম্য প্রজা লইয়া আমার কারবার, আমার হিন্দী তাহাদের মুখে শেখা দেহাতী বুলির সহিত বাংলা ইডিয়ম মিশ্রিত একটা জগাখিচুড়ী ব্যাপার। এ-ধরনের ভদ্র ও পরিমার্জিত ভব্য হিন্দী কখনও শুনি নাই, তা বলিব কিরূপে? সুতরাং একটু সাবধানের সহিত বলিলাম—কি আপনার আসার উদ্দেশ্য বলুন!

সে বলিল—আমি আপনাকে কয়েকটি কবিতা শুনাতে এসেছি।

দস্তুরমত বিস্মিত হইলাম। এই জঙ্গলে আমাকে কবিতা শোনাইতে আসিবার এমন কি গরজ পড়িয়াছে লোকটির, হইলই বা কবি?

বলিলাম—আপনি একজন কবি? খুব খুশী হলাম। আপনার কবিতা খুব আনন্দের সঙ্গে শুনব। কিন্তু আপনি কি করে আমার সন্ধান পেলেন?

—এই মাইল-তিন দূরে আমার বাড়ী। পাহাড়ের ঠিক ওপারেই। আমাদের গ্রামে সবাই বলছিল কলকাতা থেকে এক বাংগালি বাবু এসেছেন। আপনাদের কাছে বিদ্যার বড় আদর, কারণ আপনারা নিজে বিদ্বান্। কবি বলেছেন—

বিদ্বংসু সৎকবিবাচা লভতে প্রকাশং
ছাত্রেষু কুট্‌মলসমং তৃণবজ্জড়েষু।

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় কবিতা শোনাইল। কোনো একটা রেল-লাইনের টিকিট চেকার, বুকিং ক্লার্ক, স্টেশন-মাস্টার, গার্ড প্রভৃতির নামের সঙ্গে জড়াইয়া এক সুদীর্ঘ কবিতা। কবিতা খুব উঁচুদরের বলিয়া মনে হইল না। তবে আমি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের প্রতি অবিচার করিতে চাই না। তাহার ভাষা আমি ভাল বুঝি নাই—সত্য কথা বলিতে গেলে, বিশেষ কিছুই বুঝি নাই। তবুও মাঝে মাঝে উৎসাহ ও সমর্থন-সূচক শব্দ উচ্চারণ করিয়া গেলাম।

বহুক্ষণ কাটিয়া গেল। বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ কবিতাপাঠ থামায় না, উঠিবার নাম করা তো দূরের কথা।

ঘণ্টা দুই পরে সে একটু চুপ করিয়া হাসি-হাসি মুখে বলিল—কি রকম লাগলো বাবুজীর?

বলিলাম—চমৎকার। এমন কবিতা খুব কমই শুনেছি। আপনি কোনো পত্রিকায় আপনার কবিতা পাঠান না কেন?

বেঙ্কটেশ্বর দুঃখের সহিত বলিল—বাবুজী, এদেশে আমাকে সবাই পাগল বলে। কবিতা বুঝবার মানুষ এ-সব জায়গায় কি আছে ভেবেছেন? আপনাকে শুনিয়ে আমার আজ তৃপ্তি হ'ল। সমঝদারকে

এ-সব শোনাতে হয়। তাই আপনার কথা শুনেই আমি ভেবেছিলাম একদিন সময়মত এসে আপনাকে ধরতে হবে।

সেদিন সে বিদায় লইল কিন্তু পরদিন বৈকালে আসিয়া আমায় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল তাহাদের গ্রামে তাহাদের বাড়ীতে আমায় একবার যাইতে। অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহার সহিত পায়ে হাঁটিয়া চক্‌মকিটোলা রওনা হইলাম।

বেলা পড়িয়াছে। সম্মুখে গম-যবের ক্ষেত্রে বহুদূর জুড়িয়া উত্তর দিকে পাহাড়ের ছায়া পড়িয়াছে। কেমন একটা শান্তি চারিধারে, সিল্লী পাখীর ঝাঁক কাঁটা-বাঁশ ঝাড়ের উপর উড়িয়া আসিয়া বসিতেছে, গ্রাম্য বালকবালিকারা এক জায়গায় ঝরনার জলে ছোট ছোট কি মাছ ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

গ্রামের মধ্যে ঠাসাঠাসি বসতি। চালে চালে বাড়ী, অনেক বাড়ীতেই উঠান বলিয়া জিনিস নাই। মাঝারিগোছেব একখানা খোলা-ছাওয়া বাড়ীতে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ আমায় লইয়া গিয়া তুলিল। রাস্তার ধারেই তার বাড়ীব বাইরের ঘর, সেখানে একখানা কাঠের চৌকিতে বসিলাম। একটু পরে কবিগৃহিণীকেও দেখিলাম—তিনি স্বহস্তে দইবড়া ও মকাইভাজা আমার জন্য লইয়া যে চৌকিতে বসিয়াছিলাম তাহারই একপ্রান্তে স্থাপন করিলেন বটে, কিন্তু কথা কহিলেন না, যদিও তিনি অবগুণ্ঠনবতীও ছিলেন না। বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হইবে, রং তত ফর্সা না হইলেও মন্দ নয়, মুখশ্রী বেশ শান্ত, সুন্দরী বলা না গেলেও কবিপত্নী কুরূপা নহেন। ধরনধারণের মধ্যে একটি সরল, অনায়াসশিষ্টতা ও শ্রী।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য কবিলাম—কবিগৃহিণীর স্বাস্থ্য। কি জানি কেন এদেশে যেখানে গিয়াছি, মেয়েদের স্বাস্থ্য সর্বত্র বাংলা দেশের মেয়েদের চেয়ে বহুগুণে ভাল বলিয়া মনে হইয়াছে। মোটা নয়, অথচ বেশ লম্বা, নিটোল, আঁটসাট গড়নের মেয়ে এদেশে যত বেশি, বাংলা দেশে তত দেখি নাই, কবিগৃহিণীও ওই ধরনের মেয়েটি।

একটু পরে তিনি এক বাটি মহিষেব দুধের দই খাটিয়ার একপাশে রাখিয়া সরিয়া দরজার কবাটের আড়ালে দাঁড়াইলেন। শিকল নাড়ার শব্দ শুনিয়া বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ উঠিয়া স্ত্রীর নিকটে গেল এবং তখনই হাসিমুখে আসিয়া বলিল—আমার স্ত্রী বলছে আপনি আমাদের বন্ধু হয়েছেন, বন্ধুকে একটু ঠাণ্ডা করতে হয় কিনা তাই দইয়ের সঙ্গে বেশী ক'রে পিপুল শুঁট ও লঙ্কার গুঁড়ো মেশানো রয়েছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম—তা যদি হয় তবে আমার একা কেন, সকলের চোখ দিয়ে যাতে জল বের হয় তার জন্যে আমি প্রস্তাব করছি এই দই আমরা তিনজনেই খাব। আসুন—। কবিপত্নি দরজার আড়াল হইতে হাসিলেন। আমি ছাড়িবার পাত্র নই, দই তাঁহাকেও খাওয়াইয়া ছাড়িলাম।

একটু পরে কবিপত্নী বাড়ীব মধ্যে চলিয়া গেলেন এবং একটা থালা হাতে আবার আসিয়া খাটিয়ার প্রান্তে থালাটি রাখিলেন, এবার আমার সামনেই চাপা, কৌতুকমিশ্রিত সুরে আমাকে শুনাইয়া বলিলেন—বাবুজীকে বল এইবার ঘরেব তৈরী প্যাঁড়া খেয়ে গালের জ্বলুনি থামান।

কি সুন্দর মিষ্টি মেয়েলি ঠেঁট হিন্দী বুলি!

বড় ভাল লাগে এ-অঞ্চলের মেয়েদের মুখে এই হিন্দীব টানটি। নিজে ভাল হিন্দী বলিতে পারি না বলিয়া আমার কথ্য হিন্দীর প্রতি বেজায় আকর্ষণ। বইয়ের হিন্দী নয়—এই সব পল্লীপ্রান্তে, পাহাড়তলীতে, বনদেশের মধ্যে বিস্তীর্ণ শ্যামল যব গম ক্ষেতের পাশে, চলনশীল চামড়ার রহট্ যেখানে মহিষের দ্বারা ঘূর্ণিত হইয়া ক্ষেতে ক্ষেতে জল সেচন করিতেছে, অস্তসূর্যের ছায়াভরা অপরাহ্নে দূরের নীলাভ শৈলশ্রেণীর দিকে উড়ন্ত বালিহাঁস বা সিল্লী বা বকের দল যেখানে একটা দূরবিসর্পী ভূপৃষ্ঠের আভাস বহন করিয়া আনে—সেখানকার সে হঠাৎ-শেষ-হইয়া-যাওয়া, কেমন যেন আধ-আধ, ভাঙা-ভাঙা ক্রিয়াপদযুক্ত এক ধরনের ভাষা, যাহা বিশেষ করিয়া মেয়েদের মুখ সাধারণত শোনা যায়—

তাহার প্রতি আমার টান খুব বেশী।

হঠাৎ আমি কবিকে বলিলাম—দয়া ক'রে দু-একটা কবিতা পড়ুন না আপনার?

বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের মুখ উৎসাহে উজ্জ্বল দেখাইল। একটি গ্রাম্য প্রেম-কাহিনী লইয়া কবিতা লিখিয়াছে, সেটা পড়িয়া শুনাইল। ছোট্ট একটি খালের এ-পারের মাঠে এক তরুণ যুবক বসিয়া ভুট্টার ক্ষেত পাহারা দিত, খালের ওপারের ঘাটে একটি মেয়ে আসিত নিত্য কলসী-কাঁখে জল ভরিতে। ছেলেটি ভাবিত মেয়েটি সুন্দর। অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া শিস দিয়া গান করিত, ছাগল গরু তাড়াইত, মাঝে মাঝে মেয়েটির দিকে চাহিয়া দেখিত। কত সময়ে দুজনের চোখাচোখি হইয়া গিয়াছে। অমনি লজ্জায় লাল হইয়া কিশোরী চোখ নামাইয়া লইত। ছেলেটি রোজ ভাবিত, কাল সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কথা কহিবে। বাড়ী ফিরিয়া সে মেয়েটির কথা ভাবিত। কত কাল কাটিয়া গেল, কত 'কাল' আসিল, কত চলিয়া গেল—মনের কথা আর বলা হইল না। তার পর একদিন মেয়েটি আসিল না, পরদিনও আসিল না; দিন, সপ্তাহ, মাস কাটিয়া গেল, কোথায় সে প্রতি-দিনের সুপরিচিতা কিশোরী? ছেলেটি হতাশ হইয়া রোজ রোজ ফিরিয়া আসে মাঠ হইতে—ভীরু-প্রেমিক সাহস করিয়া কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।...ক্রমে ছেলেটিকে দেশ ছাড়িয়া অন্যত্র চাকুরি লইতে হইল। বহুকাল কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু ছেলেটি সেই নদীর ঘাটের রূপসী বালিকাকে আজও ভুলিতে পারে নাই।

দূরের নীল শৈলমালা ও দিগন্তবিস্তারী শস্যক্ষেত্রের দিকে চোখ রাখিয়া প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় এই কবিতাটি শুনিতে শুনিতে কতবার মনে হইল, এ কি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদেরই নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা? কবি-প্রিয়ার নাম রুক্‌মা, কারণ ঐ নামে কবি একটি কবিতা লিখিয়াছে, পূর্বে আমাকে তাহা শুনাইয়াছিল। ভাবিলাম এমন গুণবতী, সুরূপা রুক্‌মাকে পাইয়াও কি কবির বাল্যের সে দুঃখ আজও দূর হয় নাই?

আমাকে তাঁবুতে পৌঁছিয়া দিবার সময় বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ একটি বড় বটগাছ দেখাইয়া বলিল—ঐ যে গাছ দেখছেন বাবুজী, ওর তলায় সেবার সভা হয়েছিল, অনেক কবি মিলে কবিতা পড়েছিল। এদেশে বলে মুসায়েরা। আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমার কবিতা শুনে পাটনার ঈশ্বরীপ্রসাদ দুবে—চেনেন ঈশ্বরীপ্রসাদকে? ভারী এলেমদার লোক, 'দূত' পত্রিকার সম্পাদক—নিজেও একজন ভাল কবি—আমায় খুব খাতির করেছিলেন।

কথা শুনিয়া মনে হইল বেঙ্কটেশ্বর জীবনে এই একবারই সভাসমিতিতে দাঁড়াইয়া নিজের কবিতা আবৃত্তি করিবার নিমন্ত্রণ পাইয়াছিল এবং সেদিনটি তাহার জীবনে একটা খুব বড় ও স্মরণীয় দিন গিয়াছে। এত বড় সম্মান আর কখনও সে পায় নাই।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

১

প্রায় তিন মাস পরে নিজের মহালে ফিরিব। সার্ভের কাজ এতদিনে শেষ হইল।

এগারো ক্রোশ রাস্তা। এই পথেই সেবার সেই পৌষসংক্রান্তির মেলায় আসিয়াছিলাম—সেই শাল-পলাশের বন, শিলাখণ্ড-ছড়ানো মুক্ত প্রান্তর, উঁচু-নীচু শৈলমালা। ঘণ্টা-দুই চলিয়া আসিবার পরে দূরে দিগ্বলয়ের কোলে একটি ধূসর রেখা দেখা গেল—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট।

এই পরিচিত দিক্‌জ্ঞাপক দৃশ্যটি আজ তিন মাস দেখি নাই। এতদিন এখানে আসিয়া আমাদের লবটুলিয়া ও নাঢ়া-বইহারের উপর এমন একটা টান জন্মিয়া গিয়াছে যেন ইহাদের ছাড়িয়া বেশী দিন কোথাও থাকিলে কষ্ট হয়, মনে হয় দেশ ছাড়িয়া বিদেশে আছি। আজ তিন মাস পরে মোহনপুরা

রিজার্ভ ফরেস্টের সীমারেখা দেখিয়া প্রবাসীর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের আনন্দ অনুভব করিলাম, যদিচ এখনও লবটুলিয়ার সীমানা এখান হইতে সাত-আট মাইল দূরে হইবে।

ছোট একটা পাহাড়ের নীচে এক জায়গায় অনেকখানি জুড়িয়া জঙ্গল কাটিয়া কুসুম-ফুলের আবাদ করিয়াছিল—এখন পাকিবার সময়, কাটুনি জনেরা ক্ষেতে কাজ করিতেছে।

আমি ক্ষেতের পাশের রাস্তা দিয়া যাইতেছি, হঠাৎ ক্ষেতের দিক হইতে কে আমায় ডাকিল—বাবুজী, ও বাবুজী—বাবুজী—

চাহিয়া দেখি, আর বছরের সেই মঞ্চী। বিস্মিত হইলাম, আনন্দিতও হইলাম। ঘোড়া থামাইতেই মঞ্চী হাসিমুখে কাস্তে-হাতে ছুটিয়া আসিয়া ঘোড়ার পাশে দাঁড়াইল। বলিল—আমি দূর থেকেই ঘোড়া দেখে মালুম করেছি। কোথায় গিয়েছিলেন বাবুজী?

মঞ্চী ঠিক তেমনই আছে দেখিতে—বরং আরও একটু স্বাস্থ্যবতী হইয়াছে। কুসুম-ফুলের পাপড়ির গুঁড়া লাগিয়া তাহার হাতখানা ও পরনের শাড়ীর সামনের দিকটা রাঙা।

বলিলাম—বহরাবুরু পাহাড়ের নীচে কাজ পড়েছিল, সেখানে তিন মাস ছিলাম। সেখান থেকে ফিরছি। তোমরা এখানে কি করছ?

—কুসুম-ফুল কাটছি, বাবুজী। বেলা হয়ে গিয়েছে, এবেলা নামুন এখানে। ঐ তো কাছেই খুপরি।

আমার কোনো আপত্তি টিকিল না। মঞ্চী কাজ ফেলিয়া আমাকে তাহাদের খুপরিতে লইয়া চলিল। মঞ্চীর স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎ আমার আসার সংবাদ শুনিয়া ক্ষেত হইতে আসিল।

নক্‌ছেদী ভকতের প্রথম পক্ষের স্ত্রী খুপরির মধ্যে রান্নার কাজ করিতেছিল, সেও আমাকে দেখিয়া খুশি হইল।

তবে মঞ্চী সকল কাজে অগ্রণী। সে আমার জন্য গমের খড় পাতিয়া পুরু করিয়া বসিবার আসন করিল। একটি ছোট বাটিতে মহুয়ার তৈল আনিয়া আমাকে স্নান করিয়া আসিতে বলিল।

বলিল—চলুন আমি সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাচ্ছি—ঐ টোলার দক্ষিণে একটা ছোট্ট কুণ্ডী আছে। বেশ জল।

বলিলাম—সে জলে আমি নাইব না মঞ্চী। টোলাসুদ্ধ লোক সেই জলে কাপড় কাচে, মুখ ধোয়, স্নান করে, বাসনও মাজে। সে জল বড় খারাপ হবে। তোমরা কি এখানে সেই জলই খাচ্ছ? তা হলে আমি উঠি। ও জল আমি খাব না।

মঞ্চী ভাবনায় পড়িয়া গেল। বোঝা গেল ইহারাও সেই জল ছাড়া অন্য জল পাইবে কোথায় যে খাইবে না! না খাইয়া উপায় কি?

মঞ্চীর বিষণ্ন মুখ দেখিয়া আমার কষ্ট হইল। এই দূষিত জল ইহারা মনের আনন্দে পান করিয়া আসিতেছে, কখনও ভাবে নাই এ-জলে আবার কি থাকিতে পারে, আজ আমি যদি জলের অজুহাতে ইহাদের আতিথ্য গ্রহণ না করিয়া চলিয়া যাই, সরলপ্রাণ মেয়েটি মনে বড় আঘাত পাইবে।

মঞ্চীকে বলিলাম—বেশ, ঐ জল খুব ক'রে ফুটিয়ে নাও—তবে খাব। স্নান করা থাক্ গে।

মঞ্চী বলিল—কেন বাবুজী, আমি আপনাকে এক টিন জল ফুটিয়ে দিচ্ছি, তাতেই আপনি স্নান করুন। এখনও তেমন বেলা হয় নি। আমি জল নিয়ে আসছি, বসুন।

মঞ্চী জল আনিয়া রান্নার যোগাড় করিয়া দিল। বলিল—আমার হাতে তো খাবেন না বাবুজী, আপনি নিজেই রাঁধুন তবে!

—কেন খাব না, তুমি যা পার তাই রাঁধ।

—তা হবে না বাবুজী, আপনিই রাঁধুন! একদিনের জন্যে আপনার জাত কেন মারব? আমার পাপ হবে।

—কিছু হবে না। আমি তোমাকে বলছি, এতে কোনো দোষ হবে না।

অগত্যা মঞ্চী রাঁধিতে বসিল। রাঁধিবার আয়োজন বিশেষ কিছু নয়—খানকতক মোটা মোটা হাতে-গড়া রুটি ও বুনো ধুঁধুলের তরকারি। নক্‌ছেদী কোথা হইতে এক ভাঁড় মহিষের দুধ যোগাড় করিয়া আনিল।

রাঁধিতে বসিয়া মঞ্চী এতদিন কোথায় কোথায় ঘুরিয়াছে, সে গল্প করিতে লাগিল। পাহাড়ের অঞ্চলে কলাই কাটিতে গিয়া একটা রামছাগলের বাচ্চা পুষিয়াছিল, সেটা কি করিয়া হারাইয়া গেল সে-গল্পও আমাকে ঠায় বসিয়া শুনিতে হইল।

আমায় বলিল—বাবুজী, কাঁকোয়াড়া-রাজের জমিদারীতে যে গরম জলের কুণ্ড আছে, জানেন? আপনি তো কাছাকাছি গিয়েছিলেন, সেখানে যান নি?

আমি বলিলাম, কুণ্ডের কথা শুনিয়াছি, কিন্তু সেখানে যাওয়া আমার ঘটে নাই।

মঞ্চী বলিল—জানেন বাবুজী, আমি সেখানে নাইতে গিয়ে মার খেয়েছিলাম। আমাকে নাইতে দেয় নি।

মঞ্চীর স্বামী বলিল—হ্যাঁ, সে এক কাণ্ড বাবুজী। ভারী বদমাইস সেখানকার পাণ্ডার দল।

বলিলাম—ব্যাপারখানা কি?

মঞ্চী স্বামীকে বলিল—তুমি বল না বাবুজীকে। বাবুজী কলকাতায় থাকেন, উনি লিখে দেবেন। তখন বদমাইস গুণ্ডারা মজা টের পাবে।

নক্‌ছেদী বলিল—বাবুজী, ওর মধ্যে সূরয-কুণ্ড খুব ভাল জায়গা। যাত্রীরা সেখানে স্নান করে। আমরা আমলাতলীর পাহাড়ের নীচে কলাই কাটছিলাম, পূর্ণিমার যোগ পড়লো কিনা? মঞ্চী নাইতে গেল ক্ষেতের কাজ বন্ধ রেখে। আমার সেদিন জ্বর, আমি নাইবো না। বড়বৌ তুলসীও গেল না, ওর তত ধর্মের বাতিক নেই। মঞ্চী সূরয-কুণ্ডে নামতে যাচ্ছে, পাণ্ডারা বলেছে—এই, ওখানে কেন নামছিস? ও বলছে—জলে নাইবো। তারা বলছে—তুই কি জাত? ও বলেছে—গাঙ্গোতা। তখন তারা বলেছে—গাঙ্গোতীনকে আমরা নাইতে দিই নে কুণ্ডের জলে, চলে যা। ও তো জানেন তেজী মেয়ে। ও বলেছে—এ তো পাহাড়ী ঝরনা, যে-সে নাইতে পারে। ঐ তো কত লোক নাইছে। ওরা কি সকলে ব্রাহ্মণ আর ছত্রী? বলে যেমন নামতে গিয়েছে, দুজন ছুটে এসে ওকে টেনে হিঁচড়ে মারতে মারতে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। ও কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল।

—তার পর কি হ'ল?

—কি হবে বাবুজী? আমরা গরীব গাঙ্গোতা কাট্‌নি মজুর। আমাদের ফরিয়াদ কে শুনবে। আমি বলি, কাঁদিস্ নে, তোকে আমি মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডে নাইয়ে আনবো।

মঞ্চী বলিল—বাবুজী, আপনি একটু লিখে দেবেন তো কথাটা! আপনাদের বাঙালী বাবুদের কলমের খুব জোর। পাজীগুলো জব্দ হয়ে যাবে।

উৎসাহের সহিত বলিলাম—নিশ্চয়ই লিখবো।

তাহার পর মঞ্চী পরম যত্নে আমায় খাওয়াইল। বড় ভাল লাগিল তাহার আগ্রহ ও সেবাযত্ন।

বিদায় লইবার সময় তাহাকে বার-বার বলিলাম—সামনের বৈশাখ মাসে যব গম কাটুনির সময় তারা যেন নিশ্চয়ই আমাদের লবটুলিয়া-বইহারে যায়।

মঞ্চী বলিল—ঠিক যাব বাবুজী। সে কি আপনাকে বলতে হবে!

মঞ্চীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চলিয়া আসিবার সময় মনে হইল, আনন্দ, স্বাস্থ্য ও সারল্যের প্রতিমূর্তি যেন সে। এই বনভূমির সে যেন বনলক্ষ্মী, পরিপূর্ণ-যৌবনা, প্রাণময়ী, তেজস্বিনী অথচ মুগ্ধা, অনভিজ্ঞা, বালিকাস্বভাবা।

বাঙালীর কলমের উপর অসীম নির্ভরশীলা এই বন্য মেয়েটির নিকট সেদিন যে অঙ্গীকার করিয়া আসিয়াছিলাম, আজ তাহা পালন করিলাম—জানি না ইহাতে এতকাল পরে

তাহার কি উপকার হইবে। এতদিন সে কোথায়, কি ভাবে আছে, বাঁচিয়া আছে কি না, তাহাই বা কে জানে?

২

শ্রাবণ মাস। নবীন মেঘে ঢল নামিয়াছে অনেক দিন, নাঢ়া ও লবটুলিয়া-বইহারে কিংবা গ্র্যান্ট সাহেবের বটতলায় দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাও, শুধুই দেখ সবুজের সমুদ্রের মত নবীন কচি কাশবন।

একদিন রাজা দোবরু পান্নার চিঠি পাইয়া শ্রাবণ-পূর্ণিমায় তাঁর ওখানে ঝুলনোৎসবের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে চলিলাম। রাজু ও মটুকনাথ ছাড়িল না, আমার সঙ্গে তাহারাও চলিল। হাঁটিয়া যাইবে বলিয়া উহারা রওনা হইল আমার আগেই।

বেলা দেড়টার সময় ডোণ্ডায় মিছি নদী পার হইলাম। দলের সকলের পার হইতে আড়াইটা বাজিয়া গেল। দলটিকে পিছনে ফেলিয়া তখন ঘোড়া ছুটাইয়া দিলাম।

ঘন মেঘ করিয়া আসিল পশ্চিমে। তার পরেই নামিল ঝম্ ঝম্ বর্ষা।

কি অপূর্ব বর্ষার দৃশ্য দেখিলাম সেই অরণ্য-প্রান্তরে। মেঘে মেঘে দিগন্তের শৈলমালা নীল, থম্‌কানো কালো বিদ্যুৎগর্ভ মেঘে আকাশ ছাইয়া আছে, ক্বচিৎ পথের পাশের শাল কি কেঁদ শাখায় ময়ূর পেখম মেলিয়া নৃত্যপরায়ণ, পাহাড়ী ঝরনার জলে গ্রাম্য বালক-বালিকা মহা উৎসাহে শাল-কাটির ও বন্য বাঁশের ঘুনি পাতিয়া কুচো মাছ ধরিতেছে, ধূসর শিলাখণ্ড ভিজিয়া কালো দেখাইতেছে, তাহার উপর বসিয়া মহিষের রাখাল কাঁচা শালপাতার লম্বা বিড়ি টানিতেছে। শান্তস্তব্ধ দেশ—অরণ্যের পর অরণ্য, প্রান্তরের পর প্রান্তর, শুধুই ঝরনা, পাহাড়ী গ্রাম, মরুম-ছড়ানো রাঙা মাটির জমি, ক্বচিৎ কোথাও পুষ্পিত কদম্ব বা পিয়াল বৃক্ষ।

সন্ধ্যার পূর্বে আমি রাজা দোবরু পান্নার রাজধানীতে পৌঁছিয়া গেলাম।

সেবারকার সেই খড়ের ঘরখানা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য চমৎকার করিয়া লেপিয়া পুঁছিয়া রাখা হইয়াছে। দেওয়ালে গিরিমাটির রং, পদ্ম গাছ ও ময়ূর আঁকা, শাল কাঠের খুঁটির গায়ে লতা ও ফুল জড়ানো—আমাব বিছানা এখনও আসিয়া পৌঁছায় নাই, আমি ঘোড়ায় আগেই পৌঁছিয়াছিলাম—কিন্তু তাহাতে কোনো অসুবিধা হইল না। ঘরে নতুন মাদুর পাতাই ছিল, গোটা দুই ফর্সা তাকিয়াও দিয়া গেল।

একটু পরে ভানুমতি একখানা বড় পিতলের সরাতে ফলমূল-কাটা ও একবাটি জ্বাল-দেওয়া দুধ লইয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার পিছু পিছু আসিল একখানা কাঁচা শালপাতায় গোটা পান, গোটা সুপারি ও অন্যান্য পানের মশলা সাজাইয়া লইয়া আর একটি তাহার বয়সী মেয়ে।

ভানুমতীর পরনে একখানা জাম-রঙের খাটো শাড়ী হাঁটুর উপর উঠিয়াছে, গলায় সবুজ ও লাল হিংলাজের মালা, খোঁপায় জলজ স্পাইডার লিলি গোঁজা। আরও স্বাস্থ্যবতী ও লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে ভানুমতী—নিটোল দেহে যৌবনের উচ্ছলিত লাবণ্যের বান ডাকিয়াছে, চোখের ভাবে কিন্তু যে সরলা বালিকা দেখিয়াছিলাম, সেই সরলা বালিকাই আছে।

বলিলাম—কি ভানুমতী, ভাল আছ?

ভানুমতি নমস্কার করিতে জানে না—আমার কথার উত্তরে সরল হাসি হাসিয়া বলিল—আপনি, বাবুজী?

—আমি ভাল আছি।

—কিছু খান। সারাদিন ঘোড়ায় এসে খিদে পেয়েছে খুব।

আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আমার সামনে মাটির সামনে মেঝেতে হাঁটু গাড়িয়া

বসিয়া পড়িল ও পিতলের থালাখানা হইতে দুখানা পেঁপের টুকরা আমার হাতে তুলিয়া দিল।

আমার ভাল লাগিল—ইহার নিঃসঙ্কোচ বন্ধুত্ব। বাংলা দেশের মানুষের কাছে ইহা কি অদ্ভুত ধরনের, অপ্রত্যাশিত ধরনের নূতন, সুন্দর, মধুর। কোনো বাঙালী কুমারী অনাত্মীয়া ষোড়শী এমন ব্যবহার করিত? মেয়েদের সম্পর্কে আমাদের মন কোথায় যেন গুটাইয়া পাকাইয়া জড়সড় হইয়া আছে সর্বদা। তাহাদের সম্বন্ধে না পারি প্রাণ খুলিয়া ভাবিতে, না পারি তাহাদের সঙ্গে মন খুলিয়া মিশিতে।

আরও দেখিয়াছি, এ-দেশের প্রান্তর যেমন উদার, অরণ্যানী, মেঘমালা, শৈলশ্রেণী যেমন মুক্ত ও দূরচ্ছন্দা—ভানুমতীর ব্যবহার তেমনি সঙ্কোচহীন, সরল, বাধাহীন। মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারের মত স্বাভাবিক। এমনি পাইয়াছি মঞ্চীর কাছে বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদের স্ত্রীর কাছে। অরণ্য ও পাহাড় এদের মনকে মুক্তি দিয়াছে, দৃষ্টিকে উদার করিয়াছে—এদের ভালবাসাও সে অনুপাতে মুক্ত, দৃঢ়, উদার। মন বড় বলিয়া এদের ভালবাসাও বড়।

কিন্তু ভানুমতীর কাছে বসিয়া হাতে তুলিয়া দিয়া খাওয়ানোর তুলনা হয় না। জীবনে সেদিন সর্বপ্রথম আমি অনুভব করিলাম নারীর নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের মাধুর্য। সে যখন স্নেহ করে, তখন সে কি স্বর্গের দ্বার খুলিয়া দেয় পৃথিবীতে!

ভানুমতীর মধ্যে যে আদিম নারী আছে, সভ্য সমাজে সে-নারীর আত্মা সংস্কারের ও বন্ধনের চাপে মূর্ছিত।

সে-বার যে-রকম ব্যবহার পাইয়াছিলাম, এবারকার ব্যবহার তার চেয়েও আপন, ভানুমতী বুঝিতে পারিয়াছে এ বাঙালী বাবু তাদেব পরিবারের বন্ধু, তাদেরই শুভাকাঙ্ক্ষী আপনার লোকদের মধ্যে গণ্য—সুতরাং যে ব্যবহার তাহার নিকট পাইলাম তাহা নিজের স্নেহময়ী ভগ্নীর মতই।

অনেককাল হইয়া গিয়াছে—কিন্তু ভানুমতীর এই সুন্দর প্রীতি ও বন্ধুত্বের কথা আমার স্মৃতিপটে তেমনি সমুজ্জ্বল—বন্য অসভ্যতার এই দানের নিকট সভ্য সমাজের বহু সম্পদ্ আমার মনে নিষ্প্রভ হইয়া আছে।

রাজা দোবরু উৎসবের অন্য আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন, এইবার আসিয়া আমার ঘরে বসিলেন।

আমি বলিলাম—ঝুলন কি আপনাদের এখানে বরাবর হয়?

রাজা দোবরু বলিলেন—আমাদের বংশে বহুদিনের উৎসব এইটি। এ সময়ে অনেক দূর থেকে আত্মীয়স্বজন আসে ঝুলনে নাচতে। আড়াই মণ চাল রান্না হবে কাল।

মটুকনাথ আসিয়াছে পণ্ডিত-বিদায়ের লোভে—ভাবিয়াছিল কত বড় রাজবাড়ী, কি কাণ্ডই আসিয়া দেখিবে! তাহার মুখের ভাবে মনে হইল সে বেশ একটু নিরাশ হইয়াছে। এ রাজবাড়ী অপেক্ষা টোলগৃহ যে অনেক ভাল।

রাজু তো মনের কথা চাপিতে না পারিয়া স্পষ্টই বলিল—রাজা কোথায় হুজুর, এ তো এক সাঁওতাল-সর্দার! আমার যে ক'টা মহিষ আছে, রাজার শুনলাম তাও নেই, হুজুর।

সে ইহারই মধ্যে রাজার পার্থিব সম্পদের বিষয় অনুসন্ধান করিয়াছে—গরু, মহিষ এদেশে সম্পদের বড় মাপকাঠি। যার যত মহিষ, সে তত বড়লোক।

গভীর রাত্রে চতুর্দশীর জ্যোৎস্না বনের বড় বড় গাছপালার আড়ালে উঠিয়া যখন সেই বন্য গ্রামের গৃহস্থবাড়ীর প্রাঙ্গণে আলো-আঁধারের জাল বুনিয়াছে, তখন শুনিলাম রাজবাড়ীতে বহু নারীকণ্ঠের সম্মিলিত এক অদ্ভুত ধরনের গান। কাল ঝুলন-পূর্ণিমা, রাজবাড়ীতে নবাগত কুটুম্বিনী ও রাজকন্যার সহচরীগণ কল্যকার নাচগানের মহলা দিতেছে। সারারাত ধরিয়া তাহাদের গান ও মাদল বাজনা থামিল না।

শুনিতে শুনিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি, ঘুমের মধ্যেও ওদের সেই গান কতবার যেন শুনিতে পাইতেছিলাম।

৩

কিন্তু পরদিন ঝুলনোৎসব দেখিয়া মটুকনাথ, রাজু, এমন কি মুনেশ্বর সিং পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল।

পরদিন সকালে উঠিয়া দেখি ভানুমতির বয়সী কুমারী মেয়েই অন্ততঃ ত্রিশজন চারিপাশের বহু টোলা ও পাহাড়ী বস্তি হইতে উৎসব উপলক্ষে আসিয়া জুটিয়াছে। একটি ভাল প্রথা দেখিলাম, এত নাচগানের মধ্যে ইহাদের কেহই মহুয়ার মদ খায় নাই। রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি হাসিয়া গর্বের সুরে বলিলেন—আমাদের বংশে মেয়েদের মধ্যে ও নিয়ম নেই। তা ছাড়া আমি হুকুম না দিলে, কারো সাধ্যি নেই আমার ছেলেমেয়ের সামনে মদ খায়।

মটুকনাথ দুপুরবেলা আমায় চুপি চুপি বলিল—রাজা দেখছি আমার চেয়ে গরীব। রাঁধবার জন্যে দিয়েছে মোটা রাঙা চাল, আর পাকা চালকুমড়ো, আর বুনো ধুঁধুল। এতগুলো লোকের জন্যে কি রাঁধি বলুন তো?

সারা সকাল ভানুমতীর দেখা পাই নাই—খাইতে বসিযাছি, সে এক বাটি দুধ আনিয়া আমার সামনে বসিল।

বলিলাম—তোমাদের গান কাল রাত্রে বেশ লেগেছিল।

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আমাদের গান বুঝতে পারেন?

বলিলাম—কেন পারব না? এতদিন তোমাদের সঙ্গে আছি, তোমাদের গান বুঝব না কেন?

—আজ ও-বেলা আপনি ঝুলন দেখতে যাবেন তো?

—সেজন্যেই তো এসেছি। কতদূর যেতে হবে?

ভানুমতী ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণীর দিকে আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—আপনি তো গিয়েছেন ও পাহাড়ে। আমাদের সেই মন্দির দেখেন নি?

এই সময় ভানুমতীর বয়সী একদল কিশোরী মেয়ে আমাব খাবার ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাঙালী বাবুর ভোজন পরম কৌতূহলের সহিত দেখিতে এবং পরস্পরে কি বলাবলি করিতে লাগিল।

ভানুমতী বলিল—যা সব এখান থেকে, এখানে কি?

একটি মেয়ের সাহস অন্য মেয়েদের চেয়ে বেশী, সে একটু আগাইয়া আসিয়া বলিল,—বাবুজীকে ঝুলনের দিন নুন করমচা খেতে দিস্‌ নি তো?

তাহার এ কথায় পিছনের সব মেয়ে খিল খিল করিয়া হাসিযা উঠিয়া এ উহার গায়ে হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

ভানুমতীকে বলিলাম—ওরা হাসছে কেন"

ভানুমতী সলজ্জ মুখে বলিল—ওদের জিজ্ঞেস করুন। আমি কি জানি!

ইতিমধ্যে একটি মেয়ে বড় একটা পাকা কামরাঙা লঙ্কা আনিয়া আমার পাতে দিয়া হাসিয়া বলিল—খান বাবুজী একটু লঙ্কার আচার। ভানুমতী শুধু আপনাকে মিষ্টি খাওয়াচ্ছে, তা তো হবে না! আমরা একটু ঝাল খাওয়াই।

সকলে আবার হাসিয়া উঠিল। এতগুলি তরুণীর মুখের সরল হাসিতে দিনমানেই যেন পূর্ণিমার জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্বে একদল তরুণ-তরুণী পাহাড়ের দিকে রওনা হইল—তাহাদেব পিছু পিছু আমরাও গেলাম—সে এক প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা। পূর্বদিকে নওয়াদা-লছমীপুরার সীমানায় ধন্‌ঝরি পাহাড়, যে পাহাড়ের নীচে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়াছে, সে পাহাড়ের বনশীর্ষে পূর্ণচন্দ্র উঠিতেছে, একদিকে নীচু উপত্যকা, বনে বনে সবুজ, অন্যদিকে ধন্‌ঝরি শৈলমালা। মাইল-খানেক হাঁটিয়া আমরা পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া পৌঁছিলাম। কিছুদূর উঠিতে একটা সমতল স্থান পাহাড়ের মাথায়। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে একটা প্রাচীন পিয়াল গাছ—গাছের গুঁড়ি ফুল ও লতায় জড়ানো। রাজা দোবরু বলিলেন—

এই গাছ অনেক কালের পুরোনো—আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি এই গাছের তলায় ঝুলনের সময় মেয়েরা নাচে।

আমরা একপাশে তালপাতার চেটাই পাতিয়া বসিলাম, আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না-প্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল—পাশে পাশে মাদল বাজাইয়া একদল যুবক তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। ভানুমতীকে দেখিলাম এই দলের পুরোভাগে। মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা।

কত রাত পর্যন্ত সমান ভাবে নাচ ও গান চলিল—মাঝে মাঝে দলটি একটু বিশ্রাম করিয়া লয়, আবার আরম্ভ করে—মাদলের বোল, জ্যোৎস্না, বর্ষাস্নিগ্ধ বনভূমি, সুঠাম শ্যামা নৃত্যপরায়ণা তরুণীর দল—সব মিলিয়া কোনো বড় শিল্পীর অঙ্কিত একখানি ছবির মত তা সুশ্রী—একটি মধুর সঙ্গীতের মত তার আকুল আবেদন। মনে পড়ে দূর ইতিহাসের সোলাঙ্কি-রাজকন্যা ও তার সহচরীগণের এমনি ঝুলন নাচ ও গানের কথা, মনে পড়ে রাখাল বালক বাপ্পাদিত্যকে খেলার ছলে মাল্যদানের কথা।

আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ
ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ্

তার চেয়েও বহু দূরের অতীতে, প্রাচীন যুগের প্রস্তর-যুগের ভারতে রহস্যাচ্ছন্ন ইতিহাসের সকল ঘটনা যেন আমার সম্মুখে অভিনীত হইতে দেখিলাম—আদিম ভারতের সে সংস্কৃতি যেন মূর্তিমতী হইয়া উঠিয়াছে সরলা পর্বতবালা ভানুমতী ও তাহার সখীগণের নৃত্যে—হাজার হাজার বৎসর পূর্বের এমনি কত বন, কত শৈলমালা, এমনিতর কত জ্যোৎস্নারাত্রি, ভানুমতির মত কত বালিকার নৃত্যচঞ্চল চরণের ছন্দে আকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মুখের সেসব হাসি আজও মরে নাই—এই সব গুপ্ত অরণ্য ও শৈলমালার আড়ালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তারা তাদের বর্তমান বংশধরগণের রক্তে আজও আনন্দ ও উৎসাহের বাণী পাঠাইয়া দিতেছে।

গভীর রাত্রি। চাঁদ ঢলিয়া পড়িতেছে পশ্চিম দিকে দূর বনের পিছনে। আমরা সবাই পাহাড় হইতে নামিয়া আসিলাম। সুখের বিষয় আজ আকাশে মেঘ নাই, কিন্তু আর্দ্র বাতাস শেষরাত্রে অত্যন্ত শীতল হইয়া উঠিয়াছে। অত রাত্রেও আমি খাইতে বসিলে ভানুমতী দুধ ও পেঁড়া আনিল।

আমি বলিলাম—বড় চমৎকার নাচ দেখলাম তোমাদের।

সে সলজ্জ হাসিমুখে বলিল—আপনার কি আর ভাল লাগবে বাবুজী—আপনাদের কল্‌কাতায় ওসব কি কেউ দ্যাখে?

পরদিন ভানুমতি ও তাহাব প্রপিতামহ রাজা দোবরু আমায় কিছুতেই আসিতে দিবে না। অথচ আমার কাজ ফেলিয়া থাকিলে চলে না, বাধ্য হইয়া চলিয়া আসিলাম। আসিবার সময় ভানুমতী বলিল—বাবুজী, কলকাতা থেকে আমার জন্যে একখানা আয়না এনে দেবেন? আমার আয়না একখানা ছিল, অনেকদিন হল ভেঙে গিয়েছে?

ষোল বছর বয়সের সুশ্রী নবযৌবনা কিশোরীর আয়নার অভাব! তবে আয়নার সৃষ্টি হইয়াছে কাদের জন্যে? এক সপ্তাহের মধ্যেই পূর্ণিয়া হইতে একখানা ভাল আয়না আনাইয়া তাহাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

কয়েক মাস পরে। ফাল্গুন মাসের প্রথম। লবটুলিয়া হইতে কাছারি ফিরিতেছি, জঙ্গলের মধ্যে কুণ্ডীর ধারে বাংলা কথাবার্তায় ও হাসির শব্দে ঘোড়া থামাইলাম। যত কাছে যাই, ততই আশ্চর্য হই। মেয়েদের

গলাও শোনা যাইতেছে—ব্যাপার কি? জঙ্গলের মধ্যে ঘোড়া ঢুকাইয়া কুণ্ডীর ধারে লইয়া গিয়া দেখি, বনঝাউয়ের ঝোপের ধারে শতরঞ্জি পাতিয়া আট-দশটি বাঙালী ভদ্রলোক বসিয়া গল্পগুজব করিতেছে, পাঁচ-ছয়টি মেয়ে কাছেই রান্না করিতেছে, ছ-সাতটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। কোথা হইতে এতগুলি মেয়ে-পুরুষ এই ঘোর জঙ্গলে ছেলেপুলে লইয়া পিকনিক করিতে আসিল বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় সকলেরই চোখ আমার দিকে পড়িল—একজন বাংলায় বলিল—এ ছাতুটা আবার কোথা থেকে এসে জুটল এ জঙ্গলে? আম্‌ব্রেলু॰

আমি ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাদের কাছে যাইতে যাইতে বলিলাম—আপনারা বাঙালী দেখছি—এখানে কোথা থেকে এলেন?

তারা খুব আশ্চর্য হইল, অপ্রতিভও হইল। বলিল—ও, মশায় বাঙালী? হেঁ-হেঁ, কিছু মনে কববেন না, আমরা ভেবেছি—হেঁ-হে—

বলিলাম—না, না, মনে করবার আছে কি? তা আপনারা কোথা থেকে আসছেন, বিশেষ মেয়েদের নিয়ে—

আলাপ জমিয়া গেল। এই দলের মধ্যে প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি একজন রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, রায় বাহাদুর। বাকী সকলে তাঁর ছেলে, ভাইপো, ভাইঝি, মেয়ে, নাতনী, জামাই, জামাইয়ের বন্ধু ইত্যাদি। রায় বাহাদুর কলিকাতায় থাকিতে একখানি বই পড়িয়া জানিতে পারেন, পূর্ণিয়া জেলায় খুব শিকার মেলে, তাই শিকার করিবার কোনো সুবিধা হয কিনা দেখিবার জন্য পূর্ণিয়ায় তাঁর ভাই মুন্সেফ, সেখানেই আসিয়াছিলেন। আজ সকালে সেখান হইতে ট্রেনে চাপিয়া বেলা দশটার সময় কাটারিয়া পৌঁছেন। সেখান হইতে নৌকা করিয়া কুশী নদী বাহিয়া এখানে পিক্‌নিক্ কবিতে আসিয়াছেন—কারণ সকলের মুখেই নাকি শুনিয়াছেন লবটুলিয়া, বোমাইবুরু ও ফুল্‌কিয়া বইহারের জঙ্গল না দেখিয়া গেলে জঙ্গল দেখাই হইল না। পিক্‌নিক্ সারিয়াই চার মাইল হাঁটিয়া মোহনপুরা জঙ্গলের নীচে কুশী নদীতে গিয়া নৌকা ধরিবেন—ধরিয়া আজ রাত্রেই কাটারিয়া ফিরিয়া যাইবেন।

আমি সত্যই অবাক হইয়া গেলাম। সম্বলের মধ্যে দেখিলাম ইহাদের সঙ্গে আছে একটা দো-নলা শট্-গান্—ইহাই ভরসা করিয়া এ ভীষণ জঙ্গলে ইহারা ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছে। অবশ্য সাহস আছে অস্বীকার করিব না, কিন্তু অভিজ্ঞ রায় বাহাদুরের আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মোহনপুরা জঙ্গলের নিকট দিয়া এদেশেব জংলী লোকেই সন্ধ্যার পূর্বে যাইতে সাহস করে না বন্য মহিষের ভয়ে। বাঘ বার হওয়াও আশ্চর্য নয়। বুনো শূয়োর আর সাপের তো কথাই নাই। ছেলেমেয়ে লইয়া পিক্‌নিক্ করিতে আসিবার জায়গা নয় এটা।

রায় বাহাদুর আমাকে কিছুতেই ছাড়িবেন না। বসিতে হইবে, চা খাইতে হইবে। আমি এ জঙ্গলে কি করি, কি বৃত্তান্ত। আমি কি কাঠের ব্যবসা করি? নিজের ইতিহাস বলিবার পরে তাঁহাদিগকে সবসুদ্ধ কাছারিতে রাত্রিযাপন করিতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু তাঁহারা রাজী হইলেন না। রাত্রি দশটার ট্রেনে কাটারিয়াতে উঠিয়া পূর্ণিয়া আজই রাত বারোটায় পৌঁছিতে হইবে। না ফিরিলে বাড়ীতে সকলে ভাবিবে, কাজেই থাকিতে অপারগ ইত্যাদি।

জঙ্গলের মধ্যে ইহারা এত দূর কেন পিক্‌নিক্ করিতে আসিয়াছে তাহা বুঝিলাম না। লবটুলিয়া বইহারের উন্মুক্ত প্রান্তর বনানী ও দূরের পাহাড়রাজির শোভা, সূর্যাস্তের রং, পাখীর ডাক, দশ দূরে বনের মধ্যে ঝোপের মাথায় মাথায় এই বসন্তকালে কত চমৎকার ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে—এসবের দিকে ইহাদের নজর নাই দেখিলাম। ইহারা কেবল চীৎকার করিতেছে, গান গাহিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে, খাওয়ার তরিবৎ কিসে হয় সে-ব্যবস্থা করিতেছে। মেয়েদের মধ্যে দুটি কলিকাতায় কলেজে পড়ে, বাকী দু-তিনটি স্কুলে পড়ে। ছেলেগুলির মধ্যে একজন মেডিকেল কলেজের ছাত্র, বাকীগুলি বিভিন্ন স্কুল-কলেজে পড়ে। কিন্তু প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্যময় রাজ্যে দৈবাৎ যদি আসিয়াই পড়িয়াছে, দেখিবার চোখ নাই আদৌ। প্রকৃতপক্ষে ইহারা আসিয়াছিল শিকার করিতে—খরগোস,

পাখী, হরিণ—পথের ধারে যেন ইহাদের বন্দুকে গুলি খাইবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে।

যে মেয়েগুলি আসিয়াছে, এমন কল্পনার-লেশ-পরিশূন্য মেয়ে যদি কখনও দেখিয়াছি। তাহারা ছুটাছুটি করিতেছে, বনের ধার হইতে রান্নার জন্য কাঠ কুড়াইয়া আনিতেছে, মুখে বকুনির বিরাম নাই—কিন্তু একবার কেহ চারিধারে চাহিয়া দেখিল না যে কোথায় বসিয়া তাহারা খিচুড়ি রাঁধিতেছে, কোন্ নিবিড় সৌন্দর্যভরা বনানীপ্রান্তে।

একটি মেয়ে বলিল—'টিন-কাটার্' ঠুকবার বড্ড সুবিধে এখানে, না? কত পাথরের নুড়ি!

আর একটি মেয়ে বলিল—উঃ, কি জায়গা! ভাল চাল কোথাও পাবার জো নাই—কাল সারা টাউন খুঁজে বেড়িয়েছি—কি বিশ্রী মোটা চাল—তোমরা আবার বলছিলে পোলাও হবে!

ইহাবা কি জানে, যেখানে বসিয়া তারা রান্না করিতেছে, তার দশ-বিশ হাতের মধ্যে রাত্রের জ্যোৎস্নায় পরীরা খেলা করিয়া বেড়ায়?

ইহারা সিনেমার গল্প শুরু করিয়াছে। পূর্ণিয়ায় কালও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। বৈকাল পাঁচটার সময় ইহারা চলিয়া গেল।

যাইবার সময় কতকগুলি খালি জমাট দুধের ও জ্যামের টিন ফেলিয়া রাখিয়া গেল। লবটুলিয়া জঙ্গলের গাছাপালার তলায় সেগুলি আমাব কাছে কি খাপছাড়াই দেখাইতেছিল!

২

বসন্তের শেষ হইতেই এবার লবটুলিয়া বইহারের গম পাকিয়া উঠিল। আমাদের মহালে রাই-সরিষার চাষ ছিল গত বৎসর খুব বেশী। এবার অনেক জমিতে গমের আবাদ, সুতরাং এ বছর এখানে কাটুনি মেলার সময় পড়িল বৈশাখের প্রথমেই।

কাটুনি মজুরদের মাথায় যেন টনক আছে, তাহাদের দল এবার শীতের শেষে আসে নাই, এ সময় দলে দলে আসিয়া জঙ্গলের ধারে, মাঠের মধ্যে সর্বত্র খুপরি বাঁধিয়া বাস করিতে শুরু করিয়াছে। দুই-তিন হাজার বিঘা জমির ফসল কাটা হইবে, সুতরাং মজুরও আসিযাছে প্রায় তিন-চার হাজারের কম নয়। আরও শুনিলাম আসিতেছে।

আমি সকাল হইলেই ঘোড়ায় বাহির হই, সন্ধ্যায় ঘোড়ার পিঠ হইতে নামি। কত নূতন ধরনের লোক আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, ইহাদের মধ্যে কত বদমাইশ, গুণ্ডা, চোর, রোগগ্রস্ত—সকলের উপর নজর না রাখিলে এসব পুলিসবিহীন স্থানে একটা দুর্ঘটনা যখন-তখন ঘটিতে পারে।

দু-একটি ঘটনা বলি।

একদিন দেখি এক জায়গায় দুটি বালক ও একটি বালিকা রাস্তার ধারে বসিয়া কাঁদিতেছে।

ঘোড়া হইতে নামিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে তোমাদের?

উত্তরে যাহা বলিল উহার মর্ম এইরূপ : উহাদের বাড়ী আমাদের মহালে নয়, নন্দলাল ওঝা গোলাওয়ালার গ্রামে। উহারা সহোদর ভাই-বোন, এখানে কাটুনি মেলা দেখিতে আসিয়াছিল। আজই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, এবং কোথায় নাকি লাঠি ও দড়ির ফাঁসের জুয়াখেলা হইতেছিল, বড় ছেলেটি সেখানে জুয়া খেলিতে আরম্ভ করে। একটা লাঠির যে-দিকটা মাটিতে ঠেকিয়া আছে সেই প্রান্তটা দড়ি দিয়া জড়াইয়া দিতে হয়, যদি দড়ি খুলিতে খুলিতে লাঠির আগায় ফাঁস জড়াইয়া যায়, তবে খেলাওয়ালা খেলুড়েকে এক পয়সায় চার পয়সা হিসাবে দেয়।

বড় ভাইয়ের কাছে ছিল দশ আনা পয়সা, সে একবারও লাঠিতে ফাঁস বাধাতেই পারে নাই, সব পয়সা হারিয়া ছোট ভাইয়ের আট আনা ও পরিশেষে ছোট বোনের চার আনা পয়সা পর্যন্ত লইয়া বাজি ধরিয়া সর্বস্বান্ত হইয়াছে। এখন উহাদের খাইবার পয়সা নাই,·কিছু কেনা বা দেখাশোনা তো দূরের কথা।

আমি তাহাদের কাঁদিতে বারণ করিয়া তাহাদিগকে লইয়া জুয়াখেলার অকুস্থানের দিকে চলিলাম। প্রথমে তাহারা জায়গাই স্থির কবিতে পারে না, পরে একটা হরীতকী গাছ দেখাইয়া বলিল-এরই তলায় খেলা হচ্ছিল। জনপ্রাণী নাই সেখানে। কাছারির রূপসিং জমাদারের ভাই সঙ্গে ছিল, সে বলিল—জুয়াচোরেরা কি এক জায়গায় বেশীক্ষণ থাকে হুজুর? লম্বা দিয়েছে কোন্ দিকে।

বিকালের দিকে জুয়াড়ী ধরা পড়িল। সে মাইল তিন দূরে একটি বস্তিতে জুয়া খেলিতেছিল, আমাব সিপাহীরা দেখিতে পাইয়া তাহাকে আমার নিকট হাজির করিল। ছেলেমেয়েগুলি দেখিয়াই চিনিল।

লোকটা প্রথমে পয়সা ফেরত দিতে চায় না। বলে, সে তো জোর করিয়া কাড়িযা লয় নাই, উহারা স্বেচ্ছায় খেলিয়া পয়সা হারিয়াছে, ইহাতে তাহার দোষ কি? অবশেষে তাহাকে ছেলেমেয়েদের সব পয়সা তো ফেরত দিতেই হইল—আমি তাহাকে পুলিসে দিবার আদেশ দিলাম।

সে হাতে পায়ে ধবিতে লাগিল। বলিলাম—তোমার বাড়ী কোথায়?

—বালিয়া জেলা, বাবুজী।

—এ রকম করে লোককে ঠকাও কেন? কত পয়সা ঠকিয়েছ লোকজনের?

—গরীব লোক, হুজুর। আমায় ছেড়ে দিন এবার। তিন দিনে মোটে দু-টাকা তিন আনা রোজগার—

—তিন দিনে খুব বেশী রোজগার হয়েছে মজুরদের তুলনায়।

—হুজুর, সারা বছরে এ-রকম রোজগার ক'বার হয়? বছবে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা আয়।

লোকটাকে সেদিন ছাড়িয়া দিয়াছিলাম—কিন্তু আমার মহাল ছাড়িয়া সেদিনই চলিয়া যাইবার কড়ারে। আর তাকে কোনদিন কেউ আমাদের মহালের সীমানার মধ্যে দেখেও নাই।

এবার মঞ্চীকে কাটুনী মজুরদের মধ্যে না দেখিয়া উদ্বেগ ও বিস্ময় দুই-ই অনুভব করিলাম। সে বার বার বলিয়াছিল গম কাটিবার সময়ে নিশ্চয়ই আমাদের মহালে আসিবে। ফসল কাটার মেলা আসিল, চলিয়াও গেল—কেন যে সে আসিল না, কিছুই বুঝিলাম না।

অন্যান্য মজুরদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াও কোনো সন্ধান মিলিল না। মনে ভাবিলাম, এত বিস্তীর্ণ ফসলের মহাল কাছাকাছির মধ্যে কোথাও নাই এক কুশী নদীর দক্ষিণে ইসমাইলপুরের দ্বিয়ারা মহাল ছাড়া। কিন্তু সেখানে কেন সে যাইবে, অত দূরে, যখন মজুরি উভয় স্থানেই একই।

অবশেষে ফসলের মেলার শেষদিকে জনৈক গাঙ্গোতা মজুরের মুখে মঞ্চীর সংবাদ পাওয়া গেল। সে মঞ্চীকে ও তাহার স্বামী নক্‌ছেদী ভকৎকে চেনে, একসঙ্গে বহু জায়গায় কাজ কবিয়াছে নাকি। তাহারই মুখে শুনিলাম গত ফাল্গুন মাসে সে উহাদের আকবরপুর গবর্ণমেণ্ট খাসমহালে ফসল কাটিতে দেখিয়াছে। তাহার পর তাহারা যে কোথায় গেল, সে জানে না।

ফসলের মেলা শেষ হইয়া গেল জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি, এমন সময় একদিন সদর কাছারির প্রাঙ্গনে নক্‌ঝেতী ভকৎকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। নক্‌ছেদী আমার পা জড়াইয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আরও বিস্মিত হইয়া পা ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—কি ব্যাপার? তোমরা এবার ফসলের সময় আস নি কেন? মঞ্চী ভাল আছে তো? কোথায় সে?

উত্তরে নক্‌ছেদী যাহা বলিল তাহার মোট মর্ম এই, মঞ্চী কোথায় তাহা সে জানে না। খাসমহালে কাজ করিবার সময়েই মঞ্চী তাহাদের ফেলিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। অনেক খোঁজ করিয়াও তাহার পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলাম। কিন্তু দেখিলাম বৃদ্ধ নক্‌ছেদী ভকতের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নাই, যা কিছু ভাবনা সবই সেই বন্য মেয়েটির জন্য। কোথায় সে গেল, কে তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া গেল, কি অবস্থায় কোথায় বা সে আছে। সস্তা বিলাসদ্রব্যের প্রতি তাহার যে রকম আসক্তি লক্ষ্য করিয়াছি, সে-সবের লোভ দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়াও কষ্টকর নয়। তাহাই ঘটিয়াছে নিশ্চয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম—তার ছেলে কোথায়?

—সে নেই। সে বসন্ত হয়ে মারা গিয়েছে মাঘ মাসে।

অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম শুনিয়া। বেচারী পুত্রশোকেই উদাসী হইয়া যেদিকে দু-চোখ যায়, চলিয়া গিয়াছে নিশ্চয়ই। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম—তুলসী কোথায়?

—সে এখানেই এসেছে। আমার সঙ্গেই আছে। আমায় কিছু জমি দিন হুজুর। নইলে আমরা বুড়োবুড়ি, ফসল কেটে আর চলে না। মঞ্চী ছিল, তার জোরে আমরা বেড়াতাম। সে আমার হাত-পা ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

সন্ধ্যার সময় নক্‌ছেদীর খুপরিতে গিয়া দেখিলাম তুলসী তাহার ছেলেমেয়ে লইয়া চীনার দানা ছাড়াইতেছে। আমায় দেখিয়া তুলসী কাঁদিয়া উঠিল। দেখিলাম মঞ্চী চলিয়া যাওয়াতে সেও যথেষ্ট দুঃখিত। বলিল—হুজুর, সব ঐ বুড়োর দোষ। গোরমিণ্টের লোক মাঠে সব টিকে দিতে এল, বুড়ো তাকে চার আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে তাড়ালে। কাউকে টিকে নিতে দিলে না। বললে, টিকে নিলে বসন্ত হবে। হুজুর তিন দিন গেল না, মঞ্চীর ছেলেটার বসন্ত হ'ল মারাও গেল। তার শোকে সে পাগলের মত হয়ে গেল—খায় না, দায় না, শুধু কাঁদে।

—তার পর?

—তার পর হুজুর, খাসমহাল থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিলে। বললে—বসন্তে তোমাদের লোক মারা গিয়েছে, এখানে থাকতে দেবো না। এক ছোকরা রাজপুত মঞ্চীর দিকে নজর দিত। যেদিন আমরা খাসমহাল থেকে চলে এলাম, সেই রাত্রেই মঞ্চী নিরুদ্দেশ হ'ল। আমি সেদিন সকালে ঐ ছোকরাকে খুপরির কাছে ঘুরতে দেখেছি। ঠিক তার কাজ, হুজুর। ইদানীং মঞ্চী বড় কলকাতা দেখব, কলকাতা দেখব করত। তখনই জানি একটা কিছু ঘটবে।

আমারও মনে পড়িল মঞ্চী আর-বছর কলিকাতা দেখিবার যথেষ্ট আগ্রহ দেখাইয়াছিল বটে। আশ্চর্য নয়, ধূর্ত রাজপুত যুবক সরলা বন্য মেয়েটিকে কলিকাতা দেখাইবার লোভ দেখাইয়া ভুলাইয়া লইয়া যাইবে।

আমি জানি এ অবস্থায় এদেশের মেয়েদের শেষ পরিণতি হয় আসামের চা-বাগানে কুলীগিরিতে। মঞ্চীর অদৃষ্টে কি শেষকালে নির্বান্ধব আসামের পার্বত্য অঞ্চলে দাসত্ব ও নির্বাসন লেখা আছে?

বৃদ্ধ নক্‌ছেদীর উপর খুব রাগ হইল। এই লোকটা যত নষ্টের মূল। বৃদ্ধ বয়সে মঞ্চীকে বিবাহ করিতে গিয়াছিল কেন? দ্বিতীয়, গভর্ণমেন্টের টিকাদারকে ঘুষ দিয়া বিদায় করিয়াছিল কেন? যদি উহাকে জমি দিই, সে ওর জন্য নয়, উহার প্রৌঢ়া স্ত্রী তুলসী ও ছেলেমেয়েগুলির মুখের দিকে চাহিয়াই দিব।

দিলামও তাই। নাঢ়া-বইহারে শীঘ্র প্রজা বসাইতে হইবে, সদর আপিসের হুকুম আসিয়াছে। প্রথম প্রজা বসাইলাম নক্‌ছেদীকে।

নাঢ়া-বইহারে ঘোর জঙ্গল। মাত্র দু-চার ঘর প্রজা সামান্য সামান্য জঙ্গল কাটিয়া খুপরি বাঁধিতে শুরু করিয়াছে। নক্‌ছেদী প্রথমে জঙ্গল দেখিয়া পিছাইয়া গিয়াছিল, বলিল—হুজুর, দিনমানেই বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে ওখানে—কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি।

তাহাকে স্পষ্ট বলিয়া দিলাম, তার পছন্দ না হয়, সে অন্যত্র চেষ্টা দেখুক।

নিরুপায় হইয়া নক্‌ছেদী নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলেই জমি লইল।

৩

সে এখানে আসা পর্যন্ত আমি কখনও তাহার খুপরিতে যাই নাই। তবে সেদিন সন্ধ্যার সময় নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিতে দেখি ঘন জঙ্গলের মধ্যে খানিকটা ফাঁকা জায়গা—নিকটে কাশের দুটি ছোট খুপরি। একটার ভিতর হইতে আলো বাহির হইতেছে।

সেইটাই যে নক্‌ছেদীর তা আমি জানিতাম না, ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনিয়া যে প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি খুপরির বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল—দেখিলাম সে তুলসী।

—তোমরা এখানে জমি নিয়েছ? নক্‌ছেদী কোথায়?

তুলসী আমায় দেখিয়া থতমত খাইয়া গিয়াছে। ব্যস্তসমস্ত হইয়া সে গমের ভূষি-ভরা একটা চটের গদি পাতিয়া দিয়া বলিল—নামুন বাবুজী—বসুন একটু। ও গিয়েছে লবটুলিয়া, তেল নুন কিনে আনতে দোকানে। বড় ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে।

—তুমি একা এই ঘন-বনের মধ্যে আছ?

—ও-সব সয়ে গিয়েছে, বাবুজী। ভয়ডর করলে কি আমাদের গরীবদের চলে? একা তো থাকতে হ'ত না—কিন্তু অদৃষ্ট যে খারাপ। মঞ্চী যত দিন ছিল, জলেজঙ্গলে কোথাও ভয় ছিল না। কি সাহস, কি তেজ ছিল তার, বাবুজী!

তুলসী তাহার তরুণী সপত্নীকে ভালবাসিত। তুলসী ইহাও জানে এই বাঙালী বাবু মঞ্চীর কথা শুনিতে পাইলে খুশি হইবে।

তুলসীর মেয়ে সুরতিয়া বলিল—বাবুজী, একটা নীলগাইয়ের বাচ্চা ধরে রেখেছি, দেখবেন? সেদিন আমাদের খুপরির পেছনের জঙ্গলে এসে বিকেলবেলা খস্‌খস্ করছিল—আমি আর ছনিয়া গিয়ে ধরে ফেলেছি। বড় ভাল বাচ্চা।

বলিলাম—কি খায় রে?

সুরতিয়া বলিল—শুধু চীনার দানার ভূষি আর গাছের কচি পাতা। আমি কচি কেঁদ পাতা তুলে এনে দিই।

তুলসী বলিল—দেখা না বাবুজীকে—

সুরতিয়া ক্ষিপ্রপদে হরিণীর মত ছুটিয়া খুপরির পিছনদিকে অদৃশ্য হইল। একটু পরে তাহার বালিকা-কণ্ঠের চীৎকার শোনা গেল—আরে নীলগাইয়া তো ভাগলুযা হৈ রে ছনিযা—উধার—ইধার—জলদি্ পাক্‌ড়া—

দুই বোনে হুটাপুটি করিয়া নীলগাইয়ের বাচ্চা পাক্‌ড়াও করিয়া ফেলিল এবং হাঁপাইতে হাঁপাইতে হাসিমুখে আমার সামনে আনিয়া হাজির করিল।

অন্ধকারে আমার দেখিবার সুবিধার জন্য তুলসী একখানা জ্বলন্ত কাঠ উঁচু করিয়া ধরিল। সুরতিয়া বলিল—কেমন, ভাল না বাবুজী? একে খাবার জন্যে কাল রাত্রে ভালুক এসেছিল। ওই মহুয়া গাছে কাল ভালুক উঠেছিল মহুয়া ফুল খেতে—তখন অনেক রাত—বাপ মা ঘুমোয়, আমি সব টের পাই—তারপর গাছ থেকে নেমে আমাদের খুপরির পেছনে এসে দাঁড়াল। আমি একা বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে শুই রাতে—ভালুকের পায়ের শব্দ পেয়ে ওর মুখ হাত দিয়ে জোর করে চেপে আরও জড়িয়ে ধরে শুয়ে রইলুম—

—ভয় করল না তোর, সুরতিয়া?

—ইস্! ভয় বই কি! ভয় আমি করি নে। কাঠ কুড়ুতে গিয়ে জঙ্গলে কত ভালুক-ঝোড় দেখি—তাতেও ভয় করি নে। ভয় করলে চলে বাবুজী?

সুরতিয়া বিজ্ঞের মত মুখখানা করিল।

বড় বড় কলের চিমনির মত লম্বা, কালো কেঁদ গাছের গুঁড়ি ঠেলিয়া আকাশে উঠিয়াছে

খুপরির চারিধারে, যেন কালিফোর্ণিয়া রেডউড গাছের জঙ্গল। বাদুড় ও নিশাচর কাঁক পাখীর ডানা-ঝটাপটি ডালে ডালে, ঝোপে ঝোপে অন্ধকারে জোনাকির ঝাঁক জ্বলিতেছে, খুপরির পিছনের বনেই শিয়াল ডাকিতেছে—এই কয়টি ছোট ছেলেমেয়ে লইয়া উহাদের মা যে কেমন করিয়া এই নির্জন বনে-প্রান্তরে থাকে, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। হে বিজ্ঞ, রহস্যময় অরণ্য, আশ্রিতজনের প্রতি তোমার সত্যই বড় কৃপা।

কথায় কথায় বলিলাম—মঞ্চী নিজের জিনিস সব নিয়ে গিয়েছে?

সুরতিয়া বলিল—ছোটমা কোনো জিনিস নিয়ে যায় নি। ওর যে বাক্সটা সেবার দেখেছিলেন—ফেলেই রেখে গিয়েছে। দেখবেন? আনছি।

বাক্সটা আনিয়া সে আমার সামনে খুলিল। চিরুনি, ছোট আয়না, পুঁতির মালা, একখানা সবুজ-রঙের খেলো রুমাল—ঠিক যেন ছোট খুকির পুতুল-খেলার বাক্স! সেই হিংলাজের মালাছড়াটা কিন্তু নাই, সেবার লবটুলিয়া খামারের মেলায় সেই যেটা কিনিয়াছিল।

কোথায় চলিয়া গেল নিজের ঘর-সংসার ছাড়িয়া কে বলিবে? ইহারা তো জমি লইয়া এতদিন পরে গৃহস্থালি পাতাইয়া বসবাস শুরু করিয়াছে, ইহাদের দলের মধ্যে সে-ই কেবল যে ভবঘুরে সেই ভবঘুরেই রহিয়া গেল!

ঘোড়ায় উঠিবার সময় সুরতিয়া বলিল—আর এক দিন আসবেন বাবুজী—আমরা পাখী ধরি ফাঁদ পেতে। নূতন ফাঁদ বুনেছি। একটা ডাহুক আর একটা গুড়গুড়ি পাখী পুষেছি। এরা ডাকলে বনের পাখী এসে ফাঁদে পড়ে—আজ আর বেলা নেই—নইলে ধরে দেখাতাম—

নাঢ়া-বইহারের বন-প্রান্তরের পথে এত রাত্রে আসিতে ভয়-ভয় করে। বাঁয়ে ছোট একটি পাহাড়ী ঝরনার জলস্রোত কুলকুল করিয়া বহিতেছে, কোথায় কি বনের ফুল ফুটিয়াছে, গন্ধে ভরা অন্ধকার এক-এক জায়গায় এত নিবিড় যে ঘোড়ার ঘাড়ের লোম দেখা যায় না, আবার কোথাও নক্ষত্রালোকে পাতলা।

নাঢ়া-বইহার নানাপ্রকার বৃক্ষলতা, বন্যজন্তু ও পাখীদের আশ্রয়স্থান —প্রকৃতি ইহার বনভূমি ও প্রান্তরকে অজস্র সম্পদে সাজাইয়াছে, সরস্বতী কুণ্ডী এই নাঢ়া-বইহারেরই উত্তর সীমানায়। প্রাচীন জরিপের থাক-নক্সায় দেখা যায় সেখানে কুশীনদীর প্রাচীন খাত ছিল—এখন মজিয়া মাত্র ঐ জলটুকু অবশিষ্ট আছে—অন্য দিকে সেই প্রাচীন খাতই ঘন অরণ্যে পরিণত—

পুবা যত্র স্রোতঃ পুলিনমধুনা তত্র সরিতাম্—

কি অবর্ণনীয় শোভা দেখিলাম এই বনভূমির সেই নিস্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে! কিন্তু মন খারাপ হইয়া গেল যখন বেশ বুঝিলাম নাঢ়া-বইহারের এ বন আর বেশী দিন নয়। এত ভালবাসি ইহাকে অথচ আমার হাতেই ইহা বিনষ্ট হইল। দু-বৎসরের মধ্যেই সমগ্র মহালটি প্রজাবিলি হইয়া কুশ্রী টোলা ও নোংরা বস্তিতে ছাইয়া ফেলিল বলিয়া। প্রকৃতির নিজের হাতে সাজানো তার শত বৎসরের সাধনার ফল এই নাঢ়া-বইহার, ইহার অতুলনীয় বন্য সৌন্দর্য ও দূরবিসর্পী প্রান্ত লইয়া বেমালুম অন্তর্হিত হইবে। অথচ কি পাওয়া যাইবে তাহার বদলে?

কতকগুলি খোলার চালের বিশ্রী ঘর, গোয়াল, মকাই জনারের ক্ষেত, শনের গাদা, দড়ির চারপাই, হনুমানজীর ধ্বজা, ফণিমনসার গাছ, যথেষ্ট দোক্তা, যথেষ্ট খৈনী, যথেষ্ট কলেরা ও বসন্তের মড়ক।

হে অরণ্য, হে সুপ্রাচীন, আমায় ক্ষমা করিও।

আর একদিন গেলাম সুরতিয়াদের পাখী-ধরা দেখিতে।

সুরতিয়া ও ছনিয়া দুটি খাঁচা লইয়া আমার সঙ্গে নাঢ়া-বইহারের জঙ্গলের বাহিরে মুক্ত প্রান্তরের দিকে চলিল।

বৈকাল বেলা, নাঢ়া-বইহারের মাঠে সুদীর্ঘ ছায়া ফেলিয়া সূর্য পাহাড়ের আড়ালে নামিয়া পড়িয়াছে।

একটা শিমুলচারার তলায় ঘাসের উপর খাঁচা দুটি নামাইল। একটিতে একটি বড় ডাহুক, অন্যটিতে গুড়গুড়ি। এ দুটি শিক্ষিত পাখী, বন্য পাখীকে আকৃষ্ট করিবার জন্য ডাহুকটি অমনি ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গুড়গুড়িটা প্রথমতঃ ডাকে নাই।

সুরতিয়া শিস দিয়া তুড়ি দিয়া বলিল—বোলো রে বহিনিয়া—তোহর কির—

গুড়গুড়িটা অমনি ডাকিয়া উঠিল—গুড়-ড়-ড়-ড়—

নিস্তব্ধ অপরাহ্নে বিস্তীর্ণ মাঠের নির্জনতার মধ্যে সে অদ্ভুত সুর শুধুই মনে আনিয়া দেয় এমনি দিগন্তবিস্তীর্ণতার ছবি, এমনি মুক্ত দিক্‌চক্রবালের স্বপ্ন, ছায়াহীন জ্যোৎস্নালোক। নিকটেই ঘাসের মধ্যে যেখানে রাশি রাশি হলুদ বঙের দুধলি ফুল ফুটিয়াছে তারই উপর ছনিয়া ফাঁদ পাতিল—যেন পাখীর খাঁচার বেড়ার মত, বাঁশের তৈরী। সেই বেড়া ক'খানা দিয়া গুড়গুড়ি পাখীর খাঁচাটা ঢাকিয়া রাখিয়া দিল।

সুরতিয়া বলিল—চলুন বাবুজী, লুকিয়ে বসি গে ঝোপের আড়ালে। মানুষ দেখলে চিড়িয়া ভাগবে।—সবাই মিলিয়া আমরা শাল চারার আড়ালে কতক্ষণ ঘাপটি মারিয়া বসিয়া রহিলাম।

ডাহুকটি মাঝে মাঝে থামিতেছে—গুড়গুড়ির কিন্তু রবের বিরাম নাই—একটানা ডাকিয়াই চলিয়াছে—গুড়-ড়-ড়-ড়—

সে কি মধুর অপার্থিব রব! বলিলাম—সুরতিয়া, তোদের গুড়গুড়িটা বিক্রী করবি? কত দাম?

সুরতিয়া বলিল—চুপ চুপ বাবুজী. কথা বলবেন না—ঐ শুনুন, বুনো পাখী আসছে—

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পরে অন্য একটি সুর মাঠের উত্তর দিকে বনপ্রান্তর হইতে ভাসিয়া আসিল—গুড়-ড়-ড়-ড়।

আমার শরীর শিহরিয়া উঠিল' বনের পাখী খাঁচার পাখীর সুরে সাড়া দিয়াছে!

ক্রমে সে-সুর খাঁচার নিকটবর্তী হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ ধরিয়া দুইটি পাখীর রব পাশাপাশি শোনা যাইতেছিল, ক্রমে দুইটি সুর যেন মিশিয়া এক হইয়া গেল—হঠাৎ আবার একটু সুর—একটা পাখীই ডাকিতেছে—খাঁচার পাখীটা।

ছনিয়া ও সুরতিয়া ছুটিয়া গেল, ফাঁদে পাখী পড়িয়াছে। আমিও ছুটিয়া গেলাম।

ফাঁদে পা বাধাইয়া পাখীটা ঝট্‌পট্ করিতেছে। ফাঁদে পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ডাক বন্ধ হইয়া গিয়াছে—কি আশ্চর্য কাণ্ড! চোখকে যেন বিশ্বাস করা শক্ত।

সুরতিয়া পাখীটা হাতে তুলিয়া দেখাইল—দেখুন বাবুজী, কেমন ফাঁদে পা আটকেছে! দেখলেন?

সুরতিয়াকে বলিলাম—পাখী তোরা কি করিস?

সে বলিল—বাবা তিরাশি-রতনগঞ্জের হাটে বিক্রী করে আসে। এক একটা গুড়গুড়ি দু'পয়সা—একটা ডাহুক সাত পয়সা।

বলিলাম—আমাকে বিক্রি কর, দাম দেব।

সুরতিয়া গুড়গুড়িটা আমায় এমনিই দিয়া দিল—কিছুতেই তাহাকে পয়সা লওয়াইতে পারিলাম না।

৪

আশ্বিন মাস। এই সময় একদিন সকালে পত্র পাইলাম রাজা দোবরু পান্না মারা গিয়াছেন, এবং রাজপরিবার খুব বিপন্ন—আমি সময় পাইলে যেন যাই। পত্র দিয়াছে জগরু পান্না, ভানুমতীর দাদা।

তখনি রওনা হইয়া সন্ধ্যার কিছু পূর্বে চক্‌মকিটোলা পৌঁছিয়া গেলাম। রাজার বড় ছেলে ও নাতি আমাকে আগাইয়া লইয়া গেল। শুনিলাম রাজা দোবরু গরু চরাইতে চরাইতে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া হাঁটুতে আঘাতপ্রাপ্ত হন, শেষ পর্যন্ত হাঁটুর সেই আঘাতেই তাঁর মৃত্যুর কারণ ঘটে।

রাজার মৃত্যু-সংবাদ পাওয়া মাত্র মহাজন আসিয়া গরু-মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়াছে। টাকা না পাইলে সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। এদিকে বিপদের উপর বিপদ, নূতন রাজার অভিষেক-উৎসব আগামী কল্য সম্পন্ন হইবে। তাহাতেও কিছু খরচ আছে। কিন্তু সে-টাকা কোথায়? তা ছাড়া গরু-মহিষ মহাজনে যদি লইয়া যায়, তবে রাজপরিবারের অবস্থা খুবই হীন হইয়া পড়িবে—ঐ দুধের ঘি বিক্রয় করিয়া রাজার সংসারেব অর্ধেক খরচ চলিত—এখন তাহাদেব না খাইয়া মরিতে হইবে।

শুনিয়া আমি মহাজনকে ডাকাইলাম। তার নাম বীরবল সিং। আমার কোনো কথাই সে দেখিলাম শুনিতে প্রস্তুত নয়। টাকা না পাইলে কিছুতেই সে গরু-মহিষ ছাড়িবে না। লোকটা ভাল নয় দেখিলাম।

ভানুমতী আসিয়া কাঁদিতে লাগিল। সে তাহার জ্যাঠামশায় অর্থাৎ প্রপিতামহকে বড়ই ভালবাসিত—জ্যাঠামশায় থাকিতে তাহাবা যেন পাহাড়ের আড়ালে ছিল, যেমনি তিনি চোখ বুজিয়াছেন, আর অমনি এই সব গোলমাল। এই সব কথা বলিতে বলিতে ভানুমতীর চোখের জল কিছুতেই থামে না। বলিল—চলুন বাবুজী, আমাব সঙ্গে—জ্যাঠামশায়ের গোর আপনাকে দেখিয়ে আনি পাহাড়েব উপব থেকে। আমার কিছু ভাল লাগছে না বাবুজী, কেবল ইচ্ছে হচ্ছে ওঁর কবরের কাছে বসে থাকি।

বলিলাম—দাঁড়াও, মহাজনেব একটা কি ব্যবস্থা করা যায় দেখি। তারপর যাব—কিন্তু মহাজনের কোনো ব্যবস্থা করা আপাততঃ সম্ভব হইল না। দুর্দান্ত রাজপুত মহাজন কারও অনুরোধ উপরোধ শুনিবার পাত্র নয়। তবে সামান্য একটু খাতির করিয়া আপাততঃ গরু-মহিষগুলি এখানেই বাঁধিয়া রাখিতে সম্মত হইল মাত্র, তবে দুধ এক ফোঁটা লইতে দিবে না। মাস দুই পবে এ দেনা শোধার উপায় হইযাছিল—সেকথা এখন নয়।

ভানুমতী দেখি একা ওদের বাড়ীর সামনে দাঁড়াইয়া। বলিল—বিকেল হয়ে গিয়েছে, এর পব যাওয়া যাবে না, চলুন কবর দেখতে।

ভানুমতী একা যে আমার সঙ্গে পাহাড়ে চলিল ইহাতে বুঝিলাম সরলা পর্বতবালা এখন আমাকে তাহার পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরমাত্মীয় মনে করে। এই পাহাড়ী বালিকার সরল ব্যবহার ও বন্ধুত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

বৈকালের ছায়া নামিয়াছে সেই বড় উপত্যকাটায়।

ভানুমতী বড় তডবড় করিয়া চলে, ত্রস্তা হরিণীর মত। বলিলাম—শোন ভানুমতী, একটু আস্তে চল, এখানে শিউলিফুলের গাছ কোথায় আছে?

ভানুমতীদের দেশে শিউলিফুলের নাম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকমত তাহাকে বুঝাইতে পারিলাম না। পাহাড়ের উপবে উঠিতে উঠিতে অনেকদূর পর্যন্ত দেখা যাইতেছিল। নীল ধন্‌ঝরি শৈলমালা ভানুমতীব দেশকে রাজ্যহীন রাজা দোবরু পান্নার রাজ্যকে মেখলাকারে ঘেরিয়া আছে, বহুদূর হইতে হু হু খোলা হাওয়া বহিয়া আসিতেছে।

ভানুমতী চলিতে চলিতে থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল—বাবুজী, উঠতে কষ্ট হচ্ছে?

—কিছু না। একটু আস্তে চল কেবল—কষ্ট কি?

আর খানিকটা চলিয়া সে বলিল—জ্যাঠামশায় চলে গেল, সংসারে আমার আর কেউ রইল না, বাবুজী—

ভানুমতী ছেলেমানুষের মত কাঁদ-কাঁদ হইয়া কথাটা বলিল।

উহার কথা শুনিয়া আমার হাসি পাইল। বৃদ্ধ প্রপিতামহই না হয় মারা গিয়াছে, মাও নাই, নতুবা উহার বাবা, ভাই, ঠাকুরমা, ঠাকুরদা সবাই বাঁচিয়া, চারিদিকে জাজ্বল্যমান সংসার। হাজার হোক ভানুমতী স্ত্রীলোক এবং বালিকা, পুরুষের একটু সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার এ মেয়েলি আদরকাড়ানোর প্রবৃত্তি তার পক্ষে স্বাভাবিক।

ভানুমতী বলিল—আপনি মাঝে মাঝে আসবেন বাবুজী, আমাদেব দেখাশুনো করবেন—ভুলে যাবেন না বলুন—

নারী সব জায়গায সব অবস্থাতেই সমান। বন্য বালিকা ভানুমতীও সেই একই ধাতুতে গড়া।

বলিলাম—কেন ভুলে যাব? মাঝে মাঝে আসব নিশ্চয়ই—

ভানুমতী কেমন একরকম অভিমানের সুরে ঠোঁট ফুলাইয়া বলিল—হাঁ, বাংলা দেশে গেলে, কলকাতা শহরে গেলে আপনার আবার মনে থাকবে এ পাহাড় জংলী দেশের কথা—একটু থামিয়া বলিল—আমাদের কথা—আমাব কথা—

স্নেহের সুবে বলিলাম—কেন, মনে ছিল না ভানুমতী? আযনাখানা পাও নি? মনে ছিল কি ছিল না ভাব—

ভানুমতী উজ্জ্বল মুখে বলিল—উঃ বাবুজী, বড় চমৎকার আয়না—সত্যি, সে-কথা আপনাকে জানাতে ভুলেই গিযছি।

সমাধি-স্থানের সেই বটগাছেব তলায় যখন গিয়া দাঁড়াইলাম, তখন বেলা নাই বলিলেও হয়, দূর পাহাড়শ্রেণীব আড়ালে সূর্য লাল হইয়া ঢলিযা পড়িতেছে, কখন ক্ষীণাঙ্গ চাঁদ উঠিযা বটতলায় অপরাহ্ণের এই ঘন ছাযা ও সম্মুখবর্তী প্রদোষের গভীর অন্ধকার দূর করিবে, স্থানটি যেন তাহারই স্তব্ধ প্রতীক্ষায় নীরবে দাঁড়াইয়া আছে।

ভানুমতীকে কিছু বনের ফুল কুড়াইয়া আনিতে বলিলাম, উহাব ঠাকুরদাদার কবরের পাথরে ছড়াইবার জন্য। সমাধির উপব ফুল-ছড়ানো-প্রথা এদের দেশে জানা নাই, আমাব উৎসাহে সে নিকটের একটা বুনো শিউলি গাছের তলা হইতে কিছু ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহার পর ভানুমতী ও আমি দুজনেই ফুল ছড়াইযা দিলাম রাজা দোবরু পান্নার সমাধিব উপরে।

ঠিক সেই সময ডানা ঝট্‌পট্‌ কবিযা একদল সিল্লি ডাকিতে ডাকিতে উড়িয়া গেল বটগাছটার মগডাল হইতে—যেন ভানুমতী ও বাজা দোবরুর সমস্ত অবহেলিত, অত্যাচারিত প্রাচীন পূর্বপুরুষগণ আমার কাজে তৃপ্তিলাভ কবিযা সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—সাধু! সাধু! কারণ আর্য-জাতির বংশধরের এই বোধ হয় প্রথম সম্মান অনার্য রাজ-সমাধির উদ্দেশে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

১

ধাওতাল সাহু মহাজনের কাছে আমাকে একবার হাত পাতিতে হইল। আদায় সেবার হইল কম, অথচ দশ হাজার টাকা রেভিনিউ দাখিল করিতেই হইবে। তহশীলদার বনোয়ারীলাল পরামর্শ দিল, বাকী টাকাটা ধাওতাল সাহুর কাছে কর্জ করুন। আপনাকে সে নিশ্চয়ই দিতে আপত্তি করিবে না। ধাওতাল সাহু আমার মহালের প্রজা নয়, সে থাকে গভর্ণমেণ্টের খাসমহালে। আমাদের সঙ্গে তার কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা নাই, এ অবস্থায় সে যে এক কথায় আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে হাজার-

তিনেক টাকা ধার দিবে, এ বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল।

কিন্তু গরজ বড় বালাই। একদিন বনোয়ারীলালকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গেলাম ধাওতাল সাহুর বাড়ী, কারণ কাছাবির অপর কাহাকেও জানিতে দিতে চাহি না যে, টাকা কর্জ করিয়া দিতে হইতেছে।

ধাওতাল সাহুর বাড়ী পওসদিয়ার একটি ঘিঞ্জি টোলার মধ্যে। বড় একখানা খোলার চালার সামনে খানকতক দড়ির চারপাই পাতা। ধাওতাল সাহু উঠানের এক পাশের তামাকের ক্ষেত নিড়ানি দিয়া পরিষ্কার করিতেছিল—আমাদের দেখিয়া শশব্যস্তে ছুটিয়া আসিল, কোথায় বসাইবে, কি করিবে ভাবিয়া পায় না, খানিকক্ষণের জন্যে যেন দিশাহারা হইয়া গেল।

—এ কি! হুজুর এসেচেন গরীবের বাড়ী, আসুন আসুন। বসুন হুজুর। আসুন তহশীলদার সাহেব।

ধাওতাল সাহুর বাড়ীতে চাকরবাকর দেখিলাম না। তাহার একজন হৃষ্টপুষ্ট নাতি, নাম রামলখিয়া, সে-ই আমাদেব জন্য ছুটাছুটি করিতে লাগিল। বাড়ীঘর আসবাবপত্র দেখিয়া কে বলিবে ইহা লক্ষপতি মহাজনের বাড়ী।

বামলখিয়া আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে জিন খুরপাচ খুলিয়া ঘোড়াকে ছায়ায় বাঁধিল। আমাদের জন্য পা ধুইবার জল আনিল। ধাওতাল সাহু নিজেই একখানা তালের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। সাহুজির এক নাতনী তামাক সাজিতে ছুটিল। উহাদের যত্নে বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলাম। বলিলাম—ব্যস্ত হবার দবকার নেই সাহুজী, তামাক আনতে হবে না, আমাব কাছে চুরুট আছে।

যত আদর-আপ্যায়নই করুক, আসল ব্যাপার সম্বন্ধে কথা পাড়িতে একটু সমীহ হইতেছিল, কি করিয়া কথাটা পাড়ি?

ধাওতাল সাহু বলিল—ম্যানেজার সাহেব কি এদিকে পাখী মাবতে এসেছিলেন?

—না, তোমার কাছেই এসেছিলাম সাহুজী।

—আমার কাছে হুজুর? কি দরকার বলুন তো?

—আমাদের কাছাবির সদর খাজনার টাকা কম পড়ে গিয়েছে, সাড়ে তিন হাজাব টাকাব বড় দরকার, তোমার কাছে সেজন্যেই এসেছিলাম।

মরীয়া হইয়াই কথাটা বলিয়া ফেলিলাম, বলিতেই যখন হইবে।

ধাওতাল সাহু কিছুমাত্র না ভাবিয়া বলিল—তার জন্যে আর ভাবনা কি হুজুর? সে হয়ে যাবে এখন, তবে তার জন্যে কষ্ট করে আপনার আসবার দরকার কি ছিল? একখানা চিরকুট লিখে তহশীলদার সাহেবের হাতে পাঠিয়ে দিলেই আপনার হুকুম তামিল হত।

মনে ভাবিলাম এখন আসল কথাটা বলিতে হইবে। টাকা আমি ব্যক্তিগতভাবে লইব, কারণ জমিদারের নামে টাকা কর্জ করিবার আমমোক্তারনামা আমাব নাই। একথা শুনিলেও ধাওতাল কি আমায় টাকা দিবে। বিদেশী লোক আমি। আমার কি সম্পত্তি আছে এখানে যে এতগুলি টাকা বিনা বন্ধকে আমায় দিবে? কথাটা একটু সমীহের উপরই বলিলাম।

—সাহুজী, লেখাপড়াটা কিন্তু আমার নামেই করতে হবে। জমিদাবের নামে হবে না।

ধাওতাল সাহু আশ্চর্য হইবার সুরে বলিল—লেখাপড়া কিসের? আপনি আমার বাড়ী ব'য়ে এসেছেন সামান্য টাকার অভাব পড়েছে, তাই নিতে। এ তো আসবার দরকারই ছিল না, হুকুম ক'রে পাঠালেই টাকা দিতাম। তার পর যখন এসেছেনই—তখন লেখাপড়া কিসের? আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান, যখন কাছারিতে আদায় হবে, আমায় পাঠিয়ে দিলেই হবে।

বলিলাম—আমি হ্যাণ্ডনোট দিচ্ছি, টিকিট সঙ্গে ক'রে এনেছি। কিংবা তোমার পাকা খাতা বার কর, সই করে দিয়ে যাই।

ধাওতাল সাহু হাত জোড় করিয়া বলিল—মাপ করুন হুজুর। ও কথাই তুলবেন না। মনে

বড় কষ্ট পাব। কোনো লেখাপড়ার দরকার নেই, টাকা আপনি নিয়ে যান।

আমার পীড়াপীড়িতে ধাওতাল কর্ণপাতও করিল না। ভিতর হইতে আমায় নোটের তাড়া গুনিয়া আনিয়া দিয়া বলিল—হুজুর, একটা কিন্তু অনুরোধ আছে।

—কি?

—এ-বেলা যাওয়া হবে না। সিধা বা'র করে দিই, রান্নাখাওয়া ক'বে তবে যেতে পাবেন।

পুনরায় আপত্তি করিলাম, তাহাও টিকিল না। তহশীলদারকে বলিলাম—বনোয়ারীলাল, রাঁধ্‌তে পারবে তো? আমার দ্বারা সুবিধে হবে না।

বনোয়ারী বলিল—তা চলবে না, হুজুর, আপনাকে রাঁধতে হবে। আমার রান্না খেলে এ পাড়াগাঁয়ে আপনার দুর্নাম হবে। আমি দেখিয়ে দেব এখন।

বিবাট এক সিধা বাহিব করিয়া দিল ধাওতাল সাহুর নাতি। রন্ধনের সময় নাতি-ঠাকুরদা মিলিয়া নানা রকম উপদেশ-পরামর্শ দিতে লাগিল রন্ধন সম্বন্ধে।

ঠাকুরদার অনুপস্থিতিতে নাতি বলিল—বাবুজী, ঐ দেখছেন আমার ঠাকুরদাদা, ওঁব জন্যে সব যাবে। এক লোককে টাকা ধার দিয়েছেন বিনা সুদে, বিনা বন্ধকে, বিনা তমসুকে— এখন আর টাকা আদায় হতে চায় না। সকলকে বিশ্বাস করেন, অথচ লোকে কত ফাঁকিই দিয়েছে। লোকের বাড়ী ব'য়ে টাকা ধার দিয়ে আসেন।

গ্রামের আর একজন লোক বসিয়াছিল, সে বলিল—বিপদে আপদে সাহুজীর কাছে হাত পাতলে ফিরে যেতে কখনো কাউকে দেখি নি বাবুজী। সেকেলে ধরনের লোক, এতবড় মহাজন, কখনো আদালতে মোকদ্দমা করেন নি। আদালতে যেতে ভয় পান। বেজায় ভীতু আর ভালমানুষ।

সেদিন যে-টাকা ধাওতাল সাহুব নিকট হইতে আনিয়াছিলাম, তাহা শোধ দিতে প্রায় ছ'মাস দেরি হইয়া গেল—এই ছ'মাসের মধ্যে ধাওতাল সাহু আমাদের ইসমাইলপুর মহালের ত্রিসীমানা দিয়া হাঁটে নাই, পাছে আমি মনে করি যে সে টাকার তাগাদা করিতে আসিয়াছে। ভদ্রলোক আর কাহাকে বলে!

২

প্রায় বছর-খানেক রাখালবাবুদের বাড়ী যাওয়া হয় নাই, ফসলের মেলার পরে একদিন সেখানে গেলাম। রাখালবাবুর স্ত্রী আমায় দেখিয়া খুব খুশী হইলেন বলিলেন—আপনি আর আসেন না কেন দাদা, কোনো খোঁজখবর নেন না—এই নির্বান্ধব জায়গায় বাঙালীর মুখ দেখা যে কি—আর আমাদের এই অবস্থায়—

বলিয়া দিদি নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। বাড়ীঘরের অবস্থা আগের মতই হীন, তবে এবার ততটা যেন বিশৃঙ্খল নয়। রাখালবাবুর বড় ছেলেটি বাড়ীতেই টিনের মিস্ত্রীর কাজ করে—সামান্যই উপার্জন—তবু যা হয় সংসার একরকম চলিতেছে।

রাখালবাবুর স্ত্রীকে বলিলাম—ছোট ছেলেটিকে অন্তত ওর মামার কাছে কাশীতে রেখে একটু লেখাপড়া শেখান।

তিনি বলিলেন—আপন মামা কোথায় দাদা? দু-তিনখানা চিঠি লেখা হয়েছিল এত বড় বিপদের খবর দিয়ে—দশটি টাকা পাঠিয়ে দিয়ে সেই যে চুপ করল—আর এই দেড় বছর সাড়াশব্দ নেই। তার চেয়ে দাদা, ওরা মকাই কাটবে, জনার কাটবে, মহিষ চরাবে—তবুও তেমন মামার দোরে যাবে না।

আমি তখনই ঘোড়ায় ফিরিব—দিদি কিছুতেই আসিতে দিলেন না। সে-বেলা থাকিতে হইবে। তিনি কি-একটা খাবার করিয়া আমায় না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না।

অগত্যা অপেক্ষা করিতে হইল। মকাইয়ের ছাতুর সহিত ঘি ও চিনি মিশাইয়া এক রকমের লাড্ডু বাঁধিয়া ও কিছু হালুয়া তৈরী করিয়া দিদি খাইতে দিলেন। দরিদ্র সংসারে যতটা আদর-অভ্যর্থনা করা যাইতে পারে, তাহার ত্রুটি করিলেন না।

বলিলেন—দাদা, ভাদ্র মাসের মকাই রেখেছিলাম আপনার জন্যে তুলে। আপনি ভুট্টাপোড়া খেতে ভালবাসেন, তাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—কোথায় পেলেন? কিনেছিলেন?

—না। ক্ষেতে কুড়ুতে যাই, ফসল কেটে নিয়ে গেলে যে-সব ভাঙা, ঝরা ভুট্টা চাষারা ক্ষেতে রেখে যায়—গাঁয়ের মেয়েরাও যায়, আমিও যাই ওদের সঙ্গে—এক ঝুড়ি ক'রে রোজ কুড়োতাম।

আমি অবাক হইয়া বলিলাম—ক্ষেতে কুড়ুতে যেতেন?

—হ্যাঁ রাত্রে যেতাম, কেউ টের পেত না। গাঁয়ের কত মেয়েরা তো যায়। তাদের সঙ্গে এই ভাদ্র মাসে কম্‌সে-কম দশ টুক্‌রী ভুট্টা কুড়িয়ে এনেছিলাম।

মনে বড় দুঃখ হইল। এ কাজ গরীব গাঙ্গোতার মেয়েরা করিয়া থাকে—এদেশের ছত্রি বা রাজপুত মেয়েরা গরীব হইলেও ক্ষেতের ফসল কুড়াইতে যায় না। আর একজন বাঙালীর মেয়েকে এ-কাজ করিতে শুনিলে মনে বড়ই লাগে। এই অশিক্ষিত গাঙ্গোতাদের গ্রামে বাস করিয়া দিদি এ-সব হীনবৃত্তি শিখিয়াছেন—সংসারের দারিদ্র্যও যে তাহার একটা প্রধান কারণ সে-বিষয়ে ভুল নাই। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিলাম না, পাছে মনে কষ্ট দেওয়া হয়। এই নিঃস্ব বাঙালী পরিবার বাংলার কোনো শিক্ষাসংস্কৃতি পাইল না, বছর কয়েক পরে চাষী গাঙ্গোতায় পরিণত হইবে, ভাষায়, চাল-চলনে, হাবভাবে। এখন হইতেই সে-পথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে।

রেলস্টেশন হইতে বহু-দূরে অজ পল্লীগ্রামে আমি আরও দু একটি এরকম বাঙালী পরিবার দেখিয়াছি। এই সব পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া যে কি দুঃসাধ্য ব্যাপার! এমনি আর একটি বাঙালী ব্রাহ্মণ পরিবার জানিতাম—দক্ষিণ-বিহারে এক অজ গ্রামে তাঁহারা থাকিতেন। অবস্থা নিতান্তই হীন, বাড়ীতে তাঁদের তিনটি মেয়ে ছিল, বড়টির বয়স একুশ-বাইশ বছর, মেজটির কুড়ি, ছোটটিও সতের। ইহাদের বিবাহ হয় নাই, হইবার কোনো উপায়ও নাই—স্বঘর জোটানো, বাঙালী পাত্রেব সন্ধান পাওয়া এ সব অঞ্চলে অত্যন্তই কঠিন।

বাইশ বছরের বড় মেয়েটি দেখিতেও সুশ্রী—এক বর্ণও বাংলা জানে না—আকৃতি-প্রকৃতিতে খাঁটি দেহাতী বিহারী মেয়ে—মাঠ হইতে মাথায় মোট করিয়া কলাই আনে, গমের ভুষি আনে।

এই মেয়েটির নাম ছিল ধ্রুবা। পুরাদস্তুর বিহারী নাম।

তাহার বাবা প্রথমে এই গ্রামে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারী করিতে আসিয়া জমিজমা লইয়া চাষবাসের কাজও আরম্ভ করেন। তারপর তিনি মারা যান, বড় ছেলে একেবারে হিন্দুস্থানী—চাষবাস দেখাশুনা করিত, বয়স্থা ভগ্নীদের বিবাহের যোগাড় সে চেষ্টা করিয়াও করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ পণ দিবার ক্ষমতা তাদের আদৌ ছিল না জানি।

ধ্রুবা ছিল একেবারে কপালকুণ্ডলা। আমাকে ভাইয়া অর্থাৎ দাদা বলিয়া ডাকিত। গায়ে অসীম শক্তি, গম পিষিতে, উদুখলে ছাতু কুটিতে, মোট বাহিয়া আনিতে, গরু মহিষ চরাইতে চমৎকার মেয়ে, সংসারের কাজকর্মে ঘুণ। তাহার দাদা এ প্রস্তাবও করিয়াছিলেন যে, এমন যদি কোনো পাত্র পান, তিনটি মেয়েকেই একপাত্রে সম্প্রদান করিবেন। মেয়ে তিনটিরও নাকি অমত ছিল না।

মেজ মেয়ে জবাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—বাংলা দেখতে ইচ্ছে হয়?

জবা বলিয়াছিল—নেই ভেইয়া, উহাকো পানি বড্ডি নরম ছে—

শুনিয়াছিলাম বিবাহ করিতে ধ্রুবারও খুব আগ্রহ। সে নিজে নাকি কাহাকে বলিয়াছিল, তাহাকে

সে বিবাহ করিবে, তাহার বাড়ীতে গরুর দোহাল বা উদুখলওয়ালী ডাকিতে হইবে না—সে একাই ঘণ্টায় পাঁচ সের গম কুটিয়া ছাতু করিতে পারে।

হায় হতভাগিনী বাঙালী কুমারী। এত বৎসর পরেও সে নিশ্চয় আজও গাঙ্গোতীন সাজিয়া দাদার সংসারে যব কুটিতেছে, কলাইয়ের বোঝা মাথায় করিয়া মাঠ হইতে আনিতেছে, কে আর দরিদ্রা দেহাতী বয়স্কা মেয়েকে বিনাপণে বিবাহ করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে, মঙ্গলশঙ্খ ও উলুধ্বনির মধ্যে!

শান্ত মুক্ত প্রান্তরে যখন সন্ধ্যা নামে, দূর পাহাড়ের গা বাহিয়া যে সরু পথটি দেখা যায় ঘনবনের মধ্যে চেরা সিঁথির মত, ব্যর্থযৌবনা, দরিদ্রা ধ্রুবা হয়তো আজও এত বছরের পরে সেই পথ দিয়া শুক্‌নো কাঠের বোঝা মাথায় করিয়া পাহাড় হইতে নামে—এ ছবি কতবার কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি—তেমনি প্রত্যক্ষ করিয়াছি আমার দিদি, রাখালবাবুর স্ত্রী, হয়তো আজও বৃদ্ধা গাঙ্গোতীনদের মত গভীর রাত্রে চোরের মত লুকাইয়া ক্ষেতে খামারে শুক্‌নো তলায়-ঝরা ভুট্টা ঝুড়ি করিয়া কুড়াইয়া ফেরেন।

৩

ভানুমতীদের ওখান হইতে ফিরিবার পথে শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি সেবার ঘোর বর্ষা নামিল। দিনরাত অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ঘন কাজল-কালো মেঘপুঞ্জে আকাশ ছাইয়াছে; নাঢ়া ও ফুলকিয়া বইহারের দিগন্তরেখা বৃষ্টির ধোঁয়ায় ঝাপসা, মহালিখারূপের পাহাড় মিলাইয়া গিয়াছে—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের শীর্ষদেশ কখনও ঈষৎ অস্পষ্ট দেখা যায়, কখনও যায় না। শুনিলাম পূর্বে কুশী ও দক্ষিণে কারো নদীতে বন্যা আসিয়াছে।

মাইলের পর মাইল ব্যাপী কাশ ও ঝাউ বন বর্ষার জলে ভিজিতেছে, আমার আপিস ঘরের বারান্দায় চেয়ার পাতিয়া বসিয়া দেখিতাম, আমার সামনে কাশবনের মধ্যে একটা বনঝাউয়ের ডালে একটা সঙ্গীহারা ঘুঘু বসিয়া অঝোরে ভিজিতেছে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা একভাবেই বসিয়া আছে—মাঝে মাঝে পালক উস্‌কোখুস্‌কো করিয়া ঝলাইয়া বৃষ্টির জল আটকাইবার চেষ্টা করে, কখনও এমনিই বসিয়া থাকে।

এমন দিনে আপিস-ঘরে বসিয়া দিন কাটানো আমার পক্ষে কিন্তু অসম্ভব হইয়া উঠিত। ঘোড়ায় জিন কষিয়া বর্ষাতি চাপাইয়া বাহির হইয়া পড়িতাম। সে কি মুক্তি! কি উদ্দাম জীবনানন্দ! আর কি অপরূপ সবুজের সমুদ্র চারিদিকে—বর্ষার জলে নবীন, সতেজ, ঘনসবুজ কাশের বন গজাইয়া উঠিয়াছে—যতদূর দৃষ্টি চলে, এদিকে নাঢ়া বইহারের সীমানা ওদিকে মোহনপুরা অরণ্যের অস্পষ্ট নীল সীমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত থৈ থৈ করিতেছে এই সবুজের সমুদ্র—বর্ষাসজল হাওয়ায় মেঘকজ্জল আকাশের নীচে এই দীর্ঘ মরকতশ্যাম তৃণভূমির মাথায় ঢেউ খেলিয়া যাইতেছে—আমি যেন একা এ অকূল-সমুদ্রের নাবিক—কোন্ রহস্যময় স্বপ্ন বন্দরের উদ্দেশে পাড়ি দিয়াছি।

এই বিস্তৃত মেঘছায়াশ্যামল মুক্ত তৃণভূমির মধ্যে ঘোড়া ছুটাইয়া মাইলের পর মাইল যাইতাম—কখনও সরস্বতী কুণ্ডীর বনের মধ্যে ঢুকিয়া দেখিয়াছি—প্রকৃতির এই অপূর্ব নিভৃত সৌন্দর্যভূমি যুগলপ্রসাদের স্বহস্তে রোপিত নানাজাতীয় বন্য ফুলে ও লতায় সজ্জিত হইয়া আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সরস্বতী হ্রদ ও তাহার তীরবর্তী বনানীর মত সৌন্দর্যভূমি খুব বেশী নাই—এ নিঃসন্দেহে বলিতে পারি। হ্রদের ধারে রেড ক্যাম্পিয়নের মেলা বসিয়াছে এই বর্ষাকালে—হ্রদের জলের ধারের নিকট। জলজ ওয়াটারক্রোফ্‌টের বড় বড় নীলাভ সাদা ফুলে ভরিয়া আছে। যুগলপ্রসাদ সেদিনও কি একটা বন্যলতা আনিয়া লাগাইয়া গিয়াছে জানি।

সে আজমাবাদ কাছারিতে মুহুরীর কাজ করে বটে, কিন্তু তাহার মন পড়িয়া থাকে সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী লতাবিতানে ও বনপুষ্পের কুঞ্জে।

সরস্বতী কুণ্ডীর বন হইতে বাহির হইতাম—আবার মুক্ত প্রান্তর, আবার দীর্ঘ তৃণভূমি—বনের মাথায় ঘন নীল বর্ষার মেঘ আসিয়া জমিতেছে, সমগ্র জলভার নামাইয়া রিক্ত হইবার পূর্বেই আবার উড়িয়া আসিতেছে নবমেঘপুঞ্জ—একদিকের আকাশে এক অদ্ভুত ধরনের নীল রং ফুটিয়াছে—তাহার মধ্যে একখণ্ড লঘুমেঘ অস্তদিগন্তের রঙে রঞ্জিত হইয়া বহির্বিশ্বের দিগন্তে কোন্ অজানা পর্বতশিখরের মত দেখা যাইতেছে।

সন্ধ্যার বিলম্ব নাই। দিগন্তহারা ফুলকিয়া বইহারের মধ্যে শিয়াল ডাকিয়া উঠিত—একে মেঘের অন্ধকার, তার উপর সন্ধ্যার অন্ধকার নামিতেছে—ঘোড়ার মুখ কাছারির দিকে ফিরাইতাম।

কতবার এই ক্ষান্তবর্ষণ মেঘ-থমকানো সন্ধ্যায় এই মুক্ত প্রান্তরে সীমাহীনতার মধ্যে কোন্ দেবতার স্বপ্ন যেন দেখিয়াছি—এই মেঘ, এই সন্ধ্যা, এই বন, কোলাহলরত শিয়ালের দল, সরস্বতী হ্রদের জলজ পুষ্প, মঞ্চী, রাজু পাঁড়ে, ভানুমতী, মহালিখারূপের পাহাড়, সেই দরিদ্র গোঁড়-পরিবার, আকাশ, ব্যোম সবই তাঁর সুমহতী কল্পনায় একদিন ছিল বীজরূপে নিহিত—তাঁরই আশীর্বাদ আজিকার এই নবনীলনীরদমালার মতই সমুদয় বিশ্বকে অস্তিত্বের অমৃতধারায় সিক্ত করিতেছে—এই বর্ষা-সন্ধ্যা তাঁরই প্রকাশ, এই মুক্ত জীবনানন্দ তাঁরই বাণী, অন্তরের অন্তরে যে বাণী মানুষকে সচেতন করিয়া তোলে। সে দেবতাকে ভয় করিবাব কিছুই নাই—এই সুবিশাল ফুলকিয়া বইহারের চেয়েও, ঐ বিশাল মেঘভরা আকাশের চেয়েও সীমাহীন, অনন্ত তাঁর প্রেম ও আশীর্বাদ। যে যত হীন, যে যত ছোট, সেই বিরাট দেবতার অদৃশ্য প্রসাদ ও অনুকম্পা তার উপর তত বেশী।

আমার মনে যে দেবতার স্বপ্ন জাগিত, তিনি যে শুধু প্রবীণ বিচারক, ন্যায় ও দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী কিংবা অব্যয়, অক্ষয় প্রভৃতি দুরূহ দার্শনিকতার আবরণে আবৃত ব্যাপার তাহা নয়—নাঢ়া বইহারের কি আজমাবাদের মুক্ত প্রান্তরে কত গোধূলীবেলায় রক্তমেঘস্তূপের, কত দিগন্তহারা জনহীন জ্যোৎস্নালোকিত প্রান্তরের দিকে চাহিয়া মনে হইত তিনিই প্রেম ও রোমান্স, কবিতা ও সৌন্দর্য, শিল্প ও ভাবুকতা—তিনি প্রাণ দিয়া ভালবাসেন, সুকুমার কলাবৃত্তি দিয়া সৃষ্টি করেন, নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিয়া থাকেন নিঃশেষে প্রিয়জনের প্রীতিব জন্য—আবার বিরাট বৈজ্ঞানিকের শক্তি ও দৃষ্টি দিয়া গ্রহ-নক্ষত্র-নীহারিকার সৃষ্টি কবেন।

৪

এমনি এক বর্ষামুখর শ্রাবণ-দিনে ধাতুরিয়া ইসমাইলপুর কাছারিতে আসিয়া হাজির।

অনেক দিন পরে উহাকে দেখিয়া খুশী হইলাম।

—কি ব্যাপার, ধাতুরিয়া? ভালো আছিস তো?

যে ছোট পুঁটুলির মধ্যে তাহার সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি বাঁধা, সেটা হাত হইতে নামাইয়া আমায় হাত তুলিয়া নমস্কার করিয়া বলিল—বাবুজী, নাচ দেখাতে এলাম। বড় কষ্টে পড়েছি, আজ এক মাস কেউ নাচ দেখেনি। ভাবলাম, কাছারিতে বাবুজীর কাছে যাই, সেখানে গেলে তাঁরা ঠিক দেখবেন। আরো ভাল ভাল নাচ শিখেছি, বাবুজী।

ধাতুরিয়া যেন আরও রোগা হইয়া গিয়াছে। উহাকে দেখিয়া কষ্ট হইল।

—কিছু খাবি ধাতুরিয়া?

ধাতুরিয়া সলজ্জভাবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, সে খাইবে।

আমার ঠাকুরকে ডাকিয়া ধাতুরিয়াকে কিছু খাবার দিতে বলিলাম। তখন ভাত ছিল না, ঠাকুর

দুধ ও চিঁড়া আনিয়া দিল। ধাতুরিয়ার খাওয়া দেখিয়া মনে হইল, সে অন্ততঃ দু-দিন কিছু খাইতে পায় নাই।

সন্ধ্যার পূর্বে ধাতুরিয়া নাচ দেখাইল। কাছারির প্রাঙ্গণে সেই বন্য অঞ্চলের অনেক লোক জড় হইয়াছিল ধাতুরিয়ার নাচ দেখিবার জন্য। আগের চেয়েও ধাতুরিয়া নাচে অনেক উন্নতি করিয়াছে। ধাতুরিয়ার মধ্যে যথার্থ শিল্পীর দরদ ও সাধনা আছে। আমি নিজে কিছু দিলাম, কাছারির লোক চাঁদা করিয়া কিছু দিল। ইহাতে তাহার কত দিনই বা চলিবে?

ধাতুরিয়া পরদিন সকালে আমার নিকট বিদায় লইতে আসিল।

—বাবুজী, কবে কলকাতা যাবেন?

—কেন বল তো?

—আমায় কলকাতা নিয়ে যাবেন বাবুজী? সেই যে আপনাকে বলেছিলাম?

—তুমি এখন কোথায় যাবে ধাতুরিয়া? খেয়ে তবে যেও।

—না বাবুজী, ঝল্লুটোলাতে একজন ভুঁইহার বাভনের বাড়ী, তার মেয়ের বিয়ে হবে, সেখানে হয়তো নাচ দেখতে পারে। সেই চেষ্টাতে যাচ্ছি। এখান থেকে আট ক্রোশ রাস্তা—এখন রওনা হলে বিকেল নাগাদ পৌঁছব।

ধাতুরিয়াকে ছাড়িয়া দিতে মন সরে না। বলিলাম—কাছারিতে যদি কিছু জমি দিই, তবে এখানে থাকতে পারবে? চাষবাস কর, থাক না কেন?

মটুকনাথ পণ্ডিতেরও দেখিলাম খুব ভাল লাগিয়াছে ধাতুরিয়াকে। তাহার ইচ্ছা ধাতুরিয়াকে সে টোলের ছাত্র করিয়া লয়। বলিল—বলুন না ওকে বাবুজী, দু-বছরের মধ্যে মুগ্ধবোধ শেষ করিয়ে দেব। ও থাকুক এখানে।

জমি দেওয়ার কথায় ধাতুরিয়া বলিল—বাবুজী, আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত, আপনার বড় দয়া। কিন্তু চাষ-কাজ কি আমায় দিয়ে হবে? ওদিকে আমার মন নেই যে! নাচ দেখাতে পেলে আমার মনটা ভারি খুশি থাকে। আর কিছু তেমন ভাল লাগে না।

—বেশ, মাঝে মাঝে নাচ দেখাবে, চাষ করলে তো জমির সঙ্গে তোমায় কেউ শেকল দিয়ে বেঁধে রাখবে না?

ধাতুরিয়া খুব খুশী হইল। বলিল—আপনি যা বলবেন আমি তা শুনব। আপনাকে বড় ভাল লাগে বাবুজী। আমি ঝল্লুটোলা থেকে ঘুরে আসি—আপনার এখানেই আসব।

মটকুনাথ পণ্ডিত বলিল—আর সেই সময় তোমাকে টোলেও ঢুকিয়ে নেব। তুমি না হয় রাত্রে এসে প'ড়ো আমার কাছে। মূর্খ থাকা কিছু নয়, কিছু ব্যাকরণ, কিছু কাব্য লব্জ রাখা দরকার।

ধাতুরিয়া তাহার পর বসিয়া বসিয়া নৃত্যশিল্পের বিষয়ে নানা কথা কি সব বলিল, আমি তত বুঝিলাম না। পূর্ণিয়ার হো-হো নাচের ভঙ্গীর সঙ্গে ধরমপুর অঞ্চলের ঐ শ্রেণীর নাচের কি তফাৎ—সে নিজে নূতন কি একটা হাতের মুদ্রা প্রবর্তন করিয়াছে—এই সব ধরনের কথা।

—বাবুজী, আপনি বালিয়া জেলায় ছট্ পরবের সময় মেয়েদের নাচ দেখেছেন? ওর সঙ্গে ছক্করবাজি নাচের বেশ মিল থাকে একটা জায়গায়। আপনাদের দেশে নাচ কেমন হয়?

আমি তাহাকে গত বৎসর ফসলের মেলায় দৃষ্ট 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচের কথা বলিলাম। ধাতুরিয়া হাসিয়া বলিল—ও কিছু না বাবুজী, ও মুঙ্গেরের গেঁয়ো নাচ। গাঙ্গোতাদের খুশি করবার নাচ। ওর মধ্যে খাঁটি জিনিস কিছু নেই; ও তো সোজা।

বলিলাম—তুমি জানো? নেচে দেখাও তো?

ধাতুরিয়া দেখিলাম নিজের শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ। 'ননীচোর নাটুয়া'র নাচ সত্যই সে চমৎকার নাচিল—সেই খুঁৎ-খুঁৎ করিয়া ছেলেমানুষের মত কান্না, সেই চোরা ননী বিতরণ করিবার ভঙ্গী—সেই সব। তাহাকে আরও মানাইল এই জন্য যে, সে সত্যই বালক।

ধাতুরিয়া বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল—এত মেহেরবানিই যখন করলেন বাবুজী, একবার কলকাতায় কেন নিয়ে চলুন না? ওখানে নাচের আদর আছে।

এই ধাতুরিয়ার সহিত আমার শেষ দেখা।

মাস-দুই পরে শোনা গেল, বি এন ডব্লিউ রেললাইনের কাটারিয়া স্টেশনের অদূরে লাইনের উপর একটি বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়—নাটুয়া বালক ধাতুরিয়ার মৃতদেহ বলিয়া সকলে চিনিয়াছে। ইহা আত্মহত্যা কি দুর্ঘটনা তাহা বলিতে পারিব না। আত্মহত্যা হইলে, কি দুঃখেই বা সে আত্মহত্যা করিল?

সেই বন্য অঞ্চলে দু-বছর কাটাইবার সময় যতগুলি নরনারীর সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম—তার মধ্যে ধাতুরিয়া ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতিব। তাহার মধ্যে যে একটি নির্লোভ সদাচঞ্চল, সদানন্দ, অবৈষয়িক, খাঁটি শিল্পীমনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, শুধু সে বন্য দেশ কেন, সভ্য অঞ্চলের মানুষের মধ্যেও তা সুলভ নয়।

৫

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল।

নাঢ়া বইহার ও লবটুলিয়ার সমুদয় জঙ্গল-মহাল বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আর কোথাও পূর্বের মত বন নাই। প্রকৃতি কত বৎসর ধরিয়া নির্জনে নিভৃতে যে কুঞ্জ রচনা করিয়া রাখিয়াছিল, কত কেঁয়োঝাঁকার নিভৃত লতা-বিতান, কত স্বপ্নভূমি—জনমজুরেরা নির্মম হাতে সব কাটিয়া উড়াইয়া দিল, যাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল পঞ্চাশ বৎসরে, তাহা গেল একদিনে। এখন কোথাও আর সে রহস্যময় দূরবিসর্পী প্রান্তর নাই, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে যেখানে মায়াপরীরা নামিত, মহিষের দেবতা দয়ালু টাঁড়বারো হাত তুলিয়া দাঁড়াইয়া বন্য মহিষদলকে ধ্বংস হইতে রক্ষা করিত।

নাঢ়া বইহারের নাম ঘুচিয়া গিয়াছে, লবটুলিয়া এখন একটি বস্তি মাত্র। যে দিকে চোখ যায়, শুধু চালে চালে লাগানো অপকৃষ্ট খোলার ঘর। কোথাও বা কাশের ঘর। ঘন ঘিঞ্জি বসতি—টোলায় টোলায় ভাগ করা—ফাঁকা জায়গায় শুধুই ফসলের ক্ষেত। এতটুকু ক্ষেতের চারদিকে ফণিমনসার বেড়া। ধরণীর মুক্তরূপ ইহারা কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

আছে কেবল একটি স্থান, সরস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী বনভূমি।

চাকুরির খাতিরে মনিবের স্বার্থরক্ষার জন্য সব জমিতেই প্রজাবিলি করিয়াছি বটে, কিন্তু যুগলপ্রসাদের হাতে সাজানো সরস্বতী-তীরের অপূর্ব বনকুঞ্জ কিছুতেই প্রাণ ধরিয়া বন্দোবস্ত কবিতে পারি নাই। কতবার দলে দলে প্রজারা আসিয়াছে সরস্বতী কুণ্ডীর পাড়ের জমি লইতে—বর্ধিত হারে সেলামী ও খাজনা দিতেও চাহিয়াছে, কারণ একে ঐ জমি খুব উর্বরা, তাহার উপর নিকটে জল থাকায় মকাই প্রভৃতি ফসল ভাল জন্মাইবে; কিন্তু আমি রাজী হই নাই।

তবে কতদিন আর রাখিতে পারিব? সদর আপিস হইতে মাঝে মাঝে চিঠি আসিতেছে, সরস্বতী কুণ্ডীর জমি আমি কেন বিলি করিতে বিলম্ব করিতেছি। নানা ওজর-আপত্তি তুলিয়া এখনও পর্যন্ত রাখিয়াছি বটে, কিন্তু বেশি দিন পারিব না। মানুষের লোভ বড় বেশী, দুটি ভুট্টার ছড়া আর চীনাঘাসের এক কাঠা দানার জন্য প্রকৃতির অমন স্বপ্নকুঞ্জ ধ্বংস করিতে তাহাদের কিছুমাত্র বাধিবে না, জানি। বিশেষ করিয়া এখানকার মানুষে গাছপালার সৌন্দর্য বোঝে না, রম্য ভূমিশ্রীর মহিমা দেখিবার চোখ নাই, তাহারা জানে পশুর মত পেটে খাইয়া জীবনযাপন করিতে। অন্য দেশ হইলে আইন করিয়া এমন সব স্থান সৌন্দর্যপিপাসু প্রকৃতি-রসিক নরনারীর জন্য সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, যেমন আছে কালিফোর্নিয়ার যোসেমাই ন্যাশনাল পার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকায় আছে ক্রুগার ন্যাশনাল পার্ক, বেলজিয়ান

কঙ্গোতে আছে পার্ক ন্যাশনাল আলবার্ট। আমার জমিদাররা ও ল্যাণ্ডস্কেপ বুঝিবে না, বুঝিবে সেলামীর টাকা, খাজনার টাকা, আদায় ইরশাল, হস্তবুদ।

এই জন্মান্ধ মানুষের দেশে একজন যুগলপ্রসাদ কি করিয়া জন্মিয়াছিল জানি না—শুধু তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আজও সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছি।

কিন্তু কতদিন রাখিতে পারিব?

যাক্, আমারও কাজ শেষ হইয়া আসিল বলিয়া।

প্রায় তিন বছর বাংলা দেশে যাই নাই—মাঝে মাঝে বাংলা দেশের জন্য মন বড় উতলা হয়। সাবা বাংলা দেশ যেন আমার গৃহ—তরুণী কল্যাণী বধূ যেখানে আপন হাতে সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখায়; এখানকার এমন লক্ষ্মীছাড়া উদাস ধূ ধূ প্রান্তর ও ঘন বনানী নয়—যেখানে নারীর হাতের স্পর্শ নাই।

কি হইতে যেন মনে অকারণ আনন্দের বান ডাকিল, তাহা জানি না। জ্যোৎস্না রাত্রি—তখনই ঘোড়ায় জিন কষিয়া সরস্বতী কুণ্ডীর দিকে রওনা হইলাম, কারণ তখন নাঢ়া ও লবটুলিয়া বইহারের বনরাজি শেষ হইয়া আসিয়াছে—যাহা কিছু অরণ্য-শোভা ও নির্জনতা আছে তখনও সরস্বতীর তীরেই। আমি মনে মনে বেশ বুঝিলাম, এ আনন্দকে উপভোগ করিবার একমাত্র পটভূমি হইতেছে সরস্বতী হ্রদের তীরবর্তী বনানী।

ঐ সরস্বতীর জল জ্যোৎস্নালোকে চিক্ চিক্ করিতেছে—চিক্ চিক্ করিতেছে কি শুধু? ঢেউয়ে ঢেউয়ে জ্যোৎস্না ভাঙিয়া পড়িতেছে। নির্জন, স্তব্ধ বনানী হ্রদেব জলের তিন দিক বেষ্টন করিয়া, বন্য লাল হাঁসের কাকলী, বন্য শেফালীপুষ্পেব সৌরভ, কাবণ যদিও জ্যৈষ্ঠ মাস, শেফালী ফুল এখানে বারো মাস ফোটে।

কতক্ষণ হ্রদের তীরে এদিকে ওদিকে ইচ্ছামত ঘোড়া চালাইয়া বেড়াইলাম। হ্রদের জলে পদ্ম ফুটিয়াছে, তীরের দিকে ওয়াটারক্রোফ্‌ট ও যুগলপ্রসাদের আনীত স্পাইডার লিলির ঝাড় বাঁধিয়াছে। দেশে চলিয়াছি কতকাল পরে, এ নির্জন অরণ্যবাস হইতে মুক্তি পাইব, সেখানে বাঙালী মেয়ের হাতে রান্না খাদ্য খাইয়া বাঁচিব, কলিকাতায় এক-আধ দিন থিয়েটার-বায়োস্কোপ দেখিব, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কতকাল পরে আবাব দেখা হইবে।

এইবার ধীরে ধীরে সে অননুভূত আনন্দের বন্যা আমার মনের কূল ভাসাইয়া দোলা দিতে লাগিল। যোগাযোগ হইয়াছিল বোধ হয় অদ্ভুত—এতদিন পরে দেশে প্রত্যাবর্তন, সবস্বতী হ্রদের জ্যোৎস্নালোকিত বারিরাশি ও বনফুলের শোভা, বন্য শেফালীর জ্যোৎস্না মাখানো সুবাস, শান্ত স্তব্ধতা—ভাল ঘোড়ার চমৎকার কোণাকুনি ক্যান্টার চাল, হু হু হাওয়া—সব মিলিয়া স্বপ্ন! স্বপ্ন! আনন্দের ঘন নেশা! আমি যেন যৌবনোন্মত্ত তরুণ দেবতা, বাধাবন্ধনহীন, মুক্ত গতিতে সময়ের সীমা পার হইয়া চলিয়াছি--এই চলাই যেন আমার অদৃষ্টের জয়লিপি, আমার সৌভাগ্য, আমার প্রতি কোন্ সুপ্রসন্ন দেবতার পরম আশীর্বাদ!

হয়তো আর ফিরিব না—দেশে ফিরিয়া মরিয়াও তো যাইতে পারি। বিদায়—সরস্বতী কুণ্ডী, বিদায়—তীরতরু-সারি, বিদায়—জ্যোৎস্নালোকিত মুক্ত বনানী। কলিকাতার কোলাহলমুখর রাজপথে দাঁড়াইয়া তোমার কথা মনে পড়িবে, বিস্মৃত জীবনদিনের বীণার অনতিস্পষ্ট ঝঙ্কারের মত—মনে পড়িবে যুগলপ্রসাদের আনা গাছগুলির কথা, জলের ধারে স্পাইডার লিলি ও পদ্মের বন, তোমার বনের নিবিড় ডালপালার মধ্যে স্তব্ধ মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক, অস্ত-মেঘের ছায়ায় রাঙা ময়নাকাঁটার গুঁড়ি ও ডাল, তোমার নীল জলেব উপরকার নীল আকাশে উড়ন্ত সিল্লি ও লাল হাঁসের সারি—জলের ধারের নরম কাদার উপরে হরিণ-শিশুর পদচিহ্ন...নির্জনতা, সুগভীর নির্জনতা।...বিদায় সরস্বতী কুণ্ডী।

ফিরিবার পথে দেখি সরস্বতী হ্রদের বন হইতে বাহির হইয়া মাইলখানেক দূরে একটা জায়গায় বন কাটিয়া একখানা ঘর বসাইয়া মানুষ বাস করিতেছে—এই জায়গাটার নাম হইয়াছে নয়া

লবটুলিয়া—যেমন নিউ সাউথ ওয়েল্‌স্‌ বা নিউ ইয়র্ক। নূতন গৃহস্থ পরিবার আসিয়া বনের ডালপালা কাটিয়া (নিকটে বড় বন নাই, সুতরাং সরস্বতীর তীরবর্তী বন হইতেই আমদানী নিশ্চয়ই) ঘাসের ছাওয়া তিন-চারখানা নীচু নীচু খুপরি বাঁধিয়াছে। তারই নীচে এখনও পর্যন্ত ভিজা দাওয়ার উপর একটা নারিকেল কিংবা কড়ুয়া তেলের গলা-ভাঙা বোতল, একটি উলঙ্গ হামাগুড়িরত কৃষ্ণকায় শিশু, কয়েকটি সিহোড়া গাছের সরু ডালে বোনা ঝুড়ি, একটি মোটা রূপার অনন্ত পরা যক্ষের মত কালো আঁটসাঁট গড়নের বউ, খানকয়েক পিতলের লোটা ও থালা ও কয়েকখানা দা, খোন্তা, কোদাল। ইহাই লইয়া ইহারা প্রায় সবাই সংসার করে। শুধু লবটুলিয়া কেন, ইসমাইলপুর ও নাঢ়া বইহারের সর্বত্রই এই রূপ। কোথা হইতে উঠিয়া আসিয়াছে তাই ভাবি; ভদ্রাসন নাই, পৈতৃক ভিটা নাই, গ্রামেব মায়া নাই, প্রতিবেশীর স্নেহমমতা নাই—আজ ইসমাইলপুরের বনে, কাল মুঙ্গেরের দিয়ারা চরে, পরশু জয়ন্তী পাহাড়ের নীচে তরাই ভূমিতে—সর্বত্রই ইহাদের গণ্ডি, সর্বত্রই ইহাদের ঘর।

পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ পাইয়া দেখি রাজু পাঁড়ে এই ধরনের একটি গৃহস্থবাড়ীতে বসিয়া ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেছে। উহাকে দেখিয়া ঘোড়া হইতে নামিলাম। আমায় সবাই মিলিযা খাতির করিয়া বসাইল। রাজুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম সে এখানে কবিরাজি করিতে আসিয়াছিল। ভিজিট পাইয়াছে চারি কাঠা যব এবং নগদ আট পয়সা। ইহাতেই সে মহা খুশী হইয়া ইহাদের সহিত আসর জমাইয়া দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা জুড়িয়া দিয়াছে।

আমায় বলিল—বসুন, একটা কথাব মীমাংসা করে দিন তো বাবুজী! আচ্ছা, পৃথিবীব কি শেষ আছে? আমি তো এদের বলছি বাবু, যেমন আকাশের শেষ নেই, পৃথিবীবও তেমনি শেষ নেই। কেমন, তাই না বাবুজী?

বেড়াইতে আসিযা এমন গুরুতর জটিল বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা ভাবি নাই।

রাজু পাঁড়ের দার্শনিক মন সর্বদাই জটিল তত্ত্ব লইয়া কারবার করে জানি এবং ইহাও জানি যে ইহাদের সমাধানে সে সর্বদাই মৌলিক চিন্তার পরিচয় দিয়া আসিতেছে, যেমন রামধনু উইযের টিবি হইতে জন্মায়, নক্ষত্রদল যমের চর, মানুষ কি পরিমাণে বাড়িতেছে—তাহাই সরেজমিনে তদারকি করিবার জন্য যম কর্তৃক উহারা প্রেরিত হয়—ইত্যাদি।

পৃথিবীতত্ত্ব যতটা আমার জানা আছে বুঝাইয়া বলিতে রাজু বলিল—কেন সূর্য পূর্বদিকে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়, আচ্ছা কোন্ সাগর থেকে সূর্য উঠছে আব কোন্ সাগরে নামছে এর কেউ নিরাকরণ করতে পেরেছে? রাজু সংস্কৃত পড়িয়াছে, 'নিরাকরণ' কথাটা ব্যবহার করাতে গাঙ্গোতা গৃহস্থ ও তাহার পরিবরবর্গ সপ্রশংস ও বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে রাজুর দিকে চাহিয়া রহিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবিল ইংরেজীনবিশ বংগালীবাবুকে কবিরাজ মশায় একেবারে কি অথৈ জলে টানিযা লইয়া ফেলিয়াছে। বংগালীবাবু এবার হাবুডুবু খাইয়া মরিল দেখিতেছি।

বলিলাম—রাজু, তোমাব চোখের ভুল, সূর্য কোথাও যায় না, এক জায়গায় স্থির আছে।

রাজু আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। গাঙ্গোতার দল হা-হা করিয়া তাচ্ছিল্যের সুরে হাসিয়া উঠিল। হায় গ্যালিলিও! এই নাস্তিক বিচারমূঢ় পৃথিবীতেই তুমি কারারুদ্ধ হইয়াছিলে!

বিস্ময়ের প্রথম রেশ কাটিয়া গেলে রাজু আমায় বলিল—সূরযনারায়ণ পূর্বে উদয়-পাহাড়ে ওঠেন না বা পশ্চিম-সমুদ্রে অস্ত যান না?

বলিলাম—না।

—এ-কথা ইংরিজি বইতে লিখেছে?

—হ্যাঁ।

জ্ঞান মানুষকে সত্যই সাহসী করে; যে শান্ত, নিরীহ রাজু পাঁড়ের মুখে কখনও উঁচু সুরে কথা শুনি নাই—সতেজে, সদর্পে বলিল—ঝুট্‌ বাত বাবুজী। উদয়পাহাড়ের যে গুহা থেকে সূরযনারায়ণ

রোজ ওঠেন সে গুহা একবার মুঙ্গেরের এক সাধু দেখে এসেছিলেন। অনেক দূর হেঁটে যেতে হয়, পূর্বদিকের একেবারে সীমানায় সে পাহাড়, গুহার মুখে মস্ত পাথরের দরজা, ওঁর অভ্রের রথ থাকে সেই গুহার মধ্যে। যে-সে কি দেখতে পায় হুজুর? বড় বড় সাধু মহান্ত দেখেন। ঐ সাধু অভ্রের রথের একটা কুচি এনেছিলেন—এই এত বড় চক্‌চকে অভ্র—আমার গুরুভাই কামতাপ্রসাদ স্বচক্ষে দেখেছেন।

কথা শেষ করিয়া রাজু সগর্বে একবার সমবেত গাঙ্গোতাদের মুখের দিকে চক্ষু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চাহিল।

উদয়-পর্বতের গুহা হইতে সূর্যের উত্থানের এত বড় অকাট্য ও চাক্ষুষ প্রমাণ উত্থাপিত করার পরে আমি একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেলাম।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

১

যুগলপ্রসাদকে একদিন বলিলাম—চল, নতুন গাছপালার সন্ধান ক'রে আসি মহালিখারূপের পাহাড়ে।

যুগলপ্রসাদ সোৎসাহে বলিল—এক রকম লতানে গাছ আছে ওই পাহাড়ের জঙ্গলে—আর কোথাও নেই। চীহড় ফল বলে এদেশে। চলুন খুঁজে দেখি।

নাঢ়া-বইহারের নূতন বস্তিগুলির মধ্য দিয়া পথ। এরই মধ্যে এক এক পাড়ার সর্দারের নাম অনুসারে টোলার নামকরণ হইয়াছে—ঝল্লুটোলা, রূপদাসটোলা, বেগমটোলা ইত্যাদি। উদুখলে ধুপধাপ যব কোটা হইতেছে, খোলাছাওয়া মাটির ঘর হইতে কুণ্ডলী পাকাইয়া ধোঁয়া উপরে উঠিতেছে—উলঙ্গ কৃষ্ণকায় শিশুর দল পথের ধারে ধূলাবালি ছড়াইয়া খেলা করিতেছে।

নাঢ়া-বইহারের উত্তর সীমানা এখনও ঘন বনভূমি। তবে লবটুলিয়া বইহারে আর এতটুকু বনজঙ্গল বা গাছপালা নাই—নাঢ়া-বইহারের শোভাময়ী বনভূমির বারো আনা গিয়াছে, কেবল উত্তর সীমানায় হাজার দুই বিঘা জমি এখনও প্রজাবিলি হয় নাই। দেখিলাম যুগলপ্রসাদ ইহাতে বড় দুঃখিত।

বলিল—গাঙ্গোতার দল ব'সে সব নষ্ট করলে, হুজুর। ওদের ঘরবাড়ী নেই, হাঘরের দল। আজ এখানে, কাল সেখানে। এমন বন নষ্ট করলে।

বলিলাম—ওদের দোষ নেই যুগলপ্রসাদ। জমিদারে জমি ফেলে রাখবে কেন, তারাও তো গভর্ণমেন্টের রেভিনিউ দিচ্ছে, চিরকাল ঘর থেকে রেভিনিউ গুনবে? জমিদার ওদের এনেছে, ওদের কি দোষ?

—সরস্বতী কুণ্ডী দেবেন না হুজুর। বড় কষ্টে ওখানে গাছপালা সংগ্রহ করে এনে বসিয়েছি—

—আমার ইচ্ছেয় তো হবে না, যুগল। এতদিন বজায় রেখেছি এই যথেষ্ট, আর কত দিন রাখা যাবে বল। ওদিকে জমি ভাল দেখে প্রজারা সব ঝুঁকছে।

সঙ্গে আমাদের দু-তিনজন সিপাহী ছিল। তারা আমাদের কথাবার্তার গতি বুঝিতে না পারিয়া আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য বলিল—কিছু ভাববেন না হুজুর, সামনে চৈতী ফসলের পরে সরস্বতী কুণ্ডীর জমি এক টুকরো পড়ে থাকবে না।

মহালিখারূপের পাহাড় প্রায় নয় মাইল দূরে। আমার আপিসঘরের জানালা হইতে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাইত। পাহাড়ের তলায় পৌঁছিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল।

কি সুন্দর রৌদ্র আর কি অদ্ভুত নীল আকাশ সেদিন। এমন নীল কখনও যেন আকাশে দেখি নাই—কেন যে এক-এক দিন আকাশ এমন গাঢ় নীল হয়, রৌদ্রের কি অপূর্ব রং, নীল আকাশ যেন মদের নেশার মত মনকে আচ্ছন্ন করে। কচি পত্রপল্লবের গায়ে রৌদ্র পড়িয়া স্বচ্ছ দেখায়—

আর নাঢ়া-বইহারের ও লবটুলিয়ার যত বন্য পক্ষীর ঝাঁক বাসা ভাঙিয়া যাওয়াতে কতক সরস্বতী সরোবরের বনে, কতক এখানে ও মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টে আশ্রয় লইয়াছে—তাহাদের কি অবিশ্রান্ত কূজন!

ঘন বন। এমন ঘন নির্জন আরণ্যভূমিতে মনে একটি অপূর্ব শান্তি ও মুক্ত অবাধ স্বাধীনতার ভাব আনে—কত গাছ, কত ডালপালা, কত বনফুল, কত বড় বড় পাথর ছড়ানো—যেখানে সেখানে বসিয়া থাক, শুইয়া পড়, অলস জীবনমুহূর্ত প্রস্ফুটিত পিয়াল বৃক্ষের নিবিড় ছায়ায় বসিয়া কাটাইয়া দাও—বিশাল নির্জন আরণ্যভূমি তোমার শ্রান্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে জুড়াইয়া দিবে।

আমরা পাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিয়াছি—বড় বড় গাছ মাথার উপরে সূর্যের আলোক আটকাইয়াছে—ছোট বড় ঝরণা কল্ কল্ শব্দে বনের মধ্য দিয়া নামিয়া আসিতেছে—হরীতকী গাছ, কেলিকদম্ব গাছের সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতায় বাতাস বাধিয়া শন্ শন্ শব্দ হইতেছে। বনমধ্যে ময়ূরের ডাক শোনা গেল।

আমি বলিলাম—যুগলপ্রসাদ, চীহড় ফলের গাছ কোথায়, খোঁজ।

চীহড় ফলের গাছ পাওয়া গেল আরও অনেক উপরে উঠিয়া। স্থলপদ্মের পাতার মত পাতা, খুব মোটা কাষ্ঠময় লতা, আঁকিয়া বাঁকিয়া অন্য গাছকে আশ্রয় করিয়া উঠিয়াছে। ফলগুলি শিমজাতীয়, তবে শিমের দু'খানি খোলা কটকী চটিজুতার মত বড়, অমনই কঠিন ও চওড়া—ভিতরে গোল বীচি। আমরা শুকনো লতাপাতা জ্বালাইয়া বীচি পুড়াইয়া খাইয়াছি—ঠিক যেন গোল আলুর মত আস্বাদ।

অনেক দূর উঠিয়াছি। ওই দূরে মোহনপুরা ফরেস্ট—দক্ষিণে ওই আমাদের মহাল, ওই সবস্বতী কুণ্ডীর তীরবর্তী জঙ্গল অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। ওই নাঢ়া-বইহারের অবশিষ্ট সিকিভাগ সীমানা ঘেঁষিয়া প্রবাহিত—নিম্নের সমতলভূমির দৃশ্য যেন ছবির মত!

—ময়ূর! ময়ূর—হুজুর, ঐ দেখুন, ময়ূর!—

প্রকাণ্ড একট ময়ূর মাথার উপবেই এক গাছের ডালে বসিয়া। একজন সিপাহী বন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সে গুলি করিতে গেলে, আমি বারণ করিলাম।

যুগলপ্রসাদ বলিল—বাবুজী, একটা গুহা আছে পাহাড়ের মধ্যে জঙ্গলে কোথায়—তার গায়ে সব ছবি আঁকা আছে—কতকালের কেউ জানে না, সেটাই খুঁজছি।

হয়তো বা প্রাগৈতিহাসিক যুগেব মানুষের হাতে আঁকা বা খোদাই ছবি গুহার কঠিন পাথরের গায়ে! পৃথিবীর ইতিহাসের লক্ষ লক্ষ বৎসরের যবনিকা এই মুহূর্তে অপসারিত হইয়া সময়ের উজানে কোথায় লইয়া গিয়া ফেলিবে আমাদের!

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাঙ্কিত ছবি দেখিবার প্রবল আগ্রহে জঙ্গল ঠেলিয়া গুহা খুঁজিয়া বেড়াইলাম—গুহাও মিলিল, কিন্তু যে অন্ধকার তাহার ভিতরে, ঢুকিবার সাহস হইল না। ঢুকিলেই বা অন্ধকারের মধ্যে কি দেখিব! অন্য একদিন তোড়জোড় করিয়া আসিতে হইবে—আজ থাক। অন্ধকারে কি শেষে ভীষণ বিষধর চন্দ্রবোড়া কিংবা শঙ্খচূড় সাপের হাতে প্রাণ দিব? এ সব স্থানে তাহাদের অভাব নাই।

যুগলপ্রসাদকে বলিলাম—এ জঙ্গলে কিছু ডালপালা লাগাও নূতন ধরনের। পাহাড়ের বন কেউ কখনো কাটবে না। লবটুলিয়া তো গেল—সরস্বতী কুণ্ডীর ভরসাও ছাড়—

যুগলপ্রসাদ বলিল—ঠিক বলেছেন হুজুর। কথাটা মনে লেগেছে। কিন্তু আপনি তো আসছেন না, আমাকে একাই করতে হবে।

—আমি মাঝে মাঝে এসে দেখে যাব। তুমি লাগাও।

মহালিখারূপের পাহাড় একটা পাহাড় নয়, একটা নাতিদীর্ঘ, অনুচ্চ পাহাড়শ্রেণী, কোথাও দেড় হাজার ফুটের বেশী উঁচু নয়। হিমালয়েরই পাদশৈলের নিম্নতর শাখা, যদিও তরাই প্রদেশের

জঙ্গল ও আসল হিমালয় এখান হইতে এক-শ হইতে দেড়-শ মাইল দূরে। মহালিখারূপের পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া নিম্নের সমতলভূমির দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয় প্রাচীন যুগের মহাসমুদ্র একসময়ে এই বালুকাময় উচ্চ তটভূমির গায়ে আছড়াইয়া পড়িত, গুহাবাসী মানব তখন ভবিষ্যতের গর্ভে নিদ্রিত এবং মহালিখারূপের পাহাড় তখন সেই সুপ্রাচীন মহাসাগরের বালুকাময় বেলাভূমিতে।

যুগলপ্রসাদ অন্তত আট-দশ বকমের নূতন গাছ-লতা দেখাইল—সমতলভূমির বনে এগুলি নাই—পাহাড়ের উপবকাব বনের প্রকৃতি অন্য ধরনের—গাছপালাও অনেক অন্য রকম।

বেলা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কি রকমের বনফুলের গন্ধ খুব পাওয়া যাইতেছিল—বেলা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন নিবিড়তর হইয়া উঠিল। গাছের ডালে ঘুঘু, পাহাড়ী বনটিয়া, হরটিট প্রভৃতি কত কি পক্ষীর কূজন!

বাঘেব ভয় বলিয়া সঙ্গীবা পাহাড় হইতে নামিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল, নতুবা এই আসন্ন সন্ধ্যায় নিবিড় ছায়া নির্জন শৈলসানুর বনভূমিতে যে শোভা ফুটিযাছে, তাহা ফেলিযা আসিতে ইচ্ছা করে না।

মুনেশ্বব সিং বলিল—হুজুর, মোহনপুরা জঙ্গলেব চেযেও এখানে বাঘের ভয় বেশী। বিকেলের পব এখানে যাবা কাঠকুটো কাটতে আসে সব নেমে যায। আর দল না বেঁধে একা কেউ এ পাহাড়ে আসেও না। বাঘ আছে, শঙ্খচূড় সাপ আছে—দেখছেন না, কি গজাড় জঙ্গল স'বা পাহাড়ে!

অগত্যা আমবা নামিতে লাগিলাম। পাহাড়ের জঙ্গলে কেলিকদম্ব গাছেব বড় পাতার আড়ালে শুক্র ও বৃহস্পতি জ্বল্ জ্বল্ কবিতেছে।

২

একদিন দেখি এমনি একটু নূতন গৃহস্থের বাড়ীব দাওয়ায বসিয়া গনোরী তেওয়াড়ী স্কুলমাস্টাব শালপাতাব ওপব ছাতুর তাল মাখিযা খাইতেছে।

—হুজুব যে। ভাল আছেন?

—বেশ আছি। তুমি কবে এলে. কোথায় ছিলে? এরা তোমাব কেউ হয় নাকি?

—কেউ নয়। এখান দিয়ে যাচ্ছিলাম, বেলা হযে গিয়েছে, ব্রাহ্মণ, এদের এখানে অতিথি হ'লাম। তাই দুটো খাচ্ছি। চেনাশুনো ছিল না, তবে আজ হ'ল।

গৃহকর্তা আগাইয়া আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া বলিল—আসুন হুজুর, বসুন উঠে।

—না, বসব না। বেশ আছি। কতদিন জমি নিয়েছ?

—আজ দু-মাস হুজুর। এখনও জমি চষতে পারি নি।

গনোবী তেওয়াবীকে একটি ছোট মেয়ে আসিয়া কয়েকটি কাঁচা লঙ্কা দিয়া গেল। সে খাইতেছে কলাইয়ের ছাতু, নুন ও লঙ্কা। ছাতুব যে বিরাট তাল শীর্ণ গনোরী তেওয়ারীর পেটে কোথায় ধরিবে বোঝা কঠিন। গনোরী খাঁটি ভবঘুরে। যেখানে খাইতে বসিয়াছে, সেই দাওয়াব এক পাশে একটি ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি, একটি গেলাপ অর্থাৎ পাতলা বালাপোশ-জাতীয় লেপ দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম উহা গনোরীর—এবং উহাই উহার সমগ্র জাগতিক সম্পত্তি। গনোরীকে বলিলাম—ব্যস্ত আছি, তুমি কাছারিতে এসো ওবেলা।

বিকালে গনোরী কাছারিতে আসিল।

বলিলাম—কোথায় ছিলে গনোরী?

—বাবুজী, মুঙ্গের জেলায় পাড়াগাঁ অঞ্চলে। বহুৎ পাড়াগাঁয়ে ঘুরেছি।

—কি ক'রে বেড়াতে?

—পাঠশালা করতাম। ছেলে পড়াতাম।

—কোনো পাঠশালা টিক্‌ল না?

—দু-তিন মাসের বেশী নয় হুজুর। ছেলেরা মাইনে দেয় না।

—বিয়ে-থাওয়া করেছ? বয়স কত হল?

—নিজেরই পেট চলে না হুজুর, বিয়ে ক'রে করব কি? বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়েছে।

গনোরীর মত এত দরিদ্র লোক এ অঞ্চলেও বেশি দেখা যায় না। মনে পড়িল, গনোরী একবার বিনা-নিমন্ত্রণে ভাত খাইতে আমার কাছারিতে আসিয়াছিল, প্রথম যেবার এখানে আসি। বর্তমানে বোধ হয় কতকাল সে ভাত খাইতে পায় নাই। গাঙ্গোতা-বাড়ীতে অতিথি হইয়া কলাইয়ের ছাতু খাইয়া দিন কাটাইতেছে।

বলিলাম—গনোরী, আজ রাত্রে আমার এখানে খাবে। কণ্টু মিশির রাঁধে, ওর হাতে তোমার তো খেতে আপত্তি নেই?

গনোরী বেজায় খুশি হইল। একগাল হাসিয়া বলিল—কণ্টু আমাদেরই ব্রাহ্মণ, ওর হাতে আগেও তো খেয়েছি—আপত্তি কি?

তার পর বলিল—হুজুর, বিয়ের কথা যখন তুললেন তখন বলি। আর বছর শ্রাবণ মাসে একটা গাঁয়ে পাঠশালা খুললাম। গাঁয়ে এক ঘর আমাদেরই ব্রাহ্মণ ছিল। তার বাড়ীতে থাকি। ওর মেয়েব সঙ্গে আমার বিয়ের কথা সব ঠিকঠাক, এমন কি আমি মুঙ্গের থেকে ভাল মেরজাই একটা কিনে আনলাম—তার পর পাড়াব লোক ভাঙচি দিলে—বললে—ও গরীব স্কুল-মাস্টার, চাল নেই, চুলো নেই, ওকে মেয়ে দিও না। তাই সে বিয়ে ভেঙে গেল। আমি সে গাঁ ছেড়ে চলেও গেলাম।

—মেয়েটিকে দেখেছিলে? দেখতে ভাল?

—দেখি নি? চমৎকার মেয়ে. হুজুব। তা আমাকে কেন দেবে? সত্যিই তো, আমার কি আছে বলুন না?

দেখিলাম গনোরী বেশ দুঃখিত হইয়াছে বিবাহ ফাঁসিয়া যাওয়াতে, মেয়েটিকে মনে ধরিয়াছিল।

তারপব অনেকক্ষণ বসিয়া সে গল্প করিল। তাহার কথা শুনিয়া মনে হইল, জীবন তাহাকে কোনো জিনিস দেয় নাই—গ্রাম হইতে গ্রামান্তবে ফিরিয়াছে, দুটি পেটের ভাতের জন্য। তাও জোটাইতে পারে নাই। গাঙ্গোতাদের দুয়াবে ঘুরিয়াই অর্ধেক জীবন কাটাইয়া দিল।

বলিল—অনেকদিন পরে তাই লবটুলিয়াতে এলাম। এখানে অনেক নতুন বস্তি হয়েছে শুনেছিলাম। সে জঙ্গল-মহাল আর নেই। এখানে যদি একটা পাঠশালা খুলি—তাই এলাম। চলবে না, কি বলেন হুজুর?

তখনই মনে মনে ভাবিলাম, এখানে একটা পাঠশালা করিয়া দিয়া গনোরীকে রাখিয়া দিব। এতগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আমার মহালে নব আগন্তুক, তাহাদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা আমারই কর্তব্য। দেখি কি করা যায়।

৩

অপূর্ব জ্যোৎস্না-রাত। যুগলপ্রসাদ ও বাজু পাঁড়ে গল্প করিতে আসিল। কাছারি হইতে কিছু দূরে একটি ছোট বস্তি বসিয়াছে। সেখানকার একটি লোকও আসিল। আজ চার দিন মাত্র তাহারা ছাপরা জেলা হইতে এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

লোকটি তাহার জীবনের ইতিহাস বলিতেছিল। স্ত্রী-পুত্র লইয়া কত জায়গায় ঘুরিয়াছে, কত

চরে জঙ্গলে বন কাটিয়া কতবার ঘরদোর বাঁধিয়াছে। কোথাও তিন বছর, কোথাও পাঁচ বছর, এক জায়গায় কুশী নদীর ধারে ছিল দশ বছর। কোথাও উন্নতি করিতে পারে নাই। এইবার লবটুলিয়া বইহারে আসিয়াছে উন্নতি করিতে।

এইসব যাযাবর গৃহস্থজীবন বড় বিচিত্র। কথা বলিয়া দেখিয়াছি ইহাদের সঙ্গে, সম্পূর্ণ বন্ধনমুক্ত, ব্রাত্য ইহাদের জীবন—সমাজ নাই, সংসার নাই. ভিটার মায়া নাই, নীল আকাশের নীচে সংসার রচনা করিয়া, বনে, শৈলশ্রেণীর মধ্যস্থ উপত্যকায়, বড় নদীর নির্জন চরে ইহাদের বাস। আজ এখানে, কাল সেখানে।

ইহাদেব প্রেম-বিরহ, জীবন-মৃত্যু সবই আমার কাছে নূতন ও অদ্ভুত। কিন্তু সকলের চেয়ে অদ্ভুত লাগিল বর্তমানে এই লোকটির উন্নতির আশা।

এই ~বটুলিয়ার জঙ্গলে সামান্য পাঁচ বিঘা কি দশ বিঘা জমিতে গম চাষ করিয়া সে কিরূপ উন্নতির আশা করে বুঝিয়া উঠা কঠিন।

লোকটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে। নাম বলভদ্র সেঙ্গাই, জাতে চাষা কলোয়ার অর্থাৎ কলু। এই বয়সে সে এখনও আশা রাখে জীবনে উন্নতি করিবার।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—বলভদ্র, এর আগে কোথায় ছিলে?

—হুজুর, মুঙ্গের জেলায় এক দিয়ারার চরে। দু-বছর সেখানে ছিলাম—তারপরে অজন্মা হয়ে মকাই ফসল নষ্ট হয়ে গেল। সে-জায়গায় উন্নতি হবাব আশা নেই দেখলাম। হুজুর, সংসারে সবাই উন্নতি করবাব জন্যে চেষ্টা পায়। এইবার দেখি হুজুরের আশ্রয়ে—

রাজু পাঁড়ে বলিল—আমার ছ'টা মহিষ ছিল যখন প্রথম এখানে আসি—এখন হয়েছে দশটা। লবটুলিয়া উন্নতিব জায়গা—

বলভদ্র বলিল—মহিষ আমায় একজোড়া কিনে দিও পাঁড়েজি। এবার ফসল হোক, সেই টাকা দিয়ে মহিষ কিনতেই হবে—ও ভিন্ন উন্নতি হয় না।

গনোরী ইহাদের কথা শুনিতেছিল। সেও বলিল—ঠিক কথা। আমারও ইচ্ছে আছে মহিষ দু-একটা কিনব। একটু কোথাও বসতে পারলেই—

মহালিখারূপের পাহাড়ের গাছপালা এবং তাহারও পিছনে ধন্‌ঝরি শৈলমালা অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে জ্যোৎস্নার আলোয়, একটু একটু শীত বলিয়া ছোট একটি অগ্নিকুণ্ড করা হইয়াছে আমাদের সামনে—এক দিকে রাজু পাঁড়ে ও যুগলপ্রসাদ, অন্য দিকে বলভদ্র ও তিন-চারটি নবাগত প্রজা।

আমার কাছে কি অদ্ভুত ঠেকিতেছিল ইহাদের বৈষয়িক উন্নতির কথা। উন্নতি সম্বন্ধে ইহাদের ধাবণা অভাবনীয় ধরনের উচ্চ নয়—ছ'টি মহিষের স্থানে দশটা মহিষ না-হয় বারোটা মহিষ—এই সুদূর দুর্গম অরণ্য ও শৈলমালা বেষ্টিত বন্য দেশেও মানুষের মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কেমন, জানিবার সুযোগপাইয়া আজকার জ্যোৎস্না-রাতটাই আমার নিকট অপূর্ব রহস্যময় মনে হইল। শুধু জ্যোৎস্না-রাত কেন, মহালিখারূপেব ঐ পাহাড়, দূরে ওই ধন্‌ঝরি শৈলমালা, ঐ পাহাড়ের উপরকার ঘন বনশ্রেণী।

কেবল যুগলপ্রসাদ এ-সব বৈষয়িক কথাবার্তায় থাকে না। ও আর এক ধরনের ব্রাত্য মন লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছে—জমি-জমা, গরু-মহিষের আলোচনা করিতে ভালও বাসে না, তাহাতে যোগ ও দেয় না।

সে বলিল—সরস্বতী কুণ্ডীর পূব পাড়ের জঙ্গলে যতগুলো হংসলতা লাগিয়েছিলাম, সবগুলো কেমন ঝাঁপালো হয়ে উঠেছে দেখেছেন বাবুজী? এবার জলের ধারে স্পাইডার-লিলির বাহারও খুব। চলুন, যাবেন জ্যোৎস্নারাতে বেড়াতে?

দুঃখ হয়, যুগলপ্রসাদের এত সাধের সরস্বতী কুণ্ডীর বনভূমি—কত দিন বা রাখিতে পারিব?

কোথায় দূর হইয়া যাইবে হংসলতা আর বন্য শেফালি-বন। তাহার স্থানে দেখা দিবে শীর্ষ-ওঠা মকাই ও জনারের ক্ষেত এবং সারি সারি খোলা-ছাওয়া ঘর, চালে চালে ঠেকানো, সামনে চারপাই পাতা।...কাদা-হাবড় আঙিনায় গরু-মহিষ নাদায় জাব খাইতেছে।

এই সময় মটুকনাথ পণ্ডিত আসিল। আজকাল মটুকনাথের টোলে প্রায় পনেরটি ছাত্র কলাপ ও মুগ্ধবোধ পড়ে। তাহার অবস্থা আজকাল ফিরিয়া গিয়াছে। গত ফসলের সময় যজমানদের ঘর হইতে এত গম ও মকাই পাইয়াছে যে, টোলের উঠানে তাহাকে একটা ছোট গোলা বাঁধিতে হইয়াছে।

অধ্যবসায়ী লোকের উন্নতি যে হইতেই হইবে—মটুকনাথ পণ্ডিত তাহার অকাট্য প্রমাণ।

উন্নতি!—আবার সেই উন্নতির কথা আসিয়া পড়িল।

কিন্তু উন্নতির কথা না আসিয়া উপায় নাই। চোখের ওপর দেখিতে পাইতেছি, মটুকনাথ উন্নতি করিয়াছে বলিয়াই তাহার আজকাল খুব খাতির-সম্মান—আমার কাছারির যে-সব সিপাহী ও আমলা মটুকনাথকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিত—গোলা বাঁধার পর হইতে আমি লক্ষ্য করিতেছি তাহারা মটুকনাথকে সম্মান ও খাতির করিয়া চলে। সঙ্গে সঙ্গে টোলের ছাত্রসংখ্যাও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ যুগলপ্রসাদ বা গনোরী তেওয়ারীকে কেউ পোঁছেও না। রাজু-পাঁড়েও নবাগত প্রজাদের মধ্যে খুব খাতির জমাইয়া ফেলিয়াছে—জড়িবুটির পুঁটুলি হাতে তাহাকে প্রায়ই দেখা যায় গৃহস্থবাড়ীর ছেলেমেয়েদের নাড়ী টিপিয়া বেড়াইতেছে। তবে রাজু পাঁড়ে পয়সা তেমন বোঝে না, খাতির রপাইয়া ও গল্প করিয়াই সন্তুষ্ট।

৪

মাস তিন-চারের মধ্যে মহালিখারূপের পাহাড়ের কোল হইতে লবটুলিয়া ও নাঢ়া বইহারেব উত্তর সীমানা পর্যন্ত প্রজা বসিয়া গেল। পূর্বে জমি বিলি হইয়া চাষ আরম্ভ হইযাছিল বটে, কিন্তু লোকের বাস এত হয় নাই—এ বছর দলে দলে লোক আসিয়া রাতারাতি গ্রাম বসাইয়া ফেলিতে লাগিল।

কত ধরনের পরিবার। শীর্ণ টাট্টু ঘোড়ার পিঠে বিছানাপত্র, বাসন, পিতলের ঘরলা, কাঠের বোঝা, গৃহদেবতা, তোলা উনুন চাপাইয়া একটি পরিবারকে আসিতে দেখা গেল। মহিষের পিঠে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে. হাঁড়ি-কুড়ি, ভাঙা লণ্ঠন, এমন কি চারপাই পর্যন্ত চাপাইয়া আর এক পরিবার আসিল। কোনো কোনো পরিবারে স্বামী-স্ত্রীতে মিলিয়া, জিনিসপত্র ও শিশুদের বাঁকের দু-দিকে চাপাইয়া বাঁক কাঁধে বহুদূর হইতে হাঁটিয়া আসিতেছে।

ইহাদের মধ্যে সদাচারী, গর্বিত মৈথিল ব্রাহ্মণ হইতে আরম্ভ করিয়া গাঙ্গোতা ও দোসাদ পর্যন্ত সমাজের সর্বস্তরের লোকই আছে। যুগলপ্রসাদ মুহুরীকে জিজ্ঞাসা করিলাম—এরা কি এতদিন গৃহহীন অবস্থায় ছিল? এত লোক আসছে কোথা থেকে?

যুগলপ্রসাদের মন ভাল নয়। বলিল—এদেশের লোকই এই রকম। শুনেছে এখানে জমি সস্তায় বিলি হচ্ছে—তাই দলে দলে আসছে। সুবিধে বোঝে থাকবে, নয়তো আবার ডেরা উঠিয়ে অন্য জায়গায় ভাগবে।

—পিতৃপিতামহের ভিটের কোনো মায়া নেই এদের কাছে?

—কিছু না বাবুজী। এদের উপজীবিকাই হচ্ছে নূতন-ওঠ' চর বা জঙ্গলমহাল বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করা। বাস করাটা আনুষঙ্গিক। যতদিন ফসল ভাল হবে, খাজনা কম থাকবে, ততদিন থাকবে।

—তার পর?

—তার পব খোঁজ নেবে অন্য কোথায় নূতন চর বা জঙ্গল বিলি হচ্ছে, সেখানে চলে যাবে। এদের ব্যবসাই এই।

৫

সেদিন গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছেব নীচে জমি মাপিয়া দিতে গিয়াছি, আস্‌রফি টিণ্ডেল জমি মাপিতেছিল, আমি ঘোড়ার উপর বসিয়া দেখিতেছিলাম, এমন সময় কুন্তাকে টোলার পথ ধবিয়া যাইতে দেখিলাম।

কুন্তাকে অনেক দিন দেখি নাই। আস্‌রফিকে বলিলাম—কুন্তা আজকাল কোথায় থাকে, ওকে দেখিনে তো?

আস্‌রফি বলিল—ওর কথা শোনেন নি বাবুজী? ও মধ্যে এখানে ছিল না অনেক দিন—

—কি রকম?

—রাসবিহারী সিং ওকে নিয়ে যায় তার বাড়ী। বলে, তুমি আমাদের জাতভাইয়ের স্ত্রী—আমার এখানে এসে থাক—

—বেশ।

—সেখানে কিছুদিন থাকবার পরে—ওর চেহারা দেখছেন তো বাবুজী, এত দুঃখে-কষ্টে এখনও— তার পব রাসবিহারী সিং কি-সব কথা ওকে বলে—এমন কি ওর ওপর অত্যাচারও কবতে যায়—তাই আজ মাসখানেক হ'ল সেখান থেকে পালিয়ে এসে আছে। শুনি রাসবিহারী ছোরা নিয়ে ভয় দেখায়। ও বলেছিল,—মেরে ফেল বাবুজী, জান্ দেগা—ধরম দেগা নেহিন্।

—কোথায় থাকে?

—ঝল্লুটোলায় এক গাঙ্গোতাব বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাদের গোয়ালঘরের পাশে একখানা ছোট্ট চালা আছে সেখানেই থাকে।

—চলে কি করে? ওর তো দু-তিনটে ছেলেমেয়ে?

—ভিক্ষে কবে—ক্ষেতের ফসল কুড়োয়। কলাই গম কাটে। বড় ভাল মেয়ে বাবু কুন্তা। বাইজির মেয়ে ছিল বটে, কিন্তু ভাল ঘরের মেযেব মত মন-মেজাজ—কোন অসৎ কাজ ওকে দিয়েই হবে না।

জরীপ শেষ হইল। বালিয়া জেলার একটি প্রজা এই জমি বন্দোবস্ত লইযাছে—কাল হইতে এখানে সে বাড়ী বাঁধিবে। গ্র্যান্ট সাহেবেব বটগাছের মহিমাও ধ্বংস হইল।

মহালিখারূপের পাহাড়ে উপরকার বড় বড় গাছপালার মাথায় রোদ রাঙা হইয়া আসিল। সিল্লীর দল ঝাঁক বাঁধিয়া সবস্বতী কুণ্ডীব দিকে উড়িয়া চলিয়াছে। সন্ধ্যার আর দেরি নাই।

একটা কথা ভাবিলাম।

এতটুকু জমি কোথাও থাকিবে না এই বিশাল লবটুলিয়া নাঢ়া বইহারের, যেমন দেখিতেছি। দলে দলে অপরিচিত লোক আসিয়া জমি লইয়া ফেলিল—কিন্তু এই আরণ্যভূমিতে যাহারা চিরকাল মানুষ, অথচ যাহারা নিঃস্ব, হতভাগ্য—জমি বন্দোবস্ত লইবার পয়সা নাই বলিয়াই কি তাহারা বঞ্চিত থাকিবে? যাহাদের ভালবাসি, তাহাদের অন্তত এতটুকু উপকার করিবই।

আস্‌রফিকে বলিলাম—আস্‌রফি, কুন্তাকে কাল সকালে কাছারিতে হাজির করতে পারবে? ওকে একটু দরকার আছে।

—হ্যাঁ হুজুর, যখন বলবেন।

পরদিন সকালে কুন্তাকে আস্‌রফি আমার আপিস-ঘরের সামনে বেলা ন'টার সময় লইয়া

আসিল।

বলিলাম—কুন্তা, কেমন আছ?

কুন্তা আমায় দুই হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিল—জী হুজুর, ভাল আছি।

—তোমার ছেলেমেয়েরা?

—ভাল আছে হুজুরের দোয়ায়।

—বড় ছেলেটি কত বড় হল?

—এই আট বছরে পড়েছে, হুজুর।

—মহিষ চরাতে পারে না?

—অতটুকু ছেলেকে কে মহিষ চরাতে দেবে, হুজুর?

কুন্তা সত্যই এখনও দেখিতে বেশ, ওর মুখে অসহায় জীবনের দুঃখকষ্ট যেমন ছাপ মারিয়া দিয়াছে—সাহস ও পবিত্রতাও তেমনি তাদেব দুর্লভ জয়চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে।

এই সেই কাশীর বাঈজীর মেয়ে, প্রেমবিহ্বলা কুন্তা।...প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা এই দুঃখিনী রমণীর হাতে এখনও সগৌরবে জ্বলিতেছে, তাই ওর এত দুঃখ, দৈন্য, এত হেনস্থা, অপমান। প্রেমের মান রাখিয়াছে কুন্তা।

বলিলাম—কুন্তা, জমি নেবে?

কুন্তা কথাটি ঠিক শুনিয়াছে কিনা যেন বুঝিতে পারিল না। বিস্মিত মুখে বলিল—জমি, হুজুব?

—হাঁ, জমি। নূতন-বিলি জমি।

কুন্তা একটুখানি কি ভাবিল। পরে বলিল—আগে তো আমাদেরই কত জোতজমা ছিল। প্রথম প্রথম এসে দেখেছি। তার পর সব গেল একে একে। এখন আর কি দিয়ে জমি নেব, হুজুর?

—কেন, সেলামীর টাকা দিতে পারবে না?

—কোথা থেকে দেব? বাত্তির ক'রে ক্ষেত থেকে ফসল কুড়োই, পাছে দিনমানে কেউ অপমান করে। আধ টুক্রি এক টুক্বি কলাই পাই—তাই গুঁড়ো ক'রে ছাতু ক'রে বাচ্ছাদের খাওয়াই। নিজে খেতে সব দিন কুলোয় না—

কুন্তা কথা বন্ধ করিযা চোখ নীচু করিল। দুই চোখ বাহিযা টস্ টস্ করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আস্‌রফি সরিয়া গেল। ছোকরাব হৃদয় কোমল, এখনও পরের দুঃখ ভাল রকম সহ্য করিতে পারে না।

আমি বলিলাম—কুন্তা, আচ্ছা ধর যদি সেলামী না লাগে?

কুন্তা চোখ তুলিয়া জলভরা বিস্মিত চোখে আমার মুখের দিকে চাহিল।

আস্‌রফি তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কুন্তাব সামনে হাত নাড়িয়া বলিল—হুজুব তোমায় এমনি জমি দেবেন, এমনি জমি দেবেন—বুঝলে না দাইজী?

আস্‌রফিকে বলিলাম—ওকে জমি দিলে ও চাষ করবে কি ক'রে আস্‌রফি?

আস্‌রফি বলিল—সে বেশী কঠিন কথা নয় হুজুর। ওকে দু-একখানা লাঙ্গল দয়া ক'রে সবাই ভিক্ষে দেবে। এত ঘর গাঙ্গোতা প্রজা, একখানা লাঙল ঘরপিছু দিলেই ওর জমি চাষ হয়ে যাবে। আমি সে-ভার নেব, হুজুর।

—আচ্ছা, কত বিঘে হ'লে ওর হয়, আস্‌রফি?

—দিচ্ছেন যখন মেহেরবানি ক'রে হুজুর, দশ বিঘে দিন।

কুন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—কুন্তা, কেমন, দশ বিঘে জমি যদি তোমায় বিনা সেলামীতে দেওয়া যায়—তুমি ঠিকমত চাষ ক'রে ফসল তুলে কাছারির খাজনা শোধ করতে পারবে তো? অবিশ্যি প্রথম দু-বছর তোমার খাজনা মাপ। তৃতীয় বছর থেকে খাজনা দিতে হবে।

কুন্তা যেন হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। আমরা তাহাকে লইয়া ঠাট্টা করিতেছি, না সত্য কথা বলিতেছি—ইহাই যেন সে এখনও সম্ঝাইয়া উঠিতে পারে নাই।

কতকটা দিশাহারা ভাবে বলিল—জমি! দশ বিঘে জমি!

আস্‌রফি আমার হইয়া বলিল—হাঁ, হুজুর তোমায় দিচ্ছেন! খাজনা এখন দু-বছর মাপ। তীস্‌রা সাল থেকে খাজনা দিও। কেমন, রাজী?

কুন্তা লজ্জাজড়িত মুখে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—জী হুজুর মেহেরবান। পরে হঠাৎ বিহ্বলার মত কাঁদিয়া ফেলিল।

আমার ইঙ্গিতে আস্‌রফি তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

১

সন্ধ্যার পর লবটুলিয়ার নূতন বস্তিগুলি দেখিতে বেশ লাগে। কুয়াশা হইয়াছে বলিয়া জ্যোৎস্না একটু অস্পষ্ট, বিস্তীর্ণ প্রান্তরব্যাপী কৃষিক্ষেত্র, দূরে দূরে দু-পাঁচটি আলো জ্বলিতেছে বিভিন্ন বস্তিতে। কত লোক, কত পরিবাব অন্নেব সংস্থান করিতে আসিয়াছে আমাদের মহালে—বন কাটিযা গ্রাম বসাইয়াছে, চাষ আরম্ভ করিয়াছে। আমি সব বস্তির নামও জানি না, সকলকে চিনিও না। কুয়াশাবৃত জ্যোৎস্নালোকে এখানে ওখানে দূরে নিকটে ছড়ানো বস্তিগুলি কেমন রহস্যময় দেখাইতেছে। যে-সব লোক এই সব বস্তিতে বাস করে, তাহাদের জীবনও আমার কাছে কুযাশাচ্ছন্ন জ্যোৎস্নামযী রাত্রির মত রহস্যাবৃত। ইহাদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখিয়াছি—জীবন সম্বন্ধে ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গী, ইহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী আমার বড় অদ্ভুত লাগে।

প্রথম ধরা যাক্ ইহাদের খাদ্যের কথা। আমাদের মহালের জমিতে বছবে তিনটি খাদ্যশস্য জন্মায়—ভাদ্র মাসে মকাই, পৌষ মাসে কলাই এবং বৈশাখ মাসে গম। মকাই খুব বেশী হয় না, কারণ ইহার উপযুক্ত জমি বেশী নাই। কলাই ও গম যথেষ্ট উৎপন্ন হয়, কলাই বেশী, গম তাহার অর্ধেক। সুতরাং লোকের প্রধান খাদ্য কলাইয়ের ছাতু।

ধান একেবারেই হয় না—ধানের উপযুক্ত নাবাল-জমি নাই। এ অঞ্চলের কোথাও—এমন কি কড়ারী জমিতে কিংবা গবর্ণমেণ্ট খাসমহালেও ধান হয় না। ভাত জিনিসটা সুতরাং এখানকার লোকে কালেভদ্রে খাইতে পায়—ভাত খাওয়াটা শখের বা বিলাসিতার ব্যাপার বলিয়া গণ্য। দু-চারজন খাদ্যবিলাসী লোক গম বা কলাই বিক্রয় কবিয়া ধান কিনিয়া আনে বটে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা আঙুলে গোনা যায়।

তারপর ধরা যাক্ ইহাদের বাসগৃহের কথা। এই যে আমাদেব মহালের দশ হাজার বিঘা জমিতে অগণ্য গ্রাম বসিয়াছে—সব গৃহস্থের বাড়ীই জঙ্গলের কাশ ছাওয়া, কাশডাঁটার বেড়া, কেহ কেহ তাহার উপর মাটি লেপিয়াছে, কেহ কেহ তাহা করে নাই। এদেশে বাঁশগাছ আদৌ নাই, সুতরাং বনের গাছের বিশেষ করিয়া কেঁদ ও পিয়াল ডালের বাতা, খুঁটি ও আড়া দিয়াছে ঘরে।

ধর্মের কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই। ইহারা যদিও হিন্দু, কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে ইহারা হনুমানজীকে কি করিয়া বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে জানি না—প্রত্যেক বস্তীতে একটা উঁচু হনুমানজীর ধ্বজা থাকিবেই। এই ধ্বজার রীতিমত পূজা হয়, ধ্বজার গায়ে সিঁদুর লেপা হয়। রাম-সীতার কথা ক্বচিৎ শোনা যায়, তাঁহাদের সেবকের গৌরব তাঁহাদের দেবত্বকে একটু বেশী আড়ালে ফেলিয়াছে। বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজার প্রচার তত নাই—আদৌ আছে কিনা সন্দেহ, অন্ততঃ আমাদের মহালে তো আমি দেখি নাই।

ভুলিয়া গিয়াছি, একজন শিবভক্ত দেখিয়াছি বটে। তার নাম দ্রোণ মাহাতো। জাতিতে গাঙ্গোতা। কাছারিতে কোথা হইতে কে একটা শিলাখণ্ড আনিয়া আজ নাকি দশ-বারো বছর কাছারির হনুমানজীর ধ্বজার নীচে রাখিয়া দিয়াছে—সিপাহীরা মাঝে মাঝে পাথরখানাতে সিঁদুর মাখায়, এক ঘটি জলও কেউ কেউ দেয়। কিন্তু পাথরখানা বেশীর ভাগ অনাদৃত অবস্থাতেই পড়িয়া থাকে।

কাছারিব কিছুদুবে একটা নূতন বস্তি আজ মাস-দুই গড়িয়া উঠিয়াছে—দ্রোণ মাহাতো সেখানে আসিয়া ঘর বাঁধিয়াছে। দ্রোণের বয়স সত্তরের বেশী ছাড়া কম নয়—প্রাচীন লোক বলিয়াই তাহার নাম দ্রোণ, আধুনিক কালের ছেলে-ছোকরা হইলে নাকি নাম হইত ডোমন, লোধাই, মহারাজ ইত্যাদি। এসব বাবুগিরি নাম সেকালে বাপ-মায়ে রাখিতে লজ্জাবোধ করিত।

যাহা হউক, বৃদ্ধ দ্রোণ একবার কাছারি আসিয়া হনুমান-ধ্বজার নীচে পাথরখানা লক্ষ্য করিল। তারপর হইতে বৃদ্ধ কল্‌বলিয়া নদীতে প্রাতঃস্নান করিয়া এক ঘটি জল প্রত্যহ আনিয়া নিয়মিতভাবে পাথরের উপরে ঢালিত ও সাতবার পরম ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তবে বাড়ী ফিরিত।

দ্রোণকে বলিয়াছিলাম—কল্‌বলিয়া তো এক ক্রোশ দূর, রোজ যাও সেখানে, তার চেয়ে ছোট কুণ্ডীব জল আনলেই পাব—

দ্রোণ বলিল—মহাদেওজী স্রোতের জলে তুষ্ট থাকেন, বাবুজী। আমার জন্ম সার্থক যে ওঁকে রোজ জল দিয়ে স্নান করাতে পাই।

ভক্তও ভগবানকে গড়ে। দ্রোণ মাহাতোর শিবপূজার কাহিনী লোকমুখে বিভিন্ন বস্তিতে ছড়াইয়া পড়িতেই মাঝে মাঝে দু-পাঁচজন শিবের পূজারী নর-নারী যাতায়াত শুরু করিল। এ অঞ্চলে এক ধরনের সুগন্ধ ঘাস জঙ্গলে উৎপন্ন হয়, ঘাসের পাতা বা ডাঁটা হাতে লইযা আঘ্রাণ লইলে চমৎকার সুবাস পাওয়া যায়। ঘাস যত শুকায়, গন্ধ তত তীব্র হয়। কে একজন সেই ঘাস আনিয়া শিবঠাকুরের চারিধারে বোপণ কবিল। একদিন মটুকনাথ পণ্ডিত আসিয়া বলিল—বাবুজী, একজন গাঙ্গোতা কাছারির শিবের মাথায় জল ঢালে, এটা কি ভাল হচ্ছে?

বলিলাম—পণ্ডিতজী, সেই গাঙ্গোতাই ওই ঠাকুরটিকে লোক-সমাজে প্রচার করেছে যতদূর দেখতে পাচ্ছি। কই তুমিও তো ছিলে, এক ঘটি জল তো কোনদিন দিতে দেখি নি তোমায়।

রাগেব মাথায় খেই হারাইয়া মটুকনাথ বলিয়া বসিল—ও শিবই নয় বাবুজী। ঠাকুর প্রতিষ্ঠা না করলে পুজো পাওয়াব যোগ্য হয় না। ও তো একখানা পাথরের নুড়ি।

—তবে আর বলছ কেন? পাথরের নুড়িতে জল দিলে তোমার আপত্তি কি?

সেই হইতে দ্রোণ মাহাতো কাছারির শিবলিঙ্গের চার্টার্ড পূজারী হইয়া গেল।

কার্তিক মাসে ছট্‌-পরব এদেশের বড় উৎসব। বিভিন্ন টোলা হইতে মেয়েরা হলুদ-ছোপানো শাড়ী পরিয়া দলে দলে গান করিতে করিতে কল্‌বলিয়া নদীতে ছট্‌ ভাসাইতে চলিয়াছে। সারাদিন উৎসবের ধুম। সন্ধ্যায় বস্তিগুলির কাছ দিয়া যাইতে যাইতে ছট্‌-পরবের পিঠে ভাজার ভরপুর গন্ধ পাওয়া যায়। কত রাত পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের হাসি-কলরব, মেয়েদের গান—যেখানে নীল গাইয়ের জেরা গভীর রাত্রে দৌড়িয়া যাইত, হায়েনার হাসি ও বাঘের কাশি (অভিজ্ঞ ব্যক্তি জানেন, বাঘে অবিকল মানুষের গলায় কাশির মত এক প্রকার শব্দ করে) শোনা যাইত—সেখানে আজ কলহাস্যমুখরিত, গীতিরবপূর্ণ উৎসব-দীপ্ত এক বিস্তীর্ণ জনপদ।

ছট্‌-পরবের সন্ধ্যায় ঝল্লুটোলায় নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলাম। শুধু এই এক টোলায় নয়—পনেরোটি বিভিন্ন টোলা হইতে ছট্‌-পরবের নিমন্ত্রণ পাইয়াছে কাছারি-সুদ্ধ সকল আমলা।

ঝল্লুটোলার মোড়ল ঝল্লু মাহাতোর বাড়ী গেলাম প্রথমে।

ঝল্লু মাহাতোর বাড়ীর এক পাশে দেখি এখনও জঙ্গল কিছু কিছু আছে। ঝল্লু উঠানে এক ছেঁড়া সামিয়ানা টাঙাইয়াছে—তাহারই তলায় আমাদের আদর করিয়া বসাইল। টোলার সকল লোক

ফর্সা ধুতি ও মেরজাই পরিয়া সেখানে ঘাসে-বোনা একজাতীয় মাদুরের আসনে বসিয়া আছে। বলিলাম—খাইবার অনুরোধ রাখিতে পারিব না, কারণ অনেক স্থানে যাইতে হইবে।

ঝল্লু বলিল—একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে। মেয়েরা নইলে বড় ক্ষুণ্ণ হবে, আপনি পায়ের ধুলো দেবেন বলে ওরা বড় উৎসাহ ক'রে পিঠে তৈরি করেছে।

উপায় নাই। গোষ্ঠবাবু মুহুরী, আমি ও রাজু পাঁড়ে বসিয়া গেলাম। শালপাতায় কয়েকখানি আটা ও গুড়ের পিঠে আসিল—এক-একখানি পিঠে এক ইঞ্চি পুরু ইটের মত শক্ত, ছুঁড়িয়া মারিলে মানুষ মরিয়া না গেলেও দস্তুরমত জখম হয়। অথচ প্রত্যেকখানা পিঠে ছাঁচে ফেলা চন্দ্রপুলির মত বেশ লতাপাতা কাটা। ছাঁচে ফেলিবার পরে তবে ঘিয়ে ভাজা হইয়াছে।

অত যত্নে মেয়েদের হাতে তৈরি পিষ্টকের সদ্ব্যবহার করিতে পারিলাম না। আধখানা অতিকষ্টে খাইয়াছিলাম। না মিষ্টি, না কোনো স্বাদ। বুঝিলাম গাঙ্গোতা মেয়েরা খাবার-দাবার তৈরি করিতে জানে না। রাজু পাঁড়ে কিন্তু চার-পাঁচখানা সেই বড় বড় পিঠে দেখিতে দেখিতে খাইয়া ফেলিল এবং আমাদের সামনে চক্ষুলজ্জাবশতই বোধ হয় আর চাহিতে পারিল না।

ঝল্লুটোলা হইতে গেলাম লোধাইটোলা। তারপর পর্বততোলা, ভীমদাসটোলা, আসরফিটোলা, লছমনিয়াটোলা। প্রত্যেক টোলায় নাচগান, হাসি-বাজনার ধুম। আজ সারারাত ইহারা ঘুমাইবে না। এ-বাড়ী ও-বাড়ী খাওয়া-দাওয়া করিয়া নাচ-গান করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

একটি ব্যাপাব দেখিয়া আনন্দ হইল, মেয়েরা সব টোলাতেই যত্ন করিয়া নাকি খাবার তৈরি করিয়াছে আমাদের জন্য। ম্যানেজারবাবু নিমন্ত্রণে আসিবেন শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহের ও যত্নের সহিত নিজেদেব চরম বন্ধন-কৌশল প্রদর্শন করিয়া পিষ্টক গড়িয়াছে। মেয়েদের সহৃদয়তার জন্য মনে মনে যথেষ্ট কৃতজ্ঞ হইলেও তাহাদের বন্ধন-বিদ্যার প্রশংসা করিযা উঠিতে পারিলাম না, ইহা আমাব পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয়। ঝল্লুটোলার অপেক্ষা নিকৃষ্টতর পিষ্টকের সহিতও স্থানে স্থানে পরিচয় ঘটিল।

সব জায়গায়ই দেখি বঙীন শাড়ী-পবা মেয়েবা কৌতূহলপূর্ণ চোখে আড়াল হইতে ভোজনরত বাংগালী বাবুদেব দিকে চাহিয়া আছে। রাজু পাঁড়ে কাহাকেও মনে কষ্ট দিল না—পিষ্টক ভক্ষণের সীমা অতিক্রম কবিয়া বাজু পাঁড়ে ক্রমশ অসীমের দিকে চলিতে লাগিল দেখিয়া আমি গণনার হাল ছাড়িয়া দিলাম—সুতবাং সে কযখানা পিষ্টক খাইযাছিল বলিতে পাবিব না।

শুধু রাজু কেন—নিমন্ত্রিত গাঙ্গোতাদেব মধ্যে সেই ইটেব মত কঠিন পিষ্টক এক-একজন এক কুড়ি দেড় কুড়ি কবিয়া খাইল—চোখে না দেখিলে বিশ্বাস করা শক্ত যে এই জিনিস মানুষে অত খাইতে পারে।

নাঢ়া-বইহারেব ছনিযা ও সুরতিযাদের ওখানেও গেলাম।

সুরতিয়া আমায় দেখিয়া ছুটিয়া আসিল।

—বাবুজী, এত রাত ক'বে ফেললেন? আমি আর মা দুজনে ব'সে আপনার জন্যে আলাদা ক'রে পিঠে গড়েছি—আমরা হাঁ ক'রে বসে আছি আর ভাবছি এত দেবি হচ্ছে কেন—আসুন, বসুন।

নক্‌ছেদী সকলকে খাতির কবিয়া বসাইল।

তুলসীকে খুব যত্ন করিয়া খাইবার আসন করিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলাম। ইহাদের এখানে খাইবার অবস্থা কি আর আছে?

সুরতিয়াকে বলিলাম—তোমার মাকে বল পিঠে তুলে নিতে। এত কে খাবে?

সুরতিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিল—ও কি বাবুজী, এই ক'খানা খাবেন না? আমি আর ছনিয়াই তো পনর-যোলখানা ক'রে খেয়েছি। খান—আপনি খাবেন ব'লে ওর ভেতরে মা কিশমিশ দিয়েছে, দুধ দিয়েছে—ভাল আটা এনেছে বাবা ভীমদাসটোলা থেকে—

খাইব না বলিয়া ভাল করি নাই। সারাবছর এই বালক-বালিকা এ-সব সুখাদ্যের মুখ দেখিতে

পায় না। এদের কত কষ্টের, কত আশার জিনিস! ছেলেমানুষকে খুশি করিবার জন্য মরীয়া হইয়া দুইখানা পিষ্টক খাইয়া ফেলিলাম।

সুরতিয়াকে খুশি করিবাব জন্য বলিলাম—চমৎকার পিঠে। কিন্তু সব জায়গায় কিছু কিছু খেয়েছি ব'লে খেতে পারলুম না সুরতিয়া। আর একদিন এসে হবে এখন।

রাজু পাঁড়ের হাতে একটা ছোটখাটো বোঁচকা। সে প্রত্যেকের বাড়ী হইতে ছাঁদা বাঁধিয়াছে, এক-একখানি পিষ্টকের ওজন বিবেচনা করিলে রাজুর বোঁচকার ওজন দশ-বারো সেরের কম তো কোনমতেই হইবে না।

রাজু খুব খুশি। বলিল—এ পিঠে হঠাৎ নষ্ট হয় না হুজুর, দু-তিন দিন আর আমায় বাঁধতে হবে না। পিঠে খেয়েই চলবে।

কাছারিতে পরদিন সকালে কুন্তা একখানি পিতলের থালা লইয়া আসিয়া আমার সামনে সসঙ্কোচে স্থাপন করিল। এক টুকবা ফর্সা নেকড়া দিয়া থালাখানা ঢাকা।

বলিলাম—ওতে কি কুন্তা?

কুন্তা সলজ্জ কণ্ঠে বলিল—ছট্-পববের পিঠে বাবুজী। কাল রাত্রে দু-বার নিয়ে এসে ফিবে গিয়েছি।

বলিলাম—কাল অনেক রাত্রে ফিরেছি, ছট্-পরবের নেমন্তন্ন বাখতে বেরিয়েছিলাম। আচ্ছা রেখে দাও, খাব এখন।

ঢাকা খুলিয়া দেখি, থালায় কয়েকখানি পিষ্টক, কিছু চিনি, দুটো কলা, একখণ্ড ঝুনা নারিকেল, একটা কমলালেবু।

বলিলাম—বাঃ, বেশ পিঠে দেখছি!

কুন্তা পূর্ব্ববৎ মৃদুস্বরে সসঙ্কোচে বলিল—বাবুজী, সবগুলো মেহেববানী ক'রে খাবেন। আপনি খাবেন ব'লে আলাদা ক'রে তৈরি করেছি। তবুও আপনাকে গরম খাওয়াতে পারলাম না, বড় দুঃখ রইল।

—কিছু হয় নি তাতে, কুন্তা। আমি সবগুলো খাব। দেখতে বড় চমৎকার দেখাচ্ছে। কুন্তা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

২

একদিন মুনেশ্বর সিং সিপাহী আসিয়া বলিল—হুজুর, ওই বনের মধ্যে গাছের নীচে একটা লোক ছেঁড়া কাপড় পেতে শুয়ে আছে—লোকজনে তাকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—ঢিল ছুঁড়ে মারে, আপনি হুকুম করেন তো তাকে নিয়ে আসি।

কথাটা শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম। বৈকাল বেলা, সন্ধ্যার বেশী দেরি নাই, শীত তেমন না হইলেও কার্তিক মাস, রাত্রে যথেষ্ট শিশির পড়ে, শেষরাত্রে বেশ ঠাণ্ডা। এ অবস্থায় একটা লোক বনের মধ্যে গাছের তলায় আশ্রয় লইয়াছে কেন, লোকে তাকে ঢিল ছুঁড়িয়াই বা মারে কেন বুঝিতে পারিলাম না।

গিয়া দেখি গ্র্যান্ট সাহেবের বটগাছের ওদিকে (আজ প্রায় ত্রিশ বছর আগে গ্র্যান্ট সাহেব আমীন লবটুলিয়ার বন্য মহাল জরীপ করিতে আসিয়া এই বটতলায় তাঁবু ফেলেন, সেই হইতেই গাছটির এই নাম চলিয়া আসিতেছে) একটা বনঝোপে একটা অর্জুন গাছের তলায় একটা লোক ছেঁড়া ময়লা নেকড়াকানি পাতিয়া শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া আছে। ঝোপের অন্ধকারে লোকটিকে ভাল করিয়া দেখিতে না পাইয়া বলিলাম—কে ওখানে? বাড়ী কোথায়? বের হয়ে এস—

লোকটি বাহির হইয়া আসিল—অনেকটা হামাগুড়ি দিয়া, অতি ধীরে ধীরে—বয়স পঞ্চাশের উপর, জীর্ণশীর্ণ চেহারা, মলিন ছেঁড়া কাপড় ও মেরজাই গায়ে,—যতক্ষণ সে ঝোপের ভতর হইতে বাহির হইতেছিল, কি একরকম অদ্ভুত, অসহায় ভাবে শিকারীর তাড়া-খাওয়া পশুর মত ভয়ার্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া ছিল।

ঝোপের অন্ধকার হইতে দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসিলে দেখিলাম, তাহার বাম হাতে ও বাম পায়ে ভীষণ ক্ষত। বোধ হয় সেই জন্য সে একবার বসিলে বা শুইলে হঠাৎ আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারে না।

মুনেশ্বর সিং বলিল—হুজুর, ওর ওই ঘায়ের জন্যেই ওকে বস্তিতে ঢুকতে দেয় না—জল পর্যন্ত চাইলে দেয় না। ঢিল মারে, দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়—

বোঝা গেল তাই এ লোকটা বনের পশুর মত বনঝোপের মধ্যেই আশ্রয় লইয়াছে এই হেমন্তের শিশিরার্দ্র রাত্রে।

বলিলাম—তোমার নাম কী? বাড়ী কোথায়?

লোকটা আমায় দেখিয়া ভয়ে কেমন হইয়া গিয়াছে—ওর চোখে রোগকাতর ও ভীত, অসহায় দৃষ্টি। তা ছাড়া আমার পিছনে লাঠি হাতে মুনেশ্বর সিং সিপাহী। বোধ হয় সে ভাবিল, সে যে বনে আশ্রয় লইয়াছে তাহাতেও আমাদের আপত্তি আছে—তাহাকে তাড়াইয়া দিতেই আমি সিপাই সঙ্গে করিয়া সেখানে গিয়াছি।

বলিল—আমার নাম?...নাম হুজুর গিরধারীলাল, বাড়ী তিনটাঙা। পরক্ষণেই কেমন একটা অদ্ভুত সুরে—মিনতি, প্রার্থনা এবং বিকারের রোগীর অসঙ্গত আবদারের সুর এই কয়টি মিলাইয়া এক ধরনের সুরে বলিল—একটু জল খাব—জল—

আমি ততক্ষণে লোকটাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি। সেবার পৌষমাসের মেলায় ইজারাদার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে সেই যে দেখিয়াছিলাম—সেই গিরধারীলাল। সেই ভীত দৃষ্টি, সেই নম্র মুখের ভাব—

দরিদ্র, নম্র, ভীরু লোকদেরই কি ভগবান জগতে এত বেশী করিয়া কষ্ট দেন। মুনেশ্বর সিংকে বলিলাম—কাছারি যাও—চার-পাঁচজন লোক আর একটা চারপাই নিয়ে এস—

সে চলিয়া গেল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কি হয়েছে গিরধারীলাল? আমি তোমায় চিনি। তুমি আমায় চিনতে পার নি? সেই যে সেবার ব্রহ্মা মাহাতোর তাঁবুতে মেলার সময় তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—মনে নেই? কোনো ভয় নেই। কি হয়েছে তোমার?

গিরধারীলাল ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হাত ও পা নাড়িয়া দেখাইয়া বলিল—হুজুর, কেটে গিয়ে ঘা হয়। কিছুতেই সে ঘা সারে না, যে যা বলে তাই করি—ঘা ক্রমেই বাড়ে। ক্রমে সকলে বললে—তোর কুষ্ঠ হয়েছে। সেই জন্য আজ চার-পাঁচ মাস এই রকম কষ্ট পাচ্ছি। বস্তির মধ্যে ঢুকতে দেয় না। ভিক্ষে ক'রে কোনো রকমে চালাই। রাত্রে কোথাও জায়গা দেয় না—তাই বনের মধ্যে ঢুকে শুয়ে থাকব বলে—

—কোথায় যাচ্ছিলে এদিকে? এখানে কি ক'রে এলে?

গিরধারীলাল এরই মধ্যে হাঁপাইয়া পড়িয়াছিল। একটু দম লইয়া বলি—পূর্ণিয়ার হাসপাতালে যাচ্ছিলাম হুজুর—নইলে ঘা তো সারে না।

আশ্চর্য না হইয়া পারিলাম না। মানুষের কি আগ্রহ বাঁচিবার। গিরধারীলাল যেখানে থাকে, পূর্ণিয়া সেখান হইতে চল্লিশ মাইলের কম নয়—মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্টের মত শ্বাপদসঙ্কুল আরণ্যভূমি সামনে—ক্ষতে অবশ হাত-পা লইয়া সে চলিয়াছে এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গলের পথ ভাঙিয়া পূর্ণিয়ার হাসপাতালে।

চারপাই আসিল। সিপাহীদের বাসার কাছে একটা খালি ঘরে উহাকে লইয়া গিয়া শোয়াইয়া দিলাম। সিপাহীরাও কুষ্ঠ বলিয়া একটু আপত্তি তুলিয়াছিল, পরে বুঝাইয়া দিতে তাহারা বুঝিল।

গিরধারীলাল খুব ক্ষুধার্ত বলিয়া মনে হইল। অনেকদিন সে যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় নাই। কিছু গরম দুধ খাওয়াইয়া দিতে সে কথঞ্চিৎ সুস্থ হইল।

সন্ধ্যার দিকে তাহার ঘরে গিয়া দেখি সে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

পরদিন স্থানীয় বিশিষ্ট চিকিৎসক রাজু পাঁড়েকে ডাকাইলাম। রাজু গম্ভীর মুখে অনেকক্ষণ ধরিয়া রোগীর নাড়ী দেখিল, ঘা দেখিল। রাজুকে বলিলাম—দেখ, তোমার দ্বারা হবে, না পূর্ণিয়ায় পাঠিয়ে দেব?

রাজু আহত অভিমানের সুরে বলিল—আপনার বাপ-মায়ের আশীর্বাদে হুজুর অনেক দিন এই কাজ করছি। পনের দিনের মধ্যে ঘা ভাল হয়ে যাবে।

গিরধারীকে হাসপাতালে পাঠাইয়া দিলেই ভাল করিতাম, পরে বুঝিলাম। ঘায়ের জন্য নহে, রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটির গুণে পাঁচ-ছয় দিনের মধ্যেই ঘায়ের চেহারা বদলাইয়া গেল—কিন্তু মুশকিল বাধিল তাহারা সেবা-শুশ্রূষা লইয়া। তাহাকে কেহ ছুঁইতে চায় না, ঘায়ে ঔষধ লাগাইয়া দিতে চায় না, তাহার খাওয়া জলের ঘটিটা পর্যন্ত মাজিতে আপত্তি করে।

তাহার উপর বেচারীর হইল জ্বর। খুব বেশী জ্বর।

নিরুপায় হইয়া কুন্তাকে ডাকাইলাম। তাহাকে বলিলাম—তুমি বস্তি থেকে একজন গাঙ্গোতার মেয়ে ডেকে দাও, পয়সা দেব—ওকে দেখাশুনো করতে হবে।

কুন্তা কিছুমাত্র না ভাবিয়া তখনই বলিল—আমি করব বাবুজী। পয়সা দিতে হবে না।

কুন্তা রাজপুতের স্ত্রী, সে গাঙ্গোতা রোগীর সেবা করিবে কি করিয়া? ভাবিলাম আমার কথা সে বুঝিতে পারে নাই।

বলিলাম—ওর এঁটো বাসন মাজতে হবে, ওকে খাওয়াতে হবে—ও তো উঠতে পারে না। সে-সব তোমায় দিয়ে কি ক'রে হবে?

কুন্তা বলিল—আপনি হুকুম করলেই আমি সব করব। আমি রাজপুত কোথায় বাবুজী! আমার জাতভাই কেউ এতদিন আমায় কি দেখেছে? আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। আমার আবার জাত কি?

রাজু পাঁড়ের জড়ি-বুটিব গুণে ও কুন্তার সেবাশুশ্রূষায় মাসখানেকের মধ্যে গিরধাবীলাল চাঙ্গা হইয়া উঠিল। কুন্তা এজন্য দিতে গেলেও কিছু লইল না। গিরধারীলালকে সে ইতিমধ্যে 'বাবা' বলিয়া ডাকিতে আবম্ভ করিয়াছে দেখিলাম। বলিল—আহা, বাবা বড় দুঃখী, বাবার সেবা ক'রে আবার পয়সা নেব? ধরমরাজ মাথার উপব নেই?

জীবনে যে কয়টি সৎ কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে একটা প্রধান সৎ কাজ নিরীহ ও নিঃস্ব গিরধারীলালকে বিনা সেলামীতে কিছু জমি দিয়া লবটুলিয়াতে বাস করানো।

তাহার খুপরিতে একদিন গিয়াছিলাম।

নিজের বিঘা পাঁচেক জমি সে নিজের হাতেই পরিষ্কার করিয়া গম বুনিয়াছে। খুপরির চারিপাশে কতগুলি গোঁড়ালেবুর চারা পুঁতিয়াছে।

—এত গোঁড়ালেবুর গাছ কি হবে গিরধারীলাল?

—হুজুর, ওগুলো সরবতী লেবু। আমি বড় খেতে ভালবাসি। চিনি-মিছরি জোটে না আমাদের, ভুরা গুড়ের সরবৎ ক'রে ওই লেবুর রস দিয়ে খেতে ভারি তার!

দেখিলাম আশার আনন্দে গিরধারীলালের নিরীহ চক্ষু দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

—ভাল কলমের লেবু। এক-একটা হবে এক পোয়া। অনেক দিন থেকে আমার ইচ্ছে, যদি কখনো জমি-জায়গা করতে পারি, তবে ভাল সরবতী লেবুর গাছ লাগাব। পরের দোরে লেবু চাইতে গিয়ে কতবার অপমান হয়েছি হুজুর। সে দুঃখ আর রাখব না।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

১

এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময় আসিয়াছে। একবার ভানুমতীর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা প্রবল হইল। ধন্‌ঝরি শৈলমালা একটি সুন্দর স্বপ্নের মত আমার মন অধিকার করিয়া আছে...তাহার বনানী...তাহার জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি...

সঙ্গে লইলাম যুগলপ্রসাদকে।

তহশীলদার সজ্জন সিং-এর ঘোড়াটাতে যুগলপ্রসাদ চড়িয়াছিল—আমাদের মহালের সীমানা পার হইতে না-হইতেই বলিল—হুজুর, এ ঘোড়া চলবে না, জঙ্গলের পথে রহল চাল ধরলেই হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে আমারও পা খোঁড়া হবে। বদলে নিয়ে আসি।

তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম। সজ্জন সিং ভাল সওয়ার, সে কতবার পূর্ণিয়ায় মোকদ্দমা তদারক করিতে গিয়াছে এই ঘোড়ায়। পূর্ণিয়া যাইতে হইলে কেমন পথে যাইতে হয় যুগলপ্রসাদের তাহা অজ্ঞাত নয়, নিশ্চয়ই।

শীঘ্রই কারো নদী পার হইলাম।

তারপর অরণ্য, অরণ্য—সুন্দর, অপূর্ব, ঘন নির্জন অবণ্য! পূর্বেই বলিয়াছি এ-জঙ্গলে মাথার উপরে গাছপালার ডালে ডালে জড়াজড়ি নাই—কেঁদ-চারা, শাল-চারা, পলাশ মহুয়া, কুলের অরণ্য—প্রস্তরাকীর্ণ রাঙা মাটির ডাঙা, উঁচু-নীচু। মাঝে মাঝে মাটির উপর বন্যহস্তীর পদচিহ্ন। মানুষজন নাই।

হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম লবটুলিয়ার নূতন তৈরী ঘিঞ্জি কুশ্রী টোলা ও বস্তি এবং একঘেয়ে ধূসর, চষা জমি দেখিবার পরে। এ-রকম আরণ্যপ্রদেশ এদিকে আর কোথাও নাই।

এই পথের সেই দুটি বন্য গ্রাম—বুরুডি ও কুলপাল বেলা বারোটার মধ্যেই ছাড়াইলাম। তার পরেই ফাকা জঙ্গল পিছনে পড়িয়া রহিল—সম্মুখে বড় বড় বনস্পতির ঘন অরণ্য। কার্তিকের শেষ, বাতাস ঠাণ্ডা—গবমের লেশমাত্রও নাই।

দূরে দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিল।

সন্ধ্যার পরে কাছারিতে পৌঁছিলাম। যে বিড়িপাতা জঙ্গল আমাদের স্টেট নীলামে ডাকিয়া লইয়াছিল, এ-কাছারি সেই জঙ্গলের ইজারাদারের।

লোকটা মুসলমান, শাহাবাদ জেলায় বাড়ী। নাম আবদুল ওয়াহেদ। খুব খাতির কবিয়া রাখিয়া দিল। বলিল—সন্ধ্যেব সময় পৌঁচেছেন, ভাল হয়েছে বাবুজী। জঙ্গলে বড় বাঘের ভয় হয়েছে।

নির্জন রাত্রি।

বড় বড় গাছে শন্‌ শন্‌ করিয়া বাতাস বাধিতেছে।

কাছারির বারান্দায় বসিবার ভরসা পাইলাম না কথাটা শুনিয়া।

ঘরের মধ্যে জানালা খুলিয়া বসিয়া গল্প করিতেছি—হঠাৎ কি-একটা জন্তু ডাকিয়া উঠিল বনের মধ্যে। যুগলকে বলিলাম—কি ও?

যুগল বলিল—ও কিছু না, হুড়াল। অর্থাৎ নেকড়ে বাঘ।

একবার গভীর রাত্রে বনের মধ্যে হায়েনার হাসি শোনা গেল—হঠাৎ শুনিলে বুকের রক্ত জমিয়া যায় ভয়ে, ঠিক যেন কাশরোগীর হাসি, মাঝে মাঝে দম বন্ধ হইয়া যায়, মাঝে মাঝে হাসির উচ্ছ্বাস।

পরদিন ভোরে রওনা হইয়া বেলা ন-টার মধ্যে দোবরু পান্নার রাজধানী চক্‌মকিটোলায় পৌঁছানো গেল। ভানুমতী কী খুশি আমার অপ্রত্যাশিত আগমনে। তার মুখে-চোখে খুশি যেন চাপিতে পারিতেছে না, উপচাইয়া পড়িতেছে।

—আপনার কথা কালও ভেবেছি বাবুজী। এতদিন আসেন নি কেন?

ভানুমতীকে একটু লম্বা দেখাইতেছে, একটু রোগাও বটে। তাছাড়া মুখশ্রী আছে ঠিক তেমনি লাবণ্যভরা, সেই নিটোল গড়ন তেমনি আছে।

—নাইবেন তো ঝরনায়? মহুয়া তেল আনব, না কড়ুয়া তেল? এবার বর্ষায় ঝরনায় কি সুন্দর জল হয়েছে দেখবেন চলুন।

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছি—ভানুমতী ভারি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সাধারণ সাঁওতাল মেয়েদের সঙ্গে তার সেদিক দিয়া তুলনাই হয় না—তার বেশভূষা ও প্রসাধনের সহজ সৌন্দর্য ও রুচিবোধই তাহাকে অভিজাতবংশের মেয়ে বলিয়া পরিচয় দেয়।

যে-মাটির ঘরের দাওয়ায় বসিয়া আছি, তাহার উঠানের চারিধারে বড় বড় আসান ও অর্জুন গাছ। এক ঝাঁক সবুজ বনটিয়া সামনের আসান গাছটার ডালে কলরব করিতেছে। হেমন্তের প্রথম, বেলা চড়িলেও বাতাস ঠাণ্ডা। আমার সামনে আধ মাইলেরও কম দূরে ধন্‌ঝরি পাহাড়শ্রেণী, পাহাড়ের গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়াছে চেরা সিঁথির মত পথ—একদিকে অনেক দূরে নীল মেঘের মত দৃশ্যমান গয়া জেলার পাহাড়শ্রেণী।

বিড়ির পাতার জঙ্গল ইজারা লইয়া এই শান্ত জনবিরল বন্য প্রদেশের পল্লবপ্রচ্ছায় উপত্যকার কোনো পাহাড়ী ঝরনার তীরে কুটির বাঁধিয়া বাস করিতাম চিরদিন। লবটুলিয়া তো গেল, ভানুমতীর দেশের এ-বন কেহ নষ্ট করিবে না। এ-অঞ্চলে মরুমকাঁকর ও পাইওরাইট্ বেশী মাটিতে, ফসল তেমন হয় না—হইলে এ-বন কোন্ কালে ঘুচিয়া যাইত। তবে যদি তামার খনি বাহির হইয়া পড়ে, সে স্বতন্ত্র কথা।

তামার কারখানার চিমনি, ট্রলি লাইন, সারি সারি কুলি-বস্তি, ময়লা জলের ড্রেন, এঞ্জিন-ঝাড়া কয়লার ছাইয়ের স্তূপ—দোকানঘর, চায়ের দোকান, সস্তা সিনেমায় 'জোয়ানী-হাওয়া, 'শের শমশের' 'প্রণয়ের জের' (ম্যাটিনিতে তিন আনা, পূর্বাহ্নে আসন দখল করুন)—দেশী মদের দোকান, দরজীর দোকান। হোমিও ফার্মেসী (সমাগত দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা হয়)। আদি ও অকৃত্রিম আদর্শ হিন্দু হোটেল।

কলের বাঁশিতে তিনটার সিটি বাজিল।

ভানুমতী মাথায় করিয়া এঞ্জিনের ঝাড়া কয়লা বাজারে ফিরি করিতে বাহির হইয়াছে—ক-ই-লা চা-ই-ই—চার পয়সা ঝুড়ি।...

ভানুমতী তেল আনিয়া সামনে দাঁড়াইল। ওদের বাড়ীর সবাই আসিয়া আমাকে নমস্কার করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল। ভানুমতীর ছোট কাকা নবীন যুবক জগরু একটা গাছের ডাল ছুলিতে ছুলিতে আসিয়া আমার দিকে চাহিয়া হাসিল। এই ছেলেটিকে আমি বড় পছন্দ করি। রাজপুতের মত চেহারা ওর, কালোর উপরে কি রূপ। এদের বাড়ীর মধ্যে এই যুবক এবং ভানুমতী, এদের দুজনকে দেখিলেই সত্যই যে ইহারা বন্য জাতির মধ্যে অভিজাতবংশ, তা মনে না হইয়া পারে না।

বলিলাম—কি জগরু, শিকার-টিকার কেমন চলছে?

জগরু হাসিয়া বলিল—আপনাকে আজই খাইয়ে দেব বাবুজী, ভাববেন না। বলুন কি খাবেন, সজারু, না হরিয়াল, না বনমোরগ?

স্নান করিয়া অসিলাম। ভানুমতী নিজের সেই আয়নাখানি (সেবার যেখানা পূর্ণিয়া হইতে আনাইয়া দিয়াছিলাম) আর একখানা কাঠের কাঁকুই চুল আঁচড়াইবার জন্য আনিয়া দিল।

আহারাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, ভানুমতী প্রস্তাব করিল—বাবুজী চলুন, পাহাড়ে উঠবেন না? আপনি তো ভালবাসেন।

যুগলপ্রসাদ ঘুমাইতেছিল, সে ঘুম ভাঙিয়া উঠিলে আমরা বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। সঙ্গে রহিল ভানুমতি, ওর খুড়তুতো বোন—জগরু পান্নার মেজ ভাইয়ের মেয়ে, বছর বারো বয়স—আর যুগলপ্রসাদ।

আধ মাইল হাঁটিয়া পাহাড়ের নীচে পৌঁছিলাম।

ধন্ঝরির পাদমূলে এই জায়গায় বনের দৃশ্য এত অপূর্ব যে, খানিকটা দাঁড়াইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে। যেদিকে চোখ ফিরাই সেদিকেই বড় বড় গাছ, লতা, উপল-বিছানো ঝরনার খাদ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছোট-বড় শিলাস্তূপ। ধন্ঝরির দিকে বন ও পাহাড়ের আড়ালে আকাশটা কেমন সরু হইয়া গিয়াছে, সামনে লাল কাঁকুরে মাটির রাস্তা উঁচু হইয়া ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়া পাহাড়ের ও-পারের দিকে উঠিয়াছে, কেমন খট্খটে শুক্নো ডাঙা মাটি, কোথাও ভিজা নয়, স্যাঁৎসেতে নয়। ঝরনার খাদেও এতটুকু জল নাই।

পাহাড়ের উপরে ঘন বন ঠেলিয়া কিছুদূর উঠিতেই কিসের মধুর সুবাসে মনপ্রাণ মাতিয়া উঠিল, গন্ধটা অত্যন্ত পবিচিত--প্রথমটা ধবিতে পারি নাই, তারপরে চাহিয়া দেখি—ধন্ঝরি পাহাড়ে যে এত ছাতিম গাছ তাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই—এখন প্রথম হেমন্তে ছাতিম গাছে ফুল ধরিয়াছে, তাহারই সুবাস।

সে কি দু-চারটি ছাতিম গাছ! সপ্তপর্ণেব বন, সপ্তপর্ণ আর কেলিকদম্ব—কদম্ব-ফুলের গাছ নয়, কেলিকদম্ব ভিন্নজাতীয় বৃক্ষ, সেগুন পাতার মত বড় বড় পাতা, চমৎকার আঁকাবাঁকা ডালপালাওয়ালা বনস্পতিশ্রেণীর বৃক্ষ।

হেমন্তেব অপবাহ্নের শীতল বাতাসে পুষ্পিত বন্য সপ্তপর্ণের ঘন বনে দাঁড়াইয়া নিটোল স্বাস্থ্যবতী কিশোবী ভানুমতীব দিকে চাহিয়া মনে হইল, মূর্তিমতী বনদেবীর সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইযাছি—কৃষ্ণা বনদেবী। রাজকুমারী তো ও বটেই! এই বনাঞ্চলে, এই পাহাড়, ওই মিছি নদী, কারো নদীব উপত্যকা, এদিকে ধন্ঝরি, ওদিকে নওযাদার শৈলশ্রেণী—এই সমস্ত স্থান এক সময়ে যে পরাক্রান্ত বাজবংশের অধীনে ছিল, ও সেই রাজবংশের মেয়ে—আজ ভিন্ন যুগের আবহাওয়ায় ভিন্ন সভ্যতার সংঘাতে যে বাজবংশ বিপর্যস্ত দবিদ্র, প্রভাবহীন—তাই আজ ভানুমতীকে দেখিতেছি সাঁওতালী মেয়েব মত। ওকে দেখিলেই অলিখিত ভাবতবর্ষের ইতিহাসের এই ট্র্যাজিক অধ্যায় আমার চোখেব সামনে ফুটিযা উঠে।

আজকাব এই অপবাহ্নটি আমাব জীবনে আরও বহু সুন্দব অপরাহ্নের সঙ্গে মিলিয়া মধুময় স্মৃতিব সমাবোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—স্বপ্নেব মত মধুর, স্বপ্নেব মতই অবাস্তব।

ভানুমতী বলিল—চলুন, আবও উঠবেন না?

—কি সুন্দব ফুলেব গন্ধ বল তো? একটু বসবে না এখানে? সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখি—

ভানুমতী হাসিমুখে বলিল—আপনার যা মর্জি বাবুজী। বসতে বলেন এখানে বসি। কিন্তু জ্যাঠামশাইয়েব কববে ফুল দেবেন না? আপনি সেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, আমি রোজ পাহাড়ে উঠি ফুল দিতে। এখন তো বনে কত ফুল।

দূবে মিছি নদী উত্তরবাহিনী হইয়া পাহাড়ের নীচে দিয়া ঘুরিয়া যাইতেছে। নওয়াদার দিকে যে অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণী, তাবই পিছনে সূর্য অস্ত গেল। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী হাওয়া আরও শীতল হইল। ছাতিম ফুলেব সুবাস আরও ঘন হইয়া উঠিল, ছায়া গাঢ় হইয়া নামিল শৈলসানুর বনস্থলীতে, নিম্নের বনাবৃত উপত্যকায়, মিছি নদীর পরপারে গণ্ড-শৈলমালার গাত্রে।

ভানুমতী একগুচ্ছ ছাতিম ফুল পাড়িয়া খোঁপায় গুঁজিল। বলিল—বসব, না উঠবেন বাবুজী?

আবার উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রত্যেকের হাতে এক-একটা ছাতিম ফুলের ডাল। একেবারে পাহাড়ের উপরে উঠিয়া গেলাম। সেই প্রাচীন বটগাছটা ও তার তলায় প্রাচীন রাজ-সমাধি। বড় বড় বাটনা-বাটা শিলের মত পাথর চারিদিকে ছড়ানো। রাজা দোবরু পান্নার কবরের উপর ভানুমতী ও তাহার বোন নিছনী ফুল ছড়াইল, আমি ও যুগলপ্রসাদ ফুল ছড়াইলাম।

ভানুমতী বালিকা তো বটেই, সরলা বালিকার মত মহা খুশি। বালিকার মত আব্দারের সুরে বলিল—এখানে একটু দাঁড়াই বাবুজী, কেমন? বেশ লাগছে, না?

আমি ভাবিতেছিলাম—এই শেষ। আর এখানে আসিব না। এ পাহাড়ের উপরকার সমাধিস্থান, এ বনাঞ্চল আর দেখিব না। ধন্‌ঝরির শৈলচূড়ায় পুষ্পিত সপ্তপর্ণের নিকট, ভানুমতীর নিকট, এই আমার চিরবিদায়। ছ-বছরেব দীর্ঘ বনবাস সাঙ্গ করিয়া কলিকাতা নগরীতে ফিরিব—কিন্তু যাইবার দিন ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের কেন এত বেশী করিয়া জড়াইয়া ধরিতেছি।

ভানুমতীকে কথাটা বলিবার ইচ্ছা হইল, ভানুমতী কি বলে আমি আর আসিব না শুনিয়া—জানিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কি হইবে সরলা বনবালাকে বৃথা ভালবাসার, আদরের কথা বলিয়া?

সন্ধ্যা হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা নূতন সুবাস পাইলাম। আশেপাশের বনের মধ্যে যথেষ্ট শিউলি গাছ আছে। বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের ঘন সুগন্ধ সান্ধ্য-বাতাসকে সুমিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ছাতিম বন এখানে নাই—সে আরও নীচে নামিলে তবে। এরই মধ্যে গাছপালার ডালে জোনাকি জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাতাস কি সতেজ, মধুর, প্রাণারাম? এ বাতাস সকালে বিকালে উপভোগ করিলে আয়ু না বাড়িয়া পারে? নামিতে ইচ্ছা করিতেছিল না, কিন্তু বন্য জন্তুব ভয় আছে—তা ছাড়া ভানুমতী সঙ্গে রহিয়াছে। যুগলপ্রসাদ বোধ হয় ভাবিতেছিল, নূতন কোন্ ধরনেব গাছপালা এ জঙ্গল হইতে লইয়া গিয়া অন্যত্র রোপণ করিতে পারে। দেখিলাম তাহার সমস্ত মনোযোগ নূতন লতাপাতার ফুল, সুদৃশ্য পাতাব গাছ প্রভৃতির দিকে নিবদ্ধ—অন্য দিকে তাহাব দৃষ্টি নাই। যুগলপ্রসাদ পাগলই বটে, কিন্তু ঐ এক ধরনের পাগল।

নূরজাহান নাকি পারস্য হইতে চেনাব গাছ আনিযা কাশ্মীবে বোপণ করিয়াছিলেন। এখন নূরজাহান নাই, কিন্তু সারা কাশ্মীর সুদৃশ্য চেনার বৃক্ষে ছাইয়া ফেলিয়াছে। যুগলপ্রসাদ মরিয়া যাইবে, কিন্তু সরস্বতী হ্রদের জলে আজ শতবর্ষ পরেও হেমন্তে ফুটন্ত স্পাইডার-লিলি বাতাসে সুগন্ধ ছড়াইবে, কিংবা কোন-না-কোন বনঝোপে বন্য হংসলতার হংসাকৃতি নীলফুল দুলিবে, যুগলপ্রসাদই যে সেগুলি নাঢ়া বইহারের জঙ্গলে আমদানি করিয়াছিল একদিন—একথা না-ই বা কেহ বলিল!

ভানুমতী বলিল—বাঁয়ে ওই সেই টাঁড়বারোর গাছ—চিনেছেন?

বন্য-মহিষের রক্ষাকর্তা সদয় দেবতা টাঁড়বারোর গাছ অন্ধকারে চিনিতে পাবি নাই। আকাশে চাঁদ নাই, কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি।

অনেকটা নামিয়া আসিয়াছি। এবাব সেই ছাতিম বন। কি মিষ্ট মনমাতানো গন্ধ!

ভানুমতীকে বলিলাম—এখানে একটু বসি।

পরে সেই বনপথে অন্ধকারের মধ্যে নামিতে নামিতে ভাবিলাম, লবটুলিযা গিয়াছে, নাঢা ও ফুলকিয়া বইহাব গিয়াছে—কিন্তু মহালিখারূপেব পাহাড় রহিল—ভানুমতীদের ধন্‌ঝরির পাহাড়েব বনভূমি রহিল। এমন সময় আসিবে হয়তো দেশে, যখন মানুযে অরণ্য দেখিতে পাইবে না—শুধুই চাষের ক্ষেত আব পাটের কল, কাপড়ের কলের চিমনি চোখে পড়িবে, তখন তাহারা আসিবে এই নিভৃত অরণ্যপ্রদেশে, যেমন লোকে তীর্থে আসে। সেই সব অনাগত দিনের মানুযদের জন্য এ বন অক্ষুণ্ণ থাকুক।

২

রাত্রে বসিয়া জগরু পান্না ও তাহার দাদার মুখে তাহাদের সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা শুনিলাম। মহাজনের দেনা এখনও শোধ হয় নাই, দুইটি মহিষ ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছে, না কিনিলে চলে না, গয়ার এক মাড়োয়ারী মহাজন আগে আসিয়া ঘি কিনিয়া লইয়া যাইত—আজ তিন-চার মাস সে আর আসে না। প্রায় আধ মণ ঘি ঘরে মজুত, খরিদ্দার নাই।

ভানুমতী আসিয়া দাওয়ার একধারে বসিল। যুগলপ্রসাদ অত্যন্ত চা-খোর, সে চা-চিনি সঙ্গে

আনিয়াছে আমি জানি। কিন্তু লাজুকতাবশত গরম জলের কথা বলিতে পারিতেছে না, তাহাও জানি। বলিলাম—চায়ের জল একটু গরম করার সুবিধে হবে কি ভানুমতী?

রাজকুমারী ভানুমতী চা কখনও করে নাই। চা খাইবার রেওয়াজই নাই এখানে। তাহাকে জলের পরিমাণ বুঝাইয়া দিতে সে মাটির হাঁড়িতে জল গরম করিয়া আনিল। তাহার ছোট বোন কয়েকটি পাথরবাটি আনিল। ভানুমতীকে চা খাইবার অনুরোধ করিলাম, সে খাইতে চাহিল না। জগরু পান্না পাথরের ছোট খোরার এক খোরা চা শেষ করিয়া আরও খানিকটা চাহিয়া লইল।

চা খাইয়া আর-সকলে উঠিয়া গেল, ভানুমতী গেল না। আমায় বলিল—ক' দিন এখানে আছেন বাবুজী? এবার বড় দেরী ক'রে এসেছেন। কাল তো যেতেই দেব না। চলুন আপনাকে কাল ঝাটি ঝরনা বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ঝাটি ঝরনায় আরও ভয়ানক জঙ্গল। ওদিকে বড্ডো বুনো হাতী। অনেক বনময়ূরও আছে দেখতে পাবেন। চমৎকার জায়গা। পৃথিবীর মধ্যে এমন আর নেই।

ভানুমতীর পৃথিবী কতটুকু জানিবার বড় ইচ্ছা হইল। বলিলাম—ভানুমতী, কখনো কোনো শহর দেখেছ?

—হাঁ বাবুজী।

—দু-একটা শহরের নাম বল তো?

—গয়া, মুঙ্গের, পাটনা।

—কলকাতার নাম শোন নি?

—হাঁ বাবুজী।

—কোন্ দিকে জান?

—কি জানি বাবুজী!

—আমরা যে দেশে বাস করি তার নাম জান?

—আমরা গয়া জেলায় বাস করি।

—ভারতবর্ষের নাম শুনেছ?

—ভানুমতী মাথা নাড়িয়া জানাইল, সে শোনে নাই। কখনও কোথাও যায় নাই চক্‌মকিটোলা ছাড়িয়া। ভারতবর্ষ কোন্‌দিকে?

একটু পরে বলিল—আমার জ্যাঠামশায় একটা মহিষ এনেছিলেন, সেটা এবেলা তিন সের, ওবেলা তিন সের দুধ দিত। তখন আমাদের চেয়ে ভাল অবস্থা ছিল বাবুজী, তখন যদি আপনি আসতেন, আপনাকে রোজ খোয়া খাওয়াতাম। জ্যাঠামশায় নিজের হাতে খোয়া তৈরি করতেন। কি মিষ্টি খোয়া। এখন তেমন দুধই হয় না তার খোয়া। তখন আমাদের খাতিরও ছিল খুব।

পরে হাতখানি একবার তুলিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া গর্ব্বের সহিত বলিল—জানেন বাবুজী, এই সমস্ত দেশ আমাদের রাজ্য ছিল। সারা পৃথিবীটা। বনে যে গোঁড় দেখেন, সাঁওতাল দেখেন, ওরা আমাদের জাত নয়। আমরা রাজগোঁড়। আমাদের প্রজা ওরা, আমাদের রাজা ব'লে মানে।

উহার কথায় দুঃখও হইল, হাসিও পাইল। মহাজনে দেনার দায়ে দুই বেলা যাহাদের মহিষ ধরিয়া লইয়া যায়, সেও রাজবংশের গর্ব করিতে ছাড়ে না।

বলিলাম—আমি জানি ভানুমতী তোমাদের কত বড় বংশ—

ভানুমতী বলিল—তারপর শুনুন বাবুজী, আমাদের সেই মহিষটা বাঘে নিয়ে গেল। জ্যাঠামশায় যে মহিষটা এনেছিলেন।

—কি ক'রে?

—জ্যাঠামশায় ওই পাহাড়ের নীচে চরাতে নিয়ে গিয়ে একটা গাছতলায় বসেছিলেন, সেখানে বাঘে ধরল।

বলিলাম—তুমি বাঘ দেখেছ কখনও?

ভানুমতী কালো জোড়া-ভুরু দুটি আশ্চর্য হইবার ভঙ্গিতে উপরের দিকে তুলিয়া বলিল—বাঘ দেখিনি বাবুজী! শীতকালে আসবেন চক্‌মকিটোলায়—বাড়ীর উঠোন থেকে গরু-বাছুর ধরে নিয়ে যায় বাঘে—

বলিয়াই সে ডাকিল—নিছনি, নিছনি—শোন্—

ছোট বোন আসিলে বলিল—নিছনি, বাবুজীকে শুনিয়ে দে তো আর বছর শীতকালে বাঘ রোজ রাতে আমাদের উঠোনে এসে কি ক'রে বেড়াত। জগরু একদিন ফাঁদ পেতেছিল। ধরা পড়ল না।

পরে হঠাৎ বলিল—ভাল কথা, বাবুজী, একখানা চিঠি পড়ে দেবেন? কোথা থেকে একখানা চিঠি এসেছিল, কে পড়বে, এমনি তোলা রয়েছে। যা নিছনি, চিঠিখানা নিয়ে আয়, আর জগরু-কাকাকেও ডেকে নিয়ে আয়—

নিছনি চিঠি পাইল না। তখন ভানুমতী নিজে গিয়া অনেক খুঁজিয়া সেখানা বাহির করিযা আমার হাতে আনিয়া দিল।

বলিলাম—কবে এসেছে এখানা?

ভানুমতী বলিল—মাস ছ-সাত হবে বাবুজী—ভুলে রেখে দিইছি, আপনি এলে পড়াবো। আমরা তো কেউ পড়তে পারিনে। ও নিছনি, জগরু-কাকাকে ডেকে নিয়ে আয়। চিঠি পড়া হবে—সবাইকে ডাক দে।

ছ-সাত মাস পূর্বের পুরনো অপঠিত পত্রখানা আমি যুগলপ্রসাদের উনুনের আলোয় পড়িতে বসিলাম—আমার চারিধারে বাড়ীসুদ্ধ লোক ঘিরিয়া বসিল চিঠি শুনিবার জন্য। চিঠিখানা কায়েথী-হিন্দীতে লেখা—রাজা দোবরু পান্নাব নামে চিঠি। পাটনার জনৈক মহাজন রাজা দোবরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে, এখানে বিড়িপাতার জঙ্গল আছে কিনা—থাকিলে কি দরে ইজারা বিলি হয়।

এ পত্রের সঙ্গে ইহাদেব কোনো সম্পর্ক নাই—ইহাদের অধীনে কোনো বিড়িপাতার জঙ্গল নাই। রাজা দোবরু নামে রাজা ছিলেন, চক্‌মকিটোলার নিজ বসতবাটির বাহিরে তাঁর যে কোথাও এক ছটাক জমিও নাই একথা পাটনার উক্ত পত্রলেখক মহাজন জানিলে ডাকমাশুল খরচ করিয়া বৃথা পত্র দিত না নিশ্চয়ই।

একটু দূরে দাওয়ার ও-পাশে যুগলপ্রসাদ রান্না করিতেছে। তাহার কাঠের উনুনের আলোয় দাওয়ার খানিকটা আলো হইয়াছে। এদিকে দাওয়ার অর্ধেকটায় জ্যোৎস্না পড়িয়াছে, যদিও কৃষ্ণপক্ষের আজ মোটে তৃতীয়া—ধন্‌ঝরি পাহাড়ের আড়াল কাটাইয়া এই কিছুক্ষণ মাত্র চাঁদ ফাঁকা আকাশে দৃশ্যমান হইয়াছে। সামনে কিছুদূরে অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাহাড়শ্রেণী—চক্‌মকিটোলার বস্তির ছেলেপুলেদের কথা ও কলরব শোনা যাইতেছে।...কি সুন্দর ও অপূর্ব মনে হইতেছিল এই বন্য গ্রামে যাপিত এই রাত্রিটি! ভানুমতীর তুচ্ছ ও সাধারণ গল্পও কি আনন্দই দিতেছিল! সেদিন বলভদ্রের মুখে শোনা সেই উন্নতি করিবার কথা মনে পড়িল।

মানুষে কি চায়—উন্নতি না আনন্দ? উন্নতি করিয়া কি হইবে যদি তাহাতে আনন্দ না থাকে? আমি এমন কত লোকের কথা জানি, যাহারা জীবনে উন্নতি করিয়াছে বটে, কিন্তু আনন্দকে হারাইয়াছে। অতিরিক্ত ভোগে মনোবৃত্তির ধার ক্ষইয়া ক্ষইয়া ভোঁতা—এখন আর কিছুতেই তেমন আনন্দ পায় না, জীবন তাহাদের নিকট একঘেয়ে, একরঙা, অর্থহীন। মন শান-বাঁধানো—রস ঢুকিতে পায় না।

এখানেই যদি থাকিতে পারিতাম! ভানুমতীকে বিবাহ করিতাম। এই মাটির ঘরের জ্যোৎস্না-ওঠা দাওয়ায় সরলা বন্যবালা রাঁধিতে রাঁধিতে এমনি করিয়া ছেলেমানুষী গল্প করিত—আমি বসিয়া বসিয়া শুনিতাম। আর শুনিতাম বেশী রাত্রে ওই বনে হুড়ালের ডাক, বন্য হস্তীর বৃংহতি, হায়েনার হাসি। ভানুমতী কালো বটে, কিন্তু এমন নিটোল স্বাস্থ্যবতী মেয়ে বাংলা দেশে পাওয়া যায় না। আর

ওর ওই সতেজ সরল মন। দয়া আছে, মায়া আছে, স্নেহ আছে—তার কত প্রমাণ পাইয়াছি।...ভাবিতেও বেশ লাগে। কি সুন্দর স্বপ্ন। কি হইবে উন্নতি করিয়া? বলভদ্র সেঙ্গাৎ গিয়া উন্নতি করুক। রাসবিহারী সিং উন্নতি করুক।

যুগলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করিল, রান্না হইয়াছে, চৌকা লাগাইবে কিনা। ভানুমতীদের বাড়ীতে আতিথ্যের কোনো ত্রুটি হয় না। এদেশে আনাজ মেলে না, তবুও কোথা হইতে জগরু বেগুন ও আলু আনিয়াছে। মাষকলাইয়ের ডাল, পাখির মাংস, বাড়ীতে তৈরি অতি উৎকৃষ্ট টাটকা ভয়সা ঘি, দুধ। যুগলপ্রসাদের হাতের রান্নাও চমৎকার।

ভানুমতী, জগরু, জগরুর দাদা, নিছনি—সবাই আজ আমাদের এখানে খাইবে—আমি খাইতে বলিয়াছি। কারণ এমন রান্না উহারা কখনও খাইতে পায় না। বলিলাম—একটু দূরে উহারাও একসঙ্গে সবাই বসুক। যুগলপ্রসাদের দেওয়ারও সুবিধা হইবে। একত্র খাওয়া যাক।

ওরা রাজী হইল না। আমাদের আগে না খাওয়া হইলে উহারা খাইবে না।

পরদিন আসিবার সময় ভানুমতী এক কাণ্ড করিল।

হঠাৎ আমার হাত ধরিয়া বলিল—আজ যেতে দেব না বাবুজী—

আমি অবাক হইয়া উহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। কষ্ট হইল।

উহার অনুরোধে সকালে রওনা হইতে পারিলাম না—দুপুরের আহারাদির পরে বিদায় লইলাম।

... ...

আবার দুধারে ছয়ানিবিড় বনপথ। পথের ধারে কোথাও বাজকুমারী ভানুমতী যেন দাঁড়াইয়া আছে—বালিকা নয়, যুবতী ভানুমতী—তাহাকে আমি কখনও দেখি নাই। তার সাগ্রহ দৃষ্টি, তার প্রণয়ীর আগমন-পথেব দিকে নিবদ্ধ—হয়তো সে পাহাড়েব ওপারেব বনে শিকারে গিয়াছে, আসিবার দেরি নাই। তরুণীকে মনে মনে আশীর্বাদ করিলাম। ধন্‌ঝরী পাহাড়ের জোনাকি-জ্বালা নিস্তব্ধ প্রাচীন ছাতিম ফুলের বন ও অপূর্ব দূরছন্দা সন্ধ্যার আড়ালে বনবালার গোপন অভিসার সার্থক হউক।

মহালে ফিবিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সকলের নিকট বিদায় লইয়া লবটুলিয়া ত্যাগ করিলাম।

আসিবার সময় রাজু পাঁড়ে, গনোরী, যুগলপ্রসাদ, আস্‌রফি টিণ্ডেল প্রভৃতি পাল্কির চারিধার ঘিরিয়া পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে লবটুলিয়ার সীমানার নূতন বস্তি মহারাজটোলা পর্যন্ত আসিল। মটুকনাথ সংস্কৃতে স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া আমায় আশীর্বাদ করিল। রাজু বলিল—হুজুর, আপনি চলে গেলে লবটুলিয়া উদাস হয়ে যাবে।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, এদেশে 'উদাস' শব্দের ব্যবহার এবং উহার অর্থের ব্যাপকতা অত্যন্ত বেশী। মকাই-ভাজা খাইতে খারাপ লাগিলে বলে, 'ভাজা উদাস লাগছে।' আমার সম্পর্কে কি অর্থে উহা ব্যবহৃত হইল ঠিক বলিতে পারিব না।

আমার বিদায় লইয়া আসিবার সময় একটি মেয়ে কাঁদিয়াছিল। আজ সকাল হইতে আসিয়া সে কাছারির উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল—আমার পাল্কি যখন তোলা হইল, তখন চাহিয়া দেখি সে হাপুস-নয়নে কাঁদিতেছে। মেয়েটি কুন্তা।

নিরাশ্রয় কুন্তাকে জমি দিয়া বসবাস করাইয়াছি, আমার ম্যানেজারী জীবনের ইহা একটি সৎকাজ। পারিলাম না কিছু করিতে সেই বন্য বালিকা মঞ্চীর। অভাগিনীকে কে কোথায় যে ভুলাইয়া লইয়া গেল! আজ সে যদি থাকিত তাহার নিজের নামে জমি দিতাম বিনা সেলামীতে।

নাঢ়া বইহারের সীমানায় নক্‌ছেদীর ঘর দেখিয়াই আরও ওর কথা মনে পড়িল। সুরতিয়া ঘরের বাহিরে কি করিতেছিল, আমার পাল্কি দেখিয়াই বলিয়া উঠিল—বাবুজী, বাবুজী, একটু রাখুন—

পরে সে ছুটিয়া আসিয়া পাল্কির কাছে দাঁড়াইল। ছনিয়াও আসিল পিছু পিছু।

—বাবুজী, কোথায় যাচ্ছেন?

—ভাগলপুরে। তোর বাবা কোথায়?
—ঝল্লুটোলায় গমের বীজ আনতে গিয়েছে। কবে আসবেন?
—আর আসব না।
—ইস্! মিথ্যে কথা!...

নাঢ়া বইহারের সীমানা পার হইয়া পাল্কি হইতে মুখ বাড়াইয়া একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলাম।

বহু বস্তি, চালে চালে বসত, লোকজনের কথাবার্তা, বালক-বালিকার কলহাস্য, চিৎকার, গরু-মহিষ, ফসলের গোলা। ঘন বন কাটিয়া আমিই এই হাস্যদীপ্ত শস্যপূর্ণ জনপদ বসাইয়াছি ছয়-সাত বৎসরের মধ্যে। সবাই কাল তাহাই বলিতেছিল—বাবুজী, আপনার কাজ দেখে আমরা পর্যন্ত অবাক হয়ে গিয়েছি, নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হয়েছে!

কথাটা আমিও ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি। নাঢ়া লবটুলিয়া কি ছিল আর কি হইয়াছে!

দিগন্তলীন মহালিখারূপের পাহাড় ও মোহনপুরা অরণ্যানীর উদ্দেশে দূর হইতে নমস্কার করিলাম।

হে অরণ্যানীর আদিম দেবতারা, ক্ষমা করিও আমায়। বিদায়!..

৩

বহু কাল কাটিয়া গিয়াছে তারপর—পনেরো-ষোল বছর।

বাদাম গাছের তলায় বসিয়া এই সব ভাবিতেছিলাম।

বেলা একেবারে পড়িয়া আসিয়াছে।

বিস্মৃতপ্রায় অতীতের যে নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্য-প্রান্তর আমার হাতেই নষ্ট হইয়াছিল, সরস্বতী হ্রদের সে অপূর্ব বনানী, তাহাদের স্মৃতি স্বপ্নের মত আসিয়া মাঝে মাঝে মনকে উদাস করে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, কেমন আছে কুন্তা, কত বড় হইয়া উঠিয়াছে সুরতিয়া, মটুকনাথের টোল আজও আছে কিনা, ভানুমতী তাহাদের সেই শৈলবেষ্টিত আরণ্যভূমিতে কি করিতেছে, রাখালবাবুর স্ত্রী, ধ্রুবা, গিরধারীলাল, কে জানে এতকাল পরে কে কেমন অবস্থায় আছে!...

আর মনে হয় মাঝে মাঝে মঞ্চীর কথা। অনুতপ্তা মঞ্চী কি আবার স্বামীর কাছে ফিরিয়াছে, না আসামের চা-বাগানে চায়ের পাতা তুলিতেছে আজও!

কতকাল তাহাদের আর খবর রাখি না।

নীলাঙ্গুরীয়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ সে প্রে উ ৪৬

মীরা

১

আমার প্রশ্ন বোধ হয় একটু জটিল।—ভালবাসা কি সব সময়েই তাহার সেই চিরন্তন-রূপেই দেখা দিবে? সেই আবেগবিহ্বল কিংবা অশ্রুসজল? ঘৃণা কি সব সময়েই ঘৃণা? ভালবাসা কি একটা অভিনয়?—না, সত্য থেকে অভিন্ন একটা কিছু?...যদি তাহাই হয় তো সত্যের সেই অন্তর্বহ্নিতে সে কি, যাহা খাদ, যাহা অবান্তর, সেই, সবকিছুকেই দগ্ধ ভস্মীভূত করিয়া দিতে সমর্থ নয়?...বেশ গুছাইয়া মনের কথাটি বলিতে পারিতেছি না; কিন্তু এও বলি—হাজার গুছাইয়া বলিলেও অর্থাগম হইবার সম্ভাবনা আছে আপনাদের নিকট?

আপনাদের মস্তিষ্কের উপর কটাক্ষ করিতেছি না, দোহাই। বলিতেছি অভিজ্ঞতার কথা।—আপনারা ভালবাসেন নাই, ভালবাসা কত রূপ তাহা দেখেন নাই, ভালবাসা পাওয়া তো দূরের কথা। প্রমাণ দিবেন বিবাহের। কিন্তু এটা আমার তরফের প্রমাণ, অর্থাৎ বিবাহিত বলিয়াই ভালবাসার কিছু জানিলেন না। আপনাদের বিবাহ তো? আপনি তখন বোধ হয় প্রাণপণে পাশের পড়া লইয়া ব্যস্ত, ঘটকিনী হাঁটাহাঁটি করিতেছে, আপনার পিতা আর বাড়ির অন্যান্য পুরুষেরা কুটুম এবং গহনা যাচাই করিতেছেন, মেয়েরা পাত্রীর নাক, চোখ, কান, চুলের হ্রস্ব-দীর্ঘতা লইয়া ব্যস্ত। পাশের পড়া থেকে ফুরসত হইলে টোপর এবং পরীক্ষার ফলাফলের দুশ্চিন্তা মাথায় করিয়া আপনি সুড়সুড় করিয়া গিয়া গোটাকতক মন্ত্র আওড়াইয়া আসিলেন;—সংস্কৃতে যতটুকু জ্ঞান তাহাতে সেগুলি আপনার পক্ষে বিবাহের মন্ত্রও হইতে পারে, ভূতঝাড়ার মন্ত্রও হইতে পারে; এবং বাসরঘরে অশ্রাব্য বিদ্রূপ এবং অসহ্য কর্ণতাড়নায় আপনার নিজের ভূতঝাড়ার যদি ব্যবস্থা না থাকিত তো বোধহয়, কি জন্য আপনার কষ্ট করিয়া আসা সেটা বেমালুম ভুলিয়া বসিয়া থাকিতেন।—বাঙালী ব্যবস্থাপকেরা দূরদর্শী ছিলেন,—বধূ আনিবার ব্যবস্থাটা করিয়া গিয়াছেন ধুতি-শাড়িতে গাঁটছড়া বাঁধিয়া। বুঝিয়াছিলেন এই সব পরীক্ষা-পাগল বরেরা উদম পাগল হইয়া নিতান্ত যদি বস্ত্র-উত্তরীয় ফেলিয়া না পালায় তো কনেকে কোনরকমে বাড়িতে আনিয়া পৌঁছাইয়া দিতে পারিবে। এই আপনাদের বিবাহ, এব মধ্যে ভালবাসার স্থান কোথায়?...হদ্দ আছে এটা নিশ্চিন্ত আরাম; চোখ কান মুদ্রিত করিয়া একটা...

কথায় কথায় অনিলের কথা মনে পড়িয়া গেল। জীবনকে যদি কেহ দেখিয়া থাকে তো সে অনিল। তাহার দেখিবারও একটা বিশেষত্ব আছে, আপনার-আমার মত করিয়া দেখে না। বলে "ভাই, খাসা আছি। বাপ-মা, ঘটক-পুরুত, আত্মীয়-স্বজনে মিলে সমস্ত বাজার উট্‌কে অবস্থামত সেরা অম্বুরী তামাক জোগাড় করে, সেজেটেজে নল্‌চেটা হাতে তুলে দিয়েছে, ভুড়ুক ভুড়ুক করে টেনে যাচ্ছি গড়া গড়া; এসা আমেজ যে প্রতি টানেই যে বুক খালি করে দিয়ে যাচ্ছে সেটুকু পর্যন্ত হুঁশ হবার ভয় নেই। এ-ধাতে, মানে এই তাকিয়া-জাপটান জাতের পক্ষে, এই ভাল; থাকুক উড়ুণ্ডুড়ে ডানপিটেরা ল্যভ, ডিভোর্স, কোর্টশিপ ইলোপমেন্ট আরও যতসব আদাড়ে রোমান্স নিয়ে..."

আপনাদের বিবাহ এই গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাক, অনায়াসলব্ধ একটা মিষ্টাস্বাদ, সঙ্গে একটা নেশার আমেজ। তাহাতে ভালবাসার অম্ল-তিক্ত-কটু-কষায় কোথায়? ঝোলা গুড়ে গলা মাতাইয়া বলা, অমৃতপান করিয়া উঠিলাম।

তাই বলিতেছিলাম—বিবাহটাই প্রমাণ যে ভালবাসা কি তাহা জানেন না। যাহাতে না জানিতে পান সেই জন্যই আপনার শুভার্থীরা—অথবা দুইপক্ষই ধরিয়া বলা যাক—আপনাদের শুভার্থীরা আপনাদের বিবাহ দিয়া দিয়াছেন—ভালবাসার প্রতিষেধ হিসাবে। কেন এরূপ করা হয় জানি না, তবে এইটুকু জানা আছে যে, ভালবাসায় গরল থাকিতে পারে। অন্তত আমার বেলা তো ছিল;—আরও কত সবার বেলায়, জীবনে চলতি পথে এক সময়ে যাহাদের সঙ্গে হইয়াছিল দিন কয়েকের সাক্ষাৎ।

কণ্ঠে গরল ধারণ করা কি সবার কাজ?—সেই জন্যই বোধ হয় আপনাদের সঙ্গে বিবাহের রক্ষাকবচ আঁটা,—মন্ত্রপূত কবচ।

ভগবান আপনাদের নিরাপদ রাখুন। আমি কিন্তু যেন জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া এই গরলামৃত পান করিতে পাই।

২

আমারও রক্ষাকবচের আয়োজন হইতেছিল।

বি-এ পাশ করিয়া বেশ একটু ক্লান্তি আসিয়াছে। বাড়ির রাঁধা ভাত খাইয়া কলেজে হাজিরা দিয়া পাশ করা নয় তো, হোস্টেলের আড্ডা জমাইয়াও নয়। উপরন্তু মাস্টারি, প্রাইভেট টুইশ্যন। চারিটি বৎসর একদণ্ডের জন্যেও সরস্বতী দেবীর এলাকার বাহিরে পা দিতে পারি নাই। বীণাপাণি সরস্বতীর নয়, শুদ্ধ বাগ্দেবীর—বাক্যের অধীশ্বরীর। অর্থাৎ জীবনের সমস্ত সরসতা বিসর্জন দিয়া এই চারিটি বৎসর শুধুই বকিয়াছি। সকালের দুই টুইশ্যনে পাঁচটি ছেলে—ছোট ছেলে। বিকালে, কলেজ-ফেরত বাসায় আসিবার পথে একটি ধাড়ি—তিন-তিনবার ম্যাট্রিকুলেশন-বুড়ি ছুঁইয়া আসিয়াছে। তাহার পর সন্ধ্যা যাইতে না যাইতে বাসায় টুইশ্যন—তিনটি ছেলেমেয়ে ও একজন বৃদ্ধ, আমার মনিবের খুড়া। বৃদ্ধের টুইশ্যনটা একটু বাড়াইয়া বলিতেছি, আসলে টুইশ্যন নয়, তাঁহাকে খবরের কাগজ পড়িয়া শোনাইতে হইত, ছেলেমেয়েদের পড়ার পাট শেষ হইলে। তিনি আবার বেতর কালা ছিলেন, প্রায়-কথাটাই তাঁহাকে দুইবার করিয়া শোনাইতে হইত। বৃদ্ধ এদিকে কিন্তু লোক ভাল ছিলেন এবং ভাল লোক ছিলেন বলিয়াই আমার নিকট হইতে ফালতু কাজটুকু করাইয়া লইতেন; তাঁহার বিশ্বাস এই ছিল যে এটা আমায় মস্তবড় অনুগ্রহ করিতেছেন,—টুইশ্যনের অধিক এই কাজটুকু লইয়া আমায় যেন নিছক গৃহশিক্ষকেরও অধিক একটু জায়গা দিলেন। এক এক সময় বেশী প্রীত হইয়া বলিতেন, "না, তোমার পড়ার বেশ কায়দা আছে শৈলেন।"

নিতান্ত ভদ্রতার মিথ্যা এটুকু, কেন না, সমস্ত দিনের কসরতের পর গলা আমার তখন সমস্ত কায়দার বাহিরে। আমিও একটা ভদ্রতার মিথ্যায় জবাব দিতাম—তাঁহার কানের নিদারুণ অত্যাচারের কথা চাপা দিয়া বলিতাম, "আপনাকে শুনিয়েও বেশ একটা সুখ আছে; বহু ভাগ্যে এমন একজন শ্রোতা পাওয়া যায়।"

যখন আহারে বসিতাম অনর্গল বকিবার ফলে পেট আর বুক দুইটাই এমন ফাঁকা হইয়া থাকিত যে, কোন্‌টা পেট আর কোন্‌টা বুক যেন সাড় থাকিত না।

আমার পাস করিবার জীবনটা অতিবাহিত করিয়া আসিয়াছি বাক্যের মরুভূমির ভিতর দিয়া—মহাশ্বেতা বাঙ্ময়ী সরস্বতীর এলাকা। যখন বি-এ পাশ করিলাম তখন আমি শুষ্ক, পরিশ্রান্ত। শুধু এইটুকুই নয়, অনুভব করিলাম জীবনের একটা মস্ত বড় ক্ষতি হইয়া চলিয়াছে। টুইশ্যন সংগ্রহ করিতে এবং সংগ্রহ করিবার পর বজায় রাখিতে ঝুটা-সাঁচ্চা উভয়বিধ কৃতজ্ঞতার জন্য গার্জেনদের খোশামোদ করিতে করিতে মেরুদণ্ড যাইতেছে বাঁকিয়া। বাক্যের অর্ঘ্য রচনায় পাই আনন্দ। হারানো দম বোধ হয় ফিরিয়া পাইতে পারি, কিন্তু এ সর্বনাশ হইতে কখনও উদ্ধার পাইব কি না জানি না। মোট কথা আমার পাস করিবার যে আনন্দ সেটা ঠিক সাফল্যের আনন্দ নয়, একটা মুক্তির স্বস্তি,—মনে হইল কি একটা অসহ্য অবস্থা হইতে যেন অব্যাহতি পাইলাম।

জীবনের এই সুর-পরিবর্তনের মাহেন্দ্র লগ্নের ওদিকে সানাইয়ের আমেজ উঠিল। আমি তখন পরীক্ষা দেওয়ার পর পূর্ব-উপকূলে ভ্রমণে বাহির হইয়াছি। প্ল্যান হইয়াছে পরীক্ষার ফল বাহির হইবার মুখে কলিকাতায় ফিরিব, তাহার পর দেশে—আমাদের প্রবাসভূমিতে। ভ্রাম্যমানের নিরুদ্দেশ হাল্কা

দিনগুলি বাঁশির সুরে স্বপ্নালু হইয়া উঠিত। খবর পাইতাম বিবাহের আয়োজন হইতেছে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধের জীবন আমায় ডাকিতেছে। কি মধুর! ক্লান্ত চোখে কত অপূর্ব রঙের আভাস যেন ফুটিয়া উঠিতেছে; কত স্বপ্ন;—যেন একটা রূপকথার জগৎ এই জীবনকেই ঘিরিয়া কিভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহার সম্মুখ হইতে পর্দা গুটাইয়া যাইতেছে। বাঁচিয়াছি, শুষ্ক পাঠের উপর আর স্পৃহা নাই। বাঁচিয়া আবার ঐ মরণের দিকে পা বাড়াইব না।

ঠিক এই সময় একটা ব্যাপার হইল যাহাতে কলেজ, পড়া, পাসকরা—যে সবকে মরণ ভাবিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম তাহারা আবার নূতন সুরে ডাক দিল। আহ্বানটা আসিলও নিতান্ত অপ্রত্যাশিত একটা দিক হইতে।

ভ্রমণ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর পাইলাম পাস করিয়াছি। পাততাড়ি গুটাইতেছিলাম, অর্থাৎ বাড়ি যাইব, বাঁধাছাঁদা হইতেছিল, স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার একটা পাতা ছিঁড়িয়া আমার প্রিয় একটি সিনেমা আর্টিস্টের ছবি মুড়িয়া বাক্সে তুলিয়া রাখিব, হঠাৎ সেই ছিন্ন পত্রিকার বিজ্ঞাপনের গোটা দুই অসংলগ্ন লাইন চক্ষে পড়িল—

আবেদনকারী স্বয়ং আসিয়া সাক্ষাৎ করুন। গুরুপ্রসাদ রায়, ব্যারিস্টার, ৩৫/৩/১, লিণ্ড্‌সে ক্রেসেন্ট, বালিগঞ্জ।'

আবেদন করিয়াই জীবনের এতটা কাটিয়াছে, কাজেই একটা কৌতূহল হইল, এ আবার কিসের আবেদন? বিজ্ঞাপনেব বাকিটুকু মোড়কের ভাঁজের মধ্যে লুপ্ত হইয়াছে, আবার ভাঁজ খুলিয়া পড়িলাম।

'একটি নয়-দশ বৎসরের বালিকার জন্য একজন গ্র্যাজুয়েট গৃহশিক্ষক প্রয়োজন। গৃহশিক্ষকতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে এমন লোকই বাঞ্ছনীয়। আবেদনকারী স্বয়ং আসিয়া'...ইত্যাদি—

কয়েকবার পড়িলাম এবং প্রতিবাবই মনটা যেন বেশি করিয়া ঝুঁকিয়া পড়িতে লাগিল। আমায আকৃষ্ট করিতেছিল স্বয়ং বিজ্ঞাপন-দাতা অর্থাৎ ছাত্রীর পিতা। আরও সঠিকভাবে বলিতে হয়—ঠিক ছাত্রীর পিতা নয়, তাঁহার নামটা। আমরা জিভে যেন জড়াইয়া যাইতেছে,—গুরুপ্রসাদ—গুরুপ্রসাদ রায়...যতই নাড়াচাড়া কবিতেছি ততই লোকটিকে প্র্যাকটিসে, প্রাচুর্যে, আরামে বেশ হৃষ্টপুষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে। এই মনে হওয়ার মধ্যে একটা হিসাবও ছিল বোধ হয়। নামটা অতি আধুনিক সুধীনও নয়, অথবা রীতীশও নয়। গুরুপ্রসাদ নামের গুরুভার কাঁধে লইয়া ব্যারিস্টারি পড়িতে যাইত সে অন্তত চল্লিশ বৎসর আগেব কথা। তাহার মানে এখন তাঁহার অন্তত ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ বৎসরের প্র্যাক্‌টিস, বয়স ষাটের ওদিকে একটা বেশ কায়েমী প্র্যাক্‌টিসের উপর গদিয়ান হইয়া বসিয়া আছেন। আশা করা যায় দিবেন-থোবেন ভাল। একটা আরামের পরিবেশের ছবি চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠে।...নিশ্চয় কালা নয়, নিশ্চয় বসিয়া বসিয়া পরের মুখে খবরের কাগজ শুনিবার ফুরসত নাই তাঁহার। লোভ হয়, একবার দেখাই যাক না।

এম-এ পড়িবাব এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়, এ বিষয়বুদ্ধিটা যে একেবারেই ছিল না এ-কথা বলিতে পারি না, তবে আসল কথা ছিল শখ। চার বৎসর ধরিয়া যে নাগাড়ে নয়টি-দশটি ছাত্রছাত্রীর হাতে আয়ুক্ষয় করিয়া আসিতেছে তাহার একবার একটি মাত্র ছাত্রীকে পড়াইবার শখ হয়ই। চুরি-ডাকাতির জন্য পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করিয়া আসিবার পর আমাদের গাঁয়ের ভূতো বাগ্দী একবার বলিয়াছিল, "এবার আরাম করে তোমাদের স্বদেশী জেল খাটবার বড় আহিংকে হয় দাদাঠাকুর; একবার দেখলে হত।"...এ ব্যাপারটাও অনেকটা সেই বকম—সশ্রম কারাভোগের পর একটু নিশ্চিত কারা-উপভোগ মাত্র।

কিন্তু বাধাও আছে। ব্যারিস্টার জীবগুলিকে আমি যেন অন্তর্নির্দিষ্ট হইয়া এড়াইয়া চলি। মনে হয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খড়্গ-নাসা এবং বক্র-তর্জনী দিয়া উহারা সর্বদাই যেন অন্তরের কথাগুলি পর্যন্ত টানিয়া বাহির করিয়া লইবার জন্য মুখাইয়া আছে। অবশ্য সব ব্যারিস্টারই যে খড়্গ-নাসা এমন নয়, সংসারে খাঁদা ব্যারিস্টারও বিস্তর আছে; তবে আমার মনে কেমন করিয়া একটা টাইপ-চেহারা গাঁথিয়া গিয়াছে।

ধরুন, আমি চাকরির উমেদার হইয়া গেলাম। যেন গিয়া বারান্দার সিঁড়ির নিচের ধাপে দাঁড়াইয়াছি। সামনে প্যান্টের পকেটে ডান হাত দিয়া বাঁ-হাতের মুঠায় পাইপের আগাটা ধরিয়া ব্যারিস্টার গুরুপ্রসাদ রায়; আমার মুখের উপর ফেলা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, খড়্গ-নাসা ইত্যাদি। প্রশ্ন হইল, "কি চান?"

আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, ঢোঁক গিলিয়া উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে স্টেট্স্‌ম্যান দেখলাম।"

"ই-য়েস্, কি দেখলেন বলুন, আউট্ উইথ্ ইট্।"

"আজ্ঞে দেখলাম যে আপনার মেয়ের জন্যে"...

"আর ইউ শিওর—আমার মেয়ে?"

"আজ্ঞে আপনার নাতনীর জন্যে..."

"স্টেট্স্‌ম্যানে কি আমার নাতনী বলে মেন্‌শ্যন্ করা আছে?...তাড়াতাড়ি আমার সময় অল্প।"

ততক্ষণে আমার দফা অর্ধেক নিকেশ হইয়া গিয়াছে। প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া, একদমে সবটা বলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "আজ্ঞে, দেখলাম নয়-দশ বৎসরের একটি মেয়ের জন্যে একজন টিউটর..."

"এক্স্ পিরিয়েন্সড্ গ্র্যাজুয়েট টিউটর।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, একজন এক্স্‌পিরিয়েন্সড্ গ্র্যাজুয়েট টিউটর দরকার আপনার, তাই. "

"আপনার এক্স্‌পিরিয়েন্স্?"

"আজ্ঞে আমি চার বৎসর ধরে দিনে আট-দশটি ছেলেমেয়ে পড়িয়ে এসেছি।"

ব্যারিস্টার অধরোষ্ঠ কুটিল বিদ্রূপে কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। —আঁতের কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছে—শখ।...উত্তর হইল, "তার মানে জঙ্গলে খেটেছেন বলে বাগানেও কাজ করতে পারবেন। ...না, আমার একটু অন্য ধরনের অভিজ্ঞ লোক চাই; আপনি আসুন, নমস্কার।"

কাল্পনিক গুরুপ্রসাদের সঙ্গে এই রকম একটা কাল্পনিক কথাবার্তা হইয়া গেল। বিজ্ঞাপনটার দিকে চাহিয়া একদিকে লোভ আর অপর দিকে আশঙ্কা—এই দোটানায় পড়িয়া যাইব কি যাইব না যেন ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু যাওয়াই স্থির করিযা ফেলিলাম, তাহার কারণ শুধু একটা মনগড়া আশঙ্কায় এমন একটা সুবিধা ছাড়িবার চিন্তায় নিজের মনের কাছেই যেন নিজেকে অপরাধী বলিয়া বোধ হইতেছিল। ব্যারিস্টারের ভয়ে শখের দিক্‌টা যেমন কমিয়া আসিতেছিল, ব্যারিস্টারের বাড়ি বলিয়াই ইহার বৈষয়িক দিকটা তেমনি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। মনে হইতেছিল, চাই কি এই সুযোগে জীবনের গতিটাই ফিরিয়া যাইতে পারে। দুশ্চিন্তারহিত প্রচুর অবসরের মধ্যে বেশ ভালভাবেই এম-এ-টা হইতে পারে, আই-এ পাশ করা পর্যন্ত জীবনের যা একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। একটা কৃতি মানুষের সাহচর্যে ও সাহায্যে জীবনে ভালভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতে পারি। শেষ পর্যন্ত যদি কপাল তেমনভাবেই খোলে তো কত কী না হইতে পারে?—কল্পনা একেবারে অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যাদানের কোঠায় গিয়া ঠেকিল; সংস্কৃত, বাংলা, ইংরেজী—নানারকম তত্ত্ববাক্যের হুড়াহুড়িতে মনটা গরম হইয়া উঠিল; সেক্সপীয়রের অমর বাণী—'দেয়ার ইজ এ টাইড্ ইন্ দ্য এফেয়ার্স অব মেন'...বাঁধা-ছাঁদা ছাড়িয়া খানিকটা চিন্তা করিলাম—ভগবান এদিকে নামে যেমন লোকটিকে গুরুপ্রসাদ করিয়াছেন, ওদিকে পেশায় যেমনি ব্যারিস্টার না করিয়া যদি ডাক্তার কিংবা জজ-মুন্সেফ-গোছের কিছু একটা করিয়া দিতে পারিতেন তো সোনায় সোহাগা হইত। কিন্তু তাহা যখন হয় নাই...

চিন্তার মাঝেই একবার গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িলাম; না, জুজুর ভয়ে বসিয়া থাকিলে চলিবে না; ব্যারিস্টার তো ব্যারিস্টার সই। জীবনের যত মঙ্গল সব থাকে বিপদের অন্তরালে, বীরের মত পা ফেলিয়া গিয়া সেই বিপদের সামনে দাঁড়াইতে হইবে। দেরি করা নয়, 'শুভস্য শীঘ্রম'।

৩

৩৫/৩/১, লিণ্ডসে ক্রেসেন্টে যখন উপস্থিত হইলাম বেলা তখন প্রায় তিনটা হইবে।

বাড়িটা একেবারে নূতন, সময় হিসাবেও নূতন, আবার স্টাইল হিসাবেও নূতন। ঢালাই-করা কংক্রিটের বাড়ি; রেলিং, জানালার সান্-শেড, ছাদের আলিসা, থাম, সিঁড়ির পাড়, কোনখানেই স্থাপত্য-অলঙ্কারের চিহ্নমাত্র নাই: সব জ্যামিতির সোজা কিংবা বৃত্তাভাস রেখার নানা রকম সমন্বয়ে গড়া। বাহির হইতে যতটা বোঝা যায় বাড়ির ঘরদালানও ঐ ধরনের। কোণ-কানের বালাই খুব অল্পই; যেখানে কোণ-কানের সম্ভাবনা সেখানেই একটু ঘুরিয়া যেন এড়াইয়া গেছে। সব মিশাইয়া ঠিক যে সৌন্দর্যের অভাব বলিব তাহা নয়, তবে আমার মত অনভ্যস্তের চোখে নিরাভরণ অতি-আধুনিকত্বের একটা অস্বস্তি জায়গা যেন।

বেশ বড় হাতার মধ্যে বাড়িটা। বাঁ-দিকে একটা মাঝারি সাইজের বাগান, মাঝখানটিতে একটি ব্যাডমিন্টন কোর্ট, তাহার চারিদিকে কতকগুলি কামিনী গাছ, প্রত্যেক গাছটি একরকম করিয়া দুই তিন থাকে পরিপাটি করিয়া ছাঁটা; একটি পাতার, কি একটি ডালেব বাহুল্য নাই। ফুল? সে নিশ্চয় এসব গাছের কাছে আকাশ-কুসুম মাত্র। এদিকে-ওদিকে কয়েক রকম মরশুমী ফুলের বেড়। তারের জাল দিয়া মোড়া কয়েকটা লোহার পাতের খিলান—তাহার উপর কয়েক রকম বিলাতী লতার ঝাড়, ছুরি-কাঁচির শাসনে কোথাও একটু বাহুল্য নাই, চারা-গাছটি হইতে আরম্ভ করিয়া সবাই দিব্য বেশ সংযত কোটের উপর বাড়ি আর বাগান দুই-ই যেন এক ছন্দে রচা, ছাঁটাকাটা, মাজা-ঘষা, তকতকে ঝকঝকে।

বাড়ির ডানদিকে গ্যারেজ, চাকরদের আউট-হাউস। সমস্ত চৌহদ্দিটা এক-বুক উঁচু-দেওয়াল দিয়া ঘেরা, মাঝখানে ঢালা লোহার এক জোড়া গেট। গেটের থামে পালিশ করা পিতলের ফলকে কালো অক্ষরে ইংরেজীতে নাম লেখা—জি. পি. রে. বার্-এট্-ল।

সমস্ত পথটা নিজেব মনেই ব্যারিস্টারের বিরুদ্ধে আস্ফালন করিতে করিতে আসিলাম। মনে মনে কোথায় যেন একটু আশা ছিল ৩৫/৩/১ ত্র্যহস্পর্শযুক্ত গোলমেলে নম্বরটা বোধ হয় শেষ পর্যন্ত খুঁজিয়াই পাওয়া যাইবে না। চেষ্টা করাও হইবে, অথচ ভালয় ভালয় বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়াও আসা যাইবে। বাড়িটা পাইয়া দমিয়া গেলাম, সঙ্গে সঙ্গেই যে গেটের মধ্যে পা দিব এমন সাহস হইল না। অথচ একজন জলজ্যান্ত ব্যারিস্টারেব গেটের সামনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাও নিরাপদ নয়। কি করা যায়?

দাঁতে নখ খুঁটিতে খুঁটিতে দেওয়ালের আড়ালে ফুটপাতের উপর খানিকটা এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করিলাম, শক্তি সঞ্চয় করিতেছি। যে-সঙ্কল্প লইয়া আজ বাড়ি যাওয়া স্থগিত রাখিলাম, সামান্য দ্বিধা—হয় তো ভীরুতারই জন্য সে-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া গেলে জীবন তাহার ব্যর্থতা লইয়া নিশ্চয় একদিন জবাবদিহি চাহিবে।

দেওয়ালের আড়ালেই কোঁচা দিয়া জুতাটা ঝাড়িয়া লইলাম। তাহার পর হাত দিয়া চুলটা গুছাইয়া এবং প্রথম সওয়াল-জবাবে যে ইংরেজি কথাগুলা দরকার হইতে পারে—সেগুলা আবার একবার মনে মনে আওড়াইয়া লইয়া গেট ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

গা ছমছম করিতেছিল। সুরকির রাস্তার উপর চলিবার মস্‌মস্ শব্দ হইতেছে, মনে হইতেছে বাড়ির গাঢ় নিস্তব্ধতার গায়ে যেন সিঁদ কাটিবার আওয়াজ হইতেছে।...দেখিয়া থাকিবেন—আধুনিক ভদ্রোচিত বাড়ি সব নিস্তব্ধ। শব্দ স্বাভাবিক নিশ্চয়। কিন্তু স্তব্ধতাই সভ্যতা। পূর্বে সৌন্দর্য দিত অবগুণ্ঠন আজকাল অবগুণ্ঠন' টানে শব্দে। রেডিও-র হুংকার? সেটা ব্যতিক্রম,—আধুনিকতা অতিরিক্ত বেহায়াপনা।

সুরকির রাস্তার শেষে একটি তেরছা বারান্দার সামনে গোল সিঁড়ির নীচে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

বুকটা টিপটিপ করিতেছে। সামনেই ঘর, বোধ হয় হল-ঘর। শব্দ হইল যেন লোক আসিতেছে, একটা খস্‌খসে শব্দ—নিশ্চয় বিলাতী ঘাসের চটিপরা ব্যারিস্টার। বুকটাকে একটু চাপিয়া ধরিতে হইল। ঘরের ভারী পর্দাটা নড়িয়া পর্দা ঠেলিয়া যে বাহির হইয়া আসিল সে ব্যারিস্টার নয়, চাকর। এসব বাড়িতে এদের অভিধেয় বোধ হয় 'বেয়ারা'। গায়ে একটা পরিষ্কার ফতুয়া, দেহটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন তেলচুকচুকে। বাম বাহুতে একটা সোনার তাগা। কাঁধের উপর একটা ঝাড়ন; বাড়ির চাকরের মত তাহার ঝাড়নও বেশ পরিষ্কার। এসব স্থানে চাকর শুধু থাকা দরকার, তাহাকে বিশেষ কাজ করিতে হয় না, তাহার একটি ঝাড়ন থাকাও দরকার, তবে তাহা দিয়া বেশি ময়লা ঝাড়িতে হয় না।

প্রশ্ন হইল, "কাকে চান?"

কথাটা গলায় কোথায় আটকাইয়া গিয়াছিল, চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "গুরুপ্রসাদবাবু মানে এই ব্যারিস্টার সাহেবকে।"

"তিনি নেই এখানে।"

এত মধুর সংবাদ জীবনে কখনও শুনি নাই। বুকে যে হাওয়াটা আটকাইয়া ছিল একটি তৃপ্তির নিশ্বাসে সেটা মুক্ত হইয়া গেল। নিজের সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। একটু মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় গেছেন? আসবেন কবে?"

"কুমিল্লায় একটা সিডিশ্যন কেসে গেছেন, দিন-পনের লাগতে পারে?"

চাকরের মুখে শুদ্ধ উচ্চারণে 'সিডিশ্যন কেস' কথাটা শুনিয়া একটু বিস্মিতভাবে চাহিলাম, তখনই কিন্তু ভাবিলাম—ব্যারিস্টারের বেয়ারা, এমন আর আশ্চর্য হইবার কি আছে?"

যাই হোক, বাঁচা গেল। চেষ্টা করিলাম, গৃহকর্তা বাড়ি নাই, আমি আব কি করিতে পারি? এ-আফশোস তো আর থাকিবে না যে, জীবনে মস্ত বড় একটা সুবিধা পাইয়াও গাফিলতি বা ভয়ে নষ্ট করিয়া ফেলিলাম?

ফিরিতেছি, বেয়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "কি দরকার ছিল আপনার?"

দরকারটা বলিলাম।

বেয়ারা বলিল, 'ছোট দিদিমণির মাস্টারির জন্যে? তাহলে আপনি একটু অপেক্ষা করুন।"

শঙ্কিত এবং সন্দিগ্ধভাবে ফিরিয়া চাহিলাম; লোকটা কি ভাবছিল আমি চাঁদা আদায় করিতে আসিয়াছি? একটু বিরক্তও আসিল। যতটা সম্ভব মুখের ভাবটা ফিরাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আছেন সাহেব?—তবে যে তুমি বললে...?"

বলিল, "সাহেব নেই, তবে মাস্টার ঠিক করা মীরা দিদিমণির হাতে, তাঁকে ডেকে দেই গে; আপনি বসেন উঠে এসে।"—বলিয়া বারান্দার একটা উইকারের চেয়ার সামান্য একটু সামনে ঠেলিয়া নির্দিষ্ট করিয়া দিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

ব্যারিস্টাব সম্বন্ধেই ভাবিয়া আসিয়াছি, তাহার কন্যাদের সম্বন্ধে কোনরকম গড়াপেটা ধারণা নাই। এ জীবগুলি আবার কি জাতীয় হওয়া সম্ভব, চেয়ারে বসিয়া নানারকম জল্পনা-কল্পনা করিতেছি, এমন সময় মীরা উপর হইতে নামিয়া আসিয়া একটি চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইল। মাথায় পরিষ্কার বাঁকা সিঁথি, হাতে একখানি রাঙা মলাটের বই; একটি আঙুল তাহার মধ্যে গোঁজা, পায়ে এক জোড়া জরিব কাজ-করা মখমলের স্যাণ্ডেল। প্রথম দর্শনেই মীরার সব খুঁটিনাটি দেখিয়া লওয়া অল্প দক্ষতার কাজ নয়; অন্তত আমি তো পারি নাই; তবে এই তিনটি জিনিস চোখে যেন আপনিই পড়িয়া গিয়াছিল, বিশেষ করিয়া বাঁকা সিঁথি; তাই এগুলোর উল্লেখ করিলাম। মেয়েদের মাথায় বাঁকা সিঁথি তখন সবে উঠিয়াছে, অতি-আধুনিকতার বিদ্রোহের বাঁকা অসি।

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া নমস্কার করিলাম।

মীরা প্রতিনমস্কার করিয়া একবার তীক্ষ্ণ চকিত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক ভাল করিয়া দেখিয়া

লইল। এমন একটা দৃষ্টি যে আমার সমস্ত অন্তরাত্মাকে মানিয়া লইতে হইল—হ্যাঁ, ব্যারিস্টারের কন্যা বটে। প্রশ্ন করিল—"টুইশ্যানের জন্য এসেছেন?"

আমার অতিরিক্ত সঙ্কোচের কারণটা পরে ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিয়াছি। প্রথমত এত সপ্রতিভ অপরিচিতা তরুণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কথাবার্তা আমার এই প্রথম; দ্বিতীয়ত ওরই হাতে টিউটর নিয়োগের ভারটা থাকায় ওর গুরুত্বটা সেই সময় আমার কাছে খুব বাড়িয়া গিয়াছিল।

ওর পিতার সামনে যেমন করিয়া উত্তর দিতাম বলিয়া আমার বিশ্বাস, কতকটা সেই রকম ভাবেই শঙ্কিত বিনয়ের স্বরে উত্তর দিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ?"

"গ্র্যাজুয়েট?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এইবার পাশ করেছেন?"

তিনবার "আজ্ঞে হ্যাঁ" করিতে করিতে আমার দৃষ্টি আপনা-আপনিই নত হইয়া পড়িয়াছে। মীরা একটু চুপ করিল। বোধ হয় নত দৃষ্টির সুযোগে আবেদনকারীকে আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া লইল, তাহার পর বলিল, "আমাদের একজন অভিজ্ঞ লোক দরকার বলে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছিল।"

আমি একটু ধোঁকায় পড়িয়া গেলাম। প্রতিদিন আট-দশটা টুইশ্যান করিবার কথাটা বলা নিরাপদ হইবে কিনা ভাবিতেছি, মীরা নিজেই বলিল, "বেশ থাকুন। টুইশ্যানের আবার অভিজ্ঞতা কি তাও তো বুঝি না।"

আমি একটু বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিলাম; ঠিক এত সহজে আর এত তাড়াতাড়ি সিদ্ধিলাভ আশা করি নাই।

মীরা বইটা চেয়ারের পিঠে দুইবার ঠুকিয়া প্রশ্ন করিল, "কত মাইনে চান?"

অস্বীকার করিব না, এত সহজে নিয়োগের পর এমন উদার প্রশ্নে একবারে কৃত-কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। মুখে একটু কৃতজ্ঞ খোশামোদের ভাব ফুটিয়া থাকে তো কিছু আশ্চর্য হইবার নাই তাহাতে। পূর্বে তিন-চার দিনের কম হাঁটাহাঁটি করিয়া কোন টুইশ্যান সংগ্রহ করিতে পারি নাই, গার্জেন সম্প্রদায়কে ভিজাইবার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও।

বলিলাম, "যা আপনাদের সুবিধে হয় দেওয়া।"

মীরার নাসিকার ডান দিকটা সামান্য একটু কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। একটু যেন অন্যমনস্ক হইয়া চুপ করিয়া রহিল; তাহার পর আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "আমাদের সুবিধের জন্যই কি আপনি এতটা পথ বেয়ে এসেছেন?"

বেশ একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলাম, একেই খুশি করিতে গিয়াছি, আর এর কাছেই উলটা প্রশ্ন? বলিলাম—সংলগ্ন কিছুই বলিলাম না,—"আজ্ঞে—মানে হচ্ছে—আসল কথা..." বলিয়া মাঝখানেই থামিয়া গেলাম।

মীরার নাসিকার কুঞ্চনটা মিলাইয়া গিয়া কতকটা কৌতুকপূর্ণ হাসিতে ঠোঁট দুইটি একটু প্রসারিত হইল। বোধ হয় কথাটি শেষ করিতে পারি কিনা দেখিবার জন্য আমার মুখের পানে একটু চাহিয়া রহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসির সঙ্গে বলিল, "বলুন আসল কথাটা। আমরা ওটা খুব বুঝি, দ্বিধা করবার দরকার নেই; জানেন তো ব্যারিস্টারের বাড়ি, বাবা আসল কথা আগে ঠিক না করে মক্কেলের কাগজপত্র ছোঁন না"—বলিয়া বেশ ভালভাবেই খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মীরা তাহার বাবার মক্কেলের সঙ্গে ব্যবহারের কথায় হাসে না এত হাসিবার কথা নয় সেটা। আমার এই অকূল পাথারে পড়িবার মত অবস্থা দেখিয়া ওর হাসি চাপিতে পারিতেছিল না, একটা ছুতা করিয়া প্রাণ খুলিয়া একটু হাসিয়া লইল।

পরক্ষণেই কিন্তু নিজেকে সামলাইয়া লইল—প্রগল্‌ভতা হইয়া যাইতেছে বুঝিয়া হোক, কিংবা

আমি আরও সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছি দেখিয়াই হোক। বলিল, "না, আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন; আচ্ছা ধরুন..."

হঠাৎ সচকিত হইয়া বলিল, "কিন্তু, আপনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন?—বাঃ বসুন!"

আমার বসা উচিত ছিল না, একজন অপরিচিতা যুবতী দাঁড়াইয়া সামনে; তবু মীরার বলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বসিয়া পড়িলাম এবং রাগ হইল মীরার উপর। মেয়েটা আসিয়াই আমাকে দাঁড় করাইয়াছিল—তাহার নীরব সম্ভ্রম-জাগানো উপস্থিতির দ্বারা, এখন বসাইয়া দিল—তাহার ছোট্ট একটি হুকুমের দ্বারা। মরিয়া হইয়া খুব মোটা রকম মাহিনা চাহিয়া আজকের এ-পর্ব শেষ করিয়া যাইব, এমন সময় স্কুল হইতে আমার ভাবী ছাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরা বলিল, "তোমার নতুন মাস্টারমশাই তরু; ঘরটা দেখিয়ে দাও। আপনি কাল সকালেই আসবেন তাহলে।"

সকালেই আসিবার অসুবিধা ছিল, হাসিটাও বড় তীক্ষ্ণভাবে বিঁধিতেছিল ওঠ্-বোস্' করিবার ব্যাপারটাও মনে তখনও টাটকা—অর্থাৎ সেটা যে আমারই দুর্বলতা সেটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তখনও হয় নাই আমার, তাহার উপর শেষেব এই হুকুমটা—মোটেই সুপাচ্য নয়। সান্ত্বনা মাত্র এই যে, চাকরি ওঁর নয়, ওর পিতার, অর্থাৎ একজন পুরুষের। আহত আত্মসম্মানকে সান্ত্বনা দিলাম—আসিব, কিন্তু অন্তত একটা দিন দেবি করিয়া। ওর প্রথম হুকুমটা অমান্য করিয়া।

তাহার পর সন্ধ্যায় কিছু কেনাকাটা করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত সব গোছগাছ করিয়া, এদের বলিয়া কহিয়া রাখিয়া পরদিন ভোরেই আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

৪

কাজ আরম্ভ হইল।

আমি পৌঁছিবার একটু পরেই মীবা আমায তরুব ঘরে লইয়া গিয়া বলিল, "কাজ আপনাব শক্ত মাস্টারমশাই, ছাত্রীটি বড় সোজা নয়, একটু দেখেশুনে নেবেন।"

তরুর পিঠে হাত দিয়া হাসিয়া বলিল, "তোমার পরিচয় দিয়ে দিলাম একটু, বাকিটুকু মাস্টারমশাই নিজেই টের পাবেন।"

ইহার পর আমার ঘরে একটু আসিল। বেয়ারাকে আমার জন্য আসবাব-পত্রের দু-একটা উপদেশ দিয়া কোন অসুবিধা হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহাকে জানাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া উপরে চলিয়া গেল।

আমি কিন্তু দুদিন হাজার চেষ্টা করিয়াও শক্ত সহজ কোন কাজেরই বিশেষ সন্ধান পাইলাম না। আমি সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া তরুকে দেখিতে পাই না। স্নান করিতে কবিতে শুনি তরু মোটরে করিয়া কোথা হইতে আসিল, দু-একটা কিকথা বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। আহার করিয়া উঠিয়া ঘরে তোয়ালে লইয়া মুখ মুছিতেছি, তরু খট্ খট্ করিয়া নামিয়া মোটরে করিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্যাপারখানা কি?

মীরার সঙ্গে দেখা হইতেছে না। চেষ্টা করিয়া দেখা করিতে বাধ-বাধ ঠেকিতেছে। বেয়ারাটাকে কি অন্য চাকর-বাকরদের জিজ্ঞাসা করিতে মন সরিতেছে না;—দু-বেলা দিব্য রাজার হালে খাওয়া-দাওয়া করিতেছি, অথচ আসল যা কাজ সে-সম্বন্ধেই কোন জ্ঞান নাই, ওদের সামনে এটা প্রকাশ করা কেমন হইবে বুঝিতে পারিতেছি না। বড়লোকের চাকরদেরও ভাবগতিক একটু অন্য রকম। দেখাই যাক্ না, যদি এমনিই ব্যাপারটার হদিস হয় কোন।

বিকালে কি কাজ, কিংবা কোন কাজ আছে কিনা এখনও টের পাই নাই। তাহার কারণ প্রথম দিন আমার বিকালবেলার দিকে একবার পুরানো বাসায় যাইতে হইয়াছিল, ছাতাটা ফেলিয়া

আসিয়াছিলাম সেটা লইয়া আসিতে। ফিরিতে রাত্র হইয়া গেল। প্রথমটা তো কাগজ পড়িবার জন্য ধরা পড়িলাম, সেটা শেষ হইলে ছাত্রছাত্রীরা ধরিয়া বসিল—আহার করিয়া যাইতে হইবে। নূতন চাকরি, কাটান দেওয়ার ঢের চেষ্টা করিলাম, সফলও হইলাম; কিন্তু বড় ছাত্রীটি এদিকে একটু চতুর হইয়াছে, বলিল, "না, মাস্টারমশাই, আপনি যান, ওদের কথা শুনবেন না...তোমরা ব্যারিস্টারের বাড়ির মত ভাল খাবার দিতে পারবে ওঁকে? আদর যত্ন করতে পারবে?"

কৃত্রিম রোষের সহিত 'ওদের' কথাটা বলিয়া আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল।

চার বৎসরের সম্বন্ধ এদের সঙ্গে, পূর্বে তাহাতে ধৈর্যাভাবও ছিল, ক্লান্তিও ছিল, এই নূতন বিচ্ছেদে কিন্তু সব সরিয়া গিয়া শুধু স্নেহটুকু গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। আর 'না' বলিতে পারিলাম না। প্রথম রাত্রেই দেরি—বেশ একটু কুণ্ঠার সহিত বাসায় ফিরিলাম। আহার করিব না শুনিয়া মীরা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইল—শরীর ভাল আছে তো?

মোট কথা বিকালে ও সন্ধ্যার পর তরুকে লইয়া আমার কি ডিউটি প্রথম দিন সেটুকুও জানা গেল না।

দ্বিতীয় দিন বিকালে মীরার সঙ্গে দেখা হইল—আমার ঘরেই। পুরানো বাসা হইতে রিডাইরেক্টেড্ হইয়া বাড়ি হইতে একটা চিঠি আসিয়াছে—না যাওয়ার জন্য সবাই চিন্তিত,—সেই চিঠির জবাব দিতেছিলাম, মীরা তরুকে সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল, বলিল, "আপনার ছাত্রীকে আজ একটু ছেড়ে দিতে হবে মাস্টারমশাই, ডক্টর মল্লিকের ওখানে পার্টি আছে একটা, আসতে দেশ হয় রাত্রি হয়ে যেতে পারে।"

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, "তা যাক।"

লজ্জিতভাবেই এইজন্য যে, এই দু-দিনের মধ্যে ওকে আমি ধরিয়া রাখি...
দিতে হইবে? ওরা চলিযা গেলে বাড়ি না যাওয়ার কারণ জানাইয়া ...নে চান?"
পর একটু চিন্তা কবিয়া 'পুনশ্চ' দিয়া লিখলাম "কিন্তু বোধ হয় শীঘ্রই ...শ একবারে কৃত-কৃতার্থ হইযা
কারণে এমন সুবিধের চাকরিটা রাখিতে পারিব কিনা ঠিক বুঝিতে ...আশ্চর্য হইবার নাই তাহাতে।
একটা ডাকবাক্সে দিয়া আসিলাম। ...র নাই, গার্জেন সম্প্রদায়কে

বাস্তবিকই দু-দিনেই যে রকম ধৈর্যচ্যুতি হইতে বসিয়াছে, তাহাতে
চাকরি চলিবে না। প্রথমত, এই আভিজাত্যের আবেষ্টনীর মধ্যে নিজেকে
পারিতেছি না; দ্বিতীয়ত, একটা রহস্য রহিয়াছে—বাড়ির মধ্যে কোথাও একজন গৃহকর্তা ... হইয়া ...,
কিন্তু তাঁহার অস্তিত্বের কোন পাকা রকম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে না। মীরাই তো দেখিতেছি সর্বময়ী। ব্যাপারটার সঙ্গে হয়তো আমাব চাকরীর কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই; কিন্তু তবুও যেন একটা অস্বস্তি বোধ হইতেছে। আর, সকলের উপর অসহ্য হইয়াছে এই জগদ্দলের মত অবসরের বোঝা। তরু ভোরে কোথায় যায়? টুইশ্যন পড়িয়া আসিতে? দুপুরে কোথায় যায়? স্কুলে? তবে অমন মোটা মাহিনা দিয়া আমায় রাখা হইল কেন? কাজের অভাবে বাড়িটার সঙ্গে কোন যোগসূত্র অনুভব করিতে পারিতেছি না। আচ্ছা বড়মানুষি চাল!—লোক রাখিল, তাহার কাজ ঠিক করিয়া দিবে না! ঠিক উলটা একেবারে—এর আগে সব জায়গাতেই গার্জেন-উপগার্জেনের দল হুমড়ি খাইয়া থাকিত—একটা মুহূর্তও ফাঁকি দিতেছি কিনা। সেও শতগুণে ভাল ছিল কিন্তু।

রহস্যটা সেই দিনই কতকটা পরিষ্কার হইল।

চিঠিটা ফেলিয়া কথাগুলা মনে তোলপাড় করিতে করিতে বাগানে গিয়া একটা লোহার বেঞ্চিতে বসিলাম। বাহির হইতে বাগানটা যে অতি-কৃত্রিমতায় বিসদৃশ বোধ হইতেছিল, এখন ততটা মনে হইতেছে না। বরং মনে হইতেছে এই ভাল। ঘাড়-রগ ঘেঁষিয়া চুলছাঁটা লোকের গায়ে যেমন আলখাল্লা মানায় না—কাটাছাঁটা বাহুল্যবর্জিত পাঞ্জাবিই শোভা পায়, এ-বাড়ির পক্ষে এ-বাগানও কতকটা সেই রকম। আমার বেঞ্চের পাশটাতেই একটা গোলাপের বেড়্। হাতের কাছের গাছটিতে

গুটি পাঁচ-ছয় ফুল ফুটিয়াছে। বাড়ির মধ্যকার হাওয়াটা যেন চিন্তায় চিন্তায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, লাগিল বেশ। গন্ধ-লুব্ধ হইয়া একটি ফুল আলগাভাবে তুলিয়া ধরিয়াছি—পাপড়িগুলি ঝুরঝুর করিয়া ঘাসের উপর ঝরিয়া পড়িল। আমি শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। একবার চাহিয়া নিঃশব্দে স্থানটি ত্যাগ করিব ভাবিতেছি, এমন সময় বারান্দা হইতে বেয়ারা "মেমসাহেব আপনাকে একবার ডাকছেন মাস্টার-মশা।"

আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম, চোখ দুইটা অবাধ্যভাবেই একবার ছিন্ন পাপড়িগুলার উপর গিয়া পড়িল। মেমসাহেব দেখিয়াছে—দুইটা কটু কথা বলিবে; যদি শত মোলায়েম কবিয়াও বলে তো বুঝাইয়া দিবে—ফুলগাছসুদ্ধ টানিয়া নাকে চাপিয়া গন্ধ লওয়াটা যে-রুচির পরিচয়, এ-বাড়িতে সে-রুচির স্থান নাই।

অথচ ধর্ম জানেন আমার কোন দোষ নাই। ফুলটি ছিল ফুটিবার শেষ অবস্থায়, একটু পরে আপনিই ঝরিত, রূপে লুব্ধ করিয়া আমায় নিমিত্তের ভাগী করিল মাত্র।

বেয়ারার মুখের পানে অপরাধীর মত চাহিলাম,—এমনই অভিভূত হইয়া গিয়াছি যে, আর একটু হলেই তাহারই শরণাপন্ন হইয়া বোধ হয় বলিয়া ফেলিতাম, "এ যাত্রাটা আমায় বাঁচাও কোন রকমে।"

বেয়ারা বলিল, "ওপর ঘরেই রয়েছেন তিনি, আসুন আমার সঙ্গে।"

নিরুপায় হইয়া অগ্রসর হইলাম।

মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলাম—আজই-এ-কাজে ইস্তাফা দিয়া বাড়ি চলিয়া যাইব। মীরাকে

আব ভাল লাগে না, একটা গোলাপ আপনি পড়িয়াছে ঝরিয়া, তাহার জন্য

ও লাঞ্ছনা সহ্য হইবে না; ইহাব অতিরিক্ত যে-সব বিড়ম্বনা সে তো আছেই।

একটা কয়েদীকে বিচারাসনের সামনে হাজির করিতেছে।

কাজ আরম্ভ হইল। সামনে মুখটা বাড়াইয়া বলিল, "মাস্টারমশাই এসেছেন মা।"

আমি পৌঁছিবার এ হইল, "আসতে বল্।"

শক্ত মাস্টারমশাই, ছাত্রীটি দাঁড়াইয়া পর্দাটা তুলিয়া ধরিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিয়া নতনেত্রে

তরুর পিঠে

মাস্টারমশাই নিজে, "ব'স ঐ সোফাটায়।"

আমি ঘাড়টা সেই রকম গোঁজ করিয়াই আড়চোখে পিছনেব সোফাটা দেখিয়া লইয়া কয়েক পা গিয়া বসিয়া পড়িলাম। সেকেণ্ড কয়েক চুপচাপ; মনে মনে মহলা দিতেছি,— প্রথমে বুঝাইব প্রকৃতই ফুলটি আমি জানিয়া নষ্ট করি নাই। কালো-মেমসাহেবী মেজাজ নিশ্চয় বুঝিতে চাহিবে না। না চায় বলিব—চাকরি দিয়া ফুলের জন্য ক্ষতিপূবণ করিলাম। এই অশান্তির এইখানেই ইতি করিযা দিব।

প্রশ্ন হইল, "তোমায় বাগান থেকে ডেকে নিয়ে এল?"

মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলাম,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আচ্ছা উজবুক তো বাজুটা, আমায় এসে বললেই পারত তুমি বাগানে রয়েছ। আমার এমন কিছু তাড়াতাড়ি ছিল না।"

শান্ত, একটু অনুতপ্ত কণ্ঠস্বর। বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিয়া আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। প্রথমেই সামনে দেওয়ালের উপর একটি গণেশ-জননীর মূর্তির উপর নজর পড়িল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন, পটের মূর্তিটাই নীচে নামিযা আসিয়াছে।

বয়স বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ হইবে। চওড়া টকটকে রাঙা পাড়ের একটা গরদের শাড়ি পরা, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মাথায় কাপড়ের পাড়ের সঙ্গে রঙে রঙে একেবারে মিলিয়া গিয়াছে, হাতে সোনার চুড়ির সঙ্গে দু-গাছি শাঁখা।

মুখটা ঈষৎ ক্লান্ত, মনে হয় যেন অসুস্থ রহিয়াছেন। ঘরের এক পাশে কৌচের উপর দৃষ্টি

পড়িতে ঠেলিয়া জড়-করা একটা র‍্যাগ দেখিয়া মনে হইল কৌচেই শুইয়াছিলেন এতক্ষণ, ওদিকে আমায় ডাকিতে পাঠাইয়া কুশন-চেয়ারটায় আসিয়া বসিয়াছেন।

ঘরটা বেশ প্রশস্ত। নীচে আসবাবের বাহুল্য নাই, উপরে ছবির কিছু বাহুল্য আছে এবং বাড়ির হিসাবে দেখিতে গেলে বিশেষত্বও আছে। চোখে পড়ে জগদ্ধাত্রী, কালীঘাটেব একটি রাঙায়-কালোয় জ্বলজ্বলে কালীর পট, রবিবর্মার আঁকা একখানি শতদলের উপর কমলা-মূর্তি।

অর্থাৎ আমি, অথবা যে-কোন বাঙালী গৃহস্থ পরিবারের ছেলে যাহাতে অভ্যস্ত, ঘরের মানুষটি হইতে আরম্ভ করিয়া মায় পট-ছবি সমেত ঠিক সেই রকম একটি পারিপার্শ্বিক। পরিবর্তনটাও এত অপ্রত্যাশিত এবং আকস্মিক যে, মনে হয় হঠাৎ ইহার মধ্যে যাদুবলে কিছু একটা যেন হইয়া গিয়াছে—আমার এই বাগান হইতে উঠিয়া আসিবার অবসরটুকুতে। দু-তিন দিনের যে আড়ষ্ট ভাবটা মনে জমা হইয়া উঠিয়াছিল, অনুভব করিলাম সেটাও হঠাৎ অপসৃত হইয়া গিয়াছে। লিখিতে দেরি হইল, কিন্তু আমার এই ভাবান্তরটা ঘটিতে মোটেই দেরি হয় নাই। মুখ তুলিয়া প্রথমটা বিব্রত হইয়া গেলাম, তাহার পর অল্প হাসিয়া বেশ সহজভাবেই বলিলাম, "ডেকে এনে কি আর অন্যায় করেছেন!"

"এখন মরশুমী ফুলে বেশ চমৎকার হয়েছে বাগানটি, তাই বলছিলাম।" হাসিয়া বলিলেন, "আমায় ডাকতে গেলে আমি তো চটতাম।"

একটু বিরতি দিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তুমিই তাহলে নতুন টিউটর এসেছ?"

উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"শুনলাম। দু-দিন থেকে ভাবছি ডাকব, শরীরটা ঠিক ছিল না; হয়ে ওঠেনি।"

আবার একটু হাসির সঙ্গে বলিলেন, "মীরা বলছিল, 'মুখচোরা ভালমানুষ লোকটি, উনি তরুকে পড়াবেন কি মা, তরুই উল্টে ওঁর মাস্টারি করবে।" জিজ্ঞেস করলাম—'তবে রাখতে গেলি কেন ওঁকে?"

আমি কৌতূহলে মুখ তুলিয়া চাহিতে হাসিয়া বলিলেন, "সে তোমার আর শুনে কাজ নেই বাপু?"

তাহার পর বোধ হয় আপত্তিজনক কিছু একটা মনে করিয়া লইতে পারি ভাবিয়া বলিলেন, "উত্তর আর কি, দুষ্টুমি!—'তরুর হাতে নাকাল হবেন, দিব্যি দেখব বসে—গোবেচারি কেউ নাকাল হচ্ছে দেখতে বেশ ভাল লাগে।' ..ওর কথা সব সময় ধবা হয় না বাড়িতে; ওঁকেই মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বসে। যাক, তোমার ছাত্রী পড়ছে কেমন?"

হাসিয়া বলিলাম, "আমি তাকে ভাল করে দেখিইনি এখনও।"

"তাই নাকি?—তা ওর দোষ দেওয়া যায় না।"

মিসিস রায় একটু চুপ করিয়া গেলেন। মুখে যে একটা লঘু প্রসন্নতার ভাব ছিল সেটা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া মুখটা চিন্তায় একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে বলিলেন, "কখন যে পাবে দেখতে আমি ভেবে উঠতে পারি না। বাপেতে আর মেয়েতে মিলে সংকল্প করেছে এদিকে এশিয়া আর ওদিকে ইউরোপ—এ দুয়ের মধ্যে যা কিছু ভাল আছে বেছে বেছে তরুর মধ্যে বোঝাই করতে হবে। আমার মত অন্য রকম, তাই ওসব কথার মধ্যে আর থাকি না, বলি তোমাদের যা ইচ্ছা কর গে বাপু।"

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আপত্তি না থাকে তো আপনার মতটা জানতে পারি কি?"

মিসিস রায় যেন আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন, বলিলেন, "আমার মত ওদের একজন শ্রেষ্ঠ কবির যা মত তাই। ওদের সঙ্গে আর কিছুতেই মেলে না, শুধু এইখানটাতে মেলে,—ওয়েস্ট ইজ ওয়েস্ট এণ্ড ইস্ট ইজ ইস্ট, দ্য টোয়েন শ্যাল নেভার মীট্"—(West is West and East is East, the twain shall never meet).

আমি অতিমাত্রায় আশ্চর্য হইয়া মুখের পানে চাহিলাম। ইংরেজীর এমন বিশুদ্ধ উচ্চারণ আমি বাঙালী মেয়ের মুখে ইহার পূর্বে কখনও শুনি নাই, অন্তত কাছাকাছি যদি কিছু শুনিয়াও থাকি তো তাহা অতি-মেমসাহেবিয়ানায় দুষ্ট। মিসিস রায় কথাটা বলিলেন অতি সহজভাবে, তাহাতে যেমন একদিকে কৃত্রিমতাও ছিল না, অন্যদিকে তেমনই নিখুঁত বলিতে পারিবার জন্য আমার এই যে বিস্ময়, এজন্য স্ত্রীলোক বলিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচও ছিল না। খুব বেশি জানিবার মধ্যে যেমন একটা অনায়াস অবহেলা থাকে—ভাবটা অনেকটা সেই রকম। আমিও বরং একটু অপ্রতিভ হইয়া মুখে বিস্ময়ের ভাবটা মিলাইয়া লইলাম।

তিনি স্থিরদৃষ্টিতে সামনে একটু চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর একটু স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "এরা আমার কথা মানতে চায় না, মীরা ঝগড়া করে, মীরার বাপও ঝগড়া করেন। আমাদের এই রাজায় রাজায় ঝগড়া, মাঝখান থেকে তরু-উলুখড়ের প্রাণ যায়। ওকে বিলেতে পাঠানো হবে—লরেটোতে জুনিয়ার কেম্‌ব্রিজের জন্যে হাতেখড়ি চলছে; অথচ সকালবেলায় উঠে নেয়ে-টেয়ে বেচারির লক্ষ্মী পাঠশালায় গিয়ে শিবপুজোর জন্যে চন্দন ঘষতে হয়। স্কুলে ওদের মিউজিক ক্লাস সেরে এসে বাড়িতে বিকেলে কীর্তন। আমি বলি—আপাতত একটা জিনিসে পাকা হোক, তারপর অন্যটা ধরলেই চলবে—আগে কীর্তনটা আয়ত্ত করে নিক না হয়। বলেন—না, তাহলে ঝোঁকটা একদিকে চলে যাবে, বেশ সরলভাবে নতুন জিনিসকে তুলে নিতে পারবে না..."

আমি বেশ নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিলাম, "কথাটা কি সত্যি নয়?"

মিসিস রায় কৌতুকচ্ছলে হাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "নাঃ, আমার কপাল মন্দ; মীরার মুখে তোমার বর্ণনা শুনে মনে হল বোধ হয় এত দিনে স্বপক্ষে একটি মানুষ পেলাম, তুমিও দেখছি ঐ দলেই!"

তাহার পর আবার গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "না, আমি সে কথা বলছি না, বলছি—মিলতে গেলে ঐক্যের দিকগুলোয় ঝোঁক দিতে হবে, কিন্তু তা তো করা হয় না, বিরোধের দিকগুলোয় দেওয়া হয় জোর। এটা কি রকম তার জন্যে বেশি দূর না গিয়ে তরুর ব্যাপারটাই ধরা যাক না—ওকে এমন সুযোগ দেওয়া হবে যাতে ও একেবারে অতি-আধুনিক ইংরেজ যুবতী হয়ে উঠতে পারে। ও যখন লরেটোতে যায় তখন ওকে দেখলেই বুঝতে পারবে এ বিষয়ে আমাদের কোনদিক দিয়ে ত্রুটি নেই। এদিকে যাতে আবার বেশি দূর না এগোয়, অর্থাৎ দিদিমা-ঠাকুরমাদের কথা ভুলে কোন কেম্‌ব্রিজ ব্লুর গলায় মালা দিয়ে বসে, সেজন্য তাকে দিয়ে শিবের মাথায়ও গঙ্গাজল ঢালানো হচ্ছে। এ-মনস্তত্ত্ব তোমরা যদি বোঝ তো বোঝ, আমি একেবারেই বুঝি না; কেন না ঠাকুরমা-দিদিমাদের আদর্শ আর বিশ্বাস যদি মানতে হয় তো সেই আদর্শে গড়া শিবঠাকুর ওকে ঠেকাবার জন্যে হিমালয় ছেড়ে কেম্‌ব্রিজের দিকে এক পা-ও বাড়াবেন না। তার কারণ গেলেই তাঁর নিজের জাত যাবে, আর ভক্তের খাতিরে যদি সেটাও না গ্রাহ্য করেন তো এইজন্যে যে কেম্‌ব্রিজে টাটকা বিল্বপত্র একেবারেই পাওয়া যাবে না।

"এই এক ধরনের মিলন। আর এক ধরনের আছে—নিজেদের সব ছেড়ে ওদের সব নেওয়া, মনে-প্রাণে সাহেব হয়ে গিয়ে উদয়াস্ত গায়ে সাবান ঘষতে থাকা। কিন্তু একে তো আর মিলন বলা যায় না, এ আত্ম-সমর্পণ; বরং আত্ম-সমর্পণের মধ্যেও আত্মার কিছু বিভিন্নতা বজায় থাকে বোধ হয়; এ একেবারে আত্মবিলয়—ওরাই রইল, বরং পুষ্ট হল, তুমি গেলে নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যাবে। এটা সেই মনোভাব যার জন্যে মুখ থেকে বেরোয়—ইংরেজী শিখতে হলে ইংরেজী পড়তে হবে, ইংরেজীতে কথা কইতে হবে, ইংরেজীতে ভাবতে হবে, এমন কি স্বপ্নও দেখতে হবে ইংরেজীতেই (To learn English, read English, speak in English, think in English, and even dream in English)—কে বলেছিলেন কথাটা? রমেশ দত্ত, না মাইকেল?—কিন্তু কেন তা করব? মায়ের দুঃখের সঙ্গে যে ভাষা আমার জিভে মিলিয়ে রয়েছে তাকে তাড়াতে যাব কোন্ দুঃখে?—

এই আত্মবিলোপের জাত আমরা, ভাষার দিক দিয়েও আত্মবিলোপ, সভ্যতার দিক দিয়েও আত্মবিলোপ।"

মিসিস রায় সোজা হইয়া বসিয়া ছিলেন, ক্লান্তভাবে সোফার পিঠে হেলান দিয়ে একটু চুপ করিলেন; চোখ দুইটি অন্যমনস্কভাবে সামনের দেওয়ালে কমলার ছবির উপর নিবদ্ধ।

আমার চোখ দুইটি নিজে হইতেই কৌচের উপর গিয়া পড়িল।

মিসিস রায় অসুস্থ, তাহার উপর হঠাৎ মনের এই আবেগ। বলিলাম, "আপনি এখন একটু আরাম করলে ভাল হত। আপনার কথার প্রতিবাদ করা যায় না, অন্তত ভেবে চেষ্টা করতে হয়—এখন আমি আসি, আবার যখন আদেশ করবেন, আসব।"

উঠিতে যাইব কিন্তু কোন উত্তর না পাইয়া উঠিতে পারিলাম না। হাতের মধ্যে মুখের দুইটি পার্শ্ব ঈষৎ চাপিয়া, স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন মিসিস রায়,—বুঝিলাম আত্মস্থ; আমার এতগুলো কথার একটাও কানে যায় নাই। একটু পরে কমলার মূর্তি থেকে ধীরে ধীবে প্রশান্ত চক্ষু দুইটি নামাইয়া আমার উপর ন্যস্ত করিয়া বলিলেন, "হতেই হবে।"

বুঝিলাম এখনও ঘোরটা কাটে নাই। তখনই যেন সচকিত হইয়া উঠিলেন, "বলছিলাম হতেই হবে; অর্থাৎ এই আত্মবিলোপের প্রতিক্রিয়া একদিন আসবেই। তাই কৈলাস আর কেম্‌ব্রিজের এই জগাখিচুড়ি।"

আমি যেন কিছু একটা বলিবার জন্য বলিলাম, "কিন্তু এই একেবারে আত্মবিলোপেব ভাবটা যেন যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে।"

মিসিস রায় বলিলেন, "মোটেই নয়। পুরোদমেই চলেছে এখনও। যেটাকে তুমি যাওয়া বলছ, সেটা হল ঐ দুটোতে মিলে তালগোল পাকিয়ে যাওয়া।"

আমি বলিতে যাইতেছিলাম, "আজকাল জাহাজ থেকেই সুট ছেড়ে ধুতি-চাদব পরে আমাদের দেশের ছেলেরা নামছে এমন উদাহরণ বিরল নয়।

মিসিস রায় শেষ করিতে না দিয়া একটু অসহিষ্ণুভাবেই বলিয়া উঠিলেন, "তুমি জান না তাই বলছ; আমি খুব জানি—আমার নিজের ছেলে এই রকম আত্মবিলুপ্ত, আর এই আমার ছোট মেয়েকে এরা..."

এমন সময় একটা ছোট্ট জাপানী কুকুর ত্রস্তভাবে ঘরে ঢুকিয়া মিসিস রায়ের পায়ে কাছে লুটিয়া গড়াইয়া একশা হইয়া পড়িল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মীরা আর তরু এক রকম হুড়োমুড়ি করিতে করিতেই আসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

৫

এ এক সম্পূর্ণ অন্য মীরা।

এমন কলহাস্য আর লুটোপুটি করিতে করিতে প্রবেশ করিল যেন তরুর বড় বোন নয় মীরা, পরন্তু সমবয়সী সখী। পরে বোঝা গেল মাকে দখল করিবার জন্য মোটর হইতে নামিয়াই ওদের রেস আরম্ভ হইয়াছে। তরু ছোট বলিয়া ক্ষিপ্রগতি, সেজন্যও, এবং দুয়ারের পর্দার সঙ্গে মীরার আঁচল একটু জড়াইয়া যাওয়ার জন্যও, সেই-ই গিয়া আগে মায়ের কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মীরা কাছে গিয়া ক্ষণমাত্র চিন্তা করিল, তাহার পর বলিয়া উঠিল, "ঐ যাঃ, বাবা এসে বলবেন কি? তোমার হার্ম্যানের বাড়ির অমন ফ্রকটা যে একেবারে...!"

"কি হয়েছে, অ্যাঁ?"—বলিয়া তরু সভয়ে দাঁড়াইয়া উঠিতেই মীরা তাড়াতাড়ি মায়ের কোলে তাহার স্থানটা দখল করিয়া মুক্তকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল।

তরু ঠকিয়া গিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল, অনুযোগের স্বরে বলিল, "ওঠ দিদি, এ বেইমানি। হেরে গিয়ে..."

মীরা মায়ের কোলে মুখ গুঁজিয়া উত্তর করিল, "তোমারও এটা বেইমানি।"

"আমার বেইমানি কিসে?"

"বেইমানি নয় মা?—তোমার আদর খাওয়ার পালা আগে আমার। ও পরে জন্মেছে, আমার থেকে এঁটোকুটো যা বাঁচবে তাই নিয়ে ওকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি তোমার লোভে যখন আর-জন্মে সাত তাড়াতাড়ি মরে বসলাম, ও কাদের মায়ায় পড়ে ছিল? যাক্ না তাদের কাছে!...তুমি আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর কর তো মা—'মীরা আমার লক্ষ্মী মেয়ে, সোনা মেয়ে'..."

তরু ভ্যাংচাইয়া বলিল, 'কেলে সোনা..."

মীরা সেইভাবে মুখ গুঁজিয়াই দুষ্টামি করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "মীরা আমার কালো সোনা; জগৎ মাঝে নাই তুলনা'...বল না মা—"

এরা জায়গাটা দখল করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কুকুবটা সরিয়া গিয়া দূরে ঘরের কোণে একটা চেয়ারের নীচে আশ্রয় লইয়াছিল। দুইটি থাবার উপর মুখ রাখিয়া চক্ষু তুলিয়া ব্যাপারটা অনুধাবন করিবার চেষ্টা করিতেছে। তরু কতকটা নিরুপায়ভাবে মীরার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে, বোধহয় সুযোগের দিকেও নজর আছে। মীরা মেঝেয় আঁচল লুটাইয়া মায়ের কোলে মাথা গুঁজিয়া কচি মেয়ের অভিনয় করিতেছে—তরুব রাগটাকে ইন্ধন জোগাইবার জন্য ঈষৎ গ্রীবা বাঁকাইয়া এক-একবার তাহার দিকে উঁকি মারিতেছে। মিসিস রায়ের একটা হাত মীরার বেণীর উপব, মুখে মৃদু হাস্যেব সঙ্গে খানিকটা কৌতুকের ভাব মিশিয়া গিয়া অনির্বচনীয় একটা মাধুর্যের সৃষ্টি করিয়াছে, নিজের মাতৃত্বের বসে যেন বিলীন হইয়া গিয়াছে। ওঁর মাথার উপর গণেশ-জননীর ছবিটা—তুষারমৌলি হিমালয়, তার সানুদেশে একটি শিলাখণ্ডের উপর শিশু গণপতিকে কোলে হইয়া পার্বতী. চক্ষু দুটিতে বিশ্বের সব বাৎসল্য আসিয়া যেন পুঞ্জীভূত হইয়াছে; পাশে রক্ষী ও বাহন পশুরাজ।

আমার অবস্থিতিটাও বোঝা দরকার।—

আমি ঘরটাব একটু অন্য প্রান্ত ঘেঁষিয়া একটা নীচু সোফায় বসিয়া আছি। আমার সামনে একটা বেশ মাঝারি রকমেব গোল মার্বেলের টেবিল। তাহার মাঝখানটিতে বড় একটা পিতলের পাত্রে একরাশ সদ্য-প্রস্ফুটিত সাদা লিলি; আশেপাশে কয়েক রকম মাউন্টে বসানো কয়েকটা ফটো। মোট কথা আমি এমনই কতকটা প্রচ্ছন্ন ছিলাম, তাহার উপর দোরটা আবার ঘরের মাঝামাঝি,—প্রবেশ করিয়া ঝোঁকের মাথায় সটান ওদিকে চলিয়া গেলে আমায না-দেখিতে পাইবার কথা। ওরা নিজেদের আবদারের খেলা লইয়া দু-জনেই বরাবর আমার দিকে পিছন ফিবিয়া আছে। মিসিস রায় দু-একবার গোপনে আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন. মানে তাহার নিশ্চয়ই এই—দরকার নেই জানিয়ে তোমার উপস্থিতির কথাটা, চুপ করে দেখ না তামাশাটা।

যিনি এত গম্ভীর প্রকৃতির বলিয়া এইমাত্র পরিচয় পাইলাম, তাঁহার মধ্যে এই দুর্বলতা দেখিয়া কৌতুক বোধ করিলাম। উনিও যেন ইহাদের সঙ্গে এক হইয়া গিয়াছেন। বোধ হয় ইচ্ছা নয় যে, সন্তান লইয়া তাঁহার এই নবমাতৃত্বের খেলায় কোন বাধা উপস্থিত হয়।

মা যেমন সন্তানদের বয়স হইতে দেয় না; সন্তানেরাও তেমনই মায়েদেরও নিজেদের বয়সের সঙ্গে টানিয়া রাখে।

মিসিস রায় তরুর হাতটা ধরিয়া নিজের দিকে একটু আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "তুমি আমার এই সোফাটার হাতলের ওপর এসে বরং ব'স তরু, বড় বোনের সঙ্গে কি জেদাজেদি করে?...তোরা কিন্তু সাত-তাড়াতাড়ি চলে এলি কেন বললিনি তো মীরা?"

তরু মায়ের আহ্বানে রাজি হইল না। মুখটা গোঁজ করিয়া নাঁকিসুরে বলিল—"সরোঁ বলছি দিঁ দিঁ, নৈলে..."

মীরা ওদিকে কান না-দিয়া বলিল, "ভাল লাগছিল না মা এক্কেবারে—মাথাব্যথার নাম করে পালিয়ে এলাম।...মাথাব্যথাটা কী চমৎকার জিনিস মা!..."

মিসিস রায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "চমৎকার, কিরে! সত্যি করেনি তোর মাথাব্যথা?"

মীরা হাসিয়া বলিল, "এই দেখ মার বুদ্ধি! সত্যি হলে কখনও চমৎকার হয়? চমৎকার বলছিলাম—এর জোরে স্কুল থেকে পালিয়েছি, পার্টি থেকে পালাচ্ছি—ব্যথা করার জন্যে মাথাটা যদি না থাকত তাহলে কি অবস্থাটাই যে হত ভাবতে মাথা গুলিয়ে যায়।"

মিসিস রায় হাসিয়া চকিতে একবার আমার পানে চাহিলেন। তরু বলিল, "মাথাব্যথা না হাতী; কিসের জন্যে মাথাব্যথা আমি সব জানি।"

মীরা গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা, জান তো চুপ করে থাক মশাই। তুমি আজকাল একটু বেশি ফাজিল হয়ে পড়েছ তরু।"

তরু বলিল, "তুমি সর না।"

মীরা মায়ের হাঁটু দুইটা আরও জড়াইয়া বলিল, "না, সরব না।"

একটু চুপচাপ গেল। মিসিস রায়ের স্মিতহাস্যটা আরও একটু ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমার উপস্থিতিটা যে পাকেচক্রে এখনও অপরিজ্ঞাত ইহাতে মুখে কৌতুকের ভাবটাও আরও স্ফুটতর। একটু যেন সংকোচ কাটাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "কে কে এসেছিল পার্টিতে?—মিস্টার লাহিড়ীর বাড়ির সবাই এসেছিলেন? নীরেশ এসেছিল?"

শেষের এই প্রশ্নটুকুতে মীরা যেন মুখটা আরও একটু গুঁজিয়া লইল।

প্রশ্নটা অনির্দিষ্টভাবে করিলেও আসলে মীরাকেই করা হইয়াছিল। কন্যার সংকোচে, শুধরাইয়া লইবার জন্য মিসিস রায় আবার তরুর দিকে চাহিয়া প্রশ্নটার পুনরুক্তি করিলেন, "আমাদের নীরেশ এসেছিল তরু? কে কে সব এসেছিল?"

পিছন ফিরিয়া থাকিলেও বুঝিলাম তরু হাতের রুমালটার একটা কোণ দাঁতে চাপিয়া রুমালটাতে মুঠার টান দিতে দিতে মসৃণ করিতেছে, এই নবতর প্রসঙ্গে সে যেমন মায়ের কোল ভুলিয়াছে—তাহাতে তাহার চোখে-মুখে যে একটা কৌতুকের হাসিও ফুটিয়া উঠিয়াছে, না দেখিতে পাইলেও এটা আমি আন্দাজ করিতেছি। মাথাটা নাড়িয়া উত্তর করিল, "না, নীরেশ-দা আসেননি মা, তবে নিশীথ-দা আগেই এসেছিলেন, আমাদের মোটর পৌঁছুতে মিসেস মল্লিকের সঙ্গে তিনিই এসে নামালেন আমাদের, আবার দিদি যখন মাথাব্যথা বলে..."

মীরা মায়ের কোলের মধ্যে মুখটা ঘুরাইয়া বলিল, "একটু অতিরিক্ত বাচাল হয়েছ তুমি তরু। তুমি এখানে কেন? তোমার মাস্টারমশাইয়ের কাছে যাও।"

তরু কোলের কথা ভুলিয়া গিয়াছে; অন্যমনস্কভাবে গিয়া মায়ের সোফার হাতলের উপর বসিয়া মায়ের বুকে লুটাইয়া তর্কের সুরে বলিল, "বা—রে, আর তুমি কেন এখানে?

মীরা বলিল, "আমাব ঢের কাজ আছে। আমি তোমার পড়ার সম্বন্ধে মার সঙ্গে পরামর্শ করব।"

আমি এদিকে বেজায় অস্বস্তিতে পড়িয়া গিয়াছি। যতটা আন্দাজ করা গিয়াছিল তাহার চেয়ে বেশি সময় আমার উপস্থিতিটা অজ্ঞাত রহিল। ইহার মধ্যে কথায় কথায় নীরেশ লাহিড়ীর ও নিশীথের সম্বন্ধে যে প্রসঙ্গটুকু আসিয়া পড়িল সেটুকু শোনা আমার উচিত হয় নাই, তাহার উপর আবার আমার উল্লেখ হইয়া গেল। মিসিস রায় কথাটা প্রকাশ করিতেছেন না; অথচ যে হঠাৎ কি করিয়া নিজেকে এদের সামনে ধরিব মোটেই ভাবিয়া পারিতেছি না। নিজেকে প্রকাশ করিলেই এতটা সময়ের অপ্রকাশের অপরাধ লইয়াই প্রকাশ করিতে হইবে; অথচ সেই অপরাধটা প্রতি মুহূর্তেই বাড়িয়া যাইতেছে!

এদিকে হঠাৎ দু-জনের যে কাহারও দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়া পড়িবার ফাঁড়াটা মাথায় ঝুলিতেছে।

মীরা যে-কোন মুহূর্তেই উঠিয়া পড়িতে পারে, কিংবা এদিকে ফিরিয়া চাহিতে পারে। তরুর নজরে তো পড়িয়া গিয়াছিলাম বলিলেই হয়; আগাইয়া গিয়া এদিকে পিছন ফিরিয়াই মায়ের বুকে লতাইয়া পড়িল; তাহা না করিয়া সোফার হাতলে বসিয়া এই দিকে মুখ করিয়াই তো বোনের সঙ্গে তর্ক চালাইবার কথা। ও-ও বোধ হয় মাকে যথাসাধ্য দখল করিল; কিন্তু এদিকে সোজাসুজি একবার মুখ করিলে আমার ধরা পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য।

মিসিস রায় এখনও কথাটা ভাঙিতেছেন না কেন? সন্তান লইয়া এই মোহ ওঁকে কি আমার নিদারুণ অবস্থা সম্বন্ধে এতই অচেতন করিয়া তুলিয়াছে?...ঘামিয়া উঠিতেছি।

মীরার কথায় তরু উত্তর করিল, 'বেশ তো, আমার পড়ার কথাই তো? কর না পরামর্শ, শুনি!"

মিসিস রায়ের একটি হাত তরুর মাথায়, একটি হাত মীরার বেণীর উপর—দুইটিই ধীবে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে। বাৎসল্যের স্রোত যেন দুইটি ধারায় নামিয়া আসিতেছে।

মীরা বলিল, "নিজের সম্বন্ধে সব কথা শোনা চলে না।"

তরু বলল, "খুব চলে।"

মীবা বলল, "ধর, যদি তোমার বিয়ের কথা হত, থাকতে বসে?"

তর্কটার গলদ খুব স্পষ্ট; কিন্তু উত্তর দেবার উপায় ছিল না এবং সেখানেই মীবাব জিত। তরু মুখটা আরও গুঁজিয়া অনুযোগেব সুরে বলিল, "মা!"

তাহার পর কোলের মধ্যেই মাথাটা একটু ঘুবাইয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "মাস্টারমশাই বেড়াতে গেছেন; তাঁকে এখন পাব না।"

মীরা বলিল, "যাননি বেড়াতে, তোমার মাস্টারমশাই ভয়ানক কুনো!"

মিসিস বায় কন্যাদ্বযের মাথাব উপর দিয়া আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য কবিলেন।

তরু অনুরোগ করিল, "দেখছ মা, মাস্টারমশাইয়ের নিন্দে করছে দিদি!"

হার-জিতের দিক-পরিবর্তন হইয়াছে,—মীরা আরও রাগিয়া বলিল, "তোমার মাস্টারমশাই ভাল মানুষ, মুখচোরা লাজুক, অমন মানুষেরা হয় বোমা করে, নয় বেকার কবি হয়—দু'জনের একজনকেও আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। সুতরাং যখনই তাঁর কথা উঠবে, তখনই নিন্দে ভিন্ন সুখ্যাতি বেরুবে না আমার মুখ দিয়ে!"

তরু মুখ ঘুরাইয়া দিদির মুখের উপর দৃষ্টি নত করিযা একটু হাসিল, ভ্রূ উঁচাইয়া বলিল, "ইস্, আমি যেন জানিনে!.."

মীরা মুখটা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি জান শুনি?"

সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা থাক, মেলা বাচালগিবি করে না।"

তরু শেষের হুকুমটা কানে তুলিল না, বলিল, "তুমি এই দু'জনকেই বেশি পছন্দ কব।"

আমার তখন যে কি অবস্থা! তরুর দৃষ্টিটা শুধু একটু তুলিতে দেরি!

মিসিস রায়ও যেন ফাঁপরে পড়িয়া গিয়াছেন,—কথাটার যে এমনভাবে মোড় ফিরিবে, আর এত অতর্কিতে—মোটেই আশঙ্কা করেন নাই। আমার মুখের দিকে আর চাহিতে পারিতেছেন না। তরুকে মানা করিতে পারিতেছেন না। তরু নিতান্ত নিরীহভাবে তর্কের ঝোঁকে কথাটা বলিতেছে,— মানা করিতে গেলেই কোথায় আপত্তিব প্রচ্ছন্ন কারণ আছে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। সেটা হইবে আরও বিসদৃশ।

মীরা ধমকাইল, "চুপ কর তরু; তোমার কানে ধরে বলতে গিয়েছিলাম?"

তরুর জয়ের নেশা লাগিয়াছে। মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, 'সত্যি বলছি মা, দিদি ওর সই রমাদিকে বলেছে—ওর ভাল লাগে কবি, নয় তো. .হ্যাঁ, সত্যি বলছি,—রমাদির বোন সতী আমায় বলেছে..."

মীরা অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "তরু!"

তরু মায়ের ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া বলিল, "বাঃ, এতে ধমকের কি আছে মা? উনি বলছেন, মাস্টারমশাইকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না; আমি দেখাব না যে...আচ্ছা, এবার বল তো দিদি—সেদিন..."

উৎসাহের ঝোঁকে দিদির দিকে মুখ তুলিয়া ফিরিতে গিয়া তরু স্তম্ভিত বিস্ময়ে ও কৌতূহলে একেবারে নিশ্চল হইয়া গেল, বলিয়া উঠিল, "ওমা! মাস্টারমশাই যে!"

আর দৃষ্টি না পড়িয়া উপায় ছিল না, কেননা, আমি প্রবল অস্বস্তিতে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছি।

মীরা ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বস্ত্র সংযত করিয়া লইয়া খানিকটা মুখ নীচু করিয়াই রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে চক্ষু তুলিয়া সম্পূর্ণ পরিবর্তিত আকৃতিতে স্পষ্ট দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমাকে চাকরিতে নিয়োগ করিয়াছিল যে মীরা,—শান্ত, দৃপ্ত, আরও একটা কি যেন। সকলেই আমরা প্রস্তরবৎ স্থাণু হইয়া গিয়াছি। নিয়োগের সময় মাহিনার কথায় আমি যখন বলি—"আপনাদের যা সুবিধে হয় অনুগ্রহ করে দেওয়া"—সে সময় মীরার নাসিকার ডান দিকে যে কুঞ্চনটা ফুটিয়া উঠিয়াছিল সেটা আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে।

মিসিস রায়ের মুখেও একটা ভয়ের ছায়া ঘনাইয়া উঠিতেছিল,—এখনই একটা অঘটন ঘটাইয়া বসিবে মীরা, আমার এই চৌর্যবৃত্তির জন্য—এই অলক্ষ্যে সব কথা শুনিবার জন্য। তীব্র উৎকণ্ঠার মধ্যেই হঠাৎ আবার মুখটা তাঁহার প্রসন্ন হাস্যে দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তা ব'স শৈলেন, এতক্ষণ ছিলে কোথায়? তোমার ছাত্রীরই পড়ার কথা হচ্ছিল।"

আমি যত দিন এখানে ছিলাম তাহার মধ্যে মাত্র দুই দিন এই মহীয়সী নারীকে মিথ্যা বলিতে শুনিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এই এক। আমায় বাঁচানো দরকার ছিল, উনি সেই জন্য নিজের জিহ্বা কলুষিত করিলেন।

মীরা একবার মায়ের পানে চাহিল—যাচাইয়ের দৃষ্টিতে, তাহার পর তাহার নাসিকার সেই কুঞ্চন ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মীরা মাকে বিশ্বাস করিয়াছে, তাঁহার মিথ্যায় প্রবঞ্চিত হইয়াছে। বিশ্বাস করিয়াছে যে, আমি এই ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছি, এখনও আসন গ্রহণ করি নাই। সুতরাং এক-আধটা শেষের কথা যদি কানেও গিয়া থাকে তো তাহার প্রাসঙ্গিক মানেটা নিশ্চয় ধরা পড়ে নাই আমার কাছে। কতকটা ভাবহীন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিল, "বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?"

ওর মায়ের অনুরোধে নয়, অনুযোগের সুরে ঢালা ওর হুকুমে ধীরে ধীরে আবার উপবেশন করিলাম।

কিন্তু কোথায় কি একটা রহিয়া গেল যেন, কথাবার্তা আর জমিল না। আমার মনে হইল মায়ের কথা যদি বিশ্বাস করিয়াও থাকে, না বলিয়া নিঃসাড়ে প্রবেশ করিবার গ্রাম্যতাটা মীরা অন্তর দিয়া ক্ষমা করিতে পারিতেছে না।

একটু পরে একটা ছুতা করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

৬

দশ দিন হইল আসিয়াছি; রবিতে রবিতে আট দিন গিয়াছে, কাল সোম আজ মঙ্গল। মন্দ লাগিতেছে না। আমরা, যাহারা অপেক্ষাকৃত নীচু স্তরে থাকি, বড়মানুষ হওয়াটাকে সাধারণতঃ একটা অপরাধ বলিয়া ধরিয়া লই, সেই জন্য উহাদের সম্বন্ধে কতকগুলো মনগড়া ধারণা করিয়া বসি। ভ্রান্ত ধারণাগুলি

একে একে বিদায় লইয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমায় ক্রমেই ঘনিষ্ঠ করিয়া দিতেছে। দেখিতেছি যেমন 'বিলাত দেশটা মাটির', তেমনই আবার বড় মানুষেরাও মানুষ,—মানুষের অতিরিক্ত কিছু নয়, তেমনই আবার মানুষের চেয়ে কমও কিছু নয়। ধারণা ছিল শুধু দুঃখের দাহনই খাদ নষ্ট করিয়া খাঁটি মানুষের সৃষ্টি করে; এখন দেখিতেছি সুখের মধ্যে, প্রাচুর্যের মধ্যেও মনুষ্যত্বের বিকাশ সম্ভব। সত্যই তো, মানুষ আওতাতেও যখন বাড়িবার শক্তি রাখে তখন আলো-বাতাসের স্বচ্ছন্দতায় কেন বাড়িবে না?

কথাটাকে আরও একটু বাড়াইয়া বলা। আলো-বাতাস কিংবা আওতা তাহার মনে; বাহিরের অনুকূল অবস্থার সঙ্গে তাহার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই।

অনিলের কথা মনে পড়িয়া গেল, অনিল বলে, "ভাই,—আসলে সুখ-দুঃখ অর্থ-দারিদ্র্যের মধ্যে কোন তফাত নেই, কাজেই খাঁটি মনের উপর কোনটারই দাগ পড়ে না। মানুষ জাতটাই মামলাবাজের জাত, ঘর-ভাঙবার জাত—অন্নপূর্ণা আর শিবকে চায় আলাদা করতে। একজনকে কারে ফেলে হাত পাতায়, একজনকে দিয়ে হাতের আঁজলার উপর সোনার হাতা ওলটায়; ভাবে এবার বুঝি ভাঙল মন দু'জনের, পাক্‌লো মামলা। দু'জনে কিন্তু সুখ-দুঃখের যুগ্মরূপে চিরদিনই সেই একই চালার মধ্যে কাটিয়ে আসছেন, কাটাবেনও।"

একটু দার্শনিক উচ্ছ্বাস আসিয়া গেল কি? আসলে কথাগুলো মনে আসিয়া পড়িল মীরার মা অর্পণা দেবীর কথা তুলিতে গিয়া।—সুখের মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশের প্রসঙ্গে।

উনি মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের এক পুরাতন রাজবাড়ির মেয়ে। জ্যাঠা-বাপ-খুড়ারা এখন কুমার-বাহাদুর, ছোট কুমার, মেজ কুমারে আসিয়া দাড়াইয়াছেন বটে, কিন্তু ঠাকুরদাদা পর্যন্ত, কুহেলী-আবৃত অতীত হইতে সবাই 'রাজা-বাহাদুর', 'রাজা-সাহেব', 'রাজা' খেতাব ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। অথচ মনে হয় এ-বাড়ির আর সবাই এ-কথাটি জানিলেও অর্পণা দেবী নিজে যেন জানেন না।

বাড়ির মধ্যে ওঁর স্থানটি একটু অদ্ভুত গোছের। অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যে যেন উনি একটি বৈরাগ্য-আশ্রম রচনা করিয়া বাস কবিতেছেন। অপর্ণা দেবীর জ্ঞানের গভীরতার একটু আভাস এক জায়গায় দিয়াছি। পরে জানা গেল ওঁর একট' কলেজজীবনও ছিল। সেই জীবনের কৃতিত্বও এত বেশি যে ওঁর অভিভাবকেরা ওঁকে বিলাত পাঠাইবার লোভও সংবরণ করিতে পারেন নাই, যদিও সেযুগে ওটা প্রায় কল্পনাতীত ব্যাপার ছিল। অভিভাবকের মধ্যে পিতৃপক্ষ শ্বশুরপক্ষ উভয়পক্ষই ছিলেন, কেননা তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এত উগ্র আলোকের নেশার যে একেবারেই কারণ ছিল না এমন নয়,—উভয়পক্ষেই কয়েকজন আই-সি-এস্, ব্যাবিস্টার ছিল, অর্থাৎ বিলাত জিনিসটা অনেকটা ঘরোয়া ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিলাতে, ইনার টেম্পলে ব্যারিস্টারি খানা খাইতেছেন; কথা হইল তিনি আরও কিছুদিন থাকিয়া যাইবেন, স্ত্রী গিয়া কেম্ব্রিজে ভর্তি হইবেন। অদ্ভুত প্রতিভাশালিনী কন্যা,—ওঁকে লইয়া অসাধারণ রকম কিছু একটা করিতে উভয়পক্ষই যেন মাতিয়া উঠিলেন।

সব ঠিকঠাক, অপর্ণা দেবী পা বাড়াইয়া আবার টানিয়া লইলেন।

তাহার পর হইতে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন আসিতে লাগিল। যথাসময়ে স্বামী গুরুপ্রসাদ সাহেবী দাম্পত্য-জীবনের স্বপ্ন এবং তালিম লইয়া ব্যারিস্টার মূর্তিতে ফিবিলেন। স্ত্রীকে বিলাতে না পান, একটা সান্ত্বনা ছিল বিলাতকে স্ত্রীর নিকট হাজির করিতেছেন। দেখিলেন স্ত্রী কালীঘাটের কালী হইতে রবিবর্মার কমলা পর্যন্ত উগ্র শান্ত হরেক রকম দেবদেবীর আশ্রয়ে। পত্রাদিতে কোনরকম আঁচ পান নাই, একেবারে অবাক হইয়া গেলেন। প্রায় বৎসর দুই ধরিয়া অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গীচ্যুত করা গেল না। এই সময়ে অপর দিকের ইতিহাস মীরার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জন্ম—সে প্রায় পঁচিশ বৎসরের কথা। প্রায় ছয় বৎসর পরে মীরার জন্ম, আরও নয়-দশ বৎসর পরে জন্ম তরুর।

এই দশ দিনে জানা গেল মীরার দাদা নীতিশকে লইয়া এই বাড়িতে একটা ট্র্যাজেডির সুর

আছে এবং এটাও বুঝিয়াছি এ-সুর অপর্ণা দেবীর জীবনকে প্রভাবিত করিয়াছে সব চেয়ে বেশী। জীবনের সঙ্গে অপর্ণা দেবীর একটা সুস্থ ভোগের সম্বন্ধ আর নাই; উনি যেন সংসারে আছেন অথচ নাই-ও। দোতলার এক প্রান্তে নিজের ঘরটিতেই থাকেন বেশিক্ষণ, যতদূর জানিতে পারিয়াছি সাথী ওঁর অধিক-সময়েই বই। কক্ষত্যাগের নিয়মিত সময় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দুইটি,—এক সকালে, স্বামী যখন আহারে বসেন; আর এক রাত্রে, স্বামী, মীরা, তরু—সকলে যখন আহারে বসে। উনি যে সংসারে আছেন এই সময়টা একবার করিয়া মনে পড়ে সবার। আমিও মীরাদের সঙ্গেই আহার করি, গল্পে নামাইবার চেষ্টা করি অপর্ণদেবীকে। এক-এক দিন উচ্ছ্বসিত স্রোতে নামিয়া পড়েন, অনেক আলোচনা হয়, হাল্কা এবং গুরুও—যেমন প্রথম দিন হইয়াছিল। এক-এক দিন অপর্ণা দেবী থাকেন অন্যমনস্ক, স্বল্পবাক্, ঘরটাতে একটা থমথমে ভাব জমিয়া থাকে, মীরাদের কী হয় জানি না, আমার তো আহার্যগুলাও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

আহারের সময় ব্যতীত এই দশ দিনে মাত্র তিনবার অপর্ণা দেবীকে তাঁহার কক্ষের বাহিরে দেখিয়াছি; দুই দিন অপরাহ্নে, বাগানের মধ্যে। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি বাগানটায় এই কয়দিনে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছে। কাঁচির শাসন অবশ্য পূর্বরূপই, তবে নূতন বসন্তের সাড়া পাইয়া যেখানে যা ফুল ছিল এই শেষের দিকে সাত-আট দিনে যেন হুড়াহুড়ি করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। নানা রঙের কাপড়-চোপড় পরা একপাল শিশু যেন কোথায় আবদ্ধ ছিল, হঠাৎ মুক্তি পাইয়াছে। নূতন বসন্তের আতপ্ত অপরাহ্নে রঙে-গন্ধে বোঝাই এই বাগানটা আমায় অমোঘ আকর্ষণে টানে। দুই দিন অপর্ণা দেবীও নামিয়া আসিয়াছিলেন। একদিন আলোচনা হইল ফুল সম্বন্ধে, কিছু উচ্ছ্বসিত আলোচনা। প্রত্যেকটি ফুলের নাম জানেন, অনেকগুলার ইতিহাস জানেন। ইহার আগে জানিতামই না যে, ফুলের আবার একটা ইতিহাস আছে এবং সেটা রাজারাজড়ার ইতিহাসের মত শিখিবার জিনিস। গল্প করিতে করিতে বেড়াইতে ছিলাম পরিচয় দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ একটা বিচিত্র বর্ণের মরশুমী ফুলের বেডের সামনে দাঁড়াইয়া পড়িয়া ঘুরিয়া বলিলেন,—"শৈলেন, এত ভাল লাগে আমার শীতের মাঝখান থেকে বসন্তের গোড়া পর্যন্ত এই সময়টা, সমস্ত বছর যেন প্রতীক্ষা করে থাকি। জান তো এ ফুলগুলো ওদের দেশের মাঝ-বসন্তের ফুল, আমাদের দেশে ফুটতে আরম্ভ করে বেশ একটু শীত পড়লে। ওরা এই সব দিয়ে আমাদের শীতের চেহারা বদলে দিয়েছে! ঐ ফুলগুলো চিরস্থায়ী হল এদেশে, আরও ছড়িয়ে পড়বে। আমাদের পরাজয়ের গ্লানির মধ্যে এইগুলো থাকবে সান্ত্বনা হয়ে..."

শুধু কথাগুলো নয়, বলিবার সময় ওঁর চেহারাও হইয়া উঠিয়াছিল অপরূপ। কতক যেন আবেশভরে বলিয়া যাইতেছেন—আয়ত চক্ষু দুইটি স্থির দৃষ্টিতে উপরে নীচে এক-এক জায়গায় বা আমার মুখের উপর এক-একবার নিবদ্ধ হইয়া যাইতেছে, যেন স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছেন। একটু যে বেশি ভাবালু হইয়া পড়িয়াছেন, আমি যে খুব বেশি পরিচিত নই এখনও; সে-সব দিকে লক্ষ্য নাই। উনি যেন চেষ্টা করিয়া কিছু বলিতেছেন না ওঁর অন্তর্লোকে যে সব ভাবনা উঠিতেছে সেগুলাই যেন আপনা হইতে বাক্যে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে মাত্র!—সেদিন ওঁর ইংরেজী বলিবার মধ্যেও এই জিনিসটা লক্ষ্য করিয়াছিলাম;—যা অন্তরে জাগে তা প্রকাশ করিবার মধ্যে সংকোচ বা কৃপণতা থাকে না।

এমন অনাবিল কবি-প্রকৃতি আমার নজরে আর পড়ে নাই।

কয়েক দিন পরে আর একবার ওঁকে বাগানে দেখি, দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। আমি একটা ঘনপল্লবিত কৃষ্ণচূড়ায় ছায়ায় একটি বেঞ্চে বসিয়া বই পড়িতেছিলাম, হঠাৎ ওঁর শাড়ির চওড়া পাড়ের উপর নজর পড়িয়া যাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অপর্ণা দেবী সস্মিতবদনে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "ব'স তুমি।"

তাহার পর আগাইয়া গেলেন। বুঝিলাম আজ আরও পুষ্পাবিষ্ট!...প্রায় ঘণ্টাখানেক ছোট বাগানটিতে নীরবে ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার ধীরে ধীরে উপরে উঠিয়া গেলেন।

এই দুই দিন।

৭

আরও একদিন তাঁহাকে বাহিরে দেখিয়াছিলাম। দিনটা কখনও ভুলিব না।

আমার রুটিনের মধ্যে একটা কাজ বৈকালে তরুকে লইয়া মোটরে করিয়া বেড়াইতে যাওয়া; পূর্বে যে-সময়টা কলেজ হইতে ফিরিবার পথে তিনবার ইউনিভার্সিটি ফেরত সেই ধাড়ি ছেলেটাকে লইয়া কসরৎ করিতে হইত।

মোটর আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইয়াছে। তরুর কি কারণে উপরে একটু বিলম্ব হইতেছে, আমি বেয়ারাটাকে তাগাদায় পাঠাইয়া বারান্দায় অপেক্ষা করিতেছি।

মোটরের ক্লীনারটা গেট খুলিতে গিয়াছিল; হঠাৎ কানে আসিল সেখানে কাহার সহিত চেঁচামেচি লাগাইয়াছে। গাড়িবারান্দার বাহির দিকটায় তারের জাল বসাইয়া এক ঝাড় মর্ণিং গ্লোরির লতা তোলা হইয়াছে; ও দিকটা দেখা যায় না। বারান্দা হইতে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম ক্লীনারটা একটা ভুটানী বুড়ীর সহিত বচসা করিতেছে। ভুটানীটা বোধহয় বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল; গেটটা খোলা পাইয়া ভিতরে আসিবে, ক্লীনার আসিতে দিবে না। লোকটা অত্যন্ত ভীরু। ভীরু লোকদের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা দুর্বল দেখিলে অত্যন্ত সাহসী হইয়া উঠে, বোধহয় এই করিয়া নিজেদের চরিত্রের ব্যালান্স বা ভারসাম্য রক্ষা করিয়া চলে। বুড়ীকে দেখিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া খুব তম্বি করিতেছে। ভুটানীটার মুখে আর কোন কথা নাই, অত্যন্ত দীন মিনতির সঙ্গে গ্রীবা হেলাইয়া এক-একবার কপালে হাত দিয়া সেলাম করিতেছে, এক-একবার ধীরে ধীরে হাতটা বুকে চাপিয়া বলিতেছে..."বেটা.. বেটা!" অত্যন্ত কাহিল, বাঁ-হাতে গেটের একটা ছড় চাপিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আমায় দেখিয়া ক্লীনার গলা উঁচাইয়া রসিকতা করিয়া বলিল, "কি আমার লবদুর্গার মত চারদিক আলো করে মাঠাকরুণ এসে দাঁড়িয়েছেন, ওঁর বেটা হতে হবে!...ভাগো জলদি, নেই তো মোটরমে থ্যাৎলায়ে দেগা.."

ভুটানীটা যেন আর পারিল না; হাত তাহার আল্‌গা হইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে—"বেটা—বেটা!" বলিয়া হাউমাউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে দুই হাতে বুক চাপিয়া সুরকির উপর বসিয়া পড়িল। ক্লীনারটা আর এক ঝোঁকে পৌরুষের সঙ্গে তাহাকে বোধহয় টানিয়া তুলিতে যাইতেছিল, উপরতলায় অপর্ণা দেবীর ঘর হইতে উৎসুক প্রশ্ন হইল—"কি বলছে ও মদন?—কি বলছে? বেটার কি হয়েছে ওর?"

দেখি অর্পণা দেবী জানালা খুলিয়া দুইটা গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, মুখে একটা নিদারুণ উৎকণ্ঠার ভাব, মুখটা ঈষৎ হাঁ হইয়া গিয়াছে, অমন শান্ত চক্ষু দুইটাতে রাজ্যের উদ্বেগ। কিছু বুঝিলাম না; এমন কি হইয়াছে যাহার জন্যে তিনি এত বিচলিত একেবারে।

মদন বলিল, "দেখুন না মা, 'ব্যাটা-ব্যাটা' করে ভুজুং দিয়ে ভেতরে আসবার মতলব; গায়ের গন্ধে ভূত পালায়, ব্যাটা হও ওনার!"

আবার টানিয়া তুলিতে যাইতেছিল, অপর্ণা দেবী কর্কশকণ্ঠে একরকম চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "ছেড়ে দাও ওকে! চলে এস তুমি, তোমার ব্যাটা হতে হবে না, ভাবনা নেই তোমার!...এলে চলে?..."

হঠাৎ জানালার নিকট হইতে সরিয়া গেলেন এবং বেশ বোঝা গেল অত্যন্ত চঞ্চল এবং অধৈর্য গতিতে নামিয়া আসিতেছেন। বাহিরে যাহারা ছিল সবার মুখে একটা স্তম্ভিত ভাব, সবাই সবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছে। অপর্ণা দেবী চাকরবাকরকে একটা উঁচু কথা বলেন না, আর এ একেবারে রূঢ় হইয়া পড়া! ক্লীনার মদন মাথাটা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে আসিয়া মোটরটার কাছে দাঁড়াইল।

অপর্ণা দেবী কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া একেবারে ভুটানীর সামনে গিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক হাতে তাহার বক্ষোলগ্ন একটা হাত ধরিয়া অপর হাতে তাহার মুখটা তুলিয়া উদ্বিগ্নভাবে

প্রশ্ন করিলেন, "কেয়া হুয়া হ্যায় বেটাকা?"

ভুটানীটা একবার মুখের পানে চাহিল, স্ত্রীলোক দেখিয়া আরও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে ভাঙিয়া পড়িল, বুকটা চাপিয়া বলিল, "বেটা—বেটা!..."

আমরা গিয়া পাশে দাঁড়াইয়াছি। জায়গাটা নূতন আর বিরলবসতি হইলেও নিতান্ত রাস্তার ধারের ঘটনা—গেটের বাহিরে জনকয়েক লোক জড় হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত খাপছাড়া দেখাইতেছে ব্যাপারটা,—অতিশয় নোংরা ময়লা আর ছেঁড়া, পুরু, ওদেশের লুঙ্গিপরা সেই ভুটানী, আর তাহার পাশেই এই অভিজাত মহিলা,—আশ্চর্যভাবে অধীর, কতকটা যেন পাগলের মত।...তরুর মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে, চাকরদের সবাই ভীত, আমার মাথায় কোন ধারণাই আসিতেছে না—ব্যাপারটা কি। মীরা থাকিলেও না-হয় একটা কোন ব্যবস্থা হইত, সে প্রায় ঘণ্টাখানেক আগে বাহির হইয়া গিয়াছে।

অপর্ণা দেবী আমার মুখের দিকে একটু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "ভয়ানক মুশকিলে পড়া গেলতো শৈলেন, ও আমার কথা বুঝতে পারবে না, অথচ ঠিক যে ওর ছেলে নিয়ে উৎকট রকম কিছু একটা হয়েছে—আমি বুঝতে পারছি কি না..."

একবার প্রায় উপস্থিত সকলের মুখের দিকে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া লইয়া আমায় প্রশ্ন করিলেন, "কি করা যায় বল দিকিন?"

বুড়ী বুক চাপিয়া অঝোরে কাঁদিতেছে, তাহার জীর্ণ গালের রেখা বহিয়া অশ্রু নামিয়াছে। বুক চাপিয়া একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে দুলাইতেছে, আর ঐ এক বুলি—"বেটা—বেটা!"

আমাদের পাশের বাড়িটা একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানের—এ বাড়ির সঙ্গে অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, "পাশে এ বাড়িতে ভুটানী আয়া-টায়া নেই কি? আজকাল সায়েবরা প্রায় নেপালী কিংবা ভুটানীই রাখে।"

অপর্ণা দেবীর মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বোধহয় মুহূর্তমাত্র সময় যাহাতে নষ্ট না হয় সেজন্য আমায় কিছু না বলিয়া একেবারে তরুকে বলিলেন, "ঠিক, যাও তো তরু মিসিস রিচার্ডসনকে বল—Auntie will you please spare your ayah for a couple of minutes?—Mummy wants her badly,...run, there's a dear. (খুড়িমা, তোমার আয়াকে মিনিট দুয়েকের জন্যে ছেড়ে দিতে পারবে কি? মার বিশেষ দরকার...দৌড়োও, লক্ষ্মীটি।)

বুঝিলাম উগ্র উত্তেজনায় অপর্ণা দেবীর সংযত জীবন ভেদ করিয়া তাঁহার কলেজ-যুগের কয়েকটা মুহূর্ত আসিয়া পড়িয়াছে। মেয়ের সঙ্গে তাঁহাকে ইহার আগে এমনি কখনও ইংরেজী বলিতে শুনি নাই, পরেও শুনিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না; এ বিষয়ে তাঁহার স্বদেশীয়ানা অত্যন্ত কড়া।

আন্দাজ আমার ঠিক ছিল; একটা ঐ জাতেরই আয়া আসিয়া অর্পণা দেবীকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণা দেবী তাহাকে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বলিলেন, "একে জিজ্ঞাসা কর তো এর ছেলে সম্বন্ধে কি বলতে চায়—কি হয়েছে তার?"

চীনা ভাষার মত একটা ভাষায় উহাদের মধ্যে খানিকটা কি প্রশ্নোত্তর হইল। বৃদ্ধার কান্না আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আয়া ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে বুঝাইয়া দিল—বুড়ির ছেলে আজ বৎসরাবধি নিরুদ্দেশ। গত বৎসর শীতে তাহারা কয়জন মিলিয়া কুকুর, ছাগল, চামরী-গরুর লেজ, হরিণ আর ছাগলের চামড়া প্রভৃতি লইয়া হিন্দুস্থানে ব্যবসা করিতে নামিয়াছিল। একদল গত বৎসরেই শীতের শেষে ফিরিয়া যায়। তাহার ছেলে তাহাদের মধ্যে ছিল না। গ্রামের একটি লোকের মারফত মায়ের জন্য সাতটি টাকা ও একটা ফুলকাটা জ্বলজ্বলে গোলাপী রঙের ইটালীয়ান র‍্যাপার কিনিয়া পাঠাইয়া দেয়। আর খবর দেয় যে, তাহারা মাস দুয়েকের মধ্যে ফিরিবে। পাশের গ্রামের আর একটি দম্পতি নামিয়াছিল। দুই মাস নয়, মাস-পাঁচেক পরে তাহারা ফিরিল, বৃদ্ধার সহিত দেখা করিয়া পাঁচটা টাকা আর চব্বিশ-ফলার একটা ছুরি দিয়া বলিল—ছেলে পাঠাইয়া দিয়াছে, তাহাদের হাজার

বলা সত্ত্বেও কোনও মতে ফিরিল না। অন্য পথে একদল ভুটিয়া নামিয়াছিল, তাহাদের দলে ভিড়িয়া যায় খুব সম্ভবত সেই দলের একটি তরুণীর আকর্ষণে—বলে মায়ের বড় কষ্ট, হিন্দুস্থানে কিছু রোজগার করিয়া সে একেবারে ফিরিবে।

বৃদ্ধা বুকের উপর হইতে নকল প্রবালের তিন-চার ছড়া মালা সরাইয়া জামার ভিতর হইতে সযত্নে পাট করা একটা গোলাপী রঙের ফুলকাটা র্যাপার আর একটা নানা ফলার ছুরি বাহির করিয়া সাশ্রুলোচনে মাথা দোলাইয়া আয়াকে কি বলিল। আয়া অপর্ণা দেবীকে বলিল—"বলছে, ও বুদ্ধের মালা ছুঁয়ে শপথ করছে, ব্যাটার বউকে কিছু বলবে না, একটুও কষ্ট দেবে না, এই র্যাপার আর ছুরি তাকেই যৌতুক দিয়ে দেবে, তাই কখনও নিজের কাছ-ছাড়া করে না।"

দৃশ্যটা বড়ই করুণ, অনেকের চক্ষে জল আসিল, শুধু অপর্ণা দেবীর চক্ষু দুইটা যেন অধিকতর উত্তেজনায় আরও শুষ্ক ও দীপ্ত হইয়া উঠিল। একবার আমার দিকে একবার আয়ার দিকে চাহিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, "এত লোকের মাঝখানে খোঁজা...আর সে কোন্ শহরে আছে তাই বা কে জানে?"

হঠাৎ আয়ার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এত জায়গা থাকতে কলকাতায় এল কেন খুঁজতে ও?"

কি উত্তর দেয় শুনিবার জন্যে আগ্রহে চক্ষু দুইটা যেন তাঁহার ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছিল।

টের পাওয়া গেল—পাহাড় হইতে নামিয়া বৃদ্ধা খবর পাইল কলিকাতা সবচেয়ে জনবহুল জায়গা, অনেক ভুটিয়াও প্রতি বৎসর এখানে আসে; তাই সে বারটি টাকা সংগতি করিয়া পরশু এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের গ্রামে তেরটি ঘরের বসতি, অনেক ছেলেবেলায় একবার ভুটানের রাজধানী পানাখা দেখিয়াছিল, মহানগরী সম্বন্ধে কোন ধারণা ছিল না,—এখানে আসিয়া একেবারে অথৈ জলে পড়িয়া গিয়াছে। এখনও পর্যন্ত একটি ভুটিয়ার মুখ দেখে নাই, কেন কথা বোঝে না, হাতে পয়সা নাই, আজ সকাল থেকে কিছু খায় নাই। সবচেয়ে নিরাশার কথা—বুদ্ধ তাহাকে দয়া করিয়া নিজের কাছে ডাক দিয়াছেন মুক্তি খুবই কাছে, কিন্তু ছেলেকে একেবার শেষ দেখিবার সম্ভাবনাটা একেবারেই সুদূর হইয়া পড়িয়াছে।

অপর্ণা দেবী আরও আশ্চর্য কাণ্ড করিয়া বসিলেন,—যেমন আশ্চর্য, তেমনি অশোভন, দাঁড়াইয়া শুনিতেছিলেন, হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন, "মিলেগা—বেটা মিলেগা; চলো ওঠো, বুঢ়ীবাঈ, উঠো।"

এই অপ্রত্যাশিত সমবেদনায় বৃদ্ধা যেন একেবারে মুষড়াইয়া গেল। মাঝে মাঝে যে "বেটা-বেটা" করিতেছিল সেটাও বাহির হয় না মুখ দিয়া; শুধু চাপা কান্নার আওয়াজ—জীর্ণ শরীরটা যেন শতধা ভাঙিয়া পড়িবে। বুঝিতে পারিলাম—অপর্ণা দেবীরও কান্না নামিয়াছে।

কিছুক্ষণ পরে শমিত হৃদয়াবেগ লইয়া অপর্ণা দেবী ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধার একটি হাত ধরিয়া বলিলেন, "উঠো।"

বৃদ্ধা ডান হাতে লোহার গরাদ ধরিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিল। অপর্ণা দেবী তাহার বাঁ-হাতটা নিজের বাঁ-হাতে ধরিয়া, ডান-হাতে তাহার পিঠটা জড়াইয়া, ধীরে ধীরে সুরকির রাস্তা অতিক্রম করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। যেন একই শোকে আচ্ছন্না দুইটি সখী—সব জিনিসেরই অমিল—জাতির, বয়সের, সজ্জার, শুচিতার—মিল শুধু এইটুকুতে যে, দু'জনের বুকে একই ব্যথা—হৃদয়ের একই তন্ত্রীতে ঘা পড়িয়াছে।

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলাম সেই রাত্রে।

তরু পড়িতেছে, আমি কিছু অন্যমনস্ক,—আজ বিকাল হইতে মনের সামনে একটা ছবি মাঝে মাঝে স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। সুদূর হিমালয়ের এক জনবিরল পল্লীতে, একখানি গৃহে প্রবাসী পুত্রের

পথ চাহিয়া এক বৃদ্ধা,—দিন যায়, মাস যায়, বৎসর ঘুরিয়া গেল...পরিত্যক্ত ঘরের শিকল তুলিয়া দিয়া দুর্বল কম্পিত চরণে বৃদ্ধা পাহাড়ের বিসর্পিত পথ বাহিয়া নামিতেছে, —ঘরের স্মৃতির সঙ্গে পাহাড়ের স্তূপ পিছনে পড়িয়া রহিল...সামনে প্রসারিত হিন্দুস্থানের দিগন্ত-বিস্তৃত সমতল...কোথায় পুত্র? যোজন-প্রসারী দৃষ্টির মধ্যে তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না...মরীচিকার মত কলিকাতার উর্মিল আকাশরেখা—সেই মরীচিকার মধ্যে বিকৃত তৃষ্ণা—"বেটা—বেটা!..." তাহার পর বিকালের সেই সমস্ত দৃশ্যটা, যাহার অর্থ এখনও ঠিকমত মাথায় আসিতেছে না...."বেটা—বেটা!" আর সেই বেদনাতুর অবোধ সান্ত্বনা—"উঠো, বেটা মিলেগা—বুঢ়ী মাঈ, উঠো..."

তরু পড়ার মধ্যেই এক সময় প্রশ্ন করিল, "মাস্টারমশাই, জানেন?"

প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"মা কারুর ছেলের কথা হলে একেবারে কি রকম হয়ে যান, দাদার কথা মনে পড়ে যায়। আর একটা জিনিস মিলিয়ে দেখবেন'খন, বলে দিচ্ছি আপনাকে।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি মিলিয়ে দেখব তরু?"

"মা ঠিক এবারে অসুখে পড়ে যাবেন। কালই উঠে দেখবেন আপনি। ওঁর সামনে কারুর ছেলে নিয়ে কোন কষ্টের কথা তোলা একেবারে মানা।"

আমার মুখের উপর আয়ত চক্ষু দুইটা রাখিয়া ঘাড় দুলাইয়া বলিল, "হ্যাঁ মাস্টারমশাই, একেবারে ডাক্তারের মানা। দাদার কাণ্ডটা..."

সামলাইয়া লইয়া আড়চোখে আমার পানে একবার চকিতে চাহিয়া তরু অধিকতর মনোযোগের সহিত আবার পড়িতে লাগিল। একটু অস্বস্তির ভাব—এখনই যেন গূঢ় কি একটা পারিবারিক রহস্য প্রকাশ করিয়া ফেলিত আর কি!

আমার মনে পড়িয়া গেল—প্রথম যেদিন অপর্ণা দেবীর সহিত পরিচয় হয়, প্রসঙ্গক্রমে উত্তেজিত ভাবে বলিয়া উঠিযাছিলেন "তুমি জান না তাই বলছ শৈলেন, আমার নিজের ছেলে ঐ রকম আত্মবিলুপ্ত।" মীরা-তরু আসিয়া পড়ায় কথাটা আর পরিষ্কার হয় নাই সেদিন।

রহস্যটা পীড়া দিতেছিল; কিন্তু তখন আর তরুকে এ-বিষয়ে কোন প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করিলাম না

৮

পরিবারটি ছোট—মীবার বাবা, মা, তরু; নেপথ্যে মীরার দাদা।

সে অনুপাতে চাকর-বাকর বেশি। বেয়ারার কথা বলিয়াছি। নাম রাজীবলোচন হইতে সংক্ষিপ্ত হইয়া রাজু। অনেকটা সর্দারগোছের। বাসন মাজিতে হয় না আর ঘর ঝাঁট দিতে হয় না বলিয়া কতকটা আভিজাত্য-গর্বিত। থাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কাঁধে একটা পরিষ্কার ঝাড়ন ফেলা; যখন অন্য চাকরদের উপর ফফরদালালি না করে, তখন সব ঘরের আসবাবগুলা ঝাড়িয়া মুছিয়া বেড়ায়। কতকটা ওর কাজের অভাবের জন্য এবং কতকটা ওর অধীনের চেয়ার, আরশির অস্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতার জন্য অন্য চাকরেরা ওকে সম্ভ্রম করে। আরও একটা ক্ষমতা আছে লোকটার—খুব উঁচু দরের খবরের টুকরা-টাকরা সংগ্রহ করিয়া চারাইয়া দেওয়া। একদিন আমার ঘরের আসবাবপত্রগুলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে হঠাৎ মুখ তুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিল, "শুনেছেন বোধ হয় মাস্টারমশা।"

আমি মুখের দিকে চাহিতে বলিল, "আমেরিকা আর এদের একটি পয়সা ধার দেবে না।"

আমি প্রথমটা একটু বিস্মিত হইলাম; তাহার পর সত্যই ও কিছু বুঝে কিনা, জানে কিনা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রশ্ন করিলাম "কাদের?"

জানে না, কিন্তু ঠকিল না লোকটা; একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া বলিল, "কিছুই খোঁজ রাখেন না দেখছি!"

তাহার পর পাছে আবার খোঁজ লইবার জন্য টাটকা-টাটকি উহারই দ্বারস্থ হই, সেই ভয়ে হাতের চেয়ারটাতে তাড়াতাড়ি ঝাড়ন বুলাইয়া বাহির হইয়া গেল।

কথাটা কিন্তু এখানেই শেষ হইতে দেয় নাই।—রাত্রে পড়িতে আসিয়াই তরু মুখটা বিষণ্ণ করিয়া বলিল, "আপনার এখান থেকে অন্নজল এবার উঠল মাস্টারমশাই!"

এ রকম অপ্রত্যাশিত গুরুতর সংবাদে বুকটা ছাঁত করিয়া উঠিল, যতটা সম্ভব শান্ত ও নির্লিপ্ত ভাব ফুটাইয়া প্রশ্ন করিলাম,—"সত্যি নাকি?—তা, হঠাৎ কি হল?"

তরু মুখটাকে বিকৃত করিয়া বলিল, "বা—রে! পড়ে কি হবে আপনার কাছে? আমেরিকা যে অতবড় একটা মাড়োয়ারী মহাজন তার নাম পর্যন্ত জানেন না আপনি! গোয়েঙ্কা, মুরারকা, আমেরিকা—শোনেন নি এদের নাম?—বাবার মক্কেলই তো কতজন আছে।"

আমার মুখের পরিবর্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সে-ও হাসি থামাইতে পারিল না। মুক্তকণ্ঠে হাসিতে হাসিতে বলিল, "রাজু বেয়ারা ঐ রকম মাস্টারমশাই, কিছু জানে না, বোঝে না, অথচ গালভরা খবর সব যোগাড় করে তাক লাগিয়ে দেবে।"

লোকটার চরিত্রে এই নূতন আলোকসম্পাতে আমার প্রথম দিনের একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—রাজু আমায় বলিয়াছিল ব্যারিস্টার সাহেব একটা সিডিশান কেসে কুমিল্লায় গিয়াছেন। আমি একটু বিস্মিতও হইয়াছিলাম। তরুকে বলিলাম। তরু হাসিয়া জানাইল—রাজু বেয়ারার কাছে সিডিশানের যা অর্থ পার্টিশানেরও সেই অর্থ, অর্থাৎ কোন অর্থই নাই; ও শুধু ব্যারিস্টারদের সঙ্গে খাপ খায় এই রকম একরাশ শব্দ সুযোগমত সংগ্রহ করিয়া গভীর অধ্যবসায়ের সহিত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছে। যা-তা বলিয়া লোকদের ভুল খবর দেওয়ার জন্য প্রায়ই ধমক খায় মিস্টার রায়ের কাছে, চাকরি থেকে বরখাস্ত করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় দেখান। বরখাস্ত যে করা হয় না, সেইটেই রাজু নিজের মর্যাদার পরিপোষক করিয়া চাকর-দাসীদের মধ্যে আস্ফালন করে, বলে "দিন না ছাড়িয়ে, বারো টাকায় ইংরিজি-জানা বেয়ারা ফলছে গাছে!"

তরু বলিল, "বাবা হাল ছেড়ে দিয়েছেন মাস্টারমশাই। রাজু বেয়ারা বলেন না বলেন রেজো বেয়াড়া।"

নামের এই কদর্য অপভ্রংশে তরু আবার খুব এক চোট হাসিল।

রাজু বেয়ারার পরেই নাম করিতে হয় বিলাসের; বরং আগে নাম করিলেই বেশী শোভন হইত, কেননা এ-বাড়িতে রাজুর যদি এমন কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী থাকে যাহাকে সে ভয় করে তো সে বিলাস। প্রতিদ্বন্দ্বী বলিলেও বরং বিলাসকে ছোট করা হয়। রাজু বেয়ারা আর সব চাকর-বাকরদের নিজের চেয়ে ছোট মনে করিয়াই তৃপ্ত, বিলাসের পূর্ণ বিশ্বাস রাজু একটা তৃণখণ্ড মাত্র, প্রয়োজন হইলে তাহাকে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া যায় অথবা বাক্যের স্রোতে নিরুদ্দেশ করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া চলে। তবে বিলাস এটুকু করাকে পণ্ডশ্রম বা শক্তির অপব্যয় বলিয়া মনে করে, তাই নীরব অবহেলার দ্বারাই তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে চাপিয়া রাখিয়াছে। তরুর মুখে শুনিয়াছি রাজু বেয়ারা যখন চাকর-বাকরদের মধ্যে কোন বড় কথা ফাঁদিয়া জমাইবার চেষ্টা করে, একবার খোঁজ করিয়া লয় বিলাস কাছে-পিঠে কোথাও আছে কিনা। যদি কোন প্রকারে আসিয়াই পড়ে গল্পের মাঝখানে, উপরের কোন ফরমাস লইয়া, তো রাজু থামিয়া যায়; আবার বিলাস প্রভৃতির বাহিরে চলিয়া গেলে নাক সিটকাইয়া বলে, "ছুতো করে শুনতে এসেছিল! আমার বয়েই গেছে এসব কথা ওকে শোনাতে; শখ হয়েছে তোদের বলছি, কোন বাদশাজাদীর বায়না নিয়ে তো কথকতা শোনাচ্ছে না রাজু..."

বিলাসের এই শক্তির মূলে একটি আত্মচেতনা বর্তমান, সে অপর্ণা দেবীর বাপের-বাড়ির ঝি, রাজবাড়ির পরিচারিকা। অপর্ণা দেবী নিজে মাটির মানুষ, বিলাসের বিশ্বাস রাজবাড়ির মর্যাদা

যাহাতে তাঁহার এখানে কোন রকমে ক্ষুণ্ণ না হয় সেই জন্যই বিশেষ করিয়া তাহাকে অপর্ণা দেবীর সঙ্গে এখানে পাঠানো হইয়াছে; যদি সত্যই হয় বিশ্বাসটা, তো লোকবাছাইয়ে রাজবাড়ি যে ভুল করে নাই এ-কথা বেশ স্বাচ্ছন্দেই বলা চলে। আজ প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসর পূর্বে বিলাস রাজবাড়ি হইতে যে বায়ুমণ্ডল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল, এখনও সেটা বজায় রাখিয়াছে। এইজন্য সে এই আধুনিক রুচিসম্মত বাড়িতে কতকটা বেমানান,—তাহাব চওড়া কস্তাপেড়ে শাড়ি, গা-ভরা সোনা-রূপার মোটা মোটা গহনা, গালে অষ্টপ্রহর পান-দোক্তা, নাকে নথ আর চালের গুরুত্ব এই হালকা ফ্যাশানের বাড়িতে অনেকটা বিসদৃশ। মনে পড়ে প্রথম বিলাস যখন আমায় অপর্ণা দেবীর আদেশে ডাকিতে আসে, আমি তাহাকে নবপ্রথা অনুযায়ী কপালে জোড়কর ঠেকাইয়া নমস্কার করি, ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে, ভাগ্যে পুরাতন প্রথাটা বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, নয় তো নিশ্চয় পায়ের ধুলা লইয়া বসিতাম বিলাসের। ওখানে যতদিন ছিলাম মনে বরাবরই একটা ধুকপুকুনি লাগিয়া থাকিত—বিলাস কথাটা ফাঁস করিয়া দেয় নাই তো? কখনও কখনও এরূপও মনে হইয়াছে, নমস্কারটা বাড়ির মাস্টারের কাছে ওর ন্যায্য প্রাপ্য বলিয়াই দেয় নাই ফাঁস করিয়া।

বিলাসের সঙ্গে ওর কর্ত্রীর এক দিক দিয়া একটা মস্ত বড় মিল আছে, ওকে দেখা যায় বড় কম,—আরও কম যেন; অপর্ণা দেবীর ঘরেও ওকে খুবই কম দেখিয়াছি। তবুও মাঝে মাঝে ওর প্রসঙ্গ এক-আধবার আসিয়া পড়িবে।

আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। এই গম্ভীরা পরিচারিকাকে দু-এক বার মিস্টার রায়ের সঙ্গে স্মিতবদনে চটুল চপলতার সহিত পরিহাস করিতে দেখিয়াছি,—তাহাদের বাড়ির জামাই হিসাবে। আধুনিক রুচির মাপকাঠিতে এই যে গুরু অপরাধ এটিও রাজবাড়িরই পুরানো চাল,—বিলাস বজায় রাখিয়া আসিয়াছে। দেখিয়াছি মিস্টার রায় বেশ উপভোগ করিয়া প্রসন্ন-বদনেই উত্তর-প্রত্যুত্তর দিয়াছেন। ব্যাপারটা গোপনীয় নয়, অপর্ণা দেবীর সামনেই হইয়াছে। যতদূর মনে পড়িতেছে, একবার অন্ততঃ তাঁহাকেও বিলাসের পক্ষ অবলম্বন করিতে দেখিয়াছি। সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে একটি অনির্বচনীয় মাধুর্য ছিল—চমৎকার একটি নির্মল সরসতা। মনে হইত এই সামান্যা পরিচারিকা হঠাৎ অপর্ণা দেবীর ভগ্নীতে রূপান্তরিতা হইয়া মিস্টার রায়ের শ্যালিকার আসন গ্রহণ করিয়া বসিয়াছে।

রাজু বিলাসের পরে, শুধু একজন ছাড়া, আর সবাই এক রকম সাধারণ বলিলেই চলে—সোফার, যেমন হয় আর সোফার, পাচক-ঠাকুর—যে কোন পাচক-ঠাকুরেরই মত। মিস্টার রায়ের জন্য, বিশেষ করিযা পার্টি প্রভৃতি উপলক্ষ্যের জন্য একজন বাবুর্চি আছে—সেও অন্য সব বাবুর্চির মত অল্পভাষী এবং তাহার রন্ধনের আভিজাত্য এবং উৎকর্ষের জন্য পৃথিবীটাকে কিছু নীচু নজরে দেখে। মাজা-ঘষা ধোওয়া-মোছার জন্য একটি সস্ত্রীক পশ্চিমা চাকর আছে ঃ অত্যন্ত খাটে এবং যখন কাজ থাকে না আউটহাউসে নিজেদের বাসায় বসিয়া পরস্পর কলহ করে। বাকি থাকে মালী; তাহার একটু ইতিহাস আছে। আমার এ-কাহিনী ভালবাসারই কাহিনী; মালীর জীবনে ভালবাসার বা নারী-মোহের যে রূপ দেখিয়াছি তাহার একটু পরিচয় দিলে বোধহয় অন্যায় হইবে না।

ইমানুল মালীকে আমি প্রথম দেখি বাগানেই। বিকালবেলা, অলসভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা বর্ণের ফুলের বেডগুলি দেখিয়া বেড়াইতেছিলাম, ইমানুল বাগানের ওধার থেকে চারিটি ভায়োলেট ফুলের সঙ্গে ফার্ণের শীষ লাগাইয়া একটা বাটন হোল তৈয়ারি করিয়া আমার হাতে দিল, ঝুঁকিয়া কপালে হাত দিয়া বলিল, "সেলাম মাস্টারবাবু।"

বলিলাম, "সেলাম, তুমি এই বাগানের মালী?"

ইমানুল হাতের ডালকাটা কাঁচিটাতে একটা শব্দ করিয়া হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে হেঁ বাবু।"

আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। এর পরে কি বলা যায়? বলিলাম, "বাগানটা রেখেছ চমৎকার, তোমার নাম কি?"

"ইমানুল।"

একটু বিস্মিত হইয়া চাহিলাম, মুসলমান—ইহাদের খুব একটা মালী হইতে দেখা যায় না। বলিলাম, "তা বেশ।...ইমানুল হক?"

আরও বিস্মিত হইতে হইল। ইমানুল হাসিয়া বিনীত গর্ব্বের সহিত বলিল, "আজ্ঞে না বাবু, আমরা কেরেস্তান—রাজার যা ধম্ম আর আপনার গিয়ে লাটসাহেবের যা ধম্ম তাই আর কি।"

ক্রীশ্চান বলিতে আমাদের মনে সাধারণতঃ যে ধারণা জাগে এ তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মসীতুল্য গায়ের রঙ, মুখের হাড়গুলা কিছু উঁচু, গলায় একটা কাঠের মালা, ডান হাতে রূপার একটা অনন্ত, মাথার তৈলমসৃণ চুলে একটা কাঠের চিরুণী গোঁজা।—বলিলাম, "ও, তাহলে তোমার নাম ইম্যানুয়েল—বাঃ, বেশ; আমি মনে করিলাম—ইমানুল হক্ বুঝি।"

ইমানুল হাসিয়া বলিল, "আজ্ঞে না, মুসলমান নয়, রাজার যা ধম্ম সেই।"

প্রশ্ন করিলাম, 'বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ি রাঁচি বাবু—আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"ও।...কি জাত?"

"ওরাঁও জাত আমরা।" ইমানুল বিকশিতদন্ত হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল।

মনে পড়িল ওদিককার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে ক্রীশ্চানের ছুট বড় বেশি বটে। 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি কাগজে ইহাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ পড়িয়াছি অনেক। সেই সব জাতেরই একজনকে সামনে পাইয়া কৌতূহল জাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তা ইমানুল, ক্রীশ্চান কে হয়েছিল? তোমার বাপ, না ঠাকুর্দা?"

ইমানুল বলিল, "না বাবু, আমি ধরম আপনি বদলিয়েছি।"

সামনেই একজন ধর্মান্তরগ্রাহীকে পাইয়া কৌতূহলটা আরও তীব্র হইয়া উঠিল—কি বুঝিল ইমানুল যে, নিজের ধর্ম ত্যাগ করিয়া বসিল? তাহার নিজের ধর্মের তুলনায় ক্রীশ্চান ধর্মের মহত্ত্ব? পাদ্রীব প্ররোচনা? রাজার সঙ্গে, রাজ-প্রতিনিধির সঙ্গে ধর্মসাম্যের লোভ? না কি?

প্রশ্ন করিলাম, "কি ভেবে ছাড়লে ধর্ম তুমি ইমানুল?"

ইমানুল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিতে পারিল না, একটু মুখ নীচু করিয়া লজ্জিত হাসির সহিত বলিল, "যীশু আমাদের ত্রাণ করাব জন্যে জান দিয়েছিলেন বাবু, তাই. "

বেশ বোঝা গেল কিন্তু ইমানুলের এটা প্রাণের কথা নয়, কোথায় যেন একটা কি আছে। আরও কৌতূহল হইল, বলিলাম, "তাহলে তো আমাকে, মিস্টার রায়কে, রাজু বেয়ারাকে, জগদীশ সোফারকে—সবাইকেই ধর্ম পালটাতে হয় ইমানুল। বল, বাজে কথা বলছি আমি?"

অবশ্য বাজে কথাই বলিলাম; কিন্তু যাহা অভীপ্সিত ছিল সেটুকু হইল। তর্কের গলদ কোথায় ধরিতে না পারিয়া অথবা পারিলেও সেটা গুছাইয়া ধরিতে না পারায়—ইমানুল একটু থতমত খাইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মাথাটা আবার নীচু করিয়া রগের কাছটা চুলকাইতে লাগিল।

আমি সুযোগ বুঝিয়া বলিলাম, "ঠিক বলি নি আমি? মানে তোমায় দেখেই সন্দেহ হয়েছিল কি না যে এমন একজন চৌকস লোক..."

ইমানুল একবার আমার পানে চাহিল, তখনই আবার মাথাটা নামাইয়া লইয়া বলিল, "ঠিক খেয়াল করেছেন আপনি বাবু। আপনাকে না বলে কাকেই বা বলি?...এখন কথা হচ্ছে আপনাকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে বাবু আমায়।"

গভীর রহস্যের আভাস পাইয়া আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম, "তা লিখে দেব না? বাঃ, এক-শ বার লিখে দেব। ব্যাপারটা খুলে বল দিকিন আগে।"

ইমানুল কুণ্ঠিতভাবে ঘাড়টা চুলকাইতে আরম্ভ করিল, "আজ্ঞে—মানে..."

বলিলাম, "হ্যাঁ বল, আরে আমায় বলবে তাতে আবার..."

'পাদ্রী সাহেবকে লিখতে হবে বাবু,—রেভারেণ্ড স্যামুয়েল চাইল্ড সাহেবকে।"

"এ তো খুব সহজ কথা, কি লিখব বল?"

ইমানুল আবার খানিকক্ষণ নিরুত্তর রহিল, তাহার পর আরও কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "পাদ্রী সাহেবকে লিখতে হবে—টাকা কিছু জমেছে, কিছু জোগাড়ও হবে, এবার তুমি নাথুর মারফত যা কথা দিয়েছিলে তার একটা..."

এমন সময় বারান্দা হইতে রাজু বেয়ারা হাঁক দিল—"ইমানুল, তোকে বড়দিদিমণি ডাকছেন, শীগ্‌গির আয়। হারামজাদা আপনাকে বুঝি বাট্‌ন-হোল ঘুষ দিয়ে চিঠি লেখাবার জন্য ধরেছে মাস্টার-মশা?—এলি?...জল্‌দি আয়।"

প্রথম দিন এই পর্যন্তই টের পাই। ইমানুলের কথা আবার যথাস্থানে তোলা যাইবে।

৯

তরুর ঠাস-বোনা রুটিনের মধ্যে আমার জায়গা ঠিক হইয়া গেছে। কাজ বেশ নিয়মিতভাবে চলিতেছে। ওদিকে কলেজে নাম লিখাইয়া লইয়াছি। প্রচুর অবসর রহিয়াছে; পড়াশুনা ঠিকমত আরম্ভ করি নাই, তবু আয়োজন চলিতেছে।

প্রচুর অবসর, কেননা, পাঁচটার পূর্বে তরুর সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকে না। সকালে তাহার সেই লক্ষ্মীপাঠশালা, দুপুরে লরেটো, তাহার পর ঘণ্টাখানেক বৈষ্ণবসংগীত। কীর্তনের মাস্টার চলিয়া গেলে তরুর ভার আমার উপর পড়ে। প্রথমেই ওকে মোটরে করিয়া বেড়াইতে লইয়া যাইতে হয়। কোন দিন ইডেন্ গার্ডেন্‌স্, কোনদিন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, কোন দিন অন্য কোথাও। ইহার মধ্যে দুই দিন কলিকাতার বাহিরেও হইয়া আসিয়াছি—একদিন দমদমের দিকে, একদিন বোটানিক্যাল গার্ডেন্‌স্। এই মোটর-অভিযানে তরুর প্রয়োজনের চেয়ে আমার নিজের শখের দিকটাই বেশি করিয়া দেখিতেছি আমি,—এ সত্যটুকু গোপন করিয়া কি হইবে? আমি একটু ভ্রমণবিলাসী, মাঝের চারিটি বৎসর আমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ বাসনাটিকে যেন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলাম। মুক্তি পাইয়া, মুক্তির সঙ্গে সুযোগ পাইয়া সে যেন অন্ধ আবেগে ডানা মেলিয়া দিয়াছে।

আর একটা কথা—ইহার মধ্যে একদিন মীরা সঙ্গে ছিল, বরাবরই নির্বাক, বোধহয় বার-তিনেক তরুর সঙ্গে এক-আধটা কথা কহিয়া থাকিবে, আর একবার সোফারকে একটা হুকুম; আমার সঙ্গে একটাও কথা হয় নাই; কিন্তু ও যে পাশে ছিল, সেই বা কি এক অপূর্ব অনুভূতি! তাহার পর রোজই বেড়াইতে যাইবার সময় একবার ফিরিয়া বাড়িটার দিকে চাহিতাম—একটা আশা, যদি উপর থেকে কেহ বলে, "তরুদিদি একটু থেমে যেও, বড়দিদিমণি বোধ হয় যাবেন ওদিকে।"... মোটরের পা-দানিতে পা তুলিতে দেরি হইয়া যাইত।

বেড়াইয়া আসিয়া একটু এদিক-ওদিক করিয়া তরু আসে পড়িতে। পড়িবার নির্ধারিত সময় দুই ঘণ্টা। পড়ার মাঝে মাঝে গুলগুজব সাঁদ করাইয়া তরু যে সময়টুকু আত্মসাৎ করে সেটার হিসাব রাখিলে তরু বোধ হয় বইয়ে দেয় ঠিক ঘণ্টাখানেক সময়। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে;—ওইতেই পড়া হইয়া যায়, তা ভিন্ন লরেটোর পড়াইবার পদ্ধতিও এমন চমৎকার যে, পাঠ গ্রহণ করিবার সময়ই বোধ হয় ওর অর্ধেক পড়া হইয়া গিয়া থাকে। লক্ষ্মীপাঠশালায় পড়িবার বিশেষ হাঙ্গামা নাই,—স্তব, পূজা-পদ্ধতি, সব ওখানেই সারে; খান দুই-তিন হালকা বাংলা বই আছে, দেরি হয় না।

এই একরকম নিখুঁত দিনগুলির মাঝে মাঝে ছন্দপতন হইতেছে। সেটা ঘটাইতেছে মীরা; একটু আশ্চর্য বোধ হয় বৈকি। যে মীরা আমার জীবনের ছন্দ সৃষ্টি করিতে বসিয়াছে সে-ই আবার ছন্দপতন ঘটায় কেমন করিয়া? একটা দিনের কথা বলিলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হইতে পারে। ছোট দু-একটা ঘটনার কথা বাদই দিলাম।

তরু একদিন নিজের পদ্ধতিতে প্রশ্ন করিল, "মাস্টারমশাই, শুনেছেন?"

জিজ্ঞাসা করি—"কি?"

"দিদি এইবার একদিন আসবেন বলেছেন—দেখতে যে আপনি কেমন পড়াচ্ছেন।"

ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আরও দু-একদিন বলিল কথাটা।

বলি—"বেশ ভাল কথাই তো।"

লক্ষ্য করিয়াছি কথাটা বলিয়াই তরু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চায়। "ভাল কথাই তো" বলা সত্ত্বেও আমার মুখটা যে একটু মলিন হইয়া উঠে সেটা ওর দৃষ্টি এড়ায় না। একদিন বলিয়াও ফেলিল ভিতরের কথাটা। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া গেল এবং পর্দার বাহিরে একটু মুখটা বাড়াইয়া দেখিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিল; তাহার পর কুণ্ঠিত চাপা গলায় প্রশ্ন করিল, "একটা কথা বলছি মাস্টারমশাই, কিন্তু বলুন কারুকে বলবেন না কক্ষণো..."

ঈষৎ হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা যদি এমনই গোপনীয় তো বলে কাজ নেই তরু,—বলতে হয় না অত গোপনীয় কথা।"

বাধা পাইয়া তরুর মুখের দীপ্তিটা যেন নিভিয়া গেল। অপ্রতিভভাবে সামলাইয়া লইয়া বলিল, "না, সে কখনও বলবও না আমি।"

পড়িতে লাগিল। কিন্তু বেশ বুঝিতেছি তরু অভিনিবিষ্ট হইতে পারিতেছে না পড়ায়, কথাটা ওর পেটে গজগজ করিতেছে। চিরন্তনী নারীরই তো একটি টুকরা তরু—পেটে কথার ভার বহন করিবে কি করিয়া বেচারী?

মনে মনে হাসিয়া ওব অবস্থাটা উপভোগ করিতেছি, তরু হঠাৎ পড়া বন্ধ করিয়া মুখটা তুলিয়া হালকা তাচ্ছিল্যের সহিত নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, কি আর এমন লুকুনো কথা মাস্টারমশাই? লুকুনো হলে কখনও বলত দিদি—বলুন না?"—এবং পাছে আবার কোন বাধা উপস্থিত করি সেই ভয়ে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "দিদি বলে—'পড়া দেখতে আসবো বললে মাস্টারমশাইয়ের মুখটা কি রকম হয় লক্ষ্য করে বলিস তো তরু।' আমি গিয়ে বলি। দিদি তাতে বলে—'করুন রাগ তোর মাস্টারমশাই, আমি যাব একদিন। সাবধান থেক তরু, যদি দেখি ফাঁকি দিচ্ছ!' দিই ফাঁকি আমি মাস্টারমশাই?"

"না, পড় দিকিন!"

পর্যবেক্ষণ!...মনে একটা গ্লানি জমিয়া ওঠে। মীরার অর্থাৎ একটা মেয়ের এবং আমার চেয়ে বয়সে ছোট মেয়ের এই মুরুব্বিয়ানাটা বারবার হজম করিয়া যাইতে হইবে?...ব্যারিস্টার রায় নাই, মন্দ লাগিতেছে না; কিন্তু এক সময় কামনা করি তিনি আসিয়া পড়ুন অবিলম্বে,—যদিও তিনি শতবিভীষিকায় ভীষণ, তবুও। নিজের মনেই ব্যঙ্গ করিয়া বলি, 'এ সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার আস্ফালন সহ্য হবে না।"

এমন সময় মীরা একদিন আসিয়াই পড়িল। অপর্ণা দেবীর ঘরে যেদিন ইচ্ছা না থাকিলেও প্রচ্ছন্নভাবে উহাদের আদর-আবদারের খেলা দেখি, তাহার ঠিক চারিদিন পরে। বোধ হয় এ ঘটনাটুকুর সঙ্গে আসার সম্বন্ধও ছিল, কেননা আমার 'মনিব' মীরা সেদিন আমার কাছে একটু খেলো হইয়া পড়িয়াছিল, যদিও অপর্ণা দেবী মিথ্যা বলিয়া অনেকটা সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই ক্ষতিটুকু গাম্ভীর্য দিয়া না পূরণ করিয়া লইলে আমি বশে থাকিব কি করিয়া?

মনে মনে ব্যঙ্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রবেশ করিলও ঠিক সম্রাজ্ঞী রিজিয়ার মতই। প্রথমে রাজু বেয়ারা পর্দার ভিতরে মুখটা বাড়াইয়া বলিল, "বড়দিদিমণি আসছেন মাস্টার-মশা"; অর্থাৎ কায়দামাফিক অ্যানাউন্স করিল আর কি; তাহার পর পর্দাটা তুলিয়া ধরিল; মীরা ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

মীরা সাজিয়া আসিয়াছে। একটা খুব হালকা চাঁপাফুলের রঙের শাড়ি পরিয়াছে, গায়ে ঐ

রঙেরই একটা পাতলা পুরা-হাতাব্লাউস, মণিবন্ধের কাছে ঝালরের মত করিয়া কাটা, তাহার মধ্যে দিয়া মীরার পুষ্পকোরকের মত হাত দুইটি বাহির হইয়া আছে,—দু-গাছি রুলি ঝিকমিক করিতেছে। পায়ে, মাঝখানটিতে একটি করিয়া ফুলতোলা মখমলের স্যাণ্ডেল, কপালে একটি খয়েরের টিপ, মাথায় পরিষ্কার করিয়া গুছানো এলো খোঁপা, আর সেই অনবদ্য বাঁকা সিঁথি।

মীরা কালো—শ্যামাঙ্গীই বলি। পীতে-হরিতে তাহাকে দেখিতে হইয়াছে ফুলেভরা একটা নবীন চম্পকতরুর মত।

বোধহয় এই সাজিবার জন্যই একটু কুণ্ঠিত হইয়া একটা চেয়ারে বসিয়া রহিল মীরা—অল্প একটু নিজেকে দ্রষ্টব্য করিয়া তুলিলে যেমন হয়। অবিলম্বেই আবার সে-ভাবটুকু সামলাইয়া লইয়া বেশ সহজ গলায় সহজ গাম্ভীর্যের স্বরে বলিল, "আপনার ছাত্রীর পড়া দেখতে এলাম।"

উত্তর দেবার সময় গলা দিয়া যেন একটা কঠিন বস্তুকে নামাইয়া দিতে হইল। বলিলাম, "বেশ করেছেন, ভালই তো!"

মীরা বলিল, "তরু একটু বিশেষ চঞ্চল, সেই জন্যই দেখে-শুনে আপনাকে রাখলাম।"

আমার সংশয়িত মনের ভুল হইতে পারে, কিন্তু 'রাখলাম' কথাটিতে মীরা যেন বিশেষ একটু ঝোঁক দিল। হয়তো আমারই ভুল, মীরা অত রূঢ় হয় নাই, কিন্তু আমি উত্তর যা দিলাম তা এই ধারণারই বশবর্তী হইয়া। একটু ইতস্ততঃ করিলাম, তাহার পর বলিলাম, "আপনার অনুগ্রহ।"

কথাটার মধ্যে মনের তিক্ততাটা বোধহয় প্রকাশ পাইয়া থাকিবে, যদিও স্পষ্টভাবে রূঢ় হইবার আমারও ইচ্ছা ছিল না। মীরা একবার তাহার সেই তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া লইয়া আবার বেশ সহজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "না, না, অনুগ্রহ কিসের? আমরা উপযুক্ত লোক খুঁজছিলাম, আপনি উপযুক্ত লোক—এতে অনুগ্রহ কি আছে আর? আপনাকে রাখা এ তো নিছক স্বার্থ।"

মীরা কথাটা নরম সুরেই বলিল—একটু যেন অনুশোচনা আছে তাহাতে: আমাকে রাখা বিষয়ে যে দম্ভটুকু প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে সেটুকু যেন সামলাইয়া লইতে চায়। আমিও নরম হইয়া গেলাম। সত্য কথা বলিতে কি—এই নরম হইবার সুযোগটুকু পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। মীরা কি উদ্দেশ্যে ঠিক জানি না—ইচ্ছা করিয়া আমায় ক্ষুণ্ণ করিতেছে; কিন্তু ওর উপর ক্ষুণ্ণ হওয়া যে কত শক্ত আমার পক্ষে তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। আঘাতে-আকর্ষণে মীরা ইহারই মধ্যে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগাইতেছে। তরুর মুখে ও আমার কাজ পরিদর্শন করিতে আসিবে শুনিলে মুখটা বোধহয় অন্ধকার হইয়া যায়; কিন্তু উহারই মধ্যে কেমন করিয়া মনের কোথায় রঙীন বাসনা জাগিয়া থাকে। মীরা যে মূর্তিতেই আসিতে চায়, আসুক, শুধু আসুক ও। আহত পৌরুষের অভিমানে মুখ ভার করিয়া আমি প্রবল আশায় ওর পথ চাহিয়া থাকি। ওকে যতটা চাই না তাহার শতগুণ চাইও আবার। মীরাকে দেখিবার আগে এ অদ্ভুত ধরনের অনুভূতির কখনও সন্ধান পাই নাই নিজের মধ্যে। তাই বলিতেছিলাম নরম হইবার সুযোগ পাইয়া আমি যেন বর্তাইয়া গেলাম।

আমার উত্তরের মধ্যে যে একটা ব্যঙ্গের ইসারা ছিল সেটুকু নিঃশেষে মুছিয়া লইবার জন্য সত্যই কৃতজ্ঞতার স্বরে বলিলাম, "অনুগ্রহ যে নয় এ-কথা কি করে বলি?—আমি উপযুক্ত কি না সে-কথা তো যাচাই করেন নি; এসে দাঁড়িয়েছি, আপনি নিয়োগ করেছেন। আমার যে একটা অভাব ছিল, আমার যে আশ্রয়ের একটা প্রয়োজন ছিল—আমার চেহারার মধ্যে সে-কথাটা নিশ্চয় কোথাও ধরা পড়েছিল, আপনার দৃষ্টি এড়াতে পারে নি। তাই আপনি যাচাই করা দূরে থাকুক 'ভাল করে পরিচয়ও নেন নি আমার; ডেকে নিলেন। অনুগ্রহ নয় তো কি বলব একে।"

এ উচ্ছ্বাসটা দেখাইয়া ভাল করি নাই। অবশ্য, সে-কথাটা অনেক পরে জানিতে পারি, তাহার কারণটাও। মীরা কি একরকম ভাবে, স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া এই স্তুতি শুনিল,—তাহার মুখটা কঠিন হইয়া আসিতে লাগিল এবং একেবারে শেষের দিকে, ধীরে ধীরে তাহার নাসিকার সেই কুঞ্চনটা জাগিয়া উঠিল। কথাটা একেবারে ঘুরাইয়া লইয়া, কতকটা অসংলগ্নভাবেই বলিল, "পড়ছে

কি রকম আপনার ছাত্রী আগে তাই বলুন।"

সঙ্গে সঙ্গেই ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আমি আপনার স্তব শুনতে আসি নি মাস্টারমশাই। এমন কি অসাধারণ কাজ করেছি যে..."

হাসি দিয়া মর্মান্তিক কথাটা বোধহয় নরম করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে মীরা, তবুও আমার গায়ে এমুড়া-ওমুড়া একটা কশাঘাতের মত বাজিল সেটা। মনে হইল সমস্ত শরীরটা একটা অসহ্য জ্বালার সঙ্গে সঙ্গেই যেন একেবারে অসাড় হইয়া গেল, নিজের দীনতার গ্লানি যেন ক্রমাগত ফেনাইয়া ফেনাইয়া উপ্‌চাইয়া পড়িতে লাগিল। ক্ষণমাত্র মীরার চক্ষের পানে চাহিয়া চক্ষু নামাইয়া লইলাম।

তরুও যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে, একবার নিতান্ত কুণ্ঠিত, অপ্রতিভভাবে আমার মুখের উপর করুণ দুইটি চক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তাহলে কোন্‌খানটা পড়ব মাস্টারমশাই?" আমি উত্তর দিবার আগেই আবার মীরাকে প্রশ্ন করিল, "কোন্ পড়াটা শোনাব তোমায় দিদি।"

কোন উত্তর না পাইয়া মাথা নীচু করিয়া মনোযোগের সহিত ওর ইংরাজী রীডারটার পাতা উলটাইতে লাগিল।

ঘরটাতে বায়ু যেন হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে; অসহ্য গুমট একটা। তিনজনে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া আছি। একটু পরে মীরাই আবার গুমট্‌টা ভাঙিল, বরং ভাঙিবার চেষ্টা করিল বলাই ঠিক। কথাটাতে চপল হাস্যের ভাব ফুটাইরার প্রয়াস করিয়া বলিল, "যেটা খুশি পড় না, আমি দুটোতেই পণ্ডিত—যেমন তোমার লক্ষ্মীপাঠশালার শিবস্তোত্র বুঝি, তেমনই তোমার লরেটোর কচকচানি বুঝি; তুমি যেটা বলবে আমায় একই রকম ভাবে ঠকাতে পারবে। নয় কি মাস্টারমশাই?...কিন্তু আজ আমি এখন উঠি, আবার সরমাদিকে কথা দেওয়া আছে—আটটার সময় আসব।" বলিয়া হাতঘড়িটা উলটাইয়া দেখিয়া উঠিয়া পড়িল।

আবার একটু নিস্তব্ধতা আসিয়া পড়িল। কোন মতেই আঘাতের স্মৃতিটা যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। হঠাৎ কি করিয়া এবং কেন ব্যাপারটা এত কটু হইয়া উঠিল তাহাও ভাল করিযা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। একটু পরে তরু আমার ডান হাতটা হঠাৎ জড়াইয়া ধরিয়া আবদারের সুরে বলিল, "একটা কথা বলব মাস্টাবমশাই?"

ক্লিষ্ট কণ্ঠস্বরকে যথাসম্ভব শান্ত করিয়া উত্তর করিলাম "বল!"

"না, আপনি রাগ করবেন, আমার ওপরও, দিদির ওপরও।"

হাসিয়া বলিলাম, "না, করব না, বল!"...এবং এই সুযোগে, তখনই যে-ব্যাপারটা হইল সেটাকে চাপা দেওয়ার জন্য আরও প্রাণখোলাভাবে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "তোমার দিদির ওপর রাগ কেন করতে যাব?... দেখ তো!"

তরুর মুখটাও পরিষ্কার হইয়া গেল, উৎসাহের সহিত বলিল, "ভয়ঙ্কর ভালবাসে দিদি আপনাব লেখাগুলো মাস্টারমশাই। 'মানসী' 'কল্লোল' আরও অন্য অন্য মাসিক পত্র থেকে খুঁজে খুঁজে পড়ে, হ্যাঁ, দেখেছি আমি।"

কৌতূহল হইল; কিন্তু তাহার চেয়ে মুগ্ধ হইলাম বেশি। নারীর মন—উহারা পুরুষের অন্তস্থল পর্যন্ত এক দৃষ্টিতেই দেখিয়া লইতে পারে, হোক না তরুর মত ছোট। আর জোড়াতাড়া দিতেও উহাদের হাত এইটুকু থেকেই দক্ষ। তরু তাহার দিদি আর আমার মধ্যে ভাব করাইয়া লইবার জন্য সদ্যসদ্যই ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, দলিল-দস্তাবেজ হাজির করিতেছে আমার প্রতি ওর দিদির প্রীতির; অর্থাৎ এই মাত্র যা হইল, ওটা কিছু নয়, মীরা আসলে আমার লেখা ভালবাসে—যাহার মানে হয় আমায় ভালবাসে।

হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "সত্যি নাকি?"

তরু চক্ষু দুইটা বড় করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাস্টারমশাই!—দুটো পদ্য আপনার লিখেও নিয়েছে।"

"কিন্তু পেলে কোথা থেকে?"

শান্তি স্থাপনের ঝোঁকে তরু এ-দিকটা ভাবে নাই, ভয়ে ওর হাতটা একটু আলগা হইয়া গেল। তখনই আবার ভাল করিয়া আমার হাতটা জড়াইয়া পাঁজরার কাছে মাথা গুঁজিয়া ধরিল।

বলিলাম, "কি করে পেলে বল তো তোমার দিদি?"

তরু অপরাধীর মত স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "আমি নিয়ে গেছলাম।"

তাহার পর অনুযোগের সুরে বলিল, "দিদিই কিন্তু বলেছিল মাস্টারমশাই।"

আরও একটু মৌন থাকিয়া অনুশোচনার স্বরে বলিল, "আমি কুমারী মা-মেরীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করব'খন মাস্টারমশাই, না বলে নিয়ে যাবার জন্যে আপনার খাতা।...দিদ্দিকে কিন্তু বলবেন না।"

আবার সেই বোধহীনা বালিকা,—উহাদের কন্‌ভেন্টের অভ্যস্ত বুলি আওড়াইতেছে।

সেই রাত্রে, যতদূর মনে পড়ে, আমার জীবনে প্রথম এক অনাস্বাদিতপূর্ব মধুর অশান্তির আস্বাদ পাইলাম।

মীরা প্রথম দিনে আমার সামনে এক দৃপ্তরূপ লইয়া দাঁড়ায়। দ্বিতীয়বার তাহাকে দেখি প্রচ্ছন্নতার অন্তরাল হইতে তাহার মায়ের কাছে সন্তানের হালকা রূপে। কোন্‌টা স্বাভাবিক মীরা জানি না,—হয়তো দুইটা রূপই স্বাভাবিক—নিজের নিজের জায়গায়। কিন্তু মীরা চায় না যে, আমি জানি ওর একটা হালকা দিকও আছে। আজ যে-মীরা আসিয়াছিল সম্রাজ্ঞীর স্পর্ধিত বেশে—তাহার উদ্দেশ্যই ছিল দ্বিতীয় দিনের ছাপটা আমার মন হইতে ভালভাবে মুছিয়া দেওয়া। এক ধরনের আক্রোশ মীরার মনে,—সহজভাবে সে-ছাপটা সরাইতে না পারিয়া, সহজভাবে আক্রোশটা মিটাইতে না পারিয়া মীরা অস্বাভাবিকভাবেই একটু দাম্ভিকতা করিয়া গেছে আমার কাছে।...কিন্তু তাহার পর? মীরার সজ্জায় আড়ম্বর ছিল কেন? ঐ ছাপ মিটাইবার জন্য, না আরও কিছু?—এই প্রশ্নই সে-রাত্রে কত স্বপ্নজাল বিস্তার করিয়া ছিল। মীরা বাহিরে যাইবার জন্য সাজে নাই আমাদের ঘর হইতে গিয়া সে যায় নাই কোথাও। যদি ধরা যায় সাজিয়াছিল বাহিরের জন্যই, কিন্তু গেল না কেন তবে? আমায় আঘাত করিতে আসিয়া সে নিজেই আহত হইয়া গেছে—নিজের অস্ত্রেই? যদি তাই হয়? স্বপ্নের জাল যেন আরও সূক্ষ্ম হইয়া, আরও জটিল হইয়া উঠে।...আর সর্বোপরি তরুর সংবাদ—মীরা আমার লেখার পক্ষপাতী,—আমার দুইটি পদ্য—আমার অন্তরের দুইটি রঙিন বাণী মীরার সঞ্চয়ের খাতায় অমরত্ব লাভ করিয়াছে...তরু সেদিন বলিয়াছিল মীরা কবিদের ভালোবাসে,—মীরা সমর্থন করিয়াছিল এই বলিয়া সে কবিদের দু'চোখে দেখিতে পারে না।

এই মীরাই আবার আজ আমায় আঘাত দিয়াছে—সূক্ষ্ম কিন্তু অমোঘ।

জীবনে এক নূতন আলো;—অপরূপ তৃপ্তি, তাহারই পাশে কিন্তু গাঢ় ছায়া সুতীব্র বেদনা।

১০

দিন চারেক পরে মিস্টার রায় আসিলেন; আমি—আসিবার ঠিক সতের দিনের দিন।

আমি আমার ঘরে বসিয়াছিলাম। ইমানুল রাজু বেয়ারার অনুপস্থিতির সুযোগ পাইয়া আমার ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। হাতে একখানি পোস্টকার্ড, তাহাকে চিঠি লিখিয়া দিতে হইবে।—ইমানুলের পরিচয় আরও একটু পাইলাম আজ। রাঁচির দুই স্টেশন এদিকে জোনহা, সেইখানে নামিয়াই ইমানুলের বাড়ি যাইতে হয়, দুইটা পাহাড় ডিঙাইয়া। স্টেশন হইতে মাইল-দেড়েক দূরে জোন্‌হার জলপ্রপাত, ওদিককার একটা দ্রষ্টব্য বিষয়। রাঁচি হইতে মোটরে বা রেলযোগে প্রায়ই লোক দল বাঁধিয়া প্রপাত দেখিতে আসে, গাইড বা কুলি হিসাবে স্থানীয় লোকেরা এই থেকে কিছু কিছু উপার্জন করে, বিশেষ

করিয়া যখন জোন্‌হা দর্শনের মরসুম, অর্থাৎ পূজার সময় হইতে শীতের খানিকটা পর্যন্ত। কতকটা এই সাময়িক উপার্জন আর কতকটা সামান্য একটু চাষ-আবাদ—এই লইয়া ইমানুলের চলিয়া যাইতেছিল। বাড়িতে বড় ভাই, ভাজ আর তাহাদের দুইটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। বড় ভাই ক্ষেত-আবাদের দিকটায় নজর রাখে।

জোন্‌হার কাছে কি উপলক্ষ্যে একটা বড় মেলা বসে, লোক হয় বিস্তর, কিছু পাদ্রীরও আমদানি হয়। একদিন রেভারেণ্ড চাইল্ড গাড়ি হইতে নামিল, সঙ্গে একজন ওদেশী সহযোগী ও একটা পুস্তকের গাঁঠরি—মেলায় বিলি করিবার জন্য। মেলায় গাঁঠরিটা পৌছাইয়া দিবার জন্য ইমানুলকেই কুলি নিযুক্ত করিল সাহেব। সেই দিন পাদ্রী সাহেবের বক্তৃতায় যীশুর করুণার কথা ইমানুল ভাল করিয়া শুনিল। স্টেশনে ফেরত আসিবার সময় সাহেব যীশুর কথা আরও বলিল, খ্রীষ্টধর্মের গৌরব আর সমদর্শিতার কথা বলিল এবং ইমানুলের ঝোঁক দেখিয়া তাহাকে একটা টাকা দিয়া বলিল—সে যেন শীঘ্রই একদিন তাহাদের মিশনে আসে, সমস্ত ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিতে পাইবে।

মিশনে আসিয়া ইমানুল আর যা দেখিল, তা দেখিল, একটি দেখিবার মোহ তাহাকে একেবারে পাইয়া বসিল। নূতন ধর্মের চক্ষু-ঝলসানো আলোয় ইমানুলের নজর সব চেয়ে বেশি করিয়া পড়িল মিস ফ্লোরেন্স চাইল্ডের উপর। মেয়েটি রেভারেণ্ড চাইল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী, বাপ-মা নাই।...ইমানুল যখন কাহিনীটা বিবৃত করিতেছিল আমার অত্যন্ত অদ্ভুত ঠেকিতেছিল,—অত উঁচুতে দৃষ্টিক্ষেপ কি করিয়া করিতে পারিল ইমানুল। মাথায় ছিট আছে একটু নিশ্চয়, তবুও একেবারে পাগল না হইলে সম্ভব হয় কি করিয়া?

কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলাম অদ্ভুত হইলেও আশ্চর্য কি এমন? চোখে লাগা চোখের ব্যাপার, —তাহার সঙ্গে নিজের গায়ের রঙ আর মুখের কাঠামোর কি সম্বন্ধ? যে দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে তেমনই করিয়া আকর্ষণ করে; নিজের পানে চাহিয়া দেখিবার কি ফুরসত দেয়? ইমানুলের বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে তখন আবার সাম্যের মোহ—সাম্যের অর্থই তো আকাশে মাটিতে মিতালি। একদিকে থাকিবে কদর্য ওরাঁও যুবক, আর অপর দিকে থাকিবে দেবকন্যার মত তরুণী ফ্লোরেন্স, তবেই তো সাম্যের কথা উঠিবে।

আরও আছে। শুধু গায়ের চামড়া আর মুখের কাঠামোই কি সব? ভালবাসার মূল সেখানে, সেখানে তো সেই একই রাঙা রক্তের তরঙ্গ দুলিতেছে।

ভেদাভেদ-জ্ঞানের সঙ্গে দ্বিধা আশঙ্কাও গেছে,—ইমানুল কথাটা বোধ হয় স্বয়ং ফাদার চাইল্ডকে বলিত; বর্বরেরা চিন্তা আর বাক্যের মধ্যে অবসর রাখিতে জানে না। তবে ইতিমধ্যে ফাদার চাইল্ডের সহযোগী ন্যাথেনিয়াল কথাটা টের পাইল। লোকটা খুব ধূর্ত এবং অভিজ্ঞ, যাহাকে বলা যায় পাকা খেলোয়াড়। জানে যে যাহারা খ্রীস্টান হয় তাহারা সব সময় ত্রাণকর্তা যীশুর আহ্বানে সাড়া দিয়া আসে না,—বরং অধিকাংশ সময়েই নয়। অবশ্য ইমানুলেব এ-ব্যাপারটা একটু বাড়াবাড়ি, একেবারে চাঁদে হাত বাড়ানো। কিন্তু সে কথাটা বাড়িতে দিল না। খলিফা লোক, যেমন বাড়িতে দিল না, তেমনই আবার নিরুৎসাহও করিল না; বলিল, "এটা এমন কিছু বেশি কথা নয়। তুমি পাবে, তবে সময় নেবে একটু। আগে কিছু উপার্জন কর, কিছু সঞ্চয় কর; তারপর আমি যথাসমযে ফাদার চাইল্ডের কাছে কথাটা ভাঙব। ইতিমধ্যে আমি তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

ইমানুল দীক্ষিত হইবার কয়েকদিন পরে, চাইল্ড-সাহেবকে বলিয়া-কহিয়া কলিকাতায় তাঁহার এক ব্যবসাদার বন্ধুর নিকটে ইমানুলের মালীগিরির চাকরি জোগাড় করিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিল। বলিল, "এবার গিয়ে তুমি মাসে মাসে টাকা জোগাড় করতে থাক ইমানুল, আমি এদিকে পথ পরিষ্কার করতে থাকি। তুমি শুধু আমায় মাঝে মাঝে চিঠি দিতে থেক এবং দয়াময় যীশুর কাছে খুব প্রার্থনা করতে থেক।...পাবে বৈকি মিস ফ্লোরেন্সকে, তবে সময় নেবে।"

ন্যাথেনিয়াল জানিত সভ্য জীবনকে একটু ভাল করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইলেই এই বন্য

ওরাঁওয়ের মোহ ভাঙিবে, তাহার পূর্বে নয়।

ইমানুল কলিকাতায় আসিল এবং চাকরি ও প্রার্থনা শুরু করিয়া দিল। এমনই রোজ প্রার্থনা করিত নিজের ঘরে, তাহার পর প্রথম রবিবার আসিতেই পাদ্রীর দেওয়া অতিরিক্ত বড় কোট-প্যান্ট পরিয়া সাহেব-পরিবারের সঙ্গে গির্জায় যাইবার জন্য তাহাদের সঙ্গ লয়। ফলে সেইদিন তাহার দুইটি জিনিস ঘুচিয়া যায়—চাকরি আর সাম্যের মোহ। তাহার পর এখানে চাকরি করিতেছে। এখানেও প্রায় বছর-চারেক হইল।

আমি বলিলাম, "ইমানুল, তবুও রাজা-লাটসাহেবের ধরম সম্বন্ধে তোমার মোহটা গেল না?"

ইমানুল দাঁত বাহির করিয়া হাসিল, বলিল, "সাহেব আমীর মাস্টার-বাবু, ওদের কথা যেতে দিন, ত্রাণকর্তা যীশু বলেছেন, একটা ছুঁচের ছেঁদার অন্দর দিয়ে একটা উট গলে যেতে পারে, কিন্তু একজন আমীর লোক স্বর্গে যেতে পারে না। কিন্তু ফাদার-চাইল্ড অন্য রকম লোক আছেন, তিনি ত্রাণকর্তা, যীশুর মতন, কাউকে নীচু দেখেন না। আপনি দিন লিখে বাবু নাথুকে। লিখুন, 'ভাই ন্যাথেনিয়াল পুরীনকে ইমানুল রোমানের হাজার হাজার সেলাম পৌঁছে'—ইংরিজীতেই লিখবেন বাবু, নাথু ইংরিজি জানে—পড়ে, এর আগের সব খাত নাথু ভাইকে জানিয়েছি, কিন্তু এখনতক কোন জবাব না পাওয়ায় মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি..."

আমি একটু বিস্ময়ের সহিত চাহিতেই ইমানুল কুণ্ঠিতভাবে হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, 'মর্মান্তিক দুশ্চিন্তা' লব্‌জটা নিশ্চয়ই লিখে দেবেন মাস্টারবাবু, ইংরিজীতে—ক্লীনার মদন শিখিয়ে দিয়েছে খুব জোর আছে লব্‌জটাতে। মদন আপন ইস্তিরিকে হরেক চিঠিতে লেখে—'মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি'—খুব জলদি জবাব এসে পড়ে। লিখে দিন—মর্মান্তিক দুশ্চিন্তায় আছি। ইংরিজীতে আরও ওজনদার হবে লব্‌জটা—হেঁ বাবু..."

এমন সময় গেটের বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিয়া উঠিল। মর্মান্তিক দুশ্চিন্তা, আর পোস্টকার্ড ভুলিয়া ইমানুল গেট খুলিতে ছুটিয়া গেল।

একটু পরেই মীরার সঙ্গে মিস্টার রায় গাড়ি হইতে নামিলেন।

আমি বাহির হইয়া গাড়ি-বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম, অভিবাদন করিতে মীরা সংক্ষেপে পরিচয় দিল—"তরুর নতুন টিউটর—শৈলেনবাবু।"

মিস্টার রায়—"দ্যাটস্ অল্ রাইট!" (That's all right!) বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু শিরশ্চালন করিলেন, তাহার পর পিতা পুত্রীতে উপরে উঠিয়া গেলেন।

আমার মনটা অত্যন্ত ছোট হইয়া গেল। ভীত, ক্ষুণ্নমনে হাজার রকম অশুভ কল্পনা করিতে করিতে আমি ঘরের মধ্যে গিয়া একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম।

কারণ ছিল। মিস্টার রায় যেন কল্পনার মধ্য হইতে মূর্তি লইয়া নামিয়া আসিয়াছেন,—আমার বিভীষিকার ধ্যানমূর্তি। সেই বাঁকা টিকলো নাক, সেই ঈষৎ কোটরগত তীক্ষ্ণ চক্ষু, সেই কপাল, সেই মোটাঘন ভ্রূ, বর্তুল চিবুক। মনটা আমার একটা অহেতুক অস্বাচ্ছন্দ্যে যেন নিজের মধ্যেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল। কল্পিত চেহারার সঙ্গে এ মিলটা আমার একেবারেই ভাল লাগিল না, কেন না এ-রকম মিল কখনও হয় না। কেবলই মনে হইতে লাগিল—ইহার পিছনে একটা দৈব অভিসন্ধি আছে।

আমার জীবনে আর একবার মাত্র এইরূপ রহস্যময় মিলের অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহার স্মৃতি এখনও আমার মনটাকে চঞ্চল করিয়া তোলে। খুব ছোটবেলায় একবার আমাদের বাংলা স্কুলে থার্ড মাস্টারের পদ খালি হয়। হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখিলাম নূতন থার্ড মাস্টার একজন আসিয়াছেন;—মাথায় টাক, মোটা গোঁফ, সূঁচাল দাড়ি, সবল চেহারা। আসিয়াই প্রথমে হেডমাস্টারকে চেয়ারসুদ্ধ তুলিয়া আছাড় দিলেন—ছেলেদের না ঠেঙাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার জন্য। সেকেণ্ড মাস্টার আগন্তুককে নমস্কার করিবার জন্য সহাস্য মুখে হাত তুলিতে যাইতেছিলেন, আকস্মিক বিপদ দেখিয়া

ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া পড়িলেন। নূতন মাস্টার তাঁহাকে তাড়া করিয়া রাস্তা পর্যন্ত দিয়া আসিলেন, তাহার পর সেই অভিভাবনহীন স্কুলে ঢুকিয়া আমাদের মার। সে যে কি মার, স্বপ্ন হইলেও এখনও গাঁয়ে কাঁটা দিয়া ওঠে! যখন ভাঙিল স্বপ্ন, দেখি ঘামিয়া নাহিয়া গিয়াছি।

পরের দিন সত্যই থার্ড মাস্টার আসিলেন,—সেই টাক, সেই গোঁফ, সেই সূঁচাল দাড়ি, সেই চেহারা। প্রথম দিনই আমাদের ক্লাসের বলাইয়ের ঘাড়ে মার পড়িল। তেমন বিশেষ দোষ ছিল না; কিন্তু থার্ড মাস্টার বলিলেন, "আজ ভাল দিন দেখে কাজে জয়েন করেছি, বৌনিটা সেরে রাখলাম। তোমাদেরও সুবিধে হল, হেডমাস্টারের মত আমার কাছে মামার বাড়ির আবদার খাটবে না, এটা জেনে রাখলে।"

তাহার পরদিন থেকেই মার আরম্ভ হইল। সে যে কি উৎকট অমানুষিক প্রহার!—পাঁচ দিনের মধ্যে সাতটা ছেলে বিছানা লইল। অবশ্য হেডমাস্টারকে মারেন নাই—স্বপ্নে একটু বাড়াবাড়িই হয়—তবে আমাদের পড়াইয়া অর্থাৎ প্রহার করিয়া যে সময়টা বাঁচিত সেটা মাস্টারদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়াই কাটাইতেন। এগারটি দিন ছিলেন, তাহার পর স্কুল কমিটির বিশেষ অধিবেশন করিয়া তাঁহাকে সরানো হইল। যাইবার দিন একটু অনুতপ্ত গোছের হইয়াছিলেন, হেডমাস্টার প্রভৃতিকে বলিলেন, "দুঃখু রইল—আমাদের পরস্পর ভাল করিয়া পরিচয়ই হইল না ঃ ফুরসত পেলাম কই?"

তাহার পর কল্পনা আর বাস্তবে আশ্চর্য এই মিল দেখিলাম। পূর্বেই বলিয়াছি মন বড়ই বিমর্ষ হইয়া রহিল এবং সমস্ত দিন আমি মিস্টার রায়ের দৃষ্টি এড়াইয়া কাটাইলাম বলা বাহুল্য, এই স্নিগ্ধ পরিবারের সঙ্গে পক্ষাধিক কাল কাটাইয়া আমার যে একটা অহেতুক এবং অস্বাভাবিক ব্যারিস্টার-ভীতি ছিল সেটা অনেকটা অপসারিত হইয়া আসিয়াছিল, বুঝিতে পারিতেছিলাম একটু বড় মহলে কখনও যাতায়াত না থাকার দরুনই বড়দের সম্বন্ধে আমার একটা অপরিচয়ের আতঙ্ক থাকিয়া গিয়াছিল, এ এক ধরনের হীনমন্যতা—ব্যারিস্টারভীতি তাহারই একটা উগ্র রূপ। বেশ কাটাইয়া উঠিতেছিলাম দুর্বলতাটুকু, সব ভণ্ডুল করিয়া দিল কাল্পনিক আব বাস্তব ব্যারিস্টারের এই কল্পনাতীত মিল। অবশ্য ভয় আর কিছু নয়। মিস্টার রায় যে খুব একটা অভদ্র রকম কিছু করিবেন এমন নয়, তবে ব্যারিস্টারিপদ্ধতিতে খুব কড়া জেরায় ফেলিয়া আমায় ভদ্রভাবে অপদস্থ করিতে পারেন; আমার চাকরির মধ্যেই তাঁহার জেরার প্রচুর মালমশলা রহিয়াছে।—এত বেশি মাহিনার টুইশ্যনি যে লইয়া বসিয়া আছি কি বিশেষ যোগ্যতা আমার? তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া এক অনভিজ্ঞা বালিকাকে কি এমন বুঝাইয়াছি যে, সে নির্বিচারে নিয়োগ কবিয়া ফেলিল? গৃহকর্তা বাড়ি নাই দেখিয়াও আমি কয়েকটা দিন অপেক্ষা করিলাম না কেন?

কতকটা আড়ালে আড়ালেই কাটাইলাম এবং বৈকালে তরুকে লইয়া যখন বেড়াইতে গেলাম খুব সন্তর্পণে ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া প্রশ্ন করিলাম—মিস্টার রায় আমার সম্বন্ধে কোন প্রশ্নাদি করিয়াছেন কিনা। তরু বলিল—"কিচ্ছু না"...এ উত্তর নিশ্চিন্ত হইবার কথা, কিন্তু আমি আরও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। তখন মনে হইল লোকটা কিছু একটা মতলব আঁটিয়া স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। একটা নূতন লোক বাড়িতে আসিয়াছে, তাহাকে দেখিলও অথচ তাহার সম্বন্ধে না রাম না গঙ্গা—কিছুই বলে না, এ তো ভাল লক্ষণ নয়।

আহারের সময় আবার সাক্ষাৎ হইল। রাজু বেয়ারা আসিয়া বলিল, "ওঁরা ডাইনিং রুমে এসেছেন, সায়েব আপনাকে ডাকছেন।...সায়েব ভয়ঙ্কর খাপ্পা হয়েছেন মাস্টার-মশা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন রে?"

"গভর্ণমেণ্ট বলছে—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরি দিল্লীতে নিয়ে যাবে।"

আশ্বস্ত হইলাম—রাজুর সেই পাকামি! তাহার পিছনে পিছনে গিয়া ডাইনিং রুমে প্রবেশ করিলাম এবং মিস্টার রায়কে নমস্কার করিয়া নিজের চেয়ারের পিছনে দাঁড়াইলাম।

মিস্টার রায় সত্যই কি একটা লইয়া উত্তেজিতভাবে কথা কহিতেছিলেন, আমি দাঁড়াইতেই

আমার পানে চাহিয়া স্মিত হাস্যের সহিত বলিলেন, "আই সী! (I see) তুমিই তরু-মার টিউটর হয়েছ? দাঁড়াও একটু দেখি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বাঃ, তোমরা সবাই খেতে বসেছ, আর ও বেচারি চেয়ার কোলে করে দাঁড়িয়ে থাকবে, তুমি ব'স শৈলেন।"

মিস্টার রায় অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "O, sorry, I didn't mean that! (না, তা বলবার উদ্দেশ্য নয় আমার)—তোমায় দাঁড়িয়ে থাকতে বলব কেন ব'স ব'স...মিলিয়ে দেখছিলাম মীরা-মা তোমার যেমনটি বর্ণনা করে লিখেছিল আমায়, ঠিক সেই রকমটি তুমি—exactly, মীরা লিখেছিল..."

মীরা যেন প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার চেষ্টায় বলিল, "বাবা পদ্মার কথা ছেড়ে দিলে কেন? মাস্টারমশাইও নিশ্চয় শোনার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছেন।" যাহাতে আমি ব্যস্ত হইয়া উঠি সেজন্য আমার পানে কতকটা প্রত্যাশা ও মিনতির দৃষ্টিতে চাহিল।

বলা বাহুল্য, মীরা কি লিখিয়াছিল সেইটুকু শুনিবার জন্যই আমি উৎকর্ণ হইয়া উঠিয়াছি, তবু আগ্রহের অভিনয় করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "পদ্মার কথা হচ্ছিল নাকি? তাহ'লে তো..."

মিস্টার রায় বলিলেন, "পদ্মার কথা বলব বই কি, না বললে আমার আহার পরিপাক হবে না; She is sublime (পদ্মা মহিমাময়ী)...হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ঠিক কথা—মীরা-মা লিখেছিল—You are too grave for your age, তা সত্যিই তুমি বয়সের অনুপাতে বেশি ভারিক্কে—if I am any judge of physiognomy (আকৃতি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যদি আমার বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকে)...মীরা-মাঈ, কত বয়স লিখেছিলে মাস্টারমশাইয়ের?"

অবাধ্যভাবেই আমার দৃষ্টি একবার টেবিলের চারিদিকে ঘুরিয়া গেল—সকলে যেন কাঠ মারিয়া গিয়াছে। শুধু তরু তাহার শৈশবসুলভ অভিজ্ঞতায় কিছু কৌতুকের আভাস পাইয়া একবার এর, একবার ওর মুখের পানে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতেছে।

সামলাইল মীরাই, উপস্থিত-বুদ্ধি তাহারই বেশি, সামলাইলও, আবার সুযোগ পাইয়া আমার গাম্ভীর্যকে ব্যঙ্গও করিল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন লিখে থাকব বোধ হয়, ঠিক মনে পড়ছে না।"

মিস্টার রায় হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, "O no, you naughty girl ! He is hardly twenty-four—বাইশ-তেইশের বেশি হতেই পারে না। Yes, let me see...(থামো দেখি) না, তুমি আমায় বয়সের কথা লেখইনি মীরা,—না লেখনি—রয়েছে চিঠি আমার কাছে। লিখেছ লোক ভাল, লিখেছ সাহিত্যিক—মানে তরুকে ওদিকে ট্রেনিং দিতে পারবেন—অর্থাৎ তোমার সিলেক্‌শ্যন যাতে আমি রদ না করে দিই সেই জন্যই বোধ হয় আর সব কথাই লিখেছ ওঁর সম্বন্ধে, কিছু বয়সের কথা...'

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে হাসিতে মীরার নমিত মুখের দিকে চাহিয়া তিনি মাঝপথেই থামিয়া গেলেন। অপর্ণা দেবী এই সময় মুখটা একটু নীচু করিয়া ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "লেখেনি নিশ্চয় বয়সের কথা।"

মাথা নীচু করিয়া থাকিলেও বেশ বুঝিলাম, কথাটুকু বলিবার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী স্বামীর দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিয়াছে। মিস্টার রায় সঙ্গে সঙ্গে চিঠির প্রসঙ্গটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া নির্বাকভাবে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রায় মিনিট পাঁচেক শুধু সবার কাঁটা-চামচ-প্লেটের ঠোকাঠুকিতে শব্দ শোনা যাইতে লাগিল,—মাঝে মাঝে শুধু এক-একবার মিস্টার রায়ের—"I see...হু বুঝেছি।" একবার বোধ হয় উপরে উপরেই অপর্ণা দেবীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"ঠিক বলেছ তুমি, Yes, you are right...ভুল হয়েছে..."

সামলাইতে যাইয়া যে আরও বেসামাল করিয়া ফেলিতেছেন সেদিকে হুঁশ নাই।

খানিকক্ষণ পরে কথাবার্তা আবার স্বাভাবিক ধারায় প্রবর্তিত হইল। কুমিল্লার কথা, আট ঘণ্টা পদ্মার উপর স্টিমার-যাত্রার কথা, তরুর লেখাপড়ার কথা, মল্লিকদের বাড়িতে পার্টির কথা। মীরা আর অপর্ণা দেবী সাবধানে প্রসঙ্গটা ঠিকপথে চালিত করিয়া রাখিলেন। তবু মিস্টার রায় তরুর পড়িবার আলোচনায় শেষের দিকটায় আবার একটা বেফাঁস করিয়া ফেলিলেন, বলিলেন, "আমার আইডিয়া ছিল বেশ একজন বয়স্ক দেখে টিউটর ঠিক করা; তোমায় সে-কথা বলেছিলাম কি কখনও মীরা-মাঈ?"

মীরা আবার রাঙিয়া বলিল, "কই, না তো বাবা!"

অপর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "হয়েছে খাওয়া, এইবার তাহলে ওঠ তোমরা; তুমি আবার রাত জেগে আছ।"

উঠিয়া হাত মুছিতে মুছিতে মিস্টার রায় কতকটা চিন্তিতভাবে আপন মনেই বলিলেন, "তাহলে বলিনি। আর ভালই হয়েছে—যারা ছোট, অল্প বয়স, তাদের চোখের সামনে সর্বদা আমাদের মত বুড়ো একজন থাকা ভাল কি-না সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে—তাতে তারাও বুড়িয়ে যেতে পারে..."

কথা শেষ হইবার আগেই যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা সে-ই প্রথমে পর্দা ঠেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

১১

রায়-পরিবারের সঙ্গে দিন দিন বেশ ভাল করিয়া মিশ খাইয়া যাইতেছি। আর সবাই চমৎকার, এক আশঙ্কা ছিল ব্যারিস্টার রায়ের সম্বন্ধে, দেখিতেছি তাঁহার মত অমায়িক লোক অল্পই দেখা যায়। বরং বলা চলে তিনি একদিক দিয়া আমায় নিরাশ করিয়াছেন কেন না যে-জিনিসটা সম্বন্ধে একটা উৎকট রকম ধারণা গড়িয়া রাখিয়াছি, যদি দেখা যায় যে, সেটা উৎকট হইবার ধার দিয়াও গেল না তো মনে এক ধরনের নৈরাশ্য আসে। মনটা যেন উৎকটকে গ্রহণ করিবার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিয়া রাখে, তাহার পর দেখে তাহার কষ্ট করিয়া অত তোড়জোড় করাই বৃথা হইয়াছে। আমার তো মস্ত বড় একটা উপকার করিয়াছেন, একটা পেশা সম্বন্ধেই আমার ভ্রান্ত ধারণা একেবারে দূর করিয়া দিয়াছেন। আমার আদর্শ ব্যারিস্টারের চেহারাওলা লোকই যখন এই রকম তখন আর কোন দ্বিধা সন্দেহই নাই আমার ও-সম্প্রদায় সম্বন্ধে। এখন এমন একটা অদ্ভুত ধারণা এককালে ছিল বলিয়া নিজের পানেই বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহি মাঝে মাঝে।

তরুর পড়াশুনা চলিতেছে। ওকে এইভাবে যে কি করা হইবে কিছু বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অন্তত এই দোটানার মধ্যে ওর শিশু-মন বিভ্রান্ত এবং কখন কখন সেই বিভ্রমের জন্যই শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এটা বেশ বুঝা যায়। একদিন লরেটো থেকে আসিয়াই সোজা আমার ঘরে উপস্থিত হইল এবং বইয়ের স্যাচেলটা আমার বিছানার উপর ফেলিয়া দিয়া একেবারে আমার কোলে মুখ গুঁজিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রশ্ন করায় ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "আমি আর যাব না লরেটোয় মাস্টারমশাই, কখনও যাব না আমি।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন বল তো, কি হল?"

"না, ওদের মেয়েরা গালাগাল দেয় আমাদের শিবঠাকুরকে, বলে, 'He is a mad snake-charmer' (পাগলা-সাপুড়ে)। আমি বলেছি তাদের—'I will ask him to curse you' (আমি তাঁকে বলব তোমাদের শাপ দিতে) শাপ দিয়ে দেবেন'খন সবাইকে ভস্ম করবে। কিন্তু আমি যাব না ওদের স্কুলে, মাস্টারমশাই..."

তাহার পরদিন লক্ষ্মীপাঠশালা হইতে দশটার সময় আসিল বেশ প্রফুল্লভাবে। মোটর থেকে নামিয়াই আমার ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন কতকটা বিজয়োল্লাসে প্রশ্ন করিল, "মাস্টারমশাই ইম্যাকুলেট্ কন্‌সেপ্‌শ্যন্ কি সম্ভব?"

আমি লিখিতেছিলাম, স্তম্ভিতভাবে ঘুরিয়া ওর মুখের দিকে চাহিয়া একটু কড়াভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "কে শেখালে তোমায় এ কথা তরু?"

আমার ভাবগতিক দেখিয়া তরু একেবারে হতভম্ব হইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তাহার পর একেবারে ভগ্নস্বরে আমতা-আমতা করিয়া বলিল, "না, কেউ বলেনি আমায়...ওদের জিজ্ঞেস করতে বলে দিয়েছে...!"

কথাটা বুঝিলাম, লক্ষ্মীপাঠশালায় গিয়া শিবনিন্দার কথা প্রচার করায় এই ফলটি দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয় কোন অগ্রণী বয়স্থা ছাত্রী প্রশ্নের আকারে এই পালটা জবাব প্রেরণ করিতেছে; ব্যাপার দাঁড়াইতেছে কবির লড়াইয়ের মত। তরুর আবার যাহাতে বেশি কৌতূহল উদ্রেক না হয় সেই উদ্দেশ্যে বলিলাম, "ও-কথা বললে ওদের ঠাকুরকেও পাগল বলা হয় তরু, তাই তোমায় কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেটা কি তোমার বলা উচিত? ধর্ম নিয়ে কারুর মনে কষ্ট দিতে আছে?"

তরু লক্ষ্মী মেয়ের মতই উত্তর করিল, "না মাস্টারমশাই; তা ভিন্ন মহাদেব তো শুধু আমাদের ঠাকুর, ক্রাইস্ট যীশু ওদের, আমাদের—সব্বারই ত্রাণকর্তা। মহাদেব ত্রিশূল নিয়ে অন্যদের মারেন, ক্রাইস্ট তো নিজেই ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন।"

এও এক জগাখিঁচুড়ি হইয়া যাইতেছে, লরেটোর শেখানো বুলি লক্ষ্মীপাঠশালার বর্ম ভেদ করিয়া শিশু হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

এ-কথা সেদিন মিস্টার রায়কে বলিলাম। আহারেব পর উনি গিয়া একটি ঘরে একটু একান্তে বসেন। ওঁর শখের আলোচনা জ্যোতির্বিজ্ঞান,—সেই সময় কখন কখন গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই লইয়া ব্যাপৃত থাকেন। ওই সময়টিতে ওঁর একটু পানের অভ্যাস আছে। দু'এক পেগের পর ওঁর অমায়িক মনটা আরও উদার হইয়া পড়ে। ইহার মধ্যে আমায় দুই-একদিন ডাকিয়া কিছু এদিক-ওদিক আলোচনাও করিয়াছেন। আজ আমার কথাটা শুনিয়া অনেক কথাই বলিলেন, বেশির ভাগই ওঁদের দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে। স্বীকার করিলেন, ওঁর ওই উগ্র পাশ্চাত্য ভাবের দ্বারা উনি অর্পণা দেবীর জীবন ব্যর্থ করিয়াছেন, পুত্রের দিক দিয়া তো বটেই, বোধ হয় মীরার দিক দিয়াও। এখন তরুকে লইয়া আসলে একটা পরীক্ষা চলিতেছে। মিস্টার রায়ের মত, তাঁহার সন্তানেরা তাহাদের মায়ের দিকে না গিয়া তাহাদের বাপের দিকেই গিয়াছে অর্থাৎ বাপের মারফত পাশ্চাত্য ভাবটা তাহাদের মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে একেবারে। এই যদি তাহাদের প্রকৃতি তো সে-প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া সুফলপ্রদ হইবে না। তাই নমনীয় অবস্থাতেই তরুর উপব দিয়া প্রাচ্য পাশ্চাত্য দুইটি ধারার পরীক্ষা চলিতেছে। তরু শেষ পর্যন্ত বোধ হয় মাযের দিকে যাইবে। মিস্টার রায় বলিলেন, "I am hoping, Sailen, I may give at least one of our children to their Poor mother" (শৈলেন, আমার আশা, আমাদের অন্তত একটি সন্তান ওদের মার হাতে দিতে পারব)।

মিস্টার রায় পেগটা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে একটু চুমুক দিলেন, তাহার পর রাখিয়া দিয়া বলিলেন, "শৈলেন, অথচ এই পাশ্চাত্য ভাবের জন্য দায়ী ওদের মা-ই, অপর্ণা।" আমি নীরব প্রশ্নের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। মিস্টার রায় মাথাটা নাড়িয়া একটু জোরের সহিতই বলিলেন, "Yes Aparna, Except for her saree you could not know her from a European girl in those days" (শাড়ি না থাকলে সে-যুগে ইউরোপীয় মেয়ের সঙ্গে ওর কোন পার্থক্যই ধরা যেত না)। কলেজের প্রথম ছাত্রী,—ডিবেটে বল, টেনিসে বল, স্টাইলে বল ও ইংরেজ ছাত্রীদেরও পেছনে ফেলে যেত। আমি তখন বিলেতে, পুরোপুরি ওরই উপযোগী হবার জন্যে পাশ্চাত্য ধরন-ধারণে কত যত্নে কত ব্যয়ে হাত পাকালাম, তারপর যখন আমি তোয়ের, the miracle came

(বিস্ময়কর ব্যাপারটা ঘটল); ওর প্রতিভা দেখে ওকেও বিলেতে পাঠাবার কথাবার্তা বহুদিন থেকে চলছিল—সে-যুগে একটা দুঃসাহসের ব্যাপার। কথা ঠিক-ঠাক, নেক্স্ট স্টীমারেই অপর্ণা বিলেতে আসছে, কেম্ব্রিজে ভর্তি হবে, ভারতীয় মেয়ের প্রতিভা দেখিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে, হঠাৎ 'কেবল' পেলাম—অপর্ণা আসছে না। পাছে শক পাই আসল কথাটা কেউ আর আমায় খুলে জানালে না। বিলেত থেকে আমি একেবারে full fledged সায়েব হয়ে ফিরলাম and then I had the shock of my life (জীবনের সবচেয়ে মোক্ষম আঘাতটা পেলাম)। Where was the Aparna of my dreams? (আমার স্বপ্নের সে অপর্ণা কোথায়?) দেখলাম শাড়ি-সিঁদুর-শাঁখা-আলতায় এক ভট্চায-গিন্নী সামনে উপস্থিত)।"

মিস্টার রায় রসিকতাটুকু হাসিতে হাসিতে করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কত বৎসর পূর্বের কথা হইলেও হাসিটুকুতে সেদিনের সেই নৈরাশ্যটুকু লাগিয়া আছে। পেগে আর এক চুমুক দিলেন, তাহার পর পাত্রটা টেবিলে নামাইয়া রাখিয়া কৌচে হেলিয়া পড়িয়া ছাদেব দিকে খানিকটা একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন—যেন কালের ব্যবধান ভেদ কবিয়া কত দূরে গিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে তাঁহার। একটু পরে ধীরে ধীরে দৃষ্টি নামাইয়া কতকটা-যেন আত্মগতভাবেই বলিলেন, "পরিবর্তনটা টের পেলেও যে আমি অপর্ণাকে ছাড়তে পারতাম এমন নয়—I was over head and ears in love with her" (আমি ওর প্রেমে একেবারে নিমজ্জিত হয়ে গিয়েছিলাম)।

একটু থামিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন "She is a wonderful girl, believe me Sailen" (বিশ্বাস কর, আশ্চর্য মেয়ে অপর্ণা)।

মিস্টার রায স্মৃতিব আলোড়নে ভাবাতুর হইয়া পড়িয়াছেন। আমারও কিছু একটা বলা দরকাব এখানে, প্রাণের অন্তবতম কথাটাই আপনি বাহিব হইযা আসিল, বলিলাম, "আমি ওঁকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করি।"

মিস্টার রায সেইরকম আবিষ্টভাবেই আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "And she desrves" (তাব যোগ্যও সে)। তাহাব পর অকস্মাৎ আলোচনাব মোড ফিরাইয়া প্রশ্ন কবিযা উঠিলেন, "Bye the bye, মীরাকে তোমাব কি বকম বোধ হচ্ছে?"

আমি একবারে নির্বাক হইয়া গেলাম। মিস্টাব রায় সাধারণ কৌতূহলেই বোধ হয় কথাটা জিজ্ঞাসা করিযাছেন, আমার মনে যে কোথায় ঘা দিলেন তাহার খোঁজ রাখেন নাই, তবু আমি বেশ নিষ্কম্প কণ্ঠে উত্তর দিতে পারিলাম না, একটু আমতা-আমতা করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে...মীরা দেবী .মানে, আমি এই মাস দুয়েকের কাছাকাছি সামান্য যতটুকু দেখছি, তাতে তো খুব ভাল, মানে,..."

এই কয়েকটি কথা বলিতেই কপালে ঘাম জমিয়া উঠিল, মিস্টার রায় চুরুটের ধূম্রজালেব মধ্য দিয়া আমার পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন—সেই আমার চিরকালের বিভীষিকার ব্যারিস্টার, খাঁড়ার মতন নাক কি একটা রহস্য ভেদ করিবাব জন্য উদ্যত হইযা উঠিযাছে, ঠোঁট দুইটা পাইপের উপর চাপা, তাহাতে চিবুকটা আবও ধারাল হইয়া উঠিয়াছে যেন!..আমি আর অগ্রসর হইতে পারিলাম না, হঠাৎ থামিয়া গিয়া দৃষ্টি নত কবিলাম। অনেকক্ষণ চুপচাপ গেল, সে এক অসহ্য অবস্থা, আমি অপবাধের গুরভার লইয়া চক্ষু নত করিয়া বসিয়া আছি, অনুভব করিতেছি—আমার ললাটে আসিয়া পড়িতেছে বিচারকের দৃষ্টি। আমি রায়-পরিবারে আতিথেয়তার অবমাননা করিয়াছি, মীরার আমি পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি, আজ ধরা পড়িয়া গিয়াছি।...ধরাইয়া দিয়াছি আমি নিজেকে নিজেই, মিস্টার রায় বোধ হয় নিতান্ত সাধারণ কৌতূহলেই প্রশ্নটা করিয়াছিলেন—মীরাদের প্রসঙ্গটা তো চলিতেই ছিল, আমার বিবেক আমার কণ্ঠে জড়তা আনিয়া দিয়া তাঁহার কাছে কথাটা ফাঁস করিয়া দিল যে, আমি চক্ষু নত করিয়া অনুভব করিতেছি, আমার স্বেদসিক্ত ললাটে মিস্টার রায়ের উদ্যত দৃষ্টির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ—দেখিতেছি না, কিন্তু তাহাব জ্বালা অনুভব করিতেছি।

অসংযতভাবেই চক্ষুর পল্লব একবার উপর দিকে উঠিল। কী স্বস্তি! মিস্টার রায় আমার

দিকে মোটেই চাহিয়া নাই, কৌচের পিঠের উপর মাথাটা উলটাইয়া দিয়া চক্ষু মুদিয়া, চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে পাইপটা টানিতে লাগিলেন।

আরও একটু গেল।

তাহার পর সেই ভাবেই পাইপ মুখে প্রশ্ন করিলেন, "So you have joined your M.A. class already" (তাহ'লে এম-এ পড়া শুরু ক'রে দিয়েছ)?

উত্তর করিলাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হুঁ...।"

আরও খানিকক্ষণ নীরবে কাটিল, তাহার পর মিস্টার রায় সোজা হইয়া প্রশ্ন করিলেন "Suppose you go abroad and fatch a European degree" (যদি ইউরোপ গিয়ে সেখান থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে এস তাহ'লে কেমন হয়)?

অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন; "মীরাকে কেমন বোধ হচ্ছে"—তাহার চেয়ে শতগুণে অপ্রত্যাশিত। আমি কয়েকটা অদ্ভুত, অস্পষ্ট অনুভূতির মিশ্রণে একেবারে নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম; হাঁ-না, কোন রকমই উত্তর মুখে জোগাইল না।

আরও একটু পরে মিস্টার রায় ধীরে ধীরে বলিলেন, "যাও শোও গে রাত হয়েছে, আমি স্টেট্‌সম্যানে তোমার ফ্রেণ্ড মিস্টার করের অ্যাস্ট্রনমি সম্বন্ধে সেই লেখাটা ততক্ষণ পড়ি।...গুড্ নাইট্...হ্যাঁ, তরুর কথা শুনলাম, আর একদিন দুজনে বসে ভাল ক'রে আলোচনা করতে হবে।...গুড্‌নাইট।"

দুঃখের জীবনে বিনিদ্র রজনী অনেকই কাটাইতে হইয়াছে, কিন্তু সেদিনের সেই যে তন্দ্রাহীন রাত্রি যা দীর্ঘ হইযাও সুখের তীক্ষ্ণতায় আমার কাছে অল্পায়ু হইয়া পড়িয়াছিল তাহার কথা এ-জীবনে কখনও ভুলিব না। শিশু যেমন অতি সামান্য খেলনা লইয়াই কল্পনায় নিজের আনন্দ সৃষ্টি করিয়া চলে, মিস্টার রায়ের তিনটি অতিসামান্য কথা লইয়া আমি আমার জীবন-মরণ সৃষ্টি করিয়াছি সেই রাত্রে—মীরাকে কি রকম বোধ হচ্ছে? এম্-এ তাহ'লে শুরু ক'রে দিয়েছ?...আচ্ছা, ইউরোপে গিয়ে একটা ডিগ্রী নিয়ে এলে কেমন হয়?

নিতান্ত খাপছাড়া তিনটি কথা, কিন্তু প্রশ্নে-উত্তরে, আশায়-আবেগে এই তিনটি লইয়াই যে কত গড়পেটা সেদিন, এখনও ভাবিলে বিস্মিত হই। কত অসংলগ্ন অসম্ভব কল্পনা; সবকেই সূত্রের মত বাঁধিয়া রাখিল, সবের মধ্যেই সামঞ্জস্য আনিল শুধু একটি প্রশ্ন—"মীরাকে তোমার কেমন বোধ হচ্ছে?"

হয়তো নিতান্ত নিরুদ্দেশ ভাবেই মিস্টার রায় প্রশ্ন তিনটি করিয়াছিলেন, হয়ত যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার সবটুকুই মিথ্যা তবু সেই রাত্রিটি একটি চরম সত্যরূপে আমার জীবনে শাশ্বত হইয়া আছে।

১২

মাস চারেক কাটিয়া গেল। মীরা আমার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছে। আমিও কী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছি ওর জীবনে? ও আমার লেখা খোঁজে, মাস্টারির অভিনয় করে তরুকে লইয়া—যখন বোঝে আমি টের পাইয়াছি, হঠাৎ ভারিক্কে হইয়া উঠিয়া মনিবের সম্বন্ধটা মেরামত করিতে লাগিয়া যায়। এ আকর্ষণ-বিকর্ষণের মধ্য দিয়া কি হইতেছে সব সময় ঠিক ধরিতে পারি না, সন্দেহ হয়।

একদিন মিস্টার রায় বাড়িতে একটা পার্টি দিলেন। আমার সময়ে এই প্রথম পার্টি। কারণটা

ঠিক মনে পড়িতেছে না, খুব সম্ভব বিশেষ কোন উপলক্ষ্য ছিল না। আমি আসিবার এই মাস চারেকের মধ্যে মীরা চার-পাঁচটি ছোট-বড় পার্টিতে যোগদান করিয়া আসিল দেখিলাম, তাহার মধ্যে তরুর সঙ্গে একটিতে আমিও ছিলাম; সেই সব নিমন্ত্রণের পালটা-নিমন্ত্রণ হিসাবে মীরা বোধ হয় পিতাকে রাজি করাইয়া এই বন্দোবস্তটা করিতেছে। খুব ব্যস্ত;—সাজানর প্ল্যান্‌, মেনুর (খাদ্য তালিকার) নির্ণয়; যন্ত্র-সংগীতের জন্য ভবানীপুর হইতে অরকেস্ট্রা ঠিক করা, যাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে হইবে তাহাদের তালিকা প্রস্তুত, কার্ড ছাপানো, বিলির বন্দোবস্ত—এই সব লইয়া কয়েকদিন তাহার যেন নিঃশ্বাস ফেলিবার ফুরসত নাই। উৎসাহের দীপ্তি, কর্মচঞ্চলতার কতকটা আলুথালু ভাব এবং তাহারই মাঝে মাঝে একটু ক্লান্তির অবসাদে তাহার এক যেন নূতন রূপ ফুটিয়াছে। মাঝে মাঝে পরামর্শ চায়। আমি এ-সমাজের অল্পই বুঝি, বিশেষ করিয়া পার্টির বিষয় তো আরও কম। বলিলে মীরা বলে, "ও-সব শুনছি না, আপনি গা-ঝাড়া দিতে চান, শৈলেনবাবু। বাবার ফুরসত কম, একবার সেই রাত্তিরে খাবার সময় দেখা হবে, মাকে তো দেখছেনই, দাঁড়ান আপনিও স'রে, আমি দাঁড়িয়ে অপমান হই...।"

মীরা কথাগুলো একটু অভিমানেব সুরে বলে। এ কয়দিন থেকে সেই কতকটা দৃপ্ত মীরা যেন লুপ্ত; মীবা কর্মের মধ্যে কতকটা যেন এলাইয়া গিয়াছে, তাহার চিরন্তনী অসহায় নারী প্রকৃতিটা স্ফুট হইয়া উঠিযাছে। আমি অবশ্য তাহারই সাহায্যে তাহাকে পরামর্শ দিই, সে যাহা বলে, কিংবা কোন সময় বলিয়াছে সেই সব কথাই খানিকটা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমার মন্তব্য জানাই, তাহাতেই সে প্রীত। মীরা এই কয়টি দিনে কর্মব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে ভুলিয়া তাহার অজ্ঞাতসারেই আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। ও বুঝিতেছে না, ফুরসত নাই ওর বুঝিবার, এমন কি পরিবর্ধমান অন্তরঙ্গতার মাঝে কখন "মাস্টারমশাই" ছাড়িয়া যে "শৈলেনবাবু" বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে তাহারও হিসাব নাই বোধহয় ওর; কিন্তু আমার হিসাব আছে, আমি সমস্ত অন্তর দিয়া বুঝিতেছি; এই লুকোচুরিটুকু যে কত মিষ্ট লাগিতেছে!...মীরা আমায় পাইতেছে না, কিন্তু মীরাকে আমি পাইতেছি।

বলিল, "আপনি নেমন্তন্নটা নতুন ক'রে লিখে দিন না—বাংলার আজকাল যেমন নতুন কত ধবনে লেখে দেখতে পাই..."

লেখা হইলে মুখের পানে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "চমৎকার হয়েছে, আমি মাথা খুঁড়লেও পারতুম না। আপনাকে যে কী বকশিস দেব তাই ভাবছি।"

আজ মীরা কি সত্যই এত কাছে?—যেন বিশ্বাস হয় না। আমি আমার যতটুকু সীমা ও অধিকার তাহার মধ্যেই একটা শোভন উত্তর খুঁজিতেছিলাম, মীরা হাসিয়া একটু চিন্তিতভাবে ভ্রূ-যুগল কুঁচকাইয়া থাকিয়া বলিল—"হয়েছে—ওর জন্যে কার্ড পছন্দ ছাপানো সব আপনার হাতে, আমি একেবারে আর ওদিকে চাইব না।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "অসহযোগিতাও একটা বকশিস নাকি?"

মীরাও তর্কের উৎসাহে অভিনয় করিয়া বলিল, "বাঃ নিজের একটা সম্পূর্ণ ভার দিয়ে দেওয়া বকশিসের মধ্যে পড়ে না? ধরুন যদি..."

শেষ করিবার পূর্বেই অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল। আমি ওর কথার সরল অথচ অনভীপ্সিত মানেটা যেন ধরিতে পারি নাই, কিংবা ওর লজ্জাটাও যেন চোখে পড়ে নাই এইভাবে প্রশ্ন করিলাম, "তা বেশ, আমার কিন্তু প্লেন কার্ড পছন্দ, মেলা ফুলকাটা-ফুলকাটা ভাল লাগে না। আপনার সঙ্গে রুচির মিল না হতে পারে তাই আগে থাকতে বলে রাখছি।"

মীরা তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে একবার আমার পানে চাহিল---ভান করিতেছি, না সত্যিই কিছু বুঝি নাই? তাহার পর সহজভাবেই বলিল, "প্লেন তো নিশ্চয়ই, আমারও তাই পছন্দ।"

তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

কি ভাবিল মীরা আমায়? স্থূলবুদ্ধি? অরসিক? জড়? না, বুঝিতে পারিল আমি তাহার কথাটার অন্য যাহা মানে হইতে পারে তাহা পুরাপুরিই বুঝিয়াছি, না বুঝিবার ভান করিয়া তাহার লজ্জাটা সামলাইয়া লইয়াছি মাত্র?

যাহাই ভাবুক, কাজটা কিন্তু ঠিকই করিয়াছি। মীরা লজ্জিত হইবে আর আমি ওর জ্ঞাতসারে সেই লজ্জা উপভোগ করিব সেদিন এত শীঘ্র আসে না।

পার্টিতে অনেকগুলি নূতন মানুষ দেখিলাম, মীরা সাধারণত তাহাদের সঙ্গে মেলামেশা করে, মেয়ে পুরুষ উভয় জাতিরই। মীরা প্রথম ঝোঁকটায় সকলকে অভ্যর্থনা করিতে, বসাইতে ব্যস্ত ছিল, কতকটা নিশ্চিন্ত হইলে আমায় ছাড়া ছাড়া ভাবে কয়েক জনের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার মধ্যে একজন রেখা,—মীরার বিশেষ বন্ধু। মীরা যখন কয়টা দিন সরঞ্জামে মাতিয়া ছিল, রেবাকে তাহার সঙ্গে দেখিয়াছি। মেয়েটি মীরার চেয়ে এক-আধবছরের ছোট হইতে পারে, খুব সুন্দরী, খুব শৌখীন এবং অত্যন্ত লাজুক। এর আগেও এবং পরিচয়ের পরও রেবাকে দেখিয়া আমার এই কথাই মনে হইয়াছে যে, ও নিজের সৌন্দর্যকে এত ভালবাসে যে না সাজাইয়া গোছাইয়া যেন পারে না; অথচ এই সাজানর জন্যই ওর অপরিসীম লজ্জা। এই মেয়েটিকে এই একটা নূতন জিনিস দেখিলাম, যেহেতু সুন্দরীরা একটু লজ্জিত বেশি হয় একথা সত্য হইলেও শৌখীনদের ভাগ্যে লজ্জা একটু কমই থাকে—কেননা শখ জিনিসটাই হইতেছে পরের চক্ষে নিজেকে বিশিষ্ট করিয়া দেখা।

রেবাকে অবশ্য এ-কাহিনীর মধ্যে আর পাওয়া যাইবে না, কারণ আমি আসিবার কিছুদিন পরেই হঠাৎ বিবাহ হইয়া রেবা লাহোর চলিয়া গেল। সৌন্দর্য, শখ আর লজ্জার অদ্ভুত সমাবেশে ও আমার মনে একটা কৌতূহল জাগাইয়াছিল, বলিয়া ওর কথা একটু না তুলিয়া পারিলাম না।

আর একটি যুবতী সম্বন্ধে আমার কিছুদিন হইতে কৌতূহল জাগিয়াছিল, তাহার কারণ আগন্তুকদের মধ্যে তাহাকেই সবচেয়ে বেশি দেখিয়াছি এ-বাড়িতে, আর তরুর মুখেও তাহার কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। অপর্ণা দেবী আজ সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করাইয়া দিলেন। জীবনে তাহাকে কখনও ভোলা চলিবে না। শুধু তাহাই নয়, যতদিন বাঁচিয়া থাকিব তাহার স্মৃতির পাদপীঠে অনির্বাণ শ্রদ্ধার বাতি জ্বালিয়া রাখিব।

অপর্ণা দেবী গোড়া হইতে উপস্থিত ছিলেন; কাল রাত্রি হইতে তাঁহার শরীরটা একটু অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। পার্টিটা আর পিছাইয়া দেওয়া সম্ভব হইল না; তবে তিনি একটু বিলম্ব করিয়া নামিলেন, যখন প্রথম অভ্যর্থনার বেগটা কতকটা প্রশমিত হইয়া সবাই একটু স্থির হইয়াছে। তাঁহার সেই গরদের চওড়া লালপেড়ে শাড়ি, সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর, মুখে প্রসন্ন হাসি ঈষৎ ক্লান্তির সহিত মিশিয়া একটা অপার্থিব কারুণ্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিয়াছে। অভ্যাগতদের জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ফিরিলেন একটু। উনি নামিয়াছেন পর্যন্ত আমার নজরটা বেশির ভাগ ওঁর দিকেই রহিয়াছে। আমার মন আর দৃষ্টি ওঁকে বরাবরই খোঁজে, কম পায় বলিয়া আরও বেশি করিয়া খোঁজে।

এক সময় মীরা এক যুব-দম্পতির সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিয়া বলিল,—"শৈলেনবাবু, আপনার লেখার খোরাক নিয়ে এলাম, পরিচয় করুন—তপেশবাবু, আর অনীতা—মিস্টার তপেশ বোস আর অনীতা চট্টোপাধ্যায় অবশ্য-এখন বোস—বুঝতেই পাচ্ছেন জ্যান্ত রোমান্স।"

আমি ওঁদের নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিলাম, "রোমান্সের দিক থেকে ওঁদের অভিনন্দিত করছি।"

তপেশ হাসিয়া কি একটা উত্তর দিতে যাইবে, এমন সময় অপর্ণা দেবী একটু যেন চঞ্চলভাবেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুখে একটা উদ্বেগের ভাব, চাপিবার প্রয়াস থাকিলেও বেশ প্রকট। প্রশ্ন করিলেন, "সরমাকে দেখছি না তো মীরা, আসেনি?"

মীরা যেন এতক্ষণ একটা দরকারী জিনিস ভুলিয়া ছিল, একটু চকিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া

বলিল, "কই, দেখছি না তো?"

"আসেনি নিশ্চয়, কেন এল না বল তো? কার্ড পাঠাতে ভোল নি তো?"

"তাকে আমি নিজে হাতে কার্ড দিয়েছি। আসতও তো বরাবর কেমন হচ্ছে না-হচ্ছে খোঁজ নিতে।"

"তবে!"

একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ফোনে একবার দেখ মীরা, লক্ষ্মীটি!"

মীরা পা বাড়াইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা মোটর আসিয়া গেটে প্রবেশ করিল। "ঐ যে সরমাদের গাড়ি" বলিয়া মীরা ত্রস্তপদে অগ্রসর হইল।

সরমাকে আমি এই বাড়িতে পূর্বে কয়েকবার দেখিয়াছি এবং এর-তার মুখে, বিশেষ করিয়া তরুর কাছে তাহার অল্প-বিস্তর পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু কোন প্রাসঙ্গিকতা না থাকায় তাহার সম্বন্ধে কিছু বলি নাই; দু-একটা কথা বলিতে চাই।

সরমাকে দেখিলে আমার একটা কথা মনে পড়িয়া যায়,—স্থির বিদ্যুৎ। এ-এক আশ্চর্য সৌন্দর্য যাহার পানে একবার চাহিলে আপাদমস্তক ভাল করিয়া না-দেখিয়া চক্ষু ফিরাইবার উপায় থাকে না। আমি ঠিক এই ধরনের সৌন্দর্য জীবনে আর একবার মাত্র দেখিয়াছি—একটি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ের মধ্যে। বোটানিক্যাল গার্ডেনসে একটা লেকের ধারে সে, একজন আয়া আর একটা ছোট মেয়ে বসিয়া ছিল; বোধ হয় তাহার ভগ্নী। আমার খেয়াল হইল যখন ছোট মেয়েটা বলিল—"Look, Kate, the Babu is staring at you" (কেট্, দেখ বাবুটি তোমার পানে হাঁ ক'রে চেয়ে রয়েছে)। আমি অপ্রস্তুত হইয়া গেলাম, কিন্তু লক্ষ্য করিলাম কেট্ অপ্রস্তুত বা বিস্মিত কিছুই হইল না। তাহার মানে কেট্ এত অভ্যস্ত—লোকে তাহার দিকে একবার চাহিলে যে চাহিয়া থাকিবেই—কেটের এটা গা-সওয়া হইয়া গিয়াছে।

অবশ্য আমি নিতান্ত আত্মবিস্মৃত হইয়া সরমার দিকে চাহিয়া থাকি নাই। বাহাদুরি লইতেছি না; সৌন্দর্য যেমন আপনাকে এবং আর সবাইকে আকৃষ্ট করে, আমাকে তাহার চেয়ে কিছু কম করে না, তবে আমি সেই—'Look Kate, the Babu is staring at you'-এর পর থেকে অতিরিক্ত সাবধানে থাকি, সৌন্দর্যকেও বিশ্বাস করি না; চক্ষুকেও নয়। তবুও আলাদা ছিলাম, অভদ্রতার ততটা ভয় ছিল না, সরমার আশ্চর্য সৌন্দর্য দেখিলাম খানিকটা।

সরমার মাথায় এলো খোঁপা, চুলটা ঈষৎ কুঞ্চিত বলিয়া চিক্ চিক্ করিতেছে, বাঁকা কি সিধা কোন সিঁথিই নাই, চুলটা শুধু টানিয়া আঁচড়ানো। মুখটা বেশ পুরন্ত। মুখের ভাবটা একটু ছেলেমানুষ-ছেলেমানুষ গোছের, রঙটা খুব গৌর এবং একটু হলদেটে—অর্থাৎ রঙে রক্তাভা থাকিলে যে একটা উগ্রতা থাকে সেটা নাই। বিদ্যুৎও স্থির হইয়া গেলে এই রঙেই দাঁড়াইবে।

সরমার পরনে খুব হালকা কমলালেবুর রঙের একটা শাড়ি, সেই রঙেরই পুরা-হাতা ব্লাউস, কানে দুইটি ঝুমকা দুল, হাতে দু-গাছি রুলি চারগাছি করিয়া আসমানি রঙের রেশমী চুড়ি।

সরমা অসামান্যা সুন্দরী, কিন্তু তাহার সৌন্দর্যের মধ্যে আরও যা অসামান্য তা তাহার শান্তি, যাহা প্রায় বিষাদের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে।...বিদ্যুৎ শুধু স্থির নয়, তাহার দাহও হারাইয়াছে।

অপর্ণা দেবীও একটু আগাইয়া গিয়াছিলেন। মীরা হাসিতে হাসিতে সরমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া বলিল, "এসেছে তোমার সরমা, মা; এই নাও।...মা হেদিয়ে উঠেছিলেন সরমাদি। ওঁর ভয় আমি তোমাকে কার্ড দিতেই ভুলে বসে আছি।"

সরমা লজ্জিতভাবে একবার অপর্ণা দেবীর পানে চাহিয়া তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। অপর্ণা দেবী তাহার মস্তকে হাত দিয়া হাতটা ধীরে ধীরে পিঠে নামাইয়া লইলেন, হাসিয়া বলিলেন, "আমার সরমাই তো, তোর হিংসে হয় নাকি?"

সরমা হাসিয়া অপর্ণা দেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "এ কি রকম হ'ল কাকীমা? এদিকে

বলছেন 'আমার সরমাই তো', আবার ওদিকে ধরে রেখেছেন যে কার্ড না পেলে আসতাম না। আমার জোর রইল তাহ'লে কোথায়?"

আবার তিনজনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিলাম। অপর্ণা দেবী অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "বাঃ, কার্ড না দিলে আসবে না এ কথা কেন বলব? বলছিলাম মীরার পদে পদে যা ভুল,—তোমার কার্ড বোধহয় পাঠানই হয়নি। তোমার গুণের কথা চাপা দিচ্ছিলাম না, ওর দোষের কথা, ওর ভুলের কথা বলছিলাম।"

মীরা গম্ভীর হইয়া গেল, প্রশ্ন করিল, "সেইটেই কি ভুল হ'ত মা?"

অপর্ণা দেবী তাহার পানে চাহিয়া বিস্মিতভাবে বলিলেন, "বা রে! কার্ড না দেওয়াটা ভুল হ'ত না? কী যে বলে মীরা!"

মীরা আরও তর্কের ভঙ্গিতে বলিল, "বা—রে, হ'ত?—যে-সরমা তোমার এত আপনার যে মীরারও হিংসে হচ্ছে বলছ, তাকে কার্ড পাঠানই কি ভুল হয়নি?"

সঙ্গে সঙ্গে গাম্ভীর্য ঠেলিয়া তাহার হাসি উছলিয়া উঠিল।

ওর গাম্ভীর্যের পিছনে এই কৌতুক লুকানো ছিল দেখিয়া সরমা ও অপর্ণা দেবীও হাসিয়া উঠিলেন। অপর্ণা দেবী দুইজনের নিকটই পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা হয়েছে, ওদিকে চল একটু; তোমরা দু'জনেই সমান।"

মীরা একটু আবদারে হুকুমের সুরে বলিল,—"বল—দু-জনেই তোমার সমান আপনার অর্থাৎ সরমাদি আমার চেয়ে বেশি আপনার নয়?"

অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "দু-জনেই সমান দুষ্টু আর আপনার।...এস সরমা।"

ঘুরিতেই অল্প দুরেই আমায় দেখিলেন। আমি তখন অন্য দিকে চোখ-কান যে নাই আমার সেইটা প্রমাণ করিবার জন্য খুব মনোযোগের সহিত কেট্‌লি হইতে চা ঢালিতেছি। অপর্ণা দেবী কাছে আসিয়া বলিলেন, "তুমি বড় একলা পড়ে গেছ তো শৈলেন। নতুন মানুষ...।"

মীরা বলিল, "আমাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে একটু জানা-শোনা ক'রে নিন্ না, মা।" একটু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু যা একলষেঁড়ে মানুষ!"

অপর্ণা দেবী একটু হাসিলেন, বলিলেন, "তা বেশ তো। কিন্তু দাঁড়াও, আগে তোমাদের পরিচয়টা কবিয়ে দিই। এটি আমাদের তরুর নতুন মাস্টার। এ সরমা, এ হচ্ছে..."

অপর্ণা দেবী হঠাৎ থামিয়া গেলেন; কি যেন একটা প্রবল কুণ্ঠা আসিয়া গেল মাঝখানেই। সরমাও একটু রাঙিয়া উঠিল।

অপর্ণা দেবী কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "এমন চমৎকার মেয়ে দেখা যায় না শৈলেন।"

সরমা আবার একটু রাঙিয়া উঠিল, তাহার পর আমায় নমস্কার করিয়া হাসিয়া বলিল, "এমন চমৎকার কাকীমা দেখা যায় না শৈলেনবাবু, মিছিমিছি এত প্রশংসা করতে পারেন!"

আবার সবাই হাসিয়া উঠিলাম।

আমি উত্তর করিলাম, "যোগ্যের প্রশংসায়—মস্ত বড় একটা আনন্দ আছে কিনা, সরমা দেবী।"

সরমা সেইভাবেই বলিল, "শুনলেন—বললাম মিছিমিছি প্রশংসা করেন।"

আমি বলিলাম, "ঐটেই তো যোগ্যতার চিহ্ন!—আপনি যোগ্য বলেই তো মনে করেন আপনাকে যে প্রশংসাগুলো করা হয় সেগুলো আপনার প্রাপ্য নয়; যে অযোগ্য সে মনে করবে তার মত প্রশংসার পাত্র জগতে বিরল, অথচ লোকে তার প্রাপ্য চুকিয়ে দিলে না।...যা শূন্যগর্ভ তাই তো ভরে ওঠবার জন্যে হাহাকার করতে থাকে।"

যাহাকে ভালবাসা যায় সে কাছে থাকিলে একটা তৃতীয় নয়ন খোলে মানুষের। আমি যখন সরমার কথার উত্তর দিলাম—এই বলিয়া যে, সে প্রশংসার উপযোগী—তখন অপর্ণা দেবী, মীরা দুইজনে স্মিতহাস্য করিল; কিন্তু দেখিলাম মীরার হাসিটা যেন কতকটা নিষ্প্রভ, অন্ততঃ মীরার

কথা যে অন্ধ হইয়া গিয়াছে এটা তো বেশই স্পষ্ট। অবাধ্যভাবেই যেন চক্ষু গিয়া মীরার উপর পড়িল, সেই মুহূর্তেই আবার সরাইয়া লইলাম। মীরার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, তাহার তৃতীয় নয়ন আমার চেয়েও শতগুণে জাগ্রত; ঐটুকুতেই সে বুঝিল সে ধরা পড়িয়া গিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গেই সতর্ক হইয়া গেল।

১৩

শুধু সতর্ক হইল বলা ঠিক হইবে না; মীরার মূর্তিও গেল বদলাইয়া।

আমিও সতর্ক হইয়া গেলাম; কিন্তু শেষরক্ষা যে করিতে পারি নাই সেটা এই প্রসঙ্গের উপসংহারে টের পাওয়া যাইবে।

পরিবর্তনের প্রথম তো এই দেখা গেল যে মীরা আরও সহজভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিল, বরং একটু বেশি করিয়াই। সরমার বাঁ-হাতটা দুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "এবার চল সরমাদি একটু ওদিকে, শচী তোমায় খুঁজছিলও, মা এস।"

আমি সতর্ক ছিলামই। আমি এখানে আসিয়াছি তরুকে পড়ানর কাজ লইয়া, আর একটা কাজ প্রকৃতির খেয়ালে আমার উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—মীরাকে পড়া। আমি ওর অন্তস্থল পর্যন্ত ভালভাবে পড়িয়া ফেলিয়াছি। মীরা জেদী মেয়ে, আমার মুখে সরমার প্রশংসাটা ওর কটু লাগিয়াছে। বেশ বুঝিলাম আমায় না ডাকিবার জন্যই মীরা উহাদের দুইজনকে এত ঘটা করিয়া ডাকিতেছে; আঘাতটা কাটাইবার জন্য আমি তখনই চায়ের কেট্‌লিটা তুলিয়া নিজের কাজে লাগিয়া গেলাম। মীরা মনে মনে বোধ হয় একটা কুটিল হাস্য করিয়া থাকিবে; নিজের পরাজয়টা বুঝিয়া তখনই অস্ত্র পরিবর্তন করিল, দুই পা গিয়াই গ্রীবা বাঁকাইয়া একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "বাঃ, আপনিও আসুন্ শৈলেনবাবু।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "ও বেচারি চা-টা ঢালছে; খেয়ে নিয়েই না হয় আসবে; এইখানেই তো আছি আমরা।"

মীরা বলিল, "বাঃ, বাড়ির লোক উনি, নিজের চা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন? একটু দেখতে-শুনতে হবে না সবাইদের?

মিস্টার রায় অন্য একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া পড়িলেন, মীরার শেষ কথাটারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, একটু দেখ-শোনগে সবাই তোমরা, সার্ভিস্‌টা ঠিক হচ্ছে কিনা।"

তাহার পর সরমার মাথায় হাত দিয়া তাহার মুখটা নিজের দিকে ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তুমি আরও রোগা হ'য়ে গেছ সরমা-মাঈ—"You are killing yourself by inches; no..." (তুমি তিল তিল ক'রে নিজেকে হত্যা করছ; ঠিক নয়...)।"

সরমা যেন অতিমাত্রা সংকুচিত হইয়া গেল। মিস্টার রায় বিশেষ করিয়া যেন তাহাকেই বলিলেন, "যাও, দেখ-শোনগে সব। এবারে এদের স্ট্রিং-কন্‌সার্টটা বেশ ভাল হয়েছে, যে ছোকরা ব্যাঞ্জো ধরেছে তার হাতটি চমৎকার নয় কি?...হ্যাল্লো!"

অভিমতের সমর্থনের অপেক্ষা না করিয়াই অন্য একজনকে উদ্দেশ্য করিয়া চলিয়া গেলেন।

মীরা আবার আমায় ডাক দিল, "আসুন শৈলেনবাবু।"

অপর্ণা দেবীও বলিলেন, "এস শৈলেন, ও ছাড়বার পাত্রী নয়।"

মেয়ে-পুরুষে-শিশুতে প্রায় এক শতেরও অধিক লোক। সমস্ত বাগানটাতে, গাড়ি বারান্দার সামনে গোল ঘাস-জমিটাতে ছোট-বড় টেবিল পাতা। কোথাও দুইটা, কোথাও বা ততোধিক চেয়ার

দেওয়া। সুবিধামত বসিয়া আহারের সঙ্গে সবাই গল্পগুজব করিতেছে; জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশ্য জিজ্ঞাসাবাদ বেশির ভাগ করিল মীরাই, তাহার পর অপর্ণা দেবী, সরমা নমস্কার করিয়া প্রয়োজনমত এক-আধটা প্রশ্ন করিল বা উত্তর দিল, আমি একেবারেই রহিলাম নীরব।

একবার রাস্তার পাশের দেওয়ালের দিকটায় নজর পড়িল। দেখি গেট থেকে আরও একটু সরিয়া ইমানুল, ক্লীনার মদন এবং অন্য গাড়িরও কয়েকজন ড্রাইভার দাঁড়াইয়া আছে, তামাসা দেখিতেছে। একটু দূরে, গেটের ওদিকটায় একটা ঝাড়ুদার মেথর, তাহার ঠিক পিছন দিকে একটা ঝুড়ি, উচ্ছিষ্ট সঞ্চয়ের জন্য একটু লুব্ধ দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। ইমানুলকে চিনিতে একটু বেগ পাইতে হইল, সে একটা ঝলঝলে সুট পরিয়া একটু আড়াল দেখিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

ইমানুল হঠাৎ কোটপ্যান্ট পরিল কেন? এই রকম একটা দিনে কি ওর বেশি করিয়া মনে পড়িয়া যায় যে ও লাট-সাহেবের সমধর্মী?...সেই দিকে চাহিয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়—"এই যে, আপনারা এখানে? নমস্কার"—বলিয়া একটি যুবক আমাদের দলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

অপর্ণা দেবী বলিলেন,—"এই যে নিশীথ, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?"

নিশীথের পরনে নিখুঁত কায়দামাফিক ইভনিং-সুট, বাঁ হাতে হরিণেব শিঙের মুঠি লাগানো একটি চেরির ছড়ি, ডান হাতে একটা পাইপ। গায়ের রঙ শ্যামবর্ণ, বয়স সাতাশ-আঠাশ আন্দাজ হইবে।

নিশীথ পাইপে একটা টান দিল, তাহার পর বাঁ হাতের ছড়িটার উপর একটু চাপ দিয়া সেটাকে ধনুকাকার করিযা বলিল, "আমার আসতে একটু দেরিই হ'য়ে গেছল। প্রথমত কর্নেল ব্রেটের ছেলে গ্লাসগো থেকে লাস্ট মেলে ফিরেছে খবর পেলাম, একটু সন্ধানটন্ধান নিতে গেছলাম। আমবা ক-জনে ওদিকে ঐ টেবিলটাতে বসে আছি। আপনাদের পাকড়াও ক'রে নিয়ে যাবার ভার পড়েছে, আমার ওপর। চলুন।"

বলিয়া নিজের রসিকতায় সাহেবী ধবনের হাস্য করিয়া পাইপে আর একটা টান দিল।

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আমার একটু ঘোরাফেরা দরকার, অন্তত যতক্ষণ পারি। তুমি এঁদেব নিয়ে যাও বরং।...ইনি হচ্ছেন তরুর টিউটর, নাম শৈলেন মুখোপাধ্যায়। আর এ আমাদের নিশীথ, শৈলেন। তুমি নিশ্চয় শুনে থাকবে এর সম্বন্ধে।

অল্প অল্প শুনিয়াছি, দু-একবার দেখিয়াছিও, পরিচয় হয় নাই। একটা আবছা উত্তর দিলাম, "ও, ইনিই?"

নমস্কার করিলাম। নিশীথ আড়চোখে একবার দেখিয়া লইয়া পাইপটা একটু কপালের কাছে তুলিয়া দিয়া একটা দায়েঠেকাগোছের প্রতিনমস্কার করিল, তাহার পর কালক্ষেপ না করিয়া মীরার পানে চাহিয়া বলিল, "তাহ'লে আপনারা চলুন মিস রায়, সরমা দেবী আসুন।

আমার প্রতি ভদ্রতা প্রকাশ করিতে যে অভদ্রতাটা জাহির করিল সেটা অন্তত অপর্ণা দেবীর দৃষ্টি এড়াইল না, তিনি বলিলেন, "তুমি আমার সঙ্গে এস শৈলেন, আরও কয়েক জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।"

মীরা একটু আবদারের সুরে বলিল, "না মা, ওঁকে আমাদের সঙ্গে আসতে দাও।"

নিশীথ সঙ্গে সঙ্গে বলিল, "হ্যাঁ, সেই বেশ হবে, আসুন আপনিও।"

আমি একটু বিমূঢ়ভাবে অপর্ণা দেবীব পানে চাহিলাম। অপর্ণা দেবী হাসিয়া আমাকেই প্রশ্ন করিলেন, "কি করবে?"

তাহার পর সমস্যাটা আমার পক্ষে আবও জটিল করিয়া ফেলিয়াছেন দেখিয়া সেইরূপ ভাবেই আসিয়া বলিলেন, "তাহ'লে যাও ওদের সঙ্গেই, আমি এক্ষুণি ওপরে চলে গেলে তুমি আবার একলা পড়ে যাবে। ...সরমাকে ছাড়বে না।"

মীরা সরমার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "না—তোমার ঐ মিসিস সেন আসছেন।"

নিশীথ অযথাই মীরাকে সমর্থন করিয়া বলিল, "'বাঃ, ওঁকে কি ক'রে ছাড়ব আমরা।"

অপর্ণা দেবী একবার মুগ্ধ নয়নে সরমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এক্ষুণি যেন পালিও না সরমা, আর যাবার আগে নিশ্চয় একবার আমার সঙ্গে ওপরের ঘরে দেখা ক'রে যেও; নিশ্চয়। আমি বোধহয় আর বেশিক্ষণ নীচে থাকতে পারব না।"

মীরা যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, "পালানো সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থেক।"

নিশীথও ঘুরিয়া, দাঁতে পাইপ চাপিয়া প্রতিধ্বনি করিল, "পালানো শক্ত আমাদের কাছ থেকে, সেদিকে আপনার কোন চিন্তা নেই।"

বোধহয় ভাবিল এ রসিকতাটুকু একেবারে চরম-গোছের হইয়াছে; ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে সাহেবী কায়দায় মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

১৪

আমি টানা পড়িলাম বটে কিন্তু আমার যেন পা উঠিতেছিল না। বাড়িতে আমার সময়ে এই প্রথম পার্টি হইলেও তরুব সঙ্গে এর পূর্বে বার-দুয়েক বাইরে পার্টিতে গিয়াছি এবং দুইবারে যা অভিজ্ঞতা হইয়াছে তাহাতে আরও দুইবার যাওয়ার যখন প্রয়োজন হইল তখন ছুতানাতা করিয়া কাটাইয়া দিয়াছি। তাহার কারণ এই পার্টিতে আমার এই অভিজাত-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক অসামঞ্জস্যটা যতটা স্পষ্ট হইয়া উঠিত, অন্য কোন ব্যাপারেই ততটা হইত না। এধরনের পার্টিগুলা আসলে দেখিলাম স্বয়ংবর সভা, একেবারে মুখ্যতঃ না হোক নিতান্ত গৌণতঃও নয়। মীরা, শচী, মিস্টার মল্লিকের কন্যা দীপ্তি, রেবা—আরও কত সব তাহাদের নাম জানি না—ইহাদের কেন্দ্র করিয়া ভাগ্যান্বেষীরা কথাবার্তা, আধুনিকতম ফ্যাশন, মাঝে মাঝে বোধহয় উপলক্ষ্যে-অনুপলক্ষ্যে উপহার-উপঢৌকন প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে অবিরাম নিজের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া যাইতেছে। মীরাকে যাহারা আগলাইয়া থাকে তাহাদের মধ্যে আছে নীরেশ লাহিড়ী, বি-এ, ক্যান্টাব, নবীন ব্যারিস্টার; জার্মানী-প্রত্যাগত মৃগাঙ্ক সোম, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার; শোভন রায়, কি তাহা এখনও খোঁজ লইয়া উঠিতে পারি নাই; অলোক সেন, কলেজের ছাত্র, আর এই নিশীথ চৌধুরী। এই লোকটি রাজসাহী প্রান্তের কোন এক রাজার ভাগনে। বিদ্যাবুদ্ধি কতটা আছে বলা যায় না, তবে যে-সমাজে চলাফেরা করে, কিংবা মীরাকে লইয়া যাহাদের সঙ্গে রেষারেষি তাঁহাদের সঙ্গে মানানসই হইবার জন্য আমেরিকা হইতে কিছু টাকা দিয়া গোটাছয়েক অক্ষর আনাইয়া লইয়াছে এবং শীঘ্রই নাকি 'হায়ার ইঞ্জিনিয়ারিং' পড়িবার জন্য গ্লাসগো রওনা হইবে। মোটের উপর বিদ্যা, প্রতিপত্তি, অর্থ, সাজানো কথা এবং অঙ্গের সাজগোজ লইয়া ঈর্ষা-অভিনয়ের মধ্যে এখানে যে বায়ুমণ্ডল সৃষ্ট হয়, এক ধুতি-চাদর-পরিহিত গৃহশিক্ষকের সেখানে স্থান নাই। আমি সেটা অনুভব করিয়াছি; বলিয়াই দুইবার কাটান্ দিয়াছি, পার্টিতে যাই নাই। এবার একেবারে নিজেদের বাড়িতে—উপায় ছিল না, তবু আশা ছিল বাহিরে বাহিরে ঘুরিয়াই কাটাইয়া দিব, কিন্তু পাকেচক্রে ধরা পড়িয়া গেলাম।

আজ আবার বিশেষভাবে আমি এড়াইতে চাহিতেছিলাম, তাহার কারণ সরমাঘটিত ব্যাপারটুকুর পর থেকেই মীরার হঠাৎ পরিবর্তন। মীরার চরিত্রের এই দিকটাকে আমি একটু ভয় করি। এই কয়দিন হতে মীরা কর্মচাঞ্চল্যের অনবধানতায় অল্প অল্প করিয়া আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল। ওর এই খুবই কাছে আসাটাকে আমি যেমন প্রার্থনা করি, তেমনি আবার সন্দেহের চক্ষেও দেখি,—লক্ষ্য করিয়াছি মীরা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে যখন খুব কাছে আসিয়া পড়ে তাহার পর হইতে অতি সামান্য একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া—কখন বা উপলক্ষ্য না থাকিলেও—ঝপ করিয়া দূরে সরিয়া যায়। এই সময় জাগে তাহার সেই নাসিকার কুঞ্চন। আমাদের দু-জনের দূরত্বটা—যাহা মীরাই

মিটাইয়া আনে—আবার স্পষ্ট হইয়া উঠে।

নিশীথের পিছনে পিছনে চলিলাম। মীরা আলাপ-জিজ্ঞাসাবাদ করিতে করিতে যাইতেছে, নিশীথ কয়েক জনকে তাহার 'হায়ার ইঞ্জিনীয়ারিং'-এর জন্য গ্লাসগো যাত্রার কথা বলিল; আমরা বাগানের শেষের দিকটায় গিয়া পড়িলাম। তিনখানি টেবিল একসঙ্গে করা, তাহার চারদিকে খান-আষ্টেক চেয়ার। দেখিলাম নীরেশ, মৃগাঙ্ক প্রভৃতি মীরা-কেন্দ্রিকদের প্রায় সকলেই রহিয়াছে। আমরা পৌঁছিবার পূর্বেই দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল, অভ্যর্থনার একটা কাড়াকাড়ি পড়িল। নীরেশের বাম চোখে ফিতাবাঁধা একটা মনক্ল্ চশমা আঁটা; সেটা খুলিয়া ধীরে ধীরে লুফিতে লুফিতে মীরার পানে চাহিয়া বলিল, "আমরা এখানে খান তিনেক টেব্‌ল্ একত্র ক'রে বেশ জমিয়ে বসব স্থির করলাম; কিন্তু কোন মতেই জমছে না দেখে তার কারণ খুঁজতে গিয়ে টের পেলাম এর প্রাণ-প্রতিষ্ঠাই হয়নি। যা মৃত তা জমাট বাঁধতে পারে, কিন্তু জমে না। অবশ্য আপনি ঘুরতে ঘুরতে একবার না-একবার আসতেনই দয়া ক'রে, কিন্তু সেই অনিশ্চিত 'একবারে'র জন্য ধৈর্য ধরে বসে অসম্ভব হ'য়ে উঠল বলে আপনাকে কাজের মধ্যে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবার জন্যে আমরা মিস্টার চৌধুরীকে পাঠালাম। এখন কি ক'রে যে মার্জনা চাইব বুঝতে পারছি না।"

বিলাতী কায়দায় 'হিয়ার হিয়ার' বলিয়া সমর্থন হইল, কিন্তু বেশ বোঝা গেল কথাটা যেন সবার কণ্ঠে একটু বেশ আটকাইয়া বাহির হইয়াছে, বিশেষ করিয়া নিশীথের,—তাহার আপশোষ বোধহয় এই জন্যে যে তাহাকে খুঁজিয়া-পাতিয়া আনিবার ভার দিয়া ইহারা দিব্য ততক্ষণ বসিয়া রুচিকর ভাষা গড়িয়াছে। তাহার মুখ-চোখের অবস্থা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না যে সে ভব্য রকম একটা কিছু বলিবার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পরের কথার প্রতিধ্বনি করা ভিন্ন অন্য শক্তি না থাকায় পারিয়া উঠিতেছে না।

দুইটা চেয়ার কম ছিল বলিয়া আমরা দাঁড়াইয়া ছিলাম, একজন ওয়েটার সংগ্রহ করিয়া আনিয়া পাতিয়া দিল।

চেয়ারে বসিতে বসিতে মীরা হাসিয়া বলিল, "এদিকে আমি কিন্তু বুঝতে পারছি না আপনারা ধন্যবাদের কাজ ক'রে উল্টে কেন মার্জনা চাইছেন।"

কথাটার অর্থ ধরিতে না পারিয়া সকলে জিজ্ঞাসুনেত্রে মীরার মুখের দিকে চাহিল। মীরা বলিল, "তা নয় তো কি বলুন?—ওদিকে থাকলে কিছুই যে কাজ করছি না সে হাতে-হাতে ধরা পড়ে যেত; আপনাদের এই অনুগ্রহ ক'রে ডেকে নেওয়ায় বরং সবার মনে একটা ধারণা থেকে যাবে—বেচারিকে ওরা ডেকে নিলে তাই, নইলে মীরা যদি এদিকে থাকত, কাজ কাকে বলে একবার দেখিয়ে দিত।"

কথাটাতে, বিশেষ করিয়া চোখ পাকাইয়া ঈষৎ মাথা দুলাইয়া বলিবাব ভঙ্গিতে, সবাই হাসিয়া উঠিল।

ওয়েটার ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া চায়ের সরঞ্জাম লইয়া সামনে দাঁড়াইল, প্রশ্ন করিল "চা আর লাগবে কারুর?"

নিশীথ একটা কথা বলিবার সুযোগ পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেল, বলিল, "না, চা একবার হয়ে গেছে।" তাহার পর একটা জুতসই কথা বলিতে পারিবার আনন্দে সবার মুখের উপর দৃষ্টি বুলাইয়া ঈষৎ হাস্যের সহিত বলিল, "এই দুর্লভ সময়টুকুর মধ্যে চা-কে প্রবেশ করতে দিতে মন সরে না; তাহ'লে এত যে মার্জনা চাওয়া-চাওয়ির ব্যাপার, আমরা নিজেদেরই মার্জনা করতে পারব না।"

মীরা একটু বিব্রতভাবে নিশীথের দিকে চাহিয়া ফেলিয়া দৃষ্টি নত করিয়া প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য কি একটা বলিতে যাইতেছিল, মৃগাঙ্ক বলিল, "আমার মত কিন্তু অন্য রকম, অবশ্য সেটা বলতে গেলে আগে মীরা দেবীর কাছ থেকে অভয় পাওয়া দরকার।"

মীরা লজ্জিতভাবে চক্ষু তুলিয়া বলিল, "আমার অভয় দেওয়ার ক্ষমতা আছে নাকি? কই, এ-সম্পদের কথা তো জানতাম না!"

মৃগাঙ্ক উত্তর করিল; "জানেন না বলেই তো পাবার আশা করি। ধরুন, ফুলের গন্ধ আছে জানলে সে কি আর পাপড়ি খুলে সেটা ধরে বিলোতে পারত?"

সকলে আবার একটু মলিন হাসির সঙ্গে অনুমোদন করিল। ধোঁয়ার আড়ালে নিশীথের হাসিটা যে কত মলিন সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

মীরা আবার লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল, "বেশ, তা'হলে আপনার কথামতই তো আমার না দেওয়ারই কথা অভয়,—ফুলকে যদি জানিয়ে দেওয়া হয় তার গন্ধসম্পদের কথা, কেনই বা বিলোতে যাবে?"

এ-সমস্যায় সকলেই চুপ করিয়া রহিল—উত্তর আমার ঠোঁটে আসিয়াছে; কিন্তু এ পরিবেষ্টনীতে আমার মুখ খোলা উচিত কিনা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। শেষ পর্যন্ত কিন্তু প্রকাশের ইচ্ছাই জয়ী হইল; বলিলাম, "কৃপণ বলে বদনাম হওয়ার আশঙ্কা আছে তো?"

সকলে একটু চকিত হইয়া আমার মুখের পানে চাহিল। উত্তরটা ওদের পক্ষেরই, কিন্তু নবাগতের হঠাৎ প্রবেশটা উহারা সন্দেহের চক্ষে দেখিল। তবুও সমর্থন না করিয়া উপায় ছিল না, কাষ্ঠহাসির সহিত সবাই জড়াজড়ি করিয়া বসিল, "ঠিক, ঠিক বলেছেন উনি, বাঃ, কৃপণ হওয়াব একটা আশঙ্কা আছে তো?"

মীরা একেবারে বিজয়ের হাসি হাসিয়া উঠিল, বলিল, "চমৎকার! যে পরকে অভয় দেবে তার নিজেরই আশঙ্কা!"

সকলে আবার একচোট থ' হইয়া গেল, কিন্তু উহারই মধ্যে খুশিও হইয়াছে, কেননা মীরা এই উত্তরটা আমায়ই দিয়াছে মুখ্যাত। আমি প্রত্যুত্তর দিতে আরও খানিকটা সময় নিলাম, বুদ্ধির দৌড়ের পরীক্ষাও হইয়া যাক না একটু। নীরবতা কাটে না দেখিয়া অবশেষে বলিলাম, "কিন্তু এ আশঙ্কা যে অভয়েরই উলটা দিক। তার কৃপণ হওয়ার আশঙ্কা আছে বলেই তো অভয়ের জন্য তার কাছে হাত পাততে যাই, যাচকের তো দাতার কাছে জোরই এইখানে। আর এই আশঙ্কা আছে বলেই তো দাতাও মহৎ।"

সকলে আবার স্খলিত কণ্ঠে যোগ দিল, "বা ঠিকই তো...জোরই তো ঐখানে..আপনাকে কৃপণ বলা হবে—নেই এ-ভয়টা আপনার?"

মৃগাঙ্ক এই জয়-পরাজয়ের ব্যাপারটা চাপা দেওয়ার জন্যই যেন আলাদা করিয়া বলিল, "জোর বইকি, দিন অভয় এবার।"

মীরার স্তবের নেশা আসিয়া গিয়াছিল, স্তাবকের কাছে হাবিযাই তো আনন্দ; কি একটা মুগ্ধ ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার পানে চকিতে চাহিল যেন বরমাল্যটা আমাকেই তুলিয়া দিল সে। মীরা সাধারণভাবে খোশামোদ ঘৃণা করে; এখানে সে সব নাবী হইতেই স্বতন্ত্র, সে বিশিষ্টা। মনে পড়ে প্রথম দিন যখন আমি টুইশ্যনির জন্য তাহার সহিত দেখা করি, কি একটা কথায় আমার মুখে খোশামোদের ভাব ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়া তাহার নাসিকা ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই মীরাই আবার স্বয়ংবর-সভায় সব নাবীর সঙ্গে এক হইয়া যায়, পুষ্পবৃষ্টি হইলে সঞ্চয়ের জন্য আঁচল বাড়াইয়া ধরে। এখানে সে সাধারণ।...একটু অনুযোগের সুরে হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে এসে আপনি ঐদিকে হয়ে গেলেন? This is not fair" (এটা ন্যায়সঙ্গত হলো না)।

তাহার পর মৃগাঙ্কর পানে চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, বলুন, আপনার মতটা কি?"

লজ্জিতভাবে ঘাড় কাত করিয়া হাসিয়া বলিল, "না হয় দেওয়াই গেল অভয়।"

ব্যাপার ততক্ষণে অন্য রকম দাঁড়াইয়া গেছে, আমার ওকালতিতে জিতিয়া স্বয়ংবর-সভায় সকলের মনের অবস্থা এমন দাঁড়াইয়াছে যে অভয় যখন পাওয়া গেল তখন কি জন্য যে অভয়

চাওয়া সেটা বিলকুলই ভুলিয়া বসিয়াছে। ওয়েটারও চা-য়ের সরঞ্জাম লইয়া চলিয়া যাওয়ায় মনে পড়িবার সম্ভাবনা আরও কম। মৃগাঙ্ক ব্যাকুলভাবে হাতড়াইতেছিল, আমি বলিলাম, "নিশীথবাবু দুর্লভ সময়টুকুর মধ্যে চা-য়ের প্রবেশ পছন্দ করছিলেন না, আপনি বললেন আপনার মত এই যে—"

মৃগাঙ্ক ঘাড় নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "ও ইয়েস, থ্যাংক ইউ, ঠিক, আমি বলছিলাম চা একবার হয়ে গেছে বটে কিন্তু লোভ বলে আমাদের একটা প্রবল রিপু আছে—যদি মীরা দেবীর ক্লেশ না হয় তো চা যদি আর একবার ওঁর হাতের রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করে তো সেটাকে অনধিকার-প্রবেশ না বলে বরং..."

সকলে উল্লাসিতভাবে সমর্থন করিয়া কথাটা আর শেষ হইতে দিল না। ওদের পক্ষে জয়যাত্রা আবার আরম্ভ হইয়াছে দেখিয়া নিশীথ পর্যন্ত নিজের পরাজয়ের কথা ভুলিয়া অকুণ্ঠভাবেই যোগদান করিল। ওয়েটারটা ততক্ষণে ওদিকে চলিয়া গিয়াছে, উৎসাহিত ভাবে চেয়ার ঠেলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি পাকড়াও ক'রে আনছি। চা পান না করিয়ে ওঁকে ছেড়ে দেওয়া হবে নাকি?"

প্রতিধ্বনির জন্য ওর কণ্ঠ চুলকাইয়া উঠিয়াছে। এই আগেই দেওয়া নিজের অভিমতটা চা-কে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার কথাটা—আর কি মনে থাকিতে পারে?

১৫

আগেই বলিয়াছি আমার এ একটা দুরদৃষ্ট—অভিশাপই আছে জীবনে—মীরার যখন খুব কাছটিতে আসিয়া পড়িব, সঙ্গে সঙ্গে সরিয়া যাইতে হইবে। এবারে মীরার ততটা দোষ ছিল না, সরমার প্রশংসায় সে অবশ্য চটিয়াছিল, কিন্তু সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। সে স্তুতির মাদকতায় ভরপুর, তাহার চিত্তে দাক্ষিণ্যের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। কিন্তু অদৃষ্ট, ঘটনার চক্রান্তে ব্যাপারটা আবার অন্য রকম হইয়া দাঁড়াইল।

শুরু থেকেই একটা কথা আমার বড় বিসদৃশ ঠেকিতেছিল। মাঝে নিজেই তর্কের ঝোঁকে পড়িয়া একটু বিস্মৃত হইয়াছিলাম, আবার সেটার দিকে দৃষ্টি গেল। লক্ষ্য করিতেছি সরমাও যে আমাদের সঙ্গে আসিয়া বসিয়াছে সেদিকে কাহারও বিশেষ হুঁশ নাই। সব যেন মীরাকে ঘেরিয়া পড়িয়াছে। অবশ্য সরমাকেও সবাই সমুচিতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইয়াছে, এক-আধটা প্রশ্নাদিও করিয়াছে মাঝে মাঝে, আর ব্যাপার যাহা হইতেছে তাহা হইতে সে যে একেবারে বাদ পড়িতেছে এমন নয়, হাসিবার সময় সেও হাসিতেছে, এক-আধটা অভিমতও দিয়া থাকিবে—শান্তভাবে যেমন হাসা, যেমন কথা বলা তাহার স্বভাব; কিন্তু একটা ত্রুটি হইয়াই গিয়াছে তাহাদের তরফ হইতে। স্তব, প্রশংসা বা ইংরেজীতে যাহাকে বলে কমপ্লিমেন্ট, মীরার ঘাড়ে জড় করিতে সবাই এত উন্মত্ত যে এই সভাতেই যে আরও এটি মহিলা বসিয়া আছেন সেদিকে খেয়ালই নাই কাহারও। ইহারা ইংরেজদের নকল করিতে যায়, কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষা করিবে এমন সাধারণ বুদ্ধিটুকু পর্যন্ত ঘটে রাখে না। বিশেষ করিয়া পাশেই একজন লেডিকে যথাস্থানে ছাড়িয়া দিয়া আর একজনকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিবে, ওরা যে সভ্যজগতের নকল করিতেছে তথাকার নিতান্ত অসভ্যরাও এ-কথা ভাবিতে পারে না!...আমি সরমার পানে খুব সন্তর্পণে এক-আধবার চাহিয়া লইয়াছি, বুঝিয়াছি এর দাগ পড়ে নাই ওর মনে। ওর মনের কোথায় যেন একটা বেদনার উৎস আছে। যোগী যেমন নিজের মূর্ধার অমৃতরসে জিহ্বাগ্র সংলগ্ন করিয়া ধ্যানস্থ থাকে, সরমারও যেন কতকটা সেই রকম ভাব, সেও যেন সেই দুঃখের অমৃতরসে জিহ্বা দিয়া আত্মস্থ। বাহিরে ও হাসে, কথা কয়; একটা প্রসন্নতার আবরণও আছে ওর সব জিনিসের উপর; কিন্তু তাহার সঙ্গে ওর ভিতরের যোগ নাই।

হইতে পারে সবাই ওর ঔদাসীন্য জানে বলিয়াই ওকে একান্তেই থাকিতে দেয়, কিন্তু তবুও

ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশদৃশ্য, প্রায় একটা দুষ্কৃতির কাছাকাছি; আমি তো হাঁপাইয়া উঠিতেছিলাম।

পাকড়াও করিয়া আনিবার নিশীথের একটা অনন্যসাধারণ ক্ষমতা আছে স্বীকার করিতে হইবে, শুধু চা-য়ের সরঞ্জাম ঘাড়ে ওয়েটারকে পাকড়াও করিয়া আনিল না, আরও আনিল শোভনকে আর দীপ্তিকে। শোভনের বাহুটা ধরিয়া সামনে দাঁড় করাইয়া বলিল, 'দীপ্তি আর শোভনকেও ধরে আনলাম, দু-জনকে দু-জায়গা থেকে।"

প্রকাণ্ড একটা বীর সে!

মীরা চা ঢালিতে সুরু করিয়া দিল। চমৎকার দেখাইতেছিল মীরাকে। উঠিয়া সামনে ঝুঁকিয়া চা ঢালিতেছে, একগুচ্ছ চূর্ণ কুন্তল কপাল হইতে স্খলিত হইয়া নতশীর্ষ লতার তন্তুর মত মুখের উপর দুলদুল করিতেছে, কানের ঝুমকা দুইটা সামনে গড়াইয়া আসিয়াছে, তাহাদের মুক্তার ঝুরিগুলা গালের উপর পড়িয়া ঝিক্‌মিক্ করিতেছে! সকলেরই কথা একটু বন্ধ, শুধু লুব্ধভাবে একের পর এক করিয়া মীরার সামনে পেয়ালা বাড়াইয়া দিতেছে; মীরা যেন ক্রমেই পরিবর্ধমান লজ্জায় রাঙিয়া উঠিতেছে; কেহ যে কথা কহিতেছে না, সেইজন্য ও নিশ্চয় অনুভব করিতেছে, ওকে সবাই দেখিতেছে বলিয়া কথা কহিতেছে না। মীরার যে-সমাজে স্থিতি-গতি সেখানে মেয়েরা নিজেদের প্রত্যেক ভঙ্গিটির সম্বন্ধেই সচেতন,—মীরা জানে তাহার ঈষন্নত দেহযষ্টি, তাহার কপালের আলগা কুন্তল-গুচ্ছ, তাহার কানের লুটান ঝুমকা চারিদিকে একটা শান্ত বিপর্যয় ঘটাইতেছে, এ-সবের উপর তাহার আরক্তিম লজ্জাটি সম্বন্ধেও সে সচেতন, তাহাতেই তাহার লজ্জা আরও বেশি।...আমি যথাসাধ্য সংযত ছিলাম, তবু নিজের দৃষ্টি বলিয়াই অযথা তাহার সাধুতার বড়াই করিতে পারি না। দৃষ্টির দোষ ছিল না, আজ খোশামোদের অর্ঘ্য দেওয়ার পর মীরার কাছে দৃষ্টি আমার প্রশ্রয়ই পাইয়াছে।

দীপ্তি একটু দূরে, ওদিকটায় কোন একজনের সঙ্গে কি কথা কহিতে গিয়াছিল, আসিয়া উপস্থিত হইল। মীরার চেয়ে দীপ্তি বছর-চারেকের ছোট, একটু বেশি চটুল, মাথার দুইপাশে দুইটি বেণী, চলে শরীরটা একটু সামনে ঝুঁকাইয়া আর দুলাইয়া—সর্বসমেত বেশ একটা নিজস্ব স্টাইল আছে। কথা বলিবার ভঙ্গি খুব জোরাল,—কতটা সত্য বলিল, কতটা মিথ্যা বলিল ভ্রুক্ষেপ করে না, শ্রোতাদের উপর দাগ বসিল কিনা সেইটিই তাহার লক্ষ্য। আসিয়াই বিস্ময়ে সমস্ত শরীরটাকে যেন একটু টানিয়া তুলিয়া মুখের উপর হাত দুইটা জড় করিয়া বলিল, "ওমা! তুমি এখানে মীরাদি? অথচ তখন থেকে তোমায় এত খুঁজছি যে রীতিমত সাধনা বললেও চলে।...সরমাদিও দেখছি যে! বাঁচলাম, কে যেন বলছিল আপনার শরীর খারাপ, আসতে পারবেন না; এত ভাবনা হয়েছিল! মনে হ'ল সব ফেলে ছুটে যাই, একবার দেখে আসি।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "না এলেই হ'ত ভাল; কিন্তু শরীরের দোহাই তো মীরার কাছে চলবে না, তাই...।"

নীরেশ আবার কি একটা লাগসই কথা ভাবিতেছিল, জোগাড় হওয়ায় সরমাকে শেষ করিতে না দিয়াই বলিয়া উঠিল, "মীরা দেবীকে পেতে হ'লে তো সাধনারই দরকার মিস মল্লিক; আমাদের সাধনাটা একটু বেশি ছিল, সেই জন্যেই...।"

বোধ হয় অজ্ঞানকৃত, অথবা নিছক মূঢ়তা, তবুও নীরেশের অভদ্রতাটা আমার সহ্য হইল না—অর্থাৎ এই সরমার কথাটা শেষ করিতে না দিয়া নিজের মন্তব্য আনিয়া ফেলা। নীরেশের কথাটাও শেষ হইবার পূর্বেই সেটা যেন চাপা দিয়াই সরমাকে প্রশ্ন করিলাম, "হ্যাঁ, তাই বলে কি বলতে যাচ্ছিলেন সরমা দেবী? বোধ হয় মীরা দেবীর ভয়েই এসেছেন, কিন্তু আমাদের কৃতজ্ঞতা সেজন্যে কিছু কম হবে না।"

মীরা আমার কাপে চা ঢালিতেছিল, হঠাৎ আমার দিকে চোখ তুলিল। খানিকটা চা টেবিলের ঢাকনার উপর পড়িয়া গেল। মীরা তখনই আবার সমস্ত ব্যাপারটা সামলাইয়া লইল। চা-টা পড়িয়া যাওয়ার অজুহাতে তাহার তীক্ষ্ণ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিটা সঙ্গে সঙ্গে শান্ত করিয়া লইয়া বলিল, "এক্সকিউজ

মি, মাফ করবেন।"

কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক কথাবার্তা হইল। কথাবার্তাটা একটু বেশি উদ্যোগী হইয়া চালাইল মীরাই। যখন বুঝিল সরমা-সম্পর্কীয় ব্যাপারটা তাবৎকালের জন্য আমার মন হইতে মুছিয়া গিয়াছে, বা যাওয়া সম্ভব, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই সাহিত্যের কথা তুলিল, ওদের লক্ষ্য করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, মাঝখানে আপনারা সাহিত্য-চর্চার জন্যে একটা ছোটখাট প্রতিষ্ঠান তৈরী করবেন বলে বলেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু, কি হ'ল তার?"

মৃগাঙ্ক বলিল, "তারও উৎস আপনারাই। দেখলাম দু-চার দিন কথার পর আপনার উৎসাহই নিভে এল..."

কেন যে নিভিয়া আসিয়াছিল তাহা এদের রসজ্ঞানের যেটুকু নমুনা দেখিলাম তাহা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। মীরা বলিল, "না, ঠিক নেভেনি; বাবা কুমিল্লায় চলে যেতে প'ড়ে গেলাম একলা, মা'র শরীর খারাপ, নানা ঝঞ্ঝাটে আর ওদিকে মন দিতে পারিনি। আপনাদের সঙ্কল্প যদি আবার রিভাইভ্ করেন তো খুব একজন উপযুক্ত লোক পেতে পারি আমরা। আমাদের শৈলেনবাবু একজন উদীয়মান কবি এবং সাহিত্যিক,—আপনারা নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই এঁর..."

যে যেমনটি ছিল একেবারে চিত্রার্পিতের মত স্থির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল, কাহারও পেয়ালা ঠোঁটের কাছাকাছি আসিয়া থামিয়া গিয়াছে, কাহারও টেবিলের কাছাকাছি নামিয়া, কেহ একটা চুমুক টানিয়াছে, না গিলিয়া গলা ফুলাইয়া চাহিয়া আছে, কেহ ঠোঁটে পেয়ালা ঠেকাইয়া বিস্মিত দৃষ্টি তুলিয়া আমায় দেখিতেছে,—একটু একটু করিয়া পেয়ালাব গা গড়াইয়া টেবিল ক্লথের উপর চা পড়িতেছে, আশ্চর্যের অভিনয়ে বাধা পড়িবে বলিয়া সেদিকে আর লক্ষ্য করিতে পারিতেছে না।

একটু পরে যেন সম্বিত পাইয়া কয়েকজন একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, 'ইনিই আমাদের শৈলেনবাবু?"

নগণ্যতা থেকে একেবারে খ্যাতির শিখরে উঠিয়া গেলাম। বায়রণের তবু খ্যাতিহীনতা আর খ্যাতির মাঝখানে একটা রাত্রির ব্যবধান ছিল, আমার বোধহয় একটা মুহূর্তও নয়। 'উদীয়মান সাহিত্যিক'কে অভিনন্দিত করিবার জন্য একেবারে ঠেলাঠেলি পড়িয়া গেল যেন। অলোক বলিল, "বর্ণচোরা আম মশাই আপনি, হু কুড থিংক্ যে আপনিই আমাদের শৈলেনবাবু....নাউ; প্লীজ..."

শেক্হ্যাণ্ড করিবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিল। লজ্জিতভাবে শেক্হ্যাণ্ড করিয়া হাতটা টানিয়া লইব, মৃগাঙ্ক হাত বাড়াইয়া বলিল, "আসুন, বাঃ আমাদের হাতে সাহিত্য বেরোয় না বলে অস্পৃশ্য নাকি? হাঃ হা হা—"

নীরেশ একটু দূরে ছিল, টেবিলের ও-প্রান্তে; আগাইয়া আসিয়া হাতে একটা কড়া ঝাঁকুনি দিয়া হাতটা মুষ্টিবদ্ধ রাখিযাই মীরার পানে চাহিয়া নালিশের সুরে বলিল, "কিন্তু আমি আপনাকে কোনমতেই ক্ষমা কবতে পারব না মিস রায়, এ-হেন লোককে, এতদিন আমাদের কাছে অপরিচিত রাখবার জন্যে।"

শেক্হ্যাণ্ডের সঙ্গে একটা মানানসই কথা বলাও দরকার। সেটা সংগ্রহ না হওয়ায় নিশীথ এতক্ষণ হাত বাড়ায় নাই, এইবার নীরেশের কাছ থেকে হাতটা প্রায় ছিনাইয়া লইয়াই খানিকটা মৃগাঙ্কের কথা, খানিকটা নীরেশের কথা একত্র করিয়া বলিল, "আসুন, হাত মিলিয়ে নেওয়া যাক, এইবার থেকে এই কাঠখোট্টা হাত দিয়েও কবিতা বেরুবে ফরফরিয়ে।...সত্যি মিস্ রায়, আপনাকে আমরা ক্ষমা করতে পারব না, কখনও না, নেভার..."

মীরা হাসিয়া বলিল, "বাঃ, আমায়ই কি উনি বলেছেন নাকি কখনও? আমি নিজে আবিষ্কার করলাম 'কল্লোলে' ওঁর একটা লেখা দেখে।"

নীরেশ নিজের সীটে না বসিয়া আরও এদিকে দীপ্তির চেয়ারের পাশটাতে দাঁড়াইল, তাহার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি শৈলেনবাবুর লেখা পড়েননি মিস্ মল্লিক?"

বেশ বুঝিলাম দীপ্তি একটু ফাঁপড়ে পড়িয়াছে। ও যেন ভয়ে ভয়েই ছিল এই রকম গোছের একটা প্রশ্ন এদের মধ্যে কেউ না কেউ করিয়া বসিল বলিয়া। অপরাধীর মত কুণ্ঠিতভাবে একটা রগ টিপিয়া বলিল, "ঠিক মনে হচ্ছে না, তবে নিশ্চয় পড়ে থাকব।"

"নিশ্চয় পড়েছেন,—শৈলেন—শৈলেন।"

মীরা সাহায্য করিল, "শৈলেন মুখার্জি।"

তর্জনী দিয়া বিলাতী কায়দায় তিনবার কপালে টোকা মারিয়া নীরেশ বলিল, "ডিয়ার মি! পদবীটা পেটে আসছিল, মুখে আসছিল না। ঠিক, শৈলেন মুখার্জি-শৈলেন মুখার্জি। ওঁর লেখা তো প্রায়ই চোখে পড়ে, এই সেদিন তো 'প্রবাসী'তে একটা চমৎকার কবিতা পড়লাম।

যে-সময়ের কথা, তখন 'প্রবাসী' আমার স্বপ্নেরও অতীত। তাহার মাস আষ্টেক পূর্বে আমার দুইটি কবিতা 'অঞ্জলী' নামক একটি মাসিকে উপরি-উপরি দুইবার প্রকাশিত হয়, তৃতীয় মাসে কাগজটি উঠিয়া যায়, বোধ হয় সে গুরুপাপেই। তাহার পর 'মানসী' ও 'কল্লোলে' গুটি কয়েক গল্প বাহির হইয়াছে।...এই অল্প পুঁজির উপর এ রকম রাশীকৃত যশের চাপে আমি গলদঘর্ম হইয়া উঠিতেছিলাম।

মীরা বোধ হয় বিশ্বাস করিল, 'প্রবাসী' ঘটিত কথাটা, একটু অভিমানের সুরে বলিল, "বাঃ, কই, আমায় তো বলেননি শৈলেনবাবু?"

যশের মোহ অথচ তাহার মিথ্যার গ্লানি,—আমতা-আমতা করিয়া চুপ করিয়া গেলাম।

নিশীথ প্রতিধ্বনি তুলিল, "কেন, আমিও তো সেদিন ইয়েতে ওঁর একটা প্রবন্ধ পড়লাম; আমাদের মধ্য কত ডিসকাশন্ হয়ে গেল সেই নিয়ে। কি আর্টিক্‌লটার নাম মিস্টার মুখার্জি?

যেমন অসহ্য, স্বীকার করিয়া লইলে তেমনি বিপজ্জনক। আমি বিনীতকণ্ঠে নিবেদন করিলাম, "কই আর্টিক্‌ল্ তো আমি লিখিনি কোথাও!"

নিশীথ চা-য়ের পেয়ালাটা নামাইয়া চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল, টেবিলে একটা ঘুঁষি মারিয়া বলিল, "লিখেছেন; আমি নিজে পড়েছি, এখানে 'না' বললে শুনব? আত্মগোপন করা তো স্বভাব আপনাদের সাহিত্যিকদের।"

এমন বিপদেও মানুষে পড়ে। আমি নিরুপায় লজ্জার সহিত কথাটা মানিয়া লইয়া বিনয়োচিত মৃদুহাস্য করিতে লাগিলাম।

উদ্ধার করিল শোভন। লোকটা ক্রমাগত চুরুট টানিতে টানিতে সামনের ব্যাপার পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে, কথা কয় কম। তবে যেটুকু বলে তাহাতে স্পষ্টতার ছাপ থাকে। আমার সহিত করমর্দনের সৌভাগ্য হইতে ঐ একটি লোক নিজেকে বঞ্চিত রাখিয়াছে এখন পর্যন্ত। এদের অভিমতে শোভন একটু দেমাকী।

চুরুট টানার ফাঁকে ফাঁকে বলিল, "মিস্টার মুখার্জিকে পাওয়া তো আমাদের খুবই সৌভাগ্য, তোমার আর্টিকেলের কথাও তো উনি শেষ পর্যন্ত মেনে নিলেন, নিশীথ, কি করা হবে তোমাদের ওঁকে নিয়ে সেটার একটা ঠিক করে ফেল।"

"করা—মানে..." নিশীথ মীরার পানে চাহিল, অর্থাৎ কী সে মূল প্রস্তাব যাহার প্রতিধ্বনি সে করিবে?

মীরা টেবিলের উপর আঙুলগুলি সঞ্চালিত করিতে করিতে বলিল, "আমি বলছিলাম শৈলেনবাবুকে কেন্দ্র ক'রে আমাদের একটা সাহিত্যবাসর গড়ে তুললে কেমন হয়?...তুমি কি বল সরমাদি?"

সরমা বলিল, "খুবই ভাল হয় তো; খাঁটি একজন সাহিত্যিককে পাওয়া..."

সরমার কথার দাম অন্য রকম; আমি প্রকৃতই লজ্জিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম।

নীরেশ বলিল, "তাহ'লে ওঁকে কেন্দ্র করার মানে..."

মৃগাঙ্ক সমর্থনের জন্য মীরার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "কেন্দ্র করা মানে মীরা দেবী

মীন করছেন সভাপতি আর কি।"

মীরা বলিল, "ওই তো ওঁর প্রকৃষ্ট আসন। আজ এখান থেকেই আমাদের সভা প্রতিষ্ঠিত ক'রে দেওয়া যাক না কেন—শৈলেনবাবুর সভাপতিত্বে। আমি প্রস্তাব করছি"...

'হিয়ার হিয়ার!' বলিয়া সকলে সমর্থন করিতে গিয়া হঠাৎ মীরার পানে চাহিয়া থামিয়া গেল। মীরা উদ্বিগ্নভাবে সোজা হইয়া বলিল, "কিন্তু কি ক'রে হবে? ভাগ্যিস মনে পড়ে গেল।...আপনার তরু কোথায় মাস্টারমশাই? আমরা দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে বসে আছি। তার বিকেলে বেড়াতে যাওয়া যে নিতান্ত দরকার। ডাক্তার বোস বিশেষ ক'রে বলে রেখেছেন। আপনাকে তো সে-কথা বলেওছি মাস্টারমশাই, দেখছি আজকের গোলমালে আপনিও ভুলে বসে আছেন।...মাস্টারমশাইকে আমরা সবাই পার্টিতে খুবই মিস্ করব কিন্তু ওঁর যা আসল কাজ..."

মীরা যেন নিরুপায় ভাবে একবার সবার পানে চাহিল। এক মুহূর্তে সবার মূর্তি বদলাইয়া গেল। আবার চারিদিক হইতে প্রতিধ্বনি উঠল—"ও ইয়েস্, মিস্ করব বৈকি, কিন্তু ডিউটি ইজ্ ডিউটি...আচ্ছা, মাস্টারমশায়ের সঙ্গে আবার আলাপ হবে এ বিষয়ে...সাহিত্য-চর্চার সময় তো আর চলে যাচ্ছে না, কিন্তু কর্তব্য তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না...শি ইজ্ এ স্টার্ন মিসট্রেস" (কর্তব্য বড় কড়া মনিব)।

কে একজন ওয়ার্ডস্ ওয়ার্থের একটা কবিতা থেকে উদ্ধার করিয়া বলিল, স্টার্ন ডটার অব্ দি ভয়েস্ অব্ গড" (Stern daughter of the Voice of God)

শিখর হইতে পতন যে কি তা সেই দিন বুঝি। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিবার সময় যেন স্বপ্নে তাড়া খাওয়ার মত পা মুড়িয়া যাইতেছিল। সৌভাগ্যক্রমে আর কাহারও মুখের পানে দৃষ্টি যায় নাই, গিয়াছিল শুধু একবার সরমার মুখের দিকে, সত্য এবং শিষ্টতা আহত হইল কিনা দেখিবার কৌতূহলে।

সে আরক্তিম মুখে দৃষ্টি নত করিয়া বসিয়া ছিল।

১৬

আমার ডায়েরির সেই দিনের পাতায় মাত্র দুইটি কথা লেখা আছে,—"সাবাস মীরা!" কেন লিখিয়াছিলাম মনে আছে—

মীরা নিপুণ শিল্পী, যাহা ফুটাইতে চাহিতেছে এবং তাহা কিসে ফুটিবে, অর্থাৎ যাহাকে শিল্পীর সেন্স্ অব্ এফেক্ট বলে মীরার সেটা পূর্ণ আয়ত্তে। পার্টিতে সরমার আসিবার পর হইতে, বিশেষ করিয়া আমি তাহাকে প্রশংসা করিবার পর হইতেই মীরা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিল আমায় নামাইবে, মনে করাইয়া দিবে ওরা প্রশ্রয় দেয় তাই, নহিলে আমি কত নগণ্য। নামাইলই সে, যাহাতে আমার বা দর্শকদের মধ্যে কোন সন্দেহ না থাকে সেই জন্য প্রথমে উর্ধ্বে তুলিয়া দিয়া তাহার পর নামাইল; শূন্যে একটা স্পষ্ট সুদীর্ঘ রেখা অঙ্কিত করিয়া অতলে বিলীন হইয়া গেলাম আমি।

কিন্তু কেন নামাইল মীরা? আমার অপরাধটা কি ছিল? আগাগোড়া একটু অনুধাবন করিয়া দেখা যাক্।—

ব্যাপারটার সূত্রপাত হয় সরমাকে লইয়া, যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিয়াছি;—সরমাকে সেদিন পরিচিত করাইবার সময় অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এমন চমৎকার মেয়ে দেখা যায় না শৈলেন।" সরমা হাসিয়া বলিল, "এমন চমৎকার কাকীমা দেখা যায় না শৈলেনবাবু, মিছিমিছি এত প্রশংসা করতে পারেন।"

আমি বলিলাম, "যোগ্যের প্রশংসায় একটা মস্ত বড় আনন্দ আছে কিনা সরমা দেবী...

কথা লঘুভাবেই বাড়িয়া যায় এবং সরমাকে আমি আরও খানিকটা বাড়াইয়া দিই। এইখানে

মীরার নিষ্প্রভ হাসির কথা উল্লেখ করিয়াছি। পছন্দ হয় নাই মীরার। পৃথিবীতে এত লোক থাকিতে আমি সরমাকে অর্থাৎ সরমার মত সুন্দরীকে প্রশংসার এত যোগ্য ঠাহর করিতে গেলাম কেন? মীরার যে এটা ভাল লাগে নাই তাহাই নয়, এই ভাল না-লাগার ব্যাপারটা যে আমি ধরিয়া ফেলিয়াছি সেটা মীরা টের পাইয়াছিল। ব্যাপারটা এইখানে সামলাইয়া যাইত, কিন্তু তাহা না হইয়া আরও বাড়িয়াই গেল; মীরার কটু লাগিতেছে জানিয়াও আমায় আবার এই দ্বিতীয়বার বলিতে হইল যে, সরমা আমাদের মধ্যে আসিয়াছে বলিয়া আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। মীরার ঈর্ষাকে কোথায় ঠাণ্ডা করিব, না উদ্রিক্ত করিয়া তুলিলাম। কিন্তু উপায় ছিল না; ওইটুকু না বলিলে ঘোরতর অন্যায় হইত।

মীরা চা ঢালিতেছিল, ঠিক এই সময়টিতে তাহার হাত হইতে ছলকিয়া খানিকটা চা টেবিল ক্লথের উপর পড়িয়া যায়। ইহার পরই মীরার প্রতিশোধ আরম্ভ হয়; অনাড়ম্বর কিন্তু অব্যর্থ।

একটু পরেই, কতকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবেই যেন মীরা সাহিত্য-চর্চার কথা তুলিল; আমার পরিচয় দিল।...আমি স্বীকার করিতেছি মীরার হঠাৎ এই দিক্-পরিবর্তনে আমার সতর্ক হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পারি নাই। নিজেকে দোষ দিব না—অবশ্য মীরার উপগ্রহদের প্রশংসার কথা ধরি না, মীরার নিজের মুখের দুইটা প্রশংসার কথায় যে কি সুধা আছে তাহা দুইটা মসির আঁচড়ে আপনাদের কি করিয়া বুঝাইব?—আমি তাই সতর্ক থাকিতে পারি নাই; আমি আমার মোহের সাজা পাইয়াছি।

আমি বুঝিতে পারি নাই যে, প্রশংসার আড়ালে মীরা আমার জন্য নিদারুণ অপমানকে আগাইয়া আনিতেছে। সভাপতি করিবার প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গেই সে আমায় জানাইয়া দিল,—সভাপতি হইব কি, আমার এদের সভায়, এদের পার্টিতে বসিবার অধিকারই নাই। কাণ্ডটা যে উদ্দেশ্যে করা, তদনুরূপ ভাষায় প্রয়োগ করিলে দাঁড়াইত—'যে কাজের জন্য মাইনে দিয়ে রাখা তাই করুন গিয়ে। বাড়িতে পার্টি হচ্ছে তো আপনার কি সম্পর্ক তার সঙ্গে? আর সভাপতি যখন হবেন, হবেন; আপাতত সে-সব বড় কথা ছেড়ে তরুকে বেড়িয়ে নিয়ে আসুন।'

ইতি পূর্বে বোধহয় বলিয়াছি, মীরার এ আক্রোশ একটা মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই মিথ্যার একদিকে আমার যেমন দারুণ লজ্জা, অপরদিকে তেমনই সুনিবিড় তৃপ্তি। লজ্জা এই জন্য যে, মীরা ভাবিল আমি সরমার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছি, তাই এত লোক থাকিতে সরমার যোগ্যতার দিকে আমার এত দৃষ্টি, তার উপস্থিতির জন্য এত কৃতজ্ঞতার ছড়াছড়ি।—এত লজ্জা জীবনে বোধহয় আমার কমই ঘটিয়াছে। আমি সরমার বিষয় যাহা শুনিয়াছি, এ-বাড়িতে তাহার যে প্রতিষ্ঠা, তাহার জন্য তাহার প্রতি আমার একটা অপরিসীম শ্রদ্ধা আছে। আমার বিশ্বাস যে, যে সরমার তিল তিল করিয়া আত্মোৎসর্গের কথা জানিবে, সে ওকে না ভালবাসিয়া পারিবে না; যে জানিবে, তাহার পরও যদি বাসনা দিয়া সরমার বায়ুমণ্ডল কুলষিত করিতে চায়, বিশেষ করিয়া এই বাড়িতেই থাকিয়া, তো তাহার মনুষ্যত্বে সন্দেহ হইবারই কথা।

এই একই মিথ্যার অন্য দিকে চরম তৃপ্তি।—মীরা যদি ধরিয়াই লইয়া থাকে আমি সরমার পক্ষপাতী তো তাহাতে তাহার কি?—ঈর্ষা? যদি তাহাই হয় তো কোথায় সে ঈর্ষার উৎস?—আমার আর মীরার মাঝে নূতন করিয়া সরমা—এর মধ্যেই নয় কি?

কিন্তু এ-সব কথা যাক্।

তখনকার সবচেয়ে বড় কথা যা মনের সামনেই ছিল তা এই যে মীরাদের বাড়িতে আমার এই শেষ দিন। মীরা আমায় কয়েকবারই খুব নিকটে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়াছে, কিন্তু আজ চরম। তীব্র অপমানে শরীরটা কি ভারী করিয়া দেয়? পার্টির মধ্য হইতে বাহির হইলাম যেন সমস্ত মাটি তিল তিল করিয়া মাড়াইয়া চলিয়াছি, পা উঠিতেছে না' যেন—আমার অদ্ভুত চলার দিকে সবাই যেন চাহিয়া আছে—প্রত্যেকটি চক্ষুতে যেন ব্যঙ্গের কটাক্ষ—আমি এদের স্তরের একজন মেয়েকে ভালবাসিতে গিয়াছি...স্পর্ধা!

তরুকে লইয়া তাড়াতাড়ি মোটরে বাহির হইয়া গেলাম।

মাঠের পর গঙ্গার ধার, তাহার পর স্ট্রাণ্ড রোড অতিক্রম করিয়া ব্যারাকপুর রোড—আশ মিটিতেছে না, ইচ্ছা করিতেছে দূরে—আরও দূরে যাই, যেখানে আজকের অপরাহ্নের স্মৃতি আর পৌঁছিতে পারিবে না। ড্রাইভারকে আদেশ দিয়া স্তব্ধভাবে বসিয়া আছি, তরু প্রশ্ন করিয়াছে, এক-আধটা উত্তরও দিয়া থাকিব, কিন্তু কি প্রশ্ন আর কি উত্তর তা একেবারে মনে নেই। শুধু একটা কথা মনের মধ্যে ক্রমেই দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে,—কালই, তার বেশি আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। কাজ তো গৃহশিক্ষক, বাড়িতে এত বড় একটা উৎসবের মধ্যেও যাহার তিলমাত্র স্থান নাই বলিয়া মীরাই জানাইয়া দিল,—তাহার জন্য আবার নোটিশ দেওয়া কি?

ফাঁকা রাস্তা, মোটরের হুড নামাইয়া দিয়াছি; হু হু করিয়া বাতাস আসিয়া মুখে চোখে সর্বাঙ্গে লাগিতেছে। তবুও ড্রাইভারকে মাঝে মাঝে বলিতেছি,"আরও একটু জোর দেওয়া যায় না জগদীশ?"

ফিরিবার সময় মাথাটা অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। বেশ একটু রাত হইয়াছে, কিন্তু তখনও কলিকাতার বাহিরে। রাত্রির প্রশান্তির মধ্যে চিন্তার ধারা বদলায়। প্রতিজ্ঞা এরই মধ্যে একটু শিথিল হইয়াছে। অল্পে অল্পে নিঃসাড়ে একটা প্রশ্ন আসিয়া মাথায় জাঁকিয়া বসিয়াছে—মীরার দোষ কোথায়?

—আমি গৃহস্থসন্তান; ঠিক তাহাও নয়, দরিদ্রসন্তান। পড়িব এই উচ্চাশা লইয়া টুইশ্যন করিতেছি, তাহাতে ভগবান আমার আশার অতিরিক্ত সুযোগ দিয়াছেন। ফলও পাইতেছি;—সর্বপ্রকার সুবিধা এবং নিশ্চিন্ততার মধ্যে পড়াশুনা করিতে পাওয়ায় আমি এখন এম্-এ ক্লাসের একজন বিশিষ্ট ছাত্র। আমি এর বেশি আর কি আশা করিতে পারি? কিন্তু অচিন্ত্যনীয় সফলতাকেও অতিক্রম করিয়া আমার বাসনা মাথা চাড়া দিয়া উঠিল—আমি চাই মীরাকে—আমার মনিবের সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, অসাধারণ তীক্ষ্ণধী কন্যা মীরাকে, যে-কোন এক রাজকুমারেরও পরম কাম্য ধন।

না, মীরার দোষ নাই। মীরা আমার উপকার করিয়াছে। আমি দিশেহারা হইয়াছিলাম, মীরা বন্ধুর মতই আমায় আমার নিজের জায়গাটিতে ফিরাইয়া আনিয়াছে। বোধহয় ব্যাপারটা বেশ সুমিষ্টভাবে করে নাই; ভালই করিয়াছে, রুচিকর করিতে গেলে আমার চৈতন্য হইত না।

না, নিজের স্বার্থের জন্য থাকিতে হইবে, থাকিতে হইবে নিজের গণ্ডী সম্বন্ধে সচেতন হইয়া।

মনে রাখিতে হইবে—আমার গণ্ডীর মধ্যে আছে মাত্র তরু, আর সবাই, সব কিছুই গণ্ডীর বাহিরে।

বাসায় যখন ফিরিলাম তখন আমার প্রতিজ্ঞা একেবারে শিথিল হইয়া গিয়াছে। অথবা এমনও বলা চলে, প্রতিজ্ঞাটার আকার পরিবর্তিত হইয়াছে এবং সেটা আরও দৃঢ় হইয়াছে। অর্থাৎ থাকিতে হইবে।

সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতার কথা ভুলিয়া গিয়াছি; মনটা মীরার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া আসিতেছে।

১৭

ফিরিতে বেশ রাত হইয়া গেল। পড়ার হ্যাংগাম নাই, তরু উপরে চলিয়া গেল।

দেখি ইমানুল আমার দুয়ারের কাছে, বারান্দাটিতে দাঁড়াইয়া আছে, আমারই অপেক্ষায় যেন। পার্টির সময় যে-সুটটা পরিয়াছিল, এখনও ছাড়ে নাই।

আমি সামনে আসিতেই একটু অপ্রতিভ ভাবেই হাসিয়া বলিল, "বড় লেট্ হ'য়ে গেল বাবু আজকে আপনাদের।"

এ-বাড়িতে ইমানুল, ক্লীনার সকলেরই একটু-আধটু ইংরেজী বলিবার ঝোঁক আছে। ওরা যে ব্যারিস্টার সাহেব বাড়ির চাকর, অন্য কোথারও নয়; এক-আধটা বুক্‌নি দিয়া বোধহয় সেইটে সূচিত

করে, সবাই অন্তত সাত-আটটি করিয়া কথা জানে; অবশ্য রাজু বেয়ারা একটা স্কলার।

আমার দৃষ্টিটা হঠাৎ ইমানুলের শান্ত মুখের উপর যেন নিবদ্ধ হইয়া গেল। আমার যেন মনে হইল এতদিন একটা কৃত্রিম উচ্চতায় আরোহণ করিয়া ইমানুলকে ভাল করিয়া বুঝি নাই, আজ নিজের স্থানটিতে ফিরিয়া আসিয়া ইহাকে বেশ বুঝা যাইতেছে, চেনা যাইতেছে। ইমানুল আমার স্তরের মানুষ, আর একটু বোধহয় নীচে—তা এমন নীচেই বা কি? ওর ভাই আছে, ভাজ আছে, ছোট ছোট ভাইপো-ভাইঝি আছে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র গৃহস্থের সংসারের মধ্যে হইতে তাহারা বোধহয় ওর দিকে চাহিয়া আছে। ইমানুল বাহিরে আসিয়াছে, পৃথিবীকে ভাল করিয়া দেখিতেছে, শিখিতেছে, উপার্জন করিতেছে; কোন এক সময়ে ফিরিবেই বাড়ি, বাড়ি ছাড়িয়া কেহ কি চিরদিন থাকিতে পারে? বাড়ির জন্যই উপার্জন করা, নিজেকে বড় করিয়া তোলা মানুষের...।

সব দিক দিয়া আমার সঙ্গে ইমানুলের একটা নিবিড় সাম্য আছে।...মীরা যেন আরও দূরে চলিয়া গেল।

কেমন অদ্ভুত কাণ্ড, ভুলের মধ্যেও ইমানুলের সঙ্গে আমার একটা সাদৃশ্য রহিয়াছে! আমি চাই মীরাকে, ইমানুল চায় মিশনারী সাহেবের যুবতী ভ্রাতুষ্পুত্রীকে। ইমানুল শুনিয়াছি মাহিনা লয় না; মিস্টার রায়ের নিকট মাসে মাসে দশ টাকা করিয়া তাহার মাহিনা জমা হইতেছে। চার বৎসর হইয়াছে। হিসাব না-জানার কল্যাণে ইমানুল মনে মনে সঞ্চিত টাকাটার যে আন্দাজ করিয়া রাখিয়াছে সেটা আমাদের অঙ্কশাস্ত্র মত প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি। অর্থাৎ ইমানুল আমার চেয়েও মজিয়াছে।

ইমানুলকে বাঁচাইতে হইবে। আমার মোহ ভাঙিয়াছে মীরা, ইমানুলের যে মোহিনী সে কি তাহার মোহ ভাঙিতে আসিবে? না, ও-কাজটা আমায়ই করিতে হইবে, আমরা পরস্পরকে না দেখিলে দেখিবে কে?—এই গৃহস্থরা, এই দরিদ্ররা?...

আমায় ঠায় চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া ইমানুল লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করিল একটু, সঙ্গে সঙ্গেই আবার আমার মুখের পানে চাহিয়া, চক্ষুপল্লব কয়েকবার দ্রুত স্পন্দিত করিয়া বলিল, "তাহ'লে যাই এখন, দেরি হ'য়ে গেছে আপনার, এই বাট্‌ন্-হোলটা লেন।"

দুঃখের আঘাতে এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছি, ইমানুল মালীর সঙ্গে একটু ঠাট্টা করিবারও প্রবৃত্তি চাপিতে পারিলাম না। বাট্‌ন্-হোলটা নিজের নাকের কাছে ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম, "আহা বেশ চমৎকার! থ্যাংক্ ইউ মিস্টার ইম্যানুয়েল বোরান।

ইমানুল হাসিয়া আবার মাথা নত করিল। হাসিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কিন্তু ব্যাপারখানা কি বল দিকিন, চিঠি লিখতে হবে?"

ইমানুল মাথা নত করিয়াই বলিল, "কালই আসব তখন, মাস্টারবাবু, আজ রাত হয়ে গেল আপনার...মিছেই লেখা বোধহয় বাবু, তবে টাকা অনেক জমিয়েছি, ফাদার চাইল্ড যদিই শোনে..."

কেমন এক ধরনের মূঢ় আশার হাসি হাসিল একটু।

আমি ইমানুলকে নিরস্ত করিব ঠিক করিয়াছিলাম, ওর মুগ্ধতা দেখিয়া প্রাণ সরিল না। কি হইবে মোহ ভাঙিয়া? থাক না; মোহই তো জীবন। ফাদার চাইল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্রী তো জন্মে আসিবে না উহার কাছে, ও নির্ভয়ে করুক না পূজা।...মীরা যে আমার জীবন হইতে চলিয়া যাইতেছে, সুখী কি আমি সেজন্যে? ওর ভ্রান্তি যদি কখনও আমার মত আপনা-আপনিই ঘোচে, ঘুচিবে। ততদিন তাই থেকে জীবনের রস নিংড়াইয়া নিক না।

বলিলাম, "বলা যায় না ইমানুল, তুমি যেমন চাইছ, সেও তো তোমায় সেই রকম চাইতে পারে, তাহ'লে মাঝে থাকবে শুধু ফাদার চাইল্ডের মতটুকুর অপেক্ষা। তার জন্যে তো ন্যাথেনিয়ল রয়েছেই, চেষ্টা করবেই।...নাঃ, তুমি কাল নিশ্চয় এস।"

ইমানুল কৃতকৃতার্থ হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় রাজু বেয়ারা আসিয়া উপস্থিত হইল। ইমানুলের পানে চাহিয়া বলিল, "জুটেছে সেই পোস্টকার্ড নিয়ে মহাভারত লিখুতে তো?

ওঃ, আজ আবার রাজবেশ।"

ইমানুল লজ্জিতভাবে সরিয়া গেল।

রাজু ঘরে ঢুকিয়া লাইটটা জ্বালিয়া বলিল, "আপনাদের রাত হ'য়ে গেল আজ, দিদিমণি ক-বার জিগ্যেস করলেন।"

আমার মুখ দিয়া আপনিই বাহির হইয়া গেল, রাগ করেছেন নাকি?

আজ বিকেলের আগে পর্যন্ত এমন কথা বলিতাম না। এই সন্ধ্যার পর থেকে হঠাৎ আবার মনিবের সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে মীবার সঙ্গে। যাহা বলিয়া ফেলিলাম আজকালকার মনোবিশ্লেষণের ভাষায় তাহাকে বলা যায়—অবচেতনার খেলা।

রাজু কোটটা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "নাঃ তেনার শরীরে রাগ নেই, সে রকম স্বভাবই নয়। আপনি নিশ্চিন্দি থাকুন মাস্টার-মশা।"

এই আশ্বাসে আমার গা'টা যেন ঘিন ঘিন করিয়া উঠিল, কত নামিয়াছি আজ! রাজু আশ্বাস দেয়! ওকে জানাইয়া ফেলিয়াছি আমি শঙ্কিত।

রাজু হঠাৎ টেবিল ঝাড়া বন্ধ করিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "একটা কথা শুনেছেন মাস্টারমশা?—হাইকোর্টে অরিজিন্যাল সাইডে এবাব রেকর্ড নম্বর কেস।"

আজ পার্টিতে ব্যারিস্টার মহলে শোনা কথা।...তরু, চোখ বড় করিয়া বলে "মাস্টারমশাই, কি নেশা রাজুর! তেমন তেমন বড় কথাগুলো আবার তক্ষুণি গিয়ে বাংলায় লিখে নেয়—তারপর মুখস্থ করে ফেলে।"

আজকের পার্টিতে ইংরেজী ফসল সংগ্রহ হইয়াছে বেশ মোটা রকম? অকারণে আসবাব ঝাড়িতে ঝাড়িতে ওর মুখের ভাব দেখিয়া স্পষ্ট বোঝা যায় পরিচয় দেবার জন্য রাজুর পেট ফুলিতেছে। আবার একটা ওজন-দুরস্ত বোঝা নামাইতে যাইবে, উপর হইতে বিলাস ঝিয়ের গলা শোনা গেল, "রাজু, মীরা দিদিমণি শীগ্‌গির তোমায় ডাকছেন, যেমন আছ চলে এস।"

বিলাস সিঁড়ির অর্ধেকটা নামিয়া আসিয়া খবর দিয়া আবার উঠিয়া গেল। বিলাস ঝি হোক, কিন্তু একটা রাজবাড়ির প্রতিনিধি—একটু পর্দানশীন্। বনেদী ঝি, আজকালকার আয়া নয় তো।

বাজু বেচারার মুখটা ফ্যাকাশে হইয়া গেল, "ঐ যাঃ, ভুলেই গেছলাম"—তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়া একটা মুখসাঁটা খাম আমার হাতে দিয়া হন্তদন্তভাবে বাহির হইয়া যাইতেছিল, আবার উপর হইতে তাগাদা হইল—এবার খুব ত্রস্ত—"রাজু শোন, একটু শীগ্‌গির এস।"

এবার সিঁড়ির মাথা থেকে। ডাকিতেছে স্বয়ং মীরা। কণ্ঠস্বর খুব বেশি রকম উদ্বিগ্ন।

আমি শঙ্কিত কৌতূহলে বাহির হইয়া আসিলাম; কিন্তু মীরা তখন আবার নিজের ঘরে চলিয়া গিয়াছে; দেখিতে পাইলাম না।

ডাকের চিঠি নয়, মাত্র শুধু নামটা লেখা, তাও বাংলায়। চিঠি কে দেয়?... চিন্তার মধ্যে খামটা খুলিয়া ফেলিলাম।

ঠিক চিঠি জাতীয় কিছু নয়, নিতান্ত সংক্ষিপ্ত দু'টি কথা—

'মাস্টারমশাই, সরমা আমার প্রবাসী দাদার বাগদত্তা।"

মুহূর্তের মধ্যে আমার সামনে বিজলী বাতি, ঘরের আসবাবপত্র সমেত যেন একটা আকস্মিক অন্ধকারের বন্যায় ডুবিয়া গেল। সমস্ত মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া এক সূচীভেদের তীক্ষ্ণ জ্বালা, তাহার পর যেন নিজের অস্তিত্ব অনুভবই করিতে পারিলাম না।

কখন বসিয়া পড়িয়াছি, কতক্ষণ বসিয়া আছি জানি না। নিজেকে আবার অনুভব করিলাম রাজুর কথায়। রাজু হাঁপাইতেছে, মুখটা শুকাইয়া গিয়াছে, যেন কতদূর থেকে প্রাণপণে ছুটিয়া আসিয়াছে। বলিল, "মাস্টারমশা, সেই চিঠিটা—এক্ষুনি যে দিয়ে গেলাম?...চাইছেন দিদিমণি..."

সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বর এলাইয়া পড়িল; ছিন্ন খামের দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে দীর্ঘ টানের সঙ্গে হতাশভাবে বলিল, "যাঃ, ছিঁড়ে ফেলেছেন?"

আস্তে আস্তে ফিরিয়া গেল, শুনিতেছি—সিঁড়ির ধাপে ওর মন্থর পদধ্বনি ধীরে ধীরে উঠিতেছে।

একটা অসহ্য রাত্রি গেল, সৃষ্টির আদিম অন্ধকারের মত দীর্ঘ। সেদিনের—সেই অপরাহ্নের উপযোগী একটা রজনী।

আমি মনে প্রাণে এই বাড়ি ছাড়িয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া আসিয়াছিলাম। স্থির করিয়াছিলাম থাকাই।—স্বার্থ। দরিদ্র যদি প্রতিজ্ঞা আঁকড়াইয়া থাকে তাহা হইলে তাহাকে আরও একটা জিনিস চিরদিনের জন্য আঁকড়াইয়া থাকিতে হয়, সে জিনিসটা দারিদ্র্য।...তাই ফিরিয়াছিলাম। অদৃষ্ট আবার চরণকে বহির্মুখী করিল।...উপায় নাই; এই চিঠি অল্প কথায় হইলেও স্পষ্ট করিয়া প্রকাশিত, এই কুৎসিত সন্দেহের পরও থাকিলে মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার সবই ছাড়িয়া একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকিতে হয়। স্বার্থের জন্য একেবারে নিঃস্ব হইয়া থাকিব কি না, সেই বিনিদ্র রজনীতে শুধু সেই কথাই ভাবিলাম।

১৮

পরের দিন প্রভাতে রৌদ্র ছিল মলিন, সমস্ত বাড়িটা থম্‌থম্ করিতেছে। হয়তো আসলে এরকম নয়, আর সব প্রভাতের মতই এটাও, শুধু আমার মনের ছায়া পড়িয়া এমনটা বোধ হইতেছে।

মীরা এদিকে রোজ সকালে বাগানে আসে। আমাদের অভিবাদনের বিনিময় হয়। আজ নামে নাই।

বেলা প্রায় নয়টা। তরু লক্ষ্মীপাঠশালা হইতে ফিরিয়া আসে নাই। মিস্টার রায় সকাল সকাল বাহির হইয়া গেলেন। আমি শ্রান্ত চরণে গিয়া মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইলাম। কাল তাহার চিঠি পাওয়ার পর থেকেই আহত মর্যাদার একটা তেজ অনুভব করিতেছি, সেই আমায় ঠেলিয়া আনিয়াছে, সেই আমায় মুক্তি দিবে।...কিন্তু কি অসীম ক্লান্তি! মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না।

তাহার পর চেতনা হইল—এমনভাবে মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়া থাকাটা কেহ দেখিয়া ফেলিতে পারে। ঠিক শোভন নয়।

নিজে বেশ বুঝিতেছি—একটা বিকৃত স্বরে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী আছেন?"

উত্তর হইল, "কে...আসুন।"

আমি পর্দা উঠাইয়া ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম।

মীরার ঘরটি একেবারে বিলাতী কায়দায় সজ্জিত। দেয়ালটা হালকা সবুজ রঙে রঙীন। মেঝের সেই রঙের মোটা কার্পেট, তাহার উপর কৌচ, সেটী, চেয়ার, কারুমণ্ডিত ছোট ছোট টেবিল, সবগুলিই ঈষৎ গাঢ় থেকে হালকা সবুজ রঙে সুসমঞ্জসিত। একদিকে একটা দেরাজসুদ্ধ মাঝারি সাইজের টেবিল। তাহার পাশে দুইটি সুদৃশ্য আলমারি ঝকঝকে বাঁধানো বইয়ে ঠাসা। দেয়ালের ছবিগুলি প্রায় সব বিদেশী—র‍্যাফেল, মাইকেল এঞ্জেলো থেকে আরম্ভ করিয়া রেনল্ডস্, টার্নার, মিলে প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের চিত্রকরদের আঁকা? দেশীয় মধ্যে কলিকাতার আর্ট এক্‌জিবিশনের পুরস্কার প্রাপ্ত ইউরোপীয় পদ্ধতিতে আঁকা তিন-চারিখানি ছবি।

ঘরটি সাজানোর মধ্যে রুচির পরিচয় আছে, তবে একটু যেন বাহুল্য-ঘেঁষা; দু-চারখানা আসবাবপত্র ও খানকতক ছবি কম থাকিলে যেন আরও ভাল হইত।...মীরার রুচি আছে, তবে সেই সঙ্গে আধিক্যপ্রিয়তার একটা ছেলেমানুষিও আছে। মেয়েছেলের মন একটু ছেলেমানুষি-ঘেঁষাই লাগে ভাল, অন্তত আমার ত ভাল লাগে।

মীরার ঘরে দেবদেবীর ছবি নাই; এই দিক দিয়া মায়ের সঙ্গে আড়াআড়িটা খুব স্পষ্ট।

অন্য কেহ ভাবিয়া মীরা স্বর শুনিয়াই 'আসুন' বলিয়া দিয়াছে, আমি আসিব মোটেই এটা ভাবে নাই। এই প্রথম আসাও আমার। টেবিলের উপর একটা কৌচে হেলান দিয়া পড়িতেছিল মীরা, অন্তত আমি যখন প্রবেশ করিলাম তাহার পাশেই একটা ছোট টেবিলে খোলা বই ওলটান পড়িয়াছিল, এবং তাহার উপর মীরার হাতটা ছিল।

কিন্তু একি চেহারা মীরার! আমি আসিবার সময় বারান্দার হ্যাটস্টাণ্ডের গোল আর্শিটাতে আমার নিজের চেহারার প্রতিচ্ছায়া হঠাৎ দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলাম ঃ মাত্র একটি রজনীর জাগরণ আমার; মীরা যেন ক-রাত্রি ঘুমায় নাই। মুখটা শুকাইয়া যেন লম্বাটে হইয়া গিয়াছে, চোখে রাজ্যের শ্রান্তি।

আমি ভিতরে আসিতেই মীরা বিস্মিত হইয়া মুহূর্ত মাত্র আমার পানে চাহিয়া রহিল, পরক্ষণেই সোজা হইয়া বসিয়া বলিল, "ও! আপনি?"

আমি বলিলাম, "একটু দরকাব পড়ে গেল, আসতে হল, ইন্ট্রুড্ করলাম কি?"

আর সময় দিলাম না; বিনয়টুকু প্রকাশ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে বলিলাম, "কাল রাত্রে রাজু আমায় একটা চিঠি দিয়ে আসে.."

মীরা ভদ্রতার খাতিরে উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইতেছিল, যেন ভুলিয়া গেল! আমার পানে চাহিয়া থাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না, তাহাব দৃষ্টি নত হইয়া গেল। আমি বলিলাম, "আর জিজ্ঞাসা করবার অত দরকার দেখি না, তবে আত্মতৃপ্তি বা স্পষ্টভাবে অতৃপ্তির জন্যে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি, মীরা দেবী—চিঠিতে যে কথাটার সংকেত আছে সে কি সত্যিই আপনি বিশ্বাস করেন?"

মীরা নিজের উপর সংযম হারাইতেছে, স্ত্রীলোক তো? তাহার উপর সেই স্ত্রীলোক যে ভালবাসিয়াছে। ভালবাসা দুর্বল করে, পুরুষকেও করে, স্ত্রীলোককেও করে, কিন্তু স্ত্রীলোককে যতটা করে পুরুষকে তার শতাংশের এক অংশও করে না বোধ হয়। এই দুর্বলতায় স্ত্রী পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি শক্তিশালিনী। মীরা যেন ব্যাকুল হইয়া পড়িল, আমার মুখের উপর শঙ্কিত দৃষ্টি তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কি সংকেত—সংকেত কি? আমি তো শুধু.." শেষ করিতে পারিল না। একদিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে, আর অন্য দিকে উত্তর নিষ্প্রয়োজন বলিয়া নির্বিকার দৃষ্টিতে আমরা উভয়ে উভয়ের দিকে একটু চাহিয়া রহিলাম। তাহার পর আমি বলিলাম, "সরমা দেবী যে আপনার দাদার বাগদত্তা সেটা আমি অনেক আগে থেকেই জানি, মীরা দেবী। আর জানার পর থেকে ওঁকে যতটুকু দেখতে বা বুঝতে পেরেছি, তা দিয়ে ওঁর সম্বন্ধে আমার খুব একটা বিস্ময়ের আর শ্রদ্ধার ভাব আছে। আমি এ সম্বন্ধে বেশি কিছু বলব না. কেন-না, খুব গভীর অনুভূতি আর উপলব্ধি সম্বন্ধে বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কথা জিনিসটা নিজেই হাল্কা বলে মনে হয় উপলব্ধিটাকেও হাল্কা করে ফেলবে। আমার এত কথা বলবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু এসে পড়ল। আসলে এ প্রসঙ্গটা তোলবারই ইচ্ছে ছিল না আমার, আমি বলতে এসেছিলাম অন্য কথা।"

মীরা দৃষ্টি নামাইয়া লইয়াছিল, আবার তুলিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। আমি বলিলাম, "আমি বলতে এসেছিলাম—আপনি যে আপনার সম্বন্ধে নিরাশ হয়েছেন এটা আমি বেশ অনুভব করছি—এই তরুর টিউটর বাছাই সম্বন্ধে।"

মীরা সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "সে কি!"

আমি ওর কথায় উত্তর না দিয়া বলিলাম, "এটা যে হবেই, আমার বরাবরই এরকম একটা আশঙ্কা ছিল—যে রকম বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রেই, পরিচয় না নিয়েই আপনি আমায় কাজে নিয়োগ ক'রে ছিলেন। আমি অনেকবার দেখেছি আপনার চেহারায় অনুতাপের ভাব ফুটেছে; যেন আপনি ঠকেছেন, যেন অন্যরকম টিউটর রাখা উদ্দেশ্য ছিল আপনার।"

মীরা বেশ ভাল করিয়া সোজা হইয়া বসিল; বেশ বুঝিলাম সরমার ব্যাপার থেকে আমার যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রসঙ্গে আসিয়া পড়ায় সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। বেশ সপ্রতিভ হইয়া

জোরের সহিত বলিল, "না, ও-কথা বলে আপনি আমার প্রতি অবিচার করছেন শৈলেনবাবু, আপনাকে রাখার জন্য মোটেই অনুতপ্ত নই আমি। আপনি খুব ভাল একজন শিক্ষক—মা, বাবা থেকে নিয়ে বাড়ির সবাই একথা স্বীকার করি আমরা। আমার মুখে এ ব্যাপার নিয়ে...."

আজ আমি চলিয়া যাইতেছি, সুতরাং সংকোচের আর প্রয়োজন কি অত? অবশ্য স্পষ্টভাবে মীরাকে আমি পাই নাই, তাই স্পষ্টভাবে কিছু বলার কথা উঠিতেই পারে না, তবু মন তো দু-জনের দু-জনেই আভাসে জানি? আভাসেই একটু বলা যাক্ না, কাল থেকে দু-জনের তো দুই পথ।

মীরাকে শেষ করিতে না দিয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, আমার কাজ তরুর মাস্টারি, তাতে আমি যথাসাধ্য করিই—এ আত্মপ্রত্যয়টুকু আমার আছে। আর, একটা মানুষের সবচেয়ে বড় প্রশংসা এই যে, সে যথাসাধ্য করছে। কিন্তু মাস্টারির অতিরিক্ত আর একটা কথা আছে।"

মীরা আমার পানে চাহিয়া বলিল, "বলুন।"

আমার একটু দ্বিধা আসিল, সেটা কাটাইয়া লইয়া বলিলাম, "সে কথাটা এই যে একটা মানুষ আমাদের আশেপাশে থাকলে তার সঙ্গে আমাদের কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরও অনেক সম্বন্ধ এসে পড়ে..."

মীরা দৃষ্টি নত করিয়া বাম অনামিকার আংটিটা ধরিয়া ধীরে ধীরে ঘুরাইতেছিল, এইখানে হঠাৎ থামিয়া গেল, মনে হইল তাহার মুখটাও যেন রাঙা হইয়া উঠিল। আমি মুহূর্তমাত্র একটু থামিয়া আবার বলিয়া চলিলাম, "কিছু না হোক একজন সঙ্গীও তো সে? কথাটা ঠিক সঙ্গী নয়, ইংরেজীতে যাকে বলে 'নেবার' (neighbour) অর্থাৎ যার সঙ্গে আত্মীয়তা না থাকলেও খুব কাছে থাকার হেতু একটা নিবিড় পরিচয় আছে। আমার মনে হয়, এই 'নেবার' হিসাবে আমি আপনাকে নিরাশ করেছি।"

মীরা আমার পানে তাহার সেই নিজস্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার চাহিল, ক্ষণমাত্র কি একটা ভাবিল, তাহার পর বলিল, "যখনই আপনার সাহায্য চেয়েছি একটুও বিরক্ত না হয়ে আপনি আমায় সাহায্য করেছেন; আপনি না থাকলে এই পার্টিটা যে কি হ'ত। এর পরেও আমি মনে করব আপনাকে নিয়োগ করা আমার ভুল হয়েছে? আমায় এত ছোট মনে করলেন কেন আপনি?"

এর পরে কথাটা বলিতে কষ্ট হইল, কিন্তু উপায় ছিল না বলিয়াই বলিলাম, "আমি ঠিক ও-কথা বলতে চাইছি না। সামান্য কি একটু করেছি না-করেছি সে নিয়ে আপনি লজ্জা দেবেন না আমায়। আমি কথাটা অন্যভাবে বলছিলাম—ধরুন, আপনার এই 'নেবার' তো এমনও হ'তে পারে যে, আপনার দাদার বাগদত্তার সম্বন্ধেই একটা অনুচিত মনোভাব পোষণ করতে পারে...।"

ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই সরমার কথা। চিঠির প্রসঙ্গটা চাপা পড়ায় মীরা যেন পরিত্রাণ পাইয়াছিল, এবারে কি করিবে, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ধীরে ধীরে সোফায় এলাইয়া পড়িল। হাত দুইটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখের উপর জড় করিয়া একটু মৌন রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহার মুখের রেখাগুলা কঠিন হইয়া উঠিল, নাসিকা প্রান্তের সেই কুঞ্চন জাগিয়া উঠিল। ধীরে অথচ একটু রূঢ়কণ্ঠে বলিল, "পারে বৈকি শৈলেনবাবু।"

আমার সমস্ত আত্মরাত্মা যেন বিদ্রোহ করিয়া উঠিল। কেমন করিয়া স্পষ্টভাবে কথাটা বলিতে পারিল মীরা! আমি বেশ ভাল করিয়া বুঝিতেছি, ও যাহা বলিল তাহা বিশ্বাস করে না। বিশ্বাসই করিবে তো রাজুকে দিয়া চিঠিটা ফিরাইয়া আনিতে গিয়াছিল কেন? ওর এটা বিশ্বাস নয়, পরন্তু সরমার সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা আতঙ্ক, যাহা অযথাই ওর মনে একটা ঈর্ষা আনিয়া দিয়াছে। এই ঈর্ষাটা এইজন্য নয় যে, আমি সরমাকে ভালবাসিয়া থাকিতে পারি, পরন্তু এইজন্য যে, মীরা আমায় ভালবাসে।...মীরা কি রকম মেয়ে আমি ভাল করিয়াই জানি,—যদি ওর বিশ্বাস হইত যে, আমি সরমার অনুরাগী, ও ওর প্রবাসী ভাইয়ের এ অপমান কোনমতেই সহ্য করিত না। চিঠি ফেরত লওয়া তো দূরের কথা; চিঠি লিখিতই না, অন্যভাবে এবং অবিলম্বে এ-বাড়ির সঙ্গে আমার সংস্রব ছেদন করিত।

সে-ছেদনে যদি আমার নিজের মর্মই রক্তাক্ত হইত তো মীরা গ্রাহ্য করিত না।

অবশ্য এখন যে উত্তরটা দিল সেটা আমার তর্কে কোণঠাসা হইয়া মরিয়া হইয়া; তবুও আমার মনটা এমন বিষাইয়া গিয়াছে যে, আমি মার্জনা করিতে পারিলাম না। বলিলাম, "এতবড় অন্যায় অপবাদ আমি আজ পর্যন্ত জীবনে পাইনি, মীরা দেবী; আর, সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, আপনি বোধহয় মন থেকে বিশ্বাস না ক'রেও এ-অপবাদটা আমায় দিলেন, কেন-না পার্টিতে যে ব্যাপারটুকু হয়েছিল—অর্থাৎ সরমা দেবীকে যে বারদুয়েক প্রশংসা করেছিলাম বা কমপ্লিমেন্ট দিয়েছিলাম—যা উপলক্ষ ক'রে এতটা ব্যাপার, তার আসলে হেতুটা আপনার মত বুদ্ধিমতী একজন যে বুঝতে পারেননি, এটা আমি কখনই বিশ্বাস করব না। কিন্তু থাক, সেটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাসের কথা, ভুল হ'তেও পারে। তাই আমায় ধরে নিতে হবে আপনি বুঝতে পারেননি কারণটা, সুতরাং নিজেকে ক্লিয়ার করবার জন্য আমার বুঝিয়ে দেওয়াই ভাল। সরমা দেবী সম্বন্ধে কাল আমি দু-বার দুটো কথা বলেছিলাম—একবার আপনার মায়ের সাক্ষাতে। আপনার মা সরমাদেবীকে আমার কাছে পরিচিত করার প্রসঙ্গে বললেন, 'এমন চমৎকার মেয়ে হয় না, শৈলেন,..' সরমা দেবী প্রশংসায় লজ্জিত হয়ে হেসে বললেন,—'এমন চমৎকার কাকীমা হয় না শৈলেনবাবু, শুধু শুধু এত প্রশংসা করতে পারেন!'...আমার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিন, একজন নবপরিচিতা মেয়ে সম্বন্ধে বলা হচ্ছে কথাটা, সে হিসাবেও অপর্ণা দেবীর প্রশংসাটা সমর্থন করা উচিত ছিল আমার। তাই আমি বলি, যোগ্যের প্রশংসায় মস্ত বড় এটা আনন্দ আছে সরমা দেবী।'...তারপর প্রসঙ্গ ধরে আরও একটুখানি প্রশংসা করতে হয়—আমার এই হ'ল প্রথম অপরাধ।"

মীরা তেমনই কঠিন হইয়া বসিয়া আছে; চুপ করিতে আমার মুখেব দিকে চাহিয়া আবার দৃষ্টি নত করিল।

আমি বলিতে লাগিলাম, "দ্বিতীয় অপরাধ,—চায়ের টেবিলে আমরা সবাই যখন বসে, তখন কথাপ্রসঙ্গে আমি জানাই যে, সরমা দেবী আসায় আমরা সবাই কৃতজ্ঞ।"

এইবার আঘাতটা একটু ব্যাপকভাবে দেওয়ার জন্য আমার মনটা যেন মাতিযা উঠিল,—এমন একটা আঘাত দিব যাহা ব্যারিস্টারের কন্যা আর তাহার স্তাবকদের একসঙ্গে গিয়া লাগিবে। আমি তো যাইতেছি,—কিসের দ্বিধা বা সঙ্কোচ?

বলিলাম, "মীরা দেবী, আমি গরীব, পার্টিতে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য এবং সুযোগ আমার স্বভাবতই এর আগে পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু একটা জিনিস জানি—তা এই যে, আমাদের পার্টি জিনিসটা—শুধু পার্টি কেন, স্ত্রী-পুরুষেব অবাধ মেলামেশার; সারা ব্যাপারটা ইংরেজদের নকল। তা যদি হয় তো নকলটা ঠিকমতই হওয়া উচিত, আধাখ্যাঁচড়া হ'লে বড় বিসদৃশ হয়ে ওঠে। আমি মেয়েছেলে কথা বলছি না, কিন্তু আমাদের টেবিলে কাল যে-কটি পুরুষ বসেছিলেন, তাঁদের দেখে মনে হ'ল যে তাঁরা টাই বাঁধা, কাঁটা-চামচে ধরা, কি কাপে নিখুঁভাবে চুমুক দেওয়ার কায়দা রপ্ত করতেই এত বেশি সময় দিয়েছেন যে ইংরেজরা যেটাকে নিতান্ত মামুলি ভদ্রতা বলে জ্ঞান করে, সেটার দিকে পর্যন্ত নজর দেওয়ার অবসর পাননি।—দু-জন মহিলা একসঙ্গে বসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একজনকে—বিশেষ ক'বে সেই একজনকে যিনি হোস্টেস্ (নিমন্ত্রণকর্ত্রী)—প্রশংসায় কম্প্লিমেন্টে বিপর্যস্ত ক'রে অপরজনের সম্বন্ধে নীরব থাকা কোন ইংরেজ কস্মিন্‌কালেও ভাবতে পারে না। অথচ ঠিক এই জিনিসটা হয়েছিল কাল, নিশ্চয় আপনার চোখ এড়ায়নি। আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওদের প্রশংসার স্রোতটা একবার একটুখানি সরমা দেবীর অভিমুখী করতে, আশা করেছিলাম কারুর না কারুর নজর এই ত্রুটিটুকুর দিকে পড়বেই, শেষে একেবারেই নিরাশ, নিরুপায় হয়ে আমাকেই সেটুকু সংশোধন ক'রে নিতে হ'ল। তাও আমি কখন করলাম, না, নীরেশবাবু যখন হোস্টেসের প্রশংসায় এতটা মেতে উঠেছেন যে, সরমা দেবী একটা কথা বলেছিলেন, তাকে বাধা দিয়ে নিজের কথা এনে ফেললেন।"

মীরা শেষের দিকে স্থির নয়নে আমার মুখের পানে চাহিয়া কথাগুলা শুনিতেছিল—একটু

বিস্মিত—আমার মত স্বল্পবাক্ লোক যে এতকথা বলিবে, আর এত স্পষ্টভাবে, ও যেন ভাবিতে পারে নাই, বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না।

আমি ওর মনের কথা ধরিয়াই বলিলাম, "আমার এত কথা বা এসব কথা বলবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু প্রয়োজন হয়ে পড়ল, কেন-না, আপনার বিশ্বাস আপনাদের বাড়ির টিউটর আপনার দাদার বাগদত্তা সম্বন্ধে একটা অনুচিত মনোভাব রাখতে পারে এবং সে কাল সরমা দেবী সম্বন্ধে যা কিছু বলেছে তার মূলে রয়েছে ওই অনুচিত মনোভাব।"

মীরার মুখের সেই কঠিন ভাবটা নরম হইয়া আসিয়াছে। ধীরে, একটু যেন অনুতপ্ত কণ্ঠে বলিল,—'রাখতে পারে'—বলেছি শৈলেনবাবু, মাত্র একটা সম্ভাবনার কথা 'রেখেছে'—একথা তো বলিনি। আপনি উত্তেজিত হয়েছেন। আমারও ভুল দেখুন—আপনাকে বসতেই বলা হয়নি।...বসুন আপনি, দাঁড়িয়ে কেন?"

একটু হাসিয়া বলিলাম, 'না, বসার বিপদ এই যে, বসলেই দাঁড়াতে একটু দেরি লাগে, আমার সময় খুব অল্প। থাক্, ধন্যবাদ।...হ্যাঁ, আমি সেই কথাই বলতে এসেছি—এই সম্ভাবনার কথা—অর্থাৎ সরমা দেবীকে অন্য নজরে দেখা হয়তো আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে পড়তে পারে একদিন। সেই সম্ভাবনার মূলই আমি নষ্ট ক'রে দিতে চাই। আপনার আমার প্রতি অশেষ দয়া দেখিয়েছেন। এখন আমি যাতে আপনাদের অনুগ্রহেব এবং আতিথেয়তার অপমান না ক'রে বসি, সেইজন্যে বিদায় নিতে এসেছি। তরুর একটু ক্ষতি হবে, লোক ঠিক না হওয়া পর্যন্ত। কিন্তু আমি আর কোনমতেই দেরী করতে পারছি না। এক কথায় রাখতেও দয়া প্রকাশ পেয়েছিল, যাবার সময় ঠিক সেই দয়াটুকু আবার দেখাতে হবে। আমায় আজই ছেড়ে দিন .।"

১৯

শেষের দিকে আমার কথা অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক ধরনের চাপা ভয়ে, বিস্ময়ে, আবেগে মীরার মুখের চেহারা প্রতিমুহূর্তেই কি এক যেন অদ্ভুত রকম হইয়া উঠিতেছিল। অন্তরে অন্তরে সে অতিরিক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে, আমায় শেষ করিতে না দিয়াই সে প্রশ্ন করিল, "আপনি যাবেন?—সে কি?—যাবেন কেন?—যাবার কথা কি হয়েছে এমন..."

এই সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে মীরা সংযম হারাইয়া ফেলিয়াছে। আমার সংযম হারাইবার কোন বালাই নাই, আমি আজ দ্রষ্টা মাত্র, দেখিতেছি। বুঝিতেছি মীরা একটা অসহ্য অবস্থায় পড়িয়াছে—সে বুঝিতেছে নিজেকে সংযত করা দরকার, সাধারণ অনুযোগের চেয়ে একটা কথাও বেশি বলা তাহার শোভা পায় না, মুখচোখে তাহার একটা অবহেলা বা নির্লিপ্ততার ভাব থাকা দরকার—একজন মাস্টার যাইতে চাহিতেছে, একবাব মুখে বলা থাকিবার কথা—একটা মামুলী, মৌখিক ভদ্রতা, তাহার পরও যাইতে চাহে, যাক। আবার শত শত মাস্টারের দরখাস্ত পড়িবে।

কিন্তু এই নিতান্ত দরকারী ভাবটা—কথায় এবং চেহারায় মীরা কোনমতে আনিতে পারিতেছে না। তাহার কারণ ওর চেয়েও একটা ঢের বড় প্রয়োজন আছে, মীরার সমস্ত সত্তার সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ,—অর্থাৎ আমার এখানে থাকাটা।...মীরা যে এতদূর আগাইয়া গিয়াছে আমার এই বিদায় ভিক্ষার পূর্বে সে জানিত না, আবিষ্কার করিয়া যেন অসহায়ভাবে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য আমিও এতটা জানিতাম না। কিন্তু আমি অবিচ্ছেদের জন্য শঙ্কিত নই, মুক্তি আমায় ডাক দিয়াছে,—আমি সাড়া দিয়াছি।

ভালবাসা দুর্বল আমার?—তাহাতে খাদ আছে?—তা সে কথা তো গোড়াতেই স্বীকার করিয়াছি যে পুরুষের ভালবাসা মেয়েদের ভালবাসার শতাংশের একাংশও নয়।

আমি শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠেই বলিলাম, "আমায় যেতেই হবে মীরা দেবী।"

মীরা স্থির নেত্রে আমার মুখের পানে চাহিল, প্রতিজ্ঞার মধ্যে কোথাও একটু দুর্বলতা আছে কিনা আমার মুখের রেখায় তাহার অনুসন্ধান করিল। তাহার পর বলিয়া উঠিল, "না, যাওয়া আপনার হ'তেই পারে না শৈলেনবাবু।"

প্রশ্ন করিলাম, "কেন?"

মীরা একটু চিন্তা করিল, তাহার পর কৌচে হেলিয়া পড়িল; আঁচলের একটা কোণ ধীরে ধীরে পাকাইতে পাকাইতে বলিল, "কেন?...কেন?...আপনি যাবেনই বা কেন তাও তো বুঝছি না।"

বলিলাম, "বললাম তো সব কথা।"

"কি কথা?...ও, হ্যাঁ, কিন্তু সে সম্বন্ধে তো বললাম আপনাকে।"

"কি বললেন?"

"মীরা বড় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছে।"

একটু চুপ করিয়া রহিল, কপালের চুল চারিটি আঙুল দিয়া উপরে তুলিয়া দিতে লাগিল, তাহার পরে খোঁজ করিতে করিতে কথাটা হঠাৎ যেন মনে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে বলিল, "বাঃ, বললাম না যে ওটা খালি সম্ভাবনার কথা বলছিলাম? আপনি এত শীগ্‌গির ভোলেন!"—শেষের কথাটুকু বলিল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া।

আমি বলিলাম, "তার উত্তরও তো আমি দিয়েছি,—অর্থাৎ সম্ভাবনা রয়েছে বলেই—একটা অমার্জনীয় অপরাধ ক'রে ফেলা সম্ভব বলেই আমার যাওয়ার দরকার এ-জায়গা থেকে।...মীরা দেবী বিশ্বাস করুন সরমা দেবী সম্বন্ধে একটু কথা বলতেও,—ওঁকে নিয়ে এ ধরনের আলোচনা করতেও আমি অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি...আমায় ছেড়ে দিন।"

মীরা নিরাশ ভাবে এলাইয়া পড়িল; তাহার পর ধীরে ধীরে কণ্ঠস্বর নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "যাবেনই? তা বেশ।"

পরক্ষণেই তাহার যেন মস্ত বড় একটা অবলম্বনের কথা মনে পড়িয়া গেল, আবার হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "বেশ, আমার আপত্তি নেই শৈলেনবাবু, আপনি যেতে চাইছেন, কেনই বা থাকবে আপত্তি? তরু কিন্তু আপনাকে কখনই ছাড়বে না। পারেন তো যান আপনি, আমার কোনই আপত্তি নেই। এক্কেবারেই না।"

বুঝিলাম তরু যে আমায় রুখিবেই তাহার প্রেরণাটা কোথা থেকে পাইবে সে। আমি হাসিয়া বলিলাম, "বেশ, সেই কথাই থাক্।"

মীরা আবার একটু দ্বিধায় পড়িল, উহারই মধ্যে স্বচ্ছন্দ ভাবটা ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আপনি রাজী করে নেবেন তরুকে।"

হাসিয়া বলিলাম, "সেটুকু ভরসা আছে বৈ কি!"

"কি ক'রে?"

'আপনার মত বুদ্ধিমতীর কাছ থেকে অনুমতি আদায় করতে যে কসরতটা হল সেটা কি বৃথা যাবে মীরা দেবী? শক্তি বৃদ্ধি হ'ল তো। তাই দিয়ে একটা ছোট মেয়েকে আর ভোলাতে পারব না?—একটু হাসিলাম।

মীরা বলিল, "আপনি ভুল করছেন শৈলেনবাবু, তার শক্তি ভালবাসায়, স্নেহে, যেখানে আপনার হারতেই হবে।"

হাসিয়া বলিলাম, "ওই ভালবাসাই তো জোর আমার মীরা দেবী। ওর দোহাই দিয়েই তো জিতব আমি।"

"কি রকম?"

"বলব—তোমার মাস্টারমশাইকে এত ভালবাস তরু, তবু তাকে আটকে রাখতে চাইছ?—

বাঁধার ভয়ে সে নিজে কাতর হচ্ছে জেনেও?"

নিজেকে হাজার সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াও আমি কথাটা বলিয়া ফেলিলাম। তরুর নাম করিয়া মীরাকে আমার মর্মের কথাটা যাইবার পূর্বে একবার শুনাইয়া দিবার লোভটা কোনমতেই সম্বরণ করা গেল না, বলার মিষ্টতাটুকু থেকে রসনাকে বঞ্চিত করিতে পারিলাম না।...সত্যিই তো; ওরই বাঁধনের তো ভয়—এত গ্লানি মাথায় করিয়াও যে বাঁধন কাটা দুষ্কর হইয়া পড়ে।...কিন্তু আজও অনুতাপ হয়, নিজের সাধ মিটাইতে গিয়া সেই প্রথম আমি মীরার চক্ষে জল টানিয়া আনি।

অনুতাপের পাশে পাশে এও ভাবি—ঐটুকুই আমার সম্বল—এ অশ্রুবিন্দুর স্মৃতিটুকু, না হইলে কি লইয়া বাঁচিতাম?

মীরার চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। টলটলে দুই বিন্দু জল, ঘরের চারিদিকে সবুজের আভা পড়িয়া দুইটি মরকতের মত দেখাইতেছে। মনটা আমার বেদনায় মথিত হইয়া উঠিল—কেন বলিতে গেলাম কথাটা? দরকার কি বাঁধন ছিঁড়িবার? এই বাঁধনেই বাঁধা থাকি না চিরদিন...

"মীরা দেবী..."—বলিয়া কি একটা কথা বলিতে যাইতেছিলাম, এখন ঠিক গুছাইয়া মনে পড়িতেছে না। মীরা চোখের জলে একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে, তাড়াতাড়ি এ-পর্বটা শেষ করিবার জন্যই যেন বলিল, "আপনি যাবেনই। সত্যিই তো, যেতে চাইলে তরুর সাধ্য কি বাঁধে..." কথাটা আটকাইয়া গেল।

মীরার কৌচের পিছনে খোলা জানলা দিয়া এক ঝলক হাওয়া প্রবেশ করিয়া টেবিলের উপর থেকে গোটা দুই-তিন পাতলা কাগজের টুকরা উড়াইয়া দিল। মীরা বাঁচিল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিবার জন্য আমার দিকে পিছন ফিরিয়া গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইল। অশ্রুর লজ্জা গোপন করিতেছে মীরা। জানালা বন্ধ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই, ঘরের গুমোট ভাঙিতে ঐ রকম কয়েক ঝলক হাওয়াই দরকার বরং। ধীরে ধীরে হাত বাড়াইয়া জানালার পাল্লা দুইটা টানিতে টানিতে বলিল, "আমি শুধু এই জন্যে বলছিলাম যে আমার মনে একটা চিরজন্মের মত খেদ থেকে যাবে।"

কিসের খেদ? যাইবার সময়, চোখাচোখি না হইয়া থাকিবার এই সুযোগ মীরা কি মন উজাড় করিয়া আমাকে তাহার অন্তরতম কথাটি বলিবে? এমন হয়। যখন সব সম্বন্ধ ফুরাইয়া আসে তখন পরম সম্বন্ধের কথাটা বলা যায়। একটু উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম, তাহার পর প্রশ্ন করিলাম, "খেদ কিসের?"

জানালা বন্ধ করিতে অত বিলম্ব হয় না, আসল কথা, মীরা নিজেকে, নিজের অবুঝ অশ্রুকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না; এখন ধারায় নামিয়াছে কিনা তাহাই বা কে জানে? একটা পাল্লা আবার একটু বাহিরে ঠেলিয়া দিয়া মুখ না ফিরাইয়া বলিল, "আপনি রূঢ় ব্যবহার পেলেন আমার কাছ থেকে, তাই...কাল তারপর চিঠি..."

আবার থামিয়া গেল, আর যেন ও নিজেকে সামলাইতে পাবিতেছে না।

আমিও এবার বোধ হয় সংযম হারাইতাম; কিন্তু ঠিক এই সময়টিতে তরুর মোটর আসিয়া থামিল এবং তরু কিছুমাত্র অবকাশ না দিয়া, দু-একটা সিঁড়ি বাদ দিতে দিতেই হুড়হুড় করিয়া উপরে উঠিয়া আসিতে লাগিল।

লুকোচুরি সামলাইতে গিয়া আমরা উভয়ে উভয়ের কাছে আরও স্পষ্ট করিয়া ধরা পড়িয়া গেলাম; মীরা জানালা বন্ধ করিতে উঠিয়াছিল, চেষ্টাও করিতেছিল, কিন্তু তরুর পায়ের শব্দে তাড়াতাড়ি পাল্লা দুইটা বাইরের দিকে ঠেলিয়া দিয়া কৌচে আসিয়া বসিল। ভাবিবার চিন্তাইবার পূর্বেই তাহাকে আরও একটা কাজ করিতে হইল, অঞ্চল তুলিয়া চক্ষু দুইটি মুছিয়া লইতে হইল—নিতান্ত আমার সামনা-সামনিই। আমিও বিষণ্ণতা চাপা দিয়া মুখে হাসির ভাব টানিয়া আনিলাম।

তরু পর্দাটা এক সাপটে সরাইয়া ঘরে আসিয়া পড়িল। আমাকে দেখিয়া একটু থমকাইয়া দাঁড়াইল, কখনও দেখে নাই আমায় এ-ঘরে; মীরার মুখের পানে চাহিয়া একটু বিস্মিত হইল, চোখে জল না থাকিলেও পাপড়ি তাহার ভিজা তখনও। আমরা দু-জনই একসঙ্গে প্রশ্ন করিলাম, "কি তরু?"

মীরা আরও একটু বাড়াইয়া বলিল, "বড় ফূর্তি তোমার দেখছি!"

তরু বর্তমান ভুলিয়া তাহার স্ফূর্তির কারণের ব্যাপারে গিয়া পড়িল, বলিল, "আমাদের মেজ গুরুমার বিয়ে তাই..."

আমরা দু-জনেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম; মীরা বলিল, "তাই এত স্ফূর্তি? আমরা ভাবলাম তোমার নিজের বিয়ে বুঝি।"

"যাঃ"—বলিয়া তরু ছুটিয়া গিয়া দিদির কোলে মুখ লুকাইল।"

মীরা বলিল, "তুমি কি দেবে গুরুমাকে?—এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে এস, ইমানুলকে বলে দেব আমি।"

তরু মুখটা তুলিয়া আবদারের সুরে বলিল, "আর একটা পদ্য দিতে হবে, হুঁ..."

মীরা আবার হাসিয়া বলিল, "ও প্রীতি-উপহার! তা তো চাই-ই, না হ'লে বিয়ে পাকাই হবে না তোমার গুরুমার। কিন্তু সে তো মুশ্‌কিল, তোমার মাস্টারমশাইকে এবার আমাদের ছেড়ে দিতে হবে; কে লিখে দেবে তোমায়?"

তরু বিস্ময়ের সহিত ঘাড় বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল, বিদ্রুপের মতো এই গভীর কথাটা বিশ্বাস করিবে কি না বুঝিতে পারিতেছে না। একবার দিদির সিক্ত চোখের পানে চাহিল। মীরা বিব্রত হইয়া মুখ ঘুরাইতে যাইতেছিল, আমি হাসিয়া বলিলাম, "যাতে ছেড়ে না দেন সেই জন্যেই আমি ওঁর দরবার করতে এসেছি তরু ঃ তুমিও বল না আমার হয়ে, তাহ'লে খুব ভাল ক'রে তোমার মেজ গুরুমার বিয়ের প্রীতি উপহার লিখে দোবখ'ন—প্রীতি উপহার তো নয়, শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

কঠিন এক রহস্যের মধ্যে পড়িয়া তরু আবার তাহার দিদির মুখের পানে চাহিল।

মীরা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নত নয়নে আমার কথাগুলো শুনিতেছিল, একবার চকিতে আমার পানে চাহিয়া লইল, তাহার পর তরুর পিঠে দুই-তিনবার হাত বুলাইয়া নিয়া বলিল, "আচ্ছা, হবে না ছাড়া। পদ্যর বন্দোবস্ত হ'ল তো? এবার আগে জামাজুতো ছাড়গে তরু, যাও।"

২০

নিজের অজ্ঞাতসারেই আমি কখন একটা কুশন চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছি মনে নাই। তরু চলিয়া গেলে আমরা দু-জনেই খানিকক্ষণ নীরবে রহিলাম। একবার চাহিয়া দেখিলাম মীরার মুখখানি বড় সুন্দর দেখাইতেছে; তরু সেখানে কৌতুকের ভাবটা জাগাইয়া দেওয়ার পর মনে হইতেছে যেন বর্ষার পর স্বচ্ছ আর্দ্র আকাশে রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। দু-জনেই বোধহয় অপেক্ষা করিতেছি কথাটা অপর দিক হইতে উঠুক। মীরাই মুখ খুলিল, প্রশ্ন করিল, "তরুকে কি বললেন ঠিক বুঝতে পারলাম না। সত্যিই কি মত বদলালেন?"

উত্তর করিলাম, "মীরা দেবী, আপনার মনে একটা স্থায়ী খেদ রেখে যাব আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই। তা ভিন্ন যদি এমনই হয় যে, সত্যিই আপনি সন্দেহের ওপর চিঠিটা লিখেছেন, বা ঐ সম্ভাবনার কথাটা বললেন, তা থেকেই বরং প্রমাণ করি আমি আর যা-ই হই, অত হীনচেতা নই। যেদিক থেকে ভেবে দেখছি, ক্রমে মনে হচ্ছে আমার থাকাটাই যেন সমীচীন—মোর অনারেবল।"

মীরা একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর একটু ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "শুধু একটু দুঃখ রইল শৈলেনবাবু যে আপনি থেকে গেলেন বটে, কিন্তু আপনার মনে কোথায় যেন একটা কাঁটা বিঁধে রইল। ওটুকু তুলে ফেলবার উপায় নেই?"

একটু চুপ করিয়া নিজেই বলিল, "বেশ, এটুকুর জন্যেও আমিও কৃতজ্ঞ রইলাম। তার কারণ আপনি গেলে আমার মনে যে আপশোসটা থাকত সেইটেই আমার সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল না, সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল যে বাবা আর মার কাছে আমার কোন জবাবদিহি ছিল না। আপনি সেদিক

থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন। জানেন তো যাদের কাছে অতিরিক্ত আদর পাওয়া যায় তাঁদের কাছে খুব বেশি সাবধানে থাকতে হয়। আমি যে কি বলতাম তাঁদের, ভেবেই সারা হচ্ছিলাম।"

আমি মীরার দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলাম, আবার সেই চতুরা মীরা! প্রথম সুযোগেই ওর অশ্রুজলের ভিতরের কথাটা চাপা দিবে ও,—যেন বাপ-মা কি বলিবেন সেই চিন্তাই ওর আসল চিন্তা। এতক্ষণ যে অশ্রু লুকাইবার জন্য ওকে অত ঘটা করিয়া জানালা বন্ধ করার অভিনয় করিতে হইল, রুদ্ধকণ্ঠে মিনতি করিতে হইল থাকিবার জন্য—তাহার গোড়ায় শুধু ছিল বাবা-মা কি বলিবেন—আর কিছুই না।

একটা হাসি ঠেলিয়া উঠিতেছিল, কিন্তু প্রকাশ করিলাম না। মীরার কাছে যখন সব কথা বলিবার অধিকার পাইব সেই সময় একদিন এই কথাটা তুলিয়া ওর প্রবঞ্চনায় ওর চতুরতায় ওকে লজ্জা দিয়া প্রাণ খুলিয়া হাসা যাইবে। কথাটা স্মৃতির মণিকোঠায় তুলিয়া রাখিলাম। আপাতত এইটুকুই লাভ যে মীরা চতুরা বলিয়া ওকে আরও ভাল লাগিতেছে।

মীরা বলিল, "আরও একটা উপকার হ'ল শৈলেনবাবু, চিঠির মধ্যে, কিংবা কথাটার মধ্যে যে আমার তরফ থেকে অবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও নেই, আপনি থেকে যাওয়ায় সেটা প্রমাণ করবার যথেষ্ট অবসর পাব।"

অর্থাৎ আমি যে-ভাবে কথাটা বলিলাম, মীরাও সেইভাবে একটা কথা বলিবার লোভটা সামলাইতে পারিল না,—ও-ও প্রমাণ দিবে!

আমার আবার হাসি পাইল। হাজার চতুরা হইলেই মীরা এখানে নিজের কাছেই প্রবঞ্চিত হইতেছে। নিজের মনের নিজেই নাগাল পাইতেছে না। আমায় শত নিরপরাধ বলিয়া জানিলেও যে ওর এ ঈর্ষা থাকিবেই এ-কথা ওকে কি করিয়া বুঝাই?

চেতনা হইল, অনেকক্ষণ হইয়া গেছে। আমি ওর কথার উপর আর কোন মন্তব্য করিলাম না, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "তাহ'লে এখন আমি আসি।"

মীরা কোন কথা বলিল না; ধীরে ধীরে দাঁড়াইয়া উঠিল। আমিও কোন মন্তব্য করিলাম না। দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "আসি তাহ'লে।"

বাহির হইয়া আসিলাম।

দেখি রাজু বেয়ারা একতাড়া ডাকের চিঠি লইয়া ভারিক্কি চালে উঠিয়া আসিতেছে। চিঠি সব আগে মীরার কাছে যায়, সেখান থেকে আবার রাজুর মারফত যথাস্থানে বিলি হয়। এখানকার এই সাধারণ নিয়ম। রাজু সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে দেয় না,...এইখানে অন্য চাকরের তুলনায় রাজুর অসাধারণত্ব।—ব্যারিস্টার হইতেছে নিয়মের রক্ষক, সেই ব্যারিস্টারের চাকর হইয়া রাজু নিয়ম ভাঙিবে!

অবশ্য নেহাৎ সামনে পড়িয়া গেলে আমি কখনও কখনও নিজের চিঠি বাহির করিয়া লই। বলিলাম, "দেখি, আমার কিছু আছে কি না।"

রাজু যেন একটু নিরুপায় হইয়া তাড়াটা দিল।

অনিলের একখানা চিঠি আসিয়াছে।

সৌদামিনী

১

কেন যেন এমনটা হইল ঠিক বলিতে পারি না, তবে খামের উপর অনিলের হস্তাক্ষর দেখিয়াই আমার সমস্ত মনে যেন একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গেল। হইতে পারে আমার মনটা বর্তমান অবস্থা থেকে কোন দিকে মুক্তির জন্য উন্মুখ, উদগ্র হইয়াছিল বলিয়াই এমনটা হইল।—হঠাৎ অতীতের মধ্যে থেকে

একটা স্মৃতির জোয়ার আসিয়া বর্তমান-টাকে যেন ঠেলিয়া কোথায় লইয়া গেল। সেটা এতই অভিভূতকার, যে চিঠিটাও খুলিয়া পড়িতে এক রকম বোধহয় ভুলিয়াই গেলাম। সিঁড়িটা যেখানে উপরে আসিয়া শেষ হইয়াছে তাহার সামনেই ছোট্ট একটি বারান্দা, বাহিরের দিকটা খোলা, নীচে প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢালাই করা লোহার রেলিং।

আমি মীরার ঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম, সরিয়া গিয়া রেলিঙে ভর দিয়া সেইখানে, বাহিরে দৃষ্টি মেলিয়া দিয়া দাঁড়াইলাম।

নীচে, বাঁ-দিকে বাগানটা দেখা যাইতেছে। কাল বিকাল থেকে এ-পর্যন্ত এমন একটা অবস্থার মধ্য দিয়া কাটিয়াছে, মনে হইতেছে কত দিন বাগানটাকে দেখি নাই: যেন কত যুগ। নূতন হইয়া আজ হঠাৎ আমার সামনে আসিয়াছে।... বাগান ছাড়াইয়া রাস্তা ছাড়াইয়া রাস্তার ওপারে বাড়ি ছাড়াইয়া দৃষ্টি উর্ধ্বে উঠিল; মনটাকে লইয়া উঠিতেছে—বাড়ির পিছনে কতকগুলো গাছের জটলা, তাহারই মাঝখান থেকে গোটাতিনেক নারিকেল গাছ মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে, দীর্ঘ পত্রদল সঞ্চারিত করিয়া আকাশের স্বচ্ছ নীলের গায়ে যেন সবুজের তুলি টানিয়া চলিয়াছে।

আরও দূরে—কালের ও-প্রান্তে জাগিয়া ওঠে সাঁতরা, আমাদের কৈশোরের জীবন লইয়া—বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি—বেনে বৌয়েদের দোতলা বাড়ির সামনে তামাটে রঙের পানফলের লতা-বিছান পুকুর—নারিকেলের কাটা গুঁড়ি দিয়া তৈয়ারি পিচ্ছিল ঘাট। আমি, অনিল ভালমানুষের মত বসিয়া আছি—একটু দূরে একটা মোটা সজিনা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া একটি মেয়ে, খাটো কাপড় পরা, মাথায় বেড়াবেণী, মুখের ভাবটা আমাদের চেয়েও নির্বিকার।...সদ্‌গোপদের ছোট বৌ ঘাটে বাসন মাজিতেছে—ওর উঠিয়া যাওয়ার অপেক্ষা—তাহা হইলেই আমরা পানফল অভিযানে অগ্রসর হই।...পচা পাঁকের একটা গন্ধ উঠিয়া আসিতেছে, কেমন যেন দেশ-দেশ মাখানো গন্ধটা। ...ঝক্‌ঝকে বাসনের গোছাটা বাঁ-হাতে করিয়া ঘোমটার রাঙা পাড়টা নাকের ওপর পর্যন্ত টানিয়া দিয়া, বঙ্কিম ভঙ্গিতে সদ্‌গোপদের বউ উঠিয়া আসিল। কচি বউ, হদ্দ বছর তের কি চোদ্দ বয়স।...“বামুন-ঠাকুরেরা এখানে বসে যে?...” অনিলই উত্তর দিল, “এমনিই বসে আছি, পুকুরের ধারটা একটু ঠাণ্ডা কিনা।”...বেলা দুপুরের রোদে মাথার চাঁদি ফাটিতেছে ওদিকে! সদ্‌গোপদের বউ ঠোঁট চাটিয়া হাসিতেছে।—“ঠাণ্ডা, না পানফল?—আমি বলে দিতে চল্‌নু জেলেগিন্নিকে।” দুই পা আগাইয়া গিয়া আবার ঘুরিয়া বলিল, “যাই?—আচ্ছা, যাব না যদি এক কাজ কর।”—আমরা উৎসুকভাবে চাহিয়া আছি...“কাজ কর মানে যদি আমার জন্যেও খানকতক ঐখানটায় ঐ পাঁকের মধ্যে পুঁতে রাখ—আমার জন্যে মানে ঠাকুরঝির জন্যে—আমি আবার বাসন মাজতে এসবো এক্ষুনি!”

অনিল বলিতেছে, “তুমি আর দুপুরের তাতে আসবে কেন? সদী নুকিয়ে দিয়ে আসবে'খন।” সদ্‌গোপদের বৌয়ের সমস্ত মুখটা কৌতুকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, চোখ ঘুরাইয়া বলিতেছে, “ও, সদুঠাকরুণ বুঝি এর মধ্যে আছেন? কোথায় তিনি? তাই তো বলি দুপুরের এমন কড়া তাত, এত ঠাণ্ডা লাগে কিসে!”

হাসিটা আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—“না, না; এইখানেই পুঁতে রেখো; আমি বলবুনি জেলেগিন্নীকে...”

রাজু বেয়ারা আবার উপরে উঠিয়া ওদিকে কোথায় চলিয়া গেল। পায়ের গতি খুব নিয়ন্ত্রিত—যেন একটা ফৌজী সেপাই। মনটা লিণ্ডসে ক্রেসেন্টে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর আবার স্মৃতির বন্যা!...অনেক দিন পরের এক দৃশ্য। আকাশ ঘিরিয়া বর্ষা নামিয়াছে, সন্ধ্যায় অনিলদের বাড়ি আটক হইয়া গেলাম। অনিলের বাবা ছাতার নীচে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া উঠিলেন। ছাতা মুড়িতে মুড়িতে বলিতেছেন, “আরম্ভ হ'ল—শনিতে সাত মঙ্গলে তিন,—এখন সাত দিন নিশ্চিন্দি থাক।”...মজা নদীতে বাঁশের পুল এখনও বাঁধা হয় নাই, বোধহয় কাল থেকেই স্কুলে যাওয়া বন্ধ হইবে, অনিলের বাবার “নিশ্চিন্দি” কথাটা আগামী ছয়-সাতটা দিনের একটা স্পষ্ট ছবি যেন ফুটাইয়া তুলিল—ওপারে স্কুল,

এপারে আমাদের স্কুল-মুক্ত নিরুদ্বেগ দিনগুলো—মাঝে বর্ষার জলে টইটম্বুর, মজা নদী, আর, সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া অবিরাম বর্ষা—চারিদিকে কুল্ কুল্, ঝরঝর—একটা সিক্ত মর্মরধ্বনি—সমস্ত দিনটা সন্ধ্যার মত একাকার, তারপরেই একেবারে অন্ধকার রাত্রি...

অনিলের বাবা বলিলেন, "শৈল আটকে গেল বুঝি।"

একটু একটু শীত করিতেছে, কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়াইয়াছি। অনিল বলিল, "ও বলছে বাড়ি যাবে।" অনিলের মা একটু যেন শিহরিয়া বলিলেন, "রক্ষে কর! কেন? খোলা মাঠে পড়ে আছে নাকি?"

বেশ মনে পড়িতেছে অনিলের মাকে—আধবয়সী মানুষটি, প্রদীপটা বাঁ-হাতে ধরিয়া কথাটা বলিতেছেন—মুখে নথের সোনায় আর পান্না দুইটিতে, শাড়ির চওড়া রাঙা পাড়ে প্রদীপের কম্পমান আলো পড়িয়া ঝলমল করিতেছে...

মজা নদীর ধারে বৈরাগী বাবাজীর আখড়ায় আরতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—সঙ্গে তানপুরার একঘেয়ে সুরের মত বর্ষার আওয়াজটা...ব্যাঙেদের ঐকতানে গায়কদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। সন্ধ্যার অল্প পরেই রাত্রি নিশুতি হইয়া উঠিল।

একই ভাবে আছি দাঁড়াইয়া। এক-একবার নিজেকে অনুভব করিতেছি, আবার স্মৃতির আলোড়নে যাইতেছি তলাইয়া; কত ছোট-বড় ঘটনার টুকরা-টাকরা স্রোতের মুখে ভাসিয়া আসিতেছে।

সাঁতরার বসত একবকম তুলিয়া আমরা পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছি। আবার আসিয়াছি অনিলের বিবাহের বছর-দেড়েক পরে, ওর বৌ যখন ঘর করিতে আসিয়াছে। বিবাহের সময়টা আমার পরীক্ষা ছিল, তখন আসিতে পারি নাই; অর্থাৎ সাঁতরাকে দেখিতেছি আবার ঠিক সাত বছর পরে। দেশটাকে নূতন বলিয়া বোধ হইতেছে, কতকটা প্রবাসের বিরহের জন্যও, আর কতকটা কি বলিব?—যৌবনের নবীভূত দৃষ্টিভঙ্গি?—রাস্তা ঘাট, পুকুর, মাঠের সঙ্গে পুরানো স্মৃতির ছোপছাপ লাগিয়া আছে।

সতের বছরও পূর্ণ হইবার আগে অনিলেব বিবাহ হয়। দুই বৎসর হইল এনট্রান্স পাস করিয়া জেলা কোর্টে চাকরি করিতেছে। দশ টাকা জলপানি পাইয়াছিল, বাপ পক্ষাঘাতে বিকলাঙ্গ হইয়া পড়ায় জলপানিটা কাজে আসিল না। পত্র লিখিয়াছিল, "শৈলেন, বিধাতা একটু রসিকতাপ্রিয় বলে আমাদের শাস্ত্রে তাঁকে পিতামহ বলে কল্পনা করা হয়েছে—আমার পড়া বন্ধ করার বন্দোবস্ত ক'রে দশ টাকা জলপানি পাইয়ে দিলেন।"

ষোল-সতের বছরে বিবাহ আমরা—পশ্চিমের দিকেব বাঙালীরা—কল্পনায়ও আনিতে পারিনা; আমার বন্ধু সেই অনিলকে বিবাহিত দেখিয়া আশ্চর্যবোধ হইতেছে। কিন্তু দেখিতেছি বয়সের অনুপাতে ও ঢের বেশি উপযোগী। বৈবাহিক রহস্য লইয়া এমন অনেক কথা বলিল যাহা শুনিতে প্রথমটা আমায় রাঙিয়া উঠিতে হইল! অনিল হাসিয়া বলিল, "তুই জেন্টল্ম্যান হ'য়ে গেছিস শৈল, বিপদে ফেললি দেখছি, তোকে আবার মানুষ ক'রে নিতে সময় নেবে। পশ্চিমের শুকনো হাওয়ায় তোরা সব বোদা হ'য়ে যাস..."

সেই প্রথম দিনের কথা। সকালে গল্পচ্ছলে একটু ইতস্ততঃ করিয়া সৌদামিনীর কথা তুলিলাম। ওদের বাড়ির বাহিরে রকে বসিয়া আমাদের কথা হইতেছে। অনিল কেমন একটা মলিন হাসি হাসিল, বলিল, "ভাই সদুর কথা না তুলে পারলিনি? আমাদের বিয়ের কথা তো বলেইছি তোকে কয়েকবার যে, আমাদের মত তাকিয়ায় হেলান-দেওয়া জাতের পক্ষে বৌ জিনিসটা, গড়গড়ার মাথায় অম্বুরী তামাকের মত, সেজে দেয় অভিভাবকেরা। নিজের পছন্দয় রোমান্স ক'রে সংগ্রহ করা নয়..."

সামনের রাস্তায় দুইটা মোটরে আর একটু হইলেই ধাক্কা লাগিত; খানিকটা বচসা, খানিকটা কথা-কাটাকাটি হইতে স্মৃতিসূত্র আবার ছিন্ন হইয়া গেল। কিন্তু আজ কি হইয়াছে, কলিকাতা আমায় ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না।

একটু চুপ করিয়া আছি আমরা দু-জনে; তারপর অনিল আমার ডান হাতটা চাপিয়া ধরিল—

চোখে একটা আতুর দৃষ্টি; বলিল, "শৈল, সৌদামিনী পড়ে রইল, তুই তুলে নে তাকে; তুই তো ভালবাসতিস, একটু লাজুক ছিলি এই যা..."

রাত্রের ছবিটা খুব স্পষ্ট এখনও।—নিশুতি রাত, অনিল নীচের দুয়ার খুলিয়া আমায় ওপরে তাহার ঘরে লইয়া আসিয়াছে, দিনের বেলায় বৌ দেখাইয়া আশ মেটে নাই ওর। বৌয়ের সামনেই প্রশ্ন করিল, "মুখদেখানি কি দিলি—হৃদয় নাকি?"

ওর বৌ বেচারি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিলাম, "রাসকেল, আড় নেই মুখে তোর! দিলুম একটা জিনিস, একটা নতুন নাম।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "কি?—রাস্‌কেলের গিন্নী রাস্‌কেলী? হিংসে হয়, গালাগালটা ওর ভাগ্যে দিব্যি কাব্য হয়ে গেল।"

বলিলাম, "না অম্বুরী।"

দু-জনে হাসিয়া উঠিলাম। হাসির ছোঁয়াচ লাগিয়া ওর বৌও হাসিয়া আরও সঙ্কুচিত হইয়া গেল।

বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ দূর ভবিষ্যৎ হইতে দৃষ্টি আসিয়া পড়িল সন্নিহিত বর্তমানে।

সংসার পরিবর্তিত ওদের। অনিল এখন বাড়ির কর্তা। তেইশ-চব্বিশ বছরের একজন যুবার যদি সংসারের কর্তা হইতে হয় তো তাহার ব্যক্তিগত জীবনেও একটা মস্ত বড় পরিবর্তন আসে, কতকটা মেঘভারাক্রান্ত দ্বিপ্রহরের মত। এই কর্তামি আর ডেলিপ্যাসেঞ্জারি মিলাইয়া অনিল যেন অনেকটা বুড়ো হইয়া গিয়াছে। তবুও অনিল, অনিলই। বিশেষ করিয়া আমি গেলে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া ওঠে।—সেই কথায়, ভাবে উচ্ছ্বসিত অনিলকে যেন সামনে দেখিতেছি। আমি গেলে আমাদের যা বাঁধা প্রোগ্রাম,—সমস্ত গ্রাম আর গ্রামের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি,—বেনে বৌয়েদের বাড়ির সামনে পুকুরধারটায়, মজা নদীর ধারে ধারে অনন্তপুরের রাস্তা, স্কুলের ধার। একদিনও ভালবাসি নাই স্কুলটাকে, কিন্তু এখন যে কী চমৎকার লাগিতেছে। ঠিক যেমন পুরানো মাস্টার মশাইদের কাহাকেও দেখিলে প্রীতি আর ভক্তিতে মনটা ভরিয়া উঠে আজকাল; আগে যাঁদের যমের মত দেখিতাম।...গা-ঢাকা হইয়া আসিল—আমরা লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া অন্ধকারের মধ্যে, অতীতের অন্ধকারে ডুব দিয়া কি সব জিনিস খুঁজিয়া বেড়াইতেছি। সব প্রগল্‌ভতা মৌন হইয়া গিয়াছে, দু-জনেই বুঝিতেছি দু-জনা কোথায় আছে, সেখান থেকে ডাক দিয়া—একে অন্যকে ফিরাইয়া আনিতে মন সরিতেছে না। অবশ্য ভিতরে সঞ্চয় তখন খুব বেশি হইয়া উঠিতেছে, এক-একবার কথাবার্তাও আবেগময় হইয়া উঠিতেছে। অনিল কি ভাবিয়া একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "ছেলেবেলাকার বইগুলো এদিকে আর পড়েছিস শৈল?"

খুব আশ্চর্য হইয়া ওর দিকে চাহিয়া আছি। অনিল বলিতেছে, "প'ড়ে দেখিস। দেয়াল-আলমারির পুরনো বইগুলো গুছোতে গিয়ে সেদিন আমার হাতে একটা 'মনোহর পাঠ' বলে বই পড়ল। অদ্ভুত রে। এমন মিষ্টি লাগছিল। কোথায় লাগে একটা ভাল কাব্য তার কাছে। লেখাগুলোর চারদিকে সমস্ত ছেলেবেলাটা এসে ঘিরে দাঁড়ায় কিনা। বইটাও অদ্ভুত বোধ হচ্ছিল—কোনগুলোতে আঙুলের দাগ—যেখানে-সেখানে কাঁচা হাতের নাম লেখা। হ্যাঁ, একটা পদ্য—'পুষি আর আমি'।—একটা মেয়ে একটা বিড়ালকে বুকে চেপে রয়েছে, বেশ ছবিটা—বেশ মোটাসোটা গোলগাল মেয়েটা। নীচে পেন্সিলে কি লেখা আন্দাজ কর দিকিন।"

আমি একটু ভাবিয়া হাসিয়া বলিলাম, "সৌদামিনী।"

অনিল বলিল, "অনেকটা আন্দাজ করেছিস, তবে অনিল চৌধুরী চিরকালই সেয়ানা কিনা, অত ধরা-ছোঁয়া দেওয়ার পাত্র নয়। লাল পেন্সিলে লেখা আছে 'সু-দা-ম'। কেউ ধরতে বা ধরিয়ে দিতে পারবে না, নামটা আইনের প্যাঁচ বাঁচিয়ে লিখেছি; এমন কি জাত পর্যন্ত বদলে দিয়েছি—

আমাদের সখী সৌদামিনী নয়, একেবারে কৃষ্ণসখা সুদামা!

মজা নদীর ইউনিয়ন বোর্ডের তৈয়ারী-করা পুলের উপর বসিয়া আমাদের অনেকখানি রাত হইয়া গেল, কিন্তু ঐটুকু কথার পর অনেকক্ষণ আর কোন কথা নাই।...আবার অনিলের উচ্ছ্বাস আসিয়াছে, কি রকম একটা স্বপ্নালু দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়া বলিতেছে, "তোর অম্বুরীকে আমাদের এই অংশের জীবনের মধ্যে টেনে নিয়ে আসতে ইচ্ছা করে শৈল। এক-একবার মনে হয় সাহেব হতাম তো বেশ হ'ত—তুই, আমি, অম্বুরী—একসঙ্গে পাশাপাশি ছেলেবেলাকার জীবনের টুকরো-টাকরা জড় ক'রে বেড়াচ্ছি!...এক-এক সময় মনে হয় ক্রীশ্চান হ'য়ে যাই; কিন্তু তাহ'লে গ্রামছাড়াই করবে সবাই মিলে, আর এ-গ্রাম দিলেও প্রাণ ধরে আমি ছাড়তে পারব না এই তোকে বলে দিলাম শৈল। একে ছেড়ে যে মরতে হবে একদিন এইটুকু মনে হ'য়ে এক-এক সময় মনটা উদাস ক'রে দেয়.. অম্বুরীটা বেশ শৈল, কিন্তু বড় আদিম। আমাকে, অর্থাৎ ওর পুরুষটিকে কি ক'রে ঠাণ্ডা রাখবে অষ্টপ্রহর ওর এই চিন্তা; সকালে উনুন ধরান থেকে রাত্রে মশাবি ফেলার মধ্যে যা কিছু ওর কাজ সবগুলোরই মুখ আমার দিকে। কষ্ট হয় কি অসহ্য আদাম-ইভের জীবন বল দিকিনি!—ও বসে বসে আমার স্থূল ভোগের জোগাড় ক'রে যাচ্ছে—রান্না থেকে আরম্ভ ক'রে—আর আমি সপৌরুষে ভোগ ক'রে যাচ্চি!..."

সাঁতরা আবার মিলাইয়া গেল। মীরা গুন্ গুন্ করিয়া গান করিতেছে, তাহারই রণন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। মীরার সুর কানে এই প্রথম গেল। মীরার গলা খুব মিষ্ট, তবে সুরেব জ্ঞান নিখুঁত নয়; কিন্তু আশ্চর্য, ভুল সুরে এমন একটা ছেলেমানুষি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে—লাগিতেছে ভারি মিষ্ট।

রকে মাদুরের উপর অনিল, আমি বসিয়া, আমার কোলে অনিলের ছেলেটা, তাহার ঝাঁকড়া মাথার উপর চিবুকটা চাপিয়া বসিয়া আছি। অম্বুরী আমাদের কাপড় কোঁচাইতেছে, আলনায় তুলিয়া বাখিবে। অনিল বলিতেছে, "ওগো, তুমি একেবারেই 'আমি', নয় যে 'আমি-ধ্যান' 'আমি-জ্ঞান' হ'য়ে রয়েছ, একটু নিজের জীবনটাও আলাদা ক'রে দেখ দিকিন। নারী পুরুষের একখানা পাঁজর খসিয়ে তোয়ের করা জানি; কিন্তু তোমার শোচনীয় অবস্থা দেখে দুঃখে আমার সব পাঁজরগুলোই খসে পড়তে চাইছে...আহা, বেচারী!...দেখ, তোমার স্বামী দেবতার বাইরেও জগৎ আছে, গাডু মাজা আর কাপড় কোঁচানোর অতিরিক্তও কাজ আছে পৃথিবীতে..."

অম্বুরী হাঁটুতে চাপিয়া কোঁচান কাপড়টা পাকাইতেছে। হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার ব্যাখ্যানায় কাজ নেই, আমার জন্ম জন্ম এইটুকুই বজায় থাক।"

অনিল শিহরিয়া উঠিল, বলিল, "মাফ কর, তাহ'লে এর পরের জন্মেই তুমি দয়া ক'রে অন্য পুরুষ দেখো বাপু, আমায় রেহাই দিও; আমায় আষ্টে-পিষ্টে জড়িয়ে যে তুমি শুধু—জন্মের পব জন্ম...না বাপু, আমি এর মধ্যে নেই, ক্ষ্যামা দাও—"

আমরা তিনজনেই হাসিয়া উঠিয়াছি, ছোট ছেলেটাও আমার মুখে দিকে ঘুরিয়া চাহিয়া যোগ দিয়াছে, অম্বুরী হাসিয়া উপর গাম্ভীর্য চাপাইয়া আমায় সাক্ষী মানিয়া অনুযোগ করিতেছে, "শুনলে ঠাকুরপো? হিঁদুর ঘরে এ রকম আদাড়ে কথা শুনেছ কখন। কি মানুষ বাপু!—আমি তো বুঝি না..."

২

সেই ছোট বারান্দাটিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছি। চক্ষুর সামনে এক-একবার অতিমাত্র স্পষ্ট হইয়া দৃশ্যগুলা জীবনের চাঞ্চল্য লইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এক-একবার মিলাইয়া যাইতেছে—মনটা লিণ্ডসে ক্রেসেন্টে ফিরিয়া আসিতেছে—সম্মুখে রাস্তা, রাস্তার ওধারে বাড়ির শ্রেণী, তাহার

পিছনে গাছের জটলা জমিয়া উঠিতেছে। মনটা হু হু করিয়া উঠিতেছে; আমি ঠিক এখানকার মানুষ নয়, কলিকাতার নয়, লিণ্ডসে ক্রেসেন্টের তো একেবারেই নয়।...কি অসহ্য কাটাছাঁটা, মাপাজোখা ব্যাপার! কি অসহ্য রকম মানানসই করিয়া তৈয়ারী সব! এক ইঞ্চি অপব্যয় নাই, এক ইঞ্চি অতিরিক্ততা নাই—রাস্তাই বল, বাড়িই বল, বাগানই বল, কড়া হিসাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত । এই অসহ্য শুভঙ্করের রাজ্যে মানুষগুলো পর্যন্ত যেন এক-একটা অঙ্ক, তাহাদেব বাঁধা প্রসেস্ বা পদ্ধতির মধ্য দিয়া এক-একটা অমোঘ পরিণামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এক চুল এদিক-ওদিক হইলে অঙ্ক ভুল হইয়া যাইবে। রাজু বেয়ারা পর্যন্ত যেন একটা এ্যালজেব্রার ফরমূলা। সামনে দিয়া দোল-উৎসব গেল, আশা করিয়াছিলাম অন্তত বেহারী চাকরটা আউট্হাউসে ভুলিয়াও একটা ছাপরেয়ে অন্ ধরিয়া বসিবে। কিছু করিল না;—সমীচীনতার তাসের ঘর ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে যে।

মিস্টার রায় চমৎকাব, অপর্ণা দেবী আরও চমৎকার—কিন্তু এখন অনুভব করিতেছি আমার সঙ্গে মিল নাই; শ্রদ্ধা করি, কিন্তু যেন মনে হইতেছে অনেক দূর থেকে।...সবচেয়ে আত্মীয়া মীরা—তাহার প্রাণের সঙ্গে মিতালি পাতাইতে বসিয়াছি, কিন্তু কোথায় তাহার প্রাণ?—আছে কি? পাওয়া যাইবে কি কখনও? এই কি ভালবাসিতেছি? না, খুব বিচক্ষণ মনস্তাত্ত্বিকে লেখা একটা উপন্যাস পড়িয়া যাইতেছি মাত্র? অশ্রুবিন্দুটি পর্যন্ত যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনই—যেখানে দুইটি মানায় সেখানে তিনটি বিন্দু গড়াইয়া পড়িবে না।

এর চেয়ে সেই চিত্র—সদু পানফল চাহিয়াছে, ঠিক-দুপুরের সূর্যের অভিশাপকে আশীর্বাদ করিয়া লইয়া আমি আর অনিল দু-জনে বসিয়া আছি, যদি ধরা পড়ি কপালে আছে তারিণী জেলের লগুড়। কি রকম স্পষ্ট, নিঃসন্দিগ্ধ একটা ব্যাপার, একদিকে কত বড় উল্লাস আর অপর দিকে কি ভীষণ পরিণাম! রাজকন্যার জন্য সোনার গাছে মুক্তার ফল আহরণ করিবার অভিযান থেকে কিসে কম?

না, হে ভগবান, আমায় ঐ রকম করিয়া ভালবাসিতে দাও, তাহাতে আসুক শক্তি, আসুক প্রসার। অম্বুরীর মত, আমাকেও যে ভালবাসিবে তাহার প্রাণে একটা খুব বড় রকম মিথ্যার বাহুল্য থাকুক,—সে আমায় বলুক জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া সে আমার সামান্য খুঁটিনাটির দিকে পর্যন্ত চক্ষু নিবদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিবে, আর আমি মুগ্ধ বিশ্বাসে সেই মিথ্যাকে সত্য বলিয়া বুকে ধরিয়া রাখি।

অনেকক্ষণ পরে চিন্তার একটা অবসাদ আসিল। কলিকাতা স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া স্থির চিন্তার দ্বারা মনটা শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম। নিজের অজ্ঞাতসারেই কোন্ ঊর্ধ্বলোকে যেন উঠিয়া গিয়াছি, ধীরে ধীরে আবার নামিয়া কঠিন মাটির স্পর্শ অনুভব করিলাম। অনিলের হাতের লেখাটা পুরানো স্মৃতিকে ঘাঁটাইয়া মনটাকে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে।...না, এটা ঠিক স্বাভাবিক অবস্থা নয়। মন আমার শান্ত হউক; যেন রূঢ়-সত্য এই জীবনের দিকে স্বচ্ছ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতে পারিবার শক্তি না হারাই। আমার এখান থেকে যাইলে চলিবে না এখন। কলিকাতাও সত্য, মীরাদের দেওয়া টাকাটা আরও সত্য। ভাগ্যে মীরাদের সঙ্গে সম্বন্ধটা কাটাইয়া দিয়া আসি নাই। আমি আজ একজন উদীয়মান ছাত্র, আমার আলোচনা ছাত্র-মহলের একটা বড় প্রসঙ্গ, প্রফেসাররা আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। মীরার দেওয়া এই টুইশ্যনই তা সবার মূলে।

আশ্চর্য, অনিলের চিঠিটা এখনও পড়াই হয় নাই; এত ছবি, এত কথা মনে ভিড় করিয়া আসিলই বা কোথা হইতে?

খাম খুলিয়া চিঠিটা পড়িলাম।

অনিলের লেখা ঠিকানায় একটু ভুল ছিল। লিণ্ডসে স্ট্রীট লেখা ছিল, তিনদিন ঘুরিয়াছে চিঠিটা। এখানে ঐ ব্যাপার লইয়া বেশ একটু গোলমাল হয় মাঝে মাঝে। লিণ্ডসে স্ট্রীট আছে, লিণ্ডসে ক্রেসেন্ট আছে, আবার লিণ্ডসে হাউস বলিয়া বড় একটা কারখানা আছে, সেখানে একবার ঢুকিলে তাহাদের নানা ডিপার্টমেন্ট ঘুরিতেই কখন কখন চিঠির দুইটা দিন কাটিয়া যায়। ব্যাপারটা আগে আমি জানিতাম

না। সবে কাল রাত্রে আহারের সময় মিস্টার রায়ের একটা চিঠি গোলমালের প্রসঙ্গে আমার সামনে কথাটার প্রথম আলোচনা হইল। আমি এখানে আসিয়া অবধি তিনখানা পত্র দেওয়ার পর অনিলের পত্র পাইয়াছি। রহস্যটা পরিষ্কার হইল।

অনিল অত্যন্ত চটিয়াছে। আমার প্রথম পত্রের উত্তরও দিয়াছিল, দুইখানি। দ্বিতীয় চিঠি ও পায় নাই, আদৌ বিশ্বাস করে না যে আমি লিখিয়াছি—একটা ভাঁওতা আমার। তৃতীয় পত্র পাইয়াছে; কিন্তু এই দুইখানি পত্রের কোনখানিতেই ঠিকানা দেওয়া নাই। প্রথম দুইখানি চিঠি ও আমার আগেকার বাসার ঠিকানায় দিয়াছিল, আশা করিয়াছিল সেখান থেকে রিডাইরেক্টেড হইয়া আমার হাতে পৌঁছিবে। আমার পত্র পাইয়া বুঝিল পৌঁছায় নাই। আমার পুরোনো বাসায় লিখিয়া ঠিকানা আনাইয়া পত্র দিল। কর্তাকে পত্র দিয়াছিল, তিনি ছেলেদের নিকট হইতে ঠিকানা লইয়া পাঠাইয়াছেন, লিখিয়াছেন ভুল হওয়া অসম্ভব নয়।

নূতন জায়গায় গিয়া ঠিকানা না দিয়া পত্র দেয় এমন লোকের মস্তিষ্ক নিজের ঠিকানায় আছে কি না অনিল সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছে। একটি মাত্র ছাত্রী পড়ানয় আরাম আছে স্বীকার করে অনিল, কিন্তু একটা কথা—যখন প্রতিদিন গড়পড়তা দশটি-বারোটি করিয়া ছেলেমেয়ে পড়াইয়াছি তখন আমার চিঠি পড়িয়া কখনও মারাত্মক রকম ভ্রান্তি বা জটিলতার সন্ধান পায় নাই। চিন্তিত আছে,—একটু সন্দিগ্ধভাবে।

অনিলের নিজের অত হিসাব থাকে না, অম্বুরী খুকির জন্মতারিখ হইতে গুনিয়া বলিতেছে, ঠিক ছ-মাস সতের দিন আমি সাঁতরামুখো হই নাই। এই ছ'মাস সতের দিনে আমার কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছে—আমাকে আর ওদের কাছে যাইতে বলা চলে কি না অনিল ঠিক বুঝিতে পারিতেছে না, তাই শুধু অবস্থাটা জানাইয়া দিল মাত্র।

ওর ছেলের কথা লিখিয়াছে; বয়সের অতিরিক্ত পাকা হইয়া উঠিয়াছে। এদিকে জিভের আড়টা এখনও ভাঙে নাই, ট-বর্গের উপর পক্ষপাতিত্ব বেশি। সবচেয়ে দুর্বোধ্য ওর ব্যাকরণটা,—'ক' উচ্চারণ করিতে পারে, কিন্তু 'কাকা' বলিতে পারে না। আমার প্রসঙ্গ উঠিলে বলে 'শৈল টাকা'। এ শব্দতত্ত্বের রহস্য ভেদ করিবার জন্য আর একজন পাণিনির জন্মান দরকার।

অনিলের মা এখন ভাল আছেন, তবে কানটা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে।

চিঠিটা মুঠোর মধ্যে লইয়া আবার বাহিরের পানে চাহিয়া রহিলাম। মনের কোথায় বিদ্রোহ উঠিয়াছে, আমি প্রাণপণে লিণ্ডসে ক্রেসেন্টের যশোগান করিয়া শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি। মন বসাইবার জন্য সাড়ম্বরে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিতে লাগিলাম। ঠিক হইয়া গেল ছাড়িব না।

তাহার পর কি করিয়া কি হইল বলিতে পারি না; শুধু বুকের মধ্যে একটা প্রবল ব্যাকুলতা...একটু মুক্তি দাও আমায়, কলিকাতার এই ইটের পাঁজার মধ্যে থেকে মুক্তি চাই সাঁতরার শ্যামল কোলে; অন্তত একটু দেখিবার মুক্তি...কয়েদী যেমন জানলার গরাদটা চাপিয়া ধরিয়া বাহিরের খণ্ডিত দৃশ্যের পানে চাহিয়া থাকে।

ফিরিয়া আবার মীরার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। মুঠার মধ্যে কপালটা চাপিয়া সামান্য একটু চিন্তা করিলাম, তাহার পর প্রবেশের অনুমতি চাইব, কণ্ঠস্বরটা একটু কাঁপিয়া গেল। পরিষ্কার করিতে গিয়া একটু শব্দ হইতেই মীরা ডাকিল, "কে? এস।"

মীরা জানালার গরাদে হাতে দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফিরিয়া আমায় দেখিয়া অপ্রতিভ আর বিস্মিত হইয়া যেন হঠাৎ কেমনধারা হইয়া গেল। ওর ডাকিবার ভাষাতেই বুঝিয়াছিলাম, এবারেও আমি আসিতেছি ভাবিতে পারে নাই।

তাড়াতাড়ি কাজটা সারিয়া লইবার জন্য বলিলাম, "আমি ক'টা দিনের ছুটি চাইতে এলাম। একবার ঘুরে আসব, মাস পাঁচেক যাইনি।"

মীরা যেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না একটা প্রকৃতিস্থ লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

স্থির কতকটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল, "এই বলিলেন যে থেকে যাবেন, এর মধ্যেই কি হ'ল আবার?"

বেশ মজার ব্যাপার। মীরা আমায় অপ্রকৃতিস্থ ভাবিতেছে বোধ হয়, অথচ তাহার নিজের কথাই প্রকৃতিস্থ নয়। বলিলাম, "আমি তো ছেড়ে যাবার কথা বলছি না মীরা দেবী—"

"তবে?"

"ক'দিনের ছুটি চাইছি মাত্র।"

"ও। বাড়ি যাবেন?"

"না, বাড়ি আমাদের পশ্চিমে, অল্পেই যাওয়া-আসা চলে না, আমার এক বন্ধুর বাড়ি যাব, কাছেই।"

অনিলের মায়ের কানের কথা লইয়া মিথ্যা রচনা করিয়া ফেলিলাম। "লিখেছে তার মায়ের অবস্থা বড্ড খারাপ, তাই..."

"ও। তা বেশ, যাবেন। ক'দিনের জন্যে?"—দুর্বলতায় মীরার স্বরটা মনিবের মত হইয়া গেছে, অর্থাৎ ও অধিকারের জোর খাটাইতে চায়।

বলিলাম, "হপ্তাখানেকের জন্যে; ক্ষতি হবে?"

মীরা ধীরে ধীরে বলিল, "বে-শ।...না, ক্ষতি কিসের?"

নামিয়া আসিতেছি, সিঁড়ির মোড় ঘুরিব, মীরা উপর হইতে ডাকিল। দেখি বেলিঙের উপর ভর দিয়া নিম্নমুখী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। বলিল, "শৈলেনবাবু, একটা কথা..."

আমি দুই ধাপ উঠিয়া আসিয়া বলিলাম, "কি বলুন!"

মীরা একটু মুখটা ঘুরাইয়া কি ভাবিল, তাহার পর বেশ শান্ত স্থির কণ্ঠে বলিল, "মাপ করবেন, তরুর ক্ষতি হবে বলে কথাটা বাধ্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করতে হ'ল, অনুচিত জেনেও,—মানে আমায় আর টিউটরের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হবে না তো?...কথা হচ্ছে, অনিশ্চিতের মধ্যে না পড়ে থাকতে হয়—তাই..."

আমার মনটা অতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল—এই নিরুপায় নারীকে কি করিয়া বিশ্বাস করাই ওর আশঙ্কা মিথ্যা?

শান্ত দৃষ্টিতে ওর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, অযথা একটা প্রবঞ্চনা ক'রে যাব আমায় এমন ভাবলেন কেন? আমি যে নিজের তাগিদেই থেকে গেলাম এটা কি আপনি টের পাননি? বলুন?"

"নিজের তাগিদ" যে কোথায় মীরা আশা করি বুঝিল, বুঝিবে বলিয়াই বলা, তবু এর মধ্যে অর্থ-উপার্জনের কথাও যে আসিতে পারে এই সম্ভাবনার সূক্ষ্ম একটা অন্তরাল রহিল।

হয়তো আমার দেখিবার ভুল, কিন্তু মনে হইল মীরার সন্দেহক্লিষ্ট মুখটায় এক মুহূর্তের জন্য আশ্বাসের সঙ্গে লজ্জার একটা ক্ষীণ আভাস খেলিয়া গেল।

৩

মীরার কাছে ছুটি লইয়া নিজের ঘরে আসিয়া আমার একটা মজার কথা মনে পড়িল—আমি মীরার কাছে ছুটি চাহিতে গিয়াছিলাম কেন? মীরা ছুটি দেওয়ার কে? মীরার মা অবশ্য এসব কথার মধ্যে বিশেষ থাকেন না, কিন্তু মিস্টার রায় তো রহিয়াছেন এখন এখানে। না, আমার নিজেরই দোষ, আমি নিজেই মীরাকে মাথায় তুলিয়াছি। ও হুকুম দিবে তবে আমি যাইব। চমৎকার অবস্থা দাঁড় করাইয়াছি তো। তরু আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মী-পাঠশালার শাড়ি ছাড়িয়া লরেটোর জন্য তৈয়ার

হইয়াছে—খাটো ইজের, ধবধবে সাদা ফ্রক, বাঁ ঘাড়ের কাছে একটা আসমানি রঙের সিল্কের ফুল; এতক্ষণ ঘাড়ের উপর অর্ধচন্দ্রাকারে বেড়া-বেণী ছিল, খুলিয়া দিয়াছে, এখন পিঠের দুই প্রান্তে দুইটি সুরচিত বেণী দুলিতেছে; প্রান্তভাগে চওড়া রাঙা-ফিতার তৈয়ারি ফুল। পায়ে মোজা আর স্ট্র্যাপ দেওয়া জুতো।

গতিটাও বদলাইয়া গেছে। জুতা ঘষিতে ঘষিতে কতকটা লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া বলিল, "দিদি দিলে ছুটি মাস্টারমশাই, কিন্তু আমার পদ্য না লিখে দিলে বলব বন্ধ ক'রে দিতে।"

টাটকা এই চিন্তাই করিতেছিলাম বলিয়া কথাটা অত্যন্ত তিক্ত লাগিল। "তোমার দিদি কি আমার...?"—বলিয়া থামিয়া গেলাম। বলিতে যাইতেছিলাম, "তোমার দিদি কি আমার দণ্ড-মুণ্ডের মালিক নাকি যে তিনি ছুটি দিলে তবে আমি যাব?"

ঠিক সময়েই হুঁশ হইল যে, ছেলেমানুষের কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করা বড় বেমানান হইবে। হাসিয়া কথাটাকে হাল্কা করিয়া দিয়া বলিলাম, "তোমার দিদি কি তোমার মাস্টারমশায়ের মাস্টারমশাই নাকি যে ছুটি দেবেন আমায়?"

তরু প্রথমটা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছিল, আমার মুখের পরিবর্তিত ভাবে আবার আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "বাঃ, তবে যে দিদি বললেন—তরু, তোমার মাস্টারমশাই ছুটি নিয়ে গেছেন, কিন্তু পদ্যটা না লেখা পর্যন্ত ছেড় না যেন?"

আমার মুখটা আবার বোধ হয় একটু গম্ভীর হইয়া গিয়া থাকিবে, আবার সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "আসল জায়গায় ছুটি নেওয়া তো বাকিই আছে, তোমার বাবাকে, তোমার মাকে বলতে হবে না।"

তরু যেন একটু ফাঁপরে পড়িয়াছে, একটা বেণী সামনে ঘুরাইয়া আনিয়া তার ফুলটা লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছিল, সাহস দেওয়ার ভঙ্গিতে আমায় বলিল, "সে আর আপনাকে ভয় করতে হবে না মাস্টারমশাই, দিদি যা বলবেন তা বাবাও কাটবেন না, মা তো নয়ই। দিদির কাছে যখন ছুটি পেয়েছেন, তখন আর আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না।"

আমার কথার এ রকম উলটা পরিণতি দেখিয়া সত্যই অত্যন্ত হাসি পাইল। হাজার চেষ্টা করিয়াও মীরাকে তাহার কর্ত্রীত্বের আসন থেকে নামাইতে পারিতেছি না, যেন বনেদী হইয়া গিয়াছে। আমি চক্ষু দুইটা বড় করিয়া বলিলাম, "ও বাব্বা! তোমার দিদি এত বড় মহাপুরুষ;—জানতাম না তো আমি। তা বেশ, চল তোমার মার কাছে, বরং বলা যাবে'খন—হাইকোর্টের ছাড়পত্র পেয়েছি, তুমি বরং বেশ সাক্ষীও দিতে পারবে, চল।"

তরু হাসিতে হাসিতে মায়ের কাছে আমার আগমন বার্তা জানাইতে লঘুগতিতে আগাইয়া গেল।

অপর্ণা দেবীর ঘরের সামনে আসিয়া দেখি তিনি ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন। উপস্থিত হইতেই ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "তুমিও অগ্রদূত পাঠিয়ে দেখা করতে আসবে শৈলেন? চল, ভেতরে চল।"

নিজে প্রবেশ করিয়া পর্দাটা বাঁ-হাতে তুলিয়া বলিলেন, "এস।"

আমিও পর্দাটা ধরিয়া লজ্জিতভাবে প্রবেশ করিলাম। এই ছোটখাট সৌজন্যে এত অপ্রস্তুত করিয়া দেন উনি। প্রবেশের সময় পর্দা তুলিয়া ধরিবেন, আহারের সময় জলের গেলাসটা বোধ হয় সামান্য একটু দূরে পড়িয়াছে, উঠিয়া আগাইয়া দিয়া আসিবেন; মোটর থেকে যদি আগে নামেন, দোরটা টানিয়া ধরিয়া প্রতিক্ষাও করিয়াছেন। অনেকবার বলিয়াছি, কিন্তু ব্যতিক্রম হইবার যো যাই! বলেন, "এগুলো ভদ্রতা বা কার্টসি নয় শৈলেন, এগুলো ছোটখাট সেবা, শিভ্যাল্‌রির নাম নিয়ে আমরা আজকাল তোমাদের কাছ থেকে এগুলো আদায় করছি, কিন্তু আসলে এগুলো আমাদের কাছ থেকে তোমাদের প্রাপ্য।"

আপত্তিস্বরূপ কিছু বলিবার পূর্বে উত্তর পাইয়াছি, "না হ'লে মা বোনের জাত বলে আমাদের গুমোর বাড়াও কেন? আমরা যদি পাই এতে তৃপ্তি..."

হাসিয়া বলিয়াছি, "আমাদের লজ্জা দিয়ে তৃপ্তি পাবেন?"

জবাব পাইয়াছি, "আমরা তৃপ্তি পেলে লজ্জাটা না হয় সয়ে নিলে একটু।"

আর ওঁকে কিছু বলি না।

আমি প্রবেশ করিলে পর্দাটা ছাড়িয়া দিয়া চেয়ার দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি বস এইটাতে?"

নিজে টেবিলের সামনে একটা হেলান-চেয়ারে বসিলেন।

প্রসঙ্গের জের ধরিয়া হাসিয়া বলিলাম, "মায়ের কাছে যে নোটিশ দিয়ে আসতে হয় না আপনার বুড়ো ছেলে এ-কথাটা জানে, এই সাহেবী কায়দার জন্যে একজন লরেটোর ছাত্র দায়ী"—বলিয়া সহাস্যদৃষ্টিতে তরুর দিকে চাহিলাম।

তরু অপর্ণা দেবীর গায়ে হেলান দিয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপর্ণা দেবী যে আগ্রহ সহকারে দুই পা বাহিরে গিয়া আমায় লইয়া আসিয়াছেন এটা বোধ হয় ওর খুব মনে ধরিয়াছিল, ওর মাস্টারমশাইয়ের বেশ খাতির হয় এটা ও মনেপ্রাণে চায়। বলিল, "বা রে! না আগে থাকতে বললে মা উঠে এগিয়ে যেতে পারতেন?"

আমি বলিলাম, "তাই তো, বসে বসে কি মা হওয়া চলে? দেখুন তো!"

দু-জনেই হাসিয়া উঠিতে তরু লজ্জিতভাবে মায়ের বুকে মাথা গুঁজিয়া বলিল—"যান্।"

ঘরের মধ্যে আর একটা মানুষ ছিল, সেই ভুটানী। পার্টির দিন সে খানিকক্ষণ গাড়ি বারান্দায় আসিয়া তামাশা দেখিতেছিল; সেই দিনই লক্ষ্য করিয়াছিলাম তাহার চেহারা আর পোশাক—বিশেষ, পোশাকে পরিবর্তন হইয়াছে। ঘরের একটা কোণের দিকে একটা আবাম চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়াছিল। হাতে একটা স্ফটিকের মালা, সামনে একটা নীচু টেবিলে পিতলের বেশ একটি মাঝারি সাইজের বুদ্ধমূর্তি। বৃদ্ধা বোধ হয় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের হাসির শব্দে নড়িয়া চড়িয়া উঠিতে যাইতেছিল, অপর্ণা দেবী তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার বুকে হাত দিয়া বুকের কাছে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "বৈঠো; ক্যা হ্যায়, বুড্হী মাই?"

বুড়ী বিহ্বলভাবে তাহার ছানিপড়া চক্ষু তুলিয়া অপর্ণা দেবীর মুখের দিকে একটু চাহিয়া রহিল। কি যেন একটা গোলমাল হইয়া গেছে। তাহার পর মাথাটা ডাইনে বাঁয়ে নাড়িয়া কপালের উপরে গোটাকতক টোকা মারিয়া অস্পষ্ট স্বরে বলিল, "না...বেটা, বেটা..."

অপর্ণা দেবী তাহার কপালে বাঁ-হাতটা বুলাইয়া বলিলেন, "বেটা আবেগা। বুদ্দু বুদ্দু বোলো।"

ভুটানী স্ফটিকের মালাসুদ্ধ হাতটা ধীরে ধীরে আগাইয়া বুদ্ধমূর্তি স্পর্শ করিয়া আবার হাতটা কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া মালা জপিতে লাগিল। একটু পরে ধীরে ধীরে দুইটি ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কাঁপা ঠোঁটে খুব অস্পষ্টভাবে কি গোটা কতক দ্রুত উচ্চারণ করিয়া যেন আবেগটা আবার সামলাইয়া লইল।

অপর্ণা দেবী আসিয়া আবার উপবেশন করিলে প্রশ্ন করিলাম, "কেমন আছে আজকাল?"

বলিলেন, "ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ওই বুদ্ধমূর্তিটি আনিয়ে দিয়েছি, চেষ্টা করছি মনটা ধর্মের দিকে আকর্ষণ করবার। কতটা কি হচ্ছে ঠিক বুঝতে পারছি না, তবে এইটে লক্ষ্য করেছি, বাইরে বাইরে ততটা উতলা ভাব নেই, চুপ করে জপ নিয়েই থাকে যেন। তবে তন্দ্রাচ্ছন্ন হ'লে পরে কখন কখন ঐ রকম করে ওঠে, বিশেষ ক'রে কারুর পায়ের শব্দে বা অন্য রকম ভাবে যদি টের পায় কেউ ভেতরে এসেছে। এদিক দিয়ে ওর অনুভূতিটা আশ্চর্য রকম তীক্ষ্ণ, প্রায় অসম্ভব রকম। সেটাকে ওর সিক্সথ্ সেন্স বা তৃতীয় নয়ন বলা চলে। এই এত মোটা কার্পেট দিয়েছি ঘরে তো? ও ঠিক টের পাবে কেউ এলে। জেগে থাকলে হঠাৎ একটু সতর্ক হ'য়ে ওঠে, তখনি বুঝতে পেরে আবার কতকটা নিরাশ হ'য়ে মালা জপতে সুরু ক'রে দেয়; কিন্তু যদি তন্দ্রাচ্ছন্ন থাকে তাহ'লেই গোলমাল

ঐ যে কপালে হাত দিয়ে 'বেটা বেটা' করলে, ওর মানে স্বপ্ন দেখছিল ব্যাটা এসেছে। ঠিক স্বপ্ন বলা যায় না;—বাস্তবের দিকে ঐ পায়ের শব্দটুকু নিয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন মগজের মধ্যে একটা ধারণা গড়ে ওঠে। বড্ড ব্যাকুল হ'য়ে ওঠে, স্বপ্নের মধ্যে একটা ছবি ফুটে ওঠে কিনা...।"

প্রশ্নটা করিলাম, "মনটা ক্রমে ক্রমে পুরোপুরি ধর্মের দিকে এসে পড়েছে বলে আশা করেন কি?"

প্রশ্নটা আমার করা উচিত হয় নাই। ঠিক এই রকমেরই একটা পরীক্ষা যে তাঁহার নিজের জীবনে চলিতেছে সেটা আমার টের পাওয়া উচিত ছিল। অপর্ণা দেবী জানালার বাহিরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া খানিকটা যেন আত্মস্থ হইয়া রহিলেন, পরে দৃষ্টি ঘুরাইয়া লইয়া বলিলেন, "কি বলছিলে? ও! ঠিক বলতে পারি না, তুমি সাইকলজির ছাত্র, জানই তো মনের গতি বড় অদ্ভুত—যাকে বলা যায় ইনস্ক্রুটেব্‌ল। যখন ভাবা যাচ্ছে বহির্মুখী হ'য়ে সে কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় করেছে, আসলে তখন হয়তো নিজের চিন্তা নিয়ে অতলে ডুবে যাচ্ছে। ভুটানীর ব্যাপারে যদি তাই হয়তো বড় সাংঘাতিক, তাহ'লে ওর আর বেশি দিন নয়, ও ভেতরে ভেতরে ধ্বসে যাচ্ছে।"

চুপ করিয়া অপর্ণা দেবী চেয়ারটায় হেলিয়া পড়িলেন, যেন বড় বেশি ক্লান্ত এবং বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছেন। শয়ান অবস্থাতেই ধীরে ধীরে, যেন আপন মনেই বলিলেন, "যাক্, বেঁচে থেকেই বা কি করবে?"

আমার সমস্ত মনটা অনুশোচনায় খাক হইয়া গেল,—কি অন্যায়ই করিয়াছি অবুঝের মত প্রশ্ন করিয়া। খানিকক্ষণ নিজেকে বিশ্বাস করিয়া মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির করিতে পারিলাম না।...ঘরটা নিস্তব্ধ। ভুটানী এক-একবার মালা ঠিক করিয়া লইতে স্ফটিক স্ফটিকে লাগিয়া এক-একটা কিট্ কিট্ করিয়া আওয়াজ হইতেছে। তরু ছেলেমানুষ হইলেও কথাটা যে কোথা থেকে কোথায় গিয়া দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়াছে যেন। অপর্ণা দেবীর কথায় বলিতে গেলে তাঁহার এ দুর্বলতা সম্বন্ধে বাড়ির সবারই একটা তৃতীয় নয়ন আছে; কাহারও বয়স্থ ছেলে লইয়া কোন কথা উঠিলে অপর্ণা দেবীর সম্বন্ধে সবাই সশঙ্কিত হইয়া ওঠে।

অপর্ণা দেবীই আবার প্রথমে কথা কহিলেন, "মুশ্‌কিল হয়েছে ওর ছেলে এখানে নেই শৈলেন। আমি ওঁকে বলে পুলিশ সাহেবের সাহায্য নিয়ে ঢের খোঁজ করেছি, যেখানে যেখানে ভুটিয়াদের আড্ডা, ওকে নিয়ে গেছি—ওর ছেলে কলকাতায় আসেনি। আর গরম পড়ে গেছে—নতুন ভুটিয়া আসছেও না এ বছর। ওদিকে পুলিশ কমিশনারের আপিস থেকে ভুটান গভর্নমেন্টকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, টের পাওয়া গেছে ওর ছেলে বাড়িতেও ফিরে যায়নি।...চারিদিকে চেষ্টা করেছি, কিন্তু..."

হঠাৎ একটু উত্তেজিত হইয়া পড়িয়া বলিলেন, "মহাপাতকও করেছি ওর জন্যে শৈলেন, আর কি করব?"

ইচ্ছা ছিলনা, তবুও ভাব পরিবর্তনে একটু শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিয়া ফেলিলাম, "কি?"

"একদিন একটা ভুটিয়া ছেলেকে দেখেছিলে তো এখানে? না, সেদিন তুমি ছিলে না, আমি তোমার একবার খোঁজ নিয়েছিলাম—তুমি আগে যেখানে টুইশ্যন করতে তাঁদের মেয়ের না ছেলের বিয়েতে সমস্ত দিন সেখানে ছিলে।...সেই ছেলেটাকে বুড়ীর ছেলে বলে বুড়ীকে স্তোক দিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম। বুড়ীর ছেলের নাম, ওদের গাঁয়ের নাম আরও মোটামুটি কিছু খবর যোগাড় ক'রে ছেলেটাকে তালিম দিয়ে দিলাম। ভাল দেখতে পায় না চোখে, সমস্ত দিন বুড়ীর ছেলে পেয়ে সে যে কী আহ্লাদ!—যদি দেখতে!...সন্ধ্যের সময় প্রবঞ্চনাটা ধরা পড়ল। পরে টের পেলাম ওর ছেলে সমস্ত দিন খেলা শিকার—এই সব নিয়ে হুড়োহুড়ি ক'রে বেড়ালেও সন্ধ্যে থেকে একেবারে মাকে ঘিরে থাকত। রাত্তিরে দু-একটা বুড়ীকে মরতে দেখে তার কেমন একটা আতঙ্ক দাঁড়িয়ে গিয়েছিল, যে-কোন রাত্তিরেই ওর মা ওকে ছেড়ে চলে যেতে পারে। দামাল ছেলে ভয়ে যেন একেবারে অসহায় হ'য়ে থাকত। ছেলের এই শিশুভাবটা ছিল বুড়ীর সম্পত্তি,—সব মায়েরই এইটে সবচেয়ে বড় সম্পত্তি,

শৈলেন। ভুটিয়া ছেলেটার মধ্যে বুড়ী এইটে না পেয়ে খাঁটি-মেকির তফাতটা ধরে ফেললে।...শৈলেন, এসব পাড়ায় যে হিন্দুস্থানী গয়লারা গরু নিয়ে বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে যায় দেখেছ?—বাছুর মরে গেলে তার চামড়ার মধ্যে খড় ভরে কাঁখে ক'রে নিয়ে নিয়ে বেড়ায়, মার সামনে সেই কুশ-বাছুর দাঁড় করিয়ে দুধ আদায় ক'রে..."

হাতটা ধীরে ধীরে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মুখটা যেন অসহ্য যন্ত্রণায় কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "ওঃ! কি অন্যায় করেছিলাম!—পারলাম কি ক'রে বল তো...মা হ'য়ে?"

কী মুশকিলে যে পড়িয়াছি! কি করিয়া বদলাই আলোচনা? বলিলাম, "আপনি মিথ্যে নিজেকে দোষী মনে করেছেন। ভুটানীর সঙ্গে ব্যবহারটা বাইরে দেখতে প্রবঞ্চনা হ'লেও সত্যিই কি প্রবঞ্চনা ছিল?...ধরুন, এই তরুকে ছেলেবেলা থেকে কি বরাবরই সত্যি কথা বলে মানুষ ক'রে এসেছেন?—সত্যি কথা ধরে বসে থাকলে কি হ'ত মানুষ? আমার তো বিশ্বাস, মায়ের শুদ্ধ মনের জন্যে ভগবানের বিশেষ মার্জনাব ব্যবস্থা আছে। শুধু মার্জনার কথা বললে মায়ের প্রবঞ্চনাকে খাটো করা হয়, বরং বলব সেই প্রবঞ্চনার জন্যে বিশেষ পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে।"

অপর্ণা দেবী শান্ত দৃষ্টিতে আমার মুখেব পানে চাহিলেন, মুখে এটা প্রসন্ন হাসি ফুটিয়া উঠিল—ঠিক মায়েরা যে প্রশ্রয়ের হাসিতে অবোধ শিশুর মুখে ভারিক্কে কথা শুনিয়া তাহার পানে চাহিয়া দেখে।...সত্যই তো, এই প্রতিভাময়ী নারীকে একটা তুলনা দিয়া ভুলাইতে গিয়াছিলাম! লজ্জায় আমার দৃষ্টি যেন আপনি নত হইয়া পড়িল।

যা হউক একটা ভাল হইল। অপর্ণা দেবী বুঝিয়াছেন আমিও ওঁব সঙ্গে অন্তরে অন্তরে বেদনাতুর হইয়া পড়িয়াছি; প্রসঙ্গটা বদলাইবার জন্য ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছি। বলিলেন, "কোন কাজ আছে শৈলেন তোমার? এই জন্যে জিজ্ঞাসা করছি যে, আমি একটু কুনো বলে তরু কখন কখন আমি ডাকছি বলে, মীবাকে, এমন কি ওঁকে পর্যন্ত ডেকে এনেছে। তোমাকেও তেমনই ক'রে ডেকে আনেনি তো?"

তরুকে বুকের কাছে চাপিয়া হাসিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "আমার মা কিনা, তাই মিথ্যে কথা বলে আমার ভাল করবার চেষ্টা কবে। ভয় নেই, এ মিথ্যে তোমার শিক্ষা নয়, তুমি আসবার আগে থেকেই ওর এ-বুদ্ধি হয়েছে।"

ঘরের গুমোটটা গিয়া একটা লঘু হাস্যের স্রোত বহিল। আমি বলিলাম, "নয়ই তো আমার শিক্ষা, ওটা নিতান্ত মায়ের জাতের শিক্ষা, আমার কাছে কি ক'বে পাবে?—আপনি ভিন্ন আর কারুর কাছে পেতেই পারে না ও! মিথ্যের রাংকে সোনায় পরিণত করতে পারে যে পরশমণি, ভগবান মা ভিন্ন আর কাকব হাতে দেননি তো সেটা।"

অপর্ণা দেবী প্রশংসাটা তরুর ঘাড়ে তুলিয়া দিলেন। হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ছাত্রীও একদিন মা হবে, তাকে বড় করতে চাইছ, সুতরাং আর আপাতত প্রতিবাদ করলাম না...কি দরকার তোমার শৈলেন?"

বলিলাম, "আমি ক'দিনের জন্যে ছুটি নিতে এসেছি।"

অপর্ণা দেবীর মুখের হাসিটা যেন নিভিয়া গেল। আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ ছুটি নিচ্ছ যে, বাড়ি যাবে?"

বলিলাম, "না, বাড়ি যাওয়া এখন হ'য়ে উঠবে না, দিন পাঁচ-ছ'য়ের ছুটি নিয়ে একটু কাছাকাছি থেকে ঘুরে আসব।"

হাসিয়া বলিলাম, "জানেনই তো বাংলা আমার প্রবাসভূমি, সাত-সমুদ্র তের নদী পার হ'য়ে নিজের দেশে যেতে হ'লে অত অল্প ছুটিতে হবার নয়, তাতে গায়ের ব্যথাই মরবার সময় পাওয়া যায় না।"

অপর্ণা দেবী কিন্তু হাসিতে যোগ দিলেন না। যেন কি একটা বলিতে চান, বাধা রহিয়াছে।

বাধা বোধহয় তরু, তাই আমি বলিলাম, "তরু, তোমার বোধহয় এবার লরেটোয় যাবার সময় হ'ল।"

ঘড়িটার পানে চাহিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, আর দেরী নেই বেশি; খাওয়া হয়েছে তোমার?"

এ-সব বাড়ির মেয়েরা এ ধরনের ইসারাগুলো বেশ টপ্ করিয়া বুঝিয়া লয়। শুধু বুঝিয়া লওয়া নয়, তরু খানিকটা মানাইয়া লইবারও চেষ্টা করিল। বলিল, "এখনও একটু দেরী আছে, তেমনি আবার বই-টই গুছিয়েও নিতে হবে তো?"

যাইতে যাইতে দুয়ারের নিকট হইতে ফিরিয়া বলিল, "আমার পদ্য শেষ না ক'রে গেলে কিন্তু চলবে না মাস্টারমশাই, তা বলে দিচ্ছি।"

আমি গম্ভীর হইয়া বলিলাম, "যাতে বিয়েই অচল হ'য়ে যাবে এমন ভুল আমি করতে পারি কখনও? তোমার শুরুমার সঙ্গে আমার কিসের শত্রুতা বল?"

অপর্ণা দেবী একটু হাসিয়া বলিলেন, "বিয়ের প্রীতি-উপহার বুঝি? বলছিল বটে ওর মেজ শুরুমার বিয়ে।"

৪

অপর্ণা দেবী কি করিয়া প্রসঙ্গটা আবার তুলিবেন যেন ঠাহর করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। তরু চলিয়া গেলে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বলছিলাম তোমার বেড়াতে যাওয়ার মতলবটা যেন হঠাৎ হ'ল। কোন আত্মীয়-স্বজন কাছে-পিঠে আছেন নাকি?"

বলিলাম, "আত্মীয় নয় শ্রীরামপুরের কাছে আমার এক বন্ধু থাকে, একবার তার ওখান থেকে একটু ঘুরে আসব, অনেক ক'রে লিখেছে। কাছে, অথচ প্রায় পাঁচমাস যাইনি। ওদিকে পরীক্ষার জন্যে তোয়ের হ'তে নিঃশ্বাস ফেলবাব যো ছিল না, তার পরেই আপনাদের এখানে এসেছি, বুঝে-সুঝে নিতে এই তিনটে মাস কেটে গেল।"

অপর্ণা দেবী সুযোগটা হাতছাড়া হইতে দিলেন না, কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "তা কেমন বুঝছ?"

বলিলাম, "ভালই। তরুর মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছাত্রী পাওয়া তো..."

"সে না হয় হ'ল, আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি হ'য়েই বা কি করবে?—দোটানায় ফেলে ওকে কোথায় যে দাঁড় করাবে এরা, আন্দাজ করতেই পারছি না...আমি পড়াশোনা নিয়ে বোঝাবুঝির কথা বলছিলাম না; তুমি এই বাড়িতে রয়েছও তো? সেই দিক দিয়ে কেমন বুঝছ?"

বলিলাম, "সেদিক দিয়ে আমায় তো আপনারা রাজার হালে রেখেছেন।"

অপর্ণা দেবী এই দ্বিতীয় সুযোগে সোজাসুজি আসল কথাটায় আসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "বেশ, মেনে নেওয়া গেল রাজার হালেই রয়েছ তুমি; কিন্তু যাকে রাজার হালে রাখা যায় তার মান-অভিমান সম্বন্ধেও সেই রকম সতর্ক হ'য়ে থাকতে হয়।...কাল এতে একটু ত্রুটি হয়েছে শৈলেন, আমার মনে হচ্ছে তোমার এই হঠাৎ বেড়িয়ে আসার সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে।"

কথাটা এত আচম্বিতে আনিয়া ফেলিয়াছেন যে, আমি কি জবাব দিব বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। অপর্ণা দেবীই বলিলেন, 'আমি তোমায় যতটা জেনেছি তাতে অবিশ্বাসের কারণ নেই—তুমি যখন ছুটি নিচ্ছ তখন নিশ্চয় ছুটিই নিচ্ছ; কিন্তু বলতে বাধা নেই, আমার একবার যেন একটু মনে হয়েছিল তুমি একটা অশোভন গোলমাল না ক'রে ছুটির নাম নিয়ে আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছ।"

আমি আবার মুখ তুলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "এমন কি মহামারী কাণ্ড হয়েছে যে...?

অপর্ণা দেবী সাধারণত খুবই সংযত প্রকৃতির স্ত্রীলোক, কিন্তু স্পষ্ট বুঝা গেল ভিতরে বেশ একটু অধৈর্য হইয়া উঠিয়াছেন, বলিলেন, "শৈলেন, আমি সব কথা শুনেছি। কাল সন্ধ্যেয় তরুর খোঁজ নিতে গিয়ে টের পেলাম তুমি তরুকে বেড়াতে নিয়ে গেছ। সেই থেকেই আমার মনে অশান্তি লেগে ছিল—বাড়িতে একটা পার্টি, আর তুমি তাকে নিয়ে বেড়াতে চলে যাবে এমন বেখাপ্পা কাজ তুমি কখনই করতে পার না; মীরাকে জানি, কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়, যাতে তোমায় মারাত্মক রকম কর্তব্যপরায়ণ হ'য়ে উঠতে হয়েছে। পার্টি ভেঙে গেলে টের পেলাম। টের পাবার ইতিহাসটাও বড় চমৎকার। তোমাদের সঙ্গে পার্টিতে যারা সব ছিল তাদেরই মধ্যে একজন এসে বড় গলা ক'রে ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমার কাছে বর্ণনা করলে, যেন মীরা একটা মস্ত বড় বাহাদুরি করেছে।—আমি আর তাব নাম করলাম না, কিন্তু তুমি তাকে চিনেছ নিশ্চয়।...কি করব এদের সঙ্গেই তো মীরাকে মেলামেশা কবতে হবে?"

বুঝিলাম, নিশীথের কাজ, মীরার সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে অযোগ্য স্তাবক, ওদের মধ্যে আমার প্রবেশটা ওরই সবচেয়ে পীড়াদায়ক হইয়াছিল, আমার অপমানে তাই ও-ই হইয়াছিল সবচেয়ে পুলকিত; প্রথম সুযোগ পাইয়াই অপর্ণা দেবীকে সুসংবাদটা না জানাইয়া পারে নাই।...মুর্খ! এতদিন দেখিয়া-শুনিয়াও অপর্ণা দেবীকে চেনে নাই।

আমি নীরবই রহিলাম।

অপর্ণা দেবী খানিকক্ষণ চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তাহার পর প্রশ্ন করিলেন, "তোমায় একদিন হেরিডিটি সম্বন্ধে কতকগুলো কথা বলেছিলাম, মনে আছে শৈলেন?"

কথাটা পূর্বে উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি;—একদিন কথা প্রসঙ্গে অপর্ণা দেবী হেরিডিটি বা বংশানুক্রমিকতার কথা তুলিয়াছিলেন। এই রকম একটা অবান্তর বিষয় সম্বন্ধে ওঁর অধ্যয়ন ও জ্ঞানের গভীরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।

আমার জীবনের যা সবচেয়ে বড় সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা কি ভুলিতে পারি? তবুও কথাটা হাল্কা করিয়া ফেলিবার জন্য হাসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, বলেছিলেন বটে বংশের ধারাটা কখনও কখনও একটা বা দুটো ধাপ বাদ দিয়ে আবার চাগিয়ে ওঠে। আপনাদের উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন—আপনাদের দেহে যে রাজবংশের রক্ত আছে, এটা আপনার মনে না থাকলেও মীরা দেবীর মধ্যে এ-ধারণাটা আবার ফুটে উঠেছে।"

অপর্ণা দেবী আরও বেশি বলিয়াছিলেন,—বলিয়াছিলেন, "আশ্চর্য এই যে, মীরার রক্তের মধ্যে সেই রাজবংশের ধারাটা আরও পাৎলা হ'য়ে আসা সত্ত্বেও ওরই মধ্যে মর্যাদাজ্ঞানটা—আভিজাত্যের গুমরটা আরও উৎকট হ'য়ে দেখা দিয়েছে।"

অবশ্য এ-কথাটা আর অপর্ণা দেবীকে আমি বলিলাম না এখন।

অপর্ণা দেবী একটু শঙ্কিত-ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন, "ঐ হয়েছে সর্বনাশের গোড়া, শৈলেন। যখন জানই সব, তখন বরাবরের জন্যে তোমায় একটা কথা বলে রাখি,—মীরা এ-বিষয়ে নিরুপায়। ও মেয়ে ভাল, কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে কি ক'রে যাবে? ওর মধ্যে এই নতুন গণতন্ত্রের যুগ আর মৃতপ্রায় রাজতন্ত্রের যুগ পাশাপাশি কাজ করছে। ও তোমাদের চায়, তোমাদের মধ্যে যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে মহত্ব সেখানে ওর নজর গিয়ে পড়ে; কিন্তু ওর মায়ের বংশের কোন যুগের রাজা-মহারাজারা ওর মাথা দেন বিগড়ে মাঝে মাঝে। ও এইখানে একেবারে নির্দোষ। তাই বলছিলাম শৈলেন—মীরার ব্যবহারে যদি তুমি কখনও চলে যেতে বাধ্য হও তো নিশ্চয় যেও—হীনতা কেউ মাথা পেতে নেয় এটা আমি চাই না—কিন্তু ওকে ক্ষমা ক'রো। হ'তে পারে রাজরক্তের খামখেয়ালীপনায় ও তোমার মনুষ্যত্বের কাছে কোন সময় বোধহয় আরও বেশি অপরাধ করবে; আমাদের বাড়ির আতিথ্যধর্মে সেটা একটা মস্ত বড় অন্যায় হবে বলে আগে থাকতেই আমার মেয়ের হ'য়ে তোমায় এই অনুরোধ ক'রে রাখলাম।"

অত্যন্ত লজ্জিত এবং অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বলিলাম, "আপনি ব্যাপারটাকে বড় বাড়িয়ে দেখে মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন; আসলে অতটা কিছু নয়। বোধহয় একেবারেই কিছু নয়। হেরিডিটি নিয়ে মীরা দেবীর সম্বন্ধে আপনার একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে বলেই আপনি অতটা ভেবে নিয়েছেন। নিশীথবাবুও বোধহয় নিজের মনের রঙ ফলিয়েই কথাটা আপনাকে বলেছেন...।"

অপর্ণা দেবী চক্ষু তুলিয়া চাহিতে হুঁশ হইল—নিশীথের নামটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, অথচ তিনি ওটা প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। কিন্তু অপর্ণা দেবী সে-বিষয়ে কিছু না বলিয়া, দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমার ধারণাটা ভুল নয় শৈলেন, নিজেরই মেয়ে তো, এতটা ভুল হবে না। ওর এই রাজরক্তের গুমর নিয়ে আমার মস্ত বড় একটা আশঙ্কাও রয়েছে, ভগবান না করুন, সেটা যদি কখনও ফলে ওর জীবনে...।"

একটু ভীতভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি আশঙ্কা?"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "আশঙ্কা ঐ নিশীথকে নিয়ে, জান তো ও একজন খুব বড় জমিদারের ছেলে। নিজে যে ও একেবারেই অপদার্থ, যদি মীরা অসার বংশমর্যাদার মোহে এ-কথাটা কখনও ভুলে বসে?"

প্রকৃতিস্থ হইতে একটু বিলম্ব হইল।

সমস্ত ঘরটা নিস্তব্ধ। ভুটানী তন্দ্রালু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার হাতের স্ফটিক মালাটা কোলে পড়িয়া গিয়া 'ছলাৎ' করিয়া একটা মৃদু শব্দ হইল।

অপর্ণা দেবী প্রশ্ন করিলেন, "কবে যাবে?"

উত্তর করিলাম, "কালই যাই তাহ'লে। ক'টা দিন কাটিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বেশ যাও, একটু জায়গা বদলান দরকার।"

সিঁড়ি দিয়া নামিতেছি, দেখি সরমা উঠিয়া আসিতেছে। আমি সিঁড়ির বাঁকে পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইলাম। নমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "একটু অসময়ে যেন?"

ল্যাণ্ডিঙের দুইটা ধাপ নীচে দাঁড়াইয়া হাসিয়া উত্তর দিল, "মীরার ঝোঁক চাপলে তো সময়-অসময় বাছবার যো নেই। ফোন মারফত হুকুম হয়েছে—যেমন আছি চলে আসতে হবে, নৈলে আমার সঙ্গে চিরদিনের আড়ি।"

কিছু একটা বলার দরকার বলিয়াই বলিলাম, "একেবারে জার্মান কাইজারের আলটিমেটাম?"

"ঠিক তাই, কিন্তু কারণটা কি?"

"জানি না তো!"

সরমা আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল। সিঁড়ির মাথায় গিয়া আমার দিকে ফিরিয়া হাসিয়া বলিল, "অবশ্য জানবার কথাও নয় আপনার।—শুনেছি কাইজার নিজের নিকটতম পার্শ্বচরদেরও সব সময় নিজের গুপ্ত মন্ত্রণা জানাতেন না।"

ওদিক ঘুরিতেই নিশ্চয় মীরাকে দেখিতে পাইল। অগ্রসর হইতে হইতে বলিল, "তোমার এমন 'ভয়ানক মন খারাপ' কিসের জন্যে যে..."

যেন ওদিক থেকে বারণের ইঙ্গিত পাইয়া থামিয়া গেল।

রাত্রের আহারের সময় মিস্টার রায়কেও বলিলাম। একটু বেশি অন্যমনস্ক ছিলেন; বলিলেন, "যদি বেড়াতেই হয় শ্রীরামপুর না গিয়ে একবার পদ্মার ওদিকটা হ'য়ে এস বরং, চাঁদপুর, পার তো কুমিল্লা পর্যন্ত...ও রকম চমৎকার..."

আজ বিলাস-ঝি ডাইনিং রুমে ছিল, এক-একদিন্ থাকে, পরিবেশনে সাহায্য করে। বলিল, "শুনছেন মাস্টারমশায়ের বন্ধু থাকেন শ্রীরামপুরে, উনি পদ্মার-ধারে গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে *কি করবেন? আপনার মাথা খারাপ হয়েছে রায়মশাই...কি রকম মক্কেলের* পাল্লায় আজ পড়েছিলেন *বলুন তো?"*

মিস্টার রায় কাঁটা-চামচ প্লেটের উপর রাখিয়া দিয়া সিধা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "ভীষণ বিলাস, ভীষণ। আর বুড়ো বয়সে একলা এঁটে উঠতে পারি না। ভাবছি কাল তোমায় জুনিয়ার করে নিয়ে যাব—কেমন চমৎকার ওকালতিটা করলে মাস্টারমশাইয়ের পক্ষে!..."

পরদিন সকালে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য কয়েকখানা বই, কাপড়-চোপড়, অনিলের ছেলেমেয়েদের জন্য গোটাকতক খেলনা, আর কয়েকটা টুকিটাকি গুছাইয়া লইতেছি, তরু নামিয়া আসিল। খুব উল্লসিত। বলিল, "উঃ, কী চমৎকার যে আপনার পদ্যটি হয়েছে মাস্টারমশাই!"

হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি?"

তরু একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল, "বিশ্বাস করছেন না, কিন্তু দিদি নিজে বলেছে!"

আমি চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলাম, "তবেই তো! আর, বিশ্বাস যে করতেই হবে এ হুকুমও হয়েছে নাকি তোমার দিদির?"

আমার কপট গাম্ভীর্য দেখিয়া তরু হাসিয়া ফেলিল, সেও কৌতুকের ভঙ্গিতে ঈষৎ হাসিয়া মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিল, "হ্যাঁ, হয়েছে হুকুম। আরও একটা হুকুম হয়েছে।"

আমি আবার একচোট ভয় পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, "আবার কি?"

তরুও ভয় পাইবার ভঙ্গিতে বলিল, "আপনার ঠিকানাটা দিয়ে যেতে হবে।"

"কেন?"

তরু হাসিতে হাসিতেই সামনে ঘাড়টা দুলাইয়া দুলাইয়া বলিল, "কেন আবার? আরও যদি কোন হুকুম করতে হয় দিদির, কি ক'রে করবেন?—বাঃ!"

তাহার পর আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "না মাস্টারমশাই, দিদি প্রীতি-উপহারটা খুব ভাল কাগজে ছাপাবেন, আপনাকেও একখানা পাঠাবেন, তাই ঠিকানাটা চেয়ে রাখতে বললেন।"

আমি ছুটিতে যাইব, মীরা বিশ্বাস করিতে পারিতেছে না আমায়, কোন একটা যোগসূত্র ধরিয়া থাকিতে চায়।

আপনি যাইবেন, তাই লইয়া একজন অহেতুকভাবে শঙ্কিত—কথাটা ভাবিতেও সুখ নয় কি?

৫

বেশি নয়, সব মিলাইয়া হদ্দ ঘণ্টা-তিনেক লাগিল, যেন কোথা হইতে কোথায় আসিয়া গিয়াছি,—অন্য এক দেশ, অন্য এক যুগও যেন।

অনিলদের বাড়িটা একটা পাড়ার ভিতর দিয়া গিয়া একেবারে শেষের দিকে পড়ে। কাঁচা সরু গলি ছাড়িয়াই বাঁ-দিকে অনিলদের বাড়ির বাইরের উঠান দেওয়াল দিয়া ঘেরা, ইটে মাঝে-মাঝে নোনা ধরিয়া গিয়াছে। দেওয়ালের মাঝখানটায় একটা চৌকাট আছে, কিন্তু দরজা নাই।

ভিতরে গিয়া দাঁড়াইলাম। চাপা, সবুজ দুর্বা ঘাসে উঠানটা ভরা, তাহার একটু বাঁয়ে ঘেঁষিয়া পায়ে পায়ে তৈয়ারী সরু পথটা ভিতর-বাড়ির দিকে চলিয়া গিয়াছে। ডান দিকটায় একটু আগাছার জঙ্গল,—কচু, আশ্‌-স্যাওড়া, ভাট; তাহাদের উপর ছায়া ফেলিয়া একটা নোনার গাছ ফলে নুইয়া গিয়াছে। একপাশে একটা ছোট চাঁপার গাছ, গা বাহিয়া কতকগুলো তরুলতা উঠিয়াছে, সরু সরু টকটকে রাঙা ফুলে ভরিয়া রহিয়াছে!...হঠাৎ কি করিয়া জানি না, মীরাদের অতি-পরিচ্ছন্ন, সুসংযত বাগানের ছবিটা মাথায় যেন একবারে উঁকি মারিয়া গেল।

একেবারে ভিতরে গেলাম না। কিসের যেন একটা ঘোর লাগিয়াছে মনে হইতেছে সব রসটুকু নিংড়াইয়া পান করিতে করিতে অগ্রসর হই। রাস্তা দিয়াও আসিয়াছি যেন স্বপ্নে চলিয়া। পাশের

বাড়িতে খানকতক বাসন ঝন্‌ঝনিয়া পড়িয়া যাওয়ার শব্দ হইল! সঙ্গে সঙ্গে একটা মুক্ত কণ্ঠের তিরস্কার, "ওলো, বিয়ে হ'লে দু-ছেলের মা হ'তিস্—এই কাজের ছিরি?"

একটু কানে বাজে; বিশেষ করিয়া তাহার, দীর্ঘ ছ'টা মাস যে কলিকাতার বাহিরে পা দেয় নাই, আর শেষের তিনটা মাস কাটাইয়াছে বালিগঞ্জের এক সুসভ্য ব্যারিস্টারভবনে। কিন্তু একটা ছবি খুব স্পষ্ট হইয়া ওঠে, নিতান্তই বাংলার ছবি।—বড়, অনূঢ়া ঝিউড়ী মেয়ে—খিড়কির পুকুর থেকে বাসনের গোছা মাজিয়া বাঁ-হাতে সাজাইয়া লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিল—অসাবধানতা—মায়ের শাসন—সব তিরস্কারেই আজকাল একটু বিয়ের কথা মেশান—বিয়ের কথায় লজ্জা—না হওয়ার জন্য বোধ হয় মনের অন্তস্তলে কোথাও একটি তপ্তশ্বাস...রৌদ্রক্লান্ত মুখটি আরও একটু রাঙিয়া উঠিয়াছে...

দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ পল্লী আবার নিঝুম হইয়া পড়িল।

অগ্রসর হইয়া বাড়ির ভিতর-দুয়ারের কাছে আবার একবার দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল। যদিও একটু ভয় হইতেছে বাহির হইতে বা ভিতর হইতে কেহ আসিয়া পড়িলে ব্যাপারটা দেখিতে বেশ মানানসই হইবে না; কিন্তু জানাশোনা লোক—এ ভরসাটাও আছে সঙ্গে সঙ্গে। আসল কথা, বাংলার রূপটি সব মিলিয়ে এত নিঁখুতভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে, এমন কিছুই করিতে মন সরিতেছে না যাহাতে সে-রূপটি চকিত, ত্রস্ত হইয়া মিলাইয়া যায়।...কে 'অন্নদা-মঙ্গল' পড়িতেছে, খুবই সম্ভব অম্বুরী—ছাদের একঘেয়ে বিলম্বিত সুর ভাসিয়া আসিতেছে—

অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটনীরে।।
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি।।
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।।
পরিচয় না দিলে করিতে নারি পার।।
ভয় হয় কি জানি কে দিবে ফেরফার।।
ঈশ্বরীকে পরিচয় করেন ঈশ্বরী।
বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।।

কি রকম একটা আবেগে আমার চোখ যেন ভিজিয়া আসিতে চাহিল। বহু বৎসর পরে অনেক দূরের কোন এক প্রবাস হইতে যেন ফিরিয়া আসিয়াছি। ধমনীর সমস্ত রক্ত যেন সাড়া দিয়া উঠিল; ঠিক এই আমার নিজের ভুঁই। যুগ যুগ ধরিয়া এখানে দেবতায়-মানুষে লীলার খেলা হইয়া আসিয়াছে, তাই বহু যুগের সহজ-অভিজ্ঞতার দাবীতে এখানে মানুষ বিশ্বাস করে, দেবতা ছলনা করিয়া পাটনীকে ডাকিয়া খেয়া পার হইল, আলতা-রাঙা পায়ের স্পর্শে সেঁউতি সোনা করিয়া দিয়া পারণী-মূল্য দিয়া গেল।...বুঝিতেছি, কলিকাতা এ দেশের গায়ে একটা পরগাছা—তার আকাশ-বাতাস, রাস্তাঘাট, মানুষ সব সমেত একটা পরগাছা কলিকাতা। আজ সকাল পর্যন্ত এই চারিটা বৎসর আমি এইখানে ব্যয় করিয়াছি।...কী সব শ্রীহীন বাড়ি—শাসনক্লিষ্ট বাগান—মিস্টার রায়—মীরা...কি সব অনাত্মীয়—কোন্ দেশের—কত দূরের...

মাঝে মাঝে একেবারে অন্যমনস্ক হইয়া যাইতেছি, মাঝে মাঝে আবার অম্বুরীর সুর জাগিয়া উঠিতেছে—টানাটানা—অলস মধ্যাহ্নের সঙ্গে লয়ে মেশান—

বসিলা নায়ের বাড়ে নামাইয়া পদ।
কিবা শোভা নদীতে ফুটিল কোকনদ।।
পাটনী বলিছে মাগো বৈস ভাল হ'য়ে।
পায়ে ধরি' কি জানি কুম্ভীরে যাবে ল'য়ে।।

ভবানী বলিছে তোর নায়ে ভরা জল।
আলতা ধুইবে পদ কোথা থুই বল্।।
পাটনী বলিছে মাগো শুন নিবেদন।
সেঁউতি উপরে রাখ ও রাঙাচরণ।।

হুঁশ হইল, বেশি দেরী হইয়া যাইতেছে। "অনিল আছিস্?"—বলিয়া আমি ভিতরের উঠানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

উঠানের ডান দিকে টানা রক, তাহার পরেই ঢাকা বারান্দা, দুয়ার খোলা। বারান্দার মেঝেয় মাদুর পাতিয়া অম্বুরী উবুড় হইয়া শুইয়া বই পড়িতেছে, পাশে অনিলের মা একটা বালিসে মাথা দিয়া এদিক ফিরিয়া শুইয়া আছেন। মাঝখানে কোলের মেয়েটি নিদ্রিত। অনিলের ছেলে দুই হাতের মধ্যে চিবুক রাখিয়া মা'র মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছে।

প্রথম ডাকে ধ্যান ভঙ্গ হইল না কাহারও। তখন চলিতেছে—

সোনার সেঁউতি দেখি পাটনীর ভয়।
এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।

"খোকা!" বলিয়া আবার ডাকিলাম আর একটু জোরে।

অম্বুরী হুড়মুড়িয়া উঠিয়া একবার আমার পানে চাহিয়াই এক গলা ঘোমটা টানিয়া বাঁ-হাতে ভর দিয়া বসিয়া রহিল। অনিলের মায়ের গলাটা বার্ধক্যের হেতু কাঁপিয়া গিয়াছে, কালা মানুষ, দৃষ্টিও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে; একটু টানিয়া প্রশ্ন করিলেন, "থামলে কেন বৌমা, কি হ'ল?"

খোকা প্রথমটা ভয়ে, পরে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া আমার পানে চাহিয়া ছিল, হঠাৎ উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ওমা, শৈল টাকা! কি ঠব্বনাশ!"

"পারলে চিনতে?"—বলিয়া আমি হাসিতে হাসিতে গিয়া রকে উঠিলাম। বলিলাম, "তোমার মা অত শীগ্‌গীর চিনবে অবশ্য আশা করি না।"

অম্বুরী ঘোমটা তুলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।—"ঠাকুরপো!...ওমা, ঠাকুরপো, এসেছেন।"

আমি গিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিলাম, "জেঠাইমা, আমি শৈলেন।"

বৃদ্ধ উঠিয়া বসিয়া আমার চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটা চুম্বন করিলেন। বলিলেন, "ওমা দেখ! আজ সকাল থেকেই বাঁ চোখটা নাচছে, তোমায় বললাম না বৌমা—কিছু একটা সুখবর আছে—হয় কেউ আসবে নয়..."

অম্বুরী বলিল, "আমারও তো কাল রাত্তিরে হাত থেকে ঘটিটা পড়ে গেল বললাম—'রেতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ি যা'...উঃ, কতদিন আসনি যে ঠাকুরপো!"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আসবার আঁচ পেয়েই কাল রাত্তির থেকে তুমি যে রকম অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করেছ, অম্বুরী, তাতে..."

এখানে একটা কথা না বলিয়া রাখিলে ঠিক হইবে না। অনিল আমার চেয়ে বছরখানেকের বড়, একটু বেশিই হইবে; তাই অম্বুরী যখন নূতন আসিল 'বৌদি' বলিয়া সুরু করিয়াছিলাম। অনিল সে-বন্দোবস্তটা স্থায়ী হইতে দিল না। বলিল, "চিরটা কাল বয়সের একটু খাতির না ক'রে দিব্যি ইয়ারকি মেরে এলি, আজ ওর ওপর ভক্তিতে আমায় দাদা ক'রে তুলবি সেটি হবে না। ও রইল আমাদের দু-জনের মাঝখানে, যেমন ছিল সদু। যা নাম দিয়ে মুখ দেখেছিলি তাই বলে ডাকতে হবে; শপথ দেওয়া রইল।"

অম্বুরী আমার বিদ্রূপে লজ্জিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "শোন কথা! তুমি আসছ কি আমি জানি?"

অনিলের মা বলিলেন, "তারপর, আছিস কেমন শৈল? প্রায়ই জিজ্ঞেস করি অনাকে, বলে..."

অম্বুরী শাশুড়ীর কথাটা লইয়া অনুযোগের সুরে বলিল, "বলে, আর চিঠি দেয় না বেশি,

বড়লোকদের বাড়িতে পড়ায়...বড়লোকের মেয়েকে (অম্বুরী একটা কটাক্ষপাত করিল)—আমাদের সবাইকে ভুলে গেছে...বলবেই তো, কেন বলবে না বল?...কি আর এমন অন্যায় বল্লে?"

অনিলের মা আমার পক্ষ লইয়া বলিলেন, "তাই কি পারে গা ভুলতে?—কাজের ভিড়..."

আমি অম্বুরীর দিকে আড়ে চাহিয়া বলিলাম, "তা নয় হ'ল, কিন্তু যে বলে এ-সব কথা সে কখন আসবে বল তো? তার উকিলের সঙ্গে মেলা বকাবকি ক'রে কি হবে?"

অম্বুরী ঈষৎ হাসিয়া মুখ ঘুরাইয়া লইল; অনিলের মা-ই উত্তর দিলেন, "অনার সেই বাঁধা সময়, ছ'টা কুড়ির গাড়ি, বাড়ি আসতেই সন্ধ্যে।"

কেমন যেন তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দাঁড়াইয়া আছি, এক হাতে সুটকেস, এক হাতে খোকার জন্য কেনা সন্দেশের ছোটতিজেলটা; ভুলিয়া গিয়াছি...দেওয়া হয় নাই তখনও, না-দেওয়ার জন্য খোকা উৎসাহের মুখে আড়ষ্ট হইয়া থামিয়া গিয়াছে। হঠাৎ একবার তাহার লোলুপ দৃষ্টির প্রতি নজর পড়িতেই মনে পড়িল বলিলাম, "দেখো!...খোকা আয়, খাবার নে, ভুলেই গেছি! কত বড় হয়েছিস রে তুই!...ওর জিবের আড়টা এখনও যায়নি দেখছি যে..."

অম্বুরী হাসিয়া উঠিল, "না, কবে যে যাবে তাও জানিনে, চার পেরিয়ে পাঁচে পড়বেন এবার। এখন কথার মাত্রা হয়েছে—'ঠব্বনাশ'...শুনলে তো? তুমি আসতেই...কাকা বাড়ি এলে 'সর্বনাশ বলতে আছে বোকা ছেলে? প্রণাম করতে হয় না কাকাকে? সন্দেশের হাঁড়ি তো দু-হাতে বাগিয়ে ধরেছে যাত্রার দলের হনুমানের মতন...

শাশুড়ী হঠাৎ স্নেহের তিরস্কারে বলিলেন, "ওমা, কাণ্ডটা দেখ! শিশুকে বলছ, নিজের ভুলের হিসেব আছে?

বধূ ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। শাশুড়ী বলিলেন, "বসতে বলেছ শৈলকে? মুয়ে আগুন, আমিই বা কাকে বলছি। বুড়ো হ'য়ে ভীমরতি হয়েছে, এবার যেতে পারলেই হয়..."

"ওমা, সত্যিই তো"—বলিয়া অম্বুরী অপ্রতিভ হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়া একটা মাদুর লইয়া আসিল, সামনে চৌকির উপর বিছাইয়া দিতে দিতে বলিল, "আর তাও বলি—ঠাকুরপোকে নাকি কুটুমের মত 'আসুন—বসুন' বলে খাতির করতে হবে? বয়ে গেছে আমার।"

চিবুকটা হঠাৎ একটু সামনে বাড়াইয়া দিয়া একটু বেপরোয়া ভাব দেখাইয়া বলিল, "আমার বাপু বড্ড আহ্লাদ হয়েছে, ভুলে গেছলাম, পারিনি খাতির করতে। ঠাকুরপো রাগ করে, ভাজের হাতের ভাত চারটি বেশি ক'রে খাবে।"

বসিয়া জুতা খুলিতে খুলিতে হাসিয়া বলিলাম, "তুমি যে সত্যিই চাঁড়ালের বাড়িতে ব্যবস্থা করনি, এই ঢের খাতির, কি বলুন জেঠাইমা?"

অম্বুরীও তাঁহাকেই সালিশী মানিল, একটু অভিমানের সুরে বলিল, "সেই থেকে ঐ এক কথা ধরে বসে আছেন, রাত্তিরে হাত থেকে ঘটি পড়লে ঐ কথা বলতে হয় না মা? রেতের কুটুম যে চোর।"

জেঠাইমা হাসিয়া বলিলেন, "আহা, তুই আসবি তা কি জানত বেচারী? এমন দিন যায় না যেদিন শৈল ঠাকুরপোর কথা একবার না বলে—আর আসে না ভুলে গেছে—খোকাকে এত ভালবাসত..."

অম্বুরী ত্রুটি সারিতে লাগিয়া গিয়াছে। আমার জামা, চাদর, জুতা, সুটকেস ভিতরে রাখিয়া দিয়া অনিলের চটিটা পায়ের কাছে বসাইয়া চলিয়া গেল।

অনিলের মা তাঁহার সেই ছোট করিয়া ছাঁটা চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালাইতে চালাইতে বলিলেন, "কত কথা যে একসঙ্গে ভিড় ক'রে আসছে, কোন্‌টা যে আগে জিজ্ঞেস করব...বিয়ের কিছু ঠিকঠাক হ'ল শৈল?"

খোকা কখন অদৃশ্য হইয়াছে কেহ টের পায় নাই, হঠাৎ হাঁড়ি কোলে পাশের ঘর থেকে

বাহির হইয়া প্রশ্ন করিল, "মা কটা ঠাব?"

অম্বুরী ওদের পাশের ঘর থেকে পাখা আনিতে গিয়াছিল, পাখা-হাতে বাহির হইয়া আসিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "ওম্মা! আদ্দেক হাঁড়ি খালি ক'রে এখন জিগ্যেস ক'রতে এসেছে—ক'টা খাব? দে হাঁড়ি, বড্ড শক্ত পেট কিনা..."

আমি উঠিয়া খোকাকে টানিয়া কাছে লইলাম। হাঁড়ি থেকে দুইটা সন্দেশ বাহির করিয়া বলিলাম, "তুমি দু-হাতে দুটো নাও খোকা! নাও অম্বুরী, খোকার হাঁড়ি তুলে রেখে দাও। খোকার হাঁড়ি থেকে যদি একটাও চুরি যায় তো তোমার...কি করব বল তো খোকাবাবু।"

খোকা একবার চকিতে মায়ের দিকে চাহিয়া আমার কোলে একটু ঘেঁষিয়া বলিল, "ডাডার নাক কেটে..."

অম্বুরী ধমক দিতে থামিয়া গেল। আমি হাসিয়া উঠিলাম, অনিলের মাও মুখ টিপিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। অম্বুরী ঘরের তাকে হাঁড়ি তুলিয়া রাখিতে রাখিতে বলিল, "শুনলে তো? ঐসব শেখায় বসে বসে। নিজেরা খেদা বোঁচা, আমার দাদার বাঁশিপানা নাকের হিংসেতেই গেল সব—"

গোড়ায় প্রথম বিস্ময় আর আনন্দের ঝোঁকে যেটুকু ত্রুটি হইয়াছিল; অম্বুরী চরকির মত ঘুরিতে মাগিয়া গেছে। এবার আওয়াজ আসিল উঠানের ও-কোণ থেকে, তাহার পর রান্নাঘর থেকে...জেঠাইমা বলিতেছেন, "আমার কথার তো উত্তর দিলি না শৈল, চুপ ক'রে থাকলে শুনব কেন? একটা বিয়ে-থা কর এবার, বৌমার পাশে তোর বৌকে দেখে যেতে পারলে আমার কোন দুঃখ থাকবে না; তোকে তো কখনও আলাদা করে দেখিনি, আমিও না, তোর জেঠামশাইও না.."

বেশ লাগিতেছে। চারিদিকের সঙ্গে বৃদ্ধার অলস অবান্তর কথাগুলা এমন মিলিয়া যাইতেছে! এখানকার ভাষাগুলোও সবার কি রকম হাল্কা স্বচ্ছ!—যেন মনের কন্দর হইতে সোজা বাহির হইয়া আসিতেছে। আমার মুখের ভাষাও যেন বদলাইয়া গেছে, মাপিয়া-জুখিয়া, সাজাইয়া বলিবার কোন দরকার নাই।

খোকা মুখে সন্দেহ বোঝাই করিয়া, আমার মুখের পানে উলটাইয়া চাহিয়া বলিল, "আমারও বিয়ে হবে শৈল টাকা, ডেলে বুড়ির ঠংগে, না ঠাম্মা?—এত্ত বড় মাছ—"

সকলে হাসিয়া উঠিয়া থামিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "সেইটেই আগে দরকার; তুমি তাড়াতাড়ি সন্দেশটা খেয়ে নাও তাহ'লে।...অম্বুরীর পাশে দাঁড়াতে পারে এমন মেয়েও তো আগে খুঁজে বের করতে হবে জেঠাইমা?—সেটা কি খুব সহজ কথা?"

বধূগর্বে শাশুড়ীর মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, বলিলেন, "তা বটে শৈল, এমন বৌ হাজারে একটা মেলে না। তা যা বলেছিস্...

অম্বুরী একটা বড় কাচেব গেলাসে করিয়া এক গেলাস সরবত আনিল। জেঠাইমার কথার উত্তরস্বরূপ বলিলাম, "তা আর নয় জেঠাইমা? এই দেখনা, প্রশংসা করেছি কি না করেছি, এক গেলাস সরবত এসে হাজির হ'ল!"

অম্বুরী গেলাসটা বাড়াইয়া ছিল। "কার প্রশংসা?" বলিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল; সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখটা রাঙা হইয়া উঠিল, গেলাসটা তাড়াতাড়ি আমার হাতে দিয়া বলিল, "তোমাদের মায়েপোয়ে বুঝি ঐসব বাজে কথা হচ্ছে? বেশ, কর ঠেসে প্রশংসা, আমি উনুনে আঁচ দিয়ে এসেছি, যাই দেখিগে।"

লজ্জিতভাবে হন্‌হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

আমি বলিলাম, "আমি সাত-তাড়াতাড়ি এলাম সবার সঙ্গে একটু গল্প-গুজব করতে...বেশ, তাহ'লে নিন্দের পালা আরম্ভ হ'ল..."

অম্বুরী রান্নাঘর থেকেই উত্তর করিল, "হোক আরম্ভ। ওঃ, বছর ঘুরিয়ে কি সাত তাড়াতাড়ি আসা রে! ঐকথা ব'ল না, দেখব, আর একজনের কাছে!"

বলিলাম, "জেঠাইমা, তুমি একটু গড়াও বাছা, ব্যাঘাত হ'ল। আমি একবার দেখে আসি চারিদিকটা, ফিরে এসে খুকীটাকে তুলতে হবে...অনার ঘুম পেয়েছে বেটী।

অনিলের মা বলিলেন, "আবার পাগলামি এল ছেলের। এই দুপুর রোদ্দুরে ঘুরে ঘুরে কি দেখবি?"

হাসিয়া বলিলাম, "দুপুরই দেখব জেঠাইমা, অনেক দিন দেখিনি, দুপুর কাকে বলে ভুলে গেছি।"

৬

সন্ধ্যার সময় অনিল আসিল।

আমি, খুকী আর অনিলের ছেলে সানুকে লইয়া কাছাকাছি একটু ঘুরিয়া আসিয়াছি। অম্বুরী গলায় আঁচল জড়াইয়া তুলসীতলায় প্রদীপ দিতেছিল, বলিল, "থামো ঠাকুরপো, আমি মাদুর পেতে দিই, রকে ঠাণ্ডায় একটু ব'স, তারপর..."

এমন সময় "মা-মণি কোথায় গো।"—বলিয়া শিশু-কন্যাকে আহ্বান করিতে করিতে অনিল প্রবেশ করিল। আমায় দেখিয়া বলিল, "মশাই? আমি বলি অম্বুরী আবার আধ আঁচরে কাকে বসায়?"

দার্শনিক শ্রেণীর মানুষ, কোন কিছুতেই উচ্ছ্বসিত হওয়া ওর ধাত নয়; জামা-কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল, "এসে পড়াতে তোর একটা ফাঁড়া কেটে গেল।"

প্রশ্ন করিলাম, "তার মানে?"

অনিল কোটের পকেটে হাত দিতে দিতে বলিল, 'দাঁড়া দেখি...না, নেই। তোকে আজ একখানা চিঠি লিখে আবার টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেললাম, খামসুদ্ধ। পকেটে নেই একটাও টুকরো, নইলে দেখাতাম। ভাবলাম তোকে আর কখনও চিঠি দোব না, তারপর ভাবলাম, মা, অম্বুরী সবাইকে সুদ্ধু একদিন নিয়ে গিয়ে তোর ব্যারিস্টার মনিবের বাড়িতে এমন বেয়াড়া তোলপাড় লাগিয়ে দোব যে তোকে তাড়াতে পথ পাবে না। কি করলে যে তোর ওপর শোধ নেওয়া হয় ঠিকমত ভেবে উঠতে পারছিলাম না, তবে লাগসই একটা মতলব খুঁজে বের করতামই, এমন সময় তুই বিপদ বুঝে এসে পড়লি?"

বলিলাম, "তুই বা কোন্ একবার গেলি? লিখেছিলাম একবার দেখা ক'রে আসতে, পারতিস্ না?"

অম্বুরী পাখা আনিয়া হাওয়া করিতে যাইতেছিল, অনিল তাহার হাত থেকে সেটা লইয়া বলিল, "দাও, থাক্, আমি শৈলকে নিজেই বলছি—রোজ সতী-সাবিত্রীর মত তুমি তোমার আধমরা স্বামীকে এমনি ক'রে বাঁচিয়ে তুলছ।"

অম্বুরী লজ্জিত হইয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেলে বলিল, "যাওয়ার কথা বলছিস্ শৈল, তোর তো আর যমের বাড়ি নয়, যে চোখ বুজলেই পৌঁছনো যায়। তিনখানা চিঠি দিয়েছিস্ বলছিস্, পেয়েছি দুখানা তার মধ্যে—একখানাতেও ঠিকানার নামগন্ধ নেই। তাই তো অম্বুরীকে বললাম—'শৈল এখন ব্যারিস্টারী কায়দায় নেমন্তন্ন করতে শিখেছে গো, পথ বন্ধ করে খেয়ে আসতে বলে'..."

অম্বুরী বাহির হইয়া আসিয়া কলহের ভঙ্গিতে বলিল, "আমি তোমার হ'য়ে বলছি ঠাকুরপো, সব দোষ তোমার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন যে, নিজে গেলে সত্যিই কি বাড়ি খুঁজে বের করতে পারতেন

না? নড়বেন না বাড়ি থেকে, তা...।"

অনিল বলিল, "নড়ি না? আপিসে তুমি যাও কাছাকোঁচা এঁটে?"

অম্বুরী অনিলের মুখের উপর চোখ দুইটা বুলাইয়া লইয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঁধা গৎ রোজ একবার ক'রে আপিসে যাওয়া—মস্ত বড় বাহাদুরি!"

অনিলও আমাকেই সাক্ষী মানিল, বলিল, "তুই তো থাকবি দুটো দিন শৈল? মিলিয়ে দেখ্, আমার পক্ষে আপিসে যাওয়াটা মস্ত বড় একটা বাহাদুরি কি না, আর বাইরে যাওয়াটা প্রায় অসম্ভব কি না।"

এক বর্ণও ভুল নয়। যখন থেকে বাড়ি আসিল, অনিল যেন শত বাঁদীর মধ্যে বাদশাহ্। নিজেকে একটি কুটা নাড়িতে হইল না, যখন যেটি দরকার একেবারে হাতের কাছে জোগান। কোন জিনিসটির জন্য তাহাকে মুখ ফুটিয়া একটা ফরমাস পর্যন্ত করিতে হইল না। অম্বুরীকে একবার শুধু বাতাস করিতে বারণ করিয়াছিল। ঐ একটু ছন্দপতন, তা ভিন্ন ঠিক যেন দু-জনে মিলিয়া বেশ ভাল করিয়া রিহার্সাল দেওয়া একটা পাট করিয়া যাইতেছে।

শাশুড়ীকে অম্বুরী জপে বসাইয়া আসিয়াছিল। একবার গিয়া তুলিয়া লইয়া আসিল। আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি রাত্রিকালীন জলযোগ সারিলেন ঃ শেষ হইলে অম্বুরী তাঁহাকে আর সানুকে বিছানায় দিয়া আসিল। এইবার যত রাজ্যের রাজকুমার, কোটালপুত্র, কেশবতী কন্যে, রাক্ষস, হুমো জড় হইবে, তাহাদের ভিড়ের মধ্য দিয়া নাতি-ঠাকুমা স্বপ্ন-পুরীর রাজ্যে গিয়া হাজির হইবে।

অনিল বলিল, "চল্ এবার ছাদে যাই, শৈল। অম্বুরী, তুমি এস শীগ্‌গীর।"

আমার অবর্তমানে কি হয় জানি না, কিন্তু আমি থাকিলে অনিলও ওকে "অম্বুরী" বলিয়া ডাকে। ওর আসল নাম মুক্তকেশী।

অম্বুরী রান্নাঘরের দিকে যাইতে যাইতে ঘুরিয়া হাসিয়া বলিল, 'কেউ তাহ'লে শাড়ি প'রে হেঁসেলে ঢুকুক। আমার একটু দেরি হবে আজ আসতে।"

উপরে উঠিয়া বেশ খানিকটা আশ্চর্য হইয়া গেলাম, এ-বাড়িতে অম্বুরী আছে জানিয়াও। ছোট ছাদটা বেশ ভাল করিয়া জল দিয়া ধোওয়া; প্রথম তাপটা কাটিয়া গিয়া এখন বেশ ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। মাঝখানে একটা মাদুরের উপর একটা শীতলপাটি পাতা। দুইটা তাকিয়া, এক বাটা পান, দুইখানা পাখা আর সবচেয়ে যা চমৎকার—শীতলপাটির একপাশে একটা কাঁসার রেকাবি করিয়া এক রেকাবি টাট্‌কা বেলফুল।

প্রশ্ন করিলাম, "অম্বুরীর বশে কোন দৈত্য আছে নাকি অনিল? এ যে রীতিমত আরব্য-রজনীর ব্যাপার ক'রে তুললে। নীচে থেকে একবারও যে ওপরে এসেছে মনে পড়ে না তো।"

অনিল গিয়া একটা তাকিয়া আশ্রয় করিল, বলিল, "এর মধ্যে একটাও তোর জন্যে বিশেষ ক'রে আয়োজন নয় শৈল। এই ক'রে বাইরে আমার একটা বদনাম ধরিয়ে দিয়েছে—বৌয়ের আঁচল-ধরা। অবশ্য আমার গতিবিধি আছে সব জায়গায়, ওই বরং 'কুনো হ'য়ে গেলে', বলে ঠেলে পাঠায়, কিন্তু থাকতে পারি না। দোষ দিতে পারিস সে জন্যে?...তোর খবর কি বল এবার।... নে, পান খা, তুই রাঁধুনি দেওয়া পান ভালবাসিস—প্রায়ই বলে। তোর জীবনে একটা পরিবর্তন এসেছে শৈল, লক্ষ্য করেছি। মনে করিস্ নে শুধুই চোখ বুজে এই রকম অম্বুরী-সেবন করে যাচ্ছি। করেছি লক্ষ্য। কি ব্যাপার বল্ দিকিন? সোঁদা ছেলে, ছাত্রীর টুইশ্যন নিতে গেলি কেন? আমরা গরীব..."

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, "ছাত্রীর আমার বয়স ন' বছর।"

অনিল থমকিয়া আমার মুখের পানে চাহিল। ও যে একটা অন্যায়, অশোভন ধারণা করিয়া বসিয়াছিল সেইজন্য একটু রাগিয়া বলিল, "চিঠিতে আগে লিখিস নি তো?"

বলিলাম, "জানতাম দেখা হ'লেই শুনবি। বয়সের কথা ওঠে কোথা থেকে?"

অনিল একটু হাসিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিল, "তাও তো বটে, আদর্শ শিক্ষক!"

আমি হাসিলাম। অনিল প্রশ্ন করিল, "তাহ'লে? কিছু একটা ব্যাপার তো হচ্ছেই।"

এড়াইবার যো আছে ও ছোঁড়াকে? একে ওর দৃষ্টি, তায় আমার অন্তস্থলের প্রত্যেক অলিগলি নখদর্পণে! কিন্তু মীরার কথা যেন মনে হয় মনের আরও গহনের জিনিস।

জ্যোৎস্না রাত্রি। একটা হাওয়া উঠিয়াছে। আমার সবচেয়ে প্রিয় রেঙ্গুন-লতার ফুলের গন্ধ কোথা থেকে মাঝে মাঝে ভাসিয়া আসিতেছে—টাটকা চন্দনের মত গন্ধ; এক-একবার কাছের বেলফুলের মিঠেকড়া গন্ধের সঙ্গে মিশিয়া যাইতেছে...মীরার কথা যেন ভীরু অবগুণ্ঠনে আমার চিত্তের নিভৃততম কোন এক জায়গায়।

আমি একবার জড়িত দৃষ্টিতে চাহিলাম অনিলের পানে। ওর "তাহ'লে?"-র উত্তর দিতে পারিতেছি না।

অনিল যেন একটু নিরাশ হইল, ব্যথিত হইল, একটু অপ্রতিভও হইল যেন; বলিল, "থাক তবে, অন্য সময় ও-কথা হবে'খন। তোর এম-এ পড়ার কতদূর কি করছিস?"

আমার সমস্ত অন্তঃকরণটা যেন মোচড় দিয়া উঠিল।—এ কি করিলাম। অনিলকে জীবনে কখনও এত আলাদা করিয়া দেখিব, এ-ধরনের একটা বৈষম্যের আঘাত দিতে পারিব, করে ভাবিতে পারিয়াছিলাম এ-কথা? চিরকালই বিশ্বাস ছিল আমার অন্তরের যদি খুব কাছে কেউ আসে তো অনিলের পাশে আসিয়া দাঁড়াইবে, তাহার চেয়েও কাছে আর জায়গা কই?

সেই অনিলের কাছে মীরার কথা গোপন করিলাম।

নীচে অম্বুরীর গলা, "খোকন, যেন তুমি ঘুমিয়ে প'ড়ো না বাবা, আমার হ'ল বলে।"

মনে পড়িয়া গেল ঠিক এই জিনিসটি অনিল নিজের জীবনে দাঁড় করাইয়াছে—অণুমাত্রও ব্যবধান রাখে নাই ওর, অম্বুরীর, আর আমার মাঝখানে...ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, ঠিক ধরিয়াছে আমি বদলাইয়া গিয়াছি, বরং বোধহয় পূর্ণভাবে ধরিতে পারে নাই যে কত বদলাইয়া গিয়াছি।

আমি অনিলের শেষ প্রশ্নের উত্তর দিলাম না। একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া একটু কুণ্ঠার সহিত ওর মুখের উপর দৃষ্টি রাখিলাম। ওর প্রশ্ন সেই "তাহ'লে"-র উত্তরেই বলিলাম, "ঠিক যে কি ক'রে আরম্ভ করব বুঝতে পাচ্ছি না অনিল। মীরা বলে একটি মেয়ের উল্লেখ ছিল কি আমার চিঠিতে?"

অনিল সংশোধনের ভঙ্গিতে বলিল, "মীরা দেবী।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "হ্যাঁ, মীরা দেবী। সে আমার ছাত্রীর বোন।"

অনিল পূরণ করিয়া লইল, "বড় বোন।"

"হ্যাঁ, বড় বোন।"

"অবিবাহিতা।"

"হ্যাঁ, অবিবাহিতা, কিন্তু তুই জানলি কি ক'রে?"

"আগে চিঠি পড়ে ভেবেছিলাম বিবাহিতা, কিংবা বোধহয় কিছুই ভাবিনি, ছাত্রী ছেড়ে ওদিকে খেয়ালই যায়নি। এখন বুঝছি অবিবাহিতা!"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ক'রে বুঝলি?"

অনিল বলিল, "খুবই সহজে। তুই প্রেমিক, তোর বুদ্ধির জড়তা এসেছে; আমার বন্ধুর জীবন-মরণ সমস্যা, কাজেই আমার বুদ্ধিটা আরও খুলে গেছে।...তারপর?"

একবার বাঁধ ভাঙিলে আর কিছু আটকাইল না। একটি একটি করিয়া অনিলকে সব কথা বলিলাম—প্রথমদিনের সাক্ষাৎ হইতে শেষ দিনের অশ্রু পর্যন্ত। ওর ঘৃণার কথাও বলিলাম; বলিলাম,

যখনই আমার খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, মীরা যেন ধাক্কা দিয়া সঙ্গে সঙ্গে দূরে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছে। এক আশ্চর্য কাণ্ড! অপর্ণা দেবীর কথা বলিলাম—হেরিডিটি সম্বন্ধে তাঁর থিয়োরি। মীরার স্তাবকদের কথা বলিলাম, বিশেষ করিয়া স্তাবক-চূড়ামণি নিশীথের কথা। সরমার কথা বলিলাম; সরমাকে লইয়া মীরার সেদিনকার সেই অসূয়ার কথা, প্রায় যাহার জন্য ঘটনা পরম্পরায় এখানে আসা আমার। মীরার কথা খুঁটাইয়া খুঁটাইয়া বলিবার মধ্যে যে এত মধু লুকানো ছিল জানিতাম না। শেষকালে সত্যই কতকটা আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে বলিলাম, "এখন আমি কি করি অনিল ও কখনও আমার স্তরে নামতে পারবে না; যখনই অজান্তে নেমে আসে, কতখানি নামতে হয়েছে দেখে শিউরে ওঠে। আমি যতদূর বুঝতে পেরেছি এই ওর ঘৃণার রহস্য। বোধহয় ও আমায় ঘৃণা করে না; যেটাকে ঘৃণা বলছি সেটা হয়তো ওর আতঙ্ক, কিন্তু, তবুও আরও একটা কথা,—আমার দিক থেকে দেখতে গেলেও আরও দরকারী কথা। আমি ওর স্তরে উঠি কি করে? আর সবচেয়ে যা দরকারী কথা তা এই যে—কেন উঠতে যাব? অনিল, যখন প্রথম বিজ্ঞাপনটা দেখেছিলাম, একটা আশা মনে জেগেছিল বড়লোকের যদি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি কত কী-ই না হ'তে পারে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যেতে পারি। এমন তো হচ্ছেও! কিন্তু এখন সেই সব প্রায় হাতের মধ্যে—আমি এম্-এ বেশ ভাল ক'রে পাশ করব নিশ্চয়,—মিস্টার রায়, অপর্ণা দেবী আমায় খুব ভালবাসেন—যেন মনে হয় মাঝে মাঝে আমায় একটু বিচার ক'রে তৌল ক'রে দেখেন। আমার দিকে মীরার ঝোঁক ওঁদের খুব সম্ভব জানা—আমায় যে মিস্টার রায় বিলেত পাঠাতে চান এমন ইঙ্গিতও দু-একবার পেয়েছি আমি। সবই অনুকূল। রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজ্যের স্বপ্ন গোড়ায় দেখেছিলাম, এখন যেন শুধু স্বয়ংবর-সভায় গিয়ে বসা একবার! কিন্তু ঠিক এই সময়টায় আমারও মন বিরূপ হ'য়ে উঠেছে; অবশ্য রাজকন্যার নয়; রাজ্যে। মনে হচ্ছে আমিই বা কেন উঠতে যাব নিজের জায়গা ছেড়ে মীরার সামাজিক স্তরে?—মীরাকে পাওয়ার একটা উপায় হিসেবে কেন মিস্টার রায়ের সাহায্য নিতে যাব? মীরাকে আমি ভালবাসি, নিজের মধ্য দিয়ে যোগ্যতা অর্জন ক'রে ওকে পাব; আমার ভালবাসাকে আমি বেচাকেনার জিনিস করব কেন?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "যৌতুক নেয় না বিবাহে?"

আমি ভাবের ঘোরে বাধা পাইয়া ওর মুখের পানে চাহিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "যা বললি, তুই নিজে সে-কথায় বিশ্বাস করিস?"

অনিল হাসিয়া বলিল, "সে উত্তর পরে দোব, তোর নিজের মতটাই আগে শুনি না।"

আমি বলিলাম, "যৌতুক নেওয়া চলে বিবাহে; কিন্তু এটা ঠিক তো যৌতুক নয়। আমি অযোগ্য; অর্থ, প্রতিষ্ঠা আর ওদের দৃষ্টিতে কালচার হিসেবে আমি নীচে, তাই আমায় মীরার যোগ্য ক'রে নেওয়া...এটাকে যৌতুক বলব, না অপমান? শুধু তো অপমান নয়—আমি যেখানে মানুষ হয়েছি তাঁদের সকলকেই অপমান।...অনিল, আমি কোন রকম হীনতার কালি মেখে ওকে স্পর্শ করতে পারব না। ওরা যেটাকে যোগ্যতা বলে—মীরা পর্যন্ত—বোধহয় এক মীরার মা ছাড়া আর সকলেই—আমি জানি সেইটেই হবে আমার দারুণ অযোগ্যতা, আমি এ রঙচঙে কাগজের বরমাল্য গলায় দিয়ে বিয়ের আসনে বসতে পারব না।"

অনিল হাসিল, হাসিয়াই জানাইল ওর-ও মনের কথা এই।

আমি বলিতে লাগিলাম, "আমার অসহ্য হ'য়ে উঠেছিল অনিল, কী একটা অসহ্য আবহাওয়ার মধ্যে যে পড়েছিলাম! এমন সময় তোর চিঠি পেয়ে যেন স্বর্গ পেলাম হাতে। আমি হঠাৎ যেন বুঝতে পারলাম কাদের অভাবে, কিসের অভাবে আমার এমন অবস্থা হয়েছে। মীরা যদি আমায় ভালবাসেই তো আমার যা দেশ, যা পরিজন আমার মন জুড়ে যারা অষ্টপ্রহর রয়েছে তাদের সুদ্ধু আমায় নিতে হবে ওকে। ঠিক বোধহয় গুছিয়ে বলতে পারলাম না, অনিল। মনের অবস্থা ভাল ছিল না; নেইও এখন; কিন্তু বোধহয় কতকটা এই রকম। মোট কথা..."

অম্বুরী উঠিয়া আসিল। বলিল, "মোট কথা শোনবার আর একজন অংশীদার এল। ঠাকুরপো কি আগের মত একটু রাত ক'রে খাও, না ব্যারিস্টার-বাড়িতে ঘড়ির অভ্যেস হয়েছে?"

অর্থাৎ বেশ খানিকক্ষণ গল্প চলুক। বলিলাম, "ধর বদ অভ্যেসই যদি হ'য়ে থাকে একটা, তো ছাড়া উচিত নয় কি সৎসঙ্গে পড়ে?"

৭

পরদিন দুপুরবেলার কথা।

অনিল আপিসে গিয়াছে। বলিয়া গেল চার-পাঁচ দিন ছুটির চেষ্টা দেখিবে অর্থাৎ বাকী সমস্ত সপ্তাহটা। অনিলেব মা রকে বিশ্রাম করিতেছেন। অম্বুরী বেড়াইতে গিয়াছে খুকীকে লইয়া। কোণের ঠাণ্ডা ঘরটা ধুইয়া-মুছিয়া, দুয়ার-জানালা বন্ধ করিয়া আমার জন্য আরও শীতল করিয়া রাখিয়াছিল, খোকাকে লইয়া আমি শুইয়াছি। খুব ভাব হইয়াছে খোকার সঙ্গে। সকালে তাহার পছন্দমত আরও একরাশ খেলনা আনিয়া তাহার চিত্তটা একেবারে জয় করিয়া লইয়াছি! বেশ চমৎকার ছেলে; নাদুস-নুদুস, মাথায় একমাথা তারকেশ্বরের মানত করা চুল, তিনটা জটা হইয়া গেছে; একটু চঞ্চল ভাবে মাথা নাড়া অভ্যাস বলিয়া সর্বদা ডমরুর দোলকের মত দুলিতে থাকে। কখনও কাপড় ঠিক রাখিতে পারে না, প্রায়ই কসিয়া গেরো দিয়া দিতে হয়; আবার কখন কি করিয়া খুলিয়া যায়, কাঁকালে জড় করিয়া লইয়া বেড়ায়; একটি শিশু ভোলানাথ। কথার মধ্যে 'ট'-কারের বাড়াবাড়ি থাকায় আরও যেন আলগা, আপন-ভোলা বলিয়া বোধ হয়।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোকে কে বেশি ভালবাসে রে সানু?—মা, না বাবা?"

সানু বলিল, "ঠাম্মা।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ঠাকুরমার পর?"

পাশের ডল্ পুতুলটা আরও কাছে টানিয়া বলিল, "টুমি।"

আর কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্বেই সানু চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "রাত্রিরে ঠাম্মার কাছে যাবো বলে কাঁডলে কি হয় জান শৈল টাকা?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হয়?"

"হুমো ঢোরে নেয়।"

এর পরে হুমোর নানা রকম কীর্তিকলাপের কথা বলিতে বলিতে খোকা একসময় ঘুমাইয়া পড়িল।

আমারও ঘুম আসিবার কথা, কাল অনেক রাত পর্যন্ত ছাদের উপর গল্প-গুজবে কাটিয়াছে, কিন্তু ঘুম আসিতেছে না। পল্লীর মধ্যাহ্ন কাল যেমন ছিল সেই রকমই স্তব্ধ, বরং বেশি। পাশের আগাছার মধ্যে একটা ঝিল্লীর অবিরাম সংগীত ছাড়া আর কোন শব্দ নাই। আমি এই রূপের লালসাতেই কলিকাতা হইতে আসিয়াছি; কাল মুগ্ধ হইয়াছিলাম, আজ রূপ যখন আরও নিবিড় হইয়া ফুটিয়াছে, তখন আরও মুগ্ধ হওয়ার কথা, কিন্তু আজ ভাল লাগিতেছে না। একটা অব্যক্ত বেদনা অনুভব করিতেছি! এই ঝিঝির ডাকের সঙ্গে সুর মিলাইয়া মনের অতল শূন্যতায় কোথায় যেন একটা করুণ ক্রন্দন উঠিয়াছে। ক্রমে অনুভূতি স্পষ্ট হইয়া উঠিয়া লিগুসে ক্রেসেন্টের দু-একটা দৃশ্য ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। সন্ধ্যার ধূসর শূন্যে যেমন ধীর সঞ্চরণে ফোটে তারা—অস্পষ্ট থেকে ক্রমে স্পষ্টতর হইয়া। আশ্চর্য, আর কাহারও কথা মনে পড়িবার আগে আমার মনে পড়িল সরমার কথা।

তরুর কথা নয়, এমন কী মীরার কথাও নয়।

সরমা কিসের প্রতীক্ষায় আছে? মীরার দাদার কথা যতটা শুনি, তাহাকে নিজের সমাজে বা নিজের দেশে কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে তাহার আশা নাই। সে বাড়িতে কাহাকেও চিঠি দেয় না, কেন না, চিঠি দেওয়ার একটি মাত্র যে উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল—টাকা চাওয়া—বাড়িতে, বাহিরেও—সেটা সব জায়গায় বন্ধ হইয়াছে। শেষ পর্যন্ত মাত্র অপর্ণা দেবীর কাছে চিঠি আসিত—ক্বচিৎ কখনও; কিন্তু টাকা পাঠাইবার বিপদ বা ব্যর্থতা তিনি উপলব্ধি করিতেই চিঠি বন্ধ হইয়া গিয়াছে—বহু দিন হইতেই। এখন অবশ্য অনেকের বিশ্বাস সরমার কাছে কখনও কখনও আসে চিঠি। কিন্তু আমার মনে হয় এ বিশ্বাসটুকু পরিণাম থেকে কারণে গিয়া ওঠা, অর্থাৎ সরমা যখন শবরীর ধৈর্য লইয়া এখনও প্রতীক্ষা করিয়া আছে, তখন নিশ্চয় ওর সঙ্গে যোগসূত্র আছে;—নিশ্চয় ও চিঠি পায়ই।

কিন্তু যদি থাকেও যোগসূত্র তো একতরফা, অর্থাৎ চিঠি দিলেও যে মীরার দাদা ঠিকানা দেয় না এটা নিশ্চয়, তাহা হইলে অন্তত আব একজনের সঙ্গে যোগটা থাকিয়া যাইত—অপর্ণা দেবীর সঙ্গে। সেটা নাই।

তাহার প্রকৃত খবর মাঝে মাঝে এখন যেটুকু পাওয়া যায়, সে এখানকার বিলাতপ্রবাসী ছাত্রদের কাছ থেকে। তাও নিতান্ত অসম্পূর্ণ, শুধু একটা কথা স্পষ্ট তাহাতে—সে দিন-দিনই নামিয়া যাইতেছে। মীরার দাদা অর্থের শৃঙ্খল রচনা করিয়া বিদেশী সমাজের গহ্বরে নামিতে আরম্ভ করিয়াছিল; যতদিন অর্থ পাইয়াছে শৃঙ্খল জুড়িয়া জুড়িয়া ক্রমাগতই নামিয়া গিয়াছে। এখন সে অদৃশ্যপ্রায়।

ইহাই দীর্ঘ আট বৎসরের ক্রমিক ইতিহাস। অপর্ণা দেবীর কথা মনে পড়িতেছে, প্রথম যেদিন দেখা হয়, বলিতেছেন, "তুমি জান না তাই বলছ শৈলেন, আমার নিজের ছেলে এই রকম আত্মবিলুপ্ত।"

সরমা এরই কাছে বাগদত্তা, এরই প্রতীক্ষায় আছে। শান্ত অল্পভাষিণী, চারিদিকে অসংযত বিলাসের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসের জীবন লইয়া এই আত্মবিলুপ্তির জন্য তিলে তিলে নিজেকে নিঃশেষ করিয়া দিতেছে সরমা। এত বড় করুণ দৃশ্য চক্ষে পড়ে না, ঠিক যেমন ওর মত সুন্দরীও সহসা পড়ে না চক্ষে। সরমার জীবনের সঙ্গে খর দ্বিপ্রহরের পল্লীর এই একটানা কলতানের—এই দহন-সংগীতের কোথাও যেন একটা মিল আছে—কী এর পরিণতি? এ কি শুধুই ভুল, এটা অপচয়? তাই যদি হয় তো এই বিরাট ভ্রান্তির সার্থকতা কি?—যদি ভ্রান্তির সার্থকতা থাকা সম্ভবই হয় নিতান্ত।

আমার মনে হয় এই তিল তিল করিয়া জ্বলার মধ্যেই বোধহয় লোকোত্তর কোন বিপুল সার্থকতা লুকানো আছে, যার রহস্য শুধু সরমারাই জানে। কবি ফিক্‌রির দুইটা লাইন মনে পড়িল—

কঁহা ব্‌ লজ্জতে উলফৎ পতংগ তুঝে

মিলি যো শ্যামাকে ঘুল্‌ ঘুল্‌ কর জান দেনে মে।

[হে পতংগ, (প্রদীপের কাছে মুহূর্তের আত্মসমর্পণে) তুমি ভালবাসার সে আনন্দ কোথায় পাবে, যা পেল মোমবাতি তিল তিল ক'রে নিজের জীবন আহুতি দেবার মধ্যে?]

বাহিরের দিকের জানালার ছিদ্রপথে নিরাভরণ মধ্যাহ্নের আলো প্রবেশ করিতেছে, ঘরের অন্ধকারের বৈষম্য আরও তীব্র হইয়া; মাঝে মাঝে উত্তপ্ত হাওয়ার হলকা। মনটা ঝিমাইয়া যাইতেছে। এক-একবার হঠাৎ উগ্র স্পষ্টতায় লিগুসে ক্রেসেন্ট পূর্ণ অবয়বে ফুটিয়া উঠিতেছে—রেডিওর রেগুলেটারটা বাড়তির দিকে ঘুরাইয়া দিলে যেমন ঐক্যতান যন্ত্রসংগীতের শব্দগুলা হঠাৎ ঝংকার করিয়া ওঠে ঃ মীরা—তরু—ইমানুল—অপর্ণা দেবী—মিস্টার রায়—বাড়ি, বাগান, পার্টি—অভিজাত্যের সচ্ছলতা—পুত্রশোকাতুরা ভুটানী জননী—সব মিলাইয়া একটা সংগীত, একটা অদ্ভুত সিম্‌ফনি, যার মূল সুর—কেমন করিয়া জানি না—সরমা।

খোকার শীতল, মসৃণ, নগ্ন গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলাই! শিশুজীবনের উত্তপ্ত অঙ্গে ভগবানের চন্দন প্রলেপ। বেশ বুঝিতে পারি তপ্ত আঙুল বাহিয়া যেন শান্তি উঠিয়া আসিতেছে—হাত বুলাইয়া যাই, বুলাইয়া বুলাইয়া যেন আশ মিটিতেছে না।

মন আবার ঘুরিয়া যাইতেছে; ঠিক শান্তিতে তৃপ্তি পাইতেছে না। চাই বেদনা, চাই দহন; তাই বিধির বিধান এই যে শিশুর আগে আসিবে সরমা, আসিবে মীরা...

আমি সেদিন বিরহের দীর্ঘ অবকাশে প্রেমকে যেন ভাল করিয়া দেখিতে পাইলাম। বলিলাম, "হে জীবনের শ্রেষ্ঠ দেবতা, তুমি শ্রেষ্ঠ, তুমি অনবদ্য, তাই সৃষ্টির যা চরম ভাল তাহাই তোমার চরণে পড়ে অর্ঘ্য হইয়া, তাই তো তুমি যুগ-যুগান্তর ধরিয়া তাহাদেরই পূজা গ্রহণ করিয়াছ—রাজ্য, মান, লজ্জা, রূপ, যৌবন—সমস্ত বিভবকেই ধুলিমুষ্টির মত পথে ফেলিয়া যাহারা তোমার মন্দির-তোরণে উত্তীর্ণ হইয়াছে। তোমাকে পাইয়াছে সরমা, নিজেকে নিখুঁতভাবে গড়িয়া তুলিয়া নিঃশেষভাবে তোমার চরণে বিলাইয়া দিয়াছে। পদে পদে এই হিসাব, আত্মাভিমানের এই চুলচেরা বিচার, মনের এই বণিগ্‌বৃত্তি লইয়া আমি তোমাব মন্দিরে প্রবেশ করিবার স্পর্ধা কোথা হইতে পাই?"

* * * *

দরজায় ধীরে ধীরে আঘাত পড়িল। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, উঠিয়া দেখিলাম জানালার ছিদ্রপথে আলো নরম হইয়া আসিয়াছে। দরজা খুলিয়া দেখি অম্বুরী দাঁড়াইয়া; বলিল, "বেলা পড়ে এসেছে যে ঠাকুরপো, খুড়ো-ভাইপোতে খুব ঘুমোচ্ছ। কাল অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল, না?"

বলিলাম, "হয়ে থাকবে, কিন্তু ক্ষতি হয়নি, কাল রাত্তিরটা যেমন ভাল লেগেছিল আজ দিনের ঘুমটাও তেমনি চমৎকার লাগল।"

মুখ-হাত ধুইলাম। অম্বুরী খোকাকে তুলিয়া আনিয়া বলিল, "এবার রকে ওই আমগাছের ছায়াটায় মাদুর পেতে দিই ঠাকুরপো। সরবত ক'রে দোব, না চা?... বেশ চা-ই হবে। তারপর একটা ফরমাস আছে—অমন সরবতের নেশা ছাড়িয়ে যারা চায়ের নেশা ধরিয়াছে তাদের কথা বলতে হবে।"

তাহার পর আমার মুখের পানে কৌতূহল-দীপ্ত চোখে একবার চাহিয়া লইয়া বলিল, "আরও নেশা যদি কিছু ধরিয়ে থাকে, সেসব কথাও; ছাড়বার পাত্রী নই আমি।"

৮

ছোট মেয়েটাকে বুকে করিয়া একটু ঘুরিলাম। ওর সবচেয়ে বিস্ময়ের বস্তু হইয়াছে আমার চশমা। মুখ ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত দেখিল; তাহাতে রহস্য পরিষ্কার না হওয়াতে হাত বাড়াইল। আমি হাতটা ধরিয়া লইতে মুখ আগাইয়া আনিয়া যেই একটা কামড় দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছে, খোকা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "ঠব্বনাশ। ওকে খেটে ডিও না শৈল টাকা, পেটের অসুখ করবে। খুঁকু টশমা খেও না; টেটো। বিচ্ছিরি!"

মুখটা কাল্পনিক তিক্তস্বাদে যতটা সম্ভব বিকৃত করিয়া বোনকে বিরত করিবার চেষ্টা করিল। খোকা অভিভাবক হইয়া উঠিতেছে। যাহার নীচে ছোট বোন রহিয়াছে সে কি নিজে আর ছোট থাকিতে পারে কখনও?

অম্বুরী চা আর হালুয়া তৈয়ার করিয়া আমার মাদুরের পাশে রাখিয়া নিজে আমার সামনে সিঁড়িটাতে বসিল। মাদুরে খোকা আর খুকীকে বসাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম, "জেঠাইমা কোথায়?—ওঠেননি এখনও?"

অম্বুরী বলিল, "উঠেছেন, হারাণীর মা ভেতরে পাট করছে, যতক্ষণ তার আওয়াজ পাবেন

বকর বকর করবেন। এ সময়টা আমি নিশ্চিন্দি থাকি একটু। পাট সেরে হারাণীর মা-ও যাবে, ওঁকেও হাত-পা ধুইয়ে জপে বসিয়ে দোব। এই আমার রুটিন"—বলিয়া গর্বের অভিনয় করিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "দেখ, আমিও ইংরিজী জানি ঠাকুরপো।"

সানু মায়ের হাতটা টানিয়া ভীতভাবে বলিল, "খুকু শৈল টাকার টশমা খাবে মা, গলায় আটকে যাবে না?"

তাহার নিজের হাতে মুঠাভরা হালুয়া; মা বলিল, "তুমিও তা বলে হালুয়া অতখানি খেয়ো না যেন, চশমার মত পেটে যেতে আটকায় না বলে ওতে পেটের অসুখ করবে না নাকি?"

তাহার পর গল্প শুনিবাব ভঙ্গিতে আবাব একচোট ভাল করিয়া গুটাইয়া-সুটাইয়া বসিয়া বলিল, "এবার যা বলছিলাম—কেমন বাড়ি, কেমন লোক সব? তোমার ছাত্রী..."

হাসিয়া ফেলিয়া দুষ্টামির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমি না বুঝিবার ভান করিয়া গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিলাম, "বয়সের কথা জিজ্ঞেস করছ?—ন' বছর। বেশ চমৎকার মেয়ে, একটুও বেগ পেতে হয় না আমার পড়াতে।"

অম্বুরী হাসিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইয়া গেল। একবার আমার পানে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া রকের উপর ধীরে ধীরে তর্জনীর ডগাটা ঘষিতে লাগিল।

কিন্তু মেয়েছেলেই তো? এসব বিষয়ে ওরা কবে হাবিয়াছে কাহার কাছে? নিজেকে সামলাইয়া লইযা মুখটা আমার মতই গম্ভীর করিয়া ফেলিল। বলিল, "বেশ ভাল হয়েছে—হাল্কা কাজ; আর তোমার বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম বাড়িটাও ছিমছাম—কর্তা নিজে, গিন্নী, আর একটি মেয়ে—তোমার ছাত্রীর বোন।... কোথায় বিয়ে হয়েছে তার ঠাকুরপো?—খুব বড়লোকের বাড়ি? এদের তো শুনেছি দুটো মটরগাড়ি, তাদের?"

কিন্তু অত ঘুরাইয়া কথা বাহির করিবার দরকার ছিল না অম্বুরীর, কাল সন্ধ্যায় অনিলের কাছে যে সেই একবার গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, তাহার পর হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম এদের দু-জনের কাছে সমস্ত কথাই একটি একটি করিয়া মেলিয়া ধরিব, অবশ্য স্ত্রীলোক হিসাবে অম্বুরীর সামনে খানিকটা আব্রু রক্ষা করিয়া। আমার এই তিনমাসব্যাপী সমস্ত অভিজ্ঞতা বলিয়া গেলাম অম্বুরীকে—মিস্টার রায়ের কথা, অপর্ণা দেবীর পুত্রগত অদ্ভুত বেদনাময় জীবনের কথা, ভুটানীর সহিত দরদের সমতার জন্য তাঁহাদের অসম সখিত্বের কথা, রাজু বেয়ারার গুরুত্বপূর্ণ শব্দপ্রীতি, ইমানুলের অদ্ভুত আত্ম-প্রবঞ্চনা, বিলাস-ঝির কথা। গভীর অভিনিবেশের সহিত অম্বুরী সব শুনিয়া যাইতে লাগিল। ওর স্বভাবটাই এমন...আর বিবাহের পর থেকে ঠাট্টা-বিদ্রুপ আর মুক্ত মেলা-মেশার মধ্য দিয়া অনিল এমন অভ্যাস করাইয়া দিয়াছে যে আমায় একটুও সংকোচ করে না অম্বুরী, আজ যেন কোন দূরত্বই রাখিল না। গল্প শুনিতে শুনিতে হাসিল, কখনও চক্ষে বস্ত্র দিল। যখন প্রয়োজন মনে হইল, নিঃশব্দে নিজের মন্তব্য দিল—"আহা, নিজে সুন্দর নয় বলে সুন্দরকে চাইতে পারবে না বেচারি? অবিশ্যি মেমসাহেব বলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে।...হাসিও পায় বাপু, করছিস্ মালীগিরি, বিয়ে করতে হবে পাদ্রীসাহেবেব ভাইঝিকে!"

অম্বুরী ডুকরাইয়া হাসিয়া ওঠে। ঘরের মধ্যে ঝিয়ের ঘর-ঝাঁট দেওয়ার শব্দ থামিয়া যায়; বোধ হয় একটু বেখাপ্পা ঠেকে ওদের কানে।

তাহার পর বলি তরুর কথা এবং সব শেষে ও সবচেয়ে সবিস্তারে মীরার কথা। অবশ্য যেমন ভাবে অনিলকে বলিয়াছি অম্বুরীকে ঠিক সে-ভাবে সে-ভাষায় বলা চলে না। কর্মে নিয়োগের দিন থেকে এখানে আসার আগে পর্যন্ত মীরা ঘটিত সব কথাই এক রকম খুঁটিয়া খুঁটিয়া বলিলাম। শুধু মন লইয়া ব্যাপার যেখানে, সেই সব কথাগুলা বাদ দিয়া গেলাম।—যেমন অশ্রুর কথা বলিলাম না; যেমন, মীরাকে যে বলিয়াছিলাম—নিজের তাগিদেই থাকিয়া গেলাম সে-কথাও উল্লেখ করিলাম না!

অম্বুরী শুনিতেছে—একেবারে তদ্গত হইয়া; মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি দিয়া আমার পানে চাহিতেছে, মুখের ভাব যে কত রকম বদলাইতেছে বলা যায় না। মাঝে মাঝে এক-একটা ছোট্ট প্রশ্ন করিয়া নিজের চিন্তার পথ প্রশস্ত করিয়া লইতেছে। গোড়াতেই খানিকটা শুনিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল, "নাম বললে—মীরা? কি, শ্রীমতী মীরাসুন্দরী দেবী?"

বলিলাম, "না, মিস্ মীরা রায়।"

অম্বুরী চক্ষু দুইটা একেবারে উপরে তুলিয়া কি একটু ভাবিয়া লইল যেন—আবার কাহিনী শুনিয়া চলিল। খানিকটা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিয়ে হয়নি বুঝলাম, কিন্তু কথাবার্তাও হচ্ছে না? যেমন বলছ—বেশ তো ডাগর মেয়ে...কত বয়স হবে ঠাকুরপো?"

নির্লিপ্তভাবে বলিলাম, "ওর বাপ-মা তো ওর ঠিকুজি গড়তে দেননি আমায়, কি ক'রে বলব? তবে আন্দাজে মনে হয়—এই আঠার-উনিশ-কুড়ি—।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "একুশ—বাইশ—তেইশ—সাতাশ—তিরিশ...বেশ বুঝেছি...বল।"

একবার অপ্রাসঙ্গিকভাবেই জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল, "ওদের মেয়েরা তো নিজেরাই বর খুঁজে নেয়, কিছু টের পাওনি তুমি?"

নির্লিপ্তভাবে হাসিয়া বলিলাম, "কি ক'রে পাব বল? বর শিকার করতে কি ও আমায় সঙ্গী ক'রে নেয়?"

একটা জিনিস লক্ষ্য করি—আমার এই ঔদাসীন্যে অম্বুরী যেন তৃপ্ত হয়। প্রশ্নটা করিয়াই তীব্র আগ্রহে আমার পানে চাহিয়া থাকে, তাহাব পর উত্তরটা পাইয়াই প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া ওঠে! শুনিবার পাশে পাশে ওব চিন্তার ধারা বহিয়া চলিয়াছে। শেষ দিকে একবার প্রশ্ন করিয়া বসিল, "তুমি তো দু-জনকেই দেখেছ,—সরমা বেশি সুন্দর, না মীরা বেশি সুন্দর ঠাকুরপো?"

এবারও নির্লিপ্তভাবেই, কতকটা যেন এড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলাম, "এ বড় শক্ত প্রশ্ন করলে যে! আমি কি ক'রে বলি?—কারুর চোখে মীরা সুন্দরী, কারুর চোখে সরমা সুন্দরী।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "কি যে বলো ঠাকুরপো?—আচ্ছা বেশ, তোমার কথাই সই; তোমার চোখে কে বেশি সুন্দরী?"

স্পষ্ট জবাব দিলাম না, বলিলাম, "মীরা কালো হোক, কিন্তু শ্রী আছে! অবশ্য সরমার কথা আলাদা।"

অম্বুরী আবার দৃষ্টি নত করিয়া কানে তর্জনীর ডগটা ঘষিতে ঘষিতে বলিল, "তার মানে ঠাকুরপোর চোখে মীরাই বেশি সুন্দরী।"—বলিয়াই একবার হাসিয়া আমার পানে চক্ষু তুলিয়া চাহিল।

খোকা-খুকী খেলা করিতে করিতে রকেব ওদিকটায় চলিয়া গিয়াছিল। খোকা ডাকিল, "ওমা ঠিগ্‌গির এস,—টোমার মেয়ের কাণ্ড!"

•অম্বুরী গিয়া খুকীকে ধরিয়া আনিল। খুকীর কাণ্ড,—সে একটা টিকটিকির বাচ্চা ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিল। খোকা চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিল, "ঠব্বনাশ, টিট্টিকিটা যদি সাপ্ হোটে শৈল টাকা!"

বলিলাম, "তোর মামা যদি তোর মেসো হ'ত খোকা!"

এ ঠাট্টাটা দিনকতক পরে মুখ দিয়া বাহির হইবে না বোধ হয়, যেমন কড়া রকম ভদ্র হইয়া উঠিতেছি। কিন্তু আপাতত এই আবেষ্টনীর মধ্যে ঠাট্টা করিয়া ফেলিবার লোভটুকু সংবরণ করিতে পারিলাম না।

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "ওর মামা-মাসীকে এর মধ্যে টানা কেন? তোমাদের ঘরে বোন দিয়েছে এই অপরাধে?"

তাহার পর গম্ভীর হইয়া বলিল, "আচ্ছা ঠাকুরপো, একটা কথা তুমি অভয় দাও তো বলি।"

বলিলাম, "আমার ভয়ের কথা না হয় তো অভয় দিই।"

অম্বুরী একটু চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর চক্ষু দুইটি একটু কুঞ্চিত করিয়া লইয়া বলিল, "তুমি মীরাকে বিয়ে কর না কেন ঠাকুরপো—যতটা শুনলাম তাতে মনে হয় ওর যেন তোমাকে পছন্দ হয়েছে।"

হাসিয়া বলিলাম, "যদি ক'রেই বসি কোন দিন তো আশ্চর্য হয়ো না অম্বুরী।"

অম্বুরীর মুখটা যেন এক মুহূর্তে ফ্যাকাশে হইয়া গেল। নামাইয়া লইয়া খোকার দিকে চাহিয়া একরকম বিনা কারণেই বলিল, "ও খোকা. কি হচ্ছে আবার?"

ওইটুকুর মধ্যে কিন্তু নিজেকে আবার সামলাইয়া লইল, অন্তত বাহিরে বাহিরে। খুকীকে বুকে চাপিয়া তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া বলিল, "খুকুমণি, তোমার কেমন রাঙা টুকটুকে কাকীমা আসবে!..."

খোকা ঐদিক থেকে প্রশ্ন করিল, "শৈল টাকীমা মা?"

অম্বুরী এতক্ষণে আমার পানে একটু চাহিল; হাসিয়া আমার পানে চাহিয়াই খোকার কথার উত্তর দিল, "হ্যাঁ, শৈল কাকীমা। বেশ হবে ঠাকুরপো তাহ'লে। যাই, সন্ধ্যে হয়ে এল।"

আমি স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অনেক ভাবিযা মিলাইয়া পরে রহস্যটা বুঝিয়াছি; যাহা বুঝিযাছি সেইটাই সত্য।

অম্বুরী সহ্য করিতে পারিল না। ঈর্ষা নয়; যে আমি একান্তভাবে ওদের মানুষ, মীরাকে লাভ করিয়া, মীরাকে অবলম্বন করিয়া কোন্ এক অপরিচিত উচ্চস্তরে উঠিয়া যাইব, যেখানে অম্বুরীর প্রবেশ নাই—এই কল্পনাটাই অসহ্য অম্বুরীর পক্ষে। ঈর্ষা নয়, আসন্ন বিচ্ছেদের টন্‌টনানি, অম্বুরীর হৃদয়-তন্ত্রীতে যেন টান পড়িল। অনিল আমায় অতটা চায়, কিংবা আমি অনিলকে এতটা চাই তাহার অনেক কারণ আছে—আমাদের দুইজনের বাইশ-তেইশ বৎসরের প্রতি দিনটি যেন জড়াইয়া রহিয়াছে। অম্বুরী আমায় চায় অনিলের মধ্যে দিয়াও, তাহার উপর আরও একটা অন্য কারণে। শ্বশুরবাড়ির দিকে ওর কেহ আত্মীয় নাই, অনাত্মীয় হইয়াও আমি একা এই জায়গাটি পূরণ করিয়া আছি। আমি ওর দেবর, স্বামীর অভিন্নহৃদয় বন্ধু বলিয়া দেবরের চেয়ে বেশি কিছু স্বামী-পুত্র-কন্যা লইয়া অম্বুরী আমার চারিদিক দিয়া ঘিবিয়া ফেলিয়াছে। অনাত্মীয় যখন আত্মীয় হয়, তার সঙ্গে যোগটা হয় আরও নিবিড়, কেননা সদাই একটা বিচ্ছেদের ভয় লাগিয়া থাকে—অল্প কারণেই অম্বুরী ঠিক এই রকম একটা আশঙ্কার সম্মুখীন হইয়াছে।

মীবা অন্য স্তরের জীব। রূপে, সম্পদে, শিক্ষায়, বিলাসে অম্বুরীর জগতের চেয়ে মীরার জগৎ অনেক উচ্চে, বোধহয় স্বর্গ আর মর্ত্যের মাঝামাঝি একটা জায়গা; যতটা শুনিয়াছে অম্বুরী, তাহাতে ওর মনে হয় মর্ত্যের চেয়ে স্বর্গেরই বেশী কাছে। কিন্তু হাজার দুঃখ-বেদনা থাকাতেও মানুষ যেমন মর্ত্যকেই বুকে আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়, স্বর্গকে পরিহার করিয়াই চলে, মীরার জগৎ সম্বন্ধে অম্বুরীর মনের ভাবটাও সেই রকম—বেশ প্রশংসা করা চলে, আশ্চর্য হওয়া চলে, এমন কি আকাঙ্ক্ষা পর্যন্ত করা চলে, কিন্তু পাওয়া চলে না। তখন দেখা যায় শত দোষ থাকা সত্ত্বেও এই মাটিমাখা জীবনই ভাল।...যাহাদের আপন বলিয়া বুকে জড়াইয়াছে তাহাদের কেহই এই গণ্ডীর বাহিরে যায়, অম্বুরী এটা সহ্য করিবে কি করিয়া?

মীরার নামটা শুনিয়াও অম্বুরী খুশি হইতে পারে নাই—বেশ মনে আছে। নামেও যেন সম্পূর্ণ এক অন্য সুর। অম্বুরী নিজে যে জগতের মানুষ সেখানকার মেয়েরা কমলা, লক্ষ্মী, শিবকালী, কিরণ; খুব বেশি হইল তো নয়নতারা, নিভাননী—অম্বুরীর নিজের নাম মুক্তকেশী।

ওদের যে-কেহ অম্বুরীর দেবরকে অধিকার করুক, অম্বুরী তাহাকে বরণ করিয়া বুকে করিয়া লইবে। এদের মধ্যে কেহ আসিলে অম্বুরীর আর একজন বাড়িবে, মীরার আবির্ভাবে কিন্তু বাড়া দূরের কথা, আমি সুদ্ধু লুপ্ত হইয়া যাইব অম্বুরীর জগৎ হইতে।

মনে আছে এর আগের বারে আমি যখন আসিয়াছিলাম—মাস ছয়েক পূর্বে, অম্বুরী বলিয়াছিল,

"আমাদের গ্রামে একটি মেয়ে আছে ঠাকুরপো, তোমার জন্যে আমি এঁচে রেখেছি। তুমি বিয়ে কর, তারপর আবার এখানে ফিরে এস, আমরা দুটি বোনে কাছাকাছি থাকি।...কী পশ্চিমে পড়ে আছ বাপু? বুঝি না—"

মীরা অম্বুরীর সেই স্বপন ভাঙিয়া দিবে। তাই মীরার নামে অম্বুরীর মুখ শুকাইল।

৯

বেশ লাগিতেছে বটে, কিন্তু যতটা শান্তি পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম ততটা পাইতেছি না। যতক্ষণ অনিল থাকে, যতক্ষণ জেঠাইমার সঙ্গে অম্বুরীর সঙ্গে গল্প করি কিংবা খুকীকে লইয়া থাকি; দিব্য কাটে। একলা থাকিলেই মুশকিল—সেদিন লিগুসে ক্রেসেন্ট মুছিয়া যেমন সাঁতরা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তেমনি সাঁতরাকে বিলুপ্ত করিয়া লিগুসে ক্রেসেন্ট জাগিয়া উঠে। ভাবিয়াছিলাম একবার ঘুরিয়া আসি, একটু শান্তি পাইব, আসিয়া দেখি কবে অলক্ষ্যে অশান্তির বীজ বপন করিয়া ফেলিয়াছি, অঙ্কুরিত হইয়াছে, পল্লবিত হইবে, তাহার পর শাখা-প্রশাখা।...শান্তি চিরদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে।

একলা থাকিলেই মীরার চিন্তা, সঙ্গে সঙ্গে তরু, অপর্ণা দেবী, মিস্টার রায়, দাসদাসী কত যে আপনার সব! কিন্তু ঐ এক মীরাকে ঘিরিয়া। তরু মীরার বোন—ভাবিতে এত ভাল লাগে!—কিন্তু তবুও কোথায় যেন একটা বেদনা...

কেমন যেন একটু ভয় হয়—যেখানেই যাইব, এই বেদনা কি জন্মের সাথী হইয়া থাকিবে? এ কি বন্ধন! আবার এই বন্ধন হইতে মুক্তির কল্পনায়ও শিহরিয়া উঠে সমস্ত অন্তরাত্মা। ধর, মীরা নাই; বেদনাও নাই;—কি অসীম, দুঃসহ শূন্যতা!

অনিল সমস্ত সপ্তাহটা ছুটি পাইয়াছে। আজ আপিসে যায় নাই। সকাল বেলাটা দুইজনে ঘুরিলাম একচোট, দেখিয়া-শুনিয়া, দেখাশোনা করিয়া। দুপুরে দুইজনে আহার করিয়া শুইয়া আছি অনিলের ঘরে। গল্প করিতেছি। ছ'মাসের গল্প জমা আছে, একটু ফাঁক নাই যে নিদ্রা আসিয়া প্রবেশ করে।

অম্বুরী টানা বারান্দার ওদিকটায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া 'অন্নদামঙ্গল' কিংবা 'রামায়ণ' কি 'মহাভারত' পড়িতেছে, খুব নীচু সুরে, দূর থেকে মাত্র একটা গুন্‌গুন্ আওয়াজের মত মাঝে মাঝে কানে আসিতেছে। আজকাল আমাদের খাওয়াইয়া, পাট সারিয়া বই পড়িতে দেরি হয় বলিয়া অনিলের মা পূর্বেই শয্যা গ্রহণ করেন।'

হঠাৎ অম্বুরী বলিয়া উঠিল, "ও মা! তুমি কোথা থেকে? কবে এলে?"

বেশ একটা হাস্যোচ্ছল কণ্ঠে উত্তর হইল, "যমের বাড়ি থেকে। এসেছি কাল সন্ধ্যেয়।" "ব'স ঠাকুরঝি, তারপর কি খবর? দু-বচ্ছর আসনি, শুনি বড় কড়া লোক, আসতে দেয় না; তা ছাড়লে যে হঠাৎ?"

একটা প্রশ্ন করিয়াছিলাম, অনিল উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল যেন নিঃশ্বাসের শব্দটাও বন্ধ করিয়া লইয়াছে।

সেইরূপ নি-খাদ কণ্ঠের উত্তর হইল, "জ্বালাস নে বউ, সত্তর বছরের নড়বড়ে একটা মনিষ্যি—মিত্তিরদের পোড়ো বাড়ির দরজা-জানালাগুলোর মত—সে হ'ল কড়া, সে দেবে না আসতে! দু-বছর আসতে মন চায়নি, আসিনি, আজ মনে হ'ল, এলাম। তারপর, কি খবর? বর কোথায়? শুনলাম নাকি শৈলদা এসেছে?...শুনলাম তোর একটা খুকী হয়েছে?—কোথায় বৌ—আন না দেখি..."

অনিল চুপ করিয়া আছে। আমিও প্রশ্নের কথা ভুলিয়া গিয়াছি। স্মৃতি হঠাৎ আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে।

অম্বুরী উত্তর করিল, "তবু ভাল, খোঁজ রাখ দেখছি!"

কপট গাম্ভীর্যের স্বরে টানিয়া টানিয়া উত্তর হইল, "তুমি তো জান না ভাই, খোঁজ রাখা কত শক্ত। বলে, ছেলেয়-মেয়েয়, স্বামীতে-শ্বশুরে নিজের সংসারের কথা ভেবেই ফুরসত থাকে না; বিশেষ ক'রে কন্দর্পের মত স্বামী, সদাই ভয়—চোখের আড়াল করি আর কেউ কেড়ে নিক্..."

এক ঝলক আবার সেই তরল হাসি। অনিলের রুদ্ধ নিঃশ্বাসটা একটা শব্দ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

ওদিকে গম্ভীর হইয়া—

"না বৌ, মস্করা থাক্, এনে দে তোর মেয়েকে দেখি একবার; ছেলেটাই বা কোথায়?"

অম্বুরী অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে বলিল, "ওদের কাছে, ঐ ঘরে।"

"তোর বর ঘরে?—শৈলদাও নাকি?"

অম্বুরী নিশ্চয় মাথা নাড়িয়া উত্তর দিল।

নিম্নকণ্ঠে প্রশ্ন হইল, "জেগে না ঘুমুচ্ছে লো?"

অম্বুরীও নীচু গলাতেই একটু হাসিয়া উত্তর দিল, "মনে হয় তো ঘুমুচ্ছিল, কিন্তু তুমি যে রকম..."

"মুয়ে আগুন তোমায়, বলতে হয় আগে। নিশ্চয় ঘুমুচ্ছে, একটু গলা ছেড়েছিলাম বটে, কিন্তু অনেক দূরে আছি। যা, তুই মেয়েটাকে নিয়ে আয় আস্তে আস্তে। ঐ কোণের ঘরে চল, এখানে সুবিধে হবে না। শাশুড়ী কোথায়? তুই আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিস্ বৌ! দাঁড়া তো দেখি...ঠিক ইচ্ছে করে।"

তাহার পর দুইটা কণ্ঠের একটা উচ্ছল হাসি শোনা গেল।

অম্বুরী আসিয়া অতি সন্তর্পণে খুকীকে অনিলের বুকের কাছ থেকে উঠাইয়া লইয়া আবার খুব সাবধানে দুয়ার ভেজাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। আমরা গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন, গাঢ় সুপ্তির নিঃশ্বাস উঠা-নামা করিতেছে।

প্রশ্ন হইল, "ঘুমিয়েছিল?"

"হুঁ।"

"ভাগ্যিস্!..তা হোক, এখানে সুবিধে হবে না, খুকীকে আমার কোলে দে, তুই মাদুরটা নিয়ে আয়।...বাঃ, কি চমৎকার হয়েছে রে!"

ঘন, আকুল চুম্বনের শব্দ হইতে লাগিল।

ওরা চলিয়া গেলে অনিল প্রশ্ন করিল, "চিনতে পারলি?"

প্রতিপ্রশ্ন করিলাম, "সদু নাকি?"

"হুঁ।"

খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম দুইজনেই, তাহার পর আমিই প্রশ্ন করিলাম, "যা বললে ঠিক নাকি অনিল?"

"কি কথা?"

"এই সত্তর বছরের কথা?"

"না।"

"তবে?"

আবার একটুখানি চুপচাপ গেল।

প্রশ্ন করিতেছি না, কি উত্তর দেয় সেই উৎকণ্ঠায় নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া আছি। একটু পরে অনিল বলিল, "হিন্দুললনা স্বামী সম্বন্ধে কখনও এসব বিষয়ে সত্যি কথা বলতে পারে? নরকের ভয় নেই?—অন্তত পাঁচটা বছর কমিয়ে বলেছে।"

তাহার পর আর কোন কথাই হইল না। দুইজনেই বুঝিতেছি দুইজনেই জাগিয়া, অথচ যেন

কথা কহিবার উপায় নাই। মাঝে মাঝে ওদিককার ঘর হইতে হাসির লহর ভাসিয়া আসিতেছে।

সন্ধ্যার একটু আগে চা খাইয়া আমরা দুইজনে বাহির হইলাম। অম্বুরী বলিল, "মেলা রাত ক'রো না যেন।"

বলিল, "সে অবস্থা বুঝে?"

অম্বুরী বলিল, "রঙ্গ নয়, দু-জনে একত্তর হ'লে কোন জগতে থাক তার তো ঠিকানা থাকে না।"

খানিকটা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম; এখানে আসিলে আমাদের যেমন অভ্যাস। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, যখন বিলম্বিত চন্দ্রোদয় হইল, তখন আমরা বড়পুকুরের ধারে। এদিকটা এখন জনবিরল হইয়া গিয়াছে। চৌধুরীদের তখন অবস্থা ভাল ছিল, মজানদী হইতে পুকুরে নূতন জল ফেলিবার জন্য একটা পাকা নালা করিয়া দিয়াছিল। সেটা যেখানে পুকুরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশেই পাকা ঘাট। এখন চৌধুরীদের মত এ দুইটারও অবস্থা শোচনীয়। ঘাটটা পরিত্যক্ত বলিলেই চলে, বাগ্দীপাড়ার ঝিয়েরা অল্প অল্প সরে। তাহারাও প্রায় লোপাট হইয়া আসিতেছে।

যদিও নিরুদ্দেশ ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে আসিয়া পড়া, তবু দুইজনেই জানি কিসের টানে আমরা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। এটা ছিল আমাদের স্নানের ঘাট, সৌদামিনীর বাড়ি এখান থেকে বেশি দূর নয়। গঙ্গার ঘাট ছাড়িয়া আমরা এইখানেই স্নান করিতে আসিতাম, বেশির ভাগ। প্রথম আকর্ষণ ছিল ঘাটের উপরের কামরাঙা, জাম আর অন্যান্য ফলের গাছগুলা, দ্বিতীয় আকর্ষণ সৌদামিনী। ক্রমে ধারাটা উলটাইয়া গেল, আমাদের অজ্ঞাতসারেই। প্রথম আকর্ষণ হইয়া উঠিল সৌদামিনী, দ্বিতীয় আকর্ষণ জাম, কামরাঙা ইত্যাদি। পরে দেখা গেল জাম-কামরাঙার যা কিছু খাতির, সৌদামিনীকে লইয়াই।

সৌদামিনীর একমাত্র অভিভাবক ছিল ওর বুড়ি দিদিমা—অত্যন্ত ক্ষীণ একটা প্রভাব। ছেলেবেলা থেকেই ও যেন ছিল কারুর কেউ নয়, সম্পূর্ণ মুক্ত, নিঃসম্পর্কিত। বড় হইয়া যখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িতে শিখি তখন 'উর্বশী' কবিতাটা পড়িলে মনে পড়িত সৌদামিনীকে, ঠিক মিলিয়া যাইত ওর সঙ্গে।

সেই স্মৃতির মধ্যে আসিয়া বসিয়াছি—আজ দুপুরে যাহা হইয়া গেল তাহার পর না আসিয়া উপায় ছিল না। কেহ কথা কহিতেছে না অথচ বুঝিতেছি দুইজনের মনেই এক প্রবাহ, সেই প্রবাহেই যেন ভাসাইয়া অনিয়াছে আমাদের মন ক্রমেই যেন ভরিয়া উঠিতেছে, এক সময় না এক সময় কথা কহিতেই হইবে, বোধ হয় উভয়ে উভয়ের অপেক্ষায় আছি। পূর্বদিকে চাঁদ একটু উপরে উঠিতে তীরে বৃক্ষরাজির উপর দিয়া আলো আসিয়া পড়িল। ধীর সঞ্চারে কখন একটা হাওয়া উঠিল—যেন কালের ও-প্রান্ত হইতে একটা ক্লান্ত দীর্ঘশ্বাস ভাসিয়া আসিল। বড়পুকুরের কালো জল রূপালী রেখায় কুঞ্চিত হইয়া উঠিল।

আমিই কথা কহিলাম, বলিলাম, "সদুর কথা তুই আমায় কখনও বলিস্‌নি তো অনিল।"

অনিল স্থির দৃষ্টিতে সামনে চাহিয়াছিল, বলিল, "আশ্চর্য হলি?"

উত্তর করিলাম, "হলাম বৈকি!"

অনিল সেইভাবেই বলিল, "তার চেয়েও একটা আশ্চর্য হবার আছে—অন্তত আমার মনে হয়।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

উত্তর হইল, "তুই কখনও জিগ্যেস করিস্‌নি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলাম, "না, করিনি জিগ্যেস। বহুদিন আগে এক বার জিগ্যেস ক'রে শুনলাম, বিয়ে হয়েছে, শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। আর কি জিগ্যেস করব?"

অনিল বলিল, "তা তো বটেই;—পরস্ত্রী!"

একটু পরে বলিল, "আমাকেই জিগ্যেস করেছিলি, আমি ওইটুকু খবর দিয়েছিলাম। তুইও আর কিছু জিগ্যেস করলিনি, আমিও আর তুলিনি ওর কথা। ভাবলাম পরস্ত্রীর কথা শুনিয়ে মহাসাত্ত্বিক ব্রহ্মচারীর ব্রত ভঙ্গ ক'রে মহাপাতকের ভাগী হই কেন?"

অভিমানের কথা অনিলের? ওর মুখের পানে চাহিলাম—স্ফীংক্সের মত সামনেই চাহিয়া আছে, মুখের প্রতিটি রেখা কঠিনভাবে নির্বিকার।

একটু পরে আমার মুখ থেকে যেন আপনি-আপনিই নিস্ক্রান্ত হইয়া গেল, "শেষে পঁচাত্তর বছরের বুড়োর হাতে পড়ল?...সদু!"

অনিল বলিল, "যখন পড়েছিল তখন অত কোথায়? পাঁচ বছর তো কেটেও গেল!"

এরপর বহুক্ষণ একেবারে চুপচাপ। রাত্রি ঘনাইয়া আসিতে লাগিল, বাগ্দীপাড়ায় একটা গুপী-যন্ত্রের আওয়াজ উঠিল, দু-একটা আলো নিবিল।...মৌন বিস্ময়ে ভাবিতেছি পাঁচটা বৎসর সৌদামিনী এইভাবে কাটাইল।—প্রথম যৌবনের পাঁচটা বৎসর। নারীজীবনের সার সম্পদ!...কী ব্যর্থতা!...

এক সময় কঠোর মুখটা আমার পানে ফিরাইয়া অনিল বলিল, "শৈল, তুই সদুকে বিয়ে কর; মীরা যে হবে না বুঝতেই পাচ্ছিস্। She is too far off (ও বহু দূরে)।"

এত ধাক্কা জীবনে কম পায় লোকে। বলিলাম, "ওর স্বামী!...তুই কি বলছিস্ অনিল!"

অনিল স্থির কণ্ঠে বলিল, "না, ওর স্বামী থাকতে থাকতে নয়, মরে—মানে স্বর্গগত হ'লে।"

অনিল কথা কহিতেছে।—আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম; কহিলাম, "তুই বলছিস্ অনিল? সদুর বৈধব্য কামনা করছিস্?—সদুর?—অনিল...তুই!"

আমার ভাষা জোগাইতেছিল না।

অনিল বলিল, "তাই কামনা করলাম শৈল?—না কামনা করছি ও চিরএয়োস্ত্রী হয়ে থাকুক?...তুই যে অন্তত এখনও পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর বাঁচবি এটা আশা করা যায় না?"

তাহার পর অনিলের মুখ খুলিয়া গেল। বলিল, "আমার ক্ষমতা থাকলে আমি ওই অশীতিপর বুড়োকেই গন্ধর্বের রূপযৌবন দিতাম শৈল—সব ভুলে—শুধু সৌদামিনীর জন্যে, কিন্তু তা হবার যো নেই। আমি খোঁজ নিয়েছি, সিঁথির সিঁদুরের উপর বড় মায়া সদুর—কাকে একবার সজল চোখে বলেছিল—'কপালের ঐ আলোটুকু জ্বলতে থাকাই কি কম ভাগ্যি?'—বুড়োকে এখানে চিকিৎসা করাতে নিয়ে এসেছে; কিন্তু অসম্ভব ব্যাপার শৈল, আমি দেখে পর্যন্ত এসেছি এর মধ্যে,—দরকার আছে বলে আজ সকালে একবার বেরিয়ে গেছলাম না?—লোকটা যে এতদিন বেঁচে ছিল কি ক'রে সেইটেই আশ্চর্যের কথা, আর এখন যা অবস্থা হয়েছে দেখলে আঁতকে উঠতে হয়, মনে হয় যেন মরবার আগেই ভূত হ'য়ে বসে আছে! সদুর বর!...কাল চল, একবার দেখে আসবি শৈল, ভাগবত হালদারের বাড়িতে রয়েছে...।"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "ভাগবত হালদারের বাড়িতে!"

অনিল বলিল, "ও, তাও তো বটে, তুই যে কিছুই জানিস্ না!—হ্যাঁ, সদু এখন ভাগবতের ওখানেই ওঠে। ভাগবত এখন ওর মস্ত বড় অভিভাবক, একেবারে বড় কুটুম! ওর দিদিমা মারা যেতেই ভাগবত ওপরপড়া হয়ে ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এল,—সেই দিনই। সদু তখন সমর্থ মেয়ে, তা ভাগবতের দয়াতে একদিনও তাকে অরক্ষিত থাকতে হয়নি। কেউ বললে, "সাবাস ভাগবত!' কেউ সদুর জন্যে একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, কেউ বললে, 'ও যা মেয়ে, ঠিক জায়গাতেই পৌঁছুল—যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে'...তখন ব্যাপারটা অতশত বুঝি নি, শুনে যেতে লাগলাম। কিছুদিন গেল, তারপর এল ভাগবতের উপকারের দোসরা দফা। একদিন গ্রামে জন দুই-তিন নতুন লোক দেখে খোঁজ নিয়ে টের পেলাম ভাগবতের বাড়ি বরযাত্রী এসেছে—সদুর বিয়ে। দিনটা বেশ মনে আছে। বরযাত্রীদের দেখে আমি সদুর সঙ্গে দেখা করলাম। একটু গা-ঢাকা হয়ে এসেছে; খিড়কীর পুকুরে গা ডুবিয়ে সে গামছা দিয়ে মুখটা পরিষ্কার করছে, ঘাটে রক্ষক হিসাবে ভাগবতের ছোট মেয়ে নারাণী।

ভাগবতের বাড়িতে লোকজন তো কমই, বিশেষ কাউকে ডাকেওনি—বললাম, 'তোর বর দেখে এলাম সদী।' বিয়ের জন্যে মুখখানাকে ঘষে ঘষে রাঙা ক'রে ফেলেছে—অন্ধকার হ'য়ে এলেও বেশ বুঝতে পারা যায়, কি রকম সৌখীন জানিসই তো। গামছাটা সরিয়ে মুখের একপাশে জড় ক'রে বললে, 'ও মা, অনিল?—এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলি, আমি বলি হঠাৎ কে কথা কয়? কি রকম বর দেখলি রে?' বলে গামছা দিয়ে মুখটা সব ঢেকে ফেলে শুধু কৌতুকভরা চোখ দুটো বের ক'রে আমার পানে চেয়ে রইল। বললাম, "ভালই।' সদু হেসে বললে, 'তবে যে শুনেছিলাম বড় বুড়ো? অবিশ্যি আমায় কেউ বলেনি, এমনি শুনেছিলাম।' আমি বললাম, 'তোর শ্বশুর খুব বুড়ো সদু, বর-যাত্রীর আর সবাইও বুড়ো-বুড়োই, শুধু তোর বর দেখলাম কম বয়সী, মানে এই ছাব্বিশ, সাতাশ—তিরিশের মধ্যে।' সদু মুখের জলটা কুলকুচি ক'রে ফেলে দিয়ে বললে, 'মরুক গে, শ্বশুর নিয়ে তো আর ধুয়ে খাব না'—বলে খিলখিল ক'রে হেসে বললে, 'তুই এবার সর্ অনিল, উঠতে দে আমায়...আর শোন্, বিয়ে দেখতে আসবি তো? নিশ্চয় আসবি। তোকে নেমন্তন্ন করেছে? নিশ্চয় কারেনি; ভাগবত-কাকার জানাশোনা নিজের দলের ক'জন ছাড়া কাউকে বলেনি। না করলেও আমি করলাম। বিয়ে আমার, ভাগবত-কাকার তো বিয়ে নয়'—বলে আবার একবার চাপা গলায় খিলখিল ক'রে হেসে উঠল।

গেছলাম বিয়ে দেখতে অনিমন্ত্রিত হ'লেও অবশ্য না গেলেই ছিল ভাল। ছাদনাতলায় দেখলাম শ্বশুরই বর, বরোচিত লজ্জায় এবং শ্বশুরোচিত বয়সে এত ঝুঁকে গেছে যে মুখই দেখা যায় না প্রায়। আমার যে কী হ'ল!—না ভাল ক'রে বুঝে কি ভুলটাই ক'রে বসে আছি। আমি দাঁড়াতে পারিনি, কিন্তু তারই মধ্যে সদুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হ'য়ে গেল, সে কী নীরব মর্মন্তুদ দৃষ্টি!—যেন এত বড় বিদ্রূপটা আর যার কাছে হোক, অন্তত আমার কাছে ও প্রত্যাশা করেনি।"

অনিল আবার চুপ করিল। পাড়াগাঁ হিসাবে রাত্রি বেশ গাঢ় হইয়া আসিয়াছে। বাগ্দী-পল্লীতে দুই-একটা যে আলো ছিল নিবিয়া গিয়াছে শুধু জাগিয়া আছে বৈষ্ণব ভক্তের সেই গুপী-যন্ত্রটা। আমরা দুইজনেই আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এক সময় অনিল প্রশ্ন করিল, "বদলালো মত?"

মনের যে রকম অবস্থা, একটু বিরক্তিও লাগিল। অনিল দার্শনিক, সবাই তো তাহা নয়। মনের ভাবটা চাপিয়া রাখিলাম, "থাক্ ও-কথা এখন অনিল।"

অনিল বুঝিল, বলিল, "নাই বদলাক, একটা কথা শুনিয়ে রাখি। জানিস্ তো সাঁতরায় 'ভাগবত হালদারের উপকারের দুই দফা' বলে একটা কথা আছে?"

আমি ওর মুখের পানে চাহিলাম।

বলিল, "প্রথম দফা—টাকা হাওলাত দেওয়া, অমন খুঁজে খুঁজে উপকার ও ছাড়া আর কেউ পারবে না! তার ওপর সুদের তাগাদা নেই—টাকা যে ধার দিয়েছে ভুলেই গেছে যেন—বলে 'গেরস্ত যখন দেবার দেবেই, তাগাদা দিয়ে মিছে দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় ফেলা কেন? ফলে ওর সম্বন্ধে লোক নিশ্চিন্দি হয়ে যায়। দ্বিতীয় দফায় ভাগবত তোমার কাঁধ থেকে বিষয়-সম্পত্তির বোঝা পর্যন্ত নামিয়ে তোমায় আরও নির্ভাবনা ক'রে দিলে।...সদু প্রথম দফা পেয়েছে এখন দ্বিতীয় দফা বাকি, ভাগবত তার গোড়াপত্তন ক'রে রেখেছে। অবশ্য সদীর বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে সে নিজে।"

আমি আবার জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চাহিলাম।

অনিল বলিতে লাগিল, "সদুর স্বামী ভাগবতের কুটুম। সে যদি স্বর্গে যায় ভাগবত কি সদুকে ঠেলতে পারে? যে-ভাগবত, যখন একেবারেই কোন সম্পর্ক ছিল না পরের বোঝা বাড়ি এনে থুয়েছিল। গোড়াপত্তনের মধ্যে আরও একটা দূরদৃষ্টি আছে ভাগবতের।—সদুর বর আবার যে-সে কুটুম নয়, দূর সম্পর্কের সম্বন্ধী?—ভাগবতের এমনই আটঘাট বেঁধে কাজ করা, মানুষেও সম্বন্ধ-বিরুদ্ধ একটা কিছু হচ্ছে বলতে পারবে না, ভগবানেও নয়। সবার মুখ বন্ধ ক'রে রেখেছে। অবশ্য সদু এখনও

ওকে আগেকার মত 'ভাগবত-কাকা' বলেই ডেকে আসছে, বোধহয় আশা করে এইটেই হবে ওর বর্ম, ভাগবতের উপকারের পরিণতি থেকে ওকে বাঁচাতে।"

অনিল আবার একটু চুপ করিয়া বলিল, "বুঝেছি তোর মনের ভাব শৈল। সদুর বৈধব্যকে ওর মুক্তি বলতে প্রাণে লাগে; কিন্তু আমি জানি সিঁথির সিঁদুর নিয়ে যাই বলুক, ও-ও মনে মনে ক্লান্ত। আজ দুপুরে শুনলি তো?...তারপর, বিধবা-বিবাহ ক'রে সদুর জীবনে দাগ লাগানো!—শিউরে উঠেছিস ভাবতেই। কিন্তু সদুর সামনে ঐ নরক ভাগবতের দ্বিতীয় দফা উপকার।...দেখ্ ভেবে; জীবনকে, সমাজকে তোরা শুদ্ধ দৃষ্টিতে দেখিস্, আমার মত নাস্তিকের আবার বেশি বলা মানায় না।"

"চল, ওঠা যাক, রাত অনেক হ'ল। অম্বুরীর কাছে একটা মিথ্যে জবাবদিহি দিতে হবে। ভাবতে ভাবতে চল।"

১০

কয়টা দিন গুমট করিয়াছিল, পরের দিন সকাল থেকে মেঘ জমিতে জমিতে দুপুরের পর বৃষ্টি নামিল। এই জন্যও, তা-ভিন্ন মনেও দুইজনের মেঘ জমিয়া আছে, সে জন্যও, আর মোটেই বাহির হইলাম না। অম্বুরী বলিল, "হয়েছে ভাল, কাল যেমন আমায় ভাবিয়েছিল..."

বিকালে দুইখানা চিঠি পাইলাম; একটি বাড়ির চিঠি রিডাইরেক্ট, করা, একটা তরুর।

তরুর সেই প্রীতি উপহার ছাপা হইয়াছে, এক কপি পাঠাইয়া দিয়াছে। সত্যই খুব ভাল করিয়া ছাপাইয়াছে মীরা, এক্সমাস কি নিউ-ইয়ার কার্ডের মত চারখানি মোটা মোটা পাতার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকার আকারে ছাপা। চওড়া সবুজ রেশমের ফিতা দিয়া বাঁধা। তরু লিখিয়াছে মীরা নাকি দুঃখ করিয়াছে পদ্যটি যেমন, তাহার যোগ্য ছাপানো হইল না। নিশীথবাবু বলিলেন,—ভয়ংকর চমৎকার হইয়াছে, তিনি কখনও এমন সুন্দর প্রীতি-উপহার পড়েন নাই। আমি চলিয়া আসিতে তরুর মন খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। কাল রাত্রে খাবার সময় ওর বাবা, মা দুইজনেই নাম করিতেছিলেন। ওর বাবা বলিলেন, "তরুকে নিয়ে মাস্টারমশাই না হয় বিলেতে চলে যান না, ইচ্ছে থাকে নিজেও কিছু শিখে আসুন।" মা বলিলেন, "লক্ষ্মী-পাঠশালার শখ এর মধ্যেই মিটে গেল?" তাহার পর থেকেই ওর বাবা চুপ করিয়া গেলেন। যদি যাইতে চাই আমি বিলাত, একাই হোক, বা তরুকে লইয়া হোক—তাহা হইলে ওর দিদি চেষ্টা করিতে পারে। আজ আমার ঘরে বসিয়া এই কথা বলিল।

আর একটা কথা বলিল দিদি। বলিয়াছে, "তরু, তোমার মাস্টারমশাইকে সাবধান ক'রে দাও, তাঁর জন্যে মস্ত বড় একটা সারপ্রাইজ তোয়ের করেছি আমি, নোটিশ দিয়ে রাখলাম।"

তরুকে কিছু বলে নাই মীরা, আমি কিছু আন্দাজ করতে পারি কি?

চিঠিটা যখন পাইলাম তখন অম্বুরীও ছিল সেখানে বসিয়া; প্রশ্ন করিল, সারপ্রাই না কি লিখেছে, ওটার মানে কি ঠাকুরপো? সারপ্রাই তোয়ের করা কি?"

অনিল বলিল, "তার মানে হঠাৎ এমন একটা কিছু ক'রে বসবে যাতে শৈলেনের একেবারে তাক লেগে যাবে।"

"আর আমি ভাবলাম ঠাকুরপোর জন্য মস্ত একটা মালা তোয়ের করছে বুঝি। হাসি নয়, সত্যিই তাই ভেবেছিলাম—মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, আমরা কি ক'রে জানব বল? ভাবলাম ইংরেজীতে মালাকেই বুঝি সারপ্রাই বলে।"

অদ্ভুত আন্দাজে নিজেই একটু লজ্জিত হইয়া বলিল, "অবিশ্যি বলতে পার ঢাক পিটিয়ে সাবধান ক'রে আর কে মালা দেয়। তা জজ-ব্যারিস্টারের মেয়ে, ওদের পদ্ধতি কেমন কি ক'রে

জানব বল?"

একটু থামিয়া বলিল,"বেশ, তা কি সারপ্রাই করবে বলই না—মালা না-ই হ'ল।"

বলিলাম, "সেটা তো তোমায়ই জিজ্ঞেস করব মনে করছিলাম;—মেয়েছেলেদের সারপ্রাইজ করবার কি সব রীতি তা আমরা কি ক'রে জানতে পারব?—বিশেষ ক'রে আমি বেচারা।"

অম্বুরী চক্ষু তুলিয়া চিন্তা করিতেছিল, অনিল বলিল, "হ্যাঁ, ভেবে আরও দু-একটা বল অম্বুরী, তোমার বা তোমাদের একটা সারপ্রাইজ করবার রহস্য তো জানাই গেল।" অম্বুরী বিস্মিত ভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কি?"

"এই মালা তোয়ের করবার কথা। যদিও অভ্যেস হ'য়ে পড়ায় আমার কাছে ওতে কিছু সারপ্রাইজ নেই।"

অম্বুরী বলিল, "আমি তোমার জন্যে রোজ রোজ মালা তোয়ের করতে গেলাম! আমার খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই যেন।"

অনিল বলিল, "রোজ নয়; রোজ হ'লে তো আর সারপ্রাইজ হ'ল না। যেমন কোন রাত্তিরে যদি তেমন জ্যোৎস্না ফুটল, কিংবা ধর আজ রাত্তিরে—এই ঘন বর্ষা নেমেছে..."

অম্বুরী ধমক দিয়া বলিল, "আচ্ছা, তোমার লজ্জা বলে একটা বস্তু নেই? কি বেহায়াপনা হচ্ছে বল দিকিন ঠাকুরপোর সামনে?"

অনিল হঠাৎ সচকিত হইয়া উঠিল, যেন একটা ভুল সামলাইয়া লইবার ভঙ্গিতে বলিল, "ও ঠিক, মনেই ছিল না!"—শৈলেন, ওটা আমাদের নিজেদের মধ্যেকার কথা..."

"আঃ কি জ্বালা গা!"—বলিয়া অম্বুরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া পলাইল।

অনিল বলিল, "অম্বুরীর সামনে কথাটা তুললে ও বোধহয় মাকে বলত, মা আবার এই নিয়ে ভ্যানর ভ্যানর লাগাত, তাই ওতে দিলাম উঠিয়ে। জিজ্ঞাসা করছিলাম, বিলেত যাওয়ার কথাটা সিরিয়াস ভাবছিল শৈল?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "কথাটা কি সিরিয়াস্‌লি উঠেছে বলে তোর বিশ্বাস অনিল?"

অনিল একটু চিন্তা করিল, তাহার পর বলিল, "ধর, যদি ওঠে কখনও? যে ভাবেই উঠুক, উঠছে তো কথাটা? তোর নিজের কাছেও বারদুয়েক প্রশ্ন হয়েছে বললি। আমি যতটা বুঝেছি ব্যাপারটা তোদের দু-জনের সম্বন্ধে তরলতা কিংবা ঘনিষ্ঠতার ওপর নির্ভর করছে। আমার মনে হয় এখানে রায় দম্পতি ওঁদের মেয়েকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন।"

আমি বলিলাম, "ঠিক এখানেই ওঁরা আমার স্বাধীনতা নষ্ট করেছেন। আমি যেতে পারি যদি তরুর গার্জেন হ'য়ে যেতে হয়, কিন্তু সেটা হবে না অনিল।"

অনিল প্রশ্ন করিল, "কেন?"

বলিলাম, "যতদূর বুঝতে পেরেছি, তরুর বিলিতী কেরিয়ার ঐ লরেটো পর্যন্ত। ওর মায়ের ওপর দ্বিতীয় আর একটা আঘাত দিতে মিস্টার রায় সাহস করবেন না। তাঁদের ছেলের আঘাতই তাঁর পক্ষে দিন দিন মর্মান্তিক হ'য়ে উঠেছে। ভুটানীর ব্যাপারটা যদি নিজের চক্ষে দেখিস্ তো স্পষ্টই বুঝতে পারবি, অপর্ণা দেবী ওর মধ্যে দিয়েও নিজের পুত্রশোকটা আর একবার ক'রে উপলব্ধি করছেন। শোককে এই রকম দু-ধারায় পান করলে আর কতদিন টিকবেন?"

অনিল একটু চিন্তিত ভাবে থাকিয়া বলিল, "হুঁ।...বেশ ধর্ তরু যেমন লিখেছে মীরা চেষ্টা ক'রে যদি তোকে একাই পাঠাতে পারে কোন ট্রেনিঙের জন্যে কিংবা ব্যারিস্টারির জন্যে?"

আমি অল্প একটু হাসির সঙ্গে বলিলাম, "সেই কথাই তো বলছিলাম। পৌছুতে পারব কি বিলেতে তা হ'লে?"

অনিল একটু বিমূঢ় ভাবে প্রশ্ন করিল, "তার মানে?"

বলিলাম, "তার মানে অতটা লজ্জার বোঝা ঘাড়ে ক'রে যাত্রা করলে জাহাজসুদ্ধ ডুবে মরব

না কি?"

অনিল লজ্জিতভাবে হাসিয়া বলিল, "না না, আমি তা মীন্ করিনি।...আচ্ছা, আর একটা সম্ভবনার কথা ধর্; মানে ধর্, রায় দম্পতিই যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে তোকে পাঠান?"

বলিলাম, "একই কথা হ'ল না কি? তার পেছনেও কি মীরা নীরব মিনতি নিয়ে রইল না?"

অনিল আবার একটু থামিল, তাহার পর বলিল, "কেন যৌতুক বলে কিছু দেবার অধিকার নেই বাপ-মায়ের?"

বলিলাম, "ঠিক এই কথাই তুই আর একবার জিগ্যেস করেছিলি অনিল, পরশুই। নিজের বুদ্ধিমত আমিও উত্তর দিয়েছি—অর্থাৎ এটা ঠিক যৌতুক হবে না, হবে আমার বর্তমান অবস্থাকে অপমান। গরীব বাপ-মায়ে জন্ম দিয়ে যে আমায় মীরার উপযোগী শিক্ষা দিতে পারলেন না—সেই ব্যাপারটা নিয়ে ব্যঙ্গ। আমার বাপ-মায়ের গরীবিয়ানা তাতে ক্ষুণ্ণ হবে।"

বাহিরে প্রবল ধারায় বর্ষাপাত চলিয়াছে। অনিল আবার খানিকক্ষণ মৌন রহিল, "তাহার পর প্রশ্ন করিল, "বিলেত তা হ'লে হ'ল না?"

বলিলাম, "হবেই—যদি এই রকম পড়বার সুবিধেটা থেকে যায়। কোন না কোনো একটা স্কলারশিপ নিয়ে আমি যাবই বিলেত—বিলেতই হোক বা জার্মানিই হোক।"

অনিল খোলা দরজা দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া যেন অন্যমনস্কভাবে ধীরে ধীরে টানিয়া টানিয়া বলিল—"যদি—এই রকম—পড়ার সুবিধেটা থেকে যায়...যদি!..."

১১

সাঁতরায় চারিটা দিন বেশ কাটিল। চমৎকার লাগিতেছে; তবে পূর্বেই বলিয়াছি, অবিমিশ্র আনন্দের অনুভূতি নয়, তাহার উপর সৌদামিনী আসিয়া একটা যেন মর্মনিংড়ান ব্যথা জাগাইয়াছে বুকের মধ্যে। কাল যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম ঐ কথাই ভাবিয়াছিলাম—সেই সদু!—তার এই দশা?—আহা...

অনিলের প্রস্তাবটা বড় অশুচি বলিয়া বোধ হইতেছিল, কিন্তু তবু একথা অস্বীকার করিতে পারিতেছি না যে, অমোঘ সম্মোহনে ঐ চিন্তাটা আমায় আকর্ষণ করিতেছিল—সত্যই তো সিঁথির সিঁদুর তো ঘুচিল বলিয়া; আজ না হয় দু-দিন বাদে; তারপর?—ভাগবত হালদার? ভাবিতেও শিহরিয়া উঠিতে হয়। অথচ ঐ ওর নিশ্চিত পরিণতি।...কাল যতক্ষণ জাগিয়াছিলাম, বলাটা ভুল হইয়াছে, আসলে কাল একেবারে নিদ্রা হয় নাই।

হোথায় মীরা। ভাবিলাম সুখে-বেদনায়, হরিষে-বিষাদে জীবনটা অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, যাই দু-দিন একটু মুক্তির আস্বাদ লইয়া আসি।

এই মুক্তি!

আজ দুপুরে আবার আসিয়াছিল সৌদামিনী। সেই কালকের ব্যাপারের পুনরানুষ্ঠান, প্রায় আগাগোড়াই। সেই আমাদের নিদ্রার ভান করিয়া পড়িয়া থাকা, আর ওর ছেলেমেয়ে দুইটাকে লইয়া আকুলি-বিকুলি; বেশ বুঝা যায় ও যেন অনুভব করিতেছে এই সন্তান তো ওরই হইবার কথা ছিল। তাই ওদের বুকে করিয়া ওর নাড়িতে টান পড়িতেছে।

আজ বারান্দায়ই কাটাইল, বলিল, "ওর ঘরটায় তো বড্ড গরম বৌ। ওঁরা ঘুমুচ্ছেন, এইখানেই আমরা গল্প করি। এই সময় একটু ফুরসৎ পাই, পালিয়ে আসি, তোর নন্দাই এই সময়টায় একটু ভাল থাকে।...আর ভাল থাকা!..."

একবার বলিল, "আজ শৈলদার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব ভাবছি, মনে করবে দুটো দিনের জন্যে এলাম সাঁতরায়, সদী এল, অথচ একবার দেখা করলে না।"

কপট-নিদ্রা শেষ দিকটায় কখন একটু অকপট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যখন উঠিলাম দুইজনে, তখন সৌদামিনী চলিয়া গিয়াছে। বরাবরই ঘুমাইয়া থাকিবার কথা বলিয়া অঙ্গুরীর কাছে ওর প্রসঙ্গটা তুলিতেই পারিলাম না।

সদু দেখা করিবে বলিল, আবার কি ভাবিয়া চলিয়া গেল?

বিকেল বেলায় দুইজনে বাহির হইব,—আমি রকে দাঁড়াইয়া আছি, অনিল বাক্স থেকে কিছু পয়সা লইবার জন্য ভিতরে গিয়াছে। বাহিরে যেন কতকটা পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্ন কানে আসিল, "এটা কি পরলোকগত সদাশিববাবুর বাড়ি?"

বাহিরের উঠানে পাড়ার কয়েকজন ছেলেমেয়ের সঙ্গে সানু খেলা করিতেছে, প্রশ্নটা তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া।

দু-তিনবার প্রশ্নের পরও কোন উত্তর হইল না, অবশ্য না হওয়াই স্বাভাবিক। একে তো বছর কয়েক পূর্বে যে মারা গিয়াছে শিশুরা তাহার নাম মনে করিয়া রাখে না, তাহার উপর প্রশ্নকারী 'পরলোকগত' কথাটা জুড়িয়া দিয়া আরও দুর্বোধ্য করিয়া তুলিয়াছে। শেষে বোধ হয় ওরই মধ্যে একটু বড় গোছের একটি মেয়ে উত্তর করিল, "না পরলোকের নয় গো, সানুর বাবার বাড়ি।"

অগ্রসর হইতে হইতে শুনিতেছি, "কি নাম বাবার?"

সানু ঠাকুমার কাছে শোনা নামটা বলিল, "বাবার নাম অনা, টোমার নাম কি?"

"রাজীবলোচন।"

বাহির হইয়া দেখি রাজু বেয়ারা চৌকাঠের নীচে দাঁড়াইয়া আছে। 'পরলোকগত' কথাটার জন্য বিস্মিত হইলাম না। পরে অবশ্য তরুর কাছে টের পাইলাম, মীরা দুষ্টামি করিয়া গালভরা কথাটা শিখাইয়া দিয়াছিল। যা হউক, ওর উপস্থিতির জন্য বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "রাজু যে! কি ব্যাপার?"

কিছু বলিবার পূর্বে রাজুর দৃষ্টিটা যেন অনিচ্ছাকৃতভাবেই বাড়ির উপর একবার ঘুরিয়া গেল, কহিল, "এই বাড়িতেই রয়েছেন আপনি মাস্টার-মশা?"

উত্তর করিলাম, "হ্যাঁ, এইটেই আমার বন্ধুর বাড়ি, রাজু।...তারপর, ব্যাপার কি বল তো, তুমি হঠাৎ?"

অনিল আসিল, চাপরাশ-আঁটা মানুষ দেখিয়া একটু বিমূঢ়ভাবে প্রশ্ন করিল, "কে রে শৈল?...কি দরকার তোমার?"

আমি উত্তর করিলাম, "মিস্টার রায়ের বেয়ারা।"

"ডাকতে এসেছে তোকে?"

রাজু উত্তর করিল, "আজ্ঞে না, দিদিমণি এসেছেন।"

অনিল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। আমিও অতিমাত্র আশ্চর্যান্বিত হইয়া রাজুকে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী এসেছেন?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ!"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া আবার আমরা পরস্পরের মুখের পানে চাহিলাম; রাজুকে আবার প্রশ্ন করিলাম, "কোথায়?"

"ওই মোড়ের মাথায়, পণ্টিয়াক্‌টা দাঁড় করিয়ে আছেন।"

এ কি নিদারুণ লজ্জায় ফেলিল মীরা—আমাকেও আর অনিলকেও! আমি যেন বিপর্যস্ত হইয়া অনিলের পানে চাহিলাম, ঠিক ইচ্ছা করিয়া চাহিবার উপায় ছিল না, দৃষ্টিটা আপনা হইতেই তাহার মুখের উপর গিয়া পড়িল। অনিল কিন্তু নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া ইতিকর্তব্য স্থির করিয়া ফেলিয়াছে। বলিল, "একটু দাঁড়া শৈল, এলাম বলে।"

মিনিটখানেকের মধ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "চল্", বেয়ারাকেও বলিল, "এস হে।"

আঁকাবাঁকা গলিপথ হইতে বাহির হইয়াই আমরা মীরার মোটরের সামনে আসিয়া পড়িলাম। কয়েকজন কৌতূহলী বালক-বালিকা মোটরটা ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ড্রাইভার স্টিয়ারিং ধরিয়া সামনের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তরু দরজার উপর মুখ চাপিয়া একটু বিমর্ষভাবে বসিয়া আছে। মীবা গাড়ির ও-পাশে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আলাপ জমাইয়াছে।

তরু আমায় দেখিয়াই উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "ও দিদি, মাস্টারমশাই!"

মীরা ফিরিয়া চাহিতেই আমরা দুইজনে নমস্কার করিলাম। আমি অনিলকে পরিচিত করিয়া দিতে, অনিল আর একবার নমস্কার করিয়া দরজাটা খুলিয়া বলিল, "আসুন, নামুন।"

তরুকে বলিল, "নামো খুকী।"

তরু লক্ষ্মী-পাঠশালার পোষাকে আসিয়াছে; জড়িত পদে নামিযা প্রথমে অনিলের, পরে আমার পদস্পর্শ করিল।

মীরা নামিয়া অনিলের দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনাদের বোধ হয় ভয়ানক আশ্চর্য করে দিলাম; খুব ব্যতিব্যস্ত করলাম বোধ হয়।"

অনিল হাসিয়া উত্তর করিল, "আমাদের মুখ চেয়ে, ব্যতিব্যস্ত করবার ক্ষমতা থেকে ভগবান আপনাদের বঞ্চিত করেছেন! যদি সে রকম অভিসন্ধি ওঠেও কখনও আপনাদের মনে তো আপনারা আগে থাকতেই নোটিশ দিয়ে নিজের উদ্দেশ্য পণ্ড ক'রে ফেলেন।"

আমরা তিনজনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "তবুও নিশ্চিন্দি হবেন না, নোটিশ দিয়েও যে উপদ্রব করা চলে, তার নজির আমাদের দেশে আছে অনিলবাবু।—জানেন তো, এই দেশেই চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত।"

তাহার পর আমার দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা গেলেন পূর্ণিয়া শৈলেনবাবু, তাঁর কাছ থেকে হুকুম আর মোটর চেয়ে রেখেছিলাম, এলাম চলে।"

বলিলাম, "আমাদের সৌভাগ্য, আপনি যে মনে ক'রে আসবেন এটা আশা করিনি।"

তরুর মুখটা যেন একটু বিষণ্ণ। মীরা-অনিলের কথাবার্তার মধ্যে আমায় একটু একান্তে বলিল, "মাস্টারমশাই, উনি বাড়িতেও সবার সামনে আমায় 'খুকী বলবেন নাকি?"

ও-বেচারির দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিয়া আমি আর হাসি চাপিতে পারিলাম না। মীরা জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?" প্রথমটা বলিতে চাহিলাম না, কিন্তু ওর জেদাজেদিতে বলিতেই হইল। আমাদের তিনজনের হাসিতে তরু একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া আমার গায়ে সাঁটিযা গেল। মীরা বলিল, "সত্যিই কি রকম আক্কেল আপনাদের! দেখছেন কত বড় একটা মেয়ে,—অত কষ্ট ক'রে বেচারি শাড়ি পর্যন্ত পরে এল, তবু 'খুকী' বলবেন।"

চৌকাঠের কাছে গলিতে অম্বুরী দাঁড়াইয়া আছে। একটা ধোপদস্ত শেমিজ আর শাড়ি পরা, চুলটাও সামান্য একটু গোছগাছ করিয়া লইয়াছে।

মীরাকে দেখিয়া প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল যেন, তখনই আবার সে ভাবটা সামলাইয়া লইয়া কয়েক পা অগ্রসর হইয়া মীরার বাঁ-হাতটা ধরিয়া বলিল, "এস ভাই।"

তাহার পর তরুর পিঠে হাত দিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এই তোমার ছাত্রী ঠাকুরপো? সত্যি কি চমৎকারটি। এত ছোট মেয়ে মেমেদের স্কুলে পড়ে ঠাকুরপো?"

মীরা তাড়াতাড়ি বলিল, "সর্বনাশ। দেখবেন, ছোট, তা বলে ওকে যেন 'খুকী' বলে বসবেন না আপনিও।"

মীরা নিজেও এবং আমরা দুইজনে হাসিয়া উঠিলাম। তরু আবার লজ্জায় অম্বুরীকে জড়াইয়া কাপড়ে মুখ লুকাইল। অম্বুরী আমার মুখের পানে চাহিল, ব্যাপারটা শুনিয়া হাসিয়া বলিল, "না, এ অন্যায়। ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই মিলে আপনারা ওর কি অবস্থা ক'রে তুলেছেন দেখুন তো।"

তাহার পর প্রথম সুযোগেই আমায় একটু একান্তে ডাকিয়া ব্যগ্র মিনতির সহিত বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো, আমায়ও যেন 'অম্বুরী' বলে ডেক না—শুধু আজকের দিনটা—ওঁকেও বলে দিও—দোহাই তোমাদের..."

১২

মীবা প্রথমটা আলাপ-পরিচয়ে একটু অন্যমনস্ক ছিল, নূতন পরিচয়ের জড়িমাটা লাগিয়াছিল একটু, চৌকাঠ ডিঙাইয়া বহিরাঙ্গনে পা দিতেই কিন্তু তাহার মনটা যেন নূতন আবেষ্টনীতে একেবারে সাড়া দিয়া উঠিল। চলিতে চলিতে মাঝখানটিতে দাঁড়াইয়া পড়িয়া একবার মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিক চাহিয়া লইয়া বলিল, "কি সবুজ শৈলেনবাবু সবুজে যেন চোবান! এবার বুঝতে পেরেছি আপনি কিসের টানে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছেন।"

বাড়ির দিকে না গিয়া ডান দিকে তরুলতায় জড়ানো ছোট চাঁপা গাছটার কাছে চলিয়া গেল, পুষ্পভরা লতার একটা ডগা তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "কি চমৎকার ফুল! কি ছোট্ট! কি রাঙা...কি নাম এর? বিলিতি ফুল নাকি—আর, পাতা কি চমৎকার—চিরুনির মত।"

বলিলাম, "না, বিলিতি হ'তে যাবে কেন? একেবারে দিশী। তরুর অন্তত চেনা উচিত।"

হাসিয়া তরুর পানে চাহিলাম।

মীরা রহস্যটা বুঝিতে না পারিয়া অম্বুরীর পানে চাহিল, অম্বুরী বলিল, "একেই তরুলতা বলে, তাই বলছেন ঠাকুরপো।"

নামের এই মিলে মীরার মুখটা একরকম বিস্ময়মিশ্রিত হাসিতে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ওদিকে তরু আরও সংকুচিত হইয়া উঠিয়াছে। মীরা কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার লতার, একবার তরুর পানে চাহিয়া বলিল, "কি আশ্চর্য শৈলেন বাবু!—এই তরুলতা?"

একটু নালিশের সুরে বলিল, "আপনি জানতেন অথচ বলেন নি আমাদের—"

মীরা আবার ছেলেমানুষ হইয়া পড়িয়াছে; কোন কিছুতে অভিভূত হইয়া পড়িলে উহার এই অবস্থা হয়। জানিলেও এ সম্বন্ধে আমার বলিবার কি ছিল?

হঠাৎ অম্বুরীর পানে চাহিয়া বলিল, "আমি যাবার সময় কতকগুলো চুরি ক'রে নিয়ে যাব। মা যে কী ভীষণ আশ্চর্য হ'য়ে যাবেন!—কিছু বলতে পারবেন না কিন্তু আপনি, আমার ভয়ংকর ভাল লেগেছে।"

অম্বুরী বলিল, "বলব বৈকি, শুধু এক কড়ার না বলতে পারি।"

মীরা একটু থতমত খাইয়া প্রশ্ন করিল, "কি?"

অম্বুরী তরুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "আপনার তরুলতাটি আমায় দিয়ে যাবেন; আমারও বড্ড ভাল লেগেছে। সত্যি কি চমৎকার!"

সকলের হাসিতে তরু আরও সংকুচিত হইয়া পড়িল। মীরা হাসির পরেই গম্ভীর হইয়া বলিল, "এটা কিন্তু ঠিক হ'ল না।"

এবার অম্বুরী একটু থতমত খাইয়া গেল। কোথাও আধুনিক ভদ্রতার ত্রুটি হইয়া গিয়াছে মনে করিয়া মীরার চেয়েও অপ্রতিভ ভাবে প্রশ্ন করিল, "কি?—কি কি হয়নি?"

মীরা বলিল, "আমি আসতেই আপনি—এস ভাই বলে আমায় ডেকে নিলেন। এরই মধ্যে কিন্তু সুর বদলে 'তুমি' থেকে 'আপনি' করে বসেছেন!"

অম্বুরী যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিল, "এই কথা?"

মীরা বলিল, "এই কথা বটে, তবে সামান্য কথা নয়, কেন না ঐ স্নেহভরে ছোট ক'রে

যে ডেকেছিলেন তারই জোরে আমি মনে মনে একটা সম্বন্ধ ঠিক ক'রে ফেলে ছিলাম।"

তাহার পর তরুর পানে চাহিয়া বলিল, "বাঃ, তরুর দিদি আছে আমার নেই,—আমার হিংসে হবে না?"

একটা প্রীতির রস যেন সবার মনটাকে ভিজাইয়া তুলিতেছে।

অম্বুরী বলিল, "আমি ভেবেছিলাম পাড়াগেঁয়ে মানুষ—মস্ত একটা ভুল হ'য়ে গেছে কথাটা বলে, তাই..."

মীরা বিপন্নভাবে বলিল,"তবুও মনে করবেন—মস্ত একটা ভুল হয়নি? পাড়াগেঁয়েদের বোঝান শক্ত দেখছি তো!"

আবার একটা হাসি উঠিল।

আর একটু দেখিয়াই মীরা বলিল, "চলুন ভেতরে যাই, যেখানে দাঁড়াচ্ছি কিন্তু নড়তে ইচ্ছে করছে না অনিলবাবু।...আর কে কে আছেন বাড়িতে?"

অনিল বলিল, "ঠিক তো; চলুন ভেতরে! ভেতরে শুধু আমার মা আছেন আর। আপনাকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি, দুই গেঁয়োতে মিলে আমরা কি ভুলটাই ক'রছি দেখুন সেই থেকে!"

হাসিতে হাসিতে আমরা ভিতরে আসিলাম। রকের এক দিকটায় অনিলের মা সানু আর খুকীকে লইয়া একটা মাদুরের উপর বসিয়া আছেন। পাশেই আর একখানা মাদুরের উপর একটা শীতলপাটি বিছানো, আগন্তুকদের জন্য। অম্বুরীর অতন্দ্রিত চেষ্টায় বাড়িটা সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, আজ যেন আরও ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। যা মিনিট পাঁচ-ছয় হাতে পাইয়াছিল, তাহাতেই সে ছেলেমেয়ে থেকে আসবাবপত্র পর্যন্ত সব-তাতেই ত্বরিতে তাহার যাদুস্পর্শটুকু দিয়া বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রশংসা হইবে জানিয়াই আগেভাগেই বলিয়া রাখিল, "এই তোমার দিদির গেরস্থালি ভাই, আপন জেনে যদি একটু আনন্দ পাও। আগে একটু বসে জিরিয়ে নাও। তারপর হাত-পা ধুয়ে ফেল। আমি ততক্ষণ একটু চা ক'রে ফেলি...ঝি! নাইবার ঘরে জল-তোয়ালে..."

ঝি রকের পাশে বিমূঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, বলিল, "দিয়েছি জল।"

মা নূতন মানুষের সঙ্গে প্রবেশ করিতেই খুকী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, সানু মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চক্ষু বড় বড় করিয়া বলিল, "ঠব্বনাশ! কলকাটা ঠেকে সবাই এসেছেন, খুকু, ঠভ্য হয়ে বসটে হয়।"

তাহার কাণ্ডখানা দেখিয়া সবাই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা ধীরে ধীরে উঠিয়া গিয়া অনিলের মায়ের চরণস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিল, তরুও অনুকরণ করিল। অনিলের মা উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া হাতটা ওষ্ঠে ঠেকাইলেন; বলিলেন, "এস মা, এইমাত্র এলে?"

মীরা খুকীকে কোলে লইতে লইতে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আবার এই মাত্র চলে যেতে হবে।"

বৃদ্ধা একটু শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ওমা!—কেন?"

মীরা খুকীকে বুকে চাপিয়া এবং সানুর হাত ধরিয়া পাটির উপর বসিতে বসিতে বলিল, "আপনার বৌ আমাদের এক মিনিট বসিয়ে তার পরেই পা ধুইয়ে আর সঙ্গে সঙ্গেই চা খাইয়ে, বিদায় ক'রে দিতে চান।"

আবার হাসি উঠিল। অম্বুরী বলিল, "না ভাই, ঘাট হয়েছে, তোমার যখন যা খুশি কর। ঐগুলো তো সব সারতে হবে, যত দেরি কর ততই আমার লাভ।"

খানিকক্ষণ ধরিয়া বেশ গল্প জমিয়া উঠিল—কেন্দ্র খোকা-খুকী, পাড়ার খানিকটা পরিচয়, খানিকটা কলকাতার প্রসঙ্গ। এক সময় রাগিলও মীরা আমার উপর, বলিল, "অনিলবাবুর যে খোকা-খুকী আছে, একথা ক্ষুণাক্ষরেও আমায় জানতে দেননি, পুতুল নিয়ে আসতাম তাহ'লে, এখানে আর কি পাওয়া যাবে?—বলিয়া ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দশটা টাকা বাহির করিয়া, অনিল-অম্বুরী আপত্তি করিবার পূর্বেই সানুর দুই হাতে দিয়া মুঠাটা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পর তরুর দিকে চাহিয়া বলিল,

"ওঠ তরু, দিদির বাড়ি ঘর-দোর ভাল ক'রে দেখে আসি; উনি নিজে দেখাবেন না।"

মীরা ক্রমেই মুক্তভাবে জায়গাটার সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। ওরা তিনজনেই উঠিয়া গেল, আমরা বসিয়া রহিলাম। ঘর-দুয়ার দেখিয়া ছাদে গেল, কিছু বেশিক্ষণ কাটাইল সেখানে। মাঝে মাঝে এক-একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা কানে আসিতেছে—মীরার মুখের; চারিদিকের আবেষ্টনীর প্রশংসা—কোন একটা গাছের লতার, কোনও ফুলের। উপরে গিয়া তরুরও মুখ খুলিয়াছে। তরু বলিতেছে, "আজ সকাল বেলা এলে হ'ত দিদি, এক্ষুণি তো চলে যাবে..."

সময়ের অল্পতার কথাই উহাকে অন্তরে অন্তরে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছে।

একটু পরে উহারা নামিয়া আসিল। অম্বুরী বলিল, "এইবার ভাই ঠাট্টাই কর আর যাই কর, শুনছি না। মুখ-হাত ধোও গিয়ে; আমি ততক্ষণ চায়ের যোগাড় দেখি। কত দূর থেকে এসেছ বল দিকিন! আর এই রোদ্দুরটা গেছে তো মাথার ওপর দিয়ে?"

মীরা বলিল, "না, আপনি চা করলে চলবে না দিদি, দাঁড়ান আমি মুখ-হাত ধুয়ে এক্ষুণি আসছি।"

অম্বুরী বলিল, "বাঃ, আর আমি খারাপ চা করি নাকি? জিজ্ঞেস কর বরং ঠাকুরপোদের।"

মীরা স্নানাগারে যাইতে যাইতে ফিরিয়া বলিল, "ঠাকুরপো প্রভৃতি যাঁরা খুশি হবার জন্যেই সর্বদা তোয়ের হ'য়ে রয়েছেন তাঁদের খুশি করা শক্ত নয় আমার কিন্তু বিশ্বাস পাড়াগেঁয়েরা যেমন কথা বলতে ভুল করে তেমনি চা করতে মোটেই পারে না। তাই নিজে ক'রে খাব।" বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল।

ফিরিয়া আসিয়া মীরা আমাদের বলিল, "আপনারা এবার একটু ওপরে যান। রান্নাঘরের মধ্যে রান্নার নুন্-মসলা খুঁটিনাটি নিয়ে আমাদের একটু ঝগড়াঝাঁটি হ'তে পারে, আমরা চাই না যে পুরুষে দেখে সেটা।"

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "ঝগড়াঝাঁটি হবার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই বিচার-সালিসী প্রভৃতির জন্যে পুরুষের থাকা প্রয়োজন।"

মীরা বলিল, "মাফ করবেন, আপনারা দূরেই থাকুন; ব্যারিস্টারের মেয়ে—বিচার-সালিসীতে আপনারা কতটা সাহায্য করেন আমার খুবই জানা আছে।"

আবার একটা হাসির উচ্ছ্বাসের মধ্যে আমরা বিভক্ত হইয়া গেলাম।

প্রায় ঘণ্টা-দুয়েক উপরে থাকিতে হইল। মীরা যে একটা রন্ধনযজ্ঞ লাগাইয়া দিয়াছে তাহা উপর হইতে বেশ টের পাইতেছি। একবার সিগারেট লইবার জন্য নীচে নামিয়া দেখি মীরা শাড়ির আঁচলটা বাঁ-কাঁধ দিয়া ঘুরাইয়া আনিয়া কোমরে জড়াইয়া পাকা গিন্নীর মত একটা খুন্তি লইয়া কড়ায় প্রবল বেগে কি একটা সঞ্চালিত করিয়া যাইতেছে। অম্বুরী বোধ হয় লুচি বেলিতেছে; পিঠের উপর খুকী। কাজের সঙ্গে কি একটা হাসির কথা চলিতেছে যেন। রকটার দক্ষিণ দিকে একটা জামরুল গাছের তলায় রান্নাঘরটা। উহারা দুইজনেই আমার দিকে পিছন ফিরিয়া আছে। ভাল করিয়া দেখিতে না পাইলেও বেশ টের পাওয়া যায়, গৃহিনীপনার এই নূতন কাজে ঘরের তরল অন্ধকারের মধ্যে মীরার একটা নূতন রূপ ফুটিয়াছে। এলো-খোঁপার গেরো আলগা হইয়া গিয়াছে, ব্লাউজের বাঁকা ছাঁটের উপরে অনাবৃত স্কন্ধের খানিকটা দেখা যায়—অর্ধচন্দ্রাকারে মাঝখানটিতে চেনহারের সোনা চিক্ চিক্ করিতেছে। সুডৌল অনাবৃত হাতটি শখের রন্ধন-কার্যে যতটা দরকার তার চেয়েও একটু বেশি চঞ্চল, তাহাতে একটু যেন ছেলেমানুষির ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যতটুকু না দেখিয়া পারা গেল না দেখিয়া লইয়া সিগারেট লইয়া উপরে চলিয়া গেলাম। অনিল ওদিকটার আলসের উপর একটু অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়াছিল, প্রশ্ন করিল, "দুষ্মন্তবৃত্তি শেষ হ'ল?"

বলিলাম, "দেখছিস সিগারেট আনতে গিয়েছিলাম; চোখ নেই তোর?"

অনিল বলিল, "আমি তারও বেশি দেখতে পাচ্ছি; তিনটে চোখ আছে।"

একটু মৌনতাপ্রবণ হইয়া পড়িয়াছে অনিল, সিগারেট ধরাইয়া কয়েকটা টান দিয়া প্রশ্ন করিলাম, "ভাবিস্ কি?"

অনিল যেন একটা ঘোর থেকে জাগিয়া উঠিল, বলিল, "যা ভাবছিলাম তোকে আর সে-কথা বলা চলবে না।" বরং সঙ্গে সঙ্গেই, সে-প্রসঙ্গটা অগ্রসর হইতে না দিয়া বলিল, "আশ্চর্য শৈল, আশ্চর্য এই মেয়েছেলেদের ক্ষমতা—মীরা এইটুকুর মধ্যে কি নিশ্চিন্তভাবে মিশে গেছে দেখছিস্?"

আমি বললাম, "সে অম্বুরীর গুণ।"

"সেটা অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু আমার মনে হয় মীরা এর মধ্যে আর একজনকে বেশি ক'রে পেয়েছে।"

আমি একটু কৌতূহলী দৃষ্টিতে চাহিতে বলিল, "তোকে।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি রান্নাঘরে রান্না করছি না অনিল, তোর কাছে রয়েছি।"

অনিল বলিল, "মীরার কাছে তুই রান্নাঘর থেকে নিয়ে বাইরের চৌকাঠ পর্যন্ত এই জায়গাটা ছেয়ে রয়েছিস্ শৈল, তাই এখানকার মাটি, এখানকার গাছপালা, এখানকার মানুষ যাদের সঙ্গে তুই রয়েছিস্ ওর কাছে এত মিষ্টি হ'য়ে উঠেছে। এর মধ্যেও আর একটা কথা রয়েছে, অবশ্য আমার আন্দাজ, কিন্তু ভুল আন্দাজ নয়।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি?"

"মীরা ভেবেছিল—অন্তত মীরার বোধ হয় একটা সন্দেহ ছিল, তুই নেই এখানে; সত্যিই একটা ছুতো ক'রে কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছিল কোথাও। মীরার দোষ নয়, দেবকন্যাও ভালবাসলে এ-সন্দেহ করত, মীরা তো মানুষ। এখানে তোকে দেখে মীরা বর্তে গেছে।"

বলিলাম, "তার তো কৈ কোন লক্ষণ দেখলাম না।"

"তোর মোটা দৃষ্টি দেখতে পাস্‌নি; ঐখানেই তো মীরার জিত। ও বরং তোর সঙ্গেই সবচেয়ে কম কথা কয়েছে, তোর দিকে সব চেয়ে কম দেখেছে, কিন্তু ঐ সবই হচ্ছে লক্ষণ। দেখিস্, ও যা কিছু এখানে করলে, তোকে বাইরে যতটা সম্ভব বাদ দিয়ে করবে। শৈল, মেয়েরা সত্যিই শক্তির অংশ;—ওরা একই সঙ্গে, একই সময়ে খুব কাছে আর খুব দূরে থাকতে পারে। আমরা পুরুষেরা-জড় একটা পাথরের চাঁইয়ের মত—যদি কাছে থাকি তো না ঠেলে দিয়ে দূরে চলে যেতে চাই না, দূরে থাকি তো টেনে না নিলে কাছে আসবার ক্ষমতা নেই—একটা চেতনা শক্তির নিগ্রহ বা অনুগ্রহ নিতান্তই অধীন, কপালে যেটা যখন জোটে..."

অম্বুরী আসিয়া বলিল, "মীরা একটু চা খাবার জন্যে ডাকতে পাঠালে।"

অনিলকে বলিলাম, "ওঠ, কপালে আপাতত অনুগ্রহ দেখা যাচ্ছে।"

অনিল উঠিতে উঠিতে বলিল, "আমার মনে হয় নিগ্রহ—দু-ঘণ্টা ধরে দু-জনে যে রকম খেটেছে দেখছি তাতে গুরুতর একটা কিছু না দাঁড় করিয়ে ছাড়েনি।"

প্রায় চার ঘণ্টা ধরিয়া সমস্ত বাড়িটাতে একটা উচ্ছ্বাসের তরঙ্গ তুলিয়া রাত প্রায় আটটার সময় মীরা চলিয়া গেল। অম্বুরী আমাদের এবং পরে উহাদের নিজেদের এবং রাজু ও ড্রাইভারের আহারাদির পর কাছের দু-একটা বাড়ি হইতে মীরাকে একটু ঘুরাইয়া আনিল। তাহার পর সকলকে মোটরে তুলিয়া দিয়া আসিলাম। বিদায়ের সময় মীরা অম্বুরীর হাতটা ধরিয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "তখন বলেছিলাম, বুঝতে পেরেছি কিসের টানে আপনি এখানে পালিয়ে এসেছেন, এখন বুঝছি কাদের টানে। এই-দুটো টানের প্রভাব কাটিয়ে আবার আসছেন তো শৈলেনবাবু?"

ফিরিবার সময় সবাই চুপ করিয়া রহিলাম। বাড়ির বহিরাঙ্গনে আসিয়া অম্বুরী বলিল, "একটা

কথা বলব ঠাকুরপো? বলেই ফেলি, পেটে কথা থাকে না এ বদনাম তো আমাদের আছেই। মীরা বললে, শৈলেনবাবুকে ব'লো না দিদি,—আমার ভয় হয়েছিল উনি বোধ হয় একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে দেশে চলে গেছেন, কেন না কলকাতা বোধ হয় ওঁর ভাল লাগে না। তুমি নিশ্চয় পাঠিয়ে দিও দিদি, না হ'লে তরুর ভয়ানক ক্ষতি হবে—"

অনিল আড়চোখে একবার আমার মুখের পানে চাহিল।

১৩

আর মাত্র দুইটি দিন ছুটি। ইচ্ছা ছিল আরও দুইটা দিন বাড়াইয়া লইব; কিন্তু মীরা আসিয়া পড়াতে সে উপায় রহিল না; বিশেষ করিয়া অম্বুরীর কাছে মীরা যাহা বলিয়া গিয়াছে সেকথা শুনিবার পর।

সকালে অম্বুরী বলিল, "সদু ঠাকুরঝি দু-দিন এসেছিল ঠাকুরপো তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছিলে। আমি বলি কি, একবার দেখে এস না ওর বরকে; আহা, ঐ এক পোড়াকপালী! অমন মানুষ, আর ভগবান ওরই ওপর—"

জিহ্বা আর দন্তমূলের সাহায্যে অম্বুরী "চ্যু" করিয়া একটা সহানুভূতিসূচকশব্দ করিল।

অনিল আমার পানে চাহিয়া বলিল, "ওকে তো বলেছিলাম, সেদিন—একবার দেখে আসা উচিত, যাব তো বলেও ছিল। কি, যাবি নাকি শৈল?"

অনেকগুলা কথা একসঙ্গে ভিড় করিয়া আসিল মনে। অস্বীকার করিব না, তাহার মধ্যে মীরার আগমনের কথাটা খুব স্পষ্ট এবং প্রবল। একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "নাঃ, গিয়ে কি হবে? ভাল ক'রে দিতে পারবো না তো?"

অনিল তাহার নিজস্ব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল আমার মুখের পানে, যেন খোলা পাতার মত আমার মনটা পড়িয়া লইল, "তবে থাক, আর সত্যিই তো—

অম্বুরী অবশ্য বুঝিল না; একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বলিল, "ভাল ক'রে দিতে না পারলে আর যেতে নেই? দুঃখ-কষ্টের সময় মানুষে চায় আত্মীয়-স্বজনে এসে একটু জিগ্যেসাবাদ করে। তোমাদের দু-জনের কথা এত বলে বেচারী—"

প্রসঙ্গটা কি করিয়া চাপা দেওয়া যায় তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। যাহা এড়াইতে চাহিতেছিলাম, তাহা অন্য এক অসন্দিগ্ধ পথে একেবারে ঘাড়ে আসিয়া পড়িল—

অনিল বলিল, "আজ আর আমি নাইতে যাব না, শৈলেন; পরশু বৃষ্টিতে ভিজে মাথাটা বড় ভার হয়েছে, তাতে আবার গঙ্গায় নতুন জল নেমেছে। তুই নেয়ে আয়, আমি পারি তো এইখানেই দু-ঘটি তোলা জল মাথায় ঢেলে নেব এর পরে।"

নিরুপায়ভাবে বলিলাম, "একলা যেতে হবে?"

সানু উঠানটায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছিল, সহসা থামিয়া সতর্ক করিবার ভঙ্গিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "না শৈল টাকা, খবরডার একলা যেও না; টুমীরে টেনে নিয়ে যাবে।"

ওর মুরুব্বিয়ানার রকম দেখিয়া তিনজনেই হাসিয়া উঠিলাম। অনিল বলিল, "ডেঁপোর একশেষ হয়েছে।"

আমি বললাম, "তুই চল্ না সানু; সত্যিই যদি ধরে কুমীরে..."

"ঠামো।"—বলিয়া সানু প্রজাপতি শিকার ভুলিয়া তিন লাফে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। আমার সদ্য কিনিয়া দেওয়া জাপানী খেলনা-বন্দুকটা আনিয়া স্পর্ধিত ভঙ্গিতে বলিল, "টলো।"

অম্বুরী হাসিয়া বলিল, "তাই তো গা, কি বীরপুরুষ! কাকার আর ভাবনা রইল না। যাচ্ছিস তো তেলটা মাখিয়ে দিই দাঁড়া, নেয়ে আসিস্।"

তেল মাখা হইলে সান্ত্রী-সমন্বিত হইয়া স্নানের জন্য বাহির হইলাম।

গলি থেকে সদর রাস্তায় পড়িয়া একটু দ্বিধায় পড়িলাম, গঙ্গায় না গিয়া বড়পুকুরে স্নান করিয়া আসিলে কেমন হয়? বহু দিন স্নান করা হয় নাই বড়পুকুরে—বহু দিন। অনিল সঙ্গে থাকিলে ভাল হইত; অনিল থেকে আলাদা করিয়া বড়পুকুরের কথা ভাবা যায় না; আরও একজন থেকে আলাদা করিয়া, সে সৌদামিনী। সৌদামিনীর কথা মনে পড়তেই মনস্থির করিয়া ফেলিলাম...না, ও পথে নয়। মীরা আসিয়া পথনির্দেশ করিয়া গিয়াছে; বড়পুকুরে ডুব দেওয়ার অর্থ যদি হয় সৌদামিনীর স্মৃতিতে ডুব দেওয়া তো বড়পুকুর থাক। সহানুভূতি? তা আছে বৈকি সদুর দুঃখে, কিন্তু সে আহারটুকু স্পষ্ট করিয়া মুখে বলিলেই কি তাহার মূল্য বাড়িয়া যাইবে?

সানু মীরাকে আরও স্পষ্ট করিয়া তুলিল, বোধ হয় আমায় একটু ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তাহারও মনে পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বলিল, "মীরা মাসীর গাড়ি এইঠানেই ডাঁড়িয়েছিল, না শৈল টাকা?...মীরা মাসী তোমার কে হয়?"

বলিলাম, "কেউ নয়।"

সানু ক্ষণমাত্র যেন কি একটা চিন্তা করিয়া লইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "কে হবে?"

প্রশ্নটার মধ্যে অম্বুরীর অলক্ষ্য ইঙ্গিত আছে। কথাটা বদলাইয়া লইয়া বলিলাম, "পা চালিয়ে চল্ দিকিন, নয়তো আবার কুমীর এসে পড়বে গঙ্গায়।"

নিজের মনকে লোকে কি নিজেই চেনে যে কারণটা বলিব? যাহা করিলাম তাহাই বলিতে পারি মাত্র, কয়েক পা অগ্রসর হইয়া থামিয়া পড়িলাম। সানুকে বলিলাম, "গঙ্গায় আজ বড্ড কুমীর সানু, তুই অতগুলো মারতে পারবিনে একলা, তার চেয়ে চল্ বড়পুকুরে নেয়ে আসি।"

সানু একটু নিরাশ হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "বড়পুকুরে টুমীর নেই শৈল টাকা?"

তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলাম, "একটা দুটো আছে বৈকি, চল্।"

"টলো।" বলিয়া সানু অগ্রসর হইল। ফিরিয়া যাইতে যাইতে একটু তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিলাম ব্যাপারটা। বুঝিলাম সৌদামিনীর স্মৃতিও ততটা নয়, আসলে পরশু রাত্রে বড়পুকুরের যে রহস্যময় রূপ দেখিয়াছিলাম তাহাই টানিতেছে। অবশ্য তাহার সঙ্গে সৌদামিনী যে নাই এমন নয়। তবে আসল কথা ঐ...বড়পুকুর পাড়া গাঁয়ের প্রতীক...আমার কলিকাতা-শ্রান্ত মন যে পাঁড়াগাঁকে অনু অনু করিয়া সন্ধান করিতেছে।

বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ঘন আগাছার মধ্যে দিয়ে সুর বিসর্পিত পথ ধরিয়া চলিয়াছি। সানু বন্দুকটা বাগাইয়া ধরিয়া খানিকটা আগে আগে চলিয়াছে; অবশ্য আমি আছি কিনা মাঝে মাঝে দেখিয়া ভরসার পুঁজি পূর্ণ করিয়া লইতেছে। আসিয়া পড়িয়াছি—চৌধুরীদের পোড়ো বাড়ির একটা কোণ ঘুরিলেই বড়পুকুর দেখা যাইবে। দিনের বেলায় কেমন দেখায় একটা উন্মুখ আগ্রহ লাগিয়া আছে। এমন সময় হঠাৎ সানু কোণ ঘুরিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিল। কাপড় আলগা হইয়া গিয়াছে, বাঁ-হাতে সেটা গুটাইয়া ধরিয়া বলিল, "শৈল টাকা টুমীর!"

হাসিয়া বলিলাম, "সত্যি নাকি—তা চল্ মারবি চল্।"

"টুমি নাও।" বলিয়া অম্বুরীর বীরসন্তান আমার হাতে বন্দুক দিয়া বাঁ-হাতে আমার কোমর জড়াইয়া পাশে দাঁড়াইল।

অগ্রসর হইয়া দেখি ঘাটের উপর কেহ নাই। জলে খানিকটা দূরে একটি স্ত্রীলোক যেন আধডোবা সাঁতার কাটিতে কাটিতে ঘাটের পানে আসিতেছে। শরীরের এখান-ওখান জলের উপর জাগিয়া আছে, মাথা আর পা অনুমান আধ হাত্তে জলে মগ্ন।

আমি ফিরিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম, সানু বলিল, "মার না শৈল টাকা, ভয় করছে?"

বলিলাম, "হ্যাঁ, ভয় করছে, চল্।"

সানু আমার কোমরের কাপড়টা খামচাইয়া ধরিয়া ফিরিয়া চাহিল, সঙ্গে সঙ্গেই হাততালি দিয়া বলিল উঠিল, "ও শৈল টাকা, টুমীর নয়, ড্যাকো, মাসীমা।"

ঘুরিয়া দেখি সৌদামিনী কোমর পর্যন্ত জলে দাঁড়াইয়া সাঁতারের পরিশ্রমে হাঁপাইতেছে। আমায় ফিরিতে দেখিয়াই শরীরটা জলে আকণ্ঠ ডুবাইয়া দিল।

১৪

ক্ষণমাত্র দ্বিধা, তাহার পর আমি আবার ফিরিয়া পা বাড়াইলাম। সৌদামিনী ডাকিল, "ও সানু, যাচ্ছ কেন? তোমরা নাইবে এস, আমি ও-ঘাট দিয়ে উঠে যাচ্ছি।"

আমি ওকে ও-ঘাটে যাইবার অবসর দিয়া পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম, একটু পরে চাহিয়া দেখি সৌদামিনী সেই ভাবেই চিবুক পর্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া দাঁড়াইয়া আছে; ঊর্ধ্বাঙ্গের বস্ত্র ভাল করিয়া লইয়া সংবৃত করিয়া তাহার উপর গামছাটা ঘুরাইয়া দিয়াছে। নড়ন-চড়নের কোন লক্ষণ নাই। আমি ফিরিয়া চাহিতে একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "শৈলদার হঠাৎ পুকুরে নাওয়ার সখ হ'ল যে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "গঙ্গায় বড্ড কুমীর, তাই সানু আমায় এখানে নিয়ে এল, এখানে এসেও সানু তোমায় ডুব সাঁতার কাটতে দেখে কুমীর ভেবে পালাচ্ছিল।"

সদু বলিল, "যাক ওর ভুলটা ভেঙেছে।...আপনার ভুলটা যেন এখনও রয়েছে মনে হচ্ছে"—বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া বলিল, "আপনি বসুন একটু ঘাটে এসে শৈলদা, কতক্ষণ জঙ্গলে দাঁড়িয়ে থাকবেন?—গো-সাপের আড্ডা। সাঁতার কেটে হাঁপ ধরেছে, একটু জিরিয়েই আমি ও-ঘাট দিয়ে উঠে যাব।"

চুপ করিয়া রহিলাম একটু দু-জনে। সানু প্রশ্ন করিল, 'টুমি এখন নাইবে না শৈল টাকা?"

বলিলাম, "না।"

"কেন?"

কাজেই সৌদামিনীর সঙ্গে কথা কহিতে হইল—সানুর অসঙ্গত প্রশ্নের উত্তর এড়াইবার জন্য। বলিলাম, "তুমি রোজ এখানেই নাইতে আস নাকি সদু?"

সৌদামিনী উত্তর করিল, "হ্যাঁ, এখানে থাকলেই আসি।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আমার মুখের পানে চটুল হাস্যের সহিত চাহিয়া বলিল, "অব্যেস ম'লেও যায় না কিনা; তুমিই বল না শৈলদা?"

আমি আর ওর মুখের পানে চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না এবং যে কারণে সানুকে এড়াইয়া সদুর সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়াছিলাম, সেই কারণেই সদুকে ছাড়িয়া আবার সানুর সঙ্গে আলাপ করিয়া দিতে হইল। বলিলাম, "না হয় নেমে নাও গে না সানু ততক্ষণ।"

"একলা?"

বলিলাম, "একলা কেন? তোমার মাসীমা তো রয়েছেন?"

কথাটা পছন্দ হইল না সানুর। আমার হাতটা জড়াইয়া ধরিয়া আব্দারের সুরে বলিল, "না, টুমিও টলো।"

ভীষণ বিব্রত হইয়া আমি সংক্ষেপে বলিলাম, "না।"

সানু মুখটা উঁচু করিয়া নাছোড়বান্দার মতো বলিল, "কেন? টুমি মাসীমার ঠঙ্গে নাও না?"

আমার অবস্থা তখন —"বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা?" কোন রকমে বলিলাম; "না"— এবং এর পরেও আবার "কেন?" বলিয়া যে প্রশ্ন হইবে তাহার ভয়ে কাঁটা হইয়া রহিলাম।

সদু কৌতুক দেখিতেছিল, হাসিয়া বলিল, "ওঁর কথা বিশ্বাস ক'রো না সানু; উনি ছেলেবেলায় তোমার মাসীমার সঙ্গে অনেক নেয়েছেন—এই পুকুরেই; না হয় তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস ক'রো।"

সঙ্গে সঙ্গে কথাটা একটু ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "কিন্তু আজকাল আর সে বড়পুকুর নেই; আছে শৈলদা?"

যেন পরিত্রাণ পাইলাম। বলিলাম, "সত্যিই নেই।"

"তার কিছুই নেই, মজে এসেছে, শ্যাওলা জন্মে গেছে, ঘাটে লোকও থাকে না। কষ্ট হয় দেখলে।"

বলিলাম, "তবুও তো তুমি আসতে ছাড় না দেখছি।"

সদু জলের মধ্যে তাহার শুভ্র বাহু দুইটি ঘুরাইয়া আনিয়া যেন আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, তবুও আমার বড়পুকুর বড্ড ভাল লাগে, চমৎকার লাগে। এখানে এলেই যেন মনে হয় শৈলদা যে আবার ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছি, সেটা কি অল্প লাভ মনে হয়?...কি রকম জান শৈলদা।—বয়স হ'লে আবার প্রথম ভাগ কি দ্বিতীয় ভাগ পড়লে যেমন ছেলেমানুষ হ'য়ে গেছি বলে মনে হয় সেই রকম।"

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ে সদুর মুখের পানে চাহিলাম, এতটা ভারসাম্য কি করিয়া আসে;— ঠিক এই কথাই যে অনিল বলিল সেদিন!

সদু আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিল, "তুমি বিশ্বাস করছ না শৈলদা? বড় পুকুরে এলে সত্যিই আমি অন্য মানুষ হয়ে যাই। মনেই থাকে না কোথাকার মানুষ কাদের বাড়ির বৌ। তুমি তো দেখেই ফেলেছ আমায়—সাঁতার কাটছিলাম।—বৌ মানুষ সাঁতার কাটে, এ আবার কে কোথায় শুনেছে বল? আবার যে সে বৌ নয়, পঞ্চাশ বছরের বুড়ীর মত সর্বদা সভ্যভব্য ভারিক্কে হ'য়ে থাকা উচিত"—বলিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

আবার গম্ভীর হইয়া পড়িতে বলিল, "না সত্যিই বলছি শৈলদা, একবারে অন্য মানুষ হ'য়ে যাই, স্মৃতির পথ বেয়ে যে কোথায় যাই চলে! শুধু আমি কি একাই? তোমরা পর্যন্ত এসে জোট— তুমি, অনিলদা, বঙ্কু। পরশু এই রকম ঘাটে পা ডুবিয়ে বসে হঠাৎ নিজের মনেই হেসে উঠেছি, রতন বাগ্দীর ভাদ্দর-বৌ জল তুলতে আসছিল, দেখতে পাইনি। বলে, "ওকি সদুর ঠাকুরঝি, পাগল হ'লে নাকি?" আসল কথা, অনেক দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল, বুঝলে শৈলদা?—জামরুল খেতে সাধ হয়েছে তোমাদের সদীর। দুপুরবেলা, অনিলদা ঐ জামরুল গাছটায় উঠেছে, তুমি গুঁড়িটা জড়িয়ে ধরে উঠছ, আমি অনা বাগ্দীর দাওয়ায় বসে দেখছি, এমন সময় দিদিমা-বুড়ী একটা আমের শুকনো ডাল হাতে ক'রে —'কোথায় গেল তারা—গেল কোথায়?'—করতে করতে হন্ হন্ ক'রে ঘাটের পানে এগিয়ে আসছে। সঙ্গে বঙ্কু। তাকে তোমরা কি জন্যে খেদিয়ে দিয়েছ বলে সে-ই গিয়ে ডেকে নিয়ে এসেছে বুড়ীকে। যেমনি গলার আওয়াজ কানে যাওয়া অনিলদা তো সেই মগডাল থেকে কোঁচড়ে জামরুলসুদ্ধু পুকুরে ঝপাং ক'রে দে লাফ,—আর তুমি..."

সদু আর হাসির তোড় রুখিতে পারিল না, মুখখানা দুই হাতে ঢাকিয়া দুলিয়া দুলিয়া জলে বেশ খানিকটা বীচিভঙ্গ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির ছোঁয়াচ আমাকেও স্পর্শ করিল; কিন্তু অত প্রাণ খুলিয়া হাসিবার শক্তি কি সবার হয়? সদু যখন হাসে তখন হাসেই শুধু—আমি যতটা না হাসিতেছি তাহার বেশি হাসি দেখিতেছি, তার চেয়ে বেশি ভাবনা লাগিয়া আছে, কেহ দেখিয়া না ফেলে। সানু আমার মুখের পানে তাহার অবুঝ মুখখানা তুলিয়া হাসিতে লাগিল। সদু হাসিতে হাসিতেই বলিল, "আর তুমি কি করেছ মনে আছে শৈলদা?—নেমে পড়ে একেবারে চৌধুরীদের ঐ জলের নালাটার—ভেতরে—হামাগুড়ি দিয়ে—ওঃ!..."

সদু আরও ডুকরাইয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির চোটে মুখ সিঁদুরবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, কোনমতেই যেন সামলাইতে পারিতেছে না নিজেকে। আমি বলিলাম, 'থাম, এক্ষুণি আজও আবার না রত্তন বাগ্দীর ভাদ্দর বৌ এসে পড়ে।"

সদু চেষ্টা করিয়া নিজেকে থামাইয়া লইল, মুখে এক আঁজলা জল ছড়াইয়া দিয়া হাসির জেরটাকে ঠেলিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আসুক গে, বয়ে গেল।" আবার একটু খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, তাহার পর নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "শৈলদা, আমি দু-দিন তোমাদের ওখানে গিয়েছিলাম, বৌ নিশ্চয় বলেছে, বলতে পারবে না যে, দু-দিনের জন্যে এলাম, সদী খোঁজও নিলে না একবার।"

বলিলাম, "কিন্তু সবুর ক'রে তো একটু বসতে পারনি।"

সৌদামিনীর হাসি আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে ভয়ের ভান মিশাইয়া বলিল, "রক্ষে কর, তাহলে ছ-মাস বসে থাকতে হ'ত—কুম্ভকর্ণের ছ-মাস নিদ্রা, ছ-মাস জাগরণ।...আমার তো কোন কাজ ছিল না, মাত্র একবার দোষ খণ্ডন ক'রে আসা—কোন সময় বলতে না পার, সদী একবার খোঁজ নিতেও এল না।"

দুইবার কথাটা বলায় নিতান্ত লজ্জিত হইয়াই আমার একটা মিথ্যা বলিতে হইল, কেন না ওর যা অবস্থা তাহাতে আমারই আগে খোঁজ নেওয়া উচিত। বলিলাম, "আমিও তোমার ওখানে যাচ্ছিলাম সদু। আজ বিকেলে একবার যাব বোধ হয়।"

সদুর দীপ্ত মুখখানা যেন ফুৎকারে নিবিয়া গেল। বলিল, "আমার ওখানে কি করতে যাবে শৈলদা?...না, যেয়ো না।"

কলোচ্ছ্বসিত জায়গাতে খানিকক্ষণ একটা থমথমে নিস্তব্ধতা ছাইয়া রহিল। ইহার মধ্যে একবার চাহিয়া দেখিলাম, সদু গামছার একটা প্রান্ত কামড়াইয়া ধরিয়া আড়চোখ তুলিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে। চোখাচোখির পর আমি দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে বলিল, "দেখছিলাম তুমি রাগ করলে কিনা শৈলদা?"

বলিলাম, "রাগ করবার কি আছে এর মধ্যে?"

সদু শরীরটা আরও একটু ডুবাইয়া লইয়া গোটা দুই কুলকুচি করিয়া বলিল, "রাগ করবার নেই—এ কথা শুনব কেন?—তুমি যাব বললে, অথচ আমি করলাম মানা! তবে কি জান? এই নিয়ে তোমাদের কেউ দুটো কথা বলে এটা আমার সহ্য হয় না। আমাকে বলে সে আমি গ্রাহ্য করি না—মোটেই নয়। যাদের সঙ্গে চিরকালটা কাটালাম দুঃখে-সুখে, আজ বয়সের ওপর আরও গোটাকতক বছর জুড়ে গেছে বলে তারা আর আমার কেউ হবে না, চিরকাল যেমন হেসে কথা কয়ে এসেছি সেই রকম হেসে কিংবা সোজা মুখ তুলে কথা কইলেই আমার জাত যাবে, এসব কথা আমি বিশ্বাস করি না শৈলদা। অবশ্য জাত যেত যদি তোমরাও বদলাতে, কিন্তু তা বদলাওনি, বদলাবেও না।"

আমি ফিরিয়া চাহিতে উদ্দেশ্যটা বুঝিয়া বলিল, "কি করে জানলাম?—আমার মন বলছে, দেখছিও। আসল কথা সব মানুষ বদলায় না; এই দেখ না, আমি বদলেছি? এমন অবস্থাতে পড়েও বদলাইনি। কি জানি আমার যেন মনে হয় আমি বরাবরই এই রকম থাকব যত যা-ই ঘটুক না কেন।"

আবার এক ঝলক হাসিয়া জলে একটু একটু আঙুল চালাইয়া বলিতে লাগিল, "আমি যখন বদলাইনি, তখন তোমরা কোন্ দুঃখে বদলাতে যাবে শৈলদা? যাক্ কি যে বলছিলাম—হ্যাঁ, আমায় কিছু বললে আমি গায়ে মাখি না, কিন্তু তোমাদের বললে আমার গায়ে লাগে। সেদিন আমরা আসবার পর অনিলদা দেখতে এসেছিল; চলে গেলে ভাগবত-কাকা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে বললে, 'মার চেয়ে যার টান বড় তারে বলি ডাইন।'...কথাটা আমার যেন শক্তিশেলের মত বাজল শৈলদা। কিন্তু সে

কি আমার জন্যেই?—আমি তো সেই দিন দুপুরেই তোমাদের ওখানে গেলাম। পাছে ভাগবত-কাকা টের না পায় সেই জন্যে পকেট থেকে চাবির থোলোটা বের ক'রে নিয়ে তাকে গিয়ে বললাম—'এই তোমার চাবি নাও, কোথায় যে ফেল ভাগবত-কাকা!' চাবি হাতে ক'রে বললে—'কোথায় যেন বেরুচ্ছিস্ তুই এই দুপুর রোদ্দুরে?" বললাম, "হ্যাঁ, একবার অনিলদার ওখানে যাব।' আমায় সচরাচর বেশি ঘাঁটাতে সাহস করে না, কিন্তু আস্পদ্দটার মাথা ছাড়িয়ে যায় দেখে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বললে, 'অনিলদা! শুনলাম তোর আর এক দাদাও নাকি এসেছে?' তারপর জিগ্যেস করল, 'তোকে ডেকে পাঠিয়েছে নাকি?' এত বড় কথাটা বলতেও ওর মুখে একটু আটকাল না শৈলদা?"... বলিতে বলিতে সদুর গলাটা একটু গাঢ় হইয়া উঠিল। মুখটা ফিরাইয়া লইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল। তাহার পর বলিল, "আমিও কথা সইবার মেয়ে নই, বললাম, 'ডাকেনি বলেই তো যাচ্ছি ভাগবত-কাকা, যে দরদ দেখিয়ে ডেকে নেয় না তার কাছে যেতেই তো ভরসা হয়।'...কথাটা গায়ে নিশ্চয় বিষ ছড়িয়ে দিয়ে থাকবে ওর; বললে, 'আর একটা লোক যে ঘরে এখন-তখন হ'য়ে রয়েছে, তার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই?'...কথাটা এবার আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিলে যেন, বললাম, 'সম্বন্ধ আমার চেয়ে'..."

সদু হঠাৎ নিজেকে সংবৃত করিয়া লইল, কথাটা ওইখানে শেষ করিয়া দিয়া সমস্ত ভঙ্গীটা বদলাইয়া দিয়া বলিল, "এই দেখ! শৈলদা ভাববেন সদু সেই থেকে নিজের কথাই পাঁচ কাহন করছে! সত্যি!... তোমার কথা বল এইবার—কত দিন যে তোমায় দেখিনি শৈলদা—উঃ তারপর?—শুনলাম বি-এ পাশ করেছ—একটা খাওয়া পাওনা আছে।...শৈলদা, খাওয়ানোর কথায়, আমার কি মনে হচ্ছে বলব? রাগ করবে না?"

শরৎ-আকাশের মত কথায় কথায় ভাবের পরিবর্তন, ভঙ্গির পরিবর্তন; আমি ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "কি মনে হচ্ছে?"

"মনে হচ্ছে বলি, শৈলদা পাশ করেছ জামরুল পেড়ে দাও খাই, পেকেছেও কিছু কিছু দেখ না।" বলিয়া আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিয়া উত্তর দিলাম, "শক্তই বা কি এমন? বক্কাও নেই, দিদিমাও নেই।"

"তবুও পারবে না তুমি, এতক্ষণে একবার সে-সব দিনের মত 'সদী' বলে ডাকতে পারলে না যখন..." বলিয়াই এক মুখ জল লইয়া মুখটা অপর দিকে ঘুরাইয়া ধীরে ধীরে কুলকুচি করিতে লাগিল। একটু পরে আবার মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "আর শুনলাম বেশ ভাল একটা কাজও পেয়েছ—পড়াবার। আরও একটা কথা শুনলাম শৈলদা..."

থামিল বলিয়া ওর মুখের পানে চাহিয়া দেখি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে!—বহুদিনের পরিচিত একটা চাহনি—ছেলেবেলায় কত ইতিহাস যে মনে করাইয়া দেয়...!

সদু বলিল, "যদি নেমন্তন্ন না পাই শৈলদা তো...কি ক'রেই বা বলি?...রাজকন্যাকে পেয়ে ছোটবেলায় কোন এক সদী-বাঁদীর কথা কি—"

আবার হঠাৎ থামিয়া গেল। প্রসঙ্গ, ভঙ্গি এবং উদ্দেশ্য—সবই বদলাইয়া দিয়া বলিল, "তাহলে তুমি এলে না নাইতে তোমার মাসীর কাছে সানু? বেশ, আড়ি তোমার সঙ্গে, আর কখনও জামরুল আর গোলাপ জাম নিয়ে যাব না।"

তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিল, "এবার তুমি নাইবে এস শৈলদা, আবোল-তাবোল কি সব বললাম, কি মনে করবে জানি না। আসল কথা, তোমাদের দেখলে যেন মনে হয় শৈলদা...না বাপু, তুমি বরং একটু ওদিকে গিয়ে দাঁড়াও, আমি এখান দিয়ে উঠে যাই; ও আ-ঘাটা দিয়ে আর উঠতে পারি না; একে তো অনেকক্ষণ রয়েছি বলে এমনই গা-টা একটু কুট কুট করছে—কি যে হয়েছে অবস্থা বড়পুকুরের—আহা!"

বলিলাম, "হ্যাঁ, সেই কথা আমি ভাবি। তা তুমি তো স্বচ্ছন্দে গঙ্গায় গেলেই পার সদু। তোমরা তো চাও-ও, তোমাদের ওখানে গঙ্গা নেইও তো শুনেছি।"

সদু একরকম অদ্ভুত নিষ্প্রভ হাসির সহিত আমার পানে চাহিল। বলিল, "চাওয়া?...হ্যাঁ অন্তত উচিত তো চাওয়া...ঠাকুর-দেবতা। দেখ না ভাগবত-কাকা দু-বেলা ধর্না দেন, সন্ধে-আহ্নিকটি পর্যন্ত গঙ্গার তীরে হওয়া দরকার তাঁর।"

একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমার কিসের জন্যে ঠাকুর-দেবতার খোশামোদ শৈলদা?"

১৫

সানু সঙ্গে ছিল বলিয়া আসিয়াই নিজে হইতে কথাটা বলিয়া দিলাম, তাহা না হইলে সানু বলিতই; মাঝে পড়িয়া আমি চোর হইয়া যাইতাম। অনিল অম্বুরী দু-জনেই ছিল।

অম্বুরী গ্রামের সুবাদ ধরিয়া একটা ঠাট্টা করিতে ছাড়িল না। মর্মার্থটা এই যে, টানের প্রকারভেদ আছে—গঙ্গার টান—পুণ্যের টানই যে সব সময় শক্তিশালী হইবে এমন কিছুই কথা নাই। তাহার পর বলিল, "না, সত্যিই ভাল হয়েছে ঠাকুরপো, দু-দিন এল অথচ তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তুমিও তো চলে যাচ্ছ, ও-ও থাকে না এখানে।...মেয়েটা বড্ড ভাল ঠাকুরপো।"

আবার একটা ঠাট্টা করিল; কি কাজে ঘরে যাইতেছিল, ঘুরিয়া বলিল, "আর হ'লও ভাল জায়গাটিতে দেখা? বড়পুকুর তো শুনেছি ছেলেবেলায় তোমাদের কালিন্দী ছিল—তোমার আর ঐ সাধু-পুরুষটির।" বলিয়া অনিলের দিকে একটু সহাস্য চটুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় কথাটা সবিস্তারে অনিলকে বলিলাম। 'আমি বলিলাম' বলার চেয়ে অনিল বাহির করিয়া লইল বলাই ঠিক। তবু, অনিল কৌতূহলী না হইলেও তাহাকে বলিব ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম, কেন না—গোপন করিব না—যতই সকালের কথাই ভাবি, সৌদামিনী একটা সমস্যার আকারে আমার সামনে ফুটিয়া ওঠে।

স্কুলের মাঠের শেষে, মজানদীর ধারে আমরা দুইজনে বসিয়া। সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হইতেই হাওয়াটা থামিয়া গিয়া একটা গুমট পড়িয়াছে। আমাদের মধ্যে সৌদামিনীর কথা কি হয় শুনিবার জন্য সমস্ত জায়গাটা যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে।

গল্প যখন শেষ হইল অনিল বলিল, "ভেবেছিলাম তোকে আরও দুটো দিন আগে পাঠিয়ে দিতে পারলেই ভাল হ'ত।"

একটু হাসিয়া বলিলাম, "হঠাৎ?"

অনিল বলিল, "নিতান্ত হঠাৎ নয়। মীরা আসবার পর থেকেই কথাটা ভাবছি আমি—মীরার দিক থেকেও, সদুর দিক থেকেও, আর তোর দিক থেকেও। একটা কথা তোকে জিগ্যেস করি—নিশ্চয় নুকুবিনি—তোর কি মনে হয় না যে সদুর দুর্দিনের ঘূর্ণি অনিবার্যভাবে এগিয়ে আসছে, খুব সাবধানে না থাকলে অর্থাৎ খুব দূরে আর নির্লিপ্ত না থাকলে তুইও তার ঘুরপাকের মধ্যে পড়ে যাবি?—যেতেই হবে পড়ে, তুই যা-ই বলিস না কেন। তুই তোর ভবিষ্যতের কথা ছাড়; 'ডি, গুপ্ত সেবনের পূর্বে ও পরে'-র মত তোর মনের ফটো নেওয়া যদি সম্ভব হ'ত—'বড়পুকুরে নাওয়ার পূর্বে এবং পরে'—তাহ'লে ফটো দুটো যে সহজেই চেনা যেত আমার এমন মনে হয় না।"

এত গাম্ভীর্যের মধ্যেও হাসি পাইল, বলিলাম, 'এত আজগুবী তুলনাও তোর মেলে অনিল!"

অনিল হাসিল না, বলিল, "তুলনা আমার তোদের মত সাহিত্য-সাজানো না হোক, নিখুঁত

হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রমটা উল্টে যাবে—ডি গুপ্ত খাওয়ার আগে রুগ্ন, পরে পালোয়ান, বড়পুকুরে নাওয়ার আগে পালোয়ান, পরে রুগ্ন। কথাটা অস্বীকার কর্ একবার।”

বলিলাম, “বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে শুধু, অর্থাৎ ও-রকম অবস্থায় ছোটবেলার নিত্যসঙ্গিনী কেউ পড়লে সহানুভূতি না হ'য়েই পারে না। তুই সহানুভূতি জিনিসটাকে অতিরিক্ত গাঢ় রঙে রাঙিয়ে একেবারে অন্য জিনিস ক'রে তুলতে চাইছিস্।”

অনিল বলিল, “আর একটা উপমা না দিয়ে পারলাম না। চোর যখন সিঁদকাঠি নিয়ে যথাপদ্ধতি গৃহস্থের ঘরে ঢোকে তখন ততটা সাংঘাতিক হয় না, যতটা হয় সে যদি অতিথি-অভ্যাগতের বেশে এসে খোঁটা গেড়ে বসে। তুই যদি ভালবাসা বলে চিনতে পারতিস্ জিনিসটাকে তাহ'লে মীরার দিক দিয়ে বিপদটা কম ছিল, কিন্তু এই যে ভালবাসাকে ছেলেবেলার সদুর জন্যে সহানুভূতি বলে ভুল করছিস্, এইটেই হচ্ছে মারাত্মক। মনে রাখতে হবে আমি সমস্ত কথাই মীরার মুখ চেয়ে বলছি। মীরার কথা বাদ দিলে আমার মত যে কি এ-সম্পর্কে তোকে আগেই বলেছি, তুই চটেও গিয়েছিলি। এখন আবার তোকে উলটো বলব শৈল, তুই সৌদামিনীর কথা আর একেবারেই ভাবিস্‌নি, ভাবলে মীরার উপর ঘোর অন্যায় হবে। সৌদামিনীর সম্বন্ধে উদাসীন থাকা তোর পক্ষে অপরাধ নয় একটা, কিন্তু কাল যা দেখলাম তাতে মীরার সম্বন্ধে আর অন্য রকম ব্যবহার শুধু অপরাধ নয়, পাপ তোর পক্ষে। মীরা তোকে ভালবাসে শৈল, আর এই ভালবাসার জন্যে সে অনেক কিছু ত্যাগ করতে বসেছে।”

অনিল চুপ করিল এবং ইহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া কেহ আর কোন কথাই বলিলাম না। অনেকক্ষণ। চারিদিক আরও নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, শুধু মজানদীর গহ্বর থেকে একটা পোকার একঘেয়ে সংগীত উঠিয়া শব্দের একটা পাতলা কুহেলী বিস্তার করিয়াছে।

অনিল হঠাৎ “শৈল!” বলিয়া এমন উত্তেজিতভাবে আমার হাতটা চাপিয়া ধরিল যে আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম। অনিল কখনও উত্তেজিত হয় না; এ এক অভিনব ব্যাপার। বলিল, “শৈল, সব ভুল বলেছি, তাই চুপ ক'রে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করছিলাম। সদুকে বাঁচাতে হবে। আমার উপায় নেই; মাঝখানে অম্বুরী, সানু, খুকী। তুই জানিস্ আমি আমাদের ছেলেবেলায় নিত্য-সহচরীকে ভুলিনি, তবে আমি ছেলেবেলাতেই বাঁধা পড়ে গিয়ে নিতান্ত নিরুপায়। আমি যা পারলাম না তোকে তাই করতে হবে শৈল; সদুকে ভাগবতের গ্রাস থেকে বাঁচাতেই হবে। ঐটিই তোর জীবনের সব চেয়ে বড় কর্তব্য—এর সামনে মীরার ভালবাসা একটা সৌখীন বিলাস মাত্র। কে বলতে পারে মীরা তোকে সত্যিই ভালবাসে? আর যদি বাসেই তো অঙ্কুরে রয়েছে সে ভালবাসা এখনও। তোর নিজের মনের অবস্থা তুই নিজেই জানিস্। যদি খুব এগিয়ে গিয়ে থাকিস্ তো কিছু বলতে পারিনে। তা যদি না হয় তো একটা কথা তোকে ভেবে দেখতে হবে—সত্যিই কি মীরা তার ওই হেরিডিটির গুমর—ঐ বেয়াড়া রকম আভিজাত্যের গর্ব ঠেলে তোকে গ্রহণ করতে পারবে? কাল যে ছুটে এসেছিল এটা খুব বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে এই ভাবটা কি স্থায়ী হতে পারবে ওর জীবনে? যদি কোন সময় অন্য ভাবটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তো তোর জীবনটা কি বিষময় হ'য়ে উঠবে না? সামাজিক স্তরে তোদের দু-জনের প্রভেদটা অত্যন্ত বেশি। ভালবাসা এ প্রভেদ মেটাতে পারে; কিন্তু সে অসাধারণ ভালবাসা। তোদের মধ্যে ঠিক এই জিনিসটা ডেভেলাপ্‌ড হয়েছে বলে অনুভব করিস্ শৈল?”

যেন আরও একটু উত্তেজিত হইয়া বলিল, “ধরে নিলাম হয়েছে, তবু তোকে ঘুরতে হবে। জীবনে কত বড় বড় জিনিস ছাড়তে হয়, নিজের হাতে নিজের হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলতে হয়, সে তো মানুষেই করে? তার জন্যেও তো মানুষে মানুষের দিকেই চেয়ে থাকে?...সদু বসেছে মরতে—মরলেও ছিল ভাল—মরার চেয়ে একটা ভীষণ অবস্থা ওর সামনে, এ সময় একটা হালকা ভাব নিয়ে চুলচেরা বিচার করতে বসা—আমার মাথায় ঠিক আসছে না ব্যাপারটা শৈল। Nero fiddled while Rome burnt,—এটা হচ্ছে যেন তার চেয়েও একটা উৎকট বিলাসিতা।”

একদমে কথাগুলা বলিয়া গিয়া অনিল একটু চুপ করিল। আমি অবশ্য কোন উত্তর দিলাম

না; কেন-না অনিল আমাকে কোন প্রশ্ন করে নাই, ওর উত্তেজিত কথাগুলা ছিল সেই ধরনের জিনিস যাহাকে ইংরাজীতে Thinking aloud অর্থাৎ শব্দিত চিন্তাবলী।

অনিল অন্ধকারে সম্মুখের পানে চাহিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে বসিয়া রহিল। ক্রমে মুখের উত্তেজিত ভাবটা মিলাইয়া আসিল; ধীরে ধীরে শব্দিত চিন্তার ভঙ্গিতেই বলিল, "এদিকেও কি সহজ? আমি যেন বলে গেলাম গড়গড় ক'রে।...বিধবা বিবাহ, তার মানে নিজের পরিবার, নিজের সমাজ থেকে চিরনির্বাসন। তাও আবার ইচ্ছে করলেই কি হবে?—ভাগবতের দুর্গ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসা সদুকে..."

সহসা উঠিয়া অনিল বলিল, "ওঠ্, যা হবার হবে; আর ভাবতে পারি না।"

পরদিন বিকালে সাঁতরা ছাড়িলাম। জেঠাইমা বলিলেন, "সুবিধে পেলেই আসবি শৈল, তুই এলে অনা বরং ভাল থাকে, না হ'লে কী যে আকাশ-পাতাল ভাবে সর্বদা? আর বিয়ে-থা কর একটা—যা বুঝি; কেমন যেন নেড়া নেড়া ঠেকে।"

বাইরের উঠানে চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া অম্বুরী একটু আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "এত কাছে আছ ঠাকুরপো ইচ্ছে করলেই টুপ ক'রে চলে আসতে পার কিন্তু এমনি ভুলেছ আমাদের যে মনে হয় যেন কত দূরেই যাচ্ছ, কত দিনের জন্যেই না বিদেয় দিতে হচ্ছে।"

সানুকে শিখাইয়া দিল, "বল্ শৈল কাকা নিশ্চয় আসবে শীগ্গির।"

সানু ঝাঁকড়া মাথাটি ঈষৎ হেলাইয়া বলিল, "শৈল টাকা নিশ্চয় ঠেলনা নিয়ে আসবে ঠীগ্গির।"

বলিলাম, "সেয়ানা ছেলে তোমার অম্বুরী।"

বিদায়ের বিষণ্ণ আকাশে হাসির একটু বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল। গাড়ি ছাড়িবার পূর্বে অনিল বলিল, "একটা বোধ হয় দুর্ভাবনা নিয়ে যাচ্ছিস শৈল। কিন্তু উপায় কি? দেখলি তো ভেতরে ভেতরে ও কত ক্লান্ত, কত নির্ভর করে রয়েছে আমাদের ওপর?"

মীরা-সৌদামিনী

১

লিণ্ড্সে ক্রেসেন্টে ফিরিয়াই একটা মস্ত বড় পরিবর্তনের মধ্যে পড়িয়া গেলাম।

যখন বাসায় পৌঁছিলাম, সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। জামা জুতা ছাড়িয়া বারান্দায় আসিয়া একটা ডেক্-চেয়ারে গা এলাইয়া দিলাম। সাঁতরার এই কয়টি দিনের অভিজ্ঞতা এত ঘনীভূত, আর আমার বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এত বিভিন্ন যে, মনে হইতেছে কত দূর আর কত দীর্ঘ এক প্রবাস হইতে ফিরিলাম যেন। কোন্‌টা যে প্রবাস তাহাও ঠিক বুঝিতেছি না। মনটা স্মৃতির ভারে বিষণ্ণ হইয়া আছে—সুখের স্মৃতি, আবার সৌদামিনীর স্মৃতিও। বেশি মনে পড়িতেছে সৌদামিনীর কথাই,—আহা।

নীচে লোক কেহ নাই, বাড়িটি থম্‌থম্ করিতেছে, এসব বাড়ি করেই, আজ যেন বেশি। আমার মনের ঔদাসীন্যের জন্যই কি?

ইমানুল আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই রকম বিরহক্লিষ্ট, হাতে একটি ফুলের তোড়া। সেলাম করিয়া দন্ত বাহির করিয়া একটু হাসিল, প্রশ্ন করিল, "ভাল থাকছিলেন মাস্টার-বাবু?"

বলিলাম, "ছিলাম একরকম। তোমার খবর কি ইমানুল? বাড়িতে কাউকে দেখি না যে?"

ইমানুল বলিল, "আপনাকে আসতে দেখে ভাবলাম একটা তোড়া দিয়ে আসি। দাঁড়ান, রেখে আসি এটা অন্দরে।"

তোড়াটা ফুলদানিতে বসাইয়া ইমানুল আমার সামনে থামে ঠেস দিয়া বসিল, বলিল, "দিদিমণিরা বাইরে গেছেন।...মদন ক্লীনার একটা কথা বললে মাস্টারবাবু, বলে পাদ্রীকে লিখে কিছু হবে না, বলে তাকেই সোজা লেখ, সে তো সাবালিকা হয়েছে..."

একটু উদ্বিগ্নভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "লিখেছ নাকি?"

ইমানুল লজ্জিতভাবে একবার আমাদের পানে চাহিয়া ঘাড়টা নীচু করিল। উত্তরটা বুঝিতে পারিয়া কহিলাম, "না, বলছিলাম—নিয়েছ লিখিয়ে কাউকে দিয়ে?"

ইমানুল লজ্জিতভাবে বলিল, "ইংরিজীতে লিখতে হবে..."

বলিলাম, "ও! তাও তো বটে, তা দোব লিখে।"

সামান্য একটু থামিয়া ইমানুল বলিল, "মদন ক্লীনার একটা পদ্য দিয়েছে মাস্টারবাবু, সেটাও ইংরেজীতে তর্জমা ক'রে..."

ইমানুল বোধ হয় পদ্যটা বাহির করিবার জন্যই ফতুয়ার পকেটে হাতটা সাঁদ করাইয়াছে, এমন সময় গেটে মোটরের হর্ন বাজিয়া উঠিল। ইমানুল অপ্রতিভভাবে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গেট খুলিতে ছুটিল।

গাড়ি-বারান্দায় মোটর আসিয়া দাঁড়াইলে মীরা আর তরু নামিল। আমাকে দেখিয়াই মীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল, "এসে গেছেন তাহ'লে আপনি? ভাবছিলাম আপনাকে গাড়ি পাঠাব। মার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

মীরার দৃষ্টি খানিকটা উদ্‌ভ্রান্ত, তরুও উৎকণ্ঠিতভাবে আমার পানে চাহিয়া আছে। আমি উত্তর করিলাম, "না, আমি এই আসছি, করিনি তো দেখা এখনও।...কেন?"

"বলেনি কেউ? ভুটানী মারা যাওয়ার পর থেকে মা বড্ড বেশি..."

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "মারা গেছে ভুটানী?"

মীরা বলিল, "ইমানুল বসে ছিল না আপনার কাছে? বলেনি? উজবুক একটা; আসতেই বুঝি পোস্টকার্ড এনে হাজির করেছে?...আসুন ভেতরে! তরু, তুমি জামাকাপড় ছেড়ে মার কাছে গিয়ে বস, আমি আসছি।"

ভিতরে গিয়া ফ্যানটা খুলিয়া দিয়া মীরা একটা সোফায় বসিল। আমি সামনে একটা চেয়ারে বসিলাম। মীরা বলিতে লাগিল, "ভুটানী এক রকম হঠাৎই কাল বিকেলে মারা গেল, যদিও ও যে আর বেশি দিন নয় এটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে আসছিল। মারা যেতে মা একেবারে আশ্চর্য রকম উতলা হ'য়ে উঠলেন, শৈলেনবাবু! ঠিক যে শোকের ভাব তা নয়; অদ্ভুত রকম একটা নার্ভাসনেস্। বাড়িতে বাবা নেই—এখনও আসেননি তিনি, পূর্ণিয়ার কেসটা নিয়ে আটকা পড়ে গেছেন...আমি যে কী অবস্থায় পড়ে গেলাম বলতে পারি না। আপনি থাকলেও একটা পরামর্শ করবার লোক পেতাম—ফোন ক'রে সরমাদি আর নিশীথবাবুকে ডেকে আনলাম। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ডাক্তার রায়কে ফোন করা হল। তিনি সব শুনে বললেন তাঁর আসাটাই ভুল হবে, কেন-না মার তো হয়নি কিছু, শুধু একটা ভয়ানক নার্ভাস শক্ পেয়েছেন, বরং এ অবস্থায় ডাক্তারকে দেখলে উলটোই ফল হওয়ার সম্ভাবনা। বললেন, বরং যদি কাঁদবার ঝোঁক থাকে তো কাঁদতে দেওয়া ভাল। কিন্তু কাঁদবার ঝোঁক নয় তো, একটা যেন ভয়ংকর ভয়ের ভাব। বেশির ভাগই চুপ ক'রে থাকেন, মাঝে মাঝে শুধু বলেন, "তাহলে আমার কি হবে?" সে যে কী অবস্থায় কেটেছে আমাদের বলতে পারি না, শৈলেনবাবু। বাবাকে আজ সকালেই টেলিগ্রাম করেছিলাম, এখনও উত্তর পাইনি। তিনিও যে কেমন আছেন..."

মীরা তাহার বাবার সম্বন্ধে সভয়ে উল্লেখ করিতে গিয়া হঠাৎ যেন ভাঙিয়া পড়িল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, চোখ একবার একটু ছলছল করিয়া উঠিয়াই দরবিগলিত ধারায় অশ্রু নামিল। মীরা সোফার হাতলে মুখ গুঁজিয়া কচি মেয়ের মত কাঁদিয়া উঠিল।

ওর চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী নিসহায় ভাব, ক্লান্তি উদ্বেগ, আর বাবার উত্তর না পাওয়ায় এই আশঙ্কা ও অভিমান—সব একসঙ্গে ওকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। কারণটা নিশ্চয়ই এই যে, এমন একজনকে কাছে পাইয়াছে যাহার উপর ওর একটা আন্তরিক নির্ভর আছে। সমবেদনায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কি করি আমি?

ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল মীরা। আমি নিরুপায়ভাবে খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম, তাহার পর নিজের চিন্তাধারা খানিকটা গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, "মীরা দেবী, আপনি শান্ত হন। বিপদের সময় অতটা ব্যাকুল হ'লে চলে কি? মিস্টার রায়ের সম্বন্ধে কোন ভাবনা নেই; তিনি নিশ্চয়ই কাজ নিয়ে ওখান থেকে আবার অন্য কোথাও গেছেন, কাল সকাল নাগাদ খবর পাওয়া যাবে। কিংবা এও হতে পারে আপনার টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগেই তিনি বেরিয়ে পড়েছেন। আপনি স্থির হন। আর মার সম্বন্ধে আপনি একটু বেশি নার্ভাস হ'য়ে পড়েছেন। ওঁর শরীরটা দুর্বল নিশ্চয়, কিন্তু ওঁর মাথা বেশ পরিষ্কার আছে, এই আঘাতে অন্য কোন রকম ভয়ের সম্ভাবনা নেই। ওঁর সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা খুব দরকারী—জানি না সেটা করা হয়েছে কি না—আপনি যে রকম বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন।"

মীরা অনেকটা সংযত করিয়া লইয়াছে নিজেকে। আমি থামিতেই মুখটা একটু তুলিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল। বলিলাম, "ওঁকে ও-ঘরটা বদলে অন্য ঘরে আনা দরকার কয়েক দিনের জন্য। অষ্টপ্রহর ভুটানীর সঙ্গে যেরকম ছিলেন ওখানে, তাতে..."

ব্যাপার সামান্যই, কিন্তু মীরা যেন একটা আলোকরশ্মি দেখিতে পাইল; কৃতজ্ঞতাপূর্ণ মিনতির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "আপনি বলুন ওঁকে। সত্যিই বড় ভাল হয় তাহ'লে।"

বলিলাম, "আমি বলছি গিয়ে, রাজিও করাব। আপনি আসবেন কি?"

মীরা চোখ মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল। বলিল, "আপনি একলাই যান। যে নিজে অভিভূত হ'য়ে পড়েনি এমন লোকই থাকা দরকার ওঁর কাছে। আমার মুখে একটা আতঙ্কের ছায়া আছে, মা আমায় দেখে আরও যেন ব্যাকুল হ'য়ে ওঠেন, শৈলেনবাবু। আমি বুঝছি, অথচ..."

নিরুপায় করুণ দৃষ্টিতে মীরা আমার পানে চাহিল। চক্ষু আবার ডবডব করিয়া উঠিতেছে। দেখিলে কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় নিজের হাতে মুছাইয়া দিই অশ্রুবিন্দু দুইটি।

সেই মীরা আজ আমার কাছে এত দুর্বল হইয়া পড়িল? গভীর দুঃখই কি আসল সম্বন্ধের কষ্টিপাথর?

বলিলাম, "তাহলে আমি একাই যাচ্ছি, সেই ভাল হবে বরং। আপনি আর ভাববেন না।"

যে ছোট, আর স্বীয় অন্তরের খুব নিকট, তাহাকে সান্ত্বনা দিবার সময় যেমন একটা মৃদু তিরস্কারের মিশ্রণ থাকে, সেইভাবে বলিলাম, "অত উতলা হয় কখনও মানুষে? দেখুন তো।—ছিঃ।"

২

অপর্ণা দেবীর ঘরের সামনে গিয়া ডাকিলাম, "তরু আছ?"

উত্তর করিলেন অপর্ণা দেবী, "কে, শৈলেন? এস।"

পর্দা ঠেলিয়া ভিতরে গিয়াছি, তরু আসিয়া আমার হাতটা ধরিল। ও বেচারি যেন কি রকম হইয়া গিয়াছে, বুঝিতেছি আমায় পাইয়া অনেকটা ভরসা পাইয়াছে। অপর্ণা দেবীর চরণ স্পর্শ করিয়া তরুকে লইয়া একটা সোফায় বসিলাম। অপর্ণা দেবী একটা হেলান চেয়ারে বসিয়া আমি আসিবার পূর্বে বোধ হয় একটা বই পড়িতেছিলেন। পায়ের কাছে বিলাস-ঝি বসিয়া তরুর সঙ্গে বোধ হয়

তরুর প্রাইজ বইয়ের ছবি দেখিতেছিল। দেখিলাম কতকগুলো বই ছড়ানো রহিয়াছে।

চরণ স্পর্শ করিতে অপর্ণা দেবী বলিলেন, "এসে গেছ তুমি, ভালই হ'ল; এরা দুই বোনে বড্ড ভয় পেয়ে গেছে।"

তরুর দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন, "তরু ভেবেছে ওর মা এবার মরে যাবে, মীরা ভেবেছে পাগল হ'য়ে যাবে।"

আমি আর মীরা-তরুর দোষ ধরিব কি, ওঁর কথা বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলাম। বিলাস মুখ তুলিয়া বলিল, "বড় মিছে ভাবেনি, কাল তোমার ভাবগতিক ঐ রকমই দাঁড়িয়েছিল, বরং আজ সকাল পর্যন্তও বলতে পারি।"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "বুড়ীটা ছিল এতদিন কাছে কাছে, হঠাৎ মারা গেল, কষ্ট হয়েছিল যে এ-কথা অস্বীকার করব না; কিন্তু সত্যিই কি আমি এতই অধীর হ'য়ে পড়েছিলাম?"

বিলাস-ঝি বলিল, "অধীর হওয়া বরং ভাল, তুমি একেবারে গুম হ'য়ে বসে থেকে যে আরও ভাবিয়ে তুললে।"

অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "ঐ শোন শৈলেন। শুধু শোকে কেন, যে কোন অবস্থাতেই মানুষ দুটি উপায়ে কাটাতে পারে—হয় চঞ্চল হ'যে, না-হয় শান্ত হ'য়ে। যদি একটু অধৈর্য হতাম, এবা বলত শোকে উন্মাদ হ'যে গেল; শান্ত হ'য়ে ছিলাম, এখন বলছে—সে আরও ভাবনার কথা... তোরা বুঝি ভেবেছিলি বিলাস, আমার বাক্‌বোধ হ'য়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ নয়?"

অপর্ণা দেবী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন। বিলাস রাগিয়া উঠিয়া নথ নাড়িয়া বলিল, "তা বলে তুমি বাপু যেখান-সেখান থেকে ঐ সব নেপালী ভুটানী টেনে আর বাড়িতে তুলতে পারবে না, এটা আমি বলে দিলাম। যত সব অসৈরন তোমার। জানা নেই শোনা নেই..."

এমন সময় পর্দার বাহির হইতে রাজু বেয়ারার গলা শোনা গেল, "বিলাস, বড়দিদিমণি ডাকছেন তোমায় একবাব।"

বিলাস উঠিয়া গেল। বোধহয় আমার কথাবার্তার সুবিধার জন্যই মীরা তাহাকে সরাইয়া লইল, বাকি সুবিধাটুকু অন্য প্রকাবে হইয়া পড়িল। অপর্ণা দেবী হাসিয়া বলিলেন, "মীরার এই অবস্থা—ক্রমাগতই বিলাসকে ডেকে পাঠিয়ে খবর নিচ্ছে, মা আছে কি গেল। এদিকে তরু একেবারে আগলে আছে ওর মাকে—পাছে ভুটানী বুড়ী ডেকে নেয়।"

তরু অভিমানের সুরে বলিল—"যাও, ভারি দুষ্টু তুমি মা!"

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "দুষ্টু মা যাওয়াই তো ভাল। বেশ একটা ভাল মা আসবে..."

দেখিলাম অপর্ণা দেবী ভুল করিতেছেন। তরুর মুখটা জলভরা মেঘের মত থম্‌থম্ করিয়া উঠিয়াছে, এধরনের কথা আর একটু চালাইলেই ও আর নিজেকে সংবরণ করিতে পারিবে না। বলিলাম, "হ্যাঁ, তরু, তুমি বরং যাও, বই-টইগুলো ঠিক ক'রে রাখ গিয়ে। ভয় নেই, পড়তে হবে না, এসে একবার দেখে নিচ্ছি এ ক'টা দিনে কোন্ পড়া কতদূর এগুলো। যাও তুমি।"

তরু চলিয়া গেলে অপর্ণা দেবী অনেকক্ষণ দৃষ্টি নত করিয়া রহিলেন। হঠাৎ এই চুপচাপের ভাবটা ক্রমেই বড় অস্বস্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। আরও একটা ব্যাপার দু-একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম, অপর্ণা দেবীর আনমিত মুখের ভাবটা ক্রমেই পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে—কেমন একটা গম্ভীর চিন্তিতভাব, প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা বিভীষিকার অতলে তলাইয়া যাইতেছেন।

সহসা মুখ তুলিয়া এমনভাবে চাহিলেন, বেশ টের পাওয়া গেল আমার উপস্থিতির কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে সংযত করিয়া লইলেন। চেয়ারে মাথাটা হেলাইয়া দিয়া সুপ্তোত্থিতের মত দুই হাতে নিজের মুখটা একবার মুছিয়া লইলেন, তাহার পর আবার সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন, "শৈলেন, তুমি এসেছ, ভাল হয়েছে।"

ঐটুকু বলিয়াই চুপ করিলেন। আমি প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম। একটু পরে অপর্ণা দেবী আবার

বলিতে লাগিলেন, "ভুটানীর মৃত্যুটা আমায় ভাবিয়ে তুলেছে শৈলেন; অবশ্য তুমি আর কি করবে, তবুও যেন একজন কাউকে না বললে মনটা হাল্‌কা হচ্ছে না। তোমার মনে থাকতে পারে, একদিন তুমি জিগ্যেস করাতে ভুটানীর সম্বন্ধে আমার আশঙ্কার কথা তোমায় বলেছিলাম আমি। তোমায় বলেছিলাম—মনের গতি গড় দুর্জ্ঞেয়, যখন ভাবা যায় বাইরের কোন একটা জিনিসকে আশ্রয় ক'রে ওপরে উঠছে, তখন হয়তো সে ভেতরে ভেতরে আরও নিজের চিন্তা নিয়ে তলিয়ে যাচ্ছে। এ অবস্থাটা বড় সাংঘাতিক, আর ভুটানীর ব্যাপারে ঠিক এই কাণ্ডটাই হ'ল! ওকে নিয়ে আমার একটা পরীক্ষা চলছিল জানই। শেষের দিকে এই পরীক্ষাটা আশ্চর্য রকম সফল হ'য়ে আসছিল। বুড়ি এদিকে একেবারে বুদ্ধগত প্রাণ হ'য়ে উঠল। ওর পুজোটা বসে বসে খালি বুদ্ধের জপ থেকে বুদ্ধের সেবায় গিয়ে দাঁড়াল—বৈষ্ণবেরা সেবার মধ্য দিয়ে যেমন শ্রীকৃষ্ণের পূজো করে—গোওয়ান, মোছান, সাজান। অল্প উত্তেজনাতেই যে 'বেটা-বেটা' ক'রে উঠত সে ভাবটাও কমে এল, আর সবচেয়ে আশ্চর্য পরিবর্তন এই হ'ল যে, ওর মনটা যে নিঝুম মেবে থাকত, সেটা কেটে গিয়ে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠল। আমি ঝোঁকের মাথায় বৌদ্ধ ধর্মের কিছু বই আনিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম, ইচ্ছে ছিল ধর্মেব স্থূল কথাগুলো বুড়ীর মনে আস্তে আস্তে সাঁদ করানো! ওদিকে আলোচনার মধ্যে একেবারেই আসতে চাইত না, কিন্তু এদানীং নিজেই এসে বুদ্ধ সম্বন্ধে আর তাঁর ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করত, বললে মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করত, বেশ বোঝা যেত সে যেন নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছে। তারপর আবার হঠাৎ বদলে গেল বুড়ী। পরশু দিন বিকেলে আমি একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়াতে গেলেই বুড়ী সঙ্গে থাকে, কিন্তু সেদিন জানিয়ে দিলে বুকটা একটু কেমন করছে, যাবে না। ফিরে এসে দেখি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বুদ্ধের মূর্তিটাকে বুকে চেপে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলোচ্ছে, আর ওর নিজের ভাষায় বিড় বিড় ক'রে কি বলছে। পেছন ফিরে ছিল বলে আমায় দেখতে পায়নি, যখন টের পেলে আমি এসেছি, একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে গিয়ে আমার কাছে এসে বসে নিজে থেকেই বুদ্ধের কথা পাড়লে।...সন্ধ্যা থেকে জ্বর এল, আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই একেবারে এক-শ পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত ঠেলে বিকার আরম্ভ হ'ল—শুধু ছেলের কথা। সে যে কী কষ্টকর ব্যাপার না দেখলে বিশ্বাস হয় না শৈলেন। ওর নিজের ভাষা বুঝি না, কিণ্ত যেন মনে হচ্ছে ও ওর ছেলের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও যেন দেখা পেয়েছে, বাড়ি যাবার জন্যে সাধছে। ছেলের বৌকে দেবে বলে বুড়ী ফুলকাটা ইটালিয়ান র‍্যাপার আর চব্বিশ ফলার ছুরিটা সর্বদাই বুকের কাছে রাখত—বিকারের ঝোঁকে এক-একবার ঝোলার মধ্যে হাত দিয়ে সেগুলো বের ক'রে আনবার চেষ্টা করছে, আর এক-একবার শূন্যদৃষ্টিতে কাতরভাবে শুধু 'মেমসাহেব, বেটা দেও, বেটা দেও।' ওর ছেলের সন্ধান নিতে যেমন কসুর করিনি, ডাক্তারের বেলাও সেই রকমই যথাসাধ্য করলাম, কিন্তু রোগের কিছুই উপায় হ'ল না। ডাক্তাররা বললে ওর ব্রেন অ্যাফেক্ট করেছে, রক্তেরও জোর নেই, কোন আশাই নেই। সমস্ত রাত একভাবে গিয়ে সকালের দিকে বুড়ী একটু নিঝুম হ'য়ে পড়ল। বেলা যখন আটটা, মনে হ'ল বুড়ীর যেন একটু একটু জ্ঞান ফিরে এসেছে। সেটা প্রদীপ নেবার আগে জ্বলে ওঠা আর কি। তারপরই—ঘড়িতে ঠিক যখন ন'টা-পনের হয়েছে, বিকারের শেষ ঝোঁকটা উঠে বুড়ী মারা গেল।"

অপর্ণা দেবী চুপ করিলেন। খুব সহজভাবে ব্যাপারটা বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিলেও বোঝা গেল তাঁহার মনের উপর বেশ খানিকটা ঝোঁক পড়িয়াছে। শেষ করিবার পর তাহার প্রতিক্রিয়াটা যেন আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। যেন, যে ব্যাপারটুকু এইমাত্র বর্ণনা করিয়া গেলেন, সেটা এবার সত্যের স্পষ্টতায় তাঁহার মনশ্চক্ষুর সামনে ফুটিয়া উঠিয়াছে। নিস্তব্ধতার মাঝে একবার চোখ তুলিয়া দেখিলাম অপর্ণা দেবীর মুখের চেহারাটা বদলাইয়া গিয়াছে। বুদ্ধমূর্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিয়া আছেন, মুখে একটা চাপা আতঙ্কের ভাব, আর সেটা যেন বাড়িয়াই যাইতেছে। আমার ভয় হইল। বেশ বুঝিতে পারিলাম এই জিনিসটি দেখিয়াই মীরা প্রমুখ সকলে শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে,

আর চেষ্টা করিয়া অপর্ণা দেবী আমার কাছে এই ভাবটাই গোপন করিয়া আসিয়াছেন এতক্ষণ।

আমি যে কি বলিব, কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। তাহার পর মনে হইল ঘরটা কয়েক দিনের জন্য বদলাইয়া ফেলিবার কথা বলি। পাড়িতে যাইব কথাটা অপর্ণা দেবী আমার পানে দৃষ্টি ফিরাইয়া কতকটা উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "বুড়ী গেছে খুবই ভাল হয়েছে শৈলেন, ওর জীবন যে কী দুর্বহ হ'য়ে উঠেছিল তা আমি বুঝতাম. কিন্তু ওর মৃত্যুটা হ'ল বড় ভীষণ।—শেষ পর্যন্ত জগতে আর ওর ধর্ম রইল না, কিছু রইল না, রইল শুধু ওর ছেলে কিংবা আরও ঠিকভাবে বলতে গেলে—ওর ছেলের স্মৃতি। আমি অস্বীকার করব না শৈলেন, আমি ভয় পেয়ে গেছি,...আমার পরিণামও কি শেষ পর্যন্ত এই হবে? আমার দৃষ্টির সামনে থেকেও ঐ রকম ক'রে ইহকাল পরকাল সব মুছে গিয়ে শুধু জেগে থাকবে এক অপদার্থ ছেলের মূর্তি? কি ভয়ংকর অবস্থা বল তো শৈলেন, ভাবতে পার? আমি তোমায় মিথ্যে বলছি না; আমি প্রাণপণে আমার দূরদৃষ্ট থেকে সরে যেতে চেষ্টা করছি। আমি ধর্মে বিশ্বাসী—আমাদের যা ধর্ম, যাতে বলে ভগবান সহস্রমূর্তিতে আমাদের ঘিরে রয়েছেন—সেই ধর্ম আমি জীবনে সত্য ক'রে নিয়েছি। আমার আলমারীতে যা বই দেখছ, আমার ঘরে যা ছবি দেখছ, সে-সব আমার ঘর সাজাবার সৌখিন উপকরণ নয় শৈলেন; কিন্তু আমার আর সন্দেহ নেই কোন এক সময় ভুটানীর মত আমার ছেলের স্মৃতি যখন কাল হ'য়ে আমার জীবনে দেখা দেবে, তখন অন্য কিছুই তার সামনে দাঁড়াতে পারবে না। কি পাপে এই পরিণাম আমার জন্যে ওত পেতে রয়েছে শৈলেন? কি ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করা যায়?—কেন এমনটা হ'ল?"

কখনও এ রকম ভাবান্তর দেখি নাই অপর্ণা দেবীর মধ্যে, অথবা বোধ হয় মাত্র আর একদিন দেখিয়াছিলাম—যেদিন ভুটানী প্রথম আসে। সেও কিন্তু বিস্ময়কর হইলেও এতটা ভয়াবহ ছিল না। আমি নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিতেছিলাম, একটু বিরতির সুযোগ পাইয়া শান্ত, সহজ কণ্ঠে বলিলাম, "আপনি মিছিমিছি উদ্বিগ্ন হচ্ছেন, একটা অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের মনের ওপর একটা ঘটনার প্রভাব যেভাবে পড়েছে ঠিক সেইভাবেই যে আপনার ওপরও পড়বে এটা আগে থাকতে ধরে নিয়ে আপনি উতলা হ'য়ে উঠেছেন; কিন্তু সেটা কি সম্ভব?"

অপর্ণা দেবী খুব অন্যমনস্ক হইয়া আমার কথাগুলো শুনিতেছিলেন, একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সব মায়ের মন এক শৈলেন,—শিক্ষার সেখানে প্রবেশ নেই। আমাকে যদি শিক্ষিত বলে মনে করো তো অমন ছেলের চিন্তাই বা আমি করতে যাই কেন? না, ওতে রক্ষা করতে পারবে না। বরং অশিক্ষিতদের মধ্যে ধর্মের প্রভাব বেশি; আমার সেই আশা ছিল বলেই আমি ভুটানীকে এই পথে চালিত করবার চেষ্টা করেছিলাম,—কিন্তু অসম্ভব! কি রকম সর্বনেশে ব্যাপার দেখ—বুদ্ধদেব ওর ছেলেকে নিজের মধ্যে টানতে পারলেন না, শেষ পর্যন্ত নিজেই ওর ছেলের মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। আমি যে সেদিন বেড়িয়ে এসে দেখলাম বুড়ী পেতলের বুদ্ধমূর্তিকে বুকে জড়িয়ে মাথায় হাত বুলোচ্ছে—তার ভেতরকার ব্যাপারটা বুঝেছ তো? পেতলের মধ্যে বুদ্ধদেব গেছেন নির্বাণ হয়ে, তার জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে ওর ছেলে। অনেক দিন থেকেই এই ব্যাপারটা চলছিল...ধোওয়ান, মোছান, সাজানর মধ্যে যে বুড়ী তার ছেলেকেই দেখে যাচ্ছে, এতটা সন্দেহ না ক'রেই আমি আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে খুশি হ'য়ে উঠেছিলাম। টের পেলাম, যখন আর একেবারেই উপায় নেই।—শৈলেন আমি সত্যই ভয় পেয়েছি। মীরা, তরু—ওরা আমায় দেখে যে আকুল হ'য়ে উঠেছে তাতে কিছুই আশ্চর্য হবার নেই, চেষ্টা ক'রেও আমি ভয়টা চাপতে পারিনি সব সময়। সবচেয়ে ভয়ংকর ব্যাপার কি হয়েছে জান?—যখন থেকে অসুখে পড়েছিল হাজার চেষ্টা ক'রেও আমি ওকে একবার বুদ্ধদেবের নাম মুখে আনাতে পারিনি। বিকারের সময় তো কথাই নেই—অসুখ যখন শুরু হয়, আর শেষকালে যখন ওর জ্ঞান হয় খানিকক্ষণ, তখনও হাজার চেষ্টা ক'রেও ওর মনটা বুদ্ধদেবের দিকে ফেরাতে পারিনি। যত বলি—বোলো—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'—অন্তত একবার নামও করুক বুদ্ধদেবের—শুধু বুকে হাত দিয়ে বেটা—বেটা—বেটা—মেমসাহেব বেটা দেও'—"

অপর্ণা দেবী চুপ করিলেন। আমিও আর কিছু বলিলাম না—নূতন করিয়া আবার কোন দুর্বল স্থানে স্পর্শ দিব এই ভয়ে। ওঁর দৃষ্টি ক্রমে মুক্ত জানালার বাহিরে গিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে দৃষ্টি শান্ত এবং মুখের ভাব সহজ হইয়া আসিতেছে। বুঝিলাম একজনকে কথাগুলো বলিতে পারিয়া মনটা হালকা হইয়াছে। ধীমতী নারী—মনের ব্যাধিও চেনেন; ঔষধ সম্বন্ধেও ধারণা আছে,—সেই জন্য গোড়াতে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি করবে? কিন্তু তবুও একজনকে বলা দরকার?"

আরও অনেকক্ষণ গেল। একবার বাহির হইতে দৃষ্টি গুটাইয়া লইয়া খুব স্নেহদ্রব কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "খোকাকে 'অপদার্থ' বললাম, না শৈলেন?—ক'বার বললাম বল তো?"

চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

উত্তরের প্রয়োজন ছিল না। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। আরও কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ অপর্ণা দেবী আবার বিচলিত হইয়া উঠিলেন। আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, "শৈলেন, কিছু একটা হওয়া দরকার; এভাবে এ অবস্থায় আমি থাকতে পারছি না, কিরকম যেন অসহ্য হ'য়ে উঠছে।—উনি কবে আসবেন টের পেয়েছ?"

টের পাইনি সেটা আর বলিলাম না। বলিলাম, "কাল আসবেন...আমার একটা ছোট্ট কথা মনে হচ্ছে, অনুমতি দেন তো বলি।"

অপর্ণা দেবী আগ্রহের সহিত বলিলেন, "বল।"

বলিলাম, "আপনার আপাতত এ-ঘরটা একটু বদলান দরকার।"

অপর্ণা দেবী ঘরের চারিদিকটা, বিশেষ করিয়া ভুটানী যেখানটায় থাকিত—বুদ্ধের মূর্তি, ভুটানীর চেয়ার—একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, দরকার একটু বটে! তরু ওপরে যে ঘরটায় পড়ত সেইটে আমার জন্যে ঠিক ক'রে দিতে বলবে?"

৩

সুখেব বিষয় আমার আন্দাজটা ফলিল—মিস্টার রায় পরদিন সকালেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেড়াইবার বাতিক আছে একটু; বাহিরে গেলে তার সুযোগ ছাড়েন না; পূর্ণিয়া ফেরত মালদহে নামিয়া গৌড়ের ভগ্নাবশেষ দেখিয়া আসিলেন। ভুটানীর মৃত্যু পর শুনিয়া বলিলেন, "So she is dead (তাহলে মারা গেল)? অপর্ণার পক্ষে ভাল কি মন্দ হ'ল ঠিক বুঝতে পারছি না, অন্তত কতকটা অন্যমনস্ক থাকত। Poor girl. We must watch and see how it re-acts on her. (ওর মনের ওপর কি রকম প্রতিক্রিয়া হয়, দেখা দরকার)।"

আমি আর মীরা দুজনেই ছিলাম। মীরা প্রতিক্রিয়াটা কি রকম শুরু হইয়াছে বোধহয় বলিতে যাইতেছিল, আমি চোখের ইসারা করিয়া বারণ করিয়া দিলাম।

বিকালে আমার ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া আছি—আমি, মীরা আর তরু। তরুকে লইয়া বেড়াইতে যাইব, মোটরে একটা কি হইয়াছে; ড্রাইভার সেটা শোধরাইতেছে। নিশীথ আসিল। নূতন একটা সিডন-বডি গাড়ি কিনিয়াছে। অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মুখের ভাবটা। ভিতর থেকে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "গুড্ আফটারনুন মিস্ রায়," সঙ্গে সঙ্গে ফেল্ট টুপিটা হাতে করিয়া নামিয়া, সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুখটা একেবারে শুক্‌নো মত করিয়া প্রশ্ন করিল, "বাই দি বাই, মা কি রকম আছেন? সকালবেলা কোনমতেই আসতে পারলাম না। নেক্‌স্‌ট বোটে বোধহয় সেল্ করতে হবে। কতকগুলো প্রিলিমিনারিজ্ ঠিক করতে এমন আটকে গেলাম!"

কথা কহিতে কহিতেই হ্যাট-র‍্যাকে টুপিটা রাখিয়া উহারই মধ্যে চকিতে একবার আর্শির মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছায়াটা দেখিয়া লইয়া একটা চেয়ারে বসিল। আবার প্রশ্ন করিল, "মিসেস্ রায় আছেন

কি রকম বলুন তো; রাত্তিরটা যা কেটেছে!"

লোকটা দিনকতক, কি কারণে জানি না, একটু যেন ঢিলা দিয়াছিল, আবার প্রাণপণে স্বয়ংবর-সমরে নামিয়াছে। নূতন মোটরও বোধহয় একটা অস্ত্রই। বোধহয় আমার এই কয়েক দিনের অনুপস্থিতির সুযোগে আবার নূতন স্টার্ট লইয়াছে। আমার প্রতি ভাবটা এমন দেখাইল যেন আছি কি নাই সে খবরই জানে না ও।

মীরা শান্ত কণ্ঠে বলিল, "থ্যাংকু ইউ, মা অনেকটা ভালই আছেন।...শৈলেনবাবুর একটা পরামর্শে অনেকটা সুবিধে হ'ল। সামান্য কথা অথচ আমাদের মাথায় একেবারেই আসেনি। মার ঘরটা রাত্তিরে বদলে দিলাম। এটুকুতেই অনেকটা যেন অন্যমনস্ক আছেন বলে বোধ হচ্ছে।"

আমি অন্যদিকে চাহিয়া ছিলাম, তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও একবার নিশীথের দিকে চোখ পড়িয়া গেল। পরামর্শ দেওয়ার অপরাধে, আমাকে যদি একবার পায় তো যেন চিবাইয়া খায়। মুখের ভাবটা পরিবর্তন করিয়া লইয়া বলিল, "দাঁড়ান, ঠিক এই কথাই আমি ভেবেছিলাম। আপনাকে বোধহয় বলেও থাকব, বলিনি?"

মীরা বলিল, "আমার ঠিক মনে পড়ছে না। বলে থাকবেন বোধহয়।"

"তবে কি তরুকে বললাম?"

তরু মীরার মত আর সন্দেহের কিছু রাখিল না, বলিল, "না, আমায় তো বলেননি!"

নিশীথ আমার পানে আর একটা কটাক্ষ হানিল—এবার বোধহয় আমার ছাত্রী স্পষ্ট কথা বলে এই অপরাধে। অন্যায় হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে আমি একটা লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। কতকটা উহার পানে চাহিয়া বলিলাম, "ঘর-বদলানর কথাটা আমার মাথায় প্রথমে আসেনি, এইখানেই কার মুখে যেন শুনলাম মনে হচ্ছে—এখন আপনি বলায় বুঝতে পাচ্ছি..."

মীরা আমার পানে একবার চকিতে চাহিল, যেন না চাহিয়া পারিল না। নিশীথও আমার পানে আর একবার বক্রদৃষ্টি হানিয়া সঙ্গে সঙ্গে কথা পাড়িল; প্রশ্ন করিল, "মিস্টার রায় এসেছেন শুনলাম!"

মীরা বলিল, "আজ সকালে এসেছেন বাবা।"

একটা মস্ত বড় দুর্ভাবনা যেন নামিয়া গেল, নিশীথ এইভাবে বলিল, "বাঁচা গেল। I hope he was perfectly all right (আশা করি বেশ ভালই ছিলেন)।"

মীরা উত্তর করিল, "থ্যাংক্স। ভালই ছিলেন বাবা...ওঁর বেড়াবার ঝোঁক; ফেরার মুখে গৌড়ের রুইন্স্ দেখে ফিরলেন, তাইতেই দেরি হ'য়ে গেল।"

নিশীথ মুখ ভার করিয়া গাম্ভীর্যের অভিনয় করিয়া বলিল, ওঁর সঙ্গে একচোট বোঝাপড়া আছে আমার, উনি ওদিকে মন্দির-মসজিদের রুইন্স্ দেখে বেড়ান, এদিকে মানুষের রুইন্স্ নিয়ে যে..."

সম্পূর্ণ নিজের সৃষ্ট এত বড় একটা রসিকতায় বাড়ির অবস্থা ভুলিয়াই মুক্তকণ্ঠে হাসিতে যাইবে, ড্রাইভার আসিয়া বলিল, "ঠিক হ'য়ে গেছে...গাড়িটা।"

আমি আর তরু উঠিয়া দাঁড়াইলাম। নিশীথ বলিল, "মিস্ রায়ের কোথাও এন্‌গেজমেন্ট আছে নাকি?"

মীরা একটু বিলম্বিত কণ্ঠে বলিল, "কই, না!"

"তাহ'লে আমার গাড়িটা রয়েছে। সর্বদাই বাড়িতে বসে থাকাটা ঠিক নয় আপনার পক্ষে।"

মীরা শরীরটা একটু এলাইয়া শ্রান্তভাবে বলিল, "একেবারেই বেরুতে ইচ্ছে করছে না। কেমন যেন একটা কুড়েমিতে পেয়ে বসেছে।"

নিশীথ বলিল, "সে-সব কিছু শোনা হবে না; নিন, উঠুন।"

নিমরাজি দেখিয়া এতটা উৎফুল্ল হইয়া উঠিল যে আমা হেন উপেক্ষণীয়কেও সাক্ষী মানিয়া

বলিল, "কুড়েমিতে পাওয়াটা একটা দুর্লক্ষণ নয় মাস্টারমশাই?"

বলিলাম, "নিশ্চয়ই, অবশ্য নিশিতে পাওয়াকে যদি সুলক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়।"

মীরা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। নিশীথও হাসিল, অবশ্য বুঝিলে কখনও হাসিত না। মীরা উঠিয়া গেল, বলিল, "দাঁড়ান, তাহ'লে, এক্ষুণি আসছি, নেহাতই যখন ছাড়বেন না।"

নিশীথ আমাদের একটু আটকাইয়া দিল। তরুকে বলিল, "মিস্ রায় জুনিয়ার, তোমার জন্যে একটা চমৎকার জিনিস জোগাড় ক'রে রেখেছি। আন্দাজ কর তো কি?"

তরু লুব্ধভাবে একটু চিন্তা করিল, তাহার পরে আবদারের স্বরে বলিল, "না, আপনি বলুন, আমার কিছুই আন্দাজ আসছে না। বলুন, হ্যাঁ বলুন?"

নিশীথও আরও একটু লুব্ধ করিয়া তুলিল, তাহার পর দুই হাত দেখাইয়া বলিল, "এই ইযা বড়া এক লালমোহন!"

নিশীথ স্বয়ংবর-সংগ্রামে চারিদিক থেকেই তোড়জোড় লাগাইয়াছে। তরু উৎফুল্ল হইয়া..."আজই আনতে যাব, নিশীথদা"—বলিয়া নিশীথকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, এমন সময় মীরা নামিয়া আসিল, বলিল, "নিশীথবাবুর যদি আপত্তি না থাকে তো.."

নিশীথ ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলিল, "কি, কি? বলুন, আপত্তি কিসের?"

"মাকেও নিয়ে গেলে হ'ত না আমাদের সঙ্গে?"

নিশীথেব মুখের সমস্ত দীপ্তি যেন নিবিয়া গেল। স্খলিত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই...তাঁকে যদি নিয়ে যেতে পারেন তো..."

নিশীথের অলক্ষ্যে মীরা আমার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। কেন যে—স্পষ্ট বুঝা গেল না।

অপর্ণা দেবীর অস্বাভাবিক উৎকণ্ঠার কথাটা মীরাকে বলি নাই, রাত্রে আহারাদির পর মিস্টার রায়কে একান্তে তাঁহার ঘরে বসিয়া বলিলাম। মিস্টার রায় সুরাপাত্রটা ধরিয়া তীব্র উদ্বেগের সঙ্গে কাহিনীটা শুনিতেছিলেন, শেষ হইলে ছাড়িয়া দিয়া কৌচটাতে হেলান দিয়া নিজের কোলে হাত দুইটা জড় করিয়া লইলেন। বলিলেন, "Here is a pretty piece of business (চমৎকার ব্যাপার)! ভুটানীর আসার পর থেকেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল শৈলেন, যে এই রকম ব্যাপার ঘটবেই; যদিও ওকে একটু ভুলে থাকতে দেখে এক-একবার আশ্বস্তও হ'য়ে থাকব। আসল কথা—নিজের জীবনের যা ট্র্যাজেডি সেইটে অষ্টপ্রহর আবার অন্যের জীবনের মধ্যে দিয়ে দেখতে থাকা—এর ফল কখনও ভাল হয় না। আমি অপর্ণাকে দু'একবার হিন্ট্ দিয়েছিলাম। কিন্তু জানই She is self-willed (সে জেদী)। যাক, এখন করা যায় কি? This must not be allowed to continue (এ ব্যাপারটা কোনমতেই স্থায়ী হ'তে দেওয়া চলে না)।"

মিস্টার রায় অনেকক্ষণ দুইটা হাতের মধ্যে মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। একবার সুরাপাত্রটা তুলিয়া একচুমুক পান করিলেন। কিছুক্ষণ পরে একটু বিচলিতভাবে বলিয়া উঠিলেন, "O, the golden dream (হায়, সোনার স্বপ্ন)!"

বুঝিলাম মিস্টার রায় মনে মনে সমস্ত জীবনটা এমুড়ো ওমুড়ো দেখিয়া যাইতেছেন—অত স্বপ্ন দিয়ে রচা জীবন। অথচ যাহাকে কেন্দ্র করিয়া রচা, বিশেষ করিয়া সে-ই জীবনটা দুর্বহ করিয়া তুলিল। এর চেয়ে বড় ট্র্যাজেডি আর কি হইবে? পাত্রের সুরাটুকু নিঃশেষ করিয়া আরও একটু ঢালিয়া রাখিলেন, চিন্তা-শক্তিকে উত্তেজিত করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে;—কিংবা দুশ্চিন্তাকে ডুবাইবার প্রয়াস এটা?

আমি বলিলাম, "একটা ব্যাপার অপর্ণা দেবীর জীবনে বড় অপকাব করছে, আপনাকে কয়েকবার বলব মনে করেছি, এই সময়টা সেটা আবার খুব বেশি হানিকারক হ'য়ে উঠেছে..."

মিস্টার রায় স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, "You mean her exclusiveness (ওর এই কুনোবৃত্তির কথা বলছ)? If I have tried once, I have tried

a hundred times. She is always her old obdurate self (আমি অশেষ চেষ্টা করেছি; সেই পুরানো জিদ ওর)।"

বলিলাম, "বলেন তো আমি একটু চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি। ওঁর প্রাণ বোধহয় একটা পরিবর্তন চাইছে এই আঘাতটা পাওয়ার পর থেকে,—এক কথাতেই উনি যেমন ঘরটা বদলাতে রাজি হ'লেন। আমার মনে হয় ওঁর দিনকতক অন্য জায়গায় গিয়ে থাকা দরকার—দার্জিলিং, শিলং, পুরী—একটা চেঞ্জ্ অব সীন্ বিশেষ দরকাব। যদি খুব রাজি নাও থাকেন, একবার গিয়ে পড়লে নিশ্চয় ভাল লাগবে। উনি এইখানটায় নিজের মনকে বুঝতে পারছেন না।"

মিস্টার রায় অর্ধ-অন্যমনস্ক ভাবে কথাটা শুনিতেছিলেন, ভিতরে ভিতরে ওঁর একটা চিন্তাধারা চলিতেছিল। বলিলেন, "দেখ বলে...By the bye, Sailen, I also have been maturing a plan all the time. It is a lovely plan, only somewhat of a fraud (ইতিমধ্যে আমিও বরাবর একটা ছক পাকা ক'রে আনছি। ছকটা চমৎকার; তবে খানিকটা প্রবঞ্চনা আছে তার মধ্যে)!!"

আমি মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাঁহাব পানে চাহিলাম। মিস্টার রায় বলিলেন, "তুমিও তার মধ্যে আছ, rather you are the hero of the piece (বরং তোমারই প্রধান ভূমিকা)।"

কৌতূহলটা আরও উদ্রিক্ত করিয়া মিস্টার রায় আবার খানিকটা চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তোমাদের প্রোফেসার মিস্টার সরকার আমার একজন বন্ধু, শৈলেন। তাঁর কাছে তোমার কথা প্রায়ই শুনতে পাই, he has high hopes about you (তিনি তোমার সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করেন)। তোমার ভবিষ্যৎ কেরিয়ার নিয়ে আমাদের কিছু কিছু আলোচনা হয় মাঝে মাঝে। তোমায় বোধহয় এর হিন্ট্ দিয়েছি। আমার ইচ্ছে তুমি এম্-এ-টা দিয়ে ইংলণ্ডে চলে যাও, যদিও এম-এ দেওয়াটা আমি অত প্রয়োজন দেখি না—sheer waste of time (নিছক সময় নষ্ট)। সেখানে গিয়ে তুমি গ্রেজ্ ইন বা ইনার টেম্পলে ঢোক, আমি ঢুকেছিলাম ইনার টেম্পলে। এ পর্যন্ত আগেকাব প্ল্যান ছিল, সম্প্রতি—মানে আজ এইমাত্র একটু বাড়ান গেল।"

মিস্টার রায় পাত্রে একটি চুমুক দিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, "তোমার প্রিন্‌সিপ্‌ল্ কি? To remain scrupulously honest and clean (একেবারে সাধু আর নিদাগ হ'য়ে থাকা), না, এটা বিশ্বাস কর যে, জীবনে মিথ্যা প্রবঞ্চনারও একটা ন্যায্য স্থান আছে?"

বলিলাম, "আলো-ছায়ার জগৎ—এ তো নিত্যই দেখতে পাচ্ছি।"

"বেশ অপর্ণাকে বাঁচাতে হ'লে ঐ ছায়ার সাহায্য একটু নিতে হবে। অবশ্য আশা করা যাক নাও হ'তে পারে, তবে মনে হয়, we ought to be prepared for the worst (খারাপটুকুর জন্যেই তোয়ের থাকা ভাল)।—ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই, তুমি গিয়ে একটু ভাল করে নিতীশের সন্ধান নেবে। এ পর্যন্ত কেউ আপন জেনে এটা করেনি। খুঁজে বের করতে পার, ভালই, আমাদের মনের অবস্থা বুঝিয়ে, বিশেষ ক'রে তার মায়ের অবস্থার কথা বলে তার মতিগতি একটু ফেরাতে পার, আরও ভাল, না পার—ঐ যে বললে ছায়ার কথা, প্রবঞ্চনার কথা তারই—আশ্রয় নিতে হবে। You shall have to pretend—he has been found out, he has been re-claimed and write (তোমাকে মিথ্যে ক'রে লিখতে হবে যে দেখা পেয়েছ, সে শুধরে গেছে)।"

শোনার সঙ্গে বুকটা ছাঁত করিয়া উঠিল। অপর্ণ দেবীর সেদিনের সেই কুশবৎসের কথা মনে পড়িয়া গেল! কলিকাতার গয়লাদের নীচ ফন্দি—ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছেন অপর্ণা দেবী—বলিতেছেন—"উঃ কি ক'রে পারলাম বল তো শৈলেন!"

কিন্তু এই জীবন, আরোগ্যের জন্য বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা এখানে,—সব সময়েই অমৃতের নয়। পাছে মিস্টার রায় আমার কুণ্ঠা ধরিয়া ফেলেন এই জন্য তাড়াতাড়ি নিজেকে সংবৃত করিয়া লইয়া বলিলাম, "প্ল্যান্‌টা ভালই, আশা করি ভাল ক'রে চেষ্টা করলে ভগবান সহায়ও হ'তে পারেন।

কিন্তু ধরুন যদি মিথ্যাই রচনা করতে হয় তো শেষকালে—"

মিস্টার রায়ের মুখটা হঠাৎ রূঢ় হইয়া উঠিল। আমার মুখের কথাটা কাড়িয়া লইলেন, "তা হ'লে শেষকালে অপর্ণাকে বলতে হবে—The boy is dead, the rascal! We shall have to risk this and see what happens. The poor girl not be killed by inches like this (তা হ'লে বলতে হবে হতভাগা ছেলেটা মরেছে। অপর্ণাকে এ চরম আঘাতটা দিয়ে একবার দেখতেই হবে কি ফল হয়। এভাবে তুষানলে দগ্ধ হয়ে মরতে দেওয়া হবে না ওকে)।"

পেগে ধীরে আর একটা চুমুক দিয়া মিস্টার রায় শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "যাও শৈলেন, রাত হ'য়ে গেছে, Good Night!"

পরদিন সন্ধ্যার সময় আমরা কয়েকজন বাগানের লনে বসিয়া আছি। আজকাল সহানুভূতি দর্শাইতে এই সময়টা রোজই কয়েকজন করিয়া আসে; আজ এ, কাল ও, এই রকম। অবশ্য নিশীথ বাঁধা আগন্তুক। আজ ছিল নীরেশ, শোভন, আলোক আর সরমা। সরমা আসিলে অপর্ণা দেবীর কাছেই বেশি থাকে, আজ মিস্টার রায় তাঁহাকে লইয়া বেড়াইতে গেলেন। সরমা আসিয়া আমাদের মধ্যে বসিল। রাজু চা দিয়া গেল।

প্রসঙ্গটা শেষ পর্যন্ত অপর্ণা দেবীর কথাতেই আসিয়া পড়িল।—মনের কথা বাদ দিলেও, বেশ স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে ভুটানীর মৃত্যুর পর ওর শরীর হঠাৎ খুব দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে।—লক্ষণটা ভাল নয়। নীরেশ বলিল, "মনটা দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু আমার মনে হয় চিকিৎসাটা ওঁর মনের দিক থেকে হওয়া উচিত।" আমিও আমার মতটা বলিলাম—অর্থাৎ স্থান পরিবর্তনের কথা। মনের দিক থেকে যাঁহারা চিকিৎসার পদ্ধতি প্রচলন করিতেছেন তাঁহারা এই চেঞ্জ্ অব্ সীন অর্থাৎ আবেষ্টনীর পরিবর্তনের উপর খুব জোর দিতেছেন। বলিলাম—association (সাহচর্য) জিনিসটার প্রভাব আমাদের প্রতিদিনের জীবনের উপর খুব বেশি। উহারা বলিতেছেন মানসিক উদ্বেলতা যে-ব্যাধির মূল তাহার সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা পুরাতন, হানিকারক এসোসিয়েশন থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন নূতন স্থানে নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি।

আলোচনায় সবাই যোগ দিল অল্পবিস্তর; দিল না শুধু সরমা আর নিশীথ। সরমা চিরদিনই কম কথা নয়, কয়েকদিন থেকে যেন আরও বেশি করিয়া দগ্ধ হইতেছে বলিয়া আরও স্বল্পবাক। নিশীথ ঠিক বিপরীত, আজ কিন্তু যেন মুখে ছিপি আঁটিয়া গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে আলোচনা আগাগোড়া শুনিয়া গেল,—যেন মনের কোথায় পাতা খুলিয়া প্রত্যেকটি কথা লিপিবদ্ধ করিয়া লইতেছে; খুব সতর্ক, যেন একটিও বাদ না পড়িতে পায়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মিস্টার রায় অপর্ণা দেবীকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। উভয়েই আসিয়া আমাদের সহিত একটু গল্পগুজব করিলেন। মিস্টার রায় বেশ প্রফুল্ল, যেন একটা প্রয়োজনীয় কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এবং কতকটা সফলও হইয়াছেন। রাজু ডিশ, প্লেট সরাইয়া টেবিলটা পরিষ্কার করিতেছিল, মিস্টার রায় একটা বিদ্রূপও করিলেন, "রাজু, লাটসাহেবের বাড়ির লেটেস্ট নিউজ্‌টা এদের শুনিয়ে দিয়েছিস?"

সকলে হাসিয়া উঠিতে রাজু বাসন কয়টা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িল।

অপর্ণা দেবী উপরে চলিয়া গেলেন।

নিশীথ আর বিলম্ব করিল না—কি জানি পৃথিবীতে সুযোগ তো প্রতি মুহূর্তেই নষ্ট হইয়া যাইতেছে! মিস্টার রায়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "ক'দিন থেকে ভয়ানক একটা দরকারী কথা ভাবছি—আপনার যদি কাজ না থাকে তো'..."

"কি, বল, এখানে বলা চলবে?"

নিশীথ একটু যেন কিন্তু হইয়া চকিতে চারিদিকে একবার চাহিয়া লইল, বলিল, "হ্যাঁ, তা...কথাটা হচ্ছে ক'দিন মিসেস্ রায়ের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কয়েকজন বড় বড় সাইকলজিস্ট্

এ সম্বন্ধে কি বলছেন তাই মনে পড়ে গেল। তাঁদের লেটেস্ট থিয়োরি হচ্ছে যে, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এসোসিয়েশনের প্রভাব খুব বেশি, সেইজন্যে মানসিক উদ্বেলতা যার মূল সেরকম অসুখের সবচেয়ে ভাল চিকিৎসা এই যে, পুরনো হানিকারক এসোসিয়েশন থেকে মনটা বিচ্ছিন্ন ক'রে...বিচ্ছিন্ন ক'রে...মনটা বিচ্ছিন্ন ক'রে...

সবাই স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে। নীরেশ নিশীথের নামই দিয়াছে গ্রীক-দেবতা Echo অর্থাৎ প্রতিধ্বনি; আজ কিন্তু চরম হইল। নীরেশ গম্ভীরভাবে যোগাইয়া দিল, "আপনি বোধহয় বলতে চান—নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করা..."

একবার আমার পানে দৃষ্টিপাত করিয়া লইল।

বেশ সপ্রতিভ ভাবেই নিশীথ বলিল, "Just it (ঠিক তাই) নূতন সুস্থ এসোসিয়েশনের সৃষ্টি করা। যেদিন থেকে কথাটা আমাকে স্ট্রাইক করেছে, সেইদিন থেকেই আমি সব ঠিক ক'রে ফেলেছি, মিস্টার রায়; এখন শুধু আপনার অনুমতির অপেক্ষা—অবশ্য অনুমতি না দিলে ছাড়ানও নেই...রাঁচিতে আমাদের একটা বাড়ি আছে, the best place in Ranchi (রাঁচির মধ্যে সবচেয়ে ভাল জায়গা), চারিদিক খোলা, কিছু দূরে মোরাবাদী পাহাড়, simply superb (অতি চমৎকার)। আমি আপনার অনুমতি পাবার আগেই চুনটুন ফিরিয়ে ঠিকঠাক ক'রে রাখতে লিখে দিয়েছি...মানে ওঁর একটা change of scene নেহাতই দরকার—মানে।"

তাড়াতাড়ি বলিয়া ফেলিবার উত্তেজনায় একটু হাঁপাইয়াও উঠিয়াছে।

মিস্টার রায় বোধহয় একটু অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতেছিলেন, নিশীথের বাক্যস্রোতে বাধা পড়িতে বলিলেন, Many thanks for your gracious offer (তোমার উদার প্রস্তাবের জন্য বহু ধন্যবাদ), নিশীথ। শৈলেনও কাল রাত্তিরে আমায় এই কথা বলছিল অর্থাৎ এই change of scene-এর কথা। তা মিসেস্ রায়কে রাজি করাতে পারি, আর ডাক্তাররা যদি অন্য জায়গায় যেতে না বলে তো তোমার কথাই হবে; and thanks for that (আর তার জন্যে ধন্যবাদ)।"

৪

নিশীথ না উপকার করিয়া ছাড়িল না, একেবারে অপর্ণা দেবী পর্যন্ত ধর্না দিল, এবং রাজি করাইল। যে-ভাবেই হোক্ একটা খুব ভাল কাজ হইল। আমার কলেজ আছে, যাওয়া সম্ভব নয়; ঠিক হইল সঙ্গে যাইবে—মীরা, তরু, বিলাস, রাজু বেয়ারা, ড্রাইভার; এখানে অস্থায়ীভাবে একজন ড্রাইভার রাখা হইবে মিস্টার রায় রাখিয়া আসিবেন, তাহার পর ছুটি-ছাটা হইলে মিস্টার রায় বা আমি দেখিয়া আসিব।

একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, যাইবার দিন যতই ঘনাইয়া আসিতেছে, বালিকা সুলভ উৎফুল্লতার মাঝে মীরা যেন একটু আবার ম্রিয়মাণও হইয়া পড়িতেছে। যাইবার আগের দিনের কথা। আমরা ভ্রমণে বাহির হইব, মীরা নামিয়া আসিয়া বলিল, "তরু তোমাদের মোটরে একটু জায়গা হবে?"

তরু উল্লসিত হইয়া বলিল, "এস না দিদি, তুমি তো অনেক দিন আমাদের সঙ্গে যাওনি-ও, আজকাল নিশীথ-দা...।"

মীরা রাগিয়া বলিল, "তাহ'লে যাও।"

তরু বলিল, "না এস, তোমার দুটি পায়ে পড়ি দিদি।"

মীরা আসিয়া বসিল। তরু রহিল আমাদের মাঝখানে। গেট দিয়া বাহির হইতে হইতে ড্রাইভার ঘুরিয়া আমায় প্রশ্ন করিল, "কোন্ দিকে যাব?"

আমি মীরার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "আজ ভেবেছিলাম ডায়মণ্ডহারবার রোড হ'য়ে যাব খানিকটা।"

মীরা গ্রীবা বাঁকাইয়া উত্তর করিল, "মন্দ কি?"

ময়দান পারাইয়া খিদিরপুর পুল উৎরাইয়া একটু পরে আমাদের গাড়ি অপেক্ষাকৃত জনবিরল রাস্তায় আসিয়া পড়িল। মীরা একেবারে নীরব; খালটা পার হইয়া একবার শুধু ড্রাইভারকে গতিবেগটা আর একটু বাড়াইতে বলিল; আর, একবার তরুকে বলিল, "দয়া ক'রে একটু চুপ করবে কি তরু?"

তরুর রসনা মুক্ত প্রকৃতি আর অবাধ গতিবেগের মধ্যে প্রগলভ হইয়া উঠিয়াছে।

এইটুকু ব্যতীত মীরা অখণ্ড মৌনতায় আর নরম, শান্ত, দৃষ্টিতে বরাবরই সামনের দিকে চাহিয়া আছে। মীরা আজ এ রকম কেন?—মনে হইতেছে সে যেন একটি অচঞ্চল সরোবর, বুকে তাহার কিসের একটি শান্ত প্রতিচ্ছায়া পড়িয়াছে, যে চায় না সামান্য একটি শব্দের আঘাতেও এতটুকু রীতিভঙ্গ হয়, প্রতিবিম্ব এতটুকুও চঞ্চল হইয়া উঠে। আবিষ্ট মনে একটিমাত্র চিন্তাকে পরিপুষ্ট করিতেছিলাম, সে মীরার হাতখানেক ব্যবধানের মধ্যে যে-কেহই থাকিত তাহারই মনে ঐ এক চিন্তাই উঠিত;—ভাবিতেছিলাম মীরার ধ্যান-শান্তমনে এই যে প্রতিচ্ছবি তাহা শুধু কি এই প্রকৃতিই? মীরা এর মর্ম্মস্থলে কাহাকেও বসাইয়া কি প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাইয়া লয় নাই? স্পষ্ট উত্তর কোথায় পাইব এ প্রশ্নের? তবে মীরার কেশের, বসনের সুবাস যে সমস্তই মুক্ত বায়ুতে অপচয় হইয়া যাইতেছে না, নিশ্চয়ই একজনের মর্ম্মকে যে ব্যাকুল করিতেছে, আবিষ্ট ধ্যানের মধ্যে মীরার এ চৈতন্যটা নিশ্চয় সজাগ ছিল—সব যুবতীরই থাকে—এবং এই সূত্রে আমি তাহার অন্তরের সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম যোগ অনুভব করিতেছিলাম।

বেহালা পার হইয়া আমরা বাহিরে আসিয়া পড়িলাম। রাস্তার ধারে আর বাড়ি নাই, ছোট-বড় বাগান, ঘন পল্লবিত তরুলতায় পূর্ণ। প্রায় মাইল চারেক এই রকম গিয়া ফাঁকা মাঠ আসিয়া পড়িল। শুধু রাস্তাটুকু বাদ দিয়া সে সবুজের সমারোহ দুই দিকে আরম্ভ হইয়াছে সেটা শেষ হইয়াছে একেবারে দিক্‌রেখার নীলিমায় গিয়ে। মাঝে মাঝে ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে পল্লী, মেটে দেওয়ালের ওপর গোলপাতায় ছাওয়া ধনুকাকৃতি চাল, ছোট ছোট পুকুর, বিচালির গাদা; এক-আধটা পাকা বাড়িও আছে—রংকরা চারিদিকের সবুজের গায়ে যেন ঝিকমিক করিতেছে। সবার উপর মাথা ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে অসংখ্য নারিকেলের গাছ, হাওয়ায় দুলিয়া দুলিয়া অস্তমিত সূর্যের রশ্মি যেন সর্বাঙ্গ দিয়া মাখিয়া লইতেছে।

ড্রাইভার প্রশ্ন করিল, "ফিরব এবার? প্রায় বার-তের মাইল এসে পড়েছি।"

আমি মীরার পানে চাহিলাম। মীরা প্রশ্ন করিল, "কাজ আছে নাকি তেমন কিছু?"

উত্তর করিলাম, "কী আর কাজ?"

ড্রাইভার আগাইয়া চলিল। মীরা প্রশ্ন করিল, "বরং একটু আস্তে ক'রে দাও।" মীরার দৃষ্টিটা আজ অদ্ভুত রকম নরম অথচ কি দিয়া যেন পূর্ণ। কয়েক দিন হইতে মনে হইতেছে মীরা দীর্ঘ বিদায়ের পূর্বে কিছু বলিয়া যাইতে চায়, অথবা যেন চায় আমি কিছু বলি,—এইটেই বেশি সম্ভব। প্রয়োজনীয় সাহস সঞ্চয় করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। মীরা আজ কি আমায় একটা চরম সুযোগের সম্মুখীন করিয়া দিতেছে? ও আজ সাজিয়াছে, সাদাসিধার উপর নিখুঁতভাবে নিজেকে মানাইয়া যেমন সাজিতে পারে ও। একটা অদ্ভুত মৃদু এসেন্স মাখিয়াছে যাহা ওর চারিদিকে একটা স্বপ্নের মোহ বিস্তার করিয়াছে। মীরার আসাতেও আজ একটা সুমিষ্ট লজ্জা ছিল; আমায় প্রশ্ন নয়, তরুকে,—"তরু, তোমাদের মোটরে একটু জায়গা হবে?"

একটা বেশ বড় গ্রাম পার হইয়া গেলাম, নামটা উদয়পুর বা ঐ রকম একটা কিছু ফলতা-কালীঘাট ছোট লাইনের একটা স্টেশন আছে। গ্রামটা পারাইয়া খানিকটা যাইতে রাস্তার ধারে একটা মাইলস্টোনের দিকে চাহিয়া তরু বলিল, "উঃ, সতের মাইল এসে গেছি!"

মীরা ড্রাইভারকে বলিল, "এবারে তাহ'লে ফের।"

আবার প্রশ্ন করিল, "একটু নামবেন নাকি?"

যাহা যাহা চাই সে-সব আপনিই হইয়া যাইতেছে, বলিলাম, "মন্দ হয় না, হাত-পা যেন আড়ষ্ট হ'য়ে গেছে।"

অপূর্ব জায়গা! সন্ধ্যা হইয়াছে; কিন্তু মনে হইল সন্ধ্যার আবির্ভাব হয় নাই, আমরাই যেন মায়ারথে চড়িয়া সন্ধ্যায় নিজের দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। মীরা একবার মুগ্ধবিস্ময়ে চারিদিকে চাহিল, তাহার পর প্রশ্ন করিল, "আজকেও তরুকে পড়াবেন নাকি?"

অবশ্য না পড়াইবার কোন হেতু নাই, কিন্তু উত্তর করিলাম, "নাঃ, আজ আর..."

"তাহ'লে একটু বসা যাক না, কি বলেন?"

আমরা রাস্তার ধারে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখিয়া বসিলাম, যেমন মোটরে বসিয়াছিলাম,—মাঝখানে তরু শুধু; তিনজনের মধ্যে ব্যবধানটা আর একটু বেশি।

এক সময় অন্ধকার একটু গাঢ় হইলে পূর্বচক্রবালরেখা ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়বার চাঁদ উঠিল।

অল্পে অল্পে মীরা হইয়া উঠিল মুখর। তরুর মাথার উপর দিয়া সোজা আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "অন্যের কথা জানি না, কিন্তু আমার তো মনে হয় শৈলেনবাবু যে, সন্ধ্যে আর চাঁদ বলে যে দুটো জিনিস আছে, কলকাতায় থেকে সে-কথা আমি ভুলেই গিছলাম।"

মীরার মুখে উদীয়মান চন্দ্রের দীপ্তি প্রতিফলিত হইয়াছে; তাহার উপর রহস্যময় আরও একটা কিসের দীপ্তি। মীরা কালো, এই চন্দ্রালোকিত ধূসর সন্ধ্যার সঙ্গে তাহার চমৎকার একটা মিল আছে। আমার দৃষ্টি যেন স্খলিত হইয়া তাহার মুখের উপর সেকেণ্ড কয়েক পড়িয়া রহিল, তাহার পরই আত্মসংবরণ করিয়া আমি চক্ষু দুইটা সরাইয়া লইলাম, সামনে নিবদ্ধ করিয়া বলিলাম "বলেছেন ঠিক, সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা ক'রে নেবার জন্যে যে স্নিগ্ধশিখা প্রদীপের দরকার তা কলকাতায় নেই; সন্ধ্যাকে দূর থেকে বিদেয় করবার জন্যেই সে যেন তার বিদ্যুৎআলোয় চোখ রাঙিয়ে ওঠে...আমিও যেন অনেক দিন পরে দুটো হারানো জিনিস ফিরে পেলাম...যেন..."

এক মুহূর্ত একটু থামিলাম, তারপর নিজের চিন্তাটাকে পূর্ণ মুক্তি না দিয়া পারিলাম না, বলিলাম, "সব দিক দিয়ে মনে হচ্ছে বিধি হঠাৎ বড় অনুকূল হ'য়ে উঠেছেন আজ..."

অতি পরিচিত একটা সংগীতের একটা সমস্ত পংক্তি তুলিয়া বলিয়াছি, মীরা সলজ্জ দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল; একটা কিছু না বলিবার অস্বস্তিটা এড়াইবার জন্যই সামনের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?"

জীবনের এইগুলি অমূল্য মুহূর্ত, কিন্তু মাঝখানে আছে তরু। আর, অনিশ্চিতের আশঙ্কাও তখন সম্পূর্ণভাবে যায় নাই, মাত্র একটি সুযোগে সব সময় যায়ও না। একটু অন্তরালে থাকুক, সবটা আর পরিষ্কার করিব না। আজ মীরা যে মন আনিয়াছে তাহাকে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছে ওটা আমার অন্তরের সংগীতের একটা কলি—"আজু বিহি মোরে অনুকূল ভেয়ল।" বাকিটা থাক না একটু অস্পষ্ট—আজকের সন্ধ্যার মত, এই নূতন জ্যোৎস্নার মত।

মীরার প্রশ্নে আমি একটু মুখ নীচু করিয়া রহিলাম—ও বুঝুক সত্যটা গোপন করিয়া একটা মিথ্যা রচনা করিয়া বলিতেছি; তাই কুণ্ঠা, তাই বিলম্ব। একটু পরে তরুর মাথার উপর দিয়া ওর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "বিধি অনুকূল এইজন্য বলছি যে, এত দিন বঞ্চিত থাকবার পর একেবারেই অমন চমৎকার সূর্যাস্ত দেখলাম, আবার এমন সুন্দর চন্দ্রোদয় দেখছি।"

মীরাও একটু মুখ নীচু করিয়া রহিল, তাহার পর স্মিত হাস্যের সহিত একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "আপনি কবি..."

আমি বলিলাম, "কবির যশ ততটা কবির প্রাপ্য নয় মীরা দেবী, যতটা প্রাপ্য সেই মানুষের বা অবস্থায় যা তাকে কবি ক'রে তোলে।"

মীরা আর মুখ তুলতে পারিল না। একটু সময় দিয়া আমিও কথাটা বদলাইয়া দিলাম, বলিলাম, "আর বিশেষ ক'রে আজ তো কবি-যশে আমার মোটেই অধিকার নেই; ভুললে চলবে কেন যে আজকের মূলকাব্য আপনার—আপনিই সন্ধ্যে আর চাঁদের কথা তুললেন, আমি যা বলেছি তা তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছি মাত্র, আমায় হদ্দ আপনার কাব্যের-টীকাকার বলতে পারেন।"

মীরা ঘাসের উপর পা দুইটা ছড়াইয়া দিল—। শরীরে একটা ছোট আন্দোলন দিয়া হাসিয়া বলিল, "নিন, কবি চুপ কবলে, কে এমন টীকাকারের সঙ্গে কথায় এঁটে উঠবে বলুন।"

এইটুকুর মধ্যে কী যে একটা পরিবর্তন ঘটিয়াছে—মীরাকে কত যেন ছেলে-মানুষের মত দেখাইতেছে, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা আর স্বভাবের গাম্ভীর্যের জন্য যে মীরাকে বয়সের অনুপাতে একটু বড়ই দেখায়।...চাঁদ আরও অনেকটা উপরে উঠিল, জ্যোৎস্না হইয়াছে আরও স্বচ্ছ।...খানিকটা দূরে মোটরটা দাঁড়াইয়া আছে, ড্রাইভার ফুরফুরে হাওয়ায় গা এলাইয়া সীটের উপর লম্বালম্বি শুইয়া পড়িয়াছে, পা দুইটা বাহির হইয়া আছে। তরু একটু আবিষ্ট, স্পষ্ট বুঝিতেছে না, কিন্তু বেশ উপভোগ করিতেছে আমাদের কথাগুলা,—কথা-বার্তার মধ্যে হাসি থাকিলে ও বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া উপভোগ করে, গাম্ভীর্য আসিলেই শঙ্কিত হইয়া ওঠে। একবার হঠাৎ কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "মেজগুরুমার বয়কে দেখলাম দিদি, এত আমুদে লোক?"

বাহ্যত কথাটা এতই অপ্রাসঙ্গিক যে আমরা উভয়েই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "এর মধ্যে তোমার মেজগুরুমা আর মেজগুরুমশাই কোথা থেকে এলেন তরু?"

তাহার পর তরুর উচ্ছ্বাসের উৎসটা কোথায় বোধ হয় সন্ধান পাইয়া একটু লজ্জিত হইয়া পড়িল এবং একটা ঘাসের শীষ তুলিয়া দাঁতে খুঁটিতে লাগিল।

...কী চমৎকার একটা রজনী যে আসিয়াছিল জীবনে!...

যেন আরও ছেলেমানুষ হইয়া গিয়াছে মীরা। ওর সঙ্গে কথা কহিতে আর ভয়-ভরসার কথা মনেই আসে না; ছেলেমানুষকে যেমন না বলিলে চলে না সেই ভাবে কতটা হুকুমের ভঙ্গিতেই বলিলাম, "যেখান-সেখান থেকে যা-তা তুলে নিয়ে দাঁতে দেবেন না; ওতে..."

মীরা সঙ্গে সঙ্গে আমার পানে চোখের কোণ দিয়া লজ্জিত ভাবে চাহিল, তাহার পর অবাধ্য বালিকা যেমন ভাবে বলে কতকটা সেইভাবে ঈষৎ হাসিয়া এবং চিবুকটা বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "আমি দোব; আপনি তরুর টিউটর তরুকে শাসাবেন।"—বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই তাহার অবাধ্যতার একটা নমুনা দাখিল করিবার জন্যই যেন হাতের খণ্ডিত শীষটা ফেলিয়া দিয়া আর একটা বড় শীষ খুঁটিয়া দাঁতে দিল। তরু হাসিয়া একবার বোনের মুখের পানে চাহিয়া আমার দিকে চাহিল। বলিলাম, "দিদির মত কখনও অবাধ্য হয়ো না তরু।"

মীরা গম্ভীর হইয়া বলিল, "হ্যাঁ, সবাইকে গুরুজন বলে মনে করবে, আর..."

গাম্ভীর্য রক্ষা করিতে পারিল না, হাসিয়া মুখটি ওদিকে ফিরাইয়া লইল।

এ-সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল মীরা, যতটা পারিলাম সদ্ব্যবহার করিলাম। এর পরে বিধাতা সুযোগ সৃষ্টি করিলেন।—

কতকগুলি চাষাভূষা লোক আমাদের পিছনের মাঠ দিয়া আসিয়া রাস্তা পার হইয়া বোধ হয় সামনের কোন এক গ্রামে যাইতেছিল, রাস্তায় মোটর দেখিয়া কৌতূহলবশে একটু ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল ড্রাইভারের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া মোটরের রহস্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ লাগাইয়াছে।

তরু প্রশ্ন করিল, "কারা ওরা দিদি? কি এত জিজ্ঞেস করছে? মোটর দেখেনি কখনও?"

মীরা বলিল, "ওরা চাষা।"

তরু ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "চাষা কখনও দেখিনি দিদি, যাব দেখতে?"

দু-জনেই হাসিয়া উঠিলাম। মীরা বলিল, "মন্দ নয়, চাষারা মোটর দেখেনি, তুমি চাষা দেখনি—অবস্থা প্রায় একই দাঁড়াল। যাও।"

তরুর কৌতূহল মিটাইতে অনেকক্ষণ লাগিল। জ্যোৎস্না আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল। হাওয়াটা আর একটু জোর হইয়া উঠিয়াছে, মীরার কানের দুল চঞ্চল হইয়াছে, সিঁথির রেখা চূর্ণ কুন্তলে এক-একবার অবলুপ্ত হইয়া আবার বেশি করিয়া দীপ্ত হইয়া উঠিতেছে,—একখানি মুক্ত অসির ঝলমলানি।...দু-জনেই সামনে চাহিয়া আছি, খুব বেশি কথা বলিবার সময় একেবারে হইয়া গেছি নীরব। দেখিতেছি চক্ষের সামনে বিশ্ব-প্রকৃতি আমূল পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে—বাস্তব হইয়া পড়িতেছে যেন স্বপ্ন, আর জীবনের যাহা কিছু এতদিন ছিল স্বপ্ন হইয়া, এইবার যেন বাস্তব হইয়া মূর্তি পরিগ্রহ করিবে...

ঘাসের উপর মীরার ডান হাতটা আলগাভাবে পড়িয়া আছে, আঙুল কয়টি হালকা মুঠির মধ্যে গুটাইয়া লইয়া ডাকিলাম, "মীরা..."

"কি বলছেন?"—বলিয়া স্বপ্নালু দৃষ্টি আমার পানে ফিরাইল।

কি বলি?—কি ভাবেই বা বলি?...মীরার হাতটা বুকের আরও কাছে টানিয়া কি একটা বলিব—এখন ঠিক মনে পড়িতেছে না, তরু ছুটিয়া বলিল, দিদি, ড্রাইভার "বলছে মেঘ উঠেছে দক্ষিণ দিকে।"

দেখি সত্যই মেঘ উঠিয়াছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া আমরা মোটর আশ্রয় করিলাম।

বাসায় আসিয়া ঘরে ঢুকিতে রাজু বেয়ারা আসিয়া চেয়ার-টেবিলগুলো ঝাড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। যেন সহসা মনে পড়িয়া গিয়াছে এইভাবে বলিল, "ব্লটিং-প্যাডের নীচে একটা চিঠি রেখেছিলাম, পেয়েছেন মাস্টার-মশা?"

দিতে ভুলিয়া গিয়া সামলাইতেছি। আমি প্যাড দেখিবার পূর্বে নিজেই বাহির করিয়া দিল।

অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—একটা সুখবর আছে, সৌদামিনী বিধবা হইয়াছে।

৫

কবে সুদুর হিমালয়ের কোন এক অজ্ঞাত পল্লী হইতে এক পুত্রহারা জননী ব্যর্থ-সন্ধানের নিরুদ্দেশ যাত্রা করিয়াছিল। ঘটনাটি আকস্মিক, কিন্তু আমার জীবনে এর প্রভাব আছে; অল্প নয়, বহুল পরিমাণে।

ভুটানী না আসিলে মীরার আপাতত রাঁচি যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

মীরার রাঁচি যাওয়া আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ঘটনা। প্রথমে ভাবিয়া ছিলাম আসুকই না একটু বিরহ, মীরা যে-স্মৃতিসম্পদ দিয়া যাইতেছে তাহাকে পূর্ণ ভাবে পাওয়ার জন্য অবসর চাই না?"

কিন্তু বিচ্ছেদ কি শুধু স্মৃতিকেই পুষ্ট করে?

কলিকাতায় এই কয়টা মাসে অনুকূল প্রতিকূল নানা ঘটনার মধ্য দিয়া একটা বিশেষ অবস্থা এবং একটা পরিচিত সামাজিক গণ্ডির মধ্যে আমি আর মীরা যেন পরস্পরের অভ্যাস হইয়া গিয়াছিলাম। রাঁচিতে মীরা নিজেকে নিজেদের অভিজাত সমাজে আবার নূতনভাবে দেখিবার সুযোগ পাইল।

আবার ভাবি আমাদের উভয়ের জীবনে বোধ হয় এইটুকুর প্রয়োজন ছিল। বিনা প্রয়োজনে কোন্ ঘটনাই বা ঘটে জীবনে?...

কিন্তু থাক্ একথা এখন, যথাস্থানেই আলোচনা হইবে।

মিস্টার রায় সকলকে রাঁচিতে রাখিয়া আসিবার দুই দিন পরে তরুর চিঠি পাইলাম। মীরার চিঠির অপেক্ষায় আরও কয়েক দিন থাকিতে হইল। তাহার পর আসিল একদিন চিঠি।

মীরা উচ্ছ্বসিত রাঁচির কথা লিখিয়াছে। ওদের বাসাটা রাঁচি হাজারিবাগ রোডে; খুব চমৎকার

ফাঁকা জায়গা। সামনেই মোরাবাদী পাহাড়। ওরা গিয়াছিল একদিন বেড়াইতে এর মধ্যে। পাহাড়ের উপর মহাপ্রাণ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ি। আরও উঠিয়া গেলে, পাহাড়ের একেবারে শীর্ষদেশে চারিদিকে খোলা একটি চমৎকার মন্দির, এইখানে বসিয়া তিনি উপাসনা করিতেন। এইখান হইতে নীচের চারিদিকের দৃশ্য যে কী চমৎকার বলিয়া বুঝানো যায় না। কৃষ্ণনগরের গড়া, বাগান দিয়া ঘেরা মডেল পুতুল-বাড়ির মত দূরে কাছে বাড়ি সব—বাগানে পুতুলের মত মালী কাজ করিতেছে—কোন বাড়ির গেটের ভিতর খেলনার মোটরের মত একটি মোটর প্রবেশ করিল—পুতুলের মত কয়েকজন ছোট ছোট মানুষ নামিয়া ভিতরে গেল। সামনে চাহিলে অনেক দূরে দেখা যায় রাঁচি শহর, মাঝখানে রাঁচি হিল। তাহার চূড়ায় মন্দির। আরও অনেক দূরে কাঁকের নবনির্মিত পল্লী। অনেক দূর পর্যন্ত আকাশ আর চারিদিকে সুবিস্তীর্ণ উঁচুনীচু পল্লী দেখিয়া মনটা আপনা-আপনিই যেন কিসে ভরাট হইয়া আসে। মীরার অসুবিধা হইয়াছে যে সে কবি নয়, তাহারও উপর অসুবিধা যে একজন কবির কাছে বর্ণনা করিবার চেষ্টা করিতেছে। প্রথম ছুটিতেই যেন যাই আমি একবার, যদি মনে করি পড়িবার ক্ষতি হইবে তো সে ক্ষতি স্বীকার করিয়াও।

সবচেয়ে ভাল খবর, মা ভাল আছেন, এত প্রফুল্ল তাঁহাকে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মীরার মনে পড়ে না। ধন্যবাদটুকুও আমার প্রাপ্য। নিশীথবাবুর বাড়িটা চমৎকার, কয়েকদিন হইল মায়ের জবানীতে ধন্যবাদ দিয়া তাঁহাকে পত্র দেওয়া হইয়াছে।

চিঠিতে ডায়মণ্ডহারবার রোডের দিক দিয়াও যায় নাই মীরা, যদি যাইত তো শ্রদ্ধা হারাইত আমার।

অনিলের পত্রের উত্তর দিতে একটু বিলম্ব হইল, কেন-না মীরার চিঠির সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লিখলাম ঃ

"অনিল,

সৌদামিনীর, বৈধব্যের খবরটা কি আগাগোড়াই সুখবর? ভগবান সুস্থভাবে চলাফেরা করবার জন্যে দুটি ক'রে পা দিয়েছেন; কিন্তু এমন হতভাগাও তো আছে যাদের এই কাজটুকুর জন্যে একজোড়া কাঠের ক্রাচই সম্বল? এখন সেই ক্রাচ-বেচারির আসল পা নয় বলে সে দুটির ওপর চটলে চলবে কেন?...সৌদামিনীর পঁচাত্তর বৎসরের স্বামী বা তোর দিক দিয়া বলতে গেলে স্বামী পদবাচ্য জীবটি তার ঠিক স্বামী না হ'তে পারুক, একটা মস্ত অবলম্বন ছিল যার জোরে সদু দাঁড়িয়েছিল, ভুঁয়ে গড়িয়ে পড়েনি। এইবার ওর সেই দুর্দিন এল।

সৌদামিনীর বৈধব্য সম্বন্ধে এইটুকু অভিমত দিয়া মীবার কথাও একটু লিখিয়া দিলাম, উদ্দেশ্য আরও স্পষ্ট করিয়া দেওয়া যে অনিল স্কুলের মাঠে সদুর সম্বন্ধে যাহা উচ্ছ্বাসের মুখে বলিয়াছিল, সেদিক দিয়া আর কোন আশাই নাই। লিখিলাম—

"এদিককার খবর এই যে, মীরারা গেছে রাঁচি, বোধ হয় মাসখানেক থাকবে। যাবার আগের দিন ও আমায় এমন একটা জিনিস দিয়া গেল যা রক্ষা করতে হ'লে আমার আর সব কথাই ভুলতে হবে। এই জিনিসটি পাওয়ার জন্যেই আমার এই এত দিনের তপস্যা, তোকে আমি সে কথা বলেও ছিলাম। এ-ভোলার মধ্যে কর্তব্যহানি এসে পড়বে বোধ হয়, কিন্তু সে অপরাধ আমি নিরুপায় হ'য়েই করলাম এইটে জেনে আমায় মার্জনা করিস।"

কয়েকবার পড়িয়া গেলাম, তাহার পর অন্য একটা কাগজে শুধু উপরের কথাগুলি অর্থাৎ সদুর বৈধব্য সম্বন্ধে আমার মন্তব্যটুকু লিখিয়া চিঠিটা পাঠাইয়া দিলাম। দেখিলাম ওইটুকুতেই আমার

উদ্দেশ্যটা বেশ স্পষ্ট হইয়া আছে, বেশি বাড়াইয়া বলিবার দরকার নাই।

একটা কথা আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহা এই যে, মীরা আসিয়াছে পর্যন্ত অনিলের সঙ্গে আমি লুকোচুরি করিতেছি, কথা বলিতেছি মাপিয়া জুখিয়া কাটাছাঁট করিয়া; না লুকাইবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কোথায় কি যেন আপনিই আটকাইয়া যাইতেছে। ভাবি কেন হয় এমন? মীরাকে কাছে আনিতে, অনিল কি দূরে সরিয়া যাইতেছে? প্রশ্নটা অন্যদিক দিয়া করিলে এই রকম দাঁড়ায়—জীবনে প্রিয়তম কি শুধু একজনই হয়?

একটা দিন বাদ দিয়াই অনিলের উত্তর আসিল। লিখিয়াছে—"সত্যটাকে তুই পুরোপুরি দেখতে পাস্‌নি, দেখেছিস্ তার অর্ধেকটা। আসল কথা আমাদের দেশে মাত্র পুরুষ মানুষেরই পা আছে, মেয়েদের নেই। এই কথাটা শাস্ত্র নানা ভাবে যুগ যুগ ধরে প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রে এসেছে। পা নেই বলে—কিংবা আরও ঠিক ভাবে বলতে গেলে, পা যে নেই এই সিদ্ধান্তটা নানা উপায়ে সাব্যস্ত ক'রে মেয়েদের জন্যে আগাগোড়া পরিবর্তনশীল ক্রাচের ব্যবস্থা করেছে—যেমন বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী, বার্ধক্যে পুত্র। এর মধ্যে আগের আর শেষের দুটি বিধাতার হাতে, মাঝেরটি সমাজ রেখেছে নিজের আয়ত্তের মধ্যে। ব্যবস্থাটার দোষ-গুণ নিয়ে আমি আলোচনা করছি না এখানে। আমার কথা হচ্ছে—যদি সমাজই এ ভার নিয়ে থাকে তো মেয়েদের এ-বিষয়ে স্বাধীনতা যদি না দেয় তো, এই যে একটা সুস্থ সবল "রোগী"র জন্যে ঘুণ-ধরা ক্রাচের ব্যবস্থা করা হ'ল এ প্রবঞ্চনার কে জবাবদিহি করবে? সদুর ক্ষেত্রে জবাবদিহি কেউ চাইবেও না, কেউ দেবেও না, বরং সমাজের যদি অনার্স লিস্ট বের করবার ক্ষমতা থাকত তো ভাগবত হালদার অচিরেই নাইট উপাধিতে ভূষিত হ'ত, কেন-না সে যা শিভ্যালরির কাজ করেছে তা মধ্যযুগের ইউরোপীয়ান নাইটের দ্বারাই সম্ভব ছিল। আমি জানি এসব কথা, তাই সাজা-পুরস্কারের কথা না তুলে, নবীনের কাছে আপীল করেছিলাম যে (আমি ভেবেছিলাম) সে যৌবনের স্পর্ধিত-বিক্রমে এই অন্যায়ের একটা সমাধান করতে পারবে। সদু যদি শুধুই বিধবা হ'ত তো আমি তাও করতাম না, করলাম এই জন্যে যে ওর বৈধব্য-যন্ত্রণার শেষে আছে ভাগবত প্রাপ্তি।

"আজকাল আমাদের হাসপাতালের চার্জে একজন নতুন ডাক্তার এসেছে। সে রোগীদের ভাল করবার জন্যে এমন উঠে পড়ে লেগেছে যে, রোগীদের একটা আতঙ্ক এসে গেছে এবং সুস্থ মানুষেরা প্রাণপাত ক'রে চেষ্টা করছে যাতে রোগী হ'য়ে না পড়তে হয়। ডাক্তার বাড়ি বাড়ি ঘুরে দু-বেলা কুশল-সংবাদ নিয়ে বেড়াচ্ছে, এবং ঘুণাক্ষরেও কোথাও রোগের আঁচ পেলেই হয় আউটডোর নয় ইন্‌ডোর পেশেন্ট ক'রে ভর্তি ক'রে ফেলছে। লোকেরা খাতিরে পড়ে কিছু বলতে পারছে না—একটা অতবড় ডাক্তার গভর্ণমেন্ট হাসপাতালের চার্জে রয়েছে—সে এসে যদি দু-বেলা তোমার জন্যে তোমার চেয়েও উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়ে তো কি রকম একটা বাধ্যবাধকতায় পড়ে যেতে হয় ভেবে দেখ না। মনে হয় না যে অসুখে না পড়ে কত বড় একটা অন্যায় করছি? এর ওপর বিপদ হয়েছে লোকটা রোগ সারাতে পারে না এবং তার চেয়েও বিপদের কথা এই যে, সারাতে না পারা পর্যন্ত ছাড়ে না। আউটডোর পেশেন্টরা দেখতে দেখতে ইন্‌ডোরের বিছানা ভর্তি ক'রে ফেলেছে এবং ইন্‌ডোর পেশেন্টদের মনের ভাবটা এই যে, যদি যমের দোর দিয়েও তারা বেরিয়ে পড়তে পারে তো বাঁচে।...পরশু একটা ইন্‌ডোর পেশেন্ট রাত দুপুরে জানালা টপকে পালাবার চেষ্টা করেছিল, তার ধারণা ছিল তার কোন রোগ নেই অথচ তাকে নাহক আটকে রাখা হয়েছে। এখন তার সে ভুল ধারণাটা গেছে, পা ভেঙে কায়েমী ভাবে পড়ে আছে হাসপাতালে। একটা এমন ত্রাহি-ত্রাহি ডাক পড়ে গেছে যার তুলনা শুধু কলকাতায় দাঙ্গার সঙ্গে হতে পারে। যার যেখানে আত্মীয়স্বজন আছে সেখানে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে বাড়ি খালি ক'রে ফেলছে।

"অবশ্য ভাগবত হালদারের সঙ্গে পরেশ ডাক্তারের তুলনা হ'তে পারে না, তবু উপকারীর হাত থেকে মুক্তির সমস্যার কথায় পরেশ ডাক্তারের কথা মনে পড়ে গেল। মুক্তি সম্বন্ধে আমি তোর

কথা ভেবেছিলাম অনেক কারণে প্রথমত, এখানে 'রোগী' আমাদের সৌদামিনী, আমাদের ছেলেবেলোকার 'সদী'।

"দ্বিতীয়ত, সৌদামিনী দুর্লভ স্ত্রীরত্ন, গলায় হার ক'রে পরবার জিনিস। ওর মত মুক্ত-প্রকৃতির স্ত্রীলোক ক'টা পাওয়া যায় সংসারে? ওর অভিজ্ঞতা, আর সেই অভিজ্ঞতার মধ্যেও অমন নিষ্কলুষ শুদ্ধি। আর জানিস্?—তোকে কথাটা বলেছি কিনা আমার মনে পড়ছে না—সদু শিক্ষিতা। 'শিশুশিক্ষা' আর 'ধারাপাত' পড়া নয়—বাঙালী শিক্ষিত মেয়ে বলতে সাধারণত যা অর্থ দাঁড়ায়; সদু সংস্কৃত খুব ভাল জানে। ভাগবত সৌখীন মানুষ, সংস্কৃত কাব্যে সদুকে বেশ ভাল রকম তালিম দিয়ে রেখেছে, এদিকে বৈষ্ণব সাহিত্যেও। উদ্দেশ্যটা নিশ্চয় এই যে, যখন নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাতে-কলমে কৃষ্ণপ্রেম চর্চা করবে, তাতে কোন গ্রাম্যতা দোষ না এসে পড়ে। তারপর জ্ঞানের একটা স্পৃহা জাগায় চুরি ক'রে ইংরাজীও শিখেছে ও অল্প অল্প। তুই লক্ষ্য করেছিস্ কি না জানি না, সদু যখন কথা বলে মাঝে মাঝে শুদ্ধ শব্দ এসে পড়ে, যদিও ওর বরাবর চেষ্টা থাকে ওর শিক্ষা-সংস্কৃতির কথা কেউ টের না পায়। হেন অমূল্য রত্ন কোন্ ধূলায় গড়াগড়ি দেবে?

"ওকে গ্রহণ করতে বলার—আরও স্পষ্ট ক'রে বলি, বিয়ে করতে বলার অন্য উদ্দেশ্যও ছিল—সমাজকে একটা আঘাত দেওয়া, এমন একটা আঘাত দেওয়া যাতে সমাজকে জেগে উঠে বিস্মিত, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অপলক ভাবে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকতে হবে। আঘাত অন্যভাবে দেওয়া যেত, সদুকে রেফিউজে ভর্তি ক'রে দিয়ে বা হিন্দু মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে সহজেই একটা বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারা যেত; ভাগবত হ'ত নিরাশ, সমাজ একটু চোখ রগড়াত, কিন্তু তাতে আমার আশ মিটত না! আমি চাই আঘাত হবে রূঢ় এবং তা করতে হ'লে এমন একজন এসে সমাজের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে এই সদ্য বিধবাকে গ্রহণ করতে যে বংশে, মর্যাদায়, শীলে, শালীনতায়, শিক্ষায় সমাজের একজন আদর্শ যুবা যার এই দুঃসাহসিকতা দেখে সমাজ যেমন স্তম্ভিত হবে, তেমনি অপর দিকে যাকে হারাবার ভয়ে সমাজের বুক উঠবে কেঁপে। আমি এই জন্যে বিশেষ ক'রে বেছেছিলাম তোকেই। সদুর প্রতি অন্যায় হয়েছিল—সদুর মত মেয়ের প্রতি। শুধু তো সদুর ক্ষতি-পূরণ করলে চলবে না, যে সমাজ এই অন্যায় হ'তে দিয়েছিল, তার প্রতিও যে আমাদের একটা আক্রোশ আছে। শুধু ক্ষতিপূরণে হবে না, তার ওপর চাই আক্রোশের আঘাত। তা না হ'লে সৌদামিনীর মত অত্যাচারিত হয়ে আজ পর্যন্ত যত নারী মরেছে সদুরও জীবনের যে দেবদুর্লভ অংশ এই অর্ধযুগ ধরে তিলে তিলে দগ্ধ হ'য়ে ছাই হ'য়ে গেছে, তাদের তর্পণ হবে না। এই যুগের নারী প্রতিনিধি হিসাবে সদু তার এই অর্থহীন সদ্য-বৈধব্যকে অস্বীকার ক'রে নিতান্ত শুদ্ধ শুচি কুমারীর মতই এসে দাঁড়াবে আর পুরুষের প্রতিনিধি হিসেবে তুই তার গলায় মালা দিয়ে তুলে নিবি। সমাজের বিস্মিত নীরব প্রশ্নের এই হবে উত্তর—অর্থাৎ এ-অত্যাচার এ-যুগের আমরা সহ্য করব না।

"আমার ছিল এই উদ্দেশ্য; আশা ছিল সৌদামিনীর মধ্যে দিয়ে জীবনে যে দারুণ আঘাত পেলাম তার একটা সুফল ফলবে, কেন না শক্ত রকম সব আঘাতেরই একটা সুফল আছে শোনা যায়।...নিরাশ হলাম, আমারই ভুল হয়েছিল। কবি, সে এতদিন প্রণয়ের স্বপ্ন নিয়ে ছিল; এখন যখন সেই স্বপ্ন হ'তে চলল বাস্তব, তার কাছে এসব বাজে কথা তোলা উপদ্রব নয় কি? আমাদের আপিসের বীরু গাঙ্গুলীর কথাটা আমার মনে পড়ে যাওয়া উচিত ছিল। বীরু ছিল আন্‌পেড, অ্যাপ্রেন্টিস্! যেদিন তার মাইনে হবার খবর বেরুল সেদিন লড়াইয়ে বাঙালী পল্টন হ'য়ে ভর্তি হবার ফরম্ আপিসে এল। বড়বাবু একটু উঠে-পড়ে লাগলেন। বীরু হাতজোড় ক'রে বললে, "স্যার কাল পর্যন্ত বললে যে-কোন বীরত্বের কাজ করতে বীরু পেছপা ছিল না, দু-বচ্ছর এই পনরটি টাকার স্বপ্ন দেখে যেই ফলল স্বপ্নটা আর সঙ্গে সঙ্গে লড়াইয়ে চল?"

"কাল পর্যন্ত বললে হ'ত একথা অবশ্য তুই বলতে পারবি না, কেন না সদুর কথা তোকে অনেক দিনই বলে রেখেছি। তবে তোতে আর বীরুতে তফাত আছে নিশ্চয়, সে তবুও কেরানী,

তুই একেবারে কবি।

'অম্বুরী বলেছে—এবার যদি ঠাকুরপো আসতে মাসখানেকের বেশি দেরী করেন তো সদলবলে গিয়ে সবাই উঠবে, আর তো ঠিকানা নুকুন নেই।' মা একরকম ভালই আছেন। সানু তোর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে খুব বড়াই ক'রে বেড়ায়, বলে—'শৈল টাকা খুব বা-আ-ডুর, এট্টো বড়ো বন্দুক আছে।'.. কত যে বাহাদুব আর বলিনি। আমার ছেলে যদি কখনও গ্রামের ইতিহাসের এ অংশটা জানতে পারে আর আমার দৃষ্টি পায় তো নিজেই বিচাব করতে পারবে।"

অত্যন্ত চটিয়াছে অনিল। দুঃখ হল। কিন্তু আমি যে কত অসহায় হইয়া পড়িয়াছি তাহা কি কোনদিন ও বুঝিবে না? ওর তো বোঝা উচিত, কেন না ও-ও তো একদিন ভালবাসিয়াছিল। ওকে যদি জিজ্ঞাসা করি—আজ পর্যন্ত সৌদামিনীর দুঃখ ওর প্রাণে অত বাজে কেন, তাহা হইলে কি ও আমার অন্তবেব বেদনা বুঝিতে পাবিবে না। ওর এটা কি শুধুই কর্তব্যের তাগিদ? শুধুই সমাজ-সংস্কার? শুধুই সদুব মত নাবীবত্নেব ক্ষতিপূরণ?

৬

দেখিতেছি বিরহ জিনিসটা যতই কবিত্বময বলিয়া মনে কবিয়াছিলাম আসলে ততটা নয়, যদি বলি তাহার অর্ধেকও নয় তো নিতান্ত মিথ্যা বলা হয় না। নেহাৎ আবহমান কাল হইতে নানা লোক বলিয়া আসিয়াছে বটে তাই, নতুবা এক-বাব মনে হয় ইহাতে কবিত্বের একেবারেই কিছু নাই।

রীতিমত কষ্ট হইতেছে। কলেজে যখন থাকি এক রকম চলিয়া যায়, বাকি সর্বক্ষণই মনটা হু-হু করিতেছে। এ-ধবনের অভিজ্ঞতা জীবনে কখনও ছিল না। মীরার কথা চিন্তা করিতে লাগে ভাল, কিন্তু এই স্মৃতি-মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া দুই-তিনটা মাস কাটাতেই হইবে ভাবিলেও আতঙ্ক হয়। কবিতা পর্যন্ত একটাও লিখিতে পারি নাই, এবং এক সময় এই বিরহ লইয়াই কি করিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া পদ্য লিখিয়াছি ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এই জিনিসটাই আবার সবচেয়ে বেশি কথা যোগাইত।...একটা মজার কথা মনে হইত' এখন দেখিতেছি সেটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অন্যে যখন লড়ে, বসিয়া বড় বড় মহাকাব্য বেশ সৃষ্টি করা যায়। নিজে লড়িয়া সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে গেল মারিয়া রিমার্কের "অল্ কোয়াএট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট"-এর ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই বাহির হইবে না।

অবশ্য রাঁচির খবর খুবই পাই। রাত্রে মিস্টার রায়ের নিকট প্রায়ই খবর পাওয়া যায়। তাহা ভিন্ন তরুর এ বিষয়ে একেবারেই গাফিলতি নাই। দু-তিন দিন অন্তর চিঠি পাওয়া যায়ই—কেমন জায়গা, কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, নূতন কাহাদের সঙ্গে আলাপ হইল, মায়ের কথা, দিদির কথা, কিছুই বাদ যায় না।...মন কিন্তু পড়িয়া থাকে অপর একখানি চিঠির জন্য। কলিকাতা ছাড়িবার ঠিক ছয় দিন পরে পাইয়াছিলাম, এখন নিত্যই ডাক পিয়নের পথ চাহিয়া থাকি, নিত্যই নিরাশ হই।

একদিন সন্ধ্যায় বারান্দায় বসিয়া আছি। বিকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল বলিয়া বাহির হই নাই। কান্নার শেষ অশ্রুর দাগের মত তখনও আকাশে হেথায় হেথায় মেঘের ছোপ লাগিয়া আছে। ইমানুল আসিল। আমার পাশের সেটিটায় একটা বড় গোলাপ ফুল আস্তে আস্তে রাখিয়া দিয়া বলিল, "আলো জ্বালেননি বাবু? দোব জ্বেলে?

ফিরিয়া দেখিলাম ঘরে আলো জ্বালা হয় নাই, বলিলাম, "দাও জ্বেলে।" পরক্ষণেই বলিলাম, "ছেড়ে দাও ইমানুল, এ বেশ বোধ হচ্ছে।"

ইমানুল সামনের থামে হেলান দিয়া বসিল। সত্য কথা বলিতে কি মানুষের সান্নিধ্যও ভাল লাগিতেছিল না, এর উপর যদি আবার পোস্টকার্ড বাহির করে তো ধমক খাইবে।

ইমানুল একটু চুপ থাকিয়া বলিল, "লোক না থাকলে বাড়ি-ঘর-দোর কিচ্ছু না বাবু, লোকই হ'ল বাড়ির জান্।"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। তবুও বসিয়া ইমানুল উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। নিজে থেকেই বলিলাম, "তোমার চিঠিটা কাল লিখে দোব, কাল সকালে এস।"

ইমানুল বলিল, "সেই সওয়ালই করছিলাম বাবু;—চিঠিতে কিছু ফল হবে কি? চিঠি তো..."

বিস্মিত ভাবে চাহিলাম, পাগলামি যে স্পর্ধায় গিয়া ঠেকিতেছে। বোধ হয় একটু রূঢ়ভাবেই প্রশ্ন করিলাম, "চিঠি ছেড়ে তুমি করতে চাও কি?"

অন্ধকারে ভাল করিয়া মুখ দেখা যায় না ইমানুলের, বিষণ্ণ চক্ষু আর সাদা সাদা দাঁতগুলো শুধু স্পষ্ট। অপ্রতিভ ভাবে ঘাড় কাত করিয়া বলিল, "না, তাই বলছিলাম মাস্টারবাবু..."

আরও একটু চুপ করিয়া থাকিযা ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল।

ইমানুল মালী বাড়ীর মধ্যে এমন কিছু বিশিষ্ট নয় যে, তাহার গতিবিধির সন্ধান রাখা প্রয়োজন। পরের দিন রাত্রে আহারের সময় মিস্টার রায় বলিলেন, "জান বোধ হয়, মালীটা সটকেছে।"

আমি একটু কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিলাম, "কোথায় গেছে?"

মিস্টার রায় বলিলেন, "বলে গেছে কি? He may have lost his head, I knew he would one of these days. (তার মাথা বিগড়ে গিয়ে থাকতে পারে, জানতাম শীগ্‌গির একদিন বিগড়োবেই।) কাল বিকেলে আমায় বাগানে একলা পেয়ে একটা বাটনহোল দিয়ে কাঁচুমাচু হ'য়ে জিজ্ঞেস করছে—'আমার কত টাকা জমেছে হুজুর?"

"বললাম, অত হিসেব কবিনি। এই ক' বছর আছিস, কোন মাসে আট কোন মাসে দশ এই রকম জমেছে, চাই নাকি টাকাটা'?"

"বললে, 'না হুজুর, শুধু একটা লিখে দেবেন কাগজে যে...'

"পাগল লোকের ওপর রাগ করা যায় না, বললাম, 'কেন আমার ওপর মোকদ্দমা করবার জন্যে দলিল পাকা করছিস্ নাকি?' অপ্রস্তুত হ'য়ে—না হুজুর, না হুজুর,' করতে করতে সরে পড়ল। আজ মদন ক্লীনার বললে—ইমানুলের কাপড়, সুট কিছুই ঘরে নেই, তার কাছ থেকে পাঁচটা টাকা ধারও ক'রে নিয়ে গেছে, আমার জামিনে।..I knew he would come to this end. (জানতাম ওর শেষ পর্যন্ত এই পরিণাম)।

"ভাবনায় পড়েছি টাকাগুলো নিয়ে।"

পরদিন মীরার চিঠি পাইলাম। তরুও পত্র দিয়াছে। মীরা লিখিয়াছে—'কাল বিকেলে উঠেই কি দেখলাম যদি আন্দাজ করতে পারেন তো বুঝব লেখক আপনি। পারবেন না, কেন না অত বড় অপ্রত্যাশিত ঘটনা কোন নভেলিস্টের উর্বর মাথায়ও আসতে পারে না। বিকেলে একটু ঘুমিয়ে উঠেই পর্দা ঠেলে বাইরে এসে দেখি আমাদের মালী-পুঙ্গব, মিস্টার ইমানুলের বোরান, একেবারে স-শরীরে! সত্য কথা বলতে কি, প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারিনি, আর যদি সন্ধ্যের পর দেখতাম তো নিশ্চয় ভূত ভেবে মূর্চ্ছা যেতাম। আসার কারণ যে কি প্রথমটা তো কোনমতেই বলতে চায় না; মার কাছে নিয়ে গেলাম, সেখানে আরও নীরব। জানেন, লোকটা নির্ঝঞ্ঝাট, ভাল মানুষ আধ পাগলাটে বলে বাড়ির সবাই ওকে ভালবাসে। মা বললেন, "নিজে কাজ ছেড়ে দিয়ে এলি, না ছাড়িয়ে দিয়েছেন? যদি ছাড়িয়ে দিয়ে থাকেন তো বল্, চিঠি লিখে দিচ্ছি, আবার কাজ করগে যা। যদি নিজে ছেড়ে এসে থাকিস্ তো কেন এ মতিচ্ছন্ন হ'তে গেল?—যা ফিরে যা। ফিরে যা।' কোন উত্তর নেই। শেষে সন্ধ্যের সময় আমার সামনে আসল কথাটা বললে।—আমি গিয়ে মিশনরি চাইল্ড সাহেবকে বলে যেন ওর বিয়ের বন্দোবস্ত ক'রে দিই। গিয়ে বলি লোকটা যীশু মেরীর খুব ভক্ত, প্রতি রবিবারেই চার্চে যায়, আর টাকাটাও বেশ মোটা রকম জমিয়েছে! এর বাড়া পাগলামী কখনও দেখেছেন আপনি?

'অনিলা মিত্রকে বোধ হয় চেনেন, আপনাদের ক্লাসেরই ছাত্রী! অনেকটা আমারই মত অবস্থা—মায়ের অসুস্থতার জন্যে ছুটি নিয়ে এসেছে এখানে। ইমানুলের ব্যাপার নিয়ে, তাকে ঘাঁটিয়ে ঘাঁটিয়ে খুব উপভোগ করি আমরা। খুব ভাব হয়েছে আমার সঙ্গে। আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ একেবারে। দু-জনে কাটছে মন্দ নয়। গোড়ায় মিশনরি যে ওর মাথায় সাঁদ করিয়ে দিয়েছিল যীশুর ধর্মে কোন ভেদাভেদ নাই—এই হয়েছে কাল। চাইল্ড সাহেবের ভাইঝিটিকে দেখবার বড় ইচ্ছে ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সন্ধান নিয়ে খবর পেলাম চাইল্ড সাহেব অনেক দিনই সি-পি'র কোন পাহাড় অঞ্চলে বদলি হ'য়ে গেছেন। সাধটা অপূর্ণ র'য়ে গেল। ইমানুলকে বলেছি—'তুই ঠিকানাটা ঠিকমত জোগাড় কর, না হয় আমরা ধরব সবাই মিলে গিয়ে, এই সব পাহাড়ে অঞ্চলেই তো চাইল্ড সাহেব কাজ করেছেন।'...বিশ্বাস করেছে ঠিকানার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে।

"হ্যাঁ, একটা ফরমাস আছে—ইমানুলের ব্যাপার নিয়ে আপনাকে একটা গল্প লিখতে হবে, অনিলারও এই ফরমাস, সুতরাং অব্যাহতি নেই। আমার কথা না রাখেন, আশা করি কলেজ সঙ্গিনীর কথা ঠেলতে পারবেন না।

"মার জায়গাটা লাগছে ভাল, আমাদেরও; খুব বেড়াচ্ছি তাঁকে নিয়ে।

"ইমানুলের গল্প চাই-ই। ওর কমিক (হাস্যরসের) দিকটা ভাল ক'রে ফোটাতে হবে।"

আমি চিঠিটা পড়িয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলাম—কি সর্বনাশা মোহ। বাতুলতার সঙ্গে আর কতটুকু ব্যবধান আছে। নিশ্চয় প্রেম নয়, রূপোন্মত্ততা, তবুও প্রশংসা করিতে হয়, অন্তত এই হিসেবে যে এটা একটা ব্যাপারের চরমোৎকর্ষ। যদি এ মোহই হয় তো এ পরিশুদ্ধ মোহের রূপ, বিচারের দ্বিধা আর পরিণামের শঙ্কা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, নগ্ন মোহ। আর এই মোহ যে প্রেম নয়, তাহাই বা কি করিয়া বলি?

আমি বুঝি; মীরা আর মীরার সঙ্গিনীরা বুঝিবে না। কবে কোথায় যেন দেখা একটা ছবির কথা মনে পড়িয়া গেল। এক তরুণী একটা প্রস্ফুট কমল দুই হাতে লইয়া একটা ভ্রমরকে বিপর্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, নীচে লেখা আছে "খেলা"।

কমলদের জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক এই মর্মান্তিক খেলা নিত্যই চলিয়াছে; কমলরা এর বেদনা কি বুঝিবে?

এর কয়েক দিন পরে তরুর একখানি চিঠিতে জানিতে পারিলাম, ইমানুল হঠাৎ রাঁচি ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

ইমানুল সম্বন্ধে এইটুকু জানি। বাকিটুকু নিজের মনে পূর্ণ করিয়া লইয়া একটা গল্প লিখিলাম। শেষের দিকটা এইরূপ হইল।

রাঁচিতে ইমানুল সেই সখীর অবসর-বিনোদনের মস্ত একটা সম্বল হইল। পাগল ঢের দেখা যায় কিন্তু বিয়ে পাগলার দর্শন অত সুলভ নয়। কলিকাতায় ইমানুলের শুধু মাঝে মাঝে চিঠি লিখাইবার বাই ছিল, রাঁচিতে চাঁদ একেবারে হাতের কাছে মনে করিয়া তাহার আরও কিছু উপসর্গ জুটিয়াছিল—তাহার একটা বাহ্যিক দৃষ্টান্ত এই ছিল যে, ইমানুল যখনই বাহির হইত তাহার সুটটি পরিয়া লইত।

তারপর ক্রমে ঐ পোষাকী সুটই আটপৌরে হইয়া দাঁড়াইল।

একদিন দুই বান্ধবীতে ইমানুলের সুটটা ভাল করিয়া ইস্ত্রী করাইয়া দিল, বলিল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ইমানুল? বাড়িতে কাপড় পরে থাক, ধর যদি তোমার খুড়শ্বশুর কিংবা ধর যদি মিস্ চাইল্ড নিজেই কোনদিন হঠাৎ এখান দিয়ে যায় আর দেখে ফেলে তোমায়? বলা যায় না তো। তারা কাছে পিঠেই কোথাও আছে—শহরে দরকার পড়ল, হঠাৎ একদিন এসে পড়ল, এসেই দেখে জামাই কাপড় পরে...।"

অনিলা একটু বেশি উচ্ছল, তাহা ভিন্ন পাগলের কাছে তো লজ্জার বালাই নাই তত, বলে—

"আর, তা ভিন্ন তুমি সর্বদা একটু কামিয়ে-কুমিয়ে ফিটফাট হ'য়ে থেক ইমানুল—কথায় বলে 'কমালে কুমুলেই বর, নিকুলে-পুতুলেই ঘর'..."

গাম্ভীর্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে, ইমানুলকে কোন একটা অজুহাতে তাড়াতাড়ি সরাইয়া দিয়া দুই সখীতে নিরুদ্ধ হাসিকে মুক্তি দিয়া বাঁচে।

ইমানুল চলিয়া যাইতে দিন দুই-তিন অভাবটা দু-জনেই একটু অনুভব করিল। তাহার পর আবার বেড়ানোয়, পরিচয়ে, পার্টিতে ভুলিয়া গেল; একটা বিয়ে-পাগলার কথা মানুষে কতদিন মনে করিয়া বসিয়া থাকিবে?

এক বৎসর পরের কথা। সি-পি'র দূর পার্বত্য অঞ্চলে একটা ছোট ক্রিশ্চান পল্লী। সকাল থেকেই পল্লীটি উৎসবমুখর হইয়া উঠিয়াছে। ওদের পাদ্রীর আজ বিবাহ। এই রকম বিবাহে ক্রিশ্চান-প্রথার আড়ম্বরহীনতার সঙ্গে স্থানীয় প্রথার জাঁকজমক প্রায় খানিকটা মিশিয়া যায়, পাদ্রীরা অত কড়াকড়ি করে না, বোধহয় ফলও হয় না।

এই পল্লীতে সেই দিন সকালে একজন আগন্তুক আসিয়া উপস্থিত হইল। মাথায় অবিন্যস্ত বড় বড় চুল, একমুখ গোঁফদাঁড়ি, চোয়ালের হাড় অস্বাভাবিক রকম ঠেলিয়া আসিয়াছে, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত! লোকটার পরনে একটা জীর্ণ ঢলঢলে সুট, মাথায় তাহার মুখের মতই তোবড়ান একটা টুপি।

কয়েকজন নানা রকমের লোক উৎসবের কাপড়-চোপড় পরিয়া এক জায়গায় জটলা করিতেছিল, লোকটা একেবারে তাদের কাছে গিয়া দাঁড়াইল; যেন কি একটা অত্যন্ত দরকারী কাজ আছে অথচ সময়ের নিতান্ত অভাব। কতকটা বিস্ময়ে, কতকটা উন্মাদ লোককে মানুষে যে ভয় করে সেই ভয়ে সবাই একটু সরিয়া দাঁড়াইল। একজন প্রশ্ন করিল,"কি চাও?"

বড় বড় পার্বত্য ভাষাগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র থাকে, তাহা ভিন্ন আগন্তুক এখানকার লোক না হইলেও ভাষাটা কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়াছে, প্রশ্নটা শুনিয়া যেন পরিস্থিতিটা উপলব্ধি করিল; নিজের মুখে একবার হাত বুলাইয়া একবার নিজের সুটের পানে চাহিয়া লইয়া উত্তর করিল, "নাপিত পাওয়া যাবে?"

বিবাহের উৎসবের মধ্যে এখন সৌখিন পাগল পাইয়া সবাই উল্লসিত হইয়া উঠিল। একজন বেশ রসিক, আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, "তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে সদ্য হোম্ (বিলাত) থেকে এসেই এখানে চলে এসেছ, সেখানে নাপিতের অভাবে বুঝি আর টেঁকতে পারলে না?"

সমস্ত দলটা উচ্চৈস্বরে হাসিয়া উঠিল।

আগন্তুকের গাম্ভীর্য তাহাকে একটুও ব্যাহত হইল না। প্রশ্ন করিল, "আজ তোমাদের কী এখানে?" সঙ্গে সঙ্গে নিজেই আবার বলিল, "আজ তোমাদের পাদ্রী সায়েবের বিয়ে, না?"

হ্যাঁ, এই সঙ্গে তোমারও একটা হ'য়ে যাবে নাকি?"

আবার হাসির একটা তুমুল উচ্ছ্বাস উঠিল। আগন্তুক বলিল, "এ বিয়ে হবে না; হ'তে পারে না"—তাহার মুখের ভাব কঠিন হইয়া উঠিয়াছে।

সমস্ত হাসি থামিয়া গেল। একজন ছোকরাগোছের আর একটা রসিকতা করিয়া সেটাকে উজ্জীবিত করিতে যাইতেছিল, একজন বয়স্থগোছের তাহাকে বিরত করিয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"রেভারেণ্ড চাইল্ড জানেন, কেন। তিনি এসেছেন তো? তাঁর সঙ্গে দেখা করব আমি, বাধা আছে?"

তিনি আজ ছ'মাস হ'ল মারা গেছেন!"

আগন্তুকের মসীবর্ণ মুখটা যেন মুহূর্তের মধ্যে পাণ্ডুর হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আর নাথু? তাঁর সহকারী ন্যাথেনিয়েল।"

উত্তর হইল, "সে গেছে প্রায় এক বছর হ'ল।"

পিছন হইতে সেই ছোকরা একটু নিজেকে প্রচ্ছন্ন করিয়া লইয়া বলিল, "কোন বাধা নেই, তুমি ইচ্ছে করলেই সেখানে গিয়ে দেখা করতে পার।"

দলের মধ্যে যাহারা হাস্যপ্রবণ তাহাদের একটা চাপা হাসি উঠিল।

আগন্তুক নির্বিকার ভাবে বলিল, "কিন্তু এ বিয়ে হতে পারে না, তিনি অন্য রকম ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলেন, ত্রাণকর্তা যীশু ভয়ানক আঘাত পাবেন মনে তাহ'লে। কখন বিবাহ?"

"এই ঘণ্টাখানেকের মধ্যে, বরবধূ সাজগোজ করছে, এবার বেরুবে!"

"আমি মিস্ চাইল্ডের সঙ্গে দেখা করব।"

"অসম্ভব।"

"করতেই হবে দেখা...ত্রাণকর্তা...যীশু...আর ফাদার চাইল্ডের আত্মাও কষ্ট পাবেন—তিনি বলেছিলেন..."

অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তখন তাহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া স্পষ্টই বলিতে হইল, "মিস চাইল্ড পাগলের সঙ্গে দেখা করবেন না, বিশেষ ক'রে এখন।"

লোকটা যেন কাঠ হইয়া গেল। সুটটা আগাগোড়া দেখিয়া লইয়া দুইটা হাত একবার ঘুরাইয়া বলিল, "পাগল!"

এমন সময় পাদ্রী সাহেবের বাসার দিক হইতে একজন ছুটিয়া ভীড়ের বাহির হইতেই বলিল, "মিস চাইল্ড ওকে একবার ডাকছেন।"

গোলমালের কারণটা বরবধূ ও অতিথিদের নিকট পৌঁছিয়াছিল। মিস্ চাইল্ড অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

চিনিতে একটু বিলম্ব হইল, তাহার পরই মিস্ চাইল্ড উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ইমানুয়েল! হাউ লাকি। তুমি এখানে কোথা থেকে ? এরা কি বলছে তোমার সম্বন্ধে? তুমি নাকি বলছ—এ বিবাহ হ'তে পারে না?...তোমার এ রকম চেহারা কেন?—কত দূর থেকে আসছ? তুমি কোথায় আমায় কনগ্র্যাচুলেট (অভিনন্দিত) করবে, না..."

মিস্ চাইল্ড হাসিয়া উঠিলেন।

বর মিস্টার শেরিডেনও হাসিয়া বলিলেন, "but I am to be congratulated first (আপনার চেয়ে আমায় আগে অভিনন্দিত করা দরকার)।"

অভ্যাগতদের মধ্যে একজন রসিকতা করিয়া বলিলেন, "But he may be your rival! Excuse me, Miss Child" (কিন্তু ও আপনার প্রতিদ্বন্দ্বীও হ'তে পারে তো!...মিস্ চাইল্ড মাফ করবেন)।"

একটা হাসির রোল উঠিল।

ইমানুল মুগ্ধ বিস্ময়ে মিস্ চাইল্ডের পানে চাহিয়া রহিল। কী অপরূপ রূপ! কী অসম্ভব আশা। আপাদমস্তক বধূবেশের শুভ্র আচ্ছাদন, সূক্ষ্ম ছবির পারীদের মত; বদন মণ্ডলে পরীদের মতই একটা দ্যুতি, হাতে একটা শুভ্র ফুলের তোড়া চারটি সুসজ্জিতা বালিকা রমণীর মত পিছনের আস্তরণটা তুলিয়া ধরিয়া আছে...

ইমানুল একবার নিজের পানে চাহিল। কী দুস্তর ব্যবধান। কত দূরে!—কত দূরে!—সত্যই কত দূরে!

ইমানুলের শীর্ণ মুখে ধীরে ধীরে বুদ্ধির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিল। ওকে অন্ধ করিয়াছিল বিকৃত একটা আশা; নিরাশা ওকে আবার চক্ষুষ্মান করিল। দেরী হইল না, এক মুহূর্তেই ও ওর স্বপ্নের অলীক জগৎ হইতে নামিয়া কঠিন মাটি স্পর্শ করিল। নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া ব্যাপারটাকে সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিল; বলিল, "আমি বলতে এসেছিলাম...আমি বলতে এসেছিলাম যে..."

মিস্ চাইল্ড প্রসন্ন হাস্যের সহিত স্নেহদ্রব কণ্ঠে বলিলেন, "আমি জানি তুমি কি বলতে

এসেছিলে ইমানুয়েল, আমায় অভিনন্দিত করতেই এসেছিলে। যাও, তাড়াতাড়ি স্নান-টান ক'রে গির্জায় এস। কত দিন তুমি ভাল ক'রে স্নানাহার করনি? কত দূর থেকে আসছ?"

মিস্টার শেরিডেন একজন চাকরকে ব্যবস্থা করিয়া দিতে বলিয়া দিলেন।

বিবাহের অনুষ্ঠানান্তে ইমানুলের খোঁজ পড়িল। পাওয়া গেল না কিন্তু তাহাকে।

নিরাশা সত্যই কি তাহাকে চক্ষুষ্মান করিল? না, একবার দুনিরীক্ষ্য আলোকের সম্মুখীন হইয়া তাহার নয়নের দীপ্তি চিরদিনের জন্যই লুপ্ত হইয়া গেল?

৭

গল্পটার নাম দিলাম 'আলোক।' এক কপি মীরার নিকট পাঠাইয়া দিলাম, এক কপি পাঠাইলাম একটা পত্রিকায়।

মীরা লিখিল—"গল্প পাঠানর জন্যে ধন্যবাদ, আরও ধন্যবাদ এই যে, আমাদের মূঢ় ফরমাস অনুযায়ী ইমানুলকে আমাদের হাসির খোরাক ক'রে সৃষ্টি করেননি। আমরা দু-জনেই আপনার দৃষ্টি আর অনুভূতিকে অভিনন্দিত করছি।"

আরও একটা খবর দিল—নিশীথের হঠাৎ বায়ুপরিবর্তনের প্রয়োজন হইয়া পড়ায় রাঁচিতে উপস্থিত হইয়াছে; একটু দূরেই ওদের আর একটা ছোট বাড়ি আছে, সেইখানেই উঠিয়াছে। ভগবান যখন মারেন এমনি করিয়াই মারেন,—শুধু ইমানুলকে সরাইয়া লইলেন না, নিশীথকে ঘাড়ে আনিয়া ফেলিলেন। এই সব অন্যায় করেন বলিয়া ভগবান মানুষের সামনে আসিতে সাহস করেন না। মীরা চেষ্টা করে নিশীথকে অনিলার ঘাড়ে চাপাইবার, কিন্তু অনিলা বড় সেয়ানা মেয়ে। যা হোক্ বাঁধা মার সয় ভাল, দুইজনে যথাসম্ভব ভাগাভাগি করিয়া সহ্য করিয়া যাইতেছে। এত বড় বাড়ির ভাড়া বলিয়াও তো একটা জিনিস আছে?—নিশীথ যদি সেটা এই আকারেই আদায় করিতে চায়?

আর একটি পরিবারের সঙ্গে সম্প্রতি পরিচয় হইয়াছে। এখানকারই বাসিন্দা। কর্তা রিটায়ার্ড ডিস্ট্রিক্ট জজ, গৃহিণী বর্তমান, তিনটি মেয়ে, একটি ডায়োসেসনে পড়ে; দুইটি ছেলে, বড়টি ডেপুটি, এখন রাঁচিতেই থাকে। চমৎকার পরিবারটি।

আমায় একবার যাইতে লিখিয়াছে মীরা। এত দেখিবার, বেড়াইবার জায়গা আছে ওখানে। আমি গেলে রাঁচি-হাজারিবাগ রোড হইয়া হাজারিবাগ যাইবে। অমন সুন্দর পথের দৃশ্য নাকি ভারতবর্ষের এ অঞ্চলে কোথাও নাই। জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আমাদের ছোটখাট ছুটি নাই এদিকে? না থাকিলেও তিন-চার দিনের জন্য যেন যাই একবার, অত বই আর পার্সেন্টেজ আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকিলে অনেক জিনিস থেকেই বঞ্চিত হইতে হয়।

যাইবার প্রবল ইচ্ছা, নানা কারণেই, কিন্তু বাধা আছে। একটা এবং প্রধান বাধা এই যে, কোন ছুটি নাই এবং বিনা ছুটিতে বেড়াইতে যাওয়াটা বড়ই বিসদৃশ দেখায়—বেড়াইবার অতিরিক্ত যে উদ্দেশ্যটা—যেটা আসল উদ্দেশ্য—সেটা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া ওঠে।

রাত্রে আপনিই সুবিধা হইয়া গেল। আহারের সময় মিস্টার রায় বলিলেন, "আজ অপর্ণার চিঠি পেলাম শৈলেন। লিখেছে সে ভালই আছে, তার জন্যে তরুর আর সেখানে থাকবার দরকার নেই পড়ার ক্ষতি ক'রে—প্রায় মাস-দুয়েক হ'তেও চলল। অপর্ণার নিজের ইচ্ছে আমার চিঠি পেলে রাজুকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়; কিন্তু লিখেছে মীরা তাতে মোটেই রাজি নয়, বেটাছেলে এর মধ্যে থেকে একজনও কমলে তার অত বড় বাড়িটায় থাকতে ভয় করবে। মীরার একান্ত ইচ্ছে যে আমি নিয়ে

আসি তরুকে, as if that is possible, silly girl (বোকা মেয়ে, সেটা যে অসম্ভব তা বোঝে না)। আমি বলি কি, তুমি দিন চারেকের ছুটি ক'রে ঘুরে এস না...”

মেয়েটি যে তাঁহার নিতান্ত ‘সিলি’ নয় এ-কথা আর ব্যারিস্টার হইয়াও ধরিতে পারিলেন না।

আমি রাঁচি স্টেশনে নামিলাম প্রায় সন্ধ্যার কাছাকাছি। পথে নামিয়া একবার জামসেদপুরটা দেখিয়া লইলাম।

স্টেশনে তরু আসিয়াছিল। আনন্দে আমার হাতটা জড়াইয়া সমস্ত শরীরটার ভার আলগা করিয়া দিল। বলিল, “দিদিও আসতেন মাস্টারমশাই; আজ রাত্তিরে নিশীথদার ওখানে ভোজ, দিদির ওপর সব ব্যবস্থার ভার পড়েছে, তাই পারলেন না। আপনার টেলিগ্রাম আমরা কালই পেয়েছিলাম।...হাজারিবাগ রোড কবে যাবেন মাস্টারমশাই?...রণেনদাকে আপনি চেনেন না?—রণেনদা ডেপুটি; ওঃ কি ভয়ংকর ভাল লোক ওরা সবাই!....আর, আপনার রাজু এক কাণ্ড করেছে সেদিন মাস্টারমশাই!...”

মাস দুয়েকের রাশীকৃত খবর; সঙ্গে মীরাও নাই যে বাধা দিবে। সমস্ত রাস্তায় এক মুহূর্তের বিরাম দিল না।

প্রথমেই অপর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা করিলাম। মোটরের আওয়াজ শুনিয়া তিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, আমি গিয়া পদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম।

ওঁর শরীরটা সত্যই ভাল হইয়াছে অনেকটা, যদিও মুখের সেই ক্লান্ত উদ্বিগ্ন ভাবটা এখনও একটু লাগিয়া আছে। ওটা ওঁর চেহারার একটা অঙ্গ, যাইবার নয়। যাইলে, নিরাশও হইতাম।

বসিয়া অনেকক্ষণ গল্প হইল। মিস্টার রায়ের কুশল সংবাদ অবশ্য আমিই দিলাম। তাহার পর প্রথমেই সরমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বুদ্ধি করিয়া সরমার সহিত দেখা করিয়াই আসিয়াছিলাম, জানি তাহার প্রশ্ন আগেই হইবে। বলিলাম “সরমা দেবী ভালই আছেন, আমি গিয়েছিলাম কাল, আপনাদের তিনজনের নামে একখানা চিঠি দিয়েছেন। একটু হাসিচ্ছলেই বললেন, কাকীমাকে বলবেন আমার জন্যে না ভাবতে, তাঁর তাড়াতাড়ি একটু সেরে চলে আসা দরকার; একলা পড়ে গেছি বড্ড'।”

চিঠিটা বাহির করিয়া তাঁহার হাতে দিলাম। তরু উঠিয়া ছুটিয়া গেল, বোধ করি ওর দিদির কাছে।

অপর্ণা দেবী তখনই চিঠিটা খুলিলেন না। সামনে সূর্যাস্তের পানে চাহিয়া কতকটা আপন মনেই ধীরে ধীরে সরমার কথাটা আবৃত্তি করিলেন, “কাকীমাকে বলবেন আমার জন্যে না ভাবতে...বুড়ী হ'য়ে গেল সরমা। হবে না?—বুড়ী কি বয়সেই হয়? হয় দগ্ধানিতে...”

তাহার পর আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, “শৈলেন, ও ঠিকই ধরেছে, আমি ওর কথাই আজকাল বেশি ভাবি। ভুটানীর মৃত্যুতে অবশ্য মনটা আচমকা একটা ধাক্কা খেয়ে খোকার জন্যে উতলা হ'য়ে উঠেছিল, কিন্তু সেটা সাময়িক, আজকাল সরমার জন্যেই মনটা বেশি আকুল হ'য়ে থাকে। আমি মা হবার অপরাধ করেছি, নিরুপায়; কিন্তু সরমা কি দুঃখে নিজেকে অমন তিল তিল ক'রে দগ্ধাচ্ছে বল তো?...বাগদত্তা?—ঠিক যে আনুষ্ঠানিকভাবে বাগদত্তা কখনও হয়েছিল তাও নয়; তবে?...বুক ফেটে যায় শৈলেন, ও আজ আমায় গিন্নীরমত উপদেশ দিয়ে পাঠালে,—‘আমার জন্যে ভাবতে বারণ করবেন!’...খোকা গিয়ে পর্যন্ত মেয়েটার মুখে একদিনও যাকে হাসি বলে সে হাসি ফোটেনি। হাসতে হয় হাসে। পাঁচজনের সঙ্গে মিশতে হয় মেশে, কথা বলতে হয় কথা বলে, কিন্তু কিছুতেই প্রাণ নেই দেখতেই তো পাও। এমনও লোক আছে শৈলেন, যারা বলে—সরমার এটা অভিনয়। তা বলবে—ওকে বোঝবার ক্ষমতা ক'টা মানুষের আছে বল তো শৈলেন? দেখতে তো পাচ্ছ আমাদের অবস্থা? চলা-বসা, হাসা-গাওয়া, সামাজিক শিষ্টাচার—সবই যেখানে অভিনয় হ'য়ে

উঠেছে, যেখানে যা আসল, যা খাঁটি তাকে চেনবার চোখ কোথায়? সরমা কি ওদের যুগের? সরমা কি ওদের সমাজের—যে চিনবে ওরা?—আমার এক-একবার কি মনে হয় জান?—মনে হয় সরমা উমার তপস্যা করছে। উমা কার জন্যে তপস্যা করেছিলেন আর সরমা কার জন্যে করছে সেইটেই বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে তপের উগ্রতা নিয়ে। কী সংযত উদাসীনতা। রাজার ছেলে পর্যন্ত পাণিপ্রার্থী হ'য়ে নিরাশ হয়েছে শৈলেন এখন দেখছ তো?—ওর দিকে কেউ আর চোখ তুলে চাইতে সাহস করে না। যাদের চরিত্রে একটুও মনুষ্যত্ব আছে তারা ওকে অতিরিক্ত সম্ভ্রম ক'রে এড়িয়ে চলে; যাদের একবারেই নেই, তারা ওর প্রতি উদাসীন,—তারা এই বলে আনন্দ পায় যে, সরমা অভিনয় করছে।...সরমা সত্যিই উমার তপস্যা করছে। আমি স্ত্রীলোক, তা ভিন্ন আমার বংশে দুই দিক দিয়ে সতীর রক্তের ধারা আছে, আমি এ-তপস্যা চিনি। তোমার কাছে নুকোব না শৈলেন,—আমার কি আশা জান?—আমার আশা, আমার বিশ্বাস—সরমার এই তপস্যাই আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনবে, সে যেমন ছিল তেমনি ক'রে—বরং তার চেয়েও ঢের ভাল ক'রে—সরমার উপযোগী করে।...আমি রাঁচিতে এসে যে ভাল আছি, তার কারণ রাঁচির জল হাওয়াও নয়, নতুন নতুন দৃশ্যও নয়, নতুন নতুন পরিচয়ের আনন্দ নয়, তার কারণ শুধু এই যে, আমি এখানে এসে—বোধ হয় খুব কাছ থেকে কয়েক দিনের জন্যে সরে আসবার ফলেই তপস্যার মূর্তিটি খুব স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেয়েছি, এই বিশ্বাসটা আমার মনে হঠাৎ উদয় হয়েছে আর যতই দিন যাচ্ছে ততই দৃঢ় হ'য়ে উঠেছে..."

সেদিনকার ছবিটা আমার মনে গাঁথিয়া বসিয়া আছে। অপর্ণা দেবীর নতুন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখটা অস্তরাগরঞ্জিত আকাশের দিকে ফেরানো, আয়ত চক্ষে দুই বিন্দু অশ্রু টলমল করিতেছে; তাহার উপর একটা অলৌকিক আভা। সতীর তপস্যা কাহিনি বলিতে বলিতে ওঁর ধমনীর সতী-রক্তের ধারা যেন তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছে তপস্যার বিশ্বাসে কী একটা অনির্বচনীয় ভাব! হিন্দু, তাই নিজের ধমনীতেও সে রক্তোচ্ছ্বাসের আমন্দ্র শোনা যায়। মনে হইল এই সার্থক সন্ধ্যাটির জন্যই যেন আসা আজ রাঁচিতে। কোন্ অদৃশ্য শক্তি আমার আজ এ পুণ্যের ভাগী করিয়াছে—তাহাকে মনে মনে প্রণাম জানাইলাম।

ক্রমে অপর্ণা দেবীর মুখমণ্ডল সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গেই আবার ধীরে ধীরে ম্লান হইয়া আসিল। আমার দিকে চাহিয়া শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "এক-একবার আবার এও মনে হয়—নিজের স্বার্থটাকেই বড় ক'রে দেখছি না তো? ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে জানি না, তবে সরমাকে বুঝিয়ে বলেওছি অনেকবার, উনিও বলেছেন, কিন্তু..."

মীরা আসিল, সঙ্গে তরু। সবচেয়ে স্বাস্থ্য ওরই ফিরিয়াছে, অবশ্য ফিরিবার কথাও। চেহারাটা অবিন্যস্ত, রাঁধিতেছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। দৃপ্ত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া বলিল, "ভয়ানক ব্যস্ত, রাঁধতে রাঁধতে শুধু দেখা করতে এলাম একটু। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করি,—কোথায় তিন-শ মাইল দূরে পাহাড় জঙ্গলের এদিকে একটা নেমন্তন্ন পেকেছে, কি ক'রে টের পেলেন বলুন তো?...এই ক'রেই তো আপনারা আমাদের ব্রাহ্মণদের বদনাম করেছেন..."

আমি একটু ভয়ের অভিনয় করিয়া মীরার হাতের দিকে একবার চাহিয়া বলিলাম, "ভাগ্যিস আপনি খুন্তিটা হাতে ক'রে নিয়ে আসেননি!..."

সকলেই উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলাম।

৮

নিশীথ আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। অবশ্য যথাপদ্ধতিই করিল, তবু—বোধ হয় ওর অনিচ্ছা সত্ত্বেও—এমন একটা কটাক্ষ বিচ্ছুরিত হইয়া গেল যে, মনে হইল এই সঙ্গে যদি যমালয় থেকেও একটা নিমন্ত্রণপত্র বিলি করাইয়া দিতে পারিত তো খুশি হইত।

পার্টিটা মাঝারি গোছের। স্বয়ংবর সাধনে খুব আঁটঘাট বাঁধিয়া নামিয়াছে নিশীথ। নিতান্ত একটা ছোট পার্টির কর্ত্রী করিয়া মীরাকে ফাঁকি দেয় নাই, আবার সেটা মেলা বড় করিয়া তাহাকে ভারাক্রান্তও করে নাই। জন বার-চৌদ্দ লোক হইবে সব মিলিয়া।

তরুকে বলিয়া দিয়াছিলাম সব হইয়া গেলে যেন আমায় খবর দেয়। ভাবিলাম মীরা থাকিবে ব্যস্ত, নিশীথ থাকিবে বিরূপ, আগে গিয়া মিছামিছি অস্বস্তি ভোগ করা কেন।

আমি যখন পৌঁছিলাম তখন পরিবেশন আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। প্রায় সকলেই চেয়ার গ্রহণ করিয়াছে। তিন-চারজন বসিবার অনাগ্রহটা ফুটাইয়া তুলিবার জন্য এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—অকাজের ব্যস্ততা সৃষ্টি করিয়া।

আমি আসিতেই একটি তরুণী নিজের চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া আসিল! লীলায়িত ভঙ্গি সহকারে অভিবাদন করিয়া বলিল, "আসুন, শুনলাম আপনি এসেছেন, অথচ..."

প্রত্যভিবাদন করিয়া বলিলাম, "অপর্ণা দেবীর সঙ্গে গল্পে লেগে গিয়েছিলাম একটু।" টেবিলের ওপর চোখ বুলাইয়া একটু হাসিয়া বলিলাম, "ঠিক সময়েই এসেছি কিন্তু।"

সহাস্য উত্তর হইল, "এত ঠিক সময়ে আসাটাই বেঠিক। কোথায় ভেবেছিলাম যে একটু গল্প-স্বল্প করব।"

এই অনিলা মিত্র। কলেজে সম্পূর্ণ অন্যরূপ—গম্ভীর, মুখে রা নাই, ক্লাসের হাজার হাসির কথা হইলেও ঠোঁটের একটা কোণ চাপিয়া এত অল্প হাসে যে, মনে হয় ও জিনিসটা যেন শেখাই হয় নাই। মনে পড়ে না কখনও একটি কথা হইয়াছে, সিঁড়ির বারান্দায় দেখা হইলে হদ্দ একটু নমস্কার-বিনিময়।

আমায় নিজের খালি চেয়ারের কাছে লইয়া আসিল। পাশেই মীরার চেয়ার; বলিল, "শৈলেনবাবুর এই এতক্ষণে আসবার ফুরসত হ'ল মীরা-দিদি।"

একটু আগে আমায় যে ঠাট্টা করিয়াছিল, মীরা আবার সেইটেরই পুনরুক্তি করিল, একটু হাসিয়া বলিল,"তা বলে তুমি যেন মনে ক'রো না উনি নির্লোভ, উদাসীন মানুষ; গন্ধ পেয়ে তিন-শ মাইল থেকে ছুটে আসছেন।"

"কিসের গন্ধ?" বলিয়া একটা হাসির আভাসমাত্র দিয়াই অনিলা তখনই কথাটা ঘুরাইয়া লইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, "বাঃ, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?—বসুন!"—বলিয়া চেয়ারটা আমার পিছনে একটু টানিয়া দিয়া আমায় প্রায় আটকাইয়া দিয়াই তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িতেছিল, মীরা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বাঃ, আর তুমি?"

অনিলা ফিরিয়া আসিল। মীরার কাঁধের উপর দুইটা হাত দিয়া একটু ঝুঁকিয়া চাপা গলায় বলিল, "আহা, মীরা-দিদি যেন কিছু জানেন না। মিস্টার দত্ত তখন থেকে আমার ওপর কি রকম অ্যাটেন্শন্ দিচ্ছে বলো দিকিন, দু-কুড়ি বয়েস আর দোজবর বলে যেন মানুষ নয় বেচারী।"

আমি যে শুনিলাম সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাড়াতাড়ি টেবিলের ওদিকে একজন মাঝবয়সী খুব ফ্যাসান-দুরস্ত ভদ্রলোকের পাশে গিয়া বসিয়া পড়িল।

মীরা আমায় বলিল, "দাঁড়িয়ে রইলেন? বসুন।"

উপবেশন করিলে বলিল, "আপনাদের কলেজের অনিলা মিত্র, নিশ্চয়!"

বলিলাম, "চেনা শক্ত, কলেজে একেবারে অন্যরূপ।"

মীরা হাসিয়া বলিল, "তাই নাকি? কিন্তু চমৎকার মেয়ে। আর সর্বদাই একটা না একটা মতলব..."

হঠাৎ থামিয়া গেল; নিশ্চয় এই 'মতলব' করিয়া আমায় তাহার পাশে বসাইয়া দিয়া যাইবার কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

কাঁটা-চামচের টুংটাং শুরু হইয়া গেল।

দেখিতে পাইলাম এবং তাহার চেয়ে বেশি অনুভব করিলাম, আমি সকলেরই যেন মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। অনিলার অভ্যর্থনা—পদ্ধতি, তাহার পর আবার মীরার পাশে স্থান পাওয়া—তাহাও এইভাবে—সকলেই মনে করিল আমি বিশিষ্ট কেউ একজন।

আর একটা জিনিস অনুভব করিলাম, মীরা ভিতরে ভিতরে যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছে। দোষ দেওয়া যায় না মীরাকে, কিন্তু আমিও যেন একটু জড়ভরত হইয়া পড়িতে লাগিলাম।

নিশীথ ব্যাপারটাকে ফুটাইয়া তুলিল।—

দু-একবার নিশীথের পানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চাহিয়া দেখিয়াছি; নিমন্ত্রণ করিয়া এমন মৃত্যুযন্ত্রণা কাহাকেও কখনও ভোগ করিতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তরুর কাছে শুনিলাম, আমার টেলিগ্রাম পাইয়াই নিশীথ ভোজের বন্দোবস্ত করিয়াছিল, নিশ্চয় উদ্দেশ্যটা মীরাকে যতটা সম্ভব অন্যদিকে ব্যস্ত রাখা...পরিণাম এই। দুইবার চাহিলাম, দুইবারই ওর সঙ্গে চোখাচোখি হইল। অন্যদিকে আর মন দিতে পারিতেছি না। আহা, বেচারী!...কষ্টও হয়, কিন্তু ইচ্ছাকৃত তো নয় এটা আমার; এমন কি পছন্দসইও নয়।

হঠাৎ একবার নিশীথ অভ্যাগতদেব উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিল, "বাঃ, একজনকে তো আপনাদের সঙ্গে ইনট্রোডিউসই করা হ'ল না!"

তাহার পর কায়দামাফিক হাতের চেটো দিয়ে আমার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিল, "ইনি হচ্ছেন মিস্টার শৈলেন্দ্রনাথ...শৈলেন্দ্রনাথ...ডিয়ার মি!—দেখুন, এতদিন রয়েছেন মীরা দেবীদের বাড়িতে, অথচ আপনার পদবীটা!"

মনে মনে বাহাদুরী দিলাম নিশীথকে। উপেক্ষার ভাবটা বেশ ফুটাইয়া আনিতেছে, বুদ্ধি খুলিতেছে ওর। মিস্টারের সঙ্গে না খাপ খায় এই জন্য সহজভাবে হাসিয়া বলিলাম, "মুখোপাধ্যায়।"

"হ্যাঁ, শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। মীরা দেবীর বোন তরুকে পড়ান। মিসেস্ রায় আর মিস্টার রায়ও প্রায়ই আমার কাছে সুখ্যাতি করেন ওঁর,—খুব ভাল মাস্টার। খুব বিশ্বাসযোগ্য.. আর কি সব কোয়ালিফিকেশন আছে ওঁর মীরা দেবী?"

মনে মনে একটু হাসিলাম, এতেও এতটুকু মৌলিকতা দেখাইতে পাবিল না নিশীথ?—সেই মীরার অস্ত্র!

একটু সময় দিলাম মীরাকে, দেখিলাম মীরা যেন বিপর্যস্ত; একটু সহজভাবে মুখ তুলিয়া চাহিবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু উত্তর কিছু জোগাইল না ওর। আমিই হাসিয়া বলিলাম "এর চেয়ে আর বড় কোয়ালিফিকেশন কি হ'তে পারে নিশীথবাবু?—মাস্টারি করি, তাতে দু-জন মনিবই খুব সন্তুষ্ট বলছেন আপনি। ওঁদের বাড়িতে অত পুরনো চাকর; অল্প দিন হ'লেও আমাকে খুব বিশ্বাস করেন, একজন প্রাইভেট টিউটরের এর চেয়ে বড় পরিচয় আর কি হ'তে পারে বলুন?"

জড়ভরতের ভাবটা অনেকক্ষণ কাটাইয়া উঠিয়াছে, নিশীথ যেটাকে আমার গ্লানি বলিয়া ইঙ্গিতে জাহির করিতে চাহিয়াছিল, সেটাকে বেশ ভাল করিয়াই স্পষ্ট করিয়া দিয়া, সমর্থনের জন্য সপ্রতিভ ভাবেই হাসিয়া একবার চারিদিক চাহিয়া লইলাম।

অনিলার মুখটা গম্ভীর। নিশীথের কাঁটা চামচে আর মনট-চপে জড়াজড়ি হইয়া গেল। রণেন মীরার দুই সীট ওদিকে বসিয়াছিল, ঘাড়টা বাড়াইয়া কতকটা যেন নিশ্চিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "তরুর টিউটর উনি?"

মীরা জড়িত কণ্ঠে বলিল, "হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর..."

সূত্রটা অনিলা খুঁটিয়া লইল, বলিল, "কিন্তু ওঁর আসল পরিচয় বোধ হয় এই যে, উনি একজন উদীয়মান লেখক, বাংলার অনেক বড় বড় কাগজেই..."

মীরাও এতক্ষণে অনেক সামলাইয়া লইয়াছে, অনিলাকে বলিল, "আর ওঁর কলেজ কেরিয়ারের কথা বললে না? তুমিই তো বলেছিলে—শৈলেনবাবু নেক্স্ট ইয়ারে নিশ্চয় একটা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট

স্কলারশিপ নিয়ে বিলেত কিংবা জার্মানীতে...”

মীরা যে ব্যাপারটা এতটা বিসদৃশ করিয়া ফেলিবে আশঙ্কা করি নাই। তবে কারণটা বুঝিলাম,—ও যে মাস্টারের সঙ্গে মেলামেশা করে, পাশে বসিলেও আপত্তি করে না, এই অভিজাত সমাজে প্রথম সুযোগেই তাহার জবাবদিহি করিতেছে ও। অর্থাৎ বাড়ির মাস্টার হইলেও নিতান্ত অযোগ্য নই আমি।—আমি একজন সাহিত্যিক, একজন বিশিষ্ট ছাত্র, অবিলম্বেই বিলাত কিংবা জার্মানী গিয়া খেতাব আনিব; আজ না হয় অন্তত দু-বছর চার বছর পরে এই সমাজের উপযোগী যে হইবেই তাহাকে একটু প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখিতে নিতান্ত অশোভন হয় না, ভাবটা ওর নিশ্চয় এই।

সমস্ত শরীরটা যেন আমার অস্বস্তিতে সির্ সির্ করিয়া উঠিল। একটা উত্তর দিব যাহা একদিকে কাটিবে মীরাকে আর একদিকে আঘাত দিবে নিশীথের অক্ষর-লাঙ্গুলে। সুযোগ একটা এই যে, পার্টিতে সমীহ করিবার মত কেহ ছিল না। বয়স্থ যাঁহারা—রণেনের পিতা, মাতা, অপর্ণা দেবী, অনিলার মা—এঁরা পূর্বেই একবার আসিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বেশ একটু প্রাণখোলা হাসিতে ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া দিয়া বলিলাম, “অযোগ্যকে তার অনাগত যোগ্যতা দিয়ে বাড়িয়ে দেখবার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন দেখে আমার হাসি সংবরণ করা দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে, মীরা দেবী। চার বছর পরের ভাবী শৈলেনকে অভিনন্দিত ক'রে আজকের দীন, অযোগ্য শৈলেন মাস্টারকে লজ্জিতই করছেন...বিলেত, জার্মানী, কি অন্য কোন বিদেশী খেতাবের উপর আপনাদের যতটা টান আছে আমার নিজের ততটা নেই কিন্তু, থাকলে গোটাকতক অক্ষর জাহাজে আনিয়ে নিতে কতক্ষণ?

হাসির সঙ্গী বাড়াইবার জন্য বলিলাম, “আমার কি মনে হয় জানেন?—ও অক্ষরগুলো নিতান্ত ভুয়ো, যদিও হয়তো বিবাহের একটা প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অনেকে বোধ হয় ভাবেন মাথায় আকাশচুম্বী টোপর লাগিয়ে অনুরূপ দীর্ঘতার একটা অক্ষরের লাঙ্গুল না পরে নিলে ভদ্রোচিত বিবাহের আসরে ব্যালান্স (ভারসাম্য) রক্ষা হয় না, তাই...”

পেট ভরিয়া আসিলে অল্পেই হাসি পায়; আমি শেষ করিবার পূর্বে সকলেই উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, সকলে মানে অবশ্য নিশীথ সেন এস্কোয়ার, এম-আর-এ-এস, এফ-টি-এস, পি-আর-এ-এস-এ ছাড়া। তাহার কাঁটা-চামচ আর চপ-কাটলেট একেবারে তালগোল পাকাইয়া গিয়াছে। অবশ্য হাসিবার চেষ্টা যে একেবারেই না আছে এমন নয়।

অতিথিধর্মের ব্যত্যয় হইয়া যাইতেছে বলিয়া চুপ করিলাম। অবশ্য আমার সান্ত্বনা এই যে, আমি আরম্ভ করি নাই, আগে হইয়াছে আতিথ্যধর্মেরই লঙ্ঘন। তবে আমি এত সাধারণ ভাবেই এবং এমন হাসিচ্ছলে বলিয়াছি যে, এক মীরা আর নিশীথ ভিন্ন এর ছলের সন্ধান বিশেষ কেহ একটা পায় নাই, অনিলা কিছু কিছু বুঝিয়া থাকিতে পারে, আরও বোধ হয় দু-একজন যাহারা নিশীথের অসার টাইটেল-প্রীতির সন্ধানটা পাইয়াছে।...যাক্ অত ভাবিয়া কথা বলিলে তো চলে না। অযথা আঘাতই বা মাথা পাতিয়া লইব কেন? আমার আজ যাহা উপজীবিকা সে সম্বন্ধে আমার কোন লজ্জাই নাই; কেনই বা থাকিবে?—যদি সেইটাকে উপলক্ষ্য করিয়া কেহ আমায় চোট দিতে চায় বা এড়াইয়া চলিতে চায় তো তাহাকে আমার মনের ভাবটা জানাইয়া দিতে হইবে বৈকি।

হাওয়াটা যে অস্বস্তিকর হইয়া পড়িয়াছে এটা অস্বীকার করা যায় না। আমার মনের অবস্থাটা নিমন্ত্রণ খাওয়ার একেবারেই অনুকূল নয়। সাধ্য থাকিলে উঠিয়া নিজেও বাঁচিতাম, অনভিজাতদের সঙ্গ থেকে এদেরও অব্যাহতি দিতাম, কিন্তু তাহার উপায়ই ছিল না কোন; সুতরাং সাধ্যমত হাওয়ার গতিটা ফিরাইয়া দিবার চেষ্টায় রহিলাম।

একটা নিতান্ত চলতি ঠাট্টার সুযোগ আসিল, কিন্তু চলতি হইলেও হাতছাড়া করিলাম না। ওয়েটার দইয়ের প্লেট বিলি করিতে করিতে অনিলার কাছে যাইতেই বলিলাম, “দেখো, ওঁকে যেন দিয়ে ব'সো না!”

অনিলা কাঁটা-চামচ থামাইয়া বিস্মিত ভাবে আমার পানে চাহিয়া বলিল, “বাঃ, কেন দেবে

না?"

অন্য সকলেও বিস্মিত হইয়া একবার তাহার পানে, একবার আমার পানে চাহিতে লাগিল। আমি অনিলার কথার উত্তর না দিয়া মীরার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "আজ আপনাদের গানের ব্যবস্থা হয়নি?"

মীরা আমার পানে চাহিল, পরে অনিলার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, "অনিলা গাইতে জানে নাকি? কৈ আমাকে তো বলেনি কখনও। তাহ'লে কাজ নেই দই দিয়ে, গলা বসে যেতে পারে।"

অনিলা অত্যন্ত ভীত হইয়া বলিল, "না না মীরা-দিদি, আমি মোটেই গান জানি না—আমার একেবারে আসে না!..."

তাহার ভাবগতিক দেখিয়া অনেকে হাস্য সংবরণ করিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রমে খুব উপযুক্ত প্রসঙ্গই আরম্ভ করিয়াছিলাম; এই সব উপলক্ষ্যে এই ধরনের কথা একেবারে জমিয়া উঠে, আর বিশেষ করিয়া—দু-একজন ছাড়া যে ধরনের মানুষ লইয়া পার্টিটা—বড় কোন আলোচনা বা সূক্ষ্ম কোন রসিকতা জমিতও না।

আমি অনিলার আপত্তির দিকে একেবারেই কান দিলাম না। মীরার পানে চাহিয়া তাহারই কথার উত্তর দিলাম; হাসিয়া বলিলাম, "বাঃ, একটা মানুষ কষ্ট ক'রে শিখবে, তার ওপর কষ্ট ক'রে বলবে, তবে আপনারা টের পাবেন?"

অনিলা ওদিকে পরিত্রাহি আপত্তি করিয়া যাইতেছে, "বাঃ, না—কি মুশকিল!...দইয়ের প্লেট দাও আমায়, চলে যাচ্ছ যে? অথচ দই আমি ভালবাসি। কি ফ্যাসাদ দেখ তো...আচ্ছা, আপনি কি ক'রে জানলেন যে গাইতে জানি?—মীরা-দি'কে যে বলতে গেলেন?"

আমি নিরীহের মত মুখের ভাব করিয়া বলিলাম, "বাঃ, এক কলেজে পড়ি—এক ক্লাসে! আপনি কি ক'রে জানলেন যে স্টেট-স্কলারশিপ্ নিয়ে জার্মানী যাব?—মীরা দেবীকে যে বলতে গেলেন?"

হাসির আর একটা তোড় উঠিল। কেহ হাসিচ্ছলে, কেহ বা বিশ্বাসভরেই অনিলাকে আহারের শেষে গানের জন্য ধরিয়া বসিল।

রণেন বলিল, "এঁদের চেনা দায়। এই থেকে আমার আরও একটা সন্দেহ হচ্ছে..."

বেটাছেলে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল, "কি সন্দেহ? বলুন।"

রণেন গলাটা একটু সামনে বাড়াইয়া মীরার দিকে চাহিয়া বলিল, "তাহ'লে মীরা দেবীও আমাদের এত দিন ধরে যে প্রবঞ্চনা না ক'রে এসেছেন..."

মীরা দারুণ বিস্ময়ে কাঁটা-চামচ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিল, বলিল, "মাফ করবেন, আমি একেবারেই জানি না, দোহাই। শৈলেনবাবুর কথাতেই তার প্রমাণ রয়েছে—গান জানলে আমি অনিলাকে নিশ্চয় চিনে নিতে পারতাম।"

রণেন বলিল, "ওটা কাজের কথা নয়, বেশ, শৈলেনবাবুকেই সাক্ষী মানা যাক্, উনি তো একসঙ্গেই থাকেন?...কি মশাই?"

মীরা মিনতির দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া বলিল, "দোহাই শৈলেনবাবু আপনি আবার 'নয়'কে 'হয়' করতে পারেন...

মীরার গানের কথা বোধ হয় পূর্বে একবার বলিয়া থাকিব—গলা খুব মিষ্ট তবে সুরজ্ঞানটা একটু কম। অথচ সেজন্য এসব ক্ষেত্রে ওকে বাঁচাইতে যাওয়াটাও ভাল দেখায় না। কি করিয়া সামলাইব ভাবিতেছি, মীরা নিজেই বলিল, "বা, ওর সাক্ষী চলবে না,—অনিলা ওঁর সুখ্যেৎ করছে, সঙ্গে সঙ্গে উনি ওর সুখ্যেৎ করলেন, আমি করেছি, আমারও নিশ্চয় উনি বাড়াবেন।"

অনিল বলিল, "বাঁচালে মীরা-দিদি!...এবার আপনারা মানুষটির স্বভাব টের পেলেন তো? যদি সুখ্যেৎ করলেন, অন্যায় সুখ্যেৎ ক'রে ফাঁপরে ফেলবেন..."

পাশের ভদ্রলোকটির অন্য কোন দিকে মন ছিল না, অনিলার আহারের দিকেই তিনি কায়মনোবাক্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া দিয়াছিলেন। ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বলিলেন, "তাহ'লে আপনাকে আর এক প্লেট দই দিয়ে যাক, ভালবাসেন বললেন ওটা...এই ওয়েটার!"

চাপা হাসিতে অনিলার মুখটা সিন্দুরবর্ণ হইয়া উঠিল। কয়েকজন প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "কি হল?"

চাপা হাসিতেই অনিলার শরীরটা দুলিয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিল না। আমি ব্যাপারটা বুঝিয়াছিলাম, ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলাম, "গানের কণ্ঠের দরকার নেই বলে ওঁর কথা কওয়ার কণ্ঠও যেন অতিরিক্ত দই খাইয়ে রোধ করিয়ে দেবেন না!"

সকলের উচ্চকিত হাসিতে ভদ্রলোক একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন, বলিলেন, "না, না, উনি বললেন দইটা ভালবাসেন, তাই..."

বলিলাম, "ভালবাসাটাই বজায় থাকতে দিন না; একরাশ দই খাইয়ে গলা ভাঙিয়ে দইয়ের প্রতি জন্মের মত একটা আতঙ্ক দাঁড় করিয়ে দিয়ে কি হবে?"

হাসিটা গড়াইয়া চলিল।

ওয়েটার ট্রেতে কতকগুলো প্লেট লইয়া বাহির হইতেই ভদ্রলোক মোটা চশমার ভিতর দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া ব্যস্তভাবে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "থাক্, থাক্, দরকার নাই..."

বলিলাম, "এ যে আরও নিদারুণ হ'য়ে উঠল মশায়!—সন্দেশের প্লেট নিয়ে আসছে—সবার জন্যে!"

আবার হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

আমার এইটুকুই দরকার ছিল। আত্মসম্মান বাঁচাইতে বাধ্য হইয়া যে অপ্রীতিকর ব্যাপারটুকু আনিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, সেটাকে বেশ ধুইয়া মুছিয়া অপসারিত করিয়া দিলাম।

আহারের শেষে গানও হইল কিছু কিছু। আমি খানিকটা এস্রাজ বাজাইলাম এবং শেষ পর্যন্ত নিশীথকে এতটা সন্তুষ্ট করিতে সমর্থ হইলাম যে, যাইবার সময় সেও শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া বলিল, "আজকে আমার পার্টির সাক্‌সেস্ অনেকটাই আপনার উপর নির্ভর করল শৈলেনবাবু; থ্যাঙ্কস্।"

ভালই হইল। ওদের থেকে বিদায় লইতেছি, মুখে তবুও যে একটু মিষ্টস্বাদ লাগিয়া রহিল, এই ভাল।

৯

হ্যাঁ, ওদের মধ্যে থেকে এবার বিদায় লইতে হইবে।

রাঁচির এই পার্টিতে একটা জিনিস সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল,—মীরা আমাদের উভয়ের ব্যবধানটা ভুলিতে পারে নাই। ওর দোষ দিই না, ভোলা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ধরা যাক, আজ অনিলা যেমন কৌশলে উহার পাশে আমায় বসাইয়া দিল, সেইরূপ যদি ব্যারিস্টার নীরেশ লাহিড়ীকে, কিংবা রণেনকে, কিংবা এমন কি নিশীথকেও বসাইয়া দিত, তাহা হইলে অবস্থাটা কি রকম হইত?...মীরা লজ্জিত হইত, কিন্তু বিপর্যস্ত হইত না। অনিলাকে ধন্যবাদ দিই, একটা আকস্মিক ঘটনার মধ্য দিয়া সে আমার চোখ খুলিয়া দিল।

আজ অবশ্য মীরার নাসিকার সেই ঈষৎ কুঞ্চন ফুটে নাই; না, ফুটে নাই; আমি খুব লক্ষ্য করিয়াছিলাম। হয় মীরা তাহার সেই মুদ্রাদোষটা একেবারেই দমন করিতে সমর্থ হইয়াছে; না হয়

ইতিমধ্যেই আর একটা ব্যাপার ঘটিয়াছে। এত কটুতার মধ্যেও সে-কথা ভাবিতে সুখ—মীরা বোধ হয় সত্যই আমায় ভালবাসে, ডায়মণ্ডহারবার রোডের সেই সন্ধ্যা তাহার সাক্ষী। কিন্তু সমাজগতভাবে—যেখানে ও রাজার দৌহিত্রী, ব্যাস্টার-কন্যা, যে আসরে নবীন ব্যারিস্টার, ডাক্তার, এঞ্জিনীয়ার, ডেপুটি, (অপদার্থ হইলেও) নিশীথের মত রাজরক্তের অধিকারী তাহার পাণিপ্রার্থী—সেখানে মীরা আমাকে লইয়া বিপর্যস্ত। ডেপুটি আর নিশীথের কথায় মনে পড়িয়া গেল—রাঁচি-প্রবাসে টের পাইলাম—কতক এদিক-ওদিক হইতে আর কতক নিজেই লক্ষ্য করিয়া, যে মীরা বেশ গা ঢালিয়া দিয়াই নিশীথের সঙ্গে মেলামেশা করিতেছে—গল্পসল্প, বেড়ানো, পার্টি। অবশ্য নিশীথের যা উগ্র আরাধনা, উপায়ও নাই বেচারির;—একেবারে পরের জাহাজেই গ্লাসগো যাওয়া বন্ধ করিয়া ধর্না দিয়া পড়িয়া আছে!

আর একটা জিনিস লক্ষ্য করিলাম, ডেপুটি রণেন যথাসাধ্য মীরার দৃষ্টি নিজের দিকে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছে। মীরার দলের ভাবটা ঠিক বোঝা গেল না। অবশ্য আমি যতটুকু ছিলাম সে যেন চেষ্টা করিয়াই আমায় দেখাইতে লাগিল যে, রণেন তাহার কাছে উৎসাহ পাইতেছে; কিন্তু সেটা কিছু প্রমাণ নয়। আমার ঈর্ষা উদ্রেক করিয়া আমায় সতর্ক করাটাও তাহার একটা কারণ হইতে পারে। সত্যই যদি চাহিয়া থাকে মীরা আমায় তো এইটেই সম্ভব। এইটেই সম্ভব নিশ্চয়—মীরাকে কি এতই কম জানি যে, এ কথাটুকুও জোর করিয়া বলিতে পারি না?

মীরাকে কিন্তু আমি জানাইয়া দিলাম যে ভাঙন ধরিয়াছে। মীরা-বোধ হয় নিজেই টের পাইল—যখনই আমি পাশে বসিতেই সে সংকুচিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বুঝিল যে আমি তাহার সংকোচের কথা ধরিয়া ফেলিয়াছি। তাহা সত্ত্বেও আমি বুঝাইয়া দিলাম। পরদিন সন্ধ্যায় তরুকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলাম। হুড জোনহা-প্রপাত, রাঁচি-হাজারিবাগ রোড, জগন্নাথপুরের মন্দির—সবই রহিল পড়িয়া। অপর্ণা দেবী অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন; চলিয়া আসিলাম বলিয়া নয়, চলিয়া আসার মূলের যে রহস্য থাকা সম্ভব তাহারই আশঙ্কায়।

সে-রাত্রিটা গাড়িতে যে কি ভাবে কাটিয়াছিল অন্তর্যামীই জানেন। সেকেণ্ড ক্লাসে দুইটি মানুষ, তরু আর আমি। তরু বিমর্ষ, তবুও একটু কথা চালাইবার চেষ্টা করিল। উত্তরের মধ্যে আমার মনের সন্ধান না পাইয়া চুপ করিয়া গেল। একটু পরে নিদ্রিতও হইয়া পড়িল। জাগিয়া রহিলাম আমি আর আমার চিন্তা। সমস্ত বুকটা যেন হাহাকারে ভরিয়া উঠিতেছে। কী করিয়া বসিলাম! কেন হঠাৎ চলিয়া আসিলাম? এর দ্বারা জীবনে যে সবচেয়ে প্রিয় তাহাকে যে কি গুরু আঘাত দিয়া আসিলাম তাহা একবারও ভাবিলাম না?...দূরত্ব যতই বাড়িতে লাগিল, অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল, মনটা বক্ষের পিঞ্জরে ততই যেন আছাড় খাইতে লাগিল—নিজের অসহায়তায়। কাল রাত্রির পর থেকেই মীরার মুখ বিষণ্ণ; যখনই জোর করিয়া প্রফুল্ল করিতে গিয়াছি, আরও মলিন হইয়া পড়িয়াছে।...এর উপর আরও নিষ্ঠুর হইয়া তাহাকে আঘাত দিয়াছি। আজকের সকালের কথা মনে পড়ে। মীরা যেন অনেক সংকোচ কাটাইয়া কালকের রাত্রের কথাটা পাড়িল একবার, ইচ্ছা ছিল যদি সম্ভব হয় তো কালকের গ্লানিটা মুছিয়া ফেলিবে আমাদের জীবন হইতে। বলিল, "কাল শৈলেনবাবু নিশীথবাবুকে খুব বুঝিয়ে দিয়েছিলেন; নেমন্তন্নয় ডেকে কি অন্যায় ওঁর...!"

আমি একটুও চিন্তা না করিয়াই বলিলাম, "কি করব বলুন? নিজের মর্যাদার ওপর চারিদিক থেকে আঘাত পেয়ে আমার অতিথিধর্মের কথা ভুলে নিজেই ব্যবস্থা করতে হ'ল। আশা ছিল আমার তরফে একজনও উকিল পাব, তা..."

মীরার মুখের সমস্ত রক্ত যেন নিমেষে উবিয়া গেল। একটাও কথা আর বলিতে পারিল না সে। তাহার সেই নিষ্প্রভ মুখটাই শুধু মনে পড়িতেছে; কতবার তাহার মুখখানি হাসিতে কৌতুকে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, হাজার চেষ্টা করিয়াও কিন্তু সে মুখ মনে আনিতে পারিতেছি না; মীরা তাহার পর আর আমায় উৎকণ্ঠিত, উল্লসিত হইয়া কিছু বলে নাই। ও আমায় পালটা আঘাত করে নাই, ভালবাসিয়া বোধ হয় সে-ক্ষমতা হারাইয়াছে, অন্তত এখনকার মত হারাইয়াছে। ও নীরবে সহিয়া

গেল, শুধু নিজের মর্যাদাকে আর আহত হইতে দিল না। সমস্ত দিনে আমাদের হাসিয়া কথাও হইয়াছে; তরুর আব্দারে সকলে মোরাবাদী পাহাড়ে বেড়াইয়াও আসিলাম, মীরাও গেল, শুধু নিজে আর কোথাও যাইতে বলিল না—হাজারিবাগ রোড, জোনহা-প্রপাতে—কোথাও না। থাকিতে বলিল না, আসিয়াই চলিয়া যাইতেছি কেন, প্রশ্ন করিল না একবারও। সবই বুঝিল, কিন্তু একবার আঘাত খাইয়া ও সমস্ত দিন যেন নিজের আহত মর্যাদাকে পক্ষাবৃত করিয়া বাঁচাইয়া চলিল।

না, এত বড় অন্যায় করা চলিবে না মীরার ওপর। গিয়াই পত্র দিব মীরাকে যে আঘাতটুকু দিয়াছি তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া। আবার শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব। কাজ নাই আমার কলেজের পার্সেন্টেজে, পরীক্ষার কৃতিত্ব। এত সাধনায় যে-ধন লাভ করিলাম, এমনি করিয়া হেলায় হারাইব? থাক্ না মীরার একটু অবজ্ঞা, সব সরিয়া যদি ভালবাসিতে না পারিলাম তবে আমার ভালবাসা কিসের? মীরার রক্তের মধ্যে রহিয়াছে সাধারণের জন্য অবজ্ঞা, কি করিবে ও?—নিতান্ত নিরুপায় যে মীরা ওখানে। অপর্ণা দেবীর কথা মনে কড়িল—"ও মেয়ে ভাল শৈলেন...তোমাদের যেখানে সৌন্দর্য, যেখানে মহত্ত্ব—সেখানে ওর চোখ গিয়ে পড়ে, কিন্তু মায়ের বংশের কোন্ যুগের রাজামহারাজারা ওর মাথা দেন বিগড়ে মাঝে মাঝে..."

আমি ভালবাসিয়াও যদি ওর এ নিরুপায় দুর্বলতার কথা না বুঝি তো কে বুঝিবে? ভালবাসায় যদি অপরিসীম ক্ষমা রহিল না সরমার মত, যদি অন্ধতা রহিল না ইমানুলের মত, যদি উদ্দম আবেগ রহিল না ভুটানীর ছেলের মত, তবে কিসের ভালবাসা?...হাসি পায়—আমি ইমানুলের প্রেমকে আমার গল্পে অভিনন্দিত করিয়াছি!—অপদার্থ সাহিত্যিক, জীবনে প্রেমকে করি পদে পদে অবমাননা, সাহিত্যে তাহাকে পরাই রাজমুকুট!

গাড়ির গতিবেগে বাতাসে একটানা হুঁহু শব্দ। জানালা দিয়া বাহিরে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। অনুভব করিতেছি—প্রতি মুহূর্তেই মীরা হইয়া যাইতেছে সুদূর...এ ভুলের প্রায়শ্চিত্ত নাই? ধরো যদি মীরার অভিমান না ঘোচে! মীরাকে যদি আর ফিরিয়া পাওয়া না-ই যায়! তাহার পরেও তো দিনের পর দিন জুড়িয়া কাটাইতে হইবে এই জীবনটাকে!

বাসায় আসিয়াই তরুকে মিস্টার রায়ের নিকট লইয়া গেলাম। তরু তাঁহাকে উৎফুল্লভাবে জড়াইয়া বলিল, "কি চমৎকার জায়গা বাবা, কি বলব তোমায়! আমি কিন্তু শীগগিরই আবার চলে যাব বাবা তা বলে দিচ্ছি...কী রোগা হ'য়ে গেছ বাবা তুমি!"

মিস্টার রায় তাহার মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ভেবেছিলাম, এইবার মোটা হব, মা এসেছে। তা তুমি তো আবার চলেই যাচ্ছ।"

তরু হাসিয়া বলিল, "তোমায় আবার মোটা ক'রে দিয়ে তবে যাব।"

মিস্টার রায়ও হাসিয়া বলিলেন, "বাঁচলাম, তাহ'লে বেশ দেরী ক'রে মোটা হব'খন, না হওয়া পর্যন্ত তো আর যেতে পারবে না?"

আমায় বলিলেন, "তুমি হঠাৎ ফিরে এলে শৈলেন?"

উত্তর করিলাম, মিছিমিছি পার্সেন্টেজ নষ্ট ক'রে..."

মিস্টার রায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার মুখের পানে চাহিলেন, তাহার পর হঠাৎ চকিত হইয়া বলিলেন, "well, I clean forgot it (একেবারেই ভুলে বসে আছি); তোমার এক বন্ধু এসেছিল কাল। Let me see, ক্লীনারের হাতে একটা চিঠি দিয়ে যাচ্ছিল, কোথায় রেখেছি দেখি দাঁড়াও।"

চিঠিটা বাহির করিয়া দিয়া বলিলেন, "এবার যাও তোমরা।...আর তরু, তুমি একটু জোর করে লাগো; you must soon decide whether it should be Loreto or লক্ষ্মী-পাঠশালা। (লরেটোতে পড়বে কি লক্ষ্মী-পাঠশালায়, শীগগির এবার ঠিক ক'রে ফেলতে হবে)।"

ওদের বাপে মেয়েতে ইংরেজী চলে মাঝে মাঝে। তরু যাইবার জন্য পা বাড়াইয়াছিল, ঘুরিয়া দাঁড়াইল। হাসিয়া বলিল, "I have already decided Daddy, if you come to that।

(যদি তাই-ই...বলো তো আমি মনস্থির ক'রেই ফেলেছি বাবা)।"

মিস্টার রায় কৌতূহলের ভঙ্গিতে প্রশ্ন করিলেন, "Well (অর্থাৎ)?"

তরু হাসিয়া বলিল, "I would prefer লক্ষ্মী-পাঠশালা। (লক্ষ্মী-পাঠশালাই পছন্দ আমার)।"

মিস্টার রায় বিস্ময়ের ভঙ্গিতে মুখটা লম্বা করিয়া লইলেন, বলিলেন, "As much as to say you prefer your mummy to your poor old dad (তার মানে তুমি বুড়ো বাপ-বেচারির চেয়ে মাকেই চাও বেশি)? না, কখনো তোমার হাতে আর আমি মোটা হতে চাইব না, আড়ি তোমার সঙ্গে।"

পিঠে দুইটা আদবের চাপড় মারিয়া হাসিয়া বলিলেন, "Go and have a bath, look sharp, I will have it out with your mother (শীগ্‌গির গিয়ে এবার হাত-পা ধুয়ে ফেল, আমি তোমার মায়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করব)।"

ঘরে আসিয়া চিঠিটা খুলিলাম। অনিলের চিঠি। লিখিয়াছে—

"নিতান্ত জরুরী কাজ বলে ছুটে এসেছিলাম। চিঠিতে লেখবার নয় বলে কোন ইঙ্গিতও দিলাম না। রাঁচি থেকে এসেই চলে আসবি একবার, নিশ্চয়। অনিল।

তখনই গিয়া মিস্টার রায়ের নিকট হইতে ছুটি লইয়া আসিলাম।

১০

আমি যখন পৌঁছিলাম সন্ধ্যা হব-হব হইয়াছে। বাড়িতে কাহারও সাড়া নাই, ভিতরে গিয়া দেখিলাম দক্ষিণ হস্তের মুঠায় চিবুকটা চাপিয়া অনিল রকের উপর পায়চারি করিতেছে। আমায় দেখিতে পাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, "শৈল বুঝি? আয়।"

কাছে আসিলে আমার মুখের উপর স্থির-দৃষ্টি ন্যস্ত করিয়া বলিল, "রাঁচি থেকে একটু বেশী তাড়াতাড়ি চলে এসেছিস্।"

বোধ হয় একটু জড়িত কণ্ঠেই বলিয়া থাকিব, "মিছিমিছি পার্সেন্টিজটা নষ্ট করা..."

কিছু মন্তব্য প্রকাশ করিল না, স্থির-দৃষ্টিতে আরও কয়েক সেকেণ্ড চাহিয়া রহিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "এখানে অনেক ব্যাপার ঘটেছে এবং ঘটবে।"

আমার দৃষ্টিটা উৎসুক হইয়া উঠিল। অনিল বলিল, "এক নম্বর—বাড়িতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, বাড়িটা হ'য়ে গেছে খালি।"

শঙ্কিত ভাবে একবার চারিদিক চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, "তার মানে?"

অনিল বলিল, "অবশ্য অম্বুরী এণ্ড কোম্পানী কথকতা শুনতে গেছে, আটটা আন্দাজ ফিরবে; আমি বলছিলাম মার কথা—বুঝতে পারছি একা যদি মা না থাকে তো বাড়ি খালি হ'য়ে গেছে বেশ বলা চলে।"

আমি আরও শঙ্কিত ও বিস্মিত দৃষ্টিতে অনিলকে আপাদমস্তক একবার দেখিয়া লইয়া ওর মুখের পানে বিমূঢ় ভাবে চাহিতেই বলিল, "না, অত দূর নয়,—মা কাশীবাসিনী হয়েছেন। মামার একমাত্র ছেলে গেল মারা; বৈরাগ্যে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে কাশীবাসিনী হলেন। মার একমাত্র ছেলে রয়েছে বেঁচে, আতঙ্কে কাশীবাসিনী হলেন। অনেক বোঝালাম, কিন্তু ভাইপোর কীর্তিতে কি যে একটা অবিশ্বাস আমার ওপর হ'য়ে উঠল, কিছুতেই শুনলেন না। 'তোরা সব পারিস্, দাদার মত আমায়ও বুড়ো বয়সে দগ্ধাবার জন্যে আর বেঁধে রাখিস্‌নি, বাবা বিশ্বনাথের পায়ে শরণ নিচ্ছি, আর বাধা দিস্‌নি'—বলে জীবিত ছেলের শোকে চোখ মুছতে মুছতে ভাই আর ভাজের সঙ্গ নিলেন!...বাঙালী মায়ের

প্রাণের একটা নতুন দিক দেখলাম, অদ্ভুত! কত গভীর স্নেহ হ'লে এ রকম অহেতুক আতঙ্ক হয় ভেবে দেখ দিকিনি!...যাক্ ভালই হয়েছে।"

বলিলাম, "বড় কষ্ট হবে, এই যা..."

"অনিল বলিল, বাঙালীর মেয়ের বিয়ে হবার পর থেকে নিজের শরীর বলে আলাদা কিছু থাকে না, সন্তান হবার পর একেবারেই না; সুতরাং শরীরের কষ্ট ওদের কষ্টই নয়। বাঙালী জাতটা বোধ হয় অনেক বিষয়েই সবার চেয়ে ছোট, কিন্তু এদের স্ত্রী আর মা আর সব জাতের স্ত্রী আর মায়ের অনেক ওপরে। জাতটা এই জন্যেই বেঁচে আছে এখনও, শৈল।"

একটু চুপ করিয়া, অন্যমনস্কভাবে আরও একবার পায়চারি করিয়া বলিল, "দ্বিতীয় ব্যাপার এই যে, সদু আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া বলিলাম, "আত্মহত্যা! কেন?"

"কেন!" বলিয়া অনিল একটু হাসিল মাত্র। তাহার পর বলিল, "তুই দাঁড়িয়েই আছিস্!" ভিতর থেকে একটা মাদুর আনিয়া বিছাইয়া দিয়া বলিল, "এই হ'ল যা ঘটেছে। যা ঘটবে তা এই যে, সদুকে আমি আমার নিজের বাড়িতে এনে রাখব ঠিক করেছি।"

আমি একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। না বলিয়া পারিলাম না, "তোর কি মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে অনিল?"

আমি বসি নাই, সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া ছিলাম। অনিল ঠিক আমার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া, কতকটা ব্যঙ্গের হাসির সহিত বলিল, "আমি জানিতাম ঠিক এইভাবে প্রশ্ন করবি। তুই হচ্ছিস্ আমাদের সমাজের প্রতীক শৈলেন; সমাজের নিজের মাথার ঠিক নেই, যদি ঠাণ্ডা ক'রে কেউ সমস্যার সমাধান করে তো উল্টে বলবে তারই মাথা খারাপ হয়েছে। সদু মরতে বসেছে চারদিক দিয়ে, সমাজ ভ্রূক্ষেপও করবে না; এখন আমি তাকে চারদিক থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি—বলবে আমার মাথা খারাপ হয়েছে, আমায় একঘরে ক'রে আমার ধোপা-নাপিত বন্ধ ক'রে আমার চিকিৎসা করবে। এ-এক চমৎকার ব্যাপার, যতই ভাবি ততই আশ্চর্য বলে মনে হয় আমার। আইন, যেটাকে আমরা প্রাণহীন যন্ত্রের সামিল বলে ধরে নিই, সেটা পর্যন্ত সদুর মত হতভাগিনীকে মরতে দিতে রাজি নয়, মরতে চেষ্টা করছে খবর পেতেই দারোগা এসে তদন্ত ক'রে গেল, একটু লেখালেখি হাঁটাহাঁটি পড়ে গেল, বেশ টের পাওয়া গেল তার যান্ত্রিক বুকে একটা আঘাত লেগেছে। আর সমাজ, যাকে আমরা প্রাণবন্ত বলে মনে করি সে রইল একেবারে নির্বিকার। একবার কেউ ফিরেও দেখলে না।

"ওরই মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হ'য়ে গিয়েছিল, তোকে না বলে থাকতে পারলাম না। তার পরদিন ছিল সাতকড়ি চাটুজ্জের ছেলের পৈতের নেমন্তন্ন। আমি যে সারিটাতে বসেছি তাঁর পেছনের সারিতে, আমার সঙ্গে প্রায় পিঠোপিঠি হয়ে বসেছে সনাতন চক্রবর্তী আর পুরুষোত্তম সার্বভৌম। দ্বিতীয়বার মাছ পরিবেশন করতে এসেছে। শুনছি সার্বভৌম কি একটা চিবোতে চিবোতে বলছে—'মাছ তো পাতে রয়েছে প্রচুর, মুড়ো থাকে তো দিতে পারো একটা, একটার বেশি নয়, পরিপাক শক্তি আর সেরকম নেই কি না।' চক্রবর্তী বললে, "কাল দেখলে তো ব্যাপারটা পুরুষোত্তম? —একেবারে আত্মহত্যা!...। পুরুষোত্তম ঘেন্নায় আতঙ্কে এমন শিউরে উঠল যে, আমার পিঠটাতে পর্যন্ত ধাক্কা লেগে গেল। বললে, 'নারায়ণ! নারায়ণ!...তুমি এ-রকম একটা অশুচি প্রসঙ্গ অবতারণা করবার আর অবসর পেলে না সনাতন? শাস্ত্র বলেছেন আত্মহত্যার কথায় শ্রুতি পর্যন্ত কলুষিত হ'য়ে যায়। শিব! শিব! নারায়ণ! নারায়ণ!'...এদের পাশে যে ব'সে আছি এতে আমার সমস্ত শরীরটা ঘিন্ ঘিন্ ক'রে উঠল। মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি এল। সার্বভৌম যেই 'নারায়ণ! নারায়ণ!' ক'রে উঠেছে, আমি আগে যেন কিছুই শুনিনি এই ভাবে 'কি হ'ল! কি হ'ল!...বলে একেবারে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম। একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল, আর এ অবস্থায় যেমন হ'য়ে থাকে, আরও কয়েকজন আতঙ্কের মাথায় উঠে দাঁড়াল। সার্বভৌম মুড়োটা তুলতে যাচ্ছিল মুখে, হাঁ ক'রে ঘাড় ফিরিয়ে আমার মুখের

পানে চেয়ে বললে, 'কি হ'ল?' সেরকম নৈরাশ্য আর নিষ্ফল ক্রোধের মূর্তি আর কখনও দেখিনি শৈল। কি আনন্দ যে হ'ল। বললাম, 'আপনি হঠাৎ 'নারায়ণ নারায়ণ' ক'রে উঠলেন, ভাবলাম মস্তবড় একটা ছোঁয়াছুঁতের ব্যাপার হ'য়ে গেছে বা অন্য রকম কিছু বিঘ্ন হয়েছে; পেছনে ফিরে আছি, দেখতে তো পাইনি, ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছি; আর বসাটা শাস্ত্রসংগত হবে না বোধ হয়?'...সবারই খাওয়া গেল, কষ্ট হ'ল, একটা গোলোযোগও হ'ল খুব; কিন্তু একা সার্বভৌমের হাতের মুড়ো যে মুখে উঠতে পেল না সেই আনন্দে আমি আর কিছু গ্রাহ্যের মধ্যে আনলাম না; মনে হ'ল সদুর অপমানের তবুও টাটকা-টাটকা একট প্রতিশোধ নিতে পারলাম। কিন্তু সে একটা সাময়িক ফুর্তি; নেহাত একটা সুবিধে হাতের কাছে এল, ছাড়লাম না। ওতে তো সদুকে বাঁচাতে পারা যাবে না। একটা উপায় ছিল তোর হাতে; কিন্তু তোর যা চিঠি দেখলাম, তারপর আমার দ্বিতীয় চিঠির পরে তুই যেমন তুষ্ণীভাব অবলম্বন করলি তাতে বুঝলাম ও-গুড়ে বালি। তখন নিরুপায় হ'য়ে ভেবে ভেবে এই উপায় ঠাওরালাম, মানে সদুকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসা। অম্বুরীকে পর্যন্ত রাজি করলাম, অবশ্য খুব সহজেই হ'ল। কেন-না যে-ব্যাপারে আমি রয়েছি তাতে অম্বুরীর নিজস্ব একটা মত থাকতে পারে, কিন্তু অমত নেই। অর্থাৎ কি ভাল কি মন্দ সে খুবই জানে, কিন্তু সবার ওপরে জানে স্বামী-দেবতার কথা।

"এখন তুই প্রশ্ন করবি, সবই যখন ঠিক তখন তোর কাছে আবার কি করতে ছুটেছিলাম। ছুটেছিলাম এই জন্যে যে, সমস্যাটার যখন জট খুলে এনেছি মনে করলাম, তখন হঠাৎ দেখি সেটা আরও সাংঘাতিক রকম জটিল।.. তুই দাঁড়িয়ে রইলি শৈল, বস্।"

অনিল নিজেও মাদুরটাতে বসিল। আমি বসিলে বলিল, "অম্বুরীর মত পাওয়ার পর, কিংবা অম্বুরীর মুখে আমার মতের প্রতিধ্বনিটা শোনবার পর বাকি রইল, খোদ সৌদামিনীর মত নেওয়া। তার সঙ্গে দেখা করলাম। কোথায়, কবে, কখন—সেকথা থাক্; এ তো আর কাব্য হচ্ছে না; সদুকে সব কথা বললাম। বললে, 'এটা তোমার সম্ভব বলে মনে হয় অনিল-দা?'...বললাম, 'অসম্ভব কিসে?' বললে, 'ভাগবত-কাকা ছাড়বে কেন? একটা কুকুরকে দু-মুঠো ভাত দিলে তার ওপর অধিকার জন্মে যায়।'...আমি বললাম, কিন্তু মানুষের ওপর জন্মায় না; তুমি সাবালিকা।'

"...সদু বললে, 'ও তো আইনের কথা; একই গ্রামে রয়েছি, ভাগবত-কাকার কাছ থেকে আইন কতদিন বাঁচাবে? সমাজের অবস্থা দেখতে পাচ্ছ, সবার টিকি ভাগবত-কাকার কাছে বাঁধা' টিকতে পারবে?'—বললাম, 'সে ঠিক করেছি; না পারি বাড়ি-ঘর-দোর বেচে চুঁচড়োয় গিয়ে থাকব।'... সদু কাতরভাবে বললে, 'অনিলদা আমার সবচেয়ে ভাবনার কথা কি জান? আমার মাথার একেবারে ঠিক নেই; এই দশা হ'য়ে পর্যন্ত শুধু একটি দিন আমার মাথার ঠিক ছিল—যেদিন বিষ খাই। অনেক ভেবেচিন্তে মাথা ঠাণ্ডা ক'রে দেখলাম এ পৃথিবী থেকে যাওয়াই আমার একমাত্র উপায়। কিন্তু হ'ল না। তারপর থেকে আমার মাথার ঠিক নেই, ভেবে দেখবার ক্ষমতা হারিয়েছি। এ অবস্থায় আমায় আর লোভ দেখিও না অনিলদা। তোমার বাড়ি আমার স্বর্গ, যে নরক যন্ত্রণায় ভুগছে তাকে যদি স্বর্গে ডাকা যায় সে কি বিচার ক'রে দেখতে পারে? তবে মোটামুটি বুঝছি কাজটা ভাল হবে না।'

"আমি অনেক ক'রে বোঝালাম; বললাম, বিপদ যদি থাকে তো আমারই; তা আমরা দু-জন যখন তার জন্যে তোয়ের রয়েছি, সদু অমত করে কেন? তার কলঙ্ক আছেই কপালে, আমার বাড়িতে থাকলেও, ভাগবতের বাড়িতে থাকলেও; তবে সে নিজে যদি এই জায়গায় অপবাদের মধ্যে কোন রকম তফাত না দেখে, আমাকে যদি এতই অবিশ্বাস করে তো আমার কথাটা তোলাই ভুল হয়েছে।

"অবিশ্বাসের কথায় সদু একটা কাণ্ড ক'রে বসল। দু-হাতে আমার হাত দুটো খপ্ করে ধরে নিলে। বললে, 'সেই সদুই আছে তোমার; ঈশ্বর সাক্ষী ছেলেবেলায় তোমাদের হুকুম করতাম, সেই অপরাধের এই রকম ক'রেই শোধ নেওয়ালেন ভগবান,—মেনে নিচ্ছি তোমার এ মোক্ষম হুকুম

অনিলদা। কবে আসতে বলছ, বলো। সত্যিই ভাগবত-কাকার নির্যাতন আর সহ্য হচ্ছে না।

"সদু একেবারে ভেঙে পড়ল। আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে, আমার হাত দুটো নিজের মাথায় চেপে ফুলে ফুলে অনেকক্ষণ কাঁদলে। আমি কিছু বললাম না। মনটা হালকা হ'লে উঠে দাঁড়াল, আমার হাত দুটো ধরেই আছে। মিনতির স্বরে বললে, 'শুধু একটা কথা রেখ অনিলদা'...জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি কথা?' সদুর চোখে আবার জল উপচে উঠল, বললে, 'অবিশ্বাসের কথা নয়, ধর্ম সাক্ষী। কিন্তু সদীর জীবনে কখনও দুঃখের অভাব হয়নি, হবেও না, তাই, যদি কখনও এমনই হয় যে পোড়া প্রাণটাকে হিঁচড়ে বের ক'রে দেওয়া ভিন্ন আর উপায় না থাকে তো বাধা দিও না, এখন থেকেই মিনতি ক'রে রাখলাম।'

"সদু আর এক চোট ভেঙে পড়ল!"

অনিল চুপ করিল। আলো জ্বালা হয় নাই, বাড়িতে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে। আমরা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। এক সময় অনিল বলিয়া উঠিল, "কি বলিস্? সমস্যা নয়?"

বলিলাম, "সমস্যা বৈকি; মরণ যেন ওর জন্যে ওত পেতে বসে আছে।"

অনিল বলিল, "অথচ এই মরণের হাত থেকে ওকে বাঁচানো যায়; অব্যর্থ।"

আমার মনটা মথিত হইয়া উঠিতেছে। অনিল কি ভাবে সদু ওর একারই চিন্তা? পত্রের উত্তর দিই নাই বলিয়া আমি নিশ্চিন্ত আছি? ওর একা সদু, আমার সদু আর মীরা—কর্তব্য আর ভালবাসা। আমার যন্ত্রণা অনিল বুঝিবে না, যতই বুদ্ধিমান হোক না কেন। আমি নীরব আছি দেখিয়া অনিল বলিল, "তাই তোর কাছে গেছলাম তাড়াতাড়ি শৈল। তোকে এক সময় বলেছিলাম চিঠি পেয়ে এবং না পেয়ে তোর মনের ভাব বুঝেছি, আর যাওয়ার দরকার ছিল না, কিন্তু দেখলাম সদুর সমস্যা আরও জটিল, আমি তাকে বাড়িতে ঠাঁই দিলেই মিটবে না। তাই ভাবলাম আর একবার বলে দেখি শৈলকে। অবশ্য সদুকে বলিনি এখনও, কিন্তু আমি ওর মন জানি। ইদানীং সদুর সঙ্গে কথাবার্তায় একটা জিনিস আবিষ্কার করেছি শৈল, এ-সময় বলাটা ঠিক হবে না, ভাববি আমি তোর মন ঘোরাবার জন্যে মিথ্যে রচনা ক'রে বলেছি; কিন্তু তবু বলি—সদু আমায় কখনও ভালবাসত না শৈল। যখন টের পেলাম, মনে একটা ভয়ানক আঘাত পেয়েছিলাম। কিন্তু ভেবে দেখলাম ওইটেই ঠিক স্বাভাবিক। আমি সদুকে ভালবাসতাম, তুই ছিলি উদাসীন, সব মেয়েরই উমার অংশে জন্ম—উদাসীনের জন্যেই তাদের তপস্যা।"

আমার মনে একটা ঝড় উঠিয়াছিল। এ তত্ত্বটা আমিও টের পাইয়াছিলাম—অর্থাৎ আমার প্রতি সৌদামিনীর মনের ভাবটা। অনিলের উপর ওর সব-ঢালা নির্ভর আর অপরিসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু অনিল যাহা আশা করিয়াছিল সদু তাহা দিতে পারে নাই, সে জিনিসটা সদু আমরাই দিয়াছে বলিয়া আমারও মনে হইয়াছিল।

কিন্তু আমার নিজের কথা?...মনে পড়িতেছে মীরার মুখখানি। বেশ বুঝিতেছি ঐ একখানি মুখ জীবনে ভালবাসিয়াছি, কামনা করিয়াছি, স্বপ্নমণ্ডিত করিয়াছি। আঘাত দিয়া আসিয়াছি; স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে অপলক দৃষ্টিতে অপসৃয়মান গাড়ির দিকে চাহিয়া আছে মীরা। কি কঠিন, সমস্ত চিত্ত উদাস করা বিদায়!

অপর দিকে ওই ভালবাসার সামনে—চিত্তের ওই বিলাসের তুলনায় সৌদামিনীর ব্যর্থ, বিপন্ন জীবন—রূঢ় কঠোর বাস্তব!

কি করি আমি? এ কি অসহ্য অবস্থা!

আমি ব্যথিতভাবে অনিলের পানে চাহিয়া বলিলাম, "অনিল, আমি পারব না। উপায় নেই; কিন্তু তবুও বলছি আমায় সাতটা দিন সময় দে। পরশু একটা ব্যাপার হয়েছে যাতে আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যদি পারি তো জীবনে আর আমি হঠাৎ কিছু ক'রে বসব না। কিন্তু আমি করছি চেষ্টা। বোধ হয় তোর কথা রাখতে পারব না অনিল, এই রকম ভাবেই মনটাকে তোয়ের রাখিস্। সঠিক

উত্তর এই সাতটা দিন পরে দোব।"

অন্য দিন হইলে বোধ হয় অনিলকে কথা দিয়াই দিতাম, ওরই প্রস্তাবে সায় দিতাম, সদুর মৃত্যুর সম্ভাবনাও তো কম ব্যাপার নয় একটা। কিন্তু মীরাকে আঘাত দিয়া আসিয়া বড় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছি।

অম্বুরী আসিল। বাড়িতে ঢুকিয়াই বলিল, "জ্বালোনি তো আলো ঘরে? কি আলসে-কুড়ে মানুষ বাপু! কোথাও গিয়ে যে একটু নিশ্চিন্তি..."

দু-জন দেখিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

অনিল হাসিয়া বলিল, "অন্য কেউ না, শৈল এসেছে। তুমি যত মিষ্টি মিষ্টি শোনাবার শুনিয়ে যেতে পার, তোমার পতিভক্তির আসল রূপ জানাই আছে ওর।"

১১

পরদিন দুপুর বেলাব কথা। অনিল আপিস গেছে। অম্বুরী খাওয়া-দাওয়া সারিয়া খুকীকে লইয়া পাড়ায় কাহার বাড়ি বেড়াইতে গেল। অম্বুরীর পুত্র একে বীর, তায় টাটকা কথকতা শুনিয়া আসিয়াছে, তাহার উপর আবার আমার মত আদর্শ শ্রোতা পাইয়াছে, জাপানী ভাঙা বন্দুকটা লইয়া হাত-পা নাড়িয়া আস্ফালন করিতেছে, "এবার যখন রাবণরাজা সীটাকে ঢরটে আসবে শৈল টাকা, আমি এই বণ্ডুক নিয়ে যাব, ডশটা মুণ্ডু হওয়া বের ক'রে ডোব। টুমি এই ভাঙাটা সেরে ডিয়োটো শৈল টাকা।"

বলিলাম, "তার চেয়ে একটা নতুন কিনে দিলে কেমন হয়?"

সানু উল্লসিত হইয়া কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময়ে বাইরের রকে আওয়াজ শোনা গেল, "বৌ আছিস?" এবং সঙ্গে সঙ্গে সদু আসিয়া প্রবেশ করিল।

জানা থাকিলেও যেন একটা অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন দেখিয়া অন্তরে চমকিয়া উঠিলাম। সিন্দুরহীন সীমন্ত, অধরে তাম্বুলরাগ নাই, বস্ত্রে পাড়ের স্নিগ্ধতা নাই, পায়ে আলতার চিহ্নমাত্র নাই;— একটা অশুভ শুভ্রতায় সদু আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। হঠাৎ যেন নূতন করিয়া উপলব্ধি করিলাম— কী রিক্ততাই আসিয়াছে ওর জীবনে।

ও-ই প্রথম কথা কহিল, "শৈলদা? কবে এলে?"

স্বপ্নোত্থিতের মত খানিকটা আবিষ্টভাবেই বলিলাম, "এই যে সদু—আমি কাল—হাঁ, ঠিক তো, কালই সন্ধ্যেয় এসেছি।"

"ভাল আছ তো?—বলিয়া ফেলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু ততক্ষণে হুঁশ হইয়াছে।

সদু বলিল, "বৌ কোথায় গেল? তার কাছে এসেছিলাম, একটু দরকার ছিল।"

"ও!"—বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম। ভুলটা সংশোধন করিয়া সানু বলিল, "মা বেড়াটে গেছে...রাবণের গল্প শুনবে সডু পিসীমা?—টা হলে শৈল টাকার কাছে বসো।"

সদু আমার পানে চাহিয়া বলিল, "না, রাবণের গল্প শুনলে চলবে না আমার, তোমার শৈল টাকাকে শোনাও।"

আমার বুকটা ঢিপ ঢিপ করিতে ছিল, সদুকে আটকান দরকার। সানুকে বলিলাম, "তুমি আরম্ভ তো ক'রে দাও, শুনলে কি যেতে পারবে তোমার পিসীমা?"

সদু হাসিয়া বলিল, "না, আরম্ভ ক'রে কাজ নেই সানু, শুনলে শেষকালে আবার যেতে পারব না। আমার কাজ আছে, অন্য দিন শুনব'খন।"

আমায় প্রশ্ন করিল, "তুমি এখন থাকবে শৈলদা?"

বলিলাম, "না আজই যাব।"

তাহার পর কথাটা আরম্ভ করিবার একটা সুবিধা পাইয়া বলিলাম, "ভয়ংকর দরকারী একটা কাজ আছে বলে অনিল ডেকে এনেছে।"—বলিয়া স্থিরদৃষ্টিতে সদুর মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। সদু ক্ষণমাত্র বিচলিত বা অপ্রতিভ না হইয়া হাসিয়া প্রশ্ন করিল, "ভয়ংকর কি এমন কাজ? আমি তো জানি সেইখানেই তুমি এমন ভয়ংকর কাজে থাক যে নড়বার ফুরসত থাকে না, দুনিয়ার কি হ'ল খোঁজ রাখতে পার না।...নুকুলে কি হবে?—আমি বৌয়ের কাছে সব শুনেছি"—বলিয়া সেই হাস্যদীপ্ত দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া রহিল। আমার চক্ষু নামাইতে হইল। যখন তুলিলাম তখন আমার চোখে জল ভরিয়া গেছে। বলিলাম, "সদু, মাফ ক'রো আমায়। আমি খবর পেয়েছিলাম, কিন্তু সত্যিই খোঁজ নেওয়া যাকে বলে তা হ'য়ে ওঠেনি এখন পর্যন্ত। আর এ অপরাধের জবাবদিহিও নেই কোন আমার কাছে।"

সদু বারান্দার দরজায় পিঠ দিয়া, দুইটা হাত দুয়ারের মাথার উপর রাখিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, "দেখ কাণ্ড। বেটাছেলের চোখে জল!...কি এমন হয়েছে আমার যে..." আর অগ্রসর হইতে পারিল না; তাড়াতাড়ি হাত দুইটা নামাইয়া দুই হাতে আঁচল ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

চাপা, নীরব কান্না, সামলাইতে পারিতেছে না, ক্রমাগতই বাড়িয়া যাইতেছে, সমস্ত শরীরটা এক-একবার কাঁপিয়া উঠিতেছে, অঞ্চলেব আগল ঠেলিয়া ক্ষুব্ধ স্বর এক-একবার উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে।

কিছু বলিলাম না। একটু কাঁদুক। সমস্ত পৃথিবীতে ওর কাঁদিবার জায়গা মাত্র দুইটি—এক অনিলের আর এক আমার সামনে। এত বড় কথাটা ভুলিয়া ছিলাম কি করিয়া? কাঁদুক, বুকে যে পাষাণভার রহিয়াছে, অশ্রু-স্রোতে তাহার এককণাও যদি ক্ষয় করিয়া ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে।

সদু অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আঁচলটা সরাইয়া লইল; দোরে ঠেস দিয়া মুখটা বাহিরের দিকে করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এক-একবার সমস্ত শরীরটা সঘন বিক্ষোভে কাঁপিয়া উঠিতেছে; সদু শোকের উচ্ছ্বাসে অপ্রতিভ হইয়া পড়িয়াছে। যাইতেও পা উঠিতেছে না।

সানু হতভম্ব হইয়া মুখ নীচু করিয়া ভাঙা বন্দুকটা নাড়াচাড়া করিতেছে, এক-একবার চক্ষুপল্লব তুলিয়া আমাকে আর সদুকে দেখিয়া লইতেছে।

একটু পরে একবার কোনরকমে আমার মুখের পানে চাহিয়া সদু বলিল, "এখন যাই শৈলদা।"

পা বাড়াইতে আমি বলিলাম, "একটু দাঁড়াও সদু।"

মাথা নীচু করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আরও খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম দু-জনে, তাহার পরে আমি বলিলাম, "অনিলের কাছে সব শুনলাম সদু,—তুমি এখানে আসবে শুনে..."

সদু বাধা দিয়া বলিল, "না, আসছি না শৈলদা, সেই কথাই বলতে এসেছিলাম বৌকে।"

আমি অতিমাত্র বিস্ময়ান্বিত হইয়া ওর মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, "আসছ না!—কেন?"

সৌদামিনীর মুখটা যেন একটা মাত্র ভাব-ফোটানো পাথরের মূর্তির মত কঠিন হইয়া উঠিল, "কেন আসব শৈলদা? আমার দুঃখে অনিলদা 'আহা' বলতে গেছেন বলে এই প্রতিদান দোব আমি? ওঁর সর্বনাশ করব, ওঁর স্ত্রীর সর্বনাশ করব, ওঁর সন্তানদের কপালে কলঙ্কের ছাপ দিয়ে বংশটাকে চিরকালের জন্য দাগী ক'রে দোব? আমি যে এক সময় এটা ভাবতে পেরেছিলাম কি ক'রে, অনিলদার কথায় কি ক'রে 'হাঁ' বলতে পারলাম, তাই ভেবে সারা হচ্ছি।...আমার দোষ নেই শৈলদা, আমি অনিলদাকে বলেইছিলাম আমার মাথার ঠিক নেই, ভেবে কাজ করবার, ভেবে কথা বলবার শক্তি আমি হারিয়েছি।...কিন্তু ওঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ফেরবার পর আমি স্থির মনে কথাটা ভেবে দেখেছি, যতই ভেবেছি ততই আশ্চর্য হয়েছি—ওঁর এতবড় সর্বনাশ আমি কি ক'রে করতে যাচ্ছিলাম। আমি তাই ছুটে এসেছি এই অসময়ে, যতক্ষণ না বৌকে বলতে পারছি ততক্ষণ আমার মনে একটু শান্তি নেই শৈলদা। বৌ জানে কথাটা, দু-জনে মিলে আমায় দিয়ে এই পাপটা করাতে বসেছিল। আশ্চর্য!—ওদের দু-জনকে কি এক ধাতুতে গড়েছিলেন বিধাতা? বৌ মেয়েছেলে, একটু পরামর্শ দিতে পারলে

না অনিলদাকে? আর কিছু না হোক্ নিজের স্বার্থটাও তো দেখা উচিত ছিল। বুঝলাম ও নিজের স্বামীকে খুব ভাল ক'রে চেনে, সেদিক দিয়ে ভয় নেই ওর, কিন্তু স্ত্রীর ঈর্ষা বলে তো একটা জিনিস থাকতে হয়? ওর তাও নেই?—ও একেবারে সব ধুয়ে মুছে বসে আছে?'

আমি একটু অন্যমনস্ক ছিলাম, প্রশ্ন করিলাম, "বেশ, এলে না, তারপর?"

সদু বলিল, "এর আর তারপর নেই শৈলদা। না আসা মানে নিজের অদৃষ্টকে মেনে নেওয়া। ভেবে দেখলাম সেইটেই মানুষের স্বধর্ম;—এই নিজের অদৃষ্টকে চিনে তাকে মেনে। আমি এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি আমার জীবনের গতি কোন্ দিকে। যার এই রকম বিয়ে, এই রকম বিধবা হওয়া, এই রকম ভাবে চিরজন্ম এমন একজনের অন্নদাসী হ'য়ে থাকা যার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই—তাকে ভগবান কিসের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, সে তো স্পষ্ট। ভাগবত-কাকা সময় সময় আমাকে গীতা, ভাগবত—এই সব থেকে শ্লোক শোনান—হ্যাঁ, ঠিক কথা, মন্ত্রও দিয়েছেন আমায়।—তুমি আশ্চর্য হচ্ছ?—বলিদানের পাঁঠার কানে পুরুত মন্ত্র দিয়ে দেয় না? তাঁর সবচেয়ে প্রিয় শ্লোক হচ্ছে—'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি.' আজ সাত-বছর ধ'রে এই মারাত্মক শ্লোকটার বিরুদ্ধে লড়েছি শৈলদা, কিন্তু আর না, এবাব হৃষীকেশ আর তার ভক্তেরই শরণ নোব ঠিক করেছি। ভেবে দেখলাম অনিলদার মত মানুষকে ধ্বংস করার চেয়ে সে ঢের ভাল। কেন-না এই আমার স্বধর্ম, আর গীতা বোধ হয় একেই 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' বলে প্রশংসা করেছেন। সত্যিই তো—সব বকমে মরাই যদি আমার স্বধর্ম হয় তো আমিই মরব—একজন; অনিলদা মরবে কেন? বৌ মরবে কেন, আর সবচেয়ে—ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু—ও কি করেছে যে.."

সদু আর পারিল না। মুখটা বাহিরেব দিকে ঘুরাইয়া লইল। দেখিতেছি কান্না চাপিবার জন্য নীচেব ঠোঁটটাকে এক-একবার নিষ্ঠুরভাবে কামড়াইয়া ধরিতেছে। আর পারিল না;—অস্বস্তির মাঝে পড়িয়া সানু চোরের মত নামিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে বুকে চাপিয়া উদ্বেলিত কান্নার মাঝে বলিয়া উঠিল, "আমার কি দশা হবে সানু?.. ওঃ, বাবা গো, আর সহ্য হয় না কষ্ট।"

সানুকে বুকে চাপিয়া কপালটা কপাটে লাগাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সে এক অসহ্য দৃশ্য,—পাষাণও বোধ হয় গলিয়া যায়; আমার সমস্ত শরীরমন চাপিয়া যেন একটা জোয়ার ঠেলিয়া উঠিতেছে। একটা সর্বব্যাপী বিরাট দুঃখের উচ্ছ্বাস যাহা আর সব থেকেই যেন আমায় বহু উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছে—ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখ, ক্ষুদ্র ভালবাসা, ক্ষুদ্র বিচার-কল্পনা, সব থেকেই। আমি আর থাকিতে পারিলাম না; উঠিয়া গিয়া সদুর পাশে দাঁড়াইয়া গাঢ়স্বরে বলিলাম, "অত নিরাশ হ'য়ো না সদু, আরও একটা উপায় আছে।"

কোন উত্তর হইল না, সহানুভূতির কথায় কান্নাটা শুধু আরও বাড়িয়া গেল।

একটু চুপ করিয়া আবার বলিলাম, "আরও একটা উপায় আছে সদু, একেবারেই উপায়হীন করেন না ভগবান।"

সৌদামিনী ধীরে ধীরে মুখটা তুলিতে যাইতেছিল, আবার কি ভাবিয়া নামাইয়া লইল, প্রশ্ন করিল, "কি?"

কি ভাবে যে বলিব কথাটা প্রথমটা ঠিক করিতে পারিলাম না। তাহার পর নিজের মনটা গুছাইয়া লইয়া বলিলাম, "তোমায় আর আমায় নিয়ে কথা সদু, অবশ্য ধর্ম থাকবেন মাঝখানে।"

সদু কোন উত্তর দিল না। সানুকে বুকে লইয়া, কপাটলগ্ন করতলে কপাল দিয়া তেমনই ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না; শুধু একটু পরে বুঝিতে পারিলাম অশ্রুধারা আরও প্রবলতর হইয়া নামিয়াছে।

বলিলাম, "থাক্ সদু, ভেবে দেখ, তোমার উত্তরের জন্যে না হয় আর একদিন আসব শীগ্গির।"

আর একদিন থাকিয়া গেলাম। পরদিন অনিল আহার করিয়া আপিসে বাহির হইয়া গেলে,

অম্বুরী আমার সামনে আসিয়া জানালার খিলানের নীচে বসিল, একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "সব শুনেছ তো ঠাকুরপো?—কি হবে?"

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওর চেহারাটা হইয়া পড়িল ভীত-ত্রস্ত হরিণীর মত। বুঝিলাম এই ওর এখনকার আসল চেহারা, যদিও অনিলের যাওয়ার আগে পর্যন্ত ও ছিল সেই চিরকালের হাস্যমুখরা অম্বুরী। এই এক নারী যে উদয়াস্ত অভিনয় করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। আমি জানি অম্বুরীর এ কাজ নয়, এত বড় স্বার্থত্যাগ ওর দ্বারা সম্ভব নয়। যে একটা বড় স্বার্থত্যাগ করিবে তাহার তেমনই বড় একটা পৃথক সত্তা থাকা দরকার। সে সত্তা অম্বুরীর কোথায়?

একটা উপায় ঠাহর করিয়াছি বলিয়াই একটা পরিহাস করিলাম, বলিলাম, "বাঃ, এই শুনলাম তুমি নিজেই একটি সতীনের জন্যে..."

অম্বুরী অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিল, "ঠাট্টা রাখো, ঠাট্টার ঢের সময় আছে ঠাকুরপো। ওঁকে যদি বাঁচাতে না পার তো সদু-ঠাকুরঝি যে পথ ধরেছিল আমিও সেই পথ ধরব ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

অম্বুরীর চেহারা দেখিয়া ভীত হইয়া উঠিলাম। একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই বলিলাম, "বাড়াবাড়ি হ'য়ে যাচ্ছে অম্বুরী। তাহলে তুমি রাজি হ'লে কেন সদুকে জায়গা দিতে?"

অম্বুরী মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, বলিল. "কিছু শুনব না। ওঁকে বাঁচাও, নইলে ওই কথা;—অম্বুরীকে তোমরা আর বেশি দিন পাবে না।"

খানিকক্ষণ উভয়েই চুপ করিয়া রহিলাম। অম্বুরীর রাজি হওয়ার অন্তরালে এই সঙ্কল্প। আমি ধীরে ধীরে বলিলাম,"উপায় একটা ঠাউরেছি অম্বুরী।"

অম্বুরী উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল, "কি, বলো!"

সঙ্গে সঙ্গে নিজেই বলিল, "ও বুঝেছি, উনি বলেছিলেন বটে একবার।"

তাহার পর আমার উপর স্থিরভাবে চাহিয়া বলিল, "না, সেও হবে না; বংশে একটা দাগ লাগাবে ওর জন্যে?"

ব্যথিত কণ্ঠে বলিলাম, "তাহ'লে সৌদামিনী যায় কোথায়?"

অম্বুরী দৃঢ় অথচ অনায়াসকণ্ঠে বলিল, "ঢের পথ আছে; একবার ফিরে আসতে হয়েছে বলে বার বারই কিছু ফিরতে হবে না।"

অম্বুরীর উপর রাগ করিতে পারিলাম না। সংস্কারের ডেলা বাঙালী ঘরের আদর্শ গৃহস্থ বধূ,—কিন্তু সেই সংস্কার একদিকে যেমন ওর অন্তরে স্বর্গের অমৃত সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে, অন্য দিকে দুর্বলও তো করিয়াছে, তেমনই!

জন্ম-জন্মান্তরের ভালবাসা অম্বুরীর মত মেয়েই পারে দিতে, কিন্তু মনে রাখিতে হইবে অম্বুরী শৃঙ্খল, ওর কাছে কর্মের মুক্তি নাই, এমন কি চিন্তারও মুক্তি নাই।

১২

আমি আর একটা দিন যে থাকিয়া গেলাম সে এক প্রকার আলস্যভরেই এবং অন্যায় ভাবেও,—কেন-না তরু রহিয়াছে, আর আমারই উপর এখন তাহার সম্পূর্ণ ভার।

শরীর-মন কি রকম এলাইয়া পড়িয়াছে, কলিকাতার কোন আকর্ষণ অনুভব করিতেছি না। নিছক কর্তব্যজ্ঞানই সব সময় জীবনকে সচল করিতে পারে না, আরও কিছু চাই।

পরদিন একটা সুযোগে অনিলকে সব কথা বলিলাম, অবশ্য অম্বুরীর কথাটা বাদ দিয়া। অনিল প্রথমটা যেন বিশ্বাসই করিতে পারিল না, ক্রমে তাহার মুখটা ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ওর স্বভাবের মধ্যে উচ্ছ্বাস নাই বড় একটা, শান্তকণ্ঠেই বলিল, "তুই যে কি স্বার্থত্যাগ করলি, যার

জন্যে করা সেও বোধ হয় কখনও জানতে পারবে না, তবু পৃথিবীতে অন্তত একজনের জানা রইল, আর জানলেন ভগবান। লোকে যে কথা যত কম জানতে পারে তাঁর কাছে সে কথা তত বেশি ক'রে পৌঁছোয় শৈল।"

জীবনে এক-একটা কেমন অদ্ভুত ঘটনাসাদৃশ্য আসে। চারিদিন পূর্বে কলিকাতা অভিমুখী গাড়িতে বসিয়া আমি যে ধরনের চিন্তা করিতেছিলাম, চারিদিন পরে কলিকাতা অভিমুখী আর একখানি গাড়িতে, সন্ধ্যায়ই, আবার সেই ধরনের চিন্তা। কিন্তু দুইদিনের চিন্তার মধ্যে সাদৃশ্যের চেয়ে পার্থক্য সেইটেই বেশি অদ্ভুত। সেদিন ছিল মীরা, আর আজ, এই চারিদিনের ব্যবধানে তাহার জায়গা লইয়াছে সৌদামিনী। সেদিন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম মীরার কাছে ক্ষমা চাহিব, আজকের প্রতিজ্ঞা সদুকে উদ্ধার করিতেই হইবে—যাহার অর্থ হয় মীরাকে ভোলা। মানুষের কত দম্ভের প্রতিজ্ঞা।

বাসায় আসিতেই প্রথমে তরুর সঙ্গে দেখা। আনন্দের চোটে আমায় জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মাস্টারমশাই, কে আজকে এসেছেন বলুন তো, বুঝব বাহাদুর।"

বাহিরের কাহারও এখানে আসা যাওয়া খুবই কম, বিশেষ করিয়া আজকাল, যখন অপর্ণা দেবী, মীরা কেহই নাই। আন্দাজ করিতেছিলাম, তরুর আর ধৈর্য রহিল না, বলিল, "মা, দিদি!—একটুও ভাবতে পেরেছিলেন এত শীগ্‌গির আসবেন? সকালে উঠে পাঠশালায় বেরুব, হঠাৎ ট্যাক্সিতে ক'রে মা, দিদি, রাজু, মদন! ছুটে গিয়ে বাবাকে..."

কথার মধ্যেই আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া তরু থামিয়া গেল। আমারও হুঁশ হইল, তাড়াতাড়ি সামলাইয়া লইয়া বলিলাম, "হঠাৎ যে চলে এলেন। শরীর ভাল আছে তো তরু?"

তরু আশ্বস্ত হইল, বলিল, "শরীরে কি হবে?—এই তো, পরশু আমরা এলাম; মা বললেন, তুই চলে আসলে একেবারে মন টেঁকছিল না তরু তাই..."

আমি প্রশ্ন করিলাম, "আর তোমার দিদি,—তিনি কি বললেন?"

তরু বলিল, "অত জিজ্ঞেস করতে যাইনি আমি। এলেন চলে, কেমন আমোদ হবে তা নয় কেন এলে, কি করতে এলে—এই ক'রে তাকে উস্তমখুস্তম ক'রে তাড়াই...মাস্টারমশাই যেন কী!"

রাগের ভান করিতে গিয়া তরু হাসিয়া ফেলিল।

মীরার সঙ্গে দেখা হইল। এই দুইটি দিনে কত পরিবর্তন। মীরা রাঁচিতে স্বাস্থ্যের যাহা কিছু সঞ্চয় করিয়াছিল সব যেন দিয়া আসিয়াছে, বরং তাহার পূর্ব স্বাস্থ্য থেকে কিছু লইয়া। মুখে একটা আকুল, সশঙ্ক ভাব, খুব চাপা মেয়ে, তবু সেটা খুব প্রকট। নিজেই বলিল, "চলে এলাম। তরু চলে আসতে বাড়িতে যেন ফাঁকা ঠেকতে লাগল; এমন জানলে তরুকে আসতে দিতাম না।"

মুখের ভাবটা একটু অপ্রতিভ; বক্তা আর শ্রোতা দু-জনেই যখন ভিতরে ভিতরে জানে যে একটা মিথ্যা কথা বলা হইয়াছে, সেই সময় বক্তার মুখের ভাবটা যেমন হয় আর কি।

মানানসই কিছু মুখে জোগাইল না, বলিলাম, "একটু তাড়াতাড়ি হ'য়ে গেল যেন!"

"তা গেল।"—বলিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া মীরা চলিয়া গেল।

যাহা হউক প্রথম দেখা হওয়ার সংকোচটা কাটিল এক রকম করিয়া।

কিন্তু তাহার পর দিন-দিনই জীবন হইয়া উঠিতে লাগিল দুর্বহ। সমস্ত রাখিতে হইতেছে,... মেলামেশা, হাসি-আলাপ, কিন্তু প্রাণহীন পরিশ্রম একটা; যেন তীব্র স্রোত আর প্রতিকূল বায়ুর বিরুদ্ধে গুণ টানিয়া একটা নৌকা বাহিয়া চলিয়াছি। মীরার মুখেও সেই ক্লান্তি আর অবসাদ।

তবে একটা বিষয় লক্ষ্য করিতেছি, বরং অনুভব করিতেছি বলা চলে, কেন-না মীরা যাহা ভাবে তাহা লক্ষ্যের বাহিরে রাখে;—অনুভব করিতেছি মীরা কিছু যেন বলিতে চায়। সুবিধা খুঁজিতেছে, কিন্তু চায় না এবার সুবিধাটা আমি সৃষ্টি করি—আমি একটু অগ্রসর হই, তাহা হইলে মীরা বলিবে কিছু।

কিন্তু আমি অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। বেশ বুঝিতেছি দুইজনের মধ্যেই একটা ভ্রান্তি

আছে কোথাও, দুইটা কথাতেই সব পরিষ্কার হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু তবুও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। সৌদামিনী হইয়াছে বাধা, আমার পায়ের নিগড়।

ভাবি—কর্তব্যের গুরুভার লইয়াছি মাথায় তুলিয়া; আমার জীবনে প্রেমের হইয়াছে অবসান। যাহাকে বিদায় দিলাম আবার তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়া বিড়ম্বিত করি কেন?

শুধু এইটুকু নয়। আমার ক্ষুন্ন আত্মাভিমানও বিদ্রোহী হইয়া উঠে এক-একবার। ভাবি, আমার তো সবই আছে; মীরার স্বয়ংবর-সভায় নিজেকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি মাত্র অর্থে আমি বড় নই এই অপরাধে মীরার ভালবাসাও শুদ্ধভাবে আমায় স্পর্শ করিবে না?—তাহাতে থাকিবে ঘৃণার খাদ মেশানো?—সমাজে সে আমায় লইয়া পড়িবে লজ্জায়?

তাহার চেয়ে আসুক সৌদামিনী। ও আমায় ভালবাসিবে ভালবাসার পূর্ণ নির্মলতায়, যেমন অম্বুরী ভালবাসে অনিলকে—একেবারে আত্মবিলোপ। হয়তো ওকে আমিও একদিন প্রতিদান দিতে পারিব; আজ যাহা মাত্র করুণার আকারে দেখা দিয়াছে, আজ যেটাকে বলিতেছি সহানুভূতি, কাল তাহাই বোধ হয় অনাবিল প্রেম হইয়া ফুটিয়া উঠিবে,—কে জানে? কতটুকুই বা তফাত এ-দুয়ের মধ্যে?...সদুর সঙ্গে সাক্ষাতে আরও একটা নূতন জিনিসের সন্ধান পাইলাম। প্রথমবারের কথাবার্তার বাঁধুনি আর এবারের কথাবার্তার বাঁধুনির মধ্যে অনেক প্রভেদ। প্রথম বারের লঘুভাবের কথাবার্তায় আত্মগোপন করিতে পারিয়াছিল, এবারে ভাবের উচ্ছ্বাসে পারে নাই। দেখিলাম ওর বলার ভঙ্গি, ওর ভাব, ওর আদর্শ, সবই উচ্চস্তরের। অনিল বলিয়াছিল সদু দুর্লভ নারী-রত্ন, গলার হার করিয়া পরিবার জিনিস। তা এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

এক-এক সময় আবার সমস্ত তর্ক-বিতর্ক ছিন্ন করিয়া, অন্তরে সমস্তটা পূর্ণ করিয়া দাঁড়ায় মীরা, হৃদয়ের অধীশ্বরীর বেশে। বুঝি, একমাত্র ওকেই চাহিয়াছি জীবনে। কেমন প্রীতি দিয়া, তেমনি ঘৃণা দিয়া ও আমার প্রেমকে উদ্রিক্ত করিয়াছে।...বিস্মিত প্রশ্ন হইবে—ঘৃণা আবার ভালবাসা জাগায়?...হ্যাঁ, নারীর ঘৃণা ভালবাসাই জাগায়, কয়লার তীব্র চাপে মনের খনিতে হীরাই উৎপন্ন হয়। এ-তত্ত্ব অবশ্য আপনাদের জানিবার কথা নয়। সাধ্বী চরণে বঙ্গললনার প্রীতি-অর্ঘ্যই পাইয়া আসিয়াছেন বরাবর।...কী অসহ্য অবস্থা!—দেবতার মত সর্বক্ষণ পূজার পরিমণ্ডলের মধ্যে অবস্থান। অহরহ সেই একই মন্ত্রের পুনরাবৃত্তি শুনিতে থাকা!

কি বলিতে কোথায় আসিয়া পড়িলাম। হ্যাঁ, মীরা যেন চায় আমি ওকে একটু সুবিধা করিয়া দিই, এক সময় ও যেমন আমায় সুবিধা করিয়া দিয়াছিল ডায়মণ্ড হারবার রোডে। আমি একটু সুবিধা করিয়া দিলেই ও যেন আমায় কি বলিবে।

কিন্তু মনের এই নানা রকম দ্বিধাদ্বন্দ্বে আমি আর তার সুযোগ দিতেছি না, বরং সাধ্যমত এড়াইয়া চলিতেছি।

এই অবস্থা চলিয়াছে দিনের পর দিন ধরিয়া।

সাঁতরা হইতে আসিবার পরদিন সকালেই অপর্ণা দেবী ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, "কেমন আছ তাই জিজ্ঞেস করবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। রাঁচিতে শেষ দিকটা তোমায় খারাপই দেখলাম কি না। হঠাৎ চলে এলে, কিছু দেখলে না, শুনলে না.."

কিছু সন্ধান করিতেছেন এইভাবে মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আমার সেই এক কথা—নিম্নকণ্ঠে বলিলাম, "ভাবলাম—মিছিমিছি কলেজের পার্সেন্টেজটা নষ্ট করব..."

বলিলেন, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিকই।" কিন্তু বেশ বুঝিলাম কথাটা বিশ্বাস করিলেন না, অবশ্য আশাও করি নাই যে বিশ্বাস করিবেন।

খানিকটা এদিক-ওদিক কথার পর সহসা প্রশ্ন করিলেন, "হ্যাঁ, মীরা হঠাৎ চলে এল কেন? জান তার কারণ?"

উনি উত্তর চাহেন নাই, আশাও করেন নাই, শুধু আমার মুখের ভাবটা লক্ষ্য করিবার জন্য প্রশ্নটা হঠাৎ করিলেন; করিয়াই নিজে হইতেই বলিলেন, "আর জানবেই বা কোথা থেকে তুমি?"

আমি অস্বস্তির ভাবটা কাটাইবার জন্যই বলিলাম, "আমায় তো বললেন...তরু চলে আসতে..."

অপর্ণা দেবী বলিলেন, "সে তো আমায়ও বলেছিল...তাই হবে বোধ হয়।"

একবার চোখ তুলিয়া চাহিয়া দেখি—মুখের পানে চাহিয়া আছেন।

অন্যান্য কিছু কথার পর উঠিয়া আসিলাম। আসিবার সময় একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে এল।

মিস্টার রায়ও জানেন। শুধু জানা নয়, তিনি ভাঙাটা জোড়া দেওয়ার জন্যও বোধ হয় সচেষ্ট।

তরু আমায় বলিল, "আপনার বিলেতে যাওয়া এক রকম ঠিক মাস্টার মশাই।"

প্রশ্ন করিলাম, "কি ক'রে টের পেলে।"

"বাবা আজ দিদিকে বলছিলেন কিনা, আমিও ছিলাম সেখানে। বলছিলেন, এম-এ-টা দিয়েই আপনি বিলেত চলে যাবেন ব্যারিস্টারি পড়তে। বললেন...আপনার সঙ্গে নাকি কথাও ঠিক হ'য়ে গেছে বাবার।"

বুঝিলাম যাহাতে স্থায়িভাবে একটা বিপর্যয় না ঘটে আমাদের মধ্যে, সেই জন্য মিস্টার রায় কন্যার সম্মুখে আমার ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রটি খুলিয়া ধরিয়াছেন। হাসিও পাইল একটু; ভাবিলাম যৌবন গেলে যৌবনের সব কথাই কি ভোলে মানুষে। যশ-প্রতিষ্ঠার কল্পিত বাঁধ দিয়া প্রাণের ভাঙন রোধ করিতে যাওয়া।

আপনা হইতেই একটা প্রশ্ন বাহির হইয়া গেল, "তোমার দিদি কি বললেন?"

তরু উত্তর করিল, "বললেন—বেশ তো বাবা।"

একটি দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনিয়া তরু আমার মুখের পানে চাহিল।

সেদিন রাত্রে পড়িতে পড়িতে তরু বারকতক চকিত দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিল, তাহার পর একবার প্রশ্ন করিয়া বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা শুনেছেন বোধ হয় মাস্টারমশাই?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি কথা?"

"রণেনদা আসছেন যে!—রাঁচির রণেনদা, মনে আছে বোধ হয়?"

ভাবটা এমন দেখাইল যেন আচমকা মনে পড়িয়া গেছে, কিন্তু বেশ বুঝিলাম ও অনেকক্ষণ থেকেই কথাটা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল, শুধু মন স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না।

বলিলাম, "বেশ ভাল কথা। আলাপ করা যাবে, সেখানে ভাল ক'রে আলাপ হয়নি। কবে আসবেন?"

তরু আমার মুখের উপর আর একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু নামাইয়া বলিল, "আসছেন রবিবার দিন; আজ বিকেলে টেলিগ্রাম এল। মা বলে দিয়েছেন কিনা কলকাতায় এলে নিশ্চয় দেখা করতে।"

আবার ক্ষণিকের জন্য চক্ষু তুলিয়া বলিল, "দিদিও বলে দিয়েছিলেন।"

বিকাল থেকেই কেমন একটা গুমট গরম, অকস্মাৎ যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। উঠিয়া গিয়া জানালার সামনে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে তাকাইয়া আছি। সন্ধ্যার আকাশে গুটি তিন-চার তারা ছিল, দিকরেখার উপর আর একটি স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলাম, নিরভিনিবেশ পাঠের গুন্‌গুনানির মধ্যে তরু একবার প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "আচ্ছা মাস্টারমশাই, ব্যারিস্টার ভাল, না ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট?"

কষ্টও হয়, হাসিও পায়—বেচারি তরুর মনে পর্যন্ত উদ্বেগের ছোঁয়াচ। কি উত্তর দেওয়া যায়? ব্যারিস্টারকে, অর্থাৎ ভাবী ব্যারিস্টার শৈলেন মুখার্জিকে ডেপুটি রণেন চৌধুরীর কাছে খুব ছোট করিয়া দিতে পারিতাম, কিন্তু স্বয়ং তরুর পিতাই ব্যারিস্টার, পেশাটাকে খেলো করা যায় না। মাঝামাঝি একট উত্তর দিলাম, "ব্যারিস্টার অবশ্য স্বাধীন ব্যবসা, তার কথাই নেই, তবে ডেপুটিরাও শেষ পর্যন্ত ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়ে একটা জেলার মালিক হ'য়ে বসতে পারে।"

উত্তরের জন্য যে তরুর বিশেষ কৌতূহল ছিল এমন নয়। বইয়ের উপর মাথাটা ঝুঁকাইয়া দিয়া বলিল, "হোকগে মালিক; আমি এখন গ্রামারটা আগে সেরে নিই। এত ক'রে পড়া দিয়ে দেয় নতুন সিস্টার।"

গুন্‌গুনানি আরম্ভ করিয়া দিল।

১৩

একটা কিছু হোক, আর যেন সয় না। হয় একেবারে ভাঙনই, নয় ক্রটি-বিচ্যুতি ভুলিয়া সুনিবিড় বাঁধন চিরদিনের জন্য। মীরা কি বলিবে বলুক, দিব সুযোগ।

কিন্তু কি করিয়া।

মীরা নিজেই আবার সুযোগের উদ্‌যোগ করিল।

সেদিন বিকাল বেলায় আমার ঘরের সামনে বারান্দায় বসিয়া আছি। হেমন্ত-দিন-শেষের তামাটে রোদ সামনের গাছপালা রাস্তা-বাড়ির উপর পড়িয়াছে, বেশ একটা সুস্থ ভাব জাগায় না মনে। কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা যাওয়া-আসা করিতেছে, কোনটাই স্থায়ী হইতে পারিতেছে না।

নিশীথ তাহার নূতন মোটরে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আমায় দেখিয়া কি ভাবিল বলিতে পারি না, তবে বাহিরে বাহিরে রাঁচিতে সেই বিদায়ের সময়ের ভাবটা বজায় রাখিল। "হ্যাল্লো, মিস্টার মুখার্জি, কি রকম আছেন?"—বলিয়া হাতটা বাড়াইয়া ডানদিকে একটু ঝুঁকিয়া বিলাতী কায়দায় অগ্রসর হইয়া আসিল। আমিও দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলাম, "ভালই, ধন্যবাদ; আপনি কি রকম ছিলেন? আপনিও হঠাৎ চলে এলেন দেখছি।"

নিশীথ টুপিটা হ্যাটস্ট্যাণ্ডে টাঙাইয়া দিয়া একটি কুশন-চেয়ারে বসিয়া পড়িল। বলিল, "থেকেই যেতাম, কিন্তু ভেবে দেখলাম ওদিকে আবার বেজায় দেরি হ'য়ে যাচ্ছে।"

'ওদিকে' মানে অবশ্য ওর সেই 'পরের জাহাজেই গ্লাস্‌গো যাত্রা'। বলিলাম, "হ্যাঁ, তা হ'য়ে যাচ্ছে বটে।"

নিশীথ বলিল, "মিস্ রায় বাড়িতে আছেন নাকি?"

কব্জিটা উলটাইয়া হাতঘড়িটা দেখিয়া বলিল, "বাই জোভ, সাড়ে পাঁচটা হ'য়ে গেল!"

বলিলাম, "বাড়িতেই আছেন বোধ হয়, বাইরে তো কই যেতে দেখিনি।"

রাজু বেয়ারা যাইতেছিল, ডাকিয়া মীরাকে খবর দিতে বলিলাম।

খুব প্রফুল্ল নিশীথ।—সেই লোকের মত, যে নিজের মনে বিশ্বাস করে যে সমস্ত বাধা-বিপত্তি কাটাইয়া বিজয় লাভ করিবেই। সত্য হোক, মিথ্যা হোক্ এই আত্ম-প্রত্যয়ের জোরেই ও আমায় ক্ষমার চক্ষে দেখিতেছে। বিজয় যখন প্রত্যক্ষ—অন্তত যখন ভাবা যায় যে প্রত্যক্ষ—তখন উদারতা আসে না খানিকটা?

কেমন একটা ছেলেমানুষি লোভ হইল—একবার রণেন চৌধুরীর আসিবার কথাটা জানাইয়া দিই। দিলাম না কিন্তু, ভাবিলাম, যে যতটুকু নিজের মনগড়া স্বর্গে কাটাইতে পারে কাটাক।...বেচারি নিশীথ।

একটু চঞ্চলভাবে পা নাড়িতে নাড়িতে নিশীথ বলিল, "বিশেষ কাজ রয়েছে, একটা foreign travels-এর (বিদেশ যাত্রার) হাংগাম তো আন্দাজ করতেই পারেন ঃ কিন্তু রাঁচি থেকে চলে এসেছি অথচ যদি দেখা না করি...এ বিষয়ে মহিলারা কি রকম sensitive (অভিমানী) জানেনই তো!"

তাহার পর সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলিল, "But this is between you and me, mind you (কিন্তু মনে রাখবেন, কথাটা নিজেদের মধ্যে বলছি)।"

বলিয়া, সামনে পিছনে দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

রাজু বেয়ারা আসিয়া বলিল, "দিদিমণি বললেন ওঁর মাথাটা বড্ড ধরেছে।"

একটা ঝড়ে দোদুল্যমান বৃক্ষ মচকাইয়া গেলে যেমন হয়, নিশীথ যেন ঠিক সেই রকম হইয়া গেল। কিন্তু এ-সব ব্যাপারে খুব পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে সে, চক্ষু দুইটা কপালে তুলিয়া বলিল, "বাই জোভ। আপনি তো আমায় বলেননি মিস্টার মুখার্জি।"

বলিলাম, "আমি নিজেই জানতাম না। ভালই তো ছিলেন, বোধ হয় এইমাত্র আরম্ভ হয়েছে।"

মুঠায় মুখটা চাপিয়া নিশীথ একটু চিন্তা করিল। তাহার পর যাহা করিল তাহা ওদের মধ্যেও একা ওই পারে। বলিল, "একবার বল তো গিয়ে রাজু, মিস্টার চৌধুরী বড্ড ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন, যদি আপত্তি না থাকে তো ওপরে গিয়েই দেখা করি। যদি ডাক্তার দেখাবার দরকার হয় তো...বলবে—বড্ডই ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন শুনে, বুঝলে তো?"

আমার সঙ্গে আর কোন কথা হইল না, নিশীথ সেইভাবেই মুঠায় মুখ চাপিয়া পা নাড়িতে নাড়িতে বার-দুই "বাই জোভ। বাই জোভ।" করিল।

চঞ্চল হইয়াছে সন্দেহ নাই, তা সে যে কারণেই হোক্।

রাজু আসিয়া বলিল, "ধন্যবাদ জানালেন আর বললেন—না, ডাক্তারের দরকার নেই, একটুখানি একলা থাকলেই সেরে উঠবেন।"—এমন সতর্কভাবে বলিল যেন যাহা শুনিয়া আসিয়াছে তাহার একটি অক্ষরও বাদ না পড়ে।

তাহার পর সে গ্যারেজের দিকে চালিয়া গেল।

নিশীথের মোটর চলিয়া যাইবার একটু পরেই বাড়ির গাড়িটা ধীরে ধীরে আসিয়া গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়াইল। কে যায় দেখবার জন্য উগ্র রকম একটা কৌতূহল হইতেছে।

তরু আসিয়া বলিল, "দিদি বেড়াতে যেতে বললেন মাস্টারমশাই!" আজ বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা করিতেছিল না বলিয়াই বসিয়াছিলাম। তাহাই বলিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু আর বলিলাম না, "বেশ চল" বলিয়া জামাটা পরিয়া লইবার জন্য ঘরের দিকে গেলাম। তরু বলিল, "আমি যাব না।"

একটু বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করিলাম, "তবে? একলা কি করতে যাব আমি?"

তরু ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল, "একলা নয়, আপনি আর দিদি।"

আমি পাঞ্জাবিটা গায়ে দিতেছিলাম, সেই অবস্থাতেই ঘরের মাঝে নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মীরার আচরণ কয়েকদিন হইতে খুবই অদ্ভুত, সামঞ্জস্যহীন, কিন্তু এতবড় একটা বেমানান ব্যাপার করিয়া বসিবে, তাহাও এত স্পষ্টভাবে—স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই। খানিকক্ষণ আমার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। তারপর পর বলিলাম, "বল'গে আমায় একটু অন্যত্র যেতে হবে, তিনি একলাই যান।"

তরু ফিরিয়া বলিতে যাইবে, এমন সময় সিঁড়ির মোড়ের কাছে চাপা রাগের একটা বিকৃত স্বরে মীরার কণ্ঠ শোনা গেল, 'তরু বলো মাস্টারমশাইকে, এটা আমার হুকুম, ওঁর অনুগ্রহের কিছু নেই এতে।"

আমি প্রায় সংযম হারাইয়াছিলাম, কিন্তু ঠিক সময়ে নিজেকে সংবৃত করিয়া লইলাম। একটি আত্মসংযম হারান মেয়েছেলের সঙ্গে এখনই কি একটা বিসদৃশ ব্যাপার ঘটিয়া যাইত ভাবিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলাম। তবে মনে মনেই স্থির করিয়া ফেলিলাম বন্ধনের যাহা একটু অবশেষ আছে এইবার শেষ করিয়া দিতে হইবে; সুযোগ আসিয়াছে। খুব সহজ ধৈর্যের সঙ্গে জামাটা পরিয়া লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম।

সিঁড়ির মোড়ের দুইটা ধাপ নীচে মীরা অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, বাম দিকের নাসিকাটা কুঞ্চিত, চোখের কোণে যেটুকু দেখা যায় যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ একটা, চাপা উত্তেজনায় বুকটা দীর্ঘচ্ছন্দে উঠানামা করিতেছে।

আমি শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "চলুন।"

দু-জনে গিয়া মোটরে উঠিলাম।

মোটর স্টার্ট দিতে দৃষ্টিটা আমার আপনা-আপনিই একবার তরুর উপর গিয়া পড়িল। উগ্র আশঙ্কায় যেন কিম্ভূতকিমাকার হইয়া সে চৌকাঠে ঠেস দিয়া আমার পানে চাহিয়া আছে।

গেটের কাছে আসিয়া ড্রাইভার প্রশ্ন করিল, "কোন দিকে যাব?"

মীরা কোন উত্তর করিল না, বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বসিয়া ছিল, সেইভাবেই চুপ করিয়া রহিল। আমি বলিলাম, "ডায়মণ্ড হারবার রোডের দিকে চলো না হয়।"

যেখানে একদিন মিলন হইয়াছিল স্পষ্ট, সেখানে আজ বিচ্ছেদকে স্পষ্ট করিয়া দিতে হইবে।

গাড়ি সার্কুলার রোড হইয়া চৌরঙ্গী পার হইয়া পশ্চিমে ছুটিল। খিদিরপুরের পুল পার হইয়া বাঁয়ে ঘুরিয়া ডায়মণ্ড-হারবার রোড ধরিল। কোন কথা নাই। শুধু শেভ্রোলে গাড়ির মসৃণ আওয়াজ। খালের পুলটা যখন পার হইলাম মীরা হাওয়া লাগাইবার জন্য মোটরের কিনারায় মাথাটা পাতিয়া দিল, কপালের চারিদিকে চুলগুলো আল্‌গা হইয়া চোখে-মুখে উড়িয়া পড়িতে লাগিল।

বেহালা-বড়িষা পার হইয়া মোটর সবে একটু ফাঁকায় আসিয়াছে, মীরা ড্রাইভারকে বলিল, "ফেরো।"

ফিরিবার সময়ও কোন কথা হইল না। দুইজনের মাঝখানে বীচিহীন জলরাশির মত একটু স্তব্ধতা থমথম করিতে লাগিল।

বাড়িতে আসিয়া মীরা তেমনি অভঙ্গ নিস্তব্ধতায় সিঁড়ি বাহিয়া ঋজু গতিতে উপরে উঠিয়া গেল।

কি বলিত মীরা?—কেন বলিল না? ডায়মণ্ড হারবার রোডের সেখানটিতে আসিলে দু-জনের জীবনের সবচেয়ে প্রিয়তম সন্ধ্যাটিকে বোধ হয় পাওয়া যাইত অতটা যাইয়া মীরা তাহার সম্মুখীন হইল না কেন?—তাহার ভয় হইল দুর্মদ অভিমানের মধ্যে যে কঠোর সংকল্প তাহার মনে জাগিয়া উঠিতেছিল, সেই আমাদের তীর্থভূমিতে যাইলেই সেটা চূর্ণ হইয়া যাইবে?

হ্যাঁ, একটা অতি কঠোর সংকল্পকেই মীরা সেদিন প্রাণের সমস্ত উত্তাপ দিয়া লালন করিয়া তুলিতেছিল,—আত্মহত্যার সংকল্প।

কেন, কি করিয়া বলিব? নারীহৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের সংবাদ কি করিয়া জানিব?—অভিমান, নৈরাশ্য—না, তাহার ধমনীর সেই রহস্যময় রাজরক্তের কণিকা?

পরদিন সন্ধ্যার সময় সকলেই জানিতে পারিল মীরা নিশীথকেই বরমাল্য দিবে।

আত্মহত্যাই বৈকি। আত্মহত্যার কি একটিই রূপ আছে?—আরও ভয়ংকর রূপ নাই?...তিলে তিলে দগ্ধ হওয়া?—সমস্ত জীবনকে একটা দীর্ঘীকৃত মৃত্যুতে পরিণত করা?

মীরা এই আত্মহত্যাই বাছিয়া লইল। কেন?—তাহাই বা কি করিয়া বলি?—হয়তো যে আভিজাত্যকে ইচ্ছামত নোয়াইতে পারিল না তাহার উপর প্রতিশোধ।

১৪

নিশীথ আর বিলম্ব করিল না। কি জানি, নারীর মন, 'শুভানি বহু-বিঘ্নানি'...কতকটা পৌরাণিক, কতকটা আধুনিক মতে বাগদানের একটা পাকারকম বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিল। আধুনিকতার দিকে থাকিবে একটা বড় রকম পার্টি, অবশ্য নিশীথের বাড়িতেই।

যেদিন পার্টি তাহার আগের দিন একটা টেলিগ্রাম হাতে করিয়া অপর্ণা দেবীর সঙ্গে দেখা করিলাম, "বাড়ি থেকে হঠাৎ টেলিগ্রাম পেলাম, যেতে লিখেছেন।"

টেলিগ্রামটা ঠিকই তবে ফরমাসী, আমিই বাড়িতে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলাম। আর থাকাও চলে না, অথচ এই সব ব্যাপারের মধ্যে হঠাৎ কর্মত্যাগ করিয়া চলিয়া আসাও বড় কটু দেখায়। সেখানে গিয়া একটা চিঠি লিখিয়া দিলেই চলিবে।

অপর্ণা দেবী স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে একটু চাহিলেন। প্রথমটা একটা শঙ্কার ভাব ছিল সে দৃষ্টিতে, কিন্তু অচিরেই সেটা মিলাইয়া গেল। ওঁকে এত সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। বলিলেন "টেলিগ্রাম! তাহ'লে তোমার আজই তো যাওয়া উচিত..."

কালকের পার্টি থেকে অব্যাহতি পাইয়াছি দেখিয়া যেন বাঁচিলেন উনি। মহীয়সী রমণী, ওঁর সহানুভূতির স্পর্শে আমার সমস্ত মন ওঁর চরণে যেন লুটাইয়া পড়িল।

মিস্টার রায় শুনিয়া একটু চিন্তিত হইলেন। কয়েকটা প্রশ্নও করিলেন, "বাড়ি থেকে মানে,—শ্রীরামপুর থেকে?—না, তোমাদের সেই..."

বলিলাম, "আজ্ঞে না, শ্রীরামপুর আমার বন্ধুর বাড়ি, টেলিগ্রাম এসেছে পশ্চিমে আমাদের বাড়ি থেকে।"

"Hope it is nothing serious" (আশা করি কিছু গুরুতর ব্যাপার নয়)?

বলিলাম, "বোধ হয় নয়। প্রায় বছর-খানেক যাইনি, কয়েকবার যেতে লিখেছিলেনও..."

"কবে যাচ্ছ?"

বলিলাম, "আজই রাত্রের গাড়িতে যাব ভাবছি।"

মিস্টার রায় একটু অধীরতার সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "How unfortunate! কাল মীরার উপলক্ষ্যে পার্টি, আর..."

অন্যমনস্ক ধাতের মানুষ, এক-এক সময় আবার খুবই অন্যমনস্ক থাকেন। একেবারে মোক্ষম স্থানটিতে আসিয়া তাঁহার হুঁশ হইল। চুপ করিযা গেলেন। "I see, I see; বেশ তো যাবে।" বলিয়া উপরে চলিয়া গেলেন।

বাকি থাকে মীরা। দেখা করবি কিনা স্থির কবিয়া উঠিতে পারিতেছি না। আজ সমস্ত দিন বাহির হয় নাই।

যাত্রার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পূর্বে মীরার ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলাম। চোরের মত অনেকক্ষণ দরজার পাশে অপেক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিলাম, "মীরা দেবী আছেন কি?"

সেকেণ্ড দুই-তিন বিলম্ব করিয়া উত্তর হইল, "আসুন।"

মীরা বিছানায় নিশ্চয় শুইয়া ছিল। বোধ হয় নিজেকে সামলাইয়া লইয়া পাশের শোফায় নামিয়া বসিতে যাইবে, তাহার পূর্বেই আমি প্রবেশ করায় হইয়া উঠিল না; বিছানাতেই বসিয়া রহিল।

কিন্তু এ মীরা নাকি? চোখের কোলে কালি, মুখটা লম্বা হইয়া গিয়াছে, যেন একটা শ্রান্ত, আচ্ছন্ন, উৎকণ্ঠিত ভাবের সঙ্গে আমার মুখের পানে চাহিল।

বলিলাম, "বাড়ি থেকে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল..."

মীরা খুব দূর থেকে যেন আওয়াজ টানিয়া আনিয়া বলিল, "বাবাকে, মাকে বুঝিয়েছেন ওই কথা,—আমাকেও...?"

আর বলিতে পারিল না। বুকে অসহ্য বেদনা হইলে যেমন একটা অব্যক্ত আওয়াজ হয়, সেই রকম করিয়া থামিয়া গেল; এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন মুখড়াইয়া বিছানায় লুটাইয়া পড়িল।

তাহার পর কান্না। সে-রকম নীরবে গুমরাইয়া কাঁদিতে আমি আর কাহাকেও কখনও দেখি নাই। মাঝে মাঝে দ্রুতনিঃসৃত ফোঁপানির শব্দ, সমস্ত শরীরটা থরথরিয়া উঠিতেছে; একটা নিরুদ্ধ ঢেউ যেন তাহার দেহ-সরসীর তটে আছড়াইয়া পড়িতেছে।

আমি রচনা শুনাইতেছি না, যাহা ঘটিয়াছিল তাহাই বলিতেছি—আমি সংযত থাকিতে পারি নাই। দু-দিন পরে মীরার সঙ্গে সম্বন্ধচ্ছেদের কথা, কি উচিত, কি অনুচিত—এসব কিছুই ভাবিয়া দেখিতে পারি নাই। তখন শুধু একটি অনুভূতি মাত্র ছিল—মীরার বুকে একই বেদনা!...আমি খাটের পাশে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মীরার পিঠে দক্ষিণ হাতটা রাখিয়া ডাকিলাম, "মীরা।"

শুধু কান্নার আওয়াজ আরও উগ্দত হইয়া উঠিল।

আমার মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল; কয়েকটা মুহূর্তেব মধ্যে একটা গোটা জীবনের স্বপ্ন যেন একসঙ্গেই ভাঙা-গড়া দুই-ই হইয়া গেল। নিজের উচ্ছ্বসিত শোক যথাসাধ্য দমন করিয়া মুখটা আরও নামাইয়া বলিলাম, 'মীরা, কেঁদ না। আমি তোমায় সুখী করতে পারতাম না, কিন্তু আমি দুর্বল, মন স্থির ক'রে উঠতে পারছিলাম না; এ-ই ঠিক হয়েছে।"

মীরা তেমনি উবুড় হইয়া ক্রন্দনের ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠে বলিয়া চলিল—"না, না, এই ক'রেই আপনি আমার সর্বনাশ করলেন, আর বলবেন না...আমি নিজেকে ঠিক ক'রে ধরতে পারিনি আপনার সামনে, কিন্তু আপনি কেন চিনে নিলেন না?...বাইরে যা পেলেন সত্যিই কি মীরা তাই?—বলুন...আমার সর্বনাশের মধ্যে থেকে আমায় কেন জোর ক'রে টেনে নিলেন না?—কেন?...আমি কি এটুকুও আপনার কাছে আশা করতে পারতাম না? বলুন...বলুন..." সেদিনকার প্রত্যেকটি কথা আমার মনে গাঁথা আছে, ভুলি নাই। মীরা এর অতিরিক্ত আর কিছুই বলিতে পারে নাই।

১৫

বাড়ি চলিয়া আসিবার প্রায় মাসখানেক পরে অনিলের একখানি পত্র পাইলাম। লিখিয়াছে—

"এতদিন সদুর একটা উৎকট শপথ দেওয়া ছিল বলে তোকে পত্র দিইনি। আজ সেই শপথের সব দায়িত্ব থেকে মুক্ত হ'য়ে লিখতে বসলাম।

"সৌদামিনী মরেছে। মরে মরে তোকে নিষ্কৃতি দিয়েছে, আমায় নিষ্কৃতি দিয়েছে, সমাজকে করেছে নিরুপদ্রব, ভাগবতকে করেছে নিরাশ।

"আমাদের পক্ষে সৌদামিনী মরলই বৈকি, এ-লোক ছেড়ে সে এখন সিনেমালোকের জীব। এই মরা-সদু একদিন সিনেমা-স্টার হয়ে জ্যোতির্লোকে ফুটে উঠবে। সবাই থাকবে বিস্ময়ে চেয়ে। নাচে-গানে, হাস্যে-লাস্যে ওর কম্পমান দীপ্তি ঠিক্‌রে পড়বে দেশের যত যুবার হা-হুতাশভরা দৃষ্টির ওপর। আলোকরাশ্মিতে নীল রঙের ঈর্ষা ফুটে উঠবে কুলললনার চক্ষে। এ একদিন দেবে দীপ্তিহীন ক'রে কবিকে, কর্মীকে জ্ঞানগরীয়ানকে; ধূমকেতু যেমন নিজের দীপ্তি দিয়ে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে ম্লান ক'রে তোলে। সদু হবে জ্যোতিষ্ক, উপায় নেই। রূপ আর প্রতিভার আলো দিয়ে যে ওর জন্ম। কিন্তু সদু সেই জ্যোতিষ্ক হবে, যে-জ্যোতিষ্ক-ধূমকেতু, এরও উপায় নেই আর। কেন না ধূমকেতুর ইতিহাস আর সদুর ইতিহাস একই—অর্থাৎ সমাজ ওদের কোল দেয়নি। নিজের অসহ্য আলোকের জ্বালা নিয়ে ওরা দিকে দিকে আগুন লাগিয়ে বেড়াবেই।

"অথচ এই সদু একদিন হ'তে পারত গৃহস্থ-গৃহের তুলসীমঞ্চের প্রদীপটি। ওর আলোয় একদিকে ফুটে উঠত ধর্ম, একদিকে ফুটে উঠত সংসার। ও করত সৃষ্টি; আর সেবা, শ্রী আর কল্যাণের মধ্যে দিয়ে ও সেই সৃষ্টির উপর ভগবানের আশীর্বাদ নামিয়ে আনত। এই ছিল ওর মিশন, এই ছিল ওর সাধ। জলহীন তৃষ্ণার মত সাধ প্রতিদিনই তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠেছিল। মনে আছে শৈল সেইদিনকার কথা—দুপুরে আমরা দু-জনে শুয়ে আছি ঘরে, সদু এল অম্বুরীর কাছে, মেয়েটাকে নিয়ে সেই আকুলি-বিকুলির কথা মনে আছে? আমি তো ভুলব না কখনও। যতই দিন যাচ্ছিল, সদু ততই বুঝতে পারছিল ওর সৃজনসম্ভার দুর্বল হ'য়ে আসছে, ততই ওর রচনা করবার পিপাসা

উগ্র হ'য়ে আসছিল। কেন হবে না?—নিতান্ত কুরূপারও যদি হয় তো সদুর হবে না কেন? ঘেঁটুর যদি সাধ হয় ফুল ফোটাবার তো কমললতার বেলাই হবে যত দোষ?

"সদু ওর স্বামীকে—জীবনের সব রকম সফলতার প্রতিবন্ধককে—একদিনের জন্যেও ভালবাসেনি। ভেতরে ভেতরে ছিল ঘৃণা, ওপরে ছিল ঔদাসীন্য—এমন একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য যা ভেদ ক'রে কারুর নজর ওর নিদারুণ ঘৃণার স্তরে পৌঁছতে পারত না। কিন্তু আমি জানতাম ওর ঘৃণা অধৈর্য দিন-দিন কতই না উৎকট হ'য়ে উঠছিল, কেন-না আমার মনের বিদ্রোহের একটা সাড়া পাচ্ছিলাম ওর মধ্যে। তার পর ওর মুক্তি, যা একদিন আসবেই বলে ওর একমাত্র ভরসা ছিল জীবনে। শৈল, দূরেই হোক বা অদূরেই হোক্ ভবিষ্যৎ জীবনে একটা আলোর রেখা না থাকলে আমরা কেউ-ই বাঁচি না,—যাকে বলা চলে একটা ফিউচার প্রস্‌পেক্ট! সদুর এই রকম একটা ফিউচার প্রস্‌পেক্ট ছিল,—অর্থাৎ স্বামী বলে যে অস্থিচর্মের বেড়াটা ভাগবত ওর সামনে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল সেটা একদিন খসে পড়বেই। ওর তখন হবে মুক্তি। খসল বেড়া, এল মুক্তি; শুধু তাই নয় সদু যা কখনও বোধ হয় কল্পনার মধ্যে আনতে পারেনি, ওর এই মহামুক্তির সঙ্গে তাও এসে দাঁড়াল সামনে—অর্থাৎ তুই এলি।

"গত এই দুই মাসের মধ্যে অন্তত একটা মাস ধরে আমি একটা জিনিস দেখছিলাম শৈল,—অপূর্ব একটা জিনিস—একটা স্ফুটমান শতদল। তোকে পাবে এই বিশ্বাসে সদু দিন দিন যে কী অপরূপ হ'য়ে উঠেছিল, যে না দেখেছে যার চোখ নেই তাকে বোঝানো যাবে না। ও খুব চাপা মেয়ে, অর্থাৎ মনের প্রধান চিন্তাটাকে ও বেশ ওর মুক্ত ব্যবহারের মধ্যে ঢেকে রাখতে পারে; কিন্তু আমি স্পষ্ট দেখতাম—কেন্দ্রগত মধুর চারিদিকে শতদল কমলের পাপড়ি একটি একটি ক'রে বিকশিত হ'য়ে উঠছে; সদু তার আনন্দলোকে ধীরে ধীরে ফুটে উঠেছে।

"তারপর প্রতিদিনে আশাভঙ্গের পর এল শ্রান্তি। তোর আসা নেই, চিঠি নেই, কোন খবর নেই। দেখছি সেই শতদলের রক্তাভা ম্লান হ'য়ে আসছে, পাপড়ি আসছে যেন কুঁকড়ে। তোকে ইঙ্গিতে দিয়ে একটা চিঠি লিখেছিলাম। পেয়েছিলি কিনা জানি না, আমি কোন উত্তর পাইনি। ঠিক করলাম—কলকাতায় যাব তোর কাছে। একটা যে করব কিছু এইটুকু সন্দেহের ওপরই নির্ভর ক'রে সদু একদিন আমার সঙ্গে দেখা করলে। প্রসঙ্গটা আমাকে দিয়েই তোলালে পাকেচক্রে। তারপর হঠাৎ উৎকট শপথ দিয়ে আমার চিঠি দেওয়া যাওয়া সব কিছুরই পথ বন্ধ করে দিলে।

"কিন্তু তারপরও রইল প্রতীক্ষা ক'রে, শুধু আ।।ও সংগোপনে। সে যে আরও কত করুণ দৃশ্য শৈল,—নিজের অভিমানের কাছেও হার মেনে আবার পথের পানে দৃষ্টি ফেলে রাখা!

"তারপর টের পেলাম তুই পশ্চিমে চলে গেছিস। লিণ্ডসে ক্রেসেন্টের আরও সব কথা টের পেলাম।

"শৈল, তোকেই বা কি ক'রে দোষ দেব? জানি প্রেম অসপত্ন—তার সামনে সমাজ নেই, উপকার নেই, এমন কি ধর্মও নেই; সে স্বরাট্। নিজের কেতন উড়িয়েই চলে আর সবকেই দলিত ক'রে। জানি মীরাকে পাওয়া আব না-পাওয়া এই দুয়েরই সামনে সদুর উপকার করা তোর পক্ষে অসম্ভব ছিল। বরং—অদ্ভুত শোনালেও এটা খুব সত্যি যে মীরা যতক্ষণ তোর সামনে ছিল ততক্ষণ মান-অভিমান, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে সদুর উপকারের কথা ভাবতে পারতিস্—সেই জন্যেই দিয়েছিলি আশা—এখন তোর মীরা-হীন জগতে সবই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে। জানি যখন একথা, তখন তোকে না ক্ষমা ক'রে উপায় কি?

"তবুও মনে হচ্ছে—আমি কি হারালাম, তুই কি হারালি, সমাজ কতটা বঞ্চিত হ'ল! অসহ্য বেদনায় মনটা টন্‌টনিয়ে ওঠে যখন ভাবি—সদুর নাচে,' গানে, অভিনয়ে সিনেমার প্রেক্ষাগৃহ হাততালির চোটে ভেঙ্গে পড়ছে, সদুর ওপর শত-শত দৃষ্টি লালসার ক্লেদ নিয়ে মূর্ছিত হয়ে পড়ছে, স্থানে-অস্থানে সদুর নানা ভঙ্গিমার ছবি পথিকের পথবিভ্রম ঘটাচ্ছে, ছোট-বড় সব কাগজগুলো

সদুর অভিনয় ভাঙ্গিয়ে সস্তা পয়সা লুটতে মেতে উঠেছে। আমাদের ছেলেবেলার সেই এত আদরের সদুর।

"খুকীর ভাত হবে আসছে সোমবার, আসবি না জেনেও নেমন্তন্ন দেওয়া রইল। খোকা আমার পাশে দাঁড়িয়ে; বলতে এসেছে ভাতের পরেই নিশ্চিন্দি হ'য়ে খুকীর বিয়ে দিয়ে দিতে; ও তোর দেওয়া বন্দুকটা নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে খুকীকে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে আসবে।

"বললাম, 'তাহ'লে তো মস্তবড় একটা ভাবনা যায় সানু।"

"অম্বুরী দু-জনকেই খোঁচা দিলে, বললে, 'তা না হ'লে আর বলে পুরুষমানুষ সেয়ানা জাত।—বোনের ভাতটি মুখে দেওয়ার কথা হয়েছে কি বাপ-বেটায় মিলে তাকে বিদেয় করবার পরামর্শ আরম্ভ হ'ল!"

"অম্বুরী হাসছে, যোগ দিতে পারলাম না কিন্তু।—সত্যিই তো, মেয়ে হ'লেই নিত্য বিদায়ের চিন্তা...বাড়ির থেকে, কাউকে সমাজ থেকে, কাউকে একেবারে ধর্ম থেকে। কোথাও না হয় সুখের বিদায় মালাচন্দনের, কোথাও আবার ললাটে গ্লানির প্রলেপ দিয়ে।' বিদায়ের অশ্রু নিয়েই ওদের জন্ম।"

এই আমার ঘৃণায়-মেশানো ভালবাসা। এরই মধ্যে অপর দিক থেকে সৌদামিনী আসিয়া আমায় দিতে চাহিয়াছিল খাঁটি সোনা। তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে আমার অপরাধের কথাটা স্বীকার করিয়া রাখিলাম। লইতে পারি নাই, তাহার কারণ ভালবাসার নি-খাদ সোনা দিয়াই লইতে হয়। আমার সুবর্ণ আগেই দেওয়া হইয়া গিয়াছিল—মীরাকে। এ অদ্ভুত দান প্রতিদানকে কোন্ দেবতা অলক্ষ্যে থাকিয়া নিয়ন্ত্রিত করেন?—তাঁহাকে কোটি নমস্কার।

ঘৃণায়-মেশানো এই আমার ভালবাসা। অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে? আমারও হয় এক-এক সময় সন্দেহ—এত বিরুদ্ধ দুইটি জিনিস সত্যই কি জীবনে একদিন হাত ধরাধরি করিয়া আসিয়াছিল?

সন্দেহ হইলে আমার দক্ষিণ হস্তের অনামিকার পানে চাহিয়া দেখি।—

বহুদিন পরে আমি অনামধেয়া এক কাহারও নিকট হইতে একটি চিঠি পাই। রেজেস্টারী করা; খাম খুলিয়া দেখি ভিতরে কাগজে মোড়া একটি নীলা পাথর। চিঠি বলিয়া বিশেষ কিছু নাই, ছোট্ট একটি কাগজের টুকরায় লেখা..."এইটি বাঁধিয়ে প'রো।"

আংটি করিয়া অনামিকায় ধারণ করিয়াছি। যখনই সন্দেহ হয়, এই বিশ্বের রং-মেশানো হীরার দিকে চাই...মনে পড়ে, সত্যই একদিন ঘৃণার সঙ্গে মেশানো ভালবাসা পাইয়াছিলাম,—এই হীরার মতই নীল, এই হীরার মতই খাঁটি।

কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

এক
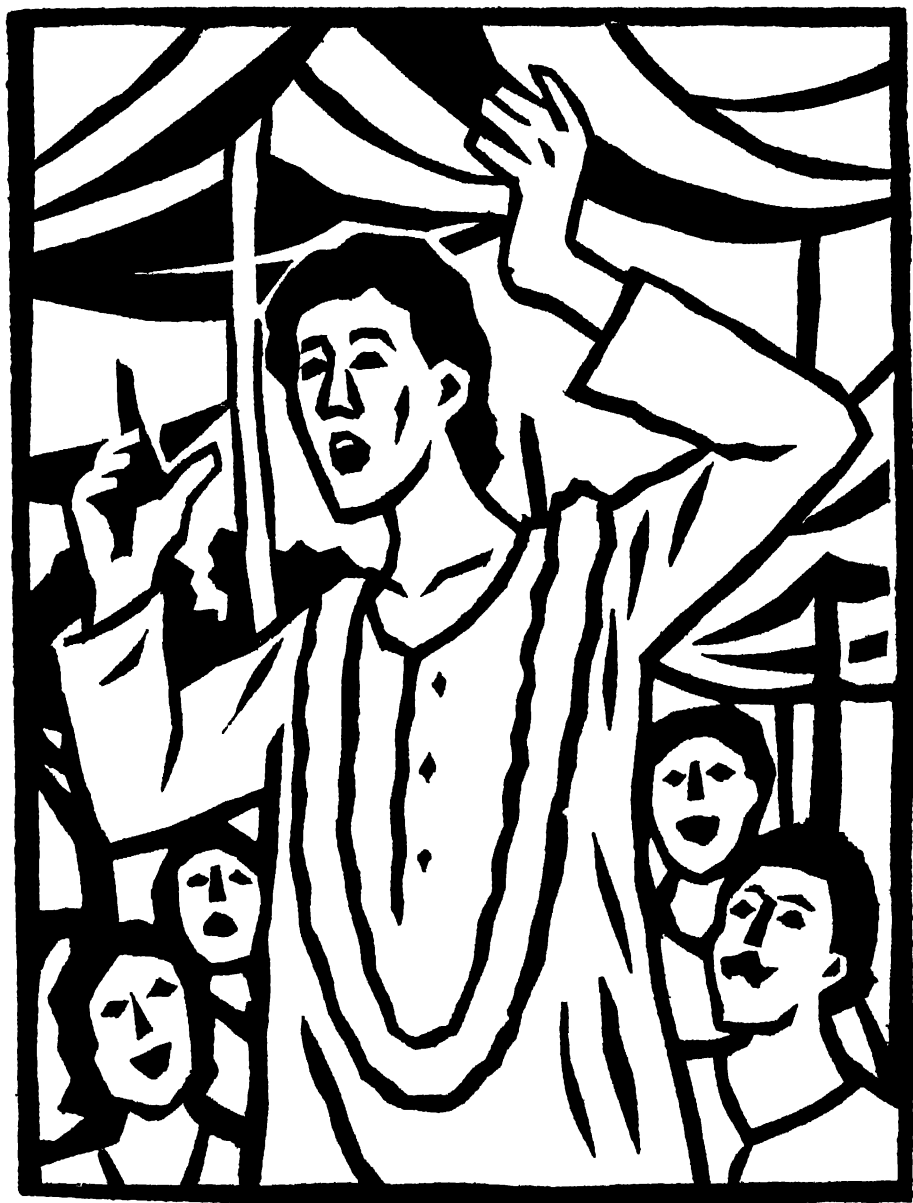
শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমত এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদেব জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল; রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে, তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছম ছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যিই বলিল—এ একটা বিস্ময়! রীতিমত!

অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল,—নেতাইচরণ তাক্ লাগিয়া দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ। তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতে বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ইহাদের উপাধি হইল বীরবংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিসের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিস কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে। হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডাবেড়ীর লোহা প্রত্যক্ষ; এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ—গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে।

ইহাদের উর্ধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিস-রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিন, পেশী দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত। শুধু বড়-বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া জোড় হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্গে ঠোঁটের রেখায় ঈষৎ একটু লজ্জিত হাসি।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট

একটি পর্ব; এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় চিরকাল জমজমাট কবিগানের পাল্লা হয়। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্ণ বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ।

সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি নোটনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না—জিনিস না, পত্তর না—সব ভোঁ ভো করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। লোকেরা হৈ হৈ করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল।—যেটা আমরা দিয়েছিলাম!

কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হইবে যে নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার। বাবা সকল, আসছে বার। আসছে বার পাওনার আগেই তোমাদের দু-বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখনও তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক।

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক জন অনেকেই সেখানে বসিয়া ছিল—অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয় লইয়া। মোহন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যাণ্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—দাও না, তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা। দেখ এমন খাতক আর মিলবে না। এ খাতকের কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে—ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারপরেই মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নূতন একটা বায়না আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা কবিগানের আসরে নোটনদাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে। আর যদি এখানে কোনরকমে শেষের দিনের গাওনাটা না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। সেক্ষেত্রে দক্ষিণার কাঞ্চনমূল্যও ওজনে ভারী হইবে।

নোটন হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—জয় মা চামুণ্ডা। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো। বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা

পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—তা হ'লে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের তো আর দেরি নেই।

.নোটন হাসিয়া বলিল—আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি?

লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিল— আজ্ঞে, তা হ'লে এখানকার কি হবে?

নোটন বলিল—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভাল, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে। আমি তা হ'লে টাকা কিন্তু বেশী নোব।

লোকটা সোৎসাহে বলিল—আচ্ছা বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

—আজই। এখুনি তোর সঙ্গে। এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল—এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলী ও দোহারদের বলিল—ওঠ! লোকটাকে বলিল,—টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে-মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে, এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার এই শেষ।

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আপসোস করিতেছিল। আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনও সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল। তাহাকে বলিলে কি সেও যাই না!

আসরের জনতা ক্রমশঃ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেছিলেন। মোহন্ত চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন,—তারা, তারা।

নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না,—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙা জলরাশির জলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর মজা পাঁকের মত জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা।

ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদার একেবারে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখনি পাইক লাঠিয়াল ভেজিয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতই তাহারা লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। এই জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতই সে দুমর্দ ও দুর্দান্ত—সে হঠাৎ মালকোঁচা সাঁটিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল—দুটো লোক। বলিয়া দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল—দোঠো আদমী হামারা সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ রাস্তা। আরে দশ কোশ তো দুলকীমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন

দুলকী চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেন রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়—বাড়ী যাই—ভাত খাই গিয়ে। ওরে নোটনদাস ভাগলবা, পালিয়েছে। কবি হবে না।

—না। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বল হরি! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো-ল। অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণদাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কে? কে রে বেটা?

—ধর তো বেটাকে, ধর তো। হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো বেটাকে।

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকেই সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা।

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়। ও রাখহরি নয়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল।—খবর-দা—র।

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ। রঙ তামাশা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল—জাড়া গাঁয়ে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল—"কি ক'রে তুই বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারদিকেতে বাঁশের বন। কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ডু কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ডু—সামনে আছে মুলোকুণ্ডু করগে মুলোর দরশন।" তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই, খুশীই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা-যা-যাঃ। কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে।

—আরে, তুষ হলেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু'তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—'কবিয়াল ভাগলবা'; তা ঠাট্টা করে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগো না।

মোহন্ত এখন মোহান্ত হইয়াছেন বটে কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার-সেরেস্তার কূটবুদ্ধি নায়েব ছিলেন। গাঁজা তিনি চিরকালই খান। তিনি এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে কবিগানের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, কবিগানই হবে। চিন্তা কি তার জন্যে? চিন্তামণি যে পাগলী বেটীর দরবারে বাঁধা, তাঁর চিনির ভাবনা। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হইয়াছে, চিনির সন্ধান মিলিয়াছে।

কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার কথাও নয় সময়ও নয়। সুতরাং সে প্রশ্ন না করিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল।

মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। অতঃপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—তাই হোক—গুরু-শিষ্যেই যুদ্ধ হোক। রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণঅর্জুনের যুদ্ধ কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হল অষ্টাদশ পর্ব।

শোরগোল উঠিল—মহাদেব। মহাদেব। ও হে কবিয়াল। ওস্তাদজী হে শোন শোন।

দুই

দায়ে পড়িয়া মহাদেব প্রস্তাবটায় সম্মতি না দিয়া পারিল না।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্বাদ করিযা তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন এবং চারিদিকে প্রমত্ত জনতা। অতঃপব সম্মত না হইয়া উপায় কি। কিন্তু আর একজন ঢুলী ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়েই নিতাইচরণের আর্বিভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল—প্রভু, অধীনের একটি নিবেদন আছে—আপনাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই মহাদেব কবিয়ালই বলিয়া উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে; তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোযাবকি করতে। কি রে, পারবি না?

নিতাইযেব গুণাগুণ কবিয়ালবা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত, কখনও কাঁসি বাজাইত—আর দোযারের কাজে তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বেগার দিয়া যাইত।

বাবুদলের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদাব মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাট করা বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন। চালটিও তাঁহার বেশ ভারিক্কী, তিনি খুব উঁচুদরের পায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা বে নিতাই। তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা। আর দেরি নয—আবম্ভ ক'বে দাও তা হ'লে। তিনি হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা কবিযা বলিলেন—এখনই তো তোমাব—। ক'টা বাজল?

কে একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া আগাইয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইযা হাতটা সবাইযা লইয়া বলিলেন,—আঃ! দরকাব নেই আলোর। বেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এত সব বেডিযম-ফেডিয়মের ধার ধাবে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্যে হোক। কাক—কাকই সই! তোর গানই শুনি।

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আবম্ভ কবিয়াছে, কুড়ুতাক কুড়ুতাক কুড়ুম কুড়ুম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল।

আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবিগানের পাল্লা। সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ডা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরনের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা বলিল—দূর দূর! ভিজে ভাতের মত গান! এই শোনে! সাঁট ক'বে পাল্লা হচ্ছে। চল বাড়ী যাই। দুই-চার জন [illegible] গেল।

[illegible] দল বলিল—মহাদেবেব দোযাবও বেশ ভাল কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল, ভাল [illegible]টক জবাব দিচ্ছে।

[illegible]চরণের প্রশংসাও হইতেছিল। প্রশংসা পাইবার মত নিতাইচরণের মূলধন আছে। তাহার [illegible]ল। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। মহাদেবের দোয়ারকে পিছনে ফেলিয়া [illegible] দুই-চার কলি [illegible]র জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

বাবুরা ইহাতে তাহাকে উৎসাহ দিলেন—বলিহারি বেটা, বলিহারি! বলিহারি!

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

এক কোণে মেয়েদের জটলা। এ মেয়েরা সবই ব্রাত্য সমাজের। তাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে—ও মা গো। নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত! ও মা গো!

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোল-সতের বছরের মেয়েটি, পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসচিস তু। শোন কেনে!

রাজা বন্ধু-গৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত দুলিতেছিল. সে হাসিয়া বলিল—দেখতা হ্যায় ঠাকুরঝি? ওস্তাদ কেয়সা গান করতা হায়, দেখতা?

রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে ঠাকুরঝি! নিতাইও তাহাকে বলে—ঠাকুরঝি। শ্বশুরবাড়ী অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে। এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশী। যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে গল্পের উটের মত নাসিকা প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল এবং নিজেই সে স্বাধীন ভাবে গান আরম্ভ করিল। আ—করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুয়াটাকে পর্যন্ত পাল্টাইয়া দিয়া সেই সুরে ছন্দে নিজেই নূতন ধুয়া ধরিয়া দিল। এবং নিজের সুন্দর কণ্ঠের প্রসাদে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ফেলিল।

মহাদেবের দোয়ার, সে-ই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ। সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাই! ও কি? ও কি গাইছ তুমি? অ্যাই—নেতাই। অ্যাই!

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি থুথু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়াই চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে তখন গাহিতেছিল—

হুজুর—ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি জানি—

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বাহবা! বাহবা। নেতাই বলছে ভাল! সাধারণ শ্রোতারাও বলিল—ভাল! ভাল! ভাল হে!

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিয়া বলিল—অ্যা-ই কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল—ধিকড় তা-তা-ধেন্‌তা—তা-তা-ধেন্‌তা—গুড়-গুড়-তা-তা-থিয়া—ধিকড়; হ্যাঁ—। বলিয়া সে তাহার নূতন স্বরচিত ধুয়াটায় ফিরিয়া আসিল—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পরধারিণী
গ—য়ে গোমাতা সবভি—গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। বহুৎ আচ্ছা! হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইলেই বলিল—বলি দোয়ারগণ!

মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোন দোয়ারও ছিল না। কেহই সাড়া দিল না। নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই বলিল—দোয়ারগণ! গোমাতা শুনে সবাই হাসছে। বলছে, গ-য়ে গরু ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া।

ঢুলীটা এবার বলিল—হ্যাঁ।

—আচ্ছা। —বলিয়া সে ছড়ার সুরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতেছিল না, রাজাকেও সে লক্ষ্য করিল না, সে আপন মনে ছড়াতেই বলিয়া গেল—

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন।।
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন।।

রব উঠিল—ভাল! ভাল! ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল—ড়ুড়ুম!

নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই।।
তেঁই গোলকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী।।

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক; রাজার বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।

নিতাইয়ের তখনো শেষ নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আরও আছে মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিত জনে।।

এবার বাবুরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরে লোকেরা হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

নিতাই বিজয়গর্বে ঢুলীটাকে বলিল—বাজাও।

এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ! স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।

তরুণী ঠাকুরঝিটির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিলচৈতন্যের মত নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। রাজা তাহার অসম্বৃতবাস বিস্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, রূঢ়স্বরে বলিল,—অ্যাই! ও ঠাকুরঝি, মাথায় কাপড় দে!

রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়া বলিল—মরণ, সাড় নাই মেয়ের!

ঠাকুরঝি এবার জিভ কাটিয়া কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া বলিল—আচ্ছা গাইছে বাপু ওস্তাদ।

ও দিকে বাবুদের মহলেও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই কলিকাতা প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত স্বীকার করিলেন—Yes। এ রীতিমত একটা বিস্ময়! Son of a dom—অ্যাঁ—He is a poet!

দুর্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলে রুদ্র, তুষ্ট হইলে আশুতোষ—মানসিক অবস্থার এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকাপ্রসাদে ব্যোমমার্গে নিমেষ-মধ্যেই যাওয়া-আসা করিয়া থাকে, সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক! বলিহারি রে!

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন—আমার পাগলী বেটীর খেয়াল বাবা; নিতাইকে বড় করতে মা আমার নোটনকে তাড়িয়েছেন।

ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা। মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল। ব্যাপারটা দেখিয়া শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া গান ধরিল।—ব্যঙ্গে, রঙ্গে গালিগালাজে নিতাইকে শূলবিদ্ধ করিয়া তিলে তিলে বধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সরস, অশ্লীলতা-ঘেঁষা গালিগালাজে সমস্ত আসরটা হাস্যরসে মুখর হইয়া উঠিল। নিতাই আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এবং মনে মনে গালিগালাজের জবাব খুঁজিতেছিল।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইল রাজা। সে মিলিটারী মেজাজের লোক, বন্ধুকে গালিগালাজগুলো তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা মেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল। রাজার স্ত্রী প্রচুর হাসিতেছিল। ঠাকুরঝি মেয়েটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, সেও এবার বিরক্তিভরে বলিল—হাসিস না দিদি! এমনি করে গাল দেয় মানুষকে!

মহাদেব ছড়া বলিতেছিল—

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি কবতে আইল।।
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে!
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে।।
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই।।

একজন ফোড়ন দিল—

অল্প জলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস না—

দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গাহিল—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্গে যাবার আশা—গো!
ফরাৎ করে উড়ল পাতা—স্বগ্গে যাবার আশা গো।।
হায় রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—স্বগ্গে যাবার আশা গো।।

অকস্মাৎ মহাদেব বলিয়া উঠিল—আঁ, জ্বালাতন রে বাপু। বলিয়াই সে আপনার পায়ে একটা চড় মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাহিল—

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড়।
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন—চড়িবেন কার উপর।।

মহাদেবের দোয়ার—যাহাকে নাকচ করিয়া নিতাই কবিয়াল হইয়াছে—সে-ই এবার ফোড়ন দিয়া উঠিল—চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বগ্গে যাবার আশা গো।

ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল, মহাদেবের তাণ্ডব ততই বাড়িয়া গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালিগালাজে নিতাইকে সে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মহাদেবের এই শূল-প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে জর্জর ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না। খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল। সে গালিগালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কাটিয়া বলিল—

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য।।
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করি না মনে।।

লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়। মহাদেব গালিগালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোন গ্লানি ছিল না। বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বলিল—হুজুরগণ, অধীন মুখ্যু ও ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না। খুব ভাল, ভাল গেয়েছিস তুই। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল—জিতা রহো, জিতা রহো রে বেটা। জিতা রহো!

চাকুরে বাবুটি করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ! এ পোয়েট! ইউ আর এ পোয়েট!

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলল—আজ্ঞে?

বাবু বলিলেন—তুই তো একজন কবি রে।

নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে মহাদেবকে বলিল—মার্জনা করবেন ওস্তাদ। আমি অধম। বলতে গেলে আমি মশকই বটে।

মহাদেব অবশ্য প্রতিপক্ষের এ বিনয়ে লজ্জিত হইল না, সে বরং নিতাইয়ের বিনয়ে খুশী হইয়া বলিল—আমার দলে তুই দোয়ারকি কর রে! এর পর নিজেই দল বাঁধতে পারবি। তা ছাড়া তোর গলাখানি খুব মিষ্টি।

নিতাই মনে মনে একটু রূঢ় অথচ রসিকতাসম্মত জবাব খুঁজিতেছিল; মহাদেবের গালিগালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ-পিতামহ তুলিয়া গালিগালাজগুলি তাহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিবার পূর্বেই পিছন হইতে দশ-বিশজন একসঙ্গে ডাকিল—নেতাইচরণ নেতাইচরণ! ওহে!

ডাক শুনিয়া নিতাইচরণ পুলকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। আজই সে 'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' হইতে নিতাইচরণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ডাকিতেছিল, তাহারা অদূরবর্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল—বাবুরা ডাকছেন। মোহন্ত ডাকছেন।

মোহন্তজী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি সিন্দুরলিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোছা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ, খুব ভাল। মা তোমার উন্নতি করবেন। মায়ের মেলায় একরাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরাদ্দ হইল। সুন্দর গলা তোমার।

চাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল—একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে। তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—You are a poet! অ্যাঁ! এ একটা বিস্ময়!

নিতাই দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিলেন—কিন্তু খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি—a poet!

হাতজোড় করিয়া এবার নিতাই বলিল—আজ্ঞে প্রভু, চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর, নেশা পর্যন্ত আমি করি না। জাত-জ্ঞাত মা ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে

বনে না আমার। ঘর তো ঘর, আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাজ্য করেছি একরকম। আমি থাকি ইষ্টিশানে বাজন পয়েন্টস্‌ম্যানের কাছে। কুলিগিরি ক'রে খাই।

এ গ্রামের চোর, সাধু, ভাল-মন্দ সমস্ত কিছুই ভূতনাথের নখদর্পণে, সে সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল—হাজারোবার! সাচ্চা সাধু আচ্ছা আদমী নিতাই।

নিতাই আবার বলিল—এই মাচণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে আমার মাথায়।

তিন

নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই। সত্যই নিতাই জীবনে কখনও চুরি করে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন গভীর রাত্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে নির্ভয় বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে, সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডারের সম্মুখীন থেসিয়ান দস্যুর মত ন্যায়ের তর্ক এখানকার বীরবংশীরা জানে না বটে, তবে নীতি ও ধর্মের কথা শুনিয়া তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া হাসে। এবং নিতাইয়ের এই চৌর্যবৃত্তি-বিমুখতার জন্য তাহারা তাহার মধ্যে আবিষ্কার করে একটি ভীরুতাকে, এবং তাহার জন্য তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে।

কেমন করিয়া সে এমনটা হইল তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। তাচ্ছিল্যভরে কেহ লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই সম্ভবত অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবে একটি ঘটনা লোকের চোখে বার-বার পড়িয়াছিল। এবং ঘটনাটি লোকের চোখে এখনও ভাসে। রোজ সন্ধ্যায় নিতাইচরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইস্কুলে চলিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিতেছিল। সেকালে ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্বে ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাই-ই থাকিয়া গেল। নিতাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা এবং তাহার সঙ্গে একটা লণ্ঠন পাইল। এই প্রাপ্তিযোগের জন্যই সকলে পাঠশালা ছাড়িলেও নিতাই ছাড়ে নাই। সে সময় ছেলে কাপড়, জামা ও লণ্ঠন চার দফা পুরস্কার পাওয়াতে নিতাইয়ের মাও বেশ খানিকটা গৌরবই অনুভব করিয়াছিল। বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল। ইহার পর আরও বৎসর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল। এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জামা, গামছা, লণ্ঠন ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খানকয়েক বই—শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়েব কণ্ঠস্থ। নিতাই সুযোগ পাইলে আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটিই উঠিয়া গেল। অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবিগানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্দমিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক দেওয়া কৌতুকও তাহার ভাল লাগে।

মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত—পণ্ডিত মশায়! এইবার তাহারা তাহাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল। অর্থাৎ রাত্রির অভিযানের দলে তাহারা তাহাকে লইতে চাহিল।

মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। সে বোনকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—নিতাইকে এবার বেরুতে বল। নেকাপড়া তো হ'ল।

গৌরচরণের গম্ভীর ভাবের কথার অর্থ—তাহার আদেশ। নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল—তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে।

নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ছি! ছি! ছি! গভ্যধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে!

নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলছিস মাকে? হচ্ছে কি?

নিতাই তখন পুরনো খাতাটায় রামায়ণ দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল। সে নির্ভয়ে বলিল—লিখছি।

—নিকছিস? গৌর আসিয়া খাতাটা ও বইখানা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে-ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম খুঁজিয়া সেই দিনই সে ঘনশ্যাম গোসাঁইয়ের বাড়ীতে মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।

গোসাঁইজী বৈষ্ণব মানুষ, ঘরে সন্তানহীনা স্থূলকায়া গৃহিণী, উভয়েরই দুগ্ধপ্রীতি মার্জারের মত। ঘরে দুইটি গাই আছে, গাই দুটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিযা দুধ দিত। কিন্তু ইদানীং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে তাহার গাভী দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে। বাধ্য হইয়া গোসাঁইজী গাভী পরিচর্যার জন্য লোক খুঁজিতেছিলেন। নিতাইকে পাইয়া বাহাল করিলেন। নিতাইয়ের সহিত শর্ত হইল, সে গাভীর পরিচর্যা করিবে, বাসন মাজিবে, প্রয়োজনমত এখানে ওখানে যাইবে, রাত্রে বাড়ীতে প্রহরা দিবে। গোঁসাইজীর সুদী কারবারে মুল এক শত মণ ধান এখন সাত শত মণে পরিণত হইয়াছে। ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তুপ বারোমাস জড়ো হইয়াই থাকে। খাতকেরা রোজই কিছু কিছু ধান শোধ দিয়া যায়। গোঁসাইজী স্ফীতোদর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিতাই গোসাঁইজীর বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

দিন কয়েক পরেই, সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে গোসাঁই ডাকিলেন—নিতাই।

বাহিরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সে জাগিয়াই ছিল, সে ফিসফিস করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি শুনেছি।

—গোলমাল করিস না, উঠে আয়। গোসাঁইজী অগ্রসর হইলেন। নিতাই শীর্ণকায় গোসাঁইজীর অকুতোভয়তা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। গোঁসাই আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে চারজন লোক, তাহাদের মাথায় বোঝাই-করা চারটি বস্তা। ভারে উত্তেজনায় লোকগুলি হাঁপাইতেছে এবং থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দরজা খুলিতেই নিঃশব্দে লোক চারিজন ঢুকিয়া উঠানের ধানের গাদায় বস্তা চারিটা ঢালিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সোনার মত রং প্রত্যক্ষ করিল। লোকগুলিকেও সে চিনিল, তাহার আত্মীয় কেহ না হইলেও প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধানচোর।

সকালবেলাতেই জোড়হাত করিয়া গোসাঁইজীকে নিতাই বলিল—প্রভু, আমি মশায় কাজ করতে পারব না।

—পারবি না।

—আজ্ঞে না।

—এক পয়সা মাইনে আমি দেব না কিন্তু। আর এ কথা প্রকাশ পেলে তোমার জান থাকবে না।

নিতাই কথার উত্তর করিল না। তাহার কাপড় ও দপ্তর লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে।

স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজা বায়েন তাহার বন্ধু। রাজালাল একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাঁটার মত ডিউটি করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চিৎকার করে স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের, অর্থাৎ রাজার এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ, সে প্রায় তিন বৎসর আগের ঘটনা।

নিতাই সেদিনও, অর্থাৎ প্রথম আলাপের দিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল, রাজার ছেলেটা ট্রেন আসিবার ঘণ্টা বাজিতেই হাঁকিতে শুরু করিয়াছিল—হট যাও! হট যাও। লাইনের ধারসে হট যাও।

নিতাইয়ের ভারি ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিয়াছিল—বাহা রে! কাদের ছেলে হে তুমি?

—আমি রাজার ছেলে।

—রাজার ছেলে? কেয়াবাৎ! তবে তো তুমি 'যোবরাজ'।

রাজা ছিল কাছেই, সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছিল। ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়ার্টারে আনিয়া হাজির করিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিল—আমার বন্ধুনোক। উমদা আদমী। ফটকেটাকে বলে—রাজার বেটা যোবরাজ। বলিয়া সে কি তাহার হা-হা করিয়া হাসি।

নিতাই উৎসাহভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া, মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা যোবরাজ, তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে।

রাজা লাফ দিয়া ঘরের ভিতর হইতে তাহার পৈতৃক ঢোল ও তাহার নিজের কাঁসি বাহির করিয়া আনিয়া নিজে লইয়াছিল ঢোলটা—ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায়। সেদিন দ্বিপ্রহরেই কবিগান জমিয়া উঠিয়াছিল রাজার ঘরে। নিতাই রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল—

রাজার ঘরের ঘরণী যিনি—তিনি মহামান্যা রাণী—
তিনি খান বড় বড় ফেনী—
সর্বলোকে বলে।

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়। মোটা সুতার খাটো কাপড়খানির

আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানির স্বাভাবিক খাঁজগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়ামাটির পুতুলের মত দেখায়। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। রাজার স্টেশনে গাড়ী আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া, আর এই মেয়েটি আসে—পশ্চিমসমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সূর্যের অগ্রগামিনী ছায়ায় মত। মেয়েটির সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত। সেদিন সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ এই সরল মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—অসঙ্কোচ খিলখিল হাসি।

রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে, সে বোনকে ধমক দিয়াছিল—হাসিস না ফ্যাক ফ্যাক করে। বেহায়া কোথাকার!

মুহূর্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত হয় নাই, স্বচ্ছন্দে শাসন মানিয়া লওয়ার মত বেতসলতাসুলভ একটি নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই শুধু লতার মত নয়, মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।

নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরিবার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। এবং মেয়েটিকে বলিল—দেখতা কেয়া ঠাকুরঝি? হামারা মিতা! ওস্তাদ আদমী! হামারা নাম হ্যায় রাজা, তো ফটকেকো নাম দিয়া যোবরাজ, তোমারা দিদিকো নাম দিয়া রাণী!—বলিয়াই অট্টহাসি।

এবার অট্টহাসির ছোঁয়াচে রাণীও হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল আবার সে হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল, চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, তবু তাহার সে হাসি থামিল না।

হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল—ওস্তাদ! ই কালকুট্টি হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়। ইসকো কেয়া নাম দেগা ভাই?

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর দোসরা নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আমাদের সবারই ঠাকুরঝি। কেমন ভাই ঠাকুরঝি!

রাজা নিতাইয়ের তর্ক-যুক্তিতে অবাক হইয়া গিয়াছিল। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিয়াছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। ই বাত তো ঠিক হ্যায়। ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি।

তাহার পর রাজা পাড়িয়াছিল মদের বোতল—আও ভাই ওস্তাদ!

নিতাই হাতজোড় করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর ভাই রাজন। ও দব্য আমি ছুঁই না।

—তব্? তব্ তুমি কি খায়েগা ভাই?

ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—দুধ খাবা, দুধ? বলিয়া আবার সেই খিল খিল হাসি।

নিতাই হাসিয়াছিল—তা খেতে পারি। এমন দব্য কি আছে ভো-মণ্ডলে? দেবদুল্লভ।

ঠাকুরঝি সত্যই বড় ঘটী হইতে মাপের গেলাসে পরিপূর্ণ একগ্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পালাইয়া গিয়াছিল।

এ সব পুরনো কথা।

রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্ত।

সেই সূত্রেই গোসাঁইজীর চাকরিতে জবাব দিয়া নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিল—ঠিক কিয়া ওস্তাদ। বহুৎ ঠিক কিয়া ভাই।

—আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে।

—আলবৎ দেগা। জরুর দেগা।

—এইখানে থাকব, আর ইষ্টিশানে মোট বইব। তাতেই আমার একটা পেট চলে যাবে।

রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি এ লাইনের একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সে সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখন পড়িয়াই আছে। তাহারই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিল। নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয়, নামাইয়া লয়, গ্রামান্তরেও মোট বহিয়া লইয়া যায়, উপার্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে নামাইতে-চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা, গ্রামান্তরে যাইতে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্য কুলীদের অপেক্ষা নিতাইয়ের উপার্জন বেশী। কারণ তাহার সহায় স্বয়ং রাজা।

স্টেশন-স্টলটি তাহাদের একটি আড্ডা; স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে—রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানে সজীব-বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট, অতি প্রগল্‌ভ বিপ্রপদ বলে—বয়স্য কি রে বেটা, বয়স্য কি? সভাকবি, রাজার সভাকবি।

নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করিয়া মুখে দেয়, সভাকবি কথাটিতে ভারী খুশী হইয়া উঠে। বিপ্রপদকে বড় ভাল লাগে তাহার। এত যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না। বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া মামার দোকানে আড্ডা লয়, বেঞ্চিতে বসিয়া অনর্গল বকে, লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া উঠে—চা-গ্রো-ম! চা-গ্রো-ম? দেহ তাহার যত আড়ষ্ট, জিহ্বা তত সক্রিয়। উৎকট রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মেজাজের মানুষ। মামার দোকানে সকালবেলায় আসিয়া বিপ্রপদ চা বিড়ি খাইয়া খাইয়া বেলা বারোটায় বাড়ি ফিরে খাইবার জন্য। খাইয়া খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বেলা তিনটায় আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে। যায় রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়া তবে। বিপ্রপদর সঙ্গে নিতাইয়ের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে, বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদ করে—

ভব কপি, মহাকবি দগ্ধানন সলাঙ্গুল—

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলে—প্রভু, কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ হাসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া বলে—ও। কপি নয়, কপি নয়, কবি, কবি। আমারই ভুল। আচ্ছা, কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি— শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেল দুর্যোধন, বাজী রাখলে যুধিষ্ঠির, কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকচ মরল কোন্ পাপে?

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিগান আরম্ভ করিয়া দেয়। বাঁ হাত গালে চাপিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া সুর ধরিয়া আরম্ভ করে—আহা—আ-হা-রে—ঘটোৎকচ মরল কোন্ পাপে?

রাজা ভাবে, ঢোলকটা পাড়িয়া আনিবে নাকি? কিন্তু সে আর হইয়া উঠে না। ইতিমধ্যে বারোটার ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে।

দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই। স্টেশনের জমাদার রাজার সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকেই লইয়া থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।

মজুরির দরদস্তুর করিতে নিতাই সবিনয়ে বলে—প্রভু গগনপানে দিষ্টি করেন একবার। গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন। বর্ষায় বলে—কিষ্ণবন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্তা। শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু।

মামার দোকানে বসিয়া বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের

তো সব শাল-দোশালা আছে, ওর যে কোন শালাই নাই। ওর কষ্টের কথা বিবেচনা করুন একবার।

দ্বিপ্রহরে বাহিরে যাইতে হইলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়—রাজন, ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখো।

এখানে থাকিলে বারোটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েন্টের কাছে লাইনের ধারে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি আছে তাহার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিপ্রহরে তখন রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে। নিতাই নিবিষ্ট মনে, যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। স্বর্ণবর্ণ-বিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। ক্ষারে কাচা তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাট করিয়া পরা সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে; এবং তাহার মাথায় একটি তকতকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটী। ঘটীটি সে ধরে না—এক হাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে। কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।

নিতাই নেশা করে না। কিন্তু দুধ তার প্রিয়বস্তু। চায়েও আসক্তি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে! ঠাকুরঝির কাছে সে নিত্য একপোয়া করিয়া দুধ যোগান লইয়া থাকে। দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয়। মামার দোকানে চা খাইলে দাম দিতে হয় দু পয়সা কাপ। বিপ্রপদর মত বিনা পয়সায় চা খাইবার অধিকার তাহার নাই। তা ছাড়া জমে না। কেমন ছোট ছোট মনে হয়।

স্টেশনে নিত্য নানা স্থানের লোকজনের আনাগোনা। আশপাশের খবর স্টেশনে বসিয়াই পাওয়া যায়। খবরের মধ্যে কবিগানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া উঠে। সেদিন সন্ধ্যাতেই লালপেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাতকাটা জামাটি পরিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া সাজে এবং গুন-গুন করিয়া কবিগান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদা দেয়। মিলিটারী রাজা সাড়ে আটটার ট্রেন পার করিয়াই বলে—ফাইভ মিনিট ওস্তাদ।

পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে কোম্পানির দেওয়া নীল কোর্তাটা চড়াইয়া স্টেশনের একমুখো বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে। ভোর হইবার পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসে। শুধু কবিগানই নয়, যাত্রাগান, মেলা—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে। আহা, আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা তাহার কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

মনের এই বাসনাটুকু সে দুই কলি গানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নির্জন প্রান্তর পাইলেই গাহিয়া সে নিজেকেই শুনায়; আর শুনায় কোন রসময় ভাইকে। সে রসময় ভাই তাহার রাজন।

সেই মেলাতে কবে যাব।
ঠিকানা কি হায় রে!
যে মেলাতে গান থামে না
রাতের আঁধার নাই রে।
ও রসময় ভাই রে।

রাজা শুনিয়া বাহা বাহা করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে—ওস্তাদ তুম ভাই গানা তৈয়ার করো। আচ্ছা গানা আতা তুমারা।

গান তাহার অনেক আছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না।

হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে এই নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল।

চার

কবিগানের পাল্লার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুরমাখানো শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই মেলা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল রাজদত্ত মাল্যকণ্ঠে সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। যেন একটা ভাবের নেশার ঘোরের মধ্যে পথ চলিতেছিল। মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল যে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে একজন কবি।

সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এতদিন তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিত না, আজ তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতে করিতে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহাদের কল-কোলাহলের কিছুই কিন্তু তাহার কানে আসিতেছিল না।

রাজা আসিতেছিল তাহার গা ঘেঁষিয়া। ওস্তাদের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে পথ চলিতেছিল সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল— হট যাও, হট যাও। এতনা নগিচমে কেঁও আতা হ্যায়? হট যাও। উৎসাহের প্রাবল্যে আজ তাহার ভুল-হিন্দী বক্তৃর মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরঝি একটু পিছনে আসিতেছিল। নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল—তোমরা তো মা তাড়িয়ে দিয়েছিল। এই তো ইষ্টিশান, তোমাদের বাড়ির দুয়োর থেকে দেখা যায়; কই, কোন দিন নেতাইয়ের খোঁজ করেছ?

ঠাকুরঝি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া, যে যখন কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। পাশের গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ী, মেলা উপলক্ষে সে আজ দিদির বাড়ী আসিয়াছে, রাত্রে এইখানে থাকিবে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে।—তুমি এত সব কি করে শিখলে? দিদির ঘরে গায়েন করতে, আমরা হাসত্যম। বাবা, এত নোকের ছামুতে—ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে।—বাবা! কল্পনা মাত্রেই রাত্রির অন্ধকার আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিতেছিল।

চণ্ডীতলা হইতে ডোমপাড়ার ভিতর দিয়াই স্টেশনের পথ। নিতাইয়ের কয়েকজন আত্মীয় আজ তাহাকে আহ্বান করিল—বাড়ী আয়।

নিতাইয়ের মা এখানে আর থাকে না, সে তাহার কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়ীতে থাকে। জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল। রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রয় করে, ভাঙ্গা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায় ও সের দরুনে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয়—এই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে। নিতাই একবার নিজের ভাঙ্গা ঘরটার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল,—না, আমার আস্তানাতেই যাই।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই একটা রূঢ় কণ্ঠের কয়েকটা কঠিন কঠিন বাক্য অতি অতর্কিতে কোন নিষ্ঠুর হাতের ছোঁড়া কয়েকটা পাথরের টুকরার মত নিতাইকে আসিয়া আঘাত করিল,—এই শূয়ার—যাবি কোথা? দাঁড়া!

এ তাহার মামার কণ্ঠস্বর। মামা এখানকার কুলাধিপতি। তাহাদের স্বজাতিদের নৈশাভিযানের দলপতি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ!

নিতাই চমকিয়া উঠিল।

পাড়ার গলিমুখ হইতে মামা নামিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল—প্রহ্লাদের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর মত। এবং খপ করিয়া তাহার টুটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল—তোর বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি খাওয়ালি—আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি ক্যানে আসরের মধ্যিখানে? শূয়ারের বাচ্চা শূয়ার!

একমুহূর্তে হতভম্ব হইয়া গেল সকলে। রাজন পর্যন্ত। নিতাইয়ের মামার হাত সাঁড়াশীর চেয়েও

শক্ত। লোহাব তালা ওই হাতের মোচড়ে মট করিয়া ভাঙিয়া যায়। নিতাইয়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে কবিগান করিলেও ওই মামারই ভাগিনেয়, ওই বংশেরই সন্তান। দেহে শক্তি তাহারও কম নয়। তার উপর প্রথম জোয়ান বয়স। সে দুই হাত দিয়া মামার হাতখানা টানিয়া ধরিল। পরমুহূর্তে রাজন আগাইয়া আসিল—ছোড়ো—!

মামার হত্যা করিবার সঙ্কল্প ছিল না। ইচ্ছা ছিল শাসনের। তাই নিতাইয়ের গলা ছাড়িয়া দিয়া কথা বলিল—যাঃ! আর এ-পাড়ার পথ মাড়াবি না। মহাদেব কবিয়াল ওই একটা কথা ঠিক বলেছে। আস্তাকুঁড়ের এঁটো (এঁটো) পাতার স্বগ্‌গে যাবার আশা গো! —বলিয়া সে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল—তেমনিই চকিতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়াই ছিল—স্তব্ধ হইয়াই রহিল। রাজন শুধু চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল—ই ক্যা হ্যায়? ই ক্যা বাত? আঁঃ। কেয়া, মগকে মুল্লুক হ্যায়?

পাড়ার ভিতর হইতে আর একটা হুঙ্কার আসিল—যাঃ—যাঃ, চেঁচাস না বে বেটা কুলী!—

নিতাই রাজনের হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল—রাজন চুপ কর। চল। ই আমার পাপ ভাই। চল। বলিযা হাসিয়া বলিল—আজ থেকে অকূলে ভাসলাম। সে অকূলে তুমিই আমার ভেলা।

রাজন তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া গদ্গদ কণ্ঠে বলিল—তুম সাচ্চা আদমী ওস্তাদ।

নিতাই আবাব একটু হাসিল। পেছনে ফোঁস ফোঁস কবিয়া কাঁদিতেছিল ঠাকুরঝি। রাজনের স্ত্রী বলিল—মরণ! কানছিস ক্যানে লো?

ভিড় তখন কমিয়া গিযাছে। সঙ্গের লোকজন আপন আপন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিল। কোয়ার্টারে আসিয়া রাজ বলিল—কুছ খা লেও ভাই ওস্তাদ।

নিতাই বলিল—গান শুনবে ভাই বাজন! ভাল গানেব কলি এসেছে মনে। শুনবে?

রাজন বলিল—ঠায়রো! ঢোলটো—

নিতাই হাত চাপিয়া ধরিল—না। শুধু গান।

বলিয়াই তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপিয়া গাহিল—

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে।

রাজন বলিল—বাঃ, বাঃ, বাঃ! উসকা বাদ?

নিতাইয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে জল মুছিতে মুছিতে বলিল—আর নাই।

তারপর সে সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। মনের মধ্যে অনেক কথা। মামার হাতে লাঞ্ছনার কথাটা তাহাব কাছে খুব বড় নয়। মামার কাছে অনেক লাঞ্ছনাই সে ভোগ করিয়াছে। ওটা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ও ছাপাইয়া সে ভাবিতেছিল কবিগানের কথা।

বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের কথা। তারণ কবি যে-আসরে গান করিয়াছে, সে আসরে কত লোক! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে। সে যেবার প্রথম তারণ কবির গান শোনে সেবারকার সে ছবি এখনও তাহার মনে জ্বলজ্বল করিতেছে।

এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই, সে কি জনতা, আর সে কি গোলমাল! তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক! চার পাঁচটা চাপরাসীই তখন মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বহাল করা হইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই-চারিজন বাবু। তবু সে কি গোলমাল। নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল, কলরবমুখর জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল, আলোকোজ্জ্বল আসরের মধ্যে তখন তারণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই লম্বা মানুষটি, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, বুকে সারি সারি মেডেল, লাল চোখ। তারণ কবির আবির্ভাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল। আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়াছিল, তাহারা পর্যন্ত চুপ করিয়া গিয়াছিল। আর সে কি গান!

তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে, সেইখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারণ কবির পায়ের ধূলাও লইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার সাধ, কবিয়াল হইবে। ইচ্ছা ছিল তারণ কবির দলে দোয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তারণ মরিয়া গেল। মদ খাইয়াই নাকি তারণ মরিয়াছে। তারণ কবিব ওই একটা বড় দোষ, ছিল, ভীষণ মদ খাইত। আসরেই তাহার বোতল গেলাস সকলের সম্মুখে যে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া মদ খাইত। ওই তাবণ কবি সেদিন গানে গাহিয়াছিল—

"তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন,
তোমার চরণধূলা আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের শাপবিমোচন,
খালাস, খালাস, খালাস, আমি খালাস নিলাম হে।"

সেদিন পালাতে তারণ হইয়াছিল বিভীষণ এবং প্রতিপক্ষ বিষ্ণু সিং হইয়াছিল বাবণ। সেই কথাটাই আজ বার বার করিয়া মনে পড়িতেছিল। সে আজ খালাস। খালাস। খালাস।

এক এক সময় তাহার মনে হয় তাবণ কবি তাহারই কপালদোষে মরিয়া গেল। সে গুরু পাইল না। এমন ভাল গুরু না হইলে কি ভাল কবি হওয়া যায়! শাস্ত্রের কি অন্ত আছে? পড়িয়া শুনিয়া সে সব শিখিতে গেলে এ জীবনে আর কবিযাল হওয়া হইয়া উঠিবে না। রামায়ণ মহাভারত— । সহসা তাহার মনে হইল, মহাদেব আজ বামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইয়া তাহাকে অপদস্থ কবিয়াছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। আলো জ্বালিল।

ছোট্ট একটা চৌকির উপর যত্নের সহিত রঙিন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুঁথিগুলি বাখিয়া থাকে। দপ্তব খুলিয়া সে বামাযণ বাহিব কবিল। দপ্তবেব মধ্যে একগাদা বই। পাঠশালা হইতে আজ পর্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহাব আছে। পথেঘাটে উড়িযা বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা, তাহারও অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া নিতাই রাখিয়াছে। কাগজ দেখিলেই সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা কবে। যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালীর, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক, ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি—সে প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে। আর আছে খান দুইয়েক খাতা, ভাঙা স্লেট-পেন্সিল, একটা লেডপেন্সিল, ছোট একটুকরা লাল নীল পেন্সিল। আর কিছু ছেঁড়া পাতা, খোলা কাগজ।

সেই রাত্রেই সে নিবিষ্ট মনে রামাযণের পাতা উলটাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক, মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার মানাইয়াছে। ভুল তাহার নয়, মহাদেবই ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে। হাসিয়া সে মহাদেবের প্রশ্নের উত্তরের ঠাঁইটা বন্ধ করিয়া রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডার অধ্যায়টা খুলিল। পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। রগের শিরা দুইটা দপ দপ করিয়া লাফাইতেছে কানের পাশে। এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ উঠিতেছে, ধীরে ধীরে শব্দগুলা মৃদু হইতে হইতে একসময় নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙিল রাজার ডাকে।

মিলিটারী রাজা রাত্রি জাগিয়াও ঠিক সকাল ছয়টায় উঠিয়াছে। সাতটায় এ লাইনের ফার্স্ট ট্রেন এ-স্টেশন অতিক্রম করিবে। যুদ্ধ-ফেরত রাজা চা খায়, চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে সিগন্যাল দিয়া ও ঘন্টি মারিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

ওস্তাদ না হইলে চা খাইয়া সুখ হয় না। বউটা এখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুরঝি কিন্তু ঠিক

আছে, সে রাজার পূর্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরঝির শাশুড়ীটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়। রাজা মনে মনে এখন আপসোস করে,—বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল। ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত। ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুতভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।

নিতাইয়ের সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল—হো ওস্তাদ।

এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল—উঁহু।

—চা হো গেয়া ভেইয়া।

—উঁহু।

—আরে ট্রেন আতা হ্যায় ভেইয়া।

—উঁহু!

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে, আজ বেচারার একটু ঘুম দরকার।

বেলা নয়টা নাগাদ নিতাই উঠিল। হাসিমুখেই উঠিল। বোধ হয় গত রাত্রের কথা স্বপ্ন দেখিয়াই, একটু মৃদু হাসি মুখে মাখিয়া উঠিয়া বসিল। এবং প্রথম কথাই মনে হইল যে কলিকাতার সেই চাকুরে বাবুটি আজ তাহাকে দেখিলেই বলিবেন—আরে তুই একজন কবি রে, অ্যাঁ। তাহার পর ইংরেজীতে কি একটা—

ভূতনাথবাবু তারিফ করিবেন—বাহবা রে নিতাই, বাহবা।

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত-দৃষ্টি মুখগুলি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। বিপ্রপদ ঠাকুর তো একেবারে কোলাহল জুড়িয়া দিবে। স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয়। এই সাড়ে নটার ট্রেনেই বিপ্রপদর মারফৎ তাহার কবিখ্যাতি একেবারে কাটোয়া পর্যন্ত আজই পৌঁছিয়া যাইবে। বাসি দুধ চা চিনি ঘরেই আছে, তবু সে আজ ঘরে চা তৈয়ারী করিল না। চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশন-স্টলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখে সেই মৃদু হাসি।

বিপ্রপদ হৈ হৈ করিয়া উঠিল—এই! এই। চোপ, সব চোপ! তারপর তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল—বলিহার বেটা বলিহার। জয় রামচন্দ্র। কাল নাকি সত্যি সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর!

আশ্চর্যের কথা, বিপ্রপদর পুরানো রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপ্রপদর সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—ধুয়ো কি ধরেছিলি বল দেখি? 'উঁপ! উঁপ! খ্যাকোর—খ্যাকোর উঁপ! চুপ রে বেটা মহাদেবা চুপ চুপ চুপ!' না কি? বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

নিতাই এবার হাত জোড় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ছোট জাত; বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুবান যা বলেন তা-ই সত্যি। বলিয়াই সে আপনার মগটি বাড়াইয়া ভেণ্ডার বেনে মামাকে বলিল—কই গো, দোকানী মাশায়; চা দেন দেখি! সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সা দিবার জন্য খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল।

দোকানী বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—মাতুল না ব'লে দোকানী বলছিস, সম্বন্ধ ছাড়ছিস নাকি নিতাই?

নিতাই কথার উত্তর দিল না। বেনে মামাই বলিল—নাঃ, কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে! সে যাই বলুন আপনি।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা ঘুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইতে পরাইতে বলিল—তার জন্যে কপিবরকে একটা মেডেল দোব।

কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়াই নিতাই চায়ের মগটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে সাড়ে নয়টার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই বোধ হয় মোটের সন্ধানে গেল। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

সাড়া না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়া আসিল। বেনে মামা বলিল—এই তো উঠে গেল! প্ল্যাটফর্মে নাই?

এদিক ওদিক চাহিয়া রাজার নজরে পড়িল, গাছাপালার আড়ালে আড়ালে নিতাই চলিয়াছে বাসার দিকে। সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল।

—গাঁওকে একঠো মোট হ্যায় ভেইয়া, একঠো বেগ আওর ছোটাসে একঠো বিস্তারা।

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

—আরে, বড়াবাবুকে জামাই। উমদা বকশিশ মিলে গা। দো আনা তো জরুর!

—না।

—কেয়া, তবিয়ৎ কুছ খারাপ হ্যায়?

—না।

—তব্? রাজা বিস্মিত হইয়া গেল।

নিতাই গম্ভীরভাবে বিষণ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিল—কুলিগিরি আর করব না রাজন।

রাজা এবার বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

পাঁচ

নিতাই বাসায় আসিয়া হঠাৎ রামায়ণখানা খুলিয়া বসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানি খুলিল। বিপ্রপদর কথায় সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে বার বার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে—ব্রাহ্মণবংশের মূর্খ কি বুঝিবে! কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হয় নাই। তাই সে রামায়ণখানা টানিয়া লইয়া বসিল। বইখানা খুলিয়া সে বাহির করিল দস্যু রত্নাকরের কাহিনী। বহুবার সে এ কাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু আজ এ কাহিনী নূতন রূপ নূতন অর্থ লইয়া তাহার মনের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিল। বই হইতে পড়িবার পূর্বেই জানা কাহিনী তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে জলও আসিয়াছে। চোখ মুছিয়া সে এবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর।"

বাহির হইতে রাজা তাহাকে ডাকিল—ওস্তাদ!

উদাসভাবেই মুখ তুলিয়া নিতাই তাহাকে আহ্বান করিল—এস, রাজন এস।

রাজা আসিয়া বসিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিল—কেয়া হুয়া ভাই তুমারা? কাম কেঁও নেহি করেগা?

নিতাই হাসিয়া বলিল—শোন, আগে এই কাহিনীটা শোন।

রাজা বলিল—দু-রো, ওহি লিখাপড়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।

নিতাই তখন পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজা অগত্যা একটা বিড়ি ধরাইয়া শুনিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তন্ময় হইয়া গেল।

"বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপনা ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ।।"

পড়া শেষ করিয়া নিতাই রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা তখন গলিয়া গিয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—সীয়ারাম! সীয়ারাম! তারপর নিতাইয়ের তারিফ আরম্ভ হইল—আচ্ছা, পড়তা হ্যায় তুম ওস্তাদ! বহুৎ আচ্ছা!

নিতাই এবার গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন, এইবার তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ।

রাজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

জানালা দিয়া রেললাইনের রেখা ধরিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল, —রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না মানুষ মারতেন?

রাজা বলিয়া উঠিল—আরে বাপ রে বাপ রে! এইসা কভি হো শকতা হ্যায় ওস্তাদ!

—তা হলে? কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখ। চারিদিকে তো র'টে গেল কবিয়াল ব'লে!

—আলবাৎ! জরুর!

—তবে? আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মুনির কথা ছেড়ে দাও। কার সঙ্গে কার তুলনা। ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁরা। কিন্তু আমিও তো কবি। না হয় ছোট।

এতক্ষণে এইবার রাজা সমস্তটা বুঝিল এবং একান্ত শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে নিতাইয়ের মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বল রাজন, আর কি আমার কুলিগিরি করা শোভন হবে? লোকে ছি ছি করবে না? বলবে না—কবি মোট বহন করছে!

—হাঁ, ই বাত ঠিক হ্যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হইয়া রাজা বলিল—লেকিন একঠো বাত ওস্তাদ—

—বল, রাজার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল।

—লেকিন রোজগার তো চাহিয়ে ভাই; খানে তো হোগা ভেইয়া!

বার বার ঘাড় নাড়িয়া নিতাই বলিল—সে আমি ভাবি না রাজন। দুবেলা না হয়, একবেলা খেয়েই থাকব, তাও যেদিন না জুটবে, সে দিন না হয় উপবাসীই থাকব। অতঃপর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কণ্ঠস্বরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করিয়া সে বলিল—তা বলে ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—! নিতাই বার বার অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না—না —না! তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর বহিবে না।

রাজাও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আবার পরিষ্কার বাংলায় বলিল—না ওস্তাদ, ছোট কাজ আর তোমার করা হবে না। উঁ-হুঁ। নাঃ।

রাজার উপর নিতাইয়ের প্রীতির আর সীমা রহিল না। গভীর আবেগের সহিত সে বলিল—তুমি আমার সত্যকার মিত্র রাজন।

—ধন্য হোগেয়া ওস্তাদ, তুমারা মিত্র হোয়কে হাম ধন্য হোগেয়া। রাজনেরও আবেগের অবধি ছিল না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই এবার বলিল,—আজ বড় দুঃখ পেয়েছি রাজন।

—দুখ? কৌন দুখ দিয়া ভাই?

—ওই তোমার বিপ্রপদ ঠাকুর। আমাকে বললে কি না—কপিবর, মানে হনুমান। আমি হনুমান রাজন?

রাজা মুহূর্তে সোজা হইয়া বসিল। তাহার মিলিটারী মেজাজ মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল নিতাইকে—জবাব কেঁও নেহি দিয়া তোম?

—জবাব জিহ্বার অগ্রভাগে এসেছিল রাজন, কিন্তু সামলে নিলাম। ব্রাহ্মণ বংশের মূর্খ বলীবর্দ

অপেক্ষা কপি অনেক ভাল রাজন।

—জরুর। আলবৎ! লেকিন বলীবর্দ কিয়া হ্যায় ভাই?

নিতাই বলিল—বলদকে বলে ভাই।

তারপর নিজেই রচনা করিয়া বলিল—

"সংসারে যে সহ্য করে সে-ই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম নয়।"

কবিতা আওড়াইয়া নিতাই বলিল—বুঝলে রাজন, ক্ষমা করেছি আমি। একে ব্রাহ্মণ, তায় রোগা লোক, তার উপর মূর্খ; ওকে আমি ক্ষমা করেছি।

রাজন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—সাদা বাংলায় বলিল—ভালই করেছ ওস্তাদ। তারপরই সে আবার বলিল—তাহলে কি করবে ওস্তাদ? একটা কিছু করা তো চাই ভাই। পেটের তুল্য অনবুঝ তো নাই সংসারে।

—আমি একটা দোকান করব ওস্তাদ?

—দোকান?

—হ্যাঁ, দোকান। বিড়ির দোকান, নিজেই বিড়ি বাঁধব, আর ইষ্টিশানের বটতলায় বসে বেচব। দু-এক বাক্স সিগারেটও রাখব।

রাজন উৎসাহিত হইয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা হোগা ওস্তাদ।

নিতাই কিন্তু এবার একটু ম্লান ভাবেই বলিল—বণিক মাতুল একটু রুষ্ট হবে আমার ওপব। কিন্তু—

—কেয়া কিন্তু? উ গোসা করনেসে কেয়া হোগা? জাস্তি ভাত খায়েগা আপনা ঘরমে!

—না রাজন। কারও ক্ষতি করতে আমার ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া আমার হাতের পান, চা জল এ তো কেউ খাবে না। বলিতে বলিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। —আচ্ছা রাজন, বাঁশ কিনে যদি মোড়া সাজি বেশ শৌখিন করে তৈরি করি, তাহলে কেমন হয়?

—উ সব্‌সে আচ্ছা! ·

—কিন্তু বিপ্রপদ বলবে কি জানো? ডোমবৃত্তিব দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—বেটা ডোম।

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া রাজন বলিল—একদিন ঠেসে কান দুটো মলে দেবো বেটা বামুনের।

—না। না। না। হাজার হ'লেও ব্রাহ্মণ। রাজন "ব্রাহ্মণ সামান্য নয়, ব্রাহ্মণে করিলে ক্রোধ হইবে প্রলয়।" শাস্ত্রের কথা ভাই। তা ছাড়া—

রাজা বাধা দিয়া বলিল—ধ্যে-ৎ। ব্রাহ্মন! সাতশো ব্রাহ্মন একঠো বকপাখীকে ঠ্যাং ভাঙনে নেহি শকতা হ্যায়! ব্রাহ্মন!

নিতাই হাসিয়া বলিল—না-না-না। বলুক ডোম। ডোমেই বা লজ্জা কি? ডোমই বা ছোট কিসে? ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ!

—বাস—বাস—বাস। কেয়া হরজ্! বোলনে দেও ডোম। রাজনেরও আর কোন আপত্তি রহিল না—বহুৎ আচ্ছা কাম, দোকান লাগাও, আওর একঠো সাদী করো ওস্তাদ। সন্‌সার পাতাও।

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উলটাইয়া নিতাই বলিল—দূর!

—দূর কেঁও ভাই? উ হাম নেহি শুনেগা!

—আচ্ছা তার আগে একটা কাহিনী বলি শোন।

কাহিনীতে রাজনের পরম অনুরাগ, সে বিড়ি ধরাইয়া জাঁকিয়া বসিল। নিতাই আরম্ভ করিল লেজকাটা শেয়ালের গল্প। গল্প শেষ করিয়া নিতাই বলিল—তুমি লেজ কেটেছ বলে আমি লেজ কাটছি না রাজন!

রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকটা হাসিল, তারপর কিন্তু বলিল—উ বাত তুমারা ঠিক নেহী হ্যায়।

সন্‌সারমে আয়কে সাদী নেহি করেগা তো কেয়া করেগা?

নিতাই এবার বলিল—তুমি ক্ষেপেছ রাজন। বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ব শেষে। আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিদ্যের মর্ম বোঝে? কেবলই খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করবে দিনরাত। তা ছাড়া ধরগা তোমার—, কথা শেষ হইবার পূর্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ? ফিক করকে হাসতা কেঁউ?

—হাসবো না? তোমার, তেমন মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে? বেশ মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে-তাতে ধরবে না রাজন।

রাজা এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাজার উচ্চহাসি উৎকট এবং বিকট। রাজার সে হাসি কিন্তু অকস্মাৎ আবার বন্ধ হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া সে বার বার ঘাড় নাড়িয়া যেন এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই বলিল—ঠিক বাত ওস্তাদ, ঠিক বাত বোলা হ্যায় ভাই। লড়াইমে গিয়া, দেখা, আ-হা-হা একদম ফুলকে মফিক জেনানা। ইরাণী দেখা হ্যায় ওস্তাদ, ইরাণী? ওইসা, লেকিন উসসে তাজা।

রাজার কথা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু স্মৃতির ছবি ফুরাইল না। সে উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। যেন বসরার সেই রূপসীদের শোভা—ওই ধু ধু করা কৃষিক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নিতাইও চাহিয়া ছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইনের সমান্তরাল শাণিত দীপ্ত দীর্ঘ রেখা দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে, সেই বিন্দুটির দিকে। সহসা এক সময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু, যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। চকিতে চকিতে একটা ছটা ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিতেছে। রাজা এখানে বসিয়া আড্ডা দিতেছে, তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য রাখিয়া, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

—ছি রে, ছি রে আমার অদেষ্ট! সকালবেলা থেকে বেলা দোপর পর্যন্ত মানুষের ঘর ব'লে মনে থাকে না! অদেষ্টে আমার আগুন লাগুক, পাথর মেরে এমন নেকনকে (কপালকে) ভেঙ্গে কুচিকুচি করি আমি।

রাজার মুখখানা ভীষণ হইযা উঠিল, সে উঠিয়া পড়িল। নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ?

—আতা হ্যায়। আভি আতা হ্যায়। সে চলিয়া গেল।

—রাজন! রাজন! নিতাই পিছন পিছন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরই রাজা ফিরিল সেই উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে। হাসিয়া সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল। নিতাই প্রশ্ন করিল—হ'ল কি?

রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্য ছেদও পড়ে না এবং এমন টানা হাসির মধ্যে কথাও বলা যায় না। তবুও বহুকষ্টে রাজা বলিল—ভাগা হ্যায়। মাঠে মাঠে—। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকট উচ্চহাসি।

নিতাই বুঝিল। গালিগালাজ-মুখরা রাজার স্ত্রী রুদ্রমূর্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিয়াই বিপরীত দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখার অভিনয় করিয়া বলিল, এইসা করকে দেখতা; হাম এক পাঁও গিয়া তো ফিন দৌড় লাগায়া। অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড় দিয়াছে, আবার কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর এক পা বাড়াইয়াছে, দৌড়িয়া যাইবার ভঙ্গি করিয়াছে, অমনি রাজার বউও ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজার কিলকে তাহার বড় ভয়। বলিতে বলিতে রাজা আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই মুহূর্তটিতেই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল সেই ঠাকুরঝি। পরনে সেই ক্ষারে ধোয়া

ধবধবে মোটা সুতোর খাটো কাপড়, মাথায় পরিচ্ছন্ন মাজা পিতলের ঘটি। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।

নিতাই সাদরে আহ্বান করিল—এস ঠাকুরঝি, এস।

ঠাকুরঝি রাজাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিয়া বিপুল কৌতুক অনুভব করিল। সকৌতুকে সে রাজার দিকে আঙুল দেখাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচন-ভঙ্গিতে—এই, এই জামাই এত হাসছে কেনে?

—শুধাও ভাই জামাইকে। নিতাই হাসিল।

—অই। অই। ই কি হাসি গো। এমন করে হাসছ কেন গো জামাই? সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়া গেল। সেও হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি! হি-হি-হি! অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মত হাসি।

রাজার হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসার জন্য সে ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল মেয়েটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ভীষণ চটিয়া রাজা ধমক দিয়া উঠিল—অ্যাও।

ধমক খাইয়া মেয়েটির হাসি বাড়িয়া গেল।

রাজা বলিল—আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের করে হাসছে দেখ। লজ্জা নাই তোর?

এবার মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সে বলিল—লাও বাপু, দুধ লাও। আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্ততে বকবে।

রাজা বলিল—তোকেও একদিন ঠ্যাঙানি দিতে হবে দেখছি। দিদির মত মাঠে মাঠে—। আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরঝি কিন্তু এবার হাসিল না। সে নীরবে নতমুখে ঘটি হইতে মাপের গ্লাসে দুধ ঢালিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদা দিল—কই গো, কড়াই পাত!

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের কড়াটি পাতিয়া দিয়া বলিল,—রাগ করলে ঠাকুরঝি? না না, রাগ ক'রো না।

ঠাকুরঝি উত্তর দিল না, মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল। পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝি আমার ডাকগাড়ি গেল। বাবা রে, বাবা রে, ছুটেছে! পোঁ—ভস-ভস ভস-ভস। বাবা রে!

ঠাকুরঝি কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না।

নিতাই বলিল—না রাজন, এ-প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হ'ল না।

কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না। কিসের অনুচিত? সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল—ধে—ৎ।

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ীর ঘণ্টা দিতে হইবে। এই সময়টি নির্ণয়ে ঠাকুরঝি তাহার সিগনাল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয়, মধ্যপথেই শুনিতে পায় মাস্টার হাঁকিতেছে—রাজা।

রাজা নিত্য সাড়া দেয়, আজও দিল—হাজির হ্যায় হুজুর।

ঠাকুরঝি এবং রাজন দুজনেই চলিয়া গেল। নিতাই একটু বিষণ্ণ হইয়াই বসিয়া রহিল। না-না, এমন ভাবে ওই মিষ্টি মেয়েটিকে রাজনের এমন কটু কথা বলা উচিত হয় নাই। সংসারে সুখ ভালবাসায়, মিষ্টি কথায়। কাল রাত্রে গাওয়া গানখানি আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল।

"আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জলে রে!"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গিয়াছে; চা খাইতে হইবে।

সে উনান ধরাইতে বসিল। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় না; তা ছাড়া শরীরটাও আজ ভাল নাই। গত রাত্রির পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, অনিদ্রায়—আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর একটু চা না হইলে জুত হইবে না।

উনান ধরাইয়া কেতলির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল। নাঃ, রাজনের এমন কটু কথা বলা ভাল হয় নাই। ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভাল। আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত। বলিবার ছিল যে। গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরঝি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত! মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে, তাই সে কথাগুলি না বলিয়াই চলিয়া গেল। 'আলকাতরার মত রঙ'—। ছি, ওই কথাই কি বলে। কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ। কৃষ্ণ কালো কোকিল কালো, চুল কালো—আহা-হা! আহা-হা! বড় সুন্দর বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে! হায়, হায়, হায়!

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

কেন কাঁদ?

ছয়

বড় ভাল কলি হইয়াছে। নিতাইয়ের নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল।—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"

বাহবা, বাহবা, বাহবা! কেন কাঁদ?

ওদিকে চায়ের জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই-করা লোহার থালা চাপা দিল। 'ফুটন্ত জলে প্রত্যেক জনের জন্য এক চামচ চা দিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন'—বেনে মামার স্টলে নিতাই চা প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞাপন পড়িয়াছে। কিন্তু তাহার পর কি?

চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না। সে জানালা দিয়া বাহিরের যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তবু পছন্দসই দ্বিতীয় কলি আসিল না। অন্য দিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায়, তারপর দুধ চিনি দেয়। আজ আর সে হইয়া উঠিল না, কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিল। অকস্মাৎ তাহার চায়ের কথা মনে হইতে সে দুধ চিনি দিয়া চা ছাঁকিয়া লইল। কলাই-করা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান। ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মত গাছটি; নিতাই বলে —'চিরোল-চিরোল পাতা'। তাহার উপর যখন চৈত্রের শেষ হইতে থোপা-থোপা লাল ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন নিতাই প্রায় অহরহই গাছটির তলায় বসিয়া থাকে। ফুলের লোভে ছেলের দল আসে, নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়া বিদায় করে, গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না।

স্টেশন হইতে রাজার হাঁক-ডাক আসিতেছে। এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ী থাকে, এখানকার মাল থাকিলে গাড়ী কাটিয়া দিয়া যায়—সেই গাড়ী শান্টিং হইতেছে। নিতাইও আগে নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ী ঠেলিত। সহসা তাহার মনের গান চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা। কুলিগিরি সে আর করিবে না, সে কবিয়াল। কুলিগিরি না করিলে অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া?

এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ চোখে পড়িল লঘু দ্রুত গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে

মোটা কাপড় পরা, হাল্কা কাশফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি; মাথায় সোনার টোপবের মত ঝকঝকে পিতলের ঘটি। ঠাকুরঝির কথাও যেমন দ্রুত, চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে। ঢ্যাঙা নয়, অথচ সরস কাঁচা বাঁশের পর্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখজুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী। যতবারই সে ঠাকুরঝিকে দেখে ততবারই এই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে সাড়া তোলে।

ঠাকুরঝি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে। নিতাই মনে মনে একটু হাসিল—তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি এমন হনহন কবিয়া চলিয়াছে। শক্তি থাকিলে ঠাকুরঝি নিশ্চয় মাটি কাঁপাইয়া পথ চলিত। কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভাল হয় নাই। আলকাতরার মত রঙ হইলেও ঠাকুরঝি তো মন্দ দেখিতে নয়! মন্দ কেন, ভালই। কালো রঙে কি আসে যায়।

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'

নিতাই ডাকিল—ঠাকুবঝি! অ ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি গ্রাহ্য করিল না, সে হনহন করিযাই চলিয়াছে।

—আমার দিব্যি! নিতাই হাঁকিয়া বলিল।

ঠাকুরঝি থমকিয়া দাঁড়াইল।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি বলিল—না, আমার দেরি হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন।

—না! ওইখান থেকে বল তুমি।

—আমাব দিব্যি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুবঝি এবাব আগাইযা আসিযা নিতাইযেব সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—তোমাব দিব্যি যদি আমি না মানি?

—না মানলে মনে বেথা পাব, আব কি ঠাকুরঝি! নিতাই ছলনা কবিয়া বলিল না, আন্তরিকতার সহিতই বলিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরেই এবার মেয়েটি বলিল—লাও কি বলছ, বল?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—রাগ করেছ?

মুহূর্তে ঠাকুবঝি ভীরু চকিত দৃষ্টিভরা চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—কালো আছি, আমি আপনাব ঘবে আছি। কেউ তো আমাকে খেতে পরতে দেয় না!

নিতাই হাসিযা বলিল—আমি কিন্তু কালো ভালোবাসি ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির মুখের কালো রঙে লাল আভা দেখা যায় না, তবু তাহাব লজ্জার গাঢতা বোঝা যায়। নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না। সে গালে হাত দিয়া মৃদু স্বরে গান ধরিয়া দিল—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে!"

লজ্জিতা ঠাকুরঝি এবার সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল, বলিল—নতুন গান? বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—কাল তুমি বাপু ভাল গান করেছ!

—ভাল লেগেছে তোমার?

—খুব ভাল।

—এস, এস, একটুকুন চা আছে—খাবে এস।

—না না। ঠাকুরঝির চা খাইতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগার কথা না কি বলিতে নাই। ছি!

নিতাই আবার দিব্যি দিল—আমার দিব্যি। নিতাই বাসার দিকে ফিরিল। রাজনের জন্য যে চাটুকু ছাঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেটা উনানের উপরে বসানোই ছিল, সেই দুইটা পাত্রে ঢালিয়া একটা ঠাকুরঝিকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি আবার সলজ্জ ভাবে বলিল—না, না, তুমি খাও।

—না, তা হবে না। তাহলে বুঝব, তুমি এখনও কোধ করে আছ।

বাটিটা টানিয়া লইয়া সকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—কোধ কি গো? কোধ?

—রাগ। 'কোধ মানে হ'ল গিয়ে তোমার রাগ। কয়ে রফলা ও-কার ধ, কোধ। 'হিংসা কোধ অতি মন্দ কভু নহে ভাল।' বুঝলে ঠাকুরঝি, এই কারুর হিংসে করো না। কোধের নাম হ'ল চণ্ডাল।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে?

গভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি। নইলে কবিয়াল করেও তিনি আমাকে 'ডোম'-কুলে পাঠালেন কেনে, বল?

নীরব বিস্ময়ে মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখের উপর ভাসিতেছিল—শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে।

অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সবই তাঁর লীলা। না হলে আমাকে ঠাট্টা ক'রে কপিবর, মানে হনুমান বলে!

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল —কে? কে বটে, কে?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সে আর শুনে কি করবে বল? লাও, চা খাও? জুড়িয়ে গেল।

ঠাকুরঝি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল। জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনও কিছু খায় না। পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল—না, বলতে হবে তোমাকে। কে বটে, কে সে? জামাই বুঝি? জামাই অর্থে রাজন।

—না না, ঠাকুরঝি, রাজন আমার পরম বন্ধু, বড় ভাল নোক।

—হ্যাঁ, ভাল নোক না ছাই। যে কট্‌কটে কথা!

—না, না। আজ তোমাকে ওটা পরিহাস ক'রে বলেছে। তুমি শালী, পরিহাসের সম্বন্ধ?

—পরিহাস কি গো?

—ঠাট্টা ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে তো ঠাট্টার সম্বন্ধ।

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল, নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ঠাকুরঝির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বলিল —তা বটে ! জামাই আমাদের রাগীদার হোক, নোক ভাল।

—ভারি ভাল নোক।

—কিন্তু তোমাকে উ কথা কে বললে, বলতে হবে। সে মুখপোড়া কে বটে, কে?

—গাল দিয়ো না ঠাকুরঝি, জাতে ব্রাহ্মণ। ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে 'বক্র' মুনির মত বসে থাকে আর ফরফর করে বকে। ওই বিপ্রপদ ঠাকুর।

—কেন উ কথা বলবে?

—ছেড়ে দাও কথা। জাতে ব্রাহ্মণ, আমি ছোট জাত—তা বলে বলুক।

—আঃ ভারি আমার বান্তন। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি, একবার দেখি। উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বা-বা-বা। ভারি মানিয়েছে তো ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুল এলো খোঁপায় এক থগা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। লজ্জায় মেয়েটি সচকিতা হরিণীর মত তাহার খসিয়া-পড়া ঘোমটাখানি ক্ষিপ্র হস্তে, দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে খপ করিয়া হাতখানি ধরিয়া বাধা

দিয়া বলিল—দেখি। দেখি। বা-বা-বা।

মেয়েটি লজ্জায় অধোমুখ ও কাঁদো-কাঁদো হইয়া গেল, বলিল—ছাড়ো। ছাড়ো।

মুহূর্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল। সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নতমুখে ছুটিয়া পলাইয়া গেল—বাটিটা ধুইবাব অজুহাতে। নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। ছি! ছি! ছি! এ কি করিল সে?

চুপ করিয়াই সে বসিয়া ছিল, হঠাৎ ঠুং শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল—ঠাকুরঝি বাটিটা নামাইয়া দিয়া আপনার ঘটিটি তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরঝির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটায় কচি পাতার মত ঝলমলে হইয়া উঠিয়াছে। চোখাচোখি হইতেই ঠাকুরঝি হাসিয়া চট করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘোমটা খসিয়া গেল। ঠাকুরঝি এবার ছুটিয়া পলাইয়া গেল, ঘোমটা তুলিয়া না দিয়াই;—তাহার রুক্ষ কালো চুল লাল কৃষ্ণচূড়া পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মত জ্বলিতেছে।

নাঃ, ঠাকুরঝি রাগ করে নাই। ওই যে যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিতেছে। কিন্তু কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়া বড় চমৎকার মানাইয়াছে।

ঠাকুরঝি ক্রমে-ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ছোট হইয়া পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল। নিতাই বসিয়া আপন মনেই ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিয়াছে।

'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?'

সাত

কালো কেশে রাঙা কুসুমের শোভা দেখিয়া গান রচনা করিয়া কবি হওয়া চলে, কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলা চলে না। নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল—বিষম হুঁচোট। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটার চারিপাশ কাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। সে ওই গানখানা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চণ্ডীতলায় চলিয়াছিল। নির্জন পথ—বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিয়া নিতাই বেশ উচ্চ কণ্ঠেই গান ধরিয়া চলিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করিয়া যেন 'কালো চুলে রাঙা কুসুমের' শোভাটি কাহাকেও দেখাইয়া দিতেছিল; যেন দ্রুতপদে ঠাকুরঝি তাহার আগে আগেই চলিয়াছে এবং তাহার রুক্ষ কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটি ঝলমল করিতেছে।

হঠাৎ আঙুলে হুঁচোট খাইয়া বেচারী বসিয়া পড়িল। দুর্বল শরীরে চোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন নিতাই এখন একবেলা খাইতেছে। উপার্জন নাই, পূর্বের সঞ্চয় যাহা আছে সে অতি সামান্য; সে সঞ্চয় আবার দোকানে লাগাইতে হইবে। সেই জন্য নিতাই একবেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে; একেবারে অপরাহ্ন বেলায় সে এখন কোনদিন রাঁধে পায়েস, কোনদিন খিচুড়ি। কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই, ঠাকুরঝিকেও না। তাহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলবে। রাজা হয়ত পাঁচ-সাত টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিবে—চালাও পানসী—বানাও খানা—ফিন দরকার হোনেসে দেগা।

রাজার মত বন্ধু আর হয় না। এদিকে রাজা সত্য-সত্যই রাজা। বিপ্রপদ যে-সব নাম তাহাকে দিয়াছে তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয়, কেবল একটি ছাড়া—সে নামটি হইল সভাকবি, রাজার সভাকবি। রাজার কাছে কোন লজ্জাই তাহার নাই; কিন্তু রাজার স্ত্রী রাণী নয়, সে রাক্ষুসী। বাপ রে! মেয়েটার জিভে কি বিষ! সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয়। মিলিটারী রাজা কঞ্চির আঘাতে মেয়েটার পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—তবু তাহার জিভ বিষ ছাড়াইতে ছাড়ে না; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে।

মর্মভেদী জ্বালা-ধরানো নিষ্ঠুর গালিগালাজ। পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ, মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাত দেয়! ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন, সকলকেই গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে। সেই গালিগালাজগুলি স্মরণ করিয়া নিতাই দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। রাজার বউয়ের গালিগালাজের বাঁধুনী বড় চমৎকার, কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনী বাঁধিয়া গালিগালাজ দিতে পারে না। কালই ট্রেনখানাকে অভিসম্পাত দিতেছিল—পুল ভেঙে প'ড়ে যমের বাড়ী যাও, যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' 'হাঁকিড়ে' চলছ—এই আগুনের তাতে অঙ্গ তোমার গ'লে গ'লে পড়ুক। যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলো সেই চাকা মুড়মুড়িয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক—যে চোঙার গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উলটিয়ে পড়, পালটিয়ে পড়; নরকে যাও। বলিহারি বলিহারি। মহাদেবের আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা কোথায় লাগে ইহার কাছে?

রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে, তাই তাহার আক্রোশ নিতাইয়ের উপর কিছু বেশী। রাজার অনুপস্থিতিতে নিতাইকে শুনাইয়া কোন অনামা ব্যক্তিকে গালিগালাজ করে। সে হাসে। রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না। রাজা দিতেও ছাড়িবে না, গোপনও করিবে না এবং রাণী জানিতে পারিবেই। সে জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির চা খাওয়া রাণী দেখিয়াছে। চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল। রাজার বউ বোধ হয় কোথাও যাইতেছিল, হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে একসঙ্গে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে মুখ সরাইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নিতাইও। পরমুহূর্তেই বাড়ীর বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

"হাসিস্ না লো কালীমুখী—আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি—লাজ বাসিস্ না?"

ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় না, চা জুড়াইয়া গিয়াছিল, জুড়ানো চা রাখিয়া সে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খাইয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

হুঁচোটের ধাক্কাটা সামলাইয়া নিতাই কোনমতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল। চণ্ডীমাকে প্রণাম করিয়া সে মোহন্তের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মোহন্ত সস্নেহেই বলিলেন,—এস, কবিয়াল নিতাইচরণ এস।

নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে মোহন্তকে প্রণাম করিল।

—জয়োস্তু। তারপর, সংবাদ কি?

—আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দেবেন বলেছিলেন!

—মেডেল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, সে হবে। পাবে? মোহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সহসা চণ্ডীদেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—কালী কৈবল্যদায়িনী মা!

নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। এমন ভাবাবেশের মধ্যে মোহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডীর দাওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল—ঠং।

মোহন্ত মুহূর্তে উঠিয়া পড়িলেন। ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে, বোধহয় একটা প্রণামী ছুঁড়িয়াছে।

মোহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবা!

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মোহন্ত বলিলেন—বলেছি তো পরে হবে। আসছে বার মেলার সময়, সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে।

নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, বিদায় কিছু দেবেন না?

—বিদায়। টাকা?

—আজ্ঞে।

মোহন্ত সকৌতুকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির আর সীমা রহিল না। অকস্মাৎ মোহন্ত কথা বলিলেন—ভালা রে ময়না, ভাল বুলি শিখেছিস তো। টাকা। মায়ের স্থানে টাকা! গান গাইতে পেয়েছিস সেইটে ভাগ্যি মানিস না?

মোহন্তের কথার সুরে যেন চাবুকের জ্বালা ছিল; সে জ্বালায় নিতাই চমকিয়া উঠিল। লজ্জার আর সীমা রহিল না তাহার। সত্যিই তো গান গাহিতে পাইয়া সে-ই তো ধন্য হইয়া গিয়াছে। আবার টাকা চায় কোন্ মুখে!

ইহার পর কোন কথা না বলিয়া সে একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। ফিরিবার পথে অকস্মাৎ তাহার চোখে জল আসিল; অকস্মাৎ মহাদেব কবিয়ালের ছড়াটা মনে পড়িয়া গেল—সেদিন গানের আসরে মহাদেব বলিয়াছিল, 'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!' ঠিক কথা, মহাদেব কবিয়াল,—আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বর্গে যায় না, যাইতে পারে না। কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও গুণী লোক, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাহার কবি হওয়ার আশা আর আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতার স্বর্গে যাইবার আশা—এই দুই-ই সমান।

আপন মনেই সে বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজেকে শুনাইয়াই বলিয়া উঠিল—দূ-রো! অর্থাৎ নিজের কবিয়ালত্বকেই দূর করিয়া দিতে চাহিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক কবিল আবার এই বারোটার ট্রেন হইতেই সে 'মোট-বহন' আরম্ভ করিবে।

বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে, তা করুক। কবিয়াল হইয়া তাহার কাজ নাই। সে মনকে বেশ খোলসা করিয়াই সকৌতুকে গান ধরিল, মহাদেবের সেই গানটি—

'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
ফরাৎ করে উঠল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।
হায়রে কলি—কিই বা বলি—গরুড় হবেন মশা গো!'

খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে একটা শব্দ আসিয়া ঢুকিল। ট্রেন আসিতেছে না? হ্যাঁ, ট্রেনই তো। সঙ্গে সঙ্গে চলার গতি সে দ্রুততর করিল। রাজা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়ে হাজির হইয়াছে। সিগন্যাল ফেলিবে, ট্রেনের ঘণ্টা দিবে। ঠাকুরঝি বোধহয় তালা বন্ধ ঘরের সম্মুখে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তো আজ কিছুতেই রাজার বাড়ী যাইবে না। কাল ছড়ার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত রাজার স্ত্রী করিয়াছে। সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌছিল ট্রেনখানা তখন বিসর্পিল গতিতে সবে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নিতাই হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। রোজগার ফসকাইয়া গেল, ঠাকুরঝি চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কানে আসিল কে তাহাকে ডাকিতেছে—নিতাই।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া ডাকিতেছে—নিতাই, নিতাই।

বাতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বহুকষ্টে দেহসমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাসিতেছে, —সেও ডাকিল,— কপিবর, কপিবর।

নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্যই সে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক মাতুল কিন্তু বেশ খানিকটা খুশী সুরেই বলিল—নাঃ, সত্যিকারের গুনীন বটে

আমাদের নিতাই। ওরে তোর কাছে যে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল। বায়না আছে কোথায়! গাওনা করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে! বায়না আছে! অকস্মাৎ তাহার সে বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল রাজনের চীৎকারে। উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজন প্রায় গগনস্পর্শী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—ওস্তা—দ! ওস্তা—দ!

রাজনের সঙ্গে একজন লোক। মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার। এই মেলায় আসরেই সে গান করিয়া গিয়াছে। নিতাই তাহাকে চিনিল।

—বায়না, ওস্তাদ, বায়না আয়া হ্যায়! রাজা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

লোকটি নিতাইকে নমস্কার করিয়া বলিল—ভাল আছেন?

এতক্ষণে নিতাই প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের কুশল? ওস্তাদ ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই পাঠালেন আপনার কাছে। একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ, আপনাকে দলে দোয়ারকি করতে হবে। মহাদেব কবিয়ালের শরীর ভাল নাই। গলা বসেছে। আপনার গলা ভাল। ওস্তাদ আপনাকে দিয়ে গাওয়াবে। আপনি নিজেও গাইবেন—এই আর কি!

রাজা বলিল—জরুর, জরুর, আলবৎ, আলবৎ যায়েগা। চলিয়ে তো বাসামে, বাৎচিৎ হোগা, চা খায়েগা।

নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল, আজ তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে—বায়না আছে! সেও বলিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয়। আসুন, বাসায় চা খেতে-খেতে কথা হবে।

বাসার দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, একটি ঝোপের আড়ালে—কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়াতলে, ও কে বসিয়া!

ঠাকুরঝি!

উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরঝি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তে সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল—কোথা গিয়েছিলে বাপু, আমি দুধ নিয়ে বসে আছি সেই থেকে!

নিতাই বলিল—কাল একটুকু সকাল ক'রে দুধ এনো বাপু। কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব। তার আগেই যেন—

রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল—হাঁ, হাঁ ঠিক আয়েগি; ঘড়িকে কাঁটাকে মাফিক আতি হ্যায় হাম্যারা ঠাকুরঝি। আজ রাজাও ঠাকুরঝির উপর খুশী হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরঝির মুখখানিও সেই খুশীর প্রতিচ্ছটায় মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল। ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠে; আবার মেঘ উঠিলে আঁধার হয়—কে যেন কালি গুলিয়া দেয়।

ঠাকুরঝি সেই খুশীর ছটামাখা মুখে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল—তুমি কবিগান গাইতে যাবে কবিয়াল? বায়না এসেছে?

কথাটা ঠাকুরঝিও শুনিয়াছে।

নিতাই ফিরিল পাঁচদিন পর। ট্রেন হইতে যখন সে নামিল, তখন তাহার ভোল পালটাইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের একজোড়া নূতন জুতা ময়লা কাপড়-জামার উপর ধপধপে

সাদা নূতন একখানা উড়নি চাদর। মুখে মৃদুমন্দ হাসি—কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম। ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিয়াছে, স্টেশন-মাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে।

—এই যে নিতাই! আরে বাপ রে, চাদর জুতো। এই যে, বাপ রে তাকে চেনাই যায় না রে!

উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

—আজ্ঞে, চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন। আর জুতো জোড়াটা কিনলাম।

শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা; জুতা-চাদর দুইই নিতাই নগদমূল্যে খরিদ করিয়াছে। গেরুয়া না পরিলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, 'ভেক নহিলে ভিখ মিলে না'; চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না। নগ্নপদ জনকে পদবী মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চায় না। তাই নিতাই পাদুকা ও চাদর কিনিয়াছে। স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশাভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও কেহ যেন তাহাকে দেখিল না, সম্ভাষণ দূরের কথা, কেহ একটা প্রশ্নও করিল না। যে প্রশ্ন করিবার একমাত্র মানুষ, সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্তব্যে ব্যস্ত ছিল। মালগাড়ী শান্টিং হইবে। গাড়ী কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল—এই! হট যাও, এই্—বুড়বুক! হটো—হটো!

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল। মানুষ বৈরাগ্যভরে যেমন জনতাকে জনবসতিকে পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া আপথে সকলের অলক্ষিতে অগোচরে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই সে স্টেশনের মেহেদীর বেড়ার পাশের অপরিচ্ছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে। মনটা তাহার মুহূর্তে উদাস হইয়া গিয়াছে; শুধু মনই নয়, সারা দেহেই সে যেন গভীর অবসন্নতা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ কানে ঢুকিল—গুন গুন সুর।

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'—গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে! ওই ঝোপটার আড়ালে; কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। মুহূর্তে ভাটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া গেল। ঠাকুরঝি! তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি। রবার-সোল ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল এবং অনুরূপ মৃদুস্বরে গাহিল,

'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?'

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সচকিত বন্যা কুরঙ্গীর মত।—বাবা রে! কে গো?

পরমুহূর্তেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল!—কবিয়াল!

নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরম স্নেহভরে সে অনুরাগিণীটিকে বলিল—এস, চা খেতে হবে একটু।

ঘরে আসিয়া নিতাই চাদরখানি গলা হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল। কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—খুলো না, খুলো না; দাঁড়াও দেখি ভাল ক'রে!

ভাল করিয়া দেখিয়া ঠাকুরঝি বলিল—আচ্ছা সাজ হইছে বাপু। ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে। ভারি সোন্দর দেখাইছে।

নিতাই বলিল—বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা।

—ম্যাডেল? ম্যাডেল দেয় নাই?

—সে আসছে বার দেবে। মেডেল কি দোকানে তৈরী থাকে ঠাকুরঝি।

—তা চাদরখানা আচ্ছা হইছে। তুমি বুঝি খুব ভাল গায়েন করেছ, লয়?

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কহিল—খুব ভাল। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানখানাও গেয়ে দিয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে কালো মেয়েটির মুখখানিও কেমন হইয়া গেল; চোখের পাতা দুইটা নামিয়া আসিল। সে দুইটা যেন অসম্ভব রকমের ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নত চোখে সে বলিল—না বাপু; ছি! কি ধারার নোক তুমি!

নিতাই হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

—কি?

—চোখ বোজ দেখি। তা নইলে হবে না।

—কেনে?

—আঃ বোজই না কেনে চোখ। তারপর চোখ খুললেই দেখতে পাবে। ঠাকুরঝি চোখ বন্ধ করিল; কিন্তু তবু সে তাহারই মধ্যে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল। নিতাই পকেটে হাত পুরিয়াছে।

—উ কি, তুমি দেখছ! নিতাই ঠাকুরঝির চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। বোজ, খুব শক্ত করে চোখ বোজ।

পরক্ষণেই ঠাকুরঝি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িল। কি! চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরঝি দেখিল, সুতার মত মিহি, সোনার মত ঝকঝকে একগাছি সুতা-হার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

ঠাকুরঝি বিস্ময়ে আনন্দে যেন বিবশ ও নির্বাক হইয়া গেল।

—সোনার?

—না, সোনার নয় কেমিকেলের। সোনার আমি কোথায় পাব বল? আমি গরীব।

ঠাকুরঝির অন্তর তারস্বরে বলিয়া উঠিল—তা হোক, তা হোক, এ সোনার চেয়েও অনেক দামী। হারখনির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচিপাতার মত।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাজা আসিতেছে; ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম হইতে হাঁকিতে হাঁকিতে আসিতেছে।

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তে ঠাকুরঝি গলার সুতা-হারখানি খুলিয়া ফেলিল। শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল—জামাই আসছে!

নিতাইও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—তা হ'লে?

পরমুহূর্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও তাহার গলায় চাদর, পায়ে জুতা। খানিকটা আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—রাজন, আপনার শরীর কুশল তো?

রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আরে, বাপ রে, বাপ রে। গলামে চাদর—

বাধা দিয়া নিতাই বলিল—শিরোপা।

—শিরোপা।

—হ্যাঁ। বাবুরা গান শুনে খুশী হয়ে দিলেন।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ।

—আরে, বাপ রে, বাপ রে। রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর বলিল—আও ভাই কবিয়াল, আও।

—কোথায়?

—আরে, আও না। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে।

—মামা! বানাও চা! লে আও মিঠাই!

বেনে মামাও অবাক হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া। বাতে-পঙ্গু বিপ্রপদ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া নিতাইকে দেখিল, তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে সুপ করিয়া টানিয়া লইল। তারপরে সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু।

বেনে মামা বলিল—আমাদিগকে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই।

—নিশ্চয়। খাও না মাতুল, সন্দেশ তো তোমার দোকানেই। দাম দেব।

—নেহি, হাম দেঙ্গে মামা। বানাও ঠোঙ্গা। কাঠের একটা প্যাকিং-বাক্স টানিয়া রাজা চাপিয়া বসিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল—বইঠ যাও।

এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল, সে আজ আর রসিকতা করিল না, ঠাট্টাও করিল না, সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল—তারপর গাওনা কি রকম হ'ল বল দেখি নিতাই?

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল; বিপ্রপদকে সে আজ জয় করিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বড় কিছু সে কল্পনা কামনা করিতে পারে না। সে আবার একবার বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু গাওনা আপনার চরম। দুদিকেই দুই বাঘা কবিয়াল—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ; একদিকে ছিষ্টিধর, অন্যদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি। আর মেলাও তেমনি।

বেনে মামা ঠোঙায় মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল—খেতে খেতে গল্প হোক। খেতে খেতে। সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল। কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই—কথার সঙ্গে তাহার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে।

বিপ্রপদও এতক্ষণে ধীরে ধীরে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, সে চট করিয়া বেনে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল—ভাগ বেটা বেরসিক কাঁহাকা! কবিরা সন্দেশ খায় কোন্ কালে? কবিরা চাঁদের আলো খায়, ফুলের মধু খায়, কোকিলের গান খায়। তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তারপর নিতাইচরণ? একদিকে ছিষ্টিধর, একদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি! তারপর? বলিয়া সে দুই হাতে ঠোঙা ধরিয়া মিষ্টি খাইতে আরম্ভ করিল।

নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু উহাতে দমিত হইল না। সে সমান উৎসাহেই বলিয়া গেল—একদিন, বুঝলে প্রভু, মহাদেবের নেশাটা খানিকটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন—মহাদেব হয়েছে কেষ্ট, ছিষ্টিধর রাধা। ছিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে—"কালো টিকেয় আগুন লেগেছে—তোরা দেখে যা গো সাধের কালাচাঁদ।" গালাগালির চরম করে গেল। ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে। দোয়াররা সব মাথায় জল ঢালছে। আমি সেই ফাঁকে এসে ধরে দিলাম ধুয়ো—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?" ব্যস, বুঝলেন প্রভু, বাবুভাই থেকে আরম্ভ করে সে একেবারে 'বলিহারি, বলিহারি' রব উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিরোপা এই চাদরখানা গলার ওপরে ঝপাং করে এসে পড়ল।

কথাটা সত্য। নিতাই ধুয়াটা ধরিয়াছিল এবং লোকে সত্যই ভাল বলিয়াছে, কিন্তু শিরোপার কথাটা ঠিক নয়।

তবে শিরোপা পাইলে অন্যায় হইত না। নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার-দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যিই তো কালো যদি মন্দই হইবে—তবে কালো চুলে সাদা রঙ ধরিলে—মন তোমার উদাস হইয়া ওঠে কেন? নিতাই বার বার এই প্রশ্নটির জবাব চাহিয়াছিল। ছিষ্টিধর খ্যাতিমান কবিয়াল—সে মানুষকে জানে এবং চেনে—

সে এ প্রশ্নের জবাব রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। গাহিয়াছিল—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদি ক্যানে?
কাঁদি না রে! কলপ মাখি!
কলপ মাখি,—না হয়, বউ তুলে দেয় হ্যাঁচকা টানে।"

লোকে খুব হাসিয়াছিল বটে কিন্তু ওই অদ্ভুত প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত সকৌতুক বিষণ্ণ তত্ত্বটি কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। পালা শেষের পর বহুজন পরস্পরের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছে—

"কালো যদি মন্দ তবে—কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?"

পরের দিন আসরে নিতাইকে মহাদেব ইচ্ছা করিয়াই ছিষ্টিধরের মুখের কাছে আগাইয়া দিয়াছিল। সেদিন ছিষ্টিধর দ্রোণ, মহাদেব একলব্য। আগের দিন প্রচুর বমি করিয়া মহাদেবের শরীরও ভাল ছিল না, গলাটাও বসিয়া গিয়াছিল। এবং ছিষ্টিধরের কাছে হারের ভয়ও ছিল। তাই সম্বন্ধ পাতাইবার পর মহাদেব উঠিয়া আসর বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল—

আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হলো—
ব্যাধের ব্যাটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোলো,
আমাকে কি মানায় তাই? তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য
একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য।

বলি—মানাবে ভাল হে!

—ইহার উত্তরে ছিষ্টিধর উঠিয়া প্রথমেই কপালে চাপড় মারিয়া গাহিয়াছিল—

—টাকা কড়ি চাইনে কো মা—তোর দণ্ডসাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুর বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে—
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে—
আমায় বলিস বধতে তারে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে।

তাহার পর মহাদেব এবং নিতাইকে জড়াইয়া গালাগালির আর আদি অন্ত রাখে নাই ছিষ্টিধর। মূল সুর তাহার ওই। নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয় তবে তাঁহারা অন্ত্যজ ব্যাধও নয়, তাহারা অসুর; মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুর আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা!

—হায় অসুরের শ্বশুরবাড়ী ঠিক-ঠিকানা নাই—
গরুর পেটে হয় দামড়া
গায়ে তাহার বাঘের চামড়া
বিধাতা সে অধোবদন—এ ব্যাটা ঠিক তাই।

সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কোপাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটা। মহাদেবও অধোবদন হইয়াছিল। ভাঙা গলা লইয়া জবাব দিবার তাহার উপায় ছিল না। কিন্তু নিতাই দমে নাই। সে উঠিয়া গান ধরিয়া দিয়াছিল অকুতোভয়ে। তাহার আর হার জিতের ভয় কি? সে গান ধরিয়াছিল—

ভাণ্ড পুত্ত দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হে!

—মহাশয়গণ আমাকে উনি জন্তুপুত্ত বলে গাল দিলেন। কিন্তু ওঁর জন্ম ভাণ্ডে—মাটির কলসীতে।

নারিকেল নিন্দে করেন—ও কষুটে গুবাক হে!

—মানে সুপুরী। মশাই সুপুরী।

কিন্তু আর যোগায় নাই। ইহার পর উলটা পথ ধরিয়াছিল। নিজেই হার মানিয়া লইয়া —মার খাওয়ার লজ্জাকে লঘু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ছড়া ধরিয়াছিল—

বাম্ভন প্রধান ওহে দ্রোণাচায্য
গুরু হয়ে তোমার এ কি অন্যায় কায্য
আমি একলব্য নহি সভ্য ভব্য
না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য
কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য।
দশের সাক্ষাতে—পা নিলাম মাথাতে—

বলিয়াই ছিষ্টিধরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—এখন রণং দেহি হারজিৎ হোক ধায্য। এবং একেবারে শেষ পালাতে হারিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—

পভুগণ! শুনুন নিবেদন!
আমি হেরেছি হেরেছি সত্য এ বচন।
হেরেই কিন্তু হয় সার্থক জীবন।

ছিষ্টিধর বলিয়া উঠিয়াছিল—নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহার কারণ,—

মুণ্ডু কাটা যায় ধুলাতে গড়ায়
জিব বাহির হয় উলটায় নয়ন।

এবং নিজেই জিব বাহির করিয়া চোখ উলটাইয়া ভঙ্গি করিয়া অবস্থাটা প্রকট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। লোকে হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই এই হাসির রোলের উপরেও এক তান ছাড়িয়াছিল—

—আ—আহা—।

তাহার সুস্বরের সেই সুর-বিস্তার মুহূর্তে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের কৌতুক উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। বর্ষার জলো হাওয়ার মাতামাতির উপর ছড়াইয়া পড়া গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মত বলিলে অন্যায় বলা হইবে না, কারণ নিতাইয়ের গলাখানি তেমনই বটে। এবং গান ধরিয়া দিয়াছিল। খাঁটি গান। আপনার মনে অনেক সময় সে অনেক গান বাঁধে—গায়। তাহারই একখানি গান।

আহা—ভালবেসে—এ বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে।
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা।
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
দুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে!
আমায় ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে।

উহাতেই আসরময় বাহবা পড়িয়া গিয়াছিল।

ছিষ্টিধর বলিয়াছিল—তোর এমন গলা নিতাই—যাত্রার দলে-টলে যাস না কেন? কবিগান করে কি করবি?

নিতাই আবার তাহার পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—সে তো পরের বাঁধা গান গাইতে হবে ওস্তাদ।

সবিস্ময়ে ছিষ্টিধর প্রশ্ন করিয়াছিল—এ তোর গান?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ওস্তাদ।

ছিষ্টিধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল—তাহার পর বলিয়াছিল—হবে, তোর হবে। কিন্তু—

—কিন্তু কি ওস্তাদ?

—কবিয়ালিও ঠিক তোর পথ নয়। বুঝলি! কিন্তু তু ছাড়িস না। ভগবান তোকে মূলধন দিয়াছেন। খোয়াস না। বুঝলি!

ইহার পর নিতাইয়ের সে রাত্রে কি উত্তেজনা! সারারাত্রি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কত স্বপ্ন।

পরের দিন মেলায় বাহির হইয়া নিজেই চাদর জুতা কিনিয়া সাজিয়া-গুজিয়া, আয়নায় বার-বার নিজেকে দেখিয়া মনে মনে অনেক গল্প ফাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাবুরা শিরোপা দিয়েছেন। সুখ্যাতির অজস্র সম্ভার সে তো দেখাইবারই নয়—তবে শিরোপাই তাহার প্রমাণ! দেখ, তোমরা দেখ!

শিরোপার গল্প শেষ করিয়া চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের মনে হইল ঠাকুরঝির কথা। সে কি এখনও ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে? নিতাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতেই উঠিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের লাইনের উপর দাঁড়াইল। সমান্তরাল শাণিত দীপ্তির লাইন দুইটি দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

কই! সেখানে তো স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ চলন্ত কাশফুলের মত তাহাকে দেখা যায় না!

তবে? সে কি এখনও ঘরে বসিয়া আছে?

দোকানে বসিয়া রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

হাঁ, আসছি, আসছি। বাড়ী থেকে আসছি একবার।

নিতাই দ্রুতপদে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকল। হাঁ, এখনও সে বসিয়া আছে। নিতাইকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হল। নিতাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল—রাগ করেছ?

মেয়েটি মুহূর্তে কাঁদিয়া ফেলিল।

—কি করব বল? ওরা কি ধ'রে ছাড়তে চায়—

—না। আমি ব'সে রইলুম, আর তুমি গেলা ওদের সঙ্গে গল্প করতে!

—তোমার হাতে ধরছি—

ঠাকুরঝি এবার হাসিয়া ফেলিল।

—বস, একটুকুন চা খাও। তোমার লেগে নতুন কাপ এনেছি—এই দেখ। সে পকেট হইতে একটি নূতন স্টীলের মগ বাহির করিল।—ভুলে গিয়েছিলাম এতক্ষণে। নিতাই হাসিল।

—না। বেলা—। বলিয়াই বেলার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।—ওগো মাগো! সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পথটাই সে ভাবিতেছিল এই বিলম্বের জন্য কি বলিবে! চলিতে চলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল হারের কথা। সে খুঁট খুলিয়া হারখানি বাহির করিল। গলায় পরিল। সঙ্গে সঙ্গে সব আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গেল।

পথে একটি ছোট নদী। স্বচ্ছ অগভীর জলস্রোত তাহার কম্পিত প্রতিবিম্বের গলায় সোনার হার ঝিকমিক করিতেছে, মেয়েটি সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, ধীরে ধীরে চঞ্চল জল স্থির হইল। এইবার একবার সে হার-পরা আপনাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল তারপর হারখানি খুলিয়া খুঁটে বাঁধিয়া নদী পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

কি বলিবে, সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই, তবে তিরস্কার সহ্য করিতে সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

নিতাই এখনও দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরের দিক্‌চক্রবাল

ধূলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস উতলা হইয়াছে, সেই উতলা বাতাস ধূলা উড়াইয়া লইয়া বহিয়া যায়, যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত। নিতাইয়ের মন এখনও চঞ্চল। সে এখনও সেই ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে মনে একটা বিচিত্র কথার মালা গাঁথিয়া উঠিল। নিজেরই একসময় মনে প্রশ্ন জাগিল—কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ওই মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল—কে আবার 'মনের মানুষ।' মনের মানুষের জন্যই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সাধ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে। পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, হঠাৎ একসময়ে তাহার আসার নিশানা ঝিকমিক করিয়া উঠে। —সেই কথাগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া সুরতরঙ্গের দোলায় আপন মনেই গুনগুন ধ্বনি তুলিয়া দুলিতে লাগিল—

"ও আমার মনের মানুষ গো।
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর।
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা,
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।"

তাহাই সে করিবে। পথের ধারে ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকিবে। ঘর হইতে ঠাকুরঝি বাহির হইলেই তাহার মাথার ঘটিতে—রোদের ছটা লাগিয়া ঝিলিক উঠিবে, সে ঘটিতে ওঠা ছটার ঝিলিক আসিয়া তাহার চোখে লাগিবে। গান বাঁধিয়া সে সুরে ভাঁজিতে লাগিল—

ও আমার মনের মানুষ গো!

আট

পথের ধারে ঘরের বদলে কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিবাস্বপ্ন শুরু করিল। গান গাহিয়া সে টাকা পাইয়াছে। কবিয়াল সৃষ্টিধর বলিয়াছে তাহার হইবে। সুতরাং তাহার আর ভাবনা কি?

ট্রেনভাড়া সমেত নিতাই পাইয়াছিল ছয়টি টাকা। কিন্তু ট্রেনভাড়া তাহার লাগে নাই। এই ব্রাঞ্চ লাইনটিতে নিতাই অনেকদিন কুলিগিরি করিয়াছে—গার্ড, ড্রাইভার, চেকার সকলেই তাহাকে চেনে, রাজার জন্য তাহাকে সকলেই ভাল করিয়াই জানে, সেই জন্য ট্রেনভাড়াটা তাহার লাগে নাই, ছয়টা টাকাই বাঁচিয়া ছিল। জুতা চৌদ্দ আনা, চাদর বারো আনা, দেশলাই বিড়ি আনা দুইয়েক—এই এক টাকা বারো আনা বাদে চার টাকা চার আনা সম্বল লইয়া নিতাই ফিরিয়াছে। প্রত্যাশা আছে, আবার শীঘ্র দুই-একটা বায়না আসিবে। নিতাইয়ের ধারণা যাহারা তাহার গান শুনিয়াছে তাহাদের মুখে মুখে তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—

—নতুন একটি ছোকরা, মহাদেবের দলে দোয়ারকি করেছিল, দেখেছ?

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভাল ছোকরা। বেড়ে মিষ্টি গলা।

—উঁহু। শুধু গলাই মিষ্টি নয়, কবিয়ালও ভাল। এবার মহাদেবের মান রেখেছে ও-ই। মহাদেব তো বেহুঁশ, ও-ই গান ধরলে—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে'। তাতেই আসর একেবারে গরম হয়ে উঠল। দাও জবাব—কালো যদি মন্দ তবে কালো চুলের এত গরব কেন? এত ভালবাস কেন? পাকলেই বা মন খারাপ কেন?

—বল কি! ওই ছোকরার বাঁধা গান ওটা?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকেই আন।

নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মহাদেব আট টাকা লইয়া থাকে, ছিষ্টিধর দশ টাকা; নিতাই পাঁচ টাকা হাঁকিবে, চার-টাকা-রাত্রিতে রাজী হইবে। এখন একজন ঢুলি নাই। রাজনের ছেলে যুবরাজকে দিয়া কাঁসী বাজানোর কাজ দিব্যি চলিবে। এবার সে আরও ভালো গান বাঁধিয়াছে। সুরও হইয়াছে তেমনি। 'ও আমার মনের মানুষ গো—তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর; ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা, আমায় হেথা টানে নিরন্তর।' ইহাতেই মাত হইয়া যাইবে। একবার সুযোগ পাইলে হয়। মুশকিল এইখানেই। কবির পালায় এমন গান গাহিবার সুযোগ সহজে মেলে না। তবুও আশা সে রাখে। এই কারণেই ঢং ঢং করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িলেই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে। ট্রেনের প্রতি যাত্রীকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে। মেলাখেলা লইয়া যাহারা থাকে, তাহাদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে, নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে। কেবল যায় না বেলা বারোটার সময়, কারণ ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরঝি।

মাসখানেক পর। গভীর রাত্রি। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল। সে ভাবিতেছিল।

সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিয়াছে একটি সিকিতে। তাহার মনটা অকস্মাৎ আবার ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিতেছে। কোনরূপে আর চারিটা দিন চলিবে। তার পর আবার কি 'মোট বহন' করিতে হইবে!

নহিলে? উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে?

এদিকে ঠাকুরঝির কাছে দুধের দাম বাকী পড়িয়া যাইতেছে। দশ দিন আগে অবশ্য সব সে মিটাইয়া দিয়াছে; দশ দিনের দশ পোয়া দুধের দাম দশ পয়সা বাকী। নিতাই স্থির করিল, আজই সে দুধের রোজে জবাব দিবে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। আজই তার শেষ দাঁড়াইয়া থাকা। 'ও আমার মনের মানুষ'—গান আর শেষ হইল না, হইল না, হইবেও না; আজ হইতে সে ভুলিয়া যাইবে, আর গাহিবে না। ওইখানেই অকস্মাৎ এক সময়ে দেখা গেল, মাথায় ঘটি—সাদা ধবধবে কাপড় পরা ঠাকুরঝিকে।

ঠাকুরঝি আগাইয়া কাছে আসিল। তাহাকে দেখিয়া নিতাই হাসিল।

ঠাকুরঝি বলিল—না বাপু, তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। নোকে কি বলবে বল দেখি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—নোকে কি কথা বলবে জানি না। আমি তোমাকে একটা কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছি।

নিতাই এখন ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই ল-কারকে ন-কার করিয়া তুলিয়াছে। লোহাকে বলে নোহা, লুচিকে বলে নুচি, লঙ্কা—নঙ্কা,—লোক—নোক হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে। রাজন, ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত।

নিতাইয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরঝি সপ্রশ্ন ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি কথা? অকারণে মেয়েটির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তে দ্রুত হইয়া উঠিল। কি কথা বলিবে কবিয়াল?

নিতাই বলিল—অনেক দিন থেকেই বলব মনে করি, কিন্তুক—

একটু নীরব থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ভাই, দুধের পেয়োজন আমার হবে না।

ঠাকুরঝি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল। একথা শুনিবে তাহা তো সে ভাবে নাই! তাহার মুখের শ্রী পরিবর্তিত হইতেছিল। বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রশ্রীর মত তাহার সে মুখখানি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া হেমন্ত-শেষের পাতার মত পাণ্ডুর হইয়া আসিল। সে হইতেছিল সম্পূর্ণভাবে তাহার অজ্ঞাতসারে। সে নির্বাক হইয়া শুধু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নিতাইয়ের কথার শেষে তাহার মুখ এবার যে পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাহার আর পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকক্ষণ পরে সে যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। কথাটা নিতাইয়ের কথা। সেই কথাটাই সে যেন কম্পিতকণ্ঠে যাচাই করিয়া লইল—আর দুধ নেবে না?

—না।

—ক্যানে? কি দোষ করলাম আমি? তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না। কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—মিথ্যে কথা একেই মহাপাপ, তার ওপর তোমার কাছে মিথ্যে বললে, পাপের আমার পরিসীমা থাকবে না। আমার সামর্থ্যে কুলুচ্ছে না ঠাকুরঝি!

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—দরিদ্র ছোটলোকের কবি হওয়া বড় বিপদের কথা ঠাকুরঝি।

কাতর অনুনয়ে ব্যগ্রতা করিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—তোমাকে পযসা দিতে হবে না কবিয়াল। অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর বলিল—না। জানতে পারলে তোমার স্বামী পেহার করবে, শাশুড়ী তিরস্কার করবে, ননদে গঞ্জনা দেবে—

ঠাকুরঝির প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না না না! ওগো, একটি গাই আমার নিজের আছে, আমি বাবার ঘর থেকে এনেছি, সে গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দোব।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

—লেবে না? কবিয়াল—? মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল, আবার তাহার চোখ দুইটিতে জল টলমল করিতেছে।

সান্ত্বনা দিবার জন্যই নিতাই মৃদু হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝির মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিতাইয়ের মুখের হাসিকেই সম্মতি ধরিয়া লইয়া মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উচ্ছ্বাসেই সে পুলকিত দ্রুত লঘুপদে নিতাইকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া নিজেই নিতাইয়ের বাসার দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। ঘরকন্না তাহার পরিচিত; দুধের পাত্রটি বাহির করিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া দ্রুততর পদে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

নিতাই পিছন হইতে ডাকিল—ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির যেন শুনিবার অবসর নাই, তাহার যেন কত কাজ। নিজের গতিবেগ আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

তখন চলিয়া গেলেও ফিরিবার পথে সে আসিয়া বাসার বারান্দায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—দাও, চা দাও। আমার নতুন কাপে দাও।

চায়ের কাপটি নামাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—একটি কথা শুধাব ঠাকুরঝি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—বল?

—আমাকে বিনি পয়সায় কেনে দুধ দেবে ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই আবার প্রশ্ন করিল—বল কিসের লেগে?

ঠাকুরঝি বলিল—আমার মন।

নিতাই অবাক হইয়া গেল—তোমার মন?

ঠাকুরঝি বলিল—হ্যাঁ। আমার মন।

তারপর হাসিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—তুমি যে কবিয়াল। কত বড় নোক। বলিয়াই সে চায়ের কাপটি ধুইবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, নিতাই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে দুইটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। ফুল দুইটি আগাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—নাও। কবিয়ালের হাতে ফুল নিতে হয়।

ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—না।

—তবে আমিও দুধ নোব না।

ঠাকুরঝি লঘু ক্ষিপ্রহাতে ফুল দুইটি টানিয়া লইয়া এক রকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল।

নিতাই নূতন গানের কলি ভাঁজিতে বসিল। আজ আবার নূতন কলি মনে হইয়াছে। 'ও আমার মনের মানুষ গো।' গানটির শুধু দু'কলি আছে আর নাই; ও গানটি ভুলিবার সংকল্পই সে করিয়াছিল, কিন্তু বিধাতা দিলেন না ভুলিতে, —ঐ গানটিকে সে পুরা করিতে বসিল। বড় ভাল গান।

'ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা'—গুন গুন করিতে করিতেই সে এককানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিল। ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি শেষ করিয়া এইবার রাজন চা-চিনি লইয়া আসিবে, আবার একবার চা খাইবে।

নূতন কলি আসিয়াছে। বড় ভাল কলি। নিতাই খুব খুশী হইয়া উঠিল।—আহা—"সেই ছটাতে ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার।"

তাই বটে, পথই সে সার করিয়াছে। কিন্তু তার পর? হ্যাঁ—হইয়াছে। পাইয়াছে, সে পাইয়াছে—সেই পথের চারিদিকেই বাঁশী বাজিতেছে—পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দুঃখ নাই কষ্ট নাই।

"চারিদিকে চার বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার?"

কার আবার? সেই ব্রজের বাঁশী। সে বাঁশী চিরকাল বাজিতেছে। প্রেম হইলে তবে শোনা যায়, নহিলে যায় না। সে শুনিয়াছে!

সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল—ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে।

ঠাকুরঝিও তাহাকে ভালবাসে।

গুন গুন করিয়া নিতাই আপন মনে আখর দিল—

"বংশী বাজে তার।
ও রাধা রাধা রাধা বলে—।"

তারপর? তারপর? আহা—! সেই বাঁশী। না। না।—হাঁ—

"ঘর জ্বলিল—মন হারালো ছটার সুরে গো।
সুখের একি আকুল আতান্তর।"

আতান্তরই বটে। এ বড় আতান্তর।

অকস্মাৎ তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। একটা কথা মনে হইতেই গান বন্ধ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি ভিন্ন জাতি, অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। এ যে মহাপাপ। ওঃ! এ বড় আতান্তর।

অনেকক্ষণ নিতাই চুপ করিয়া রহিল। নির্জনে বসিয়া সে বার বার তাহার মনকে শাসন করিতে চেষ্টা করিল। বার বার সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই শাসন মানিতে চায় না। অবাধ্য মন লজ্জা পায় না, দুঃখিত হয় না, সে যেন কত খুশী হইয়াছে, কত তৃপ্তি পাইয়াছে। ঘরের প্রতিটি কোণে যেন ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া আছে—অন্ধকারের মধ্যে ক্ষারে-ধোওয়া ধপধপে কাপড় পরিয়া সে যেন দাঁড়াইয়া আছে নিতাইয়ের মনের খবর জানিবার জন্য। নিতাই অধীর হইয়া উঠিল,

তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের জানালাটা খুলিয়া দিল। উদাস দৃষ্টিতে সে খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল রেলের লাইনের দিকে। রেলের সমান্তরাল লাইন দুইটা যেখানে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে নিতাইয়ের আজ মনে হইল একটি স্থির স্বর্ণবিন্দু জাগিয়া রহিয়াছে, সে অচঞ্চল—সে নড়ে না—আগায় না, চলিয়া যায় না, স্থির। ঠাকুরঝি যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া ওইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কবিয়াল তাহাকে ডাকে কিনা।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। রাঙা ফুলে ভরা গাছ। 'চিরোল চিরোল' পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল! গাছটার এমন অপরূপ বাহার নিতাই আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সামনেই রেল লাইনের ওপাশে বন আউচের গাছ—বন-আউচের মিঠা গন্ধ আসিতেছে। কদমের গাছটায় কচি পাতা দেখা দিয়াছে। বর্ষা নামিলেই কদমের ফুল দেখা দিবে। বাবুদের আমবাগানে দুইটা কোকিল পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে; একটা 'চোখ গেল' পাখী ডাকিতেছে চণ্ডীতলার দিকে। 'মধুকুলকুলি' পাখীগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রঙীন প্রজাপতির যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে কৃষ্ণচূড়া গাছটার চারিপাশে। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে।

ঠাকুরঝি যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছে এই দিকে।

নিতাইয়ের শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করিতেছে। সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ডাকিল—এস। ঠাকুরঝি, এস। তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। তুমি এস। আমার পাপ হয় হোক, নরকে যাইতে হয় হাসিমুখেই যাইব, তবু তোমাকে বলিতে পারিব না।—তুমি এস না। সে কি পারি? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হইবার? এস তুমি, এস।

তাহার মনে হইল নষ্টচাঁদের কথা। সে চাঁদ দেখিলে নাকি কলঙ্ক হয়। নিতাই কিন্তু কখনও সে কথা মানে নাই। মনের মধ্যে তাহার আবার গান গুনগুন করিয়া উঠিল। আপনি যেন কলিটা আসিয়া পড়িল—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ?"

ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। ঠাকুরঝি যদি আর না আসে, তবে নিতাই বাঁচিবে কি করিয়া? এখানে থাকিয়া সে কি করিবে? কোথায় সুখ তবে? সে এইখানে বসিয়া ওই পথের দিকে চাহিয়া চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিবে।

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ, তোমার নাগি—"

ও-হো-হো! গানের কলি হু-হু করিয়া আসিতেছে।

"ওগো চাঁদ তোমার নাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

হায়, হায়, হায়! একি বাহারের গান! ওগো, ঠাকুরঝি! ওগো, কি মহাভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো—তাই তো আজ এমন গান-আপনা-আপনি আসিয়া পড়িল।

নিতাই উঠিল। সে চলিল ওই রেল লাইনের পথ ধরিয়া যে পথে ঠাকুরঝি আসে। কিছুদূর গিয়া পথ নির্জন হইতেই সে ওই গানটা ধরিয়া দিল।

রেল লাইনের বাঁধে ছেদ পড়িয়াছে নদীর উপর। বাঁধের মাথা হইতে পুল আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধ হইতে নিতাই নামিল নদীর ঘাটে; নদীতে অল্প জল, এক হাঁটুর বেশী নয়। হাঁটিয়াই ঠাকুরঝি নিত্য নদী পার হইয়া আসে-যায়। নিতাই গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

নিতাই চলিয়াছিল একেবারে বিভোর হইয়া। বাঁ হাতখানি গালে রাখিয়া ডানহাতে অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা আঙুল দুইটি জুড়িয়া সে যেন ঠাকুরঝিকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল।

হয়তো সে একেবারে ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে গিয়াই হাজির হইত। নদীর ঘাটে পা দিয়াই হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল। তাই তো, সে কোথায় যাইতেছে? এ কি করিতেছে সে? ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীতে সে যদি গিয়ে দাঁড়ায়, এই গান গায়, বলে—ঠাকুরঝি, এ চাঁদ কে জান? এ চাঁদ আমার তুমি? তবে ঠাকুরঝির দশা কি হইবে? ঠাকুরঝির স্বামী কি বলিবে? তাহার শাশুড়ী ননদ কি বলিবে? পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়া যাইবে। তাহারা কি বলিবে? সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরঝি—, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল ঠাকুরঝির ছবি। দিশাহারার মত তাহার ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিবে।

ঠাকুরঝির নিন্দায় ঘর-পাড়া-গ্রাম-দেশ ভরিয়া যাইবে। ঠাকুরঝি পথ হাঁটিবে, মাথা হেঁট করিয়া পথ হাঁটিবে, লোকে আঙুল দেখাইয়া বলিবে—ওই দেখ কালামুখী যাইতেছে।

কুৎসিত অভদ্র লোক ঠাকুরঝিকে কুৎসিত কুকথা বলিবে।

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে—মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।

নিতাই নদীর ঘাটে বসিল।

আপন মনেই বলিল—আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক।

আঃ—আজ কি হইল নিতাইয়ের! আবার কলি আসিয়া গিয়াছে।—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

নিতাই গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আবার ফিরিল।

রাজা বলিল—কাঁহা গিয়া রহা ওস্তাদ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—গান, রাজন, গান। বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান আজ এসে গেল ভাই। তাই গুনগুন করছিলাম আর মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম।

—হাঁ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান?

—হাঁ, রাজন, অতীব উত্তম, যাকে বলে উচ্চাঙ্গের গান।

—বইঠো। তব ঢোলক লে আতা হাম।

রাজা ঢোল আনিয়া বসিয়া গেল।

নিতাই একমনে গাহিতেছিল—চাঁদ তুমি আকাশে থাক—

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া রাজা বলিল—আরে ওস্তাদ, আঁখসে তুমরা পানি কাহে নিকালতা ভাই?

চোখ মুছিয়া নিতাই বলিল—হাঁ রাজন, পান নিকাল গিয়া। কিয়া করেগা! চোখের জল যে কথা শোনে না ভাই।

পরদিন সকাল হইতেই বসিয়া ছিল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। আজ সকাল হইতেই তাহার মনে হইতেছে—মনে তাহার কোন খেদ নাই, কোন তৃপ্তিও নাই। সে যেন বৈরাগীই হইয়া গিয়াছে।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে অনেক ভাবিয়াছে সে। সন্ধ্যায় গিয়াছিল রাজনের বাড়ী। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা; ইদানীং রাজা নিতাইকে নানাপ্রকার সাহায্য করে বলিয়া সে নিতাইয়ের উপর প্রায় চটিয়া থাকে। তবু সে গিয়াছিল। রাজা খুশি হইয়াছিল খুব। আশ্চর্যের কথা—কাল রাজার বউও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতেই বলিয়াছিল—তবু ভাগ্যি যে ওস্তাদের আজ মনে পড়ল।

নিতাই তাহারই কাছে কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছে ঠাকুরঝির স্বামীর সমস্ত বৃত্তান্ত। ঠাকুরঝির স্বামীটি নাকি দিব্য দেখিতে।

—রঙ পেরায় গোরা, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি ললছা-সলছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে!

অবস্থাও নাকি ভাল। দিব্য সচ্ছল সংসার। রাজার স্ত্রী বলিল—যাকে বলে 'ছছল-বছল'। আট-দশটা গাই গরু। দুটো বলদ। ভাগে চাষ-বাস করে। ঠাকুরঝির তোমাদের পাঁচজনার আশীর্বাদে সুখের সংসার।

নিতাই বলিয়াছিল—আহা! আশীর্বাদ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করি মহারাণী।

রাজার স্ত্রী অদ্ভুত। সে এতক্ষণ বেশ ছিল, এবার ওই মহারাণী বলাতেই সে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ওই—ওই কথা আমি সইতে লারি। মহারাণী! মহারাণী তো খুব! মেথরাণী, চাকরাণী তার চেয়ে ভাল। না ঘর না দুয়োর। র‍্যালের ঘরে বাস—আজ এখান, কাল সেখান।

রাজা মুহূর্তে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল—কেঁও হারামজাদী? কেয়া বোলতা তুম?

—কেয়া বোলতা তুম কি? হক কথা বলব তার ভয় কি?

তাহার পরেই কুরুক্ষেত্র। রাজা ধরিয়াছিল তার চুলে। তাহাদের শান্ত করিবার জন্য নিতাই বারকয়েক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছু হয় নাই। রাজার স্ত্রী প্রায় রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত কাঁদিয়া রাজাকে গাল দিয়াছে, নিতাইকে গাল দিয়াছে। তাহার জের টানিয়া আজ সকালেও একদফা হইয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের উদাসীনতা অবশ্য সেজন্য নয়।

কাল সমস্ত রাত্রি সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে। ভাল তুমি বাস, কিন্তু সে কথা মনেই রাখ, কাহাকেও বলিও না—ঠাকুরঝিকেও না। তাহার সুখের ঘরসংসার—সে ঘর তাহার নিত্যনূতন সুখে ভরিয়া উঠুক। তুমি মনের শরমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহার সে সুখের ঘর ভাসাইয়া দিও না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরঝি আসিল ঘড়ির কাঁটার মত। রেল লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকঝকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। ক্রমে কাছে আসিয়া সে হইল ঠাকুরঝি। একমুখ হাসি ঠাকুরঝি তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কবিয়াল!

নিতাই অশ্রু-উদ্বেল কণ্ঠে বলিল—ঘরে বাটি আছে, দুধটা রেখে যাও।

সে বুঝিতে পারিল না কেন তাহার চোখে অকারণে জল আসিতে চাহিতেছে।

—না। তুমি এস। আমি অত সব লারব বাপু। আর—

—কি আর?

—রোদে এলাম, বসব একটুকুন।

—না ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে বসা ঠিক নয়। দেখ পাঁচজনে দুষ্য ভাববে।

ঠাকুরঝি স্তব্ধভাবে স্থিরদৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বিশ্রাম করবে যদি তো তোমার দিদির বাড়ী রয়েছে। আমি একটা বেটা ছেলে বাড়ীতে থাকি। পাঁচজনের দুষ্য ভাবার তো দোষ নাই। দেখ তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ ঠাকুরঝি। তাহার মুখে নিরুপায় মানুষের সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

দিন এমনি ভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। নিতাই উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকে। গানও আর তেমন গায় না। ঠাকুরঝি আসে, সেও আর নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইয়া, দুধের বাটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়, চলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে নিতাই একদিন বলিল—শোন।

ঠাকুরঝি শুনিতে পাইল, কিন্তু দাঁড়াইল না। একবার মুখ ফিরাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই আবার ডাকিল—যেও না, শোন। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।

—শোন, এদিকে ফেরো।

ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

ঠাকুরঝি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দিন কয়েক আবার সেই আগের মত চলিল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলিল—সে দিন যে কি বলবে বলছিলে—বললে না?

নিতাই বলিল—বলব।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর একদিন বলব ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি একটু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের বুক একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের বুক-ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ঝরিয়া পড়িল। যে কথাটা বলা হইল না সেই কথা গান হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

"বলতে তুমি বলো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন-আগুনে!"

অনেকদিন পরে নিতাইয়ের মনে গান আসিয়াছে; দুঃখের মধ্যেও নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। গুন গুন করিয়া গান ধরিয়া নিতাই চলিল বাবুদের বাগানের দিকে। বাবুদের বাগানে তাহার গানের অনেক সমঝদার আছে। বাগানের প্রতিটি গাছ তাহার সমঝদার শ্রোতা। এই বাগানেই সে প্রথম প্রথম কবিগান অভ্যাস করিত। গাছগুলি হইত মজলিসের মানুষ। তাহাদের সে তাহার গান শুনাইত। আজও বাগানে আসিয়া সে গান ধরিল, ওই গানটাই ধরিল—

"সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা,
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।
আমিই পুড়ি মন-আগুনে।'

গান শেষ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। নাঃ, এমনভাবে আর দিন কাটে না। এই মনের আগুনে সে আর পুড়িতে পারিবে না। শুধু মনের আগুনই নয়, পেটের আগুনের জ্বালা, সেও তো কম নয়। রোজগার গিয়াছে; পুঁজি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। রোজগারের একমাত্র পথ মোটবহন, কিন্তু কবিয়াল হইয়া তো ঐ কাজ করিতে পারিবে না। অন্তত এখানে সে পারিবে না। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাই সে করিবে। কালই গিয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিবে—মা গো, তোমার আভাগা ছেলে নিতাইচরণকে কবিয়াল করিলে, কিন্তু তাহার মনের দুঃখ পেটের দুঃখ বুঝিলে না। কোন উপায় করিলে না। সে চলিল, তাহাকে বিদায় দাও তুমি। তাহার মনে পড়িয়া গেল অনেক দিনের আগের একটা শোনা গান, বাউলেরা গাহিত, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।"

ওই প্রথম কলিটা লইয়া তাহার পাদপূরণ করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া ছিল। তাহার সে স্তব্ধতা ভাঙিল রাজনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে। সে সচকিত হইয়া উঠিল। রাজা কাহাকে দুর্দান্ত ক্রোধে ধমক দিতেছে—চোপ রহো!

পরক্ষণেই স্ত্রী-কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা-চিনি নিয়ে যাবে। কেনে? কিসের লেগে? লাজ নাই, হায়া নাই, বেহায়া, চোখখেগো মিনসে!

আর কথা শোনা গেল না, শোনা গেল দুপ-দাপ শব্দ, আর স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত চীৎকার। রাজা নীরবে স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, রাজার স্ত্রী উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতেছে। নিতাই ছি-ছি করিয়া সারা হইল। নাঃ, এই চায়ের পর্বটা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ! স্ত্রীকে প্রহার করিয়া সেই মুহূর্তটিতেই রাজা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—বানাও চা!—পন্‌রা যোলা আদমীকে মাফিক। প্রায় পোয়াখানেক চা, আধসেরটাক চিনি সে নামাইয়া দিল। রাজার স্ত্রীব দোষ কি? এত অপব্যয় কেহ চোখে দেখিতে পারে? আর এত চা-চিনি হইবেই বা কি?

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন!

রাজন নিতাইয়ের কথায় কানই দিল না, সে বাসার বাহিরে চলিয়া গেল, দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—হো ভেইয়া লোক হো! হাঁ হাঁ, হিঁয়া আও। চলে আও সবলোক, চলে আও।

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল।

মেয়ে-পুরুষের একটি দল আসিতেছে। ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা—আসবাবপত্র অনেক। মেয়েদের বেশভুষা বিচিত্র, পুরুষগুলিরও বিশিষ্ট একটা ছাপমারা চেহারা। এ ছাপ নিতাই চেনে।

—চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি! কথাটা যে বলিল, সে ছিল দলের সকলের পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সকলের আগে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড়-বড় চোখ দুইটির সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণ জয়ী দুইটা কালো ভ্রমর।

রাজনের মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটা আবার বলিল—কই হে, কোথায় তোমার ওস্তাদ না ফোস্তাদ?

রাজন নিতাইকে দেখাইয়া বলিল—ওহি হামার ওস্তাদ!

নিতাই অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে ইহাদের সকল পরিচয় দেখিয়াই চিনিয়াছে,—ঝুমুরের দল। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে? সে কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। রাজা নিজেই বলিল—ট্রেনসে জোর করকে উতার লিয়া। হিঁয়া গাওনা হোগা আজ। তুমকো ভি গাওনা করনে হোগা ওস্তাদ।

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল।—ও হরি, এই তুমরা ওস্তাদ নাকি? অ-মা-গ-অ! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ তনু থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।

নয়

জলের বুক ক্ষুর দিয়া চিরিয়া দিলেও দাগ পড়ে না, চকিতের মতন শুধু একটা রেখা দেখা দিয়া মিলাইয়া যায় আর ক্ষুরটাও জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি একটি মৃদু হাসি নিতাইয়ের মুখে দেখা দিয়া ওই তরঙ্গময়ী কৃশতনু মেয়েটার কলরোল-তোলা হাস্যস্রোতের মধ্যে হারাইয়া গেল। নিতাইয়ের হাসি যেন ক্ষুর; কিন্তু ওই মেয়েটাও যেন আবেগময়ী স্রোতস্বিনী, তাহাকে কাটিয়া বসা চলে না। মেয়েটা বরং নিতাইয়ের হাসিটুকুর জন্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই নিতাই সবিনয়ে সমস্ত দলটিকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন।

নিতাই বাড়ীর মধ্যে আগাইয়া গেল—সকলে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাইয়ের বাসা—রেলওয়ে কুলি-ব্যারাক। লাইন কনস্ট্রাকশনের সময় এখানেই ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বড় অফিস, তখনকার প্রয়োজনে এই সমস্ত ব্যারাক তৈয়ারী হইয়াছিল, এখন সব পড়িয়াই আছে। দিব্য তকতকে সিমেন্ট বাঁধানো খানিকটা বারান্দা, এক টুকরা বাঁধানো আঙিনা; সেই দাওয়া ও আঙিনার উপরেই দলটি বসিয়া পড়িল।

দলটি একটি ঝুমুরের দল। বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে। কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাড়িয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়—অশ্লীল গান। ভনভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়।

আসরে কিছু কিছু পেলাও পড়ে। রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের দেহের ব্যবসাও চলে। তবে ইহাই সর্বস্ব নয়। পুরাণের পালাগানও জানে, তেমন আসর পাইলে সে গানও গায়। যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরণের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মত কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়।

দলটি ঘরে ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ! গাছতলায় পথের ধারে আস্তানা পাতিয়া যাহারা অনায়াসে দিনরাত্রি কাটাইয়া দেয়, এমন বাঁধানো আঙিনা ও দাওয়া পাইয়া তাহাদের কৃতার্থ হইবার কথা—কৃতার্থই হইয়া গেল তাহারা। খুশী হইয়া তালপাতার চ্যাটাই বিছাইতে শুরু করিল। দীর্ঘ কৃশতনু মুখরা মেয়েটি কেবল সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়ার উপর উঠিয়া সটান উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, ঠাণ্ডা মেঝের উপর মুখখানি রাখিয়া শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিল—আঃ! তাহার সে কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি ও গভীর হতাশার কারুণ্য। সে যেন আর পারে না।

—বসন! মেয়ের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া আছে, দলের কর্ত্রী, সে-ই বলিয়া উঠিল—বসন, জ্বর গায়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুলি কেনে? ওঠ, ওঠ।

মেয়েটির নাম বসন্ত। বসন্ত সে কথার উত্তর দিল না, কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল—কই হে, ওস্তাদ না ফোস্তাদ! চা দাও ভাই।

নিতাই চায়ের জল তখন চড়াইয়া দিয়াছে, সে বলিল—এই আর পাঁচ মিনিট। কিন্তু তোমার জ্বর হয়েছে—তুমি ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলে কেন? একটা কিছু পেতে দোব?—মাদুর?

বসন্ত চোখ মেলিল না, চোখ বুঝিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওলো নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। নাগর শুধু নাগর নয়, পথের নাগর, দেখবামাত্র প্রেম! দরদ একেবারে গলায় গলায়।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর দলও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝির সেই নতুন মগটিতে চা ঢালিয়া নিতাই সেই মগটি বসন্তের মুখের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বুঝে খেয়ো, চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি।

কবিয়াল নিতাই রসের কারবারী, রসিকতার এমন ধারালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র পাইয়া সে মুহূর্তে মাতিয়া উঠিল।

চায়ের গন্ধ পাইয়া ও স্টিলের মগের শব্দ শুনিয়া তৃষ্ণার্তের মত আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ মচকাইয়া হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুইটা মেলিয়া চাহিয়া বলিল—বল কি নাগর! পীরিতে কুলোল না, শেষে যোগবশ!

অপর সকলকে চা পরিবেশন করিতে করিতে নিতাই গান ধরিয়া দিল—

"প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে!
আর কি উপায় বৃন্দে—এইবার দে এনে দে—
বশীকরণ লতা—বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে।"

গানটা কিন্তু নিতাইয়ের বাঁধা নয়, নিতাইয়ের আদর্শ কবিয়াল তারণ মোড়লের বাঁধা গান; নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে। নিতাইয়ের গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার চোখ দুইটা একেবারে শাণিত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল।

পুরুষদলের একজন বলিল—ভাল। ওস্তাদ, ভাল!

অন্যজন সায় দিল—হ্যাঁ, ভাল বলেছ ওস্তাদ।

—হ্যাঁ। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া অন্য একটি মেয়ে বলিল—হ্যাঁ, ময়না বলে ভাল।

নিতাইয়ের গানের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ, একা বসন্ত নয়—মেয়েদের সকলেরই গায়ে লাগিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন আবার বলিয়া উঠিল—"উনোন-ঝাড়া কালো কয়লা—আগুন তাতে দিপি-দিপি! ছেঁকা লাগে!"

নিতাই হাসিয়া বলিল—না ভাই, ছেঁকা কি দিতে পারি! আর তোমার সঙ্গে আমার কি পীরিত হয়, না হতে পারে? তুমি ফোটা ফুল, আমি ধুলো, ফুলের পথের নাগর তো ধুলো।—বলিয়াই গুনগুন করিয়া ধবিয়া দিল—

ফুলেতে ধুলাতে প্রেম হয়নাকো ফুল ফোটার কালে।
ফুল ফোটে সই আকাশমুখে চাঁদের প্রেমে হেলেদুলে।
ধুলা থাকে মাটির বুকে, চরণতলে অধোমুখে
ফুল ঝরিলে করে বুকে
সেই লেখা তার পোড়া কপালে।

বসন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটা কি?

প্রৌঢ় বিচারকের মতো স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—তা তোদের হার হল বাছা। জবাব তোরা দিতে নারলি। তা বাবা কি এ সব গান মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে গাইছ?

নিতাই সবিনয়ে বললে—খানিক আদেক চেষ্টা করি। দু'চারটে আসরে কবিগানও করেছি। গানটা আমার বাঁধাই বটে।

প্রৌঢ় বলিল—পদখানি তো বড় ভাল বাবা।

নিতাই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তাঁর দয়া।

বসন্ত কোন কথা বলিল না, চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া মগটা নামাইয়া দিয়া আবার সে লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাতে হাঁড়ি-মালসা, বগলে শালপাতার

বোঝা। মিলিটারী রাজা—হুকুমের সুরেই ব্যবস্থা জানাইয়া দিল—ভেইয়া লোক, ও-হি বটতলামে জায়গা সাফ হো গিয়া, আব খানা-উনা পাকা লিজিয়ে।

এক সময় রাজাকে একা পাইয়া নিতাই চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—রাজন, এই সব খরচপত্র করছ—

রাজার সময় অত্যন্ত কম এবং সংসারে গোপনও কিছু নাই। সে বাধা দিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই বলিল—সব ঠিক হ্যায় ভাই, সব ঠিক হ্যায়। বেনিয়া মামা আটা আনা দিয়া, কয়লাওয়ালা চার আনা, মুদী আট আনা, মাস্টারবাবু আট আনা, গুদামবাবু আট আনা, গাডবাবু আট আনা, মালগাড়ীকে 'ডেরাইবর' আট আনা, হামারা এক রুপেয়া; বাস জোড় লেও। তুমারা এক রুপেয়া,—উ লোককে আড়াই রুপেয়া, বারো আনাকে চাউল ডাউল। বাস, হো গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলিয়া গেল, ওদিকে শান্টিং লাইন হইতে একখানা গাড়ী কুলিরা ঠেলিয়া প্রায় পয়েন্টের কাছে লইয়া গিয়াছে।

নিতাই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত সংসার পাতিয়া ফেলিল, উনান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিল, একটি মেয়ে জল আনিল, একজন তরকারি কুটিতে বসিল, প্রৌঢ়া উনানের সম্মুখে বসিয়া মাটির হাঁড়ি ধুইয়া ফেলিয়া চড়াইয়া দিল কিছুক্ষণের মধ্যে। পুরুষেরা তেল মাখিতে বসিল; মেয়েদের স্নান তখন হইয়া গিয়াছে, সকলেরই ভিজা খোলা চুল পিঠে পড়িয়া আছে, প্রান্তে একটি করিয়া গেরো বাঁধা। সেখানে ধারে কাছে নাই কেবল সেই কৃশতনু গৌরাঙ্গী ক্ষুরধার মেয়েটি। নিতাইকে ডাকিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স বাবা, ব'স।

পুরুষ কয়জন প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তাই তো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন গো? বসুন!

উনানে একটা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া প্রৌঢ়া বলিল—খাসা গলা আমার বাবার। তারপর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাসি হাসিয়া বলিল—এই 'নাইনে'ই থাকবে বাবা? না, কাজকম্মও করবে—এও করবে?

—এই 'নাইনেই থাকবারই তো ইচ্ছে; তা দেখি।

—বিয়ে-টিয়ে করেছ? ঘরে কে আছে?

—বিয়ে! নিতাই হাসিল। হাসিয়া বলিল—ঘরে মা আছে, বুন আছে; মা বুনের কাছেই থাকে। আমি একা।

—তবে আমাদের দলে এস না কেনে?

নিতাই কিন্তু এ কথার উত্তর চট্ করিয়া দিতে পারিল না। সম্মতি দিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল রাজাকে—মনে পড়িয়া গেল ভুঁইচাঁপার শ্যামল সরস ডাঁটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি—ঠাকুরঝিকে। সে চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ়া আবার প্রশ্ন করিল—কি বলছ বাবা?

—বাবা ভাবছে তোমার মনের মানুষের কথা। সঙ্গে সঙ্গে খিল-খিল হাসি। নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া সদ্য-স্নাতা বসন্ত। মেয়েটা স্নান করিয়া চুল গা মোছে নাই, চুল পর্যন্ত ঝাড়ে নাই। ভিজা চুল হইতে তখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিতাই অবাক হইয়া গেল।

—বউ কেমন হে? বশীকরণের লতায় ছাঁদে ছাঁদে বেঁধেছ বুঝি?

নিতাই এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল—জ্বরগায়ে তুমি চান করে এলে?

—ধুয়ে দিয়ে এলাম। চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর কিনা! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে তাহার সুপরিস্ফুট সর্বাঙ্গও হাসিয়া উঠিল। নিতাইয়ের লজ্জা হইল।

প্রৌঢ়া বলিল—তাই তো বটে। চান করে এলি? ছাড়া, ছাড়, ভিজে কাপড় ছাড় বসন। তুই কোন দিন মরবি ওই ক'রে।

বিচিত্র হাসিয়া বসন বলিল—ফেলে দিও টেনে। তা ব'লে চান না করে থাকতে পারি না। চান না করলে —মা-গো। গায়ে যা বাস ছাড়ে।

একটি তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল—চুল ফেরে না লতায় পাতায়, তা বল।

বসন হাত দিয়া মাথার চুলে চাপ দিতে দিতে বলিল—আমার তো আর কেশ দিয়ে নাগরের পা মুছতে হয় না, তা চুল না ফিরিয়ে করব কি?

বহু পরিচর্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্নও ইহারা থাকিতে পারে না; সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না। কেহ পতঙ্গের মত তার শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেয়েটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয়, মর্মচ্ছেদও হইয়া যায়। তাই বসন্ত সঙ্গিনীকে এমন কথা বলিল। ফলে ঝগড়া একটা বাধিয়া উঠিবার কথা; আহত মেয়েটি ফণা তুলিয়াও উঠিয়াছিল; কিন্তু দলের নেত্রী প্রৌঢ়া মাঝখানে পড়িয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল। হাসিয়া বলিল—ও বসন শোন শোন, দেখ আমাদের ওস্তাদকে পছন্দ হয় কিনা!

তাহার কথা শেষ হইল না, বসন্তের উচ্চ উচ্ছল হাসিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। নিতাই ঘামিয়া উঠিল। প্রৌঢ়া ধমক দিয়া বলিল—মরণ! এত হাসছিস কেনে?

হাসি থামাইয়া বলিল—মরণ তোমার নয়, আমার।

—কেন?

—মা গো! ও যে বড্ড কালো; মা—গ।

সকলে নির্বাক হইয়া রহিল।

বসন্ত আবার বলিল—কালো অঙ্গের পরশ লেগে আমি সুদ্ধ কালো হয়ে যাব মাসী। মুখ বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—যাই, শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি' হলে কে করবে বাবা! সে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

একটি মেয়ে বলিল—মরণ তোমার; গলায় দড়ি!

প্রৌঢ়া ধমক দিল—চুপ কর বাছা। কোঁদল বাঁধাস নে।

মেয়েটি একেবারে চুপ করিল না, আপন মনেই মৃদুস্বরে গজগজ করিতে আরম্ভ করিল। নিতাই আপন মনে মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। হাসিতেছিল ওই গৌরগরবিনীর রকমসকম দেখিয়া। মেয়েটা ভাবে তাহার ওই সোনার মত বরণের ছটায় দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে। সবাই উহাকে পাইবার জন্য লালায়িত। হায়! হায়! হায়!

প্রৌঢ়া আবার কথাটা পাড়িল—বলি হাঁ গো, ও ছেলে।

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। ছেলেই বলবো তোমাকে। অন্য লোক বলে—ওস্তাদ। রাগ করবে না তো বাবা?

—না না। রাগ করব কেনে! মাসীর এ কথাটি তাহার বড় ভাল লাগিল।

—কি বলছ? এই 'নাইনে'ই যখন থাকবে, তখন এস না আমাদের সঙ্গে।

—না। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নিতাই উঠিল,—তা হ'লে আমি যাই এখন, আমাকেও রান্নাবান্না করতে হবে।

—ওহে কয়লা-মাণিক! বসন্তর কণ্ঠস্বর। নিতাই ফিরিয়া চাহিল। ইতিমধ্যেই বসন্ত বিন্যাস করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে—বিন্যাস করিবার মত চুলও বটে মেয়েটির। ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালো

চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে ধপধপে লাল নক্সিপাড় মিলের শাড়ী।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম দিয়েছি ভাই কয়লা মাণিক। কালো মাণিক কি বলতে পারি? সে হাতজোড় করিয়া কালো-মাণিককে প্রণাম করিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—ভাল ভাল! তা বেশ তো। ময়লা-মাণিক বলতেও পার।

—সে ওই কয়লাতেই আছে। বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নিতাই বলিল—তা আছে, কিন্তু ময়ে-ময়ে—মিল নাই। ওতে কথাটা মিষ্টি হয়। গানের কান আছে তাই বললাম। কালা হলে বলতাম না। বল কি বলছ?

—আমার একটি কাজ করে দেবে?

—কি, বল?

—চার পয়সার মাছ এনে দেবে? আমার আবার মাছ নইলে রোচে না। দেবে এনে?

—দাও। নিতাই হাত পাতিল। কিন্তু বসন্ত পয়সা দিতে হাত বাড়াইতেই সে আপনার হাতখানি অল্প সরাইয়া লইল, বলিল—আলগোছে ভাই, আলগোছে।

—কেনে? চান করতে হবে নাকি? মেয়েটার ঠোঁটের কোন্ দুইটা যেন গুণ দেওয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কয়লার ময়লা লাগবে ভাই, তোমার রাঙা হাতে।

বসন্তের হাতের পয়সা আপনি খসিয়া নিতাইয়ের হাতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে ধনুকের গুণ যেন ছিঁড়িয়া গেল। তাহার অপর প্রান্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সে কম্পন তাহার বাঁকা হাসিতে রূপান্তর গ্রহণ করিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। মনে হইল মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী। প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেজী হয়; বিড়াল হইয়া বেজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেজী হইতে সে হয় বাঘিনী। কান্না তাহার বাঁকা হাসিতে পালটাইয়া গেল মুহূর্তে। হাসিয়া সে বলিল—সেই জন্যে আলগোছে দিলাম।

জেলে-পাড়ার পথে নিতাইয়ের মনে গান জাগিয়া উঠিল। নূতন গান মনে মনে ভাবিয়া সে ওই মেয়েটার একটা তুলনা পাইয়াছে। শিমূলফুল। গুনগুন করিয়া সে কলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—আহা!

'আহা—রাঙা বরণ শিমূলফুলের বাহার শুধু সার।'

দশ

সন্ধ্যায় রাজা বেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতিল। রাজা পরিশ্রম করিল সেনাপতির মত; বিপ্রপদ বসিয়া ছিল রাজা সাজিয়া। বেচারা বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া নড়চড়া করিতে পারে না, চীৎকারেই সে শোরগোল তুলিয়া ফেলিল। অবশ্য কাজও অনেকটা হইল। মুদী, কয়লাওয়ালা বিপ্রপদর ব্যঙ্গশ্লেষের ভয়ে শতরঞ্চি বাহির করিয়া দিল, বণিক মাতুল তার পেট্রোম্যাক্স আলোটা আনিয়া নিজেই তেল পুরিয়া জ্বালিয়া দিল। লোকজনও মন্দ কেন—ভালই হইল। সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তির কেহ না। আসিলেও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই হংসশ্রোতার মত যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া জাঁকিয়া বলিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মাঝখানে আসর পড়িল ঝুমুর নাচের। নিতাই প্রত্যাশা করিয়াছিল উহাদের দলের কবিয়ালের সঙ্গে একহাত লড়িবে অর্থাৎ গাওনার পাল্লা দিবে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে এক-একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে। স্বতন্ত্রভাবে গাওনা করিবার যোগ্যতা না থাকা হেতু ওই ঝুমুর দলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা। পথে কোন গ্রামে বা মেলায় এমনি ধারার ঝুমুর দলের দেখা পাইলে পাল্লা জুড়িয়া দেয়। মেলায় ঝুমুরের সহিত

কবির আসর যোগ হইলে আসরও জোরালো হয়। এ দলেরও এমন একজন কবিয়াল আছে। কিন্তু সে আজ দলের সঙ্গে আসে নাই। কাজের জন্য পিছনে পড়িয়া আছে। দলটির গন্তব্যস্থান আলেপুরের মেলা। কথা আছে, দুই দিন পরে সে সেই সেইখানে গিয়া জুটিবে। নহিলে নিতাই একটা আসর পাইত। কবিয়ালের অভাবে আসর বসিল শুধু নাচগানের। ঢোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়াম, একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষেরা আসর পাতিয়া বসিল। তাহাদের তেলচপচপে চুলে বাহারে টেরী, গায়ে রংচঙে ছিটের ময়লা জামা। মেয়েদের গায়ে গিল্টির গয়না—কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশনের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকৃষ্ট ভঙ্গি। ঠোঁট-গালে লালরঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নো'র প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লালরঙের ছোপ। দর্শকদের মনে কিন্তু ইহাতেই চমক লাগিতেছে। মেয়েগুলির মধ্যে বসন্তই ঝলমল করিতেছে, মেয়েটার সত্যই রূপ আছে। তার সঙ্গে রুচিও আছে। মেয়েটা সাজিয়াছে বড় ভাল। কবিয়াল নিতাই ফরসা কাপড়জামার উপর চাদরখানি গলায় দিয়া ঝুমুর দলেরই গা ঘেঁষিয়া বসিল। মুখে তাহার গৌরবের হাসি। এ আসরে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি কারণ সে কবিয়াল।

গাওনা আরম্ভ হইল। খেমটার অনুকরণে নাচ ও গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, মেয়েদের পরে দোয়ারেরা সেই গানেরই পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে। একালে খেমটা নাচের প্রসার দেখিয়া তাহাদের ঝুমুর নাচ ছাড়িয়া এই ধরিয়াছে। কিছুটা অবশ্য ঝুমুরের রঙ রাখিয়াছে। সেটুকু সবই অশ্লীলতা।

প্রৌঢ়া মধ্যস্থলে পানের বাটা লইয়া বসিয়াছিল, সে নিতাইকে বলিল—বাবা, তুমিও ধর।

নিতাই হাসিল। কিন্তু দোয়ারদের সঙ্গে সে গান ধরিল না। প্রথম গানখানা শেষ হইতেই মেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া পড়িল। কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি একটি নিবেদন পাই।

চারিদিকে নানা কলরব উঠিয়া পড়িল।

—সঙ নাকি?

—ব'স ব'স।

—এই নিতাই!

একজন রসিক বলিয়া উঠিল।—গোঁফ কামিয়ে এস। গোঁফ কামিয়ে এস!

অকস্মাৎ সকল কলরবকে ছাপাইয়া রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ সব, চোপ।

বিপ্রপদও একটি ধমক ঝাড়িল—অ্যা—ও।

সকলে চুপ করিয়া গেল। নিতাই সুযোগ পাইয়া বলিল—আমি একপদ গাইব আপনাদের কাছে।

—লাগাও ওস্তাদ, লাগাও। রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই গান ধরিয়া দিল। বাঁ হাতটি গালে দিয়া, ডাঁন হাতটি মুখের সম্মুখে রাখিয়া অল্প ঝুঁকিয়া আরম্ভ করিল—

"আহা রাঙাবরণ শিমূলফুলের বাহার শুধু সার—
ওগো সখি দেখে যা বাহার।"

কলির প্রথম দফা গাহিয়া ফেরতার সময় সে হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া বলিল—এই—এই, এই রাজাও তবলাদার—বলিয়াই সে আবার ধরিল—

"শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার।
মন-ভোমরা যাস নে পাশে তার।"

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরখানি মধুর এবং ভরাট, এক মুহূর্তে মানুষের মন দখল করিয়া লয়। লইলও

তাই। লোকেব আপত্তি গ—য়ে গোমাতার মত গানে, কিন্তু এখানে তাহার আভাস না পাইয়া লোকে জমিয়া বসিল।

রাজা বাহবা দিয়া উঠিল—বাহা রে ওস্তাদ, বাহা রে!

বিপ্রপদও দিল—বহুত আচ্ছা।

বণিক মাতুল বলিল—ভাল, ভাল।

লোকেও বাহবা দিল।

নিতাই উৎসাহে মৃদু মৃদু নাচিতে আরম্ভ করিল। একবার চারদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, মুখে তাহার মৃদু হাসি। রাজার পিছনেই রাজার স্ত্রী, তাহাব পাশে ঠাকুরঝি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুহূর্তেব জন্য নিতাই গান ভুলিয়া গেল, ঠাকুরঝিকে অবহেলা দেখাইলেও ঠাকুরঝি তাহাকে অবহেলা করে নাই। তাহার গৌরবের গোপন অংশ লইতে সে আসিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে গানের খেই হাবাইয়া ফেলিল।

ঝুমুর দলেব ঢুলীটা সুযোগ পাইয়া ঢোলে কাঠি মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ এই কাটল। অর্থাৎ নিতাইয়ের তাল কাটিযা গেল। মুহূর্তে নিতাই সজাগ হইয়া গান ছাড়িয়া দিয়া হাতে তালি দিয়া বলিল—গান নয়, এবার ছড়া।

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলিয়া তালি মারিতে মারিতে পুনরায় ধরতার মুখে ধরিয়া দিল—

"ফল ধবে না ধরে তুলো চালের বদলে চুলো—"

সঙ্গে সঙ্গে সে নাচিতে শুরু করিল। পরের কলি ভাবিবার এই অবকাশ। নাচিতে নাচিতে সে ফিরিয়া চাহিল—আসবের দিকে। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—কেবল বসন্তর চোখে খেলিতেছে ছুরির ধার। নিতাই তাহার দিকে চাহিয়াই ছড়া কাটিল—

"ফুলের দরে তা বিকালো, মালা হলো গলার।"

নিতাইয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হইতেই বসন্ত যেন খেপিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়াকে বলিল—আমি চললাম মাসী। শিমূলফুলেব অর্থ সে বুঝিয়াছে।

—কোথায়?

—বাসায়, ঘুমুতে।

—ঘুমুতে!

—হ্যাঁ।

—তুই কি ক্ষেপেছিস নাকি? ব'স।

—না। এ আসরে আমি গান গাই না। যে আসরে বাঁদর নাচে সে আসরে আমি নাচি না।

বেশ উচ্চকণ্ঠেই কথা হইতেছিল। নিতাই মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। দর্শকেরা অধিকাংশই চিৎকার করিয়া উঠিল—এই, এই তুমি থাম।

চটিয়া উঠিল রাজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেয়া?

বসন্ত কোনও উত্তরই দিল না, কেবল একবার ঘাড় বাঁকাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে, একটা চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। চারিদিকে একটা রোল উঠিল, কেউ নিতাইয়ের উপর চটিয়া চীৎকার শুরু করিল, কেহ অর্থের চুক্তিতে আবদ্ধ ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার দুর্বিনীত স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন তুলিল। কিন্তু মেয়েটা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না; সম্মুখের মানুষটিকে বলিল—পথ দাও তো ভাই।

সে পথ ছাড়িয়া দিত কি দিত না কে জানে, কিন্তু সে কিছু করিবার পূর্বেই পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল নিতাই। হাত জোড় করিয়া সে হাসিমুখে বিনয় করিয়া বলিল—আমার দোষ হয়েছে। যেও না তুমি, ব'স। আমার মাথা খাও!

বসন্ত কথার উত্তর দিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসিল। গোলমাল একটু স্তিমিত

হইতেই সে উঠিয়া গান ধরিল। গানখানি বাছাই করা গান। ভদ্রজনের আসরে যেখানে খেউর গাওয়া চলে না সেইখানে গাওয়ার জন্য তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে। গানখানি বসন্তের বড় প্রিয়; নাচের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। বাছিয়া তাই সে এইখানাই ধরিল—

ঝুম ঝুমাঝুম বাজেলো নাগরী;
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো।
তোরা আয় গো!
জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখি গাগরী
রজনী হইল ভোর;—আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুরায় গো!
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো!
ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম ঝুমাঝুম!

ঝুম ঝুমাঝুমের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কি ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও আছে। ছুরির ধারের মত উচ্চ সে-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততর তানে দিয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মুহূর্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব। চারিদিক হইতে 'পেলা' পড়িতে আরম্ভ হইল—পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি, দুইটি আধুলি; দোকানী ঘনশ্যাম দত্ত একটা টাকাই ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটার সেদিকে লক্ষ্য করিবার বোধ হয় অবসর ছিল না, তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে, বুকখানা হাপরের মত হাঁপাইতেছে; গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ়া নিজে উঠিয়া পেলাগুলি কুড়াইয়া লইল।

চারিদিক হইতে রব উঠিল—আব একখানা, আর একখানা!

নিতাই বসন্তের দিকে চাহিল, চোখে চোখে মিলিতেই নমস্কার করিয়া সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

প্রৌঢ়া বসন্তের গায়ে হাত দিয়া বলিল—ওঠ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিল,—এ কি বসন, জ্বর যে আজ অনেকটা হয়েছে!

হাসিয়া বসন বলিল—একটুকুন মদ থাকে তো দাও।

সামান্য আড়াল দিয়া খানিকটা নির্জলা মদ গিলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু প্রথমবারের মত গতি বা আবেগ কিছুই আনিতে পারিল না, সে হাঁপাইতেছিল, গতির মধ্যে ক্লান্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গান ধরিয়াও গাহিতে পারিল না; দোহারেরা গাহিল। তেহাই পড়িতেই নাচ শেষ করিয়া সে শিথিল ক্লান্ত পদক্ষেপে আসব হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না, যেন তাহাদের দাবি ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর দেনা-পাওনার ওজন-দাঁড়িতে তাহার দুইখানা গান ও নাচের ভার তাহাদের পেলার ভারকে তুচ্ছ করিয়া পাথরের ভারে মাটির বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পথের ধারে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া নিতাইকে বলিল—দেখ তো বাবা! আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে।

নিতাই বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া সে বসন্তর সন্ধান করিল। মনে মনে এই মেয়েটির কাছে সে হার মানিয়াছে। 'শিমুল' ফুল বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—অন্যায় নয়, অপরাধ। নূতন গানের কলি তাহার মনের মধ্যে গুনগুনানি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বসন্ত গেল কোথায়? ঝুমুর দলের বাসা তো এই বটগাছতলা। গাছতলাটায় একখানা চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে একটা পুরুষ—দলের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষটা। মহিষের মত প্রচণ্ড আকার, তেমনি কালো, রাঙা গোল

চোখ; বোবার মত নীরব; তৃষ্ণার্ত মহিষ যেমন করিয়া জল খায়—তেমনি করিয়া মদ খায়, সারাদিন শুইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর হইতে পড়ে তাহার জাগরণের পালা। আগুন জ্বালিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া লোকটা জিনিসপত্র আগলাইতেছে। সেখানে নিতাই দেখিল বসন্ত নাই। সে জ্যোৎস্নালোকিত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। এ কি! তাহার বাসার দরজায় কয়জন লোক দাঁড়াইয়া কেন? সে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমরা।

নিতাই, চিনিল, ব্যাপারী কাসেদ সেখের ছেলে—নয়ান ওরফে ননাইয়ের দল। সে প্রশ্ন করিল—কি? এখানে কি?

—মেয়েটা তোর বাসায় এসে ঢুকেছে।

—এসেছে তা—তোমরা দাঁড়িয়ে কেনে?

দলকে দল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—যাও তোমরা এখান থেকে। নইলে হাঙ্গামা হবে। আমি রাজাকে ডাকব, কনস্টেবল আছে—তাকে ডাকব। নয়ান সেখ নিতাইকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু রাজাকে গ্রাহ্য করে; সে তবুও বলিল—শোন না, তোকে বকশিশ করব। নেতাই!

নিতাই একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া বাড়ি ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু কোথায় বসন্ত? কোথাও তো নাই। কিন্তু ঘরের দরজার শিকল খোলা। দরজায় হাত দিয়া সে দেখিল—হ্যাঁ, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

নিতাই ডাকিল—ওহে ভাই শুনছ? আমি—আমি।

—কে?

—তোমার 'কয়লা মাণিক'।

—কে! ওস্তাদ?

—ওস্তাদ কি ফোস্তাদ যা বল তুমি।

এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। নিতাই ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—বসন্ত ততক্ষণে আবার শুইয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিছানাটা পাড়িয়া দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছে। বসন্তই বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

—বাইরের দরজা বন্ধ আছে।

পাঁচিল টপকে ঢুকবে ভাই—বন্ধ কর। বসন্ত ক্লান্ত অথচ বিচিত্র হাসি হাসিল। নিতাই তাহার কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল—এ কি? এ যে অনেকটা জ্বর।

—মাথাটা একটু টিপে দেবে?

হাসিয়া নিতাই মাথা টিপিতে বসিল। বসন্ত হাসিয়া বলিল—না, তুমি ফোস্তাদ নও, ভাল ওস্তাদ—গানখানি কিন্তুক খাসা। তোমার বাঁধা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও গানটা বাতিল করে দিলাম।

—কেনে? চোখ বন্ধ করিয়াই বসন্ত প্রশ্ন করিল।

—ওটা আমার ভুল হয়েছিল।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

—আবার নতুন গান বাঁধছি। সে গুনগুন করিয়া আরম্ভ করিল—

"করিল কে ভুল, হায় রে!
মন-মাতানো বাসে ভ'রে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

বসন্তের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিল—তারপর?

—তারপর এখনও হয় নাই।

—গানটি আমাকে নিকে দিয়ো।

—আমার গান তুমি নিকে নেবে? গাইবে?

—হ্যাঁ।

জানালার দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—আজই শেষ করব।—কে? কে?

জানালার পাশ হইতে কে সরিয়া যাইতেছে? বসন্ত হাসিয়া বলিল—আবার কে। যত সব নরুকেদের দল।

নিতাই কিন্তু ওই কথা মানিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। সে যাহা দেখিয়াছে সে-ই জানে। হ্যাঁ—ওই যে দুধবরণ কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিয়াছে। মাথার কেবল স্বর্ণবিন্দুটি নাই। ঠাকুরঝি।

এগারো

জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতার মধ্যে দ্রুত চলন্ত কাশফুলটি যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। নিতাই কিন্তু স্তব্ধ হইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। চোখে তাহার অর্থহীন দৃষ্টি, মনের চিন্তা অসম্বদ্ধ অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে শারীরিক অনুভূতিতে কেবল একটি গভীর উদ্বেগ। সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল জ্যোৎস্নাময়তার মধ্যে ঠাকুরঝি হারাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সবই যেন হারাইয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া মুখরা স্বৈরিণী অসুস্থ দেহেও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতায় নিশাচর হিংস্র জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার মধ্যে পনেরো আনা তিন পয়সা, সেই অভিজ্ঞতার শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বসন্ত উঠিয়া বসিল। সে ভাবিল, যে দলটি বাড়ির দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারাই বোধ হয় দলপুষ্ট হইয়া নিঃশব্দ লোলুপতায় নখর দন্ত মেলিয়া বাড়ির চারপাশ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। উৎকণ্ঠিত হইয়া চাপা কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—কি?

নিতাই তবুও উত্তর দিল না। সে যেমন স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরঝির রাগ তো সে জানে। খানিকটা গিয়াই সে দাঁড়ায়, পিছন ফিরিয়া তাকায়, ইঙ্গিতে বলে—আমায় ডাক, ডাকিলেই ফিরিব। আজ আর কিন্তু দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল; এই রাত্রে একাই সে চলিয়া গেল। মধ্যরাত্রির নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যেও একটা ভয় আছে। সে ভয় সে করিল না।

বসন্ত এবার উঠিয়া আসিয়া নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াইল, জ্বরোত্তপ্ত হাতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল—কই?

এতক্ষণে সচকিত হইয়া নিতাই ফিরিয়া চাহিল। রূপে গুণে ক্ষুরধার স্বৈরিণীর কৃশ মুখে ডাগর দীপ্ত চোখে অপরিমেয় ক্লান্তি—গভীর উৎকণ্ঠা। নিতাই সে মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল না হইয়া পারিল না। সস্নেহে হাসিয়া সে বসন্তের কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—এত জ্বর, তুমি উঠে এলে কেনে? চল শোবে চল। উঃ! ধান দিলে যে খই হবে, এত তাপ।

—নচ্ছারগুলো ঘুরছে চারিদিকে? ছুরি ছোরা নিয়ে জুটেছে?

—নচ্ছারগুলো! নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। বসন্তের ভাবনার পথে যাহারা বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

এবারে বসন্তের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—খাপ হইতে ক্ষুরের ধার উঁকি মারিল, সে প্রশ্ন করিল—তবে? কি? কে গেল? কি দেখছ তুমি?

চকিতেই নিতাই এবার বসন্তের কল্পনার কথা বুঝিল, হাসিয়া সে বলিল—না, তারা নয়। ভয় নাই তোমার। এস, শোবে এস। সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

—কে যে গেল। কাকে দেখছিলে? কে উঁকি মেরে গেল?

—কে চিনতে পারলাম না।

—চিনতে পারলে না?

—না।

—তবে এমন করে দাঁড়িয়ে আছ যে? যেন কত সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তোমার?

বসন্তের শাণিত দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যে যেন জ্বলিতেছিল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না, শুষ্ক হাসিমুখে বসন্তের দিকে চাহিয়াই রহিল।

বসন্ত অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ দ্রুত হাসি। হাসিয়া বলিল—আ মরণ আমার! চোখের মাথা খাই আমি! যে উঁকি মারলে তার মাথায় যে ঘোমটা ছিল! ও—! আমাকে দেখে—

আবার সেই খিলখিল হাসি।

নিতাইয়ের পা হইতে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বসন্ত হাসিতে হাসিতে ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল। নিতাই ডাকিল—বসন! ও ভাই। বসন!

দুয়ারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—বসন নয় হে, কেয়াফুল, কেয়াফুল টেনো না, করাত-কাঁটার ধারে সর্বাঙ্গে ছ'ড়ে-ছিঁড়ে যাবে!

নিতাই তবুও বাহিরে আসিল।

স্বৈরিণী তখন কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

এ অবস্থায় নিতাই ডাকিতে গিয়াও পারিল না, লজ্জাবোধ হইল। আপনার দুয়ারটিতেই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিকে স্টেশনের ধারে ঝুমুরের আসরে গান হইতেছে। আলোর ছটা গাছের ফাঁকে-ফাঁকে আসিয়া এখানে ওখানে পড়িয়াছে। এদিকটা প্রায় জনহীন স্তব্ধ, পশ্চিম আকাশে চাঁদ অস্তে চলিয়াছে, পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্বৈরিণী মেয়েটার কিন্তু কোন লজ্জা নাই; খিলখিল হাসির মধ্যে কথা শেষ করিয়া ঘন অন্ধকারে কাসেদের ছেলে নয়ানের সঙ্গে ওই পূর্বদিকের গভীরতম অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই আকাশের দিকে তাকাইয়া একা দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে আবার তার মনে নূতন গান গুনগুন করিয়া উঠিল। ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাই না খেলেন! এক ঘটে, মানুষ তাঁহার ছলনায় অন্য দেখে। ঠাকুরঝি বসন্তকে দেখিয়া চলিয়া গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিয়া চলিয়া গেল। সে গুনগুন করিয়া তাই লইয়াই গান বাঁধিতে বসিল।...

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন।"

ঘটনার মধ্যে সে যেন নিয়তির খেলা বা দৈবের অদ্ভুত পরিহাস দেখিতে পাইয়াছে আজ। ঠিক তাহার অচ্ছুৎ জন্মের মতই এ পরিহাস নিষ্ঠুর। সে তাই গানের মধ্যে হরিকে স্মরণ না করিয়া পারিল না।

ভোরবেলাতে রাজার হাঁক-ডাকে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ঘরে আসিয়া গান বাঁধিতে বাঁধিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চেতনা হইবামাত্র সেই অসমাপ্ত গানের কলিটাই প্রথমে গুঞ্জন করিয়া উঠিল তাহার মনে—

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হয়কে কর নয়—অঘটন কর সংঘটন।"

রাজা হাঁকডাক শুরু করিয়াছে। সে হাঁকডাকের উচ্ছ্বাসটা যেন অতিরিক্ত। নিতাইয়ের মনে

হইল হয়তো নূতন কোন অভিনন্দন লইয়া রাজন তাঁহার দুয়ারে আসিয়াছে—ধৈর্য তাহার আর ধরিতেছে না। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিমুখে সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা—তাহার পিছনে ঝুমুরের দলের প্রৌঢ়া। রাজা সটান ঘরের ভিতরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকৌতুকে কাহাকে যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

—কাঁহা? কাঁহা হ্যায় ওস্তাদিন?

—ওস্তাদিন?

হা-হা করিয়া হাসিয়া রাজা বলিল—সব ফাঁস হো গয়া ওস্তাদ, সব ফাঁস হো গয়া। কাল রাতমে—সে হা-হা করিয়াই সারা হইল। কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

নিতাই তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না।

বুঝাইয়া দিল প্রৌঢ়া। সে এতক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—আ মরণ! ও বসন্ত, বেরিয়ে আয় না লো, এই ট্রেনেই যাব যে আমরা!

নিতাই বলিল—সে তো এখানে নাই।

—নাই! সে কি? সে আসর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে। আমি বলেও দিলাম তোমাকে। তারপর আমি খোঁজও করলাম; শুনলাম, তোমার ঘরেই—

নিতাই বলিল-হ্যাঁ, কজন লোক বিরক্ত করছিল বলে আমার ঘরেই এসেছিল। আমি এসে দেখলাম শুয়ে আছে, গায়ে অনেকটা জ্বর। কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই চলে গেল।

প্রৌঢ়া চিন্তিত হইয়া উঠিল ঃ রাজার কৌতুক-হাস্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিতাই বলিল—কাদের সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে গিয়েছে। ওই ঝোপ মত বটগাছটার তলাতেই যেন কথা কইছিল। আসুন দেখি।

তাহারা আগাইয়া গেল।

সেখানেই তাহাকে পাওয়া গেল। সে হতচেতনের মত অসম্বৃত দেহে পড়িয়াছিল। সেখানেই মাটির উপর বসন্ত তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। কেশের রাশ বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্বাঙ্গ ধুলায় ধূসর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি ভনভন করিয়া উড়িতেছে; পাশেই পড়িয়া আছে একটা খালি বোতল, একটা উচ্ছিষ্ট পাতা। কাছে যাইতেই দেশী মদের তীব্র গন্ধ সকলের নাকে আসিয়া ঢুকিল।

প্রৌঢ়া বলিল—মরণ। এই করেই মরবে হারামজাদী! বসন ও বসন।

রাজা হাসিয়া বলিল—বহুত মাতোয়ারা হোগেয়া।

নিতাই দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে লইয়া। দুধ না দিয়া কাঁচা চা, তাহাতে একটু লেবুর রস। কাঁচা চায়ে নাকি মদের নেশা ছাড়ে। মহাদেব কবিয়ালকে সে কাঁচা চা খাইতে দেখিয়াছে। বসন্ত তখন উঠিয়া বসিয়াও ঢুলিতেছে অথবা টলিতেছে। প্রৌঢ়া বলিতেছে—এ আমি কি করি বল দেখি?

—এই চা-টা খাইয়ে দিন, এখুনি ছেড়ে যাবে নেশা।

চা খাইয়া সত্যই বসন্ত খানিকটা সুস্থ হইল। এতক্ষণে সে রাঙা ডাগর চোখ মেলিয়া চাহিল নিতাইয়ের দিকে।

প্রৌঢ়া তাড়া দিয়া বলিল—চল এইবার।

নিতাই বলিল—চান করিয়ে দিলে ভাল করতেন। সোরও হত, আর সর্বাঙ্গে ধুলো লেগেছে—

তাহার কথা ঢাকা পড়িয়া গেল বসন্তের মত্ত কণ্ঠের খিলখিল হাসিতে। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—মুছিয়ে দাও না নাগর, দেখি কেমন দরদ।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—হাসিয়া কাঁধের গামছাখানি লইয়া সযত্নে বসন্তের সর্বাঙ্গের ধুলা মুছাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার তা হ'লে।

প্রৌঢ়া তাহাকে ডাকিল—বাবা!

নিতাই ফিরিল।

—আমার কথাটার কি করলে বাবা? দলে আসবার কথা?

নিতাই কিছু বলিবার পূর্বেই নেশায় বিভোর মেয়েটা আবার আরম্ভ করিয়া দিল সেই হাসি। সে হাসি তাহার যেন আর থামিবে না।

বিরক্ত হইয়া প্রৌঢ়া বলিল—মরণ। কালামুখে এমন সর্বনেশে হাসি কেনে? দম ফেটে মরবি যে।

সেই হাসির মধ্যেই বসন্ত কোনরূপে বলিল—ওলো মাসী লো—কয়লামাণিকেরও মনের মানুষ আছে লো! কাল রাতে—হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাজা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়েটাকে একটা ধমক দিয়া উঠিল—কেঁও এইসা ফ্যাক্ ফ্যাক্ করাত হ্যায়!

ওদিকে স্টেশনে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল, স্টেশন-মাস্টার নিজে ঘণ্টা দিতে দিতে হাঁকিতেছিল—রাজা! এই রাজা!

রাজা ছুটিল, নতুবা একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব ছিল না।

নিতাই হাসিয়া বলিল,—আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার বাসার দিকে ফিরিল।

প্রৌঢ়া এবার কঠিন স্বরে বলিল—বসন। আসবি, না এইখানে মাতলামি করবি?

বসন্ত ক্লান্তিতে শিথিল পদে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু হাসি তাহার তখনো থামে নাই। সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইতে হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া সে চিৎকার করিয়া বলিল—চললাম হে।

নিতাই আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়।

ওদিকে তখন ট্রেনটা ছাড়িয়াছে।

ট্রেনটা স্টেশন হইতে ছাড়িয়া সশব্দে সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছি। কামরার পর কামরা। একটা কামরায় ঝুমুরের দলটাকে দেখা গেল। বসন্ত মেয়েটি একধারে দরজার পাশেই জানালায় মাথা রাখিয়া যেন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে।

অদ্ভুত মেয়ে। নিতাই হাসিল। ঝুমুর সে অনেক দেখিয়াছে। কবিগান করিতে ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী ক্ষুরধার মেয়ে সে দেখে নাই। ক্ষুরধার নয়, জ্বলন্ত। মেয়েটা যেন জ্বলিতেছে। তবে মেয়েটার গুণ আছে, রূপও আছে। আশ্চর্য মেয়ে। গতরাত্রের গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"করিল কে ভুল—হায় রে!
মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।
করিল কে ভুল! হায় রে!"

ট্রেনটা চলিয়া গেল। নিতাই বসিয়াই রহিল। চাহিয়া রহিল রেল-লাইনের বাঁকে যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানের দিকে। বসন্ত তো চলিয়া গেল, আর হয়তো কখনও দেখাই হইবে না। অদ্ভুত মেয়ে। ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার এক একটি

রূপ; এক রাত্রে উহাকে লইয়াই তিন-তিনখানা গান মনে আসিয়াছে। সে খানিকটা উদাস হইয়া রহিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা সচেতনতা আসিয়া তাহাকে নাড়া দিল। ওইখানেই বাঁকের ওই বিন্দুটিতে একসময় একটি স্বর্ণবিন্দু ঝকমক করিয়া উঠিবে, তাহার পর দেখা যাইবে—ওই স্বর্ণবিন্দুটির নীচে চলন্ত একটি কাশফুল। স্বর্ণবিন্দু-বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটি মধ্যে মধ্যে এক একটি চকিত চমকে চোখে লাগিয়া চোখ ধাঁধিয়া দিবে। অসমাপ্ত গানগুলি তাহার অসমাপ্তই রহিল, পথের উপর স্থিরদৃষ্টি পাতিয়া নিতাই যেন প্রত্যাশা-বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল।

ঠাকুরঝি কখন আসিবে? কই, ঠাকুরঝি আসিতেছে কই?

ওই কি? না, ও তো নয়। নিতান্তই চোখের ভ্রম। মনের প্রত্যাশিত কল্পনা—এই দিকের আলোর মধ্যেও মরুভূমির মরীচিকার মত মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এখনি দেখা যায়, আবার মিলাইয়া যায়। নিতাই হাসিল। এই তো বেলা সবে দশটা। ঠাকুরঝি আসে ঘড়ির কাঁটাটির মত বারোটার ট্রেনটির ঠিক আগে!

তবু সে উঠিয়া গেল না। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টাগুলো আজ যেন যাইতেই চাহিতেছে না।

ওই! হ্যাঁ, ওই আসিতেছে। চলন্ত সাদা একটি রেখার মাথায় স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। কিন্তু না, ও তো নয়, রেখাটির গতি-ভঙ্গি তো তেমন দ্রুত নয়, রেখাটিও তেমন সরল দীঘল নয়।

ওই আর একটি রেখা, এও নয়।

নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটবর্তী হইলে সেগুলি নারীমূর্তি হইয়াই উঠিল, মাথায় তাহাদের ঘটিও ছিল। তাহারাও এ গ্রামে দুধ লইয়া আসে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ঠাকুরঝি নয়। একে একে তাহারা সকলেই গেল। কিন্তু ঠাকুরঝি কই? কই?

বেলা বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল।

রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ!

সচকিত হইয়া নিতাই হাসিয়া বলিল—রাজন।

—কেয়া ধ্যান করতা ভাই, হিঁয়া বইঠকে ? নয়া কুছ গীতা বানায়া—?

—না তো—। অপ্রস্তুতের মত শুধু খানিকটা হাসিল।

—তুমারা উপর হাম গোসা করেগা।

—কেন রাজন কেন? কি অপরাধ করলাম ভাই?

—ওহি ঝুমুরওয়ালী বোলা, তুমারা দিলকে আদমী, মনকে মানুষ—

নিতাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহার পর রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল,—চল, চা খেয়ে আসি। চা খাওয়া হয় নাই, ঠাকুরঝি আজ আসে নাই দুধ নিয়া। ঝুমুরওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ? হ্যাঁ, রাজন—আছে আমার মনের মানুষ। আমার মনের মানুষ তুমি রাজন, তুমি।

—হাম? রাজা বিকট হাসিতে স্থানটি উচ্চকিত কবিয়া দিল। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চুমু খাগা ওস্তাদ? আবার সেই বিকট হাসি। সে হাসির প্রতিধ্বনিতে আকাশ হাসিতে লাগিল, বাতাস হাসিতে লাগিল।

বারো

একদিন, দুইদিন, তিনদিন।

পর পর তিনদিন ঠাকুরঝি আসিল না। চতুর্থ দিনে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিতাই স্থির করিল, আজ ঠাকুরঝি না আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল, সেদিনও ঠাকুরঝি আসিল না। অন্যান্য মেয়েরা যাহারা দুধ দিতে আসে, তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গেল। নিতাইয়ের বার বার ইচ্ছা হইল—উহাদের কাছে সংবাদ লয়, কিন্তু তাহাও সে কিছুতেই পারিল না। কেমন সঙ্কোচ বোধ করিল। নিজেই সে আশ্চর্য হইয়া গেল—বার বার মনে হইল, কেন সঙ্কোচ, কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু তবু সে-সঙ্কোচ নিতাই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। চুপ করিয়া সে আপনার বাসায় আসিয়া ভাবিতে বসিল। কোন অজুহাতে ঠাকুরঝির শ্বশুরগ্রামে যাইলে হয় না? ভাবিয়া-চিন্তিয়া সে ঠিক করিল—হাঁস, মুরগী অথবা ডিম কিনিবার অছিলায় যাইবে। ঠাকুরঝির শ্বশুরের হাঁস মুরগী আছে সে জানে। সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্যন্ত ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি সূচ গাঁথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে—চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া আসিতে পারে।

—ওস্তাদ রয়েছ নাকি? রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, রাজা বাংলায় বাত বলিতেছে! বিস্মিত হইয়া সে হিন্দিতে উত্তর দিল—রাজন, আও মহারাজ, কেয়া খবর?

রাজা আসিয়া খবর দিল—বিষণ্ণভাবে বাংলাতেই বলিল—খারাপ খবর ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হয়েছে ভাই।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, উৎকণ্ঠিত স্তব্ধ মুখে রাজার মুখের দিক চাহিয়া রহিল।

—আজ দিন তিনেক হল, কি হয়েছে ভাই, ওই ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-মরদ সবারই সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করছে—মাথামুড় খুঁড়ছে। কাল রাত থেকে আবার মূর্ছা যাচ্ছে। দাঁত লাগছে, হাত-পা কাঠির মত করছে।

অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হইয়া উঠিল। রাজার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তুমি দেখতে যাবে না রাজন?

রাজা বলিল—বউ গেল দেখতে, ফিরে আসুক। আমি ও-বেলায় যাব।

—আমিও যাব।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল, মাথা নীচু করিয়া সে তাহা গোপন করিল।

রাজা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বড় ভাল মেয়ে ওস্তাদ। আবার কিছুক্ষণ পর রাজা বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির মরদটি যা কাঁদছে! হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলেমানুষ তো, সবে ভাব-সাবটি হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। বেচারা! রাজা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

টপ-টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি খেলাচ্ছলে আঙুল দিয়া জলের চিহ্ন দুইটা বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল—রাজন!

—ওস্তাদ!

—ডাক্তার বদ্যি-কিছু দেখানো হয়েছে?

হতাশায় ঠোঁট দুইটা দুইপাশে টানিয়া রাজা বলিল—এতে আর ডাক্তার-বদ্যি কি করবে ওস্তাদ? এ তোমার নিঘ্যাত অপদেবতা, না হয় ডান ডাকিনী, কি কোন দুষ্ট লোকের কাজ।

কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরিল। চকিতে মনে হইল, তবে কি ওই ক্ষুরধার মেয়েটার কাজ! ঝুমুর দলের স্বৈরিণী—উহাদের তো অনেক বিদ্যা জানা আছে, বশীকরণে উহারা তো সিদ্ধহস্ত।

রাজা বলিল—মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বিত্তান্ত আজই জানা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া

বলিল—আও ভেইয়া, থোড়াসে চা পিয়েগা।

এতক্ষণে সে হিন্দী বলিল, অনেকক্ষণ পর রাজা যেন সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

রাজার বাড়িতেই নিতাই বসিয়া ছিল। রাজার স্ত্রী ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে গিয়াছে। এখনও ফেরে নাই। ভরন শেষ হইলেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে—সেই সংবাদের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া নিতাই বসিয়া রহিল। রাজা দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপের মধ্যেও রাজা। সে প্রচুর মুড়ি, বেগুনি, আলুর চপ, কাঁচা লঙ্কা, পেঁয়াজ তাহার সঙ্গে কিছু সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

নিতাই বলিল—এ সব কি হবে? এ সমারোহ তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

—খানে তো হোগা ভেইয়া, পেট তো নেহি মানেগা জী। লাগাও খানা। তারপর সে চীৎকার আরম্ভ করিল—এ বাচ্চা! এ বেটা!

ডাকিতেছিল সে ছেলেটাকে। রাজার ছেলের ধরণটা অনেকটা সে আমলের যুবরাজের মতই বটে, দিনরাত্রিই সে মৃগয়ায় ব্যস্ত, একটা গুলতি হাতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। শালিক, চড়ুই, কোকিল, কাক—যাহা পায় তাহাই হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্যে হত্যা! খাওয়ার লোভ নাই। কখনও কখনও পাখীর বাচ্চা ধরিয়া পোষে এবং তাহার জন্য ফড়িং শিকার করিয়া বেড়ায়। যুবরাজ বোধ হয় আজ দূরে কোথাও গিয়া পড়িয়াছিল, সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা চটিয়া চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—এ শূয়ার কি বাচ্চা, হারামজাদোয়া—

তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা নিতাইকে বলিল—কিধর গিয়া ওস্তাদ। তারপর হাসিয়া বলিল—উ বাতঠো—কেয়া বোলতা তুম ওস্তাদ? কেযা?—তেপান্তরকে মাঠকে উধরে—কেয়া? মায়াবিনী, না কেয়া?

এমন ধারার চীৎকারে সাড়া না পাইলে নিতাই বলে—যুবরাজ বোধ হয় তেপান্তরকে মাঠ পেরিয়ে মায়াবিনী ফড়িং কি পক্ষিণীর পেছনে ছুটেছে রাজন।

আজ কিন্তু নিতাইয়ের ও-কথাও ভাল লাগিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে একটু ম্লান হাসিল, সে কেবল রাজার মনরক্ষার জন্য।

রাজাও আর ছেলের খোঁজ করিল না, দুইটা পাত্র বাহির করিয়া আহার্য ভাগ করিয়া একটা নিতাইকে দিয়া অপরটা নিজে টানিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল—যানে দেও ভেইয়া শূয়ার কি বাচ্চেকো। নসীবমে ভগবান উসকো নেহি দিয়া, হাম কেয়া করেগা?

নিতাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, ঠাকুরঝির কথা। চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রং ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত পীতাভ রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। চারিপাশে দূরান্তরের শূন্যলোক যেন মৃদু কম্পনে কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হইল। তাহারই মধ্যে চারিদিকেই নিতাই দেখিতে পাইল স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে—সব দিকেই। কোনদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই মনে হইল কম্পমান দূর দিগন্তের মধ্যে একটা স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দুলিতেছে, কাঁপিতেছে।

ক্ষুধার্ত গ্রাসে রাজা খাওয়া শেষ করিয়া বলিল—খা লেও ভাই ওস্তাদ।

ম্লান হাসিয়া নিতাই বলিল—না।

—দূর দূর; খা লেও। পেটমে যানেসে গুণ করেগা। তবিয়ৎ ঠিক হো যায়েগা।

—তবিয়ৎ ভালই রাজন, কিন্তু মুখে রুচবে না।

—কাহে? মুখমে কেয়া হুয়া ভাই?

রাজার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নিতাই যেন অকস্মাৎ বলিল—রাজন, সেদিন তুমি আমাকে শুধিয়েছিলে আমার মনের মানুষের কথা।

—হাঁ। রাজা কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে ওস্তাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আমার মনের মানুষ। বলিতে বলিতে ঝরঝর করিয়া নিতাই কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজার খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কবিয়ালের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্য সময় হইলে সে হয়তো বিকট হাস্যে কথাটা এই মুহূর্তে পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিত, কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য তাহার বেদনাভারাক্রান্ত মন আজ তাহা পারিল না। স্তব্ধ হইয়া দুইজনেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রাজার স্ত্রী।

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত নিতাই প্রশ্ন করিতে গিয়া তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জিত শত প্রশ্নের মধ্যে হইতে কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করিল, কেবল একটি কথা—কি হল?

রাজার স্ত্রী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল—ডাইন, ডাকিন, রাক্ষস—

তারপর সে অশ্লীল কদর্য অশ্রাব্য বিশেষণে নিতাইকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এবং নিতাইয়ের মুখের উপর আঙুল দেখাইয়া বলিল—তুই, তুই, তুই। তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা। এত লোভ তোর? তোর মনে এত পাপ?

অজস্র ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত ও অশ্রাব্য গালিগালাজের মধ্য হইতে বিবরণটা জানা গেল। আজ ঠাকুরঝিকে কালী মায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী! ভূত পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, পিশাচ যে মন্দ করেছে মা তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে। তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল্ বল্? কে তোকে এমন কবলে বল্? দোহাই মা কালীর।

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতেছিল তেমনি কাঁপিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে দুর্বোধ্য অনুস্বারবহুল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের, বলিয়াছে—ওস্তাদ, কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদ্‌ভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—

"কালো চুলে রাঙা কোসম হেরেছি কি নয়নে?"

রাজার স্ত্রীর মনে পড়িয়াছিল—নিতাইয়ের বাসার জানালা দিয়ে দেখা ছবি—নিতাই ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল। সে কথাটা সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

বাকীটা ঠাকুরঝিকে আর বলিতে হয় নাই। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এখানে আসিয়া নিতাইকে গালিগালাজে—শরবিদ্ধ ভীষ্মের মত জর্জরিত করিয়া তুলিল।

অন্যদিন হইলে রাজা স্ত্রীর চুলের মুঠা ধরিয়া কঞ্চির প্রহারে মুখ বন্ধ করিত। আজ কিন্তু সেও পঙ্গু হইয়া গেল। নিতাই মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। গালিগালাজ অভিসম্পাত বিশেষ করিয়া ঠাকুরঝি যাহা বলিয়াছে সেই কথা শুনিয়া—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পর ট্রেনের ঘণ্টার শব্দে রাজা সচেতন হইয়া উঠিল। তাহাকেও সচেতন করিয়া দিল। ট্রেনের ঘণ্টা পড়িয়াছে। তিনটার ট্রেন। রাজা স্টেশনে যাইবে, সে নিতাইকে ডাকিল। উঠো ভাই ওস্তাদ, কি করবে বল? হম ইষ্টিশনমে যাতা হ্যায়! নিতাই উঠিয়া আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। উদাসীন স্তব্ধ নিতাই ভাবিতেছিল, পথের কথা। কোন্ পথে গেলে সে এ লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কোন্ পথে চলে গেলে জীবনে শান্তি পাইবে সে?

ঠিক এই মুহূর্তেই একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে—এই যে ওস্তাদ।

নিতাই নিতান্ত উদাসীন মতই তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্তে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।—তুমি?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ আমি। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ। বড় দায়ে পড়ে এসেছি ভাই। বসন পাঠালে।

—বসন?

—সেই ঝুমুর দলের বসন।

লোকটি সেই ঝুমুব দলের বেহালাদার।

আরও ঘণ্টা কয়েক পর।

হেমন্তের ধুসর সন্ধ্যা। সন্ধ্যার ম্লান রক্তাভ আলোর সঙ্গে পল্লীর ধোঁয়া ও ধুলার ধূসরতায় চারিদিক যেন একটা আচ্ছন্নতায় ঢাকা পড়িয়াছে। ওদিকে সন্ধ্যার ট্রেনখানা আসিতেছে। পশ্চিমদিক হইতে পূর্বমুখে। যাইবে কাটোয়া। সিগন্যাল ডাউন করিয়া রাজা লাইনের পয়েন্টে নীল বাতি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল নিতাই।

—রাজন!

রাজা ফিরিয়া দেখিল —নিতাই। তাহাব পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গায়ে জামা, গলায় চাদর, বগলে একটি পুঁটলি। বাজা বিস্মিত হইযা প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

পাঁচটা টাকা তাহার হাতে দিয়া নিতাই বলিল—দুধের দাম, ঠাকুরঝিকে দিও।

রাজা ফিস্ ফিস্ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—ঠাকুরঝিকে জাত মে জাত দেগা ওস্তাদ?

নিতাই বিস্মিত হইয়া রাজার দিকে চাহিল।

—ঠাকুরঝিকে সাদী হাম বাতিল কর দেগা। তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা। 'সাগাই' দে দেগা।

নিতাই মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া কেবল একটি কথা বলিল—ছি!

—ছি কাহে?

—মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি!

রাজা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—তুমি বিশ্বাস কর রাজন, আমি কবিগান করি, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, কিছু করি নাই। তবে হ্যাঁ, টান—একটা ভালবাসা হয়েছিল। তা বলে ঠাকুরঝিকে নষ্টও আমি করি নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া বাঁকের মুখে ট্রেনের সার্চ-লাইট জ্বলিয়া উঠিল। ট্রেনটা ওদিক হইতে স্টেশনে ঢুকিতেছে। নিতাই দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে চলিল। এতক্ষণে এই সার্চ লাইটের আলোতে নিতাইয়ের বেশভূষা ও বগলের পুঁটলি যেন রাজার চোখে খোঁচা দিয়া বুঝাইয়া দিল নিতাই কোথাও চলিয়াছে। এতক্ষণ কথাটা তাহার মনে হয় নাই। এবার সে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

ওদিকে ট্রেনটা সশব্দে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় নিতাই কিছু বলিল কিনা রাজা বুঝিতে পারিল না। ট্রেনখানা স্টেশনে প্রবেশ করিলে পয়েন্ট ছাড়িয়া রাজা ছুটিয়া প্ল্যাটফর্মে আসিল।

—ওস্তাদ!—ওস্তাদ!

তখন নিতাই গাড়িতে উঠিয়া বসিয়াছে। গাড়ির কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া নিতাই উত্তর দিল—রাজন!

উৎকণ্ঠিত রাজন প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ভাই?

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—বায়না এসেছে ভাই। আলেপুরের মেলায়।

আলেপুবে-মহাসমাবোহে নূতন মেলা হইতেছে। কিন্তু বায়না কখন আসিল? রাজার মনে চকিতে একটা সন্দেহ জাগিযা উঠিল। ঠাকুবঝিব দুধের দাম পাঁচ টাকা মিটাইয়া দিয়া সে বায়না লইয়া কবিগান করিতে চলিয়াছে। মিথ্যা কথা! সে বলিল—ঝুট বাত।

—না রাজন। এই দেখ, লোক।

রাজা দেখিল, সেই ঝুমুর দলের বেহালাদাব। দলনেত্রী প্রৌঢ়া মেলায় গিয়াছে, সেখান হইতে নিতাইয়ের কাছে লোক পাঠাইয়াছে। তাহাদেব দলের কবিয়াল পলাইয়া গিয়াছে। বসন ঝগড়া করিয়া তাহাকে লাথি মারিয়াছে।

নিতাই বলিল,—আলেপুব, আলেপুব থেকে কান্দরা, কান্দরা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে—

ট্রেনের বাঁশী তাহার কথাটাকে ঢাকিয়া দিল।

বাঁশী থামিল, ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। রাজা ট্রেনেব সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্রশ্ন করিল—অগ্রদ্বীপসে কাঁহা? দুনিয়া ভোর কি তুমারা বায়না আয়া হ্যায়? উতার আও ওস্তাদ, উতার আও!—রাজার কণ্ঠের আর্ত মিনতি মুহূর্তের জন্য নিতাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিল। মনে মনে বলিল—হ্যাঁ, দুনিয়া ভোর বায়না আয়া হ্যায় রাজন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

তেরো

ট্রেনখানা পূর্ব মুখের বাঁকটা ঘুরিয়া ফিরিল দক্ষিণমুখে। এ সেই বাঁকটা যেখানে ঠাকুরঝি আসিলে তাহার মাথায় ঘটিটি রোদের ছটায় ঝিকমিক করিয়া উঠিত। গাড়ীখানা দক্ষিণমুখে চলিতেছে। এবার বাঁ পাশে পড়িল পূর্বদিগন্ত। পূর্বদিগন্তে তখন শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল। আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘেব আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে। নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়া রহিল। ছোট লাইনের ট্রেনগুলি বড় বেশী দোলে, আর শব্দও করে বড় লাইনের ট্রেনের চেয়ে অনেক বেশী—শূন্য কুম্ভের মত। যে লোকটি নিতাইকে লইতে আসিয়াছিল, সে ঝুমুর দলের বেহালাদার। কিন্তু বাজনাও সে জানে। সে বেশ খানিকটা নেশার আমেজে ছিল, ট্রেনের এই অত্যধিক শব্দে এবং ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল—এ যে ঝাঁপতাল লাগিয়ে দিল ওস্তাদ। এবং ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া বেঞ্চ বাজাইয়া বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখাদেখি ওপাশের বেঞ্চে দুইটা ছোট ছেলে ট্রেনের শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার আরম্ভ করিল। একজন বলিল—কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল। কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল।

নিতাইয়ের মন কিন্তু কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। চাঁদের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—

ঠাকুরঝির কথা, রাজনের কথা, যুবরাজের কথা, বণিক মাতুলের কথা, বিপ্রপদর কথা, কৃষ্ণচূড়া গাছটির কথা, স্টেশনটির কথা, গ্রামখানির কথা। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছে হইতেছিল—পরের স্টেশনেই সে নামিয়া পড়িবে।

স্টেশন পার হইয়া গেল, কিন্তু সে নামিতে পারিল না। হঠাৎ এক সময়ে সে অনুভব করিল—নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোখ কখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে কাঁদিতেছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি ম্লান হাসিয়া এতক্ষণে সে সচেতন হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সুকণ্ঠে সে গান ধরিল।—আহা! বার দুই-তিন তা-না-না করিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল।

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখব খালি;
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ, তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

বাজনদারটা নেশার মধ্যেও সজাগ হইয়া বসিয়া বলিল—বাহবা ওস্তাদ! গলাখানা পেয়েছিল বটে বাবা! বলিয়াই সে ধরতার মুখে বেঞ্চে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—হেঁই—তা—তেরে কেটে—তা—তা!

গাহিতে গিয়া নিতাই পরের কলি বদলাইয়া দিল। মন যেন গানে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুরে ফেলিলেই সে গান হইয়া বাহিব হইয়া আসিতেছে—

"না না, তাও করো মার্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।"

স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম কবিয়া ট্রেন চলিয়াছিল। নিতাই গানখানা বাব বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে। গাহিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ট্রেনটা খট্ খট্ শব্দে লাইনের জোড়ের মুখ অতিক্রম কবিয়া একটা স্টেশনে আসিয়া ঢুকিল। স্টেশনের জমাদার হাঁকিতেছে—কান্দরা, রামজীবন—পু-র। বাজনদাব জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্টেশনটার চেহারা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বলিল,—ওই, এরই মধ্যে চলে আইচে লাগচে। নামো—নামো—ওস্তাদ নামো।

নিতাই নামিল, কিন্তু গান বন্ধ করিল না। গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতেই সে স্টেশন পার হইয়া পথে নামিল।

"তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে,
কাকের মুখে বাত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।"

স্টেশন হইতে মাইল দুয়েক হাঁটা-পথে চলিয়া নিতাইয়ের মনের অবসাদ অনেকখানি কাটিয়া আসিল। রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতাবে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। ইহার পূর্বেই নিতাই দেখিবাব জন্য এ মেলায় আসিয়াছে। কেবল আলো—আলো আর আলো। সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্যসম্ভার-ভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর—যাত্রা, কবি, পাঁচালী ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক। এমনই একটি আসরে আজ তাহাকে গান করিতে হইবে। কবি ও ঝুমুর দল এক হইয়া অপর একটি এমনিই দলের সহিত পাল্লা দিয়া গান করিবে। সঙ্গের লোকটি বলিয়াছে, তাহাকেই মুখপাত—অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে গান করিতে হইবে। তাহাদের যে লোকটি এমন আসরের গান করিত, সে লোকটা বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া অন্যদলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গলাও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, লোকটাও ছিল দুর্দান্ত মাতাল, গান বাঁধিবার ক্ষমতাও তাহার আর তেমন ছিল না। গতকাল একটা গানের সুরতাল লইয়া বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছিল। দুইজনেই ছিল মত্তাবস্থায়। শেষ পর্যন্ত লোকটা বসন্তকে অশ্লীল গাল দেওয়ায় বসন্ত তাহার পিঠে লাথি বসাইয়া দিয়াছিল। ফলে লোকটা তাহার প্রণয়িনী মেয়েটাকে লইয়া অন্য

দলে চলিয়া গিয়াছে। কবিয়াল এবং ভালো গানেওয়ালা না হইলে মেলায় চলিবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রৌঢ়া নিতাইকে স্মরণ করিয়াছে। মানসম্মানের সমস্ত ভরসা এখন নিতাইয়ের উপর। সেইজন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়া ঝুমুর দলের নেত্রী প্রৌঢ়া তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে।

মনে মনে একটা খুব ভাল ধুয়া রচনা করিতে করিতে নিতাই পথ চলিতেছিল—মনটা ছিল মনে নিবদ্ধ, দৃষ্টি ছিল আকাশে নিবদ্ধ, ওই আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে। ঠাকুরঝি, রাজন, যোবরাজ, কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের দেহের পিছনে দীর্ঘ ছায়ার অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সে যত সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের ছায়া দৈর্ঘ্যে পরিধিতে তত বড় এবং ঘন হইয়া উঠিতেছে—সেই ক্রমবর্ধমান ছায়ার অন্ধকারে পিছনটা ক্রমশ যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনকে টানিতেছে মেলার আসর। ঠাকুরঝির চিন্তা, সেখানকার সকলের চিন্তাকে দুঃখকে ছাপাইয়া মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সে কবিয়াল হইয়া আসরে নামিবে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে এক আর এ এক। আজ সে সত্যই কবিয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া মেলার গাওনা করিতে চলিয়াছে। এমন ভাগ্য যে তাহার কখনও হইবে সে ভাবে নাই।

সে গাহিবে বসন্ত নাচিবে। অপর মেয়েগুলিকে সে নাচিতে দিবে না। আসরে বসিয়া তাহারা দোয়ারকি করিবে। এই সব কল্পনা করিতে করিতে তাহার মনে একটা কলিও আসিয়া গেল ঃ

"ব্রজ-গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে—
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—
ওহে কুটিল কালা।"

সঙ্গে সঙ্গে সুর ফেলিয়া সে গুন গুন করিয়া গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অপর দলের কবিয়াল নাকি বেজায় রঙদার লোক, গোড়া হইতেই সে রঙ তামাশা আরম্ভ করিয়া দেয়। রঙের জোরেই সে আসর জিতিয়া লয়। নিতাই কিছুতেই প্রথম হইতে রঙ আরম্ভ করিবে না। মানুষ কেবল মদই ভালবাসে, দুধে তাহার অরুচি—এ কথা সে বিশ্বাস করে না। যদি অরুচি দেখে তবে মদই সে দিবে। দেখাই যাক না।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খাইয়া নিতাইকে দাঁড়াইতে হইল। মেলার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের জনতা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবিয়ালির চিন্তায় বিভোর হইয়াই নিতাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, হঠাৎ বাঁকের মুখে লোকটার সহিত ধাক্কা বেশ একটু জোরেই লাগিয়াই গেল। লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কানা নাকি? একেবারে হন্যে হয়ে ছুটেছে।

নিতাই অবনত হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—তা অন্যায় হয়ে গিয়েছে ভাই।

লোকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল—অঃ, একেবারে ঠাঁই করে লেগেছে—

নিতাই বলিল—তবে দোষ একা আমার নয়, বেবেচনা ক'রে দেখুন।

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকার মোড়টা ফিরিয়াই মেলা। সারা মেলাটার বিভিন্ন পটি অতিক্রম করিয়া তাহারা মেলার বিপরীত প্রান্তে আসিয়া পড়িল। এখানে আলোকের সমারোহটা কম, কিন্তু লোকের ভিড় বেশী। মেলার এই প্রান্তে একটা গাছের তলায় খড়ের ছোট-ছোট খানকয় ঘর বাঁধিয়া ঝুমুরের দলটি আস্তানা গাড়িয়াছে। আশেপাশে এমনি আরও গোটাকয়েক ঝুমুরের দলের আস্তানা। একপাশে খানিকটা দূরে জুয়ার আসর। তাহারই পর চতুষ্কোণ আকারের একটা খোলা জায়গায় সারি সারি ঘর বাঁধিয়া বেশ্যাপল্লী বসিয়া গিয়াছে। সে যেন একটা বিরাট মধুচক্রে অবিরাম গুঞ্জন উঠিতেছে।

মধ্যে মধ্যে নেশায় উন্মত্ত জনতা উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে ফাটিয়া পড়িতেছে। তেমনি একটা

কোলাহলে নিতাইয়ের গানের কলি দুইটা গোলমাল হইয়া গেল।

বসন্তদের ঝুমুরদলের আস্তানায় ঘরগুলার সামনে গাছতলায় চ্যাটাই পাতিয়া লণ্ঠনের আলোয় প্রৌঢ়া সুপরি কাটিতেছিল—জন দুইয়েক রান্নায় ব্যস্ত ছিল। একটা খড়ের কুঠুরীতে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, মেয়েপুরুষের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরখানা উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে নিতাই চিনিল—বসন্তের হাসি; এমন ধারালো খিল খিল হাসি বসন্ত ভিন্ন কেহ হাসিতে পারে না, অন্তত ঝুমুর দলের কোন মেয়ে পারে না।

নিতাইকে দেখিয়াই প্রৌঢ়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল,—এস, এস, বাবা এস। আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

রন্ধনরতা মেয়ে দুইটি রান্না ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—হাসিমুখে বলিল—এসে গিয়েছ—লাগছে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—এলাম বৈকি।

প্রৌঢ়া বলিল—ওলো, বাবাকে আমার চা ক'রে দে। মুখে হাতে জল দাও বাবা।

একটি মেয়ে বলিল—খুব ভাল করে গান করতে হবে কিন্তুক।

অন্য মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া আলোকোজ্জ্বল কুঠুরীটার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—ওলো! বসন, কবিয়াল আইচে লো। তোর কালো-মাণিক!

নিতাই হাসিয়া সংশোধন করিয়া দিল।—কালো মাণিক নয়, কয়লা-মাণিক।

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার পা টলিতেছে, ডাগর চোখের পাতা ভারী হইয়া নামিয়া আসিতে চাহিতেছে, নাকের ডগায় চিবুকে কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে। সে আসিয়া দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—না, তুমি আমার কালো-মাণিক। আমার মান রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ—তুমি আমার কালো-মাণিক।

নেশার প্রভাবে বসন্তর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খানিকটা আবেগময় হইয়াছিল—কিন্তু সে আবেগ, শেষ কথা কয়টি বলিবার সময় যেন অনেক গুণে বাড়িয়া গেল।

প্রৌঢ়া রহস্য করিয়া বলিল—তা বলে যেন কাঁদতে বসিস না বসন, নেশার ঘোরে!

নেশায় অর্ধনিমীলিত চোখ দুইটি আবার বিস্ফারিত করিয়া বসন এবার খানিকক্ষণ প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ কাঁদব, কালো-মাণিকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দোব। এমন যত্ন ক'রে কে চা ক'রে দেয়—কে গায়ের ধুলা মুছিয়ে দেয়? আজ সারারাত কাঁদব—। বলিতে বলিতেই সে আপনার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিযা বলিল—এই নাগরেরা, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা।

প্রৌঢ়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বসন্তর হাত ধরিয়া বলিল—এই বসন! বসন! ছি! করছিস কি? খদ্দের লক্ষ্মী—তাড়িয়ে দিতে নাই।

বসন প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—তা বলে আমি কাঁদতেও পাব না মাসী, আমি কাঁদতে পাব না?

নিতাই উঠিয়া আসিয়া বলিল,—না কাঁদবে কেনে? ছি।

—তবে তুমিও এস। তুমি গান করবে আমি নাচব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। প্রৌঢ়া বলিল—যাবে। এই এল, চা খেয়ে জিরুক খানিক, তারপর যাবে; তু চল ততক্ষণে।

—চা? না, চা খাবে কি! চা খাবে কেনে? আমার ওস্তাদ আগে মদ খাবে। এস। বসন্ত নিতাইয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিতাই হাত টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড়।

—না।

—মদ আমি খাই না।

—খেতে হবে তোমাকে। আমি খাইয়ে দোব।

—না।

বসন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ খেতে হবে তোমাকে।

প্রৌঢ়া বলিল—মাতলামি করিস না বসন, ছাড়, ঘরে যা।

তেমনি বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিয়া বসন নিতাইকে বলিল—যাবে না তুমি? মদ খাবে না?

—না।

—আমার কথা তুমি রাখবে না?

—এ কথাটি রাখতে পারব না ভাই!

বসন্ত নিতাইকে ছাড়িয়া দিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—বন্ধ কর দেও দরজা।

প্রৌঢ়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—মেয়েটা ওই মদ খেয়েই নিজের সর্বনাশ করলে! এত মদ খেলে কি শরীর থাকে!

নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যে মেয়েটি চা করিতে গিয়াছিল, সে একটা কলাই-করা গ্লাসে চা আনিয়া বলিল—লাও, চা খাও ওস্তাদ।

হাসিয়া নিতাই চায়ের গ্লাসটি লইয়া বলিল,—লক্ষ্মী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই।

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল,—বাঃ, বেশ হয়েছে। নির্মলা, তু ওস্তাদকে দাদা বলে ডাকবি। ভাইদ্বিতীয়েতে ফোঁটা দিবি ওস্তাদকে, কিন্তুক কাপড় লাগবে।

নিতাই পরম প্রীত হইয়া বলিল—নিশ্চয়।

অপর মেয়েটি রান্নাশাল হইতেই বলিল—তা হলে আমি কিন্তুক ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতালুম।

প্রৌঢ়া খুশী হইয়া সায় দিয়া বলিল—বেশ বলেছিস ললিতে, বেশ বলেছিস! বসন তোকে দিদি বলবে।

নিতাইয়ের হাত হইতে চায়ের গ্লাসটা খসিয়া পড়িয়া গেল—ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য। নিতাইয়ের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে। সে দিকটা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইয়ের যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক। সভ্যসমাজের আবর্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও আবিষ্কৃত চির-অন্ধকার—মেরুলোকের মত চির-অন্ধকার। এ ধরনের বীভৎসতার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকা নয়। তবুও এমন করিয়া প্রত্যক্ষ মুখোমুখি হইয়া সে কখনও দাঁড়ায় নাই। সে হাঁপাইয়া উঠিল।

নির্মলা এবং ললিতার ঘরেও আগন্তুক আসিয়াছে। মত্ত জড়িত কণ্ঠের অশ্লীল হাস্যপরিহাস চলিতেছে।

বসন্তের ঘর হইতে সে লোক দুইটা চলিয়া গিয়াছে, আবার নূতন আগন্তুক আসিয়াছে।

প্রৌঢ়া দলের পুরুষগুলিকে লইয়া মদ খাইতে বসিয়াছে। নিতাইকে আবার একবার চা দেওয়া হইয়াছে। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝিকে। ইচ্ছা হইতেছিল—এখনই এখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সে পলাইয়া যায়। কলঙ্ক তো তাহার হইয়াই গিয়াছে, সে কলঙ্কের ছাপ ঠাকুরঝির অঙ্গেও লাগিয়াছে।

হয়তো তাহার স্বামী এজন্য তাহাকে পরিত্যাগই করিবে—বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। দশের ভয়ে তাব বাপও হয়তো তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। আজ তাহার সব লজ্জা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘর ভাঙিতে আর বাকী নাই। ভাঙিয়াই গিযাছে। তার আর ভয় কেন? আজ তো নিতাই গিয়া ঠাকুরঝির হাত ধরিয়া বলিতে পারে—'এস, আজ হইতে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি।' নিতাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—চলিয়াই সে যাইবে, ইহাদের এই মেলার গানের আসর সারিয়া চালিয়া যাইবে। কিন্তু গ্রামে নয়, অন্য যেখানে হোক—এত বড় দুনিয়ায় যেদিকে মন চায় সেই দিকে চলিযা যাইবে। মুহূর্তে পূর্বের চিন্তা কল্পনা সব তাহার পালটাইয়া গিয়াছে—না না, সে হয় না। ঠাকুরঝির ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিবে, তাহার সুখের সংসার আবার সুখে ভরিয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি তাহাকে ভুলিয়া যাক। না দেখিলেই ভুলিয়া যাইবে। সন্তানসন্ততিতে তাহার কোল ভরিয়া উঠুক, সুখে সম্পদে সংসার উথলিয়া পড়ুক, স্বামী সন্তান সংসাব লইয়া সে সুখী হোক।

চৌদ্দ

বিগত রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র চোখেই সে যাপন কবিযাছিল। কিছুতেই ঘুম আসে নাই। ভোরে উঠিয়াই সে ঝুমুর দলের আস্তানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারিপাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমায রাসোৎসব মেলা, দীঘিব পূর্ব দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির, পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া, মুখ হাত ধুইয়া নিতাই সেই রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গিয়া বসিল। রাসমঞ্চে অষ্টসখীপবিবৃতা রাধাগোবিন্দকে তাহার বড় ভাল লাগিল। সেখানেই বসিয়া সে গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপেব স্তবগান। প্রথমে গুন গুন করিয়া গানখানির রচনা শেষ করিয়া—বেশ গলা ছাড়িযা গান আরম্ভ করিল। মিষ্ট গলার গানে বেশ কয়েকজন লোকও জমিয়া গেল। আখড়ার মোহন্তও বাহির হইযা আসিলেন।

নিতাই গাহিতেছিল—

"আশ মিটায়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী!"

মোহন্ত চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে দিতে একজনকে বলিলেন— খোল আন তো বাবা!

মোহন্ত খোল লইয়া নিজেই সঙ্গত আবম্ভ করিয়া দিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন—তোমার কণ্ঠটি বড় তো ভাল। পদাবলী জান বাবা?

নিতাই পদাবলী কথাটা বুঝিল না। বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

—মহাজন পদাবলী বাবা—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের পদ?

নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল,—প্রভু, অধীনের অধম নীচ কুলে জন্ম। এ সব কি করে জানব বাবা?

হাসিয়া মোহন্ত বলিলেন,—জন্ম তো বড নয় বাবা, কর্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।

মুহূর্তে নিতাইয়ের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল—কর্মও যে অতি হীন প্রভু; ঝুমুর দলে—বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি।

—কবিগান কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

—যে গান তুমি গাইলে, সে কি তোমার গান?

মাথা নত করিয়া সলজ্জ হইয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহন্ত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—ভাল ভাল! চমৎকার গান। তারপর বলিলেন —কর্ম তোমার তো অতি উচ্চ কর্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি। যাঁরা কবি, তাঁরাই তো সংসারের মহাজন, তাঁরাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন।

টপ টপ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—কিন্তু সঙ্গ যে অতি নীচ সঙ্গ বাবা, বেশ্যা—

মোহন্ত হাসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিতাইকে বাধা দিলেন, বলিলেন—প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নেই বাবা। নিজে, পরে নয়—নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা? সূর্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী?

নিতাই বিল্বমঙ্গলের কাহিনী জানিত। গ্রামের বাবুদের থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল পালা শেষ দেখিয়াছে। সে বলিল—হ্যাঁ। কাহিনীটা সব তাহার মনে পড়িয়া গেল।

মোহন্ত সস্নেহে বলিলেন—তবে?

নিতাই ফিরিয়া আসিল—অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গান-বাজনায় নাচে সুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া কবিয়াল নিতাই বাহিরে তাহাদের খাতির করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণাই সঞ্চিত ছিল। আজ এই মুহূর্তে সেটুকুও যেন মুছিয়া গেল। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কাপড়ের খুঁটে সে চোখ মুছিল আর মনে মনে বাবাজীকে প্রণাম করিল। মনে মনে সংকল্প করিল, গোবিন্দের প্রসাদের সঙ্গে সে বাবাজীর প্রসাদকণাও চাহিয়া লইবে।

ঝুমুর দলের আস্তানায় আসিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এও বুঝি গোবিন্দের কৃপা।

আশ্চর্য! আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গত রাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নাই। সমস্ত স্থানটা গোবরমাটি দিয়া অতি পরিপাটীরূপে নিকাইয়া ফেলা হইয়াছে। গাছতলায় একটি কলার পাতায় অনেকগুলি ফুল। মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছে; সকলের পরনেই লালপাড় শাড়ী—একটি নিবিড় এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্বত্র পরিস্ফুট।

বসন্ত পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, নির্মলা ও ললিতা বসিয়া ছিল এইদিকে মুখ ফিরাইয়া। তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বেশ মানুষ যা হোক তুমি। এই এত বেলা পর্যন্ত কোথা ছিলে বল দেখি?

বসন্ত মুখ ফিরিয়া চাহিল। নিতাই মৃদু হাসিল। বসন্ত মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরক্ষণেই সে উঠিয়া রান্নাশালে চলিয়া গেল। নিতাই আসিয়া নির্মলা ও ললিতার কাছে বসিয়া বলিল—বাঃ ভারি ভাল লাগছে কিন্তুক; চারিদিক নিকানো, তোমরা সব চান করেছ, লালপেড়ে কাপড় পরেছ—

হাসিয়া নির্মলা বলিল—আজ যে লক্ষ্মীপুজো গো দাদা।

—লক্ষ্মীপুজো?

—হ্যাঁ। পূর্ণিমে, বেরস্পতিবার, আমাদের বারোমেসে লক্ষ্মীপুজো আজ।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। এতদিন মেলামেশা করিয়াও এ কথাটা সে জানিত না। ইহাদেরও ধর্মকর্ম আছে। সে প্রশ্ন করিল—কখন হবে লক্ষ্মীপুজো?

—সেই সন্ধ্যেবেলায়। আজ তোমার পালা আরম্ভ হতে সেই ল'টার আগে লয়।

প্রৌঢ়া বলিল—বাবা আমার ভক্তিমান লোক। ভাল লোক।

ললিতা বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—লোক ভাল, কিন্তুক পাল্লা মোগলের। খানা—

প্রৌঢ়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।

বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি গ্লাস। গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—লাও।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি?

মুখ মচকাইয়া বসন বলিল—মদ লয়, ধর!

নিতাই গ্লাসটি লইয়া দেখিল—সদ্য-প্রস্তুত ধূমায়িত চা।

ললিতা হাসিয়া বলিল—বুঝে-সুঝে খেও ভাই জামাই; বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে।

বসন্ত চলিয়া যাইতেছিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আগুন পোড়ারমুখে!

নিতাই হাসিয়া কথাটা নিজের গায়ে লইয়া বলিল—তাই দাও ভাই, কয়লার ময়লা ছুটে যাক। আগুনের পারা বরণ হোক আমার। জান তো?

"আগুনের পরশ পেলে কালো কয়লা রাঙা বরণ।"

ললিতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—যাও কেনে, আগুনের শীষ তো জ্বলছেই, গায়ে গায়ে পরশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এস!

বসন্তের চোখে ছুরির ধার খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে সে হাসিয়া বলিল—মদ জ্বলে দেখেছিস? বলিয়া নিজের দেহখানা দেখাইয়া সে বলিল—এ হল মদের আগুন। বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রির কথা; সে হাসিল।

ইহার মধ্যেই নিতাই বসন্তের হইয়া গিয়াছে। বসন্ত জানিয়াছে নিতাই তাহার।

মেয়েদের সেদিন সমস্ত দিন উপবাস। সে উপবাস তাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ও ফুল, ধূপ, দীপ নানা আয়োজনে পরম ভক্তির সহিত তাহারা লক্ষ্মীপূজা করিল। পূজাশেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল। নিতাই অদূরেই বসিয়া ছিল। অপর পুরুষগুলি দূরে মদ্যপান করিতে বসিয়াছে। মদ খাইতে খাইতেই তাহারা রাত্রির আসরের জন্য সাজসজ্জা করিতেছে। বেহালাদার বেহালাব পরিচর্যায় ব্যস্ত; বার্নিশের শিশি, তার, রজন লইয়া বসিয়াছে। দোহারটা ঢুলীর সহিত তাল লইয়া তর্ক বাধাইয়াছে। হাতে তাল দিতেছে, আর বলিতেছে—এই—এই—এই ফাঁক। বাজনদার আপন মনেই বাজাইয়া চলিয়াছে। দোহারের কথা গ্রাহ্য করিতেছে না।

মহিষের মত লোকটা মদের ঝোঁকে ঝিমাইতেছে। সম্মুখে জ্বলিতেছে ধুনী। অগ্নিকুণ্ডে মোটা মোটা কাঠের চ্যালা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লাল আগুনের শিখা জ্বলিতেছে। লোকটা ঝুমুর দলের পাহারাদার। চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অদূরে মেয়েদের আসর। তাহারই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছিল।

ব্রতকথা শেষ হইল। হুলুধ্বনি দিয়া সকলে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। তারপর প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল যে যাহার আপন ঘরে। অর্থাৎ ওই খড়ের কুটুরিতে। প্রৌঢ়া পুরুষদের ডাকিয়া বলিল—যাও সব, প্রসাদ লও গা। অর্থাৎ নাও গে যাও।

নিতাই একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল। বসন নিজের ঘরে ঢুকিবার মুখে দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল—শোন!

—আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ।

আজ এই নিষ্ঠাবতী বসন্তের কাছে যাইতে নিতাইয়ের এতটুকু সঙ্কোচ হইল না। ঘরে ঢুকিয়া সে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহমধুর হাসি হাসিয়া বলিল—কি বলছ বল।

বসন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ চোখ নামাইয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিল—একটু প্রসাদ খাও। বলিয়াই সে পরিপাটি করিয়া ঠাঁই করিয়া একখানি পাতায় ফলমূল সন্দেশ সাজাইয়া দিল। বসনের এই নূতন রূপ দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল; সেই বসন এমন হইতে পারে।

নিতাই আসনের উপর বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে বলিল—জয়জয়কার হোক তোমার।

বসন বলিল—এক টুকরো পেসাদ রেখো যেন।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—পেসাদ?

—হ্যাঁ, নাগরের পেসাদ খেতে হয়। সে হাসিল। বসনের মুখের এমন হাসি নিতাই কখনও দেখে নাই। সে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন জিনিসপত্র গুছাইবার অজুহাতে তাহার দিকে পিছন ফিরিল। গুনগুন করিয়া সে গান করিতেছিল। নিতাই সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

"তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।"

—বা! বা! বা! এমন গান! নিতাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

"কহে চণ্ডীদাস—"

—কি? কি? বসন! চণ্ডীদাস কি?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসন বলিল—মহাজনের গান—চণ্ডীদাসের পদ যে।

—চণ্ডীদাসের পদ তুমি জান?

—জানি। বসন্ত হাসিল। আমাদের গানের খাতায় কত পদ নেখা আছে।

পনেরো

রাত্রি নয়টায় পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের গান, মহাজনের পদ নাই। আকাশ আর পাতাল। রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মেলার নৈশ-আনন্দ-সন্ধানী মানুষের জনতার মধ্যে নগ্ন জীবনের প্রমত্ত তৃষ্ণার গান। বক্ষোভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মদ্যরসে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম আসর পাইয়াছিল বিপক্ষ দল। সে-দলের কবিয়ালটি রঙ-তামাশায় দক্ষ লোক। আসরে নামিয়াই সে নিজে হইল বৃন্দে-দূতী—নিতাইকে করিল কৃষ্ণ; পালা ধরিল মানের। অভিমানিনী নায়িকার দূতীরূপে সে গানে কৃষ্ণকে গালাগালি আরম্ভ করিল। ধুয়া ধরিল—

"কা-দা জা-মের বো-দা—কষের রসে ওলো মজেছে কালা,
আমের গায়ে মিছে—ধরিল রঙ—মিছে সুবাস ঢালা।
চন্দ্রবলী কাদা জাম—
রাধে আমার পাকা আম—"

তাহার পরই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সহিত তুলনা উপলক্ষ্য করিয়া সে বসনের রূপ-গুণের অশ্লীল বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে লোকটার

ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল। এ দলের পুরানো কবিয়াল, বসন্তের চড় খাইয়া যে দল ত্যাগ করিয়াছে, সেই লোকটাই বসন্তের প্রতিটি দোষ ও খুঁতের সংবাদ এই দলের কবিয়ালকে দিয়াছে। কবিয়াল বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া চন্দ্রাবলীর খেউড় গাহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করিল বিপক্ষ দলের মেয়েগুলি। তাহারা পর্যন্ত বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া নাচিল।

নিতাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই খেউড়ের আসরে তাহার গান জমিবে না, জমাইতে সে পারিবে না। খেউড় তাহার যেন আসে না। মুখে যেন বাধে। কিন্তু শঙ্কা তাহার নিজের পরাজয়ের জন্য নয়। সে বসন্তের কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। যে মেয়ে বসন্ত। একদণ্ডে সে আগুন হইয়া উঠে। আসরে সে একটা কাণ্ড না করিযা বসে। বার বার সে বসন্তের মুখের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু এই পাল্লার ক্ষেত্রে আশ্চর্য ধৈর্য বসন্তের, চুপ করিয়াই বসন্ত বসিযা আছে—যতবার নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলিল, ততবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে নিতাইয়েব ভুল হইল না, হাসিয়া বসন্ত ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছিল—শুনছ? এর শোধ দিতে হবে; নিতাইয়ের মনে পড়িল গতরাত্রের কয়টি কথা, বসন্ত তাহাকে প্রথম সম্ভাষণেই বলিয়াছে—কয়লা-মাণিক লয়, তুমি আমার কালোমাণিক। আমার ছিদ্র কুম্ভে জল রেখেছ, আমার মান বেখেছ তুমি।

বসন্তকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। নাচেব আসরের সাজসজ্জা কবিবার তাহার অবকাশ হয় নাই; এলোচুলই পিঠের উপর পড়িয়া আছে, লালপেড়ে তসরের শাড়ীখানিই সে একটু আঁটসাট করিয়া পরিয়াছে; সকলের চেয়ে ভাল লাগিতেছে তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টি। মেয়েরা আজ কেহই মদ খায় নাই, সেও খায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য! বসনেব চোখের দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টির চেযে সাদা মনে হইতেছে। অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের। চোখে মদের নেশায় আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মতো রাঙা এবং ধারালো হইয়া উঠে। আবার সুস্থ বসন্তেব চোখ দেখিয়া মনে হইতেছে— এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।

বিপক্ষ দলের ওস্তাদ গান শেষ কবিয়া বসিল। আশেপাশে শ্রোতার দল জমিয়াছিল, পচা মাছের বাজারে মাছির মত। পয়সা-আনি-দুয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা ততক্ষণে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে, গোটা টাকাও পড়িয়াছে দুই তিনটা। গান শেষ হইতেই শ্রোতারা হরিবোল দিয়া উঠিল—হরি হরি বল ভাই। বিচিত্র, ইহাই উহাদেব সাধুবাদ।

পাশেই সস্তা তেলেভাজা ও মাংসের দোকান—মদও বিক্রি হয় গোপনে—সেখানে আর এক দফা ভিড় জমিয়া গেল—এবং দলের দুইটা মেয়েকে লইয়া দোকানের ভিতর চেয়ার টেবিলে আসর করিয়া বসাইয়া কয়েকটি শৌখিন চাষী খাবার খাইতে বসিয়া গেল।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মা-চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া নিতাই উঠিল। কিন্তু হাত-পা তাহার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে; —এই এত বড় মদ্য-তৃষাতুর জনতা, ইহাদের কি দিয়া সে তৃপ্ত করিবে? অনেক ভাবিয়া সে গান ধরিল—

"মদ সে সহজ বস্তু লয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধা—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে খানায় পড়ে রয়!"

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল কূটবুদ্ধি; এবং বড় শক্তি হইল গলাবাজি, অর্থাৎ জোর করিয়া আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়-কে নয়, এবং নয়-কে হয় করিয়া গলার জোরেই কবিয়ালরা জিতিয়া যায়। বুদ্ধি করিয়া অশ্লীল রসের গালিগালাজ বাদ দিয়া নিতাই সেই চেষ্টা করিল। সে ধরিল—

"বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ,
নয় অকারণ—কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

'নতুবা ওগো মাতাল বৃন্দা, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর নিন্দা করিতে না। চন্দ্রাবলী কে? যে রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। যে কালী, সে-ই কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আগে তেঁতুল খাও, মাথায় জল দাও—নেশা ছুটাও, তারপর চন্দ্রাবলীর দিকে চাও। দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যেই চন্দ্রাবলী। রাধাতন্ত্রের মানের পালার দশ পৃষ্ঠার দশম লাইন পড়িয়া দেখিও।' তারপর সে আরম্ভ করিল—চন্দ্রাবলীর রূপবর্ণনা। অর্থাৎ বসন্তের রূপকেই সে বর্ণনা করিল। একেবারে সপ্তম স্বর্গের বস্তু করিয়া তুলিল। বসন্ত নাচিতেছিল। সুস্থ দেহ মনে আজ সে বড় ভাল নাচিতেছিল; —কিন্তু রূপ-যৌবন আজ কামনাময় লাস্যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। সেটা নেশার অভাবেও বটে এবং নিতাইয়ের গানে ঐ রসের অভাবও বটে! শুধু বসন্তের নাচই নয়, ক্রমে ক্রমে আসরটা ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; জনতা কমিয়া আসিতে শুরু হইল। দুই-চারিজন যাইবার সময় বলিয়া গেল—দূর!

তাহাদের থালায় প্যালা পড়িল না বলিলেই হয়।

প্রৌঢ়া কয়েকবার নিম্নস্বরে নিতাইকে বলিল—রঙ চড়াও, ওস্তাদ, রঙ চড়াও।

ঢুলিদার বসন্তের কাছে গিয়া বলিল,—একটুকুন হেলেদুলে, চোখ একটুকুন খেলাও!

বসন্ত চোখ খেলাইবে কি, চোখ ভরিয়া তার বার বার জল আসিতেছে। হেলিয়া দুলিয়া হিল্লোল তুলিবে কি, দেহ যেন অবসাদের ভারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আসরে নামিয়া শ্রোতাদের এমন অবহেলা তাহাকে বোধ করি কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইয়ের গানের তত্ত্বকথায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে লোকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। নিতাইয়ের ধর্মকথার জলো রসে তাহার নাচে রঙ ধরিতেছে না। সর্বোপরি দলের পরাজয়টাই তাহার কাছে মর্মান্তিক হইয়া উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী রূপ-পসারিনী তাহারা, দেহ ও রূপ লইয়া তাহাদের অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্যাদা নয়। কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের অহঙ্কারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ ও রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়। তাই ইহাদের জীবনের সকল মর্যাদা পুঞ্জীভূত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে নৃত্যগীতের অহঙ্কারটুকুকে আশ্রয় করিয়া। ওই দুইটা বস্তুই যে তাহাদের জীবনের এক মাত্র সত্য—সে কথা তাহারা বুঝে। তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে ভাল নাচ-গানের যে কদর—তাহা মেকী নয়। হাজার মানুষ চুপ করিয়া শোনে তাহাদের গান, বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তাহাদের রূপের মধ্যে বিচিত্র এক অপরূপের অভিব্যক্তি। মরুভূমির মত জীবনের ওইটুকুই তাহাদের একমাত্র শ্যামল সজল আশ্রয়কুঞ্জ। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধেই তাহারা অগণ্য শ্রোতার উপস্থিতিতে নগণ্য করিয়া মাথা তুলিয়া নাচে, গায়। সমাজে গণমান্য প্রতিষ্ঠানসম্পন্ন লোকের সঙ্গেও অকুণ্ঠিত দাবিতে গানের তাল মান লইয়া তর্ক করে। খেউড় কবির দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউড় না জানিলে এ দলে গাওনা করার অধিকারই হয় না। মাসী বলে—কত বড় বড় মুনি ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া—শেষ তাহাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউড় ছোট জিনিস কিসে? আজ দলের পরাজয়ের সঙ্গে—সেই মর্যাদা ধুলায় লুটাইয়া পড়িতেছে বলিয়া অবসাদে বসন্ত যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। জিতিতে হইলে কবিয়াল ও নাচওয়ালী দুজনকে একসঙ্গে জিতিতে হইবে। একজন জিতিবে, একজন হারিবে—তাহা হয় না।

কোনমতে গান শেষ করিয়া পরাজয়ের বোঝার ভারে মাথা হেঁট করিয়া নিতাই বসিল। ঢোলের বাজনার তেহাই পড়িল—বসন্তও নাচ শেষ করিল। নাচ শেষ করিয়া আসরে সে আর বসিল না; শান্ত অথচ ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। প্রৌঢ়া দলনেত্রী তাহার দিকে চাহিয়া কেবল প্রশ্নের সুরে ডাকিয়া বলিল—বসন?

বসন ফিরিয়া দাঁড়াইল, বলিল—শরীর খারাপ করছে মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিল, বলিল—দেখ না, দোসরা আসরে বাবা আমার কি করে।

বসন্ত নিতাইয়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল। নিতাই দেখিল—সে চোখে তাহার ক্ষুরের ধার। পরমুহূর্তেই বসন্ত বাহির হইয়া গেল।

প্রৌঢ়া কিন্তু অদ্ভুত। সে যেন এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দলের বেহালাদারকে নির্বিকার ভাবে বলিল—প্যালার থালাটা আন।

লোকটি প্যালার থালা আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—কয়েকটা দোয়ানীর বেশী আর পড়ে নাই। সবসুদ্ধ দু টাকাও হইবে না।

প্রৌঢ়া বলিল—গুনে দেখ কত আছে। তারপর সে পানের বাটাটা টানিয়া লইয়া বলিল—মেলার আসর, রঙ-তামাসা-খেউর-খোরাকী লোকেরই ভীড়। নইলে বাবার গানে আর ওই ফচকে ছোঁড়ার গানে? গান তো বোঝ তুমি, তুমিই বল কেনে?

বেহালাদার বলিল—তা বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন না গাইলে হবে কেনে বল? রঙের গানও তো গান।

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল—একশো বার! রঙ ছাড়া গান, না গান ছাড়া রঙ। একটা মোটা পান মুখে পুরিয়া সে আবার বলিল—ওস্তাদের মার শেষ আসরে। দেখ না, বাবা আবার কি করেই দেখ না!

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

নির্মলা, ললিতা মেয়ে দুইটির মুখেও হাসি নাই, পরস্পরে তাহারা মুখভার করিয়াই কথা বলিতেছে—বোধ হয় এই হারজিতের কথাই হইতেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই মাথা হেঁট করিল। সকলের লজ্জা যেন জমিয়া বোঝা হইয়া তাহার মাথার উপর প্রচণ্ড ভাবে চাপিয়া বসিতেছে। শুধু তো লজ্জাই নয়, দুঃখেরও যে তাহার সীমা ছিল না। খেউড় যে তাহার কিছুতেই আসিতেছে না।

ওদিকে বিপক্ষ দলের ঢুলী বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল; লোকটার বাজনার মধ্যে যেন জয়ের ঘোষণা বাজিতেছে। বাজানোর ভঙ্গির মধ্যেও হাতের সদম্ভ আস্ফালন। ও-দলের কবিয়ালেরা বোধ হয় বাহিরে ছিল—সে একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে ছুটিয়া আসরে আসিয়া প্রবেশ করিল—

"হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি?"

'কুকরী আর ময়ূরী, সিংহিনী আর শূকরী শিমুলে আর বকুলে কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী—তফাৎ নাইক, একই!' ইহার পরই সে আরম্ভ করিল অশ্লীলতম উপমা। সঙ্গে সঙ্গে আসরে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ বহিয়া গেল। লোকে হরিবোল দিয়া উঠিল। এবার লোকটা একটু থামিয়া এর সর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"আ—কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জ্বেলে দে গো—
টিকেয় আগুন দিয়ে রাখে তামুক খেয়ে লে গো।"

অর্থহীন উপমায় যে কোন প্রকারে কতকগুলো গালিগালাজ দিয়া এবং অশ্লীল কদর্য ভাব ও উপমার অবতারণা করিয়া সে আসরটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই জমাইয়া তুলিল।

নিতাই আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ও-দলের একটি মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজেই আখর দিয়া গাহিতে উঠিল—

"ধর—ধর ধর কালাচাঁদে, পলায়ে যে যায় গো!
একা আমি ধরতে লারি সবাই মিলে আয় গো।"

আসরে একটা তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। নিতাই কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না। সে হাসিমুখেই মেয়েটির এই তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিয়া বলিল—ভাল, ভাল! ভাল বলেছ তুমি!

আসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিতাই ঝুমুর দলের আস্তানায় বসন্তের খুপরির দুয়ারে দাঁড়াইল। খড়ের আগড়টা আধখোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ভিতরে একটা লণ্ঠন মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে। বাহিরে খোলা আকাশের তলায় উঠানে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে সেই একটা অগ্নিকুণ্ডই উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছে এবং তাহারই সম্মুখে মহিষের মত প্রচণ্ডকায় লোকটা পূর্ণ-উদর হিংস্র কোন পশুর মত বাসা আগলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। পদশব্দে সে ফিরিয়া চাহিল, এবং নিতাইকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া ঝিমাইতে লাগিল। নিতাই বসন্তের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল, ঢুকিতে সাহস করিল না। দেহ-ব্যবসায়িনীর ঘর। সে বাহির হইতেই ডাকিল—বসন?

—কে? ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে বসন্ত উত্তর দিল।

—আমি নিতাই। রসিকতা করিয়া 'কয়লা-মাণিক' বলিতে তাহার মন উঠিল না।

—কি?

—ভেতরে যাব?

—কি দরকার?

—একটু'ন কাজ আছে।

মুহূর্তে বসন্ত নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর অস্থির ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল, ঠিক খাপ হইতে একটানে বাহির হইয়া আসা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণ দীপ্তিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল। নিতাই দেখিয়া শঙ্কিত হইল। আজিকার অপরাহ্ণের পূজারিণী, শান্ত স্নিগ্ধ নম্র সে বসন্ত আর নাই, এ সেই পুরানো চেনা বসন্ত। তাহার সর্বাঙ্গে ক্ষুরের ধার ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রাঙা আলোর প্রতিচ্ছটায় সে যেন রক্তাক্ত! সে ফিরিয়া আসিয়া মদ খাইয়াছে। চোখে ছটা বাজিতেছে।

বসন্ত বলিল—আমি যাব না। আমি যাব না। কেনে এসেছ তুমি?

নিতাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ কঠিনতম আক্রোশে বসন্ত তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিল, বলিল—ন্যাকার মত আমার সামনে তবু দাঁড়িয়ে! কেনে, কেনে, কেনে? প্রশ্নই করিল, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করিল না। মুহূর্তে যে অধীর অস্থির গতিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেই গতিতেই সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এই আঘাত করিয়াও যেন তাহার ক্ষোভ মেটে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সে নিজের কপালে কয়টা চাপড় মারিল, তাহার শব্দটাই সে কথা বলিয়া দিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর সেই আগলদার লোকটার কাছে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—পালোয়ান!

লোকটা দলের মধ্যে পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। নেশায় ভাম লোকটা রাঙা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিল মাত্র, কথার উত্তর দিল না। সম্মুখের কয়টা দাঁত শুধু বাহির হইয়া পড়িল।

নিতাই বলিল—তোমার কাছে মাল আছে? মদ?

নিরুত্তর লোকটা এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। বোতলটা হাতে করিয়াও নিতাই একবার ভাবিল—তারপর এক নিঃশ্বাসে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল।

বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া গেল। সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করিয়া উঠিল; দুর্দমনীয় বমির আবেগে—সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে আবেগ রোধ করিল। ধীরে ধীরে আবেগটা যখন নিঃশেষিত হইল তখন একটা দুর্দান্ত অধীরতাময় চঞ্চল অনুভূতি তাহার ভিতরে সদ্য জাগিয়া উঠিতেছে। সে তখন আর এক মানুষ হইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও আর এক পৃথিবী হইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য!

সব যেন দুলিতেছে; ভিতরটা জ্বলিতেছে; দুনিয়া যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে! সে এখন সব পারে। সে-কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি মদের স্পর্শে—জলের স্পর্শে মহামারীর বীজাণু মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে।

আবার সে খানিকটা মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

দ্বিতীয়বার আসরে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার রূপটাই পালটাইয়া গিয়াছে। সে আব এক মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। নীতিকথাগুলো ভুলিয়াছে, পাপপুণ্য লইয়া হিসাবনিকাশ ভুলিয়াছে, হা-হা করিয়া অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হইবে না কেন? সামাজিক জীবনে মানুযের যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু কদর্য, যাহা কিছু উলঙ্গ অশ্লীল তাহাই আবর্জনা-স্তূপের মত সেখানে জমা হয়, সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহার জন্ম। দারিদ্র্য ও কঠিন দাসত্বের অনুশাসনেব গণ্ডীর ভিতর বহু যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, সে তাহাদেরই সন্তান। মা সেখান অশ্লীল গালিগালাজে শাসন করে; উচ্ছ্বসিত স্নেহে অশ্লীল কথায় আদর করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, কদর্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালির চর্চা কবিয়া সে-সব সে এতদিন ভুলিতে চাহিয়াছিল। সে-সবের উপর একটা অরুচি, একটা ঘৃণা তাহার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের কাছে আঘাত খাইয়া সেই আঘাতে ক্ষোভে নির্জলা মদ গিলিয়া সে উন্মত্ত হইয়া গেল। মদের নেশার মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভে অর্জন করা সব কিছুকে ভুলিয়া সে উদগীরণ করিতে আরম্ভ করিল জান্তব অশ্লীলতাকে। ছন্দ এবং সুরে তাহার অধিকার ছিল, কণ্ঠস্বব তাহার অতি সুমিষ্ট; দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল।

আসবে ঢুকিবার মুখেই সে কবিয়ালসুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে দোহারদের ডাকিয়া কহিল—দোহারগণ!

সবিস্ময়ে সকলে তাহাব দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওই অপ্রস্তুত হওয়ার পর নিতাই যে আবার ফিরিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। তাহারা সাড়া দিতে ভুলিয়া গেল।

ভুলিল না মাসী। সে চতুরা। সে মুহূর্তে সাড়া দিল—বল ওস্তাদ!

নিতাই বলিল—

ধর্ম কথায় যখন মন ওঠে না—বসে না—তখন দিতে হয় গাল।
ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল!
যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল—
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জাল!

ওদিকের কবিয়ালটা রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল—বলিহারি কালাচাঁদ, টিকেয় আগুন দিয়েছ লাগছে, তেতেছ!

নিতাই বলিল—এমন তেমন তাতা নয় বিন্দে, জ্বলছি! সেই জ্বালাতে তোকে বলছি—শোন্! সহজে তো তুই শুনবি না!—দোহারগণ!

—হাঁ—হাঁ।

নিতাই শুরু করিল—

বুড়ী দূতী নেড়ী জুত্তি ছাড়া নয় সায়েস্তা
ছড়ির বাড়ি মারলে ভাবে এ কি আমার সুখ অবস্থা!

বুড়ীকে ছড়ি মেরে কিছু হয় নাই। এবার লাগাও জুতি—লাগাও পয়জার! তারপর প্রৌঢ় লোকটার মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—বুড়ীর কোঁচকা মুখে টেরীর বাহার দেখুন, তেলকের বাহার দেখুন—

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখে রসকালি কাটিস নে!
রসের ভিয়েন জানিস নেকো গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে!

তারপর তার মুখের কাছে আঙুল নাড়িয়া বলিল—

ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে!

আসরে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর জমিয়া গিয়াছে। সে নিজেও সেই জম-জমাটের মধ্যে হারাইয়া গিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সে গান ধরিল—

বুড়ী মরে না—মরণ নাই!
হায়—হয়!

গানের সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল।

বুড়ী খানকী নেড়ী কুটনী মরে নাই, মরে নাই
ও হায়, তার মরণ নাই—মরণ নাই!

তাহার পর একটার পর একটা অশ্লীল বিশেষণ তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতাদের অট্টহাসিতে রাত্রিটা যেন কাঁপিতেছে, সমস্ত আসর এবং আলো তাহার চোখের সম্মুখে দুলিতেছে। একটা মানুষ দুইটা বলিয়া বোধ হইতেছে। ওই তো দুইটা নির্মলা, ওই তো দুইটা ললিতা; ওই তো বাজাইতেছে দুইটা বায়েন; মাসীও দুইটা হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অকস্মাৎ একসময়ে সে দেখিল—বসন্তও দুইটা হইয়া নাচিতেছে! বাহবা—বাহবা—সে কি নাচ! বসন্ত কখন আসিয়া আসরে নামিয়া নাচিতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া দিয়া টলিতে টলিতে সে বসিল। এবার তাহাদের প্যালার থালাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এবার বিপুল কলরবে হরিধ্বনি উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া দিল—বাবা আমার! এই দেখ, মাল না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়? যে বিয়ের যে মন্তর! বসন, বাবাকে আমার আর এক পাত্য দে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

বসন! এতক্ষণে নিতাই স্থির দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

নিতাইয়ের চোখ রক্তমাখা, পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী দুলিতেছে; শঙ্কা সঙ্কোচ, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে জয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাসে। বসন্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। সে চোখে তাহার কামনা ঝরিতেছে। নিতাইয়ের বুকেও কামনা সাড়া দিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য বসন্ত! সে হাসিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে নিতাইয়ের গালে চড় মারিয়া যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে, তাহার জন্য এখন সে একবিন্দু লজ্জাও বোধ করিতেছে না; বরং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার চোখ মুখ ঝলমল করিতেছে, নিতাইয়ের গরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

—দাও, পাত্য দাও। নিতাই হাসিল।

—এস, ঘরে এস, ভাল মদ আছে—বেলাতী। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া গরবিনীর মত তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ঘরে কাচের গেলাসে বিলাতী মদের সঙ্গে জল মিশাইয়া বসন্ত নিতাইকে দিল। নিঃশব্দে

গেলাসটি শেষ করিয়া নিতাই বসনের দিকে চাহিয়া হাসিল। এ বসন্ত যেন নূতন বসন্ত; নিতাইয়ের নেশার ঘোর ঝলমল করিয়া উঠিল।

সে আবার হাত বাড়াইল। তাহার তৃষ্ণা জাগিয়াছে। বলিল—দাও তো, আমাকে আর এক গেলাস দাও।

বসন্ত হাসিয়া আবার অল্প একটু তাহাকে দিল। সেটুকুও পান করিয়া নিতাই বলিল—দাঁড়াও, তোমাকে একটুকুন দেখি।

বসন হাসিয়া বলিল—না, চল আসরে চল।

—না। দাঁড়াও। সে বসন্তর হাত চাপিয়া ধরিল।

বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়—লজ্জা তাহাদের থাকে না, থাকিলে চলে না। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধুলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে। বসন্ত তাহাদের মধ্যেও আবার লজ্জাহীনা। সেই বসন্তের মুখ তবু আজ রাঙা হইয়া উঠিল।

এবং আরও আশ্চর্যের কথা; মুহূর্ত পরেই তাহার চোখে জল দেখা দিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। নিতাই সবিস্ময়ে বলিল—তুমি কাঁদছ কেনে?

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বসন্ত বলিল,—না, আমাকে তুমি দেখো না। এক পা সে পিছাইয়াও গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুই পা আগাইয়া আসিয়া নিতাই বলিল—কেনে?

বসন্ত বলিল—আমার কাসরোগ আছে! মধ্যে মধ্যে কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জ্বর হয় দেখ না? টপ টপ করিয়া বসন্তের চোখ হইতে এবার জল ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল।

—হোক। নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে; উচ্ছৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল! সে রূপ ঠাকুরঝি কখনও সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ্য করিবার সাহস আছে। নিতাইকে অগ্রসব হতে দেখিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে প্রসন্ন মুখে সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এবং নিতাইয়ের বাহুবন্ধনেব মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পিষ্ট হইতে হইতে সে মৃদুস্বরে গাহিল।

"বধু, তোমাব গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে।
ত্যেজি' জাতি-কূল বরণ কৈলাম তোমাবে সঁপিয়া দে'।"

নিতাইয়ের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। গান শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—এ কি গান! তাহার নেশা যেন ফিকা হইয়া যাইতেছে। এ কি সুর! তাহার স্খলিত হাত দুইখানা বসন্ত নিজেই নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া আবার গাহিল—

"পরাণ-বঁধুয়া তুমি,
তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি।"

অপূর্ব! অপূর্ব লাগিল নিতাইয়ের; চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করিল—কোথা শিখলে এ গান? এ কোন্ কবিয়ালের গান?

হাসিয়া বসন্ত দুইটি হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া গাহিল—

"যে হলো সে হলো—সব ক্ষমা কর বলিয়া ধরিল পায়,
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।"

গান শেষ করিয়া সে বলিল—মহাজনের পদ গো।

অধীর মত্ততার মধ্যেও নিতাইয়ের অন্তরের কবিয়াল জাগিয়া উঠিল। সে বসন্তের দুই হাত নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে শিখাবে?

বসন্ত আবেগভরে নিতাইয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল।

ষোলো

সকালে নিতাই যখন উঠিল, তখন তাহার জিভের ডগা হইতে বুকের ভিতর পর্যন্ত তেতো হইয়া উঠিয়াছে; কপাল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বালা করিতেছে। নিজের নিঃশ্বাসেরই একটা বীভৎস দুর্গন্ধ নিজের নাকে আসিয়া ঢুকিতেছে। সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদাক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত, বিষে বিষাক্ত। শীতের প্রারম্ভ—তাহার উপর সকালবেলা—এই শীতের সকালেও তাহার মৃদু-মৃদু ঘাম হইতেছে। মাথার মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় একটা যন্ত্রণা। সমস্ত চেতনা যেন গ্রীষ্মদ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মাঠের ধুলায় আচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর—এবং মাঠের মরীচিকার মত কম্পমান। পেট জ্বলিতেছে, বুক জ্বলিতেছে, ভিতরটা শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে।

বসন্ত ঘরের মধ্যেই ছিল, সে আপন মনে অন্য কাজ করিতেছিল। কয়েক দিনের বসবাসের জন্য তৈরী খড়ের ঘর, সেই ঘর সে গোছগাছ করিয়া পরিপাটী করিয়া সাজাইতে অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে উঠিয়াই ঘরকন্নার কাজগুলো যেন তাহাকে দুই হাত মেলিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। মেলায় সে কয়েকখানা ছবি কিনিয়াছিল, নূতন আমলের সাধারণ দেশীয় লঘুরুচি শিল্পীদের হাতের বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা—জার্মানিতে ছাপা রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার ছবি। দু'খানা উলঙ্গ মেমসাহেবের ছবি। ছবিগুলি সে ঘরের বাঁশের খোঁটার গায়ে টাঙাইতেছিল। নিতাইকে উঠিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল—উঠলে?

ওই হাসি এবং এই প্রশ্নেই নিতাইয়ের আজ রাগ হইয়া গেল—রাঙা চোখে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তিক্ত কণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ!

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় বসন্ত প্রথমটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিল, বলিল—শরীর খাবাপ হয়েছে, না? হবে না? প্রথম দিনেই যে মদটা খেলে! মুখ হাত ধোও, চা খাও, খেয়ে চান কর। কাঁচা চা করে দি। তুমি সেদিন দিয়েছিলে আমাকে, ভারি উপকার হয়েছিল।

নিতাই কথার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের তলার মাটি এখনও যেন কাঁপিতেছে।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সে যখন ফিরিল, তখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। দীঘির ঘাটে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্য বার বার মাথা ধুইয়া ফেলিয়াছিল। ভিজা চুল হইতে তাহার সর্বাঙ্গে জলধারা ঝরিতেছিল, সে ধারাগুলি পড়িতেছিল যেন উত্তপ্ত লোহার পাত্রে জলবিন্দুর মত। বসন্ত তখন একগাদা কাপড় লইয়া কাচিবার জন্য বাহির হইতেছিল। নিতাইকে দেখিয়া সে কাপড় রাখিয়া তাড়াতাড়ি চা করিয়া দিল লেবুর রস দিয়া। কাঁচা চা নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া সে আবার ঘরের মেঝেয় বিছানো খড়ের উপরেই শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র নিতাই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক ঘুম নয়, অশান্ত তন্দ্রা। তাহারই মধ্যে নিতাই শুনিতে পাইল বসন্ত বলিতেছে—খড়ের ওপরেই শুলে?

সে চোখ মেলিয়া চাহিল। একগাদা ভিজা কাচা কাপড় কাঁধে ফেলিয়া আপাদমস্তকসিক্ত বসন্ত দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

—ওঠ, একটা মাদুর পেতে একটা বালিশ দিই। অ ভাই নির্মলা, তোর দাদাকে একটা মাদুর আর একটা বালিশ দিয়ে যা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে।

নিতাই চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—না।

বসন্ত এবার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া শাসনের সুরে বলিল—না নয়, ওঠ, ওঠ।

নিতাই এবার উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বসন্তর দিকে চাহিল।

—কই? দাদা কই? বলিয়া হাসিমুখে নির্মলা মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সযত্নে মাদুর

ও বালিশ পাতিয়া দিতে দিতে বলিল—ওঃ, দাদা আমার আচ্ছা দাদা! যে গান কাল গেয়েছে!

নিতাইয়ের এতক্ষণে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক খেলিয়া গেল।

এই মুহূর্তেই ও-পাশের খড়ের ঘর হইতে দলের নেত্রী প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল।—বাবা আমার উঠেছে? পরমুহূর্তে সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—এ মা-গো। তোর কি কাণ্ড বসন? এই কদিন জ্বর ছেড়েছে, আর আজ এই সকালেই তু এমনি করে জল ঘাঁটছিস!

মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল—সব কাচতে হ'ল মাসী। এইবার চান করব।

—কাচবার কি দরকার ছিল?

নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—পিরীত সামান্য নয় মাসী। দাদা কাল বমি করে বিছানা-পত্য ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ়াও এবার মৃদু হাসিল, বসন্তকে বলিল—যা যা, ভিজে কাপড় রেখে চান করে আয়। কাপড় ছেড়ে বরং ও-গুলো মেলে দিবি।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—আমি বমি করেছি?

নির্মলা আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া নিতাই ভাবিতেছিল—ঘরের এই দুর্গন্ধ তাহা হইলে তাহারই বমির দুর্গন্ধ! অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গে ওই বমির ক্লেদ লাগিয়া আছে। সেই গন্ধই নিঃশ্বাসের সঙ্গে তাহার ভিতরটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। নিজের অঙ্গের ক্লেদ এইবার এক মুহূর্তে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

—মাথা ধরেছে, লয় গো দাদা? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি। নির্মলা তাহার কপালে হাত দিল। বড় ঠাণ্ডা আর নরম নির্মলার হাতখানি। কপাল যেন জুড়াইয়া গেল। ভারি আরাম বোধ হইতেছে। কিন্তু নিতাই স্নান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—না, চান কবব আমি।

বসন্ত কাপড়গুলি রাখিতেছিল, সে বলিল—নির্মলা, ওই দেখ, 'বাসকো'র পাশে ফুলেল তেলের বোতল রয়েছে, 'দে তো ভাই বার করে। তারপর সে নিতাইকে বলিল—বেশ ভাল ক'রে তেল মাখো। দেহ ঠাণ্ডা হবে, শরীবের আরাম হবে। আর সাবান লাও তো তাই লাও।

—না! বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছে তাহার জলে ডুবিয়া মরিতে। চিৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন বসন্ত স্নান করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বাক্স লইয়া কিছু করিতেছিল। নিতাই ঘরে ঢুকিতেই সে হাসিয়া বলিল—আজ কেমন সাজব, তা দেখবে। ওই দেখ, আয়না আছে, চিরুনি আছে, স্নো আছে, মুখে লাও খানিক।

স্নান করিয়া নিতাই সুস্থ হইয়াছে বটে কিন্তু মনের অশান্তি ইতিমধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছি! এ সে করিয়াছে কি? ছি! ছি! ছি! স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে সে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছে, আজই সে পলাইয়া যাইবে। ইহারা যাইতে দিবে না, সুতরাং পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। জিনিসপত্র পড়িয়া থাক, 'বাজার ঘুরিয়া আসি' বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। অন্য জিনিসপত্রের জন্য দুঃখ নাই। কিই বা জিনিসপত্র! কয়েকখানা কাপড়, দুইটা জামা, একটা কম্বল, দুইটা কাঁথা বালিশ। দুঃখ কেবল তাহার দপ্তরটির জন্য। দপ্তর তো তাহার এখন নেহাৎ ছোটটি নয়, যে গায়ের জোরে আলোয়ানের আড়াল দিয়া বগলে পুরিয়া লইয়া পলাইবে! রামায়ণ, মহাভারত এবং আরও অনেক পুরাণ লইয়া তাহার দপ্তরটা এখন অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। মেলায়,

বাজারে—যেখানে সে গিয়াছে—দুই একখানা করিয়া বই কিনিয়াছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জার গান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চণ্ডীমাহাত্ম্য, সত্যপীরের গান, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল—অনেক বই সে কিনিয়াছে। বাবুদের .পাড়ায় ছেঁড়া পাতা কুড়াইয়া পড়িয়া ভাল লাগিলে সংগ্রহ করা তাহার একটা রোগ ছিল। সেগুলিও আছে। বাবুদের থিয়েটারের আশপাশ ঘুরিয়া কয়েকখানা আদি-অন্তহীন নাটকও তাহার সংগ্রহে আছে। এ ছাড়া নিজের লেখা গানের খাতা, সেও যে এখন অনেক হইয়াছে—সব গানই সে এখন খাতায় লিখিয়া রাখে।

একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন্ত বলিল—উলঙ্গবাহার শাড়ী। এই কাপড় আজ পরব।

কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করিবে। সে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত বলিল—দেখব আজ কার জিত হয়, তোমার গানের, না আমার নাচের!

নিতাই আয়না-চিরুনিটা রাখিয়া দিয়া জামা পরিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্তে সে দ্বিধাশূন্য হইয়াছে, থাক তাহার দপ্তর পড়িয়া—সে চলিয়া যাইবে। এখানে সে থাকিতে পারিবে না।

—জামা পরছ যে? যাবে কোথা?

—এই আসি।

বসন্ত নিতাইয়ের আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইল বলিল—মানে?

—এই একটুকুন বাজার ঘুরে আসি।

—না। এখন বাজারে যেতে হবে না। একটুকুন ঘুমিয়ে লাও। ওই দেখ খানিকটা মদ ঢেলে রেখেছি, খাও, খোঁয়ারি ছেড়ে যাবে।

—না। আমি একবার মন্দিরে যাব।

—মন্দিরে?

—হ্যাঁ।

—এই বলছ বাজার, এই বলছ মন্দিব! কোথা যাবে ঠিক কবে বল কেনে?

—বাজারে যাব। রাধাগোবিন্দের মন্দিরে যাব।

—চল। আমিও যাব।

নিতাই বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া বসন্তর দিকে চাহিয়া রহিল।

রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—নিতাইয়ের মুখের দিকে সে চাহিয়া ছিল, হাসিয়া বলিল—কি ভাবছ বল দেখি?

নিতাই উত্তর দিল না।

বসন্ত এবার বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন সরছে না? লজ্জা লাগছে?

নিতাই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আকস্মিক প্রশ্নে সে চকিত হইয়া উঠিল; অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না—না। কি বলছ তুমি বসন। এস—এস।

বসন্ত বলিল—মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে আমার, তুমি যেন পালাতে পারলে বাঁচ। কে যেন তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে। আচ্ছা বাইরে চল তুমি, আমি কাপড় ছেড়ে যাই।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। বসন্তর চোখের দৃষ্টি তো ছুরি নয়—সূঁচ, একেবারে বুকের ভিতর বিঁধিয়া ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পায়। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বসন্তকে এড়াইয়া চলিয়া যাইবে সে তা-ই ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ওদিকে নির্মলা, ললিতা তাহাদের প্রিয়জন বেহালাদার ও প্রধান দোহারকে লইয়া তখন মদের আসর পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে। মহিষের মত বিরাটকায় লোকটা—প্রৌঢ়া দলনেত্রীর মনের মানুষ। লোকটা অদ্ভুত! ঠিক সেই একইভাবেই বসিয়া আছে, অনাদি অনন্তর মত। উহাকে দেখিয়া নিতাই

তাহার সমস্ত কথা স্মরণ না করিয়া পারে না। লোকটা কথাবার্তা বলে না, আমড়ার আঁটির মত সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলিয়া চাহিয়াই থাকে। রাক্ষসের মত খায়, প্রায় সমস্ত দিনটাই ঘুমায়, রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলিয়াও ঠায় জাগিয়া বসিয়া থাকে। তাহার সামনেই থাকে একটা আলো—আর একটা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। এই ভ্রাম্যমান পরিবারটির পথে-পাতা ঘরের গণ্ডির ভিতর রূপ ও দেহের খরিদ্দার যাহারা আসে তাহাদের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়িয়া পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্দান্ত মাতালগুলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিয়া—অনেকটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সুবোধ হইয়া উঠে। লোকটা ভাম হইয়া একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া আছে, নির্বিকার উদাসীনের মত। রান্নাশালার চালায় প্রৌঢ়া তেলেভাজা ভাজিতে বসিয়াছে।

ওই এক অদ্ভুত মেয়ে! মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয়া উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার পরমুহূর্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া, গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালি লইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রথ-রথী-সারথি সবই সে একাধারে নিজে।

নির্মলা হাসিয়া ডাকিল—এস গো দাদা, গরীব বুনের ঘরে একবার এস।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কি হচ্ছে তোমাদের?

—কালকে নক্ষ্মীর বার গিয়েছে, পারণ করছি সকালে। বসন কই? সে আসছে না কেনে? মদের বোতলটা তুলিয়া দেখাইয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে নীরবে হাত দুইটি কেবল জোড় কবিয়া মার্জনা চাহিল।

বেহালাদার হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকেই ডাক। কান টানলেই মাথা আসবে।

নিতাইয়ের পিছনেই বসন্তের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মাথা এখন পুণ্য করে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কানকেও যেতে হবে। তবে যদি কেটে লাও কানকে, সে আলাদা কথা।

বসন্তের কথা কয়টি নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। বাঃ, চমৎকার কথাটি বলিয়াছে বসন। খুশী হইয়া নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল—গতকালকার ভক্তিমতী পূজারিণীর সাজে সাজিয়া বসন্ত দাঁড়াইয়া আছে। বসন্ত হাসিয়া বলিল—চল।

পথের দুইধারেই দোকানের সারি।

বসন্ত সামগ্রী কিনিল অনেক। ফল মূল মিষ্টিতে পুরা একটা টাকাই সে খরচ করিয়া ফেলিল। একটা সিকি ভাঙাইয়া চার আনার আধলা লইয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—পকেটে রাখ।

নিতাই আবার চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল—এ বাঁধন কেমন করিয়া কাটিয়া ফেলা যায় সেই কথা। মন্দির হইতে ফিরিলেই তাহাকে লইয়া আবার সকলে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিবে। বসন্তও তখন আর এ বসন্ত থাকিবে না; হিংস্র দীপ্তিতে তখন বসন্ত ক্ষুরধার হইয়া উঠিবে। বসন্তের রাত্রির রূপ তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। সে ঠিক করিল, ফিরিবার পথে বসন্তকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া পথ হইতেই সে সরিয়া পড়িবে। অজুহাতের অভাব হইবে না। তাহার কোন গ্রামবাসীর সন্ধান করিবার জন্য মেলাটা ঘুরিবার একটা অজুহাত হঠাৎ তাহার মনে আসিয়া গেল, সে সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এই অবস্থায় বসন্ত আধলাগুলি তাহার হাতে দিতেই ভ্রূ তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল—কি হবে?

—ও মা গো। রাজ্যের কানা খোঁড়া মন্দিরের পথে বসে আছে। দান করব। মৃদু হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ তুমি বল দেখি?

ব্যস্ত হইয়া নিতাই অভিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল—কিছু না।

—কিছু না?

নিতাই আবার অভিনয় করিয়া বলিল, ভাবছি তোমাকে চিনতে পারলাম না। নিতাই হাসিল।

সে অভিনয়ে বসন্ত ভুলিল, বলিল—আমার ভারি মায়া লাগে গো। আহা। কি কষ্ট বল দিকিনি কানা খোঁড়া রোগা লোকদের? বাপ রে! বলিতে বলিতে সে যেন শিহরিয়া উঠিল। নিতাই সত্যই এবার অবাক হইয়া গেল। এ কি! বসন্তের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিয়া যেন টলমল করিতেছে।

চোখ মুছিয়া বসন্ত আবার হাসিয়া বলিল—সে হাসি বিচিত্র হাসি, এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই—হাসিয়া বসন্ত বলিল—আমার কপালেও অনেক কষ্ট আছে গো! কাল তো তোমাকে বলেছি, আমার কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কাসের ব্যামো। এত পান-দোক্তা খাই তো ওই জন্যে। রক্ত উঠলে লোকে বুঝতে পারবে না। আর আমিও বুঝতে পারব না। দেখলেই ভয়, না দেখলেই বেশ থাকি। দলের কেউ জানে না, জানে কেবল মাসী। কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেদিন পাড়ু হয়ে পড়বে, সেদিন আর রাখবে না, নেহাৎ ভাল মানুষের কাজ করে তো নোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। নইলে যেখানে রোগ বেশী হবে, সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। জ্যান্ততেই হয়তো শ্যাল-কুকুর ছিঁড়ে খাবে।

নিতাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল—বসন!

বসন বলিল—সত্যি কথা কবিয়াল—এই আমাদের নেকন। তবে আমার নেকন আরও খারাপ। তুমি সেই ইস্টিশানে গেয়েছিলে—'ফুলেতে ধুলোতে প্রেম'। —কবিয়াল, তখন ধুলোর সঙ্গে মাটির সঙ্গে প্রেম হবে আমার। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—দুব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে?

রোজ সকালে বসন্ত দূর্বাঘাস থেঁতো করিয়া রস খায়। অত্যন্ত গোপনে সে এই কাজটি করে। নিয়মিত খাওয়া হয় না। তাহার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় সম্ভব হইয়া উঠে না। মধ্যে মধ্যে প্রৌঢ়া মনে করাইয়া দেয়,—বসন, সকালবেলায় দূর্বোর রস খাস তো?

বসন্ত কখনও কখনও সজাগ হইয়া উঠে, কখনও বা ঠোঁট উলটাইয়া বলে—ম'লে ফেলে দিও মাসি। ও আমি আর পারি না।

আবার কাসি বেশী হইলেই সে সভয়ে গোপনে দূর্বাঘাস সংগ্রহ করিতে ছোটে। ঘাস ছেঁচিতে ছেঁচিতে আপন মনেই কাঁদে।

মন্দিরের পথ চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া উঠিল। একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহার বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল। এমন হাসিতে হাসিতে বসন্ত তাহার কাসির অসুখের কথাগুলো বলিল যে নিতাইয়ের মনে হইল, বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁট দুইটির কোলে কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ফেলিয়া চলিয়া যাইবে; গাছতলায় মরিতে হইবে। জ্যান্ততেই হয়তো শেয়াল-কুকুর ছিঁড়িয়া খাইবে।' সে ছবিগুলা যেন তাহার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল। অগ্রপশ্চাৎ তাহার সব ভুল হইয়া গেল। পলাইবার কথা তাহার মনে রহিল না। অজুহাতটার কথাও ভুলিয়া গেল। শুধু নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসন্তের সঙ্গে মন্দিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বসন্ত আবার কথা বলিল—তাহার সে বিষণ্ন কণ্ঠস্বর আর নাই; কৌতুক-সরস কণ্ঠে মৃদু হাসিয়া বলিল—গাঁটছড়া বাঁধবে নাকি? গাঁটছড়া?

কথাটা বসন নেহাৎ ঠাট্টা করিযাই বলিল। আশ্চর্য বসন! এইমাত্র নিজের মরণের কথা এত করিয়া বলিয়া ইহারই মধ্যে সে সব সে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। স্থির দৃষ্টিতে বসন্তকে কিছুক্ষণ সে দেখিল। শাণিত-ক্ষুরের মত ঝকঝকে ধারালো বসন্তের ধাব ক্ষয় হইয়া একদিন টুকরা টুকরা, হয়ত গুঁড়া হইয়া যাইবে উখায় ঘষা ইস্পাতের গুঁড়ার মত।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—দেখছ?

—হ্যাঁ।

—কি দেখছ? কেয়াফুলও শুকোয়? চোখের কোণে কালি পড়েছে?

বসন্তের মুখে তখনও হাসির রেখা। সে হাসি আশ্চর্য হাসি।

নিতাই মুখে কোন উত্তর দিল না। হাত বাড়াইয়া বসন্তের আঁচলখানি টানিয়া লইয়া নিজের চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধিতে আরম্ভ কবিল।

বসন্ত চমকিয়া উঠিল—ও কি করছ? সে এক বিচিত্র বেদনার্ত উত্তেজনা-ভরে সে আপনার কাপড়ের আঁচলখানা আকর্ষণ করিয়া বলিল—না না, না—ছি! ও আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তুমি কি সত্যি ভাবলে নাকি?

প্রসন্ন হাসিতে নিতাইয়ের মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—গিঁট আগেই পড়ে গিয়েছে বসন। টেনো না। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও এ গিঁট; আর তুমি যদি আগে মব, তবে সেই দিন আমি খুলে নোব গিঁট।

বসন্তর মুখখানি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল।

ঠোঁট দুইটা, শীতশেষের পাণ্ডুর অশ্বত্থপাতা উতলা বাতাসে যেমন থরথর করিয়া কাঁপে, তেমনি কবিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার রক্তাভ সুগৌর মুখখানা যেন সঙ্গে সঙ্গে সাদা হইয়া গিয়াছে। গরবিনী দর্পিতা বসন্ত যেন এক মুহূর্তে কাঙালিনী হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এবার হাসিযা বলিল, —এস এস, আমার আর তব সইছে না। ঠাকুরের দরবারে রাগ করে না।

—রাগ? বসন্ত বলিল—আমার রাগ সইতে পারবে তো তুমি?

—পায়ে ধরে ভ‌াঙাব। নিতাই হাসিল।—এস এস।

বাসায় ফিরিতেই একটা কলরব পড়িয়া গেল। নির্মলা-ললিতাদের মদের নেশা তখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে। ফুলের মালা গলায় গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিতাই ও বসন ফিরিবামাত্র তাহাদের দেখিয়া তাহারা হুলুধ্বনি দিয়া হৈ-চৈ করিয়া উঠিল। গাঁটছড়াটা খুলিবার কথা নিতাই বা বসন দুইজনের কাহারও মনে হয় নাই।

নিতাই হাসিতে লাগিল। আশ্চর্য, সে লজ্জা পাইল না—কোন গ্লানিও অনুভব করিল না।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, লজ্জা পাইল বসন্ত। গাঁটছাড়া বাঁধা নিতাইয়েব কাঁধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

সতেরো

ভ্রাম্যমান নাচ-গানের দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায়—গ্রাম হইতে গ্রামান্তর, দেশ হইতে দেশান্তর। কবে কোন্ পূর্বে কোথায় কোন্ মেলা হয়, কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হয়—সে সব ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ—পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, ট্রেনে, তারপর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া—রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে।

প্রৌঢ়া বলে—আগে আমরা পদ্মাপারে নিচের দিকেও যেতাম। পদ্মাপারে বাঙাল দেশে আমাদের ভারি খাতির ছিল।

নির্মলা প্রশ্ন করে—পদ্মাপার তুমি গিয়েছ মাসী?

নির্মলার কথা শেষ হইতে না হইতে মাসী পদ্মাপারের গল্প বলিতে বসে। বলে—যাইনি, বাপরে, সে কি ধুম!

তারপর বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বাসিয়া সুপারি কাটিতে কাটিতে বলে—বাতের ত্যাল খানিক মালিশ করে দে দেখি; পদ্মাপারের কথা বলি শোন।

আপসোসের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—আঃ মা, তোরা আর কি দেখলি—কিই বা রোজগার করলি আর কিই বা খেলি! সে 'দ্যাশ' কি!—সোনার 'দ্যাশ'! মাটি কি। বারোমাস মা-লক্ষ্মী যেন আঁচল পেতে বসে আছেন। সুপুরি কিনতে হয় না মা। সুপুরির বন। যাও—কুড়িয়ে নিয়ে এস। ডাব-নারিকেল—আমাদের 'দ্যাশে'র তালের মতন। দু-ধারি পাটের 'ক্ষ্যাত'।

সে হাত দুইখানা দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাড়াইয়া দিয়া সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে—এক এক পাটের ব্যাপারী কি! পয়সা কত! এই বড় বড় লৌকো! ব্যাপারীদের নজর কি, হাত দরাজ কত! প্যালা দেয় আধুলি, টাকা; সিকির কম তো লয়। আর তেমন কি খাবার সুখ! মাছই কত রকমের! ইলিশ-ভেটকি—কত মাছ মা—'অছল্যি' মাছ। আঃ তেমনি কি লঙ্কা খাবার ধুম!

ললিত বলে—আমাদের একবার নিয়ে চল মাসী ওই দ্যাশে।

মাসী বলে—মা, সি রামও নাই আর সি অযুধ্যেও নাই। সি দ্যাশে আর আমাদের সে আদরও নাই মা। সি কালে আমরা যেতাম—পালা গান গাইতাম। পদাবলীর গান—আমাদের সি কালের ওস্তাদেরা আবার বেশ রসান দিয়ে পালাগান 'নিকতো'—সে সব গান আমরা গাইতাম। যে যেমন আসর আর কি! তেলক কাটতে হ'ত, গলায় কণ্ঠি পরতে হ'ত। আবার বাজারে হাটে হাল-ফেশানী গান হ'ত। আজকাল আর পালাগান কে শোনে বল? নইলে পালাগান নিয়েই তো ঝুমুর।

বেহালাদার মাসীর কথা শুনিতে শুনিতে বলিল—উ দ্যাশের মাঝিদের গান শুনেছ মাসী?

—শুনি নাই? ভারি মিষ্টি সুর। প্রৌঢ়া নিজের মনেই গুনগুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, আসছে না ঠিক!

বেহালাদার কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল, প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল,—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই বটে। কিন্তু বেহালাদার সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল।

নির্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল। বেহালাদার থামিয়া যাইতেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল— ওই এক ধারার মানুষ! বাজাতে আরম্ভ করে থেমে গেল।

নির্মলার প্রিয়জন বেহালাদার একটু বিচিত্র ধরনের মানুষ, সারাদিন বেহালাটি লইয়া ব্যস্ত। ছড়িতে রজন ঘষিতেছে, বেহালার কান টানিয়া টানিয়া তার ছিঁড়িতেছে আবার তার পরাইতেছে। কখনও ঝাড়িতেছে, কখনও মুছিতেছে। মাঝে মাঝে কখনও সযত্ন সঞ্চিত বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাখাইতে বসে। কিন্তু বড় একটা বাজায় না। আসরে বাজায়, বাসায় নতুন গানের মহলা বসিলেও বাজায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সারাদিন যে মানুষটা বেহালা লইয়া বসিয়া থাকে সে কখনও আপন মনে কোন গান বাজায় না ইহাই সকলের আশ্চর্য লাগে। ছড়ি টানিয়া সুর বাঁধিতে বাঁধিতেই জীবন কাটিয়া গেল। তবে এক-একদিন, সেও ক্বচিৎ গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, সে বেহালা বাজাইতে বসে। সেও একটি গান। এবং তেমনি দিনটিরও একটি লক্ষণ আছে। সেদিনের সে লক্ষণ নিতাই আবিষ্কারও করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারে। নির্মলার ঘরে আগন্তুক আসিয়া যেদিন সারারাত্রির মহোৎসব জুড়িয়া দিবে সেই দিন; নিতাই বুঝিতে পারে যে আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে।

সে এক অদ্ভুত গান। নিতাই বাজনায় সে গান শুনিয়াছে। অন্ধকারে কোন গাছতলায় একা বসিয়া বেহালাদার সে গান বাজায়। কিন্তু কেহ কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদার বেহালাখানি নামাইয়া রাখে। এমন রাত্রে, অর্থাৎ নির্মলার ঘরে মহোৎসবের রাত্রে নিতাই এই গানটি শুনিবার জন্য ঘুমের মধ্যেও উদগ্রীব হইয়া থাকে! নিস্তব্ধ রাত্রে বেহালার সুর উঠিবামাত্র তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু সে ওঠে না, শুইয়া শুইয়াই শোনে। একমাত্র মহিষের মত লোকটাকেই বেহালাদার গ্রাহ্য করে না। লোকটা যেন লোকই নয়, একটা জড় পদার্থ। লোকটাও চুপচাপ রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া নিশা-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া থাকে।

ললিতার প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক, তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনদার লোকটির সঙ্গে। বাজনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহাদের লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়া যায়। ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, লোকটা মাসীর কাছে নালিশ করে, মাসীর বিচারে পরাজয় যাহারই হউক, সেই ললিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে— দোষ হইছে আমার, ঘাট মানছি আমি। আব কখুনও এমন কর্ম করব না। কান মলছি আমি। লোকটা সত্যই কান মলে।

নির্মলা ও বসন্ত লোকটার নাম দিয়েছে—'ছুঁচো। ছি-চরণের ছুঁচো।' কথাটা অবশ্য আড়ালে বলিতে হয়, নহিলে ললিতা কোঁদল বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না, হাসে।

বাজনদারটির প্রিয়তম কেহ নাই। জুটিলেও টেঁকে না। লোকটির কেমন স্বভাব—যে নারীটির সহিত সে প্রেম করিবে, তাহারই টাকা-পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে। লোকটি প্রৌঢ়। নির্মলা, ললিতা দুইজনেই এক এক সময় তাহার প্রিয়তমা ছিল। কিন্তু ঐ কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে। লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভাল—যেমন তাহার তালজ্ঞান, বাজনার হাতটিও তেমনি মিঠা। কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন। রাত্রে বাজনা বাজায়, দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে।

নির্মলা ললিতা নিতাইয়েব একটা নাম দিয়াছে। বলে—'বসন্তের কোকিল।'

বসন্ত নিতাই দুজনেই হাসে।

নূতন জীবনে এই পারিপার্শ্বিকেব মধ্যে নিতাইযের দিন কাটিতে লাগিল। জীবন-স্রোতের টানে কোথা হইতে সে কোথায় আসিয়া পড়িল, ঠাকুরঝি কোথায় ভাসিয়া গেল, রাজা কোথায় থাকিল— এ সব ভাবিতে গেলে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বসন্তের মুখপানে চাহিয়া সে তাহা পারে না। যে গিঁটটা সে বাঁধিয়াছিল সে গিঁটটা যেন অহরই বাঁধা আছে, খুলিতেছে না। ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, এক হাতে চোখের জল মুছিয়া, অন্য হাতখানি কবিগানের সঙ্গে দর্শকদের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে নিস্পৃহ নিরাসক্তির এমন একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে যে, সব কিছুই তাহার সহ্য হইল, অথচ সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিক সঙ্কুচিত করিল না। বসন্তকে ভালবাসিল। দুই হাত দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে ভুলিল না। বসন্তের ঘরে যেদিন মানুষ আসে সেদিন এক গাছতলায় শুইয়া মনে মনে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কয় অথবা বিরহের গান বাঁধে। অহরহই তাহার মনের মধ্যে ঘোরে গানের কলি। বসন্তের কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে, কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোন রকমে খাপাইয়া লইয়া সেই গানটি সে গাহিবেই গাহিবে।

"তোরা—শুনেছিস কি—বসন্তের কোকিলঝঙ্কার!
বাঁশী কি সেতার—তার কাছে ছার—
সে গানের কাছে সকল গানের হার।"

'কোকিল' নামটাই তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। 'কালো কোকিল।' ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত।

ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে। অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগানের লাইন তাহার মুখস্থ। হরুঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যান্টনী সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবসর সময়ে কত খেয়ালই হয় নিতাইয়ের। বসিয়া বসিয়া ঝুমুর দলের মেয়েদেব 'লক্ষ্মীর কথা'টিকে সে একদিন পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিল। বসন্ত যখন ব্রতের কথা শোনা শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাঁই করিয়া নিতাইকে প্রসাদ খাইতে দিল, তখন নিতাই বলিল—কথা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার কাছে একবাব শুনে লাও।

সবিস্ময়ে বসন্ত বলিল—কি?

—লক্ষ্মীর কথা! বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলার সুরে আরম্ভ করিয়া দিল—

"নমো নমো লক্ষ্মী দেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।
শতদল পদ্মে বৈস—তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহে না পাপ—তাই তো চঞ্চলা।"

বসন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে যোগাড় করলে? নতুন পাঁচালীর বই কিনেছ, তাতেই আছে বুঝি?

নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিতে লাগিল।

—বল কেনে?

—আগে শোনই কেনে। ভনিতেতেই সব পাবে।

"অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনহ নিখিল।"

মুখরা দর্পিতা বসন্ত উল্লাসে বিস্ময়ে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল—ওগো মাসী, নক্ষ্মীর পাঁচালী নিকেছে।

মাসী জিজ্ঞাসা করিল—কি? কে?

বসন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—নক্ষ্মীর পাঁচালী! লিখেছে তোমার জামাই।

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে সে আসর করিয়া সকলকে ডাকিয়া কবিয়ালের পাঁচালী শুনাইয়া তবে ছাড়িল। নিতাইকে বলিল—বেশ সুর করে বল!

নিতাইয়ের পাঁচালী শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই পাঁচালীটি ভাল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের পরিচিত কবিয়ালেরা কবি গান করে, ছড়া কাটে, দুইচারিটা গানও লেখে, কিন্তু এমনভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালী রচনা করে না। সেকালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে, তাই আজ পর্যন্ত চলিয়াছে, ভনিতার সময়ে—সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশে—ইহারা প্রণাম জানায়। সকলে বিস্মিত হইল যে নিতাই তেমনি পাঁচালী রচনা করিয়াছে। এবং সেই দিন হইতেই তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গেল।

নিতাইয়ের পাঁচালীই এখন এই দলটিতে ব্রতকথা দাঁড়াইয়াছে। শুধু এই দলের নয়, আর

পাঁচ-সাতটা দলের ওস্তাদ এই পাঁচালী লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে যখন মেয়েরা বসিয়া তাহার রচনা করা লক্ষ্মীর পাঁচালী বলে, তখন নিতাই একটু গম্ভীর হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়, যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তাহার দপ্তরটিও ক্রমশ বড় হইয়া উঠিল। অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে। আজকাল কলিকাতা হইতে বই আনায়। এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসী। মাসী অনেক জানে। নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায়। সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে। বিদ্যাসুন্দরের সন্ধান তাহাকে মাসীই দিয়াছিল। বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোঁপা না বাঁধিয়াই বেণী ঝুলাইয়া কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিলেন। নিতাই বলিয়াছিল—বিনুনীতেই তোমাকে মানিয়েছে ভাল বসন, খোঁপা আব বেঁধো না।

মাসী সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

নিতাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাসীর দিক চাহিয়াছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসী বলিয়াছিল—'বিদ্যেসোন্দর' জান বাবা? রায় গুণাকরের 'বিদ্যেসোন্দর'?

বসন্ত, ললিতা, নির্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল—আজ কিন্তু 'বিদ্যেসোন্দর' বলতে হবে মাসী।

—সব কি মনে আছে মা! ভুলে গিয়েছি!

—তবে সেই তোমার কথাটি বল। সেটি তো মনে আছে। বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

—মেলেনী মাসীর কথা? মাসী হাসিয়া আবম্ভ করিয়াছিল—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।"

মাসী গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁক কোন্দল ভেলায়।
পড়শী না থাকে পাছে কোন্দলের দায়।"

নিতাই মাসীর কাছে বসিয়া বিনয করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে বলবে মাসী, আমি খাতায় লিখে রাখব?

—আমার তো সব মনে নাই বাবা। তুমি বিদ্যেসোন্দর বই আনাও কেনে। বটতলার ছাপাখানায় নিকে দাও, ডাকে চলে আসবে। তুমি দাম দিয়ে ছাড়িয়ে লেবে। বটতলার ঠিকানা পাঁজিতে পাবে।

বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদামঙ্গল পাইয়াছে। বইয়ের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাশু রায়ের পাঁচালী, উদ্ভট কবিতার বইও আনাইয়াছে। দাশু রায় পড়িয়া তাহার মনের একটা সংশয় কাটিযাছে। "ননদিনী, ব'লো নাগরে। ডুবেছে রায় রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" এবং "গিরি, গৌরী, আমার এসেছিল,—স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করায়ে চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল," দাশু রায়ই লিখিয়াছেন; আবার খেউড়েও দাশু রায় চরম লেখা লিখিয়া গিয়াছেন। আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশু রায়কে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণাম করে।

খেউড় আর তাহাকে খুব বেশী গাহিতে হয় না, গাহিতেও আর সঙ্কোচ হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই কবিয়াল এবং কবিগান-শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। তাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিয়া শোনে; অশ্লীল খেউড়, গালিগালাজের উত্তরে সে চোখা-চোখা বাঁকা রসিকতায় গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে। কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিয়ালের সঙ্গে আসর পড়িয়াছিল। লোকটা বুড়া হইয়াছে, তবুও যত

তাহার টেরির বাহার তত লোকটা অশ্লীল। খেউড়ে নাকি বুড়ার নামডাক খুব। লোকে তাহাকে 'খেউড়ের বাঘ' বলে।

সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে। বুড়াই আগে আসর লইয়া নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল। সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া চন্দ্রাবলী অর্থাৎ বসন্তকে বুড়া গালিগালাজ দিতে আর বাকী রাখিল না। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ হিসাবে নিতাইকে যেন জীবন্ত মাটিতে পুঁতিতে চাহিল। এই সম্বন্ধটা কবির পাল্লায় বড় সুবিধার সম্বন্ধ। বিশেষ যে আগে আসরে নামে, সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালিগালাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া লয়। তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চড় মারিয়াছিল, সেদিন প্রতিপক্ষ কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইয়াই তাহাকে সে জব্দ করিয়াছিল, সে কথাও কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাইলেই প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। লোকটা আসরে নামিয়াই খেউড় আরম্ভ করিল। নিতাইয়ের চেহারা, বসন্তের চেহারা লইয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া আসর শেষ করিল।

নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌঢ়া বলিল—বাবা, সেই পুরনো পালা। খানিকটা রঙ চড়াবে নাকি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—চড়াব বইকি! দেখি এক আসর, তারপর হবে। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল। গানটা সেই পুরনো গান।

"এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে—কুঁচকো মুখে—আর রসকলি কাটিস নে।
রসের ভিয়েন না জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস্ নে।
শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নেই আর আলবোট তুলে—
ও তোর—ফোক্‌লা দাঁতে—পড়ছে লালা—জিভ দিয়ে আর চাটিস্ নে।
—ও—হায়,—বুড়ি মরে না—মরণ নাই—
ও—ভয়ে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।"

—ভয় কিসের? দোহারগণ, জান তোমরা যমের ভয়টা কিসের?

একজন বলিল—অরুচি, যমেব অরুচি।

—উঁহু।

অন্য একজন বলিল—পাছে সেখানে পেজোমি করে তাই।

—উঁহু। বলি চন্দ্রাবলী, তুমি জান?

বসন্ত বিব্রত হইল, কি বললে কবিয়ালের মনোমত হইবে বা সুবিধা হইবে সে জানে না, তবু সে ঠকিবার মেয়ে নয়, সে বলিল,—বুড়ি পাছে যমের সঙ্গে পিরীত করতে চায়, তাই সে ওকে নেয় না।

নিতাই বাহা-বাহা করিয়া উঠিল। লোকেও একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ঠিক ঠিক। বলিয়াই সে গান ধরিয়া দিল—

"ও পাছে, পিরীত করিতে চায়—যম ওরে নেয় না তাই—
ও তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।
যমকে ভালবাসিস নে।"

নিতাইয়ের মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্যে, ব্যঙ্গ শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় জমিয়া উঠে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে। বসন্তও আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না, তবে নাচে সে বিভোর হইয়া। লোকে পছন্দ করে। জনতার এক-একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু বেশী অংশ তারিফই করে। দুই-দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে। নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে।

সে গান ধরে—

"(তোমায়) ভালোবাসি ব'লেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ,
নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভাল আমার মরণ।"

সে আরম্ভ করে, তুমি বৃন্দে—তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু—তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ—পূর্ণিমায় পূর্ণিমায়—কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া—তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল রূপের মাধুরী—! ওগো দূতী—সে-ই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রংশ দেখিয়া মনের যাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ তোমার নিজের কথা।

"রসের ভাণ্ডারী তুমি—কথা তোমার মিছরীর পানা
সেই তুমি আজ হাটে বেচ—সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।"

আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই।

বসন্ত রাগ করে, কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারার মিষ্ট কথা বললে?

সে বলে—ওকে বিঁধে বিঁধে মারতে হত। খাতির কিসের?

নিতাই হাসিয়া বলে—বসন, নরম গবম পত্রমিদং, বুঝলে? নরম গরম—মিঠে কড়া—বুঝলে কিনা—ওতেই আসর মাৎ। তারপর বুঝাইয়া বলে—লোকটার বয়েস হয়েছে—প্রাণে দুঃখ দিলে কি ভাল হ'ত। তুমিই বল।

বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিযা থাকে। নিতাই হাসিয়া বলে—রাগ করলে বসন?

বসন্ত হাসিয়া বলে—না।

—তবে?

—তবে ভাবছি, তুমি আমাকে সুদ্ধ নরম ক'রে দিলে।

নিতাই হাসে।

বসন্ত বলে—সে চড় মনে পড়ে?

—সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না। ও আমার গুরুর চড়।

বসন্ত আজ তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়।

খেউড়, যাহাকে বলে কাঁচা খেউড় অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীলতার গান, —সেও তাহাকে গাহিতে হয়। দুই একটা স্থানে, গভীর রাত্রে এমন গান না গাহিলে চলে না। শ্রোতারা দাবী করে। আবার এমনও আসর আসে যেখানে এই বুড়ার মত প্রতিদ্বন্দ্বীরা হটিয়া হটিয়া গিয়া নিজেরা আস্তাকুঁড়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকেও টানিয়া আনে। আসর ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া গোড়াতেই তাহা বুঝা যায়। একটা পালা গানের পরেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া উঠে থমথমে। চোখ দুইটা হইয়া উঠে উগ্র। প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায়। দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে, আজ লাগিল। বসন্ত এবং প্রৌঢ়া বুঝিতে পারে সর্বাগ্রে।

প্রৌঢ়া বলে—বসন! ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে।

বসন্ত উত্তর দেয়—হ্যাঁ মাসী।

সে আসর হইতে বাহির হইয়া যায়, সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে—শোন।

প্রৌঢ়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়—বাবা! ডাকছে তোমাকে। বাবা গো!

নিতাই চমকিয়া উঠে। তারপর গম্ভীর মুখেই বাহিরে যায়, বসন্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়। সে জানে কিসের জন্য বসন্ত তাহাকে ডাকিতেছে। গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া মদ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া নিতাই আসিয়া আসরে বসে আর এক চেহারা লইয়া।

তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিতে থাকে—খেউড়ে অশ্লীলতায়। প্রতি আসরের পূর্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ গ্লাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে। সে খায়। মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায়। বসন্তর মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠে। সে দিন আসরে আর কিছু বাকী থাকে না। নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিশেষ স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠে—তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ; সমাজের আবর্জনা-স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে রক্তবীজের মতো। ভাষায়—ভাবে—ভঙ্গীতে অশ্লীল কদর্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধে না। শুধু তাই নয়—সেদিন সে এমন উগ্র হইয়া উঠে যে, সামান্য কারণেই যে কোন লোকের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়।

প্রৌঢ়া সেদিন দলের লোককে সাবধান করে। বলে, হাতি আজ মেতেছে বাবা। তোরা একটুকুন সমীহ ক'রে স'য়ে থাক। তোরা সব কত সময়ে কত বলিস। ও তো সব সয়।

নির্মলা হাসিয়া বলে—মাউতকে (মাহুত) বল মাসী।

প্রৌঢ়া হাসে—সে বসন্তের দিকে চায়। বসন্তও হাসে। এমন দিনে বসন্তের সে হাসি অদ্ভুত হাসি।

বসন্তের মুখে এই হাসি দেখিয়া নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসে; বলে—কি লো হাসতে গিয়ে যে গলে পড়েছিস বসন!

বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা—চোখ তাহার ঢুলঢুল করে। সে তবুও হাসে কারণ এমনি দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশার দিন। এমন দিনই নিতাই বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়। বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয়া উঠে।

সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। বসন্ত নির্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি। তবুও এমন দিনটি বসন্তের বহু প্রত্যাশার দিন।

সহজ শান্ত নিতাই আর এক মানুষ—সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাইরে।

তখন বসন্ত আপনা হইতে গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না, আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না। তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়—বসন্ত যেন কত ছেলেমানুষ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না—এমন পরম সমাদর আছে তাহার মধ্যে।

বসন্ত ছুতোনাতা করিয়া অভিমান করে, কাঁদে।

নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়। বলে—তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাই বসন।

তারপর গুনগুন করিয়া গান ধরে—

"তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি।
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জানি নাকি?"

সঙ্গে সঙ্গে বলে—বল সত্যি কি না!

বসন্ত মনে মনে খুশী হয়। মুখে তাহার হাসি ফোটে। নিজেই চোখ মুছিয়া সে বলে—বলব না। হ্যাঁ, কোকিল বটে আমার! বাহারের গান হয়েছে। শেষ কর। লিকে রাখ।

কিন্তু শেষও হয় না, লিখিয়া রাখাও হয় না। অসমাপ্ত গানগুলা হারাইয়া যায়।

এই সেদিন একদিন—নিতাই যে গানটি গাহিল, সে গানটি শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তের প্রথম রূপ। বসন্তর চোখে সে কি প্রখর চাহনি সে দেখিয়াছিল। আজ সেই বসন্তই কাঁদিতেছে।

নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল—

"সে আগুন তোমার গে-লো কোথা শুধাই তোমারে?
ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে,
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখো নি কি সখি হে?
ও হায়—সে আগুন আজ জল হ'ল কি পুড়াইয়া আ-মারে?
শুধাই তোমাবে।"

গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে বসন্ত ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল—গানটি শেষ কব, আমি শিখে তবে উঠব। তারপর বলিল—তোমাকে চড় মেবেছিলাম, সে কথা তুমি ভোল নাই তা হ'লে?

নিতাই বলিল—ভগবানের দিব্যি বসন—

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আবার হাসিয়া বলিল—এই তো, তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে পার না।

বসন্ত তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে। এই তো গান। পদাবলীর 'পিরীতি' এক, আর টপ্পাব ভালবাসা অন্য জিনিস—একেবারে খাঁটি ঘরোযা পিরীতি। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহাবি দেয়। এই না হইলে গান!

"তাবে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে?"

কিংবা

"ভালবাসিবে বলে ভালোবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"

আহা-হা! এ যেন মিছবীর পানা। নিতাই মিছরীর পানার সহিত তুলনা দেয়। নিতাইয়ের সাধ, সে এমনই গান বাঁধিবে—সে মবিয়া যাইবে, নূতন কবিয়াল নূতন ছোকরারা তাহার গান গাহিবে আর বলিবে—বাহবা! বাহব'! বাহ্‌বা।

অহরহই তাহাব মনে গানের কলি গুনগুন কবে।

আবার মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া ওঠে। মনে পড়িয়া যায় সেই বেলস্টেশন। সেই তাহাকে।

গ্রামপথে চলিবার সময় দ্বিপ্রহরে—দূরে পথের বাঁকে—হঠাৎ বোদের ছটায় ঝকমক করিয়া উঠে স্বর্ণবিন্দুর মত একটি বিন্দু। বাংলা দেশে পল্লীগ্রামে—এই সময়টাই জলখাবারের সময়, গরু খুলিবার বেলা, এই সময়েই কৃষকবধূরা মাঠে যায় পুরুষের জলখাবার লইয়া, গৃহস্থঘরে দুধের যোগান দেবার সময়ও এই। মাঠের পথে—গ্রামের পথে—ঘটি মাথায় চলন্ত কৃষকবধূদের রৌদ্রচ্ছটা প্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয়া উঠে।

তাহার মনে পড়ে সেই কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। ঠাকুরঝি। সঙ্গে সঙ্গে সব বিস্বাদ হইয়া যায়। এসব তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয় এইখান হইতেই সে ছুটিতে আরম্ভ করে, ফিরিয়া যায় তাহার সেই গ্রামে; কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেল লাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহার সেই পুরানো বাঁধা গান—"ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।"

—নাঃ!

পরক্ষণেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—নাঃ। চাঁদ, তুমি আকাশে থাক। ঠাকুরঝি, তুমি সুখে থাক। সংসার তোমার সুখের হোক।

আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই? পাঁচদিন আবার আসর বসিবে, এবার আর ঝুমুরদলের কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয়। আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা। তারণ কবিয়াল, মহাদেব কবিয়াল, নোটন কবিয়ালের মত দস্তুরমত কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে। একটা মেলার আসরে কবিয়াল হিসাবে পাল্লা দিবার জন্যে তাহাকেই শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল। ঝুমুরদলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই। তবু সে বলিয়াছে—উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং উহারাও যাইবে।

এ বায়নার পর দল চলিবে ধুলিয়ান অঞ্চলের দিকে। সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে? দলটা কানা হইয়া যাইবে যে। সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তা ছাড়া—বসন্ত আছে। বসন্তকে সে কথা দিয়াছে। সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনে পড়ে গাঁটছড়া বাঁধার কথা। কথা আছে—যে কেহ একজন মরিলে তবে এ-গাঁটছাড়া খুলিয়া লইবে অপর জন। ভাবিতে ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠে। বসন্তের মৃত্যুকামনা করিতেছে সে? না না। ঠাকুরঝি, তুমি দূরেই থাক—সুখেই থাক—তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হইবে না। সে বসন্তের কালো-কোকিল—যেখানে বসন্ত সেইখানে ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে পারে না সে। বসন্ত বাঁচিয়া থাক—সে সুস্থ হইয়া উঠুক। বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন। কয়টা দিন। ইহার মধ্যে—বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি ভালবাসার শেষ করিতে পারিবে সে? ইহার পর আবার ঠাকুরঝিকে ভালবাসিবে? এমনি করিয়াই তো একদিন ঠাকুরঝিকে ছাড়িয়া—তাহাকে ভালবাসার লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া—চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে। আবার বসন্তকে ছাড়িয়া ঠাকুরঝির কাছে? না। এই ভাল।

তবুও তাহার ভাল লাগে না। সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে। কখনও আপনিই এক সময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসে, কখনও বা দল হইতে কেহ যায়, ডাকিয়া আনে।

বসন্ত বলে—এই দেখ, এইবার তুমি ক্ষেপে যাবে।

নিতাই নিবিষ্টচিত্ততার মধ্যেই হাসে—কেনে? কি হ'ল?

—সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুবে এলে। খেতে-দেতে হবে না?

—ভাবি ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন—

—না, এখন খাও দিকিনি।

—না। আগে শোন। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া আরম্ভ করে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল। গানটা শুনিয়াই সে মনে পাথর হইয়া গেল।

নিতাই সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বসন। কী হ'ল বসন? বসন!

ধীরে ধীরে দুই চোখের কোন্ হইতে দুটি জলের ধারা গড়াইয়া আসিল বসনের। সে বলিল—এ গান তুমি কেনে লিখলে কবিয়াল?

—কেনে বসন?

ক্লান্ত বিষণ্ন কণ্ঠে সে বলিল—আমি তো এখন ভাল আছি কবিয়াল—তবে তুমি কেনে লিখলে, কেনে তোমার মনে হ'ল জীবন এত ছোট কেনে?

অকারণে নিতাইয়ের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

আঠারো

সত্যই বসন এখন ভালো আছে। অনেক ভাল আছে। দেহের প্রতি যত্ন তাহার এখন অপরিসীম। মদ এখন সে খুব কমই খায়। দূর্বাঘাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এখন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দূর্বাঘাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয়। স্বাস্থ্যও তাহার এখন ভাল হইয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ মুখখানি অনেকটা নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষ দীপ্ত গৌর বর্ণে একটু শ্যাম আভাস দেখা দিয়াছে। কথার ধার আছে, জ্বালা নাই। এখন আর সে তেমন তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না। মুচকিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

ললিতা নির্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না। বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোনো কাজ করে তখন ললিতা নির্মলাকে অথবা নির্মলা ললিতাকে একটি কথা বলে—'হায়—সখি, অবশেষে!'

অর্থাৎ যে পিরীতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত, সেই পিরীতিতেই সে পড়িল অবশেষে!

বসন্ত রাগে না, মুচকি হাসিয়া শুধু বলে—মরণ!

প্রৌঢ়াও হাসে। মধ্যে মধ্যে সেও দুই-চারিটা রহস্য করিয়া থাকে।

—বসন, ফুল তবে ফুটল। কোকিল নাম পালটে ওস্তাদের নাম দে বসন ভোমরা। কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো?

বসন্ত হাসে।

শুধু একটা সময়, বসন্ত—পুরানো বসন্ত। সেটা সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার পর হইতেই সে উগ্র হইয়া উঠে। এটা তাহাদের দেহের বেসাতিব সময়। সন্ধ্যার অন্ধকার হইলেই ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়। মেয়েরা গা ধুইয়া প্রসাধন করিয়া সাজিয়াগুজিয়া বসিয়া থাকে। তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায়। অথবা আপন আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে—মোট কথা, এই সময়ের আলাপ-রঙ্গরহস্য সবই মেয়েদের পরস্পরেব মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়া ছাড়া। মেয়েরা ইঙ্গিতময় ভাষায় অশ্লীল ভাবের রঙ্গরহস্য করে নিজেদের মধ্যে।

নির্মলা মৃদুস্বরে ডাকে—নি ব, নি-স, নি-স্ত। অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে—বসন্ত!

বসন্ত উত্তর দেয়—নি-কি? মানে—কি?

ওই নি শব্দটাকে যোগ করিয়া তারপর চলে অশ্লীল রহস্য। কোন একদিনের ব্যাভিচার-বিলাসের গল্প। সকলেই তাহাবা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। যেন সম্মুখের দেহব্যবসায়ের আসরের জন্য মনটাকে তাহারা শানাইয়া লয়। এই কাজ হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। একদিকে মাসী দেয় না, অন্যদিকে চিরজীবনের অভ্যাস—সেও দেয় না। উপায় নাই।

পুরুষদেরও এ সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন পাতে। তাহাদেরও যেন সামাজিক ভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া যায়। একান্ত নির্লিপ্তের মত তাহারা বসিয়া থাকে।

নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে, আপনার লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দপ্তর খোলে, লেখে, পড়ে। বসন্তর ঘরে আগন্তুকদেব মত্ত কণ্ঠের সাড়া জাগে—নিতাই রামায়ণ পড়ে। কৃষ্ণলীলা পড়ে। গানও রচনা করে—

"আর কতকাল মাকাল ফলে ভুলবি আমার মন?"

অথবা—

"আমার কর্মফল
দয়া ক'রে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল!"

কখনও সে বসিয়া ভাবে। ভাবে, বড় বড় কবিয়ালদের কথা—যাহারা সত্যকারের কবিয়াল। ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না। তেমন বায়না ইদানীং তাহার ভাগ্যেও দুই-একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার তাহার এ দল হইতে বাহির হইয়া পড়া উচিত। এক বাধা বসন্ত। বসন্ত যে রাজী হয় না। সে সবই বুঝিতে পারে। তবুও সে এ দল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। আশ্চর্য। সে আপন মনেই একটু হাসে।

—কি রকম? হাসছ যে আপন মনে?

নিতাই চাহিয়া দেখে—বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। সে বসিয়া আছে অল্প দূরে। বেহালাদার বসিয়া আপনার বেহালাখানিকে লইয়া পড়িয়াছে। সুর বাঁধিতেছে। সে-সুর-বাঁধা যেন তাহার ফুরাইবার নয়। সুব বাঁধিয়া একবার ছড়ি টানিয়াই আবার তার-বাঁধা কানটায় মোচড় দেয়। তার কাটিয়া যায়। বেহালাদার নূতন তার পরাইতে বসে। ছড়িতে রজন ঘষে। বেহালাখানাকে ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ লাগায়।

নির্মলার ঘরে কলরব উঠে।

বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে—বাজনা তাহার ভাল জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। একটা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়। লম্বা টানা একটা সুর। সুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে বাজিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই ঝিমঝিম করিয়া উঠে। মনে হয়, যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে, চারিদিক যেন হিম হইয়া গেল। যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠান্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনের চিন্তা-ভাবনাও যেন অসাড় হইয়া যায়।

দোহারটা তর্ক করে বাজনাদারের সঙ্গে।

বাজানাদারটার উপরে কোন কিছুর ছায়া পড়ে না। তাহার কেহ ভালবাসার জন নাই। সে হা-হা করিয়া হাসে—বাজনা বাজায়। দোহারটার তর্কের জবাব দেয়। মধ্যে মধ্যে মেয়েদের ঘরে গিয়া মদ খাইয়া আসে। বেহালাদারের জন্য মদ লইয়া আসে। তারপর ঘুম পাইলেই বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়ে।

দোহারটি ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে।

মহিষের মত লোকটা ধুনির সম্মুখে বসিয়া থাকে। প্রৌঢ়া ঘরগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া সুপারি কাটে। লোকজন আসিলে মেয়েদের ডাকিয়া দেখায়, দরদস্তুর করে, টাকা আদায় করে। গোপনে মদ বিক্রি করে। প্রৌঢ়ার এই সময়ের মূর্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গম্ভীর, কথা খুব কম কয়, চোখের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রূকুটি উদ্যত করিয়াই রাখে; দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয়। বসন্ত উগ্র হইয়া দেহের খরিদ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে। প্রৌঢ়া মাসী আসিয়া দাঁড়ায়, বসন্তকে সে প্রায় ধমক দেয়।—এই বসন! কি ব্যাপার? ঝগড়া করছিস কেনে?

—বেশ করছি। মদ খেতে বলছে, আমি মদ খাব না।

—এক-আধটু খেতে হবে বৈকি। তা না হলে হবে কেনে? নোকে আসবে কেনে?

—না আসে, না-ই এল। আমার ঘরে লোক এসে দরকার নাই।

—দরকার নাই!

—না।

—বেশ, কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেয়ো। আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

শুধু বসন্তই নয়, নির্মলা ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে। তাহারাও বলে—দরকার নাই, আর পারি না। মাসীর কিন্তু ক্লান্তি নাই, সে অনড়। তাহার সেই এক উত্তর—তা'হলে বাছা তোমাদের নিয়ে আমার দল চলবে না। তোমরা পথ দেখ। ঝুমুর দলের লক্ষ্মী ওইখানে। ও

পথ ছাড়লে চলবে না।

সকলকে চুপ করতে হয়, বসন্তকেও হয়। আবার এটাও আশ্চর্যের কথা যে, ব্যবসাটা তাহারা ছাড়িতে চায়, সে জীবনে বিষ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই ব্যবসায় ও সেই জীবনে ভাটা পড়িয়া আসিলে, মন্দা পড়িলে তাহাদেরই আর ভাল লাগে না, তাহারাই চিন্তিত হইয়া পড়ে। আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয়।

দূর, দূর, রোজগার নাই, পাতি নাই, লোক নাই, জন নাই—কিছু নাই। সব ভোঁ ভোঁ। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে—ঠিক বলেছিস, ভাই, ভাল লাগছে না মাইরি।

—ললিতে!

—কি?

—এ কেমন জায়গা বল তো?

—কে জানে ভাই। পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম নাকছাবি গড়াব ব'লে, চার টাকা খরচ হয়ে গেল। বসন!

বসন চুপ করিয়াই থাকে। তাহার দেহ-মন দুই-ই ক্লান্ত। নির্মলা ললিতা আবার ডাকে। কি লো চুপ করে রয়েছিস যে! —তারপর বলে—তোর ভাই অনেক টাকা।

কোন দিন ইহার উত্তরে বসন ফোঁস করিয়া উঠে। ঝগড়া বাধিয়া যায়। কোন দিন বিষণ্ণ-হাসি হাসিয়া উঠিয়া যায়। মেয়েটার মতিগতি কখন যে অস্থির, কখন যে শান্ত, বুঝিয়া ওঠা দায়। ঝগড়া বাধিলে নিতাইকে আসিয়া থামাইতে হয়। বসনকে ঘরে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া শান্ত করে। শান্ত হইলে প্রশ্ন করে—কেন এমন কর বসন?

বসন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া পড়িয়া বলে—জানি না।

নিতাই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়।

খুব বেশী মন্দা পড়িলে—মাসী নূতন পথ ধরে। মেয়েদের ডাকিয়া বলে—আজ সাজগোজ কর দেখি ভাল ক'রে। গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে যাব।

অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনিবে।

মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুরঘাটে যায়। স্নো, সিঁদুর, পাউডার, টিপ লইয়া সাজিতে বসে। হাঙ্গামা হয় বসনকে লইয়া। সে কোনদিন যাইতে চায়—কোনদিন চায় না। মাসী ইহার ওষুধ জানে। সে আগে হইতেই বসনকে খানিকটা মদ খাওয়াইয়া রাখে। অবশ্য মদ খাওয়াইবার জন্য অনেক ছলনা করিতে হয়, ভুলাইতে হয়।

ধোয়া ধপধপে কাপড় পরনে প্রৌঢ়া গালে একগাল পান পুরিয়া মেয়েদের সঙ্গে বাহির হয়।

মেয়েদের এই দেহের বেসাতির উপার্জনেও প্রৌঢ়ার ভাগ আছে। এই উপার্জন তিন ভাগ হইবে। দুই ভাগ পাইবে উপার্জনকারিণী মেয়েটি, এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌঢ়া—এই নিয়ম। গানের আসরে উপার্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয়। আসরের উপার্জন হয় আট ভাগ—আট ভাগ হইতে—এক ভাগ হিসাবে —মেয়েটি তিনটি পায় তিন ভাগ—এক ভাগ প্রৌঢ়ার—দুই ভাগ কবিয়ালের, এক ভাগ বেহালাদারের—এক ভাগ আধ ভাগ হিসাবে দোহার ও বাজনদার পায়। উপার্জন যে লোক হইতে হইবে না—প্রৌঢ়া তাহাকে দলে রাখিবে না। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সে উপার্জনের পথগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কোন দিক হইতে ক্ষীণতম সাড়া পাইলেই সে মিষ্টিমুখে সরস বাক্যে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলে—কে গো বাবা? এস, এগিয়ে এস। নজ্জা কি ধন? ভয় কি? এস এস। আগন্তুক আগাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয়, পান দিয়া সম্মান করিয়া বলে—পানের জন্য দু আনা পয়সা দাও বাবা। দিতে হয়।

পয়সা কটা খুঁটে বাঁধিয়া তবে মেয়েদের ডাকে—ওলো বসন, নির্মলা ইদিকে আয়। বলি ললিতে, ক'ভরি সোনা কানে পরিছিস লো?

এমনি একদিন—

মাসী তাহাকে ডাকিল—বসন! শোন, একটি লোক তোকে ডাকছে লো, বলছে সে তোকে চেনে।

বসন্ত সেদিন বলিল—আমার গা কেমন করছে মাসী। শরীর ভাল নাই।

শরীরে আবার কি হ'ল তোর? কিছু হয় নাই, শোন ইদিকে। একটু মদ খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে শরীর। শোন, ইদিকে আয়।

আহ্বান—আদেশ। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বসন বাহির হইয়া আসিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, গায়ে সুগন্ধি মাখিয়া একটি রীতিমত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী বলিল—দেখি, তোর গা দেখি!...ওমা, গা যে দিব্যি—আমার গা তোর চেয়ে গরম। ওগো বাবা, মেয়ের আমার শরীর খারাপ, একটু মদ খাওয়াতে হবে। সহসা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কাছেই আছে।

রূপোপজীবিনী নারীর আজীবনের বহু ভোগের নেশা। সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া বসন্তের মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠিল। কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।

মাসীও হাসিল। সে তো জানে, এ বিষ একবার ঢুকিলে—প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না। বসন্তের শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোকটা চলিয়া গেল বসন্তেরও নেশা ছুটিয়া যায়। মদের নেশার প্রতিক্রিয়ার মতই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া ওঠে। নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিল। এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে, কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আজও করিল। কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয়, কোথায় যাইবে? ওই মাসী—ওই নির্মলা—ওই ললিতা ছাড়া—কে কোথায় আপন জন আছে তাহার? এই দুনিয়া-জোড়া পথ ছাড়া ঘর কোথায় তাহাদের?

দিন সাতেক পর।

বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসীকে বলিল—মাসী।

বসন্তর কণ্ঠস্বরে মাসী চমকিয়া উঠিল। এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরানো বসন্তর কণ্ঠস্বর। —কি বসন?

কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস ফিস করিয়া বসন্ত —সেই পুরানো বসন্ত বলিল —ওষুদ, মাসী, আমার ব্যামো হয়েছে।

—ব্যামো? কাসি?

না না না। বসন্তর চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল—সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই প্রৌঢ়া নিজের ভুল বুঝিল, —সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়া মাসী বলিল, —তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরী করে দেব। তিনদিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস না।

ইহাদের জীবনের এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য, আসিবেই। মানুষের জীবনে কোন্ কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল—সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে কিন্তু এ ব্যাধি অনিবার্য। শুধু অনিবার্যই নয়, এই ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াই সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের। এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে।

ডাক্তারও দেখায় না, কবিরাজও না। নিজেরাই চিকিৎসা করে। ধরা-বাঁধা হাতুড়ে চিকিৎসা। চিকিৎসা অর্থে—ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়। কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধুলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সে সব কথা ইহারা ভাবে না। এইটাই যে সে-সব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে।

বসন্তও আকুল হইয়া মাসীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাসী রোগের চিকিৎসা জানে।

সংবাদটায় ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছু নাই। শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হয়, রোগগ্রস্তার গামছা কাপড়ের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিলেই হইল। তাহারই মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা-দোষের আভাস ফুটিয়া উঠে।

গামছা-কাপড় সাবধান করিয়া নির্মলা ললিতা আসিল।

বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

নির্মলা পাশে বসিয়া বলিল—চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।

নিতাই, গত রাত্রে কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল, লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বসন্ত নির্মলাকে বলিল—বারণ কর।

সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিযা কথা বলিতে পারিতেছে না।

নির্মলা বলিল—দাদা—দাদা—

নিতাই হাসিয়া বলিল—কেনে ব্যস্ত হচ্ছ বসন? কিছু ভয় ক'রো না তুমি, আমাব কিছু হবে না।

নির্মলা অবাক হইয়া গেল।

তিনদিনের স্থলে নয়দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট কবিতেছিল। সর্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে, দেহে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল। এমন ক্ষেত্রে রুগ্ন মেয়েগুলির দুর্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে। যেটুকু সেবা—যেটুকু যত্ন জোটে, সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই। নিতাই কিন্তু বসন্তর শিয়রে বসিয়া আছে—প্রশান্ত হাসিমুখে।

সেদিন।

বাহিরে রাত্রি তখন নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরের সমীপবর্তী হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর। জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঢুলিতেছিল। সুরের সাড়ায় সে জাগিয়া উঠিল। একটু না হাসিয়া সে পারিল না। খেয়ালী বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে। আজ নির্মলাব ঘরে বীভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে। বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথাই বটে। সন্ধ্যা হইতেই সে আজ এই সুর শুনিবাব প্রত্যাশাও করিয়াছিল। বড় মিঠা হাত। কিন্তু অদ্ভুত সুর। বেহাগেব আমেজ আছে। শুনিলেই মনে হয়, গভীর গাঢ় অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল।

—আঃ ছি! ছি! ছি! —বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—কি বসন? কি হচ্ছে?

—আ! বারণ কর গো—বাজাতে বারণ কর।

—ভাল লাগছে না?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল—নাঃ, নাঃ। আমার হাত পা যেন হিম হয়ে আসছে।

ছড়ির টানে একটা দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে। রাত্রি যেন কাঁদিতেছে।

উনিশ

পুরা এক মাস লাগিল। এক মাস পর বসন্ত রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া বসিল। কিন্তু বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিয়া চেনা যাইতেছিল না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহবর্ণের উজ্জ্বলতা, লাবণ্য সব কিছু নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়—সর্ব্বাঙ্গে কে যেন কয়লার গুঁড়া মাখাইয়া দিয়াছে। মাথায় সে চিকন কালো দীর্ঘ চুলের রাশি হইয়া উঠিয়াছে কর্কশ পিঙ্গলাভ। শুধু বর্ণই নয়—তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিয়াছে। তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ। রস-নিটোল কোমল দেহখানা কঙ্কালসার। বসন্তের গরব-করা রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুটি চোখ। শীর্ণ শুষ্ক মুখে চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে। চোখ দুইটা জ্বলজ্বল করিয়া জ্বলিতেছিল। ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মত।

সেদিন মাসী বলিল—বসন, বেশ ভাল ক'রে 'ত্যালে হলুদে' মেখে চান কর আজ।

বসন্ত নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে কোন উত্তর দিল না, একটু নড়িল না, চোখের একটা পলক পর্যন্ত পড়িল না।

মাসী আবার বলিল—রোগের গন্ধ মরবে, অঙ্গের কালচিটে খসখসে বদছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।

বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মাসী এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল—গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল; ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—ললিতে, বাটিতে করে খানিক তেল গরম করে দে তো মা! আর খানিক হলুদ! তারপব সে ডাকিল নিতাইকে—বাবা! বাবা কোথা গো?

নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্তর রোগশয্যা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল। বিছানাপত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমাকে বলছ মাসী?

হাসিয়া প্রৌঢ়া বলিল—বাবা মানুষের একটাই গো বাবা! সে আমার তুমি। ভাল বাবা তুমি, মেয়ে ডাকছে—বুঝতে লারছ?

হাসিয়া নিতাই বলিল—বল।

—বসনের চিরুনি আর তেলের শিশিটা দাও তো বাবা, মাথায় জট বেঁধেছে—আঁচড়ে দি।

বসন্ত এতক্ষণে কথা বলিল—বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওসব কি হবে?

ঘরের মধ্যে তেলের শিশি ও চিরুনির সন্ধানে যাইতে যাইতে নিতাই বলিল—কাচতে হবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—না! বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্না তাহার আর থামে না।

নিতাই আশ্চর্য মানুষ! সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মাসী যা বলছে তাই শোন বসন। এ সব এখন তুমি ভেবো না।

বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল।

নিতাই আবার বলিল—আমারও তো মানুষের শরীর। আমার রোগ হলে তুমি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ো। আমি না হয় মহাজনের মত হিসেব ক'রে শোধ নেব। না কি বল মাসী।

সে হাসিতে হাসিতে বিছানাগুলি লইয়া গেল।

ললিতা, নির্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বসন আমাদের ভাগ্যিমানী।

রোগ-ক্লেদ-ভরা বিছানা কাপড়—সমস্ত ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল। ললিতা নির্মলা দেহোপজীবিনী। তাহাদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ, আসে, চলিয়া যায়। যদি বা

কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয়—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মত দেহোপজীবিনীর দেহে দুর্দশার আভাস আসিবামাত্র সে চলিয়া যায়। নির্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে তিনবার, ললিতার হইয়াছে দুইবার। রোগ প্রকাশ পাইবা মাত্র তাহাদের ভালবাসার জন পলাইয়াছে। নির্মলার একজন প্রেমিক আবার—রোগের সুযোগে তাহার যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়া ছিল। আজ নিতাইয়ের আচরণ দেখিয়া তাই তাহারা অবাক হইয়া গেল। শুধু নিজেদের নয়—তাহাদের সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই।

বিছানা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, বসন্ত তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল। তেলহলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন্ত খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে; মাথায় চুল আঁচড়াইয়া প্রৌঢ়া একটি এলো খোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছে—কপালে একটি সিঁদুরের টিপও দিয়াছে।

রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুশী হইল। বলিল—বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত লাগছে।

বসন্ত হাসিল। তারপর ফেলিল একটা গভীব দীর্ঘনিঃশ্বাস। নিতাইয়ের কথাগুলো যেন বসন্তের ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়ে গেল। বসন্তের হাসির মধ্যে যত বিদ্রূপ তত দুঃখ। তাহা দেখিয়া নিতাই বিচলিত না হইয়া পারিল না।।

কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল—আমি মিথ্যে বলি নাই বসন। তোমার রং ফিরেছে—দুর্বল হোক, চেহারার রোগা রোগা ভাব গিয়েছে—বিশ্বাস না হয়, আয়নায় তুমি নিজে দেখ। সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া আয়নাখানা পাড়িয়া আনিয়া বসন্তর সম্মুখে ধরিয়া দিল।

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

বসন্তের বড় বড় চোখের কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া, শুষ্ক কালো বারুদের মত—তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। মুহূর্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া বসন্ত তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্বল হাতের লক্ষ্য—আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইয়াছিল—তাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিন-চার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাচেব টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেই মুহূর্তে একটি কঠিন কণ্ঠস্বর বণরণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।—বসন!

নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল মাসী। গম্ভীর কঠোর স্বরে মাসী আবার বলিল—বসন!

বসন্ত তেমনি নীরব অচঞ্চল; চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিষ্পলক।

—বলি, রোগ না হয় কার? তোর একার হয়েছে? জানিস—এই মানুষটা না থাকলে তোর হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি হ'ত?

বসন্ত তবু উত্তর দিল না। আর মাসীর এ মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয়। এ মাসী আলাদা মাসী। নিষ্ঠুর কঠোর শাসন পরায়ণা দলনেত্রী। মেয়েরা হইতে পুরুষ—এমন কি তাহার নিজের ভালবাসার জন—ওই মহিষের মত বিশালকায় ভীষণদর্শন লোকটা পর্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্তিব সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় নায়। নিতাইও এ স্বর, এ মূর্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল। কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ মূর্তি সে আজ প্রথম দেখিতেছে।

মাসী আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল—বসন! কথার জবাব দিস না যে বড়!

বসন্ত এবার দাঁড়াইল, নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টি মাসীর দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—দুইজনের মাঝখানে। মাসীর চোখে দুইটা ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—

রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মত। বসন্তর চোখে আগুন—তাহার চেতনা নাই—কিন্তু ভয়ও নাই—শুধু দাহিকাশক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে। নিতাই সবিনয়ে হাসিয়াও দৃঢ় স্বরে বলিল—বাইরে যাও মাসী। ছি! রোগা মানুষ—

—রোগা মানুষ! রোগ সংসারে আর কারও হয় না? ওর একার হয়েছে? ঝাঁটা মেরে—

—ছি মাসী, ছি!

—ছি কেনে—ছি কেনে শুনি?

—রোগা মানুষ। তা ছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই।

—আমার দলের লোকের ওপর করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেনে? তুমি আমার দলের লোক, কবিয়াল।

নিতাই শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে—একটু হাসিয়াই বলিল—তা বটে! তবে বসনের জন্যই তোমার দলে আছি মাসী। নইলে—। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—যাও, তুমি বাইরে যাও।

প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। দলনেত্রী এ কথাটা ভাল করিয়াই জানে। দলের সর্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার, প্রতিটি কপর্দক তাহার হাত দিয়া বিতরণের বিধি—তাহার আসন, তাহার সাজ-সরঞ্জামের আভিজাত্য, প্রত্যেক জনকে তাহার অধীন অনুগত্য করিয়া তোলে। নিজের যৌবনে—তাহার দলনেত্রীর দলের সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তাহার দলেও এতদিন পর্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এক্ষেত্রে তাহার দুর্দান্ত রাগ হইবার কথা, সক্রোধে ওই ভীষণ দর্শন লোকটাকে আহ্বান করাই উচিত। কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটাও তাহার মনে হইল না। মনে হইল—এ লোকটি তাহার আনুগত্য কোনদিনই স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, অস্বাভাবিকও কিছু নাই। নিতাই কোনমতেই তাহার কোন অপমানই করে নাই।

তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আশীর্বাদ করি বাবা, তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তা হ'লে শেষকালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—মা-মাসী তো সমান কথা গো। এখন ঘরে যাও, বউ-বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

আর কোন কথা না বলিয়া সে অনুরোধ মানিয়া লইল, চলিয়া গেল।

নিতাই এবার বসন্তর দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি! রোগা শরীরে কি এত রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন।

অকস্মাৎ বসন্ত সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইতে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল—আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন?

বসন্তের কান্না বাড়িয়া গেল। সে কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুধের দোকানে চিঠি লিখেছি। সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাসিতে আরম্ভ করিল। কাসিয়া খানিকটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন দেখাইয়া দিল।

—কি?

এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল—অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—রক্ত!

—রক্ত?

—সেই কালরোগ। বসন্ত আবার হাসিল। এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটা বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল। কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়াছে।

নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তোলা শ্লেষ্মার মধ্যে টকটকে রাঙা আভাস সুস্পষ্ট। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি হাসিয়া সে একদৃষ্টে নিতাইয়েব মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাইও নিজের দুই হাতের বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মত তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল—ভয় কি? রোগ হ'লেই কি মরে বসন? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

এবার সে এক বিচিত্র হাসি হাসিযা বসন্ত নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না!

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না।

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমি জানতাম কবিয়াল। যেদিন সেই গান তোমার মনে এসেছে—সেই দিনই জেনেছি আমি।

—কোন্ গান বসন?

—জীবন এত ছোট কেনে—হায!

ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাইয়ের চোখেও এবার জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটিল না আশ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?

তারপর?

তারপর আর হয় নাই। অসমাপ্ত হইয়াই আছে। নিতাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কবে শেষ হইবে কে জানে!

বসন্তই আবার কথা বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয়? তার ওপর ওই গান তোমার মনে এসেছে! কি করে এল?

বসন্তের মনের কথা হইয়া উঠিল দৈববাণীর মতই সত্য, মিথ্যা নয়।

দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে বসন্তের গায়ে স্পষ্ট জ্বর ফুটিয়া উঠিল। সে নিতাইকে ডাকিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—দেখ কত গরম!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—হায় জীবন 'এত ছোট কেনে, এ ভুবনে কবিয়াল!

কথাটা হইতেছিল একটা ছোটখাটো শহরে, শহরের নামটাই বলি না কেন, কাটোয়া। কাটোয়ার

এক প্রান্তে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল—ললিতাকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।

—না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—না।

—এই আধ ঘণ্টা। আমি দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসব।

—না গো—না। যদি কাসি ওঠে? যদি রক্ত দেখতে পায়? তবে এই পথের মধ্যেই ফেলে আজই এখুনি পালাবে সব। যেও না, তুমি যেয়ো না।

নিতাই অগত্যা বসিল। রক্ত উঠার কথা আর সকলের কাছে লুকানো আছে।

জ্বরটা যেন আজ বেশী বেশী বাড়িতেছে। অন্য দিন রাত্রি প্রহরখানেক হইতেই খানিকটা ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, বসন্ত অনেকটা সুস্থ হয়। আজ ঘামও হয় নাই—সে সুস্থও হইল না। মধ্যে মধ্যে জ্বরজর্জর অসুস্থ বিহ্বল ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিয়া সে চারিপাশে খুঁজিয়া নিতাইকে দেখিতেছিল—আবার চোখ বন্ধ করিয়া এ-পাশ হইতে ও-পাশ ফিরিয়া শুইতেছিল। অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত।

নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল। তাই যতবার সে চোখ মেলিয়া তাহাকে খুঁজিল, ততবার সে সাড়া দিয়া বলিল—আমি আছি। এই যে আমি!

রাত্রি তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপে নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে, এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছের পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটি কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে। হতচেতন হইয়া এ সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয়। মাটির ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিম-স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জীব জীবনের চৈতন্যলোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করিয়া দেয়। আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর; সে লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে—ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রি-দেবতার ললাট-চক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। নিতাই শত চেষ্টা করিয়াও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ তাহার চেতনা ফিরিল বসন্তের আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে। দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো!

সে কি আর্তবিহ্বল তাহার কণ্ঠস্বর!

—কি বসন? কি? উঠে বসলে কেনে? শোও, শোও। বসন্তর হাত দুইটি হিমের মত ঠাণ্ডা; পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে তাহার সর্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তের সর্বাঙ্গে ঘাম।

—বারণ কর। বারণ কর!

—কি?

—বেহালা! বেহালা বাজাতে বারণ কর গো!

—বেহালা! কই? নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও—তাহাদের দুইজনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া—আর কোন ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না।

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না? ওই যে, ওই যে! কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে!

চকিতের মত একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

বসন্তর দেহের স্পর্শই তাহাকে সে কথাটি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিল। মণিবন্ধে নাড়ীব গতি অনুভব করিয়া নিতাই সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দের নাম কর বসন—

—কেনে? বসন্ত তাহার বিহ্বল চোখ দুইটা নিতাইয়ের মুখের দিকে স্থাপন করিয়া অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কেনে?

কেনে, সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না।

মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।

নিতাই অপরাধীর মত চুপ কবিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল, সে নালিশের সব দায়দাবী, কি জানি কেন, তাহারই মাথার উপর যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিল।

বসন্ত এপাশে ফিরিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।

তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—বসন! বসন!

—না, আর ডেকো না। না। বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পবক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

কুড়ি

গঙ্গার তীরবর্তী শহর। গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশানেই, নিতাই-ই বসন্তর সৎকার করিল। সাহায্য করিল মেয়েরা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল। দোহার—ললিতার ভালবাসার মানুষ—সে মুখ ফুটিয়া বলিল—ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক। আবার কেনে?

নিতাই হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিবার লক্ষণও দেখাইল না। তার্কিক দোহার লোকটি ছাড়িল না, বলিল—হাসির কথা নয় ওস্তাদ। পরকালে কি জবাব দেবে বল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কোন জবাব দেব না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ভাই।

বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—যাক ভাই, ও কথা যাক। বলিয়াই সে বেহালায় ছড়ির টান দিল।

চিতার উপর শবদেহ চাপাবার পুর্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! বসন, আমার সোনার বসন! দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। পাশেই বালুচরের

উপর বসিয়া ছিল নির্মলা এবং ললিতা। নিঃশব্দ কান্নায় তাহাদের চোখ হইতে শুধু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায়।

নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল—দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও। সে আসিয়া বসন্তর আভরণ খুলিতে বসিল। নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীর কি-ই বা আভরণ। কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকছবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তর গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার।

নিতাই হাসিল। বলিল—খুলে নিচ্ছ মাসী?

মাসী কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া অন্ধকার, খাদ্য বিষ, আর কিছু ছোঁব না—কখনও কিছু খাব না। আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়, পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়, লোকের সঙ্গে চোখ জুড়তে হয়। বাঁচতেও হবে, খেতে-পরতেও হবে—ওগুলো চিতেয় দিয়ে কি ফল হবে বল। বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে হাতের গহনাগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—এগুলি আবার আমার পাওনা বাবা!

নিতাই আবার একটু হাসিল, হাসিয়া সে বসন্তর নিরাভরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল।

প্রৌঢ়া বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওয়ারিশান! প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললিতা, নির্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্তর চিতার দিকে চাহিয়া ছিল। বসন্তর বিয়োগে বেদনা তাহাদের অকৃত্রিম, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল নিজেদের কথা। তাহাদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হইবে, মাসী এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে। বহুভাগ্যে যদি বুড়া হইয়া বাঁচে, তবে ওই মাসীর মতই তাহারাও হয়তো দলের কর্ত্রী হইবে। তখন—, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কল্পনা তাহাদের ততদূর গেল না, আশার চেয়ে নিবাশাই তাহাদের জীবনে বড়। শুধু তাহাই নয়, নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্তটিতে বড় ভাল লাগিতেছে। তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে, মাসী বাঁচিয়া থাকিবে।

সৎকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, মহিষের মত লোকটা বসন্তর ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বসন্তর জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে।

আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের একপাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপজর্জর, পরিশ্রমক্লান্ত দেহখানা ছড়াইয়া দিল।

সে ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়; ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্ম বিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসন্তর সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায়? তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেইখানেই সে যাইবে। সে হয়তো অনন্ত নরক।

তা হোক। সেদিন তো আবার তাহার সহিত দেখা হইবে! কিছুক্ষণ পর মনটা আবার হায়

হায় করিয়া উঠিল। আজ কিছুতেই তাহার মন ভরিতেছে না। তাহার কোলের উপরেই যে বসন্ত লুটাইয়া পড়িয়া মরিল, সে যে নিজহাতে তাহার দেহখানা পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে কিছুক্ষণ আগে। আর যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে বসন্তকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।

বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত। ঝক্‌মকে ক্ষুরের মত মুখের হাসি, আগুনের শিখার মত তাপ, তেমনি রঙ তেমনি রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতই বসন্তের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল। গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না।

মরণ সত্যসত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা! সেই গহনা প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য বসন্তর কত যত্ন! এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না।—সেই দেহখানা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, ক্ষোভ, মোহ এই মুহূর্তে মরণ সব ঘুচাইয়া দিল। মরণ অদ্ভুত! থাকিতে থাকিতে তাহার মনে সেই গানের কলিগুলা গুনগুন করিয়া জাগিয়া উঠিল—

এই খেদ মোব মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে।
এ ভুবনে?

বসন বলিয়াছিল, কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি কেনে বাঁধলে কবিয়াল। গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ—যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে? সুর গুনগুন করিয়া উঠিল।

জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে?

মেটে! তাই মেটে! বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে—সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে—পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে—সে জগতে? ওঠে? ওঠে?

এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়! জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

হঠাৎ একটা কলহ-কোলাহলে তাহার গানের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল। বাহিরে দলের লোকেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্মলা তীক্ষ্ণস্বরে চীৎকার করিতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা শুনিয়া সে আরও মর্মাহত হইল। ঝগড়া বাধিয়াছে বসন্তের স্থান পূরণ লইয়া। ছি! ছি! ছি!

বসন্ত আজই মরিয়াছে, দুপুরবেলা পর্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল! তাহার স্থান কে লইবে সেই সমস্যা এখনই পূরণ না করিলেই নয়? প্রৌঢ়া বসন্তের জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ললিতা, নির্মলা আজ নিজেরা খরচ দিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বেহালাদার,

দোহার ও ঢুলীটা আলোচনা করিতেছিল কোন্ ঝুমুর দলে গানে-নাচে-রূপে যৌবনে সেরা মেয়ে কে আছে! সর্ববাদিসম্মতভাবে 'প্রভাতী' নাম্নী কে একজন তরুণীর নাম স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে; মেয়েটা নাকি বসন্ত অপেক্ষা আরও ভালো এই কারণে যে তাহার বয়স বসন্তের চেয়ে অনেক কম। দোহার বলিতেছে, তাহাকেই আনা উচিত। তাহাতে বিশ ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত লাগে তাহা দিয়াও তাহাকে দলে আনা উচিত। না হইলে এমন যে দলটা এদলটাও অচল হইয়া যাইবে।

ঢুলীটা এই কথায় বলিয়াছে—চিঁড়ে রসস্থ না হলে গলা দিয়ে নামে না। শুধু কবিয়ালের গান কেউ শুনবে না। ললিতা নির্মলা মুখপাত হ'লে চোখ বুজে গান শুনতে হবে।

ললিতা নির্মলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। একে রূপোপজীবিনী নারী, তার উপর মদের নেশা। রূপের নিন্দা শুনিয়া গালিগালাজে স্থানটা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নিতাইয়ের ভাল লাগিল না। সে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে চলিতে কখন একসময় আসিয়া দাঁড়াইল গঙ্গার ধারে, শ্মশানে। সেইখানে সে বসিল।

সামনে জনশূন্য শ্মশান। একটা চিতা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। এখানে ওখানে ছাইয়ের গাদা। গঙ্গার ওপারে পূর্বদিকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। দগ্ধ দেহের গন্ধে এখানকার বাতাস ভারী। ইহারই মধ্যে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দু'চোখ ভরিয়া নিতাই জীবনের ওপারকে কখনও সে দেখে নাই। জীবনের ওপারে মৃত্যুপুরী, মরণ ওখানে বসিয়া আছে।

পাড়ায় গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার ছিল। এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল। মনে হইতেছে, বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত। কপালে হাত রাখিয়া কতদিন সে চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন ছ্যাঁক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিল যে না চমকিয়া পারিত না। আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল।

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। অনেক গোপন সাধ তাহার ছিল। হঠাৎ মনে হইল—বসন্তের আত্মা যদি—। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মার তো দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে। গভীর নিশীথ রাত্রে বসন্ত যদি আসে চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক রূপের দেহখানির সন্ধানে? বুকখানা তাহার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সে একেবারে আসিয়া বসিল—শ্মশানের ভিতর বসন্তের চিতার পাশটিতে। রাত্রির তখন সবে প্রথম প্রহর। সব স্তব্ধ। সব অন্ধকার। শুধু ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। শহরের আলো কোলাহল অনেকটা দূরে। নিতাই চিতার পাশে বসিয়া মনে মনে বলিল—বসন এস!...বসন এস!...বসন এস!...বসন এস!

বসন্ত কিন্তু আসিল না।

সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল, শকুন, কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল, তাহারা একে একে আসিল, কলহ করিল, খেলা করিল, চলিয়া গেল। গঙ্গার জলে কত জলচর সশব্দে ঘাই মারিল, কিন্তু বসন্তর দেখা মিলিল না। সারারাত্রি বালুচরের ধার ঘেঁষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু; আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে সড়কটায় কত গরুর গাড়ি গেল; গাড়ীর নীচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা

আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকিগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তর আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম পর্যন্ত হইল না। আকাশের তারাগুলা পূর্ব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল; পূর্ব আকাশে শুকতারা উঠিল। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গঙ্গার পূর্ব পাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপারে সারি-সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল, কলকল কলকল করিয়া পাখীগুলা একবার রোল তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নাঃ, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। খোলা চোখের সামনে যে বসন্ত কোথাও ছিল না, নিতাই চোখ বুজিতেই সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—বসন্ত! বসন্ত!

চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আকাশে অন্ধকারের ঘোর আরও কিছুটা কাটিয়াছে। নিতাইয়ের সম্মুখে গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা! কুকুরের পালগুলাও দেখা যাইতেছে। উদাস মনে আবার সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কি! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তর ছবি; ছবি নয়; যেন সত্যিকারের বসন্ত; সে হাসিতেছে, সে কথা বলিতেছে! পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় সাজিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে। নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।—

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যাকে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জ্বালা?
চিকন-কালা দিবস নিশি বাধায় যাচে।"

মনখানি তাহার পরিপূর্ণ মন হইয়া উঠিল। এ যে কেমন করিয়া হইল তাহা সে জানে না, তবে হইল। বসন্ত তাহার হারায় নাই! পরিপূর্ণ মনেই সে গঙ্গার ঘাটে নামিয়া মুখহাত ধুইল, তারপর ফিরিল বাসার দিকে।

বাসায় তখন বাঁধাছাঁদার তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে!

দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল—আমি বলি, ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।

নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার সুরে তাহারই পুরানো একটা গানের দুইটি কলি আবৃত্তি করিয়া দিল—

"সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে—ভবনে ভুবনে রহি কেমনে?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।"

ললিতা ঠোঁটে পিচ কাটিয়া বলিল—বল কি বোনাই, অঙ্গে তবে তোমার ছাই কই?

নির্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স দাদা, আমি চা ক'রে দি।

বাজনাদারটি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কাল ছিলে কোথা বল তো? কার বাড়ীতে? সে কেমন হে? অর্থাৎ তাহার ধারণা নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোন দেহব্যবসায়িনীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

বেহালাদার ধমক দিল—থাম হে, থাম তুমি। যেমন তুমি নিজে, তেমন দেখ সবাইকে। ব'স ওস্তাদ, ব'স।

নিতাই হাসিয়া বসিল।

প্রৌঢ়া এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তের কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাম-দস্তুর শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল। নিতাইকে বলিল—ওগো বাবা, এই বেলাতেই উঠছি। গুছিয়ে তোমার জিনিসপত্তর বেঁধে-ছেঁদে নাও।

নির্মলা একটি বাটিতে তেলমাখা মুড়ি নামাইয়া দিয়া বলিল—চায়ের জল ফুটছে, ততক্ষণে মুড়ি কটি খেয়ে নাও। কাল তো সারারাত খাও নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—বোন নইলে ভায়ের দুঃখ কেউ বোঝে না।

—আর মাসী বেটীর কথা বুঝি ভুলেই গেলে বাবা? প্রৌঢ়া আসিয়া একটি মদের বোতল, গোটা দুয়েক গত রাত্রের সিদ্ধ ডিম, মাংস আনিয়া নামাইয়া দিল।—কাল রাত থেকে আনিয়ে রেখেছি। খাও, শরীলের জুৎ হবে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—মা মাসীকে কি কেউ ভোলে, না—ভোলা যায়? চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—তুমি খাও, আমি আসছি।

প্রৌঢ়া চলিয়া যাইতেই ঢুলীটা আবও কাছে আসিয়া বসিল। নিতাই হাসিয়া বলিল—নাও, নাও, ঢেলে লাও, আরম্ভ কর।

কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে চুপি চুপি বলিল—বসনের কাপড়চোপড় বিক্রী হযে গেল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না।

অভিযোগ করিয়া ঢুলীটা আবার বলিল—গয়না দু এক পদ রেতে খুলে লাও নি কেনে, বল দেখি? এমুনি মুখ্যুমি করে, ছি!

নিতাই বোতল দেখাইয়া বেহালাদার ও দোহারকে বলিল—এস, লাও।

তাহাবাও এবার অপরিমেয় সহানুভূতির সঙ্গে কাছে আসিয়া ঘেঁষিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পবেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল—ওই। বোতল শেষ হয়ে গেল। তুমি? তুমি তো কই—

নিতাই হাসিয়া বলিল—তা হোক, দরকাব নাই।

—তুমি খাবে না?

—নাঃ।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নিতাই বলিল বেহালাদারকে—তোমার কাছে একটা জিনিস শিখবার সাধ ছিল। রাত্রে বেহালায় তুমি যে সুরটি বাজাও ওই সুরটি বেহালায় তুলতে শিখবো। গলায় পারি, বেহলায় শিখব।

বেহালাদার বলিল—নিশ্চয়। তোমাকে শেখাব না ওস্তাদ? দেখ দেখি। তিন দিনে শিখিয়ে দোব।

নিতাই হাসিয়া বলিল—তিন দিন আর পাব কোথায় তোমাকে?

—কেনে? সবিস্ময়ে প্রশ্নটা করিল দোহার। বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে

চাহিয়া রহিল। সে আঁচ করিয়াছে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আজই আমি চলব।

—সে তো আমরাও! তুমি—

দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল—থাম, তুমি থাম।

নিতাই কিন্তু দোহারের কথা ধরিয়াই জবাব দিল—হ্যাঁ যাব সবাই, তোমরা এক পথে, আমি আর এক পথে।

বেহালাদার তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, শুধু বলিল—ওস্তাদ!

নিতাই একটু চুপ করিয়া রহিল, কথার উত্তর দিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল;—মনে নূতন পদ আসিয়াছে।

'বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বল--কেমনে থাকে হেথায়!'

হঠাৎ বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—শোন ওস্তাদ, শোন, সেই সুর তোমাকে শোনাই, শোন। এসেছে।

সে ছড়ি টানিল—লম্বা টানা সুর। সেই সুব!

ইহারই মধ্যে আসিয়া হাজির হইল মাসী।

—বাবা!

নিতাই হাত তুলিয়া ইসারায় জানাইল—এখন নয়, একটু পবে। কিন্তু বেহালাদার থামিয়া গেল। সে মাসীব মুখ দেখিয়া থামিয়া গিযাছে।

মাসী বলিল—কি শুনছি বাবা?

—কি মাসী?

—তুমি—? তুমি চলে যাবে? আমাদের সঙ্গে যাবে না?

—না মাসী। খেলার একপালা শেষ হল। এবার নতুন পালা।

—অন্য দলে—?

—না মাসী। এবার পথের পালা। এবার পথে পথে।

প্রৌঢ়া অনেক বুঝাইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। বসন্তর গহনা কাপড়ে-চোপড়ের দামের অংশ পর্যন্ত দিতে চাহিল। আরও বলিল—বসনের চেয়ে ভাল নোক আমি দলে আনছি বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই সে থাকবে।

নিতাই বলিল—না মাসী, আব লয়।

নির্মলা কাঁদিল।

নিতাইও একবার চোখ মুছিয়া বলিল না ভাই, তুমি কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাব।

বেহালাদার বলিল--তুমি কি বিবাগী হবে ওস্তাদ?

নিতাই ও-প্রশ্নের জবাবে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাই তো! বসন্তের সঙ্গে যে গাঁটছড়া ও গিঁট সে বাঁধিয়াছিল, সে গিঁট খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। এবার একটা নতুন ডাক সে শুনিয়াছে। পথে পথে চলো মুসাফের। বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ সুরটি বাজিয়া উঠিল—বিবাগী?

বৈরাগ্যই তাহার ভাল লাগিল।

একুশ

ঝুমুরের দল ধরিল দেশের পথ।

নিতাই কোন্ পথে কোথায় যাইবে তাহা ঠিক করে নাই, তবে ওই দলটির সঙ্গে থাকিবে না তাহা ঠিক, সেই কারণে দলের বন্ধন কাটাইবার অন্য একটা পথ ধরিল। কাটোয়া হইতে ছোট লাইন ধরিয়া ইহারা চলিল মল্লারপুরের দিকে। নিতাই বড় লাইন ধরিয়া উত্তর মুখে চলিল। শেষ মুহূর্তে ঠিক করিয়া ফেলিল সে কাশী যাইবে।

নির্মলা অনেকখানি কাঁদিল। মেয়েটা তাহাকে দাদা বলিত। দাদা বলিয়া নিতাইয়ের জন্য কাঁদিতে তাহার সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না।

শেষ মুহূর্তে ললিতাও কাঁদিল। বলিল—জামাই, সত্যিই ছাড়লে!

প্রৌঢ়া বর্তমানের আশা ছাড়িয়াও কিন্তু ভবিষ্যতের আশা ছাড়ে নাই। সে বলিল—চিরকাল তো মানুষের মন বিবাগী হয়ে থাকে না বাবা। মন একদিন ফিরবে, আবার চোখে রঙ ধরবে। ফিরেও আসবে। তখন যেন মাসীকে ভুলো না। আমার দলেই এসো।

বেহালাদার ম্লান হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

মহিষের মত লোকটাও বলিল—চললে? তা—! খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—সন্ন্যেসী হওয়ার কষ্ট অনেক হে। ভিখ্ করে পেট ভরে না—তা নইলে—বেশ, এস তা হ'লে।

তাহারা যাইবে ছোট লাইনের ট্রেনে—যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ি। ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল—গ্রাম ছাড়িয়া। সেই ছোট গাড়ীতেই চড়িয়া মাসী বলিল—এস বাবা, এই গাড়ীতেই চড়। এই নাইনেই তো বাড়ী। মন খারাপ হয়েছে—বাড়ী ফিরে চল বাবা।

বাড়ী! নিতাই চমকিয়া উঠিল। বাড়ী! স্টেশন! সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ! সেই রেল লাইনের বাঁক! সেই স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল! সোনাব ববণ ঝক্‌ঝকে ঘটি মাথায় ক্ষারে- ধোওয়া মোটা খাটো কাপড় পরা অতি কোমল কালো মেয়েটি! সে তাহার ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই কতকালের পুরানো গান—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কালো চুল রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

নিতাইয়ের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত হাসি। কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা—কত পুরানো গান!

তবুও নিতাই বার বার ঘাড় নাড়িয়া নীরবেই জানাইল—না। না। না।

তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কলি গুঞ্জন করিতেছিল—"চাঁদ তুমি আকাশে থাক।" মনে ঘুরিতেছিল "তাই চলেছি দেশান্তরে—।" সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না। ঠাকুরঝি এতদিনে ভাল হইয়াছে, ঘর-সংসার করিতেছে। সে গিয়া আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। না সে যাইবে না। সে যাইবে না।

নিতাই নীরবেই বিদায় লইল। এই বিদায় তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল—বিদায়-ব্যথা-কাতর ম্লান মুখ। কাহারও সহিত কোনদিন ঝগড়া হয় নাই কিন্তু তাহারা যে এত ভাল—এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্তটির আগে কোনদিন কোন একটিবারের জন্যও মনে হয় নাই। বরং সে সময় তাহাদের দোষগুলাই অনেক বড় হইয়া তাহার চোখে পড়িয়াছে। মাসীকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্ট কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিষে ভরা, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিতে জানে না। পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসে না মাসী। আজ মনে হইল—না, না,

মাসী মাসীরই মত, মায়েরই মত ভালবাসিত তাহাকে। তাহার চোখের ওই কয় ফোঁটা জল বসন্তের মরণকালের ভগবানের নামের মতই সত্য।

নির্মলা চিরদিন ভাল। মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।

ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি—শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মত মিষ্ট ছিল।

বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই সুর।

সেই সুরটাই ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গা-স্তব রচনা করিবার চেষ্টা করিল। হইল না। ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া সে বসিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মত? না। এ কল্পনা তাহার ভাল লাগিল না। তবে? কিই বা করিবে—কোথায়ই বা যাইবে? হঠাৎ তাহার মনে হইল—হায় হায় হায়, হায় রে পোড়ো মন। এই কথা কি ভাবিতে হয়? ঠাকুর, ঠাকুরের কাছেই যাইবে সে। গোবিন্দ! বিশ্বনাথ! প্রভু—প্রভুর কাছে যাইবে সে। মায়ের কাছে যাইবে। মা অন্নপূর্ণা। রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! সে সেই সব দেবতার দরবারে বসিয়া গান গাহিবে—মহিমা কীর্তন করিবে—ভগবানকে গান শুনাইবে-শ্রোতারা শুনিয়া চোখের জল ফেলিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কিছু কিছু দিয়া যাইবে—তাহাতেই তাহার দিন গুজরান হইবে। তাহার ভাবনা কি? হায় রে পোড়া মন—এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই ভাবিয়া পাইতেছিলে না? এখান হইতে কাশী, বাবা বিশ্বনাথ—মা অন্নপূর্ণা। কাশী হইতে অযোধ্যা, সীতারাম—সীতারাম' সীতারামের রাজ্য হইতে রাধা-গোবিন্দ, রাধারাণী—রাধারাণীর রাজ্য বৃন্দাবন।

তারপর মথুরা—না, না, মথুরা সে যাইবে না। রাধারাণীকে কাঁদাইয়া রাজ্যলোভী শ্যাম রাজা হইয়াছে সেখানে, সে রাজ্যে নিতাই যাইবে না। মথুবা হইতে বরং কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার। হরিদ্বারের পরেই হিমালয়—পাহাড় আর পাহাড়। ছেলেবেলায় পড়া ভূগোল মনে পড়িল—পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু পাহাড় আর নাই—হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। হিমালয়ের মধ্যেই মানস-সরোবর। সেখান পর্যন্ত নাকি মানুষ যায়। নিতাই মানস-সরোবরে স্নান করিবে। তারপর জনশূন্য হিমালয়েব কোথাও একটা আশ্রয় বানাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। নিত্য নূতন গান রচনা করিবে—গাহিবে, পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া খুদিযা লিখিয়া রাখিবে। সে মরিযা যাইবে—তাহার পর যাহারা সে-পথ দিয়া যাইবে তাহারা সে গান পড়িবে আর মনে মনে নিতাই-কবিকে নমস্কার করিবে।

শেষ বৈশাখের দ্বিপ্রহর। আগুনের মত তপ্ত ঝড়ো হাওয়া গঙ্গার বালি উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই পায়ের শস্যহীন চরভূমি ধূসরবর্ণ—যেন ধু ধু করিতেছে। মানুষ নাই, জন নাই, কেবল দুই চারিটা চিল আকাশে উড়িতেছে—তাহারাও যেন কোথাও কোন দূর-দূরান্তরে চলিয়াছে। সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। "চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরী—বহুদূর যানা হোগা।" কাশী! সে স্টেশনে ফিরিয়া বড় লাইনে কাশীর টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িল।

নিতাই আসিয়া উঠিল কাশীতে।

ব্রিজের উপর ট্রেনের জানালা দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির গঙ্গার সাদা জল ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা-গঙ্গা যেন চোখ ঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে—জয় বাবা বিশ্বনাথ—অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

সেও তাহাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিল। জয়ধ্বনির সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া দিল। জয় বাবা বিশ্বনাথ! অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

স্টেশনে নামিয়া কিন্তু অকস্মাৎ একসময় তাহার মনের ছন্দ কাটিয়া গেল। সে যেন হুঁচোট খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে বিব্রত এবং বিহ্বল হইয়া অনুভব করিল, সে কোন বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে।

বাংলা দেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতে ছিল। কাশীতেই নামিয়াই সে ভিন্ন ধরনের মানুষের মধ্যে মিশিয়া গিয়া একসময় প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল যে, এখনকার মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে তাহার জীবনের ছন্দ কোনখানে মিলিতেছে না। তাহার উপর কাশী—কাশী—কাশী—তাহার কল্পনার কাশী কোথায়? সে তো এই দোকানদানিভরা বিকিকিনির কোলাহলে মুখর এই নগরীটি নয়! কোথায় সেই বিশ্বনাথের কাশী?

বিহ্বলের মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতেছিল। কতক্ষণ চালিয়াছিল তাহার ঠিক ছিল না। অবশেষে একখানা এক্কায় উঠিয়া সে এক্কাওয়ালাকে কোনমতে বুঝাইল সে যে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবে। এক্কাওয়ালাই তাহাকে একটা চৌরাস্তায় নামাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে যাও। সেই পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ তাহার মুখ চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার থালা হাতে ধপধপে সাদা থান পরিয়া একটি মহিলা যাইতেছিলেন। সে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার মনে হইল—এ যে তাহাদের গ্রামের সেই রাঙা মা-ঠাকরুণ। হ্যাঁ—তিনিই তো! তেমনি ঝলমলে সম্ভ্রম-ভরা ভঙ্গিতে কাপড় পরিয়াছেন, মাথায় তেনি আধঘোমটা, মাথার চুলগুলি তেমনি ছোট করিয়া ছাঁটা—অবিকল তিনি। হারাইয়া-যাওয়া ছেলে যেন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনিভাবেই নিতাই আশ্বস্ত এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁহার আগে গিয়া জোড় হাত করিয়া দাঁড়াইল।

না, রাঙা মা ঠাকরুণ নন, তবে ঠিক রাঙামায়ের মতই। ইনি যে তাহাদের দেশের অন্য কোন গ্রামের আর কোন রাঙামা—তাহাতে নিতাইয়ের আর সন্দেহ রহিল না। এবং সত্যসত্যই সে হিসাবে তাহার ভুল হইল না। —তিনি বাঙালী বিধবা এবং যাঁহারা গ্রামে মা ঠাকরুণ হইয়া দাঁড়ান তাঁহাদেরই একজন বটেন। পতিপুত্রহীনা বাঙালী বিধবা কাশীতে বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে তাকাইয়া আছেন। জীবনের বোঝা নামাইবেন সেইখানেই। মন্দিরে পূজা সারিয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নিতাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মা ঠাকরুণ।

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—কে তুমি বাবা?

নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে মা আমি এখানে বড় 'বেপদে' পড়েছি।

'বেপদ' শব্দটি তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিল। শব্দটি শুনিয়া তিনি বুঝিলেন লোকটি পল্লীর মানুষ এবং একেবারে নূতন এখানে আসিয়াছে।

তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কি বিপদ বাবা?

—আমি এখানকার কথাবার্তা কিছুই বুঝিতে পারছি না মা। তার ওপর গরীব 'নোক', আশ্রয় নাই; নতুন এসেছি।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—বুঝেছি এস, আমার সঙ্গে এস। স্টেশন থেকে আসছ বুঝি?

—হ্যাঁ মা। পথে পথে—। নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

তাহার এই নূতন মা—তাঁহাকে সে নূতন মা-ই বলিল; তিনি নিতাইকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। মানুষটি বড় ভাল।

নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যবিধাতাকে বলিল—প্রভু, তোমার মত দয়াল আর হয় না। অধমের ওপর দয়ার তোমার শেষ নাই। নইলে এমন বিদেশ বিভূঁয়ে এসেও

মা যশোদার মত মায়ের আশ্রয় পেলাম কি ক'রে?

এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। কোন এক আদি-অন্তহীন আঁকাবাঁকা গলির ভিতর তাঁর বাসা—একখানি ঘর, একটুকরা বারান্দা। আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোণ। নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি বরং বাড়ীর বাইরে বসি। জাতে আমি বড় নীচু।

—কেন বাবা? এই বারান্দায় ব'স। হ'লেই বা নীচু জাত।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল। সত্যই মা যশোদা। বৃন্দাবনের মায়েরা—যশোমতীর দেশের মায়েরা কেমন মা তাহা সে জানে না, কিন্তু তাহার দেশের মায়েরা ছাড়া যশোদার মত মা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক—হিন্দুস্থানী কথা যাহারা বলে—তাহারা তাহাদের দেশে যায়—অনায়াসে এক বৎসর, দুই বৎসর এক নাগাড়ে কাটাইয়া দেয়, কই মাকে দেখিবার জন্য তা তাহারা ছুটিয়া যায় না। মায়েরাও নিশ্চয় দেশে দিব্যি থাকে। যে যশোদা গোপালকে এক বেলার জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া কাঁদিতে বসিতেন সে যশোদার মত মা তাহারা কি করিয়া হইবে? তা ছাড়া এমন মিষ্টি কথা—আহা-হা-রে!—মা গো মা! না—কি বাবা গোপাল! এমন ডাক—এমন সাড়া—আব কোথায় মেলে?

মা তাহাকে একে একে কত কথা জিজ্ঞেস কবিলেন—কি নাম, কোথা ঘর, কোথা পোস্টাপিস্, কোন্ জেলা? অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাডীতে কে কে আছে বাবা? মা, ভাই—বিয়ে করনি বাবা? নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরঝিকে, মনে পডিয়া গেল বসন্তকে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

নূতন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ—কত ঘর কোন্ জাত আছে বাবা মাণিক? তোমাদের কোন্ স্টেশন? তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন হয়েছিল বাবা? ধান ছাড়া আর কোন ফসল হয়? বর্ষা কেমন হয় বাবা? বাদলা হয় ঘন ঘন?

মায়ের চোখ দুটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

—বর্ষায় কাদা কেমন হয় বাবা? তোমাদের দেশে ডাবের গাছ বেশী, না তালের গাছ বেশী? ডাবের দর কি রকম? মাছ কেমন—কোন্ মাছ বেশী? তোমাদের দেশে মুড়ি কেমন হয় বাবা?

নিতাই একে একে জবাব দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এক-একটি ছবি!

—তোমাদের গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা? বড় দীঘি আছে গ্রামে? আঃ, কতদিন দীঘির জলে স্নান করি নাই। দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে? শালুক সব গ্রামেই আছে। নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে। কলমী-শুশুনীর শাক হয় বাবা?

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুরাইয়া যায়। মা চুপ করিয়া থাকেন উদাস মনে। বোধ হয়, তাঁহারও মনে পড়ে দেশের কথা। আবার হঠাৎ মনে পড়ে কোন একটা নূতন কথা, সেইটার পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন।

—তোমাদের ওদিকে সজনের ডাঁটা হয়? 'নজনে' আছে? পানের বরজ আছে? কেয়ার গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায়? গোখরো কেউটে সাপ খুব বেশী ওদিকে, না? নদীর ধারে শামুকভাঙা কেউটে থাকে? গাঙশালিখ আছে? 'বউ কথা কও' পাখী আছে? থাকবেই তো। 'চোখ গেল' অনেক আছে, না? 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী? অনেকে বলে 'গেরস্তের খোকা হোক'! গায়ের রঙ হলুদ, মাথাটি কালো, ঠোঁটটি লাল-টুকটুকে, আমরা বলি—'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী, 'বেনে বউও' বলি—আছে?

হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। দেখিতে দেখিতে

ফোঁটা দুই জল যেন আপনা-আপনি চোখ ফাটিয়া বাহির হইয়া টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল—বোধ হয় তাঁহার কৃষ্ণও কোথাও চলিয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন—মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখী। সেই পাখীর মাথায় ঝরে পড়ল—তাঁর চোখের এক ফোঁটা জল। সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল। পাখীটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—পাখী, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়! পাখী ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল—'কৃষ্ণ কোথা রে?' 'কৃষ্ণ কোথা রে?' চিরকাল সে ডেকেই ফিরছে।

নিতাইয়ের চোখ দিয়াও জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

মা বলিলেন—আমার কৃষ্ণও চলে গেছে বাবা। ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেউ নেই। তাই এসেছি বাবার চরণে। নইলে দেশ ছেড়ে—। অর্ধপথেই থামিয়া মা চোখ মুছিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন—তুমি কাশী এসেছ তীর্থ করতে? এই বয়সে তীর্থ! কিছু মনে ক'রো না বাবা—তোমাদের জাতের কেউ তো এমন ভাবে আসে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাত দুটি জোড় করিয়া নিতাই বলিল—পূর্বজন্মের কর্মফল—হয়ত আমার কর্মফল, নইলে—। নিতাই কথাটা শেষ না করিয়াই চুপ করিল।

মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলছিলে বাবা?

নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কাছে লুকোব না মা। আমার বাবা, দাদা, ভাই, মামা, মেসো, এরা সব চুরি-ডাকাতি করত। জেলও খাটত। সেই বংশে আমার জন্ম মা। আমি—বলিয়া সে থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার বলিল—বলিতে সে বোধ হয় সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, সসঙ্কোচেই বলিল—দেশে কবিগান শুনেছেন মা? দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বেঁধে পাল্লা দিয়ে গান করে?

—শুনেছি বইকি, বাবা। কত শুনেছি। আমাদের গাঁয়ে নবান্নের সময় বারোয়ারী অন্নপূর্ণাপুজো হ'ত। কবিগান হ'ত পুজোয়। দুর্গাপুজোয় হ'ত যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা—শখের যাত্রা। নীলকণ্ঠের গান—"সাধে কি তোর গোপালে চাই গো? শোন যশোদে!" সে সব গান কি ভুলবার? মনসার ভাসান গান হ'ত মনসাপুজোয়। চব্বিশ প্রহরের সময় কীর্তন হ'ত। বাউল বৈরাগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করত—"আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া।" আহা-হা! বাবা সেই কীর্তন-গানে শুনেছিলাম—"অমিয় মথিয়া কেবা লাবণি তুলিল গো তাহাতে গড়ি গোরাদেহ"—গোরাচাঁদের দেহ অমৃত ছেঁকে তৈরী হয়েছে। এ সব গান যে অমৃত-ছাঁকা জিনিস বাবা। কবিগান শুনেছি বইকি!

নিতাই চুপ করিয়া গেল। ইহার পর আর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না।

বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কবির দলে থাকতে বাবা? নিজে কবিগান করতে?

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলিল—হ্যাঁ মা, অধম একজন কবিয়াল। তবে মা বড়দরের কবিয়াল আমি নই। আমি ঝুমুর দলের সঙ্গে থেকে গান করতাম।

—তা হোক না বাবা। কবিয়াল তো বটে। তা তীর্থ করতে বেরিয়েছ বুঝি?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ফিরব বলে বেরুই নাই মা।

ইচ্ছে আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব, তাতেই দিন ক'টা কেটে যাবে আমার।

বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাহলে তো তুমি সুখে থাকবে না বাবা। তুমি

কবিয়াল—গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক কত প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, সুখ হবে। বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।—সুখ সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।

অপরাহ্নে সে মায়ের কাছ হইতে বিদায় লইল। ইহার মধ্যে সে তাহার সকল কথাই বলিল। রাজার কথা, বিপ্রপদর কথা। এমন কি বসন্তের কথাও বলিল। বলিল না শুধু ঠাকুরঝির কথা। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে সে গানও শুনাইল।

মায়ের বৃত্তান্তও সে সব জানিল। আপনার জন মায়ের কেউ নাই, একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দেশ হইতে জ্ঞাতিরা যাহারা তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে, তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায়, তাও অনিয়মিত। মা হাসিয়া বলিলেন—পেটের জন্যে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না বাবা, লজ্জা হয়। আবার কমিয়ে আধপেটা অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দু মাস যায়। তার মধ্যে উপোস করতে পারলে—বিধবার উপোস তো অনেক!

নিতাই অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ—সে মায়ের এই আধপেটা অন্নের ভাগ লইয়াছে! মা তাহাকে হাসিমুখে দিয়াছেন। ওঃ! সে বলিল—আমি এইবার উঠি মা। থাকলে আবার আসব।

নিতাই প্রণাম করিল দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, বলিল—আপনি দু'পা পিছিয়ে যান মা। আমি ওই ঠাঁইটির ধুলো নেব।

মা বলিলেন—তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা। আমি তো চান করব এখনি।

—না। নিতাই তাঁহার পা ছুঁইল না।

মা বলিলেন—অনেক সত্র আছে। জায়গা মিলবে। আমার ঘর এই তো দেখছ—তা ছাড়া এ বাড়িতে আর দশজন থাকে। সবাই মেয়েছেলে এখানে—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেবতার দেখা খানিকক্ষণের জন্যই বটে মা। চিরকালের পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা। আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

মা বলিলেন—তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে। এ তো বাংলা গানের দেশ নয় বাবা। অবিশ্যি গঙ্গার ঘাটে—ঘাট তো এখানে অনেক আর বাঙালীও অনেক—সেখানে বসে গান করলে অনেক শুনবার লোক পাবে—কিছু কিছু হয়তো পাবেও। কিন্তু সংসারে পেট চলাই তো সব নয় বাবা। একটু বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে কথাটি শেষ করলেন মা।

এই কথাটায় নিতাই একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন।

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া মায়ের কথার সত্যতা কিন্তু সে অনুভব করিল। ঘটনাটা ঘটিল এইরূপ। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দিরশীর্ষের ধ্বজা ও কলসের দিকে সে তাকাইয়া ছিল। সোনার পাত দিয়া মোড়া মন্দির। আকাশে ছিল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার ছটায় ঝলমল করিতেছিল।

চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার-বেশ দর্শনার্থীর ভিড়। হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি, সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল—জয় বিশ্বনাথ!

তারপর সে মনে মনে গান রচনা আরম্ভ করিল—

"ভিখারী হয়েছে রাজা মন রে আমার দেখ রে নয়ন মেলে
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে।"

গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল—আহা! প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল।

গান শেষ হইলে—অল্প কয়েকজন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল—তাহাদের একজন তাহাকে কিছু বলিল—তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল—কি বললেন প্রভু? আমি বুঝতে পারতা নাই।

একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল—তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।

—হিন্দী ভজন? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

বাঙালীটি হিন্দী-ভাষী প্রশ্নকারী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল, বোধ হয় বলিল—হিন্দী ভজন ও জানে না।

জনতার অধিকাংশই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

মন্দির হইতে সরাসরি আসিয়া সে গঙ্গার ঘাটে হাজির হইল।

চোখ তাহার জুড়াইয়া গেল। আহা, এ যে দিন-রাত্রি মেলা লাগিয়াই আছে! আর এ কি বিচিত্র মেলা! মা গঙ্গাকে সামনে রাখিয়া এ যেন ভবের খেলার হাট বসিয়া গিয়াছে। একদিকে মণিকর্ণিকা অন্যদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে শ্মশানচুল্লী জ্বলিতেছে। অবিরাম ধ্বনি উঠিতেছে—রাম নাম সত্য হ্যায়! লোকে বলে—এখানে যাহারা ভস্ম হইল তাহারা শিবলোকে চলিয়া গেল। শিবরাম! শিবরাম! শিবশম্ভু! কি তাহার মনে হইল, দশাশ্বমেধ হইতে পথের জনকে শুধাইয়া শুধাইয়া আসিয়া উঠিল মণিকর্ণিকার ঘাটে। মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া হঠাৎ সে পুঁটলিটা খুলিয়া বাহির করিল একটা পিতলের আংটি। আংটিটা বসনের। বসনেব এই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে আছে। সেইটিকে এই রাজা মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে। এই পুণ্যে বসনের সকল পাপ মুছিয়া যাক।

বসন তুমি স্বর্গে যাও।

কিন্তু ফেলিতে গিয়াও সে ফেলিতে পারিল না। হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে প্রায় ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। বসনের আর কিছু নাই। শুধু এইটুকু। না—থাক এটুকু। থাক। তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত থাক। ওঃ! বসন দিন দিন হারাইয়া যাইতেছে। কাশী আসিয়া অবধি বসনকে তাহার বোধ করি মনেই পড়ে নাই। স্বপ্নও দেখে নাই। কাটোয়ার ঘাটে বসিয়া সে চোখ বুজিতেই বসনকে দেখিয়াছিল। গান বাঁধিয়াছিল—

"মরণ তোমার হার হ'ল যে মনের কাছে।

ভাবলে যারে—কেড়ে নিলে—সে যে আমার মনেই আছে, মনেই আছে!"

কিন্তু কই? ওঃ! মনের কদমতলাও শুকাইতে শুরু করিয়াছে। বসনের মুখটা পর্যন্ত ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সেই গানটি আবার গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিল—

"এই খেদ মোর মনে।
ভালবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে।
হায়। জীবন এত ছোট কেনে—?
এ ভুবনে?"

আংটিটা সে হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়া ফিরিয়া আসিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মনটা তাহার জুড়াইয়া আসিল। বড় ভাল স্থান এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এত বড় তীর্থ আর হয় না। কত দেশের কত মানুষ। কত পাঠ। কত গান। কত দান। কত ভিক্ষা। কত কামনা। কত দুঃখ। এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘাটটা কত প্রশস্ত। মনে হইল—এই ভাল। বাকী দিনগুলা এই ঘাটে-বাটে বাসা বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

পরদিন অপরাহ্নে সামনে গামছা পাতিয়া ঘাটের এক পাশে বসিয়া সে গান ধরিয়া দিল—

"এই খেদ মোর মনে।"

কণ্ঠস্বর তাহার অতি মিষ্ট। লোক জমিল। পয়সাও কিছু পড়িল। কিন্তু গান শেষে একজন বলিল—কাশীতে এসে এ খেদ কেন হে ছোকবা?

একজন মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, ভাল গান গাও। মহাজনের পদ গাও। রামপ্রসাদের গান—কমলাকান্তের গান—এই সব গান।

সে এবার ধরিল—

"আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
সর্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।"

গান শেষ কবিবার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন তাহার বিকল হইয়া গেল। তাহাব সমস্ত অন্তরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহাব আশেপাশে ফিবিতেছেন। মায়ের পিছু পিছু যেন বসন ফিরিতেছে; ঠাকুরঝি ফিরিতেছে; রাজন ফিরিতেছে। বিপ্রপদ ফিরিতেছে। মাসী, বেহালাদার—ভিড় করিয়া ফিরিতেছে। কাশীর চেয়ে তাহার গ্রাম ভাল। কাশীতে জীবনের জন্য খেদ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু জীবনের জন্য খেদ না কবিয়া সে বাঁচিবে কি কবিয়া? নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। এখানে এখন প্রচণ্ড গরম। ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, আলাপ-আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু সব কথাই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহুদূরের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, স্বরধ্বনির রেশই কানে আসিতেছে, কিন্তু শব্দের অর্থের কথা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কাছে থাকিয়াও মানুষগুলি যেন অনেক দূবের মানুষ।

ভাল লাগিতেছে না। এ তাহার ভাল লাগিতেছে না। হোক কাশী, বিশ্বনাথের রাজত্ব, স্বর্গের সিংহ-দরজা, তবু তাহার ভাল লাগিতেছে না ভিক্ষা তাহার ভাল লাগিতেছে না! মহাজনের পদ তাহার ভাল জানা নাই। আর নিজের গান ছাড়িয়া ওসব গান যত ভাল হোক গাহিয়া কাল কাটাইবার কল্পনাও করিতে পারে না সে। নিজের যেন ওবকম পদ ঠিক আসে না। তাহার উপর সে ভিক্ষাবৃত্তিতেও ঠিক সে আনন্দ পাইতেছে না। কোথায় আনন্দ? সে অন্তত পাইতেছে না। কবিগানেব আসর, ঝলমলে আলো, হাজারো লোক! ভাল লাগিতেছে না তাহার।

মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি। কবিয়াল তুমি, দেশে ফিরে যাও। স্তব্ধ হইয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে—তাহার খেয়াল ছিল না—অকস্মাৎ সে অনুভব করিল—জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সচেতন হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—লোকজন নাই; বোধ হয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর দুই-চারিজন লোক ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সেও ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরে পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আর কোথায়ই বা যাইবে? চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গাস্রোতের নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল—গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল—গঙ্গাও যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে;

কাটোয়ায়, যে-দিন বসন্তর দেহ পোড়াইয়া ছিল, সে-দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়?

আবার তাহার মায়ের কথা পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে পাখীর ডাক সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু 'বউ কথা কও' বলিয়া তো তাহাদের কেউ ডাকে নাই; 'চোখ গেল' বলিয়া তো কোন পাখী ডাকে নাই—'কৃষ্ণ কোথা রে' বলিয়াও তো কোন পাখী কাঁদিয়া ফেরে নাই এখানে। কাকের স্বর পর্যন্ত কেমন ভিন্ন রকম! মা তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহাই ঠিক।

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও কি—এই দেশেরই ভাষা বলেন? তাঁহার এই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা—তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না? হিন্দী ভজন? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুশী হন? 'মা অন্নপূর্ণা'—তিনিও কি হিন্দী বলেন? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন—তবে কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন? তবে? তবে? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে? আবার তাহার মনে পড়িল—তাহাদের গ্রামের 'মা-চণ্ডী'কে, সঙ্গে সঙ্গে 'বুড়োশিব'কে। পাগলিনী ক্ষ্যাপা মা। ভাঙর ভোলা!

"ওমা দিগম্বরী নাচ গো।"

সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া ক্ষ্যাপা মা নাচে।

"হাড়ের মালা গলায় ভোলা নাচে থিয়া থিয়া।"

ভোলানাথ নাচে, তাহার সঙ্গে গাজনের ভক্তেরা নাচে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারাও মনে মনে নাচে। আবার সর্বনাশী এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সবাই। সবাইকে মনে পড়িল।

প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে—নির্মলা বোনকে মনে পড়িল—ললিতাকে মনে হইল, মাসী আসিয়া 'বাবা' বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। বেহালাদার, দোহার, বাজনদার, রাজন, বণিক মাতুল, বিপ্রপদ ঠাকুর, সকলে দূরে যেন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঝিকে মনে পড়িল, কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ওই যে!—গ্রামের ধারের নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ, বিস্তীর্ণ মাঠ, বৈশাখে মাঠের ধূলা, কালবৈশাখীর ঝড়, কালো মেঘ, ঘনঘোর অন্ধকার, সেই চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ—সেই কড়্ কড়্ শব্দে মেঘের ডাক—ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি—সব মনে হইল। পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজার উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসির বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ; কত কথা মনে পড়িল;—বাবুদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মত গোখুরার বাস; গোখুরাগুলো ডালে ডালে বেড়ায়, দোল খায়; কিন্তু ভক্তেরা যখন 'জয় ধর্মরাজো' বলিয়া রোল দিয়া গাছে চড়ে, তখন সেগুলো সন্তর্পণে কোথায় গিয়া লুকাইয়া পড়ে। বাগানের সেই পুরানো বটগাছতলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড়চোপড় পরা সারিবন্দী মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আলপথের দু'ধারে লক্‌লকে ঘন-সবুজ বীজধানের ক্ষেত, মাঝখান দিয়া পথ। আষাঢ় আসিতেছে। আকাশে হয়তো ইহারই মধ্যে মেঘ দেখা দিয়াছে, শামলা রঙের জলভরা মেঘ। ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের 'বার-মেসে' গানের কথা মনে হইল।

বৈশাখে সূর্যের ছটা—
যত সূর্য-ছটা, কাটফাটা, তত ঘটা কালবৈশাখী মেঘে—
লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে।
পুণ্য ধরম মাসে—
পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে—পূর্ণিমাতে (সবে) পুজে ধর্মরাজায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি কাঠের মতন বক্ষে ফেটে যায়।
তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে—

জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দলে অরণ্যষষ্ঠী পূজে।
জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।
দশহরায় চতুর্ভুজা—
দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গা পূজা, এবার সোজা মাঠ ভাসিবে বন্যায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি—চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

এমনি করিয়া আষাঢ়ের রথযাত্রা—বর্ষার বাদল—অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যন্ত মনে করিয়া করিয়া সে কে নূতন বারমেসে গান মনের আবেগে বচনা করিয়া ফেলিল—

বছর শেষে—চৈত্র মাসে—
বছর শেষে চৈত্রমাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পুজোর টাটে।
ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে—
তেল নাহি হায় শিবের মাথায়, ভরল জটায়—অঙ্গেতে ছাই
গাজনে ভূত নাচায়।
আমার পরাণ কাঁদে—হায় রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায়।।

অধীর হইয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বার বার এখানকার নূতন-মাকে মনে মনে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল—তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা।

সেখানকার মা তুমি, আমাকে ফেরাবার জন্য আগে থেকে এখানে এসে বসে আছ' তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম! শিরোধার্য করলাম।

মাসখানেক কোনরকমে কাশীতে কাটাইয়া নিতাই আবার একদিন ট্রেনে চড়িয়া বসিল। কোন রকমেই সে এখানে থাকিতে পারিল না।

এই এক মাস সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। তাহার সঙ্গে উৎকণ্ঠার, উদ্বেগের তাহার অবসান হইয়াছে। ঘুম যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোগলসরাই জংশনে কোনরূপে উঠিয়া ট্রেন পালটাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলার একটা খালি ছিল, সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল। আঃ—নিশ্চিন্ত! সোনার দেশে আপন মায়ের কোলে ফিরিয়া চলিয়াছে সে।

পরদিন সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন মনে হইল অতি পরিচিত জন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে। পরিচিত কেহ ভারি মিষ্টসুরে যেন তাহাকে ডাকিল—

—ওঠ, ওঠ, ওঠ।

—কে, কে?

নিতাই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

না, চেনা কেহ নয়, তাহাকে নয়। নীচের বেঞ্চে একজন লোক গোটা বেঞ্চটা জুড়িয়া শুইয়া আছে, তাহাকেই কতকগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে—ওঠ—ওঠ।

নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ, গাড়ীটা চেনামুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে। সব চেনা, সব চেনা। নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া—সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রীদলের একজনকে বলিল—মালগুলো ওপরে তুলে দি?

—দাও তো দাদা, দাও তো।

—বেঁচে থাক বাবা; বড় ভাল ছেলে তুমি। এক বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্বাদ করিল।

মালগুলো তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। ইস্টিশানের বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সব চেনা—সব চেনা। আঃ—তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! জানালার বাহিরে বাংলা দেশ। সব চেনা। রাণীগঞ্জ পার হইল। এইবার বর্ধমান। বাহিরে আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে।

বর্ধমানে গাড়ী বদল করিয়া—ঘণ্টা দুয়েক মাত্র, তাহার পরই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী, বুড়োশিব।

মা চণ্ডী বুড়োশিবের দরবারে বসিয়াই সে ভগবানকে গান শুনাইবে। তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়—তারকেশ্বরে—কালীঘাটে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে। দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে। সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে তাহাদের গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে। সে এবার নিজেই কবির দল করিবে, এখন তাহার নাম হইয়াছে, বায়নার অভাব হইবে না। কবিয়াল নিতাইচরণের নামে দেশের লোকও ভাঙিয়া আসিবে। মেলা-খেলায় গালাগাল খেউড় নহিলে চলে না। তাহার মধ্যেও কৌতুক আছে, তবু সে ভালবাসার গানকেই বড় করিবে। বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া এই একই খেদ। জীবন এত ছোট কেনে? ভালবাসিয়া সাধ কেন মেটে না, ছোট এতটুকু জীবনের পরিসরে ভালবাসিয়া কেন কুলায় না? ভালবাসার গান। খেদের গান। এই খেদ মোর মনে।—সেই খেদের গান।—বসন্তর নাম করিয়া গান।

কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে?

এক্সপ্রেস ট্রেনটা থামিয়া গেল; একটা বড় স্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ধমান! বর্ধমান!

বর্ধমান হইতে লুপ লাইনের ট্রেন। নিতাই আবার সেই ট্রেনে চড়িয়া বসিল। মনে মনে তখন তাহার গান রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে পৌঁছিয়াই সে সর্বাগ্রে মা চণ্ডীর দরবারে যাইবে প্রণাম করিতে। সেই প্রণাম করিবার জন্য সে গান রচনা শুরু করিয়াছে। এই গান গাহিয়াই সে মাকে প্রণাম করিবে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী নয়, সে নিজের গান গাহিয়াই মাকে প্রণাম করিবে।

"সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,
ঘরপালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভুঁই পাড়া।
তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না,
নাচ-দুয়ারে পা সরে না, চোখে বহে জলের ধারা।"

আকাশ জুড়িয়া ঘন কালো মেঘ। হু-হু করিয়া ভিজা জলো বাতাস বহিতেছে। আঃ, দেহ জুড়াইয়া যাইতেছে। মাটির বুক আর দেখা যাইতেছে না; লক্‌লকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ওঃ—ইহারই মধ্যে এদিকটায় বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। চষা ক্ষেতগুলির কালো মাটি জলে ভিজিয়া আদরিণী মেয়ের মত তুলিয়া ধরিতে যেন গলিয়া পড়িতে চাইতেছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটা অল্প বিছাইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মনের আনন্দে ভিজিতেছে। কচি নতুন অশ্বত্থ-বট-শিরীষের পাতাগুলি ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে। লাইনের দুধারের ঝোপগুলিতে থোপা থোপা ভাঁট ফুল ফুটিয়াছে! আহা-হা! ওই দূরে নালার ধারে একটা কেয়া ঝোপ বাতাসে দুলিতেছে। কেয়া-ঝোপটার বাহার খুলিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাদের বসন্তকে মনে পড়িয়া গেল,

"করিল কে ভুল—হায় রে,
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়া-ফুল।"

ঝম্‌ঝম্‌ শব্দে ট্রেন চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজলদীঘির জলের রঙের মত রঙ; বৃষ্টি জোর হইতেছে, অমনি চারদিক ঝাপসা। ওঃ, এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ থৈ-থৈ করিতেছে। ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক ট্রেনের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে। এদিকে কাড়ান লাগিয়া গেল।

ঘং-ঘং গম্‌-গম্‌ শব্দে ট্রেনখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল। গেরুয়া রঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত লাল জল থৈ-থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়! অজয় নদী! দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! দেশ, তাহার গাঁ। তাহার মা!

"তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যেন মন ভরে না
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না, বয়ে যায় মা জলের ধারা।"

এইবার বোলপুর—তারপর কোপাই, তারপব—তারপর জংশন, ছোট লাইন। ঘটো ঘটো ঘটো ঘটো ঘং-ঘং-ঘং-ঘং। সর্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন। হায়-হায় হায়-হায়! সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকেব ভিতর নাচিতেছে নিতাইয়ের মন। ছেলেমানুষের মত কাঁদিতেছে। চোখ ভাসাইয়া জল আসিতেছে অজয়ের বানের মত। মা গো-মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে—সেই 'নিমচের জোল', 'উদাসীর মাঠ',—ওই যে কাশীব পুকুর;—ওই যে সেই কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহাব কবিজীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল!

গাড়ীটা ঈষৎ বাঁকিল—ইস্টিশনে ঢুকিতেছে। ওই যে, ওই যে—গাড়ী থামিল।

ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহাব চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, বামলাল, কযেকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়াব গাছটি। ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘন সবুজ চিরোল চিরোল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তবু দুই চারিটি ফুল যেন নিতাইয়ের জন্যই ধরিয়া আছে। নিতাইয়ের চোখে জলেব ধারা। নিতাই কাঁদিতেছে, কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ কবিয়া। বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে।

বিপ্রপদর জন্য নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৌতুকের কথা। কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধাবা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না। নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে, কিন্তু এ তাহা নয়, তাহারও অতিরিক্ত কিছু। তাহার চোখের ওই দরবিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে।

কতক্ষণ পর।

নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিযা পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রাজন! ভাই!

—ওস্তাদ! ভেইয়া!

—ঠাকুরঝি!

—ওস্তাদ!

—রাজন!

—ঠাকুরঝি তো নাই ভাইয়া!

—নাই?

—নাই! উতো মর গেয়ি। রাজার মত শক্ত মানুষের ঠোঁট দুইটিও কাঁপিতে লাগিল।—বলিল—ঠাকুরঝি ক্ষেপে গিয়েছিল ওস্তাদ। তোমার যাবার পরে—

রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরঝি নাই। ঠাকুরঝি মরিয়াছে। পাগল হইয়া ঠাকুরঝি মরিয়াছে! এই কয়টা কথাই নিতাইয়ের কাছে অনেক কথার তুফান হইয়া উঠিল। বুকের মধ্যে ঝড় বহিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মনে পড়িল—জীবন এত ছোট কেনে? তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা বলিল—ওস্তাদ, ভাইয়া, রোতা হ্যায়? কাঁদছ? ঠাকুরঝির জন্যে?

চোখ মুছিয়া, বিচিত্র হাসি হাসিয়া ফেলিয়া নিতাই বলিল—গান শোন রাজন, গান শোন। গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া লইয়াই সে গলা ছাড়িয়া গাইল—

"এই খেদ আমার মনে—
ভালবেসে মিটল না এ সাধ, কুলাল না এ জীবনে।
হায়—জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?"

রাজা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হায় হায় হায় রে! বল ওস্তাদ, জীবন এত ছোট কেনে? হায় হায় হায়!

নিতাই বলিল—তাই যদি জানব রাজন!—আবার তাহার চোখ হইতে জল ঝরিতে শুরু হইল। আবার কাঁদিল। নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গল ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন! সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানে বসন আসিয়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল—কই হে! ওস্তাদ না—ফোস্তাদ! চকিতের মত মনেও হইল—বসনও যেন শুইয়া আছে! আঃ! ঠাকুরঝি, বসন—দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চল।

—কাঁহা ভাইয়া?

—চণ্ডীতলায়। চল, মাকে প্রণাম করে আসি।

রাজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে।

তাহার সর্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে—মাগো—জীবন এত ছোট কেনে?

সুতীর্থ

জীবনানন্দ দাশ

শ সে প্রে উ ৮৩

এক

লেখা-টেখা সুতীর্থ অনেকদিন ধরে ছেড়ে দিয়েছে। এর মানে এ নয় যে লেখার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সে। দেশ-বিদেশের সাহিত্যের ইতিহাস নেড়ে-চেড়ে দেখলে অবিশ্যি জানা যায় যে বিখ্যাত লেখকরাও তাঁদের প্রতিভার তুষ-তাপও আজীবন বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি—কয়েক বছর লিখে অনেকেই হার মেনে কলম থামিয়েছেন, কিংবা যা লিখেছেন তাকে সাহিত্যলেখ বলা চলে না। সুতীর্থ এ জিনিসটার মানে ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তার ধারণা সৎ লেখক অবসর খুঁজে নিয়ে নিজের ভাবে বসবার সুযোগ পেলেই (জীবনের যে কোনো অধ্যায়ে) ধীরে ধীরে বড় জাতের লেখা সৃষ্টি করতে পারে।

নিজে অনেক দিন থেকে কিছু লিখছে না বটে কিন্তু সেটা অক্ষমতার জন্যে নয়, অবসরের অভাবে। অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মুর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে; চাকরির থেকে ফিরে এসে হাতে সময় যে না থাকে তা নয়, কিন্তু তখন শরীর অবসন্ন, মন ধাতে নেই। সে মনকে আস্তে আস্তে জাগিয়ে তোলা অসম্ভব নয়, কিন্তু সময় লাগে, সহিষ্ণুতা চাই, সুযোগেরও প্রয়োজন। পিতৃপুরুষ কোনও দিক দিয়েই এমন কোনো সংস্থান করে যান নি সুতীর্থের জন্যে যে অফিস থেকে সন্ধ্যায় ভাড়াটে ফ্ল্যাটে ফিরে মন তার সমস্ত দিনের অপব্যবহার ও সমস্ত রাতের দুশ্চিন্তার সংযোগগুলোকে দু-চার মুহূর্তের জন্যে এমন একটা সহজ স্বাভাবিক আশ্রয় খুঁজে পাবে যেখানে শিল্প-সাহিত্যের আলো আসে মনে, লিখলেও তা হয়ে দাঁড়ায় যা চাওয়া যায় মোটামুটি তাই। এ কি সম্ভব কখনও? এক আধবার অবশ্য চেষ্টা করে দেখেছে সে, টের পেয়েছে ক্ষমতা আছে কিন্তু অনেক সহিষ্ণুতার সুযোগ তৈরি করে নিয়ে দু-চার লাইন লিখবার পরেই তাকে অনুভব করতে হয়েছে যে সে একা মানুষ নয় আজ আর, যা লিখেছে সে তা আত্মরতি, কুঁড়ে গোরুর গল্প, এতে চলবে না, এরকম অপবাদ শুনতে হবে তাকে সাহিত্যের নানারকম অপ্রাসঙ্গিক দ্বারপালদের কাছ থেকে; ওসব অবিশ্যি গ্রাহ্য করে না সে, কিন্তু তার নিজের মনও গ্রাহ্য করছে না যেন আজকাল তার নিজের লেখাকে। তার নিবিদ মন কি বলছে? বুঝতে পারছে না সে। কোনো জিনিস রয়েছে সারাৎসার মন বলে?

'কি হয়েছে, সুতীর্থ?'

'এই যে চা খাচ্ছি।'

'চা তো ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে রয়েছে। গালে হাত দিয়ে বসে আছ যে—'

চায়ে এক চুমুক দিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'একটু গরম চা পেলেই ভালো হত, মণিকা দেবী, গলায় একটু ব্যথা মনে হচ্ছে—'

'ঠাণ্ডা লেগেছে বুঝি। আচ্ছা, আমি চা গরম করে দিতে বলছি। তুমি এই চা-টাই খাবে তো।'

এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে সুতীর্থ বল্লে, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খাব। কাপসুদ্ধ চা ফেলে দিয়ে আমাকে নতুন চা তৈরি করে দেবে রামচরণ? আজকাল এক পেয়ালা চায়ের দাম তো—'

'আচ্ছা, আমিই উঠি, নিয়ে আসি ঠিক ক'রে। উনুনে কিছু চড়েছে নিশ্চয়, সেই তো মুশকিল; তুমি বড় দেরি করে ফেল ঘুম থেকে জেগে উঠতে—' বলে মণিকা দেবী বসেই রইলেন তবু। বল্লেন, 'আমার বাড়ির ভাড়াটা, সুতীর্থ—'

'দিচ্ছি। আমারই দোষ হয়েছে। ও মাসেরটা দেওয়া হয়নি বুঝি। এ মাসও তো ফুরিয়ে এল প্রায়। তা ছাড়া আগের আট দশ মাসেরও বাকি আছে, সেগুলো পরে দেব। টাকা যে নেই তা নয়, কিন্তু—'

চায়ের কাপটা ছিল পুরোনো একটা খুব সম্ভব টিক কাঠের চেয়ারে; কাপটাকে মেঝের ওপর

নামিয়ে রেখে মণিকা বল্লেন, 'এইখানেই বসি। গিঁট ধ'রে গেছে রে বাবা, কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। বড্ড শীত পড়েছে আজ—'

বসে পড়তে-পড়তে কিছুটা সময় লাগল দোহারা বিলাসী শরীরের মানুষটির। চেয়ার উলটে পড়েছিল প্রায়, সামলে নিতে গিয়ে চায়ের কাপটা হঠাৎ মণিকা মজুমদারের পায়ের ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে গড়াতে লাগল।

'ও কিছু না, হকচকিয়ে যেও না তুমি। ঠিক করছি—আমি ঠিক করছি সব—' বলে সুতীর্থ পা বাড়িয়ে পেয়ালাটাকে একটু দূরে ঠেলে সরিয়ে দিল মাত্র। কাপটা আগে ভাঙে নি, এবারেও ভাঙল না, ভাঙলেও কারুর কিছু এসে যেত না ঃ এমনই চা চায়ের কাপ চায়ের নেশার শীতের সকাল সুতীর্থ গুপ্তের ভাড়াটে ঘরে।

'তোমার কপালে চা নেই, সুতীর্থ—'

মণিকা কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন—সম্বিৎ ফিরে পেয়ে চুপ হয়ে গেলেন। বয়স তাঁর চল্লিশ হয়েছে; চেহারা অনির্বচনীয় তবু, যেন চল্লিশ ফিরে যাচ্ছে ত্রিশে, ত্রিশ ঠেকছে গিয়ে কুড়ি পঁচিশে। অথচ সত্যিই বয়স হয়েছে ঃ তেমনি মর্যাদা; চল্লিশটাই ঠিক, কুড়ি-পঁচিশের ইচ্ছাস্বর্গ যেন ঘিরে রয়েছে তাঁকে—খুশিমতন ঢুকে পড়লেই হয়।

'আগের দশ মাসের হিসেব পরে হবে, তা ছাড়া তোমার তিন মাসের ভাড়া বাকি।'

সুতীর্থ মেঝের ওপর চায়ের ছড়াছড়ির দিকে তাকাতে-তাকাতে বল্লে, 'তাই বুঝি। তা হবে। হিসেব তোমারই ঠিক তো।'

'কেন, তোমার খেয়াল নেই? কাকে কি দিতে হবে সেটা ভুলে গেলে মন অবিশ্যি ঝাড়াঝাপ্টা থাকে। কেউ-কেউ স্বভাবতই ভুলে যায়—তারাই জ্ঞানী কবি। অন্যদের টনটনে বুদ্ধি আছে বলেই তারা ভোলে। সুতীর্থ, তুমি যে তিন মাসের ভাড়া দাও নি সেটা যে লুকোচুরি করে দাও নি তা' আমি বলতে চাই না। সত্যিই তোমার খেয়ালই নেই হয়তো। কিন্তু—'

মণিকা সুতীর্থের শার্টের বোতামের দিকে তাকিয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রইলেন; বোতামের ওপরের মানুষটির মুখের দিকে সহসা তাকাতে গেলেন না আর।

'কবি, জ্ঞানীর জাত আলাদা, তোমার মতন নয়।'

'কি রকম?'

'সে আরেক দিন বুঝিয়ে দেব।'

'তোমার মুখে শুনে ভালো লাগবে, জ্ঞান বাড়বে; বোলো একদিন; এখন এই হিসেবটা বুঝে নাও।' বলতে বলতে সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে যে টাকাটা মণিকার হাতে দিল, তাতে পুরো দুমাসের ভাড়াও দেয়া হয় না।

'এখুনি রসিদ দিতে হবে?'

'দিয়ে দেবে যখন সুবিধে হবে, এখুনি কি দরকার।'

'দু মাসের ভাড়ার রসিদ দেব? পনেরো টাকা বাকি রইল যে।'

'দিয়ে দেব টাকাটা—আজ কালই—'

'উঠি সুতীর্থ।'

'আচ্ছা, এসো।'

দু পা এগিয়ে হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মণিকা বললেন, 'সুতীর্থ, আজকাল লিখছ-টিকছ না?'

'না তো।'

'কেন?'

'যখন আবার লিখব—তখন বলব তোমাকে।'

'কবে লিখবে আর?'

'এই পালাটা শেষ হলে।'

'হেঁয়ালির মতো কথা বলছ। পালা? কিসের পালা?'

'আছে একটা', সুতীর্থ বল্লে, 'সেও পরে বলব তোমাকে মণিকা-দি।'

'আমি দিদি হলাম কি হিসেবে—আমি তো তোমার চেয়ে ছোট।'

'বয়সের উনিশ-বিশ আছে আমাদের। কিন্তু বয়সটা তো খুব সামান্য জিনিস। অন্য সব দিক রয়েছে।'

মণিকা সোজা সুতীর্থের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন। তুমি সবাইকে বলে বেড়াচ্ছ যে তুমি আইবুড়ো, তোমার বয়স পঁচিশ, অফিসের মাইনে পাঁচশো টাকা। কিন্তু মিছে কথা তো সব সুতীর্থ। তোমার শ্বশুরবাড়ি তো পাশগাঁয়ে।'

সুতীর্থ ছেঁড়া সোফাটার এক কিনারে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'পাশগাঁ আমাকে টানে না তা তো তোমাকে বলেছি।'

'টানে না, ফি মাসে অফিসের মাইনেটা সেখানে যাচ্ছে তো।'

'টাকা না পাঠালে কি খাবে তারা?'

'তারা ক'জন?'

'আমার স্ত্রী, ছেলে মেয়ে দুটি—'

মণিকা কোনো কথা বল্লেন না কিছুক্ষণ, দেয়ালে হাত লাগিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বল্লেন, 'কোথায় চলেছি? বড় অন্ধকার তোমার ঘরটা—'

'জানালা খুলে দিচ্ছি। বোস, মণিকা দি।'

'না, থাক।'

'কাল সারারাত হাঁপানির বাড়াবাড়ি হয়েছিল বুঝি অংশুবাবুর?'

'না, কেন?'

'ভাবছিলুম রুগীর শিয়রে বসে বসে শরীর এলিয়ে যাচ্ছে। কেমন যেন কাহিল দেখাচ্ছে—'

'ভাল আছেন। এমনিই ঘুম হয় নি আমার।'

'ঘুমের ওষুধ আছে আমার কাছে।'

'দেখি আরও দু-এক দিন; না হলে ওষুধ খাব। কি ওষুধ আছে তোমার কাছে ঃ খুব কড়া? বিলিতী?'

মণিকা ওপরে চলে যাবেন, না কিছুক্ষণ বসে কাটাবেন ভেবে দেখছিলেন।

'রসিদ পাঠিয়ে দেব, কিন্তু পুরো দু মাসের হিসাব দিতে পারব না।'

'পনেরো টাকা বাকি; আচ্ছা, এক মাসের রসিদ দিলেই হবে।'

চলতে চলতে মণিকা বললেন, 'একটা কথা আমি ভাবছি। পঁয়তাল্লিশ টাকায় চারখানা ঘর তোমাকে আমি দিয়েছি। তিন বছর তুমি আছ। এ চারখানা ঘরের জন্যে দুশো আড়াই শো টাকা পেতে পারি আমি আজ; তা ছাড়া হাজার চারেক টাকা সেলামী তো দেবেই।' মণিকা কথা বলতে বলতে থেমে দাঁড়ালেন। 'বুঝলে, সুতীর্থ? এত কমে তোমায় আমি কেন দেব? চার চারটে ঘর তুমি আমার আটকে রেখেছ। অন্য কোথাও দেখ তুমি এখন। আমার কি টাকার দরকার নেই?'

'বাড়ি পাচ্ছি না তো কোথাও।'

'খুঁজে দেখেছ?'

'আমার নিজের বড় দুধেল গাইটা হারিয়ে গেছে আমি খুঁজব না? দিন রাত তো এই নিয়েই আছি।'

'ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো আর কোনো আয় নেই। লেনদেনের কারবার নেই। বাজার

খরচ চলছে না। বাড়ির অভাবে মানুষ কলকাতার ফুটপাতে নাকে খৎ দিচ্ছে আজ। ডাশা ভেঙে যাচ্ছে নাকের। হায়রে কুষ্ঠে খসে পড়ছে।'

বলতে বলতে মণিকা ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বাড়ি ভাড়ার রসিদ এল—পুরো দুমাসেরই রসিদ কেটেছেন পনেরো টাকা বকেয়া নেই। রসিদটা হাতে নিয়ে সুতীর্থ পা দুটো টেবিলের ওপর চড়িয়ে দিয়ে দূরে একটা তেতলা বাড়ির ছাদে লাল ট্যাঙ্কের ওপর এক ঝাঁক কাকের ওড়াউড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইল। মণিকা দেবীর চাকর রসিদগুলো পৌঁছে দিয়ে গেছে, আগের মত অমলাকে পাঠায় নি সে।

দুই

বিকেলটা কাটছিল বিরূপাক্ষদের আড্ডায়। বিরূপাক্ষ লোহালক্কড় কাপড় চাল কাগজ ঘড়ি পেন থেকে শুরু করে বিজ্ঞাপনের লেখা সম্পাদকীয় লেখা—সব জিনিসই সরবরাহ করে (যে চায় তাকেই) তবে তার দরদাম ঠিক করাই আছে; কালো বাজারের চেয়ে কম রেটে ব্যবসা চালাতে জানে সে; কাজেই তার ব্যবসা চলছে মন্দ না।

'বিরূপাক্ষ, কি করে হাতিকে হাঁটিয়ে নেওয়া যায়?' সুতীর্থ বললে।

'সর্দার হাতিকে? কোথায়? করাতীদের কাঠ মাথায় চাপিয়ে নদীব দিকে?' বিরূপাক্ষ সিগাবেটে শেষ টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর রেখে দিতে দিতে বললে।

'হ্যাঁ, নদীর দিকে, উজানে ভাসিয়ে দেবে।'

'তোমার দুয়োরে গিয়ে ঠেকবে, আর তুমি কাঠের সওদা ক'রে লাল হয়ে যাবে,—সে কি আর রাতারাতি হয় দাদা।'

'তোমার পাঞ্জার ছাপ পড়লে রাতারাতি হয় বৈকি', সুতীর্থ বললে, 'একটা বাড়ি চাই আমার—নিজের; তিন কাঠা জমির ওপর হলেই চলে—পাঁচ সাত কাঠা হলে ভালো হয়, বালিগঞ্জে টালিগঞ্জে বেহালা চেতলা যাদবপুর সোনারপুরে—'

বিরূপাক্ষ আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'কোথায় পাবে তুমি অত টাকা?'

'কত চাই?'

'তা চাই কিছু; বেশ ধবধবে ভাগলপুরী চাই—একবার বিইয়েছে।' বিরূপাক্ষ বললে। সুতীর্থ এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে বললে, 'তা হোক, লাখ খানেক লাখ দেড়েকই হোক না হয়। কি ক'রে টাকা পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা তুমি ক'রে দাও, বাড়ির ব্যবস্থা কর।'

বিরূপাক্ষ চার জনের জন্যে কফি তৈরি করেছিল। ডিশ ভরতি মাখন রয়েছে। আর তিন তিনটে ডিশে প্যাস্ট্রি। পাঁউরুটি স্লাইস ক'রে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'তুই এত সব চাচ্ছিস তো সুতীর্থ, কিন্তু কোনো বাজারেই তো তোর নাম নেই রে—'

অসিত একটা বিড়ি জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'একটা বদনাম থাকলেও হত সুতীর্থবাবু। লোকে এক ভাবে মানুষটাকে চিনে ফেলত।'

বিজন একটু মাচার কুমড়োর মত বিকেলের রোদে গা এলিয়ে বসেছিল। চুরুট ফুঁকতে ফুঁকতে কিছু বললে না সে।

'আমাকে তুমি বাজারে নামতে বল বিরূপাক্ষ?'

'হ্যাঁ, টাকা পেতে হ'লে।'

'কিসের বাজারে?'

'তিলের, তিসির, তামাকের টিকের। তোঁতাপুরী আম চেন? তোতাপুরী আমের।'

'মাটির ভাঁড়ের, টিনের, ক্যানেস্তারার' অসিত বল্লে 'পুরোনো কোম্পানির কাগজের—সের দরে—'

'কিম্বা রতি হিসেবে বেনামী খবরের', বিজন তার চুরুটটাকে একটু জিরোতে দিয়ে বললে, 'না হয় ভরি হিসেবে ছাড়বেন, সুতীর্থবাবু, সোনার চেয়ে ঢের বেশি পড়তা।'

'সরকারের পেটের খবর ফাঁসিয়ে দেবার ব্যবসাটাই সবচেয়ে ভালো', বিরূপাক্ষ বললে, 'আর লাইমজুস, মৌসম্বির রস আর জিন—ড্রাই জিনের—'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ব্যবসার ঘাঁৎঘোঁৎ এমন জলের মত সোজা করে বুঝিয়ে দিলে তোমরা—আমার আর তর সইছে না, তা' একটু রয়ে সয়ে চলতে হবে তবুও —সম্প্রতি আমাকে কিছু জমি কিনে দাও বিরূপাক্ষ, বালিগঞ্জে না হোক ঢাকুরিয়া, নিতান্ত না পাওয়া গেলে বেহালা যাদবপুর হলেও চলবে। টাকা আমি কিস্তি হিসেবে দেব।'

বিরূপাক্ষ চার পেয়ালা কফি প্যাস্ট্রি মুচমুচে টোস্ট সবাইকে এগিয়ে দিয়ে বললে, 'কিস্তি-বন্দিতে টাকা নিতে আমি অবিশ্যি রাজি আছি। আর কেউ ও সব কথায় কানও দিতে যাবে না। এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতায় এ সব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিন্নীশকুন লাফাচ্ছে।'

'কয় কিস্তিতে টাকাটা দিয়ে দেবে, সুতীর্থ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'কলকাতার থেকে দশ-পনেরো মাইল দূরে জায়গার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পাবি সুবিধে দরে।'

'তা হয় না বিরূপাক্ষ, ট্রাম বাসের শেষ ডিপো পেরিয়ে এক মাইল দু মাইলের বেশি যেতে পারব না।'

বিজনের নিভু নিভু চুরুটটা নিভে যাচ্ছিল, এক টান দিয়ে বললে, 'জমি কিনবার, বাড়ি তৈরি করবার এত শখ কেন আপনার, সুতীর্থবাবু?'

'আমি ভাড়াটে হয়ে আর লেপটে থাকতে চাই না,—বড্ড দেমাক আমার বাড়িউলির।'

'তা দেমাক থাকবেই তো। কলকাতার দক্ষিণ পাড়ায় বাড়ি, অথচ বন্ধকী নয়—' বিজন বললে, 'আমাদের বাড়ি আছে বটে, কিন্তু এমন কিছু ভালো বাড়ি তো নয়। করতে চেয়েছিলুম বালিগঞ্জে, কিন্তু স'রে যেতে হ'ল ঢাকুরিয়ায়। অসিতের বাড়ি অবিশ্যি টালিগঞ্জে, ভালো জায়গায়। বিরূপাক্ষের তিনখানা বাড়ি, দুখানা গাড়ি ঃ একখানা কি জীপ না কি তোমার, বিরূপাক্ষ?'

বিজন নেভা চুরুটে টান দিচ্ছিল; চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'এ সবের ভেতর এখন আর তুমি নাক ডোবাতে পারবে না, সুতীর্থ। সে সুযোগও নেই আজ আর, সে শক্তিও তোমার নেই। তুমি তো ছড়া লিখেছ এক সময়। হ্যাঁ, বিরূপাক্ষ, সুতীর্থ যখন ছড়া লিখত, তখন আমরা কলেজে পড়তুম, না? সুতীর্থের ছড়া পড়েছ তো?'

'পড়েছি', বিরূপাক্ষ বললে, 'ছড়া নয় ও কবিতা লিখত। লিখে-টিখে ও সুবিধে করতে পারে নি। কে পড়ে ওর পদ্য আজ? ও সব কবিতার লেখক হিসেবে কে চেনে ওকে?'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'আমার নিজের অবিশ্যি ভালো লেগেছিল ওর কয়েকটা কবিতা।'

'আমারও ভালো লেগেছিল,' বিজন বললে, 'লেখার চর্চাটা রাখলে পারতে তুমি সুতীর্থ, কবিতা নয়, গল্প লিখলে মন্দ হত না। ব্যবসাবিলির ফাঁকে ফাঁকে আমি মাঝে মাঝে গল্প পড়ি। হ্যাঁ হে বিরূপাক্ষ, তুমি পড় না?'

'আমি পড়ি।' বললে বিরূপাক্ষ।

'আমিও পড়ি।' কফির শূন্য পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে।

'সুতীর্থ, তোমার শ্বশুরবাড়ির খবর কি? শুনেছিলাম তোমার স্ত্রীর খুব কঠিন অসুখ, কি হয়েছিল?'

'কিছুই হয় নি, বেশ ভালোই আছেন।'

'ছেলেপুলে সেই দুটিই তো, না আরও হয়েছে?'

'ওরা তো বলে আর হয় নি।' সুতীর্থ কফি টোস্ট প্যাস্ট্রি বেশ নিজের হাতে ছেনে ছিঁড়ে ঢেলে চিবিয়ে খেতে খেতে বললে।

শুনে বিজন বিরূপাক্ষ অসিত চোখ টেনে একবার তাকিয়ে দেখে নিল সুতীর্থকে। মুখে কেউ কিছু বললে না, কফি খাচ্ছিল, বারবার তৈরি করছিল, ঢালছিল, খাচ্ছিল।

'কফি আরো খাবে অসিত? ঠাণ্ডার দিনে লাগে বেশ। অভয় এলে আরো রসিয়ে ঝালিয়ে ক'রে দিত। সিনেমায় গেছে 'রোটি' দেখতে। আজকাল ঠাকুরচাকরের গোলাম আমরা বিজন, ওরা আমাদের মুনিব। তিন বছর ধ'রে তুমি কলকাতায় আছ সুতীর্থ, পরিবার আনছ না কেন?'

'আমার পরিবারকে দেখেছ, বিরূপাক্ষ?'

'না, কেমন দেখতে?'

'তুমি দেখেছ, অসিত?'

'না, কি রকম দেখতে তোমার স্ত্রী? সুন্দর? দেখাও আমাদের।'

'তুমি দেখেছ, বিজন?'

'তোমার স্ত্রীকে দেখি নি আমি, কবে বিয়ে করেছ?'

'আমার স্ত্রী ঠিক বলতে পারবে।'

'কাকে বিয়ে করেছে, তাও বলতে পাববে বটে।' বিরূপাক্ষ পটের থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললে।

কফির পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে অসিত বললে, 'তবুও আমরা স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থাকি— কিন্তু সুতীর্থবাবু শুধু তাঁর পুরুষার্থকে কোলে টেনে বেশ ফুঁকে দিলেন দশটা বছর।'

'কোথায় আছে সুতীর্থ?' বিজন জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষকে।

'কাছেই লেক রোডে না কি লেক ভিউ রোডে--কোথায় সুতীর্থ?'

'গুলজারটা বাঁচিয়ে ছিলুম তো মন্দ না, কিন্তু এখন তাড়িয়ে দিতে চাচ্ছে।'

'তা তো দেবেই, আজকাল সেলামীর বাজার। দুশো তিনশো টাকা এদিককার এক একটা ফ্ল্যাট। তুমি কত দিচ্ছ? দু কুড়ি টাকা। তুমি এক কাজ কর সুতীর্থ'—বলতে বলতে থেমে গেল বিরূপাক্ষ।

'কোথায় আছে পরিবার?'

'পাশগাঁয়ে।'

'কেন আনো নি কলকাতায়? শ্বশুর বড়লোক?'

'এক সময় তালুকদার ছিল বটে, এখন প'ড়ে গেছে—'

'শ্বশুরবাড়ি যাও না, বউকে কলকাতায় আনো না, মাসে মাসে টাকা পাঠাচ্ছ কেন মিছেমিছি আর? তোমার টাকা তারা পোঁচে? মন কষাকষি টাকা তো।' বিরূপাক্ষ সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

বিজন হেসে বললে, 'আমি এক বাটিতে চিনি আর এক বাটিতে টাকা রেখে দেখেছি পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। সুতীর্থের টাকা তার স্ত্রী খাবে না? কি বল তুমি, বিরূপাক্ষ? কি হ'ল তোমার মাথা ভালো বাজার চোলাই খোলাই করে? ধুন্দুলের বিচির মত হড় হড় করছে বুঝি মাথার ভেতর, হড় হড় করছে?'

'পোঁচে তোমার টাকা তোমার স্ত্রী?' বিরূপাক্ষ চুরুটের ছাইয়ে টোকা মেরে বললে। খানিকটা ছাই উড়ে বিজনের চোখে গিয়ে পড়ল। ঘুষি জমিয়ে দেবে বিরূপাক্ষের চোয়ালে কপালে বিজন? জমিয়ে দেবে? সাত পাঁচ ভেবে চুপ করে রইল সে। রুমাল বার করে চোখে ভাপ দিতে লাগল।

'পোঁচে। রসিদ তো পাওয়া যাচ্ছে ঠিক মতনই। আমার স্ত্রীর সই। স্ত্রীকে কলকাতায় আনা

সম্ভব হবে না। ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসব এক সময়। জান বিরূপাক্ষ আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে—' বিরূপাক্ষকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরল সুতীর্থ।

'লোকটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে—'

সুতীর্থের সমস্ত উত্তাল উল্লোল শরীরের কঠিন বাঁধন থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে খুলে নিতে গিয়ে আরো বেশি লটকে প'ড়ে বিরূপাক্ষ, বার বার বলতে লাগল, 'কী আশ্চর্য, তোমার স্ত্রী তো তোমাকে ভালবাসবেই। এর ভেতর মজার কি আছে বলো তো দেখি। তোমার স্ত্রী—অন্য কারু তো নয়। কী মুশকিল ও রকম আছড়ে পিছড়ে গোঁত্তা মারছ কেন হা হা বাঁটের বাছুরের মত হাসছে না কাঁদছে, শোন বলি—দেখ না বিজন অসিত—ছাড়বে না তুমি আমায়, ছাড়বে না, সুতীর্থ। তু—মি—আ—মা—য়—ছা—ড়—ড়—ড় —ছা—ড়—বে—না—আ—আ—আ—' খুব একটা প্রবল ঝটকায় বিরূপাক্ষ ছিটকে পড়ল সমস্ত তেপয় ও কফির পেয়ালা পিরিচ নিয়ে আলমারিটার ওপর; —সুতীর্থ তার মস্ত বড় লম্বা শরীব ও এলোমেলো ঝাঁকড়া চুলের ফিঙের ঠ্যাং ডানার ঝটপটানি নিয়ে টান হয়ে দাঁড়িয়ে রইল দু এক মুহূর্ত। ওদের তিন জনের দিকে তাকিয়ে বিষম শীতে আক্রান্ত মানুষের মত হি হি ক'রে কাঁপতে কাঁপতে ঘব থেকে বেবিয়ে গেল সে।

তিন

দু-তিন দিন পবে সন্ধ্যের সময় বেশ শীত পড়েছে; একটা ছেঁড়া পুরোনো ওভারকোট গায়ে দিয়ে সুতীর্থ ব্যাগ হাতে করে চলছিল। লোকে দেখে মনে করতে পারে খুব ব্যস্ত ডাক্তার হয়তো চলেছে জরুরী কেসে; গলায় একটা স্টেথোস্কোপ জড়িয়ে নিলেই হত। চেহারাটা ভারিক্কের চেয়েও বিষণ্ণই দেখাচ্ছিল। ওভারকোট কাঁধে ফেলে অফিস থেকে বেরিয়েছে তিনটের সময়। বিকেলেই কোট গায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল—তবুও রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে। কী সে চায়? ব্যাগের ভেতর কী আছে তাব?

'এত ঘুবছ কেন, ট্রামে উঠে পড় সুতীর্থ।' কে যেন ভিড়ের ভেতর থেকে বল্লে তাকে।

'ওঃ তুমি—ঘুবেফিবে তোমার সঙ্গেই আজ বাববাব দেখা হচ্ছে কেন, ভবতোষ।'

'আমিও তোমারি মতন ঘুবছি যে -'

'এই যে বললে সিনেমায় যাচ্ছ—'

'না ভাই, যাওযা হল না।'

'টিকিট তো কেটেছিলে—'

'চলো একটা চায়ের দোকানে ঢুকি গিয়ে- '

'আমার সময় নেই, দাদা।'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'কোথাও না, এমনি ঘুরছি।'

'তবে সময়ের অভাব কি হল—' ভবতোষ সুতীর্থের ওভারকোটের কলারে টান মেরে বললে, 'চলো, শেফালীদের কাছে যাই।'

সুতীর্থ কটাক্ষে ভবতোযের দিকে তাকিয়ে সংবেদিত করে নিচ্ছিল ভবতোষকে নিজেকে সমস্ত পৃথিবীটাকেই যেন ঃ কাদের কাছে নিয়ে যাবে ভবতোষ? কারা তারা? কোথায় থাকে? সে তো তাদের কথা ভাবছিল না। এই পৃথিবীর কারো কোনো কথা মনেই ছিল না তার ঃ এমনিই ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

'হল তো? এইজন্যেই তো রাতবিরেতে তোমাদের ঘোরাফেরা। রাতচরা রকমারি সে একদিন

ছিল, সুতীর্থ, কোথাও গেলে কি আজ আর পাওয়া যায়—নখদর্পণ ছিল আমাদের মত জলি ওল্ড ডাগুাজদের—'

'জলি ওল্ড ডাগুাজ?'

'আরে ডাগুাজ হস্টেল—উনিশ শো ষোলো-সতেরো—ভুলে গেছ সব?'

'উনিশ শো ছেচল্লিশ তো এখন—'

'তা হোক, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে বুঝি হে। কেটে যাক—কাটুক, আমার কাটেনি—আমার কাটবে না; একটা চুল পাকেনি, দাঁত নড়েনি। সময় আসছে যাচ্ছে, কিন্তু আরো একটা সময় আছে যা দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়—যেমন তেল সিঁদুর আসছে যাচ্ছে মুছে যাচ্ছে; কিন্তু শিবলিঙ্গ—যেদিন চাও যখন চাও তখনই। চলো, ট্রামে উঠি—'

'কোথায় যাবে, ভবতোষ—'

'কফি হাউসে চলো—'

'কোনটায়?'

'বড়টায়—চৌরঙ্গী প্লেসে—'

'না, অত দূর যেতে পারব না। মাপ করতে হবে। কাছেই একটা চা-কফিব দোকানে—'

'সে হয় না,—ওরা সব আসবে কফি হাউসে, আমাব আব তোমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে সব। স্কার্ফ, শাল, কাশ্মীরী, মির্জাপুরী—সিগারেট খায় কেউ কেউ—কামেল সিগারেট—আমরা গিয়ে বসলেই হল—'

সুতীর্থ তামাশা বোধ করছিল। হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আচ্ছা, চলো।'

'চলো ট্রাম এসে নিক্।'

'কিন্তু কফি হাউসে বাত হয়ে যাবে, ট্রামে বাসে ফেরবার উপায় থাকবে না তো। সাড়ে সাতটা আটটাব সময় তো ট্রাম বন্ধ হয়ে যায—'

'কফি হাউস থেকে ফেরবার দরকার হবে না। ওদিকে ওদেবি কারু বাড়িতে কাটিয়ে দেব বাতটা। বেশি রাতে ট্যাক্সি...ফিটনে...করে বালিগঞ্জে ফেরবার কি দরকার। আসবে না কি ফিরে?'

ভবতোষ গলা খাঁকরে বললে, 'কই টিন বার কর?'

'সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, ভবতোষ।'

'আচ্ছা, তবে এই নাও—' বলে নিজের মুখের থেকে ব্রায়ার পাইপটা নামিয়ে সুতীর্থের হাতে গুঁজে দিতে গেল ভবতোষ। জিনিসটা প্রত্যাখ্যান কবলে সেটা রাস্তায় গড়াগড়ি খেত, কাজেই পাইপটা হাতে তুলে নিল সে।

'খাও, তামাক খাও, সুতীর্থ।'

'নিবে গেছে যে।'

'জ্বালিয়ে নাও, এই যে দেশলাই—'

'এই যে ট্রাম এসে পড়েছে—'

পাখিদের ডানা গজায় যেখানে সুতীর্থদের শরীরের সেই জায়গাটা আঁকড়ে টেনে ফুটপাতে তাকে চড়িয়ে দিয়ে ভবতোষ বললে, 'নাও, পাইপটা জ্বালিয়ে নাও আগে। ঘাবড়ে যেও না—আকচার ট্রাম আসছে; পালিয়ে যাচ্ছে না। ধাঁই করে একটায় চড়ে পড়লেই হবে।'

ট্রামটা চলে গেল।

'তোমার মুখের পাইপ আমি কি করে খাই?'

'দাও তাহলে', ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো ক্ষেতের কাঁকড়ার মত গাঢ় চোখে তাকিয়ে বললে, 'তুমি দেখবে আমার মুখের কফি তিনি কি করে খান।'

পাইপটা জ্বালিয়ে নিল সে। দ্বিতীয় ট্রামটাও চলে গেল, দু-তিনটে বাসও।

'যাবে যদি তবে চলো।'

'সবুর—' পাইপ টানতে টানতে ভবতোষ কথা বলবার সময় পাচ্ছিল না। নিজেকে চাঙ্গা করে নিচ্ছিল, কথা ভাবছিল।

'এই যে বাস—' সুতীর্থ বললে।

'ট্যাক্সিতে যাওয়া যাবে', মুখের থেকে পাইপ নামিয়ে বললে ভবতোষ, 'বাসে-ট্রামে চড়ে কেউ কখনো দক্ষকন্যাদের সভায় যায়?'

'জলি ওল্ড ভবতোষ—'

'জলি ওল্ড সুতীর্থ, ত্রিশটা বছর কেটে গেছে, একটি মুহূর্তও কেটে যায়নি। আমরা এই ছিলাম ডাণ্ডাজ হস্টেলে, অগিল্‌ভিতে ওয়ানে—চোখের পলক না পড়তেই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে কথা বলছি রাসবিহারী এভেন্যুতে। একই তো সময়, একই প্রবাহ ঃ রয়ে গেছে, রইছে; আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, তেরছা কান্নিক মেরে।'

ভবতোষ পাইপটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে টানতে আরম্ভ করল।

'কবে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল, সুতীর্থ? স্কটিশ থেকে বেরিয়ে দেখা হয়েছিল কি আর?'

'মনে পড়ে না তো।'

'আমাকে চিনলে কি করে—চেহারার কোনো বিষটিষ মরেনি তো? এখনও বেশ লেজে দাঁড়ায়?'

'হ্যাঁ, পুরনো মানুষ দেখলেই চিনতে পারি। এই যে ট্যাক্সি—'

'এনতার আসবে ট্যাক্সি—' ভবতোষ সুতীর্থের আস্তিন ধরে টেনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, 'এনতার আসবে জিপ—ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন।'

'রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'মেয়েরা উড়ে যাবে কফি হাউস থেকে বেশি রাত হলে? এই ভয়? সুতীর্থ?'

'আমি তো কাজে যাচ্ছিলুম, মিছিমিছি ঠেকালে কেন আমাকে।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ এড়িয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিল; কোথাও সেলুনে কামিয়ে নেবে কি না ভাবছিল।

'কাজে যাচ্ছিলে, আমি ল্যাং মারলুম আর পেঁচোয় পেল বুঝি লালগোপালকে—হেঃ হেঃ ধনগোপালকে—, বেশ তো আমি সরে দাঁড়াচ্ছি, যেখানে খুশি চলে যাও—' সুতীর্থ লম্বা শরীরে একটু কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সাত পাঁচ ভাবছিল।

'কী কাজ তোমার—কী কাজ আছে এই ব্যাগের ভেতর? পরিবার নিয়ে আছ কলকাতায়? যাচ্ছিলে কোথায় শীত-রাতের লক্ষ্মীপেঁচার মত ঃ কলকাতার কালপেঁচারা ধাড়ি ইঁদুরের ঘ্যাঁট রেঁধে রেখেছে বুঝি? লে ঝপাঝপ করে ঝাঁপিয়ে না পড়লে মুলে হাভাত করে দেবে?'

পাইপটা নিবে গিয়েছিল ভবতোষের, ফুটপাতের ওপর খানিকটা তামাকের ছাই ঝেড়ে ফেলল সে।

'আমি চলি, ভবতোষ।'

'যাও।'

'নাকি ট্যাক্সি করব?'

'করতে পার।'

'বাঃ, বেশ চুকলি কাটছ তুমি, ভবতোষ।'

পকেট থেকে পাউচ বার করে খানিকটা তামাকপাতা তুলে পাইপের ভেতর ভরতে ভরতে ভবতোষ বললে, 'সাধনা করে ও-সব জিনিস পেতে হয়, আমি তোমাকে এমনিই দিয়ে দেব? ট্যাক্সি

করবে কর; বেড়িয়ে আসতে চাচ্ছি—চলো। কিন্তু মেয়েদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে না।'

'চলো একদিকে—বেড়িয়ে আসি—' নিজের গলার শিথিল অনিশ্চয়তা অনুভব করে একটু অপ্রীত হয়ে সুতীর্থ বললে।

'চলো, তোমার স্ত্রীর কাছে যাই।'

সুতীর্থ ভবতোষের চোখ ছুঁয়ে একবার তাকাল, একটা চলন্ত ট্রামের দিকে তাকিয়ে বললে, 'সে তো এখানে নেই।'

'কোথায় গেছে তা হলে?'

বাপের বাড়িতেই থাকে। এখানে আসে না।'

'এখানে আসে না? কেন, ছেলেপুলে নেই তোমাদের?

'এক ছেলে, এক মেয়ে!'

'তবে?'

'সে আমাকে ভালবাসে না।'

ভবতোষ পাইপ জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'বুঝেছি আমি। আমারও ওই রকমই। তবে আমি শ্বশুরবাড়ি ফেলে রাখিনি, এখানেই আছে; আছে বটে তবুও না রাত চরলে চলে না আমার। তোমার স্ত্রী চলবেই না—কি করে চলবে তোমার। চলো, ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে যাই—'

'যাবে কফি হাউসে?'

'যেতে পারি', ভবতোষ পাইপ টানতে টানতে বললে, 'কিন্তু সেখানে ওরা অপেক্ষা করবে না আমাদের জন্যে এত রাতে—ওই হামলাটার পর।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে তার বুকের ওপর আঙুল বুলোতে বুলোতে ভবতোষ বললে, 'তা ছাড়া, ওদের দিয়ে এখন আমাদের চলবে না। আমরা চাই সহৃদয় মহিলা। তোমার কথা শুনে আমার মন ভিজে গেছে, ডাকো ওই ট্যাক্সিটাকে। ভালো ঘরের সুন্দর প্রকৃতিস্থ মহিলার সঙ্গে মুখোমুখি বসে যাতে রাত জমানো যায় সে ব্যবস্থা আমি তোমায় করে দিচ্ছি, ওই যে ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সিটা দূরে ছিল—তাড়াতাড়ি একটু এগিয়ে গিয়ে সেটাকে ডেকে এনে সুতীর্থ এদিক সেদিক তাকিয়ে দেখল যে ভবতোষ নেই কোথাও; পাইপের ধোঁয়ার গন্ধ হাওয়ার থেকে মিলিয়ে যায়নি যদিও, তবুও মানুষটাকে খুঁজে পেতে হলে আবার তিরিশটা বছর অপেক্ষা করা প্রয়োজন।

চার

ব্যাগ হাতে করে আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল সে—কোনো পথিক তাকে দেখলে বুঝবে লোকটা অন্যমনস্ক। কিন্তু কি নিয়ে যে সে কথা ভাবছিল তাকে জিজ্ঞেস করলে নিজেই সে তার কোনো সদুত্তর দিতে পারত না। একটা শূন্যতা আধো-শূন্যতায় নিমেষনিহত হয়ে ছিল তার মন, সেখানে বিশেষ কিছু নেই। বিশেষ কিছু থাকবার প্রয়োজনও নেই। মনটাকে স্থিরভাবে আচ্ছন্ন করে ছিল তবুও কেমন যেন একটা বিষণ্ণ বলয়।

সকলের কাছেই সে বলে বেড়ায় যে সে বিয়ে করেছে, তার ছেলেমেয়েও আছে, তার বয়সও চল্লিশ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু পাশগাঁয়ে তার শ্বশুরবাড়ি আছে বলে মানুষকে যে সে অহরহ ভাঁওতা দিয়ে চলেছে সে নামে কোনো গ্রাম আছে পৃথিবীতে? আছে তার স্ত্রী? কবে সে বিয়ে করল যে তার স্ত্রী সন্তান থাকবে?

ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ কেমন যেন একট ধ্বন্যালোক বোধ করছিল, চারদিক থেকে তাকে ঘিরে আছে;—সেটা না আলো, না অন্ধকার :কেমন একটা আবছায়ার দেশে মৃত্যুকে তার আধো

প্রবঞ্চিত করতে ইচ্ছে করছে—জীবনটাকে ভালো লাগছে আধাআধি। হাঁটতে হাঁটতে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল যে, কোন গলির ভেতর দিয়ে কোন্ সুড়ঙ্গের দিকে চলেছে খেয়ালই ছিল না তার ঃ ট্রামের শব্দ অনেক দূরে, বাসও কাছে কোথাও নেই। কোথাও এঞ্জিনের হুইসল্ শোনা যাচ্ছে—মহিষ ডাকছে—এক-আধটা মোটর হু হু করে উড়ে যাচ্ছে। হাঁটতে হাঁটতে ট্রামের রাস্তায় গিয়ে পড়ল সে আবার। অন্যমনস্কভাবে যে হাতটা চেপে ধরল সেটা রোগা নোংরা মড়ার মত ঠাণ্ডা।

'কে রে তুই?'

ছেলেটা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করাতে সুতীর্থের সম্পূর্ণ মনোযোগ ফিরে এল তার দিকে।

'ছেড়ে দিন বাবু, আমি করব না আর তোমার পায়ে পড়ছি বাবু।'

'কি নাম তোমার।'

'আমার নাম হারান।'

'বাপের নাম কি?'

'শোভান।'

'শোভান? মুসলমান? আবদুস শোভান?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'শোভান ঘোষ।'

'শোভান? শোভন বল্, শোভনলাল। শোভনলাল ঘোষ।'

ছেলেটা কেঁচোর মতো পাক খেতে খেতে বললে, 'শোভান ঘোষ।'

'পকেটে হাত দিয়েছিলে কেন?'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত চেপে ধ'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলছিল; পোয়াটাক মাইল হেঁটে চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারল নিজের বাড়ির কাছেই সে এসে পড়েছে।

'তোর বাবা কোথায়?'

'নেই।'

'কেন, কি হ'ল তার?'

'ছুরি মেরেছিল বাবাকে, ম'রে গেছে।'

'কে মারল?'

'ওই দাঙ্গার সময় বেরিয়েছিল একদিন শেয়ালদা'র বাজার থেকে মাছ কিনে বৌবাজারে বিক্রি করবে বলে, আমরা সবাই না করেছিনু, শুনল না—'

'তোরা ক' ভাই?'

'এক বোন আছে আমার, আর কিছু নেই। মুকে ছেড়ে দাও বাবু, পায়ে পড়ি তোমার, কলকাতার মনিষদের ভয় লাগে আমার। আমি তো তাদের কোনো অমান্যি করি নি, আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলুম, আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলে। আজ রাতেই মজিলপুর চলে যাব, আর কারুর পকেটে হাত দেব না। কজনকার কাটনু পকেট আমি? বাবু?'

'এই দশ-বারো জনের কেটেছিস। মজিলপুর যাবি আজ রাতেই? পায়ে হেঁটে?'

'হ্যাঁ, কত্তা, সেখানে আমার মা বাবা আছে।'

'এই যে বললি তোর বাবা মরে গেছে।'

ছেলেটি কেমন একটু ভয় পেয়ে বললে, 'বাবা তো ম'রে গেছে, মজিলপুরে আমার মা আর বাবা থাকে।'

'তার মানে?'

তার মানে অনেক কিছুই হতে পারে। ছেলেটি কিছুই বোঝাতে পারল না, কোনো কথাই

সে বলতে পারল না আর।

'কাঁদছিস? তোর বোন কোথায়?'

'তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেছে।'

সুতীর্থ যে রকম ছেলেটির মাংসের ভেতর আঙুল বসিয়ে দিয়ে তার হাত চেপে ধরেছিল, সেটাকে ঢিলে ক'রে নিয়ে বললে, 'তোর সবটাই আজগুবি হারান। তোর বাপ মরেছে, তবুও মা বাবা মজিলপুরে। বোনকে কে চুরি করলে রে?'

'আমার বোনকে মনুবাবু।'

'সে কে?'

'মনুবাবু।'

সুতীর্থ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'আচ্ছা, বুঝেছি।'

'মনুবাবু এল মেদিনীপুর থেকে। মন্ত্র পড়ে কড়ি উড়িয়ে দিল, কড়ি মাথায় আটকে গেল আমার বোনের। গোখরো সাপের মত কড়ি মাথায় মনুবাবুর সঙ্গে চলে গেল বোন মেদিনীপুর।'

'তারপর কি হল?'

'দিন ছেড়ে। আপনার পায়ে পড়ি হুজুর। আমার হাতটা ছেড়ে দিন, একটা মজার জিনিস দেখাচ্ছি আপনাকে—'

সুতীর্থ তাকে ছেড়ে দিতেই ছেলেটা ভোঁ দৌড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল প্রায়, ছেলেটার পিছু পিছু ছুটে তাকে ধ'রে এনে দাঁড় করিয়ে সুতীর্থ বললে, 'তুই এই রকম হারান?' ছেলেটির পিচুটি ও চোখের জলে অবসাদ ও নিরাশা এসে পড়েছে ঃ একটা লিকলিকে বানরের বাচ্চাকে কেউ যেন মানুষের শাবকে পরিণত করতে গিয়ে হয়রান হয়ে ফেলে রেখেছে।

'তুই ঘুমুচ্ছিস, হারান?'

মাথা নেড়ে সে ইশারায় জানাল জেগে আছে।'

'ঘুমুবি?'

'না।'

'খাবি?'

'না।'

'কি করবি তা হ'লে?'

'আমাকে ছেড়ে দিন, এখন যাব আমি মিঞা সাহেবের ওখানে।'

'মিঞাসাহেব? সে আবার কে রে?' সুতীর্থ কৌতুক বোধ করে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল।

হারান একটা ঢোঁক গিলে বললে, 'শোভান মিঞা।'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল, চলতে চলতে বললে, 'শোভান ঘোষ না বললি?'

'মিঞাও বলে কেউ কেউ।'

'কোথায় থাকে?'

'আগে মদনপুর থাকতুম আমরা, তারপর আলিপুরে তারপরে বেকবাগানে টালিগঞ্জে, এখন থাকি জানবাজারে—'

মনে মনে এই সব নিরবচ্ছিন্ন ব্যাসকূটের মীমাংসা করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'তবে মজিলপুরের কথা বলেছিলে কেন?'

'সেখানে আমার মা থাকে; মা বাবা।'

'আর জানবাজারে?'

'বাবা।'

সুরসাল এই পৃথিবী; পাঁচমেশালি সব আলোড়ন এনে বিধ্বস্ত করে একে; প্যাঁচালো মানুষের

মন; বিচিত্র এই পৃথিবীর শিশুরা; ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমর হাত ছাড়ুন, পকেট থেকে পয়সা বের করছি।'

'পয়সা কোথায় পেলি?'

'গাঁট কেটে দু টাকা মতন হয়েছে।'

সুতীর্থ ছেলেটির হাত ধ'রে থেকে বললে, 'আজ কদিন বসে এই রোজগার হ'ল? আজ একদিনেই সব পেলি বুঝি?'

'হুঁ', বলে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি বললে, 'পাঁচ সিকে দিতে হবে শোভান মিএগকে, আর বারো আনা মার জন্য রেখেছি, এই বারো আনা তোমাকে দেব বাবু?'

হারান সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েই রইল।

হারান—যদি কোনো প্রাণের গভীর থেকে থাকে তার, তা হলে সেই গভীর থেকেই কথা বলছে, (সুতীর্থের চোখের দিকে তাকিয়ে) মনে হচ্ছিল সুতীর্থের। কোনো নারী পুরুষ বা শিশুর কাছ থেকে এরকম আশ্চর্য, অকপট তলদেশ থেকে আবেদন এসেছিল কি সুতীর্থের কাছে? এসেছিল একবার—একটা ইঁদুরকে কলে আটকে যখন সে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল; একটি শিশু তাকে বাধা দিয়েছিল, একটি নারী পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল,; ইঁদুরটা নিজেও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সকলকেই ব্যর্থ করেছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ 'বারো আনা পয়সা তোর মাকেই দিস, হারান', বললেও হারানের বিশ্বাস হল না। সে আবার কবুল করল।

সুতীর্থ বললে, 'আমার পকেটে তো হাত দিয়েছিলি, ওখানেও কিছু ছিল, যাঃ, তোর মাকে দিস্—'

'দেব মাকে?' অবুঝ অবিশ্বাসী ঠোঁট কাঁপতে কাঁপতে কেমন নাক মুখ চোখের বিশ্বস্ততায় পরিণত হতে লাগল হারানের।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোকে পুষব। তুই তো বানরের সঙ্গে বানরের বিয়ে দেখেছিস; দেখতে দেখতেই শোভান ঘোষের ঘরে জন্মালি। এবার আয়, আরো কিছু দেখবি—' বলতে বলতে সুতীর্থের মন পরিবেশ ছেড়ে অনেক দূরের প্রত্যন্তে চলে গিয়েছিল; হাত আলগা হয়ে গিয়েছিল তার, ছেলেটি দাঁড়াল না আর; বান মাছের মত সাঁ করে সটকে হঠাৎ কখন ঘাই মেরে, অন্ধকারের সময়প্রসূতির ভেতর ডুবে গেল—সুতীর্থ আর খুঁজে পেল না তাকে।

যাক, চলে যাক। সেই যে সে একদিন কলে আটকে ইঁদুরটাকে নদীর জলে ডুবিয়ে মেরেছিল সেটা এমন কিছু বৃহৎ নিষ্ঠুরতার কাজ নয়; সেই শিশু যে বাধা দিয়েছিল, সেই বয়স্ক মেয়েটি যে শোভন বিষণ্ণ চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল, তারাও এমন কিছু প্রেমাত্মা পুণ্যাত্মা নয়; এই হারান—এও বা কি। এরা চলে যায়।

তোমরা তোমাদের আধুনিক ও যা আধুনিক নয়—সময় ও কাজ নিয়ে শেষ পর্যন্ত সফল হও বা না হও সেটা তোমাদের নিজেদের জিনিস। সেই সুন্দর ক্ষুরধার নিশীথ পথে এরা কে? কেউ তো নয়। কেউই কি নয়?

পাঁচ

কয়েকদিন কেটে গেছে।

সুতীর্থ সেলুনে ঢুকতেই হেড নাপিত তাকে 'আসুন' বলেই আবার তার দিকে তাকিয়ে তৃতীয়বার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললে, 'বসুন আপনি, এই এখুনি হয়ে যাবে।'

রৌদ্রের দিনে হঠাৎ এক ঝাঁক যাযাবর কাকাতুয়া উড়ে এসে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়লে

যে রকম বুক ধড়ফড় করে তেমনি কেমন একটা আশ্চর্য স্পর্শে চমকিত হয়ে হেড নাপিত মধুমঙ্গল ভাবছিল ঃ

'এ সুতীর্থ না? এক সঙ্গে তো গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছিলুম। এতদিন পরে এর সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। হয়তো চিনতে পারছে না আজ আমায়; আমিও ধরা দেব না।

সেলুনে আটটা সিটের সাতটাই খালি ছিল—কিন্তু অসময়ে নাপিতরা কেউই প্রায় হাতের কাছে ছিল না। একজন বাজারে—একজন টাকা ভাঙাতে—একজন চা খেতে গেছে। ব্রাশ, ক্ষুর, কাঁচি, পাউডারের বাটি, লাইমজুস, তেল, পাফ, চুল ছাঁটাবার ক্লিপের ছড়াছড়ির ভেতর একটা বড় আয়নার সামনে গিয়ে বসল সে। সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে 'বলব না আপনি অসময়ে এসেছেন', বলে ফেলে নিজের মনের গহনে একটু জিভ কেটে কি না কেটে মধুমঙ্গল চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেটির টাক মাথার চুলে আরো কিছু কারসাজি প্রায় শেষ করে আনতে লাগল।

'অসময়ে বই কি তোমাদের খাওয়া-দাওয়া আছে তো—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা জোট বেঁধে খাই না। ওই যে সুবোধ এসে পড়েছে। কি রে, চলতে ফিরতে বুড়ো হয়ে গেলি যে। টাকা ভাঙিয়েছিস্? নে হাত চালা, চৌধুরীবাবুর ড্রেসিংটা করে দে, আমি এই বাবুকে দেখছি।'

সুতীর্থের কাছে এসে হেড নাপিত বললে, 'আমার নাম মধুমঙ্গল।'

'ওঃ।'

'কেমন নাম?'

'ভালোই তো।'

মধুমঙ্গল সুতীর্থের সঙ্গে গালিফপুর ইস্কুলে পড়েছে, এমনিও ফক্কুড়ি করতে ভালবাসে খুব, মাঝে মাঝে ঠোঁট কাটা হয়ে পড়ে—যার তার সঙ্গে। সুতীর্থ মধুমঙ্গলের সহপাঠী ছিল, কিন্তু সে সব ইস্কুলী ইয়ার্কি এখন আর চলে না। টেনে মেনে যা চলে যতটা চলে হিসেবে রেখে মধুমঙ্গল বললে, 'কেমন নাম মধুমঙ্গল বললেন?'

'কিন্তু তোমার মুখে বিড়ির গন্ধ মধুমঙ্গল।'

মধুমঙ্গল সুবোধের দিকে ফিরে বললে, 'একটা কথা সুবোধ, বিপিন যদি বাজারে না গিয়ে থাকে তাহলে তাকে বলিস—' বলে সুবোধের কানের ভেতর একটা কথা ছেড়ে দিয়ে মধু সুতীর্থকে বললে, 'তামাক টানি দিনরাত, বড় বদ অভ্যেস—কিন্তু বিড়ির গন্ধটা খুব নিরেস লাগছিল আপনার?'

'তোমার কাজে মন দাও, মধু।'

'এগুলো তো সুগন্ধি বিড়ি, নাপতেনীরা খুব পছন্দ করে; সুখটান দিয়ে যে যায় তাকে আর ফেরায় না, স্বর্গের গলা জলে দাঁড় করিয়ে গোন বেগোনের জল হয়ে ছলছল করে ঘিরে থাকে সারারাত। আপনার চুল ছাঁটতে হবে?'

'কথাই তো বলছ তুমি। বেলা চড়ে গেছে, চার দিক্‌কার সেলুনগুলো বন্ধ, সেই জন্যেই তোমার খুব পায়া ভারি—চুল ছাঁট, চুল ছাঁট—'

বেশ নিপুণ ও মোলায়েম হাতে সুতীর্থের বুক পিঠ ঘাড় চাদর নিয়ে মুড়ে নিল, ঘাড় ঘেঁষে কান ঘেঁষে পাউডার পাফের আঘাত করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'এখন আমাদের নাওয়া খাওয়ার সময়, এ সময় মুরুব্বিরা কেউ আসে না। দোকানটা এখন বন্ধ করেই রাখতুম, তা আপনি এয়েছেন বলেই খুলে রেখেছি। ফাউ কাজে কথা বলবার সময় সারা দিনরাতের ভেতর নেই, কিন্তু এই সময়টিতে মুখ নেড়ে বড্ড সুখ, আ হা হা। মুখ নাড়লেই পব্বত।'

'চুল ছাঁটবে?'

'ছাঁটছি।'

'দেখো।'

'দেখছি।'

'কেমন যেন মেজাজ বিগড়ে আছে তোমার।'

মধুমঙ্গল কোনো কথা না বলে প্রথমে কাঁচি চালাতে চেষ্টা করল, নিল ক্লিপ হাতে, সেটাকে এক আধ মিনিট চালিয়েই আবার কাঁচি, এবার একটা নতুন ঝকঝকে—'

'কোন্ ইস্কুলে পড়েছিলেন?'

'আমি? গালিফপুর ইস্কুলে। কেন ইস্কুলের কথা জিজ্ঞেস করছ কেন?'

'এমনই—' মধুমঙ্গল বললে।

গালিফপুর ইস্কুল। রোদের ভেতরে পালকের ঝাড়ে এক ঝাঁক আশ্চর্য চন্দনা পাখি আগেই তার ঘরের ভেতরে এসে পড়েছে—এবারে পক্ষীমাতা নিজে এল যেন অনেক রোদ ছড়িয়ে বাতাস উড়িয়ে। গালিফপুর ইস্কুলের সেই সুতীর্থ না, এই যার চুল ছাঁটছে সে? মধুমঙ্গলকে চিনছে না সে, কিন্তু তবুও সেই ইস্কুলের কবেকার সূর্য বাতাস আসা ভালোবাসা শয়তানী চিপটেনীর নিদেন মানুষটা তো কাছেই বসে আছে;—সুতীর্থ এল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগের ঘুমের ভেতর থেকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে, আজকের দিনগুলোকে ঘুম পাড়িয়ে, যা অনেক আগে ছিল এখন নেই, সে সবের চমৎকার আখ্‌খুটে কোলাহলে উনিশ শো এগারো উনিশ শো বারো উনিশ শো তেরো-কেই পৃথিবীর শেষ সত্য বলে প্রবাহিত করে। একটা দুটো তিনটে অভিভূত নিঃশ্বাসে মধুমঙ্গল যা গ্রহণ করল তা মাটি ঘাস রৌদ্র মাস্টার লক্ষ্মী ছেলে আর লক্ষ্মীছাড়াদের সুরভিত এক পঁয়ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী, পঁয়ত্রিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলেও উজ্জ্বলভাবে সমসাময়িক হয়ে থাকবে যার সঙ্গে মধুমঙ্গলের মন।

'মধুমঙ্গল।'

'বলুন।'

'বেশ ছাঁটছ তুমি।'

'হুজুর খুশি হলেই ভালো।'

'কি মিঠে তোমার হাত, কোনো নাপিতটাপিত নয়, আমার মাথার চুল যেন হিজল শিরীষের পাতা চোত মাসের বাতাসে। চোতের বাতাস তুমি মধুমঙ্গল—'

হেড নাপিত কোনো কথা বললে না। চৌধুরীবাবু কিছুক্ষণ হয় চলে গেছে। সুবোধও বেরিয়ে গেছে। ঘরের ভেতর কেউ ছিল না আর। মধুমঙ্গল এক মনে চুলে ছেঁটে যাচ্ছিল ঃ যার সঙ্গে সে পড়েছে একদিন, যে তাকে চেনে না আজ সেই মানুষটির। এত অবেলায়, কিংবা কোনো সুবেলায়ও এত ভালো করে এত মন দিয়ে কারু চুল সে রকম ষঠেন্দ্রিয় দিয়ে ছেঁটেছে মনে পড়ছিল না মধুমঙ্গলের।

'একটা সিগারেট বের করে নিতে দাও তো হেড নাপিত। এতদিন পরে তোমার কাছে চুল ছেঁটে আমার পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ল। সেখানে ছিল আমাদের উমাচরণ নাপিত। তার হাত, চিরুনির আশ্চর্য যাদু—সে জিনিস উনিশ শো দশ সালেই নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের পৃথিবী থেকে—এখনো যেন আমার চুলে লেগে আছে। ওস্তাদের পোকে খুঁজে না পেয়ে ঘুমিয়েছিল যাদুটা—পঁয়ত্রিশ বছর; তুমি এসে তাকে উমাচরণের মত জাগিয়ে দিয়েছ আবার। তোমার হাতে আমার রগের চুল আর চাঁদির চুল, আমার আজিডাঙার চুল কাজিডাঙার চুল কথা বলে উঠেছে মধুমঙ্গল—'

'কি হল উমাচরণের?'

'উমাচরণ নেই।'

'কোথায় গেল?'

'মরে যেতে দেখি নি তাকে, তবে উনিশ শো দশেই আমাদের গাঁ ছেড়ে কোথায় যে সে চলে গেছল, আমরা দেশে থাকতে আর ফেরে নি। এখন কোথায় আছে কে জানে। উমাচরণ আমাকে

সুতীর্থ বলে ডাকত।'

'আপনার নাম—'

'হ্যাঁ। সুতীর্থ।'

'আপনি আরশির দিকে তাকিয়ে দেখুন তো কেমন হল।'

'দরকার নেই, আমার ভেতরে হয়েছে।'

মধুমঙ্গল বোধ হয় চিরুনি ছুঁইয়েই চুল ছাঁটছিল বিনে কাঁচিতে, মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'আপনার চুল ছাঁটতে বেলা শেষ হয়ে যাবে আমার দেখছি।'

'তা হোক, উমাচরণেরও হত। তুমি ছাঁটছ, মনে হচ্ছে যেন সমুদ্রের পারে অশোক স্তম্ভের পাশে ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব বেশি রাতে; আমাকে ঘিরে দেবদাসীদের নাচ, চুপচাপ, তাদের চুল নিঃশ্বাস ননী মাংস তাদের হাত—'

'বিড়ির গন্ধটা', গলা খাকরে নিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'মিইয়ে এসেছে বুঝি, সুতীর্থবাবু?'

'কই, পাচ্ছি না তো আর।'

'পাবেন না মধুমঙ্গল চুলে হাত দিলেই বাবুদের সিদ্ধির নেশা চড়তে থাকবে।'

'মধুমঙ্গল।'

'ঠিক আছে।' সুতীর্থের ঠোঁটের সিগারেটটা জ্বালিয়ে দিয়ে মধুমঙ্গল বললে, 'একটা কথা আপনার কাছে।'

সুতীর্থ সিগারেট টানছিল, কিছু বললে না।

'বলছি আপনাকে', মধুমঙ্গল বললে, সুতীর্থের মাথার চুলের দিকে নিজেকে সে ন্যস্ত করে রাখল কিছুক্ষণ, কাঁচি নেই; চিরুনিই নেই যেন, হাত দিয়ে বিলি কেটে চুল ছাঁটছে মধুমঙ্গল। মনে হচ্ছিল সুতীর্থের।

'মধুমঙ্গল—এই নামটা আপনার চেনা চেনা লাগছে?'

সুতীর্থ দু এক মুহূর্ত সিগারেট টেনে, নাপিতের চাদরের ভেতর থেকে হাত বার করে ছাই ঝেড়ে সিগারেট টানতে লাগল, কোনও কথা বললে না।

'শোনেন নি এ নাম আগে কোনোদিন?'

'তোমার কাছেই তো শুনলাম আজ।'

ভুলে গেছে সুতীর্থ। মধুমঙ্গল বুকের ভেতরে একটা ভারি নিঃশ্বাস পাতলা করে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু ভারি হয়ে বেরিয়ে এল। তার এই নাম নিয়ে সুতীর্থও যে তাকে ঠাট্টা করত, ঠাট্টা করে সকলের সামনে তাকে ছিঁড়ে ফেলে তারপরে কি মনে করে কাছে ডেকে প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিতে পুকুরের পাড়ের গাছ থেকে তার জন্যে অহেতুক অকপট পাৎ বাদাম পেড়ে আর জলের ভেতর থেকে পানফল উপড়ে এনে সে সব পুকুর দীঘির দেবাংশী মাছ আর জলঠাকরুণদের মত চোখে মধুমঙ্গলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাতের কাছে টেনে নিত। এ সব আজ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের কথা। সময় ও সংসারের হাতে নিরবচ্ছিন্ন মার খেয়ে মধুমঙ্গলের নামের এই ঠাণ্ডা জল ফলের মত ছিটেটুকু ছাড়া কি আর আছে সেই সাবেক কালের? সেই ইস্কুলের ছোকরা মধুমঙ্গলকে যদি এখানে এনে দাঁড় করানো যেত, কপালের ডান দিকের আবটা দেখেও এই হেড নাপিতকে সে চিনতে পারত না আজ। এইটেই দুঃখ কষ্টের কথা—এই কুশ্রী কঠিন পরিবর্তন—বালকের কাছে প্রৌঢ়ের এই নিরেট উৎখাত। মনটা ঠিকই আছে মধুমঙ্গলের হৃদয় ঠিক জায়গায় আছে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে শ্রীচেহারার কোনো মিল নেই যে, এদিক দিয়ে বেশ খানিকটা মিল মিশ রয়েছে সুতীর্থের ভেতরের ও বাইরের। সুতীর্থ বড় হয়েছে বটে, বুড়ো হয়েছে, কিন্তু তবুও সে নিজের যৌবন নিজের কৈশোরের থেকেই বেড়েই বড় হয়েছে; এরা চেনে সুতীর্থকে; কিশোর সুতীর্থকে ধরে আনলে আজকের এই বড়টাকে সে মুহূর্তের মধ্যেই নিজের প্রতিচ্ছবি বলে চিনে নিতে পারত কিন্তু মধুমঙ্গল তো নিজের

যৌবন কৈশোরকে কাল নাগের দাঁতে কেটে ফেলে ভেলায় করে পাঠিয়ে দিয়েছে ত্রিস্রোতায়—পচা মাংসের ঢোল নিয়ে ফিরে এসেছে ভেলা। কোথায় গেল পঁচিশ ত্রিশ বত্রিশ বছর আগের পৃথিবী? মনটা তো ঠিকই আছে, কিন্তু আহা, সেদিনকার সমাজ সংসার দিন ক্ষণ রূপ যৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হয়ে গেল।

'তুমি রসিয়ে রসিয়ে চুল ছাঁটছ হেড নাপিত, আস্তে আস্তে। ভালো। কিন্তু আমার উঠতে হবে তো।'

'বসুন, সন্ধ্যের সময় গিয়ে নাইবেন। চৌবাচ্চার ধরা জল আছে?'

'না।'

'পাম্পে জল আসে? ইলেকট্রিক পাম্প?'

'হ্যাঁ।'

'পাম্প কার?'

'বাড়িওলার—' সুতীর্থ বললে।

'বসুন তাহলে', মধুমঙ্গল বললে, 'চুল ছাঁটি আপনার। এত বেলায় কলকাতার বাড়ীওলা পাম্প চালাতে দেবে না।'

'যদি বাড়ীউলি হয় সে।'

'নাঃ', মধুমঙ্গল কাঁচিটা রেখে দিয়ে আর একটা কাঁচি তুলে নিয়ে বললে, 'সে সৎগুষ্টির মেয়েও দেবে না। বসুন। এই যে চেঁদো মাথার ভদ্রলোক বসেছিলেন ওর নাম মহীন চৌধুরী, ওর টাকা সুদে আসলে পুষিয়ে দিয়েছেন আপনি। এত চুল আপনার, অথচ পাকা চুল কোথায়। বয়স কত হল?'

'চল্লিশ পেরিয়ে গেছি', সিগারেটটা ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, তোমার নিজের খাওযাদাওয়া নেই, মধুমঙ্গল—কেমন লটকে পড়লে যে তুমিও আমার চুল ছাঁটার অছিলায় মধুমঙ্গল?' মধুমঙ্গল অনেকক্ষণ হয় ক্লিপ ছেড়ে দিয়েছে। ক্লিপ সে বড় একটা ব্যবহাবই করে নি আজ। পাড়াগাঁয়ের উমাচরণেব মতন কাঁচি দিয়ে ছেঁটে যাচ্ছিল—ধীরে ধীরে—শান্ত মোলায়েম নিপুণতার সঙ্গে।

'দাড়িটা আপনার না কামিয়ে ছেঁটে দিলে ভালো হয়?'

'কেন?'

'এ তো এক মাসের দাড়ি আপনার গালে। সবুর করুন, কাঁচি দিয়ে ঢঙের দাড়ি বানিয়ে দিই।'

'না, না, নূর নয় তো কামাতে হবে। আমি দাড়ি রাখি না কখনো।' সুতীর্থ একটু ঝেঁঝে উঠে বললে।

'কলকাতার নাপিতের ক্ষুরে দাড়ি কামাবেন?'

'কি হবে?'

'আজই তো তিন চারটে গরমির রুগীকে কামিয়েছি।'

'কে তুমি?' সুতীর্থ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললে, 'কি করে জানলে, তুমি তাদের ও রোগ হয়েছে?'

'সে আমার জানা আছে। আমিও তো রুগী। আমাদের নিজেদের মুখ চেনাচিনি আছে।'

সুতীর্থ আরশির ভেতরে মধুমঙ্গলের কালো নীল মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওটা বুঝি বাস্তু সাপ, ঘরে ঘরেই আছে?'

'আছে বই কি, আমার সাপ আমাকে কিছু বলবে না, কিন্তু আপনাকে কাটতে পারে। ক্লিপের আঁচড়ে ছড়ে যেতে পারে, ক্লিপ ধরিনি তাই; ঘাড়ের ক্ষুর লাগাব না আপনার। দাড়ি এখানে আপনি বরং নাই বা কামালেন।'

সুতীর্থ সেলুনের দেয়ালের চারদিকের কিমাকৃতি সব ছবিগুলোর দিকে তাকাচ্ছিল, ক্যালেণ্ডারের ছবি আছে, বিলিতি আর্ট আছে, দিশী মহাভারত ও ভাগবত যে সব ছবিতে বিকণ্টকিত হয়ে উঠেছে তাও মনের ভেতর নেশা কেলাসিত করতে না পারলেও উথলে তুলতে পারে। আমাদের শাস্ত্রে, তন্ত্রে, সুতীর্থ ভাবছিল, সারাৎসারের উপমা প্রতীক হিসেবে প্রথম ও অন্তিম রস কেমন সনির্বন্ধে এসে দাঁড়িয়েছে।

'মধুমঙ্গল আমি দাড়ি কামাব।'

'নাপিতের ক্ষুরে? যদি রক্তে দাঁত হয়?'

'হোক। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।'

'এটা বোকার মত কথা বলা হল।'

সুতীর্থ দেয়ালের একটা ছবিতে মেয়ে পুরুষের খোলাখুলি কেমন একটা আকাট তাৎপর্যের দিকে দু-এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললে, 'বোকা তুমি আমাকে বলতে পার। কিন্তু সম্প্রতি আমি কোনোদিকেই মন দিতে পারছি না। চলো আমাকে নিয়ে কোনো জায়গায়—চলো, আমি টাকা দেব। এখানে চানের সুবিধে আছে?'

'আছে বই কি।'

'ভালো সাবান আছে? ক্ষিধেও পেয়েছে। খেয়ে-দেয়ে কোথাও ঢুকে পড়ে দিনটা কাটিয়ে দেওয়া যাক্—রাতটাও। দু তিন দিন থাকতে পারলে তো ভালোই। খুব অন্ধকার চাই—খুব চুপ চাপ। যেন জীবনটা একটা শীতের ঘুমটানা রাত ছাড়া আর কিছু নয়—দেশ গাঁয়ের শীতের চারদিকে খেজুর গাছ কুয়াশা পেঁচা, রাত কোনোদিন ফুরুবে না। ঘুমের থেকে অন্য ঘুমের ভেতর চলে যাবার পথে মাঝে মাঝে একটু জেগে ওঠা—এই স্বাদ; এ ছাড়া ঘুমের কোনো শেষ নেই। এই সব—যা চাচ্ছি—কয়েকটা দিনের জন্যে দেবে তুমি আমাকে।'

সুতীর্থ তার কথা শেষ না করতেই ভেতরের ঘর থেকে খন খন করে বেজে উঠল যেন কার গলা ঃ 'হো রে মধু মঙ্গইলা, হো মউধ্যা, তর হইল কী রে—'

'এতক্ষণে বুঝি তোর ঘুম ভাঙ্গল' মধুমঙ্গল গায়ের জ্বালা ঝেড়ে বললে।

'তর সঙ্গে কথা কয় ক্যাডা রে?'

মধুমঙ্গল মাথাটাকে ঠাণ্ডা রাখবার চেষ্টা করে চুল ছাঁটতে ছাঁটতে বললে, 'তুই ভাত খেয়েছিস বিপনে?'

'তুই খাইলে তবে তো খাইমু।'

'যা, যা চান করে আয় গে যা, দিক করিস নি—'

'তর লোগ পাগলের লাহান কথা কইছে ক্যাডা? কথার লওন আছে খোওন নাই মানুষটা ক্যাডা। এই দুফুইরডার সময় নি চুল ছাঁটে? চুল ছাঁটতে আইছে না চুলের আঁটি বাঁধতে—দলঘাসের আঁটি—ছলি মদ্দি সইসের লাহান?'

'তুই যদি ফের কথা বলিস বিপনে—তা হলে ক্ষুর নিয়ে আসছি।'

'কি করবি তুই আমার। রোজই তো কান্না ছুটাস। তুই আমার বাপ কর্ণ, আমি হইলাম গিয়া রঞ্জাবতীর ছাওয়াল। আয় আয় দাতা কর্ণ আয়, করাত দাও, কুড়াল যা হাতের কাছে পাস হেইয়া দিয়া দে গলা দু ফাঁক কইরা। বাইচ্যা থাইকা আর সুখ নাই।' কাঁচি চিরুনি দেরাজের ওপর ছুঁড়ে ফেলে মধুমঙ্গল ঝট করে ও ঘরে ঢুকতেই লোকটা আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে গড়াগড়ি খেতে খেতে কিল চড় ঘুষি লাথি হজম করতে লাগল—একটা টু শব্দও করল না।

ফিরে এসে মধুমঙ্গল দেখল, সুতীর্থ একটা ঝকঝকে কাঁচি তুলে নিয়ে তার ছাঁটা চুলের ওপর বাহার কাটবার চেষ্টা করছে।

'এটা ভালো করছেন না, সুতীর্থবাবু।'

'কেমন একটা ঝুঁটি রেখেছ তুমি সমস্ত মাথা জুড়ে। এই কি ভালো চুল ছাঁটা হল, মধুমঙ্গল—'

মধু একটু বিক্ষুব্ধ হয়ে বললে, 'লোকে দেখে কি বলে সেটা আমাকে শুনিয়ে যাবেন—'

'লোকে কি বলে? আর আমি কি মনে করি সেটা কিছু নয়?'

চুলে ড্রেস করতে করতে মধুমঙ্গল বললে, 'দাড়ি থাক তা হলে আজ।'

'দাড়ি কামাতেই তো এখানে এসেছি মধু! যে আফিং খায় তাকে খেলে কাল-নাগ 'লীল' হয়ে যায়—' সুতীর্থ লীলের ওপর জোর দিয়ে ঠাট্টা করে এক আধ ফোঁটা হাসি ছিটিয়ে বললে, 'কী করবে আমাকে তোমার রোগ?'

'না, পঞ্চ রং-এ মাতাল আর সাপের বিষে কি করবে।'

'নাও, ড্রেসিং চটপট সেরে নাও। দাড়ি কামাও। তারপর যাব।'

'কোথায়?'

ওই যে বললুম।'

'সে গুড়ে অনেক দিন বালি প'ড়ে গেছে, স্যর। আমাদের কোনো চেনা বাড়িউলি নেই, বাড়িই নেই, লোকের মাথা পাতবার জায়গাই নেই। মন্বন্তর দাঙ্গা হাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালাবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব; হাড়গোড়ের ছিবড়ে শুঁকতে আরশোলারা শুঁড় নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে, ফড়-ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং? দিতে পারি তবে। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্ত-মাংস চাইছেন আপনি? কার আছে? কে দেবে আপনাকে।

দাড়ি কামানো শেষ হলে মধুমঙ্গল বললে, 'দশ বছর ধরে এখানে কাজ করছি, আপনাকে তো দেখিনি কোনোদিন। এ পাড়ায় থাকেন নিশ্চয়ই সেলুনে চুল কাটাবার দাড়ি কামিয়ে নেবার বেশ এলেম তো আপনার; এ পাড়ায় সবাই তো আমার সেলুনেই আসে—'

'এখানে আমি আসিনি আগে আর।'

'এখন থেকে আসবেন তা হলে—'

'কি মনে করেই আজ শোভাবাজারে এসে পড়েছিলুম, মধুমঙ্গল ভূতেই টেনে এনেছে মনে হয়। আমি থাকি বালিগঞ্জে; ওদিকে একটা ব্রাঞ্চ খুলতে পার তোমার ঘাট-কামানোর দোকানের?'

সুতীর্থ পালিশ গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'পয়মন্ত নাপতেনীর হাত গো তোমার,—সুবিধে পেলেই আসব; মোক্ষম; আমার আর কিছু সুবিধে করে দাও না, যা বলছিলুম—'

'মানে উমাচরণকে চাই?'

'না, উমাকে!'

'সে হয় না।' মধুমঙ্গল কিছুতেই ধরা দিল না।

সুতীর্থ চলে গেল। দাম দিতে ভুলে গেল মধুমঙ্গলকে। সেও চাইল না। দামের জন্যে নয়, দামতো কিছুই নয় লোকটার জন্যেই তার ঠিকানাটা জেনে রাখলে পারত মধুমঙ্গল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাও জিগ্যেস করতে পারল না। বালিগঞ্জে যাবে? উত্তুরে মানুষ সে—সমস্ত দক্ষিণ দিকটার নামই তো বালিগঞ্জ; ওখানে কে কাকে খুঁজে পাবে? দশ বছরের মধ্যে একবারও গিয়েছে ও মুলুকে মধুমঙ্গল। পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের ইস্কুলের সেই সব ফোর্থ থার্ড সেকেণ্ড ক্লাসের ইয়ারদের কথা মনে করে ঝুম হয়ে থাকবার মত মন মধুমঙ্গলের নয়! কিন্তু তবুও চান নেই—খাওয়া দাওয়া নেই—মেঝের ওপর কম্বল পেতে শুয়ে পড়ল সে। ঘুমোতে দেরি হ'ল।

ট্রামে উঠে সুতীর্থ ভাবল, মধুমঙ্গলের দামটা দেওয়া হল না, আর একদিন এসে দিয়ে যেতে হবে; ওকে চিনি আমি ও তো সেই গালিফপুর ইস্কুলের মধুমঙ্গল চক্রবর্তী, ওকে ভালো লাগত আমার খুব খেয়ালী ছেলে ছিল, পড়াশুনো তাস ক্রিকেট অ্যাক্টিং য'তে হাত দিত—বেশ সেঁটে—পাঞ্জা জাঁকিয়ে। ভারি ডাঁটের মাথায় চলত ফিরত, কথা বলত, ভারি তালেবর ছেলে ছিল; নাপিত হয়েও তাই আজ হয়েছে হেডনাপিত, মধুমঙ্গল কি অ্যাসেম্বলির স্পিকার হতে পারত না, কিংবা

মন্ত্রী? দুমাস তালিম করে নেবার সময় দিলে ও সে সব কাজ ঠিক চালাতে পারবে; ও সবই পাইয়ে দিত আমাকে ইস্কুলে পড়তাম যখন। সব জানে সব পারে; এখনও ওর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে মনে হচ্ছিল সর্বসিদ্ধিদাতার হাতীর শুঁড় নড়ছে যেন—এমনই নাড়া দিয়েছিল আমাকে যে ওকে বলেছিলাম বেশ একটা নিরবলীন অন্ধকারের দেশে আমাকে কয়েকদিন কাটিয়ে দেখার সুযোগ দিতে পারে কি না। সেখানে কিছুকাল থাকলে ফিরে এসে তারপর এই সব বাতাসে রোদে কী উৎসাহ পেতুম আমি, কী আলোকোৎসারিত মনে হত এই পৃথিবীকে। কিন্তু মধুমঙ্গল তা হতে দেবে না; ওর বিশ্বাস, যে তা হলে রোগ হবে, নষ্ট হয়ে যেতে হবে; তা হয় বই কি, কিন্তু সে রোগ হতে দেব কেন, আজ না হয় অকৃতী সমাজের দোষে নেশার সঙ্গে রোগের নিরেট নিষ্ফলতা মিশে আছে, কিন্তু একদিন এমন নিয়ন্ত্রণ আসবে না কি যখন অন্ধকার ও আলো, মৃত্যু ও জীবন ব্যবহারের সে ঢের অতল গভীর আনন্দের প্রবাহকে কোনো রোগ কোনো অনারোগ্য অপদর্শন এসে অসফল করে দিতে পারবে না আর। আজই তো সতর্কতা আছে, ওষধি আছে; নিরেস গণিকাবৃত্তিও আছে। ওরা যে নারী মা বোন এ রকম মন-সাফাই মনোভাবও আছে। এ সব পথে নয়, কোনো ওষুধের প্রয়োজন হবে না শরীরের বা মনের জন্যে, শরীরই শুধু তাগিদ রোধ করবে না, হৃদয়ও—দুজনেরই; কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট জীবনকালের জন্যে নয়—হয়তো এক রাত্রির জন্যে, কিংবা সাতটি আলোকিত দিনের জন্যে। কিন্তু মানুষের মন ঢের বেশি নির্দোষ—রাষ্ট্র খুব বিশেষভাবে উজ্জ্বল না হলে এ জিনিস সম্ভব নয়। কি, অসাধাসাধনের জিনিস মধুমঙ্গলের মত বেচাবার কাছে চেয়েছিল সে। যে মাত্রাবোধ চাপা পড়ে গিয়েছিল—ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। সাদা চেতনায় মন স্থির হয়ে উঠলে আবো বেশি স্থিব হয়ে পড়ে—আজকের এই অপজাত পৃথিবীতে সে স্থিরতা বিষণ্ণতা ছাড়া আর কিছুই নয়; সুতীর্থেব মুখেব প্রতিফলিত কেমন যেন তপঃকৃশহাসির পেছনে প্রকৃত মুখটাকে অর্থস্থলকে দেখা যাচ্ছিল তাব, কিন্তু ট্রামেব কোনো যাত্রীবা দেখতে পেল না কিছু।

ছয়

অন্ধকারের ভেতর দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে ওপরে উঠতেই সুতীর্থের সঙ্গে প্রায় গা ঠোকাঠুকি হয়ে গেল। মণিকা সিঁড়ির কিনারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, চাকরটাকে পাঠিয়েছিলেন একটা ওষুধ কিনতে, কিন্তু সে বড় দেরি করে ফেলেছিল; মণিকা নিজেই একবার নিচে গিয়ে দেখে এসেছেন, ফিরছে না চাকর; ওষুধ নিয়ে না ফিরলে ওপরে যেতে পারছেন না তিনি।

'এই যে মানুষ যে—' সুতীর্থ বললে।

'তাই তো দেখছি, এত রাতে তোমার উদয় যে!'

'চোখ বুজে চলেছিলাম, তোমার গায়ে লেগে গেল বুঝি।'

'তুমি ভেবেছিলে পাথর দাঁড়িয়ে আছে বুঝি।'

'রাত কটা হবে?'

চাকর ওষুধ নিয়ে সর সর কবে ওপরে চলে গেল, মণিকা দেখলেন; সুতীর্থের চোখে পড়ল না। সুতীর্থ সিঁড়ির দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

'দয়া করে যে রাস্তার দরজাটা বন্ধ করে দাও নি, ওটা আট'কে রাখলে আমাকে দেওয়ালের পাইপ বেয়ে উঠতে হত। বড্ড রাত হয়ে গেছে আজ। চলো আমার ঘরে। ঘর খোলা যে?' দু এক পা এগিয়ে গিয়ে সুতীর্থ বললে।

'খোলা রেখে গিয়েছিলে বলেই এতক্ষণ আমাকে আগলে বসে থাকতে হল, এবার আমি চলি—'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'ওপরে।'

'অংশুবাবু কি ফিরেছেন?'

'খেয়ে-দেয়ে ওর এক ঘুম হয়ে গেছে।'

সুতীর্থ হঠাৎ প্যাসেজের বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে বললে, 'রাত হয়েছে তবে। আচ্ছা, ওপরে যাচ্ছিলে যাও। অংশবাবুর হয়তো কিছু দরকার হতে পারে।'

'কি আর দরকার হবে এত রাতে।'

'এক ঘুম তো হয়ে এল প্রায়, তারপরেই তো দরকার।'

মণিকা দাঁড়িয়েছিলেন, মাথার ওপর থেকে ঘোমটা ঠিক নয়, আঁচলটা খসে গেছে খোঁপার ওপর, আঁচল চড়াতেই বাতাসে খসে গেল আবার; গলায় জড়িয়ে নিলেন আঁচল; সুতীর্থের সামনে ঘোমটা দেবার কি দরকার তাঁর; সুতীর্থ দু এক বছরের বড় হতে পারে মণিকার চেয়ে, কিন্তু নিজের ছোটর মতনই তো তাকে দেখেন তিনি। তাই অনুভব করেন না? ভাবছিলেন।

সুতীর্থ নিজের ঘরের ভেতরে ঢুকে বললে, 'বোস।'

'বসব না, ভয় আমার মেয়েটার জন্যে।'

'কে অমলা? ঘুমোয় নি?'

'ঘুমিয়েছে, কিন্তু ছ্যাঁৎ করে জেগে ওঠে তখন আমাকে কাছে না পেলে কাণ্ডই করবে।'

'নিশির ডাকেও হেঁটে চলে না কি অমলা?'

'কাকে বলে নিশির ডাক?'

'ঘুম চোখে যে মানুষ হেঁটে বেড়ায়, মাঠ, ঘাট, প্রান্তর পেরিয়ে যায়, তবুও ঘুম ভাঙে না, জান না, শোন নি?'

মণিকা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য, তেমন ঘুম থাকে না কি আবার। কই, শুনি নি তো কখনো দেখি নি তো কাউকে। তুমি দেখেছ?'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'নিশিতে পাওয়া মানুষ? কত কত দেখেছি। আমি নিজেই তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ, ঘাট, ঝিল, জঙ্গল তেপান্তর ভেঙে—পাড়াগাঁয়ে থাকতাম তখন—'

'তারপর কি হ'ত?'

'হঠাৎ ঘুমের ঘোরটা ভেঙে গেলে টের পেতুম সব।'

'বড্ড ভয়ঙ্কর জিনিস তো; ঘুমের নেশায় হেঁটে চলা; এখনো আছে নাকি এ রোগ তোমার?'

'না, কলকাতায় এসে সেরে গেছে, পনেরো বিশ বছর আগে দেশ গাঁয়ে থাকতে নিশির ডাকে চ'রে বেড়াতুম। দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছ মণিকাদি বোস—জলচকীতে কেন কুশনে বোস।'

কুশনে নয়, একটা বেতের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প'ড়ে মণিকা বল্লেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'টিনটা তো বের করেছ সিগারেটের অনেকক্ষণ। খাও, আমি উঠি।'

'বোস, সিগারেট রেখে দিচ্ছি। ও আমি খাই না, এমনিই নাড়ছিলুম টিনটা।' সুতীর্থ সিগারেট বের করল না, দেশলাইটা সরিয়ে রাখল, লঙ কোটের দু পকেটে হাত ডুবিয়ে মাথা হেঁট করে কি যেন ভাবতে লাগল।

'শীত করছে না তোমার?'

'কই না তো, গরম হয়ে আছি।'

'কলকাতায় বেশ একটু শীত পড়েছে এবার।'

'কলকাতায় শীত নেই' সুতীর্থ পকেটের ভেতর থেকে হাত বার করে এনে বল্লে।

'কোটের নিচে শার্ট নেই তোমার?'

'না এ তো লঙ কোট।'

'গরম?'

'গরমের দিনে পরা যায়।' সুতীর্থ বল্লে।

মণিকা বেতের চেয়ার থেকে উঠে একটা সোফায় ঠিক হয়ে বসে বল্লেন, 'হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়ে সর্বনাশ ঘটাতে পার। তুমি অন্তত একটা চাদর গায়ে দাও না কেন? বোস, তোমার জন্যে একটা ধোসা নিয়ে আসছি।'

'এখন তো ঘরে ফিরেছি। বেশ গরম লাগছে ঘরের ভেতর। যখন বাইরে বেরুব তখন দিও ধোসা।'

'তোমার লেপ নেই?'

'কম্বল আছে।'

'লেপ তৈরি করাও না কেন?'

'আগে পরিবার এসে নিক।' সুতীর্থ সিগারেট বের করে জ্বালিয়ে নিল।

'রাত হয়ে গেল উঠি।'

'অংশবাবু তো ডাকবেন জেগে উঠেই, তখন গেলেই হবে। পৌঁছে দেব তোমাকে—'

'তার মানে?'

সুতীর্থ সিগাবেট জ্বালিয়েছিল, কিন্তু না টেনেই নিবিয়ে রাখল, টানবার ইচ্ছে ছিল না তার, মণিকা দেবীও মুখোমুখি বসে আছেন; টানবার রুচি নেই; সিগারেটটা কোটের পকেটে রেখে দিল।

মণিকা বল্লেন, 'মুটিয়ে গেছি, শরীরে বাত ধরেছে, ওঠানামার পথে একজন লোক চাই বুঝি আমার? তোমার আগে কুতবমিনারের মাথায় চড়ব গিয়ে আমি, সুতীর্থ তুমি নিচে পড়ে হাঁপাতে থাকবে। চলো, যাবে নাকি!'

'কোথায়—কুতবে?'

'চলো অক্টারলোনিতে।'

'ওঠা যায় নাকি ওটায়?'

'চলো দেখে আসি—কে আগে ওপরে ওঠে—মোটা না রোগা, ঢেমনা না লাউডগা; কে কাকে ছাদে পৌঁছিয়ে দেয়, মাটিতে নামিয়ে আনে—রকমটা দেখে আসা যাক আশ মিটিয়ে—'

'চলো, দেখে আসি,' সুতীর্থ বল্লে, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝলে মণিকা মজুমদার। তুমি ভেবেছ, আমি তোমাকে বেতো বলেছি, তা নয়; তোমার বাত নেই, বেশ সুন্দর ছেঁচা শরীর; বেশ লম্বা ছাঁদ। ছিপছিপে চেহারা হলেই অনেকের ভালো লাগে। আমাব দেখে শুনে রয়ে সয়ে লাগে; খুব খারাপ হতে পারে, আমাদের দেশে প্রায়ই মড়াদের ওরকম চেহারা হয়; সুস্থতা না থাকলে সুন্দরী হওয়া যায় না কোনও দেশেই, আমাদের এ দেশে তো নয়ই। তোমাকে ওপরে পৌঁছিয়ে দিতে চেয়েছিলুম—অন্য কারণে। চলো, তাহলে—'

'কোথায়?'

'অক্টারলোনি মনুমেন্টে—'

'এত রাতে?'

'তুমি যাবে বলছিলে?'

'ট্রাম বাস তো চলছে না এত রাতে।'

'ট্যাক্সিতে চলো।'

'ওপরে একটা শব্দ শুনছ না?'

'কই না তো।'

'আমার মনে হয় জেগে উঠেছেন—'

সুতীর্থ মণিকার চোখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করে নিচ্ছিল সে চোখে ঘুম ঘনিয়েছে না আরো কিছুক্ষণ জেগে থাকার ইচ্ছে—ওপরে না গিয়ে সুতীর্থের এই নিচের ঘরে বসে থেকে।

'নাকি অমলাই দুঃস্বপ্ন দেখে কেঁদে উঠল। শুনলে না তুমি?' মণিকা বললেন।

'ও কিছু নয়, তোমার মনে ধাঁধা। এই বারে শীত পড়েছে।' সুতীর্থ র‍্যাকের থেকে একটা জহর কোট নামিয়ে গায়ে চড়াল।

'সারা রাত তোমাকে জাগতে হয় বুঝি মণিকা দেবী, অংশুবাবুর হাঁপানির টান, তোমার মেয়ের—'

'মেয়ের জন্যেই আমার ভাবনা বেশি। কি সে সব বাজে বকে ঘুমের ঘোরে সারা রাত। তা ছাড়া ওর হার্ট ভালো না লাংসও খারাপ। একটুতেই সর্দি-কাশি ধরে যায়; একবার ধরলে আর ছাড়তে চায় না, অ্যাঙ্গার্স খাওয়াচ্ছি।'

'অ্যাঙ্গার্স তো পাওয়া যাচ্ছে না আজকাল। পেলে আমিও খেতাম।'

'তুমি? কি রোগ হল তোমার? সর্দি-কাশির ধাত নয় তো। অ্যাঙ্গার্স কালো বাজারে পাওয়া যায়। আমি অবিশ্যি কন্ট্রোলে যোগাড় করে দিতে পারি। তোমার চাই?'

'অংশুবাবুর ধরে অ্যাঙ্গার্সে?'

'ধরা ধরি' একটা ক্লান্ত রক্তকণিকা যেন আস্তে আস্তে মোচড় খেতে না খেতেই নিটোল দিব্য হয়ে বেরিয়ে এল মণিকার নিঃশ্বাসে; বললেন, 'উনি ও-সবের বাইরে চলে গেছেন।'

'ওর হাঁপানি কি কিছুতেই সারানো যাবে না?'

'এ তো সারবার রোগ নয়। ও'র যা বয়স, ও বয়সে এ রোগ সারে না আর। সব রকম চিকিৎসাই হয়েছে, দৈবী ওষুধও যেখানে যা খোঁজ পাওয়া গেছে—মানুষ সেধে দিয়ে গেছে। মানুষের হাত পা ধরেও কত কি যোগাড় করে নিতে হল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না, তিতিয়ে গেছে সব—' বলতে বলতে কেশে উঠলেন মণিকা। মনে হল, পাঁজরের ভেতর থেকে একটা গলিত ব্যাং হাঁকড়ে উঠেছে; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে গেল সেই কুৎসিত ক্লিষ্ট প্রাণী, পটের সৌন্দর্য নিয়ে বাংলার পটের অন্তঃকৌমুদীর আলো নিয়ে ফিরে তাকালেন মণিকা দেবী।

'তোমারও ঠাণ্ডা লাগল'—সুতীর্থ বললে।

'না, ওটা ঠাণ্ডার কাশি নয়।'

তা নয় হয়তো; অংশবাবুর জন্যে বা আর কারো জন্যে সত্যমিথ্যে আবেগে অভিভূত হতে থাকলে শরীরের ভেতর কাজকর্ম একটু বাধা পড়ে, বুক ভারি হয়ে ওঠে কিছুটা গলায় শ্লেষ্মা আটকে যায়, কাশতে হয়, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আমার এই কম্বলটা গায়ে দিয়ে বসো।'

'দাও, কিন্তু তুমি',—কম্বল জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'তোমার শীত করছে না?' লং কোট জহর কোটে মানাচ্ছে?'

'খুব। আমি তো এখন ঘুমুচ্ছি না,' সুতীর্থ বললে, 'তোমার মেয়ে অমলাকে আমি একদিন দেখেছিলুম। তুমি কিছু মনে করবে না চমৎকার চেহারা ওর, কিন্তু ভেতরে যে জিনিস থাকলে পাঁচী পটলীও ছোকরাদের গুণ করে রাখে—' সুতীর্থ কোটের পকেট থেকে সিগারেট বার করে নিয়ে বললে, 'অমলার তা নেই। ওর বাপের কাছ থেকেই এ সব পায়নি বলে মনে হয়।'

মণিকা দমে গেছেন মনে হল না, অপ্রীতও কি হয়েছেন? সুতীর্থের এসব কথা গায়ে মাখবার মতো মনে করেন বলে মনে হয় না। বললেন, 'ওর বাবা আমার চেয়ে ঢের উঁচুদরের মানী লোক; যা জান না সে বিষয়ে কথা বলতে যাও কেন?'

সিগারেটটা কোটের পকেটে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ একদৃষ্টে মেঝের একটা অকিঞ্চিৎকর ছকের

দিকে তাকিয়ে ছিল।

'তুমি উঠলে?'

'তোমার কম্বলে বড্ড বেশি গরম।'

'তাই তো এরই মধ্যে ঘামিয়ে উঠেছ দেখছি।'

কম্বলটা সরিয়ে রেখে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে মণিকা বললেন, 'মেয়ে কি মার কিছু পায়নি?'

'পেয়েছে বই কি।'

'কি পেল?'

'তোমার রূপের অনেকটা। সবটা নয়। গোড়ার দিকটা অন্তত। ভবিষ্যতে এ রূপ কেমন হয়ে ওঠে দেখবার জন্যে আমি থাকব না। সত্যি গরম লাগছে। বড় নচ্ছার এই কলকাতার শীত। শীত যাকে বলে তা তো নেই—'

'কোটটা খুলে ফেললে?'

'আমাকে এক কাপ চা করে দিতে হবে।'

'এত রাতে? কিছু খাবে না?'

'না।'

'আমি তো তোমার জন্যে খাবার করে রেখেছি।'

'কোথায়?'

'আমাদের রান্নাঘরে; চাপা আঁচে চড়িয়ে রেখে এসেছি সব। বেশ গরম আছে।'

'কি আছে খাবার।'

'ভাত ডাল মাছের তরকারী—সবই—'

হাত পা খানিকটা কালিয়ে আসছে অনুভব করে সুতীর্থ কোটটা আবার এঁটে নিতে নিতে বললে, 'না, খাব না বেশি জিনিস কিছু। দেরাজে কমলা লেবু আছে; এক কাপ চা চাই।'

'দই আর চা খেলে হয় না, সুতীর্থ?'

'কম্বল গায়ে দিচ্ছ যে আবার? শীত করছে?'

'কটা বাজল?'

'সাড়ে এগারো। একটার সময় চা হলে চলবে।'

'অত রাত অব্দি কার উনুনে আঁচ থাকে?'

'ইলেকট্রিক স্টোভটা—'

'কিচেনে নেই। সেটাকে তো সরিয়ে নিয়েছি।'

'কোথায়?'

'অমলার বাবার বিছানার কাছেই একটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়েছি। বাতে ও'র পিঠে কোমরে সেঁক দিতে হয়; সারা রাতই; একটার সময় তুমি কেন চা খাবে?'

'তোমার সঙ্গে গল্পগুজব করা যাক। একটা দেড়টা নাগাদ।'

'আমাকে এখুনি উঠতে হবে—' মণিকা বললেন। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মণিকা দেবীর চোখের ভেতরে কতখানি উঠবার উপক্রম রয়েছে, কতটুকু আরো দু-চার মুহূর্ত বসে থাকার সঙ্কল্প—

'ভাড়ার কথা বলব ভাবছিলুম তোমাকে। পনেরো টাকা বাদ দিয়ে দু-মাসের ভাড়া দিয়েছ তুমি। কিন্তু আগেকার আরো কয়েক মাসের ভাড়া বাকি আছে।' মণিকা বললেন।

'এই রকমই বাকি পড়ে থাকবে আমার।' সুতীর্থ মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাদের অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

'দু শো আড়াই শো টাকায় ভাড়াটে বসাতে পারি সেলামী পেতে পারি। আজকাল আমাদের

টাকার দরকার। ওঁর ভালো চিকিৎসা করাতে হবে—হয়তো চেঞ্জে যেতে হবে। ভাড়ার টাকা ছাড়া আমাদের তো উপায় নেই কিছু; কোনো দিক দিয়ে কোনো আয় নেই আর।'

এবারেও সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলবার জন্যেই যেন জ্বালিয়েছিল সুতীর্থ, কিন্তু নিবিয়ে দিল না, ধীরে ধীরে টেনে যেতে লাগল। মণিকা বসেই ছিলেন—সুতীর্থ কোনো কথা বলবে কি না বলবে সে সবের প্রতীক্ষায় নয় হয়তো—এমনিই একটা অপরূপ হেতুপ্রভব অহেতুকতার পরিমণ্ডলের ভেতর।

'আমি তা হলে চলে যাই মণিকা দেবী—'

'কোথায়?'

'কলকাতা ছেড়ে।'

'কলকাতা ছাড়তে হবে কেন? চাকরী ছেড়ে দিয়েছ নাকি? দেও নি? তা হলে কি—বাড়ির অভাব? তা কলকাতায় কে বাড়ি পায় আজকাল। একটা কাজ কর তুমি। মণিকা হাতের পাশের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি আজকালই অমলার বিয়ে দিতে চান, তুমি একটি ছেলে যোগাড় করে দাও।'

সুতীর্থ সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে চুপ করে ছিল, নিষ্ক্রিয়তায় রাতের ঠাণ্ডায় নিবে গেছে সিগারেটটা। সেটাকে হাতের কাছে দেরাজের ভেতর ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বললে, 'ও রকম ঘটকালি করে কি ভালো বিয়ে হয়?'

'আমাদের তো হয়েছিল।'

তা হয়নি যে তা সুতীর্থ জানে; মনকে চোখ ঠার দিয়ে অংশবাবুব সঙ্গে বনিবনাও করে নিয়েছেন মণিকা দেবী। এঁদের দুজনের বিবাহমিলন তাসের বাড়ি নয়, তবে খুব শক্ত বাড়িও নয়। নানারকম ভূমিকায় চিড় খেয়ে আসছে; সে রকম কোনো বিষম ধাক্কায় কি হয় কে জানে। সে সব ধাক্কা আসে না অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় সূর্যে কোনো শস্য ফলায় না।

'তোমার আর অংশুবাবুর বেলায় খুব ভালো ফল পাওয়া গেছে, মানতে হবে; কিন্তু আগেকার সে সব দিন কোথায় এখন আর? তারপরে তো আরেক পৃথিবী এসে পড়েছে—'

সুতীর্থের কথায় কান না দিয়ে মণিকা বললেন, 'অমলার জন্যে ভালো বর জুটিয়ে দেবে। পারবে তুমি। এ বিয়েতে উনি এত খুশী হবেন যে, এ তিনটে ঘর তোমাকে আগেকার প্রি-ওয়ার রেটে ছেড়ে দেবেন; দু-চার মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলেও খুঁৎ-খুঁৎ করবেন বলে মনে হয় না।'

জানালা দিয়ে হু-হু ঠাণ্ডা আসছিল—শীতের রাতের হাঁকরা মুখ থেকে উদ্গারিত ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক। কখন যে খুলে ফেলেছে গায়ে কোট ছিল না সুতীর্থের হাড়ে কাঁপুনি লেগে গেল যেন তার; বললে, 'আমি কি করে অমলাকে বিয়ে করি মণিকা দেবী, সে কি আমাকে ভালোবাসে?'

উত্তর দিকের দুটো জানালাই বন্ধ করে দিতে গেল সুতীর্থ। ফিরে এসে মণিকার মুখোমুখি দাঁড়াতেই তিনি বললেন, 'ভালেবাসে না যে তার কোনো প্রমাণ পেয়েছ সুতীর্থ?'

'ওর বয়স কুড়ি আমার চল্লিশ বেয়াল্লিশ পেরুল। কি করে ও আমাকে ভালোবাসবে?'

'তুমি তো ওকে ভালোবাস।'

'তাও তো বলতে পারি না। আমার পরিবার রয়েছে।'

ঘণ্টা খানেক পরে সুতীর্থের জন্যে চা এল ওপর থেকে খুব ভালো চা অবিশ্যি; টি পট সুদ্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে; দুধ চিনিও যা চাই সবই আছে। কিন্তু যে চাকরটা দিয়ে গেল তাকে হয়তো লাথি মেরে ঘুম থেকে ওঠানো হয়েছে—এমনই বিরস বেপরোয়া মুখ তার।

কী করবে সুতীর্থ। সারা রাত বসে চা খেল সে। ঘুমিয়ে পড়ল বেলা সাতটায়।

সাত

বেলা দুটোর সময় সুতীর্থ জেগে উঠল।

অফিসে যেতে হবে। বেশ চেপে দাড়ি গজিয়েছে; কিন্তু সে সব গ্যাঁজ ট্যাজ কামানো দরকার মনে করল না। চান করল না। মাথা ধুয়ে মুছে চুল আঁচড়ে কাপড়-চোপড় বদলে নিল; ঘরদোর খোলা রেখেই বেরিয়ে যাবে ঠিক করল ঃ কী আছে তার ঘরে। দু একটা লেখার খাতা ছাড়া; আর যদি কিছু চুরি যায়, বাজারে কিনতে পাওয়া যাবে সে সব, কিন্তু মাঝে মাঝে মন স্থির করে জীবনের খুব পরিষ্কার মুহূর্তে যা সব লিখেছে সুতীর্থ সেগুলোকে কেউ সরিয়ে নিয়ে গেলে—কিন্তু কে সরাবে? —কিন্তু কেউ সরিয়ে নিলে—কিন্তু কেউ সরাবে না—কিন্তু কেউ সরিয়ে যদি নেয় তাহলে ওরকম সব পরিচ্ছন্ন প্রকাশের সুযোগ আসবে কি তার জীবনে আবার: আসতে পারে হয়তো; কিন্তু যা হয়ে গেছে সেটা হয়ে গেছে; সেটা আর ফিরে আসবে না; নতুন কিছু আসবে? কিন্তু পুরোনোটারও দরকার ছিল।

নীচে নামবার সময় বারান্দায় বেরিয়ে এসে সিঁড়ির দিকে চলেছে, এমনিই তেতলার দিকে চোখ পড়তেই অমলাকে দেখা গেল—বেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে;—সুতীর্থকে দেখেও সরে গেল না; চোখে চোখ পড়ল; মেয়েটির অবসর ছিল—হয়তো ফুরোবার নয়। কিন্তু সুতীর্থকে কাজে যেতে হবে; মেয়েটির মা যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকত তাহলে কাজে ফাঁকি দেবার কথা ভেবে দেখতে পারা যেত। কিন্তু মণিকা কোথায়, সে কি আব শীগগিব দেখা দেবে। সংসার ও সময়েব নিযমে স্ত্রীলোকটি আজ মা, অংশুবাবুর স্ত্রীও, কিন্তু বয়সে মনের গড়নে সুতীর্থের নিকটতম আত্মীয় তো মণিকা; সময়ের কণিকাগুলো ঠিকই আছে, কিন্তু প্রবাহে খানিকটা তাল কেটেছে, তা না কাটলে কুড়ি বছর আগে মণিকাকে আরেক নির্ণয়ের ভেতর পাওয়া যেত খুব সম্ভব—সমযের সব রকম সমাবেশ একই আনন্ত্যে নিবিষ্ট হয়ে রয়েছে যদিও। অমলাকে কেন গেঁথে দিতে চায় সুতীর্থের সঙ্গে মণিকা? আঠারো উনিশও হয়নি অমলার; আঠারো উনিশের অনেক মেয়ে অবিশ্যি ষাট বছরের প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিযে ছাড়ে; অব্যর্থ, অলঙ্ঘ্য বিষয়বুদ্ধি তাদের? কিন্তু অমলা সে জাতের মেয়ে নয়, ওর মন দশ বারো বছরের শিশুর মত।

অমলার সঙ্গে কথা বলে দেখেছে সুতীর্থ? না, তা দেখেনি। দরকার বোধ করেনি। সহমিলনের জন্যে এ মেয়েটিকে খানিকটা স্পষ্ট মাঝে মাঝে মনে হতে পারে, কিন্তু অন্য কোনো অন্তরঙ্গতার জন্যে নয়। কিন্তু সবরকম মিলনের স্পৃহা যে চরিতার্থ করতে না পারে তার সঙ্গে কি করে প্রেম হয়।

বাস ধরতে হবে। পোয়াটাক মাইল পথ হেঁটে যেতে হবে। সুতীর্থ হন হন করে হাঁটতে লাগল। কাল অফিসে সে যায় নি, আজ যাবার কথা ছিল এগারোটাব সময়, কিন্তু এরি মধ্যে আড়াইটে বাজিয়ে দিয়েছে। যেখানে বাস দাঁড়ায় সে জায়গাটা কি যে অখাদ্য; পাশের ফুটপাতে সিমেন্ট নেই, সবই কাদামাটির; কাছেই একটা মস্ত বড় বিশ্রী সরকারী কিচেনের উটের মত উনুনগুলো দিনরাত জ্বলছে, কিংবা ক্রমাগত নতুন কয়লা খেয়ে ধোঁয়া ওড়াচ্ছে। ফুটপাতের ওপর টিনের চেয়ারে বসে চব্বিশ ঘণ্টা শিখদের আড্ডা, চা খাওয়া, সৎ শ্রীআকালের একান্ত উপলব্ধির মত স্থিরতা কখনো— সেটার জিগিরের মত কেমন একটা বিদঘুটে কটকটে ভাব মুখে চোখে অন্য অন্য সময়; দড়ির খাটিয়ায় বসে শুয়ে এদিকে শিখদের ওদিকে পশ্চিমাদের হল্লা। অনবরত কিচেন থেকে ফেন নোংরা জল পচা রাবিশ গড়িয়ে ছিটকে সমস্ত জায়গাটাকে প্যাচপেচে আস্তাকুড় করে রেখেছে। কলকাতার বিরাট হিক্কার থেকে ওগরানো গরু মহিষ ষাঁড়ের নিরবচ্ছিন্নতা এখানে প্রবল। এই ভাগাড়ের ভেতর দাঁড়াবার মত কোনো একটা জায়গা বেছে নিলেও এদের তাড়নায় সেখান থেকে হড়কে পড়তে হয়—নোংরা বাঁচিয়ে কাদা বাঁচিয়ে। অথচ বাসগুলো ঠিক এই জায়গায় এসেই দাঁড়ায়। এই সব রাবিশ ভেঙ্গে

একটা মস্ত বড় গলগলে নর্দমা টপকে বাসে উঠতে হবে।

সমস্ত কলকাতা শহরটাকে খুব ভাল করে ঢেলে সাজানো দরকার; কলকাতায় সব কিছুই তো হচ্ছে, কিন্তু একটা খাণ্ডবগ্রাসী অগ্নিকাণ্ড হচ্ছে না—লণ্ডনে যেমন হয়েছিল; তারপর উদয় হল ক্রিস্টোফার রেণের নতুন শহরের। এখানে অগ্নিকাণ্ড অতিবিলম্বিত হচ্ছে; স্বাধীনতা আসছে হয়তো, কিন্তু খুব বড় আগুন বা বড় বিপ্লব না এলে রেণ আসবে না কলকাতার রাস্তা ঘাট অলিগলি ঘরবাড়ি ব্রণ খচিত এই বিরাট দুর্মুখেরও পতন হবে না তা হলে। বীথি—ঝাউ দেওদার শাল বকুল সিসু শিরীস অর্জুন সাগুদানার গাছের বীথি—পরিচ্ছন্নতা দেখার নিঃশ্বাস ফেলার ব্যাপ্তি নিরিবিলিভাব শত শত মাইল জায়গা নিয়ে বিভিন্ন ঝর্ঝরে নির্থল নগরীগুচ্ছের ভেতর বিতরণ একটি নগরীর,—এ রকম হলে হত, (মন্দের ভালো হিসেবে অন্তত) মনে হচ্ছিল তার। বাসস্ট্যাণ্ডের নিঘৃণ আবর্জনার থেকে দূরে সরে একটা চলন্ত বাসে উঠতে চেষ্টা করল সে। পড়েই যেত—চাপা পড়ে হাড় মাংস ছিবড়ে হয়ে যেত, কিন্তু হাতল চেপে ধরে ছুটন্ত বাসটার সঙ্গে কায়দা বেকায়দায় অদ্ভুতভাবে লড়ে হঠাৎ কখন সার্কাসের ওস্তাদের ডিগবাজিতে শরীরটা তার বাসের ভেতর ঢুকে গেল—কতগুলো প্যাসেঞ্জার হা হা করে তার পিঠ চাপড়ে তাকে সব বুঝবারই অবসরই দিল না।

'বড্ড বেঁচে গেছেন ভটচার্যি মশাই।'

'এই যে আসুন, যাত্রামোহনবাবু।'

'যাত্রাভঙ্গবাবু বল।'

'পরমাইর জোর আছে—'

'তা আছে বটে, তবে একটু অদলবদল হল।'

'লালমোহনের আগা কেটে মোহনলাল হল।'

বাস হু হু করে ছুটে চল্ল; হু হু করে ছুটে চল্ল।

বাসে ক্বচিৎ বসবার সুযোগ পায় সুতীর্থ। আজও হন্তদন্ত গলদঘর্ম ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হল তাকে। বাসে যারা দাঁড়িয়ে থাকে সে সব মানুষদের সকলেরই তিনটে হাতের প্রয়োজন। এক হাতে মাথার ওপর রড ধরে আছে, আর এক হাতে হ্যাণ্ডব্যাগ পোঁটলা সিগারেট খাওয়া, কিম্বা সে হাত নিজের জামা, চাদর, বিশেষ করে, পকেট বাঁচাতে ব্যস্ত; তৃতীয় হাতে তবু যথাস্থানে ঢুকিয়ে যথাসময়ে পয়সা বের করে দিতে হয় কণ্ডাক্টারকে টিকিটের জন্যে। বিড়ির গন্ধ, সিগারেটের ধোঁয়া, আগুনের দানা কণা,—ভালো চাদরটা বুঝি গেল, পাঞ্জাবিটাকে ঝরঝরে করে দেবার ফুটকি ফুলকি জ্বলছে চারদিকে। ও লোকটার সমস্ত মুখে সদ্য বসন্তের দাগ—খোসা উড়ছে। এ লোকটির গা ঘেঁষে দাঁড়ানো যায় না, এমনই দুর্গন্ধ মুখে না গায়ে না কোথায়, তবুও লেপটে দাঁড়াতে হচ্ছে লোকটার মাংস ঠেসে—পেছন থেকে ঠেলা খেয়ে, মানুষের গায়ের ঘষায়। ভারী আরাম পেয়ে শিব দৃষ্টিতে চাতালের দিকে তাকিয়ে আছে ও লোকটা। ডান দিকের মানুষটার গরমির রোগ, সমস্ত গাায়ে মুখে দাঁতের মাড়িতে কি সব চাকা চাকা দাগ; মাড়ি কেলিয়ে মিটমিটিয়ে হাসছে লোকটা, হাসলেই মাড়ি বেরিয়ে পড়ে, হাসছে কারুর কথার ফোড়নে নয় হয়তো—এম্নিই, জীবনের সৌকর্য উপলব্ধি করে; বাসের মেয়েমানুষদের শ্রী ছন্দও হাসি জোগাল তার? এ পাশের এই ফড়ফড়ে টিকি ওড়ানো লম্বা বেহারী কুর্মী না মাহাতোর সমস্ত শরীরটা কম্প জ্বরে ভেঙে পড়ছে; পুরু কালো ঠোঁট, ইঁদুরের মত ব্যাঙের মত কালো দাঁতগুলো উঁচিয়ে আছে, কোনোটা আছে, কোনোটা নেই, জিভ বেরিয়ে পড়েছে, লালা ঝরছে—কী রোগ এই মানুষটার?

দেহাত ছেড়ে কেন কলকাতায়? কেন বাসে চড়েছে?

মেয়েদের সিটে মেয়ে দুটিকে অসুন্দর বলা যায় না। এদের ভেতরে একজনের অন্তত চেহারা গড়নে ভারী মনোরম মোড় রয়ে গেছে; চোখে লাগে; তাকিয়ে থাকলে কিছুটা চঞ্চল হয়ে ওঠে মানুষের নাড়ী, মানুষের মন। কিন্তু এই মেয়েটিকে অন্তশ্চক্ষে সত্যিই অবদানের মত পাওয়া সহজ

হলেও এর সঙ্গে মৌখিক আলাপ করা কঠিন—এমনই অন্তর্বিরোধ রয়ে গেছে সমাজের—মানুষের মনের লেনদেন বিনিময় বিশ্বাস ও ব্যাপ্তির দিক দিয়ে। এ মেয়েটির সঙ্গে কোনোদিন আর দেখা হবে না। মণিকা দেবীর চেয়ে মেয়েটি বরনীয়া নয় অবিশ্যি, অমলার চেয়ে সুন্দর নয়, পথে ঘাটে যে নারীর সঙ্গে দেখা হয় তাকেই ভালো লাগে, সে রকম আবেগ সাচ্ছল্যের একেবারে উল্টো অন্য এক পৃথিবীর মানুষ হয়েও এই মেয়েটিকে দেখে সুতীর্থের ভালো লেগেছে—সত্যিই, মনে হয়েছে এর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধে এলে জীবনের দু একটা আবছায়ার ঘোরে আলো এসে পড়ত। অন্য কারু কারু নানারকম সব খোড়লে, খিচে আলো ফেলছে হয়তো মেয়েটি। সেখান থেকে যুগপৎ সুতীর্থকেও আলো দেবে? সমাজসম্মত হবে না, সুসঙ্গত হবে না। সব মানুষের সঙ্গেই সব মানুষের কথা বলবার নিয়ম নেই। ভাবতে ভাবতে মেয়েটিকে ছেড়ে অন্য দিকে তাকাল সুতীর্থ। আরও ভিড়, ঠেলাঠেলির ভেতরে এমন জায়গায় গিয়ে পড়ল যে মেয়েটি বাসে আছে কি নেই বুঝবারও উপায় রইল না তার। মেয়েটি চোখের আড়ালে যেতেই চুম্বকের টান কমে গেল বুঝি তার; তা হলে বয়সই হয়েছে সুতীর্থের; মেয়েটির সম্পর্কে বিতর্কশক্তিও ঢিলে হয়ে যেতে লাগল সুতীর্থের মনে। এ মেয়েটি কিছু নয়, মনে হল তার; একে এখুনি ভুলে যাবে সে। চলাফেরার মত সহজ স্বাভাবিকতা ছাড়া আর যে কোথাও কিছু ছিল সে কথা মনেই পড়ে না। কে যেন পা মাড়িয়ে দিল, আরো চেপে মাড়িয়ে দিয়ে গেল সুতীর্থের বাঁ পায়ের গেড়টা; পাঁজরের ওপর কনুইটা এসে পড়ছে যেন কার বারবার; আস্তে সরিয়ে দিতে গেলে সে লোকটাই চোখ রাঙায়; পিছ থেকে যারা ঠেলছে সুতীর্থকে তারা মেয়েমানুষ নয়, কিন্তু সুতীর্থের সামনে যে কালো ঢ্যাঙা বদমায়েসটা সুট পরে দাঁড়িয়ে আছে (অফিস পাড়ার একজন খানদানী অফিসাব হবে) সুতীর্থ ছাড়া কেউই আর তাকে ঠেলছে না যেন এমনই ভাবে দাঁত কিড়মিড় করছে সে; লোকটার বিরাট পশ্চাদ্দেশে বলাৎকারজনিত উল্লাস দেওয়া ছাড়া সুতীর্থের আর কোনো কাজই নেই যেন পৃথিবীতে অনুভব করে কী ভীষণ মরীযা হয়ে উঠেছে লোকটা।

কয়েকজন লোক নেমে গেল, সুট পরা ধুমনো সামনের সিটে জায়গা পেল। বাসটা পার্ক স্ট্রিটের মোড়ের কাছাকাছি থামতেই মেয়ে দুটো নেমে গেল। দুপুর বেলা এই বাঙালী মেয়েরা এদিকে কোথায় যাচ্ছে? যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, বিদেশী সৈনিক ও নাবিকেরাও আজ সরে পড়েছে অনেকেই—হয়তো সকলেই—নিজেদের সাগর পারে। মন্বন্তব মিলিটারী ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রায় সব ব্যাপাবেই মৌতাত অনেকদিন হয় মিইয়ে গেছে। মেয়ে দুটো পার্ক স্ট্রিট দিয়ে হেঁটে চলছিল। তাদের চলে যাওয়ার স্ট্রিম লাইনের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল নিতান্ত জীবনমরণের কাজেব ব্যাপারেই চলেছে, কোনো নিরবলম্ব চারণায় নয়।

মেয়ে দুটির পরিত্যক্ত জায়গায় সুতীর্থ গিয়ে বসেছিল। বাস কণ্টিনেণ্টাল হোটেলের পাশে এসে দাঁড়াতেই—এইখানেই বাস প্রতিদিন দাঁড়ায় কিছুক্ষণের জন্যে—এই ভীষণ মানুষঠাসা গাড়ির ভেতর যাত্রী প্রবেশ করতে লাগল—একজন সাহেবও ঢুকল। সাহেবটি যুবক, বোধ হয় স্কচ—ছিপছিপে ছোট মানুষ—সুট টাই হ্যাট সবই রয়েছে, ক্লাইভ স্ট্রিটের মহাজন না ভেবে সুতীর্থ একে পাদ্রী বলে ঠিক করল তবুও—স্কটিশ চার্চ কলেজের প্রফেসর—একে সুতীর্থ আগেও দেখেছে যেন কোথাও। অধ্যাপক পাদ্রীর মত মুখে একটা সঙ্কুল স্বয়ংতুষ্টির ভাব এর সম্প্রতি কেমন যেন একটা নিষ্ফলতার ধরণ-ধারণে নিঃশব্দ হয়ে আছে। এর কারণ সুতীর্থের কাছে অস্পষ্ট মনে হল না। আজ সকালবেলার খবরের কাগজেই সে পড়েছিল যে বিলেতের শ্রমিক গভর্নমেন্ট জওহরলাল ও জিন্নাকে মেলাতে পারল না; কংগ্রেস ও লীগ যে পরস্পরের অমৃতত্ত্ব নিয়ে সমান্তরাল সেটা টের পেয়ে তারা থ হয়ে গেছে; রয়টার খবর দিয়েছে যে, দ্য ব্রিটিশ ফীল হেল্পলেস অ্যাণ্ড থরোলি ডিজঅ্যাপয়েন্টেড; সেই অন্তর্বেদী বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্যের সৎ সহজ সূচিমুখ নিয়ে হাজির এই সাহেব। কিছুক্ষণ আগেই এই বাসের ভেতরেই একটি মেয়ে ঈষৎ অভিনিবিষ্ট করে রেখেছিল সুতীর্থকে; এইবারে এই সাহেবের দুটো কটকটে রাঙা কান থিতোনো কেমন একটা বিমর্ষতায় বিভোর হয়ে আগেকার কথা একেবারেই

ভুলে গেল সুতীর্থ। হোটেল কন্টিনেন্টালের কিনার ঘেঁষে উঠেছে সাহেব—চলেছে ডালহৌসি স্কোয়ারে—অথচ কাজ তার স্কটিশ চার্চ কলেজে নয় কি?

'আপনাকে আমি এগজামিনার্স মিটিঙে দেখেছি হয়তো'—সাহেবকে বল্লে সুতীর্থ—' ইংরেজিতে।

'আমাকে!' সাহেবটি বিস্মিত হয়ে আপাদমস্তক সুতীর্থের দিকে তাকাল, বাংলায় কথা বল্লে, উচ্চারণেও অস্পষ্ট নয়—

'আপনি ভুল করেছেন—' সাহেব বল্লে।

এগজামিনার্স মিটিঙ কাকে বলে সুতীর্থকে জিজ্ঞেস করল সে।

'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির এগজামিনার্সদের মিটিঙ,' বল্লে সুতীর্থ।

'ওঃ, সেই কঠা' কানের নাকের গালের মুলো পীচ টোমাটোর মত রক্তাক্ততার কণিকাগুলোকে আস্তে মুচড়ে হাসিয়ে সাহেব বল্লে, 'আমার ভ্রাটা স্কটল্যাণ্ডের গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, আমি নই, আমার ভ্রাটার সঙ্গে হনেকে আমার আকৃটির ভুল করে ঠাকে।'

'আপনি কি স্কটিশচার্চ কলেজের অধ্যাপক নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা গ্ল্যাসগো ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার, বর্টমানে গ্ল্যাসগোটে আছেন।'

'আপনি কি ফাদার ফরদিঙ্গেল ফার্গুসন ম্যাক কার্কম্যান নন্?'

'আমি নই, আমার ভ্রাটা—'

সাহেব সুতীর্থকে অবিলম্বেই বল্লে, 'ফাদার ফার্গুসন নামে কোনো ফাদার কলিকাটায় আছে বা ছিল বলিয়া আমি জানি না। আমার ভ্রাটার নাম হোরেস উইলিয়ামসন, তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজের অধ্যাপক নন, তবে অধ্যাপক বটেন—'

'আপনি কি অধ্যাপক নন মিঃ উইলিয়ামসন?'

'আমি অধ্যাপক নহি, উইলিয়ামসন নহি, হামার নামে র‍্যামসে ম্যাকগ্রেগর।'

'ম্যাকগ্রেগর?' সুতীর্থ ঠিক বুঝে উঠতে না পেরে বল্লে, 'তা হলে আপনার ভাই কি করে উইলিয়ামসন হন?'

'বাই দ্য বাই, স্কটিশচার্চ কলেজ আজকাল কি রকম চলছে?'

'বেশ ভালোই।'

'আপনি অধ্যাপক আছেন?'

সুতীর্থ বল্লে, সে ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছে, সেখানেই কাজ করে।

'আমিও ক্লাইভ স্ট্রীটে যাচ্ছি। By the by, these professors—I mean British professors in Indian Colleges—'

'Are you one of them?'

'Of Course, not. I have already told you as much, There's is a peculiar lot—"

'The British feel helpless & thoroughly disappointed.'

'Yes, they do.'

'I hope you have seen today's paper.'

'I have. The British have done all that they had to do in the circumstances. They can't do any more.'

সহসা একটা প্রবল ধাক্কায় সমস্ত বাসটা ধেনে-কেটে খিড়িঙ্গেটড়ে উঠল কেন—বাঁই বাঁই, করে ঘুরে নেচে শূন্যে লাফিয়ে কী যে হয়ে গেল বুঝবার আগে সাহেবের সঙ্গে সুতীর্থের আলিঙ্গন সহমরণ শীৎকার দুর্দান্ত হামলার আকার ধারণ করল। টুপি ছিটকে পড়েছে—চশমা উড়ে গেছে—

ফুটন্ত গরম জলের ডেকচিটা যেন জীয়ন্ত হাঁস মুরগি হরিয়াল মরাল নিয়ে আট খেয়ে চীৎকার ক'রে উঠছে—একটা বাস হয়ে গেছে ডেকচিটা; ঝলসে পুড়ে সেদ্ধ হয়ে চিৎকার করে উঠছে মানুষের মাংস রক্ত কঙ্কাল সৃষ্টির অপর পিঠের বিরাট অন্ধকারে মিশে যেতে যেতে। সুতীর্থ গলা ছেড়ে রোল করে উঠল, 'পাকড়ো পাকড়ো—'

'পাকড়ো পাকড়ো, শালা শূয়ারকা বাচ্চাকে পাকড়ো'—ম্যাকগ্রেগর সাহেবের গলা কেমন যেন একটা বখাটের মত হাউ-মাউ করে উঠতে লাগল। মনে হচ্ছিল ম্যাগগ্রেগর ভয় যা পেয়েছে তার চেয়ে তামাশা অনুভব করছে ঢের বেশি; বাসে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে নিশ্চয়ই, কিন্তু ব্যাপারটাকে মোটামুটিভাবে বুঝে নেবার কোনো তাগিদ তার না থাকলেও জিনিসটাকে পুরোপুরিভাবেই স্বায়ত্ত করে ফেলেছে সে; কিন্তু তবুও নিজের মনের খেয়াল খুশিতেই যেন জিনিসটাকে নিয়ে শেয়াল বেড়াল হায়নার রগড়ে গর্জন করে উঠবার সাধ জেগেছে তাব স্কচ কেল্টিক হৃদয়ে।—

একটা দুর্বার দামাল খোকার মত ম্যাকগ্রেগরেব চিৎকার শুনতে শুনতে সুতীর্থ হতবুদ্ধি হয়ে ভাবছিল ঃ ব্রিটিশের স্বভাব তো এরকম নয়, এ রকম কি? এ লোকটা কি খাঁটি ব্রিটিশ? মজা করছে? বিপদের মুখে এমন ফুর্তিবজ্জাতি হয়তো স্পেনিশরা করে কিংবা ফরাসীবা—ব্রিটিশরা থাকে তো একটা দানবীয় নৈঃশব্দ্যে পাথরের সানুর মতন উঁচিয়ে।

একটা মিলিটারি লরীর সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল সুতীর্থদের বাসটার। দুজন লোক মারা গেছে, জখম হয়েছে কজন এখনও তার হিসেব পাওয়া যায়নি। আর্তের মতন চিৎকার করে উঠেছে অনেকেই; কাঁদছে; বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে—ভয়ে না বিভীষিকার অভিজ্ঞতায়, না হাড়গোড় হৃদয়, ভেঙে গেছে বলে—বোঝা কঠিন।

ম্যাকগ্রেগরের কিছু হয় নি—সুতীর্থেরও না। সাহেব সুতীর্থের বগলের ভেতব তার নিজের হাত ঠেলে চালিয়ে দিয়ে বল্লে, 'চলো—'

'কোথায়?'

'হেঁটে যাওয়া যাক। বাস ঠেকে হামরা খি করে বাহিরে এলাম—' এডের মট আমরাও টো মরে যেটে পারটাম—'

'দুজন মরেছে শুধু, মরেছে কিনা ডাক্তাব না এলে বোঝা যাবে না। আপনাব হাড মাস কার্টিলেজ সব ঠিক আছে তো ম্যাগগ্রেগব?'

'ঠিক আছে?'

'ডুজন প্রাণী মরে গেছে আই বিলিভ'—ম্যাকগ্রেগর 'মৃত' লোক দুটিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বল্লে, 'ভয়ে—হার্ট খারাপ ছিল—শক—মে বি ব্রেণ হেমারেজ- -'

'এ গাড়িতো কোনো মেয়ে ছিল না?'

'না।'

'কোনো শিশুও নেই?'

'থ্যাঙ্ক গড, নো।'

'আগুন জ্বলে উঠেছে!'

'এখনি ফায়ার ব্রিগেড আসবে।'

'এইসব লোকদের কি হবে?'

'নন অব আওয়ার কনসার্ন—রেডক্রশ টেকস আপ—'

সুতীর্থকে তবুও অনর্থক এইসব মড়া আধমড়াদের সেবা শুশ্রূষা সঙ্গতির একটা বিমূঢ় প্রয়াসের ভেতর জড়িয়ে পড়তে দেখে ম্যাকগ্রেগর সাহেব চলে গেল; যাবার আগে সুতীর্থকে নিজের কার্ড দিয়ে গেল, সেই ঠিকানায় যে কোনোদিন—সনডে একসেপটেড—সুতীর্থের সঙ্গে রাত আটটার পর সে দেখা করতে রাজি।

অতএব আজ আর অফিসে যাওয়া হল না। পরদিন তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে অফিসে গিয়ে নিজের টেবিলে বসতেই ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থের ঘরে ঢুকে বল্লে, 'আপনি আজ এসেছেন দেখছি।'

'ঠিক সময়েই এসেছি; না আজও দেরি হয়ে গেল? বসুন।'

'বসব না আমি।'

'সিগারেট?'

'সিগারেট সাধছেন আপনি আমাকে, বেয়াদবী হচ্ছে।'

'আপনাকে দাঁড় করিয়ে রেখে বেকুবি হচ্ছে আমার মল্লিক সাহেব।'

'তার মানে?'

'এ ঘরে এত চেয়ার থাকতে আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর চারদিকে তাকিয়ে একখানা চেয়ারও দেখল না, বসবে না বটে সে, দাঁড়িয়ে থাকবে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যাঁচ কষবে আর বাগড়া দেবে ব্যাটাচ্ছেলে—কিন্তু তবুও—চেয়ার নেই কেন?

সুতীর্থ উপলব্ধি করে কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল।

'বেছে একটা ছারপোকা টারপোকা নেই এরকম একটা চেয়ার নিয়েসো তো হে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন এ ঘরে সুতীর্থবাবু?'

'আনছে মনোমোহন।'

'চেয়ার নেই কেন আট দশটা এই ঘরে।' হাঁকড়ে উঠল মল্লিক।

'আনছে মনোমোহন।'

'মনোমোহন কটা আনছে?'

'কটা চাই আপনার?'

'কটা চাই আমার? আমার চাই কটা?' মল্লিক টেবিলের ওপর দমাদম ঘুষি মারতে মারতে বল্লে, 'আমার কটা চাই? এটা আপনার অফিস? আপনি দিচ্ছেন?'

'অফিস আপনার। আপনি আমাকে দিচ্ছেন।'

'পথে আসুন। তাহলে কী করে আপনি আমাকে চেয়ার দিচ্ছেন?'

'আমি দিলুম কোথায় মনোমোহন দিচ্ছে।'

'মনোমোহন দিচ্ছে?' কেদোর মত চোকে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে মল্লিক দাঁতে দাঁত ঘষার ভাব দেখিয়ে বল্লে, 'আর আপনি কি করছেন?'

'আমি আপনাকে বসতে বলেছি।'

'আমাকে বসতে? আপনি?'

'এই যে মনোমোহন চেয়ার এনেছে। বসুন। খুব বেশি ছারপোকা আছে এই চেয়ারে মনোমোহন?'

'হুজুর না—' গালে হাত দিয়ে মাথা কাৎ করে হেসে ভেঙে পড়ল মনোমোহন।

সুতীর্থ বল্লে, 'মনোমোহন তুমি যাও, অত হেসো না তুমি। মনোমোহন। কি আছে হাসবার? আমরা বড্ড গলদঘর্ম হচ্ছি। যাও যাও যাও—'

মনোমোহন চলে গেলে সুতীর্থ বল্লে, 'দাঁড়িয়েই তো রইলেন মল্লিক সাহেব—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করব আমি।'

'কেন?'

'এটা আমার অফিস, মুখ সামলে কথা বলবেন সুতীর্থবাবু—'

'কি বলেছি আমি?'

'মুখ সামলে কথা বলতে বলেছি আপনাকে।'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবার—'

'একথা এখন থাক, ওটা আমার জিনিস—'

'মনোমোহনকে বরখাস্ত করবেন, তা করুন, কাল আবার তাকে কাজে বহাল করে দিলেই হবে।'

'কে করবে?'

'আপনার অফিস, আপনিই করবেন। বসুন।'

ঘরের ভেতর একবার পায়চারি করে নিয়ে সুতীর্থের টেবিল থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বল্লে, 'যাকে আমার অফিস থেকে তাড়িয়ে দিই, তার কান কেটে তাড়িয়ে দিই। সে দুকান কাটাকে আবার কাজে বহাল করব আমি? কে দু কানকাটা আছে এই অফিসে মনোমোহনের সঙ্গে এক জোয়ালে না যুতে দিলে পেট ফুলে ওঠে?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়ে দেবেন?'

'ওর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ না করলে যার পেট ফুলে ওঠে তার কটা কানকাটা সুতীর্থবাবু?'

'দুটো কান।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর পকেট থেকে চুরুট বার করে জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'আর তার যদি গণেশের মত ছটা মুখ থাকত, তাহলে কটা কান কাটা হত সুতীর্থবাবু?'

'বারোটা। রাবণের মত দশটা মুখ থাকত যদি তার তাহলে কটা কান কাটা হত?'

সুতীর্থের এ প্রশ্ন যেন বাতাসে উড়ে গেছে কানে পৌঁছয়নি এমনিভাবে চুরুট টানতে টানতে মনোমোহনের চেয়ারটার কাছে এসে দাঁড়াল মল্লিক।

'এটা আমার অফিস, আমি যাকে খুশি রাখব, তাড়াব, যখন খুশি বসব, দাঁড়িয়ে থাকব। এসব বিষয়ে কারু কোনো হাত দেবার অধিকার নেই আমার অফিসে।'

'আপনি তাহলে দাঁড়িয়েই থাকবেন?'

'আমার খুশি আমি দাঁড়াব। আমার যখন নিজের মর্জি তখন বসব। আপনি আমাকে বসতে বলতে পারেন না তো।'

'বসুন।'

'সুতীর্থবাবু।'

'আজ্ঞে—'

'কি বল্লেন আপনি এইমাত্র?'

'মনোমোহনকে তাড়িয়েই দেবেন? তাই জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'আমাকে বসতে বলছিলেন না?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

মল্লিক কব্জি ঘুরিয়ে হাত ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল। চুরুট টানছিল, চুরুটের মুখে পুরু ছাই জমেছে সেটাকে টোকা মেরে ফেলে দিয়ে ফেটে পড়ে বল্ল, 'ভদ্রতা করে আপনাকে আমি আপনি বলি। আপনি আমার অফিসে আমার তাঁবে কাজ করেন। আমার তাঁবেদার—আমার অফিসের গোলাম আপনি।' বলতে বলতে খানিকটা রক্তের চাপ বেড়ে যাচ্ছে অনুভব করে, আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয় বুঝতে পেরে মল্লিক সংক্ষেপে সেরে দিয়ে বল্ল, 'সাব-অর্ডিনেট আপনি, মুখ ছোট আপনার, গালবাদ্যি বাজবে না। অথচ সেটাই বাজাতে চান আপনি। বড্ড বদ রোগ আপনার। বিদ্বান মানুষ হতে পারেন, কিন্তু আমার অফিসের গোলাম ছাড়া কিছু নন তো আপনি। বিদ্যে ধুয়ে বাইরে গিয়ে জল খাবেন, এ অফিসে নয়—'

সুতীর্থ নানারকম ফাইল নিয়ে বসেছিল। ফাইল নাড়ছে, চাড়ছে, লিখছে, ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা তবুও তার কানে যাচ্ছিল, কিছু বলতে গেল না সে। মল্লিক চুরুট টানতে টানতে পায়চারি

করছিল ঘরের ভেতর; কি যেন বলবে বলবে ভাবছিল, কিন্তু বলা হয়ে উঠছিল না তার। চিঠি লিখতে লিখতে মুখ তুলে তাকিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'এই যে মিঃ মল্লিক, আপনি আছেন এখনও, আমি ভেবেছিলুম চলে গেছেন—'

'আমার সামনে আপনি সিগারেট খাবেন না সুতীর্থবাবু।'

ছাইদানিতে ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সুতীর্থ বল্লে 'এই তো—হয়ে এল।'

'দেখছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি?'

'দাঁড়িয়ে আছেন, জীউকে কেন কষ্ট দিচ্ছেন মিঃ মল্লিক। বসুন।'

'সিগারেটটা ফেলে দিন।'

'দিতে পারি ফেলে. কিন্তু ফেলে দেওয়ার চেয়ে মনোমোহনকে দিলেই তো ভালো হয়। আস্ত সিগাবেটটা ফেলে দেব?'

'আপনার মুখের সিগারেট খাবে কেন মনোমোহন?'

'খাবে না মনোমোহন? মনোমোহন যদি না খায় তাহলে আর কাউকে তো দেখছি, না, কে খাবে আমার মুখের সিগারেট আমার নিজের মুখ ছাড়া?'

সুতীর্থ কথাব ফাঁকে ফাঁকে—হুশ হুশ করে নয়, বেশ আস্তে, আরাম করে পেটের ভেতরে শিবের জটায় ঘুরিয়ে এনে নাকমুখ দিয়ে জোরে ধোঁয়া বার করতে করতে সিগারেট টানছিল। সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে ফেলে দেবার সময এসে পড়েছে।

'আসুন, চলুন—'

'কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'আমার ঘরে; কথা আছে।'

সুতীর্থ গড়িমসি করে বল্লে 'বেয়ারা না পাঠিয়ে নিজে এসেই আমাকে তলব করছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, আপনাব এই —'

'আসুন, কথা বলবেন না।'

'আপনি আপনার খাস কামরায় যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'যান তাহলে—' সুতীর্থ নিজের কাগজপত্র নিয়ে বসল।

নয়

সুতীর্থ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'বাজল সাড়ে এগারোটা। যান আপনার ঘরে গিয়ে অবসর মত একজন বেয়ারা পাঠিয়ে দেবেন আড়াইটার পর—'

'আড়াইটার পর?' বিজনহরির চোখে আগুন ঠিকরে উঠল, নিজেকে তবু সামলে নিল সে, চেয়ারটা নিয়ে বসে পড়ে বললে, 'এটা কি তোমার শ্বশুরবাড়ি সুতীর্থ?'

সুতীর্থ কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, 'আমাকে তুমি বলে ডাকে আমার বড় সম্বন্ধী—বেয়াইও তুমি বলে—বেয়ানও—আমার কানে খুব মিষ্টি লাগে। কিন্তু পারবেন বেয়ানের সঙ্গে পাল্লা দিতে?'

মুখ বিষণ্ন হয়ে উঠল মল্লিকের।

'এই তো আমাকে আপনি বলছিলেন—'

'বিজনহরিবাবু, আপনাকে আমি তো আপনি বলছি।'

'আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

সুতীর্থ টেলিফোন ডাইরেক্টরিটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে বললে—'সকলেই সকলকে আপনি বললে ঠিক হয়, কিংবা সকলেই সকলকে তুমি। তুমি-আপনির পার্থক্যটা রাখা ঠিক নয়। তুমি আমাকে তুমি বলতে পার মল্লিক, কিংবা আপনি আমাকে আপনি বলতে পারেন। মনোমোহন তোমাকে তুমি বলতে পারে বিজনবাবু, কিংবা মনোমোহনকে আপনি বলতে পারেন আপনি। আমার মনে হয় আপনি বাদ দিয়ে স্রেফ তুমি চালানোই ভালো হয়, আপ পিজিয়ের দিন চলে গেছে—তুমি এসে পড়েছে।'

ডাইরেক্টরির একটা পৃষ্ঠায় এসে থেমে সুতীর্থ বললে, 'আমি অবশ্য আপনাকে আপনিই বলব মিঃ মল্লিক, তবে মাঝে মাঝে তুমি এসে পড়বে—যেমন এই একটু আগে এসে পড়েছিল তোমার। বাস্তবিক তুমির দিন এসে পড়েছে, তাই মনে হয় না তোমার?'

'ছাগল দিয়ে যব মাড়ানো হচ্ছে, এই তো মনে হচ্ছে আমার—'

'রামছাগল খাবে বলে গোল্লায় যাচ্ছে যব।'

'গোল্লায় যাচ্ছে যব?'

'হুঁ।'

'জবারির কাঁধে চড়ে গোল্লায় গিয়ে উঠছে যব?'

'জবারির কাঁধে?'

'সব রকম হারামজাদারা জড়ো হয় যেখানে সেখানেই জাল পেতে বসেছে জবারি।'

'জাল পেতে বসে?'

মিঃ মল্লিক চুরুট টেনে যাচ্ছিল, সুতীর্থ কি বলছে তা সে উপলব্ধি করেছে। মেজাজ গরম করতে গেলে, একটা কিছু হয়েই যাবে।—এক্ষুনি এই মুহূর্তেই—কিন্তু ছুঁচোবাজির মতনও মেজাজ দেখাতে গেল না মল্লিক।

চুরুটে আরো দু-চারটে টান দিয়ে বল্লে, 'অফিসের কাজে আপনার হাত আছে। বেশ সাফাই আছে মনে করেন আপনি। আপনাকে পেয়ে সুবিধা হয়েছে অফিসের, মাথায় ঢুকেছে আপনার। এ বিষয়ে পরে কথা হবে। কিন্তু অফিসের বাইরে আপনার কথা নিয়ে বলাবলি করে ওরা। বলে চরিত্র নেই।'

সুতীর্থ একটা ডেমি অফিসিয়াল চিঠি ফেঁদে বসেছিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে না তাকিয়ে বল্লে, 'ওরা কারা?'

প্যাডের থেকে একটা পেনসিল তুলে নিয়ে দু-চারবার খট খট করে টেবিলটা ঠুকে মল্লিক চুপ করে রইল, বল্লে, না কিছু।

চিঠিটা খামে ভরতে ভরতে সুতীর্থ বল্লে, 'ওরা মানে ওরা। ওরা আর কেউ নয়। আমি অফিসের কাজে গাফিলতি করি বলে আমার চরিত্র খারাপ বলে ওরা?'

'অফিসের কাজে আপনি কি খেসারত করছেন তার মীমাংসা আমার ঘরে গিয়ে হবে। ওরা বলে যে আপনার কারেকটর খারাপ।'

'মদ আমি কিনে খাই না, কোনোদিন খাইনি, তবে স্নব নিউজ এজেন্সির ধরণী মজুমদার, উনি, মতিস্থির, মতামত কাগজেরও সম্পাদক, মাঝে মাঝে আমাকে বিলিতি হোটেলে নেমন্তন্ন করে দেখিয়ে দেন কি করে পাঁচ পাগড়ী মদ মেরে মাথা ঠিক রাখতে হয়। ওরকম মাথা না হলে খোকা খুকুর কাঁথার নীচে ঠেসে দেবার মত এরকম সম্পাদকীয় পেতাম না আমরা।'

সুতীর্থ আর একটা ডেমি-অফিসিয়াল চিঠি শুরু করতে করতে বল্লে, 'রকম হচ্ছে—পাঁচটে সাদা-গেরুয়া-বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবি পাগড়ী ভরা মদ থাকবে মজুমদার বান পারতেই পাগড়ী শুদ্ধ মদ পেটের ভিতর চলে যাবে মজুমদার কিন্তু তক্ষুনি স্বর্গদ্বার দিয়ে বেরিয়ে আবার টেবিলে এসে হাজির হবে পাঁচটে কড়কড়ে পাগড়ী—আরো পাঁচ পাঁইট মদের জন্য। মদে ভর্তি হয়ে মুখের ফাঁদল

দিয়ে ঢুকে আবার বেরিয়ে আসবে স্বর্গদ্বার দিয়ে। এই রকম খেলা চলবে সারাদিন—কচ দেবযানীর খেলা।'

'মতামতের ধরণীবাবু মদ খান তা আমি জানতুম, কিন্তু মাতলামো করেন না।'

'না, বলেছিই তো আমি কচের মত ব্রহ্মচারী।'

একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'ধরণীবাবুর মতন লোকের কাছ থেকে আমরা মনুষ্যত্ব চাই, সত্যি উনি অমানুষ নন, অত মদ মানুষ ছাড়া কেউ খেতে পারে না।'

'কেন, ভামকে মদ খাওয়াতে দেখলে সঙ্গে মদ ছাড়া আর কিছু খাবে না। মাছ ফেলে মদ খাবে।'

'ভাম কি?'

'ভাম, ভোঁদড়, জানেন না আপনি?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলে মদ খাবে ভাম?'

'তবে কি?'

'মাছ ফেলেও?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নোলা ডুবিয়ে।'

'ভাম, বেড়াল খাবে ওরকম? তাহলে ধরণী আর খেলেন কি? কিন্তু'—সিগারেটে দু-চারটে টান দিয়ে সুতীর্থ বল্লে—'আছে একদল মেয়েরা মজুমদারকেই পুরুষ মানুষ বলে মনে কর ভাম-বেড়ালকে নয়।'

'ভাম বেড়ালকে তো দেখেনি সে সব মেয়েরা, শুধু মজুমদারকে দেখেছে যে গো।'

ম্যানেজিং ডিরেকটর খানিকটা দূরত্বের ব্যবধান রেখে চুরুট টানছিল, তেমনি টেনে যেতে লাগল; সুতীর্থের ঘরে ঢুকবার অগে দু-চার বোতল হয়ত নিড়িয়ে এসেছে—রসটা কাজে দিচ্ছে এখন।

ভামের কথা, মদের কথা, মাছের মেয়ে পুরুষ মানুষের কথা বেশ রসিয়ে বলছে বিজনহরি।

'বাংলা দেশে আজকাল বড় মানুষ নেই।'

'নেই।'

'সাহিত্যেও নেই হয়তো।'

'সাহিত্য তো পাত নাড়া, জীবনের সঙ্গে কি সম্পর্ক ওর, কি করে থাকবে সাহিত্য 'ঝি, ঠাকুরঝি, বরফ চাই বাবু বাড়ীউলি, বাসড়াদের পাত নাড়া ছাড়া আর কিছু?'

ম্যানেজিং ডিবেকটর বল্লে, 'আপনি বড় খেই হারিয়ে ফেলেন সুতীর্থবাবু। কথা হচ্ছিল চরিত্র নিয়ে, আপনার ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে। সাহিত্য, মেয়েমানুষ, মদ, মজুমদারের কথা এল কোত্থেকে?'

মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বল্লে, 'মদ খাওয়া কাকে বলে জানেন?'

'আমি মজুমদারের সঙ্গে হোটেলে হোটেলে ফিরি। জানি না।'

'হোটেলবয় আপনি। ও কোন ছার। আমার সঙ্গে একদিন আসবেন।'

'আচ্ছা যাব।'

সুতীর্থ ফোন করবার জন্যে হাত বাড়াতেই তার হাতটা খপ করে ধরে ফেলে ঘুরিয়ে দিয়ে মল্লিক বল্লে, 'কোথায় ফোন হবে।'

'হনুমানপ্রসাদের কাছে।'

'কিসের জন্যে?'

'সেই হুণ্ডিটা সম্বন্ধে।'

'আরো কোথাও হবে?'

'হ্যাঁ শ-ওয়ালেসে।'

'কেন?'

'সেই পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নিয়ে।'

'কি বলে ওরা?'

সুতীর্থ ভ্রূকুটি করে বল্লে, 'ফোন করে বিশেষ কিছু হবে না অবিশ্যি। আমার নিজেরই একবার যেতে হবে।'

'দরকার নেই।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল, চেয়ারের হাতল ধরে ঝুঁকে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেকটরের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'কেন?'

'কদিন অফিস কামাই করা হয়েছে?'

'চারদিন।'

'আমাকে জানানো হয়েছিল?'

'সময় পাইনি।'

'সময় পাইনি—কাজে ফাঁকি দেবার সময় আছে গোলামের মালিককে কৈফিয়ৎ দেবার সময় নেই?'

'হাতে অনেক কাজ আমার মিঃ মল্লিক, সময় নষ্ট করতে পারি না।'

সুতীর্থ কাজে মন দিতে দিতে বল্লে, 'যে গরু সত্যিই দুধ দেয়, ওস্তাদ গয়লাকে চাঁট মারে না সে, কিন্তু আমাকে মারছে কেন?'

'কে গরু?'

'দুধ শুকিয়ে যাচ্ছে গরুটার, ফুকোর ব্যবস্থা হচ্ছে।'

'কার গরু? কোথায় গরু? কে—গরু কে?'

'এই অফিসটাই।'

মল্লিক বাঘ হলে সুতীর্থকে চিবিয়ে ছিবড়ে করে ফেলত ডান বাঁয়ে না তাকিয়ে এই মুহূর্তেই। অত ব্লাড প্রেসার না থাকলে নির্ঘাৎ বাঘ হয়ে যেত সে। কিন্তু ব্লাড প্রেসার খুব বেড়ে গেছে—রক্ত তো নয়, মৃত্যুরক্ত চড়ে গেছে মাথায়। মল্লিক নিজেকে ঠাণ্ডা করে নিতে গেল—

'ম্যানেজিং ডিরেকটরই তো অফিস?' মল্লিক বল্লে, 'আমিই তো অফিস। অফিস আমি। অফিসটা গরু? ফুকো দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? গরুটা যে এঁড়ে বাছুর বিইয়েছিল, সেই বুঝি ফুকো দেবে তার মাকে? এঁড়ে বাছুর কি ধর্মের ষাঁড় হয় কখনও, সুতীর্থবাবু, না বলদ হয়ে ঘানিগাছে ঘোরে?'

সুতীর্থ অফিসের প্যাডে দু'পাতা লিখে শেষ করেছে, আরো লিখছিল, একটা জরুরী অফিসী চিঠি? লিখে টাইপ করিয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে অবিলম্বেই—তিন কপি—তিন ঠিকানায়।

লিখতে লিখতে সুতীর্থ বল্লে, 'আবার চার ঠ্যাঙে দাঁড় করাতে চাই আমি গরুটাকে। ফুকো-টুকো দিয়ে নয়—আলো, বাতাস, ঘাস, ভালো জাবনা খেয়ে সুস্থ হয়ে উঠুক। অফিসটাকে দাঁড় করাব আমি।'

সুতীর্থ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে ডানদিকের র্যাকের থেকে একটা ব্লু-বুক নিয়ে এল।

'আমিও দাঁড় করাব আপনাকে। কার্ত্তিক মাসের কুকুরের মত দু ঠ্যাঙে দাঁড় করাব। কাল থেকে এ অফিসে আসতে হবে না আর; আজই চলে যেতে পারেন—ইচ্ছে হলে—এক্ষুনি।'

'তাই আজ্ঞা হোক—' সুতীর্থ চেয়ারে ফিরে এসে ফাইল নাড়তে-নাড়তে বল্লে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই উঠে দাঁড়াল সে। কলমটা পকেটে নিয়ে ম্যাকিনটোসটা কাঁধের ওপর ফেলে, ঘাড় কাৎ করে বিনে বাক্যব্যয়ে সে চলে যাচ্ছিল।

'ব্যাপারটা বড় রাজকীয় হচ্ছে হে', মল্লিক বল্লে।

সুতীর্থকে কোনো উত্তর না দিয়ে চলে যেতে দেখে মল্লিক গলা খাঁকরে বল্লে 'সুতীর্থবাবু,'

'এপার গঙ্গা, ওপার গঙ্গা—মধ্যিখানে চর—' সুতীর্থ এগিয়ে চলছিল।

'চাকরির হল কি আপনার?'

'কাল আসব একবার বিজনহরিবাবু।'

'কাল কেন, আজ কি হল? চাকরি করছেন, কাজ করবেন না? বাকি পড়ে আছে দশ বিশজন ইন চার্জের কাজ—একা সামলাতে হবে আপনাকে—দেখুন তো ফাইলের ডাঁই। পাওয়ার অব অ্যাটর্নির ব্যাপার আমি নিজে গিয়েই ঠিক করেছিলাম। আসুন।'

'না, আজ আর নয়।'

'আজ নয়? আজ কি সাঁইবাবা কাজ করে দিয়ে যাবে? এটা কি চীনে চন্নুর গুল্লিচা বাড়ি নাকি সুতীর্থবাবু, কমার্শিয়াল ফার্ম নয়? আসুন, সব ঠিক করে দিচ্ছি—একটা বোতল চাই আপনার?'

'একটায় হবে আপনার?'

'কেন? আছে আমার কাছে। অফিসেই আছে।'

'হুইস্কি??'

'খুব পুরোনো স্কচ।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'না—আমি মাঝে মাঝে একটু মোসুম্বীর রস খাই, ড্রাই জিন দিয়ে।'

'ভিমটো খান আপনি—খোকা আমার। আসুন, আমাতে আপনাতে দোর বন্ধ করে—এই ঘরে বসে।'

'আপনি খান,' সুতীর্থ সিগারেটের ছাই ঝেড়ে বল্লে।

'আমি আন্দাজ মত মিশিয়ে দিচ্ছি আপনাকে।'

মল্লিক কলিং বেল টিপতেই বেয়ারা এল, হুজুরকে সেলাম করতেই তিনি বললেন, 'দু গ্লাস জল চাই।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল। মল্লিক ডেকে বল্লে, 'দুটো সোডাই বরং নিয়ে এসো।'

বেয়ারা চলে যাচ্ছিল, সুতীর্থ বল্লে, 'সোডা নয়, জল দু গ্লাস।'

দুটো সোডা এনেই হাজির করল বেয়ারা, দরকার মত গ্লাস, পেগ।

'ছিপি খুলব?'

'না, যাও।'

লোকটা চলে গেলে মল্লিক বলে, 'কাজ ঢের আছে, কিন্তু আগে মৌতাতটা হয়ে নিক।'

'কাজ হোক তবে, মৌতাতটা থাক।'

'আগে মৌতাত হয়ে নিক।'

'তাহলে মৌতাত হোক, কাজ হবে না।'

'জোর মৌতাত হবে, জোর কাজ হবে।'

'জোর মৌতাত?'

'দশ বারো পেগ হবে—বছর চোদ্দ আগে বড়দিনের সময় কিনেছিলাম বোতলগুলো, অফিসেই আছে সেই উনিশশো বত্রিশ থেকে। বেশ পেকে উঠেছে এখন।'

'বেশ, মৌতাত হোক তাহলে' সুতীর্থ বল্লে, 'কাজ চুলোয় থাক। দুটো ষাঁৎ সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই, আমি একটা দিক দেখতে পারি। অনেক কাজ বাকি পড়ে আছে —আপনি একটু সরে যাবেন বিজনহরিবাবু, আমাকে কাজ করতে দেবেন?'

সুতীর্থ নিজেই চেয়ারে এসে বসে বেল টিপতেই মনোমোহন এল।

'এই যে মনোমোহন এই সোডার বোতলগুলো নিয়ে যাও তো।' সুতীর্থ বল্লে।

'তুমি এখান থেকে চলে যাও মনোমোহন, সোডার বোতলগুলো এই টেবিলেই থাকবে।'

মনোমোহন চলে গেল। সুতীর্থ কাগজ পত্র টেনে নিয়ে গুছিয়ে বসতে গিয়ে টের পেল কাজে মন নেই তার, কোনদিকেই মনে নেই, কিছুই ভালো লাগছে না। যখন অফিসে এসে ঢুকেছিল আজ সাড়ে দশটার সময়, তখন তো, এরকম ছিল না, খুব বিশেষ উৎসাহ নিয়ে কাজে বসেছিল আজ, সন্ধ্যে অব্দি—দরকার হলে বেশী রাত অব্দি—রুদ্ধশ্বাসে, একটানা কাজ করবার সংকল্প নিয়ে এসেছিল সে—করত সে—পারত সে—অনেক অফিসি দায়িত্বের বোঝা লাঘব করবার বিশেষ প্রয়োজনও ছিল তার। কিন্তু হল না কিছু। সুতীর্থ কলমটার ক্লিপ বুকপকেটে আটকে নিয়ে, কাগজপত্র দেরাজে ফেলে দিয়ে চাবি মেরে উঠে দাঁড়াল।

'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'যাচ্ছি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটিতে—'

'অফিসের কাজে?'

'তারপর পাবলিক লাইব্রেরিতে যাব।'

'এই অফিসের কাজে?'

'আমার মনপবনের অফিস করবার সময় হয়ে গেছে, বিজনহরিবাবু,' ম্যাকিনটোসটা কাঁধে চড়িয়ে সুতীর্থ বললে, 'চলি।'

'আজ আর কাজ হবে না?'

সুতীর্থ দেরাজ খুলে দরকারী প্রাইভেট চিঠিপত্রগুলো পকেটে ফেলে দেরাজ বন্ধ করে দিল।

'এত জিনিস যে বাকি পড়ে রইল—'

'সব কাল এসে ঠিক করে দিয়ে যাব।'

'আপনি মনে করেছেন আপনাকে না হলে আমাদের চলে না।' মাঝপথে টায়ার ফাটিয়ে দুরন্ত ট্রাকের মত ফেটে পড়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বলল।

সুতীর্থ কোনো কথা না বলে, কোনো দিকে না তাকিয়ে ঘাড় কাৎ করে চলে যাচ্ছিল। সোডার বোতল আর একটু হলেই তার মাথার ওপর পড়ত গিয়ে। কিন্তু সেটা—দ্বিতীয় বোতলটাও দেওয়ালের ওপর এসে ভেঙে চুরচুর হয়ে পড়ল। সুতীর্থ চলতে চলতে থেমে দাঁড়িয়েছিল। ফিরে এসে নিজের চেয়ারে বসে বললে, 'এইবারে আমি কাজ শুরু করতে পারি মল্লিক।'

'আপনি কি মনে করেছেন আপনাকে ছাড়া এ ফার্মের কোনো গতি নেই?'

'তা আছে। বোতলভাঙা কাঁচ সরিয়ে নে রে মনোমোহন—'

সুতীর্থ বেল না টিপে পাড়াগাঁর নদীর এপার থেকে ওপারের পথিক মনোমোহনকে ডাকল যেন, কেমন একটা আশ্চর্য হুঙ্কার তুলে। সমস্ত অফিস স্তম্ভিত হয়ে শুনল।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর লর্ড কোটের দু পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল। কি একটা কথা বলতে গিয়ে থেমে—আস্তে আস্তে বের হয়ে গেল।

দশ

যুদ্ধের বাজারে বিরূপাক্ষ বেশ লাভ করেছিল। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে সকলেই যখন সতর্ক হয়ে গেল, তখন তার মাথায় আরো বেশি লাভের খেয়াল চেপে বসতে সে ইদানীং লোকসান দিয়ে যাচ্ছিল। লোকসানের হার খুব বেশি নয়—নিয়মিত লোকসানও নয়। তবুও প্রায় সব রকম ব্যবসায়েই তার মন্দা পড়েছিল। কলকাতায় ও আশেপাশে বেশ কিছু জমি কিনে ফেলেছে সে। বালিগঞ্জে তার একটা বাড়ি, লেকের কাছাকাছি আর একটা; দুটোই দোতলা। টালিগঞ্জের বাড়িটা বড় বেশ সুরূপা, ভারি স্নিগ্ধ, অনেকখানি জায়গা নিয়ে; বাড়িটা একতলাই, কিন্তু ছাদে যে ঘরটা আছে সেটাকে চিলে কোঠা

বলা যায় না। চমৎকার কারু কারসাজির কামরা সেটা। পরিসরেও খুব বড়, সোফাসেটির অভাব নেই। একটা খাকী রং-এর সোফায় গা এলিয়ে বসেছিল বিরুপাক্ষ। হাত পাঁচেক দূরে একটা কমলা রং-এর গদীআলা কোচে ছিল জয়তী।

জয়তী বললে, 'আমার এ প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছ তুমি, ভালো করে জিজ্ঞেসও করিনি কোনোদিন,—ইস্কুলেই কি তোমার বিদ্যে শেষ, কলেজে ঢোকনি কোনদিন?'

'কি ক্ষতি হয়েছে না ঢুকে?'

'না, ক্ষতি আর কি। যারা লেখাপড়া শিখেছে তারা দাঁতে খড়কে দিয়ে তোমার পা চেটে বেড়াচ্ছে কমার্শিয়াল ফার্মে সিধুবার জন্যে। কিন্তু তবুও তোমার নিজেরও একটা ডিগ্রি থাকলে ভালো হত।'

'আমার নেই, আমার ছেলের থাকবে।' সামনের একটা গদীর ওপর পা চড়িয়ে দিয়ে ডাহা আরামে বললে বিরুপাক্ষ।

'তুমি তো ইউনিভার্সিটির সামনে থুবড়ি খেয়ে পড়লে, কলেজে যেতে পারলে না ম্যাট্রিক পাশ করলে না—'

'কিন্তু আমি তো এম এ এফ পাশ করেছি জয়তী।'

'এম এ এফ কি? আমেরিকান ডিগ্রি? যে টাকা দেয় তাকেই দেবে—সেই?'

'না, এদেশেরই ডিগ্রি?'

'এ দেশেরই? কি এম এ এফ?'

'ম্যাট্রিক অ্যাপিয়ার্ড বাট ফেইলড!' বললে বিরুপাক্ষ।

শুনে জয়তীর হেসে উঠবার কথা, কিন্তু হাসল বিরুপাক্ষ নিজেই, জয়তী অনড় হয়ে রইল।

বিরপাক্ষ বললে—'ম্যাট্রিক দিইনি আমি, কিন্তু উঠেছিলুম বেশ খানিকটা দূর—ক্লাস এইট অব্দি। তবে, ইংরেজি খবরের কাগজ ফি রোজ পড়ে বি-এ এম-এর ইংরেজি আমার রপ্ত হয়ে গেছে।'

'সেই জন্যেই তো এত টাকা করেছ। কত লাখ টাকা হল?'

'এই পঁচিশ লাখ, লেবেনচুষ হল আর কি—হি-হি-হি হিহি—'

'তা হল বটে। তা হল।'

জয়তী টাকার মর্ম জানে। কিন্তু বিরূপাক্ষ যে প্রায়ই belongs to বা belong to না বলে belonged to বলে, বিরূপাক্ষের সেই ব্যাকরণ সম্বন্ধে নতুন কিছু বলবার আছে কিনা তা জানতে চাইল।

বিরূপাক্ষের মনে কোনো খটকা ছিল না। ইংরেজি যা সে বলে তা বলে বটে এমনই একটা সেয়ানা মাহাত্ম্যে জয়তীর দিকে তাকাল সে, 'is belonged সিঙ্গুলার হলে যেমন—This house is belonged to me—প্লুরাল হলে are—'

'আমি ভাবছি যারা লেখাপড়া শেখে তারা প্রামাণিকও বটে কিন্তু অসারও বটে। বানান ঠিক রেখে দলিল লিখতে জানে তারা, অফিসে ড্রাফট তৈরি লেখে খবরের কাগজে বড় জোর বই বার করে—' জয়তী বলছিল।

'বই? সে বই পড়ে কে?'

'আমি অবিশ্যি তাদেরই বই পড়ি মাঝে মাঝে। কবিতা, গল্প, ইতিহাস, মেসমেরিজম, আইনকানুন, ইকনমিকস, দর্শন, কত কি। পড়ে খারাপ লাগে না। তবুও ওসব মানুষদের আমি চাই না।'

আকৃষ্ট হয়ে জয়তীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিরুপাক্ষ বললে, 'বই লিখলে হবে কি—ওরা পরের বাড়ির ভাড়াটে। নিজেদের বাড়ি নেই—গাড়ি নেই।'

'না, ওরকম গরীব মানুষ দিয়ে কি হবে? লেখাপড়া কি হবে কাপড়ে ফুটো বেরুতে থাকলে?

তালি মেরে মেরে মরে যায় মানুষের মন। তার চেয়ে is beloned ঢের ভালো। ব্যাঙ্কে তো লাখ পনের কুড়ি আছে—' জয়তী একটু ঝাল মিটিয়ে হেসে বললে।

সেটা যে কিসের ঝাল বিরূপাক্ষের খেয়াল ছিল না সম্প্রতি।

'কিন্তু লেখাপড়া-অলাদের সকলেই কি গরীব জয়তী?'

'খুব বেশী গরীব হয়তো ওদের সবাই নয়। কিন্তু তোমার মতন বড়লোক ওদের ভেতরে কজন?'

জয়তী ভাবছিল; এ লোকটা সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে। ভোরবেলা মাটির ভাঁড়ে দিশি মদ দিয়েই শুরু করেছে। ঘরে হুইস্কি ছিল, পোর্ট ব্র্যাণ্ডি ছিল, কিন্তু নির্বিঘ্নে মন ওর কঞ্জুষ ওর আত্মা— ও তো সবদিক দিয়েই একটা গাড়োল—বেওয়ারিশ—শুধু টাকার দিক দিয়ে নয়। টাকা ওর লক্ষ্মী, ও হাত পাতলেই ওর এঁটো কাঁটা আস্তাকুড় লক্ষ্মীর ঘড়ায় ভরে ওঠে।

'তুমি বড়লোক দেখেই তো তোমাকে আমি বিয়ে করেছি', জয়তী বলল।

'বিয়ে করেছ?' বিরূপাক্ষ বললে, 'বিয়ে করেছ জয়তী তুমি আমাকে? সব সময় সব কথা খেয়াল থাকে না। আমাদের বিয়ে হয়েছিল ওতোরপাড়ায়—না? গঙ্গার ধাবে? সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে? যেন মাঘ মাস—না জয়তী? সেটা মন্বন্তরের বছর। কালোবাজারে চাল ছেড়ে বড়লোক হচ্ছিলুম— কিন্তু আমি তোমাকে কি করে বিয়ে করলুম?'

পরদিন বিরূপাক্ষের মদের নেশা কেটে গেছে। মাথা অনেকটা পরিষ্কার। টালিগঞ্জের বাড়ির দোতলার ঘরে জয়তীকে নিয়ে বসেছিল সে।

'আজ আমার মনে পড়েছে। তুমি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে—সেটা মন্বন্তরের সময়। অত পড়াশুনো করেও ডানাকাটা পরীর মত চেহারা ছিল তোমার। আমি পড়েছিলুম ক্লাস এইট অব্দি—চেহারা আমার বেশি লম্বাচৌড়া নয়, এই কেঁৎকামাছের মত—খুব কালোকালো নয়, ঘাড়ে গর্দানে খানিকটা—যাকে বলে হোঁৎকা—সেই জন্যই আমার বেগ পেতে হয়েছিল—'

জয়তী অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে আর্ট ও থিয়েটার সম্বন্ধে একটা বিশেষ বই কিনে এনেছিল আজই, পড়ছিল। খুব মন দিয়ে পড়েছিল, বইটা ভাল লাগবার কথা। কিন্তু বুকের ভিতর কেমন ঢিবঢিব করছিল তার।

'কিন্তু জয়তী—'

জয়তী বইটা বন্ধ করল।

'আজকে কেন এসব কথা মনে পড়ছে আমার?' বিরূপাক্ষ বললে।

জয়তী বই খুলে পাতার দিকে তাকিয়ে বইল।

'শোন বলি জয়তী—'

'বই রাখ শোন—' বিরূপাক্ষ বললে।

'আমি শুনেছি তোমার কথা।'

'আমি একটা জিনিস প্রমাণ করতে চাই।'

'সে আমি জানি—সে তো অনেকবার প্রমাণিত হয়ে গেছে—'

'তুমি আমার স্ত্রী—'

'কুড়ি পঁচিশ লাখ তোমার ব্যাঙ্কে, ইনসিওরেন্সে। আমার স্ত্রীত্বের প্রমাণ তো সে সব দলিলেই আছে। কটা ইনসিওরেন্স? ছটা তো? না নতুন করেছ আরো?'

'না, ছটাই।'

'পাঁচটা অ্যাসাইন করেছ আমাকে। কিন্তু পঁচিশ হাজার টাকার ইনসিওরেন্সটা তো অ্যাসাইন করা হল না এখনো। কাকে করবে?'

'তোমাকে।'

'আমি চাপ দিচ্ছি না তোমাকে।'

'চাপ খাওয়ার ছেলে আমি? ব্যাঙ্কে সব টাকা তোমার নামে জমা দিয়ে রাখতে বিয়ের পরই তো বলেছিলে তুমি? গত বছরও বলেছিলে; কিন্তু এ বছর আর বলছ না কেন?'

'ব্যবসা তোমার, ব্যাঙ্ক তোমার, ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফট তোমার, আমার কাছে চেক বই রেখে কি হবে?'

পাঁচ লাখ টাকার অ্যাকাউন্ট তো তোমার নামে রয়েছে লয়েডসে।'

'কিন্তু পঁচিশ লাখ তো তোমার।'

'সে তো লাইফ ইনসিওরেনসের টাকাগুলো ধরে। ব্যবসা মার খাচ্ছে, ব্যবসা চালাতে হচ্ছে আমার; ইনসিওরেনসের মোটা মোটা প্রিমিয়াম দিতে হচ্ছে। ব্যবসাগুলো তোমার হাতে গুছিয়ে নিলে সব ব্যাঙ্কের সব টাকাগুলো তোমার হিসেবে লিখিয়ে নিও—' বিরূপাক্ষ একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'তুমি যে আমার স্ত্রী ব্যাঙ্ক ইনসিওরেনসের দলিলে তার প্রমাণ রয়েছে তুমি বলছ আমরা হিন্দুমতে বিয়ে করেছিলুম, হিন্দু আইন কি বলে তোমার স্ত্রীত্বের কথা?'

'যা বলবার তাই বলে।'

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'ইনসিওরেনসের চেয়ে বড় দলিল হিন্দু আইন?'

'বড়ই তো।'

'ব্যাঙ্কের চেয়ে?'

'হ্যাঁ—বড়।'

বিরূপাক্ষ এই সব কথা শুনতে চায় শুনে কেমন একটা পরিতৃপ্তির সপ্তমে গিয়ে বসে থাকতে চায় সে—নিবিড় ও নিস্তব্ধ হয়ে নয় সে শক্তি বিরূপাক্ষের নেই—কিন্তু এমনিই নড়ে চড়ে, কাত হয়ে উবু উটকো হয়ে জয়তী যে তার স্ত্রী সেই স্ত্রীত্বের কি যেন একটা মর্মান্তিকভাবে গোপন মধুর মন্ত্রসিদ্ধিকে দুরপনেয় কীটশক্তিমত্তায়—একা কীট সৃষ্টির ভেতরে, একা কীটই যেন সে—একাই পান করতে চায় সে। জয়তীকে যখন সে প্রথম বিয়ে করেছিল বছর তিনেক আগে তখন জয়তী ছাড়া অন্য কোন স্ত্রীলোকের কথাও ভাবতে পারত না বিরূপাক্ষ। এ তিন বছরে নানারকম স্ত্রীলোকের কাছে গিয়েছে বটে সে, কিন্তু তিন বছরের ভেতর দু বছরেরও বেশি নিজের বাপের বাড়িতে কাটিয়েছে জয়তী; গত ছ'মাসও জয়তী বাপের বাড়িতে ছিল, মাত্র তিন-চার দিন হল বিরূপাক্ষের এখানে এসেছে। দুর্দমনীয় আসক্তিশক্তি ফিরে পেয়েছে কীট আবার—অমেয় উল্লোল সৃষ্টির।

'তুমি হিন্দু স্ত্রী, আমাকে ছেড়ে যাবার কোন ক্ষমতা আছে তোমার?'

জয়তী বইয়ের দু-এক পাতা উলটে বললে, 'আমি কি ছেড়ে যেতে চাচ্ছি?'

'বাপের বাড়িতেই তো থাকছ, আড়াইটে বছর কাটালে—'

'এখন তো এসেছি।'

'এসেছ তো আসছ যাচ্ছ। চলে যেতে বাধা কি তোমার?'

'কোথায় চলে যাব?'

'কেন, তোমার বাপের আস্তানায়। গরীবের মেয়ে তো তুমি নও যে আমার টাকা তোমাকে ঠেকিয়ে রাখবে। তোমার বাবা শুনলুম ও-বি-ই পেয়েছেন—'

'হ্যাঁ।'

'ও-বি-ই মানে কি?'

'মানে ওব্।' জয়তীর ঠোঁটের কোণে দু-চারটে রেখা—হাসি নয়—দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল।

'ওব্?'

'এন-আই-ও-বি-ই কি হয়?' সেই গ্রীক মহামারের নাম মনে পড়াতে জয়তী বলল বিরূপাক্ষকেই।

'দাঁড়াও বলছি তোমাকে—দাঁড়াও—কি বললে, এন-আই? তারপর?'

'এন আই ও বি ই?'

বলছি তোমাকে—এন আই ও জি ই—নিয়োগী তো নিয়োগী।'

'জি নয় বি, নিয়োগী নয়—। তোমার কুড়ি লক্ষ যদি আমার জন্যে খানিকটা কথা বলে তা হলেই হবে, এটাকে নিয়ে আর ঘাঁটিও না। কি বলছিলে তুমি হিন্দু আইনের কথা?'

'বলেছিলুম তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে চাইতে পার—ঘাঁতঘোৎ তোমার সবই জানা;—কিন্তু প্রত্যেক ঘাটে আইনে ঠেকবে।'

'ঠেকবে, না ঠেকবে জানি না কিছু আমি। কিন্তু আমি বিয়ে ভেঙে দিতে চাচ্ছি কে বললে তোমাকে?'

জয়তীর মুখ চোখ প্রশ্ন সত্য স্বচ্ছ ঠেকল বিরূপাক্ষের কাছে। মেয়েটি মিথ্যে কথা বলছে না—এখন তো নয়; বিরূপাক্ষের টাকার জন্যে—বিরূপাক্ষের নিজের জন্যেই হয়তো টান আছে জয়তীর। স্ত্রীর মুখের দিকে আবার তাকাল বিরূপাক্ষ? মুখের ওপর কেমন একটা সত্যার্থের আভাস দেখে ভরসা পেল সে।

'তুমি এক্সপেরিমেন্টাল সাইকোলজিতে এম এ পড়ছিলে, বি-এ-তে ইংরেজিতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে। তুমি উত্তর কলকাতার বনেদী ঘরের মেয়ে, দক্ষিণ কলকাতার বড়লোকের ভাগনী, তোমাকে কে পায় বলো তো দেখি—'

হাতের সিগারেটের আগুনে আর একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিতে গিয়ে এক আধ মুহূর্ত চুপ করে রইল বিরূপাক্ষ। বাইরে রোদ, নীলিমা, ঘরের ভেতরে মেঝের ওপর দেওয়ালের গায়ে ডানার ছায়া ফেলে অদূর দিগন্তের পুরুষ চিল ও মহিলা পাখির চংক্রমণ; অনেক দূরে একটা অ্যাকেশিয়া গাছে ফুল ধরেছে। অ্যাকেশিয়া না চেরী অবাক হয়ে ভাবছিল জয়তী। হয়তো অন্য কোনো গাছ। এত শীতে তো অ্যাকেশিয়ার ফুল ধরবার কথা নয়। কবে ফুল ফুটবে, সাদা মেঘ আর নীল মেঘের মত নীল আকাশের গায়ে বিছানো সবুজ কৃষ্ণচূড়ার? বাইরে অপরিমেয় রোদ, প্রিয় মহানুভবের মত মুখচ্ছবি কত বড় বিশাল আকাশের পৃথক নিঃশব্দতার মত; মহাপ্রলয়ের সৃষ্টিতে উৎসারিত করে চলেছে মুহূর্তের পর মুহূর্ত।

আশ্চর্য কোনো সংস্রবই নেই যেন বিরূপাক্ষের ঘরের ভেতরের মানুষদের সঙ্গে বাইরের সচ্ছল স্বাধীনের; তিল ধারণের তিল অধিকার করে চারদিককার তিলাতীত যত তিল—আলো-মেঘ-পাখি এখানে—ওখানে—সবখানে; ভাবছিল জয়তী।

'আমি তোমাকে পেয়েছি। পেয়েছি বই কি। আইনেও পেয়েছি—এমনিও। তোমার সঙ্গ-টঙ্গ চাই। তুমি আইনত স্ত্রী তো, দিচ্ছ টিচ্ছ কিছু ভালবাসাও চাই। কিন্তু চাইলেই হল? তুমি হওয়ালে তো।'

বিরূপাক্ষ আজো যে এনতার জল খেয়েছে শুধু, মদ খায়নি, বিশ্বাস হচ্ছিল না জয়তীর। পেটে নির্মল জল ভজভজ করে না কোনোদিন এই লোকটার; আজ একটু বেশি গেঁজে উঠেছে। কোনো দিশপাশ খুঁজে পাচ্ছিল না জয়তী। নিজের হাতের বইয়ের দিকে ফিরে তাকাল সে।

'আমার মন বলেছে আমি তোমাকে পেয়েছি।'

'দিশী মদ চাচ্ছে তো তোমার মন; এখন?'

'আজ আমি মদ খাব না।'

'কেন? খোঁয়ারি ভাঙতে হবে?'

'তুমি আবার বাপের বাড়ি চলে যাবে না তো?'

'তা আমি এখন কি করে বলি?'

'কি বলতে চাচ্ছ বুঝিয়ে বল।'

'দরকার হলে চলে যাব।'

'তিনবছর তো আমাদের বিয়ে, আড়াই বছর তো কাটালে শশধরবাবুর নেকনজরে। এই তো ছ' মাস কাটিয়ে এলে আবার চলে যেতে চাচ্ছ আবার। কেন, আমি কি তোমাকে বিয়ে করিনি?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে টান মেরে ঘর ভর্তি ধোঁয়া জমিয়ে তুলে বল্লে, 'তুমি হাঁপাচ্ছ কেন?'

'আমি?'

জয়তী নিজেকে সামালে নিয়ে বল্লে, 'কৈ না তো।'

'মনে হচ্ছিল, তোমাকে হাঁপাতে দেখলে আমার ভয় করে।'

'মিছে ভয়।'

'আমি সিগারেট খাই তাতে কি তুমি দুঃখ পাও?'

'কেন পাব?'

'প্রথম প্রথম তো বাধা দিতে আমাকে সিগারেট খেতে দেখলেও। তাড়ি তো খাচ্ছি; বিলিতি দিশি জল সবই; আজকাল যে মুখ বুজে থাক তুমি সব দেখে শুনেও? এটা ভালো লাগছে না আমার। মেঘ যখন জমতে থাকে, আকাশ চুপ করে থাকে। চুপ করে আছ তুমি, মদ খাচ্ছি আমি, মদ খাওয়া ছাড়ব না। কিন্তু মদ খাওয়ার সময় তুমি এসে নথ নেড়ে বাধা দেবে সেটা আমি প্রত্যাশা করি। মদ খাওয়ার সময় তোমার খ্যাংরা খেতে ভাল লাগে আমার—এ-হে-হে-হে-হে।'

বিরূপাক্ষ হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটাকে শেষ দু'চারটে টানের থেকে রেহাই দিল, অ্যাশট্রেতে না ফেলে মেঝের কার্পেটের ওপর ফেলে পা দিয়ে পিষতে লাগল। এ ঘরের এই চমৎকার জয়পুরী কার্পেটের ওপর ধূলো, সিগারেটের ছাই তো দূরের কথা, এক চিলতে পরিষ্কার কাগজও উড়ে এসে পড়তে দিত না জয়তী একদিন,—আড়াই বছর আগে। কিন্তু সিগারেটের আগুন দিয়ে গালচেটাকে পুড়িয়ে নেওয়া হচ্ছে সিগারেটের কালি মেড়ে দেওয়া হচ্ছে? কি বলতে চায় জয়তী? কিছুই বলছে না। বিরূপাক্ষের আগের কথারও কোনো উত্তর দিল না সে। একটার পর একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে গালচের ওপর ছুঁড়ে ফেলতে লাগল বিরূপাক্ষ।

'মদ খেয়ে শরীর সুস্থ আছে তো তোমার।' জয়তী বল্লে।

'তা আছে। এ কার্পেটটা ইনসিওর করিনি আমি।'

দুটো দেশলাইয়ের কাঠি একসঙ্গে জ্বালিয়ে কার্পেটে ছড়িয়ে দিল বিরূপাক্ষ।

'বাতাসে নিভে যাচ্ছে তো তোমার দেশলাইয়ের আগুন।'

'অনেক জায়গায় পুড়ে গেছে গালচে, কেমন দেখাচ্ছে?'

'বেশ নতুন ধরনের একরকম হল।'

'পুড়িয়ে ফেলব কার্পেটটাকে?'

'কেরোসিন ঢেলে নিতে হবে দুচার টিন।'

'তাহলে তো বাড়িটাও পুড়তে থাকবে। ফায়ার ব্রিগেড আসবে। পুলিশ আসবে।'

'আসুক, আসবে।'

'কিছু হবে না তাতে?' জিজ্ঞেস করে একটু থেমে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'বাড়ি তো ইনসিওর করা নয়। বাড়ি তো ইনসিওর করিনি এখনও।'

না করেছে, মিটে গেছে। বাড়িটাকে ইনসিওর করলেও হয়, না করলেও হয়, সেটা বিরূপাক্ষ বুঝবে; জয়তীর মনের প্রেম যেন অন্য কোথাও, অন্য কোন পুরুষ বা বাড়ি আশ্রয় করে না হলেও, এই পুরুষটি ও তার বাড়ির ত্রিসীমার নয় যেন, অনুভব করতে করতে মনের প্রশান্তি ফিরে পেল জয়তী। কিন্তু এও সে জানে, এ বাড়িটা পুড়বে না, গালচেটাও। বাড়িটা পুড়লেও বীমা করে রেখেছে বিরূপাক্ষ। করেছে।

'মদ খাচ্ছি। খাওয়াটা খারাপ নয়?'

'তোমার শরীর তো সুস্থ থাকছে। কেন খারাপ হবে?'

'সুস্থতার কথা নয়; এম্নিই, ওটা ভালো?'

'খুব সম্ভব ভালো—তোমার পক্ষে।'

'কেন?'

জয়তীর কিছু বলবার ছিল না। বইটাও পড়া হচ্ছে না। বুজিয়ে রেখেছে হাতের ভেতর। খুলে পড়বে কিনা ভাবছিল।

'মদ খেয়ে আমার লিভার পেকে উঠবে, এই তো চাও তুমি।'

'তোমার লিভার আছে? না থাকলে তা পাকবে কি করে?'

বিরূপাক্ষ একটু হেসে বল্লে, 'হাঁ জী, হাঁ হাঁ জী, হাঁ, ইয়ে আচ্ছি বাৎ হ্যায়। যে সব মেয়ের জ্ঞান পবন আছে, তারা স্বামীর মদের গেলাস ভাঙতে যায় না, কিন্তু মোলায়েম হাতে কান টেনে মাথা নিয়ে আসে। তুমি আমার কর্ণমূল ধরে টান দিয়েছ জয়তী। আমি বুঝেছি তুমি আমার মদ খাওয়া পছন্দ কর না। আমি বুঝেছি। গুরুমা তার ছেলেদের ধমকে পিটিয়ে এরকম কথা বলে। মা গোঁসাই তার বড় চেলাকে নিজের ঘরে আড়ালে ডেকে নিয়ে আর এক ধাঁজে কথা বলে—এই যেমন তুমি বল্লে। বুঝেছি আমি। কিন্তু মদ ছাড়া খুব কঠিন, কিন্তু মদ ছাড়ব আমি। ছাড়ব আমি। মন্মথ, অ—মন্মথ!' বিরূপাক্ষ গলা ছেড়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠল।

'হুজুর!' বলে মন্মথ হাজির হতেই বিরূপাক্ষ বল্লে দু বোতল সোডা, গেলাস, ডিকান্টার, পেগ আর ওই একেবারে কোণার ঘরটার থেকে খুব ভালো বিলিতি যা হাতের কাছে পাও—বিয়ার, ভেরমুথ, জিন, রাম আর রামছাগল ছাড়া—নিয়েসো তো চট করে। আমি আজ খাব মদ কাল খাব, পরশু খাব, তারপর খোঁয়াড়ি ভাঙব, তারপর আস্তে আস্তে মদ খাওয়া ছেড়ে দেব ভাবছি মন্মথ। জয়তী চাচ্ছে তাই! মদ দিয়ে ধোলাই করে আমার লিভার পাকিয়ে দিচ্ছে জয়তী। বুঝলে মন্মথ—বলি বুঝলে হে মিটমিটে মন্মথ—'

বিরূপাক্ষ মন্মথের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে চোখ নাচাল—ডানে বাঁয়ে কাম্নি মেরে দুমড়ে তুবড়ে ঠাস করে একটা চড় মারল মন্মথকে।

মন্মথ ভিরমি খেয়ে—নাকি সুরে কাঁদতে কাঁদতে দোবগোড়ায় গিয়ে হো হো করে হাসতে লাগল; হা হা হা হা হেসে উঠল বিরূপাক্ষ।

এটা বিরূপাক্ষ মন্মথর একটা খেলা ভালো লাগছে না—জীবনটা কেমন যেন লিম্বু হয়ে গেছে মনে হল—হো হো হো হো করে একদল হায়নার মত হেসে ওঠে এরা দুইজন।

এগারো

পরদিন সকালবেলা ছাদের ঘরে বসেছিল বিরূপাক্ষ। কালকের সেই অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের আর্ট ও থিয়েটারের ওপর বইটা পড়ছিল জয়তী; গ্রীক থিয়েটার সম্পর্কে কি লিখেছে দেখছিল।

বিরূপাক্ষ দূরে একটা কৌচে বসে সিগারেট টানছিল; বল্লে, আমি তোমাকে যা বলছিলুম—'

মন্মথ গড়গড়ায় তামাক সাজিয়ে দিয়ে গেল বিরূপাক্ষকে। সিগারেটটা ফেলে দিল বিরূপাক্ষ জানলার ভিতর দিয়ে বাইরের রাস্তায়। গড়গড়ার নলটা আড়ষ্টভাবে টেনে নিয়ে মুখে ছুঁইয়ে দু-একটা আলতো টান মেরে জয়তীর দিকে ভালো মনে করে তাকাতে গেল সে;—কামনার চেয়ে শুভেচ্ছার প্রেরণায়। কিন্তু সে চোখে ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে বোবা রসিকতায় লিপ্ত—পাড়াগাঁর বাড়ির আত্মপ্রসাদ ছাড়া আর কোনো রংই ধরা পড়ল না...অনুভব করে কেমন যেন লাগল জয়তীর, ঘাড় ফিরিয়ে জানালার ভিতর দিয়ে দূরের রৌদ্র প্রাণবত্তার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

'আমি তোমাকে আমার পেড়াপেড়ির গল্পটা শোনাতে চাচ্ছিলুম আবার। গল্পটা যতবার বলা যায়—পুরোনো হয় না—শোন তুমি বি-এতে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেলে। আমি অত শত জানতুম না। আমি কলকাতা ইউনিভার্সিটির ছেলেদের ফেডারেশন না কি—তারি একটা মজলিসে তোমাকে দেখতে পেয়েছিলুম'—বলে তামাক টানতে লাগল বিরূপাক্ষ।

গড়গড়ায় জলতরঙ্গ, হাওয়ায় অম্বুরি তামাকের গন্ধ।

'আমাকে নিয়ে গিয়েছিল শৈলেন। শৈলেনের কথা মনে আছে? তোমাদের সভাসমিতির ছাত্রছাত্রীদের সে তো একজন বড় স্পনসর ছিল—?'

'স্পনসর?'

'না, কি বলে ওকে? স্পনসর নয়?'

'সভাসমিতির স্পনসর হতে পারে—ছাত্রছাত্রীদের নয়—'

'তা হলে চাঁই বলব?'

'বলতে পার।'

'চাঁই আর স্পনসর এক নয়?'

'না। তুমি বরং ইংরেজি শব্দ নাই ব্যবহার করলে, আমি তো বাংলা জানি—'

'ঠিক বলেছ।' গড়গড়ার নল মুখে না দিয়ে সেটাকে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত সাপছেনালি খেলিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'তুমি এত ইংরেজিনবিশ, অথচ আমি কিছুই জানি না। আমাকে শেখাবে? তোমার মত শেখাতে পারে কে আর বল?'

'ও জিনিস শেখানো যায় না'—'জয়তী এক কথায় সেরে দিয়ে বল্লে, তার পরে কথা একটু বাড়িয়ে ফেলে বল্লে, 'যে নিজেই মুগ্ধী তাকে শেখানো যায় না।'

বিরূপাক্ষ তামাক টানছিল, একটা চাপা হুঙ্কার দিয়ে তামাক টানতে লাগল আবার : যেন হোঁদড়ে হরিণীতে শীত-সকালের কথিকা তৈরি হচ্ছে নদীর এপার-ওপার থেকে।

'শৈলেন আমাকে ঘাড় ধরে টেনে নিয়ে গেছল বলেই তো তোমাকে দেখতে পেলুম। পরে জানতে পেরেছিলুম তুমি ইউনিভার্সিটির জয়তী পণ্ডিত। কিন্তু সেজন্যে নয়, তোমাদের বনেদী ঘরের জন্যেও নয়, তোমার নিছক নিজের জন্যেই তোমাকে আমি দেখেই ভালবেসেছিলুম। সেদিনই সঙ্কল্প করেছিলাম পৃথিবীতে যদি বেঁচে থাকতে হয় তা তোমার মত মেয়েমানুষের মিষ্টি জুতো খেয়ে। সে সঙ্কল্প আমি কাজে ফলিয়েছি।'

'কিন্তু যেরকম চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি করতে চেয়েছিলাম,' জয়তী একটু হেসে বল্লে, 'সে চামড়া তো গোরু-ছাগলের পিঠে পাওয়া গেল না—একটু নিরেস লাগছে না জুতোটাকে তাই?'

জয়তীর বাঁকা কোঁকড়ানো কথাটা একটু সোজা সরল করে নিয়ে বুঝে দেখতে চাইল, কিন্তু কি বলতে চাইল জয়তী ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না বিরূপাক্ষ।

'কিন্তু মানুষের চামড়ায় তো জুতো বানানো নিষেধ'—জয়তী বল্লে।

জয়তীর মুখ চাপা আঁচের অঙ্গারের মত হয়ে উঠল। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না। তার অনুভূতি উত্তাল লিঙ্গশক্তির প্রকর্ষে জায়গাজমি ঘরদোর বাড়ি তৈরি হয়, মেয়েমানুষও দখল হয়, কিন্তু সে সব মেয়েমানুষের আত্মা যে শরীরটাকে খোলসের মত ফেলে বিদায় নেয়। যখনই বিরূপাক্ষের মত একজন লোকের সংস্পর্শে তাদের আসতে হয়—তা জানে না বিরূপাক্ষ। না জেনে লাভই তার।

শীতের এ কটা রাত শুয়োরের মত সঙ্গ সুখ খুঁজছে বিরূপাক্ষ : না পেলে আহত হয়েছে—শুয়োরের মত, মানুষের মত নয়।

'তুমি সাইকোলজিতে এম-এ পড়ছিলে। আমাদের দেশে এত রূপ থাকে? তা থাকে—আমাদের দেশেই থাকে—অন্য কোথাও না, বাঙালীঘরের সেই রূপ তোমার। সকলে বলছিল তুমি ফার্স্টক্লাস পাবে। তোমার ছাঁচি মিছরি খেতে মাছি মশা বোলতা বিষ পিঁপড়ে গাঁধিপোকা ফড় ফড় করছে,

কিন্তু—তবুও কি করে মাইফেলে তোমাকে আমি পেলুম জয়তী। এ সংসারে এরকম সফলতা পেতে দুটো জিনিসের দরকার—এক টাকা, আর এক জুঁকের নাগান লাইগ্যা থাকা—'

বিরূপাক্ষ বলতে লাগল, 'টাকা অবিশ্যি আমার চেয়ে কারু-কারু আরো ঢের বেশি ছিল। কিন্তু কালোবাজারে আমি কামিয়ে নিচ্ছিলুম। মন্বন্তরের সময় তখন, কিন্তু তোমাকে দেখে আমার মাথায় খুন চড়ে গেল; মানুষের হাড়ের—' বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে এক টান মেরে সেটা ফেলে দিল লোক কোলাহলের চলাচলের রাস্তা তাক করে।

'কিন্তু শুধু টাকা দিয়ে তোমাকে তো আমি কিনে নিতে পারিনি। ওয়ার কন্ট্রাক্টে, ব্ল্যাক-মার্কেটে যত টাকাই করি না কেন, আমি তো ভাগাড়ের শুকনির বাচ্চা—মফঃস্বলে জমিদার সেরেস্তার মুহুরী ছিলেন—মাসে ত্রিশ টাকা মাইনে পেতেন। বাবাব কথা বলছি।'

নল মুখে দিল বিরূপাক্ষ।

'তোমার সে সব ধর্মভাইদের ভেতরে এমন অনেক বনেদি ছোকরা ছিল যে আমার আজকের সমস্ত ব্যবসার গুডউইল কড়ে আঙুল দিয়ে কিনে নিতে পারে।'

'কে ছিল সে রকম?'

'তুমি জানতে না?'

'আমি শুনিনি তো কোনোদিন—শমীন, রবি, মনোতোষ, সুব্রত, নীরেন—কার কথা তুমি বলছ?'

'এদের কারু আমার চেয়ে বেশি টাকা আছে জানলে তাকে বিয়ে করতে তুমি?'

'কার আছে সেরকম টাকা এদের ভেতর?'

'এদের সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট জানা আছে তোমার?'

'চার-পাঁচ লাখের বেশি নেই শমীনদের। স্থাবর-অস্থাবর সব নিয়ে লাখ দশের বেশি হবে না। কিন্তু শরিক তো অনেক। শরিক সকলেরই।'

'বাস্তবিক, একেবারে প্লাগে এসে হাত দিয়েছেন শশধরবাবু—যাই বল তুমি। মা বাপ ভাই বোন কেউই তো নেই আমার। আমি ভেবেছিলুম সেইটে আমার দোষ বিয়ের বাজারে। কিন্তু সেইটে আমার গুণ হল। আমার সম্পত্তিটা যে এজমালী নয়। আমার যে শরিক নেই সেটা আমার চেয়েও আগে বুঝে ফেলেছেন শশধরবাবু আর ওঁর মেয়ে। সত্যিই এদিকে মাথা খেলেনি এতদিন আমার। তাই তো—' বিরূপাক্ষ নল মুখে দিয়ে বল্লে, 'আমি তো একা, কোনো শরিক নেই তো আমার।'

'আমি তো আছি।'

'তুমি তো আমার স্ত্রী—শরিক তুমি? শরিক নও তো।'

'তোমার ভাই থাকলে শরিক হত? স্ত্রী হিসেবে সম্পত্তির শরিক-টরিক আমি নই, ঢের বেশি; ওটা আমারও—পুরোপুরি।'

'তা তো ঠিক?' তামাক টানতে টানতে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'আমি মরে গেলে আমার কোনো ওয়ারিশ না থাকলে আমার সমস্ত সম্পত্তি হয়তো তুমিই পাবে—'

'কারো বাঁচামরার কথা হচ্ছে না; কিন্তু আর কোনো ওয়ারিশ নেই, আমিই পাব সব।'

জয়তী প্রাণের গরমে কথা বলছে টের পাচ্ছিল বিরূপাক্ষ; এরকম নতুন টাকার মত চনচন করে বেজে উঠে জয়তীকে কথা বলতে প্রায়ই শোনা যায় না—আজকাল তো একেবারেই না; কিন্তু তবুও আজ বেশ বোল তুলে কথা বলছে জয়তী। টাকা মানুষকে কথা বলায়, প্রেম নয়, প্রণয় নয়, লালসাও নয়। বিরূপাক্ষ চোখ বুজে নল টানছিল, বল্লে, 'না কেউ পাবে না আর তুমি ছাড়া। তবে ভারি গোলমেলে এই সংসারটা, ভারি গোলমেলে আইন আদালতগুলো—'

'কি করবে আইন-আদালত আমার নামে'সব লিখে ঠিক করে রাখলে—'

'হয়তো পঁচিশ লাখের পনের কুড়ি লাখ তোমাকে দিল, বাকি টাকা আটকে রাখল—'

'কি করে আটকাবে?'

'নানারকম ফ্যাকড়া বেরিয়ে পড়ে আইনের। যে মানুষ বেঁচে থেকে লাখ লাখ টাকা জমিয়ে মরে যায়, সে মরে গিয়ে আর বেঁচে উঠতে পারে না তো। কিন্তু সে বেঁচে ফিরে না এলে আইন খানিকটা গোলমাল করবেই—'

'করবেই? তুমি লিখে দিয়েছ কাউকে সম্পত্তির কিছু?'

'কাউকে না।'

'আমি ছাড়া তোমার ওয়ারিশ আছে কেউ?'

'কেউ না। আমাদের ছেলেপুলেও তো নেই।'

জয়তী বল্লে, 'শমীন, মনোতোষ, নীরেন—ওদের সকলেরই তো ভাগের টাকাকড়ি, সম্পত্তি; ভাগ তো বেড়েই যাচ্ছে, শরিক বাড়ছে কেবলই। ওরা তো চাকরী করে, ভাল ব্যবসা নেই কারু, যা ছিল যুদ্ধের বাজারে সে সব গুটিয়ে ফেলতে হল, এমনই বাঁচার কারবারি সব। না, ওদের টাকা নেই, কিছু, দুতিন লাখের বেশি মাথা পিছু কারুর নেই, অথচ তুমি বলে দিলে তোমার ব্যবসা মেরে নিতে পারে ওদের যে কেউ। মদ তো খাচ্ছ, কিন্তু কোন আড়তের চাল খাচ্ছ বল তো দেখি?'

'বিরূপাক্ষ বল্লে, 'ওরা যদি আমার চেয়ে বড়লোক হত, তাহলে ওদের কাউকে বিয়ে করতে তুমি?'

জয়তী নিজের ঘাড়ের ওপর একটা আঁচিল খুঁটতে খুঁটতে বল্লে, 'শুধু বকলম সেঁটে এত বড় বেনে হয়ে ওঠোনি তুমি, এ ধাঁধাটা তুমি কষে দেখবে।'

'আমি দেখছি'—বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে।

'কি বার হল কষে?'

'তুমি শমীনকে বিয়ে করতে তার ত্রিশ লাখ থাকলে।'

'এটা বোকার মত কথা হল।'

বিরূপাক্ষ সিগারেটে একটা দুটো টান মেরে জানলার ভেতর দিয়ে বাজার গুলজারের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল সেটা—কিন্তু গুলজার তাতে আরো বেড়ে উঠলো বলে মনে হল না। কারু চেঁদো মাথায় গিয়ে পড়েনি সিগারেট, কারু সিল্কের শাড়ি পুড়িয়ে দেয়নি।

'বোকা কথা বলেছি?'

'তোমার তো পঁচিশ লাখ আছে। শমীনের যদি পঁচিশ লাখ থাকত, চব্বিশ লাখ, কুড়ি লাখ থাকত তাহলে আমি কি করতাম এই হল ধাঁধা।'

'আর আমার যদি কুড়ি লাখ থাকত, শমীনের পঁচিশ লাখ?'

'কি করতাম তাহলে আমি?'

'কি করতে?'

'কষে বার কর', জয়তী বল্লে।

'বার করেছি'—বিরূপাক্ষ নতুন আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে। 'তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল টাকার জোরে, আমার জোরে নয়। আমাকে শিখণ্ডীর মত দাঁড় করিয়ে তুমি বাপের বাড়ি গিয়ে কি করেছ এ দু বছর আড়াই বছর, বলবে আমাকে?'

জয়তী অকসফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের বইটা তেপয়ের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিল; সেটাকে বন্ধ করে সরিয়ে রেখে বল্লে, 'আমাকে বিয়ে করার পর থেকে এ তিন বছর তোমার হালচাল কি রকম জিজ্ঞেস করিনি তো তোমাকে কিচ্ছু আমি।'

'না, তা করনি বটে।' বিরূপাক্ষ ঠোঁট চেপে হেসে ভেতরে তেজ দমিয়ে রাখতে রাখতে বল্লে।

'টাকা তোমাকে শিকেয় টেনে নিয়েছে। আমাকেও দু কান কাটা করেছে তো টাকার লোভ।' জয়তী বল্লে।

বিরূপাক্ষ আর তর্কবিতর্ক করতে গেল না. ব্যাপারটা বুঝল সে। বুঝে বিশেষ কোনো অস্বস্তি এল না তার মনে। বিয়ে করার আগের থেকে পরের থেকে জয়তীকে বুঝে আসছে সে। জয়তী বিরূপাক্ষকে ভালবাসা বা শ্রদ্ধা করার ধার দিয়ে চলাচল করে না। কালক্রমে করবে কিনা বলা কঠিন। বিরূপাক্ষকে সমীহ করে—মনে মনে একটা দিক দিয়ে প্রশংসা করে খুব জয়তী; একা হাতে লড়ে নিজেরি হিম্মতে পঁচিশ লাখ টাকা বিরূপাক্ষ কামিয়ে ফেলেছে বলে;—কিন্তু বিরূপাক্ষের টাকার চেয়ে শমীনদের টাকাকেও ভালোবাসে জয়তী—একই কাগজের গভর্নমেন্ট প্রমিসরি নোট যদিও টাকাগুলো। শমীনদের দোষ এই যে তাদের হিসেব চার পাঁচ লাখ টাকার বেশি উঠতে পারল না। তা যদি উঠত—একটু বেশিই যদি হত—সবই তো হতে পারত তবে। পারল না। হল না সেটা।

'ওরা আসে-টাসে আজকাল তোমার বাবার বাড়িতে?'

'আসে মাঝে-মাঝে?'

'কে কে আসে?'

'মনোতোষ, সুব্রত, শমীন—সকলেই।'

'প্রায়ই আসে বুঝি?'

'কেউ না কেউ রোজই।'

'সিগারেটটা খাচ্ছিল বিরূপাক্ষ, গড়গড়ার, নলটা হাতে ছিল, নলটা নেড়েচেড়ে বল্লে, 'সময় বেছে কখন আসে তারা?'

'সন্ধ্যার পরে।'

'তারপর কতক্ষণ কেটে যায়?'

'অনেক রাত অব্দি গল্পগুজব চলে—'

বিরূপাক্ষ একটা নিঃশ্বাস ফেলে বল্লে, 'এই রকমই চলবে?'

জয়তী আকাশের রোদের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'তোমাকে বিয়ে করেছি বলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আলাপ করতে পারব না—একটা কথা হল। আজকাল এরকম কড়াকড়ি কিছু নেই।'

'তুমি কি চাও?'

'তা তো বলেছি। কোনো ওয়ারিশ নেই; বেঁচে থাকলে সম্পত্তিটা আমি পাব।'

বিরূপাক্ষ দুতিন ঘণ্টাব ভেতরেই একটিন সিগারেট ফুরিয়ে ফেলেছে; যে সিগারেটটা পুড়ে গেছে তার আগুনে আর একটা জ্বালিয়ে নিয়ে বল্লে, 'ওটা তো বিষয়-আসয়ের কথা হল। তবে সব কথাই অবিশ্যি টাকাকড়ির কথা।'

বিরূপাক্ষ একটা ঢেকুর তুলে বল্লে, 'টাকাকড়ির কথা ছাড়। আর কি কথা থাকতে পারে?'

'আছে।'

'আছে?'

'আমি বেঁচে থাকতে চাই—বিষয়-টিষয় আছে, বেশ;—কিন্তু আরো কিছু নিয়ে, তা পেতেই হবে।'

বিরূপাক্ষ দুএক মুহূর্ত হতবোধের মত চেয়ে থেকে তারপর জয়তীর কথার ভাবটা বুঝে নিল।

'কিরকমভাবে বেঁচে থাকতে চাও?'

'যেরকম চলেছে।'

'শতকরা নব্বই দিন বাপের বাড়িতে থেকে?'

'সেটা থাকা দরকার তো।'

'বিয়ে করেছে শমীনরা?'

'করেছে কেউ কেউ।'

'তবুও আসে তোমার কাছে? কেন? বিরূপাক্ষকে তুমি বিয়ে করেছ বলে?'

'তাতে তাদের কি লাভ?'

'পঁচিশ লাখের কিছু কিছু তো লাভ।'

জয়তী বল্লে, 'বেশ ল্যাজে গোবরে কথা বলা হল—'

'তা তো হল, 'বিরূপাক্ষ সিগারেটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বল্লে 'কত রাত অব্দি থাকে তারা?'

'আমি কত রাত অব্দি থাকি তোমার ঘরে?'

'তার মানে?'

'তুমি আমাকে একটা প্রশ্ন করলে, আমিও করলুম তোমাকে একটা। এসব ধাঁধার এ ছাড়া কোনো উত্তব নেই। এসো—ওঠো—'

'কোথায় যেতে হবে।' চিতল মাছেব ঘাই মেরে অন্ধকারে জলের মত পাক খেয়ে বিহ্বল হয়ে বল্লে যেন বিরূপাক্ষ।

'চলো নিউ মার্কেটে যাই—অনেক জিনিস কিনতে হবে।'

বিরূপাক্ষ মোটরটাকে ঠিক করবার জন্যে নীচে চলে গেল। নিজেই মোটর চালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ, জয়তীকে নিজের পাশে বসবার জন্যে অনুরোধ করল সে। কিন্তু পেছনের সীটে, একা—বেশ আরাম করে গিয়ে বসল জয়তী।

বার

পবদিনও জয়তীকে সেই ঘরে দেখা গেল। কমলা রঙের গদী আঁটা সোফায় বসে। বিরূপাক্ষ তেমনি খাটের ওপর শুয়েছিল।

'আজকাল আব স্টক একসচেঞ্জে যাই না বড় একটা।'

'এক্ষুনি গিয়ে লাভ নেই', জয়তী বললে, 'বাজার অবিশ্যি খুব খারাপ নয়—তবে রাই কুড়িয়ে তাল পাকাতে হবে আর কি।'

'কি হবে চুনোপুঁটির দলে ভিড়ে। আমার হাঙরের খাঁইও মিটে গেল বুঝি। বাজারের ভাল আর মন্দ। আর কেন?'

'আমার টাকা চাই।'

'তোমার নামে উইল করতে বল; সে তো রেজিস্টার্ড হয়েছে।'

'ক লাখ হল?'

'বেশি নয়, লাখ দশেক। বাকি পনেরো লাখ আমি কযেকটা স্কুল কলেজ, হাসপাতাল, ইউনিভার্সিটিকে দেব ঠিক করেছি।'

'দশ লাখ ক্যাশ? স্কুল কলেজ হাসপাতালে যা দেবে ভালোই—'

'না ক্যাশ নয়, জমি, জমা, বাড়ি মোটরকার সব নিয়ে—'

'অ্যাটর্নির সঙ্গে আমি একটু কথা বলতে চাই—'

'তা বোলো, উইল তো আমি তোমাকে দেখিয়েছি।'

'দেখেছি। একটু আধটু বদলানো দরকার।'

'কি রকম? কোন দিক দিয়ে?'

খাটের ওপর গা ছড়িয়ে বসে ঘাড় কাৎ করে বিরূপাক্ষ সিলিঙের দিকে তাকিয়েছিল।

'দশ লাখকে পঁচিশ লাখ করতে হবে।'

'কি করে তা সম্ভব হবে জয়তী?'

'যে দশ পয়সাকে দশ লাখে উঠিয়েছে সে তা পারবে।'

'তা বটে', বিরূপাক্ষ বললে, 'তা দেখব আমি। কিন্তু তাহলে তো আমার দিনরাত বাজার ঘুরতে হয়—'

বিরূপাক্ষ জয়তীর দিকে তাকাল, সে তাকাল হাতের বইটার দিকে। নিজেকে বললে জয়তী, 'ও নিজের পায় দাঁড়িয়ে মানুষ কিনা সেটা, ঠিক বলতে পারা যায় না; তবে, অনেকটা তাই বটে। ওর টাকার সৌভাগ্য আছে। ও ভাবে ওর জীবনে পরীভাগ্যও আছে, কিন্তু তা নেই। কিছুটা দিতে হয়েছিল বটে ওকে—কিন্তু আর দেব না। আমার হৃদয় ও কোনো দিনই পায়নি—এখন তা সবচেয়ে দূরে চলে গেছে। তবুও ওকে আহত করা ঠিক হবে না। ওকে টাকার বাজারে নামিয়ে দেওয়া উচিত আমার; লোকসান দেবে, লাভে হাবুডুবু খাবে, ভাল লাগবে বিরূপাক্ষের, সেই তো ওর পৃথিবী। ও যার উইল রেজিস্টারি করেছে বলছে তাতে আমার বিশ্বাস নেই। হাসপাতাল, স্কুল, কলেজকে পনেরো লাখ টাকা দেবে বলছে বিরূপাক্ষ; পনেরো টাকাও দেবে কিনা সন্দেহ। ও দেবে ইউনিভার্সিটিকে টাকা, হাসপাতালকে? তবেই হয়েছে। সে টাকা খেতে গেলে হাসপাতালে রুগী বাঁচবে না আর—ছেলেদের মাস্টারদের আর ভাত খেতে হবে না বিরূপাক্ষের টাকা চিবিয়ে খেয়ে। ও আমাকে একটা জাল উইল দেখিয়েছে জানি আমি। ওর নিজের অ্যাটর্নি যে কে—আসল উইলটা যে কোথায় জানাবে না আমাকে—জানতে পারাও যাবে না; খুবই সন্দেহ বিরূপাক্ষ কোনো টাকা দেবে কিনা আমাকে; জানতে পারাও যাবে না। খুবই সন্দেহ ওর টাকা পেতে হলে বারো মাস ওর বাড়িতে থাকতে হবে, হবে ওর সঙ্গে শুতে বসতে। কিন্তু তারপরেও জানতে পারা যাবে যে বেশ কয়েকটি হস্তেল ঘুঘুনীর ভোগে উইলটা টাকাটা বিলি করে দিয়েছে বিরূপাক্ষ। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকদের কাছে যাওয়া আসা করে তো বিরূপাক্ষ—বেশ বড়ঘরের মেয়েদের সঙ্গে ওর কারবার। বিরূপাক্ষকে বিয়ে করবার সময় এসব কথা ভেবে দেখিনি। টাকার কথাই ভেবেছিলুম শুধু। কিন্তু যে মানুষ পাই পয়সার থেকে পঁচিশ লাখে উঠতে পারে তার টাকা যে তার স্ত্রীরও প্রাপ্য নয়, সেটা বুঝে উঠতে পারিনি। এসব লোকের স্ত্রী থাকে না তো; কাউর স্ল্যাকস খুলতে হয় আঁটতে হয় শুধু—সারাদিন নানা রকমারি জায়গায়।

জিভ আর পেটের ব্যবহার রয়েছে। অন্য সব লোকের বেলায় বলা হয় চিন্তা ভাবনার চালনা রয়েছে; সূত্র সংকল্পের সন্ধান রয়েছে, কিন্তু জিভ ও পেটেরই নিত্যনিমিত্ত রয়েছে এ কথা বিরূপাক্ষদের দাড়ি কামিয়ে মুখ পালিশ করে ঘুরতে ফিরতে দেখলেই মনে হয়। অন্য কারো বেলা এমন বেয়াড়াভাবে মনে হয় না। মাথারও ব্যবহার আছে বিরূপাক্ষদের; স্টক একসচেঞ্জের সেই বাড়িটায় ঢুকে একটা অব্যক্ত পরিভাষায় চিৎকারের ভেতর, বাঘের গর্জন সিংহের গর্জনও নয়; যেন নিরবচ্ছিন্ন মড়ার দেশে কালে কালে শেয়াল হায়নায় হুল্লোড়। খুবই খাটুনি বটে এতে মানুষের মাথার। খুবই।

ওর সঙ্গে বেশি দিন থাকব না আমি। তবে চলে যাবার আগে কিছু টাকা নিয়ে যাব; ও দিতে চাইবে না কিছুই। তবুও নিতেই হবে। ওকে বিয়ে করে অসাধ অরুচি ঘেঁটেছি। ওর টাকা নিয়ে চলে যাওয়া সেই জিনিসেরই জের। কিন্তু কি করব, একটা জিনিস আরম্ভ করে মাঝপথ অবধি এসেছি, মাঝপথও ছাড়িয়ে গেছি, এখন মুড়ো দেখে নিতে হবে; না হলে কোনো ভালো নতুন সূচনার দিকে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না।

'শুধু টাকার জোরেই নয়, ধুনোর গন্ধের মত মা মনসার মুখে আমি লেগে লেগে থেকে তবে তোমাকে দখল করেছি। দু'বছর তুমি আমাকে কুকুরের মত দূর দূর করে তাড়িয়েছ যেখানে সেখানে যখন তখন যার তার সামনে—মনে নেই তোমার?'

জয়ন্তী কুরুশ কাঁটা দিয়ে কার্পেটে বুনছিল, হাতের নকশাটার দিকে তাকিয়ে থেকে কাজ করতে করতে বললে, 'কেন থাকবে না বিরূপাক্ষ—'

'তুমি আমাকে বিরূপাক্ষ বলছ যে—'

'ও কিছু না, সুবিধের জন্য বলেছি।'

'তুমি তো আমার চেয়ে কুড়ি বছরের ছোট।'

'বেশ, ডাকব না বিরূপাক্ষ তাহলে।'

'না না, একা ঘরে ওই নামেই ডেকো যখনই দরকার হয়। জিনিসটা তুচ্ছ নয়। জয়ন্তী আমাকে ডাকছে বিরূপাক্ষ—আমরা স্বামী-স্ত্রী তো বটেই, কিন্তু তুমি যখন আমাকে বিরূপাক্ষ ডাক, মনে হয় গোরানী ফিরিঙ্গি, মানিক জোড়া আমরা। সেবার এক গোরানী পর্তুগীজ ছুঁড়িকে ধরেছিলুম—'

—বলতে বলতে বিরূপাক্ষ টের পেল বেফাঁস হাওয়া সৃষ্টি করতে যাচ্ছে সে, কোনো দরকার নেই তো তার।

জয়ন্তী কোনো কৌতূহল বোধ করল না, মনটা আরো বেশি হাতের কার্পেটের নমুনার দিকে ঝুঁকে পড়েছে তার, জিনিসটাকে খুব সুন্দর জটিল শুভ্র করে তুলতে হবে।

'একটানা দু-দুটো বছর আমার ছায়া মাড়ালেও তোমার বমি আসত। মানুষ মানুষকে তাড়িয়ে দেয় যেটুকু দম খরচ করে, সেটুকু তাগিদও তোমার ছিল না।—আ হা হা হা হা—?' বিরূপাক্ষ বললে।

'তোমাকে বিয়ে করেছি তো তবুও—?' নিজের জীবনের ফাঁকা কথাটাকে একটু মুখের রস দিয়ে ভিজিয়ে নেবার চেষ্টা করে জয়ন্তী মনে মনে হাসতে হাসতে বললে।

'আমি করিয়েছি।'

'তা হবে; তোমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলুম আমি—ঘড়ির দোলক যেমন একদিক থেকে আর একদিকে দোলে।'

'ঘড়ির দোলক? তোমার কথাটা বুঝলুম না—'

'আচ্ছা, তেজী মন্দা বাজারের উপমা দিই নইলে, তুমি ক্লাইভ স্ট্রীটের মানুষ।'

'উপমা থাক', বিরূপাক্ষ জানালার বাইরের কলকাতার হয়রানি-কলতানির দিকে তাকিয়ে বললে, 'এমনি মুখের ভাষায় পরিষ্কার করে বল।'

'আমি আর কিছু বলতে চাই না।'

একটা কথা তবুও বলতে চাই আমি, অনেকবার বলেছি, তবুও বলি। কিছু মনে কোরো না। মনে যা ভাবি মুখে তা না বলে পারি না। তুমি ভয় পেতে আমাকে দেখে—ঘেন্না করতে। রাত দুটোর সময় তোমাদের বাড়ির দেয়ালের পাইপ বেয়ে তোমার ঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, তুমি ঘুমোচ্ছ। তোমার সমস্ত ঘরের ভেতর জ্যোৎস্না, জানালার শিক না ভেঙে ভেতরে ঢোকা যায় না; কিন্তু আমি তো রাহাজানের মত ছেনি হাতে ঢুকিনি ভেতরে ঢোকাও আমার উদ্দেশ্য নয়। তখনও ভাবতুম ও জিনিস আমার মত মুহুরীর ছেলের জন্য নয়। তোমাকে ছোঁয়াটোয়া নয়, কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে ত।'

শুনে জয়ন্তী কেমন একটা সেঁকো তিক্ততায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

'তুমি জেগে উঠলে জানালার খড়খড়িতে বিশ্রী শব্দ হচ্ছে বলে; চোখ চেয়ে দেখলে—ভাবলে চোর নাকি চিমড়ে, চীৎকার দেবার ক্ষমতাও হারিয়েছে, এমনই ভয়। তারপর যখন বুঝলে আমি তখন তোমার কোদার নাহান ভয় গোদার নাহান ঘেন্নায় গিয়ে দাঁড়াইল—হ্যা হ্যা হ্যা ঝয়োথি। কিন্তু তবুও—

বিরূপাক্ষ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'যখন তোমাকে বললুম জানালার ভেতর দিয়ে একটা চেক রেখে যাচ্ছি আপনার জন্যে, তুমি ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করেছিলে—কত টাকার?'

সিগারেটটা হাতে রগড়াতে রগড়াতে বিরূপাক্ষ বললে, 'বলেছিলুম, পাঁচ হাজার টাকার—'

জয়তী নিজের মনে নিজেকে বললে, 'সেইজন্যেই আমি নিয়েছিলুম। কিন্তু নিয়ে হাত পুড়ছিলো আমার। কিন্তু থোক অতগুলো টাকা পেলে নেব না? আমার কি দোষ? আমি কি দোষী নারী? একজন অঢেল টাকা নিয়ে দিনরাত গ্রহণে চড়াতে চাইলে কোথায় সে চাঁদ সূর্য যে এড়িয়ে যেতে পারবে...'

বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটা ভালো করে দেখে নিলে ক্রসড চেক নয় দেখে খুশী হলে ডিজঅনার্ড হবে না তো ঐ উচ্চিংড়ীর মত চোখের ড্যালা নেড়ে জিজ্ঞেস করলে; ক্যাশ দিতে পারি কিনা তখুনি, সেই অনুরোধও জানালে; আমি শুধু তোমার মুখের দিকে তাকিয়েছিলুম। এক্কেকবালে তাজ্জব মাইরা ভাবছিলাম যে আমিত্তির নাহান প্যাঁচে প্যাঁচে রস সেই জিনিসের হেইয়ার নাম ট্যাহা।'

বিরূপাক্ষ এই পূর্ববঙ্গীয় ভাষার অর্থ জয়তীকে ব্যাখ্যা করতে যেত না, বুঝতেও চাইত না জয়তী এ ভাষাটা বিরূপাক্ষের নিজের জন্যে, স্বগত, একান্তই আত্মরক্ষার ভাষা।

'সেদিন পঞ্চাশ হাজার টাকার চেকও দিতে পারতুম। ক্যাশও দিতে পারতুম। তোমার ঘরে কেউ ছিল না। পড়ি কি মরি করে দোতলার শিক ধরে, দেয়ালের পাইপ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলুম—যে কোনো মুহূর্তে টপকে পড়ে যেতে পারতুম—কাছেই ও দেয়ালে একটা দরজা ছিল, তুমি খুলে দিতে এলে না। ভালোই করেছিলে। টাকা তো পাঁচ হাজার দিয়েছিলাম মাত্র। পঁচিশ হাজার দিলেই দরজা খুলে যেত—তোমার বিছানায়ও জায়গা পেতুম—'

'ছি! ছি!'

'তুমি আমার স্ত্রী জয়তী।'

'ওখান থেকে উঠতে হবে না তোমার। কাছে এসো না। এসো না। বলছি। তাহলে এই জানালার ভেতর দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব—'

'লাফ দেবে? জানালায় তো শিক রয়েছে। কী হল তোমার!' জয়তী গালে হাত দিয়ে ঘাড় হেঁট করে বসে রইল। সমস্ত শরীর মন তার লেলিহান আগুনে কঠিন ধাতু পদার্থের মত গলে গিয়ে, বিশ্বম্ভর বরফের গহ্বরে কঠিন নিস্পন্দ হয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে আবার।

'ও, মুখ হাঁড়ি হয়ে গেল বুঝি। আমি তো কোনো অন্যায় কথা বলিনি। তুমি যদি আমার স্ত্রী না হতে কথাটা তাহলে বলে ফেলে লজ্জায় আমি ইঁদুরের গর্তে সেঁধুতাম গো। কিন্তু এখন তো তা হতে পারে না, তুমি যে আমার ঘরের বউ গো।'

বিরূপাক্ষ হেলে দুলে ভঙ্গি করে বরফের দেশের সাদা ভালুকের মত উল্লাস করতে গিয়ে কালো ভালুকের কবলিত ভালুকীর মত হাউমাউ করে উঠল। এ একটা বিশেষ বিশ্রুত খেলা তার বটে—অবসরের সময় চিত্ত তোষণের জন্যে। কিন্তু তবুও জয়তীর কোনো মন বা মুখের পরিবর্তন দেখা গেল না। বিরূপাক্ষের কথা—লীলালাস্য কি তার কানে পৌঁচুচ্ছে না? কিসের ভেতর ডুবে গিয়েছে সে?

'এ তিন বছরে তোমার সঙ্গে বসবাস করে আমার তিনটি ছেলেপুলে হেসেখেলে হতে পারত। আমিও ভাবছিলুম একে একে হবে সব—কিন্তু তুমি কি করছ কে জানে, যাক, ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। তবে ছেলেপুলে হলে ভালো হত। আমার পাওনা ছিল—খুব মোটা সুদেই। কসুর তো কিছু করা হয়নি—কোনো পক্ষের থেকেই।'

জয়তী বেরিয়ে যাচ্ছিল।

'আমি যাচ্ছি—ক্লাইভ স্ট্রীটের দিকে। যাবার আগে তোমাকে একটা চেক দিলে নেবে—'

জয়তী পাশ কাটিয়ে সরে যাচ্ছিল।

'পঁচিশ হাজার টাকার চেক—'

কানে তুলল না জয়তী। নিশির ডাকে বিমূঢ়ের মত কোথাও এগিয়ে যাচ্ছিল সে।

'আচ্ছা পঞ্চাশ হাজার টাকারই কেটে দিচ্ছি। আমার চেক কোনো দিন মার খায় না। এখুনি ক্যাশ করে নিতে পারবে চ্যাটার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। অস্ট্রেলিয়া চায়নার—যদি চাও।'

বিরূপাক্ষ মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল জয়তীর গতিপথের সীমারেখা দেখা দিয়েছে—সে আর চলছে না, থেমে আছে।

চেক বই হাতে নিয়ে কাটতে কাটতে বিরূপাক্ষ বললে, 'এই নাও পঞ্চাশ হাজার, কিন্তু একটা কথা আছে—'

জয়তী হাঁটতে হাঁটতে ছাদের কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, আরো হাঁটতে গেলে ছাদ থেকে পড়ে যেতে হয়; অন্য দিকেও মোড় ঘুরতে গেল না সে ঃ চেকটা নেবে কি সে; জয়তী কিছু মীমাংসা করবার আগেই তার হাতে গুঁজে দেওয়া হয়েছে—এমনভাবে যে হাত ঢিল করে ছেড়ে দিলে রাস্তায় উড়ে গিয়ে পড়বে চেকটা গুঁজে দিয়েই সরে গেছে বিরূপাক্ষ; পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক—বেয়ারার চেক—

'আজ রাতে আমার ঘরে শুতে হবে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'তুমি আমাকে জাল উইল দেখিয়েছ।'

'কে বললে?'

'পাকা উইলে কি আছে আমি দেখতে চাই—তোমার অ্যাটর্নি আর আমার অ্যাটর্নির সামনে বসে। দরকার হলে বদলে নিতে চাই।'

'বদলাবে তুমি?—কেন তোমাকে তো দশ লাখ লিখে দিয়েছি।'

পাঁচ লাখ পেলেই যথেষ্ট, কিন্তু পাওয়াটা পাকা কিনা সেটা বুঝে দেখতে হবে। আমার অ্যাটর্নির সামনে।'

'আমাকে বিশ্বাস হচ্ছে না? পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক যে এক্ষুনি দিলুম তোমাকে; মিথ্যে চেক? চলো ক্যাশ নিয়ে আসি।'

'আমি নিজেই ক্যাশ করে আনতে পারব।'

'আচ্ছা বেশ, খেয়েদেয়ে মন্মথকে সঙ্গে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া চায়না থেকে ভাঙিয়ে আনো। যদি চেক ডিজঅনার না করে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয় তাহলে আজ রাতে আলাদা ঘরে না শুয়ে, আমার ঘরেই ঘুমোবে।'

জয়তী বললে, 'কাল আমার অ্যাটর্নি আনব, তোমার অ্যাটর্নি থাকবে, পাকা উইলের কোথায় কি বদলানো দরকার ঠিক করে নেয়া যাবে।'

তেরো

রাত দশটার আগে সব দিকের সব ব্যবস্থা নিখুঁতভাবে শেষ হয়ে গেল, বিরূপাক্ষ দেখলে জয়তী তার ঘরে এসে কুশনে বসে আছে; ঘুমোয়নি; কোনো সঙ্কল্প নেই জয়তীর মুখে।

গত ছ'মাস ধরে এ জিনিস ঘটিয়ে ওঠানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। বাপের বাড়ির থেকে তিন চার দিন হল ফিরে এসেছে, কিন্তু এ তিন চার দিন জয়তী নীচে একটা আলাদা কামরার ভেতর থেকে সব দরজা বন্ধ করে দিয়ে শুয়েছে। বিরূপাক্ষ কেমন একটা ছায়া ছায়া মর্যাদায় আচ্ছাদিত হয়ে কিছু করে নি—কিছু বলেনি জয়তীকে। কিন্তু আজ টাকা দিয়ে কথা বলিয়েছে; এত রাতে বিরূপাক্ষের ঘরে আজ, কাল, একটানা মাস ছয়েক তো খুবই থেকে যাবে জয়তী। মাঝে মাঝে ধনবৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ না দেখালে মানুষ কি করে স্ত্রীধন পায় ক্লাইভ স্ট্রীটে একটা মোটা রকমের লোকসান দিয়ে এসে চিন্তিত ও চমৎকৃত হয়ে ভাবছিল বিরূপাক্ষ। শুয়ে পড়ল সে।

পরদিন বিরূপাক্ষ আর ক্লাইভ স্ট্রীটে গেল না।

দুপুরবেলা আজ সে একটা মাছরাঙা রঙের সোফায় বসেছিল—জয়তী মুখোমুখি কমলা রঙের সোফায়।

'জয়তী, কি বই পড়ছ?'

'আর্ট আর থিয়েটারের একটা বই।'

'ইংরেজি?'

'হ্যাঁ।'

'আমি বুঝব?'

'এরকম বই কি সকলে পড়ে?'

'ইংরেজি জানি না বলে বলছ?'

'না তা নয়,' জয়তী বল্লে, 'ভাষা জানা না জানার জন্যে নয়—' বলতে বলতে থেমে গেল।

'আমাকে বুঝিয়ে দিলে বুঝব না?'

জয়তী বইটার দিকে তাকাল। কোথায় পড়ছিল সে? গোড়ার দিকেই তো; বেশি এগোতে পারেনি; সেই গ্রীক থিয়েটার—

'তর্জমা করে শোনাবে আমাকে?'

'শোনাতে পারা যায়। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—এ বইয়ের ভাষায় তোমার বাধবে না তর্জমা করে দিলে। কিন্তু ভাষা কাকে নিয়ে?'

'মানে? কি বলছ, বুঝিয়ে বল।'

'একটা বইয়ের ভাষাই কি সব?'

'তোমার এ প্রশ্নের মানে কি হল?'

জয়তী দূরে শেলফের ওপর সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের ওপর একখানা আর অ্যারিস্টটলের পোয়েটিকস দুটো পাশাপাশি বইয়ের দিকে তাকিয়ে রইল। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বই দুটো। এগুলো এখানে এল কি করে? নিজেই এনেছে সে হাতে করে কোনো এক সময়—এবারে নয়, এর আগের বারে যখন এ বাড়িতে ছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষের সাহিত্যিক স্থূলতা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে আলঙ্কারিক, আরিস্টটলদের দিকে তাকানো দরকার ছিল না। আরিস্টটল; এ যেন মশা মারতে কামান দাগানো হল। কিন্তু কামান ওখানে নির্গুণভাবে পাতা রয়েছে; সগুণ হচ্ছে মশাটা। চক্কর মেরে মেরে কি যে ধুম্বন দিচ্ছে। ভনভন করে বলছে বিরূপাক্ষ, 'ও উপন্যাসটা এখন থাক।'

'পাতা থাকুক।'

'যে কোনো পুরুষ মানুষ যে কোনো স্ত্রীলোককে পেতে পারে, জানো জয়তী, দুটো জিনিস থাকা চাই সে পুরুষের—'

অগত্যা বইটা খুলতে হল আবার জয়তীকে।

চাকর তামাক সেজে দিয়ে গেল।

মেয়েটি দেখতে শুনতে খুবই ভালো হতে পারে; একটা হ্যাংলা ফোকলা মিনসে তবু তাকে লটকাবে, খুব বড় পণ্ডিত মেয়েকে একটা বোকা পাঁঠা এসে চার দিয়ে খসিয়ে নিয়ে যাবে জয়তী, বড় জাতের মেয়েকে ছোট জাতের ন্যাকা ক্যাবলা এসে গুণ করে ফেলবে, এমন কি সে রূপসী বয়সেও বড়—গুরুস্থানীয়—শিং ভেঙে এঁড়ে বাছুরের সঙ্গে ভিড়ে যাবে সে। না গিয়ে করবে কি সে। কোনো মানুষ যদি কড়া তাগিদে একটি মেয়েমানুষের ছায়ায় ছায়ায় দিনরাত ঘোরে, তাহলে নিত্য নধর মাছ কাটতে কাটতে এমনই জেল্লা খুলে যাবে আঁশবটির যে পরস্পরকে ছাড়া তাদের আর চলবে না—চলবেই না—'

বিরূপাক্ষ নলটা মুখে তুলে নিয়ে না টেনে হাত ঝেড়ে পর্বতের মত সেটাকে মেঝের ওপর

ফেলে দিল।—শরীরটা সাপ খেলিয়ে নাচিয়ে নিল বেশ এক দমক? কেমন একটা আমেজ বোধ করেছে যেন, ভারি ভালো লাগছে। স্নিগ্ধ, রসিক উন্মুক পুরুষের মত চোখ দুটো ঘুরিয়ে নাচিয়ে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'প্রেম ছাড়া আর কি শিবরাত্তিরে জয়ন্তীর বিরূপাক্ষের মন্দিরে যাওয়া? ডাকবে পাখি, ডাক ডাক—ডেকে ওঠ। গা রে পাখি, গান গা, গান গা; কোন গান ভালো লাগে তোর?—গু-গু-গুণমণি দ্-দা-দাসী তব পায়! গুণমনি দাসী তব পায়।'

বিরূপাক্ষ মাথায় একটা প্রবল ঝাঁকি দিয়ে প্রকৃতিস্থ হয়ে বসে নল তুলে নিয়ে তামাক টানল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে আস্তে আস্তে বল্লে, 'একটা পাখি লক্ষ বছরে একবার এসে একটা পাথরে ঠোঁট ঘষে যেত। কিন্তু কোটি কোটি বছর পর দেখা গেল পাখির ঠোঁটঘষায় সে পাহাড় ক্ষয়ে গেছে। তাই যদি হয় তাহলে আজ একটা—কাল একটা—পর্শু একটা—তারপর দিন একটা—ছোট ছোট প্রমিসরি নোটের ঘষায় মেয়েমানুষের বিমুখতার ক্ষয় হবে না কেন? তোমাকে বিয়ে করবার আগেও আমি জানতুম যে কোনো একজন স্ত্রীলোকের পেছনে লেগে থাকলে মেগে খেতে হবে না—সেই মেয়ে লোকটিই হবে আমানি। কিন্তু জেনেও ওয়াকিবহাল ছিলুম না। কিন্তু তোমার বাবা মত দিলেন, তুমি মত দিলে আমাদের বিয়ে হল, হিন্দু মতে হল, হিন্দু আইনে হল, হিন্দু নারীর বিয়ে হল, সবই মুঠোর ভেতর এল, আমি বুঝতে পারলুম আমি যা ভেবেছিলুম তাই-ই ঠিক'—বলে মেয়েটির দেবী শরীরের চেয়েও অপরূপ একটা কাম শরীরের দিকে তাকাতে তাকাতে চোখ দুটো লুব্ধ করে উঠল বিরূপাক্ষের। লোলুপ চোখে গড়গড়ার নল কুড়িয়ে নিয়ে চোখ বুজে নিজের স্নায়ু শিরায় রক্তের তিরতির ঝিরঝির তিরতির ঝিরঝির স্রোত অনুভব করতে করতে বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে তামাক টানতে লাগল।

'বর্ণভেদ আমি মানি, তুমি অবিশ্যি মান না। কিন্তু তুমি ধনী বামুনের ঘরের মেয়ে, আমি হচ্ছি শূদ্রের ছেলে; তবুও তোমাকে পেতে হল আমার।'

নল ফেলে দিয়ে বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল। গড়গড়ার কলকিতে তামাক হয় তো পুড়ে নিভে গিয়েছিল।

বিরূপাক্ষ সিগারেটে দু একটা টান দিয়ে সেটাকে অ্যাশট্রের ভেতর চেপে দুমড়ে ঠেলে দিয়ে বল্লে, 'তোমার বাবা জানতেন আমি শুদ্দুর তুমিও জানতে, কিন্তু আমার উপাধি রায়, আমাকে সকলের কাছে বামুন বলে ভাঁড়িয়ে হিন্দু মতে বিয়ে দেওয়া হল। এটা যে কী ল্যাজে গোবর হল বুঝতে পারলুম না। কেন, রেজিস্টারি করে করলেই হত। আমি তো তাই বলেছিলুম। আমি ইস্ট বেঙ্গলের লোক, নমঃশূদ্র, তোমরা এদিককার বনেদী বড় ঘরের বামুন, তোমাদের আত্মীয় বন্ধুরা আমাকে দেখেননি কোনদিন চেনেন না জানেন না—জানতেও চাইলেন না, তোমরাও ভোগা দিলে বেশ কিন্তু—কালোবাজারের পঁচিশ লাখ ট্যাহা এমন ঘন বাইয্যার খানালোর ব্যাঙের নাহান জাইন্দর দিয়া কথা কর ঝোয়থি!'

চাকর ঘরে ঢুকল।

'হুজুর।'

'তামাক সেজে নিয়ে আয়।'

'হুজুর' বলে সে গড়গড়া নিয়ে চলে গেল।

'অবিশ্যি আজকাল বর্ণভেদের কোন মানে নেই। এ যুগটাও সব দিক দিয়েই মুখিয়ে চলেছে। দাও ধোলাই চোলাই করে সব; একটা ফলাও বিপ্লবের কত্তা আমি। রুধিরের গন্ধে বাঘের মত হয়ে গেছে মন, একটা দুর্দান্ত দিকশূল না ছেড়ে আমি ছাড়ব না। এই পচা সমাজকে পচিয়ে দিতে হবে আরো—লাথি মেরে লৌলাট করে দিতে হবে—শুরু হবে এইটিনথ ইন্টারন্যাশনাল। থার্ড ফোর্থ ফিফথে কিছু হবে না—এইটিনথ।'

চাকর তামাক দিয়ে গেল।

'দোরটা বন্ধ করে যা। মন্মথ কোথায়? বাজারে? দোরটা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিস শশী।'

বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করা কাকে বলে শশী তা জানে। সে কুলুপ এঁটে চলে গেল।

'এরকম আটকানো থাকবে?' জয়তী বল্লে।

'থাকুক না।'

'এখন তো দিনের বেলা। আমার বেরুতে হবে তো।'

'কোথা যাবে? এ বাড়িতে কে আছে?'

জয়তী জানালার ভেতর দিয়ে দূর কৃষ্ণচূড়া দেবদারু কলকাতার রাস্তার বড় ধোঁয়াটে চক্ষুস্থির গাছগাছালির দিকে তাকিয়ে রইল। যা খুশি বিরূপাক্ষ করুক—করে যাক। কিন্তু এ সব আর বেশিদিন চলবে না। অ্যাটর্নি অবিনাশবাবু খুব বুঝদার মানুষ। বিরূপাক্ষ লোকসান দিয়ে দেউলে হবার আগেই অবিনাশবাবুর দপ্তরে বসে আইন ঠিক করে নিয়ে গুছিয়ে সরে পড়বে সে। ভাবছিল এই সব জয়তী। কিন্তু তবুও বাইরের পৃথিবীতে নিজের প্রাণের ত্রিসীমারও কোথাও কোনো উৎসাহ খুঁজে পেল না সে। কী হবে জীবন চালিয়ে। টাকা দিয়েই বা কী হবে। বয়সের সবচেয়ে ভালো সময়টাকেই একটা পাখি বানিয়ে আকাশে ছেড়ে না দিয়ে চোখ উপড়ে মাটিতে ফেলে দিল জয়তী; গাইয়ে পাখিটাকে খুপরীতে ঠেলে দিল তারপর; অন্ধকারে ভাল গান হবে বলে। ভালো গান হবে বটে—কিন্তু অধিকতর অন্ধকারের দরকার—মনস্থিরতর শূন্যতার; বিরূপাক্ষের ছোঁয়াচের থেকে অনেক দূরে; তার বাবার ওখানেও নয়; অন্য কোথাও; মৃত্যু এসে মানুষকে তার মনস্থিরতম শূন্যতা দান করবার আগে।

'দেয়ালের পাইপ বেয়ে প্রথমবার তোমার সঙ্গে সেলামী দিয়ে দেখা করতে হয়েছিল। তারপর আরও দশ বারো বার উঠতে হয়েছিল আমাকে ঐ পথ ধরেই। অথচ এমনি দুর্দান্ত তুমি যে একদিনের জন্যেও দোর খুলে দাও নি। তোমার এই বুনো ওলের মত ঠেকার দেখেই আমার এই বাঘা তেঁতুলের মত কামড়। জানোয়ারের মতন কিংবা দেবতার মত। দেবতার মতই—তাই তোমার মত দেবীকে—মানে, ইয়ে—দেবিকা রাণীকে লাভ করেছি আমি। নাও এসো বিছানায়।'

বলে খুব সুভদ্রতা বজায় রাখবার চেষ্টা করে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে নির্বাক হয়ে বসে রইল বিরূপাক্ষ। অশ্লীল আগোছালো সে হবে না—যদিও তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার অজ্ঞাতসারেই শালীনতার নিগূঢ় অভাবের ভেতর থেকেই জন্মলাভ করেছে—মনকে জন্ম দিয়েছে তার।

'তোমার পরমাইদের কথা মনে পড়ছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'পবমাই' মানে, প্রেমিক—বিরূপাক্ষের ভাষায়; জয়তী শব্দটা শোনেনি; মনে পড়ল তার; অর্থও মনে পড়ল।

শশী দরজায় তালা মেরে গেছে—তার আটটা-নটার আগে খুলবে কিনা সন্দেহ। আফিং খাওয়া সিংহীর মত ঐ শেয়ালের লালসায় জারিত হওয়ার সময় তার এখন; সিংহীর মতই প্রতিরোধ করবার সময়।

'তোমার পরমাইদের মধ্যে একজনের নাম ছিল সুতীর্থ মনে পড়ে?'

সুতীর্থের কথা মাঝে মাঝে ভেবেছে জয়তী। বিরূপাক্ষের মুখে সুতীর্থের কথা শুনে মনে পড়ে গেল আবার। নিজের মনকে বললে জয়তী ঃ আমার চেয়ে বয়সে এত বড় সুতীর্থ? কী করে তা হলে তার সঙ্গে আমার—থেমে, ঠেকে থেকে, জয়তী তারপর আবার ভাবছিল ঃ আমি তো ইউনিভার্সিটির ছেলেদের সঙ্গেই মিশতুম, কেউ কেউ আমার থেকে ছোট, কেউ কেউ দু'চার বছরের বড়। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লাগত সুতীর্থের কাছে বসে থাকতে, কথা বলা হত, চুপচাপ বসে থাকা হত, সত্যি সে সব নিস্তব্ধতার ভেতর ওর মাতৃ আর আমার পিতৃগ্রন্থি আর সব নীড়, নক্ষত্র কথা বলে উঠত যেন—সে সব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা এ পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে আজ। কোথাও নেই আর। আমি বুঝতাম একদিন, সুতীর্থ বুঝত।

'আমি তো তোমার চেয়ে কুড়ি বছরের বড়। আমি অবিশ্যি তোমার পরমাই ছিলুম না জয়তী, ওসব ভিটকেলেমি আমার ছিল না; খোকার বাবা হতে চেয়েছিলুম কিনা।' বলে বিরূপাক্ষ একটু

চুপ করে থেকে যেন বললে, 'কিন্তু সুতীর্থ তোমার জন্মে জন্মে ধান খেয়েছে জয়তী; ওর এক আলাদা মায়া। বছর পনেরো কুড়ির বড় হলেও সে যেন তোমার বাপের চেয়ে ভাইয়ের চেয়ে গর্ভের ছেলের চেয়ে বেশী এমনিভাবেই মিশেছে তার সঙ্গে। সুতীর্থ কবিতা লিখত।' বিরূপাক্ষ বললে।

'লিখত তা কি হত। ছড়া কবিতা দিয়ে কি হবে।' 'আমার কিছু হবে না, কিন্তু পরমাইদের তো হয়। আজকালকার পৃথিবীতে বোলতা, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই প্রমিসরি নোট খায়, চেক খায়, চিনি মিশ্রি খেতে চায় না, তবু ও মাঝে মাঝে গায়েন বায়েনদের ওখানে উড়ে যায় একটু আধটু সরুচাকলি খাবার জন্য—'

'সুতীর্থের কথা হঠাৎ জিজ্ঞেস করছি কেন তোমাকে জান জয়তী?'

জয়তীর দিকে তাকাল না বিরূপাক্ষ। সিগারেটে কয়েকটা টান দিয়ে অবশেষে ঘরের ভেতর বিচ্ছুরিত সূর্যকিরণের একটা সুদীর্ঘ ফলার দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, ভাবছি তাকে নেমন্তন্ন করে একদিন আনব এখানে। অনেক দিন তোমার পুলক দেখিনি। সুতীর্থের সঙ্গে কথায় কথায় লেগে গেলে বুলবুলির লড়াই করে কি রকম লাল হয়ে উঠতে তুমি—সে লাল এই তিন বছরের ভেতর কই একদিনও তো দেখি নি আর। অবিশ্যি সেটা ছিল ঝগড়ার—ইয়ে, বিবিছাড় ঝগড়ার পুলক ঝুটিয়াল বুলবুলের সঙ্গে। আমার সঙ্গে তোমাকে পুলকিত হতে হয়েছে বর্ষাকালের নাউক্ষেতের কাঁকড়ানীর মত, আমি ক্যাঁকড়াদের রাজা গো।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালাল।

চৌদ্দ

ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুতীর্থকে ডেকে বল্লে, 'বসুন।'

'আমার ঘরেই চলুন।'

'না, সেদিন গিয়েছিলুম।'

'হাতে অনেক কাজ বিজনহরিবাবু, চলুন আমার ঘরে, কাজ করতে করতে আপনার সঙ্গে কথা হবে।'

'কাজের মালিক কে বলুন'—নিজেরই চেষ্টায় এখন গলার স্বর স্থিত, ঠাণ্ডা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের।

'মালিক অবিশ্যি আমি নই, আপনিও নন, মজুর, মুদ্দোফরাস আর্দালি বেয়ারা থেকে শুরু করে আমরা সকলেই মালিক। এটা মেনে না নিলে কাজ করতে পারব না।'

'পারবেন না? এই তো সম্প্রতি একটা স্ট্রাইক চলছে—'

'স্ট্রাইক? কোথায়?' সুতীর্থ চেয়ার টেনে টেবিলের ওপর কনুই পেতে মনোযোগ দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের দিকে তাকাল।

'অত ব্যস্ত হবার কিছু নেই', ম্যানেজিং ডিরেক্টর সতর্কভাবে বল্লে, 'আমাদের কারু কিছু লাভক্ষতি নেই তাতে। এই তো সেদিন ট্রাম স্ট্রাইক হল—'

'ট্রাম স্ট্রাইক—ও।'

'আবার হচ্ছে। ওতো গৃহিণী রোগ, ও সারবে না। ও-সব রাজ-রাজড়ার কারবার—আমরা তো—কিন্তু শুনেছেন কি আমাদের ফার্মে স্ট্রাইকের সম্ভাবনা—'

সুতীর্থ শুনেছিল বইকি। সে তো এ নিয়ে বক্তৃতাও দিয়েছে, পরামর্শ দিয়েছে, ধর্মঘটের দাবিদাওয়া ঠিক করেছে কিছু কিছু।

'নিন সুতীর্থবাবু।' সিগারেটের টিন এগিয়ে দিল সুতীর্থকে।

'শুনেছি বইকি। তা শুনলাম নাকি শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট হবে না—' সুতীর্থ সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিল।

'কে বল্লে?'

'যারা স্ট্রাইক করবে তারাই বলছিল—'

'শুনলাম আপনার পরামর্শে ওরা ওঠে বসে।'

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বল্লে, 'না, অতটা নয়, আমি তো ট্রেড ইউনিয়নের কেউ নই। কোনোরকম পোলিটিক্যাল পার্টির সঙ্গেও আমার কোনো সংস্রব নেই। আম একজন নিতান্তই বাইরের মানুষ। আমার কথা কে শুনবে?'

'কিন্তু আপনি কথা বলতে যান তো।'

'যা দরকার মনে করি তা বলি।'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর বেল টিপতেই বেয়ারা এল। 'হুইস্কি—'

'ও আমি খাব না—' সুতীর্থ বল্লে।

'আপনাকে আমি তো ঘুষ দিচ্ছি না যে খাবেন না। ঘুষ খাবার লোক আপনি নন। তবে মর্শ্বী হুইস্কি খেতে পারেন।'

সুতীর্থ জ্বলন্ত সিগারেটটা সিলিঙের দিকে ছুঁড়ে মেরে বল্লে, 'না, ও আমি খাব না।'

মল্লিক একটু চকিত হয়ে বল্লে, 'ওটা ওদিকে ছিটকে ছুঁড়লেন যে। এই তো অ্যাশট্রে ছিল। এই তো চায়ের পেয়ালা ছিল—'

'একটু মজা দেখলুম—'

'ওদিকে অনেক কাগজপত্র—অগ্নিকুণ্ড না হয়, দেখুন তো সিগারেটটা কোথায় গিয়ে পড়ল—'

'পড়েছে কোথাও। আগুন লাগবে না। লাগতেও পারে।'

'আমি কি এ ফার্মের ম্যানেজিং ডিরেক্টর নই?'

সুতীর্থ ম্যানেজিং ডিরেক্টরের টিন থেকে আর একটা সিগারেট বার করে নিয়ে দেশলাই খুঁজছিল। কোনো কথা বল্লে না।

'আপনি ধর্মঘটিদের কি পরামর্শ দিয়েছেন?'

'বলেছি তোমাদের খাওয়া পরা থাকার যা দুরবস্থা, তাতে ধর্মঘট করে এই নচ্ছার ফার্মটাকে ন্যাজে মুচড়ে আছাড় মারা ছাড়া তোমাদের অন্য কোনো উপায় নেই—'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফুটন্ত নলেন গুড়ের পায়েসের মত মুখে ধ্বকটা দমিয়ে রাখতে রাখতে বল্লে, 'এর জন্যে তো আপনার এই মুহূর্তেই চাকরি যেতে পারে।'

'যাক।'

চন করে মাথায় রক্ত উঠেছে বলেই মাথাটা ঠাণ্ডা করে নেওয়া দরকার। কিছুটা ঠাণ্ডা করে নিল; দু-এক মিনিট চুপ করে থেকে, তারপরে আস্তে আস্তে মল্লিক বল্লে, 'স্থিরভাবে কাজ করবেন, সব দিক থেকে দেখে শুনে স্থির হয়ে—'

'তাই তো করছি তা না হলে রিসিভিং এণ্ডে বসে এখানে কি বসে থাকা সম্ভব হত আজো আমাদের। আমরা তো বেশ সুখাসনে বসে আছি ম্যানেজিং ডিরেক্টর।'

'ওদের কোনো কিছু পরামর্শ দেবার আগে ডিরেক্টর বোর্ডের সঙ্গে আপনার কথা বলে দেখা উচিত ছিল। আপনি তা করেন নি, আমাকেও কিছু বলেন নি। অথচ দাবি-দাওয়া ঠিক করেছেন স্ট্রাইকারদের। আপনি এই ফার্মের একজন অফিসার নন?'

সুতীর্থ বল্লে, 'এ সব প্রশ্নের কোনো মানে হয় না মিস্টার মল্লিক। আমি তিনশো টাকা মাইনে পাই বটে, কিন্তু এই শীতের রাতে আমার চাকরীটাকে গরম কোটের মত গায়ে দিয়ে বেড়াবার শখ

আমার নেই। যত দিন এই ফার্মের কুড়ি-পঁচিশ টাকা মাইনের লোকগুলোর কোনো সুরাহা না হয়, ততদিন আমার চাকরী—'

বাধা দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর বল্লে, 'এ-সব কথা আমাকে আগে বলা উচিত ছিল আপনার।'

'আমি কেন বলব? ওদের ডেপুটেশন কি সারাটা বছর আপনাকে বলেনি?'

'তা বলেছে।' মল্লিক কিছুক্ষণ চুপ করে ব্লু-বুকগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে তারপরে বল্লে, 'কিন্তু ওদের সঙ্গে, এ নিয়ে বোঝাপড়ার সময় কেটে যায় নি আমাদের—আপনি মাঝখান থেকে ওপর-পড়া হয়ে কি করে এলেন? এলেন কোত্থেকে? আপনি তো টি-ইউ-সির মেম্বারও নন। কোনো পোলিটিক্যাল পার্টির ধার ধারেন না। অথচ চাকরী ছাড়া চলে না। বিনে চাকরীতে তটের ওপর দিয়ে আপনার নৌকো চালিয়ে নেবে আপনার শ্বশুরের মেয়ে?'

মল্লিক চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল ঃ কয়েকটা দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে জ্বালিয়ে নিতে সময় লেগে গেল; দেশলাইয়ের আগুনে ছোলা মাংসের চাঙড়ের মত দেখাচ্ছিল মল্লিকের মুখটাকে। মেজাজ সহজ স্বাভাবিক করে নিতে হবে, উত্তেজিত না হয়ে শান্তভাবে কথা বলতে চেষ্টা করার ইতিহাস তার দশ বারো বছর ধরে চলেছে, কিন্তু এখনও সময়ে অসময়ে বারুদে আগুন লাগিয়ে বসে বুদ্ধি সুদ্ধি গলার আওয়াজ। না না ওরকম করে হবে না।

'আপনার এসব চলবে না সুতীর্থবাবু।'

'না যদি চলে কাজ ছেড়ে দেব।'

'ছাড়িয়ে দেব।'

'আমি ওদের দলে—'

'বেশ। চলে যান।'

'সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল।'

'কিন্তু চলে যাবার আগে'—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নিজের শরীরটাকে একটু বাঁকিয়ে ঘুরিয়ে খেজুরের রসে পাকানো গোলাপছড়ির মত মোচড় খাইয়ে নিল বার কয়েক; চোখ দুটো ভাসিয়ে, ঘুরপাক খাইয়ে নিল সমস্ত মুখে—কানে কপালেও যেন বিদ্যুতের গতিতে।

হঠাৎ একটা গা ঝাড়া দিয়ে, মল্লিক বল্লে, 'আপনি মিঃ ম্যাকগ্রেগরকে চেনেন?'

'কোন ম্যাকগ্রেগর?'

'কোনো ম্যাকগ্রেগর?'

সুতীর্থ দেয়ালের দিকে সরে গিয়ে প্রায় দেয়ালে পিঠ রেখে কপালের চামড়ায় চামড়ায় একটু ভেবে বল্লে, 'কৈ, না তো।'

'মনে করতে পারছেন না। আজ হল শুক্কুরবার। মঙ্গলবার রাত্ত আটটার পর রাসেল স্ট্রিটে যে সাহেবের সঙ্গে আপনি ডিনার খেয়েছেন, দুচার পিপে হুইস্কি বরবাদ করেছেন তার নাম কি?'

'ওঃ', সুতীর্থের মনে পড়ল। 'তা, আপনি কি করে জানলেন?'

'সে সব আমাদের জেনে নিতে হয়।'

'হ্যাঁ, ওর নাম ম্যাগগ্রেগরই তো। দেখি, ওর কার্ড তো ছিল আমার পকেটে।'

সুতীর্থ তার ওভার কোটের অগুণতি পকেট খুঁজে খুঁজে হয়রান হতে লাগল।

কনকনে শীতের ভেতরেও মুখচোখ কপাল ঘেমে গেছে দেখে মল্লিক নরম গলায় বল্লে, 'যাক যাক, সুতীর্থবাবু কার্ড কি হবে। ও আমাদের দেখা আছে। শুনুন, ম্যাকগ্রেগারের সঙ্গে আপনার বেশ দহরম আছে শুনলাম।

'না এমন কিছু নয়।'

'ওর মেমসাহেবের সঙ্গে?'

'মেম সেদিন ছিল বটে টেবিলে। ভালো মানুষ। এর চেয়ে বেশি আর কি। এর বেশি পরিচয়

ওদের সঙ্গে আমার নেই।'

'শুনলাম আপনাকে আবার ডিনারে ডেকেছেন ওঁরা।'

'ওটা ভদ্রতা—কিংবা বেশি কিছু—হতেও পারে। মানুষ ওরা গুড সর্ট। আমিই পাল্টা ডিনার দিতে ভুলে গেলুম। বড্ড বেকুবিই হয়েছে—'

সুতীর্থ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে আনাচে কানাচে চোখ বুলিয়ে শানিয়ে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বল্লে, 'কিন্তু চালচুলো নেই, কোথায়ই বা ডাকি ওদের।'

'বেশ তো, ফার্মের হোটেলে ডাকুন না। আমিও যাব।—আমি টাকা দেব—আমি যত লাগে দেব আপনার নাম করে—'

'কেন ব্যাপার কি?'

'বসুন।'

বেয়ারা হুইস্কি নিয়ে এল।

'ভাঙব? খাবেন?'

'সুতীর্থ বিরক্ত হয়ে হেসে মল্লিকের চোখ এড়িয়ে দেওয়ালের একটা ক্যালেণ্ডারের চিত্রিত সমুদ্র-নীলিমার এপার-ওপারের দিকে তাকিয়ে—ওপার-এপারের দিকে বেশি নিবিষ্ট হয়ে তাকাতে যাচ্ছিল যখন, মল্লিক বল্লে, 'মানে ম্যাগগ্রেগর সাহেবকে ধরে খুব একটা বড় কন্ট্রাক্ট নেব।'

'কন্ট্রাক্ট? কিসের?'

ম্যানেজিং ডিরেক্টর নাকি সুরে বল্লে, 'ধনা চোরের আর মনা চোরের। হাঁ করে দাঁড়িয়ে তেলো চাটলেই কি আর সব কথার—ইয়ে—আসুন—চলুন—ফার্পোতে যাই, খাওয়া দাওয়া মদ মালেব ভেতর কি হবে না হবে নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবেন।'

'মদ, মাল?'

'মাল।'

'এল কোত্থেকে?'

'ও কিছু নয়; কথার প্যাঁচ। আগামী মাস থেকে আপনার মাইনে হবে পাঁচশো টাকা। যান—কাজ করুন গিয়ে। ভেরি হেভি ডে। বাই দা বাই জয়তীকে চেনেন আপনি?'

'জয়তী? কে সে?'

'বিরূপাক্ষকে চেনেন?'

সুতীর্থ উত্তর দিতে একটু দেরী করে ফেল্ল, 'এক বিরূপাক্ষকে চিনতুম বৈকি।'

'তারই স্ত্রী।'

'না, তার স্ত্রীর সঙ্গে আমার আলাপ নেই।'

'স্টক এক্সচেঞ্জে দেখা হয়েছিল বিরূপাক্ষের সঙ্গে সেদিন। আপনার কথা বল্লে অনেক। ওর স্ত্রীর সঙ্গে আপনার মিষ্টি সম্পর্ক ছিল বল্লে।'

'ওর স্ত্রীকে কোনদিন দেখিনি আমি।'

কারু স্ত্রীর কথা নয়—আকাশ বাতাস চারিদিককার এপক্ষের কথা ভাবতে চিন্তিত ও বিষণ্ণভাবে সুতীর্থ নিজের কামরার দিকে চলে গেল।

পনেরো

'কে তুমি সুতীর্থ? এতদিন ছিলে কোথায়?'

সুতীর্থের কুশনে বসেছিলেন মণিকা। সন্ধ্যে উতরে গেছে, বাতি জ্বালানো হয়নি। শীত কমেছিল বটে, কিন্তু আজ আবার পড়েছে বেশ। মণিকার গায়ে সুতীর্থের রাগ।

'বাঃ, বেশ তো তুমি, এতদিন কোন ঘাপটিতে ছিলে? আসনি কেন সুতীর্থ?'

আগন্তুক সহসা কোনো উত্তর দিচ্ছিল না।

'এতদিন কি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়েছিলে নাকি? দেখ, তোমার চরিত্রে সন্দেহ হয় আমার—তুমি এরকম করছ কেন সুতীর্থ—তুমি কি জান না—?'

কেমন একটু অস্পষ্ট প্রেরণায় টলমল করে উঠে কোনো এক কথা বুদ্ধিকে ঠকাচ্ছে বলে প্রাণকে ঠকাতে চেষ্টা করে মণিকা ঢোঁক গিলে বল্লে, 'বয়স হয়েছে আমার। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ আছে। কাঁহাতক তোমার হয়ে ঘরদোর সামলাতে পারি আমি। তুমি যে কোথায় বেরিয়ে যাও—'

'আমি—'

'ওমা, এ কে?' ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন মণিকা, তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে নিয়ে অস্ফুটে বল্লেন 'এ তো সুতীর্থ নয়। কে আবার এল।'

সাঁ করে উঠে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে বাতি জ্বালিয়ে বিরূপাক্ষের মুখোমুখি এসে স্তম্ভিত হয়ে মণিকা বল্লেন, 'কে? কে আপনি?'

'আমি—বিরূপাক্ষ—সুতীর্থের খোঁজে এসেছিলাম—'

বিরূপাক্ষের আগাগোড়ার দিকে তাকিয়ে মণিকার মনটা কেমন একটা বিরক্তি, উপেক্ষা নৈরাশ্যে ভরে উঠল।

'তাই তো আমি মনে করেছিলুম সুতীর্থ এসেছে বুঝি। কিন্তু কে—'

বিছানার কিনারে সরে দাঁড়িয়ে মণিকা বল্লেন, 'সুতীর্থ তো সাত-আটদিন ধরে বাড়িতে আসেনি।'

'বসুন।'

'না, আমি এখন ঘরে যাব। আপনার কি দরকার বলুন তো—' মণিকা বল্লেন।

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'বলে যায় না।'

'এখানে থাকে তো?'

'আজকাল? হ্যাঁ, থাকে অবিশ্যি, তবে চালা বেঁধে থাকে না। কোথায় উবে যায়—দশ-পনেরো দিনের ভেতর দেখাই পাওয়া যায় না। কোথায় যায়—কোথায় থাকে—কি করে—কিছুই জানতে পারি না। আপনি কে? দেনদার?'

'আজ্ঞে না।'

'তবে?'

'আমি সুতীর্থের অনেক কাল আগের পরিচিত মানুষ।'

'বন্ধু? বসুন। দাঁড়িয়ে রইলেন যে।'

'বসব বলেই তো এসেছিলুম।'

ঘরের একটা কৌচের ওপর বসে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'বন্ধু আমি নিজেকে বলতে পারি না। ওরা হল বিদ্বান মানুষ—ওদের সঙ্গে কি আমাদের মতে দ্বারপণ্ডিতের বন্ধুত্ব সাজে।'

বিরূপাক্ষের গলায় কেন যেন কেমন একটা আন্তরিক নালিশের আমেজ পাওয়া যাচ্ছিল। সুতীর্থ যদি এখানে থাকত তাহলে অবিশ্যি অনুভব করত কিরকম অহেতুক ও অসার বিরূপাক্ষের এই গলার আওয়াজ—কথাবার্তা।

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ও আমার বাড়ি মাড়ায়নি। এই মাস তিনেক আগে মিনিট কুড়ি পঁচিশের জন্যে একবার পায়ের ধুলো দিয়েছিল মাত্র; তাও রাস্তায় দেখা হয়েছিল—ঘাড় ধরে নিয়ে গেছলুম বলে। ভেবেছিলুম আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওর আলাপ করিয়ে দেব—'

'আপনি পরিবার নিয়ে এখানে থাকেন বুঝি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আজকাল কলকাতায় ছেলেপুলে সংসার নিয়ে থাকা। বাড়ি পাবেন কোথা? এও তো ব্ল্যাকমার্কেটে চড়েছে! মুদি-মোদ্দাফরাসের না, ওটা হচ্ছে কসায়ের কালোবাজার—' আস্তে করে বল্লেন মণিকা।

সে কথায় কান না দিয়ে বিরূপাক্ষ বল্লে, 'যে মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে তার সঙ্গে সুতীর্থের আগের আলাপ খাতির-টাতির ছিল। কিন্তু ও জানে না সে জয়তী আমার স্ত্রী। ওকে তা জানিয়ে দেবার জন্যেই ধরে বেঁধে নিয়ে গেছলুম, কিন্তু ওর সবুর সইল না। একটা কেলেঙ্কারী করে বেরিয়ে গেল সেদিন। আর দেখা নেই—'

মণিকা খানিকটা নিবাদ হয়ে বল্লেন, 'কি কেলেঙ্কারি?'

'আমার মনে হয়েছিল মদ খেয়েছিল।'

'মদ? সুতীর্থ? মদ তো ও খায় না।'

'তা হবে। আমাকে তেড়ে এসে জড়িয়ে ধরলে—বল্লে, আমার স্ত্রী আমাকে কী যে ভালবাসে বিরূপাক্ষ—'

'কার স্ত্রী?' বিচক্ষণভাবে বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে মণিকা জিজ্ঞাসা করলেন।

'ওর স্ত্রী; সুতীর্থের স্ত্রী।'

'সুতীর্থ কি বিয়ে করেছে।'

'তা না হলে স্ত্রীর কথা বলবে কেন?' বিরূপাক্ষ আস্তে আস্তে বল্লে—নম্র সুজন চোখে ঠোঁটে একটু হাসি ছড়িয়ে।

মণিকা খোঁপার ওপরে আটকানো ঘোমটা মাথার দিকে—কপালেব দিকে খানিকটা টেনে নিয়ে আবার কিছুটা সরিয়ে দিয়ে, কি যেন বলবেন মনে করেও বল্লেন না। তৎক্ষণাৎ—কিন্তু তবুও বললেন 'আপনারা তার ছেলেবেলার বন্ধু জানেন না সুতীর্থ বিয়ে করেছে কিনা?'

'গত তিন-চার বছরের মধ্যে ওর সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি। কি করেছে না করেছে জানি না। এর আগে বিয়ে করেনি।'

'ঠিক জানেন?'

'জানি বৈকি।'

'তাহলে আর করেনি।'

মণিকার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বিরূপাক্ষ তার মুখের দিকে ভালো করে তাকাল। প্রথম দেখেই তাক লেগে গিয়েছিল বিরূপাক্ষের, এখন সে 'হয়নি, এরকম হতে পারে না' অনুভব করতে করতে নিমেষ নিহত হয়ে বসে রইল। সুতীর্থের খোঁজে এসেছিল বিরূপাক্ষ। জয়তীকে যে বিয়ে করেছে বিরূপাক্ষ সে যে বাস্তবিকই তার ঘরের বৌ, এই সত্যের ময়ূরপুচ্ছ তার কাকের পালকে গুঁজে সুতীর্থের সঙ্গে কোনোদিন সাক্ষাৎ করবার সুযোগ পায়নি। সেটা দরকার। মনে যখন চারদিক দিয়ে ফুর্তিতে ভাঁটা এসে পড়েছে তখন যাদের জীবনে সম্ভাবনা ছিল ঢের, কিন্তু হল না কিছু সেই সব লোকগুলোকে নিজের টাকা এবং অনির্বচন স্ত্রীর গল্পে একটু মাথা গুলিয়ে দেবার শখ জেগেছিল বিরূপাক্ষের। শখটা দু-চার মুহূর্তের কর্পূরের মতন টেকসই। কিন্তু তবুও শখের মানুষ বিরূপাক্ষ। সেই জন্যই সুতীর্থের কাছে আসে। এসেছে সে। ভালোও বাসে সুতীর্থকে এত বেশি যে জয়তী যদি স্বামীকে সত্যিই ছেড়ে যেতে চায়—তাহলে সুতীর্থের নির্দেশ—যাই হোক না কেন—বিরূপাক্ষ ও জয়তীর পথ কেটে দিক।

কিন্তু কে এই নারী? বিরূপাক্ষ অনড় অতল হয়ে ভাবছিল। এর বয়স কত হবে? সুতীর্থের সঙ্গে এর কি সম্পর্ক? সুতীর্থের সোফায়; অন্ধকার—শীতের সন্ধ্যায়—র‍্যাগ গায় দিয়ে; ভাবতে ভাবতে

বিরূপাক্ষের শিশু ও প্রৌঢ় মনের সন্ধিসত্তায়—যেখানে সংসর্গদানের সম্ভাবনা হিসাবে স্ত্রীলোকের ওপর চোখ পড়ে—কেমন যেন বাড়াবাড়ি হচ্ছে টের পেয়ে নিজেকে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ঠিক করে নিতে হল বিরূপাক্ষের।

ভাবছিল ঃ জয়তীকে আমি কোনদিনই পাইনি। সবচেয়ে বেশি করে পেয়েছি বলে ভুল করেছিলুম যখন তখনই যদি জয়তী আমার ভুল ভেঙ্গে দিত, তাহলে পরস্পরের শরীরের ওপর যে আকাট অধিকার করেছি আমরা তার কোনো প্রয়োজন হত না তো।

বিরূপাক্ষের সাদা অনুভূতি সিধে চেতনা এরকমভাবে ব্যাপারটার মীমাংসা করে নিতে চাচ্ছিল। কিন্তু এ সমস্যার ছক অন্য রকম; জয়তী প্রতি মুহূর্তেই বিরূপাক্ষের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না, সে প্রথম থেকেই বিরূপাক্ষের থেকে এত বেশি দূরে যে প্রকৃতির অথবা হৃদয়লোকের আইনজ্ঞানী বিশ্বের সেইটেই শেষ সীমা। (বাহির বা অন্তরের) বিশ্ব যেখানে আপেক্ষিক মণ্ডল নয় আর—সেখানে অবিশ্যি এদের দুজনের দূরত্ব ক্রমশই দূরতর হয়ে পড়ছে। কিন্তু আমাদের চেনাজানা নিসর্গ ও সংসারের প্রয়োজন সম্পর্কে সময় ও দেশ যে অশেষ, অনিঃশেষ, কে এসে তা প্রমাণ করে পরিষ্কার করে দেবে বিরূপাক্ষকে; খুব সজাগ চেতনায় নয় একটা সংস্কারের আবেগে সে ধরে নিয়েছে অবিশ্যি যে জয়তী ও তার যোগাযোগের ব্যবধান এত বেশি নয় যে কোনো দূরত্বের মাপক স্পান দিয়ে তাকে মাপা চলে না।

'আপনি কে?' সোজা প্রশ্ন করে বসল বিরূপাক্ষ।

'আমি? কেন?' মণিকা চলে যাবেন না দাঁড়াবেন ভাবছিলেন। 'আমি কেউ নই।'

'আমি ভেবেছিলুম সুতীর্থের নিকট আত্মীয়—'

মণিকা বিরূপাক্ষের দামী সিল্কের কাপড়-চোপড় সোনার ঘড়ি বোতাম মির্জাপুরী শাল জুতোর চামড়া ও রকমারি তলিয়ে দেখছিলেন। এত সব চটক আছে বলেই খানিকটা ভদ্রতা অন্তত করতে হয়—মধ্যবিত্ত মেয়েদের এই রক্তের সংস্কার কাটিয়ে উঠতে না পেরে এতক্ষণ তিনি আছেন। এ না হলে হয়তো আগেই উঠে চলে যেতেন।

মণিকা একটু সাপের মন্ত্রের ধূলো উড়িয়ে হেসে বল্লেন, 'সুতীর্থ; না, তাঁর সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই।'

'আমি ভেবেছিলুম আপনি তার বিশেষ আত্মীয়।'

'যারা ঘাড়ে চড়ে থাকে সেইরকম একজন?'

'মানে?'

'সাপ্লায়ের ছোকরাদের, কন্ট্রাক্টের ছোঁড়াদের হাতে জল খেয়ে, যাদের দিন কাটে; এমন কত মেয়ে-পুরুষ কলকাতায় আছে—'

'না, না, তা কেন?—তা নয়—সুতীর্থের বন্ধু আপনি। আপনি অনেকক্ষণ বসে আছেন। আপনাকে চা দেওয়া হল না তো।'

'না, না, আমি চা খাই না। আপনি বসুন।'

মনের ভুলে সিগারেট কেস বার করে পকেটে তখুনি ঢুকিয়ে রাখল বিরূপাক্ষ। মণিকা জিনিসটা দেখলেন; সিগারেটের প্রয়োজন লোকটার, কিন্তু তবুও কোনো উচ্চবাচ্য করতে গেলেন না তিনি। কেন করবেন? কেন এই মানুষ সামনে বসে তামাক টেনে বেয়াদপি করবে?'

'সুতীর্থের কোন পাত্তাই নেই।'

'না।'

'কোথায় গেলে পাওয়া যেতে পারে কোন রকম একটা আন্দাজ দিতে পারেন কি?'

'আমাকে বলে না কিছু।'

'অফিস করে আজকাল?'

'জানি না।'

'সেদিন বিজনহরি মল্লিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তিনি সুতীর্থকে চেনেন বল্লেন, মল্লিকের অফিসেই কাজ করত নাকি, কিন্তু অফিস ছেড়ে চলে গিয়েছে বল্লেন। অন্য কোনো অফিসে গেছে?'

মণিকা অবিশ্যি একটা অফিসের ঠিকানা জানতেন, ফোন নম্বরও জানা ছিল তাঁর, ফোনও করেছেন কয়েকবার; কিন্তু কোন সদুত্তর পাননি। অন্য কোথাও গেল সুতীর্থ? সুতীর্থের অফিসে আজকাল নাকি স্ট্রাইক চলেছে। এ মানুষটাকে এ সব কথা বলে কী হবে; ভাবছিলেন মণিকা। সুতীর্থকে তিনি ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু এটা কত দূর মমতা, কত দূর সুপ্রিয়তর আকর্ষণ সহসা ঠিক করে উঠতে পারেননি। জিনিসটা ঠিক করে ফেললে আজ হোক, কাল হোক কিছুটা ছাঁদ কেটে যাবে, ছক মুছে যাবে ঘরানা পৃথিবীর আর ঘরণী মানুষের। সেটা কি হতে দিতে হবে? হলে ভালো হবে?

'আপনি সুতীর্থের শুভানুধ্যায়ী—'

'শুধু তাই যদি হতাম তা হলে সব কাজ ফেলে এখানে আসতাম? আমাদের সম্পর্ক আরো—'

বিরূপাক্ষ ভাষা খুঁজছিল, কিন্তু যে রকম শব্দ বা পরিভাষা সে চাচ্ছিল তা পাচ্ছিল না; 'আমাদের সম্পর্ক জল ঠিক নয়, জলের সঙ্গে স্পিরিট মিশিয়ে', এই রকম বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু এই মহিলার সামনে ও সব বুলি অব্যবহার্য।

'আরো বেশী কিছু; অনেক বেশী। জানি আমি।' মণিকা বললেন, 'সেই জন্যেই, বলছি; একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।'

'বলুন।'

'সুতীর্থ হয়তো দেনার পাকে জড়িয়ে গেছে।'

'কেন?'

'বে-থা করেনি বটে, সংসার পোষণ নেই, কিছু নেই, কিন্তু বেহিসেবী বড্ড—তা ছাড়া অফিসে স্ট্রাইক চলেছে।'

'স্ট্রাইক? কোন ফ্যাক্টরী বলুন তো?'

'ফ্যাক্টরী নয়। কি একটা ফার্ম। ওদের নিজেদের ফ্যাক্টরী আছে কিনা আমি জানি না। সুতীর্থ ধর্মঘটীদের দলে ভিড়ে গেছে নিশ্চয়ই? চাকরি গেছে ওর—ভাত জুটেছে কিনা সন্দেহ—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট-কেসটা আবার বার করে বললে, 'বটে, তা হলে তো বড় মুশকিল হল। ও এখানে চলে আসে না কেন? আপনি তো ওর নিজের মানুষ।'

'ভাত খেতে সে এখানে আসবে না। খিদিরপুরে মেটেবুরুজে মজুরদের সঙ্গে মিশে খাবে।'

'আপনি বাস্তবিক সুতীর্থের কে হন?'

'কেউ নয়। আমি বাড়িউলি—' বলে বিরূপাক্ষের তেরছা চোখ এড়িয়ে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় হেঁট করে সাতপাঁচ চিন্তা করতে লাগলেন মণিকা। বিরূপাক্ষ এইবার একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে আটকে নিল।

দক্ষিণ কলকাতার এ পাড়ায় কোনো বাড়িউলি থাকে না, থাকে বাড়ির মালিক। ইনি মেয়েমানুষ নন—মহিলা; তবুও ওই বিচিত্র শব্দটা ব্যবহার করলেন কেন। হয়তো অজ্ঞতায় অসতর্কতায় অজ্ঞাতসারে শব্দটা বেরিয়ে গেছে মুখ দিয়ে। কাজেই বিরূপাক্ষের সিগারেটও আর দেরি না করেই জ্বলে উঠল।

'বেশ ভাল বাড়ি; সুতীর্থ দোতলার সমস্ত ফ্ল্যাটটা ভাড়া করে আছে বুঝি?'

'হ্যাঁ। ভাড়া দিচ্ছে না।'

কণ্ঠে নালিশের সুর, কিন্তু ততটা জমেনি; নালিশটা যেন সুতীর্থের বিরুদ্ধে নয় ঠিক, নিজের

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে, আজকালকার দিনকালের—হয়তো বিরূপাক্ষেরও বিরুদ্ধে।

'আহা কেন—ভাড়া দিচ্ছে না কেন? আপনি কি ছেড়ে দিয়েছেন?'

'না, না, আমি ছেড়ে দেব কেন। সেলামী ভাড়া নিয়ে কত হাজার হাজার টাকা পাওয়া যায় এ বাজারে। আমি ছাড়ব কেন। আমার টাকার বড্ড দরকার।'

বিরূপাক্ষের মনে হল, এই কথাটার জন্যেই এতক্ষণ যেন সে অপেক্ষা করছিল; 'টাকার বড় দরকার' এই আওয়াজটার জন্যে। কলকাতার যে কোনো ফটফটে ঝরঝরে বা এঁদো ঘিঞ্জি আস্তানায়ই যাওয়া যাক না কেন, যে কোনো দেবী-পিশাচীর সঙ্গেই দেখা হোক, 'টাকার বড় দরকার' শেষ পর্যন্ত এই আবেদনেই কান শানিয়ে ওঠে তার, হৃদয়ে দোলা লাগে, কর্তব্যপথ ঠিক করে নেয় সে; রক্ত যদি বাস্তবিকই খোঁটা দিয়ে ওঠে বাস্তবিকই চেক কাটে সে। 'কত টাকা চাই? ক' মাসের ভাড়া?'

মণিকা দেবী একটু চমকে চেয়ে দেখলেন বিরূপাক্ষ পকেট থেকে চেক বই বর করছে—

'না, না, আপনি দেবেন কেন? আপনাকে আমি দিতে বলিনি তো।'

'সুতীর্থের জন্যে আমি দিয়েই থাকি। ও তো আমার—এক হাজার টাকায় হবে, না আরো বেশি?' ফাউন্টেনপেন বার করে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল বিরূপাক্ষ।

বিরূপাক্ষের দিকে তীক্ষ্ণ আহত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মণিকা হতমান মলিনতার কেমন বেমানানো ভাবে যেন দাঁড়িয়ে রইলেন।

'এক হাজারে মন উঠছে না হয়তো—'

'মন উঠছে না' বলছে লোকটা; বেল্লিক, আহাম্মক হয়তো, হয়তো আনাড়ি, ভাষার ব্যবহার জানে না। সে যা হোক, অত্যন্ত বেয়াদবির কথা বলা হয়েছে; এর পর আর এক মুহূর্তও এই ঘরে থাকা উচিত মণিকার? কি যেন বলতে গিয়ে কথা আটকে গেল তবুও তাঁর; নড়ি-নড়ি করে কেমন একটা শীতকম্পে কেঁপে উঠল তাঁর পায়ের নখ থেকে মাথার তালু অবধি; কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন না তিনি।

'তিন হাজার কবে দিলুম।'

বিরূপাক্ষ উঠে দাঁড়াল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বা না তাকিয়ে এতক্ষণে সিগারেট জ্বালাবার অবসর হল তার। চেকটা সে মণিকার হাতে দিল না। বিছানার ওপর রেখে দিল। বললে, 'এই চেক' তাই বলে চেকটা হাতে তুলে যে নিতে হবে বিরূপাক্ষের সাক্ষাতেই তার কোনো প্রয়োজন নেই। মণিকাকে সে রকম দীন-দৈন্যতার ভেতর নামিয়ে রসগ্রহণ করবার মানুষ বিরূপাক্ষ নয়। এখন নয়। মণিকার বেলা নয়। মানুষের আত্মা আছে—আত্মার দক্ষিণ মুখ—খুব সম্ভব অনেক দিনের জন্যে—মণিকার মত এরকম নারীর সম্পর্কে।

'আজ বড্ড শীত।'

চেক বইটার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ছিলেন মণিকা, বিরূপাক্ষ তাঁর দিকে ফিরে তাকাবার আগেই চোখ আর একদিকে সরিয়ে নিয়েছিলেন তিনি; বললেন, 'শীত খুব।'

'আমি তো সিল্কের পাঞ্জাবি পরে এসেছি, ভেবেছিলুম এইবার কলকাতায় বসন্তের হাওয়া ছেড়েছে বুঝি—'

'মাঘ মাস তো শেষ হতে চলল।'

'রাত ন'টা।'

'চললেন?'

'হ্যাঁ, সুতীর্থের কোনো খোঁজখবর পেলুম না তো।'

'শুনুন'—মণিকা চেকটা ফিরিয়ে দেবার জন্য হাত বাড়ালেন।

'ওটা সুতীর্থের—'

'কিন্তু সে তো আসবে না।'

'দরকার নেই। ভাড়ার টাকা নিয়ে নেবেন। চেক ডিজঅনার্ড হবে না। কালই ক্যাশ করে নেবেন। বেয়ারার চেক দেব?'

'ওটা কি ক্রসড?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ব্যাঙ্কে তো কোনো অ্যাকাউন্ট নেই আমাদের—'

'কোন ব্যাঙ্কেই নেই? এটা অবিশ্যি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের।'

মণিকা ঘাড় নেড়ে বললেন—'না।'

'ও হোঃ'—বিরূপাক্ষ বললে, 'চেকটাতো সুতীর্থের নামে লিখে দিয়েছি'—

চেক বই বার করে বিরূপাক্ষ লিখতে লিখতে বললে, 'আপনার নাম?' ওঃ মণিকা মজুমদার, এই যে আপনাব আঁচলে সোনালি জরি দিয়ে লেখা আছে দেখছি—'

মণিকা আঁচল সামনে নিয়ে ঠিক হয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই বিরূপাক্ষ চেক কেটে মণিকাকে বললে, 'এই যে তিন হাজার টাকার—আপনার নামে—' বিছানার ওপর রেখে দিল চেকটা বিরূপাক্ষ।

'এটা চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া অ্যাণ্ড চায়নার—খুব বড় ব্যাঙ্ক এশিয়ার। ক্লাইভ স্ট্রিট পাঠিয়ে দেবেন আপনাদের বেয়ারাকে।'

বিরূপাক্ষ হেসে উঠে বললে, 'আমিও যেমন! এবারও ক্রসড চেক কেটেছি। বেয়ারার চেক দোব—বেয়ারার চেক দোব মণিকা মজুমদারকে।'

ক্রসড চেকটা বিছানার ওপর থেকে তুলে নেবার জন্যে হাত বাড়াবার আগেই মণিকা আলগোছে কুড়িয়ে নিয়ে যেন কিছুই হয়নি এমনিভাবে গায়ের শালটা বেশ আঁট কবে জড়িয়ে নিতে লাগলেন।

ষোল

বাঃ, কী অপরূপই দেখাচ্ছে মণিকাকে; ভাবছিল বিরূপাক্ষ; যেন ভরা নদীর তীরে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতের বাঘিনী সহসা, অনিবার্ণ মানুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে—অথচ বাঘিনীও বটে সে, তেমনি সাহসিকা সুদৃঢ়া মহিয়সী। এরই মমতা ষোলকলায় পেয়েছে সুতীর্থ ঃ অথচ দামাল হয়ে ফিরছে বুঝি বাইরে আহাম্মক, দামাল হয়ে ধর্মঘটে নাচাচ্ছে।

'চেকটা আমি সুতীর্থকে দিয়ে দেব।'

'কেন, আপনার নামে তো কেটেছি।'

'সই করে দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।' বিরূপাক্ষ বললে, 'কিন্তু আপনাকে ভাড়া দিচ্ছে না, ওকে দেবেন? আপনার নামেই জমা করে নিন না।'

'বললুমই তো ব্যাঙ্কে আমার কোন কারবার নেই, সুতীর্থেরও নেই। কিন্তু ওকে দিলে সে ভাঙিয়ে সমস্ত টাকাটাই আমাকে এনে দেবে। যদি না—'

বিরূপাক্ষ চোখ তুলে তাকাল মণিকার দিকে। ডান চোখের ভুরু উঠে গেছে—যত দূর ভুরুদেব ওঠার শক্তি—বেশ পরিপূর্ণ সনির্বন্ধে।

'স্ট্রাইকে যদি মেতে থাকে তা হলে ও চেক সুতীর্থকে দেব না আমি—'

'তা দেওয়াও উচিত নয়। এটা আপনারই। আমি কি ভাবছিলুম জানেন?'

সিগারেট জ্বালিয়েছিল বটে, কিন্তু টানার অবসর পায়নি বিরূপাক্ষ। নিবে গিয়েছিল

সেটা। পকেট হাতড়ে দেশলাই বের করে বিরূপাক্ষ বললে, 'আমি ক্যাশ নিয়েও ফিরি। এই দেখুন না—' বলে পোর্টফোলিও ব্যাগের ভেতর থেকে একশো টাকার নোটের কয়েকটা তাড়া বের করে বললে, 'বরং এগুলোই রেখে যাই—

মণিকা খানিকটা বিপর্যস্ত হয়ে ঘরবারের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে তারপর বিরূপাক্ষের চোখের ভেতর দিয়ে তার আতলস্বচ্ছ অন্তরাত্মাকে দেখে নিতে লাগল এমনি নীরব নির্মমভাবে যে বিরূপাক্ষ দাঁড়াবে কি চলে যাবে কথা বলবে না থ হয়ে থাকবে কিছুই ঠিক করতে না পেরে এই মেয়েমানুষটিকে—এই দেবাংশ উজ্জ্বল চিতল মাছটাকে হায়রান করবার আগে বেশ কিছু কাল সুতো ছাড়বার প্রয়োজন বটে উপলব্ধি করে বলে উঠল, 'আমি চলি।'

'বসুন। এই টাকাগুলো?'

'সুতীর্থকে দেবেন।'

'এই চেক?'

'চেকটাও।'

'কোথায় পাব তাকে?'

'পাওয়ার দরকার নেই তার পাওনা তো আপনার প্রাপ্য।'

মণিকা হেসে বললেন, 'বেশ। মেনে নিলুম। কত টাকা আছে? আপনি কে? এত টাকার ছড়াছড়ি—'

'আমি উঠি।'

'কটা বেজেছে আপনার ঘড়িতে?'

'প্রায় দশটা।'

'কত দূর যেতে হবে।'

'ও—সেই রিজেন্ট পার্কের দিকে—'

'রিজেন্ট পার্কের বিখ্যাত মানুষকেই অতিথি করেছি আজ আমার ঘরে।'

'আমি কালোবাজারে বড় মানুষ।'

'হলেনই বা। বড় মানুষ তো। কালোবাজারে সবাই কি বড় হতে পেরেছে? রিজেন্ট পার্কে কি আপনার নিজের বাড়ি?'

'আছে একটা।'

'চোরাবাজারে চুরি করে বড় হয়েছেন স্বীকার করছেন। সকলে তো কবুল করে না। কেউই করে না।'

'যার কাছে খাঁটি থাকা দরকার সেখানে ভাঁড়িয়ে লাভ কি?'

—শুনে—সামলে নিয়ে মণিকা কথা বাড়াতে গেলেন না।

দরজার দিকে যেতে যেতে এক-আধ পা ফিরে এসে বিরূপাক্ষ বললে, 'আজ বেশি রাত হয়ে গেছে।'

'দেখছি তো।'

'গাড়ি আনিনি, ভুল হয়ে গেছে। সুতীর্থের বিছানায় রাতটা যদি কাটিয়ে দিই তাহলে তেতলায় আপনাদের কোনো আপত্তি হবে না তো? বাড়িটা তো আপনার—

'আমার নাম ওঁর। কিন্তু উনি কেন আপত্তি করবেন। আপনি থাকুন।'

'আপনি এক্ষুনি চলে যাবেন?'

'হ্যাঁ, আপনার খাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'আমি খেয়ে বেরিয়েছি; শীতের সন্ধ্যায় আমি খেয়ে দেয়ে সফরে নামি।'

'চাও খাবেন না?'

'না', বিরূপাক্ষ বাতিটা নিবিয়ে দিল।

মণিকা সন্ত্রস্ত হলেন না, অপ্রতিভ হলেন না। সহজ গলায় বললেন, 'নিবিয়ে দিলেন, আমার একটু কাজ বাকি আছে।'

বলেই বাতিটা জ্বালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষের একশো টাকার কুড়িটা নোট সুতীর্থের বালিশের ওপর থেকে গুছিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে ওপরে চলে গেলেন।

খানিকক্ষণ পরে বিরূপাক্ষের জন্যে চা ফল মিষ্টি নিয়ে চাকর এসে হাজির হল। মণিকার অবিশ্যি নিচে নামবার কথা নয়। কিন্তু তবুও অনেক রাত উসখুশ করে উচাটন হয়ে রইল বিরূপাক্ষের মন—উৎখাত—উৎসাদিত হয়ে যেতে লাগল বিরূপাক্ষের শরীর ও মন। কিন্তু বিরূপাক্ষ তো আজকের নয়াল পাখি নয়, অনেক দিনের পুরোনো ভিটের হস্তেল ঘুঘু, কিন্তু তবুও ঘুমিয়ে পড়তে বেগ পেতে হল তার।

রাত পাঁচটার সময়ে মণিকা টের পেলেন যে এতক্ষণে দোতলাব মানুষটি হোঁস হোঁস ঠোঁস ঠোঁস ফোঁস ফোঁস করছে; নাকই ডাকাচ্ছে বটে; এ কি মানুষ না পাঁকাল গজালের নাক ডাকানো? আস্তে আস্তে নিচে নেমে চক্ষুস্থির করে দেখে গেলেন একবার। সুতীর্থের ঘরে ঘুমন্ত বিরূপাক্ষের পালঙ্কের পাশ দিয়ে এক আধবার পায়চারি করে গেলেন। তেতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ভাবছিলেন—না চাইতেই লোক টাকা ঢেলে দেবে—কত যে ওগরাবে ওর কুমিরের টাকা;—কিন্তু বিনিময়ে কিছু তো দিতে পারবেন না মণিকা। না দিয়ে টাকা নেওয়া কি উচিত হবে তাঁর? টাকা নেবেন মণিকা অথচ কিছু দেবেন না, এ একবগগা খেলা কতদিন চলবে?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে দেখা হবার পনেরো কুড়ি বছর আগের থেকেই নিজের মূল্য মণিকা খুব ভালো করে জানতেন। বাইরের ভালো পৃথিবীর বড় পৃথিবীর নানারকম ভালো-মাঝারি জায়গায়ও যদি তিনি নামতেন—বাজে খারাপ জায়গা না মাড়িয়ে—তাহলে—

তেতলায় উঠতে আর দু এক ধাপ বাকি—মণিকা একটু থেমে দাঁড়ালেন।

তাহলে কি হত? কি যে হত না সেই কথাই ভাবছিলেন তিনি। ভেবে ভয়াবহভাবে লোভার্ত হয়ে উঠতে পারত তাঁর মুখ। কিন্তু তেমন কিছু হল না। বুকের ভেতর অবিশ্যি কেমন একটা ঢিবঢিব কবতে লাগল। কিন্তু কি যে শীতের দেশের দেবদারু মাংসের মতন দৃঢ়তা তাঁর নিজেব চরিত্রের, বিমুগ্ধ হয়ে ভাবছিলেন মণিকা, নিজের বাড়ির চৌকাঠ পেরিয়ে কোনো দিনও যান নি কোথাও—বিরূপাক্ষের মতন মানুষেরা এসে সেধে—বিনিময়ে কিছুই পাবে না জেনে তবুও উজাড় করে ঢেলে দিতে চায়। বাংলার নদীর ধারে আম-জাম-নিম-জামরুলের গ্রামে একদিন জন্মেছিলেন তিনি, কিন্তু আজকে হয়ে দাঁড়িয়েছেন শিলঙ-টিলঙের পাইন গাছদের মত উঁচু, ঝাড়াঝাপটা, কঠিন, নিরবচ্ছিন্ন নক্ষত্রের নিচে বারান্দায় হিম রাতের ভেতর হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করছিলেন মণিকা।

পরদিন সন্ধ্যের সময় বিরূপাক্ষ এল।

সুতীর্থ আসবে কিনা সেই অপেক্ষায় হয়তো মণিকা দোতলার ঘরে বসেছিলেন। ঘরটাকে পরিষ্কার করে সাজিয়েও রেখেছিলেন সেই জন্যে। সন্ধ্যে হয়েছে—বাতি জ্বালানো হয়নি।

'কে?'

'আমি।'

বিরূপাক্ষ বললে, 'বিরূপাক্ষ, আমি বিরূপাক্ষ।'

'বাবা, আমি ভয় পেয়ে গেছিলুম। আপনি কি বেড়ালের থাবার জুতো পায় দিয়ে হাঁটেন নাকি?'

'আমার থাবা ভিজে বাঘের মত, জুতো আমার বাছুরের চামড়ার। কেন এসেছি জানেন?'

মণিকা বাতি জ্বাললেন সুইচ টিপে। বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল; প্রসাধন যে না হয়েছে তা নয়, কিন্তু এ সাজগোজের ভেতর কোনদিক দিয়েই কোথাও কোনো ইঙ্গিত নেই; নিজেকে ধুয়ে নির্মল করেছেন; মনটা যেন কোনো ধোঁয়াটে জিনিসের সংস্পর্শে এসেছিল—তাকে ধুয়ে পাখলে মণিকা নিজেকে সফল, ঝরঝরে করে তুলেছেন।

'সুতীর্থ এসেছে?'

'না।'

'কোনো খোঁজখবর পাওয়া গেল তার?'

'না।'

'না? বড় মুশকিলেই পড়েছি।'

'বসুন।'

'কাল কি এই সোফাটা দেখেছিলাম?'

'ওটা এক কিনারে ছিল। আমি যে কৌচে বসেছি সেটা নতুন; তেতলার থেকে নামিয়ে আনা হয়েছে।'

ইলেকট্রিক বাল্‌বের চারদিক ঘিরে একটা রাত প্রজাপতি উড়ছিল সেদিকে এক আধ মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বিরূপাক্ষ বললে, 'আপনার সময় হবে?'

'কিসের জন্যে?'

'গোটা কতক কথা আপনাকে বলতে চাই মণিকা দেবী।'

মণিকা হাত ঘুরিয়ে রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাত দশটা অবধি সময় আছে আমার। তারপর ওপরে যেতে হবে। এখন সাতটা। আপনি আজ গাড়ি এনেছেন?'

'গাড়ি এনেছিলুম কিন্তু মোড়ে বিদায় দিয়েছি।'

'দশটা নাগাদ এসে হাজির হবে?'

'না, কিছু বলে দিইনি। তা ছাড়া এ বাড়িতে যে আছি তাতো জানে না ড্রাইভার। না জানানোই ভালো। নানা রকম ফিচেল আছে চারিদিকে—সবাইকে সব জিনিস'—বিরূপাক্ষ পাউচ বার করল; পরে পাইপটা বের করবে হয়তো—কিন্তু কি যেন ভেবে রেখে দিল পাউচ পকেটের ভেতর। 'দশটা অব্দি? তারপরে ওপরে যাবেন বুঝি খাওয়া-দাওয়া করতে?'

'আমি রাতে বিশেষ কিছু খাই না। ওদের খাওয়া হয়ে গেছে।'

'তেতলাটা খুব নির্জন মনে হচ্চে। ওরা কারা?'

'আমার স্বামী, আমার মেয়ে। ওরা ঘুমুচ্ছে, তাই চুপচাপ সব; দোতলায়ও সুতীর্থ নেই। সুতীর্থ হইচই করত না বটে, কিন্তু তবুও সারা রাত এটা-ওটা সেটা নিয়ে জেগেই থাকত।'

'সবে তো শীতের রাত শুরু। এখনই ঘুমুচ্ছেন ওরা; এই সোয়া সাতটার সময়?'

বিরূপাক্ষ সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট টেনে নিল।

'উনি অসুখের মানুষ—'

'ওঃ।'

'এই সময়েই একটু ঘুম হয়। রাত দশটার পর থেকেই টান উঠতে থাকে।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে বললে, 'তা হলে তো বড়—' সিগারেটের এক টান দিয়ে বলল, 'সারা রাত জাগতে হয় আপনাকে?'

'আমি হাঁপানির খুব ভালো ওষুধ পেয়েছিলুম' বিরূপাক্ষ বললে। 'এক সন্ন্যাসীর কাছে—অরুণাচলে। ওঁকে দিন। সেরে যাবে।'

'অরুণাচলে?' মণিকা একটু জেগে উঠে যেন তাকালেন, 'কার অসুখ সারল সে ওষুধে?'

'আমার নিজেরি।'

'হাঁপানি ছিল বুঝি?'

'খুব মারাত্মক ধরনের ছিল; কার্ডিয়াক হাঁপানি।'

মণিকা নিজের মনে নিজেকে বললেন, দেখ এই লোকটা কেমন চমৎকার মাইফেল মিথ্যে কথা বলছে। ওর টাকা আছে সেই জন্যে ওর হাঁপানি ছিল ওর আরও টাকা আছে, অরুণাচলের ওষুধে কার্ডিয়াক হাঁপানি সারাতে পেরেছে তাই, তার চেয়েও বেশী টাকা আছে ওর, সেই জন্যে আমার স্বামীর অসুখ সারিয়ে দিতে পারবে বলছে, এই সমস্ত কিছুর চেয়ে ঢের বেশী টাকা বিরূপাক্ষের এত বেশী টাকা যে, যে কোনো রকম ছকের যে কোনো পথে পথে ও বুঝি আমাকে হাত করবে; সব দুয়োরেই ওর সঙ্গে আমার নাকি দেখা হবে, আমাকে হাত করে, 'এসো, খুকি' বলে নিয়ে যাবে বিরূপাক্ষ।

ভাবতে ভাবতে ধ্যান নিরেট রসিকতায় মুখের আনাচকানাচ ছিটেফোঁটা হাসিতে কুঁচকে উঠছিল মণিকার।

'সে ওষুধ আপনার কাছে আছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বলেই তো মনে হয়, আমি খুঁজে দেখব।'

'কিন্তু, এ রুগীর বয়স তো পঞ্চাশ পেরিয়েছে। কোনো জ্ঞানবিজ্ঞান দৈবী ওষুধ কিছুতেই তো কিছু হল না—বিরূপাক্ষবাবু—'

বিরূপাক্ষের মনে হল মেয়েমানুষের এ ঢং তার চেনা—এত ভড়কাবার কিছু নেই।

'ঠিক আছে। সব ঠিক হয়ে যাবে—' বিরূপাক্ষ বললে।

মণিকার মনে হল, লোকটা টাকার জন্যে কেয়ার করে না বটে কিন্তু নিজের কাজ গোছানো হলে পৃথিবীতে কারুর মূর্তিই বিশেষ সৌম্য থাকে না আর; এরও থাকবে না; কার কাছে কি বলেছে না বলেছে সে সব নিয়ে কেউ খুঁট বেঁধে থাকে না তখন আর। কাজ হাসিল হলে এও দুচারটে পালক খসিয়ে ডানা মেলে দেবে ধাড়ি লক্কার মত। কিন্তু দেব কি হাসিল হতে? এ লোকের কাজ হাসিল করে দেব আমি? ভেবে ভাঙা কাঁচের করাতের মত হাসিতে মুখ ভরে উঠল মণিকার। অথচ বিরূপাক্ষ যে মুখের দিকে তাকিয়েছিল, মণিকার সেমুখ হাসির কম্পহীন সমুদ্রপারের ঘন বুনোনো ফর্সা শঙ্খের মত নিটোল।

'চেকটা ক্যাশ করা হয়েছে, বিরূপাক্ষবাবু।'

'উনি ভাঙালেন বুঝি ঃ আপনার স্বামী? তিন হাজাব টাকার চেক ছিল তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওটা ক্রসড চেক ছিল—'

'তাতে কিছু বেগ পেতে হয়নি। আমাদের এখানকাব ব্যাঙ্কেব শিশিরবাবু তাঁর নিজের অ্যাকাউন্টে জমা দিয়ে নিয়েছেন।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'আমাকে?' মণিকা বললেন, কেন?'

'একটা ঋণ শোধ করবার দাবি মঞ্জুর করলেন বলে। সকলে তো করে না।'

বিরূপাক্ষের কথা শুনে এক আধ মুহূর্তের জন্যে একটু স্তিমিত মন্থর হাসি এল মণিকার মুখে; যেন কেমন হাসি? প্রশ্রয় দিচ্ছে যেন অবোধ বালককে; কৃপা করছে যেন অধম মুখফোঁড়িকে। মণিকাকে টাকা দিয়ে—যারা অনেক দূরের থেকে আসে মানুষকে টাকা গছিয়ে দেবার জন্যে, মানুষের মুখ্যত গায়ের গন্ধ শুঁকবার জন্যে সেই সব শুয়োরদের ভেতর নিজেকে খুঁজে পেল যেন বিরূপাক্ষ।

উঠে গিয়ে বিরূপাক্ষ দক্ষিণ দিকের জানালা দুটো বন্ধ করে দিয়ে এল ঃ ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

'জানালা দুটো ও বাড়িব ঠিক মুখের ওপর।'

'ওঃ, ওদের জানালাও বুঝি খোলা ছিল? মানুষ ছিল ও ঘরে—ওদের ওই জানালার ঘরে?' মণিকা জিজ্ঞেস করলেন।

'দু-চারজন তাকিয়েই থাকে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কলকাতার মানুষের এরকম চোখ মারার অভ্যেস আছে—খুব বেশী। ভারি নিঘিন্নে মানুষ সব'—বলতে বলতে সিগারেট জ্বালাল বিরূপাক্ষ।

'ভালই করেছেন জানালা বন্ধ করে।' মণিকা বললেন, 'ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। খুব শীত করছিল।'

'শীত? শীত তো বটেই। তা ছাড়া বাড়ির খোলা জানালা; মানুষের চোখের নজরে আপনি বিশ্বাস করেন না বুঝি?'

'শালটা ভুলে ফেলে এসেছি।'

আলনার থেকে সুতীর্থের একটি ধোসা টেনে ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মণিকা বললেন, 'আমার মত মেয়েমানুষের শীতবোধ বড় বেশী বিরূপাক্ষবাবু, শীত ছাড়া আর কিছুতে আমার এসে যায় না। পাড়াপড়শীর চোখ তো আমার লক্ষ্মী।'

'কোথা যাচ্ছেন?'

'জানালা খুলে দিই।'

'কি দরকার? থাক।'

'এখন কটা রাত?'

'সাড়ে আটটা।'

বিরূপাক্ষ সিগারেট ঘরের ভেতর কোনো একদিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে পাউচ বার করল, পাইপ বার করল। পাইপে তামাকের পাতা ভরতে ভরতে বললে, 'কলকাতায় আমার তিনটে বাড়ি আছে—'

কলকাতা যখন বাড়ির শহর, তখন সে সব বাড়ির মালিকও রয়ে গেছে। কারু তিনটে বাড়ি আছে—কারু ত্রিশটে বাড়ি। কিন্তু এ সব বাড়িওয়ালাদের সঙ্গে নিজের ঘরে আটক মণিকার বড় একটা দেখা হয় না। দেখা হলেও এমন কিছু হয়েছে এমন কেউ এসেছে বলে মনে হয় না তার।

'কোথায় বাড়ি আপনার বিরূপাক্ষবাবু? রিজেন্ট পার্কে তো একটা—'

'হ্যাঁ, ঐ টালিগঞ্জে, বালিগঞ্জে, ঢাকুরিয়ায়।'

'বাঃ, বেশ ভালো জায়গাই তো সব।'

'ব্যাঙ্কে লাখ পনেরো কুড়ি টাকা আছে।'

বিরূপাক্ষ তাকিয়ে দেখল মণিকা শুনলেন, কিন্তু শুনে কিছু হল না যেন পৃথিবীতে এল গেল না কারু কিছু। ব্যাঙ্কের টাকার কথা যেন মণিকা দেবীকে না বললেই ভালো হত। আমার একটা মাটির ঘোড়া আছে, একটা সোলার বাঁদর আছে, বাবা মেলার থেকে কিনে দিয়েছেন; এই সব কেচ্ছা আরম্ভ করেছে যেন বাচ্চা, এমনই নির্বিকার বয়স্কার আত্মস্থ মুখ প্রতিভা। তবুও ঝুড়ির সব জিনিসই দেখাতে হবে, না দেখালে হচ্ছে না বিরূপাক্ষের; বললে, 'পছন্দ করে বিয়ে করেছিলুম।'

'ভালোই হয়েছিল', মণিকা শীতের জন্যে ধোসাটা একটু আঁট করে নিয়ে বললেন, 'দেখে শুনে কাজ করলে বেশ ভালো।'

'বাঁজা কিনা তাই তখনও যে রূপ ছিল, এখনও তাই আছে, কিন্তু—'

বিরূপাক্ষ পাইপটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'মনে কোনো শান্তি নেই আমার।'

পাইপ টানতে টানতে নীরব হয়ে নিবিদ হয়ে মণিকার দিকে তাকিয়ে রইল সে। মণিকা উঠে যেতে পারতেন, কিন্তু বসে রইলেন বিরূপাক্ষের দিকে তাকিয়ে নয়, বিরূপাক্ষ যে আছে সে কথাটা থেকে থেকে ভুলে যাচ্ছিলেন তিনি। বিগত পনেরো কুড়ি বছরের জীবনের নানা রকম ঘটনা উঁকি মেরে যাচ্ছিল মণিকার মনে। যে পুরুষ যে স্ত্রীলোককে ভালবাসে, যে স্ত্রীলোক যে পুরুষকে—তাদের মিলনামিলন কি মহাশূন্যের অন্তহীন নির্মোহের অন্ধকারে ফেঁসে গিয়ে শীতের রাতের শহরের ঘরে

এই বিরূপাক্ষের মতন কৃকলাসদের জন্ম দেয়? মণিকা নিজে এখন এখানে বসে আছেন কেন—উঠে যাচ্ছেন না কেন? পরিভাষা শিখে ফেলেছে সে কাকলাসদের? স্বর্গীয় অবনমন ভালো নয়, মাঝে মাঝে অবনমিত হয়ে সৃষ্টির সামলানো টালটাকে টালিয়ে দেবার ভেতর যে নির্জন রস আছে সেটা উপলব্ধি করে দেখতে হয়—সেই জন্যেই মণিকা এখানে বসে আছেন এখন; মুখোমুখি বিরূপাক্ষ। কথা বলছে—

দুজনেই মিনিট পাঁচেক নিঃশব্দে বসে রইল। তারপরে বাতি নিবিয়ে মণিকা ওপরে চলে গেলেন—তাড়াহুড়ো করে নয়, স্বাভাবিক সুস্থতায় যেমন করে বাতি নিবিয়ে মানুষ বসবার ঘর থেকে খাবার ঘরে শোবার ঘরে চলে যায়।

ওপরে যাবার আগে মণিকা আলো নিবিয়ে গেলেন কেন ভোর পাঁচটা অবধি শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে ঝিমিয়ে আকচার প্যাঁচ কষে এ সমস্যার যখন কোন জট খসল না তখন একটা ভেরামন, তারপরে আর একটা ভেরামন খেয়ে অবসাদে ঘুমিয়ে পড়ল বিরূপাক্ষ।

শেষ রাতে জেগে ওঠে তেতলার বারান্দায় পায়চারি করতে করতে বিরূপাক্ষ ঘুমিয়ে পড়েছে টের পেলেন মণিকা। নিচে নেমে এসে লোকটার গায়ে সুতীর্থের কম্বলটা আলগোছে ছড়িয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে গেলেন তিনি।

সতেরো

কেমন যেন কি যেন একটা মিলে গেছে—ঘুরে ফিরে পরদিন সন্ধ্যায় আসতে হল বিরূপাক্ষকে আবার। সন্ধ্যা উতরে গেছে—খানিকটা রাত হয়েছে। মোটরটা মোড়ে বিদায় দিয়ে তাকিয়ে দেখল ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে সরাসরি চলে যাচ্ছে, না গড়িমসি করছে। গাড়িটা যখন অনেক দূরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল, তখন বিরূপাক্ষ তাড়াতাড়ি তার চেনা পথ ধরে সুতীর্থের ঘরে এসে হাজির হল।

'ভেবেছিলুম আপনি এখানে থাকবেন না—' মণিকাকে বললে বিরূপাক্ষ।

'ছিলুম না, এই এক্ষুনি এসেছি। সুতীর্থর একটা খবর না পাওয়া পর্যন্ত বড্ড অস্বস্তি বোধ করছি। শুনলুম পুলিশ গুলি চালিয়েছে—'

'কোথায়?'

'কলকাতার নানা জায়গায়—'

বিরূপাক্ষ অতশত খবর রাখে নয়। সারাটা দুপুর সে ঘুমিয়েছে, নেশা করেছে, মদের নেশা কিছু কিছু আছেই। আরো নানারকম নেশা। চৈতন্য তার সারাদিনই আচ্ছন্ন হয়েছিল। অনেক দিন থেকেই সে আরো চেতনা-অচেতনার ভাগাড়ে কবরে হায়নার মত অন্ধকারে অন্ধকারে দিন কাটায়।

'গুলি চালিয়েছে? কই আমি তো শুনিনি।'

'আমি শুনেছি।'

'গুলির শব্দ? এ পাড়ায়?'

'কোন্ পাড়ায় কে জানে। মারাত্মক শব্দ কানে এসে পৌঁছয়—মানুষ কি স্থির থাকতে পারে! কেমন লাগে যেন।'

'ঠিক কথাই তো'—ভাবছিল বিরূপাক্ষ কিন্তু মুখে এই কথা মণিকার; সেই মুখেই আবার সাজগোজের ছিটে একেবারেই যে কিছু পড়েনি তা নয়।

বাতিটা জ্বালানো ছিল—তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল সে। কোথাও পাউডার-ক্রিমের আঁচ পাওয়া যায় না অবিশ্যি, কিন্তু কেমন ঘন কালো চুলে কি সিঁথিই বটে—ওরই ফাঁকে একরত্তি সিন্দুরের বিন্দুটুকু দেখ; কী ত্রৈলোক্যচিন্তনীয়।

'আমার মনে হয় দিশি পটকার শব্দ শুনেছেন।'

'কে, আমি? কি যে বলছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'অনেক নচ্ছার ছেলেছোকরা থাকে লুকিয়ে পটকা ফাটিয়ে মানুষকে ভয় দেখায়।'

'কোন্‌টা গুলির শব্দ, কোন্‌টা ভুঁই পটকার সে তো শিশুও বোঝে। আমি আশ্চর্য হলুম কলকাতায় এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল—আপনি কোথায় ছিলেন।

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল আজ। মাথা নেড়ে ভারিক্কি চালে চুরুটটা জ্বালিয়ে নিল আবার; ভাল করে ধরেছিল না।

বললে, 'না, কিছু হয় নি। আপনি দুশ্চিন্তা করবেন না। কলকাতায় দিনরাত কত রকম শব্দ হয়। কে আপনাকে বলেছে পুলিশ গুলি চালিয়েছে। আপনার স্বামী অবিশ্যি বাইরে যান নি। কোনো ছেলে-ছোকরাও নেই এ বাড়িতে রাস্তার সোরগোল হই হল্লায় কত গুজবের—

'না হলেই ভালো। সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ খুব সেয়ানা ছেলে। এতদিন তো খুব ভালো জায়গায়ই ছিল?

'কোথায়?'

'আপনার এখানে।'

'আমার এখানে—আমি তার কি উপকার করতে পেরেছি?'

মণিকার গলা কেঁপে উঠল; এটা ভান—না সাচ্চা—চুরুট টানতে টানতে সহসা কিছু ঠাহর করে উঠতে পারল না বিরূপাক্ষ। হয়তো সত্যি—সৎ—কিন্তু কি আসে যায় তাতে। সুতীর্থ যা না চাইতেই পেয়েছে বিরূপাক্ষ তা চেয়ে আদায় করে নেবে; এর ভেতর ভেবে দেখবার কি আছে যদি সে হাত পেতে নিতে চায়; সুতীর্থের চেয়ে ভাগে কিছু কম পাবে হয়তো—নির্মলতায়ও কিন্তু বস্তু হিসেবে বস্তা ওজনে বেশীই পাবে; কালোবাজারের কারবারী সে, এই জিনিসই তো সে চায়। এই নারীটিকে বশে আনতে হলে আরো ঢের সাধনার দরকার—না আজ রাতের ভেতরেই কোনো একটা রফা হয়ে যাবে?

পুরুষ ও মেয়েমানুষ সম্পর্কে এসে কাজে কারবারে হামেশা মিথ্যে কথা বলতে হয় বিরূপাক্ষকে। কখনো সাজিয়ে মিছে কথা বলে, কখনো সোজা সিধে মিথ্যে কাজ দেয় বেশী। কিন্তু কি নিয়ে কার সম্পর্কে কি রকম মিথ্যে বলবে সে এখন? যাতে মণিকার মন গলে যাবে? কি বলবে এখন কোন বলাবলিরই দর নেই যেন, মিথ্যে কথার কোনো প্রশ্নই ওঠে না—মিথ্যে হোক, সত্য হোক, খানদানী কারবার করতে হবে বটে, রাত হচ্ছে, প্রথমেই প্রাথমিক কাজ সেরে ফেলবার জন্যে বিরূপাক্ষ বললে, 'সুতীর্থদের অফিসে খোঁজ নিয়েছিলুম আমি—' এটা মিছে কথা।

'গিয়েছিলেন সেখানে?'

'হ্যাঁ?'

'ওর কোনো পাত্তা পাওয়া গেল?'

'স্ট্রাইক হয় নি।'

'আমি যে শুনেছিলুম সুতীর্থই স্ট্রাইকের ব্যবস্থা করছে।'

'সুতীর্থ কলকাতার বাইরে চলে গেছে।' মিছে কথা সব বিরূপাক্ষের; মণিকা দেবী ধরি ধরি করেও ধরতে পারলেন না।

'কেন? গ্রেফতারী পরোয়ানা আছে নাকি?'

'আমি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু, আছে বলেই বোধ হচ্ছে—'

অনেক দূরে কিছু ঘনিয়েছে বোধ করে ডাকপাখিনীর মত সূর্যের ঝিলিকের ভেতর অস্বস্তি বোধ করে মণিকা একটু ডাক পেড়ে বললেন, 'ও পাগল বাইরে চলে গেল কেন?'

'এ ছাড়া কী করবে?'

'আমার এখানে এলে আমিই তো তাকে লুকিয়ে রাখতে পারতাম—'

'সুতীর্থের নিজের ঠিকানায় তাকে লুকিয়ে রাখবেন আপনি?'

'না, না, এখানে নয়—অন্য জায়গায় রাখবার ব্যবস্থা করতুম—'

'ও সব এখানে বসে বলছেন তো, ওতে কাজ হয় না। নাঃ, সুতীর্থ যা করেছে ভালোই করেছে।'

'যাক, বেঁচে থাকলেই সব। ভেবেছিলুম কোনো অঘটন হয়ে গেল নাকি—কলকাতার বাইরে কোথায়?'

'টালিগঞ্জে।'

'টালিগঞ্জে। সব্বোনাশ। সেটা হল কলকাতার বাইরে?'

'কি হবে টালিগঞ্জে থাকলে? এমন কি দোষ করেছে? খুন জখম তো করে নি? যদি জেলে যায় দুচার মাসের জন্যে যাবে হয়তো—'

মণিকা কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তাবপবে নিজেব বাঁ হাতের কররেখার দিকে তাকিয়ে আঁচড় কাটতে কাটতে বললেন, 'জেলে যাবে—কেন যাবার কি দবকার? কি করেছে যে যাবে? একজন মানুষের দু'চার মাস জেল কিছু নয়—দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়?'

'দুচার বছরেরও হতে পারত—'

'করেছিল কি?'

'ধর্মঘটীদের নাচাচ্ছিল।'

'কি করতে?'

'মারামারি হয়েছিল। খুন হয় নি।'

চুরুটের মুখে বেশ খানিকটা ছাই জমে উঠেছিল বিরূপাক্ষের। সেদিকে তাকাতে তাকাতে বিরূপাক্ষ বললে, 'খুন হয় নি তাই বাঁচোয়া। কয়েক দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকুক, তারপর বেরিয়ে এলেই হবে। কিছু হবে না। ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে আমি নিজেই বলে দেব—'

'ভালোই করেছিল।' বিরূপাক্ষ চুরুটের ধোঁয়ার মিহি ঘুরপাকের দিকে তাকিয়ে বললে, 'স্ট্রাইক করবে না কেন? আমাদের দেশটা যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নি বলেই তো কেষক-টেষকের এই দুর্দশা—'

শুনে মণিকা বললে নিজেকে ঃ এই লোকটা ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে অন্য রকম কথা বলে এসেছে। ধর্মঘটীদের গাল দিয়েছে, কর্তৃপক্ষকে তাতিয়ে এসেছে। আমার এখানে এসে ঝাড়ছে দেশিকতা ও গণসাম্যের চাল। এদের চিনি আমি—এদের কি উদ্দেশ্য তাও জানি। এঁটুলির মতন লেগে থাকে মানুষটা রাতের পর রাত। টাকাব দরকার অবিশ্যি আমার। এ সব মানুষের কাছে না নিলে কোথায় পাব? নেব—কিন্তু যা চায় ও কি জানে যে কিছুতেই তা পাওয়া সম্ভব নয়।

'আমি এইবারে একটা ফার্ম খুলব ভাবছি। খুলে সুতীর্থকে করব ম্যানেজিং ডিরেক্টর আর আপনাকে—'

এ লোকটা কি রকম যে গ্রহতিথির মত এসে পড়েছে কোত্থেকে যে আমার জীবনে। আমি চাঁদ হতে পারি; আমি সূর্য হতে পারি আমি সূর্য দেবী—আঃ, কী জলন্ত রোদ চারদিকে আমার—মকর সংক্রান্তির ভোরের—কিন্তু—, মণিকা দেবী ভাবতে ভাবতে কোথায় চলে গিয়েছিলেন যে, কিন্তু বিরূপাক্ষ তাঁকে চমকে জাগিয়ে দিয়ে যেন বললে, 'সুতীর্থ ঠিক কোথায় আছে শুনুন তাহলে, আছে—টালিগঞ্জে—আমার—'

কিন্তু টালিগঞ্জে কি কলকাতার বাইরে হল? সে তো বিপদের এলাকা।'

'কে অত খোঁজখবর নেয়। আম বকুল ঝাউ দেবদারু নিম জামরুলের একটা উপবনের ভেতর টালিগঞ্জে আমার বাড়ি। তাই বলে আকাশ রোদ বাতাসের অভাব নেই। কিন্তু ওখানে কে যাবে—

কে সন্দেহ করবে?'

'কিন্তু ঘাপটির ভেতর লুকিয়ে থাকবার মানুষ নয় তো সুতীর্থ। আপনার বাড়িতে আছে ভালো মানুষ সেজে?'

'হ্যাঁ, আমার স্ত্রীর হেপাজতে।'

উৎসুক হয়ে তাকাল মণিকা।

'ওরা, দুজন অনেক দিন থেকেই এ-ওকে চেনে। প্রায় কুড়ি বছরের আলাপ। জয়তীর জন্ম থেকেই তো। ভাই-বোনের মত গা ঘেঁষে চলেছে। এখন অবিশ্যি অন্য রকম। সুতীর্থের মতন লোকের কাছে আমার স্ত্রীকে আমি ছেড়ে দিতে রাজি আছি, যতদূর যায় ওরা দুজন যাক, আমার কোনো আফসোস নেই—' চুরুটের আগুন নিবে গেছে বিরূপাক্ষের, কথা বলা শেষ হয় নি; দু-একবার হ্যাঁচকা টেনে দেশলাই বার করল।

'নাঃ, ওতে আমার কোন খিঁচ নেই', বিরূপাক্ষ বললে, 'একটা জিনিসের ভালো মীমাংসা হয় ওতে। অন্য পাঁচ রকম না হয়ে সুতীর্থকে যদি জয়তী নিয়ে নেয়, তা হলে মন্দের ভালো হল—নাকি ভালোই হল।'

মণিকা ঘাড় কাত করে পায়ের নীচে মেঝের একটা ভারি সুকুশল কালো স্বস্তিকা ছকের দিকে—মহাশূন্যের দিকে যেন চিরনারীর মত তাকিয়ে ছিলেন—কোনো কথা বললেন না।

বিরূপাক্ষ দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে নিল চুরুট জ্বালবার জন্যে। কিন্তু চুরুট না জ্বালিয়ে মণিকার মুখের দিকে নিজের চোখের মণির নিঃশব্দতায় নিষ্কম্পতায় কয়লাখনির সমস্ত অন্ধকার আর্তির মত যেন কোন অদেখা সূর্যের দিকে তাকিয়ে রইল। দেশলাইয়ের আগুন নিবে গেল।

মণিকার মোমের মত নেই কিছু—সীসের মত নেই—কেমন যেন কঠিন গোমেদ মণির মত অন্তরাত্মার দিকে তাকিয়ে রইল বিরূপাক্ষ, কিছু ভেদ করতে চাইল যেন সে।

'আমার আজ শরীর খারাপ', মণিকা বললেন।

'আচ্ছা, আমি উঠি।' বললে বিরূপাক্ষ।

'না। আপনি বসুন।'

'মাথা ঝিমঝিম করছে? আমার কাছে ওষুধ আছে—শরীরের যে কোনো রকম অসুবিধে অস্বস্তি দূর করে দেবে এ ওষুধ—ওয়ারের আগের—খুব ভালো—জার্মান—' বিরূপাক্ষ পোর্টফোলিও ব্যাগের দিকে হাত বাড়াল।

যেন কিছু হয় নি এমনিভাবে মুখ করে—এ ভান ধরা পড়লে পড়বে, কি আর করা যাবে—এমনই মুখভঙ্গিতে হেসে ফেলে মণিকা বললেন, 'একটা সংসার সঙ্গে ফেরে—ওষুধ-বিষুধ সব কিছু? আমার ওষুধের কোনো দরকার নেই বিরূপাক্ষবাবু—'

'একটা বড়ি শুধু খেয়ে দেখুন—'

'না।'

'থাক তাহলে।' চুরুটটা জ্বালানো দরকার। কিন্তু না জ্বালিয়ে নিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'উঠি। মানুষ নেই। কোথাও কোনো প্রাণ নেই।'

মণিকার প্রাণে বেশ বড়, ফলসা উজ্জ্বলতা আছে। শরীরে আছে রূপ। রূপের অহঙ্কার আছে। মাঝে মাঝে মণিকার এই নির্বিশেষে তীক্ষ্ণ জ্ঞান যে কোনো মানুষের জন্যে হৃদয়ের যে কোনো কোমল সক্রিয়তাকে কেটে ফেলে আত্মস্বাতন্ত্র্যে এমনই একাকী করে তোলে তাকে—সব কিছুর আর সকলের মনে এমন একক—যে এই পৃথিবীতে নারীসত্তা বলতে তিনি ছাড়া যে আর কেউ আছেন সে কথা স্বীকার করতে চান না মণিকা—বিশেষত তাঁর স্তাবক পুরুষমানুষদের সামনে।

মণিকা আহত হয়ে সুতীর্থের স্খলন বৃত্তান্তর কথা ভেবে দেখেছিলেন। ব্যথাকে তিনি ব্যথার পথে গভীরে না নামতে দিয়ে পাশ কাটিয়ে ছেড়ে দিতে চাচ্ছিলেন অন্য কোথাও—হয়তো অস্বস্তিতে,

ক্ষয়ভঙ্গুর ক্ষণিক অস্বস্তির ভেতরে। তবুও ব্যথাই বড়, কিন্তু তবুও তিনি বয়সী মেয়েমানুষ, কাঁচা নন। ব্যথাকে তিনি স্তম্ভিত করে রাখতে পারেন, যেন ব্যথা নেই অন্য কোনো মুহূর্তের জন্যে; আছে; তারপরে সময় আছে ঃ মানুষকে রেহাই দেয়—চুম্বকের মত টেনে নেয় সব ব্যথা নিজের বুকে সময়। অস্বস্তি বোধ করছিলেন, বাধা পাচ্ছিলেন, ভাবছিলেন সব মণিকা। হঠাৎ বিরূপাক্ষের কথা শুনে তিনি আরেক পৃথিবীতে নেমে এলেন, দুঃখ যেন মুহূর্তেই সরে গেল মর্যাদাকে স্থান দেবার জন্যে, ব্যথা লঘু, ফিকে হয়ে গেল বিরক্তিতে। নিজের মনকে বললেন মণিকা ঃ কোথাও প্রাণ নেই যাবার জায়গা নেই ঃ এ কথা আমাকে শোনাতে আসে কেন বিরূপাক্ষ। প্রাণ যে সমুদ্র তা সুতীর্থ টের পেয়েছিল, কিন্তু ধনুক তুলে শাসন করল না, মর্কটের মত শিলা জলে ভাসল ঃ কে জানে। প্রাণ নেই—বলছে বিরূপাক্ষ, কোথাও যাবার জায়গা নেই—আমার কান ছারপোকা খসাবার মত আর কোনো জায়গা নেই বুঝি মানুষটার।

'সুতীর্থকে ভালবাসতুম বলেই আজ ক'রাত ধরে এখানে আসছি—' বক্তব্য শেষ করবার আগে চুরুটের দিকে নজর পড়ল বিরূপাক্ষের।

'কিন্তু আজ রাতে সুতীর্থ তো আপনার বাড়িতে'—মণিকা বললেন।

তবুও কেন বিরূপাক্ষের এ বাড়িতে আসা? মণিকার মনে হল, বিরূপাক্ষ এবার মণিকাপীঠে ঢেঁকা দিয়ে ঢের মর্মভেদী কথা বলবে ঃ সে সব কথা মণিকার গ্রহণযোগ্য না হলেও বেশ চমৎকার শোনাবে কিন্তু।

'কিন্তু সুতীর্থের সঙ্গে আমার স্ত্রীর এই সব হল আর কি।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকাপীঠে মাথা খুঁড়ে কোনো কথা বললে না সে—কোনো কথাই বললে না—নিজের স্ত্রী কি করেছে না করেছে সেই গুমরে অভিভূত হয়ে জড়বুদ্ধির মত যেন বিরূপাক্ষ ঃ মণিকা যে সামনে বসে আছেন খেয়ালই নেই যেন। নিজেকে এক আধ মুহূর্তের জন্যে কেমন ছেঁদো মনে হল মণিকার, ওপরে গিয়ে ঘুমোতে ইচ্ছে করছিল তাঁর। শীত বেড়েছে—ঘুমও পেয়েছে। ঘুমের ভেতরে চিন্তার কোনো স্থান নেই—কোনো বিক্ষোভ নেই—মণিকা নেই, মণিকাপীঠ নেই, পীঠে এসে যে তান্ত্রিক সেবক নিজের মূঢ়তার জন্যে দেবীকে তৃপ্ত করতে পারল না সেই অপবিতৃপ্তির কোনো তিতকুট নেই শীতের রাতের সমস্ত বর্ণালির শেষে এক, নিঃশব্দ অন্ধকার বর্ণের ঘুমের ভেতরে।

'আপনার স্ত্রীকে চিনি না আমি, কি করেছে জানি না। আপনি দেখুন শুনুন সুতীর্থ যদি এদিকে আসে কোনো দিন তা হলে আমি এ সব বিষয় নিয়ে কোনো কথা বলা দরকার মনে করি না তার সঙ্গে—আপনার সঙ্গেও না। হুজুকে মেতে খুন করে নি সুতীর্থ?'

'না।'

'আপনার বাড়িতে আছে তা কেউ জানে?'

'কেউ জানে না।'

'কেউ জানে না, ভালো কথা। জানতে পারে হয়তো কেউ। স্ট্রাইকে বা অফিসে, কোথাও আর কাজ করবার ফাঁক নেই সুতীর্থের—শীগগির নেই। মণিকা এখন হাত ঝেড়ে বাতাসে হাত ধুয়ে ওপরে চলে যাবেন ভাবছিলেন। পা বাড়াচ্ছিলেন প্রায় যাবার জন্যে; বিরূপাক্ষকে কিছু না বলে, নাক উঁচু করে ওপরে চলে যাওয়াটা হয়তো অভদ্রতা হয়; অনেকে ওই রকমই সটান চলে যায়—ভদ্রতার বালাই নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না, কিন্তু তবুও চলে যাওয়ার ওরকম ঢঙটা পছন্দ করেন না মণিকা। বিরূপাক্ষ অপরাধ নেবে কি না নেবে—মণিকা শালীন ঘরের মেয়ে না অন্য রকম ঘরের—এ সব কারণে নয়, এমনিই বিরূপাক্ষের মতন একজন আলপটকা আপাতভদ্র মানুষের সঙ্গে ভদ্রতা বজায় রেখে শিষ্টাচারে সুস্থতায় কথা বলে বিদায় হওয়ার রকমটা ঠিক; এটাই ঠিক মনে হয় তাঁর।

মুখে হেসে ভদ্রতা করে মণিকা বললেন—'আচ্ছা, উঠি আমি—'

'আমার বাড়ি তিনটের সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে চাই।'

'বাড়ি সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা—' মণিকা অন্য কথা ভাবছিলেন।

'আমি নিজের জীবনটাকে ঢেলে সাজাতে চাই মণিকা দেবী—আপনার সহায়তা ছাড়া কি করে চলবে আমার। চারদিককার এই বিশৃঙ্খলার ভেতর আর একজন মানুষকেও আমি দেখছি না।' বললে বিরূপাক্ষ।

মণিকা জানালার বাইরে রাত্রির দিকে তাকিয়েছিলেন—লোকটা তাঁর খোশামুদি করছে—সমগ্র মন দিয়ে বোঝাই যায়, কিন্তু তবুও সে মননের উৎপত্তি মন, নয়, মাটি—বিরূপাক্ষ নলিনাক্ষ কমলাক্ষের হ্যবরল সত্তার। তবুও মন যে ভিজল মণিকার তা নয়, কিন্তু দু-এক মুহূর্ত আগেই যে আত্মমূল্যকে সবচেয়ে বড় জিনিস মনে হয়েছিল—এখন কেমন যেন ফাঁকা মনে হল সেটাকে। হল নাকি? মনের দ্রুত পরিবর্তন; কিন্তু কোনো পরিবর্তনই তাকে আয়ত্ত করতে পারে না। মণিকা আয়ত্তের ভেতর আসতে চাচ্ছিলেন—সুতীর্থের—এমনকি বিরূপাক্ষের মত মানুষেরও মনের কোনো নারীকূট নারীজননীকূটের নির্মল ঐকান্তিকতার সূত্র ধরে।

'এই তিনটে বাড়ির ট্রস্টি করতে চাই আপনাকে?'

'বাড়ির ট্রস্ট্রি?'

'হ্যাঁ।'

'বাড়ির ট্রস্টি আমাকে? তাতে আপনার কি লাভ?'

'আপনি নিজে রয়েছেন আমার জিনিস দেখে শুনে ঠিক রেখে,—বুঝে দেখবার জন্যে ট্রস্টিদের বোর্ড ডিরেক্টরদের বোর্ড গলদঘর্ম হচ্ছে না, কোনো বোর্ড নেই কিছু নেই—শুধু আপনি আর আমি—'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালতে গিয়ে দেখল তার হাত কাঁপছে, সমস্ত শরীর একটা আশ্চর্য শীত উত্তেজনায় কাঁটা দিয়ে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার।

'আপনি আমাকে এতটা বিশ্বাস করবেন না বিরূপাক্ষবাবু।'

'আপনাকে ছাড়া কাউকেই—বড্ড শীত—'

'সুতীর্থের কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে নিন।'

'না কম্বল লাগবে না আমার।'

'আজ শীত নেই তো।'

'শীত নেই তো, শীত করছে বড্ড।'

'দিনটা তো আজ গরম—'

'কিন্তু আপনি তো শীত পুকুরের বর্ত করেছেন বিরূপাক্ষবাবু।'

'শীতটা কমছে।' বিরূপাক্ষ বললে।

'কমবে, বাড়বে, ওটা শীতরাতের শীত নয়।'

'তবে?'

'ওটা নাভীর শীত।'

বিরূপাক্ষ বিস্ময়ে একটা বেড়াল শেয়ালের মত অবোল মিনি মণিকা দেবীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে বললে, 'শীতটা যে ভেতরের সেটা সত্যি।'

শীতের কাঁপুনি কমে গেল বিরূপাক্ষের। কিন্তু বিরূপাক্ষের মুখে যে কথা এসেছিল, কিছুক্ষণের জন্যে আড়ষ্ট হয়ে গেল—জিভ আড়ষ্ট হয়ে গেল তার।

মণিকা দয়াপরবশ হয়ে বললেন, 'বাতিটা আপনার চোখে লাগছে।'

কোনো সাড়াশব্দ করল না বিরূপাক্ষ বাতিটা নিভিয়ে দিলেন না মণিকা, এমনিই ওপরে চলে গেলেন।

আঠারো

পরদিন রাতে সুতীর্থের ঘরে ঢুকে চড়া বাতিটায় বড্ড অস্বস্তি বোধ করল বিরূপাক্ষ।

'সুতীর্থের যা রকম, একটা নব্বই ওয়াটের বাতি এনে রেখেছে ঘরে। কি দরকার এটা জ্বালিয়ে রাখার?' বললে বিরূপাক্ষ।

'জ্বলছে তো' মণিকা বললেন, 'মানুষ আলোই ভালবাসে।' 'হ্যাঁ। মানুষ তো বেড়াল নয়—' বলে বিরূপাক্ষ একটা সাদা কথা বলে ছেড়ে দিল; আরো ঘোরালো করতে পারত বুঝি কথাটাকে।

'দশ পনেরো ওয়াটের একটা সবুজ বালব দেওয়া যাবে এই ঘরে—সুতীর্থ যতদিন না ফেরে—'

'কোথায় ফিরছে। ওকে তো গুণ করে বেঁধে রেখেছে।

'কে?'

'জয়তী।'

'জয়তী?'

'আমার স্ত্রী। গুণী মেয়েমানুষ। সুতীর্থ বড়সড় হলে হবে কি—ওর নাকে এখনও ছেলেবেলার দুধ।'

নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকালেন মণিকা; কাঁটা—ঘড়ির সময়—থেকে থেকে ভেসে উঠছিল তাঁর চোখে; এতটা বেজেছে; একটা বেজে এত মিনিট। কিন্তু মানুষের ছোট্ট সময়টা তলিয়ে যাচ্ছে যেই সময়ের ভেতর, সেইখানে মনোনিবিষ্ট হয়ে থেকে আবার ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল তাঁর।

'জোর বরাতে মানুষ এরকম এয়োতি পায়, আমিও পেয়েছিলুম।' বিরূপাক্ষ বললে, 'আশ্চর্য, কী করে রং ছুট হয়ে গেল। দুজনের মন দুদিকে হেলে পড়ল।'

'তাই কি হয় কখনও?' মণিকা বললেন, 'দুঘাটে বসে স্বামী-স্ত্রী কখনও নিজেদের মজা দেখে?'

'আপনি ভদ্রলোকের স্ত্রী, সেইজন্যেই এই কথা বলছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলে সুখ আছে।' বললে বিরূপাক্ষ; বলবে কি না বলবে—কিন্তু তবুও এরপর আস্তে আস্তে বললে, 'কিন্তু কথা বলার মধুরতাও তলানির দিকে তিতো হয়ে আসে, তখন চুপ করে থাকাই ভালো।'

মণিকা কব্জি ঘুরিয়ে হাতেব ঘড়িটার দিকে তাকালেন আবার। সেকেণ্ডের কাঁটা কেমন মৃদুকম্পনে ঘুরে চলেছে, কাঁচ কাঁটা সোনা, সব উজ্জ্বলতার অতীত একটা সময় ও সমাধির খোঁজ পাওয়া যাবে বিরূপাক্ষ এ ঘর থেকে চলে গেলে;—একে তাড়িয়ে দেবেন না মণিকা—যতক্ষণ আছে অভদ্রতাও করবেন না; মাঝে মাঝে আলাপচারিতে একটু আস্বাদও আছে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মধুরতা বেশি', মণিকা বললেন, 'তা নয়।'।

'তা হলে সে তিতো মদ। আদ্যোপান্তই তিতো।'

'তা হবে।'

বিরূপাক্ষের চোখ আমেজে কুঁকড়ে আসছিল, বললে, 'আহা, বড় সুন্দর কথা তো? কি বলছিলেন?'

মণিকা পাঠ অপাঠের ওপারের থেকে যে কল ঘোরাতে জানেন তাই ঘুরিয়ে বলতে শুরু করলেন, 'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই মানুষের কথাবার্তার মধুরতা বেশি—' মণিকা ভাবছিলেন : বিরূপাক্ষের কাছ থেকে আমি কয়েক হাজার টাকা নিয়েছি; আমার খুবই দায়ের সময় টাকা দিয়েছে। টাকাটা ওকে ফিরিয়ে দিতে পারব কিনা বলতে পারছি না। ওঁর সময় নেই, আমাদের কোনো আয় নেই, সুতীর্থের কাছ থেকে ঘর ভাড়া পাচ্ছি না। নিচের তলায় যাঁরা আছেন জাপানী বোমার হিড়িকের সময় ভাড়া নিয়েছিলেন, মোটে ষাট টাকা পাওয়া যাচ্ছে তাদের কাছ থেকে; এতে

কি সংসার চলে আজকাল? রোগের চিকিৎসে হয়? ভদ্রভাবে থাকতে পারে মানুষ? বিরূপাক্ষ বিপদের সময় টাকা দিয়েছে, দিয়ে কোনো দলিল পর্যন্ত রাখে নি, টাকা সে ফেরৎ চায়ও না; কী চায়? শীত রাতে স্ত্রীলোকের মুখে কথিকা শুনে তৃপ্ত হয় ওর মন, কিন্তু এর চেয়েও বেশি কিছু ও চায়; সে সব পাবে না কিছু, কিন্তু যা দিচ্ছি, সে সব ভালো কথা সাজিয়ে দিচ্ছি আমি—যেন একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের মত—এটা দেব বিরূপাক্ষকে—যদি চায় আরো কুড়িয়ে বাড়িয়ে দেব। শীতের খুব বেশি রাতে মনে পড়ে আমাদের ছেলেবেলার বনঝাউ গ্রামে কোকিল ডাকত; গত বছরও গিয়েছিলাম গাঁয়ে, তেমনি ডাকছে কোকিল পউষের মাঝরাতে কোকিল যখন ডাকে তখন তার চারদিকে লোচ্চারা কান পেতে শুনছে বলে কোকিলের চরিত্র নষ্ট হয় না। কোকিলের কথা কথিকা শোনাব আমি (কাকে চাচ্ছে কোকিল, কোথায়; বিরূপাক্ষের সম্পর্কে সেটা অবান্তর) শীতের বেশি রাত অব্দি বিরূপাক্ষকে; কিন্তু পাঁচ সাত হাত দূরে থাকবে ওর নিজের কৌচে, আমি এই পূবদিকের সোফাটায়। ও যদি উঠবার উপক্রম করে কিংবা এগিয়ে আসে আমার দিকে—ওপরে চলে যাব আমি। ওর স্ত্রীকে ও কি করে পেয়েছে সেটা বোঝা শিবের অসাধ্য—কিন্তু বিরূপাক্ষের ঘাট বুঝে টাকা ওড়াবার বাতিক থাকলেও ও বড়জাতের মানুষ নয়—কোনো স্বাভাবিক মহত্ত্বই নেই—ওর হালচাল; ধাষ্টামো আছে, শরীরের তাগদ—তেল যাকে বলে—হেঁড়ে বেল্লিকপনা এইসব আছে; এই সবের থেকেই টাকার উৎপত্তি হয়, আমাদের ব্যাঙ্কগুলো বেঁচে থাকে।

'আমি ভেবেছিলুম তলানির দিকেই কথাবার্তার মধুরতা বেশি' বলছিলেন মণিকা দেবী। কিন্তু শুধু কথাবার্তা।—আর কিছু নয়? কিরে এসে ঠেকে কথাবার্তা।'

'নিজের নামে।'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করে বল্লে, 'না, না, আর কিছু নেই কথাবার্তার পরে?'

'আর কিছুতে তলানি নেই।'

'মধুরতা তো আছে?'

পৌঁছে গেলে মধুরতা কোথায়? কখনো পৌঁছতে হয় না, সব সময় চলেছি মনে করে—রণপায়ে নয়—এমনিই সহজ পায় চলতে হয়। আজ নয়—আর একদিন—একটু একা বসবার সুবিধে হলে কার্তিক পৌষ মাসে আমার কথা ভেবে দেখবেন; সত্য বলেছি—এইসব বলতে চাচ্ছিলেন মণিকা;—কিন্তু বিরূপাক্ষকে ঠিক নয়—অন্য কাউকে।

'তলানি?' ভারি গলায় কেমন বিকৃতভাবে বললেন বিরূপাক্ষ।

'প্রথমে ভূমিকা দিয়ে শুরু। তারপরে পরিচয়ের সময়। পরিচয় ক্রমেই স্পষ্ট হতে থাকে। তখন কথা জমে।'

'সেটা হল তলানি? কাদের কথাবার্তার?'

'পুরুষদের মেয়েদের?'

'সুতীর্থের আর জয়তীর?'

'যে অন্যদের কথা ভাবে সে পরলোকে পুরস্কার পাবে, কিন্তু ইহকাল তো আমাদের নিজেদের নিয়ে; আমরা নেই?'

বলে মনে হল যেন বিরূপাক্ষের কয়েক হাজারের ঋণ শোধ হয়ে গেল তাঁর। মণিকা দেবী তিনি। তেতলার থেকে দোতলায় নেমে বিরূপাক্ষের মতন একজন লোককে নিজের মুখে শীতরাতের পরম আশ্চর্য, নব ময়ূরী কথা ও মরালী রলরোল কথিকা শুনিয়েছেন তিনি। অবিশ্যি মুজরো দিয়ে শুনেছে বিরূপাক্ষ; সুতীর্থ এমনিই শুনেছে; বয়সে কথা আরো দুচারজনকে নিজেরই তাগিদে শুনিয়েছেন; কাজেই টাকার তাগিদে বিরূপাক্ষকে শোনাতে গিয়ে একটু তাল কেটে গিয়েছে। কিন্তু তবুও কেমন বিলোড়িত হয়ে উঠেছে বিরূপাক্ষ। সে যেন ব্যাটারি খুইয়ে অন্ধকারে ঝিমিয়ে পড়েছিল হঠাৎ কী যে অনির্বচনীয় ভোল্টেজে আলো বিদ্যুতের ভেতর জেগে উঠল। মানুষটার দিকে তাকিয়ে

টের পেলেন মণিকা যে এর ভেতর আবছা অজগর মোচড় দিয়ে উঠেছে। সেটাকে মুহূর্তেই পাটের দড়িতে বদলে ফেলতে ফেলতে মণিকা বললেন, 'আপনার তিনটে বাড়ির ট্রাস্টি যদি আমাকে করতে চান তাহলে আমার জন্য একটা অফিস তৈরি করে দিতে হবে।'

'নিশ্চয়ই।'

'কোথায় হবে অফিস?'

'যেখানে চান আপনি—ধাকুড়িয়ার বাড়িতে।'

'বাড়িগুলো কি খালি?'

'না, দুটো ভাড়া দিয়েছে, আর একটায় আমি থাকি।'

'অ্যাটর্নিকে নিয়ে আসবেন তাহলে কাল?'

'নিশ্চয়ই। কিংবা আপনাকে নিয়ে যাব গাড়িতে করে। কিন্তু আজ?'

'আজ তো সময় নেই আইন আদালতের?' কেমন যেন নাক্ষত্রিক দূরত্বে মাটিকাদার মানুষকে এড়িয়ে গিয়ে মণিকা বললেন, 'আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে খারাপ লাগল।'

মণিকা ধরা দিচ্ছেন না আর। চাঁদে চড়তে চড়তে মই পিছলে যেন পড়ে গেল বিরূপাক্ষ; 'আস্তে আস্তে একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বলল, 'কেন, বাড়ি তিনটের ট্রাষ্টি আমার স্ত্রীকে করলে ভালো হত?'

'সেটা বিচার করে দেখবেন। আমি অবিশ্যি এসব ভাবছিলুম না'। মণিকা থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার স্ত্রীকে ভরণপোষণের বেশি খুব কিছু দিলেন বলে মনে হচ্ছে না। দিয়েছেন খুব বেশি কিছু?'

বিরূপাক্ষ অস্বস্তি বোধ করেছিল, এতদিন সাধ্যসাধনা করে সে যা পারেনি সেই প্রত্যক্ষ নিজেরই অন্তিম মাধুর্যে বিরূপাক্ষকে ডাক দিয়েই ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল মণিকা আবার। এই সব ট্রাষ্টিফষ্টি টাকাকড়ি ভাগ-বাঁটোয়ারায় ছিঁচকে কথা দিয়ে কী হবে। একেবারে বুকে হাত দিয়ে মোক্ষম কথা তো একটু আগেই পেড়েছিলেন মণিকা। তারপরেই ঘুষি বসিয়ে দিলেন বুকের ওপরে। বিরূপাক্ষ ঘামিয়ে উঠে কেমন যেন তলিয়ে যেতে যেতে বললে, 'আমার পনের লাখ থেকে তাকে দেব কয়েক লাখ—'

'কয়েক লাখ!'

'কেন? কি?—'

'আমি ভাবছিলুম টাকাটা কি আপনার স্ত্রীব ভোগে লাগবে? না যার সঙ্গে—'

'যার সঙ্গে কেটে পড়েছে তার ভোগে? সে তো সুতীর্থ।'

বিরূপাক্ষ চুরুট জ্বালাল।

'হ্যাঁ। সতীনকাঁটা সেঁধিয়ে দিয়ে সতী বটে জয়তী; না হলে এ রকমভাবে আদায় করে নিতে পারে? ওর ঢের অপরাধ, তবুও আমি ভালোবাসি আমার স্ত্রীকে। ছাড়াছাড়ি হবে। লোকেরা বলাবলি করবে 'ডিভোর্স' 'লিগ্যাল সেপারেশন' যার যা মুখে আসে; ঐ জিনিসটাকে ভয় করছিলুম। যাক গে লোকের বলা—হেহে—কিন্তু ছাড়াছাড়ি তো হবে, এক সঙ্গে থাকবো না; কি করে দিন কাটাব ভাবছি; কেটে যাবে।'

বিরূপাক্ষ একটা বড়, অবসন্ন হাই তুলে বললে, 'যত বড় বোয়ালই হোক না কেন জয়তী, আমার মতন বঁড়শীর কেঁচোর কাছেও তাকে আসতে হয়েছিল—ভালবেসেছিলুম বলে।'

কয়েকটা বেপরোয়া বেশ বড় রকমের হাই ছাড়ল বিরূপাক্ষ; 'আ!—আ—আ। মা—মা!—মা!' বলে চারদিককার চাতাল কাঁপিয়ে ডুকরে উঠল কয়েকবার।

'ক লাখ দেবেন তাকে?'

'এখনো ঠিক করিনি কিছু। তবে সবচেয়ে শাঁসালো মুড়োটা নিজের বিয়োতি স্ত্রীর পাতে

পড়া উচিত নয় কি—ন্যাজার দিকটা আর পাঁচ রকমের জন্যে?'

মণিকা সায় দিলেন কিংবা সেই ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন; বিরূপাক্ষের মনে হল মাথাটা কেমন মন কালো সোয়ানা খোঁপায় সাজিয়ে রেখেছেন মণিকা।

'বাকি টাকা কোথায় কোথায় দেবেন?'

'সেটা বুঝে দেখতে হবে।'

হাঁসমুর্গির ঘ্রাণে নিবিড় অন্ধকারের ভেতর শেয়ালের মতন, চিমসে দৃষ্টিতে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'বাতিটা নেবানো যায়?'

'না।'

'কেন?'

'আর একটু অপেক্ষা করুন।'

'কিসের জন্যে?'

'বেজেছে সাড়ে নটা। আপনার ঘুম পেয়েছে বিরূপাক্ষবাবু?'

'না। আমি বলছিলুম—'

'চোখে লাগছে নাকি?'

'আপনার লাগছে ভাবছিলুম।'

'না তো।'

'ঘরটাকে অন্ধকার রাখলে ভালো হত না?'

'আমি এক্ষুনি উঠব। আচ্ছা উঠছি। বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'না না, বসুন। দশটার সময়ে উপরে যাবেন বলেছিলেন।'

'ওঃ', বিরূপাক্ষ বসলে, 'আপনাকে উইল দেখানো হয়নি; আলোয় আলোয় দেখিয়ে নিই।'

বিরূপাক্ষ ব্যাগের ভেতর হাত ঢোকাল; মণিকা বললেন, 'কাকে কি দেবেন ভালো করে ঠিক করার আগেই উইল করছেন?'

'এটা খসড়া।'

'এটা খসড়ার দরকার কি—অদল বদল যখন করতেই হবে?'

'হ্যাঁ, আজকালই করব। আপনাকে চিনতাম না তো; দেখা হল, ভালো হল, উইলের সম্বন্ধে আমি অন্যরকমভাবে চিন্তা কবছি। আপনার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করব না আর।'

'কত টাকার উইল?'

'পনের লাখ টাকার—পঁচিশ লাখও বলতে পারেন।'

'অত টাকার ব্যাপারে আমার ফোড়ন না কাটাই ভাল।'

'সে কথা যদি বলেন—' বিরূপাক্ষ বললে, 'এত বোতল সোডা আনিয়ে দিতে পারেন? এখানে এক আধটা বোতল আছে? সুতীর্থ রাখে না।'

'না, ও রাখে না, সুতীর্থ খায় না কিছু। মুশকিল যা চাচ্ছেন তা আমাদের এখানে খেয়ে দেখেনি কেউ, রসদ নেই। এত রাতে আনিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। চাকরকে দিয়ে সোডা আনিয়ে দিতে পারি, কিন্তু অন্য জিনিসটা কোথায় পাবে সে। এ পাড়ায় কে রাখে এসব জিনিস।'

'কিন্তু আমার না হলে চলবে না।'

মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

'অন্তত বাতিটা নেবাতে হয়।'

মণিকা বসেছিলেন। এক্ষুনি বাতিটা নেবাতে গেল না বিরূপাক্ষ। বের করে ফেলে বললে, 'এই নিন—'

'মণিকা বললেন, 'এবার ওপরে যাব।'

'হ্যাঁ আটকে রেখেছি অনেকক্ষণ—আমার নিজের দিকটাই দেখছি শুধু—কষ্ট দিলাম ঢের—'

বিরূপাক্ষ সিগারেট জ্বালিয়ে দুএকটা টান মেরে আবার একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে প্রথমটাকে জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব আমি। কিন্তু ঘরে কোনো মানুষ নেই—একটা বোতল অব্দি নেই—এ রকমভাবে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তো আমার।'

'অভ্যেসকে চাবুক মেরে শেখাবার দরকার যাদের তারা তা করে। লাখ লাখ টাকার মালিক আপনি, ও সব দরকার আপনার নেই।'

বিরূপাক্ষ উঠে গিয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল। মণিকা মনে মনে ভাবলেন, আমি এক্ষুনি উঠে যেতে পারি। কিন্তু বসে আছি তো। বিরূপাক্ষ যা ভাবে তা যে নয় সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্য আলোয় নয়—এই অন্ধকারের ভেতরেই কিছুক্ষণ বসে থাকা দরকার আমার।'

'কটা বাজল?' বিরূপাক্ষ বললে।

'ঘড়ি দেখে বলতে হয়—'

'ঘড়ি হাতে?'

'আছে।'

'রেডিয়াম ডায়াল তো?'

'একবার অন্ধকার হয়ে পড়লে আমি আর ঘড়ি দেখি না।'

চমকিত হয়ে বিরূপাক্ষ বললে, 'দেখবার দরকারই বা কি?'

অন্ধকারের ভেতর, শীতের ভেতর মণিকা কোনো কথা বলতে গেলেন না আর। বিরূপাক্ষ বলছিল না কিছু।

মণিকা নিজেকে ঠিকভাবে গুছিয়ে বসে বললেন, 'এমন অন্ধকার যেন কোনোদিন দেখিনি আমি। মনে হয় অন্ধকার যেন বিরাজ করছে।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিল বিরূপাক্ষ। আস্তে আস্তে টানতে লাগল, মানুষটার চেয়ে বেশি আগুনটা, আগুনের চেয়ে বেশি মানুষটা জ্বলছিল যেন অন্ধকারের ভেতর। মণিকার থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা সোফায় বসে বিরূপাক্ষের মনে হচ্ছিল ব্যবধান রয়েছে; কিন্তু থাকবে? মণিকার হাতে ঘড়ি আছে; অন্ধকারে—ঘড়ি দেখবার ছলে এগিয়ে যাওয়া যাবে; ঘড়ি দেখবার আগে কাঠিটা নিভে যাবে, আর একবার জ্বালাবার আগে সোফায় ওর পাশাপাশি বসা চলবে হয়তো—দেশলাই জ্বালাবার—ঝুঁকে পড়ে কি ঘড়ি দেখবার অজুহাতে? মানুষ তো কুকুর নয়—দেবতাও নয়—মানুষ; অন্ধকারের ভেতর বিরূপাক্ষের চুরুট জ্বলতে লাগল।

'সোডা চাই।'

শুনে বিরূপাক্ষের বুক ঢিবঢিব করতে লাগল—তামাশার—ঢের বেশি উত্তেজে, কিন্তু উত্তেজকে প্রশ্রয় দেবে না সে। যা আসছে তা স্বাভাবিকভাবে এলেই সবচেয়ে ভালো।

'সোডার কথা বলছিলেন আপনি'—মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, আছে বুঝি মজুদ অংশুদার ঘরে—ঐ সব বোতলও আছে?'

'কোনো কিছুই নেই—সোডা চান তো বায়রনের সোডা আনিয়ে দিতে পারি—আমি তা হলে চাকরকে পাঠিয়ে দিই।'

'আপনি ওপরে যাচ্ছেন?'

'এখান থেকে চাকরকে ডাকাডাকি করা চলে না তো—'

'না, সোডার দরকার নেই আমার।' বিরূপাক্ষের পায়ের গুমরে জুতোটা মচমচিয়ে উঠলো। 'হুইস্কি তো পাব না। আপনিও চলে যাবেন। আমি তো সাধুবাবা নই, গোঁসাইও নই, ওরকম গোমসা

অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকব কী করে?'

মণিকা মনে মনে ভাবছিলেন ঃ জানালা সব বন্ধ, ঘরটায় কোনো দিক দিয়েই আলো ঢোকে না। বড় রাস্তার গ্যাসের আলো এর ওর বাড়ির আলো সব দিক থেকেই বেগতিকভাবে নিজেকে রক্ষা করে অন্ধকারের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে আছে। আমার নিজের সাদা হাত দেখা যাচ্ছে। আমার ফর্সা মুখ দেখছে হয়তো বিরূপাক্ষ—ওর চুরুটের আগুন দেখছি আমি—এ ছাড়া কি আর দেখা যাচ্ছে।

বিরূপাক্ষ খুব তালেবর বটে, কিন্তু মণিকার সম্পর্কে কতদূর সেয়ানা হয়ে ওঠা সম্ভব তার? না, বিরূপাক্ষের সংক্রান্ত কোনো কথা ভাবছিলেন না তিনি এখন আর; কাল সারাটা রাত জেগেছেন মণিকা, আজ সারাদিন নাকে দমে খাটতে হয়েছে, শরীর ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছিল তাঁর প্রবলভাবে। বিরূপাক্ষের স্ত্রীর, সুতীর্থের নতুন খবরটা শুনে মনটা ঝিমিয়ে পড়েছে, কথা ভাবতে ভাবতে চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে এল—নিজে টের পাবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন মণিকা, সোফার এক দিকে ধীরে ধীরে মাথা কাত হয়ে পড়ল তাঁব; থুতনিতে হাত লাগানো ছিল—হাতটা ঢিলে হয়ে বুকে পড়ে গেল।

বিরূপাক্ষের মনে হল—কেমন যেন এলিয়ে আছে শরীর, আর একটু নিজেকে মানিয়ে নেওয়া উচিত ছিল মণিকাব,—কি ভাবছেন মণিকা? সম্ভ্রম হারিয়ে ফেললেন? এই রকমই কি?

চুরুট শেষ হয়ে এসেছিল তার; আরো কিছু টানলেও হয়; কিন্তু টানতে গেল না, আলগোছে মেঝেব ওপর ফেলে দিল, জুতো দিয়ে আগুনটা পিষে ফেলে বিরূপাক্ষ শুধাল—'আমি বলছিলুম—মিসেস মজুমদাব—'

কোনো উত্তর এলো না।

'মণিকা দেবী?'

কোনো সাড়াশব্দ নেই। কিন্তু মানুষটা ঘুমোয়নি নিশ্চয়। এ সব মানুষ ঘুমোয় কি কখনও?

'একটা কথা আপনার সঙ্গে—' বর্ষারাতে পাড়াগাঁর খাটালে বেড়ালের চোখ যেমন জ্বলে ওঠে, তেমনি নিরেট নিঃসৃত চোখে মণিকাব দিকে তাকিযে বিরূপাক্ষ বসে রইল, কিন্তু কোনো উত্তর পাওয়া গেল না।

'উইলটা কি আপনাকে দিয়েছি?'

জবাব দিল না কেউ। ঘুমিয়েছে? এত সহজে এরকম অসাধারণ মানুষ ঘুমিয়ে পড়তে পারে কখনও? আবেশে কিসের আবেশে—ডুবে আছে মণিকা ঃ বিরূপাক্ষ ভাবছিল।

যেন কোনো আকস্মিক উত্তুরে বাতাসে বেতসতন্বী আত্মার আঘাতে তার সমস্ত স্থূল মাংসকালিমাকে ধুয়ে পাখলে উজ্জ্বল করতে গিয়ে বিরূপাক্ষ টের পেল অঙ্গার সে—রিরংসার আগুন ছাড়া আর কিছুতেই মুখ উজ্জ্বল হয় না তার।

'আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করবার মত মানুষ আমি নই। আশা করি মার্জনা করবেন। এর চেয়ে কি বেশি ভরসা করতে পারি আপনার কাছ থেকে—'

মণিকা যদি জেগে থাকতেন বিরূপাক্ষের এ সব কথা শুনে কি করতেন তিনি? কি বলতেন? বলা কঠিন। কিন্তু ঘুমিয়ে আছেন। বিরূপাক্ষ তা টের পেল না; স্বীকারও করল না; এ সব নারীদের চেনে সে; নিরবচ্ছিন্ন ভান আর ভাঁড়ামোয় প্রায় কোনো পুরুষের কাছেই এরা শিং ভাঙে না, কিন্তু সে ব্যাটাচ্ছেলের টাকাটা টাকার মত হলে বেশ এলিয়ে আগ বাড়িয়ে থাকে।

মণিকাকে সে সবটা চেনে না—কিন্তু তবুও এতক্ষণ পাম্পের জলের তোড়ে তেতলায় চলে যাওয়া উচিত ছিল মণিকার। কিন্তু যখন তা করেনি, তখন ছক কেটে কাজ করেছে—বিরূপাক্ষের সব টাকাটাই নেবে মণিকা—নেয় যদি মণিকাকেই দিয়ে দেবে সে ঃ টাকাকড়ি জায়গাজমি ঘরদোর; এ শীতে দেবে তো; তারপর সামনের শীত; এক আধ মাঘে পালাবে, বলে মনে হয় না, বেশ জাপটে

ধরেছে শীতটা—কথা আর নয়, কথা ভাবা নয় আর, এখন কাজ করার সময় বিরূপাক্ষের। বিরূপাক্ষ উঠে মণিকার পাশাপাশি সোফায় গিয়ে বসল। এখুনি মণিকার গায়ের ওপর হাত দিতে ভরসা হল না তার। কিন্তু অন্ধকারের ভেতর বিরূপাক্ষের মনে হল খানিকটা গা ঘেঁষেই যেন বসা হয়েছে—ভারি একটা সুন্দর দামী শাড়ির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছিল। শাড়ি ঘেঁষে বসেছে সে—এই শাড়ির ফাঁসে যে মানুষ আছে তারই রূপে বাসে বাসমতী যেন এই শাড়ি।

বিরূপাক্ষ টের পেল মণিকা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের কাতরতায় অন্ধভাবে অন্ধকারের ভেতর কালো কালো কড়ির মত মাথা খোঁপা—ঠাণ্ডা শক্ত—জবাকুসুমের গন্ধ—বিরূপাক্ষের কাঁধে এসে ঠেকল।

কি করবে বিরূপাক্ষ? মণিকাকে জাগিয়ে দেবে? কেন জাগাতে যাবে? জাগাতে তো হবে এক সময়।

আপাতত এই অনির্বচন ভূমিকার ভেতর নিমগ্ন হয়ে রইল সে। এর পর অন্য রকম সময় আসবে; কিন্তু তার জন্যে সমস্ত রাতটাই তো পড়ে আছে। এমনই নিবিষ্ট হয়ে রইল যে শীতের রাতে তার বুকের ওপর ছড়ানো শালের অনুভূতির নিস্তব্ধতার ও খানিকটা ব্যবধানে যে ঘুমিয়ে আছে তাকে নিয়ে কি করা যায় এই নিদারুণ মাথা ঘামানো—অশক্তি ও অসাড়তার আবেশে অসংখ্য রাতের ভূমিকা হিসেবে এ রাতটাকে গ্রহণ করে কেমন যেন কুঁড়েমির ভেতর তলিয়ে গিয়ে কখন সে ঘুমিয়ে পড়ল টেরই পেল না সে।

উনিশ

রাত একটা বেজে গেছে। নিচের দরজা খোলা ছিল। নিচের ভাড়াটেদের দুজন চাকর সিনেমা না কোথায় থেকে ফিরে রোয়াকে বসে সিগারেট টানছিল, সুতীর্থকে দেখে একেবারে তাজ্জব মেরে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল তারা।

সুতীর্থ দোতলার সিঁড়ির শেষ ধাপ পৌঁছে দেখল যে কোলাপসিবল গেটে তালা মারা নেই—খোলা আছে। এত রাত অব্দি ঘরদোর খোলা পড়ে থাকে সব? দিন পনেরো সে তার এ ফ্ল্যাটে ফেরেনি; ফিরে হয়তো দেখবে খাটখানা ছাড়া আর কিছু নেই; অবিশ্যি মণিকা দেবী আছেন, তিনি একটা ব্যবস্থা হয়তো করে রাখতেও পারেন।

সুতীর্থের পায়ে জুতো ছিল না, চান করেনি তিনদিন, পরনের জামাকাপড় ছেঁড়া, ময়লা, রক্ত মাখানো। মারপিট সে অবিশ্যি করেনি, কিন্তু তাকে দেখে মনে হয় এ ছাড়া আর কিছুই করেনি সে, অনেক লোকের সঙ্গে অনেক রাত ধ্বস্তা-ধস্তি করেছে।

সুতীর্থ প্রায় বেড়াল পায়ের নিঃশব্দ পায়ে হেঁটে এসে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল তার ঘর শূন্য নয়, শূন্য তো নয়ই বেশ সরগরম। দুজন মানুষ পাশাপাশি এক সোফায়ই বসে আছে—ঘুমিয়েই আছে হয়তো—কিংবা আমেজে আড়ষ্ট হয়ে আছে। হয়তো ঘুমিয়ে আছে। এমন শীতের রাতে কতখানি আবেগের দুধ মেরে মেরে সর করতে পারলে—উতরোল রক্তকে খোরাক জুগিয়ে-জুগিয়ে অবশেষে শান্ত করে নিতে পারলে মানুষ এমন অদ্ভুত নিঝুম হয়ে পরস্পরের গা ঘেঁষে ঘুমিয়ে পড়তে পারে সোফার ওপর।

ঘরের ভেতর ঢুকতে গেল না সুতীর্থ; তার ঘরে অপরের নীড় নিজে সে বীতনীড় আজ। অন্ধকারের ভেতর একবার চোখ বুলিয়ে সুতীর্থ অনুভব করল টেবিল চেয়ার বাক্স বিছানা সবই ঠিক জায়গায় রয়েছে। নতুন ভাড়াটে কেউ আসেনি।

দুয়ারে দাঁড়িয়ে থেকেই সে বুঝতে পারল মণিকা দেবীর মাথা ঘুমে না কিসের তাড়সে এসে

পড়েছে। পুরুষটির বুকের ওপর প্রায়—কার হাত কার হাতে মিশে গেছে—কোন আঙ্গুলের সঙ্গে মিশে গেছে নারীটির শাড়ির ভাঁজ, নারীটির চুলের সঙ্গে শালের জরি ঃ কে তার হিসেব করবে। মণিকা এখানে এরকম অবস্থায় এত রাতে? সুতীর্থের অনেকদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে হয়তো এই ঘরটাকে তাঁর নিজের কাজে ব্যবহার করবার জন্যে ঠিক করে রেখেছেন তিনি। বেশি বিরক্ত বা বীতশ্রদ্ধ বোধ করল না তবুও সুতীর্থ। কিন্তু তবুও মনের ভেতর কেমন একটা কৌতুকের সুড়সুড়ি এসে পড়লেও হাসতে পারছিল না; আজ রাতে সুতীর্থও মণিকাকে লক্ষ্য করেই এখানে এসেছে—এত রাতে পায়ে হেঁটে সেই চেতলা থেকে। দশটার আগেই এসে পৌঁছবে ঠিক করেছিল। কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে দেরি হয়ে গেল। মণিকাকে আজ রাতে সুতীর্থও খুব হৃদ্যতার সঙ্গে চেয়েছিল বটে; কিন্তু ঠিক এরকমভাবে চায়নি। কিংবা এরকমভাবে পেলেও মন্দ হত কি? কিন্তু কে এই লোকটা সুতীর্থের ইচ্ছাবর্গের অপরিসর ধোঁয়া কেটে ফেলে নিজের সপরিসর বস্তুস্বর্গ রচনা করে বসেছে এমন রাতে—এমন পাপরিক্ত অতল অনিমেষ শীতের রাতে। মানুষটাকে দেখে ফিরে এসে সুতীর্থ স্তম্ভিত হয়ে বারান্দায় পায়চাবি করতে লাগল। বিরূপাক্ষের মুখ থেকে লালা ঝবে পড়ছে মণিকার ব্লাউজের ওপর। কেউ কাউকেই টের পাচ্ছে না, কিছুই টের পাচ্ছে না, দুজনেই ঘুমে কাঠ হয়ে আছে।

দোতলার বারান্দা থেকে অনেকখানি আকাশ দেখা যায়। আকাশ ভর্তি আগুনের গুঁড়ির মত নক্ষত্ররাজ্যের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে—ফাঁকা জায়গা থেকে ভেসে আসা খানিকটা ঠাণ্ডা হাওয়া পান করে নিল সুতীর্থ।

ঘুমিয়ে আছে বটে—এমনি নিঃস্পন্দ ঘুম যে সুতীর্থ চেঁচালেও জেগে উঠবে না ওরা। কিন্তু এ ঘুম তো একটা অতল উপসংহার—এর আগে যে আশ্চর্য অগম অভিনয় হয়ে গেছে কি খোঁজ রাখে সুতীর্থ সে সবের? কিন্তু বিরূপাক্ষকে নিয়ে? মণিকার মতন একজন? পুলিসের হাতে হতভাগা সেবকদের মরে যেতে দেখেও শরীর ও অন্তঃশীল মন বোধ এরকম উৎখাত হয়ে মোচড় দিয়ে ওঠেনি কোনোদিন বুঝি তার। নিজের চোখকে বিশ্বাস হচ্ছিল না, ঘরের ভেতর ঢুকল সে আবার; লাইট জ্বেলে দিল; বিরূপাক্ষই তো; চেহারা আরো খারাপ হয়ে গেছে; কেমন চোয়াড়ের মত দেখাচ্ছে ওকে। কিন্তু তবুও লালা ঝরে গেছে—ফুরিয়ে গেছে—শুকিয়ে গেছে; মুখের ভেতর যে কেমন একটা সুধীর সুস্থির জীবনবেদই যেন ফুটে বেরুচ্ছে ওর। এ দুঃসাধ্য জিনিস বিরূপাক্ষ কোথায় পেল যদি মণিকা ওকে দিয়ে থাকে।

মণিকার দিকে ফিরে তাকাল সুতীর্থ। ভাবতে ভাবতে মনে হল অতি বিষম অঘটন ঘটে যাবে হয়তো যে কোনো মুহূর্তে ঃ বিরূপাক্ষের লাস লুটিয়ে থাকবে এই মেয়েমানুষটির পায়ের নিচে, আর নিজের বিছানায় কি নিদারুণ রিরংসার আলিঙ্গনের ভেতর খুঁজে পাবে না সে মণিকাকে ও নিজেকে কি ভীষণ মৃত্যুর নাগপাশের ভেতর শেষ হয়ে যাবে সব।

কিন্তু মানুষকে আশ্বাস দেওয়াই ভালো; হিংসা করে কি আর হবে। যে যাতে সান্ত্বনা পায় তাই পেতে থাকুক; মজুমদার দেবীকে অবিচার করে কোনো লাভ নেই। বাতিটা নিভিয়ে দিল সে।

বারান্দায় পায়চারি করছিল সুতীর্থ ঃ ভাড়ার টাকা দিইনি, ঘর আটকে রেখেছি, সেলামী বন্ধ করেছি। বিরূপাক্ষ অনেক দিয়েছে নিশ্চয়; সবই বিকিয়ে দিয়েছে হয়তো; কেন নেবে না মণিকা।

যেন বিরূপাক্ষ মণিকার জীবনে নেই, বিরূপাক্ষের টাকা মণিকা গ্রহণ করেনি, কোনোরকম রাত্রিবাস হয়নি বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার—ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ তার টালমারা বইয়ের ঘরের ভেতর ঢুকল। এ, ঘরটা তার বসবার, শোবার ঘরের চেয়ে অনেক দূরে; এখানে কোনো খাট ছিল না; অন্ধকারে আরসোলা ইন্দুরের আনাগোনার ভেতর খানিকটা জায়গা ঠিক করে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল সে। আজ তারো খুব ঘুম পেয়েছে—গত সাত-আট রাত সে ঘুমোতেই পারেনি।

এমন নিখাদ নিঃস্বপ্ন ঘুম অনেকদিন ঘুমোয়নি মণিকা। রাত দশটার পর থেকেই তার স্বামীকে পরিচর্যা করতে হয়। সারা রাতের মধ্যে ঘুম হয়েই ওঠে না। দিনের বেলা একটানা ঘুমের বাধা

অনেক—সব কিছু দেখবার শোনবার তত্ত্বাবধান করবার মানুষ বাড়ির ভেতর সে-ই তো একা। আজ বিরূপাক্ষের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাত দশটা পেরিয়ে গেল। ঘুম তাকে অতর্কিত আক্রান্ত করেছিল। অতর্কিত, কিন্তু খুব স্বাভাবিক ঘুম, সমস্ত দিনের অত পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর ঘুম না এসে পারে না। এ জন্যে বিরূপাক্ষ দায়ী নয়; বিরূপাক্ষের কথাবার্তার অসারতায় ঘুম যে না পায় তা নয়, কিন্তু জেগেও থাকতে পারা যায়—কিন্তু কেমন একটা হ্যাঁচকা ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে উঠল তার; তারপর কী হল কিছুই মনে নেই। এরকম ঘুম আগেও সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়েছে বটে, কিন্তু সে সব পরিবেশে বিরূপাক্ষের মত কোনো মানুষ কোনোদিন বর্তমান থাকেনি। মণিকা হঠাৎ যখন ঘুমের ভেতর থেকে জেগে উঠলেন, তখন রাত দুটো বেজে গেছে। সে স্থিরই করতে পারল না কোথায় সে রয়েছে—একরকম গভীর নিঃসাড় অন্ধকারের মানেই বুঝে উঠতে পারল না। তেতলায় তাদের ঘরে সারারাত সবুজ শেডের নিচে একটা খুবই মৃদুশক্তি শান্ত বাতি জ্বেলে—ঘরটাকে অন্ধকারের হাত থেকে রক্ষা করে মিহি মৃদু জ্যোৎস্নার মতন ছড়িয়ে থাকে সারারাত। কিন্তু এখানে সে জ্যোৎস্না নেই তো; এ তো মুখে চোখে শরীর অন্তহীন কাটাকুটি মেঘডুমুরের পাক, সর্বের ঝাঁক কালো কালো রাশি রাশি বেড়ালের ছোটাছুটির মত অন্ধকার।

সে তার নিজের ঘরে নেই—অন্য কোথাও আছে—কোথায়? কোনো নেমন্তন্ন বাড়িতে, না কোনো দূর আত্মীয়ের রোগশয্যার পাশে অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়েছে সে? নাকি এটা হাসপাতাল—কোনো অঘটন ঘটেছে তার? স্ট্রেচারে করে এখানে এনেছে তাকে সবাই মিলে? মণিকার চেতনা এত বেশি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল যে পর পর সব কিছু বুঝে নিতে কিছুটা সময় লাগল তার জেগে উঠে অনেকক্ষণ পরে তার কাছে একজন মানুষের সান্নিধ্য অনুভব করল মণিকা। এমন কি প্রথমে সে বিরূপাক্ষকে মনে করেছিল সুতীর্থ বুঝি—শালটা ভালো করে জড়িয়ে দিল তার গায়ে—চুলের ওপর হাত বুলোতে গিয়ে আড়ষ্ট হয়ে থেমে গেল—এ তো সুতীর্থ নয়। আগাগোড়া ব্যাপারটা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে এল তার কাছে।

কিন্তু বিরূপাক্ষ কখন এসে সোফায় তার পাশে বসেছে? মণিকা তো ওকে বসতে বলেনি। গা ঘেঁষে বসেছে, ব্লাউজটা যে একদিক দিয়ে ভিজে গিয়েছে সে কি ঘামে না ওর মুখের ঝরানিতে?

ঘামেনি তো মণিকা—এত বেশি শীতের রাতে কি করে ঘামবে? মণিকার মন রি রি রি রি করে উঠল।—কিন্তু তবুও নিজেকে ধিকৃত করল না সে—বিরূপাক্ষকেও না। এমন অনেক কিছুই ঘটে থাকে পৃথিবীতে যার জন্য আমাদের তোলা সংসার-সমাজের মধ্যে একটা বিরাট ভূমিবিপ্লব হয়ে গেল বলে মনে হয়—ধসে গেছে পৃথিবীর মাটি যেন পায়ের নিচে থেকে; কিন্তু ভূমিকম্পটা কি মানুষ ইচ্ছে করে করে। কিন্তু তবুও কেউ কাতরে পড়ে ভূমিকম্পে—বিশেষত, যাতে দোলা লাগে, কিন্তু চাপা পড়তে হয় না। ভাবছিল মণিকা।

দশটা থেকে দুটো অব্দি আমি বেহুঁশের মত ঘুমিয়েছিলুম। আমাকে নিস্তব্ধ দেখে বিরূপাক্ষ হয়তো মনে করেছিল আমার কাছে এসে বসা চলে। বসেছে তাই। কিংবা কে জানে ঘুমিয়ে পড়েছি বলেই এসেছে। জাগা মানুষের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় না, তার ঘুমন্ত শরীরের কাছে আবেদন করে তা পাওয়া যায় ভেবেছিল? ভেজা ব্লাউজটা শীতের ভেতরে বড় ঠাণ্ডা লাগছিল মণিকার; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল তার।

মণিকা ভাবছিল; পাওয়া যায় হয়তো; কিন্তু একজন ঘুমোনো মানুষের শরীরের ওপর দিয়ে পিঁপড়ে উঠে যায়, ইঁদুর চলে যায়, মাছি ওড়ে, মানুষ সেখানে হাত দিলে সে মানুষ মাছি আর পিঁপড়ে। কে জানে বিরূপাক্ষ কি করেছে।

মণিকা ওপরে চলে গেল।

ওপরে উঠে দেখল অমলা অসাড় হয়ে ঘুমিয়ে আছে বটে, কিন্তু অংশু টানে কষ্ট পাচ্ছেন।

'কোথায় ছিলে তুমি মণিকা এতক্ষণ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

'এমন তো ঘুমিয়ে পড় না কোনোদিন।'

'তুমি কখন জেগে উঠেছ?'

'অনেকক্ষণ—অনেক—'

'আমাকে খুঁজেছিলে বুঝি।'

'হ্যাঁ। অমলাকে ডাকলুম, কিন্তু সে কোনো সাড়া দিলে না। ভাবলুম, যাক গে, আমার তো বাঁধা এ জিনিস, কে কি করবে এর, মাঝখান থেকে মানুষকে কষ্ট দেওয়া। কোথায় ছিলে তুমি মণিকা?'

'আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—'

'কোথায়?'

'নিচে।'

'দোতলায়?'

'হ্যাঁ।'

'সেই সুতীর্থ ছোকরা কি আজো ফেরেনি?'

'না।'

'ওকে তুমি এত টান কেন।'

'কই, না তো। তার ঘরদোর খোলা রেখে গেছে। আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি।'

'আমি মাঝে মাঝে গিয়ে একটু দেখে আসি? হে-হে-হে—'

হ্যা হ্যা—হা হা করে হেসে উঠল অংশুবাবু ঃ কপাল নাক চোখের চারদিকের ঢিলে মাংস বার বার কুঁচকে উঠতে লাগল তার।

'আমাদেরও সময় ছিল মণিকা; আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে-টেখে আসতুম। সে সব দিন কোথায় গেল?'

পর পর গোটা তিনেক বালিশ সাজিয়ে বুকে করে বসে আছে লোকটা। জানালা দিয়ে কলকাতার রাতের কালো ফর্সা ডোরাকাটা আদিম টিকটিকির ঝলমলানির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, 'কি চাও তুমি বলো তো?'

'আমি? কেন?'

'দরকার আছে।' মুখে কিসের যেন জড় মরছে না—মণিকার দিকে তাকাল অংশুবাবু।'

'যা চেয়েছি, তা তো পেয়েছি।'

'ও সব ঠোঁটনাড়া মৌচুষকির কথা আমি শুনতে চাই না।'

'তার মানে? কি বলছ তুমি?'

'মানে, খোলাখুলি কথা বলতে হবে।'

'সব সময়ই তাই বলি আমি।'

'আমি আর বেশি দিন বাঁচব না—মরবার আগে তোমার নিজের মন—যে মনটা দশ বাঁও জলের নিচে লুকিয়ে থেকে তোমার নিজেরও সত্য মন—তাকে আমি দেখে যেতে চাই। আমাকে ধোঁকা দিয়ে ঠকাবে কেন তুমি?'

'আমি ঠকাচ্ছি বুঝি?'

'হাঁপানি রুগীর অন্তিমকাল এলে কে না ঠকায় তাকে?'

'তাই যদি হয় কি আর করবে তুমি?'—মণিকা টেবিল থেকে একটা কাঁচের গেলাস তুলে সোরাইয়ের থেকে জল গড়িয়ে খেতে লাগল।

শরীর ঠাণ্ডা হল তার, বললে, 'আমার ইচ্ছে সুতীর্থ তার নিজের ঘরে ফিরে আসুক।'

'কোথায় গিয়েছে সুতীর্থ?'

'জানি না।'

'ফিরে আসবে কেন?'

'ওর জীবনটাকে নিয়মের ভেতর আনা দরকার। শুনলুম ধর্মঘট করছে—করুক, যদি দরকার হয়। শুনেছি আর একজন ভদ্রলোকের স্ত্রীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে। সে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যে জিনিসটাকে আমি সবচেয়ে কম বুঝি তা হচ্ছে মিছেমিছি এ-পথে সে-পথে—কোনো স্ট্রাইক নয়, কারুর স্ত্রীর ব্যাপার নয়—এমনি কলকাতার গলিঘুঁজি রাস্তা বাগানে ঘুরে বেড়ানো। ও ঘুরে বেড়ায়।'

'কে সেই ভদ্রলোক, যার স্ত্রীর সঙ্গে—'

'সে ভদ্রলোক অংশুবাবু ছাড়া আর কে'—বললে মণিকা, গলার আওয়াজে শ্লেষ ও হাসির বিন্দু বিন্দু খামির ছড়িয়ে আন্তরিকতারও ঃ—অতএব খানিকটা আশ্বাস অনুভব করতে দিয়ে অংশবাবুকে; ঘরের ভেতরে একমন একটা গ্রহণ-তিথি-উত্তীর্ণ গ্রাসমুক্ত চাঁদের মত হেঁটে বেড়াচ্ছিল মণিকা, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল অংশু; তেপয়ের থেকে ছোট শিশিটা তুলে নিয়ে মণিকা বললে, 'এর মধ্যেই খেয়ে ফেলেছ দেখছি এফিড্রিন ঃ একটা আস্ত বড়িই খেয়ে ফেললে—'

কোনো জবাব দিল না অংশুবাবু।

'আমি বলেছিলুম তো তোমাকে আধখানা করে খাবে।'

মণিকার সাধু মননে ও সত্যার্থে আশ্বাস—আরো খানিকটা আশ্বাস বেড়ে গেল অংশুবাবুর? না, তা একই জায়গায় রয়েছে, তার কোনো বাড়া কমা নেই? গান্ধীর কাছে মণিকা হয়তো সাধু ও তার স্রষ্টার কাছে সত্য; কিন্তু ওরকম প্রেম ও ক্ষমায় জ্ঞানী হলে মানুষের ক্লান্তির অতীত হতে পারত অংশবাবু; তা হতে পারেনি। তবুও খানিকটা ভালো লাগছিল, কেমন বিষণ্নতা বিলাসে নিজেকে ছেড়ে দিল সে, মণিকার দিকে একনজর তাকিয়ে নিয়ে জানালাব ভেতর দিয়ে শূন্যের দিকে চেয়ে রইল।

প্রকৃতি সময় ও নারী যদি এ সবের প্রতীক হয়—সকলেরই অন্তর্ভেদী এই মূর্তি। কিন্তু এসব দেখে অভ্যস্ত বলেই হোক, কিংবা নিজেকে সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত করে রেখেছে সেই জন্যেই হোক, মণিকা অংশুবাবুর বিছানার পাশে বসে ধীরে ধীরে তার পিঠ বুলিয়ে দিতে লাগল, পিঠের আড়ালে মুখ নুইয়ে রেখে উপলব্ধির নদীর ভেতর ছিটেফোঁটা ঢিল ছুঁড়তে লাগল সে—হাসির, পরিহাসের, নৈরাজ্যের সহানুভূতির, সংকল্পের, ব্যথা মহত্ত্ব ও ক্ষমার কেমন একটা যোগনিদ্রার যেন—সমস্ত পৃথিবীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকে যেন।

অংশবাবু অনর্গল বকে যেতে লাগলেন আবার—

'মিছেমিছি কথা বলছ কেন?' মণিকা শাসাল তার স্বামীকে, 'কথা বললেই তো শ্লেষ্মা ওঠে তোমার, কাশির ধকল বেড়ে যায়।'

'টাকা দিয়ে বকনার দুধও পাওয়া যায়। টাকা আজকাল সবারই হাতে। যাদের নেই তাদেরও পেতে হবে। কে মাথা ঠিক রাখবে।'

'তোমাকে ওষুধ দেব?'

'সুতীর্থ ফিরেছে?'

'না।'

'কদিন হল?'

'দিন পনেরো।'

'আজো ফিরল না? তবে এই রাত দুটো অব্দি নিচে কোথায় ঘুমিয়েছিলে তুমি?'

'ওর ঘরে।'

'খালি ঘরে একা ঘুমোবার কি মানে হতে পারে বুঝি না আমি। ও ভাড়া দিয়েছে?'

'না, দেবে হয়তো শীগগিরই।'

'ক' মাসের বাকি?'

'আমি হিসেব করে বলছি—ছ' মাসের অন্তত।'

মণিকা বিছানার কিনার থেকে উঠে ঘরের ভেতর পায়চারি করে, ঘুমন্ত অমলার চুলের ওপর হাত বুলিয়ে, অবশেষে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভেব না তুমি, ও বিপদে পড়েছে। টাকা দিয়ে দেবে।'

'নিচে কার গলা শুনছিলুম?' অংশুবাবু তার সুন্দর অথচ কিছুটা বেখাপ্পা কটা চোখ তুলে মণিকাকে জিজ্ঞেস করল।

'কখন?'

'রাত দশটা সাড়ে দশটা অব্দি।'

'ও—বিরূপাক্ষের।'

'বিরূপাক্ষ কে?'

'সুতীর্থের চেনা লোক—তার খোঁজে এসেছিল।'

'এত রাত অব্দি ছিল কেন?'

এরকম প্রশ্নের কয়েক রকম জবাবের মধ্যে কোনটা বেছে নেবে। আন্দাজ করতে করতে মণিকা বিছানায় গিয়ে বসল আবার। অংশুবাবুর মনই এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকাল যে ভুল বুঝবার সুযোগ মণিকাব কথার যে-কোনো রকম মার-প্যাঁচেব ভেতর থেকেই বের করে নেবে। ঠিক এই জন্যেই নয়—এমনিই সত্যি কথাটা বলে দিতে চাইল মণিকা—সহজভাবে। কিন্তু তবু শেষ পর্যন্ত অংশুবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে হিং টিং ছট ছড়িয়ে দিয়ে বল্লে 'ভদ্রলোক আজ আসাম মেলে এসেছেন।'

'ওঃ, আমি ভেবেছিলুম বাঙালী।'

'তা বাংলা কথা বলতে পারেন।'

'সে যাক গে। তাবপর?'

'এসে কোথায় এক হোটেলে উঠেছিলেন। কিন্তু সেখানে সুবিধে হল না, তাই সুতীর্থের এখানে এসেছিলেন; এসে পেলেনও না, আমি ছিলুম তখন দোতলায়। সুতীর্থের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্তেও অনেক দরকার ছিল ওর—সমস্ত শুনে বুঝে নিতে হল। সুতীর্থ ফিরে এলে তাকে জানাতে হবে সব।'

'ভদ্রলোক চলে গেছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কটার সময়?'

'এই দশটা সাড়ে দশটা নাগাদ—'

'কোথায় গেলেন?'

'বড়লোক মানুষ গাড়ি হাঁকিয়ে কোথায় গেলেন আমি তাকে তা জিজ্ঞেস করিনি।'

'সুতীর্থ তোমার কে জিজ্ঞেস করেছিল?'

'না।'

'এমনই খাজা আহাম্মক? এই মাথা নিয়ে ব্যবসা করে ও।' অংশুবাবু হঠাৎ একটা সুন্দর ভিন জঙ্গলের বাঘিনীকে দেখে বুড়ো দক্ষিণ রায়ের মত চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাল। মণিকার কথা কতদূর বিশ্বাস করেছে অংশুবাবু বুঝতে পারা গেল না। করেছে হয়তো পুরোপুরিই বিশ্বাস মনের ভেতর একটা তেতো ঝাঁঝ—আর্সনিকের মত—যতই মিইয়ে আসতে লাগল অংশুবাবুর ততই ঝিমিয়ে পড়তে লাগল সে। ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়ল।

অংশুর পাশেই দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে চিত হয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রইল মণিকা। পৃথিবীটা কি এমন হতে পারত না যে, ভালো মনে করে যে কাজ করে যে কথা বলে তেমনি শুদ্ধচিত্তেই অন্যকে তা জানানো যায়? মণিকা একজন নিবিড় নিশীথঠুঁটী স্বর্গীয় পাখির মত নিমেষরহিত হয়ে ভাবছিল যে তাই যদি হত, তা হলে কি এ ঘরে থাকবার প্রয়োজন হত তার—কিংবা এই নগরীতে—এই পৃথিবীতে—এই গ্রহে? মহাশূন্যের অন্ধকারের ভেতর দূর আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্য পেরিয়ে অপর কোনো আলো ঋতুর দেশে হয়তো চলে যেতে হত তাকে। বাইরে গিয়ে আকণ্ঠ ঠাণ্ডা বাতাস পান করবার ইচ্ছে হল তার—এই শীতের রাতেও। মাঘঋতুর শিশির পাখলানো নক্ষত্রতন্বী নিস্তব্ধ আকাশটাকে দেখে আসবার সাধ জেগে উঠল।

'ওঠো, ওঠো মণিকা, এসো, কত কোটি কোটি তারা জ্বলছে, দেখ এসে ঃ কত সাদা কালো কমলা ডানার লাল নীল ঠোঁটের পাখিরা যেন বাইরের শূন্যে শূন্যে পাখনার ঝাপটায় বলছে তাকে ঃ এখনই সব মাঘ শেষেব ফাল্গুনের বাতাস ফুর ফুর উড় উড় করে ঢুকে পড়তে লাগল ঘরের ভেতর। কিন্তু তৎক্ষণাৎই নিচের—মাটির সংসাবগ্রন্থিতে ফিবে আসতে হল তাকে; অংশুবাবু শীগগিরই মরে যাবে, ময়েটার রূপ থাকলেও সে উৎবোবে না, এ বাড়িটা মর্টগেজে বাঁধা আর একজন লোলুপ মাড়োয়ারী কালোবাজারীর কাছে (বিরূপাক্ষ তাকে চেনেও না), সুতীর্থের দাযিত্ব সুতীর্থের নিজের চেতনা প্রেরণাব কাছে শুধু ঃ সেগুলোকে সে জ্যামিতি ট্যামিতির মতন অব্যর্থ মনে করবে। কিন্তু জ্যামিতি নিজেই ছিল; মানুষ হাতড়ে পেযেছে তাকে; মানুষ দুর্বল, জ্যামিতি অব্যর্থ। এটাই বোঝে না সুতীর্থ?

বিরূপাক্ষের সঙ্গে মণিকার সবচেয়ে বড় ফাঁড়া আজ রাতেই কেটে গেছে আশা করা যায়। বিরূপাক্ষ ঘুমিয়েছিল। তার ব্যাগের ভেতর তার উইলের খসড়া সেদিনকার চেক ও টাকা সব ফিরিয়ে দিযে এসেছে মণিকা। বিরূপাক্ষকে মণিকা ঘৃণা করে না, বিষাক্ত ব্যবসায়ী হলেও ওর হৃদয় হয়তো ঠিক সে অনুপাতে কঠিন নয়, মনটা সর্দার, কিন্তু সমীচীন নয়—স্থির নয়, এখনও রাধাচক্রে ঘুরছে। যদি বুঝতে পারা যেত ও সত্যিই ঘোড়েল, ওর হাত থেকে কিছুতেই নিস্তার নেই, তাহলে মণিকা কি ওর জন্যে এত কটা বাত খরচ করত? ওকে দেখা মাত্র বিদায় করে দিত. না হলে হয়রানি বেড়ে যেত,—এর চেয়ে ঢের বেশি হয়রানি।

অংশুবাবু হঠাৎ জেগে উঠল কেমন জ্বলজ্বলন্ত দুটো কটা চোখ মেলে. গির জঙ্গলে চিতে বাঘ জেগে উঠেছে যেন দিনের আলোয় দিনের আলোর ঘুম থেকে যেন ঃ মনে হচ্ছিল মণিকার বেশি শীতের অন্ধকারের ভেতর বসে থেকে।

'কোথায় তুমি?'

'এই তো আমি—তোমার কাছেই।'

হ্যাঁ। মণিকাকে সাপ-বেজীর ভেল্কিতে নামিয়েই ছাড়ত তাহলে বিরূপাক্ষ। কিন্তু বিরূপাক্ষ সে জাতের মানুষ ঠিক নয়; শেষ পর্যন্ত অবিশি নিজের চাওয়া জিনিসকে অধিকার না করে ও-ও ছাড়তে চায় না। কিন্তু আমি জাত-বেজী হই না হই ও জাত-সাপও নয়—অন্তত আমার সম্পর্কে সে সব কিছু হবারই ক্ষমতা যে ওর নেই—সেটা বুঝেই ঠুঁটো বাস্তুসাপের মত ওকে আসতে দেখে ছেড়ে দিচ্ছি আমি। ও যদি চায় ওর জন্য আরো কয়েকটা রাত খরচ করতে রাজি আছি আমি; কিন্তু আলো নেভাবার কোনো অধিকার থাকবে না, রাত দশটার পরে বসে থাকবার কোনো তাগিদ থাকবে না কারু। এ বাড়িটা যেন কেমন ছমছম করে। আমার একজন নিতান্ত গুরুমুখী ও মোটামুটি নিরীহ স্তাবকের সঙ্গে প্রথম রাতটা আড্ডা মেরে নিলে মন্দ লাগবে না। লোকসমাজে বেরুলে অবিশ্যি অনেক পারিষদ উপাসক জুটে যায়; আরো কত কি। কিন্তু বাইরের বড় সমাজের ঘেঁষাঘেঁষিতে বেরুবার রেওয়াজ তাদের বংশে নেই, অংশুবাবুর বংশেও না। যারা দেউড়ি পেরিয়ে ভেতরে ঢোকে তাদের সঙ্গেই কারবার করতে হয়। এখানে কৃতিত্বের অভাব হয় তো—যদি না একটি বালুকণার ভেতর

ব্রহ্মাণ্ডের পরিকল্পনা লুকিয়ে থাকে। থাকে নাকি?

'কোথায়! কোথায়!!' বাজপাখি যেন চিতেবাঘকে মেরে ফেলেছে এমনই একটা অদ্ভুত বিকট চীৎকার করে উঠল অংশু।

'এই তো আমি তোমার কাছেই আছি।'

মণিকা উঠে বসল। অংশুবাবু একটু ঝিমিয়ে পড়লে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল সে।

মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি পনেরো বছর আগে এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল মণিকার। কিন্তু তাকে দ্বিতীয় রাতেই বাড়ি থেকে বার করে দিয়েছিল মণিকা; সে ঘরে একটা চাবুক ছিল বিভূতি রায়ের; সেই চাবুক মুখের ওপর কষেছিল মুখার্জির। ওটা বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এখন মানুষকে হাসিমুখে মিষ্টি সরুচাকলি খাইয়ে মানে মানে বিদায় করে দেওয়াটাই ঠিক মনে করে মণিকা। কেননা মানুষ সব—শেষ পর্যন্ত; মানুষ; মানুষ—; ভাবনা বেদনা আছে; মানুষকে মানুষ বলে গ্রহণ করলেই সবচেয়ে ভালো।

কুড়ি

সুতীর্থ ঘুম থেকে জেগে উঠল প্রায় গোটা দশেকের সময়। তাকে বুঝে নিতে হল কোথায় সে আছে। কালকে রাতে কি হয়েছিল জেগে উঠেও সহসা সে সব কথা মনে পড়েনি তার; আস্তে আস্তে স্মৃতি ফিরে এল;—একে একে সব পরিষ্কার। বিচারবোধ ফিরে এল। কিন্তু এজন্য মনে খুব খুশি খোঁচা লাগছিল না তার। সমস্ত শরীরটা কেমন একটা ব্যথায় টাটিয়ে উঠেছিল। দিন পনেরো ধরে নানারকম অত্যাচার চলেছে শরীরের ওপর; কালকের দিনটা সব চেয়ে বেশি হাঙ্গামার ভেতর কেটেছে; তারপরে অনেক রাতে এসে এই ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়েছে। খুব ভালো করে চান করে নিতে হবে—বেশ করে তেল মেখে—না হয় সাবান রগড়ে।

সুতীর্থ আস্তে আস্তে নিজের শোবার ঘরে চলে গেল। এ ঘরটা গোছানো ঝকঝক তকতক করছে। মিসেস মজুমদারই করেছে সব। একটা নতুন তেপয় এসেছে—একটা নরম কুশনে আঁটা বড় ইজিচেয়ার, নতুন একটা আতরদান, ওয়াল-ক্লক, ক্যালেণ্ডার দুটো মাত্র, কিন্তু খুব বড় এবং বড় জাতের, এদের আভিজাত্যের দিকে তাকালে বেশ লাগে মোটামুটি; দুটো সোফাই বেশ কোলভরা, ঘরজোড়া নতুন বৌয়ের মত—পরিপাটি, দুটোই আনকোরা।

বিরূপাক্ষের জন্যেই কি এত সব। সুতীর্থের মন কিছুতেই তা বিশ্বাস করতে পারছিল না। মণিকাকে—এতদিনেও যদি সে না চিনে থাকে তাহলে কবে চিনবে আর? এক-একটা বড় ফ্যাক্টরিতে দেখেছে সে যে চাকার ভেতর কত যে চাকা খাঁজ নাট কাজ করে যাচ্ছে, সমস্ত মেশিনটা কেমন সহজে স্বাভাবিকতায় নড়ছে ঘুরছে ঃ—মেশিনের সম্পূর্ণতাকে ধ্যান করা যাক—একটা বিসদৃশ খাঁজের দিকে তাকিয়ে থেকে কি হবে? সুতীর্থকে সমগ্রতা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে মহিলার—মণিকার।

মণিকাকে চেনেনি কি সে? না যদি তার সম্পূর্ণ নারী সত্যার্থকে উপলব্ধি করে থাকে সুতীর্থ তাহলে কার অপরাধ?—মণিকার?—না সুতীর্থের নিজের যুক্তি ও ধ্যানের?

ঘরের ভেতর মাঝ মাঘের সকালের আশ্চর্য রোদের চুমকি এসে পড়েছে বড় রোদের সঙ্গে সঙ্গে—দেয়ালে জানালায় মেঝের মোজেয়িকে স্বস্তিকা আল্পনায়—উড়ু উড়ু উড়ুক্কু সব চিল চড়াই শালিখের পায়রার পাখনায়। পুবের দিকে প্রকাণ্ড দুটো জানালা খোলা; তাকালেই সূর্যকে দেখা যায়—যদিও সে দূর দক্ষিণাশ্রয়ী এখন; কোনো উজ্জ্বল অনুভূতির মত সূর্য ওই মানুষের সময় ও ইতিহাসবৃত্তান্তের সারাৎসার আলোকশীর্ষের মত; যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে—যারা আগুন—যারা

আগুন নয়, বিকেলের নদীর মত স্নিগ্ধ, যারা আগুন নিবিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মত দীনাত্মা—মানবসত্তার সেই সব আত্মার মত সূর্য ঐ। কাটা সূতোর অবিরল এলেমেলো পাঁজের মত নদী চলেছে—সেই নদীর জলের ভেতর থেকে মাঘের দুপুরে রাজহাঁস যেমন করে তাকায় তেমনি করে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখতে হয় সূর্যকে—কিংবা আদি মানবের মত—কিংবা নিঃস্বত্ব, বিশুদ্ধ করে নিতে পারে যদি আজকের মানব নিজেকে তাহলে তার গভীর বোধিশক্তির দৃষ্টি নিয়ে সূর্যের দিকে—সূর্যের ইঙ্গিতের দিকে নিজেকে ফিরিয়ে নিতে হয়।

সুতীর্থ যে তার নিজের ঘরে ফিরে এসেছে টের পেয়েছে ঐ সুদূর সূর্য। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণের সঙ্গে নিজের প্রাণশক্তির নিবিড় পানিপীড়ন বোধ করেছে সুতীর্থ—চারদিকে মাঘনীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে—শূন্যে শূন্যে—কন্যা পৃথিবীর কোলে—আলোর নির্ঝরে। একি প্রকৃতির শক্তি না সূর্য দেবী নিজে? সুতীর্থের সমস্ত শরীরকে ঝিমানো বাঘের মত পড়ে আছে দেখে দাউ দাউ করে উঠছে, ঝর্ঝরে ঝাউবনানীর মত আলোর চারদিকে পৃথিবীর প্রথম বাঘিনীর দুর্বার স্নিগ্ধতা।

স্বর...শরীরই শুধু নয় আত্মার প্রতিটি স্নায়ু শিশুসূর্যদীপ্ত হয়ে নিজেকে পিতার মত মনে করছে—মিশে যেতে চাচ্ছে কোনো মহান্ নারীর সঙ্গে। সাদা আগুনের প্রবাহের ভেতর গান ঝরে ধোঁয়াটে ধবল হয়ে উঠে উজ্জ্বলন্ত জলস্রোতের মত চোখ বুজে বসে রইল সুতীর্থ।

ঘরের ভেতর এসে মণিকা যে দাঁড়িয়েছিল সে খেয়াল ছিল না তার। 'রোদ পোয়াচ্ছ?' বল্লে মণিকা।

কোনো কথা বল্লে না সুতীর্থ, কাপড় পর্দা বইয়ের মলাটে ছোকছোক ছাক খটাস হওয়ার কোনো কথা বল্লে না সুতীর্থ, আওয়াজে মণিকার গলা হয় তো তার কানেও পৌঁছয়নি।

'কখন ফিরলে?' মণিকা আবার বল্লে, 'চোখ বুজে আছ?'

কাল রাতে নিজে যে সোফায় বসেছিল, সেইখানেই গিয়ে বসল মণিকা। সুতীর্থের কাছ থেকে কোনো উত্তরের প্রতীক্ষা করে এক আধ মিনিট চুপ করে বসে থেকে নিজেই সে নিস্তব্ধতা ভেঙে বল্লে, 'কখন এলে সুতীর্থ?'

'কে,—তুমি—'

মণিকা বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—সুতীর্থও—তাদের দুজনের দৃষ্টি অনেক দূরে একটা ছোট টিপের ভেতর এক হয়ে মিশে গেছে—উপলব্ধি করে, সেই উপলব্ধির ভেতর নিস্তব্ধ হয়ে থেকে।

'এইমাত্র এলে সুতীর্থ?'

'হ্যাঁ, এই তো; এই ঘরে।'

'এ কি চেহারা হয়েছে? কোথায় ছিলে?'

'অনেক জায়গায়।'

'কোথায়? খুব মার খেয়েছ মনে হচ্ছে।'

'দেখাচ্ছি তোমাকে।' সুতীর্থ বললে।

'থাক থাক কি দক্ষিণা দিয়েছ পেয়েছি দেখাবার জন্যে ছেঁড়া জামা খুলতে হবে না আর।'

'জামাটা খুলতে হবে, এখন খুলব কিনা ভাবছি। আমার ট্রাঙ্কে আর জামা আছে?'

'আমি কি করে বলব?'

'নেই। বড্ড গরীব হয়ে পড়েছি।'

'যত টাকা পেটায় তত গরীব—অফিসের ধাড়ি আইবুড়ো।'

'আইবুড়ো ছিলাম ছেলেবেলায়', সুতীর্থ বললে, 'তারপরে আর এক রকম হল—'

'ও-সব রূপকথা এখন আর চলবে না।'

'পাশগাঁয়ে তুমি যাবে আমার সঙ্গে?' সুতীর্থ বললে, 'চলো নিজের চোখে দেখে আসবে।'

'কি আছে সেখানে?'

'স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী ছেলেপুলে—'

'বেয়ান নেই? শালী? শালাবউ?—স্ত্রী আর শাশুড়ী আছে বুঝি শুধু?' নদীর মত গলায় মণিকা বললে।

'তোমার চেয়ে শাশুড়ীর বয়স কমই হবে হয়তো।'

সুতীর্থ পূবের দিকের একটা জানালা বন্ধ করবার জন্যে উঠে গেল।

'ওটা আবজে দিলে কেন?'

'বড্ড কড়া রোদ আসছে।'

'তোমার চোখের ওপর?'

'তোমার মুখ টসটস করছে—যেন জ্বর-জ্বালা হল—'

'হল, বেশ হল', মণিকা চোখ বুজে বললে, 'সূর্যের ছ্যাঁকা জ্বরজ্বালায় আরাম। বেশ ছিল তো—কেন জানালাটা টেনে দিলে বাপু—'

'সব জানালাই খোলা আছে, একটা ছাড়া—' সুতীর্থ নিজের মনের স্বাদে প্রীত, খানিকটা উদ্গত ও সমাহিত হয়ে বললে, 'প্রাচীন মিশরীয় মেয়েদের কথা মনে পড়ছে আমার। এও যেন সেই মিশরের নীলিমা। নীল নদের পারে শেষ শীতের রৌদ্রে বসে আছি আমি—' জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে থ' হয়ে রইল সুতীর্থ।

'আর আমি?'

'তুমি। তুমিও বসে আছ, সেই গীজের মূর্তির কাছে যেন', ঢোক গিলে বললে সুতীর্থ; কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই গলায় মিশর রোদের ডাকপাখি ডেকে উঠল যেন তার—'কোন এক ভোরের, কোন নীলের বাতাস পাচ্ছি আমি ঃ তিন হাজার বছর যে পাটে চলে গিয়েছিল সেই সূর্য আবার ফিরে এলে যে রকম বাতাস ভেসে আসে; কি গভীর সেই নীল আকাশ, সত্যিই খুব বেশী নীল—সেই সাধ-সংসর্গের মত রোদ আশ্চর্য নদী ক্ষেত প্রান্তর জন্মমৃত্যুর অনন্ত বক্তপাতের মতন সেই আলো; নীলের অনেক নীচে বড় বড় সহজের কালি ব্যথা উদ্যম নিষ্ফলতার কতশত প্রবঞ্চের ফাঁকে ফাঁকে নীল—ব্যাজন শুনছ না মণিকা? ওগুলো কি খেজুর গাছ গান গাইছে? তরতর করে জল চলে যাচ্ছে চারদিকে—'তিন হাজার বছর আগের রোদের সঙ্গে হুড়হুড় করে ছুটে চলেছে, আজকের দিনের ভেতর' সুতীর্থ আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল, কলকাতা-পৃথিবীর দিকে।

'তিন হাজার বছর আগের আজকের দিন ঃ বলেছ তুমি', মণিকা বললে, 'বাইরে অনেক দূরে যেখানে দুজনের দৃষ্টি একটা তিলের মতন বিন্দুতে মিশেছে গিয়ে সেই একাত্মতার ভেতর থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে মণিকা বললে, 'সময় বলে কেউ যে নেই আমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়।'

'সময় কেটে যায়, তবুও কাটে না?'

'না, না। তা নয়, আমার মনে হয় সেকালের একালের সব সময়ের সমস্ত ইতিহাসই এক সাময়িক।'

কথাটা শুনে বিদ্যুৎ খেলে গেল যেন, খুব আশ্চর্য লাগল সুতীর্থের—মণিকার দিকে খুব মন দিয়ে তাকিয়ে রইল সে; বললে, 'আমার তো অনেক সময় মনে হয়েছে এরকম। কিন্তু গণিতের হিসেবে এ কি টেঁকে?'

'গণিত কি বলে জানি না, কিন্তু গাণিতিক তুমি বটে; তার চেয়েও বেশী একটা জিনিস তুমি সুতীর্থ—এই তো বললে তিন হাজার বছর আগের আজকের দিনের ভেতর। তা হলে সব সময় সমসাময়িক। তুমিও তো তাই বললে।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে চলে গিয়ে বললে, 'কিন্তু বিজ্ঞান অন্য কথা বলে।

বিজ্ঞানকে অমান্য করে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?'

'বিজ্ঞানকে সত্যিই জ্ঞানে দাঁড় করাবে। বিজ্ঞান তো এখনও আধা সত্য। সত্য হবে, হেঁয়ালিকে সেই তো গিয়ে ধরবে একদিন। বলে মণিকা চুপ করে রইল কিছুক্ষণ।

মণিকা বললে, 'কিন্তু আমাদের জন্যে অনেক কিছুই হেঁয়ালি রইল।'

সুতীর্থ আলো আবছায়া চোখে তাকিয়ে নিজের সোফায় ফিরে এল।

সুতীর্থের দিকে তাকালো না মণিকা। সুতীর্থ তাকিয়েছিল দূর আকাশের শাখা আগুনের দিকে : সেটা কি সূর্যের, না সূর্য সরে গেছে তার শূন্য স্থানের? মণিকার মুখে কোনো আলো পড়ল কিনা—কিংবা ছায়া—কোনো ইঙ্গিত এসে মিলিয়ে গেল কিনা তাকিয়ে দেখবার কথা হয়তো সুতীর্থের; কিন্তু বিদ্যুৎ নেই—তবুও বিদ্যুৎ রয়েছে—নারী নেই তবুও দুর্বার রেতঃক্ষরণ ঐ সকালের, দুপুরের নীলিমায়—অনুভব করতে কবতে অপর কোনো মানবের মত হয়ে গিয়েছিল সুতীর্থ : অনেকক্ষণ পরে উঠে সে বাকি জানালাটা খুলে দিল।

'ঐ জানালাটা আবজে রাখলেই ভালো হত সুতীর্থ।'

'সরে গেছে সূর্য। এখন আর তোমার মুখে রোদ পড়বে না।'

'না সে জন্যে নয়, আমি সবে বসেছি-–'

'সোফাটাকে আরো ভালো জায়গায় ঘুরিয়ে দিই?'

'দাও।'

'সমস্ত আকাশটাকে দেখা যায়। কী ভীষণ দানবীয় চেয়ে দেখ—'

'দানবীয?'

'উর্বশী লক্ষ্মীব চেয়েও সুন্দব, ঐ আকাশের মত।'

কথা বললে না কেউ—অনেকক্ষণ।

'তুমি আমার এই সোফায় এসে বস সুতীর্থ।'

'আসছি।'

'আমার পাশে বসো।'

রোদের ভেতব দূর আকাশে চিলের কান্নাও শোনা গেল। কেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে উঠতে চায় মানুষের মন; অথচ প্রকৃতি সুপরিসরের ভেতব সুস্থিব, কেমন আশ্চর্য প্রাণবত্তায় সুচালিত; মহানুভব।

'কি দেখছ তুমি?'

'এই রোদ নীল আকাশ শহরের মিনার দালান সাদা বিছানা বস্তি ব্যথা জন্ম-মৃত্যু ভেদ করে উজ্জ্বল ব্রহ্মাণ্ডের দীপ্তি রোজই থাকে। তুমিই তো বলেছিলে একদিন—বেবিলনেও ছিল। বেবিলনে ছিল, আমরাও দেখেছি। কিন্তু তবুও দুজনে মিলে দেখবার সময় বেশী পাই না।'

সুতীর্থ মণিকার সোফায় এসে বসল; পাশাপাশি, কিন্তু গা ঘেঁষে নয়। ঘেঁষাঘেঁষি যাতে না হয় সেই জন্যেই একটু সরেই বসল এদেব ভেতর একজন।

'সবই আছে, অথচ কিছুই নেই, মহানগরীর ওপরেও এত বড় আকাশ, এরকম রৌদ্র, অথচ সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পঙ্গু, মানুষের হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে ভায়ের হাতে।'

সুতীর্থের কাঁধের ওপর হাত রেখে মণিকা বললে, 'চান করে এসো, এখন গেলে কলে জল পাবে। চৌবাচ্চায়ও আছে। আমি জ্যোতিকে বলে দিচ্ছি, দু বালতি জল এনে তোমার চানের ঘরে রাখতে। হবে দু বালতিতে?'

'ধ্বস্তাধ্বস্তিতে তোমার জামা ছিঁড়ে গেছে হয়তো। কিন্তু জামায় রক্তের দাগ কিসের?' মণিকা জামার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে।

মণিকা বল্লে, 'এ তো অনেক রক্ত; তোমার নিজের গায়ের? না অন্য কারু—'

সুতীর্থ শার্টের বোতাম খুলতে খুলতে বল্লে, 'না আমার না। কি করে শার্টটা মাড়াল তাই ভাবছি।'

'বোতাম খুলতে খুলতে থেমে গিয়ে ভ্রূকুটি করে মেঝের দিকে তাকিয়ে বল্লে, 'রক্তটা কালি মেরে গেছে। তাজা রক্ত নয় নিশ্চয়ই। এ কবে হল। সত্যিই রক্ত তো?'

'আঃ ছি, নাকের কাছে নিয়ে শুঁকছো কেন?'

সুতীর্থ শার্ট খুলে ফেল্ল, 'বারান্দার দিকে ছুঁড়ে ফেলে বল্লে, 'মনে পড়েছে।'

'তোমারই তো রক্ত?'

'সে গল্প শুনবে? তাহলে বোস তুমি।'

সুতীর্থ ইজিচেয়ারটা মণিকার সোফার দিকে ঘুরিয়ে একটু কাছে টেনে এনে বল্লে, 'শার্টে যা রক্ত দেখছ, এই নিচের গেঞ্জিতেও তেমনি,—তার নিচেও—'

'মানে তুমি জখম হয়েছ; কখন হলে?'

'কাল রাতে।'

'কাল রাতে! হাসপাতাল যাওনি কেন?'

'এখানে কি হাসপাতাল নেই ঃ তোমার এ বাড়িতে?'

'কাল রাতে তক্ষুনি হাসপাতালে যেতে পারতে তো তুমি'—

দাঁত কড়মড় করে বল্লে মণিকা, 'ওঠো। জ্যোতিকে গাড়ি ডাকতে বলছি; এক্ষুনি চল।'

সুতীর্থ কুঁড়েমি ভাঙতে ভাঙতে আস্তে হেসে বল্লে, 'যে ফেরারী সে যাবে হাসপাতালে। কী ডায়েরি করব আমি বল তো দেখি।'

'ফেরারী! কাকে খুন করলে!'

মণিকা জ্যোতিকে ডাকবার জন্যে তেতলার দিকে যাচ্ছিল ফিরে এসে খাটের কিনারে দাঁড়িয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল কিন্তু কি মনে করে তৎক্ষণাৎ তেতলায় চলে গেল। মুহূর্তেই অনেক কিছু ওষুধপত্র ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদির সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসে বল্লে, 'কই জামাটা খোলো দেখি।'

কিন্তু জামা খুলে দেখা গেল সুতীর্থের গা একেবারে পরিষ্কার—একটা মশার কামড়ও নেই কোনোদিকে—

মণিকা গালে হাত দিয়ে সোফার এক কিনারে বসে বল্লে, 'তাহলে বিরূপাক্ষ যা বলেছিল সেই কথাই ঠিক?'

'বিরূপাক্ষ? তার সঙ্গে কোথায় দেখা হল তোমার?'

'দেখা হয়েছিল। তুমি ফেরারী কাকে খুন করলে?'

'তাকে কি করে চিনবে তুমি?'

'কোনো বড়মানুষকে করোনি তো?'

এ প্রশ্ন শুনে মুলো কলা আর ঘণ্টা নাড়ার পুজোর পুরুতের মত মনে হল মণিকাকে—নিজেকেও—নিজের সংগ্রামটাকে। এক আধ মিনিট চুপ করে থেকে বড় কাজকর্মের আসরে অগ্রদানী বামুনের মত যেন—একটু বিষদাঁত ঘষে সুতীর্থ বল্লে, 'বড় মানুষরা তো আমাদের দলে।'

'ও কি, রক্তামাখা জামাটা কখন তুলে আনলে? জানালার গরাদে বেঁধে কি করছ সুতীর্থ ঃ রক্তের নিশান ওড়াচ্ছো।' বলতে বলতে খুব বিরক্ত, পীড়িত হয়ে মণিকা দরজা বন্ধ করে দিয়ে এল, রাস্তার দিকের দুটো জানালাও।

'না, কোনো বড়মানুষকে খুন করিনি।'

'কোরো না।'

'কেন করব না বল তো দেখি? আমি হেঁয়ালি সাধছি; তুমি কবে বলো। তুমি ছাড়া কেউ প্যাঁচ খুলতে পারবে না।'

'হেঁয়ালি টেঁয়ালি নয়—কেন মিছিমিছি বিপদ বাড়াতে যাবে?' 'বিপদ আছেই। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে কুলিকামিন এক আধটাকে খুন করলেই হয়ে যায়, ওতেই বেশ গেঁজে ওঠে; বেশ খাসা লপসি লিসপিস পয়দা হয়। ওরা বিপ্লব করতে জানে না, ওদের সকলকে কেটে ফেল্লেও না। কিন্তু কী হবে একটা মল্লিক, মুখার্জি, হীরাচাঁদ, হুকুমচাঁদকে মেরে।'

সুতীর্থের কথাবার্তা রকমসকমের কেমন একটা বেচাল বিসদৃশতায় মণিকার সমস্ত অন্তরেন্দ্রিয়ের মধ্যে আস্তে আস্তে বিষ সঞ্চিত হচ্ছিল যেন; টন টন করে উঠল তার।

'হীরাচাঁদ কে?'

'তাকে তুমি চিনবে না।'

'কি করেছিল সে?'

'কিচ্ছু না।'

'এ রক্তের দাগ কিসের?'

'তা পরে শুনবে। আগে বল আজকের এই যুগে আমাদের মতন লোকের পক্ষে ধরে ধরে হেঁসো দিয়ে ঝাড় সাফ করে ফেলাই ভালো—'

'না, তা আমি কি করে বলি। আমার মতে খুন করাই খারাপ।'

'কিন্তু যদি খুন করতে হয় তাহলে কাকে করব?'

'কাউকেই না।'

'বরং গয়ানাথ মালোকেই, তাই না মণিকা?'

'গয়ানাথ মালো কে?'

'নাম শুনতেই তো বুঝেছ একটা কেষ্টো-বিষ্টু কেউ নয়। কিন্তু তবুও ছেলেপুলে নিয়ে ওর একটা মস্ত পরিবার। পরিবারটা স্বামী স্ত্রীরই এক জোটে না, আরো কেউ নাক ঢুকিয়ে বংশ বাড়িয়ে গেছে তা জানি না। যা হোক, পরিবারটা না খেতে পেয়ে মরছে।'

'আমরা কি করব,' মণিকা বল্লে, 'আমরা তো নিঃসহায়।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়াল; পায়চারি করতে করতে বল্লে, 'ঠিকই বলেছ তুমি।'

মণিকার দিকে ফিরে সুতীর্থ বল্লে, 'আমি গয়ানাথ মালোকে মেরেছি। এ তারই রক্ত।'

'তার রক্ত?'

সুতীর্থ জানালা দুটো খুলে দিযে বল্লে, 'হ্যাঁ, বড়দের কারো নয়; ভয় করবার কিছু নেই।'

'স্ট্রাইক হয়েছিল?'

'কিছুটা হয়েছিল।'

'তোমাদের ফার্মে।'

'আমাদের ফার্মে নয়।'

'তাহলে?'

'এই শহরেই—কোনো কোনো জায়গায়।'

'তুমি কি কলকাতার বাইরে ছিলো এতদিন?'

'না।'

'ধর্মঘটের ব্যাপারে কিছু করেছিলে তুমি?'

'যাতে জেল হয় এমন কিছু করিনি হয়তো।'

সুতীর্থ উঠে গিয়ে বন্ধ দরজাটা খুলে দিল। ফিরে এসে বল্লে, 'কিংবা করে থাকিই যদি, জানবে কে? এই তো এই লোকটাকে খুন করেছি আমি। কি হয়েছে তাতে। খুন যে করা হয়েছে তা বের হবে একদিন। কিন্তু এ নিয়ে গাঁইগুঁই করবার মত একটা কুত্তাও থাকে না এসব লোকের।'

একুশ

চান করে খেয়ে দেয়ে সুতীর্থ বেরিয়ে পড়বার যোগাড় করছিল। খাবার অবিশ্যি ওপরের দিক থেকে এসেছিল। সুতীর্থের চাকর চলে গিয়েছিল—এরকম উড়নচণ্ডে লোকের চাকর কদিন টিকে থাকে। খাবার দিয়ে গেল জ্যোতি। কিন্তু মণিকা আর এল না। বাসে করে সুতীর্থ যে জায়গায় নামল সেখান থেকে হেঁটে আরো মাইলটাক যেতে হয়; জায়গাটা কলকাতার বাইরে। তবে বেশি দূরে নয়। নানারকম ফ্যাক্টরি রয়েছে, অনেক কুলিমজুর খাটছে। এরই ভেতর একটা ফ্যাক্টরিতে ধর্মঘট চলছিল। সুতীর্থকে দেখতে পেয়েই কতকগুলো লোক হইহই করে উঠল—হয়তো মারবেই তাকে—কিংবা হতে পারে তার কাছ থেকে সাচ্চা কিছু পাবে বলে কেমন যেন মরিয়া হয়ে উঠেছে। কি যে হবে কিছু বলা যায় না। জনতা যখন উত্তেজিত তখন যে কোনো মুহূর্তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই নিজের মৃতদেহ আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। ওরা দু-এক মুহূর্তের মধ্যেই সম্রাটও বানিয়ে ফেলতে পারে মানুষকে; সম্রাট যদি মনের ভুলে কথা বলে কিংবা বেকুবি করে, তাহলে তার গর্দান নিতে সময় লাগে না, লাগা উচিত নয় সেটাও হাড়ে হাড়ে জেনে নিয়েছে।

'আজ আমি তোমাদের কাছে বক্তৃতা করব না।' সুতীর্থ বললে।

'ও সবের দরকার নেই দাদা', হৃদয় ভৌমিক বললে, 'বালি খুব তেতে আছে। আকাশের সূর্যের চেয়ে তার ঝাঁঝ বেশি। আর কত ঝাঁঝালো করে তুলবেন তাকে সুতীর্থবাবু—'

'তোমাদের ফ্যাক্টরিতে ফিরিঙ্গি মজদুর আছে নাকি শুনলুম—'

'আছে বইকি, মজদুর নয়,' বললে বিহারী।

'মজদুর নয়, ইঞ্জিনিয়ার', বঙ্কু বললে।

'কজন আছে?'

'ইঞ্জিনিয়ার, ফোরম্যান, অ্যাসিসটেন্ট—সে আছে অনেক। কেন বলুন তো সুতীর্থবাবু।'

'তারাও তো ধর্মঘট করছে।'

'না, ইঞ্জিনিয়ার সাহেবরা করবে না। কেন করবে? এদের— '

ইয়াসিন একটু সতর্ক হয়ে বললে, 'তাদের না করলেও চলে। দিন কেটে যায়।'

'তোমাদের মতলব কি?'

'আমরা চালাব' সকলেই প্রায় সমরোলে বলে উঠল।

'কেমন চিমসে হয়ে যাচ্ছে—গোলগোল চেহারা ছিল ইয়াকুবের এ হল কী। বিড়িই বুঝি টানছে সারাদিন মকবুল। দানাপানি পেয়েছে আজ? শুধু জল খেয়ে আছ?'

'ফতিমা আপনাকে ডেকেছে।' মকবুল বললে।

'আমাকে?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'হ্যাঁ, আপনাকেই।'

'কেন বলো তো?'

'যান, গিয়ে দেখে আসবেন।'

'আজ যাব না—সময় হবে না।'

'কবে সময় পাবেন তাহলে?'

সুতীর্থ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আজ আর হবে না। সময় নেই।' মকবুল মুখ বেজার করে চলে যাচ্ছিল।'

'কোথায় যাচ্ছ মকবুল?'

একটা বিড়ি জ্বালিয়ে মকবুল বললে, 'আরে রাখুন মশাই।'

'কি হল রে তোর মকবুল—ইয়াসিন বললে।

'এই সুতীর্থবাবু প্রমিস করেছিলেন, আমার কাছে যে একবেলা আমাদের সঙ্গে বসে নুন ভাত খাবেন—'

'কিন্তু এখন কি করে খায়। এখন তো তোরাই খেতে পাচ্ছিস না।' হামিদ বললে।

'খেতে যে পাচ্ছি না, পরতে পারছি না তাই নিয়ে গিদ্ধোরের মত ফেউ ফেউ করবি—না চোখ তারিয়ে বেটাচ্ছেলেরা দেখবি, সব, নগদানগদি যা হয় একটা কিছু ব্যাখ্যা করে দিবি ফেউ ফেউ না করে—'

'ঠিকই বলেছে, মকবুল মোক্ষম বলেছে ইয়াসিন। তোমাদের ধর্মঘটের ক'দিন হল?'

'এই দশ দিন আজ নিয়ে।'

'কর্তাদের মন উঠছে না।'

'অত সহজে কি আর তা হবে। দেখুন সুতীর্থবাবু, আমার মনে হয় এই ধর্মঘট জিনিসটার বিশেষ কোনো ভবিষ্যৎ নেই আমাদের দেশে।' বঙ্কু বললে।

সুতীর্থ বিষ ঝাড়বার ওঝার মত চোখে ক্ষতটার দিকে তাকাল যেন বঙ্কুর দিকে তাকিয়ে। কিন্তু সে দৃষ্টির আবেদন শাসন সব অগ্রাহ্য করে বঙ্কু বরং হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কত পার্টি আছে। আমাদের দেশে, কত পোলিটিক্যাল পার্টি ও সব পার্টির সুনাম যে নেই তা নয়। সুনাম আছে। সুনাম ছিল একদিন। কিন্তু সে সব ভাঙিয়ে খাবার মত পেটোয়া লোকের অভাব আমাদের এই সোনার দেশে নেই সাহেব। এরা আসে যায়—সভা করে—বক্তৃতা দেয়—কাগজে লেখে—নিজেদের ভেতর কথা কাটাকাটি—পরে কামড়াকামড়িও করে। এদের ভেতর কে ছোট—কে বড়—কে আমাদের সত্যিই ভালো করল—কার বা ভালো করার প্রয়াসটা স্রেফ বদমায়েসি—এ সব পাঁচরকম দশরকম সব ভিয়েনে চড়িয়ে কালো ঘোড়ার সঙ্গে শাদা ঘুড়ী মিশিয়ে লেলিয়ে দেয় ওরা, ঘুড়ীর মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় ঘোড়াগুলো, আবার আস্ত রেখেও খায়—ঘুড়ীটাকে বেশ ঝাড়ে গোছে ফনফনে রেখে। এ সবের মানে কি হে হামিদ—এ সবের মানে কী আপ বাতাইয়ে মুঝকো—' বঙ্কু বিড়ি জ্বালাল।

হামিদ বললে, 'আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন সুতীর্থবাবু।'

'এই মাটির ওপরেই বসে পড়ুন, এ ছাড়া আমাদের আর কোন ফরাস নেই দাদা।' বঙ্কু বিড়িতে টান দিয়ে বললে।

সুতীর্থ বললে, 'তোমার কথার উত্তর আর একদিন দেব বঙ্কু। মোটামুটি তুমি ঠিক কথাই বলেছ। আমরা নিজেদের ভেতরই মন কষাকষি করি—'

'আমরা বলছেন, আমরা কারা? ধর্মঘটীদের কথা বলছি না তো সুতীর্থবাবু।'

'তা বলছ না অবিশ্যি তা আমি জানি, কিন্তু—' অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আমি বলছি তাদের কথা যাদের ফুসলানিতে আমাদের ধর্মঘট করতে হয়।'

'যা রে, তুই বড় ভালোমানুষ হামিদ, তুই জানিস না আমাদের দেশে কতগুলো কালো পাঁটা আর ধলো পাঁটা আছে।'

'হিন্দু পাঁটা আর মুসলিমের নয়াল মুর্গির আণ্ডা আছে ইয়া ইয়া।'

'লাল পাগড়ি লকলক করছে মোরগটার যে ভিজিয়ে তিতিয়ে ডিম পাড়ায়—

'আর শাদা ডিম সকসক করছে মুর্গিটার যে ভিজে পুড়ে ডিম পাড়ে—'

'হে—হে—হে—'

সুতীর্থ দাঁড়িয়েছিল—পায়চারি করছিল, একটা মরা গাছের গুঁড়ির ওপর বসল এবার। বসেই তার মনে হল ওরা সব মাটিতে বসেছে—এরকম গুঁড়ির ওপর বসা তার ঠিক হবে না, ওরা হয়তো ভাববে এইটুকুর ভেতরেও সুতীর্থবাবু ভেদাভেদ করছেন। সে মাটিতে গিয়ে বসল একেবারে অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেঁষে—

সুতীর্থ বললে, 'হামিদ, ইয়াসিন, মকবুল, বিপিন শোন তোমরা। বঙ্কু বলতে চায় যে ধর্মঘটের অছিলায় আমাদের মতন বাবুরা নাম কিনি। আশ মিটিয়ে কথা বলবার খবরের কাগজে লিখবার শখ মেটাই। এত সব বজ্জাতি করেও আমাদের তেল মরে না, শখ মেটে না, নিজেদের ভেতর এঁটোর ভাগ নিয়ে কুকুর বেড়ালের লড়াই শুরু করে দিই। ঠিকই তো। বঙ্কু যা বলেছে একেবারে মিথ্যে নয়।'

'একেবারে শব্দটা বাদ দিন সুতীর্থবাবু।' বঙ্কু বলল।

'বলব ঃ মিথ্যে নয়?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা হবে। কিন্তু তুমি যা বলেছ বঙ্কু, একেবারে সত্যও নয়।'

বঙ্কু তার জলন্ত বিড়িটা সুতীর্থকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে মারবে ঠিক করেছিল। কিন্তু টের পেল হামিদ এবং টেব পেয়ে ইশারা করে বঙ্কুকে উত্তেজিত হতে বারণ করছে। কাজেই নিস্তব্ধ হয়ে রক্তাক্ত মুখে বিড়ি টেনে চল্ল সে।

সুতীর্থ বললে, 'বঙ্কুর বক্তব্য হচ্ছে পোলিটিক্যাল পার্টির লোকরা এসে নিজেদের লাভ লোকসান হিসেব করে একরোখা বোকাদের তাতিয়ে ধর্মঘট বাধায়। ধর্মঘটীরা নিজেদের তাগিদে ধর্মঘট করে না—এই তো?'

কথা শেষ করে বঙ্কুর দিকে তাকাল সুতীর্থ। বঙ্কু বাস্তবিকই এবার বিড়িটা ছুড়ে মারল, কিন্তু ঠিক সুতীর্থকে তাক কবে নয়; কিন্তু কোনো এক বিশেষ শক্তিকে অসম্মান করতে হলে যেরকম ভাবে মারা উচিত তা তার অব্যর্থ হয়েছে—যে যার মুখ চাওয়াচায়ি করে সকলেই সেটা জেনে নিল। ব্যাপার মেনে নিল না অবিশ্যি সকলে।

'নিজেদেব তাগিদে আমরা ধর্মঘট করি না, একথা খুসকি খানকিরা বলে—'

'হতে পারে আমি খুস—'

কষে একটা গাট্টা মারল অনন্তরাম বঙ্কুর মাথায়। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল বঙ্কু ঘুরে পড়েছে।

'ওটা কি হল তোমার অনন্ত? এ কি করলে তুমি? তোমরা নিজেদের ভেতরেই যদি এরকম কর—'

বঙ্কু মুখের মাথার ঘাস ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে দুপাটি পানসে দাঁতের খানিকটা রক্তথুতুর পিচকি কাটল, আরো দু'তিনবাব পিচকি কেটে বললে, 'আমরা নিজেদের মধ্যে ঠিক আছি। একটা কথা জিজ্ঞেস করছি আপনাকে, কোথায় থাকেন আপনি?'

'বালিগঞ্জে।'

'কোন রাস্তায়?'

'লেক রোডে।'

'লেকের পারে আইভরি টাওয়ার সুতীর্থবাবুর—' কে যেন কিছুটা শিক্ষিত সাহিত্য-পড়া ওদের মধ্যের থেকে একজন বললে।

'গজদন্ত মিনারে—লেকের পারে—' সেই বললে আবার।

এসব জিনিস নিয়ে সাহিত্য পত্রিকার প্রবন্ধট্রবন্ধ লিখেছে হয়তো মানুষটি।

'আমার নিজের বাড়ি নেই, আমি ভাড়াটে।' সুতীর্থ বললে।

'কোন তলায়?'

'দোতলায়।'

'কটা কামরা?'

'তিন-চারটে—'

'তিনচারটে কামরা বালিগঞ্জের এক পরিবারের জন্যে। এটা খুব নবাবী হচ্ছে তো সুতীর্থবাবু। তা গোয়ালে আস্তাবলে গ্যারাজে যারা আছি তারা ভালো আছি। গোসলখানায় পায়খানায়

আরসোলার মত ফড়ফড় করে উড়ছি যারা নুন-চিনির বদলে আপনাদের ডি ডি টির গুঁড়ি খেয়ে তাদের দেখেছেন কোনদিন আপনি? ভালো আছে তারা, আরসোলারা বেশ আছে। কিন্তু আমাদের বস্তিতে এসে দেখেছেন কি আমরা কেমন আছি?'

'আমি তো এসব সাতসতেরোর ভেতর নতুন এসেছি ভাই, ভালো করে দেখবার শোনবার সময় হয়নি আমার।' সুতীর্থ বললে।

'সময় হয়নি! মধু আর মকরধ্বজ দিয়ে মোড়া না দিলে এসব লোকের সময় হয় না কোনো কিছু করবার—কথা বেচে নেতাগিরি করা ছাড়া।'

'বস্তির ফোটো দেখলেই সুতীর্থবাবুদের হয়ে যায়।'

'শ্রমিকসভার ব্লুবুক দেখেই সুতীর্থবাবুদের—' নিকুঞ্জ শুরু করলে।

'ব্লুবুক নয়, ব্লুবুক নয়—আমাদের কোনো ব্লুবুক নেই নিকুঞ্জ—' রতন বললে।

'আমি বলছিলুম'—নিকুঞ্জ একটু গলা খাকড়ে নিয়ে বললে, 'আমরা একটা বিষম ভুল করেছি। প্রলিটারিয়েটদের নেতা প্রলিটারিয়েটদের ভেতর থেকেই হওয়া উচিত। বুর্জোয়ারা আসে কেন আমাদের কাপ্তেনী করতে? সুতীর্থবাবু তো বালিগঞ্জের লণ্ড্রির ইস্ত্রিকরা বুর্জোয়া; বস্তি দেখেননি কোন দিন, শ্রমিকদের চেনেন না, কিষাণদের চেনেন না, আন্দোলনের ইতিহাস জানা নেই, মানুষকেই দেখেননি তিনি এমনই মহামানুষ—' নিকুঞ্জ একটা বিড়ি জ্বালিয়ে হামিদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এইসব পাতিমানুষ কেন ফোপলদালালি করতে আসে হে হামিদ?'

হামিদ ঘড় কাত করে কথা ভাবছিল, বললে, 'প্রাণে সাড়া পেয়েছেন বলেই এসেছেন সুতীর্থবাবু। এসে একদিনে অনেক কাজ করেছেন। পরামর্শের মূল্য আছে সুতীর্থবাবুর, মাথা ঠাণ্ডা আছে ঃ তোমরা যা চাচ্ছ প্রলিটারিটেরা সবি হবে—কিন্তু রাতারাতি হবে না। এই তো এলেন সুতীর্থবাবু। বুর্জোয়া ছিলেন, এখনও আছেন, কিন্তু বোঁটকা গন্ধটা নেই তেমন আর—দুদিন সবুর ভাই সব—ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হয়ে যাবে।'

'আরসোলা রাতারাতি কাঁচপোকা হয়ে যায় না হামিদ?' বঙ্কু বললে, 'তা হতে পারে।'

'কিন্তু তবুও মানুষ হয় না। কি বল? একটু সবুর করতে হবে সুতীর্থবাবুর জন্যে আমাদের?' বঙ্কু বললে।

'একটু ভোমরাগাছি করতে হবে।' নিকুঞ্জ বঙ্কুর দাবনায় ছোট একটা ঘুষি মেরে হেসে বললে।

মকবুল অনেকক্ষণ ধরে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কে কি বলছিল না বলছিল সেদিকে কান ছিল না তার? সুতীর্থকে বললে, 'আপনি চলুন—'

'কোথায়?'

'আমার বাড়ি।'

'যাব আমি।'

'আজই যেতে হয়।'

'আজ পারা যাবে না মকবুল।'

'এই এতক্ষণে কি হয়ে আসতে পারতেন না?'

'তোমার বাড়ি তো এখান থেকে মাইল তিনেক দূরে। সেখানে বাস যায় না। আমার মোটর নেই—'

শুনে কয়েকজন হো হো হো করে হেসে উঠল।

'আপনার মোটর শালিমার গিয়েছে।'

'সেখান থেকে শালী নিয়ে আসতে।'

'আমার কাছে মবিল অয়েলের টিন আছে সুতীর্থবাবু, তিন গ্যালন, দু-গ্যালন। আপনার মোটর এলেই ভক করে ঢেলে দেব—'

'কিন্তু আসবে কি করে, আপনার গাড়ির স্পেয়ার পার্ট বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'ভুশণ্ডির মাঠে বানচাল হয়ে পড়ে আছে তাই মোটর—রিযড়ে পেরিয়ে।'

'ভুশণ্ডির মাঠে কি খাচ্ছে মোটর?'

'মানুষ খাচ্ছে গোরু খাচ্ছে; আকাশ দিয়ে উড়ে যেতে যেতে যে পাখিগুলো হেগে যায় তাই দিয়ে পানচুন বানিয়ে খাচ্ছে আর কি।'

একটা হাসির হল্লা পড়ে গেল। সুতীর্থের 'আমার মোটর নেই' সম্প্রতি ভুলে গেল তারা। এক একজনে এক একটা পার্টির নাম ও তাদের চাঁইদের নিয়ে কেচ্ছা খিস্তি শুরু করে দিল। সকলেই অবিশ্যি এ উদ্দীপনায় যোগ দিল না।

কেউ দাঁত দিয়ে কেটে কুটো ছিঁড়ছিল, কেউ বিড়ি টানছিল, মাথা হেঁট করে বা ঘাড় কাত করে অথবা শূন্যের দিকে চেয়ে নিরুত্তর থেকে; কেউ বা হাত গুটিয়ে বসেছিল, সাত চড়ে মুখে কোনো রা নেই এমনি মুখ করে; অতি অথর্ব যারা তারা ঝিমুচ্ছিল, অল্পবয়সীদের ভেতরেও একরকম কয়েকজন অতি স্থবির ছিল ঃ আবার বুড়োদের মধ্যেও দুশমন গোছের কয়েকজন কেউ কোনোদিকে লেলিয়ে দিলেই দুনিয়া ছাতু করে দিতে পারে এমনিভাবে একবার ফ্যাক্টরির দিকে—সুতীর্থের দিকে—নিজেদের পরস্পরের পানে তাকাচ্ছিল কটমট কবে। ধর্মঘটীদের সকলেই যে এই দলটার ভেতরে যোগ দিয়েছে তা নয়; অনেকে আসেইনি। বিচ্ছিন্ন হয়ে মাঠের এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে আছে অনেকে।

পরদিনও ধর্মঘটীরা সেই জাযগায়ই সেইরকম ভাবে বসে শুয়ে দাঁড়িয়ে ছড়িয়ে ছিল। সুতীর্থকে দেখে বিশেষ কিছু বললে না কেউ আজ আব। কাল অনেক রাত অব্দি সুতীর্থ ছিল এখানে, আজ হয়তো সারা রাতই থাকবে। সুতীর্থেব বিশেষ কাজগুলো (সলা-পরামর্শের চেয়ে ঢের বেশি দামী যেগুলো) হামিদ অনন্ত রামদের সঙ্গেই নিষ্পন্ন হয়, নিকুঞ্জদের সঙ্গে নয়। একই দলে যে দুতিনটে চিড় থাকবে সেটা সুতীর্থ বা হামিদ কেউই ভালোবাসে না, কিন্তু সম্প্রতি বঙ্কুদের না চটালেও একেবাবে কোলে টেনে নিযে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। কে জানে হামিদ অনন্তরামও হযতো সুতীর্থকে এক পাশে সরিয়ে দিয়ে অন্যরকম সুর ধবতে পাবে--যে কোনো মুহূর্তে—আজো হযতো—কাল পরশু হয়তো।

'আমি যাব তোমাদের বাড়ি মকবুল।' সুতীর্থ বললে।

'আজই?'

'জরুর।'

'শুনে ভবেশ সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, 'ও পাড়াটা যে সবই তোমাদের মকবুল?'

'তার মানে?'

'মানে ওখানে সবাই তো মুসলমান।'

'কী হল তাতে?'

'মানে দাঙ্গা কিছুদিন হয় থেমে গেছে বটে। কিন্তু তবুও বলা যায় না কিছু। লাগ লাগ করে লাগে যদি আবার—'

'সুতীর্থবাবুকে আমাদের পাড়ায় নিয়ে লাশ গুম করে ফেলব সেই কথা বলতে চাও তুমি ভবেশ?'

মকবুল বললে, 'বাঁট দেখে বলে দেবে বুঝি কোনটা কোন ধর্মের গোরু? হিন্দু গোরুব বাঁট কেটে রেখে দেবে মুসলমানদের এলেকায় গেলে?'

শুনে ভবেশের আগে সুতীর্থ হেসে উঠল ঃ 'গোরুই বটে, গোরুই আমি মকবুল। গোরু ছাড়া কি আর! কিন্তু রাস্তার বড় বড় ভাগলপুরী গাইগুলোকে দেখে কলকাতার আদ্ধেক মানুষকেই বকনা বাছুর বলে মনে হয়। আমি নিজে অবিশ্যি কলুর বলদ ছিলুম।'

কেউ কোনো কথা বলছিল না। সুতীর্থের এ সব কথার রস সঠিকভাবে আস্বাদ করবার মত মনোযোগ, মনের মর্জি ছিল না তাদের। এমন কি বঙ্কুও বিশেষ উৎসাহিত বোধ করল না।

'ধর্মঘট তোমাদের এই দশদিন ধরে চলছে। দিন আনা দিন খাওয়া যাদের বিধান এই দশটা দিনে তাদের যে কি অবস্থা হয়েছে তা তো চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু তবুও কি নিরেট প্রাণশক্তি তোমাদের। তোমাদের সকলেই যে এক পার্টির তা নয়। তোমাদের মধ্যে নানা পার্টির লোকই হয় তো আছে; এমন কেউ কেউ আছে যে কোনো পার্টির সঙ্গেই তাদের কোনো সম্পর্ক নেই; তারা জানে তবুও ভাত কাপড়ের মনের স্বাধীনতার মর্যাদা—সকলের জন্যেই স্বাধীনতার রুজি রোজগারের সচ্ছলতায় দরকার এটা বেপরোয়াভাবে জানে তারা।'

(বলে ফেলেই সুতীর্থ মনে মনে অপছন্দ করতে লাগল; এই শব্দ, এই ভাষণ, এই রীতি তার মুখে ঠিক খাপ খাচ্ছে না যেন); 'কাজেই কোনো বিশেষ নিশানের নিচে দাঁড়িয়ে সকলে মিলে মানুষের মত সকলের হয়ে আকাশের নিচে দাঁড়াতে হবে তোমাদের—অনাথ আর্ত আহম্মকদেব ভিড় যাতে সফল হয়—'

বাধা দিয়ে বঙ্কু বললে, 'আর বক্তৃতা দেবেন না সুতীর্থবাবু বক্তৃতা আমরা চাই না। ওটা আপনার রোগ হয়ে দাঁড়াল দেখছি।'

শুনে দাঁত কেলিয়ে রইল অনেকে; হাসছে, না কাঁদছে, না টিটকারি দিচ্ছে বুঝতে পারা গেল না। গলা ছেড়ে হাসির শব্দ নেই কোনোদিকে।

'বেল্লিক তুমি বঙ্কু, ভদ্রলোক বলছেন, শুনতে দিচ্ছ না।'

'আমি কি তোমাকে কানে আঙুল দিয়ে থাকতে বলেছি হামিদ। যা বলছে সুতীর্থবাবু এই যদি মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বলত, সে মাইক পয়দা করে দিতুম আমি। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছ্যাঁদায় তুলো দিয়ে মটকা মেরে পড়ে থাকতে বলিনি হামিদ। শোন না বলছেন। কই বলছেন না তো কিছু আর আমাদের ভাগ্যিদাদা। বারোটা তোরোটা বেজে গেল বুঝি। দাও তো হে দেশলাইটা সিপতি।'

'আমার ভুল হয়ে গেছে বঙ্কু কথা বলতে গেলে এক সের লোহায় এক মণ হয়ে গুলিয়ে যায় সব।' সুতীর্থ বললে।

'হ্যাঁ, মনে হয় যেন মুখটা লাউডস্পীকার, কথাটাও ভাড়া খাচ্ছে। কে খাওয়াচ্ছে ভাড়া?' মকবুল বললে।

ঘনশ্যাম বললে, 'বড় রাম খাওয়াচ্ছে পাতিরামকে। চলবে না ও সব ছেঁদো বাকচাল সুতীর্থবাবু। কাজ কি করেছেন তার হিসেব দিন। আপনি তো সব পোলিটিক্যাল পার্টি ভেঙে ঝাণ্ডা গুটিয়ে মানুষেব মত একঠাঁয়ে আমাদের দাঁড় করাতে চান। কিন্তু কে দাঁড় কবাবে শুনি? যে হড়বড় কথা বলে যাবে সে? এ কদিন কথা আর কথা আর কথা বলা ছাড়া কি জোটালেন আমাদের জন্যে? আমি আই এস সি-পাস করে যাবদপুরে কিছুদিন পড়েছিলুম, আজ এখানে মিস্ত্রি, আমাদের ভেতর কেউ কংগ্রেসের, কেউ সোস্যালিস্ট, কেউ কম্যুনিস্ট, ফরওয়ার্ড ব্লক, ডিমোক্রাট, রেভল্যুশনারি, রিপাবলিকান—কিন্তু আজকের এই ধর্মঘটে আমাদের সকলের সব আলাদা আলাদা পোলিটিকস মিলেমিশে এক ভোগান্তি ইকনমিকস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদিক দিয়ে কি করতে পারেন অবিলম্বে সেই চেষ্টা করুন। আছে কতকগুলো চ্যাংড়া—মজুরের গায়ের গন্ধ শুঁকবে আর জিভ চুকচুক করবে—অমানুষ যে মানুষকে শোষণ করছে, সাম্রাজ্যবাদ—যে বড় বালাই, দুনিয়ার সর্বহারাদের গা-ঝাড়া দিয়ে জেগে উঠতে হবে—শালা ওলাউঠো যত সব—আপনারা কি কেবল মুখ নাড়বেন, কাজ করবেন না?'

'এ মুখ নাড়ার চেয়ে মেয়েদের নথনাড়াও ভালো। তাতে ঢের পাকা কাজ হাঁসিল হয়।' অনন্তরাম বললে।

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমিও তো ওই মিটিংই করলে ঘনশ্যাম।' বঙ্কু বললে, 'কি পথ বাতলালে তুমি নিজে? কথা ছাড়া আছে কিছু ট্যাকে?'

'আছে বইকি। দেখবি চ। গয়ানাথ মালোর কি হল বল তো দেখি—'

শুনে অনেকে একসঙ্গে ঘনশ্যামকে ছেঁকে ধরল।

'কী হল বল তো—গয়ানাথ কোথায়?'

'গয়ানাথ খুন হয়ে গেছে।'

'খুন হয়ে গেছে! কোথায়?'

'লাস পাওয়া যাচ্ছে না।'

'পাওয়া যাচ্ছে না? লাসটা অব্দি পাওয়া যাচ্ছে না।'

যারা উঠে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়ল আবার।

'কে খুন করল?'

'পুলিশ কোন কিনারা করতে পারছে না।'

'তা তো পারবেই না।'

'কে খুন কবল?'

'সে জানে চৌধুরীসাহেব আর তার শ্বশুর। আলবৎ জানে।'

'কে খুন করল! কে খুন করল!!' অনেকগুলো গলা দশ আনি উত্তেজিত ছ'আনি উৎকণ্ঠিত, নাকি ছ' আনি উৎসুকিত দশ আনি উদ্দীপিত—ছ' আনি চার আনি ব্যথিত হয়ে উঠল,—মনে হল সুতীর্থের।

সুতীর্থ জিজ্ঞেস কবল, 'গয়ানাথ কি করেছিল যে খুন হল?'

'সে আমাদের সর্দার ছিল তাই।'

'মোটরে জীপে চড়ে সব পার্টির লোক আসে, ফিরিস্তি গেয়ে জীপে করে ফিরে যায় আবার। না, না, গয়ানাথ ও-সব ভজভজে বাঁজা আঁটকুড়ের বাচ্চাদের মত নেতা ছিল না। মুখে খই ফুটত না, সে গাঁইতি নিয়ে কাজ করত।'

'গাঁইতি?' জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

'ওটা হল রূপক ঃ কাস্তে হাতুড়ি গাঁইতি। কাস্তে হাতুড়ির তো দশ মাস চলছে, একটু কষ্ট হচ্ছে। এবার গাঁইতি একটু কাজ চালিয়ে দিক—গাঁইতি, তুরপুন, করাত, কুড়ুল। গয়ানাথ মালোর মত লোক যদি কর্তাদের নেকনজরে না পড়ে তা হলে পড়বে কে। আচ্ছা, আমরাও দেখে নেব!'

'তোমরা বড় তড়পাচ্ছ হে ঘনশ্যাম—' সুতীর্থ বললে।

'আমরা গুম হয়ে যাচ্ছি—আর ওরা এর ওর মা-বোন নিয়ে স্ট্রিমলাইন হাঁকাচ্ছে। ওদের ধান খেয়ে ওদের পাঁশগাদার হোঁৎকা মুর্গির মত কথা বলবেন না সুতীর্থবাবু।'

'ছোলা মুর্গি হয়ে পড়ে থাকব আমি ঘনশ্যাম, ওদের ধান খেয়ে কথা বলি যদি।'

'বেশ মানলুম। এখন গয়ানাথের একটা কিনারা করুন। কর্তাদেরও জানান দিন যে ফ্যাক্টরি কুঁকড়ে চামচিকের ছা হয়ে যাবে, তবু একজন ধর্মঘটীকেও বাগে পাবে না তারা যদি আমাদের পঁচিশ দফা দাবি অক্ষরে অক্ষরে মেনে না নেয়।'

ঘনশ্যাম বললে, 'এটাও জানিয়ে দেবেন যে সব দল একজোট হয়েছে। ভাঙানি চলবে না। মরিয়া হয়ে চালাতে চাচ্ছে। কিন্তু কি হচ্ছে চোখের সামনে দেখছেন তো।'

'না ভাঙাচি-টাঙাচি চলবে না', সতীর্থ বললে, 'আজকাল ধর্মঘটের জোর বাড়ছে। মানুষকে মানুষ বলে মনে করে প্রায় সকলেই। কাজে তার প্রমাণ দিতে না গেলেও একটা ট্যাকটেকে চক্ষুলজ্জার খাতিরে ভাঙানি দিতে সকলেই দ্বিধা বোধ করে। কিন্তু তবুও তোমাদের সত্যাগ্রহ চলতে থাকুক।'

'তা চলবে। কিন্তু পুলিশ তো সত্যাগ্রহী নয়। ধর্মঘটীরা জেলে যাচ্ছে, মার খাচ্ছে।'

'আজ কি পুলিস আসবে?'

'আসবে বই কি।'

'কখন?'

'এক আধ ঘণ্টার ভেতরেই।'

'আচ্ছা বেশ, ধর্না দেব সত্যাগ্রহীদের সঙ্গে। মার খাব, কিন্তু এখুনি জেলে যেতে রাজী নই—'

'কেন?'

'তা হলে গয়ানাথের ব্যাপারেব গিঁট খসানো শক্ত হবে।'

'সুতোগুলো জড়িয়ে জড়িবড়ি পাকিয়ে গেছে বুঝি সুতীর্থবাবু? কত বড় ন'টাই বেবাক সুতো লাট খেয়ে গেল? গিঁট খসাবেন তো? গিঁট খসাবেন সুতীর্থবাবু হ্যাঁ হে করালীচরণ—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ খসাবেন।'

'তা খসাবেন, তার আর কি—'

সুতীর্থ বললে, 'কর্তাদের সঙ্গে দাবি-দাওয়া সুপারিশের ব্যাপারটা তোমরা কি খুব ভাল করে চালাতে পারবে? যদি পার তা হলে বল আমি কয়েকদিন জেলে দাড়ি গজিয়ে আসি—এখানে ফিরে এসে ঘাট কামাবার আগে।' সুতীর্থ তার গালের পাঁচ-সাত দিনের দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে সকলের দিকে তাকাচ্ছিল।

'আর আমাদের ঘর আর বার—আমাদের জল আর জেল; ও সব একঠাই হয়ে গেছে আমাদের—' খুব একটা কালো নিঃশ্বাস ফেলে পীতাম্বর বললে।

'হাঁড়িতে ভাত নেই বলে ঘরে গিয়ে দেখব পরিবার মুখ হাঁড়ি করে বসে আছে, তার ফাঁড়ি যাওয়াই ভালো। আমরাই যাই—পেটে কিছু চামচিকের দানা পড়বে তো ফাঁড়িতে গেলে —' একবার মুখ তুলে আবার তিন-চার ঘণ্টাব জন্যে মুখ বুজে রইল খোসাল দত্ত।

'আপনি সুতীর্থবাবু চালু হয়ে যান।' অনন্তবাম বললে, 'যা করবার করুন। হয় আমাদের সঙ্গে মিশে বেধড়ক মার খেতে শিখুন—জেলে চলুন। না হয় অ্যাডজুডিকেশন বোর্ডকে শায়েস্তা করে দিয়ে জেনে আসুন গয়ানাথকে কে মারল আর আমাদের পঁচিশ দফা অক্ষরে অক্ষরে দু-হপ্তার মধ্যে মেটানোর কদ্দুর কি হচ্ছে, কি হবে।'

বাইশ

সুতীর্থ ধর্মঘটীদের সঙ্গে মিশে সত্যাগ্রহ শুরু করে দিল। শীতেব অপরাহ্নের বোদের তেজ কমে যাচ্ছিল ক্রমেই। এই মিঠে রোদে মুখ-পিঠ পুড়িয়ে ধুলোয় ঘাসে চিত কাত উপুড় হয়ে শুয়ে থাকতে মন্দ লাগছিল না। একেই কি বলে ধর্মঘটের তাড়সে ধর্না দেওয়া। কিন্তু পিকেটিঙের এ তো কলিব সন্ধ্যে সবে। তা ছাড়া সে আইবুড়ো মানুষ, শবীরও শক্ত আছে তাব, মনেও বিশেষ কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বড় একটা দায়িত্ব নেই এক-রক্ত-দাবি করা কোনো গলগ্রহীদের কাছে।

'কি গো হামিদ, শুয়ে বসে লাভ কি যদি ওরা না আসে?'

'ওরা কি আজ আসবে?'

'ওরা কারা? পুলিস?'

'না। যারা তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে—'

'আজ আর আসবে না।'

'কাল।'

'সে সব বলা যায় না কিছু। তবে এখন থেকে ক্রমে ক্রমে কিছু আসবে। ক্রমেই ওরা দলে ভারি হবে।'

'কারা? যে সব কামিন স্ট্রাইক ভেঙে দিতে চায়?'

'হ্যাঁ, এই দশ দিন হয়ে গেল, অনেকেরই শিরদাঁড়া বেঁকে পড়ছে।'

'তোমরা শুয়ে থাকলে তোমাদের গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে ওরা; তোমাদের সত্যাগ্রহ ওরা মানবে না; ওরা আর স্ট্রাইক করবে না—কাজে যাবে—তোমাদের বুকের ওপর দিয়ে মাড়িয়ে যাবে। ওদের চোখ মুখ হাত ঠ্যাং তো মাকড়সার মত হয়ে পড়ছে ইয়াসিন; মাকড় যাবে মাকড়সার জালেব ওপর দিয়ে ধেই ধেই করে নেচে।'

'আমরা হলাম মাকড়সার জাল?'

'মাকড়সার জাল ছাড়া আর কি আমরা? মানুষ তো নয়—মানুষের পিত্তি। শরীরের পিত্তি কফ বায়ু ঠিকরে যে আঁশ বেরিয়ে আসে তার ফ্যাকড়া তুমি আর অনন্তরাম, ঘনশ্যাম—'

'আর ওরা হল মাকড়সা?'

'মাকড়সা। ওদের সঙ্গে রক্তের সম্বন্ধ আমাদের। ওদের পেটের থেকে সুতোর মত বেরিয়ে এইছি—' হ্যাচ হ্যাচ করে হাসতে লাগল কালু ওস্তাগর। হেসে মজা পেয়ে একসময় এমনই গয়ের খালাস করতে লাগল যে তার চারদিকটা মাছি নোংরামীতে ঘিনঘিন করতে লাগল।

'সুতোর লালায় লেপটে রইছি ডিম কি বলিস ভূপাল—'

'তাই তো বংছ বিদ্ধি হল ওদের; তুই ঘুমোচ্ছিছ ইয়াসিন?'

'আরে না—'

'মকবুল কোথায় গেল?'

'ও চলে গেছে?'

'সুতীর্থবাবু কোথায়?'

'ওই যে মড়া গুঁড়িটা ঠেস দিয়ে শুয়ে আছে—'

'ও থাকবে তো?'

'কি জানি, ওর ঢং আছে; ঢঙের মানুষ। কখনো এখানে এসে বসে—কখনো ওখানে গিয়ে শোয়। আকাশ পাতাল ভাবে। ঐ একরকম। ঐ যে আসছে।'

'মকবুল কোথায় গেল ইয়াসিন?' সুতীর্থ এসে জিজ্ঞেস করল।'

'ও চলে গেছে।'

'যাবার সময় আমাকে জানিয়ে গেল না?' সুতীর্থ ইয়াসিনেব দুটো ছড়ানো ঠ্যাঙের ফাঁকের ভেতরেই এসে যেন বসল। দেখে ইয়াসিন মাথাটা ওপরের দিকে চাড় দিয়ে ঠেলে ঠ্যাং গুটোতে গুটোতে বললে, 'কী আর জানাবে?'

'আমায় নাকি ফতিমা ডেকেছিল?'

'কী আর হবে ঃ আপনি তো পিকেটিং করছেন।'

'তা বটে, কিন্তু মকবুল আফশোস করছিল। ও ভেবেছে আমি ওদের সঙ্গে ফ্যানভাত খেতে নারাজ।'

'ওতে কিছু হয় না দাদা। ও কিছু মনে করেনি। ভাত খেতে নারাজ মানে? ভাত কোথায় পাবে যে আপনি গিয়ে খাবেন?'

'আমাদের কারুর—ঘরেই ভাত নেই।' বিশ্বম্ভর বললে।

'ফ্যান আছে, নুন আছে।' বললে নেপাল।

'কিন্তু কদিন থাকবে আর? কিন্তু তাই বলে লুকিয়ে চৌধুরীসাহেবদের খিড়কী দিয়ে ঢুকে কবুল করতে যাবে না বিনোদ সরখেলের মত কেউ।'

'আর বিনোদ সরখেল; ওর পরিবার হাঁচি দিলে ও তো কাপড় নোংরা করে ফেলে—' বললে অনন্তরাম।

শুনে হাসল কেউ কেউ; হাসি মুখে ফুটে উঠতে না উঠতেই মিশিয়ে গেল—শুকিয়ে গেল। বিড়ি যে নেই তা নয়, কারু কারু ট্যাঁকে কিছু কিছু আছে, কিন্তু দেশলাই এরই বড্ড অভাব। একটা মাত্র দেশলাই হাতে হাতে ঘুরে ফিরছিল। দু-চারটে কাঠি বাকি আছে তার। ফুরিয়ে গেলে দেশলাই

পাওয়ার জো নেই—এ মুলুকে—খাস কলকাতায়ও সহসা কোনো দোকানে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। কিন্তু দেশলাই আনবার জন্যে কলকাতায় যাবে কে? বাস-ট্রাম আর একটু পরেই বন্ধ হয়ে যাবে। এ তল্লাট থেকে ট্রামবাস ধরতে হলেও বেশ খানিকটা হেঁটে যেতে হয়। ফ্যাক্টরির ভেতর অবশ্যি আগুনের অভাব নেই—আছে অঢেল দেশলাইও। কিন্তু কোনো মানেই হয় না। তবুও বিড়ি জ্বলে উঠলো অনেকের।

'আর চারটে কাঠি আছে কিন্তু রসুল।'

'মাত্র চারটে। এই নিয়ে সারা রাত কাটাতে হবে। আর কারু কাছে মাচিস আছে নাকি ধর্মঘটীরা—' হামিদ কলকী বাজিয়ে হুঙ্কার দিয়ে শুধোল।

'আছে আমার কাছে—' অনেক দূর থেকে জানান দিল বিশ্বম্ভব।

একটা মরা গুঁড়ির আড়ালে বসে পেচ্ছাপ কবছিল সে। কিন্তু ভালো মানুষ, জল খালাস করবার অবস্থাতেই হামিদের ডাকের জবাব না দিয়ে পারল না।

সুতীর্থ মিহি সুরে ভাবছিল : বিশ্বম্ভরেব কাছে থাকবে না? ও তো বিশ্বকেই ভরে রেখেছে। সুতীর্থ অবাক হয়ে ভাবছিল : এ কি ভাবছি আমি, এ কি বোকার মত কথা ভাবছি।

'খুব মাটির মানুষ বিশ্বম্ভর। কালো-রোগা-ঢ্যাঙাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি সব সময়েই গাল জুড়ে থাকে। আট দশটি ছেলেপুলের বাপ—স্ত্রী আবার পোয়াতি। পবিবারসুদ্ধ সকলেই ম্যালেরিয়ায় ভুগছে। এত কাচ্চাবাচ্চার মালিকানা অবিশ্যি বিশ্বম্ভরের—কিন্তু এদের সকলেরই জন্ম দেওয়াব দায়িত্ব যে তাব একার নয় সেটা সকলেই প্রায় জানে। জানুক, তাতে বিশ্বম্ভবেব এসে যায় না কিছু। সে তার স্ত্রীকে অবিশ্বাস করে না; সে জানে, যে তার স্ত্রীব সঙ্গে তার শোয়াবসা—রোজ রাতের; ছেলেপুলে অপরের হতে যাবে কি করে? অনেকে তাব স্ত্রীকে রাঁড়ি বলে খোঁটা দেয—বিশ্বম্ভরের মুখের ওপর বাঁড়ি আর ফড়ে বলে জেরবার করে দেয় তাদের দুজনকে। দিকগে, তাতে স্ত্রীর ওপব আসক্তি তার বেড়েছে বই কমেনি; এই তো এই মাঘ ফাল্গুনেই বিশ্বম্ভবের স্ত্রীর হয়ে যাবে একটা কিছু। সুতীর্থ জানে এই সব। তাকিয়ে দেখল বিশ্বম্ভর পেচ্ছাপ করে ফিরে আসছে।

'আমার কাছে দেশলাই আছে হামিদ—' হেঁটে আসতে আসতে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছিল বিশ্বম্ভর।

'আহা, এই সব বেচারী মানুষেব ভিড়। কি অবিস্মরণীয় এদের নিববচ্ছিন্ন অন্ধকারের ভেতর প্রাণপাত; পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদঘুটে বর্ষায় খালুযেব ভেতর ল্যাটামাছেব মতন। কোনো সূর্য নেই, নক্ষত্র নেই।' সুতীর্থের মনে হল।

'ক'টা দেশলাই আছে বিশ্বম্ভর?'

'একটা শুধু।'

'ক'টা কাঠি হবে।'

'গুণে দেখতে হয়—'

বিশ্বম্ভর কাঠিগুলো বাঁহাতেব চাটির ওপর ঝেড়ে নিয়ে এক এক করে গুনছিল।'

'আরে দূর দূর! আন্দাজে বলতে পার না? বেখে দাও—রেখে দাও বাক্সর ভেতব—হিমে মিইয়ে যাবে বিশ্বম্ভর—' চীৎকার করে উঠল অনন্তরাম।

'এই গোটা পঁচিশেক কাঠি হবে হামিদ—' হেসে মাড়ি বেব করে বললে বিশ্বম্ভর।

'আচ্ছা বেশ, চটপট ভরে ফেল সব। নাও, এখন দাও বাক্সটা আমাকে।' বললে অনন্তরাম।

'তোমাকে দেব অনন্তরাম?' হামিদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে কি নির্দেশ আসে না আসে, কি করবে না করবে—এ জীবনে কেচোমাটি ওগরানো ছাড়ানো ছাড়া আর কিছুই যেন করা যায় না—এমনিভাবে দাঁড়িয়েছিল বিশ্বম্ভর।'

'দিয়ে দাও অনন্তরামকে।' ফতোয়া এল হামিদের।

'চট করে দিয়ে দাও অনন্তরামকে, না হলে তুমি লগ্‌গি করেই মাচিসের জান খেয়ে নেবে—' বন্ধু বললে।

'আর কার কাছে মাচিস আছে?' হাঁক দিল হামিদ।

আর কারু কাছে নেই।

সুতীর্থ বলল,'এ জানলে আমিই তো কলকাতার থেকে আসবার সময় দু ডজন নিয়ে আসতে পারতুম।'

'ঠিক আছে সুতীর্থবাবু', ইয়াসিন বললে, 'বিলকুল।'

সুতীর্থ বললে, 'তোমরা কি সারা রাত এখানে থাকবে হামিদ?'

'হ্যাঁ।'

'এই খোলা মাঠে?'

'থাকব।'

'সারা রাত থাকবার কি দরকার?'

'দরকার নেই অবিশ্যি, আমরা একটু বাড়াবাড়িই করছি। তবে ফ্যাক্টরির কাজ তো সারা রাত চলে। নাইট শিফটে কাজ করবার জন্যে আমাদেরই কেউ কেউ হ্যাঁচোড় প্যাঁচোড় করে ঝুলে পড়ব কিনা আন্দাজ করে নেবার জন্যেই সারা রাত থাকা দরকার। আমরাই আমাদের নজরবন্দী করে রাখছি।'

'ওঃ—' সুতীর্থ বললে। পকেটের থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বার করে হামিদের দিকে ছুঁড়ে মেবে বললে, 'বিলিযে দাও হামিদ।'

'আপনি চলে যেতে পারেন সুতীর্থবাবু।'

'না। আমি থাকব।'

'পুলিস আজ রাতে আসবে না আর।'

'তা আসবে না হয়তো।'

'আপনি কেন আমাদের খাতায় নাম লেখালেন সুতীর্থবাবু? আপনি তো কুলিকামিন নন—মিস্ত্রি প্লাম্বাব নন—'

'আমি খেয়ালি মানুষও নই। অবিশ্যি আমি নাম লেখাই নি। নাম লিখিয়েছে বিশ্বম্ভর, লিখিয়েছ তোমরা সকলেই। আমার আজকাল হাতে খড়ি।'

ঘনশ্যাম (আই এস-সি পাস, যাদবপুরেও কিছুদিন পড়েছে) বললে, এটা সুতীর্থবাবুর তা দেবার সময়। সেটা ভালো কথা। কিন্তু আপনি তো আমাদের মেসো-পিসে-চাচা-ফুফো নন, আপনি আমাদের নিজের বীটের লোক আমাদের এখানে বক্তৃতা করতে আসেন বক্তৃতা ফলাও হলে বক্তারা চলে যায়, কিন্তু আপনি এখানে থেকে যান মশাই। কেন থাকেন? আমাদের টানে নয়, নামডাকের জন্যেও নয়, আপনি এখানে থাকলেই স্ট্রাইকটা উতরে যাবে সে ভরসায়ও নয়। এখানে থাকতে খুব ভালো লাগে না আপনার ঃ কেন মিছিমিছি মার খাচ্ছেন নিজের মনের কাছে? কেন ঘুরছেন? কেন ত্রিশঙ্কুব মতন কড়িকাঠের সঙ্গে হাওয়ায় দুলছেন—'

কেউ কোন কথা বললে না। কিন্তু সুতীর্থকে তারা হামিদ অনন্তরাম ঘনশ্যাম ইয়াসিনের মাথার ওপরে পাণ্ডা মনে করে নিতে কেউই রাজি ছিল না কিছুতেই। ত্রিশঙ্কুর মানে এরা কেউ কেউ জানে, অনেকেই জানে না।

ওরা ভাবছিল ঃ ত্রিশঙ্কু তো বটেই, এ লোকটা স্পাইও হতে পারে। এ মানুষ স্পাই নয় হয়তো, কিন্তু ঘোড়েলও নয়। একজন বদমাশ শাঁসালো লোকের দরকার আমাদের—এ সব গান্ধীগিরি দিয়ে আমাদের হবে না কিছু।

সুতীর্থ অবিশি গান্ধীধর্মী নয়—বিশেষ কোনো বাঁধা ছক নেই তার, কেবলি জীবনটাকে বুঝে দেখতে চায় যে সুতীর্থ এই ধর্মঘটীরা তারই একটা উপলক্ষ্যে, দার্শনিকতায় বিস্তৃতর হয়ে উঠলে

বস্তুপুঞ্জের এসব অস্পষ্ট বিমূঢ়তাকে যে পায়ে পিষে চলে যাবে সে—হামিদ প্রভৃতি সামান্য মানুষও যেন সুতীর্থের এই চালাকি ধরে ফেলেছে। এই বিরূপ বিমুখ ভিড়ের সামনে বসে—তবুও বসে থাকতে হবে তাকে, বসে থাকতে হবে, শুয়ে থাকতে হবে, মটকা মেরে পড়ে থাকতে হবে, জেগে উঠতে হবে, মরে যেতে হবে। এ না-হলে একজন হতে পারবে না সে। হামিদ অনন্তরামরা 'হতে পারত' চেষ্টা করছে না, তারা 'হচ্ছে', সুতীর্থের মত সংকল্প করে তারা আবর্তের ভেতর এসে পড়ছে না, ছোট থেকে বড় হোক, অসার হোক নিষ্ফল হোক, সময় যেখানে তাদের এনে দাঁড় করিয়েছে সেখানে আজকের এই ধর্মঘটের (কালকের বৃহত্তর বিপ্লবের) সব চেয়ে স্বাভাবিক নায়ক তারা; সমাজের সময়ের যে স্তরে যেরকমভাবে লালিত হয়েছে সুতীর্থ তাতে ওরকম নিদারুণ মানবিকতার তাগিদ নেই তার ঃ আজকের এই ক্ষুদ্র আলোড়ন কিংবা কালকের বড়—বেশি বড় সব রক্ত বিপ্লবের সূচনা ও পরিণতি সম্পর্কে; সে রকম বিপ্লবের সম্পূর্ণ প্রয়োজন অনুভব করছে না সে, সে রক্তোৎসবের সহজ দৈন্য হয়ে দাঁড়াবার মত বিশেষ কোনো প্রেরণা নেই তার, তার বুদ্ধি ও জিনিস সমর্থন করে না। অবিশ্যি বুদ্ধি প্রেরণা সমবেদনা সংকল্প সবই তার, যারা বিপ্লব না ঘটিয়ে পারছে না তাদের জন্যে—মনে মনে; একটা দার্শনিক প্রস্থানে দাঁড়িয়ে। কিন্তু স্থূলে বিপ্লব না ঘটিয়েও মানুষের ভালো হতে পারে; জনসাধারণ হয়ে উঠতে পারে সত্যিই সফল মহাসাধারণ; বিপ্লবটা শান্তিতে শান্তভাবে পরিচালিত হতে পারে, পারে নাকি? সে রকম হলেই বুদ্ধি স্বপ্ন সংকল্পের একটা স্বাভাবিক ভূমিকা মিলত সুতীর্থের, নিতান্তই দর্শন প্রস্থানের একটু বেসামাজিক উচ্চভূমি থেকে নেমে শান্ত অথচ অনবনমনীয় সমাজবিপ্লবের স্বাভাবিক কাজে সোজাসুজি হাত দিতে পারত সে; কবি নয় দার্শনিক নয় শুধু আর—অক্লান্ত অপরিমেয় কর্মী হয়ে উঠতে পাবত সে।

কিন্তু আজকের অব্যবস্থার মানুষ—সব মানুষই শুভার্থী মানুষেরাও এখনও খুব স্থূল, ভালো কাজ করতে গিয়েও রিরংসা ঘুঘু স্বাভাবিক, কল্যাণের জানালা খুলতে গিয়ে জননীকে নিরবচ্ছিন্ন হত্যা করা শোকাবহ বা অপ্রাকৃত মনে হয় না কিছু, সোজা চোরকাঁটা বেছে ফেলবার কাজ যেন ঃ আজকের পৃথিবীর ইচ্ছা ও কর্মের মর্মার্থ তো এই। ইচ্ছা ও কর্মকে লালিত করা নয়, এ পৃথিবীতে চিন্তা ও অনুধ্যান ছাড়া বিশেষ কিছু সে করতে পারবে বলে মনে হয় না। কাজ করতে পারে সে—কিন্তু আরো একশো দেড়শো সুতীর্থকে সঙ্গে নিয়ে, ঘনশ্যাম, বন্ধু অনন্তরামদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নয়। ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়েও কাজ করবার চেষ্টা করতে পারে সে—যেমন করছে; কিন্তু এ পরিবেশের আশ্চর্য দুর্বোধ্যতা ও প্রতিকূলতার জন্যে নিজের সবচেয়ে উত্তম জিনিসগুলো দান করা সম্ভব হচ্ছে না তার পক্ষে। যে তথ্যকে সে সত্য বলে স্বীকার করে না, যে অনুমানকে ভুল বলে জানে, যে প্রণালীকে সমর্থন করে না—মনকে চোখ ঠার দিয়ে আজকের কালকের আরো পরের ভবিষ্যের একটা অস্পষ্ট কল্যাণের প্রত্যাশায় সেই অস্বীকার্য অপমানবীয় জিনিসগুলো গ্রহণ করেছে সে। এ ছাড়া এ যুগে সকলের সঙ্গে মিলে কাজ করবার উপায় নেই—উপায় নেই আর; কাজ করা ছাড়া পথও নেই এ যুগে; নিজের সত্তা যুক্তিতর্কের চিন্তা অনুশীলনের প্রভাবে অপরদের যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করে (ব্যর্থ সে চেষ্টা) নিদারুণ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার বলয়ের ভেতর কাজ করা ছাড়া উপায় নেই—উপায় নেই এ যুগে।

তেইশ

এর পর সুতীর্থের চিন্তার মোড় ঘুরে গেল ঃ চিন্তা রইল না আর কেমন নিদ্রালু ভাবালু হয়ে পড়ল সে ঃ ওদের একজন হয়ে পড়ার ভেতর বিশেষ কোনো মানে নেই। কি হবে অনন্তরাম হামিদ ঘনশ্যামের মতন হয়ে? মানুষের জীবনের পূর্ণাঙ্গীন ব্যবহার ও লক্ষ্যের কাছে এরা ও এদের এই প্রাণান্তকর

ধর্মঘটের সার্থকতা নিতান্তই স্থূল—ম্যাড়মেড়ে। কিন্তু তবুও নানারকম আঘাটার ভেতর দিয়ে চলতে হয় মানুষকে দৃষ্টি শুদ্ধ করে নেবার জন্যে, জীবন ঠিক করে তৈরি করে নেবার জন্যে। এই দার্শনিক সত্যের জন্যেও—কিন্তু তার চেয়ে বেশী ব্যক্তির কল্যাণের চেয়ে অর্থনৈতিক কল্যাণস্থাপনার কেমন যেন একটা অব্যয় উত্তেজনায় এই ধর্মঘট নিয়ে পড়েছে সে। প্রাণকল্যাণের সমুদ্র রচনা করতে গিয়ে এখানকার এই ছোট্ট সংগ্রামটুকু তো এক ঝিনুক জল; ঝিনুকটাকে স্বাতীর শিশিরের মত সেই জলে ভরে ফেলতে হবে। সৃষ্টির বড় সময়ের পারে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর ছোট সময়ের দিকে তাকালে পৃথিবীর বড় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিককার প্রাদেশিক ছোট সময়ের ছিটেফোঁটার দিকে চাইলে, ওদের ভেতর একজন হয়ে পড়ার কোনো মানে নেই : কি হবে হামিদ ঘনশ্যাম ইয়াসিন অনন্তরামের মত হয়ে?

কিন্তু তবুও এখানকার এই এক ঝিনুক প্রাণপ্রবাহী জল সংরক্ষণ উৎসারণ করা দরকার প্রাণকল্যাণের সমুদ্র সৃষ্টি করতে গিয়ে। দরকার? এইসব এক কড়ির ছাঁদার ভেতর থেকে সমুদ্র বেরুবে বুঝি?

'আপনি শুয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু?' হামিদ বলল।

'একেবারে চিত হয়ে মাটির ওপরে যে, একটা চাটাই এনে দিই—'

বঙ্কু বললে।

'তোমার তো সর্দি হয়েছে বঙ্কু—' সুতীর্থ অন্ধকারের ভেতর চোখ বুজে থেকে বললে, 'গলা ভারি হয়েছে তোমার। নাক ফোঁসফোঁস করছে। ক' রাত জাগলে?'

বঙ্কু কোনো কথা না বলে উঠে চলে গেল। সত্যিই সর্দিতে ঠাণ্ডায় সে বড় কাবু হয়ে পড়েছিল।

'ঘুমিয়ে পড়লেন সুতীর্থবাবু।'

'আকাশের তারা দেখছি।'

'যদি ঘুমিয়ে পড়েন হোথা ঐ ক্যাম্পে রেখে আসব আপনাকে পাঁজাকোলা করে—'

'ওটা কাদের ক্যাম্প?'

'আমাদেরই; ধর্মঘটীদের।'

'না। এইখানেই থাকব আমি।'

'নিমুনিয়া হবে—ঠাণ্ডা লেগে- শিশিরে শুয়ে—'

'সমুদ্রে যার শয্যা, তার আবার শিশিরে ভয়,' দূরের থেকে বললে বঙ্কু। চুপচাপ পড়েছিল। সকলেই—রাত আর একটু থমথমে হলে একজন দুজন করে উঠে চলে যেতে লাগল, কে কোনদিকে যায় অনন্তরাম আর হামিদ কড়া নজরে পাহারা দিয়ে দেখছিল।

সুতীর্থ থমকে পড়েছিল।

আধঘণ্টা পরে দূরে টর্চলাইট দেখা গেল।

'হ্যাঁ, পুলিসই আসছে হামিদ', অনন্ত বললে।

'ঘনশ্যাম কোথায়?' হামিদ জিজ্ঞেস করল।

'দেখছি না তো। এই বঙ্কু! বঙ্কু!'

'অত জোরে ডাকিসনেরে অনন্ত।'

'আমরা কি লম্বা দেব নাকি হামিদ?'

হামিদ মাথা নেড়ে বল্লে, 'গ্যাঁট হয়ে বসে থাক যে যার জায়গায় আছিস।'

'তারপর?'

'পেটালে পড়ে পড়ে মার খাবি; গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেলে যাবি সঙ্গে চলে, কাঁদুনে গ্যাস যদি ছাড়ে তবে কাঁদবি।—'

'আর গুলি করে যদি—'

'তাহলে পিস্তুত থাকবি—'

'পিস্তুত?'

'স্ট্রেচার আছে, হাসপাতাল আছে, মরলে আধপোড়া হয়ে গঙ্গা পাবি তো;—মোচলমানকে মাটি দেওয়া হবে; এ সবের জন্যে ভাবনা করিসনে। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।'

কর্তৃপক্ষ ও পুলিস গ্যাস-গুলির ধার দিয়েও গেল না। হেসে খেলে কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গেল শুধু, সুতীর্থকেও।

বাকি সবাইকে পুলিশের হেপাজতে চালান দিয়ে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মুখার্জি সুতীর্থকে নিয়ে ফ্যাক্টরির তেতলায় তার খাস কামরায় গিয়ে উঠল।

'আসুন, বসুন, আপনিই তো সুতীর্থবাবু?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি তো কমার্শ্যাল ফার্মে কাজ করেন?'

'কাজ করতুম—'

'আপনার চাকরী তো বহাল আছে—'

'আমি ছেড়ে দিয়েছি—'

'নিজে ইচ্ছে করে ছেড়ে দিলে আমি নাচার। কিন্তু আজো ফোনে মল্লিক আপনার কথা বলছিলেন—'

কি বলেছিলেন জিজ্ঞেস করতে গেল না সুতীর্থ। কোন ঔৎসুক্য ছিল না তার।

'আপনি অফিস অ্যাটেণ্ড করলেই পুরো মাইনেতে আপনাকে এ কদিনের ছুটি দিতে রাজি। মল্লিক বললেন। আসুন—'

সিগারেটের টিনের ঢাকনি খুলে সুতীর্থের দিকে এগিয়ে দিয়ে মুখার্জি বললে—'আসুন, নিন, আপনিই বেঙ্গল সাপ্লাই কর্পোরেশনের সুতীর্থবাবু। সাপ্লাই কর্পোরেশনের সঙ্গে আমাদের এই ফ্যাক্টরির কি সম্পর্ক সুতীর্থবাবু?'

'আমি তা জানব কি করে বলুন।'

ওটা হল কলকাতার এক প্রান্তে, এটা হল আর এক কিনারে। প্রায় মাইল দশেকের ব্যবধান দুটোর মধ্যে। আপনি হলেন সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন ডিপার্টমেন্টাল হেড—ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক সাহেবের—ইয়ে—মার্গ সঙ্গীত; আবাব আপনিই এখানকার কুলিকামিন হামিদ অনন্তরামের গোঁসাই। এ সব দশঘাটের জল এক পীরের ঘাটে কি করে আনলেন দাশগুপ্ত মশাই?'

'ঢল নেমেছে বলে এক হয়ে গেল সব।'

মুখার্জি একটু চুপ করে থেকে বললে, 'মল্লিক সাহেব আপনাকে সমীহ করেন কেন জানেন? আপনার কাজের নিপুণতার জন্যেও বটে, তাছাড়া গভর্নমেন্টের একজন বড় মিনিস্টার আপনার ডাকসাইটে ইয়ার!' মুখার্জি বললে।

'আমার ইয়ার? না তো কোনো ডাকসাইটে পৃথিবীতে আমার লোভ নেই। কোনো মিনিস্টারকে আমি চিনি না; তাদের কেরানীদেরও কৃপার পাত্র আমি মুখার্জি সাহেব। এগুলো কি?'

'বোতল। হোয়াইট লেবেল।'

'হোয়াইট লেবেল? এ সব ডুমুরফুল পেলেন কোথায় আপনি? এ বাজারে তো এ অপয়াগুলোকে চোখেই দেখা যায় না। দুজনের জন্যে সরঞ্জাম দেখছি—'

'আপনি আর আমি—'

'আমি না—আমি ও সব খাইনে কোনোদিন।'

'এখন নয়—এক্ষুনি নয় সুতীর্থবাবু। গলা শুকিয়ে এলে ভিজিয়ে নেবেন গলা। যদি না শুকোয় নাই বা ভেজালেন। বমি হবে না, বন্দোবস্ত করে দেব। যদি তিতো লাগে, ম্যাজম্যাজ করে, মানুষ

কি মেয়েমানুষকেও ছুঁতে যায়? এ তো হোয়াইট লেবেল শুধু। ভোগের জিনিস আনন্দ দেবে বইকি।'

মুখার্জি বললে, 'দু হপ্তা ধরে এই স্ট্রাইক নিয়ে কুঁদছেন কেন আপনি—'

'বেছে বেছে আপনাদের ফ্যাক্টরির ওপরই যে আমার বিদ্বেষ তা নয় মুখার্জি সাহেব। আমাদের নিজেদের ফার্মেই ধর্মঘট হবার কথা ছিল। কিন্তু সেটা হল না।'

'কেন?'

'সেটা পরে হবে। দৈবচক্রে এ পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম আমি—'

'কবে বলুন তো?'

'দিন পনেরো ষোল আগে।'

'সাহেবী পোশাক?'

'হ্যাঁ, বেশ জাঁকালো সুট পরে।'

'মাথায় হ্যাট ছিল তো? বলুন তারপর' মুখার্জি বললে।

সুতীর্থ সিগারেটটা পুরোপুরি না খেয়েই অ্যাশট্রের ভেতর ফেলে দিল।

'একটা জিনিস হয়তো আপনি লক্ষ কবেননি সুতীর্থবাবু।'

'কি, বলুন তো।'

'আপনি আমারি মতন লম্বা।'

সুতীর্থ আপাদমস্তক মুখার্জির দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'ঘাড়েগর্দানে একটু বেখাপ্পা হয়েও আপনি লম্বা বইকি মুখার্জিসাহেব—খুব লম্বা। মুখার্জি সাহেব—খুব লম্বা।'

'আমি সব সময়েই সাহেবী পোশাকে চলিফিবি। আপনি হ্যাটকোট পবে যখন ঠাটে চলেন পেছন থেকে ঠিক আমারই মতন দেখায় আপনাকে।'

'কবে দেখলেন?'

'মুখের ছাঁদও আপনার কতকটা আমার মত। কিন্তু তাকালেই পার্থক্য ধরা প'ড়ে। কারু মতে আপনার মুখ বেশি সুন্দর, আমার বেশি পুরুষোচিত। এই দেখুন আমার ফোটো।'

সুতীর্থ ফোটোর দিকে তাকাল না। 'আপনাকেই তো দেখছি।'

'নানা মানুষেব নানারকম মত থাকে বইকি। কিন্তু সে যাকগে আসল কথা হচ্ছে সাহেবী পোশাকে মেজাজী চালে চললে আপনাকে যদি কেউ মুখার্জি সাহেব বলে ভুল করে থাকে, তবে তাকে দোষ দেযা যায না। নিন, আসুন এইবার শুরু কবা যাক।' মদের বোতলেব দিকে হাত বাড়িয়ে দিল মুখার্জি।

সুতীর্থ মাথা নেড়ে বললে, 'না খাই যে তা নয, কিন্তু খোঁযাড়ি ভেঙে খাঁই নেই আজ আর।'

'নেই আজ? সাধব না তবে। আমি যদি একা পেরে না উঠি দয়া করে সাহায্য করবেন এই ভরসায় থাকব।'

বোতল ভেঙে খানিকটা মদ ঢেলে নিল সাহেব, খেল না, রেখে দিল এক পাশে সরিয়ে। 'সাপ্লাই কর্পোরেশনের একজন অফিসার আপনি। এখানে এসে মুদ্দোফরাসদের সঙ্গে মিশে তাদের মড়ার ফ্যান খেয়ে বাড়ির ইজ্জৎ বাঁচিয়ে স্ট্রাইক করছেন আপনি। লোকে শুনলে বলবে কি!'

সিগারেটের খোলা টিনটা টেবলের ওপর কাত হয়ে পড়েছিল। একটা সিগারেট খসিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'আমি ওদের ধর্মঘটে যোগ দেওয়াতে এটার খুব জোর বেড়েছে মনে করেন?'

'যারা সব সময়েই নিজেদের গা বাঁচিয়ে চলতে চায় সে সব বিজ্ঞ ভদ্রলোকদের চারদিকে বসিয়ে বেশ ঘোড়া ঘোড়া খেলা দেখাচ্ছেন আপনি। কিন্তু আপনার মাথা আছে—আবেগ আছে—আপনি ঝামেলা যে না বাধাতে পারেন তা নয়।'

'দুর্ঘটনার কোনো লক্ষণ দেখছেন? ফ্যাক্টরির ক্ষতি হবে মনে করেছেন?'

'ক্ষতি! ফ্যাক্টরির জীবনমরণ নির্ভর করছে এই স্ট্রাইকের মীমাংসার ওপর।'

মুখার্জি বললে, 'এ সব গুহ্য তত্ত্ব আপনার জানবার কথা নয়। কিন্তু আপনি তো আমাদের লোক। আপনার কাছে রেখে ঢেকে কি আর লাভ।'

চুরুট জ্বালিয়ে নিয়ে মুখার্জি বললে, 'অনন্তরাম, হামিদ ইয়াসিনও জানে।'

'কি করে?'

'ওরা সব জানে।'

শুনে সুতীর্থ ভরসা পেল খানিকটা, দেশলাইয়ে সিগারেটটা জ্বেলে নিল।

'ঘুষ কবুল করছি, কিন্তু বাগে আনতে পারছি না কাউকে?'

'কাকে চান বাগে আনতে?'

মুখার্জি মদের গেলাসটা মুখের কাছে নিয়ে না খেয়ে নামিয়ে রেখে বললে, 'একে একে সকলকেই। আপনাকেও। আপনাকেই প্রথম। কান টানলে তবে তো মাথাশুদ্ধু চলে আসবে। মারপিট করব না, মন মেজাজ ভেঙে দিতে যাব না। চেষ্টা করলে দুটোই পারি; কিন্তু সেরকমভাবে কতগুলো ন্যাঙন্যাঙে মানুষকে দিয়ে ফ্যাক্টরি চালানোও যা অন্ধকার রাতে একটা বালিশকে ধানজমি ভেবে ক্ষেত্র প্রস্তুত করাও তাই। সে সব করে কে আর সোনার সন্তানদের বাপদাদা হতে পেরেছে—'

এবারে এক চুমুকে গেলাসটা শেষ করে ফেলে মুখার্জি বললে, 'তাছাড়া আধুনিক যুগের মানুষ—মানে মানুষবাদ আমার ভালো লেগেছে। ওরাও মানুষ। তাই তো।'

'কি করবেন তাহলে?'

'ওদের বাইশ দফা দাবি আপনিই বেঁধে ঠিক করে দিয়েছিলেন?'

'ওদের সবায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে খসড়া তৈরি করেছি।'

'ওদের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে শীলমোহর সেঁটে রেখে দিন।'

'তাহলে কি করে স্ট্রাইক ভাঙে?'

'ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলো আমরা মেটাব, কিন্তু অনেক দাবিই অন্যায়।'

'এ আমরা মনে করি না। আমরা ভালো করে বিচার-বিবেচনা করেই দাবিগুলো ঠিক করেছি।'

'কিন্তু বাইশটা দাবি থাকলে যদি এগারোটা মেটে সেই কি যথেষ্ট নয়।'

সুতীর্থ বললে, 'আখখুটে ছেলের বায়না হলে তা হত, আমি বুঝি মুখার্জি; কিন্তু এতো তা নয়, নুন-ভাতের—বাঁচা মরার জিনিস—'

'তাহলে আমাদের কি করতে বলেন সুতীর্থবাবু?'

সুতীর্থ তৎ নগদ কোনো উত্তর দিল না।

মুখার্জি কিছুক্ষণ চুরুট টেনে তার পরে বললে, 'কোন পথে যাব আপনি দয়া করে নির্দেশ দেবেন নাকি? ওদের যারা মা গোঁসাই তারাই আমাদের গুরু গোঁসাই। তাই বলছি একটা পথ বলুন।'

'পথ চান, মেনে নিন দাবিগুলো।'

'কটা?'

'সব কটাই।'

'এই মন নিয়ে আপনি পলিটিকস করছেন সুতীর্থবাবু?'

'আমি পলিটিকসের বাইরে।'

'তাই বুঝি? খিড়কীর ছ্যাঁচা দিয়ে একেবারে সদরে প্রবেশ করেও এই কথা? হেঃ হেঃ হেঃ—' মুখার্জি পাইপ বের করে বললে, 'অগত্যা এটা আপনার না বুঝলে চলবে না যে কিছু খেতে হলে কিছু ছেড়ে দিতে হয়। কমপ্রোমাইজ ছাড়া পলিটিকস ইকনমিকস সামাজিক জীবন কিছুই চলে না।'

'একথা আমি মনে প্রাণে, স্বীকার করি মুখার্জি। কিন্তু ঐ বাইশটে দফাই তো কমপ্রোমাইজ—দাবিগুলোকে পঞ্চাশের কোঠায় ওঠাতে পারতুম।'

পঞ্চাশের কোঠায়—একশোর কোঠায়—মানে ইয়াসিন হামিদ অনন্তরাম বিশ্বম্ভর—সকলের

জন্যেই এক একটা বাগানবাড়ি করে দিতে হবে, সাতটা করে বাঁদী রেখে দিতে হবে, চোদ্দটা করে বেশ ফর্সা রায়বেঁশে দাবনা—ভদ্দরঘরের থেকে যোগাড় করে—'

'আমি উঠলুম।'

'শুনুন আরো কথা আছে।'

চব্বিশ

মুখার্জিসাহেব উঠে দাঁড়িয়ে দুহাত পেছনে বেঁধে গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে করতে বলেন, 'শীত পড়েছে।'

ফিরে এসে গেলাসে ভর্তি করে মদ ঢেলে নিয়ে এক-আধ চুমুক খেয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিল গেলাসটা।

'উঠছিলেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কোথায় যাবেন ভাবছিলেন? স্ট্রাইকের চাঁইরা তো সব চলে গেছে। এখন একা গিয়ে মাঠে শুয়ে থেকে কি লাভ?'

'না শুলে ঘুমোব কি করে?'

'এইখানে ঘুমের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। গয়ানাথ মালোকে আপনি চেনেন?'

শুনে সুতীর্থ কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল।

'গয়ানাথ মালোর নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, শুনেছি বইকি।' সুতীর্থ আর একটা সিগারেট বার করে নিল টিনের থেকে।

'গয়ানাথ মালো খুন হয়ে গেছে।' মুখার্জি জিজ্ঞেস করল।

'হতে পারে। তার খুনের খবর তো আমাকে দিয়ে যায় নি।'

'মানুষটাকে চিনতেন তো আপনি?'

'ঘটনাচক্রে চেনা হয়ে গিয়েছিল।'

'শুনে সুখী হলুম যে, আপনি মিথ্যে কথা বলছেন না। আপনি কি করে গয়ানাথকে চিনলেন? ওরা—মানে ধর্মঘটীরা তো মনে করে যে, সে খুন হয়েছে—আমরাই করেছি তাকে খুন।'

সুতীর্থ চুপ করে সিগারেট টানতে লাগল।

'গয়ানাথের সঙ্গে শেষবারের মত দেখা কার হয়েছিল?'

কোনো কথা বললে না সুতীর্থ, কথা বলার মাছি হয়ে মাকড়সার জালের দিকে উড়ে গেলেই যে সে আটকে পড়বে, কিংবা আটকে পড়লেই যে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথার ওপর—তা কিছু নয়;—সুতীর্থ এমনিই কথা বলবে না এখন আর। কথা যা বলার তা বলাও হয়ে গেছে? কথা বাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই আর।

'বলুন।'

'বলবার কিছু নেই আমার।'

মিঃ মুখার্জি পায়চারী করতে করতে কথা বলছিল; চেয়ারে এসে বসে বললেন, 'কোর্টে; তো জবাব না দিয়ে পারবেন না।'

'আমি বলে দিচ্ছি আপনাকে সুতীর্থবাবু। জলের মত পরিষ্কার সব। আজ থেকে ষোলো দিন আগে আপনি একটু সকাল সকাল অফিস থেকে বেরিয়ে হ্যাট কোট পরে একেবারে এই এলাকায় এসে হাজির হয়েছিলেন।'

সুতীর্থ শুনছিল।

'কেন এসেছিলেন তাও জানি। তখন বেলা চারটে হবে। আপনি এসেছিলেন হামিদ আর সত্যকিঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে। হামিদের কাছ থেকে খবর পেয়েছিলেন যে, আমাদের ফ্যাক্টরিতে স্ট্রাইক চলেছে। আপনার কাছে কিছু টাকার সাহায্যের জন্যে গিয়েছিল হামিদ। সে ভাবতেও পারে নি যে, গায়ে পড়ে এরকমভাবে সাহায্য করতে আসবেন ওদের! আপনি একেবারে দড়িটড়ি ছিঁড়ে বাছুরদের ভেতর ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে স্ট্রাইক করবেন—এতে ওরা নিশপিশ নিশপিশ করছিল।' বলতে বলতে মুখার্জি উঠে দাঁড়াল। ঘরের ভেতর পায়চারী করতে করতে বললে, 'হামিদের সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?'

'অনেক দিনের।'

'কি করে হল—আলাপ?'

'হামিদ কলেজ স্ট্রিটের পুরোনো বইয়ের দোকানদার আলতাফের ছেলে। সে দোকানে প্রায়ই যেতুম আমি বই নিতে। কুড়ি পঁচিশ বছর আগের কথা সব; হামিদ তখন ছোট ছিল।'

'আমাদের ফ্যাক্টবিতে যে ও কাজ করছে তা জানতেন?'

'শুনেছিলুম ভালো মিস্ত্রি হয়েছে। কিন্তু কোথায় কাজ করছে জানা ছিল না আমার। অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। আমি কোনো খোঁজখবর নিতে পারিনি।'

'আপনি যে সাপ্লাই কর্পোরেশনে কাজ করছেন কি করে জানল হামিদ?'

অনেকদিন আগে বাসে দেখা হয়ে গিয়েছিল? তখন বলেছিলুম।'

মুখার্জি টেবিলে ফিরে এসে এক চুমুকে গেলাস শেষ করে ফেলে দেরাজ থেকে একটা চুরুট বের কবে জ্বালিয়ে নিল। ইজিচেয়ারে বসে বললে, 'আপনি যে আমাকে এ সব কথা বলছেন এ কোনো কোর্টেই আপনার প্রামাণ্য বক্তব্য বলে স্বীকৃত হবে না। কোনো সাক্ষীসাবুদ তো—কেউই নেই; আপনি আর আমি শুধু। মনে হয়, অবিশ্যি যে জেরা করছি আমি ব্যারিস্টারের মত, আবহটা হাইকোর্টের মতই। কিন্তু হাতে-কলমে নথিপত্রে সেঁধুচ্ছে না কিছুই। আমার কাছে বলছেন একরকম; যদি বলেন গিয়ে আরেক রকম আর এক জায়গায়, বাধা দেবার কেউ থাকবে না তা হলে—কোনটা সত্য কোনটা মিথ্যে তার কোনো সাধু প্রমাণ থাকবে না।'

সত্য কথা ছাড়া আমি বলি না কিছু।'

'মিথ্যে কথা বলার প্রয়োজন হলে বরং চুপ করে থাকেন। তা আমি জানি। সে যা হোক, এখানে আপনার দ্বিধার কোনো কারণ নেই। আপনার কোনো কথাই আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবার মতলব নেই আমার। আপনি আপনার খাঁটি গল্পটা পরিষ্কার করে বলে গেলেই আমি খালাস—আপনিও। তারপর ঘুমোবেন গিয়ে পাশের ঘরে।'

'পাশের ঘরে কেন?'

'কোথায় যাবেন তবে এত রাতে?'

'বাড়ি গিয়েই ঘুমোব।'

'কোথায় আপনার বাড়ি? বালিগঞ্জে। ওঃ, আমি নিজেই গাড়ি করে পৌঁছিয়ে দিয়ে আসব আপনাকে?'

মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিন ষোলো আগে আপনি বিকেল চারটে নাগাদ—এ পাড়ায় এসেছিলেন?'

'এসেছিলুম।'

'হামিদের সঙ্গে দেখা করতে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কিছু টাকা দেবেন ভেবেছিলেন?'

'ভেবেছিলুম। তাকে শুধু নয়, সমস্ত ধর্মঘটীদের সাহায্য করবার জন্যে—'

'স্ট্রাইকটা যাতে খুব জোর চলে?'

'সেই জন্যেই তো টাকা দিলুম, নিজে এলুম—'

মুখার্জি বললে, 'এ জন্যে কোনো অসৎ উপায় অবলম্বন করতেও ছাড়েন নি আপনি। মল্লিক সাহেবের দেরাজ ভেঙে পাঁচশো টাকা নিয়েছিলেন—'

'ভেঙে নয়, তার দেরাজ খোলাই ছিল—'

'খোলা ছিল? না, চাবি দিয়ে খুলেছিলেন?'

'খোলা ছিল।'

'দেরাজ খুলে সোদপুরে গিয়েছিলেন তিনি আশ্রম দেখতে?'

'তিনি কাছেই বসেছিলেন। আমি তাকে দেখিয়েই বলেছিলুম যে আমার মাইনে—দু দিন বাকি ছিল মাস শেষ হতে—দু দিন আগেই নিচ্ছি। স্যালারি বিল তৈরি হয়েছিল; আমি তাতে সই করে টাকা নিয়েছিলুম—'

'উনি রাজি হলেন?'

'তক্ষুনি, এক কথায়।'

'মানে গররাজি হলেন না।'

'স্যালারি বিলে সই করে উনিই আমাকে টাকা নিতে বললেন।'

'আপনার মাইনে তিনশো টাকা তো ছিল—'

'পাঁচশো টাকা হয়েছে গত মাস থেকে—'

'মল্লিক আমাদের কাছে বলেছেন যে, আপনি টাকা চুরি করেছেন ওর দেরাজ থেকে—'

'চোর তো ও নিজেই।'

'আমিও জোচ্চোর নিশ্চয়ই?'

মুখার্জি সাহেব টেবিলের ওপর থেকে চুরুটটা কুড়িয়ে নিল। নিবে গিয়েছিল, চুরুটের মুখে ছাই জমে গেছে; টোকা দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'চারটে নাগাদ এদিকে এলেন। পরনে অফিসের স্যুট—স্যামুয়েল কিটজের বাড়ির!'

সুতীর্থ একটা মশা তাড়িয়ে বললে, 'একরকম চীনে ধুপ দিয়ে মাঝে মাঝে মশা মেরেছি আমরা। আজকাল নানা রকম স্প্রে বেরিয়েছে। এ ঘরে মশা নেই বললেই হয়, তবে একেবারেই যে নেই তা নয়।'

'সেদিন বিকেলবেলাই দিকবিদিক অন্ধকার হয়েছিল। সমস্ত আকাশ ছিল মেঘে ভরে; অনেকক্ষণ ধরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল—একনাগাড়ে। পথঘাট বেশ পেছল হয়েছিল।'

বেশ তো বলে যাচ্ছে মুখার্জি। কী করে বলছে? কোথায় ছিল সে সেদিন? সুতীর্থের খটকার ঘোরটা কেটে উঠছিল না। অবাক হয়ে সে একবার তাকাল, কিন্তু হতবাক হল না। কিন্তু তবুও বললে না কিছু—বলবার ছিল না কিছু তার; মুখার্জি তো নিজেই সাফ কথা বলে যাচ্ছে।

'নিন, এইবার আসুন।' আর একটা বোতল ভাঙল মুখার্জি।

'আর একদিন এসে খেয়ে যাব—'

মুখার্জি গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললে, 'কথা রইল তা হলে, মনে যেন থাকে।' গেলাসে একটু ছোট্ট চুমুক দিয়ে বললে, 'আপনি সেই মেঘলা অন্ধকারে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির ভেতর পেছল পথ ভেঙে যাচ্ছিলেন হামিদের সঙ্গে দেখা করতে যেতে। ফ্যাক্টরিটা বন্ধ ছিল সেদিন। এখন চলছে দ্বিতীয় দফার স্ট্রাইক দশ দিন ধরে তখন চলছিল প্রথম দফার ধর্মঘট; ধর্মঘটীদের সঙ্গে আমাদের মিটমাটও হয়ে গিয়েছিল প্রায়। স্ট্রাইকাররা কাজেও এসেছিল শেষ পর্যন্ত কাজ চলেও ছিল দু-তিন দিন। কিন্তু আপনার নির্দেশে এই দফার ধর্মঘটটা শুরু হল।'

মুখার্জি গেলাসে আর এক চুমুক দিয়ে বললে, 'কিন্তু সেদিন হামিদের দেখা পান নি আপনি। ফ্যাক্টরি বন্ধ ছিল, হামিদ চলে গেছল মেটেবুরুজে নাকি খিদিরপুরে—দু জায়গায়ই ওর রাঁড় আছে।'

'রাঁড়?'

'ও তো সিফিলিসের রুগী ঃ সিফিলিস হয়, ইনজেকশন নেয়। সেই জন্যেই তো ওদের এত ধর্মঘটের ঘটা। বাজারের স্ত্রীলোকদের ধর্মরক্ষা করছে ওরা, তারা ধর্মপুত্র দিচ্ছে, সিফিলিসের ডাক্তারকে দিয়ে সে সব সারিয়ে নিয়ে ফ্যাক্টরিতে এসে ধর্মঘট; ঘুরছে ধর্মচক্র।'

মুখার্জি চুরুট জ্বালিয়ে নিল।

'মালিকের গলা টিপে ধর্মের নামে এই যে টাকা আদায় করে নেওয়া একেই বলে ধর্মঘট—'

মুখার্জির মুখে কোনো হাসি নেই, বিষও নেই। সংকল্প আঁটা হচ্ছে, আঁটা হচ্ছে, ফেঁসে যাচ্ছে এমনিই একটা ভাব তার মাথার ভেতর খুব কেজো বটে; কিন্তু চোখে মুখে কোনো বাষ্প নেই সে সবের, কোনো জঞ্জাল নেই।

'হামিদের দেখা না পেয়ে আপনি পেছল পথ দিয়ে হনহন করে হেঁটে চলেছিলেন।'

'চলেছিলুম বটে, কাউকে হাতের কাছে পাবার জন্যে।'

'কিন্তু জনমানব কোনোদিকেই কেউ ছিল না। দুচারজন মজুর মিস্ত্রি অবিশ্যি তক্কে তক্কে ছিল আমাকে খুন করবার জন্যে নয় ঠিক—তবে বাগে পেয়ে একটা কিছু করে ফেলবার জন্যে। এদের মধ্যে গয়ানাথ মালোই ছিল সবচেয়ে বেশী কাপ্তেন। দেখতে ভিজে বেড়ালের মত, বেঁটে ঠুঁটো লিকলিকে; হাতে পায়ে মাথায় গিজগিজ করছে ভালুকের মত চুল, মাংস নেই, হাড্ডি নেই, রক্ত নেই, দাঁতের মাড়ি অবধি নেই; চামড়া ফুঁড়ে রাশি রাশি যেন সাদা শনের জঙ্গল বেরিয়েছে। ময়মনসিং-এর ম্যাস্তা ক্ষেতের ভূত।'

'শুনেছি, গয়ানাথ মালো—'

'ম্যালেরিয়ায় ভুগছিল—সাত বছর ধরে ম্যালেরিয়া। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগে মানুষ এ রকম ভোম হয়ে যায়! ওকে দিনের বেলা দেখলেও আমার মন খারাপ হয়ে যেত। কেমন যেন প্যাটপ্যাট করে তাকিয়ে থাকত খিড়কির পুকুরের উদবেড়ালের মত; হ্যাঁচকা চোখে পড়ে গেলেই সেদিনটা বেশ শুভে লাভে কেটে যেত দাদা—আঁদাড় পাঁদাড় তুকতাক দিয়ে জেরবার করার মতলব মশাই চব্বিশটা ঘণ্টা।'

মুখার্জি চুরুটের মুখে ছাইয়ের দিকে তাকিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর চুরুটটা; টেবিলের কিনারে এসে দাঁড়াল।

সুতীর্থ বললে, 'যদি বলি গয়ানাথ আপনাদের ফ্যাক্টরিরই তৈরি জিনিস—আপনাদের কমটাটকা মাল—তা হলে ঠিক বলা হবে না। কিন্তু তবুও ওর চেহারা ছাপিয়েই আপনাদের ফ্যাক্টরির গালামোহর তৈরি করা উচিত; আমি যদি এখানে কাজ করতুম এই মোহরই বুকে লটকে ফিরতুম—'

'আপনাদের ফার্মের কি মোহর?'

'এইটেই। এই সব কারখানা ডক কুলি মজুর নিয়ে যে পৃথিবী সেটার হুণ্ডি হ্যাণ্ডনোট হ্যাণ্ডবিলের ফাঁদলে আঁটবার মত মোহর এ ছাড়া আর নেই।'

'সেই মেঘলা অন্ধকারের ভেতর পেছল পথে বেশ ডাঁটের মাথায় হেঁটে চলেছিলেন আপনি। এ পাড়ার যে কেউ তখন আপনাকে দেখলেই মনে করত মুখার্জি সাহেব চলেছেন। গয়ানাথ মালো আপনার পেছনে ছিল, হিসেব আছে আপনার?'

'বাসিমুখে হেঁটে চলেছিলুম মনে আছে আমার। গয়ানাথ পেছনে ছিল?'

'গয়ানাথ মালো চলছিল আপনাকে খুন করতে—ভেবেছিল মুখার্জি সাহেবকে বানাতে চলেছে। আর একটু হলেই হয়ে গিছল—'

সুতীর্থ বললে, 'কেমন বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলুম সেদিন।'

'কি রকম?'

'মনে হচ্ছিল আমি চলেছি গয়ানাথ পেছনে পেছনে আসছে আমার—আর উয়ের টিবির ওপর দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের আর বোঁটকা গন্ধ ছাড়ছে চৌধুরী ফ্যাক্টরির রামছাগলটা।'

মুখার্জি বসেছিল। চুরুটে টান দেওয়া হয় নি শীগগির। এইবারে টান দিয়ে দিয়ে চুরুটের মুখে আগুনের ফুলকি বার করে বেশ একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে আমেজ লাগিয়ে বললে, 'গয়ানাথ সাঁ করে আপনাকে ছোরা মারতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সামনের একটা খাদের মধ্যে। কিন্তু তাই বলে সে ছোরা তার নিজের পেটের ভেতর সাঁধল কি করে?' মুখার্জি একটা ঝাড়াঝাপটা উত্তর চেয়ে সুতীর্থের দিকে তাকাল।'

'পেটে সেঁধেছিল।'

'পেটে না কলজেয় না হৃৎপিণ্ডে; কোথায় সেঁধেছিল সুতীর্থবাবু? আপনিই তো সবচেয়ে ভালো করে জানেন—'

'রাত হয়ে গেছে মুখার্জি সাহেব—'

'আপনি তো ওর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করেছিলেন। আপনার কোট শার্ট টাই রক্তে ভিজে গিয়েছিল সব।'

সুতীর্থ একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে আন্দাজ কবছিল। গয়ানাথ মালোর খুনেব দায়িত্ব তাব ঘাড়েই চাপাবার যে চেষ্টা করা হচ্ছে সেটা স্পষ্ট; এ চেষ্টা আইনেও টিঁকবে হয়তো। টিঁকুক—যদি টেঁকে। কিন্তু সে তো খুন করেনি।

'গয়ানাথ মালোকে আমি দেখিনি কোন দিন—নামও শুনিনি হেঁটে চলেছি, হঠাৎ দেখলাম একটা লোক দৌড়ে এসে হুমড়ি খেয়ে আমাব সামনে একটা খাদের ভেতর পড়ে গেল। এমনই অদ্ভুত বেকায়দায় পড়েছিল যে, ওর হাতের ছোরাটা ঘ্যাস-ঘ্যাস করে ঢুকে গেল ওর পেটের ভেতর—'

'পেটের ভেতর ঃ বুকে নয়।'

'শরীরের নীচের দিকে ঢুকেছিল। কিন্তু লোকটার খুব বাহাদুরী বলতে হবে। আমাকে এগোতে দেখেই ছোরাটা সে অসাধ্যসাধনে টেনে বের করল।'

'টেনে বের করল? চোখে দেখেছিলেন?'

'তাই তো মনে হল।'

'ছোরাকে পেটে ঢুকতেও দেখেছিলেন আপনি?'

'দেখেছিলুম বলেই তো মনে হচ্ছে।'

'আর কি দেখেছিলেন।' মুখার্জি হাসতে হাসতে বললে।

'আমাকে বিশ্বাস করুন আপনি—আমি যা দেখেছি তাই বলছি।'

'চর্মচক্ষে দেখেছিলেন সুতীর্থবাবু? পেট থেকে ছোরা খসিয়ে আপনাকে মারবার জন্যে রুখে এল বুঝি?' মুখার্জি ঘাড় হেঁট করে চুরুটটা জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেল।

'আমাকে রোখেনি। কি করে রুখবে ও? তবে চেয়েছিল তাই। ও আমাকে মুখার্জি সাহেব কিংবা তার দলের কোনো ত্যাঁদড় মনে করেছিল হয়তো কিন্তু ওর নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছিল। আমি যখন ওকে কোলে তুলে নিলুম—'

'কেন? কোলে নিলেন কেন?'

'কোথাও ডাক্তার হাসপাতাল রেডক্রশ টেলিফোন—যা হোক কাছাকাছি কোথাও নিয়ে যাবার জন্যে। তখন ও ছটফট করে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'আপনি তো এই ফ্যাক্টরির

কেউ নন—' বললুম, 'না তো—আমি এ পাড়ার লোক না', বললে, 'আমার নাম গয়ানাথ মালো, যদি দয়া করে সত্যকিঙ্করের কাছে আমার কথা বলেন, আমার ছেলেপুলে পরিবারকে যদি দয়া করে আগলে থাকতে বলেন। আমাকে বললে, অনেক দয়া আপনার, আপনার হাতেই ছেড়ে দিলাম ওদের সব—'

'ওর পরিবারকে আপনার হাতে দেওয়া হল?'

'সত্যকিঙ্কর কে?'

'জেলে আছে।'

'গয়ানাথ মালো কথা বলতে পারল না আর। কাৎরাতে লাগল। আমি তাকে খুব আলগোছে আগলে চলেছিলুম। সমস্ত জামাকাপড় আমার রক্তে ভিজে চটচট করছিল। একটা জনপ্রাণী দেখলুম না কোথাও।'

'না দেখে ভালোই হয়েছিল।'

'আর এগোতেও পারা গেল না। মানুষটা মরছিল—ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছিল। আমি তাকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখলুম। তখনই সে মরে গেল। আমার কোলে থাকতেই মরেছে বোধ করি।'

'তারপর?'

'এ খবর আমি দেব—কে বিশ্বাস করবে—যে মরেছে সে তো মরেই গেছে—পরে এসে এক সময় তার পরিবারের জন্যে ব্যবস্থা করা যাবে। ভাবতে ভাবতে আমি কলকাতার দিকে ফিরে গেলুম।'

'যদি বলা যায়, গয়ানাথ মালোকে আপনি খুন করেছেন!'

'তা বলা যেতে পারে অবিশ্যি। মোকদ্দমা সাজালে পেরে ওঠা কঠিন আমার পক্ষে।'

'হ্যাঁ, জলজ্যান্ত প্রমাণ সবই আমার কাছে রয়েছে। আপনার কোট নেকটাই জুতো রক্তে কাঁই কাঁই করছে সব। সবই আমাদের কাছে। সবই আপনার নিজের জিনিস। সবই গয়ানাথ মালোর রক্ত। অস্বীকার করবেন আপনি?'

'এখন তো অনেক রাত হয়ে গেল।'

'কিন্তু খুনের দায়ে পড়েছেন যে।'

'গয়ানাথ মালোকে আমি খুন করিনি!' সুতীর্থ বললে, 'সে তো নিজের হাতেই নিজে মরেছে।'

'তা হতে পারে। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আপনাকে?' মুখার্জি ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। পায়চারী করতে করতে বললে, 'বড় জঞ্জালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন, মশাই—'

'কোট টাই সবই আমার। কিন্তু রক্ত যে গয়ানাথ মালোর তার প্রমাণ কি?'

'মুখার্জি হে হে হে হে করে হেসে চুরুট জ্বালাল। 'কার রক্ত তা হলে?'

'যে কোনো জীবিত মানুষের।'

'তা হলেও তো ব্যাপারটা রাহাজানি।'

'আমার নিজের গায়ের রক্ত।'

'নিজের গায়ের?' কিন্তু সেজন্যে এখন যদি নিজেকে কেটে ছিঁড়ে ফেলেন তা হলে ডাক্তারী পরীক্ষায় টিকবে কি? নাকি আগেই শরীরে ছুরি মেরে ঠিক করেছিলেন? তাও টিঁকবে না।'

'উঠি এখন।'

'বসুন। আপনার কোট টাই সবই গয়ানাথ মালোর লাসটার কাছে পড়েছিল। আমরা এসে দেখলুম সব। যাদের দেখবার দরকার একে একে সকলেই দেখেছি। অনেক ফোটো উঠে গেছে—প্লেট আছে সব আমাদের কাছে।'

সুতীর্থ বললে, 'ফোটোগ্রাফের প্লেট কি মানুষকে খুনী বানায়। 'সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তা বানাতে পারে—আইনের চোখে। আমার নিজের চোখে তো আমি খুনী নই।'

'চোখ তো আইনেরই। মানুষ কে? আইনের পয়জার। মানুষের কোনো চোখ নেই।' মুখার্জি চুরুট টানতে টানতে বললে।

চুরুটটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কোনো খুনী বলেছে কোনোদিন যে সে খুন করেছে? আপনি খুন করে কবুল করবেন?'

'খুন করে এতদিন রেহাই পেলুম কি করে আমি, সাহেব।'

'আমরা চাপা দিয়ে রেখেছি এ কেসটা।'

'কি মতলবে?'

'আপনি এসব ছেড়ে চলে যান। মল্লিক সাহেবের ডিপার্টমেন্টাল চেয়ারে গিয়ে বসুন। যা নিয়ে ছিলেন চিরদিন তারই চর্চা করুন গে যান। আমরা আপনাকে বলব না কিছু আর।'

সুতীর্থ কথা ভাবছিল, কিন্তু কথা ভাবতে গিয়ে সিগারেটটা পুড়ে যাচ্ছিল শুধু কোনো মীমাংসা হচ্ছিল না; সুতীর্থ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে বললে, 'কিন্তু গয়ানাথ মালোকে তো আমি খুন করিনি।'

'আমরা তা জানি। আপনি নিজেও বলেছেন, অন্য লোকের কাছ থেকেও শুনেছি আপনি মারেন নি।'

'কে বললে? কেউ তো সেখানে ছিল না।'

'ছিল, আপনি দেখেন নি। বঙ্কুকে চেনেন?'

'বঙ্কু তো ধর্মঘটীদেব সর্দার—।'

মুখারজি হাঁটতে হাঁটতে ট্রাইজারের পকেট থেকে ছোট্ট একটা শিশি বার করে দুটো পিল ঢেলে নিয়ে বললে, 'সর্দারও বটে, আমাদের পোদ্দারও বটে। ও যাতে সর্দার হতে পারে এই কড়ারে ওকে আমাদের দালাল করেছি। বঙ্কু সেদিন গয়ানাথ মালোকে পাহারা দিচ্ছিল। গয়ানাথের কাছ থেকে অনেক আগেই জেনে নিয়েছিল যে, আমাকে খুন করার তক্কে আছে সে। ছোরা ছিল না মালোর। আমরা বঙ্কুকে বললুম তকে তকে থাকতে। আমার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। কিন্তু আপনি এসে মানুষটিকে নিকেশ করে যা সাজিয়ে দিলেন ব্যাপারটা ওরকম করেও বিছানা সাজিয়ে বসে থাকে নতুন বউ।'

মুখার্জি বললে, 'মড়াটার গায়ের ওপর আপনার কোট টাই জুতো পড়ে রইল, আপনি চলে গেলেন কলকাতায়—'

সুতীর্থ দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়ে আগুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'আপনাদের মতে এটা বেকুবি।'

'আমাদের কোনো মতটত নেই।' পিল দুটো সোডা দিয়ে গিলে ফেলল মুখার্জি। খানিকটা সোডায় মদে মিশিয়ে গেলাসটা সরিয়ে রাখল।

'কেমন যেন নিশির ডাকে হেঁটে চলেছিলুম।'

'কেউ কি ওরকমভাবে চলে? চল্লিশ পেরিয়ে গেলেও চলে?'

'সচরাচর চলে না।'

'তবে কেন চলেছিলেন আপনি?'

'গয়ানাথকে কে খুন করেছে?'

'আপনি।'

'সুতীর্থ হেসে বললে, 'গয়ানাথের ভূত যদি এসে আপনাকে বলে যে, আমি তাকে মেরেছি তা হলে বিশ্বাস করবেন আপনি? আপনি তো জানেন আমি গয়ানাথকে মারি নি, কে খুন করেছে তাও জানেন আপনি।'

সুতীর্থ যখন কথা বলছিল মুখার্জি জল খাচ্ছিল। জলের গেলাসটা তেপয়ের ওপর রেখে দিয়ে মুখার্জি বললে, 'কিন্তু আইন বলছে সুতীর্থ গুপ্তের জামা জুতো রক্তে ভিজে ক্বাথ হয়ে গয়ানাথের

লাসের ওপর পড়েছিল। কি বলবেন আইনকে আপনি?'

'কিছু বলবার নেই আমার।'

'আমাদেরও বলবার নেই কিছু। যা বলবার গয়ানাথ এসে বলবে।'

টেবিলে ঠাণ্ডা জল ছিল কুঁজোর ভেতর। খেতে ইচ্ছে করছিল সুতীর্থের মুখার্জিরও তেষ্টা পেয়েছিল; জল। কুঁজোর থেকে গেলাসে জল গড়িয়ে নিয়ে খাচ্ছিল সুতীর্থ।

মুখার্জি বললে, 'ভুল সকলেরই হয়। শয়তানের হয় না অবিশ্যি। কিন্তু জামা জুতো লাস সব ছত্রখান করে ফেলে গেলেন এত ভুল আপনার?'

সুতীর্থ জলের গেলাসটা শেষ করে মেঝের ওপর পায়ের কাছে রেখে দিয়ে বললে, 'অনেক দিন পর্যন্ত আমার নিশিতে পাওয়া রোগ ছিল। এ কয় বছর ভালো ছিলুম। রোগটা আবার ফিরে আসছে মনে হচ্ছে। গয়ানাথ যেদিন মারা যায় তার মৃত্যু অবদি হুঁস ছিল আমার তার মরবার পর কি করেছি না করেছি কি হয়েছে না হয়েছে কিছুই মনে করতে পারছি না। অনেক ট্রাম বাস বদলে—অনেকবার ঠিকানা ভুল করে খুব বেশি রাতে বাড়ি পৌঁছেছিলুম—'

'তা হবে' মুখার্জি বললে, 'সব কিছুরই সব রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। কিন্তু তাই বলে সবগুলোই কি আর আইন আদালতে টেঁকে। শাশুড়ীর কাছে রামকানাইয়ের বায়নাও টেঁকে—রামকানাই তাব জামাই বলে। কিন্তু আদালত কাব শাশুড়ী?'

ভর্তি গেলাসটা পড়েছিল টেবিলে; মদটা খেয়ে নিল মুখার্জি।

'বঙ্কু আপনাদেব স্পাই?'

'এ কথা বলে বেড়াবার কোনো অনুমতি নেই। তবে আপনাকে বলা যেতে পারে আপনি আমাদের হাতের মুঠোর ভেতর এবার। ঘনশ্যামও আমাদের স্পাই।'

'ঘনশ্যামও?' সুতীর্থ একটু চমকে উঠল। 'আর কে কে?'

'আবো আছে কেউ কেউ।'

'হামিদ?'

'না হামিদ নয়।'

সুতীর্থ বল্লে, 'আমি তাহলে উঠি এবার—'

'কলকাতায় যাবেন?'

'হ্যাঁ। অনেক রাত হয়েছে—'

'চলুন, 'গাড়ি ঠিক আছে। আমারও একটু যাবার দরকার আছে ওদিকে।'

'এত রাতে?'

'আমাদের রাত বিরেত নেই।'

মোটরে উঠে সুতীর্থ বললে, 'আমার জামাজুতোর ব্যাপার আপনি একাই জানেন শুধু?'

'বঙ্কু জানে। সে তো কাছেই ছিল।'

'আর কেউ?'

'না।'

'ফোটো তোলা হয়েছে বুঝি ও সবের?'

'তুলে রাখতে হয়। ফোটোর বিশেষ কোনো মানে নেই।'

'বঙ্কু বলে বেড়াবে?'

'তাহলে তার সর্বনাশ হবে বলে দিয়েছি।'

'জামা জুতো ফিরে পাওয়া যেতে পারে?'

'বেশ দামী নতুন জিনিস তো ওগুলো? মুখার্জি একটু ভেবে বল্লে, 'ব্যবহার করবেন?'

'না এমনই।'

'এখন পাবেন না।'

গাড়ি সাঁ সাঁ করে চলছিল। চালাচ্ছিল মুখার্জি নিজেই।

সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি স্ট্রাইকে আবার এসে যোগ দিই কি করবেন?'

'গয়ানাথ মাল্লোর খুনের খবর বেরিয়ে পড়বে—ওরা আপনাকে ধরে জরাসন্ধের মত ছিঁড়ে ফেলবে দুই দাবনার মাঝখান দিয়ে।'

'একটা মিথ্যে কথা রটিয়ে দিয়ে আমাকে ঠেকাবেন আপনারা?'

'আপনাকে ঠেকাবার দরকার যে।'

'বাইশ দফা দাবির কটা মেনে নিতে রাজি আপনারা?'

'না মেনে নিলেও চলে। না হয় এক আধটা মেনে নেব।'

'ভাঙবে স্ট্রাইক তাহলে?'

'হামিদকে হাত করতে পারলে হবে সব।'

'পারবেন করতে?'

'টাকা দিয়ে পারব না, কিন্তু আপনি সরে গেলে পারব।'

সুতীর্থকে তার আস্তানায় নামিয়ে দিয়ে মুখার্জি যেন বিদ্যুতের তারে হাত দিয়ে ধাক্কা মেরে বল্লে, 'ও এই বাড়ি।'

'হ্যাঁ। এই তো।'

'এটা কার বাড়ি?'

'অংশুবাবুর।'

'অংশুবাবু?' মুখার্জির মুখটা কেমন ছুঁচোলো হয়ে উঠল—নাকটা আরো লম্বা আরো ছুঁচলো—শীত রাতের অন্ধকারের ভেতর—সুতীর্থকে বল্লে, 'এখানে মণিকা দেবী বলে কেউ থাকতেন না?'

'অংশুবাবুরই তো স্ত্রী তিনি।'

'অংশুবাবুর স্ত্রী?' মুখার্জি সুতীর্থের আগাপাস্তলা সবদিকে ভালো করে চোখ ছানিয়ে নিয়ে মোটর ঘুরিয়ে চলে গেল।

পঁচিশ

জয়তীর স্তাবক ও প্রেমিকের মধ্যে ক্ষেমেশ চৌধুরী ও আরো দু-একজন এখনো অবিবাহিত ছিল; বাকি সকলেই বিয়ে করে সংসারে তলিয়ে গেছে। এরা কেউই বিরূপাক্ষের বাড়িতে জয়তীর সঙ্গে দেখা করতে যায় না বড় একটা।

বিরূপাক্ষের সঙ্গে জয়তীর বিয়ের ঠিক পরেই—মাঝে মাঝে যেত বটে, ইদানীং দু-এক বছর মোটেই আসা যাওয়া নেই আর। বিরূপাক্ষের টালিগঞ্জের বাড়ি থেকে ক্ষেমেশ চৌধুরীর বাড়ি অনেক দূরে—বেলগাছিয়ায়। বেলগাছিয়ার বাড়িতে ক্ষেমেশ একাই থাকে; ক্ষেমেশের আত্মীয়স্বজন নেই বিশেষ কেউ, যারা আছে কেউ কলকাতায় থাকে না বড় একটা। ক্ষেমেশের বাবা বেঁচে নেই; মা দেশের বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় আসা-যাওয়া ক্রমেই কমিয়ে দিচ্ছেন, এবারের শীতে কলকাতায় আসেননি আর ফাল্গুনের বাতাস ছাড়লে আসতে পারেন হয়তো, কিংবা আসবেন বর্ষাকালে।

নিজের বাড়িতে ক্ষেমেশ আজকাল একাই ছিল। জয়তীর সেসব দিনের পরমাইরা আজ যখন সম্পত্তি ও সন্তানের বহর বাড়িয়ে চলেছে, ক্ষেমেশই তখন আধবুড়ো একা, সাংসারিক চালচলনও ক্রমে পড়ে যাচ্ছে তার সংসারের।

'ভালো করেছ জয়তী তুমি এখানে এসে।'

'চা খাচ্ছ তুমি। আজ সকালটা কিরকম রোদে বাতাসে ঝরঝরে দেখছ।'

'মাঘ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'তোমার এ বাড়িটা তো ঝাড়জঙ্গলের মত বানিয়ে রেখেছ তুমি—'

'হ্যাঁ, খুব চুপচাপ; গাছাগাছালি ঢের, নানারকম পাখি আসে।'

'আমি পাখি খুব ভালবাসি।'

'কিন্তু কটা পাখির নাম বলতে পার? নানারকম নতুন পাখি আসে—নিবেশী পাখি—উপনিবেশী—ঝাঁকে ঝাঁকে—আমি ওদের চিনি—কিন্তু ওদের অনেকেরই কোন দিশি নাম আছে বলে জানি না—কেন দাঁড়িয়ে? বোস—বোস।'

'বসব বইকি। তুমি বুড়ো হয়ে যাচ্ছ—'

'আমি?' ক্ষেমেশ একটু হেসে বললে, 'পরে বলছি। নানারকম লতাপাতা উঁচু উঁচু গাছ দেখা যায়। সে সবের দিশি নাম কি বলতে পারি না আমি। তুমি জান?'

চশমার ভেতর দিয়ে খানিকটা চুম্বকের টানে যেন জয়তীব দিকে তাকাল ক্ষেমেশ।

'একেবারে না জানি তা নয়।'

'আমাকে বলে দাও তো ঐ গাছটার নাম কি—ঐ যে উঁচু হয়ে উঠেছে—যার ডালপালার ফাঁক দিয়ে বাইরের সাদা মেঘ দেখা যাচ্ছে। দেখেছ?'

'অনেক উঁচু উঁচু গাছ তো আছে।'

'আমার আঙুলের সোজাসুজি যেটা—ডালপালা বেশি—পাতা কম—কাজেই জাফরি কাটার কথা এল—মেঘ থাকলে কেন সাদা—না হলে নীল জানালাটা চোখে পড়ে বড় আকাশেব।'

জয়তী খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললে, 'কি জানি, নাম তো আমি বলতে পারব না।'

চোখ ঘুরে গেল জয়তী পরস্বাৎ অন্য একদিকে ক্ষেমেশের, ঠোঁটে তার হাসি লেগে ছিল।

'তোমারও আমার মত দেখছি। আমার মনে হয় আমাদের দেশের অনেকেই নানারকম গাছপাখির দিশি নাম জানে না।'

'এত নাম নেইও হয় তো।'

'আমাদের দেশের লোকেরা কেবল ভেতরের দিকেই তাকিয়ে থাকতে ভালবাসে বলতে চাও তুমি? গাছপালা পাখপাখালির দিকে তাকিয়েই নিজেব ভেতরটাই দেখে—ওদের দেখে না : এই বুঝি?'

'অনেকটা তো তাই।'

'তাই তো। ম্যাক্সমুলার থেকে কীথ অলডক্স হক্সলি, ইশার উড এই নিয়েই তো আটখানা। কিন্তু ভেতরে ডুব দিয়ে রেশমী জাল বানায় তো আমাদের দেশের লোকেরা—বেশমী জাল—ইন্দ্রজাল,—মাকড়সার জাল—বাইরের পৃথিবীর খোঁজখবর বড় একটা রাখে না?'

'তুমি আজ পাখিটাখির খুব ভক্ত হয়ে পড়েছ দেখছি ক্ষেমেশ। এও তো বহিরাশ্রয় নয়—বারফটটা কেমন একটা জিনিস যেন এতো পৃথিবীর কল্যাণে লাগে না, তোমার নিজের মন খুশি—'

'না না, আমি যা বলতে যাচ্ছি তুমি সেটা এড়িয়ে গেলে।'

'বুঝেছি।' জয়তী সোফায় এসে বসল। 'কিন্তু কোন জিনিসের কি নাম না জেনেও জিনিসের আস্বাদ পাওয়া যায়—'

'তা পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নাম জানা থাকলে মন চরিতার্থ হয় বেশি। তোমাকে চা দেওয়া হয়নি তো—'

'আমি চা নিজেই বানিয়ে খাব। তোমার মা কি এখানে?'

'না।'

'দেশের বাড়িতে?'

'কাল চিঠি পেলুম তিনি বর্ধমান থেকে এলাহাবাদে গেছেন বুড়ো সরকারের সঙ্গে প্রয়াগে চান করবার জন্যে। এত শীতে যাওয়া ভাল হয়নি—'

'কে আছেন এখানে?'

'কেউ না।'

'একেবারে একা তুমি?'

'রঞ্জন আছে।'

'সে কে?'

'আমার চাকর।'

'ওঃ আমি ভেবেছিলুম—। খুব মালদার নাম, হরির চেয়ে তুলসী পাতার হরির নামের দাম বেশি। সেই রূপচাঁদ পক্ষীর গান ঃ মনে আছে তোমার? আমি তোমার এখানে কয়েকদিন থাকব ক্ষেমেশ।'

'বেশ থেকে যাও, ওদের মতামত—তোমার বাবুর মত আছে তো?' যেন সবই আছে সবই ঠিক, সবই ভালো—এরকম স্থির সুনিশ্চয় চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে নিল ক্ষেমেশ।

'তুমি কোথা থেকে এসেছ জয়তী?'

'সেইটেই তোমাব প্রথম জিজ্ঞেস কবা উচিত ছিল। আমাকে দেখেও তুমি পাখি আর তিত্তিরাজ গাছ নিয়ে পড়লে—'

ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'তুমি তো বিরূপাক্ষ রায়কে বিয়ে করেছিলে?'

'কেন, বিয়ের আসরে তুমি উপস্থিত ছিলে না?'

'তোমার স্বামী আজকাল কোথায়? কলকাতায় তো? তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে আমি কয়েকবার গিয়েছিলুম। এখনও কি সেইখানেই আছ তোমরা?'

'টালিগঞ্জে উঠে গেছে।'

'তোমার স্বামী কোথায়? তাকে দেখছি না তো'—ক্ষেমেশ বললে, 'কলকাতায় নেই বিরূপাক্ষবাবু?'

'আছে বইকি। তুমি কোনোদিন বাড়ির চৌকাঠ মাড়িয়েছ বিরূপাক্ষ রায়ের, যে সে তোমার এখানে আসবে?'

'বললুমই তোমাকে। বার চারেক তো খুবই গিয়েছি তোমাদের ঢাকুরিয়ার বাড়িতে, কিন্তু বিরূপাক্ষবাবু তো একদিনও আমার এখানে আসেন নি—'

'এলে তুমি খুশিও হতে না ক্ষেমেশ। তুমি ঢাকুরিয়ায় গেছ কয়েকবার কিন্তু বিরূপাক্ষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে ঠিক নয়, তার সঙ্গে একটা কথা বলেছ কোনোদিন?'

'না'। নিশ্চিত সত্যকথনের মত নির্ভাবনায় বললে ক্ষেমেশ। ক্ষেমেশ ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালাটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কিছু মনে কোরো না জয়তী। ঐ লোকটাকে আমি চিনতে চাই না।'

'মনে করবার কিছু নেই আমার।'

'তুমি কার সঙ্গে এলে?'

'একাই।'

'এখন তো ট্রাম স্ট্রাইক চলছে।'

'বাস তো বাদুড় ঝুলিয়ে উড়ে বেড়ায় দিন রাত। সেই টালিগঞ্জ থেকে দশ পাড়া ভেঙে অ্যাদ্দূর আমার মতন কোনো মেয়েমানুষের একা বাসে চলাফেরা করা অন্যায়—'

'অন্যায় কেন হবে?' ক্ষেমেশ চশমাটা খুলতে চেয়ে তবুও না খুলেই জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তবে বাঙালী মেয়েদের পক্ষে পেরে ওঠা কঠিন।'

ক্ষেমেশ তার ডানহাতের মুঠো সম্পূর্ণ খুলে প্রসারিত করে কররেখার কুটিল বিন্যাসের দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে জয়তীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'বাসে এসেছ? ট্রাম স্ট্রাইকটাকে বাঁচিয়ে দিয়ে? তুমি সবই পার। তুমি কি না পার আমাকে বলে দেবে জয়তী?'—সাত আট বছরের আগের সেই চাঁদ নক্ষত্রাবিষ্ট মানুষের স্বর শোনা গেল যেন ক্ষেমেশের গলায়। কিন্তু তবুও গলা আজ কত অভিজ্ঞ ও আত্মস্থ।

'বিরূপাক্ষবাবুর দুটো গাড়ি আছে?' বললে ক্ষেমেশ।

'আছে।'

'আমি একটা ক্যাডিলাক কিনেছিলুম, বিক্রি কবে দিতে হল—'

'কেন?'

'খরচ পোষায় না। আমি তো বাস্তবিক কিছু করছি না—'

'কিছু করছ না? আজকাল তো সমস্ত পৃথিবীই মুখ চেয়ে আছে। দুটো দুটো যুদ্ধে সব ঘাঁটি উড়ে গেল—ভাবুক লোকেরা কাজের লোকেরা কোথায়—এসো, যা ভালো হবে খুব ভাঙবে না আর, সেই সব সৃষ্টি করে যাও,—তাতে সকলেরই তো হাত দিতে হবে। তোমাদের তো বিশেষ কবে। তুমি তো গিফটেড ক্ষেমেশ।'

'আমি?' আড়চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'উৎখাতের জের চলছে এখনও। তৈরিটৈরি কিছু আরম্ভ হয়নি। সে সবের পরিকল্পনাও ধোঁয়াটে। এখনও কে কোথায় ভাগ বসাবে,—কে কার গ্রাস কেড়ে খাবে—এই নিয়েই হাটরা হাটবি।

'তোমার ঘরে এত সব বই ক্ষেমেশ—চোখে ধাঁধা লেগে যায়।'

'বইগুলো কিনেছিলুম,—আমার বাবার কোন লাইব্রেরী ছিল না। তিনি আজীবন জমিদারি ঘেঁটে গোঁসাই মালপো কেত্তনের কুদরতি কবে শেষে টের পেলেন ওটা তাঁর নিজের জমিদারি নয়—'

'কি রকম?'

'সে অনেক আইনের মার প্যাঁচ আছে। আমিও বুঝি না—তুমিও বুঝবে না। সমস্ত সম্পত্তিই ছেড়ে দিতে হল তাঁর সৎভাইয়ের নামে। এক ফাঁকে কলকাতার জায়গাটা কিনে রেখেছিলেন, তাই মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা আছে।'

'দেশের বাড়িও তো আছে?'

'সেটা বাবার সব নয়—সিকিভাগ বাবার—'

'তিনচার বিঘে?'

'বিঘে দশেক হবে; একটা দেড়তলা বালিরঙের—বালিহাঁস রঙের দালান আছে—এ ছাড়া মফঃস্বলে আমাদের আর কোথাও কোনো জায়গা নেই। ছিল ঢের, বাবার তত্ত্বতদারকে বেড়েও ছিল খুব, কিন্তু মোকদ্দমায় টিকল না কিছু।'

'এই নিয়ে আফসোস?'

'আফসোস কোথায়? 'বড় বড় চুলের ভিতর হাত চালিয়ে সমস্ত মাথাকে বসন্ত বাউরার বাসা বানিয়ে স্থির চোখে জয়তীর দিকে একবার তাকিয়ে পালকের মত মাথার চুলগুলো পাট করতে করতে ক্ষেমেশ আকাশ বাতাসের দিকে চোখ ফেরাল আবার; 'তুমি জিনিসটা ঠিক ধরতে পারলে না। 'বাবা যা যা করে গেছেন সেটায় মশকরার কোন মানে হয় না; করতেও হচ্ছে না; ভালোই হল, আমি বেশি স্পষ্ট কিছু করবার সুবিধা পেয়েছি।'

'সেটাই মিথ্যে কথা।'

'কেন?'

'দশ বিঘে জমি দরদালান মফস্বলে—কলকাতায় এত জায়গা জমি ঢালাও ইঁট সিমেন্টের

এই পুরী—এটা সামন্তি আমলের ধ্বংস? সকলের সঙ্গে মিলে যাবার এইটেই যদি সোজা রাস্তা হয় তা হলে অস্পষ্ট অসাধ্য রাস্তাটা কোথায় ক্ষেমেশ? তোমার দেশটা খুব স্নিগ্ধ। স্বপ্ন ভালো; কিন্তু ভিয়েনে চড়লেও সত্যের দরকার বেশী। আমাদের মত লোকের পক্ষে সত্যেরই দরকার সবচেয়ে বেশী।'

'সত্য কি?' জানতে চাইল ক্ষেমেশ। চোখে চশমায় কেমন একটা ভাবনা সন্তাপে খানিকটা আলোড়িত হয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'তুমি কোন পার্টির জয়তী?'

'কিচ্ছুর না।'

'নও? হওয়া তো উচিত ছিল, তেতলার ড্রয়িং রুমে বসে যারা বস্তির লোকেদের জন্যে লড়াই করছে তাদের মতনই তো কথা বলছ তুমি। বিরূপাক্ষবাবুর তিনটে বাড়ি আছে—দুটো গাড়ি—কলকাতার চেম্বার অব কমার্সের তিনি চাঁই। মাথায় খদ্দেরের টুপি—হাতে হুণ্ডী—রাজনীতিক সভাসমিতিতে গেলে মাইকেও যেতে হয় না, মুখের মুচকি হাসি দেখেই সকলে হাসি মুখে মটকা মেরে থাকে ঃ এ হেন লোকের টাকায় খেয়েদেয়ে মুখ মুছে যদি না এ সব কথা বল তা হলে কে বলবে?'

'কি সব কথা?'

'এই যে সব সত্য অসত্যের কথা আমি অসত্যের পথ ধরে চলেছি বলছিলে—'

'নির্জলা সত্যের পথ ধরে চলেছ কি তুমি ক্ষেমেশ? আমি কি চলেছি?'

'সত্য কি? বললে না তো। বলতে পার?'

'সত্য কি তা তুমি জান ক্ষেমেশ।'

'যা জানি তারই দিকে নাক বরাবর চলেছি। এ ছাড়া কোনো উপায় আছে?'

'বাপের টাকায় খাও-দাও পাখি দেখ?'

ক্ষেমেশ তাকাল জয়তীর দিকে। জয়তীর মনে হল ক্ষেমেশ হয়তো বাস্তবিকই নিজের পথ বেছে নিয়েছে। যখন নিজের সবচেয়ে ভালো সাধনার ফলগুলোকে উপড়ে ফেলে দিচ্ছে মানুষের নিজেরই বিজ্ঞান বা সভ্যতা, তখন দুচারটে লোক যদি এই আত্মমন্থন ও আত্মলোপাটের হইচই ও আহাম্মকির থেকে খানিকটা দূরে সরে তাসের বাড়ির পৃথিবীতে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে তা হলে সত্য কোন দিকে আছে—কিই বা সত্য—আমাদের আজকের জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে—সেটা নির্ণয় করা কঠিন—বলা কঠিন। কিন্তু তবুও এ উদঘাতী সভ্যতাকে নিজের ভুল বুঝিয়ে দিয়ে ঠিক পথে চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা উচিত। ক্ষেমেশ হয়তো মনে করে ভুলটা স্বাভাবিক; শোধরাবার কোনো প্রশ্ন ওঠে না; সেই বিরাট টিকটিকিরা যেমন করে মরে গেল, নিজেব মৃত্যুবীজের স্বতসিদ্ধতায় মানুষও মরতে চলেছে—খুব শীগগির মরতে চলেছে হয়তো। সে যা বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছেও সত্য নয়, হয়তো—কিন্তু ক্ষেমেশের মন খুবই শিক্ষিত স্বাধীন মন যা সত্যিই বিশ্বাস করে সেইটেই তার কাছে সত্য হয়তো?

জয়তীর চোখে মুখে সকালবেলার রোদের ধবক এসে পড়েছিল। কেমন একটা আলোর সাগরে বারুণীর শাশ্বতী রূপসীর মত দেখাচ্ছিল তাকে। শাড়ির নীচের দিকটায় যে অংশে ছায়া পড়েছে—নীল সাগর শঙ্খ বুদবুদ ফেনা গন্ধ আলো গতি সচ্ছলতার কেমন ভেজা, ঠাণ্ডা, নিরবচ্ছিন্ন অনিমেশ-দেশ সৃষ্টি করেছে—উপলব্ধি করছিল ক্ষেমেশ।

'পাঁচমিশেলি নিয়ে আমাদের জীবন', ক্ষেমেশ বললে, 'কেউ কি ছাঁকা পলিটিকস করছে, কিংবা নিছক্ সাহিত্য? যে যার নিজের দলের মোটামুটি নিয়মগুলোর কাছেও কি সত্য ও সার্থক? তা নয়—সবই সুবিধের ব্যাপার—তাড়াহুড়োর জোড়া তাড়ার জিনিস। কোথাও কারু হাতে সময় নেই—সব দিকেই দিনরাত পড়ি কি মরি হুজ্জোতে—তাড়াতাড়ি একটা কিছু করে নিতে হবে—এই হল আজকের যুগের ঘরপোড়া গোরুদের কথা। এখনও চারদিকে তাদের সিঁদুরে মেঘ। মেঘটা ঘনাতেও পারে।'

'তুমিও ঘরপোড়া ক্ষেমেশ এত বড় ঘরবাড়ি নিয়ে?'

'ঘরবাড়ি এক্ষুনি পড়ে যাবে। যেটুকু সময় আছে আমি পাখি দেখেই দিন কাটাচ্ছি।'

'এর পর তেল মেখে বাঁশের লাঠি পাকাবে হয়তো সমস্তটা শীতকাল।' জয়তী একটু হেসে বললে।

'বাঁশের কাজ করলে আড়বাঁশী তৈরি করব, কিংবা বেত আব বাঁশ দিয়ে চেয়াব টেবিল, চায়ের টেবিল, আরামচেযার বানাব। তুমি তালপাতার ব্যাগ তৈরি করতে পার?'

'তুমি পার?'

'দেখছিলুম সেদিন—'

'একা মানুষ; এত জিনিস তোমাব। কিন্তু কি সদ্ব্যবহার করছ এদের? তালপাতার ব্যাগ নয়--মানুষ তৈরি হবে না?'

'মানুষ ঃ মানে যারা মারণযন্ত্র, শেল তৈরি করতে পাবে? তার চেয়ে যারা তালপাতাব ব্যাগ তৈরি করতে পারে তারা বেশী মানুষ। যারা একশোবার করে ইউবোপ আমেরিকায় এশিয়ায় কনফারেন্স পাতায় আর ভাঙে, পরস্পরকে বজ্জাৎ বলে গালাগাল দেয়—একেবারে উৎখাত করে ফেলবার ফিকিরে থাকে, তারাই তো মানুষ এখনকার পৃথিবীতে;—আর তাদের তাঁবেদাররা—ব্যাঙ্কে অফিসে—ডিপার্টমেন্টাল চেযাবে বসে পৃথিবীর সর্বত্র। এব চেয়ে বেশী মানুষ মনে করি আমি যাবা নদীর পারে হোগলার ক্ষেতের পাশে বসে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কি করে বাবুই পাখিগুলো বাসা তৈবি করে, তেমনি শান্তিতে তেমনি নীড় মানুষের জন্যেও তৈরি কববার প্রেবণা পায় তারা, কিন্তু তারপরেই উপলব্ধি করে মানুষ তো মারীবীজ হাঁকিয়ে চলেছে পৃথিবীতে--বাবুইদের সঙ্গে মানুষের তো কোনো মিল নেই—কি করে স্থিরতা পাবে মানুষ পৃথিবীতে--কি করে শান্তি পাবে?'

ক্ষেমেশ বললে, 'এত জিনিস আমার? তা বলতে পার। এই বাড়িটাকে তুমি প্রাসাদ বলেছ ঃ তা হতে পারে। কিন্তু বাড়িটা তো ধ্বংসে পড়ছে। খুব বেশী দিন অবিশ্যি বাঁচব না আমি, মরবার আগে বাড়িটা ভেঙেচুরে নষ্ট হয়ে যাবে মনে হয় না; প্রকৃতির দোহাত্তা মার বাংলাদেশে হয় না; সমাজে রাষ্ট্রে হবে কিনা সন্দেহ? আমার নিজের মনেও ঘরবাড়ি ফাঁসাবার তেমন কিছু ডাকসাইটে নেশা আছে বলে টের পাচ্ছি না। তা হলেও একটা বড়—কিন্তু বড় ভাঙা বাড়িতে আছি—এ বাড়ির কোনো অংশও কাউকে ভাড়া দিচ্ছি না আমি।' কেন দিচ্ছি না? কেন? কেন দু বিঘে জমি নিযে কলকাতায় আছি? আমিও অবাক হয়ে ভাবি কেন করছি—এ সব? অনেকে দশ বিঘে একশো বিঘে জমি নিয়ে আছে বলে? দশ জায়গায় দশখানা বাড়ি ফেঁদে রয়েছে বলে? পৃথিবীর সবচেয়ে বেশী সভ্য লোকেরা সবচেয়ে বেশী সুখে লালসায় মত্ত বলে? চারদিকে সবাই সকলকে উচ্ছন্ন করছে বলে? হ্যাঁ হ্যাঁ তাই; তাই। আমিও ওসব মানুষের পাল্টা ঘরেব মানুযের মত মৃত্যু হিংসা কামে নয়—খানিকটা পরিসর ও শান্তি খুঁজছি প্রকৃতির ভেতর; এটা কি অন্যায়? খুব বেশী আত্মপরতার প্রমাণ দিচ্ছি আমি! আমারও মনে মাঝে মাঝে খটকা বেধেছে জয়তী। এতদিন নিজের ধর্ম বলে বিশ্বাস করেছি যেটাকে—সেই পাখি আকাশ ঘাসের ওপব শুয়ে থাকাকে সত্যিই অবিশ্বাস করব যখন তখন সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাব আমি।'

ক্ষেমেশের এ সব দূর, অব্যয় কথা জয়তীর কানে ঢুকল না হয়তো। জয়তীর মনের ধাঁচ অন্য রকম; তাতে নিবিড়তা আছে হয়তো কিন্তু পরিসর নেই, নিবিড়তাও বেশী নেই, সেটা নলকূপের; অর্জুনের বাতা বাণমুখের নয় যা ভোগবতীকে এনেছিল; কপিল সগরের মত নয় যাদের বড় কোলাহলের ভেতর থেকে গভীরতার আনন্দ নিয়ে সাগরের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু তবুও খুব খাঁটি কথা বললে জয়তী।

'কলকাতায় এমন জাযগা আছে', জয়ন্তী বললে, 'যেখানে একটা কলে একশো পরিবারের জল সংস্থান করতে হয়; তুমি যে ঘরে বসে একা একা চা খেয়ে লম্বা ছাড়ছ এরকম কামরা পেলে

পাঁচিশটে পরিবার হাটে হাঁড়ি ভেঙে হেঁসেলে হাঁসফাঁস হয়ে মড়কের ইঁদুরের মত সাবাড় হতে হতে ভাগাড়ের শকুনের মত ঝাপটা মেরে নেচে ওঠে আবার। এ তো মৃত্যু—কিন্তু তবুও জীবনও বটে। জীবন ছাড়া এ আর কী? এ জীবনকে জায়গা দিতে হবে।'

'তা দিতে হবে; কিন্তু এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?'

'বাংলা আমাব ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাইনে।'

'কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি?'

'যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।'

'তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে?'

'তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গেই মেশনি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম হয়ে দাঁড়াচ্ছে টের পাও নি তুমি। পরে হবে সে কথা। আমি তোমার বাবার জমিদারির কথা বলছিলুম—'

'মড়াটাকে তো ঘেঁটেছ ঢের—আর কি হবে?'

'কোথায় আর মরল। তেলও কি মরেছে খুব? অনেক আগেই নিকেশ হবে কথা ছিল—তোমার আমার শুধু নয়—সকলের সব জমিদারি—'

'নিকেশ হোক। আমিও তো তাই চাচ্ছিলুম। জমিদারেরা দুঃখ কবছে না কি করছে জানিনে। কিন্তু আমি জমিদার নই, দুঃখ নেই আমার।'

'সুখ নেই। তোমাকে দেখে মনে হয়, ক্ষেমেশ, তুমি যদি লুক্রেশিয়সের মত কবিতা লিখতে পারতে, কিংবা রিলকের মত, আমাদের দেশের কৃষ্ণ মজুমদারের মত, কিন্তু কিছুই লিখতে পার না। যদি পারতে তা হলে এই বিষয়সম্পত্তি নিয়ে তোমাকে গাল দিতে যেতুম না আমি। ও সব জিনিস তোমার কাছেও অপ্রাসঙ্গিক হয়ে উঠত তখন, মনে অন্য বোধ আসত, বিষাদ বেড়ে যেত হয়তো, কিন্তু আরেক মূর্তি নিত। মরা জমিদারির জন্যে দুঃখ করতে না তুমি। এমনি মানুষের যা দুঃখ সেখানে তোমার দর্শনের আলো পড়ত—হয়তো তোমার কবিতার—সহজ ভাষায়, তবুও তোমার নিজের ভাষায়; সেই জন্যেই তোমাব মৃত্যু হয় না। লোকেবা পাত না নেড়ে পড়ত ওষধির মত শান্তি দিতে তুমি, শান্তি পেতে।'

দু কাপ বেশ ঘন চা দিয়ে গেল রঞ্জন।

'তোমার চাকর আমাকে ঠকিয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কিছু বিস্কুট দাও রঞ্জন। সন্দেশ নিয়ে এসো—এক হাঁড়ি এনো—বড় হাঁড়ি। রকমারি আনবে; ওসব নাম তো তোমার মুখস্থ। কি একটা আছে রঞ্জন যা বেলগাছিওয়ালা খাওয়ায় বালিগঞ্জিনীর প্রাণ ঠাণ্ডা হয়, নাকি টালিগঞ্জওয়ালী জয়তী তুমি? মফস্বলের জায়গা জমি বাড়ি মা রামকৃষ্ণ মিশনকে দিয়ে দিয়েছেন। তোমাকে বলেছি কলকাতার এ বাড়ির কোনো অংশই কাউকে ভাড়া দিই না আমি।'

'কেন?'

'দিলে ভাড়া দেব না, এমনিই ছেড়ে দেব।'

'কাকে?'

'যাদের খুব দরকারী বেশী।'

'এমন বহু লোক তো আছে কলকাতায়—'

'আছে। মানুষকে ভালোও বাসি আমি। কিন্তু ভেবে দেখছি কয়েকটি পরিবার এনে আমার এখানে বসালে আমাকে এ বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

'কেন?'

'যে রকম জীবন আমি চালাচ্ছি সেটা সম্ভব হবে না আর।'

'তুমি কি একেবারেই একা থাকতে চাও?'

'হ্যাঁ।'

'একেবারেই একা?' জয়তী আবার জিজ্ঞেস করল—ক্ষেমেশেরই শুধু নয়—পৃথিবীর সমস্ত নিঃসঙ্গ লোকদেরই প্রাণের কাছে এসে পড়ে কেমন দায়ভাগিনীর মত যেন।

'কে ঃ আমি?' ক্ষেমেশ একটা আকাশগামী হাঁসের মত বিদ্যুতের ক্ষিপ্রতায় পাশের মরালীকে দেখে নিল যেন একবার, তার পরে ডানার বেগে উড়ে যেতে লাগল আবার ঃ নীলিমা-কণিকা রাশির ভেতর দিয়ে সোঁ সোঁ করে চলেছিল যেন তারা দুজনে।

জয়তী বললে, 'আছে মানুষ আছে খুব শ্রদ্ধা করবার ভালোবাসার মত। তবে এও একরকম মন্দ করনি তুমি, পাখি দেখছ, আকাশ নক্ষত্র দেখছ। কিন্তু কোনো সময়ই কি কাছে গিয়ে বসবার মত একজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয় না?'

'এই তো হয়েছে; আজ হল, অনেকদিন পরে।' ক্ষেমেশ বললে। কথাটাকে একবা. শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে তার পরিণতি অনুসরণ করতে গেল না ক্ষেমেশ, জয়তীর মুখের দিকেও তাকাতে গেল না; দূরের ঝাউগাছে একেবারে উঁচু ডালপালায় একটা কাককেও কেমন সুন্দর দেখাচ্ছিল—অবাক হয়ে দেখছিল।

'শুনেছি তুমি তোমার বাবার বাড়িতেই বেশী থাকতে? বিয়ের পরেও?'

'হ্যাঁ, এবারেও যেতুম বাবার ওখানে, কিন্তু চলে এলুম তো বেলগাছিয়ায়।'

'বিয়ে তো তোমার বছর তিনেক হল হয়েছে?'

'তা তুমি গুণে ঠিক কর ক্ষেমেশ।'

'কতদিন ঘর করলে বিরূপাক্ষের সঙ্গে?'

'মাস পাঁচ-ছয়।'

'মোটে? কেন?' ক্ষেমেশ বললে, 'সেদিন গান্ধী কলকাতায় এসেছিলেন। আমাকে ঘাড় ধরে নিয়ে গেল রঞ্জন। গেছলুম। দর্শনের জন্যে যে ভিড় জমেছিল তার ভেতর তোমাকে দেখলুম মনে হল, গিয়েছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ গিয়েছিলুম, তুমি কোথায় ছিলে? দেখিনি তো তোমাকে। ওমা, আমাকে দেখেছিলে। আমাকে দেখলে তো কাছে এলে না কেন? কোথায় বসেছিলে তুমি?'

'গান্ধীকে দেখতে যেতুম না, রঞ্জন আমাকে টেনে নিলে। না হলে সেদিন আমার ডায়মণ্ডহারবারের দিকে যাবাব কথা ছিল। শুনেছিলুম নতুন পাখি এসেছে ওদিককার জঙ্গলে।'

'পাখি দেখা হল না তবে?'

'না। গান্ধীকে দেখাবেই রঞ্জন। আমি তো দেখেছি একবার এর আগে। আবার কেন? বলছিলুম রঞ্জনকে। কিন্তু যেতে হল।'

'একবার দেখেছ মাত্র?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।'

'কোথায়?'

ক্ষেমেশ মনে করতে চেষ্টা করে বললে, 'অনেক জায়গায় দেখেছি, কোথায় ঠিক মনে পড়ছে না।'

'ছবিতে দেখেছ ক্ষেমেশ।'

'তা হবে। সেদিন গেলে সোদপুরে; আলো পেলে জয়তী?'

'আমি তো তোমার মতন বলছি না যে, কোথাও মানুষ নেই। মানুষ আছে, অনেক আছে।'

'সোদপুরে আলো পেলে?'

'মাঝে মাঝে আলোর উৎসের কাছে যেতে হয়। আমাদের নিজেদের বিচার হয়তো অন্য রকম, কাজ আলাদা, প্রকৃতি আলাদা। কিন্তু তবুও যে সব মানুষ এরকম অশান্ত পৃথিবীতে এতদূর শান্তি, সত্য পেয়েছে তাদের কাছে গেলে ভালো হয়। হয়তো কিছু পাওয়া যায় কিংবা পাওয়া যায়

না। কিন্তু গান্ধী নিজে উপকার পেয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর পথে চলে অনেকে;—বুঝতে পেরে আশা আসে মনে। সেটা লাভ। চারদিককার পৃথিবী তো বলছে আশা নেই। সেটা ক্ষতি।'

'বিরূপাক্ষকে বিয়ে করেছিলে বলে সোদপুরে যাওয়ার দরকার হয়েছিল তোমার।'

ঝাউগাছের অনেক উঁচুর ঝিরঝিরানির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বলল, 'কোনো পাখি নেই এখানে এখন আর।'

'তার মানে?'

'তা না হলে তুমি যেতে না যে তা নয়, কিন্তু এতটা তাড়া থাকত না। বড্ড খারাপ হয়ে যাচ্ছিল সব, এত বেশী ভালো লাগল তাই।'

'যেন মহাত্মার নিজের কোনো আকর্ষণ নেই?'

'তা আছে। প্রভাব আছে। সব আছে। সোরহাবর্দ্দিও তা বোধ করছেন। আমি যা বলেছি তা অস্পষ্ট নয়।'

ছাব্বিশ

জয়তী ক্ষেমেশের বাড়িতেই কিছুদিন থাকবে ঠিক করেছে। একদিন তো কাটল। পরদিন সকালবেলা ক্ষেমেশের পড়ার ঘরে, (এইটেই বসাব ঘবও ক্ষেমেশের) বসে চা খাচ্ছিল জয়তী আর ক্ষেমেশ।

'বাড়ি ভাড়া দাও না, তোমাব কোনো আয় নেই তা হলে?'

'না।'

'চলে কি করে?'

'ব্যাঙ্কে কিছু টাকা আছে এখনও।'

চাকর বিস্কুট ও সন্দেশের হাঁড়ি ও দুটো বড় দুটো ছোট চীনামাটির রেকাবি একটা তেপয়ের ওপর সাজিয়ে জয়তীর কাছে রেখে গেল। চায়ে টাগরা গলা টনসিল পুড়িয়ে (ভালো লাগল জয়তীর, ঠাণ্ডায় কেমন ব্যথা করছিল গলার ভেতরটা) একটা দুটো চুমুক দিয়ে জয়তী বললে, 'ব্যাঙ্কে কত টাকা?'

'হাজাব পঞ্চাশেক হবে।'

'সুদ খাচ্ছ?'

'আসলে হাত দিতে হয়।'

'প্রতি মাসেই।'

'হ্যাঁ। বিরূপাক্ষের তো পঁচিশ লাখ আছে।'

'কি জানি।' অনেক দূরে যে নির্ঝর ঝরে পড়ছে সে তো রক্তের, আমি জলের খোঁজে যাচ্ছি ঃ মনে হল যেন জয়তীর কণ্ঠ শুনে।

'ক্ষেমেশ, তোমার নিজের রোজগারের কোনো পথ নেই?'

'না, কোনো ব্যবসা-ট্যাবসা করছি না। চাকরি করব না।'

'ইচ্ছে ক'রে কি মানুষ চাকরি করে? তোমার চেয়েও অনেক বড় প্রতিভাবান মানুষের চাকরি করে খেতে হচ্ছে। অবোধ অবুঝের গোলামী করে জীবন পণ্ড হয়ে যাচ্ছে তাদের। ইশাকেও ভেড়ার পাল চরাতে হয়েছিল। কি করবে—এ ছাড়া উপায় নেই তো। খাওয়া-পরার স্বাধীনতা চাই তো মানুষের।'

'স্বাধীনতা আছে আমার', ক্ষেমেশ জয়তীর মনকে ঠেক ধার দিয়ে বললে, 'ব্যাঙ্কের টাকা আছে। দায় পড়লে আমারও চাকরি করতে হত। সে রকম দায়ে এখনও পড়িনি আমি। পড়তে হবে একদিন; তখন ঠিক করে নেব পথ। চা খাচ্ছ না? সন্দেশ রেকাবিতে সাজিয়ে দাও।'

'তুমি খাবে?'

'খাব বইকি! তুমি কি একাই খাবে সব?'

'কটা এনেছে?'

'গোটা পঞ্চাশেক হবে। একা খেতে পাববে?'

'এত সন্দেশ কি হবে?'

'ও বেলা খাব, রঞ্জনকে দেয়া যাবে, কালও খেতে পারা যাবে, এক-আধ দিনে সন্দেশ নষ্ট হবে না।'

রেকাবিতে সন্দেশ সাজাতে সাজাতে জয়তী মনে মনে ভাবছিল ঃ কেমন একটা ভাঙা সোঁদা সোঁদা জমিদারি মেজাজ এখানকার সবদিকেই। বড় হাঁড়ি—অঢেল সন্দেশ—নিঃসাড় ঘরদোর পুরী—মুনাফা নেই, ব্যাঙ্কের টাকা আছে, তবুও নেই; ব্যবসা নেই, চাকরীব মত গোলামী কে করে; পাখি উড়ছে; বাড়িটা এত বেশি বন-জঙ্গল আগাছায় ভরে আছে যে, সে সবের ভেতর দিয়ে একটা গোরু বা বাছুর চলে গেলে বিদ্‌ঘুটে সবজির গন্ধ ছড়ায় চারদিকে, বিশৃঙ্খলভাবে জন্মেছে সব গাছপালা, এবড়ো-খেবড়ো ফসল, অদ্ভুত সব আগাছার চাঁদমারি; সবুজ বটে, কিন্তু তবুও এগুলো সত্যিই কি সেই সবুজ? প্রকৃতি বটে, কিন্তু তবুও কি প্রকৃতি? ক-খ লাহার বা গ-ঘ পালচৌধুরীর সাজানো বাগানবাড়ির প্রকৃতির ভক্ত নয় অবিশ্যি জয়ন্তী, কিংবা শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনের, কিন্তু তবুও ক্ষেমেশের বাড়িতে কোনো সুযোগই দেওয়া হয়নি যেন প্রকৃতিকে; অরণ্যের মাহাত্ম্য নেই এখানে, বাগানবাড়ির কাঁচিছাঁটা শৌখিনতা নেই। প্রকৃতি নেই। আছে? ভালো করে তাকাল আবার অনেক গাছ, অনেক লতা, আগাছার বিস্তর সমৃদ্ধির ভয়াবহতাব শোকাবহতাব দিকে; কেমন যেন মনটা লাগল জয়তীর। জীবনের গল্প ফুরিয়ে গেলে এ-সব ঝোপ-জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে এদেরই ভেতর মিশে যেতে হয় একদিন; সময় কাজ করতে থাকে তারপর, নিওলিথ মানুষের কথা আর মনে থাকে না কারু।...ক্ষেমেশ তো আট বছর আগেও অক্‌স্‌ফোর্ডও যাবে ঠিক করেছিল, ডিগ্রী আনবার জন্য। গ্র্যাজুয়েট হয়ে ফিরে এসে একটা কলেজে প্রফেসারি পেত হয়তো। সেও তো এই জিনিসেরই রকমফের; কিংবা ব্যারিস্টারি পাশ করে এলে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার টাকার হয়তো বড় জোর পাঁচ লাখে দাঁড়াত। কী হত তাতে। জীবনে একটু অদ্ভুত বলাধান হত হয়তো; মন আকাশের বিদ্যুতের মত নয়— এ-সি ডি সি ক্যাবেন্টেব মত চমকে হুমকি দিয়ে বসত, বেশি দৌড়-ঝাঁপ করলে করিতকর্মা পুরুষ হয়তো ওবা বলত ক্ষেমেশকে; কেউ কেউ বলত লোচ্চা বদমায়েশ—ক্ষেমেশের ব্যক্তিক জীবনের এক ঝুড়ি কেলেঙ্কারি রটিয়ে বেড়াত ওরা। কী হত এই সবে।

পরের দিনেব সকালবেলা এল। ক্ষেমেশের বসবার ঘরেই বসেছিল দুজনে। বিশেষ কোনো ব্যক্তির হতচ্ছাড়া নষ্টচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নয়—এই অনেক দিনকার উইয়ে কাটা ঘুণে খাওয়া ভালো খারাপ সুন্দর কাতর পৃথিবীটার কথা মনে কবে নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এসেছে। ক্ষেমেশ যাতে টের না পায় এমনি করে হাল্কা নিঃশ্বাস ছাড়তে চেষ্টা কবল জয়তী; কিছু পারল, কিছু পারল না।

'তোমাকে কেমন গম্ভীর দেখছি।'

'আমি কথা ভাবছিলাম ক্ষেমেশ; এক-আধটা কথা এসে পড়ল—দেখছি—হাসিমুখে ভাবতে পারি না।'

'কথা ভেবে কোনো কিনাবা পাবে না দেখ কেমন চমৎকার রূপশালি ধান-দূর্বোর পাড়াগাঁর মত রোদ চারদিকে; আকাশে কত যে সাদা মেঘের পাল চিকচিক করছে। সূয্যির হাতে থোকা থোকা বকফুলের পাপড়ির মত ছিঁড়ে পড়ছে লোটন পায়রাগুলো। ভোগবতী দেখনি কোনোদিন, দেখবে না। কিন্তু আকাশ-গঙ্গা দেখ। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ জয়তী। কবেকার কথা মনে পড়িয়ে দেয় এজন্মেব ওজন্মের কত দেশের দূর দেশের।

'কই, তুমি তো অক্‌স্‌ফোর্ডে গেলে না?'

'না, সে আর যাওয়া হল না। বাবা মোকদ্দমায় আটকে গেলেন—'

'চাকরী না কর ব্যবসায় আপত্তি কি?'

'টাকা নেই।'

'পঞ্চাশ হাজার তো রয়েছে।'

'আজকালকার বাজারে ওতো চণ্ডুর পাশে তামাকের ছিলিম, ওতে কোনো কাজ হয় না। ব্যবসার কথা পাড়লে যখন, আমি একটা কথা তোমাকে বলি—'

ক্ষেমেশের মস্ত বড় সোফাটার এক কিনারে গিয়ে বসল জয়তী, দু' রেকাবি সন্দেশ সাজিয়ে তে-পয়টায় রাখল দু'জনের মাঝখানে। সন্দেশ নিয়ে সাধতে গেল না সে ক্ষেমেশকে। নিজে তুলে নিল গোটা দুই। চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, আমি বুঝেছি কি করতে হবে আমাকে। বিরূপাক্ষের লাখ পাঁচেক টাকা বার করে ক্যাপিটালের জোগাড় করে দিতে হবে তো?'

ক্ষেমেশ এক সঙ্গে দুটো সন্দেশ মুখে পুরে একটা উড়ন্ত পাখির পানে—পাখি ফুরিয়ে গেলে—নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। 'তোমরা তো দু'তিন বছর ধরে এই জিনিসটাই চাচ্ছ।'

'আমরা কারা?'

'আমার বিয়ের আগে আমাদের বাড়ি যারা আনাগোনা করত, তারা আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে মাঝে-মাঝে, কিন্তু তাদের সমস্ত কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত বিরূপাক্ষের তিন-চার-পাঁচ লাখে গিয়ে দাঁড়ায়, পঁচিশ লাখের ভেতর পাঁচ লাখের দাবি তাদের; বিরূপাক্ষের ভাণ্ডাবী আমি; আমার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খাজাঞ্চির সঙ্গে মাছির যা। মাছি মধু খায়? না খাজাঞ্চিকে?'

ক্ষেমেশ একটা সন্দেশ মুখে গলিয়ে দিল (আগের দুটো হয়ে গেছে তার), একটু সময় কাটিয়ে আর একটা; বললে, 'খাজাঞ্চিকে খায় মাছি।'

জয়তী মুখ বেঁকিয়ে হেসে বললে, 'কেন?'

'তবে কি খাজাঞ্চিকে ছেড়ে মধু খাবে মাছি? মাছি কখনো টাকা ছেড়ে মধু খায় শুনেছ কি?'

ঘরের পাশেই কি বেগুনের ছড়ানো পাতার ওপর একটা ছোট্ট পাখি এসে বসেছিল; এত হাল্কা যে পাতাটা নুয়ে পড়ছিল না, কাঁপছিল না। পাখিটার দিকে তাকাচ্ছিল ক্ষেমেশ; কি নাম পাখিটার? খুব গাঢ় সবুজ, লাটিমের মত ছোট; শীতের সকালে খুব চমৎকার আনকোরা সবুজ মখমলের জামা পরে এসেছে মনে হয়। কি নাম? উড়ে গেল পাখিটা।

ক্ষেমেশ বলল, 'তুমি বিরূপাক্ষের খাজাঞ্চি হয়ে দাঁড়িয়েছিলে বুঝি? ওরা সেইজন্যেই তোমার কাছে যেত?' যেত, একেবারে কেটে পড়েনি তো; সম্পর্ক একটা রেখেছে শেষদিন পর্যন্ত তোমার সঙ্গে।'

'তা রেখেছে ক্ষেমেশ। রঞ্জনকে আর এক কাপ চা করে দিতে বলবে?'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে?' ক্ষেমেশ এক টি-পট চায়ের হুকুম দিল।

'এক টি-পট বলেছি আমি? চাকর বাকরের সামনে গেঁজেল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি।'

'রঞ্জন গেঁজেলদের খুব শ্রদ্ধা করে।'

'খুব বড় টি-পট তো তোমার। ওরকম ঢাউস টি-পটের গেঁজেল আমি নই।'

'তুমি খাবে, আমি খাব, বাকি থাকলে রঞ্জন খাবে। চা-খাও, চা-খাও। শীতের সকালে চা।'

চা এল। জয়তী ক্ষেমেশের কাপে ভরে দিল, নিজের পেয়ালাও ভরে নিল।

'টি-পটে অনেক চা আছে ক্ষেমেশ।'

'খাচ্ছি। ওটা পরে খাব।'

চায়ে দুবার চুমুক দিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'রোজগার করবই এরকম একটা হন্তদন্তভাবে না চলে মানুষ যদি খুব স্থির মনে ধীরে সুস্থে টাকা উপায়ের পথে যায়, তাহলে তার অভাব হয় না। মন দিয়ে ভালো করে লিখে একটা ইংরেজি আর্টিকেল তৈরি করতে তিনচার দিনের বেশি সময়

লাগে না। এজন্যে আমি পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, একশো টাকাও পাই, বেশিও পাই।'

'ইংরেজিতে প্রবন্ধ লেখ, বাংলায় লেখ না?'

'লিখব ভাবছি।'

'এইবার শুরু করে দাও। বিরূপাক্ষের কাছ থেকে কি পাঁচ লাখ চাইছ তুমিও?'

'যোগাড় করে দিতে পারলে সুবিধে হত।'

'কি করতে?'

'গোটা চারেক প্রেস কিনতাম।'

'এত টাকা লাগে তাতে?'

'শুধু জব প্রিন্টিঙেব প্রেস তো নয়।'

'ওঃ বির্লাটির্লার চালে; খবরের কাগজও বেরুত একটা?'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুকে দিতে গিয়ে পেয়ালাটা ডান হাতে ধরে রেখে বললে, 'না, না খবরের কাগজ আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। আমি পড়ি না ও-সব।' তাচ্ছিল্য বেদনা করুণা ঘেন্নায় কেমন কঠিন হয়ে উঠল যেন তার মুখ। ক্ষেমেশের পেয়ালাব চা ফুরিয়ে গেছে টের পেয়ে জয়তী টি-পট থেকে চা ঢেলে দিতে দিতে বললে, 'বল কি হে খবরের কাগজ পড় না, আমি তো চায়ের পেয়ালা মুখেই তুলতে পারব না একদিন কাগজ না পেলে।'

'পৃথিবীর সব খবরই আমার জানা। মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে; ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার রোখ, অশান্তির দিকেই ঝুঁকে পড়ছে বেশি। তবুও উৎরে যাবে—হয়তো শ্মশানের শান্তিতে কিংবা অন্য কোনো এক ঠাণ্ডা—আগেরটার চেয়েও ঢের ঠাণ্ডা ইশ্বাজ ভ্যালির সভ্যতায়। মানে মৃত্যুতে? না, জীবনেই; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে। কিন্তু আমরা বেঁচে থাকতে ও-সব হবে না কিছু। আমাদের আজকের হইচই যা নিমেষে চোখ ধাঁধিয়ে মনে হয়, সে সভ্যতায় কোনো রং নেই—অর্থ নেই—কিন্তু শান্তি আছে।'

নিজের পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে জয়তী বললে, 'কাগজও বের কববে না, এত প্রেস কিনতে চাচ্ছ?—'

'পাঁচ লাখ যোগাড় করে যদি দিতে পার আমাকে—'

'না অসম্ভব। কাউকে দিই না।'

'তাহলে—'

'তোমার এখানে থাকব বলেই আমি এসেছি।'

চায়ে চুমুক দিতে গিয়ে পেযালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষ কলকাতায় আছে? তুমি যে এখানে এসেছ তা জানে? না কি না জানিয়ে এলে। অবিশ্যি তোমার নিজের ব্যাপারে কেমন যেন শিশুর মতন ঠেকছে ভদ্রলোককে আজকাল।'

'তুমি ওকে আমল দিতে না, তবুও বিয়ে করলে। বিয়ে করে ঘর সংসারে ঢুকে গেলে বলেই তো মনে হল; একদিন নয়—কটা বছর। এ-সব কি করে সম্ভব হল আমাদের কুশপুতুলের মত মাথা ঘামিয়ে যদি তা বুঝে দেখতে চেষ্টা করতুম- - বললে, ক্ষেমেশ।

আরো বলত, কিন্তু বাইরে শূন্যেব ভেতরে কি যে কি দেখে চুপ করে থেমে গেল।

'কি হত তাহলে?'

সমস্ত রাত ভরে যেখানে ছায়াপথ ছিল—ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সেই কোটি কোটি শতাব্দীর কোটি কোটি মাইল আকাশের দিকে চেয়ে থেকে পৃথিবীর—জয়তীর দিকে ফিরে বললে তারপর, 'জয়তী এসেছ।'

ক্ষেমেশের গলায় অনেকদিনকার আগের নামশিখার কাঁপুনি যেন—কেমন যেন গভীর, স্নিগ্ধ শ্যামল এবং সংকল্প উজ্জ্বল; কিন্তু অভিজ্ঞ ও সমাহিতও বটে; তবুও একটু চিড় খেতে আপত্তি

নেই। সেই ছ্যাঁদার পথ ধরে যে বালি ঢুকে পড়তে পারে সেদিকেও লক্ষ্য যে নেই তা নয়।

জয়তীর চোখ ঠোঁট থুতনি আঁটিসাঁটি হয়ে উঠল খানিকটা।

'আমি এ বাড়িতে এসেছি।'

'তা তো দেখছি।'

ও-পাড়ায় বিরূপাক্ষ আছে তার নানান গরম নিয়ে; আমি চলে এসেছি বলে যে সে আমাকে ছেড়ে দেবে তা মনে হয় না। দেখে নেবে সে। ব্যাপারটা মোটেই সোজা নয়। তোমাকে বিপদে ফেলতে চাই না আমি। তুমি না থেকে কোনো শক্ত লোক যদি এ বাড়ির ছেলে হত, তাহলেই স্বস্তি পেতাম।'

জয়তীর কথা শুনে ক্ষেমেশ ভালো বোধ করল না, কেমন একটা আক্ষেপের হাসি ফুটে উঠল তার মুখের ভেতরে। ক্ষেমেশ যে শক্ত মানুষ নয়—নরম মানুষ নয়—মানুষ—তা জানে জয়তী। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে (এক সুতীর্থ ছাড়া), মিতভাষী জয়তী। কিন্তু ক্ষেমেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে গিয়ে ক্ষেমেশের মত মিতভাষী নয়। এই মেয়েটি যদি ক্ষেমেশের যৌন ও জীবন সাহচর্যে এসে পড়ে—যেমন ক্ষেমেশের মা এসেছিল তার বাবার জীবনে তার চেয়েও প্রাণঘন ও ধীসরস গভীরতায়—তাহলে তা আর কি—ভালোই হয—খুব ভালো হয়। এর চেয়ে বেশি ভালো—এক ঝাঁক সাগরগামী হরিয়াল সারস যদি আজ সকালবেলা এখানে এসে পড়ে, তাতেও হবে না। ক্ষেমেশকে কি বিয়ে করবে—শুধু কাঁচা শুধু কালো—রাত্রির অপরিমেয় প্রহরের মত চুলের গুচ্ছ নিয়ে যে মেয়েটি বসে আছে রাত্রিকে যা দেবার দিনের উজ্জ্বলতাকে যা দেবার ঃ কারণ শরীরে ভেতর থেকে যা দান করে? ভাবতে ভাবতে সগেরগামী হাওয়া আলোর--হরিয়ালদের কথা মনে পড়ল আবার ক্ষেমেশের। সে সব হরিয়ালের রৌদ্র কোলাহল যদি এসে পড়ে এখন—

'তোমাকে একটা আলাদা ঘর ছেড়ে দিচ্ছি জয়তী; যেটা খুশি। কিন্তু কি করে একা থাকবে তুমি? একজন ঝি আনিয়ে নেবে? আমি তোমাকে যোগাড় করে দেব?'

'ঝির ব্যবস্থা পরে করা যাবে। এক্ষুনি না পেলে জলে পড়ব না আমি। জ্যান্ত বা মড়া ভূত চিমড়ে মামদোর ভয় নেই আমার। সন্দেশ খাচ্ছ না তো?'

'আমার গোটাদশেক হয়ে গেছে। তুমি এখানে থাকছ তবে।'

'হ্যাঁ। বেশ কিছুদিন—'

'বুঝেছি।'

'বসবাস করতে এসেছি তোমার এখানে। বিরূপাক্ষের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছে ক্ষেমেশ।'

'কেন হল?'

'হয়ে গেল।'

'আর যাবে না ওখানে?'

'বোকার মত কথা বলছ কেন ক্ষেমেশ?'

'একেবারেই ছেড়ে এলে, অথচ বিয়ে করেছিলে। বিয়ে করবার সময় মানুষের মন সমুদ্রের ফিনফিনে কাঁকড়ার মত পথ খুঁজে পায় না—ফেনাবাতাস ওড়ে?'

'সেই রকমই উড়েছিল ক্ষেমেশ, দেখছ তো।'

টি-পট থেকে খানিকটা চা ঢেলে নিয়ে জয়তী বললে, 'চলে এসেছি। চলে এসেছি কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু আইনের মারপ্যাঁচ আপাতত সম্ভব হয়ে উঠছে না। কিন্তু আইন বেআইন সবের ওপরেই মানুষের মন। আমি ওখানে আর যাব না।'

ক্ষেমেশ চায়ের পেয়ালা একবার ঠোঁটের কাছে নিয়ে আবার কি মনে করে টেবিলের ওপর রেখে জানালার বাইরের পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে রইল। মাথায় ঘুরছিল যেন অনেক পাখি, অনেক ছবি ক্ষেমেশের। সেই সাত সকালে রানী সারসদের কথা মনে পড়েছিল তার। মনে হতেই কেমন

বোশেখী বিদ্যুতের মত মিলিয়ে গেছিল তারা, অন্য সাংসারিক দশ কথার চাপে পড়ে। ছ্যাঁৎ করে রাজসারসদের কথা মনে পড়ল ক্ষেমেশের আবার। এখানে যদি একপাল রানীসারস চলে আসে এখন! তা যদি হয়, তাহলে আর কিছুই চায় না, কেমন যেন এক মন্ত্রসিদ্ধি জানা আছে ক্ষেমেশের যাতে সে সমুদ্র হতে পারে, হতে পারে সিন্ধু ফেনা, উজ্জ্বল সূর্যের দিন, কত শত সারস শরীর মনের কত বিশ্বম্ভর আগুনে বাতাসে নক্ষত্রে বর্ণালিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে।

জয়তী চা খাচ্ছিল—টি-পটের থেকে শেষের তলানিটুকু ঢেলে নিয়ে—মাথা হেঁট করে। ক্ষেমেশের মুখের দিকে তাকাবার কথা মনেই ছিল না তার। নিজেরই নিতান্ত সব—কি যেন ভাবছিল জয়তী। ক্ষেমেশ এখনও সারসদের কথা ধ্যান করছিল—জয়তীরও কথা। ও সব রানী সারস বাংলার পাখি নয়, কিন্তু অলোকসামান্য পাখি ঃ জঙ্গল পাহাড় ভেদ করে যেসব বহতা নদীর জল ছলকে জলছানি দিয়ে নীলিমাকণিকা সূর্যগুড়ির উচ্ছ্বাসে উৎফলিত হয়ে পাথর উল্টে, শ্যাওলা ছিঁড়ে পায়রাচাঁদা চাপেলী নাচিয়ে শরবন কাঁপিয়ে কলরোল করে চলেছে, সে সব অবিরল জলঠাণ্ডার দেশে জলগন্ধের দেশে—জলঠাকুরানীর—জলদেবীর—নিরবচ্ছিন্ন প্রাণ প্রবাহের ভেতর এই সব পাখি থাকে। ভাবতে ভাবতে ভাবনার মোড় ঘুরে গেল ক্ষেমেশের অর্থ ও অন্তঃসার বদলে গেল, এতক্ষণ যে ক্ষেমেশের ভাবনা-তন্ময়তা অবাস্তব ছিল তা নয়, কিন্তু আমরা যাকে বাস্তব বলি প্রায় সেই প্রদেশে ফিরে এল ক্ষেমেশের মন। সাগর সূর্য পালক পশম কি এক দিব্য ফোকাসের আলো অন্ধকার থেকে উদগত হয়ে যে জয়তীর সঙ্গেও মিশে যাচ্ছে হঠাৎ তা টের পেয়ে মনের ভাবনার খেইয়ে একটা ঝাঁকুনি লাগল—একটু শব্দ করে হেসে ফেলল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘাড় হেঁট করে নিজের মনের পথে হেঁটে অনেক দূর চলে গিয়েছিল যেন—ক্ষেমেশের হাসির শব্দ শুনতে পেল না সে হয়তো ক্ষেমেশের দিকে ফিরে তাকাল না। কেমন সুন্দর সব—পাঁচটিকে—এমন কি ছটিকে ছাড়িয়েও কেমন যেন এক সপ্তম ইন্দ্রিয় দেখাচ্ছিল যা এতক্ষণ ক্ষেমেশকে সুন্দর জয়তীও ঃ ভাবছিল ক্ষেমেশ; কিন্তু তবুও দুটো মনচ্ছবি যদি ওরকম ওতপ্রোতভাবে মিশে যায় (জয়তীর শাড়িটা রোদে ছায়ায় যে রকম কমলা বাসন্তী সাদা গেরুয়া আভার দেখাচ্ছে তাতে না মিশে পারে না আর।) জয়তীকে তাহলে পাখিদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখবার শক্তি থাকে না আর—দৃষ্টিভঙ্গির গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায় ক্ষেমেশের এমনই স্খলন হয় যে সুন্দর জিনিস দেখেও হাসি পায় তার, হাসি মুছে যায় আস্তে আস্তে ছায়া পড়ে হৃদয়ে—কেমন যেন করুণার পাত্র মাঠ বন পাহাড় মৃত্যুর পাখি—আর এই জয়তী পাখি—দেখ, কেমন মাথা উপুড় করে চুপচাপ কথা ভাবছে। হাসল না এবার ক্ষেমেশ, মন করুণ স্নিগ্ধ হয়ে উঠল তার। তবুও তারপর আগাগোড়া এই সব পাত্রপাত্রীর দিকে এবং এই সকলের দিকে তাকিয়ে আছে সে ক্ষেমেশ তার দিকে তাকিয়ে পরিহাস বিশুদ্ধি পেল তার—দুর্নিবার ব্যাপ্তি পেল হাসির বলয়। এই সচ্ছল, অনুপম বিমুক্তি না থাকলে করুণ। এসে মানুষকে বেশি নিস্তব্ধ করে ফেলে—নিজেকে এই পৃথিবী গ্রহের উপযুক্ত মনে হয় না আর।

'আমি মাকে এলাহাবাদ থেকে এখানে নিয়ে আসব। তোমরা এক সঙ্গে থাকবে। আমি আজই যদি এলাহাবাদে যাই রঞ্জন তোমার ঘরের রোয়াকে শোবে।'

'না, মাসিমাকে এখানে আনতে পারবে না।'

'কেন?'

'ওঁরা হলেন সেকালের লোক। মুখ দেখাতে পারব না।'

'কিন্তু মুখ দেখাবার দরকার হবে তো—পৃথিবীতে থাকতে হলে। চেড়ীরাজ্যে অশোকবনে ছিলে—চলে এসেছ। তোমাকে ঘিরেছে কেমন একটা আচ্ছন্ন অশোকবনগ্রন্থি—সেটাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে।'

জয়তী একটু হেসে বললে, 'সত্যিই কোনো, গ্রন্থি নেই আমার—পণ্ডিতরা যেই বলুন না

কেন। মাসিমাকে এখন এলাহাবাদ থেকে আনার দরকার নেই।'

'এক-একটা পুরোনো দালানে নাগকন্যা থাকে। চোখে না দেখলে বুঝতে পারা যায় না যে রূপ মানে অত রূপ। কিন্তু চোখে তাকে দেখা যায় না। জয়তী, তোমাকে তো দেখেছি। তুমি কি করে মানুষের চোখ এড়িয়ে নাগকন্যা হয়ে থাকবে?'

'চোখে তো দেখছ', রোদের ভেতর ঝিমিয়ে পড়তে পড়তে ঘুম এল না—আলাদা পটভূমি এল আলাদা সূর্য জেগে উঠল জয়তীর মনে; কিন্তু পৃথিবীর লৌকিক সূর্যের থেকে সেটা বিচ্ছিন্ন নয়, এই সূর্যই তো; আকাশের দক্ষিণ কিনারে—দূরত্বে—কাছেই; জয়তী আস্তে আস্তে বললে, 'সুতীর্থ কোথায়?'

'সুতীর্থ কে?'

'সুতীর্থ গুপ্ত—চেন না?'

'ওঃ, তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কয়েকদিন আগে। কোথায় থাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলুম।'

'বিরূপাক্ষের একটা বাড়ি আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি।'

'কটা বাড়ি ওব?'

'গোটা তিনেক।'

'এর ভেতর একটা তোমার?'

'হুঁ, আইনত, দলিলপত্র আমার কাছে আছে।'

কথাটা ক্ষেমেশের কানেই গেল না যেন—কাছেই একটা সজনে গাছের হালকা ডালে ঘাসের চেয়েও বেশি গাঢ় সবুজ একটা পাখি এসে বসেছিল। সচরাচর এরকম পাখি দেখা যায় না—কেমন একটা হেমন্তগভীর দৃষ্টিলাবণ্য নিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়েছিল ক্ষেমেশ ঃ কি নাম এই পাখিটার? বাংলা নাম কি?

'পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ নিয়ে এসেছি।'

'ব্যাঙ্কে তোমার নামে রেখেছিল বিরূপাক্ষ?'

'রাখিয়েছিলুম।'

'কোন ব্যাঙ্কে? গিয়ে খতিয়ে দেখেছ তো নিজের চোখে—'

'লয়েডসে, চার্টার্ড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার, ইম্পিরিযাল ব্যাঙ্কে আরো আছে এদিকে সেদিকে। ঠিক আছে।'

ক্ষেমেশ চায়ে চুমুক দিযে বললে, 'বাড়িটা ভাড়া দিয়েছ?'

'না। ভেকেন্ট পজেশন।'

'বাড়িটা কোথায়?'

'বালিগঞ্জে। ভাড়াটে বসাব নিচের তলায়। ওপরে তিনটে কোঠা আছে—আমি থাকব।'

ক্ষেমেশ জানালার ফাঁক দিয়ে একটা উড়ন্ত আগন্তুক পাখির দিকে নিঝুম হয়ে তাকিয়েছিল; কি প্রগাঢ় নীলের তেজ কেমন ফিকে নীলে মিশে গেছে, কমলা লেবুব রং সোনালি হয়ে যাচ্ছে; বুকের কাছে দুধের মত সাদা পালক। কী নাম এই পাখির?

'বিরূপাক্ষের টাকা তুমি না নিলেও পারতে হয়তো জয়তী।'

'কেন?'

'টাকাই কি সব?'

'সব নয়? মাস্টারি করে খেতে বলছ হয়তো আমাকে, অথচ নিজে তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে তোমার বাবার পঞ্চাশ হাজারে তো চালাচ্ছ।'

'বিরূপাক্ষের মতন একটা মানুষ—ওর টাকা তো ভদ্র অভদ্র সব ঘরের বাঁট টেনে আদায় করা।'

'তার মানে?'

'মানে—ওটা আমার একটা উপমা।'

'উপমাটা বেল্লিকের মত হল। বিরূপাক্ষের টাকা ছুলে আমার কুষ্ঠ হবে না। পঁচিশ লাখ টাকা—তিনটে বাড়ি—বাড়িগুলো—সমস্ত সম্পত্তিই তো আমার প্রাপ্য। টিকে থাকলে পেতুম সব—কিন্তু সবই প্রায় ছেড়ে দিয়েছি ঃ মানুষের প্রাণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চায় বলে।'

জয়ন্তীর কথা শুনে সেই পাখিটাব দিকে ক্ষেমেশ ফিরে তাকাল আবার। পাখিটা একা কেন? ক্ষেমেশের বাড়িতে—সমস্ত বেলগাছিয়া তল্লাটে—সময়ের প্রবাহের ভেতরেই কেমন একটা অপরিচিত যেন পাখিটা। এসব পাখি তাহলে জন্মলাভ করে' হাওয়ার ভেতর থেকে? কেউ আছে? কাছে লুকিয়ে? সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

'তুমি বড় ভালগাব ক্ষেমেশ।'

ক্ষেমেশ চমকে উঠে জয়ন্তীর দিকে তাকাল। 'আমি? কেন, কি করেছি বলতো জয়ন্তী?'

'কি করেছ তুমি? যা কবতে পার তাই করেছ। ভেবেছিলুম বড় হবে,—এড়িয়ে যাবে। ছি, ছি, বড্ড নোংরা। গা ঘিন ঘিন কবছে আমার।'

'কিন্তু কয়েকটা বছর বিরূপাক্ষের সঙ্গে কাটিয়ে এলে তো তুমি। তা যদি সম্ভব হল—'

জয়ন্তীর কান্নার সাড়া—খুব অস্ফুট—টেব পেয়ে ক্ষেমেশ কথা বলতে বলতে থেমে গেল।

সাতাশ

অনেক রাতে মুখার্জি সুতীর্থকে তাব বাড়ির ফটকে নামিযে দিয়ে চলে গেল। নিচের সদর দরজা খোলাই ছিল—দোতলার কোলাপসিবল গেটও। ওপরে উঠে সুতীর্থ দেখল তার ঘরে বাতি জ্বলছে। ভেতবে ঢুকে দেখা গেল মণিকা সুতীর্থের সোফায় বসে আছেন।

'এতো রাতে তুমি এখানে।' সুতীর্থ বল্লে।

'তুমি খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে গেলে?' মণিকা বল্লে, 'একবার বল্লেও না কোথায় যাচ্ছ—'

'আমি তো গ্রেফতার হয়েছিলুম—'

'পালিয়ে এলে বুঝি তারপর?'

'মনটা কেমন জোর হারিয়ে ফেলেছে; কেমন হয়ে গেছে যেন—'

'তা তো দেখছিই। মুখ পুড়ে কালি হযে গেছে, খুব কড়া রোদে ধর্মঘট করছিলে বুঝি।'

'অনেক কথা আছে। জ্যোতি কি জেগে আছে?'

'না।'

'অংশুবাবুর টান ওঠেনি তো?'

'আজ রাতে একটু ঘুমুচ্ছেন।'

'ব্রোমাইড দিয়েছিলো বুঝি?'

'না, ডাক্তার এসে একটা মিক্সচার দিয়ে গেছেন। তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াচ্ছি। আগে ইনজেকশন দিয়ে গেছলেন।'

'বাড়াবাড়ি হয়েছিল কি আমি চলে যাবার পর?'

'ডাক্তার তো ডাকতে হল।'

'সারারাত তুমি জেগে আছ?'

'রোজই তো জাগি। চা দিতে বলব জ্যোতিকে। যাই উপরে। বলি—'

'অংশুবাবুকে ওষুধ দেবার সময় হয়েছে?'

'না। এই দিয়ে এলুম। আর তিন ঘণ্টা পরে।'

'তাহলে এইখানে তোমাকে বসতে হবে। আমার চায়ের দরকার নেই।'

মণিকা উঠে দাঁড়িয়েছিল—সোফার এক কিনারে—শীত ধরেছে বলেই খুব সম্ভব আঁট-সাঁট হয়ে বসে বল্লে, 'বসছি। তুমি ওদিককার সোফায় বস। উনি যদি জেগে ওঠেন, টের পাবে তুমি। আমি কানে কম শুনতে শুরু করেছি। তাছাড়া, তুমি আমার চেয়ে হুঁশিয়ার সুতীর্থ। উনি জেগে উঠলে আমাকে খবর দেবে। তুমি মোটরে এলে বুঝি?'

'হ্যাঁ, তুমি তো এই ঘরেই ছিলে?'

'না। দরজায় মোটর থামল, তাই নেমে এলুম। ওপর থেকে দেখেছি আমি সব। ও লোকটাকে তুমি কোত্থেকে জোটালে সুতীর্থ?'

'কার কথা বলছ?'

'যে তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'ও তো মিঃ মুখার্জি।'

'চিনি আমি।'

'তুমি চেন!'

'এ বাড়িতে ভাড়াটে ছিল—'

সুতীর্থ একটু অপ্রস্তুত হয়ে বল্লে, 'তাই তো তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

'জিজ্ঞেস করবেই তো; ওর মুখে আমি চাবুক মেরেছিলুম।'

'বটে? কেন?'

'চাবুক হাতে ছিল—তাই।'

সুতীর্থ মণিকার নিরবচ্ছিন্ন চুলের কালকেউটে জড়ানো মাথার দিকে মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'ক বছর আগে হল এ সব?'

'বছর পনেরো হবে।'

'তখন তুমি না জানি কিরকম ছিলে, মুখার্জির কি অন্যায়?'

সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে সুতীর্থ বল্লে, 'আজো তোমার কথা জিজ্ঞেস করে। অংশুবাবু তোমার স্বামী শুনে কেমন কেমন যেন হয়ে গেলো। কেন, ও কি জানে না যে অংশুবাবুকে বিয়ে করেছ তুমি?'

'কেন, কি বলছিল?'

'অংশুবাবুকে চেনে না মনে হল।'

'তা না চেনারই কথা।'

'কেন, এ বাড়ির ভাড়াটে তোমাকে চেনে, চিনে চাবুকও খেয়েছে। আর অংশুবাবুকে চিনবে না?'

মণিকা বল্লে, 'এত রাতে মুখার্জির সঙ্গে মোটরে ঘুরে কোথায় কি কাণ্ড বাধিয়ে ফিরলে সুতীর্থ?'

'আমি যা জিজ্ঞেস করলুম—'

'অংশুবাবুকে ও দেখেনি? না যদি দেখে থাকে সেটা আমার বরাত। ও তাকে না চিনলে আমি কি করব বল।'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, 'এটা কোনো উত্তর হল না। পুবের জানালা দুটো খুলে দিই। বড় গুমোট।'

'তা হলে তো রাস্তার লোক টের পাবে এত রাতে ঘরে আলো জ্বলছে। এত রাতে এখানে বসে থাকা—কথা বলা—চারদিকে নানা রকম নমুনার লোক আছে।'

'যা খুশি বলুক গে, আমার কিছু এসে যায় না।'

'তুমি তো স্বয়ংসিদ্ধ, কিন্তু আমি তো আমার কথা না ভেবে পারি না।'

'বাঃ, বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে রাতে তিনটেয়; মাঘ গেল—ফাগুন এসে পড়েছে—'

'মুখার্জির মত একটা বদমায়েসের সঙ্গে টহল দিয়ে বেড়ানো হচ্ছিল রাতবিরেতে। মুখার্জির বাঙালীয়ানা তো অনেক দিন হয় ঘুচে গেছে। ও তো দালাল—সাহেবপাড়ার দালাল।' মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে বললে, 'এ বাড়িতে ভাড়াটে থাকতে ছত্রিশগড়িয়া ভাষায় কথা বলত কে একটা মেয়েকে নিয়ে।'

'ওরা বউ?'

'না। মেয়েটার ধবল ছিল।'

'ধবল? ধবলকুষ্ঠ?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'মুখে নয়—অন্য কোনো জায়গায়।'

'ও, ধবল ছিল বুঝি'; সুতীর্থের জানালার কাছে গিয়ে বাইরের কলকাতার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, 'তোমাকে দেখিয়ে গেল বুঝি সেই ছত্রিশগড়িয়া মেয়েটি?'

'আমাকে দেখাবে না? আমাকে না দেখালে চাবুক খাবে কি করে তার মিনসে?'

সুতীর্থ মোটা সোজা রাস্তাটার দুধারি ঘন গাছগাছালির ফাঁকে ফাঁকে শেষ গ্যাস লাইটগুলোর দিকে তাকিয়েছিল, কোনো কথা বললে না।

'ফিরিঙ্গি মেয়েরা আনাগোনা করত এ বাসায় তখন। মদ খেত গোরু শূয়োরের মাংসের মৌতাতে ড্যাকরা মিনসেগুলোর সঙ্গে মিশে। কথা বলত চিড়িয়াখানার টিয়ে চন্নাগুলোর মত ডাকসাইটে চীৎকার পেড়ে—'

সুতীর্থ জানালার পাশেই বসেছিল, মণিকার কথা শুনছে কিনা বুঝতে পারা গেল না, কোনো উত্তর দিল না; চিন্তিত হয়ে নেহাতই কোনো মন্ত্রগুপ্তির সাত পাঁচ ভাবছিল মনে হচ্ছিল।

'সুতীর্থ, তোমার স্ট্রাইক বুঝি এখন পাতালে ভোগবতী?'

'কি করতে বল স্ট্রাইক সম্বন্ধে তুমি?'

'আমি কিছু বলি না।'

'পরামর্শ দেবে না?'

'আমি কি দেব?'

'স্ট্রাইকফাইক ভেঙে ফেলে আমাকে আবার কুণ্ডু মল্লিকের সাপ্লাই কর্পোরেশনের ডিপার্টমেন্টাল ইন-চার্জ হয়ে বসতে বল তুমি?'

'আমি? কেন? তোমার যা ভালো মনে হবে তাই করবে।'

'কেন, মুখার্জির সঙ্গে রাতে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালো লাগে তো আমার। কফি হাউসে গেলুম, ফার্পোতে গেলুম, চীনে টাউনে টহল দিলুম, হুমায়ুন প্লেসে গিয়ে ক্যাসানোভা হয়ে তারপর অলিগলিতে ঘোরা গেল। নানারকম নিউম্যাটিক বুননে গিয়ে বসলুম বাঙালী চীনে ইহুদি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়েদের—বেশ ভালো লাগল আমার—'

সুতীর্থ ঝোঁকের মাথায় কথা বলছে টের পেল মণিকা; কিসের থেকেই বা থিতিয়ে উঠছে এই ঝোঁক? সুতীর্থের মনের নির্থিতির থেকে। কিন্তু সেই নির্থিত মনকেই নির্মাণ করছে সুতীর্থ আবার। ঢেলে সাজিয়ে যা ইচ্ছে তাতে ওর মনের আগেকার সেই বর্তমান দৃঢ় বয়স্কতা ভেঙে যাচ্ছে, সেই সময়কার দুচারটে বিহ্বলতারও জড় মরছে না। বলছে বটে, কিন্তু তবুও মুখার্জির সঙ্গে অবিশ্যি মিশ খেতে পারে নি সুতীর্থ; সেটা অসম্ভব।...কথা বলতে বলতে সুতীর্থ নিজের সোফায় এসে বসল।

মণিকা কিছু বলতে যাচ্ছিল সুতীর্থকে, কিন্তু বলা হল না, গায়ের লেডিজ কোটটার বোতাম

আঁটতে আঁটতে মণিকা বললে, 'আমার সময় নেই। কি কথা তোমার বলে ফেলো। রুগী মানুষ ওপরে রেখে এসেছি।'

'স্ট্রাইকটা হামিদের হাতে ছেড়ে দিলে কেমন হয়?'

'তুমি বেরিয়ে আসবে?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা তুমি বুঝে দেখ।'

'মনটা তোমার কেমন ভারি হয়ে আছে মনে হচ্ছে মণিকা দেবী।'

সুতীর্থ বললে, 'আমি অফিসে অনেক দিন কামাই করেছি। কিন্তু আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টর মল্লিক আবার কাজে ডেকেছেন আমাকে। তাঁর অফিসের চাকরিটা নেব আবার? কি বল তুমি?'

মণিকা কোনো কথা না বলে আলস্টার খুলে কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে রেখে আবার উঠবার উপক্রম করল। কিন্তু বসে থেকে বললে, 'সারারাত বিছানায় শুয়ে বসে মীমাংসা করতে পারবে সুতীর্থ তুমি? শীতের রাত আছে—লম্বা রাত আছে—?' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল মণিকা--

'বিরূপাক্ষ আজ রাতে এসেছিল?'

'বিরূপাক্ষ?' মণিকা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কে?'

'কেন, আমার বন্ধু; তার কথা বলিনি আমি তোমাকে?'

'কাব স্বামী বিরূপাক্ষ?'

'পত্নী পরিচয় তো জানা নেই। কিন্তু পরশু রাতে ক'টাব সময় সে চলে গেল?'

মণিকা এক নিমেষের জন্যে নিজের মহৎ সম্বিতের ভাবটা হারিয়ে ফেলল। দুচার মুহূর্ত কেটে গেলে পরেও স্বাভাবিক অবস্থা আসতে সময় লাগছিল তার; মণিকা উপলব্ধি করল যে দু মিনিট আগেও মনের যে অবস্থা ছিল তার সেটা ফিরে পেতে কত সময় লাগবে তা সুতীর্থের ওপর নির্ভর করে অনেকটা ঃ কী দেখেছে সুতীর্থ? দেখে কী ভেবেছে? বিরূপাক্ষ ও মণিকাকে পাশাপাশি একই সোফায় অত রাতে ঘুমিয়ে থাকতে দেখে সুতীর্থ যে মতামতে পৌঁছেছে সেটা ছেলেমানুষী হবে না—ভালো জিনিসই হবে ক্রমে ক্রমে আস্তে সুতীর্থের দিকে চোখ তুলে তাকাল মণিকা।

'তুমি দেখেছ?' সুতীর্থকে বললে। 'কটার সময়ে এসেছিলে রাতে?'

'অনেক রাতে।' সুতীর্থ বললে।

'কোনো কথা বলবার নেই আমার', মণিকা দাঁড়িয়েছিল; সোফার এক কিনারে বসে বললে, 'তুমি তো দেখেছ; আমি শুধু এই—' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মণিকা বললে, 'না, কিছু আর বলবার নেই আমার।'

'পরশু রাতে ঐ জায়গায় ঐ সময়ে আমি না এলেও পারতুম। মানুষকে অপ্রস্তুত করে যে জ্ঞান—তাতে আলোর চেয়ে আলোর মাছি ঢের বেশী।'

'তুমি এসে পড়াতে—সেদিন অত রাতে ঠিক জায়গায় ঠিক সময়ে এসে পড়াতে—' মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে আলস্টারের পকেট থেকে একটা লবঙ্গ বের করে দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে ফেলতে বললে, 'তোমাদের কাছে আমি খালাস হয়েছি।'

'হয়েছ?' সুতীর্থ আড়চোখে মণিকার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে।

কোটের পকেট থেকে কয়েকটা এলাচ ও লবঙ্গ তুলে দিল সুতীর্থকে মণিকা। সেগুলো জানালার ভেতর দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল সুতীর্থ।

মণিকা একটু হেসে বললে, 'বিরূপাক্ষ নাক ঢেকে খেলা করতে চায় মানুষের বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে। কিন্তু তবুও বাইরের সমাজে তার বিবেক বলে কোনো জিনিস নেই; যা তা রটিয়ে বেড়াতে পারে যেখানে সেখানে—কিন্তু তুমি এসে নিজের চোখে দেখলে তো সত্য কি। তুমি পরশু

রাতে ছিলে—দেখেছিলে—ও জানে? না জানলে ওকে জানিয়ে দেবে।'

সুতীর্থ ঘাড় হেঁট করে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে করতে কোনো এক জায়গায় এসে থেমে দাঁড়িয়ে বললে, 'বিরূপাক্ষ কাউকে কিছু বলতে যাবে না। বিদ্বান বুদ্ধিমান নয়—কিন্তু নাড়ীজ্ঞান আছে। ওর টাকা তো এই সবের জন্যেই; নিজের আসল ভাঙিয়ে খেতে যাবে বিরূপাক্ষ?'

'তুমি কি বলছ সুতীর্থ?'

'আমার কিছু বলার দরকার নেই। বিরূপাক্ষ আমার কাছ থেকে হুঁশিয়ারি শিখবে? তবেই হয়েছে। সে নিজে জানে কত।'

কটকটে সূর্যের ঝাঁঝ যে হঠাৎ চোখে এসে লেগেছে এরকম মাছের মত সচকিত হয়ে সুতীর্থ জলের ভেতর ডুব দিল আবার নিস্তব্ধতার ভেতর।

'তুমি আমাকে অবিশ্বাস কর?'

'করি যদি কি এসে যায় তোমার?'

'তোমার নিজের কিছু এসে যায়?'

সুতীর্থ মাথা হেঁট করে বললে, 'আমি তো পাশগাঁয়ের সুতীর্থ গুপ্ত। আমার স্ত্রী আছে, দুটি ছেলেমেয়ে আছে। এইবারে তাদের কলকাতায় আনতে হবে। কিন্তু এ বাড়িতে কি থাকব আমি? এ বাড়িতে তো গন্ধগোকুল ঢুকেছিল; জুঁই ফুলের পাপড়ি শুঁকে সেটা বোঝা শক্ত হবে; কিন্তু মুশকিল হবে ঘেঁটু ফুলের বেলা। তার তিতো গন্ধটা তার নিজেব না পরের কে কবে কতবার করে তা ঠিক করে দেবে?'

'এ কি কথা—কি হিজিবিজি পবিভাষা তোমার সুতীর্থ?'

'কথার ভেতর ডুবে যেতে হবে তোমাকে। তুমি—'

মণিকা বাধা দিয়ে বললে, 'ধোঁয়ার মত কথা বানিয়ে বলো না। তুমি বিরূপাক্ষকে জিজ্ঞেস করো।'

সুতীর্থ হাঁটতে হাঁটতে জানালার দিকে সরে গিয়ে বললে, 'কি দরকার আমার জিজ্ঞেস করবার। তুমি যা বলেছ তার চেয়ে বেশী কি বলবে বিরূপাক্ষ আমাকে? সব শুনে বিরূপাক্ষ কি বলে শুনতে হবে আমাকে?'

'কি শুনেছ তুমি। আমি যা বলেছি তা যদি শুনে থাক, তা হলে তো আমাদের কথা ফুরিয়ে গেল। এখন অন্য কথা পাড়।'

সুতীর্থ নিজের সোফায ফিরে এসেছিল, উঠে দাঁড়িয়ে দু-চার পা হেঁটে জানালান কাছে গিয়ে দাঁড়াল আবার।

'তুমি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছ না সুতীর্থ।'

সুতীর্থ পূবের দিকের জানালা ছেড়ে দিয়ে দক্ষিণের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল; শীত রাতে কোনো বাতাসের প্রত্যাশায় নয়; এমনিই। বসতে পারছিল না সে।

'ওটা কি তোমার অভ্যেস? ঘরের ভেতর ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন?'

'বসে আছ তুমি মণিকা দেবী; বেশ তো বসে আছ তুমি। আমি পিরালি বামুনদের পরিবেশন করছি। বসে বসে কি করে তা করব?'

'কি পরিবেশন করছ; মনের সন্দেহ? সন্দেহ ছাড়া কি আর দেবে তুমি কাকে। তোমার মনের সন্দেহ ঘুচল না--'

'এইবারে ঘুচিয়ে ফেলছি', সুতীর্থ বললে। 'বিরূপাক্ষের চোখে লাগছিল বলে সে আলো নিভিয়ে দেবে—আর সেই অন্ধকারের ভেতর বসে থাকবে দুজনে রাত দুটো অবধি?'

'বলেছিল তার ঘুম পাচ্ছে। ঘুমোবার আগে ঘরটাতে অন্ধকার থাকলেই ভালো। আর ভালো মন্দতে অবিশ্যি এসে যাচ্ছিল না আমার! সুতীর্থ--'

আঠাশ

সুতীর্থ যেন ঘুমিয়ে পড়ছিল, অস্পষ্ট চোখ তুলে মণিকার দিকে তাকাতে তাকাতে পরিষ্কার হয়ে উঠল যেন তার চোখ—সন্দেহে না সাহসে পৃথিবী মিথ্যে এই ব্রহ্মোপলব্ধিতে—না সবই সত্য এই সঙ্কল্প স্থিরতায়?

'খুব বেয়াদবি হল বাতি নিভিয়ে দিয়ে বিরূপাক্ষের। কিন্তু মানুষকে কখনো শিশুর মতন মনে হয়। আমরা নারীরা মায়ের মতন—' মণিকা বললে, 'বিরূপাক্ষ যে মতলব নিয়ে আমার কাছে এসেছে সেটা প্রথম রাতেই তার চেহারা দেখে বুঝেছি আমি। বাতিটা নেভাও সুতীর্থ।'

বাতি নেভাতে গেল না সে।

ঘরের বারান্দার সবদিকের সব বাতি নিভিয়ে দিয়ে সোফায় ফিরে এসে খুব বেশী অন্ধকারের ভেতর মণিকা বললে, 'আমি তোমাকে সেদিনকার কথা বলব শোন। এর ভেতর কিছুই নেই বলেই না বললেই ভালো হত; কিন্তু তবুও তোমার শোনা দরকার। তুমি সে রাতে এমন সময়ে এসে এমন অবস্থা দেখেছ যে, নিজের কাণ্ডজ্ঞান বা মর্মজ্ঞানে যখন কিছুই বুঝলে না—অগত্যা সবই তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে হচ্ছে আমার।'

সেদিনকার ব্যাপারটা সত্যিই জলের মত পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিল মণিকা। মণিকা যে সত্য কথা বলছে উপলব্ধি করল সুতীর্থ। কোথাও কোন খিচ রইল না আর।

মণিকা তারপরে বললে, 'আমায় উইল দেখিয়েছে, উইল শুধরে দিতে বলেছে, ওর বিষয়সম্পত্তির ট্রাস্টি হতে বলেছে বিরূপাক্ষ। চেক কেটেছে, ভাঙিয়ে টাকা পেয়েছি। আমি মানুষকে সহজে বিশ্বাস করি না। কিন্তু বিরূপাক্ষ নিজের কাজ হাসিল করবার জন্যে বিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে পারে। আমরা বলি ঃ চাকরটা খুব বিশ্বাসী, নায়েবমশাই বেশ বিশ্বাসী মানুষ। বিরূপাক্ষের কথাবার্তা কাজকর্ম দেখে সব সময়ই প্রায় আমার মনে হয়েছে চাকরটা খুব বিশ্বাসী। কিন্তু তবুও বুঝেছি চাকরটা মোটেই বিশ্বাসী নয়।'

মণিকা হাই তুলে কুঁড়েমি ভেঙে বললে, 'আমাদের বাপ-ঠাকুরদার আমলে ছিল ও সব। যেমন নীলু চাকর—বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী, বামচরণ খুব ধর্মভীরু। কোথায় গেছে সে সব।'

মণিকা আগে তুড়ি দিয়ে তারপর আলসেমি ভাঙতে লাগল; হাই ছাড়তে লাগল একটার পর একটা; অনেক আলসেমি জড়ো হয়েছে শরীরে।

'তুমি ঘুমোলে তোমার সোফায়, গেল বিরূপাক্ষ?'

'তাই তো গেল, না হলে এল কখন? আমি জেগে থাকতে আসেনি তো।'

'ঘুমোলে কেন?'

'ওকে দিয়ে কোনো পাপ হবে না জেনেই ঘুমিয়েছিলুম। হঠাৎ ঘুম এসে পড়ে আমার, সেদিনও তাই হয়েছিল। কিন্তু বিরূপাক্ষ মুখার্জির মত হলে ঘুমের আগে ওপরে উঠে যেতুম আমি।'

'যে পাপী তাকে দিয়ে পাপ হবে না নিষ্পাপিনীরা কি তাই মনে করে? কে বললে, তাই মনে করে?'

'তুমি ওরকমভাবে প্রশ্ন করলে আমি কথা বলব না।'

'অনেক নিরপরাধিনী তো আমি দেখেছি।'

কোনো কথা বলল না মণিকা।

'তারা তোমার মতনই সতর্ক।'

সুতীর্থ অপোগণ্ডের মত কথা বলে ভাবছে সেটা শ্লেষ—ভাবছিল মণিকা; কি উত্তর দেবে—মিছে উত্তর খুঁজে মরছিল না তার মন।

'তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে কেন?'

অন্ধকারের ভেতর ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না মণিকাকে। সে জেগে আছে, না ঘুমিয়ে আছে? সুতীর্থের প্রশ্নের আর কোনো উত্তর দিতে গেল না, বলেছে যা বলবার। আর কিছু বলবার নেই।

'বিরূপাক্ষকে সামনে রেখে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে।' মণিকা উঠে দাঁড়াল।

'বিরূপাক্ষের লালা তোমার ব্লাউজের ওপর লেপটে পড়েছিল সেদিন। তার মাথা তোমার বুকের ওপর গড়িয়ে পড়েছিল।'

'কিন্তু ঘুমন্তকে যদি ঘুমন্ত বিষ খাওয়ায় কিংবা অমৃত তাতে তার কি অপরাধ?'

'দেখেছি আমি—তুমি খুব বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলে সেদিন।' মণিকা দাঁড়িয়ে রইল। মণিকা উঠে দাঁড়িয়ে অন্ধকারের ঘরের ভেতর নিঃশব্দে নিজ মনে পায়চারি করছিল—

'এত ঘুমের ভেতর কেউ যদি কিছু করে ঘুমন্তের সেটা অজ্ঞাত থেকে যায়। থেকে যায়?'

আর কিছু বলবে না ভেবেছিল সুতীর্থ, কিন্তু তবুও মুখ দিয়ে তার এই কেমন একটা প্রশ্ন বেরিয়ে গেল বলে একটু কুঁকড়ে গেল সে। সে জানে, মণিকা কিছু করে নি। তার স্বচ্ছ ধারালো অন্তর্ভেদী চোখ সত্য দেখেছে; সে সত্য সৎ। মিছিমিছি তবু কথা বাড়াচ্ছে সুতীর্থ?

'কি করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই। আমার কাছে বেশী কথা শুনতে চাও তুমি, বারবার শুনতে চাও। কিন্তু যা বললুম এর চেয়ে বেশী কিছু বলবার নেই আমার।' বলতে বলতে মণিকা শীতের রাত ভেঙে বন-ঝাউয়ের মত শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে গেল যেন যেখানে কোনো অভিজিৎ নক্ষত্র নেই সেই তেতলার অন্ধকারের ভেতর।

হাতের সিগারেটটা নিভে গিয়েছিল সুতীর্থের—অনেকক্ষণ আগে। সে জ্বালাল না আর। অন্ধকারে আচ্ছন্ন, আড়ষ্ট করুণার সদ্যোজাত শিশুর মত, শীতাক্রান্ত জননীর মত সেই শিশুর, বসে রইল সে। মোটামুটি এইরকমভাবে বসে রইল সে অনেকক্ষণ। তারপর আর খারাপ লাগছিল না তার। ভালো না লাগবার কথা নয়। থেকে থেকে মনে হচ্ছিল সুতীর্থের ঘরের ভেতর যেন একটা রাধাচূড়ী পাখি ঘিয়ের মত ডানা পালক মেলে ঝরঝর জলজল ঝরঝর জলজল বসন্ত রাতের হিজল বনের নদী নির্ঝরের মত শব্দে কথা বলে গেল। স্বচ্ছ জল সেই নদীর নির্ঝরের শব্দ—নির্মল, শাশ্বত।

তন্দ্রায় ঢুলে ঢুলে পড়ছিল সুতীর্থ। যেমন আমরা বলি, মাস্টারমশাই খুব বিশ্বাসী মানুষ—চাকরটা খুব বিশ্বাসী। যেমন বলতুম নীলু খুব বিশ্বাসী; রামচরণ খুব ধর্মভীরু; কোথায় গেছে সে সব? অনেক ওপরের হাওয়ার থেকে কে যেন বলছে এই সব তন্দ্রার ঢুলে মনে হল সুতীর্থের। মস্ত বড় রাত্রির ময়দানে—নিশুতির তারাটা স্বাতী সপ্তর্ষি অভিজিৎ লুব্ধক বিশাখা—কী স্থির দাঢ্য নিবিড় অনন্ত আকাশ সন্ধির অবিরল হাওয়া—অনেক স্বর্গীয় পাখি উড়ছে ঢের ওপরে—তার মধ্যে সবচেয়ে অনির্বচন পাখিটিই মানুষী। কি অসংস্থিত পৃথিবীর নিচের কয়লার গুঁড়ি উড়িয়ে ঘুরছে। কিন্তু সুতীর্থ যেখানে বসেছে সেখানে বাতাস ঠাণ্ডা নয়, কিন্তু বরফের মত শাদা, বেলফুলের মত ঝর্ঝরে পাখিদের পালক, জুঁয়েব মতন গন্ধ স্নিগ্ধতা, অথচ কোনো রক্ত নেই এমনই আশ্চর্য পরমাত্মান এক মেয়েমানুষের নিবিডতর বাতাসেব ভেতর বাতাসের মত যেন মিশে গেছে সুতীর্থ—কোনো শরীর নেই সেই নির্ঝরের ভেতর—কোনো সময় নেই সেই অপরিমেয় আলোয়—অনালোকিত অনন্ত বাতাসের ভেতর।

পরদিন সকালবেলাও নিজের ঘরের সমস্ত দরজা জানালা খুলে রোদের ভিতর নিস্তব্ধ হয়ে বসেছিল সুতীর্থ।

'কটা বাজে সুতীর্থ?' মণিকা জিজ্ঞেস করল।

সুতীর্থকে নিরুত্তর দেখে মণিকা বললে, 'তোমার হাতঘড়িটা দেখছি না তো।'

'আছে।'

'কোথায়?' মণিকা দেরাজ খুলে বললে, 'এখানেও তো নেই।'

'তাহলে চুরি হয়ে গেছে।'

'স্ট্রাইক ফণ্ড ছাড়া আর কোথাও চুরি হবার জায়গা তো দেখছি না। অমন দামী জিনিসটা দিয়ে দিলে?'

মণিকা কাল রাত্রের সেই সোফার ঠিক নির্দিষ্ট কিনারা দখল করে বসল। আকাশ পৃথিবীর সমস্ত রৌদ্রের অদ্ভুত জেল্লায় ঘর বার ভরে গিয়েছিল সব। ফাল্গুন আসেনি এখনও—তবুও বাতাসে তার অস্পষ্ট দিব্যতা—কেমন স্নিগ্ধ আগুনের ঘ্রাণ—মাঝে মাঝে করুণ আগুন। রোদ এড়িয়ে কিছুটা ছায়ার কিনারা বেছে বসেছিল মণিকা। কিন্তু তবুও রোদের অনেকগুলো চুমকি শাড়িতে গালে চুলে ছড়িয়ে ছিল। যার অর্ধেক নারী সেই মূর্তির নারীর দিকটার মত দেখাচ্ছিল মণিকাকে—বাকি সব বিশ্বম্ভর প্রকৃতির; রৌদ্রের বাতাসের নীল শাড়ীর নীলাম্বর যেন।

'হাতঘড়ি মানুষের কব্জিতে খুঁজতে হয় নাকি?'

সুতীর্থের ঘড়ি তার শার্টের আস্তিনের নিচে হারিয়ে গেছে, সেদিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'কাল রাত থেকে বড় মনের ধাঁধায় আছি সুতীর্থ। সবই কেমন বেভুল হয়ে যাচ্ছে।'

'কি ধাঁধা?'

'এখন কটা বেজেছে?'

'নটা।'

'এই ঘুমের থেকে উঠলে বুঝি?'

শার্টের হাতার বোতাম খুলে ফেলে আস্তিন গুটিয়ে নিতে লাগল আস্তে আস্তে সুতীর্থ। 'সাত মিনিট বাকি আছে নটা বাজতে।'

'আমি তো দেখেছি, তুমি সারারাত ঘুমোওনি। আমি চলে গেলুম। তুমি ঠায় বসে রইলে; এখনো বসে আছ। কেন?'

'তোমার কথায় মনে পড়ে গেল ঃ ঘড়িটা খাঁটি সোনার—অনেক দাম হবে এখনকার বাজারে। দেব ধর্মঘটীদের?'

'ওটা কোনো কাজের স্ট্রাইক নয়—'

'ওরা বোকা, তা আমি জানি। কিন্তু ওদের পরিবার তো না খেতে পেয়ে মরছে—'

'সে সব ভাবনা মুখার্জির হাতে ছেড়ে দাও। ও-ই তো ফ্যাক্টরির মালিক। মানুষ নয়, কিন্তু মিটমাট করবার শক্তি মুখার্জির আছে, তোমার নেই।'

'তার মানে?'

'তুমি তো চাঁদের বুড়ীর চরকার বাতাস—'

'রূপকে কথা বলছ মণিকা—'

'এ রূপকের কোনো মানে নেই বুঝি?'

'কি মানে?'

'তুমি যা চাও তা কি করে পাবে? কেউ কস্মিনকালেও তা পায় না। স্থান কাল জিনিস বিচার করে কাজ করতে হবে তো। এ সব ধর্মঘটীরা কে? কেমন হৃদয় মন? কি শিখেছে তারা? কতদূর জানে? না খেতে পেয়ে সুকটি মরেছে, তবুও কথা বলে বলে ওদের মন মজানো হচ্ছে এমনিই, যেন কথা খেয়েই থাকতে পারবে এই-ই মনে করা ওরা। মুখুজ্যে যদি আরো কিছুদিন গোঁ ধরে থাকে, কিংবা ওদের পিঠে হাত বুলিয়ে এখুনি যদি কিছু রফা করে নেয় তাহলে কথা-গেলা হাড়গিলের বাচ্চারা ঝাঁপিয়ে পড়বে মুখুজ্যের কোলে আদর খাবার জন্যে। মুখুজ্যে ছাড়া ওদের কোনো মিটমাট হতে পারে না।' মণিকা বললে, 'মিছেমিছি কেন বক্তৃতা দিতে যাও?'

উঠে গিয়ে একটা জানালা বন্ধ করে এল। কড়া রোদ এসে পড়েছিল তার মুখে। 'তোমার বক্তৃতা শুনিনি কোনোদিন আমি। কেমন দাও?'

'আমার নিজের কানে তো মন্দ শোনায় না।'

'মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বল?'

'এমনি, খালি গলায়। থাকে মাইক মাঝে মাঝে—'

'বক্তৃতা দিতে পার, কোনো পার্টিতে ভিড়ে গেলেই তো হয়। যদি বিশেষ কোনো বালাই না থাকে তোমার মনে তাহলে তো সুড়সুড় করে ওপরে উঠে যাবে। সেই-ই তো সবচেয়ে সোজা পথ—টিট পাখিদের পক্ষে। কাজ করবে চাকরবাকর চেলা চেংড়ীরা; পল্লী-সংগঠন, ধর্মঘট, শিল্পবিপ্লব, রক্তবিপ্লব—ওদের হাতে ছেড়ে দাও সব। কথা বলে হদ্দো মাত করে রাখ।'

'তোমার চেয়ে ভালো কথা আমি বলতে পারি?'

'তোমরা বাইরের পৃথিবীর মানুষ।'

'তুমিও বাইরে চলো না আমাব সঙ্গে।'

'সে রকম একটা রক্তবিপ্লব হলে আমাকেও নামতে হবে।'

'বড় বিপ্লব হবেই তো।'

'হলে হবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে সে বিপ্লবে আমি নাল ঠুকতে যাব কেন?'

'না আমার সঙ্গে নয়—আমি ভাড়াটে---' সুতীর্থ হেসে বললে। 'বিপ্লব হলে আমিও কারো ভাড়াটে হতে যাব না। নিজে একটা দিক নিয়ে দাঁড়াব।'

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখছিল মেঝের রোদে দক্ষিণ দিকের জানলার লোহার গরাদের বিচিত্র নকশার ছায়া পড়েছে। সূর্যকে মা বলে অনুভব করে তারি স্বচ্ছ শিশু সন্তানদের মত যেন রোদ। কত মাছি উড়ছে রোদে। সুতীর্থ আবার তাকিয়ে দেখল চায়ের পেয়ালার সোনালি কিনার ঘিরে মাছি; রোদের ভেতর পেয়ালাগুলো হরেকষের ধূসরতা পেরিয়ে হঠাৎ হীরে হয়ে ঝিকমিক করে উঠছে।

'কোন পার্টিতে যাবে বললে?'

'সে তুমি জান। এটা নিজের ঠিক করে নিতে হয়।'

'আমার তো মনে হয় আমি কংগ্রেসেরই চাবআনা সদস্য হতে পারতুম যদি--'

সুতীর্থের যদিটা শস্যের মত ফলে উঠছিল যেন, কিন্তু বুলবুলিরা এসে খেয়ে গেল; কিন্তু বললে না সে আর, চুপ করে বসে রইল সতৃষ্ণ বিষণ্ণভাবে অনেক দূরের একটা গ্যাসের বেলুন—হাওয়া অফিস থেকে ছেড়েছে হয়তো—সেই দিকে তাকিয়ে।

'সোসালিস্ট পার্টিতে যেতে পার।'

'আমার মনে হয় আমার কোনো পার্টিই সইবে না।'

মণিকা রোদের ভেতর ঝিমুতে ঝিমুতে জেগে উঠতে উঠতে বললে, 'তা সয় না আত্মারাম চিড়িয়ার। কোনো পার্টিই ধাতে সয় না, অথচ সবই সয়ে যায়। পার্কে ময়দানে একটা ভিড় জমলেই হাতের ভেতর একটা লেত্তি খুঁজে পাওয়া যায়—পৃথিবীটাকে চমৎকার লাট্টু ঘোরাবার জায়গা বলে মনে হয়; পাঁচটা পার্টির স্বতোবিরোধের ওপরে উঠে নিজের মর্যাদায় দাঁড়িয়ে কথা বলা বক্তৃতা দেওয়া—।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

আপাদমস্তক জ্যোতির দিকে চায়ের ট্রের দিকে বিরস কটাক্ষে তাকাল মণিকা; কেমন অশ্রদ্ধার ব্রন ফুটে উঠল যেন সমস্ত মুখ ভরে।

'এর দেরিতে চা এল যে মণিকা দেবী?'

'চা তো ও এনেছে। আমি তো ওকে চা তৈরি করতে বলিনি; আনতে বলিনি।'

'কেন?'

'কেন, তোমার চাকর নেই?'

'তুমি জান না সে পালিয়ে গেছে?'

'আমাকে বলে পালিয়ে গেছে, আমাকে না জানিয়ে তোমার কুটুম্ব পালায়?'

জ্যোতি দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে তাকিয়ে মণিকা বললে, 'চায়ের সঙ্গে পাঁপড় এনেছিস কেন? একশোবার তো তোকে বলেছি ওসব কাশীর পাঁপড় ডাক্তারবাবুর জন্যে রেখে দিয়েছি। সুতীর্থবাবু তো পাঁপড় খেতে ভালোবাসে না।'

'ফাঁপর এনেছে জ্যোতি—এটা খেতে ভালবাসি আমি—' সুতীর্থ একটু মুখ মিঠিয়ে হেসে চায়ের পেয়ালা তুলে নিল।

'নিয়ে যা এসব পাঁপড় জ্যোতি। নাকি তুমি খাবে সুতীর্থ?' জ্যোতিকে পই পই করে বলেছি এসব পাঁপড় কাশীর ডাক্তারের জন্যে।'

'ডাক্তার কাশীর?'

'না না, কাশীর পাঁপড় ডাক্তারকে খাওয়াব ভেবেছিলুম।'

'আরো তো আছে, সব পাঁপড়ই কি ভেজে নিয়ে এসেছে জ্যোতি? ডাক্তারটি কে? চাটুয্যে? অংশুবাবুকে দেখছেন যিনি?'

'হ্যাঁ।'

'ভিজিট নিচ্ছেন না?'

'কেন নেবেন না? আমরা প্রত্যেকটি কলে ভিজিট দিই; দিনে চারবার এলে চারবার—'

'তবে আর পাঁপড় কেন?'

মণিকার ঠোঁটের কোণ মুচড়ে উঠল কেমন একটা হুলে বিঁধে যেন; গম্ভীর হয়ে মণিকা বললে, 'আমরা ডাক্তারকে দিতে ভালবাসি।'

'দিচ্ছই তো ভিজিট দিনে চারবার করে।'

'যার যা বরাত। কই আর দিতে পারলুম, ডাক্তারের পাঁপড় তুমিই তো খাচ্ছ।'

জ্যোতি চলে গিয়েছিল, হয়তো বিড়ি টানতে; আবার এল—কেউ তাকে ডাকেনি যদিও। মণিকা বললে, 'বাবু কি ঘুমুচ্ছেন জ্যোতি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকক্ষণ।'

'আর দিদি?'

'ঘুমুচ্ছে।'

'এখনও!' সামনের শূন্যতাকে চোখ দিয়ে একটু আস্তে ঠোকর দিয়ে সুতীর্থ বললে।

জ্যোতি চলে গেল।

'ঘুমুচ্ছে তো। জীউ নিয়ে শুধু বেঁচে থাকা যেমন আমার স্বামীর, তেমন আমার মেয়ের।'

সুতীর্থ চায়ের পেয়ালায় চুমুক না দিয়ে পিরিচের ওপর সেটা রেখে দিল। মণিকার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার মেয়েকে তো বেশ ভালোই দেখায়। অসুখ আছে? কি অসুখ?'

'হার্ট খারাপ', মণিকা বললে, 'এই অল্প বয়সে এতটা যে খারাপ হতে পারে,—হল তো।'

'কে বললে?'

'কেউ বলেনি, মনে হয় আমার।'

'মনে হলে মনেই রেখে দিও মণিকা ঘোষাল। পাঁপড়ের একটা কিনার ভেঙে টোকা দিয়ে সেটাকে উড়িয়ে দিয়ে সুতীর্থ বললে।

'ঘোষাল কেন?'

'অংশ মজুমদাররা নাকি আগে ঘোষাল ছিলেন; তোমার নিজের হার্ট কেমন?'

সুতীর্থের এ প্রশ্নের একটা বাঁকা উত্তর দেবে ঠিক করেছিল মণিকা, অপারেশন টেবিলে ছুরির

মত কাজ করে এমনি জবাব মুখে এসে পড়েছিল প্রায় মণিকার, কিন্তু ভালো লাগে না, চোখ বুজে আসে, উৎসাহ বুতে যায়, মণিকা বললে, 'আমাকে তো থিওগার্গিনাল খেতে হয়। যখন তখন। হার্টের জন্যে।'

'দেখিনি তো খেতে তোমাকে কোনো দিন।'

'খাই। হার্ট খারাপ।'

'তোমার চেয়ে ভালো হার্ট মুখার্জির আছে?'

'মুখার্জির চেয়ে সুস্থ মানুষ বুঝি তোমার চোখে পড়েনি আর?'

'ও তো ঢ্যাপসা নয়—দোহারা।' সুতীর্থ বললে, কিন্তু তোমার পায়ের কাছে ওগুলো কি পড়ে আছে? চাঁদ? কিন্তু মুখার্জি চাঁদ নয় বলেই ওখানে নেই। ওখানেও নেই।'

যে শিশু মাকে চাঁদ পেড়ে দিতে বলে—এবং সে মা জানে যে চাঁদ পেড়ে দেওয়া যায় না, তাদের আকুতি ও অভিজ্ঞতায় কয়েক মুহূর্ত জড়িত হয়ে থেকে তারপবে আস্তে আস্তে নিজের স্বতন্ত্র জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় ফিরে এল সুতীর্থ।

মণিকা একটা পাঁপড় তুলে নিয়ে কামড়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল আধাআধি, চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে বললে, 'মুখুয্যের গাড়িতে চড়ে আমাদের ফটকে নামলে রাত তিনটের সময়। কি ব্যাপার বল তো সুতীর্থ—'

'ওরা স্ট্রাইকটা ভেঙে দিয়েছে।'

'জরবদস্তি করে?'

'হ্যাঁ। আমি দলের সর্দার নই অবিশ্যি—তবুও আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওদের মুখপাত্র হিসেবেই। ওদের অনেককেই গ্রেপ্তার করে হাজতে নিয়ে গেছে। আমি ভেবেছিলুম আমারও জেল হবে—কিন্তু তা হল না আপাতত—'

মণিকার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'বড্ড বিশ্রী বেকায়দা যাচ্ছে।'

'কি হয়েছে?'

'গয়ানাথ মালোর কথা তোমাকে বলেছিলুম?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, যে ধর্মঘটী খুন হয়েছে?'

'প্রমাণিত হয়েছে আমিই নাকি ওকে খুন করেছি।'

মণিকার চোখেমুখে বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ পে৽। না। মনে হচ্ছিল যেন একটু দমে গিয়ে মুহূর্তেব ভেতরেই সাব্যস্ত হয়েছে। ওর শরীরের ভেতবেই যেন সঞ্চিত আছে সে জিনিস যাতে নিজেই নিজেকে শুশ্রূষা করে স্থির করে নেয়—স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনে।

'কিন্তু তুমি তো তাকে খুন করনি। করেছ?'

সুতীর্থ বললে, 'ব্যাপারটা আমি তোমাকে বলছি মণিকা দেবী—'

গয়ানাথ মালোর মৃত্যু সংক্রান্ত আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বললে মণিকাকে সে। এর ভেতর মুখার্জির কতখানি হাত, মুখার্জির চেহারার সঙ্গে সৌসাদৃশ্য, মানুষ যা ভাবে বলে করে সে সমস্তকে অতিক্রম করে সময়পুরুষেব ভিন্ন রকমের সিদ্ধি সমস্তই মণিকার কাছে পরিষ্কারভাবে আনুপূর্বিক বিবৃত করল।

'কিন্তু এ তো বড় অদ্ভুত।'

'মনে হয় যেন বানিয়ে বলছি।'

'না, তা নয়। তবে—'

'গয়ানাথকে কি আমিই খুন করেছি মণিকা?'

'কথা বলছ সহজভাবে—কিন্তু মনটা তোমাব আড় ভাঙছে না। একটা কথা তোমাকে বলব আমি—' মণিকা সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে।

'বল।'

'গয়ানাথ তোমাকে খুন করতে যাচ্ছিল না।'

'কি করে বুঝলে?'

'গয়ানাথ তোমাকে মুখুয্যে বলেও মনে করেনি, মুখুয্যের চেহারার সঙ্গে তোমার কোন সাদৃশ্য নেই—'

'নেই?' সুতীর্থ মণিকার চোখে চোখে তাকিয়ে বললে, 'আমার নিজের চেহারা আমি নিজে তো দেখি না, আরশিও নেই আমার ঘরে। মুখার্জির সঙ্গে আমার কোন দিক দিয়ে কতদূর কি সাদৃশ্য বুঝে উঠতে পারছি না। তুমি বলছ আমাদের চেহারায় কোনো মিল নেই—'

'নেই', মণিকা বললে, 'আছে মনে করে ছোরা বাগিয়ে তোমার দিকে সে ছুটেছিল একথা যারা বলে তাদের বেকুবির সঙ্গে পারবে না তুমি। কিন্তু বেকুবি নয়—।' মণিকা একটু থেমে বললে, 'অভিসন্ধি স্পষ্ট না হলেও সোজা ধরা পড়ে যায়। তোমার কাছে আবছা ঠেকছে?'

'কেন ছুটেছিল তবে গয়ানাথ?'

'তুমি বলেছিলে না বঙ্কু ওর পেছনে ছিল?'

'হ্যাঁ।'

'বঙ্কুই ছোরা মেরেছে ওকে—তোমার সামনে খাদের ভেতর থুবড়ি খেয়ে পড়ে গেছে তাই লোকটা—'

'কি যে বল তুমি। তা হলে বঙ্কুকে দেখতুম না আমি—'

'তুমি পেছনে ফিরে তাকিয়েছিল?'

'কোনো দিকেই তাকাইনি আমি—যে খাদে পড়ে গেল তার দিকে ছুটে গেলুম আমি—'

'জায়গাটার আশেপাশে ঝাড়জঙ্গল ছিল?'

'দেখিনি আমি—তবে মাঠজঙ্গল নিয়েই জায়গাটা। আচ্ছা আমি আরেকবার ঘুরে দেখে আসব। তুমি যা বললে তার—কিন্তু জায়গাটা দেখে আসব আমি।'

'গেলে হবে কি? যে জায়গায় হয়েছিল এসব তো তুমি খুঁজে বের করতে পারবে না; সব জায়গাই একই রকম মনে হবে তোমার কাছে; চেলেটেলে বের করতে পারবে না কিছু—গুলিয়ে যাবে সব। কাচাছাড়া ভাবের মানুষ তুমি, মুখুয্যের মতন কাজের মানুষ তো নয়—'

'কিংবা বিরূপাক্ষের মতন। না, তা নই।'

'বিরূপাক্ষ কাজের লোক বইকি; বাড়ি-মোটর পঁচিশ ত্রিশ লাখ টাকা ব্যাঙ্কে তার। তোমার মতন ভাড়া না দিয়ে পরের বাড়িতে থাকার অভ্যেস নেই তো তার—।'

মণিকার কথাটা যে তার পেটের থেকে বেরুচ্ছে, হৃদয়ের থেকে নয়, মাথার থেকে নয়—উপলব্ধি করেও পাল্টা রগড় করতে গেল না, কেমন নিঃশব্দ হয়ে রইল সুতীর্থ।

'ক' মাসের ভাড়া বাকি তোমার?'

'সাত-আট মাসের তো বটেই—'

'তোমাকে দশ মাসের ভাড়া দিয়ে দেব আমি—'

'অতটা পাওনা কিনা বলতে পারি না।'

'সেলামিও দিয়ে দেব।'

'দেবে তো বেশ করবে—' মণিকা বললে, 'কিন্তু মুখ লম্বা করে আছ কেন? তুমি যখন এ বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলে তখন সেলামির রেওয়াজ ছিল না তো। তবুও দেবে—এক কান কাটলেই দু-কান কাটা হয়—নিজেরই হয়। আর কার কি হবে। তা দিও—দিয়ে দিও দশ মাসের ভাড়া—সেলামী—' মণিকা হাসতে হাসতে বললে। 'ভাড়া দেও না বলে অবিশ্যি তোমাকে তাড়িয়ে দিতে

পারা যেত; নতুন ভাড়াটে বসানো যেত। কিন্তু অংশুবাবু আর আমি তো চড়কের গাজন গেয়ে গেয়ে মাথা খারাপ করিনি—আমাদের ঠাণ্ডা মাথা; তুমি এরকম বিগড়ে যাচ্ছ কেন?'

মণিকার কথা, গলার আওয়াজ কানের পটহে গিয়ে আঘাত করে, আঘাত করবার অনুমতি দিলে মনে হয় মর্মেও। কিন্তু কারু অনুমতিসাপেক্ষ মেয়ে মণিকা নয়, যদি হত তা হলে এরকম ষোলো আনা মানুষ হতে পারত না সে। মণিকা নিট ষোলো আনা নয়, তবুও খাদ আছে বলেই নিখাদ সোনার মত। সুতীর্থ যা চায় ঠিক সেরকমভাবে কথা বলছে না বটে মণিকা, কিন্তু তবুও খুব খারাপ লাগছে সুতীর্থের?

ঊনত্রিশ

'জানালাটা খুলে দাও সুতীর্থ, রোদ পড়ে গেছে, এখন একটু হাওয়া আসুক।'

জানালাটা কে খুলে দিল টেরই পাওয়া গেল না যেন। হাওয়া আসছিল। শীত কমে গেছে একেবারে; হাওয়া না থাকলে ঘরের ভেতরটা কেমন গুমোট।

ফুরফুরে হাওয়ার ভেতর বসে থেকে মণিকা বললে, 'দেবে তো বলেছ, কিন্তু কবে দেবে ভাড়া?'

'আজ কালই দিয়ে দেব।'

'দশ মাসের নয়, তবে মাস আষ্টেকের নিশ্চয়—আট মাসের ভাড়া পাওনা আছে তোমার কাছে।'

'আমি পরশুই দিয়ে দেব।'

'পরশু পেতে আমার আপত্তি নেই। টাকার ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠেনি আমার মন, কিন্তু পরশু তুমি ভাড়ার টাকাটা দেবে না জানি। তুমি তো ওয়াদা দিচ্ছ—'

'ওয়াদা?' সুতীর্থ একটু হাঁফের অসুবিধা বোধ করে যেন বললে, 'আমি পরশুই তোমাকে টাকা দিয়ে দেব।'

'আমি তোমাকে বিশ্বাস করি না।'

'আচ্ছা আমি এক্ষুনি তোমাকে চেক দিচ্ছি—একটা সিগারেট জ্বালিয়ে সুতীর্থ বললে।

'চেক নেব না আমি।'

'কেন?'

'ক্যাশ চাই। কেমন যেন বাজে মনে হচ্ছে তোমার চেক বইটাকে—'

শুনে সুতীর্থ কলকাতার একটা বড় সিডিউল্‌ড ব্যাঙ্কের চেক বইটা সরিয়ে রেখে দিল।

'ধর্মঘট করছ সত্যকে ছাপাতে না দাঁড় করাতে। দাঁড় করাতে তো! কিন্তু জীবনের অন্য সব ব্যাপারে মিথ্যে ফেঁদে স্ট্রাইকটাকে সত্য করবে তুমি। তা কি করে হয়?' মণিকা বললে, 'এখানে ধর্মঘট করছ মুখুয্যের সঙ্গে ওখানে বড় হাতের পোলিটিকস্‌ চালাচ্ছ সিঙ্গি রুখে—ধর্মের ওপর নির্ভর করে, সত্যকে সহায় করে, যেন সব সত্যেই তোমাদের দিকে এরকম প্রাণবল সংগ্রহ করে। কিন্তু সব সত্যই কি তোমাদের দিকে? যে বাড়িতে থাকা হয় সেখানে আট দশ মাসের ভাড়া বাকি পড়ে থাকলে ছ্যাঁচড়ের সঙ্গে কোথায় প্রভেদ কর্মকর্তার? সমাজের, অফিসের শাসনের বড় বড় ব্যাপারে তো বটেই, সাংসারিক খুঁটিনাটিতেও এ সব বিষে বিষিয়ে উঠল সব।'

যা অনুভব করেছে সেইটেই জোর দিয়ে বলতে চেয়েছে মণিকার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল সুতীর্থের। কেমন অমৃতের পুত্রের মত তাকিয়ে আছে মণিকা জানালার ভেতর দিয়ে সুতীর্থের মত বিষ কন্যার সম্পর্কের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

'তোমার দশ মাসের ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারি সে টাকা আমার কাছে আছে।'

'আছে? এইখানেই?'

'এইখানে—এই ক্যাশ বাক্সে। কিন্তু তবুও তোমার বক্তৃতায় মন ভিজল না আমার। এ টাকা তোমাকে আমি দেব না।'

মণিকা নিরুপায়ের মত হাসতে লাগল, হাসতে লাগল আজকের বিশৃঙ্খলা লৌকিক পৃথিবীর ক্ষতের ছ্যাঁদাটার গভীরতার দিকে তাকিয়ে নিঃসহায়ের মত। কিন্তু তবুও হাসিটা নিষ্ফল নিরুজ্জ্বল নয়।

'হাসছ?'

'তোমাকে একটা খৎ লিখে দিতে হবে; তোমার হয়ে লিখে দিচ্ছি আমি।' মণিকা বললে।

'কিসেব খৎ?'

'তোমার মনিবকে লিখে দেব। লিখে দেব ঃ কুকুরটা এইখানেই থাকবে খাবে—এঁটিলি কামড়াবে—আঁশটে গন্ধ ছড়িয়ে বেড়াবে;—বেড়াক—কোনো চারা নেই।'

'লিখে দিও কুকুরের বাচ্চা পাঠিয়ে দেব সামনের শীতে।'

মণিকা গম্ভীর হযে বললে, 'ক্যাশ বাক্সে টাকা আছে, আমাকে দেবে না, ও টাকাটা দিয়ে কি করবে?'

'যাদের দিতে হয় তাদের দেব।'

'ধর্মঘটীদের পরিবারদের? কিন্তু স্ট্রাইক তো ভেঙে গেছে—'

'জেলে গেছে ওরা। কিন্তু ধর্মঘট চালাতে হবে, পরিবারদের খেতে পরতে হবে—' সুতীর্থ কেমন যেন নালার ওপারের চিতেবাঘের মত তাকাল মণিকার দিকে।'

নালার এপারের সেয়ানা হরিণীর মত তাকিয়ে মণিকা বললে, 'তা হবে বইকি। কিন্তু আমার খয়রাতের টাকা দিয়ে ওদের খাওয়ানো? আমি তো মুখুয্যের দিকে। আমি কেন টাকা দেব মুখুয্যেকে যারা রুখছে সে সব মিনসে মাগীদের ফ্যানভাতের জন্যে?'—ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল মণিকার দৃষ্টি; জ্যোৎস্না রাতের নদী বনের ভেতর কালো ডোরাকাটা সোনালী রঙের সুন্দর জিনিস যেন তার প্রিয়কে না দেখে একটা ইতর বাঘকে দেখেছে এমনই নিদারুণ হয়ে উঠল মণিকার ঠোঁট। 'কোনো পুরুষমানুষ এমন করে! বিরূপাক্ষ করত না নিশ্চয়ই, মিঃ মুখার্জিও না।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলে এক হাজার টাকার একটা চেক লিখে দিল মণিকাকে। মণিকা তাকিয়ে দেখল ক্যাশ বাক্সের আনাচে-কানাচে একতলায় দোতলায় দু'চার টাকার খুচরো ছাড়া ক্যাশ আর কিছু নেই—একটা পাঁচ টাকার নোট অবধি না। চেক সে সুতীর্থের কাছ থেকে নেবে না ঠিক করেছিল, কিন্তু না নিয়েই বা করবে কি? কাঁচা টাকা দেবে কোত্থেকে সুতীর্থ। টাকা ও জমায় নি কোনোদিনই —সেটা জানে মণিকা; সম্প্রতি চাকরিও নেই; যে চেক দিয়েছে সেটা হয়তো কোনো সমিতি বা পবিষদের ফণ্ডের টাকা; পরিষদের সম্পাদক সুতীর্থের হোক না হোক, চেক কাটবার পরোয়ানা আছে তার। এ চেক ডিজঅনার্ড হবে না। চেকটা ব্যাঙ্কে নির্ঘাত মার খাবেই জেনেশুনে মণিকাকে তা গছিয়ে দেওয়া—, অত দূর অধঃপতন হয়নি সুতীর্থের। অধঃপতন তার হয়ইনি, কিছুটা চন্দ্র চাঞ্চল্য হয়েছে ভাবছিল মণিকা; তুয়োলে-বুয়োলে কিছু হবে না, যখন সারবে নিজের থেকেই সেরে যাবে। আর যদি না সারে ঃ—মণিকার নিঃশ্বাস খুব ভেতরের থেকে এল গাছের পাতার থেকে না এসে সমুদ্রের রাত্রির নিজের নিঃসুপ্তি কোটরের থেকে চলে আসে যেমন বাতাস।

'এটা তো বেয়ারার চেক, এটাকে ক্রসড করে দাও।'

'কেন, তাতে তোমার কি সুবিধে?'

'কখন ভাঙাব তা তো জানা নেই, চেকটা হারিয়ে যেতে পারে।'

'এক্ষুনি ক্যাশ করে নাও, ঐ তো রাস্তার ওপারেই তো ব্যাঙ্ক।'

'আমিই ক্রস করে নেব।' চেকটা ব্লাউজের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলল মণিকা।

'মুখার্জি তোমাকে খুনে প্রমাণ করে ছেড়ে দিল যে তবুও?'

'কড়ার করে নিয়েছে। আমাকে ধর্মঘটের সংস্পর্শে থাকতে দেখলে স্ট্রাইকারদের বলে দেবে যে, আমি গয়ানাথ মালোকে খুন করেছি। ওরাই তখন খুন করবে আমাকে।'

'ওরা কি বিশ্বাস করবে?'

'হাতে হাতে প্রমাণ দেখিয়ে দেবে, বিশ্বাস করবে না? বিশ্বাস না করলে পুলিশ তো আছেই; আমার জামাজুতো গয়ানাথের লাসের কাছে পড়েছিল রক্তাক্ত অবস্থায়। কেন, তা তুমি জানো। সমস্ত রকম দরকারী ফোটোগ্রাফ ওদের আছে। ফোটো তোলবার আগে কর্তারা স্বচক্ষে দেখে গেছে সব—ডায়রি করে রেখেছে।'

'মোকর্দমা করবে তুমি?'

'না। কি লাভ করে। করব না আমি।'

'স্ট্রাইকের নেশা ঘুচল তা হলে এবার তোমার?'

'দেখা যাক ওরা কি করে।'

'ওরা? কারা?'

'মুখার্জি আমাকে খুনে প্রমাণ করলে হামিদরা কি চষে ফেলবে আমাকে?'

'কিংবা সরকার কি ফাঁসি দেবে? বড় বেল্লিক তুমি?'

মণিকা বললে, 'তোমার জীবনের একটা পর্ব শেষ হয়ে গেছে। আর একটা আরম্ভ করবার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা দরকার। দেখ, দেশের হাওয়া কোন দিকে যাচ্ছে। স্ট্রাইকের দরকার হবে—বিপ্লবেরও—হয়তো খুব বড় বিপ্লবের—হয়তো শান্তভাবে নয়, ফ্রান্সের মত, রাশিয়ার মত। কিন্তু তার আগে নিজেকে উপযুক্ত করে নাও। বয়স তো তোমার কম হয় নি। কিন্তু এখনও তুমি মোটেই তৈরি হতে পার নি।'

সুতীর্থ বিড়ি জ্বালিয়ে বললে, 'আমার তো লেখার দিকে, সাহিত্যের দিকেই বেশী নজর দেবার কথা ছিল। তুমিই তো আমাকে হল্লায় নামালে।'

'আমি?'

'তোমাকে আমি চাই।'

'আমাকে?'

'এখন নয়। বড় বিপ্লবের সময়।'

শুনে মরুভূমির মতন কেমন একটা লু-চলাচলের রূঢ়তা এসে পড়ল যেন মণিকার নিবিড় মাতা পৃথিবীর মত মুখে; সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বিড়ি খাচ্ছ কেন? দিশি বলে? কিন্তু বিড়ির গন্ধে আমার বমি আসে, চলি তা হলে এখন।'

তেতলা যেন মহা নেপথ্য; যাত্রিনীকে দ্রুত নিবিড়তায় উঠে যেতে দেখল সুতীর্থ।

'কোথায় ছিলে কাল সারাটা দিন—সমস্তটা রাত?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'নানা জায়গায়। এক্ষুনি মুখার্জির কাছ থেকে এলুম।'

'মিটমাট হল কিছু?'

'না।'

'কোনো ভরসাও দিল না মুখুয্যে?'

'কি করে দেবে, আমার তো বাইশ দফা দাবি।'

'ওগুলো কমিয়ে দাও, কেটেছেঁটে ফেলো তেজও গুটিয়ে নাও। ওরকম মারমুখো হয়ে সংসারে কোনো কাজই চলে না। তুমি দিনের পর দিন বড় লোহার কার্ত্তিক হয়ে পড়েছ।'

'তোমার লক্ষ্মীর মূর্তি খুলছে তো দিনের পর দিন—'

'কেন খুলবে না? নাভির বদলে মৃগনাভি নেই তো আমার—'

'আমাদের আছে। সেটা মানি। সেই জন্যেই বিশৃঙ্খল হয়ে গেল জীবন, কোনো শান্তি নেই, দিকনির্ণয় নেই, ধরবার মত কিছু পাচ্ছি না।' কিন্তু এ খুনের সমস্ত প্রয়াস রক্তাক্ততা নিষ্ফলতা কিছুই ছোঁয়নি বুঝি ওকে, প্রশান্তির মত দাঁড়িয়ে আছে, মৃগনাভি তো ইতর মানুষদের নষ্ট করেছে; নিজের সমাহিত নিয়ে কতশত সাগরতীরে সভ্যতার উষানারীদের দিব্যতায় জেগে রয়েছে মণিকা—ভাবছিল সুতীর্থ।

সুতীর্থ বললে, 'যে দেখে তার চোখেই এত ভালো লেগে যায় তোমাকে।'

সুতীর্থ ঠোঁটে হেসে বললে, 'তোমার কাছে খবর পৌঁছিয়ে দেবার নির্দেশ পেয়েছি—'

'কার কাছ থেকে?'

'মুখুয্যে বলছিল—'

মণিকার সমস্ত শরীর ঘিরে একটা ফণা জেগে উঠছিল—দেখছিল সুতীর্থ।

'আমি ধর্মঘট করতে চাই-ই—'

'করবে। তাতে আমার কী।'

'করলে আমার খুন ধরিয়ে দেবে মুখার্জি।'

'দিক, আমার কী এসে যায়।'

'কিন্তু একটা কড়ার করে নিতে চায় মুখার্জি।'

মণিকা আঁচল দিয়ে গলায় বেড়ি পরতে গিয়ে আঁচলের চাবিটা ঝনঝন করে বাজাল একবার। সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে আছে, নাকের ছ্যাঁদা কাঁপছে না এখনও, কিন্তু মণিকার সমস্ত ফর্সা সুন্দর সত্তা কালকেউটের মতন কালো আগুন হয়ে রয়েছে যেন; সে ঝাঁঝের দিকে তাকানো যায় না যেন; সুতীর্থ চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললে, 'সেদিন মুখার্জি এসে দেখে গেছে আমি এই বাড়িতে থাকি। এ বাড়ির ভাড়াটে ছিল সে একদিন। তখন তোমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল তার। বললে আমাকে।'

'বললে বুঝি? ভগবান ঠাকুরের মত পণ্ডিত এ তল্লাটে আর পেলে না বুঝি মুখুয্যে—কাকে বলবে ভগা ঠাকুরকে ছাড়া?'

'কিন্তু কাজ হাঁসিল করতে হবে তো—'

'কোন কাজ?'

'স্ট্রাইকটা—'

'তার সঙ্গে ওর পূর্বাশ্রমের খবর নেওয়ার কী সম্পর্ক?'

'তা আছে।'

'আছে?'

চড়িয়ে দাঁত ভাঙতে এগিয়ে এসে মাথায় খুব বেশি রক্ত চড়ে গেছে অনুভব করে মণিকা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনের ভেতর আগুন পুড়ে গেছে। বরফও গলে গেছে মণিকার—একটা সুস্থ, ঠাণ্ডা আত্মস্থতায় সে পৌঁছে যাচ্ছে।

'তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়েছ ঠিকই?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে কি করছ এখন?'

'চাকরি-বাকরি শীগগির কিছু করব না আর।'

'কি করে চলবে তা হলে?'

'ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাই নে।'

'আমি তোমাকে খাবার দিতে পারব না।'

'দিও না।'

'মাঝে মাঝে তুমি এমন পান্তবুড়ো হয়ে এ বাড়িতে ফিরে আস যে ছেলেমেয়ের মা হয়েছিলুম বলে তোমার তত্ত্বতলব না করে আমি পারিনে। কোনো উচ্ছন্নে জিনিস দেখতে আমার ভালো লাগে না। তুমি ফের যখন এ বাড়িতে ঢুকবে ভদ্রলোকের ছেলের মতন ঠাঁট রেখে ঢুকতে হবে তোমাকে—'

'তোমার এ বাড়িতে আরো কিছুদিন থাকব আমি।'

'ভাড়া না দিলে থাকতে দেব না।'

'ভাড়া দেব।'

'এক সঙ্গে কতগুলো ভজাবে, তারপর দেবে, তা হলে চলবে না। ফী মাসে চাই; গোড়ার দিকে দিতে হবে।'

'বেশ তো, মাস পয়লাই দেব। আমাকে মুখার্জি সাহেব বলেছে ধর্মঘট যদি করতেই চাই এমন, তাতে তার আপত্তি নেই। আমি খুন করেছি তা প্রমাণ করতে পারলেও ও নিয়ে প্যাঁচে ফেলে স্ট্রাইক পণ্ড করতে যাবে না। এমনি লড়বে আমার সঙ্গে—সোজাসুজি কোনো আকস্মিক উটকো ঘটনার সুবিধা নিয়ে নয়—'

'ওর সঙ্গে এই চুক্তি ঠিক করে এলে?'

'আপাতত।'

'ওকে মানুষে বিশ্বাস করে?'

'এত বড় ফ্যাক্টরির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়েছে তো; অনেকেই বিশ্বাস করেছে বলে।'

'ও তোমায় ডেকেছিল বুঝি?'

'আমি নিজেই গিয়েছিলুম।'

'গরজ তোমারই বেশি—'

'আমাকে আজকালই ডাকত অবিশ্যি'—সুতীর্থ বললে, 'কই জ্যোতিকে দেখছি না।'

'কি দরকার?'

'চা দিয়ে যাবে।'

'আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি।'

'ওঃ, তা বেশ করেছ। আমি একটা চুরুট জ্বালাই তা হলে। চা দুপুরে খাওয়া যাবে; বাইরে।'

সুতীর্থ চুরুট বের করে ধরিয়ে নিয়ে মণিকাকে বললে, 'লড়তে যখন নেমেছি তখন শেষ না করে ছাড়ব না, এরকম কথা বলতে পারতুম, কিন্তু এ সব জেদের কথা কাজের কথা নয়।'

'কাজ করতে নামলেই জেদ বেড়ে যায়—পেট থেকে চাঁচাছোলা কথা বেরুতে থাকে। সে কথা ঠেকাবে কার সাধ্যি। বাছুরের মা গোঁসাই মাব মত তেরিয়া হয়ে উঠলে খাটালের লোকদের যেমন হয় আর কি—তোমার সঙ্গে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে তেমনি ঝামেলা হয়েছে মুখুয্যেদের।'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো কথা বললে না।

মণিকা সোফায় বসে বললে, 'এ ধর্মঘটে জিতে যদি তুমি মুখার্জিকে কাবু করতে পার, সেটাও বিশেষ কোনো কাজের কথা হবে না।'

আবার প্যাঁচ কষবে, তা জানি, ভাবছিল সুতীর্থ।

'আজ ঘাড় নোয়ালে ওরা কালই গর্দান উঁচু করতে জানে আবার।'

'আমরাই করতে দিই বলে।'

'বুদ্ধি-সুদ্ধির সঙ্গে আহম্মকির লড়াই তো। কেন জিতবে না মুখুয্যে?'

সুতীর্থের চুরুটটা নিবে যায়নি একেবারে, কিন্তু যে আগুন আছে তা নিয়ে ফোঁকা অসম্ভব। ছাই ঝেড়ে ফেলে দিয়ে চুরুটটাকে ভালো করে জ্বালিয়ে নিতে লাগল।

ত্রিশ

'তোমার বাইশ দফার দশ দফা মেনে না নিলে যদি খুশি না হও, বাইশ দফাই মেনে নেবে, কিন্তু কালই প্রমাণ করে দেবে যে আইন ওদের দিকে—তোমার দিকে নয়।'

'বড় বেগতিক জীবন আমাদের—রাষ্ট্রে সমাজে সব দিকেই। এ অবস্থায় কিসের দরকার?'

'বিপ্লবের। যা কোনোদিন ভারতবর্ষ দেখেনি এমনি একটা বিপ্লবের।'

'জলের, না রক্তের?'

'রক্তের যাতে না হয় সেই চেষ্টা করাই দরকার। খুব বড় বিপ্লব, অথচ খুব শান্তভাবে হচ্ছে—এ জিনিসটা যে একেবারে অসম্ভব তা নয়। কিন্তু কে করবে? উপকরণ কোথায়? গান্ধীজী নিরাশ নন। কিন্তু তিনি একা ছাড়া কেউই তো আর গান্ধীজী নন।'

'এসব লোক একক থেকেই বেশি কাজ করতে পারে। পথে ঘাটে গান্ধী জন্মালে কারু কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া খুব বড় কেজো রেভুল্যশান গান্ধীদের দিয়ে হবে না। ওঁরা সে সবের ঢের ওপরে—মানুষ ওঁদের চেয়ে নিচে বলতে পার, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে মানুষ ওঁদের চেয়ে ঢের আলাদা রকমের।'

জ্যোতি চা নিয়ে এল।

'কে চা আনতে বলেছে জ্যোতি?' জ্যোতি ইতস্তত করছিল।

'বাবু কি করছেন?'

'ঘুমুচ্ছেন।'

'ডাক্তারবাবুর ওখানে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ—হয়ে এলুম তো এই।'

'কখন আসবেন?'

'একটা নাগাদ।' জ্যোতি চলে গেল।

'তোমার ঘড়িতে কটা বেজেছে সুতীর্থ?'

'ঘড়িটা আমি বিক্রি করে ফেলেছি।'

'মণিকা চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছিল; তরল গরম জিনিসে গলা পুড়িয়ে নিতে ভালো লাগছিল; টনসিলে কেমন ব্যথা। গলায় আঁচলের পাক জড়িয়ে নিতে নিতে বললে, 'আমার কাছে বিক্রি করলেই পারতে—'

'তোমার ঘড়ি কি হবে—তোমার তো টাকার দরকার।'

'তোমার ঘড়িটাকে আরো চড়া দামে বিক্রি করে কিছু কাঁচা টাকা পাওয়া যেত।'

নাও হতে পারে খাঁই, সত্যিই কেবলই টাকার দরকার মণিকার ভাবতে ভাবতে সুতীর্থ বললে, 'চেকটা ভাঙিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ওষুধ আর ডাক্তারের ভিজিটের বড় বাড়াবাড়ি চলছে আজকাল। আমাদের তো রোজগার নেই, ব্যাঙ্কেও টাকা নেই। নিচের তলার ভাড়াটেদের টাকাই খেতে হয়।'

সুতীর্থ চিন্তিতভাবে চুরুট টানতে টানতে বললে, 'তোমার কথা কয়েকবার জিজ্ঞেস করলে মুখার্জি। আমার সঙ্গে যাবে একদিন ওর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আসতে?'

'আমি? কেন?'

'আমরা তিনজনে মিলে কথাবার্তা বলব—আমার সঙ্গে চলে আসবে আবার।'

আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকার, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে; তা পুড়ে যাবার আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজক্রিয় তাপ; কিন্তু তারপরে কালো ছাই পড়ে থাকে। কালো ছাই ছড়াবে না মণিকা, মনকে উত্তেজিত করবে না, মূর্খদের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি

করাই লিখন যখন এই ভীষণ দুর্ঘটনার গ্রহে তখন নিজেকে জ্বালিয়ে চড়িয়ে মনটাকে পীড়ন করতে যাবে না সে। শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিস এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পারে না কিছু আর; বেশ তিরিক্ষে তামাসাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত স্নিগ্ধ হয়ে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'মুখার্জির গাড়ি তোমাকে নিতে আসবে তাহলে মণিকাদি?'

গাড়ি আসবে না—মণিকাকে যেতে হবে না; গাড়ি এলেও যেতে হবে না; জানে মণিকা। আগে বেশ পরিষ্কারভাবে চিন্তা করত সুতীর্থ, কিন্তু স্পষ্টভাবে আবার চিন্তা করতে পারবে সুতীর্থ,—এ যুগের বাঙালী ও ঠিক নয়—আগেকার যুগের বাঙালীর বেশি ভালো জিনিস আছে ওর ভেতর।

'আমিও যাব তোমার সঙ্গে। আমাদের শীগগিরই আবার ফিরিয়ে দিয়ে যাবে—'

'কি কথাবার্তা হবে?'

'এমনি—ধর্মঘট সংক্রান্ত—'

'ওখানে কে কে থাকবে?'

'আমরা তিনজন—'

'অ্যাডজুডিকেটর কারা?'

'অনেকেই আছে—কিন্তু মুখার্জিই সব।'

'তুমি কথাবার্তা চালাবে তোমাব নিজের প্রতিনিধি হয়ে?'

'না, না, তুমি আর আমি ধর্মঘটীদের প্রতিনিধি—'

'আমার কথা ছেড়ে দাও—স্ট্রাইকাররা তোমাকে তাদের সর্দার মেনে নিয়েছে?'

'মেনে নিয়েছে বলেই তো মনে হয়।'

'মনে হয়? তারা সব জেলে, আর তুমি জেলের বাইরে; তাদের স্ত্রী-সন্তান খেতে পাচ্ছে না, আর তুমি খ্যাঁট মেরে প্রতিনিধিত্ব করছ। এ তো চারপেয়েদের প্রতিনিধি। হামিদ যদি ওখানে থাকে তা হলে তো তোমার জুতো ছিঁড়ে খুর বার করে নাল ঠুকে দেবে—'

সুতীর্থ ঈষৎ মুখ ফাঁক করে হেসে বাগেশ্বরীর দিকে তাকাল—ভাবের আশ্চর্য ঈশ্বরীর দিকে? মণিকা মুখ চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে চুপ করেছিল। অনেকক্ষণ পরে সুতীর্থ বললে, 'আমাকেই ওরা প্রতিনিধি সাব্যস্ত করেছে—'

'মুখার্জির ওখানে মদের ব্যবস্থাও থাকবে?'

'তুমি গেলে মুখার্জি মদ খাবে না।'

'এসব স্ট্রাইকফাইক ব্যাপারের কিছু বুঝি না আমি. অ্যাডজুডিকেটরের সঙ্গে আমি কি কথা বলব।'

'তুমি যতক্ষণ থাকবে তোমার ইচ্ছে না হলে স্ট্রাইকের কথা বলব না আমরা—'

'তবে?'

'পৃথিবীর যে কোনো বিষয়ে তোমার রুচি আছে তাই নিয়ে কথাবার্তা হবে। বেশি কিছু বলবার ইচ্ছে না যদি থাকে তোমার, বসেই থাকবে না হয়, আমাদের কথা শুনবে।'

'তোমাদের কথা তো বেড়ালেও শোনে না—'

সোফার থেকে উঠে ঘরের মধ্যে পাইচারি করতে করতে সুতীর্থ বললে, 'চলো আমার সঙ্গে ওর এখানে;—দিনখন ঠিক করে নেয়া যাক।'

'তোমার মেয়েকে স্ত্রীকে নিয়ে যেও সুতীর্থ।'

'আমি বিয়ে করলে তো নিয়েই যেতুম আমার পরিবারকে।'

'তুমি বিয়ে করনি?'

'কবে করলুম?'

'এতদিন তো বলে আসছ তোমার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে—'

'পাশগাঁ বলে কোনো জায়গা আছে পৃথিবীতে?'

'নেই?'

'তুমি জান যে তা নেই।'

'নেই? মা, মেয়ে, স্ত্রী নেই?'

'নেই।'

'কিন্তু ছিল একদিন সব। আমরা যে জায়গার থেকে রওনা হই চলতে চলতে সে জায়গাতেই গিয়ে পৌঁছই আবার। পৃথিবীটা গোল বলে নয়—আমাদের সমস্ত আশা-ভরসা বাঁকিয়ে চলে বলে তো ভোগ করেছে—অনুভব করেছে সেই জায়গাতেই ফিরে আসতে চায়। তুমি সুমুখে তো চলেছ সুতীর্থ—কিন্তু ক্রমেই কাছে ঘনিয়ে আসছ ঃ যা দেখেছিলে বুঝেছিলে সেই সীতা—নাকি সেই সোনার সীতার দিকে।'

সুতীর্থ পায়চারি করতে করতে থেমে গিয়েছিল; আবার পায়চারি শুরু করে বললে, 'খুব আশ্চর্য কথা বলেছ তুমি। এরকম কথা সেকালের গ্রীসে সিবিলিয়া বলত। সফিংস বলত। ঈডিপাস ছাড়া কেউ সফিংসের হেঁয়ালির উত্তর দিতে পারেনি। তুমি যা বললে তার মানে বার করতে হলে অনেক দিন বসে চিন্তা করতে হবে।'

'কর চিন্তা।' মণিকা আস্তে আস্তে বললে।

'কিন্তু আমি কি ঈডিপাস?'

'তা তুমি জান।'

সুতীর্থ সোফায় এসে বসে যে সব বই অনেক আগে সে পড়েছিল, যে সব ছবি প্রতিনিয়তই চোখে এক সময় ভাসত তার, ইসকাইলাস সোফোক্লসের যে সমস্ত কোরাস প্রবহমান রোদমীর সবচেয়ে বড় বিশেষত্বের মত তার কানে ক্রন্দন করে বেজে উঠত, তার চিন্তা চেতনাকে প্রসূতি ও সুগভীরতা দান করতে এক সময় সেই সব কথা ভাবছিল। কোথায় থেকে সে কোথায় চলে এসেছে। অন্তরপীঠ ছেড়ে সে বাইরে এসেছে—বস্তু পৃথিবীর সঙ্গে একাত্ম হচ্ছে? সত্তার বেশি বিকাশ হচ্ছে তারা? বেশি সত্যকে পাচ্ছে সে? না তা নয়! বরং আগেকার সেই অধ্যয়ন ভাবনা সংকল্পনার পৃথিবীতেই বস্তুকে বুঝি পেয়েছিল সে—বস্তুর অবচ থেকে একেবারে অন্তিম উঁচু অব্দি সমস্ত নিরতিশয় বিকাশের ভেতর; বস্তুর উচ্চ, নীচ, নীচকে মনে রেখে উঁচু মর্মমঙ্গলা ভিত্তিই যে যথার্থ সত্য ও উপলব্ধিকে ধারণ করবার মত নির্মল ও নিবিদ আধার হিসেবে নিজের মনকে পেয়েছিল সে; এ মন নিয়ে এতদিন মহাভারতের বড় অব্যয় গল্পকার হয়ে উঠবার কথা তার, সোক্রোতেস, সোফোক্লেস ও প্লেটো আইনস্টাইনের বিমিশ্র এক আশ্চর্য আত্মা হয়ে উঠবার কথা। কি হয়েছে সে? কি বলছে? কি করছে?'

'যেতে হবে কখন?' জিজ্ঞেস করল মণিকা।

'কোথায়?' চারদিককার সময় ও পরিসরের ভাসমান বিশৃঙ্খলার ভেতর একজন নারী একটি কথা জিজ্ঞেস করেছে ওকে টের পেল সুতীর্থ যেন হঠাৎ।

'মুখুজ্যের ওখানে।' মণিকা বললে।

'যাবে তুমি?' একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সুতীর্থ।

সুতীর্থ উপলব্ধি করল যে আবার যেন সে ধুলোর পৃথিবীতে এসে পড়েছে; ধুলো কাদা রক্ত পৃথিবীকে জয় করে আলোর পৃথিবী বার করবার জন্যে কে তাকে বাছের বাছ মর্দ চিনে এনেছে। কোঁৎকা গাছে হেলান দিয়ে এই তালপাতার সেপাইগিরিই ভালো লাগছে তার, এই একটু আগের আশ্চর্য হিরণ মেঘগুলোকে উড়িয়ে দিয়ে মাটি পৃথিবীতে নেমে তিতু মীরের তাড়স লাভ করতে লাগল আস্তে আস্তে সে; মনে হয় স্বাভাবিকতা ফিরে পেয়েছে।

'হ্যাঁ, চলো মুখার্জির ওখানে, কি করবে, বেড়ালের পায়েও তো ধরতে হয়।' সুতীর্থ বললে।

'কেন?'

'গলায় কাঁটা ফোটে যদি বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়।'

'আমার গলায় কোথায় ফুটল?'

'আমার ফুটেছে।'

গয়ানাথ মালোর খুনের ব্যাপার নিয়ে স্ট্রাইক চালানো নিয়ে সুতীর্থের গলায় কাঁটা ফুটেছে; উপলব্ধি করছিল মণিকা; চৈতন তো সুতীর্থ; মুখুজ্যে হয়তো চৈতনকে বলেছে, মণিকা দেবীকে মুখুজ্যের রাতের বৈঠকে নিয়ে গেলে সুতীর্থের গলার কাঁটা বের করে দেবে সে। যাবে কি সে? চৈতন বটে—তবুও চৈতনকে ভালোবাসে মণিকা; ভালোবাসে কি সুতীর্থকে? সত্যিই গলায় কাঁটা ফুটেছে—তুলে দেবে কি মুখুজ্যে? কাঁটা তোলবার অন্য কোনো উপায় নেই? বেড়ালের পায়েই ধরতে হবে গিয়ে?

'কখন যেতে হবে মুখুজ্যের ওখানে?'

'রাতের বেলায়।'

'দিনে হয় না?'

'না, বড্ড ব্যস্ত থাকে সারাদিন। অনেক লোকজনের হল্লা। রত দশটা অব্দি নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পায় না।'

'কটা আন্দাজ যেতে হবে?'

'এই সাড়ে দশটা এগারোটা—'

'ফিরব কখন?'

'আড়াইটে তিনটের সময়—ওর গাড়ি নেই।'

মণিকার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আছে। নিজের অনুভূতিকে বিদ্যুতের বাহক বানালে রক্ষা নেই আজকের এই পৃথিবীতে। প্ররোচনা ও উত্তেজনার হাত এড়িয়ে, সৎ রসিকতার আশ্রয় নিয়ে কখনও কখনও বা নিজেরই স্থিরতায় সহিষ্ণুতায় শান্ত হয়ে থাকতে হবে—সিদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।

'তোমার সঙ্গে আমি যদি যাই মুখুজ্যের ওখানে যা চাচ্ছ পাবে তুমি সুতীর্থ?'

'গয়ানাথ মালোর ব্যাপার চাপা পড়ে যাবে। কথা দিয়েছে আমাকে মুখার্জি।'

'যে মানুষকে তুমি খুন করনি, খুন করেছে মুখুজ্যে, সেই ব্যাপারটা চাপা দেবার জন্যে তুমি দেবে ঘুষ?'

'তুমি তো ইতুপুজোর ঘট ভাসিয়ে দিয়ে কথা বললে, কিন্তু ব্যাপারটা কিরকম গড়িয়েছে দেখছ না—।'

'আমি কেন দেখতে যাব? আমি কে? আমি এ সবের ভেতর নেই তো।'

'নেই? মুখার্জিকে এখানেও ডেকে আনতে পারি। আনব? এ বাড়ির থেকে তুমি অবিশ্যি তাড়িয়ে দিয়েছিলে তাকে।' সুতীর্থ বললে।

সুতীর্থের কথার মর্মভেদী ছেলে-মানুষী শুনতে শুনতে আস্তে আস্তে চোখ বুজল মণিকা। কিন্তু বিষয়ই বিষ, বিষয় মাতায় মানুষকে, বিষয় নিয়ে মেতে দেখ, কেমন বড় গড়নের মানুষ কি রকম চিমসে হয়ে যায়—কি বলে, কি ভাবে, কি করে।

'এ-স্ট্রাইক আমার চালাতেই হবে। তুমি সাহায্য করলে ভালোই হত। হয়তো কুড়ি দফাতেই রাজি হয়ে যাবে মুখার্জি। কিংবা তুমি যদি আর কিছু বেশি খুশি করতে পার তাকে—'

মণিকা সোফায় এক কিনারে মাথা কাত করে চোখ বুজে ছিল। ধীরে ধীরে মুখ তুলে সুতীর্থকে স্বচ্ছ জিনিসের মত দৃষ্টি দিয়ে ভেদ করে দূরতর কোনো কিছুর দিকে যেন তাকিয়ে মণিকা বললে, 'খুশি করতে পারি যদি? কি দিয়ে?'

'বিরূপাক্ষকে কি দিয়ে করেছিলে অন্ধকারের ভেতর? আমি তো সেখানে ছিলুম না।'

কিছু যে করেনি, কিছু যে হয়নি, বিরূপাক্ষের ব্যাপারটা যে কিছু নয় সেটা খুব ভালো করে জেনেও সুতীর্থের রক্তে গোত্রান্তরের বিষ ঢুকেছে বলেই সে যা বললে সেই কথাটা বলা সম্ভব হল তার পক্ষে। কিন্তু নিজের রক্ত নির্মল—শুদ্ধ ছিল মণিকারও স্নিগ্ধ ছিল—ঠাণ্ডা ছিল; সে চুপ করে রইল।

'সেদিন সেই বেশি রাতের অন্ধকারের ভেতরে কি হয়েছিল—কিনা হয়েছিল তুমি হয়তো জান না, কিন্তু তোমার সুপ্ত শরীর জানে। এবারেও আধার—আধেয় নয়। তোমাকে নিজেকে কিছু জানতে হবে না।' বলতে বলতে বেরিয়ে গেল সুতীর্থ।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে সে দেখল মণিকা সেই জায়গাতেই সেইরকম ভাবেই কেমন যেন একটা সাদা নারী সারসের ছায়ার মতন নিঃশব্দ হয়ে বড়, গোল, রৌদ্র পরিবেষ্টনীর ভেতর বসে আছে।

'এখনও বসে আছ তুমি।' মণিকাকে বললে সুতীর্থ। মণিকার মুখোমুখি সোফায় বসে সুতীর্থ বললে, 'ছেড়ে দেব এসব। মল্লিকের কাছে যাব আজ—আমাদের ফার্মের। তাকে গিয়ে আমি বলব আমাকে কাজে বহাল করে নিতে। নেবে বলেই মনে হয়। না, যদি নেয় তাহলে কোনো একটা কলেজে ঢুকে পড়ব।'

'স্ট্রাইক হয়ে গেল।'

'যারা বড় লীডার ব্যক্তিকে নিয়ে তাদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। কিন্তু আমার মতন চুনোপুঁটির তো সব সময় স্ট্রেচার নিয়ে হাজির থাকবার কথা ঃ ওটা কে গেল? ইয়াসিন বুঝি, এটা? লছমন, আর ওটা বড়নাম সেটা মাকুরাম, এই লাসটা। পাঁচীর, ওটা খোকনার। কিন্তু মানবকে তরাতে গিয়ে মানুষগুলোকে গণ্যই করছি না আমি আজকাল। এটা খারাপ হচ্ছে। অবিশ্যি একটা বেশ ঘনিয়ে ফাটিয়ে বিপ্লব এলে কেই বা থাকবে ব্যক্তি, কোথায় থাকবে মানব। কিন্তু সেরকম বিপ্লবের একটা মাছিকেও তো উড়তে দেখা যাচ্ছে না এখনও; মিছে-মিছে তবে কতগুলো ঘরপোড়া গরু নাচিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে আজকের হাতের কাছের মানুষগুলোর দুঃখ দরদ সম্বন্ধে কাঠ হয়ে থাকলে চলবে কেন! বিনিময়ে সে বিপ্লবের উজ্জ্বল উপকারগুলো পাওয়া যাবে না।'

সুতীর্থ বললে, 'সত্যিই কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি। এই ধর্মঘটীদের বা তাদের জেনানাদের ছেলেপুলেদের দিনরাত্তির বস্তির দুঃখ-কষ্টের ওপরে চলে গেছি, যেন,—কিংবা নিচে তলিয়ে গেছি; সেখানে মানুষ মরলে বাঁচলে কিছু এসে যায় না, কিন্তু মানুষের ভালোর জন্যে চিন্তা—মানে ভাবনাগ্রন্থির সরসতাটা ঠিক থাকা চাই নিতান্তই নিজে চরিতার্থ করবার জন্যে। দেখলাম ও আমার ধাতে সয়না। হওয়া উচিত ছিল হয় তো অন্য কিছু, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি মানুষ আমি মানুষ, আমরা মানুষ মণিকা।'

সুতীর্থ চুরুট জ্বালাচ্ছিল—একটা দুটো তিনটে দেশলাই কাঠিতেও কিছু হল না।

'তুমি, গয়ানাথ। ইয়াসিন, হামিদ, মকবুল, বিশ্বম্ভর—সব—'

'তুমি নিজেও তো?'

হ্যাঁ, সে নিজেও তো ব্যক্তি মানুষ। চুরুট জ্বালিয়ে দিয়ে কিছু বললে না সুতীর্থ, যা বলবার একটু আগেই তা বলেছে।

'এদের সকলকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে? একথা যদি মনে করে থাক তুমি তা হলে থুক কেটে চলে যাবে বুঝি?' মণিকা বললে।

'হ্যাঁ, মানুষদের নিকেশ করে মানবতাকে মঙ্গল করবার মত ফরাসী রুশ বিপ্লবের নায়ক হবার সে দাবী আমার নেই, মহাত্মার অপর পথ আমি মোটেই ধ্যান-সাধ্য মনে করতে পারছি না। কোনো তৃতীয় পথ দেখছি না। মানুষ নিয়েই থাকতে হবে আমাকে। মানবতাকে এগিয়ে কিংবা তলিয়ে দেবার জন্যে লোহার কার্ত্তিকের দরকার কিংবা মায়া কাজলের ঃ লেনিন গান্ধী কল্কীর।'

একত্রিশ

দু তিন দিন পরে মণিকা সুতীর্থকে বল্লে, 'তোমার কোনো সুবিধে হত তোমার সঙ্গে আমি মুখুয্যের বাড়ি গেলে?'

'মনের এরকম অবস্থা নিয়ে তুমি ওসব জায়গায় যেওনা।'

'মনকে আমি তৈরি করে নিতে পারি।'

সুতীর্থ কাজে ব্যস্ত ছিল, বল্লে, 'আচ্ছা, আরেক সময়ে তোমার সঙ্গে এ নিয়ে কথা হবে।'

পরদিন মণিকা বল্লে, 'চাকরি ছেড়ে দিয়েছ?'

'ছেড়ে দিয়েছি, বলেইছি তো তোমাকে।'

'আর এটা?'

'স্ট্রাইক? হামিদের হাতে ছেড়ে দেব।'

'তারপর কি করবে তুমি?'

'কিছু টাকা হাতে আছে—কয়েকদিন লিখব পড়ব, ঘুরে বেড়াব, চিন্তা করব। এক সময় আমি আদি গ্রীকদের লেখা খুব পড়তুম আর আমাদের দেশের জীবন মনীষীদের; পড়তে হবে আবার এই সব। আজকাল অনেক নতুন বই বেরুচ্ছে ঃ দেখব কিছু কিছু নেড়ে; ফ্রয়েড ওপর ওপর পড়েছি, মার্ক্স দেখেছি, ফরাসী শিখছিলুম, বোদেলেয়র, ভিলোঁ, প্রুস্ত, ভার্লের ফরাসীতে পড়া দরকার। অনেক দিন হয় লেখা ছেড়ে দিয়েছি, কিছু লিখব।'

'তোমার লেখা পড়িনি আমি কোনোদিন।'

'পুরনো পাণ্ডুলিপি হাতের কাছে কিছু নেই। নতুন কিছু লিখলে শোনাব তোমাকে।'

'কোথায় যাচ্ছ? বেরুবার যোগাড় করছ তুমি?'

'বেলগাছিয়ায় যেতে হবে ঃ ক্ষেমেশ চৌধুরীর কাছে।

'সে কে?'

সুতীর্থ উঠে দাঁড়িয়েছিল; সোফার হাতলের ওপরে বসে বললে, 'বিরূপাক্ষ আর আসেনি এখানে?'

'এলেও পারত। আমি নিষেধ করিনি।'

'না এলেই তো ভালো হত।'

'সেটা যেদিন সে বুঝবে সেদিন আসবে না।'

'বুঝবে কি?'

'ও বুঝে ফেলেছে, সেই জন্যেই ভিড়ছে না আর। আসবে না আর। আমার কথাবার্তা হাবভাব মিষ্টি চারের মত জলের ভেতর ঝরে পড়েছিল। ও তো বোয়াল—গন্ধে গন্ধে টোপ খেতে এসে দেখল হ্যাঁচকা খাওয়ার মত কিছু নেই—মৃত্যু ছাড়া খাদ্য নেই—কেঁচোটা বঁড়শিতে গাঁথা।'

'কেঁচো কে?'

'ও যা চাচ্ছিল সেটা।'

'ন জিনিসকে ভিলো কেঁচো বলো না।' সুতীর্থ একটু হেসে বললে।

'ভিলোঁ কে?'

'একজন ফরাসী কবি।'

'ফরাসী কবিদের পড়া নেই আমার।'

'পড়লে পারতে ভিলোঁ অবিশ্যি যদি ফরাসী জানতে।'

'তুমি তো কেঁচো মনে কর?'

সুতীর্থ চুরুট টানছিল, কোনো উত্তর দিল না।

চুরুট নামিয়ে বললে, 'সেই দশ—বারো বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি যেন আবার—সেই গ্রীকদের, ফরাসীদের আমলের সেই নাবিকে, ও তার পরের সময়ের মনীষীদের, এই সেদিনকার বাংলার পটের আমলের পৃথিবীতেও—কিন্তু আগের চেয়ে খানিকটা বেশি অভিজ্ঞতা নিয়ে। আমার মনের একগুঁয়েমি—প্রাণের সেই এখন আর—মনটা জল, চিলের ডানা, আগুনের মত হয়ে উঠেছে।

'তুমি তো কেঁচো মনে কর জিনিসটাকে।'

'তা করি।' সুতীর্থ বললে।

'বিরূপাক্ষ টোপ খেতে এসে দেখল কেঁচোটা বঁড়শীতে গাঁথা। ঘুরে ফিরে ঘুরে ফিরে কানকো কাঁপিয়ে লেজ নেড়ে জল গিলে বুড়বুড়ি কেটে উপুড় চিত ফলিকাত প্যাঁচ কষে যখন দেখল কোনো ফয়সালা নেই, তখন ভুস করে বারো বাঁও জলে ডুব দিয়ে গেল বোয়ালটা।'

'এত বেশি জল ওর পৃথিবীতে?'

'বেশি টাকায় বেশি জল, বেশি তেল, বেশি হাঁসফাঁস; ও এক আশ্চর্য নিদেন পৃথিবীতে থাকে।'

'বিরূপাক্ষের স্ত্রী কোথায় গেছে? নিজেই তো বলছিল যে ছেড়ে গেছে না যাচ্ছে?'

'ক্ষেমেশ চৌধুরীর ওখানে আছে। বিরূপাক্ষ কাকে বিয়ে করেছে আমি জানতুম না। ক্ষেমেশ বললে জয়তীকে বিয়ে করেছে।'

সুতীর্থ চুরুটে দু-তিনটে টান দিয়ে বললে, 'আমি জয়তীকে চিনি।'

'বেলগাছিয়া থেকে কখন ফিরবে?'

'রাত হয়ে যাবে। নাও ফিরতে পারি।'

'তোমার ঘর সংসারের জন্যে একটা চাকর যোগাড় করবে না?'

'আমি টাকা দেব—আমার খাওয়ার ব্যবস্থাটা তোমাদের সঙ্গেই হোক।'

'কত দেবে?'

'যা চাও।'

'আজ রাতে ফিরবে? ফেরবার সময় একটা চেক আনতে পারবে?'

'কত টাকার।'

'চেক বই তো এখানেই আছে তোমার? ক্যাশ আনলেই ভালো হয়।'

সুতীর্থ একটু ভেবে বললে, 'এক্ষুনি পাঁচশো টাকা দিচ্ছি তোমাকে।'

সুতীর্থ ক্যাশ বাক্স খুলছিল; মণিকা বললে, 'এত টাকা পেলে কোথায়? ঘড়ি বিক্রি করে?'

'আমার উপায়ের কি অন্ত আছে; কাল আর পাঁচশো টাকা দেব।'

টাকাগুলো হাতে নিয়ে মণিকা বললে, 'কিন্তু ওদের ছেলেপুলেদের জেনানাদের কি ব্যবস্থা হবে?'

'এ নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাব না।'

'গয়ানাথ মালোকে যে মেরেছে সে তোমাকেও মেরেছে বটে।'

'হামিদ ইয়াসিন সত্যকিঙ্কর বিশ্বনাথ—লোক ঢের ভিড়ে গেছে ওদিকে। আমি কিছুদিন আত্মবিচারের—'

'আত্মবিচার—' মণিকা নদীর জলে কুল জলপাই পড়ার মতো এক ধরনের শব্দে হেসে বললে, 'ওটা বোধ হয় মনের অগোচরে পাপ—নাকি ধর্ম সুতীর্থ—অনেক দিন ধরে বাঙালীর ছেলেদের? তাহলে মুখুয্যেই জিতল। কত টাকা ঘুষ দিয়েছে তোমাকে?'

'সবই ক্যাশ বাক্সে আছে—খুলে দেখ।'

'আমাকে যে পাঁচ শো টাকা দিলে তাও তো ঘুষের টাকা?'

সিদ্ধার্থের মত গাম্ভীর্যে ও আন্তরিকতায় মাথা নেড়ে সারিপুত্রকে যেন বললে, 'না না, ও আলাদা টাকা।'

'কেন ঘুষ দিয়েছে তোমাকে? কেন ঘুষ খেলে?'

সুতীর্থ নেবা নেবা চুরুটটা ভালো করে জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'তোমার তাতে কি ক্ষতি হয়েছে? তোমাকে তো যেতে হচ্ছে না মুখার্জি সাহেবের ডিনারে।'

'কত টাকা দিয়েছে আপাতত?'

'পাঁচ হাজার। এ টাকার সঙ্গে তোমার যাওয়া-আসার কোনো সম্পর্ক নেই। তোমার কথা মুখার্জি কোনদিন বলেওনি আমাকে।'

'আমরা ভাবুকরা' সুতীর্থ বললে, 'কাজের মানুষদের মত সোজা মোটা পথে চলতে পারি না। এই স্ট্রাইকের ব্যাপারটা হাতে নিয়ে তোমাকেও জড়িয়ে নিতে চাচ্ছিলুম; থাকতে তুমি আমার সংগ্রামটাকে ঘিরে। কিন্তু মসলিন যারা তৈরি করত, যে সব রূপসীরা তা পরত কেউই অশুদ্ধ নয়—যাদের চোখ টাটাত সেই লোকগুলো ছাড়া। হয়তো আমাদের পৃথিবীই খারাপ—কোনো চিন্তা বা কাজের মিহি মসলিন জমিন এখানে স্বাভাবিক নয় তাই ভালো নয়, ঠিক নয়।'

মণিকা সুতীর্থের মুখের দিকে তাকিয়েছিল বটে, কিন্তু কথার দিকে নয়, কোনো কথা শুনেছে' বলে মনে হল না।

'কি হিসেবে ভাঙল স্ট্রাইক?'

'ভাঙেনি এখনও। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে মুখার্জি আমাকে সরিয়ে দিয়েছে।'

সুতীর্থ সোফায় বসেছিল উঠে গেল, চুরুট টানতে টানতে ফিরে এসে বললে, 'কোনটা চাকরির টাকা, কোনটা ব্যবসার আর কোনটাই বা ঘুষের সেকালের মানুষেরা টাকার ওপর একটা পাঁচনের বাড়ি মেরে সেটা ঠিক করে নিতে পারতেন। ঘুষের টাকাটা সরিয়ে রাখতেন তাঁরা মদ, মালাই ইত্যাদি সাঁইত্রিশ রকম মাধুরীর জন্যে। সে পাঁচন এখনও আমাদের আছে, কিন্তু পাঁচন দিয়ে টাকাব ওপর বাড়ি মারলে পাঁচন বলে যে সব টাকা ঘুষের আর জোচ্চোরির- -সব সব টাকা; রসের মালপো হবে—দেশ দশের পাল চরানো হবে এ টাকা দিয়ে; ইস্কুল-কলেজ সাহিত্য জ্ঞান জিজ্ঞাসা নিরীক্ষা—ও সব কোনো জিনিসই হবে না। ও সব জিনিস হয়ে গেছে—আর হবে না। এখন থেকে টাকা হবে শুধু—না হলে মানুষের মৃত্যু হবে।'

'সে টাকাটা নিলে তুমি?' মণিকা বললে। 'ঘুষ হিসেবে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

'ঘুষ ছাড়া টাকার চলাচল নেই : আজ কেউ কাডকে টাকা নিয়ে গুরুদক্ষিণা দেয় মণিকা?'

'কোথায় যাচ্ছ তুমি?'

'বেলগাছিয়ায়।'

খুব আস্তে আস্তে চাপা গলায় কথা বললে মণিকা মিনিট চাবেক; তারপর গলা খাকরি দিয়ে সহজ গলায় বলতে আরম্ভ করল। শুনে সুতীর্থ সাবধান হয়ে বললে, 'ওঃ—'

'কখন কি হয় বলা যেতে পারে না।'

'আমাকে আগে বলনি কেন তুমি?'

'না, না, এখন তখন কিছু নয় তবে বাড়িতে একজন পুরুষ মানুষের থাকা দরকার।'

সুতীর্থের চুরুট নিবে গিয়েছিল। জানালার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাতাস আসছিল; মাঘ শেষ হয়ে যাচ্ছে; অনেক দূরে পাড়াগাঁর পানবন খই মৌরীর ক্ষেত, রঙ বেরঙের পালক কলমী কাঞ্চন নতুন দুধ সোনামণি শরৎকালের ফুল চারদিককার চাঁদাকাঁটা কেয়াকাঁটা দল ঘাসের জল উচ্ছল করে উড়ে যাচ্ছে নীলের থেকে নীলের দিকে, রোদের থেকে মেঘের কণাকণিকার উজ্জ্বলতা ভেদ করে কোন দিগন্তের মাতৃগণের দিকে ফাল্গুনের বাতাস। এদিকে ট্রাম লাইন চকচক করে উঠছে, কোনো ট্রাম নেই, ফুটপাথে চীৎকার করে উঠছে গাধাটা; গায় তার একজন ইমানদার নেতার নাম চক দিয়ে লিখে গিয়েছে কে যেন, রাস্তায় জিলিপি কচুরি ছড়িয়ে পড়ল ছোট ছেলেটার ঠোঙায়

চিলে ছোঁ মেরে গেছে বলে, সামনের লাল রঙের বাড়িটার ছাদে সাদা সাদা জামা কাপড় উড়ে পড়ছে; ছাদের দড়িতে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল সব, ইলেকট্রিক তার কাঁপছে, পাশের বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠল, কি একটা আশ্চর্য সম্ভাবনা আছে যেন; ঘোড়েল নেতাটির নাম পিঠে জাঁকিয়ে গাধাটা হাঁকড়াচ্ছে আবার, যেন নামটা মুছে না দিলে বেচারী ককিয়ে কূল পাবে না আর। বেঘোর হুল্লোড় ফাল্গুনের বাতাস উড়ে এসে পড়ছে মণিকার চোখে চুলে, সুতীর্থের দেশলাইয়ের আগুনে, যে ট্রামটা হুস করে ছুটে গেল তার আগে কোথায় উধাও হয়ে চলে গেল—থেমে গেল বাতাস। পর মুহূর্তেই ফিরে এল আবার।

সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল তার দেশলাইয়ে শুধু একটা কাঠি আছে। ঘরের দরজা জানালা সবই বন্ধ করে দিতে লাগল সে তাই।

চোখ বুজে কুমারী মেয়ের ধ্যানের মত শান্তিতে বসেছিল মণিকা। শীত প্রথম যখন আসে দেশে তেমনই একটা আশা আমেজ চমকিত ভাবে টের পাওয়া যায় শীত প্রথম যখন ছেড়ে যায় দেশ থেকে?

অন্ধকারের ভেতর দেশলাইটা জ্বলে উঠল সুতীর্থের; আগুনের ধ্বকে লাল হয়ে উঠতে লাগল চুরুটের মুখ। ভালো করে চুরুট জ্বলে উঠলে দরজা জানালা খুলে দিতে দিতে সুতীর্থ বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?'

'না।'

'মনে হচ্ছিল ঘুমোচ্ছ।'

মণিকা সেন স্বর্গের থেকে হারিয়ে স্বর্গে ফিরে এসেছে, এমনই চোখে সুতীর্থের দিকে একবার তাকিয়েই ওপরে চলে গেল।

নাঃ, বেলগাছিয়ায় যাওয়া হবে না আজ আর। সুতীর্থ ঘন্টাখানেক পরে খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে একটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই নিয়ে বসল, তারপরে একটা ইকনমিকসের—একটা উপন্যাস টেনে নিল—একটা চিঠি লিখতে চেষ্টা করল—কিন্তু কাকে?

একটা দীর্ঘ কবিতা ফেঁদে বসল—কিন্তু কেন?—ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুই হল না তার।

স্ট্রাইক অনেক দূরে কাঁদছিল। মণিকা তেতলার ঘরে নাক ডাকাচ্ছিল।

কয়েকদিন পরে ক্ষেমেশের বেলগাছিয়ার বাড়িতে আকাশে বাতাসে পাখির পালকে সকালবেলায় রোদ এসে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সুতীর্থ গিয়ে পৌঁছল।

'এই যে তুমি এসেছ সুতীর্থ—বোস—বোস—'

'আমি তোমার চেয়ে পনেরো বছরের বড় ক্ষেমেশ—'

'তাই কি? আমি তো ভেবেছিলুম, তুমি আর আমি শিবের গুরু রাম'—ক্ষেমেশ একটু তেরচা কাম্নিক মেরে বললে, 'রামের গুরু শিব।'

'তুমি আমাকে সুতীর্থ বলে ডাকবে আমার চেয়ে এত ছোট হয়ে, তা ডেকো। আমাকে সেদিন তুমি বলেছিলে বেলগাছিয়ার এই বাড়িতে আছে—নিরিবিলিতে—এর বেশি কোনো দাবি তোমার নেই, চাকরি-বাকরি করবার দরকার নেই, অবসর আছে, রোদ পাখি মাটি ঘাসের কোলে সময় কেটে যায়; এমনি নির্লিপ্ত নিকাজের ভেতর দিয়ে যদি মৃত্যুর দিন পর্যন্ত চলে যাওয়া যায়—শান্তিতে—তা হলে আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই তোমার—বলেছিলে—'

'এর চেয়ে বেশি সাধ কার আছে?'

'সকলেরি প্রায়—তোমার মত দু-একজন ছাড়া।'

'থাকা কি উচিত?'

'সুতীর্থ গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে আকাশের নীল ফিকে ধূসরতার দিকে তাকিয়ে বললে, 'এ তো থিসিয়ূসের এথেনস নয়—এমন কি পট এঁকেছিল যে খুশি মানুষেরা আমাদের দেশে—সে দিনও নেই। তুমি দেখছ তো কি রকম পৃথিবীতে আছ। তোমার বাবার বাড়ি ব্যাঙ্কের টাকা আকাশ আলো পাখি ফড়িঙের ভেতর ঘুরে ফিরে জীবন কাটানো খারাপ নয়। খারপ নয়, খুব ভালো। কিন্তু চারিদিকের পৃথিবী এমনই বেয়াড়া যে এ রকমভাবে মৌচুষকির নীড় বানিয়ে শান্তি চর্চা করতে দেবে না তোমাকে—'

'কি করবে? নীড় ভেঙে দেবে?'

'শীগগিরই। এখুনি তো ভেঙে পড়ছে—'

'ভেঙে পড়ছে, আমি টের পাচ্ছি না তো।'

'এক আধটা পাখি থাকে, তাদের বাসার থেকে ডিম চুরি গেলে কিংবা পিছলে মাটিতে পড়ে ভেঙে গেলেও টের পায় না।'

'কি ভেঙে যাচ্ছে আমার?'

'এই তো আমিই এসে তোমার মনের শান্তি নষ্ট করে দিচ্ছি। আমার মতন আরো অনেকে অনেক দিন থেকে তোমার পেছনে লেগে আছে। ভবিষ্যতে আমরা সবাই মিলে এমন দল বেঁধে আসব যে এখন থেকেই নিজেকে যদি তুমি তৈরি করে না নাও বড় অঘটন হবে তোমাব।'

'অঘটন? মরে যেতে হবে?'

'মরে যাওয়া সহজ জিনিস যদি শান্তিতে মরা যায়। কিন্তু খুব অশান্তিতে মরতে হবে। কত ভালো মানুষ রুশ বিপ্লবে জার্মানীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে মরেছে, আমরা বাঙালীরা মন্বন্তরে যাচ্ছি। খুব খারাপ। কিন্তু এর চেয়েও সব বিকট রকমের মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে চারদিক থেকে। এদিকেও আসবে।'

সুতীর্থ পকেট থেকে চুরুট বাব করে জ্বালিয়ে নিল।

'ফেরারি যদি না হতে চাও তা হলে মানুষেব ভেতর মিশে যেতে হবে তোমার, গঠন করতে হবে? একদিকে বিরূপাক্ষের মতন ভাম আর একদিকে তোমার মতন খরগোশকে দেখে সুন্দরবনের পরীবা তামাশা বোধ করতে পারে, কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে গুলি খেয়ে মরতে হবে তোমাদের—'

'ভামটাকে মারা কঠিন।'

'কেন?'

'কি করে মারবে তুমি নিজেকে?'

'তা হবে। কিন্তু তুমি তো খরগোশ।'

'তা হবে। কিন্তু খুব লম্বা কান নেড়ে নেড়ে কথা বলছ তুমি আজ সকালবেলা থেকে ধোপাবাড়ির ছাঁদন দড়িটা গলায় ঝুলিয়ে। তুমি তো এ রকম ছিলে না। রুচি বিকার হয়েছে তোমার; চরিত্রে বিকার দেখা দিয়েছে। আমাকে গুলি করবার কথা বলছিলে তুমি—'

'হ্যাঁ বলেছিলুম—'

'নিজের হাতে করবে?'

'দরকার হলে করব।'

'তোমার চাকর কাকে গুলি করবে?'

'আমার চাকর নেই—'

'আমার আছে। আমার কুকুরও আছে কিন্তু আমার কুকুরও আমার গুণীমানী বন্ধুকে গুলি কবতে লজ্জা বোধ করে।'

'কুকুরটা আশ্রমে থাকে বুঝি? মোহনভোগ খায়?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পূর্বাশ্রমের কথা আমাকে বলতে চায় না তোমার কাছেও ঘেঁষে না; কি ছিলে তুমি ওর? শুনেছি খুব মিষ্টি সম্বন্ধ ছিল নাকি?'

'ও যতদিন বাচ্চা ছিল ততদিন ছিল; একটু সোমত্থ হতেই তোমার ওখানে পাঠিয়ে দিয়েছি ক্ষেমেশ—'

নরম, স্নিগ্ধ গলায় বলেছিল সুতীর্থ; গলায় আরো আন্তরিক আকুতি এসে পড়ল; সুতীর্থ বললে, 'এটা তোমার বাড়ি ছিল একদিন, এখন আমার বাড়ি। আমি যাদের থাকতে বলব এখানে তাদের বাড়ি। এখানে ছ হাজার লোক অনায়াসেই থাকতে পাবে। কলকাতার পথে ঘাটে ফুটপাথে ভাগাড়ে লেজ খসবার আগে ব্যাঙাচির মত কাতরাচ্ছে তারা। এইখানে জায়গা দিতে হবে তাদের'— সুতীর্থ বললে।

'দেখ। পুলিশ কমিশনার কি বলে?'

'পুলিশ কমিশনারের দোহাই দিচ্ছ?'

'দেখ। মন্ত্রীরা কি বলে—'

'মন্ত্রীরা?'—

'জনসাধারণের প্রতিনিধি তো তারা।'

'বাড়ি রেকুইজিশনের অফিসার হিসেবে আমি আসিনি ক্ষেমেশ।'

'এসেছ স্বাধীনভাবে, কিন্তু শাসন কর্তাদের ডিঙিয়ে তো কিছু করতে পারবে না। কলকাতার প্রায় সব লোকই তো আজ সাদা দাঁত কেলিয়ে ঘোড়া হয়ে গেছে—ছ্যাকড়া গাড়ির। দিত রাত ছুটছে—নাদছে—কর্পোরেশনেব চামচ দিয়ে শায়েস্তা করতে পারছে কি ঘোড়ার নাদগুলো ঝাড়ুদার? কর্পোরেশন ভেঙে পড়ছে—দানা পাচ্ছে না ঘোড়াগুলো। আমার বাড়িতে তো ঢের ঘাস, কিন্তু রি-হ্যাবিলিটেশন অফিসারকে ডিঙিয়ে ঘাস পাবে সেই ঘোড়াগুলো? কই, নোলা দেখা যাচ্ছে না তো সে সব ঘোড়ার। আসুক না অফিসার সাহেবের সার্টিফিকেট নিয়ে। আমি বাড়ি ছেড়ে দিয়ে দেহাতে চলে যাব—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে চুরুটের মুখে বেশ অনেকখানি ছাই জমিয়ে ফেলেছে; চুপ করে বসেছিল সে, কোনো কথা বললে না।

'তুমি উদমহরের ঘোড়ার মত এসে দাবনা ঝাপটালে কি হবে সুতীর্থ—তোমার ডমফাই ঘোড়ারা কোথায়? পথে পথে না চেঁচিয়ে না নেদে, দলঘাস আর বুটের বদলে হাওয়া না চিবিয়ে সমস্ত ঘোড়াগুলো যদি একটা নিদারুণ হ্রেষাগর্জনে জেগে উঠত, তা হলে বেছে বে‍ে আমাকে এসে গুলি করতে চাইতে না তুমি, কাদের গুলি খেয়ে তুমি নিজেই লাট মেরে পড়ে থাকতে ভেবে দেখেছ নিশ্চয়ই। তুমি বোকা বলেই আজ সকালবেলা আমার বেলগাছিয়ার বাড়িতে এসে লেজ নাড়ছ। তোমার মাথায় আগে ঢের জিনিস ছিল সুতীর্থ—কিন্তু আজকাল এই রকম হয়ে যাচ্ছ? যারা কাজের মানুষ তারা অন্য জায়গায় অন্যভাবে কাজ করছে।'

'রক্ত ছাড়া বিপ্লব করতে পারলে খুব ভালো হত। কিন্তু সে রুচি বা হজম শক্তি এখনও লাভ করেনি তো মানুষ।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিতে নিতে বাতাসে বাতাসে কয়েকটা কাঠি পুড়ে গেল—বাতাস থেমে গেলে বললে, 'কিন্তু কিই বা হবে রক্ত বিপ্লব করে। অনেকবার তো সে সব করা হল। কিছু হল না তো। ফরাসী বিপ্লব, রুশ বিপ্লব, স্পেন চীনের বড় বড় বিপ্লব সব এল গেল—কিন্তু কোনো দিকনিরূপণ মন পরিবর্তন হল না তো মানুষের। আরো খারাপ হল তো। এর চেয়ে আগেকার পৃথিবী ঢের ভালো ছিল ঃ লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙ যুগের চীন, অশোক চক্র, হোয়েন সঙ ফা হিয়েন শ্রীজ্ঞানের ভারত আরো আগেকার স্নিগ্ধ ভাত কাপড়ের, মিহি চেতনার মহৎ চিন্তার ভারতবর্ষ থিসিয়ুস পেরিক্লিসের গ্রীস—মানুষ তখন পৃথিবীর আকাশ বাতাস আলোতেই খেলা করত, কাজ করত, কথা

ভাবত; মাটি খুঁড়ে ইঁদুর ছুঁচো শেয়াল ভোঁদড়ের মত থাকবার দরকার হয়নি তো তার মারণ শিল্পের ভয়ে।'

'হ্যাঁ, মৃত্যুশিল্পী হয়ে দাঁড়াল মানুষ, ভয়ের আকর সে শিল্প বটে সুতীর্থ, কিন্তু তবুও পরস্পরের ভয়। মারণশিল্প খারিজ করলেও মানুষকে মাটি খুঁড়ে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে মানুষেরি ভয়ে—' ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার চুরুটটা বড্ড কড়া সুতীর্থ; অত ধোঁয়া ছেড়ো না; গ্যাঁজা না কি?'

'মিঠে গ্যাঁজা; কড়া বলেই মিঠে।'

'চা খাবে?'

'দাও—নেবুর রস দিয়ে।'

'রঞ্জন এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি হয়তো। উঠলে চা হবে। একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

'রঞ্জন কে?'

'আমার চাকর।'

'এত বেলা অব্দি ঘুমুচ্ছে যে?'

'রাত্তু জাগতে হয়।'

'তুমি তো একা মানুষ। অনেক রাত অব্দি জাগিয়ে রাখ চাকরকে?'

'না, তা নয়। ও রোজই প্রায় সিনেমা-থিয়েটার যায়! ন'টার শোতে যায়। ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া করে। আমি অবিশ্যি আগেই খেয়ে নিই। ও এসে গান গায়, গাজন গায়, ডালপাতায় পিরভু কাঁপে দেখে, তারাবনের তারা দেখে রাতের আকাশে, শিস্তাইয়ের কথা ভাবে—'

'শিস্তাই কে?'

'ওর আছে একজন। রাঁঢ় বলে ও। মেয়েটা বাঙালি নয়, বেহারীও নয় ঠিক—'

'যায় তার কাছে?'

'যায়, সে আসে; প্রায়ই তো।'

বত্রিশ

'ও, এই সব বুঝি? এই সব রকমারি বুঝি?'

'এই হচ্ছে একরকম—'

'তা, এর চেয়েও ভালো হবে। সবুর কর না তুমি।'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'এই যা হচ্ছে একেবারে তটের ওপর দিয়ে নৌকো চালিয়ে নিতে পারবে।'

'আমি নিজে সিনেমা থিয়েটারে যাই না, ও যায়, আমি টিকিটের পয়সা দিই; সীজন টিকিট কিনে দিই ওকে নাচগান জলসা আসরে মজলিস দেখবার জন্যে—'

সুতীর্থ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে—পরে গম্ভীর হয়ে বললে, 'যেখানে তোমার অন্তত একটা নাইট স্কুল খোলা উচিত তোমার বাড়িতে সেখানে তুমি এই সব করছ, ক্ষেমেশ—রঞ্জনকে নিয়ে। সেকালে কলকাতার বনেদী ঘরের বাবুরা বেড়ালের সঙ্গে বেড়ালের বিয়ে দিত খুব ঘটা করে। তুমিও তাই-ই করছ দেখছি। রক্তটা রয়ে গেছে এখনও তোমায় নাড়ে—'

সুতীর্থের বুদ্ধিবিবেকের দৌড়ে কেমন যেন তামাশা অনুভব করছিল ক্ষেমেশ, ক্লান্ত লাগছিল, করুণা বোধ করে বললে, 'মিছেই তুমি কথা বলছ সুতীর্থ! রঞ্জন তুচ্ছ, ছোটলোক মানুষ হতে পারে, কিন্তু তাই বলে শখ থাকবে না তার?'

'থাকবে বই কি। শখ না থাকলে বেঁচে থেকে লাভ কি। আমার তো মাঝে মাঝে শখ হয় রাশিয়ায় আবার জারের এলেম ফিরিয়ে আনি—'

'স্ট্যালিনই তো জার—'

'খাঁটি জার নয়। ইচ্ছে করে আমি জার হই, রাসপুটিন হয়ে মেয়েদের নিয়ে ফূর্তি করি, এদের সকলকে রুখবার জন্যে হয়ে দাঁড়াই লেনিন, চার্চিল হয়ে বলশেভিক শায়েস্তা করি, রুজভেল্ট ট্রুম্যান হয়ে শাঁখের করাতে কেটে ফেলি চার্চিলকে ইংরেজদের—এই সবই তো শখ, কিন্তু কিছুই তো হচ্ছে না;—কিন্তু এইবার হবে, শখের খিদমতদারদের সঙ্গে আমার বেশ লাটকাচ্ছে—'

জয়তী কখন ঘরের ভেতর ঢুকেছিল সুতীর্থ দেখেনি। ঘরের ভেতরে সোফা সেটি কৌচে কুশনেব ঠাসাঠাসি; এরই একটায় গিয়ে বসেছিল জযতী। সুতীর্থ ঘাড় কাত করে অন্য দিকে তাকিয়েছিল, জয়তীকে দেখল না; সুতীর্থের থেকে খানিকটা দূরে—আড়াআড়িভাবে—একটু পিছিয়ে বসেছিল জয়তী।

'খুব বেশি কথা বলা অভ্যেস নয় তোমাব—' জয়তী বললে। ঘরে যে আরেকজন লোক এসেছে বুঝল সুতীর্থ। কিন্তু জয়তীর দিকে মুখ না ফিবিয়ে যেমনিভাবে জানালার ভিতর দিয়ে আকাশ পাতা পালক আলোর দিকে তাকিয়ে ছিল তেমনিভাবে চেয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'বেশি কথা বলছি আজকাল। কম কাজ করছি—'

'বাটখারাটাকে টায়টোয রাখতে পেরেছ তাই!'

'হ্যাঁ। তুমি বেশি কাজের বহব দেখতে চাও জযতী?'

'তোমার তরফ থেকে? আমাকে দেখিয়ে লাভ কি?'

'জযতী বললে, কি কাজ করছ তুমি আজকাল?'

'কিচ্ছু না।'

'দেশের কাজ করছ?'

'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে।'

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি—আমি—খানিকটা নিরাশ হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে।' জয়তী একটু হেসে বললে। গালে টোল পড়তে না পড়তেই হাসি ফুরিয়ে গেল তার।

'স্বাধীনতা এল—অথচ তুমি আমি আমরা ভেল্কি লাগাতে পেরেছি বলে এল না। এল কতকগুলো লোক প্রাণপাত কবেছে বলে। স্বাধীনতাব জন্যে যাবা লড়েছে তারা অনেকেই আজ মৃত। দেশ দু ভাগ হয়ে যাবে খুব সম্ভব। স্বাধীন গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে মুনাফা পাবে—আজ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে তারাই মোটা মাইনে ও বড় বড় সিধে পাচ্ছে। দেশ যতদিন অধীন ছিল এরা ব্রিটিশদের যেমন রাজভক্তি দেখিয়ে এসেছে—দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীনতা নিয়ে এরা ঠিক তেমনই মাতামাতি করবে। স্বাধীনতা ও তার নিয়মানুগত্য নিয়ে এদের মাতামাতির কেলেঙ্কারিতে কোনো ভদ্রলোক রাস্তায় মুখ দেখাতে পারবে না আর।'

'এই সব হবে?' জয়তী বললে।

'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি।'

স্বাধীনতা তো উনিশ শো আটচল্লিশের জুনে আসবে।'

'শুনেছি আগেই আসবে—সাতচল্লিশের আগস্টেই', ক্ষেমেশ বললে।

'কে বলেছে তোমাকে ক্ষেমেশ?'

'আমি খবরের কাগজ পড়ি না, তবুও আমার কানে আসে।'

'তাহলে এ বছরই আসছে স্বাধীনতা? সুতীর্থ?'

'আসছে। জওয়ার ক্ষেতের থেকে পাখি তাড়িয়ে দিচ্ছে নাকি নেতারা।'

'তোমার নিরাশার একটা কারণ হচ্ছে এ স্বাধীনতায় তোমার কোনো লেনদেন নেই; পাচ্ছ

অথচ দাওনি কিছু; এই তো বলতে চাও তুমি? কিন্তু আমাদের কারুরই কোনো দান নেই। ক্ষেমেশের আছে? নেই। আমার নেই। কোটি কোটি লোকের নেই। তাই বলে যারা এ জিনিস সম্ভব করে তুলেছে তাদের ধন্যবাদ জানিয়ে খুব কৃতার্থ তো আমরা।'

'জয়তী সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে বললে, 'স্বাধীনতায় তোমার কোনো দান নেই? কিন্তু তুমি তো কয়েকবার জেলে গিয়েছ সুতীর্থ?'

'শখের জেলে যাওয়া। কোনোদিন পিস্তল না ধরেই জেলে গিয়েছি আমি।'

'গিয়েছ তো। উদ্দেশ্যও মারাত্মক ছিল তো?'

'শুধু উদ্দেশ্য দিয়েই কি আমাদের যাচাই হবে ক্ষেমেশ?' সুতীর্থ জিজ্ঞেস করল।

'ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ওরকমভাবে যাচাই করত, তা হলে মুনিদের মধ্যে বেছে বেছে জরৎকারু মুনি আমার বেলগাছিয়ায় বাড়িতে এরকম ঢুকে পড়তে পারত কি আজ?' ক্ষেমেশ বললে সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে; 'পনেরো কুড়ি বছর আগে খতম হয়ে যেতে।'

'দিশী সরকারও অগাধ জলের মীন নিয়ে মাথা ঘামাবে না--তাদের অনেক সরকারী শহীদ আছে।'

'শহীদ হতে চায়নি কোনোদিন,' জয়তী বললে. 'হতেও পারল না, সেইজন্যেই তো ক্ষেমেশ খুব স্বাধীনতা বোধ করছে।'

'হ্যাঁ, তুমি আমি বিরূপাক্ষ—আমাদের এইরকম ধাত জয়তী। আমরা গোড়ার থেকেই স্বাধীন —সবরকম ফসকা গেরোর পায়জামায় ঃ—পাঁচ দরজিতে মিলে আমাদের কি আর নতুন স্বাধীনতা দেবে।'

'সাতচল্লিশের আগস্টে স্বাধীনতা আসছে তুমি তো বললে ক্ষেমেশ।'

'সেইরকমই শুনেছি আমি।'

সুতীর্থ বললে, 'প্রফুল্ল চাকী, সত্যেন কানাইলালের মত শহীদ হতে চেয়েছিলুম আমি, কে তোমাকে বলেছে জয়তী? ঘোষ কতবার আমাকে পিস্তল দিতে চেয়েছিল—সেই বারীন-অরবিন্দদের সময়ের কথা—মহাত্মা গান্ধীর নামও শোনেনি কেউ তখন—কিন্তু আমি কিছুতেই পিস্তল নিলুম না। কিছুতেই মন উঠল না আমার। ওরকম ধরনের পিস্তলের বিপ্লবের জন্য কোনো স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করতে পারিনি। আশ্চর্য পিস্তল না ছুঁড়ে দু-চারটে সাহেব না মেরে দেশ কি করে স্বাধীন করতে পারা যায় সে কথা ভাবতেই পারত না কেউ তখন। এমনই, একটা দুর্বার সন্তাপ ছিল—এত মুখিয়ে চলছিল সব যে, কেউই না ভেবেই পারত না যে, দু-চারশটা পুলিস জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের (চা-বাগানের ক্লাইভ স্ট্রীটের বা মিলিটারির সাহেবদের কে চায় কে পায় এইরকম ভাব) খুনের সরগরম পথেই স্বাধীনতার রণপায়ে ছুটে আসবার কথা। কিন্তু তবুও আমি পিস্তলের—অপূর্ব—জেল্লা—স্বীকার করতে পারিনি সেই দিনও।'

'তারপরে পেরেছ?'

'না।'

'কোনোদিন পারবে না আর?'

'সে কথা বলতে পারছি না এখন।'

'তখন তোমার বয়স কত?'

'সাত আট।'

'এত অল্প বয়সে এসবের ভেতর জড়িয়ে পড়েছিলে?'

'আমার বাড়ন্ত গড়ন ছিল; তেরো চোদ্দ বছরের ছেলের মত দেখাত আমাকে। বারীন ঘোষ তো তাই মনে করেছিল। আমি পিস্তল সরবরাহ করতুম। নানারকম জায়গা থেকে চুরি বাটপাড়ি, মাঝে মাঝে জবরদস্তি করেও পিস্তল যোগাড় করতে হয়েছে। ভারী জিনিস তো পিস্তল। বেশ গায়ে

জোর ছিল তখন আমার এক একটা ধু-ধু ফাঁকা জায়গার চখাচখীর ধানী জমিতে গলায় দড়ির মাঠে বৌবাতাসির চরে গাছগাছালি চাঁদমারি তাক করে পিস্তল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বেশ হাত পাকিয়ে নিয়েছিলুম। কিন্তু তবুও কোনো প্রাণী মারিনি, মানুষ খুন করিনি। যেসব ইংরেজরা তখন আমাদের দেশ শাসন করতে আসত, তাদের দু-চারজনকে মেরে গভর্নমেন্টকে তরাসে বানিয়ে দিয়ে কিছু ধকল হয় বটে—কিন্তু যুদ্ধ না করে, স্বাধীনতা পাওয়া অসম্ভব এই আমার ধারণা ছিল—'

'এই ধারণার জোরে সুতীর্থ শহীদ হতে পারল না আর,' ক্ষেমেশ সরতে সরতে লম্বা সোফাটার কিনারে সরে গিয়ে বললে, 'দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে কিন্তু সরকারী শহীদদের ভেতর সুতীর্থের নাম নেই।'

'কাদের নাম আছে সেখানে?'

'প্রায় সবারই আছে—অনেক পর্ব—অনেক পর্যায়—তোমাকে দেখাব জয়তী একদিন।' ক্ষেমেশ বললে।

'শহীদদের অনেকেই তো মরে গেছে—' জয়তী বললে।

'সকলেই', একটা সিগারেট জ্বালিয়ে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'মেরে মরা চাই, না হলে শহীদ হয় না কখনো—'

'কেন, বারীন ঘোষ তো বেঁচে আছেন, উল্লাসকর আছেন। অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, অম্বিকা চক্রবর্তী আছেন। শহীদ কাকে বলে সুতীর্থ?' জিজ্ঞেস করল জয়তী।

'খুব সম্ভব অধীন দেশে যারা দেশের প্রভুভক্তদের নষ্ট করবার জন্যে লড়াই করে মরে, কিংবা বেঁচে থাকে, মরে বেঁচে থাকে—তাদের শহীদ বলে। যেসব শহীদ মরে গেছে দেশ স্বাধীন হলে তাদের লিস্টি তৈরি করা হয়—খুব ভালো করে চেক করা হয় যাতে কারুর নাম বাদ না পড়ে; পুরোপুরি তালিকা তৈরি হলে তাদের ফোটো, ছবি, অস্থি পাওয়া গেলে অস্থি চিতের ছাই এটা-ওটা সংগ্রহ করা হয়। সভাসমিতি মিছিল-টিছিল বেশ জাঁকিয়ে তুলতে পারা যায় শহীদদের নিয়ে। স্বাধীনতা পেলে আমাদের দিশী সরকার তাই করবে মনে হচ্ছে।

'বেশ আঁটঘাট বেঁধে করবে সব; দেখে আমাদের খুব ভালো লাগবে।' ক্ষেমেশ বললে।

'কিন্তু যেসব শহীদ বেঁচে আছে তাদের সম্বন্ধে কি হয়?' জয়তী বললে, 'তাদের নাম লিস্টিতে থাকে খুব সম্ভব। থাকে না ক্ষেমেশ?'

'তা তো তুমি জানো সুতীর্থ। নেই তোমার নাম লিস্টিতে?'

সুতীর্থ জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তাদের নামও থাকে, কিন্তু তারা বেঁচে আছে বলে দেশ তাদের সম্বন্ধে খানিকটা চক্ষুলজ্জা বোধ করে—দেশের জন্য রিভলবার হাতে লড়েছিল এইসব শহীদরা; দেশ তো স্বাধীন হচ্ছে; এসব শহীদরাও বেঁচে আছে। বেঁচে থেকে কি করছে? ঘিয়ের ব্যবসা করছে; কিংবা পুরানো ক্যানেস্তারা বিক্রির কাজ; করুক; মরে যাবে তো একদিন। তারপর সব হবে।'

সুতীর্থ চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'শহীদ কাকে বলে জিজ্ঞেস করছিলে জয়তী। এইসব লোকদের শহীদ বলে।'

'তা হলে ভারী বিচিত্র তো।'

জয়তীর কথা কানে গেল না সুতীর্থের চুরুট টানতে টানতে নিজের কথার জের টেনে সুতীর্থ বললে, 'এরা শহীদ।'

'শহীদের লিস্টিতে তোমার নাম নেই সুতীর্থ?'

'না।' সুতীর্থ বললে।

জয়তী বললে, 'নেই কেন? তুমি তো কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে লড়াই করছ। কয়েকবার জেলে গেলে—দমদম সেন্ট্রাল জেলে ছিলে—প্রেসিডেন্সি জেলে ছিলে—হিজলী ক্যাম্পে ছিলে—বক্সার ক্যাম্পে ছিলে—'

সুতীর্থ চুরুট টানতে টানতে বললে, 'আমি নিজের মনের খুশিতে লড়াই করেছি, ওরা ভালো বুঝে আমাকে জেলে দিয়েছে। রিভলবার চুরি করেছি, পৌঁছে দিয়েছি ঢের, কিন্তু রিভলভার উঁচিয়ে মানুষ মারি নি, চেষ্টাও করিনি। তখনকার সেসব দিনে যে কিরকম দিনকাল ছিল তা তুমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারবে না। পিপাসা পেলে আমরা জল খাই, ঠিক সে রকমভাবে চোঁ চোঁ বোমা পিস্তল ছুটত তখন। পিপাসায় ওদের গলা শুকিয়ে কাঠ হত, অথচ আমার কোনো তেষ্টা নেই—এক ফোঁটা জল খাওয়া নেই তখন। বোমা চালান দিচ্ছি, রিভলভার যোগান দিচ্ছি খুব সাত্ত্বিকভাবে, কাউকে মারছি না দেখেশুনে ষড়যন্ত্রীদের ভেতরে কেউ কেউ আমাকে মারতে চেষ্টা করেছিল, আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিনি বিশেষ কিছু, কিন্তু তবুও তো বেঁচে আছি আজ পর্যন্ত—

সুতীর্থ চুরুটের দিকে মন দিল, বার কয়েক টেনে জয়তীকে বললে, 'কেন মরিনি—কেন মরিনি—এতগুলো বছব নিশির ডাকের ভেতর দিয়ে বারীন ঘোষের আমল থেকে বিনয় বোস দীনেশ গুপ্তদের চাটগাঁ আর্মারি রেড—তাবপর গান্ধীজীর—তোমরা তো সোদপুর নোয়াখালির কথা বলবে—আমি বলছি সেই অদ্ভুত ডাণ্ডি-চৌরি-চৌরার ভেতর দিয়ে কোথায় থেকে কোথায় চলে এলুম—কিসে বিশ্বাস ছিল আমার—কিসে অবিশ্বাস ছিল—ভালো করে বুঝবারও সময় পাইনি।'

বলতে বলতে হঠাৎ মনে হল সুতীর্থের বেশী কথা বলে চলেছে সে, এটা তার স্বভাব নয়ঃ অনেকদিন পর জয়তীকে দেখে এইরকম হচ্ছেঃ সুতীর্থ নিজেকে থামিয়ে ফেলে আস্তে আস্তে বললে, 'এইবারে বুঝে দেখতে হবে সব।' তারপর চুপ করল।

'কি বুঝে দেখবে?'

'এক বছর আমি বিদায় নেব সব কিছুর থেকে।'

'তার মানে?'

'আমার গত তিরিশ বছরের বৃত্তান্ত তুমি তো জান।'

'এইবারে ভালো করে শুনতে হবে সব।' জয়তী বললে।

'সুতীর্থের বৃত্তান্ত আমার চেয়ে বেশী জানা ছিল তোমার জয়তী। আমি বিশেষ কিছু জানি না। তুমি?' ক্ষেমেশ চশমা খুলে নিয়ে জয়তীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললে।

'কিছু কিছু জানি।'

তেত্রিশ

সুতীর্থ ঠাণ্ডা চুরুটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে, 'প্রায় সাত-আট বছর বয়সে আমি কাজে নেমেছি। নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্য সব জায়গায় চলে যেতুম। আমার বাপ-মা ভাই-বোন নয়, আমাকে ঘিরে অন্য যেসব ছেলেমেয়েরা থাকত তাদের কাছ থেকে আমি মন্ত্রগুপ্তি পেলুম যে, ইস্কুল কলেজ কিছু নয়—বাঙালী ছেলের পক্ষে দেশ স্বাধীন করার চেষ্টা ছাড়া অন্য কোনো কাজ নেই। আমাদের দলের তিরিক্ষে সরপুটির মত রূপমতী একজন মেয়েও এই কথা বলেছিল আমাকে—বলবার কি ঠাট! কি ওজন! আহা! প্রায় বত্রিশ তেত্রিশ বছর আগে গুলি খেয়ে সেই মেয়েটি মরে গেছে—আজো যখন তার কথা মনে হয়—' সুতীর্থ ক্ষেমেশের জয়তীর চার চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে টের পেয়েও আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থেকে বললে, 'আমি তখন খুব ছোট ছিলুম, আট নয় বছর বয়স হবে, সেই মেয়েটির পনেরো ষোল, আমাকে চুমো খেয়ে খেয়ে পুদিনা পাতা মরীচ তেঁতুল আর লবণের যে পাঞ্জাবী চাটনী বানাত—উফ! যখনি এর পরে একা পড়ে যেতুম, আমাকে কোলে টেনে মাইয়ের ওপর নিয়ে যেত সে; এমনই ন্যাতা জোবড়া মনে হত, এত বিরক্তি লাগত, এত রাগ হয়েছিল একবার—যে নখ দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছিলুম তার নাক মুখ—'

সুতীর্থ একটা ঢোক গিলে বললে, 'মানুষের ইচ্ছা খুব দেরিতে আসে, তার ভালবাসাও; আট ন' বছরের একটা কুকুর তো ছেলেপুলের ঠাকুর্দা, কিন্তু ন' বছর বয়সে সেই মেয়েটিকে আমি ভালোবাসলেও ওরকম টানাহেঁচড়া পছন্দ করতুম না। শিবের মাথার সিন্দুর ছিলুম। তিনচারজন বেশ রায় রায়ান গোছের পুরুষও ছিল সেই বিপ্লবীদের দলে, খুবই শ্রদ্ধা করতুম তাদের; ভালোবাসতুম মেয়েটিকে, কিন্তু তবুও লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রিভলভার চালিয়ে ইংরেজ খুন করে দেশকে স্বাধীন করবার যে সব পথ দেখিয়ে দিত তারা, যে সব মোক্ষম জবানী ঝাড়ত—আমি সে সব মোটামুটি বিশ্বাস করলেও প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি কিছু ক্ষেমেশ।'

'সেই মেয়েটির কি নাম ছিল?'

'দুটো নাম ছিল; একটা রম্ভা, আর একটা কিনা গোতমী। অদ্ভুত নাম। গোতমী বলে ডাকত তাকে কেউ কেউ। কেউ কেউ কিশা বলত।'

'কে গুলি করেছিল তাকে?'

'বিপ্লবীদেরই কেউ।'

'কেন?'

'সন্দেহ করেছিল কিশাকে। সে একজন ছোকরা ডেপুটিকে ভালোবেসেছিল—রটে গিয়েছিল বিপ্লবীদের মধ্যে। কথাটা সত্যি কিনা আমি জানি না। কিশা ষড়যন্ত্র সব ফাঁস করে দেবে আশঙ্কা করছিল ওরা।'

'নাগার্জুনের মত স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে, কোনোদিকেই কোনো পিঠ খুঁজে পেলে না বুঝি সুতীর্থ? তবুও তো দলে ভিড়লে তাদের।' জয়তী বললে।

'হ্যাঁ, কিন্তু দলের জন্যে সব দিলুম না তো, ইস্কুল কলেজ তো ছাড়লুম না।'

'জেলে তো গেলে বারবার।'

'কিন্তু পরীক্ষায়ও পাশ করতে লাগলুম। হিজলী ক্যাম্পেও গিয়েছি, বি-এ অনার্সও যুতেছি, ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এসে রিভলভারও জুগিয়েছি, খুব মন দিয়ে পড়ে এম-এ পাশও করা গেল—কিন্তু রিভলভারে বিশ্বাস ছিল না আমার—ইউনিভার্সিটিতেও না। এক সময় আমি ছড়া কবিতা গল্প লিখতুম; বেশ সাড়া পড়ে যাচ্ছে আমার লেখা নিয়ে—দেখছিলুম। তবুও অনেক দিন হয় লেখাটেখা ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যে আমার বিশ্বাস যদি থাকত তাহলে এরকম হত না।'

'বিপ্লব করলে, জেলে গেলে, ইউনিভার্সিটি ডিগ্রী নিলে, সাহিত্য করলে, কিন্তু কিছু হল না বলতে চাও?'

'কিছু হল না জয়তী, আমার ধর্ম নেই বলে।'

'ধর্ম নেই মানে? ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই? ঈশ্বরে বিশ্বাস তো আমারও নেই।'

সুতীর্থ বললে, 'পৃথিবী যে খারাপ নয়, মানুষ যে সত্যিই ভালো, প্রাণের গঙ্গা যে রক্তে নাওয়াবে না মানুষকে আর, কোনো বিপ্লবেরই দরকার হবে না একদিন সমাজ যে সুস্থ ও শুভ হয়ে উঠবে সকলের জন্যে, জীবন যে বাস্তবিকই আশা-ভরসার, এসব জিনিসে কোনো আপ্ত বিশ্বাস নেই আমার। সেটা থাকলেই ভালো হত; এ যুগে বিশ্বাস কাঁচিয়ে গেলে অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে তাকে ফিরে পাওয়া যায় না আর।'

'আজকালকার বাজারে দিনরাত লেনদেন চলছে যে সব ব্যাপারের ব্যাঙ্কগুলিকে সাক্ষী রেখে, গাদা বাজারকে ঘুষ দিয়ে ওপরওয়ালাদের সার্টিফিকেট যোগাড় করে, দরকার মত অসংখ্য মেয়েমানুষের মাংস খেয়ে নতুন মাংসের জন্যে বেড়াজাল পেতে রেখে; এসব যখন একটা মস্ত বড় কালান্তক ঢেউয়ের মত উনিশশো সাতচল্লিশ আগস্টের পিঠের ওপর গিয়ে থুবড়ি খেয়ে পড়বে

তখন তো আমরা স্বাধীনতা পাব। মানুষ যদি খুব ভালো মনে কাজ করে তাহলে পঞ্চাশ বছর লেগে যাবে এতকালের ঘোলা আঁশটে মলমাংস ঝেড়ে কিছু নিরালতা লাভ করতে। কিন্তু মানুষ কি ভালো বুদ্ধি প্রেরণার কাজ করবে—একটানা পঞ্চাশ বছর করবে? আমি শুনিনি তো কোনো দিন কোনো ইতিহাসে এরকম হয়েছে—' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'হয়তো খুব দূর ভবিষ্যতে করতে পারে, কিন্তু এক্ষুনি করবে বলে মনে হয় না।' জয়তী সুতীর্থকে বললে।

'তাহলে কি দলিলে স্বাধীনতা পেয়ে স্বাধীনতার স্বাদ পাবে মানুষ?' ক্ষেমেশ তার পোড়া সিগারেটটা জ্বালিয়ে নিয়ে বললে।

'দেখা যাক।—উনিশশো সাতচল্লিশ এসে নিক।'

'দশ বারো বছর আগে আমি শবরমতীতে গিয়েছিলুম একবার', সুতীর্থ বললে, 'মনে কোনো প্রত্যাশা, সংকল্প কিছুই ছিল না আমার; কঠিন মন নিয়ে গিয়েছিলুম ভেবেছিলুম, গান্ধীজীকে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু নিতান্ত অন্ধ ভঙ্গি ছাড়া কেউই বিশেষ কিছু ভাবে না তাঁর সম্বন্ধে মানুষটার খুব বাইরের সুখ্যাতি আছে বটে, কিন্তু এত বড় সুখ্যাতি কেন এ সন্দেহ বাইরের পৃথিবীতেই শুধু নয়, খুব সম্ভব ভারতবর্ষেও সব জায়গায় প্রায় দানা বেঁধে আছে—একটু আঁচড়ালেই টের পাওয়া যাবে। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখা করতে গেলাম তাঁর সঙ্গে। তিনচার দিন ছিলুম আশ্রমে। সত্যিই একটা আশ্চর্য বিশ্বাস জাগল মনের ভেতর—মন নয় আত্মার ভেতরেই যেন—ভারতবর্ষের, পৃথিবীর আজ না হোক, কাল পরশু যে ভালো হবে মানুষের মানে যে খারাপ নয়, সত্যিই ভালো : সেটার প্রতি। তারপরে কলকাতায় ফিরে ছ'মাস খুব বিশ্বাসেব সঙ্গে কংগ্রেসের কাজ করেছিলুম আমি; গ্রামে গ্রামে গিয়েছিলুম গান্ধীজীর নির্দেশ অনুসারে কাজ করবার জন্যে। কিন্তু টিকল না; কাজেই শুধু অবিশ্বাস হল না; মানুষকেই শুধু না, মোহনদাস করমচাঁদকেও বিশেষ কোনো সারাৎসার হিসেবে উপলব্ধি করতে পারলুম না আমি।'

'সে রকম সারাৎসার কে আর থাকে পৃথিবীকে?' জয়তী বললে।

'কে আর থাকে পৃথিবীতে : পৃথিবীর মানুষ তো সব।' ক্ষেমেশ ভুরুর উস্কানিতে জয়তীর দিকে তাকিয়ে বললে।

ক্ষেমেশের মুখ ভুরুর দিকে তাকিয়ে দেখল জয়তী, হাসলেও হাসতে পারত; কিন্তু গম্ভীর হয়ে ছিল তার মন, সুতীর্থ ঠিকই বলেছে, হয়তো সারাৎসার কেউ নেই, কিছু নেই, খুব ছোট তিলের মত পরিসরেরও ভেতর প্রতি মানুষের নিকটতম পরিজনটি ছাড়া।

'কিন্তু ছ'মাস—এত অল্প সময়ের মধ্যে—এত বড় একটা প্রভাব—তোমার মনে বেল কুড়িয়ে রাইয়ের সামিল হয়ে গেল—এটাও খুব আশ্চর্য সুতীর্থ।'

'বেল কুড়িয়ে রাইই বটে,' বললে সুতীর্থ, 'বেশ বলেছ তুমি ক্ষেমেশ।'

'তুমি গিয়েছিলে আর শবরমতীতে?'

'না, আর যাই নি।'

'শুনেছিলুম তুমি পর্ণকুটীরে গিয়েছিলে বছর খানেক আগে—' ক্ষেমেশ বাইরের চারদিককার উজ্জ্বল ঝলসানির আর ঘরের ভেতরের একজন নারীর কোথায় যেন সৃষ্টির ঢলের ভেতর রোদে স্পর্শে শব্দে মিল হয়ে গেছে অনুভব করে আলোবাতাসে চোখ বুজে বসে থেকে সুতীর্থকে বললে।

'না, যাইনি।'

'এই তো সেদিন সোদপুরে এসেছিলেন—গিয়েছিলে?'

'না।'

'কেন?'

'বিশ্বাস নিজের ভেতর থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হয়—বিশ্বাস কিংবা অবিশ্বাস। চলাফেরা

চিন্তা অর্থের আমার মনে হয় আমার জীবনের ছোট আধারের প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা জমিয়েছি সব। এখন ব্রহ্মাণ্ডের ঝাঁপি এলেও ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। কী দেবে তা? যা দেবে জানা আছে আমার। মোহনদাস করমচাঁদজীকেও আবার দেখবার দরকার নেই। দেখেছি। এখন বছরখানেকের জন্যে তোমাকে বলছিলুম জয়তী, গ্রামে চলে যাব আমি। ভেবে দেখব সব। অভিজ্ঞতার থেকে কি বেরুবে আমার? বিশ্বাস না অবিশ্বাস? দেখব, বুঝব, এর পরে কি করতে হবে ঠিক করব।'

'কোথায় কোন গ্রামে যাবে তুমি।'

'ঠিক করিনি।'

'কবে যাবে?'

'আজকালই।'

'তুমি তো অফিসে চাকরি করতে?'

'ছেড়ে দিয়েছি।'

'শুনেছিলুম একটা স্ট্রাইক নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলে?'

'ছিলুম। আমার চেয়ে ভালো হাতে তুলে দিয়েছি বিধান ব্যবস্থা সব।'

'স্ট্রাইকটা ক'দিন চালিয়েছিলে?'

'মাসখানেক।'

'ও, তারপর ব্যাঙের আধুলি দেখিয়ে চলে এলে বুঝি। তোমার বয়স হয়েছে সুতীর্থ—এখন চুপচাপ বসে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়ের কঙ্কাবতী পড়া উচিত তোমার।' ক্ষেমেশ বললে।

'একত্রিশটা দাঁত আছে তোমার ক্ষেমেশ', সুতীর্থ বললে, 'আমি যদি কঙ্কাবতী পড়ি—'

'তাহলে বত্রিশটা দাঁত হবে ক্ষেমেশের?' জয়তী একটু তামাশা বোধ করে বললে, 'ভারি মজার কথাই তুমি বলতে চাচ্ছ সুতীর্থ।'

'ক্ষেমেশের লাইব্রেরী থেকে ও বইগুলো যোগাড় করে দেবে আমাকে জয়তী', সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের লাইব্রেরীটা বেশ ভাল, অনেক রকম বইই নেই, কিন্তু যা আছে রঞ্জনেরও ভালো লাগবে।'

'তুমি কোথায় থাক আজকাল?' জয়তী হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল।

'লেক বাজারের দিকে।' সুতীর্থ বললে।

'ফ্ল্যাট ভাড়া করে? ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে গ্রামে? তাহলে ফিরে এসে তো বাড়ি পাবে না আর কলকাতায়।'

'কলকাতায়ই যে ফিরে আসব এমন তো কোন কথা নেই।'

'এখানে না ফিরলে কাজ করবে কোথায়?'

'কাজের জায়গা দেশগাঁয়ে নেই?' সুতীর্থ একটু তেরছা চোখে জয়তীর দিকে তাকাল।

'কিন্তু তোমরা তো বড় কাজ করবে। গাঁয়ে কাকে নিয়ে কাজ করবে? গাঁয়ে লোক কোথায়?'

সুতীর্থ পকেট থেকে একটা নতুন চুরুট বার করে বললে, 'তুমি পাড়াগাঁ দেখনি কোনো দিন জয়তী—'

চৌত্রিশ

'আমি হালিশহর, সোনারপুর, মজিলপুর, লক্ষ্মীকান্তপুর—গিয়েছি তো অনেক জায়গায়।'

ক্ষেমেশ—চা আসছে না রঞ্জন আসছে না, দাড়ি কামাবার ক্ষুরটুর আসছে না, একটু বিরক্ত হয়ে, 'এই রঞ্জন—এ—ই—এই—ই' বলে গলাজলে দাঁড়িয়ে গানের গলা সাধবার মত চিৎকার করতে করতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললে, 'বালিগঞ্জ গিয়েছি, টালিগঞ্জ গিয়েছি, ঢাকুরিয়া গিয়েছি,

চেতলা গিয়েছি, বেহালা গিয়েছি—তুমি কার গাড়ি হে বুইক? আমি আগে ছিলাম মহারাজ বিক্রমাদিত্যের; এখন কার? এখন বিরূপাক্ষ রাজবংশীর; আরে কার গোরব্যাটা! কার? আজ্ঞে জয়তী দেবীর। তবে চল, চল, আমাকে খিদিরপুর, মেটেবুরুজ, আলিপুর, পাকপাড়া নিয়ে চল—আমি বাংলাদেশের গ্রামগ্রামালি দেখব—আম গাঁয়ের ডাক শুনেছি—আমার হিলম্যান মিংকস-এর ডাক—দশ গ্যালন পেট্রলে হবে?—না বেশী লাগবে ধনদা ঠাকুর?—বেশী লাগবে?—আবার কালোবাজারের শেয়ালের ডাক শুনিয়ে ছাড়বে দেখছি—'

ক্ষেমেশ উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি একটু ওপরের থেকে আসছি জয়তী।'

'কেন?'

'আমার ভোরাইটা সেরে আসি।'

'তোমার ঘড়িতে ক'টা ক্ষেমেশ।'

'সাড়ে আটটা, এইবারে মুখ ধোব, দাড়ি কামাব, বাথরুমে যাব, রঞ্জনকে ওঠাব ঘুমের থেকে, চায়ের ব্যবস্থা হবে—'

'ক্ষেমেশ, কাল রাত চারটা অবধি বাইরে ছিল রঞ্জন?' জয়তী জিজ্ঞেস করল?

'কড়া নাড়ার শব্দে তোমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুঝি? তখন পাঁচটা। এই তো সবে বারান্দার শান চেলে সোত পাক খেয়ে কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছে—চলো জয়তী আমার সঙ্গে ওপরে—'

'কেন?'

'বারোটার আগে রঞ্জন ঘুম থেকে জাগবে বলে মনে হয় না—হিটারে চা করে নেবে চল।'

'আমি চা খেয়ে এসেছি।' সুতীর্থ বললে।

'তোমাকে তো ভোর পাঁচটায় চা করে দিলুম—তুমিও এসো ক্ষেমেশ, আমি যাচ্ছি। মুখ ধুয়ে দাড়ি কামিয়ে ঠিক হয়ে নিতে তোমার ঘণ্টা দেড়েক তো লাগবে—তারপরে নিচে এসো—আমি চা ঠিক করে রাখব।'

ক্ষেমেশ চলে গেল।

'বিরূপাক্ষের সঙ্গে কয়েক দিন আগে আমার দেখা হয়েছিল।'

'কোথায়?'

'তার বাড়িতে—সে যে তোমাকে বিয়ে করেছে তা তো আমি জানতুম না। কবে বিয়ে হল?'

'বছর তিনেক আগে।'

খানিকটা চুরুটের ছাই সুতীর্থের শার্টের ওপর ঝরে পড়ল; জামার ছাইটা ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা না করে, চুরুট না টেনে—কথা ভাবছিল সুতীর্থ—কি কথা সে নিজেও ঠাহর করে উঠতে পারছিল না। অনেক দূরে একটা বটগাছের ডালপালার ভেতর একটা কালো পাখিকে আবিষ্কার করল তার চোখ। সুতীর্থ ভাবছিল, আমার চোখের বাহাদুরি আছে বটে, কিন্তু তবুও কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল সে, কেমন একটা ব্যথা : স্নায়ুর ভেতরে না মনোময়তার রক্তে না হিরন্ময়তার রক্তে না হিরন্ময় কোষে? জয়তী তাকিয়ে আছে সুতীর্থের দিকে। চোখ জয়তীর দিকে ফিরিয়ে নেবার উপক্রম করে তবুও কালো পাখিটার দিকে তাকিয়ে থেকে সুতীর্থ বললে, 'ক্ষেমেশের এখানে বেড়াতে এসেছ?'

'না।'

'তবে?'

'আমি বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি। আইন আদালতে তো যেতে হবে এ জন্যে।' জয়তী বললে।

'কেন?'

'বিরূপাক্ষকে ছেড়ে এসেছি—বললাম তোমাকে—শোননি?'

'শুনেছি।'

'আমি আলাদা থাকতে চাই এখন থেকে। সেটা আইন দিয়ে ঠিক করিয়ে নিতে হবে না?'

'তা হলে তো ক্রিশ্চান হয়ে নিতে হয়; ক্রিশ্চান—মুসলমান—'

'হতে রাজি আছি আমি।'

'কি জানি, আইনের মারপ্যাঁচ আমার জানা নেই। খুব কঠিন হবে', সুতীর্থ বললে, ডান হাতটা খানিকটা তুলে নিয়ে দেখল চুরুট নিবে গিয়েছে, জ্বালাতে গেল না, চোখ দিয়ে দেশলাই খুঁজল দুচারবার; চোখে পড়ল দেশলাই সুতীর্থের, কিন্তু চোখে যে পড়েছে সেটা টের পেয়ে দেশলাইটা কুড়িয়ে নেবার আগে অন্য বিষয়ের দিকে চলে গেল চোখ—জয়তীর দিকে নয়; স্ট্রাইক, মণিকা, মল্লিক, মুখার্জির কথা ভাবতে ভাবতে জয়তীর কথা মনে পড়ল আবার। সুতীর্থ বললে, মন যখন তোমার বিরূপাক্ষের দিকে নেই, আইন ওর দিকে থাকলেও কি আর হবে।'

'কিছু করতে পারবে না।'

'কিছু করতে চাইবে না।'

'আমার ওপর সব সত্ত্ব ছেড়ে দেবে ও।'

চুরুট নিবে গিয়েছে টের পেল সুতীর্থ।

সোফাগুলোর আনাচে কানাচে কি যেন খুঁজে তাকাতেই দেশলাইটা চোখে পড়ল তার; জ্বালিয়ে নিল চুরুট।

'পাঁচ লাখ টাকা আমি নিয়ে এসেছি। বালিগঞ্জের বাড়িটাও আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আইনে পাকাপাকি করে নিয়েছি।'

'ভালোই তো।' সুতীর্থ বললে। বটগাছটার দিকে তাকিয়ে চুরুট টানতে লাগল সে। পাতা—অনেক ঘন পাতা ছায়ার আড়ালের কালো পাখিটাকে কোনো অনুমান বলে ঠিক করে নিতে পারছে না, বুঝতে পারছে না ওটা কি পাখি ঃ কোকিল না নীলকণ্ঠ না কি; কোকিল যদি হয় মকর সংক্রান্তি কেটে গেলেও এমন চুপ করে আছে কেন? ওটা পাখি তো? একটা ছোট কালো মেরজাই নয় তো দেশোয়ালীদের? পাখী না হয়ে মেরজাই? পাখি হোক।

'আমি এখন কি করব?'

কে—জয়তী কথা বলছে? সুতীর্থ চুরুট ফুঁকছিল। ঘাড় ফিরিয়ে জয়তীর দিকে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলুম তুমি ওপরে চলে গেছ স্টোভ জ্বালতে।' স্টোভ তো নিচেও জ্বালানো যায়; সুতীর্থ ঘরের চারদিকের প্লাগের ছ্যাঁদাগুলোর দিকে তাকিয়ে বললে, চলো তুমি আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?'

'গ্রামে যাবে চলো।'

গ্রামে কোনদিন যায়নি জয়তী; গ্রামের নিমিত্ত নিধান কাকে বলে জানে না। গ্রামগুলো মরছে; তুইয়ে বুইয়ে নতুন গ্রাম নির্মাণের ব্যাপারটা ভেবে দেখতে যায় নি। গ্রাম কোথায়—কি রকম—কি করতে হবে এই সব গ্রাম নিয়ে—এ সম্বন্ধে কোনো স্বভাব কৌতূহল কোনোদিন ছিল না তার। কিন্তু সুতীর্থ তাকে গ্রামে যেতে বলেছে। হঠাৎ যেন অনেক চাপা জলোচ্ছ্বাসে শুকনো ফাঁকা একটা প্রান্তর ভরে উঠল। এটা কি প্রান্তর? না সমুদ্র?

'কোন গ্রামে যাবে সুতীর্থ?'

'ঠিক করিনি এখনো।—তবে কোন একটা গাঁয়ে নয়—অনেক গ্রামে যাব।'

'ভারতবর্ষকে তো এখনও দুভাগ করা হয়নি। কিন্তু হবে শুনছি। ওদের ভাগে যে অংশ পড়বে সে সব গ্রামেও যাবে?'

জয়তী বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে যাব।'

'শুধু বেড়াতে যাওয়া নয়, অনেক কঠিন কাজ করতে হবে গ্রামে গিয়ে। শহরে তো অনেক বোকা লোক আছে; তার চেয়ে ঢের বেশি বোকা মানুষ গ্রামে থাকে। কিন্তু বোকা বলে বজ্জাতির কসুর নেই। তাদের ওপরয়ালা আছে, আরো খারাপ। আরো ওপরে—সমস্ত দেশ জুড়েই কেমন একটা নিরেস অর্থহীন বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে রয়েছে। মাঝে মাঝে দেখবে এরা সকলে মিলে আমাদের দুজনকে পালে চাপা দিয়ে লাট করে ফেলতে চেষ্টা করছে—'

'এরা সকলে মিলে নয় এদের অনেকে—'

'কলকাতা দিল্লিরও চাঁই লোক আছে ওদের মধ্যে।'

'আমরা তো কোনো খারাপ কিছু করতে যাচ্ছি না—ভালো কাজ করব। আমাদের দিকেও লোক থাকবে। আমি যাব গ্রামে।'

'কদিন থাকবে?'

'যতদিন তুমি থাকতে বল।'

সুতীর্থ চুরুটে টান দিয়ে শেষে বললে, 'এতদিন তুমি থাকতে পারবে না।'

'কেন?'

'গ্রামে গ্রামেই থেকে যাব—কলকাতায় ফিরব না আর।' মহা সরীসৃপের মত বিরাট পাথরের গায়ে আঘাত করে জল নিজের জলের দেশে ফিরে যাচ্ছে এমনই একটা আশ্চর্য আদি পৃথিবীরই নাদ যেন বেজে উঠল সুতীর্থের কথায়।

সেই জলের শব্দ শুনল জয়তী।

'কলকাতায় তোমার বাড়ি আছে, টাকা আছে, মানু[illegible] আছে, যারা তোমাকে টানে।' সুতীর্থ বললে, 'গ্রামে গিয়ে বরাবর তুমি থাকতে পারবে না।'

'সুতীর্থ চুরুটের মুখের আগুনের দিকে তাকিয়ে [illegible]ল একবার—টানবার আগে। আস্তে আস্তে টানছিল।

'মাঝে মাঝে এক আধ মাসের জন্যে য[illegible] আমি কলকাতায় আসি তাতে তোমার আপত্তি আছে?' সুতীর্থের দিকে তাকিয়ে জয়তী বল[illegible]।

'ঠিক করেছ গ্রামে যাবে?'

'আমি কিছু রেখে ঢেকে বলে[illegible] [illegible]তীর্থ?'

'আমাদের সঙ্গে গেলে দু-চা[illegible] শর্ত আ[illegible]।'

'বললেই তো।'

'সব শর্তগুলোর কথা [illegible] বলেছি তোমাকে।'

'কেন? বলবার কি [illegible]রি? এটা কি দুপক্ষের ব্যাপার।'

'তাহলে বুঝেছ তুমি [illegible]।' খুব বিশ্বাসভরে বললে সুতীর্থ। মানুষের গুলি এড়িয়ে আকাশের অন্তহীন নিরাপদের ভেত[illegible]নো হাঁস-দম্পতির মত নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর বুকের ভেতর থেকে।

'গ্রামে গিয়ে [illegible] বিয়ে করব তো জয়তী'—সুতীর্থ চুরুটের আগুনের দিকে তাকাল আবার চুরুটটা অনেকখা[illegible]য় হয়ে গেছে; জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

'কেন [illegible] করবে কেন এত বয়সে?'

[illegible]পরে দোতলার ঘরে ড্রর‍র-ঠটক ঠক ঠক ঠট্রাক ট্রাক—শব্দ হচ্ছিল; কেউ চেয়ার টেবিল [illegible] করছে মনে হল।

[illegible]তী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আমি তোমার সঙ্গে না থাকলে কোনো কিছুতেই আত্মবিশ্বাস ফিরে [illegible] না তুমি। সেরকম বিশ্বাস না থাকলে, সুতীর্থ এ যুগকে সাহায্য করতে পারবে না তুমি। [illegible]পন্ন আমাদের এই যুগ, তোমার মতন লোকের সাহায্য চায়।'

'তা চাইতে পারে, কিন্তু আপ্ত বিশ্বাস আমার নেই।'

'জানি, বললে তুমি কোনো রকম বিশ্বাসই নেই তো?'

সুতীর্থ হাল্কা চোখে আলো রোদের দিকে তাকিয়েছিল, চোখে গভীরতা আসছিল তার ক্রমে ক্রমে। জয়তী দেখছিল মস্ত বড় ঝাড়নটা পূর্ব দিকের দেয়ালে কাঠ হয়ে আছে; আনাচে কানাচে ময়লা আছে; অনেকদিন ঝাড় সাফ করা হয়নি।

পঁয়ত্রিশ

'আছে।' জয়তী বললে, 'না হলে ওরকম স্ট্রাইকটায় হাত দিতে যেতে না তুমি।'

'স্ট্রাইক। আমি তো ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায় কাজ করতে সুতীর্থ?'

'সাপ্লাই কর্পোরেশনে।'

'কত মাইনে পেতে?'

'পাঁচশো।'

'আরো উন্নতি হচ্ছিল নাকি?'

'টাকাকড়ির? তা হত।'

'কেন ছেড়ে দিলে সব?'

'আমরা জোট পাকিয়ে পরিশ্রম করে মল্লিকদের ফার্ম দাঁড় করিয়ে দিলে ধনী-মানী লোকদের তো সুবিধে হবে, যারা না খেতে পেয়ে মরছে সে-সব কেরানী মাস্টার বেকারদের কোনো লাভ হবে না।'

'এই তোমার বিশ্বাস?'

চুরুট খেতে গিয়ে—চুরুটটা ফেলে দিয়েছে মনে পড়ল সুতীর্থের। আর একটা চুরুট বের করে জ্বালিয়ে নিল, কোথায় রেখে দিল যেন তারপর দেশলাইটা জয়তীর কথা শুনেছে বলে মনে হলো না, চুরুট না টেনে বাইরের রৌদ্রের বড় ঝিলিকটার দিকে তাকিয়ে রইল।

'ধন্য সত্য তোমার সুতীর্থ। অথচ সত্যে অবিশ্বাসীর বদনাম্ তোমার?'

যে হাঁস আকাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছে তার মত চোখে যে গহন জলে সাঁতার কেটে চলেছে মাঝগাঙের সেই গৃহ বলিভুক রাজ-হাঁসিনীর দিকে তাকাল সুতীর্থ।

নিবে গেছে চুরুট, সুতীর্থের চোখ দেশলাই খুঁজে ফিরছিল; নেই; আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু সহজে চোখের পথে কোথাও নেই; আচ্ছা পরে দেখা যাবে।

'কলকাতায় একটা লোককেও তুমি খুঁজে পাবে না যে এজন্য পাঁচশো টাকার চাকরী ছেড়ে দেয়।'

'কেন, তুমিই তো ছেড়ে দিচ্ছ জয়তী।'

'আমি?' সুতীর্থের নেবা চুরুটটার দিকে তাকিয়ে জয়তী বললে, 'তুমি দেশলাই খুঁজছিলে? পেয়েছ?'

'না।'

'কোথায় গেল দেশলাইটা?'

'লাখ টাকার চাকরী ছেড়ে দিচ্ছ তো তুমি; আমার সঙ্গে গ্রামে যাবে বলছ। এত শ্রদ্ধা তোমার পৃথিবীর ওপর? এত বিশ্বাস মানুষকে?'

জয়তীর চোখ দেশলাই খুঁজছিল; কোনো কোণে খামচি—কোনো দিকে দেখতে পেল না সেটা।

'অথচ আমার কি মারাত্মক অবিশ্বাস দেখ। আমি জানি যে তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।' বলে আস্তে আস্তে চুরুটটাকে মুখে তুলে টানতে গিয়ে সুতীর্থ টের পেল নিবে গেছে; অনেক আগেই নিবে গেছে, দেশলাই খোঁজা হচ্ছে, এত সব ভুলে গিয়েছিল সে। দেশলাই পেল কি জয়তী?

জয়তী রোদের ভেতর চোখ বুজে কেমন গাঢ় লাল বর্ণের সুধা স্রোতটাকে খানিকটা তিতোর মত অনুভব করে চোখ মেলে বললে, 'আমি এই ক্ষেমেশের বাড়িতেই থাকব তবে?'

'থাকো। এ বাড়িটা খুব ভালো।'

'হ্যাঁ, ইঁটের ওপর ইঁট চড়িয়ে বেশ গেঁথেছে, কিন্তু আমার মাটির দেয়াল হলেই হবে।'

'কোথায়?'

গ্রামে। আজই চলো।'

'আজই?'

দেশলাইট খুঁজে পেয়েছে জয়তী, দিই দিই করে সুতীর্থকে দেওয়া হল না। চুরুট নাই বা জ্বালাল সুতীর্থ। না; জ্বালবার কোনো তাড়া নেই। দেশলাইটার দিকে তাকিয়ে সুতীর্থ বললে, 'পেলে খুঁজে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় ছিল?'

'গদির কিনারে; ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল।'

সুতীর্থ নেবাচুরুটের ছাইয়েব দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আজ হবে না, তবে আজ-কালই যাব গ্রামে?'

'কোন গ্রামে যাবে ঠিক কবেছ?'

'স্টেশনে গেলে ঠিক হবে।'

'তা হবে। সব গ্রামই গ্রাম, একরকম অ-কার, একটা সম্ভাবনা, একই রকম শূন্যতা। আলোও আছে?' জয়তী বললে, 'সুতীর্থ, ওদিকে পা-স্তান হচ্ছে নাকি?—আমাদের যশোর খুলনা চাটগাঁ নোয়াখালির দিকে যাবে?'

'চলো!' সুতীর্থ তাকিয়ে দেখল -তী হাত বাড়িয়ে দেশলাইটা দিচ্ছে। হাতের থেকে দেশলাইটা কুড়িয়ে নিয়ে সুতীর্থ বললে, 'এক-কি দুটি সন্তানের দরকার আমার।'

কোনো কথা বললে না -তী; মুখের ভেতর তার কোনো ভাব নেই, যেন কেউ নেই, কিছু নেই, কেউ কোনো কথ-লেনি যেন।

সুতীর্থ চুরুটের মুখে-থকে সাদা ঠাণ্ডা ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বললে, 'আচ্ছা থাক, কোনো দরকার নেই।'

'কেন?'

'এক-আধটা চাভুষোর ছেলেকে আমাদের ঘরে এনে মানুষ করলেই হবে।'

সুতীর্থ।

চুরুট জ্বা-টু হেসে বললে, 'পৃথিবীতে কোটি কোটি লোক চাষাভুষোর ছেলেগুলোকে জয়তী নিয়ে সন্তানের সাধ মেটাচ্ছে বুঝি? তাই যদি করে তাহলে আমরাও তা করব। নিজেদের ঘ- যদি তাহলে পৃথিবীর লোকেরা যা করে সেই নিয়মে চলব আমরা। সেই নিয়মে কিন্তু না সুতীর্থ?'

চলবে পৃথিবীর শীত ঋতুতে খুব গভীর তো সেই নিয়ম—।' সুতীর্থ কিছুদিন চুরুট হাতে নিয়ে -র বসে রইল। বললে, 'তুমি আমার সঙ্গে শেষ দিন পর্যন্ত থাকবে গ্রামে?'

চু' 'পৃথিবীর শীত ঋতুতে গভীর সেই নিয়ম। কি যে গভীর। পৃথিবীতে আরো চল্লিশটা শীত বাঁচব আমরা—তুমি আর আমি।'

জয়তীর মুখে একথা শুনে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সুতীর্থ, তারপর অন্য চিন্তা এল, সুতীর্থের মনে—অন্য ভাব; চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রোদের বেলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'পৃথিবীটা আজকাল খুব খারাপ, আমার মতন মানুষের মন সেই পৃথিবীর মতই খারাপ। মনটাকে স্নিগ্ধ, সত্য করে নিতে হলে চাষাভুষো হয়ে থাকতে হবে গিয়ে গ্রামে। আমরা একটু বড়—প্রামাণিক চাষা হব বলে, বেশি সাহস, বেশি বুদ্ধি, বেশি সহানুভূতি নিয়ে কাজ করব—যত বেশি লোকের জন্যে সম্ভব করব। কিন্তু কোনো নতুন সূর্য নতুন সমাজ আর পুরানো সমাজের আকাট ভাঁওতার কেলেঙ্কারি থাকবে না আমাদের রক্তের ভেতর কোনো বিষ থাকবে না কোনো বিষ থাকবে না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে; কাজ কবব, উপলব্ধি করব—সেবা করব—সন্তানেবা আসবে—শেখাব তাদের; ফুরিয়ে যাব পৃথিবীর থেকে।'

'এই তো পৃথিবীর কথা।' জযতী বললে।

'না, পৃথিবীর কথা এর চেয়ে ঢের খারাপ।'

'সব সময় না; যা বলেছ তুমি এইরকম ভালো অনেক সময়—'

জয়তীর শরীবে রোদ এসে পড়েছে তার ভেতবে বসে থেকে সে বললে, বলে ভালো লাগল তার, কথা ভেবে, বলে, ভালো লেগেছে মুখে হাসি রযে গেছে তাই জয়তী বললে, 'আমি তোমাব সঙ্গে এসেছি এবার; যা এত চেষ্টা করে পারনি এতদিন—আমি এসেছি বলে সব পারবে।'

শুনে মন খানিকটা আতস কাচের রোদের মত স্থিত, অক্ষুণ্ন হয়ে এল, কাঁচে সূর্য ফলিত হয়ে চলেছে, সুতীর্থ বললে, 'আমরা যদি পারি—' বলতে বলতে তবুও চুপ করে রইল সে।

'তুমি পৃথিবীকে ভালো মনে কর সুতীর্থ। আমাব চেয়ে বেশি বিশ্বাসী তুমি।'

'আমি?'

'কেউ তোমাকে বলেনি এই কথা এতদিনেও, তেমনভাবে বলেনি।' জযতী নিজেকেই আস্তে আস্তে বলছি যেন। 'জীবনের ভালো জিনিসগুলো আমি তোমাকে দিয়ে প্রমাণ করাব।' বললে জয়তী—এত চাপা গলায়—যে একটা ফিসফিস শব্দ হল শুধু; নিজেকেই বলতে চাচ্ছিল জযতী, আর কাউকে নয়। কিন্তু তবুও শুনতে পেল সুতীর্থ; বললে, 'আমাদের জীবন প্রমাণ নিযে নয়। প্রমাণ ট্রমান নিযে নয়। না।'

'তবে?'

'যে জিনিস নিজের থেকে হয় তাই নিযে।'

'কি জিনিস?'

বিরূপাক্ষের টাকাকড়ি, বাড়ি যা তুমি নিয়েছ তার কাছ থেকে, ফিরিয়ে দিতে হবে তাকে। চলো ফিরিয়ে দিয়ে আসি আজ—' জয়তী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'কি ফিরিয়ে দেবে?'

'দলিলপত্র সব।'

'তোমার নিজের হাতে টাকা আছে?' অনেকক্ষণ পরে বললে জয়তী।

'না। নেই।'

'কি করে চলবে তবে সব।'

সুতীর্থ হাসতে লাগল। 'আমি একা মানুষ। তুমি তো নেই জয়তী—সে সব গাঁয়ে। আমি একা তো।'

অনেক ভেবেচিন্তে অনেক চেষ্টা চরিত্র কবেও জয়তী বিরূপাক্ষের সব জিনিসই তাকে ফিরিয়ে দিতে রাজি হতে পারল না। অন্তত পঞ্চাশ হাজার টাকা সে বাখতে চাইল, আর বালিগঞ্জের বাড়িটা। এ বিষয়ে জয়তীর মতামত স্থির তো। আরো ভালো করে বুঝে ফেলবার জন্যে একমাস বা অনন্তকাল সময় চায় না সে; তাতে মত বদলাবে না। সে জানে তা; সুতীর্থও জানে। মানুষের জীবনের এইরকম সব ধরণ ধারণ, নির্ধারণ।

'সুতীর্থ, কিছু হাতে রেখে তোমার সঙ্গে চলি আমি;—তেমন বেশি কিছু নয়, আমি বলছি

তোমাকে—'

'তা হতে পারে না,' সুতীর্থ বললে।

কিন্তু বিরূপাক্ষকে টাকাকড়ি সব ঝেড়েপুছে দিয়ে আপোসে আসতে হবে সুতীর্থের সঙ্গে? বিরূপাক্ষকে সেরকম করে সব ফিরিয়ে দিতে পারবে না জয়তী।

'তুমি ক্ষেমেশের এ বাড়িতে থাকো। ক্ষেমেশের তাঁবে নয়—নিজের মনে। সেটা সম্ভব হবে। পাখিটাখি নিয়ে ক্ষেমেশের ঘর-বার। যেন সব মানুষ পাখি হয়ে গেলে ভালো হত, স্বচ্ছমনের সাদা পাখি সব—' বলতে বলতে জানালা আলো বাতাস সূর্যে চমৎকার দিঙমণ্ডলের দিকে তাকাল সুতীর্থ।

সুতীর্থ আবার দেশলাই হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় রেখেছে সেটা? নিবে গেছে চুরুট। নিজের সোফা জয়তীর সোফা চারদিকে তাকাচ্ছিল সে। পেল না দেশলাই। পেল না যে সেটা টের পেল না জয়তী; সে মেঝের দিকে ঘাড় হেঁট করে তাকিয়েছিল।

দেশলাই উড়ে যায়নি, ছিল; খুঁজে পেল সুতীর্থ; চুরুট জ্বালিয়ে বললে, 'না, বিয়ে করব না আমি। শীতকালে গাঁয়ে একা থাকাই সব থেকে ভালো। একা থাকা। শীতকালে। পাড়াগাঁয়ে।'—চোখের সামনে যেন সবুজ ঘাস—ফর্সা ধুলোর পথ—ফসল—শীতের আমেজ—বিকেলের সূর্য দেখা যাচ্ছে—এমনিভাবে বলল সুতীর্থ। কিন্তু চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল তার; গ্রাম মানে—গ্রামের নাড়ীনক্ষত্র—যা অন্ধকারে ও হালকা ও অতল—সেই সব নিয়েই তার কাজ—যতদূর সম্ভব সঙ্গতি আনতে পারা যায়—সেইজন্যেই যাচ্ছে সে।

'ক্ষেমেশের এখানে আমি থাকব না।' জয়ন্তী বললে।

'কোথায় যাবে তাহলে?'

'বাবার ওখানে গিয়ে থাকব। আমি টিচারি করব।'

'ও'—সুতীর্থ যেন লিকলিকে ট্রাম লাইনের পৃথিবীতে ফিরে ফিরে এসে বললে, 'আচ্ছা উঠি জয়তী।'

'আজই তুমি গ্রামে যাবে।'

'হ্যাঁ, আজই।'

'আজই?' জয়তী কি যেন এক ভাবনার হাত থেকে নিস্তার পেয়ে পেয়েও পাচ্ছে না এমনি চোখে দেয়াল মেঝে চারিদিককার ঘাস গাছ পৃথিবীর মানুষের শেষ আশার মত সমস্ত সূর্যের পিণ্ডের দিকে একবার তাকিয়ে বললে, 'জিনিসটিনিস কোথায় তোমার?'

'গাঁয়ে গিয়ে যোগাড় করব।'

'এখন বুঝি টিকিটের টাকা হাতে নিয়ে যাবে।'

'হ্যাঁ।'

সুতীর্থ চলে গেল।

মানুষের চোখ সূর্যের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না। চোখ ঝলসে পুড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল জয়তীর সূর্যের দিকে তাকাতে তাকাতে। কিন্তু তবুও তাকিয়ে রইল সে; কোনো অশেষ প্রণিধান, অজেয় অমেয় স্থিরতা অমর আশা লাভ করবার জন্যে নয়; কেউ কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করতে পারে না—পৃথিবী বলছে, সুতীর্থ চলেছে—সূর্য জ্বলে—এইসব মেধাবী গভীর মর্ত্যের থেকে কয়েক বছরে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল তার মন; ফিরে আসতে চাচ্ছিল এসবের দিকে;—কিন্তু পারছে না—সূর্যের চোখ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তার—।

ঠাণ্ডা হাত এসে লাগল জয়তীর চোখের ওপর। কারা যেন ঢুকে পড়েছে ঘরে—ক্ষেমেশ—সঙ্গে কে—বিরূপাক্ষ—

কী করেছিলে জয়তী—সূর্যের দিকে তাকাচ্ছিলে যে!—'

ছত্রিশ

'আমি কিছু দেখছি না ক্ষেমেশ।'

'ঝলসে গেছে তোমার চোখ। খানিকক্ষণ পরে দেখতে পারবে।'

'কে হাত রেখেছিল আমার চোখের ওপর?'

'আমি।'

'ওদিকে দাঁড়িয়ে কে?'

'রঞ্জন।'

'আর কে?'

'আর কেউ নেই।'

'ও—' না বিরূপাক্ষ নেই। এক ঝলক স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল জয়তীর।

'আমাকে দেখতে পাচ্ছ? জয়তী?' খানিকটা দূরে একটা সোফায় বসে ক্ষেমেশ বললে।

'ঠিক দেখতে পাচ্ছি না। একটু দেরি হবে—'

'তোমার তো গ্লুকোমা ছিল। ওরকম কটকটে সূর্যের দিকে তাকিয়েছিলে জয়তী—'

'আকাশে মেঘ করেছে ক্ষেমেশ?'

'মেঘ? না তো, খুব কড়া রোদ; মেঘ নেই, খুব নীল।'

'ও—' জয়তী বললে, 'হ্যাঁ, রোদ গায় লাগছে—কিন্তু—'

ক্ষেমেশ জয়তীর গরম রসস্থ চোখের দিকে তাকিয়ে রইল—সূর্যের দিকে—কয়েকটা পাখির দিকে তারপর। ভুলেই গিয়েছিল জয়তী ঘরের ভেতরে বসে আছে; অনেকক্ষণ পরে ফিরে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে, 'তোমার খুব পুরু লেনস চাই।'

শাড়ির আঁচল মাটিতে পড়েছিল, উঠিয়ে নিয়ে একটু ধুলো ঝেড়ে জয়তী বললে, 'অনেকদিন থেকেই চশমার দরকার। কিন্তু খুব পুরু না হলেও চলবে।'

'চশমা নাও নি কেন এতদিন?'

'এইবারে নেব।'

'মোটা পাথর লাগবে তোমার।'

'কেন, আমি ছানি কাটিনি তো। পুরু লেনস কেন লাগবে?'

'ছানি নয়—'

'চোখের শিরা শুকিয়ে যাচ্ছে আমার—'

'তারপরে অন্ধ হয়ে যায়।' ক্ষেমেশ বললে, 'এর কোন ওষুধ নেই জয়তী?'

'না। ক্ষেমেশ।'

'আমি ভাবছি কোনো ওষুধ আছে কিনা—'

'তোমার ঘড়িতে কটা?'

'একটা বেজেছে।'

'আমি গ্রামে যাব ভেবেছিলাম।' জয়তী বললে।

'সময় হলে যাবে—'

রঞ্জন চা নিয়ে এল।

'বড্ড রসিয়ে চা করেছি আজ—' রঞ্জন বললে, 'সুতীর্থবাবু গরম গরম চেখে গেলে পারতেন। এ জিনিস হবে কি আর কোনোদিন।'

চা সাজিয়ে রেখে রঞ্জন চলে গেল। চায়ের কাপ শেষ করে টিপয়ের ওপর সরিয়ে রেখে ক্ষেমেশ খুব তৃপ্তির সঙ্গে মুখ মুছছিল।

'লিপটন বুঝি?'

'না খুচরো সব—এ পাতা সে পাতা মেশানো—কোত্থেকে বেছে আনে রঞ্জন।'

দুপুর। ফিকে নীল ছিল, এইবারে গাঢ় নীল হয়ে পড়েছে সমস্ত আকাশ—কানায় কানায়; সাদা মেঘগুলো আরো বেশি সাদা, ফুরফুরে বাতাস ভেসে আসছে।

দু'এক চুমুক খেয়ে জয়তী আর চা খাচ্ছে না দেখে ক্ষেমেশ জয়তীর পেয়ালাটা তুলে নিয়ে আকাশ রোদের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে ভুলে যেতে লাগল সব—কোথায় সে আছে, ওদিককার সোফায় কে বসে আছে—হাতের তার ঠাণ্ডা চায়ের পেয়ালা জয়তীর না তার নিজের। হঠাৎ তার মনে হল পেয়ালার ডাঁট খুব শক্ত করে ধরে আছে সে—পেয়ালার ভেতরে চা নেই আর। সমস্ত চা খেয়েছে সে? কখন খেল?

'আমার পাইয়োরিয়া আছে।'

'তোমার?' ক্ষেমেশ চোখ তুলে একবার তাকিয়ে বললে 'মাড়ির দাঁতে?'

'হ্যাঁ, বিয়ের পর থেকে। আমার মুখের চা তুমি না খেলেই পারতে।'

'চাই তো খাই আমি—বেছে বেছে মুখ সম্বন্ধে খেয়াল রেখে।' হাতের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে ক্ষেমেশ বললে।

চারদিকে খুব বেশি নিঃশব্দতা। মেঘের ওপর দিয়ে মড় মড় করে এক চিলতি কাগজ বাতাসে উড়ছে—ঘুরছে—

'আমার পাইয়োরিয়া নেই—' জয়তী চোখ তারিয়ে হেসে উঠে বললে। এবার সে আগের চেয়ে পরিষ্কার দেখছে।

'একটা দাঁতে পোকা কুরছে। তামাকের ছাই দিয়ে দাঁত মাজলে ভালো হবে—'

'খেয়ো দাঁতটা নড়ছে?'

'স্টপ করিয়ে নিলেও খাবে ক্ষেমেশ?'

'আর একটা দাঁত ধরবে।'

'আমি তো বেশি মিষ্টি খাই না। কেন পোকা হচ্ছে?'

'তা হয়।'

'স্বভাব?'

ক্ষেমেশ উঠবে ভাবছিল; রঞ্জনকে বলে আসতে হবে—আরো চা করে দিতে। কি জিজ্ঞেস করেছে জয়তী ঠিক শুনতে পেল না; উঠল না, রঞ্জনকে কিছু বলবার দরকার নেই ভাবছিল ক্ষেমেশ, যা করবার নিজেই করবে ও, চা দিতে হলে দেবে।

দাঁতের কথা হচ্ছিল, স্বভাবেরও কথা, অন্য এক আধটা কথা মনে হল; জয়তী বললে, 'কেউ আমাকে বলেনি যে মানুষের স্বভাব ভালো—তাই শেষ পর্যন্ত ভালোই হবে মানুষের—'

ক্ষেমেশ বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, ঘরের ভেতরে চোখ ফিরিয়ে টেনে বললে, 'এর পরে বলবে।'

'পরে?—কবে?—'

যে প্রশ্নের দুরকম উত্তর চলে আসছে অনেকদিন থেকে, সেইটে জিজ্ঞেস করেছে জয়তী; কোন উত্তরটা বেশি সত্য এখনও ঠিক করেনি ক্ষেমেশ; তবুও এটা ঠিক যে এখন কিছু হবে না, পরে হবে; ক্ষেমেশ আস্তে আস্তে বললে, 'আমাদের মৃত্যুর পরে।'

'কটা বেজেছে।'

'চা খাবে?'

'আমাদের মৃত্যু—আমাদের এই যুগের?'

'আরো আসছে কয়েকটা যুগের—'

'ও—' জয়তী বললে, 'কিন্তু তখনও ক্ষেমেশের মত হয়তো কেউ বলবে, এখনও হল না, আরো কয়েক যুগ পরে হবে।'

'বুঝেছ তুমি।' বলে ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে, চশমা খুলে নিয়ে চোখের ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে নিল; 'একেই জানা বলে,' বোজা চোখের ওপর আঙুলের আলতো চাপ রেখে ক্ষেমেশ বললে, 'কিন্তু তবুও তুমি জ্ঞানী নও।'

'জ্ঞানীর দুঃখ সুতীর্থ অনুভব করেছে? কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে পারছি না।' বলতে বলতে চশমা পরে নিল ক্ষেমেশ।

'ওর কথা আর না বলাই ভালো!'

'কেন?'

'কেন নেই।' জয়তী বললে, 'চায়ের কথা বলেছিলে—'

চায়ের জল চাপিয়েছে হয় তো রঞ্জন।

সুতীর্থ স্টেশনে পৌঁছে গেছে? পূর্ববঙ্গের দিকে যাবে হয় তো; আসামের দিকে যাবে, নাকি ঢাকার দিকে, না খুলনা রূপসা পেরিয়ে—

'মৈত্রেয়ীর কথা মনে হচ্ছে আমার—' জয়তী বললে, 'তোমার কাছে উপনিষদ আছে?'

'না। চায়ে মাঝে মাঝে বেশি মিষ্টি দেয় রঞ্জন। কিন্তু সব সময়েই দেখছি তোমার মিষ্টির হাত ঠিক থাকে—'

'কেউ কেউ বিনে চিনিতে চা খায়—'

'আমি নেবুর রস দিয়ে চা খাচ্ছি মাঝে মাঝে—বেশ ভালো লাগছে।'

'নেবুর রস দিয়ে কাঁচা চা? চিনি নেই?'

জয়তী কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করে আস্তে আস্তে বললে, ''সুভাষ বোস কি সত্যিই নেই আর ক্ষেমেশ?'

'হ্যাঁ, কালো রঙের চা; চিনি কম; মৈত্রেয়ীর কথা কেন মনে পড়ল তোমার জয়তী?'

'নেবুর রস দিয়ে চা বানিয়ে দেখিনি কোনোদিন আমি।'

'কিছুই না—শুধু নেবুর রস দিয়ে চা বানানো।'

'সহজ—কিন্তু নেবুর রস উনিশ-বিশে নষ্ট হয়ে যেতে পারে চা।'

'তোমার হাতে চায়ের চিনির কোনো উনিশ-বিশ হয় না তো জয়তী; কেন নেবুর রসের হবে?'

'কটা বেজেছে ক্ষেমেশ?'

কিন্তু ক্ষেমেশ ঘড়ি না দেখে দূরে পাঁচিলের শ্যাওলার দিকে তাকিয়েছিল; সবুজ মখমলের মত পুরু হয়ে উঠেছে; রোদ এসে পড়েছে।

'এটা কার চুরুট?'

'সুতীর্থ ফেলে গেছে—'

ক্ষেমেশ বললে, 'আমি জ্বালিয়ে নিচ্ছি!'

ক্ষেমেশ চুরুট খাচ্ছিল নিঃশব্দে। কোনো কথা বলবার ছিল না জয়তীর।

'চুরুটের মুখে সাদা ছাই জমেছে সেগুলো—'

'সেগুলো? ফেলে দেব না আমি—যদি নিজেব থেকে পড়ে না যায়।'

'নিজের থেকেই পড়ে যাবে—কিন্তু অনেকক্ষণ পরে পরে।'

'ও—' ক্ষেমেশ বললে।

'ব্যাঙ্কে যাবার সময় আছে?'

'না—' ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ক্ষেমেশ বললে। 'ব্যাঙ্কে যেতে তুমি জয়তী?'

'দরকার ছিল—'

'আগে বলা উচিত ছিল তোমার।'

'কেন আজই উঠে যাবে বুঝি সব, কোনো ব্যাঙ্ক থাকবে না আর কাল?'

ক্ষেমেশ চশমা খুলে মুছছিল, মুছতে মুছতে বললে, 'যারা ব্যাঙ্কে টাকা রাখে তাদের অদল-বদল হবে খানিকটা; কিন্তু মানুষের হাতে টাকার কোনো মানহানি হবে না কোনোদিন। জান তুমি। খুব জ্ঞানের কথা আর শান্তির কথা এইসব।'

চশমা মুছে ঠিক করেছে, পরল ক্ষেমেশ।

'আমিও তাই বলছিলাম ক্ষেমেশ! বেশ শান্তিতে আছি। আজো আমাদের চীনের মত অবস্থা হয়নি।'

'প্রথমে দেশ স্বাধীন হবে।'

'তারপরে?'

'চীনের মত অবস্থা? ভাবছি আমি তাই। কিন্তু কি হবে চীনের মতন হলে? যারা মানুষকে মেরেছে সেই সব মানুষ শায়েস্তা হবে হয় তো। কিন্তু টাকা মার খাবে না কোনোদিন। এই দেবতাই ব্যাধি। মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।'

'কিন্তু প্রতিটি শতকই আশা করে যে এইভাবে জ্ঞান হবে। চীন কি আশা করছে না? তোমার চুরুট নিবে গেছে ক্ষেমেশ—কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত। গিয়েছে। মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই থাক টিপাইয়ের ওপর—এখন জ্বালাব না আর।'

'আমরা আশা করছি? সুতীর্থ নিজে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু সত্যি একটা আশ্চর্য উপলক্ষ্যের মত মরুভূমির বালিতে যে ঘাস গজায় না এই জ্ঞান নিয়ে ঘাস গজাতে গেল—' জয়তী বললে, 'আমাদের চেয়ে বেশী জ্ঞানী তাই সুতীর্থ আমরা দু একদিনের হিসেবে জিনিসের দিকে তাকিয়ে দেখি ও হাজার বছরের হিসেবে।'

'খানিকটা চাপা আগুন রয়েছে চুরুটের ভেতর, এখুনি নিবে যাবে!' চুরুট হাতে নিয়ে ক্ষেমেশ বললে।

'জ্বালাবে?'

'তুমি উঠলে—?'

'হ্যাঁ, এইবারে—'

জয়তী আস্তে অত্রস্তভাবে বললে, 'আমি চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়?' ক্ষেমেশ বললে, 'বিরূপাক্ষের ওখানে নয়; সুতীর্থের কোনো ঠিকানা নেই—'

'না। বাবার ওখানেও যাব না আর; আমি নিজে কিছু কাজ করব, নিজে যা ভালো বুঝি সেই হিসেবে।'

'কি কাজ?'

'এই যে তোমার চুরুট—'

'আমি জিজ্ঞেস করছিলুম—'

'দেশলাই পাচ্ছ না ক্ষেমেশ—'

'কাজ নিয়ে কলকাতায় থাকবে?'

'তা ঠিক বলতে পারি না। তবে গ্রামে যাবার দরকার নেই। আমার কাজ অন্যরকম; একজন মানুষের নিয়ে শুধু, কিন্তু তবুও সাঙ্গ করতে সময় লাগবে—'

'ও—' জয়তীর হাত থেকে দেশলাই তুলে নিল ক্ষেমেশ।

'বিরূপাক্ষের বাড়ি টাকাকড়ি সব ফিরিয়ে দেব। আজই ফিরিয়ে দিলে ভালো হত—কিন্তু কোনোদিন দিতে পারব কিনা সেই নিয়েই সংগ্রাম—একজন মানুষের; সাহায্য করবার কেউ নেই; এতে সমাজের কোনো উপকার হবে না, পৃথিবীর তো দূরের কথা। কিন্তু আমার মনে হয় আমার নিজের উপকার হবে। মানুষের জীবনের ওপর এখন মানুষদের নানারকম দাবি; কিন্তু আমি টাকাওলা মানুষ বলে এই একটা পরীক্ষা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবার সুযোগ আমার আছে। তাড়াতাড়ি এর একটা রফা হতে পারলেই ভালো হয়; অন্য কাজ করবার অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু জানি না কতদূর কি হবে। হয় তো সত্তর বছর টাকাকড়ি আঁকড়ে থাকতে পারি—হয়তো সত্তর দিন'—জয়তীর চোখ অনেকটা ঠিক হয়ে এসেছে এখন। 'দেশলাইটা মাটিতে পড়ে গেছে ক্ষেমেশ—'

'সুতীর্থের সঙ্গে এই সব কথা হয়েছিল বুঝি তোমার?'

ক্ষেমেশ বললে; মেঝের ওপর দেশলাইটার দিকে তাকাল সে, তুলল না।

'চীন আমাদের চেয়ে বেশী জেগে উঠেছে।' বলে বাঁ-হাতি জানালার শার্সিগুলোর দিকে তাকাল ক্ষেমেশ। রোদ ছিল ওখানে, নেই এখন আর।

'তা হতে পারে—'

'সমস্ত এশিয়াই জেগে উঠবে।'

'কিন্তু কিরকমভাবে? কি হিসেবে?—'

'সেটা ভারতবর্ষ স্থির করবে? ক্ষেমেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'এই বেলা বোধ হয় ভারতবর্ষেরই স্থিব করা উচিত। কিন্তু এ সব আন্দোলন থেকে আমি ঢের দূরে সরে এসেছি।'

'আন্দোলনও এখনও ঢেব দূবে। চীন আজকাল দুঃখের দেশ। অবশ্য পুরস্কার পাবে শীগগিরই—আমার মনে হয়। কিন্তু রাশিয়ার হাতে পুরস্কার না নিলেই ভলো হত—' জয়তী বললে।

একটু থেমে বললে, 'মানুষেব খাঁটি মঙ্গল মানুষের হাতে মানুষ যদি নেয—আমার বলবার কিছু নেই অবশ্য তাহলে—'

'চীনের নিজেরও আত্মা আছে।' জয়তী বললে।

'ছিল একদিন।'

'আমাদেরও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পৃথিবী এক হয়ে যাবে হয় তো।'

জয়তী বললে, 'চীন রাশিয়ার কাছ থেকে কি নিচ্ছে—রাশিয়া ভারতের কাছ থেকে কোন জিনিস—তা নিয়ে কারো মাথা ব্যথা থাকবে না তখন। কিন্তু খুব দেরিতে হবে এ সব জিনিস—যদি হয়। আমাদের মাথা ব্যথা সত্যিই রাশিয়া বা আমেরিকা বা অন্য কেউ—কে আমাদের বিপদগ্রস্ত করবে তাই নিয়ে। কেমন একটা অন্ধকারেব যুগে আছি আমরা—'

'রাশিয়া আলো পেয়েছে, চীন পাচ্ছে তার কাছে। আমেরিকা নিজেই আলোকিত।' বলে, চশমাটা খুলে ফেলল ক্ষেমেশ; চশমার পাথরের ওপর রোদ ঝলসাচ্ছে—তাকিয়ে দেখছিল।

'ভারতবর্ষও'—জয়তী হেসে বললে, 'অন্ধকারটা এইরকম।'

মেঝের থেকে কুড়িয়ে ক্ষেমেশের হাতে দেশলাই তুলে দিয়ে জয়তী বললে, এটা খেয়ো, চুরুট; এক বাক্স ভালো কিনে নিও তুমি।'

দেশলাই নেবার সময় জয়তীর হাতটা নিজের হাতের ভেতর আটকে নিবিড়ভাবে চেপে দিল ক্ষেমেশ।

জয়তী ঘনিয়ে এসে ক্ষেমেশের হাত তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে গেল।

চুরুট জ্বালাল ক্ষেমেশ।

জয়তী চলে গেল।

তুঙ্গভদ্রার তীরে

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

শ সে প্রে উ ১০৬

উর্মিমর্মর

দক্ষিণ ভারতে বাক্য প্রচলিত আছে ঃ গঙ্গার জলে স্নান, তুঙ্গার জল পান। অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান করিলে যে পুণ্য হয়, তুঙ্গার জল পান করিলেও সেই পুণ্য। তুঙ্গার জল পীযূষতুল্য, মৃত-সঞ্জীবন।

সহ্যাদ্রির সুদূর দক্ষিণ প্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র নদী উত্থিত হইয়াছে, তুঙ্গা ও ভদ্রা। দুই নদী পর্বত হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইবার পব পরস্পর মিলিত হইয়াছে, এবং তুঙ্গভদ্রা নাম গ্রহণ করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। তুঙ্গভদ্রা নদী স্বভাবতই তুঙ্গা বা ভদ্রা অপেক্ষা পুষ্টসলিলা, কিন্তু তাহার পুণ্যতোয়া খ্যাতি নাই। তুঙ্গভদ্রা অনাদৃতা নদী।

তুঙ্গভদ্রার যাত্রাপথ কিন্তু অল্প নয়। ভারতের পশ্চিম সীমান্তে যাত্রা আরম্ভ করিয়া সে ভারতের পূর্ব সীমায় বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইতে চায়। পথ জটিল ও শিলা-সঙ্কুল, সঙ্গিসাথী নাই। কদাচিৎ দুই-একটি ক্ষীণা তটিনী আসিয়া তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলিযাছে। তুঙ্গভদ্রা তরঙ্গের মঞ্জীর বাজাইয়া দুর্গম পথে একাকিনী চলিয়াছে।

অর্ধেকেরও অধিক পথ অতিক্রম করিবার পর তুঙ্গভদ্রার সঙ্গিনী মিলিল। শুধু সঙ্গিনী নয়, ভগিনী। কৃষ্ণা নদীও সহ্যাদ্রির কন্যা, কিন্তু তাহার জন্মস্থান তুঙ্গভদ্রা হইতে অনেক উত্তরে। দুই বোন একই সাগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়াছিল; পথে দেখা। দুই বোন গলা জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে চলিল।

তুঙ্গভদ্রার জীবনে স্মরণীয় ঘটনা কিছু ঘটে নাই, তাহার তীরে তীর্থ-সিদ্ধাশ্রম মঠ-মন্দির রচিত হয নাই, তাহার নীরে মহানগরীর তুঙ্গ সৌধচূড়া দর্পণিত হয় নাই। কেবল একবার, মাত্র দুই শত বৎসরের জন্য তুঙ্গভদ্রার সৌভাগ্যের দিন আসিযাছিল। তাহার দক্ষিণ তীরে বিরূপাক্ষের পাষাণমূর্তি ঘিরিয়া এক প্রাকারবদ্ধ দুর্গ-নগর গড়িযা উঠিয়াছিল। নগরের নাম ছিল বিজয়নগর। কালক্রমে এই বিজয়নগর সমস্ত দাক্ষিণাত্যের উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। বেশি দিনের কথা নয়, মাত্র ছয় শতাব্দীর কথা। কিন্তু ইহারই মধ্যে বিজযনগরের গৌরবময় স্মৃতি মানুষের মন হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তটে বিজয়নগরের বহুবিস্তৃত ভগ্নস্তূপের মধ্যে কী বিচিত্র ঐতিহ্য সমাহিত আছে তাহা মানুষ ভুলিয়া গিয়াছিল। কেবল তুঙ্গভদ্রা ভোলে নাই।

কোনো এক স্তব্ধ সন্ধ্যায়, আকাশে সূর্য যখন অস্ত গিয়াছে কিন্তু নক্ষত্র পরিস্ফুট হয় নাই, সেই সন্ধিক্ষণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থলে ত্রিকোণ ভূমির উপর দাঁড়াও। কান পাতিয়া শোনো, শুনিতে পাইবে তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার কানে কানে কথা বলিতেছে; নিজের অতীত সৌভাগ্যের দিনের গল্প বলিতেছে। কত নাম—হরিহর বুক্ক কুমার কম্পন দেবরায় মল্লিকার্জুন—তোমার কানে আসিবে। কত কুটিল রহস্য, কত বীরত্বের কাহিনী, কত কৃতঘ্নতা, বিশ্বাসঘাতকতা, প্রেম বিদ্বেষ, কৌতুক, কুতূহল, জন্মমৃত্যুর বৃত্তান্ত শুনিতে পাইবে।

তুঙ্গভদ্রার এই উর্মিমর্মর ইতিহাস নয়, স্মৃতিকথা। কিন্তু সকল ইতিহাসের পিছনেই স্মৃতিকথা লুকাইয়া আছে। যেখানে স্মৃতি নাই, সেখানে ইতিহাস নাই। আমরা আজ তুঙ্গভদ্রার স্মৃতিপ্রবাহ হইতে এক গণ্ডূষ তুলিয়া লইয়া পান করিব।

প্রথম পর্ব
এক

কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমস্থল হইতে ক্রোশেক দূর ভাটির দিকে তিনটি বড় নৌকা পালের ভরে উজানে চলিয়াছে। তাহারা বিজয়নগর যাইতেছে, সঙ্গম পার হইয়া বামদিকে তুঙ্গভদ্রায় প্রবেশ করিবে। বিজয়নগর পৌঁছিতে তাহাদের এখনো কয়েকদিন বিলম্ব আছে, সঙ্গম হইতে বিজয়নগরের দূরত্ব প্রায় সত্তর ক্রোশ।

বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণ। ১৩৫২ শকাব্দ সবে মাত্র আরম্ভ হইয়াছে।

তিনটি নৌকা আগে পিছে চলিয়াছে। প্রথম নৌকাটি আয়তনে বিশাল, সমুদ্রগামী বহিত্র। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও রণতরীর আকারে গঠিত, সঙ্কীর্ণ ও দ্রুতগামী; তাহাতে পঞ্চাশ জন যোদ্ধা স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। তৃতীয় নৌকাটি ভারবাহী ভড়, তাহার গতি মন্থর। তাই তাহার সহিত তাল রাখিয়া অন্য বহিত্র দু'টিও মন্থর গতিতে চলিয়াছে।

নৌকা তিনটি বহুদূর হইতে আসিতেছে। পূর্ব সমুদ্রতীরে কলিঙ্গদেশের প্রধান বন্দর কলিঙ্গপত্তন, সেখান হইতে তিন মাস পূর্বে তাহাদের যাত্রা শুরু হইয়াছিল। এতদিনে তাহাদের যাত্রা শেষ হইয়া আসিতেছে, আর সপ্তাহকাল মধ্যেই তাহারা বিজয়নগরে পৌঁছিবে—যদি বায়ু অনুকূল থাকে।

যে-সময়ের কাহিনী, সে-সময়ের সহস্রবর্ষ পূর্ব হইতেই ভারতের প্রাচ্য উপকূলে নৌবিদ্যার বিশেষ উৎকর্ষ হইয়াছিল। উত্তরে 'নৌ-সাধনোদ্যত' বঙ্গদেশ হইতে দক্ষিণে তৈলঙ্গ তামিল দেশ পর্যন্ত বন্দরে বন্দরে সমুদ্রগামী বৃহৎ বহিত্র প্রস্তুত হইতেছিল, তাহাতে চড়িয়া ভারতের বণিকেরা ব্রহ্ম শ্যাম কম্বোজ ও সাগরিকার দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য করিয়া ফিরিতেছিল; উপনিবেশ গড়িতেছিল, রাজ্যস্থাপন করিতেছিল। এইভাবে বহু শতাব্দী চলিবার পর একদা কালান্তক ঝড়ের মত দিক্‌প্রান্তে আরব জলদস্যু দেখা দিল, তাহার সংঘাতে ভারতের রতনভরা তরী লবণজলে ডুবিল। তবু ভারতের তটরেখা ধরিয়া সমুদ্রপোতের যাতায়াত একেবারে বন্ধ হইল না, তটভূমি ঘেঁষিয়া নৌ-যোদ্ধার দ্বারা সুরক্ষিত পোত এক বন্দর হইতে অন্য বন্দরে যাতায়াত করিতে লাগিল. নদীপথেও নৌ-বাণিজ্যের গমনাগমন অব্যাহত রহিল।

নৌকা তিনটির মধ্যে সর্বাগ্রগামী নৌকাটির প্রধান যাত্রী কলিঙ্গ দেশের রাজকন্যা কুমারী ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা। রাজকন্যা বিজয়নগরে যাইতেছেন বিজয়নগরের তরুণ রাজা দ্বিতীয় দেবরায়কে বিবাহ করিবার জন্যে।

প্রথম নৌকাটি ময়ূরপঙ্খী। তাহার বহিরঙ্গ ময়ূরের ন্যায় গাঢ় নীল ও সবুজ রঙে চিত্রিত; পালেও নীল-সবুজের বিচিত্র চিত্রণ। দ্বিতীয় নৌকাটি মকরমুখী; তাহার দেহে বর্ণবৈচিত্র্য নাই, ধূসর বর্ণের নৌকা। তাহার ভিতরে আছে ত্রিশজন নৌ-যোদ্ধা; তাহারা এই নৌ-বহরের রক্ষী। এতদ্ব্যতীত নৌকায় আছে পাচক সূপকার নাপিত ও নানা শ্রেণীর ভৃত্য। সর্ব পশ্চাৎবর্তী ভড় বিবিধ তৈজস, আবশ্যক বস্তু ও খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ। এতগুলা লোক দীর্ঘকাল ধরিয়া আহার করিবে, চাল দাল ঘৃত তৈল গম তিল গুড় শর্করা লবণ হরিদ্রা কাশমর্দ প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঙ্গে চলিয়াছে।

ভড়ের পিছনে একটি শূন্য ডিঙি দড়ি-বাঁধা অবস্থায় ল্যাজের মত ভড়ের অনুসরণ করিয়াছে। এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় যাতায়াত করিবার সময় ইহার প্রয়োজন।

এইভাবে রাজকীয় আড়ম্বরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রাজনন্দিনী বিদ্যুন্মালা বিবাহ করিতে চলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মনে সুখ নাই।

সেদিন অপরাহ্ণে তিনি নৌকার ছাদে বসিয়া ক্লান্ত চক্ষে জলের পানে চাহিয়া ছিলেন। তাঁহার

বৈমাত্রী ভগিনী মণিকঙ্কণা তাঁহার সঙ্গে ছিল। মণিকঙ্কণা শুধু তাঁহার ভগিনী নয়, সখীও। তাই বিদ্যুন্মালা যখন বিবাহে চলিলেন তখন মণিকঙ্কণাও স্বেচ্ছায় সঙ্গে চলিল। বিবাহের যিনি বর তিনি ইচ্ছা করিলে বধূর সহিত তাহার অনূঢ়া ভগিনীদেরও গ্রহণ করিতে পারিতেন। ইচ্ছা না করিলে পাত্রকুলের অন্য কেহ তাহাকে বিবাহ করিতেন। এই প্রথা আবহমানকাল প্রচলিত ছিল।

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার বৈমাত্রী ভগিনী, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো একটু প্রভেদ ছিল। বিদ্যুন্মালার মাতা পট্টমহিষী রুক্মিণী দেবী ছিলেন আর্যা, কিন্তু মণিকঙ্কণার মাতা চম্পাদেবী অনার্যা। আর্যগণ প্রথম দক্ষিণ ভারতে আসিয়া একটি সুন্দর রীতি প্রবর্তিত করিয়াছিলেন; আর্য পুরুষ বিবাহকালে আর্যা বধূর সঙ্গে সঙ্গে একটি অনার্যা বধূও গ্রহণ করিতেন। বংশবৃদ্ধিই প্রধান উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রথাটি লোভনীয় বলিয়াই বোধকরি টিকিয়া ছিল। আর্যা পত্নীর মর্যাদা অবশ্য অধিক ছিল, কিন্তু অনার্যা পত্নীও মাননীয়া ছিলেন।

বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার বয়স প্রায় সমান, দু'এক মাসের ছোট বড়। কিন্তু আকৃতি ও প্রকৃতিতে অনেক তফাৎ। আঠারো বছর বয়সের বিদ্যুন্মালার আকৃতির বর্ণনা করিতে হইলে প্রাচীন উপমার শরণ লইতে হয়। তন্বী, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী, কিন্তু চকিত হরিণীর ন্যায় চঞ্চলনয়না নয়। নিবিড় কালো চোখ দু'টি শান্ত অপ্রগল্‌ভ; সর্বাঙ্গের উচ্ছলিত যৌবন যেন চোখ দু'টিতে আসিয়া স্থির নিস্তরঙ্গ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রকৃতিতেও একটি মধুর ভাবমন্থর গভীরতা আছে যাহা সহজে বিচলিত হয় না। অন্তঃসলিলা প্রকৃতি, বাহির হইতে অন্তরের পরিচয় অল্পই পাওয়া যায়।

মণিকঙ্কণা ঠিক ইহার বিপরীত। সে তন্বী নয়, দীর্ঘাঙ্গী নয়, তাহার সুবলিত দৃঢ়পিনদ্ধ দেহটি যেন যৌবনের উদ্বেল উচ্ছ্বাস ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। চঞ্চল চক্ষু দু'টি খঞ্জনাপাখির মত সঞ্চরণশীল, অধর নবকিশলয়ের ন্যায় রক্তিম। দেহের বর্ণ বিদ্যুন্মালার ন্যায় উজ্জ্বল গৌর নয়, একটু চাপা; যেন সোনার কলসে কচি দূর্বাঘাসের ছায়া পড়িয়াছে। কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর। তাহার প্রকৃতিও বড় মিষ্ট, মোটেই অন্তর্মুখী নয়; বাহিরের পৃথিবী তাহার চিত্ত হরণ করিয়া লইয়াছে। মনে ভাবনা-চিন্তা বেশি নাই, কিন্তু সকল কর্মে পটীয়সী; বিচিত্র এবং নূতন নূতন কর্মে লিপ্ত হইবার জন্য সে সর্বদাই উন্মুখ। পৃথিবীটা তাহার রঙ্গকৌতুক খেলাধূলার লীলাঙ্গন।

কিন্তু তিন মাস নিরবচ্ছিন্ন নৌকারোহণ করিয়া দুই ভগিনীই ক্লান্ত। প্রথম প্রথম সমুদ্রের ভীমকান্ত দৃশ্য তাঁহাদের মুগ্ধ করিয়াছিল, তারপর নদীর পথে দুই তীরের নিত্যপরিবর্তমান চলচ্ছবি কিছুদিন তাঁদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছিল। নদীর কিনারায় কখনো গ্রাম কখনো শস্যক্ষেত্র কখনো শিলাবন্ধুর তটপ্রপাত; কোথাও জলের মাঝখানে মকরাকৃতি বালুচর, বালুচরের উপর নানা জাতীয় জলচর পক্ষী—সবই অতি সুন্দর। কিন্তু ক্রমাগত একই দৃশ্যের পুনরাবর্তন দেখিতে আর ভাল লাগে না। নৌকার অল্প পরিসরে সীমাবদ্ধ জীবনযাত্রা অসহ্য মনে হয়, স্থলচর জীবের স্থলাকাঙ্ক্ষা দুর্বার হইয়া ওঠে।

সেদিন দুই ভগিনী পালের ছায়ায় গুণবৃক্ষের কাণ্ডে পৃষ্ঠ রাখিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া ছিলেন। ছাদের উপর অন্য কেহ নাই; নৌকার পিছন দিকে হালী একাকী হাল ধরিয়া বসিয়া আছে। তাহাকে ছাদ হইতে দেখা যায় না। বিদ্যুন্মালার ক্লান্ত চক্ষু জলের উপর নিবদ্ধ, মণিকঙ্কণার চক্ষু দু'টি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত চারিদিকে ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে। মণিকঙ্কণার মনে অনেক অসন্তোষ জমা হইয়া উঠিয়াছে। এ নৌকাযাত্রার কি শেষ নাই? আর তো পারা যায় না। সহসা তাহার অধীরতা বাঙ্‌মূর্তি ধরিয়া বাহির হইয়া আসিল, সে বিদ্যুন্মালার দিকে ঘাড় ফিরাইয়া বলিল—'একটা কথা বল্‌ দেখি মালা। চিরদিনই বিয়ের বর কনের বাড়িতে বিয়ে করতে যায়। কিন্তু তুই বরের বাড়িতে বিয়ে করতে যাচ্ছিস, এ কেমন কথা?'

সত্যই তো, এ কেমন কথা! এই বিপরীত আচরণের মূল অন্বেষণ করিতে হইলে কিছু ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে।

দুই

সঙ্গম বংশীয় দুই ভাই, হরিহর ও বুক্ক বিজয়নগর রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবনকথা অতি বিচিত্র। দিল্লীর সুলতান মুহম্মদ তুঘ্‌লক দুই ভ্রাতার অসামান্য রাজনৈতিক প্রতিভা দেখিয়া তাঁহাদের জোর করিয়া মুসলমান করিয়াছিলেন। সে-সময়ে গুণী ও কর্মকুশল হিন্দু পাইলেই মুসলমান রাজারা তাঁহাদের বলপূর্বক মুসলমান করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইতেন। কিন্তু হরিহর ও বুক্ক বেশি দিন মুসলমান রহিলেন না। তাঁহারা পলাইয়া আসিয়া শৃঙ্গেরি শঙ্করমঠের এক সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হইলেন। সন্ন্যাসীর নাম বিদ্যারণ্য, তিনি তাঁহাদের হিন্দুধর্মে পুনর্দীক্ষিত করিলেন। তারপর দুই ভাই মিলিয়া গুরুর সাহায্যে হিন্দুরাজ্য বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিজয়নগরের আদি নাম বিদ্যানগর, পরে উহা মুখে মুখে বিজয়নগরে পরিণত হয়।

কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যখন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, সেই সময় কৃষ্ণার উত্তর তীরে একজন শক্তিশালী মুসলমান দিল্লীর নাগপাশ ছিন্ন করিয়া এক স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই রাজ্যের নাম বহমনী রাজ্য। উত্তরকালে বিজয়নগর ও বহমনী রাজ্যের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রায় চিরস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বহমনী রাজ্যের চেষ্টা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমান অধিকার প্রসারিত করিবে, বিজয়নগরের প্রতিজ্ঞা কৃষ্ণার দক্ষিণে মুসলমানকে ঢুকিতে দিবে না।

রাজ্য প্রতিষ্ঠার অনুমান শত বর্ষ পরে বিজয়নগরেব যিনি বাজা হইলেন তাঁহার নাম দেবরায়। ইতিহাসে ইনি প্রথম দেবরায় নামে পরিচিত। দেবরায় অসাধারণ রাজ্যশাসক ও রণপণ্ডিত ছিলেন। তিনি তুরস্ক হইতে ধানুকী সৈন্য আনাইয়া নিজ সৈন্যদল দৃঢ় কবিয়াছিলেন এবং যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত কবিয়াছিলেন। তাঁহার পঞ্চাশবর্ষব্যাপী শাসনকালে সমস্ত দাক্ষিণাত্য বিজয়নগরের পদানত হইয়াছিল, মুসলমান রাজশক্তি কৃষ্ণার দক্ষিণে পদার্পণ করিতে পারে নাই।

কিন্তু দেবরায়ের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও বিজয়রায় ছিলেন কর্মশক্তিহীন অপদার্থ। ভাগ্যক্রমে বিজয়রায়ের পুত্র দ্বিতীয় দেবরায় পিতামহের মতই ধীমান ও রণদক্ষ। তাই প্রথম দেবরায় নিজের মৃত্যুকাল আসন্ন দেখিয়া দুই পুত্রের সহিত তরুণ পৌত্রকেও যৌববাজ্যে অভিষেক করিলেন এবং কতকটা নিশ্চিন্ত মনে দেহরক্ষা করিলেন।

তরুণ দেবরায় পিতা ও পিতৃব্যকে ডিঙ্গাইয়া রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন। অতঃপব আট বৎসর অতীত হইয়াছে। পিতৃব্য রামচন্দ্র বেশি দিন টিকিলেন না, কিন্তু পিতা বিজয়রায় অদ্যাপি জীবিত আছেন; রাজা হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাঁহার নাই: প্রৌঢ় বয়সে রাজপ্রাসাদে বসিয়া তিনি দুষ্ট শিশুর ন্যায় বিচিত্র খেলা খেলিতেছেন।

দেবরায়ের বয়স বর্তমানে পঁয়ত্রিশ বছর। তাঁহার দেহ যেমন দৃঢ় ও সুগঠিত, চরিত্রও তেমনি বজ্রকঠিন। গম্ভীর মিতবাক্, সংবৃতমন্ত্র পুরুষ। রাজ্যশাসন আরম্ভ করিয়া তিনি দেখিলেন, ম্লেচ্ছ শত্রু তো আছেই, উপরন্তু হিন্দু রাজারাও নিরন্তর পরস্পরের সহিত বিবাদ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে একতা নাই, সহধর্মিতা নাই। অথচ ম্লেচ্ছ-শক্তির গতিরোধ করিতে হইলে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। দেবরায় একটি একটি করিয়া রাজকন্যা বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা যদি ঐক্যসাধন না হয় কুটুম্বিতার দ্বারা হইতে পারে। সেকালে রাজন্যবর্গের মধ্যে এই জাতীয় বিবাহ মোটেই বিরল ছিল না, বরং রাজনৈতিক কূটকৌশলরূপে প্রশংসার্হ কার্য বিবেচিত হইত।

সকল রাজা অবশ্য স্বেচ্ছায় কন্যাদান করিলেন না, কাহারও কাহারও উপর বলপ্রয়োগ করিতে হইল। সবচেয়ে কষ্ট দিলেন কলিঙ্গের রাজা গজপতি চতুর্থ ভানুদেব।

দাক্ষিণাত্যের পূর্ব প্রান্তে সমুদ্রতীরে কলিঙ্গ দেশ, বিজয়নগর হইতে বহু দূর। দেবরায়ের দূত

বিবাহের প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইল। কলিঙ্গরাজ ভানুদেব ভাবিলেন, এই বিবাহের প্রস্তাব প্রকারান্তরে তাঁহাকে বিজয়নগরের বশ্যতা স্বীকার করার আমন্ত্রণ। তিনি নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিবেশী অন্ধ্র রাজ্য সসৈন্যে আক্রমণ করিলেন, কারণ অন্ধ্র দেশ বিজয়নগরের মিত্র।

সংবাদ পাইয়া দেবরায় সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে ভানুদেব পরাজিত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করিলেন। শান্তির শর্তস্বরূপ তাঁহাকে দেবরায়ের হস্তে নিজ কন্যাকে সমর্পণ করার প্রস্তাব স্বীকার করিতে হইল। দেবরায় কিন্তু বিবাহ করিতে শ্বশুরগৃহে আসিতে পারিবেন না; কন্যাকে বিজয়নগর পাঠাইতে হইবে, সেখানে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইবে।

তৎকালে বাজাদের নিজ রাজ্য ছাড়িয়া বহু দূরে যাওয়া নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে শত্রু ওত পাতিযা আছে, সিংহাসন শূন্য দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে। তাছাড়া ঘরের শত্রু তো আছেই।

ভানুদেব কন্যাকে বিজয়নগরে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। স্থলপথ অতি দুর্গম ও বিপজ্জনক; কন্যা জলপথে যাইবে। কলিঙ্গপত্তন বন্দরে তিনটি বহিত্র সজ্জিত হইল। খাদ্যসামগ্রী উপঢৌকন ও জলযোদ্ধার দল সঙ্গে থাকিবে। রাজদুহিতা বিদ্যুন্মালা সখী পরিজন লইয়া নৌকায় উঠিলেন। তিনটি নৌকা সমুদ্রপথে দক্ষিণদিকে চলিল। তারপর কৃষ্ণা নদীর মোহনায় পৌঁছিয়া নদীতে প্রবেশ করিল। তদবধি নৌকা তিনটি উজানে চলিয়াছে।

যাত্রা শেষ হইতে বেশি বিলম্ব নাই। ইতিমধ্যে দুই রাজকন্যা অধীর ও উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। সঙ্গে কন্যাকর্তারূপে আসিয়াছেন মাতুল চিপিটকমূর্তি এবং রাজকন্যাদের ধাত্রী মন্দোদরী। রাজবৈদ্য রসরাজও সঙ্গে আছেন। ইঁহাদের কথা ক্রমশ বক্তব্য।

তিন

মণিকঙ্কণার কথা শুনিয়া কুমারী বিদ্যুন্মালা তাহার দিকে ফিরিলেন না, সম্মুখে চাহিয়া থাকিয়া অলসকণ্ঠে বলিলেন—'কঙ্কণা, তুই হাসালি। এ নাকি বিয়ে! এ তো রাজনৈতিক দাবাখেলার চাল।'

মণিকঙ্কণা পা গুটাইয়া বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিয়া বসিল। বলিল—'হোক দাবাখেলার চাল। বর বিয়ে করতে আসবে না কেন?'

সম্মুখে অর্ধ ক্রোশ দূরে নদী মিলিত হইয়া যেখানে বিক্ষুব্ধ জলভ্রমি রচনা করিয়া ছুটিয়াছে, সেইদিকে তাকাইয়া বিদ্যুন্মালাব অধরপ্রান্তে একটু বাঁকা হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—'তিন-তিনটি বৌ ছেড়ে আসা কি সহজ? তাই বোধহয আসতে পারেনি।'

মণিকঙ্কণা হাসি-হাসি মুখে কিছুক্ষণ চাহিয়া বহিল, তারপর বিদ্যুন্মালার বাহুর উপর হাত রাখিয়া বলিল—'মহারাজ দেববায়ের তিনটি রানী আছে, তুই হবি চতুর্থী। তাই বুঝি তোর ভাল লাগছে না?'

বিদ্যুন্মালা এবার মণিকঙ্কণার পানে চক্ষু ফিরাইলেন—'তোর বুঝি ভাল লাগছে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'আমার ভালও লাগছে না, মন্দও লাগছে না। রাজাদের অনেকগুলো রানী তো থাকেই। এক রাজার এক রানী কখনো শুনিনি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি শুনেছি। রামচন্দ্রের একটিই সীতা ছিল।'

মণিকঙ্কণা হাসিল—'সে তো ত্রেতাযুগের কথা। কলিকালে মেয়ে সস্তা, তাই পুরুষেরা যে যত পারে বিয়ে করে। যেমন অবস্থা তেমনি ব্যবস্থা।'

বিদ্যুন্মালাব কণ্ঠস্বর একটু উদ্দীপ্ত হইল—'বিশ্রী ব্যবস্থা। স্ত্রী যদি স্বামীকে পুরোপুরি না পায়, তাহলে বিয়ের কোনো মানেই হয় না।'

মণিকঙ্কণা কিয়ৎকাল নীরবে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'পুরোপুরি পাওয়া কাকে বলে ভাই? স্বামী তো আর স্ত্রীর সম্পত্তি নয় যে, কাউকে ভাগ দেবে না। বরং স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তি।'

বিদ্যুন্মালার বিম্বাধর স্ফুরিত হইল, চোখে বিদ্রোহের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন—'আমি মানি না।'

মণিকঙ্কণা কলস্বরে হাসিয়া উঠিল—'না মানলে কী হবে, বিয়ে করতে তো যাচ্ছিস!'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'যাচ্ছি। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত নিরপবাধ মানুষ যেমন বধ্যভূমিতে যায়, আমিও তেমনি যাচ্ছি। যে-স্বামীর তিনটে বৌ আছে তাকে কোনোদিন ভালবাসতে পারব না।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার গলা জড়াইয়া ধরিল—'কেন তুই মনে কষ্ট পাচ্ছিস ভাই! ভেবে দ্যাখ, তোর মা আর আমাব মা কি মহারাজকে ভালবাসেন না? বিয়ে হোক, তুইও নিজের মহারাজটিকে ভালবাসবি। তখন আর সতীনের কথা মনে থাকবে না।'

বিদ্যুন্মালা কিছুক্ষণ বিবসমুখে চুপ করিয়া রহিলেন, তারপব বলিলেন—'মনে কব, মহারাজ দেবরায় আমার সঙ্গে সঙ্গে তোকেও গ্রহণ কবলেন, তুই তাঁকে ভালবাসতে পারবি?'

মণিকঙ্কণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'পারব না! বলিস কি তুই! তাঁকে অন্য বৌবা যতখানি ভালবাসে আমি তার চেয়ে ঢের বেশি ভালবাসব। আমাব বুকে ভালবাসা ভবা আছে। যিনিই আমার স্বামী হবেন তাঁকেই আমি প্রাণভরে ভালবাসব।'

বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণাকে কাছে টানিয়া লইযা তাহার মুখখানি ভাল করিয়া দেখিলেন, একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিযা বলিলেন—'আমি যদি তোর মতন হতে পারতুম। আমার মন বড় স্বার্থপর, যাকে চাই কাউকে তার ভাগ দিতে পাবি না।'

মণিকঙ্কণা আবেগভরে বিদ্যুন্মালাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া লইয়া বলিল—'না না, কখনো না। তুই বড় বেশি ভাবিস; অত ভাবলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। যা হবার তাই যখন হবে তখন ভেবে কি লাভ?'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না; দুই ভগিনী ঘনীভূত হইয়া নীরবে বসিয়া বহিলেন। সূর্যের বর্ণ আবক্তিম হইযা উঠিযাছে, রৌদ্রেব উত্তাপ নিম্নগামী; দক্ষিণ তীবেব গন্ধ লইয়া মন্দ মধুর বাতাস বহিতে আরম্ভ কবিয়াছে। নদীবক্ষে এই সময়টি পরম মনোরম।

ছাদের নীচে মড়্‌মড়্ মচ্‌মচ্ শব্দ শুনিয়া যবতিদ্বয়ের চমক ভাঙিল। মণিকঙ্কণা চকিত হাসিয়া চুপিচপি বলিল—'মন্দোদরীব ঘুম ভেঙেছে।'

অতঃপর ছাদের উপর এক বিপুলকাযা রমণীব আবির্ভাব ঘটিল। আলুথালু বেশ, হাতে একটি রূপার তাম্বুলকরঙ্ক; সে আসিয়া থপ্ করিয়া রাজকন্যাদের সম্মুখে বসিল, প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া তুড়ি দিল, বলিল—'নমো দারুব্রহ্ম।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালাকে চোখের ইঙ্গিত করিল, মন্দোদরীকে ক্ষেপাইতে হইবে। সময় যখন কাটিতে চায় না তখন মন্দোদরীকে লইয়া দু'দণ্ড রঙ্গ-পবিহাস করিতে মন্দ লাগে না।

কলিঙ্গের উত্তরে ওড্রদেশ, মন্দোদরী সেই ওড্রদেশের মেয়ে। বয়স অনুমান চল্লিশ, গায়ের রঙ গব্য ঘৃতের মত; নিটোল নিভাঁজ কলেবরটি দেখিয়া মনে হয় একটি মেদপূর্ণ অলিঞ্জর। গায়ে ভারী ভারী সোনার গহনা, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সদাই হাস্য-বিম্বিত। আঠারো বছর পূর্বে সে বিদ্যুন্মালার ধাত্রীরূপে কলিঙ্গের রাজসংসারে প্রবেশ করিয়াছিল, অদ্যাপি সগৌরবে সেখানে বিরাজ করিতেছে। বর্তমানে সে দুই রাজকন্যার অভিভাবিকা হইয়া বিজয়নগরে চলিয়াছে। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, রাজসংসারই তাহার সংসার।

মণিকঙ্কণা মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—'দারুব্রহ্ম তোমার মঙ্গল করুন। আজ দিবানিদ্রাটি কেমন হল?'

মন্দোদরী পানের ডাবা খুলিতে খুলিতে বলিল—'দিবানিদ্রা আর হল কই। খোলের মধ্যে

যা গরম, তালের পাখা নাড়তে নাড়তেই দিন কেটে গেল। শেষ বরাবর একটু ঝিমিয়ে পড়েছিলুম।'

বিদ্যুন্মালা উদ্বেগভরা চক্ষে মন্দোদরীকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'এমন করে না ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ক'দিন বাঁচবি মন্দা! দিনের বেলা তোর চোখে ঘুম নেই, রাত্রে জলদস্যুর ভয়ে চোখে-পাতায় করতে পারিস না। শরীর যে দিন দিন শুকিয়ে কাঠি হয়ে যাচ্ছে।'

মন্দোদরী গদ্‌গদ হাস্য করিয়া বলিল—'যা যা, ঠাট্টা করতে হবে না। আমি তোদের মতন অকৃতজ্ঞ নই, খাই-দাই মোটা হই। তোরা খাস-দাস কিন্তু গায়ে গত্তি লাগে না।'

পানের বাটা খুলিয়া মন্দোদরী দেখিল তাহার মধ্যে ভিজা ন্যাকড়া জড়ানো দুই-তিনটি পানের পাতা রহিয়াছে। ইহা বিচিত্র নয়, কারণ দীর্ঘপথ আসিতে পানের অভাব ঘটিয়াছে। দুই-একটি নদীতীরস্থ গ্রামে ডিঙি পাঠাইয়া কিছু কিছু পান সংগ্রহ করা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা যথেষ্ট নয়। অথচ পানের ভোক্তা অনেক। মন্দোদরী প্রচুর পান খায়, মাতুল চিপিটকমূর্তিও তাম্বূল-রসিক। বস্তুত যে পানের বাটাটি মন্দোদরীর সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তাহা মাতুল মহাশয়ের। মন্দোদরী নিজের বরাদ্দ পান শেষ করিয়া মামার বাটায় হাত দিয়াছে।

বাটায় পান ছাড়াও চুন গুয়া কেয়াখয়ের মৌরী এলাচ দারুচিনি, নানাবিধ উপচার রহিয়াছে। মন্দোদরী পানগুলি লইয়া পরিপাটিভাবে পান সাজিতে প্রবৃত্ত হইল।

দুই ভগিনী দেখিলেন স্থূলতার প্রতি কটাক্ষপাতে মন্দোদরী ঘামিল না, তখন তাঁহারা অন্য পথ ধরিলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'আচ্ছা মন্দোদরি, তোকে তো আমরা জন্মে অবধি দেখছি, কিন্তু তোর রাবণকে তো কখনো দেখিনি। তোর রাবণের কি হল?'

মন্দোদরী বলিল—'আমার রাবণ কি আর আছে, অনেক দিন গেছে। আমি রাজসংসারে আসার আগেই তাকে যমে নিয়েছে।'

বিদ্যুন্মালা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—'সত্যিই তোর স্বামীর নাম রাবণ ছিল নাকি?'

মন্দোদরী মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, তার নাম ছিল কুম্ভকর্ণ।'

মণিকঙ্কণা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'ও—তাই! তোর কুম্ভকর্ণ যাবার সময় ঘুমটি তোকে দিয়ে গেছে।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তাহলে তোর এখন শুধু বিভীষণ বাকি!'

মন্দোদরী আর একটি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—'আর বিভীষণ! তোদের সামলাতে সামলাতেই বয়স কেটে গেল, এখন আর বিভীষণ কোত্থেকে পাব।'

মণিকঙ্কণা সান্ত্বনার স্বরে বলিল,—পাবি পাবি। কতই বা তোর বয়স হয়েছে। এই দ্যাখ না, বিজয়নগরে যাচ্ছিস, সেখানকার বিভীষণেরা তোকে দেখলে হাঁ করে ছুটে আসবে।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—কে বলতে পারে, ম্লেচ্ছ দেশের আমীর-ওমরা হয়তো তোকে ধরে নিয়ে গিয়ে বেগম করবে।'

মন্দোদরী বলিল—'ও মা গো, তারা যে গরু খায়।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তোকে পেলে তারা গরু খাওয়া ছেড়ে দেবে।'

মন্দোদরী জানিত ইহারা পরিহাস করিতেছে; কিন্তু তাহার অন্তরের এক কোণে একটি লুক্কায়িত আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহা এই ধরনের রসিকতায় তৃপ্তি পাইত। সে পান সাজিয়া মুখে দিল, চিবাইতে চিবাইতে বলিল—'তা যা বলিস। কার ভাগ্যে কি আছে কে বলতে পারে? নমো দারুব্রহ্ম।'

এই সময়ে নৌকার নিম্নতল হইতে তীক্ষ্ণ চিৎকারের শব্দ শোনা গেল। শব্দটি স্ত্রী-কণ্ঠোত্থিত মনে হইতে পারে, কিন্তু বস্তুত উহা মাতুল চিপিটকমূর্তির কণ্ঠস্বর। কোনো কারণে তিনি জাতক্রোধ হইয়াছেন।

পরক্ষণেই তিন চার লাফ দিয়া চিপিটকমূর্তি ছাদে উঠিয়া আসিলেন। মন্দোদরী কোলের কাছে প্যানের বাটা লইয়া বসিয়া আছে দেখিয়া তাঁহার চক্ষুদ্বয় ঘূর্ণিত হইল, তিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া

সূচীতীক্ষ্ণ কণ্ঠে তর্জন করিলেন—'এই মন্দোদরি! আমার ডাবা চুরি করেছিস!' তিনি ছোঁ মারিয়া ডাবাটি তুলিয়া লইলেন।

মন্দোদরি গালে হাত দিয়া বলিল—'ও মা! ওটা নাকি তোমার ডাবা! আমি চিনতে পারিনি।'

চিপিটকমূর্তি ডাবা খুলিয়া দেখিলেন একটিও পান নাই, তিনি অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন—'রাক্কুসী! সব পান খেয়ে ফেলেছিস! দাঁড়া, আজ তোকে যমালয়ে পাঠাব। ঠেলা মেরে জলে ফেলে দেব, হাঙরে কুমীরে তোকে চিবিয়ে খাবে।'

মন্দোদরী নির্বিকার রহিল; সে জানে তাহাকে ঠেলা দিয়া জলে ফেলিয়া দিবার সামর্থ্য চিপিটকমূর্তির নাই। তাছাড়া এইরূপ অজাযুদ্ধ তাহাদের মধ্যে নিত্যই ঘটিয়া থাকে। চিপিটকমূর্তি মহাশয়ের কণ্ঠস্বর যেমন সূক্ষ্ম তাঁহার চেহারাটিও তেমনি নিরতিশয় ক্ষীণ। তাঁহাকে দেখিলে গঙ্গাফড়িং-এর কথা মনে পড়িয়া যায়; সরু গায়ে কেবল লম্বা এক জোড়া ঠ্যাং, আর যাহা আছে তাহা নামমাত্র। কিন্তু মাতুল মহাশয়ের পূর্ণ পরিচয় যথাসময়ে দেওয়া যাইবে।

দুই রাজকন্যা বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া মাতুল মহাশয়ের বাহ্বাস্ফোট পরম কৌতুকে উপভোগ করিতেছেন ও হাসি চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন। সূর্য তুঙ্গভদ্রার স্রোতে রক্ত উদ্‌গিরণ করিয়া অস্ত যাইতেছে। নৌকা সঙ্গমের নিকটবর্তী হইতেছে, সম্মিলিত নদীর উতরোল তরঙ্গে অল্প অল্প দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। নৌকাগুলি দক্ষিণদিকের তটভূমির পাশ ঘেঁষিয়া যাইতেছে, এইভাবে সঙ্গমের তরঙ্গভঙ্গ যথাসম্ভব এড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করিবে। উত্তরের তটভূমি বেশ দূরে। মণিকঙ্কণার চঞ্চল চক্ষু জলের উপর ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা এক স্থানে আসিয়া স্থির হইল; কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সে বিদ্যুন্মালাকে বলিল—'মালা, দ্যাখ তো—ঐ জলের ওপর—কিছু দেখতে পাচ্ছিস!' বলিযা উত্তরদিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।

চার

দুই ভগিনী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বিদ্যুন্মালা চোখের উপর করতলের আচ্ছাদন দিয়া দেখিলেন, তারপর বলিয়া উঠিলেন—'হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। একটা মানুষ ভেসে যাচ্ছে—ঐ যে হাত তুলল—হাতে কি একটা রয়েছে—'

মণিকঙ্কণাও দেখিতেছিল, বলিল—'কৃষ্ণা নদী দিয়ে ভেসে এসেছে, বোধহয় অনেক দূর থেকে সাঁতার কেটে আসছে—আর ভেসে থাকতে পারছে না—সঙ্গমের তোড়ের মুখে পড়লেই ডুবে যাবে।'

হঠাৎ মণিকঙ্কণা দ্রুতপদে নীচে নামিয়া গেল। বিদ্যুন্মালা উৎকণ্ঠিতভাবে চাহিয়া রহিলেন। মামাও যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া ইতি-উতি ঘাড় ফিরাইতে লাগিলেন। অন্য নৌকা দু'টির বাহিরে লোকজন নাই। কেহ কিছু লক্ষ্যও করিল না।

তারপর শঙ্খধ্বনি করিতে করিতে মণিকঙ্কণা আবার ছাদে উঠিয়া আসিল, সে শঙ্খ আনিবার জন্য নীচে গিয়াছিল। শাঁখ বাজাইয়া এক নৌকা হইতে অন্য নৌকায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা এই নৌ-বহরের সাধারণ রীতি; কেবল আশঙ্কাজনক কিছু ঘটিলে ডঙ্কা বাজিবে। মণিকঙ্কণা পুনঃ পুনঃ শাঁখ বাজাইয়া চলিল; বিদ্যুন্মালা উদ্বেগভরা চক্ষে ভাসমান মানুষটার দিকে চাহিতে লাগিলেন। মানুষটা স্রোতের প্রবল আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে এবং প্রাণপণে ভাসিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।

শঙ্খনাদ শুনিয়া দ্বিতীয় নৌকার খোলের ভিতর হইতে পিল্ পিল্ করিয়া লোক বাহির হইয়া পটপত্তনের উপর দাঁড়াইল। সকলের দৃষ্টি ময়ূরপঙ্খীর দিকে। বিদ্যুন্মালা বাহু প্রসারিত করিয়া ভাসমান মানুষটাকে দেখাইলেন। সকলের চক্ষু সেইদিকে ফিরিল।

ব্যাপার বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না; একটা মানুষ স্রোতে পড়িয়া অসহায়ভাবে নাকানি-

চোবানি খাইতেছে, তলাইয়া যাইতে বেশি দেরি নাই। তখন দ্বিতীয় নৌকা হইতে একজন লোক জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল, ক্ষিপ্র বাহু সঞ্চালনে সাঁতার কাটিয়া মজ্জমানের দিকে চাহিল। তাহার দেখাদেখি আরো দুই-তিনজন জলে ঝাঁপ দিল।

ময়ূরপঙ্খীর ছাদে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা, মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটকমূর্তি সাগ্রহ উত্তেজনাভরে দেখিতে লাগিলেন; কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ রাজবৈদ্য রসরাজও তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তিনি চোখে ভাল দেখেন না, মণিকঙ্কণা তাঁহাকে পরিস্থিতি বুঝাইয়া দিল।

প্রথম সাঁতারুর নাম বলরাম; লোকটা বলিষ্ঠ ও দীর্ঘবাহু। সে প্রবল বাহু তাড়নায় তীরের মত জল কাটিয়া অগ্রসর হইল; নদীর মাঝখানে উতবোল জলপ্রবাহ্ তাহার গতি মন্থর করিতে পারিল না; যেখানে মজ্জমান ব্যক্তি স্রোতের মুখে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কোনোক্রমে ভাসিয়া চলিয়াছিল তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইল। লোকটি চতুর, কি করিয়া মজ্জমানকে উদ্ধার করিতে হয় তাহা জানে। মজ্জমান লোকের হাতের কাছে যাইলে সে উন্মত্তের ন্যায় উদ্ধর্তাকে জড়াইয়া ধরিবে; তাই লোকটি তাহার হাতের নাগালে না গিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া চলিল।

ময়ূরপঙ্খীর ছাদে যাঁহারা শতচক্ষু হইয়া চাহিয়া ছিলেন তাঁহারা দেখিলেন, বলরাম ফিরিয়া আসিতেছে এবং তাহার পাঁচ-ছয় হাত ব্যবধানে মজ্জমান লোকটি তাহার অনুসরণ করিতেছে; যেন কোনো অদৃশ্যসূত্রে দুইজন আবদ্ধ রহিয়াছে। তারপর দেখা গেল, অদৃশ্য সূত্রটি বংশদণ্ড। দুইজনে বংশদণ্ডের দুইপ্রান্ত ধরিয়াছে এবং বলরাম অন্য ব্যক্তিকে নৌকার দিকে টানিয়া আনিতেছে। অন্য সাঁতারুরাও আসিয়া পড়িল। তখন দেখা গেল, একটা নয়, দুইটা বংশদণ্ড। সকলে মিলিয়া বংশের এক প্রান্ত ধরিয়া লোকটিকে টানিয়া আনিতে লাগিল।

নৌকার উপর সকলে বিস্ময় অনুভব করিলেন। বংশদণ্ড দু'টা কোথা হইতে আসিল? তবে কি মজ্জমান ব্যক্তির হাতেই লাঠি ছিল? কিন্তু লাঠি কেন?

ইতিমধ্যে দুইজন নাবিক বুদ্ধি কবিয়া ডিঙিতে চড়িয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু মজ্জমান ব্যক্তিকে ডিঙিতে তোলা সম্ভব হইল না; উদ্ধর্তরা ডিঙির কানা ধরিল, ডিঙির নাবিকেরা দাঁড় টানিয়া সকলকে নৌকাব দিকে লইয়া চলিল।

নৌকা তিনটি পাল নামাইযাছিল এবং স্রোতের টানে অল্প অল্প পিছু হটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। মণিকঙ্কণা দেখিল ডিঙাটি মাঝেব নৌকার দিকে যাইতেছে, সে হাত তুলিয়া আহ্বান করিল। তখন ডিঙা আসিয়া ময়ূরপঙ্খীর গায়ে ভিড়িল। বলরাম ও সাঁতারুরা নৌকায় উঠিল, মজ্জমানকে নৌকায় টানিয়া তুলিয়া নৌকার গুড়ার উপর শোয়াইয়া দিল। লোকটিকে দেখিয়া মৃত বলিয়া মনে হয়, কিন্তু সে দুই হাতে দুইটি বংশদণ্ড দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া আছে।

নৌকার ছাদ হইতে সকলে দেখিলেন জল হইতে সদ্যোদ্ধৃত ব্যক্তি বয়সে যুবা; তাহার দেহ দীর্ঘ এবং দৃঢ়, কিন্তু বর্তমানে শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। দেহের গৌর বর্ণ দীর্ঘকাল জলমজ্জনের ফলে মৃতবৎ পাংশু বর্ণ ধাবণ করিয়াছে। বিদ্যুন্মালার হৃদয় ব্যথাভরা করুণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল; আহা, হতভাগ্য যুবক কোন্ দৈব দুর্বিপাকে এরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে—হয়তো বাঁচিবে না—

মণিকঙ্কণা তাঁহার মনের কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সংহত কণ্ঠে বলিল—'বেঁচে আছে তো?'

মাতুল চিপিটকমূর্তি গ্রীবা লম্বিত করিয়া দেখিতেছিলেন, শিরঃসঞ্চালন করিয়া বলিলেন—'মরে গিয়েছে, জল থেকে তোলবার আগেই মরে গিয়েছে।'

বলরাম সংজ্ঞাহীন যুবকের বুকে হাত রাখিয়া দেখিতেছিল, সে ফিরিয়া ছাদের দিকে চক্ষু তুলিল, সসম্ভ্রমে বলিল—'আজ্ঞা না, বেঁচে আছে; বুক ধুক্‌ধুক্ করছে। রসরাজ মহাশয় দয়া করে একবার নাড়ীটা দেখবেন কি?'

ক্ষীণদৃষ্টি রসরাজ এতক্ষণ সবই শুনিতেছিলেন এবং অস্পষ্টভাবে দেখিতেছিলেন, কিন্তু কিছুই ভালভাবে ধারণা করিতে না পারিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—'হাঁ হাঁ, অবশ্য অবশ্য। আমি যাচ্ছি—এই যে—'

মণিকঙ্কণা তাঁহার হাত ধরিয়া পাটাতনের উপব নামাইয়া দিল, তিনি সন্তর্পণে গিয়া প্রথমে যুবকের গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, তারপর নাড়ি টিপিয়া ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন। মণিকঙ্কণা তাঁহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল—'কেমন দেখছেন?'

রসরাজ সজাগ হইয়া বলিলেন—'নাড়ি আছে, কিন্তু বড় দুর্বল। দাঁড়াও, আমি ওষুধ দিচ্ছি।' তিনি রইঘরের দিকে চলিলেন। মণিকঙ্কণা তাঁহার সঙ্গে চলিল।

ময়ূরপঙ্খী নৌকায় দুইটি রইঘর; একটিতে দুই রাজকন্যা থাকেন, অন্যটিতে মাতুল চিপিটকমূর্তি ও রসরাজ। নিজের রইঘরে গিয়া রসরাজ একটি পেটরা খুলিলেন। পেটরার মধ্যে নানাবিধ ঔষধ, খল-নুড়ি প্রভৃতি রহিয়াছে। রসরাজ একটি স্ফটিকের ফুকা তুলিয়া লইলেন; তাহাতে জলের ন্যায় বর্ণহীন তরল পদার্থ রহিয়াছে। এই তরল পদার্থ তীব্রশক্তির কোহল। রসরাজ একটি পানপাত্রে অল্প জল লইয়া তাহাতে পাঁচ বিন্দু কোহল ফেলিলেন, মণিকঙ্কণার হাতে পাত্র দিয়া বলিলেন—'এতেই কাজ হবে। খাইয়ে দাও গিয়ে।'

মণিকঙ্কণা দ্রুতপদে উপরে গিয়া পাত্রটি বলরামের হাতে দিল, বলিল—'ওষুধ খাইয়ে দাও।'

'এই যে রাজকুমারি!' বলরাম পাত্রটি লইয়া নিপুণভাবে সংজ্ঞাহীনের মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিল। মণিকঙ্কণা সপ্রশংস নেত্রে তাহার কার্যকলাপ দেখিতে দেখিতে বলিল—'তুমিই প্রথমে গিয়ে ওকে ভাসিয়ে রেখেছিলে—না? তোমার নাম কি?' মণিকঙ্কণা রাজকন্যা হইলেও সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে সহজভাবে কথা বলিতে পারে।

বলরাম হাত জোড় করিয়া বলিল—'দাসের নাম বলরাম কর্মকার। আমি বঙ্গদেশের লোক, তাই ভাল সাঁতার জানি।'

মণিকঙ্কণা কৌতূহলী চক্ষে বলরামকে দেখিল, হাসিমুখে ঘাড় নাড়িয়া তাহার পরিচয় স্বীকার করিল, তারপর ছাদে উঠিয়া গিয়া বিদ্যুন্মালার পাশে বসিল। রসরাজ মহাশয়ও ইতিমধ্যে ছাদে ফিরিয়া গিয়াছেন। ছাদ পাটাতন হইতে বেশি উচ্চ নয়, মাত্র তিন হাত। ছাদে উঠিবার দুই ধাপ তক্তার সিঁড়ি আছে। রসরাজ মহাশয় সহজেই ছাদে উঠিতে পারেন, কেবল নামিবার সময় কষ্ট।

অতঃপর প্রতীক্ষা আরম্ভ হইল, ঔষধের ক্রিয়া কতক্ষণে আরম্ভ হইবে। মাতুল ও রসরাজ নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন, দুই রাজকন্যা ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া মৃতকল্প যুবকের পানে চাহিয়া রহিলেন, মন্দোদরী থুম হইয়া বসিয়া রহিল।

অর্ধ দণ্ড কাটিতে না কাটিতে যুবক ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল। কিছুক্ষণ শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল। বলরাম তাহাকে ধরিয়া বসাইয়া দিল, সহাস্য মুখে বলিল—'এখন কেমন মনে হচ্ছে।'

দর্শকদের সকলের মুখেই উৎফুল্ল হাসি ফুটিয়াছে। যুবক প্রশ্নের উত্তর দিল না, ধীর সঞ্চারে ঘাড় ফিরাইয়া চারিদিকে চাহিতে লাগিল। বলরাম বলিল—'তুমি কে? তোমার দেশ কোথা? নাম কি? নদীতে ভেসে যাচ্ছিলে কেন?'

এবারও যুবক উত্তর দিল না, দুই হাতে লাঠিতে ভর দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল। রসরাজ ছাদ হইতে বলিলেন—'আহা, ওকে এখন প্রশ্ন কোরো না। নিজেদের নৌকায় নিয়ে যাও, আগে এক পেট গরম ভাত খাওয়াও। নাড়ি সুস্থ হবে, তখন যত ইচ্ছা প্রশ্ন কোরো।'

'যে আজ্ঞা।'

বলরাম ও নাবিকেরা ধরাধরি করিয়া যুবককে ডিঙিতে তুলিল। ডিঙি মকরমুখী নৌকার দিকে চলিয়া গেল।

পশ্চিম আকাশে দিনের চিতা ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছে, সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিতেছে। নৌকা তিনটি পাল তুলিয়া আবার সম্মুখদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। আজ শুক্লা ত্রয়োদশী, আকাশে চাঁদ আছে। নৌকা তিনটি সঙ্গম পার হইয়া তুঙ্গভদ্রায় প্রবেশ করিবে, তারপর তীর ঘেঁষিয়া কিংবা নদীমধ্যস্থ

চরে নোঙ্গর ফেলিবে। নদীতে রাত্রিকালে নৌকা চালনা নিরাপদ নয়।

রসরাজ মহাশয় উৎফুল্ল স্বরে বলিলেন—'কোহলের মত তেজস্কর ওষুধ আর আছে! পরিস্রুত সুরাসার—সাক্ষাৎ অমৃত। এক ফোঁটা মুখে পড়লে তিন দিনের বাসি মড়া শয্যায় উঠে বসে।'

মন্দোদরী একটি গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া বলিল—'জয় দারুব্রহ্ম।'

মণিকঙ্কণা হাসিয়া উঠিল—'এতক্ষণে মন্দোদরীর দারুব্রহ্মকে মনে পড়েছে।—চল মালা, নীচে যাই। আজ আর চুল বাঁধা হল না।'

পাঁচ

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদ মাথার উপর উঠিয়াছে। নৌকা তিনটি সঙ্গম ছাড়াইয়া তুঙ্গভদ্রার খাতে প্রবেশ করিয়াছে এবং একটি চরের পাশে পরস্পর হইতে শতহস্ত ব্যবধানে নোঙ্গর ফেলিয়াছে। চারিদিক নিথর নিস্পন্দ, বহতা নদীর স্রোতেও চাঞ্চল্য নাই; চরাচর যেন জ্যোৎস্নার সূক্ষ্ম মল্লবস্ত্র সর্বাঙ্গে জড়াইয়া তন্দ্রাঘোরে অবাস্তবের স্বপ্ন দেখিতেছে।

ময়ূরপঙ্খী নৌকার একটি রইঘর স্নিগ্ধ দীপের আভায় উন্মেষিত। সন্ধ্যাকালে ঘরে অগুরু-চন্দনের ধূপ জ্বালা হইয়াছিল, তাহার গন্ধ এখনো মিলাইয়া যায় নাই। একটি সুপরিসর শয্যার উপর দুই রাজকন্যা পাশাপাশি শয়ন করিয়াছেন। মন্দোদরী দ্বারের সম্মুখে আড় হইয়া জলহস্তীর ন্যায় ঘুমাইতেছে।

রাজকুমারীদের চেতনা বারংবার তন্দ্রা ও জাগরণের মধ্যে যাতায়াত করিতেছে। বৈচিত্র্যহীন জলযাত্রার মাঝখানে আজ হঠাৎ একটি অতর্কিত ঘটনা ঘটিয়াছে; তাই তাঁহাদের উৎসুক মন নিদ্রার সীমান্তে পৌঁছিয়া আবার জাগ্রতে ফিরিয়া আসিতেছে। অপরাহ্ণের ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে তাঁহাদের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিতেছে।

দুই ভগিনী মুখোমুখি শুইয়াছিলেন। মণিকঙ্কণা এক সময় চক্ষু খুলিয়া দেখিল বিদ্যুন্মালার চক্ষু মুদিত, সেও চক্ষু মুদ্রিত করিল। ক্ষণেক পরে বিদ্যুন্মালা চক্ষু মেলিলেন, দেখিলেন কঙ্কণার চক্ষু মুদিত, তিনি আবার চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তারপর দুইজনে একসঙ্গে চক্ষু খুলিলেন।

দুইজনের মুখে হাসি উপচিয়া পড়িল। মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার মুখের আরো কাছে মুখ আনিয়া শুইল। বিদ্যুন্মালা ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া বলিলেন—'ভাগ্যে তুই দেখতে পেয়েছিলি, নইলে লোকটাকে উদ্ধার করা যেত না।'

মণিকঙ্কণা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—'মানুষটি উচ্চবর্ণের মনে হল। ব্রাহ্মণ কিংবা ক্ষত্রিয়।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'কিন্তু গলায় পৈতে ছিল না।'

মণিকঙ্কনা বলিল—'পৈতে হয়তো নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল। কিন্তু হাতে লাঠি কেন ভাই? লাঠি নিয়ে কেউ কি জলে নামে?'

বিদ্যুন্মালা ভাবিতে ভাবিতে বলিলেন—'হয়তো ইচ্ছে করেই লাঠি নিয়ে জলে নেমেছিল, যাতে ভেসে থাকতে পারে। বাঁশের লাঠি তো, ভাসিয়ে রাখে।'

'তাই হবে।'

তারপর আরো কিছুক্ষণ জল্পনা-কল্পনার পর তাঁহাদের চোখের পাতা ভারী হইয়া আসিল, তাঁহারা ধীরে ধীরে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ময়ূরপঙ্খীর যে কক্ষটিতে রসরাজ ও চিপিটকমূর্তি থাকেন তাহা নিষ্প্রদীপ। দুইজনে পৃথক শয্যায় শয়ন করিয়াছেন। রসরাজ মহাশয় সাত্ত্বিক প্রকৃতির মানুষ, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন। চিপিটক অন্ধকারে জাগিয়া আছেন; তাঁহার মস্তিষ্কবিবরে নানা কুটিল চিন্তা উইপোকার ন্যায় বিচরণ করিয়া

বেড়াইতেছে—যে লোকটিকে নদী হইতে তোলা হইয়াছে সে হিন্দু না মুসলমান? মুসলমান হইলে শত্রুর গুপ্তচর হইতে পারে; হিন্দু হইলেও হইতে পারে—আজকাল কে শত্রু কে মিত্র বোঝা কঠিন। ছুতা করিয়া নৌকায় উঠিয়াছে, কী অভিসন্ধি লইয়া নৌকায় উঠিয়াছে কে বলিতে পারে—

চিপিটকমূর্তির গঙ্গাফড়িং-এর ন্যায় আকৃতির কথা পূর্বে বলা হইয়াছে, এবার তাঁহার প্রকৃতিগত পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে। মাতুল মহোদয়ের যথার্থ নাম চিপিটক নয়, অবস্থাগতিকে চিপিটক হইয়া পড়িয়াছিল। বিংশ বৎসর পূর্বে কলিঙ্গের চতুর্থ ভানুদেব দক্ষিণ দেশের এক সামন্তরাজার কন্যাকে বিবাহ করিয়া যখন স্বদেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার অসংখ্য শ্যালকদিগের মধ্যে একটি শ্যালক সঙ্গে আসিলেন। কিছুকাল কাটিবার পর ভানুদেব দেখিলেন শ্যালকের স্বগৃহে ফিরিবার ইচ্ছা নাই; তিনি তখন তাঁহাকে রাজপরিবারের ভাণ্ডারীর পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজ-ভাণ্ডারে বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর সঙ্গে রাশি রাশি চিপিটক স্তূপীকৃত থাকে, দধি ও গুড় সহযোগে ইহাই ভৃত্য-পরিজনের জলপান। শ্যালক মহাশয়ের আদি নাম বোধকরি হরিআপ্পা কৃষ্ণমূর্তি গোছের একটা কিছু ছিল, কিন্তু তিনি যখন ভাণ্ডারের ভার গ্রহণ করিয়া পরমানন্দে চিপিটক বিতরণ করিতে লাগিলেন তখন ভৃত্য-পরিজনের মধ্যে তাঁহার নাম অচিরাৎ চিপিটকমূর্তিতে পরিণত হইল। ক্রমে নামটি সাধারণের মধ্যেও প্রচারিত হইল। শুধু চিপিটক বিতরণের জন্যই নয়, শ্যালক মহাশয়ের নাকটিও ছিল চিপিটকের ন্যায় চ্যাপ্টা।

মনুষ্যচরিত্র লইয়া প্রকৃতির এক বিচিত্র পরিহাস দেখা যায়, যাহার বুদ্ধি যত কম সে নিজেকে তত বেশি বুদ্ধিমান মনে করে। চিপিটকমূর্তি মহাশয় পিতৃরাজ্যে অবস্থানকালে নিজের ভ্রাতাদের কাছে নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রখ্যাত ছিলেন, তাই সুযোগ পাইবামাত্র তিনি অভিমানভরে ভগিনীপতির রাজ্যে চলিয়া আসিযাছিলেন। তারপর রাজ ভাণ্ডারের অধিকর্তার পদ পাইয়া তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে ভানুদেব তাঁহার বুদ্ধির মর্যাদা বুঝিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহার নিভৃত অন্তরে যে চরম আশাটি লুক্কায়িত ছিল তাহা অদ্যাপি পূর্ণ হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে উপনিবিষ্ট আর্য জাতির মধ্যে—সম্ভবত দ্রাবিড় জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে—একটি সামাজিক নীতি প্রচলিত হইয়াছিল; তাহা এই যে, মাতুলের সহিত ভাগিনেয়ীর বিবাহ পরম স্পৃহনীয় ও বাঞ্ছিত বিবাহ। উত্তরাপথে যাঁহারা এই জাতীয় বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন তাঁহারাও দাক্ষিণাত্যে গিয়া দেশাচার ও লোকাচার বরণ করিয়া লইতেন। দীর্ঘকালের ব্যবহারে ইহা সহজ ও স্বাভাবিক বিধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তাই চিপিটকমূর্তি যখন ভগিনীপতির ভবনে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন তখন তাঁহার মনে দূর ভাবিষ্যতের একটি আশা বীজরূপে বিরাজ করিতেছিল। যথাকালে তাঁহার একটি ভাগিনেয়ীর আবির্ভাব ঘটিল, চিপিটকের আশা অঙ্কুরিত হইল। তারপর বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল, কিন্তু মাতুলের সহিত রাজকন্যার বিবাহের প্রসঙ্গ কেহ উত্থাপন করিল না; চিপিটকের আশার অঙ্কুর জলসিঞ্চনের অভাবে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিল; শ্যালকরূপে রাজসংসারে প্রবেশ করিয়া রাজ-জামাতা পদে উন্নীত হইবার উচ্চাশা তাঁহার ফলবতী হইল না। চিপিটকমূর্তি একবার ভগিনীর কাছে কথাটা উত্থাপন করিয়াছিলেন, শুনিয়া রাজমহিষী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন—'একথা অন্য কারুর কাছে বলো না।'

প্রকৃত কথা, কলিঙ্গের সমাজবিধি ঠিক আর্যাবর্তের মতও নয়, দাক্ষিণাত্যের মতও নয়, মধ্যমপথগামী। ভারতের মধ্যপ্রদেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থা প্রায় একই প্রকার; তাহারা সুবিধামত, একুল-ওকুল দুকুল রাখিয়া চলে। কলিঙ্গের লোকেরা মামা-ভাগিনেয়ীর বিবাহকে ঘৃণার চক্ষে দেখে না। আবার অতি উচ্চাঙ্গের সংকার্য বলিয়াও মনে করে না। স্ত্রীলোকের কাছা দিয়া কাপড় পরার মত ইহা তাহাদের কাছে কৌতুকজনক ব্যাপার, তার বেশি নয়।

চিপিটক কিন্তু আশা ছাড়িলেন না, ধৈর্য ধরিয়া রহিলেন। ভাগিনেয়ী বিদ্যুন্মালা বড় হইয়া উঠিল। তারপর যুদ্ধ-বিগ্রহ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে বিদ্যুন্মালার বিবাহ স্থির হইল বিজয়নগরের দেবরায়ের সঙ্গে। এবং এমনই ভাগ্যের পরিহাস যে, চিপিটকমূর্তি বধূর মাতুল বিধায় অভিভাবকরূপে

তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইলেন।

আশা আর বিশেষ ছিল না। কিন্তু চিপিটক হাল ছাড়িবার পাত্র নন, তিনি নৌকায় চড়িয়া চলিলেন। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

সে-রাত্রে নৌকার অন্ধকার রইঘরে শয়ন করিয়া চিপিটক চিন্তা করিতেছিলেন—নদী হইতে উদ্ধৃত লোকটা নিশ্চয় মুসলমান এবং শত্রুর গুপ্তচর। কাল সকালে তাহাকে নৌকায় ডাকিয়া কূট প্রশ্ন করিলেই গুপ্তচরের স্বরূপ বাহির হইয়া পড়িবে। গুপ্তচর যত ধূর্তই হোক চিপিটকের চক্ষে ধূলি দিতে পারিবে না।

ছয়

ওদিকে মকরমুখী নৌকায় সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কেবল দুইজন রাত-প্রহরী নৌকার সম্মুখে ও পিছনে জাগিয়া বসিয়া ছিল। আর জাগিয়া ছিল বলরাম কর্মকার ও জলোদ্ধৃত যুবক। চাঁদের আলোয় পাটাতনের উপর বসিয়া দুইজনে নিম্নস্বরে কথা বলিতেছিল। যুবক এক পেট গরম ভাত খাইয়া ও দুই দণ্ড ঘুমাইয়া লইয়া অনেকটা চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে।

তাহাদের বাক্যালাপ অধিকাংশই প্রশ্নোত্তর; বলরাম প্রশ্ন করিতেছে, যুবক উত্তর দিতেছে। বলরাম যে যুবককে প্রশ্ন করিতেছে তাহা কেবল কৌতূহল প্রণোদিত নয়, অনাহূত অতিথির প্রকৃত পরিচয় সংগ্রহ করাই তাহার মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে বুদ্ধিহীন চিপিটকমূর্তি ও বুদ্ধিমান বলরামের মনোভাব একই প্রকার।

বলরাম বলিল—'তুমি যে মুসলমান নও তা আমি বুঝেছি। তোমার নাম কি?'

যুবক বলরামের দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া চরের দিকে চক্ষু ফিরাইল, অস্পষ্ট স্বরে বলিল—'আমার নাম অর্জুনবর্মা।'

বলরাম মৃদুস্বরে হাসিল—'ভাল। আমি ভেবেছিলাম তোমার নাম বুঝি দণ্ডপাণি।'

অর্জুনবর্মার পাশে দণ্ড দু'টি রাখা ছিল, সে একবার সেই দিকে চক্ষু নামাইয়া বলিল—'তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। কিন্তু এই দণ্ড দু'টি না থাকলে এতদূর আসতে পারতাম না, তার আগেই ডুবে যেতাম।'

বলরাম বলিল—'তুমি কোথা থেকে আসছ?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'গুলবর্গা থেকে।'

বলরাম বলিল—'গুলবর্গা—নাম শুনেছি। দক্ষিণে যবনদের রাজধানী। ওরা বড় অত্যাচারী, বর্বর জাত। আমিও ওদের জন্যে দেশ ছেড়েছি। বাংলা দেশ যবনে ছেয়ে গেছে। তুমিও কি ওদের অত্যাচারে দেশ ছেড়েছ?'

'হ্যাঁ।' অর্জুনবর্মা থামিয়া থামিয়া বলিতে লাগিলেন—'গুলবর্গার কাছে ভীমা নদী—ওদের অত্যাচারে আজ সকালবেলা ভীমা নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিলাম--ভীমা এসে কৃষ্ণাতে মিশেছে—তার অনেক পরে কৃষ্ণা তুঙ্গভদ্রায় মিশেছে—এত দূর তা ভাবিনি—লাঠি দুটো ছিল তাই কোনোমতে ভেসে ছিলাম—'তারপর তুমি বাঁচালে—'

বলরাম প্রশ্ন করিল—'কোথায় যাচ্ছিলে?'

'বিজয়নগর। ভেবেছিলাম সাঁতার কেটে তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণ তীরে উঠব, তারপর পায়ে হেঁটে বিজয়নগরে যাব।'

'তা ভালই হল। আমরাও বিজয়নগরে যাচ্ছি। তোমার পায়ে হাঁটার পরিশ্রম বেঁচে গেল।'

কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব রহিল, তারপর অর্জুনবর্মা প্রশ্ন করিল—'তোমরা কোথা থেকে আসছ?'

'কলিঙ্গ থেকে। তিন মাসের পথ।'

'সামনের বড় নৌকায় কারা যাচ্ছে?'

বলরাম একটু চিন্তা করিল। কিন্তু এখন তাহারা তুঙ্গভদ্রার স্রোতে প্রবেশ করিয়াছে, নদীর দুই কূলেই বিজয়নগরের অধিকার, যবন রাজ্য অনেক দূরে কৃষ্ণার পরপারে, সুতরাং অধিক সাবধানতা নিষ্প্রয়োজন। সে বলিল—'কলিঙ্গের দুই রাজকন্যা যাচ্ছেন। বড় রাজকন্যার সঙ্গে বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের বিয়ে হবে।'

অর্জুনবর্মা আর কোনো ঔৎসুক্য প্রকাশ করিল না। বলরাম পাটাতনের উপর লম্বমান হইয়া বলিল—'রাত হয়েছে, শুয়ে পড়। এখনো তোমার শরীরের গ্লানি দূর হয়নি।'

অর্জুন লাঠি দু'টি পাশে লইয়া শয়ন করিল—'তোমার নিজের কথা তো বললে না। তুমি কলিঙ্গ দেশের মানুষ, বাংলা দেশের কথা কী বলছিলে?'

বলরাম বলিল—'আমি কলিঙ্গ থেকে আসছি বটে, কিন্তু বাংলা দেশের লোক। আমার নাম বলরাম, জাতিতে কর্মকার।'

অর্জুন বলিল—'বাংলা দেশ তো অনেক দূর! তুমি দেশ ছেড়ে এতদূর এসেছ!'

বলবাম আক্ষেপভবে বলিল—'আরে ভাই, বাংলা দেশ কি আর বাংলা দেশ আছে, শ্মশান হযে গেছে, সেই শ্মশানে বিকট প্রেত-পিশাচ নেচে বেড়াচ্ছে। তাই দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছি।'

'বাংলা দেশে বুঝি যবন রাজা?'

'হ্যাঁ। মাঝে কযেক বছর রাজা গণেশ সিংহাসনে বসেছিলেন, বাঙ্গালী হিন্দুব বরাত ফিরেছিল। তারপর আবার যে-নরক সেই নবক।'

'ওরা বড় অত্যাচারী, বড় নৃশংস—' অর্জুনের কথাগুলি অসমাপ্ত রহিয়া গেল, যেন মনের মধ্যে অসংখ্য অত্যাচার ও নৃশংসতার কাহিনী অকথিত রহিয়া গেল।

বলরাম হঠাৎ বলিল—'ভাল কথা, তোমার বিয়ে হযেছে?'

'না।' আকাশে অবরোহী চন্দ্রের পানে চাহিয়া অর্জুন ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল—'যবনের রাজধানীতে বিয়ে কবলে তার প্রাণসংশয়, বিশেষত যদি বৌ সুন্দরী হয। যাদের ঘরে সুন্দবী মেয়ে জন্মেছে তারা মেয়ের বয়স সাত-আট হতে না হতেই বিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়। অনেকে মেয়ের মুখে ছুরি দিয়ে দাগ কেটে মেয়েকে কুৎসিত কবে দেয়, যাতে যবনদের নজর না পড়ে। তাতেও রক্ষে নেই, মুসলমান সিপাহীবা যুবতী মেযে দেখলেই ধরে নিয়ে যায়, আর স্বামীকে কেটে রেখে যায; যাতে নালিশ করবার কেউ না থাকে। দক্ষিণ দেশে মেয়েদের পর্দা ছিল না; এখন তারা যবনেব ভয়ে ঘর থেকে বেরোয় না।'

বলরাম উত্তেজিতভাবে উঠিয়া বসিয়া বলিল—'যেখানে যবন সেখানেই এই দশা। তবে আমার জীবনের কাহিনী বলি শোনো। বর্ধমানের নাম তুমি বোধহয় শোননি? দামোদর নদের তীরে মস্ত নগর। সেখানে আমার কামারশালা ছিল; বেশ বড় কামারশালা। কাস্তে কুড়ুল কাটারি তৈরি করতাম, ঘোড়ার ক্ষুরে নাল ঠুকতাম, গরুর গাড়িব চাকায় হাল বসাতাম। তলোয়ার, সড়কি, এমনকি কামান পর্যন্ত তৈরি করতে জানি, কিন্তু মুসলমান রাজারা তৈরি করতে দিত না, মাঝে মাঝে রাজার লোক এসে তদারক করে যেত। আমরা অবশ্য লুকিয়ে লুকিয়ে অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতাম। কিন্তু সে যাক—

'একবার লোহা কিনতে জংলীদের গাঁয়ে গিয়েছিলাম। ওরা পাহাড় জঙ্গল থেকে লোহা-নুড়ি সংগ্রহ করে এনে পুড়িয়ে লোহা তৈরি করে; আমরা কামারেরা গরুর গাড়ি নিয়ে যেতাম, তাদের কাছ থেকে লোহা কিনে আনতাম। সেবার গাঁ থেকে লোহা কিনে দু'দিন পরে ফিরে এসে দেখি, মুসলমান সেপাইরা আমার কামারশালা তছনছ করে দিয়েছে, আর আমার বৌটাকে ধরে নিয়ে গেছে—' বলরাম আবার শয়ন করিল, কিছুক্ষণ আকাশের পানে চাহিয়া থাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিল—'বৌটা মুখরা ছিল বটে, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখতে ছিল। যাক গে, মরুক গে। যে যেমন কপাল নিয়ে এসেছে। আমার আর দেশে মন টিকল না। ভাবলাম যে-দেশে মুসলমান নেই সেই

দেশে যাব। তারপর একদিন লোহার ডাণ্ডা দিয়ে একটা জঙ্গী জোয়ানের মাথা ফাটিয়ে দিয়ে কলিঙ্গ দেশে চলে এলাম।

'কলিঙ্গ দেশে এখনও যবন ঢুকতে পারেনি। কিন্তু ঢুকতে কতক্ষণ? আমি একেবারে কলিঙ্গের দক্ষিণ কোণে কলিঙ্গপত্তনে এসে আবার নতুন করে কামারশালা ফেঁদে বসলাম। কলিঙ্গে তখন যুদ্ধ চলছে, কামারদের খুব পসার। আমি অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে লেগে গেলাম। রাজা থেকে পদাতি পর্যন্ত সবাই আমার নাম জেনে গেল। তারপর যুদ্ধ থামল, বিজয়নগরের রাজার সঙ্গে কলিঙ্গের রাজকন্যার বিয়ে ঠিক হল। নৌ-বহর সাজিয়ে রাজকন্যে বিয়ে করতে যাবেন। আমি ভাবলাম, দূর ছাই, দেশ ছেড়ে এতদূর যখন এসেছি তখন বিজয়নগরেই বা যাব না কেন? বিজয়নগরের রাজবংশ বীরের বংশ, একশো বছর ধরে যবনদের কৃষ্ণা নদী ডিঙোতে দেননি। বর্তমান রাজা শুধু বীর নয়, গুণের আদর জানেন; যদি তাঁর নজরে পড়ে যাই আমার বরাত ফিরে যাবে। গেলাম নৌ-নায়ক মশায়ের কাছে। নৌ-বহরে দূরযাত্রার সময় যেমন সঙ্গে ছুতোর দরকার, তেমনি কামারও দরকার। নৌ-নায়ক মশায় আমার নাম জানতেন, খুশি হয়ে নৌকোয় কাজ দিলেন। আর কি, যন্ত্রপাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সেই থেকে চলেছি।'

বলরামের কথা বলিবার ভঙ্গি হইতে মনে হয়, সে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, কিন্তু দুঃখ বস্তুটাকে সে বেশি আমল দেয় না। দুঃখ তো আছেই, দুঃখ তো জীবনের সঙ্গী; তাহার ফাঁকে ফাঁকে যতটুকু সুখ আহরণ করা যায় ততটুকুই লাভ।

বলরাম ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অর্জুনবর্মার চক্ষু মুদিত, সে বোধ হয় ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার ক্লান্তি-শিথিল মুখের পানে চাহিয়া বলরাম হৃদয়ের মধ্যে একটু স্নেহের ভাব অনুভব করিল। আহা, ছেলেটার কতই বা বয়স হইবে, বড় জোর একুশ-বাইশ, বলরামের চেয়ে অন্তত দশ বছরের ছোট। এই বয়সে অভাগা অনেক দুঃখ পাইয়াছে; অনেক দুঃখ না পাইলে কেহ দেশ ছাড়িয়া পলাইবার জন্য নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়ে না।

সাত

পরদিন প্রত্যূষে নৌকো তিনটি নোঙ্গর তুলিয়া আবার উজানে যাত্রা করিল।

তুঙ্গভদ্রায় বড় নৌকা চালানো কিন্তু কৌশলসাধ্য কর্ম, তজ্জন্য আড়কাঠির সাহায্য লইতে হয়। নদীগর্ভ পূর্বের ন্যায় গভীর নয়, নদীর তলদেশ শিলাপ্রস্তরে পূর্ণ, কোথাও পাথুরে দ্বীপ জল হইতে মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে; অতি সাবধানে লগি দিয়া জল মাপিতে মাপিতে অগ্রসর হইতে হয়। নদীর প্রসারও অধিক নয়, কোথাও পঞ্চদশ রজ্জু, কোথাও আরো কম; দুই তীরের উচ্চ পাষাণ-প্রাকার নদীকে সঙ্কীর্ণ খাতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। নৌকা নদীর মাঝখান দিয়া চলিলেও দুই তীর নিকটবর্তী।

সঙ্গে দেশজ্ঞ আড়কাঠি আছে, তাহার নির্দেশে হাঙ্গরমুখী নৌকাটি সর্বাগ্রে চলিল। তার পিছনে ময়ূরপঙ্খী, সর্বশেষে ভড়। হাঙ্গরমুখী নৌকা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ও লঘু, তাই আড়কাঠি তাহাতে থাকিয়া পথ দেখাইয়া চলিল। কখনো দক্ষিণ তীর ঘেঁষিয়া, কখনো উত্তর তীর চুম্বন করিয়া; কখনো দাঁড় টানিয়া, কখনো পাল তুলিয়া নৌকা তিনটি ভুজঙ্গপ্রয়াত গতিতে স্রোতের বিপরীত মুখে অগ্রসর হইল।

মধ্যাহ্নে আহারাদি সম্পন্ন হইলে চিপিটকমূর্তি আজ্ঞা দিলেন—'যে লোকটাকে কাল নদী থেকে তোলা হয়েছে, আমার সন্দেহ সে শত্রুর গুপ্তচর; তাকে এই নৌকায় নিয়ে এস। সঙ্গে যেন দু'জন সশস্ত্র রক্ষী থাকে।'

চিপিটকমূর্তি যদিও সাক্ষিগোপাল, তবু তিনি নামত এই অভিযানের নায়ক, তাই তাঁহার ছোটখাটো আদেশ সকলে মানিয়া চলিত।

মকরমুখী নৌকায় আদেশ পৌঁছিলে অর্জুনবর্মা লাঠি দু'টি হাতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলরাম হাসিয়া বলিল—'লাঠি রেখে যাও। চিপিটক মামার কাছে লাঠি নিয়ে গেলে মামার নাভিশ্বাস উঠবে।'

অর্জুনবর্মা ক্ষণেক চিন্তা করিয়া বলরামকে বলিল—'তুমি লাঠি দু'টি রাখ, আমি ফিরে এসে নেব।'

অর্জুন দুইজন সশস্ত্র প্রহরীসহ ডিঙিতে চড়িয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকায় চলিয়া গেল। বলরাম কৌতূহলের বশে লাঠি দু'টি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতে লাগিল। সে লাঠির দেশের লোক, যে-দেশে বাঁশের লাঠিই সাধারণ লোকের প্রধান অস্ত্র সেই দেশের মানুষ। সে দেখিল, বাঁশের লাঠি দু'টি বাংলা দেশের লাঠির মতই, বিশেষ পার্থক্য নাই: হয় হাত লম্বা, গাঁটগুলি ঘনসন্নিবিষ্ট, দুই প্রান্তে ' ‌ ‌ ‌ ‌তলের তারের শক্ত বন্ধন; যেমন দৃঢ় তেমনি লঘু। এরূপ একটি লাঠি হাতে থাকিলে পঞ্চাশজন শত্রুর মহড়া লওয়া যায়। কিন্তু দু'টি লাঠি কেন? বলরাম লাঠি দু'টি হাতে তৌল করিয়া দেখিল; তাহাদের গর্ভে সোনা-রূপা লুকানো থাকিলে এত লঘু হইত না, জলে পড়িলে ডুবিয়া যাইত। তবে অর্জুনবর্মা লাঠি দু'টি হাতছাড়া করিতে চায় না কেন? ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একটা কথা তাহার মনে হইল, সে আবার লাঠি দু'টিকে ভালভাবে পরীক্ষা করিল। ও—এই ব্যাপার! তাহার ধারণা ছিল বাংলা দেশের বাহিরে এ কৌশল আর কেহ জানে না, তা নয়। বলরামের মুখে হাসি ফুটিল; সে বুঝিল অর্জুনবর্মা বয়সে তরুণ হইলেও দূরদর্শী লোক।

ওদিকে অর্জুনবর্মা ময়ূরপঙ্খী নৌকায় পৌঁছিয়াছিল। কিন্তু বাহিরে পাটাতনের উপর বা রইঘরের ছাদে প্রখর রৌদ্র; চিপিটক তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া পাঠাইলেন; কক্ষটি দিবা দ্বিপ্রহরেও ছায়াচ্ছন্ন। দারুনির্মিত দেওয়ালগুলিতে জানালা নাই, জানালার পরিবর্তে তঙ্কার ন্যায় ক্ষুদ্রাকৃতি অনেকগুলি ছিদ্র প্রাচীরগাত্রে জাল রচনা করিয়াছে; এইগুলি আলো এবং বাতাসের প্রবেশপথ। চিপিটক একটি মাদুরের উপর বালিশে হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। এক কোণে বৃদ্ধ রসরাজ একখানি পুঁথি, বোধহয় সুশ্রুত-সংহিতা, চোখের নিকট ধরিয়া পাঠ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অর্জুনবর্মা ঘরে প্রবেশ করিয়া একবার দুই করতল যুক্ত করিয়া সম্ভাষণ জানাইল, তারপর আবার দ্বারের সন্নিকটে উপবিষ্ট হইল।

বলা বাহুল্য, অর্জুনবর্মাকে যখন নৌকায় ডাকা হইয়াছিল তখন রাজকন্যারা জানিতে পারিয়াছিলেন; স্বভাবতই তাঁহাদের কৌতূহল উদ্রিক্ত হইয়াছিল। অর্জুনবর্মা মামার কক্ষে প্রবেশ করিলে মণিকঙ্কণা চুপিচুপি বলিল—'মালা, চল্, ও-ঘরে কি কথাবার্তা হচ্ছে শুনি।'

বিদ্যুন্মালা ঈষৎ ভ্রূ তুলিয়া বলিলেন—'ও-ঘরে আমাদের যাওয়া উচিত হবে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—ও-ঘরে যাব কেন? দেওয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারব। আয়।'

দুই ভগিনী নিজ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পাশের দিকে চলিলেন, সন্তর্পণে সচ্ছিদ্র গৃহ-প্রাচীরের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে দৃষ্টি প্রেরণ করিলেন। কক্ষের অভ্যন্তরে তখন পরম উপভোগ্য প্রহসন আরম্ভ হইয়াছে।

চিপিটক বালিশ ছাড়িয়া চিড়িক মারিয়া উঠিয়া বসিলেন, অর্জুনবর্মার দিকে অভিযোগী অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া রমণীসুলভ কণ্ঠে তর্জন করিলেন—'তুমি ম্লেচ্ছ! তুমি মুসলমান!'

অর্জুনবর্মার মেরুদণ্ড কঠিন ও ঋজু হইয়া উঠিল, চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল; সে মেঘমন্দ্র স্বরে বলিল—'না, আমি হিন্দু, ক্ষত্রিয়।'

চিপিটক তাহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, সামলাইয়া লইয়া বলিলেন—'বটে! বটে! তুমি কেমন ক্ষত্রিয় এখনি বোঝা যাবে। —ওরে, ওর গা শুঁকে দেখ তো, হিঙ্গু-পলাণ্ডু-রসুনের গন্ধ বেরুচ্ছে কি না।'

রক্ষিদ্বয় আদেশ পাইয়া অর্জুনবর্মার গা শুঁকিল, বলিল—'আজ্ঞা না, পেঁয়াজ-রসুন-হিঙের গন্ধ নেই।'

ঘরের কোণে বসিয়া রসরাজ শুনিতেছিলেন, তিনি বিরক্তিসূচক চট্‌কার শব্দ করিলেন। চিপিটক কিন্তু দমিলেন না, বলিলেন—'হুঁ, গায়ের গন্ধ নদীর জলে ধুয়ে গেছে। —তোমার নাম কি?'

অর্জুনবর্মা নাম বলিল। শুনিয়া চিপিটক বলিলেন—'বটে—অর্জুনবর্মা। একেবারে পৌরাণিক নাম। ভাল, বল দেখি, অর্জুন কে ছিল?'

অর্জুনবর্মা এতক্ষণে চিপিটক মামার বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়া লইয়াছে; কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে রঙ্গকৌতুকে তাহার রুচি নাই। সে গম্ভীর মুখে বলিল—'পাণ্ডব।'

'হুঁ, অর্জুনের বাবার নাম কি ছিল?'

'শুনেছি দেবরাজ ইন্দ্র।'

চিপিটক অমনি কল-কোলাহল করিয়া উঠিলেন—'ধরেছি ধরেছি। আর যাবে কোথায়? যে অর্জুনের বাবার নাম জানে না সে কখনো হিন্দু হতে পারে না। নিশ্চয় যবনের গুপ্তচর।—রক্ষি, তোমরা ওঁকে বেঁধে নিয়ে যাও—'

রসরাজ রুক্ষস্বরে বাধা দিলেন, বলিলেন—'চিপিটক, তুমি থামো, চিৎকার করো না। অর্জুনের বাবার নাম ও ঠিক বলেছে। তুমিই অর্জুনের বাবার নাম জান না, সুতরাং বেঁধে রাখতে হলে তোমাকেই বেঁধে রাখতে হয়।'

চিপিটক থতমত খাইয়া গেলেন, ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু অর্জুনের বাবার নাম তো পাণ্ডু!'

রসরাজ বলিলেন—'পাণ্ডু নামমাত্র বাবা, আসল বাবা ইন্দ্র।'

চিপিটক অগত্যা নীরব রহিলেন। রসরাজ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি, বেদ-পুরাণে পারঙ্গম; তাঁহার কথার বিরুদ্ধে কথা বলা চলে না।

রসরাজ অর্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তোমার শরীর কেমন? গায়ে ব্যথা হয়েছে?'

অর্জুন বলিল—'সামান্য। আপনার ঔষধের গুণে দেহের সমস্ত গ্লানি দূর হয়েছে।'

রসরাজ বলিলেন—'ভাল ভাল। তুমি যদি আত্মপরিচয় দিতে চাও, দিতে পার, না দিতে চাও দিও না। তুমি অতিথি, আমরা প্রশ্ন করব না।'

অর্জুন বলিল—'আমার পরিচয় সামান্যই।' সে বলরামকে যাহা বলিয়াছিল তাহাই সংক্ষেপে পুনরাবৃত্তি করিল।

রসরাজ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'যবনের রাজ্যে হিন্দুর ধর্ম কৃষ্টি স্বাধীনতা সবই নির্মূল হয়েছে। তুমি পালিয়ে এসেছ ভালই করেছ। দক্ষিণ দেশে এখনো স্বাধীনতা আছে, কিন্তু কতদিন থাকবে কে জানে। —আচ্ছা, আজ তোমরা এস বৎস।'

অর্জুনবর্মা উঠিয়া দাঁড়াইল। চিপিটক চোখ পাকাইয়া বলিলেন—'আজ ছেড়ে দিলাম। কিন্তু পরে যদি জানতে পারি তুমি গুপ্তচর, তাহলে তোমার মুণ্ড কেটে নেব।'

রসরাজ বলিলেন—'চিপিটক, তোমার বায়ু বৃদ্ধি হয়েছে। এস, ঔষধ দিই।'

বাহিরে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা ছিদ্রপথে সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং অতি কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। পালা শেষ হইলে তাঁহারা পা টিপিয়া টিপিয়া ফিরিয়া আসিলেন এবং মুক্ত পটপত্তনে দাঁড়াইয়া অন্য নৌকার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণেক পরে অর্জুনবর্মা রক্ষীদের সঙ্গে বাহিরে আসিল, তাহার মুখে একটা চাপা হাসি। রাজকুমারীদের দেখিয়া সে সসম্ভ্রমে যুক্তপাণি হইয়া অভিবাদন করিল, তারপর ডিঙিতে নামিয়া বসিল। রক্ষী দুইজন দাঁড় টানিয়া সম্মুখে হাঙ্গরমুখী নৌকার দিকে চলিল।

মণিকঙ্কণা সেই দিকে কটাক্ষপাত করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—'অর্জুনবর্মা! হ্যাঁ ভাই, সত্যিই ছদ্মবেশে দ্বাপরযুগের অর্জুন নয় তো!'

বিদ্যুন্মালা ঈষৎ ভর্ৎসনা ভরা চক্ষে মণিকঙ্কণার পানে চাহিয়া তাহার লঘুতাকে তিরস্কৃত করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যাকালে নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের প্রস্তরময় তীরে নৌকা বাঁধা হইল। দিনের গলদ্‌ঘর্ম প্রখরতার পর চন্দ্রমাশীতল রাত্রি পরম স্পৃহনীয়। নৈশাহারের পর দুই রাজকন্যা মাঝিদের আদেশ দিলেন, তাহারা পাটাতন দিয়া নৌকা হইতে দ্বীপ পর্যন্ত সেতু বাঁধিয়া দিল; রাজকন্যারা দ্বীপে অবতরণ করিলেন। জনশূন্য দ্বীপ, কঠিন কর্কশ ভূমি; তবু মাটি। অনেকদিন তাঁহারা মাটির স্পর্শ অনুভব করেন নাই; দুই ভগিনী হাত ধরাধরি করিয়া চন্দ্রালোকে পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

নৌকা তিনটি পরস্পর শত হস্ত ব্যবধানে নিথর দাঁড়াইয়া আছে; যেন তিনটি অতিকায় চক্রবাক রাত্রিকালে দ্বীপপ্রান্তে আশ্রয় লইয়াছে, প্রভাত হইলে উড়িয়া যাইবে।

সহসা হাঙ্গরমুখী নৌকা হইতে মৃদঙ্গ মন্দিরার নিক্কণ ভাসিয়া আসিল। দুই রাজকন্যা চমকিয়া সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। শত হস্ত দূরে হাঙ্গরমুখী নৌকার পাটাতনের উপর কয়েকটি লোক গোল হইয়া বসিয়াছে, অস্পষ্ট আবছায়া কয়েকটি মূর্তি। তারপর মৃদঙ্গ মন্দিরার তালে তালে উদার পুরুষকণ্ঠে জয়দেব গোস্বামীর গান শোনা গেল—

মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে!

বলরাম জাতিতে কর্মকার হইলেও সঙ্গীতজ্ঞ এবং সুকণ্ঠ। সে নৌকাযাত্রার সময় মৃদঙ্গ ও করতাল সঙ্গে আনিয়াছিল; তারপর নৌকায় আরো দু'চারজন সঙ্গীত রসিক জুটিয়া গিয়াছিল। মন উচাটন হইলে তাহারা মৃদঙ্গ মন্দিরা লইয়া বসিত। পূর্ব ভারতে জয়দেব গোস্বামীর পদাবলী তখন সকলের মুখে মুখে ফিরিত; ভাষা সংস্কৃত হইলে কী হয়, এমন মধুর কোমলকান্ত পদাবলী আর নাই।

বলরামের দলের মধ্যে অর্জুনবর্মাও ছিল। সে গাহিতে বাজাইতে জানে না, কিন্তু সঙ্গীতরস উপভোগ করিতে পারে। তাই আজ বলরামের আহ্বানে সেও নৈশ কীর্তনে যোগ দিয়াছিল।

ধিক্ তান্ ধিক্ তান্ বলরামের মৃদঙ্গ বাজিতে লাগিল, ধ্রুবপদ আর একবার আবৃত্তি করিয়া সে অন্তরা ধরিল—

তালফলাদপি গুরুমতিসরসম্
কিমু বিফলীকুরুষে কুচকলসম্।
মাধবে মা কুরু মানিনি মানময়ে।।

নিস্তরঙ্গ বাতাসে রসের লহর তুলিয়া অপূর্ব সঙ্গীত প্রবাহিত হইল; দূরে দাঁড়াইয়া দুই রাজকন্যা মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন। তাঁহারা কলিঙ্গের কন্যা, জয়দেবের পদ তাঁহাদের অপরিচিত নয়, কিন্তু এমনি নিরাবিল পরিবেশের মধ্যে এমন গান তাঁহারা পূর্বে কখনো শোনেন নাই। শুনিতে শুনিতে তাঁহাদের দেহ রোমাঞ্চিত হইল, হৃদয় নিবিড় রসাবেশে আপ্লুত হইল।

মধ্যরাত্রে সঙ্গীত-সভা ভঙ্গ হইল। দুই রাজকন্যা নিঃশব্দে ময়ূরপঙ্খী নৌকায় উঠিয়া গেলেন, রইঘরে গিয়া শয্যায় পাশাপাশি শয়ন করিলেন। কথা হইল, না, দুইজনে অর্ধনিমীলিত নেত্রে পরস্পর চাহিয়া একটু হাসিলেন; তারপর চক্ষু মুদিয়া সঙ্গীতের অনুরণন শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

হৃদয়ে রসাবেশ লইয়া নিদ্রা যাইলে কখনো কখনো স্বপ্ন দেখিতে হয়। সকলে দেখে না, কেহ কেহ দেখে। দুই রাজকন্যার মধ্যে একজন স্বপ্ন দেখিলেন—

স্বয়ংবর সভা। রাজকন্যা বীর্যশুল্কা হইবেন। তিনি মালা হাতে সভার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া আছেন, চারিদিকে রাজন্যবর্গ। যিনি জলে ছায়া দেখিয়া শূন্যে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিতে পারিবেন তাঁহার গলায় রাজকন্যা মালা দিবেন। একে একে রাজারা শরক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কেহই লক্ষ্যভেদ করিতে পারিলেন

না। রাজকন্যার মনে অভিমান জন্মিল। অর্জুন কেন আসিতেছেন না! অন্য কেহ যদি পূর্বেই লক্ষ্যভেদ করেন তখন কী হইবে! অবশেষে ছদ্মবেশী অর্জুন আসিয়া ধনুর্বাণ তুলিয়া লইলেন। জলে ছায়া দেখিয়া ঊর্ধ্বে মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিলেন। অভিমানের সঙ্গে আনন্দ মিশিয়া রাজকুমারীর চক্ষে জল আসিল, তিনি অর্জুনের গলায় মালা দিলেন। অর্জুন ছদ্মবেশ ত্যাগ করিয়া রাজকন্যার সম্মুখে নতজানু হইলেন, বলিলেন—

মা কুরু মানিনি মানময়ে।

আট

নৌকা তিনটি চলিয়াছে।

ক্রমশ তীরে জনবসতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শুষ্ক ঊষরতার ফাঁকে ফাঁকে একটু হরিদাভা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রাম-শিশুরা বৃহৎ নৌকা দেখিয়া কলরব করিতে করিতে তীর ধরিয়া দৌড়ায়; যুবতীরা জল ভরিতে আসিয়া নৌকার পানে চাহিয়া থাকে, তাহাদের নিরাবরণ বক্ষের নির্লজ্জতা চোখের সলজ্জ সরল চাহনির দ্বারা নিরাকৃত হয়; গ্রাম-বৃদ্ধেরা দধি নবনী শাকপত্র ফলমুল লইয়া ডাকাডাকি করে, নৌকা হইতে ডিঙি গিয়া টাটকা খাদ্য ক্রয় করিয়া আনে।

নদীর উপর প্রভাত বেলাটি বেশ স্নিগ্ধ। কিন্তু যত বেলা বাড়িতে থাকে দুই তীরের পাথর তপ্ত হইয়া বায়ুমণ্ডলকে দুঃসহ করিয়া তোলে। দ্বিপ্রহরে নৌকাগুলির নাবিক ও সৈনিকেরা জলে লাফাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটে, হুড়াহুড়ি করে। তাহাদের দেখিয়া রাজকুমারীদেরও লোভ হয় জলে পড়িয়া খেলা করেন, কিন্তু অশোভন দেখাইবে বলিয়া তাহা পারেন না; তোলা জলে স্নান করেন।

অপরাহ্ণে সহসা বাতাস স্তব্ধ হইয়া যায়। মনে হয় বায়ুর অভাবে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আড়কাঠি উদ্বিগ্ন চক্ষে আকাশের পানে চাহিয়া থাকে; কিন্তু নির্মেঘ আকাশে আশঙ্কাজনক কোনো লক্ষণ দেখিতে পায় না। তারপর অগ্নিবর্ণ সূর্য অস্ত যায়, সন্ধ্যা নামিয়া আসে। ধীরে ধীরে আবার বাতাস বহিতে আরম্ভ করে।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিয়াছে। পূর্ণিমা অতীত হইয়া কৃষ্ণপক্ষ চলিতেছে, আর দুই-এক দিনের মধ্যেই গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো যাইবে। পথশ্রান্ত যাত্রীদের মনে আবার নূতন ঔৎসুক্য জাগিয়াছে।

এই কয়দিনে বলরাম ও অর্জুনবর্মার মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরো গাঢ় হইয়াছে। তাহারা ভিন্ন দেশের লোক, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে মনের ঐক্য খুঁজিয়া পাইয়াছে; উপরন্তু অর্জুনবর্মার পক্ষে অনেকখানি কৃতজ্ঞতাও আছে। বিদেশ-বিভুঁই-এ মর্মজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য বন্ধু বড়ই বিরল, তাই তাহারা কেহ কাহারও সঙ্গ ছাড়ে না, একসঙ্গে খায়, একসঙ্গে ঘুমায়, একসঙ্গে উঠে বসে। ইতিমধ্যে মনের অনেক গোপন কথা তাহারা বিনিময় করিয়াছে। দেশত্যাগের দুঃখ এবং তাহার পশ্চাতে গভীরতর আঘাতের দুঃখ তাহাদের হৃদয়কে এক করিয়া দিয়াছে।

বিজয়নগর যত কাছে আসিতেছে, দুই রাজকন্যার মনেও অলক্ষিতে পরিবর্তন ঘটিতেছে। প্রথমে নৌকায় উঠিবার সময় তাঁহারা কাঁদিয়াছিলেন, শ্বশুরবাড়ি যাত্রাকালে সকল মেয়েই কাঁদে, তা রাজকন্যাই হোক আর সাধারণ গৃহস্থকন্যাই হোক। কিন্তু এখন তাঁহাদের মনে অজানিতের আতঙ্ক প্রবেশ করিয়াছে। বিজয়নগর রাজ্যে সমস্তই অপরিচিত; মানুষগুলা কি জানি কেমন, রাজা দেবরায় না জানি কেমন। মণিকঙ্কণার মুখে সদাস্ফুট হাসিটি ম্রিয়মাণ হইয়া আসিতেছে। বিদ্যুন্মালার ইন্দীবর নয়নে শুষ্ক উৎকণ্ঠা। জীবন এত জটিল কেন!

বিজয়নগরে পৌঁছিবার পূর্বরাত্রে দুই রাজকন্যা রইঘরে শয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ঘুম সহজে আসিতেছিল না। কিছুক্ষণ শয্যায় ছট্‌ফট্ করিবার পর মণিকঙ্কণা উঠিয়া বসিল,, বলিল—'চল্ মালা, ছাদে যাই। ঘরে গরম লাগছে।'

বিদ্যুন্মালাও উঠিয়া বসিলেন—'চল্।'

মন্দোদরী দ্বারের সম্মুখে আগড় হইয়া শুইয়া ছিল, তাঁহাকে ডিঙাইয়া দুই বোন রইঘরের ছাদে উঠিয়া গেলেন। নৌকার রক্ষী দুইজন রাজকন্যাদের বহিরাগমন জানিতে পারিলেও সাড়াশব্দ দিল না।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি, মধ্যযামে চাঁদ উঠিবে। নৌকা বাঁধা আছে, তাই বায়ুর প্রবাহ কম। তবু উন্মুক্ত ছাদ বেশ ঠাণ্ডা, অল্প বায়ু বহিতেছে। আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জ যেন সহস্র চক্ষু মেলিয়া ছায়াচ্ছন্ন পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করিতেছে। দুই ভগিনী দেহের অঞ্চল শিথিল কবিয়া দিয়া ছাদের উপর বসিলেন।

নক্ষত্রখচিত ঝিকিমিকি অন্ধকাবে দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিলেন। একবার বিদ্যুন্মালার নিশ্বাস পড়িল। ক্লান্তি ও অবসাদেব নিশ্বাস।

মণিকঙ্কণা জিজ্ঞাসা করিল—'কি ভাবছিস?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'ভাবছি শিরে সংক্রান্তি।'

'ভয় করছে?'

'হ্যাঁ। তোর ভয় করছে না?'

'একটু একটু। কিন্তু মিথ্যে ভয়, একবার গিযে পৌঁছলেই ভয় কেটে যাবে।'

'হয়তো ভয় আরো বাড়বে।'

'তুই কেবল মন্দ দিকটাই দেখিস।'

'মন্দকে যে বাদ দেওয়া যায় না।'

মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার ধরা-ধবা গলাব আওয়াজ শুনিয়া মুখেব কাছে মুখ আনিয়া দেখিল বিদ্যুন্মালার চোখে জল। সে হ্রস্বস্বরে বলিল— 'তুই কাঁদছিস!'

বিদ্যুন্মালা তাহার কাঁধে মাথা রাখিলেন।

এখন, স্ত্রীজাতির স্বভাব এই যে, একজনকে কাঁদিতে দেখিলে অন্যজনেরও কান্না পায়। সুতরাং মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালার কাঁধে মাথা রাখিয়া একটু কাঁদিল।

মন হালকা হইলে চক্ষু মুদিয়া আবার দুইজনে নীরবে বসিয়া রহিলেন। তারপর হঠাৎ মণিকঙ্কণা ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'মালা, পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখ—কিছু দেখতে পাচ্ছিস?'

বিদ্যুন্মালা চকিতে পশ্চিম দিকে ঘাড় ফিরাইলেন। দূরে নদীর অন্ধকার যেখানে আকাশের অন্ধকারে মিশিয়াছে সেইখানে একটি অগ্নিপিণ্ড জ্বলিতেছে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয় একটা রক্তবর্ণ গ্রহ অস্ত যাইতেছে। কিন্তু কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলে দেখা যায়, আলোকপিণ্ডটি কখনো বাড়িতেছে কখনো কমিতেছে, কখনো উর্ধ্বে শিখা নিক্ষেপ করিতেছে। অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আগুনের পিণ্ড! কোথায় আগুন জ্বলছে?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'বিজয়নগর তো ওই দিকে। তাহলে নিশ্চয় বিজয়নগরের আলো। দাঁড়া, আমি খবর নিচ্ছি!—রক্ষি!'

দুইজনে বস্ত্র সংবরণ করিয়া বসিলেন; একজন রক্ষী ছায়ামূর্তির ন্যায় কাছে আসিয়া দাঁড়াইল— 'আজ্ঞা করুন।'

মণিকঙ্কণা হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—'ওই যে আলো দেখা যাচ্ছে, ওটা কোথাকার আলো তুমি জানো?'

রক্ষী বলিল—'জানি দেবী। আজই সন্ধ্যার পর আড়কাঠি মশায়ের মুখে শুনেছি। বিজয়নগরে হেমকূট নামে পাহাড়ের চূড়া আছে, সেই চূড়া পঞ্চাশ ক্রোশ দূর থেকে দেখা যায়। প্রত্যহ রাত্রে হেমকূট চূড়ায় ধুনী জ্বালা হয়, সারা রাত্রি ধুনী জ্বলে। সারা দেশের লোক জানতে পারে বিজয়নগর জেগে আছে।—আমরা কাল অপরাহ্ণে বিজয়নগরে পৌঁছব।'

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া মণিকঙ্কণা বলিল—'বুঝেছি। আচ্ছা, তুমি যাও।'

রক্ষী অপসৃত হইল। দুইজনে দূরাগত আলোকরশ্মির পানে চাহিয়া রহিলেন। উত্তর ভারতের দীপগুলি একে একে নিভিয়া গিয়াছে, নীরন্ধ্র অন্ধকারে অবসন্ন ভারতবাসী ঘুমাইতেছে; কেবল দাক্ষিণাত্যের একটি হিন্দু রাজা ললাটে আগুন জ্বালিয়া জাগিয়া আছে।

নয়

পরদিন অপরাহ্ণে নৌকা তিনটি বিজয়নগরের নিকটবর্তী হইল। অর্ধক্রোশ দূর হইতে সূর্যের প্রখর আলোকে নগরের পরিদৃশ্যমান অংশ যেন পৌরুষ ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে ঝলমল করিতেছে।

নদীর উত্তর তীরে উগ্র তপস্বীর উর্ধক্ষিপ্ত ধূসর জটাজালের ন্যায় গিরিচক্রবেষ্টিত অনেগুন্দি দুর্গ। আদৌ এই দুর্গ বিজয়নগর রাজ্যের রাজধানী ছিল; পরে রাজধানী নদীর দক্ষিণ তীরে সরিয়া আসিয়াছে। অনেগুন্দি দুর্গ বর্তমানে একটি নগররক্ষক সৈন্যাবাস।

নদীর দক্ষিণ কূলে শতবর্ষ ধরিয়া যে মহানগরী গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা যেমন শোভাময়ী তেমনি দুষ্প্রধর্ষা। সমকালীন বিদেশী পর্যটকের পাণ্ডুলিপিতে তাহার গৌরব গরিমার বিবরণ ধৃত আছে। নগরীর বহিঃপ্রকাশের বেড় ছিল ত্রিশ ক্রোশ। তাহার ভিতর বহু ক্রোশ অন্দরে দ্বিতীয় প্রাকার। তাহার ভিতব তৃতীয় প্রাকাব। এইভাবে একের পর এক সাতটি প্রাকার নগবীকে বেষ্টন করিয়া আছে। প্রাকারগুলির ব্যবধান-স্থলে অসংখ্য জলপ্রণালী তুঙ্গভদ্রা হইতে নগরীর মধ্যে জলধারা প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে। নগরীর ভূমি সর্বত্র সমতল নয়, কোথাও ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকাগুলিতে মানুষের বাস, শস্যক্ষেত্র, ফল ও ফুলের বাগান, ধনী ব্যক্তিদের উদ্যান বাটিকা। নগরবৃত্তের মধ্যে পৌঁছিলে দেখা যায়, রাজপুরীর বিচিত্র সুন্দর হর্ম্যগুলি সহস্রার পদ্মের মধ্যবর্তী স্বর্ণকেশরের ন্যায় শোভা পাইতেছে।

নদীমধ্যস্থ নৌকা হইতে কিন্তু সমগ্র নগর দেখা যায় না, নগরের যে অংশ নদীর তটরেখা পর্যন্ত আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে তাহাই দৃশ্যমান। অনুমান দুই ক্রোশ দীর্ঘ এই তটরেখা মণিমেখলার ন্যায় বঙ্কিম, তাহাতে সারি সারি সৌধ উদ্যান ঘাট মন্দির হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ন্যায় গ্রথিত রহিয়াছে।

নগর-সংলগ্ন এই তটরেখার পূর্ব সীমান্তে বিস্তীর্ণ ঘাট। বড় বড় চতুষ্কোণ পাথর নির্মিত এই ঘাটের নাম কিল্লাঘাট; শুধু স্নানের ঘাট নয়, খেয়া ঘাটও। এই ঘাট হইতে সিধা উত্তরে অনেগুন্দি দুর্গে পারাপার হওয়া যায়। এই ঘাটে আজ বিপুল সমারোহ।

কলিঙ্গের রাজকুমারীদের লইয়া নৌ-বহর দেখা দিয়েছে, আজই অপরাহ্ণে আসিয়া পৌঁছিবে, এ সংবাদ মহারাজ দেবরায় প্রাতঃকালেই পাইয়াছিলেন। তিনি বহুসংখ্যক হস্তী অশ্ব দোলা ও পদাতি সৈন্য কিল্লাঘাটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য। কিল্লাঘাটে পাঠানোর কারণ, এই ঘাটের পর গ্রীষ্মের তুঙ্গভদ্রা আরো শীর্ণা হইয়াছে, বড় নৌকা চলে কি না চলে। কিল্লাঘাট রাজপ্রাসাদ হইতে মাত্র ক্রোশেক পথ দূরে, সুতরাং রাজকুমারীরা কিল্লাঘাটে অবতরণ করিয়া দোলায় বা হস্তিপৃষ্ঠে রাজভবনে যাইতে পারিবেন, কোনোই অসুবিধা নাই। উপরন্তু নগরবাসীরা বধূ-সমাগমের শোভাযাত্রা দেখিয়া আনন্দিত হইবে।

রাজা স্বয়ং কিল্লাঘাটে আসেন নাই, নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুমার কম্পনদেবকে প্রতিভূস্বরূপ পাঠাইয়াছেন। কুমার কম্পন রাজা অপেক্ষা বয়সে অনেক ছোট, সবেমাত্র যৌবনপ্রাপ্ত হইয়াছেন, অতি সুন্দরকান্তি নবযুবক। রাজা এই ভ্রাতাটিকে অত্যধিক স্নেহ করেন, তাই তিনি বধূ-সম্ভাষণের জন্য নিজে না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন।

কিল্লাঘাটের উচ্চতম সোপানে কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া নৌকার দিকে চাহিয়া আছেন।

তাঁহার পিছনে পাঁচটি চিত্রিতাঙ্গ হস্তী, হস্তীদের দুই পাশে ভল্লধারী অশ্বারোহীর সারি। তাহাদের পশ্চাতে নববেশপরিহিত ধনুর্ধর পদাতি সৈন্যের দল। সর্বশেষ ঘাটের প্রবেশমুখে নানা বর্ণাঢ্য বস্ত্রনির্মিত দ্বিভূমক তোরণ, তোরণের দুই স্তম্ভাগ্রে বসিয়া দুই দল যন্ত্রবাদক পালা করিয়া মুরজমুরলী বাজাইতেছে। বড় মিঠা মন গলানো আগমনীর সুর।

ওদিকে অগ্রসারী নৌকা তিনটিতেও প্রবল ঔৎসুক্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। আরোহীরা নৌকার কিনারায় কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া ঘাটের দৃশ্য দেখিতেছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদের উপর বিদ্যুন্মালা মণিকঙ্কণা মন্দোদরী ও মাতুল চিপিটকমূর্তি উপস্থিত ছিলেন। সকলের দৃষ্টি ঘাটের দিকে। তোরণশীর্ষে নানা বর্ণের কেতন উড়িতেছে; ঘাটের সম্মুখে জলের উপর কয়েকটি গোলাকৃতি ক্ষুদ্র নৌকা অকারণ আনন্দে ছুটাছুটি করিতেছে। ঘাটের অস্ত্রধারী মানুষগুলা দাঁড়াইয়া আছে চিত্রার্পিতের ন্যায়। সর্বাগ্রে অশ্বারূঢ় পুরুষটি কে? দূর হইতে মুখাবয়ব ভাল দেখা যায় না। উনিই কি মহারাজ দেবরায়?

নৌকাগুলি যত কাছে যাইতেছে মুরজমুরলীর সুর ততই স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। দুই দলের দৃষ্টি পরস্পরের উপর। আকাশের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই।

নৌকা তিনটি ঘাটের দশ রজ্জুর মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখন মণিকঙ্কণা বিদ্যুন্মালা ছাদ হইতে নামিয়া রইঘরে গেলেন। ঘাটে নামিবার পূর্বে বেশবাস পরিবর্তন, যথোপযুক্ত অলঙ্কার ধারণ ও প্রসাধন করিতে হইবে। মন্দোদরীকে ডাকিলে সে তাঁহাদের সাহায্য করিতে পারিত; কিন্তু মন্দোদরী ঘাটের দৃশ্য দেখিতে মগ্ন, রাজকন্যারা তাহাকে ডাকিলেন না।

দুই ভগিনী গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে মহার্ঘ স্বর্ণতন্তুরচিত শাড়ি ও কঞ্চুলী পরিধান করিলেন, পরস্পরকে রত্নদ্যুতিখচিত অলঙ্কার পরাইয়া দিলেন। তারপর বিদ্যুন্মালা গমনোন্মুখী হইলেন। মণিকঙ্কণা জিজ্ঞাসা করিল—'আলতা কাজল পরবি না?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, থাক।'

তিনি উপরে চলিয়া গেলেন। মণিকঙ্কণা ক্ষণেক ইতস্তত করিল, তারপর কাজললতা লাক্ষারসের করঙ্ক ও সোনার দর্পণ লইয়া বসিল।

বিদ্যুন্মালা পটপত্তনের উপর আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার মনে হইল এই অল্পক্ষণের মধ্যে আকাশের আলো অনেক কমিয়া গিয়াছে। তিনি চকিতে উর্ধ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। দক্ষিণ হইতে একটা ধূম্রবর্ণ রাক্ষস ছুটিয়া আসিতেছিল, বিদ্যুন্মালার নেত্রাঘাতে যেন উন্মত্ত ক্রোধে বিকট চিৎকার করিয়া নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। নিমেষমধ্যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল।

দাক্ষিণাত্যের শৈলবন্ধুর মালভূমিতে গ্রীষ্মকালে মাঝে মাঝে এমনি অতর্কিত ঝড় আসে। দিনের পর দিন তাপ সঞ্চিত হইতে হইতে একদিন হঠাৎ বিস্ফোরণের ন্যায় ফাটিয়া পড়ে। ঝড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না, বড় জোর দুই-তিন দণ্ড; কিন্তু তাহার যাত্রাপথে যাহা কিছু পায় সমস্ত ছারখার করিয়া দিয়া চলিয়া যায়।

এই ঝড়ের আবির্ভাব এতই আকস্মিক যে চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না, সতর্ক হইবার শক্তিও লুপ্ত হইয়া যায়। নৌকা তিনটি পরস্পরের কাছাকাছি চলিতেছিল, ঘাট হইতে তাহাদের দূরত্ব পাঁচ-ছয় রজ্জুর বেশি নয়, হঠাৎ ঝড়ের ধাক্কা খাইয়া তাহারা কাত হইয়া পড়িল। ময়ূরপঙ্খী নৌকার ছাদে মন্দোদরী ও চিপিটকমূর্তি ছিলেন, ছিট্‌কাইয়া নদীতে পড়িলেন। পাটাতনের উপর বিদ্যুন্মালা শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া মত্ত জলরাশির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

মকরমুখী নৌকা হইতেও কয়েকজন নাবিক ও সৈনিক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে অর্জুনবর্মা একজন। যখন ঝড়ের ধাক্কা নৌকায় লাগিল তখন সে মকরমুখী নৌকার কিনারায় দাঁড়াইয়া ময়ূরপঙ্খী নৌকার দিকে চাহিয়া ছিল; নিজে জলে পড়িতে পড়িতে দেখিল রাজকুমারী ডুবিয়া গেলেন। সে জলে পড়িবামাত্র তীরবেগে সাঁতার কাটিয়া চলিল।

আকাশের আলো নিভিয়া গিয়াছে, নৌকাগুলি ঝড়ের দাপটে কে কোথায় গিয়াছে কিছুই দেখা যায় না। কেবল নদীর উন্মত্ত তরঙ্গরাশি চারিদিকে উথল-পাথার হইতেছে। তারপর প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি নামিল। চরাচর আকাশ-পাতাল একাকার হইয়া গেল।

বিদ্যুন্মালা তলাইয়া গিয়াছিলেন, জলতলে তরঙ্গের আকর্ষণ-বিকর্ষণে আবার ভাসিয়া উঠিলেন। কিছুক্ষণ তরঙ্গশীর্ষে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইবার পর তাঁহার অর্ধচেতন দেহ আবার ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

নিকষ-কালো অন্ধকারের মধ্যে ঝড়ের মাতন চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক, মেঘের হুঙ্কার; তারপর শোঁ শোঁ কল্‌কল্‌ শব্দ। জল ও বাতাসের মরণাত্মক সংগ্রাম।

বিদ্যুন্মালা জলতলে নামিয়া যাইতে যাইতে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলেন, কে যেন তাঁহাকে আকর্ষণ করিয়া আবার উপর দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট রহিলেন; শরীর অবশ, বাঁচিয়া থাকার যে দুরন্ত প্রয়াস জীবমাত্রেরই স্বাভাবিক তাহা আর নাই। জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়াছে। ক্রমে তাঁহার যেটুকু সংজ্ঞা অবশিষ্ট ছিল তাহাও লুপ্ত হইয়া গেল।

দশ

ঝড় থামিয়াছে।

মেঘের অন্ধকার অপসারিত হইবার পূর্বেই রাত্রির অন্ধকার নামিয়াছে। বর্ষণধৌত আকাশে তারাগুলি উজ্জ্বল; তুঙ্গভদ্রার স্রোত আবার শান্ত হইয়াছে। তীরবর্তী প্রাসাদগুলির দীপরশ্মি নদীর জলে প্রতিফলিত হইয়া কাঁপিতেছে। কেবল হেমকূট শিখরে এখনও অগ্নিস্তম্ভ জ্বলে নাই।

এই অবকাশে ঝঞ্ঝাহত মানুষগুলির হিসাব লওয়া যাইতে পারে।

কিল্লাঘাটে যাহারা অতিথি সংবর্ধনার জন্য উপস্থিত ছিল তাহারাও ঝড়ের প্রকোপে বিপর্যস্ত হইয়াছিল। বস্ত্রতোরণ উড়িয়া গিয়া নদীর জলে পড়িয়াছিল; হাতীগুলা ভয় পাইয়া একটু দাপাদাপি করিয়াছিল, তাহার ফলে কয়েকজন সৈনিকের হাত-পা ভাঙ্গিয়াছিল; আর বিশেষ কোনো অনিষ্ট হয় নাই। ঝড় অপগত হইলে কুমার কম্পন নৌকা তিনটির নিরাপত্তা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু রাত্রি অন্ধকার, তীরস্থ গোলাকৃতি ছোট নৌকাগুলি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কুমার কম্পন কোনো সন্ধানই পাইলেন না। তখন তিনি সৈন্যদের ঘাটে রাখিয়া অশ্বপৃষ্ঠে রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন। রাজাকে সংবাদ দিয়া কাল প্রত্যূষে তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন।

নৌকা তিনটি ঝড়ের আঘাতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু ডুবিয়া যায় নাই; অগভীর জলে বা নদীমধ্যস্থ দ্বীপের শিলাসৈকতে আটকাইয়া গিয়াছিল। নাবিক ও সৈন্যদের মধ্যে যাহারা ছিটকাইয়া জলে পড়িয়াছিল তাহারাও কেহ ডুবিয়া মরে নাই, জল ও বাতাসেব তাড়নে কোথাও [illegible] ডাঙ্গার আশ্রয় পাইয়াছিল। ময়ূরপঙ্খী নৌকায় মণিকঙ্কণা ও বৃদ্ধ রসরাজ আটক [illegible] প্রাণের আশঙ্কা আর ছিল না বটে, কিন্তু বিদ্যুন্মালা, চিপিটক এবং মন্দোদরীর [illegible] নিদারুণ ত্রাস উৎপন্ন হইয়াছিল। মণিকঙ্কণা ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে [illegible] গেল বিদ্যুন্মালা? মামা ও মন্দোদরীর কী হইল? তাহারা কি সকলেই ডুবিয়া [illegible] মণিকঙ্কণাকে সান্ত্বনা দিবার ফাঁকে ফাঁকে প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন। [illegible] মন্দোদরী ডুবিয়া যায় নাই। দুইজনে একসঙ্গে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। কেহই সাঁতার [illegible] পক্ষীর ন্যায় শীর্ণ দেহটি ডুবিয়া যাইবার উপক্রম করিল; মন্দোদরীর কিন্তু ডুবিবার [illegible] গেল না; তাহার বিপুল বপু তরঙ্গশীর্ষে শূন্য কলসের ন্যায় নাচিতে লাগিল। [illegible] মন্দোদরীর একটা পা নাগালের মধ্যে পাইলেন, তিনি মরীয়া হইয়া তাহা

চাপিয়া ধরিলেন। ঝড়ের টানাটানি তাঁহার বজ্রমুষ্টিকে শিথিল করিতে পারিল না। কিন্তু চিপিটক ও মন্দোদরীর প্রসঙ্গ এখন থাক।

বিদ্যুন্মালা নদীমধ্যস্থ একটি দ্বীপের সিক্ত সৈকতে শুইয়া ছিলেন, চেতনা ফিরিয়া পাইয়া অনুভব করিলেন তাঁহার বসন আর্দ্র। মনে পড়িয়া গেল তিনি নদীতে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তারপর বিদ্যুচ্চমকের ন্যায় পরিপূর্ণ স্মৃতি ফিরিয়া আসিল। তিনি ধীরে ধীরে চোখ খুলিলেন।

চোখ খুলিয়া তিনি প্রথমে কিছু দেখিতে পাইলেন না, ভিতরের অন্ধকার ও বাহিরের অন্ধকার প্রায় সমান। ক্রমে সূচির ন্যায় সূক্ষ্ম আলোকের রশ্মি তাঁহার চক্ষুকে বিদ্ধ করিল। আকাশের তারা কি? আশেপাশে আর কিছু দেখা যায় না। তখন তিনি গভীব নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া সন্তর্পণে উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন।

কে যেন শিয়রে বসিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া ছিল, হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'এখন বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে?'

বিদ্যুন্মালা চক্ষু বিস্ফারিত কবিয়া চাহিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না; অন্ধকারের মধ্যে গাঢ়তর অন্ধকাবেব একটা পিণ্ড রহিয়াছে মনে হইল। তিনি স্খলিত স্বরে বলিলেন—'কে?

শান্ত আশ্বাসভরা উত্তর হইল—'আমি—অর্জুনবর্মা।'

ক্ষণকাল উভয়ে নীবব। তারপর বিদ্যুন্মালা ক্ষীণ বিস্ময়ের সুরে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা—আমি ঝড়ের ধাক্কায় জলে পড়ে গিয়েছিলাম—কিছুক্ষণের জন্য নিশ্বাস রোধ হয়ে গিয়েছিল—তারপর কে যেন আমাকে টেনে নিয়ে চলল—আর কিছু মনে নেই। —এ কোন্ স্থান?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'বোধহয় নদীব একটা দ্বীপ। আপনি শরীবে কোনো ব্যথা অনুভব করছেন কি?'

বিদ্যুন্মালা নড়িয়া চড়িয়া বসিলেন। বলিলেন—'না। কিন্তু আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

অর্জুনবর্মা বলিল—'অন্ধকার বাত্রি, তাই কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। আকাশেব পানে চোখ তুলুন, তারা দেখতে পাবেন।'

বিদ্যুন্মালা উর্ধ্বে চাহিলেন। হাঁ, ওই তারাব পুঞ্জ। প্রথম চক্ষু মেলিযা তাহাদেব দেখিয়াছিলেন, এখন যেন তাহারা আবো উজ্জ্বল হইযাছে।

অর্জুনবর্মা বলিল—'পিছন দিকে ফিবে দেখুন, হেমকূট চূড়াব ধুনী জ্বলছে।'

হেমকূট চূড়ায় প্রত্যহ সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ধুনী জ্বলে; আজ বৃষ্টির জলে ইন্ধন সিক্ত হইয়াছিল তাই ধুনী জ্বলিতে বিলম্ব হইয়াছে। বিদ্যুন্মালা দেখিলেন, দূরে গিরিচূড়ায় ধূম্রজাল ভেদ করিয়া অগ্নির শিখা উত্থিত হইতেছে।

সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মার দিকে চাহিলেন, মনে হইল যেন সুদূব ধুনীর আলোকে অর্জুনবর্মার আকৃতি ছাযাব ন্যায দেখা যাইতেছে। এতক্ষণ বিদ্যুন্মালাব অন্তবেব সমস্ত আবেগ যেন মূর্ছিত হইয়া ছিল, এখন স্ফুলিঙ্গেব ন্যায একটু আনন্দ স্ফুরিত হইল—'অর্জুনবর্মা। আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি।' এই পর্যন্ত বলিযাই তাঁহার আনন্দটুকু নিভিযা গেল, তিনি উদ্বেগসংহত কণ্ঠে বলিলেন—'কিন্তু কঙ্কণা কোথায়? মন্দোদ[illegible] কোথায়?'

অর্জুন বলিল—'কে কোথায় আছে তা সূর্যোদযেব আগে জানা যাবে না।'

'আজ কি চাঁদও উঠবে না?'

'উঠবে, মধ্যরাত্রির পব।'

'এখন রাত্রি কত?'

'বোধহয় প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। —রাজকুমাবি, আপনার শরীর দুর্বল, আপনি শুয়ে থাকুন। বেশি চিন্তা করবেন না। দুর্বল শবীবে চিন্তা কবলে দেহ আরো নিস্তেজ হয়ে পড়বে।'

'আর আপনি?'

'আমি পাহারায় থাকব।'

এই অসহায় অবস্থাতেও বিদ্যুন্মালা পরম আশ্বাস পাইলেন। দুই-চারিটি কথা বলিয়াই তাঁহার শরীরের অবশিষ্ট শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল, তিনি আবার বালুশয্যায় শয়ন করিলেন। কিছুক্ষণ চক্ষু মুদিয়া শুইয়া থাকিবার পর তাঁহার ক্লান্ত চেতনা আবার সুপ্তির অতলে ডুবিয়া গেল।

বিদ্যুন্মালার চেতনা সুষুপ্তির পাতাল স্পর্শ করিয়া আবার ধীরে ধীরে স্বপ্নলোকের অচ্ছাভ স্তরে উঠিয়া আসিল। তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, সেই স্বপ্ন যাহা পূর্বে একবার দেখিয়াছিলেন। স্বয়ংবর সভায় অর্জুন মৎস্যচক্ষু বিদ্ধ করিয়া রাজকুমারীর সম্মুখে নতজানু হইলেন। বলিলেন—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।'

বিদ্যুন্মালা চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন অর্জুনবর্মা তাঁহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিতেছে—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।' স্বপ্নের অর্জুন ও প্রত্যক্ষের অর্জুনবর্মায় আকৃতিগত কোনো প্রভেদ নাই।

চাঁদ অবশ্য অনেক আগেই উঠিয়াছিল, দিকচক্র হইতে প্রায় এক রাশি ঊর্ধ্বে আরোহণ করিয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র, কিন্তু পরশু ফলকের ন্যায় উজ্জ্বল। তাহারই আলোকে বিদ্যুন্মালার ঘুমন্ত মুখখানি পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তবেণী চুলগুলি বিস্রস্ত হইয়া মুখখানিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছিল, মহার্ঘ বস্ত্রটি বালুকালিপ্ত অবস্থায় নিদ্রাশীতল দেহটিকে অযত্নভরে আবৃত করিয়াছিল। সব মিলিয়া যেন একটি শৈবালবিদ্ধ কুমুদিনী, ঝড়ের আক্রোশে উন্মূলিত হইয়া তটপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

অর্জুনবর্মা মোহাচ্ছন্ন চোখে ওই মুখখানির পানে চাহিয়া ছিল। তাহার দৃষ্টিতে লুব্ধতা ছিল না, মনে কোনো চিন্তা ছিল না; রম্যাণি বীক্ষ্য মানুষের মন যেমন অজ্ঞাতপূর্ব স্মৃতির জালে জড়াইয়া যায়, অজুনবর্মার মনও তেমনি নিগূঢ় স্বপ্নজালে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আলোড়িত জলরাশির মধ্য হইতে রাজকন্যার অচেতন দেহ টানিয়া তোলার স্মৃতিও অসংলগ্নভাবে মনের মধ্যে জাগিয়া ছিল।

অনেকক্ষণ বিদ্যুন্মালার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবার পর তাহার চমক ভাঙ্গিল। ঘুমন্ত রাজকন্যার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া থাকার রূঢ় ধৃষ্টতায় সন্ত্রস্ত হইয়া সে চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না কুহেলির ভিতর নিমগ্ন প্রকৃতি বাষ্পাচ্ছন্ন চোখের দৃষ্টির ন্যায় অস্পষ্ট আবছা হইয়া আছে। অর্জুন চারিদিকে চক্ষু ফিরাইল, তারপর নিঃশব্দে সরিয়া গিয়া দ্বীপের কিনারা ধরিয়া পরিক্রমণ আরম্ভ করিল। চিরসঙ্গী লাঠি দু'টি আজ তাহার সঙ্গে নাই, নৌকা হইতে পতনকালে নৌকাতেই রহিয়া গিয়াছিল। বলরাম যদি বাঁচিয়া থাকে হয়তো লাঠি দু'টিকে যত্ন করিয়া রাখিয়াছে।

দ্বীপটি ক্ষুদ্র, প্রায় গোলাকৃতি; তীরে নুড়ি-ছড়ানো বালুবেলা, মধ্যস্থলে বড় বড় পাথরের চ্যাঙড় উঁচু হইয়া আছে। অর্জুনবর্মা তীর ধরিয়া পরিক্রমণ করিতে করিতে নানা অসংলগ্ন কথা চিন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু তাহার উদ্বিগ্ন জল্পনার মধ্যে মনের নিভৃত একটা অংশ রাজকন্যার কাছে পড়িয়া রহিল। রাজকুমারী একাকিনী ঘুমাইতেছেন। যদি হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া তাহাকে দেখিতে না পাইয়া ভয় পান! যদি দ্বীপের মধ্যে শৃগাল বা বনবিড়াল জাতীয় হিংস্র জন্তু লুকাইয়া থাকে—।

দ্বীপে কিন্তু হিংস্র জন্তু ছিল না। অর্জুনবর্মা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল কয়েকটি তীরচব ক্ষুদ্র পাখি জলের ধারে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহার পদশব্দে টিটিহি টিটিহি শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। টিট্টিভ পাখি।

বিদ্যুন্মালার কাছে ফিরিয়া আসিয়া অর্জুনবর্মা দেখিল তিনি যেমন শুইয়া ছিলেন তেমনি শুইয়া আছেন, একটুও নড়েন নাই। অহেতুক উদ্বেগে অর্জুনের মন শঙ্কিত হইয়া উঠিল, সে তাঁহার শিয়রে নতজানু হইয়া মুখের কাছে মুখ আনিয়া দেখিল।

না, আশঙ্কার কোনো কারণ নাই। ক্লান্তির বিবশ জড়তা কাটিয়া গিয়াছে, রাজকুমারী স্বপ্ন দেখিতেছেন। স্বপ্নের ঘোরে তাঁহার ভ্রূ কখনো কুঞ্চিত হইতেছে, কখনো অধরে একটু হাসির আভাস দেখা দিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে।

স্বপ্নলোকে কোন্ বিচিত্র দৃশ্যের অভিনয় হইতেছে কে জানে। অর্জুনবর্মা মনে মনে একটু ঔৎসুক্য অনুভব করিল; সে একবার চাঁদের দিকে চাহিল, একবার বিদ্যুন্মালার স্বপ্নমুগ্ধ মুখখানি দেখিল। তারপর মৃদুস্বরে বলিল—'রাজকুমারি, দেখুন চাঁদ উঠেছে।'

এগারো

বিদ্যুন্মালা জাগ্রতলোকে ফিরিয়া আসিয়া সিধা উঠিয়া বসিলেন, অর্জুনবর্মার পানে বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। স্বপ্ন ও জাগরের জট ছাড়াইতে একটু সময় লাগিল। তারপর তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন—'আপনি কথা বললেন?'

অর্জুন অপ্রতিভ হইয়া পড়িল, বলিল—'আপনি বোধহয় খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলেন। আমি ভেঙে দিলাম।'

বিদ্যুন্মালা চাঁদের পানে চাহিলেন, মনে মনে ভাবিলেন, স্বপ্ন এখনও ভাঙে নাই।

অর্জুনবর্মা সঙ্কুচিতভাবে একটু দূরে বসিল, বলিল—'বাজকুমারি, আপনার শরীরের সব গ্লানি দূর হয়েছে?'

চাঁদের দিকে চাহিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'হাঁ, এখন বেশ স্বচ্ছন্দ মনে হচ্ছে।—বাত কত?'

হেমকূট শিখরে অগ্নিস্তম্ভ নির্ধূম শিখায় জ্বলিতেছে, নদীতীরস্থ গৃহগুলিতে দীপ নিভিয়া গিয়াছে। অর্জুন বলিল—'তৃতীয় প্রহর।'

এখনো রাত্রি শেষ হইতে বিলম্ব আছে। যতক্ষণ সূর্যোদয় না হয় ততক্ষণ স্বপ্নকে বিদায় দিবার প্রয়োজন নাই।

রাজকুমারী মনে মনে যেন কিছু জল্পনা করিতেছেন। তারপর মন স্থির করিয়া তিনি অর্জুনবর্মার পানে ফিরিলেন, বলিলেন—'ভদ্র, আজ আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন।'

অর্জুন গলার মধ্যে একটু শব্দ করিল, উত্তর দিল না। বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আপনার পরিচয় আমি কিছুই জানি না, কিন্তু আমার প্রাণদাতার পরিচয় আমি জানতে চাই। আপনি সবিস্তারে আপনার জীবনকথা আমাকে বলুন, আমি শুনব।'

অর্জুন বিহ্বল হইয়া বলিল—'দেবি, আমি অতি সামান্য ব্যক্তি, আমার পরিচয় কিছু নেই।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আছে বৈকি। আপনি নিজের কার্যের দ্বারা খানিকটা আত্মপরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তা সম্পূর্ণ নয়। আপনার সম্পূর্ণ পরিচয় আমি জানতে চাই।'

অর্জুন দ্বিধাগ্রস্ত নতমুখে চুপ করিয়া রহিল। উত্তর না পাইয়া বিদ্যুন্মালা একটু হাসিলেন, বলিলেন—'অবশ্য আপনি ক্লান্ত, ওই দুর্যোগের পর ক্ষণকালের জন্যও বিশ্রাম করেননি। আপনি যদি ক্লান্তিবশত কাহিনী বলতে না পারেন, তাহলে থাক, আপনি বরং নিদ্রা যান। আমি তো এখন সুস্থ হয়েছি, আমি জেগে থেকে পাহারা দেব।'

অর্জুন বলিল—'না না, আমার নিদ্রার প্রয়োজন নেই। আপনি যখন শুনতে চান, আমার জীবনকথা বলছি। রাত্রি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর তো কিছুই করবার নেই।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তাহলে আরম্ভ করুন।'

অর্জুন কিছুক্ষণ হেঁট মুখে নীরব রহিল, তারপর ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—

'আমার পিতার নাম রামবর্মা। আমরা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়। আমার পূর্বপুরুষেরা বহু শতাব্দী

আগে উত্তর দেশ থেকে এসে কৃষ্ণা নদীর তীরে বসতি করেছিলেন। উত্তর দেশে তখন যবনের আবির্ভাব হয়েছে, মানুষের প্রাণে সুখ-শান্তি নেই। দাক্ষিণাত্যে এসেও আমার পূর্বপুরুষেরা বেশি দিন সুখ-শান্তি ভোগ করতে পারলেন না, পিছন পিছন যবনেরা এসে উপস্থিত হল। উত্তরাপথের যে দুরবস্থা হয়েছিল দক্ষিণাপথেরও সেই দুরবস্থা হল। তারপর আজ থেকে শত বর্ষ পূর্বে বিজয়নগরে হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হল, যবনেরা কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণ দিক থেকে বিতাড়িত হল। আমার পূর্বপুরুষেরা কৃষ্ণার উভয় তীরে বসতি স্থাপন করেছিলেন, তাঁরা যবনের অধীনেই রইলেন। দাক্ষিণাত্যের যবনেরা দিল্লীর শাসন ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তার নাম বহমনী রাজ্য; গুলবর্গা তার রাজধানী।

আমার পূর্বপুরুষেরা যোদ্ধা ছিলেন, গুলবর্গার উপকণ্ঠে জমিজমা বাসগৃহ করেছিলেন। যখন যবন এসে গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করল তখন তাঁরা যুদ্ধব্যবসায় ত্যাগ করলেন; কারণ যুদ্ধ করতে হলে যবনের পক্ষে স্বজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। তাঁরা অস্ত্র ত্যাগ করে শাস্ত্রচর্চায় নিযুক্ত হলেন।

এসব কথা আমি আমার পিতার মুখে শুনেছি।

সেই থেকে আমাদের বংশে বিদ্যার চর্চা প্রচলিত হয়েছে, কেবল আমি তার ব্যতিক্রম। কিন্তু নিজের কথা পরে বলব, আগে আমার পিতার কথা বলি।

আমার পিতা জীবিত আছেন, আমি দেখে এসেছি, কিন্তু এতদিনে তিনি বোধহয় আর জীবিত নেই। তিনি যুদ্ধবৃত্তি ত্যাগ করেছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে তিনি যোদ্ধা ছিলেন। কোনো দিন যবনের কাছে মাথা নত করেননি। গৃহে বসে তিনি বিদ্যাচর্চা করতেন, জ্যোতিষ ও গণিত বিদ্যায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল। বিশেষত হিসাব-নিকাশের কাজের জন্য তিনি গুলবর্গায় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখছি, গুলবর্গার বড় বড় ব্যবসায়ী তাঁর কাছে আসে নিজের ব্যবসায়ের হিসাবপত্র বুঝে নেবার জন্য। এ থেকে পিতার যথেষ্ট আয় ছিল।

আমার যখন দশ বছর বয়স তখন আমার মা মারা যান। পিতা আর বিবাহ করেননি। আমি এবং পিতা ছাড়া আমাদের গৃহে আর কেউ ছিল না।

আমার কিন্তু বিদ্যাশিক্ষার দিকে মন ছিল না। বংশের সহজাত সংস্কার আমার রক্তে বেশি আছে; ছেলেবেলা থেকে আমি খেলাধূলা অস্ত্রবিদ্যা সাঁতার মল্লযুদ্ধ এইসব নিয়ে মত্তর থাকতাম। একদল বেদিয়ার কাছে একটি গুপ্তবিদ্যা শিখেছিলাম, যার বলে এক দণ্ডে তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করতে পারি। পিতা আমাব মনের প্রবণতা দেখে মাঝে মাঝে বলতেন—'অর্জুন, তোমার ধাতু-প্রকৃতিতে গোত্রপ্রভাব বড় প্রবল, তোমার কোষ্ঠীও যোদ্ধার কোষ্ঠী। তুমি বিজয়নগরে গিয়ে হিন্দু রাজার অধীনে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন কর।' আমি বলতাম—'পিতা, আপনিও চলুন।' তিনি বলতেন—'সাত পুরুষের ভিটে ছেড়ে আমি যাই কী করে? গৃহে দীপ জ্বলবে না, যবনেরা সব লুটেপুটে নিয়ে যাবে। তুমি যাও, হিন্দু রাজ্যে নিঃশঙ্কে বাস করতে পারবে।' কিন্তু আমি যেতে পারতাম না, পিতাকে ছেড়ে একা চলে যেতে মন চাইত না।

এইভাবে জীবন কাটছিল; জীবনে নিবিড় সুখও ছিল না, গভীর দুঃখও ছিল না। তারপর আজ থেকে দশ-বারো দিন আগে রাত্রি দ্বিপ্রহরে পিতার এক বন্ধু এলেন। মহাধনী বণিক, সুলতান আহমদ শাহের সভায় যাতায়াত আছে, তিনি চুপি চুপি এসে বলে গেলেন—'আহমদ শাহ্ স্থির করেছে তোমাকে আর তোমার ছেলেকে গরু খাইয়ে মুসলমান করবে, তারপর তোমাকে নিজের দপ্তরে বসাবে। কাল সকালেই সুলতানের সিপাহীরা আসবে তোমাদের ধরে নিয়ে যেতে।'

পিতার মাথায় বজ্রাঘাত। সংবাদদাতা যেমন গোপনে এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন। আমরা দুই পিতা-পুত্র সারারাত পরস্পরের মুখের পানে চেয়ে বসে রইলাম।

মুসলমানেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, তাদের প্রাণে ভয় নেই। কিন্তু তারা দস্যুরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ

করেছিল, সেই দস্যুবৃত্তি এখনো ত্যাগ করতে পারেনি। তারা লুঠ করতে জানে, কিন্তু রাজ্য চালাতে জানে না; আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখতে জানে না। তাই তারা কর্মদক্ষ বুদ্ধিমান হিন্দু দেখলেই জোর করে তাদের মুসলমান বানিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেয়। পিতাকেও তারা গরু খাইয়ে নিজের দলে টেনে নিতে চায়। সেই সঙ্গে আমাকেও।

রাত্রি যখন শেষ হয়ে আসছে তখন পিতা বললেন—'অর্জুন, আমার পঞ্চাশ বছর বয়স হয়েছে, কোষ্ঠী গণনা করে দেখেছি আমার আয়ু শেষ হয়ে আসছে। ম্লেচ্ছরা যদি জোর করে আমার ধর্মনাশ করে আমি অনশনে প্রাণত্যাগ করব। কিন্তু তুমি পালিয়ে যাও, তোমার জীবনে এখনো সবই বাকি। নদী পার হয়ে তুমি হিন্দু রাজ্যে চলে যাও।'

আমি পিতার পা ধরে কাঁদতে লাগলাম। পিতা বললেন—'কেঁদো না। আমরা যাদববংশীয় ক্ষত্রিয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁকেও একদিন জরাসন্ধের অত্যাচারে মথুরা ছেড়ে দ্বারকায় চলে যেতে হয়েছিল। তুমি বিজয়নগরে যাও, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে রক্ষা করবেন।'

বাইরে তখন কাক কোকিল ডাকতে আরম্ভ করেছে। আমি গৃহ ছেড়ে যাত্রা করলাম। আমার সঙ্গে শুধু এক জোড়া লাঠি। বেদিয়ারা আমাকে যে লাঠিতে চড়ে হাঁটতে শিখিয়েছিল সেই লাঠি। এ লাঠি একাধারে অস্ত্র এবং যানবাহন।

বাড়ি থেকে বেরিয়েই শুনতে পেলাম—অশ্বক্ষুরধ্বনি। চারজন অশ্বারোহী আমাদের ধরে নিয়ে যেতে আসছে। আমি আর বিলম্ব করলাম না. লাঠিতে চড়ে নদীর দিকে ছুটলাম। সওয়ারেরা আমাকে দেখতে পেয়েছিল, তারা আমাকে তাড়া করল। কিন্তু ধরতে পারল না। আমাদের গৃহ থেকে নদী প্রায় অর্ধক্রোশ দূরে, আমি গিয়ে লাঠিসুদ্ধ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। অশ্বারোহীরা আর আমাকে অনুসরণ করতে পারল না।

সারাদিন নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রার সঙ্গমে এসে পৌঁছুলাম। তারপর—তারপর যা হল সবই আপনি জানেন।'

অর্জুন নীরব হইল। বিদ্যুন্মালা নতমুখে শুনিতেছিলেন, চোখ তুলিয়া সম্মুখে চাহিলেন। চন্দ্রের প্রভা ম্লান হইয়া পূর্বাকাশে শুকতারা দপদপ করিতেছে।

দ্বিতীয় পর্ব

এক

দিনের আলো ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই কিল্লাঘাটে মহা হৈ-চৈ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কুমার কম্পন ফিরিয়া আসিয়াছেন। গোলাকৃতি খেয়ার তরীগুলি ঝড়ের তাড়নে ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু ডুবিয়া যায় নাই, তাহারা ঘাটে ফিরিয়া আসিয়াছে। এই বিচিত্র গঠনের ডিঙাগুলি তুঙ্গভদ্রার নিজস্ব নৌকা, ভারতের অন্য কোথাও দেখা যাইত না। বেতের চ্যাঙারির গায়ে চামড়ার আবরণ পরাইয়া এই ডিঙাগুলি নির্মিত, তবে আয়তনে চ্যাঙারির তুলনায় অনেক বড়, দশ-বারো জন মানুষ তল্পিতল্পা লইয়া স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। এই জাতীয় জলযান প্রাচীন কাল হইতে আরব দেশে প্রচলিত ছিল, দক্ষিণ ভারতে কেমন করিয়া উপনীত হইল বলা সহজ নয়। হয়তো মোপলারা যখন আরব দেশ হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে উপনিবেশ স্থাপন করে তখন তাহারাই এই জাতীয় নৌকার প্রবর্তন করিয়াছিল।

কুমার কম্পনদেব ঘাটে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন, কলিঙ্গের তিনটি বহিত্র নদীমধ্যস্থ বিভিন্ন চরে আটকাইয়া বেসামাল ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে; যদিও মানুষগুলোকে দেখা যাইতেছে না, তবু আশা করা যায় তাহারা বাঁচিয়া আছে। বাঁচিয়া থাকিলে তাহাদের উদ্ধার করা প্রয়োজন; সর্বাগ্রে

কলিঙ্গের দুই রাজকন্যার সন্ধান লওয়া কর্তব্য। কম্পনদেব আদেশ দিলেন; চক্রাকৃতি ডিঙাগুলি লইয়া মাঝিরা অর্ধমজ্জিত বহিত্রগুলির দিকে চলিল। সর্বশেষ ডিঙাতে স্বয়ং কম্পনদেব উঠিলেন।

এখনও সূর্যোদয় হয় নাই, কিন্তু পূর্বদিগন্ত আসন্ন সূর্যের ছটায় স্বর্ণাভ হইয়া উঠিয়াছে। ডিঙাগুলি ভাটির দিকে চলিল, কারণ বানচাল বহিত্র তিনটি ঐদিকেই পরস্পর হইতে দুই-তিন রজ্জু দূরে আটকাইয়া আছে।

সকলের পশ্চাতে কম্পনদেবের ডিঙা যাইতেছিল। তিনি ডিঙার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া এদিক-ওদিক চাহিতেছিলেন; সহসা তাঁহার চোখে পড়িল, পাশের দিকে দ্বীপাকৃতি একটি চরের উপর দুইটি মনুষ্যমূর্তি পড়িয়া আছে। তিনি আরো ভাল করিয়া দেখিলেন ঃ হাঁ, সৈকতলীন মনুষ্যদেহই বটে। কিন্তু জীবিত কি মৃত বলা যায় না। একটির দেহে বালু-কর্দমাক্ত রক্তাংশুক দেখিয়া মনে হয় সে নারী। কম্পনদেব মাঝিকে সেইদিকে ডিঙা ফিরাইতে বলিলেন।

দ্বীপে নামিয়া কম্পনদেব নিঃশব্দে ভূমিশয়ন মূর্তি দুইটির নিকটবর্তী হইলেন। একটি নারী, অন্যটি পুরুষ; পরস্পর হইতে তিন-চারি হস্ত অন্তরে শুইয়া আছে। কিন্তু মৃত নয়, নিশ্বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে দেহের সঞ্চালন লক্ষ্য করা যায়। হয় মূর্ছিত, নয় নিদ্রিত।

কম্পনদেবের চক্ষু যুবতীর মুখ হইতে পুরুষের মুখের দিকে কয়েকবার দ্রুত যাতায়াত করিল, তারপর যুবতীর মুখের উপর স্থির হইল। এই সময় সূর্যবিম্ব দিকচক্রের উপর মাথা তুলিয়া চারিদিকে অরুণচ্ছটা ছড়াইয়া দিল। যুবতীর মুখে বালার্ক-কুঙ্কুমের স্পর্শ লাগিল।

কম্পনদেব নিষ্পলক নেত্রে যুবতীর ঘুমন্ত মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তিনি রাজপুত্র, সুন্দরী যুবতী তাঁহার কাছে নূতন নয়। কিন্তু এই ভূমিশয়ান যুবতীর মুখে এমন একটি দুর্নিবার চৌম্বকশক্তি আছে যে বিমূঢ় হইয়া চাহিয়া থাকিতে হয়। কম্পনদেব যুবতীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া মনে মনে বিচার করিলেন—এ নিশ্চয় কলিঙ্গের প্রধানা রাজকন্যা, বিজয়নগরের ভাবী রাজবধূ। কম্পনদেব বোধকরি কলিঙ্গদেশীয়া বরাঙ্গনাদের কুহকভরা রূপলাবণ্যের সহিত ইতিপূর্বে পরিচিত ছিলেন না, তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া ঈর্ষামিশ্রিত অভীপ্সার শিহরণ বহিয়া গেল।

আরো কিছুক্ষণ নিদ্রিতাকে পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি গলার মধ্যে শব্দ করিলেন, অমনি বিদ্যুন্মালার চক্ষু দু'টি খুলিয়া গেল; অপরিচিত পুরুষ দেখিয়া তিনি বসন সংবরণপূর্বক উঠিয়া বসিলেন। উষাকালে তিনি আবার তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অর্জুনও ঘুমাইয়াছিল। অর্জুনের ঘুম কিন্তু ভাঙ্গিল না, সারা রাত্রি জাগরণের পর সে গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

বিদ্যুন্মালা একবার কুমার কম্পনদেবের দিকে চক্ষু তুলিয়াই আবার চক্ষু নত করিলেন। এই পরম কান্তিমান যুবকের চোখের দৃষ্টি ভাল নয়। বিদ্যুন্মালা ঈষৎ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি কে?'

কম্পনদেব বলিলেন—'আমি রাজভ্রাতা কুমার কম্পনদেব। ঝঞ্ঝা-বিধ্বস্তদের খোঁজ নিতে বেরিয়েছি। আপনি—?'

'আমি কলিঙ্গের রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।'

কম্পনদেব অর্জুনের দিকে কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'এ ব্যক্তি কে?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি ঝড়ের আঘাতে নৌকা থেকে জলে পড়ে গিয়েছিলাম, ডুবে যাচ্ছিলাম। উনি আমাকে উদ্ধার করেছেন। ওঁর নাম অর্জুনবর্মা।'

নিদ্রার মধ্যেও নিজের নাম অর্জুনের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল, সে এক লাফে উঠিয়া দাঁড়াইল; কম্পনদেবকে দেখিয়া বলিল—'কে?'

কম্পনদেব কুঞ্চিতচক্ষে তাহাকে নিরীক্ষণ করিলেন, উত্তর দিলেন না; তারপর বিদ্যুন্মালার দিকে ফিরিলেন—'সারা রাত্রি আপনি এবং এই ব্যক্তি দ্বীপেই ছিলেন?'

'হাঁ।'

'ভাল। চলুন, এবার ডিঙায় উঠুন।'

বিদ্যুন্মালা উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার চক্ষে সহসা ব্যাকুলতার ছায়া পড়িল, তিনি বলিলেন— 'কিন্তু—কঙ্কণা? আমাদের নৌকা কি ডুবে গিয়েছে?'

কম্পনদেব বলিলেন—'না, একটি নৌকাও ডোবেনি।—কঙ্কণা কে?'

'আমার ভগিনী—মণিকঙ্কণা।'

'তিনি নিশ্চয় ময়ূরপঙ্খী নৌকাতেই আছেন। আসুন, প্রথমে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাই।'

বিদ্যুন্মালা ডিঙায় উঠিলেন। কুমার কম্পন একটু চিন্তা করিয়া অর্জুনের দিকে শিরঃসঞ্চালন করিলেন। অর্জুন ডিঙায় উঠিল। তখন কম্পনদেব স্বয়ং ডিঙায় আরোহণ করিয়া স্রোতের মুখে নৌকা চালাইবার আদেশ দিলেন।

সূর্য আরো উপরে উঠিয়াছে। নদীর বুকে যে সামান্য বাষ্পাবরণ জমিয়াছিল তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে, নৌকা তিনটি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। প্রথমেই ময়ূরপঙ্খী নৌকা নিমজ্জিত চরে অবরুদ্ধ হইয়া উৎকণ্ঠ ময়ূরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, চারিদিকে জল। ইতিমধ্যে একটি ডিঙা তাহাব নিকট পৌঁছিয়াছে, কিন্তু ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে মানুষ দেখা যাইতেছে না।

কুমার কম্পনের ডিঙা ময়ূরপঙ্খীর গায়ে গিয়া ভিড়িল। কুমাবী বিদ্যুন্মালা শীর্ণ কণ্ঠে ডাকিলেন—'কঙ্কণা!'

খোলের ভিতর হইতে আলুথালু বেশে মণিকঙ্কণা বাহির হইয়া আসিল। বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া দুই বাহু প্রসারিত করিয়া চিৎকার করিযা উঠিল—'মালা! তুই বেঁচে আছিস!'

বিদ্যুন্মালা টলিতে টলিতে ময়ূরপঙ্খীর পাটাতনে উঠিলেন, দুই ভগিনী পরস্পর কণ্ঠলগ্না হইলেন। তারপর গলদশ্রু নেত্রে রইঘরে নামিয়া গেলেন। রাজপুরীতে যাইতে হইবে, আবার বেশবাস পরিবর্তন করিয়া রাজকন্যার উপযোগী সাজসজ্জা করা প্রয়োজন।

ডিঙাতে দাঁড়াইয়া কুমার কম্পন অঙ্গুলি দিয়া সূক্ষ্ম গুম্ফের প্রান্ত আমর্শন করিতে লাগিলেন। অর্জুন অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতেছিল, তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে কষ্ট হইল না। রাজপুত্র রূপ দেখিয়া মজিয়াছেন।

শোভাযাত্রা করিয়া বাজকন্যারা কিল্লাঘাট হইতে রাজভবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

রাজকন্যাদের হাতীর পিঠে উঠিবার অনুরোধ করা হইয়াছিল, তাঁহারা ওঠেন নাই। দুই বোন পাশাপাশি চতুর্দোলায় বসিয়াছেন। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠে চতুর্দোলার পাশে চলিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টি মুহুর্মুহু রাজকন্যাদের দিকে ফিরিতেছে; রহস্যময় দৃষ্টি, তাঁহার অন্তর্গূঢ় জল্পনা কেহ অনুমান করিতে পারে না।

চতুর্দোলার পশ্চাতে একটি দোলায় রাজবৈদ্য বৃদ্ধ রসরাজ ঔষধের পেটরা লইয়া উঠিয়াছেন। ভাগ্যক্রমে তাঁহার দেহ অনাহত আছে, কিন্তু অবস্থাগতিকে তিনি যেন একটু দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছেন।

রসরাজের পিছনে নৌকার নাবিক ও সৈনিকের দল পদব্রজে চলিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অর্জুনবর্মাও আছে। সে চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছে, সবগুলি মুখই পরিচিত, কিন্তু বলরামকে দেখা যাইতেছে না। অর্জুনের পাশের লোকটি হাসিয়া বলিল—'বলরাম কর্মকারকে খুঁজছ? সে আসেনি। নৌকা জখম হয়েছে, তাই মেরামতির জন্য বলরাম আর কয়েকজন ছুতার নৌকাতেই আছে।' অর্জুন নিশ্চিন্ত হইল, বিচিত্র নগরশোভা দেখিতে দেখিতে চলিল।

শোভাযাত্রার গতি দ্রুত নয়; সম্মুখে পাঁচটি হাতী ও পশ্চাতে অশ্বারোহীর দল তাহার বেগমর্যাদা সংযত করিয়া রাখিয়াছে। আজ আর মুরজমুরলী বাজিতেছে না, থাকিয়া থাকিয়া বিপুল শব্দ তুরী ও পটহ ধ্বনিত হইতেছে; যেন বিজয়ী সৈন্যদল ডঙ্কা বাজাইয়া গৃহে ফিরিতেছে।

এই বিশাল নগরের আকৃতি প্রকৃতি সত্যই বিচিত্র। সাতটি প্রাকারবেষ্টনীর মধ্যে ছয়টি পিছনে

পড়িয়া আছে, তবু নগর এখনো তাদৃশ জনাকীর্ণ নয়। ভূমি কোথাও সমতল নয়, কঙ্কারাবৃত পথ কখনো উঠিতেছে কখনো নামিতেছে, কখনো মকরাকৃতি অনুচ্চ গিরিশ্রেণীকে পাশ কাটাইয়া যাইতেছে। কোথাও অগভীর সংকীর্ণ পয়োনালক পথকে খণ্ডিত করিয়া দিয়াছে, হাঁটু পর্যন্ত জল অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়। যেখানে জমি একটু সমতল সেখানেই পথের পাশে পাথরের গৃহ, ফুলের বাগান, আম্রবাটিকা, ইক্ষুক্ষেত্র। শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বহু নরনারী পথের ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে, হাস্যমুখী যুবতীরা চতুর্দোলা লক্ষ্য করিয়া লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ করিতেছে।

তারপর আবার অসমতল শিলাবন্ধুর ভূমি, স্বল্পসেচনতুষ্ট জোয়ার-বাজরার শূলকণ্টকিত ক্ষেত্র। ঊর্ধ্বে চাহিলে দেখা যায়, দূরে দূরে তিনটি স্তম্ভাকার গিরিশৃঙ্গ—হেমকূট মতঙ্গ ও মালয়বন্ত আকাশে মাথা তুলিয়া যেন দূরাগত শত্রুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াছে।

দিবা দ্বিতীয় প্রহরের আরম্ভে মিছিল এক উত্তুঙ্গ সিংহদ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইহাই শেষ তোরণ, তোরণের দুই পাশ হইতে উচ্চ পাষাণ-প্রাকার নির্গত হইয়া অন্তর্ভুক্ত ভূমিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। বিস্তীর্ণ নগরচক্রের ইহা কেন্দ্রস্থিত নাভি।

তোরণের প্রহরীরা পথ ছাড়িয়া দিল, মিছিল সপ্তম পুরীতে প্রবেশ করিল। সাত কৌটার মধ্যে এক কৌটা। ইহার ব্যাস চারি ক্রোশ; ইহার মধ্যে চৌত্রিশটি প্রশস্ত রাজপথ আছে, তন্মধ্যে প্রধান রাজপথের নাম পান-সুপারি রাস্তা। নাম পান-সুপারি রাস্তা হইলেও সোনা-রূপা হীরা-জহরতের বাজার। এই মণিমাণিক্যের হাটের মাঝখানে রাজভবনের অসংখ্য হর্ম্যরাজি।

মিছিল সেইদিকে চলিল। গভীর শব্দে ডঙ্কা ও তূরী বাজিতেছে। পথে লোকারণ্য; পথিপার্শ্বস্থ অট্টালিকাগুলির অলিন্দে বাতায়নে চাঁদের হাঁট; দুই সুন্দরী রাজকন্যাদের দেখিয়া সকলে জয়ধ্বনি করিতেছে। মণিকঙ্কণা ও বিদ্যুন্মালা চতুর্দোলায় পাশাপাশি বসিয়া আছেন। মণিকঙ্কণা সাহসিনী মেয়ে, কিন্তু তাহার বুকও মাঝে মাঝে দুরু দুরু করিয়া উঠিতেছে। বিদ্যুন্মালার আয়ত চক্ষু সম্মুখ দিকে প্রসারিত, কিন্তু তাঁহার মন আপন অতল গভীরতায় ডুবিয়া গিয়াছে। তিনি ভাবিতেছেন—জীবন এত জটিল কেন?

বেলা দ্বিপ্রহরে মধ্যদিনের সূর্যকে মাথায় লইয়া শোভাযাত্রা রাজভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

দুই

রাজপুরীর সাত শত প্রতিহারিণী ও পরিচারিকা সভাগৃহের সম্মুখে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের বাম হস্তে চর্ম, দক্ষিণ হস্তে মুক্ত তরবারি। সকলেই দৃঢ়াঙ্গী যুবতী, সুদর্শনা। তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক তাতারী যুবতী আছে, পিঙ্গল কেশ ও নীল চক্ষু দেখিয়া চেনা যায়। রাজপুরীতে, সভাগৃহ ব্যতীত অন্যত্র, পুরুষের প্রবেশ নিষেধ, এই নারীবাহিনী পুরী রক্ষণ করে ও পৌরজনের সেবা করে।

চতুর্দোলা রাজসভার স্তম্ভশোভিত দ্বারের সম্মুখে থামিয়াছিল। কুমার কম্পন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিলেন। বাদ্যোদ্যম তুমুল হইয়া উঠিল। তারপর সভাগৃহ হইতে মহারাজ দেবরায় বাহির হইয়া আসিলেন। তপ্তকাঞ্চন দেহ, মুখে সৌম্য প্রশান্ত গাম্ভীর্য; পরিধানে পট্টবস্ত্র ও উত্তরীয়; কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বাহুতে অঙ্গদ। যৌবনের মধ্যাহ্নে মহারাজ দেবরায়ের দেহ যেন লাবণ্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে।

তিনি একটি হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিলেন, অমনি বাদ্যোদ্যম নীরব হইল। কুমার কম্পন বলিলেন—'মহারাজ, এই নিন, কলিঙ্গর দুই দেবীকে নদী থেকে উদ্ধার করে এনেছি।'

দুই রাজকন্যা চতুর্দোলা হইতে নামিয়া রাজার সম্মুখে যুক্তহস্তা হইলেন। রাজাকে দেখিয়া

মণিকঙ্কণার সমস্ত ভয় দূর হইয়াছিল, সে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে চাহিল; বিদ্যুন্মালার মুখ দেখিয়া কিন্তু মনের কথা বোঝা গেল না। রাজা পূর্বে কলিঙ্গ-কন্যাদের দেখেন নাই, ভাটের মুখে বিবাহ স্থির হইয়াছিল। তিনি একে একে দুই কন্যাকে দেখিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নতা আরো গভীর হইল। আশীর্বাদের ভঙ্গিতে করতল তুলিয়া তিনি বলিলেন—'স্বস্তি।'

রসরাজও নিজের দোলা হইতে নামিযাছিলেন, এই সময় তিনি আসিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'জয়োস্তু মহারাজ। আমি কলিঙ্গের রাজবৈদ্য রসরাজ, কুমারীদের সঙ্গে এসেছি। কুমারীদের মাতুল অভিভাবকরূপে ওদের সঙ্গে এসেছিলেন. কিন্তু তাঁকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমিই আপনাকে কন্যাদের পরিচয় দিচ্ছি। ইনি কুমারী-ভট্টারিকা বিদ্যুন্মালা, ভাবী রাজবধূ; আর ইনি রাজকুমারী মণিকঙ্কণা, ভাবী রাজবধূর সঙ্গিনীরূপে এসেছেন।'

রাজা বলিলেন—'ধন্য। মাতুল মহাশয়কে নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। আপাতত—'

রাজা পাশের দিকে ঘাড় ফিরাইলেন। ইতিমধ্যে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার পাশে একটু পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ইনি একাধাবে রাজ্যেব প্রধান সেনাপতি ও মহাসচিব। পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক দৃঢ়শরীব পুরুষ; অত্যন্ত সাদাসিধা বেশবাস, মুখ দেখিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও পদমর্যাদার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না।

বাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, মান্য অতিথিদের পরিচর্যার ব্যবস্থা করুন। এঁরা আমাদের কুটুম্ব, অতিথি-ভবনে নিয়ে গিযে এঁদের সমুচিত পানাহার বিশ্রামেব আয়োজন করুন।'

'যথা আজ্ঞা আর্য।' লক্ষ্মণ মল্লপ করজোড়ে অতিথিদেব সম্বোধন করিলেন—'আমাব সঙ্গে আসতে আজ্ঞা হোক। অতিথি-ভবন নিকটেই, সেখানে আপনাদেব স্নান পান আহার বিশ্রামের আয়োজন করে রেখেছি।'

লক্ষ্মণ মল্লপ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে বসরাজ চোখে ভালো দেখেন না, তিনি তাঁহার হাত ধরিয়া আগে লইয়া চলিলেন, অতিথিবর্গ তাঁহাদের পিছনে চলিল। রাজসভা হইতে শত হস্ত দূরে রাজকীয় টঙ্কশালের পাশে প্রকাণ্ড দ্বিভূমক অতিথি-ভবন। সেখানে পাঁচ শত অতিথি এককালে বাস করিতে পারে।

ইত্যবসরে বাজপুরী হইতে একটি শক্তসামর্থ্য দাসী স্বর্ণকলসে জল আনিয়া রাজকুমারীদের পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়াছিল। এই দাসী বিপুল রাজপরিবারেব গৃহিণী, সাত শত প্রতিহারিণীর প্রধানা নায়িকা; নাম পিঙ্গলা। রাজা তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'পিঙ্গলে, কলিঙ্গ-কুমারীদের জন্য নতুন প্রাসাদ প্রস্তুত হচ্ছে, এখনো বাসেব উপযোগী হয়নি। তুমি আপাতত এঁদের রাজ-সভাগৃহের দ্বিতলে নিয়ে যাও, উপস্থিত সেখানেই এঁরা থাকবেন।'

পিঙ্গলা একটু হাসিযা বলিল—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

পিঙ্গলাকে নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন ছিল না, কারণ ইতিপূর্বে রাজার আদেশে সে সভাগৃহেব দ্বিতলে রাজকুমারীদের জন্য উপযুক্ত বাসস্থান সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়াছিল; রাজা বোধ করি কুমাবীদের শুনাইবার জন্য একথা বলিয়াছিলেন। রাজকীয় সভাগৃহটি দ্বিভূমক; নিম্নতলে সভা বসে, দ্বিতীয তলে তিনটি মহল। একটিতে মহারাজ দিবাকালে বিশ্রাম করেন, দ্বিতীয়টি রাজার পাকশালা, সেখানে দশটি পাচিকা রাজার জন্য রন্ধন করে, নপুংসক কঞ্চুকী পাকশালার দ্বারের পাশে বসিয়া পাহারা দেয়। তৃতীয় মহলটি এতদিন শূন্য পড়িয়া ছিল। এখন সাময়িকভাবে নবাগতাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে।

রাজা পুনশ্চ বলিলেন—'এঁদের নিয়ে যাও, যথোচিত সেবা কর। দেখো যেন সেবার ত্রুটি না হয়।'

পিঙ্গলা বলিলেন—'ত্রুটি হবে না মহারাজ। আমি নিজে এঁদের সেবা করব।'

'ভাল।'

পিঙ্গলা রাজকুমারীদের স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া লইয়া গেল। মহারাজ ভ্রাতার দিকে ফিরিয়া সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্ত রাখিলেন—'কম্পন, কাল থেকে তোমার অনেক পরিশ্রম হয়েছে। যাও, নিজ গৃহে বিশ্রাম কর গিয়ে।'

কম্পনদেব হ্রস্বকণ্ঠে বলিলেন—'আমার কিছু নিবেদন আছে আর্য।'

রাজা সপ্রশ্ন নেত্রে ভ্রাতার পানে চাহিলেন, তারপর বলিলেন—'এস।'

দুই ভ্রাতা সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন।

বহু স্তম্ভযুক্ত রাজসভার আকৃতি নাট্যমণ্ডপের ন্যায়; তিন ভাগে সভাসদ্‌গণের আসন, চতুর্থ ভাগে অপেক্ষাকৃত উচ্চ মঞ্চের উপর সিংহাসন। পাথরে গঠিত হর্ম্য, কিন্তু পাথর দেখা যায় না; কুড্য ও স্তম্ভের গাত্র সোনার তবকে মোড়া। মণিমাণিক্যখচিত স্বর্ণ-সিংহাসনটি আয়তনে বৃহৎ, তিন চারি জন মানুষ স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বসিতে পারে। সিংহাসনের পাশে সোনার দীপদণ্ড, সোনার পর্ণসম্পুট, সোনার ভৃঙ্গার। চারিদিকে সোনার ছড়াছড়ি। সেকালে এত সোনা বোধ করি ভারতের অন্যত্র কোথাও ছিল না।

দ্বিপ্রহরে সভাগৃহ শূন্য, সভাসদেরা স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজা দেবরায় আসিয়া সিংহাসনের উপর কিংখাবের আসনে বসিলেন; তাঁহার ইঙ্গিতে কুমার কম্পন তাঁহার পাশে বসিলেন। দুইজনে পাশাপাশি বসিলে দেখা গেল তাঁহাদের আকৃতি প্রায় সমান; দশ বছর বয়সের পার্থক্যে যতটুকু প্রভেদ থাকে ততটুকুই আছে। এই সাদৃশ্যের সুযোগ লইয়া মহারাজ দেবরায় একটু কৌতুক করিতেন; বিদেশ হইতে কোনো নবাগত রাষ্ট্রদূত আসিলে তিনি নিজে সভায় না আসিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়া দিতেন। রাষ্ট্রদুতেরা চোখে না দেখিলেও রাজার কীর্তিকলাপের কথা জানিতেন। তাঁহারা কুমার কম্পনকে রাজা মনে করিয়া সবিস্ময়ে ভাবিতেন—এত অল্প বয়সে রাজা এমন কীর্তিমান! রাজা এই তুচ্ছ কাপট্যে আমোদ অনুভব করিতেন বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে অনিষ্ট হইতেছিল; কুমার কম্পনের মনে সিংহাসনের প্রতি লোভ জন্মিয়াছিল।

উভয়ে উপবিষ্ট হইলে রাজা ভ্রূ তুলিয়া ভ্রাতাকে প্রশ্ন করিলেন। কুমার কম্পন তখন ধীরে ধীরে বিদ্যুন্মালা ও অর্জুনবর্মার কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জুনবর্মা নদী হইতে বিদ্যুন্মালাকে উদ্ধার করিয়াছিল, দুইজনে নির্জন দ্বীপে রাত্রি কাটাইয়াছে, পাশাপাশি শুইয়া ঘুমাইয়াছে। কুমার কম্পন একটু শ্লেষ দিয়া একটু রঙ চড়াইয়া সব কথা বলিতে লাগিলেন; শুনিতে শুনিতে রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল।

বিবৃতির মাঝখানে লক্ষ্মণ মল্লপ এক সময় আসিয়া সিংহাসনের পাদমূলে পারসীক গালিচার উপর বসিলেন এবং কোনো কথা না বলিয়া নতমস্তকে কুমার কম্পনের কথা শুনিতে লাগিলেন। কুমার কম্পন তাঁহার আবির্ভাবে একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিয়া চলিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ ও কুমার কম্পনের মধ্যে ভালবাসা নাই, দু'জনেই দু'জনকে আড়-চক্ষে দেখেন। কিন্তু লক্ষ্মণ মল্লপ রাজ্যের মহাসচিব, তাঁহার কাছে রাজকীয় কোনো কথাই গোপনীয় নয়।

কুমার কম্পন বিবৃতি শেষ করিয়া বলিলেন—'মহারাজ, আমার বার্তা নিবেদন করলাম, এখন আপনার অভিরুচি।' তারপর লক্ষ্মণ মল্লপের দিকে বক্র কটাক্ষপাত করিয়া বলিলেন—'আমার বিবেচনায় এ কন্যা বিজয়নগরের রাজবধূ হবার যোগ্যা নয়।'

রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'তুমি যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে।'

কুমার কম্পন অভিবাদন করিয়া প্রস্থান করিলেন। নিজের মনোগত অভিপ্রায় না জানাইয়া যতটা বলা যায় তাহা বলা হইয়াছে। আপাতত এই পর্যন্ত থাক।

রাজা ও মন্ত্রী পরস্পরের চোখে চোখ রাখিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তারপর রাজা বলিলেন—'আপনি বোধহয় কম্পনের কথা সবটা শোনেননি—'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'না শুনলেও অনুমান করতে পেরেছি।'

'আপনার কি মনে হয়?'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'ঘটনা সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু ইঙ্গিতটা অমূলক। আমি রাজকন্যাকে দেখেছি, আমার মনে কোনো সংশয় নেই।'

'কিন্তু—' রাজা থামিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'অর্জুনবর্মা নিশ্চয় দলের সঙ্গে এসেছে। তাকে প্রশ্ন করা যেতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'সেই ভাল। তাকে ডেকে পাঠান। আমি তাকে প্রশ্ন করব। আপনি তার মুখ লক্ষ্য করবেন।'

লক্ষ্মণ মল্লপ ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, তারপর বাম হস্ত দিয়া দক্ষিণ করতলে তালি বাজাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের দিক হইতে একজন চোবদার রক্ষী আসিয়া সিংহাসনের সম্মুখে রূপার ভল্ল নামাইয়া নতজানু হইল।

মন্ত্রী বলিলেন—'রাজকন্যাদের সঙ্গে যারা এসেছে তাদের মধ্যে একজনের নাম অর্জুনবর্মা। অতিথিশালা থেকে তাকে এখানে নিয়ে এস।'

রক্ষী ভল্ল হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্ত্রী পুনশ্চ বলিলেন—'বেঁধে আনতে হবে না। সমাদর করে নিয়ে আসবে।'

রক্ষী বলিল—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

রাজা বলিলেন—'আমি বিরাম-গৃহে যাচ্ছি, সেখানে তাকে পাঠিয়ে দিও।'

রক্ষী বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

তিন

অতিথি-ভবনে বহুসংখ্যক পরিচারক নবাগতদের সেবার ভার লইয়াছিল। প্রথমে অতিথিরা শীতল তক্র পান করিয়া পথশ্রম দূর করিলেন; তারপর স্নান ও আহার। অতিথিরা অধিকাংশই আমিশাষী, বহুবিধ মৎস্য ও মাংসাদি সহযোগে জবারের রোটিকা ও ঘৃতপক্ব তণ্ডুল গ্রহণ করিলেন। রসরাজ নিরামিষ খাইলেন। তাঁহার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, দধিমণ্ড ক্ষীর ফলমূল ও মিষ্টান্নের ভাগই অধিক।

প্রচুর আহার করিয়া সুবাসিত তাম্বূল চর্বণ করিতে করিতে সকলে অতিথি-ভবনের দ্বিতলে উপনীত হইলেন। দ্বিতলে সারি সারি অসংখ্য প্রকোষ্ঠ, প্রকোষ্ঠগুলিতে শুভ্র শয্যা বিস্তৃত। অতিথিগণ পরম আরামে সুকোমল শয্যায় লম্বমান হইলেন।

অর্জুনবর্মা একটি প্রকোষ্ঠে উপাধান মাথায় দিয়া শয়ন করিয়াছিল। উপাধান হইতে স্নিগ্ধ-শীতল উশীরের গন্ধ নাকে আসিতেছে। উদর তৃপ্তিদায়ক খাদ্যপানীয়ে পূর্ণ, মস্তিষ্কে নূতন কোনো চিন্তা নাই; অর্জুনবর্মা চক্ষু মুদিত করিয়া রহিল। ক্রমে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল।

সহসা তন্দ্রার মধ্যে নিজের নাম শুনিয়া অর্জুনবর্মার ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, প্রকোষ্ঠের দ্বারমুখে এক ভল্লধারী পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে। অর্জুনবর্মা ত্বরিতে উঠিয়া বসিল।

রক্ষী দোপাট্টা দাড়ির মধ্যে হাসিয়া প্রশ্ন করিল—'মহাশয়ের নাম কি অর্জুনবর্মা?'

অর্জুন বলিল—'হাঁ, কী প্রয়োজন?'

রক্ষী বলিল—'শ্রীমন্মহারাজ আপনাকে স্মরণ করেছেন। আসতে আজ্ঞা হোক।'

অর্জুন বিস্মিত হইল; মহারাজ তাহার ন্যায় নগণ্য বক্তিকে কেন স্মরণ করিলেন ভাবিয়া পাইল না। সে গাত্রোত্থান করিয়া বলিল—'চল।'

অতিথিশালা হইতে নামিয়া অর্জুন রক্ষীর সঙ্গে রাজসভার দিকে চলিল। আকাশে এখন সূর্য

পশ্চিমে ঢলিয়াছে; কিন্তু এখনো বাতাস উত্তপ্ত, পৌরজন গৃহচ্ছায়া ছাড়িয়া বাহির হয় নাই। জনশূন্য পুরভূমি দিয়া যাইতে যাইতে রক্ষী জিজ্ঞাসা করিল—'রাজাকে কিভাবে অভিবাদন করিতে হয় আপনি জানেন তো?'

অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। সে কখনো রাজদরবারে যায় নাই, মাথা নাড়িয়া বলিল—'না, জানি না।'

রক্ষী বলিল—'চিন্তা নেই, আমি শিখিয়ে দিচ্ছি।'

সে মাটিতে ভল্ল রাখিয়া রাজ-বন্দনার প্রক্রিয়া দেখাইল। দুই হাত জোড় করিয়া মাথার উর্ধ্বে তুলিল, কটি হইতে উর্ধ্বাঙ্গ সম্মুখে অবনত করিল, তারপর খাড়া হইয়া হাত নামাইল। বলিল—'রাজাকে এইভাবে অভিবাদন করতে হয়। পারবেন?'

অর্জুন অনুরূপ প্রক্রিয়া করিয়া দেখাইল। নূতনত্ব থাকিলেও এমন কিছু শক্ত নয়। রক্ষী তুষ্ট হইয়া বলিল—'ওতেই হবে।'

সভাগৃহের দ্বিতলে উঠিবাব সোপান-মুখে শস্ত্র-হস্তা দুইটি তরুণী প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। পুরুষ প্রহরীর অধিকার শেষ হইয়া এখান হইতে স্ত্রী-প্রহরীর এলাকা আরম্ভ হইয়াছে। প্রহরিণীদ্বয় অর্জুনবর্মাকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিল, রক্ষীকে প্রশ্ন করিল, তারপর পথ ছাড়িয়া দিল। রক্ষী নীচেই রহিল, অর্জুনবর্মা সঙ্কীর্ণ সোপান দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। সোপান মধ্যপথে মোড় ঘুরিয়া গিয়াছে, মোড়ের কোণে অন্য একজন প্রহরিণী দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে অতিক্রম করিয়া অর্জুনবর্মা দ্বিতলে উঠিল। এখানে আরো দুইজন প্রহরিণী। তাহারা জানিত, অর্জুনবর্মা নামক এক ব্যক্তিকে রাজা আহ্বান করিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে একজন অর্জুনকে রাজ-সমীপে উপনীত করিল।

রাজকক্ষটি আকারে যেমন বৃহৎ, উচ্চ দিকে তেমনি গোলাকৃতি ছাদযুক্ত; মুসলমান স্থাপত্যের প্রভাবে ভবনশীর্ষে গম্বুজ রচনার রীতি প্রচলিত হইয়াছিল। দেয়ালগুলি পুরু রেশমের কানাৎ দিয়া আবৃত; তাহার ফলে কক্ষটি দ্বিপ্রহরেও ঈষৎ ছায়াচ্ছন্ন ও নিরুত্তাপ হইয়া আছে। কক্ষের মধ্যস্থলে মণিমুক্তাজড়িত মর্মর-পালঙ্কে মহারাজ দেবরায় অর্ধশয়ান রহিয়াছেন। তাঁহার মাথার দিকে মসৃণ শিলাকুট্টিমের উপর বসিয়া মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ কোনো দুরূহ চিন্তায় মগ্ন আছেন। পায়ের কাছে মেঝেয় বসিয়া পিঙ্গলা পান সাজিতেছে এবং মৃদুকণ্ঠে রাজাকে নবাগতা কলিঙ্গ-কুমারীদের কথা শুনাইতেছে। ...রাজকুমারীরা স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন...কন্যা দু'টি যেমন সুন্দরী তেমনি শীলবতী...প্রথমটি একটু গম্ভীর প্রকৃতির, দ্বিতীয়টি সরলা হাস্যময়ী...

পিঙ্গলা সোনার তাম্বূলকরঙ্ক দুই হাতে রাজার সম্মুখে ধরিল। রাজা একটি পান তুলিয়া মুখে দিলেন, বলিলেন—'তুমি পান নাও, আর্য লক্ষ্মণকেও দাও।'

রাজার সম্মুখে তাম্বূল চর্বণ পুরুষের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, তবে অনুমতি দিলে খাওয়া চলিত। স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনো নিষেধ ছিল না, এমন কি নর্তকীরাও রাজার সম্মুখে পান খাইত।

লক্ষ্মণ মল্লপ পানের বাটা লইয়া নিজের সম্মুখে রাখিলেন, তারপর শঙ্কুলা লইয়া নিপুণ হস্তে সুপারি কাটিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা বাটা হইতে একটি পান লইয়া মুখে পুরিল।

এই সময় অর্জুনবর্মা দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল এবং শিক্ষানুযায়ী যুগ্মবাহু তুলিয়া রাজাকে বন্দনা করিল। রাজা তাহাকে কক্ষের মধ্যে আহ্বান করিলেন, সে আসিয়া পালঙ্কের সমীপে ভূমির উপর পা মুড়িয়া বসিল। তাহার মেরুদণ্ড ঋজু হইয়া রহিল, দেহভঙ্গিতে দীনতা নাই, আবার ঔদ্ধত্যও নাই।

রাজা পিঙ্গলাকে ইঙ্গিত করিলেন, সে পাশের একটি কানাৎ-ঢাকা দ্বার দিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। কক্ষে রহিলেন রাজা, লক্ষ্মণ মল্লপ এবং অর্জুনবর্মা।

লক্ষ্মণ মল্লপ শঙ্কুলায় কুচকুচ শব্দ করিয়া সুপারি কাটিতেছেন, যেন অন্য কিছুতেই তাঁহার মন নাই। রাজা নিবিষ্ট চক্ষে অর্জুনকে দেখিলেন, তারপর শান্ত কণ্ঠে বলিলেন—'তোমার নাম

অর্জুনবর্মা।'

অর্জুন ইতিপূর্বে দূর হইতে মহারাজ দেবরাথকে একবার দেখিয়াছিল, এখন মুখোমুখি বসিয়া সে তাঁহার পরিপূর্ণ অনুভাব উপলব্ধি করিল। রাজা দেখিতে শান্তশিষ্ট, কিন্তু তাঁহার একটি বজ্রকঠিন ব্যক্তিত্ব আছে যাহার সম্মুখীন হইলে অভিভূত হইতে হয়। অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'আজ্ঞা, মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'তুমি ক্ষত্রিয়। বাজকন্যাদের নৌকায় যোদ্ধা রূপে এসেছ?'

অর্জুন বলিল—'আমি রাজকন্যাদের সঙ্গে কলিঙ্গ থেকে আসিনি মহারাজ।'

রাজা ঈষৎ বিস্ময়ে বলিলেন—'সে কি রকম?'

অর্জুন তখন গুলবর্গা ত্যাগের বিবরণ বলিল। রাজা শুনিলেন; লক্ষ্মণ মল্লপ শঙ্কুলা থামাইয়া অর্জুনের মুখের উপর সন্ধানী চক্ষু স্থাপন করিলেন। বিবৃতি শেষ হইলে রাজা বলিলেন—'চমকপ্রদ কাহিনী! তোমার পিতার নাম কি?'

অর্জুনবর্মা বলিল—'আমার পিতার নাম রামবর্মা।'

রাজা একবার মন্ত্রীর দিকে অলসভাবে চক্ষু ফিরাইলেন, লক্ষ্মণ মল্লপের শঙ্কুলা আবার সচল হইল।

রাজা বলিলেন—'ভাল।—সংবাদ পেয়েছি কাল ঝড়ের সময় তুমি রাজকন্যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলে। তুমি উত্তম সন্তরক, কিভাবে রাজকুমারীকে উদ্ধার করলে আমাকে শোনাও।'

রাজার এই জিজ্ঞাসার মধ্যে অর্জুন কোনো কূট উদ্দেশ্য দেখিতে পাইল না, সে সরলভাবে রাজকন্যা উদ্ধারেব বৃত্তান্ত বলিল। তাহার মনে পাপ ছিল না, তাই কোনো কথা গোপন করিল না; নিজের কৃতিত্ব যথাসম্ভব লঘু কবিয়া বলিল। বাজা ও মন্ত্রী তাহার মুখেব উপর নিশ্চল চক্ষু স্থাপন করিয়া শুনিলেন।

বৃত্তান্ত শেষ হইলে রাজা কিছুক্ষণ প্রীতমুখে নিজ কর্ণেব মণিকুণ্ডল লইয়া নাড়াচাড়া করিলেন, তারপব বলিলেন—'তোমার কাহিনী শুনে পরিতুষ্ট হয়েছি। তোমার সৎসাহস আছে, বিপদের সম্মুখীন হয়ে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হয় না। তুমি বিজয়নগবে বাস করতে চাও, ভাল কথা। কোন্ কাজ করতে চাও?'

অর্জুন জোডহস্তে বলিল—'মহাবাজ, আমি ক্ষত্রিয়, আমাকে আপনার বিপুল বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিন।'

রাজা বলিলেন—'সৈন্যদলে যোগ দিতে চাও? ভাল ভাল।—কিন্তু বর্তমানে তুমি কলিঙ্গ-সমাগত অতিথিদের অন্যতম। আপাতত বিজয়নগরের রাজ-আতিথ্যে থেকে আহাব-বিহার কর। তারপর তোমার ব্যবস্থা হবে। এই স্বর্ণমুদ্রা নাও। তুমি রাজকুমারীর প্রাণরক্ষা কবেছ, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হয়েছি।'

রাজার পালঙ্কের উপর উপাধানের পাশে এক মুষ্টি স্বর্ণমুদ্রা রাখা ছিল; ছোট বড় অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রা। রাজা একটি বড় মুদ্রা লইয়া অর্জুনকে দিলেন, অর্জুন কপোতহস্তে গ্রহণ করিল।

রাজা বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, অর্জুনবর্মাকে পান দিন।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বাটা হইতে অর্জুনকে পান দিলেন। অর্জুন জানে না যে পান দেওয়ার অর্থ বিদায় দেওয়া, সে পান মুখে দিয়া ইতস্তত করিতে লাগিল; স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজসকাশ হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিতে লাগিল। লক্ষ্মণ মল্লপ তাহা বুঝিয়া হাতে তালি বাজাইলেন। প্রহরিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

মন্ত্রী বলিলেন—'অর্জুনবর্মাকে পথ দেখাও।'

অর্জুন তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল, পূর্বের ন্যায় উদ্বাহু প্রণাম করিয়া প্রহরিণীর সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেল।

রাজা ও মন্ত্রী কিছুক্ষণ আত্মস্থ হইয়া বসিয়া রহিলেন; কেবল মন্ত্রীর হাতের যন্ত্রিকা কুচকুচ শব্দ করিয়া চলিল।

অবশেষে রাজা লক্ষ্মণ মল্লপের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'কুমার কম্পন তিলকে তাল করেছেন। অর্জুনবর্মার মন নিষ্পাপ, সুতরাং রাজকন্যাও নিষ্পাপ।'

রাজা কহিলেন—'আপনি যথার্থ বলেছেন, আমারও তাই মনে হয়। কম্পন ছেলেমানুষ, রজ্জুতে সর্পভ্রম করেছে। কিন্তু তবু—বিবাহোন্মুখী কন্যাকে পরপুরুষ স্পর্শ করেছে, এ বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান যদি কিছু থাকে—'

মন্ত্রী বলিলেন—'উত্তম কথা। গুরুদেবের উপদেশ নেওয়া যাক।'

অতএব রাজগুরু আর্য কূর্মদেবকে রাজার প্রণাম পাঠানো হইল। কূর্মদেব একটি তৃণাসন হস্তে উপস্থিত হইলেন। শীর্ণকায় পলিতশীর্ষ ব্রাহ্মণ, রাজা তাঁহার সম্মুখে দণ্ডবৎ হইলেন। কূর্মদেব স্বস্তিবাচন উচ্চারণ করিয়া শিলাকুট্টিমের উপর তৃণাসন পাতিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজাও ভূমিতে বসিলেন।

সমস্যার কথা শুনিয়া কূর্মদেব কিয়ৎকাল চক্ষু মুদিয়া মৌনভাবে রহিলেন। শাস্ত্রজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তি হইলেও তিনি শাস্ত্রকে শাস্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করেন না, লঘু পাপে গুরুদণ্ডের ব্যবস্থা করেন না। তিনি চক্ষু খুলিয়া বলিলেন—'দোষ হয়েছে, কিন্তু গুরুতর নয়। বিবাহোন্মুখী কন্যাকে সাধু উদ্দেশ্যে পরপুরুষ স্পর্শ করলে তাদৃশ দোষ হয় না। তবে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বিবাহ তিন ঋতুকাল বন্ধ থাকবে। এই তিনমাস কন্যা প্রত্যহ প্রাতে অবগাহন স্নান করে পম্পাপতির মন্দিরে স্বহস্তে পূজা দেবেন। তাহলেই তাঁর পাপ-মুক্তি হবে। তখন বিবাহ হতে পারবে। শ্রাবণ মাসে আমি বিবাহের তিথি নক্ষত্র দেখে রাখব।'

গুরুর ব্যবস্থা রাজার মনঃপূত হইল। বিবাহ তিন মাস পরে হইলে ক্ষতি কি? বরং এই অবকাশে ভাবী বধূর সহিত মানসিক পরিচয়ের সুযোগ হইবে। ইতিমধ্যে কন্যার পিতা গজপতি ভানুদেবকে সংবাদটা জানাইয়া দিলেই চলিবে।

রাজা বলিলেন—'যথা আজ্ঞা গুরুদেব।'

দুই দণ্ড পরে গুরুদেব বিদায় লইলেন। তখন রাজা ও মন্ত্রী নিভৃতে মন্ত্রণা করিতে বসিলেন।

চার

অর্জুনবর্মা সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অতিথি-ভবনে ফিরিয়া আসিল। রাজার প্রসন্নতা লাভ করিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ; সে নিজ কক্ষে ফিরিয়া আবার শয্যায় শয়ন করিল। রাজদত্ত পানটি মুখে মিলাইয়া গিয়াছে, কেবল একটি অপূর্ব স্বাদ মুখে রাখিয়া গিয়াছে। মন নিরুদ্বেগ, রাজা তাহাকে সৈন্যদলে গ্রহণ করিবেন; বিদেশে তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তা থাকিবে না। শুইয়া শুইয়া অর্জুনের দেহমন মধুর জড়িমায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

দুই দণ্ড পরে তন্দ্রা-জড়িমা কাটিলে সে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া আলস্য ত্যাগ করিল। দেখিল, পরিচারক কখন তাহার শয্যাপাশে এক প্রস্থ নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় রাখিয়া গিয়াছে। এদিকে দিনের তাপও অনেকটা কমিয়াছে, অপরাহ্ণ সমাগত। অর্জুন নববস্ত্র পরিধান করিয়া, রাজার উপহার স্বর্ণমুদ্রাটি উত্তরীয়প্রান্তে বাঁধিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল।

রাজ-পুরভূমির উত্তর অংশে রাজকীয় টঙ্কশালার পাশ দিয়া পান-সুপারি রাস্তা আরম্ভ হইয়া সিধা পূর্বদিকে গিয়াছে; এই পথ প্রস্থে চল্লিশ হস্ত, দৈর্ঘ্যে দ্বাদশ শত হস্ত। ইহাই বিজয়নগরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজপথ। পান-সুপারি রাস্তা নাম হইলেও পান-সুপারির দোকান এখানে অল্পই আছে। এই রাস্তার

দুই পাশ জুড়িয়া আছে সোনা-রূপা হীরা-জহরতের দোকান। প্রধান রাজপুরুষদের অট্টালিকা, নগরবিলাসিনীদের রঙ্গ-ভবন। ছোটখাটোর মধ্যে আছে মিঠাই অঙ্গদি, ফুলের দোকান, শরবতের দোকান।

সায়ংকালে পান-সুপারি রাস্তায় উচ্চকোটির নাগরিক নাগরিকার সমাগম হইয়াছে। যানবাহন বেশি নাই, পদচারীই অধিক। সকলের পরিধানে বিচিত্র সুন্দর বস্ত্র ও অলঙ্কার। তাহাদের ত্বরা নাই, সকলে মন্থর চরণে চলিয়াছে। কেহ পানের দোকানে পান কিনিয়া খাইতেছে, কেহ পানশালায় শীতল শরবত পান করিতেছে; মেয়েরা ফুল কিনিয়া কণ্ঠে কবরীতে পরিতেছে। বিলাসিনীদের গৃহের সম্মুখে যুবকদের যাতায়াত একটু বেশি। বিলাসিনীরা গৃহসম্মুখে উচ্চ চত্বরের উপর কাষ্ঠাসনে বসিয়াছে, তাহাদের দেহের উচ্ছলিত যৌবন সূক্ষ্ম অচ্ছাভ মল্লবস্ত্রে ঈষদাবৃত। কাহারো কবরীতে দাসী চাঁপা ফুলের মালা জড়াইয়া দিতেছে; কেহ তাম্বূলরাগে অধর রঞ্জিত করিয়া পরিচারিকাদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করিতেছে। তাহাদের বিদ্যুৎবিলাসের ন্যায় হাস্যকটাক্ষ মুগ্ধ পথিকজনের চক্ষু ধাঁধিয়া দিতেছে।

অর্জুনবর্মা অলসপদে চলিয়াছিল। চলিতে চলিতে সে কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করিল। বিজয়নগরের অধিবাসীদের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বড় কেহ নাই, সকলেরই গায়ের রঙ অরুণাভ গৌর হইতে কচি কলাপাতার মত কোমল হরিৎ পাণ্ডু, মেয়েরা সুগঠনা ও লাবণ্যবতী। এদেশের স্ত্রীপুরুষ কেহই পাদুকা পরিধান করে না; এমন কি রাজা যতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে থাকেন তিনিও পাদুকা ধারণ করেন না। গুলবর্গায় মুসলমানেরা চামড়ার শুঁড়-তোলা নাগরা পরে; দেখাদেখি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরাও নাগরা পরে। এদেশে কেবল তুরাণী তীরন্দাজেরা স্থূল বৃষচর্মের ফৌজী জুতা পরে। এখানে মাথায় টুপি বা পাগড়ি পরার বেওয়াজ নাই, তুরাণীরা ছাড়া সকলেই নগ্নশির। এখানে নারীদের পর্দা বা অবগুণ্ঠন নাই, তাহারা সহজ সচ্ছন্দতাব সহিত পথে বাহির হয়, তাহাদের চোখের দৃষ্টি নম্র অথচ নিঃসঙ্কোচ; তাহারা পরপুরুষ দেখিয়া ভয় পায় না। অর্জুনের বড় ভাল লাগিল।

ফুলের মিশ্র সুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া অর্জুন এক ফুলের দোকানে উপস্থিত হইল। মালিনী একটি গৃহের সম্মুখভাগে প্রশস্ত বাতায়নের ন্যায় স্থানে বসিয়া ফুল বিক্রয় করিতেছে। গ্রীষ্মকালে রকমারি ফুলের অভাব। বিজয়নগর গোলাপ ফুলের জন্য বিখ্যাত; সেই গোলাপ ফুলের মরশুম শেষ হইয়াছে; তবু দুই-চারিটা রক্তবর্ণ গোলাপ দোকানে আছে। স্তূপীকৃত সোনার বরণ চাঁপা ফুল আছে; আর আছে জাতী যূথী কাঞ্চন অশোক। বাতায়নের তোরণ হইতে সারি সারি নবমল্লিকার মালা ঝুলিতেছে। মালিনী বসিয়া মাল্যরচনা করিতেছিল, অর্জুন বাতায়নের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই মালিনী চোখ তুলিয়া চাহিল। অর্জুন বলিল—'মালা চাই।'

মালিনী একটু প্রগল্‌ভা, মুচকি হাসিয়া বলিল—'কার জন্যে মালা চাই? নিজের জন্যে, না নাগরীর জন্যে।'

অর্জুনও হাসিল। বলিল—'আমি বিদেশী, নাগরী কোথায় পাব! নিজের জন্যে মালা।'

মালিনী ঘাড় কাৎ করিয়া অর্জুনকে দেখিল—'বিজয়নগরে নাগরীর অভাব নেই। তোমার কোমরে টঙ্কা আছে তো?

উত্তরীয়ের খুঁট হইতে সোনার টঙ্কা খুলিয়া অর্জুন দেখাইল—'এই আছে।'

দেখিয়া মালিনীর চক্ষু একটু বিস্ফারিত হইল, সে বলিল—'তবে আর তোমার ভাবনা কি, ও দিয়ে সব কিনতে পার। কি চাই বল।'

অর্জুন বলিল—'আপাতত একটা মালা হলেই চলবে।'

মালিনী তখন দোদুল্যমান মাল্যশ্রেণী হইতে একটি মালা লইয়া অর্জুনকে দেখাইল। যূথী ও অশোক ফুলে গ্রথিত মালা; মালিনী বলিল—'এটা হলে চলবে? এর মূল্য তিন দ্রম্ম। এর চেয়ে

ভাল মালা আমার দোকানে নেই।'

অর্জুন বলিল —'ওতেই হবে।'

মালিনী দীর্ঘ মালাটির দুই প্রান্ত হাতে ধরিয়া বলিল—'এস, গলায় পরিয়ে দিই।'

অর্জুন মালিনীর কাছে গিয়া গলা বাড়াইয়া দাঁড়াইল, মালিনী মালা গোল করিয়া তাহার গ্রীবার পিছনে বাঁধিয়া দিল। তারপর পিছনে সরিয়া গিয়া অর্জুনকে পরিদর্শনপূর্বক বলিল—'বেশ দেখাচ্ছে।'

অপরিচিতা যুবতীর সহিত এরূপ লঘু হাস্যালাপ অর্জুনের জীবনে এই প্রথম। সে হাসিমুখে মালিনীকে স্বর্ণমুদ্রা দিল। মালিনী তাহার আসনের তলদেশ হইতে এক মুঠি রূপা ও তামার মুদ্রা লইয়া হিসাব করিয়া অর্জুনকে ফেরত দিল, বলিল—'গুনে নাও।'

অর্জুন মাথা নাড়িল। এ দেশের মুদ্রামান সম্বন্ধে তাহার কোনোই ধারণা নাই। সে ক্ষুদ্র মুদ্রাগুলি চাদরের খুঁটে বাঁধিল। মালিনী মিষ্ট হাসিয়া বলিল—'আবার এস।'

অর্জুন পিছু ফিরিতেই একটি লোকের সঙ্গে তাহার মুখোমুখি হইয়া গেল। শীর্ণ আকৃতি, বৈশিষ্ট্যহীন মুখ; বোধহয় ফুল কিনিতে আসিয়াছে। অর্জুন তাহাকে পাশ কাটাইয়া রাস্তায় উপনীত হইল এবং পূর্বমুখে চলিতে লাগিল।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া অর্জুন দেখিল, রাস্তার ধারে একদল লোক জমা হইয়াছে, তাহাদের মাঝখানে কিরাতবেশী একজন লোক। কিরাতের মাথায় কড়ির টুপি, বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটি উগ্রমূর্তি বাজপাখি বসিয়া আছে, ডান হাতে খাঁচার মধ্যে একটি ধূম্রবর্ণ পারাবত। লোকটি সুর করিয়া বলিতেছে—'আমার বাজপাখি আমার পায়রাকে খুব ভালবাসে, পায়রা বাজপাখির বৌ। কিন্তু বৌ-এর স্বভাব ভাল নয়, সে মাঝে মাঝে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায়। বাজপাখি তখন বৌকে খুঁজতে বেরোয়। দেখবে? দ্যাখো দ্যাখো, মজার খেলা দ্যাখো।'

ইতিমধ্যে আরো দু'চারজন দর্শক আসিয়া জুটিয়াছিল। কিরাত খাঁচা খুলিয়া পারাবতকে উড়াইয়া দিল, পারাবত ফট্‌ফট্‌ শব্দে আকাশে উঠিয়া পশ্চিমদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল। তখন কিরাত বাজপাখির পায়ের শিকল খুলিয়া তাহাকেও ছাড়িয়া দিল। বাজপাখি আতসবাজির ন্যায় সিধা শূন্যে উঠিয়া গেল, রক্তচক্ষু ঘুরাইয়া দূরে পলায়মান পারাবতকে দেখিল, তারপর ঝটিকার বেগে তাহার অনুসরণ করিল।

দর্শকেরা ঘাড় তুলিয়া এই আকাশ-যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। পারাবত পলাইতেছে, কিন্তু বাজপাখির গতিবেগ তাহার চর্তুগুণ; অচিরাৎ বাজপাখি পারাবতের নিকট উপস্থিত হইল। পারাবত আঁকিয়া বাঁকিয়া নানাভাবে উড়িয়া পালাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বাজপাখি তাহার উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে দুই পা বাড়াইয়া তাহাকে নখে চাপিয়া ধরিল, তারপর অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে নির্জীব পারাবতকে কিরাতের কাছে ফিরাইয়া আনিল। কিরাত উত্তেজিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'দেখলে? দেখলে? আমার বাজপাখি নষ্ট-দুষ্ট বৌকে কত ভালবাসে! দ্যাখো, বৌ-এর গায়ে নখের আঁচড় পর্যন্ত লাগেনি।'

সকলে হাসিয়া উঠিল। অর্জুন খেলা দেখিয়া প্রীত হইয়াছিল, সে কিরাতের সামনে একটি তাম্রমুদ্রা ফেলিয়া দিয়া পিছন ফিরিল।

এই সময় সেই শীর্ণ লোকটার সঙ্গে তাহার আবার মুখোমুখি হইয়া গেল। লোকটা অলক্ষিতে তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অর্জুন মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। ফুলের দোকানে তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল, আবার এখানে দেখা। লোকটা কি তাহার মতই নিরুদ্দেশ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অর্জুন আবার পূর্বদিকে চলিল। তাহার ইচ্ছা কিল্লাঘাটে গিয়া দেখিয়া আসে বলরাম কর্মকার ভাঙ্গা বহিত্র লইয়া কী করিতেছে। কিন্তু এদিকে দিন শেষ হইয়া আসিতেছে, কিল্লাঘাটে পৌঁছিতেই রাত্রি হইয়া যাইবে। তখন আর ফিরিবার উপায় থাকিবে না। আহা, যদি লাঠি দু'টি থাকিত। যা

হোক, কাল প্রভাতেই সে বলরামকে দেখিতে যাইবে।

ক্রমে অর্জুন পান-সুপারি রাস্তার পূর্ব সীমানায় আসিয়া পৌঁছিল। এখান হইতে সাধারণ লোকালয়ের আরম্ভ; গৃহগুলি উত্তম বটে, কিন্তু পান-সুপারি রাস্তার মত নয়, পথও অপেক্ষাকৃত অপ্রসর। দক্ষিণদিক হইতে অন্য একটি পথ আসিয়া এইখানে তেমাথা রচনা করিয়াছে। তারপর কিল্লাঘাটের দিকে চলিয়া গিয়াছে।

অর্জুন এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হইল। কিন্তু সন্ধ্যা ঘনীভূত হইতেছে, সে আর বেশি দূর না গিয়া সেখান হইতেই ফিরিল। অন্ধকার হইবার পূর্বেই অতিথি-ভবনে ফিরিতে হইবে।

এইখানে তৃতীয় বার সেই শীর্ণ লোকটির সঙ্গে তাহার দেখা হইল। লোকটি অর্জুনের পশ্চাতে কিয়দ্দূরে আসিতেছিল, অর্জুন ফিরিতেই সেও ফিরিয়া আগে আগে চলিতে আরম্ভ করিল। অর্জুন আশ্চর্য হইয়া ভাবিল, কী ব্যাপার! এই লোকটিকেই বার বার দেখিতেছি কেন! তবে কি লোকটি আমারই পিছনে লাগিয়াছে? কিন্তু কেন?

তেমাথার কাছাকাছি ফিরিয়া আসিয়া অর্জুন দেখিল, ইতিমধ্যে সেখানে প্রকাণ্ড একটা হাতীকে ঘিরিয়া ভিড় জমিয়াছে; হাতীর কাঁধে মাহুত বসিয়া আছে; লোকটি ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেল। অর্জুনও জনতার কিনারায় উপস্থিত হইয়াছে এমন সময় ভিতর হইতে চড়চড় শব্দে কাড়া বাজিয়া উঠিল। তারপর পুরুষ কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'বিজয়নগরে শত্রুর গুপ্তচর ধরা পড়েছে—রাজাদেশে তার প্রাণদণ্ড হবে—বিজয়নগরে শত্রুর গুপ্তচরের কী দুর্দশা হয় তোমরা প্রত্যক্ষ কর।'

অর্জুন গলা বাড়াইয়া দেখিল। চক্রব্যূহের মাঝখানে হাত-পা বাঁধা একটা মানুষ চিৎ হইয়া পড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতেছে। বাদ্যকর ঘোষক হাতির মাহুতকে ইশারা করিল, মাহুত হাতি চালাইল। হাতি আসিয়া ভূপতিত লোকটার বুকে পা চাপাইয়া দিল।

অর্জুন আর সেখানে দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিল। এরূপ দৃশ্য গুলবর্গায় সে অনেক দেখিয়াছে। বিজয়নগর ও বহমানী রাজ্যের মধ্যে বর্তমানে শান্তি চলিতেছে বটে, কিন্তু উভয় পক্ষই শত্রু সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহে তৎপর। গুপ্তচর যখন ধরা পড়ে তখন এই বিকট শাস্তিই তাহার প্রাপ্য।

রাজপুরীর কাছাকাছি আসিয়া অর্জুন একটু পিপাসা অনুভব করিল। পাশেই একটি পানশালা। সে সত্রের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পালিকাকে বলিল—'শীতল তাক্ দাও, ক্ষার তক্র।'

সত্রপালিকাটি যুবতী। এখানে পানের দোকানে, ফুলের দোকানে, পানশালা ইত্যাদি ছোট ছোট দোকানে যুবতীরাই বেসাতি করে। এই যুবতীটি অর্জুনকে একটু ভাল করিয়া দেখিল, তারপর মৃৎপাত্রে লবণাক্ত কপিত্থ-সুরভিত তক্র পান করিতে দিল।

তক্র পান করিয়া অর্জুনের শরীর ও মন দুই-ই স্নিগ্ধ হইল। সে নিঃশেষিত মৃৎপাত্র ফেলিয়া দিয়া যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিল—'মূল্য কত?'

যুবতী অর্জুনকে লক্ষ্য করিতেছিল। বোধহয় তাহার বেশবাসে কিছু বিশেষত্ব দেখিয়া থাকিবে। সে বলিল—'তুমি বিদেশী, আজ কি তুমি কলিঙ্গ-রাজকন্যাদের সঙ্গে এসেছ?'

অর্জুন বলিল—'হ্যাঁ।'

যুবতী মাথা নাড়িয়া বলিল—'তাহলে দাম নেব না। তুমি আজ আমাদের অতিথি।'

অর্জুন কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, তারপর স্মিতমুখে 'ধন্য' বলিয়া বাহির হইল।

আকাশে রাত্রির পক্ষচ্ছায়া পড়িয়াছে। পথের দুই পাশে ভবনগুলিতে সন্ধ্যাদীপ জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চলিতে চলিতে অর্জুন চক্ষু তুলিয়া দেখিল, দূরে পশ্চিমদিকে হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নিস্তম্ভ জ্বলিয়া উঠিল।

আরো কিছুদূর গিয়া সে সহসা দাঁড়াইয়া পড়িল; তাহার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। এমন অনুভূতি সে পূর্বে কখনো পায় নাই। তাহার মনে হইল, এতদিনে সে নিজের দেশ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

এই বিজয়নগরই তাহার স্বদেশ, তাহার স্বর্গাদপি গরিয়সী মাতৃভূমি। অগ্নিশীর্ষ হেমকূটের পানে চাহিয়া তাহার চক্ষু বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

অর্জুন জানিত না যে, মাতৃভূমি বলিয়া কোনো বিশেষ ভূখণ্ড নাই। মানুষের সহজাত সংস্কৃতির কেন্দ্র যেখানে, মাতৃভূমিও সেইখানে।

পাঁচ

রাজপুরীতে বেলাশেষের প্রহর বাজিলে মহারাজ দেবরায় আপরাহ্নিক সভা ভঙ্গ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। সভায় পাত্র অমাত্য সভাসদ্ ছাড়াও ইরাণ দেশের রাজদূত আবদর রজ্জাক ছিলেন। আরো কয়েকটি রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু কাজের কথা কিছু হইতেছিল না। রাজসভায় কেবল রাজনীতির আলোচনাই হয় না, হাস্য-পরিহাস, গল্প-গুজবও হয়। সকলে রাজাকে অভিবাদন করিয়া বিদায় হইলেন।

দ্বিতলের বিরাম মন্দিরে গিয়া রাজা প্রথমে কেতকী-সুরভিত জলে স্নান করিলেন। তারপর আহারে বসিলেন। কিঙ্করীরা কক্ষে অসংখ্য ঘৃত-দীপ ও অগুরুবর্তি জ্বালিয়া দিল। দুই-হস্ত পরিমাণ চতুষ্কোণ একটি কাষ্ঠ-পীঠিকা তিনজন কিঙ্করী ধরাধরি করিয়া মহারাজের পালঙ্কের পাশে রাখিল। অনুচ্চ পীঠিকার উপর বৃহৎ সুবর্ণ থালি, থালির উপর অগণিত সোনার পাত্রে বিবিধ প্রকার অন্নব্যঞ্জন। মহারাজ আচমন করিয়া আহারে মন দিলেন। পিঙ্গলা ময়ূরপুচ্ছের পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। কঞ্চুকী হেমবেত্র হস্তে দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া পরিদর্শন করিতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে দেবরায় পিঙ্গলার দিকে চক্ষু তুলিলেন—'কলিঙ্গ-কুমারীদের খাওয়া হয়েছে?'

পিঙ্গলা বীজন করিতে করিতে বলিল—'না, আর্য। তাঁরা অন্য রানীদের মত মহারাজের আহার শেষ হলে আহারে বসবেন।'

মহারাজ আর কিছু বলিলেন না।

আহারান্তে একটি দাসী জলের ভৃঙ্গার হইতে মহারাজের হাতে জল ঢালিয়া দিল, মহারাজ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলেন।

অতঃপর কঞ্চুকী ও দাসী কিঙ্করীরা রাজাকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিল। কেবল পিঙ্গলা রহিল।

পিঙ্গলার হাত হইতে পান লইয়া দেবরায় শয্যায় অর্ধশয়ান হইলেন, বলিলেন—'পিঙ্গলে, তুমি দেবীদের সংবাদ পাঠিয়ে দাও যে, আমার নৈশাহার শেষ হয়েছে—'

'আজ্ঞা মহারাজ।'

'আর দেবী পদ্মালয়কে জানিয়ে দিও যে, আজ রাত্রে আমি তাঁর অতিথি হব।'

পিঙ্গলা অস্ফুট কণ্ঠে স্বীকৃতি জানাইল, তারপর মহারাজকে পদস্পর্শ প্রণাম করিয়া রাত্রির মত বিদায় লইল।

রাজা কবে কোন্ রানীর মহলে রাত্রিবাস করিবেন তাহা অতিশয় গোপনীয় কথা, পূর্বাহ্নে কেহ জানিতে পারে না। শেষ মুহূর্তে রাজা অন্তরঙ্গকে জানাইয়া দিতেন। রাজাদের জীবন সর্বদাই বিপদসঙ্কুল, বিশেষত রাত্রিকালে গুপ্তঘাতকের আশঙ্কা অধিক, তাই রাজা কোথায় রাত্রি যাপন করিবেন তাহা যথাসম্ভব গোপন রাখিতে হয়।

রাজার মহল হইতে বাহির হইয়া পিঙ্গলা পাকশালা অতিক্রমপূর্বক কলিঙ্গ-কুমারীদের মহলে উপস্থিত হইল। এই মহলে গম্বুজশীর্ষে বৃহৎ একটি কক্ষ ঘিরিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রকোষ্ঠ। একটি প্রকোষ্ঠে রাজকন্যাদের নৈশাহারের আয়োজন হইয়াছে। কয়েকজন দাসী কাষ্ঠ-পীঠিকায় অন্নব্যঞ্জন সাজাইয়া অপেক্ষা করিতেছে। রাজকুমারীরা বড় ঘরে আছেন। পিঙ্গলা সেখানে গিয়া যুক্ত করে বলিল—'মহারাজের নৈশাহার সম্পন্ন হয়েছে, এবার আপনারা বসুন।'

দুই রাজকন্যা ভোজনকক্ষে গমন করিলেন। কাষ্ঠ-পীঠিকার দুই পাশে রেশমের আসন পাতা। রাজকন্যারা তাহাতে বসিলেন। চারজন পরিচারিকা তাঁহাদের পরিচর্যা করিতে লাগিল। পিঙ্গলা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিল, তারপর বলিল—'অনুমতি করুন, আমি অন্য রানীদের সংবাদ দিতে যাই। সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা আহারে বসবেন না।'

বিদ্যুন্মালা উদাসমুখে নীরব রহিলেন, মণিকঙ্কণা মৃদু হাসিয়া বলিল—'এস।'

'এই দাসীরা আপনাদের সেবা করবে; কাল প্রাতে আমি আবার আসব।' পিঙ্গলা যুক্তকরে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

দুই ভগিনী নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। বিদ্যুন্মালা নামমাত্র আহার করিলেন, মণিকঙ্কণা প্রত্যেকটি ব্যঞ্জনের স্বাদ লইয়া খাইল। দুইজনের মনের গতি ভিন্নমুখী। বিদ্যুন্মালার মনে সুখ নাই; মহারাজ দেবরায়ের সুন্দর কান্তি এবং সদয় ব্যবহার দেখিয়া তাঁহার মন আরো বিকল হইয়া গিয়াছে। ভাগ্যবিধাতা যেন এক হাতে সব দিয়া অন্য হাতে সব হরণ করিয়া লইতেছেন। মণিকঙ্কণার মনে কিন্তু বসন্তের বাতাস বহিতেছে। আশঙ্কার ঝড়-বাদল অপগত হইয়া হৃদয়াকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠিয়াছে।

দাসীদের সম্মুখে কোনো কথা হইল না, আহার সমাপন করিয়া রাজকন্যারা শয়নকক্ষে গেলেন। কক্ষের দুই পাশে প্রকাণ্ড দুটি পালঙ্কেব উপর শয্যা, শয্যার উপর জাতীপুষ্প বিকীর্ণ। মৃগমদ গন্ধে কক্ষ আমোদিত। মণিকঙ্কণা দাসীদের বলিল--'তোমরা যাও, আর তোমাদের প্রয়োজন হবে না।'

একটি দাসী বলিল—'যে আজ্ঞা, বাজকুমাবী। দ্বারের বাইরে প্রতিহারিণীরা প্রহরায় রহিল, যদি প্রয়োজন হয়, হাততালি দেবেন।'

দাসীরা প্রস্থান করিলে মণিকঙ্কণা বলিল—'মালা, তুই কোন্ পালঙ্কে শুবি?'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'দুই পালঙ্কই সমান, যেটাতে হয় শুলেই হল। আয়, দু'জনে এক পালঙ্কে শুই।'

'সেই ভাল। নৌকোতে একলা শোয়ার অভ্যাস ছেড়ে গেছে।'

দু'জনে একসঙ্গে শয়ন করিলেন। মণিকঙ্কণা ভগিনীর পানে চাহিয়া বলিল—'তোর কি এখানে কিছুই ভাল লাগছে না। অমন মনমরা হয়ে আছিস কেন?'

আসল কথা মণিকঙ্কণাকেও বলিবাব নয়, বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'মামা আর মন্দোদরীর কথা মনে হচ্ছে। কি জানি তারা বেঁচে আছে কিনা।'

চিপিটক ও মন্দোদরীর কথা মণিকঙ্কণা ভুলিয়া গিয়াছিল। হঠাৎ স্মরণ করাইয়া দিতে সে থতমত হইয়া চুপ কবিল, তারপর ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'সত্যিই কি আর ডুবে গেছে: হয়তো বেঁচে আছে, কাল খবর পাওয়া যাবে।'

চিপিটক ও মন্দোদরী বাঁচিয়া ছিলেন। কিন্তু রাজভৃত্যেরা অনেক খোঁজাখুঁজি করিয়াও তাঁহাদের পায় নাই। পাইবার কথাও নয়।

ঝড়ের প্রারম্ভে নৌকা হইতে জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া চিপিটক মন্দোদরীর পা চাপিয়া ধরিয়াছিলেন। তারপর ঝড়ের প্রমত্ত আস্ফালনে পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল, কিন্তু চিপিটক মন্দোদরীর পা ছাড়িলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন, মন্দোদরীর চরণ ছাড়া তাঁহার গতি নাই। মন্দোদরী ডুবিল না, চিপিটকের নাকে মুখে জল ঢুকিলেও তিনি ভাসিয়া রহিলেন।

তারপর যুগান্ত কাটিয়া গেল, নিবিড় অন্ধকারে তাঁহারা কোথায় চলিয়াছেন কিছুই জ্ঞান নাই। ক্রমে ঝড়ের বেগ কমিতে লাগিল, বৃষ্টি থামিল। মেঘ কাটিয়া গেল। অবশেষে নদীর তরঙ্গভঙ্গও মন্দীভূত হইল, তুঙ্গভদ্রার স্রোত আবার স্বাভাবিক ধারায় বহিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকার দিগন্তব্যাপী;

চিপিটক মন্দোদরীর চরণ ধারণ করিয়া ভাসিয়া চলিয়াছেন; একটা হাত অবশ হইলে অন্য হাত দিয়া পা ধরিতেছেন। মন্দোদরীর সাড়াশব্দ নাই, সে কেবল ভাসিয়া যাইতেছে।

অনেকক্ষণ কাটিবার পর চিপিটকের একটু সন্দেহ হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'মন্দোদরী, বেঁচে আছিস তো?'

মন্দোদরী এক ঢোক জল খাইয়া বলিল—'আছি। জয় দারুব্রহ্ম!'

আর কথা হইল না, কথা কহিবার সামর্থ্য বেশি ছিল না। খড়কুটার মত তাঁহারা স্রোতের মুখে নিরুপায় ভাসিয়া চলিলেন।

কিন্তু তাহাদের এই ভাসিয়া চলার কাহিনী দীর্ঘ করিয়া লাভ নাই। রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিতেছে তখন মন্দোদরীর দেহ মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। সে হাঁচোড়-পাঁচোড় করিয়া কাদা ঘাঁটিয়া শুষ্ক ডাঙ্গায় উঠিল; চিপিটক তাহার পিছে পিছে উঠিলেন; চোখে কেহ কিছু দেখিল না, অনুভবে বুঝিল নুড়ি-ছড়ানো স্থান; নদীর তীরও হইতে পারে, আবার নদীমধ্যস্থ দ্বীপও হইতে পারে।

কিন্তু এসব কথা বিবেচনা করিবার শক্তি তাহাদের ছিল না, মাটি পাইয়াছে ইহাই তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা যেমন ছিল সেই অবস্থায় নুড়ি বিছানো মাটির উপর শুইয়া অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রথমে ঘুম ভাঙ্গিল মন্দোদরীর। সে চক্ষু মেলিয়া দেখিল প্রভাত হইয়াছে, একদল স্ত্রীলোক তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া খিলখিল হাসিতেছে। মন্দোদরীর সর্বাঙ্গে সোনার গহনা, কিন্তু বস্ত্র নামমাত্র। ভাগ্যে পরিধেয় শাড়িটি কোমরে গ্রন্থি দিয়া বাঁধা ছিল তাই সেটি অবশিষ্ট আছে, স্তনপট্ট উত্তরীয় প্রভৃতি সবই তুঙ্গভদ্রা কাড়িয়া লইয়াছে। শাড়িটিও তাহার দেহে নাই, ছিন্ন পতাকার মত মাটিতে লুটাইতেছে।

মন্দোদরী কোনো মতে লজ্জা নিবারণ করিয়া উঠিয়া বসিল, বিহ্বলনেত্রে স্ত্রীলোকদের পানে চাহিয়া বলিল—'তোমরা কে গা?'

রমণীরা কলকণ্ঠে উত্তর দিল, কিন্তু মন্দোদরী কিছুই বুঝিল না। ইহাদের ভাষা গ্রাম্য; মন্দোদরী এদেশের নাগরিক ভাষাই বোঝে না গ্রাম্য ভাষা বুঝিবে কি করিয়া!

এদিকে চিপিটক মাতুলের অবস্থাও অনুরূপ। তিনিও প্রায় দিগম্বর, কেবল কটিসংলগ্ন অন্তর্বাস কৌপীনটুকু আছে। জাগিয়া উঠিয়া দেখিলেন, লাঠি হাতে একদল ষণ্ডামার্কা পুরুষ তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার ধারণা জন্মিল তিনি ডুবিয়া মরিয়াছেন, যমদূতেরা তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে। তিনি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—'আমি কিছু জানি না রে বাবা!'

যা হোক, অল্পকাল পরে তিনি নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন। গ্রামীণ পুরুষদের সঙ্গে কথাবার্তা হইল। মামা দক্ষিণ দেশের মানুষ, ইহাদের ভাষা কোনোক্রমে বুঝিয়া লইলেন।—

নদী হইতে অনতিদূরে দক্ষিণে পাহাড়-ঘেরা একটিমাত্র গ্রাম আছে। আজ প্রাতে গ্রামের কয়েকটি মেয়ে নদীতে জল ভরিতে আসিয়াছিল। তাহারা দেখিল উপলবিকীর্ণ উপকূলে দুইটি নরনারী-মূর্তি পড়িয়া আছে। তাহারা ছুটিয়া গিয়া গ্রামে খবর দিল; তখন গ্রাম হইতে অনেক লোক আসিয়া মূর্তি দু'টিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের বুঝিতে বাকি রইল না যে, গত রাত্রির ঝঞ্ঝাবাতে নদীতে পড়িয়া ইহারা ভাসিয়া আসিয়াছে।

মামা কাতর স্বরে বলিলেন—'এখন কি হবে!'

গ্রামের পুরুষেরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল। তাহাদের জীবন বহির্জগৎ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন, নূতন মানুষ তাহারা দেখিতে পায় না, তাই এই দুইজনকে পাইয়া তাহারা পরম হৃষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে একজন বয়স্ক ব্যক্তি চিপিটককে বলিল—'চল, আমাদের গ্রামে থাকবে।'

তাহারা মেয়ে-পুরুষে দুইজনকে ধরাধরি করিয়া গ্রামে লইয়া চলিল।

নদীর প্রস্তরময় তট হইতে সঙ্কীর্ণ প্রণালীর মত পথ গিয়াছে, সেই পথে পাদক্রোশ যাইবার

পর গ্রাম। হাজার হাজার বছর পূর্বে এই স্থানে বোধহয় একটি হ্রদ ছিল, ক্রমে হ্রদ শুকাইয়া পলিমাটির উপর গাছপালা গজাইয়াছিল, তারপর মানুষ আসিয়া এই পাহাড়ঘেরা স্থানটিকে ঘিরিয়া বসিয়াছে। ফল ফলাইয়াছে, ফসল তুলিয়াছে, গরু ছাগল পুষিয়া শান্তিতে বাস করিতেছে। ইহারা অধিকাংশ কুটিরে বাস করে, কিন্তু এখনো অল্পসংখ্যক লোক প্রাচীন অভ্যাস ছাড়িতে পারে নাই, তাহারা এখনো গুহাবাসী। এই পর্বতচক্রের বাহিরে বিস্তীর্ণ দেশের সহিত তাহাদের সম্পর্ক অতি অল্প, কদাচিৎ নগর হইতে নৌকাযোগে বণিক আসিয়া কাপড় এবং মেয়েদের তামা ও লোহার গহনা বিক্রয় করিয়া যায়, বিনিময়ে নারিকেল সুপারি ছাগচর্ম প্রভৃতি লইয়া যায়।

দেখা গেল গ্রামের মানুষগুলা অর্ধ-বন্য হইলেও অতিশয় অতিথিবৎসল। তাহারা অতিথিদের একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসাইয়া দুগ্ধ পিণ্ডক্ষীর খাইতে দিল, পাকা আম ও কদলী দিল। দুই বুভুক্ষু অতিথি পেট ভরিয়া খাইল। আহারের পর গ্রামবাসীরা তাহাদের পান সুপারি খাইতে দিল। ইহারা জোয়ার বাজরির সঙ্গে পান সুপারির চাষও করে; জঙ্গলে খদির বৃক্ষ আছে, নদীর তীর হইতে শামুক ঝিনুক কুড়াইয়া তাহা পুড়াইয়া ইহারা চুন তৈয়ার করে। পান পাইয়া মন্দোদরী ও চিপিটক আহ্লাদে আটখানা হইলেন।

ইতিমধ্যে গ্রামেব সমস্ত স্ত্রীলোক আসিয়া মন্দোদরীকে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল; মন্দোদরীকে দেখিবার জন্য নয়, তাহার গহনা দেখিবাব জন্য। মন্দোদরীর গলায় ছিল সোনার হাঁসুলী, হাতে অঙ্গদ ও কঙ্কণ, কোমরে চন্দ্রহার, পায়ের আঙ্গুলে রূপার চুট্‌কি। গ্রামের মেয়েরা আগে কখনো এমন অপরূপ গহনা দেখে নাই। তাহাবা কলকণ্ঠে নিজেদের মধ্যে কথা বালতে বলিতে মন্দোদরীর গা খাব্‌লাইতে লাগিল।

ওদিকে চিপিটক পান চিবাইতে চিবাইতে প্রবীণ মোড়লকে বলিলেন—'তোমাদের আতিথ্যে সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন বিজয়নগরে ফেরবার উপায় কি?'

মোড়ল মাথা নাড়িয়া বলিল—'বিজয়নগরের যাবার রাস্তা নেই। চারিদিকে পাহাড়।'

'অ্যাঁ! সে কী। আমাকে যে বিজয়নগরে ফিরতেই হবে।'

'তুমি কি বিজয়নগরের মানুষ?'

'না, আমি কলিঙ্গ রাজ্যের একজন আমাত্য, গুরুতর রাজকার্যে বিজয়নগরে যাচ্ছিলাম। —তা নদীপথে বিজয়নগরে যাওয়া তো সম্ভব।'

'সম্ভব—কিন্তু আমাদের নৌকা নেই।'

চিপিটকের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—'তবে উপায়? আমরা যাব কি করে?'

মোড়ল হাসিয়া বলিল—'যাবার দরকার কি? আমাদের গ্রামে থাকো।'

কি সর্বনাশ! এই পাহাড়ের মাঝখানে জংলীদের মধ্যে সারা জীবন কাটাইতে হইবে। তাঁহার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর উচ্চতর গ্রামে আরোহণ করিল—'অ্যাঁ! না না, আমরা নগরবাসী এই জঙ্গলে থাকতে পারব না। পাহাড়ে জঙ্গলে বাঘ ভালুক আছে—ওরে বাবারে, আমাকে খেয়ে ফেলবে।'

মোড়ল সান্ত্বনা দিয়া বলিল—'কোনো ভয় নেই। বাঘ ভালুক আমাদের গ্রামে আসে না। মাঝে মধ্যে দু'চারটে হনুমান আসে, তারা মানুষ খায় না। তোমরা নির্ভয়ে থাক, আমরা তোমাদের থাকার ভাল ব্যবস্থা করব, তোমরা পরম সুখে থাকবে।'

চিপিটক বিক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন- 'কোথায় মনের সুখে থাকব? ঐ কুটিরে?'

মোড়ল মাথা নাড়িয়া বলিল—'কুটির একটিও খালি নেই। কিন্তু তোমরা যদি কুটিরে বাস করতে চাও, আমরা তোমাদের জন্যে কুটির তৈরি করে দেব। আপাতত একটি সুন্দর গুহা আছে, তাতেই তোমরা থাকবে।'

চিপিটকের চক্ষু কপালে উঠিল। শেষে গুহা! এও অদৃষ্টে ছিল! অতি কষ্টে জিহ্বার জড়ত্ব দূর করিয়া চিপিটক বলিলেন—'বণিকেরা আসে বলছিলে, তারা কি আসবে না?'

মোড়ল বলিল—'তারা দু'চার দিন আগে এসেছিল, আবার এক বছর পরে আসবে।'

চিপিটকের বাক্‌রোধ হইয়া গেল। ওদিকে গাঁয়ের মেয়েরা মন্দোদরীর সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া ফেলিয়াছিল, ভাষা না বুঝিলেও ভাবের আদান প্রদান চলিতেছিল। এই গ্রামের মেয়েরা কাছা দিয়া কটি হইতে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় পরে, বক্ষ নিরাবরণ, তবু গহনার প্রতি তাহাদের যথেষ্ট আসক্তি আছে। মন্দোদরীর গহনা দেখিয়া তাহারা স্বভাবতই অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা মন্দোদরীকে দুই হাতে ধরিয়া টানিয়া তুলিল, বলিল—'চল। মোড়ল বলেছে তোমরা গুহায় থাকবে, তোমাকে গুহায় নিয়ে যাই। কী সুন্দর গুহা! তোমরা দু'জনে মনের আনন্দে থাকবে।'

মোড়ল চিপিটককে বলিল—'গুহা দেখবে এস। এত ভাল গুহা আর এখানে নেই। পুরনো মোড়ল এই গুহায় থাকত, তিরানব্বই বছর বয়সে মারা গেছে। তাই গুহাটা খালি হয়েছে। আমি এখন মোড়ল; ভেবেছিলাম আমি গিয়ে থাকব, কিন্তু আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা অনেক, ও গুহায় আঁটবে না। তোমরা অতিথি এসেছ, তোমরাই থাক।'

সকলে গুহার নিকট উপস্থিত হইল। গ্রামের বাহিরে পর্বতচক্রের একস্থানে একটি গুহা। গুহার প্রবেশ-দ্বার অতি ক্ষুদ্র, হামাগুড়ি দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। চিপিটকের পক্ষে প্রবেশ করা বিশেষ কষ্টকর নয়, কিন্তু মন্দোদরীকে টানা-হেঁচড়া করিয়া ঢুকিতে হয়। তবে গুহার অভ্যন্তর বেশ সুপরিসর। মন্দোদরীর গুহায় প্রবেশ করিতে কোনো আপত্তি দেখা গেল না। সে হামা দিয়া গুহায় প্রবেশ করিল। মোড়ল তখন চিপিটককে বলিল—'তুমি কিছুক্ষণ গুহায় গিয়ে বিশ্রাম কর। গুহায় বুড়ো মোড়লের বিছানা আছে, তাতেই তোমাদের দুই স্বামী-স্ত্রীর চলে যাবে।'

এতক্ষণে চিপিটকের হুঁশ হইল, ইহারা তাঁহাকে মন্দোদরীর স্বামী মনে করিয়াছে। তিনি ক্রোধে ছিটকাইয়া উঠিয়া প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন। ইহারা বন্য বর্বর লোক, মন্দোদরী তাঁহার স্ত্রী নয় জানিতে পারিলে কি করিবে কিছুই বলা যায় না। হয়তো আবার টানিয়া লইয়া গিয়া নদীতে ফেলিয়া দিবে। উহাদের ঘাঁটাইয়া কাজ নাই।

আত্মগ্লানি গলাধঃকরণ করিয়া চিপিটক জানুর সাহায্যে গুহায় প্রবেশ করিলেন।

ছয়

পরদিন প্রভাতে বিজয়নগরের রাজপুরী জাগিয়া উঠিল। রাজা জাগিলেন, রানীরা জাগিলেন, পৌর-পরিজন জাগিল। বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার ঘুম ভাঙ্গিল।

সূর্যোদয় হইতে না হইতে পিঙ্গলা সভাগৃহের দ্বিতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে রাত্রে রাজপুরীতেই কোথাও থাকে, তাহার স্বতন্ত্র গৃহ নাই। শুনা যায় তাহার একটি গুপ্ত নাগর আছে; মাসের মধ্যে দুই-তিন বার গভীর রাত্রে সে চুপিচুপি নাগরের কাছে যায়। সেখানে রাত কাটাইয়া উষাকালে রাজপুরীতে ফিরিয়া আসে। অন্যথা সে রাজপুরী ছাড়িয়া কোথাও যায় না। রাজপুরীতে তাহার অহোরাত্রের কাজ।

রাজকুমারীদের কাছে উপস্থিত পিঙ্গলা বলিল—'রাজগুরু কূর্মদেব সংবাদ পাঠিয়েছেন, তিনি এখনি আপনাদের আশীর্বাদ জানাতে আসবেন।'

রাজকুমারীরা প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। দুই দণ্ড পরে গুরুদেব আসিলেন, রাজকুমারীরা তাঁহার চরণে প্রণতা হইলেন। পিঙ্গলা উপস্থিত ছিল, সে বিদ্যুন্মালার পরিচয় দিল।

কূর্মদেব ভাবী রাজবধূকে স্বচক্ষে দেখিতে আসিয়াছিলেন, দেখিয়া তৃপ্ত হইলেন; মনে মনে বলিলেন—'কন্যা সুলক্ষণা ও শুদ্ধচরিত্রা, অন্য কন্যাটিও তাই। দু'জনেই বিজয়নগরের রাজবধূ হইবার যোগ্যা।' তিনি বিদ্যুন্মালাকে বলিলেন—'কন্যা, শাস্ত্রীয় কারণে বিবাহ তিন মাস স্থগিত থাকবে। এই

তিন মাস তোমাকে একটি ব্রত পালন করতে হবে। প্রত্যহ প্রভাতে তুমি পম্পাপতির মন্দিরে যাবে। পম্পাপতির মন্দির বেশি দূর নয়, তুমি পদব্রজে যাবে। সেখানে পম্পা সরোবরে অবগাহন স্নান করবে, সরোবরের পদ্ম তুলে পম্পাপতির পূজা করবে, তারপর ফিরে আসবে। তিন মাস এইভাবে কাটাবার পর বিবাহ হবে।'

বিদ্যুন্মালা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস মোচন করিলেন। শিরে সংক্রান্তি আসিয়া পড়িয়াছিল, এখন অন্তত তিন মাসের জন্য পরিত্রাণ। তিনি মস্তক অবনত করিয়া স্বীকৃতি জানাইলেন। পিঙ্গলা বলিল—'গুরুদেব, কবে থেকে ব্রত আরম্ভ হবে?'

কূর্মদেব বলিলেন—'আজ থেকেই আরম্ভ হোক-না। শুভস্য শীঘ্রম্।'

রাজগুরু প্রস্থান করিলে পম্পাপতির মন্দিরে যাইবার জন্য সাজ-সাজ পড়িয়া গেল। পিঙ্গলা নিজে সঙ্গে যাইবে না, কিন্তু সে সমস্ত ব্যবস্থা করিল। রাজার কাছে সংবাদ গেল, পম্পাপতির মন্দিরে অগ্রদূত পাঠানো হইল। তারপর পট্টবস্ত্র পরিহিতা দুই রাজকন্যা বাহির হইলেন। সম্মুখে অসি হস্তে দুইজন প্রতিহারিণী, পিছনে আরো দশজন। পথ আলো করিযা সুন্দরীর ঝাঁক চলিল।

পম্পাপতির মন্দিব রাজপুরীর বায়ুকোণে অনুমান পাদক্রোশ দূরে অবস্থিত। মন্দিরের উত্তরে তুঙ্গভদ্রা, দক্ষিণে-বামে পম্পা সরোবর ও হেমকূট পর্বত। ত্রেতাযুগে এ পম্পা সরোবরে সীতা স্নান করিয়াছিলেন, রাম-লক্ষ্মণ তাহার তীরে পবমধার্মিক বকপক্ষী দেখিয়া হাস্য-পরিহাস করিযাছিলেন।

রাজকন্যারা সভাগৃহ হইতে মাত্র কিয়দ্দূর গিয়াছেন, পথের পাশেই অতিথি-ভবন। একটি যুবক অতিথি-ভবন হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে যুবতী-প্রবাহ দেখিয়া পথপার্শ্বে থামিয়া গেল। তারপর সে যুবতীদের মধ্যে রাজকন্যাদের দেখিতে পাইল।

রাজকন্যারা যুবককে দেখিয়াছিলেন এবং চিনিতে পারিয়াছিলেন। অর্জুনবর্মা। সে সসম্ভ্রমে দুই কর যুক্ত করিল। রাজকন্যাদের গতি স্থগিত হইল না, কিন্তু মণিকঙ্কণা চকিত হাস্যে দশনপ্রান্ত ঈষৎ উন্মোচিত করিল। বিদ্যুন্মালা হাসিলেন না, তাঁহার মুখখানি রক্ত সঞ্চারে একটু উত্তপ্ত হইল মাত্র। কেহ জানিল না যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ক্ষণিকের জন্য দুরু দুরু করিয়া উঠিয়াছে।

অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল, স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেলেন। অর্জুন একটু ইতস্তত করিল; একবার তাহার ইচ্ছা হইল রাজকুমারীর অনুসরণ করে, তিনি প্রতিহারিণী পরিবৃতা হইয়া কোথায় যাইতেছেন দেখিয়া আসে। কিন্তু না, তাহা শোভন হইবে না। সে দৃঢ়পদে অন্য পথে চলিল।

আজ সকালে সে বলরামকে দেখিতে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়াছিল। পথে নামিয়াই রাজকুমারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাহার মন ক্ষণেকের জন্য বিক্ষিপ্ত হইযাছিল, এখন সে আবার মন সংযত করিয়া কিল্লাঘাটের দিকে অগ্রসর হইল।

প্রভাতকালে নগরীর রূপ অন্য প্রকার; যেন সদ্য ঘুম-ভাঙা আলস্য-নিমীল রূপ। পান-সুপারি রাস্তায় লোক চলাচল বেশি নাই। দোকানপাট ধীরমন্থর চালে খুলিতেছে।

কিছুদূর চলিবার পর অর্জুন অকারণেই একবার পিছু ফিরিয়া চাহিল। সেই শীর্ণ লোকটা তাহার পিছনে আসিতেছে, নিজের মুখাবয়ব ঢাকা দিবার জন্যই বোধহয় মাথায় একটি পাগড়ি পরিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তাহার স্বরূপ ঢাকা পড়ে নাই।

অর্জুনের একটু বিরক্তি বোধ হইল। কি চায় লোকটা? তাহার একটা উদ্দেশ্য আছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? একবার অর্জুনের ইচ্ছা হইল ফিরিয়া গিয়া লোকটাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে—কী চাও তুমি? কিন্তু তাহাতে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে; অর্জুন এ দেশে নবাগত, কাহারো সহিত কলহ করিতে চায় না। সে লোকটাকে মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া অন্য কথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতে লাগিল।

ভাবনার বিষয়বস্তুর অভাব ছিল না। পিতা সুদূর গুলবর্গায় কি করিতেছেন; সত্যই কি সুলতান

তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে; পিতা কি অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন?...এই দেশটা তাহার ভাল লাগিয়াছে; এই দেশকে নিজের দেশ ভাবিয়া সে সুখী হইয়াছে; সে কী দেশের সেবা করিতে পারিবে? রাজা কি তাহাকে সৈনিকের কার্য দিবেন?—এই সকল চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে রাজকুমারী বিদ্যুন্মালার স্নিগ্ধগম্ভীর মুখখানি তাহার মানসপটে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রাজকুমারীর মনে গর্ব-অভিমান নাই, অর্জুনের ন্যায় সামান্য ব্যক্তির জীবনকথা শুনিতেও তাঁহার আগ্রহ। ঈশ্বর কৃপায় তিনি রাজেন্দ্রাণী হইয়া সুখে থাকুন—

অর্জুন যখন কিল্লাঘাটে পৌঁছিল তখন দ্বিপ্রহরের বিলম্ব নাই। ঘাটে দুই তিনটি গোলাকৃতি খেয়া-তরী ছিল, সে একটি ভাড়া লইয়া বানচাল বহিত্রগুলির দিকে চলিল। বহিত্র যেমন ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া আছে। প্রথমটির নিকট গিয়া অর্জুন তাহার ভিতরে কোনো সাড়াশব্দ পাইল না। তখন সে দ্বিতীয়টির নিকটে গেল। এই বহিত্রটির খোলের ভিতর হইতে ঠুক্‌ঠাক্ শব্দ আসিতেছে। সে বহিত্রের গায়ে নৌকা ভিড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিল—'বলরাম!'

ঠুক্‌ঠাক্ বন্ধ হইল। মুহূর্ত পরে খোলের ভিতর হইতে বলরাম পাটাতনে উঠিয়া আসিল, অর্জুনকে দেখিয়া একগাল হাসিল—'এস এস, বন্ধু, এস। রাজভোগ ছেড়ে পালিয়ে এলে যে!'

'তোমাকে দেখতে এলাম'—অর্জুন বহিত্রের গলুইয়ে ডিঙা বাঁধিয়া পাটাতনে উঠিল—'আমার লাঠি দু'টো আছে তো?'

'আছে। আমি যত্ন করে রেখেছি। চল, ছায়ায় যাই, এখানে বড় রৌদ্র।'

দুইজনে চিপিটক মামার রইঘরে গিয়া বসিল। মামার তৈজসপত্র পড়িয়া আছে, কেবল মামা নাই। দু'জনে কিছুক্ষণ ঝড়ের সন্ধ্যার সংবাদ বিনিময় করিল, শেষে অর্জুন বলিল—'বহিত্র কি বেশি জখম হয়েছে?'

বলরাম বলিল—'জখম বেশি হয়নি, যেটুকু হয়েছে তা সূত্রধরেরা মেরামত করতে পারবে। কিন্তু তিনটি বহিত্রই চড়ায় আটকে গিয়েছে, যতদিন না বর্ষায় নদীর জল বাড়ছে ততদিন ওরা ভাসবে না।'

'তোমার কাজ শেষ হয়েছে?'

'আমার কাজ বেশি ছিল না। গোটা কয়েক লোহার কীলক তৈরি করে দিয়েছি, বাকি কাজ সূত্রধরেরা করবে।'

'তাহলে তুমি আমার সঙ্গে বিজয়নগরে চল না।'

'বেশ, চল। কিন্তু এখানে আহার তৈরি, খেয়ে নিয়ে বেরুনো যাবে। রান্না অবশ্য বেশি নয়, ভাত আর মাছের রাই-ঝোল।'

'মাছ কোথায় পেলে?'

'তুঙ্গভদ্রায় মাছের অভাব। বঁড়শি দিয়ে ধরেছি। মাছের স্বাদ কিন্তু ভাল নয়, বাংলা দেশের মত নয়। কাল খেয়েছিলাম।'

দু'জনে নৌকার খোলের মধ্যে গিয়া আহারে বসিল। খাইতে খাইতে কথা হইতে লাগিল—'রাজাকে দেখেছ? কেমন রাজা?'

'রাজা আমাকে ডেকেছিলেন, আমি তাঁর কাছে গিয়েছিলাম। রাজার মতন রাজা। আমাকে তাঁর সৈন্যদলে নেবেন বলেছেন।'

অর্জুন রাজদর্শনের আখ্যান বিস্তারিত করিয়া বলিল। শুনিয়া বলরাম বলিল—'তাই নাকি। তোমার কপাল ভাল। আমিও রাজার শ্রীচরণ দর্শন করতে চাই, বিশেষ প্রয়োজন আছে। তুমি ভাই একটু চেষ্টা করো।'

'নিশ্চয় করব। আমার যথাসাধ্য করব।'

আহারান্তে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া দুই বন্ধু গাত্রোত্থান করিল। বলরাম একটি পাটের থলিতে কিছু লোহা-লক্কড় লইয়া থলি কাঁধে ফেলিল। অর্জুন নিজের লাঠি দু'টি হাতে লইল।

গোল নৌকায় চড়িয়া তাহারা ঘাটে নামিল। অর্জুন দেখিল, নির্জন ঘাটের এক কোণে শীর্ণকায় লোকটি বসিয়া আছে। মাথায় পাগড়ি থাকা সত্ত্বেও রৌদ্রতাপে তাহার অবস্থা করুণ। অর্জুন ও বলরাম পথ চলিতে আরম্ভ করিলে সেও পিছে চলিল।

অর্জুন চলিতে চলিতে বলরামকে নিম্নস্বরে শীর্ণ লোকটির কথা বলিল। বলরাম একবার ঘাড় ফিরাইয়া পঞ্চাশ হস্ত দূরস্থ লোকটাকে দেখিল, তারপর কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল—'রাজার গুপ্তচর হতে পারে।'

অর্জুন আশ্চর্য হইয়া বলিল—'রাজার গুপ্তচব—।'

বলরাম বলিল—'রাজারা কাউকে বিশ্বাস কবেন না। বিশ্বাস করলে তাঁদের চলে না। তুমি নূতন লোক, গুলবর্গা থেকে এসেছ, তাই তোমার পিছনে গুপ্তচর লেগেছে। ভাল রাজা, বিচক্ষণ রাজা! কিন্তু তোমার মনে পাপ নেই, তোমার কিসের ভয়?'

অর্জুন অনেকক্ষণ হতবাক্ হইয়া রহিল। বাজনীতিব সহিত তাহার পবিচয় নাই; যে-মানুষ প্রসন্ন মুখে তাহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ স্বর্ণমুদ্রা দান কবে, সে-ই আবার তাহার পিছনে গুপ্তচর লাগাইতে পারে ইহা যেন বিশ্বাস হয় না। কিন্তু বলরামের কথাই সত্য, রাজাদের সর্বদা সতর্ক থাকিতে হয়।

পান-সুপারি রাস্তা দেখিয়া বলবামের চক্ষু গোল হইল। দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া তাহারা পিপাসার্ত হইয়াছিল, তক্রবতীর দোকানে গিয়া আকণ্ঠ শীতল তক্র পান করিল। আজ আর তক্রবতী যুবতী মূল্য লইতে অস্বীকার করিল না।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে দু'জনে অতিথি-ভবনে উপনীত হইল। বলবামের পরিচয় শুনিয়া পরিচারকেরা তাহাকে অর্জুনেব পাশের একটি প্রকোষ্ঠে থাকিতে দিল।

সাত

পরদিন প্রভাতে দুই বন্ধু নগর পরিদর্শনে বাহির হইল। বলরাম ইতিপূর্বে এমন বিস্তীর্ণ শোভাময় নগর দেখে নাই, বর্ধমান ইহার তুলনায় গণ্ডগ্রাম, অর্জুনও বিজয়নগরের সামান্য অংশই দেখিয়াছে। তাই তাহারা সাগ্রহে নগর দর্শনে বাহির হইল। আজ তাহাবা সারাদিন নগরেব যত্রতত্র ঘুরিয়া বেড়াইবে, হ্রদে স্নান করিবে, মিঠাই-অঙ্গদি হইতে দ্বিপ্রহরে আহার্য সংগ্রহ করিয়া লইবে। তারপর সন্ধ্যাকালে ফিরিয়া আসিবে।

অতিথি-ভবন হইতে বাহির হইয়া আজও রাজকন্যাদের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। তাঁহারা প্রহরিণী পরিবৃতা হইয়া পম্পাপতির মন্দিরে চলিয়াছেন। অর্জুন ও বলরাম পথের ধারে দাঁড়াইয়া পড়িল। মণিকঙ্কণা আজও মিষ্ট হাসিল, বিদ্যুন্মালার গণ্ডে কাঁচা সিঁদুর ছড়াইয়া পড়িল। তাঁহারা চলিয়া গেলে বলরাম অর্জুনকে জিজ্ঞাসা করিল—'এঁরা কোথায় যাচ্ছেন?'

অর্জুন বলিল—'জানি না। কালও গিয়েছিলেন।'

'চল, খোঁজ নিই।'

বেশি খোঁজ করিতে হইল না, একটি পানের দোকানে তাহারা প্রকৃত তথ্য অবগত হইল। সংবাদ ইতিমধ্যে নগরে রাষ্ট্র হইয়াছে। রাজগুরুর আদেশে কলিঙ্গ-কুমারী তিন মাস ব্রত পালন করিবেন, প্রত্যহ পম্পা সরোবরে স্নান করিয়া মন্দিরে দেবার্চনা করিবেন। ব্রত উদ্‌যাপনের পর বিবাহ হইবে।

অতঃপর তাহারা নগবের চারিদিকে যথেচ্ছা ঘুরিয়া বেড়াইল। বলা বাহুল্য, শীর্ণ গুপ্তচরটি তাহাদের পিছনে রহিল।

নগরে অগণিত তুঙ্গশীর্ষ দেবমন্দির; কোনো মন্দির বীরভদ্রের, কোনো মন্দির রামস্বামীর,

কোনো মন্দির মল্লিকার্জুনের। মন্দিরসংলগ্ন ভবনে বহুসংখ্যক দেবদাসীর বাস। চম্পক দামগৌরী এই সুন্দরীদের বিবাহ হয় না; ইহারা নৃত্য-গীত দ্বারা দেবতার সেবা করিয়া যৌবনকাল যাপন করে। দেবতাই তাহাদের স্বামী।

নগর পরিধির মধ্যে অনেক ছোট ছোট পাহাড় আছে; পাহাড়ে কোথাও কোথাও গুহা আছে। এই সকল গুহায় কেহ বাস করে না, কদাচিৎ মন্মথ-পীড়িত নায়ক-নায়িকা এই প্রাকৃতিক সঙ্কেতগৃহে নৈশ অভিসার করে, প্রণয়ের অপরিণামদর্শিতায় নিজেদের নাম গুহাগাত্রে লিখিয়া রাখিয়া যায়। দ্বিপ্রহরে এই গুহার ছায়ায় রাখাল বালক নিদ্রা যায়। পাহাড় ছাড়াও চারিদিকে বহু পয়ঃপ্রণালী আছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সরোবর আছে। অর্জুন ও বলরাম সরোবরে স্নান করিল, সঙ্গে যে আহার্য আনিয়াছিল তাহা তরুচ্ছায়ায় বসিয়া ভোজন করিল, তারপর একটি গুহার স্নিগ্ধ অন্ধকার গর্ভে শুইয়া রহিল।

অপরাহ্নে সূর্যের তেজ কমিলে দুইজনে গুহা হইতে বাহির হইল। গুপ্তচর গুহামুখ হইতে কিয়দ্দূরে একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া ছোলাভাজা খাইতেছিল। সেও গাত্রোত্থান করিল।

বলরাম তাহাকে দেখিয়া অর্জুনকে বলিল—'এস, লোকটাকে নিয়ে একটু রঙ্গ করা যাক।'

দু'জনে নিম্নকণ্ঠে পরামর্শ করিল, তারপর বলরাম পুনশ্চ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, অর্জুন নির্জন পথ ধরিয়া রাজপুরীর অভিমুখে চলিল। রাজপুরী এখান হইতে অনুমান ক্রোশেক পথ দূরে।

গুপ্তচর বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল ইতস্তত করিল, তারপর অর্জুনকে অনুসরণ করিল। স্পষ্টই বোঝা যায় অর্জুন তাহার প্রধান লক্ষ্য।

সে গুহার দিকে পিছন ফিরিলে বলরাম গুহা হইতে বাহির হইয়া তাহার পিছু লইল। ওদিকে অর্জুন কিছুদূর গিয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। দুইজনের মাঝখানে পড়িয়া গুপ্তচরের আর পালাইবার পথ রহিল না। সে ন যযৌ ন তস্থৌ ভাবে দাঁড়াইল পড়িল।

বলরাম আসিয়া গুপ্তচরের কাঁধে হাত রাখিল, বলিল—'বাপু, তোমার নাম কি?'

গুপ্তচর অন্যদিকে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অর্জুন দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মুখের ভাব পরিবর্তিত হইল, বোকাটে আধ-পাগলা গোছের মুখ করিয়া সে বলিল—'আমার নাম বেঙ্কটাপ্পা।'

বলরাম বলিল—'বাঃ! খাসা নাম! তুমি কী কাজ কর?'

'কাজ!' বেঙ্কটাপ্পা ফ্যাল ফ্যাল চাহিয়া বলিল—'আমি কাজ করি না, কেবল পথে পথে ঘুরে বেড়াই।'

'বটে! কিন্তু পেট চলে কি করে?'

'পেট! পেট তো চলে না, আমি চলি।'

'বলি খাও কি?'

'যা পাই তাই খাই।'

'পথে পথে ঘুরে বেড়াও, রোজগার কর না, তোমার খাবার ব্যবস্থা করে কে?'

ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বেঙ্কটাপ্পা আকাশের দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিল—'ওইখানে ভগবান আছেন, তিনি খাবার ব্যবস্থা করেন।'

'বৎস বেঙ্কটাপ্পা, তুমি তো ভারি চতুর লোক, ভগবানের ঘাড়ে খাবারের ভার তুলে দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পিছনে লেগেছ কেন?'

বেঙ্কটাপ্পা হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিয়া বলিল—'পিছনে লাগা কাকে বলে?'

'তাও জান না?' ভারি নেকা তুমি!' বলরাম বাহু ধরিয়া বলিল—'চল তুমি আমাদের সঙ্গে, পিছনে লাগা কাকে বলে বুঝিয়ে দেব।'

বেঙ্কটাপ্পা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিল—'না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাব না।'

বলরাম বলিল—'বেশ, পিছনে থাকো ক্ষতি নেই, কিন্তু বেশি কাছে এস না। আমার বন্ধুর হাতে লাঠি দেখতে পাচ্ছ?'

বেঙ্কটাপ্পা ইতিউতি চাহিয়া হঠাৎ পিছন দিকে ছুট মারিল। বলরাম উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, বলিল—'বেঙ্কটাপ্পাকে আজ আর দেখা যাবে না। চল, অতিথি-ভবনে ফেরা যাক।'

অর্জুন বলিল—'এখনো বেলা আছে। পম্পা সরোবর দেখতে যাবে?'

'হাঁ হাঁ, তাই চল।'

সূর্যাস্তের সময় তাহারা পম্পার সন্নিধানে পৌঁছিল। স্থানটি শান্ত রসাস্পদ, পর্বত সরোবর ও মন্দির মিলিয়া তপোবনের পরিবেশ সৃজন করিয়াছে। মন্দিরের সম্মুখে বহুবিস্তৃত পাষাণ-চত্বর। পিছনে ও পাশে দেবদাসীদের বাসস্থান। চত্বরের উপর তিনজন প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ বসিয়া আছেন। পূজার্থীর ভিড় নাই।

অর্জুন ও বলরাম দূর হইতে মন্দিরস্থ বিগ্রহকে প্রণাম করিল, তারপর সরোবরের দিকে চলিল।

মন্দির-সংলগ্ন ঘাট হইতে পম্পার দৃশ্য অতি মনোহর। দূরপ্রসাবিত গোলাকৃতি হ্রদের তীর ঘন-সন্নিবিষ্ট তরুশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। তাহার ফাঁকে জলের উপর সন্ধ্যাভ্র বর্ণমালা প্রতিফলিত হইয়াছে। নীলাভ জলে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কমল ও কুমুদের গুচ্ছ। কমল মুদিত হইতেছে, কুমুদ ধীরে ধীরে উন্মীলিত হইতেছে। এমনিভাবে যুগযুগান্ত ধরিয়া তাহারা পালা করিয়া দিবারাত্র জনক-তনয়ার স্নানপুণ্য সরোবর পাহারা দিতেছে।

দুই বন্ধু ঘাটের পৈঠায় পম্পার জল মাথায় ছিটাইল, তারপর মুগ্ধনেত্রে চারিদিকে চাহিতে লাগিল। মৃদুমন্দ বায়ুভরে সরোবরের জল উর্মিল হইয়া উঠিতেছে, শুদ্ধ স্নিগ্ধ কমলগন্ধ বিকীর্ণ হইতেছে। তীরের জলরেখা ধরিয়া বকপক্ষীরা সঞ্চরণ করিতেছে; কয়েকটি বক উড়িয়া গিয়া রাত্রির জন্য বৃক্ষশাখায় বসিল। রামচন্দ্র যে বকপক্ষী দেখিযাছিলেন ইহারা কি তাহারই বংশধর?

অর্জুন ও বলবাম শান্ত তৃপ্ত মন লইয়া বসিয়া রহিল। ক্রমে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল; তখন সহসা মন্দিরের চত্বরে মৃদঙ্গের রোল উত্থিত হইল। অর্জুন ও বলরাম তাড়াতাড়ি উঠিয়া মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল।

মন্দিরের ভিতরে ও বাহিরে বহু দীপ জ্বলিয়াছে। একদল দেবদাসী অপূর্ব বেশে সজ্জিত হইয়া যুক্তকরে মন্দিরদ্বার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। তিনজন প্রৌঢ়ের মধ্যে একজন মন্দিরেব পূজারী, তিনি মন্দিরের অভ্যন্তরে বিগ্রহের পুরোভাগে পঞ্চপ্রদীপ হস্তে দাঁড়াইয়াছেন। অন্য দুইজন প্রৌঢ় চত্বরে দাঁড়াইয়া মৃদঙ্গ ও মঞ্জীরা বাজাইতেছেন। দর্শকের সংখ্যা বেশি নয়; অর্জুন ও বলরাম তাহাদের মধ্যে গিয়া অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে দণ্ডায়মান হইল।

আরতি আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীগণের সুঠাম দেহ নৃত্যের তালে ছন্দিত হইয়া উঠিল। মৃদঙ্গ মঞ্জীরার ধ্বনির সহিত নূপুর ও কঙ্কণকিঙ্কিণীর নিক্কণ মিশিল। দশটি দেহ একসঙ্গে লীলায়িত হইতেছে, দশজোড়া নূপুর একসঙ্গে ঝংকৃত হইতেছে, হিলোল বাহু-মৃণাল একসঙ্গে বিসর্পিত হইতেছে। নর্তকীদের মুখের ভাব তদ্‌গত, চক্ষু অর্ধ-নিমীলিত, তাহাদেব অন্তশ্চেতনা যেন উর্ধ্বলোকে সাক্ষাৎ নটরাজের সন্নিধানে উপনীত হইয়াছে।

তারপর নৃত্যেব সহিত উদাত্ত কণ্ঠস্বর মিশিল। যিনি মঞ্জীরা বাজাইতেছিলেন, তিনি জয়মঙ্গল রাগে গান ধরিলেন। কণ্ঠস্বর গম্ভীর, কিন্তু তাল দ্রুত, এই গানের সুরে নর্তকীরা যেন মাতিয়া উঠিল। তাহাদের দেহ আলোড়িত করিয়া নৃত্যের ঘূর্ণাবর্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। দর্শকের ইন্দ্রিয়গ্রামের উপর দিয়া যেন হর্ষের একটা ঝড় বহিয়া গেল।

চিরদিনই দাক্ষিণাত্য দেশ নৃত্যগীতাদি কলায় পারদর্শী। সেকালে ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণীর সহিত কর্ণাট রাগ দেশ রাগ গুর্জর রাগ এবং জয়মঙ্গল রাগের বিশেষ সমাদর ছিল।

দুই দণ্ড পরে আরতি শেষ হইল। দেবদাসীরা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া স্বপ্নদৃষ্টা অপ্সরার মত অদৃশ্য হইয়া গেল। পূজারী ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করিলেন।

রাত্রি হইয়াছে। অর্জুন ও বলরাম ফিরিয়া চলিল। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি; তবু অদূরে হেমকূট চূড়ায় অগ্নিস্তম্ভ হইতে আলোকের প্রভা রাত্রির অন্ধকারকে ঈষৎ স্বচ্ছ করিয়া দিয়াছে। দুইজনে নীরবে

পথ চলিয়াছে। তাহাদের মনে যে গভীর অনুভূতি জাগিয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা তাহাদের নাই। ইহা একদিকে যেমন নূতন, অন্যদিকে তেমনি চিরপুরাতন, তাহাদের রক্তের সহিত মিশিয়া আছে। তাহারা জানে না যে আজ তাহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিল তাহা তাহাদের অপৌরুষেয় সংস্কৃতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

আট

তারপর একটি একটি করিয়া গ্রীষ্মের অলস মন্থর দিনগুলি কাটিতে লাগিল। কলিঙ্গ-সমাগত অতিথিবৃন্দ মনের আনন্দে আছে, তাহারা খায়-দায়, নগরে ঘুরিয়া বেড়ায়, গলায় ফুলের মালা পরিয়া, গোঁফে আতর মাখিয়া নগরবাসিনী যুবতীদের সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতা করে। কাহারো কোনো চিন্তা নাই, এইভাবে যতদিন চলে।

রাজবৈদ্য রসরাজ অতিথি-ভবনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমটা একটু সঙ্গীহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন; তারপর দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যাকালে বিজয়নগরের রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী আসিলেন, প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া সাদর সম্ভাষণের ভঙ্গিতে দুই বাহু তুলিয়া প্রচণ্ড একটি সংস্কৃত বচন ছাড়িলেন। রসরাজ নিঃঝুমভাবে একাকী বসিয়া ছিলেন, পুলকিত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ততোধিক প্রচণ্ড একটি শ্লোক ঝাড়িলেন। বয়সে এবং পাণ্ডিত্যে উভয়ে সমকক্ষ, সুতরাং অবিলম্বে ভাব হইয়া গেল। দুইজনে নিদান শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া পরমানন্দে সন্ধ্যা অতিবাহিত করিলেন।

অতঃপর প্রত্যহ দুই রাজবৈদ্যের সভা বসিতে লাগিল। নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হয়; রাজ পরিবারের বিচিত্র রোগ চুপি-চুপি আলোচনা হয়। একজন বলেন, রাজাদের আসল রোগ মাথায়; মাথাটা ঠাণ্ডা রাখিতে পারিলে আর কোনো গণ্ডগোল থাকে না। অন্যজন বলেন, রাজাদের সব রোগের উৎপত্তি উদরে, যদি পরিপাকযন্ত্র সুচারুরূপে সচল থাকে তাহা হইলে মস্তিষ্ক আপনি ঠাণ্ডা হইয়া যায়, কোনো গোলযোগের সম্ভাবনা থাকে না। পরন্তু রানীদের সমস্যা অন্য প্রকার—

একদিন কথা প্রসঙ্গে রসরাজ বলিলেন—'আমার কাছে যে কোহল আছে তার তুল্য কোহল ভূ-ভারতে নেই।'

দামোদর স্বামী হটিবার পাত্র নন, তিনি বলিলেন—'আমার কাছে যে কোহল আছে তা এক চুম্ব পান করলে স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র ঐরাবতের পৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে মাটিতে পড়বেন।'

কিছুক্ষণ দুই পক্ষ নিজ নিজ কোহলের উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইলেন। কিন্তু কেবল আত্মশ্লাঘায় তর্কের নিষ্পত্তি হয় না। রসরাজ বলিলেন—'আসুন, পরীক্ষা করে দেখা যাক। আপনি আমার কোহল দশ বিন্দু পান করুন, আমি আপনার কোহল দশ বিন্দু পান করি। ফলেন পরিচীয়তে।'

'উত্তম কথা।' দামোদর স্বামী গৃহে গিয়া নিজের কোহল লইয়া আসিলেন। দুই বৃদ্ধ পরস্পরের কোহল পান করিলেন। তারপর দণ্ডার্ধ অতীত হইতে না হইতে তাঁহারা শয্যার উপর হস্তপদ বিক্ষিপ্ত করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

গভীর রাত্রে দামোদর স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি উঠিয়া টলিতে টলিতে গৃহে গেলেন। রসরাজের ঘুম সে রাত্রে ভাঙ্গিল না।

বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা সভাগৃহের দ্বিতলে আছেন। তাঁহাদের জীবনধারা আবার স্বাভাবিক ছন্দে প্রবাহিত হইতেছে। পিত্রালয়ে তাঁহারা যেমন ছিলেন, এখানকার জীবনযাত্রা তাহা হইতে বিশেষ পৃথক নয়।

কিন্তু একই সরোবরে বাস করিলে দুইটি মীনের মতিগতি এক প্রকার হয় না। দুই রাজকুমারীর প্রকৃতি মূলতঃ ভিন্ন, নূতন সংস্থিতির সম্মুখীন হইয়া তাঁহাদের মন ভিন্ন পথে চলিয়াছে। কিন্তু সেজন্য তাঁহাদের স্নেহ-ভালবাসার সম্বন্ধ তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

মণিকঙ্কণার মন স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, সেখানে জটিলতা কুটিলতা নাই, সামাজিক বিধিব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ নাই। সে মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া পলকের মধ্যে হৃদয় হারাইয়াছে এবং হৃদয় হারানোর আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া আছে। মহারাজের কয়টি মহিষী, তিনি তাহাকে বিবাহ করিবেন কিনা, এই সকল প্রশ্ন তাহার কাছে নিতান্তই অবান্তর। মহারাজ যদি তাহাকে বিবাহ না করেন, সে চিরজীবন কুমারী থাকিয়া তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিবে, তাঁহার সেবা করিবে; ইহার অধিক আর কিছু সে চাহে না। তাহার মনের এইরূপ আত্মভোলা অবস্থা।

বিদ্যুন্মালার মন কিন্তু শান্ত নয়, পাষাণ-বন্ধনে প্রতিহত জলপ্রবাহের ন্যায় সর্বদাই আলোড়িত হইতেছে। যাঁহার কাছে শ্রীরামচন্দ্রই একমাত্র আদর্শ স্বামী, বহুপত্নীক দেবরায়ের সহিত বিবাহ তাঁহার প্রীতিপ্রদ হইতে পারে না। আদৌ তাঁহার মন এই বিবাহের প্রতি বিমুখ হইয়া ছিল। কিন্তু রাজকন্যাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর রাজনৈতিক কার্যকলাপ নির্ভর করে না; বিদ্যুন্মালা বিরূপ মন লইয়া বিবাহ করিতে চলিয়াছিলেন।

তারপর নদীগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিল এক অজ্ঞাত অখ্যাতনামা যুবক। রাজকুমারীর মন স্বপ্নসঙ্কুল হইয়া উঠিল। হয়তো স্বপ্ন একদিন অলীক কল্পনাবিলাসের মত মিলাইয়া যাইত, কিন্তু হঠাৎ ঝড় আসিয়া সব ওলট-পালট করিয়া দিল; নদী হইতে উদ্ধার এবং দ্বীপের উপর সেই নিভৃত রাত্রিটি চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। বিদ্যুন্মালা নিজ হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন কথাটি জানিতে পারিলেন। রাজার মেয়ে এক অতি সামান্য যুবকের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন।

মহারাজ দেবরায়কে দেখিয়া বিদ্যুন্মালাব হৃদয় বিচলিত হইল না; কিন্তু তিনি বুদ্ধিমতী, বুঝিলেন রাজা নারীলোলুপ অগ্নিবর্ণ নয়, তিনি স্থিরবুদ্ধি অচলপ্রতিষ্ঠ রাজা। তাঁহার চিত্তলোকে নারীর স্থান অতি অল্প।

বিবাহ স্থগিত হইল, পম্পাপতিস্বামীর পূজা আরম্ভ হইল। প্রথম দিনই বিদ্যুন্মালা অর্জুনবর্মাকে পথের ধারে দেখিলেন, তারপর প্রায় প্রত্যহ দেখা হইতে লাগিল। মাঝে একদিন ফাঁক পড়িলে বিদ্যুন্মালা সারাদিন উৎকণ্ঠায় ছটফট করেন। ভুলিয়া যাইবার পথ রহিল না।

একদিন পূর্বাহ্ণে পম্পাপতির মন্দির হইতে ফিরিবার পর মণিকঙ্কণা বলিল—'চল মালা, অন্য রানীদের সঙ্গে ভাব করে আসি।'

বিদ্যুন্মালার মন আজ বিক্ষিপ্ত, তিনি পথের ধারে অর্জুনকে দেখিতে পান নাই। উদাসভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া বলিলেন 'তুই যা কঙ্কা, আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। আমি একটু শুয়ে থাকি।'

মণিকঙ্কণা ইদানীং নিজের মন লইয়াই মাতিয়া ছিল, বিদ্যুন্মালার মনের গতি কোন্ দিকে তাহা লক্ষ্য করে নাই। সে বলিল—'তা বেশ। তোকে একটু ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আমি একাই যাই। মানুষগুলো কেমন, জানা দরকার।'

মণিকঙ্কণা পিঙ্গলাকে ডাকিয়া প্রয়োজন ব্যক্ত করিল। পিঙ্গলা বলিল—'যথা আজ্ঞা। মহারাজের আদেশ আছে, যেখানে যেতে চাইবেন সেখানে নিয়ে যাব। মধ্যমা দেবী শঙ্কটা কিন্তু কারুর সঙ্গে দেখা করেন না, তাঁর মহলে মহারাজ ছাড়া আর কারুর প্রবেশাধিকার নেই।'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তাই নাকি! দেখতে কুৎসিত বুঝি?'

পিঙ্গলা মুখ টিপিয়া হাসিল, বলিল— 'মধ্যমা দেবীকে আমরা কেউ দেখিনি। তাঁর পিত্রালয় থেকে যেসব দাসী এসেছিল তারাই তাঁকে অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে। চলুন, আগে কনিষ্ঠা রানী বিলোলা দেবীর কাছে নিয়ে যাই; তারপর পাটরানী পদ্মালয়াম্বিকার ভবনে নিয়ে যাব।'

মণিকঙ্কণা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল—'পাটরানীর কী নাম বললে? প-দ্মা-ল-য়া-ম্বি-কা!'

পিঙ্গলা বলিল—'তাঁর নাম পদ্মালয়া। কিন্তু তিনি যুবরাজ মল্লিকার্জুনকে গর্ভে ধারণ করেছেন। রাজবংশের নিয়ম, যে-রানী পুত্রবতী হবেন তাঁর নামের সঙ্গে 'অম্বিকা' শব্দ জুড়ে দেওয়া হবে।

অতঃপর পিঙ্গলা ও আরো কয়েকজন রক্ষিণীকে সঙ্গে লইয়া মণিকঙ্কণা বাহির হইল।

সমুদ্রের বন্দরে যেমন অসংখ্য তরণী বাঁধা থাকে, রাজ পৌরভূমির বেষ্টনীর মধ্যে তেমনি অগণিত পৃথক প্রাসাদ। দ্বিভূমক ত্রিভূমক পঞ্চভূমক প্রাসাদ, অধিকাংশই আকারে বৃহৎ, দুই-একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র প্রাসাদও আছে। দুইটি নূতন প্রাসাদ নির্মাণ হইতেছে; একটি বিদ্যুন্মালার জন্য, অন্যটি কুমার কম্পনদেব নিজের জন্য প্রস্তুত করাইতেছেন। তিনি বর্তমানে তাঁহার দুই ভার্যা লইয়া যে-প্রাসাদে আছেন তাহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র বলিয়া তিনি তাঁহার মর্যাদার উপযোগী মনে করেন না, তাই উচ্চতর ও বৃহত্তর প্রাসাদ নির্মাণ করাইতেছেন। রাজসভা হইতে অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র প্রাসাদে রাজ-পিতা বীরবিজয়দেব বাস করেন। তিনি অদ্যাপি জীবিত আছেন।

মণিকঙ্কণা কনিষ্ঠা রানীর তোবণ মুখে পৌঁছিবার পূর্বেই সেখানে সংবাদ গিয়াছিল। মণিকঙ্কণা দেহলিতে পদার্পণ করিয়া দেখিল, দ্বিতল হইতে সোপানশ্রেণী বাহিয়া জলপ্রপাতের মত এক ঝাঁক যুবতী নামিয়া আসিতেছে। সর্বাগ্রে দেবী বিলোলা, পিছনে সখিবৃন্দ।

ছোট রানী বিলোলাকে দেখিলে মনে হয় পনেরো বছরের কিশোবী মেয়ে। ছোটখাটো নিটোল পরিপুষ্ট গড়ন, সদ্য ফোটা মল্লীফুলের মত হাসিভবা মুখ; সে আসিয়া মণিকঙ্কণার সম্মুখে দাঁড়াইল, খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—'তুমি বুঝি নতুন ছোট রানী হবে?'

বিলোলাকে মণিকঙ্কণাব ভাল লাগিল। সে বুঝিল, বিলোলা তাহাকে বিদ্যুন্মালা বলিয়া ভুল করিয়াছে। সে ভ্রম সংশোধন করিল না, একটু ঘাড় বাঁকাইয়া হাসিল, বলিল—'তা কি জানি।'

বিলোলা বলিল—'শুনেছি বিয়ের দেরি আছে। তা সে থাক। আজ আমার পুতুলের বিয়ে, তোমাকে নিমন্ত্রণ করলাম। চল, বিয়ে দেখবে।'

মণিকঙ্কণার হাত ধরিয়া বিলোলা উপরে লইয়া চলিল। ত্রিতলের বিশাল কক্ষে বিবাহ বাসর। সোনার বর ও রূপার বধূ পাশাপাশি সিংহাসনে বসিয়াছে, দুইটি ক্ষুদ্রকায়া বালিকা চামর ঢুলাইতেছে। বর-বধূর সম্মুখে শত শত সুসজ্জিত পুত্তলিকা নানা প্রকার উপঢৌকন লইয়া দাঁড়াইযা আছে। চারিদিকে বিচিত্র কর্মরত বিতস্তি-প্রমাণ পুতুলের ভিড়।'

বিলোলা কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল—'কই, বাজনা বাজছে না কেন?'

অমনি কক্ষের এক কোণ হইতে বেণু বীণা ও করতাল বাজিয়া উঠিল। কক্ষের মণ্ডপিত কোণে কয়েকটি যন্ত্র-বাদিকা বসিয়া ছিল, তাহাদের বাদ্যযন্ত্রের মধুর স্বননে কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বিলোলা প্রশ্ন করিল—'কেমন বব-বধূ?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'চমৎকার। যেমন বর তেমনি বধূ। কিন্তু আমি তো জানতাম না, ওদের জন্য যৌতুক আনিনি।'

বিলোলা বলিল—'পরে পাঠিয়ে দিও। এখন বোসো, মিষ্টিমুখ করতে হবে। —ওরে, অতিথির জন্যে মিষ্টান্ন নিয়ে আয়।'

দুই দণ্ড পরে মণিকঙ্কণা আনন্দিত মনে বিলোলার নিকট হইতে বিদায় লইল। বিলোলা বলিল—'আবার এস।'

অতঃপর মহাদেবী পদ্মালয়াম্বিকার ভবন।

ইনিই পট্টমহিষী, একমাত্র রাজপুত্র মল্লিকার্জুনের জননী। পদ্মালয়া প্রগাঢ়যৌবনা, বয়স পঁচিশ বছর; রূপ দেখিয়া কালসর্পও মাথা নীচু করে। তাঁহার প্রকৃতিতে কিন্তু চপলতা বা ছেলেমানুষী নাই; সকল অবস্থাতেই একটি অবিচল স্থৈর্য বিরাজ করিতেছে। চোখ দু'টিতে শান্ত মনস্বিতার প্রভা; গম্ভীর মুখমণ্ডলে সুদূর একটি প্রসন্নতার আভাস লাগিয়া আছে।

তাঁহাকে দেখিয়া মণিকঙ্কণার চক্ষু সম্ভ্রমে ভরিয়া উঠিল, সে নত হইয়া তাঁহাকে পদস্পর্শ প্রণাম করিল। পদ্মালয়া হাত ধরিয়া তাহাকে তুলিলেন, স্মিতমুখে বলিলেন—'এস ভগিনী।'

পালঙ্কের পাশে বসিয়া দুই-চারিটি কথা হইল; প্রীতি-কোমল প্রশ্ন, শ্রদ্ধাবিগলিত উত্তর। পদ্মালয়া মণিকঙ্কণার প্রকৃতি বুঝিয়া লইলেন, চেটীকে ডাকিয়া বলিলেন—'মধুরা, মল্লিকার্জুনকে নিয়ে আয়।'

অদূরে উন্মুক্ত অলিন্দে কয়েকটি চেটীর মাঝখানে চার বছরের একটি বালক তীর-ধনুক লইয়া খেলা করিতেছিল। বেত্রনির্মিত ক্ষুদ্র ধনু দিয়া হুলবিহীন তুক্ক বাণ এদিক-ওদিক নিক্ষেপ করিতেছিল। বনচারী রামচন্দ্রের ন্যায় বেশ, মাথার চুল চূড়া করিয়া বাঁধা। মাতার আহ্বান শুনিয়া মল্লিকার্জুন ধনুক স্কন্ধে লইল, তারপর সৈনিকের মত দৃঢ়পদে মাতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

পদ্মালয়া বলিলেন—'ইনি আমার ভগিনী, এঁকে নমস্কার কর।'

মল্লিকার্জুন অমনি করতল যুক্ত করিয়া মস্তক অবনত করিল।

বালক মল্লিকার্জুনের শিরীষ-কোমল কান্তি ও মধুর ভাবভঙ্গী দেখিয়া মণিকঙ্কণা মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল, সে মল্লিকার্জুনের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাহাকে দুই বাহু দিয়া আবেষ্টন করিয়া লইল, স্নেহ-গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিল—'কী সুন্দর আমাদের পুত্র! দেবি, আমি যদি মাঝে মাঝে এসে ওকে দেখে যাই তাহলে আপনি রাগ করবেন কি?'

পদ্মালয়া দেখিলেন, মণিকঙ্কণার মন বাৎসল্য রসে আর্দ্র হইয়াছে। তিনি স্মিতমুখে বলিলেন—'যখন ইচ্ছা এস।'

মহারাজ দেবরায়ের হৃদয়ে প্রচুর স্নেহরস ছিল। তাঁহার কর্মবহুল ভাবনাবহুল জীবনের কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত ছিল এই স্নেহবস্তুটি।

তাঁহাব সর্বপ্রধান প্রেমাস্পদ ছিল বিজয়নগর রাজ্য। তিনি যুদ্ধ করিতেও ভালবাসিতেন; কিন্তু কেবল যুদ্ধের জন্যই যুদ্ধ ভালবাসিতেন না, রাজ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। প্রজাদের প্রতি আন্তরিক প্রীতি যাহার নাই সে কখনো আদর্শ রাজা হইতে পারে না। দেবরায় প্রজাদের প্রাণাধিক ভালবাসিতেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার স্নেহের পাত্র-পাত্রী ছিল অসংখ্য। যে সকল নরনারী তাঁহার সেবা করিত তাহাদের তিনি সর্বদা স্নেহরসে সিঞ্চিত করিয়া রাখিতেন। লক্ষ্মণ মল্লপ প্রমুখ মন্ত্রিগণ একবার তাঁহার বিশ্বাস লাভ করিতে পারিলে আর কখনো তাঁহার স্নেহাশ্রয় হইতে চ্যুত হইতেন না। এতদ্ব্যতীত তাঁহার নিকটতম পারিবারিক চক্রের মধ্যে ছিলেন তাঁহার পিতা বীরবিজয়রায়, দুই ভ্রাতা বিজয়রায় ও কম্পনরায়, তিনটি রানী এবং পুত্র মল্লিকার্জুন।

পিতার সহিত মহারাজ দেবরায়ের সম্বন্ধ ছিল বিচিত্র। বীরবিজয় নির্লিপ্ত স্বভাবের মানুষ ছিলেন; তিনি নানা প্রকার অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিতে ভালবাসিতেন। তিনি বিপত্নীক; ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র বিলাস। ছয় মাস রাজত্ব করিবার পর তিনি দেখিলেন, রন্ধনকার্যে বিশেষ বিঘ্ন ঘটিতেছে; তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র দেবরায়কে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রন্ধনকার্যে মনোনিবেশ করিলেন। দেবরায়কে তিনি ভালবাসিতেন; দ্বিতীয় পুত্র বিজয়ের প্রতি তাঁহার মন ছিল নিরপেক্ষ, এবং কনিষ্ঠ পুত্র কম্পনকে তিনি গভীরভাবে বিদ্বেষ করিতেন। পৌরজন আড়ালে তাঁহাকে পাগলাপ্পা বা পাগলা-বাবা বলিত। মহারাজ দেবরায় পিতৃদেবকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন না বটে, কিন্তু ভালবাসিতেন। বীরবিজয় মাঝে মাঝে পুত্রের ভবনে আবির্ভূত হইয়া পুত্রকে স্বহস্তে প্রস্তুত মিষ্টান্ন খাওয়াইতেন, কিছু উপদেশ দিতেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নানা দুরভিসন্ধি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিতেন। রাজা তদ্‌গতভাবে পিতৃবাক্য শ্রবণ করিতেন এবং মনে মনে হাসিতেন।

রাজার মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায় ছিলেন অবিমিশ্র যোদ্ধা। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বিজয়নগরের রাজপরিবারে নামের বৈচিত্র্য ছিল না; একই নাম—হরিহর বুক্ক কম্পন বিজয় দেবরায়—বার বার ফিরিয়া আসিত। প্রভেদ দেখাইবার জন্য ঐতিহাসিকেরা 'প্রথম' 'দ্বিতীয়' প্রভৃতি উপসর্গের ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজভ্রাতা বিজয় যুদ্ধ করিতে ভাসবাসিতেন এবং নিপুণ সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার অবশ্য একটি পত্নী ছিলেন, কিন্তু পত্নীকে রাজ অবরোধে রাখিয়া তিনি দেশ হইতে দেশান্তরে সৈন্যদল লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন; কদাচিৎ রাজধানীতে ফিরিয়া দু'চার দিন পত্নীর সহিত যাপন করিয়া আবার বাহির হইয়া পড়িতেন। মহারাজ দেবরায় এই ভ্রাতাটিকে কেবল ভালই বাসিতেন না, শ্রদ্ধাও করিতেন। এমন অনন্যমনা একনিষ্ঠ যোদ্ধাকে শ্রদ্ধা না করিয়া উপায় নাই।

বিজয়রায় বর্তমানে রাজ্যের দক্ষিণ প্রান্তে কয়েকজন বিদ্রোহী হিন্দু সামন্ত রাজাকে দমন করিতে ব্যস্ত আছেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই-তিন বার অশ্বারোহী বার্তাবহ আসিয়া রাজাকে যুদ্ধের সংবাদ দিয়া যায়। রাজাও বার্তা প্রেরণ করেন। রাজধানী হইতে যুদ্ধক্ষেত্র অশ্বপৃষ্ঠে দুই দিনের পথ। যাইতে একদিন ও ফিরিতে একদিন।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা কম্পনদেবের প্রতি মহারাজের প্রীতি সর্বজনবিদিত। তাঁহার স্নেহ প্রায় বাৎসল্য পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। পিতার নিয়মিত সতর্কবাণী এবং মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপের নীরব অসমর্থন তাঁহার মোহভঙ্গ করিতে পারে নাই।

তিনটি রানীর প্রতি তাঁহার প্রেম সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য, হৃদয়াবেগের আধিক্য নাই। পুত্র মল্লিকার্জুন তাঁহার নয়নমণি।

এই স্নেহসর্বস্ব অপিচ বজ্রাদপি কঠোর রাজাটিকে প্রজারা যেমন ভালবাসিত, শত্রুরা তেমনি ভয় করিত।

বিজয়নগর রাজ্যে কেবল একজন মহারাজ দেবরায়কে ভালবাসিতেন না, তাঁহার নাম কুমার কম্পনদেব। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। দেবরায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ভালবাসিতেন বলিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাও তাঁহাকে ভালবাসিবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নাই। বিশেষত স্নেহ স্বভাবতই নিম্নগামী, তাহাকে উর্ধ্বগামী হইতে বড় একটা দেখা যায় না।

কম্পনদেবের প্রকৃতি ছিল লোভী কুটিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী; তদুপরি রাজার কাছে অত্যধিক আদর পাইয়া তিনি অতিমাত্রায় অহঙ্কারী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অহঙ্কার বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইত না; রাজার প্রতি মিষ্ট বা সহৃদয় ব্যবহারে তিনি তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন। মনে মনে সিংহাসনের প্রতি তাঁহার লোভ ছিল, কিন্তু সে লোভ তিনি ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিতেন না; রাজ-সভাসদ্‌গণের মধ্যে তাঁহার অন্তরঙ্গ কেহ ছিল না। বয়সে তরুণ হইলে কি হয়, মনোগত অভীপ্সা গোপন করিবার দক্ষতা তাঁহার ছিল।

কম্পনদেবের দুইটি পত্নী—কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী; দু'টিই সুন্দরী ও রাজকুলোদ্ভবা। কম্পনদেব ইচ্ছা করিলে আরো দশটা বিবাহ করিতে পারেন, কেহ বাধা দিবে না। রাজার অজস্র প্রসাদ তাঁহার মাথায় সর্বদা বর্ষিত হইতেছে। তবু তাঁহার মনে তৃপ্তি নাই। তাঁহার উচ্চাশা কোনো দিকে পথ না পাইয়া শেষে তাঁহাকে এক নূতন কার্যে প্রবৃত্ত করিল; তিনি এমন এক গৃহ প্রস্তুত করিবেন যাহা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে উচ্চতায় রাজভবন অপেক্ষাও গরীয়ান হইবে। রাজার অনুমতি পাইয়া কুমার কম্পন নূতন অট্টালিকা নির্মাণে মনঃসংযোগ করিলেন।

নূতন অট্টালিকায় গৃহপ্রবেশের দিন আসন্ন হইয়াছে, এমন সময় একটি ব্যাপার ঘটিল। কম্পনদেব বিদ্যুন্মালাকে দেখিলেন। তারপর মণিকঙ্কণাকে দেখিলেন। কলিঙ্গের রাজকন্যা দু'টি শুধু অনিন্দ্য রূপসী নয়, তাঁহাদের আকৃতিতে অপূর্ব সম্মোহন, দুর্নিবার অনঙ্গশ্রী। লোভে কম্পনদেবের

অন্তর লালায়িত হইয়া উঠিল। বাহিরে তাঁহার বিবেকহীন লালসা অল্পই প্রকাশ পাইল, কিন্তু তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, যেমন করিয়া হোক ওই যুবতী দু'টিকে অঙ্কশায়িনী করিবেন। কিন্তু বলপ্রয়োগ চলিবে না, কূটকৌশল অবলম্বন আবশ্যক।

কম্পনদেবের কলাকৌশল কিন্তু সফল হইল না। বিদ্যুন্মালার চরিত্রে সন্দেহ আরোপের চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কম্পনদেবের সহায়ক মিত্র কেহ ছিল না; কেবল ছিল কয়েকটি অনুগত ভৃত্য এবং মুষ্টিমেয় চাটুকার বয়স্য; তাই তাঁহার মাথায় বহু প্রকার কুবুদ্ধি খেলিলেও সেগুলিকে কার্যে পরিণত করিবার উপযোগী লোক কেহ ছিল না। তিনি সংবাদ পাইলেন রাজা বিদ্যুন্মালাকেই রাজবধূ করিবেন; সুতরাং সেদিকে কোনো আশা নাই। মণিকঙ্কণার জন্য রাজা উপযুক্ত পাত্রের চিন্তা করিতেছেন, মধ্যম ভ্রাতা বিজয়রায়ের কেবল একটি বধূ, মণিকঙ্কণা সম্ভবত তাঁহার ভাগেই পড়িবে। কম্পনদেবের অসন্তোষ এতদিন তুষানলের ন্যায় ধিকিধিকি জ্বলিতেছিল, এখন দাবানলের মত দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। রাজা হইয়া বসিতে না পারিলে জীবনে সুখ নাই।

নয়

একে একে দশ দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে অর্জুনের আহ্বান আসিল না। যত দিন যাইতেছে অর্জুন ততই হতাশ হইয়া পড়িতেছে। রাজা কি তাহাকে মনে রাখিয়াছেন। রাজার সহস্র কাজ, সহস্র ভাবনা; তাহার মধ্যে সামান্য একজন সৈনিক পদপ্রার্থীর কথা তাঁহার মনে থাকিবে এরূপ আশা করাও অন্যায়। রাজাকে এই তুচ্ছ কথা স্মরণ করাইযা দিতে যাওয়াটা ধৃষ্টতা।

তবে এখন সে কী করিবে? এই দেশ, এই দেশের মানুষ তাহার চোখে ভাল লাগিয়াছে; এই দেশকে সে মাতৃভূমি রূপে হৃদয়ে বরণ করিয়া লইয়াছে। এখন সে কোথায় যাইবে? কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করিবে?

গত দশ দিন সে বলরামকে সঙ্গে লইয়া বিজয়নগরের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে, এদেশের মানুষের স্বচ্ছন্দ নিরুদ্বেগ জীবনযাত্রার যে চিত্র দেখিয়াছে তাহাতে আনন্দ পাইয়াছে। কিন্তু যতই দিন কাটিতেছে, নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া ততই সে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। স্বর্গে যদি স্থায়ীভাবে থাকিতে না পারিলাম, তবে দু'দিনের অতিথি হইয়া লাভ কি!

সেদিন তাহারা নগর ভ্রমণে বাহির হয় নাই, অতিথি-ভবনেই বিরস মন লইয়া বসিয়া ছিল। বাক্যালাপের স্রোতে মন্দা পড়িয়াছে; বলরাম খুব কথা বলিতে পারে, কিন্তু আজ তাহার বাক্-যন্ত্র নিস্তেজ। মাঝে মাঝে দু'একটা অসংলগ্ন কথা বলিয়া সে চুপ করিয়া যাইতেছে।

আজ বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা কখন পম্পাপতির মন্দিরে গিয়াছেন, দেখা হয় নাই।

দ্বিপ্রহরে তাহারা স্নানাহার করিতে গেল। অন্য সহযাত্রী অতিথিদের মধ্যে বসিয়া আহার করিল। সকলেই নিজেদের মধ্যে নানা জল্পনা করিতে করিতে আহার করিতেছে, কেহ ঘোড়ার মত প্রকাণ্ড ছাগল দেখিয়াছে, তাহারই উত্তেজিত বর্ণনা দিতেছে; কেহ পর্তুগীজ সৈনিকদের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে, তাহাদের বিচিত্র ভাষা ও ভাবভঙ্গী অনুকরণ করিয়া দেখাইতেছে। সকলের মনই ভাবনাহীন, এদিকে রাজকীয় দাক্ষিণ্যের জোয়ার পূর্ণবেগে প্রবাহিত হইতেছে, ভাটার কোনো লক্ষণ নাই। অর্জুন ও বলরাম নীরবে আহার শেষ করিয়া উঠিয়া আসিল।

কক্ষে ফিরিয়া বলরাম শয্যায় অঙ্গ প্রসারিত করিল, অর্জুন দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল।

দণ্ড দুই এইভাবে কাটিবার পর বলরাম প্রকাণ্ড হাই তুলিয়া বলিল—'ঘুম পাচ্ছে। দিবানিদ্রা ভাল নয়। চল, নৌকাগুলা দেখে আসি।'

গত দশ দিনের মধ্যে তাহারা একবার কিল্লাঘাটে গিয়া নৌকাগুলিকে পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছে। অর্জুন স্তিমিত স্বরে বলিল—'চল।'

বলরাম উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেছে এমন সময় দ্বারের কাছে একটি মূর্তি আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া বলরাম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল—'একি, বেঙ্কটাপ্পা যে। তারপর, খবর কি? অনেকদিন তোমাকে দেখিনি!'

দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া বেঙ্কটাপ্পা সলজ্জ হাসিল। তাহার মুখের বোকাটে ভাব আর নাই, সে বলিল—'আমি আপনাদের পিছনেই ছিলাম, আপনারা দেখতে পাননি।' তারপর অর্জুনকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—'আপনাকে মহারাজ স্মরণ করেছেন।'

অর্জুন বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইল—'মহারাজ আমাকে স্মরণ করেছেন!'

বেঙ্কটাপ্পা বলিল—'হ্যাঁ, মহারাজ বিরামকক্ষে আপনাকে দর্শন দেবেন। আপনি আসুন আমার সঙ্গে।'

অতর্কিতে পরিস্থিতিতে পড়িয়া অর্জুন হঠাৎ দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, বলরাম বেঙ্কটাপ্পাকে বলিল—'ভাল ভাল। আমরা যা অনুমান করেছিলাম তা মিথ্যা নয়। ভাই বেঙ্কটাপ্পা, তুমি সত্যিই একজন রাজপুরুষ, ভবঘুরে নয়।'

বেঙ্কটাপ্পা আবার সলজ্জ হাসিল। অর্জুন বলিল—'তুমি একটু অপেক্ষা কর, আমি এখনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।'

বেঙ্কটাপ্পা দ্বারের পাশে সরিয়া গেল। অর্জুন ত্বরিতে বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া উত্তরীয় স্কন্ধে লইল। ঘরের কোণে লাঠি দু'টি দাঁড় কবানো ছিল, সে-দু'টি হাতে লইয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলে বলরাম তাহার কাছে আসিয়া হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'লাঠি নিয়ে যাচ্ছ যাও, কিন্তু রাজার কাছে বোধহয় লাঠি নিয়ে যেতে দেবে না। —সে যা হোক, রাজার প্রসন্নতা যদি পাও, আমার কথা ভুলো না ভাই।'

অর্জুন বলিল—'ভুলব না। আগে দেখি রাজা কী জন্য ডেকেছেন।'

সভাগৃহের দ্বিতলে মহারাজ দেবরায় পালঙ্কে অর্ধশয়ান হইয়া মন্থরভাবে তাম্বূল চর্বণ করিতেছিলেন। পালঙ্কের পাশে ভূমিতলে আসন পাতিয়া বসিয়া লক্ষ্মণ মল্লপ নির্বিকার মুখে সুপারি কাটিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে এক টুকরা সুপারি মুখে ফেলিয়া চিবাইতেছিলেন। কক্ষটি শীতল ও ছায়াচ্ছন্ন, অন্য কেহ উপস্থিত নাই। তবে দ্বারের বাহিরে প্রতিহারিণী আছে।

রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হইতেছিল।

রাজা বলিলেন—'আহমদ শা অনেকদিন চুপ করে আছে। আমার মন বলছে তার মতলব ভাল নয়। এতদিন চুপ করে বসে থাকার ছেলে সে নয়।'

লক্ষ্মণ মল্লপ পানের বাটা হইতে এক খণ্ড হরীতকী বাছিয়া লইয়া মুখে দিলেন, বলিলেন—'তা বটে। কিন্তু বহমনী রাজ্যে আমাদের যে গুপ্তচর আছে তারা জানাচ্ছে, ওখানে যুদ্ধের কোনো আয়োজন নাই। সিপাহীরা ছাউনিতে বসে গোস্ত-রুটি খাচ্ছে আর হল্লোড় করে বেড়াচ্ছে।'

দেবরায় বলিলেন—'ওরা ধূর্ত এবং শঠ; কপটতাই ওদের প্রধান অস্ত্র। ওদের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আমাদের কপট এবং শঠ হতে হবে; ধর্মযুদ্ধ চলবে না। যুদ্ধে আবার ধর্ম কী? যুদ্ধ কর্মটাই তো অধর্ম। ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়েই ভারতবর্ষ উৎসন্ন গেল।'

মন্ত্রী বলিলেন—'সত্য কথা। ছলে বলে কৌশলে বিজয় লাভ করাই যুদ্ধের ধর্ম, অন্য ধর্ম এখানে অচল। মুসলমানেরা এই মূল কথাটা জানে বলেই বার বার হিন্দুদের যুদ্ধে পরাজিত করেছে।'

রাজা বলিলেন—'আমার বিশ্বাস আহমদ শা আমাদের গুপ্তচরদের চোখে ধুলো দিয়ে চুপি চুপি গুপ্ত-আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'আমরা প্রস্তুত আছি। আমাদের এগারো লক্ষ সৈন্যের মধ্যে মাত্র ত্রিশ হাজার সৈন্য কুমার বিজয়ের সঙ্গে দক্ষিণে আছে, বাকি সব তুঙ্গভদ্রার শতক্রোশব্যাপী তীর সীমান্তে থানা দিয়ে বসে আছে। যবনের সাধ্য নেই তাদের ভেদ করে রাজ্য আক্রমণ করে।'

রাজা ঈষৎ হাসিলেন—'আমি জানি আমরা প্রস্তুত আছি। তবু সতর্কতা শিথিল করা চলবে না। প্রস্তুত থাকা অবস্থাতেও নিশ্চিন্ততা আসে। দু'এক দিনের মধ্যে আমি উত্তর সীমান্তে সেনা পরিদর্শনে যাব।'

এই সময় কক্ষদ্বারের প্রহরিণী দ্বারমুখে দাঁড়াইয়া জানাইল যে, অর্জুনবর্মা আসিয়াছে।

রাজা বলিলেন—'পাঠিয়ে দাও।'

অর্জুন প্রবেশ করিয়া যথারীতি উর্ধ্ববাহু হইয়া প্রণাম করিল। বলা বাহুল্য, লাঠি দু'টি তাহাকে বাহিরে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল। রাজার সকাশে অস্ত্র লইয়া গমন নিষিদ্ধ।

দেবরায় অর্জুনকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, সে পালঙ্কের পায়ের দিকে ভূমিতে বসিল। রাজা স্নিগ্ধ হাসিয়া বলিলেন—'অতিথিশালায় সুখে আছ?'

অর্জুন বলিল—'আছি মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'নগর পরিভ্রমণ করেছ শুনলাম। কেমন দেখলে?'

অর্জুন উচ্ছ্বসিত হইয়া নগরের প্রশংসা করিতে চাহিল, কিন্তু উচ্ছ্বাস তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির হইল না। সে ক্ষীণস্বরে বলিল—'ভাল মহারাজ।'

'যে লোকটি তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সে কে?'

অর্জুন দেখিল বেঙ্কটাপ্পার কৃপায় তাহার গতিবিধি কিছুই রাজার অগোচর নয়, সে বলিল—'তার নাম বলরাম কর্মকার, বাংলা দেশের মানুষ। রাজকুমারীদের সঙ্গে নৌকায় এসেছে। আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে।'

রাজা তখন বলিলেন—'সে থাক। তুমি আমার সৈন্যদলে যোগ দিতে চাও। পূর্বে কখনো যুদ্ধ করেছ?'

'না আর্য। কার পক্ষে যুদ্ধ করব?'

'যবন সৈন্যদলে হিন্দু সৈনিকও আছে। —তুমি অবশ্য ভল্ল ও অসি চালনা জানো। আমার পদাতি এবং অশ্বারোহী দুই শ্রেণীর সৈন্যদল আছে। তুমি কোন্ দলে যোগ দিতে চাও?'

অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'মহারাজের যেরূপ ইচ্ছা। আমি অশ্ব চালাতে জানি, কিন্তু আমি আর একটি বিদ্যা জানি মহারাজ, যার বলে ঘোড়ার চেয়েও শীঘ্র যেতে পারি।'

লক্ষ্মণ মল্লপ মুখ তুলিলেন। রাজা ঈষৎ ভ্রূভঙ্গি করিয়া বলিলেন—'সে কেমন?'

অর্জুন বলিল—'দু'টি লাঠির উপর ভর দিয়ে আমি দ্রুততম অশ্বকেও পিছনে ফেলে যেতে পারি।'

রাজা উঠিয়া বসিলেন—'লাঠির উপর ভর দিয়ে এ কেমন বিদ্যা আমাকে দেখাতে পারো?'

অর্জুন বলিল—'আজ্ঞা এখনি দেখাতে পারি। আমার লাঠি দু'টি সঙ্গে এনেছিলাম। কিন্তু প্রতিহারিণী কেড়ে নিয়েছে।'

রাজা করতালি বাজাইলেন, প্রহরিণী দ্বার-সম্মুখে আবির্ভূতা হইল।

রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মার লাঠি নিয়ে এস।'

অবিলম্বে লাঠি লইয়া প্রহরিণী ফিরিয়া আসিল, অর্জুনের হাতে দিয়া প্রস্থান করিল।

রাজা বলিলেন—'এবার দেখাও।'

অর্জুন উত্তরীয়টি স্কন্ধ হইতে লইয়া কোমরে জড়াইল; দৃঢ়বদ্ধ উন্নত বক্ষ অনাবৃত হইল।

তারপর সে গ্রন্থিযুক্ত দীর্ঘ বংশযষ্টি দু'টি দুই হাতে ধরিয়া দুই পায়ের সম্মুখে দাঁড় করাইল। ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলি দিয়া বংশদণ্ডের একটি গ্রন্থি চাপিয়া ধরিয়া ক্ষিপ্রভাবে বংশের উপর উঠিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে অন্য বংশদণ্ডটি বাঁ পায়ে সংযুক্ত করিল। এইভাবে অর্জুন দুই বংশদণ্ড দ্বারা পদযুগলকে লম্বমান করিয়া দীর্ঘজঙ্ঘ সারস পক্ষীর ন্যায় বিশাল কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

রাজা উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিলেন। লক্ষ্মণ মল্লপও হাসিলেন। ব্যাপারটি যুগপৎ হাস্য ও বিস্ময় উৎপাদক। অর্জুন যষ্টিদণ্ড হইতে অবতবণ করিয়া রাজার সম্মুখে দাঁড়াইল।

রাজা বলিলেন—'তুমি এই লাঠিতে চড়ে ঘোড়ার চেয়ে জোরে ছুটতে পারো?'

অর্জুন সবিনয়ে বলিলে—'পারি মহারাজ।'

'চমৎকার!' মহারাজেব চোখে চিন্তার ছায়া পড়িল; তিনি কিয়ৎকাল অর্জুনের মুখের উপর চক্ষু রাখিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে বলিলেন—'পরীক্ষা কবা প্রয়োজন। অর্জুনবর্মা, তুমি আজ যাও, কাল প্রাতঃকালে সূর্যোদয়ের পূর্বে এখানে এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে। তোমাকে একটা বিশেষ কাজে পাঠাব।'

উল্লসিত মুখে অর্জুন বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

দুই পা গিয়া আবার রাজার দিকে ফিরিল, কুণ্ঠিত মুখে বলিল—'আর্য, ক্ষমা করবেন। আমাকে যখন অনুগ্রহ করেছেন তখন আমার বন্ধু বলরামের কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। বলরামের কথা আগে বলেছি; সে লৌহকর্মে নিপুণ. তারও কিছু গুপ্তবিদ্যা আছে, মহারাজকে নিবেদন করতে চায়।'

রাজা বলিলেন—'ভাল ভাল, তোমার বন্ধুব নিবেদন পরে শুনব। তুমি কাল প্রত্যূষে লাঠি নিয়ে আসবে।'

'আজ্ঞা আসব।'

অর্জুন প্রস্থান করিলে বাজা ও মন্ত্রী দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মা যদি লাঠিতে চড়ে ঘোড়ার চেয়ে দ্রুত যেতে পারে তাহলে ওকে দিয়ে দৌত্যের কাজ আরো ভাল হবে। এমন কি ওর দেখাদেখি দণ্ডারোহী দূতের দল তৈরি করা যেতে পারে।'

'আজ্ঞা আমিও তাই ভাবছিলাম।' লক্ষ্মণ মল্লপ ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'গুলবর্গার সংবাদ অর্জুনবর্মাকে বলা হল না।'

দেবরায়ের মুখ গম্ভীর হইল, তিনি বলিলেন—'বলব স্থির করেই তাকে ডেকেছিলাম, কিন্তু বলতে পারলাম না, মায়া হল। কাল ওকে দক্ষিণে বিজয়ের কাছে পাঠাব। সেখান থেকে ফিরে আসুক, তারপর গুলবর্গার খবর বলব।'

বলা বাহুল্য, এই দশ দিন দেবরায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, গুলবর্গায় গুপ্তচর পাঠাইয়া অর্জুন সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাবপব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অর্জুন যাহা বলিয়াছিল সমস্তই সত্য।

সেদিন সন্ধ্যাকালে দুই বন্ধু সাজসজ্জা করিয়া নগর পরিভ্রমণে বাহির হইল। একজন রাজ-অনুগ্রহ লাভ করিয়াছে, অন্যজন শীঘ্রই করিবে। আহ্লাদে দু'জনের হৃদয়ই ডগমগ।

পান-সুপারি রাস্তা ছাড়াইয়া তাহারা নগর পট্টনে উপস্থিত হইল। এখানে ফুলের দোকানে মালা কিনিয়া গলায় পরিল, কপিত্থগন্ধী তক্র পান করিল, পানের দোকানে গিয়া পান চাহিল।

পানের দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া তিনটি তরুণ যুবক নিজেদের মধ্যে হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। ইহারা বিলাসী নাগরিক নয়, মধ্যম শ্রেণীর গৃহস্থ পর্যায়ের লোক। অর্জুন ও বলরাম

দোকানে উপস্থিত হইবার পর আর একটি যুবক আসিয়া পূর্বতন যুবকদের সঙ্গে যোগ দিল। উত্তেজিত স্বরে বলিল—'শীঘ্র পান খাওয়াও। বড় বিপদে পড়েছি।'

তিনজনে সমস্বরে বলিল—'কি হয়েছে?'

নবাগত যুবক বলিল—'বামনদেব দৈবজ্ঞের কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলাম। হাত দেখে কি বলল, জানো? বলল, আমার সাতটা বিয়ে হবে আর পঁয়ত্রিশটা মেয়ে হবে। ছেলে একটাও হবে না। আমি এখন কী করি?'

সকলে হাসিয়া উঠিল। তাম্বূল-পসারিণী বিপন্ন যুবককে পান দিয়া হাসিমুখে বলিল—'শিখিধ্বজের মন্দিরে পূজা দাও, তা হলেই ছেলে হবে।'

যুবক পান মুখে পুরিয়া বলিল—'বাজে কথা বোলো না। আমার এখনো একটাও বিয়ে হয়নি, ছেলে হবে কোত্থেকে!'

হাস্য-কৌতুকেব মধ্যে বলরাম জিজ্ঞাসা করিল—'বামনদেব দৈবজ্ঞ কোথায় থাকেন?'

যুবক অঙ্গুলি দেখাইয়া বলিল—'ওই যে রামস্বামীর মন্দিব, ওর পাশেই পণ্ডিতের বাসা। আপনিও কি জানতে চান ক'টা মেয়ে হবে?'

'আগে দেখি ক'টা বিয়ে হয়।' বলরাম পান লইয়া অর্জুনকে টানিয়া লইয়া চলিল।

অর্জুন বলিল—'সত্যিই কি হাত দেখাবে নাকি!'

বলরাম বলিল—'দোষ কি! একটা নতুন কিছু করা যাক।'

বামন পণ্ডিত নিজ গৃহের বহিঃচত্বরে অজিনাসন পাতিযা বসিয়া ছিলেন। স্থূলকায় প্রৌঢ় ব্যক্তি, স্কন্ধে উপবীত, মুণ্ডিত মুখে তীক্ষ্ণাযত চক্ষু, মাথার চারিপাশ ক্ষৌরিত, মাঝখানে সমস্তটাই শিখা।

বলরাম ও অর্জুন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া যুক্তপাণি হইল। পণ্ডিত একে একে তাহাদের পবিদর্শন করিয়া বলিলেন—'তোমরা দেখছি ভাগ্যান্বেষী বিদেশি। করকোষ্ঠী দেখাতে চাও?'

'আজ্ঞা।'

দৈবজ্ঞ প্রথমে অর্জুনের হাত টানিয়া লইয়া কররেখা পরীক্ষা করিলেন, বেশ কিছুক্ষণ দেখিলেন, বয়স জিজ্ঞাসা করিলেন। তারপর হাত ছাড়িয়া দিয়া বলিলেন—'জলমজ্জন যোগ ছিল, কেটে গেছে। তোমার জীবন এখন এক সঙ্কটময় দশার ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। পিছনে বিপদ, সামনে বিপদ, কি হয় বলা যায় না। তুমি আগামী শ্রাবণী অমাবস্যার পর আমার কাছে এস, তখন আবার হাত দেখব।'

অর্জুন বিমর্ষ মুখে বলরামের পানে চাহিল। বলরাম তাড়াতাড়ি দৈবজ্ঞের দিকে হাত বাড়াইয়া দিয়া বলিল—'আমার হাতটাও একবার দেখুন: আমরা দুই বন্ধু।'

বামনদেব হাত দেখিয়া বলিলেন—'তোমার হাত মন্দ নয়, দুঃখ কষ্ট অনেকটা কেটে এসেছে; তবে স্বদেশে আর কখনো ফিরতে পারবে না, বিদেশে সুখ-সম্পদ দারা-পুত্র লাভ করবে। তোমরা দু'জনে বন্ধু? তাহলে একটা কথা বলে রাখি। —তোমরা দু'জন যদি একসঙ্গে থাকো তাহলে তোমার বন্ধুর অনেক রিষ্টি কেটে যাবে। কিন্তু তোমার কিছু অনিষ্ট হতে পারে। এখন আর কিছু বলব না, শ্রাবণ মাসে আবার এস।'

বলরাম প্রণামী দিতে গেল, কিন্তু বামনদেব লইলেন না, বলিলেন—'শ্রাবণ মাসে প্রণামী দিও।'

দুই বন্ধু বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া চলিল। বলরামের মনে অনুতাপ হইতে লাগিল, লঘুচিত্ত লইয়া দৈবজ্ঞের কাছে না যাইলেই ভাল হইত। কিন্তু তাই বা কেন? বিপদের কথা পূর্বাহ্নে জানা থাকিলে সাবধান হওয়া যায়।

চলিতে চলিতে এক সময় অর্জুন বলিল—'আমার সঙ্গে থাকলে তোমার অনিষ্ট হতে পারে।'

বলরাম বলিল—'কিন্তু তোমার রিষ্টি কেটে যাবে। সুতরাং তোমার সঙ্গ ছাড়ছি না।'

তৃতীয় পর্ব

এক

পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া অর্জুন ধড়াচূড়া বাঁধিল, লাঠি হাতে লইয়া বলরামকে বলিল—'আমি চললাম। কোথায় যাচ্ছি, কবে ফিরব কিছুই জানি না।'

বলরাম বলিল—'দুর্গা দুর্গা। আমি সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হতো। যা হোক, সাবধানে থেকো। দুর্গা দুর্গা।

বাহিরে তখনো রাত্রির ঘোর কাটে নাই। সভাগৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া অর্জুন দেখিল, সেখানে মানুষ কেহ উপস্থিত নাই, কেবল দু'টি ঘোড়া পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। রাজমন্দুরার তেজস্বী অশ্ব, পক্ব তিন্তিড়ী ফুলের ন্যায় বর্ণ, পিঠে কম্বলের আসন, মুখে বল্‌গা। ঘোড়া দু'টি নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে, কেবল তাহাদের কর্ণ সম্মুখে ও পিছনে নড়িতেছে। অর্জুনকে তাহারা চোখ বাঁকাইয়া দেখিল ও অল্প নাসাধ্বনি করিল।

অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল। সভাগৃহে সাড়াশব্দ নাই। কিছুক্ষণ পরে বাহিরের দিক হইতে এক মনুষ্যমূর্তি দেখা দিল। কৃশ খর্বাকৃতি মানুষটি, মাথায় বৃহৎ পাগড়ি, কোমরে তরবারি, বয়স অর্জুন অপেক্ষা ছয়-সাত বছরের জ্যেষ্ঠ। সে কাছে আসিয়া অর্জুনকে সন্দিগ্ধ অপাঙ্গদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

তারপর সভাগৃহের দ্বিতল হইতে পিঙ্গলা আসিয়া জানাইল, মহারাজ দু'জনকেই আহ্বান করিয়াছেন।

মহারাজ দেবরায় ইতিমধ্যে প্রাতঃস্নানপূর্বক দেবপূজা সমাপন করিয়াছেন; সূর্যোদয়ের পূর্বেই রাজকার্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

অর্জুন ও দ্বিতীয় ব্যক্তি রাজার বিরামকক্ষে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহারাজ পালঙ্কের উপব উপবিষ্ট; তাঁহার সম্মুখে দুইটি কুণ্ডলিত জতুমুদ্রাঙ্কিত পত্র। দুইজনে যথারীতি প্রণাম করিয়া বাজার সম্মুখে দাঁড়াইল। বলা বাহুল্য, অর্জুনের লাঠি ও দ্বিতীয় ব্যক্তির তরবারি প্রতিহারিণীর নিকট গচ্ছিত রাখিতে হইয়াছিল।

রাজা বলিলেন—'স্বস্তি। তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে দূত করে পাঠাচ্ছি কুমার বিজয়রায়ের কাছে। অনিরুদ্ধ, তুমি পথ চেনো, তুমি অর্জুনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। পথে চটিতে ঘোড়া বদল করবে। এই নাও দু'জনে দুই পত্র, স্কন্ধাবারে পৌঁছে পত্র কুমার বিজয়ের হাতে দেবে। দুই পত্রের মর্ম যদিচ একই, তবু দু'জনেই কুমার বিজয়কে পত্র দেবে। উত্তরে তিনি তোমাদের পৃথক পত্র দেবেন। সেই পত্র নিয়ে তোমরা ফিরে আসবে। একত্র আসার প্রয়োজন নেই, যে যত শীঘ্র পারবে ফিরে আসবে। আশু কর্মে তোমাদের পাঠাচ্ছি। মনে রেখো বিলম্বে কর্মহানির সম্ভাবনা।'

অনিরুদ্ধ রাজার হাত হইতে লিপি লইয়া নিজের পাগড়িতে বাঁধিয়া লইল; তাহার দেখাদেখি অর্জুনও লিপি পাগড়িতে বাঁধিল।

রাজা বলিলেন—'এই নাও, কিছু স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে রাখ, প্রয়োজন হতে পারে। দক্ষিণ দিকের তোরণ-রক্ষীদের বলা আছে. কেউ তোমাদের বাধা দেবে না। এখন যাত্রা কর। শুভমস্তু।'

রাজার নিকট বিদায় লইয়া দুইজনে অস্ত্রাদি উদ্ধার কবিয়া নীচে নামিল। অশ্ব দু'টি পূর্ববৎ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের পৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

তাহারা লক্ষ্য করিল না, এই সময়ে সভাগৃহের দ্বিতলের একটি গবাক্ষ দিয়া একজোড়া সদ্য-ঘুম-ভাঙ্গা রমণীচক্ষু নীচের দিকে চাহিয়া ছিল। চোখ দু'টি বড় সুন্দর, মুখখানির তুলনা নাই। অশ্বারোহীরা অন্তর্হিত হইলে কুমারী বিদ্যুন্মালার দুই ভ্রূর মাঝখানে একটু ভ্রূকুটির চিহ্ন দেখা দিল। তিনি অর্জুনবর্মাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন। ভাবিলেন, অর্জুনবর্মা! কোথায় চলেছেন!

আজ ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বিদ্যুন্মালা অলস অর্ধ-প্রমীল মনে মহলের বাতায়নগুলির পার্শ্বে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সহসা একটি বাতায়ন দিয়া নীচের দৃশ্য চোখে পড়িল। তাঁহার সমগ্র চেতনা সজাগ ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কাহাকেও কোনো প্রশ্ন করিতে পারিলেন না, প্রশ্নগুলি মনের মধ্যেই রহিল। তারপর যথাসময় তিনি পম্পাপতির মন্দিরে গেলেন। সারা দিন মনটা উদাস বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

বেলা প্রথম প্রহর অতীতপ্রায়। নগরের সপ্ত প্রাকার পার হইয়া অর্জুন ও অনিরুদ্ধ উন্মুক্ত পথ দিয়া চলিয়াছে। অশ্ব দু'টি যুগ্ম শরের ন্যায় পাশাপাশি ছুটিতেছে, কেহ কাহাকেও অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিতেছে না।

পথ অশ্মাচ্ছাদিত, শিলাবন্ধুর। নগর সীমানার বাহিরেও লোকালয় আছে, বিসর্পিল শৈলশ্রেণীর ফাঁকে ফাঁকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম দেখা যায়। পথের দুই পাশে তাপ-কৃশ ঝোপ-ঝাড় জঙ্গল; যেন পাথরের রাজ্যে উদ্ভিদ অনধিকার প্রবেশের চেষ্টা করিয়া হতাশ্বাস হইয়া পড়িয়াছে।

আকাশে প্রখর সূর্য সত্ত্বেও অশ্বারোহীরা তাপে বিশেষ কষ্ট পাইতেছে না। মাথায় পাগড়ি আছে, উপরন্তু অশ্বের ধাবনজনিত বায়ুপ্রবাহ তাহাদের দেহ শীতল রাখিয়াছে।

দুইজনে পাশাপাশি চলিয়াছে বটে, কিন্তু বাক্যালাপ বেশি হইতেছে না। অনিরুদ্ধের মন খুব সবল নয়, তাহার সন্দেহ হইয়াছে রাজা তাহাকে সরাইয়া অর্জুনকে নিয়োগ করিতে চান; তাই অর্জুনের প্রতি তাহার মন বিরূপ হইয়া বসিয়াছে। অর্জুন তাহা বুঝিয়াছে, তাহাদের মাঝখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রচ্ছন্ন বিরোধ দেখা দিয়াছে।

এক সময় অনিরুদ্ধ বলিল—'তোমার নাম অর্জুন। তোমাকে আগে কখনো দেখিনি।'

অর্জুন আত্মপরিচয় দিয়া বলিল—'তোমাকেও আগে দেখিনি।'

অনিরুদ্ধ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—'তুমি নবাগত, তাই আমার নাম শোনোনি। আমি অনিরুদ্ধ, বিজয়নগরের প্রধান রাজদূত। দশ বছর এই কাজ করছি। আশু দৌত্যকার্যে আমার তুল্য আর কেউ নেই।'

বিরসভাবে অর্জুন বলিল—'ভ'ল। আমার সৌভাগ্য যে রাজা তোমাকে আমার সঙ্গে দিয়েছেন।'

কিন্তু বাক্যালাপে অর্জুনের মন নাই, তাহার মন ও চক্ষু পথের আশেপাশে চিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে। ওখানে ওই গিরিচূড়া বিচিত্র ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া আছে, এখানে পথের উপর দিয়া শীর্ণ জলধারা বহিয়া গিয়াছে। অদূরে ওই ভগ্নপ্রায় পাষাণমন্দিরের পাশ দিয়া পথ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। অর্জুন মনে মনে স্থানগুলিকে চিহ্নিত করিয়া রাখিতে লাগিল। এই পথেই তাহাকে ফিরিতে হইবে।

'তোমার হাতে লাঠি কেন?'

'যার যেমন অস্ত্র, তোমার তলোয়ার আমার লাঠি।'

'কিন্তু দু'টো লাঠির কী দরকার?'

অর্জুন একটু হাসিল—'একটা লাঠি দিয়ে লড়ব, সেটা ভেঙ্গে গেলে অন্য লাঠি দিয়ে লড়ব।'

অনিরুদ্ধের মন সন্তুষ্ট হইল না। তাহার সন্দেহ হইল, লাঠি দুইটির অন্য কোনো তাৎপর্য আছে।

দ্বিপ্রহরে তাহারা এক পান্থশালায় পৌঁছিল। পথের কিনারে ক্ষুদ্র প্রস্তরনির্মিত গৃহ, তাহার পাশে ছায়াশীতল একটি বৃহৎ বটবৃক্ষ। বৃক্ষতলে দুইটি অশ্ব বাঁধা রহিয়াছে।

একজন মধ্যবয়স্ক শিখাধারী লোক গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিল, বলিল—'অশ্ব প্রস্তুত,

আহার প্রস্তুত। এস, বসে যাও।' লোকটি অনিরুদ্ধকে চেনে।

দুইজনে অশ্ব হইতে নামিয়া গৃহে প্রবেশ করিল। ঘরে পীঠিকার সম্মুখে আহার্যের থালি, জলের ঘটি; ক্ষুধার্ত পিপাসার্ত দুইজনে বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া গেল।

অর্ধ দণ্ডের মধ্যে আহার সমাপ্ত করিয়া তাহারা নূতন ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিল—'সেনাদলের ছাউনি আরো পুব দিকে সরে গেছে। সন্ধ্যার আগে পৌঁছুলে দূর থেকে ধোঁয়া দেখতে পাবে, রাত্রে পৌঁছুলে আগুন দেখতে পাবে। এখনো ত্রিশ ক্রোশ বাকি।'

আবার তাহারা বাহির হইয়া পড়িল।

দুই অশ্বারোহী যখন কুমার বিজয়ের স্কন্ধাবারে পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হইয়া গিয়াছে। গোধূলির আলোয় সৈন্যাবাসটি দেখাইতেছে একটি বিরাট গো-গৃহের মত। অসংখ্য গরুর গাড়ি পাশাপাশি সাজাইয়া বিপুলায়তন একটি চক্র-ব্যূহ রচিত হইয়াছে; তাহার মধ্যে তালপত্রের ছত্রাকৃতি অগণিত ছাউনি। মধ্যস্থলে সেনাপতির জন্য বস্ত্রনির্মিত উচ্চ শিবির।

শকট-চক্রের একস্থানে একটু ফাঁক আছে; এই প্রবেশদ্বারের মুখে সশস্ত্র রক্ষী পাহারা দিতেছে, উপরন্তু একদল রক্ষী শকটবেষ্টনের বাহিরে পরিক্রমণ করিতেছে। পাছে শত্রুসৈন্য রাত্রিকালে আক্রমণ করে তাই সতর্কতা।

অনিরুদ্ধ ও অর্জুন স্কন্ধাবারে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেনাপতির নিকট নীত হইল। বিজয়রায় তখন আহারে বসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজদূত যখনই আসুক তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, ইহাই রাজকীয় নিয়ম।

বস্ত্রাবাসের একটি বৃহৎ কক্ষে বিজয়রায় আহারে বসিয়াছিলেন। পীঠিকার সম্মুখে আট-দশটি থালিকা, থালিকাগুলিকে ঘিরিয়া দশ-বারোটি তৈলদীপ। ছয়জন পরিচারক পার্শ্বরক্ষী সম্মুখে ও পিছনে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে; তাহাদের কটিতে ছুরিকা।

বিজয়রায়ের আহার্যবস্তুর পরিমাণ যেমন প্রচুর, তেমনি অধিকাংশই আমিষ। সেই সঙ্গে কিছু ঘৃতপক্ক অন্ন ও এক ভৃঙ্গার দ্রাক্ষাসার। বিজয়রায় ম্লেচ্ছ রন্ধনপদ্ধতির পক্ষপাতী ছিলেন, তাই তাঁহার ভোজনপাত্রগুলিতে শোভা পাইতেছিল মেষমাংসের শূল্যপক্ক গুটিকা, কালিয়া সেক্‌চী দোল্‌মা সমোসা ইত্যাদি। একটি স্ফটিকের পাত্রে স্তূপীকৃত আঙ্গুর ফল।

বিজয়রায়ের আকৃতি মধ্যম পাণ্ডবের মত; ব্যূঢ়োরস্ক গজস্কন্ধ। জ্যেষ্ঠ দেবরায় ও কনিষ্ঠ কম্পনের সহিত তাঁহার আকৃতির সাদৃশ্য অতি অল্প। সঙ্গম বংশের প্রতিষ্ঠাতা হরিহর ও বুকরায় সকল বিষয়ে অভেদাত্মা ছিলেন কিন্তু তাঁহাদের আকৃতি ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। ভীমার্জুনের আকৃতির যে তফাত, হরিহর ও বুকরায়ের আকৃতিতে সেইরূপ পার্থক্য ছিল; একজন সিংহ, অন্যজন হস্তী। তারপর পুরুষানুক্রমে এই দ্বিবিধ আকৃতি বারবার এই বংশে দেখা দিয়াছে। দেশের লোক হরিহররায় ও বুকরায়কে স্নেহভরে হুক্ক-বুক্ক বলিয়া উল্লেখ করিত। দেবরায় ও বিজয়রায়কে দেখিয়া তাহারা নিজেদের মধ্যে সগর্বে বলাবলি করিত—হুক্ক-বুক্ক আবার ভ্রাতৃরূপে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

অনিরুদ্ধ ও অর্জুন বিজয়রায়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি বিশাল চক্ষু তুলিয়া তাহাদের পরিদর্শন করিলেন, তারপর বাঁ হাত বাড়াইয়া পত্র দু'টি গ্রহণ করিলেন, পত্রের জতুমুদ্রা অভগ্ন আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া তিনি পত্র দু'টি মাথায় ঠেকাইলেন, তারপর একজন পরিচারকের দিকে চাহিলেন। পরিচারক আসিয়া একে একে পত্র দু'টির জতুমুদ্রা ভাঙ্গিয়া বিজয়রায়ের চোখের সম্মুখে মেলিয়া ধরিল। তিনি আহার করিতে করিতে পাঠ করিলেন।

পত্রে দূতদের সম্বন্ধে বোধহয় কিছু লেখা ছিল। পত্র পাঠান্তে বিজয়রায় উভয়ের প্রতি আবার নেত্রপাত করিলেন, বিশেষভাবে অর্জুনকে লক্ষ্য করিলেন। তারপর জীমূতমন্দ্র স্বরে বলিলেন—'তোমরা পানাহার কর গিয়ে, দু'দণ্ডের মধ্যে পত্রের উত্তর পাবে। মহারাজের আজ্ঞা, যত শীঘ্র সম্ভব বার্তা নিয়ে ফিরে যাবে।'

অনিরুদ্ধ বলিল—'আর্য, আমি আজ রাত্রেই ফিরে যেতে পারতাম, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে ঘোড়া চলবে না। কাল প্রত্যূষে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করব।'

বিজয়রায় একটি সমোসা মুখে পুরিয়া ঘাড় নাড়িলেন। অনিরুদ্ধ ও অর্জুন শিবিরের বাহিরে আসিল।

বাহিরে তখন মশাল জ্বলিয়াছে। কোথাও সঞ্চরমান আলোকপিণ্ড ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও স্থির হইয়া আছে। প্রান্তরে যেন ভৌতিক দীপোৎসব চলিতেছে।

রাজদূতেরা ছাউনিতে উত্তম পানাহার পাইল। একটি স্বতন্ত্র ছত্রতলে শুষ্ক তৃণশয্যায় শয়ন করিল। ছত্রাবাসগুলি রাত্রিবাসের জন্য নয়, অধিকাংশ সৈনিক মুক্ত আকাশেব তলে খড় পাতিয়া শয়ন করে। দিবাকালে প্রচণ্ড সূর্যের দহন হইতে আত্মরক্ষার জন্য ছত্রগুলির প্রয়োজন হয়।

দু'জনে শয্যাশ্রয় করিয়াছে, এমন সময় সেনাপতির এক পবিচারক আসিয়া দুইজনকে দুইটি পত্র দিয়া গেল। অর্জুন নিজের চিঠি কোমরে গুঁজিয়া লইল।

বাক্যালাপ বিশেষ হইল না। অনিরুদ্ধ একটি উদ্‌গাব তুলিল, অর্জুন জৃম্ভণ ত্যাগ করিল। দু'জনের মাথায় একই চিন্তার ক্রিয়া চলিতেছে—কি কবিয়া অন্যকে পিছনে ফেলিয়া আগে রাজার সমীপে পৌঁছিবে।

উভয়ের শরীর ক্লান্ত ছিল। অনিরুদ্ধ শয়ন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। অর্জুন লাঠি দু'টিকে আলিঙ্গন করিয়া শুইয়া রহিল এবং অধিক চিন্তা করিবার পূর্বেই ঘুমাইয়া পড়িল।

ক্রমে স্কন্ধাবারে মশালগুলি একে একে নিভিয়া আসিতে লাগিল। তাবপর রন্ধ্রহীন অন্ধকারে চরাচর ব্যাপ্ত হইল। এই অন্ধকারে ক্বচিৎ প্রহবীদেব হাঁকডাক ও অস্ত্রের ঝনৎকার শুনা যাইতে লাগিল।

রাত্রির মধ্য যামে দূরাগত শৃগালেব সমবেত ডাক শুনিয়া অর্জুনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। চক্ষু না খুলিয়াই সে অনুভব করিল তাহার দেহের ক্লান্তি দূর হইয়াছে। সে চক্ষু খুলিল।

ছত্রের বাহিরে তরল অস্ফুট আলো দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিয়া বসিল। তবে কি সকাল হইয়া গিয়াছে! সে চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল, অনিরুদ্ধ এখনো ঘুমাইতেছে।

কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া সে আবার বাহিরের দিকে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি প্রেরণ করিল। না, এ ভোরের আলো নয়, চাঁদের আলো। মধ্যরাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিয়াছে। ছাউনি সুষুপ্ত। অর্জুন নিঃশব্দে উঠিয়া ব্যূহমুখে উপস্থিত হইল।

প্রধান প্রহরী হাঁকিল—'কে যায়?'

অর্জুন তাহার কাছে গিয়া বলিল—'চুপ চুপ। আমি রাজদূত। এখনি আমাকে রাজধানীতে ফিরতে হবে।''

প্রহরী বলিল—'তা ভাল। কিন্তু ঘোড়া চাই তো। তোমার ঘোড়া কোথায়?'

'ঘোড়ার দরকার নেই। এই আমার ঘোড়া—' বলিয়া অর্জুন লাফাইয়া লাঠিতে আরোহণ করিল, তারপর দীর্ঘ পদক্ষেপে উত্তরাভিমুখে চলিল। হতবুদ্ধি প্রহরীরা মুখব্যাদান করিয়া রহিল।

স্কন্ধাবারের কাছে সুচিহ্নিত পথ নাই, মাঠের মাঝখানে অস্থায়ী ছাউনির নিকট পথ কিজন্য থাকিবে! অর্জুন কৃষ্ণপক্ষের অর্ধভুক্ত চাঁদকে ডান দিকে রাখিয়া চলিল। ক্রোশেক দূর চলিবার পর পথ মিলিল। চন্দ্রালোকে অস্ফুট রেখা, তবু পথ বলিয়া চেনা যায়।

চেনা গেলেও সাবধানতার প্রয়োজন। পথ সিধা নয়, ঘুরিয়া ফিরিয়া ঢিবি-ঢাবা বাঁচাইয়া চলিয়াছে, কোথাও দুই ভাগ হইয়া গিয়াছে; এইসব স্থানে আসল পথটি চিনিয়া লইতে হইবে। পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে চলিতে অর্জুনের মুখে একটু হাসি দেখা দিল। স্কন্ধাবার কখন পিছন দিকে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কোথাও জনপ্রাণী নাই; ভাগ্যে এই সময় কেহ তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, দেখিলে ভাবিত একটা দীর্ঘ শীর্ণ প্রেত চাঁদের আলোয় ছুটিয়া চলিয়াছে।

একটা শৈলখণ্ডের মোড় ঘুরিয়া অর্জুনের পথ হারাইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূর হইল। সম্মুখে

বহু দূরে একটি রক্তাভ আলোর বিন্দু দেখা দিয়াছে। হেমকূট পর্বতের আগুন। আর পথভ্রষ্ট হইবার ভয় নাই, ওই আলোকবিন্দু সম্মুখে রাখিয়া চলিলেই বিজয়নগরে পৌঁছানো যাইবে। অর্জুন সহর্ষে দীর্ঘ পদদ্বয় ক্ষিপ্রতর বেগে চালিত করিয়া দিল।

উষার আলো ফুটিয়াছে কি ফোটে নাই, পশ্চিম আকাশে চাঁদ ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। রাজসভা-গৃহের অন্ধকার মূর্তি ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। দাসী পিঙ্গলা অভিসারে গিয়াছিল, বহির্দিক হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সভাগৃহের অগ্রপ্রাঙ্গণে হাঁটুর উপর মাথা রাখিয়া একজন বসিয়া আছে। পিঙ্গলা কাছে গিয়া ঝুঁকিয়া দেখিল—অর্জুনবর্মা! বিস্ময়ে বিহুলভাবে ছুটিতে ছুটিতে সে রাজাকে সংবাদ দিতে গেল।

দুই

রাজা বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, আজ থেকে তুমি আমার অতিথি নও, তুমি আমার ভৃত্য। তোমাকে আশুগতি দূতের কাজ দিলাম; এও সাময়িক কাজ। তোমার গুপ্তবিদ্যা রাজনীতির ক্ষেত্রে অতি মূল্যবান বিদ্যা; এ বিদ্যা গুপ্ত রাখা প্রয়োজন। কেবল মুষ্টিমেয় লোককে তুমি এ বিদ্যা শেখাবে। কিন্তু সে পরের কথা। —আর্য লক্ষ্মণ, অর্জুনবর্মার বাসস্থান নির্দেশ করুন; রাজপুরীর কাছে হবে অথচ গোপন স্থান হইয়া চাই। অর্জুনবর্মা রাজকার্যে নিযুক্ত হয়েছে একথা অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়।'

লক্ষ্মণ মল্লপ কেবল ঘাড় নাড়িলেন। অর্জুন যুক্তকরে বলিলেন—'ধন্য মহারাজ। যেখানে আমার বাসস্থান নির্দেশ করবেন সেখানেই থাকব। যদি অনুমতি করেন, আমার বন্ধু বলরামও আমার সঙ্গে থাকবে। বলরামের কথা কি আপনার স্মরণ আছে মহারাজ?'

রাজা বলিলেন—'আছে। আজ আমার সভারোহণের সময় হল, তুমি যাও। সারাদিন অতিথিশালায় বিশ্রাম করবে। সন্ধ্যার পর তোমার বন্ধুকে নিয়ে এস। দেখবো কেমন তার গূঢ়বিদ্যা।'

সূর্যোদয় হইয়াছে। মন্ত্রণাগৃহ হইতে বাহির হইয়া অর্জুন অতিথিশালার দিকে চলিল। দেহের স্নায়ুপেশী ক্লান্ত কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে অপূর্ব উল্লাস উচ্ছলিত হইতেছে।

দাসী পিঙ্গলা এই কয়দিনে বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে; একটু অবকাশ পাইলেই তাঁহাদের কাছে আসিয়া বসে, রাজ্যের গল্প করে। রাজার ইঙ্গিতে রাজকুমারীদের মনোরঞ্জন করাও তাহার একটি কর্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই সেদিন কুমারীরা পম্পাপতির মন্দির হইতে ফিরিবার পর সে তাঁহাদের মহলে আসিয়া মেঝের উপর পা ছড়াইয়া বসিল। প্রকাণ্ড একটা হাঁফ ছাড়িয়া বলিল—'বাবাঃ! অর্জুনবর্মা মানুষ নয়, বাজপাখি।'

দুই রাজকন্যা চকিতে মুখ ফিরাইলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'কে বাজপাখি—অর্জুনবর্মা!'

পিঙ্গলা বলিল—হ্যাঁ গো, রাজকুমারি, যিনি তোমাদের সঙ্গে এসেছেন।'

বিদ্যুন্মালার হৃৎপিণ্ড দুলিয়া উঠিল। মণিকঙ্কণা বলিল,—'ও মা, তিনি উড়তেও জানেন! আমরা তো জানি তিনি মাছের মত সাঁতার কাটতে পারেন। তা তিনি কোথায় উড়ে বেড়াচ্ছেন?'

পিঙ্গলা গলা একটু হ্রস্ব করিয়া বলিল—'কি বলব রাজকুমারি, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! মহারাজ কাল সকালে তাঁকে দূতকর্মে পাঠিয়েছিলেন ষাট ক্রোশ দূরে। আজ সকালে তিনি কাজ সেরে ফিরে এসেছেন। বল দেখি রাজকন্যা, এ কি মানুষে পারে!'

মণিকঙ্কণা বলিল—'অমানুষিক কাজ বটে। তিনি কি একলা গিয়েছিলেন?'

পিঙ্গলা হাসিয়া উঠিল—'একলা কেন, সঙ্গে অনিরুদ্ধ ছিল, রাজ্যের চঙ্গ দূত। অনিরুদ্ধ এখনো ফেরেনি। হয়তো সন্ধ্যেবেলায় ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরবে।'

বিদ্যুন্মালার হৃদ্‌যন্ত্র যে অস্বাভাবিকভাবে প্রসারিত ও সঙ্কুচিত হইতেছে, তিনি নিশ্বাস রোধ করিয়া আছেন তাহা কেহ জানিতে পারিল না। পিঙ্গলা আরো খানিকক্ষণ অর্জুনবর্মার পরাক্রমের কথা আলোচনা করিয়া চলিয়া গেল।

মণিকঙ্কণাও কিয়ৎকাল পরে উঠিয়া গেল, রাজাব বিরামকক্ষে উঁকি মারিয়া দেখিতে গেল রাজা সভা হইতে ফিরিয়াছেন কি না। সে সুযোগ পাইলেই রাজার বিরামকক্ষের দিকে গিয়া আ'ড়াল হইতে উঁকিঝুঁকি মারে। বিদ্যুন্মালা একাকিনী বসিয়া রহিলেন; তাঁহাব হৃদয়ে আশা ও আকাঙ্ক্ষার জটিল গ্রন্থিরচনা চলিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর রাজার বিরামকক্ষে দীপাবলী জ্বলিতেছিল। মহারাজ পালঙ্কে সমাসীন, সম্মুখে ভূমির উপর অর্জুন ও বলরাম। আজ লক্ষ্মণ মল্লপ উপস্থিত নাই, সম্ভবত অন্য কোনো কাজে ব্যাপৃত আছেন। পিঙ্গলা এতক্ষণ ঘরে ছিল, রাজার ইঙ্গিতে সরিয়া গিয়াছে।

রাজা বলিলেন—'বলরাম, তুমি বাঙ্গলা দেশেব মানুষ?'

বলরাম করজোড়ে বলিল—'আজ্ঞা, রাঢ় বাঙ্গলা—বর্ধমান ভুক্তি, নগর বর্ধমান।'

রাজা কহিলেন—'বাঙ্গলা দেশে মুসলমান রাজা। তারা অত্যাচার করে?'

বলরাম বলিল—'করে মহারাজ। যারা দুষ্ট তারা স্বভাবের বশে অত্যাচার করে, আর যারা শিষ্ট তারা অত্যাচার করে ভয়ে।'

'ভয়ে অত্যাচার করে!'

'হ্যাঁ মহারাজ। মুসলমানেরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, হিন্দুরা সংখ্যায় তাদের শতগুণ। তাই তারা মনে মনে ভয় পায় এবং সেই ভয় চাপা দেবার জন্য অত্যাচার করে।'

'তুমি যথার্থ বলেছ। সকল অত্যাচারের মূলে আছে ষড়রিপু এবং ভয়। তুমি দেখছি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তোমার গুপ্তবিদ্যা কিরূপ, আমাকে শোনাও।'

'মহারাজ, আমি কর্মকার, লোহার কাজ করি। সকল রকম লোহার কাজ জানি, এমন কি কামান পর্যন্ত ঢালাই করতে পারি।

'সে আর নূতন কি! বিজয়নগরে শত শত কর্মকার কামান নির্মাণে নিযুক্ত আছে।'

'যথার্থ মহারাজ। কামান সর্বত্র তৈরি হয়, তাতে নূতনত্ব কিছু নেই। কিন্তু এমন কামান যদি তৈরি করা যায় যা একজন মানুষ স্বচ্ছন্দে অবলীলাক্রমে বহন করে নিয়ে যেতে পাবে?'

মহারাজ কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন—'তা কি করে সম্ভব?'

বলরাম বলিল—'আর্য, যুদ্ধের জন্য যে কামান তৈরি হয় তা অতি গুরুভার, তাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া মহা শ্রমসাধ্য ব্যাপার; পঞ্চাশজন লোক মিলে গো-শকটে তুলে তাকে নিয়ে যেতে হয়। বিজয়নগরের মত পার্বত্য দেশে কামান যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে যাওয়া আরো কষ্টসাধ্য কার্য। তাই এমন কামান দরকার যা প্রত্যেক সৈনিক ভল্লের মত হাতে করে নিয়ে যেতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'কিন্তু সেরূপ কামান কি তৈরি করা যায়! বড় কামান ঢালাই করা যায়, মাঝারি পিতলের কামানও ঢালাই হয়, কিন্তু একজন মানুষ বহন করে নিয়ে যেতে পারে এমন কামানের কথা শুনিনি।'

বলরাম বলিল—'আর্য, কামানের রহস্য তার নালিকার মধ্যে। বড় নালিকা ঢালাই করা সহজ

কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং লঘু নালিকা তৈরি করা কঠিন। কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয় মহারাজ।'

'যদি সম্ভব হয় তাহলে আধুনিক যুদ্ধের ধারা একেবারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে, তীরন্দাজ সেনার আর প্রয়োজন হবে না।—তুমি দেখাতে পার?'

'পারি মহারাজ। দ্বারের প্রহরিণী আমার থলি কেড়ে নিয়েছে, আজ্ঞা দিন থলিটা নিয়ে আসুক।'

রাজার আদেশে প্রহরিণী বলরামের থলি দিয়া গেল। বলরাম থলি হইতে একটি লৌহযষ্টি বাহির করিয়া রাজার হাতে দিল। রাজা অভিনিবেশ সহকারে সেটি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন; এক বিতস্তি দীর্ঘ, বেণুবংশের ন্যায় গোলাকৃতি লৌহযষ্টি। কিন্তু দণ্ড নয়, নালিকা; তাহার অন্তর্ভাগ শূন্য এবং মসৃণ। রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—'এ তো দেখছি লৌহ নালিকা! এত সরু নালিকা তুমি নির্মাণ করলে কি করে?'

বলরাম স্মিতমুখে হাতজোড় করিয়া বলিল—'আর্য, ওইখানেই আমার গুপ্তবিদ্যা। আমি সরু নল তৈরি করার কৌশল উদ্ভাবন করেছি।'

রাজা নালিকাটিকে আরো খানিকক্ষণ দেখিলেন, বলিলেন—'তারপর বল।'

বলরাম বলিল—'শ্রীমন্, কামান নির্মাণের মূল রহস্য নালিকা নির্মাণ; নালিকা তৈরি হলে বাকি সব উপসর্গ অতি সহজ। দেখুন, এই নালিকা দিয়ে অতি সহজেই ক্ষুদ্র কামান রচনা করা যায়। প্রথমে নলের এক প্রান্ত লোহার আবরণ দিয়ে বন্ধ করে দেব, তাতে কেবল একটি সূচিপ্রমাণ ছিদ্র থাকবে। তারপর নলের মধ্যে বারুদ ভরব, পিছনের ছিদ্রপথে বারুদ একটু বেরিয়ে আসবে। তখন সেই ছিদ্রের বেরিয়ে-আসা বারুদে আগুন দিলেই কামান ফুটবে। প্রক্রিয়া বোঝাতে পেরেছি কি মহারাজ?'

রাজা আরো কিছুক্ষণ নলটি নাড়িয়া-চাড়িয়া বলিলেন—'বুঝেছি। কিন্তু পরিপূর্ণ যন্ত্রটি কেমন হবে এখনো ধারণা করতে পারছি না। তুমি তৈরি করে আমাকে দেখাতে পার?'

'পারি মহারাজ। দু'চার দিন সময় লাগবে।'

'তাতে ক্ষতি নেই। তুমি যন্ত্র প্রস্তুত কর। যদি সম্পূর্ণ যন্ত্রটি যুদ্ধে ব্যবহারের উপযোগী হয়—'

এই সময় ধন্নায়ক লক্ষ্মণ উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে বলিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ, এদের বাসস্থান নির্দেশের কী ব্যবস্থা করলেন?'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'পুরভূমির মধ্যে বাড়ি হল না, ওদের গুহায় থাকার ব্যবস্থা করেছি।'

'গুহায়? কোন্ গুহায়?'

'রাজ-অবরোধের দক্ষিণ প্রান্তে কমলা সরোবরের অদূরে সঙ্কেত-গুহা নামে যে গুহা আছে তাতেই ওদের ব্যবস্থান নির্দেশ করেছি। গুহাটি নির্জন, ওদিকে লোক-চলাচল নেই; ওরা আরামে থাকবে, রাজার হাতের কাছে থাকবে, অথচ বাইরের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে না।'

রাজা বলিলেন—'ভাল, আজ থেকে ওরা গুহাবাসী হোক, কিন্তু গৃহের আরাম থেকে যেন বঞ্চিত না হয়। বলরামের বোধহয় কিছু যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হবে—'

বলরাম বলিল—'আর সব যন্ত্রপাতি আমার আছে মহারাজ, কেবল একটি ভস্ত্রা হলেই চলবে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ সাম্প্রতিক ঘটনা জানেন না, তিনি বলরামের প্রতি কৌতূহলী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'ভস্ত্রা পাবে।—এখন অনুমতি করুন, মহারাজ, এদের গুহায় পৌঁছে দিই।'

রাজা লৌহ নালিকাটি বলরামকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—'আপনি বলরামকে নিয়ে যান, অর্জুনবর্মার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

বলরামকে লইয়া মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। রাজা অর্জুনের দিকে গম্ভীর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, একটা দুঃসংবাদ আছে। তোমার পিতার মৃত্যু হয়েছে।'

অর্জুন দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল। সংবাদ কিছু অপ্রত্যাশিত নয়, এই আশঙ্কাই

সে দিনের পর দিন মনের মধ্যে পোষণ করিতেছিল; তবু তাহার কণ্ঠের স্নায়ুপেশী সঙ্কুচিত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধের উপক্রম করিল, হৃদ্‌যন্ত্র পঞ্জরের মধ্যে ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। চিন্তা করিবার শক্তি ক্ষণকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল, কেবল মস্তিষ্কের মধ্যে একটা আর্ত চিৎকার ধ্বনিত হইতে লাগল—'পিতা! পিতা!'

রাজা তাহার অবস্থা দেখিয়া সদয়কণ্ঠে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তোমার পিতা ক্ষত্রিয় ছিলেন, তিনি গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছেন, ধর্মের জন্য প্রাণ দিয়েছেন।'

এইবার অর্জুনের দুই চক্ষু ভরিয়া অশ্রুর ধারা নামিল, সে রুদ্ধ কণ্ঠে কেবল একটি শব্দ উচ্চারণ করিল—'কবে—?'

রাজা বলিলেন—'এগারো দিন আগে। ম্লেচ্ছরা তাঁকে গো-মাংস খাইয়ে ধর্মনাশের চেষ্টা করেছিল, তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেছেন। —তুমি এখন যাও, আজ রাত্রিটা অতিথিশালাতেই থেকো, রাত্রে পিতাকে প্রাণ ভরে স্মরণ কোরো। কাল তোমার পিতৃশ্রাদ্ধের আয়োজন আমি করব। এস বৎস।'

অর্জুন যখন সভাগৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন চারিদিকে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়াছে, নগর প্রায় নিষ্প্রদীপ। বাষ্পাকুল চোখে আকাশের পানে চাহিয়া তাহার মনে হইল জগতে সে একা, নিঃসঙ্গ; তাহার হৃদয়ও শূন্য হইযা গিয়াছে।

তিন

দুই দিন পবে মহারাজ দেবরায় সীমান্ত সেনা পরিদর্শনে বাহির হইলেন। সঙ্গে পিঙ্গলা এবং পাঁচজন পাচক। দেহরক্ষীরূপে চলিল এক সহস্র তুরাণী ধনুর্ধর। রাজা রাজ্যেব উত্তর সীমান্তের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত পরিদর্শন করিবেন, ন্যূনাধিক এক পক্ষকাল সময় লাগিবে। ইতিমধ্যে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ একান্ত অনাড়ম্বরভাবে রাজ্য পরিচালনার ভার নিজ হস্তে তুলিয়া লইয়াছেন।

কুমার কম্পনদেবের ইচ্ছা ছিল, রাজার অনুপস্থিতি কালে তিনিই রাজ-প্রতিভূ হইয়া রাজকার্য চালাইবেন। কিন্তু রাজা তাঁহাকে ডাকিলেন না; এত অল্প সময়ের জন্য শূন্যপাল নিয়োগের প্রয়োজন হয় না, মন্ত্রীই কাজ চালাইয়া লইতে পারেন। কুমার কম্পনের বিষয়-জর্জরিত মন আরো বিষাক্ত হইয়া উঠিল।

কুমার কম্পনের নূতন গৃহ সম্পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে নানা প্রকার মহার্ঘ সাজসজ্জা বসিয়াছে। কিন্তু এখনো তিনি গৃহপ্রবেশ করেন নাই। তাঁহার প্রকাশ্য অভিপ্রায়, রাজা প্রত্যাগমন করিলে রাজাকে এবং রাজ্যের গণমান্য রাজপুরুষদের প্রকাণ্ড ভোজ দিয়া গৃহপ্রবেশ করিবেন। এই অভিপ্রায়ের পশ্চাতে যে কুটিল এবং দুঃসাহসিক অভিসন্ধি আছে তাহা তিনি হাস্যমুখে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

অর্জুন ও বলরাম গুহামধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। অতিথিশালা হইতে গুহায় স্থানান্তরিত হইয়া কিন্তু তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের তিলমাত্র হানি হয় নাই।

বিজয়নগরের সর্বত্র, তথা রাজ-পুরভূমির মধ্যে ছোট ছোট পাহাড় আছে; পাহাড় না বলিয়া তাহাদের শিলাস্তূপ বলিলেই ভাল হয়। সর্বত্র দেখা যায় বলিয়া কেহ এগুলিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করে না। অনেক শিলাস্তূপের অভ্যন্তরে নৈসর্গিক কন্দর আছে। অর্জুন ও বলরাম যে গুহাতে আশ্রয় পাইয়াছিল তাহাই এইরূপ গুহা। ইতস্তত বিকীর্ণ বড় বড় শিলাখণ্ডের মাঝখানে ক্রমোচ্চ স্তনইব ভুবঃ একটি স্তূপ, এই শিলায়তনের মধ্যে গুহা। গুহাটি বেশ বিস্তীর্ণ, কিন্তু অধিক উচ্চ নয়; এমন তাহার ত্রিভঙ্গ গঠন যে তাহাকে স্বচ্ছন্দে দুই ভাগ করিয়া দুইটি প্রকোষ্ঠে পরিণত করা যায়। পিছন

দিকে ছাদের এক অংশে কিছু পাথর খসিয়া গিয়া একটি নাতিবৃহৎ ছিদ্র হইয়াছে, সেই পথে প্রচুর আলো ও বায়ুর প্রবাহ প্রবেশ করে।

মন্ত্রী মহাশয় যত্নের ত্রুটি রাখেন নাই। কোমল শয্যা, উপবেশনের জন্য পীঠিকা, জলের কুণ্ড, দীপদণ্ড ও অন্যান্য তৈজস দিয়া গুহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। রাজপুরীর রন্ধনশালা হইতে প্রত্যহ দুইবার একটি দাসী আসিয়া রাজভোগ খাদ্য পানীয় দিয়া যায়। বলরাম ও অর্জুন একদিন বহিত্রে গিয়া বলরামের লোহা-লক্কড় ও যন্ত্রপাতি লইয়া আসিয়াছে, তাহার মৃদঙ্গাদি বাদ্যও আনিতে ভোলে নাই। দুই বন্ধু নিভৃতে নিরালায় সংসার পাতিয়া বসিয়াছে।

পিতার শ্রাদ্ধশান্তির পর অর্জুন ধীরে ধীরে আবার সুস্থ হইয়া উঠিতেছে। তাহার অসহায় বিহ্বল ভাব কাটিয়া গিয়াছে; বর্তমানে যে বৈরাগ্য ও নিস্পৃহতার ভাব তাহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছে তাহাও ক্রমে কাটিয়া যাইবে। যৌবনের মনঃপীড়া বড় তীব্র হয়, কিন্তু বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ক্ষত শীঘ্র শুকায় এবং অচিরাৎ নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

বলরাম হৃদয়ের প্রীতি ও সহানুভূতি দিয়া অর্জুনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। সে নিজে জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছে, দুঃখের মূল্য বোঝে, তাই তাড়াতাড়ি করিয়া অর্জুনের শোক ভুলাইয়া দিবার চেষ্টা করে না; বরং শোকের ভাগ লইয়া শোক লাঘব করিবার চেষ্টা করে। কখনো নানা বিচিত্র কাহিনী বলে, কখনো সন্ধ্যার পর প্রদীপ জ্বলিলে মৃদঙ্গ লইয়া গান ধরে—শ্রিত-কমলাকুচ মণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিতললিত বনমাল জয় জয় দেব হরে!

গুহার যে অংশে ছাদে ফুটা, আজ সেইখানে বলরাম হাপর বসাইয়াছে। সকালবেলা চুল্লীতে আগুন ধরাইয়া সে কাজ করিতে বসে; অর্জুন তাহার হাপরের দড়ি টানে। লৌহখণ্ড তপ্ত হইয়া তরুণার্করাগ ধারণ করিলে বলরাম তাহা হাতুড়ি দিয়া পিটিয়া অভীষ্ট রূপ দান করে। কাজের সঙ্গে সঙ্গে গল্প হয়। বলরামই বেশি কথা বলে, অর্জুন কখনো ঘাড় নাড়ে কখনো দু'একটা কথা বলে। বলরাম বলে—'এ গুহাটি বেশ, এর সঙ্কেত-গুহা নাম সার্থক। আমরা এখানে আসার ফলে কিন্তু অনেক অভিসারিকার প্রাণে ব্যথা লেগেছে।'

অর্জুনের সপ্রশ্ন দৃষ্টির উত্তরে বলরাম মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলে—'এ গুহাটি রাজপুরীর যুবতী দাসী-কিঙ্করীদের গুপ্ত বিহারগৃহ; অভিসারিকারা কুহুরাত্রে চুপি-চুপি আসত, নাগরেরাও আসত। গুহার অন্ধকারে ক্ষীণ দীপশিখা জ্বলত। আর জ্বলত মদনানল।'

অর্জুন বলে—'তুমি কি করে জানলে?'

বলরাম বলে—'তুমি দেখনি! গুহার গায়ে জোড়া জোড়া নাম লেখা আছে। কোথাও খড়ি দিয়ে লেখা—রত্নমালা-দেবদত্ত; কোথাও গিরিমাটি দিয়ে লেখা—চন্দ্রচূড়-বল্লভা। কতক নাম নূতন, কতক নাম অনেকদিনের পুরানো, প্রায় মিলিয়ে এসেছে, ভাল পড়া যায় না। এরা সব এখানে আসত। কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বাদ সাধলেন, আমাদের এনে এখানে বসিয়ে দিলেন। ওদের মনে কি দুঃখ বল দেখি! আবার নূতন গুহা খুঁজতে হবে।' বলিয়া বলরাম অনেকক্ষণ ধরিয়া হো হো শব্দে হাসিতে থাকে। অর্জুনের অধরেও একটু হাসি খেলিয়া যায়।

আবার কখনো বলরাম বলে—'আজ আর কামান তৈরি করতে ভাল লাগছে না। এস, তোমার লাঠির জন্যে দুটো হুল তৈরি করে দিই। লাঠির ডগায় বসিয়ে দিলেই লাঠি বল্লমে পরিণত হবে।'

অর্জুন বলে—'তাতে কী লাভ?'

বলরাম বলে—'লাভ হবে না! একাধারে ঘোড়া এবং বল্লম পাবে। ভেবে দেখ, তুমি রাজদূত, তোমাকে যখন-তখন পাহাড় জঙ্গল ভেঙ্গে দূর-দূরান্তরে যেতে হবে। হঠাৎ যদি অস্ত্রধারী আততায়ী আক্রমণ করে! তুমি তখন কী করবে? লাঠি দিয়ে কত লড়বে! তখন এই অস্ত্রটি কাজে আসবে। তুমি টুক্ করে লাঠি থেকে নেমে বল্লম দিয়ে শত্রুর পেট ফুটো করে দেবে।'

'তা বটে।'

বলরাম দুইটি লোহার হুল তৈয়ার করিয়া লাঠির মাথায় আঁট করিয়া বসাইয়া দেয়। দুই বন্ধু দু'টি ভল্ল লইয়া কিছুক্ষণ ক্রীড়াযুদ্ধ করে। রঙ্গ-কৌতুকে অর্জুনের মন লঘু হয়।

দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্বে রাজপুরীর দাসী খাবার লইয়া আসে। দূর হইতে তাহাকে আসিতে দেখা যায়। মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড থালা, তাহাতে অন্ন-ব্যঞ্জন। তার উপর আর একটি অন্ন-ব্যঞ্জনপূর্ণ থালা। সর্বোপরি একটি শূন্য থালা উপুড় করা। কোমরে ছোট একটি জলপূর্ণ কলসী। তাহার শাড়ির রঙ কোনো দিন চাঁপা ফুলের মত, কোনো দিন পলাশ ফুলের মত। গতিভঙ্গী রাজহংসীর মত। তাহাকে আসিতে দেখিলে মনে হয় মাথায় সোনার মুকুট পরা দিব্যাঙ্গনা আসিতেছে।

সে দৃষ্টিগোচর হইলেই বলরাম কাজ ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে, বলে—'অর্জুন ভাই, চল চল, স্নান করে আসি। মধ্যাহ্ন ভোজন আসছে।'

গুহা হইতে চার-পাঁচ রজ্জু দূরে পৌরভূমির দক্ষিণ কিনারে বিপুলপ্রসার কমলা সরোবর; দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ক্রোশেক স্থান জুড়িয়া স্ফটিকের ন্যায় জল টলমল করিতেছে। দূরে পূর্বদিকে কমলাপুরমের ঘাট দেখা যায়। কিন্তু অর্জুন ও বলরাম ঘাটে স্নান করিতে যায় না। নিকটেই আঘাটায় স্নান করিয়া ফিরিয়া আসে।

গুহায় ফিরিয়া দেখে, দাসী পীঠিকার সম্মুখে আহার্য সাজাইয়া বসিয়া আছে। তাহারা আহারে বসিয়া যায়। আহার শেষ হইলে দাসী উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

প্রথম দুই-তিন দিন দাসীকে ভাল করিয়া লক্ষ্য করে নাই। একদিন খাইতে বসিয়া বলরামের জিজ্ঞাসু চক্ষু তাহার উপর পড়িল। মেয়েটি পা মুড়িয়া অদূরে বসিয়া আছে। তাহার বয়স অনুমান কুড়ি-একুশ; কচি কলাপাতার মত স্নিগ্ধ দেহের বর্ণ। ঊর্ধ্বাঙ্গে কাঁচুলি ও উত্তরীয়, নিম্নাঙ্গে উজ্জ্বল পীতবসন; মধ্যে ডমরুর ন্যায় কটি উন্মুক্ত। মুখখানি কমনীয়, টানা-টানা চোখ, অধর ঈষৎ স্ফুরিত। মুখের ভাব শান্ত এবং সংযত; যেন দর্শকের দৃষ্টি হইতে নিজেকে সরাইয়া রাখিতে চায়। লাজুক নয়, কিন্তু অপ্রগল্‌ভা। বলরাম তাহার প্রতি কয়েকবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে প্রশ্ন করিল—'তোমার নাম কি?'

যুবতীর চোখ দু'টি ভূমিসংলগ্ন হইল, সে সম্বৃত স্বরে বলিল—'মঞ্জিরা।'

কিছুক্ষণ নীরবে আহার করিয়া বলরাম বলিল—'তুমি রাজপুরীতেই থাকো।'

মঞ্জিরা বলিল—'হাঁ।'

'কতদিন আছ?'

'আট বছর।'

'তোমার পিতা-মাতা নেই?'

'আছেন। তাঁরা নগরে থাকেন।

বলরাম আরো কিছুক্ষণ আহার করিয়া মুখ তুলিল; তাহার অধরকোণে একটু হাসি। বলিল—'তুমি আগে কখনো এ গুহায় এসেছ? অর্থাৎ আমরা আসার আগে কখনো এসেছ?'

মঞ্জিরা চোখ তুলিয়া বলরামের মুখের পানে চাহিল। চোখে ছল-কপট নাই, ঋজু দৃষ্টি। বলিল—'না।'

বলরাম বলিল—'কিন্তু অপবাদ শুনেছি, রাজপুরীর দাসী-কিঙ্করীরা মাঝে মাঝে রাত্রিকালে এই গুহায় আসে।'

মঞ্জিরার মুখের ভাব দৃঢ় হইল, সে বলরামের চোখে চোখ রাখিয়া বলিল—'যারা দুষ্ট মেয়ে তারা আসে। সকলে আসে না।'

তিরস্কৃত হইয়া বলরাম চুপ করিল। সেকালের কবিরা অভিসারিকাদের লইয়া যতই মাতামাতি করুন, সমাজে অভিসারিকাদের প্রশংসা ছিল না। বিকীর্ণকামা নারী সকল যুগে সকল সমাজেই নিন্দিত। তবে এ কথাও সত্য, সেকালে অভিসারের প্রচলন একটু বেশি ছিল।

বলরাম ও অর্জুন আহার শেষ করিয়া আচমন করিতে উঠিল। মঞ্জিরা উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি লইয়া চলিয়া গেল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে অর্জুন ও বলরাম ভ্রমণের জন্য বাহির হইল। রাজা রাজধানীতে নাই, সভা বসে না; তবু অর্জুন দিনে একবার রাজসভার দিকে যায়, শূন্য সভাঙ্গনে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করিয়া ফিরিয়া আসে। আজ বলরামও তাহার সঙ্গে চলিল।

গুহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূর যাইবার পর বলরাম দেখিল, একটা উঁচু পাথরের চ্যাঙড়ের পাশে একজন অস্ত্রধারী লোক দাঁড়াইয়া আছে। মুখে প্রচুর গোঁফদাড়ি, মাথায় পাগড়ি, হাতে ভল্ল, কোমরে তরবারি। তাহাদের আসিতে দেখিয়া লোকটা পাথরের আড়ালে অপসৃত হইল।

বলরাম বলিল—'এস তো, দেখি কে লোকটা।'

অর্জুনের হাতে হুল-শীর্ষ লাঠি দু'টি ছিল, সুতরাং অস্ত্রধারী অজ্ঞাত পুরুষের সম্মুখীন হইতে ভয় নাই। অর্জুন একটি লাঠি বলরামকে দিল, তারপর দুইজনে দুই দিক হইতে চ্যাঙড় ঘুরিয়া অন্তরালস্থিত লোকটির নিকটবর্তী হইল।

তাহাদের দেখিয়া লোকটি অপ্রস্তুত হইয়া পড়িল। বলরাম বলিল—'বাপু, কে তুমি? তোমার নাম কি? এখানে কি চাও?'

লোকটি বলিল—'আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আমার নাম চতুর্ভুজ নায়ক।'

বলরাম বলিল—'কাকে পাহারা দিচ্ছ?'

চতুর্ভুজ নায়কের গোঁফ এবং দাড়ির সঙ্গমস্থলে একটু শ্বেতাভা দেখা দিল—'তোমাদের পাহারা দিচ্ছি।'

বিস্মিত হইয়া বলরাম বলিল—'আমাদের পাহারা দিচ্ছ! আমাদের অপরাধ?'

'তোমরা গোপনীয় রাজকার্যে ব্যাপৃত আছ। পাছে বাইরের লোক কেউ আসে তাই মন্ত্রী মহাশয়ের হুকুমে পাহারা দিচ্ছি।'

'বুঝলাম। রাত্রেও কি পাহারা থাকে?'

'থাকে।'

'তুমি একা পাহারা দাও, না তোমার মতন চতুর্ভুজ আরো আছে?'

'আমরা তিনজন আছি, পালা করে পাহারা দিই।'

'নিশ্চিন্ত হলাম। অভিসারক আর অভিসারিকাদের ঠেকিয়ে রেখো। আমরা একটু ঘুরে আসি।'

সূর্যাস্তের অল্পকাল পরে অর্জুন ও বলরাম ফিরিয়া আসিল, দেখিল গুহায় দীপ জ্বলিতেছে, মঞ্জিরা খাবার সাজাইয়া বসিয়া আছে। দুইজনে খাইতে বসিয়া গেল।

রাজবাটি হইতে রোজ নূতন নূতন অন্ন-ব্যঞ্জন আসে। আজ আসিয়াছে শর্করা-মধুর পিণ্ডক্ষীর, দুই প্রকার মৎস্য, শূল্য মাংস, উখ্য মাংস, দুগ্ধফেননিভ তণ্ডুল, ঘৃতলিপ্ত রোটিকা, সম্বর, অবদংশ ও পর্পট। দক্ষিণ দেশে আহারের নিয়ম মধুরেণ সমাপয়েৎ নয়, মধুর খাদ্য দিয়া আহার আরম্ভ। অর্জুন ও বলরাম পিণ্ডক্ষীর মুখে দিয়া পরম তৃপ্তিভরে ভোজন আরম্ভ করিল।

পিণ্ডক্ষীরের আস্বাদ গ্রহণ করিতে করিতে বলরাম অর্ধমুদিত নেত্রে মঞ্জিরাকে নিরীক্ষণ করিল। মঞ্জিরা বাম করতল ভূমিতে রাখিয়া একটু হেলিয়া বসিয়া আছে, স্নেহদীপিকার নম্র আলোকে তাহার মুখখানি বড় মধুর দেখাইতেছে। কিছুক্ষণ দেখিয়া বলরাম বলিল—'তোমার নাম মঞ্জিরা। মঞ্জিরা মানে বাঁশি। তুমি বাঁশি বাজাতে জান?'

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে মঞ্জিরা আয়ত চক্ষু তুলিয়া চাহিল। একটু ঘাড় বাঁকাইল, বলিল—'জানি।'

বলরাম বলিল—বাঃ বেশ। আমি গান গাইতে পারি, তোমাকে গান শোনাব। তুমি আমাকে বাঁশি শোনাবে?'

মঞ্জিরার অধরে চাপা কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল, সে একটু ঘাড় নাড়িল।

বলরাম উৎসাহভরে বলিল—'ভাল। কাল তাহলে তুমি তোমার বাঁশি এনো। কেমন?'

মঞ্জিরা আবার ঘাড় নাড়িল।

অর্জুন আড়চোখে বলরামের পানে চাহিল। গুহার ভিতর দুইটি নর-নারীর মধ্যে পূর্বরাগের অনুবন্ধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে দেখিয়া তাহার মন উৎসুক ও প্রসন্ন হইয়া উঠিল।

পরদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জিরা খাবার লইয়া আসিল। আজ বলরাম ও অর্জুন পূর্বাহ্ণেই স্নান করিয়া প্রস্তুত ছিল। আহারে বসিয়া বলরাম বলিল—'কই, বাঁশি, আনোনি?'

মঞ্জিরা কোঁচড় হইতে বাঁশি বাহির করিয়া দেখাইল। বনবেতসের এড়ো বাঁশি। বলরাম হৃষ্ট হইয়া বলিল—'এই যে বাঁশি। তা—তুমি বাজাও, আমরা খেতে খেতে শুনি।'

মঞ্জিরা নতমুখে মাথা নাড়িয়া হাসিল। বলরাম বলিল—'ও—বুঝেছি, আমি গান না গাইলে তুমি বাঁশি বাজাবে না। ভাবছ, আমি গাইতে জানি না, ফাঁকি দিয়ে তোমার বাঁশি শুনে নিতে চাই। —আচ্ছা দাঁড়াও।'

আহারান্তে বলরাম মৃদঙ্গ কোলে লইয়া বসিল। বলিল—'জয়দেব গোস্বামীর পদ গাইছি—শ্রীরাধিকার বিরহ হয়েছে, তিনি চন্দন আর চন্দ্রকিরণের নিন্দা করছেন। কর্ণাট রাগ, যতি তাল। আমার সঙ্গে সঙ্গে বাজাতে পারবে?'

মঞ্জিবা উত্তর দিল না, বাঁশিটি হাতে লইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বলরাম কয়েকবার মৃদঙ্গে মৃদু আঘাত করিয়া কলিতকণ্ঠে গান ধরিল—

'নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণমনুবিন্দতি খেদমধীবম্—'

মঞ্জিরা বাঁশিটি অধবে রাখিয়া ফুঁ দিল। বাঁশির ক্ষীণ-মধুর ধ্বনি বসন্তের প্রজাপতির মত জয়দেবের সুরের শীর্ষে শীর্ষে নাচিয়া বেড়াইতে লাগিল। বলরাম গান গাইতে গাইতে মঞ্জিরার চোখে চোখ রাখিয়া চমৎকৃত হাসি হাসিল।

'সা বিরহে তব দীনা
মাধব মনসিজ-বিশিখভয়াদিব
ভাবনয়া ত্বয়ি লীনা।'

দু'জনের চক্ষু পরস্পর নিবদ্ধ, কিন্তু মন নিবদ্ধ সুরের জালে। মোহময় সুর, কুহকময় শব্দ; সঙ্গীতের স্রোতে আশ্লিষ্ট হইয়া দু'জনে একসঙ্গে ভাসিয়া চলিয়াছে।

দুই দণ্ড পরে গান শেষ হইল।

মৃদঙ্গ নামাইয়া রাখিয়া বলরাম গদ্‌গদ স্বরে বলিল—'ধন্য! তুমি এত ভাল বাঁশি বাজাও আমি ভাবতেই পারিনি। —আমার গান কেমন শুনলে?'

মঞ্জিরা সলজ্জ স্বরে বলিল—'ভাল।'

বলরাম হঠাৎ বলিল—'ভাল কথা, তোমার খাওয়া হয়েছে?'

মঞ্জিরা মাথা নাড়িয়া বলিল—'না।'

বলরাম বিব্রত হইয়া পড়িল—'অ্যাঁ—এখনো খাওনি! গান-বাজনা পেলে বুঝি খাওয়া-দাওয়ার কথা মনে থাকে না? এ কি অন্যায় কথা? যাও, যাও, খাও গিয়ে। কাল যখন আসবে খাওয়া-দাওয়া সেরে আসবে। কেমন?'

মঞ্জিরা চলিয়া যাইবার পর বলরাম শয্যা পাতিয়া শয়ন করিল, অর্জুনও নিজের শয্যা পাতিল। বলরাম কিছুক্ষণ সুপারি চর্বণ করিয়া বলিল—'মঞ্জিরা মেয়েটা ভারি সুশীলা।'

অর্জুন হাসি দমন করিয়া বলিল—'তা তো বুঝতেই পারছি।'

বলরাম সন্দিগ্ধভাবে তাহার দিকে ঘাড় ফিরাইল, বলিল—'কি করে বুঝলে?'

অর্জুন বলিল—'বাঁশি বাজাতে পারে।'

বলরাম এবার হাসিয়া উঠিল—'সে জন্যে নয়। মেয়েটার শরীরে রাগ নেই, আর খুব কম

কথা নয়। যে-মেয়ে কম কথা কয় সে তো রমণীরত্ন।'

অর্জুনের মনে পড়িল বলরামের পূর্বতন স্ত্রী মুখরা ও চণ্ডী ছিল। অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়া বলিল—'তা বটে।'

অতঃপর মঞ্জিরা আসে যায়। দ্বিপ্রহরে বলরামের সঙ্গে দু'দণ্ড বাঁশি বাজাইয়া তৃতীয় প্রহরে ফিরিয়া যায়। রাত্রে কিন্তু বেশিক্ষণ থাকে না, আহার শেষ হইলেই পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যায়। বলরামের সহিত তাহার আন্তরিক বন্ধন ঘনিষ্ঠ হইতেছে। সঙ্গীতের বন্ধন নাগপাশের বন্ধন, দু'জনকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তবু, বলরাম সাবধানী লোক, সে জানিয়া লইয়াছে যে মঞ্জিরা অনূঢ়া; পরকীয়া প্রীতি যে অতি গর্হিত কার্য তাহা তাহার অবিদিত নাই।

এইভাবে দিন কাটিতেছে। বলরাম কামানটি সম্পূর্ণ করিয়াছে, কিন্তু রাজা প্রত্যাবর্তন না করা পর্যন্ত কিছু করণীয় নাই। কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়া শুক্লপক্ষ আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার পর দুই বন্ধু গুহার বাহিরে দাঁড়াইয়া তরুণী চন্দ্রলেখার পানে চাহিয়া থাকে। চন্দ্রলেখা দিনে দিনে পরিবর্ধমানা।

একদিন এই নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার মধ্যে এক বিচিত্র অপ্রাকৃত ব্যাপার ঘটিল। দিনটা ছিল শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী কি সপ্তমী তিথি। সন্ধ্যার পর যথারীতি আহার সমাপন করিয়া বলরাম ও অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়াছিল। মঞ্জিরা চলিয়া গিয়াছে; দীপের শিখাটি তৈলাভাবে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র হইয়া আসিতেছে।

বলরাম আলস্যভরে জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া বলিল—'কামানটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে ঠিক হল কিনা। কাল প্রত্যুষে বেরুব।'

অর্জুন বলিল—'বেশ তো! কোথায় যাবে?'

'কোনো নির্জন স্থানে। যাতে শব্দ শোনা না যায়। আজ ঘুমিয়ে পড়। শয়নে পদ্মনাভঞ্চ।'

কিন্তু নিদ্রাকর্ষণের পূর্বেই বাধা পড়িল। গুহার মুখের কাছে ধাবমান পদশব্দ শুনিয়া দু'জনেই ত্বরিতে শয্যায় উঠিয়া বসিল।

গুহার রন্ধ্রমুখে ধূম্রাকার ছায়া পড়িল, একটি কম্পিত কণ্ঠস্বর শুনা গেল—'অর্জুন ভদ্র! বলরাম ভদ্র!'

অর্জুন গলা চড়াইয়া হাঁক দিল—'কে তুমি!'

'আমি চতুর্ভুজ নায়ক।'

দু'জনে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলবাম বলিল—'চতুর্ভুজ! ভিতরে এস। কী সমাচার?'

প্রহরী চতুর্ভুজ তখন গুহায় প্রবেশ করিয়া আলোকচক্রের মধ্যে দাঁড়াইল। দেখা গেল তাহার চক্ষু ভয়ে গোলাকৃতি হইয়াছে, দাড়িগোঁফ রোমাঞ্চিত। সে থরথর স্বরে বলিল—'হুক্ক-বুক্ক!'

'হুক্ক-বুক্ক! সে কাকে বলে?'

চতুর্ভুজ তখন স্খলিত স্বরে যথাসাধ্য বুঝাইয়া বলিল। রাজবংশের প্রবর্তক হরিহর ও বুক্কের প্রেতাত্মা দেখা দিয়েছেন। তাঁহারা গুহার বাইরে অনতিদূরে পদচারণ করিতেছেন। চতুর্ভুজ প্রথমে তাঁহাদের মানুষ মনে করিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা মানুষ নয়, প্রেত, চতুর্ভুজের সম্বোধন অগ্রাহ্য করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

শুনিয়া অর্জুন লাঠি দু'টি হাতে লইল, বলিল—'চল দেখি।'

চতুর্ভুজ মাটিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল—'আমি আর যাব না। তোমরা যাও।'

দুই বন্ধু গুহা হইতে বাহির হইয়া এদিক-ওদিক চাহিল। চন্দ্র এখনো অস্ত যায় নাই, জ্যোৎস্না-বাষ্পে চারিদিক সমাচ্ছন্ন। কিন্তু মানুষ কোথাও দেখা গেল না। তাহারা তখন আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের পাশে দাঁড়াইল।

হাঁ, সরোবরের দিক হইতে দুইজন লোক আসিতেছে। এখনো দর্শকদের নিকট হইতে প্রায় শত হস্ত দূরে আছে। একজন দীর্ঘকায় ও কৃশ, অন্য ব্যক্তি খর্ব ও গজস্কন্ধ; জ্যোৎস্নালোকে তাহাদের মুখাবয়ব দেখা যাইতেছে না। তাহারা যেন প্রগাঢ় মনোযোগের সহিত কোনো গোপনীয় কথা আলোচনা করিতেছে।

অর্জুন ও বলরামের মাথার উপর দিয়া একটা পেচক গম্ভীর শব্দ করিয়া উড়িয়া গেল। বলরাম নিঃশব্দে অর্জুনের হাত ধরিয়া প্রস্তরস্তূপের আড়ালে টানিয়া লইল।

দুই মূর্তি অগ্রসর হইতেছে। অর্জুন ও বলরাম পাথরের আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল, যুগলমূর্তি তাহাদের বিশ হাত দূর দিয়া রাজসভার দিকে চলিয়া যাইতেছে। এখনো তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট; মানুষ বলিয়া চেনা যায় কিন্তু মুখ-চোখ দেখা যায় না।

অর্জুন বলরামকে ইঙ্গিত করিল, দুইজনে আড়াল হইতে বাহির হইয়া সমস্বরে তর্জন করিল—'কে যায়? দাঁড়াও।'

মূর্তিযুগল দাঁড়াইল; তাহাদের দেহভঙ্গিতে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ পাইল। তারপর, বুদ্বুদ যেমন ফাটিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি তাহারা শূন্যে মিলাইয়া গেল।

অর্জুন ও বলরাম দৃষ্টি বিনিময় করিল। বলরাম অধর লেহন করিয়া বলিল—'যা দেখবার দেখেছি। চল। গুহায় ফিরি।'

গুহার ভিতরে চতুর্ভুজ জড়সড়ভাবে বসিয়া ছিল; প্রদীপটি নিব-নিব হইয়াছিল। বলরাম প্রদীপে তৈল ঢালিল, প্রদীপ আবার উজ্জ্বল হইল।

চতুর্ভুজ বায়সের ন্যায় বিকৃত কণ্ঠে বলিল— 'দেখলে?'

বলরাম শয্যায় উপবেশন করিয়া বলিল—'দেখলাম। চোখের সামনে মিলিয়ে গেল। —কিন্তু ওরা যে হক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা তা তুমি জানলে কি করে?'

চতুর্ভুজ শয্যার পাশে আসিয়া বসিল, বলিল—'গল্প শুনেছি। হরিহর ছিলেন লম্বা রোগা, আর বুক্ক ছিলেন বেঁটে মোটা। ওঁরা মাঝে মাঝে দেখা দেন, অনেকে দেখেছে। রাজ্যের যখন কোনো গুরুতর বিপদ উপস্থিত হয় তখন ওঁরা দেখা দেন।'

দুই বন্ধু উদ্বিগ্ন চক্ষে চাহিয়া রহিল। গুরুতর বিপদ! কী বিপদ! তুঙ্গভদ্রার পরপারে মূর্তিমান বিপদ বুভুক্ষু শার্দূলের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সেই বিপদ! কিংবা অন্য কিছু?

চতুর্ভুজের কথায় তাহাদের চিন্তাজাল ছিন্ন হইল—'আজ রাত্রে আমি গুহার মধ্যে থেকেই পাহারা দেব। কি বল?'

বলরাম কহিল—'সেই ভাল। তুমি আমাদের পাহারা দেবে, আমরা তোমাকে পাহারা দেব।'

চার

মহারাজ দেবরায় সৈন্য পরিদর্শনে যাত্রা করিবার পর সভাগৃহের দ্বিতলের গৌরব গরিমা অনেকটা কমিয়া গিয়াছিল। দুই রাজকন্যা পরিচারিকা পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছিল। পিঙ্গলা নাই, রাজার সঙ্গে গিয়াছে। বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণার মানসিক অবস্থা খুবই করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

দুই ভগিনীর মনঃকষ্টের কারণ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মণিকঙ্কণা কাতর হইয়াছে রাজার বিরহে; প্রভাতে উঠিয়া সে আর রাজার দর্শন পায় না, আড়াল হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিতে পায় না। সে ক্ষিন্ন মনে এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে ঘুরিয়া বেড়ায়; কখনো চুপি চুপি রাজার বিরামকক্ষে যায়, পালঙ্কের পাশে বসিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করে। তারপর যখন গৃহ অসহ্য হইয়া ওঠে তখন দেবী পদ্মালয়ার ভবনে যায়; সেখানে বালক মল্লিকার্জুনের সঙ্গে কিয়ৎকাল খেলা করিয়া ফিরিয়া

আসে। সে লক্ষ্য করে রাজার অবর্তমানে পদ্মালয়ার অবিচল প্রসন্নতা তিলমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সে মনে মনে বিস্মিত হয়। এরা কেমন মানুষ!

বিদ্যুন্মালার সমস্যা অন্য প্রকার। বস্তুত তাঁহার সমস্যা একটা নয়, অনেকগুলা সমস্যার সুত্র একসঙ্গে জট পাকাইয়া গিয়াছে।

বিদ্যুন্মালা যাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বিজয়নগরে আসিয়াছেন সেই দেবরায়ের প্রতি তিনি প্রীতিমতী নন; যাহার প্রতি তাঁহার মন আসক্ত হইয়াছে সে রাজা নয়, রাজপুত্র নয়, অতি সামান্য যুবক। তাহার সহিত রাজপুত্রীর বিবাহের কথা কেহ ভাবিতেই পারে না।

পূর্বে অর্জুনের সহিত বিদ্যুন্মালার প্রায় প্রত্যহ দেখা হইত। দশ দিন আগে দ্বিতলের বাতায়নে দাঁড়াইয়া বিদ্যুন্মালা চকিতের ন্যায় অর্জুনকে অশ্বারোহণে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তারপর আর তিনি অর্জুনকে দেখেন নাই; শুনিয়াছিলেন অর্জুন দৌত্যকার্যে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছে। তারপর সে কোথায় গেল? বিদ্যুন্মালা প্রত্যহ অতিথিশালার সম্মুখ দিয়া পম্পাপতির মন্দিরে যান, কিন্তু অর্জুনের দেখা পান না। কি হইল তাহার? দাসীদের প্রশ্ন করিতে শঙ্কা হয়, পাছে তাহারা সন্দেহ করে। তিনি অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছেন।

বিবাহ তিন মাস পিছাইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু তিন মাস কতটুকু সময়? একটি একটি করিয়া দিন যাইতেছে আর মেয়াদের কাল ফুরাইয়া আসিতেছে। সময় যে যুগপৎ এমন দ্রুত ও মন্থর হইতে পারে তাহা কে জানিত? ভাবিয়া ভাবিয়া রাজকুমারীর দেহ কৃশ হইয়াছে, চোখে একটা অস্বাভাবিক প্রখর দৃষ্টি। জালবদ্ধা কুরঙ্গী বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পাইতেছে না।

একদিন সূর্যাস্ত কালে বিদ্যুন্মালা নিজ শয্যায় অর্ধশয়ান হইয়া দুর্ভাবনার জালে জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। মণিকঙ্কণা কক্ষে নাই, বোধ করি নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাজার বিরামকক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। একটি দাসী ভূমিতলে বসিয়া কুমারীদের পরিধেয় বস্ত্র ঊর্মি করিতেছিল, কুমারীরা সান্ধ্য-স্নান করিয়া পরিধান করিবেন।

সূর্যাস্ত হইলে কক্ষের অভ্যন্তর ছায়াচ্ছন্ন হইল। বিদ্যুন্মালার দেহ সহসা অসহ্য অধীরতায় ছটফট করিয়া উঠিল। তিনি শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া ডাকিলেন—'ভদ্রা!'

দাসী কাপড় চুনট্ করিতে করিতে জিজ্ঞাসু মুখ তুলিল—'আজ্ঞা রাজকুমারি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'ঘরে আর তিষ্ঠতে পারছি না। চল, নীচে খোলা জায়গায় বেড়িয়ে আসি।'

ভদ্রা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—'তাহলে প্রতিহারিণীদের বলি। আপনি সন্ধ্যাস্নান সেরে বেশ পরিবর্তন করুন।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, না, প্রতিহারিণীদের প্রয়োজন নেই, কেবল তুমি সঙ্গে থাকবে। ফিরে এসে বেশ পরিবর্তন করব।'

'যে আজ্ঞা রাজকুমারি।'

ভদ্রাকে লইয়া বিদ্যুন্মালা নীচে নামিলেন। সোপানের প্রতিহারিণীরা একবার সপ্রশ্ন ভ্রূ তুলিল, ভদ্রা দক্ষিণ হস্তের ঈষৎ ইঙ্গিত করিল। রাজকুমারীরা বন্দিনী নন, কেহ বাধা দিল না।

প্রাঙ্গণে নামিয়া বিদ্যুন্মালা এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। কেবল উত্তরদিকে পম্পাপতির মন্দিরের পথ তাঁহার পরিচিত। তিনি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন—'ওদিকে কী আছে?'

ভদ্রা বলিল—'ওদিকে কমলা সরোবর।'

'চল।' —বিদ্যুন্মালা সেই দিকে চলিলেন।

চলিতে চলিতে ভদ্রা বলিল—'কমলা সরোবর এখান থেকে অনেকটা দূর, প্রায় অর্ধ ক্রোশ। অত দূর কি যেতে পারবেন রাজকুমারি!'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না, ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে চলিলেন; কিন্তু তাঁহার মন অন্তর্নিহিত হইয়া রহিল। সন্ধ্যার সময় লোকজন বেশি নাই; যে দু'চারটি পৌরজন সম্মুখে পড়িল তাহারা কলিঙ্গ-কুমারীকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দূরে সরিয়া গেল।

খানিক দূর গিয়া রাজকুমারী অনুভব করিলেন, পথ কঙ্করময় হইয়াছে, অদূরে একটি নীচু পাহাড়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'ওটা কি?'

ভদ্রা বলিল—'ওটা একটা পাহাড় রাজকুমারি। ওর মধ্যে গুহা আছে। লোকে বলে—সঙ্কেত-গুহা।' ভদ্রার ঠোঁটের কোণে একটু চাপা হাসি দেখা দিল। সঙ্কেত-গুহার পরিচয় পুরস্ত্রীরা সকলেই জানে।

রাজকুমারী গুহা সম্বন্ধে আর কোনো ঔৎসুক্য দেখাইলেন না, আরো কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কমলা সরোবর এখনও দূরে। তিনি ফিরিলেন। এই ভ্রমণের ফলে বিক্ষিপ্ত মন ঈষৎ শান্ত হইল।

পরদিন সায়ংকালে বিদ্যুন্মালা ভদ্রাকে বলিলেন—'আমি আজও একটু ঘুরে-ফিরে আসি। তোমাকে সঙ্গে যেতে হবে না।' ভদ্রার মুখে অব্যক্ত আপত্তি দেখিয়া বলিলেন—'ভয় নেই, আমি হারিয়ে যাব না, পথ চিনে আসতে পাবব।'

ভদ্রা আর কিছু বলিতে পারিল না। বিদ্যুন্মালা নীচে নামিয়া কাল যেদিকে গিয়াছিলেন সেইদিকে চলিলেন। পবিচিত পথে চলাই ভাল, অপরিচিত পথ কিরূপ কণ্টকাকীর্ণ তাহা রাজকন্যা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

আকাশে সূর্যাস্তের বর্ণলীলা শেষ হইয়াছে, চাঁদের কিরণ পবিস্ফুট হয় নাই। বিদ্যুন্মালা নীচু পাহাড়টা পাশে বাখিয়া কিছু দুব অগ্রসর হইয়া ফিরি-ফিরি করিতেছেন, এমন সময় পিছন দিক হইতে কে বলিল—'রাজকুমারি! আপনি এখানে!'

বিদ্যুন্মালা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন গুহার দিক হইতে দ্রুতপদে আসিতেছে—অর্জুন। তাহার মুখে বিস্ময়বিমূঢ় হাসি।

অর্জুন বিদ্যুন্মালার সম্মুখে যুক্তকরে দাঁড়াইল, বলিল—'আপনি একা এতদূর এসেছেন!'

বিদ্যুন্মালা ক্ষণকাল তাহার মুখেব পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর কোনো কথা না বলিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। উদ্বেগের সঞ্চিত বাষ্প অশ্রুর আকারে বাহির হইয়া আসিল।

অর্জুন হতবুদ্ধি হইয়া গেল, নির্বাক সশঙ্ক মুখে বিদ্যুন্মালার পানে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুন্মালা চোখ মুছিলেন না, গলদশ্রু নেত্রে ভাঙা ভাঙা গলায় বলিলেন—'আগে রোজ সকালে আপনাকে দেখতাম, আজকাল দেখতে পাই না কেন?'

অর্জুন হৃদয়ের মধ্যে একটা চমক অনুভব করিল। রাজকুমারী এ কী বলিতেছেন। কিন্তু না, ইহা সাধারণ কুশলপ্রশ্ন মাত্র। অশ্রুজলেরও হয়তো একটা কারণ আছে; রমণীর অশ্রুপাতের কারণ কে কবে নির্ণয় করিতে পারিয়াছে? অর্জুন আত্মসংবরণ করিয়া বলিল—'আমি এখন আর অতিথি-ভবনে থাকি না। রাজা আমাকে কাজ দিয়েছেন। আমি আমার বন্ধু বলরামের সঙ্গে ওই গুহায় থাকি।'

বিদ্যুন্মালা এবার চোখ মুছিলেন, ঘাড় ফিরাইয়া গুহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—'গুহায় থাকেন। গুহায় থাকেন কেন?'

অর্জুন বলিল—'তা জানি না। রাজার আদেশ। —আপনি ভাল আছেন?'

বিদ্যুন্মালার অধরে একটু ম্লান হাসি খেলিয়া গেল। —'ভাল। হাঁ, ভালই আছি। আপনি তো লাঠি চড়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।'

অর্জুন বিস্মিত হইয়া বলিল—'আপনি জানলেন কি করে? ও—আমি বোধহয় আপনাকে লাঠি চড়ার কথা বলেছিলাম। হাঁ, রাজা আমাকে দূতকার্যে পাঠিয়েছিলেন।'

কিছুক্ষণ দু'জনে নীরব, যেন উভয়েরই কথা ফুরাইয়া গিয়াছে। শেষে অর্জুন বলিল—'সন্ধ্যা

উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। চলুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'না, আমি একা যেতে পারব। কাল এই সময় আপনি এখানে থাকবেন, আমি আসব।'

বিদ্যুন্মালা চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে কয়েকবার পিছু ফিরিয়া চাহিলেন। অর্জুন দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর রাজকন্যা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেলে অশান্ত শঙ্কিত মনে গুহায় ফিরিল।'

বিদ্যুন্মালার একটি রাত্রি এবং একটি দিন দুঃসহ অধীরতার মধ্যে কাটিল। কিন্তু তিনি মন স্থির করিয়া লইয়াছেন; বায়ুতাড়িত হালভাঙ্গা নৌকায় ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইলে কোনো ফল হইবে না; নৌকা ছাড়িয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তীরের দিকে যাইতে হইবে। এবার অগাধ জলে সাঁতার।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বিদ্যুন্মালা গুহার অভিমুখে গেলেন। মণিবন্ধে একটি মল্লীফুলের মালা জড়ানো। আজ আর কান্নাকাটি নয়, প্রগলভ্ চটুলতা। অর্জুনের হৃদয় এখনো প্রেমহীন; নারীর তূণীরে যত বাণ আছে সমস্ত প্রয়োগ করিয়া অর্জুনের হৃদয় জয় করিয়া লইতে হইবে।

অর্জুন অপেক্ষা করিতেছিল, যে পাষাণস্তূপের পাশে দাঁড়ইয়া হুক্ক-বুক্কের প্রেতাত্মা দর্শন করিয়াছিল সেই পাযাণস্তূপে ঠেস দিয়া পথের দিকে চাহিয়া ছিল। বিদ্যুন্মালা আসিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। অর্জুন খাড়া হইয়া দুই কর যুক্ত করিল।

বিদ্যুন্মালা হাসিলেন। গোধূলির আলোকে এই হাসির বিদ্যুদ্দীপ্তি যেন অর্জুনের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া দিল। সে দেখিতে পাইল না যে হাসির পিছনে অনেকখানি কান্না, অনেকখানি ভয় লাগিয়া আছে।

রাজকন্যা বলিলেন—'এদিকটা বেশ নিরিবিলি। তবু স্তম্ভের আড়ালে যাওয়াই ভাল।'

তিনি আগে আগে চলিলেন, অর্জুন নীরবে তাঁহার অনুগামী হইল। দু'জনে স্তম্ভপাষাণের অন্তরালে দাঁড়াইলেন। এখানে কাহারো চোখে পড়িবার আশঙ্কা নাই।

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের একটু কাছে সরিয়া আসিলেন, একটু ভঙ্গুর হাসিয়া বলিলেন—অর্জুন ভদ্র, আবার আপনার বিপদ উপস্থিত হয়েছে।'

বিদ্যুন্মালার মুখে এমন কিছু ছিল যাহা দেখিয়া অর্জুনের বুক দুরুদুরু করিয়া উঠিল, সে ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—'বিপদ।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'হাঁ, গুরুতর বিপদ। একবার যাকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন, তাকে আবার উদ্ধার করতে হবে।'

অর্জুন মূঢ়ের ন্যায় পুনরাবৃত্তি করিল—'উদ্ধার!'

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের মুখ পর্যন্ত চক্ষু তুলিয়া আবার বক্ষ পর্যন্ত নত করিলেন; অস্ফুট স্বরে বলিলেন—'হাঁ, উদ্ধার। আমাকে উদ্ধার করতে হবে। এখনো বুঝতে পারছেন না?'

অসহায়ভাবে মাথা নাড়িয়া অর্জুন বলিল—'না।'

'তবে বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

বিদ্যুন্মালা মল্লীমালিকাটি মণিবন্ধ হইতে পাকে পাকে খুলিয়া দুই হাতে ধরিলেন, তারপর অর্জুন কিছু বুঝিবার পূর্বেই মালিকাটি তাহার গলায় পরাইয়া দিলেন।

অর্জুন ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিল—'রাজকুমারি, এ কি করলেন?'

থরথর কম্পিত অধরে হাসি আনিয়া বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'স্বয়ংবরা হলাম!'

তিনি একটি পাষাণ-পট্টের উপর বসিয়া পড়িলেন। প্রগল্‌ভতা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তাই এইটুকু অভিনয় করিয়া তাঁহার দেহমনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল।

অর্জুন আসিয়া তাঁহার পায়ের কাছে বসিল; ব্যাকুল চক্ষে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অলক্ষিতে আকাশে আলো মৃদু হইয়া আসিতেছে।

অর্জুন মিনতির স্বরে বলিল—'রাজকুমারি, আপনি ক্ষণিক বিভ্রমে ভুল করে ফেলেছেন। আপনার মালা ফিরিয়ে নিন। আমি প্রাণান্তেও কাউকে কিছু বলব না।'

বিদ্যুন্মালা আকাশের পানে চাহিলেন, মাথা নাড়িয়া বলিলেন—'আর তা হয় না। কিন্তু আজ আমি যাই, অন্ধকার হয়ে গেছে। কাল আবার আসব। কাল কিন্তু আর তোমাকে 'আপনি' বলতে পারব না; তুমিও আমাকে 'তুমি' বলবে।'

ছায়ার ন্যায় বিদ্যুন্মালা অন্তর্হিতা হইলেন।

অর্জুন গুহায় ফিরিল। মঞ্জিরা এখনো খাদ্য লইয়া আসে নাই। বলরাম প্রদীপ জ্বালিয়া মৃদঙ্গ লইয়া বসিয়াছে, আপন মনে গান ধরিয়াছে—

ন কুরু নিতম্বিনি গমনবিলম্বনমনুসর তং হৃদয়েশম্।

অর্জুন গলা হইতে মালা খুলিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছিল; বলরাম মালা দেখিয়া গান থামাইল; বলিল—'মালা কোথায় পেলে? পান-সুপারি বাজারে গিয়েছিলে নাকি?'

অর্জুন একটু স্থির থাকিয়া বলিল—'না, একটি মেয়ে দিয়েছে।'

বলরাম উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল—'আরে বাঃ! তুমিও একটি মেয়ে জুটিয়ে ফেলেছ! বেশ বেশ। তো—কে মেয়েটি? রাজপুরীর পুরন্ধ্রী নিশ্চয়।'

অর্জুন বলিল—'হাঁ, রাজপুরীর পুরন্ধ্রী। কিন্তু নাম বলতে নিষেধ আছে।'

এই সময় নৈশাহারের পাত্র মাথায় লইয়া মঞ্জিরা উপস্থিত হইল। মালার প্রসঙ্গ স্থগিত হইল।

সে-রাতে অর্জুন শয্যায় শয়ন করিয়া অনেকক্ষণ জাগিয়া রহিল। গভীর দুঃখ ও বিজয়োল্লাস একসঙ্গে অনুভব করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার তাহার জীবনে কেন ঘটিল। বিদ্যুন্মালাকে সে দেখিয়াছে শ্রদ্ধার চোখে, সম্ভ্রমের চোখে। কিন্তু তিনি মনে মনে তাহাকে কামনা করিয়াছেন। তিনি রাজকন্যা, রাজার বাগ্‌দত্তা বধূ; আর অর্জুন অতি সামান্য মানুষ। কী করিয়া ইহা সম্ভব হইল! তারপর—এখন কী হইবে? ইহার পরিণাম কোথায়? যেভাবে বলরাম মঞ্জিরাকে ভালবাসে সেভাবে অর্জুন বিদ্যুন্মালাকে ভালবাসে না। সম্ভ্রম ও পদমর্যাদার বিপুল ব্যবধান তাহাদের মাঝখানে। তাহাদের মধ্যে যে কোনপ্রকার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটিতে পারে ইহা তাহার কল্পনার অতীত। উপরন্তু সে রাজার ভৃত্য, রাজার বাগ্‌দত্তা বধূর প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে কোন্ স্পর্ধায়!

উত্তপ্ত মস্তিষ্কের অসংযত দিগ্‌ভ্রান্ত চিন্তা নিষ্পন্ন হইবার পূর্বেই অর্জুন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিল শেষ রাত্রে। মল্লীমালার ম্রিয়মাণ গন্ধ তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

মালাটি তাহার বুকের কাছে ছিল। সে তাহা মুষ্টিতে লইয়া একবার সজোরে পেষণ করিল, তারপর দূরে সরাইয়া রাখিল। যাহাতে ওই গন্ধ নাকে না আসে।

কিন্তু ঘুম আর আসিল না। মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তা-ঊর্ণনাভ জাল বুনিতে আরম্ভ করিল।

সেদিন সন্ধ্যাকালে পাথরের আড়ালে অর্জুন ও বিদ্যুন্মালার নিম্নরূপ কথোপকথন হইল :

অর্জুন বলিল—'তুমি রাজকন্যা। আমি সামান্য মানুষ।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'তুমি সামান্য মানুষ নও। তুমি যদুকুলোদ্ভব, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তোমার পূর্বপুরুষ।'

বিদ্যুন্মালা বেদীর মত একটি প্রস্তরখণ্ডে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় বসিয়াছেন, অর্জুন তাঁহার সম্মুখে সমতল ভূমিতে পিছনে পা মুড়িয়া উপবিষ্ট। বিদ্যুন্মালার চক্ষু অর্জুনের মুখের উপর নিশ্চলভাবে নিবদ্ধ। তিনি যেন জীবন বাজি রাখিয়া পাশা খেলিতেছেন। অর্জুনের দৃষ্টি পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মত এদিক-ওদিক ছটফট করিয়া ফিরিতেছে।

অর্জুন বলিল—'তুমি মহারাজ দেবরায়ের বাগ্‌দত্তা।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি কাউকে বাগ্‌দান করিনি। রাজায় রাজায় রাজনৈতিক চুক্তি হয়েছে, আমি কেন তার দ্বারা আবদ্ধ হব?'

'তোমার পিতা তোমাকে দান করেছেন।'

'আমি কি পিতার তৈজস? আমার কি স্বতন্ত্র সত্তা নেই।'

শাস্ত্রে বলে স্ত্রীজাতি কখনো স্বাতন্ত্র্য পায় না।'

'ও শাস্ত্র আমি মানি না। আমার হৃদয় আমি যাকে ইচ্ছা দান করব।'

'তুমি অপাত্রে হৃদয় দান করেছ।'

'ও কথা আগে হয়ে গেছে। তুমি অপাত্র নও।'

অর্জুন কিছুক্ষণ নতমুখে রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল—'আমার দিক থেকে কথাটা চিন্তা করে দেখেছ?'

বিদ্যুন্মালার মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামিয়া আসিল, চক্ষু বর্ষণ-শঙ্কিত হইল। তিনি বিদীর্ণ কণ্ঠে বলিলেন—'তুমি কি আমাকে চাও না?'

অর্জুন ক্লান্ত মস্তক বিদ্যুন্মালার জানুর উপর রাখিল, বিধুর কণ্ঠে বলিল—'চাওয়া না-চাওয়ার অবস্থা পার হয়ে গেছে। তিন দিন আগে আমি সজ্জন ছিলাম, আজ আমি কৃতঘ্ন বিশ্বাসঘাতক। রাজা আমাকে ভালবাসেন, আমাকে পরম বিশ্বাসের কাজ দিয়েছেন; আর আমি প্রতি মুহূর্তে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তুমি আমার এ কী সর্বনাশ করলে?'

বিদ্যুন্মালার মুখের মেঘ কাটিয়া গিয়া ভাস্বর আনন্দ ফুটিয়া উঠিল। বিজয়িনীর আনন্দ। তিনি অর্জুনের মাথায় হাত রাখিয়া কোমল স্বরে বলিলেন—'কেন তুমি মিছে কষ্ট পাচ্ছ! রাজা হৃদয়বান লোক, তিনি তোমায় স্নেহ করেন, সবই সত্যি। কিন্তু তাঁর অনেক ভৃত্য পরিচর আছে, তুমি না থাকলেও তাঁর চলবে। এবং তিনি না থাকলেও তোমার চলবে। তুমি এ দেশের অধিবাসী নও। তুমি রাজার কাজ ছেড়ে দাও। চল, আমরা চুপি চুপি এদেশ ছেড়ে পালিয়ে যাই।'

অর্জুন চমকিয়া মুখ তুলিল, বিভ্রান্ত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'এ দেশ ছেড়ে চলে যাব! এই অমরাবতী ছেড়ে পালিয়ে যাব! কোথায় যাব? ম্লেচ্ছের দেশে? না, আমি পারব না।'

সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিদ্যুন্মালাও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া তাহার হাত ধরিলেন। তিনি কিছু বলিবার উপক্রম করিয়াছেন, এমন সময় প্রস্তরস্তম্ভের অন্তরাল হইতে শব্দ শুনিয়া থমকিয়া গেলেন। অর্জুন শরীর শক্ত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

শব্দটা আর কিছু নয়, মঞ্জিরা আপন মনে গানের কলি গুঞ্জরণ করিতে করিতে খাবার লইয়া গুহার দিকে যাইতেছে। দুইজনে রুদ্ধশ্বাসে দাঁড়াইয়া রহিলেন, মঞ্জিরা তাঁহাদের দেখিতে পাইল না, তাহার গানের গুঞ্জন দূরে মিলাইয়া গেল।

বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কানে অধর স্পর্শ করিয়া চুপি চুপি বলিলেন—'আজ যাই। কাল আবার আসব।'

তিনি জ্যোৎস্না-কুহেলির মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অর্জুন হর্ষ-বিষাদ ভরা অন্তরে গুহায় ফিরিতে ফিরিতে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, কাল আর সে বিদ্যুন্মালার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে না।

কিন্তু প্রতিজ্ঞা রহিল না। পরদিন সে যথাকালে যথাস্থানে আবার উপস্থিত হইল। যৌবন ও বিবেকবুদ্ধির দড়ি-টানাটানি চলিতে লাগিল।

এইভাবে কয়েকদিন কাটিল। কিন্তু সমস্যার নিষ্পত্তি হইল না।

পাঁচ

মহারাজ দেবরায় সৈন্য পরিদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন কৃষ্ণ পক্ষের দশমী তিথিতে, শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে অগ্রদূত আসিয়া সংবাদ দিল, আগামী কল্য পূর্বাহ্ণে মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। রাজপুরী এই এক পক্ষকাল যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, আবার চন্‌মনে হইয়া উঠিল।

মণিকঙ্কণার হৃদয় আনন্দের হিন্দোলায় দুলিতেছে। কাল মহারাজ আসিবেন, কতদিন পরে তাঁহার দর্শন পাইব! প্রতীক্ষার উত্তেজনায় সে আত্মহারা। দিন কাটে তো রাত কাটে না।

বিদ্যুন্মালার মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। রাজার অনুপস্থিতি কালে তিনি প্রবল হৃদয়বৃত্তির স্রোতে অবাধে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, বাধাবিঘ্নগুলি ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছিল; এখন বাধাবিঘ্নগুলি পর্বতপ্রমাণ উচ্চ হইয়া দাঁড়াইল। ভয়ে তাঁহার বুক শুকাইয়া গেল। তাঁহার সঙ্কল্প তিলমাত্র বিচলিত হইল না, কিন্তু সঙ্কল্প সিদ্ধির সম্ভাবনা কঠিন নৈরাশ্যের আঘাতে ভূমিসাৎ হইল। কী হইবে! অর্জুন পলায়ন করিতে অসম্মত। তবে কি মৃত্যু ভিন্ন এ সঙ্কট হইতে উদ্ধারের অন্য পথ নাই? বিদ্যুন্মালা উপাধানে মুখ গুঁজিয়া নীরবে কাঁদিলেন, চোখের জলে উপাধান সিক্ত হইল। কিন্তু অন্ধকারে পথের দিশা মিলিল না।

অর্জুনের অবস্থা বিদ্যুন্মালার অনুরূপ হইলেও তাহার মনে অনেকখানি আত্মগ্লানি মিশ্রিত আছে। বিদ্যুন্মালাকে সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভালবাসিয়াছে, কিন্তু সমস্ত প্রাণ উৎসর্গ করিয়া ভালবাসিয়াছে, মনের মধ্যে এমন নিবিড় প্রেমের অনুভূতি পূর্বে তাহার অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু প্রেম যত গভীরই হোক, তাহার দ্বারা অপরাধ বোধ তো দূর হয় না। প্রেম যখন সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়াছে তখনো মস্তিষ্কের মধ্যে চিন্তার ক্রিয়া চলিয়াছে—আমি রাজার সহিত কৃতঘ্নতা করিয়াছি; যিনি আমার অন্নদাতা, যিনি আমার প্রভু, তাঁহারই সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। কেন বিদ্যুন্মালার প্রেম প্রথমেই প্রত্যাখ্যান করি নাই, কেন বার বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি? এখন কী হইবে? রাজার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইব কেমন করিয়া? তাঁহার চোখে চোখ রাখিয়া চাহিব কোন্ সাহসে? তিনি যদি মুখ দেখিয়া মনের কথা বুঝিতে পারেন!...এ কথা কাহাকেও বলিবার নয়। বলরামকেও সে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। বলরাম তাহার চিত্তবিক্ষোভ লক্ষ্য করিয়াছে, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করিয়াছে, কিন্তু সত্য উত্তর পায় নাই। সে ভাবিয়াছে অর্জুনের হৃদয় এখনো পিতৃশোকে মুহ্যমান।

এদিকের এই অবস্থা। ওদিকে কুমার কম্পন রাজার আশু প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া সর্বাঙ্গে উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করিলেন। সময় উপস্থিত; আর বিলম্ব নয়। এবার গৃহপ্রবেশের নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হইবে। যাহারা রাজার বিশ্বাসী প্রিয়পাত্র কেবল সেইসব মন্ত্রী সভাসদকে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। তারপর সকলে একত্রিত হইলে রাজার সঙ্গে সকলকে একসঙ্গে নির্মূল করিতে হইবে। কবে নিমন্ত্রণ করিলে ভাল হয়? কাল রাজা ফিরিবেন, হয়তো ক্লান্ত দেহে নিমন্ত্রণ রক্ষা না করিতে পারেন। সুতরাং পরশ্বই শুভদিন।

কুমার কম্পন বাছা বাছা রাজপুরুষদের নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন এবং নবনির্মিত গৃহে অতিথিসৎকারের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

পিতা বীরবিজয়ের কথাও কম্পন ভুলিলেন না। বুড়া তাঁহাকে দু'চক্ষে দেখিতে পারেন না। তাঁহার সদ্‌গতি করিতে হইবে।

পরদিন মধ্যাহ্নের দুই দণ্ড পূর্বে মহারাজ দেবরায় ডঙ্কা বাজাইয়া সদলবলে পুরীতে ফিরিয়া আসিলেন। সভাগৃহের বহিঃপ্রাঙ্গণে বৃহৎ জনতা অপেক্ষা করিতেছিল, তন্মধ্যে দুইজন প্রধান; কুমার কম্পন এবং ধন্নায়ক লক্ষ্মণ। সাত শত পুরপ্রহরিণী শঙ্খ বাজাইয়া তুমুল নির্ঘোষে রাজার সম্বর্ধনা করিল।

রাজা অশ্ব হইতে অবতরণ করিতেই কুমার কম্পন ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার জানু স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, বলিলেন—'আর্য, আপনি ছিলেন না, রাজপুরী অন্ধকার ছিল, আজ এক পক্ষ পরে আবার সূর্যোদয় হল।'

কুমার কম্পন অতিশয় মিষ্টভাষী, কিন্তু তাঁহার মুখেও কথাগুলি চাটুবাক্যের মত শুনাইল। রাজা একটু হাসিলেন, ভ্রাতার স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তোমার সংবাদ শুভ? গৃহপ্রবেশের আর বিলম্ব কত?'

কম্পন বলিলেন—'গৃহ প্রস্তুত! কেবল আপনার জন্য গৃহপ্রবেশ স্থগিত রেখেছি। কাল সন্ধ্যার সময় আপনাকে আমার নূতন গৃহে পদার্পণ করতে হবে আর্য। কাল আমার গৃহপ্রবেশের শুভমুহূর্ত স্থির হয়েছে।'

রাজা বলিলেন—'তোমার নূতন গৃহে অবশ্য পদার্পণ করব।'

'ধন্য।' কম্পন আর দাঁড়াইলেন না, বেশি কথা বলিলে পাছে মনোগত অভিপ্রায় প্রকাশ হইয়া পড়ে তাই তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিলেন।

রাজা তখন মন্ত্রী উপমন্ত্রী সভাসদ্ বিদেশীয় রাষ্ট্রদূত প্রভৃতি সমবেত প্রধানদের দিকে ফিরিলেন। প্রত্যেককে মিষ্ট সম্ভাষণ করিয়া কিছু সংবাদের আদান-প্রদান করিয়া বিরাম-ভবনে প্রবেশ করিলেন।

ইতিমধ্যে পিঙ্গলা আসিয়া দ্বিতলের বিশ্রামকক্ষের তত্ত্বাবধান করিয়াছিল, পাচকেরা রান্না চড়াইয়াছিল। রাজা অত্বরিতভাবে স্নান করিলেন, তারপর ধীরে সুস্থে আহারে বসিলেন। আহার শেষ হইতে বেলা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল।

রাজা পালঙ্কে অঙ্গ প্রসারিত করিলেন। পিঙ্গলা ভূমিতলে বসিয়া পান সাজিতে প্রবৃত্ত হইল। রাজা অলসকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—'কলিঙ্গ-রাজকুমারীদের সংবাদ নিয়েছ?'

পিঙ্গলা বলিল—'তাঁহারা কুশল আছেন আর্য।'

এই সময় নব জলধরে বিজুরিরেখার ন্যায় মণিকঙ্কণা কক্ষে প্রবেশ করিল; ছায়াচ্ছন্ন কক্ষটি তাহার রূপের প্রভায় প্রভাময় হইয়া উঠিল।

তাহাকে দেখিয়া মহারাজ সহাস্যমুখে শয্যায় উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিলেন; মণিকঙ্কণা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল—'উঠবেন না মহারাজ, আপনি বিশ্রাম করুন। পিঙ্গলা, তুমি ওঠো, আজ আমি মহারাজকে পান সেজে দেব।'

পিঙ্গলা হাসিমুখে সরিয়া দাঁড়াইল। মণিকঙ্কণা তাহার স্থানে বসিয়া পান সাজিতে লাগিয়া গেল। রাজা পাশ ফিরিয়া অর্ধশয়ানভাবে তাহার তাম্বূল রচনা দেখিতে লাগিলেন। পিঙ্গলা স্মিতমুখে বলিল—'ধন্য রাজকুমারী! পান সাজতেও জানেন!'

মণিকঙ্কণা পর্ণপত্রে খদির লেপন করিতে করিতে বলিল—'কেন জানব না! কতবার মাতাদের পান সেজে দিয়েছি। কলিঙ্গ দেশে পানের খুব প্রচলন। তবে উপকরণে বিশেষ আছে। পানের সঙ্গে গুয়া খদির কর্পূর দারুচিনি তো থাকেই, চুয়া কেয়া-খদির নারঙ্গফুলের ত্বক্, কেশর প্রভৃতিও থাকে। —এই নিন মহারাজ।'

মণিকঙ্কণা উঠিয়া পানের তবক রাজার সম্মুখে ধরিল; তিনি সেটি মুখে দিয়া কিছুক্ষণ চিবাইলেন, তারপর বলিলেন—'চমৎকার পান! তুমি এত ভাল পান সাজতে পার জানলে আগেই তোমার শরণ নিতাম। কাল থেকে তুমি নিত্য দ্বিপ্রহরে এসে আমার পান সেজে দেবে।'

মণিকঙ্কণা কৃতার্থ হইয়া বলিল—'তাই দেব মহারাজ। আমাদের সঙ্গে কিছু কলিঙ্গদেশীয় পানের উপকরণ আছে, তাই দিয়ে পান সেজে দেব।'

সে আবার পানের বাটা লইয়া বসিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিঃশব্দপদে ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ প্রবেশ করিলেন। মণিকঙ্কণা বলিল—'ওমা, মন্ত্রীমশায় এলেন। এবার বুঝি রাজকার্য হবে। আমি তাহলে যাই।' রাজার প্রতি দীর্ঘ বিলম্বিত দৃষ্টি সম্পাত করিয়া সে নিষ্ক্রান্ত হইল।

মন্ত্রী পালঙ্কের শিয়রের দিকে ভূমিতলে বসিলেন। পিঙ্গলা তাম্বূলকরঙ্ক তাঁহার দিকে আগাইয়া দিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। রাজার সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া ফিরিবার পর সে এখনো পলকের জন্য বিশ্রাম পায় নাই।

রাজা ও মন্ত্রীর মধ্যে বাক্যালাপ আরম্ভ হইল। মন্ত্রী মহাশয়ের নিবেদন করিবার বিশেষ কিছু ছিল না, তিনি সংক্ষেপে রাজ্য সম্বন্ধীয় বক্তব্য পেশ করিয়া বলিলেন—'একটা সংবাদ আছে; হুক্ক-বুক্কর প্রেতাত্মা দেখা দিয়েছে।'

রাজা শয্যায় উঠিয়া বসিলেন—'হুক্ক-বুক্ক দেখা দিয়েছেন? কে দেখেছে?'

মন্ত্রী বলিলেন—'অর্জুন ও বলরামের গুহা পাহারা দেবার জন্য যাদের নিয়োগ করেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন দেখেছে। অর্জুন ও বলরামও দেখেছে।'

'হুঁ।' মহারাজ কর্ণের মণিকুণ্ডল অঙ্গুলিতে ধরিয়া একটু নাড়াচাড়া করিলেন—'অনেক দিন পরে হুক্ক-বুক্ক দেখা দিলেন। সেই আহমদ শা সুলতান হয়ে যখন বিজয়নগর আক্রমণ করেছিল তার আগে দেখা দিয়েছিলেন। আশঙ্কা হয়, দারুণ বিপদ আসন্ন। কিন্তু কোন্ দিক দিয়ে আসবে বুঝতে পারছি না।'

মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—'সীমান্তের অবস্থা কেমন দেখলেন।'

রাজা বলিলেন—'শত্রুর তৎপরতার কোনো চিহ্ন পেলাম না। আমার সীমান্তরক্ষী সেনাদল একটু ঝিমিয়ে পড়েছিল, আমাকে দেখে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠেছে।'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ কুচকুচ করিয়া সুপারি কাটিলেন, তারপর নিজের জন্য পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন—'কুমার কম্পন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে বাছা বাছা কয়েকজন সদস্যকে নিমন্ত্রণ করেছেন। আমিও নিমন্ত্রিত হয়েছি। আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।'

'কী ভাল লাগছে না?'

'এই নিমন্ত্রণের ভাবভঙ্গী। সন্দেহ হচ্ছে কুমার কম্পনের কোনো প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি আছে। যে দ্বাদশ ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করেছেন তাদের কারুর সঙ্গেই তাঁর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা নেই।'

'কিন্তু—প্রচ্ছন্ন অভিসন্ধি কী থাকতে পারে?'

'তা জানি না। মহারাজ, আপনিও নিমন্ত্রিত, আমার মনে হয় আপনার না যাওয়াই ভাল।'

রাজার ললাট মেঘাচ্ছন্ন হইল, তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন—'কম্পন আমাকে ভালবাসে, সে আমার অনিষ্ট করবার চেষ্টা করবে, আমি ভাবতেও পারি না। তাছাড়া আমার অনিষ্ট করবার ক্ষমতা তার নেই। —আপনিও তো নিমন্ত্রিত হয়েছেন, আপনি কি যাবেন না?'

মন্ত্রী পান মুখে দিয়া বলিলেন—'না মহারাজ, আমি যাব না। হুক্ক-বুক্ক দেখা দিয়েছেন, এ সময় আমাদের সকলেরই সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

এ প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্বেই দ্বাররক্ষিণী আসিয়া জানাইল, অর্জুনবর্মা ও বলরাম রাজার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

রাজার অনুমতি পাইয়া দুইজনে আসিয়া পালঙ্কের পদপ্রান্তে বসিল। অর্জুন রাজার মুখের

দিকে একবার চক্ষু তুলিয়াই চক্ষু নত করিল। বলরাম যুক্ত করে বলিল—'আর্য, কামান তৈরি হয়েছে। সঙ্গে এনেছিলাম, প্রহরিণীর কাছে গচ্ছিত আছে।'

রাজা প্রহরিণীকে ডাকিয়া কামান আনিতে বলিলেন। কামান আসিলে প্রহরিণীকে বলিলেন—'বলরাম বা অর্জুন যদি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আমার কাছে আসতে চায়, তাদের বাধা দিও না।'

প্রহরিণী প্রস্থান করিলে বলরাম উঠিয়া কামান রাজার হাতে দিল। একহস্ত পরিমাণ যন্ত্রটি, দেখিতে অনেকটা বক-যন্ত্রের মত। রাজা সেটিকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীর হাতে দিলেন, বলিলেন—'যন্ত্রের প্রক্রিয়া বুঝেছি। যন্ত্র চালিয়ে দেখেছ?'

বলরাম বলিল—'আজ্ঞা দেখেছি, ঠিক চলে। অর্জুন আর আমি একদিন বনের মধ্যে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখেছি। পঞ্চাশ হাত দূর পর্যন্ত প্রাণঘাতী লক্ষ্যভেদ করতে পারে।'

রাজা বলিলেন—'ভাল, আমিও পরীক্ষা করে দেখতে চাই। কাল প্রত্যুষে তোমরা আসবে, দক্ষিণের জঙ্গলে পরীক্ষা হবে। পরীক্ষার জন্য কি কি বস্তু প্রয়োজন?'

বলরাম বলিল—'বেশি কিছু নয় আর্য, গোটা তিনেক মাটির কলসী হলেই চলবে। বাকি যা কিছু—গুলি বারুদ কার্পাসবস্ত্র, নারিকেল-রজ্জু—আমি নিয়ে আসব।'

রাজা প্রশ্ন করিলেন—লৌহ-নালিকা প্রস্তুতের কৌশল প্রকাশ করতে চাও না?'

বলরাম আবার যুক্তপাণি হইল—'মহারাজ, এটি আমার নিজস্ব গুপ্তবিদ্যা। যদি উপযুক্ত শিষ্য পাই তাকে শেখাব।'

'ভাল। তুমি একা এই লঘু কামান কত তৈয়ার করতে পার?'

'মাসে তিনটা তৈয়ার করতে পারব।'

রাজা ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন—'তবে তোমার গুপ্তবিদ্যা গুপ্তই থাক। অন্তত শত্রুপক্ষ জানতে পারবে না।'

পরদিন উষাকালে রাজা বলরাম ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণের জঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। জঙ্গল নামমাত্র, রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক গাছপালার ফাঁকে শিলাকীর্ণ অসম ভূমি। তিনটি মৃৎকলস পাশাপাশি বসাইয়া বলরাম কলস হইতে পঞ্চাশ হাত দূরে সরিয়া আসিয়া লক্ষ্যভেদের জন্য প্রস্তুত হইল।

প্রথমে সে কামানটির নলের মুখ দিয়া অর্ধমুষ্টি বারুদ প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া ক্ষুদ্র একখণ্ড কার্পাস নলের মুখে ঠাসিয়া দিল; কামানের পশ্চাদ্ভাগে সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে একটু বারুদের গুঁড়া দেখা গেল। তখন সে নলের মুখে মটরের মতো কয়েকটি লৌহগুটিকা প্রবিষ্ট করাইয়া আবার কার্পাসখণ্ড দিয়া মুখ বন্ধ করিল। বলিল—'মহারাজ, কামান তৈরি। এখন আগুন দিলেই গুলি বেরুবে।'

রাজা বলিলেন—'দাও আগুন।'

বলরাম একটি অগ্নিমুখ নারিকেল-রজ্জু সঙ্গে আনিয়াছিল, সে কলসীর দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়া কামানের পিছন দিকে অগ্নিস্পর্শ করিল। অমনি সশব্দে কামান হইতে গুলি বাহির হইয়া পঞ্চাশ হাত দূরের তিনটি কলস চূর্ণ করিয়া দিল।

রাজা সহর্ষে বলরামের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—ধন্য! আজ থেকে অর্জুনের মত তুমিও আমার ভৃত্য হলে। —এই লঘু কামান আমি নিলাম।'

ছয়

সন্ধ্যার পর কুমার কম্পনের নূতন প্রাসাদ দীপমালায় সজ্জিত হইয়াছিল। প্রাসাদের তোরণশীর্ষে একদল বাদ্যকর মধুর বাদ্যধ্বনি করিতেছিল। গৃহপ্রবেশের শুভমুহূর্ত সমাগত।

প্রাসাদে এখনো পুরস্ত্রীগণের শুভাগমন হয় নাই। কেবল কয়েকজন যণ্ডামার্ক ভৃত্য আছে; আর আছে স্বয়ং কুমার কম্পন।

অতিথিরা একে একে আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা সংখ্যায় বেশি নয়, মাত্র দ্বাদশ জন।

কুমার কম্পন পরম সমাদরের সহিত সকলকে গোষ্ঠাগারে বসাইলেন। তাঁহার মুখের অম্লান হাসির উপর মনের আরক্ত ছায়া পড়িল না।

দ্বাদশজন সমবেত হইলে কুমার কম্পন বলিলেন—'আমি মানস করেছি আমার গৃহের প্রত্যেকটি কক্ষে একটি করে অতিথিকে ভোজন করাব। তাহলে আমার সমস্ত গৃহ পবিত্র হবে।'

অতিথিরা হর্ষ জ্ঞাপন করিলেন। কুমার কম্পন একজনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—'জীমূতবাহন ভদ্র, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনি আগে আসুন।'

বয়োজ্যেষ্ঠ জীমূতবাহন ভদ্র গাত্রোত্থান করিয়া কুমার কম্পনের অনুসরণ করিলেন। বাকি সকলে বসিয়া নিজ নিজ বয়সের তুলনামূলক আলোচনা করিতে লাগিলেন।

কুমার কম্পন অতিথিকে একটি কক্ষে লইয়া গেলেন। বহু দীপের আলোকে কক্ষটি প্রভাম্বিত, শঙ্খশুভ্র কুট্টিমের উপর শ্বেতপ্রস্তরের পীঠিকা, পীঠিকার সম্মুখে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনপরিপূর্ণ থালি। দুইজন ভৃত্য অদূরে দাঁড়াইয়া আছে, একজনের হাতে ভৃঙ্গার ও পানপাত্র, অন্য ভৃত্য চামর লইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

কুমার কম্পন অতিথিকে বলিলেন—'আসন গ্রহণ করুন ভদ্র।'

ভদ্র পীঠিকায় উপবিষ্ট হইলেন। কুমাব কম্পন বলিলেন—'অগ্রে ফলাম্লরস পান করুন ভদ্র।'

ভৃত্য পানপাত্রে পানীয় ঢালিয়া ভদ্রের হাতে দিল, ভদ্র পানপাত্র মুখে দিযা এক নিশ্বাসে পান করিলেন। পাত্র ভৃত্যের হাতে প্রত্যার্পণ করিয়া তিনি ক্ষণকাল স্থিব হইয়া রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িলেন।

কুমার কম্পন অপলক নেত্রে অতিথিকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন; তাঁহার মুখে চকিত হাসি ফুটিল। অব্যর্থ বিষ, বিষবৈদ্য যাহা বলিয়াছিল তাহা মিথ্যা নয়। তিনি ভৃত্যদের ইঙ্গিত করিলেন, ভৃত্যেরা অতিথির মৃতদেহ ধরাধরি করিয়া পিছনের দ্বার দিয়া প্রস্থান করিল।

কুমার কম্পনের মস্তকে ধীরে ধীরে হত্যার মাদকতা চড়িতেছে, চোখের দৃষ্টি ঈষৎ অরুণাভ হইয়াছে। তিনি অন্য অতিথিদের কাছে ফিরিয়া গেলেন, মধুর হাসিয়া বলিলেন—'ভদ্র কুমারাপ্পা, এবার আপনি আসুন।'

কুমারাপ্পা মহাশয় গাত্রোত্থান কবিলেন।

এইভাবে কুমার কম্পন একটির পর একটি করিয়া দ্বাদশটি অতিথির সৎকার করিলেন। এই কার্য সমাপ্ত করিতে একদণ্ড সময়ও লাগিল না।

কুমার কম্পনের মাথায় রক্তের নেশা পাক খাইতেছে, তিনি চারিদিক রক্তবর্ণ দেখিতেছেন, সমস্ত দেহ থাকিয়া থাকিয়া অসহ্য অধীরতায় ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিতেছে। রাজা এখনো আসিতেছে না কেন! তবে কি আসিবে না! যদি না আসে?

গৃহে ভৃত্যেরা ছাড়া অন্য কেহ নাই। অন্য কেহ আসিবে না। যাহারা আসিয়াছিল তাহারা নিঃশেষিত হইয়াছে। বাকি শুধু রাজা। রাজা যদি কিছু সন্দেহ করিয়া থাকে সে আসিবে না। লক্ষ্মণ মল্লপও আসে নাই, হয়তো লক্ষ্মণ মল্লপই রাজাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছে—!

কুমার কম্পনের মাথার মধ্যে রক্তস্রোত তোলপাড় করিতেছিল, অধিক সূক্ষ্ম চিন্তা করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। রাজা যদি না আসে আমিই তাহার কাছে যাইব। সে এই সময় একাকী বিরামকক্ষে থাকে। যদি বা লক্ষ্মণ মল্লপ সঙ্গে থাকে তবে একসঙ্গে দু'জনকেই বধ করিব।

ভৃত্যদের সাবধান করিয়া দিয়া কুমার কম্পন একটি ক্ষুদ্র ছুরিকা কটিবস্ত্রে বাঁধিয়া লইলেন; তারপর গৃহ হইতে বাহির হইলেন। তোরণশীর্ষে মধুর বাদ্যধ্বনি চলিতে লাগিল।

তোরণের বাহিরে আসিয়া একটা কথা কুমার কম্পনের মনে পড়িল, তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধ পিতা বিজয়রায়। সে কনিষ্ঠ পুত্রকে দেখিতে পারে না, সে যদি বাঁচিয়া থাকে তবে নানা অনর্থ ঘটাইবে। সুতরাং তাহাকেই সর্বাগ্রে বিনাশ করা প্রয়োজন।

রাজ-পিতা বিজয়রায়ের ভবন অধিক দূর নয়, কুমার কম্পন সেইদিকে চলিলেন।

বিজয়রায়ের ভবন পাহারার ব্যবস্থা নামমাত্র, ভবন-দাসীর সংখ্যাও বেশি নয়; বৃদ্ধ ঘটা-চটা ভালবাসেন না। তোরণদ্বারের কাছে দুইজন প্রহরী বসিয়া দুইজন ভবন-দাসীর সঙ্গে রসালাপ করিতেছিল; কুমার কম্পনকে দেখিয়া তাহারা সন্ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমার কম্পন পিতৃভবনে কখনো আসেন না।

তিনি কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ভবনে প্রবেশ করিলেন। ভৃত্যেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। পুত্র পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আশঙ্কার কথা কিছু নাই, তাহারা ভাবিতে লাগিল শিষ্টাচারের কোনো ত্রুটি হইল কিনা।

ভবনের দ্বিতলে বসিয়া বিজয়রায় তখন এক নূতন মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতেছিলেন। যবচূর্ণ শক্তু তালের রসে মাখিয়া পিণ্ডক্ষীরের সহিত থাসিয়া পাক করিলে উত্তম নাড়ু হয় কিনা পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় কম্পন গিয়া দাঁড়াইলেন।

বিজয়রায় মুখ তুলিয়া ভ্রূকুটি করিলেন, বলিলেন—'কম্পন! কী চাও?'

কুমার কম্পন উত্তর দিলেন না, ক্ষিপ্রহস্তে কটি হইতে ছুরিকা লইয়া পিতার বক্ষে আঘাত করিলেন। ছুরিকা পঞ্জরের অন্তর দিয়া হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করিল। বিজয়রায় চিৎ হইয়া পড়িয়া গেলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কেবল একটি ত্রস্ত-বিস্মিত শব্দ বাহির হইল—'অধম—!' তারপর তাঁহার অক্ষিপটল উল্টাইয়া গেল।

কম্পন তাঁহার বক্ষ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া আবার কটিতে রাখিলেন। পিতার মুখের পানে আর চাহিলেন না, দ্রুত নামিয়া চলিলেন।

সূর্যাস্তকালে অর্জুন অভ্যাসমত সভাগৃহের প্রাঙ্গণে আসিয়াছিল। অভ্যাসবশতই লাঠি দু'টি তাহার সঙ্গে ছিল। ক্রমে সন্ধ্যা হইল, মহারাজ সভাভঙ্গ করিয়া দ্বিতলে প্রস্থান করিলেন। তবু অর্জুন প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার কোনো নিমিত্ত ছিল না, রাজা তাহাকে আহ্বান করেন নাই, কিন্তু তাহার মন তথাপি গুহায় ফিরিয়া যাইতে চাহিল না। এই গৃহে বিদ্যুন্মালা আছেন তাই কি সে নিজের অজ্ঞাতে এই গৃহের ছায়া ত্যাগ করিতে পারিতেছে না, অকারণে প্রাঙ্গণে ঘুরিয়া বেড়ায়? মানুষের মন দুর্জ্ঞেয়, মন কখন মানুষকে কোন দিকে টানিতেছে, কোন দিকে ঠেলিতেছে, কিছুই বোঝা যায় না।

চাঁদ উঠিয়াছে। প্রাঙ্গণ জনবিরল হইয়া গিয়াছে। সহসা অর্জুন দেখিল কুমার কম্পন আসিতেছেন। তাঁহার গতিভঙ্গিতে অস্বাভাবিক ব্যগ্রতা পবিদৃষ্ট হইতেছে। তিনি অর্জুনের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন না, সভাগৃহের দ্বারের অভিমুখে চলিলেন। অর্জুন চকিত হইয়া লক্ষ্য করিল তাঁহার কটিতে একটি ছুরিকা আবদ্ধ রহিয়াছে। কম্পন অবশ্য রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন, কিন্তু সঙ্গে ছুরি কেন? অস্ত্র লইয়া রাজার সম্মুখীন হওয়া নিষিদ্ধ। বিদ্যুদ্বেগে কয়েকটি চিন্তা তাহার মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল।

কুমার কম্পন সোপান বাহিয়া দ্রুতপদে উঠিতে লাগিলেন। সোপানের প্রতিহারিণীরা বাধা দিল না, কারণ রাজসকাশে কম্পনের অবাধ গতি।

কম্পন রাজার বিরামকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন দীপান্বিত কক্ষে অন্য কেহ নাই, রাজা পালঙ্কে শুইয়া চক্ষু মুদিয়া আছেন। বোধহয় নিদ্রিত। কম্পন ক্ষিপ্রচরণে সেইদিকে চলিলেন।

রাজা কিন্তু নিদ্রা যান নাই, চক্ষু মুদিয়া রাজ্য-চিন্তা করিতেছিলেন। পদশব্দে চক্ষু মেলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন। কম্পনের ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক নয়। রাজা ঈষৎ বিস্মিত স্বরে বলিলেন—'কম্পন, কী চাও?' তিনি গৃহপ্রবেশের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

কম্পনের হিংস্র মুখে হাসি ফুটিল। তিনি ছুরিকা হাতে লইয়া বলিলেন—'রাজ্য চাই।'

তারপর যাহা ঘটিল তাহা প্রায় নিঃশব্দে ঘটিল। রাজা নিরস্ত্র বসিয়া আছেন। কুমার কম্পন তাঁহার কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া ছুরি চালাইলেন। রাজা অবশে আত্মরক্ষার জন্য বাম বাহু তুলিলেন, ছুরি তাঁহার কফোণির নিম্নে বাহুর পশ্চাদ্দিকে বিদ্ধ হইল। প্রথমবার ব্যর্থ হইয়া কম্পন আবার ছুরি তুলিলেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ছুরি চালাইতে হইল না, অকস্মাৎ পিছন হইতে তীক্ষ্ণাগ্র বংশ-ভল্ল আসিয়া তাঁহার গ্রীবামূলে বিদ্ধ হইল। কম্পন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া পালঙ্কের সম্মুখে পড়িয়া গেলেন।

রাজাও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না, এক দৃষ্টে মৃত ভ্রাতার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বাহু হইতে গলগল ধারায় রক্ত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

'মহারাজ, আপনি আহত!'

রাজা অর্জুনের পানে চক্ষু তুলিলেন। অর্জুন দেখিল, রাজার চক্ষু অশ্রুসিক্ত।

রাজা কণ্ঠস্বর সংযত করিতে করিতে বলিলেন—'অর্জুন, তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছে।'

অর্জুন নীরব রহিল।

এই সময় পিঙ্গলা কক্ষে প্রবেশ করিল, রাজার রক্তাক্ত কলেবর দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল—'এ কী, মহারাজ আহত! কে এ কাজ করল? ওরে তোরা কে কোথায় আছিস ছুটে আয়—'

বিভিন্ন দ্বার দিয়া কঞ্চুকী পাচক প্রহরিণী অনেকগুলি লোক কক্ষে প্রবেশ করিল এবং রাজার শোণিতলিপ্ত দেহ দেখিয়া স্থাণুবৎ দাঁড়াইয়া পড়িল।

রাজা সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'কম্পন আমাকে হত্যা করতে এসেছিল, অর্জুন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। আমার আঘাত মারাত্মক নয়, তবে ছুরিকায় যদি বিষ থাকে—'

মণিকঙ্কণা পিঙ্গলার চিৎকার শুনিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, এখন ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে দুই বাহুতে জড়াইয়া লইল, তারপর ত্বরিতে উঠিয়া নিজের বস্ত্র হইতে পট্টিকা ছিঁড়িয়া রাজার বাহুর ঊর্ধ্বভাগে শক্ত করিয়া তাগা বাঁধিয়া দিল। গলদশ্রু নেত্রে অস্ফুটব্যাকুল কণ্ঠে বলিতে লাগিল—'দারুব্রহ্ম! এ কী হল—এ কী হল—'

ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার সহিত দেখা করিতে আসিতেছিলেন, কক্ষে ভিড় দেখিয়া তিনি ভিড় ঠেলিয়া সম্মুখে আসিলেন; রাজার অবস্থা এবং কুমার কম্পনের মৃতদেহ দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপার বুঝিয়া লইলেন। রাজার সহিত তাঁহার একবার দৃষ্টি বিনিময় হইল; রাজা করুণ হাসিয়া যেন তাঁহাকে জানাইলেন—তোমার সন্দেহই সত্য।

মুহূর্তমধ্যে লক্ষ্মণ মল্লপ সারথির বল্‌গা নিজ হস্তে তুলিয়া লইলেন; তাঁহার আকৃতি ভিন্নমূর্তি ধারণ করিল। তিনি সকলের দিকে আদেশের কণ্ঠে বলিলেন—'তোমরা এখানে কি করছ? যাও, নিজ নিজ স্থানে ফিরে যাও।—পিঙ্গলা, তুমি ছুটে যাও, শীঘ্র বৈদ্যরাজকে ডেকে নিয়ে এস।—অর্জুন, তুমি যেও না, তোমাকে প্রয়োজন হবে।'

কক্ষ শূন্য হইয়া গেল। কেবল মণিকঙ্কণা ও অর্জুন রহিল। বিদ্যুন্মালাও একবার কক্ষে আসিয়াছিলেন, দৃশ্য দেখিয়া নিজ কক্ষে ফিরিয়া গিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকিয়া শয্যাপার্শ্বে বসিয়া ছিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ মণিকঙ্কণাকে বলিলেন—'দেবিকা, আপনি এখন নিজ কক্ষে ফিরে যান, আর কোনো শঙ্কা নেই।'

মণিকঙ্কণা উঠিল না, রাজার পৃষ্ঠ বাহুবেষ্টিত করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল—'আমি যাব না।'

ভয়ঙ্কর বার্তা মুখে মুখে পৌরভূমির সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রানীদের কানে সংবাদ উঠিয়াছিল। তাঁহারা রাজাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু রাজার অনুমতি ব্যতীত

তাঁহাদের ভবন হইতে বাহিরে আসিবার অধিকার নাই। সকলে নিজ নিজ মহলে আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। দেবী পদ্মালয়াম্বিকা দীপহীন কক্ষে পুত্র মল্লিকার্জুনকে কোলে লইয়া পাষাণমূর্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন।

বৈদ্যরাজ দামোদর স্বামীর গৃহ রাজ-পুরভূমির মধ্যেই। সেদিন সন্ধ্যার পর রসরাজ মহাশয় তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই বৃদ্ধের মধ্যে ইত্যবসরে প্রণয় অতিশয় গাঢ় হইয়াছিল। দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া দ্রাক্ষাসব পান করিতেছিলেন; মৃদুমন্দ বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল। এমন সময় পিঙ্গলা ঝটিকার ন্যায় আসিয়া দুঃসংবাদ দিল। দুই বৃদ্ধ পরস্পরের হাত ধরিয়া উঠি-পড়ি ভাবে রাজভবনের দিকে ছুটিলেন। পিঙ্গলা ঔষধের পেটরা লইয়া সঙ্গে ছুটিল।

রাজার বিরাম-ভবন হইতে তখন কম্পনের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হইয়াছে। ইতিমধ্যে পিতার ও দ্বাদশজন সভাসদের মৃত্যুসংবাদও রাজা পাইয়াছেন। তিনি অবসন্ন দেহভার মণিকঙ্কণার দেহে অর্পণ করিয়া মুহ্যমানভাবে বসিয়া আছেন। ক্ষত হইতে অল্প রক্ত ক্ষরিত হইতেছে।

দামোদর ও হ্রস্বদৃষ্টি রসরাজ দ্রুত স্খলিত পদে প্রবেশ করিলেন। দামোদর হাত তুলিয়া বলিলেন—'জয় ধন্বন্তরি! কোনো ভয় নেই। স্বস্তি স্বস্তি।'

তিনি পালঙ্কে রাজার পাশে বসিয়া ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিলেন, মুখে চট্‌কার শব্দ করিলেন, তারপর রাজার দক্ষিণ মণিবন্ধে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া নাড়ি পরীক্ষায় ধ্যানস্থ হইয়া পড়িলেন।

কিছুক্ষণ পরে তিনি মাথা নাড়িয়া চোখ খুলিলেন—'না, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই। নাড়ি ঈষৎ দমিত, কিন্তু বিষক্রিয়ার কোনো লক্ষণ নেই।—রসরাজ মহাশয়, আপনি দেখুন।'

রসরাজ রাজার নাড়ি দেখিলেন, তারপর সহর্ষে বলিলেন—'বৈদ্যরাজ যথার্থ বলেছেন। রাজদেহে কণামাত্র বিষের প্রকোপ নেই। স্বস্তি স্বস্তি। এখন ক্ষতস্থান প্রলেপাদির ব্যবস্থা করলেই রাজা অচিরাৎ নিরাময় হবেন।'

তখন ক্ষত চিকিৎসার উপযোগ হইল। তাগা খুলিয়া দিয়া ক্ষতস্থান পরিষ্কৃত হইল; দামোদর স্বামী তাহাতে শতধৌত ঘৃতের প্রলেপ লাগাইলেন, ক্ষত বন্ধন করিলেন না। তারপর রাজাকে অরিষ্ট পান করাইয়া পুনরায় নাড়ী পরীক্ষাপূর্বক নাড়ীর উন্নতি লক্ষ্য করিয়া সানন্দে বহু আশীর্বাদ আবৃত্তি করিতে করিতে রাত্রির জন্য প্রস্থান করিলেন।

লক্ষ্মণ মল্লপ অর্জুনের সঙ্গে কক্ষের এক কোণে দাঁড়াইয়া ছিলেন, এখন রাজার পালঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'অর্জুনকে মধ্যম কুমারের শিবিরে পাঠাচ্ছি। তিনি দূরে আছেন, হয়তো অন্যের মুখে বিকৃত সংবাদ শুনে বিচলিত হবেন।'

রাজা নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—'তাই করুন।—কী হয়ে গেল! কম্পন পিতাকে পর্যন্ত—। অর্জুন, তুমি কোথায় ছিলে? কেমন করে যথাসময়ে উপস্থিত হলে?'

অর্জুন বলিল—'আর্য, আমি প্রাঙ্গণে ছিলাম, কুমার কম্পনকে আসতে দেখলাম। তাঁর ভাবভঙ্গী ভাল লাগল না, তাঁর অভিসন্ধি সঠিক বুঝতে পারিনি, বুঝতে পারলে মহারাজ অক্ষত থাকতেন।'

রাজা ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিলেন—'হুক্ক-বুক্কের আবির্ভাব মিথ্যা নয়, হয়তো এই জন্যই এসেছিলেন। —অর্জুন, তুমি আজ যে-কাজে যাচ্ছ যাও, এই মুদ্রাঙ্গুরীয় নাও, বিজয়কে দেখিও, তারপর তাকে সব কথা মুখে বোলো।—আর ফিরে এসে তুমি আমার দেহরক্ষীর কাজ করবে, প্রভাত থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার প্রাণরক্ষার ভার তোমার।'

অর্জুন নত হইয়া যুক্তকরে রাজাকে প্রণাম করিল। অল্পকাল পরে মন্ত্রী তাহাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মণিকঙ্কণা রাজাকে ছাড়িয়া যাইতে সম্মত হইল না। রাত্রে সে ও পিঙ্গলা রাজার কাছে রহিল।

চতুর্থ পর্ব
এক

রাজার প্রতি আক্রমণের সংবাদ প্রচারিত হইলে কিছুদিন খুব উত্তেজিত আলোড়ন চলিল। তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইল। রাজার ক্ষত দু'চার দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইল, তিনি নিয়মিত সভায় আসিতে লাগিলেন। রাজ্যের লোক নিশ্চিন্ত হইল।

কুমার কম্পনের মৃতদেহ কোলে লইয়া তাঁহার দুই পত্নী কৃষ্ণা দেবী ও গিরিজা দেবী সহমৃতা হইয়াছেন। বিনা দোষে দুই অভাগিনীর অকালে জীবনান্ত হইল।

বিজয়নগরের জীবনযাত্রা আবার পুরাতন প্রণালীতে প্রবাহিত হইতে লাগিল। এদিকে আকাশে নববর্ষার সূচনা দেখা যাইতেছে। কুমারী বিদ্যুন্মালা যথারীতি পম্পাপতিব মন্দিরে যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহার অন্তরে হরিষে বিষাদ। শ্রাবণ মাস দুর্বার গতিতে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে; কিন্তু অর্জুনকে তিনি কাছে পাইয়াছেন। অর্জুন সারা দিন রাজার কাছে থাকে, রাজা সভায় যাইলে তাঁহার পিছনে যায়, সিংহাসনের পিছনে দাঁড়াইয়া থাকে। তিনি বিরাম-ভবনে আসিলে কখনো তাঁহার কক্ষে থাকে, কখনো কক্ষের আশেপাশে অলিন্দে চত্বরে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিদ্যুন্মালার মন সর্বদা সেই দিকে পড়িয়া থাকে। তিনি সুযোগ খুঁজিয়া বেড়ান; যখনি দেখেন অর্জুন অলিন্দে একাকী আছে তখনি লঘুপদে আসিয়া তাহার দেহে হাত রাখিয়া স্পর্শ করিয়া যান, অস্ফুট কণ্ঠে একটি-দুইটি কথা বলেন। কিন্তু এই সুখ ক্ষণিকের, ইহাতে ভবিষ্যতের আশ্বাস নাই। বিদ্যুন্মালার মন হর্ষ-বিষাদে দোল খাইতে থাকে।

মণিকঙ্কণার জীবনে নূতন এক আনন্দময় অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে। পূর্বে সে চুরি করিয়া রাজাকে দেখিতে যাইত, এখন রাজা যখনই বিরাম-ভবনে আসেন সে তাঁহার কাছে আসিয়া বসে। রাজার মনের উপর একটা দাগ পড়িয়াছে, প্রায়ই বিমনা হইয়া বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতার কথা চিন্তা করেন, লোভী কৃতঘ্ন ভ্রাতার জন্য প্রাণ কাঁদে। মণিকঙ্কণা পালঙ্কের পাশে বসিয়া নানাপ্রকার গল্প জুড়িয়া দেয়—কলিঙ্গ দেশের কথা, পিতামাতার কথা, আরো কত রকম কথা। তারপর পানের বাটা লইয়া পান সাজিতে বসে, নিজের দেশের খদিরাদি উপকবণ দিয়া পান সাজিয়া রাজাকে খাওয়ায়। পিঙ্গলা কখনো ঘরে আসিলে তাকে বলে—'তুই যা, আমি রাজার কাছে আছি।'

মণিকঙ্কণার সংসর্গে রাজার মন উৎফুল্ল হয়, তিনি কম্পনের কথা ভুলিয়া যান।

প্রত্যেক মানুষেরই অন্তরের নিমগ্ন প্রদেশে একটি নিভৃত রস-সত্তা আছে, রাজার সেই রস-সত্তা মণিকঙ্কণার সান্নিধ্যে উন্মোচিত হয়। মণিকঙ্কণার সহিত রাজা একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতা অনুভব করেন। ইহা পতি-পত্নীর স্বাভাবিক প্রীতির সম্বন্ধ নয়, যেন তদপেক্ষাও নিগূঢ় ঘনিষ্ঠ একটি রসোল্লাস।

একদিন রাজা রহস্য করিয়া বলিলেন—'কঙ্কণা, তোমার ভগিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার বিয়েটাও দেব স্থির করেছি, কিন্তু কার সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবে পাচ্ছি না।'

মণিকঙ্কণা ক্ষণেক অবাক হইয়া চাহিল, তারপর বলিল—'আমি কাকে চাই আমি জানি।'

রাজা বুঝিলেন, গূঢ় হাস্য করিয়া বলিলেন—'কিন্তু তুমি যাকে চাও সে যদি তোমাকে না চায়?'

মণিকঙ্কণা বলিল—'তাহলে চিরজীবন কুমারী থাকব। দিনান্তে যদি একবার দেখতে পাই তাহলেই আমার যথেষ্ট।'

রাজার হৃদয় প্রগাঢ় বসমাধুর্যে পূর্ণ হইয়া উঠিল. তিনি মণিকঙ্কণার বেণীতে একটু টান দিয়া বলিলেন—'আচ্ছা সে দেখা যাবে।'—

আষাঢ়ের নীলাঞ্জন মেঘ একদিন অপরাহ্নে ঝড় লইয়া আসিল, প্রবলবেগে করকাপাত করিয়া চলিয়া গেল। দশদিক শীতল হইল।

দামোদর স্বামী নিজ গৃহের উঠান হইতে কিছু করকা-শিলা চয়ন করিয়া বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময় লাঠি ধরিয়া রসরাজ আসিলেন। দামোদর স্বামী বলিলেন—'এস বন্ধু, আজ করকা সহযোগে মাধ্বী পান করা যাক।'

দামোদরের স্ত্রী-পরিবার নাই, একটি যুবতী দাসী তাঁহার সেবা করে। দাসী আসিয়া ঘরে দীপ জ্বালিয়া মন্দুরা পাতিয়া দিয়া গেল। দুই বন্ধু মাধ্বীর ভাণ্ড লইয়া বসিলেন। দামোদর করকা-শিলার পুঁটলি খুলিলেন; করকাখণ্ডগুলি জমাট বাঁধিয়া শুভ্র বিম্বফলের আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি সন্তর্পণে শীতল পিণ্ডটি তুলিয়া মাধ্বীর ভাণ্ডে ছাড়িয়া দিলেন। মাধ্বী শীতল হইলে দুইজনে পাত্রে ঢালিয়া পান করিতে লাগিলেন।

দাসী আসিয়া থালিকায় ভর্জিত বেসনের ঝাল-বড়া রাখিয়া গেল।

পানাহারের সঙ্গে সঙ্গে জল্পনা চলিল। কেবল নিদান শাস্ত্রের আলোচনা নয়, মাধ্বীর মাদক প্রভাব যত বাড়িতে লাগিল, দুই বৃদ্ধের জিহ্বা ততই শিথিল হইল। রসের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইল। রসরাজ উৎকল-প্রেয়সীদের রতি-চাতুর্য পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করিলেন; প্রত্যুত্তরে দামোদর স্বামী কর্ণাটককামিনীদের বিলাসবিভ্রম ও রসনৈপুণ্যের আলোচনায় পঞ্চমুখ হইলেন।

রাত্রি বাড়িতে লাগিল, সুধাভাণ্ড শেষ হইয়া আসিল। দু'জনেরই মাথায় রুমঝুম অপ্সরীর নূপুর বাজিতেছে, কণ্ঠস্বর গদ্‌গদ। রাজা-রানীদের সম্বন্ধে গুপ্তকথার আদান-প্রদান আরম্ভ হইয়া গেল।

দামোদর স্বামী গলার মধ্যে সংহত গভীর হাস্য করিলেন, জড়াইয়া জড়াইয়া বলিলেন—'বন্ধু, একটি গুপ্ত কথা আছে যা রাজা আর আমি জানি, আর কেউ জানে না।'

রসরাজ মধুভাণ্ডটি দুই হাতে তুলিয়া লইয়া শেষ করিলেন, বলিলেন—'তাই নাকি!'

দামোদর বলিলেন—'হুঁ। রাজার মধ্যমা রানী অসূর্যম্পশ্যা, শুনেছ কি?'

রসরাজ আবার বলিলেন—'তাই নাকি! কিন্তু অসূর্যম্পশ্যা কেন? এ দেশে তো ও রীতি নেই।'

দামোদর বলিলেন—'না। প্রকৃত রহস্য কেউ জানে না। একবার মধ্যমার রোগ হয়েছিল, আমি চিকিৎসা করেছিলাম। তাই আমি জানি।'

'তাই নাকি। রহস্যটা কী?'

'মধ্যমা অপূর্ব সুন্দরী, কিন্তু দাঁত নেই; জন্মাবধি একটিও দাঁত গজায়নি। একেবারে ফোক্‌লা।'

'তাই নাকি! এ রকম তো দেখা যায় না।' রসরাজ দুলিয়া দুলিয়া হাসিতে লাগিলেন—'হুঁ হুঁ হুঁ। রানী ফোক্‌লা।'

দামোদর বলিলেন—'রাজা কিন্তু সেজন্য মধ্যমাকে কম স্নেহ করেন না! রাজাদের সব রকম চাই—খি খি খি—বুঝলে?'

রসরাজ বলিলেন—'তা বটে। সব যদি এক রকম হয় তাহলে পাঁচটা বিয়ে করে লাভ কি!'

কিছুক্ষণ পরে হাসি থামিলে দামোদর ভাণ্ড পরীক্ষা করিলেন; ভাণ্ড শূন্য দেখিয়া বলিলেন—'রাত হয়েছে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। তুমি কানা মানুষ, কোথায় যেতে কোথায় যাবে।'

দুই বন্ধু বাহির হইলেন। অতিথি-ভবন বেশি দূর নয়, সেখানে উপস্থিত হইয়া রসরাজ বলিলেন—'তুমি একলা ফিরবে, চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

দু'জনে ফিরিলেন। দামোদর নিজ গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'তাই তো, তুমি এখন ফিরবে কি করে? চল তোমাকে পৌঁছে দিই।'

এইভাবে পরস্পরকে পৌঁছাইয়া দেওয়া কতক্ষণ চলিল বলা যায় না। পরদিন প্রাতঃকালে

দেখা গেল দুই বন্ধু দামোদর স্বামীর বহিঃকক্ষে মন্দুরার উপর শয়ন করিয়া পরম আরামে নিদ্রা যাইতেছেন।

গুহার মধ্যে বলরাম ও মঞ্জিরার প্রণয় ঘনাবর্ত দুগ্ধের ন্যায় যৌবনের তাপে ক্রমশ গাঢ় হইতেছে। অর্জুন আজকাল দিনের বেলা গুহায় থাকে না, রাজার সঙ্গে থাকে, তাই তাহাদের সমাগম নিরঙ্কুশ। মঞ্জিরা দ্বিপ্রহরে কেবল বলরামের খাবার লইয়া আসে। বলরামের আহার শেষ হইলে দু'জনে ঘনিষ্ঠভাবে বসিয়া গল্প করে। কখনো বলরাম চুল্লী জ্বালিয়া কাজ আরম্ভ করে, মঞ্জিরা হাপরের দড়ি টানে; বায়ুর প্রবাহে অগ্নি উদ্দীপ্ত হয়, আগুনের মধ্যে লোহার পত্রিকা রক্তিমবর্ণ ধারণ করে। বলরাম আগুন হইতে পত্রিকা বাহির করিয়া এক লৌহদণ্ডের চারিপাশে ঠুকিয়া ঠুকিয়া পেঁচ দিয়া জড়ায়; লোহা ঠাণ্ডা হইলে আবার আগুনে রক্তবর্ণ করিয়া লৌহদণ্ডের চারিপাশে জড়ায়। এইভাবে ধীরে ধীরে লোহার নল প্রস্তুত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র কামানের অর্থাৎ বন্দুকের নল তৈরি করিবার ইহাই তাহার গুপ্ত কৌশল।

কখনো তাহারা মৃদঙ্গ ও বাঁশি লইয়া বসে। বলরাম মঞ্জিরার চোখে চোখ রাখিয়া গায়—

প্রিয়ে চারুশীলে প্রিয়ে চারুশীলে
মুঞ্চ ময়ি মানমনিদানম্।

মঞ্জিরা শান্ত ধীর প্রকৃতির মেয়ে, বলরামের একটু প্রগল্ভতা বেশি। কিন্তু তাহাদের আসক্তি শালীনতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যায় না।

এইভাবে চলিতেছে, হঠাৎ একদিন দ্বিপ্রহরে মঞ্জিরা আসিল না। তাহার পরিবর্তে অন্য একটি মেয়ে খাবার লইয়া আসিল।

বলরাম চক্ষু পাকাইয়া বলিল—'তুমি কে? মঞ্জিরা কোথায়?'

নূতনা বলিল—'আমি সুভদ্রা। মঞ্জিরা বাপের বাড়ি গিয়েছে, তাই আমি খাবার নিয়ে এসেছি।'

'বাপের বাড়ি গিয়েছে!' মঞ্জিরার বাপের বাড়ি থাকিতে পারে একথা পূর্বে বলরামের মনে আসে নাই—'বাপের বাড়ি গিয়েছে কেন?'

'তার আন্নার অসুখ, খবর পেয়ে কাল রাত্রেই সে চলে গেছে।'

'আন্না মানে তো দাদা! দাদার অসুখ!—তা কবে ফিরবে?'

'তা কি জানি।'

'হুঁ। মঞ্জিরার বাপের নাম কি?'

'বীরভদ্র। তিনি রাজার হাতিশালে কাজ করেন।'

'হুঁ। বাড়ি কোথায়?'

'নীচু নগরে। পান-সুপারি রাস্তার পুবে তুঙ্গভদ্রার তীরে তাঁর বাড়ি।'

'বটে।' বলরাম আহারে বসিল। নবাগতা সুভদ্রা মঞ্জিরার সখী, বলরামের ভাবভঙ্গি দেখিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

আহারের পর সুভদ্রা পাত্রাদি লইয়া প্রস্থান করিবার পর বলরাম চিন্তা করতে লাগিল। কি করা যায়। মঞ্জিরা কবে আসিবে কিছুই ঠিক নাই। তাহার পিতা হস্তিপক বীরভদ্রকে হস্তিশালা হইতে খুঁজিয়া বাহির করা যায়। কিন্তু তাহাতে লাভ কি। মঞ্জিরার বাপকে দর্শন করিলে তো প্রাণ জুড়াইবে না। বরং তাঁহার গৃহ খুঁজিয়া বাহির করিলে কাজ হইবে।

তৃতীয় প্রহরে বলরাম পরিষ্কার বস্ত্র উত্তরীয় পরিধান করিয়া বাহির হইল। নীচু নগরে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত পল্লীতে তুঙ্গভদ্রার তীরে খোঁজাখুঁজি করিবার পর রাজ-হস্তিপক বীরভদ্রের গৃহ পাওয়া গেল।

প্রস্তরনির্মিত ক্ষুদ্র গৃহ। বলরাম দ্বারে করাঘাত করিলে মঞ্জিরা দ্বার খুলিয়া দাঁড়াইল। বলরামকে

দেখিয়া তাহার মুখে বিস্ময়ানন্দ ভরা হাসি ফুটিয়া উঠিল।

বলরাম মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল—'খবর না দিয়ে পালিয়ে এসেছ যে!'

মঞ্জিরা থতমত হইয়া বলিল—'সময় পেলাম না। কাল রাত্রে বাবা ডাকতে গিয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে চলে এলাম।'

'আন্না কেমন আছে?'

মঞ্জিরার মুখ মলিন হইল, সে ছলছল চক্ষে বলিল—'ভাল না। কাল খুব বাড়াবাড়ি গিয়েছে। বৈদ্য মহাশয় বলছেন, 'ত্রিদোষ'।'

দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া আরো কিছুক্ষণ কথা হইল, তারপর বলরাম 'কাল আবার আসব' বলিয়া চলিয়া গেল।

অতঃপর বলরাম প্রত্যহ আসে, দ্বারের কাছে দু'দণ্ড দাঁড়াইয়া কথা বলিয়া যায়। মঞ্জিরার আন্না ক্রমশ আরোগ্য হইয়া উঠিতেছে। প্রাণের আশঙ্কা আর নাই।

একদিন অনিবার্যভাবেই মঞ্জিরার পিতা বীরভদ্রের সহিত বলরামের দেখা হইয়া গেল। দীর্ঘায়ত গৌরবর্ণ মানুষ, বয়স অনুমান চল্লিশ; প্রকৃতি শান্ত ও গম্ভীর। মঞ্জিরাকে অপরিচিত যুবার সহিত কথা কহিতে দেখিয়া সপ্রশ্ন নেত্রে চাহিলেন। বলরাম বলিল—'আপনি মঞ্জিরার পিতা? নমস্কার। মঞ্জিরার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে—তাই—'

বীরভদ্র শিষ্টতা সহকারে বলরামকে ভিতরে আসিয়া বলিতে বলিলেন। দুইজনে আস্তরণের উপর উপবিষ্ট হইলে বীরভদ্র বলরামের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মঞ্জিরা একটু আড়ালে থাকিয়া তাঁহাদের কথাবার্তা শুনতে লাগিল।

বলরাম নিজের পরিচয় দিল, মঞ্জিরার সহিত কি করিয়া পরিচয় হইল তাহা জানাইল। শুনিয়া বীরভদ্র বলিলেন—'বাপু, তুমি দেখছি গুণবান ব্যক্তি। ভাগ্যবানও বটে, কারণ রাজার নজরে পড়েছ।'

বীরভদ্রকে প্রসন্ন দেখিয়া বলরাম ভাবিল, এই সুযোগ, এমন সুযোগ হয়তো আর আসিবে না। যা থাকে কপালে। সে হাত জোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল—'মহাশয়, আপনার শ্রীচরণে আমার একটি নিবেদন আছে।'

বীরভদ্র একটু চকিত হইলেন, বলিলেন—'কী নিবেদন?'

বলরাম বলিল—'আপনার কন্যা মঞ্জিরাকে আমি বিবাহ করতে চাই। আপনি অনুমতি দিন।'

বীরভদ্র নূতন চক্ষে বলরামকে নিরীক্ষণ করিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন—'বাপু, তুমি যোগ্য পাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তুমি বিদেশী, তোমার হাতে কন্যা দান করতে শঙ্কা হয়।'

বলরাম বলিল—'মহাশয়, আমি বিদেশ থেকে এসেছি বটে, কিন্তু কোনো দিন ফিরে যাব এমন সম্ভাবনা নেই। বিজয়নগরই আমার গৃহ, বিজয়নগরই আমার দেশ।'

বীরভদ্র বলিলেন—'তা ভাল। কিন্তু এ বিষয়ে মঞ্জিরার মন জানা প্রয়োজন। দ্বিতীয় কথা, মঞ্জিরা রাজপুরীতে কাজ করে, রাজাই তার প্রকৃত অভিভাবক। তিনি যদি অনুমতি দেন আমার আপত্তি হবে না।'

'যথা আজ্ঞা'—বলরাম আশান্বিত মনে গাত্রোত্থান করিল। রাজার অনুমতি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

মঞ্জিরা আড়াল হইতে সব শুনিয়াছিল। তাহার দেহ ক্ষণে ক্ষণে পুলকিত হইল, মন আশার আনন্দে দুরু দুরু করিতে লাগিল।

বিজয়নগর হইতে বহু দূরে তুঙ্গভদ্রার গিরি-বলয়িত উপকূলের ক্ষুদ্র গ্রামটিতে চিপিটক ও মন্দোদরীর দাম্পত্য জীবন আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। একই গুহায় বাস করিয়া ছদ্ম দাম্পত্য বেশিদিন

বজায় রাখা কঠিন। অগ্নি ও ঘৃত যত পুরাতনই হোক, তাহাদের সান্নিধ্যের ফল অনিবার্য। চিপিটক ও মন্দোদরীর দাম্পত্য ব্যবহারে কপটতার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট ছিল না।

চিপিটক মনকে বুঝাইয়াছিলেন, ইহা সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র। তিনি বিজয়নগরে ফিরিয়া যাইবার সংকল্প ত্যাগ করেন নাই। মন্দোদরী কিন্তু পরমানন্দে ছিল। এখানে আসিবার পর দারুব্রহ্ম তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, সে একটি পুরুষ পাইয়াছে। আর কী চাই।

কিন্তু জনসমাজে বাস করিতে হইলে কিছু কাজ কবিতে হয়, কেহ বসিয়া খাওয়ায় না। মন্দোদরী নিজের কাজ জুটাইয়া লইয়াছিল। সে অল্পকাল মধ্যে গ্রামের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিল। তৃতীয় প্রহরে গ্রামের যুবতীরা গা ধুইতে নদীতে যাইত, মন্দোদরী তাহাদেব সঙ্গে যাইত। সকলে মিলিযা গা ধুইত, তারপর গ্রামের আম্র কুঞ্জের ছায়ায গিয়া বসিত। মন্দোদবী নানা ছাঁদে চুল বাঁধিতে জানে, সে একে একে সকলের চুল বাঁধিয়া দিত এবং সঙ্গে সঙ্গে গল্প বলিত। মেয়েবা চুল বাঁধিতে বাঁধিতে অবহিত হইযা রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী শুনিত। তাবপর সূর্য পাহাড়েব আড়ালে অদৃশ্য হইলে যে যার কুটিরে ফিরিয়া যাইত। মন্দোদরীকে রাঁধিতে হইত না, গ্রামবধূবা পালা করিয়া তাহার গুহায় অন্নব্যঞ্জন দিয়া যাইত।

চিপিটকমূর্তি কিন্তু রাজশ্যালক, সুতবাং অকর্মাব ধাড়ি। গ্রামে চিপিটক বিতরণেব কাজ থাকিলে হয়তো করিতে পারিতেন, কিন্তু অন্য কোনো শ্রমসাধ্য কাজে তাঁহাব রুচি নাই। দেখিযা শুনিযা মোড়ল বলিল—'কর্তা, তোমাকে দিয়ে অন্য কাজ হবে না, তুমি ছাগল চবাও।'

চিপিটক দেখিলেন, ছাগল চবানোতে কোনো পরিশ্রম নাই; ছাগলেরা আপনিই চবিয়া খায়, তাহাদের মাঠে ছাড়িযা দিয়া গাছতলায় বসিয়া থাকিলেই হইল। তিনি রাজী হইলেন।

অতঃপর চিপিটক ছাগল চরাইতেছেন। কিন্তু তাঁহার চিত্তে সুখ নাই, মন পড়িয়া আছে বিজয়নগবে। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চক্ষু মুদিয়া তিনি আকাশ-পাতাল চিন্তা করেন।

এদেশের ছাগলগুলি আকারে আয়তনে বেশ বৃহৎ, রামছাগলেব চেয়েও বৃহৎ ও হৃষ্টপুষ্ট; কাবুলী গর্দভেব আকার। গাঁয়েব ছেলেবা তাহাদের পিঠে চড়িয়া ছুটাছুটি কবে। দেখিয়া দেখিয়া একদিন তাঁহার মাথায় একটি বুদ্ধি গজাইল। ছাগলের পিঠে চড়িয়া তিনি যদি নদীর ধার দিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা কবেন তবে অচিরাৎ বিজয়নগরে পৌঁছিতে পাবিবেন।

যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। চিপিটক একটি বলিষ্ঠ পাঁঠা ধরিয়া তাহাব পৃষ্ঠে চড়িয়া বসিলেন এবং নদীর কিনার দিয়া তাহাকে উজানে চালিত কবিলেন। চিপিটকের দেহ শীর্ণ ও লঘু, তাহাকে পৃষ্ঠে বহন করিতে অতিকায় পাঁঠার কোনোই কষ্ট হইল না।

কিন্তু নদীর তীর সর্বত্র সমতল নয়, তীরের পাহাড় মাঝে মাঝে নদী পর্যন্ত নামিয়া আসিয়া দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। এইরূপ একটি ক্রমোচ্চ পাহাড়ের সম্মুখীন হইয়া ছাগল স্থির হইয়া দাঁড়াইল; সে গ্রাম হইতে অর্ধক্রোশ আসিয়াছে, এখন পর্বত ডিঙাইয়া আর অগ্রসর হইতে রাজী নয়। চিপিটক তাহাকে তাড়না করিলেন, মুখে নানাপ্রকার শব্দ করিলেন, কিন্তু ছাগল নড়িল না। চিপিটক তখন দুই পায়ের গোড়ালি দিয়া সবেগে ছাগলের পেটে গুঁতা মারিলেন। ছাগল হঠাৎ চার পায়ে শূন্যে লাফাইয়া উঠিয়া গা ঝাড়া দিল। চিপিটক তাহার পৃষ্ঠচ্যুত হইয়া মাটিতে পড়িলেন। ছাগল লাফাইতে লাফাইতে গ্রামে ফিরিয়া গেল।

পতনের ফলে চিপিটকের অস্থি মচকাইয়া গিয়াছিল, তিনি লেংচাইতে লেংচাইতে গৃহে ফিরিলেন।

অতঃপর কিছুদিন কাটিলে তাঁহার মাথায় আর একটি বুদ্ধি অবতীর্ণ হইল। এটি তেমন মারাত্মক নয়, এমনকি সুবুদ্ধিও বলা যাইতে পারে। তিনি মন্দোদরীকে আদেশ করিলেন—'তুই রোজ দুপুরবেলা নদীর ধারে গিয়ে বসে থাকবি। আমাদের নৌকা তিনটের ফেরার সময় হয়েছে, একদিন না একদিন এই পথে যেতেই হবে। তুই চোখ মেলে থাকবি, তাদের দেখতে পেলেই ডাকবি।'

মন্দোদরী বলিল—'আচ্ছা।'

চিপিটক দ্বিপ্রহরে ছাগল চরাইতে চরাইতে গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়েন। মন্দোদরী গজেন্দ্রগমনে নদীতীরে যায়, উঁচু পাথরের ছায়ায় শুইয়া ঘুমায়। নৌকা সম্বন্ধে তাহার মোটেই আগ্রহ নাই, সে পরম সুখে আছে। অপরাহ্ণে গাঁয়ের মেয়েরা গা ধুইতে আসিলে সে তাহাদের সঙ্গে গা ধুইয়া ফিরিয়া যায়। চিপিটককে বলে—'কোথায় নৌকা!'

এইভাবে দিন কাটিতেছে।

দুই

গ্রীষ্মকালীন ঝড়-ঝাপ্‌টা অপগত হইয়া বিজয়নগরে বর্ষা নামিয়াছে। রাজ-পৌরভূমির চারিদিকে ময়ূরের ষড়জসংবাদিনী কেকাধ্বনি শুনা যাইতেছে। ময়ূরগুলি কোথা হইতে আসিয়া উচ্চভূমিতে অথবা শৈলশীর্ষে উঠিয়াছে এবং পেখম মেলিয়া মেঘের পানে উৎকণ্ঠ হইয়া ডাকিতেছে।

এদেশে বেশি বৃষ্টি হয় না; কখনো রিম্‌ঝিম্ কখনো ঝিরিঝিরি। কিন্তু আকাশ সর্বদা মেঘ-মেদুর হইয়া থাকে। গ্রীষ্মের কঠোর তাপ অপগত হইয়া মধুর শৈত্য মানুষের দেহে সুধা সিঞ্চন করিয়া থাকে। দিবাভাগে সূর্যদেব যেন অঙ্গে ধূসর আস্তরণ টানিয়া ঘুমাইয়া পড়েন; রাত্রিগুলি দেবভোগ্য স্বর্গের রাত্রি হইয়া দাঁড়ায়। পীতবর্ণ তৃণপাদপ ধীরে ধীরে হরিৎ বর্ণ ধারণ করে; পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে গাঢ় সবুজের রেখা। তুঙ্গভদ্রার শীর্ণ ধারা অলক্ষিতে পূর্ণ হইয়া উঠিতে থাকে।

বর্ষা সমাগমে অর্জুন ও বলরামকে গুহা ছাড়িতে হইয়াছিল। গুহার ছাদের ফুটা দিয়া জল পড়ে। মন্ত্রী মহাশয় তাহাদের বাসের অন্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কুমার কম্পনের নূতন প্রাসাদ শূন্য পড়িয়া ছিল, তাহারা প্রাসাদের নিম্নতলে আশ্রয় পাইয়াছিল। বলরাম গৃহের রন্ধনশালায় কামারশালা পাতিয়াছিল।

চাতুর্মাস্য ব্রতারম্ভের দিনটি আরম্ভ হইল টিপি টিপি বৃষ্টি লইয়া। অর্জুন প্রত্যূষে উঠিয়া রাজ সকাশে চলিল। চারিদিক অন্ধকার, মেঘের আড়ালে রাত্রি শেষ হইয়াছে কিনা বোঝা যায় না। হেমকূট পর্বতের শৃঙ্গে এখনো ধিকি ধিকি আগুন জ্বলিতেছে।

সভা-ভবনের নিকটে আসিয়া অর্জুন দ্বিতলের একটি বিশেষ গবাক্ষের দিকে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিল। গবাক্ষে আবছায়া একটি মুখ দৃষ্টিগোচর হইল। বিদ্যুন্মালা দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি প্রত্যহ এই সময় অর্জুনের দর্শনাশায় গবাক্ষে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন।

অর্জুনের হৃদয় মথিত করিয়া একটি দীর্ঘশ্বাস পড়িল। ইহার শেষ কোথায়?

রাজার বিরাম-ভবনে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে। গতরাত্রে রাজা বিরাম-ভবনেই ছিলেন, তিনি স্নান সারিয়া পূজায় বসিয়াছেন। অর্জুন সোপান দিয়া উপরে আসিয়া রাজার কক্ষে দাঁড়াইল। কক্ষে কেহ নাই, অর্জুন রাজার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। ছায়াচ্ছন্ন কক্ষ, বাতায়নগুলি অচ্ছাভ আলোর চতুষ্কোণ রচনা করিয়াছে।

সহসা পাশের একটি পর্দা ঢাকা দ্বার দিয়া বিদ্যুন্মালা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার চোখে বিভ্রান্ত ব্যাকুলতা। তিনি লঘু পদে অর্জুনের কাছে আসিয়া তাহার হাতে হাত রাখিলেন, সংহত স্বরে বলিলেন—'আজ কী দিন জানো? চাতুর্মাস্য আরম্ভের দিন। কাল শ্রাবণ মাস পড়বে।'

অর্জুন নির্বাক দাঁড়াইয়া রহিল। বিদ্যুন্মালা আরো কাছে আসিয়া অর্জুনের স্কন্ধে হাত রাখিয়া বলিলেন—'তুমি কি আমাকে সত্যিই চাও না? আমি কি তবে আত্মহত্যা করব? কী করব তুমি বলে দাও।'

এই সময় একটি দ্বারের পর্দা একটু নড়িল। পিঙ্গলা কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া থমকিয়া রহিল। দেখিল, বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া নিম্নস্বরে কথা বলিতেছেন। অর্জুন বা বিদ্যুন্মালা পিঙ্গলাকে দেখিতে পাইলেন না।

অর্জুন অতি কষ্টে কণ্ঠ হইতে স্বর বাহির করিল—'আমি কি বলব? তুমি যাও, এখনি রাজা আসবেন।'

বিদ্যুন্মালা বলিলেন—'আমি যাচ্ছি। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর আমি তোমার কাছে যাব।'

বিদ্যুন্মালা নিঃশব্দ পদে অন্তর্হিতা হইলেন।

অল্পক্ষণ পরে পিঙ্গলা অন্য দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল, অর্জুনের প্রতি একটি সুতীক্ষ্ণ বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিয়া বলিল—'এই যে অর্জুন ভদ্র! আপনি একলা রয়েছেন। মহারাজের পূজা শেষ হয়েছে, তিনি এখনি আসবেন।'

অর্জুন গলার মধ্যে শব্দ করিল; কথা বলিতে পারিল না। তাহার বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতেছিল।

দুই দণ্ড পরে মণিকঙ্কণা ও বিদ্যুন্মালা পম্পাপতির মন্দিরে চলিয়া গেলেন।

নিজ কক্ষে দেবরায় সভারোহণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পালঙ্কের কাছে দাঁড়াইয়া পিঙ্গলা তাঁহার বাহুতে অঙ্গদ পরাইয়া দিতেছিল। অর্জুন দূরে দ্বারের নিকট প্রতীক্ষা করিতেছিল।

রাজার কপালে কুঙ্কুম তিলক পরাইতে পরাইতে পিঙ্গলা মৃদুস্বরে রাজাকে কিছু বলিল। রাজা পূর্ণদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিলেন। পিঙ্গলা আবার কিছু বলিল। রাজা আরো কিছুক্ষণ তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া অর্জুনের দিকে মুখ ফিরাইলেন। স্বর ঈষৎ চড়াইয়া বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, তুমি সভায় গিয়ে বলো আজ আমি সভায় যাব না। তুমি সভা থেকে গৃহে ফিরে যাও, আজ আর তোমাকে প্রয়োজন হবে না।'

রাজাকে প্রণাম করিয়া অর্জুন চলিয়া গেল। সোপান দিয়া নামিতে নামিতে তাহার হৃৎপিণ্ড আশঙ্কায় ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। রাজার কণ্ঠস্বরে আজ যেন অনভ্যস্ত কঠিনতা ছিল। তিনি কি কিছু জানিতে পারিয়াছেন। পিঙ্গলা কি—?

অপরাধ না করিয়াও যাহারা অপরাধীর অধিক মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে অর্জুনের অবস্থা তাহাদের মত।

বিরামকক্ষে দেবরায় পালঙ্কে বসিয়াছিলেন। তিনি পিঙ্গলার পানে গম্ভীর চক্ষু তুলিয়া বলিলেন—'অর্জুন সম্বন্ধে গোপন কথা কী আছে?'

পিঙ্গলা রাজার পায়ের কাছে ভূমিতলে বসিল, করজোড়ে বলিল—'আর্য, অভয় দিন।'

রাজা বলিলেন—'নির্ভয়ে বল।'

পিঙ্গলা তখন ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিল—'কিছুদিন থেকে দাসীদের মধ্যে কানাকানি শুনছিলাম; দেবী বিদ্যুন্মালা নাকি অন্তরালে অর্জুনবর্মার সঙ্গে বাক্যালাপ করেন। আমি শুনেও গ্রাহ্য করিনি। অর্জুনবর্মা দেবী বিদ্যুন্মালার সঙ্গে নৌকায় এসেছেন, তাঁকে নদী থেকে উদ্ধার করেছিলেন। সুতরাং তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু আজ আমি নিজের চোখে দেখেছি মহারাজ।'

'কী দেখেছ?'

তখন পিঙ্গলা যাহা দেখিয়াছিল, শুনিয়াছিল, রাজাকে শুনাইল। বিদ্যুন্মালা অর্জুনের কাঁধে হাত রাখিয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহার পুনরাবৃত্তি করিল। কিছু বাড়াইয়া

বলিল না, কিছু কমাইয়াও বলিল না। রাজা শুনিয়া বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায় মুখ অন্ধকার করিয়া বসিয়া রহিলেন।

বলরাম একটি নূতন কামান প্রস্তুত করিয়াছিল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সেটি থলিতে ভরিয়া সে বাহির হইল। অর্জুনকে বলিয়া গেল—'রাজাকে কামান দিতে যাচ্ছি। সেই সঙ্গে বিয়ের কথাটাও পাকা করে আসব। একটা বৌ না হলে ঘর-দোর আর মানাচ্ছে না।'

অর্জুন নিজ শয্যায় লম্বমান হইয়া ছাদের পানে চাহিয়া ছিল, উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিল, তারপর ঘরময় পদচারণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। ভালবাসা পাইয়াও সুখ নাই; একটা অনির্দিষ্ট আশঙ্কা তাহার অন্তঃকরণকে গ্রাস করিয়া রাখিয়াছে; যেন মরণাধিক একটা মহাবিপদ অলক্ষ্যে ওত পাতিয়া আছে, কখন অকস্মাৎ ঘাড়ে লাফাইয়া পড়িবে। এই শঙ্কার হাত হইতে পলকের জন্য নিস্তার নাই। মাঝে মাঝে তাহার ইচ্ছা হইয়াছে, চুপি চুপি কাহাকেও না বলিয়া বিজয়নগর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু কোথায় পলাইবে? বিজয়নগর তাহার হৃদয়কে লৌহজটিল বন্ধনে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। বিজয়নগর ছাড়িয়া আর সে মুসলমান রাজ্যে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। প্রাণ যায় সেও ভাল।

কঙ্কণ-কিঙ্কিণীর মৃদু শব্দে অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল বিদ্যুন্মালা দ্বারের সম্মুখে আসিয়া কক্ষের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিতেছেন। বলরাম নাই দেখিয়া তিনি অর্জুনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দীপের স্নিগ্ধ আলোকস্পর্শে তাঁহার সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কার ঝলমল করিয়া উঠিল।

বিদ্যুন্মালা ভঙ্গুর হাসিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলেন—'আমি মরতে চাই না, আমি তোমাকে চাই। আমার লজ্জা নেই, অভিমান নেই, আমি শুধু তোমাকে চাই।' দুই বাহু বাড়াইয়া তিনি অর্জুনের গলা জড়াইয়া লইলেন। একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার বুকে মাথা রাখিলেন।

অর্জুন জগৎ ভুলিয়া গেল। তাহার বাহু অবশে বিদ্যুন্মালার দেহ দৃঢ় বন্ধনে বেষ্টন করিয়া লইল।

হিয়ে হিয় রাখনু। যুগ কাটিল কি মুহূর্ত কাটিল ধারণা নাই। হৃদয় কোন্ অতলস্পর্শ অমৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। প্রতি অঙ্গে রোমহর্ষণ।

তারপর এই আত্মবিস্মৃত রসোল্লাসের অতল হইতে দুইজনে উঠিয়া আসিলেন। চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, কে একজন তাঁহাদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

তবু সহজে মোহতন্দ্রা কাটিতে চায় না। ধীরে ধীরে তাঁহারা চেতনার বহির্লোকে ফিরিয়া আসিলেন। যিনি দাঁড়াইয়া আছেন তিনি—মহারাজ দেবরায়!

এই ভয়ঙ্কর সত্য সম্পূর্ণরূপে অন্তরে প্রবেশ করিলে দুইজনে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজা বিদ্যুন্মালার দিকে তাকাইলেন না, অর্জুনের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ভয়াল কণ্ঠে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা!'

অর্জুন নতমুখে রহিল, মুখে কথা যোগাইল না। রাজা যে-দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহার একমাত্র অর্থ হয়, দ্বিতীয় অর্থ হয় না; সুতরাং বাক্যব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

রাজার কটি হইতে তরবারি বিলম্বিত ছিল, রাজা তাহার মুষ্টিতে হাত রাখিলেন। বিদ্যুন্মালা ত্রাস-বিস্ফারিত নেত্রে রাজার পানে চাহিয়া ছিলেন। তিনি সহসা মুখে অব্যক্ত আকুতি করিয়া রাজার পদতলে পতিত হইলেন; ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—'রাজাধিরাজ, অর্জুনবর্মাকে ক্ষমা করুন। ওঁর কোনো দোষ নেই, আমি অপরাধিনী। হত্যা করতে হয় আমাকে হত্যা করুন।'

রাজা বিরাগপূর্ণ নেত্রে বিদ্যুন্মালার পানে চাহিলেন। বিদ্যুন্মালা ঊর্ধ্বমুখী হইয়া বলিতে লাগিলেন—'রাজাধিরাজ, আমি অর্জুনবর্মাকে প্রলুব্ধ করেছিলাম, কিন্তু উনি আমাকে নিয়ে পালিয়ে

যেতে সম্মত হননি। ওঁর অপরাধ নেই, আমি অপরাধিনী, আমাকে দণ্ড দিন।'

রাজার মুখের কোনো পরিবর্তন হইল না, তিনি আরো কিছুক্ষণ ঘৃণাপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া দুই হাতে তালি বাজাইলেন। অমনি ছয়জন অসিধারিণী প্রতিহারিণী কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহাদের অগ্রে পিঙ্গলা।

রাজা বলিলেন—'রাজকুমারীকে মহলে নিয়ে যাও।'

পিঙ্গলা বিদ্যুন্মালার হাত ধরিয়া তুলিল, সহজ স্বরে বলিল—'আসুন দেবি।'

বিদ্যুন্মালা একবার রাজার দিকে একবার অর্জুনের দিকে চাহিলেন, তারপর অধর দংশন করিয়া গর্বিত পদক্ষেপে দাসীদের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। তিনি রাজকন্যা, দাসী-কিঙ্করীর সম্মুখে দীনতা প্রকাশ করা চলিবে না।

কক্ষে রহিলেন রাজা এবং অর্জুন। রাজা বহ্নিমান শৈলশৃঙ্গের ন্যায় জ্বলিতেছেন, অর্জুন তাঁহার সম্মুখে মুহ্যমান। রাজার হাত আবার তরবারির মুষ্টির উপর পড়িল; তিনি বলিলেন—'রাজকন্যা যা বলে গেলেন তা সত্য?'

অর্জুন জানে রাজকন্যার কথা সত্য, কিন্তু নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার স্কন্ধে সমস্ত দোষ চাপাইতে পারিবে না। সে একবার মুখ তুলিয়া আবার মুখ নত করিল; ধীরে ধীরে বলিল—'আমিও সমান অপরাধী মহারাজ।'

রাজা গর্জিয়া উঠিলেন—'কৃতঘ্ন! বিশ্বাসঘাতক! এ অপরাধের দণ্ড জানো?'

অর্জুন মুখ তুলিল না, বলিল—'জানি মহারাজ।'

রাজা বলিলেন—'মৃত্যুদণ্ডই তোমার একমাত্র দণ্ড। কিন্তু তুমি একদিন আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে, আমিও তোমার প্রাণদান করলাম। যাও, এই দণ্ডে আমার রাজ্য ত্যাগ কর। অহোরাত্র পরে যদি তোমাকে বিজয়নগর রাজ্যে পাওয়া যায় তোমার প্রাণদণ্ড হবে। বিজয়নগরে তোমার স্থান নেই।'

অর্জুনের কাছে ইহা প্রাণদণ্ডের চেয়েও কঠিন আজ্ঞা। কিন্তু সে নতজানু হইয়া যুক্তকরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

দু'দণ্ড পরে বলরাম গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে বলিল—'রাজার সাক্ষাৎ পেলাম না, তিনি বিরাম-ভবনে নেই। একি! অর্জুন—?'

অর্জুন ভূমির উপর জানু মুড়িয়া জানুর উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে, বলরামের কথায় পাংশু মুখ তুলিল। বলরাম কামানের থলি ফেলিয়া দ্রুত তাহার কাছে আসিয়া বসিল; ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—'কী হয়েছে অর্জুন?'

অর্জুন ভগ্নস্বরে বলিল—'রাজা আমাকে বিজয়নগর থেকে নির্বাসন দিয়েছেন।

'অ্যাঁ! সে কী! কেন? কেন?'

অর্জুন অনেকক্ষণ নীরবে বসিয়া রহিল, তারপর নতমুখে অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বলরামকে সকল কথা বলিল, কিছু গোপন করিল না। শুনিয়া বলরাম কিছুক্ষণ মেঝের উপর আঙুল দিয়া আঁক-জোক কাটিল। শেষে উঠিয়া গিয়া নিজ শয্যায় শয়ন করিল।

রাজ-রসবতীর দাসী রাত্রির খাবার লইয়া আসিল। মঞ্জিরা নয়, অন্য দাসী; মঞ্জিরা এখনো পিত্রালয় হইতে ফিরিয়া আসে নাই। দাসীকে কেহ লক্ষ্য করিল না দেখিয়া সে খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। অবশেষে গভীর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অর্জুন উঠিল, লাঠি দু'টি হাতে লইয়া বলরামের শয্যার পাশে গিয়া দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে বলিল—'বলরাম ভাই, এবার আমি যাই।'

বলরাম ধড়মড় করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল; বলিল—'যাবে! দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও।'

সে উঠিয়া দ্রুতহস্তে নিজের জিনিসপত্র গুছাইল, নবনির্মিত কামান ইত্যাদি ছালার মধ্যে ভরিল। অর্জুন অবাক হইয়া দেখিতেছিল; বলিল—'এ কী, তুমিও যাবে নাকি?'

বলরাম বলিল—'হ্যাঁ, তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।'

অর্জুন কুণ্ঠিত হইয়া বলিল—'কিন্তু—রাজার কামান তৈরি—!'

বলরাম বলিল—'কামান তৈরি রইল।'

ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া অর্জুন বলিল—'আর—মঞ্জিরা?'

বলরাম বলিল—'মঞ্জিরা রইল। যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই আপদ। চল, বেরিয়ে পড়া যাক—আরে, খাবার দিয়ে গেছে দেখছি। এস, খেয়ে নিই। আবার কবে রাজভোগ জুটবে কে জানে।'

অর্জুনের ক্ষুধা-তৃষ্ণা ছিল না, তবু সে বলরামের সঙ্গে খাইতে বসিল। আহারান্তে দুই বন্ধু বাহিরে আসিল। বলরাম বলিল—'চল, আগে বাজারে যাই।'

পান-সুপারির বাজার তখনো সব বন্ধ হয় নাই? বলরাম চিঁড়া ও গুড় কিনিয়া ঝোলায় রাখিল, ঝোলা কাঁধে ফেলিয়া বলিল—'পাথেয় সংগ্রহ হল। এবার চল।'

'কোন্ দিকে যাবে?'

'পশ্চিম দিকে। পুব দিকের সীমান্ত অনেক দূরে, পশ্চিমের সীমান্ত কাছে। শুনেছি, পশ্চিম দিকে সমুদ্রতীরে কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য আছে।'

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। নগরের কর্ম-কলধ্বনি শান্ত হইয়া আসিতেছে। হেমকূট চূড়ায় অগ্নিস্তম্ভ অস্থির শিখায় জ্বলিতেছে। অর্জুন একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিল। তারপর হৃদয়ে অবরুদ্ধ আবেগ লইয়া অন্ধকার নিরুদ্দেশের পথে পা বাড়াইল। সহায়হীন যাত্রাপথে বন্ধু তাহার সঙ্গ লইয়াছে ইহাই তাহার একমাত্র ভরসা।

তিন

মহারাজ দেবরায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ন্যায়বুদ্ধি ক্রোধের অগ্নিবন্যায় ভাসিয়া যায় নাই। তিনি স্বভাবতই ধীর প্রকৃতির মানুষ, নচেৎ সেদিন অর্জুন প্রাণে বাঁচিত না।

কিন্তু মানুষ যতই ধীরপ্রকৃতির হোক, এমন একটা দৃশ্য চোখে দেখিবার পর সহজে মাথা ঠাণ্ডা হয় না। নিজের বাগ্‌দত্তা বধূ অন্য পুরুষের আলিঙ্গনবদ্ধ। কয়জন রাজা রক্তদর্শন না করিয়া শান্ত হইতে পারেন?

দেবরায় বিরাম-ভবনে ফিরিয়া আসিলেন, কটি হইতে তরবারি খুলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া পালঙ্কের পাশে বসিলেন। পিঙ্গলা বোধহয় শিলাকুট্টিমের উপর তরবারি ঝনৎকার শুনিতে পাইয়াছিল, দ্রুত আসিয়া রাজার কাছে বসিল, জিজ্ঞাসু নেত্রে রাজার মুখের পানে চাহিল।

রাজা একবার কক্ষের চারিদিকে কষায়িত দৃষ্টি ফিরাইলেন, তারপর কঠিন স্বরে বলিলেন—'বিদ্যুন্মালাকে স্বতন্ত্র কক্ষে রাখো, দ্বারে প্রহরিণী থাকবে। আমার বিনা আদেশে কোথাও বেরুতে পাবে না।'

পিঙ্গলা বলিল—ভাল মহারাজ। কিন্তু বিদ্যুন্মালা ও মণিকঙ্কণা প্রত্যহ প্রাতে পম্পাপতির মন্দিরে যান। তার কি হবে?'

দেবরায় বিবেচনা করিলেন। ক্রোধের যুক্তিহীনতা কিঞ্চিৎ উপশম হইল। —পরপুরুষ স্পর্শের দোষ ক্ষালনের জন্য পম্পাপতির পূজা, অথচ—। এ কী বিড়ম্বনা! যা হোক, হঠাৎ পম্পাপতির মন্দিরে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলে লোকে নানাপ্রকার সন্দেহ করিবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নয়। রাজ-অন্তঃপুরের কলঙ্ককথা যতক্ষণ চাপা থাকে ততক্ষণই ভাল। বিদ্যুন্মালা হাজার হোক রাজকন্যা, তাহার

সম্বন্ধে সমুচিত চিন্তা করিয়া কাজ করিতে হইবে। রাজা বলিলেন—'আপাতত যেমন চলছে চলুক। ব্রত উদ্‌যাপনের আর বিলম্ব কত?'

'আর এক পক্ষ আছে আর্য।'

এক পক্ষ সময় আছে। রাজা পিঙ্গলাকে বিদায় করিয়া চিন্তা করিতে বসিলেন। রাজপরিবারে এমন উৎকট ব্যাপার বড় একটা ঘটে না। কিন্তু ঘটিলে বিষম সমস্যার উৎপত্তি হয়।

মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ একবার আসিলেন। রাজা তাঁহাকে এ বিষয়ে কিছু বলিলেন না। লক্ষ্মণ মল্লপ রাজার বিমনা ভাব ও বাক্যালাপে অনৌৎসুক্য দেখিয়া দুই-চারিটা কাজের কথা বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

—স্ত্রীজাতির মন স্বভাবতই চঞ্চল। অধিকাংশ নারীই বিকীর্ণমন্মথা। কিন্তু বিদ্যুন্মালাকে দেখিয়া চপল-স্বভাবা মনে হয় না। সে গম্ভীর প্রকৃতির নারী। রাজকুমাবীসুলভ আত্মাভিমান তাহার মনে আছে। তবে সে এমন কাজ করিয়া বসিল কেন?

অর্জুন তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিল, নদী হইতে উদ্ধার কবিয়াছিল। অঙ্গস্পর্শ না কবিয়া নদী হইতে উদ্ধার করা যায় না, অনিবার্যভাবেই অঙ্গস্পর্শ ঘটিয়াছিল। কিসে কি হয় বলা যায় না, সম্ভবত অঙ্গস্পর্শেব ফলেই বিদ্যুন্মালা অর্জুনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। নারীব মন একবার যাহার প্রতি ধাবিত হয়, সহজে নিবৃত্ত হয় না।

অর্জুন শাস্তি পাইয়াছে। এখন প্রশ্ন এই ঃ বিদ্যুন্মালাকে লইয়া কী করা যায়? জানিয়া শুনিয়া তাহাকে বিবাহ করা অসম্ভব। অথচ বিবাহ না করিয়া তাহাকে পিতৃরাজ্যে ফিরাইয়া দেওয়াও যায় না। গজপতি ভানুদেব সামান্য ব্যক্তি নন, তিনি এই অপমান সহ্য করিবেন না। আবার যুদ্ধ বাধিবে, যে মিত্র হইয়াছে সে আবার শত্রু হইবে।...বিষ খাওয়াইয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে বিদ্যুন্মালার প্রাণনাশ করিয়া অপঘাত বলিয়া রটনা কবিয়া দিলে সমস্যাব সমাধান হয়। কিন্তু—

মণিকঙ্কণা প্রবেশ করিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু দু'টি আতঙ্কে বিস্ফারিত। দ্বিধাজড়িত পদে সে পালঙ্কের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, শঙ্কা-সংহত কণ্ঠে বলিল—'মহারাজ, কি হয়েছে? মালা কী করেছে?'

বিদ্যুন্মালা ভিতরে ভিতরে কী কবিতেছে মণিকঙ্কণা কিছুই জানিতে পারে নাই। এখন বিদ্যুন্মালাকে সহসা বন্দিনী অবস্থায় পৃথক কক্ষে রক্ষিত হইতে দেখিয়া মণিকঙ্কণা আশঙ্কায় একেবারে দিশাহারা হইয়া গিয়াছে।

দেবরায় অপলক নেত্রে কিয়ৎকাল তাহার মুখেব পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—'তুমি জানো না?'

মণিকঙ্কণা পালঙ্কের পাশে বসিয়া পড়িল, রাজার পায়ের উপর হাত রাখিয়া বলিল—'না মহারাজ, আমি কিছু জানি না। কিন্তু আমার বড় ভয় করছে।'

সহসা মহারাজ দেবরায়ের মনের উষ্মা সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। পৃথিবীতে বিদ্যুন্মালাও আছে, মণিকঙ্কণাও আছে; সরলতা ও কপটতা পাশাপাশি বাস করিতেছে। তিনি মণিকঙ্কণাকে কাছে টানিয়া আনিয়া ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলিলেন—'তাহলে তোমার জেনে কাজ নেই। আজ থেকে তুমি আর বিদ্যুন্মালা পৃথক থাকবে।'

মণিকঙ্কণা আর প্রশ্ন করিল না, রাজার জানুর উপর মাথা রাখিয়া অস্ফুট স্বরে বলিল—'যথা আজ্ঞা মহারাজ।'

অর্জুন ও বলরাম চলিয়াছিল। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের তলে অস্পষ্ট পথরেখা ধরিয়া চলিয়াছিল। কেহ কথা বলিতেছিল না, বলিবার আছেই বা কি?

একে একে নগরের সপ্ত তোরণ পার হইয়া মধ্যরাত্রে তাহারা নগরসীমানার বাহিরে উপস্থিত হইল। অতঃপর রাজপথের স্পষ্ট নির্দেশ আর পাওয়া যাইবে না; নদী যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আপনার অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, রাজপথও তেমনি উন্মুক্ত শিলাতরঙ্গিত প্রান্তরে আসিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। পথ-নির্ণয় করিয়া অগ্রসর হওয়া দুষ্কর।

চলিতে চলিতে টিপিটিপি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। বলরাম এতক্ষণ নীরবে চালিয়াছিল, এখন অট্টহাস্য করিয়া উঠিল, বলিল—'আকাশের দেবরাজ আর বিজয়নগরের দেবরায়, দু'জনেই আমাদের প্রতি বিরূপ।'

কয়েক পা চলিবার পর অর্জুন বলিল—'বিজয়নগরের দেবরায়ের দোষ নেই। দোষ আমার।'

বলরাম বলিল—'কারুর দোষ নয়, দোষ ভাগ্যের। দৈবজ্ঞ ঠাকুর ঠিক বলেছিলেন।'

'হুঁ। আমার সঙ্গদোষে তোমারও সর্বনাশ হল।'

'সে আমার ভাগ্য।'

টিপিটিপি বৃষ্টি পড়িয়া চলিয়াছে। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের মৃদু স্ফুরণ অদৃশ্য প্রকৃতিকে পলকের জন্য দৃশ্যমান করিয়া লুপ্ত হইতেছে। থমকিয়া থমকিয়া বায়ুর একটা তরঙ্গ বহিতে আরম্ভ করিল। পথিক দু'জন এতক্ষণ বিশেষ অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে নাই, এখন রোমাঞ্চকর শৈত্য অনুভব করিতে লাগিল।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার পর বিদ্যুতের আলোকে অদূরে একটি দেউল চোখে পড়িল। দেউলটি ভগ্নপ্রায়, কিন্তু তাহার ছাদযুক্ত বহিরঙ্গন এখনো দাঁড়াইয়া আছে। পরিত্যক্ত দেবালয়। এখানে মানুষ কেহ থাকে বলিয়া মনে হয় না। বলরাম বলিল—'এস, খানিক বিশ্রাম করা যাক। দিনের আলো ফুটলে আবার বেরিয়ে পড়া যাবে।'

দুইজনে ছাদের নীচে গিয়া বসিল। এখানে বিরক্তিকর বৃষ্টি ও বাতাস নাই, ভূমিতলও শুষ্ক। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর বলরাম পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া শয়ন করিল। অর্জুনের দেহ অপেক্ষা মন অধিক ক্লান্ত, সে জানুর উপর মাথা রাখিয়া অবসন্ন মনে ভাবিতে লাগিল—বিদ্যুন্মালার ভাগ্যে কী আছে...

দু'জনেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, ঘুম ভাঙ্গিল পাখির ডাকে। আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া দিনের আলো ফুটিতেছে। কয়েকটা চটক পক্ষী মণ্ডপের তলে উড়িয়া কিচিরমিচির করিতেছে। আশেপাশে কোথাও মানুষের চিহ্ন নাই। দেউলে দেবতার বিগ্রহ নাই।

অর্জুন ও বলরাম আবার বাহির হইয়া পড়িল। বৃষ্টি থামিয়াছে, মেঘের গায়ে ফাটল ধরিয়াছে, তাহার ভিতর দিয়া নীল আকাশ দেখা যাইতেছে। বলরাম ঝুলি হইতে একমুঠি চিঁড়া বাহির করিয়া অর্জুনকে দিল, নিজে একমুঠি লইল, বলিল—'খেতে খেতে চল।'

বলরাম চিঁড়া চিবাইতে চিবাইতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চলিল। বলিল—'এখানে মানুষ-জন নেই বটে, কিন্তু আগে জনবসতি ছিল, হয়তো গ্রাম ছিল। এখনো তার চিহ্ন পড়ে রয়েছে চারিদিকে। কতদিন আগে গ্রাম ছিল কে জানে!'

অর্জুন একবার চক্ষু তুলিয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত গৃহের ভগ্নাবশেষগুলি দেখিল, বলিল—'পঞ্চাশ ষাট বছরের বেশি নয়। হয়তো মুসলমানেরা এদিক থেকে বিজয়নগর আক্রমণ করেছিল, তারপর গ্রাম ছারখার করে দিয়ে চলে গেছে।'

'তাই হবে।'

ক্রমে সূর্যোদয় হইল, ছিন্ন মেঘের ফাঁকে কাঁচা রৌদ্র চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল, পাশে তুঙ্গভদ্রার জল ঝলমল করিয়া উঠিল।

তাহারা পশ্চিমদিকে যাইতেছে, ডানদিকে তুঙ্গভদ্রা। কিন্তু তাহারা তুঙ্গভদ্রার বেশি কাছে যাইতেছে না, সাত-আট রজ্জু দূর দিয়া যাইতেছে; তুঙ্গভদ্রার তীরে সেনা-গুল্ম আছে, সৈনিকের হাতে

পড়িলে হাঙ্গামা বাধিতে পারে।

পথে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পড়িল। বর্ষার জলে খরস্রোতা কিন্তু অগভীর, দক্ষিণ দিক হইতে আসিয়া তুঙ্গভদ্রায় মিলিয়াছে। অর্জুন ও বলরাম জলে নামিয়া অঞ্জলি ভরিয়া জল পান করিল। তারপর এক হাঁটু জল পার হইয়া চলিতে লাগিল।

তরঙ্গায়িত ভূমি, শিলাখণ্ডের ফাঁকে ফাঁকে তৃণোদ্গম হইয়াছে, পথের চিহ্ন নাই। আকাশে কখনো রৌদ্র কখনো ছায়া। দুই পান্থ চলিয়াছে। সূর্যাস্তের পূর্বে বিজয়নগর রাজ্যের সীমানা পার হইয়া যাইতে হইবে।

দ্বিপ্রহরে তাহারা একটি পয়োনালকের তীরে বসিয়া গুড় সহযোগে চিঁড়া ভক্ষণ করিল, তারপর পয়ঃপ্রণালীতে জল পান করিয়া আবার চলিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে তাহারা একটি বিস্তীর্ণ উপত্যকায় পৌঁছিল। উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে অপেক্ষাকৃত উচ্চ পর্বত প্রাকাবের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। বোধহয় এই পর্বতই বিজয়নগর রাজ্যের অপরান্ত।

উপত্যকাব উপর দিয়া যাইতে যাইতে দুই পান্থ লক্ষ্য করিল, আশেপাশে নিকটে দূরে বহু স্তূপ রহিয়াছে; স্তূপগুলির অভ্যন্তরস্থ পাথর দেখা যায় না, বহু যুগের ধুলা ও বালুকায় ঢাকা পড়িয়াছে। মনে হয়, সুদূর অতীতকালে এই উপত্যকায় একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল; তারপর কালের আগুনে পুড়িয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। মানুষের হস্তাবলেপের সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে।

অর্জুন ও বলরাম প্রাকারসদৃশ পর্বতেব পদমূলে যখন পৌঁছিল তখন সূর্যাস্ত হয় নাই বটে, কিন্তু সূর্য পর্বতের আড়ালে ঢাকা পড়িয়াছে। পর্বতের পৃষ্ঠদেশে এক সাবি উচ্চ পাষাণ-স্তম্ভ দেখিয়া বোঝা যায় ইহাই বিজয়নগর রাজ্যেব পশ্চিম সীমানা।

বলরাম ঊর্ধ্বে চাহিয়া বলিল—'এই পাহাড়টা পার হলেই আমরা মুক্ত। চল, বেলা থাকতে থাকতে পার হয়ে যাই।'

পর্বতগাত্র পিচ্ছিল। সাবধানে উপরে উঠিতে উঠিতে বলরাম মন্তব্য কবিল—'ওপারে কাদের রাজ্য কে জানে।'

অর্জুন বলিল—'যদি মুসলমান রাজ্য হয়—'

বলরাম বলিল—'যদি মুসলমান বাজ্য হয়, অন্য রাজ্যে চলে যাব। দক্ষিণে সমুদ্রতীরে দু একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্য আছে।'

পাহাড়ে বেশি দূর উঠিতে হইল না, অল্প দূরে উঠিয়া তাহারা দেখিল সম্মুখেই একটি গুহার মুখ। বহুকাল পূর্বে এই গুহা মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত হইত, গুহার মুখে উচ্চ খিলান দিয়া বাঁধানো ছিল। এখন খিলান ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গুহামুখে স্তূপীভূত হইয়াছে। কিন্তু গুহার মুখ একেবারে বন্ধ হইয়া যায় নাই।

বলরাম গুহার মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিয়া বলিল—'আমাদের দেখছি গুহা-ভাগ্য প্রবল, যেখানে যাই সেখানেই গুহা।'

বলরাম একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিল, আকাশের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিল—'রাত্রে বোধহয় আবার বৃষ্টি হবে। পাহাড়ের ওপারে আশ্রয় পাওয়া যাবে কিনা ঠিক নেই। —কি বল? আজ রাত্রিটা গুহাতেই কাটাবে?'

অর্জুন নির্লিপ্ত স্বরে বলিল—'তোমার যেমন ইচ্ছা।'

'তবে এস, এই বেলা গুহায় ঢুকে পড়া যাক।' বলরাম উঠিয়া গুহায় প্রবেশের উপক্রম করিল।

এই সময় অর্জুনের দৃষ্টি পড়িল গুহামুখের একটি প্রস্তরফলকের উপর। অসমতল প্রস্তরফলকের গাত্রে প্রাচীন কর্ণাটী লিপিতে কয়েকটি আঁকাবাঁকা শব্দ খোদিত রহিয়াছে।

অপটু হস্তে পাষাণ কাটিয়া কেহ এই শব্দগুলি খোদিত করিয়াছিল। বহুকালের রৌদ্রবৃষ্টির প্রকোপে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, তবু যত্ন করিলে পাঠোদ্ধার করা যায়—'দেবদাসী তনুশ্রী গৌড়নিবাসী

শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।'

অর্জুন কিছুক্ষণ এই শিলালেখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তারপর বাহিরে একটি শিলাখণ্ডের উপর গিয়া বসিল। বলরাম বলিল—'কি হল?'

অর্জুন উত্তর দিল না, বহু দূর অতীতের এক পরিচয়হীনা নারীর কথা ভাবিতে লাগিল। কবে কে জানে, তনুশ্রী নামে এক দেবদাসী ছিল...সম্মুখের উপত্যকায় নগরী ছিল, নগরীর দেবমন্দিরে তনুশ্রী ছিল দেবদাসী...সেকালে দেবদাসীদের বিবাহ হইত না, তাহারা দেবভোগ্যা..তারপর কোথা হইতে আসিল মীনকেতু নামে এক শিল্পী...হয়তো সে পাষাণ-শিল্পে দক্ষ ছিল, যে মন্দিরে তনুশ্রী ছিল দেবদাসীদের অন্যতমা সেই মন্দিরের শিল্পশোভা রচনার জন্য শিল্পী মীনকেতু আসিয়াছিল...তারপর তনুশ্রী কামনা করিল শিল্পী মীনকেতুকে...অন্তর্গূঢ় তীব্র কামনা...দিন কাটিল মাস কাটিল, কিন্তু তনুশ্রীর কামনা পূর্ণ হইল না...শিল্পী মীনকেতু একদিন কাজ শেষ করিয়া চলিয়া গেল, হয়তো তনুশ্রীকে নিজের বজ্রসুচী উপহার দিয়া গেল...তারপর একদিন অন্তরের গোপন দাহ আর সহ্য করিতে না পারিয়া তনুশ্রী চুপি চুপি গুহামুখে আসিয়া পাষাণ-গাত্রে নিজের মর্মজ্বালা খোদিত করিয়া রাখিল; অনিপুণ হস্তের স্বল্পাক্ষর ভাষায় তাহার হৃদয়ের ক্রন্দন প্রকাশ পাইল—দেবদাসী তনুশ্রী গৌড়নিবাসী শিল্পী মীনকেতুকে কামনা করিয়াছিল।—কামনা পূর্ণ হয় নাই, পূর্ণ হইলে মর্মান্তিক গোপন কথা পাষাণে উৎকীর্ণ হইত না।

সামান্যা দেবদাসী তনুশ্রীকে কেহ মনে করিয়া রাখে নাই, কিন্তু তাহার ব্যর্থ কামনা পাষাণফলকে কালজয়ী হইয়া আছে। ইহাই কি সকল ব্যর্থ কামনার অন্তিম নিয়তি!

অর্জুন তন্ময় হইয়া ভাবিতেছিল, কয়েক বিন্দু বৃষ্টির জল তাহার মাথায় পড়িল। সে উর্ধ্বে একবার নেত্রপাত করিয়া দেখিল, সন্ধ্যার আকাশে মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে। ঝরিয়া-পড়া বারিবিন্দু যেন দেবদাসী তনুশ্রীর অশ্রুজল।

অর্জুন উঠিয়া বলরামকে বলিল—'চল, গুহায় যাই।'

চার

গুহার প্রবেশ মুখ বেশ প্রশস্ত, কিন্তু ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হইয়া ভিতর দিকের অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। ভূমিতলে শুষ্ক প্রস্তরপট্ট। এখানে শয়ন করিলে আর কোনো সুখ না থাক, বৃষ্টিতে ভিজিবার ভয় নাই।

দুইজনে প্রস্তরপট্টের খানিকটা ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া উপবেশন করিল। বলরাম বলিল—'মন্দ হল না। যদি বাঘ ভাল্লুক না থাকে আরামে রাত কাটবে। এস, এবার রাজভোগ সেবন করে শুয়ে পড়া যাক। অনেক হাঁটা হয়েছে।'

গুহার বাহিরে ধূসর আকাশ হইতে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিপাত হইতেছে। গুহার মধ্যে অন্ধকার ঘন হইতেছে। দুইজনে শুষ্ক চিঁড়া গুড় সেবন করিয়া পাশাপাশি শয়ন করিল।

দু'জনেই পরিশ্রান্ত। বলরাম অচিরাৎ ঘুমাইয়া পড়িল। অর্জুনের কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘুম আসিল না। গুহার ভিতর ও বাহির অন্ধকারে ডুবিয়া গেল; রাত্রি গভীর হইতে লাগিল।

ক্লান্ত চক্ষু অন্ধকারে মেলিয়া অর্জুন চিন্তা করিতে লাগিল দুইটি নারীর কথা; এক, বহুযুগের পরপার হইতে আগতা তনুশ্রী, দ্বিতীয়—বিদ্যুন্মালা। একজন সামান্যা দেবদাসী, অন্যা রাজকুমারী। কিন্তু তাহাদের জীবনের এক স্থানে ঐক্য আছে; তাহারা যাহা কামনা করিয়াছিল তাহা পায় নাই। নিয়তির পক্ষপাত নাই, নিয়তির কাছে রাজকন্যা এবং দেবদাসী সমান। —অর্জুনের মনের মধ্যে রাজকন্যা ও দেবদাসী একাকার হইয়া গেল।

গুহার মধ্যে শীতল জলসিক্ত বায়ুর মন্দ প্রবাহ রহিয়াছে। বায়ুপ্রবাহ গুহা-মুখের দিক হইতে আসিতেছে না, ভিতর দিক হইতে আসিতেছে। অর্জুন কিছুক্ষণ তাহা অনুভব করিয়া ভাবিল—গুহার মধ্যে তো বায়ু-চলাচল থাকে না, বদ্ধ বাতাস থাকে; তবে কি এ-গুহা নয়, সুড়ঙ্গ? পাহাড়ের পেট ফুঁড়িয়া অপর পাশে বাহির হইয়াছে। তাহা যদি হয়, পর্বত লঙ্ঘনের ক্লেশ বাঁচিয়া যাইবে।

ক্রমে তাহার চক্ষু মুদিয়া আসিতে লাগিল। অল্পকাল মধ্যেই সে ঘুমাইয়া পড়িত, কিন্তু এই সময় একটি অতি ক্ষীণ শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আবার তাহাকে সজাগ করিয়া তুলিল। শব্দ নয়, যেন বাতাসের মৃদু অথচ দ্রুত স্পন্দন; বহুদূর হইতে আসিতেছে। বাদ্যভাণ্ডের শব্দ! কিছুক্ষণ শুনিবার পর অর্জুন উঠিয়া বসিল।

হ্যাঁ, তাই বটে। বহু দূরে কিড়ি কিড়ি নাকাড়া বাজিতেছে। কিছুক্ষণের জন্য থামিয়া যাইতেছে, আবার বাজিতেছে। —কিন্তু এই জনপ্রাণীহীন গিরিপ্রান্তে এত রাত্রে নাকাড়া বাজায় কে? শব্দটা এতই ক্ষীণ যে কোন্ দিক হইতে আসিতেছে অনুমান করা যায় না।

অর্জুন বলরামের গায়ে হাত রাখিতেই সে উঠিয়া বসিল। অন্ধকারে কেহ কাহাকেও দেখিল না, বলরাম বলিল—'কী?'

অর্জুন বলিল—'কান পেতে শোনো। কিছু শুনতে পাচ্ছ?'

বলরাম কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া শুনিল; শেষে বলিল—'অনেক দূরে নাকাড়া বাজছে! এ কি ভৌতিক কাণ্ড না কি? কারা নাকাড়া বাজাচ্ছে, হুরু-বুরু?'

অর্জুন বলিল—'না, মুসলমান নাকাড়া বাজাচ্ছে। আমি ওদের বাজনা চিনি।'

'আমিও চিনি।' বলরাম আরও খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিল—'তাই বটে। খিটি মিটি খিটি মিটি খিট্ খিট্। কিন্তু মুসলমান এখানে এল কোথা থেকে?'

'পাহাড়ের ওপারে হয়তো বহমনী রাজ্য।'

'তা হতে পারে, কিন্তু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এতদূরে নাকাড়ার শব্দ আসবে?'

'কেন আসবে না। এই গুহা যদি সুড়ঙ্গ হয়, তাহলে আসতে পাবে।'

'সুড়ঙ্গ!'

অর্জুন বায়ু-চলাচলের কথা বলিল। শুনিয়া বলরাম বলিল—'সম্ভব। উপত্যকায় যখন মানুষের বসতি ছিল, তখন তারা এই সুড়ঙ্গ দিয়ে পাহাড় পার হত। এখন মানুষ নেই, গুহাটা পড়ে আছে। —কিন্তু মুসলমানেরা গুহার ওপারে কী করছে? ওপারে কি নগর আছে?'

'জানি না। সম্ভব মনে হয় না।'

বলরাম একটু নীরব থাকিয়া বলিল—'আজ রাত্রে আর ভেবে কোনো লাভ নেই। শুয়ে পড়। কাল সকালে উঠে দেখা যাবে।'

বলরাম শয়ন করিল। অর্জুন উৎকর্ণভাবে বসিয়া রহিল, কিন্তু দূরাগত নাকাড়াধ্বনি আর শোনা গেল না। তখন সেও শয়ন করিল।

পরদিন প্রাতে যখন তাহাদের ঘুম ভাঙ্গিল তখন সূর্যোদয় হইয়াছে, মেঘভাঙ্গা সজল রৌদ্র গুহা-মুখে প্রবেশ করিয়াছে। বলরাম বলিল—'এস দেখা যাক, এটা গুহা কি সুড়ঙ্গ।'

দুইজনে গুহার অভ্যন্তরের দিকে চলিল। নবোদিত সূর্যের আলো অনেক দূর পর্যন্ত গিয়াছে, সেই আলোতে পথ দেখিয়া চলিল। গুহা ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া আসিতেছে, দুইজন পাশাপাশি চলা যায় না। অর্জুন আগে আগে চলিল।

অনুমান দুই রজ্জু সিধা গিয়া রন্ধ্র তেরছাভাবে মোড় ঘুরিল। এখানে আর সূর্যের আলো নাই; প্রথমটা ছায়া-ছায়া, তারপর সূচীভেদ্য অন্ধকার।

অর্জুন তাহার লাঠি দু'টি ভল্লের ন্যায় সম্মুখে বাড়াইয়া সন্তর্পণে অগ্রসর হইল। অনুমান আর দুই রজ্জু গিয়া লাঠি প্রাচীরে ঠেকিল। আবার একটা মোড়, এবার বাঁ দিকে।

মোড় ঘুরিয়া কয়েক পা গিয়া অর্জুন দাঁড়াইয়া পড়িল। হঠাৎ অন্ধকার স্বচ্ছ হইয়াছে, বেশ খানিকটা দূরে চতুষ্কোণ রন্ধ্রের মুখে সবুজ আলোর ঝিলিমিলি।

অর্জুন বলিল—'সুড়ঙ্গই বটে।'

সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গ ক্রমশ প্রশস্ত হইয়াছে, কিন্তু সুড়ঙ্গের শেষে নির্গমনের রন্ধ্রটি বৃহৎ নয়; প্রস্থ অনুমান দুই হস্ত, খাড়াই তিন হস্ত। একজন মানুষের বেশি একসঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে না।

অর্জুন ও বলরাম রন্ধ্রমুখ দিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহাদের দেহ শক্ত হইয়া উঠিল।

রন্ধ্রমুখের চারিপাশে ও নিম্নে যে-সব ঝোপ-ঝাড় জন্মিয়াছিল তাহা কাটিয়া পরিষ্কৃত হইয়াছে; রন্ধ্রমুখ হইতে জমি ক্রমশ ঢালু হইয়া প্রায় বিশ হাত নীচে সমতল হইয়াছে। সমতল ভূমিতে বড় বড় গাছের বন। গাছগুলি কিন্তু ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়, গাছের ফাঁকে ফাঁকে বহুদূর পর্যন্ত নিষ্পাদপ ভূমি দেখা যায়। উন্মুক্ত ভূমির উপর সারি সারি অসংখ্য তালপাতার ছাউনি। ছাউনিতে অগণিত মানুষ। মানুষগুলি মুসলমান সৈনিক, তাহাদের বেশভূষা ও অস্ত্রশস্ত্র দেখিয়া বোঝা যায়। মাটির উপর লম্বমান অনেকগুলি তালগাছের কাণ্ডের ন্যায় বৃহৎ কামান; সৈনিকেরা কামানের গায়ে দড়ি বাঁধিয়া সেগুলিকে পাহাড়ের দিকে টানিয়া আনিতেছে। বেশি চেঁচামেচি সোরগোল নাই, প্রায় নিঃশব্দে কাজ হইতেছে।

বলবাম কিছুক্ষণ এই দৃশ্য নিরীক্ষণ করিয়া অর্জুনের হাত ধরিয়া ভিতর দিকে টানিয়া লইল। রন্ধ্রমুখ হইতে কিছু দূরে বসিয়া দুইজনে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলরাম হ্রস্বকণ্ঠে বলিল—'গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনি হয়, আস্তে কথা বল। কী বুঝলে?'

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অর্জুন বলিল—'ওরা বহমনী রাজ্যের সৈন্য।'

বলরাম বলিল—'হুঁ। কত সৈন্য?'

'ছাউনি দেখে মনে হয় দশ হাজারের কম নয়। পিছনে আরো থাকতে পারে।'

'হুঁ। ওদের মতলব কি?'

'অতর্কিতে বিজয়নগর আক্রমণ করা ছাড়া কী মতলব থাকতে পারে? ওরা এই সুড়ঙ্গের সন্ধান জানে, তাই সুড়ঙ্গের মুখ থেকে ঝোপ-ঝাড় কেটে পরিষ্কার করে রেখেছে। এইদিক দিয়ে সৈন্যরা বিজয়নগরে প্রবেশ করবে।'

'আর কামানগুলো? সেগুলো তো সুড়ঙ্গ দিয়ে আনা যাবে না।'

'সেইজন্যেই বোধহয় ওদের দেরি হচ্ছে। কামানগুলোকে আগে পাহাড় ডিঙ্গিয়ে নিয়ে যাবে, তারপর নিজেরা সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে।'

'আমারও তাই মনে হয়।' বলরাম থলি হইতে চিঁড়া-গুড় বাহির করিয়া অর্জুনকে দিল, নিজেও লইল। বলিল—'এখন আমাদের কর্তব্য কি?'

অর্জুন বলিল—'এদেব কার্যকলাপ আরো কিছুক্ষণ লক্ষ্য করা দরকার। আমরা যা অনুমান করছি তা ভুলও হতে পারে।'

দু'জনে নির্জলা প্রাতরাশ শেষ করিল। বলরাম বলিল—'ইতিমধ্যে আমার ছোট্ট কামানে বারুদ গেদে তৈরি হয়ে থাকি। যদি কেউ সুড়ঙ্গে মাথা গলায় তাকে বধ করব।'

অর্জুন বলিল—'প্রস্তুত থাকা ভাল। আমারও ভল্ল আছে।'

বলরাম থলি হইতে কামান বাহির করিল। কামানে বারুদ ও গুলি ভরিয়া নারিকেল ছোবড়ার দড়ির মুখে চক্‌মকি ঠুকিয়া আগুন ধরাইল। তারপরই দুইজনে রন্ধ্রমুখের অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সৈন্যদের কার্যবিধি দেখিতে লাগিল।

যত বেলা বাড়িতেছে সৈনিকদের কর্মতৎপরতাও তত বাড়িতেছে। কয়েকজন সেনানীপদস্থ ব্যক্তি সিপাহীদের কর্ম পরিদর্শন করিতেছে। স্পষ্টই বোঝা যায়, কামানগুলিকে টানিয়া পাহাড়ে

তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু কামানগুলি এতই গুরুভার যে, কার্য অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে।

দ্বিপ্রহরে কিটি কিটি নাকাড়া বাজিল। এই নাকাড়ার ক্ষীণ শব্দ কাল রাত্রে তাহারা শুনিয়াছিল। সৈনিকেরা কর্মে বিরাম দিয়া মধ্যাহ্ন ভোজনে বসিল। বলরাম ও অর্জুন তখন রন্ধ্রমুখ হইতে সরিয়া আসিল। বলরাম বলিল—'আর সন্দেহ নেই। এখন কর্তব্য কী বল।'

অর্জুন বলিল—'কর্তব্য অবিলম্বে রাজাকে সংবাদ দেওয়া।'

বলরাম কিছুক্ষণ মাথা চুলকাইল। রাজা অর্জুনকে নির্বাসন দিয়াছেন, কিন্তু অর্জুন বিজয়নগরকে মাতৃভূমি জ্ঞান করে, বিজয়নগরকে সে অনিষ্ট হইতে রক্ষা করিবে। বলরামেরও রক্ত তপ্ত হইয়া উঠিল। সে বলিল—'ঠিক কথা। কিন্তু রাজাকে অবিলম্বে সংবাদ কি করে দেওয়া যায়! আমি যেতে পারি, কিন্তু পায়ে হেঁটে যেতে সময় লাগবে। ততক্ষণে—' বলরাম রন্ধ্রমুখের দিকে হস্ত সঞ্চালন করিল।'

অর্জুন বলিল—'তুমি যাবে না, আমি যাব।'

বলরাম চমকিয়া বলিল—'তুমি যাবে! কিন্তু রাজ্যের মধ্যে ধরা পড়লেই তো তোমার মুণ্ড যাবে!'

অর্জুন বলিল—'যায় যাক। আমার জীবনের কোনো মূল্য নেই। যদি বিজয়নগরকে রক্ষা করতে পারি—'

'অর্জুন, আমার কথা শোনো। তুমি থাকো, আমি যাচ্ছি। কাল এই সময় পৌঁছুতে পারব।'

'না। ততক্ষণে শত্রু কামান নিয়ে পাহাড় পার হবে। আমি লাঠিতে চড়ে শীঘ্র যাব, আজ রাত্রেই রাজাকে সংবাদ দিতে পারব।'

'কিন্তু—তুমি বিজয়নগরকে এত ভালবাসো?'

'বিজয়নগরকে বেশি ভালবাসি, কি রাজাকে বেশি ভালোবাসি, কি বিদ্যুন্মালাকে বেশি ভালবাসি, তা জানি না। কিন্তু আমি যাব।'

এই সময় বাধা পড়িল। রন্ধ্রমুখের বাহিরে মানুষের কণ্ঠস্বর। বলরাম ও অর্জুন দ্রুত উঠিয়া গুহামুখের পাশের দিকে সরিয়া গেল। বলরাম একবার গলা বাড়াইয়া দেখিল, তারপর অর্জুনের কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলিল—'তিন-চারজন সেনানী এদিক পানে আসছে। তৈরি থাকো, ওরা গুহার মধ্যে পা বাড়ালেই কামান দাগব।' বলরাম ক্ষিপ্র হস্তে কামান ও আগুনের পলিতা হাতে লইয়া দাঁড়াইল।

সেনানীরা ঢালু জমি দিয়া উপরে উঠিতেছে, তাহাদের বাক্যাংশ বিচ্ছিন্নভাবে শোনা গেল—

'কামানগুলো আগে পাহাড়ের ওপারে নিয়ে যেতে হবে, তারপর...'

'সৈন্যরা যখন ইচ্ছা সুড়ঙ্গ পার হতে পারে..'

'দেখেছি। মাঝখানে অন্ধকার বটে, কিন্তু মশাল জ্বাললে...'

'এস দেখি।'

রন্ধ্রের মুখ সংকীর্ণ, একসঙ্গে একাধিক ব্যক্তি প্রবেশ করিতে পারে না। বলরাম রন্ধ্রমুখের দিকে কামান লক্ষ্য করিয়া দাঁড়াইল।

একটা মানুষ রন্ধ্রমুখে দেখা গেল। সে রন্ধ্রে প্রবেশ করিবার জন্য পা বাড়াইয়াছে অমনি বলরামের কামান ছুটিল। গুহামধ্যে বিকট প্রতিধ্বনি উঠিল।

প্রবেশোন্মুখ লোকটার বুকে গুলি লাগিয়াছিল, সে রন্ধ্রের বাহিরে পড়িয়া গেল, তারপর ঢালু জমির উপর গড়াইতে গড়াইতে নীচে নামিয়া গেল। অন্য যাহারা সঙ্গে ছিল তাহারা এই অভাবনীয় বিপর্যয়ে ভয় পাইয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পলাইল।

বলরাম উত্তেজিতভাবে অর্জুনের কানে কানে বলিল—'তুমি যাও, রাজাকে খবর দাও। আমি

এখানে আছি। যতক্ষণ বারুদ আছে ততক্ষণ কাউকে গুহায় ঢুকতে দেব না।' সে আবার কামানে গুলি-বারুদ ভরিতে লাগিল।

'চললাম।' অর্জুন একবার বলরামকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সুড়ঙ্গমধ্যে প্রবেশ করিল। হয়তো আর দেখা হইবে না।

পাঁচ

সুড়ঙ্গের পূর্ব প্রান্তে নির্গত হইয়া অর্জুন আকাশের পানে চাহিল। মেঘ-ঢাকা আকাশে ছাই-ঢাকা অঙ্গারের মত সূর্য একটু পশ্চিমে ঢলিয়াছে। এখনো দেড় প্রহর বেলা আছে। এই বেলা বাহির হইয়া পড়িলে সন্ধ্যার পর বিজয়নগরে পৌঁছানো যাইবে। অর্জুন উপত্যকায় নামিল, তারপর লাঠিতে চড়িয়া পূর্বমুখে দীর্ঘায়িত পদদ্বয় চালিত করিয়া দিল।

তেজস্বী অশ্ব যেরূপ শীঘ্র চলে, অর্জুন সেইরূপ শীঘ্র চলিয়াছে। তবু তাহার মনঃপূত হইতেছে না, আরো শীঘ্র চলিতে পারিলে ভাল হয়। তাহার আশঙ্কা, যদি ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়, যদি ঘন মেঘের অন্তরালে সূর্য আকাশে অস্তমিত হয়, তাহা হইলে পথ চিনিয়া বিজয়নগরে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। পথের একমাত্র নির্দেশ দূরে বাম দিকে তুঙ্গভদ্রার উদ্বেল ধারা। তুঙ্গভদ্রার সমান্তরালে চলিলে পথ ভুলিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি প্রবল বারিধারায় চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া যায়, তুঙ্গভদ্রাকে দেখা যাইবে না।

অর্জুন দুই দণ্ডে উপত্যকা পার হইল। তারপর উদ্‌ঘাতপূর্ণ শিলাবিকীর্ণ ভূমি, সাবধানে না চলিলে অপঘাতের সম্ভাবনা। অর্জুন সতর্কভাবে চলিতে লাগিল, তাহার গতি অপেক্ষাকৃত মন্থর হইল। তবু এইভাবে চলিলে সন্ধ্যার অব্যবহিত পরে পৌঁছানো যাইতে পারে। এখনো প্রায় বিশ ক্রোশ পথ বাকি।

সূর্য দিগন্তের দিকে আরো নামিয়া পড়িল। দিক্‌চক্রে গাঢ় মেঘ পুঞ্জীভূত হইয়াছে, তাই সূর্যাস্তের পূর্বেই চতুর্দিক ছায়াচ্ছন্ন, দূরের দৃশ্য অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

তারপর হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা হইল। অর্জুনের একটি লাঠি পাথরের ফাটলের মধ্যে আটকাইয়া গিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। অর্জুন প্রস্তুত ছিল না, হুমড়ি খাইয়া মাটিতে পড়িল।

ত্বরিতে উঠিয়া সে ভগ্ন লাঠি পরীক্ষা করিল। লাঠি ঠিক মাঝখানে ভাঙিয়াছে, ব্যবহারের উপায় নাই। অর্জুন কিছুক্ষণ মাথায় হাত দিয়া দাঁড়াইল, তাপর ভাঙ্গা লাঠি ফেলিয়া দিয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। প্রস্তর কর্কশ ভূমির উপর দিয়া নগ্নপদে ছুটিয়া চলিল।

সূর্য অস্ত গেল। যেটুকু আলো ছিল তাহাও নিভিয়া গেল, আকাশের অষ্ট দিক হইতে যেন দলে দলে বাদুড় আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। দিক্‌চিহ্নহীন ভূমিতলে আর কিছু দেখা যায় না।

অর্জুন তবু ছুটিয়া চলিয়াছে। শিলাঘাতে চরণ ক্ষতবিক্ষত, কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহার জ্ঞান নাই, তবু অন্তরের দুরন্ত প্রেবণায় ছুটিয়া চলিয়াছে।

রাত্রি কত? প্রথম প্রহর কি অতীত হইয়া গিয়াছে। তবে কি আজ রাত্রে রাজার কাছে পৌঁছানো যাইবে না? অর্জুন থমকিয়া দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিল। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে সহসা চোখে পড়িল বাম দিকে দিগন্তরেখার কাছে ক্ষুদ্র রক্তাভ একটি আলোকপিণ্ড। প্রথমটা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না; তারপর মনে পড়িল—হেমকূট পর্বতের মাথায় অগ্নিস্তম্ভ। সে দিগ্‌ভ্রান্তভাবে দক্ষিণে চলিয়াছিল।

একটা নিশানা যখন পাওয়া গিয়াছে তখন আর ভাবনা নাই। বিজয়নগর এখনো অনেক দূরে, কিন্তু সেখান হইতে আলোর হাতছানি আসিয়াছে। অর্জুন অগ্নিবিন্দুটি সম্মুখে রাখিয়া আবার

দৌড়িতে আরম্ভ করিল।

তারপর হঠাৎ সব লণ্ডভণ্ড হইয়া গেল। অন্ধকারে ছুটিতে ছুটিতে সহসা তাহার পায়ের তলা হইতে মাটি সরিয়া গেল, ক্ষণকাল শূন্যে পড়িয়া সে ঝপাং করিয়া জলে পড়িল, পতনের বেগে জলে ডুবিয়া গেল। তারপর যখন সে মাথা জাগাইল, তখন ভরা নদীর খরস্রোত তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিয়াছে।

আবার তুঙ্গভদ্রার জলে অবগাহন। কিন্তু এবার ভয় নাই। তুঙ্গভদ্রা তাহাকে বিজয়নগর পৌঁছাইয়া দিবে।

অর্জুন চলিয়া যাইবার পর বলরাম কামানে গুলি-বারুদ ভরিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে বসিয়া রহিল। রন্ধ্রমুখের বাহির হইতে বহু কণ্ঠের উত্তেজিত কলরব আসিতেছে। কিন্তু রন্ধ্রমুখের কাছে কেহ আসিতেছে না। বলরাম দাঁত খিঁচাইয়া হিংস্র হাসি হাসিল, মনে মনে বলিল—'যিনি এদিকে আসবেন তাঁকে শহীদী'র শরবৎ পান করাব।'*

দু'দণ্ড অপেক্ষা করিবার পর কেহ আসিতেছে না দেখিয়া বলরাম গুড়ি মারিয়া গুহামুখের নিকটে আসিল। বাহিরে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া দেখিল, পঞ্চাশ হাত দূরে হৈ হৈ কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে। ভিমরুলের চাকে ঢিল মারিলে যেরূপ হয় পরিস্থিতি প্রায় সেইরূপ; বিক্ষিপ্ত চঞ্চল পতঙ্গের মত অগণিত মুসলমান সৈনিক বিভ্রান্তভাবে ছুটাছুটি করিতেছে, অধিকাংশ সৈনিক কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া আস্ফালন করিতেছে। কিন্তু মৃতদেহটা যেখানে গড়াইয়া পড়িয়াছিল সেখানেই পড়িয়া আছে, কেহ তাহার নিকটে আসিতে সাহস করে নাই। একদল সৈনিক অর্ধচন্দ্রাকারে কাতার দিয়া পঞ্চাশ হাত দূরে দাঁড়াইয়া আছে এবং একদৃষ্টে মৃতদেহের পানে তাকাইয়া আছে।

তাহাদের ভীতি ও বিভ্রান্তির যথেষ্ট কারণ ছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল কাছাকাছি শত্রু নাই। তাহারা ইতিপূর্বে রন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া সুড়ঙ্গের এপার ওপার দেখিয়া আসিয়াছে, জনমানবের দর্শন পায় নাই। হঠাৎ এ কী হইল? গুহার মধ্য হইতে কাহারা অস্ত্র নিক্ষেপ করিল! কেমন অস্ত্র! তীর নয়, তীর হইলে দেহে বিঁধিয়া থাকিত। তবে কেমন অস্ত্র? আততায়ী মানুষ না জিন্! ছোট কামান যে থাকিতে পারে ইহা তাহাদের বুদ্ধির অতীত।

সেনানীরা নিজেদের মধ্যে এই অভাবনীয় ঘটনার আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। সকলেরই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা। পাহাড় ডিঙ্গাইয়া কামান লইয়া যাওয়ার কাজও স্থগিত হইল। মৃতদেহটা সারাদিন পড়িয়া রহিল।

সূর্যাস্তের পর অন্ধকার গাঢ় হইলে একদল সৈনিক চুপি চুপি আসিয়া ভীত-চকিত নেত্রে রন্ধ্রের পানে চাহিতে চাহিতে মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া গেল। তারপর দীর্ঘকাল কোনো পক্ষেরই আর সাড়াশব্দ নাই।

মধ্যরাত্রে বলরাম কামান কোলে বসিয়া বসিয়া একটু ঝিমাইয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ একটা জ্বলন্ত মশাল গুহার মধ্যে আসিয়া পড়িল। বলরাম চমকিয়া আরো কোণের দিকে সরিয়া গেল, যাহাতে মশালের আলোকে তাহাকে দেখা না যায়। কামান উদ্যত করিয়া সে বসিয়া রহিল।

কিন্তু কেহ গুহায় প্রবেশ করিল না। মশালটা প্রচুর ধূম বিকীর্ণ করিতে করিতে নিভিয়া গেল।

দণ্ড দুই পরে আর একটা জ্বলন্ত মশাল আসিয়া পড়িল। বলরাম শত্রুপক্ষের মতলব বুঝিল; তাহারা আগুন ও ধোঁয়ার সাহায্যে লুক্কায়িত আততায়ীকে বাহিরে আনিতে চাহে। সে চুপটি করিয়া রহিল।

---

* সেকালে মুসলমানদের মধ্যে প্রবাদ-বাক্য প্রচলিত ছিল, হিন্দুকে মারিতে গিয়া যদি কোন মুসলমান মরে তবে সে শহীদী'র শরবৎ পান করে। অর্থাৎ স্বর্গে যায়।

ওদিকে বহমনী সেনানীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। যদি গুহায় লুক্কায়িত জীব বা জীবগণ মানুষ হয় তবে তাহারা নিশ্চয় বিজয়নগরের মানুষ। যদি বিজয়নগরের মানুষ আক্রমণের কথা জানিতে পারিয়া থাকে তাহা হইলে অতর্কিতে আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। এখন কী কর্তব্য? গুহানিবদ্ধ জীব সম্বন্ধে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত কিছু করা যায় না।

রাত্রি তৃতীয় প্রহরে আবার রন্ধ্রমুখের কাছে মশালের আলো দেখা গেল। এবার মশাল গুহামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল না; একজন কেহ গুহার বাহিরে অদৃশ্য থাকিয়া মশালটাকে ভিতরে প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতে লাগিল।

বলরাম চুপটি করিয়া রহিল।

লোকটা তখন সাহস পাইয়া গুহার মধ্যে পা বাড়াইল। সে গুহার মধ্যে পদার্পণ করিয়াছে অমনি ভয়ঙ্কর প্রতিধ্বনি তুলিয়া বলরামের কামান গর্জন করিয়া উঠিল। লোকটা গলার মধ্যে কাকুতির ন্যায় শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল, মশাল মাটিতে পড়িয়া দপ্‌দপ্‌ করিতে লাগিল।

লোকটা আর শব্দ করিল না, রন্ধ্রমুখের কাছে অনড় পড়িয়া রহিল। মশালের নিবন্ত আলোয় বলরাম আবার কামানে গুলি-বারুদ ভরিল। তাহার ইচ্ছা হইল উচ্চৈঃস্বরে গান ধরে—হরে মুরারে মধুকৈটভারে! কিন্তু সে ইচ্ছা দমন করিল।

অতঃপর আর কেহ আসিল না। মশালও নয়।

মহারাজ দেবরায় সান্ধ্য আহার শেষ করিয়া বিরামকক্ষে আসিয়া বসিয়াছিলেন। মন্ত্রী লক্ষ্মণ মল্লপ পালঙ্কের সন্নিকটে হর্ম্যতলে বসিয়া কোলের কাছে পানের বাটা লইয়া সুপারি কাটিতেছিলেন। কক্ষে অন্য কেহ ছিল না; কক্ষের চারি কোণে দীপগুচ্ছ জ্বলিতেছিল। মন্ত্রী ও রাজা নিম্নস্বরে জল্পনা করিতেছিলেন।

মণিকঙ্কণা মাঝে মাঝে আসিয়া দ্বারের ফাঁকে উঁকি মারিতেছিল। মন্ত্রীটা এখনো বসিয়া ফিস্‌ফিস্‌ করিতেছে। সে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছিল।

রাজা শেষ পর্যন্ত বিদ্যুন্মালা সম্বন্ধে সকল কথা মন্ত্রীকে বলিয়াছিলেন। সমস্যা দাঁড়াইয়াছিল, বিদ্যুন্মালাকে লইয়া কী করা যায়। অনেক আলোচনা করিয়াও সমস্যার নিষ্পত্তি হয় নাই।

সহসা বহির্দ্বারের ওপারে প্রতীহার-ভূমি হইতে উচ্চ বাক্যালাপের শব্দ শোনা গেল। মন্ত্রী ভ্রূ তুলিয়া দ্বারের পানে চাহিলেন, রাজা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। তারপর একটি প্রতিহারিণী দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল—'অর্জুনবর্মা মহারাজের সাক্ষাৎ চান।'

রাজা ও মন্ত্রী সবিস্ময় দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। তারপর মন্ত্রী পানের বাটা সরাইয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—'আমি দেখছি।'

মন্ত্রী দ্রুতপদে দ্বারের বাহিরে চলিয়া গেলেন। রাজা কঠিন চক্ষে সেইদিকে চাহিয়া ভ্রূবদ্ধ ললাটে বসিয়া রহিলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী অর্জুনকে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুনের সর্বাঙ্গে জল ঝরিতেছে, বস্ত্র ও পদদ্বয় কর্দমাক্ত। সে টলিতে টলিতে আসিয়া রাজার সম্মুখে যুক্তকর ঊর্ধ্বে তুলিয়া অভিবাদন করিল, তারপর ছিন্নমূল বৃক্ষবৎ সশব্দে মাটিতে পড়িয়া গেল।

মন্ত্রী ত্বরিতে তাহার বক্ষে হাত রাখিয়া দেখিলেন, বলিলেন—'অবসন্ন অবস্থায় মূর্ছা গিয়াছে। এখনি জ্ঞান হবে।' তিনি অর্জুনের মুখে যে দু'চার কথা শুনিয়াছিলেন তাহা রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজার মেরুদণ্ড ঋজু হইল।

'সত্য কথা।'

'সত্য বলেই মনে হয়। মিথ্যা সংবাদ দেবার জন্য ফিরে আসবে কেন?'

কিয়ৎকাল পরে অর্জুনের জ্ঞান হইল। সে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, তারপর দণ্ডায়মান হইল। স্খলিত স্বরে বলিল—'মহারাজ, শত্রুসৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাজ্য আক্রমণের চেষ্টা করছে।'

রাজা বলিলেন—'বিশদভাবে বল।'

অর্জুন বিস্তারিতভাবে সকল কথা বলিল। শুনিয়া রাজা মন্ত্রীর দিকে ফিরিলেন—'আর্য লক্ষ্মণ—'

কিন্তু মন্ত্রীকে দেখিতে পাইলেন না। মন্ত্রী কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছেন।

সহসা বাহিরে ঘোর রবে রণ-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। আকাশ-বাতাস আলোড়িত করিয়া বাজিয়া চলিল, দূর দূরান্তরে নিনাদিত হইল। বহু দূরে অন্য দুন্দুভি রাজপুরীর দুন্দুভিধ্বনি তুলিয়া লইয়া বাজিতে লাগিল। রাজ্যময় বার্তা ঘোষিত হইল—শত্রু রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে, সতর্ক হও, সকলে সতর্ক হও, সৈন্যগণ প্রস্তুত হও।

ধন্নায়ক লক্ষ্মণ মল্লপ কটিতে তরবারি বাঁধিতে বাঁধিতে ফিরিয়া আসিলেন। রাজা ও মন্ত্রীতে দ্রুত বাক্যালাপ হইল—

'সব প্রস্তুত।'

'রাজধানীতে কত সৈন্য আছে?'

'ত্রিশ হাজার।'

রাজা বলিলেন—'বহমনী যখন পশ্চিম দিক থেকে আক্রমণ করেছে তখন পূর্বদিক থেকেও একসঙ্গে আক্রমণ করবে।'

লক্ষ্মণ মল্লপ বলিলেন—'আমারও তাই মনে হয়। —এখন আদেশ?'

'রাজধানী রক্ষার জন্য নগরপাল নরসিংহ মল্লের অধীনে দশ হাজার সৈন্য থাক। আমি দশ হাজার সৈন্য নিয়ে পশ্চিম সীমান্তে যাচ্ছি, আপনি দশ হাজার নিয়ে পূর্ব সীমান্তে যান।'

'ভাল। কখন যাত্রা করা যাবে?'

'মধ্য রাত্রি অতীত হবার পূর্বেই।'

'তবে মশালের ব্যবস্থা করি। জয়োস্তু মহারাজ।' মন্ত্রী চলিয়া গেলেন। অর্জুনের দিকে কেহ দৃক্‌পাত করিল না। দুন্দুভি বাজিয়া চলিল।

মণিকঙ্কণা এত রাত্রে দুন্দুভির শব্দ শুনিয়া হতচকিত হইয়া গিয়াছিল, সে রাজার কাছে ছুটিয়া আসিল। অর্জুনকে দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—'এ কি!'

রাজা বলিলেন—'মণিকঙ্কণা! আমি যুদ্ধে যাচ্ছি। পিঙ্গলাকে ডাকো, আমার রণসজ্জা নিয়ে আসুক।'

মণিকঙ্কণা বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া পিছু হটিতে হটিতে চলিয়া গেল।

'মহারাজ—'

রাজা অর্জুনের দিকে চাহিলেন। অর্জুনের অস্তিত্ব তিনি ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

অর্জুন বলিল—'মহারাজ, আমি আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেছি, বিজয়নগরে ফিরে এসেছি, সেজন্য দণ্ডার্হ।'

রাজা বলিলেন—'তোমার দণ্ড আপাতত স্থগিত রইল। তুমি কারাগারে বন্দী থাকবে। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তোমার বিচার করব। যদি তোমার সংবাদ মিথ্যা হয়—'

অর্জুন যুক্তকরে বলিল—'একটি ভিক্ষা আছে। আমাকে আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন। যদি আমার সংবাদ মিথ্যা নয়, তৎক্ষণাৎ আমার মুণ্ডচ্ছেদ করবেন।'

রাজা ক্ষণেক বিবেচনা করিলেন—'উত্তম। তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।'

'ধন্য মহারাজ।'

পিঙ্গলা রাজার বর্মচর্ম শিরস্ত্রাণ ও তরবারি লইয়া প্রবেশ করিল।

ছয়

সে-রাত্রে বিজয়নগর রাজ্যে কাহারো নিদ্রা আসিল না। রাত্রির আকাশ ভরিয়া রণদুন্দুভির নিনাদ স্পন্দিত হইতে লাগিল।

দুন্দুভিধ্বনির তাৎপর্য বুঝিতে কাহারো বিলম্ব হয় নাই। যুদ্ধ! শত্রু আক্রমণ করিয়াছে। দূর গ্রামে গ্রামে গৃহস্থেরা দুন্দুভি শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিল, ঘরে অস্ত্রশস্ত্র যাহা ছিল তাহাতে শাণ দিতে লাগিল। নগরের সাধারণ জনগণ পরস্পরের গৃহে গিয়া উত্তেজিত জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করিয়া দিল; ধনী ব্যক্তিরা সোনাদানা লুকাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। গণ্যমান্য রাজপুরুষেরা রাজসভার দিকে ছুটিলেন। সৈনিকেরা বর্মচর্ম পরিয়া প্রস্তুত হইল। অনেকদিন পরে যুদ্ধ। সৈনিকদের মনে হর্ষোদ্দীপনা, মুখে হাসি; সৈনিকবধূদের চোখে আশঙ্কার অশ্রুজল।

রাত্রি দ্বিপ্রহরে রাজা ও লক্ষ্মণ মল্লপ দুই দল সৈন্য লইয়া পূর্ব ও পশ্চিমে যাত্রা করিলেন। অশ্বারোহী সৈনিকদের হস্তধৃত মশালশ্রেণী অন্ধকারে জ্বলন্ত ধূমকেতুর ন্যায় বিপরীত মুখে ছুটিয়া চলিল।

তিন রানী নিজ নিজ ভবনে দ্বার রুদ্ধ করিয়া অন্ধকার শয্যায শয়ন করিলেন। পদ্মালয়াম্বিকা শিশুপুত্র মল্লিকার্জুনকে বুকে লইয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতে লাগিলেন; যুদ্ধ ব্যাপারে নারীর করণীয কিছু নাই, তাহাবা কেবল কাল্পনিক বিভীষিকাব আগুনে দগ্ধ হইতে পাবে।

বিদ্যুন্মালা নিজেব স্বতন্ত্র কক্ষে ছিলেন। তিনি কক্ষের বাহিরে যাইতেন না, মণিকঙ্কণা মাঝে মাঝে দ্বারের নিকট হইতে তাঁহাকে দেখিয়া যাইত। এক গৃহে থাকিয়াও দুই ভগিনীর মাঝখানে দূরত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল। আজ বিদ্যুন্মালা নিজ শয্যায় জাগিয়া শুইয়াছিলেন, মণিকঙ্কণা আসিযা তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিল, জলভরা চোখে বলিল—'রাজা যুদ্ধে চলে গেলেন।'

বিদ্যুন্মালা সবিশেষ কিছু জানিতেন না, কিন্তু রাজপুরীতে উত্তেজিত ছুটাছুটি দেখিয়া ও দুন্দুভিধ্বনি শুনিয়া বুঝিয়াছিলেন, গুরুতর কিছু ঘটিযাছে। তিনি মণিকঙ্কণার হাতের উপর হাত রাখিলেন, কিছু বলিলেন না। মণিকঙ্কণা আবার বলিল—'অর্জুনবর্মা এসেছিলেন।'

বিদ্যুন্মালা উঠিয়া বসিলেন, মণিকঙ্কণার মুখের কাছে মুখ আনিয়া সংহৃত স্বরে বলিলেন—*'কি বললি? কে এসেছিলেন?'*

মণিকঙ্কণা বলিল—'অর্জুনবর্মা এসেছিলেন। মাথার চুল থেকে জল ঝরে পড়ছে, কাপড় ভিজে; পাগলের মত চেহারা। রাজাকে কী বললেন, রাজা তাঁকে নিয়ে যুদ্ধে চলে গেলেন।'

বিদ্যুন্মালার দেহ কাঁপিতে লাগিল, তিনি চক্ষু মুদিয়া আবার শুইয়া পড়িলেন। তিনি জানিতেন, রাজা অর্জুনবর্মাকে নির্বাসন দিয়াছেন। তারপর হঠাৎ কী হইল! অর্জুনবর্মা ফিরিয়া আসিলেন কেন? অনিশ্চয়ের সংশয়ে তাঁহার অন্তর মথিত হইয়া উঠিল।

মণিকঙ্কণার অন্তরে অন্য প্রকার মন্থন চলিতেছে। রাজা যুদ্ধে গিয়াছেন। যাহারা যুদ্ধে যায় তাহারা সকলে ফিরিয়া আসে না। রাজা যদি ফিরিয়া না আসেন! সে অবসন্নভাবে বিদ্যুন্মালার পাশে শয়ন করিল, বাহু দিয়া তাঁহার কণ্ঠ জড়াইয়া লইয়া ম্রিয়মাণ স্বরে বলিল—'মালা, কি হবে ভাই?'

বিদ্যুন্মালা উত্তর দিলেন না। সারা রাত্রি দুই ভগিনী পরস্পরের গলা জড়াইয়া জাগিয়া রহিলেন।

বলরাম রাত্রে ঘুমায় নাই, রন্ধ্রের মধ্যে একটি মৃতদেহকে সঙ্গী লইয়া জাগিয়া ছিল। আবার যদি কেহ আসে, তাহাকে শহীদী'র শরবৎ পান করাইতে হইবে।...অর্জুন কি বিজয়নগরে পৌঁছিয়াছে? রাজাকে সংবাদ দিতে পারিয়াছে? সংবাদ পাইয়া রাজা কি তৎক্ষণাৎ সৈন্য সাজাইয়া বাহির হইবেন। যদি বিলম্ব করেন—

সকাল হইল। রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত, সাময়িকভাবে মেঘ সরিয়া গিয়াছে। বলরামের কৌতূহল হইল, দেখি তো মিঞা সাহেবরা কি করিতেছে। সে পাশের দিক দিয়া রন্ধ্রমুখের কাছে গিয়া বাহিরে উঁকি মারিল। যাহা দেখিল তাহাতে তাহার হৃৎপিণ্ড ধক্ করিয়া উঠিল।

মুসলমান সৈনিকেরা একটা প্রকাণ্ড কামান ঘুরাইয়া সুড়ঙ্গের দিকে লক্ষ্য স্থির করিয়াছে এবং তাহাতে বারুদ ভরিতেছে। উদ্দেশ্য সহজেই অনুমান করা যায়; কামান দাগিয়া তাহারা গুহামুখ ভাঙ্গিয়া দিবে, সেখানে যে অদৃশ্য শত্রু লুকাইয়া আছে তাহাকে বধ করিবে।

বলরাম দেখিল, কামানের গোলা রন্ধ্রের মধ্যে প্রবেশ করিলে জীবনের আশা নাই। সে আর বিলম্ব করিল না, ঝোলা হইতে যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে দ্রুত ফিরিয়া চলিল। প্রথম বাঁকের মুখে আসিয়া সে দেখিল এই স্থান বহুলাংশে নিরাপদ; কামানের গোলা সিধা পথে চলে, মোড় ঘুরিয়া আসিতে পারিবে না। সে বাঁক অতিক্রম করিয়া সুড়ঙ্গমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বিকট শব্দ করিয়া কামানের গোলা রন্ধ্রমধ্যে আসিয়া পড়িল। বড় বড় পাথরের চাঁই ভাঙ্গিয়া রন্ধ্রমুখ বন্ধ হইয়া গেল। ভাগ্যক্রমে ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলা বলরামের নিকট পৌঁছিল না।

এতক্ষণ যতটুকু আলো ছিল তাহাও আর রহিল না। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে বলরাম হাত বাড়াইয়া গুহাপ্রাচীর অনুভব করিতে করিতে পূর্বমুখে চলিল। মুসলমানেরা যদি ইতিমধ্যে পাহাড় ডিঙ্গাইয়া সুড়ঙ্গের পূর্বদিকে পৌঁছিয়া থাকে, তাহা হইলে—

অর্জুন রাজাকে লইয়া ফিবিবে কি না, কখন ফিরিবে, কে জানে।

কিছুদূব অগ্রসর হইবার পর একটা ধ্বনিব অনুবণন বলরামেব কানে আসিল। মানুষের কণ্ঠস্বর, দূর হইতে আসিতেছে। কিন্তু পাযাণগাত্রে প্রতিহত হইয়া বিকৃত হইয়াছে। শব্দের অর্থবোধ হয় না।

বলরাম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিল। ধ্বনি ক্রমশ কাছে আসিতেছে, স্পষ্ট হইতেছে। তারপর কণ্ঠস্বর পবিষ্কাব হইল—'বলরাম ভাই!'

মহাবিস্ময়ে বলরাম চিৎকার করিয়া উঠিল—'অর্জুন ভাই!'

অন্ধকারে হাতে হাত ঠেকিল, দুই বন্ধু আলিঙ্গনবদ্ধ হইল।

'বলরাম ভাই, তুমি বেঁচে আছ!'

'আছি। তুমি রাজাব দর্শন পেয়েছ?'

'পেয়েছি। রাজা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। কামানের শব্দ শুনলাম। ওরা কামান দাগছে?'

'হ্যাঁ। কামান দেগে গুহার মুখ উড়িয়ে দিয়েছে।'

'যাক, আর ভয় নেই। এস।'

বিজয়নগবের দশ হাজার সৈন্য পর্বতের পদমূলে সমবেত হইয়াছিল। বাজাব আদেশে তাহারা ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পর্বতপৃষ্ঠে আরোহণ করিল।

পর্বতের পরপারে বহমনী সৈন্যদল যখন দেখিল বিজয়নগরবাহিনী সত্যই উপস্থিত আছে তখন তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল না, কামান ও ছত্রাবাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

সেকালের মুসলমানেরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ছিল, সম্মুখ-যুদ্ধে কখনো পশ্চাৎপদ হইত না। কিন্তু গুলবর্গার বহমনী সুলতান আহমদ শা'র নিকট খবর পৌঁছিয়াছিল যে, তাঁহার অতর্কিত আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে।

বর্ষাকাল বিজয় অভিযানের উপযুক্ত কাল নয়; অবশ্য অতর্কিত আক্রমণ করিয়া পররাজ্য খানিকটা দখল করিয়া বসিতে পারিলে লাভ আছে, কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধ অসমীচীন। তিনি তাই সৈন্যদলকে ফিরিয়া আসিবার আদেশ পাঠাইয়াছিলেন।

বহমনী সৈন্যদল যুদ্ধ-স্পৃহা দমন করিয়া চলিয়া গেল। বিজয়নগরের সৈন্যদলও নিজ রাজ্যের সীমানা লঙ্ঘন করিল না। অবশ্যম্ভাবী যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

মহারাজ দেবরায় দুই হাজার সৈন্য পশ্চিম সীমান্তে রাখিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। অর্জুন ও বলরাম তাঁহার সঙ্গে আসিল।

ওদিকে পূর্ব-সীমানা হইতে ধন্নায়ক লক্ষ্মণও ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে শত্রুসৈন্য নদী পার হইবার উদ্যোগে করিতেছিল, নদীর পরপারে বিজয়গরের বাহিনী উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহারা বিমর্ষভাবে প্রস্থান করিল।

অতঃপর রাজা ও মন্ত্রী বহিঃশত্রু সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া আভ্যন্তরিক চিন্তায় মনোনিবেশ করিয়াছেন।

শ্রাবণ মাস সমাগত। রাজগুরু বিবাহের দিন স্থির করিয়াছেন; শ্রাবণের শুক্লা ত্রয়োদশীতে বিবাহ। সুতরাং বিবাহের কথাই সর্বাগ্রে চিন্তনীয়।

রাজা ও মন্ত্রী মিলিয়া মতলব স্থির করিয়াছেন যাহাতে সব দিক রক্ষা হয়। মতলব স্থির করিয়া তাঁহারা রাজগুরুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়াছেন। রাজগুরু পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া এই সামান্য কৈতবে সম্মতি দিয়াছেন।

একদিন দ্বিপ্রহরে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া মহারাজ বিরামকক্ষে আসিয়া বসিলেন। পিঙ্গলার হাত হইতে পান লইয়া বলিলেন—'বিদ্যুন্মালাকে পাঠিয়ে দাও। আর মণিকঙ্কণাকে আটকে রাখো। সে যেন এখন এখানে না আসে।'

কিছুক্ষণ পরে বিদ্যুন্মালা ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কয়দিনে তাঁহার শরীর কৃশ হইয়াছে, মুখে রক্তহীন পাণ্ডুতা। গতিভঙ্গি ঈষৎ আড়ষ্ট। তিনি রাজার সম্মুখে আসিয়া নতমুখে দাঁড়াইলেন।

রাজা ক্ষণকাল তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন—'শেষবার প্রশ্ন করছি। তুমি আমাকে বিবাহ করতে চাও না?'

বিদ্যুন্মালা নত নয়নে নির্বাক রহিলেন।

রাজা বলিলেন—'অর্জুনকেই তুমি আমার চেয়ে যোগ্যতর পাত্র মনে কর!'

এবারও বিদ্যুন্মালা নীরব, কেবল তাঁহার অধর ঈষৎ কম্পিত হইল।

রাজা একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন—'স্ত্রীজাতির চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়। যা হোক, তুমি যখন পণ করেছ অর্জুনকে ছাড়া আর কাউকে বিবাহ করবে না তখন তাই হবে, অর্জুনের সঙ্গেই তোমার বিবাহ দেব।'

বিদ্যুন্মালার মুখ অতর্কিত ভাবসংঘাতে অনির্বচনীয় হইয়া উঠিল, অধরোষ্ঠ বিবৃত হইয়া থর থর কাঁপিতে লাগিল। তিনি একবার ভয়সঙ্কুল চক্ষু রাজার দিকে তুলিয়া আবার নত করিয়া ফেলিলেন। তারপর কম্পিত দেহে ভূমির উপর রাজার পদমূলে বসিয়া পড়িলেন।

রাজা আঙ্গুল তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু একটি শর্ত আছে।'

বিদ্যুন্মালা ভয়ে ভয়ে আবার চক্ষু তুলিলেন। শর্ত! কি রূপ শর্ত!

রাজা বলিলেন—'তোমার বিদ্যুন্মালা নাম আর চলবে না। আজ থেকে তোমার নাম—মণিকঙ্কণা। বুঝলে?'

বিদ্যুন্মালা কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু ইহাই যদি শর্ত হয় তবে ভয়ের কী আছে? তিনি ক্ষীণ বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিলেন—'যথা আজ্ঞা আর্য।'

রাজা তখন ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন—'আমি গজপতি ভানুদেবের কন্যা বিদ্যুন্মালাকে বিবাহ করব বলে তাকে এখানে এনেছি। কিন্তু তুমি যদি অর্জুনকে বিবাহ কর, তাহলে আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। সুতরাং আজ থেকে তোমার নাম মণিকঙ্কণা। —যাও, আসল মণিকঙ্কণাকে পাঠিয়ে দাও।'

বিদ্যুন্মালা নত হইয়া রাজার পায়ের উপর মাথা রাখিলেন; উদ্বেলিত অশ্রুধারায় রাজার চরণ নিষিক্ত হইল।

বিদ্যুন্মালা চলিয়া যাইবার পর মণিকঙ্কণা আসিল। তাহারও গতিভঙ্গি শঙ্কাজড়িত, চক্ষু সংশয়ে বিস্ফারিত। সে অস্ফুট বাক্য উচ্চারণ করিল—'মহারাজ, আমাকে ডেকেছেন?'

রাজা বলিলেন—'হ্যাঁ। এস, আমার কাছে বোসো।'

মণিকঙ্কণা আসিয়া পালঙ্কের পাশে বসিল, বলিল—'মালা কাঁদছে কেন?'

রাজা বলিলেন—'আমি বকেছি। আমাকে বিয়ে করতে চায় না, তাই বকেছি।'

মণিকঙ্কণার মুখ ধীরে ধীরে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে লাগিল। সে একদৃষ্টে রাজার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

রাজা বলিলেন—'ও যখন আমাকে বিবাহ করতে চায় না তখন তোমাকেই আমি বিবাহ করব। —কেমন, রাজী?'

মণিকঙ্কণার মুখখানি আনন্দে উত্তেজনায় ভাস্বর হইয়া উঠিল। রাজা তর্জনী তুলিয়া বলিলেন—'কিন্তু একটি শর্ত আছে। আজ থেকে তোমার নাম— বিদ্যুন্মালা। মণিকঙ্কণা নামটা আমার মোটেই পছন্দ নয়।'

এই শর্ত! বিগলিত হাস্যে মণিকঙ্কণা মহারাজের কোলের উপর লুটাইয়া পড়িল।

সন্ধ্যার পর মহারাজের বিরামকক্ষে দীপাবলী জ্বলিয়াছে। রাজা একটি কোষবদ্ধ তরবারি কোলের উপর লইয়া পালঙ্কে বসিয়া আছেন। পালঙ্কের পাশে ভূমিতে বসিয়া মন্ত্রী নির্লিপ্তভাবে কুচকুচ সুপারি কাটিতেছেন।

অর্জুনবর্মা আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। নাগরিকের ন্যায় পরিচ্ছন্ন বেশবাস; হাতে অস্ত্র নাই। রাজা তাহার আপাদমস্তক দেখিলেন। তারপর ধীর গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'অর্জুনবর্মা, আমার আদেশে তুমি বিজয়নগর থেকে নির্বাসিত হয়েছিলে। সে আদেশ আমি প্রত্যাহার করলাম। তুমি দেশভক্তির চূড়ান্ত পরিচয় দিয়েছ, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মাতৃভূমিকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছ। তোমাকে আমার তুরঙ্গ বাহিনীর সেনানী নিযুক্ত করলাম। এই নাও তরবারি।'

অর্জুন হতবুদ্ধিভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর আভূমি প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

অর্জুনের পর বলরাম আসিল। প্রণাম করিয়া রাজার পায়ের কাছে মাটিতে বসিল। রাজা কিছুক্ষণ কঠোর নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'তুমি আমার অজ্ঞাতসারে অর্জুনের সঙ্গে পালিয়েছিলে, সেজন্য দণ্ডার্হ।'

বলরাম হাত জোড় করিল—'মহারাজ, ছেলেটা বড় কাতর হয়ে পড়েছিল তাই সঙ্গে গিয়েছিলাম।'

মহারাজ বলিলেন—'হুঁ! তুমি ক'টা ম্লেচ্ছ মেরেছ?'

বলরাম বিরসমুখে বলিল—'আজ্ঞা, মাত্র দু'টি।'

'আনুপূর্বিক বল।'

বলরাম সেদিন বিজয়নগর ত্যাগের পর হইতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল। শুনিয়া রাজা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, শেষে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—'সমস্তই দৈবের লীলা। হয়তো এইজন্যই হক্ক-বুক্ক এসেছিলেন। যা হোক, উপস্থিত তোমাদের ক্ষিপ্রবুদ্ধির জন্য বিপদ নিবারিত হয়েছে। তুমি যদিও দণ্ডনীয় তবে তোমাকে পুরস্কৃত করব।'—উপাধানের তলদেশ হইতে একটি সোনার অঙ্গদ বাহির করিয়া রাজা বলরামকে দিলেন—'এই নাও অঙ্গদ, পরিধান কর। এখন থেকে তুমি প্রধান রাজকর্মকার, অস্ত্রাগারের সমস্ত কর্মকার তোমার অধীনে কাজ করবে।'

বলরাম বাহুতে অঙ্গদ পরিল, মাটিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিল, তারপর আবার হাত জোড় করিল—'মহারাজ, দীনের একটি নিবেদন আছে।'

রাজা বলিলেন—'ভয় নেই, তোমার গুপ্তবিদ্যা প্রকাশ করতে হবে না।'

বলরাম বলিল—'ধন্য মহারাজ। আর একটি নিবেদন আছে।'

'আবার নিবেদন! কী নিবেদন?'

'মহারাজ, আমি বিবাহ করতে চাই।'

মহারাজের মুখে ধীরে ধীরে কৌতুকহাস্য ফুটিয়া উঠিল—'তুমিও বিবাহ করতে চাও! কাকে?'

'মহারাজ, তার নাম মঞ্জিরা। আপনার অন্তঃপুরে রন্ধনশালার দাসী।'

'তার পিতৃ-পরিচয় আছে?'

'আছে মহারাজ। মঞ্জিরার পিতার নাম বীরভদ্র, তিনি মহারাজের হাতিশালার একজন হস্তিপক। তাঁর অনুমতি চাইতে গিয়েছিলাম; তিনি বললেন, মহারাজ যদি অনুমতি দেন তাঁর আপত্তি নেই।'

রাজা কৌতূহল-ভরা চক্ষে কিছুক্ষণ বলরামকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—'বীরভদ্রের যদি আপত্তি না থাকে আমারও আপত্তি নেই। তুমি ধূর্ত বাঙ্গালী, তোমাকে বেঁধে রাখবার জন্য কঠিন শৃঙ্খল চাই। —এখন যাও, আগামী শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন তোমার বিবাহ হবে।'

বলরাম মহানন্দে প্রণাম করিতে করিতে পিছু হটিয়া কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

রাজা মন্ত্রীর পানে চাহিয়া হাসিলেন—'মন্দ হল না। একসঙ্গে তিনটি বিবাহ। যত বেশি হয় ততই ভাল। বরযাত্রীদের চোখে ধুলো দেওয়া সহজ হবে।'

সাত

রাজা এবং রাজকুলোদ্ভব পাত্র-পাত্রীদের বিবাহ হইবে পম্পাপতির মন্দিরে, ইহাই চিরাচরিত বিধি। রাজার অনুমতি থাকিলে অন্য বিবাহও পম্পাপতির মন্দিরে সম্পাদিত হইতে পারে।

রাজার বিবাহের তিথি জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইবার পর রাজ্যময় উৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। রাজা ইতিপূর্বে তিনবার বিবাহ করিয়াছেন, চতুর্থ বারে বেশি ধুমধাম হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সদ্য বিপন্মুক্তির পর রাজার বিবাহ, তাই উৎসব একটু বেশি জাঁকিয়া উঠিল। গৃহে গৃহে পুষ্পমালা দুলিল, নানা বর্ণের কেতন উড়িল। নাগরিকরা দলবদ্ধভাবে গীত গাহিতে গাহিতে নগর প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। চতুষ্পথে চতুষ্পথে বাজীকরের খেলা; মাঠে মাঠে মল্লযোদ্ধাদের বাহ্বাস্ফোট, হাতির লড়াই; তুঙ্গভদ্রার বুকে বিচিত্র নৌকাপুঞ্জের সম্মিলিত জলকেলি। বিজয়নগরের প্রজাগণ রাজাকে ভালবাসে, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উৎসবে গা ঢালিয়া দিয়াছে।

রাজসভার প্রাঙ্গণেও বিপুল মণ্ডপ রচিত হইয়াছে। সেখানে অহোরাত্র পান ভোজন, রঙ্গরস, নৃত্যগীত চলিয়াছে।

তারপর বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরে বিরাট হৈ হৈ পড়িয়া গেল। হাতি-ঘোড়ার শোভাযাত্রা; সৈন্যবাহিনী বাজনা বাজাইয়া সদর্পে কুচকাওয়াজ করিতে লাগিল। দলে দলে নাগরিক নাগরিকা মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া পম্পাপতির মন্দিরের দিকে ধাবিত হইল; তাহারা রাজার বিবাহ দেখিবে।

রাজবৈদ্য দামোদর স্বামী একটি ভৃঙ্গারে কোহল লইয়া অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইলেন। রসরাজ সবেমাত্র প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া জলযোগে বসিয়াছিলেন; দামোদর স্বামী দ্বারের নিকট হইতে ডাকিলেন—'বন্ধু, আমি এসেছি।'

ক্ষীণদৃষ্টি রসরাজ গলা শুনিয়া চিনিতে পারিলেন—'আরে বন্ধু, এস এস।'

দামোদর আসিয়া বসিলেন, ভৃঙ্গারটি সম্মুখে রাখিয়া বলিলেন—'আজ মহা আনন্দের দিন, তাই তোমার জন্য একটু কোহল এনেছি। সদ্য প্রস্তুত তাজা কোহল,, তুমি একটু দেখ।'

'এ বড় উত্তম কথা। আমার কোহল প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। সুতরাং এস, তোমার কোহলই পান করা যাক।'

দুই বন্ধুর উৎসব আরম্ভ হইয়া গেল।

ওদিকে অন্যান্য কন্যাযাত্রীরাও উপেক্ষিত হয় নাই। এতদিন তাহারা রাজার আতিথ্যে পানাহার বিষয়ে পরম আনন্দেই ছিল, কিন্তু আজ তাহাদেব সমাদব দশগুণ বাড়িয়া গেল। রাজপুরী হইতে ভারে ভারে মিষ্টান্ন পক্কান্ন পরমান্ন আসিল। সেই সঙ্গে কলস কলস সুরা। একদল রাজপুরুষ আসিয়া মিষ্টভাষায় সকলকে অনুরোধ উপরোধ নির্বন্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন; একবার স্বয়ং রাজা আসিয়া সকলকে দর্শন দিয়া গেলেন। কন্যাযাত্রীরা মাতিয়া উঠিল; অপর্যাপ্ত পানাহাবের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গভঙ্গি সহকারে নৃত্যগীত লম্ফঝম্ফ ক্রীড়াকৌতুক আরম্ভ করিযা দিল।

ফলে, বিবাহের লগ্নকাল যখন উপস্থিত হইল তখন দেখা গেল অধিকাংশ কন্যাযাত্রীই ধরাশায়ী; যাহাদের একটু সংজ্ঞা আছে তাহারা বিগলিত কণ্ঠে অশ্লীল গান গাহিতেছে এবং নিজ উরুদেশে মৃদঙ্গ বাজাইতেছে।

রসরাজের অবস্থাও অনুরূপ। বস্তুত গান না গাহিলেও তিনি মৃদুস্ববে কাব্যশাস্ত্রেব রসালো স্থানগুলি আবৃত্তি করিতেছেন এবং মদাসক্ত মসৃণ হাস্য করিতেছেন। কয়েকজন রাজপুরুষ আসিযা তাঁহাকে গরুব গাড়িতে তুলিয়া বিবাহস্থলে লইয়া গেল। কারণ, তিনি কন্যাকর্তা. বিবাহ-বাসবে তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন।

রাজপুরুষেরা রসরাজকে লইয়া বিবাহসভাব পুরোভাগে বসাইয়া দিল। পাশাপাশি তিন জোড়া বর-কন্যা বসিয়া আছে; রসরাজ দেখিলেন—ছয় জোড়া বর-কন্যা।' তিনি পাত্র-পাত্রীর মুখ-চোখ ভাল করিয়া দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ভাল করিয়া দেখিবার কী আছে? তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। তিনি আনন্দাশ্রু মোচন করিলেন, হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অচিবাৎ উপবিষ্ট অবস্থাতেই ঘুমাইয়া পড়িলেন।

যথাকালে বিবাহক্রিয়া শেষ হইল। সকলে জানিল, কলিঙ্গের রাজকন্যা বিদ্যুন্মালার সঙ্গে রাজার বিবাহ হইয়াছে। সন্দেহের কোনো কারণ নাই, তাই কেহ কিছু সন্দেহ করিল না। দর্শকেরা আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সন্তুষ্টচিত্তে গৃহে ফিরিয়া গেল।

আট

তৃতীয় দিন প্রত্যূষে কন্যাযাত্রীর দল মহা বাদ্যোদ্যম করিয়া বহিত্রে উঠিল। শ্রাবণের ভরা তুঙ্গভদ্রা দুই কূল প্লাবিত করিয়া ছুটিয়াছে, বহিত্র তিনটি স্রোতের মুখে ভাসিয়া চলিল। যাত্রীরা এই কয় মাস রাজ-সমাদরে খুবই সুখে ছিল. কিন্তু তবু ভিতরে ভিতরে গৃহের পানে মন টানিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সকলে বহিত্রের পাটাতনে বসিয়া জল্পনা করিতে লাগিল, বহিত্রগুলি দেড় মাসে কলিঙ্গপত্তনে ফিরিবে কিংবা দুই মাসে ফিরিবে। স্রোতের মুখে নৌকা শীঘ্র চলে। মন আরো শীঘ্র চলে।

বিজয়নগর হইতে দূরে তুঙ্গাভদ্রার শিলাবন্ধুর সৈকতে ছোট্ট গ্রামটির কথা ভুলিলে চলিবে না। সেখানে মন্দোদরীকে লইয়া চিপিটকমূর্তি আছেন। মন্দোদরীর মনে কোনো খেদ নাই। সে একটি স্বামী পাইয়াছে, গ্রামবধূরা তাহাকে রাঁধিয়া খাওয়ায়· ইতিমধ্যে সে গ্রামের ভাষা আয়ত্ত করিয়াছে, সকলের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া কথা বলিতে পারে। আর কী চাই? গ্রামে তাহার মন বসিয়া গিয়াছে, সারা জীবন এই গ্রামে কাটাইতে পারিলে সে আর কিছু চায় না।

চিপিটকের মনের অবস্থা কিন্তু মন্দোদরীর মত নয়। এই তিন মাসে গ্রামের পরিবেশ তাঁহার কাছে সহনীয় হইয়াছে, কিন্তু স্বদেশে ফিরিবার আশা তিনি ছাড়েন নাই। এখানে ছাগল চরানো বিশেষ কষ্টকর কর্ম নয়, কিন্তু আত্মমর্যাদার হানিকর। তিনি রাজ-শ্যালক—একথা কিছুতেই ভুলিতে পারেন না।

সেদিন দ্বিপ্রহরে আকাশ লঘু মেঘে ঢাকা ছিল, সূর্য থাকিয়া থাকিয়া ঘোমটা সরাইয়া নবধূর মত সলজ্জ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। চিপিটক ভোজনান্তে ছাগলের পাল লইয়া বনের দিকে যাইবার পূর্বে মন্দোদরীকে বলিয়া গেলেন—'নদীর ধারে যাবি। যদি নৌকা আসে—'

মন্দোদরী বলিল—'আচ্ছা গো আচ্ছা। তিন মাস ধরে নদীর ধারে যাচ্ছি, আজও যাব। কিন্তু কোথায় নৌকা! তারা কি এখনো বসে আছে, কোন্‌কালে দেশে ফিরে গেছে।'

'তবু যাস্‌।' চিপিটক গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া ছাগল চরাইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার আশার প্রদীপ ক্রমেই নির্বাপিত হইয়া আসিতেছে।

তারপর গ্রামের মেয়েবা ঘরের কাজকর্ম সারিয়া নদীতে জল আনিতে গেল, তখন মন্দোদরীও কলস কাঁখে তাহাদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে চলিল। মেয়েরা নদীর ঘাটে বেশিক্ষণ রহিল না, গা ধুইয়া নিজ নিজ কলসে জল ভরিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেল। মন্দোদরী বালুর উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া রহিল।

স্নিগ্ধ পরিবেশ। আকাশে মেঘ ও সূর্যের লুকোচুরি খেলা, সম্মুখে খরস্রোতা নদীর কলধ্বনি। একাকিনী বসিয়া বসিয়া মন্দোদরীর ঘুম আসিতে লাগিল। দিবানিদ্রার অভ্যাস তাহার এখনো যায় নাই।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত হইবার পর মুখে সূক্ষ্ম বৃষ্টির ছিটা লাগিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গিল। সে চোখ মুছিতে মুছিতে উঠিয়া বসিল। তারপর সম্মুখে নদীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একেবারে নিষ্পলক হইয়া গেল।

বৃষ্টির সূক্ষ্ম পর্দার ভিতর দিয়া দেখা গেল, আগে পিছে তিনটি বহিত্র নদীর মাঝখান দিয়া পূর্বমুখে চলিয়াছে। পাল-তোলা বহিত্র তিনটি মনে হয় কোন্ অচিন দেশের পাখি।

কিন্তু মন্দোদরীর প্রাণে বিন্দুমাত্র কবিত্ব নাই। সে দেখিল, অচিন দেশের পাখি নয়, তিনটি অত্যন্ত পরিচিত বহিত্র কলিঙ্গ দেশে ফিরিয়া চলিয়াছে।

মন্দোদরীর বুকের মধ্যে দুম্ দুম্ শব্দ হইতে লাগিল। সে ক্ষণকাল ব্যায়ত চক্ষে চাহিয়া থাকিয়া মুখে আঁচল ঢাকা দিয়া আবার শুইয়া পড়িল। কী আপদ! নৌকাগুলি এতদিন বিজয়নগরেই ছিল! এতদিন ধরিয়া কী করিতেছিল? ভাগ্যে গ্রামের অন্য কেহ দেখিয়া ফেলে নাই। জয় দারুব্রহ্ম।

তিন-চারি দণ্ড শুইয়া থাকিবার পর সে মুখের আঁচল সরাইয়া সন্তর্পণে উঁকি মারিল, তারপর গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

নৌকা তিনটি চলিয়া গিয়াছে, তুঙ্গভদ্রার বুক শূন্য।

সূর্য ডুবু ডুবু হইল। মন্দোদরী কলস কাঁখে লইয়া গজেন্দ্রগমনে ফিরিয়া চলিল।

চিপিটক গ্রামে গুহার সম্মুখে বসিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন, মন্দোদরীকে আসিতে দেখিয়া তাহার পানে সপ্রশ্ন ভ্রূভঙ্গি করিলেন। মন্দোদরী কলসটি গুহামুখের কাছে নামাইয়া হাত উলটাইয়া বলিল—'কোথায় নৌকা! মিছিমিছি ভূতের বেগার। কাল থেকে আমি আর যেতে পারব না, যেতে য় তুমি যেও।' বলিয়া মন্দোদরী গুহামধ্যে প্রবেশ করিল।

চিপিটক আকাশের পানে চোখ তুলিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন।

পরিশিষ্ট

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'বিষবৃক্ষ' বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ উপন্যাস। বাংলায় যাকে আমরা উপন্যাস বলি, ইংরিজিতে তার স্পষ্ট দুটি ভাগ, রোম্যান্স এবং নভেল। বঙ্কিমচন্দ্র 'রোম্যান্স' দিয়েই তাঁর লেখা শুরু করেছিলেন—দুটি ঐতিহাসিক রোম্যান্স ও একটি কাব্যিক রোম্যান্স। নভেল জাতীয় উপন্যাস তিনি এই প্রথম লিখলেন বলে পাঠকসমাজ ও সমালোচকমহলে তার অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। সেই সময়ের বিখ্যাত পত্রিকা Calcutta Review (Vol.LVII, 1873) এই উপন্যাসের পরিচয় দিতে গিয়ে লেখে ঃ

"This novel whose appears at the head of this notice, now reprinted from the *Bangadarsana*, was to be found in the baitakhana of every Bengali Babu throughout the whole of last year. It is quite of a different character from its predecessors. While the others were all historical, 'men and women as they are, and life as it is' is the motto of the present one."

অর্থাৎ একেবারে সঠিক ব্যাপারটাই সমালোচনায় ধরা পড়েছিল। 'প্রবাসী' পত্রিকার আশ্বিন, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসের একটি সমালোচনা করেছিলেন। তিনিও প্রায় এই একই কথা বলেছিলেন ঃ

"বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্চে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা' ও 'মৃণালিনী' লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরেজিতে যাকে বলে রোমান্স। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা।...

'বিষবৃক্ষে' কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"

দুটি সমালোচনাতেই উল্লেখ করা হয়েছে, উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়েরই সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এটি প্রকাশিত হয়। আসলে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ বৈশাখ, ১২৭৯ সংখ্যা থেকেই ধারাবাহিক ভাবে এটি প্রকাশিত হতে থাকে। এটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৩ সালে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালেই এর আটটি সংস্করণ হয়ে যায়। গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণে উৎসর্গপত্রটি ছিল এইরকম ঃ

'কাব্যপ্রিয় পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্তবাবু জগদীশনাথ রায় সুহৃদ্বরকে এই গ্রন্থ বন্ধুত্ব ও স্নেহের চিহ্নস্বরূপ অর্পিত হইল।'

উপন্যাসটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল বলে অমৃতলাল বসু এর একটি নাট্যরূপ দেন এবং সাধারণ রঙ্গালয়ে সেটি দীর্ঘদিন অভিনীত হয়।

'বিষবৃক্ষ' বিভিন্ন ভারতীয় ও বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়েছে। এর ইংরেজি অনুবাদ করেন মিরিয়ম এস্ নাইট ১৮৮৪ সালে, তিনি এর নাম দেন 'The Poison Tree'। ১৮৯১ সালে এর হিন্দি অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয় সুইডিশ ভাষায় এর অনুবাদ।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে স্বয়ং ঔপন্যাসিকেরই যে দুর্বলতা ছিল, তার কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। নবীনচন্দ্র সেন 'আমার জীবন'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, তাঁর সামনে বিষবৃক্ষের অংশবিশেষ পড়তে পড়তে বঙ্কিমচন্দ্র কেঁদে ফেলেছিলেন, বলেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ আমি পড়িতে পারি না। তুমি অন্য কিছু শুনিতে চাও ত পড়ি।' চতুর্থ খণ্ডে তিনি লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ কন্যাও যে কুন্দনন্দিনীর মতো আত্মহত্যা করেছিল, এ কথা মনে করলেই তাঁর কষ্ট হত।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'প্রতিনিধি' সংবাদপত্রে বিষবৃক্ষের সমালোচনা করেছিলাম এবং সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছিল তা তিনি 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন ঃ

"প্রতিনিধি' নামক সংবাদপত্রে আমি 'কুন্দনন্দিনী' চরিত্রের সমালোচনা করিয়াছিলেন। বঙ্কিমবাবু পড়িয়া বলিয়াছিলেন, সামান্য চরিত্র, তার অত বিশ্লেষণের দরকার ছিল না। আমি বলিলাম, 'এক বিষয়ে চরিত্রটি আমার কাছে অসামান্য বলিয়া বোধ হয়—উহার নিশ্চেষ্ট সরলতা, আর কোথাও অমন চিত্র দেখি নাই।' বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'আমি তিলোত্তমার চরিত্রেও একটু তাহা দেখাইয়াছি।' আমি বলিলাম, 'কুন্দে তাহার বিকাশ অনেক বেশি।"

এই গ্রন্থেই শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আব একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ কবেছেন। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন— "শুনেছি, বিষবৃক্ষে আপনার নিজের জীবনের একটা ছবি আছে, ইহা কি সত্য কথা?' উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'কতক সত্য বই কি, তবে আসলের উপব অনেক রং ফলাইতে হইয়াছে।"

শেষের কবিতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'শেষেব কবিতা'ব প্রচ্ছদ

'শেষের কবিতা' ১৩৩৫ সালে রচিত ও প্রবাসী পত্রে (ভাদ্র-চৈত্র ১৩৩৫) মুদ্রিত হয়ে ১৩৩৬ সালে ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হয।

নির্মলকুমারী মহলানবিশ-লিখিত 'কবির সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে' (১৩৬৩) গ্রন্থে 'শেষের কবিতা' রচনাব ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। লেখিকা জানিয়েছেন ১৯২৮ সালে দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণসঙ্গী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও নির্মলকুমারী মহলানবিশের অনুরোধে মুখে মুখে কথিত একটি গল্পে শেষের কবিতার সূচনা। লেখিকাব বিবরণে গল্পটি এই—

"ধরো গল্প শুরু করা যাক—টিং টিং টিং টেলিফোন বেজে উঠেছে, বাড়িব একটি মেয়ে গিয়ে ধরল টেলিফোন—ও প্রান্ত থেকে যে কথা কইছে তার গলা অচেনা, ছেলেটি কিছুতেই নামও বললে না। খানিকটা কথা হবার পর হঠাৎ টেলিফোন থেমে গেল। মেয়েটি তো অবাক। কে, কী বৃত্তান্ত, কিছুই জানে না, অথচ কথা বলবার পর থেকে বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে। পরদিন আবার ঘণ্টা। ক্রমে এমন হল যে মেয়েটি রোজ অপেক্ষা ক'রে থাকে বিকেল বেলা টেলিফোন বাজবে ব'লে। যে ছেলেটি কথা বলে সে কিছুতেই নাম ঠিকানা বলে না। শুধু এইটুকু বলেছে যে সেও কখনো মেয়েটিকে দেখে নি, তবু তার কথা এত শুনেছে যে, আলাপ না ক'বে থাকতে পাবল না। মেয়েটিব বাড়িতে যে সে আসতে চায় না তাব কারণ পাছে দেখা হ'লে তার এই ভালোলাগাটুকু চ'লে যায়, তাই সে দূরে দূরেই রইল। টেলিফোনের ভিতর দিয়ে এই যে পরিচয় সেইটুকুতেই সে খুশি থাকবে। মেয়েটিব কথা কার কাছ থেকে শুনেছে তাও সে কিছুতেই বলতে রাজি নয়। এই রকম ক'রে টেলিফোনের আলাপ যখন বেশ জ'মে উঠেছে এমন সময হঠাৎ একদিন ছেলেটি বললে যে সে বিদেশে চ'লে যাচ্ছে কাজেই আর গল্প করা হবে না। কিছুদিন পরে মেয়েটি শিলং পাহাড়ে চেঞ্জে গেল। সেখানে একদিন গাড়ির আকস্মিক দুর্ঘটনা। যে ভদ্রলোক সাহায্য করলেন তাঁর গলা শুনে মেয়েটি চমকে উঠল, তিনিও বুঝলেন কাকে সাহায্য কবেছেন। টেলিফোনেব ভিতর দিয়ে তাদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল যে পরস্পরকে চিনতে একটুও দেরি হল না" ইত্যাদি। গল্পটা মোটেই এরকম ছোটো নয় এবং এত শুক্‌নো তো নয়ই।

'শেষের কবিতা'র নাম প্রথমে ছিল 'মিতা'।

'শেষের কবিতা'র 'নির্ঝরিণী' কবিতাটি স্বতন্ত্রভাবে পাঠ্যগ্রন্থে সংকলিত হলে কেউ কেউ তার অর্থব্যাখ্যানের জন্য অনুরোধ করেন। সুনীলচন্দ্র সরকারের পত্রের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

শেষের কবিতা গ্রন্থে 'নির্ঝরিণী' কবিতার বিশেষ উপলক্ষে বিশেষ অর্থ ছিল। তার থেকে বিশ্লিষ্ট করে নেওয়াতে তার একটা সাধারণ অর্থ খুঁজে বের করা দরকার হয়। আমার মনে হয় সেটা এই যে, আমাদের বাইরে বিশ্বপ্রকৃতির একটি চিরন্তনী ধারা আছে, সে আপন সূর্য-চন্দ্র আলো-

আঁধার নিয়ে সর্বজনের সর্বকালের। জ্যোতিষ্ক-লোকের ছায়া দোলে তার ঝর্নার ছন্দে। জীবনে কোনো বিপুল প্রেমের আনন্দে এমন একটা পরম মুহূর্ত আসতে পারে যখন আমার চৈতন্যের নিবিড়তা আপনাকে অসীমের মধ্যে উপলব্ধি করে—তখন বিশ্বের নিত্য উৎসবের সঙ্গে মানবচিত্তের উৎসব মিলিত হয়ে যায়, তখন বিশ্বের বাণী তারই বাণী হয়ে ওঠে। ইতি ৫ বৈশাখ ১৩৪৩।

শেষের কবিতা গ্রন্থে অমিত রায়ের উক্তিতে যে-সকল ইংরেজি কবিতাংশ ব্যবহৃত, নিচে সেই কবিতাগুলির ও তাদের রচয়িতার নাম দেওয়া হল। শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় ও শিশিরকুমার ঘোষ এই নির্দেশপঞ্জি সংকলন করে দিয়েছেন।

For God's sake
"The Canonization", John Donne (1572-1631)
For we are bound
"Passage to India", Walt Whitman (1819-1892)
O What is this
"The Ecstasy", Arthur Symons (1865-1945)
Blow gently over my garden
"The Beloved", Katherine Tynan Hinkson (1861-1931)
Tender is the night
"Ode to a Nightingale", John Keats (1795-1821)

এই উপন্যাসে অনেকগুলি কবিতা আছে যা অব্যবহিত পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া'-র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কবিতাগুলি উপন্যাসের কোন পরিচ্ছেদে আছে এবং মহুয়ায় তার নাম কী হয়েছে, উল্লেখ করা হল ঃ

শেষের কবিতা	কবিতা	মহুয়া কাব্যগ্রন্থ
পরিচ্ছেদ ২	পথ বেঁধে দিল বন্ধনহীন গ্রন্থি,	পথের বাঁধন
নিবারণ চক্রবর্তী	আমরা দুজন চলতি হাওয়ার পন্থী	
পরিচ্ছেদ ৬	রে অচেনা, মোর মুষ্টি ছাড়াবি কী করে,	অচেনা
নিবারণ চক্রবর্তী	যতক্ষণ চিনি নাই তোরে?	
পরিচ্ছেদ ৭	ঝর্না, তোমার স্ফটিক জলের স্বচ্ছধারা	নির্ঝরিণী
নিবারণ চক্রবর্তী		
পরিচ্ছেদ ১২	তোমারে দিইনি সুখ, মুক্তির নৈবেদ্য	নৈবেদ্য
লাবণ্য	গেনু রাখি,	
লাবণ্য	সুন্দর, তুমি চক্ষু ভরিয়া এনেছ অশ্রুজল	অশ্রু
অমিত	সুন্দরী তুমি শুকতারা	শুকতারা
	সুদূর শৈলশিখরান্তে	
অমিত	কত ধৈর্য ধরি	
	ছিলে কাছে দিবসশর্বরী	প্রণতি
পরিচ্ছেদ ১৩	তোমারে ছাড়িয়া যেতে হবে রাত্রি যবে	বাসরঘর
নিবারণ চক্রবর্তী		
পরিচ্ছেদ ১৭	কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও।	বিদায়
লাবণ্য		
অমিত	তব অন্তর্ধানপটে হেরি তব রূপ চিরন্তন	অন্তর্ধান

'রবীন্দ্রনাথ ঃ কথা সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-আন্দোলনের পুরোধা বুদ্ধদেব বসুর মন্তব্য স্মরণীয় ঃ

"বাংলা সাহিত্যের একটি সন্ধিক্ষণ তখন, 'কল্লোল'কে কেন্দ্র ক'রে হাওয়া বদল ঘটেছে, আর তাই নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে সমালোচনা।...তারুণ্যের সেই সংঘাতের দিনে রবীন্দ্রনাথের আদর্শ আর মেনে নিতে পারছিনা আমরা,...কিন্তু 'শেষের কবিতা'র প্রথম কিস্তি বেরোনমাত্র বিকিয়ে যেতে হ'লো। মাসে মাসে এই আশ্চর্য নতুন রচনাটি পড়তে পড়তে আমাদের মনে হ'লো যেন একটা বন্ধ দুয়ার, যা আমাদের আনাড়ি হাতের আঘাতে কোনো উত্তর দেয় নি, তা এক যাদুকরের স্পর্শে হঠাৎ খুলে গেলো—দেখা গেলো আমাদেরই অনেক স্বপ্নের চোখ-ধাঁধানো মূর্তি। আমরা যা-কিছু চেষ্টা করছিলাম অথচ ঠিক পারছিলাম না, সেই সবই রবীন্দ্রনাথ করেছেন—কী সহজে, কী সম্পূর্ণ ক'রে, কী সুন্দর ভঙ্গিতে। মনে হ'লো বইটা যেন আমাদেরই, অর্থাৎ নবীন লেখকদেরই উদ্দেশ্যে লেখা, আমাদেরই শিক্ষা দেবার জন্য এটি গুরুদেবের একটি তির্যক ভর্ৎসনা। অবাক হয়ে দেখলুম, রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক' মূর্তি—আমরা আধুনিক বলতে যা ভাবছিলাম ঠিক তা নয়, কিন্তু তারই কোনো সার্থক রূপান্তরে যেন আমাদের কল্পিত রবীন্দ্রযুগের সীমানা এক ধাক্কায় অনেক দূরে সরে গেলো; যেটাকে আমরা 'রবীন্দ্রযুগ' আখ্যা দিয়েছিলাম, সেটা যে নিজেই গতিশীল এবং পরিবর্তনশীল তা বুঝতে পেরে অনেক ধারণা বদলে গেলো আমাদের। বার বার যিনি নবজাত, প্রায় সত্তর বছরে আবার, তাঁর এক নূতন জন্ম।"

পরিণীতা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এই গ্রন্থকে অনেকে শরৎচন্দ্রের বড়গল্প হিসাবেই গ্রহণ করেন। শরৎসমিতি কর্তৃক প্রকাশিত শতবার্ষিক সংস্করণেও একে বড়গল্পই আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

এটি প্রকাশিত হয় 'যমুনা' পত্রিকার ফাল্গুন, ১৩২০ সংখ্যায়। পরে ১৩২১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে এটি গ্রন্থাকাবে প্রকাশ করেন রায় এম. সি. সবকার বাহাদুর এন্ড সন্স। গ্রন্থে কোনো উৎসর্গপত্র ছিল না।

আরণ্যক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

এই গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ। এটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ করেন ক্যাত্যায়নী বুক স্টল। বর্তমানে মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর সংস্করণটিই প্রচলিত। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে আছে ঃ

গৌরীকে দিলাম

এটি কী ধরনের গ্রন্থ, উপন্যাস অথবা ডায়েরি, ভ্রমণ অথবা আত্মজীবনী—ইত্যাকার বিতর্ক সমালোচক মহলে প্রচলিত আছে। সেই কারণে গ্রন্থের সঙ্গে লেখকের যে ছোট নিবেদন ছিল 'প্রস্তাবনা'-র আগে, সেটি এখানে দেওয়া হল ঃ

"মানুষের বসতির পাশে কোথাও নিবিড় অরণ্য নাই। অরণ্য আছে দূরদেশে যেখানে পতিতপক্ক জম্বুফলের গন্ধে গোদাবরী তীরের বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। আরণ্যক সেই কল্পনা-লোকের বিবরণ। ইহা ভ্রমণ বৃত্তান্ত বা ডায়েরী নহে—উপন্যাস। অভিধানে লেখে 'উপন্যাস' মানে বানানো গল্প। অভিধানকার পণ্ডিতদের কথা আমরা মানিয়া লইতে বাধ্য। তবে 'আরণ্যক'-এ পটভূমি সম্পূর্ণ কাল্পনিক নয়। কুশী নদীর অপর পারে এরূপ দিগন্তবিস্তীর্ণ অরণ্যপ্রান্তর পূর্বে ছিল, এখনও আছে। দক্ষিণ ভাগলপুর ও গয়া জেলার বনপাহাড় তো বিখ্যাত।"
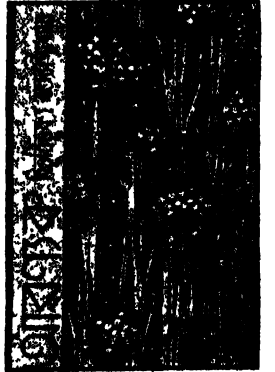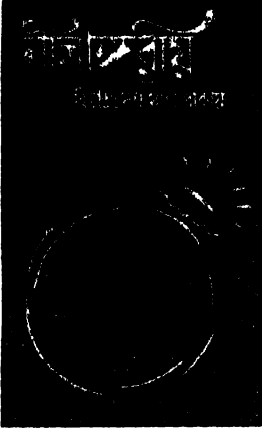
নীলাঙ্গুরীয় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বইটির প্রকাশ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের জন্মাষ্টমীতে, প্রথম (প্রকাশভবন) প্রকাশ মাঘ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে ছিল :

আমার স্নেহভাজন কনিষ্ঠ
শ্রীহরিভূষণ মুখোপাধ্যায়কে

প্রথম সংস্করণে লেখকের একটি ভূমিকা ছিল, সেটা এখানে উল্লেখ করা খুবই দরকার, কারণ 'বরযাত্রী' ও সমজাতীয় গ্রন্থের স্রষ্টা হিসাবে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় মূলত কৌতুক রসের লেখক রূপেই পাঠকের কাছে পরিচিত হয়েছেন। কিন্তু এ গ্রন্থটি যে আদৌ সেই ধরনের রচনা নয়, এ বিষয়ে সচেতন থাকবার জন্যও ভূমিকাটি আমাদের মনে রাখা দরকার :

"'নীলাঙ্গুরীয়' বইখানির একটু ইতিহাস আছে। শ্রাবণ, ১৩৪৬-এর শনিবারের চিঠি 'কশ্চিৎ প্রৌঢ়' 'ভালবাসা' শীর্ষক একটি রচনা প্রকাশিত করেন। লেখক তাহাতে ভালবাসার নানা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া শেষে তাঁহার পাঠকের নিজের নিজের অভিমত জানাইবার জন্য আহ্বান করেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন যে, মানুষের এই মনোবৃত্তিটি উপরে উপরে মোটামুটি সবল এবং নিরীহ মনে হইলেও আসলে অত্যন্ত জটিল। 'কশ্চিৎ প্রৌঢ়ে'র আহ্বানে আমি 'ভালবাসা' নামক একখানি গল্প 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত করি; যাহা পরে 'বসন্ত' নামক গল্পসংগ্রহে বাহির হইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি ভালবাসার সঙ্গে খাওয়াইবার ইচ্ছা থাকাও বিচিত্র নয়।

বৃত্তিটির জটিলতার আরও একটা দিক দেখাইবার ইচ্ছা থাকায় এই বইখানির অবতারণা। কতদূর সফল হইলাম বিদগ্ধ পাঠক বিচার করিবেন। আর একটা কথা,—'নীলাঙ্গুরীয়' কৌতুক রসের লেখা নয়। গোড়া থেকেই একটা অন্যবিধ প্রত্যাশায় থাকিয়া পাঠে বাধা জন্মাইতে পারে বলিয়া এটুকু বলিয়া দেওয়া প্রয়োজন মনে করিলাম।"

গ্রন্থটি সম্বন্ধে পাঠকের আরো একটা ব্যাপারে সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি, বিভূতিভূষণ এই উপন্যাসে অনেক ইংরেজি বাক্য ব্যবহার করেছেন—যে সমাজের মানুষের আখ্যান লিখছেন তাঁদের মুখে এগুলি অপরিহার্য ছিল বলে। প্রত্যেকটি বাক্যের যে বাংলা তর্জমা তিনি করে দিয়েছেন তাতে এমনকী কথ্য ইংরেজি ভাষার ওপরও তাঁর কী অসাধারণ দখল ছিল, তা বুঝতে পারা যায়।

কবি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাকারে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় 'ফাল্গুন, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে। উৎসর্গপত্রে ছিল :

সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয়
শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার
শ্রদ্ধাভাজনেষু

গ্রন্থের ভূমিকায় মোহিতলাল মজুমদার (মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ) এই উপন্যাসকে বড় গল্প আখ্যা দিয়েছেন, কখনও কাব্যও বলেছেন

এবং উপন্যাস হিসাবেও স্বীকার করেছেন। তিনি এ সম্বন্ধে যে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"'কবি' নামে এই বড়গল্পটি পাঠ করিয়া আমি তাবাশঙ্করের কবিশক্তির মূল প্রেরণা, বা প্রধান লক্ষণটির সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে পারিয়াছি।...

এই 'কবি' নামক কাব্যখানিতে তারাশঙ্কর একটা জাতির সেই মর্মস্থল উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন—ওই ক্ষুদ্র কাহিনীটিতে তিনি তাহার সেই সহস্র বৎসরের হৃদয়স্পন্দন ধরিয়া দিয়াছেন।...

প্রথমত, এ জাতির আভিজাত্য-গৌরব বলিয়া প্রকৃত কোনো গৌরব নাই; ইহার গৌরব—সর্ববিশেষণবর্জিত, উচ্চ-নীচ-অভিমানহীন, ওই ভূমির মতোই সমতলবাহিনী একটি অতি সরল অকৃত্রিম মানবতায়।

দ্বিতীয়ত, বাঙালীর ওই যে নিজস্ব জাতিগত বা রক্তগত আকৃতি, তাহা সমাজের উপরের স্তরে শাস্ত্র-শাসনের ও সমাজ-বন্ধনের কঠিন কবচে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলেও, ব্রাহ্মণ হইতে নিম্নতম শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত সকলের চিত্তে উহা সমান; সমাজের ওই কৃত্রিম শ্রেণীবিভাগ সত্ত্বেও, ভাবের বা রসের ক্ষেত্রে একটি আশ্চর্য সমানুভূতি সমগ্র জাতিকে সমপ্রাণ করিয়া রাখিয়াছে—এমন দুই-একটি তন্ত্রী আছে, যাহাতে ঝঙ্কার দিলে আর সকল তন্ত্রী ঐকতানে বাজিয়া ওঠে,—ইহাও দেখিতে পাই।

তৃতীয়ত, সেইভাব—যাহা বাঙালীর ওই সমাজ-জীবনেব নানা বন্ধন ও নানা অস্বাস্থ্যকর সংস্কার-জঞ্জালের তলায় পড়িয়া জীবনেব গতিধাবায় বিক্ষিপ্ত ও বিপর্যস্ত হইযা থাকে—তাহারও সাধনমার্গ আছে; অর্থাৎ যাহা রক্তগত, তাহাকেই বীজরূপে আশ্রয় করিয়া সেই বীজের পূর্ণবিকাশ-সাধনের একটা নিজস্ব পন্থাও আছে। এই পন্থাও প্রকৃতির পন্থা, ইহা শাস্ত্রনির্দিষ্ট নয়, ইহার পথ বাঙালী আপনার অনুভূতি—অর্থাৎ নিজ অন্তরের ক্ষুধা-অনুযায়ী আপনি খুঁজিয়া লয়। ইহারই নাম 'সহজিয়া'—বাঙালীই এই মন্ত্রের আদি-সাধক। সে কেমন সাধনা, এ গল্পের ওই 'কবিযাল' নায়ক তাহার একটি চমৎকৃত দৃষ্টান্ত। ইহাও এক অর্থে প্রকৃতি-সাধনা। বাঙালী আসলে শাক্তও নয়, বৈষ্ণব নয়, বৌদ্ধও নয়, বেদান্তীও নয়; সে সকলই কতকগুলো বাহিরের ছাঁচমাত্র; সে ছাঁচ সে যেমন গড়ে তেমনি ভাঙে; তাহার ভিতরকার সেই তরল বস্তুটা চিরদিন তরলই আছে। ছাঁচগুলো ভাঙিয়া তাহা দেখিবার সুবিধা হইবে না। তাই তারাশঙ্কর, যেখানে ছাঁচেব বালাই নাই, সেইখান হইতেই এই মূর্তিটি তুলিয়া লইয়া, সেই তরলকে আমাদেব চোখেব সম্মুখে পর্দায় দানা বাঁধিতে দেখাইয়াছেন। সেই সহজের এমন কাহিনী বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে পাই নাই।"

সুতীর্থ · জীবনানন্দ দাশ

লেখকের মৃত্যুর দু-দশক পরে ধারাবাহিক উপন্যাস হিসাবে 'দেশ' পত্রিকায প্রথম প্রকাশিত হয় ছত্রিশটি সংখ্যায়।

প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ পৌষ, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দে।

প্রকাশক ঃ ময়ূখ বসু, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩।

প্রচ্ছদ ঃ সত্যজিৎ রায়।

খুব স্বাভাবিক কারণেই এর আখ্যাপত্রে কোনও উৎসর্গপত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

তুঙ্গভদ্রার তীরে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

লেখকের ডায়ারি অনুযায়ী এই উপন্যাস রচনার শুরু ২১ জুলাই, ১৯৬৩, শেষ ১৭ এপ্রিল, ১৯৬৫। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৭২ সালের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে আনন্দ পাবলিশার্স

প্রাইভেট লিমিটেড থেকে প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়, পয়লা অগ্রহায়ণ, সালে। প্রচ্ছদশিল্পী অজিত গুপ্ত।

উৎসর্গপত্রে ছিল ঃ

বাংলা সাহিত্যের বিক্রমশীল ধর্মপাল
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
সুহৃদয়েষু

লেখকের একটি ভূমিকা ছিল, সেটি এইরকম ঃ

'এই কাহিনীর ঐতিহাসিক পটভূমিকা Robert Sewell-এর A Forgotten Empire এবং কয়েকটি সমসাময়িক পাণ্ডুলিপি হইতে সংকলিত। Sewell-এর গ্রন্থখানি ৬৫ বছরের পুরাতন। তাই ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সম্পাদিত সাম্প্রতিক গ্রন্থ The Delhi Sultanate পাঠ করিয়া Sewell-এর তথ্যগুলি শোধন করিয়া লইয়াছি। আমার কাহিনীতে ঐতিহাসিক চরিত্র থাকিলেও কাহিনী মৌলিক; ঘটনাকাল খৃ ১৪৩০-এর আশেপাশে। তখনো বিজয়নগর রাজ্যের অবসান হইতে শতবর্ষ বাকি ছিল।

অনেকের ধারণা পোর্তুগীজদের ভারতে আগমনের (খৃ ১৪৯৮) পূর্বে ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন ছিল না। ইহা ভ্রান্তধারণা। ঐতিহাসিকেরা কেহ কেহ অনুমান করেন, 'সুলতান ইল্‌তুৎমিসের সময় ভারতবর্ষে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পরবর্তীকালে স্বয়ং বাবর শাহ তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন যে, বাঙালী যোদ্ধারা আগ্নেয়াস্ত্র চালনায় নিপুণ ছিল। এই কাহিনীতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবতারণা অলীক কল্পনা নয়। তবে বাবর শাহের আমলেও ক্ষুদ্র আগ্নেয়াস্ত্র ভারতে আবির্ভূত হয় নাই।

দেশ-মান সম্বন্ধে সেকালে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। চাণক্য এক কথা বলেন, অমরসিংহ অন্য কথা। আমি মোটামুটি ৬ ফুটে ১ দণ্ড, ২০ গজে ১ রজ্জু এবং ৩ মাইলে ১ ক্রোশ ধরিয়াছি।

পরিশেষে বক্তব্য, আমার কাহিনী Fictionised history নয়, Historical Fiction.'

এই গ্রন্থ ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র-পুরস্কার লাভ করে।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে কিছু উল্লেখযোগ্য মানুষের অভিমত ঃ

রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ 'আপনি বিজয়নগরের অতীত ঐশ্বর্যের স্মৃতি একটি মনোরম কাহিনীর মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—এজন্য আমরা অর্থাৎ ঐতিহাসিকেরা খুবই কৃতজ্ঞ—কারণ লোকে ইতিহাস পড়ে না—কিন্তু আপনার বই পড়িবে। Alexander Dumas যে উদ্দেশ্য নিয়ে Three Muskateers প্রভৃতি লিখিয়াছিলেন আপনার দুইখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়া তেমনি শশাঙ্কের পরবর্তী সময়কার বাংলা ও দেবরায়ের বিজয়নগর সম্বন্ধে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।'

প্রমথনাথ বিশী ঃ 'আপনার গল্প পড়তে পড়তে বঙ্কিমবাবুকে মনে এনে দেয়—তিনি ছাড়া আপনার জুড়ি নেই। এর অধিক প্রশংসাবাক্য জানি না।'

সুকুমার সেন ঃ 'অনেকদিন বাংলা বই পড়ে এমন তৃপ্তি পাইনি। আপনি গল্পের মধ্যে অনেক রস প্রবাহিত করেছেন।'

[কৃতজ্ঞতা ঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ]

—0—